ছাড়বে না। শ্রী নেহর, নিজেই বলেছেন যে, পর্তুগীজ গভর্নমেণ্ট ভারত সরকারকে উত্তেজিত করবার চেষ্টা করছেন। ভারত সরকার যদি গোয়া সমস্যা সমাধানের জন্য সামরিক পন্থা অবলম্বন করতে বাধ্য হন তাহলে গোয়া থেকে পর্তুগীজদের পালাবার একটা অজুহাত ও পথ হয়, তা নাহলে নাকি পর্তুগালের বর্তমান গভর্নমেণ্টের পতন হবে। ভারত সরকারের এ অনুমান কতখানি সত্য জানি না। কিন্তু যদি সত্য হয়, তাহলে তো বলা যায় যে, ভারত সরকারের একরকম জানাই ছিল যে, ১৫ই আগস্ট বেশিসংখ্যক সত্যাগ্রহী গোয়ায় প্রবেশ করলে পর্তু-গীজেরা একটা গুরুতর নৃশংস কাণ্ড ঘটাবে।

তাহলে ভারত সরকারের নীতির তাৎপর্য কী? পর্তুগীজদের বর্বরতা বিশ্ববাসীর সামনে অবশ্য প্রকট হয়েছে। যাঁরা প্রাণ দিয়েছেন তাঁদের আত্মদান নিশ্চয়ই বৃথা যাবে না। কিন্তু ভারত সরকার কি তাঁদের কর্তব্য ঠিক মতো করেছেন না করছেন? একদিক দিয়ে দেখতে গেলে, ১৫ই আগস্টের হত্যাকাণ্ড তাঁরা হ'তে দিয়েছেন। যাই ঘটুক, ভারত সরকার কোনো অবস্থায়ই বলপ্রয়োগের নীতি অবলম্বন করবেন না—এরূপ ঘোষণা করা এবং সেই সংগে গোয়ায় সত্যাগ্রহ যাত্রা করতে দেওয়ার ফল যে এইরকম হবে তা পর্তুগীজদের কাজ ও মনোভাব থেকে ভারত সরকারের অনুমান করতে না পারার কোনো কারণ ছিল না। বরঞ্চ এই ধারণাই হবার কথা যে, পর্তু-গীজরা ভারত সরকারকে উত্তেজিত—শ্রী নেহরুর ভাষায় "provoke"—করার জন্য এইরকমই কিছু করবে। নিজেদের কৃতকর্মের জন্য পর্তুগীজদের বিশ্বের জনমতের কাছে জবাবদিহি করতে হবে, বিশ্বের জনমতের চাপে পর্তুগীজরা এখন বেকায়দায় পড়বে—এই আশার মূল্য পরীক্ষা করার পূর্বে ভারতের জনমত ভারত সরকারের জবাবদিহি দাবী করতে [illegible] অনেকের বিশ্বাস যে, ভারত [illegible] পূর্ব থেকেই জানিয়ে দিতেন [illegible] বলপ্রয়োগ [illegible] ভারত [illegible]

রকম ব্যবহার [illegible]ত। কিন্তু এখনো ভারত গভর্নমেণ্ট বলছেন যে, তাঁরা কোনো অবস্থা[য়]ই সামরিক উপায় অবলম্বন করবেন না।

তবে মুশকিল হচ্ছে এই যে, ১৫ই আগস্টের ঘটনার পরে ভারতেই অশান্তি দেখা দিয়েছে যা নিবারণ করার জন্য সরকারকে ভারতবাসীদের বিরুদ্ধেই বল-প্রয়োগ করতে হচ্ছে। ভারত সরকার পর্তুগীজদের সংগে "অহিংস" নীতি অবলম্বন করছেন কিন্তু তার ফলে ভারতে ভারতবাসীদের মধ্যে সহিংস ব্যবহারের প্রকাশ দেখা যাচ্ছে এবং তার প্রতি-বিধানের জন্য ভারত সরকারকে সহিংস পন্থা নিতে হচ্ছে।

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রিত্বের পেয়ালা সুরাবর্দী সাহেবের ঠোঁটের কাছে এসেও সরে গেল। শেষ পর্যন্ত মুসলিম লীগ ও ইউনাইটেড ফ্রণ্টের কোয়ালিশন হোল। মুসলিম লীগের দলপতি চৌধুরী মহম্মদ আলি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। আওয়ামী লীগের শর্ত ছিল, মিঃ সুরাবর্দীকে প্রধানমন্ত্রী করতে হবে, ইউনাইটেড ফ্রণ্টের নেতা মিঃ ফজলুল হকের চেষ্টা ছিল যেন তেন প্রকারেণ সেটা ঠেকানো। মুসলিম লীগ মিঃ সুরাবর্দীকে ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী করতে প্রস্তুত ছিল কিন্তু আওয়ামী লীগ কাউন্সিল তাতে রাজী হয়নি। পরে আওয়ামী লীগ [illegible] বিবৃতি দিয়েছে তাতে বলা হয়েছে [illegible] মিঃ সুরাবর্দীকেই প্রধানমন্ত্রী করা হবে, এরকম শর্তের উপর আওয়ামী লী[গ] জোর দেয়নি। আওয়ামী লীগ চেয়েছি[ল] যে, পূর্ব[বং]গের কাউকে প্রধানমন্ত্রী করা হবে। [গ]ভর্নর জেনারেল এবং প্র[ধান]মন্ত্রীর মধ্যে একজন পূর্ব পাকি[স্তান] এবং এক[জ]ন পশ্চিম পাকিস্তান [থে]কে নেয়ার নীতির উপর নাকি আওয়ামী লীগ জোর দিয়েছিল। মিঃ সুরাবর্দী ছাড়া পূর্ব পাকিস্তান থেকে অন্য কাউকে প্রধানমন্ত্রী [করা হ]লে নাকি আওয়ামী লীগের আপত্তি [ছি]ল না। একথার কোনো মূল্য [illegible] যেতে পারে বলা কঠিন [illegible] ইউনাইটেড ফ্রণ্টও [illegible] এক [illegible] ভিত্তিতে কাজ করতে পারেও [illegible] কারণ নেই। তবে [illegible]

ইস্কান্দার মির্জা সাহেব অস্থায়ী গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হবার পূর্বে [illegible] বিষয়ের [illegible] ছিলেন পাকিস্তানী মন্ত্রিমণ্ডলীতে ফজলুল হক সাহেব সেই বিষয়ের ভার [illegible]পেয়েছেন! অর্থাৎ ফজলুল হক সাহেব এখন পাকিস্তানের Minister for the Interior—যাকে ভারতে বলা হয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বা হোম মিনিস্টার। এই ফজলুল হক সাহেবকেই ইস্কান্দার মির্জা সাহেব [illegible] বছর আগে বিশ্বাসঘাতক এবং দেশ-দ্রোহী আখ্যা দিয়েছিলেন এবং তাঁকে দিয়ে রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করার প্রতিশ্রুতি লিখিয়ে নিয়েছিলেন।

যাই হোক, কোয়ালিশন তো হ'ল [illegible] উভয় দল যদি তাঁদের স্ব স্ব [ঘো]ষিত নীতি সমর্থন করেন তাতে চা[illegible] [illegible] কনস্টিট্যুশন কেমন [illegible] তৈরী [illegible] বুঝা যায় না। কারণ ইউনাইটেড ফ্রণ্ট আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য regional autonomy—চায় যেটা মুসলিম লীগ চায় না। মুসলিম লীগ চেয়ে [illegible] চাচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তানকে এক ইউনিট করতে। কিন্তু তাতে অথচ পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে [illegible] ইউনাইটেড ফ্রণ্ট রাজী নয় [illegible] regional autonomy স্বীকৃত না [illegible] কনস্টিট্যুশন কীভাবে তৈরী হ[বে] [illegible] আওয়ামী লীগ যখন কোয়ালিশনে [illegible] তখন এ সম্ভাবনা আছে যে বিরোধী হিসাবে আওয়ামী লীগ পশ্চিম পাকিস্তানকে এক ইউনিট করার বিরুদ্ধে regional autonomy-র পক্ষে [illegible] করে দাঁড়াবে। তবে আওয়ামী লীগ কোয়ালিশনের মধ্যে টানার চেষ্টা [illegible] চলছে, লেন-দেনের শর্ত নিয়ে [illegible] বুঝাপড়া যদি হয়ে যায় তবে আও[য়ামী] লীগও কোয়ালিশনে যোগ দিতে [illegible] তখন আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য এবং প[শ্চিম] পাকিস্তানকে এক ইউনিট করার ব্যা[পারে] দলগুলির মধ্যে কী বুঝাপড়া হয় [বলা] যায় না। আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যের [illegible] ব্যাপারে পূর্ববংগের প্রতিনিধিদের যাঁরাই তাঁদের পূর্বঘোষিত নীতি [illegible] করবেন তাঁরাই পূর্ববংগের জন[সাধারণের] শ্রদ্ধা হারাবেন এবং পূর্ববংগ [illegible] রাজনৈতিক ভবিষ্যতও [illegible]

ডাক্তারের ডায়েরী

—ডাঃ আনন্দকিশোর মুন্সী

(৮)

বর্ষাকাল। সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠেই দেখলাম দিগন্তে খুব ঘনঘটা। দেখতে দেখতে কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে গেল। এমন গর্জন শুরু হল, মনে হল, আকাশ ফেটে টুকরো টুকরো হয়ে ঝরে পড়বে বুঝি। কোন এক হোমরা চোমরা মহাকবি যেন বলে-ছিলেন—মর্নিং শোজ্ দি ডে। ঘুম থেকে উঠে মুখ ধুয়ে চা খেতে খেতে ঐ ইংরেজ কবির খুব তারিফ করে আমার রুম মেট্ বিনু বললে—আজ আর দেখতে হয় না। অ্যায়সা জল হবে যে, শহর ভেসে যাবে। রাস্তায় জল দাঁড়াবে। কলেজে যেতে হবে না।

তখন আমি মেডিক্যাল কলেজে সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ি। মেসে থাকি। একঘরে তিনজন। বিনু, হাজারী এবং আমি। তিনজনেরই এক ক্লাস। সকাল বেলা মেঘের এই আড়ম্বর দেখে কলেজে যেতে হবে না ভেবে মনে খুব ফুর্তি হল।

আমরা যে মেসটায় থাকতাম, ঘণ্টা-খানেক জোরে বৃষ্টি হলেই তার সামনের রাস্তাটা জলে ডুবে যেত। ২।৩ ঘণ্টা না কাটলে সে জল সরত না। এই তিরিশ বছরে কলকাতার কত পরিবর্তন হল, কত পুরোনো বাড়ি ভেঙে কত বড় বড় রাস্তা হল; তার পাশে কত বিরাট বিরাট নতুন বাড়ি উঠল, শহর কত বড় হল, কিন্তু একটু বেশি বৃষ্টি হলে আগেও যা হত, এখনও দেখি ঠিক তাই। এখনও সেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা ট্রাম বন্ধ, এখনও এখানে-ওখানে সেই হাঁটু জল। একবার জল জমলে দেখি শিগগির আর নাবে না।

সেদিন কিন্তু সকালের ঐ ঘনঘটার গর্জনই শুধু সার হল। বর্ষণ আর হল না। বেশ কিছুক্ষণ ফাঁকা আওয়াজ করে মেঘ কেটে গেল। ঝকঝকে রোদ উঠল। মাঝখান থেকে আমাদের ফুর্তিটাই শুধু মাঠে মারা গেল। এনাটমি না খুলে তাস নিয়ে বসব ভেবেছিলাম, তা আর হল না। যে ইংরেজ মহাকবির তারিফ মুহূর্তকাল আগেও তিন মুখে করেছি, এখন তাঁরই মুণ্ডপাত করে আবার সেই এনাটমি আর মড়ার হাড় বার করে মুখস্ত করতে বসে গেলাম। তিনজনে তিন তক্তাপোশে।

হাজারী বললে,—দেখলেন তো ইংরেজদের কিম্বদন্তী? সব বোগাস্। ওসব ভাঁওতা কি এদেশে চলে? আমাদের মুনি-ঋষিরা যা বলে গেছেন, তা ওল্টানো বাবা ইংরেজ-ফিংরেজের কর্ম নয়। সেই কবে বলে গেছেন—প্রভাতে মেঘাড়ম্বরে দাম্পত্য কলহে চৈব, বহ্বারম্ভে লঘু ক্রিয়া। দেখলেন কেমন হাতে হাতে ফলে গেল? অক্ষরে অক্ষরে? মর্নিং শোজ্ দি ডে!! ফুঃ।

গ্রে সাহেবের লেখা এগারশ' পাতার মোটা এনাটমি খুলে তিনজনে তিনটি মাথার খুলি হাতে নিয়ে বই দেখে মিলিয়ে পড়তে শুরু করলাম। মানুষের মাথার খুলি কি করে ঘাড়ের শিরদাঁড়ার ওপর বসে আর ডাইনে-বাঁয়ে ইচ্ছেমত ঘোরে, তার কায়দাটা যেই কোন প্রকারে কণ্ঠস্থ করেছি, অমনি নীচে কি যেন একটা গোলমাল শোনা গেল। চেঁচামেচি কিছু নয়। দোতলা থেকে ছেলেরা সব হুড়মুড় করে নীচে নাবছে মনে হল। একতলার আজ হঠাৎ কি হল? পড়া ফেলে দৌড়ে ভেতরের বারান্দায় এসে নীচে তাকিয়ে দেখি একজন অপরিচিত ভদ্রলোককে ঘিরে আমাদের মেসের ছেলেরা সব দাঁড়িয়ে। সবাই খুব গম্ভীর। কেমন যেন একটা থমথমে ভাব। আমাদের পাশের ঘরের একটি ছেলে নীচে নেমে গিয়েছিল, তাকে ওপর থেকেই ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম—কি হয়েছে মশাই?

ছেলেটি আমাদের দিকে তাকিয়ে ঠোঁটে আঙুল দিয়ে ইশারায় চুপ করতে বলে নীচে নেবে আসতে বললে। এ আবার কি? এত চুপচাপ, ফিসফাসের কি হল?

চটপট নীচে নেবে গেলাম। শুনলাম, কি হয়েছে। একতলার চার নম্বর ঘরে ফার্স্ট ইয়ারের যে নতুন ছেলেটি মাস-খানেক হল এসেছে, তার মৃতদেহ পাওয়া গেছে কর্পোরেশনের এক পার্কে। আফিং খেয়ে আত্মহত্যা করেছে। এই ভদ্রলোক খবর এনেছেন।

শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

ফার্স্ট ইয়ারের এই ছেলেটির সঙ্গে আমাদের আলাপ-পরিচয় হয়নি। কী নাম, কোথায় বাড়ি, কিছুই জানতাম না। দেখেছি ছেলেটির চেহারা খুব সুন্দর। ধবধবে ফর্সা রং, লম্বা-চওড়া জোয়ান। মাথায় কোঁকড়া কোঁকড়া লম্বা চুল। ফুল বাবুটি সেজে থাকত। শুনেছি নতুন

বিয়ে করেছে। কলকাতাতেই শ্বশুরে বাড়ি। গিলেকরা চুড়িদার আদ্দির পাঞ্জাবি, আর তাঁতের মিহি ধুতি পরত। জামা-কাপড়ে বিলাতী দামী সেন্ট ব্যবহার করত।

মেসে ওকে বড়-একটা দেখতে পাওয়া যেত না। সারাদিন বাইরে বাইরেই কাটাত। গভীর রাত্রে মেসে ফিরে প্রায়ই নাকি খেত না। শনি, রবি, এ দুদিন তো মোটেই মেসে ফিরত না। শ্বশুর বাড়ি থাকত। মেসের কারুর সঙ্গেও বিশেষ মিশত না। তাই ওর সম্বন্ধে কেউ কিছু বলতে পারল না। এবারে শনিবার মেস থেকে গিয়েছে। আজ মঙ্গলবার, এখনও মেসে ফেরে নি। এরই মধ্যে হঠাৎ আফিং খেতে গেল কেন?

যে ভদ্রলোক খবর এনেছিলেন, তিনি বললেন—রোজ ভোরে উঠে আমি ঘণ্টা দুই পায়ে হেঁটে বেড়াই। কোনদিন হয়ত ময়দানে যাই, কোনদিন যাই অন্য কোন পার্কে। ময়দান অথবা পার্কে বেশ খানিকক্ষণ ঘুরে ট্রামে করে বাড়ি ফিরি। আজ মাইল দুই হেঁটে ঐ পার্কে ঘুরতে ঘুরতে দক্ষিণ দিকের কোণের ঝোপটার কাছে যেতেই শুনলাম বাগানের মালী চেঁচাচ্ছে—এদিকে শীগগির আসুন বাবু, খুন হয়েছে। গিয়ে দেখি, ঝোপের ভেতর ঘাসের ওপর এক ভদ্রলোক শুয়ে। চোখ বন্ধ, মুখে ফেনা। এক হাতে একখানা খাতা আর এক হাতে কলম। খাতায় নিজের নাম-ঠিকানা সব লেখা। নিজে হাতে লিখে গেছেন কোথা থেকে আফিং কিনে কখন খেয়ে কিভাবে আত্মহত্যা করলেন। ঐ ঠিকানা দেখেই বাড়ি ফেরবার পথে আপনাদের এই খবরটা দিতে পারলাম। বলে ভদ্রলোক চলে গেলেন।

আমরা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের ঘরে এই খবর দিতে গেলাম। আমাদের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট একজন নতুন পাশ-করা ডাক্তার। সব শুনে বললেন—যে খবর নিয়ে এসেছে, সে কোথায়?

বললাম—সে তো খবর দিয়েই চলে গেছে।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বললেন—ওকে ছেড়ে দেওয়া আপনাদের ঠিক হয়নি। সঙ্গে নিয়ে থানায় যাওয়া উচিত ছিল।

বললাম—কর্পোরেশনের পার্কে সুইসাইড হয়েছে, ওরাই তো থানায় খবর দেবে। আমাদের উচিত ছেলেটার বাড়িতে খবর দেওয়া। ওর লোকাল গার্জেন কে?

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের খাতা খুলে ওর শ্বশুরে বাড়ির ঠিকানা পাওয়া গেল। ২।৩ জন চলল সেখানে খবর দিতে, আর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে নিয়ে আমরা রওনা হলাম ঐ পার্কে।

মেসের গলি থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তায় এসে ট্রামে উঠলাম। তখন কলকাতায় এত লোক ছিল না। ট্রামে এত ভিড় হত না। ট্রাম থেকে আমরা পার্কের কাছে এসে নামলাম। এই পার্কটা ছিল খুবই নির্জন। আজ দেখলাম বেশ লোক।

বড় রাস্তার গেট দিয়ে ঢুকে পার্কটা পার হয়ে দক্ষিণপূর্ব কোণে ছ' ফুট উঁচু ক্রোটন দিয়ে ঘেরা বেশ বড় একটি কুঞ্জ। তার পাশ দিয়ে সরু রাস্তা। কোণে একটি গ্যাস পোস্ট। গ্যাসের আলো কুঞ্জের ভেতরে পড়ে, কিন্তু ঘন ক্রোটনের বেড়া ভেদ করে বাইরে থেকে দেখা যায় না। ভেতরটা পুরু সবুজ ঘাসে ঢাকা। চার কোণায় চারটি ছোট রঙিন পাতা বাহারের গাছ।

এই কুঞ্জের ভিতরে ছেলেটি ঘাসের ওপরে চিত হয়ে শুয়ে আছে। গায়ে সেই গিলে করা ধবধবে আদ্দির পাঞ্জাবি। পরনে মিহি তাঁতের ধুতি। পায়ে ঝকঝকে কালো পাম্প-শু। মাথার নীচে নতুন কেনা গ্রের মোটা এনাটমি। বুকের উপর এক হাতে একখানা একসারসাইজ বুক, আর একহাতে একটি ফাউণ্টেন পেন। পাশে লেমনেডের একটা বোতল আর একটি কাঁচের গ্লাস।

দেখলাম অমন সুন্দর ফর্সা রং দিনেই কেমন কালো হয়ে গেছে। খোঁচা খোঁচা দাড়ি গজিয়েছে। [illegible] কোঁকড়া চুল উসকো খুসকো হয়ে [illegible] পড়েছে। মুখ দিয়ে গাঁজলা বেরিয়ে [illegible] সে কি গাঁজলা! মুখ থেকে প্রায় [illegible] ছয়েক বেরিয়ে ঘন হয়ে যেন মোচা[illegible] মত জমে আছে।

রাতে বৃষ্টি হয়নি, তাই এ[illegible] তেমনি অক্ষত আছে। পিঁপড়ে সব [illegible] বেঁধে চোখেমুখে ঘুরে বেড়াচ্ছে। [illegible] মনে হল অনেক আগেই মৃত্যু হয়ে[illegible]

তবু আমাদের সুপারিণ্টে[illegible] কাছে গিয়ে ওর বুকে একবার স্টে[illegible] কোপ বসালেন। চোখের পাতা [illegible] চোখের তারা দেখলেন। আঙুলের [illegible] দিয়ে চোখের মণি ছুঁয়ে প্রাণের [illegible] খুঁজে দেখলেন। হাত পা টেনে দে[illegible] শক্ত হয়ে গেছে। বললেন, চার পাঁচ [illegible] আগেই মৃত্যু হয়েছে।

ছেলেটির বাঁ হাতের খাতায় [illegible] আছে—

> One more unfortunate
> weary of breath
> Rashly Importunate
> Gone to his Death.

তারপর বাংলায় ওর নাম ঠিক[illegible] তারিখ দিয়ে লিখেছে—আমার মৃ[illegible] জন্য আমি নিজেই শুধু দায়ী। [illegible] কেউ নয়। আমি নিজের ইচ্ছায় সজ্ঞ[illegible] প্রাণত্যাগ করলাম। কেউ হয়ত বলবে ত[illegible] ভীরু, কাপুরুষ, কেউ বলবে পাগ[illegible] তাদের সকলকে কলা দেখিয়ে আমি [illegible] যাচ্ছি।

এ পৃথিবীতে আসা না আসার উ[illegible] আমার কোন হাত ছিল না। [illegible] এখানে থাকা না থাকা সম্পূর্ণ আ[illegible] ইচ্ছাধীন। যতদিন ইচ্ছে থাকব, [illegible] খুশি চলে যাব, কেউ আমাকে রু[illegible] পারবে না। ইচ্ছে থাকলেও এ পৃথিব[illegible] থাকা যায় না। মৃত্যু এসে বাগড়া [illegible] কিন্তু যাবার পথ সব সময় খোলা। ইচ্ছে চলে যাব।

এতদিন বেশ ছিলাম, আজ কেন চলে যাবার ইচ্ছে হল, তার নি[illegible] একটা খুব জোর কারণ আছে। সেট

তা আমি বলব না। যার বোঝবার সে ঠিক বুঝবে।

অনেক দিন তো বেঁচে থাকলাম। আর বেঁচে কি হবে? শুনেছি পটাশিয়াম সায়ানাইড খেলে খুব তাড়াতাড়ি মৃত্যু হয়। আমি তা চাই না। তাই আফিং খেয়েছি। আফিংএ বেশ নেশা হয়! এখনই বেশ হচ্ছে। মনটা ভারি হালকা লাগছে।

কালীঘাট, ভবানীপুর, ধরমতলা, চিৎপুর, শ্যামবাজার সব জায়গার দোকান থেকে একটু একটু করে কিনে যে পরিমাণ আফিং আমি খেয়েছি, তাতে এক্ষুণি হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে স্টমাক পাম্প দিলে হয়ত বাঁচতে পারি। কিন্তু সে সুযোগ আমি কাউকে দেব না। তাই বেছে বেছে শহরের প্রান্তে জনহীন এই বিরাট পার্কের এমন নিরালা কুঞ্জটি খুঁজে খুঁজে বার করেছি। এনার্টামিখানা মাথায় দিয়ে এই ঘাসের ওপর এমন আরাম করে শুয়ে গ্যাসের এই স্বল্প আলোর কেমন চমৎকার নিজের কথা লিখতে পাচ্ছি। এখান থেকে গোঁ গোঁ করলে অথবা চেঁচালেও কেউ শুনতে পাবে না।

আফিং খেলে এত ভাল লাগে, মনে কোন ক্ষোভ থাকে না, আগে জানলে কবে এটা খেয়ে দেখতাম। আজ আমার এই পৃথিবীতে কারো ওপর কোন অভিমান নেই। কোন নালিশ নেই। যারা আমাকে দুঃখ দিয়েছে, কষ্ট দিয়েছে, আঘাত হেনেছে, তাদের সবাইকে আজ এই মুহূর্তে আমি অনায়াসে ক্ষমা করতে পারছি।

এই পর্যন্ত বেশ লিখেছিলাম। আর লিখতে ইচ্ছে হচ্ছে না। মাথাটা কেমন যেন ঝিম ঝিম করছে। মিছি মিছি লিখে আর কি হবে? এইবার আমি ঘুমুবো। খুব ঘুম পাচ্ছে। হাই উঠছে। লিখতে ভাল লাগছে না। ইচ্ছেও হচ্ছে না। হাতেও কোন জোর পাচ্ছি না।

এর পর আর লেখা নেই। হিজিবিজি কতকগুলো কালির আঁচড়। কোন অক্ষর বোঝা যায় না। মানেও হয় না। কোন স্বাক্ষরও নেই। শেষ কথাগুলো বেশ জড়িয়ে জড়িয়ে ফাঁক ফাঁক করে লেখা। আঁকা বাঁকা লিখতে লিখতে হাত অবশ হয়ে এক কোণে ঢলে পড়েছে। কলমের মুখে খাতার ওপর আঁকাবাঁকা দাগ পড়েছে। স্পষ্টই বোঝা যায়, যতক্ষণ জ্ঞান ছিল, ছেলেটা নিজের মনের কথা লিখে যেতে চেষ্টা করেছে।

আত্মহত্যার মৃত্যু এই প্রথম আমার নিজের চোখে দেখা। পরে কত মৃত দেহই না দেখেছি। গলায় দড়ি দেওয়া, বিষ খাওয়া, জলে ডোবা, আগুনে পোড়া, ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়া। পোস্ট মর্টেম করে কত দেহের মৃত্যুর কারণ নির্ণয় করতে হয়েছে। পরীক্ষা দিয়ে পাশ করতে হয়েছে। ডাক্তার হতে হলে সব ছাত্রকেই এসব করতে হয়। কিন্তু তখন আমি মেডিক্যাল কলেজে সেকেণ্ড ইয়ারে মাত্র উঠেছি। রোগ অথবা অপঘাত কোন মৃত্যুই হাসপাতালে দেখিনি। তাই ঐ ছেলেটির এই মৃত্যু এবং ওর লেখা এই কথাগুলো এখনও আমার চোখে এত স্পষ্ট ভাসে।

আত্মহত্যা যারা করে, তাদের চেষ্টা থাকে কেউ যেন না বোঝে। টের না পায়। ধরে না ফেলে। তাই গোপনে নিজেকে তৈরি হতে হয়। প্রাণনাশের উপায় ভেবে চিন্তে ঠিক করতে হয়। সংগ্রহ করতে হয়। সুযোগের অপেক্ষা করতে হয়।

বি এস-সি যখন পড়তাম, তখন কলকাতার একটি ছেলে মফস্বলে গিয়ে আমাদের সঙ্গে ভর্তি হল। প্রাকটিক্যালে পাশ করা কলকাতায় তখন সহজ ছিল না। তাই ও কলকাতা ছেড়ে আমাদের হস্টেলে গিয়ে উঠল। চমৎকার স্বাস্থ্য। খুব ভাল বাঁশী বাজাত। ওর বাঁশী যারাই একবার শুনেছে জীবনে কখনও তা ভুলতে পারবে না। খুব বন্ধুত্ব হয়ে গেল।

আমাদের কলেজে কেমিস্ট্রির ল্যাবরেটরিতে তখন পটাশিয়াম সায়ানাইড একটা মুখ ভাঙ্গা কাঁচের পেট মোটা বোতলে শেলফের নীচের তাকে খোলা পড়ে থাকত অন্য সব কেমিক্যালের সঙ্গে। সল্ট রিডিউস করবার জন্য যার যতটা খুশি ঐ সায়নাইড ভাঙ্গা বোতল থেকে হাতের তেলোয় ঢেলে নিজের টেবিলে নিয়ে এসে আমরা রেখে দিতাম। যতটুকু দরকার ব্যবহার করে বাকিটা ফেলে দিতাম। জিনিসটা যে কি সাংঘাতিক বিষ, মানুষের দেহে ঢুকলে যে কত দ্রুত মৃত্যু ঘটাতে পারে, আমরা যেভাবে ওটা নাড়া-

চাড়া করতাম, তা দেখে কেউ কখনও তা ভাবতে পারত না।

হোস্টেলে সেই সময় কোত্থেকে একটা হুলো বেরাল এল। রাত্রে তো ডাকাডাকি চেঁচামেচি করতই, দিনেও ওর উৎপাতের সীমা ছিল না। ঘরদোর নোংরা করত। চায়ের দুধ খেয়ে যেত। দুধের পাত্র ভাল করে ঢেকে ভারি কোন বই দিয়ে চেপে না রাখলে ওর মুখ থেকে রক্ষা করা যেত না। তাই দেখে আমাদের বন্ধুটি ভীষণ রেগে গেল। বললে, ব্যাটাকে পটাশিয়াম সায়ানাইড খাইয়ে একদিন মারব। শুনে আমরা তামাসা ভেবে হেসেই উড়িয়ে দিলাম।

একদিন দুধের সঙ্গে সত্যি সত্যি ও সায়ানাইড মিশিয়ে রাখল। বেরালটা ঐ দুধ খেয়ে মরে গেল। ল্যাজ ধরে তুলে বেরালটাকে হাসতে হাসতে বাইরে নর্দমায় ফেলে দিয়ে এল। ওর এই নৃশংস কাণ্ড দেখে আমরা মর্মাহত হলাম। প্রতিবাদ করলাম।

শুনে ও শুধু হাসল। বলল—তোরা সব ল্যাবা কান্ত। স্রেফ মেয়ে মানুষ! তোদের ভাল করলেও তোরা রাগ করিস।

সেদিন রাত্রে রবীন্দ্রনাথের 'এখনও গেল না আঁধার, এখনও রহিল বাধা' গানখানা বাঁশীতে তুলে এমন দরদ দিয়ে ও বাজালো যে, আমরা সবাই মুগ্ধ হয়ে গেলাম। ওর উপর আর রাগ করে থাকা গেল না। আবার ভাব করে ফেললাম।

বি এস-সি পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি এসে মাসখানেক পরে একদিন কাগজে দেখি ও পটাশিয়াম সায়ানাইড খেয়ে আত্মহত্যা করেছে। সায়ানাইডের শিশির গায় আমাদের কলেজের লেবেল মারা।

পরে শুনলাম, যে মেয়েটিকে ও ভালবাসত, তার সঙ্গে মেলামেশা ওর মা পছন্দ করতেন না। তাই নিয়ে মার সঙ্গে ঝগড়া করে সেইদিন রাত্রে ছাদে গিয়ে চুপি চুপি এই কাণ্ড করেছে।

হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় যদি এটা করে থাকে, তাহলে অত আগে এই বিষ কলেজ থেকে সংগ্রহ করে ও নিজের কাছে রেখে ছিল কেন? এর উত্তর আজও আমি পাইনি।

আজ এই ছেলেটির লেখা পড়ে মনে হল ওর মনেও একটা ক্ষত ছিল। চিঠির কথার ফাঁকে ফাঁকে একটা লুকোনো অভিমান ফুটি ফুটি করছে। যেন কোন ব্যক্তিবিশেষের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। কিন্তু সে কে? শ্বশুর-বাড়ির কেউ কি?

এমনি সময় ছেলেটির শ্বশুর বাড়ির কয়েকজন ভদ্রলোক এসে পড়লেন। প্রথমটায় ওঁরা তো বিশ্বাসই করেননি যে, ছেলেটি এমন কাজ কখনও করতে পারে। আমাদের মেসের যে ছেলেরা খবর দিতে গিয়েছিল, তাদের অনেক রকম জেরা করে শেষে বললেন এ হতেই পারে না। নিশ্চয়ই এ নামের অন্য কোন লোক। আপনারা নিজের চোখে দেখে এসেছেন কি?

আমাদের ছেলেরা স্বীকার করলে যে, নিজের চোখে ওরা দেখে আসেনি সত্যি। একদল গেছে দেখতে। ওরা এসেছে এখানে। খবর দিতে।

শুনে ওঁরা বাড়িতে কিছু না ভেঙে নিজের চোখে দেখতে এসেছেন। এদৃশ্য দেখে প্রৌঢ় মতন এক ভদ্রলোক মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। শুনলাম ইনিই ছেলেটির শ্বশুর। ভদ্রলোক দুঃখ করে বলতে লাগলেন—দেখুন, কি সর্বনাশ আমার ও করে গেল। কত খোঁজ খবর করে, কত রকম করে বেছে এত টাকা খরচ করে ভাল পাত্র দেখে মেয়ের বিয়ে দিয়ে দেখুন আমার কি হল। মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করলাম, মেসে রেখে মাস মাস কত টাকা খরচ হল, মেয়েটার ভবিষ্যৎ ভেবে কিছুই তা গ্রাহ্য করিনি। পরশু রাতে মেয়েটার সঙ্গে কি নিয়ে কথা কাটাকাটি করে ঝগড়া বাঁধিয়ে চলে এসে যে এমন কাণ্ড করে বসবে কি করে তা বুঝব বলুন দেখি?

ভদ্রলোককে আমরা আর কি বোঝাব? সামান্য দাম্পত্য কলহে যে সত্যি সত্যি এমন সাংঘাতিক পরিণতি হতে পারে, ক'জনই বা তা আগে দেখেছে? দেখলে কি আর অত সহজে কেউ বলতে পারত বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া?

হঠাৎ এক ভদ্রলোক ছুটতে ছুটতে এসে বললেন—এখানে নাকি আফিং খে[illegible] কে পড়ে আছে? কোথায় সে?

ভদ্রলোক সম্পূর্ণ অচেনা। আমরা চিনি না, ছেলেটির শ্বশুর বাড়ি[illegible] লোকেরাও না। কথার ধরন যেমন উদ্ধ[illegible] তেমনি রূঢ়। এই পরিবেশে নিতা[illegible] অশোভন বলে মনে হল। বেশ এক[illegible] বিরক্ত হয়েই ছেলেটিকে দেখিয়ে বলল —ঐ দেখুন, ৪।৫ ঘণ্টা আগেই মৃ[illegible] হয়েছে।

শুনে ভদ্রলোকের ধৈর্যচ্যুতি হ[illegible] চটে উঠলেন। যেন চ্যালেঞ্জ করে বলে[illegible] —কে বলেছে মৃত্যু হয়েছে?

অবাক হয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে থে[illegible] বললাম—কেন? ডাক্তার দেখে বলে গে[illegible]

ভদ্রলোকের মুখে এবার বিদ্রূপে[illegible] হাসি দেখা দিল। ঠেস দিয়ে বললেন— আপনাদের ডাক্তার? মেডিক্যাল কলেজে[illegible] পাশ করা? আফিং খাওয়ার ওরা জানে? কতটুকু বোঝে? সব গো-মুখ[illegible] গো-বদ্যি। আফিং খেয়ে অমন মড়ার [illegible] কতদিন লোকে পড়ে থাকতে পারে, জানেন? এর চিকিচ্ছে জানে শ[illegible] চীনেরা। দাঁড়ান, আমি এক্ষুণি ব[illegible] বাজার থেকে একজন চীনে ডাক্তার নি[illegible] আসছি। তখন দেখবেন আফিং খাও[illegible] চিকিচ্ছে কাকে বলে। বলেই ভদ্রলো[illegible] যেমন হড়বড় করে এসেছিলেন, আ[illegible] তেমনি ছুটতে ছুটতে চলে গেলেন। ব[illegible] গেলেন—আমি ট্যাক্সি করে যাব ও[illegible] আসব।

দেখে আমরা কেমন যেন ভ্যাবাচ্যা[illegible] খেয়ে গেলাম। ছেলেটির শ্বশুরমশা[illegible] বিলাপ বন্ধ করলেন। এর ওর মুখ চে[illegible] দেখতে লাগলেন। মনে হল হঠাৎ [illegible] ক্ষীণ আশার ক্ষীণতর একটু আ[illegible] কোথাও দেখতে পেলেন।

শহরের এক প্রান্তে এই পা[illegible] ট্যাক্সি করে বৌবাজার যাতায়াতেও ত[illegible] কার দিনে কম নয়। অনেক খরচ। ত[illegible]

ভদ্রলোক কেন গায়ে পড়ে নিজের মাথায় এ ভার নিলেন, কেউ বলতে পারল না।

দেখতে দেখতে কথাটা চারদিকে রটে গেল যে, চীনে ডাক্তার এসে আফিং খাওয়া মরা মানুষে বাঁচাবে। কোথা থেকে দলে দলে লোক এসে এই নির্জন পার্কে ভিড় জমিয়ে তুলল।

এতক্ষণে থানা থেকে দারোগাবাবু একজন কনস্টেবল নিয়ে হাজির হলেন। মালির জবানবন্দী নিয়ে ছেলেটিকে দেখে ওর শ্বশুরমশাইকে বললেন—আপনি আমার সঙ্গে চলুন। একে তো এখন পুলিস মর্গে পাঠাতে হবে। পোস্ট মর্টেম না হলে আপনারা বডি পাবেন না।

ভদ্রলোক হাত জোড় করে বললেন—দয়া করে একটু সময় দিতেই হবে। এক ভদ্রলোক চীনে ডাক্তার ডাকতে গেছেন। তিনি ফিরে না আসা পর্যন্ত আপনারা একটু অপেক্ষা করুন। ডাক্তার এসে দেখে যান, তারপর যা করবার সব করবেন।

দারোগাবাবু বিস্মিত হয়ে বললেন—ডাক্তার এসে এখন আর কি করবে? স্পষ্টই তো দেখা যাচ্ছে এটা একটা সুইসাইড। বেঁচে থাকলে আমরাই আগে হাসপাতালে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করতাম।

ভদ্রলোক বললেন—তবু উনি একবার এসে দেখে যান। আপনি এই সময়টুকু দয়া করে আমায় দিন।

দারোগাবাবু বললেন—বেশ, আপনি তাহলে এখান থেকে সোজা থানায় যাবেন। আমি না ফেরা পর্যন্ত একটু বসবেন। একটা এনকোয়ারী সেরেই আমি যাচ্ছি।

বলে কনস্টেবল নিয়ে তিনি চলে গেলেন।

দারোগাবাবু যাবার পর আরও আধ ঘণ্টা প্রায় কেটে গেল। সেই ভদ্রলোক অথবা চীনে ডাক্তার কেউ আর আসে না। বসে বসে লোকে চলে গেল। বিরক্ত হয়ে উঠল। কেউ বলতে শুরু করলে—বোগাস। কেউ বললে—পাগল। একটি দুটি করে লোক আবার ফিরে যেতে লাগল। ভিড় কমে গেল।

আমাদেরও করবার আর কিছুই ছিল না। ওদিকে কলেজে যেতে হবে। দেরি হয়ে যাচ্ছে। তাই আমরাও উঠে পড়লাম। পার্কটা পার হয়ে বড় রাস্তার গেটটার কাছে আসতেই দেখি একটা ট্যাক্সি এসে থামল। ট্যাক্সি থেকে সেই ভদ্রলোক নাবলেন। সঙ্গে চীনে ডাক্তার।

চীনে ডাক্তারটির চেহারা দেখে ডাক্তার বলে চেনা যায় না। চীনে সায়েব বলে মনে হয়। তখনকার দিনে চীনে সায়েব রাস্তায় ঘাটে সর্বদা যেমন দেখা যেত সে রকম। মাথায় শোলার টুপি। পরনে সস্তা ময়লা কোট প্যান্ট।

ভদ্রলোক ট্যাক্সি ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে কুলী, কুলী বলে ডাকতেই দুটো মুটে এগিয়ে গেল। গাড়ির ভেতর থেকে আফিং-এর চিকিৎসার সব সরঞ্জাম বার করা হল। দুটি কালো স্টিলের ট্রাঙ্ক, একটি প্রকাণ্ড হুঁকোর নল। পেঁচিয়ে গোল করে রাখা। একটা দু'হাত লম্বা স্টেথিসকোপ। আর গাড়ির পেছনে কেরিয়ারে দড়ি দিয়ে বাঁধা প্রকাণ্ড দুটি তামার হাঁড়ি। হাঁড়ি দুটোর মুখ খুব বড়। বিয়ে বাড়িতে পোলাও যেরকম হাঁড়িতে রাঁধে অনেকটা সে রকম। কিন্তু পেতলের নয়। তামার।

এই সব সরঞ্জাম দুটো মুটের মাথায় চাপিয়ে ভদ্রলোক সাহেবকে নিয়ে পার্কের মধ্যে ঢুকলেন। হন্ হন্ করে চলতে লাগলেন। ভদ্রলোক আগে, তার পিছনে চীনে সায়েব এবং তার পেছনে ঐ দুটি মুটে। সবার পেছনে আমরা।

আবার পার্ক পেরিয়ে আমরা ঐ কুঞ্জটির কাছে এলাম। ভদ্রলোককে দেখে উৎফুল্ল হয়ে ছেলেটির শ্বশুর মশাই হাত তুলে নমস্কার করলেন। তাড়াতাড়ি সায়েবকে কুঞ্জের ভিতরে নিয়ে গেলেন।

সায়েব ছেলেটিকে একবার দেখে ওর একখানা হাত তোলবার চেষ্টা করে ছেড়ে দিল। মুখ ফিরিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল ভদ্রলোককে বলল—উও তো মর্ গয়া।

বলেই পার্কের মধ্য দিয়ে হন্ হন্ করে গেটের দিকে রওনা হল। এইবার ভদ্রলোক কেমন যেন ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলেন। একবার চীনে সায়েবের দিকে, একবার ছেলেটির দিকে আর একবার ঐ মুটে দুটির দিকে তাকাতে লাগলেন। সায়েবকে অনেক দূরে এগিয়ে যেতে দেখে অবশেষে নিজের বিহ্বল ভাব কাটিয়ে মুটে দুটি নিয়ে অপ্রস্তুত মুখে চীনে সাহেবের পিছন পিছন ধীরে ধীরে রওনা হলেন।

আমরা আবার হতভম্ব হয়ে ঐদিকে তাকিয়ে রইলাম। আফিং খাওয়ার চীনে চিকিচ্ছে আর দেখা হল না।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় বিদ্বেষের সূচনা

সুধাংশুবিমল মুখোপাধ্যায়

দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের জাতি এবং বর্ণ-বৈষম্যমূলক নীতি মানব সভ্যতার একটি গুরুতর কলঙ্ক। দক্ষিণ আফ্রিকা যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসী সংখ্যা প্রায় সওয়া কোটি। ইহার মধ্যে ৩৬৫,৫৬৪ জন ভারতীয়।

১৯০৯ সালে কেপ কলোনি, নাটাল, ট্রান্সভাল এবং অরেঞ্জ ফ্রি স্টেট এই চারিটি প্রদেশ লইয়া দক্ষিণ আফ্রিকা যুক্তরাষ্ট্র (Union of South Africa) গঠিত হয়। যুক্তরাষ্ট্র গঠনের ৫০ বৎসর পূর্বে নাটালের শ্বেতাঙ্গ ক্ষেত্রস্বামীদের অনুরোধে নাটালে ভারতীয় শ্রমিক প্রেরিত হয়। ভারত সরকার প্রথমটা ভারতীয় শ্রমিক পাঠাইতে রাজী হন নাই। কিন্তু বার বার অনুরুদ্ধ হইয়া অবশেষে ১৮৬০ সালে পরীক্ষামূলকভাবে অল্প সংখ্যক শ্রমিককে নাটাল যাইবার অনুমতি দিয়াছিলেন। ১৮৬০ সালের ১৩ই অক্টোবর ভারতীয় শ্রমিকের প্রথম দল 'ট্রুরো' (S. S. Truro) জাহাজে মাদ্রাজ হইতে দক্ষিণ আফ্রিকা যাত্রা করিল। এই দলে অল্প সংখ্যক স্ত্রীলোকও ছিল। ৩৪ দিন পর 'ট্রুরো' পোর্ট নাটাল বন্দরে নোঙ্গর করিল।

দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রেরিত ভারতীয় শ্রমিকদিগকে কতকগুলি নির্দিষ্ট শর্তে কাজ করিতে হইত। সেই জন্য ইহাদিগকে 'Indentured labourer' অর্থাৎ চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক বলা হইত। ইহাদের অবস্থা ক্রীতদাসের অবস্থা অপেক্ষা বিশেষ উন্নত ছিল না।*

ইহাদিগকে সাধারণত 'কুলি' বলিয়া অভিহিত করা হইত। চুক্তির মেয়াদ শেষ হইবার পর ইহাদিগকে নাটাল সরকারের ব্যয়ে ভারতবর্ষে পৌঁছাইয়া দিতে হইত। ইচ্ছা করিলে তাহারা স্বাধীনভাবে নাটালেই বসবাস করিতে পারিত। ১৮৭০ সালের একটি আইনে ব্যবস্থা হইল যে, যদি কোন চুক্তিবদ্ধ ভারতীয় শ্রমিক চুক্তির মেয়াদ শেষ হইবার পর নাটাল সরকারের ব্যয়ে দেশে ফিরিয়া যাইবার দাবি ছাড়িয়া দেয়, তবে তাহাকে বিনামূল্যে নাটালে জমি দেওয়া হইবে। বহু ভারতীয় এই আইনের সুযোগ গ্রহণ করিয়া নাটালে স্থায়ী ঘর বাঁধিল। এইভাবে নাটালে একটি ভারতীয় সমাজ গড়িয়া উঠিল। প্রবাসী ভারতীয়দিগের মধ্যে কেহ শ্রমিকের কাজ করিয়া, কেহ বা চাষ-বাস করিয়া, কেহ বা আবার দোকানপাট করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিত। ক্রমে মরিশাস এবং ভারতবর্ষ হইতে ভারতীয় ব্যবসায়ীগণ নাটালে যাইয়া ব্যবসা-বাণিজ্য আরম্ভ করিলেন। কালে নাটালের অর্থনৈতিক জীবনে ইঁহারা একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিলেন। ভারতীয় ব্যবসায়ীদিগের ম[illegible] কেহ কেহ ভাগ্যান্বেষণে নাটাল হই[illegible] ওলন্দাজ উপনিবেশ ট্রান্সভালে চ[illegible] গেলেন। দক্ষিণ আফ্রিকা প্রবাসী ওলন্[illegible] ঔপনিবেশিকগণ বুয়র (Boer) ন[illegible] পরিচিত।

নাটালের আর্থিক সমৃদ্ধির ম[illegible] প্রবাসী ভারতীয় সম্প্রদায়ের দানের পরি[illegible] উপেক্ষণীয় নহে। ১৮৮৬ সালে না[illegible] সরকার নিযুক্ত ওয়াগ কমিটি (Wa[illegible] Committee) মন্তব্য করেন যে ভারত[illegible] গণের আগমন এবং অবস্থান নাটা[illegible] পক্ষে কল্যাণকর হইয়াছে এবং ভারত[illegible] দিগের ক্ষতি হইতে পারে এমন আইন [illegible] অদূরদর্শিতার পরিচায়ক।*

অতি অল্পকালের মধ্যেই ভার[illegible] ব্যবসায়িগণ বেশ সম্পত্তিশালী হ[illegible] উঠিলেন। ইঁহাদের ভাগ্যো[illegible] ইউরোপীয়দিগকে ঈর্ষান্বিত ক[illegible] তুলিল। নাটালের অন্যতম নেতা[illegible] নায়ক স্যার টমাস হিস্‌লপ (Sir Thom[illegible] Hyslop) ত খোলাখুলিই বলিলেন [illegible] চুক্তিবদ্ধ ভারতীয় শ্রমিক আসে ত আস[illegible] আপত্তি নাই। কিন্তু আর [illegible] ভারতীয়ের আগমন বাঞ্ছনীয় নহে।*

এই মনোভাব অতি অল্পদিনের মধ্[illegible] দক্ষিণ আফ্রিকার সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ি[illegible] ইহার বিরুদ্ধ কথা বলিলেও [illegible] হইল না। ১৮৮০ হইতে দ[illegible] আফ্রিকায় ভারতীয়দিগের প্রতি বৈষ[illegible] মূলক নীতি প্রয়োগ করা হই[illegible] থাকে। তাহারা যে অবাঞ্ছিত আগন্[illegible] সর্বপ্রকারে এই কথাটাই আহাদিগ[illegible] বুঝাইয়া দেওয়ার চেষ্টা আর[illegible]

---

*"The 'indenture' system was an invention of the British brain to substitute it for forced labour and slavery. The indentured 'coolies' were half-slaves, bound over body and soul by a hundred and one inhuman regulations"—verdict on South Africa by P. S. Joshi, P. 43.

*"We are content to place [illegible] record our strong opinion, bas[illegible] on much observation, that t[illegible] presence of these Indians has be[illegible] beneficial to the whole colony, a[illegible] that it would be unwise, if not u[illegible] just, to legislate to their prej[illegible] dice."—Wagg Committee's Repor[illegible]

*"We want Indians as inde[illegible] tured labourers, but not as fr[illegible] men."

হইল। ১৮৮০ সাল হইতে নাটাল প্রবাসী ইংরেজ সম্প্রদায় যে সমস্ত ভারতীয় মজুর চুক্তির মেয়াদ শেষ হইবার পর নাটালে ঘর বাঁধিয়াছে তাহাদের উপর বিধি নিষেধ আরোপ করিবার জন্য সরকারের উপর চাপ দিতে থাকে। কেহ কেহ ইহাদের উপর বিশেষ কর বসাইবার প্রস্তাব করিলেন। অনেকে আবার চুক্তির মেয়াদ শেষ হইবার পর ইহাদিগকে বাধ্যতামূলকভাবে দেশে পাঠাইয়া দিবার পরামর্শ দিলেন। নাটালের সর্বত্র প্রবাসী ভারতীয়দিগের বিরুদ্ধে জোর প্রচার আরম্ভ হইল। ক্রমে ভারতীয় বিরোধী আন্দোলন এত শক্তিশালী হইয়া উঠিল যে, নাটাল সরকার ভারতীয়দিগের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য একটি কমিশন নিযুক্ত করিলেন (১৮৮৬)। ইহাই উল্লিখিত রাগে কমিশন। একাধিক ইংরেজ সাক্ষী কমিশনের নিকট ভারতীয় আগন্তুকগণের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন। কমিশনের রিপোর্টেও ভারতীয়দিগকে প্রশংসাই করা হইয়াছে।

এদিকে ট্রান্সভালেও তীব্র ভারতীয় বিদ্বেষ আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। ভারতীয়গণ নাটাল হইতে ট্রান্সভালে প্রবেশ করিয়াছিল। ট্রান্সভাল প্রবাসী ভারতীয়গণ কেহ কেহ ব্যবসা-বাণিজ্য দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতেন। অনেকে মজুরি বা ফিরিওয়ালার কাজ করিত। ভারতীয়গণ শীঘ্রই ট্রান্সভালের বুয়র ঔপনিবেশিকদিগের চক্ষুশূল হইয়া উঠিল। জনমতের চাপে ট্রান্সভাল সরকার ১৮৮৫ সালের ৩ আইন পাশ করিলেন। এই আইনে বলা হইল যে ভারতীয়গণকে কোনদিনই ট্রান্সভালের নাগরিক হইবার অধিকার দেওয়া হইবে না। সরকার যে সমস্ত অঞ্চল নির্দিষ্ট করিয়া দিবেন, কেবলমাত্র সে সমস্ত অঞ্চলেই ভারতীয়গণ স্থাবর সম্পত্তির মালিক হইতে পারিবে। তাহাদের বসবাসের জন্য সরকার বিশেষ বিশেষ অঞ্চল নির্দিষ্ট করিয়া দিতে পারিবেন। তবে যাহারা অন্যের চাকুরি করে, তাহারা স্ব স্ব প্রভুর সহিত যে কোন জায়গায় থাকিতে পারিবে। ভারতীয় ব্যবসায়ীদিগের নাম রেজিস্ট্রি করা বাধ্যতামূলক হইল। নাম রেজিস্ট্রি করিবার জন্য ২৫ পাউণ্ড ফিস দিতে হইত। ১৮৮৫ সালের ৩ আইনের এই আইন ভঙ্গের জন্য কোন শাস্তির ব্যবস্থা করা হয় নাই। এই আইনে ভারতীয়গণের ট্রান্সভালে বসবাস করিবার, ভূসম্পত্তির মালিক হইবার এবং ব্যবসা-বাণিজ্য করিবার অধিকার স্বীকার করা হইয়াছে।

এই আইনের ধারাগুলি প্রথম প্রথম কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হয় নাই। ১৮৯৩ সালে প্রথম সরকারের টনক নড়িল। ১৮৯৬ সালের নভেম্বর মাসে ট্রান্সভাল ব্যবস্থা-পরিষদে (Volksraad) ১৮৮৫ সালের ৩ আইনের ধারাগুলি অবিলম্বে কঠোরতার সহিত প্রয়োগ করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ("......immediately applied and rigorously maintained")। ১৮৯৭ সালের ৩ আইনে শ্বেতাঙ্গিনী এবং ভারতীয় বা অন্যান্য অশ্বেতাঙ্গের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ হয়। ভারতীয়ের শ্বেতাঙ্গীর পাণিগ্রহণ ফৌজদারী অপরাধরূপে গণ্য হইল। ১৮৯৮ সালের ১৫ আইনের দ্বারা ট্রান্সভালের স্বর্ণখনি অঞ্চলগুলিতে ভারতীয়দিগের ব্যবসা করিবার অধিকার কাড়িয়া নেওয়া হইল। এই আইনের একটি ধারায় বলা হইল যে কোন ভারতীয় কোন প্রকারে খনি হইতে স্বর্ণ উত্তোলনের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিতে পারিবে না। ১৮৯৯ সালের এপ্রিল মাসে ট্রান্সভালের রাষ্ট্রপতির এক ঘোষণা পত্রে ভারতীয়দের বসবাস এবং ব্যবসায়ের জন্য কয়েকটি অঞ্চল নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। নির্দিষ্ট স্থানগুলির বাহিরে কোথাও তাহাদের বসবাস এবং ব্যবসায়ের অধিকার রহিল না। এই বৎসরই শহরের রাস্তাগুলির ফুটপাথে সমস্ত অশ্বেতকায়ের চলাচল নিষিদ্ধ হইল।

দক্ষিণ আফ্রিকার আর একটি রাষ্ট্র অরেঞ্জ ফ্রি স্টেটেও এই সময় ভারতীয় বিদ্বেষের আগুন ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। হীন মিথ্যা প্রচারের দ্বারা ভারতীয় চরিত্রে কলঙ্কলেপন করা হইতেছিল। ভারতীয়দিগের বিরুদ্ধে প্রচারিত একখানি পুস্তিকায় বলা হয়—ইহাদের সঙ্গে স্ত্রী বা অন্য কোন আত্মীয়া থাকে না। ফলাফল সহজেই অনুমেয়। ইহাদের ধর্ম বলে যে, স্ত্রীলোকের আত্মা নাই। খ্রীষ্টানগণ যোগ্য শিকার।*

১৮৯১ সালে একটি আইন পাশ করিয়া আরব, চীনা, ভারতীয় এবং অশ্বেতকায় সমস্ত এশিয়াবাসীর অরেঞ্জ ফ্রি স্টেটে চাষ-বাস এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের অধিকার লোপ করা হইল। ঐ বৎসর ১১ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে ফ্রি স্টেট সরকার সমস্ত ভারতীয় প্রতিষ্ঠান বন্ধ করিয়া দিলেন। মালিকদিগকে নামমাত্র ক্ষতিপূরণ দিয়া বিদায় করিয়া দিলেন।

নাটালই বা পিছনে পড়িয়া থাকিবে কেন? "নাটাল এ্যাডভারটাইজার" (The Natal Advertiser) পত্রিকার ১৫।৯।৯৩ তারিখের সংখ্যায় মন্তব্য করা হয় যে, ভারতীয় শ্রমিক না হইলে দক্ষিণ আফ্রিকার চলে না; সত্য কথা। কিন্তু তাহা হইলেও ভারতীয় ব্যবসায়ীদিগকে যত শীঘ্র তাড়াইয়া দেওয়া হয়,

---

* "As these men (i.e. the Indians) enter the State without wives or female relatives the result is obvious. Their religion teaches them to consider all women as soulless and Christians as natural prey".—Green Book No. 1, 1894, P. 30.—

এই পুস্তিকা অরেঞ্জ ফ্রি স্টেট আইন পরিষদে পেশ করা হইয়াছিল।

[illegible] ইহারাই দক্ষিণ আফ্রিকার [illegible] এই সময় নাটালে ভারতীয় [illegible] প্রতিদ্বন্দ্বিতায় [illegible] মোট প্রবাসী ভারতীয়দের এক-তৃতীয়াংশ মাত্র [illegible] স্বাধীন-ভাবে [illegible] ইহাদের মধ্যে অনেকেরই মিউনিসিপ্যালিটি এবং আইন পরিষদের নির্বাচনে ভোট দেওয়ার অধিকার ছিল। ভারতীয়গণের [illegible] উত্তরোত্তর ইউরোপীয় উপনিবেশিকগণ শঙ্কিত এবং ঈর্ষান্বিত হইয়া উঠিল। ব্যাগ কমিশনের রিপোর্টে দেখা যায়, অধিকাংশ ইউরোপীয়ই কৃষি এবং বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভারতীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা [illegible] না।* নাটালের [illegible] ভারত সরকারের নিকট প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন যে, যে সমস্ত ভারতীয় শ্রমিকের চুক্তির মেয়াদ শেষ হইয়া গিয়াছে, তাহাদিগকে অবশ্যই দেশে ফিরিয়া যাইতে হইবে। ভারত সরকার এই প্রস্তাবে রাজি হইলেন না। ১৮৯১ সালে নাটাল ব্যবস্থা পরিষদে এই মর্মে আইন পাশ করা হইল যে, চুক্তির মেয়াদ শেষ হইবার পর কোন ভারতীয় শ্রমিক যদি দেশে ফিরিয়া না যায়, তবে তাহাকে পূর্বের ন্যায় বিনামূল্যে জমি দেওয়া হইবে না। ১৮৯৫ সালের একটি আইনে বলা হইল যে, চুক্তির মেয়াদ শেষ হইবার পর নাটালে থাকিতে হইলে সরকারের অনুমতি লইতে হইবে। অনুমতি পত্রের জন্য বার্ষিক তিন পাউন্ড কর ধার্য হইল। নাটালের কোন ভারতীয় শ্রমিকই এই সময় গড়ে বার্ষিক ছয় পাউন্ডের বেশি উপার্জন করিত না। ফলে এই ফিস যোগানো অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। টাকার জন্য বহু ভারতীয় নারী-শ্রমিক নারী-ধর্মে জলাঞ্জলি দিতে বাধ্য হইল।*

১৮৯৩ সালে নাটাল স্বায়ত্তশাসন লাভ করে। স্বায়ত্তশাসনাধীন নাটালের প্রথম আইন পরিষদের প্রথম অধিবেশনেই ভারতীয়দিগকে পার্লামেন্টের ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত করার প্রস্তাব গৃহীত হইল। দক্ষিণ আফ্রিকার রাজনৈতিক আকাশে এই সময় এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের আবির্ভাব হইয়াছে। পরবর্তীকালে ইহারই দিব্য জ্যোতিতে সমগ্র জগৎ উদ্ভাসিত হইয়াছে। এই জ্যোতিষ্কই ভারতীয় জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী। তখন তিনি তরুণ আইন ব্যবসায়ী মিঃ এম কে গান্ধী। তাঁহার নেতৃত্বে সঙ্ঘবদ্ধ প্রবাসী ভারতীয় সম্প্রদায় এই আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইল। ফলে ইংরেজ সরকার ইহা অনুমোদন করিলেন না। কিন্তু তিন বৎসর পর ১৮৯৬ সালে সামান্য অদলবদল করিয়া এই আইনই পুনরায় নাটাল আইন পরিষদে গৃহীত হইবার পর ইংরেজ সরকারের অনুমোদন লাভ করিল। যে সমস্ত ভারতীয় এই আইন পাশ হইবার পূর্বে [illegible] তালিকাভুক্ত হইয়াছিলেন, [illegible] অধিকার অক্ষুন্ন রহিল। কিন্তু [illegible] কোন ভারতীয়কে ভোটার শ্রেণী[illegible] নিষিদ্ধ হইল।

নাটালে ভারতীয় বিদ্বেষ [illegible] বাড়িয়া চলিল। ঊনবিংশ শত[illegible] হইবার মুখে নাটালে প্রবাসী ভার[illegible] ইউরোপীয়ের সংখ্যা প্রায় সমান [illegible] হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ভারতীয় [illegible] গণও ক্রমেই বেশি সংখ্যায় [illegible] আসিতেছিলেন। ১৮৯৭ সালে [illegible] রোপীয়গণ উচ্ছৃঙ্খল হইয়া [illegible] ভারতীয়দিগকে মারপিট [illegible] কিভাবে ইহার সূচনা হয়, সে [illegible] বলিতেছি। ১৮৯৬ সালের ম[illegible] মহাত্মা গান্ধী ভারতবর্ষে ফিরিয়া [illegible] পুস্তিকা প্রকাশ করিয়া এবং বিভি[illegible] জনসভায় বক্তৃতা করিয়া তিনি [illegible] আফ্রিকার ভারতীয় সমস্যা [illegible] ভারতীয় জনমতকে সচেতন [illegible] চেষ্টা করেন। রয়টারের মারফৎ [illegible] গান্ধীর কার্যকলাপের বিকৃত [illegible] দক্ষিণ আফ্রিকায় পৌঁছিল। [illegible] ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকগণ [illegible] উঠিল।

প্রবাসী ভারতীয়গণের [illegible] আহ্বানে ১৮৯৬ সালের [illegible] গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকায় [illegible] চলিলেন। পরিবারবর্গও সঙ্গে চ[illegible] ১৮৯৭ সালের জানুয়ারী মাসে [illegible] জাহাজ 'কুরল্যান্ড' (S. S. Cou[illegible] ডারবান বন্দরে নোঙর করিল। [illegible] সময়ে 'নাদেরী' (S. S. Naderi[illegible] আর একখানা জাহাজও ভারতী[illegible] লইয়া ডারবান বন্দরে পৌঁছিল [illegible] দুইখানি জাহাজে প্রায় ৮০০ [illegible] যাত্রী ছিল। ইঁহাদের নাটালে [illegible] সহিত গান্ধীজীর কোন সম্পর্ক ছি[illegible] নাটালের ইংরেজ ঔপনিবেশকদের জনসভায় প্রবাসী ভারতীয়গণকে [illegible] ভাষায় আক্রমণ করা হইল। 'কুর[illegible] ও 'নাদেরী' জাহাজে আগন্তুক [illegible] নাটাল অভিযানকারীরূপে চিত্রিত হইল। মহাত্মা গান্ধী এবং অন্যান্য [illegible] দিগের জাহাজ হইতে নামা বন্ধ [illegible] উদ্দেশ্যে একটি কমিটি গঠন করা

* "The sooner steps are taken to suppress and, if possible, to compel the Indian trader, the better. These latter are the real canker that is eating into the very vitals of the community."

"......Were strongly opposed to the presence of free Indians as rivals and competitors either in agricultural or commercial pursuits."

* "This cruel impost caused enormous suffering, resulted in breaking up families, and driving men to crime and women to a life of shame".—G. K. Gokhale.

অবস্থা ক্রমেই গুরুতর আকার ধারণ করিয়া উঠিল। শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য নাটালের প্রধান মন্ত্রী মিঃ এস্‌কম্বিকে (Mr. Escombe) ডারবান বন্দরে আসিতে হইল। অবশেষে গান্ধীজী এবং ভারতীয় যাত্রীদিগকে জাহাজ হইতে নামিবার অনুমতি দেওয়া হইল। শহরে যাইবার পথে উন্মত্ত শ্বেতাঙ্গ জনতাই গান্ধীজীকে প্রহার করে। ডারবান পুলিসের বড়কর্তা মিঃ আলেকজান্ডার এবং তাঁহার পত্নীর চেষ্টায় তাঁহার প্রাণ-রক্ষা হইল। নির্যাতিত মানবতা কৃতজ্ঞতার সহিত চিরকাল আলেকজান্ডার দম্পতির কথা স্মরণ করিবে।

ইংরেজ সরকার গান্ধীজীকে যাহারা প্রহার করিয়াছিল, তাহাদিগকে শাস্তি দেওয়ার প্রস্তাব করিলেন। গান্ধীজী কিন্তু বাঁকিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি মামলা চালাইতে রাজি হইলেন না। এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়া তিনি নিজের অসম্মতি জানাইলেন। পরাধীন ভারতের 'কুলির' কণ্ঠে এ কার স্বর! প্রায় ২০০০ বৎসর পূর্বে 'মানবপুত্র' যীশুর কণ্ঠেও ত এই সুরই বাজিয়াছিল।

গান্ধীজী ইহার পর দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় সমস্যা সম্পর্কে ইংল্যান্ডে জনমত গঠনে সচেষ্ট হইলেন। তিনি দাদাভাই নোরোজী, স্যার উইলিয়ম ওয়েডারবার্ন, স্যার উইলিয়ম হান্টার এবং স্যার মঞ্চেরজী ভবনাগরী প্রভৃতি জননায়ক এবং বিভিন্ন সরকারী বিভাগের সহিত পত্রালাপ আরম্ভ করিলেন।

এদিকে নাটালের আইন পরিষদ আইনের পর আইন করিয়া ভারতীয়-দিগের অধিকার সংকুচিত করিয়া চলিল। ১৮৯৭ সালের ১ আইন বহিরাগত-দিগের নাটালে প্রবেশের উপর নানা-প্রকার বিধিনিষেধ আরোপ করিল। এই আইনে বলা হইল যে, বাহির হইতে যাহারা প্রথম নাটালে আসিবে, তাহাদের কোন ইউরোপীয় ভাষায় দখল থাকা চাই। তাহাদের প্রত্যেকের নিকট নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ থাকা চাই। অন্যথায় তাহাদিগকে নাটালে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হইবে না। ১৮৯৭ সালের ১৭ আইনের দ্বারা ভারতীয় ব্যবসায়ীদিগকে গুরুতর অসুবিধায় ফেলা হয়। আপাত-দৃষ্টিতে নিরীহ এই আইনের বলে প্রত্যেক ব্যবসায়ীকে ব্যবসায়ের লাইসেন্স লইতে বাধ্য করা হইল। কিন্তু কার্যকালে দেখা গেল যে, ইউরোপীয় ব্যবসায়ী-দিগের লাইসেন্স পাইতে কোন অসুবিধা হয় না। পক্ষান্তরে ভারতীয় ব্যবসায়ীর লাইসেন্স পাওয়া অসাধ্য না হইলেও দুঃসাধ্য। এই প্রসঙ্গে জনৈক শ্বেতাঙ্গ লাইসেন্স অফিসারের স্বীকারোক্তি প্রণিধানযোগ্য।*

ঊনবিংশ শতক শেষ হইয়া বিংশ শতক আসিল। বিংশ শতাব্দীতে প্রবাসী ভারতীয়গণের অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। শতাব্দীর প্রথম দশকে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের নীতির বিরুদ্ধে অহিংস গণ-সংগ্রাম আরম্ভ হয়। ইতিহাসে এই ধরনের সংগ্রাম পূর্বে কোনদিন দেখা যায় নাই। ১৯১৪ সালে গান্ধী-স্মাটস্ চুক্তির (Gandhi-Smats Agreement) পর এই সংগ্রামের অবসান হয়। দক্ষিণ আফ্রিকায় যে অল্প কয়েকজন দূরদর্শী রাজনীতিবিদ্ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, স্বর্গত মিঃ হফমেয়ার (John H. Hopmeyr) তাঁহাদের মধ্যে অগ্রগণ্য। দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় সমস্যা সম্পর্কে তাঁহার একটি উক্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন যে, ইতিহাসের দেবতা ন্যায়নিষ্ঠ। দক্ষিণ আফ্রিকার একটি অতি জটিল সমস্যার জন্য ভারতবর্ষই দায়ী। দক্ষিণ আফ্রিকা ইহার বিনিময়ে ভারতবাসীকে নিরুপদ্রব আইন অমান্যে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে।§

* "A European licence is granted as a matter of course, whereas an Indian licence is refused as a matter of course, if it is a new one."

§ "Often there is justice in the working of history. India has given to South Africa one of the most difficult of its problems; South Africa in its turn gave to India the idea of civil disobedience" —South Africa by John H. Hafmeyr.

অ্যাটমের যুগে কি না সম্ভব। বিলেতের দুজন বৈজ্ঞানিক অ্যাটমের সাহায্যে একটা ঘড়ি তৈরী করেছেন; যেটাকে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা সঠিক সময় নির্ধারক ঘড়ি বলা চলে। —এঁরা অবশ্য এটার একটা লম্বা নাম দিয়েছেন যেটা শুনলে সাধারণের পক্ষে বোঝা মুশকিল হবে যে এটা একটা ঘড়ি। শুধু নামই নয় এর চেহারাতে এটা ঘড়ি বলে মনে হবে না। এই ঘড়িটা সিয়েসিয়াম নামক ধাতুর ভেতর যে এ্যাটম আছে তার ভেতরকার স্পন্দনের সাহায্যে চলে। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে, ঘড়িটা এক সেকেণ্ডের দশ হাজার ভাগ নির্ভুল সময় দেয়। কিন্তু এর নির্ভুল সময় রাখার ক্ষমতা আরো অনেক বেশী।

*

মাইলার এক নতুন ধরনের প্ল্যাস্টিক। এই মাইলারের সাহায্যে এমন কতকগুলি জিনিস তৈরী করা হচ্ছে যেগুলো তৈরী করার কথা কোন দিনই ভাবা যায়নি। এটা ইস্পাতের তিন ভাগের এক ভাগ শক্ত, এটা একটা অপরিচালক পদার্থ আর এটার রাসায়নিক বস্তু প্রতিরোধ করবার ক্ষমতা আছে। বর্তমানে এই মাইলার দিয়ে প্যারাসুট এবং কথা ধরে রাখবার ফিতে তৈরী করা হচ্ছে। মাইলার ছাড়াও আরো একটা নতুন ধরনের প্ল্যাস্টিক তৈরী হচ্ছে যেটার সাহায্যে অনেক নতুন নতুন জিনিস তৈরী করা সম্ভব হবে। এটার নাম দেওয়া হয়েছে আইসোসাইনেটস্—এটা ফেনার মত একটা জিনিস। এই ফেনা প্রয়োজন অনুযায়ী খুব দৃঢ় বস্তুতে পরিণত করা যায়। আবার বালিশের মত নরমও করা যায়। আশা করা যাচ্ছে যে অদূর ভবিষ্যতে আইসোসাইনেটস দিয়ে রবারের ফেনার তৈরী বালিশ এবং কুশানের চেয়ে অনেক সস্তায় এই সব জিনিস তৈরী করা যাবে। এছাড়া আশা করা যায় যে এর স্থায়িত্ব বেশী হওয়ার জন্য মোটরের টায়ার তৈরী করা সম্ভব হবে। এই ধরনের টায়ার ১০০,০০০ মাইল ভ্রমণের পরও ভাল অবস্থায় থাকবে আশা করা যায়।

*

চক্রদত্ত

উড়ন্ত চাকতি নিয়ে মাঝে মাঝে বেশ হৈ চৈ পড়ে যায়। কেউ কেউ উড়ন্ত চাকতির কথা বিশ্বাস করেন আবার কেউ কেউ উড়িয়ে দেন। কিন্তু উড়ন্ত চাকতি না হোক 'পাইপ্যানের' সম্বন্ধে আজকের দিনে কেউ সন্দেহ প্রকাশ করবেন না।
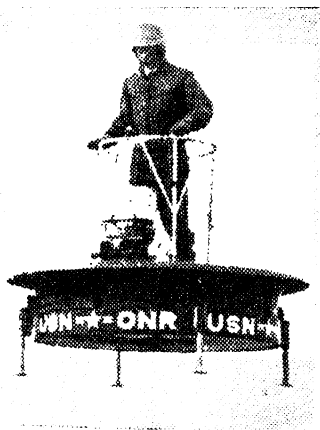
উড়ন্ত পাইপ্যান

আর এই পাইপ্যান আকাশে উড়লে একটা উড়ন্ত চাকতির মত দেখায় বলা চলে। পাইপ্যান একটা গোল চাকার মত প্ল্যাটফর্ম। এর ওপর একজন লোক দাঁড়িয়ে এটা চালায়। পাইপ্যান চালাবার জন্য কোন রকম শিক্ষার প্রয়োজন নেই। বলতে গেলে কয়েক মিনিটের মধ্যেই এটা চালাবার নিয়ম কানুন শিখে ফেলা যায়। আকাশে যখন এটা উড়তে থাকে তখন কোন এক নির্দিষ্ট দিকে চালাবার জন্য উড়ো জাহাজের মত স্টিয়ারিং হুইলের সাহায্য নিতে হয় না। যে দিকে চালাবার দরকার পাইপ্যানের চালক শুধু সেই দিকে নিজের ওজন প্ল্যাটফর্মের ধারে দিতে থাকবে। পাইপ্যান ওড়ে দুটো পাখার সাহায্যে। পাখ[illegible] প্ল্যাটফর্মের তলায় সমান্তর[illegible] লাগান আছে। পাখা দুটো এ[illegible] লাগান যে দুটো বিপরীত দিকে [illegible] পাখা দুটো চলতে আরম্ভ করলে [illegible] পাখা গর্তের ভেতর দিয়ে হাওয়[illegible] নেয় আর একটা পাখার সাহায্যে [illegible] খুব জোরে মাটির দিকে ঠেলে ব[illegible] দেয়। ফলে প্ল্যাটফর্মের মত [illegible] আকাশে উঠতে থাকে। পাখা [illegible] করবার জন্য ইঞ্জিন দুটো ১০[illegible] শক্তিবিশিষ্ট। পাইপ্যান বর্তমানে [illegible] মূলকভাবে নৌবিভাগ ব্যবহার [illegible] এটা ঠিক যে যখন পাইপ্যানের [illegible] উন্নতি হবে তখন এটাকে সাধা[illegible] বাড়ি থেকে যেখানে সেখানে নিয়ে [illegible] যাবে। এর প্রধান অন্তরায় [illegible] যে যদি কোন কারণে একটা ইঞ্জি[illegible] হয়ে যায় তাহলে এটা একটা [illegible] জিনিসের মত সোজাসুজি ধ[illegible] মাটিতে পড়ে যাবে।

*

আমরা জানি যে হীরার খনি[illegible] যে সব হীরা পাওয়া যায় সে[illegible] আসল হীরা। অবশ্য হীরার মত [illegible] অনেক নকল হীরা বাজারে পাও[illegible] যেগুলো বিভিন্ন কৃত্রিম উপায়ে তৈর[illegible] বাজারে ছাড়া হয়। কিন্তু পাকা [illegible] হাতে পড়লে আসল আর নকলের [illegible] ধরা পড়ে যায়। কিন্তু জেনারেল [illegible] ট্রিক কোম্পানী এক কৃত্রিম হীরা [illegible] করেছেন যেটা ঠিক আসল হীরার [illegible] এই কোম্পানী রক্তবর্ণ দামী হীরা [illegible] করেছেন যেটা খুব বেশী চাপ দিয়ে [illegible] করা হচ্ছে। চাপ দেবার কারণ যে [illegible] যখন মাটির নিচে থাকে তখন তার [illegible] মাটির স্তরের একটা চাপ পড়ে [illegible] রক্তবর্ণ হীরাকে গারনেট বলা [illegible] কোম্পানী সবুজ ধরনের খনিজ [illegible] যাকে হরনব্লেণ্ড বলা হয় তাকে ২[illegible] ডিগ্রী ফারেনহাইট-এর সমান [illegible] ৩৭৫,০০০ পাউণ্ডের চেয়ে বেশী [illegible] প্রত্যেক ১ বর্গ ইঞ্চির ওপর দিয়ে [illegible] কৃত্রিম গারনেট তৈরী করেছেন।

আলোচনা

রবীন্দ্রনাথের কর্ণ-কুন্তী সংবাদ

মহাশয়, ১৩ই শ্রাবণের 'দেশ'এ মন্মথনাথ ঘোষের "রবীন্দ্রনাথের কর্ণকুন্তী সংবাদ" প্রবন্ধটি পড়ে বিস্মিত হলুম। লেখক কর্ণকুন্তী সংবাদ সম্পর্কে নানাবিধ মন্তব্য করবার পর লিখেছেন, "রবীন্দ্রনাথের কর্ণকুন্তী সংবাদে পরিণত বয়সের আনন্দ নাই।"—পরিণত বয়েসের আনন্দ সম্বন্ধে কিছু বলার অধিকার আমি এখনও অর্জন করিনি, কিন্তু উপরোক্ত কথার অর্থ যদি এই হয় যে "কর্ণকুন্তী সংবাদ" বাল্যপাঠ্য রচনা তবে সে সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন মনে করি।

লেখকের মতে কর্ণকুন্তী সংবাদ মহৎ রচনা নয়, তার কারণ কর্ণ বা কুন্তী কেউই মহৎ নন—মহত্ত্বের ভান করেছেন। মহাভারত পড়া থাকা সত্ত্বেও তিনি কেন এমন ধারণা করলেন বোঝা গেল না। সমগ্র মহাভারতে কুন্তীর চরিত্র কোথাও অসৎ করে দেখানো হয়নি। স্বার্থসিদ্ধির জন্য পাণ্ডবদের দলে ভুলিয়ে ভালিয়ে আনবার জন্যও তিনি কর্ণের কাছে যাননি। তিনি গিয়েছিলেন আপন পুত্রের মধ্যে হানাহানি বন্ধ করতে। কর্ণের জন্য কুন্তীর কোনোরূপ স্নেহ ছিল না—এ-কথা মহাভারতের কোথাও নেই। যৌবনের ভুলের জন্য পরিণত বয়সেই দুঃখ এবং অনুতাপ বেশী হয়ে থাকে। যে-পুত্র ভাগ্যহত এবং দুঃখপীড়িত—তার জন্যে কুন্তীর স্নেহের অকুলান ছিল না। তা ছাড়া কুন্তীর অন্যায় ব্যভিচারের ফলে কর্ণ জন্মেছিলেন এ ধারণা ভুল। দুর্বাশা মুনির কাছ থেকে কুন্তী যে-কোনো দেবতাকে আহ্বান করবার মন্ত্র পেয়েছিলেন এবং বালিকাসুলভ কৌতূহলবশে তিনি সূর্যকে আহ্বান করেছিলেন, কিন্তু সূর্য যখন সত্যি সত্যি স্বশরীরীভাবে উপস্থিত হন তখন কুন্তী ভয় পেয়ে তাঁকে ফিরে যেতে বলেন। কিন্তু সূর্য মন্ত্রবদ্ধ—তাঁর ফেরবার পথ নেই। সুতরাং তিনি কুন্তীর গর্ভে এক পুত্র উৎপাদন করেন। কুন্তী ভীত হয়ে সেই সন্তানকে জলে ভাসিয়ে দেন। কিন্তু আপন গর্ভজাত পুত্রের জন্য তাঁর কোনো স্নেহ মমতা থাকবে না—এমন উদ্ভট কল্পনার কোনো মূল খুঁজে পেলাম না। এক্ষেত্রে আরো একটি কথা বিশেষ স্মরণীয় যে—কর্ণ ছাড়াও পঞ্চপাণ্ডবদের মধ্যে কেউই পাণ্ডুর পুত্র নয়। কুন্তীর সেই মন্ত্রবলে বিভিন্ন দেবতার ঔরসজাত। সুতরাং কর্ণের প্রতি তাঁর ভুলের জন্য পরিণত বয়েসে অনুতাপ তীব্রতর হওয়া সম্ভব।

কর্ণ সম্বন্ধে লেখক যে সমস্ত বিশেষণ প্রয়োগ করেছেন সে সমস্ত অবস্থাচক্রে কর্ণের ক্ষেত্রে সত্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও মহাভারতকার প্রায় সর্বত্রই তাঁকে মহাত্মা কর্ণ বলে অভিহিত করেছেন (কালীপ্রসন্ন সিংহ কৃত অনুবাদ)। কর্ণ কখনও ক্ষাত্রধর্ম থেকে বিচ্যুত হন নি। তাই অর্জুন প্রভৃতিরা যখন নরকবাস করছেন তখন কর্ণ স্বর্গে প্রতিষ্ঠিত। তা ছাড়া কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কর্ণ যে অর্জুন ভিন্ন অপর পাণ্ডবদের আপন মুষ্টিতে পেয়েও ছেড়ে দিয়েছেন একথা মহাভারতেই পেলাম। রবীন্দ্রনাথ কর্ণের দান এবং ত্যাগের কথাই উল্লেখ করেছেন এবং সে বিষয়ে মহাভারতে কর্ণের চেয়ে আর কে বেশী অগ্রণী? রাধা কর্ণের প্রতি স্নেহশীলা কিন্তু কর্ণ জানতেন যে, তিনি তাঁর আপন মা নন—সুতরাং আপন মাকে নিয়ে স্বপ্নে কল্পনা বিলাস করতে কর্ণের বাধা কোথায় বুঝতে পারলুম না।

অতএব রবীন্দ্রনাথ কর্ণ এবং কুন্তীর মিথ্যে মূর্তি গড়েছেন এ-কথার অর্থ স্পষ্ট বোঝা গেল না। তবে আমার মূল আপত্তি অন্যত্র। রবীন্দ্রনাথের রচনা মহাভারতের হুবহু প্রতিলিপি হবে, এ কথাই বা কেন? যুগের সঙ্গে সঙ্গে চরিত্রের আদর্শ বদলায়। রবীন্দ্রনাথ ইতিহাস এবং পুরাণ কাহিনীকে নতুন আলোকে সার্থকভাবে পুনরায় সজ্জিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের সেই মৌলিক সৃষ্টির রসবিচার লেখকের কাছ থেকে পেলে খুশী হতাম। ইতি—সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, ২-বি, বৃন্দাবন পাল লেন, কলিকাতা-৩।

(২)

মহাশয়, এবারের (৩০শে জুলাই প্রকাশিত) সাপ্তাহিক 'দেশে' "রবীন্দ্রনাথের কর্ণ-কুন্তী সংবাদ" নামে সমালোচনাটি (?) পড়ে অত্যন্ত হতাশ হলুম।

শ্রীযুক্ত মন্মথ ঘোষ মহাশয়ের লেখা পড়ে মনে হয় রবীন্দ্রকাব্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটেছে কেবলমাত্র "কর্ণ-কুন্তী সংবাদে"র মধ্যে দিয়ে এবং এই কবিতাটিও তিনি উপলব্ধি করতে পারেননি। তিনি নেহাতই 'কর্ণ-কুন্তী ঘটিত সংবাদ জানতে চেয়েছেন। মহাকাব্যের কিছু অংশ পড়লেই ও সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য মিলবে। কিন্তু যেটুকু মিলবে না সেইটুকুই রবীন্দ্রনাথের 'কর্ণ-কুন্তী সংবাদে'র উপাদান এবং বৈশিষ্ট্য। মহাভারতে আমরা plot বা ঘটনার বিবরণ পাই কিন্তু ঘটনাপ্রবাহের আড়ালে মাতাপুত্রের স্বাভাবিক হৃদয়বৃত্তির একটা সুন্দর ছবি আলোচ্য কবিতাটির মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। একদিকে কুন্তীর মাতৃস্নেহ অপর দিকে কর্ণের পুত্রহৃদয় ও সত্যনিষ্ঠার মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব ফুটে উঠেছে। এ ধরনের অন্তর্দ্বন্দ্ব রবীন্দ্রকাব্যের একটা বৈশিষ্ট্য। লেখক অভিযোগ করেছেন বীর কর্ণের পক্ষে মাতা কুন্তীর অনুনয়ে বিচলিত হওয়া কোনও ক্রমেই সম্ভব নয়—কারণ কর্ণ বীর, তাঁর হৃদয়ে কোমলতার কোনও স্থান ছিল না। বলা বাহুল্য এ ধরনের যুক্তি অত্যন্ত হাস্যকর। মহাকাব্যের নজীর টেনেই বলা যেতে পারে অঙ্গদ, কুণ্ডল ইত্যাদি বীরের ভূষণ। যে কোনও বনস্পতির মধ্যে যে প্রচণ্ড শক্তি আছে—ফুলের রঙে বা পাতার শ্যামলতায় তার সে শক্তি কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ করে না। ক্ষমা, প্রেম ইত্যাদি বীরেরই ধর্ম। কেবলমাত্র কঠোরতা বা নৃশংসতাই নয়।

লেখকের আর একটা স্থূল যুক্তির উদাহরণ দিই

> ত্যাগ করেছিনু তোরে
> সেই অভিশাপে পঞ্চপুত্রে বক্ষে করে
> তবু মোর চিত্ত পুত্রহীন।......"

এই উদ্ধৃতাংশের প্রতিবাদ করে বলেছেন "একথা বিশ্বাস করা কঠিন মনে হয়।........ আরও মিথ্যা মনে হয় যখন ভাবি কুন্তীর আরও পাঁচটি সন্তান ছিল........।"—অর্থাৎ

মনে করুন কোনও মায়ের একাধিক সন্তানের মধ্যে কেউ যদি বিদেশে থাকে .তবে সে সন্তানের জন্য মায়ের কোনও চিন্তা বা ব্যাকুলতা থাকে না—এ ধরনের যুক্তিহীন প্রবন্ধ আর যাই হোক সুচিন্তিত বা সুলিখিত কোনোটাই নয়।

এ ছাড়া সমগ্র রচনার মধ্যে বার বার এ ধরনের স্থূল বিশ্লেষণ-শক্তি ও অযৌক্তিকতার পরিচয় পাওয়া গেছে। লেখক কাব্যের আসল রসটুকুই অনুধাবন করতে পারেন নি। সুকীর্তি কর, ইণ্ডিয়ান ইনস্টিট্যুট অব্ টেক্নোলজী, হিজলী।

(৩)

মহাশয়,

রবীন্দ্রনাথের 'কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ' পড়িলে ভাল লাগে কি মন্দ লাগে বস্তুত এই প্রশ্নের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে মন্মথনাথ ঘোষ মহাশয় যে যুক্তিগুলির অবতারণা করিয়াছেন সে সম্বন্ধে আমাদের কয়েকটি কথা বলিবার আছে।

লেখকের বক্তব্য প্রধানত এই যে, কর্ণ ও কুন্তীর চরিত্রে কবিগুরু যে মহানুভবতা আরোপ করিয়াছেন তাহা 'মিথ্যা কল্পনার আলসলাসা' ছাড়া অন্য কিছু নয়। মহাভারতের কর্ণ ও কুন্তী, রবীন্দ্রনাথের কর্ণ ও কুন্তী নয়।

তাহা না হইলেও লেখকের ক্ষুব্ধ হওয়ার কিছু নাই। তিনি নিজেও বলিয়াছেন, "পূর্বসূরীদের কোন সুপরিচিত চিত্রকে এইভাবে বিচিত্রিত করার দৃষ্টান্ত অনেক কবির মধ্যেই পাওয়া যায়।" আমরা অনেকের মধ্যে মাইকেল মধুসূদন দত্তের "মেঘনাদ বধ কাব্যের" উল্লেখ করিব। রামায়ণের মূল চরিত্রগুলি মাইকেলের কাব্যে বিপরীত রূপে চিত্রিত হইয়াছে। রাম চরিত্র সেখানে ক্ষুণ্ন হইয়াছে, মেঘনাদ চরিত্রে মহত্ত্ব আরোপিত হইয়াছে। ইহাতে মেঘনাদ বধ কাব্যের যে অমর অবদান (শুধু ছন্দের নবীনত্বে নয়, কালের জয়যাত্রায়)—তাহা অস্বীকার করিয়া লাভ আছে কি? বিদেশী সাহিত্যেও ক্লাসিক চরিত্রগুলির উপর রোমাণ্টিক কল্পনা আরোপ করিয়া পরবর্তী কবিদের বিখ্যাত কবিতা রচনার দৃষ্টান্ত বিরল নয়। তবে সেই কবিতাগুলিতে কবির যুগের ভাবধারার ছায়া পড়িবে, তাহাতে সন্দেহ থাকে না।

মহাকাব্যের সহস্রাধিক পাত্র-পাত্রীকে বাদ দিয়া কর্ণ ও কুন্তীকে লইয়া তাঁহাদের অব্যক্ত বেদনাকে কবি বাণীরূপ দিয়াছেন। তাহা কবির নূতন মহাকাব্য রচনার প্রয়াস নহে; তাহা একটি অপূর্ব কবিতা বলিয়া পাঠক মহলে আদৃত হইয়াছে। কবিতার সুর, মূল বক্তব্যের স্পষ্টতা, পৌরাণিক কাহিনীর পরিপ্রেক্ষিত, তাহা ব্যতীত অন্যান্য কবিতা-সামগ্রী—সকল দিক দিয়া কবিতাটি স্বচ্ছ হইয়া পাঠকের মনে গভীর রেখাপাত করে। অধুনা-হতাশ লেখকের মনেও এককালে রেখাঙ্কন করিয়াছিল—কবিতাটির জয় এইখানেই।

একটি কথা না বলিলে আমাদের বক্তব্য অসম্পূর্ণ থাকে। মনে হয়, আলোচ্য কবিতাটি রচনাকালের সামাজিক ও জাতীয় অবস্থার পটভূমিতে বিচার করিলে কবিতাটির মহত্ত্বের নূতন দিক লেখকের সামনে প্রকাশিত হইবে। কবিতাটির রচনাকাল জাতীয় জীবনে গুরুত্বপূর্ণ। জাতীয় আন্দোলনের নবজাগরণের দিনে দিকে দিকে নূতন ভাবনার দ্বার খুলিয়া গিয়াছে—সমাজে প্রতি ব্যক্তির স্বীকৃতি দিবার সময় দেখা দিয়াছে। এতকাল সামাজিক ব্যভিচারের দোষে দুষ্ট বলিয়া যাহাদের দূরে সরাইয়া রাখিয়াছিলাম—তাহাদের নিকটে টানিতে হইবে। কবিগুরুর বিশ্বমানবতার দরবারে কেহই অনিমন্ত্রিত থাকিবে না। এই যুগের কর্ণ আর কুন্তীকে নূতন করিয়া সামাজিক মর্যাদা দিবার জনাই এই কবিকৃতি। সেই স্থানে মহাভারত খুলিয়া কর্ণ ও কুন্তীর চরিত্রের সহিত আক্ষরিক মিল খুঁজিলে 'পরিণত বয়সের আনন্দ' হইতে লেখক বঞ্চিত হইবেন। ইতি—ভবদীয় প্রশান্তকুমার মৌলিক, ইচ্ছাপুর, ২৪ পরগণা।

ফরাসী সংস্কৃতি সংখ্যা

মহাশয়,—'দেশের' ফরাসী সংস্কৃতি সংখ্যার জন্য অভিনন্দন জানাই। এমনভাবে বিভিন্ন দেশের ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে যদি পরিচয় করিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়, তাহলে খুব ভালো হবে। এরকম কোন উদ্দেশ্য 'দেশ' পরিচালকমণ্ডলীর আছে কিনা জানি না। যদি থাকে তাহলে ফ্রান্স দিয়ে আরম্ভ করা শুভসূচনা হয়েছে বলতেই হবে। তবে আলোচ্য সংখ্যায় একটি গুরুতর ত্রুটি থেকে গেছে, বা না হলেই সর্বাঙ্গসুন্দর হত। যে বাঙ্গালী মনীষীরা ফরাসী ভাষা ও সংস্কৃতির চর্চা করে গেছেন তাঁদের মধ্যে তরু দত্তের নাম বাদ পড়ল কেন? তিনি শুধু ইংরেজী লিখতেন না, উত্তম ফরাসীও জানতেন। তাঁর পিতা এবং তাঁরা দু'বোন তরু ও অরু উভয়েই দীর্ঘকাল ফ্রান্সে কাটিয়েছেন। তরু দত্ত ফরাসীতে একটি ছোট্ট ও পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসও লিখেছিলেন। তাঁর অকাল মৃত্যুর পরে বইখানা প্রকাশিত হলে পারিসের তৎকালীন সুধীমণ্ডলীর কাছ থেকে অকুণ্ঠ প্রশংসাবাণী এসেছিল। ছোট্ট পরিবেশে এত বেদনামধুর উপন্যাস খুব কমই দেখেছি। কয়েক বছর আগে "কুমারী আর্'ভ্যার দিনপঞ্জী" নামে বইখানির বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। ইতি—অনিমেষ চৌধুরী, আসানসোল।

কাব্যগ্রন্থ

প্রিয়া ও পৃথিবী—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ, ৯৩ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা ৭। দাম—২, টাকা।

কথাসাহিত্যিক অচিন্ত্যকুমার আজ কবি অচিন্ত্যকুমারের খ্যাতিকে এমনভাবে আচ্ছাদিত করে রেখেছেন যে, ভবিষ্যৎ কালে কোনো তরুণ পাঠকের হাতে তাঁর কোনো কাব্যগ্রন্থ পড়লে সে বিস্মিত হয়ে ভাববে এ-দুজন একই লেখক কি না। এ-অবস্থার জন্য অচিন্ত্যকুমার নিজেই কিন্তু দায়ী। একদা তিনি যে একজন সত্যিকারের প্রতিভাবান সৎ কবি ছিলেন, আজ বোধ হয় সে-কথাটা তিনি ভুলেই গেছেন। না হলে ক্বচিৎ-কখনো শখ করে দু' একটা কবিতা না লিখে একটু বেশীই মনোযোগ দিতেন এদিকে।

নিজেকে তিনি নিজে হয়ত ভুলতে পারেন, অস্বীকারও হয়তো করতে পারেন, কিন্তু সাহিত্যের ইতিহাসের যাঁরা হিসাব রাখেন, তাঁদের কাছে তো আর এ-সত্য গুপ্ত হয়ে থাকবে না! আর নিশ্চয়ই বাংলা দেশ সাহিত্য সম্বন্ধে এতোখানি উদাসীন হয় নি যে, অদূর অতীতে যাঁরা কবিতা রচনা করে বাংলা কাব্যধারাকে প্রচলিত পথ থেকে সরিয়ে এনে বিপ্লবের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, তাঁদের ইতিমধ্যেই ভুলে যাবে। তাই, আজ অচিন্ত্যকুমার যতোই কেন না কবিকর্ম থেকে দূরে সরে থাকুন রসিক পাঠক তাঁর প্রাক্তন দিনের রচনা পাঠ করেও আনন্দ লাভ করবেই। বর্তমান প্রকাশক অচিন্ত্যকুমারের 'প্রিয়া ও পৃথিবী'র নতুন সংস্করণ প্রকাশ করে তাই আমাদের অভিনন্দন লাভের যোগ্য হয়েছেন।

অচিন্ত্যকুমারের কবিতা সম্বন্ধে আলোচনায় নতুন কিছু বলবার নেই। যাঁরা রসের সন্ধানী আর যাঁরা সমালোচক, তাঁদের সকলের চোখেই ধরা পড়বে, ছন্দ ব্যবহারে কবি যতোই কেন না প্রচলিত রীতিকে আশ্রয় করুন, তাঁর বলবার বিষয় কিম্বা তাঁর ধ্যানধারণা কোনোটাই প্রচলিত রীতিনীতির আশ্রয়ী নয়। এবং ভাবলে আশ্চর্য হতে হবে যে, রবীন্দ্রনাথের সমকালে একজন তরুণ কবি তাঁর স্বাধীন ভাবনাকে এমন সফল করে প্রকাশ করতে পেরেছিলেন তাঁর কবিতায়।

'প্রিয়া ও পৃথিবীর' কয়েকটা কবিতা পড়লে সত্যিই মনে হয় অচিন্ত্যকুমার এখনও কেন কবিতা রচনায় তেমনি মনোযোগ দেন না। একাধারে সৎকবি এবং সার্থক কথাসাহিত্যিক তো অনেক আছেন আমাদের দেশে, তিনিও কেন তাঁদেরই একজন হয়ে

থাকুন না। সুকবি অচিন্ত্যকুমারকে যে বাংলা দেশ ভুলতে বসেছে এখন থেকেই।

২০৭।৫৫

উপন্যাস

নবজন্ম—আশাপূর্ণা দেবী। প্রকাশক—ইষ্ট লাইট বুক হাউস, ২০ স্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা—১। দাম—২৷৷০।

বাংলা কথাসাহিত্যে, বিশেষত উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে, নারী-চরিত্র বহুদিন ধরেই প্রাধান্য লাভ করে আসছে। তাদের অসহায়ত্ব, তাদের সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনা আমাদের সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য বস্তু—তাদের ঘিরে পুরুষ চরিত্রগুলো নানা কাহিনীতে ভিড় করে এসে দাঁড়িয়েছে। এর ব্যতিক্রম অবশ্য আছে, তবে আপাতভাবে বিচার করলে এ-সত্য সম্পর্কে অধিক তর্ক নিষ্প্রয়োজন বলে বিবেচিত হবে সন্দেহ নেই। এসব চরিত্র আমাদের সাহিত্যের মূল্যবান সম্পদ একথা যেমন সত্য, তেমনি একথাও সত্য যে, এরা সবই পুরোপুরি কল্পনানির্ভর—পুরুষ কথা-শিল্পীদের সৃষ্ট। নারীমনের সুখ-দুঃখের ইতিকথা নারীর অনুভূতিতে যেভাবে প্রতিফলিত হয় তারও অভিব্যক্তি মূর্ত হোক আমাদের সাহিত্যে—এ আকাঙ্ক্ষাও পাঠকমনে জাগে মধ্যে মধ্যে। যে কয়জন মহিলা সাহিত্যিক সাম্প্রতিককালে সাহিত্যব্রতী হয়েছেন সংখ্যায় তাঁরা অতি নগণ্য হলেও প্রতিভার বিচারে তাঁদের দু'একজন নিঃসন্দেহে শ্রদ্ধার্হ। বিশেষ করে, আলোচ্য গ্রন্থের রচয়িত্রী আশাপূর্ণা দেবী শেষোক্ত এই দু'একজনেরই অন্যতম।

'নবজন্ম' তাঁর নতুন উপন্যাস। সহজ সুরে, সহজ ভাবে, সহজ কথাকে ব্যক্ত করবার রচনাচাতুর্য লেখিকার জানা আছে বলেই তাঁর বই পড়বার সময় পাঠকমন কখনও কোথায়ও থমকে দাঁড়ায় না। আশাপূর্ণা দেবীর রচনারীতির এ বৈশিষ্ট্য বর্তমান গ্রন্থেও উপস্থিত। গ্রামীণ সভ্যতার পটভূমিতে রচিত এই উপন্যাসে শুধুমাত্র শশধরের পরিবারই পাঠকমনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে না, সে-সঙ্গে সাধারণ গ্রাম্য গৃহস্থ জীবনের আশ্চর্য একটি ছবিও চোখের সামনে জেগে ওঠে।

চরিত্রসৃষ্টিতে লেখিকা তাঁর অনিন্দিত ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। শশধর আর বাসন্তী চরিত্রের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর মধুর সম্পর্ক থাকলেও দুজনের নীরব মানসিক দ্বন্দ্বের মধ্যে যে বাস্তবতা ফুটে ওঠে তা শুধু গ্রামেই নয়, স্বল্পশিক্ষিত মানুষের যে-কোন সংসারেই তার উদাহরণ মেলে।

আর একটি চরিত্র 'যাত্রাদলের পাণ্ডা' ভবঘুরে গৌরাঙ্গ। ঘরজামাই থাকতে তার লজ্জা নেই, প্রতিদিনের কটূক্তি আর ঘৃণিত জীবনের মধ্যেও কোনো অভিযোগ নেই। কিন্তু গৌরাঙ্গ মানুষ, খাঁটি মানুষ—শ্বশুরের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা আর বাসন্তীর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা প্রীতি আর সহানুভূতি উজাড় করে দিয়েছে সে জীবনের সর্বস্ব বিলিয়ে। মিথ্যে ফেরারী জীবনের দিনগুলি আর সর্বশেষে আত্মসমর্পণের চেষ্টার মধ্যে অনন্যচরিত্র হয়ে উঠেছে গৌরাঙ্গ। ২৭৮।৫৫

সমুদ্রের গান—শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক—ক্যালকাটা বুক ক্লাব, ৮৯, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা ৭। দাম—২॥০ টাকা।

বেশ কয়েক বৎসর যাবৎ নিয়মিতভাবে লিখলেও লেখক হিসেবে শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের যশপ্রাপ্তি বিলম্বিত হচ্ছে বলেই মনে হয়। বিশেষত ছোটগল্প রচনায় এক বিস্ময়সঞ্চারী প্রতিভার ইঙ্গিত নিয়েই তিনি পাঠক সমাজের কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন। ছোটগল্পের সার্থক রচনাকার তাঁর আপন বৈশিষ্ট্য থেকে এ গ্রন্থেও মুক্ত নন। এ-কথা বলার অর্থ এই যে 'সমুদ্রের গান' উপন্যাস বলে ঘোষিত হলেও মূলত এটি একটি বড় গল্প। কখনও-কখনও মনে হয়েছে কতগুলো বিভিন্ন ছোটগল্পের সংযোজিত সংস্করণ। আঙ্গিকের দিক থেকে এ-গ্রন্থের যে সংজ্ঞাই নিরূপিত হোক না কেন, এ-কথা অবশ্য স্বীকার্য যে, লেখক সমগ্র কাহিনীর মধ্যে যোগসূত্র হারিয়ে ফেলেন নি। অর্থাৎ কাহিনী বুননের মধ্যে একটি সম্পূর্ণ উপন্যাসের ধারা রক্ষা করার চেষ্টা হয়েছে।

'সমুদ্রের গান' একটি মধুর প্রেম কাহিনী। সম্প্রতিকার বাংলা সাহিত্যে শুধুমাত্র প্রেমসর্বস্ব উপন্যাস খুবই বিরল হয়ে পড়েছে। কোনো-কোনো কথাশিল্পী তাঁদের কাহিনীর জন্য সমাজসত্য আর সমস্যাই খুঁজে বেড়াচ্ছেন। তাও অধুনা কথাশিল্পে সবকিছুই আমরা পাই, পাই না শুধু মানুষের হৃদয়—যে হৃদয় শুধু সঙ্গীতেরই সুর ভাঁজে আর প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে থাকে। এ-গ্রন্থে সেই মানব-হৃদয়েরই প্রচ্ছন্ন রহস্য উদ্ঘাটিত হয়েছে। ঠিক দুঃসাহস নয়, তবে এ-গ্রন্থ রচনার জন্য লেখকের সৎসাহস অবশ্যই প্রশংসার যোগ্য।

এ-ধরনের রচনায় যে শ্রুতিমধুর ভাষা আর সংবেদনশীল হৃদয়ানুভূতির প্রয়োজন, তা লেখক অর্জন করেছেন সন্দেহ নেই। তবে শব্দচয়নের প্রশ্নে কিছু বলবার আছে। কতোগুলি শব্দ—যেমন 'জ্যোৎস্না-ঠিকরে-পড়া আবছা-আঁধারে, 'পাপড়ি-মেলে-জেগে-ওঠা' বা 'পথের-ওপর-ঝুঁকে-পড়া' লেখক নানাস্থানে ব্যবহার করেছেন। এত সংযোজন চিহ্নের বাহুল্য থাকার পেছনে লেখকের কোনো বৈজ্ঞানিক যুক্তি থাকতে পারে, তবে পড়ার সময় এ-সব শব্দ পাঠক চোখে পীড়া দেয় বলেই আমাদের বিশ্বাস।

সমালোচনায় সাধারণত গ্রন্থকারই আলোচ্য বিষয়, কিন্তু বর্তমানক্ষেত্রে প্রকাশকও নেপথ্য নন। প্রচ্ছদসজ্জায় প্রকাশক অভিনবত্ব আনতে চেষ্টা করেছেন। বাংলা বইয়ের প্রচ্ছদচিত্র নিয়ে প্রকাশকদের মধ্যে ইদানীংকালে যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে, সে প্রতিযোগিতায় বর্তমান প্রকাশক নতুন কিছু উপস্থিত করতে চেষ্টা করেছেন। 'সমুদ্রের গানে'র প্রচ্ছদপট অভিনব সন্দেহ নেই, আর সে-কারণেই নতুন। কিন্তু ছাপার মান প্রকাশকের পরিচিত সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখার মতো নয়। ২৩০।৫৫

ছায়ামারীচ—সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক—বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলকাতা ১২। দাম ৩৲ টাকা।

'ছায়ামারীচে' লেখক উপন্যাসের প্রচলিত রীতিকে গ্রহণ করেন নি। সমগ্র আখ্যানবস্তুকে বিশেষ কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে প্রতিটি অধ্যায় রচনা করেছেন ছোটগল্প রচনার পদ্ধতিতে। এ-আঙ্গিক নতুন বা অভিনব কিছু নয়, বরং বলা ভালো, বাংলা সাহিত্যে অনেক আগেই এ-রীতির পরীক্ষা হয়ে গেছে। এতে উপন্যাসের মূল আবেদন অবশ্য ব্যাহত হয় না, তবে এ-ধরনের উপন্যাস-সৃষ্টি করতে গেলে বিভিন্ন চরিত্রগুলোর মধ্যে একটি সঙ্গতিরক্ষার জন্য বিশেষ মনোনিবেশের প্রয়োজন হয়। এ-গ্রন্থ আলোচনা প্রসঙ্গে এ-উক্তি করার কারণ এই যে, দু-একটি জায়গায় সে অসঙ্গতি স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। প্রথম দুটি পরিচ্ছেদে সদ্য কলেজে ভর্তি হওয়া সুন্দরী এক নরম মেয়ে হৈমন্তী, দাদা আর ছোট বোনদের মুখের দিকে তাকিয়ে দুর্বল, অসহায়, গরীব কেরানী কৈলাসকে বিয়ে করলো সে, ভালোও বাসলো। এ-উদারতা, এ-মহত্বের তুলনা বিরল। তারপর এলো চৈতন্য গড়াই, এলো হেরম্ব দত্ত—চিত্রজগতের রথী মহারথী—গা ভাসিয়ে দিলো হৈমন্তী, মদ পর্যন্ত ঠোঁটে তুললো। গৃহস্থ ঘরের বাঙালী মেয়ের জীবনে এ-পরিণতি অবান্তর না হলেও প্রায় অসম্ভবই। লেখকের বা আমাদের চোখের ওপর একটি কি দুটি নিদর্শন যে এমন নেই তা নয়, কিন্তু বৃহত্তর সমাজ জীবনে এ-নিদর্শন প্রায় ব্যতিক্রম বলে মনে হয়। পরিচালক চৈতন্য গড়াই তার চরিত্রে সঙ্গতি হারিয়েছে কতোবার। অথচ বিজয় সেনের প্রতি উপযুক্ত মনোযোগ দিলেন না লেখক, চারদিকের এই কৃত্রিমতার মধ্যে সে-ই ছিলো একটি মানুষ। মূলত ছায়াচিত্রের পটভূমিকায় লেখা হলেও, লেখক অধিকাংশ সময়ই ব্যস্ত হয়েছেন 'এক্সট্যাসী ক্লাবের' সভ্যসভ্যাদের নিয়ে। ক্লাবের আবহাওয়ায় কতোগুলো টাইপের সন্ধান পেলাম, মানুষ পেলাম কই? কিন্তু এরই মধ্যে গড়ে উঠেছে হৈমন্তীর মূর্খ অসহায় স্বামী কৈলাশ চৌধুরীর সত্যিকারের মানুষ-চরিত্রটি। ব্যথা বেদনা নিয়ে সে যেন আমাদের ধরা ছোঁয়ার মধ্যে এসে পোঁচেছে।

'ছায়ামারীচ' অন্য নগরের কথা নয়, বরং আমাদের কলকাতারই কাহিনী। বাঙালী সমাজই এর পটভূমি। সুধীরঞ্জনবাবুর এক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এই উপন্যাস পাঠান্তে পাঠকের কাছে সহজেই ধরা পড়ে। বাঙলা বই যাঁরা পড়েন সেই সব সাধারণ পাঠক-

পাঠিকার চোখে-দেখা পৃথিবীকে সাহিত্যের উপজীব্য করতে তিনি যেন নারাজ। এখানে যদিও তিনি লণ্ডনকে বেছে নেননি, বরং আমাদের চেনা কলকাতাকেই আশ্রয় করেছেন, তবু এ-যেন আরেক কলকাতা। যাদের সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের প্রচুর উৎসাহ অদমনীয় কৌতূহল, সেই চলচিত্রজগতের উর্বসী রূপসীরা, আর ঐশ্বর্যবান পুরুষেরা এ-কাহিনীর নরনারী। ছায়াচিত্রমহলের এই সব যশস্বীদের সঙ্গে জড়িয়ে আছে এক্সট্যাসী ক্লাবের আর সব সভ্যসভ্যা, যারা পর্যান্ত বিত্তের অহঙ্কারে পৃথিবীকে তুচ্ছ মনে করে, অর্থ আর ঐশ্বর্যের প্রাচীর গড়ে তার আড়ালে যথেচ্ছাচার চালিয়ে যায় দিনের পর দিন। নিজেদের ব্যাখ্যায় তাদের সমাজ আনন্দের বৈকুণ্ঠধাম, নীতিবোধের সংজ্ঞায় যা ভয়াবহ নোংরামি। এরা কেউই আমাদের কাছের মানুষ নয়, কিন্তু ছায়ামারীচের সর্বত্রই এদের বিচরণ। আমাদের কাছে এরা অপরিচিত বলেই লেখকের কৃতিত্ব অনেকখানি বেড়ে গেছে। সমাজের তথাকথিত অল্প-সংখ্যক ভাগ্যবানদের অন্দরে প্রবেশ করে লেখক যতটুকু দেখেছেন, ততটুকুই ব্যক্ত করেছেন এখানে। যদি সত্যদৃষ্টি হয় তবে এর যথেষ্ট মূল্য আছে। ৭২৯।৫৫

গল্প সংকলন

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প—অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির, ৫, শ্যামা-চরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২, দু-টাকা।

উত্তেজনা, আগ্রহ, ঘটনা-স্রোতের মধ্য দিয়ে সূচনা থেকে পরিণতির দিকে এগিয়ে চলার সহজ, সাবলীল ঝোঁক, ভাষার স্বচ্ছ, মসৃণ বেগ,—পাঠকের মন সম্বন্ধে নির্ভর-যোগ্য জ্ঞান, লেখকের নিজের কর্তব্য সম্বন্ধে অভ্রান্ত বোধ,—অর্থাৎ দক্ষ গল্প-লেখকের পক্ষে যেসব সম্পদ এবং সামর্থ্য থাকা একান্ত দরকার, বিভূতিভূষণ বন্দ্যো-পাধ্যায়ের মন ছিল সেই সব গুণে সমৃদ্ধ, সামর্থ্যে নিপুণ। ছোটোদের উপযোগী মোট তেরটি গল্পেই এই সংগ্রহের সার্থকতার আনুকূল্য করেছে। ভূতের গল্পে ছোটো-বড়ো সকলেরই আগ্রহ আছে ও নিছক একটি মর্জির রেখাচিত্রধর্মী গল্পে ছোটরা ক্লান্তি বোধ করে। তা'বলে ছোটরা যে কল্পনায় দীন কিংবা আগ্রহে দুর্বল, সেকথা মনে করবার কারণ নেই। বরং এদিকে তাদের সহজাত ঐশ্বর্যই চোখে পড়ে। কিন্তু বড়োদের কল্পনা অন্য রকম। তাঁরা চিন্তায় ভারাক্রান্ত, তর্কে বিপর্যস্ত। ছোটোদের গল্পে Higher Mathematics, Space, Time ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করেও গল্পের আকর্ষণ যে অভিপ্রেত পাঠকের কাছে অক্ষুণ্ন রাখা যায়, তার দৃষ্টান্ত আছে বিভূতিভূষণের 'বিরজা হোম ও তার বাবা' গল্পে। 'হারুন-অল-রসিদের বিপদ' অন্য রসের আবেদন-বাহী, কিন্তু ছোটোদের পক্ষে কম চিত্তা-কর্ষক নয়। এবং এই ছোটোদের গল্পগুলি বড়োদেরও দিব্যি ভালো লাগে। অর্থাৎ বয়স্ক পাঠকের মধ্যে কিশোরের স্পৃহা-কল্পনা-প্রবণতা থাকাটা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু ছোটোদের মধ্যে বড়োদের প্রবীণতা-বোধের সীমা আছে। সেই সীমাবোধ বিভূতিভূষণ পুরোমাত্রায় দেখিয়ে গেছেন। বর্তমান সংকলনের প্রতি লেখাটিই তার প্রমাণ।

প্রকাশক ছাপা-বাঁধাই-কাগজে কোনো ত্রুটি রাখেন নি।

২৪৪।৫৫

রম্যরচনা

মিহি ও মোটা—ইন্দ্রনাথ; ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ, ৯৩, হ্যারিসন রোড কলিকাতা—৭। মূল্য—২, টাকা।

ভাবের গভীরতর অনুধাবন এবং ভাষার সৌকর্যসাধনে যে অক্ষম কিংবা অমনোযোগী, রম্যরচনা সেই অগতির গতি, এই ধারণা ব্যাপক হ'লে সাহিত্যের একটি রমণীয় শাখা অচিরে ধুলোয় লুটোবে। বরং আমরা জানি, যে ভূমি অতিশয় সারবান এবং বহুযত্নে কর্ষিত, রম্যরচনা তারই অবসরের ফসল।

"ইন্দ্রনাথ" বিদেশে পর্যটন করেছেন এবং সেই অনতিদুর্লভ কীর্তি পাঠকের গোচরে আনতে পশ্চাদপদ নন। তাছাড়া তিনি যাকে শিক্ষাবিদেরা "সাধারণ জ্ঞান" বলেন তাও নানা বই কাগজ থেকে কিছু সংগ্রহ করেছেন। অতএব এই রকম বাকরচনা করে সাধারণ্যে প্রচার করবার অধিকার তাঁকে দিতে হবেঃ "বিশ্বাস প্রবণতা থেকে সংস্কারের দূরত্ব বেশী নয়। একটা থেকে হয় আরেকটা, তখন সমাজের মধ্যে অবশ্যমান্য অনুষ্ঠানের স্থান গ্রহণ করে।"

এবং প্যারিসের রাজপথে মার্টিনি নামক বিদেশী পানীয় সহযোগে যে প্রেমের কাহিনী শোনা গেল, আর কোন গুণ না থাকলেও ওই ভৌগোলিক মর্যাদার বলেই তা সাহিত্য।

এই এক নতুন স্নবারি (Snobbery) বাংলা সাহিত্যে রম্যরচনার বুকে বাসা বেঁধেছে। ২০৯।৫৫

প্রাপ্তিস্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থ আসিয়াছে।

কুশী প্রাঙ্গণের চিঠি—বিভূতিভূষণ মুখো-পাধ্যায়।

হাসি ও অশ্রু—বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

বি টি রোডের ধারে—সমরেশ বসু।

চীন দেখে এলাম ১ম পর্ব—মনোজ বসু।

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প—অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত।

বাইশ কবির মনসা-মঙ্গল বা বাইশা—শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য।

হিন্দুস্থানী রাগ সঙ্গীত রাগেশ্বর—১ম ভাগ—শ্রীপ্রবুদ্ধকুমার চট্টোপাধ্যায়।

শ্রীগুরুতত্ত্ব ও গীতা—আচার্য শ্রীগোপাল-চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

যৌন বিজ্ঞান ২য় খণ্ড—আবুল হাসানাৎ।

লাইবেরিয়ার উপকথা—সুনন্দা বন্দ্যো-পাধ্যায়।

আফ্রিকার চিত্র—সুমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায়।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি—মহম্মদ আবদুল হাই।

আচারাঙ্গ সূত্র—শ্রীহীরাকুমারী।

ভগ্নতরী—রমেন গুপ্ত।

রঙরাগ—স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভুলি নাই—মনোজ বসু।

বাঁশের কেল্লা—মনোজ বসু।

টাকার প্রাচীর—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাস।

রংবাহার—শ্রীকার্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত।

রাহুর প্রেম—এমিলী ব্রণ্টী। অনুবাদক অশোক গুহ।

ক্ষণিকা—কার্তিক মজুমদার।

জীবন নদী—শ্রীবিমলজ্যোতি দাস।

শেষের কবিতা

পরিতোষ খাঁ

আমি আজ চলে যাই নিরাশার ধূসর গভীরে।
সেখানে চেয়োনা তুমি তোমার দীঘল চোখ ঘিরে
এনোনা স্মৃতির মৌন। জীবনের আনন্দের ঢেউ
তোমাকে করাক স্নান।

বিমর্ষ আবিষ্ট ব্যর্থ কেউ
তোমাকে চেয়েছে চেয়ে ফিরে গেছে
চলে গেছে একা দূর পথে।
করুণ কান্নার মতো তা'র হিম ব্যথার জগতে
ফেলোনা পায়ের ছাপ। আষাঢ়ের মেঘমায়া নদী
চৈত্রের চড়ায় তা'র ছুঁয়ে যেতে
মন তো করোনি। আজ যদি
যায় সে যাক সে তীক্ষ্ম বঞ্চনার নিরালা আগুন
সাথে নিয়ে।

কামনার অফুরন্ত মায়াবী ফাল্গুন
নিয়ত থাকুক জেগে তোমাতে, বহুর রমণীয়
শরীর—সময়—পেশী—আশ্লেষের অবাধ পানীয়
কালের পেয়ালা হোক। সুখী হোক
তোমার জীবন।
অনেকের স্বাদে হোক ময়ূরের মত্ত উপবন।

আমি একা পথ খুঁজে আমাকে লাগেনি
কারো ভালো,
মেঘের মিছিলে মুগ্ধ কবে বেলা কেটে গেছে,
কেটে গেছে কখন সকালও।

দূরবীক্ষণ

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

অন্য আলোয় আমাকে দেখবে তুমি।
এই মসৃণ মমতার সমভূমি
থেকে অন্তত কয়েক মাত্রা দূরে
যেখানে আকাশ আলোকলতার সুরে
সুর মেলায়নি, সেই লজ্জায় ঢালুঃ
এধারে খাড়াই, ওদিকে গভীর জল
দুজনেই তার সুনীল উত্তরীয়
ধ'রে আছে ব'লে দিগন্ত আলুথালু,
ভয়ে কাঁপে যতো বিহঙ্গ বিহ্বল—
সেখানে আমায় পরীক্ষা ক'রে নিয়ো।

আজকে তোমার সকল প্রশ্ন
হারিয়ে গিয়েছে আমার কথায়,
কথার কোমল সচ্ছলতায়
আছো অপরূপ নাতিশীতোষ্ণ,
নম্র সময় চামর বুলায়।

আমি দূরে যাবো; বিষুবরেখার ব্রতী
হ'তে পারবো না—ওই আকাশের পাশে
নিজেকে পুড়িয়ে তোমার চৈত্রমাসে
রেখে যাবো এক মধুর মেরুজ্যোতি।
তরুছায়াতলে এইখানে তুমি থাকো,
শান্তি তোমার সখী হোক শাশ্বতী—
ছোটো এই দীঘি, বাঁকা এ-কাঠের সাঁকো,
এই মধুকর সুখী এ-মাঠের ঘাসে,
কিশোর হাওয়ার পরিমিত পাগ্‌লামিঃ
পুরোনো-আলোয় তোমাকে দেখবো আমি॥

পারাপার

অরবিন্দ গুহ

তোমার কাছে অনেক কিছু গোপন ক'রে রাখি,
তুমি আমার মধ্যাদিনের পাখি।
অসংশয়ে শুনি তোমার নানারকম স্বর,
তুমি আমার একা থাকার ঘর।

দিনের বেলা কাটাতে হয় কষ্ট কাজের ভানে,
[illegible]চোখ আমি সজল করি কপট অভিমানে।
[illegible]রও চোখ সহসা জলময়
[illegible] হ'লো আমার অভিনয়—
[illegible] শেষে বৃষ্টি নামে বাঙলাদেশের প্রাণে।

বৃষ্টি যদি নামে মাঘের শেষে,
বলতে পারো কী হয় তবে দেশে?
জানো না? হায়, আমিই কি তা জানি।
তুমি আমার নীরবতা, তুমি আমার বাণী।

তুমি যখন ডোবাতে চাও, অমি তখন ভাসি;
দূরে সরাও, আমি তোমার বুকের কাছে আসি।
বন্ধ হয়, আবার খোলে দ্বার।
জীবন ভ'রে আমার পারাপার
করতে হবে। কেন যে আমি তোমাকে ভালোবাসি।

ধীরাজ ভট্টাচার্য

॥ চার ॥

পুরোদমে শুটিং চলেছে 'গিরিবালা'র। সকাল ছটায় গাড়ি আসে, আটটার মধ্যে লোকেশনে পেঁছে মেক-আপ করে প্রস্তুত হয়ে থাকি। বেলা বারোটা পর্যন্ত শুটিং চলে। তারপর সূর্য মধ্য গগনে দেখা দিলে অর্থাৎ 'টপ্ সান্' (top sun) হয়ে গেলে শুটিং বন্ধ হয়। তখন আমাদের লাঞ্চের ছুটি। আবার দুটো থেকে সাড়ে চারটে পর্যন্ত কাজ চলে, রোদের তেজ কমে এলে শুটিংও বন্ধ হয়ে যায়।

গিরিবালার শুটিং-এ আর একটা নতুন জিনিস দেখলাম 'রিফ্লেক্টর' বা ঝক্‌ঝকা ব্যবহার। আগে শুধু সানলাইটেই শুটিং হত। একটু অন্ধকার জায়গা, যেখানে সরাসরি সূর্যের আলো পড়ে না, সেখানে বড় বড় আয়না দিয়ে সূর্যের আলো ধরে ফেলা হত। তার ফলে আলোর সমতা রক্ষা হতো না। কেমন যেন ছোপ ছোপ আলোর এফেক্ট হত। মধু বোসকেই প্রথম দেখলাম কাঠের বড়, মাঝারি ও ছোট ফ্রেমে সোনালী ও রূপালী কাগজ এঁটে সূর্যের বিপরীতে ধরে সেই আলো অভিনয়-শিল্পী ও লোকেশনের উপর ফেলে ছবি তুলছেন। প্রয়োজনমত এই রকম রিফ্লেক্টর পনেরো কুড়িখানাও ব্যবহার করা হত। ফটোগ্রাফীর উৎকর্ষ যে আগের চেয়ে অনেক ভাল হল একথা বলাই বাহুল্য।

ভাল কথা। নরেশদার সঙ্গে ললিতা দেবীর (মিস বনী বার্ড) সেদিনকার অপ্রিয় ব্যাপারটা মধু বোসই একদিন মিটিয়ে দিলেন। সেও এক মজার ব্যাপার। স্বামী-স্ত্রীর ভূমিকা অভিনয় করছি, শুটিং-এর সময় ললিতা দেবীকে সাদরে জড়িয়ে ধরে হেসে 'ডায়ালোগ' বলি। শট শেষ হয়ে গেলে গম্ভীর মুখে উঠে চলে এসে অন্যদিকে পায়চারি করে বেড়াই। নরেশদাও যথাসম্ভব ওকে এড়িয়ে চলতে শুরু করলেন। ললিতা দেবীর প্রসঙ্গ উঠলেই নরেশদা হঠাৎ মধু বোসের সিনারিওর খাতাটা গভীর মনোযোগের সঙ্গে পড়তে শুরু করেন অথবা আমাকে ডেকে অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করে বসেন। ব্যাপারটা মধু বোসের দৃষ্টি এড়াল না।

একদিন আমায় ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন—'ব্যাপার কী বলতো ধীরাজ? হিরোইন, তার সঙ্গে কোথায় একটু ভাব-সাব করবে, যাতে দুজনের জড়সড় ভাবটা কেটে যায়। তা না নর্থ পোল আর সাউথ পোল?'

আমতা আমতা করে সে-প্রসঙ্গ কোনও রকমে এড়িয়ে গেলাম। মধু বোস কিন্তু নাছোড়বান্দা। নরেশদাকে জিজ্ঞাসা করলেন—'ব্যাপারটা সত্যিই কি হয়েছে বলুন তো নরেশবাবু। ধীরাজ আর ললিতা পরস্পরকে খালি এড়িয়েই চলেছে। এতে কিন্তু বিয়ের পর ওদের প্রণয়-দৃশ্যটা ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে।'

একগাল হেসে নরেশদা অম্লানবদনে বলে বসলেন—'মিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং আর কি! ভুল বোঝাবুঝির ব্যাপার।'

মধু বোস ও আমি দুজনেই থ বনে গেলাম।

'—দুদিনের তো আলাপ, এর মধ্যে আন্ডারস্ট্যান্ডিংটাই বা হল কখন! নাঃ, ব্যাপারটা তো খুব সহজ মনে হচ্ছে না। শোন ধীরাজ,' আমাকে একটু আড়ালে নিয়ে গিয়ে মধু বোস বললেন—'সত্যি কি হয়েছে বলত?'

সত্যি কথা বলতে কি নরেশদার উপর মনে মনে বেশ একটু রাগও হয়েছিল। কাণ্ডটা আসলে বাধালেন উনিই, আর বেগতিক দেখে সমস্ত দোষটা আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং-এর দোহাই পেড়ে খালাস? গোড়া থেকে শুরু করে সেদিনকার ব্যাপারটা সব বললাম মধু বোসকে। সব শুনে প্রথমটা বিস্ময়ে চোখ দুটো বড় হয়ে গেল মধু বোসের। তারপর হাসতে শুরু করলেন, যেন হিস্টিরিয়ার হাসি। প্রথমে কুঁজো হয়ে তারপর পেটে হাত দিয়ে। সব শেষে শুয়ে পড়লেন ঘাসের উপর।

শুনেছিলাম, হাসি জিনিসটা সংক্রামক। এবার সে প্রবাদবাক্য হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করলাম। মধু বোসকে ওভাবে হাসতে দেখে প্রথমটা হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম।

তারপর কখন কেমন করে অজ্ঞাতে ও অনিচ্ছায় একটু একটু করে হাসতে হাসতে হাসিতে ফেটে পড়লাম মনে নেই। একটু পরে দেখি, ব্যাপারটা অনুমানে বুঝে নিয়ে অপ্রস্তুতের হাসি হাসতে হাসতে নরেশদা এগিয়ে আসছেন। ওরই মধ্যে চেষ্টা করে একটু দম নিয়ে মধু বোস বললেন—'নরেশবাবু, আপনি যদি ধর্মযাজক হতেন, তাহলে সমস্ত পৃথিবীটা মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং-এ ভরে যেত।' আবার হাসি, এবার নরেশদাও যোগ দিলেন।

সে দিনের লোকেশন ছিল ওঙ্কারমল জেঠিয়ার বাগান-বাড়িতে। চেয়ে দেখি, আমাদের ওভাবে হাসতে দেখে ইউনিটের আর সব কর্মীরাও হাসতে শুরু করেছে। শুধু পূর্ব দিকে গঙ্গার ধারে একখানা বেতের চেয়ারে বসে উদাস চোখে নদীর

অপর পারে দৃষ্টি মেলে চেয়ে আছে ললিতা দেবী। আমাদের এ হাসির উৎস যে ও নিজেই, মনে হল তা বুঝতে পেরেই যেন আরও আড়ষ্ট হয়ে গেছে। হঠাৎ হাসি থামিয়ে মধু বোস বললেন—'আপনারা বসুন, আমি এখুনি আসছি।'

একটু পরেই অনিচ্ছুক প্রতিবাদরতা ললিতা দেবীকে একরকম টানতে টানতে এনে আমাদের মাঝখানে বসিয়ে দিলেন মধু বোস। তারপর ইংরেজিতে বললেন—'বনি, মস্ত একটা ভুল হয়ে গেছে। সেদিন নরেশবাবু তোমায় ইচ্ছে করে অপমান করেন নি। অনভিজ্ঞ নতুন ছেলে এ লাইনে এলে পাছে তারা খারাপ হয়ে যায়, এই আশংকায় উনি তাদের বাঁচাবার জন্য তৎপর হয়ে মরাল সম্বন্ধে লেকচার দিতে শুরু করে দেন। সেদিন ধীরাজকেও এ সম্বন্ধে সচেতন করবার সদিচ্ছায় উদাহরণ খুঁজে না পাওয়ায় হাতের কাছে তোমাকে দেখে তোমার নামই করে ফেলেন। সবচেয়ে মুশকিল হল, তুমি যে বাংলা বুঝতে পার, এটা উনি ভাবতেও পারেন নি। নাও, মিটমাট করে ফেল। তোমাদের ভুল বোঝাবুঝির ঠেলায় আমার সিনগুলো নষ্ট হয়ে যাবে এ আমি কিছুতেই হতে দেব না।'

গম্ভীর মুখে তবুও ললিতা দেবী বসে আছেন দেখে নরেশদা হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন—'মিসআণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং মিস বার্ড, আই অ্যাম সরি!'

ব্যাস, মেঘ কেটে গেল। হেসে নরেশদার প্রসারিত হাতখানা ধরে ললিতা দেবী বাধো বাধো বাংলায় বললেন—'হামি বাংলা বুঝটে পারি—এর জন্য সরি!'

আবার হাসির তুফান উঠলো। পশ্চিম আকাশের দিকে চেয়ে দেখি, সূর্যদেব রাগে অথবা লজ্জায় লাল হয়ে পশ্চিম দিগন্তে আত্মগোপনের চেষ্টা করছেন।

সেদিন আর শুটিং হল না। তল্পিতল্পা নিয়ে যে যার বাড়ি চলে এলাম।

'কাল-পরিণয়' ছবির শুটিং আপাতত বন্ধ আছে। শুনলাম 'গিরিবালা' রিলিজ হয়ে গেলে আবার শুরু হবে। গাঙ্গুলীমশাই অমন তাড়াহুড়ো করে ছবি তুলতে ভালবাসেন না, তা ছাড়া তিনি অনেক কাজের মানুষ। শুধু ছবি তোলা নিয়ে মেতে থাকলে চলবে কেন?

'গিরিবালা' প্রায় শেষ হয়ে এল। রোজ শুটিং, বেশ লাগে। শুটিং না থাকলেই মনটা খুঁত-খুঁত করে। এর মধ্যে মনে রাখবার মত কিছু ঘটেনি। মুখে স্বীকার না করলেও মনে মনে বেশ বুঝতে পারতাম, ললিতার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা দিন দিন বেড়েই চলেছে। হয়তো অনেকেই লক্ষ্য করে, হাসাহাসিও করে; গ্রাহ্য করি না।

সেদিন হঠাৎ শুটিং-এর শেষে মধু বোস বললেন—'কাল 'গিরিবালা'র শেষ শুটিং।'

মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল আমার। আড়চোখে লক্ষ্য করে দেখলাম, ললিতার মুখখানাও ম্লান। আকাশ পাতাল ভাবতে ভাবতে একটু দূরে বেঞ্চির উপর বসে পড়লাম। নরেশদা আর মধু বোসও

এগিয়ে এলেন। কাছে এসে মধু বোস কোনও রকম ভূমিকা না করেই বললেন—'আজকাল ললিতার সঙ্গে তোমার আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিংটা একটু বেশী হয়ে যাচ্ছে না ধীরাজ?'

বেশ একটু ঝাঁজের সঙ্গেই বললাম—'আপনারাই বলেন হিরোইনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা না করলে স্বাভাবিক অভিনয় বিশেষ করে লভ্ সিন্ করা সম্ভব নয়।'

কোনও জবাব না দিয়ে কিছুক্ষণ আমার দিকে চেয়ে ম্লান হেসে নরেশদা ও মধু বোস গাড়ির দিকে চলে গেলেন।

ওঙ্কারমল জেঠিয়ার বালীর বাগান-বাড়ি থেকে ভবানীপুর বেশ খানিকটা দূর। এই দীর্ঘ পথ সেদিন নীরবেই কাটিয়ে দিলাম। চেষ্টা করেও কোনও কথা বলতে পারলাম না।

রাত্রে শুয়ে ঘুম আর আসছে না। নিজের মনের সঙ্গে তর্ক শুরু করে দিলাম।

—অন্যায়? কি অন্যায়টা করেছি শুনি?

—প্রথমেই নরেশদা তোমায় সাবধান করে দিয়েছিলেন, এ লাইনে প্রলোভন বিছান।

—নরেশদার সবতাতেই একটু বাড়াবাড়ি। ললিতাকে যদি আমার ভাল লাগে তাতে দোষ কি?

—দোষ এই যে, ছবি শেষ হতে চললো অথচ তোমার ভাল লাগা দিন দিন বেড়েই চলেছে।

তর্ক হচ্ছে—সত্যে উপনীত হওয়ার জন্য যুক্তিপূর্ণ পথে যে আলাপ-আলোচনা চলে, তাকেই বলে তর্ক। আর কোনও যুক্তিই মানব না, যেভাবে হোক আমার নিজের মতকে প্রতিষ্ঠিত করবই, এটা হল বিতণ্ডা। সোজা পথ ছেড়ে মনের সঙ্গে এই বিতণ্ডা করতে করতে ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়লাম।

ঘুম ভাঙলো মায়ের ডাকে। বলছেন—'শুটিং-এর গাড়ি এসে দাঁড়িয়ে আছে। তিন তিনবার ডেকে গেলাম এখনও ঘুম ভাঙলো না? আজ তোর হল কি?'

লজ্জা পেয়ে তাড়াতাড়ি উঠে কোনও রকমে প্রাতকৃত্য শেষ করে গাড়িতে উঠে ড্রাইভারের কাছে শুনলাম, আজ আর অন্য আর্টিস্ট কেউ নেই, শুধু আমি আর ললিতা। সারা পথ চুপচাপ কাটিয়ে জেঠিয়ার বাগানবাড়িতে যখন এসে পৌঁছলাম, তখন প্রায় আটটা বাজে।

আমার আগেই মধু বোস ললিতাকে নিয়ে পৌঁছে গেছেন। তাড়াতাড়ি মেক-আপ করতে গেলাম।

সেদিন নেওয়া হল কতকগুলো বিক্ষিপ্ত শর্ট। যেমন মত্ত অবস্থায় আমার টলতে টলতে হেঁটে যাওয়া। উপরের জানালা খুলে ললিতার উঁকি মেরে দেখার ক্লোজ-আপ। সিঁড়ি দিয়ে টলায়মান দু'খানি পা নেমে আসছে ইত্যাদি ইত্যাদি। আর নেওয়া হল বিভিন্ন ভঙ্গিতে আমার আর ললিতার একত্রে কতকগুলো স্টীল ফটো পাবলিসিটির জন্য।

লাঞ্চের সময় হয়ে গেল। প্রতিদিনের বরাদ্দ যথারীতি খাবারের সঙ্গে অবাক হয়ে দেখলাম, কেক্, সন্দেশ ও কমলালেবুর অতিরিক্ত আয়োজন। একটু পরেই জানতে পারলাম বাড়তি খাওয়াটা খাওয়াচ্ছেন ললিতা দেবী, বিদায় আপ্যায়ন হিসাবে। আমিও বাদ গেলাম না। কেমন অভিমান হল। যুক্তিহীন অভিমান ও

বয়সের নিত্যসঙ্গী। ভাবলাম, আমাকেও ললিতা দেবী সবার সঙ্গে এক করে বিদায় দিতে চায়?

মুখ দেখে বোধ হয় বুঝতে পেরেছিল। একটু নিরিবিলি হতেই কাছে এসে চুপি চুপি বললে—'ধীরাজ, তোমার জন্যে রেখেছি একটা বিগ্ সারপ্রাইজ। মামি নিজে রান্না করছে, মুরগ মসাল্লাম। রাত্রে আমাদের ওখানে তুমি খাবে। আনন্দে আত্মহারা হয়ে স্থান-কাল-পাত্র ভুলে খপ করে ললিতার একখানি হাত ধরে ফেললাম, কথা খুঁজে পেলাম না।

চকিতে চারদিক দেখে নিয়ে ললিতা বললে—'ছাড়ো ছাড়ো সবাই দেখলে কি ভাববে বলতো? বি পেশেণ্ট ডারলিং!'

ডারলিং? আমি আর নেই। ছবিতে নামতে শুরু করে, আমারে এই একুশ বাইশ বছর বয়সে, ইংরেজি জানা কোনও কটা রঙের মেয়ের মুখ থেকে ডাইরেক্ট ডারলিং ডাক এই প্রথম। ভাবলাম, আর বাড়ি যাব না। গঙ্গার তীরে ওঙ্কারমল জেঠিয়ার এই বাগান-বাড়িতে মালি হয়ে সারা জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারি যদি ললিতার মত মেয়ে রোজ মাত্র একটিবার ডারলিং বলে ডাকে।

সেদিন আর বিশেষ কাজ কিছু হল না। খাওয়া-দাওয়া শেষ হতেই বেলা আড়াইটা বেজে গেল। কাজ শেষ করার আনন্দে সবাই বিভোর। মধু বোস ক্যামেরাম্যান যতীনকে নিয়ে কতকগুলো প্যানোরামিক দৃশ্য তুললেন এডিটিং শট হিসাবে। বেলা যেন তবুও শেষ হয় না।

অবশেষে তল্পি-তল্পা বেঁধে বালী থেকে যখন রওনা হলাম, তখন পাঁচটা বেজে গেছে। ছোট গাড়িটায় আমি, ললিতা ও মধু বোস। বড় ভ্যানটায় আর সব স্টুডিও কর্মীরা। হৈ হল্লা করে সবাই বেরিয়ে পড়লাম—রাস্তার লোক অবাক বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলে ভাবে—ব্যাপার কি?

ধর্মতলায় আসতেই মধু বোস ৫ নম্বর বাড়িতে নেমে গেলেন রুস্তমজী সাহেবের সঙ্গে দেখা করবার জন্য। গাড়ি আমাকে ও ললিতাকে নামাতে চললো। ললিতারা ম্যাডান স্ট্রীটে একটা বড় ব্যারাক বাড়িতে থাকতো। তখন অবশ্য রাস্তাটির অন্য নাম ছিল, আর রাস্তাও অত চওড়া ছিল না। সবে দুধারের বাড়িগুলো ভাঙতে শুরু করেছে। ম্যাডানের আফিস ও বাড়ির পাশ দিয়ে গাড়ি ম্যাডান স্ট্রীট ধরে দক্ষিণমুখে একটু এগুতেই ডান দিকে একটা পুরনো প্রকাণ্ড ব্যারাক বাড়ি পড়ে। সেইখানেই একটা ফ্লাট নিয়ে ললিতারা থাকে।

গাড়ি থামতেই ললিতা নেমে পড়ল। আমি গম্ভীর হয়ে চুপ করে একপাশে বসে আছি, হাত ধরে একটু টান দিয়ে ললিতা বললে—'এস।'

তবুও ইতস্তত করছি, দেখি ড্রাইভার রামবিলাস মুচকি মুচকি হাসছে। অগত্যা নামলাম। সদর দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকে সামনে পড়ে একটা অন্ধকার নোংরা স্যাঁতসেঁতে উঠোন। একটু এগিয়ে গিয়ে কাঠের নড়বড়ে একটা সিঁড়ি, তাই বেয়ে উপরে উঠতে হবে। কেমন একটু নিরুৎসাহ হয়ে গেলাম। ললিতার হাত ধরে সেই অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে উঠছি হঠাৎ পাশ দিয়ে দু-তিনটি ছেলেমেয়ে হুড়মুড় করে নেমে গেল। বহু দিনের পুরনো সিঁড়ি যন্ত্রণায় কাতর আর্তনাদ করে উঠল। রোমাণ্টিক নভেল পড়ে পড়ে যে কুসুম বিছানো পথ কংক্রিটের মত মনে স্থায়ী আসন পেতে রেখেছিল, এই অন্ধকার নড়বড়ে সিঁড়িই প্রথমে সেটায় নাড়া দিয়ে কাঁটার অস্তিত্বে সচেতন করে দিলে। হঠাৎ নরম বালিশের মত একটা পদার্থ পায়ের ওপর পড়তেই সভয়ে চিৎকার করে পড়তে পড়তে ললিতাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরেও টাল সামলাতে পারলাম না। সিঁড়ির উপর দুজনে জড়াজড়ি করে বসে পড়লাম বা পড়ে গেলাম। কিছুমাত্র ভয় না পেয়ে পরম কৌতুকে খিল খিল করে হেসে উঠল ললিতা। শীতের সন্ধ্যায় বেশ বুঝতে পারলাম কপালটা আমার ঘামে ভিজে উঠেছে।

(ক্রমশ)

ফটোগ্রাফীর আর্ট

নীরোদ রায়

ফটোগ্রাফীর মাধ্যমে আর্ট-চর্চার সম্ভাবনা নিয়ে যখনই প্রশ্ন উঠেছে তখনই জবাব পাওয়া গেছে সপক্ষে এবং বিপক্ষে—আলোচনা আর বিতর্কের ভিতর দিয়ে। এক শ্রেণীর লোকের কাছে সম্ভাবনার স্বীকৃতি পেলেও অপর শ্রেণীর দিক থেকে এসেছে ঘোরতর আপত্তিঃ ফটোগ্রাফীতে সৃষ্টিমূলক কিছু নেই, যা আছে তা শুধু ক্যামেরার কল-কব্জার কারচুবি।

স্বীকৃতি আর আপত্তিতে দ্বন্দ্ব। বহু কথা হয়েছে, আলোচনাও হয়েছে অনেক। এ প্রসংগ নিয়ে অনেক প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে বহু দেশে। ভারতবর্ষে বোধ করি তেমনভাবে কিছু হয়নি। না হবার কারণ আছে। ফটোগ্রাফী এদেশে বিশেষ পুরোনো নয় এবং এর উৎকর্ষ তেমন প্রশংসনীয়ও নয় বলেই হয়তো এদেশেব মতামতে অস্পষ্টতার ছায়া আছে। অস্পষ্ট মতামতের ভিতরও দেখতে পাওয়া গেছে স্বীকৃতি আর আপত্তিতে দ্বন্দ্ব। দুই দলের দুইরকম মনোভাব।

ফটোগ্রাফীর আর্ট নিয়ে বহু আলোচনার ভিতর একটি কথা নিয়ে খুব বেশী আলোচনা হয়েছেঃ Is photography an art, or a science, or both? ফটোগ্রাফীটা 'আর্ট' কিনা, এ প্রশ্নের জবাবে বিতর্কের খাতিরে বলতে হবেঃ 'ফটোগ্রাফী' অর্থে বোঝায়—The art of taking pictures by the action of light on chemically prepared surface. এখানে 'art of taking pictures' অর্থ হচ্ছে technique of taking pictures—অর্থাৎ art of the science. কোন কাজের পদ্ধতিকে আমরা art বলে থাকি। যেমন, art of talking art of singing এসব। এদিক থেকে বিচার করলে আমাদের মেনে নিতে হবে যে, ফটোগ্রাফীর কাজটা আর্ট। (প্রকৃতপক্ষে কাজের আর্টের সংগে ফটোগ্রাফীর আর্ট অনেক তফাৎ)

আবার অন্যদিকেঃ ফটোগ্রাফী করতে হয় ক্যামেরার কলকৌশলের মাধ্যমে—যার প্রতিটি স্তরের ভিত্তি বৈজ্ঞানিক সূক্ষ্ম হিসাবের উপর। তারপর, একটি ফটোগ্রাফকে নেগেটিভে বা কাগজে ফুটিয়ে তুলতে রসায়নিক পদ্ধতির প্রয়োগ মেনে চলতে হয় ব'লে photography is a science বলতে হবে।

এখন 'ফটোগ্রাফী' না বলে ফটোগ্রাফ কথাটা যদি ধরে নেয়া যায়, তাহ'লে অর্থ হয়ে দাঁড়ায় অন্যরকম। ফটোগ্রাফের প্রকারভেদ হবে উদ্দেশ্য ও কাজের ধারা নিয়ে। একরকমঃ যে ফটোগ্রাফ তুলতে ক্যামেরা যন্ত্রের ক্ষমতা অতিক্রম করেনি এবং রসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কাগজের উপর বিষয়বস্তুর হুবহু ছাপ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে মাত্র, সে ফটোগ্রাফকে মামুলি প্রতিচ্ছবি বলা চলে। সংবাদচিত্র বা দলিল-চিত্র গোছের ছবি এর আওতায় পড়ে। এখানে ছবিতে হুবহু ছাপ থাকে বলেই camera does not lie কথাটা খাটে। ফটোগ্রাফীর নানাদিকের ভিতর এ একটি দিক। প্রয়োজনের বিচারে এ দিকের মূল্য যথেষ্ট। এ জাতীয় ফটোগ্রাফীতে ক্যামেরার প্রাধান্য বেশী। ফটোগ্রাফার ক্যামেরার উপর নির্ভরশীল সম্পূর্ণভাবে। এখানে science একমাত্র কার্যকরী।

এখন আমরা মেনে নিতে পারি ফটোগ্রাফীর কাজটা এক হিসাবে art এবং এক হিসাবে science। যদি তাই হয়ে থাকে, তাহলে art and science—both বলতেও আপত্তি করাটা ঠিক হবে না।

প্রবন্ধের মূল কথা ছিল 'ফটোগ্রাফীর আর্ট'—অর্থাৎ ফটোগ্রাফী কাজের মাধ্যমে

নেগেটিভ ছবিঃ নেগেটিভখানাই একটা নতুন ধরনের ছবি। এ রকম ছবি দেখতে কেউ অভ্যস্ত নন। চোখে অস্বাভাবিক লাগলেও দেখতে ভালই লাগে। যে কোন নেগেটিভকে এ ধরনের ছবি করলে মানাবে না, উপযুক্ত নেগেটিভ বাছাই করতে হবে শিল্পীকে। নেগেটিভ ছবি করতে হলে একটা প্লেটে বা ফিল্মে প্রিণ্ট ক'রে তারপর সেই পজিটিভ থেকে ছবি করতে হবে
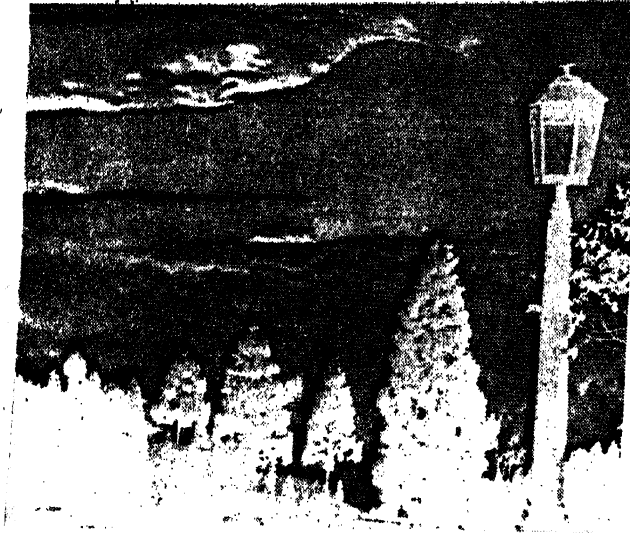
বাস-রিলিফ ছবি (Bas. relief): নেগেটিভের উপর প্লেট বা ফিল্মের পজিটিভ মিলিয়ে নিয়ে একটু তফাৎ (out of register) করে ছবি তৈরী করলে এ রকম ছবি হবে

যে আর্ট গ্রহণযোগ্য। পূর্বে 'ফটোগ্রাফ' কথাটা ধরে নিয়ে একদিক আলোচনা করা হয়েছে। তার অন্যদিক হচ্ছে: যে ফটোগ্রাফ তৈরী করতে ফটোগ্রাফারের মস্তিষ্কের কাজ ক্যামেরা ও রাসায়নিকের হিসাবকে অতিক্রম করে গেছে, সেই বে-হিসাবী কাজের ফলে ফটোগ্রাফে যে সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে—সেটাই হচ্ছে প্রকৃত art। বলা হয়েছে, উদ্দেশ্য ও কাজের ধারা নিয়ে ফটোগ্রাফের প্রকার ভেদ হবে। শুধু science-এর উপর নির্ভর করলে ফটোগ্রাফ হবে এবং ফটোগ্রাফে সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুললে তা হবে ছবি। এখানে প্রচলিত কথায় 'Man behind the camera' কথাটা উল্লেখ করে বলা চলে: যিনি ক্যামেরা ব্যবহার করবেন তাঁর উদ্দেশ্যের উপর ফলাফল নির্ভর করবে। তিনি শিল্পীমন নিয়ে যে ছবি তৈরী করবেন তাতে science-এর সাহায্য নিতে হলেও প্রকৃতপক্ষে art প্রকাশ করাই মুখ্য উদ্দেশ্য। এ জাতীয় আর্ট-সংপৃক্ত ছবি বর্তমান জগতে pictorial photograph নামে পরিচিত এবং এটাই হচ্ছে ফটোগ্রাফীর আর্ট।

ফটোগ্রাফ ও ছবি

সব ফটোগ্রাফই প্রকৃতপক্ষে ছবি নয়। পূর্বের কথা থেকে বলা যায়—ফটোগ্রাফ তৈরী করেন ফটোগ্রাফার এবং ছবি তৈরী করেন ফটো-শিল্পী। ফটোগ্রাফকে ছবিতে পরিণত করতে যে কাজটুকু দরকার, তা শিল্পী ছাড়া অন্যের পক্ষে সম্ভব নয়। ফটো-শিল্পীরা ফটোগ্রাফে একটি বিশেষ রূপ ফুটিয়ে তুলতে যে প্রচেষ্টা ক'রে আসছেন সে ধারা pictorial photograph নামে পরিচিত। বর্তমান যুগে সারা পৃথিবীতে এ ধারায় চর্চা করার লোক নেহাৎ কম নয়। এদেরই প্রচেষ্টায় প্রদর্শনী থেকে আরম্ভ ক'রে নানাভাবে জনসাধারণের মনের ভিতর এ ধারণা জন্মেছে যে, ফটোগ্রাফের ভিতর সম্পূর্ণ আর্ট বজায় রেখে ছবি তৈরী করা সম্ভব এবং তা গ্রহণযোগ্য।

অঙ্কনচিত্র এবং ফটোগ্রাফীর ছবি—উভয়ই শিল্পসংপৃক্ত কিন্তু প্রকারভেদ আছে। তুলি আর রঙ নিয়ে চিত্রশিল্পী কল্পনারাজ্যের চিত্র আঁকতে পারেন, কিন্তু ফটোগ্রাফার বাস্তব রাজ্যের সৌন্দর্য গ্রহণ করতে পারেন ক্যামেরার সাহায্যে। কল্পনার ছবিকে রূপ দিতে গিয়ে চি শিল্পী তুলির আঁচর কেটে যান এ শেষকালে নিজের প্রাণেরই সঞ্জীবন ম তাঁর চিত্রে প্রাণের সঞ্চার হয়। কল্প আর বাস্তব তখন হয় এক। ফটো শিল্পীও কত অবজ্ঞাত সামান্য বস্তু ছবি তুলে কাগজের উপর রূপদান ক তাকে অসামান্য মর্যাদা দান করেন। প্রকৃ শিল্পী এ'রাই। মনের ভাব, উদ্দে এবং আদর্শ উভয়েরই এক—শুধু সাধ প্রণালীর প্রকারভেদ।

ছবি ও আর্ট

প্রকৃত আর্ট কি জিনিস, তা উপলি করা যায়, বোঝানো বা শেখানো যায় না শিক্ষকের কাছে ছাত্র চিত্রশিল্পের অঙ্কন পদ্ধতি সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করতে পা কিন্তু প্রকৃত আর্ট সম্বন্ধে কোন জ্ঞান তার জন্মাতে পারে না যতক্ষণ না আর্টে অনুভূতি তার প্রাণে জাগছে। তা আমরা সহস্র চিত্রাঙ্কণ শিক্ষার্থীদে ভিতর মাত্র অল্প কয়েকজনকে দেখতে পাই যাঁরা নিজ গুণে প্রকৃত শিল্পী হত পেরেছেন। বাকী সবাই হয়তো পা করে ডিপ্লোমা পেয়েছেন। তাঁ tecnique শিখে পাশ করেছেন—আ তাঁদের প্রাণে স্থিতিলাভ করেনি।

ফটোগ্রাফীর আর্ট সম্বন্ধে বলা গেলে একই কথা বলতে হয় pictorial art শেখাবার কোন রাজপ নেই, যে-পথে অনায়াসে এগিয়ে যাও যেতে পারে। ফটো-শিল্পী বহু কঠো পরিশ্রম ও তিক্ত অভিজ্ঞতার ভিতর দি নিজেই তাঁর অভীষ্ট পথ খুঁজে পান অন্ধকার ঘরে (dark room) কাগজে উপর ছবির প্রাণ ফুটিয়ে তুলতে গি হয়তো আর এক ছবির সৌন্দর্যের সন্ধা পান। কেউ বলে দেয়নি, সম্পূর্ণ অজা এক পদ্ধতির ভিতর নতুনত্বের অভিজ্ঞ লাভ করেন। সেই পদ্ধতি অবলম্ব অপর কেউ ছবি তৈরী করতে গি হয়তো আর এক পদ্ধতির সন্ধান খুঁ পান। এভাবে ফটো-শিল্পী নিজ ভাবধারাকে অবলম্বন ক'রে নিজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন কাজের ভিতর দিে সাধারণ ফটোগ্রাফার দীর্ঘকাল অধ্যবসা ফলে ফটোগ্রাফীর science সম্বন্ধে জ্ঞ

করতে পারেন, কিন্তু ফটো-শিল্পীর সঙ্গে তাঁর পার্থক্য হবে কাজে।

ফটোগ্রাফকে ছবিতে পরিণত করা অভিজ্ঞ ফটো-শিল্পীর পক্ষে সম্ভব। ক্যামেরা তাঁকে সাহায্য করবে বিষয়বস্তুর একটা ছাপ ধরে দিতে, কিন্তু ফটো-শিল্পীর মনের ছবি ফ্রটিয়ে তোলার ক্ষমতা ক্যামেরার নেই। বাস্তবর্পের যে সৌন্দর্য চিত্র ফটো-শিল্পী দেখেছেন, তাকে কাগজে ফ্রটিয়ে তুলতে তাঁর প্রতিভা আর অভিজ্ঞতা সাহায্য করবে। অপর কেউ তা পারবে না।

শিল্পীর সাধনার প্রয়োজন। সাধনার প্রকৃত সফলতা ঘটে তখনই, যখন তাঁর চিত্রে কোন বিশেষ ভাব র্পায়িত হয়ে ওঠে—যে ভাব প্রাণের ভিতর অন্ভূতি জাগায়। যে-চিত্র কঠিন হৃদয়ের অন্তর স্তর স্পর্শ করতে পারে, যে-চিত্র চিত্তে দোলা দিতে সক্ষম—সে-চিত্রই প্রকৃত শিল্পীর দান। শ্ধ্ বিভিন্ন রঙের খেলা অথবা বৃহৎ আকার হলেই প্রকৃত চিত্র বলা চলে না।

বাস-রিলিফ ছবি তৈরী করতে নেগেটিভ-পজিটিভ যতট্কু তফাৎ করা দরকার, তার থেকে বেশী ক'রে এই নতুন রকমের ছবি তৈরী করা হয়েছে। এ ধরনের ছবি আজ পর্যন্ত কোথাও দেখতে পাওয়া যায় নি

ফটোগ্রাফীর পোর্টরেট-ছবিতে যে ব্যক্তির স্বভাব বা ব্যক্তিত্ব ফ্টে ওঠেনি, সে পোর্টরেট আর্টের ক্ষেত্রে ম্ল্যহীন। যে-দৃশ্যে প্রকৃতির র্পের সৌন্দর্য ফ্টে ওঠেনি এবং মনকে প্রকৃতির সেই বাস্তব পরিবেশে টেনে নিয়ে যেতে অক্ষম, সে-ছবিতে প্রাণ কোথায়? যে-ছবিতে প্রাণ নেই, সে-ছবিতে আর্ট নেই। এখানে ফটোগ্রাফারের প্রতিভার অভাব থাকলে ক্যামেরার ক্ষমতাকে অতিক্রম ক'রে কাজের বৈশিষ্ট্য ছবিতে প্রকাশ পায় না।

শিল্পাচার্য নন্দলাল বস্র দ্'টি কথা বলছি। "প্রধান জিনিস হচ্ছে প্রতিভা। প্রতিভা না থাকলে উ'চুদরের শিল্প সৃষ্টি হয় না। আর দ্বিতীয় জিনিস হচ্ছে, প্রকৃতির র্পের জ্ঞান।" র্পের জ্ঞান আর সূক্ষ্মদৃষ্টি নিয়ে যে ফটোগ্রাফার ক্যামেরা ব্যবহার করবেন, তাঁর শিল্প প্রতিভা ছবির ভিতর দিয়ে ফ্টে উঠবেই। তিনি যে-কোনো ধরনের ছবি তুল্ন না কেন, তাতে সৌন্দর্যের আভাস থাকাই স্বাভাবিক।

"Long ago, when the scottish painter D. O. Hill resorted to photography for his portrait work, his results were so superior to those painted by his contemporaries, that a critic, asked to express his opinion upon the new process, remarked that he was afraid it was going to be a foe-to-graphic art."

শিল্প-প্রতিভা থাকলে যে কোন শিল্পীর পক্ষে অন্য মাধ্যম গ্রহণ ক'রে ছবি তৈরী করা কঠিন নয়। চিত্রশিল্পীরা ফটোগ্রাফীর মাধ্যমে অনেক ছবি তৈরী করেছেন এরকম বহ্ নজীর আছে। তাঁদের তীক্ষ্ম শিল্পদৃষ্টি ফটোগ্রাফকে আর্টসংপৃক্ত ক'রে তোলে অনায়াসে। এ সম্বন্ধে একটা বই থেকে কিছ্টা অংশ উল্লেখ করছি।

ফটোগ্রাফের আর্ট এবং তুলিকাচিত্রের আর্ট—প্রকারভেদ শ্ধ্ technique-এর দিক থেকে। একথা মনে রেখে বিচার করলে ফটোগ্রাফের আর্টকে স্বীকার করতেই হবে। যাঁরা pictorial photographic exhibition দেখেছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই ফটোগ্রাফের আর্ট সম্বন্ধে অনেকটা আভাস পেয়েছেন। শিল্পীমনা দর্শকরা অনেক ছবি দেখে অভিভূত না হয়ে পারেন না। বাছাই করা ফটো-শিল্পীদের প্রতিভার পরিচয় এসব ছবিতে স্পষ্ট হয়ে ফ্টে আছে। মোট কথা, ফটোগ্রাফীর আর্টকে চিত্রশিল্পের আর্টের সমপর্যায়ে স্থান দিতে আপত্তি থাকলেও, পৃথক্ ক'রে এ আর্টকে সমাদর করা উচিত। এ আর্টকে অবহেলা করা চলে না একথা সত্যি।

ফটোগ্রাফীর আর্টের ধারা

ফটোগ্রাফীর আর্টের স্বীকৃতি যতট্কু পাওয়া গেছে সেদিকে খেয়াল রেখে এগিয়ে যাচ্ছেন প্রত্যেক দেশের ফটোশিল্পীরা। এগিয়ে যাওয়ার ভিতর অবশ্য স্বাতন্ত্র্য আছে দেশ বিদেশে। প্রত্যেক দেশের শিল্পরীতি ও ভাবধারা তাদের নিজস্ব জাতীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে প্রকাশ পায়। ফটো-শিল্পীরাও pictorial photography নিয়ে ছবিতে সৌন্দর্য ফ্টিয়ে তুলতে জাতীয় বৈশিষ্ট্যকে পরিত্যাগ করতে পারেন না।

জাতির সভ্যতা ও সংস্কৃতি, ভাষা ও সামাজিক প্রথার বৃহত্তর ক্ষেত্রে পার্থক্য থাকলেও শিল্প-প্রথার সাদৃশ্য বহ্লাংশে দেখতে পাওয়া যায় কারণ তাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্যের ভিত্তি ম্লত এক।

চীন দেশের পদ্ধতিতে তোলা ফটোগ্রাফ

তাদের চিন্তাধারার উৎস একই ধারায় প্রবহমান। ফটোগ্রাফীর আর্টের আদর্শ ও উদ্দেশ্য সবদেশেই সমান, কিন্তু জাতীয় সভ্যতার রুচি ও শিল্পধারা অনুযায়ী ভিন্নদেশে প্রকাশ ও প্রসার হচ্ছে ভিন্ন-ভাবে। তুলনা করলে দেখতে পাই প্রাচ্য আর পাশ্চাত্যের শিল্পধারায় পার্থক্য, ভারতবর্ষ আর চীন-জাপানের পার্থক্য।

চীন-জাপানের চিত্রশিল্পের ধারা প্রায় এক। এদের শিল্পরীতিতে জাতীয় বৈশিষ্ট্য এত বেশী সুস্পষ্ট যে এমনটি বোধ করি আর কোন দেশেই নেই। অথচ আশ্চর্য যে, এই আর্ট সবদেশের চোখে সুন্দর লাগে, সবাই উপলব্ধি ক'রে মুগ্ধ হয়। এই দেশ ভ্রমণ করবার সময় রবীন্দ্র-নাথের দৃষ্টি এদের আর্টের দিকে আকৃষ্ট হয়েছিল ব'লেই তিনি এক চিঠিতে লিখে-ছিলেন: "আমাদের নববঙ্গের চিত্রকলায় আর একটু জোর, সাহস এবং বৃহত্ত দরকার আছে, এই কথা বারবার আমার মনে হয়েছে। আমরা অত্যন্ত বেশি ছোট-খাটোর দিকে ঝোঁক দিয়েছি। টাইকান্‌, শিমোমুরার ছবি একদিকে খুব আয়তনের আর একদিকে খুব সুস্পষ্ট। কিছুমাত্র আশেপাশের বাজে জিনিস নেই। চিত্র-করের আঁকার যে আঁচড়গুলো সকলের চেয়ে পরিস্ফুট কেবলমাত্র সেইটেকেই খু জোরের সঙ্গে পটের উপর ফলিয়ে তোলা সমস্ত মন দিয়ে এ ছবি না দেখে থাকবা জো নেই, কোথাও কিছুমাত্র লুকোচুরি ঝাপ্‌সা কিম্বা পাঁচমিশেলি রং চং দে যায় না। ধব্‌ধবে প্রকাণ্ড শাদা পটে উপর অনেকখানি ফাঁকা, তার মধ্যে ছবি ভারি জোরের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে।"

চীন দেশের চিত্রাঙ্কনের আর্টে একই ধারা। ফটোগ্রাফীর আর্টেও নতুন পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ফটোগ্রাফী আর্টে যদিও বা কিছুটা সাদৃশ্য মে চীন দেশের সঙ্গে সাদৃশ্য পাওয়া কঠিন অথচ এই পার্থক্য অন্য দেশের ফটো শিল্পীকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে, মু করে। আজ পৃথিবীর বহুদেশের ফটো শিল্পী নিজস্ব শিল্পধারার বাইরেও চী দেশের ধারায় ছবি তৈরি করছেন এ সে ছবি নিঃসংশয়ে প্রশংসা লাভ করছে

চীনদেশীয় আর্টের কতকগুলি নি হচ্ছেঃ দূরের জলের ঢেউ নেই, দূরে গাছের পাতা নেই এবং দূরের মানুষে চোখ নেই। দূরের জিনিসে যা আছে হচ্ছে অস্পষ্ট আভাস। এই অস্প আভাসের ভিতর প্রধান বিষয়বস্তু সুস্প ছাপ নিয়ে ফুটে উঠবার সুযোগ পায় শাদা পটে অনেকখানি ফাঁকার উপর প্রধ বিষয়বস্তুকে যেভাবে ফলিয়ে তোলা হ তা অনেকটা ফটোগ্রাফীর high k পদ্ধতির অনুরূপ। High key ছবি আগাগোড়া সাদার ভিতর দিয়ে ছবি তৈ হয়, কিন্তু এদের বিষয়বস্তু স্বাভাবি ভাবে থেকেও আকর্ষণীয় হয় এ পদ্ধতির জন্য। চীন দেশের ফটোশিল্পী ছবি তৈরি করতে এক-নেগেটিভের স্থা বহু-নেগেটিভের ব্যবহার খুব পছ করেন। এই composite ছবি তৈ করতে খণ্ড-সৌন্দর্যের যে রচনা তৈ করেন, তাতে কাল্পনিক বা বেখাপ কিছুই থাকে না। ছবির সব অংশই বাস্ত থেকে গৃহীত। এটা মস্তবড় বিশেষ

চীন দেশের আর্টের নিয়ম সম্বে জানা যায় যে, শিল্পীরা যা চোখে দেখে ছেন তাই থেকে ছবি আঁকেন। কল্পনা সুপদানে পক্ষপাতী মন, কল্পনার মূ নেই। বাস্তব জীবনের সৌন্দর্য এ'দে চর্চার বিষয়বস্তু। তারপর, ছবির আশে

পাহাড়ে মেঘ ও রৌদ্র
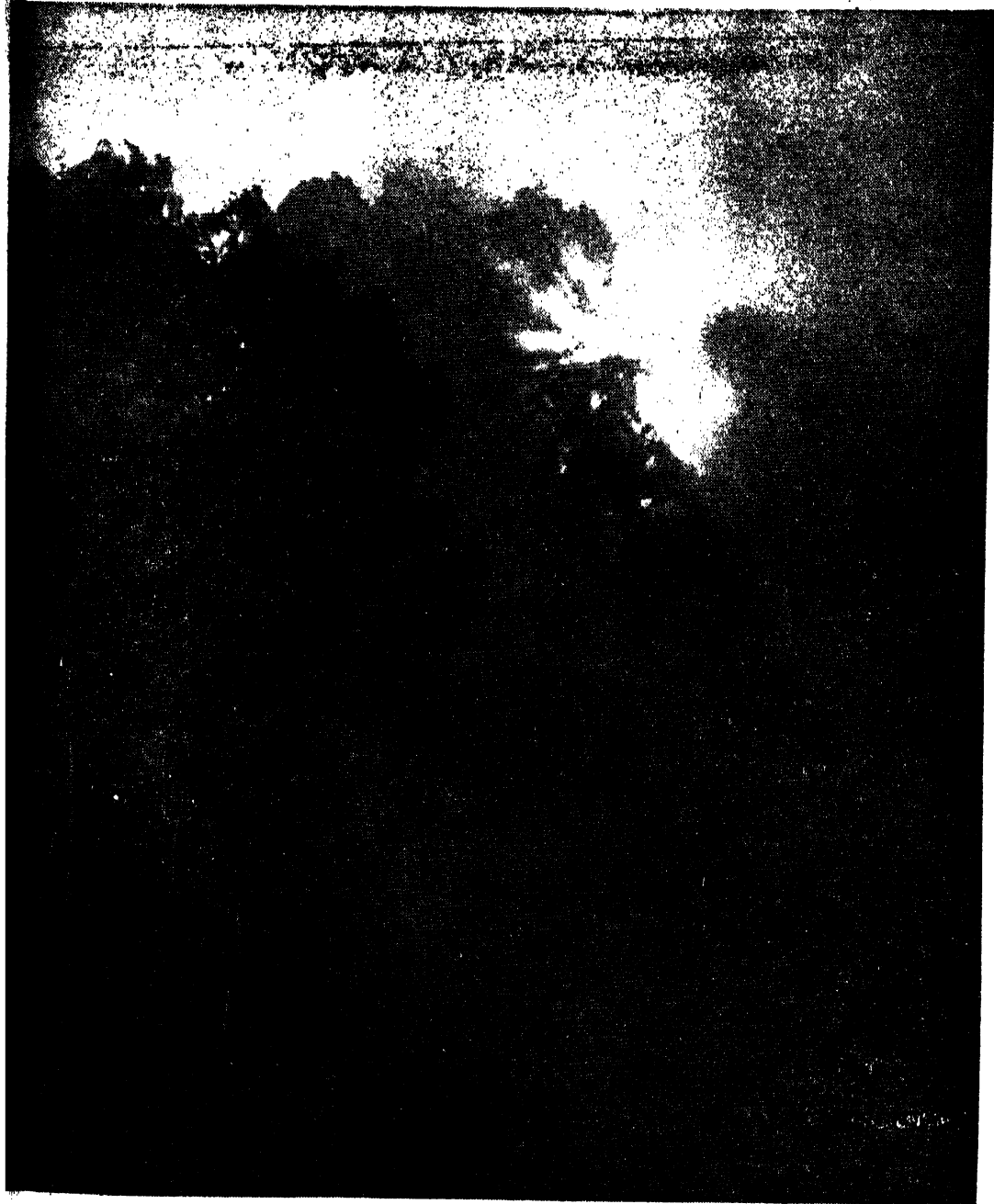
শীতের বীথিকা

পাশে যথাসম্ভব ফাঁকা রেখে যেভাবে ফুটিয়ে তোলেন ছবিকে, তা চোখে অসাধারণ সৌন্দর্য নিয়ে ধরা দেয়। ছবিতে অবান্তর কিছুর স্থান নেই বলেই দর্শকের দৃষ্টি এদিক ওদিক বিক্ষিপ্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায় না। চোখকে আঁকড়ে ধরে। চীন দেশের এই পদ্ধতি গ্রহণ ক'রে অন্য দেশ নতুনত্বের স্বাদ পাবেই অথচ নিজের দেশের রূপসৌন্দর্যের হানি হবে না।

ভারতবর্ষে ফটোগ্রাফীর আর্ট নিয়ে যাঁরা চর্চা করছেন, তাঁদের ভিতর আবার বিভিন্ন মতাবলম্বী আছেন। যদি কেউ স্পষ্ট-ছবির সৌন্দর্য নিয়ে চর্চা করেন, অপর একজন হয়তো ঐ সৌন্দর্যের ভিতর আর্ট খুঁজে পান না। অনেকের মতে, অস্পষ্ট ছবি অথবা super-imposition ও composite না হলে আর্ট হয় না। ওদের মতে পরিষ্কার ছবিতে সৌন্দর্য নেই, বুঝতে পারলে আর্ট নেই। ওতে আর্ট নেই, এতে আর্ট আছে—এ নিয়ে আবার এক সমস্যা।

সমস্যা দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। অতি সহজ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এখানে একথা বলা চলেঃ প্রকৃতির সৃষ্টিতে রূপ আছে সর্বত্র। প্রকারভেদ রূপের বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্যে। কোন কিছু সামান্য হলেও তুচ্ছ নয়, অনাবশ্যক নয়। প্রাণের অনুভূতি নিয়ে তাকালে কদর্য বস্তুর মধ্যেও সৌন্দর্যের সন্ধান পাওয়া যায়। এই সৌন্দর্যবোধ যাঁর প্রাণে জাগ্রত তিনিই শিল্পী। শিল্পী যে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ছবি ফুটিয়ে তুলবেন, তাতে একটা আবেদন থাকবে। সে ছবি দেখে একটা সাড়া জাগবে প্রাণে। যে ছবিতে আর্ট আছে সে ছবি স্পষ্ট glossy কাগজে হোক, আর অস্পষ্ট matt কাগজেই হোক—চোখে দেখে ভাল লাগবেই।

প্রাকৃতিক দৃশ্যে আর্ট

সামান্য প্রাকৃতিক দৃশ্য, যা সচরাচর সাধারণ লোকের চোখ এড়িয়ে যায়, তা চিত্র হয়ে ফুটে ওঠে শিল্পীর দৃষ্টিতে ধরা পড়ে। সে-চিত্র সাধারণ লোকের চোখের সামনে তুলে ধরলে তখন তারা বুঝতে পারে প্রকৃতির সৌন্দর্য কোথায়!

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য শিল্পীর মনকে স্বভাবতই আকৃষ্ট করে। তাই, ঋতু পরিবর্তনে যে ছাপ প্রকৃতিতে ফুটে ওঠে, তা দেখে শিল্পীর মনেও পরিবর্তন আসে। ঋতুর বিভিন্ন রূপ বর্ণনা করে প্রাকৃতিক আবহাওয়া, জানিয়ে দেয় নিজস্ব রূপ-মাধুর্য। সুন্দর বসন্তই হোক অথবা ঘন-বর্ষাই হোক—প্রাকৃতির রূপের কোনটাই শিল্পীর প্রাণে সাড়া না জাগিয়ে পারে না। নতুন ঋতুর আবির্ভাবে কবির মনে যে ভাবের সৃষ্টি হয়, তাঁর লেখনীতে তারই বর্ণনা প্রকাশ পায়। চিত্রশিল্পীর মনে যে অনুভূতি জাগে, তাই রঙীন হয়ে ফুটে ওঠে পটের উপর। আর ফটোশিল্পীরা ক্যামেরা নিয়ে খুঁজে বেড়ান প্রকৃতির নবরূপের সৌন্দর্য।

যে ফটোশিল্পী প্রাকৃতিক দৃশ্য-সৌন্দর্যে মুগ্ধ হন, তার কাছে যে কোন ঋতুই সুন্দর মনে হবে। গ্রীষ্ম-বর্ষায় প্রকৃতির বিশেষ রূপ তাঁকে সমানভাবেই আকর্ষণ করবে। এ সময় আকাশে মেঘের যে খেলা চলে, তা ফটো-শিল্পীদের কাছে বিশেষ সম্পদ। ছবিতে এই মেঘ-সম্পদ না থাকলে গ্রীষ্ম-বর্ষার মাধুর্য হারিয়ে যাবে। ফটোশিল্পীরা ক্যামেরা নিয়ে বাইরে এসে landscape, waterscene অথবা যে কোন দৃশ্য তুলবার আগে আকাশের দিকে তাকিয়ে মেঘের খোঁজ করেন। খুঁজে দেখে নেন আকাশের কোন দিকের মেঘ তাঁর ছবির পিছনে থাকলে সুন্দর দেখাবে। এভাবে সম্মুখের জল, স্থল আর দূরের নীল আকাশের বুকে মেঘ—এক ছন্দে গাঁথা হয় একটি ছবিতে। ছবিতে অন্য সব সম্পদ থেকেও মেঘ না থাকলে দেখে মনে হবে, কোথায় যেন একটা অভাব

আছে, কোথায় যেন সৌন্দর্যের ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে। মেঘের সৌন্দর্য আমরা উপলব্ধি করতে পারি দুটি ছবিকে পাশাপাশি রেখে—একটিতে মেঘ রেখে, অপরটিতে আকাশ ফাঁকা করে।

এদেশে বর্ষাকাল থেকে শরৎকাল পর্যন্ত, আকাশ জুড়ে মেঘের খেলার অন্ত থাকে না। দেখে মনে হয়, এই বুঝিবা সেই দেশ, এই বুঝিবা সেই সময়, যখন মেঘ-দূত রচিত হয়েছিল। অন্য সময় আকাশে মেঘের কদাচিৎ আবির্ভাব হলেও সে-মেঘে রূপ থাকে না, জৌলুস থাকে না। মনকে আকৃষ্ট করে না। বর্ষায় মেঘের খেলা শুরু হয় সূর্যোদয়ে আর শেষ হয় সূর্যাস্তে। সকালের মেঘের গায় সূর্যের প্রথম সোনালী কিরণ মিশিয়ে দেয়, দুপুর বেলা সূর্যের প্রখর তেজ মেঘে রূপালী রং ধরিয়ে দেয়, আর বিকেল বেলা পশ্চিম আকাশের দিগন্তে নানা রং মেঘে মিশিয়ে সূর্য আড়ালে বিদায় নেয়। সোনালী, রূপালী, নানা রংয়ের মেঘ শিল্পীর চোখে রং ধরিয়ে দেয়। প্রকৃতির এই সৌন্দর্য ছবিতে ফুটে ওঠে নানাভাবে, বিভিন্ন রচনায়।

তারপর সেই মেঘ যদি জল হয়ে ঝরে' পড়ার উদ্যোগে আকাশ জুড়ে' দুর্যোগের ইঙ্গিত দেয়, তাতে শিল্পীর মনে ভীতির সঞ্চার না হয়ে আনন্দের সঞ্চার হয়। বর্ষার প্রলয়রূপে প্রকৃতির নবরূপ—ফটোশিল্পীর ছবির সম্পদ।

বর্ষা হ'ল। নদী, বিল, খাল ভ'রে উঠলো কানায় কানায়। ভরা নদীর উপর দিয়ে সারি সারি নৌকো পাল তুলে চলে যায়। বিলের মাঝি ভাটিয়ালী গান গেয়ে নৌকো চালিয়ে বাড়ির দিকে চলে। তার নৌকোর তলায় সূর্যের শোনালী শেষ রশ্মিটুকু ডুবে যায় শত টুকরা হয়ে। এমনিভাবে কত সৌন্দর্য ফটোশিল্পীর সন্ধানে আসে, সে সৌন্দর্য অমর হয়ে গে'থে থাকে ছবিতে।

ফটোশিল্পী যদি চলে যায় কোন পাহাড় দেশের গভীর বনে, তাহলে এই সময় দেখতে পাবে প্রবল বেগে ছুটে চলা পাহাড়ী ঝরণার উচ্ছ্বাস। পাথর ঠেলে ঝরণা আঁকা-বাঁকা পথ বেয়ে চলার সময় সূর্যের রশ্মি ঝলমলিয়ে ফটোশিল্পীর চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দেয়।

চোখ স্নিগ্ধ করে দেয় পল্লীদেশ। পুকুরঘাটে পল্লী-বধূরা শূন্য কলসী জলে ডুবিয়ে পূর্ণ করে নেয়, ঢেউগুলি তখন বড় হয়ে ছড়িয়ে পড়ে সারা পুকুরে। আবার, ফটোশিল্পী যখন সমুদ্র সৈকতে দাঁড়িয়ে অগণিত ঢেউয়ের দৃশ্য দেখেন, তখন তাঁর একথাই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে ঢেউগুলি নিজেদের ক্ষুদ্র অস্তিত্ব মিশিয়ে দিয়ে এক হতে চায় এই বিরাট জল সমুদ্রে। কুলহীন সমুদ্রে সংখ্যাহীন ঢেউ—ফটোশিল্পীর ছবির পক্ষে এক মূল্যবান বিষয়বস্তু।

এ তো গেল গ্রীষ্ম-বর্ষায় মেঘ আর জল নিয়ে ছবির রূপ বর্ণনা। এভাবেই রচিত হয় শীত-বসন্ত ঋতুর রূপ।

শীতকালে প্রকৃতির যেসব সৌন্দর্য আমাদের নজরে পড়ে তা হচ্ছেঃ সবুজ ঘাসের ডগায় আর পাতায় পাতায় মুক্তোর মত ছড়িয়ে থাকা শিশিরবিন্দু, প্রভাতের কুয়াশাচ্ছন্ন পৃথিবী এবং বাগানে রং বেরং-এর ফুলের খেলা। এ-সব জিনিসের দিকে খেয়াল রেখে ফটোশিল্পী যে ছবি তৈরি করবেন, তাতে এই ঋতুর ছাপ নিশ্চয়ই ফুটে উঠবে।

এসময় আকাশে মেঘ থাকে না। তাই বলে কি স্থল-দৃশ্য বা জল-দৃশ্য সুন্দর দেখাবে না ছবিতে? ছবিতে মেঘের সৌন্দর্য নিয়ে যে কথা আগে বলা হয়েছে তা শুধু গ্রীষ্ম-বর্ষার জন্য। শীত-বসন্তে আকাশে মেঘ থাকবে না সত্যি, কিন্তু ঋতুর ছাপ প্রকৃতিতে নিশ্চয়ই থাকবে। প্রকৃতিতে যে-রূপ থাকবে সে-রূপের বর্ণনাতেই মাধুর্য ফুটে উঠবে ছবিতে।

শীতের প্রভাতে যখন চতুর্দিক থাকে কুয়াসাচ্ছন্ন, তখন পথে দাঁড়িয়ে মনে হয়—পথঘাট, ঘরবাড়ী, গাছপালা এসব যেন মিশে গেছে এক সঙ্গে। ক্যামেরার out of Focus-এর মত চোখে ধরা দেয় সব। নতুন রূপের স্বাদ পাওয়া যায়ঃ পথগুলো অচেনা, দেশটা অজানা। সেই পথে চলতে গিয়ে দেখা যায়, আকাশে মন্দির বা গির্জার চূড়া ভেসে আছে অস্পষ্ট হয়ে দূরের দিকে সব কিছুই মিশে গিয়ে কল্পনা আর বাস্তব এক হয়ে গেছে। ফটো—শিল্পীর ক্যামেরায় এসব দৃশ্যের ছাপ এনে কাগজে ফুটিয়ে তুললে স্বভাবতই দেখতে অনেকটা পেন্সিলে আঁকা ছবির মত মনে হবে। কালোর গাঢ়তা প্রায় থাকে না বলেই সাদার ভিতর একটু ঝাপসায় যে ছবি তৈরী হয়, তা দেখতে High key ছবির মত সুন্দর।

তারপর একটু বেলা হলে, সূর্যের কিরণ যখন কুয়াসা ভেদ ক'রে গাছের ফাঁকে ফাঁকে ছড়িয়ে পড়তে চেষ্টা করে, সেই আধো-আলো আধো-ছায়ায় যে সৌন্দর্য ফুটে ওঠে, তার রূপ ক্যামেরায় ধরা ফটো-শিল্পীর পক্ষে কঠিন নয়।

এ সময়কার জলদৃশ্যেও ঋতুর স্পষ্ট ছাপ থাকে শুকিয়ে যাওয়া কোন নদীর বালুচরে দাঁড়িয়ে সূর্যাস্তের সময় দেখতে পাওয়া যাবে—স্নিগ্ধ শান্ত পরিবেশে রঙীন সূর্য ম্লান হয়ে ডুবে যাচ্ছে দিগন্তে। তখন এই পরিবেশে কল্পনা করা যায় না কিছুতেই যে, এই সুন্দর বেলা-

ভূমির উপর দিয়ে বর্ষার দুর্দান্ত স্রোত গর্জন ক'রে চলে গেছে বর্ষাকালে। কোথায় গেল সেই অশান্ত ঢেউগুলির উচ্ছাস! আজ তারা নিস্তেজ, উচ্ছাসহীন।

শীতের পরে বসন্ত এলো।

প্রাণের অনুভূতিতে কেউবা হয়তো—উদাসী-হাওয়া, কোকিলের ডাক, গরম-ঠান্ডার আমেজ অনুভব করবে। এ নিয়ে ফটো—শিল্পীর কিছুই করবার নেই। যা-নিয়ে আছে তা হচ্ছে চোখ খুলে প্রকৃতির দিকে তাকানো।

বসন্তের নবরূপ চোখে ধরা দেবে গাছের দিকে তাকালেই। গাছগুলি এক বছরের পুরোণো পাতা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে নতুন বছরের হিসাবের জন্য তৈরী হচ্ছে। পাতাশূন্য গাছ হয়তো অনেকের চোখে নীরস রূক্ষ মনে হতে পারে, কিন্তু এর ভিতর যে সৌন্দর্য লুকিয়ে থাকে তা ফটো-শিল্পীর চোখে ভাল লাগবে। শিল্পী বুঝবেন, পাতা ফেলে দেওয়া গাছের উদাসীন ভাব। গাছ নিঃস্ব হলেও নিস্তেজ নয়, নব পল্লব সঞ্চারের আনন্দে আশাপূর্ণ।

বসন্তের আর এক রূপ এই নব পল্লব সঞ্চার। শাখায় শাখায় নব পল্লব আর ফুলের আবির্ভাব, শিল্পীর ছবিতে প্রাণ ফুটিয়ে তোলে। ফটো-শিল্পীর কাছে একটি মাত্র গাছের শাখা একটি বিশেষ সৌন্দর্য মনে হয়।

এভাবে প্রকৃতির একরূপ থেকে অন্যরূপে, এক স্তর থেকে অন্য স্তরে—যেখানেই ফটো-শিল্পী অনুভূতি নিয়ে তাকাবেন, সেখানেই হদিস পাবেন সৌন্দর্যের।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রসঙ্গ ছেড়ে দিয়ে ফটোগ্রাফীর অন্য যে কোন বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করলে, প্রত্যেকটিতেই আর্ট সৌন্দর্যের সম্ভাবনা দেখতে পাওয়া যাবে। ফটোগ্রাফীতে Table top অথবা Still life ছবি শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গির গুণে কতদূর সুন্দর হয় তার উদাহরণ pictorial photographyতে হামেসাই মেলে। প্রাণহীন বিষয়বস্তুকে সাজিয়ে গুছিয়ে নিয়ে ছবির ভিতর দিয়ে প্রাণ সঞ্চার করা হয়। শিল্পীর স্পর্শে অসাধারণ হয়ে ওঠে অতি তুচ্ছ জিনিস। ফটোগ্রাফীর আর্টের সন্ধান সেখানেই পাওয়া যায়।
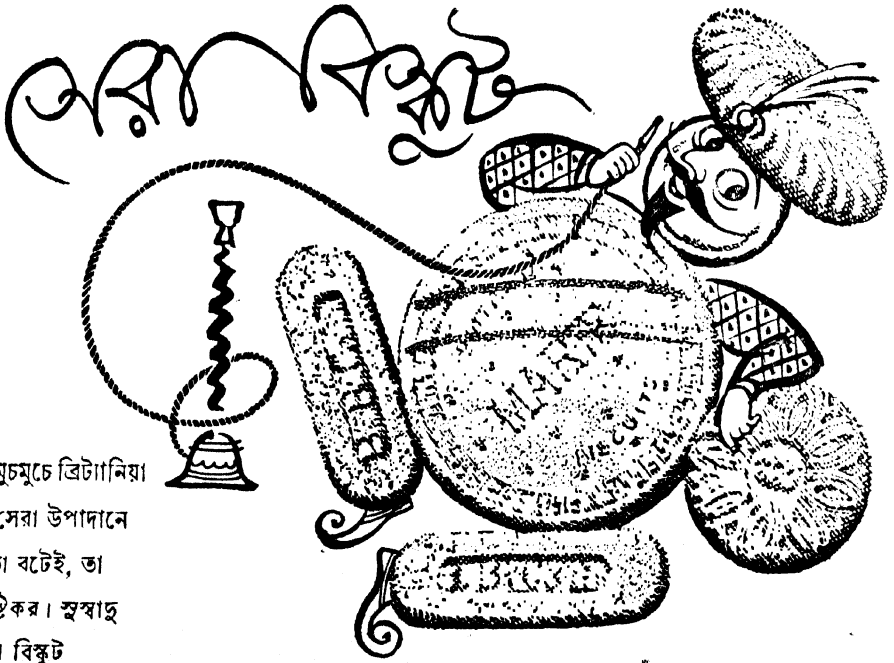
ঝাঁসীর রানী ০ মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য

॥ ৩ ॥
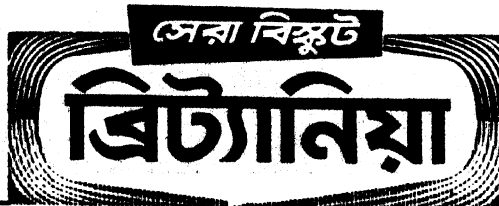
রামচন্দ্র রাওয়ের অভিভাবক গোপাল রাও মারা গেলেন ১৮২২ সালে। তাঁর স্থান গ্রহণ করলেন নারো ভিকাজী।

রামচন্দ্র রাওয়ের একমাত্র বোনের বিবাহ হয়েছিল সাগরের প্রাক্তন সুবেদার বিনায়ক গণেশ চন্দোরকারের পুত্র মোরেশ্বরের সঙ্গে। ১৮১৯ সালে, সাগর ও নর্মদা রাজ্য ব্রিটিশের হাতে যাবার পর থেকে তিনি ৪৭,০০০ টাকা বাৎসরিক বৃত্তি পাচ্ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর মোরেশ্বর সেই বৃত্তির অর্ধেক ২৩,৫০০৲ পাচ্ছিলেন। নাবালক পুত্রকে সরিয়ে মোরেশ্বরের পুত্র কৃষ্ণ রাওকে ঝাঁসীর উত্তরাধিকারী করবার একটি অসম্ভব বাসনা সখুবাঈয়ের মনে জাগল। তার কারণ হয়তো এই. নারো ভিকাজীর আমলে তিনি মন্ত্রীর অনভিজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করবার সুযোগ পেয়েছিলেন। জেনেছিলেন রাজত্ব করবার আনন্দ।

রামচন্দ্র রাও ১৮২৭ সালে সাবালক হলেন। ঠগী দমনের ব্যাপারে বুন্দেলখণ্ডে তিনি বৃটিশ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিলেন। ১৮২৪ সালে বর্মার যুদ্ধের সময়ে তিনি ব্রিটিশ সরকারকে ৭০,০০০৲ দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। তা ছাড়া বিভিন্ন সময়ে তিনি ব্রিটিশ সরকারকে দুটি কামান, চারশ অশ্বারোহী এবং এক হাজার পদাতিক সৈন্য দিয়ে সাহায্য করেন। কর্নেল স্লীম্যানের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব ছিল। কর্ণেল স্লীম্যান রামচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। ঝাঁসীকে তিনিই বুন্দেলখণ্ডের অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে তুলনা করে বলতেন, "Oasis in a desert"। সমগ্র অবস্থা পর্যালোচনা করে বৃটিশ সরকার রামচন্দ্র রাওকে রাজা খেতাব দেবার সংকল্প করলেন।

সখুবাঈ মরিয়া হয়ে রাজকোষের ধনরত্নসমূহ স্থানান্তরিত করলেন সাগরে, তাঁর কন্যাগৃহে। তাঁর কন্যাও এইসব ষড়যন্ত্রে মাতার সাহায্যকারিণী ছিলেন। রামচন্দ্রের খাদ্যে প্রত্যহ বিষ মেশানো হচ্ছে এরকম একটা সন্দেহ করবারও কারণ ঘটল। শঙ্কিত রামচন্দ্র রাও কর্নেল স্লীম্যানকে জানালেন তাঁর আশংকার কথা।

এইসব আভ্যন্তরীণ ষড়যন্ত্র বৃটিশ সরকারের সিদ্ধান্তকে বিচলিত করতে পারল না। ১৮৩২ সালের ৯ই ডিসেম্বর উইলিয়াম বেণ্টিংক স্বয়ং ঝাঁসীতে এলেন। ঝাঁসীর কেল্লার উপরের প্রাসাদে দরবারঘর সুসজ্জিত করা হল। একটি শোভন ও সুন্দর অনুষ্ঠানের পর উইলিয়াম বেণ্টিংক রামচন্দ্র রাওকে খেতাব দিলেন—"মহারাজাধিরাজ ফিদুই বাদশাহ জানুজা ইংলিস্তান মহারাজ রামচন্দ্র রাও বাহাদুর।" ঝাঁসীরাজের সীলমোহরে নাগারা ও চামরের সঙ্গে এই খেতাব খোদাই করতে অনুমতি দিলেন। খোলা দরবারে ব্যবহার করবার জন্য একখানি ব্রিটিশ পতাকা দিলেন। ঝাঁসী থেকে সাগরে গিয়ে বেণ্টিংক রামচন্দ্র রাওকে একখানি সম্মানসূচক অভিনন্দন-পত্র পাঠালেন।

মারাঠা রাজ্যে ঝাঁসীর উন্নতিতে ঈর্ষ্যাপরায়ণ রাজপুত রাজ্য অরছা ও দতিয়া, ঝাঁসীর অন্তর্গত জিগনী ও উদয়গাঁও এবং বিলচারীর পওয়ার রাজপুত সামন্তদের উত্তেজিত করতে লাগলেন। বিক্ষুব্ধ রাজপুত সর্দাররা ঝাঁসী থেকে সাগর অভিযাত্রী বেণ্টিঙ্কের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে রামচন্দ্র রাওয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানালেন। বেণ্টিঙ্ক জানালেন যে আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যবস্থায় তিনি হস্তক্ষেপ করবেন না। অতএব, রাজপুত সর্দাররা ভূমিয়াবৎ জাহির করলেন। জমির স্বত্বাধিকার নিয়ে লড়াইকেই বলা হয় ভূমিয়াবৎ। এক কথায় প্রবল স্বেচ্ছাচার ও বিদ্রোহ দেখা দিল। নারো ভিকাজী ও রামচন্দ্রের প্রবল চেষ্টা সত্ত্বেও, তাঁদের বারো হাজার সৈন্য পরাস্ত হয়ে গেল। ঝাঁসী ও মৌরাণীপুর ছাড়া সমস্ত রাজ্যই বেহাত হয়ে গেল বিদ্রোহীদের হাতে। গোয়ালিয়রের ইংরেজ রেসিডেণ্ট আর ক্যাভাণ্ডিশ গভর্নর জেনারেলকে জানালেন—"দতিয়া ও অরছার রাজারা একজোট হয়ে ঝাঁসীতে প্রবল অরাজকতার সৃষ্টি করেছেন। বৃটিশ সরকারের হস্তক্ষেপ ব্যতীত এক ঝাঁসীরাজের পক্ষে বিদ্রোহ দমন অসম্ভব। চন্দেরী পর্যন্ত গোলমাল ছড়িয়ে পড়বার সম্ভাবনা আছে। গোয়ালিয়ারে বাইজাবাঈ উত্তেজিত হয়ে উঠতে পারেন।"

অরছা ও দতিয়ার রাজারা হস্তক্ষেপ করে এই ভূমিয়াবৎ দমনে সাহায্য করলেন। বুন্দেলখণ্ডের সমৃদ্ধতম রাজ্য ঝাঁসীর আর্থিক অবস্থা হয়ে পড়ল শোচনীয়। রাজকোষ শূন্য করেছেন সখুবাঈ। অগত্যা, বিপন্ন রামচন্দ্র গোয়ালিয়ার ও অরছার কাছে রাজ্য বাঁধা রেখে টাকা নিলেন, বৃটিশ সরকারের কাছ থেকেও টাকা নিলেন। ঋণের পরিমাণ হ'ল প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ টাকা।

বিপন্ন ও ভগ্নহৃদয় রামচন্দ্রের সান্ত্বনা পাবার কোনো আশাই ছিল না মায়ের কাছ থেকে। মায়ের দুরভিসন্ধির কথা জানিয়ে বারবার আশঙ্কা প্রকাশ করলেন তিনি স্লীম্যানের কাছে। লছমীতাল হ্রদে নিয়ত সাঁতার কাটবার ও ঝাঁপ দেবার অভ্যাস ছিল তাঁর। একদিন লছমীতালের জলে, তাঁর ঝাঁপ দেবার স্থানে, পাথরে বিদ্ধ অবস্থায় তীক্ষ্ণধার বর্শা ও ভল্ল পাওয়া গেল। লাল্লু কোটেলকার ও আনন্দ বর্মা এই দুইজন সাবধান করলেন রামচন্দ্রকে। ষড়যন্ত্র প্রকাশিত হল। রামচন্দ্র রাও বুঝলেন এ সখুবাঈয়ের কাজ। সখুবাঈ এবং তাঁর সহকারী গঙ্গাধর মুলের আক্রোশ থেকে বাঁচাবার জন্য আনন্দরাও বর্মাকে রামচন্দ্র মৌরাণীপুরের তহশীলদার নিযুক্ত করলেন। কথিত আছে, লাল্লু কোটেলকারের অনুরোধে তিনটি দরিদ্র বালিকা, কাশী, সুন্দর ও মুন্দারকে ঝাঁসী রাজপ্রাসাদে স্থান দেওয়া হয়। এ'রা তিনজন ভবিষ্যতে রাণী লক্ষ্মীবাঈয়ের সহকারিণী হয়েছিলেন।

অন্দরে ও বাইরে নানা কারণে আঘাত পেয়ে রামচন্দ্র দিন দিন ভেঙে পড়তে লাগলেন। নতুন খেতাব নিয়ে

জাঁকিয়ে রাজত্ব করবার সময় মিলল না তাঁর। ১৮৩৫ সালে অনেক বড় এবং শক্তিশালী আর এক দরবারের পরোয়ানা পেয়ে রামচন্দ্র রাও চলে গেলেন। এমনই জোরদার সেই পরোয়ানা যে, ঝাঁসীর সিংহাসনের উত্তরাধিকারীর কোন ব্যবস্থা করবার সময়ও তাঁর মিলল না। তাঁর মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী জেনে সখুবাঈ পূর্বাহ্ণে সাগর থেকে কন্যা ও দৌহিত্রকে আনিয়েছিলেন। মরণোন্মুখ জ্ঞানহীন পুত্রের কোলে দৌহিত্র কৃষ্ণরাওকে বসিয়ে দিয়ে তিনি ঘোষণা করলেন যে, রামচন্দ্র ভাগিনেয়কে দত্তক নিয়েছেন। শাশুড়ী ও ননদের অধীনা হয়ে রামচন্দ্রের পত্নীর বেঁচে থাকবার কোন বাসনা ছিল না। তিনি স্বামীর সঙ্গে সহমৃতা হবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে সখুবাঈ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। জানালেন বর্তমানে কৃষ্ণরাও তাঁর দত্তকপুত্র। যেহেতু সেই পুত্র বিদ্যমান সেহেতু সহমৃতা হবার অধিকার নেই তাঁর। দুর্গ প্রাসাদ তিনি অধিকার করে রাখলেন। কৃষ্ণরাওকে অশৌচ পালন করালেন। দশম দিনে মস্তক মুণ্ডন ইত্যাদি করবার সময়ে রঘুনাথ রাও এসে বাধা দিলেন। তিনি বললেন, যেহেতু তিনি নিজে ও গঙ্গাধর রাও রয়েছেন, সেহেতু রামচন্দ্র রাওয়ের ভিন্ন গোত্র থেকে দত্তক নেবার কথা ওঠে না। দত্তক গ্রহণের যখন কোনো শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান হয়নি, তখন এই বালককে স্বীয় পিতার বর্তমানে জনকাশৌচ পালন করানো অতীব ধর্ম-বিগর্হিত কাজ।

এই সময় কর্নেল স্লীম্যান ঝাঁসীতে এলেন। সখুবাঈয়ের সমস্ত বাধা সত্ত্বেও রঘুনাথ রাও মনোনীত রাজা হলেন। সেটা ১৮৩৫ সাল।

রঘুনাথ রাও কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত ছিলেন সত্য। কর্নেল স্লীম্যান বলেন, ঝাঁসীর সুযোগ্য শাসক রঘুনাথহরি ১৭৯৫ সালে কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত হয়ে কাশীধামে গিয়ে গঙ্গায় আত্মবিসর্জন করেন। রঘুনাথ রাও, তাঁর ব্যাধি সত্ত্বেও, অতীব ভদ্র, মার্জিত, উদারচেতা লোক ছিলেন। ১৮৩৮ সালে তাঁর মৃত্যু হল।

রঘুনাথ রাওয়ের কোন বৈধ সন্তান ছিল না। কিন্তু তাঁর মুসলমানী প্রণয়িনী লচ্ছো বা রোশানের দুটি ছেলে ও একটি মেয়ে হয়েছিল। লচ্ছোর বিলাসিতা ও শৌখীনরুচি সম্বন্ধে অনেক গান আজও ঝাঁসীতে প্রচলিত—যথা—

"ফুলে' ফুলে' পিয়ারী লচ্ছো রঘুনাথকি নার
ফুল সোহাঁরী কেশজুড়া—ফুলে' যে বিহার॥"

মৃত্যুর পর ঝাঁসীর আঁতিয়াতালের সন্নিকটে মেহ্‌দীবাগে লচ্ছোকে সমাধিস্থ করা হয়। রঘুনাথ রাওয়ের প্রণয়িনীর সমাধিতে একদা ঋতুতে ঋতুতে অঞ্জলি দিত ভিন্ন ভিন্ন ফুলের গাছ। আজ সেখানে ঘাস, আগাছা এবং কাঁটা। যে দুনিয়াতে রাজার তখ্‌তের কোনো নিরাপত্তা নেই, সে দুনিয়াতে রাজ-প্রণয়িনীদের ভাগ্য প্রারশ করুণ। যৌবনের মদগর্বিত উচ্ছল দিনগুলির অবসানে জীর্ণ সমাধিতেই সাধারণত তাঁদের সমাপ্তি। সেখানে—

"নাহি চেরাগ, না বসোরা গুল—
ভুলিয়া সেথা না গাহে বুলবুল॥"

লচ্ছোর পুত্র আলি বাহাদুর ঝাঁসীর সিংহাসন সম্বন্ধে নিজের দাবী জানালেন।

রঘুনাথ রাওয়ের মৃত্যুর পর পুনর্বার ঝাঁসীর সিংহাসন নিয়ে দাবীদারের প্রশ্ন উঠল। দাবী জানালেন চারজন। রঘুনাথ রাওয়ের বৈধ পত্নী, আলি বাহাদুর, কৃষ্ণরাও বিনায়ক চন্দোরকার এবং শিবরাও ভাওয়ার কনিষ্ঠ পুত্র গঙ্গাধর রাও।

কোম্পানীর নির্বাচিত কমিশন, এই দাবীর বিষয়ে তদন্ত করলেন এবং নির্বাচিত করলেন গঙ্গাধর রাওকে।

বার বার আশাভঙ্গে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন সখুবাঈ। ঝাঁসীর সিংহাসনের উপর আধিপত্য স্থাপনের লোভে তিনি পুত্রের শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর নিরন্তর কামনা ছিল পুত্রের মৃত্যু। দৌহিত্রকে রামচন্দ্রের গৃহীত দত্তক হিসাবে ঘোষণা করেছিলেন স্বীয় দায়িত্বে। হিন্দু ব্রাহ্মণ হয়েও, পিতার জীবিতকালে সেই বালককে দিয়ে জনকা-শৌচ পালন করিয়েছিলেন। রামচন্দ্রের পর রঘুনাথ রাও রাজা হলেন। তারপরে আবার নির্বাচিত হলেন কনিষ্ঠ দেবর

গঙ্গাধর রাও। ক্রুদ্ধা ভুজঙ্গীর মত সখুবাঈ দংশন করতে উদ্যত হলেন।

ঝাঁসীর কেল্লার রক্ষী গোসাবী আখোরাদের উৎকোচ দানে বশীভূত করে তিনি কেল্লা অধিকার করলেন দৌহিত্রকে নিয়ে। এই বালককে পুতুলি রাজা করবেন এবং প্রিয় পারিসদ গঙ্গাধর মুলেকে মন্ত্রী করবেন, এই ছিল তাঁর একমাত্র চিন্তা।

ঝাঁসীর রাজকোষ তখন শূন্য। তা জেনেও সখুবাঈ গোসাবীদের বকেয়া বেতন দাবী করবার জন্য উত্তেজিত করতে লাগলেন। এই অরাজক অবস্থা দেখে গঙ্গাধর রাও বুন্দেলখণ্ডের তৎকালীন রাজনৈতিক প্রতিনিধি স্যার সাইমন ফ্রেজারকে জানালেন। ফ্রেজার নিজে স্যার টমাস আব্রির অধীনে সৈন্য আনালেন। সাগর থেকে এলেন সৈন্য সহ আব্রি। ঝাঁসীর কেল্লা ঘিরে ফেলে ফ্রেজার সখুবাঈকে আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে আত্মসমর্পণ করাবার নোটিশ দিলেন। অন্যথায় গোলাবর্ষণ হবে তাও জানাতে কসুর করলেন না।

কেল্লার মধ্যে নিষ্ফল আক্রোশে গজরাতে লাগলেন সখুবাঈ। চারদিন পর উপায়ান্তর না দেখে আত্মসমর্পণ করলেন তিনি। সখুবাঈকে ঝাঁসী শহরের কাছে-পিঠে রাখা যুক্তিযুক্ত ভাবলেন না ফ্রেজার। ঝাঁসী থেকে পনের মাইল দূরে বড়োয়া সাগরে, সিন্ধিয়ার একটি প্রাসাদে তাঁকে প্রথমে রাখা হল। তারপর ঝাঁসীর বাইরে, দতিয়া রাজ্যে মাদোরা দুর্গে তাঁর বাসস্থান নির্দিষ্ট হল। নিশ্চিন্ত হলেন গঙ্গাধর রাও।

দীর্ঘদিনের অবহেলায় ও ঋণে ঝাঁসীর রাজকোষ তখন শূন্য। ঝাঁসীর আভ্যন্তরীণ অবস্থা তখন বিপর্যস্ত। এই অবস্থায় গঙ্গাধর রাওয়ের হাতে শাসন ক্ষমতা তুলে দিতে ভরসা পেলেন না ফ্রেজার। গঙ্গাধর রাও বৃত্তি পেতে লাগলেন এবং সুপারিনটেন্ডেন্ট রস শাসন চালাতে লাগলেন। গঙ্গাধর রাও শাসন ব্যবস্থায় আগ্রহ দেখিয়ে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করলেন। আনন্দিত হলেন সুপারিনটেন্ডেন্ট রস। শীঘ্রই গঙ্গাধর রাও ভার পাবেন ঝাঁসীর রাজ্যের সে কথাও জানালেন রস।

রাজ্যের প্রতি রাজার কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হলেন গঙ্গাধর রাও। সঙ্গে সঙ্গে নিজের দিকেও তিনি মন দিলেন। কলাশিল্পে তাঁর অনুরাগ আন্তরিক। ঝাঁসীর নাটশালায় তাঁর নির্দেশে অভিনয় হয় অভিজ্ঞান-শকুন্তলার। দীর্ঘ বিচ্ছেদের অন্তে মিলন হয় নায়ক-নায়িকার। হস্তিনাপুরের রাজপুরীতে মিলন উৎসব শুরু হয়।

তাঁর নিজের জীবনেও প্রয়োজন একটি রাজলক্ষ্মীর। ইংরেজ রেসিডেন্ট এবং তাঁর যুগ্ম প্রচেষ্টায় ঝাঁসীতে পুনঃপ্রতিষ্ঠ হয়েছে সুখশান্তি এবং নিরাপত্তা। সুযোগ্য নিয়ন্ত্রণের ফলে কৃষির উন্নতি হয়েছে। শূন্য রাজকোষে আবার জমা পড়েছে টাকা। ঘরে ঘরে সুখশান্তি, প্রজাবর্গ আশ্বস্ত। কিন্তু নিজের ঘর তাঁর শূন্য। রাণী না থাকলে রাজা হওয়া তাঁর সম্পূর্ণ হবে না। স্ত্রী রমাবাঈ বিগত হয়েছেন বহু আগে। ঘরে তাঁর লক্ষ্মী চাই, অন্তঃপুর চায় গৃহিণী। রাজ্য চায় রাণী। সিংহাসন চায় উত্তরাধিকারী। কিন্তু তাঁর নিজের প্রয়োজন একটি সহধর্মিণীর। তৎপর হলেন গঙ্গাধর রাও। মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণরা তিন ভাগে বিভক্ত। কোঙ্কনস্থ, দেশস্থ এবং কড়েরা। নেবালকর বংশ কড়েরা শ্রেণীর। স্ব-শ্রেণীতে চট্ ক'রে রাণী হবার উপযুক্ত সর্বসুলক্ষণা কন্যা পাওয়া কঠিন। তাই উত্তরে দক্ষিণে বিভিন্ন স্থানে দূত পাঠানো হল।

গঙ্গাধর রাওয়ের সভাসদ ব্রাহ্মণ তাঁতিয়া দীক্ষিত স্থির করলেন কানপুরের সমীপে বিঠুরে যাবেন। ১৮১৮ সাল থেকে পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও সেখানে বৃটিশ সরকারের বৃত্তিভোগী হয়ে বাস করছেন। সেই সঙ্গে প্রচুর মহারাষ্ট্রীয় প্রজা পেশোয়ার উপর নির্ভর করে বিঠুরে এবং তার আশেপাশে বসবাস করছেন। শেষ পেশবা বাজীরাও যদিচ একান্ত পরনির্ভরশীল অবসর-প্রাপ্ত জীবন যাপন করছেন, তবু-ও তাঁর সঙ্গে মহারাষ্ট্রীয় সমাজের যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ। সেখানে মেয়ের সন্ধান মিললেও মিলতে পারে। এই কথা মনে করে তাঁতিয়া দীক্ষিত চললেন বিঠুরে। ঝাঁসী থেকে কানপুরের পথে রওনা হলেন তাঁরা শুভদিন দেখে।

অনেক পূর্বে কলকাতায় তখন ইংরেজ সভ্যতা ক্রমবর্ধমান। পশ্চিমে ও মধ্য ভারতে তার কোনো চিহ্ন নেই। দ্রুত গমনে ঘোড়া, দীর্ঘপথে উট, নতুবা ডাকগাড়িই সেখানে একমাত্র বাহন। ঘোড়া, পাল্কি ইত্যাদি নিয়ে রওনা হয়ে গেল তাঁতিয়া দীক্ষিতের দল।

একটি শুভক্ষণের জন্য রাজপ্রাসাদে অপেক্ষা করে রইলেন গঙ্গাধর রাও।

(ক্রমশ)

কাগজে কাগজে

ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়

এ সময়টায় ও জায়গায় ভিড় হয় না এমন দিন নেই। সে ভিড় চলমান। লোক আসে, যায়। কেউ সোজা হাইকোর্টে ঢোকে, কেউ তার উল্টোদিকের বাড়িতে। রাস্তায় বিশেষ কেউ দাঁড়ায় না।

তবু এই মহানগরীর পথে-ঘাটে অনেক আশ্চর্য ঘটনা ঘটতে দেখা যায়, যার জন্য খুব দরকারী কাজে ছুটন্ত মানুষকেও কিছুক্ষণ থমকে দাঁড়াতে হয়।

এও তেমনি। এতগুলো কাজের মানুষ যে এক জায়গায় ভিড় জমিয়েছে, সেও নিতান্ত কৌতূহলের বশে। যদিও সে কৌতূহলের নিরসন হবার কোন সম্ভাবনাই নেই। কারণ ওই যে পথের ওপর বসে দু'জন লোক গলা জড়াজড়ি করে ধরে কাঁদছে, তারা কে, কোথাকার লোক কেউ জানে না। উস্‌কো-খুস্‌কো চুল। একমুখ দাড়ি। দুজনের চেহারা প্রায় একই রকম। পরনে আধ-ময়লা ছেঁড়া জামাকাপড়। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে এরা একই পক্ষের লোক। হয়তো দুই ভাই। হাইকোর্টে মামলা চলছিল কারো বিরুদ্ধে। যাতে হার হওয়া মানে সর্বস্বান্ত। আর শেষ পর্যন্ত তাই হয়েছে।

কিন্তু এ ধারণা ভুল। সর্বস্বান্ত হয়েছে এরা ঠিকই, তবে ভাই নয়, এক-পক্ষও নয়। গতকাল পর্যন্ত পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। আজ হঠাৎ যুক্তভাবে আবেদন করেছে হাইকোর্টের কাছে যে, আর তারা মামলা চালাবে না। নিজেদের মধ্যে আপসে মীমাংসা হয়ে গেছে।

সে তো ভাল কথা। তবে এত কান্না কিসের, ঝগড়াই যদি মিটে যায়?

হাসিমুখে যাদের ঘরে ফেরা উচিত তারা এই ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুরে পথের মধ্যে বসে কাঁদে কেন?

কেন যে কাঁদে সেটা বলতে পারতেন কেবল তাঁরা, যাঁরা এদের মামলা পরিচালনা করছিলেন। তাঁরা এখন অন্য কাজে ব্যস্ত। সাক্ষীরা আজ আসেনি।

সুতরাং এই 'কেন'র জবাব এখানে পাওয়া যাবে না। ভিড়ের ভেতরে নয়, হাইকোর্টে নয়, তার কাছাকাছি কোন বাড়িতেও নয়।

এ প্রশ্নের সম্পূর্ণ জবাব পেতে হলে একটু কষ্ট স্বীকার করতে হবে। ভিড়ের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে সোজা চলে যেতে হবে হাওড়া স্টেশনে। তারপর মাত্র সাড়ে সাত আনার একখানা টিকিট কেটে একটা লোকাল ট্রেনে চেপে বসতে হবে।

কিন্তু অতো সময় কি সকলের আছে? তাই—

স্টেশনের নাম কাসুন্দি। মফস্বল শহরের স্টেশন যেমন হয়। লাল কাঁকরে ছাওয়া উঁচু প্ল্যাটফরম। লম্বা টিনের শেড দেওয়া বিশ্রামঘর। স্টেশন-মাস্টার, টিকিট-ঘর।

ঠিক গেটের মুখে টিকিট দিয়ে বাইরে বেরোলেই একদল ঘোড়ার গাড়ির

গাড়োয়ান এসে ছেঁকে ধরবে—যাবেন বাবু, শেয়ারে—তেমাথা।

তেমাথা—মানে কোন তিন রাস্তার মোড় নয়। স্টেশনের দিক থেকে রাস্তাটা সটান চলে এসে যেখানে বাজারের রাস্তার সঙ্গে মিশেছে তার একটু আগে পথের ধারে একটা তিন মাথাওয়ালা খেজুর গাছ ছিল। তের 'শ পঞ্চাশ সালের প্রচণ্ড ঝড়ে তার একটা মাথা ভেঙে যায়। তার-পর মাঝে মাঝে ঝড় হয়েছে আর একটা করে মাথা ভেঙেছে। এখন একটা মাথাও অবশিষ্ট নেই। শুধু কন্ধকাটার মতো গাছের গুঁড়িটা দাঁড়িয়ে আছে অতীত গৌরবের মরণোন্মুখ সাক্ষী হিসাবে।

লোকে এখনও বলে—তেমাথা। ভবিষ্যতে কোনদিন গাছটা ওখান থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেও হয়তো তাই বলবে।

স্টেশনের সব কটা যানবাহনের মোটা-মুটি গন্তব্যস্থল ওই পর্যন্ত। একখানা বাস আছে। তার ছাদ এতই নীচু যে, ঘাড় হেঁট করেও দাঁড়ানো যায় না। বসতে হবে। অথচ কলকাতা থেকে কোন ট্রেন এলে ভেতরে বসবার জায়গাও পাওয়া যায় না। অনেকে ছাদের ওপরে ওঠে।

তবে তোমার যদি ভালো না লাগে এসব, তাহলে একা একখানা সাইকেল রিক্‌শ নিতে পারো। বাসের মধ্যে গাদা-গাদি ভিড়ে মালপত্রের সামিল হওয়ার চেয়ে অথবা ঘোড়ার গাড়িতে কোন চর্ম-রোগগ্রস্ত লোকের গায়ে গা লাগিয়ে যাওয়ার চেয়ে সে অনেক ভালো। মাত্র ছ আনা পয়সা দিলেই শহরের মাঝখানে পেঁৗছে দেবে। একেবারে নির্ঝঞ্ঝাট। ইচ্ছা হলে ঝাড়া হাত-পায়ে মনের আনন্দে গুন-গুন করে গানও গাইতে পারা যায়। কেউ আপত্তি করবার থাকবে না।

তেমাথার পরই চৌমাথা। গাছ নয়, রাস্তাই। স্টেশনের পথটা সোজা চলে গেছে গঙ্গার ঘাটের দিকে। ডানদিকের রাস্তায় গেলে—বাজার। আর বাঁদিকের রাস্তা ধ'রে গেলেই—না, ওদিকে এখন কিছু নেই।

বছর দুই আগে এ পথ দিয়ে হেঁটে গেলে অনেক কিছু দেখা যেত। নটবর দত্ত আর মদন বড়ালের বাড়ির পরে ভূধর সমাদ্দারের বাড়ি। তার ঠিক পাশেই এক-টুকরো ফাঁকা জমিকে পিছনে রেখে দুখানা দোকান। এ অঞ্চলের দুটি নামকরা দোকান। সব সময় খদ্দেরের ভিড় লেগেই আছে। অনেক দূর থেকেও লোকে এই দোকান দুটোয় জিনিসপত্র নিতে আসত।

দুই দোকানের সামনে দুখানা বেঞ্চি পাতা। সকাল হ'তে না হ'তে নটবর দত্ত, অধর বড়াল ছাড়াও আরো অনেকে এসে জুটত। খবরের কাগজ, বিড়ির ধোঁয়া আর তর্কবিতর্কে জায়গাটাকে সরগরম ক'রে রেখে দিত।

সে সব কিছু নেই। দুটো দোকানেই এখন মরচেধরা তালা ঝুলছে। মাথার ওপরে সাইন-বোর্ড ভাঙাচোরা অবস্থায় কোন গতিকে খাড়া রয়েছে। লেখাগুলো অস্পষ্ট।

প্রথম যেদিন দু'জন লোক এই রাস্তায় অনেকক্ষণ ধরে ঘোরাঘুরি করছিল সেদিন

বাড়ির রোয়াক থেকে নটবর দত্ত খ্যাঁক-খেঁকে গলায় প্রশ্ন করেছিল, 'কাকে চাই?'

একজন জবাব দিয়েছিল, 'লোক নয়, ঘর। দোকানঘর চাই।'

'দোকানঘর? ভাড়া?'

'হ্যাঁ।'

'তা এখেনে কেন, ওই বাজারের দিকে যান না।'

'আজ্ঞে না, আমরা একটু পাড়ার মধ্যে দোকান করতে চাই। এমন অনেকে তো আছেন যাঁরা বাজার থেকে মালপত্র বয়ে আনতে চান না। তাছাড়া সময়-অসময়—'

কেমন একটু তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে নটবর দত্ত বলেছিল 'তাই নাকি? কি দোকান করতে চান আপনারা?

'মুদিখানা আর স্টেশনারী।'

'মুদিখানা আর স্টেশনারী! তার চেয়ে মাংস আর দইয়ের দোকান করলে ভাল হত।' হা হা করে হাসতে হাসতে নটবর দত্ত বলেছিল আবার, 'কিন্তু এদিকে তো ওরকম কোন ঘর পাওয়া যাবে না।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, আমরাও তাই দেখছি।'

'তা দেখছেন যদি, তাহলে এবার দয়া ক'রে সরে পড়ুন দেখি।'

দুজনে একসঙ্গে বলে উঠেছিল, 'তার মানে?'

'মানে বিশেষ কিছু নয়। এ-পাড়ায় অনেক বয়েসের মেয়ে আছে কি না। আপনাদের এরকম ঘুরঘুর করতে দেখলে তাদের বাপ-মা হয়তো ভাববে—হ্যাঁ—হ্যাঁ—বুঝতেই পারছেন।'

ওরা মুখ চাওয়াচাওয়ি ক'রে হেসেছিল একটু। তারপর বলেছিল, 'বেশ, আমরা যাচ্ছি।'

ওরা চলে গিয়েছিল। কিন্তু একেবারে ফিরে যায়নি।

কয়েকদিন বাদে ওদের একজনকে ফিরে আসতে দেখা গেল। এবারে আর ঘোরাঘুরি নয়। ভূধর সমাদ্দারের বাড়ির পাশে যে ফাঁকা জমিটুকু, সেইখানে গিয়ে দাঁড়াল। একটু পরেই ঠেলাবোঝাই বাঁশ, টিন, দড়াদড়ি নিয়ে আর একজন এসে হাজির। সঙ্গে লোকলস্কর।

মাপজোখ, খোঁড়াখুঁড়ি শুরু হয়ে গেল। দেখতে দেখতে তিন দিনের মধ্যে টিনের ছাদ-দেওয়া দুখানা দোকান-ঘর তৈরি শেষ। ভালো দিন দেখে মহা-সমারোহে মুদিখানা আর স্টেশনারী দোকানের উদ্বোধন হল'।

দুই দোকান জুড়ে একখানি সাইন-বোর্ড—'তোমার আমার দোকান।' শুধু এইটুকু নতুনত্বের জন্যেই কি না কে জানে—দুদিনের ভেতরে পাড়ার লোক ঝুঁকে পড়ল। অধর বড়াল থেকে শুরু করে গগন চাটুজ্যে। কেউ আর বাদ রইল না। রাতারাতি নতুন দোকানের খদ্দের হয়ে গেল। কেউ লজেন্স, কেউ বিস্কুট—কেউ নুন, কেউ লঙ্কা।

এল না কেবল নটবর দত্ত।

অধর বড়াল বললে, 'আরে, ওর কথা ছেড়ে দাও। ও শালার হিংসে হয়েছে।'

'হিংসে! কেন?'

'বারে, হবে না? বাজারে ওর ছেলের একটা দোকান আছে যে। তা তোমাদের এই দোকান সে-দোকানকে কানা করে দিয়েছে। সবাই এখন সে-দোকান ছেড়ে তোমাদের দোকানেই জিনিসপত্র নেয়—কাজেই—'

রজত বলল, 'কিন্তু আমরা তো কাউকে সে-দোকান ছেড়ে আমাদের এখানে আসতে বলিনি।'

'বলনি কি রকম? বলার বেশি করেছ। এই যে তোমরা প্রত্যেকটা জিনিসের দাম দু-এক পয়সা কম নাও। ছোট ছেলে-পিলেদের বিস্কুট, লজেন্স ঘুষ দাও। তাছাড়া নতুন দোকান করেই যেভাবে ধার দিতে আরম্ভ করেছ, তাতে কি কোন খদ্দের তোমাদের কাছে না এসে পারে?'

তপেন বলল, 'দেখুন, আমরা নতুন লোক। দোকান জমাতে হলে এটুকু তো করা দরকার।'

'দরকার বৈ কি। নিশ্চয়ই দরকার। তোমরা ব্যবসা করতে নেমেছ। উদ্দেশ্য—লাভ করা। সুতরাং তার জন্যে যা-যা করলে ভালো হয়, তাই করবে। এতে যদি রাগ করে কেউ না আসে, তাতে তোমাদের কী?'

তাদের কিছুই নয়। তবে দোকান করবার সময়ে তারা মনে মনে ঠিক করেছিল, এ-পাড়ার সকলকে তাদের দোকানের খদ্দের করে ছাড়বে। বিশেষ করে নটবর দত্তকে। কিন্তু প্রথম দিন যে তাদের সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েছিল তাকে অভ্যর্থনা জানাবার সুযোগ আর হল না।

রজত বলল একদিন তপেনকে, 'দাঁড়া, এক মতলব ঠাউরেছি। নটবরকে আসতেই হবে।'

তপেন বলল, 'কি মতলব?'

'শোন, তবে বলি।' কানে কানে কি যেন বলতেই তপেনের মুখ খুশিতে ভরে উঠল।
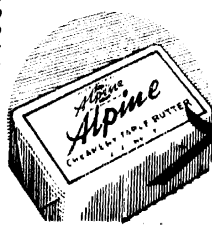
'খুব ভাল মতলব। এবারে ঠিক আসবে।'

রোজ খুব সকালে নটবর দত্ত ওদের দোকানের সামনে দিয়েই বেড়াতে যায়। বেড়িয়ে ফেরে। আসতে যেতে দুবারই ওদের দিকে এমনভাবে তাকায় যে, ডাকতে সাহস হয় না।

সেদিন দূরে থেকে নটবরকে বেড়িয়ে ফিরতে দেখে রজত বললে, 'তপেন, রেডি?'

'রেডি।'

তারপর কাছাকাছি আসতেই শুরু হয়ে গেল। হাতাহাতি।

এ ওকে বলে, 'শালা।'

ও একে বলে, 'শালা।'

দোকানে যে দু-একজন ছিল, তারা তো অবাক। এ আবার কি?

নটবর দত্তও হাঁ-হাঁ ক'রে ছুটে এল, 'আরে—আরে, ওকি! ঝগড়া কিসের?'

কোথায় ঝগড়া! দুজনে থেমে গেল। একটা হো-হো হাসিতে সকলকে চমক লাগিয়ে একসঙ্গে বলে উঠল, 'আসুন দত্তমশাই, প্রাতঃপ্রণাম।'

নটবর দত্ত থ। এমন কান্ড সে জীবনে কোনদিন দেখেনি।

'আপনারা—মানে, তোমরা ঝগড়া করছিলে কেন?'

'ঝগড়া তো করিনি।'

'তবে?'

রজত বলল, 'দেখছিলাম, আপনি আসেন কি না। একটা সিগারেট খাবেন?'

মন্দ লোকে বলে, নটবর দত্ত হাসে না। কিন্তু ব্যাপার-স্যাপার দেখে তার তোবড়া মুখেও হাসি দেখা দিল। সে-হাসির অর্থ বুঝতে যদিও সকলের অনেকদিন সময় লেগেছিল।

'সিগারেট! তার মানে বিলিতী বিড়ি? না, ও আমি খাই না। খাঁটি দেশী বিড়ি হ'লে একটা চলতে পারে।'

'বিড়ি তো আমার দোকানে নেই। ওই তপেনের দোকানে আছে। দেরে তপেন—দত্তমশাইকে একটা বিড়ি দে।'

একটা বিড়ি নয়, আস্ত এক বান্ডিলই বাড়িয়ে ধরল তপেন, 'নিন্, দত্তমশাই।'

'ওকি, অত কি হবে? একটা বিড়ি দাও।'

রজত বলল, 'আহা, নিন্ না। একটা এখন ধরান, বাকিগুলো রেখে দিন পরে খাবেন।'

'নাহে, বাড়িতে আমি বিড়ি খাই না। তামাক খাই। তুমি একটাই দাও। বরং পরে এলে আবার দিও।'

'বেশ, তবে কথা দিন, রোজ আসবেন।'

নটবর দত্ত ঘাড় নেড়ে বলল, 'আসব হে আসব। যা ব্যবহার তোমরা করলে তাতে কি না এসে থাকতে পারব?'

সত্যিই তাই। পরের দিন থেকে নটবর দত্ত নিয়মিত হাজিরা দিতে থাকে। কোনদিন ফাঁক পড়ে না। তার দেখাদেখি আরও অনেকে এসে জোটে। নিবারণ সান্যাল, রাধানাথ ঘোষাল, চিত্ত রায়, তারক গুপ্ত—সব। হাসি-ঠাট্টা আর গল্প-গুজবে জায়গাটাকে মশগুল ক'রে রাখে। রজত আর তপেন খদ্দের দেখার ফাঁকে এদের আলোচনায় যোগ দেয়।

এখানে এরা আলোচনা করে আর এদের নিয়ে আলোচনা হয় বাজারে। নটবর দত্তের ছেলে কানাই দত্ত বলে, 'নাঃ, লোক দুটো দেখছি যাদু জানে। নইলে আমার এতদিনকার বাঁধা খদ্দের সব ছেড়ে গেল।'

পাশের চায়ের দোকানের গদাধর বলে, 'আমার দোকানে চা খেতেও কেউ আসে না আজকাল। কি হল বল তো?'

'আসবে কি,' কানাই ঠোঁট বেঁকিয়ে বলে, 'বিনা পয়সায় চা পেলে কে আর পয়সা খরচ করতে চায়? তার ওপর যদি ধোঁয়াটাও মাগনায় পাওয়া যায়।'

'বলিস কি, দুটোই?'

'দুটোই।'

'তবে আমি এই বলে রাখছি কানু, তুই দেখিস। ও শালারা ডুববে। ডুবল বলে। আর দেরি নেই।'

'হুঁ, আমারও তাই মনে হয়। তা ছাড়া যেরকম বেমক্কা ধার দিতে শুরু করেছে। এখানকার সবাইকে তো চিনিস। নিলে আর কেউ উপুড়-হস্ত করতে চায় না। আবার আশকারা পেলে তো কথাই নেই। একদম মেরে দেবে।'

কিন্তু ওদের আশঙ্কাকে মিথ্যা প্রমাণিত করে দোকানের বিক্রি বেড়ে যায়। এমন কি, পুব পাড়া, দক্ষিণ পাড়া থেকেও খদ্দের আসে। ইস্কুলে যাতায়াতের পথে মেয়েরা কেনে মাথার কাঁটা, রঙিন সুতো, সূঁচ। ছেলেরা কেনে খাতা, পেন্সিল। চিত্ত রায়ের ছেলের বৌ ছোট দেওরকে পাঠায় চানাচুর, আচার কিনতে। শরীরে বিশেষ একটা অবস্থায় মুখের অরুচি কাটাবার জন্যে।

তপেন বলে, 'হারে রজত, ফের তুই সাত বছরের পচা আচারগুলো এই বাচ্চা ছেলেকে গছাচ্ছিস? কত করে বললাম ওগুলো ফেলে দে। আর খাওয়া যাবে না। তা শুনলি না তো?'

দুলু কেমন সন্দেহের চোখে তাকায়। রজতের হাত থেকে আচার নিতে ইতস্তত করে।

রজত বলে, 'ভালো হবে না বলছি তপনা। খদ্দের ভাঙাস নে। তাহলে আমিও চুকলি কাটব দেখিস।'

তারপর দুলুর দিকে আচারের মোড়কটা এগিয়ে দিতে দিতে বলে, 'নাও খোকা, খুব ভাল আচার।'

ছেলেটি তবু হাত বাড়ায় না।

ব্যাপার দেখে অধর বড়াল হেসে ওঠে। দুলুকে ভরসা দিয়ে বলে, 'নাও নাও, ভাল আচার। পচা নয়। দেখছ না ও লোকটা ঠাট্টা করছে।'

তপেনের হাসিমুখের দিকে তাকিয়ে দুলুও বোধ হয় ব্যাপারটা বুঝতে পারে। তাই তাড়াতাড়ি আচারের মোড়কটা নিয়ে সরে পড়ে।

রজতও এর শোধ নিতে ছাড়ে না। বাটি হাতে কোন ছোট ছেলেমেয়ে তপেনের দোকানে গুড় কিনতে এলেই বলে ওঠে, 'দেখ তপেন, যে গুড়টার মধ্যে মড়া ইঁদুর পড়েছিল, সেটা সরিয়ে রেখেছিস তো? দেখিস, যেন ছোট ছেলে পেয়ে চালিয়ে দিসনে।'

ছেলেটা ভ্যাবাচাকা খেয়ে যায়। বলে, 'বাটি ফিরিয়ে দিন, আমি গুড় নোব না।'

অধর বড়াল কিংবা আর কেউ বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঠান্ডা করে। গুড় দিয়ে বাড়ি পাঠায়।

এমনি খুনসুড়ি প্রায় রোজই বাধে। এ যদি বলে, এটা ভালো—তবে ও বলে, না ওটা।

কিন্তু এই সামান্য কথা কাটাকাটি থেকে যে এতটা গড়াবে এটা কেউ ভাবেনি।

রাধানাথ ঘোষাল অবশ্য একদিন

ছিল, 'এতেই ওদের কাল হবে হে। তোমরা দেখো।'

কথাটা কেউ কানে নেয়নি। যাঃ, তাই কখনো হয়? এত বন্ধুত্ব, এত ভাব-ভালবাসা, একি কোনদিন নষ্ট হতে পারে? বন্ধুবান্ধবের মধ্যে এরকম অহিংস ঝগড়াঝাটি তো হামেশাই হয়ে থাকে। তাতে আর ক্ষতিটা কি হয়েছে?

প্রথম প্রথম এদের কাণ্ডকারখানা দেখে সকলে অবাক হয়ে যেত। তারপর সয়ে গিয়েছিল। পথ চলতি অনেকে দাঁড়িয়ে দেখত। বেশ মজা লাগত।

রোজ সকালে আড্ডা বসে। নানারকম কথার ফাঁকে খবরের কাগজের কথা ওঠে।

রজত বলে, 'দেখ তপনা, ও কাগজখানা তুই বাতিল করে দে। পয়সা দিয়ে শুধু শুধু একটা বাজে কাগজ রেখে কি হবে?'

'কেন, বাজে কোন্‌খানটা দেখলি, তাই শুনি?'

'আসলটাই তো বাজে। রবিবারের দিন। কোথায় লোকে একটা গল্প-টল্প পড়বে তা নয়, যতো আম-কাঁঠাল খেতে কেমন লাগে, কেমন করে হাত দেখতে হয়, মাছের ঝোলে কতখানি লঙ্কা দিলে শরীর সুস্থ থাকে--এই সব। আরে, লোককে কি এগুলো পড়ে বুঝতে হবে? আম-কাঁঠাল খেতে কেমন লাগে তা তারা জানে না? হাত দেখতে জেনেই বা কি লাভ? চারটে পয়সা দিলে রাস্তার ধারের যে কোন জ্যোতিষী তোর ভূত, ভবিষ্যৎ পটাপট বলে দেবে। আর যতই বোঝাও, মাছের ঝোল লাল টকটকে করে না খেলে পেটই ভরবে না। কি বলুন দত্তমশাই, ঠিক বলিনি?'

হা হা করে হাসতে থাকে রজত।

উপস্থিত অন্য সকলেও হাসে। নটবর দত্ত বলে, 'তা যা বলেছ ভায়া। ওসব জেনে আমাদের কোন লাভ নেই। তার চেয়ে বরং একটা গল্প পড়লে কাজ দেবে। কিংবা কোন মহাপুরুষের জীবনকাহিনী। এই যেমন তোমার এই কাগজে আছে।'

দুজনে দু'খানা আলাদা কাগজ রাখে। এই কাগজ নিয়ে রোজই তাদের মধ্যে তর্ক বাধে। কোনদিন তপেন রেগে যায় বেশি, কোনদিন বা রজত। লোকে ভাবে, এই রে, এবার একটা মারামারি ফাটাফাটি না হয়ে যায়। কিন্তু কিছুই হয় না। শেষ পর্যন্ত ভাব হয়ে যায়। বাড়ি ফেরবার সময় দুজনে কাগজ বদলাবদলি করে নিয়ে যায়।

এ বিষয়ে কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলে রজত উত্তর দেয়, 'আরে ছোঃ, একি আমার জন্যে নাকি? বাড়িতে যে একজন মালিক আছেন, তাঁর হুকুম। তপেনেরও তাই।'

'তবে আর কি,' তারক গুপ্ত বলে, 'সেই দুজনকে বদলাবদলি ক'রে নিলেই হয়। রোজ রোজ কাগজ বদলাতে হয় না।'

রজত বলে, 'ওই কথাই একবার গিয়ে বলে দেখুন না। ঝাঁটা খেয়ে ফিরতে হবে। তপেনকে ও দুচোখে দেখতে পারে না। আমি একদিন বলতে গিয়েছিলাম। তা বলে, কেন, ও সুন্দরীকে বুঝি খুব মনে ধরেছে?

বললাম, বরং তপেনেরই মনে ধরেছে তোমাকে।

কথাটা মুখ দিয়ে বেরুতে যা দেরি, আমাকেই ধরে মারে আর কি।

মুখপোড়া মিনসের মরণ হয় না? আমার দিকে নজর? দাঁড়াও দেখাচ্ছি মজা।

তারপর তপেনের উনিকে ডেকে বলে, শোন্ লো শোন্, তুই বাপু তোর কর্তাটিকে সামলা। নইলে মরবি। বলে কি না—ব্যাপারটা সবিস্তারে বর্ণনা ক'রে দুজনেই হাসাহাসি করে।

আমি সেখান থেকে সরে আসি।'

এদের দুজনের যে রকম বন্ধুত্ব, ওদের দুটিতেও তাই। একজন অপরকে ছেড়ে থাকতে পারে না। অথচ যখন বাড়ি করবার কথা ওঠে তখন মালতীই প্রথমে বাধা দেয়।

'না, একখানা নয়, দুখানা বাড়ি চাই।'

অবাক হ'য়ে রজত বলে, 'কেন, চির-কাল তো আমরা এক ভাড়া বাড়িতেই বাস ক'রে এলাম। একই হাঁড়িতে আমাদের রান্না হয়। সেই হাঁড়ি তুমি আলাদা করে দিতে চাও?'

'চাই। তার কারণ, তোমাদের এই বন্ধুত্ব হয়তো কোনদিনই ভাঙবে না। কিন্তু তোমাদের ছেলেপিলেরা তোমাদের মতো নাও হ'তে পারে। পরে যদি এই বাড়ি নিয়ে তারা লাঠালাঠি বাধায়?'

কথাটা ঠিক। তাই রজত চুপ ক'রে থাকে। তবে এই কথা তপেনকে গিয়ে বলবার মতো মনের জোরও সে পায় না। রজত আর তপেন। দুই বিপরীত স্বভাবের লোক। রজত কথা বলে বে... তপেন কম। রজতের মতে, 'খাও-... আর ফুর্তি কর।' তপেনের মত ... উল্টো। সে বলে, 'না, এত কষ্ট ক... টাকা রোজগার করা, সেই টাকা এ... নয়ছয় ক'রে ওড়ানো উচিত নয়। ... যতটা লাগে খরচ ক'রে, বাকি সব জমা... উচিত।' তাই এতটুকু ক্ষতি তার ... হয় না।

যদি কোনদিন রজত বলে, 'চল্... তপেন, কলকাতা থেকে ঘুরে আ...

একটা ভালো বই এসেছে। দেখে যাবে।'

পেন বলে, 'কি ক'রে যাবি, দোকান রে।'

হ্যাঁ। তাছাড়া আর কি। রোজই তো া থাকে। একদিন নাহয় বন্ধই ল।'

'কত ক্ষতি হবে তা জানিস?'

'দূর তোর ক্ষতি। চিরকাল কেবল ই মরব, একদিন একটু আমোদ না। থাক্ দোকান বন্ধ, তুই চল্।

তপেন রাজী হয় না, 'আমি যাব না। ইচ্ছা হয়, তুই যা।'

অগত্যা রজতকে একাই যেতে হয়। বারে একা নয়। মালতীকে সঙ্গে যায়।

এক ফাঁকে নটবর দত্ত এসে হাজির

কই হে, তোমার বন্ধুটি কোথায়?'

কলকাতায় গেছে। সিনেমা দেখতে।'

একা একা?'

'না, একটু টেরা হাসি হেসে তপেন সগিন্নী।'

হাসতে হাসতে নটবর বলে, 'ও, তাই তা বেশ বেশ। কিন্তু—'একটু থেমে 'আমি একটা কথা বলব। কিছু কর না। '

া, না, মনে কি করব! আপনি ।'

লছিলাম তোমার বন্ধুর কথা। যেরকম উড়নচণ্ডী দেখছি, তাতে য়, একটা পয়সাও রাখতে পারবে তোমাদের পয়সা-কড়ি, আবার ঙ্গ থাকে না তো? দেখো, যেন টাও না চলে যায়।'

পেন চুপ ক'রে থাকে। পয়সা-কড়ি, -খরচ, সবই তাদের এক জায়গায়। বর দত্ত আবার বলে, 'রাগ কোর ন, তোমার ভালোর জন্যেই বলা। হোক, ভবিষ্যৎ ব'লে একটা আছে তো।'

বর আর দাঁড়ায় না।

ন্তু এত সত্ত্বেও তাদের বন্ধুত্ব থাকে। মতভেদ হয়, কিন্তু দ হয় না। তাই মালতীর কথাটা নে লাগুক, রজত সেটা মুখ দিয়ে বের করতে পারে না। শুধু তপেন কি মনে করবে, এই ভেবে।

সেই তপেন যে এমন কথা বলবে, এটা রজত কোনদিনও ভাবতে পারে নি।

কথাটা আগে তপেনের মাথায় আসেনি। প্রথমে নটবর দত্ত মাথায় ঢুকিয়ে দেয়। পরে নীলিমা একদিন বলে, 'জানো, সেদিন দত্তগিন্নী বলছিলেন—'

'কোন্ দত্তগিন্নী?'

'বারে, তোমাদের ঐ নটবর দত্ত। তাকে চেনো না?' নীলিমা যেন হেসে গড়িয়ে পড়ে।

তপেন হাসে, 'ও, তা কি বলছিলেন তিনি?'

'বলছিলেন যে, তুমি খুব বোকা। নইলে নিজের টাকাকড়ি কেউ পরের হাতে তুলে দিয়ে হাত ধুয়ে ব'সে থাকে?'

তপেন মুহূর্তে গম্ভীর হয়ে যায়, 'হুঁ, কিন্তু এত কথা তিনি জানলেন কেমন করে, তুমি বলেছ?'

'না, মানে—হ্যাঁ, বলেছিই তো। তুমি তো সত্যিই বোকা।' নীলিমা মুখে ব্যর্থ হাসি টানবার চেষ্টা করে।

'তা তুমি এত কথা বলতে গেলে কেন?'

এবারে নীলিমাও রেগে ওঠে, 'কেন বলব না তাই শুনি। দত্তগিন্নী তো ভাল কথাই বলেছেন। পৃথিবীতে এমন কেউ আছে নাকি যে নিজের ভবিষ্যৎ ভাবে না? আজ নাহয় খুব ভাব, কাল যদি এত না থাকে, তখন যে সব যাবে। শেষটায়—'

'আঃ, তুমি থাম দেখি।' তপেন বিরক্ত গলায় বলে, 'কি সব বাজে বকতে শুরু করলে।'

নীলিমা থামে না। সে একনাগাড়ে অনেক কথা বলে যায়। যার কিছু তপেনের মাথায় ঢোকে, কিছু ঢোকে না। তবে মূল কথাটা তাকে নাড়া দিয়ে যায়। ভাবিয়ে তোলে।

তারপর একদিন সব ভাবনার অবসান ক'রে দিয়ে কথাটা তপেন বলেই ফেলে, 'দেখ্ রজত, ভাবছিলাম তোকে একটা কথা বলব।'

'কথা বলবি, তার এত ভূমিকার কি দরকার। বলনা, কি বলবি।'

'বলছিলাম, আমাদের হিসাবপত্রগুলো আলাদা করলে কেমন হয়?'

'কেন, হঠাৎ? সন্দেহ হচ্ছে বুঝি সব মেরে দেব বলে।'

'না, না, তা নয়।' মাথা চুলকে তপেন বলে, 'আলাদা করলে বোঝা যাবে কোন্ দোকান থেকে কত লাভ হচ্ছে।'

তপেনের মুখের দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে রজত। কি যেন বোঝবার চেষ্টা করে। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, 'বুঝেছি। আচ্ছা, তাই হবে।'

এর পরে আলাদা বাড়ি করবার কথা তুলতে কোন বাধাই থাকে না।

গঙ্গার ধারের পাড়ায় কাঠা পাঁচেক জমির ওপরে পাশাপাশি দুখানা বাড়ি তৈরি হয়। ছোট্ট ছোট্ট একতলা বাড়ি। অবশ্য দুই বাড়ির মধ্যে ফাঁক এতই অল্প যে, এক বাড়ির ছাদ থেকে লাফ দিয়ে আর এক বাড়ির ছাদে যাওয়া যায়।

বেশ চলছিল। দোকানের হিসাব এবং বাড়ি আলাদা হ'ল বটে, কিন্তু বিক্রি এতটুকু কমল না। বরং বেড়ে গেল। নিজেরা আর পেরে উঠছিল না। দুজন লোক রাখতে হয়েছিল। টিনের ঘর ভেঙে কোঠাঘর তৈরি হল'। চার-পাঁচ বছরের

মধ্যে এ-শহরের দু'ঘর স্থায়ী বাসিন্দা বেড়ে গেল।

কিন্তু পৃথিবীর নিয়ম, সময়ের স্রোত সব সময় একই ভাবে প্রবাহিত হয় না। মাঝে মাঝে একটা বিপরীতমুখী ধারা এসে তাকে চক্রাকারে ঘুরিয়ে দেয়। মানুষের জীবনে উত্থান পতন আসে। আমীর ফকির হয়। গরীব বড়লোক হয়।

নইলে তুচ্ছ একটা কথায় অত বড় বিপর্যয় ঘটবে কেন?

বলতে গেলে রজত কোন হিসাবপত্রই রাখত না। সারাদিনে যা বিক্রি হত', সেই টাকা একটা লাল থলিতে পুরে নিয়ে বাড়ি চলে যেত। তপেন এসব বিষয়ে খুব সাবধানী। সে একখানা খাতা রেখেছিল। রাত্রে দোকান বন্ধ করার সময়ে সেদিনের কেনাকাটা এবং বিক্রি ক'রে কত টাকা রইল, সব গুণেগেথে খাতায় লিখে রাখত।

রজত ডাকত, 'কইরে তপেন, তোর হ'ল?'

'না, একটু দেরি আছে। তুই যা, আমি পরে যাব।'

আগে ঠিক এমনটা ঘটত না। দুটি বেলা দোকান বন্ধ ক'রে দু'জনের এক-সঙ্গে বাড়ি ফেরা চাই। সারা রাস্তা হাসি-ঠাট্টা আর গল্পগুজবে মেতে থাকত। কখন্ যে বাড়ি পৌঁছে যেত, টেরই পেত না।

নটবর দত্তের বাড়ির সামনে দিয়ে বাড়ি ফেরার পথ। হুঁকো হাতে নটবর বসে থাকে রোয়াকে। রজতকে ফিরতে দেখে জিজ্ঞাসা করে, 'কিহে, একা যে! বন্ধুটি কোথায়?'

মৃদু হেসে রজত বলে, 'দোকানে হিসেব করছে। শালা মুদি দোকান ক'রে খাঁটি মুদি বনে গেল।'

নটবরের মুখেও হাসি ফোটে, 'তাই তো দেখছি হে। বলি, এত হিসেব এতদিন ছিল কোথায়? তোমার মত লোককেও সন্দেহ!'

কোন জবাব দেয় না রজত। মুখ বিষণ্ণ ক'রে এগিয়ে যায়। অন্ধকারে নটবরের মুখের হাসি দেখতে পায় না সে। পেলে বুঝতে পারত, এক ধূর্ত শিয়ালের কূট শয়তানির চিহ্ন তার ভেতরে সুস্পষ্ট।

রজত চোখের আড়াল হতেই সদ্য-সাজা হুঁকোটায় গোটা দুই-তিন দ্রুত টান মেরে ঘরে রেখে দেয় নটবর। তারপর লাঠিগাছা টেনে নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। টুকটুক করে গিয়ে হাজির হয় তপেনের দোকানে।

এসব তথ্য রজতের অজানা। জানা থাকলে একটু সাবধান হতে পারত। অন্তত ঠাট্টাচ্ছলেও তপেনকে চটাবার সাহস পেত না।

সেদিন সকালের আড্ডায় কাগজের কথার জের টেনে রজত বলে, 'তুই থাম তো তোপনা। যেমন তোর দোকান, ঠিক তার উপযুক্ত কাগজ। যা-যা, ওই কাগজ ছিঁড়ে জিরে, মরিচ বেচগে যা। আর পড়তে হবে না।'

'কি বললি?' তপেন ভেতরে ভেতরে বেশ গরম হয়ে ওঠে।

'ঠিকই বলেছি। মুদিখানা দোকান ক'রে তোর বুদ্ধিটাও মুদির মতো ভোঁতা হয়ে গিয়েছে।'

'ভালো হবে না বলছি। আমাকে মুদি মুদি করবি না।'

'মুদিখানা দোকান যার, তাকে মুদি ছাড়া আর কি বলব! সম্রাট সাজাহান?'

'আর তুই! তোর যে স্টেশনারী দোকান, তোকে কি বলব?'

'আমাকে? আমাকে বলবি স্টে-শ-নার। সে তো ভাল নাম। বলনা যত খুশি। তাতে আমার কিছু আসে যায় না। কিন্তু তোকে আমি বলব মুদি—মুদি—মুদি। মুদি না হলে কেউ—'

কিসের একটা ইঙ্গিত দিতে গিয়ে রজত থেমে যায়। নিজেকে সামলে নেয়। কিন্তু সেটা তপেনের নজর এড়ায় না। তবু একটু চেপে সে বলে, 'দেখ্, ফের যদি তুই মুদি বলবি তো—'

'কি করবি কি? কামড়ে দিবি নাকি?'

'একটি চড়ে তোমার বদন বিগড়ে দেব।' মস্ত এক চড় উঁচিয়ে তপেন এগিয়ে যায় রজতের দিকে।

সঙ্গে সঙ্গে রজত এমন জোরে এক ধাক্কা দেয় যে, তপেন তিন হাত দূরে ছিটকে গিয়ে পড়ে। একটা ইঁটে লেগে তার হাত-পা ছড়ে যায়।

ঠিক এই রকমই হয়। অতি বুদ্ধিমান মানুষেও কোন কোন সময় কাণ্ডজ্ঞানবর্জিত হয়ে এমন একটা কাজ করে বসে, যার জন্যে সারা জীবন তাকে ফল ভোগ করতে হয়। অথচ আশ্চর্য, রাগ হলে মানুষ জ্ঞানবুদ্ধি হারায়। পরিণাম চিন্তা করবার অবসর পায় না।

তা ছাড়া ঘটনার আকস্মিকতায় সকলে এতই অভিভূত হয়ে পড়েছিল যে, বাধা দেবার কথা কারো মনেই আসেনি। এতটা যে হবে তাও কেউ বোঝেনি।

'আহা-হা, কর কি, কর কি—' বলে অধর বড়াল ছুটে আসবার আগেই একটা আধলা ইঁট তুলে তপেন ছুড়ে মারে রজতের কপাল লক্ষ্য করে।

ইঁটটা যথাস্থানে লাগে। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছোটে। 'উঃ, বাবা গো—' বলে দু'হাতে কপাল চেপে রজত বসে পড়ে।

তারপর হৈ-চৈ, গণ্ডগোল। ছুটে আসে সবাই। ভিড় জমে যায়। কয়েকজন ধরে তপেনকে। কয়েকজন রজতকে। ভাবে, এইবার রজত উঠে একটা কিছু না করে।

নটবর দত্তও হাঁ হাঁ করে ছুটে আসে। রজতকে ধরে বলে, 'আরে, এসব কি? ভেতরে ভেতরে না হয় রাগই ছিল, তাই বলে মারামারি।'

ভেতরে ভেতরে রাগ, সে আবার কি? কথাটা বুঝতে পারে না অনেকে। দোকানের হিসাব আলাদা হয়েছে, দু'খানা বাড়ি তৈরি হয়েছে এ খবর সবাই জানে। তার মধ্যে কোন অস্বাভাবিকত্ব তারা দেখতে পায়নি। তার জন্যে যে নিজেদের মধ্যে মনোমালিন্য ঘটেছে এটা কেউ বুঝতে পারে নি। দৈনন্দিন আচারে-ব্যবহারে তো মনেই হয় না যে, ভেতরে ভেতরে রাগারাগি চলছে। তবে নটবর এমন কথা বলে কেন?

নটবর দত্ত আবার বলে, 'তা যা হোক্ ভায়া। তুমি যেন আবার মেরে বস না। কথায় বলে, কুকুরে কামড়ালে কি—'

না। সে ভয় নেই। একটু সামলে নিয়ে অস্বাভাবিক মৃদু আর ঠাণ্ডা গলায় রজত শুধু বলে, 'তুই আমাকে মারলি তপেন। তোকে তো আমি মারতে চাইনি।'

সত্যিই তাই। তপেন যে চড় উঁচিয়ে গিয়েছিল তার কোন গুরুত্ব ছিল না। সে চড় রজতের গাল পর্যন্ত পেঁছিত কি না সন্দেহ। রজত কি ভাবলে সেই জানে, তপেনকে এক ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিতে চাইলে। সে ধাক্কাটা একটু জোর হয়ে যাওয়াতেই যত বিপত্তি। রগচটা তপেন রেগে-মেগে একটা ইঁট মেরে বসল।

হয়তো ব্যাপারটা বেশি দূর গড়াত না। মাথায় ব্যাণ্ডেজ বেঁধে রজত দুদিন পড়ে থাকত বিছানায়। তারপর একটা লোক দেখানো ক্ষমা-প্রার্থনার পর আবার ভাব হয়ে যেত। দোকান চলত যথানিয়মে।

এ-সবের কিছুই হল না। সকলের অলক্ষ্যে কোথায় যেন একটা ফাঁক ছিল। সেই ফাঁক দিয়ে শনি এসে ঢুকল। রজতকে নিয়ে গেল থানায়। জখম দেখিয়ে নালিশ লেখালে।

প্রথমে মহকুমা কোর্ট। মীমাংসা হল না। তারপর জেলা কোর্ট। সেখানকার রায় কারও মনঃপূত হল না। অতএব সবশেষে হাইকোর্টের শরণাপন্ন হতে হল।

নগদ টাকা গেল, দোকান গেল, স্ত্রীর গায়ের গহনা গেল, শেষ পর্যন্ত বাড়ি দু'খানাও গেল। কিছুতেই তাদের চৈতন্য হল না। কি যে তারা চায়, কিসের জন্যে এই মামলা, একথা ভাববার কোন অবসরই তারা পেল না।

এ শহরের লোক শুধু অবাক হয়ে দেখল, কত সামান্য কারণে কিভাবে দুটি সুখের সংসার তছনছ হয়ে গেল। কোথা থেকে তারা এসেছিল, কোথায় চলে গেল কেউ জানল না।

কেউ যদি বলত, 'সবই ভবিতব্যতা। ওদের বরাতে এই লেখা ছিল।'

'আপনি থামুন তো মশাই।' অধর বড়াল তাকে থামিয়ে দিয়ে বলত, 'ভবিতব্যতা! সব ওই শালা নটবরের কারসাজি। বেটা এক ঢিলে দুই পাখি মারলে। ওদের দোকান দুটো তুলে দিয়ে ছেলের দোকানে বিক্রির পথ পরিষ্কার করলে আবার সাক্ষী দিয়ে দিয়ে মোটা টাকা ঘরে তুললে।'

এ সন্দেহ অনেকেই করে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ নাকি দেখেছে, জেলা কোর্টের পেছনে বটগাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে নটবর দত্ত উকিলের হাতে টাকা গুঁজে দিচ্ছে।

সাক্ষী আবার কবে উকিলকে টাকা দেয়?

সেদিন রাত তখন অনেক। গরমকালের রাত। অনেকক্ষণ গুমোট থাকবার পর সবেমাত্র ঝিরঝিরে হাওয়া বইতে শুরু করেছে। সেই হাওয়ার দোলায় সকলের চোখেই ঘুমের ঘোর নেমে
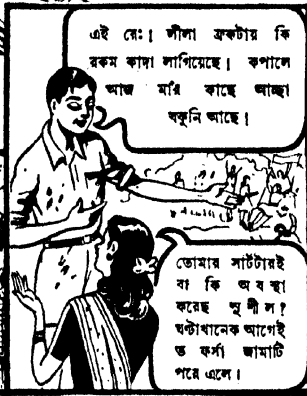
এসেছে। রাস্তাঘাট ফাঁকা। মাঝে মাঝে শুধু দূর থেকে দু'একটা কুকুরের আর্ত চীৎকার ভেসে আসছে বাতাসে।

একটি লোক এল। ঠায় দাঁড়িয়ে রইল দোকান দুখানার দিকে চেয়ে। তারপর অজস্র তারাভরা আকাশের দিকে তাকাল। হঠাৎ এক সময় মাটিতে বসে পড়ে দু' হাঁটুর ভেতরে মুখ গুঁজল সে। একটা চাপা গোঙানির শব্দ শোনা যেতে লাগল বহুক্ষণ ধরে।

একটু পরে আর একজন আসে সেখানে। এক মিনিট দাঁড়িয়ে দেখে সেও হাঁটু গেড়ে বসে ঠিক তার পেছনে। কাঁধের ওপরে হাত রাখে।

চমকে ফিরে তাকাতেই নবাগত বলে, 'আর কতদিন এভাবে চলবে রে? এ মামলার কি শেষ নেই?'

একটি মুহূর্ত। দুজনে চুপচাপ বসে থাকে। মাথার ওপর দিয়ে একটা প্যাঁচা কর্কশ আওয়াজ তুলে চলে যায়।

মাথা তুলে এবার অন্য লোকটি বলে, 'না, আজই শেষ। কাল থেকে আর মামলা চলবে না।'

এত সমস্ত খবর কোন কাগজে বেরোয় নি। প্রতিদিন সকালে কাগজ হাতে পেয়ে প্রথমেই যারা আইন-আদালতের পাতা খুলে বসে, তাদের কাছে হয়তো খুব মুখরোচক হবে না বলে।

এ ছাড়া আরও একটা খবর বেরোয় নি। কাগজে বেরোবার মতো নয়। আর জানতও না কেউ। এমন কি রজত-তপনের দোকানে যারা রোজ আড্ডা দিত, তারাও নয়।

এক কানাই দত্ত ছাড়া।

রোজ রাত্রে দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করে কানাই সোজাসুজি বাড়ি ফিরত না। গঙ্গার ধার থেকে ঘুরে আসত। আসবার পথে রজত, তপেনের বাড়ির দিকে কটমট করে তাকাত।

সেই শুধু একদিন দেখেছিল।

অনেক রাত্রে যখন সমস্ত পৃথিবী ঘুমে অসাড়, তখন দুই বাড়ির ছাদে দুজনে মুখোমুখি বসে আছে।

এ বাড়ির রজত বোসের ছেলে অশোক। আর ও বাড়ির তপেন মিত্রের মেয়ে ঝর্ণা।

রামকৃষ্ণ মিশনের নিয়মাবলী

শ্রীসরলাবালা সরকার

বেলুড়ের জমি কেনা হইয়াছে, কিন্তু এখনও তাহা বসবাসের উপযুক্ত করিয়া লইতে হইলে অনেক কিছুই করিতে হইবে। জমির নিচু দিকের জায়গাগুলি মাটি ফেলিয়া ভরাট করিতে হইবে। একখানা একতলা বাড়ি অবশ্য আছে, কিন্তু সেটি খুবই পুরনো এবং সেই বাড়িতে দুখানা বড় আর দুখানা ছোট ঘর একটা বারান্দা, আর তা ছাড়া চাকরদের থাকিবার তিনখানা ঘর, সব-সুদ্ধ মোট সাতখানা ঘর, আর গেটের কাছে একখানা ভাঙা ঘর। মেরামত না হইলে তাহাতে বাস করা চলিবে না, তাহা ছাড়া ঐ কয়খানা মাত্র ঘরে সংকুলানও হইবে না। সুতরাং আগে জমিটি ভরাট করার কাজ আরম্ভ করিতে হইবে, তার-পর পুরাতন বাড়িটিকে যতটা সম্ভব বাসের উপযোগী করিতে হইবে এবং নূতন কয়েকখানা ঘরও তুলিতে হইবে।

এদিকে ঠাকুরের জন্মোৎসব আসিয়া পড়িয়াছে। দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে জন্মোৎসব করা চলিবে না। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে স্বামীজীর ইউরোপ হইতে প্রত্যাবর্তনের পর কোনরকমে সেখানেই ঠাকুরের জন্মোৎসব সমাধা হইয়াছে, এবার স্বামীজী বিশেষভাবে জনসাধারণ সকলকেই জন্মোৎসবে আহ্বান করিবেন মনস্থ করিয়াছেন। সেজন্য ঠিক করিয়াছেন, একদিন তিথিপূজা হইবে এবং আর একদিন সাধারণ উৎসব।

জন্মতিথি পূজা নীলাম্বরবাবুর বাগান-বাড়িতেই সম্পন্ন হইল, আর সাধারণ উৎসবের জন্য বেলুড়ের কাছেই বালী নামক স্থানে 'পূর্ণচন্দ্র দাঁর প্রতিষ্ঠিত রাসমন্দির ও তাহারই সংশ্লিষ্ট বৃহৎ অঙ্গন পাওয়া গেল। সেখানে উৎসব হইলে জায়গার অপ্রতুল হইবে না।

জন্মতিথি পূজার দিন নীলাম্বর-বাবুর বাগান-বাড়িতে যাঁহারা ব্রাহ্মণ নহেন এমন অনেক ভক্তকে স্বামীজী যথাবিহিত ভাবে উপবীত দান করেন। ইহার পরে অবশ্য নানা সম্প্রদায় উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু স্বামীজীই একদিক দিয়া এই ক্ষত্রিয়াচারে উপবীত গ্রহণের পথ প্রদর্শক। অবশ্য কায়স্থসমাজে ইহার পূর্বেই ক্ষত্রিয়াচারে উপনয়ন গ্রহণ আরম্ভ হইয়াছিল।

স্বামীজী তাঁহার শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়কে এই উপনয়ন প্রদান কার্যের ভার দিয়াছিলেন, এ সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন স্বামী-শিষ্য সংবাদ নামক পুস্তক হইতে তাহার কিছু উদ্ধৃত করিতেছি :—

"দ্বিজাতি মাত্রেরই উপনয়ন সংস্কারে অধিকার আছে, বেদ তার প্রমাণস্থল। আজ ঠাকুরের জন্মদিনে যারা আসবে তাদের সকলকে পৈতে পরিয়ে দেব। এরা সব ব্রাত্য হয়ে গেছে। শাস্ত্রে বলে, ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত করিলেই আবার উপনয়ন সংস্কারের অধিকারী হয়। আজ ঠাকুরের জন্মতিথি—সকলেই তাঁর নাম নিয়ে শুদ্ধ হবে। তাই আজ সমাগত ভক্তমণ্ডলীকে পৈতে পরাতে হবে।"

"শিষ্যকে স্বামীজী ক্ষত্রিয়াদি দ্বিজাতির গায়ত্রী মন্ত্র বলিয়া দিলেন এবং বলিলেন, "ব্রাহ্মণেতর ভক্তদিগকে এইরূপ গায়ত্রী মন্ত্র দিবি। ক্রমে দেশের সকলকেই ব্রাহ্মণ পদবীতে উঠিয়ে নিতে হবে। ঠাকুরের ভক্তদের তো কথাই নাই। হিন্দুমাত্রেই পরস্পর পরস্পরের ভাই। 'ছোঁব না', 'ছোঁব না' বলে ইহাদিগকে আমরাই হীন করে ফেলেছি। তাই দেশটা হীনতা, ভীরুতা, মূর্খতা ও কাপুরুষতার পরাকাষ্ঠায় গিয়াছে। এদের তুলতে হবে, অভয়বাণী শুনাতে হবে। বলতে হবে—'তোরাও আমাদেরই মত মানুষ, তোদেরও আমাদের মত সব অধিকার আছে।" (স্বামী শিষ্য সংবাদ)

ঠাকুরের এই জন্মতিথির পূজার দু' দিন পরে স্বামীজী অতি প্রত্যূষে গঙ্গা-স্নান করিয়া নীলাম্বরবাবুর বাগান-বাড়িতে যে ঘরটি পূজার ঘর করা হইয়া-ছিল, সেই ঘরে গিয়া পূজার আসনে বসিলেন। পুষ্পপাত্রে যে ফুল-চন্দন ও বিল্বপত্র ছিল সবই তুলিয়া লইলেন এবং ঠাকুরের পাদুকার উপর অঞ্জলি দিয়া ধ্যানে মগ্ন হইয়া গেলেন, তারপর সেখানে যে তাম্রকৌটায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পূণ্যাস্থি ছিল সেই কৌটাটি কাঁধের উপর তুলিয়া লইয়া অপর সকলকে তাঁহার সহিত আসিবার জন্য ইঙ্গিত করিয়া বেলুড়ের কেনা জমির দিকে অগ্রসর হইলেন।

শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী তাঁহার পাশে পাশেই চলিতেছিলেন, স্বামীজী তাঁহাকে বলিলেন, "ঠাকুর আমায় বলেছিলেন, 'তুই কাঁধে করে আমায় যেখানে নিয়ে যাবি, আমি সেইখানেই যাব আর থাকব। তা গাছতলাতেই কি আর কুটীরেই কি। সেই জন্যেই আমি তাঁকে নিজে কাঁধে করে নূতন মঠের জমিতে নিয়ে যাচ্ছি। নিশ্চয় জানবি, বহুকাল পর্যন্ত 'বহুজন হিতায়' ঠাকুর ওখানে স্থির হয়ে থাকবেন।"

নূতন জমিতে পেঁৗছে একটি বড় আসনের উপর কৌটাটি নামাইয়া রাখিয়া স্বামীজী ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। অপর সকলেও প্রণাম করিলেন। সকলের মনেই এক অপূর্ব ভাব তাঁহাদের এমন ভাবে বিভাবিত করিল যেন তাঁহারা কিছু-

ক্ষণের জন্য এই দৃশ্যমান জগৎ হইতে কোন এক বহুদূর অদৃশ্য জগতের অস্তিত্ব অনুভব করিতেছেন।
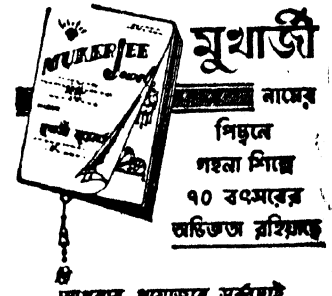
আজ সে দিনের সেই দৃশ্যটি যেন দেশ ও কালের সীমা অতিক্রম করিয়া আমাদের মানস-নেত্রের সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে উজ্জ্বল ও জ্যোতির্ময় রূপে।

সেই গঙ্গাতীর, সেই বেলুড়ের সে দিনের পুরাতন বাড়ি। গৈরিক পরিহিত সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ ঠাকুরের অস্থি দক্ষিণ স্কন্ধে বহন করিয়া গঙ্গাতীরে বেলুড় মঠে স্থাপন করিতেছেন।

অস্থির পেটিকা আসনে স্থাপনের পর পূজা আরম্ভ হইল, পূজার পর বিরজা হোম। বিরজা হোমের সময় সন্ন্যাসী ছাড়া অন্য কাহারও উপস্থিত থাকার অধিকার নাই, সেজন্য শিষ্য শরচ্চন্দ্রকে স্বামীজী বহু দূরস্থ প্রবেশ-পথে পাহারা দিতে পাঠাইলেন।

হোম শেষে স্বামীজী চরু অর্থাৎ পায়েস রান্না করিয়া ঠাকুরকে ভোগ দিলেন, তারপর সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আপনারা আজ কায়মনোবাক্যে ঠাকুরের পাদপদ্মে এই প্রার্থনা করুন যেন মহাযুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আজ হইতে বহুকাল 'বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়' এই পুণ্যক্ষেত্রে অবস্থান করিয়া ইহাকে সর্বধর্মের অপূর্ব সমন্বয়ক্ষেত্র করিয়া রাখেন।"

পুণ্যক্ষেত্র? হাঁ, সর্বধর্মের সমন্বয়-ক্ষেত্ররূপ মহাতীর্থ। স্বামীজী ফিরিবার সময় শিষ্য শরচ্চন্দ্রের উপর অস্থিসম্পুট ফিরাইয়া লইয়া যাইবার ভার দিয়াছিলেন। তখনকার মত ফিরাইয়া লইয়া যাইতে হইল, কেননা তখন মঠ বাসের উপযুক্ত হয় নাই। স্বামীজী শরচ্চন্দ্রকে বলিলেন, "ঠাকুরের এই কৌটা ফিরিয়ে নিয়ে যেতে আমাদের (সন্ন্যাসীদের) কারও অধিকার নেই, কারণ আজ আমরা এখানে ঠাকুরকে বসিয়েছি। অতএব তুই-ই এই কৌটা তুলে নিয়ে চল্।"

শরচ্চন্দ্র কৌটা মাথায় বহিয়া লইয়া গেলেন। নীলাম্বরবাবুর বাগান-বাড়িতে পৌঁছিয়া কৌটাটি ঠাকুরঘরে রাখা হইল। স্বামীজী তারপর শরচ্চন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, "ঠাকুরের ইচ্ছায় আজ ধর্মক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠা হল। বারো বছরের চিন্তা আজ আমার মাথা থেকে নামলো।"

আরও তিনি বলিয়াছিলেন—"এই মঠ হবে বিদ্যা ও সাধনার কেন্দ্রস্থান। তোদের মত ধার্মিক গৃহস্থেরা এর চারদিকের জমিতে ঘরবাড়ি করে থাকবে, তার মাঝ-খানে ত্যাগী সন্ন্যাসীরা থাকবে। আর মঠের ঐ দক্ষিণের জমিটায় ইংলণ্ড ও আমেরিকার ভক্তদের থাকবার ঘরদোর হবে। এরকম হলে কেমন হয় বল দেখি?"

শিষ্য বলিলেন,—"মহাশয়, এ আপনার অদ্ভুত কল্পনা।"

স্বামীজী বলিলেন, "কল্পনা কিরে? সময়ে সব হবে। আমি তো পত্তন মাত্র করে দিচ্ছি—এরপর আরো কত কি হবে। আমি কতক করে যাব। আর তোদের ভিতর নানা আইডিয়া দিয়ে যাব। তোরা পরে সে সব ওয়ার্ক আউট করবি। বড় বড় প্রিন্‌সিপল্ কেবল শুনলে কি হবে? সেগুলিকে কার্যক্ষেত্রে দাঁড় করাতে—প্রতিনিয়ত কাজে লাগাতে হবে। শাস্ত্রের লম্বা লম্বা কথা পড়লে কি হবে? শাস্ত্রের কথাগুলি আগে বুঝতে হবে। তারপর জীবনে সেগুলি ফলাতে হবে। বুঝলি? একেই বলে প্র্যাকটিক্যাল রিলিজিয়ন।" (স্বামী-শিষ্য সংবাদ)

ঠাকুরের জন্মোৎসব দাঁয়েদের রাস-বাড়িতে সমারোহে সম্পন্ন হইল। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ মার্চ মাস। ১১ মার্চ সন্ধ্যায় স্টার থিয়েটারে এবং ১৮ই মার্চ শুক্রবার এমারেল্ড থিয়েটার হলে রামকৃষ্ণ মিশনের দুটি সভা আহ্বান করা হয়। দুটি সভাতেই স্বামীজী সভাপতিত্ব করেন। স্টার থিয়েটারের সভায় মিস নোবল (ভগিনী নিবেদিতা) 'ইংলণ্ডে ভারতীয় চিন্তা' এই বিষয়ে একটি বক্তৃতা করেন এবং দ্বিতীয় সভায় স্বামী সারদানন্দ 'আমেরিকায় আমাদের প্রচারকার্য' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

২৫শে মার্চ শুক্রবার মিস মার্গারেট নোবল তাঁহার গুরু স্বামী বিবেকানন্দের নিকট ব্রহ্মচর্যের দীক্ষা গ্রহণ করিয়া "ভগিনী নিবেদিতা" নাম গ্রহণ করেন। এই দিনটি শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের তথা সমগ্র ভারতবর্ষের একটি বিশেষ স্মরণীয় দিন।

যাঁহারা নিবেদিতার সংস্পর্শে আসিয়াছন, তাঁহারা একথা নিশ্চয়ই বলিবেন, নিবেদিতা" এই নাম তাঁহার জীবন পেনে কি অপূর্ব সার্থকতা লাভ করিয়াছল। এমন সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন ়থিবীর ইতিহাসে অতি অল্পই পাওয়া ায়। একাধারে বীর্যবতী মহা তেজস্বিনী, পের দিকে মূর্তিমতী ত্যাগ। অকপটতা, রলতা এবং মাধুর্য যেন একাধারে এই হামনস্বিনী মহিলার জীবনে মূর্তরূপ ারণ করিয়াছিল, আবার অন্যদিকে তিনি াতি কঠোরা জনশিক্ষয়িত্রী ছিলেন। ারতবর্ষের ধূলিকণা পর্যন্ত তাঁহার াছে যেভাবে অতি পবিত্র পূজার বস্তু হল, যদি অতি অল্প সংখ্যক ভারতীয় ারী ও পুরুষেরও সেরূপ একান্ত নিষ্ঠা াকিত, তাহা হইলে ভারতের সকল ়র্দিনের অবসান হইত।

এই ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দেই হরিপ্রসন্ন হারাজ সংসার ত্যাগ করেন। তিনি কুরের সন্তানগণের মধ্যেই একজন, ন্তু এতদিন একেবারে গৃহত্যাগ করেন ই। ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করিয়া তিনি ়ু বৎসর চাকরি করেন, কিন্তু গৃহেও ্যাসীর মতই জীবন যাপন করিতেন। ল়ড় মঠে জমি-কেনা হইবার পরে তিনি করি ছাড়িয়া দিয়া সঙ্ঘে আসিয়া যোগ লেন এবং সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া স্বামী জ্ঞানানন্দ নাম গ্রহণ করিলেন। এখন নি সঙ্ঘে যোগ দেওয়ায় তাঁহারই াবধানে এপ্রিল মাস হইতে বাড়ি রির কাজ আরম্ভ হইয়া গেল।

জমির উপর যে একতলা ছোট বাড়িটি ল, তাহার উত্তর দিকের দুখানি ঘরের ঝ পিচ ঢালা ছিল। কাজেই মেঝেটি । ভালই ছিল। তা ছাড়া ঘর দুখানি । করবার উপযুক্ত ছিল। এখনও সে দুটি আছে। উত্তর-পূর্ব কোণের ট পরে ভিজিটার্স রুম হয় এবং অন্য টও সাধুদের থাকিবার ঘর হয়। যাহা ক, ঐ ঘর দুটি মিসেস বুল ও মিস ক্লাউড জমি কিনিবার পর কিছুদিন গৃহরূপে ব্যবহার করিয়াছিলেন। াতে গেলে তাঁহারাই বেলুড় মঠের প্রথম অধিবাসিনী।

নীলাম্বরবাবুর বাগান-বাড়িতে তখন াকেই একত্র হইয়াছেন, স্বামীজী তো আছেনই, স্বামী সারদানন্দও আমেরিকা হইতে আসিয়াছেন, সিংহল হইতে স্বামী শিবানন্দও ফিরিয়া আসিয়াছেন। স্বামী ত্রিগুণাতীত ও স্বামী অখণ্ডানন্দও রিলিফের কাজ শেষ করিয়া ফিরিয়াছেন। হরি মহারাজ, বাবুরাম মহারাজ, তুলসী মহারাজ, বুড়ো গোপালদাদা এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দ ইঁহারা সকলেই আছেন। হরিপ্রসন্ন মহারাজ গৃহত্যাগ করিয়া সঙ্ঘে যোগ দিয়াছেন, ইহা ছাড়া আরও অনেকগুলি তরুণ সাধুও আছেন। মনে হয়, নীলাম্বরবাবুর বাগান-বাড়িতে যেন আনন্দের হাট বসিয়া গিয়াছে।

সকল কাজ যাহাতে সুশৃঙ্খলে চলে স্বামীজী এখন সেদিকে দৃষ্টি দিয়াছেন। স্বামী সারদানন্দের হাতে দিয়াছেন ব্যবস্থার ভার, কেননা তিনি সদ্য আমেরিকা প্রত্যাগত, ওদেশের কাজকর্ম চলে ঘড়ির কাঁটা ধরিয়া। এখনও সে অভ্যাস তাঁহার পুরাপুরিই রহিয়াছে।

প্রত্যেককে বিভিন্ন কাজের ভার দেওয়া হইল। ধ্যান, জপ, পূজা, পাঠ, নাওয়া, খাওয়া, শোওয়া সবই নিয়মিতভাবে চলিতে লাগিল। তুলসী মহারাজ ও শরৎ মহারাজ নূতন ব্রহ্মচারিগণের অধ্যাপনার ভার লইলেন এবং বেদ বেদান্ত উপনিষদের নিয়মিত ক্লাস হইতে লাগিল।

এই সময় স্বামীজী মঠের জন্য কতকগুলি নিয়ম প্রণয়ন করেন। নিয়মগুলি কয়েক ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছিল। মঠ (১) ও (২)। (৩) সাধন প্রণালী। (৪) মত। (৫) ভক্তি। (৬) ঠাকুরঘর। (৭) ভারতবর্ষের কার্যপ্রণালী। ইহা ছাড়া আলমবাজার মঠেও কতকগুলি নিয়ম রচিত হইয়াছিল। সেগুলিতে মঠের জীবনযাত্রার নিয়মাবলী ছিল।

মঠ (১) নম্বরের নিয়মগুলি এইরূপ :—

১। শ্রীভগবান রামকৃষ্ণ-প্রদর্শিত প্রণালী অবলম্বন করিয়া নিজের মুক্তিসাধন করা ও জগতের সর্বপ্রকার কল্যাণ সাধনে শিক্ষিত হওয়ার জন্য এই মঠ প্রতিষ্ঠিত হইল। স্ত্রীলোকদিগের জন্যও ঐ প্রকার আর একটি মঠ স্থাপিত হইবে।

২। যেভাবে পুরুষদিগের মঠ পরিচালিত হইবে, স্ত্রীলোকদিগের মঠও ঠিক সেইভাবে পরিচালিত হইবে। বিশেষ এই, স্ত্রীলোকদিগের মঠে পুরুষের কোন সংশ্রব থাকিবে না এবং পুরুষদিগের মঠে স্ত্রীলোকের কোন প্রকার সংশ্রব থাকিবে না।

৩। হিমাচলে কোন উপযুক্ত স্থানে ঐ প্রকার দুইটি মঠ স্থাপিত হইয়া ঐ প্রকার নিয়মে পরিচালিত হইবে।

৪। স্ত্রীমঠ,—যতদিন পর্যন্ত কার্যসম্পাদনে সমর্থা স্ত্রী না পাওয়া যায়, ততদিন দূর হইতে পুরুষদের দ্বারা চালিত হইবে; তাহার পর উহারা আপনাদের কার্য আপনারাই করিয়া লইবে।

৫। বিদ্যার অভাবে ধর্মসম্প্রদায় নীচ-

দশা প্রাপ্ত হয়। অতএব সর্বদা বিদ্যার চর্চা থাকিবে।

৬। ত্যাগ ও তপস্যার অভাবে বিলাসিতা সম্প্রদায়কে গ্রাস করে, অতএব ত্যাগ এবং তপস্যার ভাব সর্বদা উজ্জ্বল রাখিতে হইবে।

৭। প্রচারের দ্বারা সম্প্রদায়ের জীবনী-শক্তি বলবতী থাকে, অতএব প্রচার কার্য হইতে কখনও বিরত থাকিবে না।

৮। এই প্রকার মঠ সমস্ত পৃথিবীতে স্থাপন করিতে হইবে। কোন দেশে আধ্যাত্মিক ভাব মাত্রেরই প্রয়োজন। কোন দেশে ইহজীবনের কিঞ্চিৎ সুখস্বচ্ছন্দতার অতীব প্রয়োজন। এই প্রকার যে জাতিতে বা যে ব্যক্তিতে যে অভাব অত্যন্ত প্রবল তাহা পূর্ণ করিয়া সেই পথ দিয়া তাহাকে ধর্ম-রাজ্যে লইয়া যাইতে হইবে।

৯। ভারতবর্ষে প্রথম ও প্রধান কর্তব্য—নীচ শ্রেণীর লোকদিগের মধ্যে বিদ্যা ও ধর্মের বিতরণ। অন্নের ব্যবস্থা না করিতে পারিলে ক্ষুধার্ত ব্যক্তির ধর্ম হওয়া অসম্ভব। অতএব তাহাদের নিমিত্ত অন্নাগমের নূতন উপায় প্রদর্শন করা সর্বাপেক্ষা প্রধান ও প্রথম কর্তব্য।

১০। সমাজ সংস্কারের উপর মঠের অধিক দৃষ্টি থাকিবে না। কারণ সামাজিক দোষ বা কুরীতি সমাজরূপ শরীরের ব্যাধি-বিশেষ। ঐ শরীর বিদ্যা ও অন্নের দ্বারা পুষ্ট হইলে ঐ সকল কুরীতি আপনা-আপনি চলিয়া যাইবে। অতএব, সামাজিক কুরীতির উদ্ঘোষণে বৃথা শক্তি ক্ষয় না করিয়া সমাজশরীর পুষ্ট করাই এই মঠের উদ্দেশ্য।

১১। চরিত্রবল না হইলে মনুষ্য কোন কার্যেই সক্ষম হয় না। এই চরিত্রবল-বিহনীতাই আমাদের কার্যপরিণতা-বুদ্ধির অভাবের একমাত্র কারণ।

১২। আত্মনির্ভর ও আত্মপ্রত্যয় চরিত্র-গঠনের একমাত্র উপায়। অতএব এই মঠের প্রত্যেক কার্যে ও প্রত্যেক শিক্ষায় ইহার উপর যেন লক্ষ্য থাকে।

১৩। শিষ্যের গুরুর উপর একান্ত বিশ্বাস থাকা উচিত। সেই প্রকার গুরুও শিষ্যের প্রতি একান্ত বিশ্বাসবান না হইলে শিষ্যের উন্নতি হইতে পারে না। গুরু শিষ্যের উপর বিশ্বাস করিলে শিষ্যের শক্তি স্ফুরিত হয়। শিষ্যের বিশ্বাসে গুরুরও শক্তি বিপুলতা লাভ করে।

১৪। এই মঠের সমস্ত কার্যই মঠস্থ সর্বাঙ্গের সম্মতিক্রমে সম্পাদিত হইবে। সর্ব-সম্মতির অভাবে অধিক সংখ্যকের সম্মতিতে হইবে।

১৫। যে কেহ কামকাঞ্চন ত্যাগ করিয়া নিষ্কাম কর্ম, ভক্তি, যোগ, জ্ঞান—ইহাদের এক, দুই বা সমস্ত অভ্যাস করিয়া জীবন অতিবাহিত করিতে চান, যিনি সচ্চরিত্র, ঈর্ষাশূন্য ও অধ্যক্ষের এবং গুরুর আদেশ পালনে প্রাণপণ তৎপর, তিনি এই মঠের অঙ্গ-রূপে গৃহীত হইতে পারিবেন।

১৬। মঠের অঙ্গগণ দুইভাগে বিভক্ত—নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসী। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী শব্দে যাহারা আকুমার ব্রহ্মচারী ও যাহারা আজীবন ব্রহ্মচর্য পালন করিবে, তাহাদিগকে বুঝাইবে।

১৭। খণ্ডিত ব্রহ্মচর্য যাহারা পুনর্বার ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করিয়া সন্ন্যাস লইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে, তাহারাও মঠের অঙ্গ হইতে পারিবে।

১৮। পিতামাতা বা অভিভাবকেরা যে সকল বালককে স্বেচ্ছায় শিক্ষার নিমিত্ত এই মঠে পাঠাইবেন, অথবা যে সকল বালক অনাথ, তাহারাও এই মঠে গৃহীত ও শিক্ষিত হইবে, কিন্তু মঠের অঙ্গ হইতে পারিবে না। শিক্ষা সমাপ্তির পর বিবাহ করা বা না করা তাহাদের ইচ্ছাধীন।

১৯। আপাতত, কেবল সদ্বংশজাত হিন্দু বালকই গৃহীত হইবে।

২০। ধর্মের মধ্য দিয়া না হইলে ভারতবর্ষে কোন ভাব চলে না। এই জন্য অর্থ, বিদ্যা সমাজ-সংস্কার ইত্যাদি সমস্তই ধর্মের মধ্য দিয়া চালাইতে হইবে।

২১। এখন উদ্দেশ্য এই যে, এই মঠটিকে ধীরে ধীরে একটি সর্বাঙ্গসুন্দর বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করিতে হইবে। তাহার মধ্যে দার্শনিক চর্চা ও ধর্ম-চর্চার সঙ্গে সঙ্গে একটি পূর্ণ "টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট" করিতে হইবে; এইটি প্রথম কর্তব্য। পরে অন্যান্য অবয়ব ক্রমে ক্রমে সংযুক্ত হইবে।

২২। ভারতবর্ষের সমস্ত দুঃখের মূল—"নিম্নশ্রেণী ও উচ্চশ্রেণীর মধ্যে অত্যন্ত প্রভেদ হওয়া"; এই ভেদ নাশ না হইলে কোনও কল্যাণের আশা নাই। এই জন্য সকল স্থানে প্রচারক পাঠাইয়া ঐ সকল ব্যক্তিদিগকে বিদ্যা ও ধর্ম শিক্ষা দিতে হইবে।

২৩। অতএব এই মঠে যাঁহারা এক্ষণে অধ্যক্ষ আছেন বা পরে অধ্যক্ষ হইবেন, তাঁহারা সর্বদা যেন এইটি মনে রাখেন যে, এই মঠ কোনমতেই বাবাজীদিগের ঠাকুরবাড়ীতে পরিণত না হয়।

২৪। ঠাকুরবাটী দ্বারা দুই চারিজনের কিঞ্চিৎ উপকার হয়, দুই দশজনের কৌতূহল চরিতার্থ হয়; কিন্তু এই মঠের দ্বারা সমগ্র পৃথিবীর কল্যাণ সাধিত হইবে।

মঠ (২)—

১। প্রীতি, অধ্যক্ষদিগের আজ্ঞাবহতা, সহিষ্ণুতা ও একান্ত পবিত্রতাই ভ্রাতৃবর্গের মধ্যে একতা রক্ষার একমাত্র কারণ।

২। সর্বাপেক্ষা উদ্দেশ্যের একতা ঐক্য-বন্ধনের প্রধান কারণ।

৩। আমাদের ঠাকুর মানের জন্য আসেন নাই; আমরা তাঁহার দাস, আমরাও মান ভোগের আকাঙ্ক্ষী নহি। কেবল নিজে পবিত্র থাকিয়া অন্যকে পবিত্রতা শিক্ষা দিয়া তাঁহার আজ্ঞাপালন করাই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য।

৪। এই মঠের প্রত্যেক অঙ্গেরই ভাবা উচিত যে, তাঁহার প্রত্যেক কার্যে তিনি যেন শ্রীভগবানের মহিমা প্রকাশ করেন। তিনি যেখানেই যান বা যে অবস্থাতেই থাকুন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিনিধি। এবং লোকে তাঁহার মধ্য দিয়াই শ্রীভগবানকে দর্শন করিবে।

৫। এই ভাবটি সদা মনে জাগরূক থাকিলে আর বেচালে পা পড়িবে না।

৬। আজ্ঞাবহতাই কার্যকারিতার প্রধান সহায়। অতএব প্রাণভয় পর্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া আজ্ঞাপালন করিতে হইবে। সকল দুঃখের মূল ভয়। ভয়ই মহাপাপ, সেই ভয় একেবারেই ছাড়িতে হইবে।

৭। অপরের নামে গোপনে নিন্দা করা ভ্রাতৃভাব বিচ্ছেদের প্রধান কারণ। অতএব কেহই তাহা করিবে না। যদি কোন ভ্রাতার

বরুদেধ কিছু বলিবার থাকে ত একান্তে তাহাকেই বলা হইবে।

৮। তাঁহার সেবক বা সেবকের সেবকদর মধ্যে কেহই মন্দ নহে। মন্দ হইলে কেহ এখানে আসিত না। অতএব কাহাকেও মন্দ ভাবিবার অগ্রে "আমি মন্দ দেখি কেন?" প্রথম ভাবা উচিত।

৯। পুরুষানুক্রমে উদ্দেশ্যের একতানতাই (Continuance of Policy) মহৎ কার্য সাধনের ও উত্তরোত্তর শক্তি সঞ্চয়ের একমাত্র কারণ। অর্থাৎ আমাদের পূর্বোক্ত উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য একজন মঠাধ্যক্ষ যে কার্যপ্রণালী পরিচালিত করিবেন, তাঁহার উত্তরাধিকারী তাহাই যেন অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হয়েন।

১০। সংহতিই অভ্যুত্থানের প্রধান উপায় ও শক্তি সংগ্রহের একমাত্র পন্থা। অতএব যে কেহ কায়, মন ও বাক্যের দ্বারা এই সংহতির বিশ্লেষণ করিতে চেষ্টা করিবেন, তাঁহার মস্তকে সমস্ত সঙ্ঘের অভিশাপ নিপতিত হইবে এবং তিনি ইহ-পরলোক উভয় হইতে ভ্রষ্ট হইবেন।

১১। যদি কাহারও পদস্খলিত হয়, তাহা হইলে সমস্ত সঙ্ঘের নিকট আপন অপরাধ স্বীকার করিয়া সঙ্ঘ যাহা বিধান করেন, তাহাই অবনত মস্তকে পালন করিবে।

১২। যে কেহ অপরাধ করিয়া তাহা অস্বীকারপূর্বক সঙ্ঘের সহিত বিবাদ করিতে উদ্যত হন, তিনিও ইহলোক ও পরলোক হইতে ভ্রষ্ট হইবেন।

১৩। কারণ, এই সঙ্ঘই তাঁহার অঙ্গস্বরূপ এবং এই সঙ্ঘেই তিনি সদা বিরাজিত।

১৪। একীভূত সঙ্ঘ যে আদেশ করেন তাহাই প্রভুর আদেশ, সঙ্ঘকে যিনি পূজা করেন তিনি প্রভুকে পূজা করেন এবং সঙ্ঘকে যিনি অমান্য করেন তিনি প্রভুকে অমান্য করেন।

মত।

১। ঠাকুরের উক্তিসকল একত্র করিয়া তাহাকে একমাত্র শাস্ত্র করিলে তাঁহার বিশাল ভাব ও আমাদের আজীবন পরিশ্রমের এইমাত্র ফল হইবে যে, আমরা একটি ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ সম্প্রদায়ের স্রষ্টা হইব ও বহু বিবদমান ভাগে বিভক্ত এই সমাজকে আরও কোলাহলময় করিয়া তুলিব।

২। অতএব আমাদের সনাতন শাস্ত্র বেদই একমাত্র শাস্ত্ররূপে পরিগৃহীত ও প্রচারিত হইবে ও গীতা যে প্রকার পুরাকালে ছিল সেই প্রকার ঠাকুরের উক্তি আধুনিক সর্বাঙ্গসুন্দর বেদমতের ব্যাখ্যা।

৩। অর্থাৎ শঙ্করাচার্য প্রভৃতি সমস্ত ভাষ্যকারেরাই এক এই বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন যে, সমগ্র বেদরাশিই এক কথা বলিতেছেন। সেইজন্য আপাতবিসম্বাদী উক্তি সকলের মধ্যে স্বীয় মতের বিরুদ্ধ উক্তিগুলিকে বলপূর্বক আপন মতানুযায়ী অর্থকরণ দোষে দূষিত হইয়াছেন।

৪। পুরাকালে যে প্রকার একমাত্র গীতাবক্তা ভগবানই এই সকল আপাতবিবদমান উক্তি সকলের মধ্যে কিঞ্চিৎ সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছিলেন, কালে অতীব বিশালতাপ্রাপ্ত সেই বিবাদ নিঃশেষে ভঞ্জন করিবার জন্যই তিনিই শ্রীরামকৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন।

৫। এইজন্য তাঁহার উক্তিসকলের মধ্য দিয়া না পড়িলে ও তাঁহার জীবনের মধ্য দিয়া না দেখিলে বেদ বেদান্ত বুঝিবার কাহারও শক্তি নাই। অর্থাৎ, এই যে সকল স্থলে দৃষ্টিতে বিসম্বাদী শাস্ত্রোক্তি অধিকারী বিশেষে উপদিষ্ট ও ক্রমবিকাশের প্রণালীতে নির্দিষ্ট, ইহা শ্রীভগবানই প্রথমে নিজের জীবনে প্রকাশ ও উপদেশ করেন এবং সমস্ত জগৎ বিবাদ বিসম্বাদ ভুলিয়া ধর্ম ও অন্যান্য বিষয়ে যে ভ্রাতৃভাবে নিবদ্ধ হইবে, তাহা এই কেন্দ্র হইতেই ক্রমশ দূরবিসর্পী প্রভাবচক্রবাল দ্বারা অনুমিত হইতেছে।

অর্থাৎ বেদাদি শাস্ত্র এতদিন অজ্ঞানান্ধকারে লুপ্ত ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণরূপ প্রদীপ উহাকে পুনঃপ্রকাশিত করিল।

৭। অতএব স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, নূতন শাস্ত্র অনাবশ্যক। প্রাচীন অনাদি শাস্ত্র হইতে নূতন আলোক আসিতেছে; শ্রীরামকৃষ্ণরূপ অনুবীক্ষণের মধ্য দিয়া এই শাস্ত্রের মর্ম সংগ্রহ করিতে হইবে।

৮। ঠাকুরের উক্তিসকল উত্তররূপে সংগৃহীত ও যে সকল সেবক ঠাকুরের নিকট সর্বদা থাকিতেন তাঁহাদের দ্বারা পরিগৃহীত হইলে বেদের টীকারূপে পূজিত হইবে।

৯। ঠাকুরের ভাবের অনুকূল বেদার্থ করিতে হইবে। সর্বাপেক্ষা এই ভাব যেন সর্বদা মনে থাকে যে, তাঁহার সমস্ত উপদেশই জগতের হিতের জন্য। যদি কেহ কখনো কোন অহিতকর বাক্য শুনিয়া থাকেন তাহা হইলে বুঝা উচিত যে, সে বাক্য অধিকারী বিশেষে প্রযুক্ত এবং অন্য লোকে পালন করিলে অকল্যাণকর হইলেও সেই অধিকারীর জন্য মঙ্গল-প্রদ।

১০। ঐ প্রকার ঠাকুরের সমস্ত উক্তির মধ্যে ব্যক্তিবিশেষে উপদিষ্ট ও সার্বজনিক কল্যাণের জন্য উপদিষ্ট উক্তি বাছিয়া লইতে হইবে। তন্মধ্যে সার্বজনিক-কল্যাণ-প্রযুক্ত উপদেশসমূহই পুস্তকাকারে সংগৃহীত হইবে ও জনসাধারণে প্রচারিত হইবে।

১১। অধিকারীবিশেষে উপদিষ্ট উপদেশ সকলও সংগৃহীত হইয়া গোপনভাবে মঠে পরিরক্ষিত হইবে—যাহা দ্বারা মঠের প্রচারকগণ ব্যক্তিবিশেষে বিশেষ উপদেশ প্রদানে শিক্ষিত হইবেন।

১২। প্রভুর নিজের মুখের একটি উপদেশ এই যে, যাহারা বহুরূপী একবার দর্শন করিয়াছে তাহারা বহুরূপীর একটিমাত্র রংই জানে। কিন্তু যাহারা বৃক্ষের তলায়

বাস করিয়াছে তাহারা বহুরূপীর সকল বর্ণই জ্ঞাত থাকে। এইজন্য যাঁহারা প্রভুর নিকটে সর্বদা বাস করিতেন ও যাঁহাদিগকে তিনি স্বীয় কার্যসাধনের জন্য পালন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের সম্মতি ব্যতিরিক্ত কোন উক্তিই প্রামাণিক বলিয়া গৃহীত হইবে না।

১৩। জ্ঞান, যোগ, ভক্তি ও কর্মের পরাকাষ্ঠা সমষ্টিস্বরূপে এরূপ অপূর্ব পুরুষ আর মানব জাতির মধ্যে কখনই সমুদিত হন নাই। ঐ প্রকার সর্বাঙ্গসুন্দর যাঁহার চরিত্র, তিনিই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের যথার্থ শিষ্য ও অনুগামী।

১৪। ঐ প্রকার সর্বাঙ্গসুন্দর চরিত্র গঠনই এই যুগের উদ্দেশ্য ও তাহার জন্যই সকলের প্রাণপণ চেষ্টা করা কর্তব্য।

সাধন প্রণালী।

১। শ্রীভগবান ব্যক্তিবিশেষে বিভিন্ন সাধন শিক্ষা দিতেন। এইজন্য সাধন প্রণালীর কোন সার্বজনীন নিয়ম হইতে পারে না।
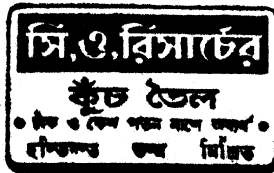
২। তবে লোকসাধারণের জন্য কিঞ্চিৎ ভক্তি, ভজন ও কর্মপরিণতজ্ঞান (practical Advaitism—"অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা ইচ্ছা তাই কর") শিক্ষা দিলেই যথেষ্ট হইবে।

৩। প্রভুর প্রদর্শিত সমুদয় সাধন প্রণালী পূর্বোক্ত প্রকারে সংগৃহীত হইয়া গোপনভাবে মঠে পরিরক্ষিত হইবে এবং শিক্ষকদিগের শিক্ষার জন্য থাকিবে, কারণ ব্যক্তিবিশেষের উপদিষ্ট সাধন অপর ব্যক্তির অনিষ্টকারকও হইতে পারে।

৪। জ্ঞান, ভক্তি, যোগ ও কর্মের সমবায়ে চরিত্র গঠিত করা এই মঠের উদ্দেশ্য এবং তন্নিমিত্ত যে সকল সাধন প্রয়োজন সেই সকল সাধনই এই মঠের সাধন বলিয়া পরিগৃহীত হইবে।

৫। অতএব সকলেরই মনে রাখা উচিত যে, এই সকল অঙ্গের যিনি একটিতেও ন্যূনতা প্রদর্শন করেন, তাঁহার চরিত্র রামকৃষ্ণরূপে সুষায় প্রকৃষ্টরূপে দ্রুত হয় নাই।

৬। আরও ইহা মনে রাখা উচিত যে, নিজের মুক্তিসাধনের জন্য মাত্র যিনি চেষ্টা করেন, তদপেক্ষা যিনি অপরের কল্যাণের জন্য চেষ্টা করেন তিনি মহত্তর কার্য করেন।

৭। এই শিক্ষার জন্য প্রথমত এই মঠ চতুর্বিভাগে বিভক্ত হইবে। যথা—জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম ও যোগ। এবং প্রত্যেক বিভাগেই ঐ বিভাগের শিক্ষিতব্য বিষয়ের উপদেশের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিগণ উপদেষ্টারূপে নিযুক্ত থাকিবেন।

৮। প্রত্যেক বিভাগেই ঐ বিভাগের শিক্ষিতব্য বিষয়ের উপযোগী পুস্তকাদি পাঠ হইবে ও অনুভূতির নিমিত্ত সাধন শিক্ষিত হইবে।

৯। কিন্তু সকল বিভাগেরই অঙ্গদিগকে কিছু না কিছু কর্মবিভাগের কার্য করিতে হইবে।

১০। "শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্"। অতএব শরীর রক্ষার প্রতি সর্বদা দৃষ্টি রাখিতে হইবে। তবে কোন মহদুদ্দেশ্য সাধনে যদি শরীর পাত হয়, পরমকল্যাণ বুঝিতে হইবে।

১১। গীতাদি শাস্ত্র এবং শ্রীভগবান স্বয়ংও বৃথা কঠোর তপস্যার প্রতিপক্ষ ছিলেন। অতএব তাহা পরিত্যাগ করিতে হইবে। কিন্তু যে সকল তপস্যা শারীরিক কিঞ্চিৎ ক্লেশকর হইলেও বিশেষ কল্যাণকর, সকলেরই ঐ সকল তপস্যা অভ্যাস করা আবশ্যক; নতুবা বিলাসিতা প্রবেশ করিয়া সর্বনাশ করিবে।

১২। আমাদের উদ্দেশ্য বিলাসিতাও নহে, তপস্যাও নহে, অথবা যোগও নহে; উদ্দেশ্য—ভববন্ধন ছেদন, জ্ঞানলাভ বা ভক্তিলাভ।

১৩। অতএব যে কোন উপায় দ্বারা এই উদ্দেশ্য সাধিত হইবে, আমরা মহাসমাদরে তাহাই গ্রহণ করিব।

১৪। শ্রীভগবান এখনও রামকৃষ্ণশরীর ত্যাগ করেন নাই। কেহ কেহ এখনও তাঁহাকে সেই শরীরে দেখিয়া থাকেন ও উপদেশ পাইয়া থাকেন এবং সকলেই ইচ্ছা করিলে দেখিতে পাইতে পারেন। যতদিন তিনি পুনর্বার স্থূলে শরীরে আগমন না করিতেছেন ততদিন তাঁহার এই শরীর থাকিবে। সকলের প্রত্যক্ষ না হইলেও তিনি যে এই সঙ্ঘের মধ্যে থাকিয়া এই সঙ্ঘকে পরিচালিত করিতেছেন ইহা সকলেরই প্রত্যক্ষ; তাহা না হইলে এই নগণ্য, অত্যল্পসংখ্যক অসহায় পরিতাড়িত বালকদিগের দ্বারা এতাদৃশ স্বল্পকালের মধ্যে সমগ্র ভূমণ্ডলে এত আন্দোলন কখনই সংঘটিত হইত না।

১৫। অতএব এই সঙ্ঘের মধ্যে যদি কেহ শ্রীভগবানের উপদেশের অবিসম্বাদী কোন নূতন প্রণালী উদ্ভাবন করেন এবং তাহার সুফল যদি প্রত্যক্ষ হয়, তাহা হইলে উহাও শ্রীভগবানের আদেশরূপে গৃহীত, আদৃত ও পালিত হইবে।

১৬। শ্রীভগবান কামিনীকাঞ্চনের ন্যায় আর কোন ভাবকে যদি বারম্বার ত্যাগ করিতে আদেশ করিয়া থাকেন তাহা এই যে, ঈশ্বরের অনন্ত-ভাবকে ইতিউতি করিয়া সীমাবদ্ধ করা।

১৭। যে কেহ ঐ প্রকারে শ্রীভগবানের অনন্ত-ভাবকে সীমাবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিবে সে নরাধম তাঁহার দ্বেষী।

১৮। সংকীর্ণ সমাজে ধর্মের গভীরতা ও প্রবলতা থাকে, ক্ষীণবপু জলধারা সমধিক বেগশালিনী। উদার সমাজে ভাবের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে গভীরতা ও বেগের নাশ দেখিতে পাওয়া যায়।

১৯। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, সমস্ত ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত উল্লংঘন করিয়া এই রামকৃষ্ণশরীরে সমুদ্র হইতেও গভীর ও আকাশ হইতেও বিস্তৃত ভাবরাশির একত্র সমাবেশ হইয়াছে।

২০। ইহার দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে, অতি বিশালতা, অতি উদারতা ও মহাপ্রবলতা একাধারে সন্নিবিষ্ট হইতে পারে এবং ঐ প্রকারে সমাজও গঠিত হইতে পারে। কারণ, ব্যষ্টির সমষ্টির নামই সমাজ।

এই সকল নিয়মের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে স্বামীজীর মনের ভাব ও মঠের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাঁহারা ধারণা অতি স্পষ্টভাবেই প্রকাশ পাইয়াছে। দেশবাসী যাহাতে এই মঠ স্থাপনের উদ্দেশ্যটি সঠিকভাবে বুঝিতে পারেন, সেই জন্য এইগুলি উধৃত করা হইল। অপর নিয়মগুলি সংক্ষেপে পরে দেওয়া হইবে।

॥ ১২ ॥

ঠিক ঘুম নয়, কেমন এক ঘন তন্দ্রা এসেছিল এবং সেই আচ্ছন্নতার মধ্যে বাসনা আচমকা যেন অনুভব করছিল, করতে পারছিল সাংঘাতিক এক ঝড় উঠেছে। সোঁ সোঁ হাওয়া, গুমোট কালো আকাশ, গাছ লুটোচ্ছে, পাতা উড়ছে। সমানে একটানা বয়ে চলেছে। কী দুরন্ত আর তীব্র! বাসনা সেই ঝড়ো হাওয়ায় আর অন্ধকারে কেমন করে যেন এসে পড়েছিল। না কি, সেই হাওয়াই এসে পড়েছে বিস্তীর্ণ ব্যবধান পলকে পেরিয়ে, ডিঙিয়ে; আর এখন বাসনাকে তুলে নিয়েছে। খুঁট বাঁধা মশারি কী কাপড় হাওয়ার বেগে যেমন উড়ে যাই যাই করেও কোনোরকমে আটকে থাকে, বাসনাও যেন সেই সাংঘাতিক বাতাসের টানে ভেসে যেতে যেতে কোথাও আলগা ভাবে বাঁধা রয়েছে। এই অনুভূতি তার স্নায়ু এবং শিরায় শিরায় আশ্চর্য এক অসহায়তা ছড়িয়ে দিয়েছে। এবং সেই দুরন্ত আকর্ষণ ওকে অবশ করছিল, ভয়ে বুকের স্পন্দনও বুঝি স্তব্ধ করে দিতে চাইছিল।

আমি বুঝি ভেসেই যাবো, উড়েই যাবো এই হাওয়ার টানে! হাত বাড়িয়ে ধরার একটা অবলম্বন খুঁজছিল বাসনা ব্যাকুল হয়ে। কিছু নেই, কিছুই না। পা দুটোকে শক্ত আর আঁট করে বাসনা বিছানার মধ্যে চেপে রাখলে। আর হাওয়ার হু হু টানে ওর গা, হাত, মুখ ক্রমশই ভেসে যাই যাই করছিল।

হঠাৎ, হঠাতই হাত বাড়িয়ে এই শেষ সময় কী যেন ধরে ফেলতে পারল বাসনা। একটা হাতই বোধ হয়। কার?

চোখ মেলে চাইল এবার। কপাল-গলা ভিজে উঠেছে। কেবিনের মিটমিটে বাতিটা ম্লান চোখে জ্বলছে। মাথার দিকে জানলা হাওয়ায় একটু শব্দ তুলল। কেবিনের সাদা পর্দাটা যেন ঠায় দাঁড়িয়ে আছে, দরজাটা ভেজান। রাত বেড়েছে। আশ্চর্য নিস্তব্ধ সব।

গাল গলা মুছে আস্তে আস্তে ভয়ে ভয়ে এদিক ওদিক তাকাল বাসনা। কেউ নেই।

এখন যদি কাউকে কাছে ডাকার অধিকার থাকত, বা ডাকা চলত, বাসনা অমলেন্দুকেই ডাকত। ওর কথাই শুধু মনে পড়ছে।

অমলেন্দুকে ডাকত এবং ডেকে বলত, হ্যাঁ, বলত বৈকি—এখানে এসে বসো। আমার মাথার কাছে। একটু সরে যাও বিছানার নিচের দিকে। তোমার মুখ, তোমার চোখ, তোমার গলা, বুক, হাত—সব যেন আমি দেখতে পাই।

আর শোনো। আমার যা বলার আছে তুমি শোনো। তোমায় শোনান উচিত। আমার কথা অনেক—সারা বিকেল এবং সন্ধ্যে ধরে এইসব কথা আমি ভেবে ভেবে ঠিক করেছি তোমায় বলবো বলে। কমলাদের মুখ থেকে এই বৃত্তান্ত জানার পর—আমি যেন এক জন্ম থেকে অন্য জন্মে এসে দাঁড়িয়েছি। কিংবা বলতে পার আমি আকাশ থেকে মাটিতে ছিটকে পড়েছি।

চাদরটা বুক থেকে উঠিয়ে গলা পর্যন্ত টেনে নিল বাসনা। বালিশের পাশ দিয়ে হাত এলিয়ে দিল। একটুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে তাকিয়ে একটা পোকা দেখল। বাতির কাছে ফুর ফুর করে উড়ছে—দেওয়ালের গায়ে ছিটকে পড়ছে আবার।

এই পতঙ্গের মতন, বাসনা মনে মনে তার সারা বিকেল-সন্ধ্যের জমানো কথা

ভেবে ভেবে এবার বলছিল, অমলেন্দুকে উদ্দেশ করেই, ওই পতঙ্গের মতন তুমি আমার আলোর সীমানায় বার বার এসেছো, অমলেন্দু। বার বার। এবং ঈশ্বর জানেন, আমি তোমায় কোনো প্রলোভন দেখাই নি। হাতছানি দিয়ে ডাকিনি, ইশারায় কাছে টানি নি, টানতে চাই নি। বরং তুমি, হ্যাঁ তুমি নিজেই, স্বেচ্ছায়, তুমিই জানো কী আকর্ষণে আমার চোখের সামনে ছুটে ছুটে এসেছ। তুমি কথা বলতে, গল্প করতে চাইতে, হাসতে, আমায় হাসাতে চাইতে। আমি বুঝেছিলাম, কারণ বোঝা সহজই ছিল, আমার ওপর তোমার এই লোভ কিসের এবং কেন।

আমি ভেবেছিলাম, ভাবা নিশ্চয় অন্যায় হয়নি যে, তুমি অন্তত সেই সৎ পুরুষদের অন্যতম নও যারা পরস্ত্রীর পায়ের ওপরে আর চোখ তোলে না।

বলতে আমার সঙ্কোচ নেই, তোমাকে আমি অবিশ্বাস করতাম। এবং ঘৃণাও। ঘরে সাপ আছে জানলে নিশুতি রাতে কী অন্ধকারে বা আনমনা থাকলে সেই ঘরের একটি দড়ির স্পর্শেও মানুষ আঁৎকে ওঠে। তেমনি, তোমায় আমি ভীষণ সন্দেহ করতাম, তেমন কারণ তুমি ঘটিয়েছিলে তোমার আচার-আচরণে, আর তাই আমার, আমার কোনো এক অবস্থায় একটা সন্দেহকেও ধীরে ধীরে বিশ্বাস করে নিতে আমার বাধেনি। যদি সে-দিন অতো রাত্রে তোমার সঙ্গে দেখা না হতো, তুমি নিজের থেকে ওষুধ এনে না দিতে, আর সেই ওষুধ খেয়ে আমি মরার মতন না ঘুমোতাম, দরজা খোলা না থাকত, তবে এমন ভুল আমি করতাম না। করবার কারণ থাকত না।

ভুল আমি করেছি। এতো বড় ভুল মানুষে বুঝে করে না, এমন মারাত্মক ভুল। কিন্তু তখন, তেমন অবস্থায় পড়লে এবং আমার যে রকম মনোভাব ছিল তোমার সম্পর্কে তাতে এই ভুল করা আশ্চর্যের নয়। তবু, ভাবলে আমি আশ্চর্যই হচ্ছি।

কেন যে এমন হলো!

বাসনা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে। বাইরে কোথায় কে কেঁদে উঠেছিল, সেই কান্নার অস্পষ্ট একটু গোঙানি কেবিনের স্তব্ধতায় একটা ভয় ছিটিয়ে গেল।

চুপ! পাশ ফিরল আবার বাসনা। বালিশে মুখের একটা পাশ গুঁজে নিয়ে চোখ বন্ধ করে পড়ে থাকল।

ঘুম আসছিল না। মাথাটা ঠাস ধরে গেছে। ভাবতেও আর ভাল লাগছে না। তবু ছেঁড়া খোঁড়া অজস্র ভাবনা ধোঁয়ার শিখার মতন ভেসে ভেসে উঠছে।

অমলেন্দুর কথা যতোই ভাবছে ততই এবার নিজের ওপর, নিজের সম্পর্কে বিরক্তি জমছে। বিশ্রী লাগছিল বাসনার। বলতে কি, যতোই যুক্তি সাজাও, নিজেকে সমর্থন করো—তবু, বাসনা স্পষ্টই বুঝতে পারছিল, অমলেন্দুকে যা ভাবা গিয়েছিল সে তা নয়।

অনুশোচনা হচ্ছিল বাসনার—তার মূর্খতা এবং এই মারাত্মক ভুলের জের টেনে যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে ও তার কথা ভেবে ভেবে এবং অমলেন্দুকে অকারণেই এতোটা চুনকালি মাখিয়েছে মনে মনে কেন তাই ভাবতে বসে।

আমি খুবই অন্যায় করেছিঃ বাসনা বলছিল নিজেকেই এবং প্রশ্ন করছিল, কিন্তু কেন, কেন আমি এসব ভাবলাম, এতো করলাম? কি দরকার ছিল?

আর অতো নিস্তব্ধ রাত্রে, একা, হাসপাতালের এই অনাত্মীয়, নিঃঝুম ঘরে, মৃদু আলোর মধ্যে বাসনা হঠাৎ যেন নিজেকে নিজের কথার উত্তর দিতে শুনে চমকে উঠল।

সেই উত্তরটা মুখ দিয়ে শব্দ হয়ে ফুটছিল না। বা মনের মধ্যে সাজানো কথা নিঃশব্দে লেখার মতন কথা বলছিল না। সমস্ত শরীর এবং মনে আশ্চর্য এবং অব্যক্ত এক ব্যর্থতা গুমরে গুমরে কাঁদছিল। যে কান্না অত্যন্ত অস্পষ্টভাবে তার চেতনায় সাপ-চলার মতন শির শির করে এই অনুভূতি জাগাচ্ছিল যে, হয়তো তার এ-ভুল এমনভাবে মিথ্যে না হয়ে গেলেও সে খুশী হতো।

আমি কি তাই চেয়েছিলাম? বাসনা ভাববার চেষ্টা করছিল বিহ্বল হয়ে। তার বুক কাঁপছিল, একটা ব্যথা যেন হাত বাড়িয়ে হৃদপিণ্ডটাকে মুচড়ে ধরার চেষ্টা করছিল। আর বাসনা ভয়ানক রকম ভয় পেয়ে চোখ বন্ধ করে চাদরে মাথা পর্যন্ত ঢাকা তুলে নিয়ে কাঠ হয়ে পড়েছিল।

অমলেন্দু এল। পরের দিনই। ভিজিটিং আওয়ার্সের ঘণ্টা পড়েছে সবে।

বাসনা শুয়েছিল। কনুই মোড়া হাতের ওপর মাথা রেখে, পাশ ফিরে। ছায়া ছমছম ঘর। ঠাণ্ডা। লাইজলের গন্ধ উঠছিল।

কেবিনের পর্দাটা একটু কেঁপে গেল। একটা পাশ সরে উঁকি দিল মুখ। তারপর নিঃসাড়েই অমলেন্দু মাথার কাছটিতে এসে দাঁড়াল।

দেশলাই-কাঠির মতন ফস্ করে একবার জ্বলে উঠেই চোখ মুখ যেন নিভে ছাই কালো হয়ে গেল বাসনার।

অমলেন্দুর চোখে চোখে তাকাতে পর্যন্ত পারছিল না বাসনা। দেওয়ালে চোখ রেখে চুপ করে, ঠোঁট জুড়ে নিস্পন্দ হয়ে পড়ে থাকল।

অমলেন্দু দেখছিল। ফ্যাকাশে, ক্লান্ত, ম্লান একটি মুখ। শুকনো ফুলের মতন নিষ্প্রাণ। কপালের ওপর রুক্ষ কিছু
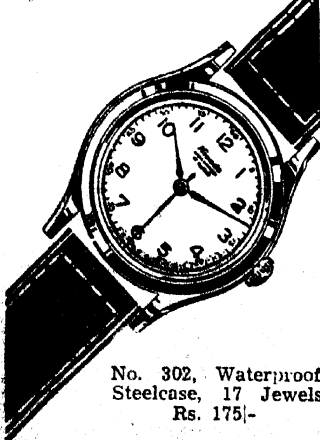
চুল জড়িয়ে রয়েছে। গলার সেই নীল শিরাটা সুতোর মতন চিবুক পর্যন্ত উঠে এসে হারিয়ে গেছে কোথায় যেন। চোখ ভরা ঘুম না বেদনা—ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না।

আস্তে করে হাত বাড়িয়ে কপালে রাখল একটু অমলেন্দু। একটু যেন জ্বর জ্বর লাগছে না। চুলগুলো সরিয়ে দিতে দিতে বললে খুব মৃদু নরম গলায়, 'জ্বর রয়েছে দেখছি।'

টুলটা একটু পাশ করে নিয়ে বসল অমলেন্দু।

বাসনা চুপ। যদিও এই স্পর্শ ভাল লাগছিল—কিন্তু ভয়ও হচ্ছিল, যদি কমলারা কেউ এসে পড়ে এখন, তবে? কিন্তু কিছু বলতে পারছিল না বাসনা; বাধা দিতেও না।

'কাল সন্ধ্যেবেলায় ও-বাড়ি গিয়ে দেখি কেউ নেই। শুনলাম, হাসপাতালে সব। তোমার কথাও বললে ঠাকুরটা। কিন্তু কোন্ হাসপাতালে আছো তা জানে না।' অমলেন্দু নিজে থেকেই হাতটা সরিয়ে নিলে কপালটা পরিষ্কার করে দিয়ে, 'শুনে পর্যন্ত এমন অস্থির হয়ে উঠেছিলাম। কিন্তু কি করবো, কোথায়, কোন্ হাসপাতালে আছো তা কেমন করে খুঁজে বের করি। উপায় ছিল না আমার চুপচাপ বসে থাকা ছাড়া। শেষে কমলা বৌদিরা ফিরলে সুধাদার মুখে সব শুনলাম।' অমলেন্দু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল।

একটু চুপ।

'ওরা এলো না!' এতোক্ষণে বাসনা কথা বললে খুব সাধারণ একটা ভূমিকা করে।

'আসবে নিশ্চয়। সুধাদা অফিস থেকে তাড়াতাড়ি ফিরে ওদের নিয়ে আসবেন।'

'তুমি কি কলেজ থেকেই সটান আসছো?' বাসনা সহজ হবার চেষ্টা করছিল।

'না, কলেজ যাই নি আজ।'

'যাও নি! কেন?' বাসনা তাকাল। যদিও অমলেন্দুর কলেজ না-যাওয়ার কারণ বুঝতে তিলমাত্র দেরি হয়নি।

সে-কথার কোনো জবাব না দিয়ে অমলেন্দু বললে, 'আমার ভাগ্যটা খুবই মন্দ দেখছি।' বলে বিষণ্ণ হাসি হাসল একটু।

বাসনা দেখল সেই বিষণ্ণ হাসিটুকু। কষ্টই হচ্ছিল তার। কি ভেবে সামান্য পরে জবাব দিল, হাসবার চেষ্টা করে, 'আমারই বা কী এমন ভাল ভাগ্য! এ-সব ছোঁয়ায় হয়। বড্ড ছোঁয়াচে লোকের কপালের সঙ্গে তোমার কপাল জড়িয়েছে।'

'তাই নাকি?' অমলেন্দু একটু গম্ভীর হয়ে চুপ করে গেল। খানিক পরে বললে, 'এমন একটা রোগ বাঁধালে শুধু নিজের শরীরের ওপর অগ্রাহ্য করে।' একটু থামল, 'অবশ্য রোগের কথা বলা যায় না কিছুই, তবু—তুমি ভীষণ অযত্ন আর অগ্রাহ্য কর শরীরটাকে। আজ পাঁচ মাস ধরে রোগটা পুষে পুষে বাড়ালে, একবারও তো মানুষের সন্দেহ হয়, ভাবনা হয়, ভয় হয়।' ক্ষোভে গলার স্বর ভার আর চাপা শোনাচ্ছিল।

সন্দেহ, ভাবনা, ভয়? বাসনার কানে শব্দগুলো যেন তীরের মতন গেঁথে যাচ্ছিল।

সন্দেহ, ভাবনা, ভয়—আমি যে না করেছি এ তুমি কি করে জানলে অমলেন্দু? বাসনা মনে মনে বলছিল কাতর হয়ে, পাঁচ মাস ধরে প্রতিদিন কী ভীষণ সন্দেহ আর ভাবনায় আর ভয়ে আমার দিন কেটেছে তা তুমি জানো না। কল্পনাও করতে পারবে না। সন্দেহ, ভাবনা এবং ভয়—আমার সব ছিল—কিন্তু আমি যে অন্য কিছু ভেবেছিলাম। তাই কাউকে কিছুই বলতে পারি নি, লুকিয়েই রাখতে হয়েছে। তোমায় কি বলবো সে-কথা? শুনবে?

বাসনা অমলেন্দুর মুখটা এবার ভাল করে দেখছিল। দুশ্চিন্তায়, দুর্ভাবনায় গুমোট হয়ে রয়েছে। কাল সারারাত বোধ হয় ঘুমোতে পর্যন্ত পারে নি, ছটফট করেছে। এখন তো বাসনা ওরই স্ত্রী। স্ত্রী সম্পর্কে উদ্বিগ্ন যদি হয় অমলেন্দু বাসনা কি-ই বা করতে পারে।

বাসনার জন্যে এই যে একটা লোক সারারাত না ঘুমিয়ে দুশ্চিন্তায় দুর্ভাবনায় ছটফট করেছে—কথাটা ভাবতে ভালই লাগছিল বাসনার। আরও ভাল লাগছিল মনে করতে যে, অমলেন্দু বাসনার সম্পর্কে একটা দায়িত্বের মনোভাব নিয়ে এখন সব কথা ভাবছে এবং ভাববে।

'আমাকেও তো অন্তত একবার বলতে পারতে!' অমলেন্দু বলছিল। বাসনা হঠাৎ কথার শব্দে আবার সজাগ হয়ে কথা শুনতে লাগল, 'এখন অবস্থাটা কেমন দাঁড়াল দেখতেই পারছ। হাত-পা আমার বাঁধা। কিছু করার উপায় নেই। এমন কি, রোজ এসে দেখা করারও।'

'তা কেন—!' জবাবে খানিক অপেক্ষা করে বলল বাসনা, 'তুমি রোজই এসো।'

'আমার তাই ইচ্ছে, তুমি এখন আপত্তি না করলেই হয়।'

'আপত্তি কি!' বাসনা ঘাড় সরিয়ে একটু কাৎ হয়ে শুল।

'তোমার যে কখন কিসে আপত্তি ওঠে বলা যায় না।' সম্ভবত একটু বিরক্ত হয়েই অমলেন্দু বলছিল, 'আমি বুঝি না, বুঝতেই পারি না।' একটু থেমে বাসনার চোখে চোখ রেখে আস্তে করে বললে অমলেন্দু আবার, 'সুধাদাকে আলাদা করে বলবো কথাটা।'

বাসনা চমকে উঠল যেন। তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বললে, 'পাগল নাকি, এখন, এ-অবস্থায়?'

'এ অবস্থায় নয় তো কখন?' অমলেন্দুর মুখ আরও গম্ভীর হয়ে গেল, আরও বিষণ্ণ।

'সেরে উঠি, তারপর।' বাসনা সহজ গলায় বলছিল।

'সেরে উঠে বাড়ি ফিরে যাবে, স্বাস্থ্যটা আবার ভাল হবে—ক'মাস আরও যাক এভাবে, তারপর। তা হ'লে এই বিয়ের কি দরকার ছিল? আমার করবারই বা কি থাকল!' অধৈর্য হয়ে কথা বলছিল অমলেন্দু। এবং বেশ অভিমান করেই।

বাসনার একটুও কষ্ট হল না এই অভিমানের সুর চিনে নিতে। অদ্ভুত লাগছিল তার। বুকটা কেমন এক আবেগে কনকন করছিল।

দু'জনেই চুপচাপ। অমলেন্দু অন্য দিকে তাকিয়ে।

বাসনা পর্দার দিকে একবার চেয়ে নিয়ে আস্তে করে হাত বাড়াল। অমলেন্দুর হাতটা টেনে নিলে বুকের ওপর। খুব ভাল লাগছিল। মুখ দিয়ে কথা ফুটছিল না। চোখে জল আসছিল।

'যদি মরে যাই তা হলে কথা নেই।' খানিক পরে চাপা, ভেজা গলায় ধীরে ধীরে বললে বাসনা। বলে একটু হাসলে। অপেক্ষা করল। আবার বলছিল দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে, 'যদি সেরে উঠি, তোমায় আর ভোগাব না। আমিই বলবো সব। স্বীকার করবো। আর আমার লজ্জা-সঙ্কোচ থাকবে না।'

অমলেন্দু কথা বললে না। চুপ করেই থাকল।

বাসনা ভাবছিল। ভাবছিল, এই অমলেন্দুকে সে আজ অন্য চোখে দেখছে। বড্ড কষ্ট হচ্ছে ওর জন্যে। ওর কথা শুনে। আগে যা হতো না। হয়নি।

'তোমায় একটা কথা আমার বলা উচিত।' হঠাৎ কেমন এক আবেগের মধ্যে বলে ফেলল বাসনা। এবং বলেই একটু সতর্ক হয়ে উঠল।

'কি?' অমলেন্দু তাকাল।

'বলবো?'

'বলো।'

'আজই, এখুনি নয়।' অমলেন্দুর হাত ছেড়ে দিল বাসনা, 'সে অনেক কথা। এতো অল্প সময়ে কুলোবে না। কমলারা এসে পড়বে এখুনি। অন্য একদিন—যেদিন সময় পাবো, কেউ আসবে না। কাল পরশু—যে কোনো একদিন।'

বাসনার কথা ফুরোয় নি—কেবিনের পর্দা সরে কমলার মুখ ভেসে উঠল।

(ক্রমশ)

অগুরু

নলিনীকান্ত চক্রবর্তী

অগুরুর ব্যবহার আমাদের দেশে অতি প্রাচীনকালে থেকে হয়ে আসছে। এর খ্যাতি আমাদের দেশ ছাড়িয়ে নানা দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। সেকালে আরব, পারস্য, গ্রীস প্রভৃতি দেশে ভারতবর্ষ হতে প্রচুর অগুরু পাঠানো হত। এখনো বিদেশের বাজারের চাহিদা মেটাতে আমাদের দেশ থেকে প্রচুর অগুরু রপ্তানি হয়।

আমাদের দেশের প্রাচীন গ্রন্থাদিতে অগুরুর ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায়। মহাভারতের সভাপর্বে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে কিরাত রাজার অন্যান্য জিনিসের সাথে অগুরু নিয়ে যাওয়ার বিষয় লেখা আছে।

চন্দনাগুরু কাষ্ঠানাং ভারানকালীয় কস্য চ
চর্ম বত্ন সুবর্ণানাং গন্ধনাশ্চৈব রাশয়।
—মহাভারত সভাপর্ব ৫২ অঃ ১০ম শ্লোক

এ হতে আমরা জানতে পারি মহাভারতের কিরাত দেশ অগুরুর জন্য বিখ্যাত ছিল। আসাম প্রদেশে অগুরু উৎপন্ন হওয়ার কথা মহাকবি কালিদাসেরও জানা ছিল। তাঁর রঘুবংশ কাব্যে রঘুর দিগ্বিজয় বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন ঃ

চকম্পেতীর্ণ লৌহিত্যে তস্মিন্
প্রাগ্‌জ্যোতিষেশ্বরঃ।
তদ্ গজা লা নতাং প্রাপ্তৈঃ
সহকালাগুরুদ্রুমৈঃ॥
—রঘুবংশ ৪র্থ সর্গ।

বৈষ্ণবপদাবলী গ্রন্থসমূহে "অগুরু চন্দন চুয়াকে" নিত্য ভোগ্য বস্তুর মধ্যে ধরা হয়েছে। এই সকল পদাবলীতে বারংবার অগুরুর উল্লেখ আছে।

অগুরু বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন নামে পরিচিত। অগুরুকে ইংরেজীতে Aloe Wood বা Eagle Wood বলা হয়। বাংলায় বলে আগর। সংস্কৃত অগুরু, আসামী ভাষায় শশী, হিন্দীতে আগর, তামিলে আগ্‌লি চন্দন, তেলেগুতে অগুই, মালায়ালাম ভাষায় অগুরু এবং ব্রহ্মদেশে আকান নামে ইহা পরিচিত।

হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে, ভুটানে, আসামের নওগাঁও, শিবসাগর, কাছাড়, দরং, কামরূপ জেলায়, খাসিয়া পাহাড়ের ৩০০০ ফিট উঁচু পর্যন্ত, ত্রিপুরা রাজ্যে, পূর্ব পাকিস্থানের সিলেট জেলায় এবং ব্রহ্মদেশের দক্ষিণ টেনাসেরিন ও মারগুই দ্বীপপুঞ্জে প্রচুর অগুরু পাওয়া যায়। এখানে আরেকটি কথা উল্লেখযোগ্য। প্রবাদ এই যে, ত্রিপুরা রাজ্যের বর্তমান রাজধানী আগরতলা আগর বন কেটে স্থাপন করা হয়েছে, এ সম্বন্ধে মতদ্বৈধতা থাকলেও এ প্রবাদম্বারা এ রাজ্যে আগর (অগুরু) গাছের আধিক্য বুঝায়। বর্তমানে এই রাজ্যের ধর্মনগর বিভাগে প্রচুর আগর গাছ জন্মায়।

অগুরু গাছ (Aquileria Agallocha Roxb.) থাইমেলেসি (Thymalaceae) গোত্রের অন্তর্গত। চির সবুজ পত্রাচ্ছাদিত প্রায় ৩০-৪০ ফুট লম্বা এই গাছ। এর কাঁচ ডাল পালা রেশমের মত চক্‌চকে। ছাল পাত্‌লা ও খস্‌খসে। ভিতরের ছাল পাট করলে পার্চমেণ্ট কাগজের মত হয়। প্রাচীন আসাম দেশীয় রাজারা ইহাতে লিখতেন। পাতা গাছের গুঁড়ির দুই ভাগে একান্তর (alternate) ভাবে জন্মায়। পাতা ২—৪ ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা, পাত্‌লা, উজ্জ্বল চামড়ার মত, আগা সরু ও অস্পষ্ট সমান্তরাল শিরাবিন্যাস বিশিষ্ট। জুন মাসে গাছে ফুল হয়। সবুজ আভাযুক্ত সাদা রঙের ছোট ছোট ফুল মঞ্জরীদণ্ডের (peduncle) উপর এমনভাবে সাজানো থাকে যে পুষ্পবিন্যাসটিকে (inflorescence) ছাতার মত দেখায়। পুষ্পপুট (perianth) অবনত ও বাহিরের দিগে রোমযুক্ত, পুংদণ্ডের (filament) আগা লাল্‌চে রঙের। আগস্ট মাসে ইহার ফল হয়, ফল ১½—২ ইঞ্চি লম্বা হয়। বহির্বাস ফলে লেগে থাকে এবং ফল মখমলের মত নরম হয়।

অগুরুর কাঠ সাদা রঙের। এই কাঠের ভিতর মাঝে মাঝে নানা আকারের খণ্ড খণ্ড সার জন্মায়। এই সার অনেক জায়গায় কাঠের সংগে জড়িয়ে থাকে, আবার কোথাও কাঠ হতে আলাদাভাবে পিণ্ডের আকারে থাকে। সার কাল রঙের ও সুগন্ধিযুক্ত হয়। কোন্ গাছে অগুরু হয়েছে তা বিশেষজ্ঞ ছাড়া বুঝতে পারে না। সাধারণত যে গাছে অগুরু হয় তাতে কাল রঙের একজাতীয় পিঁপড়ে থাকে এবং সেই গাছ হতে মধুর মত গন্ধ বের হয়। এই পিঁপড়েরা অগুরু বিষয়ক পরিজ্ঞানের একটি বিশেষ সহায়।

অগুরু গাছের সুগন্ধ নিজস্ব নয়। একরকম পরভোজী ছত্রাক (fungus) এই অগুরুর কাঠে বাসা বাঁধে। অগুরুর গাছ থেকে ওরা খাবার নেয়। এর পরিবর্তে নিজেদের এন্‌জাইম (Enzyme)-এর সাহায্যে বাব্‌লার আঠার মত একপ্রকার আঠা তৈরী করে। এই আঠাই অগুরু। এই পরভোজী গাছটির সাহায্য ছাড়া সুগন্ধী উদ্বায়ী তৈলটি তৈরী হতে পারে না। ডাঃ সহায়রাম বসু এই সম্বন্ধে গবেষণা করেন এবং বর্তমানেও করছেন। তাঁর গবেষণার ফলে তিনি এই রোগউৎপাদক ছত্রাকটি পৃথকীকরণে সমর্থ হয়েছেন। ছত্রাকটি Fungi Imperfecti শ্রেণীর। বর্তমানে তিনি
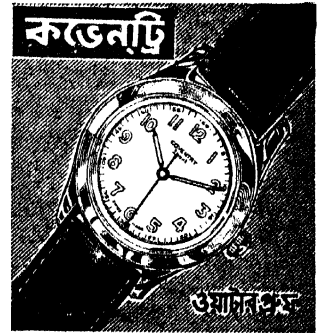
অগুরুর গাছ   ফুল (খোলা অবস্থায়)

ইন্জেকসন্ (Injection) করে এই ছত্রাকটি কৃত্রিম উপায়ে অগুরু গাছে লাগিয়ে অগুরু তৈরী করতে চেষ্টা করছেন। এই চেষ্টা সফল হলে কৃত্রিম উপায়ে রোগাক্রান্ত গাছ হতে প্রচুর পরিমাণে অগুরু পাওয়া যাবে।

রাজ নির্ঘণ্টু গ্রন্থ মতে অগুরু চার প্রকার। কৃষ্ণাগুরু (আসামে), কাষ্ঠাগুরু (পীতবর্ণ), দাহাগুরু (গর্জারি) ও মঙ্গল্যাগুরু (কেদারে) পাওয়া যায়। ভাল অগুরু কাঠ কাল রঙের, শক্ত ও ভারি, জলে ডুবে যায়। এই কাঠ চিবোলে দাঁত জড়িয়ে যায় এবং কষায় ও তিক্ত স্বাদযুক্ত হয়। সিলেটে ভাল অগুরুকে 'ঘড়কী' বলে।

অগুরুর ধূপ দেবমন্দিরে ব্যবহারের জন্য বাজারে বিক্রী হয়। আবার শিলায় ঘষে চন্দনের মতো ব্যবহার করা যায়। অগুরু হতে আতর, তেল, সাবান ইত্যাদি বিলাসদ্রব্য তৈরী হয়। অগুরুর কাঠ জলে সিদ্ধ করে, সেই জল পরিষ্কার করে তা হতে অগুরুর আতর তৈরী হয়। আমাদের দেশের বহু লোক অগুরুর আতর তেল সাবান ইত্যাদি ব্যবহার করে। অগুরুর সুগন্ধি কাঠে গহনার বাক্স ও বেড়াবার ছড়ি ইত্যাদি তৈরী হয়। অগুরুর ছাল হতে পার্চমেণ্ট কাগজের মত এক-প্রকার কাগজ পাওয়া যায়।

অগুরু কেবল বিলাসীগণের উপ-ভোগ্য নয়। ঔষধরূপেও প্রাচীনকাল হতে এর ব্যবহার হয়ে আসছে আয়ুর্বেদ গ্রন্থে উহাকে তিক্ত, উষ্ণ ঝাঁঝালো ও কটু বলে বর্ণনা করা হয়েছে

ইহা দ্বারা কফ, বাত, বায়ু, হিক্কা কর্ণপীড়া, শ্বেতি, গেঁটেবাত, দুষ্টরক্ত প্রভৃতি রোগ উপশম হয়। (আয়ুর্বেদ)

মধুর সাথে কৃষ্ণাগুরু সেবনে হিক্কা আরাম হয়। .... (চরক)

অগুরুর তৈল কুষ্ঠ ও নানাবিধ চর্ম-রোগে উপকারী। .... (সুশ্রুত)

অগুরুর কাঠ সর্প ও বৃশ্চিক বিষের প্রতিষেধক। ...... (চরক ও সুশ্রুত)

মধুর সাথে অগুরু সেবনে কাস আরাম হয়। .... (বাগভট)

আন্ত্রিক গোলযোগ, ব্রঙ্কাইটিস হাঁপানী, বমন, গর্ভপাত প্রভৃতি রোগ অগুরু সেবনে আরাম হয়। (ইউনানী)

কফের বেদনা ও শিরোরোগে ব্রাণ্ডির সাথে অগুরুর প্রলেপে বিশেষ ফল হয় Met. med. Ind.)

অগুরু অতিশয় উত্তেজক ও সুগন্ধযুক্ত। মাথাধরা, স্নায়বিক দৌর্বল্য পক্ষাঘাত ও বমন নিবারণ করে কাপড়ে অগুরু কাঠের গুঁড়া লাগালে উহাতে পোকা ধরে না। ১০—৬০ গ্রেন মাত্রায় উহা বলকারক ঔষধের কাজ করে

জেনেভা আন্তর্জাতিক মহা-সম্মেলনের সভাপতি ডাঃ ভাবা বলিয়াছেন যে, পৃথিবী আজ আণবিক স্বর্ণযুগের দ্বারে উপনীত হইয়াছে।—"বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে হয়ত সত্য রূপটিই

ধরা পড়েছে; আমরা সাধারণ মানুষ কিন্তু এখনো আণবিক প্রস্তরযুগই চোখে দেখছি"—মন্তব্য করিলেন বিশুখুড়ো।

* * *

নিউ ইয়র্ক বিজ্ঞান আকাদামীর "ফেলো" ডাঃ ভিক্টর লেভিন নাকি বলিয়াছেন যে, পৃথিবীকে নিশ্চিহ্ন করার একটি সহজ উপায় রহিয়াছে, সে-টি
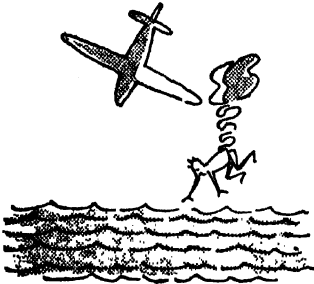
হইল মেরু অঞ্চলে গিয়া কয়েকটি আণবিক ও হাইড্রোজেন বোমা ফেলিয়া আসা। ইহা করিতে পারিলে সেখানে সঞ্চিত তুষাররাশি গলিয়া সমস্ত পৃথিবীকে প্লাবনে ভাসাইয়া দিবে।—"পরামর্শটা শুনে মনে হচ্ছে, পৃথিবীকে নিশ্চিহ্ন করার সম্বন্ধে আমরা সবাই একমত, শুধু সমস্যা হলো একটা সহজ পন্থা আবিষ্কার! সেই পন্থাটি আবিষ্কার ক'রে দিলেন ডাঃ লেভিন। কিন্তু কথা

হলো, যাঁরা বোমা ফেলে দিয়ে আসবেন তাঁদের এই প্রলয় পয়োধিজলে বাঁচার আর একটি পন্থা আবিষ্কার করা হয়েছে তো? শুনেছি, নারায়ণ নাকি বটপাতায় শয়ন ক'রে বিগত যুগের প্রলয়জলে আত্মরক্ষা করেছিলেন, কিন্তু এ যুগে বটপাতা কি বোমারুদের ভার বইতে পারবে?—বলে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় নাকি শিক্ষা খাতে বরাদ্দ হ্রাস করা হইয়াছে।—"এই বাজে খরচাটা একেবারে উঠিয়ে দিতে পারলেই ভালো হয়। আমরা সবাই লিখিব, পড়িব, মরিব দুঃখে—অবস্থা সম্বন্ধে সম্যক্ ওয়াকিবহাল। আশা করি, তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় শিক্ষার বাহুল্য খরচ সম্বন্ধে আর কারু কোন অভিযোগ থাকবে না।"—মন্তব্য করিলেন আমাদের জনৈক সহযাত্রী।

* * *

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহাশয়া জানাইয়াছেন যে, ভারতে জন্ম-সংখ্যা নাকি ক্রমেই হ্রাস পাইতেছে।—"ঘটা ক'রে দুর্গা, কালী, সরস্বতী, শেতলা প্রভৃতি দেবীর বারোয়ারী হচ্ছে, তা'তে মা ষষ্ঠী যদি গোসা ক'রে ব'সে থাকেন তা'হলে সেটা কি তাঁর পক্ষে খুব অন্যায় হবে?"—বলিলেন অন্য এক যাত্রী।

* * *

একটি সরকারী বিবৃতিতে প্রকাশ, রেলযাত্রীদের মধ্যে এখনো নাকি দৈনিক প্রায় কুড়ি হাজার যাত্রী বিনা টিকিটে ভ্রমণ করিতেছেন। ইহার প্রতি-বিধানের জন্য রেলকর্তৃপক্ষ নাকি আরো অধিক সংখ্যক "চেকার" নিয়োগের ব্যবস্থা করিবেন।—"কিন্তু তা'তে এই কুড়ি হাজার যাত্রীর "ব্যক্তিস্বাধীনতায়" হস্তক্ষেপ করা হবে না তো?"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

বরোদার এক সংবাদে জানা গেল, সেখানে একটি ব্যাঙ নাকি একটি গোখরা সাপকে মারিয়া ফেলিয়াছে।—"গোয়া সরকারের রকম-সকম দেখে এ ধরনের ঘটনাকে আর মিথ্যে ব'লে উড়িয়ে দেওয়া চলে না।"!!

* * *

মহাশূন্যের অদৃশ্য তারকার সন্ধানের জন্য কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় শুনিলাম একটি অতিকায় রেডিও-টেলেস্কোপের ব্যবস্থা করিয়াছেন। শ্যামলাল বলিল—"কিন্তু twinkle twinkle little stars যাঁরা এই মাটির পৃথিবীতেই বিচরণ করছেন তাঁদের সন্ধানের পথ কেউ বাৎলে দিলেই সর্বসাধারণ উপকৃত হতো"!

* * *

কতকদিন আগের এক সংবাদে শুনিয়াছিলাম যে, ফ্রান্সের ফকীর বুরমা নিরনব্বই দিন অনশন করিয়া পৃথিবীর রেকর্ড ভঙ্গ করিয়াছেন। সম্প্রতি শুনিলাম, ব্রাজিলের ফকীর সিল্‌কী সেই রেকর্ডও ভঙ্গ করিয়াছেন—তিনি নাগাড়ে পুরা নিরনব্বই দিন ছয় ঘণ্টা অনশন করিয়াছেন।—"দেখা গেল, শুধু বক মারায় নয়, রেকর্ড ভঙ্গেও ফকীরের কেরামতি যথেষ্ট"—বলেন এক সহযাত্রী।

* * *

ভারতীয় ফুটবল দল বাইশ জন খেলোয়াড় সহ মস্কোর পথে কাবুল রওয়ানা হইয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের সঙ্গে গিয়াছেন আটজন কর্মকর্তা।

সঙ্গে গিয়াছেন আটজন কর্মকর্তা!
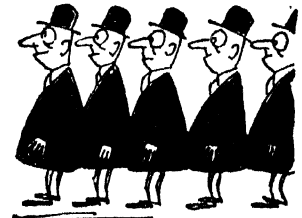
বিশুখুড়ো বলিলেন—"কর্মকর্তা আর জনাকয়েক বাড়িয়ে নিলেই ভালো হতো, বিদেশ বিভূঁইয়ের কথা তো বলা যায় না"!

পরিচালনায় কৃতি উপহার

গত বছর "অঙ্কুশ" বক্স-অফিস সাফল্য অর্জন করতে না পারলেও একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন কৃতী পরিচালককে সামনে এনে দিতে সক্ষম হয়েছিল। কাহিনীর ট্রিটমেণ্টে এমন একটা নতুনত্ব প্রকাশ পেয়েছিল সে ছবিখানিতে যা চিত্ররসিকদের দৃষ্টি স্বতঃই আকর্ষণ করে নিয়েছিল। সেই একই পরিচালকেরই পরবর্তী ছবিখানি হচ্ছে "উপহার"। ছবিখানি দেখবার আগে মন একটু দ্বিধাগ্রস্ত হয় চিত্রকাহিনী রচয়িতার স্থানে শৈলজানন্দের নাম থাকায়। পর পর কেবল অসফল ছবি দিয়ে দিয়ে শৈলজানন্দ এমন অপ্রিয় হয়ে উঠেছেন যে, কোন ছবির সংগে ওর নাম যুক্ত থাকাটাই সন্দেহ উপস্থিত করে। অথচ একথাটা লোকে কেন বিস্মৃত হয়ে যায় যে, শৈলজানন্দ প্রথমত এবং প্রধানত একজন

—শৌভিক—

কথাসাহিত্যিক এবং কথাসাহিত্য রচনায় বাংলা সাহিত্যের প্রথম পর্যায়ের সাহিত্যিকদের পাশেই তাঁর স্থান। অবশ্য "উপহার" তার অনেক দিন আগেকার রচনা এবং এখানে ছবিতে মূল গল্পটিকে একটা কাহিনীর সূত্ররূপেই ব্যবহার করা হয়েছে; ছবির কাহিনীটিতে শৈলজানন্দের প্রেরণাটাই শুধু গ্রহণ করা হয়েছে। ছবিতে কাহিনীটি যেভাবে পাওয়া যায় তার জন্য পরিচালক হিসেবে তপন সিংহ খুবই কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু কৃতিত্বটা শুধু তার একারই পাওনা কিনা সেটাও ভাবতে হবে। কারণ চিত্রনাট্যকার হিসেবে তপন সিংহের নাম থাকলেও ওদিকে অবার সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের নাম রয়েছে নাট্যরূপদাতা ও সংলাপ রচয়িতা হিসেবে। গোলমালে পড়তে হচ্ছে "নাট্যরূপ" আর "চিত্রনাট্য", এদের পার্থক্য নির্ধারণ নিয়ে। এমন ফ্যাসাদ বড়ো দেখা যায় না। যাই হোক, প্রশংসা যার ভাগেই পড়ুক, "উপহার" যে কাহিনী বিন্যাসে বেশ খানিকটা নবীন ও শিল্পী-মনের পরিচয় দেয় তা ছবিখানির ওপর প্রথম নজর পড়া মাত্রই উপলব্ধি করা যাবে। চলতি ধারা থেকে একটু ভিন্ন রকমের চেহারা ছবিখানির—যার ছাপ বিষয়বস্তু ও গঠনকার্য উভয় ক্ষেত্রেই পরিস্ফুট পাওয়া যায়।

* * *

"উপহার"-এর কাহিনী মধ্যবিত্ত সমাজের চেহারাটা কঠিন বাস্তবের চেহারায় ফুটিয়ে তুলেছে। তার মধ্যে দিয়ে হাজির করে দেওয়া হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির কতকজন মানুষকে। এদের

মধ্যে প্রধান হচ্ছে কাঙালীচরণ। বৃদ্ধ তিরিক্ষি মেজাজের ব্যক্তি, একটা ভাঙা বাড়ির মালিক। নীচের তলায় থাকে একমাত্র মেয়ে কৃষ্ণাকে নিয়ে। আয় বলতে ওপরের দুখানি ঘরের ভাড়া পঞ্চাশ টাকা। ভাড়াটে এসে জুটলো অধ্যাপক অশোক তার স্ত্রী এবং ভৃত্য ভোলাকে সঙ্গে নিয়ে। অশোক লোক কেমন, মাইনে পত্তর ঠিক ঠিক দেয় কি-না কাঙালীচরণ ভোলাকে ডেকে জেনে নিতে যাওয়ায় ভোলা রেগে টঙ হয়ে যায়। সময়ে অসময়ে অশোক বা ভোলার ওপর আস্ফালন না করে কাঙালী থাকতে পারে না। এদিকে ভাত জোটে তো তরকারি জোটে না অবস্থা। কৃষ্ণা শুধু ভাতের থালা নিয়ে চোখের জল ফেলে। পরনেও তার একখানি বলতে কাপড় নেই। অশোকদের দেখেই কৃষ্ণা দাদা-বৌদি সম্পর্ক পাতিয়ে নেয়, ওদেরও বেশ লাগে মেয়েটিকে। কৃষ্ণা আর পাশের বাড়ির এম-এ ছাত্র সুনীলের প্রণয়ের ব্যাপারটা অশোকদের কাছে ধরা পড়লো। অশোক চেষ্টা করলে সুনীলের সঙ্গে কৃষ্ণার বিয়ে দিয়ে দেবার। কাঙালীর আপত্তি, সে নিঃস্ব কপর্দকশূন্য বলে। অশোকের চেষ্টায় সুনীলের পিতা বিয়ে দিতে রাজী হলেন বটে কিন্তু ঘরখরচা বাবদ হাজার টাকা তার চাই। কাঙালী টাকার জন্যে আপত্তি তুললে; তবুও অশোক আরও এ ব্যাপারে এগিয়ে গেল, টাকা জোগাড় হয়ে যাবে ভেবে নিয়ে। আশীর্বাদেরও দিন ঠিক হলো, কিন্তু হঠাৎ কাঙালী আগের দিন জানালে যে, সে অন্যত্র কৃষ্ণার বিয়ে ঠিক করেছে যেখানে তার টাকা লাগবে না। টাকার অভাবে সুনীলের সঙ্গে কৃষ্ণার বিয়ে না হলে ওদের দুটো জীবনই যে ব্যর্থ হয়ে যাবে তা অসহ্য হলো অশোকের স্ত্রীর কাছে। স্বামীর হাতে সে তার সমস্ত গয়না তুলে দিলে বাঁধা দিয়ে টাকা জোগাড় করে আনার জন্যে। কিন্তু বড়ো দেরি হয়ে গেলো; টাকা নিয়ে অশোক ফিরে আসার আগেই কাঙালী অপর পক্ষের সঙ্গে বিয়ের কথা পাকা করে ফেললে। সুনীল কৃষ্ণাকে নিয়ে পালিয়ে যাওয়া ঠিক করলে, কৃষ্ণাও তৈরী হলো সেজন্যে। কিন্তু বাধা দিলে অশোকের স্ত্রী; কৃষ্ণাকে সে জানালে যে,
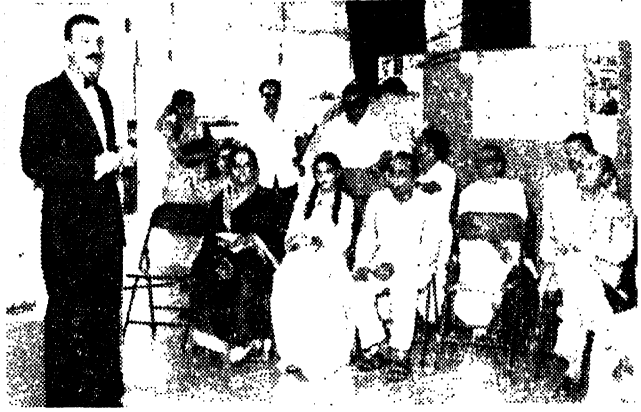
"সানফোরাইজড্ কে মেহমান"—সানফোরাইজের উদ্যোগে সঙ্গীত অনুষ্ঠানকালে বক্তৃতারত মিঃ হ্যারল্ড ক্লার্ক্‌স

ঘর থেকে পালিয়ে মেয়েদের জীবন সুখের হয় না। পারলে না কৃষ্ণা পালাতে। কাঙালীর ঠিক করা পাত্রের সঙ্গে কৃষ্ণার বিয়ের দিন এলো। বাড়িতে একটা শোকের ছায়া। তার মধ্যেই অশোক ও তার স্ত্রীকেই বিয়ের সব ব্যবস্থা করতে হলো। পাত্র এলো চারজন মাত্র বরযাত্রী নিয়ে। বিয়েতে বসবার আগেই জানা গেল পাত্র উন্মাদ। পাত্রের এক বন্ধু সদন্তঃকরণ যুবক পাত্রকে বুঝিয়ে তাকে নিয়ে উধাও হয়ে গেলো। বিয়ে ভেঙে যাওয়ায় কাঙালীর সব রাগ গিয়ে পড়লো অশোকের ওপর, ভীষণ তম্বী করতে লাগলো সে। অশোক সেই লগ্নেই সুনীলের সঙ্গে বিয়েটা দেবার চেষ্টা করলে, কিন্তু খোঁজ করতে দেখা গেল সুনীল বম্বেতে। বিয়ে না হওয়াতে কাঙালী সিঁড়ির নীচে দাঁড়িয়ে অশোক-

দের লক্ষ্য করে দিনরাত যাচ্ছেতাই বলে যেতে লাগলো। কৃষ্ণার ওপরে যাওয়া নিষেধ। অশোকরাও বাড়ি ছেড়ে দেবার জন্যে প্রস্তুত হলো। একদিন কৃষ্ণা ওপরে গেল তার বৌদির কাছে; নিচে ফিরে আসতেই কাঙালী তাকে অমানুষিক প্রহার করলে। পরদিন সকালে কৃষ্ণাকে আর বিছানায় পাওয়া গেল না। কাঙালী সমস্ত দিন ধরে মেয়ে খুঁজে ক্লান্ত বিমর্ষ হয়ে ফিরে এলো। অশোক কাঙালীর মুখের অবস্থা দেখে প্রশ্ন করে ব্যাপারটা জানতে পারলে। কাঙালীর বুকের রোগটা চাড়া দিয়ে উঠলো। এমনি সময়ে খবর এলো যে, কৃষ্ণা গাড়ি চাপা পড়ে হাসপাতালে। কাঙালীচরণের জন্য ডাক্তারের ব্যবস্থা করে অশোক হাসপাতালে গেল কৃষ্ণাকে দেখতে। কাঙালীর অবস্থা খারাপের দিকে গেল, মুখে শুধু কৃষ্ণার নাম। ডাক্তারের কথায় কৃষ্ণাকে হাসপাতাল থেকে আনানো হলো, কিন্তু তখন কাঙালীর বাক্‌রোধ হয়ে গিয়েছে। অল্প পরেই কাঙালীর মৃত্যু হলো। কদিন পর শ্রাদ্ধের কথা প্রসঙ্গে কৃষ্ণা তার বাবার গুদাম ঘরটা খুললে বাসনপত্তরের খোঁজে। একটা নিদারুণ ব্যাপার প্রকাশ হয়ে পড়লো—ভাঙা ট্রাঙ্কের মধ্যে থরে থরে সাজানো নোটের বাণ্ডিল। নিজে না খেয়ে, সেরেফ না খেতে পরতে দিয়ে কাঙালী কেবল টাকা জমিয়েই গিয়েছে, এমন কি খরচের ভয়ে সে তার স্ত্রী ও পুত্র কলেরায় আক্রান্ত হতে চিকিৎসাও করায় নি, বেঘোরে তারা মারা যায়। হাহাকার করে উঠলো কৃষ্ণা। সেই সময়েই আসামে একটা চাকরির জোগাড় করে সুনীলও বম্বে থেকে ফিরে অশোকের সঙ্গে দেখা করতে এলো। এর পর কাহিনীর পরিণতি না বললেও চলে।

কাহিনীটির ঘটনা বিন্যাসে একটা দরদী সমাজসচেতন মনের স্পর্শ আগাগোড়া পাওয়া যায়। তবে অতি লম্বায়িত কাহিনী। কাঙালীচরণের ঠিক করা পাত্রের সঙ্গে কৃষ্ণার বিয়ে এবং আসর থেকে বর উধাও হওয়াতে ক্লাইমেক্সে উঠলো। কিন্তু শেষে গুদাম খুলে কাঙালীর জমানো টাকার স্তূপ আবিষ্কার পর্যন্ত ঘটনায় কাহিনীর পরিণতি পর্যন্ত মাঝের অংশ এমনি দীর্ঘ যে, ধৈর্যচ্যুতি ঘটবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। তবে কাহিনীর রহস্য বা সাসপেন্সটা অদ্ভুতভাবে জমিয়ে রেখে যাওয়া হয়েছে শেষ পর্যন্ত। গল্পের মধ্যে প্রাণে সাড়া ধরিয়ে দেবার যোগ্যতা রয়েছে; অন্যায় ও অসম সামাজিক ধারা ও আচরণের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মতো জোরালো মন পাওয়া যায়। অধ্যাপক অশোক বা তার স্ত্রী, সুনীল বা কৃষ্ণা, অথবা কৃষ্ণার জন্য নির্বাচিত পাত্রের বন্ধু যুবকটি যে বিয়ে ভেঙে দিতে পাত্রকে নিয়ে উধাও হয়ে যায়—এমনি সব যুবক-যুবতী রয়েছে যাদের মতিগতি এ-যুগের মতিগতির ও উন্নত চিন্তাধারার সঙ্গে খাপ খেয়ে যায়। তাই টাকার জন্য সুনীল ও কৃষ্ণার বিয়ে না হতে পারার বেদনাটা মনে লাগে এবং তাই এদের মিলন ঘটাবার জন্য অশোক ও তার স্ত্রীর গহনা বেচে টাকা যোগাড় করে আনার ব্যাপারে ওদের সহৃদয়তায় মন গলে যায়। কাহিনীর বিন্যাসে আরও লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে চরিত্রগুলিকে কার্যরত অবস্থায় দেখানো। সাধারণত ছবিতে যেমন পাওয়া যায়, পাত্র-পাত্রীর সবাই কেবল কথাই বলে যায়, কেউ বা গানে গানে নাচে, কেউ গাড়ি হাঁকিয়ে যায় এবং দেখে মনে হয় সবাই নিষ্কর্মা একেবারে। এখানে অশোককে দেখা যায় ছেলেদের খাতা পরীক্ষা করতে; কাঙালীচরণ তো দিন-রাত ঠুক-ঠাক নিয়েই ব্যস্ত; চাকর ভোলা, কিংবা কৃষ্ণা বা তার বৌদি সকলেরই হাতে একটা না একটা কাজ আছেই। দৃশ্যগুলির রচনার মধ্যে বেশ একটা কল্পনাপ্রবণ মনের সন্ধান মেলে। এমনিভাবে নানাদিক থেকেই ছবিখানি যথেষ্ট অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য নিয়েই উপস্থিত হয়েছে।

ছবিখানির মস্ত গৌরব হচ্ছে অভিনয়ের দিকটা। আর এদিকে একা কানু বন্দ্যোপাধ্যায় কাঙালীচরণের চরিত্রটিকে যেভাবে রূপায়িত করেছেন, তা তাঁর দীর্ঘ শিল্পী-জীবনের তো বটেই, এমন কি বাংলা পর্দার ইতিহাসেও একটি অনবদ্য চরিত্রসৃষ্টি বলে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। খেঁকুড়ে মেজাজের কঞ্জুস কাঙালীচরণ পয়সার মোহে স্ত্রী-পুত্রকে চিকিৎসা না করিয়ে মারা যেতে দিয়েছে; একমাত্র মেয়েকে খেতে পরতে দেয় না অথচ তার

কুন্দন চিত্রে নিম্মি

আচরণের মধ্যে দুনিয়ার যতো দারিদ্র্যই যেন ফুটে রয়েছে। ওর ঐ থেকে থেকে ক্ষেপে ওঠা; ভোলাকে ডেকে অশোকদের অবস্থা জানতে সন্দেহবাতিকতা; আর শেষে কৃষ্ণার বিয়ে ভেঙে যাবার পর আক্রোশে সিঁড়ির নীচে দাঁড়িয়ে অশোকদের উদ্দেশে গালিগালাজ প্রভৃতি; ওর এক একটা অভিব্যক্তি দীর্ঘদিন চোখের সামনে জবলজবলে হয়ে থাকবে। এমন জম্পেশ অভিনয় বহুকাল দেখা যায়নি। কাঙালীচরণের চরিত্রাভিনয়ের মুখোমুখি দাঁড়াবার প্রায় সমান সামর্থ্য দেখিয়েছেন ভোলা চাকরের চরিত্রে জহর রায়। প্রভু অনুরক্ত ভৃত্য; কাঙালীর আচরণে ক্ষেপে যায় সে, কিন্তু কৃষ্ণার প্রতি সহৃদয়। ক্যাবলাভাবের গোঁয়ার একটু। জহর রায়ও স্মরণে রেখে দেবার মতো একটি অনবদ্য চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। উত্তমকুমার এখানে প্রণয়ী যুগলের চশমাধারী গুরুজন। প্রগতিভাবাপন্ন উদার প্রকৃতির হিতকারী অধ্যাপক অশোকের চরিত্রে অবতরণ করেছেন তিনি। এই নতুনভাবেও উত্তমকুমারকে ভালো লাগবে। তার স্ত্রীর চরিত্রে মঞ্জু দেও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করার মতো একটি দরদী নারীচরিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। কৃষ্ণা ও সুনীলের চরিত্রে সাবিত্রী ও নির্মলকুমার দুজনেই অন্যান্যের অভিনয়ের উঁচু পর্দার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে গিয়েছেন। এদের অভিনয়ে বেশ একটা সাবলীলতা পাওয়া যায়, স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি। একটু কৃত্রিম লাগে কৃষ্ণার মোটর চাপা পড়ার দৃশ্যটা, আর সুনীলেরও বম্বের রাস্তায় রাস্তায় চাকরি খুঁজে বেড়ানোর প্রসঙ্গটা মনে হয় ফালতু। যাই হোক অভিনয় ছবিখানিতে একটা অতিরিক্ত মর্যাদাও যোগ করে দিয়েছে। অভিনয়ে অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে আছেন ছবি বিশ্বাস, তুলসী চক্রবর্তী, সলিল দত্ত, নৃপতি, শ্যাম লাহা, প্রেমাংশু বসু, অনুভা গুপ্তা, অপর্ণা দেবী, রাজলক্ষ্মী প্রভৃতি। এ'দেরও প্রত্যেকেরই অভিনয় যথাযথ মান রেখে গিয়েছে।

ক্যামেরায় দৃশ্যের রচনার দিকটায় বৈশিষ্ট্য আছে, আলোকসম্পাত সবক্ষেত্রে যথাযথ নয়। তবুও কাজের প্রশংসা করতে হয়। কলাকৌশলের অন্যান্য দিকেও কাজ ভালোই। দুখানি মাত্র গান, কিন্তু সুপ্রযুক্ত। প্রথম গান "রিম ঝিম রিম ঝিম শ্রাবণের দিন" গানখানি গৌরীপ্রসন্ন লিখেছেন ভালো, কালীপদ সেন রবীন্দ্র সুরের অনুসরণে সুরও দিয়েছেন ভালো, গাওয়াও ভালো হয়েছে এবং পরিচালক গানখানি খেলিয়েছেনও ভালো। ছবিখানির একটি উজ্জ্বল অংশ এই গানখানি। আবহ সঙ্গীতে বেশী অংশে সিনেবক্সের বিলিতি রেশটাই পাওয়া যায়, তবুও দৃশ্য জমিয়ে তোলার খুবই কৃতিত্ব পাওয়া যায়; একটা বৈশিষ্ট্য ফুটেছে। কলাকুশলীদের অন্যান্যেরা হচ্ছেন আলোকচিত্র গ্রহণে অনিল বন্দ্যোপাধ্যায়, শব্দ গ্রহণে গৌর দাস, শিল্প-নির্দেশে বিজয় ঘোষ এবং সম্পাদনায় সুবোধ রায়। নতুন দিনের উপযোগী একখানি ছবি পরিবেশন করার জন্য গঠনকারীদের সকলেরই প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়।
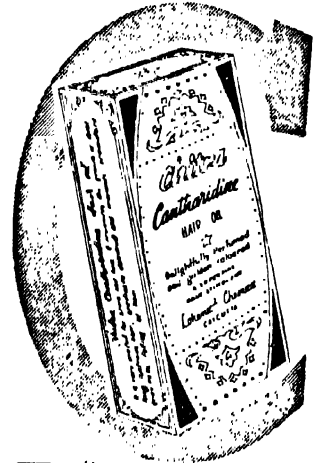
ওয়ারসতে বিশ্বযুব ক্রীড়া উৎসবে ভারত হকির বিজয় মুকুট লাভ করেছে। হকিতে বিশ্বের অজেয় যোদ্ধা ভারতের পক্ষে এই সম্মান লাভ কোন নতুন ঘটনা নয় তবুও নিউজিল্যাণ্ডের দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় দিল্লী ওয়াণ্ডারার্স দলের পরাজয়ের পরিপ্রেক্ষিতে ওয়ারসর জয়লাভের কিছু মূল্য আছে বই কি? দিল্লী ওয়াণ্ডারার্স নামে ভারতের যে হকি দল এখন নিউজিল্যাণ্ড সফর করছে বহু গুণী ও কৃতী খেলোয়াড়ে সে দলটি পুষ্ট। এই দলের অন্তত ৬।৭ জন খেলোয়াড় ভারতের অলিম্পিক টীমে স্থান পাবেন, সন্দেহ নেই। তাই দিল্লী ওয়াণ্ডারার্সের পরাজয়ে অনেক আশাবাদীর মনেই আগামী অলিম্পিকে ভারতের জয়লাভ সম্পর্কে একটু সন্দেহ জেগেছে। কিন্তু নিউজিল্যাণ্ডে ভারতীয় দলের পরাজয়ও কোন নতুন ঘটনা নয়। নিউজিল্যাণ্ডে হকি খেলা খুবই জনপ্রিয়। ভারতীয় হকিকে প্রথম আতিথ্য দান করে সম্মান দিয়েছিল এই নিউজিল্যাণ্ড। ১৯২৬ সালে ভারতের এক ফৌজী দল সর্বপ্রথম নিউজিল্যাণ্ড সফর করে। এর আগে ভারত বিদেশের মাটিতে হকি খেলেনি। প্রথম টেস্ট খেলায় ফৌজী দল জয়লাভ করলেও দ্বিতীয় টেস্টে নিউজিল্যাণ্ডের কাছে ৪-৩ গোলের ব্যবধানে পরাজয় স্বীকার করতে হয় ভারতীয় দলকে। তৃতীয় টেস্টও ১-১ গোলে অমীমাংসিত থাকে। বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভারতীয় দলের এই প্রথম বৈদেশিক সফরেই যাদুকর ধ্যানচাঁদের অনন্য মনীষার পরিচয় পাওয়া যায়। সুতরাং ধ্যানচাঁদ দলে থাকা সত্ত্বেও যে নিউজিল্যাণ্ড ভারতীয় টীমের 'রাবার' লাভে অন্তরায় সৃষ্টি করেছিল তাদের হাতে দিল্লী ওয়াণ্ডারার্স হার স্বীকার করবে এতে আশ্চর্যের কিছুই নেই। অলিম্পিকে ভারতের সাফল্য সম্পর্কে যাদের মনের কোণে সন্দেহ জেগেছে তাদের সন্দেহ নিরসনের জন্যই এই ঘটনার উল্লেখ। তবে একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে, হকি খেলায় সব দেশই এগিয়ে চলেছে এবং ভারতের প্রাধান্য খর্ব করবার জন্য কারোই আগ্রহের অভাব নেই। সুতরাং বিশ্বজয়ীর সম্মান করায়ত্ত রাখতে হলে ভারতকেও হতে হবে যত্নশীল। গবেষণা করতে হবে নতুন ক্রীড়াপদ্ধতির।

* * *

রাশিয়া সফরকারী ভারতীয় ফুটবল দল

খেলার মাঠে

একলব্য

কাবুলের পথে রাশিয়া অভিমুখে যাত্রা করেছে। এতদিন রাশিয়ায় হয়তো পৌঁছেও গেছে। গত সপ্তাহে কয়েকজন খেলোয়াড়ের সংক্ষিপ্ত জীবন পরিচয় প্রকাশ করা হয়েছে। এ সপ্তাহে বাকী খেলোয়াড়দের পরিচয় প্রকাশ করা হলঃ—

নূর—হায়দরাবাদ সিটি পুলিসের খ্যাতনামা লেফট হাফ নূর মহম্মদ ১৯৪৪ সাল থেকে নিজ রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করে আসছেন। ১৯৫১ সালে ভারতীয় দলে তাঁর ডাক পড়ে। এই বছর দূরপ্রাচ্য সফরে এবং এশিয়ান গেমে নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড় ছিলেন। ফলে তিনি ভারতের ১৯৫২ সালের অলিম্পিক টীমে স্থান পান। চতুর্দলীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় নূর ভারতের পক্ষে খেলেছেন ১৯৫২ ও ১৯৫৪ সালে। রাশিয়ান দলের বিরুদ্ধেও নূরের ক্রীড়ানৈপুণ্য সকলের প্রশংসা অর্জন করে। তবে নূরের প্রতিভা এখন নিম্নমুখী বলেই মনে হয়। আগের চটকদারী খেলার অনেকখানি হারিয়ে ফেলেছেন নূর।

জোসেফ ক্রিষ্টি—১৯৫৩ সালে ব্যাঙ্গালোর মুসলিম টীমের পক্ষে রোভার্স কাপের খেলায় অংশ গ্রহণ এবং এই বছরই ব্যাঙ্গালোর ব্লুজের পক্ষে ডুরাণ্ড কাপে খেলার সুযোগ ছাড়া মহীশূরের তরুণ লেফট আউট ক্রিষ্টি এ পর্যন্ত কোন প্রতিনিধিমূলক খেলায় অংশ গ্রহণের সুযোগ পাননি। সেইজন্য রাশিয়া সফরকারী ভারতীয় দলে তাঁর নির্বাচন কিছুটা অপ্রত্যাশিত। ১৯৩৩ সালে জোসেফ ক্রিষ্টি মহীশূরের এক খৃষ্টান

রাজ্যের পুলিস বিভাগের চাকুরীতে প্রতিষ্ঠিত।

কানাইয়ান—ভারতের ক্ষিপ্রগতি রাইট আউটদের মধ্যে কানাইয়ান নিঃসন্দেহে ক্ষিপ্রতম। ক্ষিপ্রতাই কানাইয়ানের একমাত্র গুণ নয়; দুই পায়ে শটও আছে জোরালো। বল নিয়ে রক্ষণব্যূহ অতিক্রম করতে খুবই ওস্তাদ। কিন্তু যে পরিমাণে বিপদের সূচনা করেন সেই পরিমাণে গোল লাভ করতে পারেন না। গুণী খেলোয়াড় কিন্তু চতুরতা কম।

ব্যাঙ্গালোর থাকা সময়েই কানাইয়ানের খ্যাতি ছিল। ১৯৫০ সালে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের আহ্বানে কলকাতায় আসেন। ১৯৫১ সালে যোগদান করেন রাজস্থান ক্লাবে। রাজস্থানের সঙ্গে এর এখনও অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। কানাইয়ান এস পি ডব্লিউ অর্থাৎ স্ট্যাণ্ডার্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কসের কর্মী। স্কুল জীবনে কানাইয়ান বরাবর ১০০ ও ২০০ মিটার দৌড়ে প্রথম হয়ে এসেছেন। মনে হয় কানাইয়ানের দৌড়াবার দিন এখনো ফুরোয়নি। বয়স ২৩ বছর।

গিরিশ বর্মা—চেহারার মধ্যেই রয়েছে কেমন একটা দার্শনিক ভাব। হ্যাঁ, দার্শনিক বই কি! রাশিয়া সফরকারী ভারতীয় দলে নির্বাচিত অপর রাইট আউট গিরিশ বর্মা 'ফিলসফির' ছাত্র। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ফিলসফি'তে এম এ পড়েন। সেই সঙ্গে আইনও।

আলমোড়া গবর্নমেণ্ট কলেজে পড়বার সময় হকি ও ফুটবল খেলোয়াড় হিসেবে বর্মা বেশ খ্যাতি অর্জন করেন। তারপর এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র মহলে তার ক্রীড়াখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। হকি ও ফুটবলে তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ব্লু'ও লাভ করেছেন। বেশ শ্রমশীল খেলোয়াড়। গতিবেগও যথেষ্ট, দুই পায়েই শট আছে। ইতিপূর্বে এলাহাবাদের পক্ষে আই এফ এ শীল্ড ও রোভার্স কাপে খেলেছেন। জন্ম-তারিখ ১৯৩১ সালের

আমেদ—এ যুগের বিস্ময়কর ফুটবল প্রতিভার অধিকারী আমেদের রক্তের মধ্যেই

ছিল ফুটবলের নেশা। ফুটবলের স্বর্ণখনি বাঙ্গালোর আমেদের জন্মভূমি। আমেদ যে বংশে জন্মগ্রহণ করেছেন, বাঙ্গালোর ফুটবলে সে বংশের দান অতুলনীয়। মহমেডান স্পোর্টিংয়ের কয়েকজন খ্যাতনামা খেলোয়াড় সাবু, আমীর ফজলুল্লা, নবাব এবং ইস্টবেঙ্গলের আমেদ একই বংশসম্ভূত। আমেদের পিতা বাবা খাঁ ছিলেন বাঙ্গালোরের খ্যাতনামা ব্যাক; সুতরাং শিশু বয়স থেকেই আমেদের ফুটবল পাঠ আরম্ভ হয়। অজ আম ইট ঈশ থেকে নতুন ঘাটি পুরোন বাটি পর্যন্ত ফুটবল পাঠ আমেদের গৃহপ্রাঙ্গণেই শেষ হয়েছিল। তারপর ঐক্য বাক্য থেকে ঊর্ধ্ব মূর্ধন্য পর্যন্ত পাঠ শেষ হয়েছিল বাঙ্গালোরের ক্রিসেণ্ট ক্লাবে। বাঙ্গালোর মুসলিম দলে যখন তিনি যোগ দিয়েছেন, তখন তিনি ফুটবলের ভাষা বুঝতে পারেন, মাঠের মধ্যে ফুটবল গোপনে তার সঙ্গে কথা কয়, ইঙ্গিত দেয় গতি-পথের। আমেদ তখন ফুটবলের সুচারু শিল্পী। বাঙ্গালোর মুসলিম দলে সত্তার খেলতেন আমেদের সঙ্গে। সত্তার রাইট-ইন্-এ, আমেদ লেফট্-ইন্-এ; ফুটবলের দুই রত্নের মণি-কাঞ্চন সংযোগ। ১৯৪৮ সালে রোভার্স কাপ ফাইন্যালে বাঙ্গালোর মুসলিম দলের হাতে মোহনবাগানের পরাজয়ের মূলে ছিল আমেদের অনবদ্য ক্রীড়ানৈপুণ্য। এই বছরই ভারতের অলিম্পিক টীমে তার ডাক পড়ে এবং লণ্ডন অলিম্পিকে চমৎকার ক্রীড়াচাতুর্য প্রদর্শন করেন। তারপর ১৯৪৯ সালে আমেদের ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে যোগদান এবং এই ক্লাবের সঙ্গে তার সম্পর্ক আজও অচ্ছেদ্য। ইস্টবেঙ্গলের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ে আমেদের দান যে কতখানি তা কারও অজানা নেই। 'হেলসিংবর্গ' – 'গোটেবর্গ' – 'অফেনব্যাক' – 'অস্ট্রিয়ান'—'রাশিয়ান', যখনই যে দল এখানে খেলতে এসেছে, তারা বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে চেয়ে দেখেছে আমেদের নগ্ন-পদ ক্রীড়াচাতুর্য—অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছে ভারতীয় খেলোয়াড়ের ক্রীড়াদক্ষতার। আমেদ সত্যই ফুটবলের নিপুণ শিল্পী।

পায়ে বাধ্যতামূলক বুটের বন্ধন আমেদের ক্রীড়াচাতুর্যে সাময়িক অসুবিধার সৃষ্টি করেছিল, কিন্তু তিনি চমৎকারভাবে বুটরপ্ত হয়ে উঠেছেন এবং লেফট্-ইন্ ছেড়ে খেলতে আরম্ভ করেছেন রাইট-ইন্-এ। দুবারের অলিম্পিক লেফট ইন্ আমেদ আসছে অলিম্পিকে রাইট-ইন্-এ খেলবেন কি না কে জানে। আমেদের প্রতিভাদীপ্ত ফুটবল-জীবনে কত ট্রফি জয় করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। ভারতের নিম্নমুখী ক্রীড়ামানের মধ্যে আমেদ ব্যতিক্রম। আমেদ ফুটবল প্রতিভায় ভাস্বর। আমেদই একমাত্র খেলোয়াড় যাঁর রাশিয়ায় খেলার পূর্ব অভিজ্ঞতা আছে।

লায়িক—হায়দরাবাদ সিটি পুলিস টীমে গুণী ও কৃতী খেলোয়াড়ের অভাব নেই।

রাইট ইন লায়িক এঁদেরই একজন। ১৯৪৯ সাল থেকে লায়িক ফুটবলে হায়দরাবাদ রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করে আসছেন। ১৯৫১ সালে দূর প্রাচ্য সফরে এবং এশিয়ান গেমে ভারতীয় টীমে এঁর ডাক পড়েছিল। ১৯৫২ ও ১৯৫৪ সালে চতুর্দলীয় ফুটবলেও ভারতের পক্ষে খেলেছেন।

অসম্ভব শ্রমশীল। নিজ খেলোয়াড়দের বল যোগাতে ওঁদের অন্ত নেই। বয়স ২৩। পুরো নাম গোলাম ইউসুফ সরিফ লাতিফ।

এস ঘোষ—রাশিয়া সফরকারী ভারতীয় দলে সেণ্টার ফরোয়ার্ড হিসাবে সুশান্ত ঘোষের নির্বাচন অনেকের কাছে অযৌক্তিক বলে মনে হলেও সত্যিকারের ভাল সেণ্টার ফরোয়ার্ড ভারতে কোথায়? তা ছাড়া সুশান্ত এ বছর ভালই খেলেছেন। অন্যান্য বছরের সঙ্গে তুলনা করলে সুশান্তর এ বছরের ক্রীড়ানৈপুণ্য সত্যই উজ্জ্বল। এস ঘোষ ২৪ পরগণার খড়দার অধিবাসী। এখানকার কুলীনপাড়া ক্লাবে প্রথম ফুটবল খেলতে আরম্ভ করেন। ১৯৪৭ সালে যোগদান করেন রাজস্থান ক্লাবে। ১৯৪৮ সালে রাজস্থানের দ্বিতীয় ডিভিশন চ্যাম্পিয়ন হবার মূলে সুশান্ত ঘোষের কৃতিত্ব ছিল অনেকখানি। ১৯৫১ সালে এস ঘোষ ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে যোগদান করেন এবং পরের বছর সাড়া দেন মোহনবাগানের ডাকে। ১৯৫৩ সাল থেকে ইনি উয়াড়ী ক্লাবে খেলছেন। গতবার উয়াড়ীর লীগ রানার্স হবার মূলে সুশান্তর কৃতিত্ব কম নয়। ইনি বি জি প্রেসে চাকরী করেন। বয়স ২৪।

স্যাত্তার—বোম্বাইয়ের সেণ্টার ফরোয়ার্ড স্যাত্তার মেওয়ালালের মত ক্রীড়ানৈপুণ্যে কলাকুশলী না হলেও খেলোয়াড় নির্বাচক সমিতি মনে করেন স্যাত্তার গোল করবার ক্ষেত্রে অধিক পারদর্শী। ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত স্যাত্তার ইণ্ডিয়া কালচার লীগের খেলোয়াড় ছিলেন। গতবার ইনি ওয়েস্টার্ন রেলে চাকরি গ্রহণ করেছেন। ১৯৫৩ সালে কালচার লীগ ও কোলাপুরের একটি খেলায় স্যাত্তার 'ট্রিপল হ্যাটট্রিকের' কৃতিত্ব সহ ৯টি গোল ক'রে প্রশংসা অর্জন করেন। ১৯৫২ সালে হারউড লীগে স্যাত্তার পাঁচবার হ্যাটট্রিক এবং ৩৫টি গোল করে-ছিলেন; পরের বছর করেছিলেন ২৬টি গোল আর ৪ বার হ্যাটট্রিক। এবার বোম্বাইয়ের গোলদাতা খেলোয়াড়দের তালিকায় তাঁর স্থান শীর্ষে, হ্যাটট্রিক করেছেন দু'বার।

স্যাত্তার হকি খেলাতেও সমপারদর্শী। তিনি ১৯৫২ সালে জাতীয় ফুটবলে এবং ১৯৫৩ ও ১৯৫৫ সালে জাতীয় হকিতে বোম্বাইয়ের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। ১৯৪৬ সালে রয়্যাল এয়ারফোর্স হকি টীমের সঙ্গে নিউজিল্যাণ্ড ও সিংহল সফর করেন। এ্যাথলেটিকসেও কয়েকবার বোম্বাইয়ের পক্ষে নির্বাচিত হয়েছেন। একজন সর্ববিশারদ স্পোর্টসম্যান। বয়স ২৮।

পূরণ বাহাদুর—ইস্টার্ন কম্যাণ্ডে খেলবার সময়ই পূরণ বাহাদুরের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। তখন পূরণ খেলতেন লেফট্-আউটে। ১৯৪৯ সালে আফগান সফরে এবং ১৯৫১ সালে দূরপ্রাচ্য সফরে পূরণ ভারতীয় দলে স্থান পান। তারপর পূরণ সামরিক বিভাগে সম্মানজনক পদ লাভের জন্য ন্যাশনাল ডিফেন্স একাডেমীতে শিক্ষা আরম্ভ করেন। এখানকার শিক্ষা সমাপ্তও করেছেন। দৈহিক দিক দিয়ে পূরণ একটু খর্বাকৃতি, কিন্তু মজবুত গড়ন। যেন লোহা দিয়ে গড়াপেটা শরীর। পায়ের নৈপুণ্যও অনবদ্য। গতবার কলকাতার মাঠে এশিয়ান কোয়াড্রাঙ্গুলারে পাকিস্থানের বিরুদ্ধে হ্যাটট্রিক করে পূরণ অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেন। এই খেলায় পূরণ যে চাতুর্য দেখিয়েছিলেন, তা আজও যেন চোখের উপর ভাসছে। লেফট-আউট পূরণ বাহাদুরকে লেফট-ইন হিসাবে আবিষ্কার করেন ভারতের ফুটবল কোচ এ এফ ফ্রাটলে।

এ ব্রাগাঞ্জা—ভারতের যে দুই একজন খেলোয়াড়ের বিলেতে ফুটবল খেলা শেখার সুযোগ ঘটেছে, বোম্বাইয়ের নিপুণ খেলোয়াড় ব্রাগাঞ্জা তাঁদের অন্যতম। ১৯৪৮ সালে 'চেলসা ফুটবল ক্লাবের' খ্যাতনামা 'কোচ' টমি ওয়াকারের শিক্ষাধীনে তিনি ইংলণ্ডের স্টামফোর্ড ব্রিজে ফুটবল খেলার উন্নত কলাকৌশল আয়ত্ত করেন। ব্রাগাঞ্জার দু'খানা পা-ই সমানভাবে চলে। চমৎকারভাবে 'ড্রিবল' করে সহ-খেলোয়াড়দের বল জুগিয়ে চলেন। দমও অফুরন্ত। মাথার বাইরের সাহায্যে খেলার চেয়ে মস্তিষ্কের উপর বেশী আস্থাশীল। 'ডবলিউ' পদ্ধতিতে খেলায় পক্ষপাতী। শুধু ফুটবল খেলাতেই ব্রাগাঞ্জার সুনাম নয়। হকি খেলাতেও এর সমনৈপুণ্য দুই খেলাতেই বোম্বাইয়ের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। ভারতকে ফুটবলে সাহায্য করেছেন ম্যানিলার এশিয়ান গেমে ও রাশিয়ান দলের বিরুদ্ধে টেস্ট খেলায়। বয়স ২৭। বোম্বাইয়ে টাটা কোম্পানীর চাকুরিতে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং হকি ও ফুটবল টাটা স্পোর্টস ক্লাবের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ।

জে এণ্টনী—ভারতীয় ফুটবলের স্বর্ণখনি বাঙ্গালোর থেকে যেসব নিপুণ খেলোয়াড় আবিষ্কৃত হয়েছে, লেফট্-আউট জে এণ্টনী তাঁদের অন্যতম। এণ্টনী প্রথমে বাঙ্গালোরের মার্চেণ্টস ক্লাবে খেলা আরম্ভ করেন। এটি ছিল 'বি' ডিভিশন টীম। এখান থেকে ১৯৪১ সালে আর এক 'বি' ডিভিশন টীম নিউ লাকি স্টার ক্লাবে যোগ দেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ভাগ্যে সুদিন আসে এবং বাঙ্গালোর ফুটবলে 'তারকা' হিসাবেই খ্যাতি অর্জন করেন। ১৯৪২ সাল থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত মহীশূর রোভার্সে, ১৯৪৭ সালে মহীশূর রাজ্য পুলিস দলে এবং ১৯৪৮ সালে বাঙ্গালোর মুসলিম টীমে খেলে তিনি ১৯৪৯ সালে কলকাতার মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের ডাকে সাড়া দেন। মহমেডান স্পোর্টিং থেকে ১৯৫০ সালে যান রাজস্থান ক্লাবে। ১৯৫২ সালে এণ্টনী হেলসিঙ্কি অলিম্পিকে ভারতীয় দলে স্থান পান। ১৯৫৩ সালে মোহনবাগান ক্লাবে খেলে এণ্টনী আবার বাঙ্গালোরে ফিরে গেছেন। এখন তিনি ৫১৫ কম্যাণ্ড ওয়ার্কশপ স্পোর্টস ক্লাবের সভ্য। জাতীয় ফুটবলে তিনি মহীশূর এবং বাঙ্গলা দুই রাজ্যেরই প্রতি-নিধিত্ব করেছেন। এণ্টনীর বয়স ৩১ বছর।

এস রায়—খবরের কাগজে কলকাতার খেলোয়াড়দের ক্রীড়ানৈপুণ্যের খবর পড়ে বুড়িগঙ্গার তীরে যে ছেলেটির মনে কলকাতার মাঠে ফুটবল খেলার স্বপ্ন জেগেছিল, আজ সেই ছেলেটিই কলকাতার মাঠে কৃতী লেফট-আউট হিসাবে পরিচিত। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের লেফট্-আউট সুধীর রায়ের আদি বাড়ী ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে। কলকাতায় এসে [illegible]

হাঙ্গেরীর অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন সাঁতার পটিয়সী ইডা জেকেলীর বাটারফ্লাই সাঁতারের দৃশ্য। কয়েক সপ্তাহ আগে জেকেলী ৫ মিনিট ৪০.৮ সেকেন্ড সময়ে ৪০০ মিটার মেড্‌লে সাঁতারে নতুন বিশ্ব রেকর্ড করেছেন। এই বিষয়ে বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারী ছিলেন ডাচ বালিকা মেরী কক্‌। ককের চেয়ে সাড়ে ৭ সেকেন্ড কম সময়ে জেকেলী নতুন রেকর্ড করেছেন।

সময়েই তাঁর মধ্যে ফুটবল প্রতিভার সন্ধান পাওয়া যায়। ফলে তিনি ভারতীয় স্কুল দলের প্রতিনিধিত্ব করবার সুযোগ পান। ১৯৫০ সালে মোহনবাগান ক্লাবে যোগ দিয়ে এস রায় বেশী খেলায় অংশ গ্রহণের সুযোগ পাননি। ১৯৫১ সালে ভবানীপুর ক্লাবেও তাঁর প্রতিভার বিকাশ হয়নি। ১৯৫২ সালে সুধীর এরিয়ানে যোগ দেন এবং খেলোয়াড় তৈরীর পীঠস্থান এরিয়ানেই তাঁর নৈপুণ্যের স্ফুরণ হয়। ১৯৫৪ সালে তিনি জাতীয় ফুটবলে বাঙলা দলে স্থান পান। এস রায় এই বছর ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে যোগ দিয়েছেন। রাইট-আউট এবং সেণ্টার ফরোয়ার্ডে ঠেকা চালালেও লেফট-আউটই রায়ের প্রকৃষ্ট স্থান। দু'খানা পায়ে চমৎকার শট আছে। বল নিয়ে কেটে বেরোবার ভঙ্গিও মনোরম, গতিবেগও যথেষ্ট; তবে এস রায়কে সর্বাঙ্গসুন্দর খেলোয়াড় হিসাবে খ্যাতি অর্জন করতে হলে মাথার ব্যবহার করতে হবে,—ভিতর বাহির দুয়েরই।
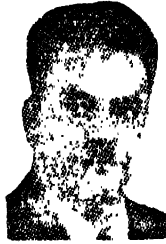
পি গুপ্ত—নিখিল ভারত ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি শ্রীপঙ্কজ গুপ্তকে ভারতীয় ক্রীড়া-ক্ষেত্রের ডিরেক্টর বলা যেতে পারে। কি ফুটবল, কি ক্রিকেট, কি হকি, কি অন্যান্য খেলাধুলা, সব যায়গায়ই তাঁর অসীম প্রতিপত্তি। খেলার দৌলতে বিশ্বের সর্বত্র পরিভ্রমণ করবার সুযোগ পি গুপ্তর মত আর কেউ পেয়েছেন কি না সন্দেহ। বিভিন্ন দলের সংগে বিভিন্ন দেশে পি গুপ্ত যতবার সফর করেছেন তার একটা হিসাব দেবার চেষ্টা করছি। ১৯২৪ ও ১৯২৬ সালে ফুটবল টীমের সংগে জাভা সফর, ১৯৩২ সালে লস্ এঞ্জেল (আমেরিকা) অলিম্পিক, ১৯৩৩ সালে সিংহলে ফুটবল সফর, ১৯৩৫ সালে অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডে হকি সফর, ১৯৩৬ সালে বার্লিন অলিম্পিক, ১৯৩৮ সালে অস্ট্রেলিয়ায় ফুটবল সফর, ১৯৪০ সালে সিংহলে এ্যাথলেটিক সফর, ১৯৪৬ সালে ইংলণ্ডে ক্রিকেট সফর, ১৯৪৭ সালে অস্ট্রেলিয়ায় ক্রিকেট সফর, ১৯৪৮ সালে লণ্ডন অলিম্পিক, ১৯৫২ সালে ইংলণ্ডে ক্রিকেট সফর ও হেলসিঙ্কি অলিম্পিক, ১৯৫৩ সালে জুবিলি ক্রিকেট টীম আনবার জন্য ইংলণ্ড গমন। ভারতীয় টীমের দলপতি হিসাবে এবার যাচ্ছেন তিনি রাশিয়ায়।
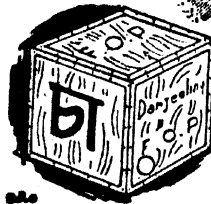
দেশী সংবাদ

৮ই আগস্ট—অদ্য লোকসভায় বিভিন্ন দলের সদস্যগণ পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের উদারভাবে ভারতীয় নাগরিক অধিকার প্রদানের জন্য আবেদন জানান। সদস্যরা এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেন যে, কোনরূপে হয়রানি না করিয়া পূর্ববঙ্গ হইতে আগত ৩২ লক্ষ উদ্বাস্তুকে নাগরিক অধিকার প্রদান করা উচিত।

৯ই আগস্ট—ভারতের উপরাষ্ট্রপতি ডাঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ আজ বৈদ্যুতিক বোতাম টিপিয়া দুর্গাপুরে বাঁধের উদ্বোধন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ দামোদর উপত্যকার এই বাঁধ পরিকল্পনাটি ভারতের জনগণের উদ্দেশে উৎসর্গ করেন এবং এইরূপ আশা ব্যক্ত করেন যে, এককালে যে দামোদর নদের নাম ধ্বংস ও দুর্গতিদের অশ্রুর সহিত জড়িত ছিল, তাহা অদূর ভবিষ্যতে আশা ও সমৃদ্ধির বার্তাবহ হইয়া উঠিবে।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু এলাহাবাদে এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে তাঁহার সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং ইউরোপীয় দেশসমূহে পরিভ্রমণের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, বিশ্ববাসীর দৃষ্টিতে এক্ষণে ভারতের মর্যাদা পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশী বৃদ্ধি পাইয়াছে।

আজ কলিকাতায় বিভিন্ন বামপন্থী দল 'গোয়া ছাড়' দিবস পালন করেন। পর্তুগীজ পুলিসের গুলীতে নিহত শহীদ নিত্যানন্দ সাহার চিতাভস্ম এইদিন কলিকাতায় আনীত হয়।

ভারতীয় নাগরিকত্ব আইন সংশোধন বিল যুক্ত সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরণের জন্য স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী পণ্ডিত পন্থ যে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন, অদ্য লোকসভায় তাহা গৃহীত হইয়াছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ঘোষণা করেন যে, উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব সম্পর্কে সরকার বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে প্রস্তুত আছেন।

১০ই আগস্ট—কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রী সি ডি দেশমুখ আজ লোকসভায় যুক্ত সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী কোম্পানী বিল বিবেচনার্থ উত্থাপন করেন।

আজ কলিকাতা মহানগরীতে নানা সংস্থার উদ্যোগে বিভিন্ন মনোরম অনুষ্ঠানের মধ্যে ভক্ত জনগণের পরম নিষ্ঠা ও স্বতস্ফূর্ত আগ্রহে শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। এই উপলক্ষে শ্রীশ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী উৎসব কমিটির আহ্বানে দক্ষিণ কলিকাতার দেশপ্রিয় পার্কে এক অভাবনীয় বিরাট জনসমাগম হইয়াছিল।

১১ই আগস্ট—সর্বদলীয় গোয়া বিমোচন সহায়ক সমিতির বেলগাঁও শাখা সর্বাত্মক প্রস্তুতির হুঁশিয়ারী স্বরূপ এক পতাকা

উত্তোলন করেন। জনৈক প্রবীণ পর্তুগীজ অফিসারের মতে গোয়ার পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষ ভারতীয় এলাকায় সত্যাগ্রহ করিবে। ১৫ই আগস্ট ব্যাপক সত্যাগ্রহ হইতে ভারতীয়দের বিরত করাই ইহার উদ্দেশ্য।

আজ পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের শরৎ-কালীন অধিবেশন আরম্ভ হইলে কলিকাতা উন্নয়ন সংশোধন বিলটি বিবেচনার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

আনন্দবাজার পত্রিকার অন্যতম সহ-সম্পাদক শ্রীঅমলেন্দু দাশগুপ্ত আজ রাত্রি ১১টার সময় তাঁহার কারবালা ট্যাঙ্ক লেনস্থ বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। শ্রীদাশ-গুপ্ত ছয় মাস যাবৎ কঠিন যকৃতপীড়ায় ভুগিতেছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৫২ বৎসর হইয়াছিল।

১২ই আগস্ট—গতকল্য পাটনায় রাজ্য পরিবহন কর্মীদের সহিত বিহার ন্যাশনাল কলেজের ছাত্রগণের যে সংঘর্ষ হইয়াছিল অদ্য তাহার পরিণতি চরমে উঠে। এইদিন পাটনায় বিহার ন্যাশনাল কলেজের সম্মুখে পুলিস গুলীবর্ষণ করিলে একজন ছাত্র নিহত এবং অন্যান্য কয়েকজন আহত হয়।

প্রথিতযশা জননায়ক এবং 'আনন্দবাজার পত্রিকা', 'হিন্দুস্থান স্টান্ডার্ড' ও 'দেশ' পত্রিকার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পরিচালক স্বর্গত সুরেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের প্রথম তিরোধান বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে আজ কলিকাতার নাগরিকগণ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সমবেত হইয়া তাঁহার অমর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধার অর্ঘ নিবেদন করেন।

পর্তুগীজ উপনিবেশ দিউ-এ সন্ধ্যা হইতে সকাল পর্যন্ত কার্ফু জারী করা হইয়াছে।

১৩ই আগস্ট—আজ পাটনায় পুলিস পুনরায় বি এন কলেজের সম্মুখে গুলী চালনা করে। ফলে ৬ জন নিহত ও প্রায় ২৫ জন আহত হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গের শ্রীহেমন্তকুমার বসুর নেতৃত্বে যে ৬৫ জন সত্যাগ্রহী গোয়া সীমান্ত অতিক্রম করিয়া পর্তুগীজ এলাকায় প্রবেশ করিয়াছিলেন, পুলিস তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। গোয়ার মুক্তির দাবীতে আজ কলিকাতার বিভিন্ন স্কুল কলেজের ছাত্রগণ ধর্মঘট করেন।

১৪ই আগস্ট—পর্তুগীজ সরকার অদ্য সকাল হইতে সমগ্র গোয়ায় সামরিক আইন জারী করিয়াছেন। গোয়ার গভর্নরের [illegible] সামরিক আইন প্রয়োগের পূর্ণ ক্ষমতা [illegible] করা হইয়াছে। পর্তুগীজ নেতারা কারো[illegible] গোয়া সীমান্ত কার্যত বন্ধ করিয়া দি[illegible] এবং তাহারা সীমান্ত-রেখার পাঁচ ছয় মাই[illegible] মধ্যে অগ্রসর হইয়াছে। এদিকে গো[illegible] স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র বেল[illegible] হইতে দুই সহস্রাধিক নিরস্ত্র ভারতী[illegible] সীমান্ত অঞ্চলে প্রেরণ করা হইয়াছে।

১৫ই আগস্ট—অদ্য গোয়া [illegible] সত্যাগ্রহে পশ্চিমবঙ্গের একজন মহিলা [illegible] ২০ জন সত্যাগ্রহী পর্তুগীজ পুলি[illegible] গুলীতে নিহত হন। অদ্যকার ঘটনার [illegible] সত্যাগ্রহ প্রত্যাহৃত হইয়াছে।

বিদেশী সংবাদ

৮ই আগস্ট—আজ জেনেভায় আণ[illegible] শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার সংক্রান্ত [illegible] আন্তর্জাতিক সম্মেলন আরম্ভ হয়। ভার[illegible] খ্যাতনামা বিজ্ঞানী ডাঃ হোমী ভাবা সভাপ[illegible] আসন গ্রহণ করেন। পৃথিবীর ৭৩টি [illegible] হইতে আগত প্রায় ১২ শত প্রতিনিধির সম্[illegible] সভাপতি ডাঃ ভাবা ঘোষণা করেন, '[illegible] নিঃসংশয়চিত্তে এই ভবিষ্যদ্বাণী করিতে [illegible] যে, হাইড্রোজেন বোমার বিধ্ব[illegible] ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া উহাকে মা[illegible] কল্যাণে ব্যবহার করা আগামী ২০ বৎস[illegible] মধ্যেই সম্ভবপর হইবে।'

১০ই আগস্ট—বৃটিশ আণবিক [illegible] সংস্থার অধ্যক্ষ স্যার জন কক্‌রফট ঘো[illegible] করেন যে, হাইড্রোজেন বোমার বিপুল শ[illegible] আয়ত্তের মধ্যে আনিয়া উহাকে শান্তিম[illegible] উদ্দেশ্যে নিয়োগের জন্য বৃটেনে গবে[illegible] আরম্ভ হইয়াছে।

ভিয়েৎনামে সাধারণ নির্বাচনের প্রস্তু[illegible] কল্পে আলাপ আলোচনার যে প্রস্তাব [illegible] ভিয়েৎনাম সরকার পেশ করিয়াছিলেন, দ[illegible] ভিয়েৎনাম সরকার অদ্য তাহা কার্যত অ[illegible] করিয়া দিয়াছেন।

১১ই আগস্ট—চৌধুরী মহম্মদ আ[illegible] নেতৃত্বে ১১ জন সদস্য লইয়া গ[illegible] পাকিস্থানের প্রথম কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা [illegible] শপথ গ্রহণ করেন। কোয়ালিশন মন্ত্রিস[illegible] দুইটি দলের সদস্যসংখ্যা এইরূপ—মুস[illegible] লীগ—৬ এবং যুক্তফ্রন্ট—৫। নূতন ম[illegible] সভায় যুক্তফ্রন্ট দলের নেতা মিঃ এ কে ফজ[illegible] হক, শ্রীকামিনীকুমার দত্ত, ডাঃ খান সা[illegible] প্রভৃতিকে গ্রহণ করা হইয়াছে। ১৯[illegible] সালে শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের পদত্যাগের [illegible] এই প্রথম সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের এ[illegible] প্রতিনিধিকে গ্রহণ করা হইল।

১২ই আগস্ট—জার্মানীর খ্যাত[illegible] সাহিত্যিক টমাস ম্যান ৮০ বৎসর ব[illegible] সুইজারল্যাণ্ডে পরলোকগমন করিয়াছেন।

প্রতি সংখ্যা—[illegible] আনা বার্ষিক—১২০, ষাণ্মাসিক—১০,
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ৬ ও ৬/১ সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১৩
শ্রীপ্রভাসচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস লিমিটেড হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

২২ বর্ষ
৪৩ সংখ্যা

দেশ

শনিবার
১০ ভাদ্র, ১৩৬২

DESH
SATURDAY, 27TH AUGUST, 1955.

সম্পাদক—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন
সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

পর্তুগালের সহিত সম্পর্ক ছেদন

ভারত সরকার ইতোপূর্বে দিল্লীর পর্তুগীজ দূতাবাস বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন, তথাপি পর্তুগীজ সরকারের সহিত তাঁহারা সমগ্রভাবে রাজনীতিক সম্পর্ক ছেদন করেন নাই। বোম্বাই, মাদ্রাজ এবং কলিকাতাস্থ পর্তুগীজ বাণিজ্য দূতাবাসগুলির কাজ চলিতেছিল। সম্প্রতি এই সব বাণিজ্য দূতাবাসগুলিও ১লা সেপ্টেম্বর হইতে বন্ধ করিয়া দিবার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। তদনুযায়ী ভারত সরকারও পর্তুগীজ ছিটমহল হইতে ভারতীয় বাণিজ্য দূতকে সরাইয়া আনিবেন। আমাদের মতে এই সিদ্ধান্ত পূর্ব হইতেই গ্রহণ করা উচিত ছিল। প্রকৃতপক্ষে পর্তুগীজ সরকার ভারতের মাটিতে এবং ভারতীয় অধিবাসীদের উপর যেরূপ নৃশংস বর্বরতা আরম্ভ করিয়া দিয়াছে, গোয়াকে ভারতের অবিভাজ্য অংশস্বরূপে স্বীকার করিবার পর এবং পর্তুগীজ সরকারের আচরণ সভ্য জগতের সরকারসমূহের সম্পূর্ণ রীতিবিরুদ্ধ এমন কথা বারংবার ঘোষণা করিবার পর সেই সরকারের সহিত ভারতের কোন সম্পর্ক রাখাই উচিত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। কিন্তু শান্তির নীতি পাছে ক্ষুন্ন হয়, এই আশঙ্কায় ভারত সরকার সরাসরি তেমন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে এতদিন পর্যন্ত সঙ্কোচ বোধ করিয়াছেন। ১৫ই আগস্টের ব্যাপারে ভারতব্যাপী বিক্ষোভের ফলে তাঁহাদের দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট হয়। এই দিবস বিক্ষুব্ধ জনগণ কর্তৃক ভারতস্থ কয়েকটি কেন্দ্রে পর্তুগীজ দূতাবাস আক্রান্ত হয়। কলিকাতা এবং বোম্বাইয়ে এই সম্পর্কে অবস্থা অনেকটা গুরুতর আকার ধারণ করে। উত্তেজিত জনতা বাণিজ্য দূতাবাসে হামলা করে। ভারতের প্রধান মন্ত্রী এজন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি দূতাবাসগুলির ক্ষতিপূরণের দায়িত্বও স্বীকার করিয়া লন। আন্তর্জাতিক নীতির দিক হইতে দূতাবাসগুলি রক্ষার দায়িত্ব অবশ্যই আছে এবং প্রত্যেক সভ্য সরকার তৎসম্পর্কিত দায়িত্ব প্রতিপালনে বাধ্য থাকেন। কিন্তু দেশের স্বার্থ এবং রাষ্ট্রীয় মর্যাদাকে কোন সরকারই ক্ষুন্ন করিতে পারেন না। সেই দিক হইতে জনমতকেও তাঁহাদিগকে মান্য করিয়া চলিতে হয়। ফলত এই কর্তব্য তাঁহাদের পক্ষে সর্বপ্রথম। পর্তুগীজ সরকার ভারত সম্পর্কে যেরূপ সভ্যতাবিরোধী মনোভাব লইয়া অগ্রসর হইতেছে, তাহাতে এই দিক হইতে কর্তব্য প্রতিপালন করিবার প্রয়োজনে অন্য কোন দেশের সরকার তাঁহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিতেন এবং তাহার ফলে পর্তুগীজ সরকারের সঙ্গে তাঁহাদের সমগ্র সম্পর্ক অনেক আগেই ছিন্ন হইত। সুতরাং জনসাধারণের পক্ষেও ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার কারণ দেখা দিত না। ভারত সরকারের শান্তিপূর্ণ নীতির রাজনীতিক তাৎপর্য আমরা একেবারে না বুঝি এমন নহে; কিন্তু পর্তুগীজ বর্বরতার বিরুদ্ধে ব্যাপক এবং আন্তর্জাতিক নৈতিক শক্তি জাগ্রত করিবার দিক হইতে তাঁহাদের নীতি আজও যথেষ্ট বলিষ্ঠতার সহিত প্রযুক্ত হইতেছে না ইহাই আমাদের বিশ্বাস। বাণিজ্য দূতাবাসগুলি বন্ধ করিয়া দেওয়ার পরও এই সম্বন্ধে তাঁহাদের আরও অগ্রসর হইবার প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী তেমন ব্যবস্থা অবলম্বনে উদ্যোগী হইয়াছেন। তাঁহার সাম্প্রতিক এমন উক্তিতে আমরা আশ্বস্ত হইয়াছি।

নিন্দনীয় মনোবৃত্তি

বিহারের ছাত্র আন্দোলন স্থগিত হইয়াছে, ইহা সুখের বিষয়। পাটনায় বাস কণ্ডাক্টরের সহিত ছাত্রদের ভাড়া লইয়া সামান্য রকমের বচসা সারা বিহারে অশান্তি বিস্তার করে। এই অশান্তির ফলে বিহারে ভারতীয় স্বাধীনতা দিবসের উৎসব পণ্ড হইয়া যায়। পুলিস অবিবেচিতভাবে গুলী চালাইয়া অশান্তির কারণ পাকাইয়া তোলে আমাদের ইহাই মনে হয়। কিন্তু পুলিসের কার্য সম্বন্ধে তদন্তের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবার পর এই অশান্তির কারণ সম্পূর্ণভাবে নিরাকৃত হইয়াছে। এই ব্যাপারে ছাত্রেরা দেশের স্বার্থ এবং জাতির মর্যাদাকে পর্যন্ত উচ্ছৃঙ্খলতার বশে লঙ্ঘন করে, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। তাহারা সরকারী আফিসে আদালতের উপর হইতে ভারতের জাতীয় পতাকা নামাইবার জন্য জিদ ধরে। তাহারা কোন স্থানে জাতীয় পতাকা অপসারিত করিয়া তাহার স্থলে শোকসূচক কৃষ্ণপতাকা উত্তোলন করিতে চেষ্টা করে;

জাতীয় পতাকা পোড়াইয়া দেয় পর্যন্ত। এইসব কাজ কোন স্বাধীন দেশের তরুণোচিত মনোবৃত্তির নিশ্চয়ই পরিচায়ক নয়। সরকারী ব্যবস্থাবিশেষের বিরুদ্ধে ছাত্রদের আপত্তির কারণ থাকিতে পারে এবং সেজন্য তরুণদের বিক্ষোভের কারণ ঘটিবে ইহাও অস্বাভাবিক নহে। তরুণদের চিত্ত স্বভাবতই ভাবপ্রবণ। অন্যান্য দেশেও তরুণদের সম্পর্কে এই ধরনের সমস্যা কখনো কখনো দেখা দেয়। কিন্তু কোন দেশেই তরুণেরা উত্তেজিত হইয়া জাতীয় পতাকাকে অমর্যাদা করিয়াছে এমন কথা শোনা যায় না। পক্ষান্তরে দেশ এবং জাতির মর্যাদার প্রতি আঘাতের কারণই তাহাদের বিক্ষোভের মূলে প্রধানত কাজ করিয়া থাকে। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে বিহার গৌরবময় ঐতিহ্য সৃষ্টি করিয়াছে। স্বদেশের মুক্তিকামী সন্তানদের শোণিতোৎসর্গে বিহারের ভূমি পবিত্র হইয়াছে। বিহারের সেই মর্যাদা কোনভাবে ক্ষুণ্ন না হয় অতঃপর বিহারের ছাত্রনেতারা সেদিকে লক্ষ্য রাখিয়া অগ্রসর হইবেন, আমরা ইহাই দেখিতে চাই। বিহারের বর্তমান মন্ত্রিমণ্ডল বা সেখানকার পুলিসের বিরুদ্ধে তাহাদের কোন আন্দোলন সমগ্রভাবে দেশের স্বার্থ বা জাতির মর্যাদার পরিপন্থী হয় ইহা কোনক্রমেই বাঞ্ছনীয় নহে এবং তেমন কাজ স্বাধীনতালব্ধ জাগ্রত ভারতের তরুণদের পক্ষে নিতান্তই গর্হিত এবং নিন্দনীয়।

সমাজ-বিরোধী কাজ

সমাজবিরোধী ক্রিয়াকলাপ দমনের উদ্দেশ্যে কলিকাতার পুলিস কর্তৃপক্ষ যে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা দেশবাসীর সমর্থন এবং প্রশংসা লাভ করিবে। সমাজবিরোধী এই সংজ্ঞাটি খুবই ব্যাপক। আজকাল কতকগুলি বিশেষ শ্রেণীর অপরাধ এই সংজ্ঞার দ্বারা সাধারণের দৃষ্টির মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সম্প্রতি বিধান সভায় এই সম্পর্কে যে বিবৃতি দিয়াছেন, তাহাতে মহিলাদের প্রতি কুৎসিত ইঙ্গিত এবং তাঁহাদের মর্যাদাহানিকর আচরণ, এই অপরাধে দণ্ডিত ব্যক্তিদের উল্লেখ দেখা যায়। ইতোপূর্বে এই ঘৃণ্য অপরাধের কথা শাসন-বিভাগ কর্তৃপক্ষকে সমাজ-বিরোধী কার্যস্বরূপে স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করিতে হইয়াছে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। আমরা সভ্য দেশের অধিবাসী এবং সভ্য জাতি বলিয়া আমরা গর্ব করি। কলিকাতা পশ্চিমবঙ্গের সভ্য এবং শিক্ষিত সমাজের কেন্দ্রস্থল। এই শহরে নারী, বিশেষভাবে ছাত্রী ও তরুণীদের প্রতি আচরণ সম্পর্কে এই শ্রেণীর অপরাধ আজও অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রশ্রয় পায়, ইহা অত্যন্তই লজ্জার কথা। এই সব অপরাধের কথা শুনিলেও আমাদের মাথা লজ্জায় অবনত হয়। আমাদের মতে শহরের বুক হইতে এই অপরাধ উৎখাত করিবার জন্য সর্বপ্রকার কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার। বস্তুত এই শ্রেণীর অপরাধের দণ্ড সমাজকে নৈতিক বোধে যথেষ্ট রকমে জাগ্রত করে, এমন হওয়া প্রয়োজন। ফলত সমাজ-বিরোধীদের প্রতি দণ্ডদান যদি সমাজের সকল স্তরে অপরাধের প্রতি ঘৃণা এবং তৎপ্রতিকারে নৈতিক আগ্রহ উদ্দীপ্ত করিবার উপযোগী না হয়, তবে দণ্ডদানের উদ্দেশ্য সম্যকরূপে সাধিত হইতে পারে না।

কর বৃদ্ধির নূতন পর্ব

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী কর বৃদ্ধির অভিনব পর্বে অবতীর্ণ হইয়াছেন। কিছুদিন পূর্বে কলিকাতা শহরে আমদানী চা এবং টাটকা ফলের উপর শুল্কে বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়। সম্প্রতি চিনি, দিয়াশলাই এবং সোনার গহনার উপরও বিক্রয়কর ধার্যের প্রস্তাব করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, একের পর আর এরূপ কর বৃদ্ধির সরকারী উদাম সর্বসাধারণের পক্ষে প্রসন্নচিত্তে অভিনন্দন করা সম্ভব হইবে না। চা, চিনি এবং দিয়াশলাই এই তিনটি বস্তু জনসাধারণের নিত্য আবশ্যক। টাটকা ফলের প্রয়োজন রোগী ও শিশুদের পক্ষে সামান্য নয়। সোনার গহনা ঠিক এই পর্যায়ে পড়ে না; কিন্তু পারিবারিক জীবনে ইহার প্রয়োজন রহিয়াছে। কন্যাদায়গ্রস্ত মধ্যবিত্ত এবং দরিদ্র পরিবারসমূহের পক্ষে ইহা জটিল সমস্যার সৃষ্টি করিবে। চিনি এবং দিয়াশলাইয়ের উপর চড়া হারে শুল্ক বর্তমানে ধার্য রহিয়াছে। ইহার সঙ্গে বিক্রয়কর যুক্ত হইলে চা প্রকৃতপক্ষে ক্রেতাসাধারণের উপরই গি পড়িবে। নানাপ্রকার করভারে পশ্চিম বঙ্গের জনসাধারণ পূর্ব হইতে প্রপীড়িত। বিপুল বেকার সমস্যা এখানকার সমাজ-জীবনকে বিপর্যস্ত করিয়া ফেলিয়াছে। খাদ্যশস্যের মূল্য কিছু কমিলেও বস্ত্রের মূল্য ক্রমাগত চড়িতেছে। অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তুর মূল্যও সুলভ হইতেছে না। বর্তমানে সরকার বিপুল ব্যয়সাধ্য উন্নয়ন পরিকল্পনার রূপায়নে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, সুতরাং আয় বৃদ্ধির প্রয়োজন তাঁহাদের দেখা দিয়াছে; কিন্তু বাস্তব অবস্থার সকল দিকে সজাগ দৃষ্টি ও সমদৃষ্টি রাখিয়াই করবৃদ্ধি ও নূতন কর ধার্য করিবার কাজে তাঁহাদের অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন।

প্রধানমন্ত্রীর আসাম পরিদর্শন

ভারতের প্রধানমন্ত্রী কয়েকদিনের জন্য আসাম পরিদর্শনে আগমন বর্তমানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বন্যা-পীড়িত আসামের বহুবিধ সমস্যা রহিয়াছে। সর্বোপরি উত্তর-পূর্ব সীমান্ত এজেন্সীর শাসনাধীন এলাকায় ভারত সরকার হইতে এক ব্যাটালিয়ন সৈন্য প্রেরণ করিতে হইয়াছে। নাগা পাহাড় অঞ্চলের উপদ্রবই ইহার কারণ। ভারত সরকারের পক্ষ হইতে এই অঞ্চলে সৈন্য প্রেরণ এই প্রথম। ভারতীয় লোকসভায় প্রধানমন্ত্রী এই অঞ্চলের অশান্তি এবং উপদ্রবের যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহাতেই এতৎসম্পর্কিত গুরুত্ব উপলব্ধি হয়। সরকার-বিরোধী উপজাতিগণের এক শ্রেণীর প্রচেষ্টা সত্যই আশঙ্কার কারণ সৃষ্টি করিয়াছে। ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত হিসাবে এই অঞ্চলের সামরিক গুরুত্ব রহিয়াছে। এইরূপ অসাধারণ কূটনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন এলাকার অবস্থা সর্বপ্রকারে শান্তিপূর্ণ সবল ও সুদৃঢ় থাকে, ইহাই প্রয়োজন। বস্তুত এই অঞ্চলে কোন বিপদ দেখা দিলে সমস্ত ভারতের নিরাপত্তা বিপন্ন হইতে পারে। এমন অনর্থ ঘটিবার সম্ভাবনা অঙ্কুরেই উৎপাটন করা সরকারের অবশ্য কর্তব্য।

বৈদেশিকী

পর্তুগীজ দুঃশাসন থেকে গোয়ার মুক্তি একদিন হবেই, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু তার পূর্বে ঘটনার স্রোত কোন্ দিকে বইবে ঠিক বুঝা মুশকিল। ১৫ই আগস্টের হত্যাকাণ্ডের পরে অনেক দেশে পর্তুগীজ সরকারের নিন্দা হয়েছে, কিন্তু আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এর জন্য এখনো এমন কিছু আলোড়ন হয় নি যার ফলে পর্তুগীজ সরকার ভয় পেয়ে গোয়া ছেড়ে যাবার আয়োজন করবে। তাছাড়া, বিদেশী সমালোচনা সব ক্ষেত্রে যে কেবলমাত্র পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে হয়েছে তা নয়, ভারত সরকারের আচরণের উপরও এক শ্রেণীর সমালোচকরা কটাক্ষপাত করে পর্তুগীজদের ভরসা জুগিয়ে চলেছে। এই শ্রেণীর সমালোচকদের মধ্যে ইংলণ্ডের কতকগুলি নামজাদা সংবাদপত্রও আছে।

অন্যপক্ষে ভারত সরকারের নীতি ভারতবাসীর নিকটও যে খুব সুস্পষ্ট তাও বলা যায় না। ভারত সরকারের মুখপাত্রগণ ক্রমাগত বলে যাচ্ছেন যে, সরকার তাঁর মূল নীতি—অর্থাৎ শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমস্যা সমাধানের নীতি—কিছুতেই পরিত্যাগ করবেন না অর্থাৎ পর্তুগীজরা যাই করুক না কেন, ভারত সরকার বলপ্রয়োগের পন্থা কিছুতেই অবলম্বন করবেন না। সরকারের পক্ষ থেকে লোকের মনে এই ধারণা সৃষ্টি করার চেষ্টা হচ্ছে যে, পর্তুগীজরা ভারত সরকারকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করছে, যাতে ভারত সরকার বলপ্রয়োগের পথে যান, কিন্তু ভারত সরকার উত্তেজিত না হয়ে শান্ত থেকে পর্তুগীজদের দুরভিসন্ধি ব্যর্থ করে দিচ্ছেন।

উপরোক্ত যুক্তির সারবত্তা সাধারণ বুদ্ধিতে বুঝা সহজ নয়। পর্তুগীজদের দুরভিসন্ধি যদি এই হয় যে, যেন-তেন প্রকারেণ ভারত সরকারকে বলপ্রয়োগের পথে আনা (বহু সংখ্যক ভারতবাসীও কিন্তু তাই চায়) এবং ভারত সরকার বলপ্রয়োগের পন্থা নিলে যদি গোয়া থেকে পর্তুগীজদের উচ্ছেদ সাধন তিন দিনের মাত্র কাজ হয় (যা ভারত সরকারের মুখপাত্রগণের কথা থেকে ভারতবাসীদের ধারণা হয়েছে), তাহলে বুঝতে হবে যে, পর্তুগীজরা চাচ্ছে যে, ভারত সরকার অবিলম্বে তাদের মেরে গলা ধাক্কা দিয়ে গোয়া থেকে বার করে দিন।

পর্তুগীজদের এরূপ অদ্ভুত ইচ্ছার অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্য একটা অত্যন্ত জটিল যুক্তিজাল সৃষ্টি করা যেতে পারে, কিন্তু সেটা সাধারণ লোকের নিকট বিশ্বাস্য হবে না। সাধারণ লোক ভাবছে যে, ভারত সরকার বলপ্রয়োগের পথে যাবেন না, এই ঘোষণার জন্যই পর্তুগীজরা এতো বাড়াবাড়ি করতে সাহস করছে।

যুদ্ধবিরোধী নীতির সমর্থকরূপে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের সুনাম নষ্ট হবে, কেবল এই ভয়েই ভারত সরকার বলপ্রয়োগ করতে পারছেন না এবং পারেন না—এই ধারণার বশবর্তী হয়েই যে পর্তুগাল কোনো রকম মীমাংসার আলোচনায় আসতে চাইছে না, তা নিশ্চিত

বলা যায় না। পর্তুগীজ সরকার বার বার ভারত গবর্নমেন্টের প্রতি আক্রমণাত্মক মনোবৃত্তি আরোপ করেছেন। কেবল আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তিপ্রিয়তার সুনাম রক্ষার জন্যই ভারত সরকার হাত গুটিয়ে বসে আছেন, এরূপ মনে করার মতো শ্রদ্ধা ভারত সরকারের প্রতি পর্তুগীজদের আছে কি না সন্দেহ। পর্তুগীজরা নিশ্চয়ই ভাবছে যে, ভারত সরকার যে বলপ্রয়োগের পথে যেতে চাচ্ছেন না, তার কারণ ভারত সরকার তার ফলাফল সম্বন্ধে ভীত, গোয়া থেকে পর্তুগীজ হঠানো ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর কড়ে আঙুলের কাজ হলেও তা করতে গেলে ভারতবর্ষকে একটা জটিল অবস্থার মধ্যে গিয়ে পেঁছতে হতে পারে। সেই ভয়ই ভারত সরকারের আসল ভয়। কিছু দিন পূর্বে লোকসভায় প্রধান মন্ত্রী মহাশয় এক বক্তৃতায় এই ভয়ের একটু আভাসও পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু সেটাকে যথাসম্ভব চাপা দিয়ে "আমরা সংযম দেখাচ্ছি এবং পর্তুগীজদের শতরকম খোঁচানি সত্ত্বেও আমাদের সংযম ভঙ্গ করতে পারছে না"—এই কথাই সরকারী প্রচারের মূলমন্ত্র হয়েছে। তার দ্বারা পর্তুগীজরা যথেষ্ট জব্দ হচ্ছে কি না এবং ভারতবাসীরাও সরকারের মতের তাল পাচ্ছে কিনা সন্দেহ।

সরকার পর্তুগালের সঙ্গে সর্বপ্রকার কূটনৈতিক সম্বন্ধচ্ছেদের সিদ্ধান্ত করেছেন। গোয়ার উপর অর্থনৈতিক চাপ প্রয়োগের ব্যবস্থাও কঠোরতর করার চেষ্টা অবশ্যই হবে। গোয়ার বন্দর আংশিকভাবে অচল করার প্রয়াসও চলছে, অবশ্য তার জন্য বেসরকারী চেষ্টা যা হয়েছে এখন পর্যন্ত সেটাই উল্লেখযোগ্য। বম্বের ডক-শ্রমিকগণ কোনো গোয়াগামী জাহাজের মালে হাত দেবে না বলে স্থির করেছেন। কিন্তু করাচী সরকার এবং করাচীর ডক-শ্রমিকগণ যদি এ বিষয়ে সহযোগিতা না করেন, তবে গোয়ার বন্দর অচল করা যাবে না।

কিন্তু সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হচ্ছে, গণ-আন্দোলনের সম্পর্কে ভারত সরকার কী নীতি চালাবেন। সত্যাগ্রহ আন্দোলনের প্রতি সরকারের ভাব মোটেই পরিষ্কার নয়। মনে হয় যেন সরকার সত্যাগ্রহ চান আবার চানও না। সত্যাগ্রহ আন্দোলনের চাপ পর্তুগীজরা অনুভব করুক, এটা সরকারের অভিপ্রেত বলে মনে হয়, আবার একসঙ্গে বেশি সংখ্যক সত্যাগ্রহীর গোয়া গমনের ফলে যে অবস্থার উদ্ভব হওয়ার সম্ভাবনা, সেটার সম্মুখীন হতেও গবর্নমেন্টের আগ্রহ নেই।

১৫ই আগস্ট গোয়ায় নিরস্ত্র সত্যাগ্রহীদের গুলী করে মারার যে প্রতিক্রিয়া ভারতে হয়েছে, সেটা সরকারকে নিশ্চয়ই ভাবিত করে তুলেছে। ১৫ই আগস্টের ঘটনার পরে পর্তুগীজদের উপর ভারতবাসীর যে ক্রোধ বৃদ্ধি হয়েছে, যদি অনুরূপ ঘটনা আবার ঘটে, তবে সেটা যে কী আকারে ফেটে পড়বে বলা যায় না। পর্তুগীজদের ১৫ই তারিখের আচরণের ফলে কোনো কোনো দল অহিংস সত্যাগ্রহের পথ ছেড়ে অন্য ধরনের কাজের দিকে ঝুঁকতে পারেন। কারণ যাঁরা এই আন্দোলনে ছিলেন, তাঁদের মধ্যে অনেকের উদ্দেশ্যই ছিল ভারত সরকারকে "পুলিস অ্যাকশনের" পথে নামানো, সত্যাগ্রহকে তাঁরা "পুলিস অ্যাকশনের" বিকল্প বলে গ্রহণ করেন নি। তবে একদল আছেন যাঁরা সত্যাগ্রহকে "পুলিস অ্যাকশনের" বিকল্প বলে মনে করেন। ১৫ই আগস্টের ঘটনার পরেও তাঁরা অহিংস সত্যাগ্রহের নীতি অনুসরণ করতে চান এবং আগামী ২রা অক্টোবর গান্ধীজীর জন্মবার্ষিকীতে আবার বহুসংখ্যক সত্যাগ্রহীর অভিযানের ব্যবস্থা তাঁরা করবেন বলে সংবাদে প্রকাশ।

সমস্ত মিলে অবস্থাটা বেশ জটিল হয়েছে, ভারত সরকারের নীতির অস্পষ্টতার দরুণ ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিছু বলাও মুশকিল। এটা একেবারে অসম্ভব নয় যে, অবস্থা আরো একটু ঘোরালো হলে পর্তুগালের বন্ধুরা পর্তুগালকে এই পরামর্শ দিতে পারেন যে, গোয়া ভারত ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত হবে কি না, সেটা আন্তর্জাতিক পরিদর্শকদের অধ্যক্ষতায় অনুষ্ঠিত গণভোটের দ্বারা স্থির হোক। তারপর গণভোট বিলম্বিত করা বা তার উদ্দেশ্য ব্যর্থ করার জন্য পর্তুগীজরা নানা রকম কৌশল প্রয়োগ করতে পারে। প্রশ্নটা একবার "আন্তর্জাতিকতার" খপ্পরে পড়লে তার মীমাংসা অদূর ভবিষ্যতে হবে বলে বোধ হয় না।

*

মরক্কো ও অ্যালগেরিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলন ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের সংঘর্ষ সম্প্রতি অতি ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। বর্তমানে ফরাসী সৈন্যদলের অবর্ণনীয় নিষ্ঠুর নিষ্পেষণকার্য চলছে। "বিদ্রোহী"দের আশ্রয়দানকারী গ্রাম ও জনপদ ছারখার করে দেওয়া হচ্ছে।

গোয়ার কথা উঠলেই অনেকে পর্তুগীজদের সঙ্গে তুলনা করে ফরাসীদের সুবুদ্ধির প্রশংসা করেন। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে ব্যাপারটা অন্যরকম দেখা যাবে। মরক্কো, টিউনিস, অ্যালগেরিয়ায় যে অর্থে ফরাসী উপনিবেশ গড়ে উঠেছে, তার সঙ্গে পণ্ডিচেরীর সঙ্গে তার পার্থক্য ছিল। উত্তর আফ্রিকার ফরাসী ঔপনিবেশিকরা কেবলমাত্র শাসনের কর্তৃত্ব ও ব্যবসা-বাণিজ্যে সুযোগ হস্তগত করেছে তা নয়, অধিকাংশ ভালো জায়গাজমিগুলিও তারা নিজেদের খাস করে রেখেছে। ফরাসী শাসনের অপসারণের অর্থই হবে তাদের সেই সব সুবিধা ও বিপুল খাস জমিদারীর অবসানের সূত্রপাত। পণ্ডিচেরীতে অন্তত আধুনিককালে অবস্থা সেরকম ছিল না। তা সত্ত্বেও পণ্ডিচেরীও ফরাসীরা সহজে ছাড়ে নি, তবে বলা বাহুল্য, ফরাসীরা এতো বোকা নয় যে, পণ্ডিচেরীর জন্য যুদ্ধ করতে যাবে। কিন্তু যেখানেই স্বার্থের পরিমাণ বেশি, সেইখানেই যুদ্ধ করেছে এবং করছে। ফরাসীদের পক্ষে পণ্ডিচেরীর ঔপনিবেশিক মূল্য যা ছিল, পর্তুগীজদের পক্ষে গোয়ার ঔপনিবেশিক মূল্য তার চেয়ে বেশি, পর্তুগীজদের পক্ষে গোয়া কিছুটা আফ্রিকায় ইউরোপীয় উপনিবেশগুলির পর্যায়ে পড়ে। কেনিয়ায় ইংরেজ যা কাণ্ড করছে, মরক্কোতে ফরাসীরা যে কাণ্ড করছে গোয়ায় পর্তুগীজ আচরণ তার সঙ্গে তুলনীয়।

২৪-৮-৫৫

১

১৯৫২ সাল। মে মাস।

আবার কেদার-বদরী-যাত্রার উদ্যোগ করছি।

কিছুদিন আগে ভাইপো বিলেত থেকে ফিরেছে। বৈজ্ঞানিক, বিজ্ঞান-বিষয়ে গবেষণা করছে। সব কিছু নিজের বিদ্যাবুদ্ধি দিয়ে যাচাই করে দেখে, যার প্রমাণ পায় না তা মানতে চায় না।

আমার যাওয়ার খবর শুনে বলে, আবার কেদার-বদরী চললে কেন? একবার ত ঘুরে এসেছ। যাও না, ইউরোপ দেখে এস। ও-দিকে ত কখনো যাও-ই নি। অনেক কিছু নতুন দেখবে। আর যদি পাহাড়েই বেড়াতে চাও—চলে যাও সুইজারল্যাণ্ডে। কী অপূর্ব দেশ! পাহাড় পাবে, স্নো পাবে, লেক্ পাবে। যেমন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, তেমনি টুরিস্টদের থাকবার সুবন্দোবস্ত। পায়ে হাঁটার কষ্ট নেই, চটিতে থাকার অসুবিধে নেই। সব কিছুই হাতের কাছে পাবে, এমন কি পাহাড়ের বরফ-ঢাকা চূড়ায় পর্যন্ত ট্রেনে করে পৌঁছে দেবে!

চুপ করে শুনি, আর হাসি।

তারপরে বলি, হাঁ—তাইত গল্প শুনি, বই-এ পড়ি, ছবিও দেখি। পাস-পোর্টও ত করা আছে। কিন্তু তবুও যাওয়া হচ্ছে কই? যখনি সুযোগ আসে তখনি হিমালয়ের দিকেই মন ছোটে,—বার হয়ে পড়ি। যেতেই হয়।

ভাইপোও হাসে। বলে, আশ্চর্য! তোমাদের এসব বুঝি না কিছু। বুঝেও কাজ নেই আমার!

তারপর একাই যাত্রা করি। যাত্রা সাঙ্গ করে ফিরেও আসি—পরিপূর্ণ পরিতৃপ্তি নিয়ে।

২

বছর ঘুরে যায়। আবার মে মাস আসে।

হিমালয়ের দুর্নিবার আকর্ষণ ঘর-ছাড়া মনকে আবার পথে টানে। যাত্রার আয়োজন করি।

ভাইপো খবর শুনে কাছে এসে দাঁড়ায়। হাসে। বলে, পাগল হলে নাকি? আবার চলেছ কেদার-বদরী? এইত সেদিন ঘুরে এলে?

তারপর, আবার পশ্চিম-যাত্রার পরামর্শ দেয়, পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রোজ্জ্বল প্রগতির পরিচয় দেয়। হঠাৎ গম্ভীর হয়ে প্রশ্ন করে, আচ্ছা—সত্যি বলো ত ওখানে বারবার গিয়ে কি কোন আনন্দ পাও?

উত্তর দিই, পাই বই কি। নিশ্চয় পাই এবং আশাতীত পাই। নইলে যাবোই বা কেন? কেউ ত এখান থেকে জোর করে পাঠায় না। তবে কেন যে যাই, কি যে পাই—বোঝাতে পারি না।

ভাইপো গম্ভীর হয়েই বলে, চলো, এবার আমিও যাবো তোমার সঙ্গে। একবার দেখে আসি, কি আছে ওখানে। পারবো না যেতে,—শুনেছি নাকি খুব কষ্টকর পথ?
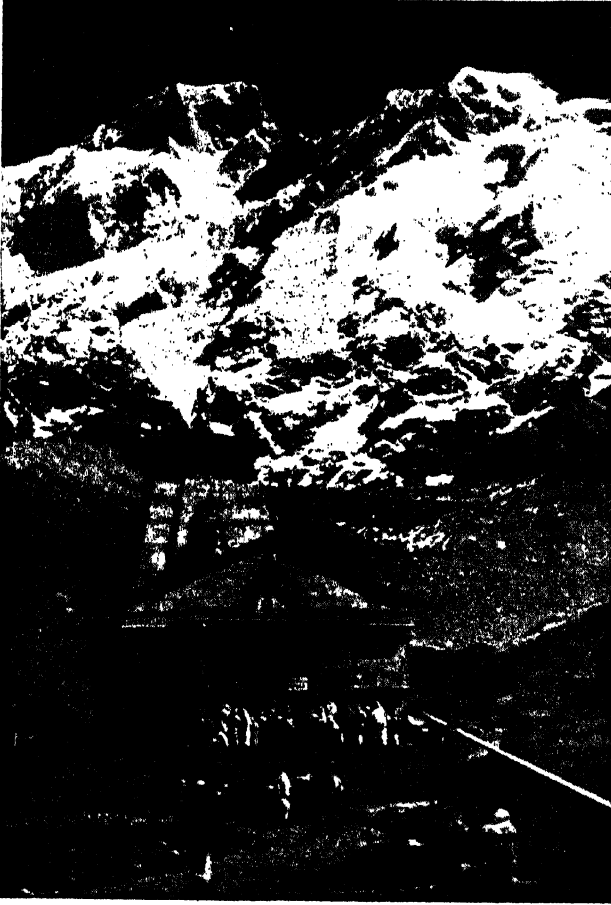
কেদারনাথ

যে কেউ আসে কেদার-বদরী-যাত্রার পরামর্শ নিতে, নিঃসঙ্কোচে যেতে উৎসাহ দিই। বলি, দ্বিধা না করে বেরিয়ে পড়ুন। কোনও ভয় নেই। সুবিধে-অসুবিধের, বাধা-বিপত্তির হিসেব-নিকেশ করতে যাবেন না, করলেই হিসেবে মিলবে না, যোগে ভুল হবে—যাওয়ায় বাধা ঘটবে। বার হয়ে পড়লেই দেখবেন, ঠিক ঘুরে এসেছেন।

ভাইপোর বেলায় কিন্তু বলতে দ্বিধা জাগে। ভাবি, সত্যিইত পথের অত অসুবিধা, গৃহ-সুখের সন্ধান নেই —যদি কোন ক্লেশ বোধ করে।

তবুও বলি, বেশ ত চলো না, হাজার হাজার লোক চলেছে, আর তুমি পারবে না? নিশ্চয় পারবে। তবে পথের কষ্টটুকু স্বীকার করে নিও। চোখ ও মন সম্পূর্ণ উন্মুক্ত রেখো—অপার আনন্দ পাবে।

দুজনে বেরিয়ে পড়ি।

হিমালয়ে পথ চলার অভিনব জীবন তার শুরু হয়। চারিদিকের বিচিত্র আবেষ্টনীর সঙ্গে সে নিজেকে সুন্দর-ভাবে মানিয়ে নেয়। দুর্গম পথের দুরূহতাও হাসিমুখে বরণ করে।

পথ চলতে চলতে জিজ্ঞাসা করি, সামনের চড়াইটা ওঠবার জন্যে একটা ডান্ডী বা ঘোড়া করব নাকি?

সে তখনি প্রতিবাদ জানায়। বলে, না, নাঃ—চমৎকার চলেছি। ধীরে ধীরে ঠিক উঠে যাবো। বেশ লাগছে।

বৈজ্ঞানিক গবেষক মন তার সজাগ আছে। অনুসন্ধিৎসার অনুবীক্ষণে সব কিছু দেখবার জানবার চেষ্টা করে।

কেদারনাথে এসে পৌঁছুলাম। সাগর-বক্ষ থেকে ১১,৭৫০ ফিট। তুষারমৌলী কেদারশৃঙ্গের পাদদেশে অপরূপ মন্দির। মন্দিরের পিছনে বিস্তীর্ণ প্রান্তর। কিছুকাল আগেও বরফে ঢাকা ছিল। এখন চারিদিকে তুষার-গলা জলের ধারা নেমেছে—অদূরবর্তিনী মন্দাকিনীর সঙ্গে কলোচ্ছ্বাসে মিলতে ছুটেছে। বেড়াতে বেড়াতে চলে এলাম বরফের রাজত্বে। সামনেই নগাধিরাজের তুষার-শুভ্র বিরাট রূপ। দুজনে স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকি।

অস্ফুটস্বরে ভাইপো বলে, নাঃ—আবার এখানে আসতেই হবে।

আমি হাসি। ভাবি, তার বৈজ্ঞানিক মন কি দেখল, কি পেলো—কে জানে?

তবে এটুকু জানি,—আবার আসতেই হবে!

৩

আবার বছর ঘুরে যায়। আবার মে-মাসও আসে।

আবার হিমালয়-যাত্রার প্রস্তুতি করি।

এবার আর ভাইপো প্রশ্ন করে না। দুঃখ জানায়, নতুন কাজে যোগ দিয়েছি; কোনমতে বার হবার উপায় নেই। কিন্তু দেখে নিও আসছে বছর যাবোই—গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রী ঘুরে আসতে হবে।

জানি, সে যাবেও।

এমনি করে আমারও বারবার হিমালয়-যাত্রা। কি যে পাই, কত যে পাই—ভাষায় প্রকাশ হয় না, শুধু বুঝি, মন ভরে উঠে—প্রশান্তির প্রদীপ্তিতে পরিতৃপ্তি আনে।

৪

এবার কিন্তু কেদার-বদরীর পথেই শুধু যাবো না। গঙ্গোত্রী হয়ে গোমুখও দেখে আসার আকাঙ্ক্ষা। কেদার-

বদরীর বিবরণীর অভাব নেই। গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রী যাত্রা-পথের কাহিনীও পড়ি। এর পূর্বেও ও-পথে গিয়েছি। সানন্দে ঘুরে এসেছি। সবারই অভিজ্ঞতা যে একই হতে হবে এমন কোন কথা নেই। না-হওয়াই স্বাভাবিক। চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি, শরতের আকাশে ভেসে-যাওয়া সাদা মেঘখানি বিভিন্ন জলা-ধারের জলের ভিতর ভিন্ন ভিন্ন আকারের ছায়া ফেলেছে। অথচ কোন কোন লেখায় পথের দুর্গমতার যে বিভীষিকা সৃষ্টি করে তা দেখে মনে সন্দেহ জাগে—আমি কি তবে অন্য কোথাও গেছি—ও-পথেই যাই নি!

পথের কষ্ট আছে, ঠিকই। হিমালয়ের পাহাড়-পথে দুর্গমতাও বিচিত্র নয়। কিন্তু সেটা বড় কথাও নয়, ভয়েরও নয়। কেদার-বদরীর যাত্রা-পথ এখন ত বাস চলাচলের ফলে সহজ ও সুগম হয়েছে। গেলেই হোল। যাত্রীর স্রোতও অবিরত বয়ে চলেছে—পাহাড়ে ঝরনার মত।

তাই, সে পথের পরিচয় দেবার জন্যে এ লেখার অবতারণা নয়। গঙ্গোত্রী যাত্রা-পথেরও নয়। গোমুখে যাত্রী যায় অল্প। সেই পথেরই কাহিনী বলা এর উদ্দেশ্য।

শ্যাম-বিটপি-ঘন-তট-বিপ্লাবিনি ধূসর-তরঙ্গ-ভঙ্গে

৫

কলিকাতা থেকে হরিদ্বার রেলপথ। হরিদ্বার থেকে হৃষীকেশ ষোলো মাইল, —রেলের শাখা-লাইনও আছে, বাসও চলে। হৃষীকেশের পরই পাহাড় শুরু। স্তরে স্তরে গিরিশ্রেণী আকাশ স্পর্শ করতে চলেছে। হৃষীকেশ থেকে গঙ্গোত্রী-পথেও ১৯৪৯ সাল হতে বাস চলাচল শুরু হয়েছে। কেদার-বদরীর বাস একদিকে চলে গেল, গঙ্গোত্রী-পথের বাস ভিন্ন পথে নরেন্দ্রনগরের দিকে পাহাড়ে উঠতে লাগল। নরেন্দ্রনগর পার হয়ে, টেহেরী ছেড়ে এসে হরিদ্বার থেকে ৮২ মাইল দূরে ধরাসু। বাস-এর পথ আপাতত এইখানেই শেষ। আরও এগিয়ে নিয়ে যাবার আয়োজন চলেছে।

ধরাসু গঙ্গার উপর। এখান থেকে গঙ্গার উপত্যকা দিয়ে একটি পথ চলে গিয়েছে গঙ্গোত্রী। ৭৫ মাইল দূরে। আর একটি পথ বামদিকের গিরিশ্রেণী অতিক্রম করে নেমেছে যমুনার উপত্যকায় এবং যমুনার কূল ধরে চলে গেছে যমুনোত্রী। ধরাসু থেকে যমুনোত্রী ৪৮ মাইল। পাঁচ বছর আগে যমুনোত্রী দেখে এসেছি। এবার ও-পথে যাবার কথা নয়। গঙ্গোত্রী হয়ে গোমুখ যাওয়াই উদ্দেশ্য।
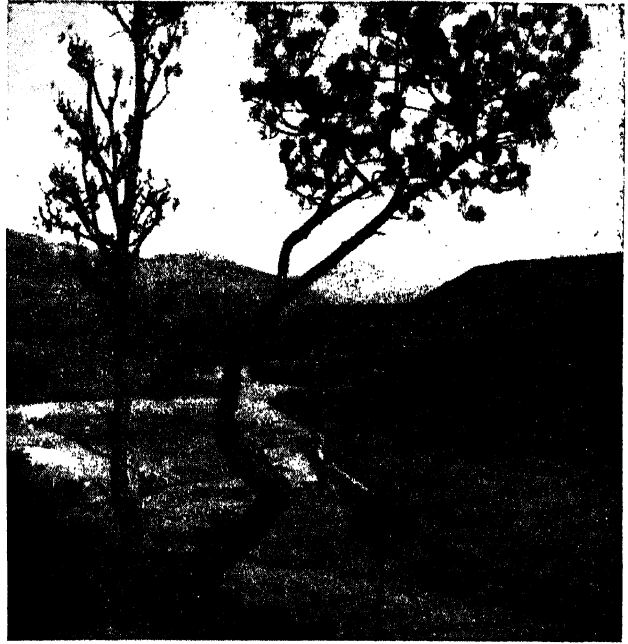
ধরাসু থেকে পায়ে চলার পথ শুরু। হাঁটা পথ হলেও প্রশস্ত পথ—ভয়ের কোন কারণ নেই। নিশ্চিন্ত মনে নির্ভয়ে পথ চলা যায়। ক্বচিৎ কোথাও পাথর বেশী হলে পথ অপ্রশস্ত হয়, কিন্তু সেখানেও চলাচলে কোন আশঙ্কা নেই। একমাত্র পাহাড় ধ্বসে গিয়ে পথ যদি নিশ্চিহ্ন হয়—তখনি সাময়িক চলাচলের অস্থায়ী পথটুকু সংকীর্ণ হয়, মনে হয়ত ভয়ও জাগায়। কিন্তু বর্ষার আগে খুবই কম পাহাড় ধ্বসে, তাছাড়া অসমর্থ বৃদ্ধ যাত্রীদের স্বচ্ছন্দে সে সব পথ অতিক্রম করতে দেখে মনে সাহস জাগে। আকস্মিক দুর্ঘটনার সংবাদও ত কখন শোনা যায় না। বড় শহরের প্রশস্ত রাজ-পথেও চলাচলের বিপদ কি কম!

ধরাসু থেকে গঙ্গোত্রী পাঁচ ছয় দিনের পথ। নয় মাইল অন্তর ধর্মশালা। কেদার-বদরীর পথের মত অত ঘন ঘন চটী বা গ্রাম পাওয়া যায় না। তাই, এ-পথে নয় মাইলের কম পড়াও নেই, অর্থাৎ সারাদিনে নয় মাইল অথবা আঠারো মাইল যেতেই হয়।

উত্তরকাশী, ভাটোয়ারী, গাঙনানী, হরশীল, ধরালী ছাড়িয়ে এসে গঙ্গোত্রী। সাগরবক্ষ হতে ৯৯৫০ ফিট উঁচু।

সবগুলিই গঙ্গার উপর মনোরম স্থান।

মাঝে দুইটি বড় চড়াই আছে। প্রথমটি 'সুখী'র চড়াই,—চড়াই উঠার সুখ নেই, তবে চড়াই-শেষে বিশ্রামে সুখ আছে। দ্বিতীয়টি, গঙ্গোত্রীর আগেই 'ভৈরব-ঘাটি'র চড়াই। চড়াই

গঙ্গোত্রী—মা'র ডাণ্ডী

হিসাবে এর খ্যাতি আছে, তবে খ্যাতির তুলনায় ভীতিকর নয়।

৬

গঙ্গোত্রী ছোট জায়গা।

বিরাট গিরিশ্রেণীর মাঝে একটি মন্দির ও কয়েকখানি ঘর,—যেন প্রকাণ্ড এক বটগাছের শাখায় ছোট্ট একটি পাখীর বাসা।

মন্দিরের পাশেই গঙ্গা।

সেই জাহাজ-ভেসে-যাওয়া সুবিস্তীর্ণ সুগভীর ভাগীরথী নয়,—উপলবহুল ক্ষীণকায়া পার্বত্য নির্ঝরিণী। হিম-শীতল জল। গৈরিকবসনা। কলস্বরে বয়ে চলেছেন। উচ্ছল উদ্বেল।

গঙ্গার উপর কাঠের ছোট পুল। অপর পারে সাধু-সন্তদের আশ্রম। ছোট ছোট এক একটা ঘর। চারিদিকে দেবদারুর গহন বন। সেই বনের ধারে গঙ্গার তীরে একান্তে সাধন-ভজনের নিভৃত স্থান।

এ-পার থেকে হঠাৎ দেখে চমকে উঠি। কই, পাঁচ বছর আগে অমন ঘর-বাড়ি ত ওপারে দেখি নি! এক জায়গায় কয়েকটি অতি-মনোরম বাংলো-প্যাটার্নের ঘর। যেন একটা নতুন শৌখিন কলোনী। শুনি, এক স্বামীজি তাঁর আশ্রমের সংস্কার করেছেন। ঝক্‌ঝকে বাড়িগুলি সূর্য-কিরণে ঝল্‌মল্‌ করতে থাকে। কিন্তু সেই প্রশান্ত আবেষ্টনীর মাঝে সে উজ্জ্বলতা উদ্ধত মনে হয়,—যেন পূর্ণিমার স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নার মাঝে প্রখর বৈদ্যুতিক আলো। চোখে ও মনে আঘাত হানে।

৭

তীর্থ-ভ্রমণের এক প্রধান অঙ্গ সাধু-সঙ্গ। তাই, পুণ্যকামী তীর্থ-সেবীদের তীর্থক্ষেত্রে এলেই সাধু-সন্দর্শনের আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়ে উঠে।

জানতাম, সকাল দশটায় ধর্মশালায় সাধুদের ভাণ্ডারা দেওয়া হয়। দিনের মধ্যে একবারই। অনেক সাধু আসেন,—একসঙ্গে দর্শনও মেলে।

সঙ্গীদের উৎসাহে প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়ালাম।

দুটি পাশাপাশি ঘর—বারান্দার উপর দুটি জানালা। জানালায় ফোকর-কাটা,—যেন স্টেশনের টিকিট-ঘর।

ঘরের ভিতর কালী-কম্‌লী-ক্ষেত্রের লোক, খাবার নিয়ে বসে আছেন। বাইরে বারান্দায় ও চত্বরে সাধুরা এসে জমায়েৎ হচ্ছেন। কাঠের বেঞ্চও দুই-তিনটি পাতা আছে। কেউ কেউ তাতে বসেছেন। অনেকেরই রুক্ষ রূপ—কোমল কান্তি নয়,—কঠিন, কঠোর। কারো কারো চোখে-মুখে মধুর হাসি,—শিশুর সরলতায় সুস্নিগ্ধ। সবারই নগ্ন পদ। অল্প কয়েকজনের অঙ্গে আচ্ছাদন আছে—মোটা কম্বল বা চাদর। অনেকেই নগ্ন দেহ—কৌপীনমাত্র সার। কারো কারো তাও নেই—সম্পূর্ণ বিবস্ত্র। সবাই জটা-জুটধারী। প্রায় কুড়ি-পঁচিশটি মহাত্মা এসেছেন। দুই একজন পরস্পর কথা বলছেন। নইলে, প্রায় সকলেই নির্বাক্‌। অনেকে মৌনীও আছেন। সকলেরই হাতে একটি বা দুইটি পাত্র—কোনটি তামার, কোনটি পিতলের, কোনটি বা লাউ-এর তৈরি।

এখানেও 'কিউ'।

একে একে সার বেঁধে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াচ্ছেন। ভিতর থেকে

খান ছয়েক রুটী, ভাত ও ডাল বা তরকারী দেওয়া হচ্ছে।

কেউ বারান্দায় বসে খাচ্ছেন, কেউ বা গঙ্গার ধারে পাথরের উপর গিয়ে বসছেন, কেউ কেউ বা নিজ আশ্রমে অপর পারে চলেছেন।

একজন নাগা সাধু দাঁড়িয়েই খাচ্ছেন; শুনলাম, তিনি কখনও বসেন না, শোনও না।

সবাই অপর-পারের আশ্রমবাসী। কিন্তু, মহাত্মারা সকলেই ভাণ্ডারা নিতে আসেন না। আশ্রমে পৌঁছে দিলে তাঁদের কেউ কেউ গ্রহণ করেন। আবার, এমনও কয়েকজন আছেন যাঁরা এ-সব অগ্নি-পক্ক কোন কিছু ভোজন করেন না। দর্শনার্থীরা কিস্‌মিস্‌, বাদাম ইত্যাদি দিয়ে প্রণাম করে আসে, শুধু তাই খান।

ছোট একটি ঘটনা ঘটে গেল।

সংগীদের সংগে একপাশে দাঁড়িয়ে এ-সব দেখছিলাম। ক্ষেত্রের কর্তৃপক্ষের একজন কাজকর্মের তদারক করছিলেন। এগিয়ে এসে আমাদের একটা বেঞ্চে বসতে অনুরোধ করলেন। বেঞ্চটির এক ধারে বসে দুটি সাধু খাবার নেবার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। খালি অংশটুকুতে তাঁদের সংগে একাসনে বসতে আমরা সঙ্কোচ বোধ করলাম। ক্ষেত্রের লোকটি জানালেন, তাতে কিছু দোষ নেই। কিন্তু, আমরা বসা-মাত্রেই সাধু দুটির মধ্যে একজন বিশেষ বিরক্ত হলেন। তাঁর চোখে-মুখে উগ্রভাবে রুষ্ট-ভাব আত্মপ্রকাশ করলো। অপর সাধুটি সেখানে নিঃসংকোচে বসে রইলেন এবং তাঁর মৃদু নিষেধ সত্ত্বেও এ-সাধুটি অবোধ্য ভাষায় কি বলতে বলতে বেঞ্চ ছেড়ে উঠে গেলেন।

লজ্জায় আমাদের মন সংকুচিত হয়ে উঠল।

আমরাও তখনি বেঞ্চ ছেড়ে একপাশে এসে দাঁড়ালাম।

সাধুটি আমাদের দিকে তখনও রোষ-নেত্রে তাকিয়ে আছেন। দুর্বাসামুনির কথা মনে হোল। শকুন্তলার প্রতি সেই অকরুণ অভিশাপ—'যার কথা এমনি একান্ত মনে চিন্তা করছিস্‌—সে-ই তোকে দেখে চিনতে পারবে না!'

ভাবি, কলির এই নব-দুর্বাসাও হয়ত অভিশাপ দিচ্ছেন,—'তোরা যেমন আমার পাশে এসে বস্‌লি, তেমনি তোদের পাশেও একাসনে এসে বসবে—অচ্ছুত-অস্পৃশ্যেরা।'

মনে মনে বলি, ঠাকুর, অনেক দিন বনে চলে এসেছ। খবর রাখো না। তারা শুধু একাসনে বসবারই অধিকার পায় নি, এখন দেবতাদের হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করার লোভে মন্দিরে এগিয়ে চলেছে! তা চলুক,—ভেদাভেদ যত ঘোচে, ঘুচুক। কিন্তু, হিমালয়ে এসে তুমি পেলে কি? অংগের বসন-ভূষণ বহিরাবরণ সব কিছুই ছেড়েছ, অথচ অনের কোণে মান-অভিমানের মানুষ-স্বভাবটি এখনও তেমনি আঁকড়ে আছ, ক্রোধের ফণা এখনও তেমনি দুলছে! হিমালয়ের শান্তির মাঝে এখনও সেই অ-শান্তি!

৮

বিকালে ওপারে চললাম সাধু-সন্দর্শনে।

এ-পারে মানুষের বাসা, ও-পারে সাধুর বাস। এ-পারে পাথরের বাড়ি, কয়েকটি দোকান-ঘর, জানকীবাঈ-এর তৈরি গংগামায়ীর মন্দির। ও-পারে শান্ত তপোবন, সাধুদের ছোট ছোট কুটি, তাঁদের মনোমন্দিরে আরাধ্য দেবতা। এ-পারে যাত্রী-জীবনের উচ্ছল চঞ্চলতার স্রোত, ও-পারে ধ্যান-গম্ভীর নিস্তরঙ্গ জীবন-জলধি।

মাঝখানে পুণ্যতোয়া ভাগীরথী। তারই উপর পারাপারের সেতু। এ-পারের মানুষের সংগে ও-পারের সাধুর যোগা-যোগ সৃষ্টি করেছে।

এ-পারের মানুষ যায় সাধু-সন্দর্শনে, ও-পারের সাধুরা আসেন ভাণ্ডারার সন্ধানে। এ-পারের সংসার-সন্তপ্ত মন সাধু-সন্তদের কাছে ছোটে শান্তির আশায়, ও-পারের আকাশ-মাগীরা গৃহীর দুয়ারে এসে দাঁড়ান ভিক্ষার ঝুলি হাতে। যেন, জননী জাহ্নবী তাঁর দুই কোলে ভিন্ন-প্রকৃতি দুই সন্তান নিয়ে মাতৃগৌরবে চলেছেন।

পুলের উপরে এসে দাঁড়ালাম।

পাঁচ বছর আগেকার কথা মনে হয়। মার সংগে এখানে এসেছিলাম। সেবারও এমনি সাধু-দর্শনে বার হয়েছিলাম। ধর্মশালা থেকে বার হবার আগেই হঠাৎ চারিদিক অন্ধকার করে বৃষ্টি নেমেছিল। শীতও তেমনি দশগুণ হয়ে দেখা দিল।

মাকে বললাম, এত ঠাণ্ডায় বা'র হবে? মন্দিরে ত দেবতাই দর্শন হয়েছে—আবার সন্ধ্যায় আরতি দেখবে,—সাধু-দর্শন না হয় থাকুই।

মা বলেন, সে কি বাবা! তা কি হয়? তীর্থে এসে সাধু-দর্শন করব না? মহাত্মাদের দর্শনে কতো পুণ্য, কতো তৃপ্তি!—বৃষ্টি ত কমে এল, চলো যাওয়া যাক্।

অতএব যাওয়াই হয়। একে গঙ্গোত্রীর ঠাণ্ডা, তায় বৃষ্টি-বাদল। গায়ে বেশ কিছু গরম জামা-কাপড় চাপালাম।

মার ডাণ্ডী-ওয়ালাগুলি পাহাড়ী হলেও মুড়িশুড়ি দিয়ে ডাণ্ডী নিয়ে চলেছে।

পাণ্ডাজি শ্রীভূমানন্দ বললেন, প্রথমে চলুন এখানকার এক মস্ত সাধুকে দেখতে।

পুল পার হয়ে বাঁদিকে একটু উঠেই তাঁর কুটি।

পাথরের ছোট পাঁচিল-ঘেরা খানিকটা জমি। তার মাঝখানে একটি ছোট্ট ঘর। পাঁচিলের এক কোণে আরও একটি ছোট ঘর আছে। মাঝখানের ঘরখানির কাছে এসে দাঁড়ালাম। চারিদিকে খোলা রোয়াক্। একটি মাত্র ছোট দরজা—গঙ্গার দিকে মুখ করা। জানালা নেই।

দরজার সামনে এসে ভিতরে তাকালাম।

যোগাসনে বসে এক অপূর্ব মূর্তি। জটাধারী। স্থূলকায়। তাম্রকান্তি। সারা অঙ্গে কোথাও কোন আবরণ নেই। জ্যোতির্ময় মূর্তি—নিশ্চল নিস্পন্দ। নিষ্পলক নেত্রে যেন গঙ্গার দিকে তাকিয়ে আছেন। হঠাৎ দেখে মনে হয়, এ যেন জীবন্ত মানুষ নয়,—পাষাণ-মূর্তি। কাশীতে-দেখা ত্রৈলঙ্গস্বামীর প্রতিমূর্তিটি চোখের উপর ভেসে উঠল।

অবাক-বিস্ময়ে তাকিয়ে আছি। পাণ্ডাজির ডাকে চমক ভাঙ্ল। বললেন, মাকে নিয়ে ঘরের ভিতরে চলুন।

মাথা অনেকখানি হেঁট করে দরজায় ঢুকতে হয়; কিন্তু, এখানে আপনা হতেই ত মাথা নত হয়ে আসে।

মার সঙ্গে প্রণাম করে মূর্তির পাশে দাঁড়ালাম। এতক্ষণে পাথর-মূর্তি স্পন্দন পেলো। আঁখির তারা ঘুরিয়ে একবার আমাদের তাকিয়ে দেখলেন। প্রশান্ত বদনে মধুর হাসির অস্ফুট-রেখা ফুটে উঠল। ঈষৎ ইঙ্গিত করে আমাদের বসতে বললেন,—হাত তুলে আশীর্বাদ করলেন।

মা যুক্তকরে তাঁর স্নেহচ্ছায়াতলে নিবিষ্টচিত্তে বসে আছেন। দুনয়নে আনন্দাশ্রুর ধারা। প্রসন্ন পরিতৃপ্তির প্রতিমূর্তি!

এদিকে সাধুর চোখের দৃষ্টি আবার গঙ্গার ধারার দিকে নিবদ্ধ হয়েছে। ক্ষণিকের সজাগতা কোথায় মিলিয়ে গেছে। আবার, নিষ্পলক আঁখি, নিস্পন্দ দেহ। মনে হয় প্রাণহীন। অথচ, তাঁরি সান্নিধ্য মনে এক অপূর্ব অনুভূতি আনে। বুদ্ধির সীমা-বদ্ধ, পরিচিত দেশ-কাল অতিক্রম করে মন কোন অসীমতার মাঝে ভেসে যায়। অনাদি কাল যেন একটি ক্ষুদ্র মুহূর্তের মাঝে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ায়। প্রকৃতিস্থ হতে চেষ্টা করি।

মনে পড়ে, পল্ ব্রান্টনের কথা। অরুণাচলের ঋষি মহর্ষি রমণএর সাথে তাঁর প্রথম-সাক্ষাতের বিবরণ। দেশ-কাল-পাত্র— পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনী—সব কিছুরই প্রয়োজনীয়তা কি করে নিমেষে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল! অথচ, বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্, বিচক্ষণ, বিধর্মী বিদেশী!

ইতিমধ্যে ঘরের ভিতর আর একটি ব্রহ্মচারীও এসে দাঁড়িয়েছেন। গেরুয়া আলখাল্লা পরা। জটাভার চূড়া করে মাথার উপর বাঁধা। মুখে কঠোর সন্ন্যাস-জীবনের সুস্পষ্ট পরিচয়, অথচ, কোমলতাও আছে। প্রৌঢ় হলেও শ্মশ্রু-গুম্ফের রেখা নেই।

সাধুটি সম্পূর্ণ মৌনী। ব্রহ্মচারীজি তাই তাঁর কথা ধীরে ধীরে বলছিলেন, একশো বছরের উপর বয়স; সাধারণত এমনি ধ্যানরতই থাকেন। আমি সেবা করি।

প্রণামী দেওয়ার প্রশ্নে ব্রহ্মচারীজি জবাব দিলেন, কিছুকাল আগে এক যাত্রী কিছু দিয়ে গিয়েছিলেন, তা এখনও রয়েছে; তাই নেওয়ার প্রয়োজনও নেই, রীতিও নেই।

আরও কিছুক্ষণ বসে থেকে আবার প্রণাম করে আমরা চলে এলাম। তখনও তিনি তেমনি নিশ্চল, নিস্পন্দ। এমনি করেই তাঁর দিন যায়, মাস যায়, বছর যায়,

বছরের পর বছরও ঘোরে। কি করে থাকেন, কেন থাকেন,—কি ভাবেন, কেনই বা ভাবেন এবং কি-ই বা পেয়েছেন—এ-সব সমস্যার মীমাংসা হয় না।

মাকে নিয়ে আরও সাধু-দর্শন করে ধর্মশালায় ফিরলাম। স্থানীয় লোকজন এসেছেন। তাঁদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করছি। সেই সাধুজিটির কথা উঠল।

একজন বললেন, এক সময়ে ও'র মত বড় সাধু দেখা যেতো না। সাধু-সমাজে ও'র শীর্ষ স্থান ছিল।

"ছিল" শুনেই মনে চমক লাগল।

বললাম, কেন, উনি কি এখনও বড় একজন মহাত্মা নন্? না, আরও বড় একজন এসেছেন?

উত্তর শুনি, সে-সব অনেক কথা। ঐ বিরাট পুরুষের কাছে ওটা হয়ত একটা ছোট্ট ঘটনা, কিন্তু সেইটিই এখন মস্ত বড় হয়ে দেখা দিয়েছে।

উত্তরদাতাও একজন গেরুয়াধারী হিমালয়বাসী ব্রহ্মচারী। তিনি বলতে থাকেন, উনি একজন মহাপুরুষ সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তিতিক্ষার দিক থেকে দেখতে গেলে সাধুরা সকলেই এ'কে খুব উঁচু বলেই মানেন। শাস্ত্র-জ্ঞানও গভীর। নিজের চোখেই ত এ'র কষ্ট-সহিষ্ণুতা দেখে এলেন। এই প্রচণ্ড শীতের মধ্যেও কি রকম বসে রয়েছেন এ-শীত তো ও'র কাছে কিছুই নয়। আগে বছরের পর বছর কাটিয়েছেন গোমুখে—বরফের মধ্যে। সেখানেও ঠিক ঐভাবে সারা বছর থাকতেন, গায়ে কোনও আবরণ নেই, ধুনীর আগুনও নেই। অথচ, বয়সও হয়ে গেছে একশোর উপর। ইদানীং কয়েক বছর আর গোমুখে যান্ না,—এখানেই থাকেন। সত্যিই আশ্চর্য ক্ষমতা। একবার পণ্ডিত মালব্যজি ও'কে কাশীতে নিয়ে গিয়েছিলেন—তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ে কি একটা উদ্বোধন ব্যাপারে। কাগজেও সে-কথা তখন বার হয়েছিল।

বললাম, হাঁ,—এখন মনে পড়ছে বটে,—পড়েছিলাম, হিমালয় থেকে কোন্ এক বড় সাধুকে তিনি নিয়ে গিয়েছিলেন।

ব্রহ্মচারী বললেন, ইনিই তিনি। তারপর শুনুন ব্যাপার। ও'র জীবনের রাহু হয়েছে ও'র ওই সেবক-সাধুটি।

আশ্চর্য হলাম। বললাম, কুটির ভিতর আলখাল্লা-পরা যে সন্ন্যাসীটি দাঁড়িয়েছিলেন? কেন, বেশ সুন্দর ত কথা বলছিলেন—শাস্ত্রজ্ঞানও বেশ আছে দেখলাম। ভালই ত লাগ্‌ল।

মুচকে হেসে ব্রহ্মচারী বললেন, ঐ ত ব্যাপার! ওটি সন্ন্যাসী নয়,—সন্ন্যাসিনী। এখন ঘটনাটা শুনুন। সাধুজি কয়েক বছর হিমালয় থেকে নেমে নীচে হরিদ্বারের দিকে যেতেন। সেদিকে কিছু-কাল কাটিয়ে আবার উপরে চলে আসতেন। এ-পথে মাঝে পাণ্ডাদের একটা গ্রাম আছে, দেখেছেন নিশ্চয়—ধরালী। প্রতি বছর আসা-যাওয়ার সময় সেই গ্রামের কাছে তিনি রাত কাটাতেন। তখন এই মেয়েটি ছিল খুব ছোট। সাধুকে দেখতে পেলেই তাঁর কাছে ছুটে আসত, সারাক্ষণ তাঁর কাছে কাছে থাক্‌ত, ইনিও খুব স্নেহ করতেন তাকে। এমনি করে বছরের পর বছর যায়, মেয়েটিও বড় হয়ে উঠে। তারপর তার বিয়েও হোল; কিন্তু স্বামীর ঘর করা তার ভাগ্যে ছিল না। শেষে গেরুয়া পরল, এই সাধুজির কাছে সন্ন্যাস নিল, এ'রই কাছে এসে রইল। এ'র কাছে শাস্ত্র-শিক্ষাও করেছে—তখন ইনি মৌনী ছিলেন না, কথা বলতেন। কঠিন সন্ন্যাস-ব্রতও পালন করেছে। কিন্তু, এ-সব হলে হবে কি! এ'র কাছে এসে থাকার পর থেকেই—সাধুজির সম্পর্কে লোকমহলে কথা উঠল—তাদের মুখ ত কেউ চাপা দিতে পারে না! ফলে, আগে ওখানে যাত্রীর ভিড় হোত এখন আর তত হয় না।

গল্প শেষ করে ব্রহ্মচারীজি চুপ করলেন, তারপর একটু উত্তেজিত হয়ে বললেন, আমিও বলি, মশাই, কাজটা ঠিক হয় নি। অত বড় সাধু—অত বিরাট শক্তি-শালী পুরুষ; চিরকাল একা ছিলেন, একাই থাকলে হোত। কি প্রয়োজন ছিল

একজন সন্ন্যাসিনীকে কাছে থাকতে দেবার? আর নিজে থাকেন ত ঐ রকমভাবে! নিজে মহাপুরুষ হতে পারেন, একশো বছরের উপর বয়সও হতে পারে —কিন্তু মেয়েটা ত আর সে ঐশীশক্তি পায় নি!

নির্বাক্ হয়ে শুনি। মন্তব্য শুনে স্তব্ধ হই। ভাবি, এই দুর্গম হিমালয়ের নিভৃত অঞ্চলে সাধু-জীবনের ভালমন্দের বিচার-কাঠিও কি একই? এখানেও মানুষের মনে সেই চির-জাগরূক সন্দেহের কীট, কুৎসা-রটনার অদম্য স্পৃহা!

অতি-বিচিত্র এ বিশাল জগতে এ-ও এক চিরন্তন করুণ সত্য।

হাসি পেলো। বললাম, ব্রহ্মচারীজি, সাধুজিকে অতই শক্তিশালী বিরাট পুরুষ বলে যখন মানলেনই তখন সামান্য একটি মেয়েকে উন্নত করার ক্ষমতাটুকুও তিনি রাখেন, এটুকু স্বীকার করতে ক্ষতি কি? ক্ষতি কিছুই নয়। কিন্তু, মানুষ-স্বভাব যাবে কোথায়?

৯

সেদিন সন্ধ্যায় শোনা সে-কাহিনী আজও বেশ মনে আছে। পুলের উপর দাঁড়িয়ে পাঁচ বছর আগেকার সে-সব কথা ভাব্ছিলাম।

সামনেই সাধুজির সেই আশ্রম। প্রায় তেমনি আছে। প্রথমে সেই দিকেই গেলাম। চীর্‌গাছের ফাঁক দিয়ে পশ্চিমের রোদ এসে পড়েছে কুটির উপর। চারিদিক নীরব নিস্তব্ধ।

কুটি-র সামনে এসে দাঁড়ালাম।

সেই ঘর, সেই দুয়ার, সেই রোয়াক—সবই তেমনি আছে। এবার সাধুজি ঘরের মধ্যে নয়, রোয়াকে বসে আছেন। চেহারা প্রায় তেমনি আছে—একটু শীর্ণ। লোলচর্ম বার্ধক্য ঘোষণা করছে। বয়স যে বহু বছর—সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ, তবে কতো তা দেখে বলা সম্ভব নয়। তেমনি গঙ্গার দিকে চেয়ে বসে আছেন। গঙ্গাই দেখেন, না, আর কিছু?

ভাবি, পাঁচ বছর আগেকার সে-ই দেখা কি এখনও চলছে?

এবার, কিন্তু সম্পূর্ণ সজাগ। আমরা প্রণাম করতেই আশীর্বাদ করলেন; হাত নেড়ে বসতে ইশারা করলেন।

সেই ব্রহ্মচারিণীও এলেন। হাঁ, মেয়েই বটে। তবে ধরা কঠিন। চেহারার মাঝে, গলার স্বরে অতি সামান্যই ইঙ্গিত আছে।

স্বামীজির সঙ্গে এবার কথা হতে লাগল। তিনি এখনও মৌনী। তবুও হাত নেড়ে মুখের ভঙ্গিতে ভাবপ্রকাশ করছিলেন। কখন কখন ব্রহ্মচারিণীকে ইঙ্গিত করছিলেন, তিনি ওঁর হয়ে বলছিলেন।

আমার সঙ্গীর ও আমার এই দ্বিতীয়বার গঙ্গোত্রী আসা শুনে খুশী হলেন। ঈষৎ হেসে ইশারা করে বললেন, আবার আসতে হবে।

গোমুখ যাবার ইচ্ছা আছে শুনে আরও আনন্দ প্রকাশ করলেন। হাত দিয়ে বোঝালেন, রাস্তা নেই, কঠিন পথ। তবে কোন ভয় নেই; সব সময়েই যেন মনে বিশ্বাস রাখি, ঠিক দর্শন মিলবে। অতি অপরূপ স্থান।

আকাশের দিকে হাত তুলে বোঝালেন, সবই তাঁর রূপ, তাঁরই অপরূপ লীলা।

স্বামীজির ইঙ্গিতে ব্রহ্মচারিণী গঙ্গার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করতে লাগলেন,—পুরাণ-কথিত ভাগীরথীর কত পুণ্য-কাহিনী।

স্বামীজির আশীর্বাদ নিয়ে প্রফুল্ল-চিত্তে চলে এলাম। গোমুখ-যাত্রার সংকল্পও সুদৃঢ় হোল।

এরপর সেই স্বামীজিকে আর একবার দেখেছিলাম। সেদিন গোমুখ-অভিমুখে যাত্রা করছি। সকালে। ওপার থেকে রওনা হয়েছি। হঠাৎ দেখলাম, এ-পারে গঙ্গায় স্নান সেরে সেই উলঙ্গ মূর্তি আশ্রম পানে উঠে চলেছেন। তাঁর দুই হাতে দুইটি বাল্‌তি। নিশ্চয় গঙ্গার জল ভরা। বাল্‌তি দুটি অক্লেশে দুই হাতে নিয়ে সহজ স্বচ্ছন্দগতিতে চড়াই-পথে চলেছেন। সুদীর্ঘ, সরল সবল দেহ। কে বলবে, একশো বছরের উপর বয়স?

চোখের উপর একটা ছবি ভেসে উঠল।

পুরীর সুনীল সফেন সমুদ্র। তারি বালুকা-তীরে একটি নগ্ন শিশু দুই হাতে দুটি খেলার ছোট বাল্‌তি নিয়ে ছুটে চলেছে!

শিশুরই মত সরল, নিষ্পাপ।

সত্য-শিব-সুন্দরের সহজ সোপানই বুঝি বা শিশু-মন।

(ক্রমশ)

পর্তুগীজ আঙ্গোলা

অমিয় চক্রবর্তী

যদি থাকত একটি তৃণ, মরুধ্যানে কোথাও বিস্মৃত
শ্যামরক্ত চিহ্নটুকু,
তাকেই নির্যাসে তপ্ত আঙেগালার কবিতা গোলাপে
জাগাতেম মিশ্রিত উপমা,
দূর যাত্রী দাহ ধূপে সুরভিত।
এ মুহূর্তে দগ্ধ শুধু কঠিন কাতর ইচ্ছা,
চেয়ে চেয়ে উবে যাওয়া ব্যথার আতর
অগ্নিগন্ধ আহত শূন্যে তাপঃ
তলে পর্তুগীজ-বন্দী জর্জর আফ্রিকা
প্লেনের পাখায় কাঁপে কাংস্য অনির্দেশ
অগণ্য নিস্তরু ডাঙা, ছায়া-সাক্ষীহীন।
প্রকাণ্ড নির্লজ্জ ব্যাপ্তি, তবুও গোপনে
কলঙ্ক শৃঙ্খল গাঁথা, জানি, লুয়ান্দায়—
ক্রীতদাস ধিক্কৃত কলোনিতে।
ছিন্ন বাঁচা বন্দী জনতার
কোথাও খনিতে লুপ্তি, কারা খাটে কলে;
কালো ত্বক বিধিদত্ত, নির্যাতিত নিগ্রো শোধে তারি
আমৃত্যু ভীষণ দাম অপমানে রাত্রিদিন।
অধম বণিক ঘোরে সাম্রাজ্য পাপের মূর্খ দাপে,
সামরিক বিধাতার নিষ্ঠুর ক্ষণিক প্রহসনে।

ধূ ধূ ক্লান্তি তটে দেখি অশ্রুতীর রক্ত নিঃশ্বসিত
নীল যেন লাল হয়ে জাগে নীর,
নিঃসংসর্গ ভূমিকায় অশ্রুত ক্রন্দন।
পাহাড়ের স্তব্ধ সারি দূর-মনা।
অভিশাপ কবিতায় রচা তাও সাধ্য নয়ঃ
এতখানি প্রান্তরের দারুণ অলক্ষ্য অত্যাচার
নিষ্ফল আক্রোশে বাঁধি সে কোন্ সত্তায়।
যদি পারি জাকারান্দা গাছে ঘেরা কোনো পথে
নরদাস ব্যবসায়ী আড়তের রন্ধ্রে নেমে যেতে,
কবিতাও ফেলে দিয়ে জানিনা সে কোন্ দৈবযোগে
বিদীর্ণ দিতাম বক্ষ প্রাণের বিজয় বিদ্রোহে।
চেয়ে ভারতীর ক্ষমা, যেচে শাস্তি কাফ্রি চেতনার
ব্যর্থ হয়ে শূন্যে আজ দূরে চলি॥

নাইরোবি
কেনিয়া আগস্ট ১৯৫৫

একটি জাতি : একটি জীবন : টমাস মান

কিরণকুমার রায়

ডানজীগ নিয়ে তখন আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। লুব্ধ শকুনের দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছেন হের হিটলার। খবরের কাগজে বড়ো বড়ো হেডিং হয়ে দেশ-দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়তো তাঁর চীৎকার। বয়স তখনও আমার অল্প, ইস্কুলের মাঝারি ক্লাশে মাস্টার মশায়ের বকুনির ভয়ে সন্ত্রস্ত। সে সময় একটি গল্প পড়েছিলাম এক জার্মান সাহিত্যিকের। আমায় অভিভূত করেছিল গল্পটি। তারপর অনেকদিন, অনেক বিস্ময়, অনেক উত্তেজনা গড়িয়ে গেছে জীবনের রাজপথে। কিন্তু গল্পটির বিস্মরণ হলো না আজো। গল্পটি প্রেমের, একটি সরল মেয়ে আর একটি গ্রামীণ ছেলের। ভালোবাসার বৃন্ত যখন সূর্যমুখীর স্বপ্ন নিয়ে জেগে উঠেছে, তখন ছেলেটি গেল রাজধানী। য়ুনিভার্সিটিতে। বিরাট নগরী, বৃহত্তর পরিবেশ, বিপুলতর সমৃদ্ধি। মিল নেই গ্রামের সঙ্গে, গ্রামের মেয়েদের সঙ্গেও মিল নেই ফ্যাশনগর্বী নাগরিকাদের। ছেলেটি যখন ফিরে এলো, সঙ্গে এলো ঝকমকে এক মেয়ে সোনালী চুল উড়িয়ে, নীৎশে আর সোপেনহাওয়ারের বড়ো বড়ো বুলি মুখস্থ করে। য়ুনিভার্সিটির মেয়েটির সঙ্গে গ্রামের ছেলেটি হাসি-গানে এমন তন্ময়, তার নজর নেই আর কোন দিকে। ম্লান বিবর্ণ পাণ্ডুর হয়ে গেল গ্রামের মেয়েটি। এমন সময় অন্যমনস্ক পথ চলতে গিয়ে মেয়েটি গেল মারা। আর ছেলেটি বিয়ে করলো য়ুনিভার্সিটি পড়া মেয়েটিকে। কিন্তু বিয়ের রাতে সব বাতি যখন নিভেছে, নববধূও যখন ঘুমিয়েছে; হঠাৎ ভয়ার্ত চীৎকার করে উঠলো ছেলেটি। কি ব্যাপার? চোখ। দুটো করুণ ক্লান্ত বিবর্ণ চোখ অনিমেষ তাকিয়ে থাকে ছেলেটির দিকে।

'কোথায়, কোথায় চোখ?'

'ওই যে, মশারির কোণায়!'

'দূর পাগোল। ঘুমোও ঘুমোও তুমি।' নিবিড় বেষ্টনে সোহাগ করে মেয়েটি।

কিন্তু ঘুমোতে পারে না। চীৎকার করে ওঠে ছেলেটি। চোখ বন্ধ করলেই ভেসে ওঠে দুটো আর্ত চোখ। আশ্চর্য করুণ, বিষণ্ণ, ম্লান, ক্লান্ত আর কান্না-ভরাতুর চোখ।

সেই চোখ, যে চোখ ছিল গ্রামের মেয়েটির। যে চোখে চুমো খেয়েছে ছেলেটি, যে চোখে নরম আঙুলের পরশ বুলিয়ে দিয়েছে। যে চোখ নাকি কবিতার মতো মনে হতো ছেলেটির, যে চোখ দেখে সে ভালোবেসেছিল।

অচরিতার্থ ভালোবাসা নিয়ে যে মেয়েটি মারা গেল দুর্ঘটনায়, সেই মেয়েটির চোখ ছেলেটিকে ঘুমুতে দেয় না। অপলক অনিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

গল্পটি পড়ে কয়দিন শুধু গল্পটির কথাই ভেবেছি আমি। আর সে-সময়ে প্রতিদিন পড়েছি খবরের কাগজে হিটলারী কালাপাহাড়ী কীর্তি। নগরের পর নগর পুড়েছে, জনপদের পর জনপদ পাশবিক অত্যাচারে আর্তনাদ করেছে। পৃথিবী-ব্যাপী ভয়ংকরতম যুদ্ধের কালনাগিনী আমাদের জীবনেও বিষের স্পর্শ লাগিয়ে গিয়েছে। তবু আমি তারি মধ্যে, খবরের কাগজে প্রতি অক্ষরের পেছনে খুঁজেছি মানুষকে। হিংসা উন্মত্ততার আড়ালে ব্যক্তিক মানুষকে। যে মানুষ ভালোবাসে আর যে লেখক মানুষের কথা লিখতে গিয়ে নিজে কাঁদেন। তাঁদের। হিংস্র দৈত্যের মতো জার্মান জাতির মধ্যে আমি খুঁজেছি সেই যুদ্ধের মধ্যেও। রাজনীতির হলাহলের কুয়াশায় তাঁরা হারিয়ে থাকলেও তাঁদের পেয়েছি সাহিত্যে। জার্মান সাহিত্যে। তাই মহাযুদ্ধের অবসানে সোভিয়েট কথাশিল্পী জার্মান জাতিকে ফ্যাসিস্ত বলে অভিহিত করলেও, আমি জেনেছি তিনি ভুল করেছেন। মনুষ্যত্বের যে নির্মল প্রকাশ আমাদের বন্দনীয়, জার্মানীর মানুষের মধ্যে তার অবসান ঘটেনি। আপনার আমার মতোই সে ভালোবাসে প্রিয়জনকে, দেশকে, পৃথিবীকে। রাজনীতির কুটচক্রে যাঁরা বিভ্রান্ত হয়েছিলেন, জার্মান জাতি কেবলমাত্র তাঁদের নিয়েই সমষ্টিবদ্ধ নয়।

বিশেষ করে এ কথাটা আমি ভেবেছিলাম, কারণ জার্মান জাতির সঙ্গে আমাদের একটা আশ্চর্য মিল আছে। য়ুরোপের জার্মানী আর এশিয়ায় ভারত, প্রাণের গভীরতর সত্তায় এই দু' দেশের যতখানি নিবিড়তর মিল, তেমন আর কোথায়ও খুঁজে পাই না আমি। জার্মানীতে ক্ষাত্রবুদ্ধি প্রবল, কিন্তু ব্রাহ্মণ্য মেজাজটাও স্পষ্ট। স্পষ্ট জার্মান সাহিত্যে।

আর্যত্বের অহমিকাই কেবলমাত্র মিল নয়। অধ্যাত্মবাদের মধ্যে ভারতীয়ের মতো জার্মান জাতিও পরম সান্ত্বনা খুঁজতে চেষ্টা করেছে। সংস্কৃত ভাষা

জার্মানীতে প্রিয়, প্রাচীন ভারত শ্রদ্ধেয়। জীবনের নানা ইন্দ্রজাল, নানা বিলাস-ব্যসনের মধ্যেও জার্মান-মন খুঁজে বেড়ায় পরম শান্তি, চরমতম মোক্ষকে। এই অতৃপ্ত তৃষ্ণা জার্মান সাহিত্যে স্রোতস্বিনী ধারার মতো প্রবাহিত, বেগবতী, প্রখর। এই ধারাই বোধ হয় জার্মান সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ধারা।

আধুনিককালে জার্মান সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখক, নিঃসন্দেহে টমাস মান। হিটলার তাঁকে ঘোষণা করেছিলেন 'অ-জার্মান'। নিজের দেশের নাগরিকত্ব তিনি হারিয়েছিলেন, নিজের দেশের শহরে শহরে, পল্লীতে পল্লীতে পুড়ে ভস্ম হয়েছে তাঁর গ্রন্থাবলী। প্রৌঢ় বয়সে মার্কিন রাজ্যের নাগরিক হয়েছিলেন। কিন্তু তবু সারা পৃথিবী তাঁকে স্বীকার করেছে আধুনিক জার্মান সাহিত্যের অগ্রণী কথাশিল্পী বলে। শুধু জার্মান সাহিত্যের নয়, বিশ্ব-সাহিত্যের।

টমাস মানকে যতই আমি অনুভব করতে যাই, আমার বিস্ময় বাড়ে। একটি জাতি, একটি জীবন, টমাস মান। একটি জীবন কি একটি জাতির প্রতিনিধি, না পৃথিবীব্যাপী সমস্ত মানুষের? জীবনে নানা স্থানে পরিভ্রমণ করেছেন টমাস মান। য়ুরোপ ও আমেরিকার বহুদেশে পরিব্রাজক হয়ে বক্তৃতা দিয়েছেন। যৌবনে যেখানে শান্তির নীড় নির্মাণ করে সুদীর্ঘকাল শিল্প-চেতনার আত্মমগ্ন প্রশান্তির মধ্যে কাটিয়েছেন, প্রৌঢ় বয়সে সে নীড় ভেঙেছে। নতুন দেশে নতুন বাসস্থান গড়ে তুলেছেন। পরিণত বৃদ্ধ বয়সে আবার সেই বাসভূমি পরিত্যাগ করে নতুন বাসভবন নির্মাণ করেছেন অন্য দেশে, অন্য আবহাওয়ায়। কিন্তু যেখানেই তিনি গেছেন, তিনি ছিলেন জার্মান। জার্মানীর ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন, তাঁর অন্তরের সর্বস্তরে জড়িয়ে রয়েছে জার্মান জাতির অনুভব, আশা আকাঙ্ক্ষা এবং আদর্শবোধ। অথচ জার্মানীর সঙ্গে তাঁর মতের মিল ঘটেনি, পথ-নিশানাও না।

বিত্তবান ব্যবসায়ীর সন্তান ছিলেন টমাস মান। তাঁর ঠাকুর্দা ও বাবা ছিলেন ল্যুবেক শহরে খ্যাতনাম। দু'বার মিউনিসিপ্যালিটির মেয়র নির্বাচিত
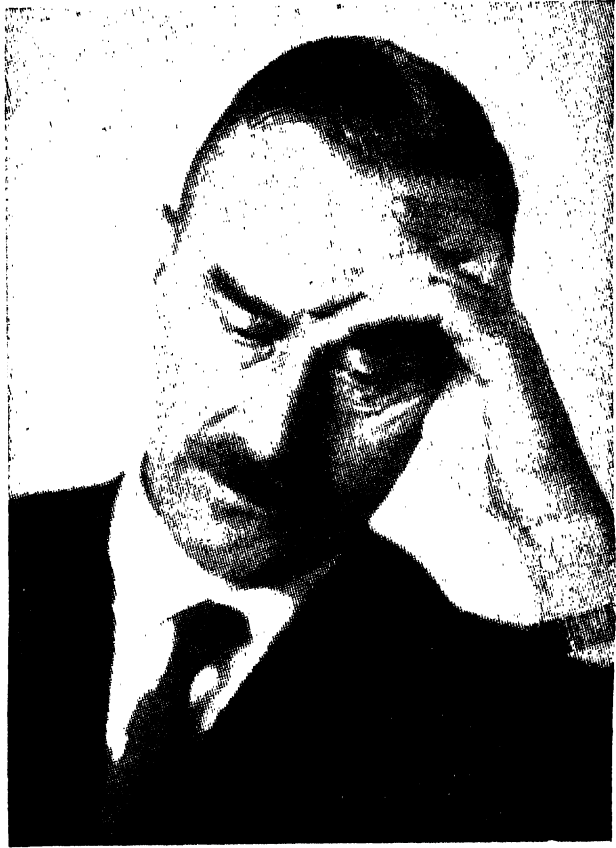
টমাস মানঃ 'আমার ঝোঁক ছিল খুব বড় রকমের শিল্পকর্মের উপরে।'

হয়েছিলেন তাঁর বাবা। মায়ের কথা বলতে গিয়ে টমাস মান বলেছেন, 'তাঁর থেকে পেয়েছি সংবেদনশীল শিল্পবোধ।' মা ছিলেন সুন্দরী, বিদুষী আর সঙ্গীতানুরাগী। রোমান্টিক মন ছিল তাঁর, তেজ ছিল, আর ছিলেন অত্যন্ত অনুভূতিপ্রবণ। ল্যুবেক শহরে তাঁর রূপের আর ব্যক্তিত্বের বিশেষ নাম ছিল। মায়ের প্রভাব পড়েছিল ছেলের ওপর।

টমাস মান সুপুরুষ। প্রশস্ত কপাল, তীক্ষ্ণ নাক আর একজোড়া সুন্দর ভ্রূ'র নিচে উজ্জ্বল দু'টো চোখ। এমন চোখ, যে চোখ অন্তর-বাহির দুই-ই দেখে আশ্চর্য স্পষ্টতায়। নরম, আত্মমগ্ন, সুদূরপ্রসারী আর স্বপ্নময়।

দু'ভাই, দু'বোন। সমৃদ্ধির ছায়ায় তাঁর বাল্যকাল কেটেছে সুখে। ভাইটি শিল্পী, ছবি আঁকে। বোনেরা গান-গল্প-আড্ডা জমায়। দুষ্টুমি করে। (দু'বোনই পরে আত্মহত্যা করে মারা যায়।)

কিন্তু টমাস মান বুঝতে পারেন না, জীবনে তিনি কি হবেন। ব্যবসায়ী না কেরানি না লেখক। বাবা ঠাকুর্দা নামী ব্যবসায়ী। টমাসও যোগ দেবেন ব্যবসায়ে, সকলেই তা' আশা করেন। কিন্তু তাঁর নিজের মন অন্যত্র ছুটে বেড়ায়। বাবার থেকে পেয়েছেন উদারনৈতিক বুদ্ধি, স্বাধীন চিন্তা ও মহৎ প্রেরণা। এর সঙ্গে সংবেদনশীল অনুভব ও শিল্পবোধ মিশে যে হৃদয় তিনি লাভ করেছেন, তার সঙ্গে

ব্যবসায় বা এরকম কিছু মেলে না। অন্য কিছু, অন্য কোথায়ও তাঁর জীবন। কিন্তু কি সে জীবন? কি সে বৃত্তি?

লেখা তাঁকে আকর্ষণ করতো। বাল্যকাল থেকে। আকর্ষণ করতো বৃহৎ ও মহৎ সবকিছু। জীবনের তুচ্ছ-তুচ্ছ নানা ঘটনার দিনমালা, এই তুচ্ছতা অতিক্রম করে বড়ো কিছু একটার অস্পষ্ট স্বপ্ন ছিল তাঁর মধ্যে। এই স্বপ্ন তাঁকে টেনে এনেছিল লেখার জগতে।

ইস্কুলে পড়তে গিয়ে ভালো ছাত্রের শিরোপা মেলে নি কোনদিনই। মাস্টার মশায়দের রাশভারী মুখ, চারদিকের তুচ্ছতার প্রতি মমতা, তাঁর কাছে হাস্যকর বলে মনে হতো। তিনি বিদ্রূপে ঝলসে উঠতেন। তাঁদের নিয়ে লিখতেন ব্যঙ্গাত্মক রচনা। ইস্কুলে একটা পত্রিকা বার করেছিলেন, নাম দিয়েছিলেন 'স্প্রিং স্টর্ম'। মাস্টার মশাইরা এ পত্রিকা দেখলে খুশি হতেন না: একটা বেপরোয়া, স্বাধীন আর স্বতঃস্ফূর্ত অনুভূতি জড়িয়ে ছিল পত্রিকায়। 'পল টমাস' ছদ্মনামে টমাস মান এতে লিখতেন কবিতা, নাটক, রোমান্স আর প্রবন্ধ। কিন্তু জানতে বাকি থাকতো না কারো, 'পল টমাস' কে। তাই ছদ্মনামের মুখোশ ছুঁড়ে ফেলে টমাস মান বেরিয়ে এলেন একটা কবিতায়। তারপর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সুদীর্ঘকাল চলেছে লেখকজীবন।

কিন্তু তখনও তাঁর বয়স অল্প, আত্মপ্রত্যয় দৃঢ় নয়। ভবিষ্যৎ জীবনে লেখক হবেন কিনা, ঠিক উপলব্ধি করতে পারেন না। এমন সময় বাবা মারা গেলেন। প্রচুরতর সমারোহে তাঁকে সমাধি দেওয়া হলো। আর আশ্চর্য, তার সপ্তাহ কয়েক পরেই একশ' বছরের খ্যাতনাম পারিবারিক ব্যবসা ঋণদায়ে চলে গেল উত্তমর্ণদের হাতে। টমাস মান মিউনিকে গেলেন সপরিবারে, একটা বীমা-প্রতিষ্ঠানে অবৈতনিক কেরানি হয়ে ঢুকলেন ব্যবসার কায়দাকানুন ভালো করে শিখবেন বলে। কিন্তু ভালো লাগলো না। সুদের হার আর বীমার তালিকা। তার বাইরে, তার উপরে জীবনের যে মহামূল্য, অপরূপ ঐশ্বর্যসুষমা, অবারিত সুর-ঝরণা—তাঁকে তা আকর্ষণ করতে লাগলো। ছেড়ে দিলেন অর্থহীন শিক্ষানবিশী।

অকেজো, ব্যর্থ, অকর্মণ্য বলে অনেকে মনে করলেন তাঁকে। এ সময়েই একটা প্রেমের ছোট উপন্যাস লেখেন তিনি ('ফলেন্')। তখনও নিজের ওপর খুব বিশ্বাস নেই, তখনও নিজেকে নিয়ে তাঁর ভাবনা। কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে খ্যাতি অর্জন করলেন তিনি প্রথম রচনায়। হয়তো খুব ব্যাপ্তি নেই এই খ্যাতির, হয়তো খুবই নগণ্য। কিন্তু সামান্য খ্যাতির আলোকে তিনি আবিষ্কার করলেন নিজেকে। জানলেন যে, তিনি লেখক ছাড়া আর কিছু নয়।

রাশিয়ান আর স্ক্যাণ্ডেনেভিয়ান সাহিত্য তাঁকে মুগ্ধ করতো। মুগ্ধ করতো ফরাসী সাহিত্য। এ সময়ের কথা বলতে গিয়ে তিনি পরে বলেছিলেন, 'তখন আমার ঝোঁক ছিল খুব বড় রকমের শিল্পকর্মের উপরে, মুগ্ধ হয়েছিলাম সেইসব বিরাট 'এপিক' ধরনের শিল্পকর্মে, যা সৃষ্টির পেছনে থাকে বিরতিহীন প্ররণা ও অজেয় ধৈর্যের সাধনা। তখন আমার ধ্যান জ্ঞান ছিলেন বালজাক, টলস্টয় এবং ভাগনারের মতো সফল শিল্পীশ্রেষ্ঠরা। আমার স্বপ্ন ছিল যদি পারি এ'দের অনুসরণ করবো।'

শোপেনহাওয়ারের দর্শন তখন তিনি 'দিন রাত' পড়তেন, লোকে যা একবারই মাত্র পড়ে। পড়তেন আর ভাবতেন। নীৎশে তাঁকে আকর্ষণ করতো, কিন্তু তাঁর দর্শন টমাস মান স্বীকার করতে পারতেন না। জীবনকে পূর্ণভাবে অনুভব করার, ব্যাপকভাবে উপলব্ধি করার একটা অতৃপ্ত তৃষ্ণা ছিল তাঁর। প্রকাণ্ড এক উপন্যাস লিখলেন এ সময়ে। লিখেই পাঠালেন প্রকাশকের ঠিকানায়, যে প্রকাশক আগেকার বইটি ছেপেছিলেন।

পোস্ট আপিসে গিয়ে উপন্যাসের পাণ্ডুলিপিটি বেশ পরিপাটি করে প্যাকেট করলেন। তারপর এক হাজার মার্ক ইনসুর করে পাঠালেন বার্লিনে প্রকাশকের নামে। পোস্টাপিসের কেরানি অনেকক্ষণ ধরেই লক্ষ্য করছিলেন টমাস মানকে। ইনসুরের অঙ্ক দেখে তিনি হাসলেন।

'হাসছেন কেন?' একটু বিদ্রূপ, একটু রাগ নিয়ে প্রশ্ন করেন টমাস।

'টাকার অঙ্ক দেখে। প্রকাশক পাণ্ডুলিপি নেবে তো? বেশ, বেশ। নামকরা লেখক বুঝি আপনি?'

পাণ্ডুলিপির আকার দেখে ঘাবড়ে গেলেন প্রকাশক। বল্লেন, 'দয়া করে ছোট করে দিন। এতো বড়ো লেখা কেউ পড়বে না।'

'পড়বে। পড়বে।'

তখন টমাস মান জীবিকায় সৈনিক। কিছু টাকা আছে ব্যাঙ্কে। নিজেই প্রকাশ করলেন এ বই। দু'খণ্ডে।

আজ এ বইয়ের নাম পৃথিবীর সর্বত্র সুপরিচিত। 'দি বাডেন ব্রুক।'

প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই বিপুলতর খ্যাতি অর্জন করলেন টমাস মান। দু'খণ্ড একত্রে প্রকাশিত হলো চীপ এডিশন হয়ে।

সর্বত্র শুধু 'বাডেন ব্রুকের' আলোচনা। একটি মহৎ উপন্যাস প্রকাশিত হলো বলে সরব কোলাহল। জীবনের সব কাজে যিনি বিফল হয়েছেন, অনুপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়েছেন, হঠাৎ তাঁর এতো যশ, এতো খ্যাতি, নিজেই চমকে উঠলেন টমাস মান। তখন তাঁর বয়স ছাব্বিশ বছর।

সমসাময়িক কালের একটি শিল্পী-পরিবারের কাহিনী 'বাডেন ব্রুক'। লেখকের আত্মজীবনীর ছায়া আছে তাতে। অনেকে বলেন, আত্মজীবনকেই পটভূমিকা করে আপন কল্পনার বিস্তার এই উপন্যাসে। ভাগনারের সঙ্গীত ও শোপেন-হাওয়ারের দুঃখবাদী দর্শনের প্রভাব পড়েছিল উপন্যাসের চিত্রিত পরিবারটিতে। আবেগ ও বিষণ্ণতার রেখায় অপূর্ব এর কাহিনী। টমাস মানের অধিকাংশ লেখাই শিল্পীজীবনের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত। পরবর্তিকালের যে শিল্পীরা জীবন সম্বন্ধে তর্কপ্রবণ হয়ে উঠেছিলেন, প্রথম দিককার রচনাগুলিতে তাঁরাই ছিলেন আবেগ-মর্মরিত, প্রেরণা-উদ্বুদ্ধ।

আধুনিক বিশ্বসাহিত্যে এই উপন্যাসটি অসাধারণ খ্যাতিতে উজ্জ্বল। একমাত্র জার্মানীতে 'বাডেন ব্রুকে'র দশ লক্ষ কপি বিক্রি হয়েছে। আজ পর্যন্ত এ বইয়ের দেড় শতাধিক সংস্করণ বেরিয়েছে। ১৯২৯ সালে টমাস মান নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন এ উপন্যাসের জন্য।

মিউনিকের একটি তরুণ হঠাৎ আন্তর্জাতিক সাহিত্যের আসরে খ্যাতিমান হয়ে গেলেন। পত্রিকায় তাঁর ছবি বেরোতে লাগলো, নানা দেশে তাঁর উপন্যাসের অনুবাদ।

মিউনিকের এক বিত্তবান ঘরের কন্যা কাৎশ্যা। দূর থেকে দেখেন টমাস মানকে। শ্রদ্ধা করেন, সমীহ করেন। একদিন আলাপ হলো অপ্রত্যাশিতভাবে।

তারপর রোজ আসতে থাকেন টমাস মান কাৎশ্যাদের বাড়িতে। খ্যাতিবান লেখকের একটা বিশেষ মর্যাদা গড়ে উঠেছিল সে বাড়িতে। ত্রিশ বছর বয়সে কাৎশ্যাকে বিয়ে করেন টমাস মান।

বিয়ের পর প্রায় ত্রিশ বছর একটানা শান্তিতে কেটেছে তাঁর। আনন্দময় লেখকজীবন। মিউনিকে। বিরাট বাড়ি করেছেন। প্রচুরতর সমৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে।

তাঁর পরবর্তী বিরাট উপন্যাস প্রকাশিত হয় ১৯০৯ সালে। এ উপন্যাসেরও নায়ক একজন শিল্পী, রুচিতে সে অভিজাত। ভাগ্য-নির্দেশকে ডিঙিয়ে যে মুক্তি চেয়েছিল কর্মপ্রেরণার মধ্যে, সমাজসেবার মধ্যে, অস্বীকার করতে চেয়েছিল নিয়তিকে। মুক্তির স্বাদ সে লাভ করেছিল, নিয়তিকে উত্তীর্ণ হয়েছে ভেবে তার আনন্দলাভও জুটেছিল, কিন্তু এই সমাজসেবার কর্মোন্মাদনাও কি নিয়তি-নির্দেশিত ভাগ্যই? কে জানে!

তারপর প্রকাশিত হয় এক তরুণ জার্মান ইঞ্জিনীয়ারের জীবন-জিজ্ঞাসা নিয়ে রচিত উপন্যাস 'ভসাওবেরবার্গ'। ১৯২০ থেকে '২৪ সালের য়ুরোপীয় জীবন নিয়ে এ কাহিনীর পটভূমিকা—সদ্যসমাপ্ত যুদ্ধের ধ্বংসলীলা ও সংকটে মানুষের মনে জেগেছে সভ্যতা সম্বন্ধে প্রশ্ন। সভ্যতার ভবিষ্যৎ কোথায়? জীবনের যা সৌন্দর্য, প্রেমময় ও কল্যাণ-স্নিগ্ধ রূপ; প্রেয়সীর অনুরাগ, সন্তানের আশ্রয়, প্রকৃতির নয়নাভিরাম বৈচিত্র্য—জীবনের এই শুভ ও সৌন্দর্যের মধ্যে টমাস মান শান্তি খুঁজতে চেষ্টা করলেন। "না, না। মৃত্যু যেন মানুষের চিন্তাকে আশ্রয় না করে।" বললেন তিনি উপন্যাসের উপসংহারে।

টমাস মানের প্রথমদিককার রচনায় আবেগ অত্যন্ত তীব্র। মাঝে মাঝে শরৎচন্দ্রকে স্মরণ করিয়ে দেয়। কাহিনীর বিষয়বস্তু ও বর্ণনারীতিতে পাঠকের মনে স্নিগ্ধ কৌতূহল বরাবর জাগিয়ে রেখে রসতৃপ্তি দেয়। কিন্তু তখনকার রচনাতেও তিনি আবেগের শাড়িতে দার্শনিকতার পাড় বুনে বুনে উপন্যাস রচনা করেছেন। বহির্বিশ্বের দ্বন্দ্ব ও সংঘাত, হিংসা ও মৃত্যুর নানা অভিজ্ঞতায় টমাস মানের মনে একটা প্রশ্ন সর্বদা জাগ্রত। কী এই জীবনের অর্থ? এই সভ্যতার ভবিষ্যৎ কোথায়? মাঝে মাঝে শোপেনহাওয়ারের দর্শন তাঁর মনে প্রখর হয়ে উঠেছে, কখনো কখনো গভীর আধ্যাত্মিক সংকটের মধ্যে পরম শান্তিকে খুঁজতে চেষ্টা করেছেন।

১৯২৯ সালে তিনি সাহিত্যের নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। তাঁর আগে জার্মান সাহিত্যের চারজন বরণীয় লেখক নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। টি মমসেন (১৯০২), রুডলফ অরকেন (১৯০৮), পল জোহান লাডুইগ হেইজে (১৯১০) ও জি হাউপ্টম্যান (১৯১২)।

ইতিমধ্যে কমিউনিস্ট ও সোস্যালিস্ট পার্টি জার্মানীতে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। মার্ক্সের জড়বাদী দ্বান্দ্বিক দর্শন বুদ্ধিজীবী মহলে বিশেষভাবে আলোচিত হচ্ছে এবং তারই আড়ালে অত্যন্ত ক্ষুদ্র একদলের ঝটিকাবাহিনীর শীর্ষে অজ্ঞাতপরিচয় হের হিটলার কথা কয়ে উঠছেন। বিরুদ্ধ শক্তির টানা-

পোড়েনের মধ্যে টমাস মানের শিল্পীমন আলোড়িত হয়ে উঠলো। তখনকার লেখায় তিনি স্পষ্ট সমাজসচেতন হয়ে উঠলেন। তাঁর আবেগ ও ভাবপ্রবণতা তখন রূঢ় বাস্তবের আঘাতে ভেঙে গেছে, তিনি মাটির মানুষের দিকে তাকাবার চেষ্টা করেছেন। এই সময় তাঁর অনেক গল্প ও তর্কবহুল উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে।

তারপর ঝড়ের গতিতে জার্মানীর রাজনৈতিক চিত্র পরিবর্তিত হয়ে গেল। ঝটিকাবাহিনীর উপর ভর করে হিটলার অধিকার করলেন রাষ্ট্রক্ষমতা। রাইখস্টাগ পুড়ে ছাই হলো, তার চাপায় পড়লো প্রগতিবাদী দল। নিরপেক্ষতার মুখোশ পরে সোস্যালিস্টরাও রেহাই পেল না, তাদের অপকীর্তির মধ্যে নাৎসী হিটলার তাঁর জয়পতাকা উড়ালেন বার্লিনে। মৃত্যু ও ভয়ের রাজত্ব গ্রাস করলো জার্মানী।

এই সময় টমাস মান বাইবেলী যুগের নায়ক জোসেফকে কেন্দ্র করে খণ্ড খণ্ড এক বিরাট উপন্যাস লেখেন। বাইবেলী চরিত্র ও রীতিনীতির পটভূমিকায় এ কাহিনী রচিত হলেও সমসাময়িক জীবনের অভিজ্ঞতাই তিনি তুলে ধরেছেন এই উপন্যাসে। টমাস মান এই গ্রন্থে বলতে চেয়েছেন, শিল্পীকে শুধু সৌন্দর্য সৃষ্টিতেই তন্ময় হয়ে থাকলে চলবে না, তাঁকে সামাজিক কর্তব্যও পালন করতে হবে। অবশ্য সে কর্তব্য পালন করতে হবে শিল্পের সাধনার মধ্য দিয়েই। নতুন নতুন অভিজ্ঞতার সংঘর্ষে, আত্ম-দ্বন্দ্বের ব্যাপ্তিতে উপন্যাসটি অপূর্ব। মাঝে মাঝে দর্শন ও রাজনীতির নানা পথ দিয়ে এগিয়ে গেছে এই কাহিনী, কোথায়ও কোথায়ও হৃদয় থেকে মস্তিষ্কের কাছেই আবেদন করেছে লেখা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই উপন্যাসটি একটি বিচিত্র শিল্পকীর্তির গৌরব অর্জন করেছে। বর্তমান যুগের সারা পৃথিবীর সাহিত্যে এপিকের সম্মান অর্জন করেছে এই গ্রন্থটি।

এই সময় নানা রূপকের মধ্য দিয়ে তিনি আক্রমণ করেছেন নাৎসীবাদ ও হিটলারকে। 'যাদুকর' নামে তাঁর একটি গল্প এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। এক যাদুকর সমস্ত দর্শকদের মোহগ্রস্ত করে রেখেছে, তখন প্রেক্ষাগৃহের এক যুবক এসে হত্যা করলো যাদুকরকে। হিটলার ও জার্মান জাতিকে অত্যন্ত স্পষ্ট ধরা যায় এইসব লেখায়। আর টমাস মানের সমাজসচেতন দৃপ্ত তেজস্বিতাও মনের মধ্যে বিদ্যুৎ জ্বালিয়ে দেয়।

অতএব যা স্বাভাবিক তাই ঘটলো। টমাস মান নির্বাসিত হলেন জার্মানী থেকে। তাঁর উপন্যাসগুলির বহ্ন্যুৎসব করলো নাৎসী চরেরা। টমাস মান তারপর বাস করেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। তাঁর লেখার তেজ কখনো থামেনি। মহাযুদ্ধের শেষে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে যখন নতুন বিপদের আশংকা আস্তে আস্তে বড়ো হয়ে উঠতে আরম্ভ করেছে, তখন তিনি সুইজার-ল্যাণ্ডে এসে বসবাস করতে থাকেন। আশী বছর বয়সে গত ১২ই আগস্ট জুরিখে তিনি পরলোকগমন করেছেন।

অধ্যাত্মবাদের মধ্যে সারা জীবন টমাস মান শান্তি খুঁজতে চেষ্টা করেছেন। ভগবানের সঙ্গে পরম নৈকট্যসাধনের অনুভূতি তাঁর মনে গভীরতর আকুতি জাগিয়ে রেখেছে। এই পবিত্র উপলব্ধির আলোকে তিনি কল্যাণের শিখা জাগিয়ে রেখেছেন তাঁর জীবনে। অসত্য, অকল্যাণ ও অবুদ্ধিকে তিনি আঘাত করেছেন। পৃথিবীর মাটি থেকে এই জাগ্রত কল্যাণ-শিক্ষা সম্প্রতি নিভে গেল। একটি জীবন। একটি আলোকবর্তিকা। টমাস মান।

ইংরেজি ভাষায় অনূদিত টমাস মানের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ:

উপন্যাস: রয়েল হাইনেস; বাডেন ব্রুক; ম্যাজিক মাউণ্টেন; যোসেফ এণ্ড হিজ ব্রাদার্স; ইয়ং যোসেফ; যোসেফ ইন ইজিপ্ট; দি বিলাভেড রিটার্নস; ফেলিক্স ক্রুল ইত্যাদি।

ছোট উপন্যাস ও গল্পগ্রন্থ: ডেথ ইন ভেনিস; চিল্ড্রেন এণ্ড ফুলস; আর্লি সরো; এ ম্যান এণ্ড হিজ ডগ; মারিও এণ্ড ম্যাজিশিয়ান; নক্টার্নস; স্টরিজ অব থ্রি ডিকেডস্ ইত্যাদি।

প্রবন্ধ ও সমালোচনা: থ্রি এসেজ; এ স্কেচ অব মাই লাইফ; পাস্ট মাস্টার্স এণ্ড আদার এসেজ; এন এক্সচেঞ্জ অব লেটার্স; ফ্রয়েড, গ্যেটে এণ্ড ভাগনার; দি কামিং ভিক্টরি অব ডেমক্রেসী; দিস ওয়ার; দিস পীস ইত্যাদি।

আলোচনা

'কর্ণকুন্তী সংবাদ'

সবিনয় নিবেদন,

৩৯ সংখ্যা দেশে রবীন্দ্রনাথের 'কর্ণ-কুন্তী সংবাদ'এর উপরে একটি অপরূপ প্রবন্ধ পড়লাম। রচনাটির প্রথমাংশ বিবৃতি-মূলক। অর্থাৎ কর্ণ-কুন্তী সংবাদের গল্পাংশ বর্ণন। সমালোচনা ঠিক তার পরেই। দেখা গেল লেখক তাঁর অত্যন্ত সহজ ও প্রাঞ্জল বক্তব্য প্রকাশে প্রায় দুটি পৃষ্ঠা ব্যয় করেছেন। আর সারাংশ হচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ কর্ণ ও কুন্তী উভয় চরিত্রে অবাস্তব চিত্রণ করেছেন। মহাভারতের চরিত্র চিত্রণের সঙ্গে কর্ণ কুন্তী সংবাদে বর্ণিত চরিত্র দুইটির কোন সাদৃশ্যই নেই। উপরি লিখিত মহা-কাব্যটি যাঁরা পড়েছেন তাঁদেরকে অভিযোগটির অন্তত কিছুটা সমর্থন করতে হয়। কিন্তু একেবারে নয়। জন্মের সঙ্গে সঙ্গে বিসর্জিত সন্তানের উপর জননীর মায়ামমতা হওয়া অসম্ভব—এ ধরনের মন্তব্য স্বীকার করে নেওয়া দুরূহ। বরং বিসর্জিত সন্তানকে দেখার ও কাছে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা জননীর একটু বেশী পরিমাণে থাকাই স্বাভাবিক। আর যদি অনেক বছরের পর সেই পুত্র অসীম বলশালী পুরুষ হয়ে তাঁর সামনে উপস্থিত হয়, তাহলে তো কথাই নেই। কর্ণ ও কুন্তী সম্বন্ধে একথা সম্পূর্ণরূপে প্রযোজ্য। কুন্তী যে কর্ণকে পাণ্ডবপক্ষে ফিরিয়ে আনতে গিয়েছিলেন তাতে ছলনা বিন্দুমাত্র ছিল না। অর্জুন ও কর্ণের জীবনপণ প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা তিনি জানতেন। মা হয়ে তিনি মনশ্চক্ষে নিজ পুত্রের মৃত্যুর দৃশ্য সইতে পারেননি। তিনি চেয়েছিলেন এই ভয়াবহ সম্ভাবনার পথ রুদ্ধ করতে। মহাভারতের কুন্তী চরিত্রে আর যাই থাক হীনতা ছিল না। কর্ণের সম্বন্ধে প্রবন্ধকারের অভিযোগ অনেকগুলিই অস্বীকার করা যায় না। তবুও কর্ণের উপর শ্রীযুত ঘোষকে অযথা তীব্রভাবে বিদ্বিষ্ট বলে মনে হয়েছে। তিনি স্বীকার করেছেন একটি বিশেষ বয়সে কর্ণ নিজেকে মাতৃ-পরিত্যক্ত বলে জানতে পারে। এতদূর স্বীকার করেও লেখক কি প্রকারে যে পরবর্তী মন্তব্যটি করেছেন বুঝতে পারিনি। রাধাকে যদি কর্ণ চিরকালই নিজের মা বলে জানত তাহলে প্রবন্ধকারের যুক্তি খণ্ডন করা যেত না। কিন্তু যে মুহূর্তে কর্ণ জেনেছে তার জন্মবৃত্তান্ত 'রহস্যময়' সেই মুহূর্তেই তার মন সেই অদেখা মার কাছে ছুটে যেতে চেয়েছে। মনে মনে সে রচেছে কত সহস্র কল্পনাজাল। এতো মনস্তত্ব। এর জন্যে রাধার কল্পিত অত্যাচারের কোন প্রয়োজনই ছিল না।

তবুও যদি প্রবন্ধকারের সব যুক্তি তর্কের খাতিরে মেনেই নেওয়া যায়, তাহলেও আমাদের বক্তব্য প্রকাশে বাধা ঘটে না। মহৎ সাহিত্যের প্রথম ও প্রধান গুণ হচ্ছে প্রসাদ-গুণ। যেটি আলোচ্য কবিতায় বিস্ময়কররূপে বিদ্যমান। আর পরিচিত চরিত্রের অপরূপায়ন বাংলা সাহিত্যে এই প্রথম নয়। ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক গতানুগতিকতার সীমা লঙ্ঘন করেছেন শুধু রবীন্দ্রনাথ নন—বঙ্কিমচন্দ্র, মাইকেল ও আরো অনেকে। 'কর্ণ-কুন্তী সংবাদ' যে একটি আশ্চর্য সুখপাঠ্য কবিতা তাই নয়, করুণরস, শান্তরস প্রভৃতি বিভিন্ন রসের সমাবেশে সমুজ্জ্বল। এর অন্তত কয়েকটি পঙক্তির তুলনা শুধু রবীন্দ্র-সাহিত্যে নয় সমগ্র বিশ্ব-সাহিত্যে বিরল। কিন্তু আমাদের প্রবন্ধকার নারাজ। মহাভারতের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি মিল খুঁজে না পেয়ে তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন 'কর্ণ-কুন্তী সংবাদ' ভালো দূরের কথা একটা কবিতাই নয়। কিন্তু আগেই বলেছি, কোন কবিতার ভিত্তি যত সত্য ঘটনার উপরই থাকুক না কেন, প্রত্যেক কবির পূর্ণ স্বাধীনতা থাকে সেই চিত্রকে বিচিত্রিত করার। কাব্যজগতের এটি অলিখিত অনুশাসন। কর্ণকে কর্ণই আর কুন্তীকে কুন্তীই রাখলে 'কর্ণ-কুন্তী সংবাদ' রচনা হয় না, সেটি হয় কাশীরাম দাসের মহা-ভারতের পুনর্লিখন। রবীন্দ্রনাথ তা জানতেন। আর জানতেন বলেই তার আশ্চর্য কল্পনা-বিলাসী মন দিয়ে কর্ণ ও কুন্তী চরিত্রকে নতুন দিক থেকে উপলব্ধি করতে পেরে-ছিলেন। লেখক অবশ্য একেবারে রসজ্ঞান-হীন নন। 'যৌবনারম্ভে' নাকি তাঁর কবিতাটি খুব ভাল লেগেছিল। "কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কর্ণ-কুন্তী সংবাদে পরিণত বয়সের সে আনন্দ নাই।" অনুমান করি তিনি বর্তমানে অশীতিসমীপে।

ইতি—তুষারকান্তি সাহা, সেণ্ট পলস কলেজ, কলিকাতা।

ফরাসী সংস্কৃতি সংখ্যা

মহাশয়,

দেশ : ফরাসী সংস্কৃতি সংখ্যা প্রকাশের জন্য আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ।

বিষয় বৈচিত্র্যে এই সংখ্যাটি তথ্যবহুল ও 'দেশ'-এর উদার সাংস্কৃতিক বোধসম্পন্ন রুচির পরিচায়ক। এ বিষয়ে বাংলাদেশে আপনারা একক। অদ্বিতীয়।

বাংলা ও ফরাসী বিষয়ে অনেকেই বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করেছেন। কিন্তু একটি উল্লেখযোগ্য নাম চোখে পড়লো না। তরু দত্ত। এই প্রতিভাময়ী নারী অল্প বয়সে লোকান্তরিতা হয়েও নিজ কবি-শক্তিতে আজও স্মরণীয়া। তরু দত্ত ফরাসী উত্তম-রূপে জানতেন ও ফরাসী ভাষাতে একটি উপন্যাসও রচনা করেছিলেন। এ দিক থেকে ফরাসীবিদ্ বাঙালীদের সঙ্গে তরু দত্তের নামও উচ্চার্য।

দ্বিতীয়ত শিবনারায়ণ রায়ের প্রবন্ধে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার কথার অবতারণ করা হয়েছে। কিন্তু তাঁর সব কথাগুলির সমর্থন করতে না পারায় দুঃখিত।

রবীন্দ্রনাথের মুখেই আমরা শুনেছি যে সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ বাহন সংস্কারমুক্ত মন। তবু বলব যে, সংস্কারমুক্তি নগ্নতা নয়। শিবনারায়ণবাবু যে নজির দেখিয়েছেন—সে সবগুলিই বিশেষ প্রয়োজনে জন্ম নিয়েছিল। Photography ও চিত্রশিল্পে যা তফাৎ, সাহিত্য ও জীবনেও সেই পার্থক্য। জীবনের ভূমিতেই সাহিত্যের গাছ বাড়ে ও ফুল ফোটায়, কিন্তু সেই মাটি ও কুসুম এক বস্তু নয়। অন্তত বহিঃপ্রকাশে।

এ কথা সর্বদা মান্য যে, বাংলা ভাষায় সংস্কারের জড়তা থাকার জন্য বাংলা গদ্য সর্বত্র সঞ্চারী হতে পারেনি। কিন্তু সেজন্য রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীকে দায়ী করা যায় না। উভয়েই বিচিত্র বিষয়ে বৈচিত্রময়ী ভাষা ব্যবহার করে দেখিয়েছেন।

শিবনারায়ণবাবুর শেক্সপীয়রের নজীরের বিরুদ্ধে বলার আছে। Shakespeare Studiesবলে বিলাতী পত্রিকাটি পড়লেই একথা স্পষ্ট হবে। Elizabethan stage-র দর্শকদের মধ্যে 'groundlings' বলেও একটি গোষ্ঠী ছিল। তাদের কথা কী শিবনারায়ণবাবু জানেন না? বহু বিদগ্ধজনের মতে শেক্সপীয়েরীয় অশ্লীলতার জন্য তারাও দায়ী। আমাদের বোম্বের সিনেমা শিল্প কী সেই শিক্ষা দেয় না?

বিদ্যাসাগর সম্পর্কেও শিবনারায়ণবাবু সংস্কৃত সাহিত্যের প্রসঙ্গ তুলেছেন। ঋতু-সংহারের কামনার সুরে বাঁধা গান ও কুমারসম্ভবের তৃতীয় সর্গের অপরূপ সৌন্দর্য কী এক জিনিস?

তাছাড়া সকল ভাষার রীতি ও স্বভাব এক নয়। Hamlet ও Othello কেন, আধুনিক কবি Herbert Palmer-এর 'Smite' the mountain's withered hips"—hips-এর বাংলা কী হবে ও কে করবেন? ভাষার ঋজুতার জন্য নগ্নতার প্রয়োজন হয় না। বিষয়-বৈশিষ্ট্যই ঋজুতার প্রধান লক্ষণ। উগ্র realismর বিরুদ্ধে Horace তাঁর Ars Poeticaতে বলেছেন, "Let not Medel slay her children before the public" (l. 185) স্বর্গীয় মোহিতলাল মজুমদার কী শিব-নারায়ণবাবুর নজীরগুলির মতো সাহিত্য সম্বন্ধে 'শিশ্নোদরপরায়ণ' কথাটি দুঃখের সঙ্গে ব্যবহার করেন নি?

আশাকরি, 'দেশের' শিক্ষিত পাঠক সম্প্রদায় শিবনারায়ণবাবুর গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধটির আলোচনায় প্রবৃত্ত হবেন। নমস্কারান্তে।

বিনীত—পবিত্রকুমার রায়, রামগড়, বিহার।

গোয়া বিমোচন আন্দোলন যে অত্যন্ত অন্যায় এবং সত্যাগ্রহীরা যে ভারতের নেতাদের উস্কানীতেই দলে দলে গোয়া প্রবেশ করিতেছে এই কথা প্রমাণ করিবার জন্য বিলাতের রক্ষণশীল দলের

কয়েকটি কাগজ মাথামুণ্ডু অনেক কিছু লিখিয়াছেন।—"মনে পড়ছে পঞ্চতন্ত্রের নীলবর্ণ শৃগাল দীর্ঘদিন আত্মগোপন ক'রে থাকতে পারেনি"—স্মরণ করাইয়া দিলেন জনৈক সহযাত্রী।

* * *

একটি সংবাদে শুনিলাম বৃটেন নাকি একটি 'আণবিক ঘড়ি' আবিষ্কার

করিয়াছে। বলা হইয়াছে এ ঘড়ি দ্বারা কক্ষপথে পৃথিবীর গতিবিধি সম্বন্ধে

নির্ভুল গণনা করা সম্ভব হইবে।—"মনে হয়, পর্তুগীজ সরকার এই ঘড়িটি কিনলে উপকৃত হবেন। পৃথিবীর গতিবিধি তাঁদের নিজের ঘড়িতে নিশ্চয়ই ধরা পড়ছে না এবং ঠিক্ সময় দেয় না বলেই হয়ত তাঁরা যাত্রার সময়ও ঠিক্ ধরতে পারছেন না"—মন্তব্য করিলেন বিশুখুড়ো।

* * *

জেনেভার "Atom for Peace Exhibition" হইতে নাকি কয়েকটি প্রদর্শনীর দ্রব্য চুরি হইয়া গিয়াছে। শ্যামলাল এই অদ্ভুত চুরির সংবাদ শুনিবামাত্র ছড়া কাটিতে আরম্ভ করিল—"ও ললিতে, চাপ কলিতে একটা

কথা শোন সে, রাধার ঘরে চোর ঢুকেছে মুখ পোড়া এক মিন্সে"!!!

* * *

পনরই আগস্ট ভারতের সর্বত্র সাড়ম্বরে স্বাধীনতা দিবস উদ্-যাপিত হইয়াছে। সেইদিনই কলিকাতার দেয়ালে দেয়ালে কে বা কাহারা লিখিয়া রাখিয়াছে—ভুয়া স্বাধীনতা। জনৈক সহ-যাত্রী মন্তব্য করিলেন—"লেখক দেয়ালের গায় লিখতেই শিখেছেন, 'দেয়ালের লেখা' পড়তে এখনো শেখেন নি"!!

* * *

একটি সংবাদে বলা হইয়াছে—পাটনা এ বৎসর স্বাধীনতা দিবস পালন করে নাই।—"পাটনার সাম্প্রতিক ঘটনা দেখে শুনে মনে হচ্ছে তাঁরা স্বাধীনতাকে কোন একটি বিশিষ্ট দিনের মধ্যে সীমা বদ্ধ রাখতে নারাজ"—মন্তব্য করেন বিশুখুড়ো।

* * *

পাক স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে অস্থায়ী গবর্ণর জেনারেল ইস্কিন্দার মির্জা সাহেব স্বীকার করিয়াছেন যে অষ্টম বর্ষে পাকিস্তানের রাজনৈতিক স্রোত কর্দমাক্ত হইয়া উঠিয়াছিল।—"এটা পলিমাটির কাদা নয়; অনেকেই জানেন জল ঘোলা ক'রে জল খাবার নজির দুনিয়ায় আছে"—বলেন বিশুখুড়ো।

* * *

পদত্যাগের পর জনাব মহম্মদ আলি নাকি তাঁর নিজের অনেক জিনিস-পত্র নীলামে বিক্রয় করিয়া দিতেছেন। শ্যামলাল বলিল—"আমরা বলছিলাম আর দু' একটা দিন সবুর করলে হতো ভালো। পাকিস্তানের পাকচক্র খোদা ন জানতি!!"

* * *

জনাব সুরাবর্দী অভিযোগ করিয়াছেন যে, পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী আর গভর্নর দুইজনই পাঞ্জাবী। উত্তরে ফজলুল হক্ সাহেব জানাইয়াছেন যে, ইস্কিন্দার মির্জা সাহেব পাঞ্জাবী নহেন, তিনি মুর্শিদাবাদের লোক।—"কথাটা শুনে মির্জা সাহেব আর তাঁর চেলাচামুণ্ডারা নিশ্চয়ই তোবা তোবা ক'রে উঠেছেন এবং মুর্শিদাবাদের সিল্ক যে গোমতী আর বুড়ীগঙ্গার জলে কাচা হলে মসলিন ব'নে যায় সে কথা কোমরে গামছা বেঁধে প্রমাণ করে দিয়েছেন"—বলেন আমাদের জনৈক সহযাত্রী।

* * *

আন্তর্জাতিক পরমাণু বিজ্ঞানী সম্মেলনে ঘোষণা করা হইয়াছে এখন হইতে নাকি ফসল উৎপাদনে তেজস্ক্রিয় সার ব্যবহার হইবে।—"তবেই হয়েছে; গোবরের সারে উৎপন্ন ডাঁটাটা-আঁশটা যদি বা পাতে পড়ছিল, এবারে তা-ও গেল। তেজস্ক্রিয় সার দেওয়া জমিতে সাধারণের জন্যে এক সর্ষেফুল ছাড়া আর কিছু ফলবে ব'লে তো মনে হয় না"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

ঝাঁসীর রানী ○ মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য

॥ ৪ ॥

তাম্বে পরিবারের পূর্ব-কথা

কৃষ্ণাজী অনন্ত তাম্বের জন্ম সাল ১৭১৯ খ্রীষ্টাব্দ। নাম থেকে বোঝা যায় তাঁর পিতার নাম ছিল অনন্ত কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে বিশদ কিছু জানা যায় না। কৃষ্ণাজী ছিলেন তৎকালীন বিখ্যাত ধর্মসাধক ব্রহ্মেন্দ্র স্বামীর ভক্ত। কৃষ্ণাজী বিদ্যা, বুদ্ধি এবং চরিত্রের বিবিধ গুণে প্রিয় হয়েছিলেন গুরুর কাছে। ব্রহ্মেন্দ্র স্বামীর ভক্তবৃন্দের মধ্যে একজন ছিলেন প্রথম বাজীরাও পেশবা। বাজীরাওয়ের সময়ে মহারাষ্ট্র শক্তির দ্রুত উন্নতি সম্বন্ধে বলা যায়—

"বাজী তেরে রাজ মেঁ
ধক্ ধক্ ধরতী হোয়।
জিত জিত ঘোড়া মুখ করে
তিত তিত ফত্তে হোয়॥"

একদা বুন্দেলা রাজা ছত্রসালের প্রশস্তিতে বাবা প্রাণনাথ এই আশীর্বাণী উচ্চারণ করেছিলেন। বাজীরাওয়ের সম্পর্কেও বলা যায়, যেদিকে তাঁর অশ্ব মুখ ফেরাত, সেইদিকেই স্থাপিত হ'ত তার জয়ধ্বজা। মহারাষ্ট্র জাতির সেই গৌরবময় দিনে দূরদর্শী বাজীরাও পেশবা যোগ্য মানুষ দেখলেই তাকে শিক্ষিত করতেন সমরবিদ্যায়। চোখে ছিল তাঁর উচ্চাশার স্বপ্ন। মোগলশাহীর পতনে সূচিত হয়েছে মহারাষ্ট্রের উন্নতি। মহারাষ্ট্রকে জয়ী করবার জন্য চাই যুদ্ধ-কুশলী তরুণ যুবকদের।

বাজীরাও পেশবার ব্যক্তিগত ইচ্ছায় কৃষ্ণাজী অনন্ত তাম্বে সমর শিক্ষা করলেন। ১৭৩৮ সালে মহম্মদ খাঁ বাঙ্গোসের আক্রমণ থেকে বুন্দেলখণ্ডকে রক্ষা করবার সময় কৃষ্ণাজী অনন্ত তাম্বে গেলেন মারাঠা বাহিনীর সঙ্গে। বুন্দেলখণ্ডে স্থাপিত মারাঠা রাজ্যের একাংশে হামীরপুর ও বান্দার সুবেদারী পেলেন তিনি। তারপর পুণা থেকে তাঁকে ডাকা হ'ল। ১৭৫৯-৬০ সালে তিনি মারাঠা বাহিনীতে একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। ১৭৬১ সালে, পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে, মারাঠা শিবিরের উত্তর দরজার অধিনায়ক ছিলেন কৃষ্ণাজী। পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে মারাঠাশক্তির শোচনীয় পরাজয় ঘটল। পুণাতে খবর গেল, লক্ষাধিক মণিমুক্তা এবং স্বর্ণ-মোহর বিনষ্ট হয়েছে। ভগ্নহৃদয়ে প্রাণত্যাগ করলেন তৎকালীন পেশবা বালাজী বাজীরাও। পানিপথের যুদ্ধ-ক্ষেত্রের স্বল্পসংখ্যক মারাঠাবীর প্রত্যাগতদের মধ্যে কৃষ্ণাজীও ছিলেন।

১৭৬৫ সালে কৃষ্ণাজী পেশবা প্রথম মাধবরাওয়ের নির্দেশে মারাঠা বাহিনীর সহায়তায় নাগপুর ও বেরারের অধিপতি ভোঁসলাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। স্রোতস্বিনী বেষ্টিত গিরিশিখরে অবস্থিত বালাপুর দুর্গ থেকে যুদ্ধ করলেন জানোজীরাও ভোঁসলা। কিন্তু কৃষ্ণাজী তাঁকে পরাভূত করলেন। জানোজীরাও পলায়ন করলেন চন্দা অভিমুখে। মাধবরাও, কৃষ্ণাজীকে ভার দিলেন, মাহুরের গিরিবর্ত্ম রক্ষা করবার। যাতে নিজাম এবং ভোঁসলাদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব না হয়। মাধবরাওয়ের কাকা রঘুনাথরাও যে কোনো সময়ে পেছন থেকে তাঁকে আক্রমণ করতে পারেন, সে আশঙ্কাও তাঁর ছিল। উমারখেদ-এ ঘাটি করলেন কৃষ্ণাজী। তাঁর নিয়মিত বিবৃতিগুলি আজও পেশোয়া দফতরে বিদ্যমান।

এইভাবে আজীবন পেশোয়াশাহীকে একনিষ্ঠভাবে সেবা করবার জন্য কৃষ্ণাজীর পদমর্যাদা বেড়ে গেল। পুণাতে শানোয়ার ওয়াড়াতে তিনি একটি সুবৃহৎ অট্টালিকা নির্মাণ করলেন। সেটি আজও

বিদ্যমান। তবে সে-ভবন আজ তাম্বে পরিবারের অধিকারচ্যুত।

কৃষ্ণাজীর পুত্র বলবন্তরাও উমারখেদ-এ ছিলেন। যুদ্ধের শিক্ষা পুঁথিতে নয়, অভ্যাসে—এই ছিল মারাঠা বীরদের অভিজ্ঞতা। বলবন্ত্ পিতার সাহচর্যে যুদ্ধবিদ্যা শিখেছিলেন। ১৭৯৪ সালে মাধবরাওয়ের মৃত্যুর পর পুণাতে পেশোয়াশাহীর আসন ঘিরে যে রক্তাক্ত ইতিহাস রচিত হয়েছিল তার ঘূর্ণিপাকে কৃষ্ণাজীর নাম বিলীন হয়ে যায়। তাঁর মৃত্যু সম্বন্ধে সবিশেষ জানা যায় না।

বলবন্তরাও, দ্বিতীয় বাজীরাও, শেষ পেশবার কনিষ্ঠ ভ্রাতা চিম্‌নাজী আপ্পার বিশেষ অনুগত ছিলেন। ১৮১৫ খৃীঃ অব্দে চিম্‌নাজী আপ্পার সঙ্গে তিনি বারাণসী গেলেন। কাশীতে অসিঘাটের সন্নিকটে চিম্‌নাজী আপ্পার বাড়ির কাছে তিনি স্বীয় গৃহ নির্মাণ করলেন। দীর্ঘদিনের অবহেলায় সেই বাড়ি আজ ভূমিসাৎ হয়ে গেছে। তবু চিম্‌নাজী আপ্পার বাড়িটি আজও আছে। তার সামান্য দূরেই ভগ্ন প্রাচীর ও ভিত্তি পড়ে আছে তাম্বে পরিবারের।

বলবন্তরাওয়ের পুত্র মোরোপন্ত বা মোরেশ্বর তাম্বের জন্ম হয় ১৮১১ সালে। বলবন্তের কবে মৃত্যু হয় সঠিক জানা যায়নি, তবে মোরেশ্বর সাবালক হ'য়ে চিম্‌নাজীর বংশধরদের কাজকর্মে সাহায্য করবার আগে নয়। চিম্‌নাজী আপ্পার মৃত্যু হয় ১৮৩২ সালে। বারাণসীর সুবিখ্যাত ধনী থাট্‌লে পরিবারে বিবাহ হয় তাঁর নাবালিকা কন্যা দ্বারকা বাঈয়ের ১৮৩৬ সালে।

কৃষ্ণানদীর দোয়াবে অবস্থিত কাড়ার শহরের সাপ্‌রে পরিবার সুবিখ্যাত ধনী ছিলেন। সে দিনে ব্যাঙ্ক ছিল না। লোকের টাকা গচ্ছিত রাখা এবং সময়মত তাদের দেওয়া ছিল সাপ্‌রেদের কাজ। কথিত আছে, তাঁদের বাড়িতে নিত্যকর্মে সোনার বাসন ব্যবহৃত হ'ত। এই সাপ্‌রে পরিবারের জনৈকা কন্যার সঙ্গে দাক্ষিণাত্যে বিবাহ হয় মোরোপন্তের। মারাঠা ব্রাহ্মণ বংশের নিয়মানুসারে বিবাহের পরই কন্যার নাম পরিবর্তন করে রাখা হ'ল ভাগীরথী বাঈ।

অসিঘাটের বাড়িতে, এই ভাগীরথী বাঈয়ের গর্ভে, ২১শে নবেম্বর ১৮৩৫ সালে মোরোপন্ত তাম্বের একটি কন্যা সন্তান হ'ল। মায়ের ইচ্ছায় তার নাম হ'ল মণিকর্ণিকা, সংক্ষেপে মনু।

প্রথম সন্তানই কন্যা, তাতে মোরোপন্ত বা তাঁর স্ত্রী'র কোনো দুঃখ ছিল না। সন্তান, সন্তানই।

যখন মনু একান্ত শিশু আর হাজারটি শিশুর মতোই হাসি, কান্না, খেলায় তার দিন কাটত, তখন তার দিকে চেয়ে চেয়ে বাবা মার স্বপ্ন ছিল না কি? নিশ্চয় ছিল। কিন্তু সেই স্বপ্ন ঘর-দুয়ারের, ঐশ্বর্য সমৃদ্ধির। মা হয়তো ভাবতো অষ্টবর্ষে গহনা কাপড়ে গৌরী সেজে মনু তাঁর শ্বশুরালয়ে যাবে। ঘরে ঘরে মহালক্ষ্মীর আর গণেশ চতুর্থীর পুজোতে। সুহাসিনী করে নিয়ে যাবে তাঁর মনুকে। স্বামীতে, পুত্রে, মনু তাঁর সুখে সংসার করবে। বাবা হয়তো দিনান্তে গৃহে ফিরে শিশুর কলকাকলী শুনতেন আর ভাবতেন মেয়ে আমার সৌভাগ্যবতী হবে। দেশবিদেশ খুঁজে বর এনে দেব মনুকে।

কিন্তু পিতামাতার স্নেহসিঞ্চিত স্বপ্নের কোনো দূরান্তেও ঠাঁই ছিল না দুর্মদ স্বাধীনতা সমরের। বাজনা যদি কিছু বেজে থাকে তো স্বপ্নে তাঁদের সানাই বেজেছে গৌড়সারং সুরে বিয়ের দিনে, আর সধবা মহারাষ্ট্রীয় রমণীদের আনাগোনায় অলঙ্কার শিঞ্জিত হয়েছে। যুদ্ধক্ষেত্রে তরোয়ালে তরোয়ালে ঝন্‌ঝনা তাঁরা কল্পনা করেননি। সাধে কামনায় যে-হাতে হীরের বালা আর মোতির চুড়ির কথা তাঁরা ভেবেছেন, সেই হাত যে একদিন এক অদম্য উৎসাহে অনুপ্রাণিত হয়ে তরোয়াল তুলে নেবে, সে তাঁরা ভাবেননি। পতিগৃহে, মঙ্গলসূত্র এবং কুঙ্কুম তিলকের সীমান্তনী চিহ্ন নিয়ে মৃত্যু মেয়েদের পরমকাম্য। স্নেহাস্পদের মৃত্যুর কথা যদিচ বাপ মা ভাবেননি, কিন্তু একদিন এক মহানমৃত্যু বরণ করে তাঁদের কন্যা যে লক্ষ কোটি নরনারীর মনে যুগান্তব্যাপী শ্রদ্ধার আসন অর্জন করবে, আর তার সমাধিস্থান উত্তরকালে ভারতবর্ষের তীর্থক্ষেত্র হয়ে উঠবে, সে কথা নিশ্চয় মোরোপন্ত বা ভাগীরথী কল্পনা করেননি।

তাই অন্য শিশুদের মতোই শৈশব কাটতে লাগল মনুর মায়ের আদরে, বাপের স্নেহে, কাজল পরে, দেয়ালা করে। ভোরবেলা কলকাকলীর সঙ্গে মায়ের মুখ চেয়ে ঘুম ভেঙে উঠে আর সন্ধ্যাবেলা সেই মুখেরই ঘুমপাড়ানী গান শুনে ঘুমিয়ে পড়ে।

একান্ত ভালোবাসা আর সুখশান্তির এই নীড়টুকুতে একদিন আঁধি এল। সে এক সাঁঝের বেলা। উত্তুরে বাতাসে ঝড় বইছে, পাথরের দেয়ালে পেতলের পিদীমের আলোটা দপ্ দপ্ করছে আর কালো কালো ছায়া নেচে বেড়াচ্ছে ঘরময়। বাইরে আকাশ দিয়ে সাঁজোয়া পরা ফৌজের মতো সারি সারি চলে যাচ্ছে মস্ত মস্ত কালো কালো মেঘ। এমনি এক সন্ধ্যাবেলায় অসিঘাটের সেই বাড়িখানি, আর দুটি মানুষ, একজন বড়ো, একজন শিশু, তাদের মন আঁধার করে ভাগীরথী চলে গেলেন। পরে রইল তাঁর সাধের ঘর সংসার। ঘরের কোণে মহালক্ষ্মী, গণেশ আর বিষ্ণু বিগ্রহ। পুজোর বিবিধ সরঞ্জাম, মনুর কাজললতা, দুধের বাটি সবই পড়ে রইল। তাঁর হাতের কল্যাণস্পর্শ ছাড়া সবইতো বোবা, আর অর্থহীন। মোরোপন্ত একবার কাঁদলেন, একবার শিশুর মুখ চেয়ে বুক বাঁধলেন। তাঁর মা, বলবন্তের বিধবা পত্নী, মনুকে কোলে তুলে নিলেন। দুই বছরের বালিকা মনু কিছুই বুঝল না। সে শুধু দেখল মা কোথায় যেন চলে গেল। রাণীর মতো সেজে, ফুলের দোলায়, রঙীন কাপড়ে। তারপর মন কেমন ক'রে কতো রাত গেল, কতো দিন এল, কতোবার ঘুমচোখে হাত বাড়িয়ে মা-কে খুঁজে, শূন্য বিছানা ছুঁয়ে হাত ফিরে এল, মা আর এল না।

আজকের কথা তো নয়, একশো সতেরো বছর আগেকার কথা। সেদিনও বারাণসী মস্ত বড় পুণ্যধাম। সাধু, সন্ন্যাসী, দীনদরিদ্র, রোগী, ভোগী, সবারের আশ্রয় বিশ্বনাথের চরণ। হরিদ্বার, এলাহাবাদ, জয়পুর, চুণার, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, কলকাতা, কটক আর মহীশূর, সর্বত্র থেকে ব্যাপারীরা এনেছে সেখানে তামা, পেতল, কাঁসা আর রুপোর বাসন। কাপড়, জরি, পাথরের জিনিস, মাটির পুতুল, হাতীর দাঁতের খেলনা, চন্দনকাঠের বেসাতি। সিংহলের উপকূল থেকে ডুবুরীরা মুক্তো এনেছে। চিল্কা থেকে এসেছে শঙ্খ কড়ির বোঝা। কলকাতা থেকে গঙ্গায় নৌকো ভাসিয়ে এসেছেন বাঙালী পণ্ডিত, ব্যবসায়ী কর্মচারীর দল। বিভিন্ন জায়গা থেকে যে সব বাঙালী ব্রাহ্মণ কোনরকম সমাজ-বিরুদ্ধ কাজ করেছেন, তাঁরা অনেকে এসেছেন। তাঁরা আর ফিরে যাবেন না। দেশে ঘরে তাঁদের বলবে 'কেশেড়া বামুন'।

কতোরকম মানুষ, কতোরকম মানসিক, যজ্ঞ পূজার সহস্র উপচার। মণিকর্ণিকায় দিবারাত্রি চিতা বহিমান্। বোঝা বোঝা আশা আকাঙ্ক্ষা পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে সেখানে। গঙ্গার জলে মিশে তারা সমুদ্রে বিলীন হবে। আবার নতুন সব আশা আকাঙ্ক্ষা কামনা জমা হচ্ছে বিশ্বনাথের চরণের তলায়।

দশাশ্বমেধ ঘাটে নিত্য গীতাপাঠ, ভক্তজনের ভজনগান—"দরশন দিজো গিরিধারী, মোহন মুরারি"। সাঁঝিগঙ্গার খরস্রোতে কুমারী মেয়েদের মনের সরমাক্ত প্রার্থনাটুকু নিয়ে ভেসে চলেছে ছোট ছোট ঘিয়ের প্রদীপ। সব যেমন ছিল তেমনি রইল। কিন্তু একখানি ঘরে সব শূন্য হয়ে গেল।

চিম্নাজী আপ্পার তার পূর্বেই মৃত্যু হয়েছে। সেটা ১৮৩৮ সাল। কানপুরের সমীপবর্তী বিঠুরে রয়েছেন শেষ পেশবা দ্বিতীয় বাজীরাও। তাঁর আহ্বানে মোরোপন্ত বিঠুর যা স্থির করলেন। তাঁর সঙ্গে চললেন ে আত্মীয় কেশবভাস্কর তাম্বে।

বড় বড় ভাও নৌকা। বেসাতি অ যাত্রী নিয়ে দেশে দেশান্তরে ফিরছে তারই একটিতে চললেন মোরোপন্ত পরম স্নেহে গঙ্গা তাঁকে পেঁাছে দিলে বিঠুর।

"পুণ্যতীর্থ কাশীধামের অধ্যা হলো শেষ।" (ক্রমশ

পাঁচমুড়ার মাটি

কমল মজুমদার

যে দেশের মৃত্তিকা রক্তিম, যেখানে যেখানেই মাটিতে কাঁকর, একথা সত্যই যে, সেখানকার কুমোররা তাদের কাজ সম্পর্কে অনেক কিছুই ভাবে। মাটির গুণের কথা তাদের সকল সময়ই মনে থাকে, তারা আলোচনা করে। যখনই একটি পুকুর সংস্কার করা হয় অথবা কোন নূতন কুয়ো খোঁড়া হয়—এ খবর পাবা মাত্রই কুমোররা মাটি দেখতে যায়, সংগ্রহ করে কাজে লাগাতে চেষ্টা করে। ঠিক এইরূপ ছুটোছুটি, আমাদের বিশ্বাস, যেখানকার মাটি ঈষৎ কালো সেখানকার কুমোরদের করতে হয় না। গঙ্গা মহলের কুমোররা, শুধু ভাবে জিনিসপত্রে রঙ ধরাবার কথা, তারা বনক মাটি কেনে, তারা লাল মাটি কেনে। কালো মাটা সংগ্রহ করে নিকটস্থ খেত খামার থেকে, গ্রামের আশপাশ থেকে। গড়ন-পত্তনের জন্য বড় একটা বেশী ভাবতে হয় না। অথচ যেখানকার মাটি লাল সে দেশের কুমোরদের গড়নপত্তনে টিস্ না রে এমন মাটির কথা ভাবতেই হয়।

পাঁচমুড়ার কুমোরদের নাম আর পাঁচটা থানায়, নিজ জেলায় এবং ভিন্ দেশে যথেষ্ট। এখানকার কুমোররা একাধারে যেমন মাটি খুঁজেছে, রঙমাটির (স্লিপস) জন্য যেমত অস্থির হয়েছে তেমনি সেই সঙ্গে তারা খুঁজেছে নূতন রূপ। তাদের সমস্ত কিছু সৃষ্টির মধ্যে একটি সচেতন মনের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রত্যেকটি কাজের আঙ্গিক, গড়ন, সাজ এবং প্রিমিটিভ বন্ধন আমাদের অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করে।

পাঁচমুড়া, বাঁকুড়ার তালডাংরা থানার একটি ছোট গ্রাম। বাস অনেক শালের জঙ্গল পেরিয়ে এসে এই গ্রামের ধারে থামছিল। দু'পাশেই তাঁতের ঠক ঠক আওয়াজ, এই ছোট রাস্তা ছাড়িয়ে যেই একটি আড়াআড়ি রাস্তায় পড়লাম, অমনি

ঝাড়বারি

চোখে পড়লো দু'ধারে দোকান সাজানো। এইটুকু গ্রামে এরূপ দোকান সাজানো থাকবে আমি অন্তত আশা করিনি। কত ঘোড়া, কত হাতী, সওয়ার ঝাড়বারি রকমারি জিনিস থরে থরে; পাঁচ গ্রামের লোক আসে এটা সেটা নিত্যপ্রয়োজনীয় মানসিকের বস্তু সামগ্রী কিনতে। ফলে এদের সাজিয়েই রাখতে হয়। অবশ্য এতে করে প্রমাণ হয় না যে, এদের জিনিস পাঁচ হাটে যায় না, পাঁচ হাটে তো যায়ই, পাঁচ শহরেও যায়।

পাঁচমুড়ার বিখ্যাত কাজ হচ্ছে তার 'ঝাড়বারি'। এই ঝাড়বারি মূল কল্পনাটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। বহু জায়গার মনসার ঘটের সঙ্গে আমাদের পরিচয় আছে, কিন্তু কোথাও ঠিক এইভাবে কল্পনা করা হয়নি। এই ঝাড়বারির সমস্ত কিছুতে সর্বাঙ্গীণ চিত্রের লক্ষণ বিশেষভাবেই পরিস্ফুট। কখনও তা স্থাপত্যের নিদর্শন নিয়ে দেখা দেয়; সময়ে তার ভাস্কর্য মহিমা অতি দূরে অন্তরীক্ষ থেকে সম্মুখে ভেসে আসে। মধ্যবর্তী প্রতিমার দেবমূর্তির সকল গাম্ভীর্য, তেজ, দীপ্তি শুধুমাত্র আয়ত নয়নের জন্য নয়, তার সংযত ভঙ্গিমার জন্যই অদ্ভুতভাবে প্রতীয়মান হয়। এছাড়া, ঘর কাটা চৌহদ্দিতে আর আর মূর্তি গুলিতেও সেই সৌন্দর্য বর্তমান। সমস্ত ঝাড়বারি ঘিরে সর্পমস্তক, অথবা গোলাপ ফুলকারি জাতীয় ঘের, এক অপূর্ব সাজ-ব্যবস্থার সৃষ্টি করেছে। ঠিক এই

ঘোড় সওয়ার

কাবাময় নক্সা সাধারণত লোকশিল্পে দেখা গেলেও আলোছায়ার সত্যের এইরূপ বাস্তব উল্লেখ কোথাও দেখা যায় না। এই বাস্তবতাকে ফুটিয়ে তোলার ব্যাপারে সব থেকে সাহায্য করেছে এর রঙ—যা অনেকটা ব্রোঞ্জের মত। ঠিক এরূপ রঙ সাধারণত বাঙলার অন্যান্য যায়গায় দেখা যায় না, তার অবশ্য প্রথম কারণ হ'ল মাটি (স্লিপস) সে কথা আমরা স্বীকার করি, দ্বিতীয় কারণ হলো পোড়াবার পদ্ধতি।

ঠিক এইরূপ রঙ পাঁচমুড়োর ঘোড়ায়, বিড়ালে, হাতীতে, এই সকল জন্তুগুলি স্থানীয় লোকেদের নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তু। লোকে মানত করে, ঠাকুর দেবতার থানে দেয়। আমরা কিন্তু এগুলির মধ্যে চমৎকার একটি রূপের সন্ধান পাই। বহুকাল থেকেই আমাদের দেশে অনেক রকমারি হাতী ঘোড়া গড়া হয়েছে। প্রত্যেকটিতে এ কথাই প্রমাণ হয় যে, তারা

মাটির তৈরি নানাবিধ সামগ্রী

হাতী ঘোড়া করতে চেয়েছিল, ছোট আয়তনের মধ্যে স্পষ্টরূপে যতটুকু আনা সম্ভব ততটুকুই আনবার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু এখানে দেখা যায়, যতটুকু তেজ সবটুকু স্বভাব আছে তা পাঁচমুড়োর কারিগররা এনে ফেলেছে। সব থেকে আনন্দদায়ক হল, এই জন্তুগুলির—যথা ঘোড়া বিড়াল এদের বলিষ্ঠ বুক। একটি জানোয়ারের যা কিছু জোর, তা যেন বা একটি অমোঘ মুঠোর মত সবেগে দর্শকের সামনে এগিয়ে আসছে। তার উপর জয়পোণ্ডার, পাঁচমুড়া থেকে প্রায় এক ক্রোশ দূর হবে, সেখানকার মাটির গুণে, জিনিসগুলি যেন ধাতুময় বলে মনে হয়। এক একটি ঘোড়া তিন ফুট চার ফুট পর্যন্ত উঁচু হয়। এগুলি পোড়ানো যে কি বিচক্ষণতার কাজ তা না দেখলে বুঝা যায় না। অনেক সময় হয়তো এগুলি চিড় খেয়ে যায়, তখন কুমোররা সেই ফাটল গালা দিয়ে সুন্দরভাবে জুড়ে দেয়। আর একটি জিনিস পাঁচমুড়োর বিখ্যাত, তা হচ্ছে ঘোড়-সোয়ার। মানুষটি সত্যই ভারি সুন্দর, কালীঘাটের পটের মুখখানি যেন বসানো, চোখ দুটি মিঠে, চুল কেয়ারি করা।

আমার নিজের ভাল লেগেছে পাঁচমুড়োর ছোট হাতী, এই ছোট বস্তুটির মধ্যে অদ্ভুত স্কাইফীয়ান ঢং বর্তমান। মনে হয় যেন একটা তার দিয়ে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে জিনিসটা করা। মাটিতে এরূপ কাজ অত্যন্ত বিরল। এই হাতীটি তথা প্রায় প্রত্যেকটি জিনিসের মধ্যেই আদিম রহস্য ছড়িয়ে আছে। তার ভৌগোলিক কারণও যথেষ্ট আছে। এই রহস্যকে ঠিকভাবে বাঁচিয়ে রাখা সত্যই অত্যন্ত বিস্ময়কর। যে কোন জিনিসের অনুশীলন ক্রমে পটুত্বের দিকে অথবা সামঞ্জস্যের দিকে হাতকে নিয়ে যায়ই, সুতরাং একথা আমরা কিছুতেই বলতে পারবো না যে, তাদের হাত ততটা পটু নয়। তবু অনুশীলনের কঠিন শৃঙ্খলতাকে ছাপিয়ে কিভাবে যে সেই আদিম রহস্য সমস্ত কাজের মজ্জায় থেকে সঠিক রসে রূপে দেখা দিল তা আমরা বুঝতে পারলেও বর্ণনা করতে পারি না। একথা খুব ঠিক নয় যে, এখানে সবই প্রায় আদিবাসী থাকে। তবে একথা সত্য, এখানে শালবন আছে, এখানকার রাস্তা লাল।

তাই বহু পুরাতন যক্ষিণীর শ্রীছাঁদটি ঝাড়বারির মধ্যবর্তিনী মূর্তির নামে আজও দেখা দেয়, তার অঙ্গ ভঙ্গে যথাযথ লীলার ব্যঞ্জনাও রয়েছে আমরা দেখতে

ছোটনাগপুরের ওরাঁও উপজাতি

নিখিল মৈত্র ও সুনীল জানা

রাঁচির থেকে কিছুদূরে ছোট এক গ্রামে গিয়েছি। ছোট টিলার পাশে খেলার মাঠ। তারই ধারে গ্রামের কয়েকজন ওরাঁও অধিবাসীর সঙ্গে কথা-বার্তা হচ্ছিল। মাঠের মাঝখানে বড় বড় ছেলেরা খেলছে, ছোট ছোট ছেলের দল আশে পাশে সামান্য স্থান করে নিয়ে হুড়োহুড়ি করছে। এইরকম একটি ছোট ছেলের দল আমাদের পাশেই ঘোরাঘুরি করছিল। হঠাৎ খেলাধুলো ছেড়ে সবাই এক লাইনে দাঁড়িয়ে গেল, সামনের ছেলেটা চেঁচাতে আরম্ভ করল: 'লড়কে লেংগে ঝাড়খণ্ড'। সমবেত শিশুকণ্ঠে তাই প্রতিধ্বনিত হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। ওরাঁও গ্রামবৃদ্ধ আমাদের কি যেন বলছিলেন, হঠাৎ তিনিও নীরব হয়ে গেলেন, কারণ শ্রোতারা তন্ময় হয়ে ছেলেদের এই অদ্ভুত খেলা দেখছিল। ছেলেরা অনেক রকমের ধ্বনি দিতে শিখেছে; সব মনে নেই। তবে, 'ঝাড়খণ্ড হামারা হ্যায়' শুনে ওরাঁও মোড়লদের জিজ্ঞাসা করলামঃ কেন, ঝাড়খণ্ড ত আপনাদেরই। চিৎকার করে একথা জানাবার প্রয়োজন কি?

তর্ক ও যুক্তি দিয়ে গ্রাম প্রধানেরা সব কথা বুঝোতে পারলেন না। গ্রামের মধ্যে ঘুরে ফিরে আসার পর তাঁদের বক্তব্য কিছুটা পরিষ্কার হল। ছোট বড় সমস্ত গ্রামেই জমিদার বা মধ্যস্বত্বভোগী মহাজন, ব্যাপারী এসব বাইরের লোক, সাধারণত হাজারিবাগ, পালামৌ, গয়া প্রভৃতি জেলার অধিবাসী। এখন অবশ্য এরা ওরাঁও গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা হয়েছে। তাছাড়া, আহির (গোয়ালা), লোহার (কামার), কুমোর এবং মুসলমান জোলারাও এসে ওরাঁও গ্রামে ঘর বেঁধেছে।

ওরাঁও উপজাতির মধ্যে শিক্ষা বিস্তারও যথেষ্ট হয়েছে। খৃষ্টান ওরাঁওদের মধ্যে স্বাক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন লোকের সংখ্যা শতকরা ৫০ ভাগেরও বেশি, স্ত্রী-শিক্ষারও ব্যবস্থা আছে। এখন শিক্ষিত উপজাতির যুবক যুবতীরা চাকুরির ক্ষেত্রে অসম প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হচ্ছে। তাছাড়া, আজ সমস্ত দেশের মধ্যে যে নবজাগরণ, নতুন চেতনার উন্মেষ তা থেকে ছোটনাগপুরের মালভূমিও বাদ পড়েনি। এই সবের আবর্তে ওরাঁও উপজাতিরা আজ প্রতিবাদ-মুখর হয়ে উঠেছে। সীমানা নির্ধারণ কমিশন যখন এদিকে এসেছিল, তখন নাকি বিরাট শোভাযাত্রা বেরিয়েছিল। দূর দূর গ্রামেও উপজাতির স্বাধিকারের দাবি পৌঁছে গিয়েছে। সমস্ত ছোটনাগপুর আজ চঞ্চল। খেলার মাঠে ঐ চঞ্চলতার অভিব্যক্তি দেখেছি, কিন্তু খুব আশ্বস্ত হতে পারি নি। আজ যে নেতারা বিদ্বেষবহ্নি প্রজ্জ্বলিত করছেন, কাল যখন তা দাবানলের মত বিহারের সমস্ত উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে ছড়িয়ে

ওরাঁও যুবতী

গ্রামের সামাজিক সংগঠন ঠিক আগের মতনই ছিল। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গ্রাম-বৃদ্ধের সম্মিলিত সমিতির মত অনুযায়ী সমস্ত কাজকর্ম হতো। ধীরে ধীরে এ অবস্থার পরিবর্তন হলো। আকবরের সময়ে রাজবংশী রাজাকে দিল্লীর প্রাধান্য মেনে নিতে হয় এবং জাহাংগীরের রাজত্বকালে পরাধীনতার অভিশাপ হিসেবে গুরু করভারও নৃপতি দুর্জন শালকে মাথা পেতে স্বীকার করে নিতে হয়েছিল। তারপর এই করভারের মাত্রা ক্রমান্বয়ে বেড়ে গেল। ছোট ভূস্বামী রাজ দরবারের জাঁকজমক এবং সার্বভৌম শক্তির খাজনা মেটাতে না পেরে ধার করা আরম্ভ করলেন। পাওনাদারদের টাকার বদলে উপজাতিদের গ্রাম ইজারা দেওয়া হলো, ভাল জমি হস্তান্তরিত হয়ে গিয়ে পড়ল বহিরাগতদের হাতে। এর বিরুদ্ধে অসহায় উপজাতির জীবনেও একদিন বিদ্রোহবহ্নি জ্বলে উঠল। সমস্ত শতাব্দীতেই ধূমায়িত অসন্তোষ কখনও বা প্রকাশ্য বিদ্রোহে, আবার কখনও অন্তঃসলিলা ধারায় প্রবহমান। আজ তা নতুন এক ভাবে আত্মপ্রকাশ করছে।

ওরাঁও উপজাতির জীবনকে বাইরের যে সমস্ত শক্তি নিয়ন্ত্রিত করছে তার মধ্যে অন্যতম খৃষ্টান মিশন। বর্তমানে রোমান ক্যাথলিক, প্রটেস্টান্ট এস-পি-জি (সোসাইটি ফর দি প্রপেগেশন অফ গসপেল) এবং জার্মান প্রটেস্টান্ট গশনর মিশন ওরাঁও উপজাতি এলাকায় বিশেষভাবে সক্রিয়। বিগত পঞ্চাশ বছর ধরে এ অঞ্চলের আদিবাসীদের মধ্যে শিক্ষার যে ব্যাপক অগ্রগতি হয়েছে, তার প্রায় সবই মিশনারি প্রচেষ্টার ফলে। উচ্চ-শিক্ষায় শিক্ষিত আদিবাসী যুবক-যুবতীর অভাব নেই। রাজনৈতিক কলহ, কোন্দলেও উপজাতি নেতারা যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন! আজও রাঁচি শহরে ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের সেণ্ট জন এবং মেয়েদের জন্যে উরসুলিন স্কুল ও প্রটেস্টাণ্ট গোষ্ঠীর সেণ্ট পলস্ এবং মেয়েদের সেণ্ট মারগারেট প্রধানত উপজাতিদের ছেলেমেয়েদের জন্যেই এবং প্রতিটি বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান যথেষ্ট উঁচু। রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ বিহার রাজ্যের নামকরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এখানকার বিদ্যার্থীদের মধ্যেও একটা অংশ আদিবাসী সম্প্রদায়ের। আচার, ব্যবহারেও মিশনারিরা উপজাতিদের অভারতীয় করে গড়ে তোলে নি। বিভিন্ন কারণে শিক্ষার ব্যবস্থা হিন্দীর মাধ্যমেই। শিক্ষিত ওরাঁও নিজেদের মধ্যেও হিন্দী ভাষার মাধ্যমেই কথাবার্তা বলেন। উচ্চারণভংগীতে কিছু বিশেষত্ব আছে, তাও খুব স্বাভাবিক।

ও'রাও তরুণী

এসব সত্ত্বেও কিন্তু উপজাতির জীবনে মিশনারি সম্প্রদায় কিছু সমস্যা সৃষ্টি করেছে। অতীতে কৃষি বিদ্রোহের অন্যতম কারণও ছিল ধর্মান্তরিত করার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ। শিক্ষার সংগে বিশেষ কোনও ধর্মমতের প্রচার নানা কারণে বাঞ্ছনীয় নয়। অথচ উপজাতি এলাকায় (বিশেষভাবে বিহারে) অন্য যে শিক্ষা ব্যবস্থা আছে তা যৎসামান্য।

ওরাঁও জীবনের মূল সমস্যা নিয়ে এত কথা বলাতে যেন কেউ মনে না করেন যে, উপজাতির জীবনে কোনও আনন্দই নেই, কেবল নানারকমের বিশৃঙ্খলাই চারদিকে দেখতে পাওয়া যায়। প্রকৃতিও এখানে যেমন বৈচিত্রময়, মানুষও তেমনি সুন্দর। ছোটনাগপুর মালভূমি প্রায় দুহাজার ফিট উঁচু উপরের স্তরেই ওরাঁওদের গ্রাম। চারদিকে ছোট ছোট পাহাড়। এককালে বিরাট শলবন আর বনদেশের নিবাসী বাঘ, ভালুক, চিতা, নেকড়ে, হরিণ, নীলগাই প্রভৃতি ছিল। এখন সে বনানীও অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে এবং ভালুক ছাড়া অন্য জীব জানোয়ারের সাক্ষাৎ কদাচিৎ মেলে। শাল গাছ আবার চারদিকে গজিয়ে উঠেছে কিন্তু সবই নবীন। কেঁদ (বিড়ি পাতার গাছ), কুল, আম, কাঁঠালের গাছও চারদিকে ছড়িয়ে আছে। কোথাও প্রকৃতির রূপ সম্পূর্ণ বন্ধ্যা—বিরাট পাথরের স্তূপ উদ্ভিদ জগৎকে প্রবেশ নিষেধ বলে সতর্ক করে দিয়েছে। পাহাড়ের মাঝে ছোট ছোট উপত্যকায় চাষবাস হয়। বৃষ্টির জল ভরে রাখার

জন্যে অনেক জায়গায় পাহাড়ের গা কেটে সিঁড়ি তৈরি হয়েছে। জমি খুব উর্বরা নয়, প্রতি বছরই খাদ দিতে হয়। রাঁচি জেলার গুমলা মহকুমা ও রাঁচি সদরেই প্রধানত ওরাঁও উপজাতির বাস। মানভূম জেলাতেও ওরাঁও বসবাস করে, তাদের মোদি বলে অভিহিত করা হয়। শাহাবাদ, চম্পারন, ভাগলপুর এবং উড়িষ্যার বিহার সীমান্ত অঞ্চলেও কিছু ওরাঁও-এর বাস। নিজের দেশের মাটিতে অন্নসংস্থান না করতে পেরে এবং তখনকার দিনে সরকারের পরোক্ষ সহযোগিতায় বিভিন্ন ঠিকেদাররা গিয়ে ওরাঁও শ্রমিককে বাঙলা এবং আসামের চ-বাগানে চালান করে দিত। তাদের অনেকেই এখন চাবাগানের স্থায়ী বাসিন্দে, দেশের সঙ্গে যোগাযোগ একেবারে নেই বললেই চলে। প্রয়োজন হলে কাজের জন্যে এখনও ওরাঁও যুবকেরা ভিটেমাটি ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে যায় এবং কিছু টাকা জমাতে পারলে আবার দেশে ফিরে আসে। মহাযুদ্ধের আগেও কালাপানি পাড়ি দিয়ে সুদূর আন্দামান দ্বীপমালায় বন বিভাগ বা অন্য সরকারী কাজ করার জন্যে ওরাঁওদের যাতায়াত ছিল এবং আজও শ্রমিক হিসেবে আন্দামানে রাঁচির উপজাতিরা সব থেকে সমাদৃত।

ওরাঁও নিজেকে কুরুখ বলে উল্লেখ করে। কিম্বদন্তী অনুসারে পুরাকালে করখ নামে প্রবল প্রতাপান্বিত এক রাজা ছিল তারই বংশধর বলে সে করখ। ছোটনাগপুর মালভূমিতে সব থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠ উপজাতি ওরাঁও, তারপর পূর্ব অঞ্চলের বাসিন্দা মুণ্ডা এবং দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের খরিয়ারা সব থেকে সংখ্যাল্প। মাথা গুণতিতে ওরাঁওরা সব থেকে বেশি কেবল তাই নয়, বাইরের ভাবধারাও তাদের মধ্যে বেশি সংক্রামিত হয়েছে। রাঁচির আশে পাশের গ্রামে গিয়ে একথা খুব ভালভাবেই বুঝেছিলাম। মেয়েদের ছবি তুলতে গেলে সলজ্জ হাসি হেসে ওরাঁও তরুণীও সরে যায়, কিন্তু বেশিদূরে নয়। আমাদের মত লোক তারা দেখতে বেশ অভ্যস্ত। একজন যুবক এগিয়ে এসে সবাইকে আবার ডেকে নিয়ে এল। ছবি তোলার আগে আশ্বাস দিতে হল যেন রাঁচি গিয়ে প্রিণ্ট পাঠিয়ে দিই। এ ধরনের

ধানক্ষেতের পাশে ও'রাও কিশোর

প্রতিশ্রুতি অন্য কোনও উপজাতিদের কাছে দিতে হয়নি।

গ্রামের মধ্যে সব থেকে দর্শনীয় স্থান নাচের আখড়া এবং তারই পাশে অবিবাহিত যুবকদের যৌথ বাসগৃহঃ জোন্‌খ এরপা অথবা ধাঙ্গর কুরিয়া। ১১।১২ বছরের ছেলে থেকে অবিবাহিত তরুণের দলকে এই বাসগৃহে থাকতেই হবে। ওরাঁও গ্রামবৃদ্ধেরা বলেন যে, এভাবে কিশোর এবং তরুণের দলকে শিক্ষা দেওয়ার বিধি বহুদিনের। বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে আলাদা আলাদা থাকলে বোধহয় গৃহস্থালির বিভিন্ন কাজে এবং সামাজিক রীতি-নীতিতে তাদের শিক্ষিত করা সম্ভব হত না। সেজন্যেই আদিম সমাজ এইভাবে গ্রামের সমস্ত শিক্ষার্থীকে একত্র জীবনযাপনের নির্দেশ দিয়েছিল। শিক্ষানবীশদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা তাদেরই ম[illegible] থেকে নিযুক্ত একজন 'মনিটার' উপাধি তার মহাতো। পাঠশাল[illegible] প্রধান পড়ুয়ার বা স্কুলে 'ছাত্র-পরি[illegible]' বিরাগভাজন হলে যেমন গঞ্জনা [illegible] করতে হয়, ওরাঁও কিশোরকেও [illegible] তেমনি তটস্থ অবস্থায় প্রতিটি হু[illegible] তামিল করতে হয়!

যৌথ বাসগৃহের অন্য সমস্ত আন[illegible] সাময়িক শাস্তি সহজেই পড়ুয়ার দল ভ[illegible] যায়। লম্বা কুঁড়ে ঘর; শয্যা বাক[illegible] চাটাই-এর উপর। তালপাতার সে মা[illegible] কিন্তু প্রতি বৎসর কুমারীরা বিশেষভা[illegible] কুমারদের জন্যে বানিয়ে দেয়। প্রেমাস্পদে[illegible] উদ্দেশ্যে প্রেমিকা আলাদা করে কিছু তৈ[illegible] করত পারে না। ঘর জোড়া বড় চাট[illegible] সবার জন্যে তৈরি হয়। দিনের কাজে[illegible] পর বর্ষার সময় ছাড়া অন্য সময় সমস্ত ধাঙরের দল আখড়ায় নাচ গানের মহড়া[illegible] মিলিত হয়। অনূঢ়া কিশোরী এ[illegible] যুবতীর দলও যোগ দেয়। নাগারা, ঢোল[illegible] ঝাঁঝ, নরসিঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে মিলিত [illegible] গীত শুরু হয়। কৃষ্ণপক্ষের তৃতীয়ার এ[illegible] রাত্রে এমনি এক ওরাঁও গ্রামের আখড়া[illegible] উপস্থিত হবার সৌভাগ্য হয়েছিল[illegible] অন্ধকারেই নাচের মহড়া আরম্ভ হয়েছে[illegible] আস্তে আস্তে তৃতীয়ার চন্দ্রোদয় হ[illegible] চাঁদ উঠার সাথে সাথে নাচের উদ্দামতাও যেন বেড়ে গেল। পরিপূর্ণ চাঁদের আলোতে বহুদূর বিস্তৃত ঊষর প্রান্তর দেখা যাচ্ছে মাঝে মাঝে এক আধটা শাল এবং মহুয়া গাছ। কোন কোন যুবক-যুবতীরা আসর থেকে একটু দূরে চলে গিয়েছে শাল গাছের পাশে। আবছা আবছা মানুষের মূর্তি ভেসে আসছে। এইরকম আসা যাওয়া সমস্ত ক্ষণ ধরেই চলছে। চন্দ্রা[illegible] শুধু সভ্য মানুষই হয় না।

কুমারী মেয়েদের জন্যেও স্বতন্ত্র বাসগৃহ আছে। ওরাঁওরা সে যৌথ বাসগৃহকে বলে 'পেলো কোটওয়ার'। বয়স্ক কোনও গ্রামবৃদ্ধের উপর মেয়েদের দেখাশুনো করার দায়িত্ব দেওয়া হয়। ঘরের সমস্ত কাজকর্মের পরিচালনার ব্যবস্থা করতে হয় বড়কী ধাঙ্গারিনকে। বড়কীও বড় পড়ুয়া। করম উৎসবের সাত দিন আগে মেয়েরা পেলো কোটওয়ারে যব নিয়ে এসে পুঁতে দেয়। উৎসবের দিনে

বর-অঙ্কুর তরুণীরা কুমারদের উপহার দেয়। নাচ, গান, মেলামেশার মধ্যে দিয়ে একদিন যুবক-যুবতী তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের সঙ্গী নির্বাচনও চূড়ান্ত করে ফেলে। বিবাহ হয়ে যাবার পরে নতুন দম্পতীকে সবাই মিলে শুভেচ্ছা জানিয়ে বিদায় দেয়।

ওরাঁও সমাজ কয়েকটি গোত্রে (কিল্লীতে) বিভক্ত। এক কিল্লীর মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ। এক গ্রামের মধ্যে বিবাহ না হওয়াই বাঞ্ছনীয়, তবে সামাজিক কোনও বাধা নেই। গোত্রের মধ্যে হনুমান কিল্লীও আছে। যুবক-যুবতী তাদের নির্বাচনের কথা পিতামাতাকে জানাবার পর বর-পক্ষকেই অগ্রণী হয়ে বিবাহের সমস্ত ব্যবস্থা করতে হয়। কন্যাপক্ষকে মোটা রকমের যৌতুক না দিলে চলে না। টাকা-কড়ি দেওয়া হয়ে গেলে বরযাত্রীর দল কন্যার বাড়িতে যাবে। সেখানে ঘরের সামনে বিশেষ এক মণ্ডপ তৈরি হয়। বিবাহ আচার খুব সংক্ষিপ্ত, তারপর বিরাট ভোজ। আহার্যের সঙ্গে পচাই হাঁড়িয়াও মুক্তহস্তে বিতরণ করা হয়। বর-বধূর অনুগমন করে পাত্রের বাড়িতেও আবার দুইপক্ষ উৎসবের শেষ অধ্যায় অনুষ্ঠান করে। বিবাহ উৎসবে হিন্দু আচারের প্রভাব অত্যন্ত সুস্পষ্ট। সিন্দুর দান ও গাত্রহরিদ্রা বিবাহের অন্যতম অবশ্যকরণীয় বিধি। সমাজে অবিবাহিত যুবকের স্থান বিবাহিতের নিচে। কোনও কুমার পাহান—গ্রাম্য প্রধান হতে পারে না।

গ্রামের পুরোহিত অধিকাংশ ক্ষেত্রে গ্রামের মুখপাত্রও। পাহান বা বৈগা (মোড়ল এবং পুরোহিত) অনেক সময় বংশ পরম্পরায় একই বর্ধিষ্ণু পরিবার থেকে নিযুক্ত হয়, আবার গ্রাম্য দেবতার অনুমতি নিয়ে নির্বাচনের বিধিও প্রচলিত। ওরাঁওদের সর্বশক্তিমান দেবতা ধরমেশ। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা ধরমেশের পূজো সব থেকে স্মরণীয় সামাজিক অনুষ্ঠান। মৃত পূর্বজদের আত্মার আধার পাচবা লার। এছাড়া প্রতি গ্রমের অধিষ্ঠাত্রী দেবীও আছেন। ভূত, প্রেত এবং বিভিন্ন দুষ্ট অপদেবতা বিতাড়নও পুরোহিতকেই করতে হয়। অসুখ, বিসুখ হলে গ্রাম-বাসীরা মাতি অথবা ওঝার কাছে যায়। অনিষ্টকারী কোনও শক্তির চক্রান্তে অসুস্থতা সৃষ্টি হলে, তার বিরুদ্ধে যথাযোগ্য ক্রিয়াকলাপও ওঝাকে করতে হয়।

ওরাঁও সাজ, পোশাকও অতি সাধারণ। পুরুষেরা স্বল্প পরিসর কারিয়া পরিধান করে এবং মাঝে মাঝে গ্রামের জোলার তৈরি চাদর বরাকি দিয়েও নিজেকে আচ্ছাদিত করে। শহর থেকে দূরে গ্রামের মেয়েরা বড় বড় লাল পেড়ে মোটা শাড়ি ব্যবহার করে। শাড়ি খুব মজবুত এবং টেঁকসই। ডুরেকাটা, ছাপা ও অন্য রকমের শাড়িরও এখন যথেষ্ট প্রচলন হয়েছে, পরিধানও যেমন আড়ম্বরহীন, খাদ্যও তেমনি বাহুল্য-বর্জিত। ভাত এবং সাধারণ তরিতরকারিই প্রধান খাদ্য। উৎসব উপলক্ষে শুয়োর, মুরগি, পাঁঠা প্রভৃতি কাটা হয়। বর্ষার সময় মাছ পাওয়া যায়, অন্য সময় শুকনো মাছ ব্যঞ্জন হিসেবে সমাদৃত, তবে খুব সহজলভ্য নয়।

মৃতদেহকে সৎকারই করা হয়, কিন্তু চাষের কাজ যখন বেশি তখন মশানে কবর দেওয়ার বিধি প্রচলিত। ফসল কেটে গোলায় উঠিয়ে নেবার পর, বিশেষ একদিন স্থির করে সমস্ত প্রোথিত মৃত-দেহকে মাটির নিচ থেকে বের করে নিয়ে আসতে হয়। তারপর সেইসব এক সঙ্গে চিতায় তুলে সৎকার করা হয়। অস্থি এবং চিতাভস্ম গ্রামের মধ্যে নির্দিষ্ট স্থানে সমাধিস্থ করে ওরাঁওরা মৃতের ক্রিয়াকলাপ সম্পূর্ণ করে।

কৃষিই ওরাঁও সমাজের প্রধান উপ-জীবিকা। পরিবারের সবাই—পুরুষ স্ত্রী একযোগে খেতের কাজে যোগ দেয়। মেয়েদের পক্ষে হলচালনা করা নিষিদ্ধ। তাছাড়া, বোনা, রোয়া, আগাছা পরিষ্কার করা এবং ধানকাটা পুরুষ-স্ত্রী সবাই মিলে একই সঙ্গে করে। আদিবাসী জীবনে কাজের ফাঁকে ফাঁকে নাচের ও গানের অবসর মেলে। ঢেউখেলানো ধানের খেতে ওরাঁও কৃষকের দল কাজকর্ম মুলতুবি রেখে এমনি গান শুরু করে

দেয়। কৃষিকাজ ছাড়াও সামান্য কুটির-শিল্পের কাজও গ্রামাঞ্চলে হয়। লাক্ষা সংগ্রহ ও তসর গুটিপোকা পালনই প্রধান শিল্প। সামান্য কেঁদ পাতা বিড়ি তৈরির জন্যে বাইরে চালান হয়।

চাষবাসের সময় কোনও গৃহস্থের প্রয়োজন হলে অবিবাহিত যুবকদের যৌথ ঘর থেকে কাজের জন্যে লোক নিতে পারেন। ধাঙ্গর কুরিয়ার প্রধান পড়ুয়ার সঙ্গে পারিশ্রমিক সম্বন্ধে আগে দর-দস্তুর করতে হয়। শ্রমের বিনিময়ে যে অর্থ সংগৃহীত হলো, তা দিয়ে যৌথ গৃহের বাজনা কেনা হয়। তেমনি গৃহস্থালীর কোনও কাজে মেয়ে-দের প্রয়োজন হলে, গ্রামবৃদ্ধের সম্মতি এবং পারিশ্রমিকের বিনিময়ে মেয়েদেরও সাহায্য পাওয়া সম্ভব।

নবান্নের পর থেকে উৎসব পর্যন্ত ওরাঁওদের সব থেকে আনন্দময় সময়। সেই সময় সবাই দল বেঁধে মাছ বা জন্তু শিকারে বেরোয়। শিকার করে যা কিছু পাওয়া গেল, গ্রামের প্রতিটি পরিবারের মধ্যে তা ভাগ করে দেওয়া হয়। যুদ্ধ ও মৃগয়ার দেবী চণ্ডীর পূজাও এই উপলক্ষে করার বিধি প্রচলিত। হিন্দু আচার, অনুষ্ঠান উপজাতি জীবনে কিভাবে স্থান পেয়েছে এ তারই আর একটা দৃষ্টান্ত। ফাগ (বা ফাগু) উৎসবে সমস্ত দিন রাত ধরে অবিশ্রান্ত নাচ, গান, ভোজন এবং পানের মহড়া চলে। বসন্ত উৎসব প্রধানত যুবক-যুবতীদেরই।

ওরাঁও গ্রামে লম্বা মাটির ও খাপড়ার ঘর। এক লাইনের পেছনে আর এক লাইন। অনেকটা শ্রমিক পল্লীর মত। চালের উপরে লাউ, চালকুমড়ো, ছিমের লতা। গ্রাম অঞ্চলে এখনও লাউ বা কুমড়োর খোলে তেল বা জল নিয়ে যাতায়াত করতে দেখা যায়। তবে, ওরাঁও জীবনের এ পরিচয় রাঁচি শহরে বা আশে পাশের গ্রামে যদি কেউ খুঁজতে চান, তবে সব পরিশ্রমই ব্যর্থ হবে। বাইরের জগতের হাব, ভাব, আচার, অনুষ্ঠান তাদের জীবনধারাকে বহু-পরিমাণে পরিবর্তিত করেছে। অনেক সময় প্রতিবেশী বিহারী বা বাঙ্গালীদের সঙ্গে কোনও প্রভেদ খুঁজে পাওয়া মুশকিল।

উপজাতি জীবনের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে রাষ্ট্রকে আরও বেশি সচেতন হওয়া প্রয়োজন রাঁচির থেকে ফেরার পথে বারবার মনে হয়েছিল। বাইরের ভাবধারাকে আটকে রাখার মত কোনও দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর তৈরি করা সম্ভব নয়, তবুও, সামগ্রিক কল্যাণের জন্যে দেখতে হবে যাতে নিজস্ব জীবনধারার গতি রুদ্ধ না হয়ে যায়। সভ্যতার জয়যাত্রার মিছিলে আদিম জাতিরও স্থান নিশ্চয়ই আছে তবে নিজের বৈশিষ্ট্য এবং স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে বাইরের ভাবধারার সঙ্গে সমন্বয় করতে হবে। ওরাঁও সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জীবনের সমস্যা সমাধান "লড়কে লেঙ্গে" বলে উত্তেজনার সঞ্চার করলে কখনই হবে না। একথা দেশ এবং উপজাতি সবাইকেই বুঝতে হবে।

কাজ থেকে সবেমাত্র বাসায় ফিরেছি, শরণ সিং হীরালালকে নিয়ে আমার ঘরে এলো। 'নমস্তে' বলে শরণ সিং বসলো চেয়ারটায়, সঙ্গীকেও বসালো। অভ্যেস বশে বলি—কি খবর? যদিও জানি কি উত্তর পাবো। দরখাস্ত লিখে দিতে হবে। কাগজপত্র ঘেঁটে চার্জ-শীটের জবাব বা প্রমোশনের উমেদারী করে দিতে হবে আর একজনের জবানীতে।

প্রস্তুত হয়ে বসতে এতোক্ষণে চোখ পড়লো হীরালালের মুখে। ক্রোধ আর উদ্বেগে চোখের চাউনি আর মুখের রেখাগুলো বাঙ্ময়। বুঝতে পারলাম কেন শরণ সিং স্নানাহার না করেই আমাকেও সে-সময় না দিয়ে কারখানা থেকে সোজা বাড়ি এসে হাজির।

যথারীতি নথিপত্রের জন্যে হাত বাড়িয়ে দিলাম। শরণ সিং বল্লে, আগে শুনে নিন বাবুজী, এর নাম হীরালাল, লোকো শেডে হেল্‌পার। এর প্রতি শক্ত জুলুম, ঘোর অবিচার হয়েছে।

হঠাৎ হীরালাল নিজেই শুরু করলে শরণ সিংকে কথা শেষ করতে না দিয়েই। 'ষড় চলেছে মশাই, সব ষড় চলেছে। শুয়োরের দল তো? আমায় প্যাঁচে ফেলার জন্যে সবাই জোট পাকিয়েছে' এটুকু বলতেই তার মুখের কোণে থুতু জমে গেল। চোখের তারা দুটো ঘুরছে। হলদে চোখে উম্মাদের অস্থিরতা।

অনর্গল সে বকে চললো। তার চারিদিকে শত্রু। ফিসফিস করে বললে এক সময়ে, কাউকে বিশ্বাস নেই। রেলের অধিকারীরা কোথায় নিয়ম ভঙ্গ করেছে এটাই শোনার জন্যে উৎসুক ছিলাম। তার কোনো উত্তর পেলাম না। যাদের সম্পর্কে ও বেশী বল্লে তারা সকলেই প্রায় তার সহকর্মী।

অনর্থক সকলকে এমন সন্দেহ করতে নেই। ওকে আমি বোঝাবার চেষ্টা করি। 'থাক, থাক আপনাকে আর ও বেইমান হয়ে দালালি করতে হবে না।' অবাক হই।

'—আপনি তা হলে দরখাস্ত লিখছেন না।'

'কিসের দরখাস্ত না জানলে লিখবো? আর এতে আমারই বা লেখার কি আছে।' উঠে দাঁড়িয়ে পড়লো হীরালাল।

'বুঝেছি, বুঝেছি আপনিও ওদের দলে। সব চর রেখেছে ব্যাটারা চারিদিকে। না লিখবেন তো না-ই লিখলেন, বয়ে গেছে আমার।'

আমি বা শরণ সিং কিছু বলার বা বোঝার আগেই ঝড়ের মত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল হীরালাল। সাইকেলটাকে একটানে ঘুরিয়ে নিল। থুথু ফেললে মাটিতে কয়েকবার। এদিকে চাইলেও না একবার। হন হন করে বেরিয়ে চলে গেল।

শরণ সিং-এর কাছে প্রথম অধ্যায়টুকু

দেয়। কৃষিকাজ ছাড়াও সামান্য কুটির-শিল্পের কাজও গ্রামাঞ্চলে হয়। লাক্ষা সংগ্রহ ও তসর গুটিপোকা পালনই প্রধান শিল্প। সামান্য কেঁদ পাতা বিড়ি তৈরির জন্যে বাইরে চালান হয়।

চাষবাসের সময় কোনও গৃহস্থের প্রয়োজন হলে অবিবাহিত যুবকদের যৌথ ঘর থেকে কাজের জন্যে লোক নিতে পারেন। ধাঙ্গর কুরিয়ার প্রধান পড়ুয়ার সঙ্গে পারিশ্রমিক সম্বন্ধে আগে দর-দস্তুর করতে হয়। শ্রমের বিনিময়ে যে অর্থ সংগৃহীত হলো, তা দিয়ে যৌথ গৃহের বাজনা কেনা হয়। তেমনি গৃহস্থালীর কোনও কাজে মেয়ে-দের প্রয়োজন হলে, গ্রামবৃদ্ধের সম্মতি এবং পারিশ্রমিকের বিনিময়ে মেয়েদেরও সাহায্য পাওয়া সম্ভব।

নবান্নের পর থেকে উৎসব পর্যন্ত ওরাঁওদের সব থেকে আনন্দময় সময়। সেই সময় সবাই দল বেঁধে মাছ বা জন্তু শিকারে বেরোয়। শিকার করে যা কিছু পাওয়া গেল, গ্রামের প্রতিটি পরিবারের মধ্যে তা ভাগ করে দেওয়া হয়। যুদ্ধ ও মৃগয়ার দেবী চন্ডীর পূজোও এই উপলক্ষে করার বিধি প্রচলিত। হিন্দু আচার, অনুষ্ঠান উপজাতি জীবনে কিভাবে স্থান পেয়েছে এ তারই আর একটা দৃষ্টান্ত। ফাগ (বা ফাগু) উৎসবে সমস্ত দিন রাত ধরে অবিশ্রান্ত নাচ, গান, ভোজন এবং পানের মহড়া চলে। বসন্ত উৎসব প্রধানত যুবক-যুবতীদেরই।

ওরাঁও গ্রামে লম্বা মাটির ও খাপড়ার ঘর। এক লাইনের পেছনে আর এক লাইন। অনেকটা শ্রমিক পল্লীর মত। চালের উপরে লাউ, চালকুমড়ো, ছিমের লতা। গ্রাম অঞ্চলে এখনও লাউ বা কুমড়োর খোলে তেল বা জল নিয়ে যাতায়াত করতে দেখা যায়। তবে, ওরাঁও জীবনের এ পরিচয় রাঁচি শহরে বা আশে পাশের গ্রামে যদি কেউ খুঁজতে চান, তবে সব পরিশ্রমই ব্যর্থ হবে। বাইরের জগতের হাব, ভাব, আচার, অনুষ্ঠান তাদের জীবনধারাকে বহু-পরিমাণে পরিবর্তিত করেছে। অনেক সময় প্রতিবেশী বিহারী বা বাঙ্গালীদের সঙ্গে কোনও প্রভেদ খুঁজে পাওয়া মুশকিল।

উপজাতি জীবনের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে রাষ্ট্রকে আরও বেশি সচেতন হওয়া প্রয়োজন রাঁচির থেকে ফেরার পথে বারবার মনে হয়েছিল। বাইরের ভাব-ধারাকে আটকে রাখার মত কোনও দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর তৈরি করা সম্ভব নয়! তবুও, সামগ্রিক কল্যাণের জন্যে দেখতে হবে যাতে নিজস্ব জীবনধারার গতি রুদ্ধ না হয়ে যায়। সভ্যতার জয়যাত্রার মিছিলে আদিম জাতিরও স্থান নিশ্চয়ই আছে, তবে নিজের বৈশিষ্ট্য এবং স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে বাইরের ভাবধারার সঙ্গে সমন্বয় করতে হবে। ওরাঁও সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জীবনের সমস্যা সামাধান "লড়কে লেঙ্গে" বলে উত্তেজনার সঞ্চার করলে কখনই হবে না। একথা দেশ এবং উপজাতি সবাইকেই বুঝতে হবে।

কাজ থেকে সবেমাত্র বাসায় ফিরেছি, শরণ সিং হীরালালকে নিয়ে আমার ঘরে এলো। 'নমস্তে' বলে শরণ সিং বসলো চেয়ারটায়, সংগীকেও বসালো। অভ্যেস বশে বলি—কি খবর? যদিও জানি কি উত্তর পাবো। দরখাস্ত লিখে দিতে হবে। কাগজপত্র ঘেঁটে চার্জ-শীটের জবাব বা প্রমোশনের উমেদারী করে দিতে হবে আর একজনের জবানীতে।

প্রস্তুত হয়ে বসতে এতোক্ষণে চোখ পড়লো হীরালালের মুখে। ক্রোধ আর উদ্বেগে চোখের চাউনি আর মুখের রেখাগুলো বাঙ্ময়। বুঝতে পারলাম কেন শরণ সিং স্নানাহার না করেই আমাকেও সে-সময় না দিয়ে কারখানা থেকে সোজা বাড়ি এসে হাজির।

যথারীতি নথিপত্রের জন্যে হাত বাড়িয়ে দিলাম। শরণ সিং বল্লে, আগে শুনে নিন বাবুজী, এর নাম হীরালাল, লোকো শেডে হেল্পার। এর প্রতি শক্ত জুলুম, ঘোর অবিচার হয়েছে।

হঠাৎ হীরালাল নিজেই শুরু করলে শরণ সিংকে কথা শেষ করতে না দিয়েই। 'ষড় চলেছে মশাই, সব ষড় চলেছে। শুয়োরের দল তো? আমায় প্যাঁচে ফেলার জন্যে সবাই জোট পাকিয়েছে' এটুকু বলতেই তার মুখের কোণে থুতু জমে গেল। চোখের তারা দুটো ঘুরছে। হলদে চোখে উন্মাদের অস্থিরতা।

অনর্গল সে বকে চললো। তার চারিদিকে শত্রু। ফিসফিস করে বললে এক সময়ে, কাউকে বিশ্বাস নেই। রেলের অধিকারীরা কোথায় নিয়ম ভঙ্গ করেছে এটাই শোনার জন্যে উৎসুক ছিলাম। তার কোনো উত্তর পেলাম না। যাদের সম্পর্কে ও বেশী বল্লে তারা সকলেই প্রায় তার সহকর্মী।

অনর্থক সকলকে এমন সন্দেহ করতে নেই। ওকে আমি বোঝাবার চেষ্টা করি। 'থাক, থাক আপনাকে আর ও বেইমান হয়ে দালালি করতে হবে না।' অবাক হই।

'—আপনি তা হলে দরখাস্ত লিখবেন না।'

'কিসের দরখাস্ত না জানলে লিখবো? আর এতে আমারই বা লেখার কি আছে।' উঠে দাঁড়িয়ে পড়লো হীরালাল।

'বুঝেছি, বুঝেছি আপনিও ওদের দলে। সব চর রেখেছে ব্যাটারা চারিদিকে। না লিখবেন তো না-ই লিখলেন, বয়ে গেছে আমার।'

আমি বা শরণ সিং কিছু বলার বা বোঝার আগেই ঝড়ের মত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল হীরালাল। সাইকেলটাকে একটানে ঘুরিয়ে নিল। থুথু ফেললে মাটিতে কয়েকবার। এদিকে চাইলেও না একবার। হন হন করে বেরিয়ে চলে গেল।

শরণ সিং-এর কাছে প্রথম অধ্যায়টুকু

শ্নে হেসেছিলাম। কিন্তু আরও কয়েক-বার দেখেছি হীরালালকে, ওকে জেনেছি কতক অংশে, তাই পরে আর হাসি আসে না।

হীরালালের রংটা চকচকে বার্নিশ করা। চোয়ালের হাড় উঁচু। মাথার চুল যতই কায়দা করে কাট্‌ক, খোঁচা খোঁচা দাঁড়িয়ে থাকে। ইয়ারেরা যখন ওর র্পের স্খ্যাতি করে ও অপ্রতিভ হয়ে হাসে। 'যাঃ, কি যে বলিস মাইরি।' তারপর আড়ালে আয়নায় এসে সযত্নে গোঁফ ছাঁটে।

হীরালালের মা মরেছে ওর শিশ্-কালেই। বাপ ছিল এই শেডেরই মিস্তিরি। বৌ মরতে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। ছেলেমেয়েগ্লোর হাতে রান্নাবান্না আর ঘর সংসারের কাজ চাপিয়ে বেপরোয়া ফ্র্তিফার্তি করে কাটাতে লাগলো। বড়ো ছেলেমেয়ে তিনটে ক্রমে চরে খেতে শিখলো। যে যার ব্যবস্থা জ্টিয়ে নিয়ে আলাদা গিয়ে ঘর বাঁধলো। হাবাগঙ্গারাম হীরালালের বয়স বাড়ে, কিন্তু ব্দ্ধি অ[illegible] পাকে না। কোনো চেষ্টা নেই। অগ[illegible] রিটায়ার করার বছর দ্ই আগে হীরালাল[illegible] বাপ হীরালালকে, সায়েব স্বোদের ধ[illegible] করে খালাসী করে ঢ্কিয়ে দিয়েছি[illegible] এখানে। তার কিছ্দিন বাদে মাতাল হ[illegible] মারপিট করে ঘরে এসে শ্য়ে পড়[illegible] হীরালালের বাপ। দিন সাতেক প[illegible] ইহলীলা সংবরণ করল।

সেই থেকে হীরালাল একা। তা[illegible] তার দ্ঃখ নেই। ইয়ার দোস্ত অ[illegible] আছে। সময় বেশ কেটে যায়। বছরের প[illegible] বছর যায়। প্রোনো খালাসীরা কে[illegible] মিস্তিরি, কেউ চার্জহ্যান্ড হয়ে গেছে[illegible] ও সেই একই জায়গায় নাক ঘষছে।

একদিন সাধন কর্মকার এসে হীরা-লালকে বললে, 'আমি শ্নেছি ইয়া[illegible] পরের চান্সই তোমার। ফোরম্যান সায়েবে[illegible] সংগে লোকো অফিসারের কথাবার্ত[illegible] হচ্ছিল।'

ক্রমে অনেকের ম্খে কথাটা শ্নে[illegible] শ্নে হীরালালের মন নেচে ওঠে। কার[illegible]খানার ক্যাণ্টিনেই সেদিন ফিস্টি হয়ে[illegible] গেল।

'—ওঃ, এতোদিনে শেডে একটা ভালো মিস্তিরি হলো!'

'—আর দাদা, তোকে পায় কে?'

'—যাই হোক ভাই, মনে রাখিস কিন্তু আমাদের। কথা বলবি তো?'

চা-ওয়ালাকে পয়সাগ্লো দিয়ে সবাইকে একখিলি করে পান খাওয়ায় হীরালাল। আর একটা করে সিগারেট। চাপাচাপি করতে হয় না। নিজেই ডেকে খাওয়ায়। সব কথার ওই এক জবাব। আকর্ণ বিস্তৃত হাসি, আর 'কি যে বলিস, মাইরি!'

একদিন নরেন সামন্ত এসে হৈ চৈ বাঁধিয়ে দিল। কথাটা শ্র্ হয়েছিল চুপিচুপি। শেষে কানে কানে ছড়িয়ে পড়লো। সিনেমা দেখতে গেল-শনিবারে দলবেঁধে ওরা মেদিনীপ্রে গিয়েছিল। ট্রেনে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে নরেন আলাপ করছিল। তিনি সপরিবারে অন্য বেঞ্চিতে বসেছিলেন। নরেন ছিল তাঁর সামনে। ছেলেমেয়ে বউ নিয়ে ভদ্দরলোক কলকাতা থেকে বাড়ি আসছেন। হীরালালকে দেখে

নাকি ভদ্দরলোকের ভীষণ পছন্দ হয়েছে। খোঁজ খবর করলেন। রবিবারে নরেনের কাছে এসেছিলেন। ও'র মেয়ের সঙ্গে হীরালালের বিয়ে দিতে চান ভদ্দরলোক। 'মেয়েটিকে তো দেখেছিস সবাই, ফার্স্ট ক্লাস'—বলেই হাসলো নরেন। তারপর গম্ভীর হয়ে গেল—'তবে গরীব মানুষ, খরচপত্তর বিশেষ করতে পারবেন না।'

সকলে ভিড় করে এসে উপদেশ আর উৎসাহ দেয় হীরালালকে।

—তাতে কি হয়েছে? আরে, তোর আর অভাব কি?

—দুজনের বেশ চলে যাবে পঁচাত্তর টাকায়।

—তোর মাইরী দিন পড়েছে হীরু; চাকুরিতে উন্নতি আবার সঙ্গে সঙ্গে ইয়েও।

—বউটা লক্ষ্মী আছে। কথা বাড়াস নি। নাম করতে না করতেই মিস্তিরি।

বিশ্বাস করতে সাহস হয় না। দেখেছে বই কি হীরালাল। চাঁপা রঙের শাড়ি ঘুরিয়ে পরা। হাসছে গল্প করছে ভাইবোনের সঙ্গে। কাঁসাইএর পুলটা যখন পার হচ্ছিল, জানলা দিয়ে ঝুঁকে ঝুঁকে সে কী হাসি—সারাক্ষণই কানের দুটো দুল ছটফট করছে, আর কাঁচের চুড়িগুলোর টুংটাং। খুশীর চোটে সেদিন আরও টুপাইস খসে গেল হীরালালের।

সাধনকে প্রায়ই ধরে পড়ে হীরালাল। কইরে, কোনো অর্ডার তো বেরুচ্চে না।

সাধন বলে, দাঁড়া, দাঁড়া ভেকেন্সিটা হোক। তবে তো?

—দরখাস্ত দেবো নাকি একটা।

—দূর, দরখাস্ত কি হবে? মুখেই বলে আয় মিলান সায়েবকে।

মিলান সায়েবও খুব চিন্তিত মনে হল। 'তোমায় তো মিস্তিরি না করলেই নয়, আচ্ছা দেখি। কি করা যায়।' একটু হেসে আবার বলেন, তার ওপর তোমার আবার সাদির ব্যবস্থা হচ্চে। তুমি লুকোলে কি হবে? আমি সব জানি। খাওয়াবে টাওয়াবে তো?

—কি যে বলেন সায়েব, আপনাদের খাওয়াবো না?

সবাই জেনে ফেলছে শেড়ে। খবরটা ছড়িয়ে পড়েছে চারিধারে। এমন কি টাইমকিপারবাবুও একদিন ধরলেন—কি হে হীরালাল, ডুবে ডুবে খুব জল খাওয়া হচ্চে! কবে হচ্চে—খাওয়া-দাওয়া?

অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে হীরালাল—না না, ডুবে ডুবে আর কি? এখনও দিন ঠিক হয়নি। হলেই জানাবো।

—দেখো, সময়মত আবার ভুলে যেও না।

এক মুহূর্তও ভুলে থাকতে পারে না হীরালাল। চোখের ঘুম ছুটে যায়। মিস্তিরি হলেই অন্য কোয়ার্টার। দুটো ঘর। ওই বউটি টুকটুক করে ঘুরে বেড়াবে। বন্ধুরা এলে এপাশের ঘরে বসবে। চা খাবে। সবাই বলবে, বউ হয়েছে বটে হীরুর। বউ অমনি ঘোমটা টেনে পালাবে পাশের ঘরে। এইসব কথা ভাবতে ভাবতে মাঝরাতে বিছানায় উঠে বসে বিড়ি ধরায় হীরালাল। এখন রোজ সে দাড়ি কামায়। গন্ধ তেল কিনে এনেছে, মাথায় মাখে। দর্জিকে দুটো শার্টের মাপ দিয়ে এসেছে।

নরেন সামন্তকে মাঝে মাঝে আলাদা ডেকে এনে বিড়ি খাওয়ায় হীরালাল আজকাল। গল্প করে। নরেন শুধুই বাজে গল্প করে। আসল কথাটা কিছুতেই পাড়ে না। অগত্যা অধৈর্য হয়ে কথাটা নিজেই পাড়লো সে, কইরে নরেন, কলকাতার ভদ্দরলোকেরা তো আর এলেন না!'

'তুই আচ্ছা উজবুক তো', হেসে ওঠে নরেন, 'তোর এতো তাড়া কি? আমরা হলাম বরপক্ষ। তারা তো কন্যাপক্ষ। তারা এসে খোশামোদি করবে তবে......তোর মত ছেলে পাওয়া কি সস্তা, তার ওপর বিনা পয়সায়...'। চুপ করে থাকে হীরালাল। গম্ভীর হয়ে নরেন আবার বলে, 'নিজে থেকে গরজ দেখাসনি, পজিশন খারাপ হয়ে যাবে!'

—না না, গরজ না; তবে কথাটা উঠেছে, তাই বলছিলাম—

—আরে ছাড়। ভয় নেই, ফস্কাবে না। এই শ্রাবণ মাস তো শেষ হয়ে এলো। এর পর ভাদ্র। হিন্দুর ছেলে, জানিস তো, ভাদ্দরে বিয়ে হয় না! এখন তাড়াহুড়ো করে পজিশনটা নষ্ট করবি কেন?

হীরালাল চুপ করে যায়। কোনোমতে এই দুটো মাস। তারপর...

দু মাস কেটে গেল। কন্যাপক্ষের খবর নেই। নরেনকে চুপিচুপি ডেকে কলকাতায় যাবার খরচ দিল হীরালাল। শিখিয়ে দিল ভদ্দরলোকের বাড়ি গিয়ে ভান করতে যেন হঠাৎ এপাড়ায় এসে পড়েছে বলে দেখা করতে এসেছে। তখন নিশ্চয় উনিই কথাটা তুলবেন।

হীরালালের বুদ্ধির তারিফ করলে নরেন। পিঠে চাপড় দিয়ে হাসলো—'উঃ, তোর পেটে পেটে এতো?' টাকাটা হাতে নিল। শনিবার রওনা হবে।

সোমবার শুকনো মুখে নরেন এসে যা বললে তা, যা ভেবেছে ও তাই। ভদ্দরলোক এতো উৎসাহ দেখিয়ে চুপ করে গেলেন কেন? কারণ আছে নিশ্চয়। নরেনের হাত ধরে নাকি কতো কান্নাকাটি করলেন ভদ্দরলোক। মেদিনীপুর থেকে ফিরেই বাড়ি সুদ্ধ সবাই অসুখে। মেয়েটির মা সবে সেরেছেন। এখন মেয়েটি নিজেই বিছানায় পড়েছে। ডাক্তার বলেছে টাইফয়েড। এখন বাঁচে কিনা।

এমনি কিছু ভয় ছিল হীরালালের।

রান্নাভাত ঢাকা দেওয়াই পড়ে রইল। বিছানায় শুয়ে রইল চোখ চেয়ে। হাতের কাছে সুখের কল্পলোক। তবু হাত বাড়াতে পারে না। আনন্দস্বাদের স্বপ্ন, প্রতীক্ষায় অবসন্ন হয়ে পড়ে মাঝে মাঝে। কেমন বিষাদের মূর্ছায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে হীরলাল। আবার লোকের কথা শুনে বিশ্বাস করতে লোভ হয়—উগ্র কামনা উজ্জীবিত হয়ে ওঠে।

রামধনির বৌ সেদিন সন্ধ্যে রাত্তিরে হঠাৎ মারা গেল। সকলে মিলে তাকে শ্মশানঘাটে নিয়ে এল। অন্যেরা নেশার ঝোঁকে হল্লা করছে। এমনিতেই হীরালালের মন ভাল ছিল না, তার ওপর সিদ্ধির ঝোঁকে ভারি হয়ে আছে মাথাটা। খানিক বাদে দেখলো শুধু ও নিজে আর বুড়ো রামধনি মড়া আগলে বসে আছে, অন্যেরা চিতা সাজাচ্ছে খানিক দূরে। তেঁতুল গাছগুলো ঝিমঝিম করচে বাতাসে। কুকুর ডাকছে থেকে থেকে। হঠাৎ হীরালালের দুহাত জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠলো বুড়ো রামধনি। ছেলেমানুষের মতো সেকি কান্না। কি করবে হীরালাল। শোনা শেখা সান্ত্বনার কথা বলতে চাইলো। কথা জোগালো না। জলে চোখ ভরে আসে। কান্না ঠেলে ওঠে বুক থেকে। পাক খেয়ে ওঠে পাঁজরের মাঝ থেকে। সারা শরীরটা কান্নায় কেঁপে ওঠে ক্রমে। যে মা'কে সে দেখেনি, দেখেছে বলে মনে পড়ে না, তাঁর নাম করে, তাঁর শোকে ডুকরে কেঁদে উঠলো হীরালাল। মা বেঁচে থাকলে তাঁরও অমনি বয়স হতো। অমনি সাদা কাঁচা চুল। অমনি জ্বলজ্বলে সিঁদুর। এতোদিন বাদে যেন নিজের মাকে শ্মশানে এনেছে, যে মা ওকে একদিনও আদর করে যেতে পারেনি।

সবেমাত্র সবাই হাজির হয়েছে। কাজে হাত দেয়নি কেউ। জটলা হচ্ছে জায়গায় জায়গায়। হীরালাল পাশ দিয়ে যাচ্ছিল।

বড়ো মিস্তিরি, ও বড়ো মিস্তিরি। মুখ কালো কেন? বিবি গোসা করে-নিতো? ঘরে আসতে নারাজ না কি?

উত্তর দেয় না হীরালাল।

'এই যে, বড়ো মিস্তিরি! ওরে বাবা, এতো চটো কেন? কথা বলবে না

নাকি? দেখো বাপু; এল-এম-ফাইভ ঠেলে দিও না।

হীরালাল একবার চেয়ে পদক্ষেপ দ্রুততর করে।

'একচোটে মিস্তিরি, না চাইতেই ইস্তিরি। মেজাজ হবে না? কার কপাল দেখতে হবে তো?'

সেখান থেকে চলে যায় হীরালাল। কারো কথার উত্তর দেয় না।

একা কোথাও সন্ধ্যেবেলায় সাইকেলটা নিয়ে চলে যায়। ঘুরে বেড়ায়। নয়তো বা রামধনির ঘরে এসে বসে থাকে। রামধনি ওকে বোঝায়—তুই এতো বোকা কেন? ওদের কথায় মাথা গরম করবি না। ওরা তোকে খ্যাপায়, আর তুইও নাচিস সব কথায়। তা কি আর না জানে হীরালাল। কেউ ওর ভালো চায় না। সবায়ের গা জ্বালা করে হীরালালের যদি সুখ হয়।

ক্রমে ও কেমন করে বুঝেছে যে, মিস্তিরি হবার পথে অনেক বাধা। ওকে অপদস্থ আর অপমান করার জন্যেই এরা এতো মিস্তিরি-মিস্তিরি করে। আসলে কেউ চায় না যে, ও মিস্তিরি হোক। কেউ না। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত বড়ো মিস্তিরি। বড়ো মিস্তিরি।' 'ডি-এল-ও কি বল্লেন?' 'ডি-এল-ও কেন? হিরুর কেস জেনারেল ম্যানেজারের কানে তোলা উচিত।' দাঁত বার করে সবাই হাসে। একদিন কে একজন বল্লে, বিয়ে করে বিবিকে নিয়ে দিল্লী যাও মিস্তিরি। বোর্ডের সায়েবদের সঙ্গে আলাপও হবে, আর নতুন বিবির দেশ দেখাও হবে।' অফিসঘরের সামনে দিয়ে হনহন করে চলে আসছিল হীরালাল। দেখলো ফোরম্যান আর ডি-এল-ও সায়েব আসছেন। মাথায় রক্ত তখন নাচছিল। দাঁড়িয়ে পড়লো সামনে।

—সায়েব?

—কি চাই? কে এ লোকটা? ফোরম্যানের দিকে ফিরলেন সায়েব।

হীরালাল তখন মরিয়া। ফোরম্যান কিছু বলার আগেই বল্লে, 'আমি একজন খালাসী, আমার একটা আর্জি আছে!'

ভুরু কুঁচকে গেল সায়েবের—তা এখানে কি? দরখাস্ত কোরো।

'—না সায়েব, আজই আমায় বদলি করে দিন—চক্রধরপুর বিলাসপুর যেখানে হোক। এখানে আমি কাজ করতে পারবো না।

'ওঃ, একেবারে আর্জেন্ট?'

'হ্যাঁ স্যার, আজই। ট্রান্সফার করুন নয় নোটিশ দিন!'

'বাজে বোকো না। যাও নিজের কাজে যাও। কে তোমায় আমার সঙ্গে দেখা করার পারমিসান দিয়েছে?'

'না হলে স্যার, এখানে আমি কাজ করতে পারবো না। একদিনও না।' উত্তেজনায় লাল হয়ে গেছে হীরালালের মুখ। জিভটা জড়িয়ে আসে। হাত-পা কাঁপতে থাকে।

'তোমার ইচ্ছেয় তোমার পোস্টিং হবে নাকি? যাও, চলে যাও। দাঁড়িয়ে কেন? যদি কিছু বলার থাকে লিখে জানাবে ফোরম্যানকে।'

সায়েবরা কাজ দেখতে দেখতে চলে গেলেন।

সোজা অফিসঘরে এলো হীরালাল। কেরানীবাবুর কাছ থেকে কাগজ নিল একটুকরো। দোয়াত কলম নিয়ে বসে গেল। ওর বিরক্তি ঘৃণা ক্ষোভ ক্রোধ একসঙ্গে ফেটে পড়তে চাইলো। অক্ষম পঙ্গু ভাষা, অশক্ত ক্ষীণ কলমের নিব। সবকিছু লিখে ফেলতে চাইলো হীরালাল। ওর প্রতি নিষ্ঠুরতার প্রতিবাদে এক ফতোয়া। ওর নিজেরই প্রকাশ-রহিত হাস্যকর জীবনীর মতই অসংলগ্ন এক সাহিত্য সৃষ্টি হলো। অর্থহীন অশুদ্ধ আঁচড়গুলোয় মিনতি আর করুণাভিক্ষাও ছিল। একে রাজভাষা, তায় ক্ষোভের তরঙ্গে দুলচে সারা শরীর।

সে চিঠি আমি পড়েছি। সে চিঠি নিয়ে আমায় অধিকারীদের সঙ্গে দেখা করতে হয়েছে। হীরালাল কি বলতে চেয়েছিল তারই ভাষ্য করতে হয়েছে। কোণে পড়ে মার খাওয়া কুকুরের মতো উদ্ধত অসংযত কতোগুলো চিৎকারের সঙ্গে সোজা ভাষায় সে চিঠিতে একথাই লেখাছিল যে, সে কাজ করতে চায় না। সেদিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন অধিকারীরা। হীরালালের পক্ষে আমার জবাবদিহিতে কোনো কাজ হয়নি, হীরালালের কোনো লাভ হয়নি। কিন্তু ওর সন্দেহ নিরসন করে আমি ওর কাছে এসে লাভ করেছি অনেক।

চিনতে পারলাম সেই দ্বিধাহীন বিশ্বাসী ভালমানুষীকে, যাকে এতোদিন বোকামী বা ক্ষ্যাপামী বলেই জানতাম।

সে কথাই বলছি।

আচমকা গালে একটা চড় কষিয়ে দিলে যেমন দশা হয়, দিন দশেক পরে, এক সকালে হীরালালের সেই দশা। অফিসঘরে ডেকে পাঠিয়ে ফোরম্যান সায়েব এক চিঠি দিলেন। চিঠির মানে ঠিকমত ধরতে পারলো না হীরালাল। বাবুদের কাছে এলো। বাবু পড়ে বুঝিয়ে দিলেন। চিঠিতে লেখা—যুক্তিসংগত বিবেচনার পর তোমার ভলেণ্টারী রিটায়ারমেণ্ট নোটিশ নেওয়া হল। এই মাস থেকে তোমায়

খালাস করাও হল। পাওনা ছুটি তিন হপ্তা পাবে। কোম্পানীর যা জিনিসপত্র তোমার কাছে আছে, তা বুঝিয়ে দাও এবং যথাসম্ভব শীঘ্র কোম্পানীর কোয়ার্টার খালি করে দাও। প্রভিডেন্ড ফান্ডের টাকা কিভাবে নেবে জানাও।'

অবাক কাণ্ড। রিটায়ার করবে কেন হীরালাল? বদলি চায়; এখানে কাজ করতে চায় না। এ জায়গা বিষ লাগচে।

ফোরম্যান সায়েবের সঙ্গে দেখা করতে গেল। তিনি হাঁকিয়ে দিলেন,—তোমার চিঠিতে যেমন চাওয়া হয়েছে, তাই তোমায় দেওয়া হয়েছে। তোমার কদর দেবে রেলের এমন তাকত নেই। এবার দ্যাখো, যেখানে তোমার সমজ্দার মেলে।'

কি কথার কি মানে করেছে ওরা।

সেইদিন শরণ সিংএর সঙ্গে হীরালাল আমার কাছে এসেছিল। ব্যবহারে অবাক হয়েছিলাম সেদিন। পূর্বাপর ঘটনা জানতে পেরে নানা সূত্রে তার সঙ্গে আলাপ করেছি। নির্দয়তার শিকার মনে করে তার সম্পর্কে সহানুভূতি ছিল। কিন্তু তখনও অনেক জানা বাকী ছিল। হীরাকে এখন দেখে মনে হয় কুটিল কালো দিকটা না জানা মানুষ এখনও তবে বেঁচে আছে, এতো দুর্বিপাকেও। আমার কাছ থেকে উঠে সে সোজা চলে যায় ডি-এল-ও সাহেবের বাংলোয়। সায়েব আর মেম্সায়েব বাগানে বেড়াচ্ছিলেন।

—কি চাই......?

—আমি হুজুর একজন খালাসী। হীরালাল মণ্ডল, লোকো শেডের......

—ওঃ, তুমিই না ভলেণ্টারী রিটার-মেণ্ট চেয়েছ?

—না হুজুর, আমি......

—চাপ্রাসী। এসব ফালতু লোককে, না জিজ্ঞেস ক'রে ঢুকতে দাও কেন?

—কিন্তু হুজুর, আমার দরখাস্তে আমি চেয়েছিলাম......

—তোমার দরখাস্ত আমি দেখেছি। যাও এখান থেকে। চাপরাসী......তোমরা কেউ গেটে থাকো না কেন?

পেছন ফিরে মাঠের অন্য দিকে সায়েব হাঁটতে শুরু করলেন। কি সুন্দর টুক্-টুকে গোলাপটি হয়েছে ওদিকটায়। চাপ-রাসীর ইঙ্গিতে হীরালাল চলে এলো। গেট থেকে খানিক এসে পথের ধারে কৃষ্ণচূড়া গাছের নিচে হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসলো। চারিদিকে ক্রমে অন্ধকার ঘনিয়ে এলো।

অনেক রাতে নিজের ঘরে ফিরলো হীরালাল। খাবার তৈরী করেনি, খায়ওনি কোথাও। সে কথা মনে পড়লো না। বিছানায় শুয়ে পড়লো।

অনেক রাত হয়ে যায়, তবু ঘুম আসে না হীরালালের। ঘরে বিশ্রী গুমোট। বিছানায় শুয়ে কিছুক্ষণ এপাশ ওপাশ করলে। শেষে বাইরে চলে এলো।

নিস্তব্ধ হয়ে এসেছে চারিপাশ। ফ্লাড লাইটের আলোয় সারি সারি নিচু বাড়ি-গুলো খেলার ঘরের মত দেখাচ্চে। ভারি ছোট্ট আর নিষ্প্রাণ। এখানে ওখানে দু' একজন ব'সে আছে। ওরই মতো হয়তো ঘরের গরমে অতিষ্ঠ হয়ে।

হীরালাল হাঁটুতে মুখ রেখে জলের কলের বাঁধানো ধারটায় বসলো।

এতোক্ষণ দেখেনি হীরালাল। কিছু দূরে কারা দুজন বসেছিল। ওকে দেখতে পেয়ে ওর দিকেই এগিয়ে এলো। বড়ো আলোটা ওদের পেছনে। মুখ দেখা যায় না কারুর। কাছে এলো ওরা। সাধন আর তার সঙ্গে কে যেন? হীরালাল তাকে চেনে না।

সাধন এসে হীরালালের কাঁধে হাত রাখলো। পাশে বসলো মুখবুজে খানিক্ষণ। সহানুভূতি জানালো। হীরা-লাল বসে রইল; যেন কানে কিছুই যাচ্ছে না। যা মুখে এলো তাই বলে সাধন সায়েবদের গাল দিল। মুখের দিকে চেয়ে চুপ করে রইল হীরালাল। মনে কোনো কথা ছুঁতে পারছিল না; কিন্তু যখন সাধন বলছিল, কিছু ভাবিস নি। আরে, মরদ লোকের দুটো হাত থাক্লে কেন্ শালা রুটি মারে? যারা রেলে কাজ পায়নি—সব লোক কি না খেয়ে আছে? কথাটা ওকে আশ্চর্য রকমের সাহস দিল। সাধন তখনও বলে যাচ্ছিল, এই তো, আমার ভগ্নীপতি। কাঁথিতে সাইকেল সারাই এর দোকান আছে। কারো পায়ে তেল দিতে হয় না। নিজের খুশিমত কাজ করে।

পাশের লোকটি তাহ'লে সাধনের ভগ্নীপতি। বেশ লম্বা চওড়া চেহারা। বড়ো গোঁফ, হিন্দুস্থানী লোকদের মতো

—পাকিয়ে ওপরে তোলা। তার সঙ্গে হীরালালের আলাপ হ'ল।

সাইকেল সারাই-এর দোকানে কোনো ঝঞ্ঝাট নেই। খাটো আর খাও। দুজন কারিগর আছে কাঁথির দোকানে। আর নিজের ছোট ভাই, দেখা শোনা কিছু কিছু করে। দিয়ে-থুয়ে দিন কম্-সে-কম্ পাঁচ-ছ টাকা থাকে। গরম কালে আরো। তখন সাইকেল বেগড়ায় বেশী। সাত আট এমনকি দশও হয় এক একদিন। তবে খাটতে পারা চাই। পাঁচ টাকা দিন? মনে মনে হিসেব করছিল হীরা। তিন-পাঁচে-পনেরো, মানে, একশো পঞ্চাশ টাকা।

সিগারেট দিল সাধনের ভগ্নীপতি। আরে ভায়া, চাকরির জন্যে আবার শোক? চাকরি কি মরদ লোকের কাজ? যে ফাঁকি-বাজ, নয় হাবাগঙ্গারাম—সেই চাকরি করে। তোমার মত গুণী খাটিয়ে লোক, যা শুনলাম সাধনের কাছে, তোমার কি চাকরি মানায়। তোমার উচিত নিজের ব্যবসা করা।

হীরালাল শুনেছে, ব্যবসা করতে তো টাকা লাগে। প্রথমেই টাকা ঢালো। নয়-নয় করেও বেশ মোটা রকমের।

সাধনের ভগ্নীপতি খড়্গপুরেই একটা দোকান করবে ঠিক করে এসেছে। ভাই কাঁথির দোকান দেখাশোনা করবে। ওখানে ক'টাই বা লোক, কটাই বা সাইকেল। এখানে একেবারে ঢের লেগে রয়েছে। এখানে যে লোকের একটা সাইকেলের দোকান আছে, তার পয়সা খায় কে? শুধু জায়গা জোগাড় করে সাহস করে বসা। তবে হ্যাঁ, গতর খাটাতে হবে।

গতর খাটাতে গররাজি নয় হীরালাল, তবে টাকা?

সাধন ওকে মনে করিয়ে দিল, যে কোনোদিন ইচ্ছে করলেই হীরু টাকাটা পেয়ে যেতে পারে। প্রভিডেন্ড ফণ্ড-এর টাকা।

সে আর কতই বা, শ'তিনেক।

সাধনের ভগ্নীপতি দিলখোলা লোক। আরে, তুমি হলে সাধনের বন্ধু। আমার ভায়ের মত। ও টাকাই অনেক। আমি তো শ' পাঁচেক খরচ কোরবোই; তার ওপর তোমার ওই টাকা। টাকা তো আসল কথা নয়। তোমার মতো একজন বিশ্বাসী খাটিয়ে লোক যদি সঙ্গে থাকে—'জয় বাবা

'বিশ্বকর্মা' বলে খালি হাতে নেমে পড়া যায়। এখানে তো নিজে সব দেখতে পারবো না। সে তোমার চার্জ। কাঁথিরটা আসলে দেখাশোনা করতে হবে। ভাইটা একেবারে ছেলেমানুষ।

সারাদিনের সমস্ত গ্লানি আর শোক হীরালালের মন থেকে কখন সম্পূর্ণ মুছে গেছে। ভালই হয়েছে। গেছে—তো গেছে। কুকুরের চাকরি। হাতজোড় করে থাকো দিনরাত। তার চেয়ে এ স্বর্গ—যেমন খাটবে তেমন পাবে। কারো পরোয়া নেই।

ঘরে এসে বিছানায় শুলো হীরালাল। কিন্তু ঘুমের চিহ্ন নেই। দেড়শো, দেড়শো না হোক্ একশো কুড়ি......। অন্তত একশো। ওঃ, তাই যথেষ্ট। ওরা তো দুটি প্রাণী। না, স্বপ্নে নয়। স্বচ্ছ দেখতে পেল হীরা, সেই মুখখানি। হাসিখুশীতে ভরা। চিক্‌চিক্ করচে গলার হার। ছট্‌-ফট্ করচে কানের দুলজোড়া। নরম রোগা শরীর ঘিরে—চাঁপা রঙের শাড়িটা। সারা-রাত চেয়ে চেয়ে সেই মুখের ছবি দেখলো হীরালাল।

পরের দিন ভোর বেলায় কলতলায় যখন হীরালাল মুখ ধুতে গেল, তখন ভিড় হয় নি। মনে গতদিনের কোনো উদ্বেগ নেই। ঘর-দোর পরিষ্কার করলে। উনুন ধরিয়ে চা-রুটি বানালো। ধীরে-সুস্থে খেয়ে নিল। কারখানায় এসে 'টুল্‌-বক্‌স্' সাজাতে বসলো। স্টোরবাবুকে জমা দিতে গেল তারপর। দুটো স্প্যানার, একটা হাতুড়ি, আর একটা পাঞ্চ কম আছে। কে হয়তো কাজ করতে নিয়ে গেছে। তার কাছেই পড়ে আছে। বাবু বললেন, খুঁজে এনে মিলিয়ে দাও। নইলে সেকেণ্ড হ্যাণ্ড এনে নম্বরে মিল করে দাও না। এতো তাড়া কিসের?

সহকর্মীরা মনে বড়ো আঘাত পেয়েছে। কারো রুজি রুটি চলে যাবে, সে আর কারই বা ভাল লাগে। বললে, আমাদের কারো একটা নিয়ে জমা দিয়ে দে না। আমরা ব্যবস্থা করে নেবো।" [illegible]লাল বললে—না না, ও-সব থাক। বাবু, আপনি জমা নিন্।" [illegible] নতুন জিনিসের [illegible] বাবু।" [illegible] বলে, আপনি জমা নিন্।"

হীরুর গলায় তখন অন্যস্বর। চোখে অন্য দৃষ্টি। স্বপ্নে মশগুল হয়ে আছে হীরালাল। সাধন ইতিমধ্যে একবার কলকাতা গিয়েছিল। খবর এনেছে, মেয়েটি ক্রমে ক্রমে সেরে উঠচে। বরাত ভালো। খুব বেঁচে গেল এ-যাত্রা। ভদ্দরলোকের নাকি ইচ্ছে, বিয়েটা অঘ্রান মাসেই হোক। ততদিনে শরীরটাও সেরে উঠবে ওর।

'তাই ভালো' ভাবলে হীরালাল। ততদিনে ওর সাইকেলের দোকানও জমু-জমাট। জল্পনা-কল্পনা, ঘর ভাড়া নেওয়া, এই করতে করতে কেমন করে দিন পনর কেটে গেল। প্রাভিডেণ্ড ফাণ্ডের টাকাটা হাতে পেল হীরালাল, তিনশো পঁয়তাল্লিশ টাকা।

সাধনের ভগ্নীপতি বললে, তোমারও তো খরচ-খরচা আছে। বাকীটা তোমার কাছে থাক। ওই দুশো হলেই এখনকার মতো চলে যাবে।

খরচ-খরচা আছে বই কি? কলকাতার মেয়ে। হয়তো মনে কতই না শখ-সাধ। বুড়ো গরীব বাপ হয়তো জামা-শাড়ি দিতে পারবে না। এখন থেকে দু' চারটে করে হীরাকে নিজেই কিনে রাখতে হবে। তারপর আয়না-চিরুনি; আল্‌তা—আর কি; আর কি শখ কে জানে।

হীরালাল পুরোনো বাজারের কাছে দুটো ঘর ভাড়া নিল। সব সাজসরঞ্জাম কিনে আন্‌লো। হাঁড়ি-কুঁড়ি হাতা-খুন্তি......পুরোনোগুলোয় আবার কি রাঁধবে? নতুন বৌ এসে কি কালিচিটে পুরোনো হাঁড়িতে ভাত বসাবে?

হীরালালের ঘর তখন জমজমাট। খুঁটিনাটিও সাজানো। শুধু ঘরের লক্ষ্মী পাটে এসে বসলেই হয়।

সেদিন খুব ঘটা করে চাঁদ উঠেছে। আলোয় স্পষ্ট হয়ে রয়েছে চারপাশ।

দর্জির দোকানে ওর একটা জামা ছিল। সেইটে আর দুটো নতুন-কেনা শাড়ি কাগজের একটা বাণ্ডলে নিয়ে নিজের ঘরের দোর গোড়ায় দাঁড়ালো হীরালাল। দুটির মধ্যে একটি শাড়ি সিল্কের। বড়ো বড়ো লাল ফুল তোলা। দোকানে কাপড়টা দেখছিল আর ভাবছিল হীরা কেমন দেখাবে ওকে। সিল্কেরী শাড়ি ভারি সুন্দর দোলে। একটু নাড়াচাড়া করলে, কি, একটু বাতাস পেলে দুলে দুলে ওঠে শাড়ি।

বেশ দেখায়। ঘরে ঢুকে আলো জে[illegible] আবার একবার শাড়িটা দেখবে, মনে ম[illegible] ভাবছিল হীরালাল।

হাঁপাতে হাঁপাতে সাধন এ[illegible] উপস্থিত। খবর শুনে বুক শুকিয়ে গে[illegible] হীরালালের। দোকানের যন্ত্রপাতি কিনা[illegible] ওর ভগ্নীপতি কলকাতা গিয়েছিল। এ[illegible] মাত্তর সাধন খবর পেয়েছে যে, ওখানে [illegible] সব টাকা পকেট কাটা হয়ে গেছে। ভগ্নী-পতি নাকি ভীষণ বিপদে পড়েছে.... বলতে বলতে প্রায় কেঁদে ফেলল সাধন।

হীরালালের মুখে একটা কথা এলো না। চাবিটা হাতে করে ঘরের দরজা তেমনি দাঁড়িয়ে রইলঃ তা হ'লে? [illegible] হবে? দোকানের কি হবে?

সাধন জানালো রাত্রের গাড়িতে ভগ্নীপতির কাছে কলকাতায় যেতে চা[illegible] ও। হাতে একেবারে কিচ্ছু নেই। গোটা পাঁচেক টাকা চাই। আরো বললে সাধন পকেটমারটা নাকি ধরা পড়েছে। ত[illegible] ওখানে পুলিসের কড়া নিয়ম। টাকাটা [illegible] ওদেরই সেকথা প্রমাণ দিয়ে তবে পুলিসের কাছে থেকে টাকাটা ফেরত পাবে। উকিল-টুকিল ধরে ব্যবস্থা করতে হবে। ভগ্নী-পতি কিছুই জানে না কলকাতার; সাধন নাড়িনক্ষত্র জানে।

ওঃ, তাহ'লে টাকাটা আবার পাওয়া যাবে? হীরালালের সব হিম শিরাগুলোয় আবার রক্ত বইল। আর গোটা পঁচিশেক টাকা পকেটে আছে সবসুদ্ধু। প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের তিনশো পঁয়তাল্লিশের বাকী পঁচিশ। পাঁচটা টাকা পকেট থেকে বার করে সাধনের হাতে দিল হীরালাল।

সাধন চলে যাচ্ছিল। হীরালাল ডাকল। কলকাতায় তো যাচ্ছিস, ওম্‌নি একবার ওই ভদ্দরলোকেদের সঙ্গে দেখা করে আসিস্।

সাধন ব্যস্ত হয়ে বললে, সে তো বটেই। এখন যেতে আর বাধা কি? কথা তো পাকা হয়েই গেছে। ধরতে গেলে এখন তো ওরা কুটুম।

সাধন চলে গেল।

হীরালাল আলোয় এসে মেলে ধরলো শাড়িটা। চেয়ে রইল একদৃষ্টে। এখন তো সবে কার্ত্তিক পড়েছে। অঘ্রান মাসের আর কতদিন? আর কত দেরি?

তোডরমল

দশমিক মুদ্রা

১৯০৬ সালের ভারতীয় মুদ্রা আইন সংশোধিত হইয়া সম্প্রতি লোকসভায় দশমিক মুদ্রাবিধি গৃহীত হইয়াছে। তাহার ফলে এক রুপেয়াকে ১০০ ইউনিটে রুপান্তরিত করিয়া অর্ধরুপেয়া অর্থাৎ আধুলিকে ৫০ ইউনিটের মুদ্রা এবং সিকিকে ২৫ ইউনিটের মুদ্রারুপে পরিগণিত করা হইবে। এতদিন এক টাকাকে ষোল আনা হিসাবে, আধুলিকে আট আনা এবং সিকিকে চারি আনা হিসাবে গণনা করা হইত। তারপর পাই, পয়সা ইত্যাদি পর্যায় ত রহিয়াছেই। দশমিক মুদ্রাবিধি গৃহীত হওয়ায় আনা পাইর রাজত্বের অবসান ঘটিবে। ফলে এতদিন যে আনা পাইর নামতা মুখস্থ করিয়া শুভংকরের ফাঁকি বাহির করিতে গলদ্ঘর্ম হইতে হইত সেই গাণিতিক কসরতের প্যাঁচ হইতে অন্তত রক্ষা পাওয়া যাইবে। উপরোক্ত আইন অনুসারে এক টাকা হইতে আরম্ভ করিয়া সিকি মুদ্রার প্রচলন অব্যাহত থাকিবে। তবে যাহা কিছু পরিবর্তন ঘটিবে তাহা সিকি মুদ্রার নীচে যে সব শ্রেণী বিভাগ আছে যথা দুই আনা, এক আনা, দুই পয়সা এবং এক পয়সা এই সম্পর্কে। এইসব খুচরা মুদ্রার কি নামাকরণ হইবে তাহা এখনও ঠিক হয় নাই। তবে লোকসভায় বিতর্ককালে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু বলিয়াছিলেন যে, ১ ইউনিটের (অর্থাৎ এক রুপেয়ার ১/১০০ অংশ) নামাকরণ পয়সাই হইবে কিনা তাহা বিবেচনা করা যাইবে। উক্ত নামাকরণ গৃহীত হইলে 'পয়সার' অস্তিত্ব অটুট থাকিবে এবং রুপি-রাজের সাথে পয়সা-পরিচারকের অনুগমন অনেকটা সাহেব—বিবি—গোলামের সমন্বয়। তবে 'পয়সার' নামাকরণের অসুবিধা এই যে, দশমিক প্রথায় এক ইউনিট দাঁড়ায় ১/১০০ এবং বর্তমান বিধি অনুসারে এক পয়সা হয় ১/৬৪, কাজেই দশমিক প্রথায় এক পয়সার দাম বর্তমান এক পয়সার চাইতে কম এবং এইদিক দিয়া দুইটি খুচরা মুদ্রা নির্ণয়ে নানা গোলযোগ ঘটিতে পারে। ভবিষ্যতে এক ইউনিটের নাম 'সেণ্ট' হইবে না 'পয়সা' থাকিবে তাহা অবশ্য সঠিক বলা যায় না। তবে 'পয়সা' এই নামটির বিলোপ ঘটিলে আপসোসের কথা হইবে। প্রফুল্ল নাটকে ভিখারী অবস্থায় যোগেশের মুখে "একটি পয়সা" এই ছোট্ট কথাটিতে যে করুণ রস নিঃসৃত হয় এবং পূর্ববঙ্গের ছড়াগানে "একটি পয়সা দিবেন আমারে, গুরুদশার ভিক্ষা মাগি", যে অবস্থার বর্ণনা আছে তাহা ভবিষ্যৎ বংশধরের কাছে অজ্ঞাত থাকিয়া যাইবে। সে যাহাই হউক, দশমিক মুদ্রা-নীতি যে আমাদের দেশে নূতন আবিষ্কার তাহা নহে। অনেক বৎসর ধরিয়াই এই প্রথা প্রবর্তনের জন্য আলাপ-আলোচনা চলিতেছিল। এমন কি, দেশ বিভাগের পূর্বে অর্থাৎ ১৯৪৬ সালে এইরুপ একটি বিল আইন সভায় উত্থাপিতও হইয়াছিল। কিন্তু অনিশ্চিত রাজনৈতিক পরিস্থিতির জন্য ঐ বিলটির আলোচনা অগ্রসর হইতে পারে নাই। সম্প্রতি এই সম্পর্কে যে আইন পাশ হইয়াছে তাহা এক ইউনিটের নীচে মুদ্রা শ্রেণীবিভাগ বাদে ১৯৪৬ সালের বিলটিরই অনুরুপ।

ইতিহাস বলে যে, দশমিক বিধি নাকি বহু শতাব্দী পূর্বে হিন্দু গণিতজ্ঞেরা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। দশমিক বিন্দুর উপযোগিতা সম্বন্ধে গণিতজ্ঞেরাই সবিশেষ বলিতে পারেন। আমরা এই বুঝি যে, কোন সংখ্যাকে দশ দিয়া পূরণ বা ভাগ করা অতি সহজসাধ্য। সে যাহাই হউক, দশমিক মুদ্রা প্রথার পুনঃপ্রবর্তনে স্বাধীন ভারত যে তাহার ঐতিহ্যময় অতীতের সাথে সংযোগ স্থাপন করিল তাহা অনেকেরই কাছে গর্বের কারণ। এই গর্ববোধকে নিছক ভাবালুতা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। এখন দেখা যাক কেবল সূক্ষ্ম ভাবগ্রহিতা ছাড়াও এই প্রথার বৈষয়িক কোন কার্যকারিতা আছে কিনা। এতদিন আনা পাইর হিসাব লইয়াই সকলে ব্যস্ত ছিল। ষোল আনায় এক টাকা, বার পাইতে এক আনা—এই নামতা মুখস্থ করিয়াই যোগ, বিয়োগ, পূরণ, ভাগ প্রভৃতি অংক লিখিতে হইত। পাইর নীচে প্রদত্ত সংখ্যাগুলিকে প্রথমে যোগ করিয়া তারপর বার দিয়া ভাগ করিয়া অবশিষ্টাংশ বসাইতে হয়। তারপর আনার নীচের সংখ্যাগুলিকে অনুরুপভাবে যোগ করিয়া ষোল দিয়া ভাগ করিতে হয়। ইহাই আনা পাইর জগতে যোগ অংকের পদ্ধতি ছিল। শুদ্ধ করিয়া এইসব অংক কষিতে পারা ছোটবেলায় 'রাজসূয়' যজ্ঞের মতই দুরুহ ছিল। না পারার যে কি যাতনা তাহা যাহারা গ্রামের পাঠশালার পণ্ডিত মহাশয়ের কাছে পড়িয়াছেন তাঁহারা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হইতে বলিতে পারেন। তারপর পূরণ ভাগের পালা—তাহা আয়ত্ত করাও পরিশ্রম সাপেক্ষ। দশমিক প্রথায় গণিতের বন্ধুর পথ অনেকটা সরল হইল। কারণ দশ দিয়া পূরণ ভাগ সহজসিদ্ধ—সামনে শূন্য বসাইয়া অথবা বামে দশমিক দিয়া পূরণ ভাগের রহস্য ভেদ করা গেল।

ইহা ছাড়া, হিসাবের খাতাতেও দশমিক প্রথা বিশেষ সহায়তা করে। ব্যাংকের হিসাবের খাতাই প্রথমে ধরা যাক্। ধরুন আপনার কোন ব্যাংকে একটি একাউণ্ট আছে যাহাতে আপনি টাকা জমা দেন এবং প্রয়োজনমত টাকা তোলেন। বর্তমানে টাকা আনা পাইর শ্রেণী বিভাগ থাকায় ব্যাংকের জমার খাতে টাকা আনা পাই এই তিন ভাগে লাইন

টানিতে হয়। আবার খরচের খাতেও অনুরূপ তিন ভাগে লাইন টানিয়া আপনি যে টাকাটা তোলেন তার হিসাব রাখিতে হয়। তারপর যে টাকাটা উদ্বৃত্ত থাকে তাহা আবার 'ব্যালেন্স' নামক খাতে তিন ভাগে দেখাইতে হয়। ভাবিয়া দেখুন, যদি আপনার জমা ও তোলা দিনে অনেকবার হয় তবে মাসের শেষে এই জমার যোগ অঙ্ক (যাহাকে summation বলা হয়) এবং তোলার যোগ অঙ্ক টাকা আনা পাইর হিসাবে কতখানি শ্রমসাপেক্ষ। তারপর যদি কোন কারণে হিসাবের ভুলে আপনার কোন চেক্ ফেরত গেল তাহা হইলেও আর রক্ষা নাই। হয়ত হিসাব-রক্ষক কেরানির চাকুরি নিয়াই টানাটানি পড়িতে পারে। কাজেই বর্তমান মুদ্রা-পদ্ধতিতে টাকা আনা পাইর হিসাব রাখা অসাধ্য বা দুঃসাধ্য না হইলেও অনায়াস-সাধ্য নয়। অবশ্য অভ্যাসযোগে সবই সহজসাধ্য হয়। কিন্তু দশমিক প্রথায় আনা পাইর যোগ বিয়োগে যে শ্রম ব্যয়িত হইত তাহা অনেকখানি বাঁচিয়া যাইবে। এইদিক দিয়া জাতির মস্ত বড় লাভ সন্দেহ নাই। অন্য কেহ না বুঝিলেও ব্যাঙ্কের কেরানি দশমিক প্রথার উপকারিতা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিবেন এবং আইন প্রণয়নকারীদের নীরবে ধন্যবাদ জানাইবেন। তারপর চেক্ কাটা ইত্যাদি ব্যাপারেও দশমিক প্রথা অনেকখানি উপযোগী। আপনি চেকের উপর টাকা এবং সেন্ট (এক ইউনিটের নাম যদি এই হয়) লিখিয়াই কাজ সমাধা করিতে পারেন, পাই পর্যন্ত আর লিখিবার শ্রম স্বীকার করার কোন প্রয়োজন হয় না। ধরুন, আপনাকে ইন্সিওরেন্স প্রিমিয়াম বাবদ ১৫০ টাকা ৯ আনা ৬ পাইর একটি চেক্ কাটিতে হইবে এবং মনে করুন, আজই ঐ টাকা দেওয়ার সর্বশেষ তারিখ। আজই এই টাকা জমা না দিলে আপনার জীবনবীমা হয়তো চালু থাকিবে না। এই অবস্থায় মনে করুন, আপনি তাড়াতাড়িতে অক্ষরে লিখিলেন ১৫০ টাকা ৯ আনা ৬ পাইস (পয়সা) আর সংখ্যায় লিখিলেন ১৫০ টাকা ৯ আনা ৬ পাই। কিছুদিন বাদে দেখিলেন যে, পাইর বদলে পাইস লেখার ফলে আপনার চেকটি ফেরত আসিয়াছে এবং সেই দরুণ বর্ধিত [illegible] আর চালু থাকিল না। এই অবস্থায় কি আপনার স্বভাবতই মনে হইবে না যে, পাই ও পয়সার বিভেদ চিরতরে উঠিয়া গেলেই ভাল? দশমিক প্রথায় চেক্ কাটিবার কালে ভুলের সম্ভাবনা কম এবং সামান্য ভুলের জন্য চেক্ ফেরত আসিবার কারণও ক্রমে অন্তর্হিত হইবে। এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে যে, কতিপয় বৎসর পূর্বে হিসাব রাখার সুবিধা বিবেচনা করিয়া ব্যাঙ্কিং মহলে এইরূপ একটি প্রস্তাব আলোচিত হইয়াছিল যে, ব্যাঙ্কে যাঁহারা একাউণ্ট রাখেন তাঁহারা যেন যতটা সম্ভব আনা পাই বর্জন করিয়া চেক্ কাটেন। কিন্তু কার্যত ঐ প্রস্তাব ফলপ্রসূ হয় নাই। দশমিক প্রথা প্রবর্তনে ঐ উদ্দেশ্য ভবিষ্যতে সফল হইবে।

এই ত গেল হাতে লেখা হিসাবের সুবিধার কথা। যন্ত্রের সাহায্যে যে হিসাব রাখা হয় সেইদিক হইতে বিচার করিলেও দশমিক মুদ্রারীতির উপযোগিতা সর্বজনগ্রাহ্য। বর্তমানে যদিও আনা পাইর হিসাবের জন্য যন্ত্র উদ্ভাবিত হইয়াছে, তথাপি দশমিক প্রথায় টাকার অঙ্কগুলি যখন দশ বা দশ দিয়া বিভাজ্য হইবে তখন যন্ত্রগুলি আরও দ্রুত কাজ করিবে। পরিসংখ্যানের ক্ষেত্রে এই দ্রুত ফলপ্রাপ্তি বিশেষ অর্থপূর্ণ। কারণ, পরিসংখ্যানের বাঁধা পথের পরিকল্পনার জয়রথ অগ্রসর হয়।

এতক্ষণ সুবিধার কথাই বলা হইয়াছে। মৃণালেও কণ্টক রহিয়াছে। কাজেই সেই সম্বন্ধে একটু কিছু না বলিলে আমাদের আলোচনা অসম্পূর্ণ রহিবে। এতদিন আমরা আনা পাইর হিসাবে এতখানি অভ্যস্থ ছিলাম যে, সহসা আনা পাইর অন্তর্ধানে আমাদের বৈষয়িক ব্যাপারে নানাপ্রকার অসুবিধার সৃষ্টি হইতে পারে। প্রশ্ন উঠিয়াছে যে, নিরক্ষর গ্রামবাসীরা এই পরিবর্তনের ফলে হয়ত অনেকের কাছে টাকা পয়সার লেনদেনের ব্যাপারে ঠকিতে পারে। অনেকে হয়ত এই পরিবর্তনের সুযোগে গ্রামবাসীদের আর্থিক ব্যাপারে নানাভাবে বঞ্চিত করিতে পারে। এই সম্ভাবনা যে একেবারে নাই, এমন কথা বলা যায় না। তবে প্রত্যেক চিরাচরিত রীতির পরিবর্তন ঘটিলে আনুষঙ্গিক কতকগুলি অসুবিধা আপাতত সৃষ্টি হয় বটে। কিন্তু সেই অসুবিধার কথা স্মরণ করিয়া বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে কোন পরিবর্তন গ্রহণ করা হইবে না এরূপ যুক্তি আজকের জগতে অচল। বিচার করিতে হইবে সাময়িক ক্ষতি বা অসুবিধা স্বীকার করিয়া চিরস্থায়ী কোন মঙ্গল আসিবে কিনা। কয়েক বৎসর আগে হায়দ্রাবাদ রাজ্যের হালিসিক্কা মুদ্রা প্রত্যাহৃত হইয়া যে ভারতীয় মুদ্রা প্রচলিত হইল তাহাতে জনসাধারণের কোন ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া শোনা যায় নাই। সংবাদপত্র, বেতার, প্রাচীরপত্র প্রভৃতির সাহায্যে ব্যাপক প্রচারকার্য চালাইলে জনসাধারণ মুদ্রা-পরিবর্তনের সঠিক তথ্য জানিতে পারিবে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। লোকসভায় এই বিষয়ে বিতর্ককালে অনুরূপ প্রচার-কার্যের যৌক্তিকতা দেখান হইয়াছে এবং সরকার এই দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করিতে কোন ত্রুটি করিবেন না। কাজেই নিরক্ষর নরনারীরা যে ঠকিয়া যাইবে এরূপ মনে করা ঠিক হইবে না। বিশেষ করিয়া হালিসিক্কা প্রত্যাহারের সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা এখনও সজীব আছে। ইহা ছাড়া, টাকাকড়ির হিসাবের ব্যাপারে লোকের জ্ঞানের নাড়ি টনটনে।

উপসংহারে বলা যাইতে পারে যে, একমাত্র বৃটেন ছাড়া প্রায় সকল দেশ দশমিক মুদ্রারীতি অনেক আগেই গ্রহণ করিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীতে প্রায় সকল প্রধান দেশেই এই প্রথা অবলম্বিত হইয়াছে। এখানে এ প্রশ্ন স্বতই মনে জাগে যে, দশমিক প্রথার সর্ববিধ সুবিধা থাকা সত্ত্বেও বৃটেনের মত সভ্য দেশ কেন ইহা গ্রহণ করে নাই। ইংরাজজাতি স্বভাবতই সংরক্ষণশীল। তাহাদের দেশে একটি প্রথার পরিবর্তে আরেকটি প্রবর্তন করিতে অনেক সময় লাগে। তবে তাহারা দশমিক মুদ্রারীতির সুবিধা সম্বন্ধে সম্যক্‌রূপে অবহিত। ইংরেজজাতি গ্রহণ করে নাই বলিয়াই যে আমরা এই সুযোগ গ্রহণ করিব না তাহার কোন কারণ নাই। এই পদ্ধতি গ্রহণ করিয়া ভারত অন্য জাতির আদর্শ অনুকরণ করে নাই। কারণ এই পদ্ধতি ভারতের নিজস্ব অবদান। দশমিকের বিন্দুতেই সিন্ধুর পরিপূর্ণ সম্ভাবনা নিহিত।

॥ পাঁচ ॥

সিঁড়ির চার পাঁচটা ধাপ উপরে উঠলেই দোতলার বারান্দা। হঠাৎ ডানদিকের ঘরের দরজাটা খুলে গেল আর এক ঝলক আলো এসে সামনে পড়ল। একটি মোটাসোটা আধা বয়সী মহিলা পা পর্যন্ত ছিটের গাউন পরা টর্চ হাতে এসে দাঁড়ালেন বারান্দায়। টর্চের আলোয় দেখি কোলের উপর একটা মিশমিশে কালো লোমশ কুকুরকে জড়িয়ে ধরে হেসেই চলেছে ললিতা। এতক্ষণে খেয়াল হল আমার হাত দুটো তখনও জড়িয়ে আছে ললিতাকে। লজ্জায় হাত ছাড়িয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। টর্চ-হাতে মহিলাটির বয়স চল্লিশ-প'য়তাল্লিশের মধ্যে। গায়ের রং ফর্সা নয়, বেশ চাপা। মুখ দেখলে বুঝতে মোটেই কষ্ট হয় না যে, এই প্রৌঢ়াই ললিতার মা। নাক চোখ মুখ হুবহু এক।

বেকুবের মত ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছি। নির্বিকার মুখে মহিলাটি ডাকলেন---'বনি!'

নিমেষে হাসি থেমে গেল ললিতার। তাড়াতাড়ি উঠে কুকুরটাকে কোলে ক'রে সিঁড়িগুলো একরকম লাফিয়ে পার হয়ে মায়ের কাছে গিয়ে বললে---'মামি, এই ধীরাজ, আমার হিরো!'

জীর্ণ নড়বড়ে সিঁড়িটায় দাঁড়িয়ে শুধু মনে হচ্ছিল---এই মুহূর্তে ওটা যদি ভেঙে আমায় নিয়ে পড়ে যায় তাহলে বেঁচে যাই। ললিতার মায়ের সঙ্গে প্রথম আলাপে খানিকটা ভাল ইমপ্রেশন দেব বলে কতকগুলো জুতসই ভাল ভাল কথা মনে মনে রিহার্সাল দিয়ে রেখেছিলাম। সব ভেস্তে গেল। অপরাধীর মত এক-পা দু-পা করে উঠে সামনে গিয়ে মুখ নিচু করে দাঁড়ালাম। স্নিগ্ধ হাস্যে আমাকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে পরিষ্কার বাংলায় ললিতার মা বললেন---'তোমরা ভিতরে এস।'

সবাই ভিতরে ঢুকলে ললিতার মা দরজাটা ভেজিয়ে দিলেন। ঘরের মধ্যে ঢুকে অবাক বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে গেলাম। লোকমুখে কয়েকটি বিখ্যাত পীঠস্থানের

ধীরাজ ভট্টাচার্য

কথা শুনেছিলাম যেখানে অতি দুর্গম কষ্টকর পথ বহু ক্লেশে অতিক্রম ক'রে দেবতার কাছে পৌঁছে মানুষ পথ আর পথের কষ্ট সব ভুলে যায়। যেন মানুষের একাগ্রতা ও ধৈর্যের পরীক্ষা নেবার জন্যই পথের ছলনা।

আমারও ঠিক তাই হ'ল। নীচের ঐ দুর্গন্ধময় অন্ধকার উঠোন, জীর্ণ নড়বড়ে অন্ধকার সিঁড়ি, সব ভুলে গেলাম এদের ছিমছাম পরিষ্কার ঘরখানি দেখে। মাঝারি ঘর। এক পাশে শোবার খাট, তার উপর পরিষ্কার ধবধবে বিছানা। অন্য পাশে তিন চারখানি সোফা ও তার সঙ্গে মিল রেখে গোল একটা টেবিল। তার উপর ফুলদানি। তা'তে টাট্‌কা সুগন্ধি নাম-না-জানা ফুলের স্তবক। দেওয়ালে দু' তিনখানা ছবি, সবই নাম করা আর্টিস্ট-এর আঁকা। ঘরের মধ্যে কাঠের ফ্রেমে ফিকে সবুজ কাপড় দিয়ে একটা মুভেবল্ পার্টিশন। দরকার হলে গুটিয়ে এক পাশে রাখা যায়। সব মিলিয়ে মনে হল, এদের দারিদ্র্য আছে, দৈন্য নেই। রুচি আছে, সচ্ছলতা নেই। কেমন একটা সম্ভ্রম মাখানো বিস্ময়ে সব ভুলে হাঁ করে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

চমক ভাঙলো ললিতার মার কথায়। 'আমাদের এই জোড়াতালি দিয়ে দারিদ্র্য ঢাকবার চেষ্টা দেখে মনে মনে হাসছ ধীরাজ?'

হেসে জবাব দিলাম---'না। বরং শিখে নিচ্ছিলাম পরিচ্ছন্নতা ও রুচি দিয়ে কি ক'রে দারিদ্র্য ও দৈন্যকে হার মানাতে হয়।'

বোধ হয় খুশী হলেন ললিতার মা। আমাকে ও'র পাশে এসে বসতে বললেন। দুজনে সোফায় বসলাম। ললিতা তখনও দাঁড়িয়ে কুকুরটাকে আদর করছে।

মিসেস বার্ড এবার একটু রেগেই বললেন---'বনি! এখনও দাঁড়িয়ে লোলাকে আদর করছ? যাও---বাথ রুম থেকে মুখ হাত ধুয়ে কাপড় চোপড় বদলে এস।'

কুকুরটাকে ছেড়ে দিতেই সে পশ্চিম দিকের অন্ধকার বারান্দায় ছুটে গেল, ললিতাও তার পিছনে পিছনে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ দু'জনেই চুপচাপ। আমিই শুরু করলাম---'দেখুন মিসেস্ বার্ড, আপনি তো চমৎকার বাঙলা বলতে পারেন, কিন্তু ললিতা---'

বাধা দিয়ে ললিতার মা বললেন---'ভাল বলতে পারে না। অবাক হবারই কথা, তোমার কাছে বলতে বাধা নেই, আমি বাঙালী ক্রিশ্চান। আমার স্বামী ছিলেন আইরিশম্যান, ই আই আর-এ গার্ডের কাজ করতেন। বনিকে আমরা ইচ্ছে করেই বাঙলা শেখাইনি। কারণ, আমাদের এই অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সমাজের কোনো অভিজ্ঞতা যদি তোমার থাকতো, তাহলে বুঝতে পারতে এ সমাজে বাঙলা বলা বা বোঝা একটা অপরাধ।'

বিস্মিত হয়ে ললিতার মায়ের মুখের

দিকে চাইতেই তিনি বললেন—'হ্যাঁ অপরাধ। যদি কেউ জানতে পারে, আমি ভাল বাঙলা বলতে পারি বা বুঝতে পারি, তাহলে সমাজের চোখে আমি অনেকখানি নেমে গেলাম এবং ছুতোয় নাতায় সবাই আমাদের এড়িয়ে চলবে। এ সমাজে রংএর কোনো দামই নেই। আবলুস কাঠের মত রং-ও যদি তোমার হয়, আর বুলি যদি ইংরেজী হয়, ব্যস্ সাত খুন মাপ। এই দেখ না, আমাকে দেখেই বুঝতে পারবে আমি বেশ কালো। কিন্তু বনি? বনি পেয়েছে ওর বাপের রং।'

হঠাৎ কথা বন্ধ করে ললিতার মা পুব দিকের দেওয়ালে আলোর ব্র্যাকেটের নীচে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন। ও'র দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখি ঠিক আলোর নীচে ছোট একখানা বাঁধানো ফটো টাঙানো রয়েছে। অনুমানে বুঝলাম উনিই মিঃ বার্ড, বনির বাবা।

চুপ করে রইলাম। ভাবলাম এই অপ্রীতিকর প্রসংগটা বদলানো দরকার। বললাম—'আচ্ছা মিসেস বার্ড, সিঁড়িটায় কোনও আলো নেই কেন? ও-রকম অন্ধকার তার উপর সিঁড়িটা তো মোটেই নিরাপদ নয়। বাড়িওয়ালাকে আপনারা বলেন না কেন?'

ললিতার মা বললেন—'বাড়িওয়ালার কোনো দোষ নেই। এই বাড়িটায় খুব কম করে দেড়শোটি পরিবার বাস করে। কারও সংগে কারও ঘনিষ্ঠতা দূরে থাক ভাল পরিচয়ও নেই। সারা দিন রাত কে কখন আসে, কে কখন বেরিয়ে যায় ঠিক নেই। প্রথম প্রথম বাড়িওয়ালা আলো দিয়ে ছিল। সকালে দেখা গেল বাল্‌ব নেই। এই রকম পাঁচ-সাতবার বাল্‌ব চুরি যাবার পর আর আলো দেয় না।'

হঠাৎ মাথার উপর হুড়মুড় শব্দ। মনে হল সমস্ত ছাদটা এখনি ভেঙে মাথায় পড়বে। ঘরের মধ্যে দেওয়ালের ছবিগুলো কেঁপে দুলতে লাগল। ভয়ে ও উত্তেজনায় উঠে দাঁড়ালাম।

অভয় দিয়ে ললিতার মা বললেন—'বোস ধীরাজ! উপরের ঘরে পেগি আর মেরি দু'বোনে নাচতে শুরু করেছে। কান পেতে শুনলাম, তাই বটে। একটা গ্রামোফোনে নাচের রেকর্ড বাজছে, বীভৎস তার আওয়াজ আর তারই তালে নাচের নামে দুরমুশ করছে উপরের ছাতটা পেগি আর মেরি দুই বোন। অদ্ভুত অস্বস্তিকর পরিবেশ। এর আগে এ রকম আবহাওয়ায় আর কোনও দিন পড়িনি।

পশ্চিমের বারান্দার ডান দিক থেকে বনি ডাকলে—'মামি! মামি!!'

ললিতার মা উঠে গিয়ে বারান্দায় উঁকি দিয়ে এসে কাঠের সেই মুভেবল্ পার্টিশনটা দিয়ে ঘরের খানিকটা জায়গা আড়াল করে দিলেন। বুঝলাম বনির বেশ পরিবর্তন হবে। অন্য দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকে—একটা ইংরেজী গানের দু' লাইন গুন্ গুন্ করে গাইতে গাইতে পার্টিশনের আড়ালে প্রসাধন শুরু করল বনি।

চুপ করে বসে আছি। কানে আসছে শুধু বনির গুন্ গুন্ গুঞ্জন আর উপরে মুগুর দিয়ে ছাত পেটানোর আওয়াজ। হঠাৎ শুনি গান থেমে গেছে। পার্টিশনের আড়াল থেকে বনির ন্যাকা কান্নার আওয়াজ ভেসে এল—'মামি! উই আর হাঙ্‌রী মামি!'

ক্ষুধা তৃষ্ণা একরকম ভুলেই গিয়েছিলাম। হঠাৎ অনুভব করলাম আমারও খুব ক্ষিধে পেয়েছে। কোনও কথা না বলে ললিতার মা উঠে পশ্চিমের বারান্দার বাঁদিকে চলে গেলেন। বুঝলাম ঐ বারান্দার ডান দিকে হল বাথরুম আর বাঁ দিকে কিচেন।

পার্টিশনের দিকে চোখ পড়তেই দেখি অপরূপ সাজে বেরিয়ে আসছে ললিতা। পরনে গোলাপী রংএর ফিনফিনে পাতলা সিল্কের ঢিলে পাজামা, গায়ে ততোধিক পাতলা শুধু একটা নক্সা কাটা কিমোনো। পায়ে বেডরুম শ্লিপার, মাথায় এক রাশ রুক্ষ চুল ফাঁপানো ফোলা। ললিতা কাছে এসে দাঁড়াতেই একটা ইভনিং ইন প্যারীর মিঠে গন্ধে ঘরটা মশগুল হয়ে উঠল।

হতবাক হয়ে এক দৃষ্টে চেয়ে আছি। হাসি মুখে কিছুক্ষণ আমার দিকে চেয়ে ঝুপ করে আমার সোফাটার হাতলের উপর বসে পড়ল ললিতা। তারপর চক্ষের নিমেষে আমার গলা জড়িয়ে ধরে মুখের পাশে মুখ রেখে গদগদ কণ্ঠে বললে—'নাউ মাই ডারলিং! মামির সংগে কি কি কথা হল বল।'

গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে আমার। সোফাটার এক পাশে জড়োসড়ো হয়ে কুঁকড়ে বসে পাংশু মুখে পশ্চিমের বারান্দার বাঁ দিকে চাইতে লাগলাম—যদি

দয়া করে ললিতার মা খাবার নিয়ে এখুনি এসে পড়েন ত বেঁচে যাই। কিন্তু এলেন না। জবাব না পেয়ে কপট অভিমানে মুখটা আমার বুকের উপর রেখে আরও নিবিড় আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরে ললিতা বললে—'এত সাজগোজ করে এলাম তোমার জন্যে আর তুমি একবারটিও বললে না কেমন দেখাচ্ছে আমাকে!'

বুকের ভিতরটায় হাতুড়ি পিটছিল। অতি কষ্টে বললাম—'ভালো!'

মোটেই খুশী হল না ললিতা। মুখ তুলে তেমনি অভিমানক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললে—মোটেই না। কী রকম হিরো তুমি? অন্য দেশ হলে হিরোইনকে এভাবে নির্জনে পেলে হিরো বুকে জড়িয়ে নাচতে শুরু করে দিত।'

সাহস খানিকটা ফিরে এসেছিল। বললাম—'তুমি হলে বিশ্বের নায়িকা, আর আমি? ছোট্ট পিছিয়ে পড়া বাঙলা দেশের মুখ চোরা লাজুক হিরো। ফাতটা অনেকখানি কিনা—কাটিয়ে উঠতে সময় নেবে।'

পরম কৌতুকে হেসে উঠল ললিতা। তারপর বললে—'মাই ডারলিং! এত ভাল ভাল কথা বলতে পার অথচ কাজের বেলায় খালি পিছিয়ে পড়। ইউ আর হোপলেস্!'

জড়সড় ভাবটা ততক্ষণে কেটে আসছে। হেসে বললাম—'ধর সবে আমাদের লভ সিনটা জমে উঠেছে এমন সময় তোমার মামি খাবার নিয়ে ঢুকলেন তখন?'

বেশ একটু জোর দিয়েই ললিতা বললে—'মোটেই না। মামি এতক্ষণ কিচেনে বেতের চেয়ারটায় বিয়ারের বোতল খুলে বসেছে। এটা মামির বিয়ার খাওয়ার সময়। এখন ভূমিকম্প হলেও নট হ্যাফ্ এন্ আওয়ার এদিকে আসবে না।'

ভাবলাম ললিতাকে জিজ্ঞাসা করি—যা ত বলছ তেমন সচ্ছল নয়। অথচ মামির বিয়ার, তোমার রং বেরঙের এসব আসে কোত্থেকে? লজ্জা ও এসে বাধা দিল।

ললিতা বললে—'অনেস্টলি ধীরাজ, বলতো এর আগে আর কোনও মেয়ের প্রেমে পড়েছ?'

প্রথমটা চমকে উঠলাম। সামনে গিয়ে একটু চুপ করে থেকে আস্তে আস্তে জবাব দিলাম—'না।'

—'দ্যাটস্ হোয়াই! তাই তুমি অত শাই। আমি বাজি রেখে বলতে পারি সাতদিন যদি তুমি আমার সঙ্গে মেলামেশা কর, আমি তোমায় স্মার্ট ড্যাশিং হিরো বানিয়ে দেবো।'

অবাক হয়ে ভাবছিলাম এই কি সেই লজ্জানতা স্বরূপ বাক গিরিবালা? হাত বাড়ালেই যে মেয়ে ছুটে এসে বাহু বন্ধনে ধরা দেয় তাকে নিয়ে আর যাই চলুক প্রেম করা চলে না। ললিতা সম্বন্ধে যে মিষ্টি মধুর রোমান্সের জাল এতদিন যত্ন করে বুনে চলে ছিলাম আজ হঠাৎ দমকা হাওয়ায় তার অনেকখানি উড়িয়ে নিয়ে গেল। সত্যি কথা বলতে কি এই গায়ে পড়া প্রেম, এর জন্য প্রস্তুতও যেমন ছিলাম না ভালও তেমনি লাগছিল না।

বাইরের বারান্দায় একটা বিশ্রী গোলমাল শোনা গেল। মেয়ে পুরুষ এক সঙ্গে চিৎকার করে কি বলছে, এক বর্ণও বোঝা গেল না। ললিতা তাড়াতাড়ি উঠে বাইরে চলে গেল। নির্বিকার তেমনি ঠায় বসে রইলাম। মনে হল আজ আমার ভয় বিস্ময় কৌতূহল কিছুই আর নেই যেন। এই রহস্যময় পুরোনো ব্যারাক বাড়িতে সব কিছুই সম্ভব।

হাসতে হাসতে ফিরে এসে এক রকম আমার গায়ের উপর পড়ল ললিতা। তারপর দু' হাত দিয়ে আমায় দু' তিনটে ঝাঁকানি দিয়ে বললে—'জান ধীরাজ, কি মজার ব্যাপার হয়েছে? দক্ষিণ দিকের কোণের ঘরটায় লিজি বলে একটা মেয়ে থাকে। সে এই ব্যারাকের টমি বলে একটা ছোঁড়ার সঙ্গে অন্ধকার বারান্দায় দাঁড়িয়ে প্রেম করছিল। এমন সময় সিঁড়ি দিয়ে চুপি চুপি উঠে এসে হঠাৎ ওদের উপর টর্চের আলো ফেলেছে ওর লাভার। অনেক দিন ধরেই সন্দেহ করছিল—হাতে নাতে ধরে ফেলেছে আজ। ব্যস আর যায় কোথা। কিল চড় ঘুষি তারপর টমির সঙ্গে শুরু হল ঘুষোঘুষি।' আবার হাসিতে ফেটে পড়লো ললিতা।

সমস্ত দেহ মন ঘেন্নায় রি-রি করে উঠল। ললিতার উচ্ছ্বাস ও হাসি তখনও থামেনি, বললে—'রাত দশটার পর হঠাৎ যদি কেউ বারান্দায় একটা আলো জ্বেলে দেয়, অন্তত টেন পেয়ার্স অব লাভার হাতে নাতে ধরা পড়ে যাবে।'

আমার কাঁধ ধরে ঝাঁকানি দিয়ে আবার সেই কুৎসিত ইঙ্গিতে ভরা গা জ্বালানো হাসি। রোমান্সের নেশা পুরোপুরি ছুটে গেছে আমার। কতক্ষণে এদের হাত থেকে, এই নোংরা আবহাওয়া থেকে মুক্তি পাব এখন তাই শুধু একমাত্র চিন্তা।

ভেজানো দরজায় খট্ খট্ করে দু'তিনটে টোকা পড়ল। আর এক নতুন বিস্ময়ের জন্য প্রস্তুত হয়ে বসলাম। তাড়াতাড়ি উঠে স্থান ভ্রষ্ট কিমোনোটা ঠিক করে নিয়ে গম্ভীরভাবে ললিতা বললে—'কাম্ ইন্।'

ঘরে ঢুকলো একটা বছর দশেকের পশ্চিমা মুসলমান ছেলে। পরনে ময়লা লুঙ্গি, গায়ে ততোধিক ময়লা ও ছেঁড়া গেঞ্জি। দেখলাম ওর হাতে রয়েছে শালপাতা দিয়ে মোড়া পুরু কয়েকখানা পরোটা।

ললিতা বললে—'কিচেনমে মামি কো পাস লে যাও।' ছেলেটিকে নীচের কোনও মুসলমান হোটেলের বয় বলেই মনে হল। মিনিটখানেক বাদেই দু'হাতে রেজকি ও পয়সা গুনতে গুনতে ঘরে এসে আমাকে ও ললিতাকে সেলাম করে চলে গেল।

এই অদ্ভুত ব্যারাকবাড়ির কথা ভাবতে ভাবতে বোধ হয় একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ দেখি ঘরের মাঝখানে অপরূপ ভঙ্গিতে নাচতে শুরু করে দিয়েছে ললিতা। ভূতলে এক পা আর স্বর্গে এক পা তুলে এক বিচিত্র অদ্ভুত নাচ। একটু কান খাড়া করে শুনি উপর তলায় পেগি মেরি বোধ হয় ক্লান্ত হয়ে নাচ থামিয়েছে, কিন্তু গ্রামোফোনটা থামায় নি। তারই ভাঙা অস্পষ্ট সুরের রেশ টেনে স্বর্গ-মর্ত তোলপাড় করে নাচছে ললিতা। হাসি পাচ্ছিল, অতি কষ্টে সামলে নিয়ে ভাল লাগার ভান করে চেয়ে রইলাম।

নাচ থামিয়ে হঠাৎ চিৎকার করে উঠলো ললিতা—'মামি, আই হ্যাভ্ ডান্ ইট্।' চেয়ে দেখি দু' হাতে ধরা একটা বড় ট্রের উপর কতকগুলো খাবারের ডিশ্ নিয়ে মিসেস বার্ড কখন এসে দাঁড়িয়েছেন আমার পিছনে। বড় ড্যাবড্যাবে চোখ দুটো তাঁর গর্বে ও প্রশংসায় উজ্জ্বল।

আমার দিকে ফিরে বললেন—'এই ডিফিকাল্ট্ নাচটা সত্যিই বনি শিখে ফেলেছে। কি বল?' কিছু না বুঝেই হাসি মুখে সম্মতি সূচক ঘাড় নাড়লাম।

বুঝলাম, রাত্রি আটটার পর থেকে মিসেস বার্ড একটু বেশী ভাবপ্রবণ হয়ে পড়েন। আর ললিতার নাচই যে তার একমাত্র কারণ নয়, এটা বুঝতেও দেরি হ'ল না। গর্বস্ফীত চোখে কিছুক্ষণ মেয়ের দিকে চেয়ে থেকে মিসেস বার্ড বললেন—'ভেরি গুড্ ডার্লিং। নাউ গিভ্ ইওর পুয়র মামি এ কিস্।'

ছুটে এসে ললিতা চুমোয় চুমোয় মাকে অস্থির করে তুললো। আদরের ঠেলায় খাবার শুদ্ধ ট্রেটা মাটিতে পড়ে আর কি! কোনও রকমে সামলে নিয়ে মিসেস বার্ড বললেন—'নাউ চিলড্রেন, হিয়ার ইজ্ ডিনার।'

দু'জনে মিলে গোল টেবিলটার উপর খাবারগুলো তিনটে প্লেটে সাজিয়ে দিলে। সত্যিই ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছিল। আর দ্বিরুক্তি না করে সবাই খেতে বসে গেলাম। প্রায় এক পোয়া ওজনের ঘিয়ে জবজবে মোটা পরোটা একখানা করে, অন্য প্লেটে মুরগমসাল্লাম আর ছোট একটা চিনেমাটির বাটিতে খানিকটা ক'রে সাদা পুডিং। এই অদ্ভুত বাড়িটায় এতক্ষণ বাদে সত্যিকার আনন্দ পেলাম খেয়ে—একথা স্বীকার না করলে সত্যের অপলাপ করা হবে। মুরগির এ রকম প্রিপারেশন এর আগে খাইনি। শুনলাম, এক পরোটা ছাড়া মাংস ও পুডিং ললিতার মা নিজে তৈরি করেছেন। বাংলায় ও ইংরেজীতে প্রশংসার যতগুলো ভালো ভালো কথা মনে এল সব উজাড় করে দিলাম। ফলে লাভ এই হ'ল, ললিতার মাকে কথা দিতে হ'ল যে,

সপ্তাহে অন্তত একদিন ও'দের এখানে এসে খেয়ে যেতে হবে।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হতেই রাত ন'টা বেজে গেল। বাড়ি ফেরার জন্যে উসখুস করতে থাকি কিন্তু ওরা কিছুতেই উঠতে দেবে না। নানা ব্যক্তিগত প্রশ্ন। যথা—বাড়িতে কে কে আছেন, অবস্থা কেমন, ভাই বোন ক'টি ইত্যাদি ইত্যাদি। এতেও নিস্তার নেই। ললিতা মায়ের সামনেই স্পষ্ট বলে ফেললে—'বাড়িতে না আছে বউ, না আছে লাভার, অত তাড়া কিসের?'

অগত্যা অনিচ্ছাসত্ত্বেও আরো খানিকটা বসতে হল।

অবশেষে সত্যিই বিদায় নিয়ে, আবার আসবার এবং পরবর্তী ছবিতে যাতে ললিতাকে হিরোইন নেওয়া হয় তার জন্য গাঙ্গুলী মশাই, নরেশদা এবং মধু বোসকে বিশেষ করে অনুরোধ করবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ঘর থেকে যখন বার হ'লাম তখন দশটা বাজে। এদের এতখানি আদর আপ্যায়নের অর্থ খানিকটা পরিষ্কার হয়ে গেল।

বারান্দায় এসে থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম। ঘুটঘুটে আঁধার। এক হাত কাছের মানুষ দেখা যায় না। বিশেষ করে এতক্ষণ আলোর সামনে থেকে হঠাৎ অন্ধকারে যেন দিশেহারা হয়ে গেলাম। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে ভাবছি, টর্চ হাতে ললিতা ঘর থেকে বেরিয়ে এল। খানিকটা আশ্বস্ত হলাম। কাছে এসে চট্ করে টর্চটা নিবিয়ে দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে গদগদ কণ্ঠে ললিতা বললে—'মাই ডার্লিং ধীরাজ! হাউ আই লাভ্ ইউ!'

চোখের নিমেষে ঘটে গেল ব্যাপারটা। পায়ের নখ থেকে চুলের ডগা পর্যন্ত ঝিন্ ঝিন্ করে উঠল আমার। মুহূর্তের জন্য বাস্তব জগৎ ছেড়ে চলে গেলাম ছায়াছবির রঙিন্ স্বপ্নলোকে। মনে হ'ল, আমি যেন পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়া রাজপুত্র, সাত সমুদ্দুর তের নদী পার হয়ে ছুটে এসেছি রাজকন্যা ময়নামতীর কাছে—রাজকন্যা পরিয়ে দিচ্ছে আমার গলায় জয়মাল্য।

হঠাৎ স্বপ্ন ভেঙে গেল। কাছে বোধ হয় দু' হাত তফাতে একটা গম্ভীর ক্রুদ্ধ কণ্ঠ গর্জন করে উঠল—'বনি!'

সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা উগ্র মদের গন্ধ নাকে এসে ঢুকল।

অন্ধকারে দেখতে না পেলেও বেশ বুঝতে পারলাম, ভয়ে ললিতার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি আমায় ছেড়ে দিয়ে জোর করে সহজ হবার চেষ্টা করে ললিতা। অন্ধকারে এক পা সামনে এগিয়ে গিয়ে বলে—'জিমি? বাট ইউ টোল্ড মি, ইউ আর অন্ নাইট ডিউটি? লেট্ মি ইনট্রোডিউস্ ফার্স্ট—'

—'শাট্ আপ্ ইউ ডারটি বীচ্!' অন্ধকারে হুঙ্কার ছাড়ে হেঁড়ে গলা।

—'বাট লেট্ মি একস্‌প্লেইন জিমি!' করুণভাবে বলবার চেষ্টা করে ললিতা, পারে না, বাধা পায়।

আমার অবস্থা তখন লিখে বোঝানো অসম্ভব। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে শুধু ঘামতে লাগলাম। ওদের কলহের শেষ পরিণতি কি হবে ঠিক বুঝতে না পারলেও এটা পরিষ্কার বুঝতে পারলাম যে, আজ এই রোহিণী-গোবিন্দলালের কলহে অংশ গ্রহণ না করেও আর কিছুক্ষণ যদি এখানে এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকি, তাহলে বাংলা দেশের শিশু ফিল্মশিল্পের সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা; কেননা অকালে বাংলার একটি উদীয়মান তরুণ সুদর্শন নায়কের হঠাৎ তিরোধানের ক্ষতি তখনকার দিনে সহসা পূরণ হওয়ার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। সুতরাং—

ঐ অন্ধকার নড়বড়ে সিঁড়ি থেকে যে কোনও মুহূর্তে পড়ে হাত পা ভাঙার নিশ্চিত সম্ভাবনাকে তুচ্ছ করে এক পা দু পা করে পেছু হটতে শুরু করলাম।

উপরে তখন হেঁড়ে গলা পঞ্চমে উঠেছে—'একস্‌প্লেন? একস্‌প্লেন হোয়াট্? দ্যাট ইউ ওয়েয়ার রিহার্সিং এ লভ্ সিন ফর্ ইওর রট্‌ন্ সিনেমা?'

সঙ্গে আর যে সব স্ল্যাং বিশেষণগুলো দিচ্ছিল সেগুলো সেদিন ওদের মুখে না আটকালেও আজ আমার কলমে আটকাচ্ছে। তাই ইচ্ছে করেই সেগুলো বাদ দিলাম। উপরে তাকিয়ে দেখলাম, আশে পাশের ঘর থেকে অনেক স্ত্রী পুরুষ ওদের চার পাশে ভিড় করে দাঁড়িয়ে মজা দেখছে।

ললিতা বোধ হয় কি একটা বোঝাবার চেষ্টা করছিল শুনতে পেলাম না। শুধু শুনলাম একটি চড়ের আওয়াজ, সেই সঙ্গে ললিতার আর্তনাদ—'জিমি, হাউ ডেয়ার ইউ!'

ততক্ষণে ঐ মারাত্মক সিঁড়ির শেষ ধাপে পৌঁছে গেছি আর আমায় পায় কে। অন্ধকার উঠোনের মধ্যে হোঁচট্ খেতে খেতে ছুটলাম বাইরের দরজার দিকে। উপর থেকে তেড়ে এল শুধু হেঁড়ে গলার কয়েকটা বিক্ষিপ্ত কথার টুকরো।—'ইউ ডবল ক্রসিং হোর, জাস্ট লাইক ইওর ওল্ড হ্যাগ্ মামি!' সঙ্গে ললিতার চিৎকার। আর কিছু শুনতে পেলাম না, শোনবার প্রবৃত্তিও ছিল না। দম বন্ধ করে ছুটে এসে দাঁড়ালাম 'অ্যালবিয়ন থিয়েটারের' সামনে (অধুনা 'রিগ্যাল সিনেমা')। সর্বাঙ্গ থর থর করে কাঁপছিল। চেষ্টা করেও কিছুক্ষণ সে কাঁপুনি থামাতে পারলাম না। পকেট থেকে রুমাল বার করে কপালের ঘাম মুছতে লাগলাম। ন'টার শো অনেকক্ষণ শুরু হয়ে গিয়েছে, সামনে বিশেষ লোকজন ছিল না, বেঁচে গেলাম। খানিকক্ষণ বাদে পাশের একটা পানের দোকান থেকে পান খেয়ে একটা সিগারেট ধরালাম, তারপর ট্রাম ধরবার জন্য বাঁ দিকের ফুটপাথ ধরে আস্তে আস্তে চলতে শুরু করলাম।

(ক্রমশ)

॥ ১৩ ॥

সামান্য জ্বর জ্বর ভাবটা কাটল। যন্ত্রণাও কম। ক'দিন একটানা বিছানায় শুয়ে শুয়ে আর ভাল লাগছিল না। শিরদাঁড়া যেন অসাড় অবশ হয়ে গিয়েছে। সকাল থেকেই সে-দিন বালিশে হেলান দিয়ে বসে বসে অনেকক্ষণ কাটিয়েছে বাসনা। দুপুরের দিকে আর বসে থাকতেও ইচ্ছে হচ্ছিল না। একটু উঠে দাঁড়াতে, চলাফেরা করতে কী যে ভীষণ ইচ্ছে হচ্ছিল তার। তবু সাহস পাচ্ছিল না। ভয় হচ্ছিল। কে জানে আবার যদি কিছু হয়ে যায়!

শেষে নার্সকেই মনের ইচ্ছেটা বলে ফেলল বাসনা। গলার সুরে ছেলে-মানুষের মতন খানিক মিনতি, একটু-বা আব্দারও। 'বেশ তো।' সুনীতি—নার্স সুনীতি চল্লিশ বছরের ভরাট গোলগাল মুখের আনাচে কানাচে হাসি ছড়িয়ে বললে, 'জানলাটার কাছে গিয়ে বসুন একটু। টুলটা আমি এগিয়ে দিচ্ছি।'

বিছানা ছেড়ে পায়ে ভর দিয়ে উঠতেই কেমন যে হাল্কা লাগল বাসনার। মনেই হচ্ছিল না ওর শরীর বলে কিছু আছে। কোনোরকম ভার, হাঁটার শক্তি বা পা-ফেলার জোর। অবশ্য এরকমটা মনে হয়েছিল কয়েক মুহূর্তের জন্যে। সুনীতি হাত বাড়াতেই কিন্তু বাসনা প্রথমটায় একটু ধরি-কি-না-ধরি করে নিজে নিজে হেঁটে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। না, কোনো কষ্ট হল না। দাঁড়িয়ে মুখ ফিরিয়ে তাকাল বাসনা সুনীতির দিকে। একটু হাসল ঠোঁট ভিজিয়ে।

'কেমন যেন লাগে, না!' বাসনা বললে নিজের থেকেই, 'বিছানায় শুয়ে শুয়ে এমন অভ্যেস হয়ে যায়, দাঁড়ালেই মনে হয়, পড়ে যাবো। হাঁটতেই জোর আসে না পায়ে।'

'তবু তো মাত্র ক'দিন শুয়ে রয়েছেন।' সুনীতি জবাব দিল, 'অপারেশানের পর কিন্তু বেশ কিছুদিন শুয়ে থাকতে হবে।'

হাসিটুকু নিভে গেল। সুনীতির দিকে চেয়ে চেয়ে সময় কাটল একটু।

'কবে হবে অপারেশান?' বাসনা জিজ্ঞেস করল, খুব মৃদু গলায়, ভয়ে ভয়ে।

'ঠিক জানি না। তবে শীঘ্রই, দিন আট দশের মধ্যে বোধ হয়, জ্বর যখন ছেড়েই গেছে।'

সুনীতির মুখ থেকে চোখ তুলে জানলা দিয়ে তাকিয়েছিল বাসনা কথা-গুলো শুনতে শুনতে। খুব অস্পষ্ট কালো কালো একটা ছবি যেন মনে ভেসে উঠছিল। সেই মুখটা মনে পড়ছিল, ফরসা গাল-গলা ফোলা জ্বল জ্বলে চোখ বয়স্ক ডাক্তারটির। উনিই ডাঃ ব্যানার্জি। বাসনাকে দেখেছেন। এখনও দেখছেন। কাটাকুটিও করবেন নিশ্চয়।

বুকের ওপর থেকে লাফ দিয়ে এক মুঠো ভয় যেন গলার কণ্ঠার কাছে এসে বিঁধেছে।

কী ভাবল বাসনা। মুখ ফিরিয়ে বললে, 'খুব কষ্ট হয়, না—?'

'কষ্ট! না, তেমন কষ্ট আর কী—' সুনীতি সাহস যোগাবার চেষ্টা করলে, 'সামান্য কষ্টটষ্ট সহ্য করতে হয়ই। তা এ আর কিসে না হয় বলুন। একটা ফোড়া হলেও কি তার টনটনানি যন্ত্রণা কিছু কম।'

আর কোনো কথা বললে না বাসনা। জানলার কিনারা ধরে দাঁড়িয়ে থাকল। বাইরে তাকিয়ে।

সুনীতি চলে গেল।

এখন শেষ দুপুর। রোদের কমলা রঙ আজ সামনের গাছ রাস্তা ফুলবাগান ভিজিয়ে রেখেছে। ছায়া বাড়ছে দালানটার গায়ে গা দিয়ে। খানিকটা রোদ জানলায়। বাসনার গায়ের একটা পাশেও।

বাসনা দেখছিল। কাঁকরের রাস্তা দিয়ে একটা দুটো গাড়ি যাচ্ছে আসছে। দু'দশজন লোক। কয়েকটি ছেলে। একটি দুটি নার্স। মেথর ধাঙড় জামাদার গোছের কেউ কেউ, তাদের বউটউও। আঁচল ধরে ধরে কী বুকে মুখ দিয়ে ওদের বাচ্চা।

মোরগফুলের ঝুঁটি দোল খাচ্ছে হাওয়ায়। কাক চড়ুই ডাকছে। বেশ চুপ-চাপ, শান্ত শান্ত লাগে এই দুপুরে, হাসপাতালের এ-পাশটা। কোথা থেকে এক নীলকণ্ঠ পাখি উড়ে এসেছে। উড়ছিল এখান ওখান। বাসনার চোখে পড়ল। ব্লকের এ রেলিং থেকে অন্য রেলিংয়ে উড়ে গেল। তারপর ফরফর ডানা এলিয়ে বাতাসে। আকাশে।

আকাশটা কী নীল। রোদ টসটসে। তুলোট মেঘের কল্কা বুনেছে যেন জমিতে।

হঠাৎ আকাশ থেকে চোখটা মাটিতেই নেমে এল। আট দশজন লোক চলেছে। কাঁধে মড়া বয়ে। কিছু ফুল চোখে পড়ছে। একটা চাদরও যেন। মুখ নয়।

বুকটা ছ্যাঁক্ করে ওঠে বাসনার।

কাঁকরের রাস্তা বয়ে দলটা মিলিয়ে যেতে খানিকটা তবু স্বস্তি পায় বাসনা।

হ্যাঁ, বিশ্রীই লেগেছে তার। মনটা আরও মুষড়ে পড়ল দৃশ্যটা দেখার পর।

আট দশ দিন পর, বাসনা ভাবছিল, তার শরীরটাই বা অগ্রহায়ণের এমন ঠাস দুপুরে, একটু শীত শীত হাওয়ায়, মোরগফুলের ঝুঁটির পাশ দিয়ে অসাড়ে চলে না-যাবে এমন নয়। যেতে পারে। যাওয়া আশ্চর্যের নয়।

টুলটার ওপর আস্তে আস্তে বসে পড়ল বাসনা। বসে বার কয়েক গুণে গুণে নিশ্বাস নিল। যেন হিসেব করছিল, তার জীবনের এখনও কতো বাকি, সে-জোর নিশ্বাস প্রশ্বাসে আছে কিনা।

আর ভাবছিল, এই ভয়, মৃত্যুভয়—শরীরের ভয়, যন্ত্রণা-সহ্যের উদ্বিগ্নতা-দুশ্চিন্তা তার কাছে যেন একেবারেই নতুন। আগে ছিল না। যদিও থেকে থাকে, তা অন্তত এমন করে তাকে আকুল-ব্যাকুল করে নি, করতে পারে নি। বরং কষ্ট কী দুঃখ কী মৃত্যুর মধ্যে যে নির্যাতন নিগ্রহ এবং বিরাট নিঃস্বতা

আছে তা যেন মনেই আসত না। তখন ভাবত, মরে যদি যাই যাবো। কষ্ট যদি হয় হবে, সইবো।

কী সুখেই আমি আছি যে বাঁচবার জন্যে ডাক্তার ওষুধ শরীর শরীর করবো— তখন বলত বাসনা, আড়ালে পরিমলের ছবির কাছে দাঁড়িয়ে মনে মনে। হ্যাঁ বলত, কমলারা যদি শরীরের কথা তুলত। এবং ভাবত, বেশ স্বচ্ছ ভাবেই ভাবতে পারত অন্তত যে, আমার কাছে মৃত্যু কিছু নয়, কিছু না—এর কোনো শূন্যতা আমায় স্পর্শ করতে পারবে না। বরং যদি যাই, মরে যাই—আমার পথ আর তাঁর পথ এক হয়ে যাবে। হয়ত আমি পেঁছতে পারব তাঁর কাছে।

সত্যি কীই বা তখন গ্রাহ্য করেছে বাসনা। শরীর স্বাস্থ্য কষ্ট যন্ত্রণা কিছু না।

আর আজ, কী আশ্চর্য, নিজের ওপরই কেমন এক মায়া পড়ে গেছে। অগাধ দুর্বলতা। নয়তো, বিছানা ছেড়ে দু-পা হেঁটে জানলায় এসে দাঁড়াবে তাই কতো ভাবছিল, সাহস পাচ্ছিল না, সুনীতির কাছে ফলাফলটা জেনে নিয়ে তবে উঠেছে পা-ভর দিয়ে।

আজকাল আমি ভয় পাচ্ছি! বাসনা যা ভাবছিল তা গুছিয়ে সাজালে প্রায় এ-রকম দাঁড়ায় ঃ আমি খুবই মুষড়ে পড়ছি যখন ভাবছি আমি আর থাকবো না। এখন এই-ই আমার বেশ লাগছে। ভালোই লাগছে। নিজেকে এবং আমার এই জীবনকে নতুন করে দেখছি আমি। আমার জন্যে অনেক সুখ আছে, অনেক আনন্দ।

এ কষ্ট আর ক'দিন। আমি সেরে উঠবো। তারপর কতো অসংখ্য দিন আর মাস আর বছর পড়ে রয়েছে। পুরো জীবনটাই আমাদের। আমার আর অমলেন্দুর। আমাদের ঘর-সংসার, কাজ-অকাজ, রান্নাবান্না, ঘরগুছনো বিছানা সাজানো, বেড়ান, গল্প, হাসি, ঘুম। আরও কতো! ছেলেপুলে। সেই সুখের সুন্দর কষ্ট। তারপর কোল জোড়া হয়ে ঘর-বারান্দা। ছেলে মানুষ করা। দুধ খাওয়ানো, ঘুম পাড়ানো। কথা ফুটলে ডাক শেখানো, তারপর ছড়া, অ-আ।

এ-সব স্বপ্ন আমার কবেই ফুরিয়েছিল। আবার এসেছে। এখন আর স্বপ্নই বা বলি কেন। যা হয়, হচ্ছে সকলের, হবেই, তারই সোজা-মাটা কথা, হিসেব। এমন হিসেবে কমলার জীবন চলছে, বেলা, মীরা, আরতিদির। বীথির বিয়ে হলে তারও। সকলেরই, সব মেয়েমানুষেরই, আমারও চলবে।

সেই হিসেবের সুখ আমি এখন বুঝি। স্বাদ পাই নি, কিন্তু স্বাদ যে আছে তা জেনেছি। নিজেকে এখন আমি ভালোই বাসছি। আমার সত্তায় এখন মিশে আছে একটি উজ্জ্বল মুখর জীবনের কুঁড়ি। এবার ফুটবে। একটি দল মুখ খুলেছে শুধু। আস্তে আস্তে নিজেকে ছড়িয়ে-বাড়িয়ে-সাজিয়ে তবেই তার সবটুকু শোভা ফুটবে।

এর জন্যে সময় চাই। একদিন দুদিন নয়। দু'পাঁচ মাস কী দু'এক বছরও না। অনেক, অনেক সময়।

বসে থাকতে আর ভাল লাগছিল না। এর মধ্যেই ক্লান্তিতে মাথাটা ঝিমঝিম করছিল। গা হাত অবশ অবশ। টুল ছেড়ে আস্তে আস্তে উঠল বাসনা। সাবধানে দু পা এগিয়ে লোহার খাটের মাথাটা ধরে ফেলল।

পাশ ফিরে শুয়েই পড়ল বাসনা। চোখ আড়াল করে। বালিশে মুখ গুঁজে চুপ করে শুয়েই থাকল। হয়তো ঘুমোবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু ঘুম আসছিল না। বরং কান্না আসছিল। অন্য রকম এক কষ্ট হচ্ছিল বুকে। আর নিজেকে এখন এতো অসহায় লাগছিল বাসনার, যেন একটা ঝরা পাতা হাওয়ায় উড়ছে। ঠিক ঠিকানা নেই।

বীথিই এল। তখনও হাসপাতালের ঘণ্টা পড়েনি। না পড়ুক। এটা কেবিন। একজন কেউ আমরা থাকতেই পারি চব্বিশ ঘণ্টা ইচ্ছে করলে। সে-সব বলা কওয়া আছে। কিন্তু তুমি এতো কি ভাবছিলে, ছোড়দি? আমি অন্তত মিনিট পাঁচেক হলো তোমার মাথার কাছে এসে দাঁড়িয়ে রয়েছি।

টুলে নয়, বাসনার বিছানাতেই কিনারা ঘেঁষে বসল বীথি। টুলটার ওপর বইখাতা নামিয়ে রাখল।

'তুই কি সটান কলেজ থেকেই আসছিস আজ?' বাসনা আঁচলে চোখ মুখ মুছে নিয়ে একটু অবাক গলায় বললে।

'না। কলেজ গিয়েই আজ ছুটি পেয়ে গেলাম। দল বেঁধে গিয়েছিলাম আমাদের এক বন্ধুর বাড়ি। কাল তার বিয়ে হয়েছে। সেখান থেকে আসছি।' বীথি বেণী দুলিয়ে মাথা নেড়ে নেড়ে বলছিল। হাসি হাসি মুখ।

'তোর বন্ধু। কে—? দেখিনি আমি?' বাসনা একটু উঠে বসল।

'না। খুব বন্ধু নয়। পড়তো একসঙ্গে।' বীথি একটু থামল। হঠাৎ হাসল ফিক করে, 'জানো, মেয়েটা এমন কান-কাটা—' কথাটা শুরু করে চুপ করে গেল। শুরু করলে আবার, 'এক রাত্তির কাটতে না কাটতেই একেবারে অন্য মানুষ। আমরা সব অবাক, ছোড়দি। যতক্ষণ ছিলাম শুধু বরের গল্প।'

'কেমন দেখলি বর?' বাসনাও হাসল। ভাবছিল অন্য কথা।

'তেমন কিছু নয়। রাম শ্যাম যদুর মতনই।' ঠোঁট উল্টে বীথি বললে, 'এই নিয়ে এতো আহ্লাদ করবার কি যে ছিল লাবণ্যর জানি না।'

বাসনা খানিকক্ষণ আর কিছু বললে না। ভবছিল। বীথিকে একথা বোঝান মুশকিল একটা রাত্তিরই কখনো সখনো জীবনে এমন এক একটা মোড় ঘুরিয়ে দেয়, যার পর আর মনেই হয় না, পিছনে আমার পথ ছিল আরও, সে-পথ আমি হেঁটে এসেছি।

মনমরা ভাবটা এই সব হাল্কা কথায় কাটছিল। আবার না চেপে বসে তাই তাড়াতাড়ি বাসনা যা ভাবছিল, ভাবতে শুরু করেছিল এলোমেলো করে চড়িয়ে দিয়ে অন্য কথা পাড়ল।

'পরের বিয়ে দেখে দেখে আর কতদিন কাটাবি। নিজেই একটা করে ফেল।' বাসনা হাসল।

'ঠিক বলেছ।' বীথিও জবাব দিচ্ছিল, 'তোমরা তো আর খুঁজেটুজে দিলে না, নিজেই একটা পাত্র জুটিয়ে নি এবার।' কথাটা শেষ করে শব্দ করেই হাসল বীথি। হেসে সরাসরি বাসনার দিকে তাকিয়ে থাকল।

বাসনার হঠাৎ মনে হলো, কথাটা যেন তাকে ঠেস দিয়েই বললে বীথি। অস্বস্তি আর কেমন যেন কুণ্ঠায় অপ্রস্তুত মুখে তাকিয়ে থাকল বাসনা। বিশ্রী লাগছিল।

মুখ ফিরিয়ে বাসনা বোকার মতন কী যে আজে বাজে কথা ভাবল, আর যখন তার চুপ করে যাওয়াই উচিত, তখন—ঠিক তখনই অতো চড়া সুরের ওপরও আরো সুর চড়াতে গেল। বলল, বলে ফেলল আচমকাই, 'কেন, পাত্র তো আছেই ঠিক করা। অমলেন্দু।'

বীথি আর জবাব দিচ্ছিল না। বাসনা অপেক্ষা করলে। তারপর আস্তে আস্তে মুখ ফেরাল বীথিকে দেখতে।

'হাসি হাসি মুখটা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে

গেছে বীথির। কালো মুখে দাগ ফুটেছে কঠিন হয়ে। বীথির মাথা আর দুলছে না, বিনুনী নড়ছে না। গলার হারটা আঙুলে পেঁচাচ্ছিল আর তাকিয়েছিল বাসনার দিকেই স্তব্ধ চোখে।

বাসনাও চুপ। বুকটা কাঁপছে।

'একটা কথা বলবো, ছোড়দি।' বীথিই কথা বললে আচমকা।

তাকাল বাসনা। আঙুল মটকাতে মটকাতে সহজ হবার ভঙ্গি করছিল। একবার হাই তুলল।

'তুমি হয়ত বুঝতেই পার, আর আমিও জানি—' বীথি স্পষ্ট গলায় বলছিল, 'এই ঠাট্টা আমার কেন ভাল না লাগার কথা।'

'ঠাট্টা কেন, কথাটা তো ঠিকই।' বাসনা জবাবে সাধারণ একটা কথা বললে। এবং আর কিছু বলবে না ঠিক করে মুখ বুজল।

যে কথা দিয়ে আলোচনাটা শেষ করতে চাইল বাসনা, বীথি যেন সেই কথাতেই শুরু করল।

'কিছুই ঠিক নয়, ছোড়দি। অমলদার মন আমি জানি।'

'জানিস?' চমকে উঠল বাসনা। মুখটা শুকিয়ে আসছিল। ভয় হচ্ছিল এবার না বীথি মুখ ফুটে কথাটা বলেই দেয়। নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করে হাসবার ভঙ্গি করলে বাসনা, 'পাগলামি করিস না তো! তুই ওকে জিজ্ঞেস করেছিলি?'

'সব কথাই কি জিজ্ঞেস করতে হয়, ছোড়দি!' বাসনার ঠোঁটের আগায় করুণ একটু হাসি ফুটলো, 'নাকি তুমিই পারতে! পেরেছো!'

বাসনার চোখের সামনে হঠাৎ যেন একরাশ পুরু কুয়াশা ভেসে এল। বীথির মুখ আর দেখতেই পাচ্ছিল না। জল ছিটনো আয়নায় ছায়াপড়া মুখের মতন অবস্থা, অদ্ভুত। বাসনার মনও সেই কুয়াশায় ঢাকা পড়ে যাচ্ছিল। ভাবতে পারছিল না বাসনা। ভাববার আর যেন কিছুই ছিল না। বিহ্বল, বিমূঢ়। গা, পা, হাত কিছুই আর নড়ছিল না। অসাড় দেহে, হৃদপিণ্ডের মৃদু দীর্ঘ-বিরতি স্পন্দনে নিশ্চল হয়ে পড়েছিল।

হাসপাতালের ঘণ্টার শব্দে চমকে উঠে যেন নিজেকে ফিরে পেল বাসনা।

বীথিও এই নিস্তব্ধতা আর গুমোট কাটিয়ে কথা বললে, আস্তে আস্তে, 'তুমি যেন ভেবো না এর জন্যে আমার খাওয়া ঘুম বন্ধ হয়ে গিয়েছে—' হাসবার চেষ্টা করছিল ও, 'একটু হয়ত মনটা খারাপ হয়েছিল প্রথম প্রথম। এখন কিছু না। আমি জানি, এ রকম অনেক হয়। তাই ও-সব আর ভাবি না, ছোড়দি। আজ হোক, কাল হোক বিয়ে আমার হবেই। সেই নতুন ভদ্রলোককে—' এবার সত্যিই হাসল বীথি, 'আমি বেশ ভালবাসতে পারব। কোনো কিছুতেই আমার আটকাবে না। পাঁচ সংসারের মতন আমারও সংসার তখন রোদবৃষ্টি মাথায় নিয়ে থাকবে।' বীথি চুপ করল।

বাসনার বুকটা টনটন করে কান্না উপচে আসছিল। অনেক বাতাস দিয়ে সেই আবেগ চাপতে গলা ফুলে উঠল। নীল শিরাটা স্পষ্ট হল আরও।

বীথি তখন টুল থেকে বই খাতাপত্র তুলে ঘাঁটছিল। একটা পত্রিকা আর চটি মতন একটা বই এগিয়ে দিয়ে বললে, 'তোমার জন্যে এনেছি, ছোড়দি। সারাদিন একলাটি থাকো। এগুলো শেষ করো, আরও বই দিয়ে যাবো।'

বীথি চলে গিয়েছিল। তারপর কমলা এল অমলেন্দুর সঙ্গেই। সুধাময় আজ আসতে পারবে না। কালও না। কমলাও কাল আসবে না। কোথায় যেন যেতে হবে। হয় বীথি আসবে। না এলেও অমলেন্দু। তার কাছ থেকেই খোঁজ খবর জেনে নেবে কমলা।

ওরা এল। বসল। গল্প করল। এটা সেটার খোঁজ খবর নিলে। তারপর অন্ধকার ঘনিয়ে আসতে হাসপাতালের ঘণ্টা বাজল। ওরাও উঠে পড়ল।

কমলারা যখন থাকে অমলেন্দুর সঙ্গে কথাই বলতে পারে না বাসনা। একটা দুটো হ্যাঁ—না। তাও কতো সন্তর্পণে। তাকাতেও পর্যন্ত ভয় ভয়, লজ্জা করে।

তবু যাবার সময় আড়চোখে-চোখে অমলেন্দুকে অনেকবার দেখল বাসনা আজ। যেন বলছিল, এরা আসে না-আসে কষ্ট হয় না। কিন্তু তুমি এসো। নিশ্চয় এসো। তুমি কাছে থাকলে এতো ভাল লাগে, না থাকলে মনে হয় সব ফাঁকা, সমস্ত।

কমলারা চলে গেল। কেবিনের বাতি ততক্ষণে জ্বলে উঠেছে। বেশ সন্ধে হয়ে গেছে। হাসপাতালের করিডোরে পায়ের শব্দ ক্ষীণ হয়ে আসতে লাগল। সেই রোজকার মতন ছমছম নিঃশব্দ রাত্রি আসছে। কখনো দু একটা চিকণ গলার স্বর কাঁকিয়ে ওঠে। আবার চুপ। সেই গন্ধ। অ্যালকালি, অ্যাসিড আর লাইজলের বিচিত্র, কটু গন্ধ। মাঝে মাঝে বমি আসে।

অমলেন্দু আজ হাতে করে ফুল এনেছিল। মরসুমী ফুল। লাল সাদা ছিট মেশান। ছোট্ট ছোট্ট ফুল। চিকরি কাটা পাতা। ঘন বেগুনী রঙেরও কটা ফুল ছিল। কাঁচের গ্লাসে রেখে মিটকেসটার ওপর বসিয়ে দিয়ে গেছে।

এই ফুল দেখতে দেখতে এবং অমলেন্দুর কথা ভাবতে বসে বীথিকেই বার বার এখন মনে পড়ছিল বাসনার।

বীথি যেন আজ অন্য কোনো মেয়ে হয়ে এসেছিল। অন্য আর-এক রূপে বাসনা যাকে কোনোদিন দেখেনি। চিনতেও পারেনি।

আশ্চর্য এই মেয়ে, বীথি। মাত্র কুড়ি বছর বয়স কিন্তু এই বয়স তাকে বৃথা মন-ভার করে থাকতে শেখায় নি। শেখাতে পারে নি বোধ হয়। কত স্পষ্ট আর সহজ। বাসনা বাস্তবিকই অবাক হয়ে ভাবছিল, এই বীথির যে এতো সাহস, কিংবা বলো এমন অসংকোচ সাদামাটা

সরল সহজ মন—বাসনা তা ভাবতেও পারেনি।

অমলেন্দুকে যে ও ভালবাসত—এই কথাটা কী সহজ ভাবেই ও বললে। কী অক্লেশে। এতটুকু ঢোঁক গিলল না, কিন্তু-কিন্তু করলে না। সোজা-সুজি বললে মনের কথা। কোনো লুকোচুরি, চুপিচাপা নয়। ভালবেসে-ছিলাম, তারপর ওর মন বুঝলাম। বেশ একটু কষ্ট হল। কিন্তু সেই কষ্টই আমার সব নয়। এমন হয় আমি জানি। কাজেই মন মুষড়ে থাকব কেন। আমি তেমনি হাসিখুশীই আছি। আবার কেউ আসবে, যাকে বিয়ে করবো। তাকে আমি ভালবাসবো। কোথাও এতটুকু আটকাবে না, ছোড়দি। দিব্যি সুখে দুঃখে ঘর সংসার করবো।

কথাগুলো সোজা, খুবই সোজা। কোথাও কাব্য নেই, কান্না নেই, ঢাকঢুকি নেই। কানে শুনতে হয়তো ভাল লাগে না। কিন্তু বাসনা জানে, এই কটি মাত্র কথা এবং এমনই সহজ, সরল দু পাঁচটি কথাতেই একটি জীবনের অনেক কিছু বলা হয়ে যায়। তাদের মতন মেয়ের প্রায় সবই। খুব সত্যি, সাদামাটা বলেই এ কথা বলা এতো কঠিন।

কতো যে কঠিন এবং কী ভীষণ শক্ত বাসনা যত জানে, জানছে, বুঝতে পারছে, এতো আর কে?

বাসনাও যদি বলতে পারত—আমি বিধবা হয়েছিলাম, এটা নিছক আকস্মিকতা। দুর্বিপাক, দুর্ভাগ্য। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, আমি মরে গিয়েছিলাম। আমার শরীর রাতারাতি তার রক্ত মাংস স্নায়ু অনুভূতি সব, সমস্ত হারিয়ে বসেছিল। শরীরের এই সব যদি ইলেকট্রিকের তার হতো তবে কোথাও একটা সুইচ নিভোলেই সব অসাড় হয়ে যেত পলকেই। মরে যেত। কিন্তু আমার শরীর তা নয়, কোনো মানুষেরই শরীর তা নয়। পরিমল নেই বলে আমার শরীর মন নিভতে পারে না—রক্ত চলাচল বন্ধ হতে পারে না। এই শরীর খেতে চায়, ঘুমোতে চায়, কথা বলতে, ভালবাসতে, ভালবাসা পেতে এবং শরীরের ফর্দ মিলিয়ে আরও অনেক কিছু করতে। সে সব চাওয়াটাই বেঁচে থাকা। সোজা

কথায় জীবন। যদি রক্ত-মাংস-মনকে আমি সকাল দুপুর সন্ধে, শীত গ্রীষ্ম বর্ষায়, মাসে বছরে প্রতি মুহূর্তে অনুভব করতে পারি, তারা আমায় সে অনুভূতি অকৃপণের মতন দিয়েই যায়—তবে বলতে দোষ কি, আমি সাদামাটা ভাষায় বীথির মতই চাইবো—আমার শরীর এবং মনের নানারকম ইচ্ছে, ছোট বড় কামনা-বাসনা মেটাতে পারার জন্যে, আমায় পূর্ণ করতে একজন পুরুষ দরকার প্রথমত। একজন কেউ স্বামী হোক, একটি সংসার, একটি দুটি ছেলেমেয়ে এবং এ সবের মধ্যে হেসে কেঁদে ভালবেসে, ঝগড়াঝাটি করে, মান-অভিমানের পালা সাঙ্গ করে বেশ সুন্দর কেটে যাবে আমার, খুব সুখে, শান্তিতেই। তার বেশি সুখ-শান্তি আমাদের জন্যে নয়। আমি চাই না।

অমলেন্দুকে যদি সেই গোড়াগুড়িতেই বাসনা স্পষ্ট করে কথাটা বলতে পারত...!

বলতে পারত? বাসনা নিজের মধ্যে কাউকে যেন প্রশ্ন করতে শুনে চমকে উঠল।

ভয় হচ্ছিল, বিহ্বল হয়ে পড়ছিল, বিড়বিড় করে বলছিল তবু, আমি তাই চেয়েছিলাম! বোধ হয় তাই।

চাইলাম যদি তবে বলতে পারিনি কেন? খুব কি কঠিন ছিল? কিসে আমায় বাধা দিল?

আর হঠাৎ, বাসনার মনের এই বিস্তীর্ণ মাঠে এক ভীষণ দমকা হাওয়া খেলে গিয়ে কবেকার কোন জমানো পাতার ডাঁই থেকে একটা পাতা উড়ে এল যেন।

অবাক হয়ে দেখছিল বাসনা। সেই পাতা। পাতা নয়, একটি দিন। কবে কতোকাল আগে ফেলে আসা। তবু আজও কী স্পষ্ট।

মফস্বল শহর। বৃষ্টি হয়ে গেছে এক পশলা। শ্রাবণের শেষ তখন। আকাশ-মেঘ-দুপুর কালো কালো, বিকেল আলোয় ম্লান। ঘরের বাইরে ভিজে হাওয়া। কদমের গন্ধ। করবী ঝোপের পাতা চিক চিক করছিল। অপরাজিতার লতায় বৃষ্টির ফোঁটা। আর তখন ঝাঁক বেঁধে প্রজাপতি এসে নেমেছিল বাগানে। কতো রঙ, কী সুন্দর পাখা, কী চঞ্চল!

বাসনা ঘরের মধ্যে বসে বসে গলা সাধছিল। ভাল লাগছিল না। মন উড়ছিল প্রজাপতির ঝাঁকে। হঠাৎ চোখে পড়ল বিজন এসেছে। নীল হাফ প্যাণ্ট, গায়ে ভেজা গেঞ্জি। প্রজাপতি ধরছে ছুটে ছুটে। ডাকল বাসনাকে। যাবে কি যাবে-না একটু ভাবল বাসনা। তারপর বিনুনী দুলিয়ে, ফ্রক হাঁটু পর্যন্ত টেনে ছুটল। বাইরে।

আর বিজনের সঙ্গে হুড়োহুড়ি লুটোপুটি খামচাখামচি করে প্রজাপতি ধরা। ধরা কি যায় ছাই। বাসনা হয়ত ছুঁই ছুঁই করছে, বিজন হাততালি দিয়ে উঠল পাশ থেকে। উড়িয়ে দিল।

তবু অনেক কষ্টে সৃষ্টে ঝিরঝির জলে গা মাথা ভিজিয়ে কাদা ঘেঁটে একটা প্রজাপতি শেষ পর্যন্ত ধরেছিল বাসনা। আর ঠিক তখনই গেট দিয়ে বাড়ি ঢুকলেন বাবা। দেখলেন এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়িয়ে। তারপর হনহন করে ভেতরে।

সঙ্গে সঙ্গেই ডাক। চোর-পায় বাসনা ঢুকল। সেই ঘর। হারমোনিয়াম খোলা। বাবা সামনে দাঁড়িয়ে।

'কি করছিলে বাইরে?'

বাসনা চুপ। আলগা মুঠো থেকে প্রজাপতিটা কখন উড়ে গেছে। নীচু মুখে ফ্রকের কাপড় খুঁটছিল। শেষে নখ।

'কি করছিলে বাইরে?' বাবা আরও কর্কশ স্বরে ধমকে উঠলেন।

ভয়ে বাসনার বুক-গা কাঁপছিল। কথা ফুটছিল না। কোনো রকমে বললে, অস্পষ্ট গলায়, 'প্রজাপতি ধরছিলাম।'

'প্রজাপতি ধরছিলে। অসভ্য, বেয়াড়া, বদমাস মেয়ে কোথাকার!' টেবিল ঝাড়া পালক-গোঁজা লিকলিকে কঞ্চিটা তুলে নিলেন বাবা। তারপর—? তারপর সেই বেত হাতে পায়ে গায়ে পড়েনি, যেন বাসনার অমন সুন্দর বর্ষা ভেজা ছোট্ট খুশী মনের নরম গায়ে দাগ কেটে কেটে পড়েছে।

সেদিন সারারাত ধরে বাসনা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিল। আর ভেবেছিল, কি অসভ্যতা, কোনটা অসভ্যতা, কিসের বদ-ায়সী? প্রজাপতি ধরার খেলা, ওই ঝিরঝির বৃষ্টি ভেজা বিকেলে ছুটোছুটি, অমন সুন্দর করে পা টিপি-টিপি হাঁটা না আর কিছু, অন্য কিছু। অন্য কি হতে পারে? বাসনা তার ছোট্ট মন নিয়ে আকাশ পাতাল তন্ন তন্ন করে খুঁজল। প্রজাপতি আর মেঘ বৃষ্টি ফুল পাতা ছাড়া আর কিছুই খুঁজে পেল না। কাউকে দেখল না খেলার সাথী দুষ্টু বিজন ছাড়া। অসভ্যতা কোথায় ছিল, কিসের মধ্যে বাসনা জানল না। তবে সেই থেকে সহজ টানে, সহজ ডাকে, চোখের মনের খুশীতে সুন্দর সরল কিছু ধরতে হাত বাড়াতে গেলেই যেন আড়ষ্ট হয়ে উঠত। হাত বাড়াতে গিয়েও পারত না। আস্তে আস্তে হাত টেনে নিত। মনে হতো কে যেন দাঁড়িয়ে আছে পালক গোঁজা লিকলিকে কঞ্চি হাতে।

ছেলেবেলার সেই দিন আজ হঠাৎ মনে পড়ল। স্পষ্ট ছবি।

কিন্তু কী আশ্চর্য, বাসনা ভীষণ অবাক হয়ে ভাবছিল, সেই প্রজাপতি ধরার খেলা আর অমলেন্দুকে নির্ভয়ে হাত বাড়িয়ে ছুঁতে যাওয়া এর মধ্যে সম্পর্ক কোথায়?

নাকি আছে কিছু? (ক্রমশ)

চক্রদত্ত

পোলিও রোগটা যে কি সে সম্বন্ধে বলতে গেলে সকলেরই কিছুটা ধারণা আছে। রোগটার সম্বন্ধে বর্তমানে গবেষণা আরম্ভ হলেও, রোগটা বহুকাল থেকেই পৃথিবীতে আছে। ৩০০০ বছর আগেকার ইজিপ্টের একটা শিলা-চিত্রে এই রোগের কথা জানতে পারা যায়। এই শিলাচিত্রে দেখা যায় যে, একজন যুবক বাঁকা ছোট পা নিয়ে ক্র্যাচের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এর থেকে এটা বোঝা যায়, সেই সময়ও ঐ জাতীয় রোগে লোকে আক্রান্ত হোত। অবশ্য তখনকার দিনে এই রোগের সম্বন্ধে লোকরা যে খুব বেশী জানতো বলে মনে হয় না। উনিশশো শতাব্দীর মাঝামাঝি জার্মানীর এক গ্রামবাসীর ছেলের দুটো পা-ই কোন রোগে নষ্ট হয়ে যায়। ছেলেটির বাবা অস্থিবিশেষজ্ঞ ডাঃ জ্যাকব হেনীর কাছে ছেলেকে নিয়ে যায়। ডাঃ হেনী পরীক্ষা করে বলেন যে, কোন কারণে ঐখানকার নার্ভ কোষ-গুলো সব নষ্ট হয়ে গেছে। পোলিও রোগে আক্রান্ত হবার পর সেই স্থানের সব নার্ভকোষ নষ্ট হয়ে গিয়ে বিকলাঙ্গ হয়ে পড়ে। উনিশশো শতাব্দীর সেই সময় বরাবর সুইডেনে পোলিও রোগের মড়ক দেখা দেয়—ফলে ঐ রোগের অনেক অজানা তথ্য জানা যায়। স্টকহলমের ডাক্তার মেডিনও এই রোগ সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ করে প্রকাশ করেন। পরে ডাক্তার হেনী এবং মেডিনের যুক্ত প্রচেষ্টায় পোলিও রোগের কিছুটা চিকিৎসা সম্ভব হয়। কিছুকাল লোকেরা রোগটার নাম 'হেনী-মেডিন রোগ' বলে বলতো। এর পর দেখা গেল যে, এই রোগ নিয়ে ঠিকমত গবেষণা করতে গেলে যথেষ্ট টাকার প্রয়োজন। টাকা সংগ্রহের ব্যাপারে আমেরিকা অগ্রণী হয়ে টাকা সংগ্রহ করতে লেগে গেল। এখন যে সব বিভিন্ন স্থানে এই পোলিও রোগ নিয়ে গবেষণা হচ্ছে সে এই সংগৃহীত টাকা থেকে। বড় বড় লোকেরা মুক্ত হস্তে এর জন্য টাকা দিয়ে যাচ্ছেন। ১৯৪৯ সালে ডাঃ জন এনডারস দেখলেন যে, বাঁদরের শরীরের যে কোন ধরনের টিসুর ওপর পোলিও জন্মান যায়। এতদিন এইটেই জানা ছিল যে, মানুষের আর শুধু কয়েক জাতের বাঁদরের নার্ভওয়ালা টিসুতেই পোলিও জন্মান যায়। ডাঃ এনডারসের এই আবিষ্কারের পর টীকা দিয়ে রোগ প্রতিরোধ করার ব্যাপারটা সহজ হয়ে দাঁড়াল। এছাড়াও ১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ সালের ভেতর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণার থেকে অনেক নতুন তথ্য আবিষ্কার করা গেল। দেখা গেল যে, পোলিও তিন ধরনের ভাইরাস থেকে হয়। এই তিন জাতের ভাইরাসকে আলাদা আলাদা করে গবেষণা আরম্ভ করা হোল। গবেষণার সময় একটা জিনিস লক্ষ্য করা গেল যে, এই ভাইরাস প্রথমে রক্তের মধ্যে কিছু সময়ের জন্য ঘুরে বেড়ায় তারপর রোগ দেখা দেয়। এটা জানার পর টীকা নিয়ে পরীক্ষার কাজেরও খুব সুবিধা হোল। টীকা তৈরীর জন্য প্রথমে বাঁদরের কিডনী নিয়ে খুব ভাল করে টুকরো টুকরো করা হয় —তারপর সেগুলো টিউবে ভরে পোলিও রোগের ভাইরাস সংক্রামিত করে একটি নির্ধারিত তাপওয়ালা ঘরের মধ্যে চার থেকে ছ দিন রেখে দেওয়া হয়। তারপর যখন টীকা তৈরী করা আরম্ভ হয় তখন পোলিও ভাইরাস মারা গেছে দেখা যায় এবং তার থেকে আর নতুন রোগ হবার সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু মানুষের শরীরে এই টীকা দিলে এটা শরীরের ভেতরের জীবন্ত পোলিও ভাইরাসকে প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে। এই সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করে ডাঃ জোনাস সল্ক্ এক নতুন ধরনের পোলিও রোগ প্রতিরোধের টীকা তৈরী করেন। দেখা যাচ্ছে যে, ডাঃ সল্কের এই নতুন টীকা পোলিও রোগের চিকিৎসার এক নতুন অধ্যায় খুলে দিয়েছে। পৃথিবীর বহু জীবন্মৃত বিকলাঙ্গের মনে আশার সঞ্চার করছে এই সল্কের টীকা। সবচেয়ে বড় কথা এই টীকার আবিষ্কারক ডাঃ সল্ক এর জন্য কোন টাকাই আশা করেন না অথবা চান নি। তিনি তাঁর টীকা পেটেণ্ট পর্যন্ত করেন নি। এবং তিনি জগতের সকলকে এর টীকা তৈরী করবার উপায় জানিয়ে দিয়েছেন—যাতে প্রয়োজন হলে যে কেউ তৈরী করতে পারে।

*

মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার হয়েছে বহু-কাল—কিন্তু এটা সঠিক জানা যায় না যে, প্রথম কি ছাপা হয়েছিল। আন্দাজ করা যায় যে, পৃথিবীতে প্রথম খেলার তাস ছাপা হয়েছিল। দেখা যায় যে, ইয়োরোপে প্রায় ১৪০০ শতাব্দীতে ছাপান তাস দিয়ে লোক তাস খেলতো। এর প্রায় অর্ধ শতাব্দী পরে প্রথম বাইবেল ছাপান হয়।

*

পৃথিবীতে প্রায় ৮০০ বিভিন্ন ধরনের তেজষ্ক্রিয় এ্যাটমের খোঁজ পাওয়া যায়।

*

অস্ট্রিচ পাখী পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বড় পাখী। এর একটা চোখ এত বড় যে, এটা পাখীটার মস্তিষ্কের প্রায় ছ গুণ ওজন।

বৈষ্ণব সাহিত্য

কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ—শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স কর্তৃক ২০৩।১।১, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৫ টাকা।

পণ্ডিত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দের নূতন করিয়া পরিচয় দেওয়া আবশ্যক করে না। এই গ্রন্থের পূর্বতন সংস্করণগুলি বাংলার ভক্ত, রসিক এবং সুধিজন সমাজে সমাদৃত হইয়াছে।

মহাকবি জয়দেবের অমরলেখনীপ্রসূত গীতগোবিন্দের কাব্য-সৌন্দর্য এবং চমৎকারিতার সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই। দ্বাদশ সর্গে বিভক্ত তিন শত শ্লোকের অনধিক একখানি মাত্র কাব্যগ্রন্থ রচনার দ্বারা জয়দেব ভারতের চিন্তা-জগতে এবং অধ্যাত্ম সাধনার ক্ষেত্রে যে প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছেন জগতে তাহার তুলনা মিলে না। প্রকৃতপক্ষে মহাকবির গীতগোবিন্দ অন্যতম শাস্ত্রস্বরূপেই সম্পূজিত হয় এবং ইহার কারণও রহিয়াছে। বৈষ্ণবসাধনার নিগূঢ় রসমাধুর্যকে মহাকবি গীতগোবিন্দে ছন্দোময় রূপ দিয়াছেন। তাঁহার গীতিচ্ছন্দে রসময় আনন্দময় দেবতার সঙ্গে মানুষের অন্তরের নিবিড় ভাবে নিত্য সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। রসের অনুভূতি কবির গীতে দীপ্তি লাভ করিয়া ব্যাপ্তি পাইয়াছে। বস্তুত মাধুর্যের পথেই ভগবৎতত্ত্ব অব্যবহিত একত্বে উপলব্ধি করা সম্ভব হইয়া থাকে। মধুর দূরকে নিকটে আনে। শ্রীভগবানের প্রেমরসের মাধুর্য অন্তরের অবীর্য দূরীভূত করিয়া বিশ্বপ্রকৃতিকে সৌন্দর্যের অনুভূতি দীপ্ত করিয়া তোলে। এইভাবে মানুষ একান্ত অসহায় তাহার জীবনে চিন্ময় আশ্রয়ের সন্ধান পায়। সর্বতোব্যাপ্ত সৌন্দর্যানুভূতির পথে তাহার অসহায়ত্ব দূর হয়। এমন উজ্জ্বল অনুভূতির মূলে রসরীতির যে দিব্য লীলা বা খেলা চলে কবি জয়দেবের গীতগোবিন্দে আমাদের অন্তরে আমরা তাহারই সাড়া পাই।

আলোচ্য গ্রন্থের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ২৪৮ পৃষ্ঠাব্যাপী বিস্তৃত ভূমিকায় সাত্বত ধর্ম, বীরভূমি, কবি সাময়িকী, কবি-জীবন, কাব্যকথা, শ্রীগোবিন্দের গীত, শ্রীগীতগোবিন্দে গোবিন্দ, শ্রীকৃষ্ণ প্রসঙ্গ, শ্রীরাধা প্রসঙ্গ, শ্রীরাধাতত্ত্ব, কংসারির সংসার, শ্রীমদ্ভাগবত এবং শ্রীগীতগোবিন্দ, শ্রীগীতগোবিন্দে প্রথম শ্লোক, অর্থবন্ধ, প্রকৃতিভাবে উপাসনা, যোগমায়া, জয়দেবের ছন্দ, পূজারী গোস্বামী, কবি জয়দেবের বৈষ্ণবামৃত বা পীযূষ-লহরী—গ্রন্থের এই বিস্তৃত ভূমিকা একাধারে ঐতিহাসিক তথ্য, আলঙ্কারিক বিচার এবং তত্ত্ব-সিদ্ধান্তের মনিমঞ্জুষাস্বরূপ। আলোচ্য সংস্করণের ভূমিকাংশে গ্রন্থকার অনেক কথা নূতন করিয়া বলিয়াছেন এবং কয়েকটি অধ্যায় সম্পূর্ণ নূতনভাবে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহাতে পূর্ববর্তী সংস্করণের অপেক্ষা আলোচ্য সংস্করণের সমধিক সৌকর্য সাধিত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে মহাকবি জয়দেবের শ্রীগীতগোবিন্দের এই ভূমিকাংশ গ্রন্থকারের সাধনাকে, বাংলার সাহিত্যকে বিশেষ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। ভক্ত, সাধক এবং চিন্তাশীল সমাজ ইহা আস্বাদন করিয়া পরম উপকৃত হইবেন এবং আনন্দ লাভ করিবেন। গীতগোবিন্দের এই সর্বাঙ্গসুন্দর সুসম্পাদিত ও সুশোভন সংস্করণ সর্বত্র সমাদৃত হইবে, সন্দেহ নাই। ৩৯৭।৫৫

১। **সার-সংগ্রহ-মাধুরিমা—২**

১। **শ্রীশ্রীবৃন্দাবন-লীলা—৮৵০**

শ্রীমা-মণি লিখিত। শ্রীসুধীরকুমার বসু কর্তৃক ৪নং পার্শি বাগান লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

লেখিকা গোঁসাইজীর কৃপাশ্রিতা। তিনি একজন সাধিকা আলোচ্য পুস্তকখানিতে দিব্যানুভূতি বর্ণিত হইয়াছে। পাঁচজন বৈষ্ণব সমাধিমগ্না এই সাধিকাকে দর্শন দিয়া ক্রমিকভাবে কতক দিন পর্যন্ত বৈষ্ণব ধর্মের সারতত্ত্ব কতকগুলি শ্লোকে বিন্যস্ত করিয়াছেন। শ্লোকগুলি ভাগবত, গীতা, বিদগ্ধ মাধব, ললিত মাধব, ব্রহ্মসংহিতা পদাবলী, শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত, গোবিন্দ-লীলামৃত, গীতগোবিন্দ এই সব শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে প্রধানত উদ্ধৃত। বাহির হইতে বিচার করিলে শ্লোকগুলির বিন্যাস অসংলগ্ন এবং ব্যবহিত বলিয়া মনে হয়; কিন্তু অনুভূতির ক্ষেত্রে রস-সম্বন্ধ সূত্রে এইগুলি অব্যবহিত ভাবে পরিস্ফুর্ত হইয়াছে ইহাই সম্ভব। শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা মাহাত্ম্য-সূচক শ্লোকগুলির ভিতর দিয়া এই সত্যটির সাড়া পাওয়া যায়। বাস্তবিকপক্ষে এই ধরনের দিব্যদর্শন এবং প্রত্যক্ষানুভূতি উচ্চ সাধনস্তরের কথা। ইহা সমালোচনার বিষয় নয়। সাধারণ পাঠক পাঠিকাগণ বৈষ্ণব ধর্মের সার তত্ত্বের সংগ্রহ এবং সংকলনস্বরূপে সার সংগ্রহ মাধুরিমা আস্বাদন করিয়া উপকৃত হইবেন এবং আনন্দলাভ করিবেন এইটুকু বলা চলে।

শ্রীবৃন্দাবন-লীলাও লেখিকায় প্রত্যক্ষানুভূতিরূপে বিবৃত হইয়াছে। তাঁহার বৃন্দাবনে অবস্থানকালে নামরসে নিমগ্ন হইয়া তিনি এই লীলা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। নামের এবম্বিধ মহিমা শাস্ত্রে বহুভাবে উক্ত হইয়াছে। নামরসে নিবিষ্ট হইয়া সাধক নৈষ্ঠিকী রতি লাভ করেন এবং রতির গাঢ়তায় তিনি আচার্যবান্ হন অর্থাৎ সৎগুরুর কৃপা পান।

তাহার ফলে পঞ্চাত্মক জীবকোষের সকল অবীর্য তাহার দূর হইয়া যায়। তিনি লীলা-মাধুর্যে অভিনিবিষ্ট হন, ভাগবতে এইসব কথা আছে। নামের মধ্যেই শ্রীকৃষ্ণের বিক্রীড়া রহিয়াছে। নাম কর্ণপীযূষে পরিণত হইলে সেই বিক্রীড়া বা ব্রজবধূদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বিলাসরাজ্যে সাধক অনুপ্রবিষ্ট হন, ইহাও শাস্ত্রেতে আছে। কিন্তু অবিরাম এবং অবিচ্ছেদ্যভাবে নাম জীবনে পূর্ণকামত্বে পরিস্ফুর্ত না হইলে এই অবস্থা লাভ করা যায় না। সাধকের জীবন সে অবস্থায় নাম-ময় হইয়া যায় এবং তিনি দেহের সর্বসম্বন্ধে কীর্তনচ্ছন্দে শ্রীভগবানের সেবার অধিকার অর্জন করেন। নামের ভিতর দিয়া লীলার এমন প্রত্যক্ষতা-প্রভাবিত মাধুর্য উপলব্ধি করা অবশ্যই সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। তথাপি ভক্তমুখে লীলাকথার কীর্তন শ্রবণে ভগবৎ-কৃপা চিত্তে উদ্দীপিত হয়। এই দিক হইতে শ্রীশ্রীবৃন্দাবন লীলার সার্থকতা রহিয়াছে। ভক্ত এবং রসিকসমাজে সাধিকার দিব্যানুভূতির ব্যাপ্তি এবং দীপ্তির স্পর্শ লাভ করিয়া পুস্তকখানি পাঠে উপকৃত হইবেন। ৩৭৬, ৩৭৭।৫৫

সাধক-কথা

শ্রীশ্রীমৎ প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর মৌনী অবস্থার উপদেশ—দ্বিতীয় খণ্ড। শ্রীশ্রীমৎস্বামী অসীমানন্দ সরস্বতী কর্তৃক সম্পাদিত। সৎগ্রন্থ প্রকাশনী, ৮।১, হাজরা লেন, কলিকাতা, মূল্য ২৲ টাকা।

অধ্যাত্মতত্ত্ব এবং ধর্মজীবন সম্পর্কিত সাধন-ভজন সম্বন্ধে গোঁসাইজীর অমূল্য উপদেশের এই সংগ্রহ পাঠে সকলেই উপকৃত হইবেন। ৭৬।৫৫

নারী জাগরণ—পণ্ডিত দিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য প্রণীত। শ্রীনবদ্বীপ শ্রীগৌরাঙ্গ মিশন হইতে প্রকাশিত। প্রাপ্তিস্থান—অধ্যক্ষ শ্রীগৌরাঙ্গ মিশন, নবদ্বীপ। মূল্য তিন আনা।

সামাজিক অত্যাচার, অবিচার এবং কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে গ্রন্থকারের নাম উল্লেখযোগ্য। আলোচ্য পুস্তকখানির আলোচনা নারী-সমাজের অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রাণপূর্ণ উদ্দীপনায় জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। গ্রন্থকার হিন্দু সমাজ, বিশেষভাবে হিন্দু বিবাহ বিধির সংস্কার সমর্থন করিয়াছেন। ৫২৬।৫৪

শান্তির বারতা—প্রথম খণ্ড। স্নেহময় ব্রহ্মচারী প্রণীত। অযাচক আশ্রম, স্বরূপানন্দ স্ট্রীট, বারাণসী হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১॥০ টাকা।

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস এবং তদীয় শিষ্যা শ্রীযুক্তা সাধনা দেবী ত্রিপুরা ভ্রমণকালে যে সব উপদেশ প্রদান করেন, পুস্তকখানিতে তাহাই সংকলিত হইয়াছে। উপদেশগুলি উন্নত জীবন লাভে সমাজে অনুপ্রেরণা সঞ্চার করিবে। এমন পুস্তকের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়। ৯৩।৫৫

ঠাকুর মায়ের গল্প—শ্রীঅনিলকুমার চক্রবর্তী এবং শ্রীরণজিৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। সেনগুপ্ত এণ্ড কোং কলিকাতা ১২ হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১৲ টাকা।

ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব এবং শ্রীশ্রীমায়ের জীবনের ঘটনা এবং উপদেশ অবলম্বন করিয়া কিশোর-কিশোরীদের উপযোগী গল্পের আকারে পুস্তকখানিতে সংক্ষেপে প্রদত্ত হইয়াছে। গ্রন্থকারদ্বয় শিক্ষাব্রতী। তাঁহাদের লেখা কৃতিত্বের পরিচায়ক। সহজ, সরল ভাষায় লিখিত ঠাকুর এবং শ্রীশ্রীমায়ের মধুর-লীলা প্রসঙ্গ কিশোর-কিশোরীদের মনে গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করিবে। এক বৎসরের মধ্যে পুস্তকখানির দ্বিতীয় সংস্করণ ইহার লোক-প্রিয়তার পরিচায়ক। ১৮৪।৫৫

আমার জীবন—শ্রীমৎ স্বামী অসীমানন্দ সরস্বতী কথিত আত্মকথা। সৎগ্রন্থ প্রকাশনী, ৮।১, হাজরা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য—২৲ টাকা।

মানভূমের অন্তর্গত রামচন্দ্রপুর শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী অসীমানন্দের আত্মকথা প্রথম খণ্ডে তাঁহার শৈশব হইতে দ্বাদশ বর্ষ বয়সে বর্ধমানে যাত্রার প্রসংগ পর্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। স্বামীজী সাধক, কর্মী, বিহার-বিধানসভার তিনি বর্তমানে সদস্য। আগ্রহোদ্দীপক ভাষায় কথিত তাঁহার এই আত্মজীবনী বেশ সরস উপভোগ্য এবং আদর্শনিষ্ঠার পরিচায়ক। ৯৯।৫৫

আলোর তৃষা—শ্রীফণীন্দ্রনাথ দাস। শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী হইতে প্রকাশিত।

লেখক শ্রীঅরবিন্দের শিষ্য এবং সেই ভাবের ভাবুক। পণ্ডিচেরীর শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের অধিষ্ঠাত্রী শ্রীমায়ের দিব্যজীবনের প্রেরণায় তিনি অনুপ্রাণিত। পুস্তকের আলোচনায় অধ্যাত্মরাজ্যের অনেক গূঢ় রহস্যের উপর আলোক-সম্পাত করা হইয়াছে। আলোচনা আন্তরিকতাপূর্ণ এবং এই আলোচনায় লেখকের প্রাণময় অধ্যাত্মানুভূতির স্পর্শ পাওয়া যায়। ১৪৪।৫৫

কবিতা

খিলপ্রবরীর খাতা—শ্রীসঞ্জীবকুমার বাগচি প্রণীত। শ্রীমলিনা বিশ্বাস কর্তৃক উত্তর বাংলা

সাহিত্য মন্দির, শিলিগুড়ি, দার্জিলিং হইতে প্রকাশিত। মূল্য ||০ আনা।

সঞ্জীবকুমারের কাব্য-খ্যাতি আছে। উত্তর-বঙ্গে তিনি কবি হিসাবে সুপরিচিত। তাঁহার লেখায় সর্বত্র সজীব একটা প্রাণরসের স্পর্শ পাওয়া যায় এবং সেই রস স্বতস্ফূর্ত, সঞ্জীব কাব্যমালার প্রথম খণ্ডস্বরূপে প্রকাশিত এই পুস্তকখানিতে খিলশ্বরীর খাতা, অপ্রাকৃত প্রেম, তহশীলদারের ভোগ এবং শ্রদ্ধার্ঘ্যের উত্তরে এই তিনটি কবিতা সঙ্কলিত হইয়াছে। এগুলির কাব্যরস উপভোগ্য। খিলশ্বরীর খাতার দুইটি স্থানে কয়েকটি লাইন বাদ দিলে লেখাটি রসোত্তীর্ণ হইত, বক্তব্য ভাবটি পরিস্ফুট করার পক্ষে ক্ষতিও হইত না। রুচির দিক হইতে এই ত্রুটি পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করা কর্তব্য।
১২৭।৫৫

ছেলেবেলা—স্বামী অসীমানন্দ সরস্বতী প্রণীত। শ্রীললিতমোহন ভট্টাচার্য কর্তৃক সদ্‌গ্রন্থ প্রকাশনী, ৮।১-এম, হাজরা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

লেখকের ছেলেবেলার লেখা কবিতার সংগ্রহ। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে কিশোর চিত্তে যেসব মহৎভাবের সাড়া জাগিয়াছিল, কবিতাগুলিতে তাহার স্পর্শ পাওয়া যায়।
১০৭।৫৫

দেখা দাও—শ্রীনীরদবরণ প্রণীত। শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী হইতে প্রকাশিত। মূল্য ||০ আনা।

মহাযোগী শ্রীঅরবিন্দের উদ্দেশ্যে কাব্য-ছন্দে এই শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদনে রচয়িতার অন্তর-রস উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে। লেখাটি শ্রীঅরবিন্দের দিব্যজীবনের উদারচ্ছন্দে চিত্তকে স্পর্শ করে এবং মহাযোগীর প্রতি পরম শ্রদ্ধায় আমরা মনে প্রাণে পবিত্রতার প্রতিবেশ পাই।
৩৪।৫৫

নূরজাহান—শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র মজুমদার প্রণীত। বঙ্গবাণী, ৩৬, পদ্মপুকুর রোড, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য ||০ আনা।

কবিতাগুলিতে নৈতিক আদর্শের উদ্দীপনা আছে, কয়েকটি কবিতায় লেখকের হৃদয়ের আবেগের পরিচয় পাওয়া যায়। ১৬২।৫৫

দরদী—শ্রীশচীন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। গ্রন্থকার কর্তৃক বার্নপুর হসপিটাল রোড, আসানসোল হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১||০ টাকা।

কয়েকটি কবিতার ভাবের নিবিড়তা ছন্দের মধ্যে নিজেকে ডুবাইয়া দিয়া মনের মূলে প্রকাশের প্রেরণা পাইয়াছে। কবিতাগুলি ইহাতে প্রাণময় হইয়া উঠিয়াছে। ১০২।৫৫

গীতি-অর্ঘ্য—সত্যর্ষি শ্রীশ্রীমৎ যোগ-জীবনানন্দ স্বামী প্রণীত। শ্রীপতিতপাবন কুণ্ডু কর্তৃক শ্রীগুরু গেহ ১১ এন এল ঘোষের লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১||০ টাকা।

গীতি-পুস্তক। গীতিসমূহের রচয়িতা সুস্পষ্টভাবেই রবীন্দ্রনাথের দ্বারা প্রভাবিত। গানগুলি ভগবদনুভূতি এবং প্রীতি রসে সুমধুর। রচয়িতার অন্তরের প্রগাঢ় স্পর্শ গানগুলিতে পাওয়া যায়। ভাষা এবং ভাব এগুলিতে ঘনীভূত হইয়া প্রাণরসকে উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিয়াছে। ৪৮।৫৫

সাময়িক পত্রিকা

বিশ্বভারতী পত্রিকা। সম্পাদক—শ্রীপুলিন-বিহারী সেন। ৬।৩, দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা। শ্রাবণ—আশ্বিন ১৩৬২। প্রতি সংখ্যা মূল্য এক টাকা। বার্ষিক সডাক পাঁচ টাকা।

বিশ্বভারতী পত্রিকা সাময়িকভাবে কিছুদিন বন্ধ ছিল। শ্রীপুলিনবিহারী সেনের সম্পাদনায় সম্প্রতি দ্বাদশ বর্ষের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। সর্বপ্রথমে সম্পাদক মহাশয়ের রচনানির্বাচনের এবং তাঁর উন্নত রুচির প্রশংসা করতে হয়। আলোচ্য সংখ্যায় প্রবীণ ও নবীন সাহিত্যিকবর্গের রচনা অতি সুন্দররূপে পরিবেশিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত পত্র, শ্রীক্ষিতিমোহন সেন, শ্রীরাজশেখর বসু, শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত, শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ, শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার, শ্রীসুনীলচন্দ্র সরকার লিখিত প্রবন্ধাবলীতে এই সংখ্যা সমৃদ্ধ। এ ছাড়া করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মোহিতলাল, জীবনানন্দ সম্প্রতি লোকান্তরিত কবি চতুষ্টয়ের জীবন ও কাব্য 'শ্রদ্ধাঞ্জলি' শীর্ষক একটি বিশেষ বিভাগে আলোচিত হয়েছে; আলোচনা করেছেন যথাক্রমে শ্রীসুশীল রায়, শ্রীঅজিত দত্ত, শ্রীকানাই সামন্ত ও শ্রীনরেশ গুহ। শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় লিখিত 'গ্রন্থ-পরিচয়' কেবল গ্রন্থের আলোচনা নয়, দুটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ। রবীন্দ্রনাথ—আইনস্টাইন ১৯৩০ সালে মিলিত হয়েছিলেন—এই দুই মনীষীর আলাপ-আলোচনা এই সংখ্যায় মুদ্রিত হয়েছে। চিত্রের দিক থেকেও এই সংখ্যা সমৃদ্ধ। শ্রীনন্দলাল বসু অঙ্কিত তিনরঙা ও একরঙা ছবি, আইনস্টাইনসহ রবীন্দ্রনাথের ও আইনস্টাইনসহ জহরলালের চিত্র, চারজন কবির প্রতিকৃতি এই সংখ্যায় আছে। আর আছে শ্রীসুধীরচন্দ্র কর কৃত রবীন্দ্রনাথের গানের স্বরলিপি।

প্রাপ্তি স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থ আসিয়াছে।

মধ্যযুগের কবি ও কাব্য—১ম খণ্ড—শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু।

ব্লাডপ্রেসার ও করোনারী থ্রম্বোসিস—ডাঃ নরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত।

স্বাধীনতার দায়িত্ব—ডাঃ নরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত।

আশাপূর্ণা দেবীর ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প—অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির, ৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

শ্যামা গীতিকা—শ্রীঅরুকুমার ভট্টাচার্য

Dr. B. C. Roy—K. P. Thomas.

এক পকেট হাসি—প্রবোধচন্দ্র বসু

মনের কোণে—শ্রীস্নেহলতা দেবী

শঙ্করাচার্য—শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভৌমিক

অবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগী

ছবির কাজ আলোকপাত করা, অন্ধকারে নিক্ষেপ করা নয়। কিন্তু ছবির এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে অবজ্ঞা করে মানুষের মনের ওপর থেকে আলো সরিয়ে কালিমাঘন পর্দার অন্তরালে সরিয়ে দেবার অপরাধ মাঝে মাঝে ছবির মধ্যে ঘটতে দেখা যায়। সংস্কারাচ্ছন্ন দুর্বল মনকে কাবু করে ছবির জনপ্রিয়তা সৃষ্টিরও চেষ্টা আজও বেশ পরিমাণেই হয়ে চলেছে। এ বিষয়ে সবচেয়ে বাগিয়ে ধরা হয় ভারতীয় নারীর সতীত্বকে। এই যেমন সদ্যমুক্ত "কংকাবতীর ঘাট।" একটা মধ্যযুগীয় ভাবধারা নিয়ে বিষয়বস্তুর সৃষ্টি। অশিক্ষা ও অজ্ঞতার যুগের মনোভাব। রুগ্ন স্বামীর আরোগ্য কামনা করে জলে ডুবে আত্মহত্যা করার ব্যাপার নিয়ে গল্প তৈরীর কল্পনাও যে এ যুগে হতে পারে, সেইটেই হচ্ছে সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়। ছবিখানি দেখার পর কয়েকজন পাঠিকা জানতে চেয়েছেন যে, স্বামীর চিকিৎসা ও সেবায় প্রাণপাত না করে আরোগ্যের জন্য নিজের জীবন মানত করে জলে প্রাণ বিসর্জন দেওয়াই যদি সতীত্বের পরাকাষ্ঠা বলে পরিগণিত হয়, তাহলে সহমরণ প্রথা যা ছিল, তাতে দোষ কি ছিল? বাস্তবিকই এ প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিকই। অত্যন্ত অবৈজ্ঞানিক ও মূঢ় দৃষ্টিভংগী ছবিখানির বিষয়বস্তুতে। তা নয়তো কাহিনীতে প্রচুর নাটকীয় উপাদান রয়েছে এবং শিল্পীবৃন্দের অভিনয় দক্ষতায় বেশ নাট্যরস জমে উঠেছে।

* * *

"কংকাবতীর ঘাট"এর আখ্যানবস্তুটি মহেন্দ্র গুপ্ত রচিত জনপ্রিয় নাটকখানি থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। কৌতূহলকে উদগ্র করে রেখে দেবার মতো কাহিনী, তাছাড়া চরিত্রের দিক থেকেও বৈচিত্র্য আছে যথেষ্ট। নাটকখানিকে চিত্রনাট্যে রূপান্তরিত করেছেন নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। ঘটনার বুননীতে প্রয়োজনমতো নাটকীয়তা সৃষ্টির কৃতিত্ব আছে। স্বামীর আরোগ্য কামনা করে জলে ডুবে আত্মহত্যা করে সতী হওয়ার আদর্শ প্রচারেই কাহিনীর পরিণতি। একটি আত্মহত্যায় নয়, প্রথমে মা'র আত্মহত্যা, সেটা অবশ্য ছবিতে উহ্য রাখা হয়েছে। এখানে রয়েছে মায়েরই আদর্শ অনুসরণ করে একইভাবে মেয়ের আত্মহত্যা। মেয়েটির নাম শিলা। গল্পের আরম্ভতে দেখা যায় শিলা কলেজের মেয়ে। তার বাবা মিঃ মুখার্জী নিরুদ্দেশ ছ'বছর ধরে, অভিভাবিকা শিলার মা। কলেজের মাইনে দিতে না পারায় শিলা ক'দিন কলেজে যায়নি। তাই ওর সংগে দেখা করতে এলো সহপাঠী প্রবীর। প্রবীর এসে শিলার মা'র কাছে ওদের দুরবস্থার কথা জেনে শিলাকে গোপন করে তার মা'র হাতে কয়েকশ টাকা দিলে। প্রবীর অতসী গ্রামের জমিদার। এই অতসী গ্রামের নদীতেই সতী কংকাবতী প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে। প্রবীর চলে যাবার পর শিলার মা চামেলি দেবীর কাছে এলো নন্দু গুণ্ডা। নন্দু জানালে এক বড়লোকের খপ্পরে শিলাকে ভিড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা সে করেছে। ওরা পরামর্শ করে ঠিক করলে বড়লোক লালমোহনকে শিলার পিতৃবন্ধু বলে পরিচয় দেবে এবং শিলাকে জানালে বম্বে থেকে তার বাবা লোকটিকে পাঠিয়েছে টাকাকড়ি দিয়ে সাহায্য করে ওদের দেখাশুনা করার জন্য। নন্দুকে বাবা বলে ডাকে এমনি এক গুণ্ডা প্রকৃতির ছোকরা মাঝে মাঝে শিলার মার কাছ থেকে কি একটা রহস্য প্রকাশ করে দেবার ভয় দেখিয়ে টাকা নিয়ে যেতে থাকে।

* * *

নন্দুর ব্যবস্থামতো বালিগঞ্জে নতুন বাড়ি ভাড়া নেওয়া হলো লালমোহনের টাকায় এবং বাড়ি সাজানোও হলো কেতাদুরস্তভাবে। শিলা জানলো তার বাবা বম্বে থেকে বন্ধু মারফত টাকা পাঠাচ্ছে, প্রবীরও জানলো তাই। কিন্তু শিলার প্রতি লালমোহনের কেমন একটা হ্যাংলাভাব। শিলার তা ভালো লাগে না। ওদিকে শিলা প্রবীরের সংগে ঘনিষ্ঠতা রেখে চলে, সেটা লালমোহন বা চামেলি কারুরই পছন্দ নয়। ঠিক এমনি

—শৌভিক—
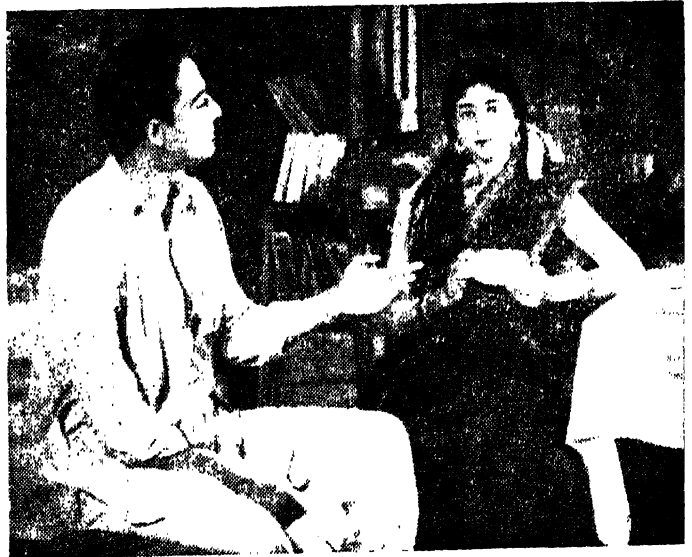
'গোধূলি' চিত্রে নির্মলকুমার ও সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়

সময়ে একদিন শিলার জন্মদিনের উৎসবের মাঝে এসে উপস্থিত হলো জীর্ণবেশ বৃদ্ধ মিঃ মুখার্জী। চামেলি মুখার্জীকে সবায়ের অলক্ষ্যে একটা ঘরে লুকিয়ে রাখলে। হঠাৎ সেখানে শিলা আর প্রবীর উপস্থিত হয়। মুখার্জি লাল-মোহনজনিত ব্যাপারটা শুনলে এবং বুঝলে আর সেই সঙ্গে শিলা ও প্রবীরের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণও অনুভব করলে। প্রবীর শিলাকে বিয়ে করতে রাজি আছে কি না ভেবে দেখে পরদিন প্রবীরকে দেখা করতে বললে মুখার্জি। চামেলি ও নন্দু অনর্থ ঘটার আভাস পেয়ে প্রবীরকে সরিয়ে ফেলার ষড়যন্ত্র করলে। পরদিন মনস্থির করে প্রবীর এসে দাঁড়াতে মুখার্জি শিলাকে তার হাতে সম্প্রদান করলে এবং পিছনের দরজা দিয়ে ওদের অন্তর্ধান হওয়ার সহায়তা করলে। প্রবীর নিজের বাড়িতে গিয়ে তার স্বর্গতা মা'র প্রতিকৃতির সামনে দাঁড়িয়ে শিলার কণ্ঠে পরিয়ে দিলে সতী কঙ্কাবতীর কণ্ঠহার আর সিঁথিতে দিলে কঙ্কাবতীর নিজের সিঁদুরকৌটো থেকে নেওয়া সিঁদুর যা প্রবীরের মা সংগ্রহ করে রেখেছিলেন তাঁর পুত্রবধূর উদ্দেশে। কয়েক দিন পর প্রবীর শিলাকে নিয়ে এলো চামেলি দেবীর বাড়িতে। এখানে দেখা হয়ে গেল লালমোহনের সঙ্গে এবং তার কাছ থেকেই প্রবীর জানলে যে চামেলি এক বেশ্যা, মুখার্জির রক্ষিতা। সেই মুহূর্তেই প্রবীর শিলাকে ত্যাগ করে ফিরে গেল গ্রামে। শিলার গর্ভে তখন প্রবীরের সন্তান।

• • •

শিলাও তারপর গৃহত্যাগ করলে, তার বাবা মিঃ মুখার্জী তার সঙ্গ নিলে। বাবা ও মেয়ে একটা ঘর ভাড়া নিয়ে থাকে। মুখার্জী ভিখোসিখ্যে করে সংসার চালায়। যথাকালে শিলার একটি পুত্র জন্মালো। ওদিকে গ্রামে ফিরে প্রবীর তার মায়ের ঠিক করে যাওয়া প্রতিবেশী কন্যা মৃণালকে বিয়ে করলে। শিলাকে না পাওয়ার লালমোহন চামেলিকে বালিগঞ্জের বাড়ি থেকে তাড়ালে। চামেলি একটা বস্তীতে এসে ঘর ভাড়া করে রইলো। নন্দুর সেই গুণ্ডা ছেলেটাকে চামেলি কাছে এনে রাখলে এবং ক্রমে বোঝা গেল এই ছেলেটির মা চামেলি। বছর কতক পার হয়ে গেলো। শিলা রুগ্না। তার ছেলে মাকে লুকিয়ে পান বিক্রী করে ঔষধ-পথ্য জোগাড় করে নিয়ে আসে। মুখার্জী তেমনিই ভিক্ষুক। একদিন হঠাৎ পান বিক্রীতে বেরিয়ে ছেলেটি মোটরের ধাক্কা খেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়লো। মোটরের আরোহী প্রবীর আর মৃণাল। ছেলেটিকে ডাক্তারখানায় নিয়ে গিয়ে তার জ্ঞান ফিরিয়ে

আনিয়ে ওরা তাকে ওর মা'র কাছে পেণছে দিতে এলো। প্রবীরের সঙ্গে শিলার দেখা হয়ে গেল দীর্ঘকাল পর। মুখ ফিরিয়ে প্রবীর ছুটে বেরিয়ে গাড়িতে এসে উঠলো। ইতিমধ্যে নন্দু দেশে চলে যাবার আগে শিলার জন্মবৃত্তান্ত শুনিয়ে দিয়ে গেল। জানা গেল মিঃ মুখর্জী দারুণ অসুখে পড়ায় তার স্ত্রী কঙ্কাবতী নিজের জীবন মানত করে স্বামীর আরোগ্য প্রার্থনা করে নদীতে প্রাণ বিসর্জন দেয়। স্ত্রীর মৃত্যুতে পাগলপ্রায় হয়ে মুখার্জী তার শিশু কন্যাটিকে নিয়ে এসে তোলে তার রক্ষিতা চামেলি বিবির বাড়িতে। সেই সময়ে চামেলিরও একটি পুত্র জন্মায়। নন্দুর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে চামেলি ঘুমন্ত মুখার্জীর পাশ থেকে মেয়েটিকে তুলে নিজের কাছে এনে রাখে এবং নিজের ছেলেকে তুলে দেয় নন্দুর কাছে মানুষ হতে। মুখার্জীকে বোঝানো হয় তার মেয়ে চুরি হয়ে গেছে। সেই মেয়েই শিলা এবং শিলা চামেলিকেই তার মা বলে জেনে এসেছে। মেয়ে চুরি যাওয়ার পর মুখার্জী শিলা একটু বড়ো হতে নিরুদ্দিষ্ট হয়। দেশে ফিরেই প্রবীর অসুখে পড়ে। অসুখের ঘোরে মুখে কেবল শিলার নাম। অবস্থা শেষে এতো খারাপ হলো যে, ডাক্তাররা হাল ছেড়ে দিলে। খবর পেয়ে শিলা উপস্থিত হলো এবং তার ছেলেকে মৃণালের হাতে তুলে দিয়ে তার মা কঙ্কাবতীর আদর্শ অনুসরণ করে স্বামীর আরোগ্য কামনা করে মাথায় প্রদীপ নিয়ে কঙ্কাবতীর ঘাটে প্রাণ বিসর্জন দিলে। বলা বাহুল্য, প্রবীর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সম্পূর্ণ নিরোগ হয়ে উঠলো।

* * *

অবৈজ্ঞানিক এমনিধারা অলৌকিক ব্যাপারটির মধ্যে দিয়ে একটা অতি গর্হিত আদর্শকে সতীত্বের আদর্শ বলে তুলে ধরা হয়েছে। যমের সঙ্গে লড়াই করে স্বামীকে বাঁচিয়ে তোলা এক কথা, কিন্তু এ কি এক উদ্ভট কল্পনা! অবশ্য নাট্য-উপাদান প্রভূত থাকলেও সমস্ত কাহিনীটাই কষ্ট কল্পনায় ভরা। তবে ঘটনাবলীর উপস্থাপনে চিত্রনাট্যের কৃতিত্ব আছে; এমন জিনিসকেও নাটকীয় গতি সৃষ্টি করে জমাট করে তুলতে সহায়ক হয়েছে। পরিচালনার দিকটা মামুলী; কাহিনীর দৃষ্টিভঙ্গীর মতোই সেকেলে ধাঁচের। কয়েকক্ষেত্রে অসঙ্গত ব্যাপারও চোখে পড়ে। ছবিখানির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে যাওয়া যায় গল্পে সাসপেন্স থাকায় এবং চরিত্র চিত্রণের গুণে। ছবিখানি পরিচালনা করেছেন চিত্ত বসু। অভিনয়ের দিকটা বেশ চোকশই বলা যায়। নাম করতে গেলে গোড়াতেই মুখার্জীর চরিত্রে অহীন্দ্র চৌধুরীর কথাই ওঠে। মঞ্চেও তিনি এ চরিত্রটিতে অবতরণ করেছেন। চরিত্রের বৈচিত্র্যটা তিনি এখানেও অব্যাহতভাবে ফুটিয়েছেন। প্রবীর ও শিলার চরিত্রে উত্তমকুমার ও সন্ধ্যারাণী তাঁদের অভিনয়-দক্ষতার সুষ্ঠু পরিচয়ই রক্ষা করে গিয়েছেন। নন্দু গুণ্ডার চরিত্রে কমল মিত্রকে চেহারায় আচরণে মানিয়েওছে এবং তিনি অভিনয় ফুটিয়েওছেন বেশ বৈশিষ্ট্য দেখিয়েই। ওর পালিত পুত্র বখাটে ছোকরাটির চরিত্রে অনুপকুমার যতোবার আবির্ভূত হয়েছেন, প্রত্যেকবারই সবায়ের ওপর থেকে দর্শক-দৃষ্টি ছিনিয়ে নিয়েছেন। অনেকদিন পর চন্দ্রাবতীকে দেখা গেল বেশ জমাটি অভিনয়কুশলতা প্রদর্শন করতে—এ ছবিতে চামেলির চরিত্রে। দর্শক-দৃষ্টি হরণে লালমোহনের চরিত্রে শ্যাম লাহা কম কৃতিত্ব দেখান নি। চামেলিকে ওর মিসেস মা বলে সম্বোধন এবং মিঃ মুখার্জীকে মিস্টার বাবা বলে

ভারত চিত্রমের কালো বৌ চিত্রে কাজল ও বাণীর ভূমিকায় সন্ধ্যারাণী ও শোভা সেন

হিন্দী দেবদাস চিত্রে সুচিত্রা সেন

ডাকার ভঙ্গী হাসিতে প্রেক্ষাগৃহ ভরিয়ে তোলে। অনুভা গুপ্তা এতে আছেন প্রবীরের দ্বিতীয় স্ত্রী মৃণালের চরিত্রে; বিশেষ কিছু নেই চরিত্রটিতে। অন্যান্য শিল্পিবৃন্দ হচ্ছেন—সন্তোষ সিংহ, শিবকালী চট্টোপাধ্যায়, পঞ্চানন ভট্টাচার্য, ঋষি বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবুয়া, লীলাবতী প্রভৃতি।

* * *

কলাকৌশলের দিকে বিশেষভাবে প্রশংসনীয় হচ্ছে আলোকচিত্রের কাজ। রামানন্দ সেনগুপ্ত কাহিনীর ভাব অনুযায়ী পরিবেশ সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছেন। চারখানি মোটামুটি ধরনের গান আছে। আবহসঙ্গীতে কোন বৈশিষ্ট্য নেই। পরিচালনা করেছেন কালীপদ সেন। শব্দগ্রহণ করেছেন শ্যামসুন্দর ঘোষ, শিল্পনির্দেশক কার্তিক বসু এবং সম্পাদক বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়।

নূতন গ্রামোফোন রেকর্ড

সম্প্রতি বাজারে গ্রামোফোন কোম্পানীর কতকগুলি নূতন রেকর্ড বাহির হইয়াছে। তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইলঃ—

হিজ মাস্টারস্ ভয়েসঃ—সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের—দুইখানি আধুনিক গান (এন ৮২৬৫৬), রচনা গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। সুপ্রীতি ঘোষের দুইটি আধুনিক গান (এন ৮২৬৫৭) রচনা শ্যামল গুপ্ত। 'নাগিন' কথাচিত্রের গানের সুরে—ইলা চক্রবর্তীর দুইখানি বাংলা গান (এন ৮২৬৫৮), রচনা—পবিত্র মিত্র। আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায়, মৃণাল চক্রবর্তী, গায়ত্রী বসু ও প্রশান্তকুমার—গীত 'বিধিলিপি' কথাচিত্রের ৪খানি গানের দু'খানি রেকর্ড (এন ৭৬০১৫ ও এন ৭৬০১৬)। সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে 'কৃষ্ণসুদামা' ছবির দুইখানি গান (এন ৭৬০১৭) এবং শ্যামল মিত্র ও প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুইখানি 'কৃষ্ণসুদামা' ছবির গান (এন ৭৬০১৮)।

কলাম্বিয়াঃ—সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের দুইখানি আধুনিক গান (জি ই ২৪৭৬০), রচনা—গৌরীপ্রসন্ন, সুর—অনুপম ঘটক। মিণ্টু দাশগুপ্ত গীত দুইখানি কৌতুক গীতি (জি ই ২৪৭৬১)। শ্যামল মিত্র ও গায়ত্রী বসুর কণ্ঠে 'জয় মা কালী বোর্ডিং' চিত্রের দুইখানি রেকর্ড—জি ই ৩০২৯২ ও জি ই ৩০২৯৩)। রবীন মজুমদারের কণ্ঠে 'কৃষ্ণসুদামা' ছবির দুইখানি গান (জি ই ৩০২৯৪)। ক্ল্যারিয়নেটের মাধ্যমে অমর সিং যশোয়ালের 'নাগিন' চিত্রের দুইটি গানের সুর।

খেলার মাঠে

একলব্য

ইংলণ্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকার সদ্য সমাপ্ত ক্রিকেট টেস্টে ইংলণ্ড ৩—২ খেলায় জয়ী হয়ে 'রাবার' লাভ করেছে। ইংলণ্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকার এই পর্যায়ের টেস্টে দুই দলের সম্মুখেই ছিল 'রাবার' লাভের রঙীন হাতছানি। উপর্যুপরি প্রথম দু'টি টেস্টে বিজয়ী হ'য়ে ইংলণ্ড 'রাবার' লাভের পথ সুগম করে রাখে, পরের দু'টি টেস্টে জয়লাভ করায় দক্ষিণ আফ্রিকার সম্মুখে ভেসে ওঠে 'রাবার' বিজয়ের মধুর স্বপ্ন। ফলে পঞ্চম ও শেষ টেস্ট খেলার অনুষ্ঠান ক্ষেত্র কেনিংটন ওভ্যাল মাঠ হয়ে পড়ে দুই দেশের অভীষ্ট সিদ্ধির পরীক্ষাস্থল। আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বের মধ্যে দুই দলকেই এখানে ব্যাট বলের লড়াইয়ে তীব্র সংগ্রাম করতে হয়। শেষ পর্যন্ত ইংলণ্ড জয়ী হয়ে 'রাবার' লাভ করে।

ইংলণ্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক এবং ধুরন্ধর খেলোয়াড় আর্থার গিলিগান এই টেস্ট সম্পর্কে দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রীড়ানৈপুণ্যের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেছেন—"গত ৩০ বছরের মধ্যে ইংলণ্ডের মাটিতে সাগরপারের কোন দল এমন চমৎকার ফিল্ডিং নৈপুণ্য দেখিয়েছে বলে আমার মনে পড়ে না।" আর্থার গিলিগান দক্ষিণ আফ্রিকার খেলোয়াড়দের ব্যাটিং এবং বোলিংয়েরও প্রশংসা করেছেন।

দক্ষিণ আফ্রিকার ইংলণ্ড সফর এখনো শেষ হয়নি। তাই সমস্ত খেলার পর্যালোচনা করা এ নিবন্ধে সম্ভব নয়। শুধু পাঁচটি টেস্ট খেলার মধ্যেই এ সপ্তাহের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখতে হ'চ্ছে। এই টেস্টে ইংলণ্ডের নতুন অধিনায়ক পিটার মে সব চেয়ে বেশী কৃতিত্ব দাবী করতে পারেন। শুধু বেশী কৃতিত্বই নয়, নতুন কৃতিত্বও বটে। কারণ পাঁচটি টেস্টে তিনি যে রান সংগ্রহ করেছেন ইতিপূর্বে ইংলণ্ডের কোন অধিনায়কের পক্ষেই একটি টেস্ট পর্যায়ে এত বেশী রান সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। মে পাঁচটি টেস্টের নয়টি ইনিংসে সবসুদ্ধ রান করেছেন ৫০২ এবং তার রানের গড় হিসেব হ'য়েছে ৭২·৭৫ —দুই দলের মধ্যে শীর্ষস্থানের অধিকারী। মে'র পরে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন খ্যাতিমান ব্যাটসম্যান ডেনিস কম্পটন। নয়টি ইনিংসে কম্পটনের হ'য়েছে ৪৯২ রান। দ্বিতীয় টেস্টেই কম্পটনের টেস্ট খেলার পাঁচ হাজার রান পূর্ণ হয়ে যায়, যা বিশ্বের খুব বেশী খেলোয়াড়ের পক্ষে লাভ করা সম্ভব হয়নি। বিশ্ববন্দিত খেলোয়াড় ডেনিস কম্পটনের এই টেস্টই শেষ টেস্ট কি না কে জানে? কারণ ৪ বছর আগে হাঁটুতে জল জ'মে কম্পটনের খেলোয়াড় জীবনে ছেদ পড়ার যে সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল আবার সেই আশংকা দেখা দিয়েছে। যাই হোক, দুই দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে ব্যাটিং তালিকায় তৃতীয় স্থানের অধিকারী দক্ষিণ আফ্রিকার সহ অধিনায়ক জ্যাকি ম্যাক্‌গ্লু। দশ ইনিংসে ম্যাক্‌গ্লু ৪৭৬ রান করেছেন, এর মধ্যে তার সেঞ্চুরীর সংখ্যা দুই। ব্যাটিং তালিকায় দক্ষিণ আফ্রিকার জন ওয়েট চতুর্থ এবং রয় ম্যাকলীন পঞ্চম স্থানের অধিকারী। ষষ্ঠ স্থান অধিকার করেছেন ইংলণ্ডের উদীয়মান ব্যাটসম্যান টম গ্রেভনি।

বোলিংয়ের গড় হিসেবে ইংলণ্ডের ন্যাটা স্পিন বোলার জনি ওয়ার্ডলে শীর্ষস্থানের অধিকারী। তারপরের স্থান ফ্রাঙ্ক টাইসনের। দক্ষিণ আফ্রিকা দলের ফাস্ট বোলার এডি ফুলারের গড় হিসেব ভাল হলেও বোলিংয়ে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন ট্রেভর গডার্ড, হিউ টেফিল্ড ও পিটার হাইন।

কোন ব্যাটসম্যানই এই টেস্টে ডাবল সেঞ্চুরী করতে পারেন নি। ইংলণ্ড-অধিনায়ক পিটার মে ও দক্ষিণ আফ্রিকার সহ-অধিনায়ক জ্যাকি ম্যাক্‌গ্লু দু'বার করে
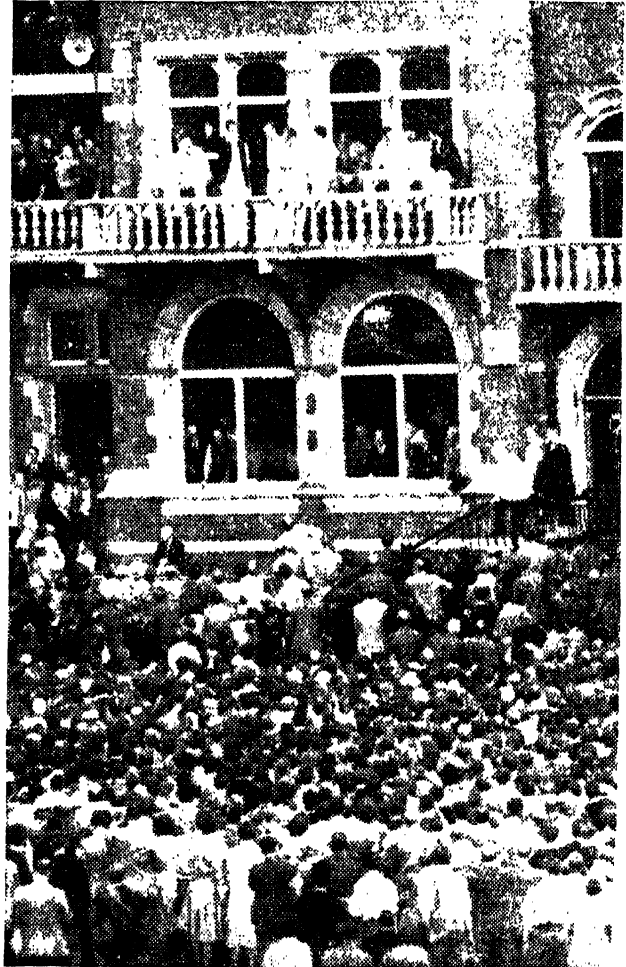
ইংলণ্ডের 'রাবার' বিজয়ী অধিনায়ক পিটার মে তার দলের খেলোয়াড়দের সংগে কেনিংটন ওভ্যালের ব্যাল্কনির উপর দাঁড়িয়ে দর্শকদের সম্বর্ধনা গ্রহণ করছেন

সেঞ্চুরী করেছেন। ইংলণ্ডের পক্ষে আরও যিনি সেঞ্চুরী করেছেন তিনি হচ্ছেন ডেনিস কম্পটন, কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার পক্ষে আরও ৪ জন ব্যাটসম্যান রাসেল এনডিন, রয় ম্যাকলীন, জন ওয়েট ও পল উইন্সলো সেঞ্চুরী করেছেন। একমাত্র প্রথম টেস্ট ছাড়া বাকী ৪টি টেস্ট পাঁচদিনে মীমাংসিত হয়। প্রথম টেস্টে জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হয়েছিল চতুর্থ দিনে। পাঁচটি টেস্টের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করা হচ্ছে।

প্রথম টেস্ট—ট্রেন্ট ব্রিজ মাঠ

৯ই জুন নটিংহ্যামশায়ারের ট্রেন্ট ব্রিজ মাঠে ইংলণ্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম টেস্ট খেলা আরম্ভ হয়। এই টেস্টে ইংলণ্ডের এক ইনিংস ও ৫ রানে জয়লাভের মূলে সবচেয়ে বেশী কৃতিত্ব ছিল দুইজন বোলারের। একজনের স্পিন এবং অপরের গতিবেগ মারাত্মক বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে। টসে বিজয়ী হয়ে ইংলণ্ড ৩৩৪ রান করবার পর দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটসম্যানরা ইংলণ্ডের বোলারদের সমীহ করে ব্যাট চালাতে থাকেন। ইয়র্কশায়ারের ন্যাটা স্পিন বোলার ওয়ার্ডলের বলের বিরুদ্ধে তারা ব্যাট তুলতেই চান না। ফলে এক সময়ে ওয়ার্ডলে উপর্যুপরি ১৩ বার 'মেডেন' পান এবং প্রথম ইনিংসে তার বোলিংয়ের হিসেব দাঁড়ায় ৩২-২৩-২৪-৪। দক্ষিণ আফ্রিকা ১৮১ রানের বেশী সংগ্রহ করতে না পারায় ফলো অনে বাধ্য হয়। দ্বিতীয় ইনিংসেও টাইসনের বলে তারা প্রমাদ গনেন। টাইসনও এক সময় মাত্র ৫ রানে ৫টি উইকেট পেয়ে শেষ পর্যন্ত ২৮ রানে ৬টি উইকেট দখল করেন। ফলাফলঃ—

ইংল্যাণ্ড—প্রথম ইনিংস—৩৩৪ (ডি কেনিয়ন ৮৭, পিটার মে ৮৩, টি বেলী ৪৯, টি গ্রেভনি ৪২; ফুলার ৫৯ রানে ৩ উইঃ)

দক্ষিণ আফ্রিকা—প্রথম ইনিংস—১৮১ (ডি ম্যাকগ্লু ৬৮, জে চিটহাম ৫৪; ওয়ার্ডলে ২৪ রানে ৪ উইঃ)

দক্ষিণ আফ্রিকা—দ্বিতীয় ইনিংস—১৪৮ (ডি ম্যাকগ্লু ৫১, টি গডার্ড ৩২; ফ্রাঙ্ক টাইসন ২৮ রানে ৬ উইঃ)

(ইংল্যাণ্ড এক ইনিংস ও ৫ রানে বিজয়ী)

দ্বিতীয় টেস্ট—লর্ডস মাঠ

লর্ডস মাঠে দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় ইংলণ্ড ৭১ রানে দক্ষিণ আফ্রিকাকে পরাজিত

দক্ষিণ আফ্রিকার দীর্ঘদেহী বোলার পিটার হাইনের বোলিং করবার ভঙ্গি। হাইনের দেহের উচ্চতা ৬ ফুট সাড়ে ৪ ইঞ্চি

করে রাবার লাভের পথ সুগম করে রাখে। দক্ষিণ আফ্রিকার দীর্ঘ দেহী বোলার পিটার হাইন, যার দেহের উচ্চতা ৬ ফুট সাড়ে চার ইঞ্চি, তার প্রশংসনীয় বোলিংয়ের ফলে ইংলণ্ড প্রথম ব্যাট করেও ১৩৩ রানের বেশী সংগ্রহ করতে পারে না। ৬০ রানে হাইন মে, গ্রেভনি, কম্পটন, বেরিংটন ও ইভান্সের উইকেট দখল করেন। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম ইনিংস শেষ হয় ৩০৪ রানে। বিপর্যয় দেখে ইংলণ্ড দ্বিতীয় ইনিংসে দৃঢ়তার সঙ্গে ব্যাটিং করতে আরম্ভ করে এবং ৩৫৩ রানে তাদের ইনিংস শেষ হয়। ১৮৩ রান করতে পারলেই জয় সুনিশ্চিত এই অবস্থায় দক্ষিণ আফ্রিকা দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে, কিন্তু ইংলণ্ডের ফাস্ট বোলার ব্রায়ান স্ট্যাথামের মারাত্মক বোলিং দক্ষিণ আফ্রিকার জয়লাভের আশা নির্মূল করে দেয়। স্ট্যাথাম ৩২ রানে ৭টি উইকেট দখল ক'রে অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেন। ৩২ রানে ৭টি উইকেট লাভ টেস্ট খেলায় স্ট্যাথামের জীবনের শ্রেষ্ঠ বোলিং 'এভারেজ'। অবশ্য এই টেস্টের আগের দুইটি কাউণ্টি ম্যাচে স্ট্যাথাম লিস্টারশায়ার ও উরস্টারশায়ারের বিরুদ্ধেও ৭টি ক'রে উইকেট পেয়েছেন। ফলে উপর্যুপরি তিনটি খেলায় তিনি ৭টি করে উইকেট লাভ করেন। দ্বিতীয় টেস্টে দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক জ্যাক চিটহামের বা হাতের কনুইয়ে আঘাত লাগে, ফলে তিনি পরের দু'টি টেস্টে অংশ গ্রহণ করতে পারেন না। ফলাফল—

ইংল্যাণ্ড—প্রথম ইনিংস—১৩৩ (কে বেরিংটন ৩৪; পিটার হাইন ৬০ রানে ৫ উইঃ, গডার্ড ৫৯ রানে ৪ উইঃ)

দক্ষিণ আফ্রিকা—প্রথম ইনিংস—৩০৪ (আর ম্যাকলিন ১৪২, এইচ কিথ ৫৭, আর এনডিন ৪৮; ওয়ার্ডলে ৬৫ রানে ৪ উইঃ)

ইংল্যাণ্ড—দ্বিতীয় ইনিংস—৩৫৩ (পিটার মে ১১২, টম গ্রেভনি ৬০, ডেনিস কম্পটন ৬৯; টেফিল্ড ৮০ রানে ৫ উইঃ, গডার্ড [illegible] রানে ৩ উইঃ)

দক্ষিণ আফ্রিকা—দ্বিতীয় ইনিংস—১১১ (আর এনডিন ২৮; স্ট্যাথাম ৩৯ রানে ৭ উইঃ, ওয়ার্ডল ১৮ রানে ২ উইঃ)

(ইংল্যাণ্ড ৭১ রানে বিজয়ী)

তৃতীয় টেস্ট—ওল্ড ট্রাফোর্ড মাঠ

ম্যানচেস্টারের ওল্ড ট্রাফোর্ড মাঠে ইংলণ্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকার তৃতীয় টেস্ট ম্যাচ। দক্ষিণ আফ্রিকার সম্মুখে কঠিন সমস্যা। ইংলণ্ড জয়লাভ করলেই 'রাবার' পাবে। তার উপর আবার দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক জ্যাক চিটহাম খেলতে পারছেন না। আগের খেলাতেই তার বাঁ হাতের কনুইয়ের হাড় ভেঙেছে। চিটহামের বদলে খেলতে নামলেন পল উইন্সলো—৬ ফুট লম্বা দেহ। অধিনায়কের দায়িত্ব পড়লো জ্যাকি ম্যাকগ্লুর উপর। ম্যাকগ্লু, উইন্সলো আর ওয়েট ইংলণ্ডের বোলারদের উপর আধিপত্য বিস্তার করে এমন চমৎকারভাবে ব্যাটিং করলেন যার ফলে দক্ষিণ আফ্রিকার জয়লাভ সহজ হল। অবশ্য শেষ দিনের খেলায় যথেষ্ট উত্তেজনা দেখা গিয়েছিল এবং জয়ের জন্য দু'ঘণ্টা সময়ের মধ্যে ১৪৫ রান করবার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। টেস্ট খেলায় দু'ঘণ্টায় ১৪৫ রান করা খুব সোজা কথা নয়, কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকা বেপরোয়া, মেরে খেলে দু'ঘণ্টার কিছু কম সময়েই প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে ৩ উইকেটে জয়লাভ করে। ম্যাকগ্লু, উইন্সলো ও ওয়েট তিনজনই দ্বিতীয় ইনিংসে সেঞ্চুরী করেন। এর মধ্যে উইন্সলার ব্যাটিং খুবই আনন্দদায়ক হয়। তিনি তিনটি ওভার বাউণ্ডারী মেরেছিলেন—

একটি বল প্যাভিলিয়নের ছাতের উপর পড়ে মাঠ পার হ'য়ে যায়। চতুর্থ দিনে উইকেট কিপার গডফ্রে ইভান্সের আঙুলে চোট লাগায় টম গ্রেভনিকে ইংলণ্ডের উইকেট কিপিং করতে হয়। ফলাফল ঃ

ইংল্যাণ্ড—প্রথম ইনিংস—২৮৪ (ডেনিস কম্পটন ১৫৮, ট্রেভর বেলী ৪৪, পিটার মে ৩৪; গডার্ড ৫২ রানে ৩ উইঃ, এ্যাডকক ৫২ রানে ৩ উইঃ, হাইন ৭১ রানে ৩ উঃ)

দক্ষিণ আফ্রিকা—প্রথম ইনিংস—(৮ উইঃ ডিক্লেঃ) ৫২১ (ম্যাকগ্লু ১০৪, জে ওয়েট ১১৩, পি উইনসলো ১০৮, টি গডার্ড ৬২, এইচ কিথ ৩৮; টাইসন ১২৪ রানে ৩ উইঃ)

ইংল্যাণ্ড—দ্বিতীয় ইনিংস—৩৮১ (পিটার মে ১১৭, কলিন কাউড্রে ৫০, টি বেলী ৩৮, জি ইভান্স ৩৬; পিটার হাইন ৮৬ রানে ৫ উইঃ, এ্যাডক ৪৮ রানে ৩ উইঃ)

দক্ষিণ আফ্রিকা—দ্বিতীয় ইনিংস—(৭ উইঃ) ১৪৭ (আর ম্যাকলিন ৫০, ডি ম্যাকগ্লু ৪৮; টাইসন ৫৫ রানে ৩ উইঃ, বেডসার ৬০ রানে ২ উইঃ)

(দক্ষিণ আফ্রিকা ৩ উইকেটে বিজয়ী)

চতুর্থ টেস্ট—লীডস মাঠ

লীডস মাঠে চতুর্থ টেস্ট আরম্ভের সময় দক্ষিণ আফ্রিকা কিছুটা মনোবল সংগ্রহ করেছে, তবুও সংশয়, অধিনায়ক নেই, এ খেলাতেও ইংলণ্ডের সম্মুখে 'রাবারের' হাতছানি। কিন্তু ব্যাটিং, বোলিং ও ফিল্ডিং—ক্রিকেট খেলার তিনদিকেই চমৎকার পারদর্শিতা দেখিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা এই খেলাতে ২২৪ রানে জয়লাভ করে। জ্যাক ম্যাকগ্লু এ টেস্টেও সেঞ্চুরী করেন, আর সেঞ্চুরী করেন রাসেল এনডিন। পিটার হাইন, ট্রেভর গডার্ড এবং হিউজ টেফিল্ডের বোলিং কার্যকরী হয়। মিডিয়াম ফাস্ট ন্যাটা বোলার গডার্ডকে দ্বিতীয় ইনিংসে একটানা ৪ ঘণ্টা বোলিং করতে দেখা যায় এবং শেষ পর্যন্ত তাঁর বোলিংয়ের হিসেব দাঁড়ায় ৬২-৩৭-৬৯-৫। সত্যিই চমৎকার এভারেজ। ১৯০১ সাল থেকে দুই দেশের মধ্যে টেস্ট খেলার প্রবর্তনের পর ইংলণ্ডে দক্ষিণ আফ্রিকা কোনদিন দু'টি টেস্ট খেলায় জিততে পারেনি। পর পর দু'টি খেলায় জয়লাভ করায় এই সফরে এর ব্যতিক্রম ঘটলো। ফলাফল ঃ—

দক্ষিণ আফ্রিকা—প্রথম ইনিংস—১৭১ (আর ম্যাকলিন ৪১, আর এনডিন ৪১, ডি ম্যাকগ্লু ২৮, এইচ টেফিল্ড ২৫; লোডার ৫২ রানে ৪ উইঃ, স্টাথাম ৩৫ রানে ৩ উইঃ)

ইংল্যাণ্ড—প্রথম ইনিংস—১৯১ (ডেনিস কম্পটন ৬১, পিটার মে ৪৭, জে ওয়ার্ডলে ২৪; হাইন ৭০ রানে ৪ উইঃ, টেফিল্ড ৭০ রানে ৪ উইঃ)

দক্ষিণ আফ্রিকা—দ্বিতীয় ইনিংস—৫০০

বিশ্ববন্দিত ক্রিকেট খেলোয়াড় ডেনিস কম্পটনের ব্যাটিং করবার ভঙ্গি

(জে ম্যাকগ্লু ১৩৩, আর এনডিন নঃ আঃ ১১৬, টি গডার্ড ৭৪, এইচ কিস ৭৩, জে ওয়েট ৩২; জে ওয়ার্ডলে ১০০ রানে ৪ উইঃ)

ইংল্যাণ্ড—দ্বিতীয় ইনিংস—২৫৬ (পিটার মে ৯৭, ডি ইনসোল ৪৭, টি গ্রেভনি ৩৬, ডেনিস কম্পটন ২৬; টি গডার্ড ৬৯ রানে ৫ উইঃ, টেফিল্ড ৯৪ রানে ৫ উইঃ)

(দক্ষিণ আফ্রিকা ২২৪ রানে বিজয়ী)

পঞ্চম টেস্ট—কেনিংটন ওভাল

কেনিংটন ওভ্যাল মাঠে পঞ্চম ও শেষ খেলা আরম্ভের সময় দুই দলেরই বুক দুরু দুরু—কি হয়, কি হয় ভাব। দুই দেশই দু'টি করে টেস্ট জিতেছে— দুই দেশের সম্মুখেই রাবারের হাতছানি, আবার পরাজয়েরও আশংকা। তারপর বৃষ্টিভেজা পিচ ফলাফলকে নিশ্চিত করে তুললো—খেলা অমীমাংসিত থেকে যাবার সম্ভাবনা কম, নেই বললেই চলে। বৃষ্টির ফলে প্রথম দিন আড়াই ঘণ্টার বেশী খেলা সম্ভব হল না। ইংলণ্ড টসে জয়লাভ করে পিচ আরও খারাপ হবার আশংকায় প্রথমে ব্যাটিং শুরু করলো। আইকিন এবং ব্রায়ান ক্লোজ সতর্কতার সঙ্গে খেলা আরম্ভ করলেন। দুইজনই ন্যাটা ব্যাটসম্যান এবং ইংলণ্ডের নতুন প্রথম জুটি। ইংলণ্ড প্রথম ইনিংসে ১৫১ রানের বেশী সংগ্রহ করতে পারলো না। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম ইনিংস আরও কম রানে শেষ হ'ল। দ্বিতীয় ইনিংসে অধিনায়ক মে, গ্রেভনি ও কম্পটনের দৃঢ়তাপূর্ণ ব্যাটিংয়ে ইংলণ্ড সংগ্রহ করলো ২০৪ রান। কঠিন সমস্যা দক্ষিণ আফ্রিকার সম্মুখে। তাদের উইকেট টিকে থাকবার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল। ইংলণ্ড ৯২ রানে খেলায় জিতলো আর 'রাবার' জিতলো ৩—২ খেলায়। পঞ্চম টেস্টে দুই দেশের দুই কৃতী স্পিন বোলার লক ও টেফিল্ডের বোলিং খুবই প্রশংসনীয় হয়। টনি লক ৫৫ ওভার ২৫ মেডেন ও ১০১ রানে ৮টি উইকেট পান আর টেফিল্ডের হিসেব দাঁড়ায়—৮২.৪—৩৬—৯১—৮ উইকেট। ফলাফল ঃ—

ইংল্যাণ্ড—প্রথম ইনিংস—১৫১ (ডি বি ক্লোজ ৩২, ডেনিস কম্পটন ৩০, ডব্লিউ ওয়াটসন ২৫; গডার্ড ৩১ রানে ৫ উইঃ, টেফিল্ড ৩৯ রানে ৩ উইঃ)

দক্ষিণ আফ্রিকা—প্রথম ইনিংস—১১২ (জে ম্যাকগ্লু ৩০, জে ওয়েট ২৮; টনি লক ৩৯ রানে ৪ উইঃ, লেকার ২৮ রানে ২ উইঃ, বেলী ৬ রানে ১ উইঃ)

ইংল্যাণ্ড—দ্বিতীয় ইনিংস—২০৪ (পিটার মে ৮৯, টম গ্রেভনি ৪২, ডেনিস কম্পটন ৩০; এইচ টেফিল্ড ৬০ রানে ৫ উইঃ)

দক্ষিণ আফ্রিকা—দ্বিতীয় ইনিংস—১৫১ (জে ওয়েট ৬০, টি গডার্ড ২০; লেকার ৫৬ রানে ৫ উইঃ, লক ৬২ রানে ৪ উইঃ)

(ইংলণ্ড ৯২ রানে বিজয়ী)
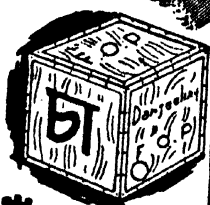
দেশী সংবাদ

১৬ই আগস্ট—প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহর, আজ লোকসভায় এক বিবৃতি প্রসঙ্গে গোয়ায় পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষের আচরণকে নৃশংস ও বর্বরোচিত বলিয়া নিন্দা করেন।

গোয়ায় নিহত সত্যাগ্রহীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন এবং পর্তুগীজ নৃশংসতার প্রতিবাদে আজ বোম্বাই ও দিল্লীতে পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। বোম্বাইয়ে এক বিরাট জনতা পর্তুগীজ কনসাল অফিসে ভারতীয় পতাকা উত্তোলন করে।

গোয়ায় নিরস্ত্র সত্যাগ্রহীদের উপর পর্তুগীজ সরকারের গুলী চালনার প্রতিবাদে এইদিন কলিকাতায় ছাত্র বিক্ষোভ দেখা দেয় এবং একদল ছাত্রছাত্রী কলিকাতায় পর্তুগীজ কনসালের অফিস ভবনের শীর্ষদেশে ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে।

১৭ই আগস্ট—গোয়ায় পর্তুগীজ পুলিসের গুলিচালনায় নিরস্ত্র সত্যাগ্রহীদের মৃত্যুবরণের সংবাদে সারা পশ্চিম বাঙ্গলার জনসাধারণের মনে যে গভীর বেদনা ও ক্ষোভের সঞ্চার হইয়াছে, আজ কলিকাতা মহানগরী ও পার্শ্ববর্তী শিল্পাঞ্চলে সর্বাত্মক সাধারণ হরতাল ও ধর্মঘটে তাহা বহিঃপ্রকাশ লাভ করে।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহর, আজ লোকসভায় বলেন যে, ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতা দিবসে গোয়াবাসীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে গোয়ার অভ্যন্তরে ব্যাপক বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।

১৮ই আগস্ট—আজ লোকসভায় প্রধান-মন্ত্রী শ্রীনেহর, বলেন যে, স্বাধীনতা দিবসে গোয়ায় পর্তুগীজ সৈন্যদের গুলীতে ২২ জন ভারতীয় সত্যাগ্রহী নিহত হইয়াছেন বলিয়া সর্বশেষ সরকারী বিবরণে জানা গিয়াছে।

আজ লোকসভায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহর, ঘোষণা করেন যে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত এজেন্সীর অসামরিক কর্তৃপক্ষকে উক্ত এলাকার তুয়েনসাং বিভাগে ইতস্তত হিংসাত্মক কার্যকলাপ দমনে সহায়তার জন্য এক ব্যাটেলিয়ন ভারতীয় সৈন্য প্রেরণ করা হইতেছে।

পর্তুগীজ পুলিস কর্তৃক পাঁচ শতাধিক সত্যাগ্রহীকে এক অপ্রশস্ত কক্ষে তালাবদ্ধ অবস্থায় রাখা হয় এবং উহার ফলে তাঁহাদের মধ্যে ৫০ জন সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়েন বলিয়া জানা গিয়াছে।

১৯শে আগস্ট—পশ্চিমবঙ্গ সরকার চিনি, দিয়াশলাই ও স্বর্ণালঙ্কারের উপর বিক্রয়-কর ধার্যের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বর্তমান

অধিবেশনেই উপরোক্ত উদ্দেশ্যে বিক্রয়কর আইনটি সংশোধনের জন্য উত্থাপন করা হইবে।

পশ্চিমবঙ্গে ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যা সমাধানকল্পে প্রস্তাবিত ইস্পাত কারখানাটি দুর্গাপুরে স্থাপন করার জন্য ভারত সরকারকে অনুরোধ জানাইয়া পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় সর্বসম্মতিক্রমে এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

ভারত সরকার তাহাদের কন্সাল জেনারেলকে ভারতস্থিত পর্তুগীজ ছিটমহল হইতে ফিরাইয়া আনার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আগামী ১লা সেপ্টেম্বর হইতে ভারতীয় দূতাবাস বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। ভারত সরকার বোম্বাইস্থিত পর্তুগালের কন্সাল জেনারেল এবং কলিকাতা ও মাদ্রাজের অনারারী কন্সাল-দিগকেও আগামী ১লা সেপ্টেম্বর অথবা তৎপূর্বে তাঁহাদের দূতাবাসগুলি বন্ধ করিয়া দেওয়ার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন।

আজ লোকসভায় প্রেস কমিশনের রিপোর্ট লইয়া ১২ ঘণ্টাব্যাপী আলোচনা আরম্ভ হয়, কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রী ডাঃ কেশকার জানান যে, রিপোর্টের বেশীর ভাগ সুপারিশ সম্বন্ধেই সরকার মোটামুটি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

২০শে আগস্ট—আজ পশ্চিমবঙ্গ বিধান-সভায় তুমুল বিতর্কের পর ফৌজদারী কার্য-বিধি (পশ্চিমবঙ্গ সংশোধন) বিলটি ১১১-৪১ ভোটে গৃহীত হয়। ১৮৯৮ সালের ফৌজদারী কার্যবিধি আইনের কতকগুলি বিধান সংশোধন করিয়া জনসাধারণের মধ্য হইতে জাস্টিস অব পিস নিয়োগ এবং অপরাধ দমনে শাসন কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করা ও সাধারণের কল্যাণ বিধানার্থ তাঁহাদের হস্তে কতকগুলি ক্ষমতা অর্পণ করাই ঐ বিলের উদ্দেশ্য।

২১শে আগস্ট—দোদমার্গ সীমান্ত হইতে যে তৃতীয় সত্যাগ্রহীদল গোয়ায় প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেই দলের ৪০ জন সত্যাগ্রহীর সকলকেই গতকল্য সন্ধ্যায় পর্তুগীজ এলাকা হইতে ভারতে নিক্ষেপ করা হয়। সাদা পোশাকধারী পর্তুগীজ পুলিস সত্যাগ্রহীদের [illegible]মভাবে প্রহার করে।

চলতি বৎসরে কলিকাতা ও শহরতলী অঞ্চলে উদ্বাস্তু ছাত্রছাত্রীগণের জন্য ছয়টি নূতন কলেজ স্থাপন করা হইবে। ইহার মধ্যে চারটি হইবে কেবলমাত্র ছেলেদের জন্য এবং দুইটি হইবে মেয়েদের জন্য।

বিদেশী সংবাদ

১৬ই আগস্ট—পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী চৌধুরী মহম্মদ আলী আজ ঘোষণা করেন যে, ১৯৫৭ সালের প্রথম ভাগে পাকিস্থানে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে এবং আগামী ২।৩ মাসের মধ্যে দেশের সংবিধান রচনা করা হইবে।

গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে খণ্ডিত কোরিয়ার পুনর্মিলনের উপায় উদ্ভাবনকল্পে উত্তর কোরিয়া যে বৈঠকের প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিল, দক্ষিণ কোরিয়া সরকার আজ তাহা সরকারীভাবে অগ্রাহ্য করেন।

১৭ই আগস্ট—ফরাসী আণবিক শক্তি কমিশনের প্রধান ধাতু বিজ্ঞানবিদ ডাঃ চার্লস একমার অদ্য জেনেভায় এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, আন্তর্জাতিক পরমাণু বিজ্ঞান সম্মেলনের অদ্যকার অধিবেশনে ভারতবর্ষ জিরকোনিয়াম সম্পর্কে অতিশয় মূল্যবান এক তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন।

১৯শে আগস্ট—লণ্ডনস্থ সুদান এজেন্সী ঘোষণা করিয়াছেন যে, গতকল্য সুদান প্রতিরক্ষা বাহিনীর তিনটি কোম্পানী বিদ্রোহ করায় সুদানের দক্ষিণ প্রদেশগুলিতে আপৎ-কালীন অবস্থা ঘোষণা করা হইয়াছে।

অদ্য সোভিয়েট সরকারের মুখপত্র 'ইজভেস্তিয়ায়' রুশ পদার্থ বিজ্ঞানী ডক্টর জি আই পক্রোভস্কি কর্তৃক লিখিত এক প্রবন্ধে বলা হইয়াছে যে, ঊর্ধ্বাকাশে কৃত্রিম উপগ্রহ প্রেরণ সংক্রান্ত প্রারম্ভিক গবেষণা কার্য সম্পূর্ণ হইয়াছে।

২০শে আগস্ট—আমেরিকায় এক প্রলয়ঙ্কর বন্যায় ৯২ জন মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। নিউইয়র্ক সহ চারটি প্রদেশে গভর্নরগণ আপৎকালীন অবস্থা ঘোষণা করিয়াছেন।

২১শে আগস্ট—ফরাসী কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করিয়াছেন যে, উত্তর আফ্রিকার আলজিরিয়ায় গতকল্য ব্যাপক দাঙ্গা হাঙ্গামায় অন্তত ৪৬০ জন বিদ্রোহী ও ৬৯ জন সেনা নিহত হয়। মরক্কোর বিভিন্ন স্থানে দাঙ্গাহাঙ্গামায় অন্তত ২১০ জন নিহত হইয়াছে। নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে প্রায় একশতজন ইউরোপীয়। দাঙ্গা হাঙ্গামার ফলে ইউরোপীয় অধ্যুষিত বহু জেলা বিধ্বস্ত হইয়াছে।

প্রতি সংখ্যা—১৯ আনা, বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০,
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা, লিমিটেড, ৬ ও ৮, সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১৩
শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক এবং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস লিমিটেড হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

২২ বর্ষ
দেশ
শনিবার
৪৪ সংখ্যা
১৭ ভাদ্র, ১৩৬২
DESH
SATURDAY, 3RD SEPTEMBER, 1955.

সম্পাদক—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন

সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

সাময়িক প্রসঙ্গ

মর্মান্তিক দুর্ঘটনা

গত ২৩শে আগস্ট সন্ধ্যাবেলা মুর্শিদাবাদ ও নসিপুর স্টেশনের মধ্যে কুর্মিটোলা উদ্বাস্তু শিবিরের ৬ জন উদ্বাস্তু ট্রেনে চাপা পড়িয়া নিহত এবং কয়েকজন আহত হইয়াছেন। ঘটনার বিবরণীতে দেখা যায়, উদ্বাস্তুদের জন্য অর্থসাহায্য প্রেরণে বিলম্ব ঘটায় ৫ শত উদ্বাস্তু নরনারী রেললাইনে উপবিষ্ট থাকিয়া ধর্মঘট আরম্ভ করেন। ইহার ফলেই দুর্ঘটনাটি ঘটে। সরকারী কার্যের প্রতিবাদস্বরূপে রেলপথ রোধ করা উদ্বাস্তুদের পক্ষে এই নূতন নহে। এই উপায় ইতোপূর্বেও অবলম্বিত হইতে দেখা গিয়াছে। জন সাধারণের অসুবিধা এবং উদ্বাস্তুদের নিজেদের জীবনের ঝুঁকির দিক হইতে এইরূপ চেষ্টার অনৌচিত্য আমরা স্বীকার করি না কিন্তু এই ক্ষেত্রে উদ্বাস্তুদের মানসিক অবস্থার কথাও বিবেচনা করা দরকার। অন্নাভাবে মানুষের সব সময় ঔচিত্য-অনৌচিত্য বোধ থাকে না। অসহায় উদ্বাস্তুদের সম্বন্ধে এ কথা বিশেষভাবেই প্রযোজ্য। সরকারের পক্ষে বিবৃতিতে সুস্পষ্টভাবেই এই সত্য স্বীকৃত হইয়াছে যে, উদ্বাস্তুদের জন্য নির্দিষ্ট খয়রাতী অর্থ তাহাদের শিবিরে পোঁছিতে বিলম্ব ঘটে। একাউণ্ট অফিস হইতে চেক যথাসময়ে পাঠানো হয় নাই, একজন কর্মচারীর ত্রুটির জন্য এমনটা হয়। ৮ দিন বিলম্ব ঘটিবার পর জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী উদ্বাস্তুদের মধ্যে অর্থসাহায্য বিতরিত হয়। চেকখানাও সেইদিন গিয়া পোঁছে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, তৎপূর্বেই দুর্ঘটনা ঘটিয়া যায়। উদ্বাস্তুদের সাহায্য বিধানে বিলম্বের অভিযোগ বহুদিন হইতেই আছে। দুর্গত এবং নিতান্ত নিঃস্ব এই শ্রেণীর উদ্বাস্তু নরনারীদের সম্বন্ধে ঔদাসীন্যের প্রতিবেশ পশ্চিমবঙ্গের শাসন-বিভাগে কতখানি রহিয়াছে এবং কিভাবে কাজ করিতেছে, কুর্মীটোলার শোচনীয় ব্যাপারে ৬ জন উদ্বাস্তুর জীবন দিবার পর সেই সত্যের নিষ্ঠুর স্বরূপ উন্মুক্ত হইল। ইহাতে লোকের মনে বিক্ষোভের সৃষ্টি হইবে, ইহাই স্বাভাবিক। চেক পাঠাইতে কর্মচারী বিশেষের ব্যক্তিগত ত্রুটির সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়াও আমরা আমাদের মন হইতে তজ্জনিত বেদনা দূর করিতে পারিতেছি না। হিসাবে টাকা দেওয়ার যে ক্ষমতা এই ব্যাপারের পর ম্যাজিস্ট্রেটকে দেওয়া হইয়াছে, পূর্বে তেমন ব্যবস্থা কেন করা হয় নাই, এমন অভিযোগের কারণ যখন পূর্বেও ঘটিয়াছে, এই প্রশ্ন থাকিয়াই যাইতেছে। অন্নাভাবে পড়িলে মানুষের অবস্থা কি দাঁড়ায় ভুক্তভোগী ছাড়া তাহা অপরের পক্ষে উপলব্ধি করা কঠিন ইহাই হইতেছে সমস্যা।

গোয়া সত্যাগ্রহের মনস্তাত্ত্বিকতা

গোয়া সম্পর্কে ভারত সরকার অহিংস নীতিতে দৃঢ় থাকিবেন, তাঁহাদের এই সংকল্প। ভারতের রাষ্ট্রীয় মর্যাদা এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সেই আদর্শের রীতির পরিপূর্তির দিক হইতে সরকারী নীতির সমীচীনতা স্বীকার করিয়া লইতে হয়। কিন্তু এই অহিংস নীতির আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াও ভারত সরকার পর্তুগীজ গভর্নমেণ্টের অনমনীয় মনোভাব দমন করিবার উদ্দেশ্যে সব ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই। প্রারম্ভিক হিসাবে দুই একটি ব্যবস্থা তাঁহারা অবলম্বন করিয়াছেন মাত্র। কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতির আগামী অধিবেশনে এই সম্বন্ধে কি নীতি অবলম্বিত হইবে, তৎপ্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট রহিয়াছে। আমাদের অভিমত এই যে, ভারতের সর্বপ্রধান রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে কংগ্রেসের সর্বতোভাবে সমর্থন যে গোয়া সত্যাগ্রহের পশ্চাতে রহিয়াছে এবং ভারত সরকার যে সত্যাগ্রহের সেই অহিংস প্রচেষ্টা সমর্থন করেন, এই সত্যটি সুস্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। এ সম্বন্ধে কোনরূপ ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি না হয়, এদিকে লক্ষ্য থাকা দরকার। ভারতের প্রধান মন্ত্রীর সাম্প্রতিক গৌহাটি বক্তৃতা এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই বক্তৃতায় তিনি গোয়ার মুক্তি অর্জনে সত্যাগ্রহীদের বীরত্বের এবং তাহাদের সাহসিকতার আন্তরিকভাবে প্রশংসা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের অবলম্বিত নীতির সহিত মহাত্মা গান্ধীর প্রবর্তিত সত্যাগ্রহের মূল আদর্শের মিল কতখানি, এই বিষয়ে গভীর সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। ভারতের প্রধান মন্ত্রী বলিয়াছেন, সত্যাগ্রহীরা শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের কথা মুখে বলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা সম্ভবত মনে মনে

বন্দুকের লড়াইয়ের কথাই ভাবেন। ভারত সরকারের এতৎসম্পর্কিত নীতির বিভিন্নরূপ সমালোচনার কথা আমরা এক্ষেত্রে উল্লেখ করিব না। সে সম্বন্ধে ভিন্নমত থাকা বিচিত্র নয়। কিন্তু সত্যাগ্রহীরা কেহ সত্যাগ্রহ করিতে গিয়া অহিংস নীতি লঙ্ঘন করিয়াছেন, আমরা ইহা জানি না। পরন্তু পর্তুগীজদের বর্বর অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাঁহারা অহিংস নীতিতে নিষ্ঠাবুদ্ধির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া তাহাদের বন্দুকের গুলীর সম্মুখে আগাইয়া গিয়াছেন এবং যাইতে প্রস্তুত হইয়াছেন। ব্যক্তিগতভাবে কাহার মনে কি আছে, সে বিচারে প্রবৃত্ত না হইয়া গোয়া সত্যাগ্রহ আন্দোলনের নীতির দিক হইতে অহিংসার আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিবার সংকল্পশীলতাকে বড় করিয়া দেখা প্রয়োজন এবং ইহার সমর্থনের জন্য কংগ্রেস ও ভারত সরকারের সর্বান্তঃকরণে অগ্রসর হওয়া আমরা কর্তব্য বলিয়া মনে করি।

দস্যুসর্দার মানসিংহ

২৫শে আগস্ট মধ্যভারতের স্বরাষ্ট্র-সচিব শ্রীনরসিং রাও দীক্ষিতের মতে মধ্য-ভারতের পক্ষে ১৫ই আগস্টের মতই উৎসবের দিন। কারণ ঐ দিন প্রসিদ্ধ দস্যু মানসিংহ নিহত হইয়াছে। তাহার মৃত্যুতে ১৫ লক্ষ নরনারী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়াছে। মধ্যপ্রদেশ, উত্তর প্রদেশ, বিন্ধ্যপ্রদেশ এবং রাজস্থান এই চারটি রাজ্য জুড়িয়া ২০ বৎসরকাল মানসিংহ খুন ডাকাতি চালায়। দস্যু-সর্দার মানসিংহকে ভারতের রবিনহুড বলা হইত। কেহ কেহ রাজাও বলিত। বাঙলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী তান্তিয়া ভীলের জীবনী আলোচনা প্রসঙ্গে এইরূপ মন্তব্য করিয়া-ছিলেন যে, বড় রকমের সাধু হইতে হইলে যেমন সাধনার দরকার, বড় রকমের পাপী হইতে হইলেও অনেকটা সেইরূপ সাধনার পথেই অন্যভাবে যাইতে হয়। তাঁহার মতে ঊর্ধ্ব ও অধঃ মানুষের জীবনের দুইটি চরম প্রান্তেই পরম সত্য রহিয়াছে। এমন দার্শনিকতার সঙ্গে অবশ্য আমাদের বাস্তব জীবনের সামঞ্জস্য বিধান করা যায় না। কারণ, জীবনের এই দুইটি চরমপ্রান্তে সাধারণে যাইতে পারে না, সুতরাং তাহা সমাজ-ভূমিও নয়। তবে এ কথা সত্য যে, প্রচণ্ড পাপের মধ্যেও বলিষ্ঠ এবং বিস্ময়কর একটা বৈচিত্র্য রহিয়াছে। সামাজিক আশ্রয় হইতে বিচ্ছিন্ন যাহার জীবন, সে তজ্জনিত অসহায়ত্বের দৈন্যকে বাহ্যিক উদারতার সামাজিকসূত্র-সংস্পর্শে পূরণ করিয়া লইতে চেষ্টা করিবে, ইহা স্বাভাবিক। বস্তুত, এইভাবে অহংকারকে কিছুটা চাঙ্গা করিয়া রাখিতে না পারিলে সে বাঁচে না। মানুষ সব অবস্থাতেই মূলত মর্যাদায় সামাজিক জীব। বাঙলার রঘু ডাকাত এইদিক হইতে ঐতিহাসিক খ্যাতি লাভ করিয়াছে। দক্ষিণ ভারতের জম্বুলিঙ্গম নাদার ধনীর বিত্ত লুণ্ঠন করিয়া তান্তিয়া ভীলের মত দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করিত, ইহা শুনা যায়। সৌরাষ্ট্রের ডাকাত ভূপৎ পাকিস্থানে গিয়া পলাইয়া আছে, সে ঠিক এই শ্রেণীর মধ্যে পড়ে না। মানসিংহেরও এই দিককার জীবন আমাদের কাছে অজ্ঞাত। সে নাকি খুব পূজা-আর্চা লইয়া থাকিত। তাঁহার দানধ্যানের কথা সংবাদ-পত্রে প্রাধান্য পায় নাই, সুতরাং ভারতের রবিনহুড আখ্যা তাহার পক্ষে যথার্থ হইয়াছে কি না, এ বিচার করা সম্ভব নয়। মানসিংহের দুরন্ত জীবনের এই দিকটা একেবারেই গোপন। প্রকাশ্যে সে দস্যু, সে নরঘাতক, সে নিষ্ঠুর। কিন্তু তাহার এই যে প্রকাশ্য জীবন, ইহার জন্য সে প্রশংসা পাইতে পারে। সে তাহার সত্যকার স্বরূপকে সমাজের কাছে ঘোষণা করিয়াছে; শুধু তাহাই নহে, জীবন দিয়া তাহাকে প্রতিষ্ঠা দিয়াছে। ভীরুর মত সে সাধু সাজিয়া দুর্বলের সর্বনাশ করে নাই। দস্যু সে, শাণিত অস্ত্রে সে বহু নরনারীর রক্তের ধারায় পৃথিবীর মাটি সিক্ত করিয়াছে, কিন্তু ভাম্পায়ার বাদুড়ের মত মানুষের রক্ত শোষণ করিয়া সে স্বচ্ছন্দ জীবন যাপন করে নাই। মানসিংহের প্রকাশ্য দস্যুজীবনের হিংস্রতার গ্লানি এ দেশের সমাজ-জীবনের অপ্রকাশ্য বা গোপনভাবে যে সমাজদ্রোহী হিংস্রতা চলিতেছে, সেদিকে আমাদের দৃষ্টি উন্মুক্ত করিবে কি? মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মানসিংহের নিধন-কামনায় অমরনাথে গিয়া মানত করিয়াছিলেন। সমাজদ্রোহী প্রচ্ছন্নচারী নরঘাতক দস্যুদের উৎখাত কামনা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মন্ত্রীদিগকে কতখানি আগ্রহান্বিত করিয়া তুলিয়াছে, ইহাই বিবেচ্য।

ভারতীয় সংস্কৃতি ও সংহতি

সম্প্রতি ভারতীয় সংস্কৃতি পরি-ষদের উদ্যোগে পরিহাস সম্মেলন নামে একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। এই সম্মেলনে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে কয়েকজন খ্যাতনামা পরিহাসরস-স্রষ্টা সাহিত্যিক যোগদান করেন। ভারত সরকারের তথ্য এবং বেতার বিভাগের মন্ত্রী ডাঃ কেশকার এই অনুষ্ঠানে ভারতীয় সংস্কৃতির মূলগত ঐক্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁহার মতে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার সমুন্নতি সাধনের ভিতর দিয়াই রাষ্ট্রীয় ভাষা হিন্দীকে সমৃদ্ধি সাধন সম্ভব। ডাঃ কেশকারের এই উক্তিতে অবশ্য নূতনত্ব কিছু নাই। ভারতের বিভিন্ন ভাষার প্রচলন থাকা সত্ত্বেও ভারতীয় সংস্কৃতির মূলগত ঐক্যের কথা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। ফলত ভারতের ঐতিহ্য এই ঐক্যের উপরই গড়িয়া উঠিয়াছে। স্বাধীনতা লাভ করিবার পর অখণ্ড ভারতের এই ঐক্যবোধকে সমধিক পরি-স্ফুট এবং বলিষ্ঠ করিবার প্রয়োজন দেখা দিয়াছে এবং সেজন্য সুযোগও আসিয়াছে। প্রাচীন ভারতের সাংস্কৃতিক ঐক্য বা সংহতিবোধ প্রধানত ধর্মকে আমাদের মতে ভাষাগত বিভিন্নতা বা বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়াই ভারতের সংহতিকে মর্যাদাবোধে বলিষ্ঠ করিয়া তুলিতে হইবে এবং সেই প্রয়ো-জন সম্পন্ন করিবার পক্ষে রাজ-নীতিকদের চেয়ে কবি, শিল্পী এবং সাহিত্যিকদের সাধনার মূল্য বেশী। ইঁহাদের সেই মর্যাদা রাষ্ট্রকে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। ফলত শাসকদের পক্ষ হইতে সেই মর্যাদার স্বীকৃতিমূলক নীতি অবলম্বনের উপরই ভারতীয় সংস্কৃতির অভিনব উজ্জীবন নির্ভর করিতেছে।

ফরাসী গভর্নমেণ্ট মরক্কো ও অ্যালজেরিয়া ফরাসী সৈন্য দিয়ে ভরে ফেলছেন। NATOকে প্রদত্ত সৈন্য থেকে পর্যন্ত ৫০ হাজার সৈন্য উত্তর আফ্রিকায় চালান করা হচ্ছে—ফরাসী সাম্রাজ্যবাদী এবং ঔপনিবেশিক স্বার্থ রক্ষার জন্য। সারা মরক্কো এবং আলজেরিয়ায় সামরিক কর্তৃত্ব ও শাসনের সঙ্গে প্রচণ্ড ত্রাসনীতি চলছে। কিন্তু কেবল পিটিয়ে ঠাণ্ডা করার নীতি সফল হবে, এ আশা ফরাসীরাও করে না। বিষয়টা U N O-তে উঠার সম্ভাবনা আছে, তখন চক্ষুলজ্জা রক্ষা করার মতো একটা কিছু বলতেও হবে। তা ছাড়া আরব জাতিগুলি তথা "মুসলিম দুনিয়া" চটে যাচ্ছে, সেজন্য বৃটেন ও আমেরিকাও উদ্বিগ্ন বোধ করছে। সুতরাং কেবল গোলাগুলী দিয়ে কাজ হবে না বুঝে ফরাসী গভর্নমেণ্ট সঙ্গে সঙ্গে মরক্কোতে একটা রাজনৈতিক রফার আলোচনাও চালাচ্ছেন।

প্রকৃতপক্ষে মঃ গ্রাঁদভাল মরক্কোর রেসিডেণ্ট-জেনারেল নিযুক্ত হয়ে এসে একটা রাজনৈতিক রফার দিকেই অগ্রসর হবার চেষ্টায় ছিলেন। কিন্তু স্থানীয় ফরাসী ঔপনিবেশিকগণ মঃ গ্রাঁদভালের চেষ্টাকে ব্যর্থ করার জন্য সন্ত্রাসবাদী কাজ শুরু করে। তারা কেবল "নেটিভ" মারা আরম্ভ করে তা নয়, ফরাসী পুলিসের মধ্যে যাঁরা ঔপনিবেশিকদের সন্ত্রাসকর কার্যাবলীর প্রতি সহানুভূতি দেখাতে রাজী ছিলেন না, তাঁদের উপর পর্যন্ত আক্রমণ হয়। ১৪ই জুলাই ফরাসী ঔপনিবেশিকরা একটা বড়ো রকমের হত্যাকাণ্ডের অনুষ্ঠান করে। ২০শে আগস্ট—সুলতান মহম্মদ বেন ইউসুফের পদচ্যুতির তারিখের দ্বিতীয় বার্ষিকীতে "নেটিভ"রা তার প্রত্যুত্তর দেয়। সারা মরক্কোতে অশান্তি জেগে ওঠে। তখন ফরাসী ঔপনিবেশিকদের দোষ-গুণের বিচারের কথা কারো মনে থাকে না—"নেটিভ"দের আগে ঠেঙিয়ে শিক্ষা দাও, এই রব উঠে। সাম্প্রতিক দাঙ্গাহাঙ্গামায় একটি ফরাসী জীবনের

পরিবর্তে অন্তত পাঁচটি মরক্কোবাসীর জীবন নেওয়া হয়েছে।

কিন্তু বিনা আবরণে সন্ত্রাসনীতি চালানো আর সম্ভব নয়। সুলতান মহম্মদ বেন ইউসুফকে পদচ্যুত করে তাঁর জায়গায় যে জো-হুকুম ব্যক্তিটিকে বসানো হয়েছিল, তাকে আর রাখা চলবে না এটা ফরাসীরা আগেই বুঝতে পেরেছিল। তাকে এবার সরাতেই হবে। সুলতান মহম্মদ বেন ইউসুফ জাতীয়তাবাদী-ভাবাপন্ন ছিলেন, তিনি মরক্কোর মুখ্য জাতীয়তাবাদী দল "ইস্তিকলালের" প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। শাসন সংস্কার প্রবর্তনের পূর্বে অস্থায়ী গভর্নমেণ্ট নিযুক্ত করার কথা যখন উঠে, তখন সুলতান মহম্মদ বেন ইউসুফ "ইস্তিকলালে"র প্রতিনিধিদেরও মন্ত্রিমণ্ডলীর মধ্যে নিতে চান। প্রকৃতপক্ষে সুলতান ইউসুফ "ইস্তিকলাল"কেই মরক্কোর রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে সর্বাধিক প্রাধান্য দিতে চেয়েছিলেন। "ইস্তিকলাল" মরক্কোর স্বাধীনতা ও জনসাধারণের স্বার্থের সেবক, অতএব ফরাসী ঔপনিবেশিকদের চক্ষে সবচেয়ে বড়ো শত্রু। "ইস্তিকলালের" প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হওয়ার জন্যই সুলতান ইউসুফকে পদচ্যুত করা হয়। জাতীয়তাবাদীদের দাবীর অন্যতম প্রধান দাবী হচ্ছে—ইউসুফকে পুনরায় সুলতান-পদে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। ফরাসী গভর্নমেণ্ট তাঁদের ক্রীড়নক বর্তমান সুলতানকে পরিত্যাগ করার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন, কিন্তু ইউসুফকে সুলতানপদে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে এখনো রাজী হচ্ছেন না। কারণ তাহলে ফরাসীদের একেবারেই মান থাকবে না। মহম্মদ বেন ইউসুফ বর্তমানে ফরাসী গভর্নমেণ্ট কর্তৃক মাদাগাস্কারে নির্বাসিত হয়ে আছেন। মরক্কোর যে সকল রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে এখন ফরাসী গভর্নমেণ্টের আলোচনা চলছে—এ'দের মধ্যে "ইস্তিকলালে"র প্রতিনিধিরাও আছেন—তাঁরা দাবী করেছেন মহম্মদ বেন ইউসুফকে অন্তত এখনই মাদাগাস্কার থেকে ফ্রান্সে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করতে হবে।

ফরাসী গভর্নমেণ্টের আশঙ্কা হচ্ছে, মহম্মদ বেন ইউসুফকে ফ্রান্সে আসতে দিলে তাঁকে সুলতানপদে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার দাবী আরও জোর হবে এবং তা অগ্রাহ্য করা ফ্রান্সের পক্ষে আরো কঠিন হবে। কিন্তু মহম্মদ বেন ইউসুফের উপর মরক্কোর জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের দাবী যেভাবে কেন্দ্রিত হয়েছে, তাতে তাঁকে মাদাগাস্কারে নির্বাসিত রেখে মরক্কো সম্পর্কে যে কোনো আপস হবে তা মনে হয় না। কোনো আপসরফা করতে হলে ফ্রান্সকে এ বিষয়ে নরম হতেই হবে। তাহলে তিউনিসিয়ার অনুরূপ শাসন সংস্কারের প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে মরক্কোতে একটি মন্ত্রিমণ্ডলী গঠিত হবার কিছু সম্ভাবনা আছে। অবশ্য তিউনিসিয়াকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হচ্ছে না, আভ্যন্তর স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হচ্ছে, তাও সম্পূর্ণ নিরঙ্কুশ নয়। এর দ্বারা সমস্যার পূর্ণ সমাধান হবে না, তবে জাতীয়তাবাদী স্বাধীনতা আন্দোলন শান্তিপূর্ণ পথে অগ্রসর হবার সুযোগ পেতে পারে।

* * *

মিশর-ইজ্রেল সীমান্তবর্তী গাজা অঞ্চলে শান্তি নেই। ইজ্রেল ও মিশরীয়দের মধ্যে ছোটখাটো সংঘর্ষ লেগেই আছে। যে-যখন সুবিধা পায় একে অপরের এলাকায় ঢুকে কিছু অনিষ্ট সাধন, দু-পাঁচটা খুন-জখম করে আসে। ইউনো'র সীমান্ত পর্যবেক্ষকগণের উপস্থিতি সত্ত্বেও এরকম চলছে। এক এক সময়ে ঘটনাগুলি একটু বেশি গুরুতর হয়, তখন ভয় হয় বুঝি বা দু'পক্ষ খোলাখুলি যুদ্ধে নেমে যায়। সম্প্রতি উপর্যুপরি কতকগুলি ঘটনার ফলে অবস্থাটা একটু বেশি খারাপ হয়েছে।

আসল মুশকিল হচ্ছে, মধ্য প্রাচ্যের আরব রাষ্ট্রগুলি বিশেষ করে মিশর ইজ্রেলের অস্তিত্ব মেনে নিতে চাচ্ছে না। ইহুদিরা বাহুবলে ইজ্রেল রাষ্ট্র স্থাপন করেছে, আরবরা যুদ্ধ করে ঠেকাতে পারেনি। বিশেষ করে মিশর যুদ্ধে পরাজয়ের গ্লানি ভুলতে পারছে না। যুদ্ধ করে ইহুদি রাষ্ট্রের অবসান ঘটিয়ে প্যালেস্টাইনকে আবার আরব রাষ্ট্র করার কল্পনা মিশর ছাড়তে পারছে না। সেই জন্য মিশর এবং তার অনুবর্তী আরব রাষ্ট্রগুলি ইজ্রেলের সঙ্গে যুদ্ধের অবসান হয়েছে, একথা মানতে রাজী নয়।

প্যালেস্টাইন থেকে দশ লক্ষ আরব রিফিউজি ইউনো'র ভিক্ষান্নে অতি কষ্টে দিন যাপন করছে। আরব রাষ্ট্রগুলিতে হয়ত তাদের পুনর্বাসন সম্ভব ছিল, কিন্তু তাতে আরব রাষ্ট্রগুলির গরজ নেই, কারণ যদি আরব রাষ্ট্রের মধ্যে রিফিউজি-দের পুনর্বাসন হয়ে যায়, তবে ইজ্রেলের সঙ্গে বিবাদের একটা বড়ো প্রত্যক্ষ কারণ অন্তর্হিত হবে এবং লোকে ভাববে আরব রাষ্ট্রগুলি ইজ্রেলের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়েছে। কিন্তু ইজ্রেল থেকে যত সংখ্যক আরব বিদূরিত হয়েছে তার চেয়ে বেশি সংখ্যক ইহুদি নানা দেশ থেকে সেখানে গেছে। আর সেখানে আরবদের ফিরিয়ে নেবার জায়গা নেই। এই অবস্থায় রিফিউজিরা না ঘরকা, না ঘাটকা হয়ে আছে। আরব-ইজ্রেল সম্পর্কের একটা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত তাদের দুর্দশার অবসানের সম্ভাবনা নেই। এদিকে ইজ্রেলও নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য দরকার হলে মরিয়া হয়ে লড়বে।

ইজ্রেলের সঙ্গে আরব রাষ্ট্রগুলির শত্রুতার জন্য ইঙ্গ-মার্কিন কর্তারাও একটু বিপন্ন হয়েছেন। আরব রাষ্ট্রগুলি বিশেষ করে মিশরের ভাব হচ্ছে এই যে, ইজ্রেলবিরোধী না হলে আরবদের বন্ধুতা পাওয়া যাবে না। বৃটিশ গভর্নমেণ্ট দরকার হলে ইজ্রেলকে বলি দিতে পারেন, কিন্তু আমেরিকার মুশকিল। মার্কিন ইহুদি-দের সাহায্যের দ্বারাই ইজ্রেল গড়ে উঠেছে, ইজ্রেলের পিছনে প্রভূত প্রভাব-শালী মার্কিন ইহুদি সমাজ রয়েছে।

সম্প্রতি মিঃ ডালেস একটা প্রস্তাব করেছেন যে, যদি একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি হয় যার দ্বারা অন্য কয়েকটি বড় জাতি ইজ্রেল-আরব সীমান্ত "গ্যারাণ্টি" করবে তবে মার্কিন গভর্নমেণ্ট তাতে যোগ দিতে প্রস্তুত আছেন। এতৎসঙ্গে মিঃ ডালেস আরব রিফিউজিদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা সম্বন্ধেও একটা প্রস্তাব করেছেন। মিঃ ডালেসের প্রস্তাব সম্পর্কে মিশরের সরকারী মতের আভাস যা প্রকাশ হয়েছে, সেটা অনুকূল নয়, তবে শীঘ্রই আরব রাষ্ট্রগুলির প্রতিনিধিরা মিলিত হয়ে মিঃ ডালেসের প্রস্তাব আলোচনা করবেন। মিঃ ডালেসের প্রস্তাব স্বীকার করার মানে হবে ইজ্রেলের অস্তিত্ব মেনে নেওয়া। মিশর এযাবৎ যে ভাব দেখিয়ে আসছে, তাতে তার পক্ষে সহসা এই মার্কিন প্রস্তাব স্বীকার করা সহজ হবে না।

৩১।৮।৫৫

একটি বকুল

বিষ্ণু দে

একটি বকুলে ফোটে দুজনার ছবি,
দুইজনে পুঁতেছিল একটি বকুল।
আজ তার ফুল ঝরে নিঃসঙ্গের গানে,
পাহাড়ের গোধূলিতে ভাসে তার সুর,
আকাশের পাখোয়াজে নিঃসঙ্গ বিধুর
শূন্য ঘরে ঘরে ওড়ে গন্ধময় সুর,
এ গাছে ও গাছে প্রশ্ন সারাটা বাগানে।

বাইশটি শ্রাবণের চোখের তলায়
বকুল বেড়েছে, আজ ছেয়ে গেছে ফুল,
আর কতোকাল বলো ব্যর্থ দিন গোনা?
বকুলের মালা দিক্ এ ওর গলায়,
মুঠি মুঠি তুলে নিক ঝরা ঝরা ফুল।
ছিল দুইজন, আর একটি বকুল—
আবাব দেখতে চাই আছে তিনজনা।

নিজেকে নিয়ে

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

লোকে তাকে কবি বলে। অবশ্যই কবি সে, যেহেতু
অক্ষরে সে অক্ষর মেলায়, বাঁধে সেতু
শব্দের সমুদ্রে অনায়াসে।
এবং জমকে, ধ্বনি-ব্যঞ্জনায়, ছন্দের বিলাতে
কবিকর্ম তার
তুচ্ছ নয়, এই কথা বন্ধুজন আর
হিতৈষিবর্গের কাছে জেনে নিয়ে সঙ্গত কারণে
এতকাল তৃপ্তি পেয়েছে সে,
যে-তৃপ্তি প্রতিটি মূর্খ নিজের সৃষ্টিকে ভালবেসে
পেয়ে থাকে। সে যে কবি, এ নিয়ে কখনো তার মনে
সংশয় ছিল না।

সংশয় জেগেছে আজ। বিদায়ী রৌদ্রের কণা-কণা
প্রণয়ের চিহ্ন মুখে নিয়ে
লজ্জার গভীর সুখে নিজেকে হারিয়ে
নিমগ্ন যখন তার বারান্দার টবের করবী।
সেই দিকে চেয়ে চেয়ে নাবালক বিস্ময়ে সে ভাবে,
এ কার তুলিতে আঁকা ছবি,
এত স্থির, এত শান্ত, তবুও বাঙ্ময়।
দুর্বহ অশ্রুর ভারে নয়নপল্লব তার কাঁপে;
এবারে বুঝেছে, মনে হয়,
সমস্তই ব্যর্থ তার; শব্দের সমুদ্রে বেয়ে জাল
কী সে পেতে চেয়েছিল, হায়, কী পেয়েছে এতকাল!

ধীরাজ ভট্টাচার্য

॥ ছয় ॥

অবশেষে সত্যিই একদিন 'ক্রাউন সিনেমায়' (বর্তমান উত্তরা সিনেমা) 'গিরিবালা' মুক্তিলাভ করল। তারিখটা আজও স্পষ্ট মনে আছে। বাংলা ১০ই ফাল্গুন শনিবার ১৩৩৬ সাল, ইংরিজি ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩০। ছবিটি মুক্তি পাওয়ার দু একদিন আগে মিঃ বোস ও ম্যাডান কর্তৃপক্ষ 'ম্যাডান থিয়েটারে' (বর্তমান 'এলিট' সিনেমা) সকালে একটি বিশেষ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। তখনকার দিনের সমস্ত নাম করা দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্র-পত্রিকার সমালোচকদের এই প্রদর্শনীতে আহ্বান করা হয়। এখানে বলে রাখি, তখনকার দিনে কোনও ছবির মুক্তির আগে এ রকম প্রেস শো বা স্পেশাল শো'র রেওয়াজ ছিল না। কাজেই অনেকেই বেশ একটু কুতুহলী হয়ে নতুনত্বের সন্ধানে ছুটে এসেছিলেন সে-দিনের সকালের শো-এ। তখনকার দিনের বিখ্যাত চিত্র ও মঞ্চ সাপ্তাহিক 'নাচঘর' ত' স্পষ্ট লিখেই ফেললেন,—সেদিন রবীন্দ্রনাথের গল্প থেকে গৃহীত 'গিরিবালা' চিত্রনাট্যের অপ্রকাশ্য অভিনয় দেখবার জন্যে ম্যাডান কোম্পানী অনেক সাংবাদিক ও 'নাট্য সমালোচককে' নিমন্ত্রণ করেছিলেন। এই আমন্ত্রণ পেয়ে আমাদের মতন আরো অনেক বাঙালী নাট্যসমালোচক নিশ্চয়ই অল্প বিস্মিত হন নি। কারণ এটা অভূতপূর্ব। (নাচঘর, ২রা ফাগুন, ১৩৩৬)

একখানা নির্বাক ছবির মুক্তিতে এত হৈ চৈ ও চাঞ্চল্য এর আগে বাংলা দেশে হয়নি। প্রতি দৈনিক ও সাপ্তাহিক গিরিবালার স্তুতিগানে মুখর হয়ে উঠল। আরে সে কী প্রশংসা! সবগুলো এখানে উদ্ধৃত করে দেওয়া সম্ভব নয়, কয়েকটি নমুনা দেবার লোভ সামলাতে পারলাম না:—

The Statesman, Tuesday, Feb. 11, 1930:
"Dhiraj Bhattacharjee, Naresh Mitter and Chakrabartty gave good performances in the male roles."

The Bengalee, Feb. 11, 1930:
"By the courtesy of Messrs. Madan Theatres our representative had the pleasure of witnessing a private show of the film on Sunday last and he was struck by the excellence of this Indian film which is a clear evidence of the progressive success of screen versions of Indian stories, both from the view point of technique and dramatic art."

Liberty, Sunday, Feb. 16, 1930:
"The Madan's (the pioneer of the Film Industry in India), are screening, at the Crown Cinema, their latest production 'Giribala'—a plot worth its weight in gold, emanating from the pen of that distinguished writer of writers Dr. Rabindranath Tagore."

ইংরিজি দৈনিক 'অ্যাডভান্স' ত' আমার সম্বন্ধে একটা পুরো কলমই লিখে ফেললেন।

Advance, Thursday, Feb. 13, 1930:
"Dhiraj Bhattacharya plays the hero Gopinath, a rather weak minded son of a wealthy zaminder, and considering that this is his very first attempt at film acting, he is a success. A little more training, a good producer who will know how exactly to bring out the best in him, and it will not be long before he attains 'stardom' in Bengal film circles. Provided of course he does not lose his head in the meantime, but puts in hard and earnest work."

বাংলা সাপ্তাহিক 'ভোটরঙ্গ' গল্প পরিচালনা ও ফটোগ্রাফীর পর আমাদের অভিনয় সম্বন্ধে লিখলে—

...এই তিনটি চরিত্রের সবটুকু বৈচিত্র্যই অভিনেতৃবর্গ ছবির ওপরে ভালো করে ফুটিয়েছেন। যেমন হয়েছে ললিতাদেবীর গিরিবালা, তেমন হয়েছে ধীরাজবাবুর গোপীনাথ আবার তাঁদেরই সঙ্গে সমানভাবে পা ফেলে চলেছেন শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র মিত্র, গোপীনাথের বন্ধুর ভূমিকায়।"
('ভোটরঙ্গ' রবিবার, ৬ষ্ঠা ফাল্গুন, ১৩৩৬)

সাপ্তাহিক 'শিশির' লিখলে,—

বলিতে দ্বিধা নাই যে, এই চিত্রনাট্যের প্রায় প্রত্যেকেই বেশ কৃতিত্বের সহিত অভিনয় করিয়াছেন। গোপীনাথের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত ধীরাজ ভট্টাচার্যের এবং তাঁহার বন্ধুর ভূমিকা নরেশবাবুর অভিনয় হইয়াছিল অতি চমৎকার।
(শিশির, শনিবার ২৮শে ফাল্গুন, ১৩৩৬)

সাপ্তাহিক 'নাচঘর' লিখলে—

গিরিবালা দেখে আমরা বাংলার ফিল্ম-শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশান্বিত হয়েছি। অভিনয়ের কথা বলতে গিয়ে গোড়াতেই ম্যাডান কোম্পানীর নতুন সংগ্রহ প্রিয়দর্শন তরুণ-নট শ্রীধীরাজ ভট্টাচার্যকে আমরা আমাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি।
(নাচঘর, ১৬ই ফাল্গুন, ১৩৩৬)

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'বায়োস্কোপ' প্রথম পৃষ্ঠায় সম্পাদকীয় কলমে লিখলে—

'গিরিবালা'র পরিচালক শ্রীযুক্ত মধু বোস তাঁর এই প্রথম তোলা ছবিতে তাঁর যথেষ্ট শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। ছবিখানি দেখলেই স্পষ্ট বুঝা যায়—একে সর্বাঙ্গ সুন্দর করে তোলবার প্রাণপণ চেষ্টার ত্রুটি কোথাও হয়নি। ভবিষ্যতে তাঁর কাছ থেকে আমরা আরও অনেক কিছু আশা করি।............ গিরিবালার গোপীনাথের ভূমিকায় অবতীর্ণ

হয়েছেন শ্রীযুক্ত ধীরাজ ভট্টাচার্য। ছায়া লোকের এই নবীন শিল্পীকে আমরা আমাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি।

(বায়োস্কোপ, ১৬ সংখ্যা, ২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩০)

এ ছাড়াও 'কুরুক্ষেত্র' 'বাংলা', 'ভগ্নদূত' প্রভৃতি পত্রিকায় উচ্ছ্বসিত প্রশংসা। সবার এক কথা, এ রকম নীট ছবি বাংলায় আর হয়নি। আমাকে সবচেয়ে বিস্মিত ও ভাবিত করে তুললো, তখনকার সবচেয়ে জনপ্রিয় বহুল প্রচারিত সাপ্তাহিক 'নবশক্তি'। অধুনা বিখ্যাত সমালোচক ও চিত্র পরিচালক শ্রীযুক্ত মনুজেন্দ্র ভঞ্জ (চন্দ্রশেখর) 'গিরিবালা'র সমালোচনা প্রসঙ্গে 'নবশক্তি'তে লিখলেন—'

...আমরা কিন্তু সবচেয়ে মুগ্ধ ও চমৎকৃত হয়েছি নায়ক গোপীনাথের ভূমিকায় একজন নতুন অভিনেতার অভিনয় চাতুর্যে।

...চমৎকার ফিল্ম ফেস আছে তার। তার ভাব প্রকাশের ভংগীও অনিন্দনীয়, তাঁর সংযত অভিব্যক্তি আমাদের বিশেষভাবেই আকৃষ্ট করেছে। সমজাতীয় না হলেও ধীরাজবাবুর মুখের নিম্নাংশের সঙ্গে ওদেশের অতুলনীয় গ্রেটা গার্বোর মুখের আশ্চর্য রকম সাদৃশ্য আছে। এই সাদৃশ্য আমাদের বিস্মিত করেছে বলেই আমরা এখানে তার উল্লেখ করছি। আমাদের বিশ্বাস এই একটি ভূমিকায় অভিনয় করেই ধীরাজ-বাবু এদেশের চিত্র প্রিয়দের কাছে বিশেষভাবেই জনপ্রিয় হয়ে উঠবেন।

('নবশক্তি' শুক্রবার ২রা ফাল্গুন ১৩৩৬)

বলতে লজ্জা নেই আজ এত দীর্ঘদিন বাদেও চন্দ্রশেখরবাবুর ঐ গ্রেটা গার্বোর মুখের নিম্নাংশের সঙ্গে তুলনার মানেটা ঠিক মত বুঝে উঠতে পারিনি। কখনও মনে হয় বুঝি প্রশংসা আবার কখনও সন্দেহ জাগে ঠাট্টা করলেন নাকি?

পরিচালক মধু বোস বাবাকে নিয়ে 'গিরিবালা' দেখালেন। হাবে ভাবে বুঝতে পারলাম বাবা মনে মনে খুশীই হয়েছেন। অনেক দিন বাদে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলাম।

ইতিমধ্যে আমার সেই দূর সম্পর্কের কাকাটি সপরিবারে একদিন আমাদের বাড়িতে এসে হাজির হলেন। 'যখন পুলিশ ছিলাম'-এর পাঠকবর্গের বোধ হয় মনে আছে পড়া ছেড়ে প্রথম যখন আরম্ভ করি ইনিই উপযাচক হয়ে এসে বাবা মাকে অনেকগুলো কটু অপ্রিয় কথা শুনিয়ে গিয়েছিলেন। আজ হঠাৎ এঁর আবির্ভাবে আমরা সবাই মনে মনে বেশ একটু শঙ্কিত উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলাম। কাকার বড় মেয়ে রিনির বয়স তের চৌদ্দ। ইশারায় তাকে একটু দূরে আড়ালে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম—'ব্যাপার কী পার্ল হোয়াইট?'

ফুটফুটে সুন্দর নিটোল চেহারা রিনির। গোল মুখে হাসলে টোল খায়, তখনকার দিনের সর্বজনপ্রিয় অভিনেত্রী পার্ল হোয়াইটের মত। আমি ঠাট্টা করে তাই ওকে ঐ নামেই ডাকতাম। রিনি খুশীই হোত, কাকা কাকীমা চটে যেতেন।

ছোট্ট সহজ কথাও অকারণ ক্ষেপিয়ে ঘোরালো করে তোলা বোধ হয় মেয়েদের অভ্যাস। চারিদিকে সভয়ে চেয়ে গলাটা খাটো করে রিনি বললে—'জান ছোড়দা, ব্যাপারটা হচ্ছে তোমার 'গিরিবালা'।

বেশ ভয় পেয়ে গেলাম। মুখে আস্ফালন করে বললাম—'ফাজলামো করিসনি ব্যাপারটা কি বল?'

মুখখানা কাচু মাচু করে রিনি বললে —'বাবা মা বলতে বারণ করে দিয়েছে যে?'

বেশ বুঝলাম কথাটা বলবার জন্যে রিনি ছটফট করছে। বললাম—'ও আচ্ছা, তাহলে বলিসনি।'

চলে আসবার জন্যে ফিরে দাঁড়াতেই পিছনের শার্টের একটা কোণ টেনে ধরলে রিনি। ফিরে দাঁড়িয়ে অবাক হবার ভান করে বললাম—'কি রে?'

—'তুমি যদি কাউকে না বল ত' বলতে পারি!'

'—দরকার নেই আমার শুনে অমন কথা। ছেড়ে দে, আমায় এখুনি স্টুডিওতে যেতে হবে।'

স্টুডিও আর শুটিং। এ দুটোর উপর রিনির কৌতূহলের অন্ত ছিল না। এ যেন অদৃষ্টের পরিহাস। কাকা-কাকীমা বায়োস্কোপ থিয়েটারের নাম শুনতে পারতেন না আর ছেলে মেয়ে-গুলো, বিশেষ করে রিনি, সবার বড় বলে সিনেমা থিয়েটারের কথাগুলো যেন গিলতো। নিমেষে আমার আরও কাছে এসে চুপি চুপি বললে রিনি—'বাবা করুকগে রাগ। জানো ছোড়দা, বাবার আফিসের বড়বাবু থেকে শুরু করে অনেকেই তোমার 'গিরিবালা' ছবি দেখে এসেছে।'

ঠোঁট দুটো উলটে তাচ্ছিল্যের ভান করে বললাম—'এই কথা!'

রিনি দমবার মেয়ে নয়। বললে—'শুধু এই কথা নয়, এর পরের কথাগুলো আরও দরকারী।'

পরের দরকারী কথাগুলো শুনবার কোনও কৌতূহল প্রকাশ না করে চুপ করে আছি দেখে অভিমান-ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে রিনি বললে—'বেশ বেশ, নাই বা শুনলে। আর কখখোনো তোমাকে কিচ্ছু বলব না।'

বুঝলাম আর বাড়াবাড়ি করা বুদ্ধি-মানের কাজ হবে না। বললাম—'হ্যাঁরে রিনি, তোকে পার্ল হোয়াইটের সিরিয়ল 'The Iron Chair' ছবিটার শেষ ইনস্টলমেণ্টটা বলিছি কি?'

হঠাৎ খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল রিনি। আমার হাত ধরে বললে—'বল না ছোড়দা, তোমার দুটি পায়ে পড়ি!'

'—তার আগে ঐ পরের দরকারী কথাটা বল।'

গড় গড় করে বলতে শুরু করলো রিনি—

বায়োস্কোপ থিয়েটারের উপর বাবা বরাবরই চটা। তোমার কথা উঠলেই বাবা মাকে বললেন—ধীরেটা এবার উচ্ছন্নে যাবে। রাঙা বৌ আর রাঙাদাকে কত করে বললাম, শুনলেন না। পরে বুঝবেন মজাটা। এই বয়েসে ঐ সব সংসর্গে পড়ে দু'দিন বাদেই মদ ভাঙ্ খেতে শুরু করবে তারপর ওদেরই মধ্যে একটা খৃষ্টান ছুঁড়িকে বিয়ে করে আমাদের বংশের নাম ডোবাবে।

যৌবনে মা আমার নাম করা সুন্দরী ছিলেন। দুধে আলতা মেশানো গায়ের রঙ, নিখুঁত গড়ন। সব মিলিয়ে মায়ের মত সুন্দরী মেয়ে আমাদের গ্রামে এর আগে আর কেউ দেখেনি। তাই বধূবেশে প্রথম পদার্পণ থেকেই ছোট বড় সবাই মাকে রাঙা বৌ বলে ডাকত। বাবাও খুব ফর্সা ছিলেন, ঠিক কাঁচা হলুদের মত রঙ। কাকারা এবং আত্মীয় যারা বয়সে বাবার ছোট, সবাই রাঙাদা বলে ডাকতেন।

একটু থেমে দম নিয়ে বলতে শুরু করল রিনি—'চারিদিকে সব নাম করা শিষ্য। তারা যখন ছবির পর্দায় গুরু-পুত্রের কাণ্ডকারখানা দেখবে তখন? তাই বাবা আমাদের সবাইকে বলে দিয়েছে—তোমরা যে আমাদের আত্মীয় একথা যেন কাউকে না বলি।'

আমার সিনেমায় যোগ দেওয়া সম্বন্ধে আত্মীয় স্বজন কেউ খুশী হয়নি একথা জানতাম। কিন্তু ব্যাপার যে এতদূর গড়িয়েছে জানা ছিল না।

রিনি বললে—'আমাদের পাড়ার রায় বাহাদুরের মেয়ে গোপাকে জান ছোড়দা?' কাকা থাকতেন খিদিরপুরে হেম-চন্দ্র স্ট্রীটে (আগে নাম ছিল পদ্মপুকুর রোড) দু তিনবার মাত্র গিয়েছি কাকার বাড়ি তাও খুব অল্প সময়ের জন্যে। এর মধ্যে রায় বাহাদুরের মেয়ে গোপাকে না জানা খুব একটা মারাত্মক অপরাধ বলে মনে হয়নি। সহজভাবেই বললাম—'না।'

বিস্ময়ে দুচোখ কাপালে তুলে রিনি বললে—'তুমি কী ছোড়দা? গোপা তোমাকে চেনে আর তুমি ওকে জান না?'

সত্যিই ভাবিত হয়ে পড়লাম। স্মৃতি সমুদ্র মন্থন করে গোপা নাম্নী মেয়েটির পরিচয় রহস্য উদ্ঘাটন করবার চেষ্টা করতে লাগলাম।

রিনিই বাঁচিয়ে দিলে। বললে—'গোপা এবার ম্যাট্রিক পাশ দিয়ে বেথুনে আই এ পড়ছে'। চেহারা আর পয়সার দেমাকে আগে আমাদের সঙ্গে কথাই কইত না। তোমার ছবি দেখে এসে যেচে আলাপ করেছে গোপা।'

কৌতূহল বেড়ে গেল। বললাম—'কি রকম?'

রিনি বললে—'আগে চোখাচুখি হলে মুখ ঘুরিয়ে নিত, কথাই কইত না। হঠাৎ ক'দিন থেকে দেখি আমাদের বাড়ির দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সেদিন ছাতে কাপড় মেলে দিয়ে চলে আসছি, কানে এল—'শোন রিনি।' আমি ত অবাক। চেয়ে দেখি ওদের ছাতের আলসের উপর ঝুঁকে আমার দিকে চেয়ে আছে গোপা। চলে আসব কি না ভাবছি, গোপা বললে—ধীরাজ ভট্টাচার্য, তিনি 'গিরিবালা' ছবিতে নেমেছেন, তিনি ত তোমার ভাই হন, না? একবার ভাবলাম বলি—না। বললাম—হ্যাঁ। গোপা বললে—আগে মাঝে মাঝে তোমাদের বাড়ি আসতেন, এখন আর দেখতে পাইনে কেন?

কাকিমার গলা শুনতে পেলাম—'রিনি!'

রিনি বললে—'মা ডাকছে। আমি চলি ছোড়দা!'

বাধা দিয়ে বললাম—'চলি মানে? তারপর কি কথা হল বল?'

'—ফিরে এসে বলবো।' এক রকম ছুটে পালিয়ে গেল রিনি।

রায় বাহাদুরের সুন্দরী মেয়ে গোপার চেহারাটা কল্পনার তুলিতে আঁকবার বৃথা চেষ্টা করতে করতে বাইরের ঘরের দিকে পা বাড়ালাম।

(ক্রমশ)

১০

সাধুজীর আশ্রম থেকে গেলাম আর এক সাধুর কুটিতে।

তিনি বাইরে পাথরের উপর বসে বই পড়ছিলেন। ইনিও বিবস্ত্র। তবে মৌনী নন। দীর্ঘ দেহ, দীর্ঘ জটাজুট।

সাদরে আমাদের বসতে বললেন।

একটা চীর্ গাছের গুঁড়ি পড়ে ছিল—সাধুকে প্রণাম করে তারই উপর সকলে বসলাম।

সাধুটি বড় স্নিগ্ধ হাসেন, সুমিষ্ট কথা বলেন।

কুটির দিকে তাকিয়ে দেখেই চিনতে পারলাম। গতবার এখানেও এসেছিলাম। তখন অপর আর একজন সাধু ছিলেন। তিনিও নাগা, তবে মৌনী ছিলেন।

বেশ মনে পড়ে, ঘরের ভিতর মাটির মেঝেতে ধুনী ছিল, তার থেকে এক-টুকরা পোড়া কাঠ নিয়ে মাটির উপর লিখে লিখে আলাপ করেছিলেন।

কলিকাতায় ভবানীপুরে থাকি শুনে লিখেছিলেন, সে ত কালীঘাটের খুব কাছে। কালী-মা বড় জাগ্রতা দেবী—বলে উদ্দেশে প্রণাম করেছিলেন।

অনেকক্ষণ আলাপ হয়েছিল। মা সঙ্গে ছিলেন,—তাঁকে দেখিয়ে ইশারায় বলেছিলেন—ইনি আমারও মা।

শুনে মার চোখে জল এসেছিল।

কোন সেবায় আসতে পারি কি না, জিজ্ঞাসা করায় প্রথমে ঘাড় নেড়ে 'না' বলেছিলেন। তারপরে, অতি সংকোচে একটি ধূপকাঠি বার করে দেখিয়েছিলেন—ইচ্ছা হয় ত এই দিতে পার।

ধর্মশালায় ফিরে এসে পাঠিয়েও দিয়েছিলাম।

তাঁর কাছ থেকে চলে আসার আগে মা বারবার অনুরোধ করতে লাগলেন—আর কোন কিছু চাই কিনা বলুন; হেসে আরও বলেছিলেন—আমি ত মা আছি।

সাধুটিও হেসেছিলেন—বড় ম্লান হাসি। তারপর, হাত তুলে সম্মতি জানিয়ে ধীরে ধীরে লিখলেন, যদি ইচ্ছা হয় এবং কোনও রকম অসুবিধা না থাকে ত আসামী এণ্ডির চাদর একটা পাঠাতে পার।

চাওয়া শুনে মা-র সে কী অপরিসীম আনন্দ।

কলিকাতায় ফিরেই পাঠানো হয়েছিল।

ধর্মশালায় এসে তাঁর চাদর-চাওয়ার কারণ বুঝেছিলাম। কয়েক বছর তিনি গোমুখে ছিলেন। শীতকালেও থাকতেন সেই বরফের মাঝে। কিছুকাল আগে সেখানে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তাঁর অনিচ্ছা সত্ত্বেও এখানে তাঁকে আনা হয়। শরীর এখনও সুস্থ হয়ে উঠে নি।

কাঠের উপর বসে ঘরের দিকে তাকিয়ে কয় বছর আগেকার সে-সব কথা আজ মনে হচ্ছে।

তিনি কোথায় জিজ্ঞাসা করায় জানলাম, আমাদের সঙ্গে দেখা হওয়ার পরের বছরই দেহ-রক্ষা করেছেন।

হঠাৎ ঘরটা যেন খুব ফাঁকা ফাঁকা মনে হোল।

ক্ষণিকের পরিচিত, সংসার-ত্যাগী, হিমালয়বাসী এক নাগা সন্ন্যাসীর মৃত্যু-সংবাদ। তবুও কিসের বেদনায় মন যেন ভারি হয়ে উঠল।

জরা-মৃত্যু তার বিশাল জাল এখানেও

গঙ্গোত্রীর ওপারে সাধুসন্তদের কুটি

বিস্তার করেছে—কোথাও নিস্তার নেই। যেখানেই জীবন—সেখানেই মরণ!

পাথরের উপর বসে স্বামীজী বলছিলেন, তাঁর মৃত্যুর পর এই কয় বছর আমি এসেছি। বড় শান্তিময় স্থান। তবে আমার আসন গঙ্গামায়ীর কিনারায় ঐ পাথরটি।

তাকিয়ে দেখলাম, একটি মসৃণ, সমতল পাথর,—ঠিক ধারার ধারেই।

বললেন, ঐখানে বসি। আপনা হতেই ধ্যান আসে। ভাগীরথীর কল্লোচ্ছ্বাস—সেই ত ভগবদ্ সঙ্গীত। গঙ্গাতীরে বাস —এই ত স্বর্গবাস। গঙ্গার জলে স্নান, গঙ্গাকে অবলোকন, গঙ্গার নাম স্মরণ, গঙ্গার মাহাত্ম্য সংলাপন—অমৃতময় এ জীবন।

হঠাৎ কথা বলতে বলতে উঠে গেলেন। ঘর থেকে মুঠো ভরে কি নিয়ে এলেন। গেলেন, এলেন—এও যেন উলঙ্গ শিশুর ঘোরাফেরা।

কাছে এসে হাত বাড়িয়ে বললেন, নাও, প্রসাদ নাও।

চেয়ে দেখি, মুঠো ভরা কিস্‌মিস্, বাদাম। একটিমাত্র কিস্‌মিস্ তুলে নিলাম, মাথায় ঠেকালাম, মুখে দিলাম।

বললাম, এই যথেষ্ট।

আরও নিতে বলেন। তবুও নিই না। জানি, এই তাঁর একমাত্র আহার্য।

সেবার কথা উল্লেখ করি। গ্রহণ করেন না। হাসেন। বড় স্নেহ-ভরা ব্যবহার।

গোমুখ যাওয়ার কথা তুলি। শুনে খুশি হন। উৎসাহ দেন। বলেন, লোকে ভয় দেখাবে,—কিন্তু মনে বিশ্বাস রেখো —কোন ভয় নেই।

সেই একই অভয়বাণী!

পরম-আত্মীয়ের মত বিদায় দেন, আশীষ জানান।

কঠোর সন্ন্যাসী, অথচ অন্তরে স্নেহের ধারা। যেন, পাষাণ-কারা হিমালয়ে নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ।

১১

সেখান থেকে আরও এগিয়ে গেলাম।

একটি নতুন কুটি। ছোট। সাধুও নতুন এসেছেন। ঘরের সামনে বারান্দায় বসে আছেন। ইনি ঠিক নাগা নন—সামান্য একটা কোপীন আছে। তবে মৌনী। যুবা পুরুষ—মাংসপেশীগুলি সবল সুন্দর স্বাস্থ্য ঘোষণা করছে। মুখ-চোখের হাবভাব, বসার ভঙ্গী—অনেক কিছুই শ্রীরামচন্দ্রের কিঙ্করের কথা স্মরণ করায়।

আশ্চর্য হলাম যখন তিনি আঙুল দিয়ে ঘরের ভিতর তাঁর আরাধ্য দেবতার মূর্তির দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করালেন—সত্যই ত রঘুনাথজীর মূর্তি! সুন্দর সাদা ধবধবে পাথরের। দেখেই বললাম, এ তো জয়পুরের।

তিনি ঘাড় নেড়ে জানালেন, হাঁ।

এঁর কাছে শ্লেট, পেনসিল আছে। তাতে লিখে তাঁর বক্তব্য জানাচ্ছিলেন।

সারাক্ষণই রঘুনাথজীর সেবায় আছেন। প্রবল বাসনা, তাঁর একটা আলাদা ছোট মন্দির করেন। কাজও শুরু করেছেন—প্রাঙ্গণের একপাশে দেখালেন।

গোমুখ যাওয়ার কথা আবার উঠল। এঁর কাছেও সেই একই উৎসাহের বাণী—কঠিন পথ, তবুও ভয় নেই, অন্তরে স্থির বিশ্বাস নিয়ে চলে যাও।

সবাই অটল বিশ্বাসের বাঁধ বেঁধে জীবনধারা বহিয়ে চলেছেন।

এঁকে আবার দেখেছিলাম পরদিন—গোমুখ যাওয়ার পথে।

একমনে মন্দিরের প্রাচীর তৈরি করছেন। সন্তানসন্ততির আবাসগৃহ নয়, আরাধ্য দেবতার মন্দির।

একাই দুই হাতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথর তুলে আনছেন। সর্বাঙ্গের পেশী-গুলি পাথরের ভারে ফুলে উঠেছে। শরীরে যৌবনের দীপ্তি। মুখে কিন্তু শিশুর সরল হাসি। পাথরের উপর পাথর সাজিয়ে একটা দড়ির সাহায্যে দেখছেন, ঠিক সোজা রাখা হোল কি না। নিপুণ হাতে নিষ্ঠার সাথে কাজ করছেন।

ভাবি, রাজমিস্ত্রী বা ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন না কি!

ঢেঁকি স্বর্গে এসেও সত্যিই ধান ভানে!

১২

অস্তমুখী সূর্য পশ্চিম দিকের পাহাড়ের অন্তরালে আত্মগোপন করেন। তাঁর বিদায়-বেলার শেষ আশীর্বাদ পাহাড়ের মাথায় শাদা বরফের উপর রক্তচন্দনের তিলক আঁকে।

সঙ্গীরা বলেন, চলুন, এতক্ষণ ত গঙ্গার উপর-দিকে আসা গেল। এবার ফেরা যাক—গঙ্গার নীচের দিকে সেই এক সাধুর নতুন আশ্রমের সব বাড়ি দেখা গিয়েছিল ও-পার থেকে—সেখানেও ত যাবো।

অতএব সেখানেও যাই।

পথে এক পাহাড়ী নদীর উপর ছোট পুল। কেদারশৃঙ্গ হতে কেদার-গঙ্গা নেমে এসেছেন—বরফ-গলা ঘোলা জল। সগর্জনে পুলের কিছু নীচেই ভাগীরথী গঙ্গায় আত্মসমর্পণ করছেন।

পথের বাঁ দিকের পাহাড়গুলির পিছনেই কেদার-শিখর। এই কেদার-গঙ্গা ধরে যেতে পারলে দুই-তিন দিনেই এখান থেকে কেদারনাথে পৌঁছানো যায়। যায় বটে, তবে সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। দুর্গম গিরিপথ—চির তুষারে আচ্ছন্ন। বিপদসংকুল হওয়া ত স্বাভাবিকই। কখন কখন সাধু-সন্তরা এ-পথে যাতায়াত করেন—সেই নগ্নপায়ে, নগ্ন গায়ে।

অত্যাশ্চর্য বোধ হয়।

১৯৪৭ সালে একটি সুইস দলের কয়েকজন গিয়েছিলেন—অবশ্য অনেক সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে। একেবারে কেদার-শিখরে উঠেছিলেন—এই দিক দিয়েই। কেদারনাথ থেকে কেদার-শিখরে এখনও কেউ উঠতে পারেন নি।

মাথা উঁচু করে পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে দেখি। মাত্র দুদিনের পথ! অথচ আমাদের সেই কেদারনাথেই যেতে হবে একশো মাইলেরও উপর ঘুরে—যাত্রী-পথ ধরে! প্রায় দিন দশেক লাগবে।

ভাবি, একবার এসে এ-পথে যাওয়ার চেষ্টা করলে হয়। কেদার-গঙ্গা যেন আকর্ষণ করতে থাকেন!

পুল পার হয়ে একটু এসেই সেই স্বামীজীর নবীন আশ্রম।

একটা বেড়াঘেরা এলাকায় কতকগুলি সুন্দর বাড়ি। গেট দিয়ে ঢুকতে হয়। চারিদিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। চাকচিক্যের ঔজ্জ্বল্য। একটি ঘরের সামনের বারান্দায় অনেকগুলি তামার বাসন সাজানো। কি উজ্জ্বল সেগুলির দীপ্তি! চারিদিকেই গৃহশ্রী। লক্ষ্মীর চরণচিহ্ন। আশ্রমের শান্ত আবহাওয়া নয়, কর্মব্যস্ততার সজীবতা। কয়েকজন লোকজনও ঘুরছে।

স্বামীজি কি কাজের তদারক কর-ছিলেন। আমাদের দেখে এগিয়ে এলেন, অভ্যর্থনা করলেন। আমরাও হাত তুলে নমস্কার করলাম।

প্রৌঢ় বয়স। সুন্দর স্বাস্থ্য। উজ্জ্বল গৌরবর্ণ। দাড়ি-গোঁফ-মাথা সবই কামানো। পরনে গেরুয়া লম্বা আলখাল্লা। দামী ভাল কাপড়ে তৈরি। শুধু বেশভূষাতেই ভদ্র নন্, কথাবার্তা, ব্যবহারেও সামাজিক ভদ্রতার পরিচয় দেন। বসবার জন্যে কম্বল পাততে হুকুম করলেন, বলেন, এখানে ত চেয়ার দিতে পারবো না, শুধু কম্বলই আছে। তবে এ আনিয়েছিলাম অনেক দূর দেশ থেকে,—কেমন জিনিস দেখুন না!

সত্যই, বেশ ভাল কম্বল—দামী, রঙ্-বেরঙের।

কিন্তু বসতে ইচ্ছা করে না।

বাইরে আঙিনার দিকে তাকাতেই মনে পড়ল, গতবার মাকে নিয়ে এখানেও এসেছিলাম। ঐ পাথর-বাঁধানো জায়গাটায় ইনি বসেছিলেন। সামনে কতকগুলি যাত্রী। তাদের ভাষণ দিচ্ছিলেন। নানান্ কথা,—ধর্মের ত বটেই, সামাজিক, রাজ-নৈতিক কোন প্রসঙ্গেরই বাদ ছিল না। মাঝে মাঝে ইংরাজি শব্দেরও প্রয়োগ

হিমালয়ে নাগা সন্ন্যাসী **ফটো: শিবতোষ মুখোপাধ্যায়**

ছিল। আমরা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে চলে গিয়েছিলাম। সেবারও বসতে বলেছিলেন —বসা হয় নি।

এবার বাড়িঘর অনেক বেড়েছে। স্বামীজী চা খেতেও অনুরোধ করলেন। বললেন, চা, খাবার, কিছু খান। সব কিছুরই ব্যবস্থা আছে। চা ত হরদমই চলছে—তৈরি রয়েছে। যাত্রীরা আসে অনেকে। আমার নিজের লোকজনও রয়েছে।

কিন্তু, চা খেতেও মন সরে না। বলি, না, থাক। একটু আগেই খেয়ে বেরিয়েছি। এখন বেলা বেশী নেই—আমরা আরও একটু ঘুরতে চাই। তা ছাড়া, কাল গোমুখ যাবো, ধর্মশালায় ফিরে তারও ব্যবস্থা সব দেখে নিতে হবে।

গোমুখের কথা শুনেই স্বামীজি গম্ভীর হন, বলেন, ও-বড় কঠিন পথ। আপনারা যেতে পারবেন না—বৃথা চেষ্টা করবেন না। তার চেয়ে বরং কাল চলে আসুন এখানে—চা-টা খাবেন। দেশের সব খবর-টবর শোনা যাবে—অনেক গল্প হবে।

ভাবি, তোমারি মুখে এ-কথা সাজে বটে!

মুখে বলি, আচ্ছা—চললাম।

হাত তুলে বিদায়-সম্ভাষণ জানাই। তিনিও গেট্ পর্যন্ত এগিয়ে দেন। বলেন, আবার আসবেন।

ভদ্রতার প্রতিমূর্তি।

হঠাৎ মনে পড়ে শহরের পাকা ব্যবসায়ীদের কথা,—কি অমায়িক কথার আড়ম্বর!

এতক্ষণ আশ্রমে আশ্রমে ঘোরার পর এখানে এসে মনের প্রশান্ত-প্রবাহে বাধা পেলো।

গঙ্গোত্রী-বাসী একটি সঙ্গীকে প্রশ্ন করলাম, স্বামীজির বহু ধনী শিষ্য আছেন বুঝি?

তিনি একটু সঙ্কোচের সঙ্গে বললেন, নাঃ, ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। শিষ্য কিছু আছে বটে, কিন্তু অর্থ উনি নিজেই উপার্জন করেন। আজ ক'বছর কাঠের বেশ বড় ব্যবসা করছেন।

ব্যবসা!—শুনে চমকে উঠি। উঠবারই কথা। গঙ্গোত্রীতে ব্যবসায়ী সাধু! ভাবলাম, কোন্‌দিন হয়ত দেখব, বড়-বাজারে গেরুয়াধারী জটাজুট সন্ন্যাসী দোকান খুলে বসেছে!

উত্তরদাতা পাশের জঙ্গলের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলেন, ঐ সব জঙ্গল গভর্নমেণ্টের কাছ থেকে ও'র জমা নেওয়া। ঐ দেখছেন না, মাঝে মাঝে ফাঁক রয়েছে —ও-সব জায়গায় গাছ কাটা হয়েছে। দেওদার, চীর্, পাইন গাছ,—সব দামী কাঠ। তাছাড়া, একচেটিয়া ব্যবসা। এ-সব অঞ্চলে বা গঙ্গোত্রীর পথে যত ঘর-বাড়ী তৈরি হয়—সব কাঠ সাপ্লাই করেন ইনি। এখানে আসার পথে ভৈরব-ঘাটিতে কালী-কম্‌লীর ধর্মশালাটি গত বছর আগুনে পুড়ে গিয়েছিল—এ-বছর নতুন ঘর তৈরি

হচ্ছে, দেখেছেন নিশ্চয়,—কাঠ জোগান দিচ্ছেন ইনি। বহু টাকা করেছেন।

মনে পড়ে বটে, আসার পথে ভৈরব ঘাটিতে বহু কাঠ সংগ্রহ করা আছে দেখেছিলাম। তারি উপর বসে দুরন্ত চড়াই উঠার শ্রান্তি দূরে করেছিলাম, দ্বিপ্রহরের আহারও করেছিলাম। তখন ভেবেছিলাম, জঙ্গল থেকে বিনামূল্যে সব কেটে-আনা কাঠ,—সার্থক জন্ম এ গাছগুলির।

এখন জানি, সে-সবই এ'র ব্যবসার সম্পত্তি!

সমস্ত ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল, কিন্তু মন ঘোলাটে হয়ে উঠল।

ঘন-সবুজ জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে দেখি। চারিদিকে বিশাল বনস্পতি। তারি মাঝে মাঝে কাটা-গাছে বিচ্ছেদ ঘটিয়েছে।

শ্যাম-বনানীর শ্যামল অঙ্গে নখরা-ঘাতের ক্ষত চিহ্ন।

১৩

গঙ্গা-স্নান সেরে তৃপ্ত মনে ফিরছি, হঠাৎ এমন সময় কোথায় যেন পা দিয়ে ফেলেছি,—ব্যবসায়ী সাধুর আশ্রম থেকে বেরিয়ে মনের এমনি সঙ্কুচিত ভাব। এ-মনোভাব কাটাবার উদ্দেশে নতুন সঙ্গীদের সঙ্গে আলাপ শুরু করলাম।

একটি যুবকও আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছিলেন। সারাক্ষণে খুব অল্পই কথা কয়েছেন। এ'কে সকালেও একবার দেখে-ছিলাম ভাণ্ডারার সময়। সব সাধুদের নেওয়া শেষ হলে সসঙ্কোচে সেই ফোকরের কাছে দাঁড়িয়ে নিজের আহার্য নিয়ে-ছিলেন। তারপর নদীর ধারে একান্তে গিয়ে বসেছিলেন।

বছর কুড়ির উপর বয়স। সুশ্রী দেখতে। লম্বা দোহারা চেহারা। দাড়ি, গোঁফ আছে, কিন্তু এখনও বেশী বড় হবার সময় হয় নি। লুঙির মত একটা ছোট সাদা মোটা কাপড় পরনে—হাঁটু পর্যন্ত ঝুলে। শুধু পা, খালি গা—তারি উপর একটা সুতির মোটা চাদর জড়ানো। কাঁধের উপর একটা তোয়ালে—মাদ্রাজীদের যেমন প্রায়ই থাকে—সেইটিই শুধু গেরুয়া।

জিজ্ঞাসা করলাম, এখানেই থাকেন, না, যাত্রায় এসেছেন?

যুবকটি মিষ্টি হেসে ধীরভাবে বললেন, দুটোর কোনটাই নয়—আবার দুটোই খানিকটা ঠিক। এসেছি মাত্র দুদিন। এখানে থাকার উদ্দেশ্য নিয়ে। কালী-কমলীক্ষেত্রের একটা কুটি এ-পারে খালি পড়ে আছে সাধুদের থাকবার জন্যে। সেইটে এখন দেখতে এসেছিলাম, দেখেও গেলাম—এখন অনুমতি পেলে সেখানেই থেকে যাব।

কেদার-গঙ্গা ও ভাগীরথীর সঙ্গম-স্থলের খুব সন্নিকটেই কুটিটি। আমরাও দূরে থেকে দেখেছিলাম। সাধনার অনু-কূল স্থান।

তারপর, অতি সঙ্কোচে বললেন, আপনারা কাল সকালেই গোমুখ রওনা হচ্ছেন?

বললাম, হাঁ কেন—আপনিও যাবেন নাকি? বেশ ত চলুন না, একসঙ্গে যাওয়া যাবে।

বললেন, গোমুখ-দর্শনের ইচ্ছা ত আছে,—যেতেও নিশ্চয় হবে। তবে কালই আপনাদের সঙ্গে যাবো কিনা ঠিক বুঝতে পারছি না।

শুনেছিলাম, গোমুখের যাত্রী-সংখ্যা খুবই কম। সাধারণতঃ দল বেঁধে যাত্রীরা এখান থেকে যান্। বহু স্থানে পথ নেই, পথ-চিহ্নও নেই। তাই পথ-প্রদর্শকের একান্ত প্রয়োজন। গঙ্গোত্রীর মত ছোট জায়গায় তারও সংখ্যা খুব কম। সাধু সন্ন্যাসীরা সেই কারণে যাত্রীদলে যোগ দেন। দেবার আরও একটা কারণ আছে।

গঙ্গোত্রীর পরে

গঙ্গোত্রী থেকে গোমুখ দেখে ফিরে আসতে অন্তত তিন দিন লাগে। পথে কোথাও গ্রাম নেই—লোকের বসতিও নেই। তাই আহারাদিও মেলে না। যাত্রীদের প্রয়োজন মত নিজ নিজ আহার্য সঙ্গে নিয়ে যেতে হয়। দলে থাকলে সাধু-সন্ন্যাসীদেরও একটা ব্যবস্থা হয়ে যায়।

ইতিমধ্যে আমাদের কাছেও দুই এক-জন যাত্রী সাধু খবর নিয়ে গেছেন, আমরা যাচ্ছি কিনা।

এ-সব জানি বলেই এঁকেও উৎসাহ দলাম, আমাদের সঙ্গে যাবার জন্যে। ছেলেটিরও যাবার প্রবল আগ্রহ আছে, অথচ সঙ্কোচও আছে।

কথা বলার মধ্যে সঙ্গীটি মাঝে মাঝে ইংরেজি কথাও বলছিল। বিশুদ্ধ উচ্চারণ —ভাষাও শুদ্ধ। কৌতূহল হোল।

বললাম, কয়েকটা প্রশ্ন করব—কিছু মনে কোরো না। যদি বাধা থাকে উত্তর দিও না—আমিও কিছু মনে করব না।

হাসিমুখে বললে, বলুন না, সব কিছুরই জবাব দেবো। আপনি বুঝি এই দুবার এলেন এখানে? আমার কিন্তু এই প্রথম,—হিমালয় দেখাও প্রথম। বলুন, কি বলছেন।

আমি প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে চলি, সে-ও নিঃসঙ্কোচে উত্তর দেয়।

রাজপুত। রাজপুত্রের মত চেহারাও। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম্-এ পড়ছিল —পলিটিক্যাল সায়েন্সে-এ। আইন-কলেজে আইনও পড়ছিল। সে-কলেজে আমিও কিছুকাল পড়িয়েছি। তবে এ আমার ছাত্র নয়,—হতে পারত। স্নেহ-সূত্র যেন দৃঢ় হয়ে উঠে।

কলেজের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কয়েকজনের নাম করল,—সবাইকে চিনি। কথা বলতে বলতে ছেলেটির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। ফেলে-আসা জীবনের কয়েকটি স্মৃতি-রেখা,—যেন পুরানো চিঠি পড়ার আস্বাদ।

বাড়ীর কথাও বললে। সচ্ছল সংসার কিন্তু সংসার তাকে কোনদিন বাঁধতে পারে নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষার আগ্রহ ছিল,—কিন্তু সে-আকর্ষণও তাকে টেনে রাখতে পারে নি।

বলতে বলতে তার কণ্ঠ হঠাৎ কঠিন হয়ে উঠল,—বললে, আজ একবছর আগে সব ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছি। ঘুরেছি অনেক, শাস্ত্রগুলি পড়ছি, এখন হিমালয়ে এসেছি—নিভৃতে একান্তে বসব।

মুখের পানে তাকিয়ে দেখলাম, চোখে বুদ্ধির দীপ্তি, ওষ্ঠাধরে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, অন্তরে অটল বিশ্বাস।

সন্ন্যাসী রাজপুত্র! মনে মনে প্রণাম করলাম।

ধর্মশালার কাছে এসেছি। [illegible] স্মরণ করিয়ে দিলাম, কালকের [illegible] কথা। ভাবলাম, অপরিচয়ের বাঁধন [illegible] কাল পথে যেতে যেতে দেখব [illegible] গোপন গতি। কেন সে এতো [illegible] ছেড়ে এল? কি সে চায়?

কিন্তু তার সঙ্গে আর দেখা হয় নি। গোমুখ-যাত্রার সময় তার খোঁজ করে ছিলাম, শুনলাম, আমাদের কিছু আগে দুজন সাধু গেছেন—হয়ত তাঁদের [illegible] গেছে, পথেই দেখা হবে। কিন্তু [illegible] জানলাম, তাঁদের সঙ্গেও সে যায় নি।

না-যাওয়ার কারণও অনুমান করলাম। এ-যাত্রা-পথে অপরের কাছে কোন [illegible] সাহায্য নেওয়ার সঙ্কোচ বোধ করি সে এখনও কাটিয়ে উঠতে পারে নি।

আরও এক কারণ হয়ত আছে। সেদিনের সেই স্বল্প-আলাপনের অন্তরে প্রীতির সৌরভ ছিল।

তাই, সম্ভবত তার সন্ন্যাসী-মন স্নেহের সামান্য স্পর্শে মায়া-ভ্রমে ভীরু বিহঙ্গমের মত পালিয়েছে।

অথচ, প্রেম মাত্রেই তো মায়া নয়।

তার ক্ষণিকের পরিচয় আমার মনে আনন্দের দীপ জেলে দিল। সেই ব্যাপারী সাধুর অসাধু-সঙ্গের আঁধার ঘোচাল।

(ক্রমশ)

সাঙ্গীতিকী

পারিজাত

সংগীতের আসরে বা স্বরসাধনায় আমরা যখন তম্বুরা (চলিত কথায় তানপুরা) ছাড়ি, তখন যন্ত্রের চারটি তারই আমরা সমানভাবে ছাড়তে থাকি। অর্থাৎ আমাদের অভ্যাস এই যে, পঞ্চমের তারে যদি আমরা এক মাত্রা সময় লাগাই তো বাকী তিনটি তারেও এক এক মাত্রার ঝংকার দিয়ে চলি। বারাণসীর সুবিখ্যাত ধ্রুপদিয়া ও গ্রন্থকার স্বর্গীয় হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের এ বিষয়ে মত ও তম্বুরা ছাড়ার প্রণালী ছিল কিন্তু অন্য ধারার। তিনি বলতেন যে, আমাদের সপ্তকের সাতটি স্বরকেই ওই চারটি তারের মধ্য দিয়ে ঝংকৃত করতে হবে। এ প্রসংগে সমান মাত্রার কোন প্রশ্নই ওঠে না। তিনি বলতেন যে, পঞ্চমের তার হ'তে মধ্যম-পঞ্চম এই দুই স্বরের নির্গমন হওয়া উচিত; তেমনি খরজের তার হ'তে তিনটি স্বর যথা, ধৈবত-নিষাদ-ষড়জ এবং জুড়ির দুই তারে ঋষব-গান্ধার ধ্বনিত হয়। স্বগীয় সংগীতাচার্যের মতে, আমাদের যদি কান একটু তৈরী থাকে এবং যদি সেই সংগে একটু মনটাও সন্নিবিষ্ট থাকে, তাহলে চার তারের দুই বৈজিক স্বরের মধ্যে আমরা সপ্তস্বরের নাদধ্বনি ঠিকই শুনতে পাব।

কথাটি খাঁটী সত্য এবং এর জন্য দু'টি বিভিন্ন স্বরের স্পন্দনের কোন প্রয়োজন নেই, একটি স্বরই যথেষ্ট। এছাড়া, হরিনারায়ণবাবুর যুক্তিটি কতদূর শাস্ত্রসংগত, এও বিচার্য। এ সম্বন্ধে আমরা একটু বৈজ্ঞানিকভাবেই আলোচনা করব। পাশ্চাত্ত্য সংগীতের প্রখ্যাত শাস্ত্রকার হেল্‌ম্‌হোল্‌ৎস্ (Helmholtz) বলেন যে, আমরা বৈজিক বা মৌলিক স্বর (Fundamental) বলতে একটি স্বরকেই বুঝি, সে হচ্ছে স্বরজ। যদিও এই "সা"ই হচ্ছে "মূলগত" স্বর, এর আর এক নাম "প্রথম আংশিক স্বর" (First Partial Tone), কারণ এই "সা" হ'তেই সপ্তকের বাকী ছয় সুরের নির্গমন হয়েছে, অর্থাৎ "সা" স্বয়ং এবং রা, গা, মা, পা, ধা, নি এই ছয় সুর মিলিয়ে একটি পূর্ণ স্বরজ বা খরজ তৈরী হয়েছে। অতএব, শুদ্ধ "সা" পূর্ণ স্বর নয়, অ-পূর্ণ বা আংশিক; এবং বৈজিক বা প্রথম স্বর বলে এর নাম প্রথম আংশিক স্বর। আংশিক স্বরই হচ্ছে প্রাকৃতিক অনুরণন (Natural Harmonies) এবং স্বরের উৎকর্ষতা বা অপকর্ষতার জন্যও প্রধানত দায়ী। আমরা দেখতে পাই যে, সেতারে একটি তার, বড়-জোর দুটি তার বাজে, কিন্তু লাগান থাকে সাতটি তার, আবার তরফ দেওয়া সেতার বা সুরবাহারে এগারটি বা তেরটি তার (এসরাজে পনরটি) বাড়তি থাকে। স্বরের সম্পদ

বাড়ানর জন্য, স্বরকে ঐশ্বর্যপূর্ণ করবার জন্যই এই সব বাড়তি তারের ব্যবহার। সেতার বা সুরবাহারে কেবলমাত্র একটি তার চড়িয়ে, তাতে গৎ বাজালে এর সত্যাসত্য ধরা পড়বে। কণ্ঠস্বরেরও ঠিক একই বিশেষত্ব আছে। কোন কণ্ঠস্বর আমাদের কাছে নিষ্প্রভ ও জেল্লাহীন লাগে, এরও ঐ এক কারণ। অর্থাৎ কণ্ঠস্বরে আংশিক স্বরের বা প্রাকৃতিক অনুরণনের অপ্রাচুর্য। স্বরের মধ্যে যত বেশী এই অনুরণন, স্বরও তত বেশী ঐশ্বর্যপরায়ণ।

হেলমহোলৎস্ বলেন যে, বৈজিক স্বর হ'তে উদ্ভূত আংশিক স্বরসমূহের সংখ্যার সীমা নেই, তবে সাধারণত একটু চেষ্টা করলে ষোড়শ পর্যন্ত শোনা যায়। ফরাসী পণ্ডিত মের্সেন্ (Mersenne) বলেন যে, তিনি ত্রয়বিংশ স্বর পর্যন্ত শুনেছেন এবং দ্বাদশ, পঞ্চদশ ও সপ্তদশ স্বর পর্যন্ত বেশ ভালই শোনা যায়। আমাদের হয়ত সকল সংগীতজ্ঞের কান সমানভাবে তৈরী নয়, এবং সে কারণে অত গভীরভাবে তাঁদের বিশ্লেষণ করার শক্তিও হয়ত নেই। তবুও বৈজিক "সা" স্বরকে ধ্বনিত করলে আমরা পর পর কেমন করে কি কি স্বরের স্পন্দনধ্বনি শুনতে পাই, সেটি জেনে রাখা দরকারঃ—

সা্ সা্ পা সা গা পা ণা র্সা র্রা র্গা র্মা র্পা র্ধা র্ণা র্না র্সা এখন উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক আইন অনুসারে, আমরা দেখতে পাই যে, সপ্তস্বরের প্রায় সব স্বরই এর মধ্যে পাওয়া যায়। কতকটা এমনিভাবেই ইউরোপীয় বিলাবলী ঠাটের (Diatonic Scale) সৃষ্টি হয়। তীব্র মধ্যমটি ঘুচিয়ে শুদ্ধ মধ্যম করা হয়, কেননা দুটি চতুঃস্বরের (Tetra-chord) বাঁধনে দুইটি পূর্ণস্বর ও একটি অর্ধস্বরের স্থাপন হয়, যেমন
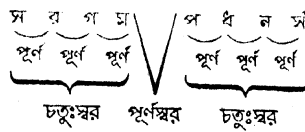
কেবল দুই টেট্রাকর্ডের মধ্যে ব্যবধান একটি পূর্ণস্বর।

পঞ্চমকে যদি খরজ করে ঝঙ্কার দেওয়া যায়, তার অনুরণন থেকে আমরা পাই—

প্ প্ র প ন র্র র্ম র্প র্ধ র্ন
ঋ" র" গ" ম" ম্ম" প"

এখানে আমরা সপ্তম আংশিক স্বরস্বরূপে মধ্যমকে পাই। কাজেই, স্বর্গীয় পণ্ডিত হরিনারায়ণবাবু কিছু অন্যায় বলতেন না যে, পঞ্চমের ঝঙ্কারে মধ্যমও ধ্বনিত হয় এবং জুড়ির তার দুটি হতে ঋষভ ও গান্ধার, এবং খরজ হতে ধৈবত-নিষাদ পাওয়া যায়। তাঁর মতানুযায়ী তানপুরা ছাড়তে হলে—

পা্ । সা । সা্ । ।
মা পা রা গা ধা না সা

আমরা এমনি পাই। এত হিসেব করে যন্ত্র ছাড়ার অনেক অসুবিধা আছে, বিশেষ যখন চতুর্মাত্রিক ছন্দে গানবাজনা চলে। তাছাড়া, স্বর-ঝঙ্কারের অনুরণন সেই স্বরেরই উপাংশ, উপাদান। স্বর-নিস্বরণের সংগে সংগেই অনুভূতিতে সপ্তস্বর মিশ্রিত পূর্ণধ্বনি শ্রবণের বিষয়ীভূত হয়, কাজেই এ প্রসংগ নিয়ে বাদানুবাদের কোন প্রয়োজন হয় না। বিশ্বের প্রতি কণায় কণায় অবিরাম শ্রুত বা অশ্রুত নাদধ্বনি ঘটে চলেছে, যার মধ্যে ছন্দেরও গরমিল নেই, সুরেরও অসাদৃশ্য নেই। শাস্ত্রীয় সংগীতের গোঁড়া ভক্তরা, যাঁরা ঔড়ব ও খাড়ব নিয়ে বাগ্-বিতণ্ডা করেন, তাঁরা যেন এ বিষয়ে একটু অবহিত থাকেন।

আসরের খবর

কলিকাতার সংগীত ক্ষেত্রে সদারাং সংগীত সংসদ আজ সুপ্রতিষ্ঠিত। গত শনিবার ২৭শে আগস্ট উক্ত সংসদ কর্তৃক আহূত এক সাংবাদিক সম্মেলনে সংসদের সভাপতি শ্রী এইচ এস কাওয়াসজী মেহতা আগামী সম্মেলনের সংবাদ ঘোষণা করে জানান যে, সংসদের উদ্যোগে নিখিল ভারত সদারাং সংগীত সম্মেলনের দ্বিতীয় বার্ষিক অনুষ্ঠান আগামী ২৩শে থেকে ২৭শে সেপ্টেম্বর দক্ষিণ কলিকাতার ভারতী প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত হবে। সভাপতি জানান যে, এবারে পাঁচদিনে মোট পাঁচটি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে।

ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলী খান (করাচী), শ্রীমতী হীরাবাঈ বরদেকার (বোম্বাই), পণ্ডিত রবিশঙ্কর (দিল্লী), ওস্তাদ বিলায়েৎ খান (সেতার বোম্বাই), শ্রীমতী বিমলা ওয়াকাদে (পুনা), ওস্তাদ হাবিবুদ্দীন খান (মীরাট), পণ্ডিত চতুরলাল (দিল্লী), শ্রীমতী রোশন কুমারী (নৃত্য বোম্বাই), ওস্তাদ ইমরাৎ খান (বোম্বাই), পণ্ডিত শান্তা প্রসাদ (বেনারস) প্রমুখ ভারত বিখ্যাত শিল্পীদের এই সম্মেলনে যোগদান সুনিশ্চিত বলে সভাপতি ঘোষণা করেন। সর্বভারতীয় খ্যাতিসম্পন্ন আরও কয়েকজন সংগীত শিল্পী ও স্থানীয় খ্যাতনামা শিল্পীগণও এই অনুষ্ঠানে যোগদান করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

সদারাং সংগীত সংসদের অন্যান্য কার্যাবলীর উল্লেখ করে সংসদ সভাপতি জানান, দুঃস্থ সংগীত শিল্পীদের অর্থ সাহায্য করিবার জন্য সংসদ একটি তহবিল করেছেন এবং এই তহবিল থেকে কয়েকজনকে ইতিমধ্যে সাহায্যও করা হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে অর্থাভাবে সাহায্য ব্যবস্থা অচল হয়ে পড়েছে। সংসদ আশা করেন যে সুস্থ শিল্পীদের সাহায্য প্রচেষ্টায় জনসাধারণ তাঁহাদের সাহায্য করবেন। সংসদের অন্যান্য কার্যালীর মধ্যে আছে নিয়মিত সংগীত আসরের ব্যবস্থা ও সদারং সংগীত কলেজ পরিচালনা।

*

আগামী ১১ই সেপ্টেম্বর রবিবার সকাল ৮টায় সুরবাণী সংগীত বিদ্যালয়ের উদ্যোগে "শ্রী" সিনেমা হলে একটি বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ এবং প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করবেন সংগীতশাস্ত্রী ডাঃ সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী। উক্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ চিন্ময় লাহিড়ী, দুর্গা সেন, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, নিখিল সেন, শ্যামল মিত্র, সনৎ সিংহ, পান্নালাল ভট্টাচার্য, নির্মল সরকার, যন্ত্রসংগীতে সুজিতনাথ, অপরেশ চট্টোপাধ্যায়, লহরায় জনাব কেরামতউল্লা খাঁ। সংগতে নানকু মহারাজ, কুমুদ ঘোষ, দেবনাথ চট্টোপাধ্যায়, দিলীপকুমার, নারায়ণ চৌধুরী, সৌমেন ঘোষ এবং বিশেষ নিমন্ত্রিত অতিথি শিল্পী হিসাবে ধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, শীতল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিদালয়ের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ অংশ গ্রহণ করবেন।

সুন্দরবনের জীবজন্তু

শ্রীঅরুণচন্দ্র গুপ্ত

পশ্চিমবঙ্গের উপকূলভাগের অধিকাংশ স্থান জুড়ে সুন্দারিগাছের অরণ্যময় অঞ্চল 'সুন্দরবন' নামে পরিচিত। কোন কোন বনজন্তু তাদের অভ্যাস ও আহার্য বদলিয়ে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে নিজেদের যে কতখানি খাপ খাইয়ে চলতে পারে পৃথিবীতে তার চমৎকার নিদর্শন পাওয়া যায় এই সুন্দরবনে। জলাভূমির কুমীরের মতো উভচর জীব ছাড়া অন্যান্য জীবের বাসের পক্ষে এ অঞ্চলের প্রাকৃতিক অবস্থা নিতান্তই প্রতিকূল। উভচর কুমীরের পক্ষে অবশ্য এখানকার অবস্থা বিশেষ অনুকূল।

তা হলেও অতি প্রাচীনকাল থেকেই এ অঞ্চলে আরো অন্য বন্য জীবজন্তু বসবাস ক'রে আসছে। এ কথা অবশ্য সত্য যে, কয়েক রকম বন্য জন্তু, অন্তত দু'টি, সাম্প্রতিক কালে সুন্দরবনের জঙ্গল থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তা স্বাভাবিক কারণে নয়, ঊনবিংশ শতাব্দীর লোলুপ শিকারীরাই সেজন্য দায়ী। এই দুটি জন্তুর একটি হচ্ছে ক্ষুদ্রকায় একশৃঙ্গী গণ্ডার। এ জাতীয় জীবের সামান্য কয়েকটি মাত্র জীবিত নিদর্শন মালয় উপদ্বীপের অতি দুর্গম অঞ্চলে এখনও আছে বলে জানা যায়। সুন্দরবনে এককালে যে গণ্ডারের বসতি ছিল তার প্রমাণ এখনও 'গেঁড়া খাল' (গেঁড়া অর্থে গণ্ডার) এই নামের মধ্যে পাওয়া যায়। এ জাতের গণ্ডারের শেষ জীবিত নিদর্শনটিকে ১৮৭০ সালের কাছাকাছি কোন এক সময়ে গুলী করে মারা হয়েছে বলে মনে হয়।

এখানকার আর একটি লুপ্ত জন্তু হচ্ছে জলচর মহিষ। ১৮৮৫ সালেও এ জন্তুর অবস্থিতি জানা যায়। এর শেষ জীবিত নিদর্শনটিকে যে কোন সময়ে হত্যা করা হয়েছে তা সঠিকভাবে জানা যায় নি।

সুন্দরবন (প্রকৃত নাম সুন্দরিবন) নাম এসেছে সুন্দরি নামের গাছ থেকে। স্থানীয় গাছপালার মধ্যে এ গাছই ব্যবসার দিক থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। অঞ্চলটি সমুদ্রের উপকূলে বহু নদীর মোহনায় সঞ্চিত পলির দ্বারা গঠিত লোনা জলাভূমি। এর বেশির ভাগ জায়গাই ভরা জোয়ারের জলে প্লাবিত হয়ে যায়। কোনো জায়গাতেই পানীয় জল পাওয়া যায় না, কাজেই জন্তুদের রীতিমত লোনা জলই পান করতে হয়। উপকূলভাগ বা তার কাছাকাছি জায়গা ছাড়া কোথাও ঘাস জন্মায় না। আর ঘাসও যা জন্মায় তার বেশির ভাগই আবার হরিণে খায় না।

মাটি বেশির ভাগ জায়গাতেই নরম কাদার মতো। তার ভিতর দিয়ে নানাজাতীয় সুন্দরিগাছের শিকড় সঙ্গীনের মত উঁচু হয়ে আছে। ফলে পথচলা অতি দুরূহ ব্যাপার। নানা আকারের নদীনালায় সমগ্র অঞ্চল পূর্ণ (এগুলিকে সে অঞ্চলে খাল বলা হয়)। ফলে অঞ্চলটিকে বহু ছোট ছোট দ্বীপের সমষ্টি বলে মনে হয়। খালগুলিতে হাঙর এবং একজাতের অত্যন্ত হিংস্র কুমীরের বাস আর দ্বীপে বাস করে গোখুরাসাপ ও একজাতীয় ডোরাকাটা বড় বাঘ। এই জাতের বাঘকেই বলা হয় 'রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার'। কাজেই দেখা যাচ্ছে, সুন্দরবন সহজে ও নিরাপদে বসবাস করার জায়গা নয়। এজন্যই সেখানে জীবজন্তুর বৈচিত্র্যও খুবই কম।

অন্যান্য জায়গার মতো এখানেও শূকর আর হরিণই বাঘের প্রধান খাদ্য। আগেই বলা হয়েছে সুন্দরবনে সব জীবজন্তুকেই লোনা জল পান করতে হয়। শূকর ও চিত্রল হরিণের এ অসুবিধা সহ্য করার ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি। এ বনে আর একটি মাত্র জাতের হরিণ বাস করে তা হল "মান্তাজাক"। এ হরিণ সাধারণত 'বার্কিং ডিয়ার' নামে পরিচিত। যে সব জায়গায় জলে লবণের ভাগ কিছু কম এরা সে সব এলাকাতেই বাস করে। সুন্দরবনের মোট হরিণের শতকরা ০·০১টি এ জাতের।

পশ্চিমবঙ্গে সুন্দরবনের যে অংশ পড়েছে তাতে বন্য জন্তুর সংখ্যা বিরল। তার কারণ, নদীগুলি উজানের দিক ক্রমশ শুকিয়ে গেছে এবং তার ফলে মোহনার জল অতিরিক্ত লবণাক্ত হয়েছে।

প্রত্যেকটি বাঘই নরখাদক—এ প্রকার অঞ্চল সুন্দরবন ছাড়া এশিয়ার আর কোথাও নেই। কখন কিভাবে এখানকার সমস্ত বাঘই নরখাদকে পরিণত হল—ইতিহাসে তার নজির নেই। তবে অনুমান করা হয় যে, কয়েক শতাব্দী পূর্বে ব-দ্বীপ অঞ্চল গঠিত হওয়ার কালে জমি যখন যথেষ্ট উঁচু হয় নি, তখন বান এলেই সমগ্র ব-দ্বীপ কয়েক ফুট জলের তলায় ডুবে যেত। শূকর ও হরিণের মতো ছোটখাট যে সব জন্তু নিকটবর্তী অরণ্য-অঞ্চল থেকে বসবাসের জন্য এ অঞ্চলে এসেছিল এ অবস্থা হলেই তারা হয় সমুদ্রে ভেসে যেত নয়তো কুমীরের পেটে যেত।

বাঘের পায়ে খুরের বদলে নখ থাকায় তারা হেলানো গাছ আঁকড়ে জলের ওপর থাকতে পারত এবং এভাবেই নিজেদের বাঁচাত। বছরের পর বছর এ রকম ঘটবার পর শিকারী জন্তু ও শিকারের জন্তুর মধ্যে

সামঞ্জস্যের এতটা অভাব ঘটল যে, বাঘ ক্ষুধার জ্বালায় নতুন শিকার খুঁজতে বাধ্য হল।

অন্যত্র এ রকম অবস্থার উদ্ভব হলে বাঘ সাধারণত নিকটবর্তী গ্রামাঞ্চলের মাঠ-ময়দান থেকে দিনের বেলায়ও গবাদি পশু শিকার করতে শুরু করে।

কিন্তু সুন্দরবনে মনুষ্যবসতি না থাকায় গৃহপালিত গবাদি পশুও ছিল না। বাধ্য হয়ে সুন্দরবনের বাঘকে খালে মাছ ধরতে শিখতে হল এবং গোসাপ জাতীয় জীব খাওয়া শুরু করতে হল। এতে ক্ষুধার নিবৃত্তি না হওয়ায় বাঘ শেষ পর্যন্ত মানুষ শিকার করতে শুরু করল। আগে এই মানুষের সম্বন্ধেই তার সহজাত একটা ভীতি ছিল। কিছুদিন মানুষ শিকার করার পর সেই সহজাত ভীতি তো সম্পূর্ণ দূর হয়ে গেলই, তার উপর মানুষ শিকার করা যে কত সহজ তাও বাঘ শিখে ফেলল। বাঘের বাচ্চারা মায়ের সঙ্গে শিকারে গিয়ে তা শিখল। এমনিভাবে ক্রমে ক্রমে এ অঞ্চলের গোটা ব্যাঘ্র সমাজই নরখাদক হয়ে উঠল। মানুষ খাওয়া তার উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া প্রকৃতি হয়ে দাঁড়াল। বহুকাল কেটে গেল, বাঘের মানুষ শিকারের স্বভাব জন্মাবার অনুকূল অবস্থার পরিবর্তন ঘটলেও প্রকৃতিবশেই বাঘগুলি মানুষ শিকার করেই যেতে লাগল এবং সুবিধা পেলে আজও মানুষই শিকার করে থাকে।

কাষ্ঠসংগ্রহ, মধুসংগ্রহ অথবা মৎস্য-শিকারের উদ্দেশ্যে যে সব লোক প্রায়ই সুন্দর-বনে যায়, সেখানকার বাঘ তাদের জীবন-যাত্রাপ্রণালী এবং অভ্যাস ও রীতি সম্বন্ধে পুরুষানুক্রমে প্রচুর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে; এসব লোকের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাঘের চাতুর্যও বৃদ্ধি পেয়েছে। খালি গায়ে, খালি পায়ে, কাটবার কোন অস্ত্র না নিয়ে কাঠের বোঝা মাথায় যেসব লোক বনের মধ্যে ঘুরে বেড়ায় বা মাছধরা জাল, ছিপ প্রভৃতি নিয়ে ছোট নৌকোয় ভেসে বেড়ায়, তাদের সে ভাল করেই চেনে; কিন্তু যারা পোশাক-পরিচ্ছদ পরে এবং মাথায় শিরস্ত্রাণ আঁটে তাদের সে চেনে না এবং তাদের সম্বন্ধে সে সন্দেহ পোষণ করে থাকে।

একটা উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হতে পারবে। ঘটনাটি খুব বেশি দিনের নয়। ১৯৪৯ সালের গোড়ার দিকে পশ্চিমবঙ্গের তখনকার রাজ্যপাল ডক্টর কৈলাসনাথ কাটজুর সঙ্গে লঞ্চে করে বর্তমান প্রবন্ধ লেখকের সুন্দরবন ভ্রমণ করার সৌভাগ্য হয়েছিল। একদিন সকাল প্রায় ৯টার সময়ে দলের লঞ্চগুলি একটি নদী দিয়ে যাচ্ছিল। নদীতে কতকগুলি ছোট মাছধরা নৌকো নোঙর বাঁধা ছিল। নৌকোগুলোর পাশ দিয়ে লঞ্চগুলি যাবার সময় জেলেদের চিৎকারে লঞ্চ থামানো হল। জেলেরা যা বলল তা থেকে বোঝা যায়, আগের রাত্রে নৌকোগুলি এখানে ওখানে ছড়িয়ে পড়ে এবং নানা জায়গায় নোঙর করে থাকে। কতকগুলি ছিল এতদূরে যেখান থেকে ডাকলে শুনতে পাওয়া যায় না। কেবল একটি নৌকো নদী আর একটি খাড়ি যেখানে মিশেছে তার কাছে খাড়ির মধ্যেই নোঙর করে ছিল। নোঙরটি ফেলা হয়েছিল খাড়ির মাঝামাঝি জায়গায়, কিন্তু পাছে রাত্রে স্রোত পালটাবার সঙ্গে সঙ্গে দিক পালটে নৌকো পাড়ে লাগে সেজন্য গাছের সঙ্গে দড়ি দিয়ে টান করে নৌকোটি বাঁধা হয়েছিল।

রাত্রে কোন ঘটনা ঘটে নি। যখন প্রভাত হল তখন সবকিছু ঠিকই আছে মনে হল। জেলেরা সকালের খাবার তৈরির কাজে লেগে গেল। তারা ভাবতেই পারে নি, যে লোকটি দড়ি খুলতে আসবে তাঁকে দিয়েই সেদিনের প্রাতরাশটা সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে এক ব্যাঘ্র-মহাশয় খাড়ির পূর্ব তীরে অপেক্ষা করছিলেন। এ সব নদীনালায় জেলেদের দৈনন্দিন কার্যকলাপের সঙ্গে এখানকার বাঘেরা খুব পরিচিত। এই বাঘটিও তাই আড়ালে নিঃশব্দে অপেক্ষা করছিল। খাওয়ার পর বছর চব্বিশ বয়সের এক সুগঠিত যুবক মাত্র একটা লুঙ্গি পরে একটা ডিঙিতে করে পাড়ে এল দড়ি খুলতে।

প্রথমে সে গেল পশ্চিম পাড়ে, তারপর গেল তার সাক্ষাৎ শমন যেখানে অপেক্ষা করছিল সেই পূর্ব পাড়ে। সন্দেহজনক কিছু দেখতে বা শুনতে না পেয়ে দড়ি খুলবার জন্য আস্তে আস্তে সে যেই নিচু হয়েছে অমনি বাঘটি একটুখানি দূর থেকে কাঁটা-ঝোপের মাঝ দিয়ে গুঁড়ি মেরে পেছনের পায়ের উপর দাঁড়িয়ে উঠে লোকটির ঘাড়ের পিছন দিক ধরল।

ঘটনাটি ঘটল অতি নিঃশব্দে, এর জন্য কোনো দৌড়োদৌড়ি বা লাফঝাঁপেরও দরকার হল না। লোকটির সঙ্গীরা নৌকো সরাবার জন্য বাইরের পাটাতনের উপর দাঁড়িয়ে ছিল। তাদের চোখের উপরই এ ব্যাপার ঘটল। তারা তো তারস্বরে চীৎকার জুড়ে দিল এবং নৌকোর পাটাতন বাজিয়ে যথাসম্ভব সোর-গোল করতে লাগল। কিন্তু কিছুতেই কোন কাজ হল না।

লোকটির ঘাড় ধরার সঙ্গে সঙ্গে মটকে গিয়েছিল, কাজেই সে কোন রকম হুটো-পাটিই করতে পারে নি। বাঘ শিকার মুখে নিয়ে কাঁটাঝোপের মধ্যে অদৃশ্য হয়। জেলেরা খুব তাড়াতাড়ি দড়ি কেটে নোঙর তুলে নৌকো বড় নদীতে নিয়ে গেল। ডিঙি সেখানেই পড়ে রইল।

আশ্চর্য এই যে, বাঘ দূরে না গিয়ে শিকার যেখানে ধরেছিল তার ৫০ ফুটের মধ্যেই বসে রইল। সে ভাল করেই জানত যে, যতই গোলমাল হোক না কেন, সে যেখানে ছিল সেখানে ঘন ঝোপের মধ্যে তার ভয়ের কিছু নেই। প্রায় এক ঘণ্টা পরে লেখক বাঘটাকে সেখানে দেখতে পান। ডক্টর কাটজুর অনুমতি নিয়ে তিনি মৃতদেহটি ফিরিয়ে আনতে যান। যেখানে মৃতদেহটি ছিল সেখানে তখন প্রচুর রক্ত পড়ে ছিল। ঘটনার বাকি অংশের সঙ্গে বর্তমান বক্তব্যের কোন সম্বন্ধ নেই। সংক্ষেপে এটুকু বলা যেতে পারে যে, বাঘ তখন তার শিকারের উপরেই ছিল, কিন্তু সে আক্রমণ না করে পিছু হটে গেল। কাদার মধ্য দিয়ে সে শিকার মুখে করে এগোতে লাগল। বিপজ্জনকভাবে কিছুক্ষণ তাড়া করার পর মৃতদেহটি উদ্ধার করা গেল। ঝোপের মধ্যে বাঘ নিজেকে খুবই নিরাপদ মনে করেছিল, তাই তাড়াহুড়ো করার প্রয়োজন বোধ করে নি। শিকারের মাত্র একখানি উরু সে খেয়েছিল।

কুমীর ও সাপ ছাড়া সুন্দরবনে সরীসৃপ জাতীয় সোনাগোদি ও রামগোদি পাওয়া যায়। এগুলির চামড়ার জন্য শিকারীরা গোপনে এ সব জীব মারতে আসে। মহিলাদের জুতো, হাতের থলি প্রভৃতি তৈরির কাজে এ চামড়া লাগে। অজগর ও রাজগোখরো সাপও এখানে পাওয়া যায়। এখানকার ইগুয়ানা জাতীয় সরীসৃপ মানুষের কোন ক্ষতি করে না, বরং গোখরো সাপের ডিম খেয়ে মানুষের উপকারই করে।

পক্ষীর মধ্যে সুন্দরবনে দু'টি শ্রেণী আছে। প্রথম শ্রেণী এখানেই থাকে এবং ডিম পাড়ে। অপর শ্রেণী বাইরে থেকে আসে লাল বন্য মুরগি, জলচর মুরগি, সাদা আইরিশ, মুখখোলা সারস, এডজুটান্ট পাখী, নানারকম বক এবং চিল প্রথম শ্রেণীতে পড়ে। রাজহংস, পাতিহাঁস, বালিহাঁস, টিয়া, হরিয়াল এবং কারলিউ পাখী দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে। স্থানীয় পাখীদের মধ্যে প্রধানত সারসদের বসবাসের বড় বড় আস্তানা আছে। এসব জায়গায় তারা যথাসময়ে ডিম পাড়ে। গোসাবার কাছে সজনেখালি বন-বিভাগের অফিসের কাছে এ রকম একটা আস্তানা দেখা যায়।

[শিক্ষক। শ্রাবণ, ১৩৬২]
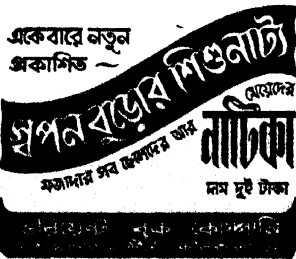
আলোচনা

'কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ'

সবিনয় নিবেদন,

রবীন্দ্রনাথের 'কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ' সম্বন্ধে ৩৯ এবং ৪১ সংখ্যক 'দেশে' যে আলোচনা হয়েছে তা থেকে সাহিত্যের একটি ব্যঞ্জনাপূর্ণ তত্ত্বের উদ্ভব হয়েছেঃ ইতিহাস, পুরাণ বা সাহিত্যের কোনো মূল চরিত্র বা কাহিনী অবলম্বনে পরবর্তী কোনো শিল্প রচনায় শিল্পীর কতোখানি স্বাধীনতা থাকা সঙ্গত? মূল লেখক শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ বলেছেন, কিছুমাত্র স্বাধীনতা নেই; আলোচক শ্রীযুক্ত অম্বুজ বসু বলেছেন, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। আমার বিনীত নিবেদন এই যে, যা সাধারণত হয়ে থাকে, সত্য উভয় প্রান্তের মধ্যবর্তী।

শ্রীযুক্ত বসু সাহিত্যের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র থেকে কয়েকটি সুপ্রসিদ্ধ উদাহরণ সহ নিজের বক্তব্য ও যুক্তিকে সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও শ্রীযুক্ত ঘোষ যে প্রশ্নটি তুলেছেন সে বিষয়ে চিন্তার অবকাশ থাকে। ইতিহাস-পুরাণ-সাহিত্যের অপেক্ষাকৃত স্বল্পপরিচিত কোনো মূল চরিত্র বা কাহিনী সম্বন্ধে সমস্যা তত গুরু নয়। কিন্তু বহুশ্রুত বিষয়গুলি নিয়েই চিন্তা। সেগুলিকে নিজের প্রয়োজন ও ইচ্ছা মতো যদি ভেঙে গড়ে নেওয়াই হোলো তাহলে মূল নামটির বিড়ম্বনা কেন? অন্য নাম দিলেই তো হয়। আধুনিক কর্ণ যদি বৃকোদরের মতোই হন তাহলে তাঁকে বৃকোদর নামে বর্ণনা করলেই তো সমস্যা মেটে। কর্ণ যদি কর্ণের মতোই না হলেন তাহলে তাঁকে কর্ণ বলা কেন?

আসল কথা, এই ধরনের সুপরিচিত চরিত্র বা কাহিনীগুলির একটা মোটামুটি পরিচয় থাকে। এই মৌলিক পরিচয় থেকে বিশেষ রকমের কোনো পার্থক্য হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। পরবর্তী দৃষ্টিভঙ্গী এমন হওয়া উচিত নয় যা এই মৌলিক পরিচয়কে আঘাত করতে পারে। এই মূল পরিধির মধ্যে থেকে কিছু কিছু অদলবদল হলে পাঠকের সঙ্গতিবোধ ব্যাহত হয় না। মূল কথাগুলি বজায় থাকলে খুঁটিনাটির পরিবর্তনে ক্ষতি নেই। এই পরিধির মধ্যে থেকে এইসব চরিত্র বা কাহিনীগুলির নতুন ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করা যেতে পারে, নতুন ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে, এবং সাধারণত তাই হয়ে থাকে। একেবারে আমূল পরিবর্তনের স্বপক্ষে কোনো যুক্তি পাওয়া দুষ্কর।

গ্যেটের 'ফাউস্ট', মিলটনের 'শয়তান', ভবভূতির 'রাম', কালিদাসের 'মহাদেব' ইত্যাদি তাদের মূল থেকে কতোখানি পৃথক্ এ-আলোচনা হয়েছে, এখানে তা থেকে নিবৃত্ত হলাম। আলোচ্য ক্ষেত্রে কর্ণের বিষয় বলা যেতে পারে যে রবীন্দ্রনাথের কর্ণ পৌরাণিক অথবা traditional কর্ণ থেকে যে মূলত পৃথক তা মনে হয় না। কর্ণ নির্দোষ চরিত্র নন। মহাভারতে কেহই নন।

যুধিষ্ঠিরেরও নরকবাস ঘটেছিল। কিন্তু কর্ণের যেসব অসামান্য গুণাবলীর পরিচয় মহাভারতকার দিয়েছেন তাতে কর্ণকে মহাভারতের মহত্তম চরিত্রের অন্যতম হিসাবে অনেকেই গণ্য করেছেন। 'দাতাকর্ণ' তো একটি প্রবাদবাক্য। তাছাড়া গুরু পরশুরামের কাছে কর্ণের অসাধারণ সহ্যশক্তির পরিচয়ের মর্মন্তুদ কাহিনী, তাঁর অতুলনীয় ক্ষাত্রবীর্য, তাঁর কৃতজ্ঞতাবোধ, আত্মসম্মানবোধ, প্রতিজ্ঞা-পরায়ণতা, করুণা ও ক্ষমা ইত্যাদি গুণাবলী সুপরিচিত। অতএব রবীন্দ্রনাথের কর্ণ মহাভারতের কর্ণকে মূলত খণ্ডন তো করেই নি; বরঞ্চ কর্ণচরিত্রের যথার্থ নাটকীয় ব্যঞ্জনাটি রবীন্দ্রনাথের চরিত্র চিত্রণে সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ কর্ণকে বৃকোদর করেন নি, আপন প্রতিভায় নতুন আলোকে পুনঃসৃষ্টি করেছেন।

'কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ' মহৎ সাহিত্য কি না সে আলোচনা বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্যের বহির্গত। ভবদীয়—হিমাংশুভূষণ মুখোপাধ্যায়, আলীগড়।

"ইতিহাস ও ৬ই আগস্ট"

শ্রীবীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক লিখিত ২০শে শ্রাবণের 'দেশে' প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ সম্পর্কে দুই একটি প্রশ্ন করতে চাই।

লেখকের ভাষায়—"বিজ্ঞানীদের ধারনা গ্রাফাইট নির্মিত অ্যাটমিক পাইলের মধ্যে বিশুদ্ধ ইউরেনিয়াম ধাতুর অবস্থিতি **সম্মতিসূচক** করা সম্ভব হলে এরা 'চেন-রিঅ্যাকসনের আবির্ভাব ঘটাবে।"

"সম্মতিসূচক" কথাটির অর্থ কী? বোধহয় ইংরেজী "agreeable" কথাটির আক্ষরিক অনুবাদ। কিন্তু বাংলা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে আক্ষরিক অনুবাদের ফল হিসাবে যাহা পরিবেশিত হইয়াছে—তাহা আর যাহাই হউক বাংলা হয় নাই। Hydrogen is chemically agreeable with chlorine। যদি ইহার বাংলা করি—হাইড্রোজেন রাসায়নিকভাবে ক্লোরিনের সম্মতিসূচক—তাহা হইলে দুর্বোধ্য কিছু বলা হইল মাত্র—বাংলা হইল না। ইহার যথার্থ অনুবাদ হওয়া উচিত—"হাইড্রোজেনের সহিত ক্লোরিনের সহজেই রাসায়নিক মিলন ঘটে"।

প্রবন্ধের শেষের দিকে লেখক বলিতেছেন—"আণবিক বোমার পরীক্ষা সর্বপ্রথম হয় ১৫ই জুলাই"। যখন পরমাণুর বস্তুকণা শক্তিতে রূপান্তরিত হইয়া মানুষকে নূতন শক্তি-ভাণ্ডের সংবাদ আনিয়া দিয়াছে—তখন "শক্তি" বা 'বোমার" আগের কথাটি "আণবিক" না হইয়া "পারমাণবিক" হওয়া উচিত সর্বক্ষেত্রে। কারণ আণবিক হইল Molecular আর পারমাণবিক Atomic। রসায়ন শাস্ত্রে—Molecular Energy বলিয়া যাহা প্রচলিত তাহাই আণবিক শক্তি। কিন্তু "Atomic" energyকে পারমাণবিক শক্তিই বলিতে হইবে। হয়ত কণা-শক্তিও বলা যাইতে পারে। ইতি—শ্রীশান্তিদা শঙ্কর দাশগুপ্ত, কলিকাতা—১।

লেখকের উত্তর

সবিনয় নিবেদন,

প্রশ্নকর্তা 'সম্মতিসূচক' কথাটির ইংরাজি আক্ষরিক অনুবাদ করে আমার রচনার ঐ অংশের অর্থ বোধ হয় অনুধাবন করতে সক্ষম হননি। আমি ইংরাজি প্রবন্ধের বাংলা অনুবাদ করি না, যে কোন বিষয়কেই সর্ব-সাধারণের জন্য সহজবোধ্য করে বাংলায় পরিবেশন করবার চেষ্টা করি। ঠিক কোন শব্দ কোন জায়গায় ব্যবহার করলে অর্থ সম্পূর্ণ এবং তৎসঙ্গে বাক্য শ্রুতিমধুর হবে তা লেখকের নিজস্ব বিবেচনার ওপর নির্ভর করে। হাইড্রোজেন এবং ক্লোরিনের agreeabilityর সঙ্গে অ্যাটমিক পাইল এবং ইউরেনিয়াম ধাতুর concurenceকে একভাবে বিচার করে অত্যন্ত ভুল করা হয়েছে। এক্ষেত্রে এই উদাহরণ একেবারেই খাটে না।

Atom অর্থ পরমাণু কিন্তু বাংলা ভাষায় atom bomb আণবিক বোমা নামেই সুপ্রচলিত। প্রত্যেক ভাষাতেই কিছু না কিছু রীতি বিরুদ্ধ শব্দের প্রচলন আছে, আণবিক বোমা বাংলা ভাষায় ঠিক সেই রকমই একটি বহুল প্রচারিত শব্দ। সুতরাং এক্ষেত্রে এর ব্যবহার ভ্রান্তিজনক বলে আমি মনে করি না।

বিনীত
বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

ফরাসী সংস্কৃতি সংখ্যা

মাননীয় মহাশয়,—'দেশে'র ফরাসী সংস্কৃতি সংখ্যা পড়ে যে বিমলানন্দ পেলাম তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। আপনার এই সাধু প্রচেষ্টায় আপনার প্রতি শ্রদ্ধায় মন ভরে গেল—আর এরই প্রেরণায় আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ না জানিয়ে থাকতে পারলাম না।

২০শে শ্রাবণের "দেশে" এই সংস্কৃতি সংখ্যাটি সম্বন্ধে প্রকাশিত আলোচনা পড়লাম। এতে প্রকাশ পেয়েছে "দেশে"র পাঠক-পাঠিকার আপনার প্রতি তাঁদের উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন আর আছে নানা বিদেশী সাহিত্যের পরিচয় পাবার অত্যুগ্র বাসনা এবং এরই তৃপ্তিলাভের জন্য রয়েছে কয়েকটি মূল্যবান প্রস্তাব ও অনুরোধ, যেমন উর্দু, ফার্সি, রাশিয়ান, ইতালীয়, জার্মান এমনকি ইংরাজীর উপরও এ ধরনের সংস্কৃতি সংখ্যা বের করা (কল্যাণকুমার ঘোষ), ফরাসী থেকে অনূদিত সমুদয় বাংলা গ্রন্থের একটি তালিকা প্রকাশ করা (অভিমন্যু মুখোপাধ্যায়) ইত্যাদি।

নানা দেশ বিদেশের ভাষা ও সাহিত্যের সম্যক পরিচয় লাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষা থাকা সত্ত্বেও আমাদের মত সাধারণ পাঠক-পাঠিকাদের পক্ষে তা মেটান সম্ভব হয়ে ওঠে না। তার কারণ, প্রথমত, আমরা সব ভাষা জানি না এবং আমাদের পক্ষে তা সম্ভবও নয়। দ্বিতীয়ত, বাংলা ভাষায় অনেক বিদেশী সাহিত্যের অনুবাদ হয়নি ইংরাজীতে যা পাওয়া যায়। এবং তৃতীয়ত হচ্ছে আর্থিক প্রশ্ন। যে ক'খানা বিদেশী বই-এর বাংলা অনুবাদ হয় তারও সব কিনে পড়বার সামর্থ্য আমাদের মত মধ্যবিত্ত পাঠকদের নেই বললেই হয়। তাই স্বল্প মূল্যের সাপ্তাহিক অথবা মাসিক পত্রিকা মারফৎই আমাদের দেশ-বিদেশের সাহিত্যের রসাস্বাদনের প্রয়াস পেতে হয়। আর এবিষয়ের সহায়ক হিসাবে বহুল প্রচারিত "দেশ" পত্রিকাই অন্যতম। তাই আপনার সকল মহৎ প্রচেষ্টাকে স্মরণ করে আপনার কাছে আমার একটি অনুরোধ যে, আমরা যাতে দেশ-বিদেশের সাহিত্যরস "দেশে"র মাধ্যমে আহরণ করবার সুযোগ পাই তারই একটি সুপরিকল্পিত উপায় উদ্ভাবন করবেন। নমস্কার। ইতি—

বিনীত—শ্রীহিরেন্দ্রকুমার লাহিড়ী।

শিকারীর স্বর্গ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ সেন

অপরাহ্নের রাঙা মেঘ কৃষ্ণচূড়ার সবুজ ফাঁদে পড়ে অজস্র সিঁথির স'দুরে ফেটে পড়েছে! সেই পুষ্পদলে [illegible]লির কাঁকর অবলুপ্ত। সেই পথে [illegible]লিতে চরণ চাহে নাকি লাজে' এইভাবে [illegible]া ফেলে সামনের ঘোমটা ঢাকা টালি [illegible]ারান্দায় এসে উঠলুম, শিল্পী রাধাচরণ [illegible] আমি।

মিষ্টি হাসি টেনে মণিবাবু আমায় [illegible]ল্লেন,—শিল্পীর কাছে আপনার খবর [illegible]পেয়েছি। এতো কাছে, তবু পরস্পরের [illegible]চনাশোনা নেই—কী আশ্চর্য!

সেই ভুল ঘোচাতেই তো এলুম আজ [illegible]শল্পীকে নিয়ে। পায়াভারি বড় সাহেব, [illegible]নে একটা সঙ্কোচ হয় বই কি!—[illegible]ত্তর দেই।

তাঁর সৌম্য মুখখানিতে প্রসন্ন হাসির [illegible]দীপ্ত; বল্লেন তিনি,—ওকথা বলবেন [illegible]া। আপনারা না এলে এখানে কি নিয়ে [illegible]ময় কাটবে। আজকের অপরাহ্নের [illegible]হরী বাড়াতে শিল্পী এসেছেন [illegible]াপনাকে নিয়ে—এতো আমার সৌভাগ্য। [illegible]ামিও আশ মিটিয়ে আপনার মতো [illegible]ন্দরবন ঘুরে এলুম; হয়তো এই শেষ [illegible]দখা,—জীবনে আর কখনো সেখানে যেতে [illegible]াবো কিনা সন্দেহ। এই দু'দিন আগে [illegible]রে এসেছি। দশ বারোদিন সেখানে [illegible]ব শিকার করেছি। চলুন না এবার আর কোথাও। আপনি তো ভোরদহের হ্রদের ধারে কাটিয়ে এলেন। শুনেছি, সেখানে বিস্তর শিকার মিলে।

বলি,—হাঁ, প্রবাসী হাঁসেরা কিছু-দিনের জন্য অরণ্যভূমি মুখর ক'রে তোলে। রাত্রিবেলা বাঘ আর বুনো শুয়রের জ্বালায় বনের ধারে যাওয়ার উপায় নেই। হ্রদের শোভা, প্রকান্ড বাঁধের উপর থেকেই দেখতে হয়। দশ বারোজন সৈন্যও সেখানে মোতায়েন। এবার কিন্তু একটা ভীষণ ব্যাপার ঘট্‌ল সেখানে। দশদিন ধরে শিকদার পাহাড়ে বাঘবেদীর কাছে বসে প্রকান্ড একটা বাঘের ভীষণ হাঁকড়ানো চলল। জি টি রোডে দিনরাত শত শত মোটর বাস ট্যাক্সি চল্‌ছে। সবাই সেই বাঘের ডাক শুনছে, অনেকে ওর প্রকান্ড মুখখানা দেখে ভয়ে সারা।

বাঘবেদীতে বুধ শনিবারে শিন্নি যোগায় এদেশের গৃহস্থ চাষীরা। গরুর প্রথম বিয়ানের দুধ, কলা, মূলা, বেগুন —যা প্রথমে ফলে, সেগুলি দিয়েই ভেট হয়। মেয়েরা লম্বা চুল খুলে দুধে ধোয়া বাঘরাণীর বেদী যত্নে পুছে দেয়। হৈ চৈ লেগে গেল চারিদিকে—পুজার কোন ত্রুটি হয়েছে এই ভেবে। ওদের সন্তান, গরু বাছুর কাড়া-মোষ, ছাগল রাতদিন তো ঐ বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায় —ওদের কল্যাণের জন্য বাঘরাণীর বেদীতে সম্বৎসরে বহুবার ঘটা ক'রে পুজো হয়। বাঘরাণীর এবার স্বয়ং উপস্থিতিতে সবাই ভয়ে সারা। পিপড়েডুলি থেকে হাজারী-বাগের সহরপুরার নদীর ধার পর্যন্ত একটা আতঙ্ক—কি জানি কখন কি হয়।

সেই শিকদার পাহাড়ের তলা দিয়ে একদল বন্ধুকে নিয়ে এসেছি ভোরদহের ডাক বাংলোয়। সুপারিন্টেন্ডেন্ট রাম-বাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে বললেন,—ভাগ্যিস্ কাল আসেন নি। এই ক'দিন কিভাবে যে কেটেছে কি বল্‌বো। রাতদিন দরজা বন্ধ করে থাকতে হয়েছে, বাঘটা নেবে গেল এইমাত্র। সেই পথেই তো আপনারা ডাক বাংলোয় ঢুকলেন।

মণিবাবু হেসে ওঠলেন,—উঃ, আমাকে কেন একটা খবর দিলেন না। ফোন পেলেই মোটর নিয়ে উর্ধশ্বাসে ছুটতুম। দেখ্‌তেন, বাঘটাকে ডাক বাংলোর দরজায় এনে আপনারই চোখের সামনে ওটাকে গুলি করে মারতুম।

বলেই তিনি হাতের তেলোয় মুখ ঢেকে এক অদ্ভুত আওয়াজ বের করলেন —যেন মাটি ফুঁড়ে বাঘের গর্জন থেকে থেকে হচ্ছে।

মণিবাবু বললেন,—বনে থেকেই এগুলি শিখেছি। এই আওয়াজ কানে গেলেই বাঘিনী ছুটে ডাক বাংলোর

দরজায় হাজির হতো। জানেন, এটা ছিল বাঘিনীর সন্তান ধারনের কাল। এভাবে আমি কয়েক জায়গায় বাঘিনী শিকার করেছি। সন্তান উৎপন্ন হলে ওরা ভীষণ নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে; এমন কি জনাকীর্ণ হাট বাজারের পাশে সামান্য বেল্লেঝোপের আড়ালে কি কৌশলে প্রকাণ্ড দেহটাকে লুকিয়ে রেখে শিকারের প্রতীক্ষায় থাকে। অনেক সময় গাঁয়ে এসে প্রকাশ্য দিবালোকে গোয়ালের জন্তু ছিনিয়ে নিয়ে যায়। অনেক সময় বাঘ-বাঘিনী একত্রে শিকারের খোঁজে বের হয়। এদেশে বৎসরে যত মানুষ ও গৃহপালিত জীবন বাঘের হাতে প্রাণ দেয়, তুলনায় আফ্রিকা দেশে সেই সংখ্যা দশমাংশের চেয়েও কম। সে সব দেশের বিচিত্র ও বিভিন্ন হিংস্র প্রাণীর সংখ্যা মানুষের তুলনায় যদিও ঢের বেশী। কিন্তু ওদেশের লোকের হাতে বহু হিংস্র প্রাণী প্রতি বৎসর মারা যায় তাই বন্যজন্তুর সংখ্যা ক্রমশই হ্রাস পেয়েছে। সেদেশের মতো আমাদের দেশে হিংস্র গরিলা ও সিংহের উৎপাত নেই বল্‌লেই হয়।

এবারে আপনাকে আমার অভিজ্ঞতার একটা কাহিনী বল্‌বো। সেটা নাগা দেশের শিকারের কথা। শিকারী জীবনের কত কথা, কত ভাব নিঃশব্দে হারিয়ে যায়। সেই বিস্মৃতির অতল থেকে বাঁচিয়ে রাখবার ভার রইল আপনার। যে-দেশে মানুষের মানমর্যাদার মাপকাঠি, কতগুলি নরমুণ্ড ঘরের দরজায় টাঙ্গানো তারই সংখ্যা গুনে, সে-দেশে শিকারের খোঁজে নাক গলাতে যাওয়া কিরূপ সুবুদ্ধির পরিচায়ক, বন্ধুজনের শ্লেষ ইঙ্গিতে বহুবারই তা' টের পেয়েছি।

শত্রুপক্ষের নিহত লোকগুলির মুণ্ড সাজিয়ে আভিজাত্যের চূড়ায় ওঠা, কিম্বা সর্দার পদবী লাভের যোগ্যতা অর্জন, এটা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এখন বিদ্যমান আছে। এই স্মরণীয় কীর্তি লাভের জন্য নিউজিল্যাণ্ড, পাপিয়া অধিবাসী, অষ্ট্রেলিয়ার অগ্নিদীক্ষার ছবি আপনি দেখেছেন (Wonders of Land & Sea বই)। আফ্রিকার প্রাচীন সনাতন প্রথায় এখনো সেটা টিঁকে আছে। কাফ্রী ও জুলুদের মধ্যেও এরূপ ধর্মোন্মাদনার দৃষ্টান্ত বর্তমানেও ভুরি ভুরি বিদ্যমান। আসামের নাগা, মিকির, কুকী, গারোদের মধ্যেও হয়তো এরূপ প্রথা এককালে ছিল।

বড় ভালবাসি আমি এই নাগাদের দেশ; প্রতি বছরই আমি সেখানে শিকারে যাই। এ আমার বহুদিনের স্নেহের বন্ধন। অনেক অকৃত্রিম বন্ধু আমি খুঁজে পেয়েছি ওদের মধ্যে। অনেকেই ওদের সম্বন্ধে একটা বিসদৃশ ধারণা পোষণ করেন,—নরখাদক, একথা সম্পূর্ণ সত্য নয়। স্থিতির সংকটকালে মানুষের আত্মরক্ষার জন্য যে রীতি অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়, অর্থাৎ প্রবলের আক্রমণ থেকে গোষ্ঠী বা বংশ রক্ষার জন্য যে ভয়াবহ নৃশংসতার প্রশ্রয় ওরা দেয়, এককালে মনুষ্য সমাজে এ অবস্থা সর্বত্রই সমভাবে বিদ্যমান ছিল। নাগা, কুকী, আবরদের বেলাও তাই, এবং এখনো তা আছে। গারো, নাগা কুকীদের মধ্যে এমন অনেককে দেখেছি, যাদের চিন্তা, ব্যবহার, সমাজজ্ঞান আমাদের চেয়ে কোন অংশেই হীন নয়। সামাজিক অন্যায় বা বিরোধের মীমাংসা এতকাল তারা আত্মবলেই সম্পন্ন করেছে; বিচার আদালতের মারপ্যাঁচের কলকাঠি নেড়ে সর্বস্বান্ত হওয়ার চেয়ে জীবন দে'য়া বা নে'য়াটাকেই ওরা শ্লাঘনীয় ভাবে। কাজেই উপজাতীয় বিরোধ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামায় যথেষ্ট শোণিতপাত হয়—এরূপ দৃষ্টান্তও বিরল নয়। যুদ্ধ ব্যাপারে বর্তমান সভ্যসমাজ যে নৃশংসতা ও পাইকারী হত্যার প্রশ্রয় দেয়, সে তুলনায় অসভ্য বর্বর জাতির বাৎসরিক নরহত্যা বা লুণ্ঠনের ব্যাপকতা অতি সামান্য। ধর্মান্ধতা ও গোঁড়ামিতে যে-পরিমাণ নরনারী বধ ও শিশু হত্যা নির্বিচারে অনুষ্ঠিত হয়েছে সে তুলনায় অসভ্য জাতির সম্মানের মানদণ্ড তথা-কথিত সভ্যজাতির চেয়ে ঢের উঁচু। বিগত

বন্দুকটা ঘুরে পাখির দিকে নিশানা ঠিক করলাম
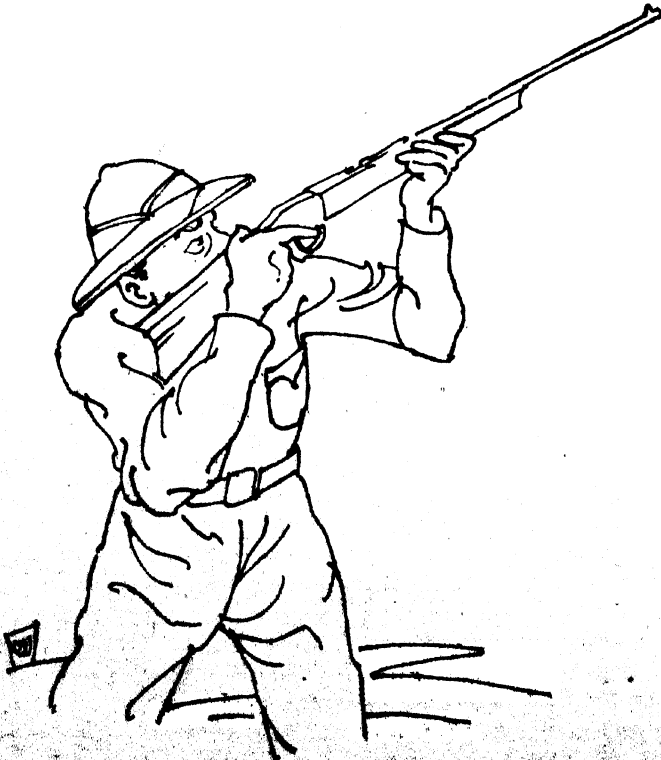
...যুদ্ধের ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের নারকীয় ...ভৎসতার ইতিহাস সবাইর জানা।

এই নাগা দেশটিকে বলা যায়, ...তিকার শিকারের স্বর্গ! শিকার খুঁজতে এখানে বিশ মাইল যেতে হয় না। বাড়ির আশপাশে ঝোপজঙ্গলে বিচিত্র বন্যজন্তুর অবাধ বিহার। বাঘ, ভাল্লুক, হাতী, গণ্ডার, প্যান্থার, চিতা, বনমানুষ, দলবদ্ধ নেকড়ে, বিষাক্ত সর্প কিছুরই অভাব নেই। পরস্পরের পথের কণ্টক দূর করতে এরা পরস্পর প্রতিযোগী।

বর্তমান দিনে দশচক্রের চাপে সব কিছুই যেন কর্পূরের মতো উবে যেতে শুরু করছে। সব চিন্তা বাদ দিয়ে প্রতি বৎসরই চলে আসি পাহাড়ী দেশের সুস্থ সবল মানুষগুলির সাহচর্য লাভের আশায়। ছুটির দিন ঘনিয়ে এলেই উৎসাহে যেন চোখের ঘুম ফুরিয়ে আসে। সোজা দুটো বন্দুক হাতে ক'রে বের হয়ে পড়ি সঙ্গে জিনিসপত্তর একপ্রকার নেই বললেও হয়। নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে মনে হয়, সোনার কলকাতা শহর নিঃশব্দে মিলিয়ে গেছে। সবুজের রং মেশে চোখে। দেখি, পাহাড় অরণ্য, ছায়াময় বনভূমি—হরিৎ পৃথ্বীর গোপন সত্তা, আর সুনীল আকাশের বহুবিস্তৃত পাখা আনন্দ-উন্মত্তায় চারিদিক ভরে আছে। এমন অভিরাম ছবি নিঃসন্দেহ মনের ক্ষুধিত আত্মাকে সোহাগ যুগিয়ে উৎফুল্ল ক'রে তোলে। এই সুস্থ সবল পাহাড়ীদের সম্বন্ধে অনেকে কেন এই উগ্র মনোভাব পোষণ করেন আজো বুঝতে পারি না। হয়তো বিদেশীয়দের পুঁথিতে এমন অনেক আজগুবী খবর বের হয়েছে, যাতে আমরা নিজের দেশবাসীকে ঘৃণা করতে শিখেছি। বিদেশী মিশনারীরা ওদের যতই উপকার করুক, ওদের জাতীয়তা বোধটিকে নিজেদের প্রয়োজনে লাগাবার জন্যই ওরা ব্যস্ত হয়ে ওঠে। যে জাতি ইংরেজের শক্তি খর্ব করবার জন্য মহাত্মার ...কাবলম্বী হয়েছিল, তারা কিভাবে ভারতীয় স্বাধীনতায় সংযুক্ত থাকবার বিরোধী হতে পারে? বিদেশী পুঁথিতে ...কারী নরমাংসলোভী জাতির কত ...ব্যাখ্যা আমরা এতকাল শুনে ...ছি। কিন্তু প্রত্যক্ষ এখানে তো ...ই দেখলুম না।

বিরাট পাখা দুটি নিচে নেমে আসছে

প্রবলের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে প্রতিঘাত হানবার যে দুর্জয় চেষ্টা মানুষের মনে—সেই ভয়াবহ নিষ্ঠুরতা এখনো পৃথিবীতে বিদ্যমান।

বর্তমান সভ্যজাতির দিকে তাকালে বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়; রাজ্য বিস্তারের লোভে এই পর্তুগাল জাতির বংশধরেরা কিরূপ নিষ্ঠুরতার সহিত ও ব্যাপকভাবে ইনকো ও মায়া সভ্যতাকে সমূলে উচ্ছেদ করেছে। পেরু সভ্যতার সমগ্র নিদর্শন চূর্ণ করে সমগ্র জাতির ধ্বংসসাধনে বিরত হয় নাই, এরূপ সভ্যজাতির পরিচয়ও আমরা পাই। খৃষ্টশিষ্যদের এই অমানুষিক অত্যাচারের বিবরণ এখনও পুঁথিপত্রে টিঁকে আছে।

মায়াবিনী কথাটির স্বরূপ অর্থে বোঝায় নাগা পাহাড়ের এই নদীটিকে। বনজঙ্গলের হাঁটাপথে কতবার যে নদী পেরুতে হল ঠিক নেই, কত কষ্টে নদী উত্তীর্ণ হয়েছি লোকের ঘাড়ে চেপে। একটু এগিয়ে শুনতে পাই, নদীর আবার সেই খল্ খল্ হাসি। শিলা-রাশির উপর ছন্দলীলার বার্তা বয়ে চলেছে। সতর্ক হয়ে পা না বাড়ালে ওরই অট্টহাসির স্রোতে গড়িয়ে পড়তে হবে। এবারেও পারানির কড়ি যোগাতে হলো হৃষ্টপুষ্ট নাগা বাহকের কাঁধে চেপে। একটু কোথাও টেরে গেলেই সর্বনাশ! ঘাড়ের মোট স্রোতের মুখে নাকানি-চুবানি খেয়ে উঠবে। সে আরো ফ্যাসাদ। খৃষ্টপর্বে কলকাতার মাঠে চলে ঘোড়-দৌড়ের মহরৎ ও আমোদ-প্রমোদের তুর্কি নাচ। সে সব ছেড়ে প্রতি বছরই নাগা পাহাড়ে হাজির হই। পঞ্চায়েৎ বা মোড়লের উপর প্রত্যেক পুঞ্জির অতিথ-শালার দায়িত্বভার আবহমানকাল থেকে চলে আসছে। খাবার-দাবার জিনিসপত্রও ওরাই সরবরাহ করে।

আমি পুঞ্জীর বাইরে তাঁবু খাটিয়ে আছি। ওদের রসদ কখনো চাইনে।

সকালবেলা। খোলা তাঁবুতে বসে চেয়ে আছি দূর অরণ্যের দিকে। কেমন স্তরে স্তরে পাহাড়শ্রেণী ঘন অরণ্যের আচ্ছাদনে আবৃত। স্বচ্ছ আকাশটির স্পর্শ এসে লেগেছে। সেই নীল সবুজের বুকে পড়েছে সূর্যরশ্মি। সকালবেলা। দূর থেকে পুঞ্জির স্ত্রী-পুরুষ, ছোট ছেলেমেয়েরা উঁকি দিচ্ছে আমার তাঁবুর দিকে। জনকয়েক সাহসী ছেলে একটু একটু করে আমার তাঁবুর দিকে এগিয়ে চোখ বিস্তৃত করে ভিতরের জিনিসগুলির দিকে নজর দিচ্ছিল।

কলম্বাসের মতো একজন রহস্য অনুসন্ধিৎসু তাঁবুর এক পাশে রক্ষিত বন্দুকটির কাছে এগিয়ে এল। তারপর আমার দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করলো,—বাবু, এটা কি?

বন্দুক।

ছেলেটি প্রশ্ন করলো,—এতে কী হয় বাবু?

বন্দুকের কথাটা তাকে বুঝিয়ে দিতেই সে বলে উঠল,—ঐ যে চিলটা দেখছিস, ওকে তুই মারতে পারিস?

বলি,—আকাশে তো অনেকগুলি চিল, তার কোন্‌টা?

ছেলেটি তৎক্ষণাৎ হাতের আঙুল বাড়িয়ে বলল,—ঐ যে দূরের চিলটা—সোনালী রংয়ের ওর পালক। দেখ্‌ছিস তো?

উত্তর দেই—ওটাকে মেরে কি হবে?

ছেলেটি বলে,—তুই ওকে মারতেই পারবি না কখনো।

এক গুলিতেই ওটা ঝপাং ক'রে আছ্‌ড়িয়ে মাটিতে পড়বে'—একটু আত্ম-শ্লাঘার সংগেই কথার উত্তর দেই। ওটা তো কারু অনিষ্ট করে নাই? কেন মারবো?

ছেলেটি হাত তুলে বল্‌ল—বলিস্ কি? ওটা যে আমার সখের ছাগলের বাচ্চাটাকে মেরে দিয়েছে। ওকে মারবার জন্য কত চেষ্টা করেছি, কত জায়গায় ফাঁদ পেতে রেখেছি, কিন্তু ওটা ভারি চালাক।

ওকে জিজ্ঞাসা করি,—তোর নাম কি?

"বলুয়া।"

দেখ্‌তো, হাওয়ায় ওটা দোল খেয়ে চর্কি-ঘোরা ঘুরছে। ওটাকে মেরে কি হবে?—বুলুয়াকে বোঝাই।

বলুয়া বলে,—ওটা ভারি চিম্‌টে চোর। ছাগল ছানাটিকে নখে বিঁধিয়ে আকাশে টেনে তুল্‌ল, কিন্তু রাখতে 'নারলো'। সেই উঁচু থেকে পাথরে ছিট্‌কে পড়ে ছাগলটা ভ্যাঁ ভ্যাঁ ক'রে শেষটায় মরে গেল। ওটাকে তুই মারতেই পারবি না। কত ঢিল ছুঁড়ে দেখেছি, ওর গায়েই পৌঁছায় না।

একটা ডেক চেয়ারে বসে বলুয়ার সংগে কথাবার্তা চালাচ্ছিলুম। আস্তে আস্তে সংগীরাও এসে তার গা ঘেঁষে দাঁড়ালো।

কী ওদের চেহারা! যেন কালো পাথর কুঁদে মূর্তি গ'ড়েছে কেউ! চোখগুলি কী ভাস্বর! হাতের ও পায়ের সুস্পষ্ট পেশীগুলি দেখে দুঃখ হয়, আমাদের ছেলেমেয়েদের জন্য। এদেশে দেখি, প্রত্যেকের বুক নাভি থেকে আধ হাত উঁচুতে; আর ম্যালেরিয়াক্লিষ্ট উদরের পরিধির দিকে তাকালে চোখে জল আসে। ন্যুব্জদেহ মানুষের ভবিষ্যতের দিকটাও অন্ধকার সমাচ্ছন্ন।

বলুয়াকে বন্দুকটা এগিয়ে দিতে নির্দেশ দেই। সে খুশী হয়ে ওঠে; চোখে মুখে ওর একটা আলোকের ছটা সহসা ফুটে উঠল।

ডেক চেয়ারে বসেই বন্দুকটা তুলে পাখীর দিকে নিশানা ঠিক ক'রে দুড়ুম ক'রে গুলি ছুঁড়তেই দেখি, ঘুরে ঘুরে বিরাট পাখা দু'টি নীচে নেবে আস্‌ছে। বিস্ময়ে বিস্ফারিত চোখে ছেলেগুলি পাথরের মূর্তির মতোই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

"যা বলুয়া, পাখীটাকে কুড়িয়ে আন।"

এই নির্দেশ পেয়েই ছেলের দল ছুটলো ময়দানের দিকে।

একটু বাদে তারা ফিরে এল। বলুয়া পাখীটিকে কাঁধের উপর ফেলেছে; সর্বাংগে তার রক্তধারা গড়িয়ে পড়ছে। চোখে মুখে অদ্ভুত আনন্দের ঔজ্জ্বল্য! —এতোদিনের পরিশ্রম যেন আজ সার্থক! ছাগল চুরির উপযুক্ত দণ্ড তো এই।

পাখীটি তুলে এনে বলুয়া যখন আমার পায়ের কাছে রাখলো, বল্লুম,— এ পাখী তোর বলুয়া, তুই নিয়ে যা।

অম্নি সেই দলটি হর্ষের হিল্লোল তুলল। বলুয়া পাখীটিকে ঘাড়ে তুলে নিল। হর্ষের স্রোত নাগা পুঞ্জির দিকে এগিয়ে গেল।

(২)

সেদিন বিকেলে উপেন মারাং এসে সদলবলে হাজির।

কি খবর মারাং মশয়?

বলে,—বলুয়াকে আজ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। দুপুরে বাড়ির পাশের ঝোপ থেকে বাঘ বেরুয়ে এসে ওকে নিয়ে গেছে; এখনো খোঁজ হয়নি ওর। আপনাকেও যেতে হবে। পুঞ্জির একদল বল্লমধারী নাগাও এসেছে সঙ্গে।

বহু লোকজন নিয়ে বলুয়ার খোঁজে বেরুলুম। বহু বনজঙ্গল, গিরি-কন্দর, মাঠ, জলা ছাড়িয়ে একটা টিলাতে উঠলুম। প্রত্যেক স্থান তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজে দেখ্‌তে লাগল লোকেরা।

হঠাৎ দূরে দেখা গেল, বলুয়ার আধখানা মৃতদেহ পড়ে আছে। অম্নি নাগা শিকারীর দল স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালো। তারপর গোল হয়ে ওদের যুদ্ধ নাচ শুরু করল। মারাং সেই দলের মাঝখানে। এইবারে সবাই সারি হয়ে বর্শাখানা মাথার উপর উঁচু ক'রে বারকয়েক যুদ্ধ-হুঙ্কার (war cry) দিয়ে এক সঙ্গে বর্শাগুলি যেখানে বুলুয়ার দেহ পড়েছিল, সেখানে ছুঁড়ে মারল। তারপর নৃত্য করতে করতে সেখানে এগিয়ে গেল।

আমি মারাংকে জিজ্ঞাসা করলুম,— এর অর্থ কি?

মারাং বলল,—এটাই আমাদের সনাতন যুদ্ধ-রীতি। এই বর্শাগুলিই শত্রুকে লক্ষ্য ক'রে বিদ্ধ করা হয়েছে। এবারে বলুয়ার বাপ এখানেই ওর কবর দিবে।

দেখলুম, বলুয়ার বাপের চোখে বিন্দুমাত্র জল নেই। কেননা, এ বীরের মৃত্যু। ছেলের দেহটিকে বাড়িতে বয়ে নিয়ে গেলে মেয়েদের যে আর্তনাদের বিভীষিকা ওঠে, সে রীতি এখানে নেই। সেখানেই সবাই মিলে একটা কবর খুঁড়ল। তার ভিতর বলুয়ার অর্ধভুক্ত দেহটি রক্ষা ক'রে প্রত্যেকেই তার উপর কিছু মাটি দিয়ে প্রত্যেকের শ্রদ্ধা নিবেদন করবে। প্রথমেই আমার ডাক পড়লো। কয়েক মুষ্টি মাটি বুলুয়ার কবরে নিক্ষেপ করে উঠে দাঁড়ালুম। আজিকার প্রভাতের ছবিটির সঙ্গে এর কত তফাৎ। সেই উষ্ম শোণিতের উৎসাহপূর্ণ নব-প্রভাতটিকে এই রুক্ষ কঙ্করাকীর্ণ ভূমিতে রেখে গেলাম আজ সকলে।

বলুয়ার প্রতি শেষ কর্তব্য সারা হলে মৌনভাবে সবাই গৃহে ফিরে এলাম।

ঘরে যাবার আগে মারাং মশায় বললেন,—আজ রাত্রিবেলা বাঘটাকে শিকার করতে হবে; আধ খাওয়া দেহটির খোঁজে বাঘটি রাত্রিবেলা নিশ্চয়ই ঘুরে আসবে। আপনাকেও যেতে হবে। সেখানে একটা মাচাং তৈরী হয়ে গেছে। আপনি প্রস্তুত থাক্‌বেন; রাত দশটায় সেখানে গিয়ে পৌঁছবো।

রাত ন'টায় মারাং মশায় এসে হাজির, সঙ্গে আরো দুজন শিকারী। সেখানে পৌঁছে দেখি, মাঁচা হাত চারেক উঁচু; কবরের খানিক দূরে খুঁটির উপর তৈরী —বেশ সাজানো গোছানো; চারিদিকে কাঁচা পাতার ডাল বেঁধে দিয়েছে,—হঠাৎ দেখলে গাছের ঝোপ বলেই ভ্রম হয়।

মাঁচার খুঁটিতে হাত রেখে মনে হোল, এটা বড় নড়বড়ে—একটুতে হেলে পড়তে পারে। জিজ্ঞেস করলুম, মারাং মশায়কে,—দেখুন তো, চারজনের ভার এতে সইবে তো?

তিনিও খুঁটি নেড়ে অবাক হয়ে রইলেন; বললেন,—ওরা তো শক্ত ক'রেই

মাচাং বে'ধেছে—কি ক'রে এমনটা হোল?

তারপর খ্‌'জতে গিয়ে দেখেন—ডালপালায় কাঁচা কাদা মাটি লেগে রয়েছে। মারাং মশায় বললেন,— জলা থেকে হাতীগ্‌লি ফেরবার বেলা হয়তো গাছ ভেবে এতে গা ঘষেছে, তাই খ্‌'টি-গ্‌লি নড়ে গেছে। আচ্ছা, এবারে উঠে পড়্‌ন মাঁচায়, বাঘ আসবার সময়ও ঘনিয়ে এসেছে। তিনজন তো খ্‌'টির উপর হাত রেখে এক লাফে উপরে উঠে পড়লেন। খ্‌'টিতে ভর রেখে বন্দ্‌ক হাতে নিয়ে উঠতে গিয়ে খানিকটা পিছলে পড়তেই সংগীরা আমায় হাত ধরে টেনে উপরে তুলল। জ্‌ত করে যে যার জায়গায় বসে পড়েছি। কারো একট্‌ নড়বার যো নেই—'নট ট্‌ স্পিক্‌', এমনকি হাসি কাশির আওয়াজও বন্ধ। নিশ্বাস ছাড়তে হবে খ্‌ব আস্তে; কেননা, বাঘের এসব বিষয়ে বোধ বড় প্রখর। বহ্‌ দ্‌র থেকেই মান্‌ষের গতি-বিধি সন্ধান নেবার জন্য কান ও নাক খাড়া ক'রে রাখে। অনেক সময় মান্‌ষের গায়ের গন্ধেও বাঘ সজাগ হয়ে ওঠে। কাজেই যেদিক থেকে বাঘের আগমন সম্ভাবনা হাওয়ার গতিটা সেই দিক থেকে হওয়াই নিরাপদ। বিপরীত দিক থেকে হাওয়া বইলে বাঘ অনেক সময় খ্‌'ত খ্‌'ত করে কিম্বা ফিরে যায়, অথবা দ্‌রে চুপ করে দাঁড়িয়ে সন্দিগ্ধ-ভাবে চারিদিকে চেয়ে দেখে।

আমরা যেন টের পাচ্ছি, বাঘটা কোথাও ল্‌কিয়ে থেকে চারিদিকের অবস্থাটা বেশ ভালভাবে পরীক্ষা করছে। একটা সন্দেহের ছায়া চারিদিকে। বল্‌য়ার মৃতদেহের খানিকটা যেখানে সে রেখে গেছিল, সে পর্যন্ত এগিয়ে আসছে না। বনের অন্ধকারে একটা নীল আলোক শিখা ক্ষণে ক্ষণে জ্বলে উঠছে তারও আভাস পাচ্ছি। বাঘের ল্‌কোচুরি খেলাটা ভালভাবেই লক্ষ্য করছি। বল্‌য়ার প্রাণ নিয়েছে, সেই দণ্ড দিতে চারজন শিকারীর তীক্ষ্ন দৃষ্টি প্রতি ম্‌হ্‌র্তে লক্ষ্য বিদ্ধ করবার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেছে। জানোয়ার, বল্‌র শাস্তি তোমাকে আজ নিতেই হবে।

হঠাৎ এ কিসের শব্দ! মনে হোল, কোথাও একটা ভীষণ অগ্নিকাণ্ড স্‌র্‌ হয়েছে। কিন্তু আগ্‌নের শিখা দেখা যাচ্ছে না। ফাঁস ফাঁস ফাঁস—বাঁশ ফাটার আওয়াজ চতুর্দিকে। দ্‌'দশটা নয়, এক সংগে শত শত বাঁশ ফাট্‌ছে। আর কী তার বিকট শব্দ! ক্রমেই বেড়ে চলেছে—সেই আওয়াজ—তার তীব্রতা, সেই আর্ত-কঠোরতা। কি হোল মারাং মশায়? ফিরে দেখি, আমার সংগী তিন[illegible] বর্শা শ্লথ হাত থেকে মাটি[illegible] পড়ে [illegible] ম্‌খে কেবল—ওরে গেল্‌ম গেল্‌ম অনেক কষ্টে বললেন—মস্ত কোন [illegible] দল বাঁশ বন খেতে খেতে এদিকে [illegible] চারিদিকটা ঘিরে ফেলেছে—পাল[illegible] আর পথ নেই। শ্‌'ড় দিয়ে বাঁশের উল্টে পটাপট ভাঙছে—এ তারই শব্দ[illegible]

মারাং কাঁপতে কাঁপতে বললে[illegible] পথ দেখ্‌ছি না কোন দিকে, কেবল সাপ আসবার স্‌ড়ংগটি বাদে।

মারাং বলেছিলেন—বাঘ [illegible] পর সেখানে একটা স্‌ড়ংগের ভিতর [illegible] রাত বারোটায় একটা অজগর ফণা দ্‌[illegible] এদিকে এগিয়ে আসে—তার মণির [illegible] বনটা আলো হয়, সেটাকেও মেরে কেড়ে নিতে হবে।

হায়রে আপদ! সেই একটি পথই আমাদের জন্য খোলা। হামা[illegible] দিয়ে কতকটা এগিয়ে সেই স্‌ড়ংগের নেবে এলাম। এবার যদি অজগরটা দ্‌লিয়ে গিরিদ্‌র্গের পথরোধ দাঁড়ায়, কি হবে উপায়?

ফণি কুড়ানোর কথা তখন গেছি; কোনক্রমে প্রাণ হাতে করে স্‌ড়ংগটা পের্‌তে পারি, তবেই [illegible] মা মনসার দোহাই দেই মনে মনে। কেড়ে নেবার ইচ্ছাটাও নেহাৎ বাজে কিছ্‌ মনে করো না।

যা হোক, কেউ এলো না দ্‌ঃসময়ে।

চারজন শিকারী জলাভূমির ধার[illegible] এক নাগা বাড়ির কাছে এসে পৌঁ[illegible] শীতে আমাদের হাত-পা জমে উ[illegible] নাগা গৃহস্থ একরাশি খড় এনে [illegible] আগ্‌ন ধরালো। সেই আগ্‌নে হাত[illegible] গ্‌লি সে'কে যেই ঘরের ভিতর এ[illegible] অম্নি একটা প্রকাণ্ড বাঘ, যে[illegible] বসে আমরা আগ্‌নে হাত-পা সে'কছি সেখানে লাফিয়ে এসেই কী [illegible] চীৎকার শ্‌র্‌ করছে। এতক্ষণ [illegible] আমাদের পিছ্‌ নিয়ে এতটা পথ এ[illegible] এবং শিকার হাতছাড়া হোল ভেবেই এই ভীষণ গর্জন।

যাক, ভালোয় ভালোয় সে [illegible] বে'চে গেল্‌ম।

রামকৃষ্ণ মিশন ও ভারতবর্ষ

শ্রীসরলাবালা সরকার

ভক্তি এবং ঠাকুরঘর সম্বন্ধে নিয়মগুলির মধ্যে স্বামীজী বিশেষভাবে সাবধান করিয়া দিয়াছেন যেন সেগুলি কেবল বাহিরের আড়ম্বর মাত্র না হয়।

ভক্তির ১নং নিয়মে বলা হইয়াছে, [illegible]প্ত না হইলে কাহারও ভক্তিতে [illegible] নাই, ইহা বিশেষরূপে মনে [illegible] হইবে।'

[illegible]নং। সংকীর্তনের উৎসাহে লম্ফ-[illegible] করিয়া স্নায়ুমণ্ডলীকে পর্যন্ত [illegible] মূর্চ্ছাগ্রস্থ হওয়াই ভক্তি নহে, [illegible] সকলের মনে থাকে।

[illegible]নং নিয়মে বলা হইয়াছে, "ভক্তির [illegible] যোগের উচ্চসীমায় উপস্থিত [illegible]। কিন্তু লম্ফঝম্ফ করিলে বা [illegible]গ্রস্ত হইলে অথবা উক্ত ভাবকালে অলৌকিক দর্শন হইলেই যে জীব সমাধি অবস্থা প্রাপ্ত, ইহা সিদ্ধান্ত নহে।

৪। ভক্তির প্রভাবে সমাধি উপস্থিত হইয়াছে বা স্নায়ুর তাড়নায় স্বপ্ন সন্দর্শন হইতেছে, ইহা স্থির করিতে হইবে।

এই সমস্ত কথায় প্রকৃত ভক্তিকে [illegible] করা হয় নাই, কিন্তু এই ভাবের [illegible] যে দুর্বলতা আসে সেই [illegible] বিশেষভাবে সতর্ক করা [illegible] সেইজন্য ৭নং নিয়মে এ কথাও [illegible]য়াছে যে, "অধ্যক্ষদিগের ইহাও [illegible] দৃষ্টি রাখা উচিত যে, ভক্ত্যাদি [illegible]কটি প্রবল হইয়া অপরগুলিকে [illegible] করে।" (অর্থাৎ ভক্তি ভাবের [illegible] প্রভৃতি যেন পরিত্যক্ত না হয়) [illegible] নিয়মে বলিয়াছেন, "ভক্তিভাব [illegible] ভজনস্বরূপ ভগবানের গুণা-[illegible]ত হইবে এবং উহাতে তাল-[illegible] প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে।" [illegible] গুণানুবাদের গান যেন [illegible] গীত হয়)

[illegible] সম্বন্ধেও স্বামীজী কোন বাধানিষেধ প্রবর্তন করেন নাই। ১নং নিয়মে বলিয়াছেন "এই মঠের প্রত্যেক অঙ্গই ঠাকুরঘরে যাইয়া পূজা করিতে পারিবেন।"

কিন্তু ২নং নিয়মে বলিয়াছেন, "ঠাকুর স্থাপন, পূজা, ভোগরাগ ইত্যাদি সম্বন্ধে পরমহংসদেবের কোন উপদেশ নাই। ইহা তাঁহার সম্মানের জন্য আমরা কল্পনা করিয়াছি।

৩নং নিয়মে পরমহংসদেবের প্রধান শিক্ষা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, "যোগ, ধ্যান, ভজন, জপ ইত্যাদিই তাঁহার প্রধান শিক্ষা। মঠে বর্তমান ব্যক্তিদিগের মধ্যে কেহই একথা স্বীকার করেন না যে, পরমহংসদেব কাহাকেও মূর্তি স্থাপন, পূজা, ভোগরাগাদির উপদেশ করিয়াছেন।"

৭নং নিয়মেঃ—"মূর্তি পূজাদি অন্যান্য ভাবও যথাস্থানে পরিলক্ষিত হইবে। কিন্তু প্রভুর প্রদর্শিত শিক্ষা-প্রণালীই সর্বোচ্চ স্থান প্রাপ্ত হইবে ও সর্বাপেক্ষা সর্বাধিক প্রযত্নের অধিকারী হইবে।

৮নং। অর্থাৎ প্রত্যেকেই এইটি বিশেষ মনে রাখিবেন যে, যিনি ধ্যান, ভজন ইত্যাদি প্রণালী ত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র মূর্তিপূজা, ভোগরাগ ইত্যাদিতে ব্যস্ত আছেন, তিনি প্রভুর প্রদর্শিত শিক্ষা-প্রণালীকে অবজ্ঞা করিতেছেন। ধ্যান, ভজন ইত্যাদি প্রধান কর্তব্যের সঙ্গে মূর্তিপূজা প্রভৃতি আর সমস্ত থাকুক, হানি নাই।

স্বামীজীর এই নিয়মাবলীতে আর একটি পর্যায়ে বিশেষভাবে ভারতবর্ষের কার্যপ্রণালী সম্বন্ধেই উল্লেখ আছে। স্বামীজী বলিয়াছেন, "ভারতবর্ষে ৬৩ কোটিরও অধিক হিন্দুর বসতি ছিল, কিন্তু আজ সে হিন্দু ২০ কোটিতে পরিণত হইয়াছে। তাহার উপর খৃষ্টান রাজ্যের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় ২ কোটি লোক খৃষ্টান হইয়া গিয়াছে এবং প্রতি বৎসর প্রায় লক্ষাধিক লোক খৃষ্টান হইয়া যাইতেছে। এই হিন্দুজাতি ও ধর্মের রক্ষার জন্যই করুণাবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব অবতীর্ণ হইয়াছেন।

স্বামীজী ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এই নিয়মাবলীতে পর পর যে কয়েকটি বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন তাহার কিছু কিছু এখানে উদ্ধৃত করিতেছি। স্বামীজী বলিয়াছেন, "সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে দুইটি মহাশক্তি নিরন্তর কার্য করিতেছে। এই দুই মহাশক্তির সংঘর্ষেই জগতের বৈচিত্র্য ও লীলা সংঘটিত হইতেছে।

মানব সমাজেও এই দুই শক্তি জাতি-রূপ বৈচিত্র্য প্রতিনিয়ত উৎপাদন করিতেছে ও করিবে।"

স্বামীজীর মতে "বৈচিত্র্যই জগতের প্রাণ এবং এই বৈচিত্র্যরূপ জাতি কখনও বিনষ্ট হইবার নহে।" কিন্তু তিনি বলিয়াছেন "এই বৈচিত্র্যের সঙ্গে সঙ্গে

মৃত্যুর ছায়ার ন্যায় অধিকার-তারতম্য-- মানব সমাজে উপস্থিত হইতেছে।"

স্বামীজী বলিয়াছেন, "নিয়ত সংঘর্ষশীল এই দুইটি শক্তির মধ্যে একটি অধিকার-তারতম্যের অনুকূল ও দ্বিতীয়টি তাহার প্রতিকূলে উপস্থিত হইয়া তাহাকে নষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছে।"

স্বামীজীর মতে, "বুদ্ধি ও শক্তির তারতম্যে ব্যক্তিবিশেষে ক্রিয়ার বিশেষত্ব থাকিবেই, যথা—কেহ সমাজ শাসনে পারদর্শী, কেহ বা পথের ধূলি পরিষ্করণে ক্ষমবান। তাই বলিয়া সমাজ শাসনে পারদর্শী মানবেরই যে জগতের যাবতীয় সুখ ভোগে অধিকার থাকিবে এবং পথের ধূলি-পরিষ্কারক অনাহারে মরিবে, ইহাই সামাজিক অকল্যাণের মূল কারণ।"

পলিটিক্স সম্বন্ধে স্বামীজী বলিয়াছেন, "সমাজে যাহাকে সমাজনীতি বা Politics বলে, তাহা কেবল এই ভোগ-তারতম্য-সমুত্থিত অধিকারপ্রাপ্ত ও অধিকার-নিরাকৃত জাতিসমূহের সংগ্রামের নাম।"

আমাদের দেশে ও সকল দেশেই কোন না কোনভাবে 'জাতিভেদ' আছে। আমাদের দেশে যেভাবে বর্ণাশ্রম ধর্ম অনুসারে জাতিভেদ প্রচলিত আছে, স্বামীজীর মতে তাহা অনিষ্টকর নয়। তিনি বলিয়াছেন, "আমাদের দেশে সম্প্রতি যত জাতি আছে তদপেক্ষা যদি লক্ষাধিক

জাতি হয়, তবে কল্যাণ বই অকল্যাণ নাই। কারণ যে দেশে জাতির সংখ্যা যত অধিক, সে দেশে শিল্পাদি ব্যবসায়ের সংখ্যা ততই অধিক; কিন্তু মৃত্যুর ছায়া-রূপ ভোগ তারতম্য জাতির বিপক্ষেই সংগ্রাম করিতেছে।"

স্বামীজী আরও বলিয়াছেন, "যে জাতি এ সংগ্রামে যত পরাজিত, তাহার দুর্দশা ততই অধিক। এ সংগ্রামে যে জাতি যে পরিমাণে জয়লাভ করিতেছেন, সে জাতি সেই পরিমাণে উন্নতির সোপানে আরোহণ করিতেছেন।" স্বামীজী বলেন, "এই অধিকার তারতম্যের মহাসংগ্রামে পরাস্ত হইয়া ভারতবর্ষ গতপ্রাণপ্রায় অবস্থায় পতিত হইয়াছে।"

স্বামীজী আরও বলিয়াছেন, "অর্থাৎ সার কথা এই যে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি জাতি বিভাগ কোন দোষের নহে; কিন্তু ভোগাধিকার তারতম্যই মহা অনর্থের কারণ হইয়া উঠিয়াছে।"

এখনকার দিনে দেশ ও বিদেশের সকল জাতিই সকল জাতির সংস্পর্শে আসিতেছে এবং ইহাতে সকলের মধ্যে একটা সাম্য স্থাপনের উপায় নির্ধারণের প্রশ্ন স্বভাবতই উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষ তাহার অভ্যন্তরীণ সমস্যা সমাধানেই অসমর্থ, এমন অবস্থায় বাহিরের সমস্যা কি করিয়া সমাধান করিবে?

স্বামীজী বলিতেছেন, "বাহ্যজাতির সহিত সাম্য স্থাপন অতি দূরের কথা, যতদিন এ ভারত নিজগৃহে সাম্য স্থাপন করিতে না পারিবে ততদিন তাহার পুনর্জীবনী শক্তি লাভের আশা নাই।"

রামকৃষ্ণ মিশন ও ভারতবর্ষ—এই দুইই অভেদাত্মা। মিশন কোন একক ব্যক্তির মুক্তি বা মঙ্গলের জন্য কার্য-তৎপর নয়, সমগ্র ভারতবর্ষ, এমন কি সমগ্র পৃথিবীই তাহার কর্মক্ষেত্র। কিন্তু ভারত যদি নিজেই মৃত্যুর পথে চলে, তবে জগতকে অমরত্বের বাণী সে কি করিয়া শুনাইবে এবং মিশনেরই বা তখন অস্তিত্ব কোথায়?

কিন্তু স্বামীজী দৃঢ়বিশ্বাসী, তাঁহার মনে নিরাশার ছায়ামাত্রও নাই। তিনি বলিয়াছেন, "এই ভারত পুনর্বার জাগ্রত হইবে এবং যে মহাতরঙ্গ এই কেন্দ্র হইতে সমুত্থিত হইয়াছে, মহাপ্লাবনের ন্যায় তাহা সমগ্র মানবজাতিকে উচ্ছ্বসিত করিয়া মুক্তিমুখে লইয়া যাইবে। ইহা আমাদের বিশ্বাস এবং শিষ্যপরম্পরাক্রমে প্রাণপণে ইহারই সাধনে আমরা কটিবদ্ধ।"

তিনি একথাও বলিয়াছেন, "যে কেহ ইহাতে বিশ্বাস করিবে সে-ই প্রভুর কৃপায় মহাবীর্য ও ওজস্বিতা লাভ করিবে।"

রামকৃষ্ণ মিশন ভারতের বর্তমান অবস্থায় কোন্ উদ্দেশ্য লইয়া কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইবে?

স্বামীজী বলিয়াছেন, "অতএব আমাদের উদ্দেশ্য জাতি বিভাগ নষ্ট করা নহে; কিন্তু ভোগাধিকারের সাম্যসাধনই আমাদের উদ্দেশ্য। আচণ্ডালে যাহাতে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের অধিকার-সহায়তা হয়, তাহার সাধন করাই আমাদের জীবনের প্রধান ব্রত।"

স্বামীজী তাঁহার দূরদৃষ্টিতে দেখিয়াছেন, আজিকার দিনে তিন প্রকার বিপদের সম্ভাবনা রহিয়াছে। তাঁহার কথায়ঃ—"তিন বিপদ আমাদের সম্মুখে—(১) ব্রাহ্মণ ব্যতিরিক্ত আর সমস্ত বর্ণ একত্রিত হইয়া পুরাকালের বৌদ্ধধর্ম-বিশেষের ন্যায় এক নূতন ধর্ম সৃষ্টি করিবে। ইহা যদি হয় এই অতি প্রাচীন সভ্যতা সমাধানে সমস্ত প্রযত্নই বিফল হইয়া যাইবে। এই ভারতবর্ষ পুনরায় বালকত্ব প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত পূর্বগৌরব বিস্মৃত হইয়া উন্নতির পথে বহু কালান্তরে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইবে। দ্বিতীয় বিপদ এবং তৃতীয় বিপদ,—ভারতবর্ষ বাহ্যদেশীয় ধর্ম অবলম্বন করিবে, অথবা সমস্ত ধর্মভাব ভারতবর্ষ হইতে একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে।"

স্বামীজী বলিতেছেন, "দ্বিতীয় বিপদ যদি ঘটে, তাহা হইলে ভারতীয় সভ্যতার ও আর্য জাতির বিনাশ অতি শীঘ্রই সাধিত হইবে। কারণ যে কেহ হিন্দুধর্ম হইতে বাহিরে যায়, আমরা যে কেবল তাহাকে হারাই তাহা নয়, একটি শত্রু অধিক হয়। ঐ প্রকার স্বগৃহ-উচ্ছেদকারী শত্রু দ্বারাই মুসলমান অধিকারকালে যে মহা অকল্যাণ সাধিত

হইয়াছে ইহা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। তৃতীয় কল্পে মহাভয়ের কারণ এই যে, যে ব্যক্তির বা জাতির যে বিষয়ে প্রাণের ভিত্তি পরিস্থাপিত, তাহা বিনষ্ট হইলে সে জাতিও নষ্ট হইয়া যায়। আর্য জাতির জীবন ধর্মভিত্তিতে উপস্থাপিত। তাহা নষ্ট হইয়া গেলে আর্য জাতির পতন অবশ্যম্ভাবী।"

এই অবশ্যম্ভাবী পতন নিবারণের জন্য রামকৃষ্ণ মিশন কোন্ পথ অবলম্বন করিবে?

ইহার উত্তরে স্বামীজী বলিয়াছেন "নদীবেগ আপনা হইতেই বাধাহীন পথ নির্বাচিত করিয়া লয়। সমাজের কল্যাণস্রোতও সেই প্রকার বাধাহীন পথে আপনা হইতেই চলে। অতএব সমাজকেও ঐ প্রকার পথে লইয়া যাইতে হইবে।" (এই কথার তাৎপর্য এই যে, ভারতবর্ষের যেটি প্রকৃত বিশেষত্ব সেইটি যাহাতে বাধাহীন ও বলশালী হয় সেজন্যই চেষ্টা করা।)

এই ভারতবর্ষ স্বগৃহজাত ও বাহ্য দেশ সমাগত বহু জাতিতে পরিপূর্ণ। আর্যধর্ম, আর্যভাব ইহাদের অধিকাংশের মধ্যে এখনও প্রবিষ্ট হয় নাই। অতএব এই ভারতবর্ষকে প্রথমত আর্যভাবাপন্ন করিলে, আর্যাধিকার দিলে, আর্য জাতির ধর্মগ্রন্থে ও সাধনে সকলকে সমভাবে আহ্বান করিলে এই মহা বিপদ হইতে আমরা উত্তীর্ণ হইতে পারিব। এইজন্য প্রথমত যে সকল জাতি সংস্কারবিহীন হইয়া আর্যধর্ম হইতে কিঞ্চিৎ বিচ্যুত হইয়াছে, পুনঃসংস্কার দ্বারা আর্য জাতির ধর্মে তাহাদিগকে সম্পূর্ণ অধিকার দিতে হইবে। মনুষ্যের যেখানে অধিকার, সেইখানেই তাহার প্রেম। নতুবা ব্রাহ্মণ মাত্রেরই ধর্ম বলিয়া অন্যান্য জাতি তাহা পরিত্যাগ করিবে। (অর্থাৎ যাহাদের অনধিকারী করিয়া রাখা হইয়াছে তাহারা ধর্মকে নিজধর্ম বলিয়া মমত্ববোধে গ্রহণ করিতে পারে না। এইজন্যই তাহারা সে ধর্ম ত্যাগ করিয়া অন্য ধর্ম গ্রহণ করে।) ঐ প্রকার আচণ্ডাল সর্ব জাতিকে ও ম্লেচ্ছাদি বাহ্যজাতিকেও সংস্কারাদি দ্বারা হিন্দু সমাজকে বিস্তৃত করিতে হইবে। কিন্তু ধীরে ধীরে এই কার্যে অগ্রসর হইতে হইবে। অধুনা শাস্ত্রোক্ত অধিকারী হইয়াও যাহারা নিজ অজ্ঞতায়

...কারবিহীন তাহাদিগকে সংস্কৃত করা ...ব্য।" (১৮নং)

স্বামীজী বলিয়াছেন, এইভাবে ...চারকমণ্ডলী সর্বত্র শাস্ত্রের ও ধর্মের ...চার করিয়া জনসমাজের মধ্যে ধর্মের ...তি আগ্রহ ও ভালবাসা জাগ্রত করিবেন। ...মকৃষ্ণ মিশনের ইহা একটি প্রধান কায।

স্বামীজী আরও বলিয়াছেন, "মুসল...ান বা খৃীষ্টানদিগকেও হিন্দুধর্মে ...ানিবার বিশেষ উদ্যোগ করিতে হইবে। ...কন্তু উপনয়নাদি সংস্কার কিছুদিনের ...ন্য তাহাদের মধ্যে হওয়ার আবশ্যক ...ই।" (২০নং)

পাশ্চাত্য প্রভাব ভারতবর্ষের হিত ও ...হিত দুই-ই করিয়াছে। স্বামীজী ...লিয়াছেন, "যদিও ভোগাধিকার তারতম্য ...রতবর্ষকে গতপ্রাণপ্রায় অবস্থায় আনয়ন ...রিয়াছে, কিন্তু পাশ্চাত্ত্য আলোকের ...ভায় এই ভারতভূমি অধুনা কিঞ্চিৎ ...তিভাত হইতেছে। ধীরে ধীরে এই ...ুপ্ত জাতির মধ্যে পাশ্চাত্ত্য মহাজাতি...মূহের অধিকার-তারতম্য ভঞ্জনের বিরাট ...দ্যম ও প্রাণপণ সংগ্রামের বার্তা অস্ম...দশীয় পরাহত প্রাণেও কিঞ্চিৎ আশার ...ঞ্চার করিতেছে। মানব-সাধারণের ...ধিকার, আত্মার মহিমা নানা বিকৃত, ...কৃত প্রণালী-মধ্য দিয়া শনৈঃ শনৈঃ এ ...শের ধমনীতে প্রবেশ করিতেছে। ...রাকৃত জাতিসকল আপনাদের লুপ্ত ...ধিকার পুনর্বার চাহিতেছে। এ সময়ে ...দ বিদ্যা, ধর্ম ইত্যাদি জাতিবিশেষে ...বন্ধ থাকে, তবে সে বিদ্যার ও সে ...র্মের নাশ হইয়া যাইবে।" (১৩নং)

সুতরাং এই যুগসন্ধিসময়ে রামকৃষ্ণ ...শনকে সেই বিদ্যা ও ধর্মের বন্দিত্ব ...োচন করিবার ভার লইতে হইবে, সর্ব...ধারণের মধ্যে ভারতীয় মহাবিদ্যা ও ...ান ধর্মভাবকে প্রচারের দ্বারা বিস্তৃত ...রিবার ভার লইতে হইবে। এই অতি ...চীন মহিমময় মহাদেশের মহিমা ...বার পুনরুজ্জীবিত করিবার ভার ...তে হইবে। আর্যভূমিতে আর্য জাতির ...নঃপ্রতিষ্ঠার ভার রামকৃষ্ণ মিশনের ...র ভগবান প্রদত্ত দায়স্বরূপে ন্যস্ত ...য়াছে।

স্বামীজী বলিয়াছেন, "এই জগতের ...র্ণ সেই অবস্থা যখন 'সর্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ' পুনর্বার হইবে, যখন শূদ্রবল, বৈশ্যবল ও ক্ষত্রিয়বলের আর আবশ্যকতা থাকিবে না, যখন মানবসন্তান যোগ-বিভূতিতে বিভূষিত হইয়াই জন্ম-পরিগ্রহ করিবে, যখন চৈতন্যময়ী শক্তি জড়শক্তির উপর সম্পূর্ণ আধিপত্য স্থাপন করিবে, —যখন রোগ-শোক মনুষ্য-শরীরকে আক্রমণ করিতে পারিবে না, ইন্দ্রিয়সকল আর মনের প্রতিকূলে ধাবমান হইতে পারিবে না, পশুবল প্রয়োগ পুরকালের স্বপ্নের ন্যায় লোকস্মৃতি হইতে বিলুপ্ত হইবে—যখন এই ভূমণ্ডলে প্রেমই একমাত্র সর্বকার্যের প্রেরয়িতা হইবে, তখনই সমগ্র মনুষ্যজাতি ব্রহ্মণ্য-বিশিষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণ হইয়া যাইবে। তখনই জাতিভেদ লুপ্ত হইয়া প্রাচীন ঋষিদিগের দৃষ্ট সত্যযুগ সমুপস্থিত হইবে। সেই পথে যে জাতিবিভাগ ক্রমশ অগ্রসর করে, তাহাকেই অবলম্বন করিতে হইবে। যে জাতিবিভাগ জাতিভেদনাশের প্রকৃষ্ট উপায় তাহাই সুপরিগৃহীত হইবে।"

যে সকল কারণে জাতি দুর্বল হইয়া পড়িতেছে তাহার একটি কারণ সম্বন্ধে স্বামীজী বলিয়াছেন, "স্বগোত্রে বা যে সকল গোত্রের সহিত অতি নিকট রুধির সম্বন্ধ তাহাদের পরস্পরের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ বন্ধন হওয়াই জাতির শরীরকে দুর্বল করিয়া ফেলিয়াছে। দুর্বল-শরীরধারী জাতি কখনও মহান হইতে পারে না, ইহাও ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। অতএব হিন্দুদিগের শরীর যাহাতে সমধিক বল-বিশিষ্ট হয় তাহার উপায় বিধান করা এক প্রধান কর্তব্য।" (২২নং)

জাতীয় দুর্বলতার আরও কতকগুলি কারণ সম্বন্ধে স্বামীজী বলিয়াছেন, "জাতিভেদে বিবাহ স্থগিত করা ও এক এক জাতির মধ্যে বহু শাখাভেদ হইয়া তাহাদের মধ্যে আদান-প্রদান বন্ধ হওয়া ও তাহার উপর কৌলীন্য প্রথা দ্বারায় বিবাহের পরিধি আরও সংকীর্ণ হওয়ায় রক্ত দূষিত হইয়া জীবনীশক্তি ও বলের অত্যন্ত ক্ষয় হইয়াছে। ইহার প্রতিবিধান করিতে গেলে প্রথমত প্রত্যেক জাতির মধ্যে যে সকল অবান্তর বিভাগ আছে, তাহাদের মধ্যে যাহাতে আদান-প্রদান হয় তাহার উদ্যোগ করা উচিত।" (২৪নং)

"তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব-

ভুজো যথা।" যে সম্প্রদায়ে শক্তিরাশি সমাহিত, তাহারা সমাজকে যে দিকে চালাইবে সমাজ সেই দিকেই চলিবে। পবিত্রতা, নিঃস্বার্থতা ও বিদ্যাধরতাই এই শক্তি সঞ্চয়ের উপায়। যত অধিক উহা আমাদের মধ্যে সঞ্চিত হইবে, তত অধিক পরিমাণে আমরা সমাজের উপর কার্য করিতে পারিব।" (২৫নং)

"উহা সাধিত করিতে গেলে একটি মহাবলশালী সমাজের সৃষ্টি করিতে হয়, যাহার প্রাণশক্তি ভারতের অস্থিমজ্জায় ক্রমশ প্রবিষ্ট হইয়া মৃতপ্রায় ভারতকে পুনরুজ্জীবিত করিবে।" (২৬নং)

"লোকভয়ে, অন্নাভাবের ভয়ে, মানহানির ভয়ে, মনুষ্য সমাজের পক্ষে কল্যাণকর হইলেও নূতন উদ্যমে উদ্‌যুক্ত হয় না। তাহার উপর যে সমাজ যত অধিক দিন পথবিশেষকে অবলম্বন করিয়া আসিয়াছে, তাহার পক্ষে নূতন কোন পথাবলম্বন করা ততই কঠিন হয়। অতএব এই মহাবলশালী সমাজভিত্তি সৃষ্টি করিতে হইলে নূতন উপনিবেশ সংস্থাপন করাই একমাত্র উপায়। যে স্থানে নরনারী প্রাক্তন সংস্কারাপেক্ষাও কঠিনতর বন্ধন সমাজশাসন হইতে দূরে থাকিয়া নূতন উৎসাহ, নূতন উদ্যম প্রয়োগ করিয়া নববলে বলীয়ান ভারতবর্ষের বাহিরে উপনিবেশ স্থ উপায় নাই।" (২৭নং)

তবে কোথায় এই উপনিবেশ সম্ভব হইবে? স্বামীজী এ এইরূপ নির্দেশ দিয়াছেন,—"মধ্য হাজারীবাগ প্রভৃতি জেলার নিকট সজল, স্বাস্থ্যকর অনেক ভূমি অনায়াসে পাওয়া যাইতে পারে প্রদেশে এক বৃহৎ ভূমিখণ্ড লইয়া উপর একটি বৃহৎ শিল্প বিদ্য ধীরে ধীরে কারখানা ইত্যাদি হইবে। অন্নাগমের নূতন পথ আবিষ্কৃত হইতে থাকিবে লোক উক্ত উপনিবেশে আসিতে থাকিবে তাহাদিগকে যে প্রকারে গঠিত সে প্রকারেই গঠিত হইবে।" (২৮

এই শিল্প বিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠার কথা স্বামীজী বারবার করিয়াছেন। লোকের অন্নাভাব সর্বপ্রথম কর্তব্য এবং তারপর গড়িয়া লইতে হইবে নূতনভাবে এখনও মানুষের ভিতর আদিম রহিয়াছে এবং যেখানে জমি আবহাওয়া স্বাস্থ্যকর সেইরূপ স্বামীজী উপনিবেশের যোগ্য স্থান মনে করিয়াছিলেন। হয়তো এই তাঁহার মনে উদয় হইবার সঙ্গে কাজও আরম্ভ করিয়া দিতেন, তখন সবে বেলুড় মঠের জমি হইয়াছে, হাতে একেবারেই অর্থ নাই স্বাস্থ্যও ভাঙিগয়া পড়িয়াছে, তাই তাঁর সে সঙকল্প কার্যে পরিণত হইল না।

বেলুড়ের জমি কেনা হইলে স্বামীজী একটু বিশ্রামের জন্য ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ৩০শে মার্চ দার্জিলিং যাত্রা করেন, সময় তাঁহার শরীর খুবই খারাপ হইয়াছিল। দার্জিলিং গিয়া তিনি গভর্নমেন্ট প্লিডার এস এন ব্যানার্জির বাড়ি আতিথ্য গ্রহণ করিলেন, এই ভদ্রলোক স্বামীজীর একান্ত অনুরক্ত ভক্ত ছিলেন। স্বামীজী তাঁহার বাড়িতে থাকিবেন ইহাতে তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না।

কিন্তু মে মাসেই কলিকাতায় প্লেগ মহামারীরূপে দেখা দিল। সেদিন যাঁহারা কলিকাতায় ছিলেন তাঁহারা হয়তো

...র দিনের কথা ভুলিতে পারেন ... প্রত্যেক বাড়িতেই প্রতিদিন বড় ... ইঁদুর মরিতেছে, বাড়ির অধিবাসীরা ... যেখানে সুবিধা পাইতেছেন সেখানেই পলাইয়া যাইতেছেন। দেখিতে দেখিতে জনপরিপূর্ণ কলিকাতা নগরী যেন শ্মশানে পরিণত হইল। পথে-ঘাটে আর লোক চলাচল নাই, বড়লোকেরা কেহ বা কলিকাতার বাহিরে বাগান বাড়িতে কেহ বা অন্য কোন দেশে পলাইয়া গিয়াছেন, কিন্তু যাহারা দরিদ্র তাহারা ঘরবাড়ি ছাড়িয়া কোথায় যাইবে? প্লেগ দরিদ্র পল্লীতেই বাসা বাঁধিল, বিশেষ করিয়া অপরিচ্ছন্ন বস্তিগুলি প্লেগ-রোগীতে পরিপূর্ণ হইল।

স্বামীজী এই সংবাদ পাইবামাত্র দার্জিলিং ছাড়িয়া কলিকাতা চলিয়া আসিলেন এবং নীলাম্বরবাবুর বাগান-বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও পৌঁছানো মাত্রই কিভাবে প্লেগ রিলিফ কার্যে নামান হইবে তাহার একটা খসড়া প্রস্তুত করিয়া ফেলিলেন।

কিন্তু টাকা কোথায়? রিলিফ কাজে অনেক টাকার দরকার, কোথা হইতে সে টাকা আসিবে?

টাকার প্রশ্ন উঠিতেই স্বামীজী বলিয়াছিলেন, "কেন? যদি দরকার হয় আমাদের এই নতুন কেনা মঠের জমিটাই বিক্রি করে দেব।"

কিন্তু জমি বিক্রি করিতে হয় নাই। প্লেগ সেবাকার্যে অর্থেরও অভাব হয় নাই, কর্মীরও অভাব হয় নাই।

ঠাকুরের অস্থি সমাধি দিবার জন্য এক টুকরা গঙ্গার ধারের জমির জন্য বারো বৎসর ধরিয়া স্বামীজী যেন সাধনা করিয়াছিলেন, গুরুভাইদের মাথা গুঁজিবার একটুখানি জয়গার জন্য কতই না তাঁহার পরিশ্রম ও প্রয়াস; সেই জমিতে ঠাকুরের অস্থি স্থাপন করিয়া বলিয়াছিলেন, "আজ ধর্মক্ষেত্র স্থাপন করলুম" —সেই জমি বিক্রি করিয়া দিতে তাঁহার মনে এতটুকু ইতস্তত ভাবও দেখা যায় নাই। কিন্তু ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের দয়ায় টাকার জন্য জমি বিক্রি করিতে হয় নাই।

গভর্নমেন্ট এই সময় কতকগুলি বিশেষ নিয়ম করিয়াছিলেন, যাহাতে মহামারী চারিদিকে ছড়াইয়া না পড়ে। স্বামীজী ঠিক করিয়াছিলেন যে, কলিকাতার কাছেই একটা খোলা মাঠে হিন্দু প্লেগ রোগীদের জন্য একটি আস্তানা করিবেন। তাহা ছাড়া সর্বত্র যাহাতে শহর পরিষ্কার করা হয় তাহার জন্য তাঁহার সন্ন্যাসী সেবক দল লইয়া তিনি নিজেও অবতীর্ণ হইলেন।

নিবেদিতা এই সময় এই বস্তিবাসী রোগীদের সেবা ও বস্তি পরিষ্কার কার্যে যেভাবে লাগিয়াছিলেন সে কথা এখনও হয়তো অনেকের মনে আছে। স্বামী সারদানন্দ ছিলেন এ কাজে নিবেদিতার দক্ষিণ হস্ত। কলিকাতার লোকেরা এক আশ্চর্য দৃশ্য সেদিন দেখিতে পাইয়াছিল, তাহারা দেখিয়াছিল যে, গেরুয়া কাপড়-পরা সাধুর দল নর্দমা পরিষ্কার করিতেছেন, মেথর ও ধাঙ্গড়ের মত।

লোকে ভয়ে কলিকাতা ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়াতে শীঘ্রই প্লেগ কমিয়া গেল এবং গভর্নমেণ্টও তাঁহার সতর্ক-মূলক আইনগুলি প্রত্যাহার করিলেন। স্বামীজী তখন সদলে কলিকাতা ছাড়িয়া ১১ই মে তারিখে আলমোড়ার দিকে যাত্রা করিলেন, তাঁহার সঙ্গে গেলেন হরি মহারাজ, স্বামী নিরঞ্জনানন্দ স্বামী স্বরূপানন্দ, গুপ্ত মহারাজ, সিস্টার

নিবেদিতা, মিসেস বুল, মিস ম্যাকলাউড, আমেরিকার কনসাল জেনারেলের স্ত্রী মিসেস প্যাটার্সন প্রভৃতি।

এই মে মাসে 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার সম্পাদক সি আর রাজন্ আয়ারের মৃত্যু হয়। এই উৎসাহী যুবক মাত্র ২৬ বৎসর বয়সেই দেহত্যাগ করেন। ইনি একজন গ্রাজুয়েট ছিলেন এবং অতি দক্ষতার সংগে 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকা পরিচালন করিতেছিলেন।

ভারতবর্ষে শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘের প্রথম ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকা 'ব্রহ্মবাদিন' এবং দ্বিতীয় পত্রিকা 'প্রবুদ্ধ ভারত'। স্বামীজীর কাছ হইতে উৎসাহ ও অর্থসাহায্য পাইয়া তাঁহার তিন জন গৃহী শিষ্য প্রথমে 'ব্রহ্মবাদিন' নামে মাসিক পত্রিকা বাহির করেন। ইঁহারা তিন জনেই মাদ্রাজী এবং ইঁহাদের নাম জি ভেংগটরংগ রাও, এস সি নজুন্ক রাও এবং এম সি আলাসিংগা পেরুমল। পত্রিকাখানিকে পাক্ষিক করাই তাঁহাদের ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তাহা হয় নাই। প্রথমে পাক্ষিক পরে মাসিকরূপে 'ব্রহ্মবাদিন' প্রকাশিত হয়। তাহার পরের বৎসর Awakened India বা 'প্রবুদ্ধ ভারত' প্রকাশিত হয়। প্রবুদ্ধ ভারত মাত্র ১২ পৃষ্ঠার একখানি মাসিক পত্রিকা, রাজন্ আয়ার এই পত্রিকার প্রাণস্বরূপ ছিলেন। তিনি দুই বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রমে পত্রিকা সম্পাদন করেন, তাঁহার মৃত্যুর পর পত্রিকাখানি বন্ধ হইয়া গেল।

যে মাসে রাজন্ আয়ারের মৃত্যু হইল এবং ২রা জুন তারিখে স্বামীজীর শর্ট-হ্যাণ্ড লেখক গুডউইন লোকান্তরে গমন করেন। গুডউইন সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নাই, কিন্তু চিরকুমার। স্বামীজীর একান্ত সেবক ছিলেন তিনি। তাঁহার মত সুদক্ষ শর্টহ্যাণ্ড লেখক না থাকিলে স্বামীজীর অনেক বক্তৃতাই সর্বসাধারণের অপরিজ্ঞাত থাকিয়া যাইত।

গুডউইন স্বামীজীর ছায়ার মত অনুবর্তী ছিলেন। গোপাললাল শীলের বাগানে আমেরিকা হইতে প্রত্যাগমনের পর স্বামীজী ও তাঁহার পাশ্চাত্ত্য শিষ্য-গণের জন্য যখন থাকিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল স্বামীজী কয়েকদিন সেখানে থাকিয়া আলমবাজারের মঠে আসিয়া রহিলেন তখন গুডউইনও তাঁহার সংগে আসিলেন। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দত্ত গুডউইন সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—

"গুডউইন ইংরাজ হিসাবে পরিবর্ধিত হইয়াছিল, কিন্তু আলমবাজারের মঠে আসিয়া দেখিল যে সকলেই একটা কম্বল পাতিয়া মেঝেতে পড়িয়া থাকে এবং হাত দিয়া ডাল ভাত খায়। গুডউইন অবিলম্বে নিজের পূর্ব অভ্যাস ত্যাগ করিয়া এ দেশীয় সাধুদের মত হাতে করিয়া ডাল ভাত খাইতে আরম্ভ করিল, এবং একখানা কম্বল পাতিয়া পশ্চিম দিকের দালানটিতে শুইয়া থাকিত, বিছানা প্রভৃতি কিছুই রাখিল না। অনেকেই নিষেধ করিল এরূপ কঠোর করিলে শরীরের হানি হইবে। * * গুডউইন কোন বাধা শুনিল না, বলিল "স্বামীজী যেরূপ কঠোর করিয়াছিলেন আমিও সেইরূপ করিব।"

* * একদিন গুডউইন রামক বোসের গলিতে মা'র সহিত দেখা করি গেল। সংগে গুপ্ত ছিল। গুডউইনের মু ও হাতে মশা কামড়াইয়াছে। তাহাতে দ হইয়াছে। মা অতি সস্নেহে গুডউইন জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার গায়ে মশার কামড়রের দাগ। মশারি টাঙ্গাও কেন?" গুপ্ত বুঝাইয়া দিতে লাগি গুডউইন স্থিরভাবে বলিল,—"স্বামী খালি কম্বলে পড়িয়া থাকেন। তাঁহ মশারি নাই, তাঁহাকে মশায় কামড় সেইটিই আমার বিশেষ কষ্ট। * * * "আম গায়ে কামড়ানোর জন্য বিশেষ চিন্তিত নই এই কথা শুনিয়া মা বলিলেন,—"আ গুডউইনের কি গুরু ভক্তি। নিজের দে পাত করে গুরুসেবা করে।"

"একদিন রবিবারে স্বামীজী, গুডউই ও আর সকলে মিলিয়া আলমবাজার লোচন ঘোষের ঘাটে স্নান করিতে গেলেন তখন ভাঁটা পড়িয়াছিল। কূল একটু নীচু গিয়াছিল। গুডউইন আগে স্নান করি ঘাটের পৈঠার উপর এক কমণ্ডলু জল স্বামীজীর জুতা লইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। স্বামীজী স্নান করিয়া কাদা ভাঙিয়া ঘাটের সিঁড়িতে উঠিলেন। পায় কাদা লাগিয়া গেল। অনেকেই তখন উপস্থিত ছিলেন কিন্তু কাহারও মনে কি করা উচিত সে ভাবটি আসিল না গুডউইন ত্বরিত-হস্তে কমণ্ডলুর জল দিয়া স্বামীজীর পা ধুইয়া দিল এবং নিজের উত্তরীয় দিয়া পা মুছাইয়া জুতা পরাইয়া দিল। যেন কোন বিশেষ কাজ নয়, সাধারণ কাজ।* * *

আমি রাখাল মহারাজের মুখে কাহিনীটি শুনিয়াছি।

"স্বামীজী, ক্যাপটেন সেভিয়ার, মিসেস সেভিয়ার এবং গুডউইন প্রভৃতি ইংল্যাণ্ড হইতে একত্রে ভারতবর্ষে আসিতেছিলেন। এডেন বন্দরে জাহাজ লাগিল, স্বামীজী নৌকা করিয়া এডেন বন্দর দেখিতে গেলেন। সংগে সকলেই চলিল। এডেন-এ অধিকাংশই এই ভারতবর্ষের লোক। তাহারা সামান্য দোকান-পাট করে। অনেকদিন পরে কল্কেতে তামাক সাজিয়া খাওয়া স্বামীজী দেখিলেন। তিনি অত্যন্ত তামাক-প্রিয়। এইজন্য কল্কেতে তামাক সাজিয়া খাওয়ার তাঁর প্রবল ইচ্ছা হইল। একজন দোকানদারের কাছ থেকে কল্কেটা চাহিয়া নিয়া স্বামীজী হাতে করিয়া কল্কেটাতে তামাক খাইতে লাগিলেন। * * গুডউইন এইভাবে স্বামীজীর সাধারণ লোকের সংগে সমানভাবে মেশা যেন পছন্দ করিতে পারিলেন না। স্বামীজী তাহা লক্ষ্য করিলেন, এবং গুডউইনের দিকে চাহিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন, "এই গরীব দুঃখী ন্যাংটা লোকেরাই আমার জ্ঞাতভাই।

তুমি যদি এদের ঘৃণা কর তা'হলে তোমার সংগে আমার কোন সম্পর্কই নাই। আমার গরীব জাতভাইকে যে ঘৃণা করে তাকে আমি পছন্দ করি না। তোমরা জাহাজে করিয়া নিজের দেশে ফিরিয়া যাও, আমি একাই ভারতবর্ষে যাইব। * * * এই গুডউইনের মৃত্যু সংবাদ যখন স্বামীজী পাইলেন তখন তিনি আলমোড়ায় ছিলেন। তিনি সংবাদ শুনিয়া বলিয়াছিলেন, পুত্রশোক কি ভয়ঙ্কর! এখন বুঝিতে পারিতেছি পুত্রশোক কি?"

গুডউইন যখন মারা যান তখন তিনি "মাদ্রাজ মেল" পত্রিকার কাজে নীলগিরি উটকামন্ড পাহাড়ে ছিলেন। আন্ত্রিক জ্বরে তাঁহার মৃত্যু হয়। গুডউইনের মৃত্যুর পর তাঁহার সমস্ত কাগজ-পত্র আলাসিংগা তাঁহার মায়ের ঠিকানায় পাঠাইয়া দিয়াছিল। মার্কুইস অব বাথের জমিদারীতে Froame নামক স্থানে গুডউইনের বৃদ্ধা মাতা ও তাঁহার দুটি অবিবাহিতা ভগ্নী বাস করিতেন। স্বামীজীও গুডউইনের জননীর নিকট একটি কবিতা লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন,—কবিতাটি এখানে দেওয়া হইলঃ—

"Requiescat in pace"—
(J. J. Goodwin)

Speed forth, O soul, upon
the star-strewn path,
Speed blissful one! Where
thought is ever free,
Where time and sense no
longer mist the view,
Eternal peace and blessings
on thee!
Thy service true, complete
thy sacrifice
Thy home, the heart of love
Transcendent find,
Remembrance sweet, that
kills all space and time
Like alter-roses, fill thy
place behind.
Thy bonds are broke, thy
quest in this is found,
And one with That which
comes as Death and
Life,
Thou helpful one! unselfish
e'er on earth,
Ahead, still help with love
this world of strife.
—Vivekananda.

(শ্রীনরেন্দ্রদেবের অনুবাদ)

লভুক সে শান্তিলোকে অনন্ত বিরামঃ—
যাও ত্বরা হে বিদেহী,
নক্ষত্র বিস্তৃত তব পথে,
ওহে আনন্দময়!
—চিরমুক্ত যেথায় কল্পনা,
নাহি বাধা ত্রিকালের,
দৃষ্টি যেথা রোধে না ইন্দ্রিয়;
শাশ্বত অনন্ত শান্তি মোক্ষবর
লভ তুমি প্রিয়!
সার্থক তোমার সেবা,
পূর্ণ তব আত্মদান ব্রত,
পরা-প্রেম-হৃদি-পদ্মে
চিদানন্দে করো গিয়ে বাসা
শুধু স্মৃতি-সুমধুর
দেশ-কালজয়ী চিরন্তন,
প্রসাদী-ফুলের মত ভরে থাক্
তোমার আসন।
ঘুচিল বন্ধন তব,
সন্ধান মিলিল এতদিনে,
যাহা মৃত্যু যাহা প্রাণ—
একাত্ম হয়েছ তারি সনে।
বসুধার বন্ধু ওগো, যাও,
চির নিঃস্বার্থ সুহৃদ
ক্ষুদ্র এ পৃথিবীর বুকে তব
প্রেম শান্তি এনে দিক!
বিবেকানন্দ
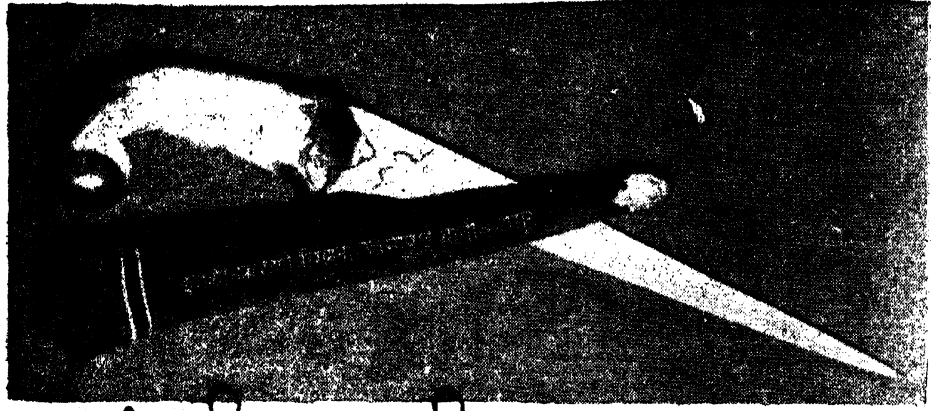
ঝাঁসীর রানী ০ মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য

॥ ৫ ॥

শুধু বসুন্ধরা নন, রাজসিংহাসনও বীরভোগ্যা। সর্বদেশে এবং কালে তখ্‌তের একপ্রেমনিষ্ঠার কোনো পরিচয় নেই। মারাঠা সাম্রাজ্যের তখ্‌তে বসলেন শিবাজী, সেই তখ্‌ত অলঙ্কৃত করলেন বালাজী বিশ্বনাথ, শতবর্ষ হতে না হতে শেষ পেশবা দ্বিতীয় বাজীরাও সেই তখ্‌ত বিচ্যুত হয়ে চলে গেলেন বিঠুর। চিরচঞ্চল পবনেরও গতিবেগের একটা নিয়ম আছে। তাকে চিনবার নিশানা আছে, কিন্তু হায়! তখ্‌ত কবে নতুন মালিক বরণ করবে, তার নি[illegible]পত্তা একেবারেই নেই।

১[illegible]৩৮ সালে প্রত্যক্ষে এবং পরোক্ষে প্রায় [illegible] হাজার লোক পেশবার উপর নির্ভরশীল হয়ে বিঠুরে থাকতেন। বাজীরাওকে ব্রিটিশ সরকার যে আট লক্ষ টাকা বৃত্তি দিয়েছিলেন, তা তাঁর নিজের পক্ষে পর্যাপ্ত; কিন্তু এই বিরাট আশ্রিতের দলকে প্রতিপালন করবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। বহুদিন ধরে এই সব কর্মচারী, সৈনিক ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের দল পেশোয়া দপ্তরের আশ্রয়ে বিভিন্ন জীবিকা নিয়ে দিন কাটিয়েছেন। আজ তাঁদের পেশোয়া রাজ্যহীন, নির্বাসিত। তবু তিনি তাদের-ই। সুদিনে যিনি দেখেছেন, দুর্দিনেও তিনিই দেখবেন।

বিঠুর ঘাটের সন্নিকটে মোরোপন্ত এবং কেশব ভাস্কর স্বীয় গৃহ নির্মাণ করলেন। মনু বড় হতে লাগলেন সেখানে। সম্ভবত মোরোপন্ত পেশবার অসংখ্য বিগ্রহাদির হোমশালার পূজাকর্ম তত্ত্বাবধান করতেন।

বৃদ্ধ বাজীরাও এই মা-মরা মেয়েটিকে স্নেহ করতেন। পেশোয়ার উত্তরাধিকারী ধুন্দুপন্থ নানা মনুর চেয়ে আঠারো বছরের বড় ছিলেন। তখন তিনি প্রাপ্তবয়স্ক যুবক। মনুর সঙ্গে তাঁর বাল্যের মিত্রতার কাহিনী হয়তো শুধু কাহিনীমাত্র। তবু বাজীরাও-এর প্রাসাদে মনু কিছু কিছু লেখাপড়া শিখেছিলেন। ঘোড়া চড়বার সুযোগও দুই-একবার হয়েছিল। স্বভাবত তেজী এবং দুরন্ত ছিলেন বলে তাঁর খেলার সঙ্গী প্রায়শ ছিল ছেলেরা। মনে হয়, মোরোপন্ত যেহেতু সারাদিন ব্যস্ত থাকতেন, সেহেতু যথেচ্ছ খেলা করবার সুবিধা ছিল মনুর। শোনা যায় বাজীরাও মনুর নাম দিয়েছিলেন ছবেলী অর্থাৎ ময়না।

মনুর [illegible] জনপ্রিয় কাহিনী হচ্ছে—একদিন সাহেব ও পাস্তুরং রাওসাহেব ও সাহেব পেশবার একমাত্র হাত বেড়াতে বেরিয়েছিলেন। সেই হ চড়বার জন্য মনু বারবার জেদ নানা এবং রাও তাতে কান দিলে মেয়ের অপমানে ক্ষুব্ধ হৃদয় মো বললেন—'তোর ভাগ্যে হাতী তুই সামান্য লোকের মেয়ে?'

মনু সবর্গে উত্তর দিলেন—'আমার অদৃষ্টে একদিন হাতী মিলবে।'

মেয়ের আট বছর বয়স উত্তী দেখে মোরোপন্ত স্বভাবতই হলেন। তৎকালীন মহারাষ্ট্রীয় ঘরে অষ্ট বর্ষে গৌরী-দানের প্রথা এই সময় তাঁতিয়া দীক্ষিত এলেন।

বাজীরাও পেশবা ঝাঁসীরাজ বাবা দীক্ষিত ভট্‌কঙ্কর বা দীক্ষিতকে যথাযোগ্য সমাদর ব সাধ্যমত বিবাহ ব্যাপারে সাহায্য ভরসা দিলেন। মোরোপন্ত কন্যা জানবার জন্য উৎসুক হয়ে দীক্ষিতকে মনুর কাশীকৃত [illegible]। তাঁতিয়া দীক্ষিত জন্ম

দেখে সবিশেষ আকৃষ্ট হ'লেন।
ন, 'এই জন্মপত্রিকা যার, সেই
কন্যা রাণী হবে। তার থেকে
পাতিকালের নাম অমর খ্যাতি লাভ
।'

ষ্টচিত্তে মোরোপন্ত জানালেন কন্যা
তাঁতিয়া দীক্ষিত মেয়েটিকে
আগ্রহ প্রকাশ করলেন। মনুকে
রে আনা হল। তাঁতিয়া দীক্ষিত
দেখতে লাগলেন। সাড়ে সাত
বয়েস, কিন্তু বুদ্ধিতে উজ্জ্বল,
চেহারা। তাঁর ভাল লাগল।
মোরোপন্তের সঙ্গে তাঁতিয়া দীক্ষিত
বর্তা বলছেন, বিবাহ সংক্রান্ত
চনায় আকৃষ্ট হয়ে পেশবাও মন্তব্য
। এই সময় বাজীরাও-এর
নর তলা থেকে একটি কালো সাপ
উঠল। ঘরের সকলে বিচলিত,
হয়ে পড়লেন। অকুতোভয় মনু
ক চমৎকৃত করে একখানি আসন
কম্বল দিয়ে সাপটিকে চাপা
ন। সঙ্গে সঙ্গে অন্য সকলে এসে
টিকে হত্যা করল।
স্নেহকম্পিত হৃদয় মোরোপন্ত,
লিত পেশবা, সকলেই মনুকে
সনা করে বললেন,—'সাপটি তো
মড়ে দিতেও পারতো।'

মনু বললেন,—'কিন্তু সাপটির ভাগ্য
। শুধু কয়েক মুহূর্তের জন্য
টি এল এবং বাজীরাও পেশবা,
র রাজশাস্ত্রী সকলকে ভয়চকিত
তুলল। এই জীবনই আমার কাম্য।'
মনুর পরবর্তী জীবনের গৌরবময়
তিই জনসাধারণকে এই গল্পগুলি
করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। কেননা,
সে এর কোনো নজীর নেই।
গল্পে এবং গাঁথায় রাণীর স্মৃতির
জনসাধারণের শ্রদ্ধাভক্তিই এদের

নুকে দেখে সন্তুষ্ট হলেন তাঁতিয়া
ত। তাঁর বারবার মনে হল এই
ঝাঁসীর রাণী হবার উপযুক্ত।
গঙ্গাধর রাওয়ের সঙ্গে বিবাহ
উত্থাপন করলেন। আশাতীত
বিগলিতচিত্ত মোরোপন্ত সম্মত
। বাজীরাও মোরোপন্তের ধারণা
তাঁতিয়া দীক্ষিতকে বার বার

ঝাঁসীর রাণীমহল, বর্তমানে কোতোয়ালী

উচ্চকণ্ঠে প্রশংসা বাক্য জানালেন। গঙ্গাধর রাওকে সবিশেষ জানাবার জন্য তাঁতিয়া দীক্ষিত ফিরে গেলেন ঝাঁসী।

সানন্দ সম্মতিতে গঙ্গাধর রাও সকন্যা মোরোপন্তকে আনবার জন্য যান-বাহন পাঠালেন। তাঞ্জাম মাঝখানে নিয়ে সারি সারি ঘোড়সোয়ার টগ্‌বগিয়ে চলে গেল বিঠুর।

কন্যার সন্ধানে আর একটি দল নর্মদার দক্ষিণে ভ্রমণ করছিল। নর্মদা মধ্যভারত ও দাক্ষিণাত্যে অতি শ্রদ্ধেয় নদী। তিনি চিরকুমারী। একদা তাঁর বিবাহ স্থির হয়েছিল শোণ নদের সঙ্গে। শোণ নদ মহা আড়ম্বরে 'বরাত' নিয়ে ধীরে ধীরে আসতে লাগলেন দক্ষিণে। বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করে তাড়াতাড়ি এলে তাঁর পদমর্যাদার পক্ষে অশোভন হবে। বর দেখবার আগ্রহে অধীর চিত্তে নর্মদা তাঁর দাসী ঝুলাকে পাঠালেন। সে শোণকে দেখে এসে নর্মদাকে বরের সম্বন্ধে যথাযথ বর্ণনা দেবে। পুরুষের চিত্ত, দাসীকে দেখে আকৃষ্ট হল। ঝুলাকে তিনি বিবাহ করলেন। এই কথা জানতে পেরে ক্রুদ্ধা নর্মদা এক পদাঘাতে শোণ এবং ঝুলাকে পূর্বদেশে পাঠিয়ে দিলেন। শোণের অস্থিরমতি স্বভাবের জন্য তাঁর বিবাহের উপর কোনো আকর্ষণ রইল না। তিনি চিরকুমারী থাকবার প্রতিজ্ঞা করলেন এবং অভিমানে পশ্চিম-গামিনী হলেন।

(Colonel Sleeman—Rambles and Recollections P 15—16).

সেই থেকে নর্মদা চিরকুমারী। তবু তিনি বহুজনের কাছে মা। তাঁর জল তাদের কাছে পুণ্যবারি। তাঁর আশীর্বাদ তারা জীবনে প্রার্থনা করে।

এই নর্মদার উত্তরে কন্যা সন্ধানের ফলে এই রকম সুলক্ষণা কন্যার সন্ধান মিলেছে বলে তাঁতিয়া দীক্ষিত উৎফুল্ল হলেন।

মোরোপন্ত এবং মনুকে নিয়ে উপযুক্ত সমারোহে ফিরে এল ঝাঁসীর রাজপ্রতিভূরা। মনুকে নিয়ে যখন মোরোপন্ত এলেন, তখন ঝাঁসীর রাজ-অন্তঃপুরিকা রমণীরা হোমশালার খাজিকদের কন্যাকে ঝাঁসী নগরীর উৎসব সমারোহ, রাজপ্রসাদের ঐশ্বর্য ইত্যা দেখিয়ে মুগ্ধ করবার প্রয়াস করলে বালিকা মনু বললেন—'পেশোয়ার প্রা যে দেখেছে, ঝাঁসীর রাজপ্রাসাদ দেখে মুগ্ধ হবে কি করে? আর কি পেশে কি ঝাঁসীরাজ ঐশ্বর্যের মধ্যে চমকপ্রদ আছে?'

এই কথা অতিরঞ্জিত হয়ে গঙ্গাধ কানে গেল। ক্রুদ্ধ গঙ্গাধর মোরোপন্ত বিঠুরে ফিরে যেতে বললেন। মোরোপ ফিরে গেলেন।

দাক্ষিণাত্যে ঘুরে যে দলটি এ তারা নিরাশ হয়ে ফিরে এল। ত তাঁতিয়া দীক্ষিত পুনর্বার গঙ্গাধর অনুরোধ করলেন, বিঠুরের কন্যাকে গ করতে গঙ্গাধর সম্মত হলেন। তাঁ তাঁকে বোঝালেন, রাজ অন্তঃপুরে বালিকা কি বলেছে এবং মেয়েরা অতিরঞ্জিত করে কি বলেছেন, ভাষণে নিশ্চয় পার্থক্য আছে। তা সে বালিকা। তার পক্ষে চপল উক্তি সম্ভব। তবুও সেই কন্যা পাত্রে পক্ষে একান্ত মঙ্গলকারিণী, তার ঝাঁসীর রাজবংশ খ্যাত হবে।

এবার বিবাহের আয়োজন হ শুভদিনে মোরোপন্ত ও মনু ঝাঁসীতে প্রবেশ করলেন তখন নগ পথ আলোকসজ্জিত। পত্রপুষ্পের সুসজ্জিত বিভিন্ন নগরদ্বার। বৈশাখ পূর্ণিমা সংবৎ ১৯০০ এবং ইংরেজ ১৮৪৩ সালে ঝাঁসীতে মহাধুমধা বিবাহ সম্পন্ন হল।

যজ্ঞ হোমে পুষ্প এবং লাজাঞ্জলি দেবার পর গ্রন্থি বন্ধনের সময়ে মনু সভাস্থ সকলকে চমৎকৃত এবং গঙ্গাধরকে কিঞ্চিৎ ক্ষুন্ন করে পুরোহিতকে বললেন, "গাঁঠ চাঙগলা বান্ধো আহে"—গ্রন্থি ভাল করে বাঁধুন।

গঙ্গাধর বালিকাবধূর অঞ্জলি কোষ-বদ্ধ হাতে গ্রহণ করে হোমাগ্নিতে বার-বার ঘি, মধু এবং লাজ বর্ষণ করলেন। অগ্নি সাক্ষী রেখে মনুর কপালে সধবার আয়তী চিহ্নস্বরূপ কুঙ্কুম তিলক আঁকলেন, গলায় পরালেন মঙ্গলসূত্র। করতলে কুঙ্কুম ও লাক্ষার পদ্মচিহ্ন আঁকা হল। পায়ে উঠল স্বর্ণশিঞ্জির ও পদাঙ্গুরীয়। পায়ে স্বর্ণালঙ্কার একমাত্র

কুলবধূরা পরতে পারেন। তারপর জল ছিটিয়ে শুভ দক্ষিণাবর্ত শাঁখ য়ে পুরনারীদের সঙ্গে পুরোহিত গমন করলেন। পশ্চাতে নববধূকে রাজা গঙ্গাধর গিয়ে ঝাঁসীর রাজ-াসনে বসলেন।

অভূতপূর্ব গাম্ভীর্য ও গৌরবে ধরের হৃদয় উদ্বেলিত হ'ল। কালো রের সুবিশাল দুর্গের পায়ের কাছে খানির মত প্রাসাদের সমস্ত কোণা অদৃশ্য পিতৃপুরুষদের কণ্ঠে তে আশীর্বাণী উচ্চারিত হ'ল। ঠতাত রঘুনাথ হরি, পিতা শিবরাও রাও, হতভাগ্য তরুণ যুবক রামচন্দ্র রাও, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রঘুনাথ রাও, মৃত্যুতে তাঁরা দ্বেষ-বিদ্বেষ বিস্মৃতলোকে। দের একমাত্র কামনা, নেবালকর বংশ কথনো বিলুপ্ত না হয়। এ বিবাহ দুটি মানুষের সংসার রচনার জন্য । এর পিছনে আছে রাজসিংহাসনের দাবী। বুন্দেলখণ্ডের এই মরাঠা রাজ্যকে করে রাখতে পারে শুধু উপযুক্ত বংশধর। নেবালকর বংশ চায় উপযুক্ত উত্তরাধিকারী। রাজপরিবারে ভার্যা শুধু পুত্রের জন্য। তাঁর অন্যান্য ভূমিকা নগণ্য। সকলের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে মূর্ত করে পুরোহিত আশীর্বাণী উচ্চারণ করলেন—'আজ থেকে পতিগৃহে বধূর নতুন নামকরণ হ'ল—লক্ষ্মীবাঈ। কল্যাণী, এই নামে তুমি তোমার পতি-কুলের গৌরব বর্ধিত কর।'

গঙ্গাধর রাওয়ের প্রিয় হাতী সিদ্ধ-বক্স সোনার জরির সাজে সেজে শুঁড় দুলিয়ে রাজপথে ফিরতে লাগল। টগ্-বগিয়ে চলতে লাগল আরবী ঘোড়া। রঙীন মুরেঠা বেঁধে মুরগীর আর ভেড়ার লড়াই লাগিয়ে দিল পথের ধারে বাজীওয়ালা। রাজার প্রিয় গোলন্দাজ গোলাম ঘৌস কেল্লার বুরুজ থেকে ঘনগর্জ, অর্জুন, নলদার আর ভবানী-শঙ্কর—এই চারখানা কামানে একশোবার তোপ দাগলেন। বড় বড় কালো ঘোড়ার পিঠে চড়ে ইংরাজ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রস্ দলবলে এসে শ্রদ্ধা জানিয়ে গেলেন উপহার দিয়ে। ঝাঁসীর নাট্যশালায় নাট্যাভিনয় চলতে লাগল। অরছা, দতিয়া ও অন্যান্য প্রতিবেশী রাজারা

ঝাঁসীতে মোরোপন্ত তাম্বের বাড়ি

এলেন নিমন্ত্রণ রাখতে। জলসায় বসে আতরদানিতে আঙুল ডুবিয়ে কানে আর গোঁফে লাগিয়ে ভাল ভাল গোয়ালিয়ার ঘরাণার গাইয়েদের গান শুনে ফিরে গেলেন তাঁরা। রাজপুরীতে নিরন্তর সর্বসাধারণ নিমন্ত্রিত হল। গরীব-দুঃখী অন্ন, বস্ত্র এবং কম্বল পেল। ব্রাহ্মণরা সুবৃহৎ থালা পরিপূর্ণ করে 'পুরাণপুরী', 'শ্রীখণ্ড' এবং 'আনারসা' ভোজন করে 'নকো, নকো' অর্থাৎ না-না বলতে লাগলেন।

ঝাঁসীর রাজকুলের কুলস্বামিনী অর্থাৎ গৃহদেবতা মহালক্ষ্মীর মন্দিরে মহাসমারোহে নবদম্পতির শুভকামনায় পূজা নিবেদিত হ'ল। বিশাল পিতলের আধারে জ্বলতে লাগল নন্দাদীপ। সেই প্রদীপ অনির্বাণ জ্বলে রাজপরিবারের কল্যাণ কামনা করবে যুগ যুগ ধরে দেবতার কাছে, এই হ'ল শাস্ত্রের বিধান। তার শিখা যদি তৈলাভাবে বা অন্য কোনো কারণে নিভে যায়, তবে অসীম অমঙ্গল।

মোরোপন্ত একমাত্র সন্তানকে ছেড়ে থাকতে পারলেন না। প্রথমে তিনি বিঠুরে প্রত্যাবর্তন করলেন। কিন্তু মনুর সঙ্গে বিচ্ছেদ তাঁর কাছে একান্ত দুর্বহ বোধ হ'ল। পুনর্বার ঝাঁসীতে ফিরে এলেন তিনি। গঙ্গাধর রাও তাঁকে সসম্মানে বৃত্তি নির্দিষ্ট করলেন। মুরলীধর মন্দির নির্মিত ক'রে তাতে বাস করতে লাগলেন মোরোপন্ত, মুরলী-ধরের পূজারী হয়ে।

মোরোপন্তের বয়েস তখন বত্রিশ মাত্র। পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য, অটুট যৌবন। গুরুসরাইয়ের বাসুদেব শিবরাও থান-ওয়ালকরের কন্যার সঙ্গে বিবাহ হ'ল তাঁর। এই কন্যার নাম বিবাহের পর হ'ল চিমাবাঈ। চিমাবাঈ, লক্ষ্মীবাঈয়ের চেয়ে দুই তিন মাসের মাত্র বড় ছিলেন।

চিমাজীরয়ের সঙ্গে লক্ষ্মীবাঈ-এর মাতা, কন্যা, সখী, বন্ধু, এর মিশ্রণে একটি মধুর সম্পর্ক রচিত হ'ল। তখন গঙ্গাধর রাওয়ের বয়স উনত্রিশ, লক্ষ্মীবাঈয়ের বয়েস আট। 'মনু' নামের সঙ্গে বিঠুরের সমস্ত সম্বন্ধই ছাড়তে হ'ল তাঁকে। এখন থেকে তিনি হ'লেন ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ।

(ক্রমশ)

অফিস ফেরত ট্রামের ভিড় এড়াতে হেঁটেই চলেছিলাম, দেখি শিশির আসছে উল্টো দিক থেকে। অনেকদিন বাদে দেখা ওর সঙ্গে, তাই মুখ থেকে অতর্কিতে সাদর সম্ভাষণ বেরিয়ে এল।

—শিশির না, বহুদিন বাদে দেখা তোমার সঙ্গে।

নিজের ব্যবহারে নিজেই একটু আশ্চর্য হলাম। ওর সম্পর্কে আমার যা ধারণা, তাতে ওকে না চিনে পাশ কাটিয়ে চলে গেলেই বোধ করি উচিত কাজ হত। সময় অনেক কিছুকেই নরম করে আনে। যে তীব্র ঘৃণা একদিন উৎসারিত হয়েছিল ওর কার্যকলাপে, তা কত মৃদু হয়ে শেষ পর্যন্ত শুধুমাত্র একটি ঘটনার স্মৃতিতে পর্যবসিত হয়েছে।

—আরে রবি! হ্যাঁ অনেক দিন বাদে। কেমন আছ?

লক্ষ্য করে দেখলাম ওর বেশভূষার প্রভূত উন্নতি। শরীরও একটু চিক্কণ যেন। মুখকান্তিতে সচ্ছলতার প্রসাদ। ওকে ডেকে আমি যেমন বিরত বোধ করছিলাম, সেও খুব স্বস্তি অনুভব করছিল না। যদি আমি না ডাকতাম তাহলে ও স্বাচ্ছন্দে পাশ কাটিয়ে ব্যস্ত পায়ে এগিয়ে যেত। কিন্তু যখন আর তার উপায় নেই, তখন মৌখিক ভদ্রতায় বাধা থাকে কেন।

—ভালো। তোমার হাতে ওটা কি?

—রেকর্ড। আমার লেখা, আমারই সুর দেওয়া। গেয়েছেন—শিশির একজন নামকরা গাইয়ের নাম উচ্চারণ করলে।

—ভালোই আছ তবে, কি করছ?

—ওই গ্রামোফোন কোম্পানীতেই চাকরি পেয়েছি। শিশির ঠিকানা দিল একটা। বলল, যেয়ো একদিন আমার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব।

শিশির চলে গেলে, একটা সিগারেট ধরিয়ে আমি হাঁটতে লাগলাম। ওর স্ত্রীর কথায় আমার মনে পড়ল সুষমার মুখ। ওর গানের কথায় আমার মনে পড়ল বহু বছর আগের একটি দিন। সঙ্গীত-বিজ্ঞান প্রবেশিকায় ওর গান প্রথম প্রকাশিত হয়েছে স্বরলিপি সমেত। আমি শিশির সুষমা একসঙ্গে ঝুঁকে পড়ে দেখেছিলাম। তারপর সুষমা উঠে চা বানিয়েছিল।

চা খেতে খেতে সুষমাকে জনান্তিকে বলেছিলাম, 'আজ শুধু চায়ে তোমায় রেহাই দিতাম না বৌদি, কিন্তু দেখছি তোমার আট গাছা চুড়ির আর দুটি অবশিষ্ট।' উত্তরে সুষমা ম্লান হেসেছিল।

সঙ্কীর্ণ গলির সেই অন্ধকার ঘরে, লণ্ঠনের অল্প আলোয় আমরা তিনজনে ক্লান্ত হয়ে বসে থাকতাম। জানলায় লাগানো তিনটে কাঁচ লাল, সবুজ, হরিদ্রাভ আলো বিকীরণ করতো—চতুর্থটি ভেঙে যাওয়ায়, সেখানে লাগানো পিচবোর্ডটির রঙ হয়ে উঠতো আরও কালো। বেশীর ভাগ সময় আমি একটা বই নিয়ে বসে থাকতাম, আর ওরা চুপ করে। এই নীরবতা অসহ্য হয়ে উঠলে শিশির হঠাৎ ওর বালিশ ওটা, টিলে রিডের বেসুরো পর্দার হারমোনিয়ামটা

খাটের তলা থেকে টেনে বার করে সশব্দে বলত, গান শোনো একটা, আজ সকালেই সুর দিয়েছি। কিংবা চা কিনে আনি বলে পাশের ঘর থেকে কেতলিটা নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে যেত।

গান লিখত ও দোকানে বসে। সুর দিত সকালে, যখন সুষমা পিছনের ঘরে তোলা উনুনে ভাত ডাল সিদ্ধ করতে ব্যস্ত থাকত। চুনের চিহ্নহীন দেয়াল, রুক্ষ সিমেন্টের মেঝে, আর উনুনের রান্নাভাত ওকে এমন করে ঘিরে থাকত যে, হারমোনিয়াম যন্ত্রের উপর শিশিরের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ওকে স্পর্শ করবার অবকাশ পেত না।

খাটের উপর বসে অনেকদিন ওর গান শুনেছি। শেষের দিকে তার কোনোটাই মর্মে প্রবেশ করত না। শেষ হলে অবশ্য যথারীতি বলতাম বেশ হয়েছে—কিন্তু তাতে শিশির বিশেষ উৎসাহ বোধ করেছে বলে কোনদিন মনে হয়নি। সুষমার মুখেও ভাবান্তরের কিছুমাত্র ছায়াপাত লক্ষ্য করি নি। এত কম কথা বলত সুষমা আর এতই নিরুত্তাপ! তার সমস্ত আবেগ উত্তাপ ঠাঁই নিয়েছিল তার শরীরে। দিন দিন আরও রূপসী হয়ে উঠছিল সুষমা। অপূর্ব লাবণ্যে শ্রীমণ্ডিত ওর সর্বাঙ্গ।

আজ শিশিরের গান রেকর্ড কোম্পানী নিয়েছে। নিশ্চয়ই সুর-কার হিসেবে কিছুটা ওর কৃতিত্ব ছিল। আমি যদিও গান বুঝি না, তবু ওর গান কেমন লাগে এ নিয়ে তখন আমার মনে প্রশ্ন জাগেনি। শিশিরের বাসায় যে গান শুনতে যেতাম না, এ সত্য আমার চেতনায় ধরা পড়েছিল অনেকদিন আগে। তবু ওর গানের সুরে যদি প্রচণ্ড শক্তি থাকত, তবে তা আমাকে নাড়া না দিয়ে পারত না। ওর গান যে নিতান্তই মাঝারি, তার স্বপক্ষে আমি একটা যুক্তিও খাড়া করেছিলাম। শিশিরের জীবনে হয়ত অনেক যন্ত্রণার ছাপ পড়েছে, অনেক কষ্টভোগ করেছে ও। অভাব অনটন, বৈচিত্র্যহীন পঙ্গু দৈনন্দিন আবর্তন এমন কি দাম্পত্য-প্রীতিবন্ধনের, ভালোবাসার অভাবও—কিন্তু তার কোনটাই মহৎ দুঃখ নয়। তাতে সেই আকাশস্পর্শী আবেগ কই। আর কোথায় বা তাতে সমুদ্রের মত বিক্ষোভ। আসল কথা, ওর চরিত্রে দেখেছি ব্যক্তিত্বের একান্ত অভাব। মাঝে মাঝে আমার আশ্চর্য লাগত সত্যিই কি সুষমা কোনদিন ওকে ভালোবাসতে পেরেছিল। পেরেছিল নিশ্চয়ই নয়ত ওর সঙ্গে সে ঘর ছেড়ে এসেছিল কিসের তাগিদে, আত্মীয়স্বজন সমাজ সমস্ত কিছুকে অস্বীকার করে। আমি আরও ভাবতাম, কেমন ছিল সে শিশির যাকে সুষমা একদিন ভালোবাসত। উজ্জ্বল প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা, সমৃদ্ধত যুবা-পুরুষ, যার উপর সে আশ্রয় করেছিল—ঐকান্তিক ভরসায়। বর্তমান শিশিরকে দেখে আমি কিছুতেই সেই যুবকটির অবয়ব অনুমান করতে পারিনি।

দুপুরবেলায় ওর ছোট্ট মনিহারী দোকানটিতে, একখণ্ড কাগজ সামনে রেখে, পেন্সিল ধরে, খরিদ্দারের আশায় কিংবা গানের চরণের মিল খুঁজতে, কি করতে যে বসে থাকত শিশির তা ওই জানে। ওর দোকানে গিয়েছি কদাচিৎ, তখন দেখেছি ওর দৃষ্টি সন্ধানী তো নয়ই বরং স্তিমিত—একরাশ শূন্যতা বোঝাই করা। স্কুলের সামনের ও দোকানে ছোট ছেলেদের জন্য মারবেল ঘুড়ির সুতো, চানাচুর লজেন্স ইত্যাদি অপ্রচুর সঞ্চয় হয়ত তাদের কা[illegible] লোভনীয় ছিল—কিন্তু দোকানীর প্র[illegible] হীন চাহনি আর ঔদাসীন্য তাদের ক[illegible] ঘেঁষতে যথেষ্ট মাত্রায় প্ররোচিত কর[illegible] পারত না।

—এই যে শিশির, তারপর তোম[illegible] ব্যবসাপত্রের অবস্থা কেমন?

—ভালোই।

—কিন্তু তুমি যদি এইভাবে এখ[illegible] সঙ্গীতচর্চা করতে থাক, তবে তোম[illegible] দোকানের উন্নতি কি করে হয় বল?

ও চুপ করে থাকত।

অনেকদিন পরে আমি চিন্তা ক[illegible] ছিলাম—কেমন করে শিশির আমার [illegible] অনধিকারচর্চা সহ্য করত। তখন অনু[illegible] করেছি যে, সেদিন আমার কণ্ঠে বন্ধু[illegible] সাদর সমালোচনার সুর থাকত না। [illegible] হয়, তার অকর্মণ্যতা সুষমার তদানী[illegible] দুরবস্থার জন্য দায়ী, এই ধারণায় কিছু[illegible] রূঢ়তাই ফুটে উঠত আমার ব্যবহা[illegible] ভাবতাম, ওর ব্যক্তিত্বের অভাব ওকে এম[illegible] মেরুদণ্ডহীন করে তুলেছে যে, আম[illegible] ভর্ৎসনা মাথা পেতে না নিয়ে [illegible] গত্যন্তর নেই। দুর্ব্যবহারে যখন [illegible] মুখের রেখামাত্র বিচলিত করতে পারি[illegible] তখন মনে হয়েছে বুঝি বা চতুর্দি[illegible] নির্যাতনের এই সীমাহীনতা ওকে [illegible] দূর অভিভূত করেছে যে, আমার [illegible] আঘাত ওর পক্ষে যৎসামান্য। আজ [illegible] ও আমাকে উপেক্ষা করত। তার ক[illegible]

আমার প্রথম যৌবনের উদ্দাম উচ্ছ্বাস সকল রকম সম্ভবপর ছদ্মবেশ সত্ত্বেও ওর চোখে ধরা পড়ে গিয়েছিল। ও আমাকে উপেক্ষা করত, কারণ ও স্থির-নিশ্চয় ছিল যে, আমায় নিয়ে ওর কোন আশংকা নেই।

লণ্ঠনের মৃদু আলোয় ফর্সা কাল-পাড় ঢাকাই শাড়ি পরে, পান খেয়ে ঠোঁট দুটি টুকটুকে লাল করে, সীমন্তে সিন্দুর রেখার অপূর্ব সজ্জায় সুষমা রাণীর মতই অবস্থান করত। কখনো বা ওর হাত নাড়ার সঙ্গে সেই মৃদু আলো সোনার চুড়িতে ঝিলিক দিয়ে ইশারায় হেসে উঠতো। তখন ওর দিকে স্পষ্ট করে তাকাতে আমার ভয় করতো। লুকিয়ে একটুখানি দেখে আমি চোখ সরিয়ে নিতাম—সেই-ই আমার পক্ষে যথেষ্ট। হয়তো অপেক্ষা করতাম কখন কাঁচের গ্লাসে চা দেবার সময় ওর আঙুল আলতো করে আমার আঙুলকে স্পর্শ করে যাবে। সেই প্রতীক্ষার অবসরে শিশির যখন হারমোনিয়ামটার উপর এলোমেলো চাপ দিয়ে চলেছে, আমি সুষমার সঙ্গে কথা বলতাম—সিনেমা, সংগীত, মানবচরিত্র ইত্যাদি অকারণ অজস্র কথার ফুলঝুরি। সুষমার দিকে না তাকিয়েও বুঝতাম ওর দৃষ্টি আমাকে ছুঁয়ে রয়েছে।

সুষমার সান্নিধ্যে আমার এই উদ্দীপনা সত্ত্বেও, ও আমার কাছে রহস্যাবৃত হয়েই রইল। ওর প্রশান্তির উঁচু পাথরে আমার উচ্ছ্বাস প্রতিদিন আছড়ে পড়ে ফিরে আসত। পরদিন দ্বিগুণ অধীরতা নিয়ে উপস্থিত হতাম। সমস্ত দিন নানান কাজের ফাঁকে যত কথা বুনে মালা তৈরী করেছি, তা অসমর্পিতই রয়ে গেছে শেষ পর্যন্ত।

একদিন সন্ধ্যায় ওর দোকানে গিয়ে উপস্থিত হয়েছি।

—কি হে তোমার ত' বন্ধ করার সময় হলো।

—না, একটু দেরি হবে আমার।

—পাগল নাকি! এত রাত্রে কে আসবে তোমার মারবেল কিনতে।

শিশির রাজি হল না আসতে, বলল জরুরী কাজ রয়েছে, এক ভদ্রলোকের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। 'তুমি যাও বরং, আমি একটু পরেই আসছি।'

—আমি বসি। কত দেরি হবে তোমার?

—না না, এখানে বসবার জায়গা কই। তোমার অসুবিধে হবে। আর তাছাড়া বেচারী সুষমা একলা রয়েছে সারাটা দিন। তুমি গেলে তবু একটু গল্প-গুজব করতে পারবে।

শিশিরের কথায় আমি ওর মুখের দিকে তাকালাম। ব্যঙ্গের ছোঁয়া কি কণ্ঠস্বরে? সন্দেহ। ওর কথায় কিন্তু কোথাও অস্বাভাবিকতার স্পর্শ নেই।

আমি যখন ওদের বাসায় পৌঁছলাম, তখন সুষমা বৈকালিক প্রসাধন শেষে সিঁদুরের ফোঁটা পরছিল।

'বৌদি, তুমি এত চওড়া করে সিঁদুর পরো, জানো আমার কিন্তু ভারি ভালো লাগে।'—ঘরের বাইরে থেকে কথাটা ছুঁড়ে দিয়ে কাঠের চৌকিটাতে আমি সশব্দে বসে পড়লাম।

মৃদু হাসল সুষমা। 'সত্যি! কিন্তু তুমি ত' আজকালকার ছেলে। এখনকার ফ্যাশন ত—'

আমি বাধা দিলাম। 'আর তুমি কোন প্রাচীন যুগের মেয়ে?'

—নই? কত বয়স হলো জানো!

—থামো থামো। হ্যাঁ তোমার স্বামী-দেবতাটির আজ আসতে দেরি হবে। তিনি বিশেষ জরুরী কাজে ব্যস্ত আছেন। আমায় আদেশ করেছেন গল্প-গুজব করে তোমায় প্রফুল্ল রাখতে হবে। এখন অনুমতি করুন দেবী।

সুষমার মুখ আমার কথায় বিবর্ণ হয়ে গেল। 'কি কাজ ঠাকুরপো?'

—কি জানি, বললে কোন ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করতে হবে।

—তুমি একটা কাজ করবে ভাই। এখুনি তাকে একবার ডেকে নিয়ে আসবে। বোলো আমার শরীর ভালো নেই।' একটুক্ষণ চুপ করে রইল সুষমা—'বোলো আজ যেন কাউকে নিয়ে না আসে।'

এতদিন ওর ঠাণ্ডা ব্যবহারে এমনই অভ্যস্ত হয়েছিলাম যে, ওর আর্ত তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর আমাকে সবেগে নাড়া দিয়েছিল। আমার বিহ্বলতা সুষমার দৃষ্টি এড়ায় নি। তাই যে মুখোশ অতর্কিতে সরে গিয়েছিল, তা আস্তে আবার মুখের উপর টেনে এনেছিল ও। এমন কি ভবিষ্যতে বিচলিত হওয়ার জন্য লজ্জার ছায়াও

দেখেছি ওর মুখে। অবশ্য আমার সপ্রশ্ন দৃষ্টি তখুনি সংযত করেছিলাম—কারণ সুষমার আজ্ঞা পালনেই তখন নিজেকে ধন্য বোধ করবার মত অবস্থা আমার। ওর কৈফিয়তে আমার প্রয়োজন ছিল না।

কিন্তু তার কথামত কাজ করা সম্ভব হয়নি। শিশির ভুবনকে সঙ্গে নিয়ে এসে পড়েছিল, সুষমার সহাস্য অভ্যর্থনায় আমি আশ্চর্য হয়েছিলাম। এতক্ষণ যে ব্যক্তির আগমন ওর অনভিপ্রেত ছিল—সে কি ওই ভুবন!
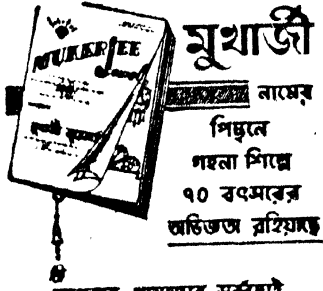
'আসুন ভুবনবাবু, আজকাল আপনার দেখা পাওয়াই ভার, তবু ভাগ্য আমার যে এতদিন বাদে মনে পড়ল। তুমি বুঝি ধরে আনলে ওঁকে?'

'এসব আপনার মন-রাখা কথা বৌদি, কই ক'বার খোঁজ নিয়েছেন আমার। শিশিরবাবু তবু মাঝে মধ্যে খবর নেন।' —ভুবনের সোনা বাঁধান একটা দাঁত ওর কথার সঙ্গে চক্‌চক্‌ করছিল।—'তারপর রবি, তোমার কি খবর।'

'তোমার সঙ্গে ভুবনবাবুর ত আলাপই রয়েছে, ভুবনবাবু রাস্তায় আসতে আসতে বলছিলেন। তুমি ওঁর সঙ্গে পড়তে না? ভুবনবাবুর সঙ্গে আমাদের বহু দিনের আলাপ।' —শিশির বলল।

'তাইত দেখছি'—আমার অপ্রসন্নতা আমার উচ্চারণে গোপন থাকেনি। চমৎকার সন্ধ্যাটি নষ্ট হয়ে গেল বলে একটু পরেই বিদায় নিয়ে চলে এসেছিলাম। ভুবনের এই অভ্যর্থনা আমার ভালো লাগেনি। এমন কি, হঠাৎ আমি চলে আসায় শিশির কিংবা সুষমা আমায় থাকবার জন্য একবারও অনুরোধ করল না বলে, কয়েকদিন একটানা যন্ত্রণায় কি কষ্টই না পেয়েছিলাম।

আজ শিশিরের সঙ্গে রাস্তায় হঠাৎ দেখা হওয়ায় আমার সমস্ত চিন্তা সেই বিগত ঘটনাকে কেন্দ্র করে আলোড়িত হয়ে উঠেছিল। কোন কথা স্পষ্ট করে ওদের কাছ থেকে জানবার সুযোগ আমার হয়নি। এলোমেলো পরিস্থিতি, টুকরো টুকরো কথাবার্তা জুড়ে সাজিয়ে আমার মনোমত একটি কাহিনী আমি উদ্ধার করেছিলাম, তার সবটাই হয়ত নিজেকে স্তোক দেওয়ার জন্য। সেই কাহিনীতে অনেক ফাঁক ছিল বটে, কিন্তু সেই বিন্যাস আমায় সান্ত্বনা দিয়েছিল ঠিকই।

ক্লাবে তাস খেলতে যাওয়ার সময় শিশিরের নূতন দোকান কয়েকদিন চোখে পড়েছিল আমার। তারপর এক গানের জলসায় শিশিরের গান শুনলাম। আলাপ হয়েছিল সেখানেই, সুষমার সঙ্গেও 'পাড়ায় নতুন এসেছি, আসবেন মাঝে মাঝে'—সুষমার হাসিতে সৌজন্যের অতিরিক্ত আগ্রহ দেখেছিলাম বলেই বোধ হয়েছিল সেদিন।

তাই ভুবনের সঙ্গে ওদের অনেক দিনের আলাপ শুনে আশ্চর্য হইনি। ভুবনের কথায় অন্তরঙ্গতার স্পর্শ লুকোন থাকেনি, তা ঘনিষ্ঠ পরিচয়েরই প্রমাণ দেয়। কেমন করে কি সূত্রে কবে আলাপ, এ প্রশ্ন বহুবার করতে গিয়ে থেমে গিয়েছি। তাতে হয়ত আমার মনের জ্বালা ধরা পড়ে যেত। মানসিক এই অশান্তির মধ্যে একটুখানি আশ্রয় আমার জন্য রয়ে গিয়েছিল—সুষমা ভুবনকে অপছন্দ করে। ওর আগমন আশঙ্কায় তার কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ আর্ত আবেগে কেঁপে ওঠে।

বিনিদ্র অবসরে তখন আমার ভাবনা ওই বিষয়টিকেই কেন্দ্র করেছিল। সুষমার এই বিরক্তির কারণ কি? ভুবনের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা ছিল না। স্কুলের সহপাঠীরা পরবর্তী জীবনে কেমন করে তাদের অন্তরঙ্গতা হারিয়ে ফেলে এ খবর সকলেরই কিছু কিছু জানা। চার-দেয়াল আমাদের আটকে রেখে সখ্যতার অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করেছিল—তা অপসৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কে কোথায় ছিটকে গেছি। কখনো কারো সঙ্গে হঠাৎ দেখা হলে, কুশল প্রশ্নের জিজ্ঞাসার মধ্যে পুরনো আন্তরিকতাকে টেনে আনবার ব্যর্থ চেষ্টা করে থেমে যাই। মনের তার একসুরে আর বেজে ওঠে না।

কেমন ছিল এই ভুবন তা অনেক চেষ্টা করেও মনে আনতে পারিনি। মনে পড়ছে স্কুল বেঞ্চে ওর বসে থাকা; ও সোনা-বাঁধানো দাঁত যার আসলটি কোন দুর্ঘটনায় স্থানচ্যুত হয়েছিল। পুরু ঠোঁট, উঁচু চোয়াল, অবাধ্য চুল, সবকিছু মিলিয়ে এমন ভোঁতা একটি ছবি ফুটে উঠেছিল স্মৃতিতে যে, তাতে কোন গুণপনা খুঁজবার ইচ্ছা হয়নি। আর সেইটিই ভুবন সম্পর্কে সবচেয়ে [illegible] কথা—ওকে দেখে মনে কোন প্রশ্ন জাগে না। তাই ওকে পছন্দ না করলেও অপছন্দ করবার কথাও মনে হয় নি। [illegible]

র বেশভূষা, আংটি, বোতাম সব জড়িয়ে ঝেতাম ওদের পরিবারটি বিত্তবান। য়েস হলে টাকাওয়ালা লোক আমাদের ছে যেমন বিশিষ্ট হয়ে ওঠে—অল্প য়সে ঠিক তেমনটি বোধ হয় না।

ওর চেহারা অসুন্দর, তাই সুষমা কে পছন্দ করে না একথা বিশ্বাস রিনি। আর ভুবনের উপস্থিতিতে সেদিন মন, অন্যান্য দিনেও তেমনি, সুষমাকে ন্দমাত্রও অসন্তুষ্ট দেখিনি। ক্রমে ওর পস্থিতি শিশিরের বাসায় প্রায় প্রতি-দিনকার ঘটনাই হয়ে উঠেছিল। ভুবনের তি শিশির সুষমার তোষামোদের বহারকে ভালোবাসা মনে করে বিমূঢ় য়েছি, রোজই ভেবেছি, এবার এই ধারার আড্ডা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রে নেওয়াই ভাল। ভুবনের আপ্যায়ন আমার প্রতি অবহেলা বলেই মনে হয়েছে আমার। তাছাড়া ভুবন তার উচ্চগ্রাম কথা-র্তায় সন্ধ্যার সেই নিবিড়তাকে ক্ষুণ্ণ রে ফেলেছিল। ঘরে পা দেবার সঙ্গে ঙ্গে ওর চিৎকার আমার সুখকে ফুঁ য়ে নিভিয়ে দিত।

কয়েকদিন বাদেই আমার ধৈর্যের বাঁধ ঙল। এক রাত্রে ভুবনের সঙ্গে শিশিরের সা থেকে উঠে রাস্তায় এসেছিলাম। রা সন্ধ্যা ভুবন আর শিশির দোকান বসা বাজার এই সব আলোচনায় ময়টাকে বিষাক্ত করে তুলেছিল। রাস্তায় সে ভুবন বললে—'এসো এখানে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাই একটা।' ওর হাতের টিন থেকে গোল্ড-টিপ্‌ড দামী সিগারেট দিয়ে দেশলাই জেলে ধরল ও।

—'কিছু মনে করো না রবি, আমি কিন্তু তোমায় এতদিন খুব ভালো ছেলে জানতাম—'

—'তার মানে?'

—'মানে না বোঝবার মতো কাঁচা খোকা তুমি নও। ক' টাকা দিয়েছ আজ পর্যন্ত, শিশিরবাবুকে ব্যবসা করার জন্য?' —ওর সোনা বাঁধানো দাঁত ছুঁয়ে কথাগুলো গরম সীসের মত আমার কানের মধ্যে এসে পড়ল।

—মুখ সামলে কথা বল ভুবন। এখুনি আমি শিশিরকে তোমার হারামির কথা বলছি।' উত্তেজনায় আমার সমস্ত শরীর ঠক্‌ঠক্‌ করে কাঁপছিল।

উত্তরে ভুবন হাসল কিছুক্ষণ। 'আহা দান না হয় নাই-ই করেছ—ধার দিয়েছ ত' বটে। এই তো আমিও কিছু দিচ্ছি। অমন স্ত্রী যার ঘরে, কি বলো?'

—'তোমার মত ইতরের সঙ্গে কথা বলার প্রবৃত্তি আমার নেই।'

প্রায় ওকে ধাক্কা দিয়েই সেদিন দ্রুত-পায়ে বাড়ি ফিরেছিলাম।

ভুবনের কথা শিশিরকে বলা বৃথা। ওর কাছ থেকে প্রশ্রয় না পেলে, কিছুতেই ভুবন এমন কথা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করতে সাহস পেতো না। কিন্তু সুষমাকে সাবধান না করে দিয়ে আমার শান্তি নেই। এতক্ষণে ওর আতঙ্কের মানে আমার কাছে পরিষ্কার হলো। এখন আমার চেয়ে বড়ো বন্ধু ওর আর নেই। যেখানে ওকে ঘিরে এই সর্বনাশ উদ্যত হয়ে উঠেছে সেখানে আমি ওকে উদ্ধার না করলে আর কে করবে। সুষমাকে একলা পাবার জন্য পরদিন বিকেলে ওদের বাসায় গিয়েছিলাম। শিশির তখনো দোকানে।

ওদের ঘরের জানলাগুলো তখনো বন্ধ ছিল। বিকেল চারটের পড়ন্ত রোদ্দুর ঘরে প্রবেশ করবার পথ পায়নি। আবছা আলো চোখে অভ্যস্ত হলে দেখলাম সুষমা খাটের উপর শুয়ে রয়েছে।

এখনো শুয়ে রয়েছ যে,—জানলাটা খুলে সুষমার মুখের উপর চোখ পড়ল আমার। রুক্ষ চুল উড়ে এসে মুখে পড়েছে। আধ-ময়লা, সাদা কাপড় পরনে ওর। ধীরে ধীরে উঠে, হাত দিয়ে চুল-গুলো মুখের উপর থেকে সরিয়ে দিল ও। মুখের ঈষৎ রক্তিমাভার মধ্যে ওর কালো বড় বড় চোখ দুটো কেমন ম্লান দেখাচ্ছে।

—স্নান করো নি আজ। জ্বর হয়েছে নাকি।'

—'না।' অত্যন্ত ধীরে আমার প্রশ্নের উত্তর দিল ও।

এতক্ষণে ঘরের ভিতর চোখ পড়ল আমার। টেবিলের উপর একটা প্লেটে ভুক্তাবশিষ্ট কিছু খাবারের টুকরো। চায়ের কাপে তলানিটুকু ঠাণ্ডা হয়ে সাদা হয়ে রয়েছে। আর একরাশ পোড়া গোল্ড-টিপ্‌ড সিগারেটের অংশ মেঝেয় ছড়ানো।

সুষমার চোখ আমার দৃষ্টিকে অনুসরণ করছিল। 'একটু দাঁড়াও, ঘরটা নোংরা হয়ে রয়েছে, পরিষ্কার করে ফেলি।'

ঘরের বাইরে স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইলাম আমি। অসহ্য যন্ত্রণায় সমস্ত শরীর যেন ভেঙে পড়ছে। দরজাটা দুহাতে ধরে প্রাণপণে নিজেকে সংযত করবার জন্য সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে, দাঁত চেপে উদ্গত আর্তনাদকে চেপে রাখতে পেরেছিলাম শেষ পর্যন্ত। মনে হয়েছিল, এখুনি এখান থেকে ছুটে পালিয়ে না গেলে চিৎকার করে ছেলেমানুষের মতো কেঁদে উঠব। কিন্তু কিছুতেই পা দুটোকে সচল করতে পারি নি।

'এবারে এসো'—সুষমার আচরণ এতক্ষণে স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। আমার অতর্কিত উপস্থিতিতে ওর অস্বস্তিটুকু কেটে গেছে একেবারে।—'এমন সময়ে হঠাৎ?'

সেখানে সমস্ত কিছু দিনের আলোর মত পরিষ্কার হয়ে গেছে, যেখানে আত্মগোপন করবার এতটুকু সঞ্চয় কোথাও অবশিষ্ট নেই, সেখানে এই লজ্জাহীনার নিঃসংকোচ মিথ্যাচার আমার দুঃখকে দু'পায়ে মাড়িয়ে দিয়েছিল। তার সবখানি তীব্র জ্বালায় ফেটে পড়েছিল আমার কণ্ঠস্বরে।

—'কে এসেছিল, দুপুর বেলায়?'

—'কই, কেউ না ত'—ও মিষ্টি করে হাসল আমার চোখের দিকে তাকিয়ে।

—'মিথ্যাবাদী। কেন এসেছিল ভুবন? কেন আসে রোজ রোজ—কেউ কিছু বোঝে না তুমি মনে করো?'

সুষমার মুখের হাসি মুখেই মিলিয়ে গেল। ওর সৌন্দর্যের মধ্যে এতখানি কাঠিন্য কোথায় লুকিয়ে ছিল, তা ওর সেদিনের চেহারা না দেখলে বুঝতাম না কিছুতেই।

—'তুমিও ত' আস রোজ রোজ।'

—'আমি!'

—হ্যাঁ তুমি। কেন আস [illegible] তোমরা আমাকে যে সব [illegible] মিষ্টি হাসি দিয়ে ভুলিয়ে রাখ [illegible]

সুষমা ঘর থেকে বেরিয়ে [illegible] অনেকক্ষণ চুপ করে বসেছিলাম [illegible] বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা এসেছিল [illegible] অন্ধকার গাঢ়তর হয়ে এসেছিল [illegible] সেই ছোট ঘরে। প্রস্তুতিহীন আ[illegible] সেই তীক্ষ্ম মার আমার চিন্তা [illegible] শক্তি পর্যন্ত কেড়ে নিয়েছিল, উঠে [illegible] যাবার সামর্থ্য খুঁজে পাইনি। [illegible] মুহূর্তগুলো এক এক করে কেটে [illegible] সঙ্গে আমার ক্লীবত্ব আমার চোখে স্প[illegible] হয়েছিল। ভুবন যা কাঞ্চনমূল্যে [illegible] করেছে, আমি তাই শুভার্থীর ছ[illegible] আবরণে, নিঃশব্দে ভিক্ষুকের মত কাম[illegible] করেছি প্রতিদিন। কি লজ্জা, দেয়া[illegible] মাথা ঠুকে মরে যেতে ইচ্ছা করছি[illegible] আমার।

'কি ব্যাপার, আজ যে সব বড় চুপ[illegible] চাপ, সুষমা কই?'—শিশির জামাটা খু[illegible] টাঙিয়ে রেখেছিল দেয়ালে। ওর শু[illegible] রোগা চেহারা দেখে আমার সমস্ত শরী[illegible] ঘৃণায় শিউরে উঠল। সমস্ত দোষ [illegible] উপর তুলে দিয়ে যেন আমি নিষ্কৃ[illegible] পেলাম। ওর অকর্মণ্যতার মধ্যেই রয়ে[illegible] ভুবনের প্রতি প্রশ্রয়ের কারণ। আর [illegible] ব্যক্তিত্বের অভাবের মধ্যে সুষমার [illegible] গ্লানিময় দিনগুলো। যেদিন আমা[illegible] অভিসন্ধি ওর কাছে ধরা পড়েছিল—কে[illegible] সে আমায় তাড়িয়ে দেয়নি ওর বা[illegible] থেকে জোর করে, পুরুষের মতো।

ভিতর থেকে এক পেয়ালা চা এ[illegible] চেয়ারটায় বসে শিশির চুমুক দিলো[illegible] 'যাও হে, গিন্নী তোমায় ভিতরে ডাকছে[illegible] চা খেতে। —আমি এখন সদরের লোক [illegible] আর তুমি তো দেখছি একেবারে অন্দ[illegible] মহলে জেঁকে বসেছো। অনেকদিন হ[illegible] গেল ভালবাসা একটু ফিকে হয়ে এসেছে[illegible] কি বলো। নিজের রসিকতায় ও নিজে[illegible] শব্দ করে' হাসতে লাগল।

ভিতরে আধো অন্ধকার ঘরে চায়ে[illegible] গ্লাসটা হাতে নিতে নিতে আমার ম[illegible] হলো এতদিনে সুষমার কাছ থেকে শে[illegible] বারের মত কিছু গ্রহণ করলাম।

'খুব রাগ হয়েছে বুঝি'—সুষমা[illegible]

...এনে দিত... ...সেটা চমকে উঠেছিলাম। ...য় পাই ... সত্যি কথাই তো ...ডাক্তারের ... ...ন। কিন্তু ...তোমাকে যে তুমি, আর ...মনে হয় না। ... একটা হাত আমার ...চ্ছি। ...রে ধরল। —মাথাটা ...মনমরা ... চলো তোমার সঙ্গে ...মর বাসা। ...টা বেড়িয়ে আসি।'

...ছরে যেন ... নিজেকে স্পষ্ট করে ... ...নিজের পাড়ায় ওকে ...ভিতরে ... ঘুরে বেড়াবার সাহস আমার নেই। ... কথাটিকেই কি সুষমা ...মায় বুঝিয়ে ...তে চায়। কি ভীরু, কি ...ক্ষে আমি তা ... ভব করা আমার পক্ষে ...ভবপর হলো।

মনে আছে, ...সেত খালি গ্লাসটা ...মিয়ে রেখে চোরের মত চুপি চুপি ...দের বাসা থেকে রাস্তায় নেমে এসে-...লাম। সেই অন্ধকার ঘরে সুষমা মাথা ...চু করে বসেছিল। কি ভাবছিল ও, কোন ...ভিব্যক্তি ফুটে উঠেছিল চোখে কিছুই ...মি দেখতে পাইনি।

নিজের সম্পর্কে নিজের ধারণা ছোট ...য়ে যাবার মত দুর্ঘটনা বুঝি মানুষের ...বনে আর নেই। বিগত কিছুদিনের ...বস্থা আমায় সেই অবস্থায় এনে ...লেছিল। ক্লাবেও যেতাম, কিংবা ...নেমায় কিন্তু প্রতি সন্ধ্যায় ওদের ...সায় যাব না, এই তীব্র ইচ্ছার মানে ...মি তখনি বুঝতাম। শিশিরের ...কানের পথ ভুলেও অনুসরণ করিনি ...কানদিন। দূরে কোন নারীমূর্তিতে ...ষমার ছায়া দেখেছি মনে করে সে ...স্তাই পরিত্যাগ করেছি। আগের আত্ম-...শ্বাসের সে জোর আর ছিল না—তাই ...ফস্বলে যাবার প্রথম সুযোগ ত্যাগ ...রিনি।

কিছুদিন পরে শহরে যখন কয়েক ...নের ছুটিতে ফিরেছিলাম, তখন মনে ...য়েছিল, এবারে ওদের বাসায় যাওয়া ...তে পারে। মনের অসুখ সেরে গেছে ...তদিনে। অবশ্য তার উপায় ছিল না, ...ধুর চিঠিতে জেনেছিলাম শিশির তার ...কান তুলে দিয়ে অন্য পাড়ায় চলে ...ছে। ইচ্ছা ছিল ওদের বাসায় গিয়ে ...জেকে একবার পরীক্ষা করে নেব, তা ...র সম্ভব হলো না।

এর পর যখন শিশিরের সঙ্গে দেখা হল—তখন ভেবেছি মন থেকে ওদের স্মৃতি নিঃশেষে মুছে গেছে। গেঞ্জি গায়ে, বাজারের থলি হাতে ও দ্রুতপায়ে ফিরছিল। 'রবি না, এসো, এসো। বাড়িতে গিয়ে কথা হবে। ভাতটা চাপিয়ে এসেছি কিনা, পুড়ে যাবে।'

—'কেন সুষমা?'

—'ও। জানো না তুমি। সুষমা তো মারা গেল সেবারেই। কলেরা। সবার আগে তোমার কথা প্রায়ই বলত।'

আমি হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম। শোকে নয়, বিস্ময়ে। কত সহজে কথা-গুলো শিশিরের মুখ থেকে বেরিয়ে এল। ওর কথা ও নিজেও বিশ্বাস করে নি। আমাকে বিশ্বাস করানোও যেন ওর চেষ্টা নয়।

পরে এক নীতিজ্ঞ বন্ধু যখন মুখ-রোচক মন্তব্য করেছিলেন যে, নষ্টা স্ত্রীলোকটি কুলত্যাগিনী হয়েছে—তখন শিশিরের কথাগুলো আবার আমার মনে পড়েছিল। আগের যুগের অক্ষম ঔপ-ন্যাসিকেরা যখন তাঁদের নায়কনায়িকাদের নিয়ে মহা বিপদে পড়ে যেতেন, তখন একজনের সর্পাঘাতে মৃত্যু ঘটত। তারপর পাঁচ পৃষ্ঠা হাহাকার করে তাঁরা পাঠকদের বিশ্বাস উৎপাদনের চেষ্টা পেতেন। হত-ভাগ্য পাঠকদের কিন্তু এত কষ্টেও চোখ দিয়ে একফোঁটা জল নামত না। বন্ধুর মন্তব্য যাই হোক, এক হিসেবে শিশিরের কথাই ঠিক—সুষমার মৃত্যুই ঘটেছে। সুখের আশায় সুষমা যে সিঁড়িটায় পা দিয়েছিল, তার ভিত্তিতে জোর ছিল না—সেই স্খলন তাকে আরও নীচে নিয়ে গেছে। এ মৃত্যু ছাড়া আর কি!

এতদিন চলে গেছে, হয়ত ভবিষ্যতেও শিশিরের সঙ্গে, আজ যেমন তেমনি দেখা হবে। আর তখনই আমার মনে পড়ে যাবে ছোট গলির সেই ঘর, মৃদু লণ্ঠনের আলো, আমি শিশির সুষমা। নিজের সম্পর্কে উচ্চ ধারণার বাহুল্য ঠিক না, তবু মনে হয়, সুষমার যদি বাঁচার মুহূর্তে কোথাও অবশিষ্ট থাকে, তবে তা আমার সেই মনে পড়ায়। প্রথম যৌবনের সেই মায়াবী দিনে সাহসের অভাব হয়ত ছিল—কিন্তু ভালোবাসার ত' অভাব হয়নি।

জিজ্ঞাসা করলাম—কেমন আছেন?

ছন্দা বললে—আপনার অষুধ খেয়ে বমি আর হয়নি। কিন্তু সকাল থেকেই মাথাটা খুব ঘুরছে।

বললাম গ্লুকোজ নিন। অনেক ভাল লাগবে।

ইন্‌জেকশন দিয়ে ওষুধ পথ্যের ব্যবস্থা করে উঠে এলাম। রোজ এগারটায় গাড়ি আসে। গ্লুকোজ ইন্‌জেকশন দিয়ে আসি। ৪।৫ দিনেই ছন্দা সেরে উঠল। একদিন বললে—এইবারে আপিসে যাব?

বললাম—আরও দিন তিনেক রেস্ট নিন। ইন্‌জেকশন দিই। তারপর যাবেন।

পরদিন গিয়ে দেখি ওদের শোবার ঘর বন্ধ। দরজায় টোকা দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। কয়েক মিনিট পরে নিরঞ্জন দরজা খুলে বলল—ওঃ আপনি? আসুন আজ সকাল থেকেই ওঁর শরীরটা ভাল নেই।

দেখলাম ঘরের চেহারা বদলে গেছে। খাট বার করে মেঝেতে গদি পেতে বিছানা হয়েছে। তাকিয়া বালিশ সব এদিক ওদিক ছড়ানো। ছন্দা এলোমেলো পোশাকে শুয়ে আছে। বললাম—কি ব্যাপার? আবার শরীর খারাপ হল কেন?

মুচকি হেসে ছন্দা বললে—কি জানি? দেখুন কি হল। বলে হাতখানা বাড়িয়ে দিল।

নাড়ী দেখলাম খুব দ্রুত। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। হাতের আঙুল ঠান্ডা নয়। গা গরম। চোখের মণি দুটি বড় হয়ে বেশ জ্বল জ্বল করছে। বললাম—ইন্‌জেকশন দিচ্ছি। ঠিক হয়ে যাবে। এখন খেতে পাচ্ছেন একটু একটু?

ছন্দা বললে—হ্যাঁ, আজ চা টোস্ট ডিম খেয়েছি।

বললাম—আর দিন দুই পরেই আপিস করতে পারবেন।

ছন্দা বললে—একটা সার্টিফিকেট দিন তো লিখে। নিরুর হাতে পাঠিয়ে দিই।

নিরঞ্জন কাগজ এগিয়ে দিয়ে বললে—আমাদের একই আপিস। সিভিল ডিফেন্স। বড় সাহেবকে বলা আছে, লিভার খারাপ হয়ে অসুখ হয়েছে। ঐ রকম যদি কিছু একটা লিখে দেন তাহলে ভাল হয়।

গ্যাস্ট্রাইটিস্ বলে সার্টিফিকেট লিখে দিলাম। তারপর আরও দিন দুই ইন্‌জেকশন দিয়ে ছন্দাকে বললাম—এখন ক্ষিদে হবে খুব। একটু ভাল করে খাওয়া-দাওয়া করবেন।

মাসখানেক পরে একদিন দুপুর বেলা বাড়ি ফিরে যেই খেয়ে উঠেছি, অমনি প্রভঞ্জনের ড্রাইভার এল। বললে—বাড়িতে ভীষণ কান্ড হয়ে গেছে। এক্ষুনি যেতে হবে।

জিজ্ঞাসা করলাম—কি হয়েছে?

ড্রাইভার বললে—সাব মেমসাব দুজনেই বিষ খেয়েছে।

শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। বললাম—কি খেয়েছে?

ড্রাইভার বললে—আফিং। সাহেব বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছেন। মে[...] বোধহয় এতক্ষণে বেহুঁশ হয়ে [...] আপনি শীগ্‌গির চলুন।

বিষ খাওয়ার কেস। ডাক্তারের [...] ঝামেলা। আত্মহত্যা হতে পারে [...] খুন হওয়াও অসম্ভব নয়। তাই এ[...] ঝঞ্ঝাট ঘাড়ে না নেওয়াই বুদ্ধিমা[নের] কাজ। হাসপাতালে পাঠিয়ে দে[ওয়াই] ভাল।

বললাম—এখানে না এসে অ্যা[ম্বু]ল্যান্স ডেকে হাসপাতালে নিয়ে গে[লে না] কেন?

ড্রাইভার বললে—মেমসাব বল[লে] জলদি আপনাকে নিয়ে যেতে। আপ[নি] চলুন। গিয়ে যা ভাল হয় করুন।

জিজ্ঞাসা করলাম—সাহেবের বা[বা] মাকে খবর দিয়েছ?

ড্রাইভার বললে—না। আপনার কাছেই মেমসাব আগে পাঠালেন।

বুঝলাম আত্মহত্যার চেয়ে আত্মরক্ষা[র] প্রবৃত্তিই প্রবল হয়েছে। তাই ডাক্তারের খোঁজ পড়েছে সকলের আগে। কিন্তু বাড়িতে আফিং খাওয়ার চিকিৎসাও কি সহজ? স্টমাক্ পাম্প দিতে হবে। রুগীকে জাগিয়ে রাখবার চেষ্টা করতে হবে। কৃত্রিম উপায়ে বুকে পিঠে চাপ দিয়ে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস চালাতে হবে। দু দুজন রুগী। আমি একা সামলা[ব] কি করে? হাসপাতালে এই রকম জোড়া কেস এলে আমরা চারজন ডিউটির ছা[ত্র] হিমসিম খেয়ে যেতাম। এখন একা কি করব?

কাছেই আমার এক বন্ধুর বাসা। ভাবলাম এঁকেও সংগে নিয়ে যাই। তাড়াতাড়ি পোশাক পরে ব্যাগ নিয়ে গাড়ি করে বন্ধুর বাড়ি গেলাম। বন্ধু বললেন—এসব কেস হাতে নেওয়ার অনেক রিস্ক। শেষটায় বিপদে পড়বেন না তো?

বললাম—এরা আমার চেনা লোক। কোন বিপদ হবে বলে মনে হয় না। আর সে রকম বুঝলে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেব। এর বাবা-মাকে খবর দেব।

বন্ধু বললেন—তাহলে চলুন। আপনি ততক্ষণে গাড়ি করে একটা স্টমাক্ পাম্প কিনে আনুন। আমি তৈরি হয়ে নিই।

গাড়ি করে বেরিয়ে আশেপাশে ব[...]
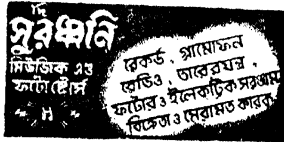
...কানে কোথাও স্টমাক্ পাম্প পাওয়া ... না। যুদ্ধের বাজার। আমদানী বন্ধ। ...রে এলাম।

বন্ধু ততক্ষণ তৈরী হয়ে নীচে ...বেছেন। বললেন—এক বাড়িতে কিছু-... আগে টাইফয়েডের সময় নাক দিয়ে ...বার দেওয়ার জন্য একটা স্টমাক টিউব ...নিয়েছিলাম। ওরা যত্ন করে তুলে ...খেছে। চলুন দেখি সেটা পাই কি না। ... কাছেই বাড়ি। যাবার পথে সেখানে ...য়ে ওটা পাওয়া গেল। এইবার ওষুধের ...দাকান। দোকান থেকে গ্লুকোজ ...ট্রোপিন, স্ট্রিকনিন, কোরামিন, স্পেরাবিমিন, ...টাসিয়াম পারম্যানগানেট সব নিয়ে ...মরা প্রভঞ্জনের বাড়ির দিকে ছুটলাম। ...খন বেলা আড়াইটে।

শোবার ঘরে ঢুকে দেখি জানালা ... বন্ধ। তার ওপর পর্দা টানা। ঘর ...শ অন্ধকার। ভাল করে তাকাতে দেখা ...ল মেঝেতে সেদিনকার মত গদির ...পর বিছানা। পাশাপাশি দুজন শুয়ে ...ছে। ছন্দা আর প্রভঞ্জন। ছন্দার হাতের ...ছে শাদা একটা চীনে মাটির প্লেট। ...র ওপর কয়েকটা সন্দেশ। কিছু ...সমিস বাদাম পেস্তা। আর কিছু লবঙ্গ ...লাচ। পাশে কাঁচের গেলাসে জল।

কাছে গিয়ে দেখলাম ছন্দা জেগে ...ছে, কিন্তু প্রভঞ্জনের মুখ দিয়ে ফেনা ...ঠেছে। মিনিটে পাঁচ-ছ'বারের বেশী ...ঃশ্বাস নিচ্ছে না। হাত-পা ঠান্ডা নখের ...ও নীল। মুখ তামাটে। চোখের তারা ...ালপিনের মত বিন্দুপ্রায়।

দেখেই এট্রোপিন, স্ট্রিকনিন, কোরামিন, ...লাবেসিন সব ইন্‌জেকশন একটা একটা ...রে দিয়ে সময়টা নোট করে রাখলাম। ...ন্দাকেও গোটা দুই ইন্‌জেকশন দেওয়া ...ল। এইবার স্টমাক টিউব দিতে হয়। ...মেঝেতে রুগী থাকলে টিউব ঢুকিয়ে ...কান লাভ নেই। স্টমাক ধুয়ে জল বার ...রা যাবে না। ড্রাইভারকে বললাম—...ায়েবকে খাটে তুলতে হবে।

ছন্দা বললে—এঘরে তো আর খাট ...ঢুকবে না। পাশের ঘরে খাট পাতা আছে। ...সেখানে বিছানা করে দিক। ঠাকুর-চাকর ...আর ড্রাইভার মিলে উঠিয়ে নিয়ে যাক।

তাই করা হল। প্রভঞ্জনকে পাশের ...ঘরে খাটে এনে শোয়ান হল। একটা বালতিতে পারম্যানগানেট অফ পটাশ জলে গোলা হল। টিউব ঢুকিয়ে মগে করে সেই জল টিউবের মাথায় ফানেলে ঢালা হল। এক মগ জল ঢুকিয়ে ফানেল যখন আবার কাত করে গামলায় নাবানো হল দেখা গেল লাল জল কালো হয়ে গেছে। আফিং-এর গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। যতক্ষণ না লাল জল বেরোয় ততক্ষণ এমনি করে ধোয়া হল। আধ ঘণ্টা পর দেখা গেল জলের রং আর বদলাচ্ছে না লালই রয়েছে। তখন খানিকটা জল পেটে রেখে টিউব বার করে নেওয়া হল।

এঘরে প্রভঞ্জন ওঘরে ছন্দা। প্রভঞ্জনের জ্ঞান নেই। বেহুঁশ। ইন্‌জেকশন দিলেও বোঝে না। ছন্দার জ্ঞান আছে। কথা বলছে। জিজ্ঞাসা করলাম কখন আফিং খেলেন?

ছন্দা বললে—দুপুর বেলা। বারটার সময়।

কতটুকু?

ছন্দা হাতের আঙুল দিয়ে আন্দাজে যা দেখাল তার পরিমাণ ৩।৪ ভরির কম নয়।

বললাম—দুজনেই এক মাপ? সমান সমান?

ছন্দা মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বললে—হ্যাঁ।

বললাম তা হলে আপনি এখনও জেগে আছেন কি করে?

ছন্দা বললে—ওটা খেতে ভীষণ তেতো। রাখতে পারলাম না। উঠে গেল। বললাম—কোথায় ফেললেন?

পাশেই বাথরুম। আঙুল দিয়ে দেখিয়ে ছন্দা বললে—বেসিনে। বললাম—এখন গেলে দেখা যাবে?

ছন্দা বললে না। বমি করে মুখ ধুয়ে চোখে মুখে জল দিয়ে এসে মাথাটা কি রকম করে উঠল। ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম। চীৎকার শুনে ড্রাইভার এসে দরজা ধাক্কাতে লাগল। কোন রকমে উঠে ছিটকিনি খুলে দিলাম। তারপর আর জানি না।

প্রভঞ্জনের ঘরে যেতেই বন্ধু বললেন—কি বললে আপনার রুগী?

যা শুনেছি সব বললাম। বন্ধু বললেন—ওঁর জন্যে ভাবনা নেই। এঁকে নিয়েই মুশকিল। এখনও দেখুন নিঃশ্বাস মিনিটে সাতটা আটটার বেশী নিচ্ছে না। আরও কমে গেলে আরটি-ফিশিয়াল রেস্‌পিরেশন দিতেই হবে। দেখুন তো কটায় এট্রোপিন দেওয়া হয়েছে?

দেখে বললাম তিনটেয়। তিন ঘণ্টা হল।

বন্ধু বললেন—আর একটা দিন এখন। আর একবার স্টমাক ওয়াশ করবার সময় হল।

আবার ইন্‌জেকশন দিয়ে বসলাম—এইবারে ওর মা-বাবাকে একটা খবর

দিলে হত না? ওরা তো কিছুই জানেন না এখনও!

বন্ধু বললেন—শীগ্‌গির গাড়ি পাঠিয়ে খবর দিন। অনেক আগেই দেওয়া উচিত ছিল। খুব অন্যায় হয়ে গেছে।

ড্রাইভারকে পাঠিয়ে আবার প্রভঞ্জনের স্টম্যাক ওয়াশ করা হল। এইবার আর কালো জল বেরুল না। একটু পরেই লাল জল বার হল।

স্টমাক্ ওয়াশ করবার পর বন্ধু নাড়ী দেখে বললেন—আর একটা কোরামিন দিন পাঁচ সি সি।

এতবার ইনজেক্‌শন দিয়েছি প্রভঞ্জন টের পায়নি। এইবার দিতেই আঃ বলে পা গুটিয়ে নিল। হঠাৎ হাত তুলে মুখ থেকে টিউবটা টান মেরে ফেলে দিল। দেখলাম নিঃশ্বাসের রেট বেড়ে গেল। বিষের ক্রিয়া কমে যাচ্ছে মনে হল।

প্রভঞ্জনকে ডাকতে একবার সাড়া পাওয়া গেল। খুব আশা হল এবার ও বেঁচে উঠবে।

পাশের ঘরে ছন্দাকে গিয়ে এই খবরটা দিয়ে বললাম—আর বোধহয় ভয় নেই। মনে হচ্ছে এবারে আপনার কর্তা বেঁচে উঠলেন।

ছন্দার কাছ থেকে কোন সাড়া পাওয়া গেল না। কাছে গিয়ে মনে হল ঘুমিয়ে পড়েছে। ধীরে ধীরে লম্বা লম্বা শ্বাস নিচ্ছে। তাড়াতাড়ি একটা এট্রোপিন ইনজেকশন করে দিলাম। ছন্দা জেগে উঠল।

এমনি সময় প্রভঞ্জনের মা মালাকে নিয়ে এলেন। সঙ্গে একজন নামকরা প্রবীণ ডাক্তার। বড় একজন বিশেষজ্ঞ। আমার বন্ধুটিকে দেখেই বললেন—আরে আপনি এখানে? আগে জানলে কি আর এতদূর আসি? মিছিমিছি?

প্রভঞ্জনকে পরীক্ষা করে এবং আমরা কি করেছি সব শুনে বললেন—সবই তো করা হয়েছে। বাকি দেখছি শুধু আয়রন লাঙ।

ছন্দাকে দেখে বললেন—এ'র দিকেও একটু নজর রাখবেন। এইবারে দুজনকেই বেশ খানিকটা করে গরম কফি খাওয়ান।

প্রভঞ্জনের মাকে বললেন—কিছু ভাববেন না। দুজনেই সেরে উঠবেন। যা করা হয়েছে, তার চেয়ে ভাল আর কি হতে পারে, তা আমার জানা নেই।

আমার বন্ধুটিকে দেখিয়ে বললেন—এমন একটি মস্ত লোক থাকতে আপনাদের ভয় কিসের? আজ রাতটা এ'রা থাকবেন। ... করবেন। প্রয়োজন ... জানাবেন। বলে ... দিয়ে ভদ্রলোক চলে গেলেন।

বিশেষজ্ঞ চলে ... গোপনে জিজ্ঞাসা ... এত যে আমড়াগাছি?

মৃদু হেসে বন্ধু ... এ'কে বাগে পেয়ে ... আজ তার শোধ ... লোক!

মালা বললে ... তাহলে আজ রাত্রি ... যা হোক দুটি এখানে ...

বন্ধুটির থাকবার ... কিন্তু বিশেষজ্ঞের ... গেলেন। বললাম ... থেকে ঘুরে আসি। ... এ'র বাড়িতেও একটা খবর ... প্রভঞ্জনের বাবাকেও বলে আসি ... কাছে শুনে তিনিও নিশ্চয় খু... পাবেন।

বাড়ি এসে স্নান সেরে ... বাড়িতে খবরটা দিয়ে প্রভঞ্জনের ... বাসায় গেলাম। ওর বাবা জানালার ... একটা মোড়ায় বসে ছিলেন। ... গম্ভীর মুখ। এ ক'মাসেই যেন ... বেশী বুড়ো হয়ে গেছেন। প্রভ... এবার বেঁচে উঠল শুনে মুখের ভা... কোন পরিবর্তন হল না। বললে... আপনি আমার ছেলের প্রাণ বাঁচিয়েছে... আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। এ ... কোন দিন শোধ হবে না। কিন্তু আ... দেখছি ওর মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে। ... আপনি বাঁচালেন। কিন্তু কাল? মৃ... ওকে ধরেছে। সেই বজ্রমুষ্টি থেকে ... ওকে ছিনিয়ে আনবে? না, ডাক্তারবা... কেউ ওকে বাঁচাতে পারবে না।

শুনে ভারি দমে গেলাম। কিছুক্ষ... চুপ করে থেকে উঠে এলাম। ফিরে এ... দেখি প্রভঞ্জন অনেক ভাল। ডাক... সাড়া দিচ্ছে, কিন্তু জাগছে না। ছন্... গরম গরম কফি পর পর দু'কাপ ... খেয়ে নিল। প্রভঞ্জন কিছুতেই খা... না। জোর করে খাওয়াতে গিয়ে অ... এক বিপত্তি হল। হাত থেকে গেল

টেনে নিয়ে দড়াম করে ছুড়ে মেরে আবার ভোঁস ভোঁস করে ঘুমুতে লাগল।

ঠিক হল প্রথম রাতটায় বন্ধু জাগবেন। শেষটায় আমি। এগারোটার মধ্যে খেয়ে নিয়ে আমি শুয়ে পড়লাম। রাত দুটোয় বন্ধু আমায় তুলে দিলেন। দেখলাম প্রভঞ্জনের নাড়ী বেশ স্বাভাবিক হয়েছে। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসও ভাল। মাথা কিন্তু একবারও উঠল না। ঠিক জেগে বসে রইল।

ভোরবেলা প্রভঞ্জন উঠে বসল। বলল—মিছিমিছি আপনাদের ভোগা'ম। আসুন কফি খাওয়া যাক।

বললাম—কাল রাতে তো কিছুতেই আপনাকে কফি খাওয়ানো গেল না। গ্লাশ ছুড়ে ভেঙে ফেললেন।

শুনে প্রভঞ্জন খুব হাসল। বলল—দেখলেন, কিছু মনে নেই।

কফি খাওয়া হলে আবার গ্লুকোজ ইনজেক্শন দিয়ে আমরা চলে এলাম। সেই দিনটা প্রভঞ্জন খুব ঘুমুল। তারপর আর কোন উপসর্গ দেখা গেল না। ইনজেক্শন দিতে আমি আরও ২।৩ দিন গেলাম; কিন্তু কেন ও বিষ খেয়েছিল, তা বলল না। শুধু বলত—জীবনে অনেক কিছু করেছি। ভিখিরী ছিলাম, রাজা হয়েছি। লেখাপড়াও কম করিনি। প্রফেসরী করেছি, এমন কি রিসার্চ পর্যন্ত করেছি! আর বেঁচে কি হবে?

তারপর মাসখানেক ওর আর খবর পাইনি। একদিন দুপুরে আবার ওর কাছ থেকে ডাক এল। গিয়ে দেখি ছন্দা প্রভঞ্জন দুজনেই খুব গম্ভীর। ছন্দার কপালের বাঁদিকটা নীল হয়ে ফুলে উঠেছে। হাতেও দু-এক জায়গায় কালশিরে পড়েছে।

জিজ্ঞাসা করলাম—কি ব্যাপার? চেহারা এমন হল কি করে?

ছন্দা বললে—পরশু বাথরুমে পড়ে গিয়ে চোট লেগেছে।

প্রভঞ্জন বললে—শুধু মাথায় নয়, পেটেও লেগেছে। শুনেছি এ সময় এরকম আঘাত লাগলে শিশুর ক্ষতি হয়। বিকলাংগ হয়। তাই ভাবছি এটা অপারেশন করে বার করা যাক।

বললাম—অপারেশন করবে কে? আপনি?

এইবার প্রভঞ্জন হেসে ফেলল। বলল—না। সেইজনাই তো আপনাকে ডাকা।

বললাম—একজন এক্স্পার্টকে আগে দেখান। শুনুন তিনি কি বলেন, তারপর কি করা উচিত ঠিক করা যাবে এখন।

সেইদিনই বিকেলে একজন বিশেষজ্ঞকে দেখানো হল। তিনি বললেন—বাচ্চা বেশ ভাল আছে। কোন আঘাত লেগেছে বলে মনে হয় না। কাজেই বিকলাঙ্গ হবে ভাববার কোনই কারণ নেই।

শুনে ছন্দা খুশী হল, কিন্তু প্রভঞ্জন হল না। বললে—বিকলাঙ্গ যে হবে না, সে গ্যারাণ্টি কেউ দিতে পারে? হলে তো সারাজীবন আমাকেই ভুগতে হবে।

বললাম—আজগুবি ভেবে মন খারাপ করবেন না। দেখবেন সুস্থ সবল বাচ্চা হবে।

আমাকে আমার ফার্স্ট এইড পোস্টে নামিয়ে ওরা চলে গেল।

তারপর মাস তিনেক আর কোন খবর জানি না। আমার স্ত্রী তখন মৃত্যুশয্যায়। অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছে। যে কোন মুহূর্তে মৃত্যু হতে পারে। তাই কয়েকদিন আমি বাড়ির বাইরে যাই না। রুগী দেখি না। একদিন ভোরবেলা আবার প্রভঞ্জনের ড্রাইভার এল। বলল—বহুৎ জরুরী দরকার। শীগ্গির চলুন।

বললাম—কি হয়েছে?

ড্রাইভার বলল—সায়েব আবার বিষ খেয়েছে।

বললাম—সে কি? কখন?

ড্রাইভার বলল—বোধহয় রাত্রে। আজ ভোরে মেমসাব ডেকে বললেন এক্ষুনি আপনাকে নিয়ে যেতে। শুনেই ছুটে এসেছি।

বললাম—কিন্তু আমি তো যেতে পারব না। আমার স্ত্রীর খুব অসুখ। অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছে। ওঁকে ফেলে তো এখন যেতে পারি না।

ড্রাইভার বলল—সাঁ...

বললাম—না। ... কাউকে এনে দেখাতে।

ক্ষুন্ন হয়ে ... প্রভঞ্জনের বাবার কথা মনে পড়... ছিলেন মৃত্যু ওকে ... বাঁচাতে পারবে না।

আধ ঘণ্টাও তখন ... এল। উস্কোখুস্কো ... বোধহয় আর বেঁচে নেই। ... নাইড খেয়েছেন। ... আপনি তো কৈ ... একবার দয়া করে।

নিরঞ্জনকে আমার ... এলাম। বিছানায় আমার ... শুয়ে। শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। ... নল লাগানো। বললাম ... শয্যায়। যে কোন মুহূর্তে ... পারে। তাই এঁকে ফেলে ... আমি বাইরে কোথাও যাই নি...

নিরঞ্জন মাথা হেঁট করে ... বেরিয়ে বলল—কিছু মনে ... ডাক্তারবাবু। বুঝতেই পারিনি ... বাড়িতে এই বিপদ। আচ্ছা, দেখি ... কাউকে পাই কি না।

সিঁড়ি পর্যন্ত গিয়ে আবার ... এসে পকেট থেকে একটা খাম বার ... আমার হাতে দিয়ে বলল—দাদা ... কিছু লিখে যান নি। বালিশের ... শুধু এই খামটা পাওয়া গেছে। দেখু... দেখি এটা কি?

খুলে দেখলাম প্রভঞ্জনের মলমূত্র... ইত্যাদি পরীক্ষার সব রিপোর্ট। একখা... দেখলাম যৌনগ্রন্থির কৃত্রিম ক্ষরণে... পরীক্ষা। মাস কয়েক আগে পরীক্ষা... হয়েছে। ডাক্তারী ভাষায় লেখা আছে এ... প্রজননের ক্ষমতা নেই।

রিপোর্টগুলি খামে পুরে নিরঞ্জনে... হাতে দিয়ে বললাম—এসব দিয়ে আ... কি হবে? ছিঁড়ে ফেলে দিন।

নিরঞ্জন হাত পেতে খামটা নিল, আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল... কি যেন বলবে মনে হয়। তারপর মা... নীচু করে মুখ ফিরিয়ে হন্‌হন্‌ ক... সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল।

এক সংবাদে প্রকাশ যে, গোয়ায় পর্তুগীজ উপনিবেশের অবসান-কল্পে 'সনাতনধর্ম যুবকমণ্ডল' নাকি দিল্লীর যমুনাতীরে একটি যজ্ঞের ব্যবস্থা করিয়াছেন।—"কিন্তু সনাতনধর্ম যুবক মণ্ডল একথাটা হয়ত ভুলে গেছেন যে

একটি পরামর্শ!

চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী। তা ছাড়া যজ্ঞের ঘৃতের প্রশ্নও আছে; ধর্মের ছাপ মেরে ঘৃতকে বহুদিন আগেই আমরা সর্প চর্বি সংযুক্ত করে রেখেছি"—মুখখানা বিকৃত করিয়া মন্তব্য করিল শ্যামলাল।

* * *

কাশ্মীরের গণপরিষদ তথাকার জনগণের প্রতিনিধি নহে এবং কাশ্মীরের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কান সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার এই রিষদের নাই—এই মর্মে প্রচারকার্য লাইতেছেন মির্জা আফ্‌জল বেগ। দুড়ো বলিলেন—"গাঁয়ে-না-মানা মোড়ল-দর কথার ওপর কোন রকম গুরুত্ব আমরা কোনদিনই আরোপ করিনে, তবু বেগ াহেবের প্রসঙ্গে বক্সী গোলাম মহম্মদকে মরণ করিয়ে দিতে চাই যে—ধীমান ্যক্তিরা কোন রকম "বেগ" ধারণ করেন া!!"

* * *

যেহেতু জনাব মহম্মদ আলি দ্বিতীয় বেগম গ্রহণ করিয়াছেন সই হেতু তাঁর রাষ্ট্রদূত হিসাবে নির্বাচন যুক্তিযুক্ত হয় নাই—এই কথা বলিতেছেন াকিস্থানের বেগমরা। শ্যামলাল বলিল—তাঁরা হয়ত শরীয়তী মতের কথা মনে ক'রেই গণ্ডা পুরে যাওয়ার ইচ্ছে করছেন।"

* * *

গোয়ার একজন সত্যাগ্রহীকে নাকি জনৈক পর্তুগীজ সৈনিক প্রশ্ন করিয়াছেন—প্রেম বলিতে তোমরা কী বোঝ? পল্লীর প্রতি তোমাদের যে প্রেম, সেই প্রেম দিয়া কি তোমরা আমাদের হাত হইতে "দমন" ছিনাইয়া নিতে পারিবে? —"সত্যাগ্রহী কী জবাব দিয়েছেন জানিনে, রসিক হ'লে তিনি নিশ্চয়ই বলেছেন—না, এ প্রেম পল্লীর প্রতি নয়, "শালাজার" প্রতি"—মন্তব্য করিলেন জনৈক সহযাত্রী।

* * *

পশ্চিমবঙ্গ সরকার সমীপে একটি 'ডেপুটেশন' নাকি জানাইয়াছেন যে, এই রাজ্যের অনেক মন্দিরের দেব-দেবীরা বড়ই দুরবস্থায় পতিত হইয়াছেন। —"আমরা অবশ্য দেবদেবীদের জমিদারী হস্তান্তরের সংবাদ এ পর্যন্ত পাইনি"—বলেন অন্য এক সহযাত্রী।

* * *

শ্রীযুক্ত জওহরলাল সম্প্রতি মন্তব্য করিয়াছেন যে এখন দিল্লীতে বসিয়া তিনি 'বাবুর' অর্থাৎ কেরানির কাজ করিতেছেন অর্থাৎ ফাইল ঘাঁটিতেছেন। —"কিন্তু জওহরলালজী বোধ হয় জানেন না যে ফাইল ঘাঁটাই কেরানির একমাত্র কাজ নয়,—আমাদের দাবী মানতে হ'বে মিছিলেও তাকে নাবতে হয়। সত্যিকারের কেরানি না হলে সে পরিস্থিতির কথা ভাবা যায় না'—বলিলেন বিশু খুড়ো।

* * *

কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণাপ্পা আদর্শ মন্ত্রীর কয়েকটি গুণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, বলিয়াছেন উটের মেহনত, মহিষের পুরু চামড়া, গাধার খাটুনি আর কুকুরের ঘুম—এই কয়টি গুণ অর্জন করিলেই তবে আদর্শ মন্ত্রী হওয়া যায়। শ্যামলাল বলিল—

আদর্শ মন্ত্রী!

"মধুর অভাবে যেমন গুড়ের বিকল্প ব্যবস্থা আছে তেম্নি সব-কিছুতেই বিকল্পের অভাব নেই। সময়ের অভাবে কৃষ্ণাপ্পা বর্ণিত সব কটি পশুর গুণ অর্জন করা না গেলে শুধু গণ্ডারের চামড়া সংগ্রহ করতে পারলেও কাজ চলে যায় ব'লে অনেকে বলেন। সত্যি-মিথ্যে জানিনে, মন্ত্রীদের কি-ই বা কতটা আমরা জানি!!"

* * *

লোকসভার একটি বেশ কৌতুকাবহ সংবাদ শুনিলাম; বলা হইয়াছে সেখানে একটি বিড়াল নাকি বাচ্চা প্রসব করিয়াছে। —"বৃহৎ কর্মের ব্যাপারে আমরা পর্বতের মূষিক প্রসবের কথাই শুনে এসেছি, বেড়াল প্রসবের সংবাদ শুনলুম এই প্রথম"—মন্তব্য করিলেন বিশুখুড়ো।

॥ ১৪ ॥

এখানে সকাল অন্যরকম। হিমকুয়াশা ভেজা ভেজা। ফরসাটুকু কাটল তো সেই সূর্য ওঠার মুখেই এই ইট-কাঠের পাখির বাসায় বিচিত্র কিচিরমিচির। টুকটাক আলো নিভেছে অনেকক্ষণ। পাশ ফেরাফিরি, আড়মোড় ভাঙ্গা, হাই ওঠাউঠি। পায়ের খসখস তারপর। পাঁচ গলার পাঁচ রকম স্বর। করিডোর দিয়ে বাসি শাড়ি ঝুলিয়ে-ঝুলিয়ে, ফোলা চোখ, রুক্ষ চুল মেয়েদের আসা-যাওয়া। টুথব্রাশ আর গামছা, নয়তো মাজন-সাদা দাঁতে আলতো আঙ্গুলে দিয়ে ঘোরাঘুরি। অ্যালমুনিয়ামের গামলা মেঝেতে, বিছানায় বসে বসেই মুখ ধুচ্ছে কেউ কেউ। জল ছড়ছড় শব্দ। জমাদার দড়ি-বাঁধা জল-ফিনাইল ভেজান পাটের ন্যাতা বুলিয়ে যাচ্ছে মেঝেতে। সকালের দুধ-রুটি বিলি হয়ে গেল।

আজ কোন্ ভোর থাকতেই উঠেছে বাসনা। ঘুম ভেঙেছে যখন, তখন ফরসাও ফোটেনি ভাল করে। ঠিক মনে পড়ছে না, তবে খুব সুন্দর কী যেন ছোট্ট এক টুকরো স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। আর ঘুমোতে পারে নি। শরীরটাও বেশ ভাল লাগছিল। কিছু-দিনের মধ্যে এমন ঝরঝরে লাগে নি নিজেকে।

করিডোরের বেসিনে গিয়ে মুখ ধুয়ে এল নিজেই আজ। কী খেয়াল হতে বাসি কাপড়টাও বদলে ফেলল। তারপর কেবিনের বাইরে এসে রেলিংয়ে পিঠ ঠেকিয়ে লেবার ওয়ার্ডটা দেখছিল। লাইন বাঁধা বিছানা, লাল-কালো কম্বল, ফিনাইলের গন্ধ, মেয়েদের ওঠাবসা, নার্স নেই কি নেই। ঝি চা বয়ে আনছে কাঁচের গ্লাসে সিঁড়ি ভেঙে।

বাসনার মনে হচ্ছিল ওরা সবাই যেন এক ওয়েটিং-রুমে রাত কাটিয়ে জেগে উঠেছে। সবই কেমন এলো-মেলো, ছন্নছাড়া। যাই-যাই ভাব সকলের।

ফর্সা, একটু রোগা মতন, পানপাতা ঢঙের মুখ, একটি মেয়ে আসছিল করি-ডোর দিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে, আঁচলে মুখ মুছতে মুছতে। টিয়াপাখি-রঙ শাড়ি গায়ে। যেতে যেতে চোখ তুলতেই দেখল বাসনাকে। থমকে দাঁড়াল একটু। তারপর আস্তে পায়ে কাছে এসে দাঁড়াল।
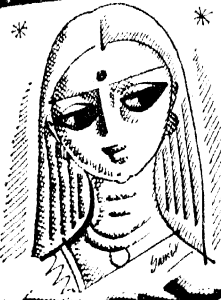
'ও মা, আপনি! এখনো আছেন হাসপাতালে?' ডাগর চোখ আরও ডাগর দেখাচ্ছিল তার। আর কেমন যেন বোকা বোকা। অবাক হয়ে চোখে খুঁটিয়ে দেখছিল বাসনাকে।

বাসনা মাথা নাড়ল, কথা বললে না—শুধু এক ফোঁটা বোকা-হাসি ঠোঁটে এনে তাকাল। তাকিয়ে থাকল। মেয়েটি কে? কোথায় দেখেছে বাসনা তাকে মনে করতে পারছিল না। এই বা কি করে চিনলো বাসনাকে?

বাসনার চিনি-না চিনি-না চোখ মুখের ভাবটা ধরতে পারল মেয়েটি। ঠোঁট টিপে হেসে বললে, 'উল্টো-উল্টি ছিলাম আমরা—' আঙ্গুলে দিয়ে ওয়ার্ডের দূর-কোণের কোনো একটা বিছানা দেখাল। 'আপনাকে আমি দেখেছি।' আবার ফিক করে হাসল, 'আমার মাথা পুবে, আপনার মাথা পশ্চিমে। তাকালেই চোখে পড়ত।'

বাসনা এতোক্ষণে মোটামুটি ব্যাপারটা বুঝে একটু সহজ হয়ে হাসল।

'যাক্ তাহলে আপনি আছেন।' মেয়েটি কেমন এক স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলল, 'প্রথমদিন যা টানাহ্যাঁচড়া, এই নার্স, এই ডাক্তার, এলাহি কান্ড-কারখানা—দেখে-শুনে আমার তো ভয় লেগে গিয়েছিল। তারপর হুস্ করে নিয়ে চলে গেল। সেদিন ... নেই। সত্যি দিদি, রোজই ... ভাবতুম।' একটু থেমে বললে আবার, 'কোথায় আছেন আপ...

পাশেই কেবিন। ... কেবিনটা দেখিয়ে দিয়ে ... হেসে বললে, 'ভেবেছিলেন ... গেছি, না—?'

অপ্রস্তুত হাসি হেসে ... মেয়েটি। 'এখানে যা ... কারখানা, ভাল-মন্দ ভাবা ... নয়।'

'তা ঠিক।' বাসনা ... ফেলল।

কথার মোড় ফেরাল মেয়েটি ... 'আপনার ওটা আলাদা ঘর ...'

'হ্যাঁ, কেবিন।'

'বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, না ...'

'মন্দ না। আসুন না আমার ...'

'এখুনি? আচ্ছা আসছি— ... পরে আসবো।' কী ভেবে এদিক ওদিক চেয়ে বললে ও। বলে ... সামান্য। তারপর তরতর করে চলে গে... করিডোর বেয়ে।

মেয়েটিকে বড় ভাল লাগল বাসনা... চেনা-জানা দেখাশোনা নেই। এল ... গেল। ঝর ঝর করে কথা বলল ... রাশ। কিন্তু তাতেই এই মেয়েটি... মিষ্টি স্বভাব প্রকাশ হয়ে পড়ল। ... যেন মায়া ওর। দেখতেও বেশ। যদি... একটু রোগা। হয়ত বাচ্চা হতে এসে... এতো রোগা হয়ে পড়েছে। বয়স ... কমই। বছর বাইশের বেশি বলে মনে হয় না।

আরও একটু দাঁড়িয়ে থেকে বাসনা নিজের কেবিনে চলে গেল।

মেয়েটি এল প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে ... বাইরে প্রথম শীতের রোদ তখন কাঁচের মতন ঝকঝকে, আকাশ নীল। কোথা... কাক ডাকছে। ট্রামরাস্তা থেকে ভেসে আসছে মাঝে মাঝে ঘড় ঘড় শব্দ ... মোটরের হর্ন।

বিছানায় বসে বসে বীথির দি... যাওয়া মাসিক পত্রিকার পাতা ওল্টাচ্ছি... বাসনা। ওকে দেখে কাগজটা কোলে

নামিয়ে হাসল গালভর্তি করে। মেয়েটিও।

প্রথমে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক ভালো করে চেয়ে চেয়ে, তারপর পা পা করে জানলা পর্যন্ত এগিয়ে, ঘরের এপাশ ওপাশ হেঁটে হেঁটে খুব যেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। টুলটার কাছে এসে বললে, 'বেশ ভালো ঘর। মনেই হয় না হাসপাতাল!' বসল ও। বাসনার মুখে চোখ রেখে বিষণ্ণ একটু হাসি হাসল, 'টাকা থাকলে কত সুখ। না ?'

অপ্রস্তুত লাগছিল বাসনার। লজ্জা করছিল। মুখ ফিরিয়ে অন্য কথা পাড়ল।

'নামটি কি ভাই তোমার ?' আপনি বলতে আটকাচ্ছিল বাসনার, 'তোমাকে আর আপনি বলতে পারছি না।'

'কে বলেছে বলতে। আমার নাম পূর্ণিমা। আমরা কায়স্থ। বসু।' পূর্ণিমা বলছিল, 'বাগবাজারের এক হন্দ গলিতে থাকি, দিদি। কী নোংরা—কী নোংরা! চন্দ্র-সূর্যির মুখ দেখতে পাই না। বর্ষায় বাড়ির সদর দিয়ে জল ঢোকে। যত রাজ্যির নর্দমার জল। শীতকালে তেমনি ঠাণ্ডা।'

এরপর, জবাবে বাসনাকে বলতে হল তার বাড়ির ঠিকানা। নাম, পদবীও। পদবীটা বলার সময় হঠাৎ কি মনে করে ভীষণ একটা সাহসের কাজ করে বসল বাসনা। বললে, মিত্র—। আর এমন-ভাবে বললে যেন সমস্ত লুকোচুরি আজ সে টান মেরে ফেলে দিয়ে সাহসে ভর করে সত্য কথাটাই বলল। সত্য পরিচয় দিল।

বেশ একটা গর্ব হচ্ছিল বাসনার। হ্যাঁ, সে পেরেছে। এই তো পারল। ভয় করল না আর।

পূর্ণিমা ততক্ষণে গুছিয়ে বসেছে। পাড়া বেড়াতে এসে আসন বিছিয়ে গল্প করতে বসার মতন অলস ভঙ্গি। বাসনার দিকে চেয়ে চেয়ে হঠাৎ ফিক করে হেসে বললে, 'একটা কথা বলবো, দিদি ? কিচ্ছু মনে করবেন না তো!'

'বলো।' বাসনা ওর হাবভাবের চাপল্য দেখে বললে।

'আপনি এ-দলে কেন ?' বলে পূর্ণিমা তার চোখ দিয়ে নিজের অধঃ-অঙ্গ দেখিয়ে আবার হাসল।

পলকে ব্যাপারটা বুঝে নিলে বাসনা। সমস্ত মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। কানের ডগা গরম। নাক ঠোঁট

জ্বালা জ্বালা করছিল। ভীষণ অস্বস্তি। উত্তেজনায় আর রাগে মাথার শিরায় দপ্ দপ্ করে উঠল। বুকটাও ধক্ ধক্ করছে।

'আমার অসুখ!' মাথা হেঁট, চোখ নিচু; বাসনা কোনরকমে বললে। সময় নিয়ে।

'ও!' অবাক সুরের সহজ একটা টান দিয়ে ডাগর চোখে চেয়ে থাকল পূর্ণিমা। বললে একটু পরে, 'আমিও অমনি কিছু ভাবছিলুম।' একটা হাত এগিয়ে তালুর এ-পিঠ ও-পিঠ দেখাল, 'বুঝলেন দিদি, আমাদের মেয়েদের এমনিই সব—, এর এ-পিঠ ও-পিঠ দুইই সমান। কোথাও ছাড় নেই। এই ধরুন না আমার কথা। এই নিয়ে তিন হলো। ছ'মাস পর্যন্ত ধরি—তারপরই ফল নষ্ট। আর ভাল লাগে না। এতো কষ্ট। ডাক্তার-বদ্যি আগেরবারও করেছি। বাঁচাতে পারি নি। এবারও করছি। আমার ভরসা হয় না। এও নাকি এক অসুখ।'

পূর্ণিমার গলা ভিজে ভিজে লাগছিল না। বরং খুব রুক্ষ, একটু-বা ধার ধার শোনাচ্ছিল। বাসনা চোখ না তুলে পারল না।

বাইশ বছরের ফর্সা মেয়ে রোদপড়া কাঁচের মত ঝকঝকে চোখ নিয়ে তাকিয়েছিল। ঠোঁটের একটা পাশ সামান্য একটু বাঁকা।

বাসনা এখনো সেই অস্বস্তি কাটিয়ে উঠতে পারেনি। আড়ষ্ট হয়ে রয়েছে। কোল থেকে মাসিক পত্রিকাটা তুলে নিয়ে পাতা ওল্টাতে শুরু করলে।

পূর্ণিমা খানিক চুপ থেকে বললে আবার, 'আসলে এ-রোগ ছিল ওঁর, আমার নয়। খুব ভালবাসেন কিনা, ভাগ দিয়েছেন।' টুল সরিয়ে উঠে দাঁড়াল ও, শাড়ির আঁচলটা কাঁধে তুলে ঠোঁট কামড়ে তাকাল। অদ্ভুত এক চাপা চিকণ গলায় বললে, 'পুরুষ মানুষের মতন ঠগ জোচ্চোর আছে নাকি! আগে জানলে—' কথাটা আর শেষ করল না পূর্ণিমা। সারা মুখ বিকৃত করে চলে গেল।

ভালই হল। স্বস্তি পেল বাসনা। যতোটা ভাল ভাল লাগছিল প্রথমে, পূর্ণিমার ছাইভস্ম বোকার মতন সব প্রশ্ন শুনে সেই ভাল লাগার রেশটা ফিকে হয়ে গেছে। বাসনা ক্রমেই কেমন জড়সড়, আড়ষ্ট গম্ভীর হয়ে আসছিল। আরও খানিক থাকলে আর না জানি কি বলতো মেয়েটা, অবাক অবাক প্রশ্ন করে বসতো।

মাসিক পত্রিকাটা তুলে নিয়ে এবার শুয়ে পড়ল বাসনা। পাতা উল্টে উল্টে গল্পটা বের করলে। সবেই শুরু করেছিল তখন। একটা পাতাও পুরো পড়া হয় নি।

মন বসছিল না। কয়েক লাইন পড়ার পরই সরে আসছিল, দৃষ্টি এবং মন। কালো কালো ক্ষুদে অক্ষরের জড়াজড়ি অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছিল।

এবং এখন হঠাৎ কানে আসছিল—কাছেই, খুব সম্ভব মেটারনিটি ব্লকের সামনে বটগাছের ডালে বসে একটা ঘুঘু ডাকছে।

পত্রিকাটা একপাশে সরিয়ে রেখে শুয়েই থাকল বাসনা। চোখ ওপরে তুলে। ঘুঘুর ডাক শুনতে লাগল।

তারপর আস্তে আস্তে সব থিতিয়ে থিতিয়ে নিজের ভাবনাই ভেসে উঠল।

বাসনা ভাবছিল, পূর্ণিমার কাছে আমি খুব সাহস দেখিয়েছি ভাবছিলাম। ওকে বলেছি, আমি মিত্র, আমার নাম বাসনা মিত্র। অর্থাৎ কি-না [illegible] স্ত্রী আমি এ-কথা যদিও সরাসরি [illegible] তবু একরকম আমি তা স্বীকার [illegible] ছিলাম। আর নিজের [illegible] বিশ্বাস বাড়ছিল, ভাল লাগছিল [illegible] তারপর আমি, অন্য কথায় [illegible] অন্য-এক-কথায় এতো [illegible] পেরেছি। অতোটা লজ্জা পাওয়া [illegible] উচিত ছিল না। তখন, সে সময় [illegible] মধ্যে বাসনা মিত্র যদি এক [illegible] তবে পূর্ণিমার বোকামিতে শুধু [illegible] হাসাই উচিত ছিল। অথচ [illegible] আর বিশ্রী লেগেছে সে-[illegible] আমার নোংরামি, আমি [illegible] কাজ করেছি লুকিয়ে চুরিয়ে [illegible] নিয়ে কেউ ঠাট্টা [illegible] খারাপ ভাবছে—এই [illegible] হয়েছিল। কোনো সধবা মেয়ে [illegible] গ্রাহ্যও করবে না, শুনলে [illegible] হাসিই হাসবে সেই কথায় [illegible] নিষ্ঠাশীলা বিধবার মতন [illegible] সংকোচে, আড়ষ্টতায় রাগে [illegible] গিয়েছিলাম। অসহ্য রাগও [illegible] তখন। আশ্চর্য! আমি বিধবা নই [illegible] অন্তত পূর্ণিমার সামনে বসে [illegible] ভাবতে পারতুম আমি। ভাবলে [illegible] ছিল না। অন্তত মন থেকে [illegible] করা হতো না।

বাসনার খারাপ লাগছিল। [illegible] বুঝতে পারছিল ও, এখনও [illegible] মতন তার মন, তার কথা, ইচ্ছা [illegible] স্পষ্ট এবং সহজ হতে পারে নি। [illegible] নয়। এখনও কোথায় যেন একটু [illegible] চুপ, লুকোচুরি, আড়াল-আড়াল [illegible] রয়ে গেছে।

হতাশ হয়ে পড়ছিল বাসনা। [illegible] মুষড়ে আসছিল, অশ্রদ্ধা হচ্ছিল [illegible] ওপর। দু' হাত দিয়ে ঠেলে [illegible] কোনো কিছু গ্রাহ্য না করে যখন [illegible] এগিয়ে যেতেই চাচ্ছি তখন এই [illegible] চুরি কেন?

আর পূর্ণিমার শেষ কথাটাও [illegible] পড়ছিল এবার।

বাসনা যেন পূর্ণিমাকে [illegible] এবার, পুরুষরাই শুধু কথা লুকোয় [illegible] ভাই—আমরাও লুকোই। [illegible] লুকিয়েছি। আমার কথা, [illegible]

ন, মনোভাব—সবই আমি লুকিয়েছি। কথাটা মনে পড়লেই, বাসনা দেখেছে, শ্রী রকম এক গ্লানিতে তার সারা টাই কুঁকড়ে আসে। দিনে দিনে সেটা রও বাড়ছে, আরও অসহ্য হয়ে ছে! এখন মনে হয়, এ-ও এক কমের শঠতা। তোমায় যখন ভালবাসিনি বং অত্যন্ত ইতর, ধূর্ত, বলে ভেবেছি —তখন আমার তরফ থেকে এই সজ্ঞান ঠতা আমায় বিন্দুমাত্র বিচলিত করতে রে নি। সেই মন, মনোভাব, আর আমার নেই, ধারণা পালটে গেছে। কী ভেবেছি তখন আর এখন কী দেখছি! ছি—ছি! নিজের কাছে নিজেই এখন লজ্জায় মরছি। অনুশোচনায় পুড়ছি। অমলেন্দুকে আমার সব কথা বলে দেওয়া উচিত। কি ভাবতাম তাকে, কেন ভাবতাম, কেনই বা বিয়ে করেছিলাম। ওর সঙ্গে আমার এখন যা সম্পর্ক তা ভালবাসার। স্বামী-স্ত্রীর। এই সম্পর্কের মধ্যে লুকোচুরি, মন চাপাচুপি থাকা উচিত নয়।

তা ছাড়া, বাসনা ভাবছিল, বলা যায় না—হয়তো এই হাসপাতালই আমার শেষ বিছানা হল। নতুন করে ঘর বাঁধা গেল না, সুযোগই পেল না বাসনা। এখন, সেই শেষ মুহূর্তেও এই অসহ্য চিন্তা আর অনুশোচনা আমায় তুষের আগুনে পুড়িয়ে মারবে যে,—ভালবাসার ভান করে তোমায় আমি ঠকিয়েছি। ঠতা ছাড়া আর কিছুই ছিল না আমার। আর কিছু না। কিন্তু এ-কথা তা সত্যি নয়। একসময় ছিল, যখন -সব ভেবেছি। ভুল করেছি। অথচ খন, বোঝান মুশকিল, বলাও যে কি রে সম্ভব বুঝি না—তোমায় আমি কী ভীর ভাবে ভালবেসে ফেলেছি মলেন্দু। এমন করে কাউকে ভালবাসা য়, আমি যেন এই জানলাম, অনুভব লাম।

মনে মনে এবার আশ্চর্য এক আবেগ নুভব করছিল বাসনা। মনের মধ্যে সের এক ভাব টলটল করছিল, উপচে ছিল বুকের মধ্যে। অজস্র কথা, এক ম বিষন্নতা। ব্যাকুলতা।

বাসনার মনে হচ্ছিল কোনো পবিত্র এবং শুদ্ধ এক আবেগ তাকে মাটি থেকে অনেক উঁচুতে তুলে নিয়ে যেতে চাইছে। এর অনুভূতি এতো শান্ত, বিশুদ্ধ এবং গভীর যা কথায় বলা যায় না। বোঝান যায় না।

এর আনন্দ অন্য এক ধরনের। যদিও তা কাউকে বোঝাবার নয় তবু বলতে ইচ্ছে করে কিছু কিছু। হ্যাঁ, বলতে ইচ্ছে করে এই সাধারণ আকাঙ্ক্ষা কী অসামান্য, কতো একান্ত। তোমার-আমার ভালবাসায় আমরা কেউ কারুর থেকে বিচ্ছিন্ন নয় কোথাও। সকালের শিশিরভেজা সবুজ ঘাসের মত আমি আছি, আর আমার মধ্যে অদৃশ্য জীবনের মতন তুমি আছ, প্রতি মুহূর্তে আমার আয়ু ও বর্ণকে প্রাণবন্ত করে চলেছ। কিংবা তুমি যদি ফুল হও—তোমার জীবন যখন দল খুলে খুলে ফুটছে, আমি তোমার মধ্যে মিশে থেকে পরাগ গন্ধ বিলিয়ে যাচ্ছি, পাপড়ির গায়ে গায়ে রঙ এঁকে চলেছি। এমনি ঘনিষ্ঠ ও একাত্ম হতে হবে, না হলে ভালবাসা কি।

রোদের মধ্যে বাতাস মিশে থাকার মতন যদি না তুমি-আমি মিলে-মিশে একাকার হতে পারলাম তবে মেঘের রঙ ফুটবে না। আর রং যদি না ফোটে তবে বুঝবো আমরা দু-জনে শুধু খাওয়া পরা শোয়ার জন্যে, কিছু কিছু সুখ সুবিধে ফুর্তির জন্যে স্বামী-স্ত্রী।

ভগবান, স্বর্গ, আরও বড় শান্তি, অন্য বড় সুখে আর আমার রুচি নেই, ইচ্ছে নেই, বিশ্বাস নেই। আমি সাধারণ একটি মেয়ে, তুমিও সাধারণ এক পুরুষ। আমি সুন্দর করে তোমায় ভালবাসতে চাই, তুমিও তেমনি করে আমায় ভালবাসো। এর জন্যে, আমায় ভাল হতে হবে, পবিত্র এবং শুদ্ধ হতে হবে। সহজ, সরল এবং সুন্দর হতে হবে মনে, প্রাণে। কোথাও যেন না মালিন্য থাকে; ভীরুতা বা সংকোচ। আকাশ-গঙ্গার জলবিন্দুর মতন আমায় নির্মল, বিশুদ্ধ হতে দাও, জীবনমুক্ত।

বাসনার মন আর হাসপাতালের কেবিনে ছিল না। গভীর এক আবেশ আর আবেগে এই মন শীতের রোদ ডিঙিয়ে ট্রাম লাইন ছাড়িয়ে, ভিড় কোলাহল কাটিয়ে কোথাও যেন অমলেন্দুর গা-মন ছুঁয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

সারা দুপুর সেই আশ্চর্য সুন্দর আবেগ-আবেশ থরো থরো মন নিয়ে বাসনা চুপ করে শুয়ে থাকল।

অপেক্ষা করছিল কখন বিকেলের ঘণ্টা পড়বে—অমলেন্দু আসবে! একা অমলেন্দুই শুধু। আজ আর কেউ নয়, কেউ আসছে না। আর কখন, কতোক্ষণে অমলেন্দুর নিশ্বাসের বাতাস গায়ে মেখে, মৃদু গলায় এক এক করে সব কথা বলবে বাসনা। সব—সমস্ত কথা।

(ক্রমশ)

সাহিত্য সমালোচনা

মধ্যযুগের কবি ও কাব্য—প্রথমখণ্ড, বৈষ্ণব কবি ও কাব্য :—অধ্যাপক শ্রীশঙ্করী-প্রসাদ বসু কর্তৃক প্রণীত। জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড কর্তৃক প্রকাশিত। রয়াল সাইজ, ১৮৪ পৃষ্ঠা। মূল্য ৬৲।

বাঙলা সাহিত্যের বিভিন্ন যুগ এবং সেই সকল যুগে রচিত বিভিন্ন প্রকারের কাব্য সম্বন্ধে সাম্প্রতিক কালে নানাভাবে আলোচনা হইতেছে, এই আলোচনার মধ্যে অধ্যাপক শ্রীশঙ্করী প্রসাদ বসু রচিত আলোচ্য গ্রন্থখানিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থখানিকে দুই খণ্ডে পূর্ণতা দান করিবার পরিকল্পনা লইয়া মধ্যযুগের বৈষ্ণব কবি ও কাব্য লইয়া লেখক বর্তমান খণ্ডটি রচনা করিয়াছেন, দ্বিতীয়খণ্ডে মধ্যযুগের অপরাপর শ্রেষ্ঠ বাঙালী কবি ও তাঁহাদের কাব্য সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার সংকল্প লেখকের আছে, এবং আশা করি শীঘ্রই সে-কাজেও তিনি হাত দিবেন।

বর্তমান গ্রন্থে লেখক তাঁহার আলোচনার সুবিধার জন্য লেখক এবং তাঁহাদের লেখার ভিতর হইতে প্রসঙ্গ বাছিয়া লইয়াছেন। চৈতন্য পূর্ববর্তী বৈষ্ণব কবিগণের ভিতর হইতে তিনি বিদ্যাপতি ও বড়ুচণ্ডী দাসকে বাছিয়া লইয়াছেন; বড়ুচণ্ডী দাসের কবিকৃতির মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বর্ণিত রাধাচরিত্রই তিনি প্রধান ভাবে অবলম্বন করিয়াছে। চৈতন্য-পরবর্তী কালের কবি-গণের মধ্য হইতে লেখক সুপ্রসিদ্ধ চারিজন কবিকে বাছিয়া লইয়াছেন,—ইঁহারা হইলেন জ্ঞান দাস, গোবিন্দ দাস, বলরাম দাস ও শেখর কবি। শেষ প্রবন্ধে লেখক সুপ্রসিদ্ধ চৈতন্য-চরিতামৃতকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন,—এই আলোচনার মধ্যে দুইটি প্রসঙ্গ প্রধান,—একটি হইল চৈতন্য-চরিতকার হিসাবে কৃষ্ণদাস কবিরাজ এবং বৃন্দাবন দাস মহাশয়ের তুলনামূলক আলোচনা; দ্বিতীয় মুখ্য প্রসঙ্গ হইল কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয়ের গ্রন্থে বর্ণিত শ্রীচৈতন্য।

মধ্যযুগীয় বাঙলা বৈষ্ণব সাহিত্য সম্বন্ধে যাঁহারা আলোচনা করেন তাঁহাদের আলোচনায় দুইভাবে একদেশ-দর্শিতা দোষ আসিয়া পড়িবার সম্ভাবনা; কেহ কেহ একটা ধর্মীয় দৃষ্টিদ্বারা প্রথমাবধি এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত হন যে বৈষ্ণব-কবিতার কাব্য-রূপের দিকে তাঁহাদের সহজ দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় না; অন্যদিকে আর একটি আধুনিক প্রবণতা দেখা দিয়াছে, বৈষ্ণবকবিতাকে বিশুদ্ধ সাহিত্য সৃষ্টি রূপে গ্রহণ করিবার। কিন্তু উভয় দৃষ্টিকেই অসম্পূর্ণ বলিয়া মনে হয়, বৈষ্ণব কবিতার একটা মিশ্ররূপ রহিয়াছে; অধ্যাত্মরস ও সাহিত্য-রসের এখানে একটি অপূর্ব মিশ্রণ ঘটিয়াছে। বর্তমান লেখকের সব আলোচনার বৈশিষ্ট্য এই,—তিনি একটি গভীর এবং ব্যাপক দৃষ্টির ভিতর দিয়া বৈষ্ণব কবিতার এই সামগ্রিক *রূপটিকেই ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। লেখক কোনও দিক হইতেই গোঁড়া নন,—বৈষ্ণবতায়ও নয়—সাহিত্য-পন্থীয়ও নন;* খোলামনে সত্যকে গ্রহণ করিবার তাঁহার একটা সহজ প্রবণতা আছে—ইহাই তাঁহার আলোচনাকে একটা নিজস্বতা দান করিয়াছে। যে সকল কবি সম্বন্ধে লেখক আলোচনা করিয়াছেন তাঁহাদের সম্বন্ধে কতগুলি ঐতিহাসিক বিতর্ক রহিয়াছে; বর্তমান লেখক [illegible] করিয়াই সেই সকল বিতর্কজালের মধ্যে নিজেকে জড়াইতে চান নাই; এ-সকল বিতর্ক বিতর্ক এড়াইয়া সাধারণ[illegible] সিদ্ধান্তগুলিকেই তিনি গ্রহণ করিয়া তাঁহার আলোচনায় অগ্রসর হইয়াছেন। [illegible] সাহিত্যের রসরূপের দিকেই তাঁহার দৃষ্টি মুখ্যত নিবদ্ধ; এ-বিষয়ে [illegible] বিশ্লেষণ এবং পরিবেশনে তিনি [illegible] বৈদগ্ধ্যের পরিচয় দিয়াছেন পাঠকসমাজের নিকট হইতে তাহা সপ্রশংস [illegible] করিবে বলিয়া বিশ্বাস করি।

—শ্রীশশিভূষণ [illegible]

উপন্যাস

মরিয়ম—গোলাম [illegible] সাধারণ পাবলিশার্স, ৭, [illegible] —১৭। মূল্য তিন টাকা [illegible]

বিষয়বস্তুর দিক থেকে [illegible] আসরে যে একটা বৈচিত্র্য [illegible] সাম্প্রতিক কালের বিভিন্ন [illegible] দেবে। আলোচ্য উপন্যাসখানিতে [illegible] ছাপ রয়েছে। এই উপন্যাসের [illegible] পাকিস্থান [illegible] রেল [illegible] তাদের পরি[illegible]। [illegible] নেকারও নয়। পাকিস্থানে [illegible] ইউ পি, বোম্বাই, মাদ্রাজ [illegible] রেলওয়ে থেকে এরা [illegible] এখানে। কিন্তু জীবন[illegible] রেল ইয়ার্ডের মধ্যে [illegible] ওয়াগনের অভ্যন্তরে অপ[illegible] ও লাঞ্ছনার মাঝে। মরিয়ম [illegible] আনিসের স্ত্রী। উপন্যাসে [illegible] চরিত্রই প্রাধান্য লাভ করেছে [illegible] ধুয়া আছে—তবে সব চেয়ে [illegible] দিয়েছে লেখকের মানবীয়তা [illegible] ও সংবেদনশীল দৃষ্টিভঙ্গী। [illegible] যাওয়ার পর ছেলেদের নিয়ে [illegible] অন্যের অনুগ্রহ না নিয়ে [illegible] পরিবর্তে জীবিকা অর্জন, [illegible] করতে গিয়ে 'ঝি' সম্বোধন [illegible] পরিবেশ ও বর্ণনা পাঠকের [illegible] উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। শেষ [illegible] ব্যক্তিত্ব ও নারীত্ব জয়লাভ [illegible] কাহিনীর মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে [illegible] টুকুও বাৎসল্য রসের মনোজ্ঞ [illegible] ছোট চরিত্রগুলি—প্রসন্নদা, [illegible] নূর মহম্মদ, খুশী, তমিজ বিশ্বাস, এরা স্বকীয়তায় ভাস্বর।

একঘেয়েমির হাত থেকে লেখক পাঠককে রেহাই [illegible] পারেন নি। উপন্যাসের বিভিন্ন [illegible] বিশেষ করে মধ্যাংশের অনেকটা [illegible] বড্ড ঝিমিয়ে পড়া ভাব—পাঠকও

করেন বৈকি! আর নতুন ও পুরনো বানানের সংমিশ্রণ (যেমন জিনিষ ও জিনিস), ছাপার ভুল, ভুল বানান ('সান্তনা', 'সত্ত্বেও' লিখে হয়েছে লেখা 'সান্তনা', 'সত্বেও' ইত্যাদি ও এমনি আরও), জায়গায় জায়গায় ভাঙা টাইপ, কালির অসমতা প্রভৃতি মিলে মুদ্রণকার্য আশানুরূপ হতে পারে নি। প্রকাশকের এদিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত ছিল। তবে ছাপাই মন্দ নয়—প্রচ্ছদপট পরিকল্পনা মনোরম। ৭০।৫৫

পাকা ধানের গান : সাবিত্রী রায়। প্রকাশক : মিত্রালয়। ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট। কলিকাতা : ১২। দাম : সাড়ে তিন টাকা।

'পাকা ধানের গান'—উপন্যাসটির কেন্দ্রবস্তু রাজনীতি। তার পাশাপাশি গ্রামবাংলার সমাজ জীবনটি স্নিগ্ধধারা প্রবাহের মত বয়ে গিয়েছে। উপন্যাসটির প্রধান চরিত্র পার্থ। কিশোর পার্থ রাজনীতির নতুন নতুন বিবর্তনের মধ্য দিয়ে যৌবনে উপস্থিত হলো। স্বাধীনতা আন্দোলনের সন্ত্রাসবাদ থেকে মার্ক্সীয় মতবাদে দীক্ষা, কৈশোর থেকে যৌবন—এর মধ্য দিয়ে নায়ক পার্থের দেশের আত্মা সন্ধান চলেছে। দেশের আত্মা হলো তার অন্তর। তার জীবনের খরস্রোতে নানা চরিত্র, নানা পরিবেশ নানা দিক থেকে ধারা মিলিয়েছে। প্রেম নামে স্নিগ্ধ স্বপ্ন আছে, দেশ নামে প্রখর কর্তব্য আছে। একদিকে ব্যক্তিমানস, আর একদিকে বিশাল দেশের বিপুলতর আহ্বান। এই নিয়ে 'পাকা ধানের গানে'র আখ্যান।

লেখিকার অপরূপ এক কবিমন আছে। বাংলা দেশের লোকাচার, ব্রতকথা অপূর্ব দক্ষতায় তিনি কাহিনীতে অঙ্গীভূত করেছেন। কিন্তু যেখানেই রাজনীতি সম্বন্ধে কিছু বলতে চেয়েছেন অনেক সময় সে সব বক্তব্য রসস্নিগ্ধ হতে পারেনি। আর মাঝে মাঝে ভাষণবিলাস পরিহার করতে পারলে ভালো হ'তো। চরিত্রগুলির মধ্যে জানকী, আলি-মেঘী ভদ্রা-দীনবন্ধু পাঠকমনে আনন্দিত হয়ে যায়। 'পাকা ধানের গান' বিরাট উপন্যাসের প্রথম পর্যায়। তাই অসম্পূর্ণতা রয়েছে। পাঠকমনকে আগামী অধ্যায়গুলির জন্য কৌতূহলে বন্দী করতে পেরেছেন লেখিকা। গ্রন্থখানির অঙ্গসজ্জা সুরুচি শোভন। (২৯৫।৫৫)

অগ্নিস্বাক্ষর : শক্তিপদ রাজগুরু। প্রকাশক : মিত্র ও ঘোষ। ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট। কলিকাতা : ১২। দাম : ন' সিকা।

গ্রামকেন্দ্রিক উপন্যাস। প্রধান চরিত্র মোহিত। ডাকাত থেকে গৃহী—পৃথিবীর প্রেমে জন্মান্তর হলো তার। তার সেই প্রেমকে রূপ দিয়েছে তরঙ্গ। তার যাযাবর মনকে, তার ঘৃণিত জীবনকে নতুন স্বপ্নে বন্দী করেছে সে। এর পাশাপাশি রয়েছে পাতু। তরঙ্গের ওপর তার লুব্ধ দৃষ্টি কিন্তু তা প্রতিহত হয়ে ফিরে এলো। তরঙ্গ মোহিতের নীড়প্রেমের চলচ্চিত্র রচনা করেছে গ্রাম আর গ্রামীণ মানুষ। তার ব্যবস্থা আর অব্যবস্থা। শক্তিমান আর হীনশক্তির দ্বন্দ্ব।

লেখকের ভাষা কাব্যধর্মী। গ্রামজীবনের আলেখ্যটি মমতাময় ভাষায় তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন। কিন্তু অনেক সময় কাব্যের আড়ালে গল্প হারিয়ে গিয়েছে। এটি নিশ্চয়ই ত্রুটি। ঘটনা-গ্রন্থন শিথিল। মাঝে মাঝে আকস্মিক প্রসঙ্গের অবতারণা। পাঠকের কৌতূহলকে অবারিত ধারায় তিনি টেনে আনতে পারেননি। উপন্যাস রচনা করতে হলে ঘটনা ও চরিত্র নির্মাণে আরো মনোযোগ দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। (২৮৪।৫৫)

গল্প সংকলন

আশাপূর্ণা দেবীর ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প—অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির। ৪, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট। কলিকাতা—১২। দাম দু টাকা।

শ্রেষ্ঠ গল্প প্রকাশ করা একটি আধুনিক রেওয়াজ। লেখিকা সে কথা ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন। আমাদেরও মনে হয় যে-সব গ্রন্থকার পুরোমাত্রায় জীবিত, রচনার সজীবতার দিক থেকে, তাঁদের নির্বাচিত গল্প-সঙ্কলন আরও কিছুদিন পরে প্রকাশ করাই সঙ্গত। আশাপূর্ণা দেবীর গল্প বরাবরই সরস লেখা। সহজ ঘরোয়া চিত্র অতি সুন্দর তাঁর কলমে ফোটে এবং অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে। টেনে বুনে গল্প আর রসিকতা জমাতে হয় না। তাঁর বড়দের জন্য লেখা গল্পে যে শিল্পকর্মের সন্ধান পাওয়া যায়, ছোটদের জন্য লেখাতেও তার প্রমাণ আছে। জীবন্ত প্রমাণ। বারোটি গল্প নিয়ে এই সঙ্কলন প্রকাশিত হয়েছে। আরও পাঁচ ছয়টি দেওয়া চলত, তা হলে বইখানিও এত স্বল্পকায় মনে হত না। সত্যিকারের ছোটদের গল্প লেখা খুব সহজ নয়, এটা যে কোন গল্প লেখকই জানেন। বিষয় পরিবেশ বাচনভঙ্গী এবং

মনের ভাব—সব কটি জিনিসের সঙ্গতি ও উপযোগিতার ওপরই তার সাফল্য নির্ভর করে। আশাপূর্ণা দেবীর প্রায় সব কটি গল্পই উতরেছে, এটা আনন্দের কথা। বিশেষ করে 'একালের অসুবিধে' আর 'বুদ্ধির বাইরে'। এ দুটি গল্পে ছোটদের মনস্তত্ত্ব ও তাদের স্বাভাবিক কল্পনা প্রবণতা অতি চমৎকার ফুটেছে। চোর-ধরা গল্পটিও মজার; অতিরিক্ত ডিটেকটিভ গল্প পড়ার হাস্যকর পরিণতি। 'আকাশের স্বাদ' ছোটদের জন্য লেখা হলেও বড়দেরই কথা। তবে 'কী করে বুঝব' হল সেরা গল্প। ডাম্বল আর বাকুকে ছেলে-বুড়ো কেউই ভুলতে পারবে না এবং কয়েকবার পড়লেও এ গল্পের সরসতা নষ্ট হয় না। 'হুঁসিয়ার' পড়লে মনে হয় জেরোম কে জেরোমের বিখ্যাত রচনা 'আংকল পজারের' অফিস যাত্রা।

বিষয় যাই হোক, আশাপূর্ণা দেবীর সূক্ষ্ম কৌতুক বোধ সর্বত্রই জাগ্রত এবং কার্যকরী। আতিশয্য, ন্যাকামি, বাহুল্য তিনি বর্জন করতে জানেন। আসলে শিশু জগৎ ও শিশু মন, এ দুটোকে তিনি ভালো করে চেনেন। আর ভালোও বাসেন। নইলে ব্যঙ্গ-কৌতুকের মধ্যে সহানুভূতি আসত না। আর আন্তরিক সমবেদনা না থাকাও যা, শিশুকে এবং সেই সঙ্গে তার সাহিত্যকেও হত্যা করা তাই। এই সমবেদনা চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে হয় না, ফলাও করে চোখের জল ফেলাবারও দরকার করে না। প্রচ্ছন্ন অথচ স্বভাব-গন্ধের মতই ছড়িয়ে থাকে। তাই ওটি শিল্পের কৃতিত্ব। সবচেয়ে বড় কথা, আশাপূর্ণা দেবীর ছোটদের গল্প আপন উদ্দেশ্যেই উদ্দেশ্যহীন। নীতি কথার কোড়া দিয়ে কৃত্রিম স্বাদ আনবার চেষ্টা একেবারেই নেই। ৩৬৮।৫৫

গোয়েন্দা কাহিনী

চক্রী—নীহাররঞ্জন গুপ্ত। বেংগল পাবলিশার্স। ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট। দাম তিন টাকা।

নীহাররঞ্জন গুপ্ত অনেকগুলি ডিটেকটিভ উপন্যাস লিখিয়া জনপ্রিয় হইয়াছেন। তাঁহার উদ্ভাবিত চরিত্র কিরীটি রায় একজন বিখ্যাত গোয়েন্দা; সহকর্মী ও বন্ধু সুব্রত। শার্লক হোমস্ ও ওয়াটসনের মতই ইঁহারা অচ্ছেদ্য সঙ্গী। একাধিক রহস্য ও খুনের সমস্যা সমাধান করিলেও তাঁহারা উচ্চ দরের সৃষ্টি নহেন, এ কথা স্বীকার করা ভাল। সাহস ও বুদ্ধি অবশ্য কিরীটি রায়ের আছে। কিন্তু বিশ্লেষণ ও পর্যবেক্ষণ শক্তিতে এমন কিছু অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় তিনি এ যাবৎ দেন নাই। বাংলা ভাষায় অনেকেই তদন্ত-কাহিনী রচনা করিয়াছেন। কিন্তু একমাত্র শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া কাহারও গোয়েন্দা কাহিনী উল্লেখযোগ্য এবং রসোত্তীর্ণ হইয়াছে বলিয়া মনে পড়ে না। নীহারবাবু আগের চেয়ে এখন ভাষা ও প্রকাশভঙ্গীতে আরও যত্ন লইতেছেন, ইহা অবশ্য সুখের বিষয়। তবে ইংরেজি বুকনিগুলি অপরিহার্য হইলেও যত্রতত্র তাহাদের ব্যবহার শ্রুতিকটু লাগে, বিশেষ করিয়া যেখানে অনায়াসে তাহা মাতৃভাষায় প্রকাশ করা যায়। ব্যক্তিগত মুদ্রাদোষ অথবা বাচনভঙ্গী হিসাবে গ্রহণ করিলেও মনে প্রশ্ন জাগে, ইংরেজি কথাগুলির মধ্যে এত ব্যাকরণ ও বর্ণাশুদ্ধি থাকিবে কেন? ইহা কি শুধুই 'স্মার্টনেস্' না কি কতকগুলি ইংরেজি কথার সাহায্য পাঠকদের মনে চমক লাগাইবার জন্য? কয়েকটি অমার্জনীয় অশুদ্ধি উদ্ধৃত করিতেছি—

'ঐ ছবির Collections-এর জন্যই বাড়িটা হয়ত একটা fanatic দাম দিয়েও কিনবে।—' (পৃঃ ১০৩)

'Matter will take a shape!' (পৃঃ ১৪)

'His very movements suspicious' (পৃঃ ৭৫)

'Now you are in the spo[illegible]' (পৃঃ ৫৩)

'কে? ও মিঃ রায়, our detecti[illegible] Hallow!' (পৃঃ ৩২)

'There was another [illegible] ত্রিমিত কণ্ঠে (?)

শতদল বললেন। [illegible] পাবেন না মিঃ বোস! This [illegible] কিরীটির কণ্ঠস্বরে অদ্ভুত [illegible] (পৃঃ ১৩৩) বেপরোয়া [illegible] পড়ুন?

'যে যাই বলুক, definitely [illegible] fowl play is going [illegible]

'কিন্তু কোন প্রকার [illegible] বর্তমানে ঐ বাড়িতে চলেছে [illegible]

ইংরেজি ভাষা লইয়া [illegible] আপত্তি নাই। তবে এতটা [illegible] দেখা সহ্য হয় না। এগুলি [illegible] প্রমাদ, তাহা ভাবিবার [illegible] নীহারবাবু। [illegible]

প্রাপ্তি স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থ আসিয়াছে।

গণনায়ক—সতীনাথ [illegible]
আরোগ্য নিকেতন—[illegible]পাধ্যায়।
দুর্গমের ডাক—প্র[illegible]
কিংশুক—মনোজ বসু।
হারানো সুর—তারাশ[illegible]
কন্যাকাল—প্রভাত দে[illegible]
বাঙলার মহাপুরুষ—[illegible]
বন্ধু স্মৃতি—শ্রীপ্রভাত[illegible]
প্রমীলার সংসার—[illegible]
নীলচোখের সংকেত—[illegible]বিট।
রত্নমালার কাহিনী—শ্রী[illegible]
বয়নিকা—শ্রীপ্রফুল্লবালা ঘো[illegible]
সাহিত্য-বীক্ষা—নীরেন্দ্রনাথ [illegible]
মহাপ্রাণ স্যার ডেনিয়েল হ্যামিলটন—শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য।
সতুবদির রোজনামচা—সতুবদি।
কৃষ্ণচূড়া—মণীন্দ্র রায়।
সংগীত পরিচয়—২য় ভাগ—শ্রীদু[illegible] বিশ্বাস।
The Eighth Year of Freedom. Aug. 1954—Aug. 1955. Editor—Sunil Guha.
কথার কথা—সুভাষ মুখোপাধ্যায়।
বিদ্যুৎ বিশারদ—দেবীদাস মজুমদার।
মুদ্রণ বিশারদ—অশোক ঘোষ।
বিদ্যাপতি শতক—ডক্টর মুহম্মদ শাহীদুল্লাহ্।

...রিরই একটি শ্রেষ্ঠ চিত্রসৃষ্টি ...তো', 'কিন্তু', 'যদি', 'বোধ হয়' ...সংকোচ বোধ করে বলা নয়, ...য় স্পষ্ট করে একথা আজ ...কে বলবার সুযোগ পাওয়া গিয়েছে ...আদের দেশ পরিমাণেই শুধু নয়, ... দিক থেকেও এমন ছবি তৈরি ...পারে, যা পৃথিবীর সমগ্র চিত্র- ... ইতিহাসেই অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি ...রিগণিত হবার যোগ্য। একথা আজ ... বলতে পারা যাচ্ছে, 'পথের ...' ছবিখানি দেখবার পর। বিভূতি ...াধ্যায়ের অনবদ্য সাহিত্যসৃষ্টি এই ... পাঁচালী', কিন্তু সত্যজিৎ রায় ... রচনার বাহাদুরিতে এবং পরি- ... সৌকর্যে এমন একটা মৌলিক ... সামনে এনে হাজির করে ...য়েছেন, যা অন্তত এদেশে চলচ্চিত্রের ...দিকাল থেকে এপর্যন্ত প্রদর্শিত দিশী ...বদেশী এমন কোন ছবির কথা মনে করা ...য় না, যাকে এর সংগে তুলনার যোগ্য ...লে গণ্য করা যায়। ছবিখানি দেখার পর

—শৌভিক—

এবিষয়ে কারুর যদি সংশয় থাকে তো বুঝতে হবে তার মনে নিজের দেশের কৃতিত্বকে স্বীকার করে নেওয়ার ব্রীড়াবনত সংকোচ আছে, নয়তো সে ব্যক্তি চরম উন্নাসিক আর নয়তো স্রেফ হিংসুটে। দীর্ঘ প্রায় পঁচিশ বছর ধরে দিশী বিদেশী মিলিয়ে হাজার হাজার ছবি দেখে কোনক্ষেত্রেই এমন পুলকিত হওয়া যায়নি এবং আর কোন ছবিকে এমনভাবে বিশেষণে বিশেষণে মুড়ে অলংকৃত করে তোলার জন্য মন উদ্গ্রীব হয়ে ওঠেনি। এখন সত্যিই সারা পৃথিবীর টিকি নেড়ে একথা বলতে পারার আজ সুযোগ এসেছে যে, ভারতীয় ছবি সর্বাংগীণ সৌকর্যে সমগ্র বিশ্বে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা পাবার মতো যোগ্যতার পরিচয় দেবার ক্ষমতা রাখে। এবং বিস্মিত হতবাক হতে হয় ছবিখানি কিভাবে তোলা হয়েছে সেকথা ভাবতে গেলে।

* * *

চিত্রনাট্যকার ও পরিচালক সত্যজিৎ রায় চলচ্চিত্রের সংগে আগে সংশিলষ্ট ছিলেন না; আলোক-চিত্রশিল্পী সুব্রত মিত্র 'দি রীভার' ছবিখানিতে একজন সহযোগীর কাজ মাত্র করেছেন; আর শিল্পনির্দেশক বংশী চন্দ্রগুপ্তেরও চলচ্চিত্রের সংগে সংস্রব বেশী নয়। এই তিন জন আর তাদের সংগে অন্যদেশ হতে বাতিল হয়ে যায় এমনি সরঞ্জাম, তাও নেহাৎই অপ্রচুর। কিন্তু তাই নিয়েই এরা ঐন্দ্রজালিকের মতো যা সৃষ্টি করেছেন, তা পৃথিবীর সেরা সব সরঞ্জাম নিয়েও হয় না। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, শিল্প ও নাট্যসংগত ভালোটুকু ভেবে ভেবে খুঁজে খুঁজে ছন্দোবদ্ধ দৃশ্যে গেঁথে গেঁথে ক্যামেরায় তোলার যে আদর্শ ধৈর্য, অধ্যবসায় ও কষ্টসহিষ্ণুতার কাহিনী ছবিখানি নির্মাণের সংগে জড়িয়ে রয়েছে, সেইটেই একটা ইতিহাস। দেখা গেল, দরদী শিল্পী ও চিন্তাশীল মানুষ নিষ্ঠার সংগে ভোঁতা যন্ত্রপাতি-

সরঞ্জাম নিয়েও কি অনিন্দ্য গরিমাই না ফ‍ুটিয়ে তুলতে পারে। ছবিখানির সংগঠন-কারীদের নেতা হিসেবে পরিচালক সত্যজিৎ রায় চিত্র নির্মাণের সমস্ত বিভাগ-গ‍ুলিতেও প্রাণের যে সাড়া এনে দিয়েছেন, তা সবকিছ‍ুকে নতুনের দ‍ৃষ্টিতে চোখের সামনে উদ্ভাসিত করে তোলে। প্রত্যেকটি বিভাগই যার যা ভূমিকাকে ব্যক্তিত্বপ‍ূর্ণভাবে অথচ সবায়ের সঙ্গে সবায়ের সমন্বয়ের রাখি বেঁধে বিকশিত হয়ে ওঠার এমন দ‍ৃষ্টান্ত আর পাওয়া যায়নি। সবায়ের কাজ আলাদা আলাদা, কিন্তু সবাইকে মিলিয়ে একটা পরম র‍ূপময় সম্প‍ূর্ণতা গড়ে উঠেছে। ভূপেন্দ্র ঘোষ বা সত্যেন চট্টোপাধ্যায় আগে অনেক ছবিতেই শব্দ গ্রহণ বা শব্দ যোজনার কাজ করেছেন, কিন্তু 'পথের পাঁচালী'তে পরিচালক তাদের কাজ এমন-ভাবে সাজিয়ে খেলিয়ে নিয়েছেন, যাতে তাদের কাজের চমৎকারিত্ব নতুন করে অঞ্জনায়িত হয়ে ওঠে। সংগীতকেও তো ছবিতে কতোরকমভাবেই ব্যবহ‍ৃত হতে দেখা গিয়েছে, কিন্তু এ ছবির সংগীত সংযোজনায় রবীন্দ্রশংকরের মতো প্রতিভার মৌলিকত্ব যেমন স‍ুস্পষ্ট, তেমনি কাহিনীর প্রয়োজন মেটাতেও সেই সংগীতকে কিভাবে প্রয়োগ করলে ছবিরও একটা বিশেষ মর্যাদার অংগ হ ওঠে সেবিষয়েও পরিচালক সত্যজিৎ প্র পথ করে দিয়েছেন। পরিচালন প্রতি দেখিয়ে দিল যে, কলাকৌশলের প্রতি দিকেরই এক একটা স্বতন্ত্র ভূমিক অন‍ুভূত হওয়ার সঙ্গে প্রত্যেককে জড়ি সমগ্রতাকেও এমন একটা অপ‍ূর্ব পরিস্ফ‍ুট করে তোলা যায়, যা দেখে দেখতে প্রতিনিয়তই বলে উঠতে ই করবে 'চমৎকার', 'চমৎকার'!

* * *

"পথের পাঁচালী"র মৌলিকত্ব এমনি চমকপ্রদ যে ছবিখানি মান‍ুষের আবেগে কোঠায় কি পরিমাণ ঠাঁই করে নি পারবে, সেবিষয়ে ব্যবসাদারী মনে দস্তুর মতো সংশয়ের উদ্রেক হয়। নাচগান নে এবং চুটকি রংগ-তামাসা নেই ব বাজারের কোন পরিবেশক ছবিখানি তোলা শেষ করতে টাকা আগাম দি এগিয়ে আসেননি। তার ওপর সংগঠনকা ও শিল্পীরা প্রায় সকলেই নতুন লো প‍ুরনো দ‍ু একজন যারা আছেন, তাদে টান নেই। কিন্তু তব‍ুও পরিচালক সং জিৎ রায় টাকা পাবার জন্য তার শিল্প নিষ্ঠাকে জলাঞ্জলি দিতে রাজি হননি এইখানেই আসে পশ্চিমবংগ সরকার এ বিশেষভাবে ম‍ুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচ রায়ের সহায়তার কথা। কোনদিন ভারতে কোন রাজ্য যা করেনি, ডাঃ রায় প্রথ চলচ্চিত্রের প‍ৃষ্ঠপোষকতায় অর্থ সাহায্যে জন্য এগিয়ে এলেন। এ সাহায্য না পেলে চিত্র জগত অবশ্যই একটা মহান স‍ৃষ্টি থেকে বঞ্চিত হতো। পরিচালক সত্যজি রায় রাজ্যের এই সাহায্যের মান তো রক্ষা করেছেনই, এমন কি একথা বলা যায় যে পশ্চিমবংগ গবর্নমেণ্ট শিল্পের প‍ৃষ্ঠ-পোষকতায় সবায়ের যে অগ্রণী সে মর্যাদাও পাইয়ে দিয়েছেন। প্রতিটি অংশে মৌলিকত্ব প্রতিভাত করিয়ে দেওয়ার জন্য ভেবেচিন্তে কাজ করার ছাপ সর্ব স‍ুস্পষ্ট। মনকে ম‍ুগ্ধ করে তুলতে খ‍ুঁট-খাচ কতো রকমের কাজ যার বর্ণনা দিয়ে শেষ করে ওঠা যায় না। কাহিনীর মানবিক আবেদনটাও এমন সহজ ও সরলভাবে এনে হাজির করে দেওয়া হয়েছে, যা মান‍ুষ মাত্রেরই মনকে আবেগে

ূত করে তুলবে। আগাগোড়া ছবি-
। কোথাও একটু অবাঞ্ছিত অংশ
একটু কিছু বাজে নেই, যা মনের
ক বাজাতে অক্ষম; একটাও মুহূর্ত
যা চমক লাগিয়ে যায় না। এমন
কুই তারিফের ছবি একটা প্রপঞ্চ
ব বলে মনে হবে।

* * *

সুবৃহৎ উপন্যাস "পথের পাঁচালী"কে
ানি প্রমাণ দৈর্ঘ্যের ছবির পরিসরে
দেওয়া কঠিন এবং দুঃসাহসিক
। তাছাড়া 'পথের পাঁচালী' হচ্ছে
ত ও মানব চরিত্রের বর্ণনাময়
্যাস। নানাবিধ প্রাকৃতিক শোভা-
এই উপন্যাসখানির মূল উপাদান।
বাহুল্য, বিরাট উপন্যাসখানির সব-
ছবিতে এনে দেওয়া সম্ভব নয়, আর
জিৎ রায় তা করতেও চেষ্টা করেননি।
ু তাই বলে চিত্রনাট্যটি মূল গ্রন্থ থেকে
টুকুও বিচ্যুতও হয়নি, এইটেই
জিৎ রায়ের অসাধারণ কৃতিত্বের
ট। বিরাট গ্রন্থখানি থেকে ছেঁকে
ভাব আর রসটুকু যথাযথভাবে এমন
বেশিত হয়েছে যা দেখবার পর কোন

আক্ষেপ করার ছুতো পাওয়া যায় না। তাছাড়া ছবিখানিকে একটি স্বতন্ত্র মৌলিক সৃষ্টি বলেই স্বীকার করে নেওয়াই উচিত। কারণ গ্রন্থটির অবলম্বন হলেও চিত্ররূপায়ণে এতো মৌলিক সৃজনী প্রতিভার লক্ষণ সুস্পষ্টরূপে পাওয়া যায়, যা এর মধ্যে একটা নিজস্বতার দাবী মূর্ত করে তুলেছে।

আখ্যানভাগ বলতে কতোটুকুইবা। দরিদ্র ব্রাহ্মণ হরিহর। গল্প যখন আরম্ভ তখন তার সংসারে স্ত্রী সর্বজয়া, কন্যা দুর্গা আর বৃদ্ধা ভগিনী ইন্দির ঠাকরুণ। দুষ্টু মেয়ে দুর্গা পাশের বাগান থেকে ফল কুড়িয়ে আনে বলে সর্বজয়াকে কথা শুনতে হয়। সর্বজয়ার রাগ গিয়ে পড়ে ইন্দির ঠাকরুণের ওপর, কারণ দুর্গার টান তার ওপরেই বেশী। তাছাড়া হরিহরের চাকরি নেই বলে অনটনের মধ্যে সংসার চালিয়ে চালিয়েও সর্বজয়ার মেজাজ খিটখিটে। ইন্দির ঠাকরুণের রাগ হলে ছেঁড়া কাঁথা মাদুর আর পার্থিব সম্বল পিতলের ঘটিটা হাতে নিয়ে রাগে গরগর করতে করতে বাড়ী ছেড়ে চলে যায়। অবসর সময়ে হরিহর যাত্রার পালা লেখে, তার আশা একদিন তার লেখা পালা অভিনয় হয়ে হৈহৈ পড়ে যাবে, তখন আর দুঃখ থাকবে না। এই আবহাওয়ায় জন্মালো অপু—স্বপ্নভরা সন্দিৎসু দুটি চোখ সার। হরিহর একটা চাকরি পেলে। ইন্দির ঠাকরুণ আবার ফিরে এলো। দিন যেতে লাগলো। অপু বড়ো হতে থাকে; দিদির সঙ্গে ছুটোছুটি করে বেড়ায়, কিন্তু পাশের বাড়ির মেজ কাকিমা ওদের গরীব বলে দেখতে পারে না। ইন্দির ঠাকরুণের কাছে ভাই-বোনদুটি রূপকথার গল্প শুনে ঘুমিয়ে পড়ে। অপু পাঠশালায় ভর্তি হয়। একদিন দিদির সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে খেলতে কাশবন পার হয়ে রেলগাড়ী দেখে আসে; নতুন অভিজ্ঞতা অর্জনের একটা চমক এলো ওদের জীবনে। অনেকদিন মাইনে বাকি পড়ায় সংসার আবার অচল। কাজের খোঁজে হরিহর গেল বিষ্ণুপুরে। তারপর চার মাস তার কোন পাত্তা নেই। ইন্দির ঠাকরুণ মাঝে চলে গিয়েছিল, আবার এক দুপুরে ফিরে এলো। সর্বজয়ার মেজাজ আজকাল আরও তিরিক্ষি।
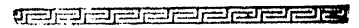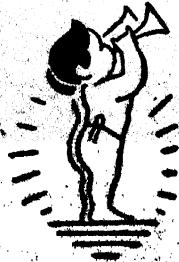
এ যুগের শ্রেষ্ঠ
চিত্র তারকাগণের
অপূর্ব্ব সমাবেশ
আপনি দেখতে পাচ্ছেন
ইনসানিয়ৎ-এ
জেমিনীর চিত্র
শ্রেষ্ঠাংশে:-
দিলীপ কুমার · দেব আনন্দ · বীণা রায়
বিজয়লক্ষ্মী · জয়ন্ত · জয়রাজ
শোভনা সমর্থ · কুমার · আগা
বদ্রীপ্রসাদ · মোহনা ও জিমি
প্রযোজনা ও পরিচালনা: এস-এস-ভাসান
সঙ্গীত:- সি. রামচন্দ্র
৩০শে সেপ্টেম্বর ভারতের সর্ব্বত্র মুক্তিলাভ করছে

ইন্দির ঠাকরুণ ধুঁকতে ধুঁকতে এসে কোনরকমে ছাওয়ায় বসে একটু জল খেতে চাইলে। সর্বজয়া খেতে বসেছিল, ননদকে বললে নিজেই গড়িয়ে নিতে। ইন্দির ঠাকরুণ এলো জল গড়াতে, সর্বজয়ার খাওয়ার দিকে দেখলে। গড়ানো জল আর খাওয়া হলো না; ইন্দির ঠাকরুণ আবার বেরিয়ে গেলো বাড়ি থেকে নিজের পুঁজিপাটা নিয়ে। খেলা ভাঙ্গ করে ফিরবার পথে দুর্গা আর অপু দেখলে পিসিমা হাঁটুতে মাথা গুঁজে বাড়ির সামনের গাছতলাটায় বসে। ডেকে সাড়া না পেয়ে গায়ে হাত ছুঁতেই ধুপ করে পিসিমার দেহটা গড়িয়ে পড়লো মাটিতে। ইন্দির ঠাকরুণের দেহে প্রাণ নেই। দুর্গা আর অপু ভয় পেলো। দেখতে দেখতে বর্ষা এলো সঘন হয়ে। ভাইবোন দুটিতে আনন্দে মাতামাতি করলে বর্ষার জলে। বাড়িতে ফিরে দুর্গার জ্বর; প্রতিবেশিনী সর্বজয়ার এক সহৃদয়া জা ডাক্তার দেখালে; নিউমোনিয়া। দারুণ ঝড়-জলের এক রাত্রে দুর্গা মারা গেল। কিছুদিন পর হরিহর ফিরলো টাকা জোগাড় করে। দুর্গার জন্য আনা শাড়িখানা সর্বজয়ার হাতে দিতেই এতোদিনের রুদ্ধ আবেগে সর্বজয়া কান্নায় ভেঙে পড়লো। এরপর হরিহর স্ত্রী-পুত্রকে নিয়ে বারাণসী যাত্রা করলে।

* * *

চমকপ্রদ নাটকীয় ঘটনা বলতে কিছুই নেই। এতে আছে বিন্যাসের মধ্যে দিয়ে এমন সমস্ত পরিবেশ গড়ে তোলা, যা আবেগকে উচ্ছলিত করে দেয়। সামান্য খুঁটিনাটি নিয়ে গড়ে তোলা হয়েছে এক একটা নাট্য-পরিণতি। এর মধ্যে যা সব প্রযুক্ত হয়েছে, তার মধ্যে অবাস্তবতাও নেই, অসত্যও নেই। দুঃখ দারিদ্র্যের সঙ্গে অহরহ সংগ্রাম করে জীবনপথ অতিক্রম করে যাওয়ার এ এক অপরূপ ইতিবৃত্ত। গল্প হচ্ছে দুর্গা আর অপুকে নিয়ে। নিকষ দারিদ্র্যের মধ্যে জন্ম তাদের। বলতে গেলে মানুষ ওরা প্রকৃতির কোলে; স্বস্তির আধার বৃদ্ধা পিসিমা, ইন্দির ঠাকরুণ। তারই মধ্যে থেকেই ওরা দেখে গরীব বলে ওদের বাড়ির মেজকাকিমার ওদের ওপরে কি নিদারুণ ঘৃণা। কাকিমার ছেলেমেয়েরা কিন্তু ওদেরই মতো এবং ওদের সঙ্গে মিশতে খেলতে চায়; কিন্তু মার শাসনে দূরে সরে থাকে। এটাও ওরা দেখলে, না খেতে পেয়ে উপবাসে দিন কাটাচ্ছে, পাশের বাড়ির সহৃদয়া আর এক কাকিমাই শুধু তার খোঁজ নিতে আসে, কিন্তু আর কেউ ওধার দিয়েও মাড়ায় না, অথচ দিদি মারা যাবার পর ওরা যখন বারাণসী যাত্রা সাব্যস্ত করলে, তখন ভিটে ছেড়ে না যাবার জন্য পড়শীদের কতো উপদেশ! গ্রামের সেই পণ্ডিতমশাই—হাতে বেত নিয়ে ছাত্র পড়াচ্ছে, আবার মুদিখানাও চালাচ্ছে। তারই ফাঁকে চক্রবর্তী এসে মাথায় এক খাবলা তেল ঘষে বিনিময়ে চলে যাবার সময় পণ্ডিতের বারোয়ারির চাঁদা মকুবের আশ্বাস দিয়ে যায়। নিজের সন্তানদের পালন করার আকুলতায় সহায় সম্বলহীনা বৃদ্ধা ননদের ওপরে সর্বজয়ার হৃদয়হীনতা মানুষের মনের আর একটা দিক উদ্ঘাটন করে দেয়। সইয়ের বিয়ের সাজ দেখতে দেখতে দুর্গার চোখের কোণে একটি ফোঁটা জল পল্লীবালার আশা ও স্বপ্নের কি আভাসই না ফুটিয়ে তোলে। ছোটখাটো হলেও আঁতের জিনিসে ভরা সব ঘটনাবলী; মনের ওপরে আঁচড় কাটে না, এমন কিছুই নেই কোথাও।

* * *

টুকরো টুকরোভাবে অনেক কিছুই লক্ষ্য করার রয়েছে বিন্যাসের মধ্যে। তেঁতুল চুরি করে চুপি চুপি অপুকে ডেকে তেল আনিয়ে আচার মেখে নিজের মুখে দেওয়া, আবার কখনও অপুর গালে দেওয়া—এমনভাবে দৃশ্যটি বিন্যস্ত যে, দেখতে দেখতে দর্শক মাত্রেরই মুখ জলে ভরে ওঠে। এমনিধারা সব অতিসাধারণ, অনাড়ম্বর এবং স্বাভাবিক ঘটনা, যা দেখতে দেখতে দর্শকমাত্রেরই স্মৃতি ও অনুভূতি স্পর্শাতুর হয়ে ওঠে। দুর্গা আর অপুর কাশবনের মধ্যে লুকোচুরি খেলতে খেলতে হঠাৎ টেলিগ্রাফের থাম দেখে থমকে যাওয়া আর থামের গারে কান দিয়ে অবাক হয়ে গমগমানি শব্দ শোনা এবং তারপরই ট্রেনের হুইসল শুনে ছুটে ছুটে দেখতে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দর্শকগণও ওদের সঙ্গে একানুভূতিসম্পন্ন হয়ে ওঠে। গ্রামের সেই মিঠাইওয়ালাকে দেখে তার পিছু অনুসরণ আর ঘুঙুরবাঁধা বাঁকের তালে তালে হাঁড়ির দোলনের সঙ্গে ছোটদের

তাল রেখে চলা; ওদের চড়ুইভাতি করতে বসে নুন আনতে ভুল হওয়া নিয়ে ঝগড়া করে সব পণ্ড হওয়া ইত্যাদি সব সরল ঘটনা মনের ওপরে ভারি প্রশান্তি এনে দেয়। আর একদিকে রয়েছে ও বাড়ির মেজবৌয়ের মেয়ের বিয়ের ব্যাণ্ড-বাদ্যি নিয়ে কেমন সমারোহ; আবার তার আগে রয়েছে অপুর জলখাবার সময়কার থমথমে দৃশ্য। ইন্দির ঠাকরুণের বারবার রেগে চলে যাওয়া আবার ফিরে ফিরে আসা কেমন একটা করুণামেশা অনুভূতি এনে দেয়। তারপর ইন্দির ঠাকরুণের হাঁটুতে মাথা গুঁজে মরে পড়ে থাকা এবং দুর্গার ছোঁয়ায় মাটিতে গড়িয়ে পড়ায় মনটা বড়ো উদ্বেল হয়ে ওঠে। এমন মৃত্যু-দৃশ্য ছবিতে কখনো দেখা যায় নি। আর এটা বড়ো বেশী মনে বাজে, অতি শান্ত-নিরীহ বৃদ্ধা ইন্দির ঠাকরুণ বলে; সন্ধ্যেবেলা ভাইপো-ভাইঝীকে রূপকথা শুনিয়ে ঘুম পাড়ায়, তারপর দেয়ালে হেলান দিয়ে গাইতে থাকে—"হরি দিন তো গেলো সন্ধ্যা হলো"—ওর নিজেকে পার করার জন্য হরির কাছে আবেদনের কথা স্মরণ করে। আপনা থেকেই মনটা ভারি হয়ে ওঠে। সর্বক্ষেত্রেই অনুভব হতে থাকে সরল অপুর কৌতূহলী চোখ দুটির অস্তিত্ব—যাত্রাতে তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধ দৃশ্য দেখতে যেমন, তেমনি পিসিমার মৃত্যু দেখার সময়েও, সর্বত্র সবখানে। দুর্গার মৃত্যুর পর বারাণসী যাবার সময় অপু তার পুঁজিপাটা বাঁধতে গিয়ে তাকের মাথায় দিদির আচার খাবার ভাঙা নারকোল মালায় পুঁতির হার আবিষ্কার করে তার বিমর্ষ হয়ে সে হার পুকুরের গর্ভে নিক্ষেপ করা—সে এক অপূর্ব নাটকীয় স্পর্শ। এই পুঁতির হারটাই ছিল পাশের বাড়ির মেয়ের এবং চুরির দোষ এসে পড়ে দুর্গার ওপর। দুর্গা অস্বীকার করে কিন্তু তবুও মা-র কাছ থেকে বেদম প্রহার খায়। সেই স্মৃতি জড়ানো এই হার! অতুলনীয় এর বর্ষার দৃশ্য। মেঘে মেঘে আকাশ ছেয়ে গেল; ঝড় উঠলো—অপু আর দুর্গা ছুটেছে ছুটেছে। বর্ষার আভাসে ব্যাঙের দল সাঁতরাচ্ছে জলে ছিপ দিয়ে মাছ ধরছিলো এক টাকমাথা টুপ করে এক ফোঁটা জল পড়লো টাকে ওপরে। পদ্মপাতার ওপরে টুপটা জল পড়তে লাগলো, দেখতে দেখতে আকাশ ভেঙে পড়লো। সেই প্রচণ্ড ঝর ঝর ধারায় দুর্গার চুল এলো করে ভেজার সে কি অপূর্ব দৃশ্য! তারপর দুর্গার মৃত্যু-রাত্রের ঝড়-বাদল। জানলা চটটা উড়ে খুলে পড়তে চায় ওদিকে দরজার আগলও ঝড়ের দাপটে ভাঙে ভাঙে। একা সর্বজয়া রুগ্না মেয়ে কোলে, পাশে শুয়ে অপু। প্রকৃতির প্রচণ্ড দাপাদাপি, তার মাঝে সর্বজয়ার মুখে আশঙ্কার সঙ্গে জীবনরক্ষার দুর্জয় প্রচেষ্টা একটা দারুণ নাটকীয় পরিস্থিতি গড়ে তোলে। আশঙ্কায়, উদগ্রীবতায় দর্শকমন এমন থমথমে হয়ে যায় যে তেমন অনুভূতি আজও পাওয়া যায়নি কখনো। পরদিন সকালে জল-কাদা, উড়ো চালা মরা ব্যাঙ উঠোনের দৃশ্যকরুণতাকে জমিয়ে তোলে আরো। তারপর চূড়ান্ত নাট্যপরিণতি ঘটে হরিহর দীর্ঘকাল পর ফিরে এসে সর্বজয়ার হাতে দুর্গার শাড়িখানা তুলে দিতেই। সর্বজয়ার হাহাকারে কোন দর্শকের পক্ষেই আর আবেগধারা রোধ করে রাখা সম্ভব হয় না।

* * *

পরিবেশ সৃষ্টিতে এমন সব উপাদান এমনভাবে সাজানো, যার মধ্যে একটা চমৎকার সর্বজনীন আবেদন গড়ে উঠেছে। যে আবেদনটা ধনী-দরিদ্র-শিক্ষিত-অশিক্ষিত, দিশী-বিদেশী, পৃথিবীর যে কোন দেশের যে কোন শ্রেণীর যে কোন মনের ওপরে ছোঁয়া দেবেই। বিন্যাসের ধারাটাকে নিও-রিয়ালিজম বলে আখ্যাত করা যায়—যুদ্ধোত্তরকালে ইতালীর দে সিকা প্রমুখ মনীষীবৃন্দের প্রচেষ্টায় যে ধারার প্রাদুর্ভাব হয়। কিন্তু সত্যজিৎ রায় তাদের অনেক পিছনে ফেলে এমন উঁচু ধাপে গিয়ে পৌঁচেছেন, যার ধারে-কাছে কিছু আছে বলে জানা নেই। নির্মম ও স্বাভাবিক বাস্তবকে কাব্যের ললিত ছন্দে, শিল্পের সুকুমার ভঙ্গীতে এবং নাটকের আবেগময় গতিতে এমন একটি

সৃষ্টি এই 'পথের পাঁচালী' যা চলচ্চিত্রের মাহাত্ম্যকে নতুন করে উপলব্ধি করিয়ে দেয়। সর্বদিকেই চমৎকার সামঞ্জস্য। যেটি যেমন চরিত্র, চেহারাগুলিও ঠিক সেইমতোই খাপ খাওয়ানো। সুবীর দাশগুপ্তের অপু কিম্বা উমা দাশগুপ্তার দুর্গাকে দেখে কিছুতেই কল্পনা করা যায় না যে অপু বা দুর্গার চেহারা আর কোনরকম হতে পারে, কিম্বা ওদের অভিনয়ে যেভাবের চলাফেরা ভাবভঙ্গী অভিব্যক্ত হয়েছে তা আর কোনরকম হতে পারে। ইন্দির ঠাকরুণের চরিত্রে চুণীবালা দেবী তো একটি পরম বিস্ময়। প্রায় নব্বুই বৎসরের বৃদ্ধা; লোলচর্মে চোখ মুখ নাক একাকার, কিন্তু কি হৃদয়গ্রাহী অভিব্যক্তিই না তার মধ্যে থেকেই ফুটে বেরিয়েছে! পৃথিবীর এই বয়স্কতমা অভিনয়শিল্পীর এই কৃতিত্ব সমগ্র জগতেরই অভিনয়ক্ষেত্রে এক অতুলনীয় কীর্তি। তাই ওর অমনভাবে মৃত্যুটা মনকে বড়োই আকুলি-বিকুলি করে তোলে। কানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের হরিহর আশা ও স্বপ্নভরা যাত্রার পালা লিখিয়ে দরিদ্র ব্রাহ্মণ চরিত্রের মতো দেখতেও হয়েছে ফুটেও উঠেছে তেমনি ভাবেই, আর কোন চেহারাই যেন ও চরিত্রে মানায় না। তেমনি ফুটেছে করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সর্বজয়া। স্ত্রীরূপে জীবনের কোন সাধই পূরণ করতে পারলে না, কিন্তু তার জন্যে কোন নালিশ নেই। আর মাতৃরূপেও সন্তানসন্ততিকে পেটপুরে খেতে দিতেও পারে না কিন্তু তাদের বাঁচাবার জন্য কি দুর্জয় চেষ্টা। তার মধ্যেও বাঁচিয়ে চলেছে পরিবারের মর্যাদা —চুপিচুপি ভোরে উঠে থালাবাসন বন্ধক দিয়ে চাল এনেছে তবু মুখ ফুটে চরম অভাবের কথা পরম হিতৈষী প্রতিবেশীর কাছেও বলতে যায়নি। ভারতীয় নারীত্বের এই যে বৈশিষ্ট্য, বুক ফাটলেও মুখ না ফোটার, তা করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয়ে মূর্ত হয়ে উঠেছে। শেষে দুর্গার জন্য শাড়ি নিয়ে দীর্ঘদিন পর হরিহর উপস্থিত হতে মৃত দুর্গার শোকে সর্বজয়ার কান্নায় ভেঙে পড়ার মতো এমন উদ্দাম-আবেগ নিদারুণ করুণ দৃশ্য কমই দেখা গিয়েছে। ছোট ছোট চরিত্রগুলিরও প্রত্যেকটি ঠিক যেমন হওয়া দরকার ছিল তেমনিই হয়েছে। মুদিখানা চালাতে চালাতে গদিতে বসেই পাঠশালার পণ্ডিতী করার অংশে তুলসী চক্রবর্তীকে যেন নতুনভাবে দেখা গেল। বাঁকে হাঁড়ি ঝোলানো মিঠাইওয়ালার ছোট ছোট খরিদ্দার আকর্ষণের শৃগাল-দৃষ্টি; আর তার ঝুমঝুম করে তালে তালে দুলে দুলে চলা মন থেকে মুছে যাবার নয়। যতোটুকুই চরিত্র হোক প্রত্যেকটিই এমন চেহারা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে যে, মনে হয় এমনটি না হলেই যেন বেমানান হতো।

• • •

ছবিখানির বিন্যাসে অবলম্বিত নিও-রিয়ালিজম্ ধারায় একটা অতিরিক্ত লালিত্য যুক্ত হয়েছে সুব্রত মিত্রের আলোকচিত্রগ্রহণ কৃতিত্বে। ক্যামেরায় এই তাঁর প্রথম হাত, কিন্তু এই হাতেখড়িতেই তিনি শ্রেষ্ঠ ক্যামেরার কাজের সমতুল যোগ্যতা দেখিয়েছেন। নির্বাক প্রাকৃতিক দৃশ্যে একটা নাটকীয় ভাবমুখরতা ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি। কলকাতার অল্প দূরে বোড়াল গ্রামে ছবিখানি তোলা। এতে স্টুডিওর কৃত্রিম আলোতে তোলার অংশ খুবই সামান্য; সবই প্রায় বহির্দৃশ্যে গ্রামের প্রাকৃতিক আলোয় তোলা। তাই প্রতিটি অঙ্গে প্রাণের এমন সাড়া। বাঁশ বনে দুর্গা ও অপুর ছুটোছুটি খেলা; কাশের ঘন বনে হাওয়ার ঢেউ; পুকুরের পাড় দিয়ে মিঠাইওয়ালার যাওয়া; বৃষ্টির আগে জলের ওপরে ব্যাঙের খেলা; কলমিডাঁটায় ফড়িঙ ওড়া; মৃত ইন্দিরঠাকরুণের ঘটিটা গড়িয়ে পুকুরে গিয়ে পড়া; মড়ার ওপরে একটা মাছি এসে বসা; বর্ষায় ভিজে কুকুরের গাঝাড়ানি; মেঠো পথে শবযাত্রা; পদ্মপাতায় বৃষ্টির ধারা, তারপর সেই আসল বৃষ্টি প্রভৃতি ছবিখানির প্রতিটি ইঞ্চির মধ্যে আলোকচিত্রের সৌকর্য ফুটে উঠেছে। দৃশ্যগুলির রচনাও প্রত্যেকটিই চমৎকার অভিনবত্বে ভরা। বেশ একটা মৌলিকতা অনুভব করা যায়। 'টেকনিক' বলতে দুর্গার ভেজার সময় বর্ষার দৃশ্য এবং দুর্গার মৃত্যুর আগের রাতের দুর্যোগ অবিস্মরণীয় কৃতিত্ব হয়ে থাকবে। ক্যামেরার মতো শব্দকেও একটা ভূমিকায় চমৎকারভাবে খেলানো হয়েছে। ট্রেন আসার সময় রেলের ওপরকার শব্দ, টেলিগ্রাফ পোস্টের গুমগুমানি। বৃষ্টির ঝড়ের গর্জন, কাশবনের শনশনানি এসব শব্দও লক্ষ্য করার বিষয়। শব্দযোজনার জন্য ভূপেন ঘোষ এবং শব্দ পুনঃযোজনার জন্য সত্যেন চট্টোপাধ্যায় তাঁদের কৃতিত্বে নতুন করে মর্যাদা যোগ করতে সক্ষম হয়েছেন। শিল্প নির্দেশ ও সুরযোজনার দিকটায়ও সাড়া পড়িয়ে দেবার মতো কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে। হরিহরের সংসারই হোক, কি পণ্ডিতের মুদিখানাই হোক আর বিয়ে বাড়িই হোক, এমন সাজানো যাতে সবক্ষেত্রেই বাস্তবতা পরিপাটিভাবে ফুটে উঠেছে। বংশী চন্দ্রগুপ্তের শিল্পনির্দেশে কোথাও কৃত্রিমতার লেশ মাত্র নেই। তেমনি কৃত্রিমতার রেশও কোথাও পাওয়া যায় না রবীন্দ্রশঙ্কর সংযোজিত আবহ সুরে। সবই দিশী বাজনা, মেঠো আর গেঁয়ো সুর, কিন্তু নাটকে চমৎকার মৌতাত যোগ করে গিয়েছে আগাগোড়া। তেমনি আবার প্রয়োজনবোধে দুর্যোগের দাপটও ব্যক্ত হয়েছে বাজনার মধ্যে দিয়ে। এদিক থেকে রবীন্দ্রশঙ্কর একটা অনুকরণীয় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। বিভিন্ন বাজনার সঙ্গে মেল সৃষ্টি করায়ও নতুনত্বের সন্ধান দিয়েছেন। ছবিখানি সম্পাদনায় দুলাল দত্তের কৃতিত্বও প্রশংসনীয়।

• • •

"পথের পাঁচালী"-র গুণ কীর্তন লিখে শেষ করা যায় না। এতো দিকে এতো গুণের ছবি আগে আর দেখা যায়নি। প্রতিটি ক্ষণ লোককে মুগ্ধ বিস্ময়ে ছবির ওপরে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে দেবার জোর সম্পন্ন এমন ছবিটি আর হয়নি। উদ্যানের প্রাকৃতিক শোভায় মুগ্ধ হতে যেমন আঙুল দিয়ে দেখিয়ে, বুঝিয়ে বলে দেবার দরকার হয় না তেমনি 'পথের পাঁচালী'-র গুণগুলোও স্বতই দর্শককে মুগ্ধ করে রাখে।

খেলার মাঠে

একলব্য

পুরস্কার ডেভিস কাপের খেলার অপর নাম হচ্ছে 'চ্যাম্পিয়নসিপ অব দি ওয়ার্লড' বা বিশ্ব টেনিস প্রতিযোগিতা। ডেভিস কাপের বিজয়ী দেশও টেনিসের বিশ্ব শ্রেষ্ঠ দেশ বলে পরিগণিত। তাই ডেভিস কাপ জয়ের আকাঙ্ক্ষা বিশ্বের সকল দেশের জাতীয় আকাঙ্ক্ষায় পরিণত হয়েছে। কিন্তু বেশী দেশের পক্ষে ডেভিস কাপ লাভ করা সম্ভব হয়নি। ১৯০০ সাল থেকে এই প্রতিযোগিতার আন্তর্জাতিক খেলা আরম্ভ হলেও এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে যে কয়টি দেশ ডেভিস কাপ লাভের স্বপ্নকে সার্থক করেছে, একটি আঙ্গুলেই তাদের নাম গণনা করা যায়। আমেরিকা, বৃটিশ আইলস, অস্ট্রেলিয়া, অস্ট্রেলেশিয়া, ফ্রান্স ও গ্রেট বৃটেন ছাড়া আর কোন দেশই এপর্যন্ত ডেভিস কাপ লাভ করতে পারেনি। এর মধ্যে এক আমেরিকাই ডেভিস কাপ ঘরে তুলেছে ১৮বার।

গতবার ডেভিস কাপের চূড়ান্ত খেলায় অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে আমেরিকা বিশ্ব টেনিসে তাদের নষ্ট গৌরবের পুনরুদ্ধার করেছিল, কিন্তু এবার চ্যালেঞ্জ রাউন্ডের খেলায় আমেরিকাকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে অস্ট্রেলিয়া আবার লাভ করেছে ডেভিস কাপ। সুতরাং একটানা ৪ বছর অস্ট্রেলিয়ায় অবস্থান করবার পর যে 'ডেভিস কাপ' গত ডিসেম্বর মাসে সিডনী কোর্ট থেকে 'ফরেস্ট হিল' যাত্রা করেছিল, ৮ মাস হাওয়া পরিবর্তনের পর তাকেই আবার অস্ট্রেলিয়ায় ফিরে আসতে হচ্ছে। এতে যুদ্ধোত্তর টেনিসে অস্ট্রেলিয়ার প্রাধান্য পুনরায় প্রমাণিত হল।

আন্তর্জাতিক টেনিসে বিজয়ী দেশের

আন্তর্জাতিক টেনিসের বিজয়ীর পুরস্কার ডেভিস কাপের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার দুই কীর্তিমান খেলোয়াড় লুইস হোড ও কেন রোজওয়াল

উইম্বলডনে আমেরিকার কৃতিত্বপূর্ণ সাফল্যের পর ডেভিস কাপে তাদের এমন শোচনীয়ভাবে হার স্বীকার করতে হবে, একথা খেলার আগে কেউই কল্পনা করতে পারেনি। উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন টনি ট্রাবার্ট, যিনি উইম্বলডনের ৭টি খেলার মধ্যে প্রতিপক্ষকে একটি সেটও দান করেননি। টেনিস নৈপুণ্যের সুচারু দক্ষতায় সাবলীলভাবে উইম্বলডন জয় করে হয়েছেন বিশ্বজয়ী, তিনি একটি খেলাতেও জিততে পারবেন না একথা কি কল্পনা করা সম্ভব? আবার টেনিসের অপ্রত্যাশিত ফলাফলের কথাও সর্বজনবিদিত। উইম্বলডন জয়ের পরই ট্রাবার্টকে আমেরিকার ওয়েস্টার্ন ট্রিস্টেট চ্যাম্পিয়নসিপের সেমি ফাইন্যালে জেরি মস নামক এক কলেজ ছাত্রের কাছে একটি সেট হারাতে হয়। মসের কাছে ট্রাবার্টের ম্যাচ হারাবারই উপক্রম হয়েছিল, কিন্তু কোনভাবে তিনি জেরিকে পরাজিত করেন। তারপর মেডো ক্লাবের আন্তর্জাতিক লন টেনিস চ্যাম্পিয়নসিপের সেমি ফাইন্যালে হার্টস ফ্লামের সঙ্গে খেলবার সময় ট্রাবার্ট পিঠে একটা ব্যথা অনুভব করেন। এই ব্যথাই ডেভিস কাপে আমেরিকার পরাজয়ের কারণ কিনা কে জানে! যাই হক ডেভিস কাপের চ্যালেঞ্জ রাউন্ডে অস্ট্রেলিয়ার কাছ থেকে একটি ম্যাচও লাভ করতে পারেনি আমেরিকা। ৪টি সিঙ্গলস এবং একটি ডাবলস সব খেলাতেই অস্ট্রেলিয়া জয়ী হয়েছে। ১৯৪৮ সালে আমেরিকা এইভাবে পাঁচটি খেলায় অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে ডেভিস কাপ লাভ করেছিল। নিউ ইয়র্কের ফরেস্ট হিলে আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ার চ্যালেঞ্জ রাউন্ডের খেলাকে কেন্দ্র করে প্রশান্ত মহাসাগরের ওপারে যে উৎসাহ উদ্দীপনার সাড়া জেগেছিল, খেলা শেষে স্বাভাবিকভাবেই তা মন্থর হয়ে গেছে। অবশ্য যুক্তরাষ্ট্রীয় লন টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপে এই দুই দেশের ধুরন্ধর খেলোয়াড়দের আবার পরস্পরের সম্মুখীন হতে দেখা যাবে। এ খেলারও আকর্ষণ কম নয়।

* * *

২৬শে আগস্ট ফরেস্ট হিলে ডেভিস কাপের চ্যালেঞ্জ রাউন্ডের উদ্বোধন দিনের

দুটি সিংগলস খেলাতেই বিজয়ী হয়ে অস্ট্রেলিয়া চ্যাম্পিয়ন কেন রোজওয়াল ভিক সেক্সাসকে পরাজিত করেন। অস্ট্রেলিয়ার লুইস হোড পরাজিত করেন উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন টনি ট্রাবার্টকে। দুটি খেলাতেই উন্নত টেনিস নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায় এবং তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেও সেক্সাস ও টনি পরাজয়ের হাত এড়াতে পারেন না। পরের দিন শুধু ডাবলসের খেলা। খেলা নয়, মরণ-পণ সংগ্রাম বলা চলে। সত্যিই মরণ-পণ সংগ্রাম। আমেরিকার সম্মুখে কঠিন সমস্যা। এই দিনের পরাজয়ের অর্থ আন্তর্জাতিক টেনিসে প্রতিষ্ঠা খর্ব। কেউই হার স্বীকার করতে রাজী নয়। টেনিস কোর্টে বাঘ-সিংহের লড়াই। এ ছোবল মারছে তো ও সেটা প্রতিরোধ করছে, ও ছোবল মারছে তো এ আটকে দিচ্ছে। মনের মধ্যে ভীষণ গর্জন। বাগে পেলে কেউ ছেড়ে দেবে না। বেস লাইন ও নেটের কোলে চলছে 'ভলি ও ড্রাইভের' বন্যা। অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে ডাবলসে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন উইম্বলডনের ডাবলস চ্যাম্পিয়ন হোড ও হার্টউইগ। আমেরিকার পক্ষে খেলছেন ট্রাবার্ট ও সেক্সাস। বিশ্বের দুই শ্রেষ্ঠ ডাবলস জুটি। প্রথম সেট মীমাংসিত হতে লাগল ৫৬ মিনিট। ১৪—১২ গেমে আমেরিকা সেট পেল। অস্ট্রেলিয়া নিল পরের দুটি সেট। চতুর্থ সেট পেল আমেরিকা। আবার সমস্যা। দীর্ঘ দু'ঘণ্টা ২৯ মিনিট দুই দেশের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর অস্ট্রেলিয়া জয়ী হল। মাঠের মধ্যে সে কি উল্লাস! যেন একটা সাম্রাজ্য জয় করেছে অস্ট্রেলিয়া। অস্ট্রেলিয়ার যে সব দর্শক ফরেস্ট হিলে উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা ছুটে এলেন মাঠের মধ্যে। জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গন করলেন বিজয়ী জুটিকে। প্রতিদ্বন্দ্বী ট্রাবার্ট ও সেক্সাস জানালেন অভিনন্দন।

পরের দিন বাকী দুটি সিংগলসের খেলা। জয় পরাজয়ের মীমাংসার পর এ খেলার আর তেমন আকর্ষণ নেই। তবু যদি আমেরিকা জয়লাভ করে পরাজয়ের গ্লানিকে লাঘব করতে পারে। কিন্তু যাদের ডেভিস কাপ দখলে রাখার স্বপ্ন ভেঙে গেছে,—ভেঙেছে মনোবল তাদের পক্ষে কি আর জয়লাভ সম্ভব! তাই কোন খেলাতেই জিততে পারেনি আমেরিকা।

চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডের খেলার ফলাফল ঃ—

সিংগলস—প্রথম দিন

কেন রোজওয়াল ৬—৩, ১০—৮, ৪—৬ ও ৬—২ গেমে ভিক সেক্সাসকে পরাজিত করেন।

লুইস হোড ৪—৬, ৬—৩, ৬—৩ ও ৬—৬ গেমে টনি ট্রাবার্টকে পরাজিত করেন।

ডাবলস—দ্বিতীয় দিন

লুইস হোড ও রেক্স হার্টউইগ ১২—১৪, ৬—৪, ৬—৩, ৩—৬, ও ৭—৫ গেমে টনি ট্রাবার্ট ও ভিক সেক্সাসকে পরাজিত করেন।
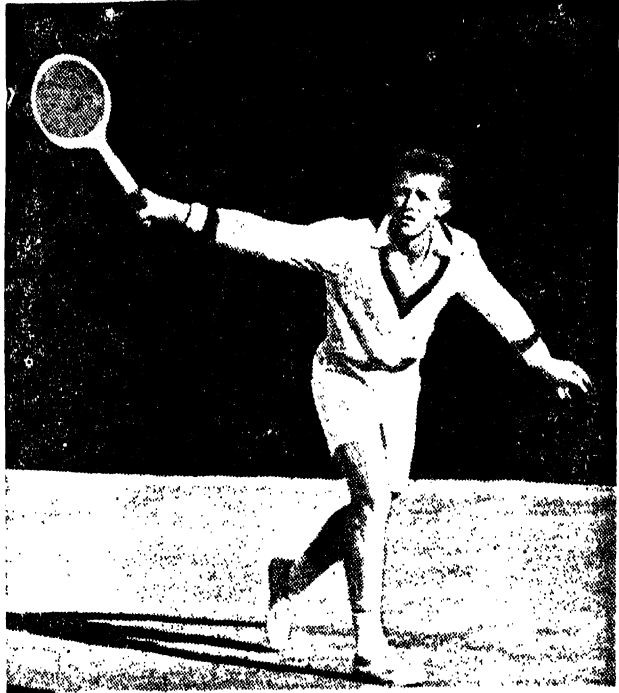
উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন টনি ট্রাবার্টের দীপ্তিময় খেলার দৃশ্য

সিংগলস—তৃতীয় দিন

লুইস হোড ৭—৯, ৬—১, ৬—৪ ও ৬—৪ গেমে ভিক সেক্সাসকে পরাজিত করেন।

আমেরিকার পয়লা নম্বর খেলোয়াড় ভিক সেক্সাসের খেলার ভঙ্গি

কেন রোজওয়াল ৬—৪, ৩—৬, ৬—১ ও ৬—৪ গেমে হ্যাম রিচার্ডসনকে পরাজিত করেন।

* * *

স্বাধীনতা সপ্তাহে গুণীজন সম্বর্ধনার আয়োজনের মধ্যে একজন ক্রীড়াবিদকে সম্মান দান আমাদের দেশের সাংস্কৃতিক তথা ক্রীড়াক্ষেত্রের এক ঐতিহাসিক ঘটনা। শিক্ষায়-দীক্ষায়, সাহিত্যে, শিল্পনৈপুণ্যে, বীরত্বে এবং নাট্য ও কাব্যগাথায় যারা দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছেন, বাঙলা মায়ের সেই সব সুসন্তানদের সম্বর্ধনাসভায় এমন একজন ফুটবল খেলোয়াড়ের ডাক পড়ে, যার নাম বাঙলার ঘরে ঘরে, ছেলেবুড়ো তরুণের মুখে মুখে একদিন কীর্তিত হয়েছে, যাঁর ক্রীড়া-শৌর্যের কথা স্মরণ করলে এখনো গর্বে সবার বুক ফুলে ওঠে। অতীতের এই কীর্তিমান খেলোয়াড় হচ্ছেন শ্রীগোষ্ঠ পাল।

অবশ্য পাঁচজন গুণীজনের সম্বর্ধনার সঙ্গে শ্রীপালের সম্বর্ধনার কিছু পার্থক্য আছে। হিমালয় বিজয়ী বীর তেনজিংয়ের সম্বর্ধনা সভায় শ্রীপালকে সভাপতির আসনে বরণ করে প্রদেশ কংগ্রেসের কর্তৃপক্ষ আগেই তাঁকে পরোক্ষ সম্বর্ধনা জানিয়েছিলেন। স্বাধীনতা সপ্তাহের অনুষ্ঠানের সমাপ্তি

দিবসে 'গোষ্ঠ পাল অভিনন্দন সমিতির' তরফ থেকে তাঁকে পৃথকভাবে অভিনন্দিত করে গুণমুগ্ধ দেশবাসীর অন্তরের দান হিসেবে পাঁচ হাজার টাকার একখানি 'চেক' উপহার দেওয়া হয়। এই সভাতেই ঘোষণা করা হয়, মোহনবাগান ক্লাব মারফত বাঙলার জনপ্রিয় রাজ্যপাল ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখার্জি শ্রীপালকে ১০ হাজার টাকা উপহার দেবেন, মোহনবাগান ক্লাবের তরফ থেকেও আরও কিছু অর্থদানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। আমরা আগেই বলেছি, খেলোয়াড় জীবনে পরিপূর্ণ সাফল্য, যশ-মান এবং প্রতিষ্ঠা অর্জন করলেও আর্থিক দিক দিয়ে অতীতের এই দিকপাল খেলোয়াড়ের নিরহঙ্কার জীবন ব্যর্থতার ইতিহাসে পূর্ণ। জীবনের পাথেয় কিছুই নেই। তাই দেশবাসীর অন্তরের এই দান বৃটিশ যুগের অমিতবিক্রম এই ক্রীড়াবিদের জীবনযাত্রাকে সহজ করে তুলবে। এ সম্মান গোষ্ঠ পালের আগেই পাওয়া উচিত ছিল। দেরিতে হলেও ক্রীড়াক্ষেত্রে গোষ্ঠবাবুর অতুলনীয় দানের কথা যে দেশবাসী ভুলে যায়নি, এটাই আনন্দের কথা।

খেলোয়াড় হিসেবে গোষ্ঠ পালের নাম না শুনেছেন এমন লোক বাঙলায় নেই বললেই চলে। তাঁর খেলোয়াড়োচিত বীরপনার অতীত

গোষ্ঠ পালের খেলোয়াড় জীবনের ছবি—কি সুঠাম গঠন, কি স্বাস্থ্যোজ্জ্বল দেহশ্রী

কাহিনী আজ উপকথায় পরিণত। তাঁর অনবদ্য ক্রীড়ানৈপুণ্যের মাধুর্য ফুটবল রসিকদের মাতাল করে তুলেছিল আর বৃটিশ সামরিক ও বে-সামরিক দলের বিরুদ্ধে গোষ্ঠ পালের ক্রীড়াশৌর্য স্বদেশপ্রাণ বাঙালীর মনে এনে দিয়েছিল সংগ্রামী শক্তির প্রেরণা। খেলার মাঠের বর্মে চর্মে আবৃত বৃটিশ শক্তির প্রতিভূ ইংরেজ দলগুলির বিরুদ্ধে খালি পায়ে খেলে আমরা যদি জয়লাভ করতে পারি, পর্যুদস্ত করতে পারি তাদের পল্টনী ক্রীড়াশৌর্যকে, তবে তাদেরই বা এদেশ থেকে নড়াতে পারবো না কেন? খেলার মাঠে ইংরেজ দলের পরাজয়ের ঘটনা এই আত্মবিশ্বাস অর্জনের কম সহায়ক হয়নি। এবং প্রধানত গোষ্ঠ পালের সিংহ-বিক্রম ক্রীড়াধারাকে কেন্দ্র করেই এই আত্মবিশ্বাস দানা বেঁধে উঠেছিল। গোষ্ঠবাবুর এই ক্রীড়াখ্যাতি সম্পর্কে নতুন করে বলবার কিছুই নেই। দৈনিক কাগজে এ বিষয়ে যথেষ্টই আলোচনা হয়েছে, তাঁর জীবনীও প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন পত্রিকায়। কংগ্রেস মণ্ডপের সম্বর্ধনা সভায় উপস্থিত সুধীবর্গ নানাভাবে তাঁকে সম্বর্ধনা জানিয়ে তাঁর প্রতি অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

ভারত সরকারের পুনর্বাসন বিভাগের সহকারী মন্ত্রী নেতাজীর আই এন এ খ্যাত সংগ্রামী বীর মেজর জেনারেল জে কে ভোঁসলে গোষ্ঠ পালকে মাল্যভূষিত করে বলেন—"আমি আজ আর এক সংগ্রামী বীরের গলায় মাল্য অর্পণ করছি, যিনি খেলার মধ্য দিয়ে প্রকৃত বীরের সম্মান অর্জন করেছেন।" বাঙলা সরকারের তরফ থেকে মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন গোষ্ঠ পালকে মাল্যভূষিত করে তাঁর অতীত ক্রীড়াশৌর্যের প্রশংসা করেন। কলকাতা কর্পোরেশনের ডেপুটী মেয়র ডাঃ অমর মুখার্জি নাগরিকদের পক্ষ থেকে শ্রীপালকে সম্বর্ধনা জানাতে এসে বলেন—'হে বীর, তোমাকে নানা জনে নানাভাবে সম্বোধন করেছে। কেউ বলেছে 'বাঙলার বাঘ, কেউ বলেছে মত্ত সিংহ, কেউ বলেছে গ্রেট পল, আবার কেউ বলেছে চাইনিজ ওয়াল। আমি তোমায় বাঙলার বীর বলেই সম্বোধন করে নাগরিকদের পক্ষ থেকে অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।' আচার্য সুনীতি চ্যাটার্জি জাতীয় জীবনে খেলাধুলার প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করে গোষ্ঠ পালের ক্রীড়াশৌর্য বাঙালীকে কতখানি জাতীয় ভাবধারায় অনুপ্রাণিত করেছিল, তা বিবৃত করেন। সাহিত্যিক কুলের পক্ষ থেকে প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীতারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায় শ্রীপালকে অভিনন্দিত করে বলেন, আমরা পটল চেরা চোখ, বাঁশীর মত নাক, কন্দর্পের মত চেহারার নায়ক খুঁজে বেড়িয়েছি, যদি শ্রীপালের মত নায়ক খুঁজতাম, তবে দেশ অনেক দূর এগিয়ে যেতে পারতো। সাহিত্যিক শ্রীসজনীকান্ত দাশ নিজেকে কল্পনার মাঠের খেলোয়াড়রূপে বর্ণনা করে বলেন—কল্পনার মাঠের খেলোয়াড় আজ বাস্তব খেলোয়াড়কে সম্বর্ধনা জানাবার সুযোগ পেয়ে ধন্য হ'ল। তিনি আরও বলেন—"আমাদের ছেলে বিজয় সিংহ লঙ্কা করিয়া জয়, সিংহল নামে রেখে গেছে নিজ শৌর্যের পরিচয়।" বিজয় সিংহের সেই সিংহলে গোষ্ঠ পাল আর একদল বাঙালী নিয়ে গিয়ে ক্রীড়াশৌর্যের পরিচয় দিয়ে এসেছেন। বাঙলার এই বীর সন্তানকে সম্মান জানিয়ে বাঙালী মাত্রেই সম্মানিত হল। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ শ্রীপালের ক্রীড়া মনীষার উল্লেখ করে বলেন, আজ একজন ক্রীড়াবিদকে সম্বর্ধনা জানাবার উদ্দেশ্যে ক্রীড়াক্ষেত্রে আমাদের ঋণ স্বীকার করা। প্রতি বছরই ক্রীড়াক্ষেত্রের সম্মানিত বীরকে এভাবে সম্বর্ধনা জানাবার আমাদের ইচ্ছে আছে। এটা তার প্রথম সূচনা। জাতীয় জীবনে খেলাধুলার আজ যে প্রয়োজন জাতিকে তা বিস্মৃত হলে চলবে না।

সম্বর্ধনার উত্তর দিতে উঠে শ্রীগোষ্ঠ পাল আবেগ জড়িত কণ্ঠে বলেন—আপনারা আমাকে আজ যে সম্মান দিলেন, এর আমি সম্পূর্ণই অযোগ্য। এ সম্মান আমার প্রাপ্য নয়—এ সম্মান এই জামার। এই বলে গোষ্ঠবাবু সবার সম্মুখে মোহনবাগান ক্লাবের সবুজ ও লাল রংয়ের ইউনিফর্ম উঁচু করে ধরেন। তিনি বলেন, এই জামা-ই আমাকে সম্মান দিয়েছে—এই জামা-ই আমার ধ্যানজ্ঞান, জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এই জামা যেন আমাকে ত্যাগ না করে। গোষ্ঠবাবু আর

কথা বলতে পারেন না। তার কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হয়ে আসে। তারপর নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে তরুণ খেলোয়াড়দের উদ্দেশ্যে কয়েকটি কথা বলেন।

মোহনবাগান ক্লাব ইউনিফর্মের উপর গোষ্ঠবাবুর এই টান তাঁর ক্লাবপ্রীতির জাজ্বল্যমান প্রমাণ। ক্লাবের প্রতি কতখানি প্রীতি, কতটা দরদ থাকলে সেই ক্লাবের ইউনিফর্মকে জীবনের অচ্ছেদ্য বর্মরূপে কল্পনা করা যায়, তা অনুমান করা কষ্টসাধ্য নয়। বাস্তবিকপক্ষে মোহনবাগান ক্লাব ছিল গোষ্ঠবাবুর প্রাণ। জীবনে কত প্রলোভন এসেছে, কত রঙীন আশার হাতছানি, কিন্তু গোষ্ঠবাবুর ক্লাব-প্রীতি এতটুকু খর্ব করতে পারেনি। শুধু ক্লাব-প্রীতিই নয়, খেলোয়াড় জীবনের মধ্যেই আমরা পেয়েছি গোষ্ঠ পালের জাতীয় চরিত্রের পরিচয়। আই এফ এর দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে তিনি অধিনায়ক নির্বাচিত হয়েও ভারতীয়ের বিরুদ্ধে দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের উৎকট বর্ণবিদ্বেষের জন্য দক্ষিণ আফ্রিকা সফর করেননি। গোষ্ঠবাবুর জীবনের মধ্যেও আমরা পেয়েছি দুই বিপরীতধর্মী চরিত্রের পরিচয়। মাঠের মধ্যে যাকে দেখেছি দুর্দম, দুর্বার, মাঠের বাইরে তাকে দেখেছি মূক, অসহায়, দেখেছি বিনম্র শান্ত। চরিত্রের এই মাধুর্য, এই চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং এই ক্লাব প্রীতির সঙ্গে প্রতিভা মিশে গোষ্ঠবাবুকে বড় করে তুলেছে, তাঁকে করেছে দীপ্তিমান।

অভিনন্দন সমিতির পক্ষ থেকে গোষ্ঠ-বাবুকে যে মানপত্র দেওয়া হয়েছে, এখানে তা প্রকাশ করার লোভ সম্বরণ করতে পারছি না।

গোষ্ঠ পালের সম্বর্ধনা সভায় প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ শ্রী পালকে পাঁচ হাজার টাকার একখানি চেক ও মানপত্র উপহার দিচ্ছেন

অভিনন্দন পত্র

১৯১১ সনে বাঙালী যেদিন অকস্মাৎ খেলার মাঠে ইংরেজকে হারাইয়া সাময়িকভাবে আত্মমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন প্রধান সমস্যা দাঁড়াইল সেই নবলব্ধ গৌরব অব্যাহত রাখার। ১৯১২ সনের সেই সংকটকালে হে বীর! কলিকাতার ক্রীড়াক্ষেত্রে তুমি অবতীর্ণ হইলে

"পাণ্ডব-শিবির দ্বারে রুদ্রেশ্বর যথা
শূলপাণি!"

এবং হিমাচলের মত ব্যূহমুখে দণ্ডায়মান হইয়া বাঙালীর অর্জিত সম্মান শুধু অক্ষুণ্ণ রাখিলে না, দিনে দিনে বর্ধিত করিয়া জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও তাহার আত্মশক্তি উদ্বুদ্ধ করিবার সহায়তা করিলে। খেলার মাঠে তোমার অটল মহিমা বাঙালীকে নূতন সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিল।

তাহার পর, দীর্ঘকাল সেই সম্মানের কেন্দ্র—সেই মিলন-তীর্থ বা গোষ্ঠকে পালন করিয়া তাহার যশোজ্যোতি অম্লান রাখিয়া তুমি অবসর গ্রহণ করিয়াছ। তোমার অতীত গৌরব স্মরণ করিয়া হে গোষ্ঠ পাল, আমরা তোমাকে নতি নিবেদন করিতেছি। তুমি আমাদের প্রণাম গ্রহণ কর।

হে সৌম্য, ক্রীড়াক্ষেত্রে তোমার সুন্দর আবির্ভাব দর্শকদের চিত্তে যে আশা, আনন্দ ও মাধুর্যের সঞ্চার করিত, তাহা ভুলিবার নহে। তোমার উপস্থিতিই সকলের ভরসা ছিল। চীনের প্রাচীরের মত অন্তঃপুর সুরক্ষিত করিয়া তুমি দাঁড়াইলেই আমরা উৎসাহিত হইয়া উঠিতাম। শত্রু মিত্র সকলেই বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে তোমার গৃহসংরক্ষণ-কৌশল প্রত্যক্ষ করিত। তোমার সেই নয়নাভিরাম মহিমা স্মরণ করিয়া আজ তোমার জীবন-অপরাহ্ণে আমরা শ্রদ্ধা ও প্রীতির অর্ঘ্য লইয়া উপস্থিত হইয়াছি। তুমি গ্রহণ করিয়া আমাদের ধন্য কর।

হে ধীর, তুমি ধৈর্য ও আত্মপ্রত্যয়ের অবতার ছিলে। তোমাকে পাইয়া আমরাই শুধু লাভবান হই নাই, সমগ্র ভারত তোমার ধীরতার আদর্শ গ্রহণ করিয়াছে। ময়দানের সংগ্রামে বীর সেনানায়কের ন্যায় তোমার অকুতোভয় অধিষ্ঠান, তোমার বিচক্ষণ পরিচালনা এবং নিয়ম-শৃংখলার প্রতি একনিষ্ঠ অনুরাগ আজও ভারতের ক্রীড়াবিদদের অনুপ্রাণিত করিয়া থাকে। তোমাকে পাইয়া বাঙালী আমরা ধন্য। এই শুভদিনে শুভ-লগ্নে তোমাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া আজ আরও ধন্য হইলাম। হে বীর, হে সৌম্য, হে ধীর, হে গোষ্ঠ পাল তুমি শতায়ু হইয়া জীবনের অভিজ্ঞতাপ্রসূত উপদেশের দ্বারা আমাদের ক্রীড়াক্ষেত্র পরিচালিত করিতে থাক। তোমার আদর্শে ও উপদেশে আমাদের জীবন সুন্দর ও সুষমামণ্ডিত হউক।

গোষ্ঠ পাল অভিনন্দন সমিতির পক্ষ হইতে
শ্রীঅতুল্য ঘোষ,
সভাপতি
কলিকাতা, ২২শে আগস্ট, ১৯৫৫
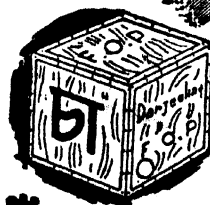
দেশী সংবাদ

২২শে আগস্ট—ভারত সরকার ব্যাংক বিরোধ সম্পর্কে গজেন্দ্র গদকার কমিশনের সুপারিশসমূহ পুরোপুরিভাবে গ্রহণ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বলিয়া আজ সংসদে ঘোষণা করা হয়।

লোকসভায় প্রেস কমিশনের রিপোর্ট সম্পর্কে বিতর্কের জবাব দানকালে তথ্য ও বেতার মন্ত্রী ডাঃ কেশকার বলেন যে, বেতনভুক ব্যার্তাজীবীদের চাকুরির শর্তাবলী সম্বন্ধে সরকার শীঘ্রই একটি বিল উত্থাপন করিবেন।

২৩শে আগস্ট—আজ পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় বিরোধী পক্ষের প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও বিপুল ভোটাধিক্যে ১৯৫৫ সালের কলিকাতা ও শহরতলী পুলিস সংশোধন বিলটি গৃহীত হয়।

আজ রাজ্য বিধান সভায় সেচমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখার্জি জানান যে, এই বৎসর পশ্চিমবঙ্গে কোচবিহার দার্জিলিং প্রভৃতি জেলায় বন্যার ফলে প্রায় ১২৫০ বর্গমাইল পরিমিত অঞ্চল জলপ্লাবিত হইয়াছে এবং তিনজনের মৃত্যু সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

আজ পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি কর্তৃক আয়োজিত স্বাধীনতা সপ্তাহ উৎসবের শেষ দিবসের অনুষ্ঠানে নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ীকে সম্বর্ধনা জানান হয়।

২৪শে আগস্ট—পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্বায়ত্তশাসনের কেন্দ্রস্থলরূপে উপযুক্ত ক্ষমতা ও অধিকার দিয়া 'গ্রাম পঞ্চায়েৎ' গঠনের উদ্দেশ্যে একটি বিল প্রণয়ন করিয়াছেন। বিলটির নাম রাখা হইয়াছে "১৯৫৫ সালের পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েৎ বিল"।

গত রাত্রে নবদ্বীপ ও মুর্শিদাবাদ রেল স্টেশনদ্বয়ের মধ্যে চার নম্বর গুমটির নিকট চলন্ত ডাউন পার্সেল ট্রেন থামাইতে গিয়া ছয়জন উদ্বাস্তু নিহত ও পাঁচজন গুরুতররূপে আহত হইয়াছে।

আরোণ্ডায় পর্তুগীজের গুলীতে আহত বীর রমণী শ্রীযুক্তা সুভদ্রা বাঙ্গৈকে অসীম সাহসিকতার সহিত পর্তুগীজ বুলেটের সম্মুখীন হওয়ার জন্য আজ স্বর্ণপদকে ভূষিত করা হয়। ১৫ই আগস্ট গণ-সত্যাগ্রহে তিনি পর্তুগীজ পুলিসের গুলীতে আহত হন।

পশ্চিমবঙ্গের পুনর্বসতি মন্ত্রী শ্রীমতী রেণুকা রায় ও কেন্দ্রীয় পুনর্বসতি উপমন্ত্রী শ্রী কে ভোঁসলের মধ্যে উদ্বাস্তু কলোনীতে জাতীয় পরিকল্পনা প্রবর্তন সম্বন্ধে আলোচনা হয়। উক্ত সম্মেলনে উদ্বাস্তুদের মধ্যে শারীরিক ব্যায়াম ও নৈতিক শিক্ষা প্রবর্তনের এবং উহার জন্য উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগের প্রস্তাব করা হয়।

২৫শে আগস্ট—গোয়ার মুক্তি আন্দোলন দমন করার জন্য একটি নূতন সামরিক ঘাটি

খোলা হইয়াছে এবং পর্তুগীজ পুলিস বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

জম্মুর নেকোয়াল ঘটনা সম্পর্কে লোকসভায় এক প্রশ্নের উত্তরে প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরু বলেন, রাষ্ট্রপুঞ্জের পর্যবেক্ষকদের রিপোর্টে পাকিস্থানের উপরই সম্পূর্ণ দোষারোপ করা হইয়াছে। এই ঘটনায় পাকিস্থানী সৈন্যবাহিনীর গুলী চালনায় ৮ জন ভারতীয় নিহত হয়।

রাষ্ট্রীয় শ্রমিক বীমা সম্পর্কে শ্রমিকদের অবশ্য দেয় অর্থ সাহায্য মজুরী হইতে কাটিয়া রাখার বিরুদ্ধে উলুবেড়িয়ায় লাডলো চটকলের শ্রমিকরা গতকল্য যে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে, আজ উহা ঐ মহকুমার আরও ৪টি চটকলে বিস্তৃতি লাভ করে।

২৫শে আগস্ট—শাস্তি হিসাবে বেত্রদণ্ড রহিত করিয়া আজ রাজ্যসভায় একটি বিল গৃহীত হইয়াছে।

উত্তর প্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশের কুখ্যাত ডাকাত সর্দার মানসিং গোয়ালিয়রের নিকট পুলিস বাহিনী ও তাঁহার দলের মধ্যে সংঘর্ষকালে গুলীতে নিহত হইয়াছে।

২৬শে আগস্ট—কলিকাতার গৃহ সমস্যার সমাধান সম্পর্কে আজ পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় সর্বসম্মতিক্রমে একটি বে-সরকারী প্রস্তাব গৃহীত হয়। উক্ত প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, কলিকাতা নগরী এবং শহরতলীর শিল্পাঞ্চলগুলিতে অল্প আয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে যে কঠিন গৃহ সমস্যা দেখা দিয়াছে তাহা বিবেচনা করিয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকার শিল্প-মালিকগণের পক্ষে অল্প আয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য যথাযোগ্য গৃহ নির্মাণের কাজ আন্তরিকভাবে হাতে লওয়া উচিত।

২৭শে আগস্ট—আসামের বন্যাপীড়িত অঞ্চল পরিদর্শনের জন্য প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরু আজ নয়াদিল্লী হইতে বিমানযোগে গৌহাটিতে পৌঁছেন।

ভারত-পাকিস্থান বাণিজ্য চুক্তি উভয় সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হইয়া অদ্য প্রকাশিত হইয়াছে। এই চুক্তি অনুসারে পূর্ববঙ্গের সীমান্ত এলাকায় ব্যবসা-বাণিজ্যের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হইয়াছে এবং চলচ্চিত্র ব্যবসায় সম্পর্কে একটি বিশেষ বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

২৮শে আগস্ট—[illegible] গোয়া মুক্তি কমিটির অধিবেশনে আগামী ২রা অক্টোবর মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিবসে গোয়ায় পাঁচশত সত্যাগ্রহী প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। মুক্তি কমিটি এক প্রস্তাবে পর্তুগীজদের নির্মম অত্যাচার সত্ত্বেও চূড়ান্ত জয় না হওয়া পর্যন্ত ব্যক্তিগত ও গণ-সত্যাগ্রহ চালাইয়া যাইবার সংকল্প প্রকাশ করিয়াছেন।

রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ অদ্য সারদরশার (বিকানীর) হইতে তিন মাইল দূরবর্তী একস্থানে গান্ধী বিদ্যামন্দিরের প্রধান ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। এই গান্ধী বিদ্যামন্দিরই ভারতের প্রথম পল্লী বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরু আজ শিলং-এ এক বিরাট জন-সমাবেশে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, ভারত কল্যাণ রাষ্ট্র গঠন এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজ পদ্ধতি প্রবর্তনের লক্ষ্য-পথে তীর্থযাত্রীর মত অগ্রসর হইতেছে। এই মহান তীর্থযাত্রায় যোগদানের জন্য তিনি সমগ্র দেশবাসীর প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান।

বিদেশী সংবাদ

২৩শে আগস্ট—আমেরিকার টেক্সাসের একটি রেস্তোরাঁয় প্রধান ভোজনকক্ষে ভারতীয় দূত শ্রী জি এল মেটা এবং তাঁহার সেক্রেটারীকে আহার করিতে দেওয়া হয় নাই বলিয়া মার্কিন রাষ্ট্রদপ্তর অদ্য ভারত সরকারের নিকট ত্রুটি স্বীকার করিয়াছেন।

২৪শে আগস্ট—প্রাক্তন পাক-প্রধানমন্ত্রী জনাব মহম্মদ আলী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাক-রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হইয়াছেন বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে।

২৫শে আগস্ট—মরক্কোর ফরাসী নিরাপত্তা বাহিনীর প্রধান কর্মকর্তা জেনারেল লেবলাঙ্ক পদত্যাগ করিয়াছেন। প্রকাশ, মরক্কো হইতে জাতীয়তবাদ নিশ্চিহ্ন করার জন্য তিনি যে সকল ক্ষমতা চাহিয়াছিলেন, রেসিডেণ্ট জেনারেল মঃ গ্র্যাণ্ডভ্যাল তাহা মঞ্জুর করেন নাই বলিয়া তিনি পদত্যাগ করেন।

২৬শে আগস্ট—ফ্রান্স ন্যাটো নিয়ন্ত্রণাধীন সৈন্যবাহিনী হইতে সৈন্য সরাইয়া আনিয়া উহার এক ডিভিশন আলজিরিয়ায় সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

২৭শে আগস্ট—সোভিয়েট রেডক্রস ও রেড ক্রিসেণ্ট এসোসিয়েশন আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উত্তর প্রদেশের বন্যাপীড়িত জনসাধারণের জন্য প্রধানমন্ত্রী নেহরুর জাতীয় সাহায্য ভাণ্ডারে এক লক্ষ টাকা দান করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

২৮শে আগস্ট—মিশরের প্রধানমন্ত্রী লেঃ কর্নেল আবদুল নাসের উত্তর আফ্রিকায় ন্যাটো বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ফরাসী সেনা নিয়োগের বিরুদ্ধে বৃটেন ও উত্তর অতলান্তিক চুক্তি সংস্থাভুক্ত অপর ১১টি রাষ্ট্রের নিকট প্রতিবাদ জানাইয়াছেন।

প্রতি সংখ্যা—/৫ [illegible] বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০,
[illegible] ৬ এ ৮, সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১৩
[illegible] কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস লিমিটেড হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সম্পাদক—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন

সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

সাময়িক প্রসঙ্গ

কংগ্রেস ও গোয়া

কংগ্রেস এতদিন পর্যন্ত গোয়া-সম্পর্কে ব্যাপক সত্যাগ্রহ সমর্থন না করিলেও ব্যক্তিগতভাবে সত্যাগ্রহ নিষিদ্ধ করেন নাই; কিন্তু নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির বিগত অধিবেশনে সুস্পষ্টভাষায় ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহও নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী লোকসভাতেও এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন। তাঁদের মতে, নিজেদের দেশ সম্পর্কে ইতিপূর্বে সত্যাগ্রহের নীতি অবলম্বিত হইলেও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাহা অবলম্বিত হয় নাই। গোয়া ভারতের অন্তর্ভুক্ত ঠিকই; কিন্তু ভারতীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত নহে। গৃহীত প্রস্তাবের দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, গোয়াসম্পর্কে কংগ্রেস ভারত সরকারের নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া চলিতে চাহেন। শুধু ইহাই নয় তাঁহারা কার্যত এই সম্বন্ধে সব দায়িত্ব একমাত্র ভারত সরকারের উপর ন্যস্ত রাখিয়াই সন্তুষ্ট থাকার পক্ষপাতী। ভারতের প্রধানমন্ত্রী এই আশ্বাস দিয়াছেন যে, গোয়া সমস্যার কতদিনে সমাধান হইবে তিনি তাহা বলিতে পারেন না, তবে এই কথা জোরের সঙ্গে বলিতে পারেন যে, শেষটায় ভারতেরই জয় হইবে। গোয়ার মুক্তির জন্য ভারত সরকার সঙ্গত সর্ববিধ উপায় অবলম্বন করিবেন কংগ্রেসের প্রস্তাবে এই আশ্বাস পোষণ করা হইয়াছে। ইহাতে মনে হয়, ভারত সরকারের এতদসম্পর্কিত নীতি সম্বন্ধে সমিতির সদস্যগণের [illegible] কিছু পরিচয় আছে, কিন্তু [illegible] লোকে তাহার কিছুই জানে না। [illegible] গৃহীত প্রস্তাবের যৌক্তিকতা [illegible] দেশের লোকের মনে নানারকম [illegible] সৃষ্টি হইবে ইহা অসম্ভব নয়। গোয়া সম্পর্কে ভারত সরকারের অবলম্বিত নীতির পরবর্তী পর্যায়গুলির সহিত পরিচয় এবং তাহার কার্যকারিতাই দেশের লোকের মন হইতে এই সংশয় দূর করিতে পারে। প্রস্তাবে ভারত সরকারের উপর গুরুতর দায়িত্বভার ন্যাস্ত হইয়াছে। তাঁহারা তৎপ্রতিপালনের দ্বারা জনমতের মর্যাদা রক্ষায় কিভাবে অগ্রসর হন, ইহাই দ্রষ্টব্য। ফলত কংগ্রেসের প্রস্তাবে জাতির পক্ষে একান্তই অসহায়ত্ব-মূলক পরিস্থিতির সৃষ্টি হইয়াছে। ইহা দূর করা প্রয়োজন।

পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের বাস্তুত্যাগ

পূর্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মিঃ আবু-হোসেন সরকার সম্প্রতি এই আশা প্রকাশ করিয়াছেন যে, এই বৎসরের মধ্যেই পূর্ববঙ্গ হইতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বাস্তুত্যাগ সম্পূর্ণ বন্ধ হইবে। তাঁহার মতে কয়েক সপ্তাহ হইল পূর্ব-বঙ্গের অবস্থার অনেকটা উন্নতি সাধিত হইয়াছে। পূর্ববঙ্গ হইতে বাস্তুত্যাগীদের হিসাব অবশ্য তাঁহার এই উক্তি অনেকটা সমর্থন করে। দেখা যায়, জুলাই মাসের প্রথম দুই সপ্তাহে পূর্ববঙ্গ হইতে ২৪ হাজার নরনারী পশ্চিমবঙ্গে আসে, আগস্ট মাসের প্রথম দুই সপ্তাহে সেই সংখ্যা অনেকটা হ্রাস পাইয়া ৮ হাজারে দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু বাস্তুত্যাগীদের সংখ্যার এই সাময়িক হ্রাস বৃদ্ধি আদৌ নির্ভরযোগ্য নহে। কারণ পাকিস্থানী রাজনীতির অব্যবস্থিত গতি। তাহার ফলে এই হিসাব কয়েক দিনের মধ্যে একেবারে উল্টাইয়াও যাইতে পারে। সেইরূপ অভিজ্ঞতা আমাদের আছে। সুতরাং পূর্ববঙ্গ হইতে সংখ্যা-লঘু সম্প্রদায়ের বাস্তুত্যাগ যদি বন্ধ করিতে হয়, তবে তাহার মূল-গত যে কারণ তাহাই দূর করা প্রয়োজন। পূর্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী এ সম্বন্ধে এই অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছেন যে, পূর্ব-বঙ্গের হিন্দুদের বাস্তুত্যাগের মূলে আংশিকভাবে অর্থনৈতিক কারণ রহিয়াছে, নিজেদের নিরাপত্তা সম্বন্ধে মিথ্যা আশঙ্কা দ্বিতীয় কারণ। অর্থনৈতিক কারণের কথা আমরা অনেকদিন হইতে শুনি। কিন্তু এ সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠে এই যে, তথাকার অর্থনৈতিক কারণে মুসল-মানরা দেশ ত্যাগ করে না হিন্দুরাই শুধু করে কেন? এই প্রশ্নের একমাত্র উত্তর এই যে, মুসলমানরা ভবিষ্যতে তাহাদের অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটিবে এই আশা রাখে। কিন্তু, হিন্দুরা তাহাদের অর্থনৈতিক দুর্গতি হইতে ভবিষ্যতে পরিত্রাণ লাভের কোন সম্ভাবনাই দেখে না। পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় শিক্ষায় দীক্ষায় সমুন্নত। তাঁহারা বলিষ্ঠ-চেতা বীর্যবান্ এবং অত্যুগ্র স্বদেশ-প্রেমিক। ভারতের ইতিহাস এ সত্য প্রমাণ করে। রাষ্ট্রনীতিক কোন্ দুর্দৈবের পাকে পড়িয়া পূর্ববঙ্গের সেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায় আজ এইরূপ অসহায় অবস্থার ভিতর পড়িয়াছেন যে, পিতৃ-পিতামহের বাস্তুভিটা ছাড়িয়া তাহাদিগকে দুর্গতের জীবন বরণ করিয়া লইতে হইতেছে। সভ্য জগতের ইতিহাসের ইহা এক মর্মান্তিক অধ্যায়। পূর্ববঙ্গের মুখ্য-

মন্ত্রী এই মর্মান্তিক দুঃখ হইতে পূর্ব-বঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে উদ্ধার করিয়া তথাকার রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রাণ-ধর্মের প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবেন কি?

জাতীয় পতাকার মর্যাদা

পাটনায় পণ্ডিত জওহরলাল সম্প্রতি তথাকার ছাত্রদের আন্দোলন সম্পর্কে যে বক্তৃতা করেন, শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ তাহার বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়া এক দীর্ঘ বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন। পাটনায় না হোক্ বিহারের কোন কোন স্থানে ছাত্রদের আন্দোলন সম্পর্কে জাতীয় পতাকার প্রতি যে অমর্যাদা প্রদর্শিত হয়, ছাত্রসমাজের মুখপাত্রগণ সে কথা অস্বীকার করিতে পারেন নাই। সেজন্য তাঁহারা ভারতের প্রধানমন্ত্রীর নিকট ক্ষমা ভিক্ষাও করিয়াছেন। ইহার পর জাতীয় পতাকার এই প্রসঙ্গ চাপা পড়া উচিত ছিল। কিন্তু নেতৃত্বাভিমান ভিন্ন বস্তু। তাহার বশে পড়িয়া শ্রীজয়-প্রকাশ নারায়ণ এই অপ্রিয় প্রসঙ্গটি আবার উস্কাইয়া তুলিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, তিনি এমন কথা পর্যন্ত বলিয়াছেন যে, এক খণ্ড বস্ত্রের প্রতি অনুরাগ দেখাইলেই দেশপ্রেম হয় না। তাঁহার মতে, ভারতের জাতীয় পতাকা এক টুকরা ন্যাকড়া ছাড়া আর কিছুই নয়। বস্তুতান্ত্রিকতা আমরা অনেক রকম দেখিয়াছি, কিন্তু বস্তুতান্ত্রিকতার এমন উৎকট মানসিকতা জগতের ইতিহাসে বিরল। জাতীয় পাতাকা সব দেশে এবং সব সমাজেই জাতীয় মর্যাদার প্রতীক-স্বরূপে গণ্য হইয়া থাকে। পতাকার মর্যাদা রক্ষায় উদ্দীপ্ত হইয়া দেশপ্রেমিক সন্তানেরা দেশে দেশে মরণ বরণ করিয়া লন। এই পতাকার মর্যাদা রক্ষার জন্য মেদিনীপুরে মাতঙ্গিনী হাজরা প্রাণ দিয়াছিলেন। এই সেদিনও বীরাঙ্গনা সুভদ্রা বাঈ পর্তুগীজ সৈনিকের গুলির আঘাতে রক্তাক্ত দেহে পতাকার মর্যাদা রক্ষা করিতে আগাইয়া যান। শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ ইঁহাদের মহত্ত্ব এবং বীর্যবত্তাকে কি উপেক্ষা করিতে চাহেন? প্রকৃতপক্ষে শ্রীযুক্ত নারায়ণ জাতীয় পতাকা অবমাননাকারীদের প্রকারান্তরে সমর্থন করিতে গিয়া সমগ্র ভারতের প্রাণধর্মের উপরই আঘাত করিয়াছেন। তাঁহার মন্তব্য দেশবাসীর অন্তরে বিক্ষোভের কারণই সৃষ্টি করিবে। জাতীয় পতাকার মর্যাদা রক্ষার জন্য হাজার হাজার লোক গুলীতে প্রাণ দিবার জন্য প্রস্তুত, ভারতের প্রধানমন্ত্রীর মত দেশ-বাসীর প্রত্যেকে ইহাই দেখিতে চায় এবং সেইদিনকে তাহারা ভারতের শুভদিন বলিয়া মনে করে, ইহাই সত্য।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

শ্রীযুক্ত ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জার্নালধর্মী রচনা 'মনে এলো' আগামী সপ্তাহ হইতে দেশ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে। —সম্পাদক 'দেশ'

রূপকুণ্ডের রহস্য

উত্তর প্রদেশের গাড়োয়াল জেলার ত্রিশূল পর্বতের সানুদেশে রূপকুণ্ড হ্রদের তীরে তিনশতাধিক মৃতদেহ তুষারস্তরের মধ্যে পতিত রহিয়াছে। কেহ কেহ ইহা পৌরাণিককালের ব্যাপার বলিয়া মনে করেন। ঐতিহাসিকগণ এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, শিখ সেনা-পতি জোয়াবর সিং ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে তিব্বতের বহু অংশ জয় করিয়া কাশ্মীরে ফিরিবার পথে তিব্বতী সৈন্যদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হন। মৃতদেহগুলি তাঁহারই সৈন্যদের। কেহ কেহ বলেন, মৃতদেহ-গুলি শিখ সেনাদের নয়, শিখ সেনাদের পশ্চাদ্ধাবনের পর তিব্বতী সেনারা ফিরিবার পথে মারা যায়। মৃতদেহগুলি তাহাদের। কিন্তু ইহাতেও একটি প্রশ্ন থাকিয়া যায়। এই অঞ্চলের লোকেরা এইরূপ বলে যে, মৃতদেহগুলির মধ্যে নারী ও শিশুর শবও আছে। তাহাদের মতে মৃতদেহগুলি একদল তীর্থযাত্রীর। ইহারা নন্দা দেবীকে পূজা দিবার জন্য গিরিশিখরে আরোহণ করিতেছিল। সম্প্রতি এই রহস্যের দ্বার উদ্ঘাটন করিবার উদ্দেশ্যে ভারত সরকারের নৃতত্ত্ব বিভাগের ডিরেক্টর ডাঃ দত্ত মজুমদারের নেতৃত্বে ৫ জন সদস্যের একটি দল এই অঞ্চলে যাইতেছেন। ডাঃ দত্ত মজুমদার মৃতদেহের অ... পরীক্ষা করিয়া সেগুলি শিখ কি... তিব্বতীর নির্ধারণ করিতে চে... করিবেন। ইহা ছাড়া, তাঁহারা অন... প্রমাণও সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিবে... গত বৎসর দক্ষিণ আমেরিকার এক ... পর্বতের গুহায় তুষারপুঞ্জের মধ্যে এ... বালিকার মৃতদেহ আবিষ্কৃত ... পুরাতাত্ত্বিকদের মতে বালিকাটি ... এক হাজার বৎসর পূর্বের দ... আমেরিকার তৎকালীন সভ্য-সংস্কৃ... বিশিষ্ট মায়াজাতির রাজকন্যা। হিম... চিররহস্যময়। ত্রিশূল পর্বতের হ্রদত... মানুষগুলি জগতে কোন্ যু... কোন্ কথা ব্যক্ত করিবার জন্য সমাধি... রহিয়াছে, কে বলিবে?

পরলোকে অমরনাথ ঝা

বর্তমান ভারতের বিদ্যাবত্তা ... মনীষার প্রভাবে যাঁহারা দেশের গৌ... বৃদ্ধি করিয়াছেন, ডাঃ অমরনাথ ... তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার অকালমৃত্যু... দেশের যে ক্ষতি ঘটিল তাহা সহ... পূরণ হইবার নয়। ডাঃ ঝা শ... বিদ্যাবত্তার জন্য আন্তর্জাতিক খ্যা... অধিকারী ছিলেন, ইহা নয়, তি... আদর্শ শিক্ষাব্রতী ছিলেন। ভারত... ভবিষ্যৎ শিক্ষানীতির সংস্কার ... সম্প্রসারণে তাঁহার মনীস্বিতামূ... অবদানের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। ... ঝা শিক্ষাক্ষেত্রে প্রাচ্য ও পাশ্চা... এতদুভয়ের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য দে... নাই। পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির যাহা বি... কল্যাণকর তাহা গ্রহণ করিবার প্র... জনীয়তা তিনি স্বীকার করিতেন। কি... মনে প্রাণে তিনি জাতীয়তাবাদী ছিলে... ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতির এবং ঐতিহ্যে... প্রতি তিনি অন্তরে একান্ত শ্রদ্ধাবুদ্ধি... পোষণ করিতেন। সেই সংস্কৃতি... ভিত্তি করিয়াই স্বাধীন ভারত জগতে... মর্যাদার আসন অধিকার করিবে এ... জগতের সাংস্কৃতিক সম্প্রীতি সাধ... সহায়ক হইবে, তাঁহার এই বিশ্বাস ছিল... প্রভূত আর্থিক উন্নতি সাধনের সঙ্গে... সঙ্গে তিনি জাতির অন্তর-ধর্মে... উজ্জীবনও একান্ত প্রয়োজন মনে... করিতেন। তাঁহার জীবনাদর্শ এদেশে... রাষ্ট্র-সাধনায় নূতন শক্তি সঞ্চার করিবে

আলোচনা

কীর্তন শব্দের ব্যুৎপত্তি

মহাশয়,

৩০শে জুলাই ও ১৩ই আগস্টের 'দেশ' পত্রিকায় কীর্তন সম্পর্কে শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য ও শ্রীশার্ঙ্গদেবের আলোচনা পড়ে কয়েকটি কথা মনে হল। নীচে 'কীর্তন' শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে কিছু তথ্য পেশ করছি। হয়তো তাতে বিতর্কের সমাধানের সাহায্য হবে।

বাচস্পত্যকার কীর্তনের দুটি ব্যুৎপত্তি দিয়েছেন, নিজন্ত কৃৎ ধাতু+অন এবং সৌত্র কীর্ত্‌ ধাতু+অন। পাণিনীয় ধাতুপাঠে চুরাদিগণীয় 'কৃৎ সংশব্দনে' ধাতু আছে। তা থেকে ধাতুপ্রকৃতি হয় 'কীর্তি'। অন প্রত্যয় থেকে তা "কীর্তন"ই হয় (অনিট অর্ধ-ধাতুক প্রত্যয় পরে থাকায় "নি"র লোপ হয় পাণিনি ৬।৪।৫১)। কিন্তু বাচস্পত্যকার ধাতুটিকে গণপাঠের বহির্ভূত সৌত্র বলেছেন, এই থেকে "কীর্ত্‌" ধাতুর উল্লেখ আছে পাণিনি ৩।১।৯৭ সূত্রে। "ধাতুবৃত্তি"তে মাধবাচার্য (পৃঃ ৩৮৬, চৌখাম্বা সং) এবং "সিদ্ধান্ত কৌমুদী"তে ভট্টোজী দীক্ষিত দুজনেই ধাতু পাঠ অনুসরণ করে সেখানে ধাতুটিকে নিজন্ত মনে করেছেন। কিন্তু ধাতু পাঠের বাইরেও যে একটি "কীর্ত্‌" ধাতু ছিল তার প্রমাণ, ঋগ্বেদে দুটি জায়গায় শব্দটির প্রয়োগ আছে; কীর্তেন্যং অথবা নাম বিভ্রৎ ১।১০৩।৪; তদ্‌ বাং দাস্রং মহি কীর্তেন্যং ভূৎ ১।১১৬।৬। এন্য প্রত্যয়ান্ত (পাণিনি ৩।৪।১৪) অনেকগুলি শব্দ ঋগ্বেদে আছে —বরেণ্য, দৃশেণ্য, দ্বিষেণ্য, যুধেন্য, ঈলেন্য ইত্যাদি। উদ্ধৃত ঋগ্বেদের মন্ত্রে ইন্দ্রের "নাম কীর্তেন্য" এই উক্তিটি দেবতার নাম-কীর্তনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ব্যাক্যাংশের সাদৃশ্য এখানে কৌতূহলো-দ্দীপক। ঋগ্বেদে নাম-সাধবার কথা অন্যত্রও আছে। সে-কথা যাক। বলা যেতে পারে, ধাতুপাঠের কীর্তি ধাতুর আদিম রূপ আমরা পাই বৈদিক "কীর্ত্‌" ধাতুতে, পাণিনি তাঁর সূত্রে এই ধাতুটিরই উল্লেখ করেছেন। সূত্রোক্ত কীর্তি শব্দের ব্যুৎপত্তি বিচার করতে গিয়ে মাধব এবং ভট্টোজী ধাতু পাঠের নজিরে "ক্তিন"কে "যুকের" (পাণিনি ৩।৩।১০৭) অপবাদ বলে কল্পনা করেছেন, কিন্তু তার কোন দরকারই ছিল না। এক্ষেত্রে বাচস্পত্যকারের অনুমানই ঠিক। মাধবও স্বীকার করেছেন নিচ্‌ এক্ষেত্রে অনিত্য, "কীর্তিত" রূপও সম্ভব। বৈদিক "কীর্ত্‌" ধাতুর সমান্তরাল আরেকটি ধাতু ছিল "কৄ", যা থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে "কীরিঃ", অর্থ "স্তোতা" (নিঘণ্টু ৩।১৬)। দেবতার মহিমাসূচক মন্ত্র "পাঠ" করা হত, কিন্তু স্তোত্র সুরে গাওয়া হত, এইটিও লক্ষণীয়। "কৄ" ধাতুর গান করা অর্থ ধাতু পাঠে নাই, আছে "বিকীরণ" অর্থে। কিন্তু বেদে এই অর্থে ধাতুটির বহুল প্রয়োগ মেলে। অনির্বাণ, শিলং।

'কর্ণ-কুন্তী সংবাদ'

মহাশয়,—

'দেশ' পত্রিকার ১৩ই শ্রাবণ (১৩৬২) সংখ্যায় প্রকাশিত মন্মথনাথ ঘোষ রচিত প্রবন্ধ "রবীন্দ্রনাথের কর্ণ-কুন্তী সংবাদ" পড়ে বিস্মিত হয়েছি।

মনে হয় প্রবন্ধটির মোটামুটি বক্তব্য এই যে, রবীন্দ্রনাথের ঐ রচনাটিতে পরিণত বয়সের মন যথেষ্ট আনন্দ পেতে পারে না কারণ সমগ্র রচনাটিতে সম্পূর্ণ অসত্য কল্পনার জাল বোনা হয়েছে। এই যুক্তি আরও খানিকটা প্রসারিত করে এমন কথাও বলা যায় যে কর্ণ চরিত্রের ঐতিহাসিক অস্তিত্বও তো প্রমাণ সাপেক্ষ। আসলে কিন্তু সাহিত্য ইতিহাস নয়, ইতিহাসও সর্বদা সাহিত্য হয়ে ওঠে না।

মহাকাব্যের পাত্রপাত্রীরা সবাই সাধার মানুষ নয়। রবীন্দ্রনাথের রচনাটিতে অসাধার কর্ণ-চরিত্রের একটি সর্বাঙ্গীণ রূপ স্বল্প পরিবেশের ভিতরে ফুটে উঠেছে। তাই এ এতো আদর।

স্বল্পায়াসে খ্যাতি অর্জনের উদ্দেশে যদি প্রবন্ধ লেখা হয়, তবে কারও কিছু বলবার থাকে না। কিন্তু "দেশ" পত্রিকার মতন কাগজ কেন তার সহায়ক হবে? বিস্ময় সেখানে। নমস্কারান্তে ইতি—শ্রীইন্দ্রাণী সেন, দমদম।

ছোটনাগপুরের ওরাঁও উপজাতি

মহাশয়,—

নানা পত্রপত্রিকায় সুনীল জানার যে ফটোগ্রাফগুলি চোখে পড়ছিল, আদিবাসী জীবন ছিল তার প্রধান বিষয়-বস্তু। দেশের পাতায় এবার নিখিল মৈত্র ও সুনীল জানার লেখায় বিভিন্ন আদিবাসীদের সমাজজীবনের সামগ্রিক চিত্র পাওয়া যাচ্ছে। এরকম প্রবন্ধের প্রয়োজন আছে। কেননা আমাদের প্রতিবেশী এই আদিবাসীদের সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতা যতখানি, কৌতূহলও ততখানি। লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-প্রসূত সচিত্র এই প্রবন্ধগুলি তাই ভাল লাগছে।

দেশের ৪৩ সংখ্যার ছোটনাগপুরের ওরাঁও উপজাতি সম্বন্ধে প্রবন্ধটিতে আদিবাসীদের বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে বাইরের ভাবধারার সমন্বয় সাধনের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু আমার মনে হয় যে এ-ক্ষেত্রে বাইরের ভাবধারা এত প্রবল ও সর্বগ্রাসী হবে যে আদিবাসীদের বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষা অসম্ভব হয়ে পড়বে। লেখক যে সমন্বয়ের কথা বলেছেন, তা দুটি প্রায়-সমোন্নত সভ্যতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আদিবাসীদের বাইরের ভাবধারায় সম্পূর্ণরূপে প্রভাবিত হবার সম্ভাবনা খুবই বেশি। এ প্রভাব কাটিয়ে টিঁকে থাকবার মত স্থায়ী বৈশিষ্ট্য যদি তাঁদের থাকে, তবে তাকে টিঁকিয়ে রাখার জন্যে সচেতন প্রচেষ্টার প্রয়োজন হবে না। চিরকাল আদিবাসীরা তাঁদের প্রাচীন জীবনধারা বজায় রেখে আমাদের 'জীবন্ত-যাদুঘর দেখার সুযোগ করে রাখবেন, এরকম আশা করা ঠিক নয়। আদিবাসীরা নিজেরা চাইলেও তা করতে সম্ভবত সক্ষম হবেন না।

আলোচ্য প্রবন্ধে একটি ভুল শব্দের ব্যবহার চোখে পড়ল। প্রবন্ধের একটি লাইন—"আদিবাসী এবং বহিরাগতের মিলনে এই শংকর বংশের সৃষ্টি।" এখানে শঙ্কর না হয়ে সঙ্কর হবে। সম্ভবত এ ত্রুটি লেখকের অসাবধানতাবশত। তবু এ ভুল অসাবধানী পাঠকের মনে ভুল ধারণার সৃষ্টি করতে পারে মনে করে এর উল্লেখ করলাম। প্রীতি নমস্কারান্তে—শ্রীঅনাদি মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা—১৪।

১৪

আমাদের গোমুখ-যাত্রার সব আয়োজন প্রস্তুত।

বিরাট কিছুই নয়;—যা কিছুর একান্ত প্রয়োজন, তারই আয়োজন। শুধু, খাওয়া-পরা-শোওয়ার ব্যবস্থা—কিন্তু, তাই কি কম?

সঙ্গের কুলি দুটি নেপালী। হৃষীকেশ থেকেই সাথে আছে। তাদের সঙ্গে এবার আমার অদ্ভুত ব্যবস্থা। চল্লিশ দিন হিমালয়ে কাটাবো। যেখানে খুশী যাবো, যতদিন খুশী থাকবো। হৃষীকেশ থেকে দুমাইল গিয়েও থেকে যেতে পারি, আবার হিমালয়ের কোন অজানা হিমশিখরেও একমাস কাটাতে পারি। জিজ্ঞাসা করি, সব ভেবেচিন্তে বলো— এই চল্লিশ দিনের জন্যে কত নেবে,—খাওয়া-দাওয়া সব তোমাদের, সে-সব ঝঞ্ঝাট আমি বইতে পারবো না।

তারা অনেক ভেবে বলে, বাবুজি, তাহলে এক একজনকে একশ' কুড়ি টাকা করে দিতে হবে। দেখুন, জিনিসপত্রের দাম—

আমি কথার মাঝে ছেদ টানি। বলি, কারণ দেখানোর দরকার নেই। বেশ, ঐ টাকাই পাবে। ভালভাবে কাজ করো ত বখশিশও পাবে।

তারা খুশী হয়ে কাজে লাগে।

কাজ শুধু মোট বওয়া। কিন্তু, সব সময়ে সব কিছু কাজে এগিয়ে আসে সাহায্য করতে—স্বেচ্ছায়, হাসিমুখে।

আশ্চর্য তাদের শারীরিক শক্তি। এক মণ ভারী বোঝা পিঠের উপর নিয়ে স্বচ্ছন্দে চড়াই উঠে এসেছে।

তাদের পথ-চলার একটা ছন্দ আছে, আনন্দও আছে। দেখতেও আনন্দ।

সেবা তাদের শুধু কর্তব্যই নয়—ধর্ম। সমস্ত শক্তি দিয়ে নিঃস্বার্থভাবে পরকে পরম সেবা করার এরা জীবন্ত উদাহরণ।

এদের বিশ্বাস করে কখনও ঠকতে হয় নি। কেউ ঠকেছে বলে শুনিও নি। মানুষ যে অবিশ্বাসী হতে পারে—এইটেই এদের কাছে অবিশ্বাস্য।

এরা অতি দীন-দরিদ্র। তবুও আত্ম-মর্যাদার মান জানে। তাই, দারিদ্র্যও এদের গৌরব,—দীন হলেও হীন নয়। নদীর জলে স্নানের কালে, ঝরণার ধারে বা গাছের ছায়ায় রাঁধবার সময় এদের সাজ দেখেছি। উলঙ্গই বললে চলে, একটি কৌপীনমাত্র সার। এরাও হিমালয়ের এক শ্রেণীর যথার্থ সাধু।

হাত জোড় করে পায়ের কাছে দুজনে এসে বসল। কি যেন বলতে চায়, অথচ এদের সঙ্কোচ জাগে।

জিজ্ঞাসা করলাম, কি হয়েছে রে?

আস্তে আস্তে বলে, বাবুজি, এ-তিন দিন আমাদের খাওয়া-দাওয়া কি হবে? গোমুখ ত আমরা কখনো যাই নি। শুনেছি—ওদিকে গ্রাম বা দোকান নেই—কোন খাবার মেলে না।

বললাম, এই ব্যাপার! এর জন্যে ভাবনা? এ কদিন গঙ্গোত্রী এসেও ত তোদের খাওয়ার কথা ভাবতে হয় নি—যদিও খাবার ব্যবস্থা তোদের নিজেদেরই করার কথা,—মনে আছে ত?

দুজনেই হাসে, কপালে হাত ঠেকায়। বলে, জি বাবুজি।

বললাম, তবে ও-কথা ভাবছিস্

মহাকাব্যের পাত্রপাত্রীরা সবাই সাধারণ মানুষ নয়। রবীন্দ্রনাথের রচনাটিতে অসাধারণ কর্ণ-চরিত্রের একটি সর্বাঙ্গীণ রূপ স্বকল্প পরিবেশের ভিতরে ফুটে উঠেছে। তাই এর এতো আদর।

স্বল্পায়াসে খ্যাতি অর্জনের উদ্দেশে যদি প্রবন্ধ লেখা হয়, তবে কারও কিছু বলবার থাকে না। কিন্তু "দেশ" পত্রিকার মতন কাগজ কেন তার সহায়ক হবে? বিস্ময় সেখানে। নমস্কারান্তে ইতি—শ্রীইন্দ্রাণী সেন, দমদম।

ছোটনাগপুরের ওরাঁও উপজাতি

মহাশয়,—

নানা পত্রপত্রিকায় সুনীল জানার যে ফটোগ্রাফগুলি চোখে পড়ছিল, আদিবাসী জীবন ছিল তার প্রধান বিষয়-বস্তু। দেশের পাতায় এবার নিখিল মৈত্র ও সুনীল জানার লেখায় বিভিন্ন আদিবাসীদের সমাজজীবনের সামগ্রিক চিত্র পাওয়া যাচ্ছে। এরকম প্রবন্ধের প্রয়োজন আছে। কেননা আমাদের প্রতিবেশী এই আদিবাসীদের সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতা যতখানি, কৌতূহলও ততখানি। লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-প্রসূত সচিত্র এই প্রবন্ধগুলি তাই ভাল লাগছে।

দেশের ৪৩ সংখ্যায় ছোটনাগপুরের ওরাঁও উপজাতি সম্বন্ধে প্রবন্ধটিতে আদি-বাসীদের বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে বাইরের ভাবধারার সমন্বয় সাধনের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু আমার মনে হয় যে এ-ক্ষেত্রে বাইরের ভাবধারা এত প্রবল ও সর্বগ্রাসী হবে যে আদিবাসীদের বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষা অসম্ভব হয়ে পড়বে। লেখক যে সমন্বয়ের কথা বলেছেন, তা দুটি প্রায়-সমোন্নত সভ্যতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আদিবাসীদের বাইরের ভাব-ধারায় সম্পূর্ণরূপে প্রভাবিত হবার সম্ভাবনা খুবই বেশি। এ প্রভাব কাটিয়ে টিঁকে থাকবার মত স্থায়ী বৈশিষ্ট্য যদি তাঁদের থাকে, তবে তাকে টিঁকিয়ে রাখার জন্যে সচেতন প্রচেষ্টার প্রয়োজন হবে না। চিরকাল আদিবাসীরা তাঁদের প্রাচীন জীবনধারা বজায় রেখে আমাদের 'জীবন্ত-যাদুঘর দেখার সুযোগ করে রাখবেন, এরকম আশা করা ঠিক নয়। আদিবাসীরা নিজেরা চাইলেও তা করতে সম্ভবত সক্ষম হবেন না।

আলোচ্য প্রবন্ধে একটি ভুল শব্দের ব্যবহার চোখে পড়ল। প্রবন্ধের একটি লাইন—"আদিবাসী এবং বহিরাগতের মিলনে এই শংকর বংশের সৃষ্টি।" এখানে শঙ্কর না হয়ে সঙ্কর হবে। সম্ভবত এ ত্রুটি লেখকের অসাবধানতাবশত। তবু এ ভুল অসাবধানী পাঠকের মনে ভুল ধারণার সৃষ্টি করতে পারে মনে করে এর উল্লেখ করলাম। প্রীতি নমস্কারান্তে—জ্যোতির্ময়ানন্দ মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা—১৪।

১৪

আমাদের গোমুখ-যাত্রার সব আয়োজন প্রস্তুত।

বিরাট কিছুই নয়;—যা কিছুর একান্ত প্রয়োজন, তারই আয়োজন। শুধু, খাওয়া-পরা-শোওয়ার ব্যবস্থা—কিন্তু, তাই কি কম?

সঙ্গের কুলি দুটি নেপালী। হৃষীকেশ থেকেই সাথে আছে। তাদের সঙ্গে এবার আমার অদ্ভুত ব্যবস্থা। চল্লিশ দিন হিমালয়ে কাটাবো। যেখানে খুশী যাবো, যতদিন খুশী থাকবো। হৃষীকেশ থেকে দুমাইল গিয়েও থেকে যেতে পারি, আবার হিমালয়ের কোন অজানা হিমশিখরেও একমাস কাটাতে পারি। জিজ্ঞাসা করি, সব ভেবেচিন্তে বলো— এই চল্লিশ দিনের জন্যে কত নেবে,—খাওয়া-দাওয়া সব তোমাদের, সে-সব ঝঞ্ঝাট আমি বইতে পারবো না।

তারা অনেক ভেবে বলে, বাবুজি, তাহলে এক একজনকে একশ' কুড়ি টাকা করে দিতে হবে। দেখুন, জিনিসপত্রের দাম—

আমি কথার মাঝে ছেদ টানি। বলি, কারণ দেখানোর দরকার নেই। বেশ, ঐ টাকাই পাবে। ভালভাবে কাজ করো ত বখশিশও পাবে।

তারা খুশী হয়ে কাজে লাগে।

কাজ শুধু মোট বওয়া। কিন্তু, সব সময়ে সব কিছু কাজে এগিয়ে আসে সাহায্য করতে—স্বেচ্ছায়, হাসিমুখে।

আশ্চর্য তাদের শারীরিক শক্তি। এক মণ ভারী বোঝা পিঠের উপর নিয়ে স্বচ্ছন্দে চড়াই উঠে এসেছে।

তাদের পথ-চলার একটা ছন্দ আছে, আনন্দও আছে। দেখতেও আনন্দ।

সেবা তাদের শুধু কর্তব্যই নয়—ধর্ম। সমস্ত শক্তি দিয়ে নিঃস্বার্থভাবে পরকে পরম সেবা করার এরা জীবন্ত উদাহরণ।

এদের বিশ্বাস করে কখনও ঠকতে হয় নি। কেউ ঠকেছে বলে শুনিও নি। মানুষ যে অবিশ্বাসী হতে পারে—এইটেই এদের কাছে অবিশ্বাস্য।

এরা অতি দীন-দরিদ্র। তবুও আত্ম-মর্যাদার মান জানে। তাই, দারিদ্র্যও এদের গৌরব,—দীন হলেও হীন নয়। নদীর জলে স্নানের কালে, ঝরণার ধারে বা গাছের ছায়ায় রাঁধবার সময় এদের সাজ দেখেছি। উলঙ্গই বললে চলে, একটি কৌপীনমাত্র সার। এরাও হিমালয়ের এক শ্রেণীর যথার্থ সাধু।

হাত জোড় করে পায়ের কাছে দুজনে এসে বসল। কি যেন বলতে চায়, অথচ এদের সঙ্কোচ জাগে।

জিজ্ঞাসা করলাম, কি হয়েছে রে?

আস্তে আস্তে বলে, বাবুজি, এ-তিন দিন আমাদের খাওয়া-দাওয়া কি হবে? গোমুখ ত আমরা কখনো যাই নি। শুনেছি—ওদিকে গ্রাম বা দোকান নেই—কোন খাবার মেলে না।

বললাম, এই ব্যাপার! এর জন্যে ভাবনা? এ কদিন গঙ্গোত্রী এসেও ত তোদের খাওয়ার কথা ভাবতে হয় নি—যদিও খাবার ব্যবস্থা তোদের নিজেদেরই করার কথা,—মনে আছে ত?

দুজনেই হাসে, কপালে হাত ঠেকায়। বলে, জি বাবুজি।

বললাম, তবে ও-কথা ভাবছিস্

গঙ্গোত্রী মন্দির

কেন? যদি আমাদের খাবার মেলে, তোদেরও নিশ্চয় মিলবে। আর যদি আমরা খেতে না পাই, তোরাও পাবি না।

ওরা আবার হাত তুলে নমস্কার করতে থাকে। বলে, এ ঠিক্ আছে, বাবুজি।

কিন্তু, এদিকে মালের বোঝা ভারি হয়ে গেছে—যে কজন দলে আছে, সবারই খাবার নিতে। উপায়ই বা কি?

ভরসা এইটুকু, ফেরবার পথে এ-সব আহার্যের বোঝার ভার লাঘব হয়ে, অন্যত্র ভার বাড়াবে!

কুলিদের গোমুখের শীতে যাতে অসুবিধা না হয়, তাই ধর্মশালা থেকে কয়খানা কম্বলের বাবস্থা করা হয়েছে। বিড়িও নেওয়া হয়েছে তাদের জন্যে। শীতের মধ্যে একটু মৌতাত পায়, পথ-চলার ক্লান্তিও হরণ করে, শুনি। হবেও বা।

শুধু বলি, বাপু, রাত্রে যদি একঘরে শুয়ে থাকিস্—ওটা খাস্ নে। ওর গন্ধ সইতে পারি না—ভাল সিগারেটের গন্ধে কষ্ট কম। কিন্তু, তা পাচ্ছিস্ কোথায়!

সব কথা বোঝে কিনা বুঝি না।

শুধু দেখি, গভীর কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত হয়, জোড়হাতে নমস্কার করতে থাকে।

সকালে সকলে একসঙ্গে রওনা হলাম।

বহুদিন ধরে শুনে এসেছি,—গোমুখের পথ—দারুণ দুর্গম। সাধু-সন্ন্যাসীরা যায়,—নইলে যাত্রীদের মধ্যে খুব কমই যেতে সাহস পায়। আমরা সাধুও নই, সন্ন্যাসীও নই; অসীম সাহসের অধিকারীও নই। তবুও যাবার অদম্য আকাঙ্ক্ষা। দুর্গমতার কাহিনী, কেন জানি না, মনে ভয় জাগায় না, আকর্ষণই করে।

মনে পড়ে, যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গাঃ বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ—

কিন্তু তখনি মনে হয়, ঠিক তাই ব কই? এ-তো বিনাশের কথা নয়। এ-যে ঈপ্সিত-প্রাপ্তির আশার আলো,—প্রিয় মিলনের মধুর অভিসার।

তাই, মনে ভয়ের ছায়া নেই, আশা আনন্দের দীপ্তি রয়েছে।

কিন্তু, ফুলের কাঁটার মত এ আনন্দেও ব্যথা অনুভব করি।

মা-র বড় ইচ্ছা ছিল আসবার আনি নি,—কেন না, তাঁর শ্বাস ভেঙেছে। এ-পথে ডাণ্ডী চলে না, তা তাঁর পক্ষে এসব পথ হেঁটে যাওয়া অসম্ভব।

তিনি এলে খুশী হতেন, তৃপ্তি শান্তি পেতেন,—জানি বলেই মনে ব্যথা জাগে।

তাই, যাত্রা-মুখে তাঁকে স্মরণ ক প্রণাম করি আর বলি, আমার এ-চো দুটি তোমারি দেওয়া, এ-চোখে তুমি দেখো। আমার দেখার সব আনন্দ, তৃপ্তি, সব পুণ্য তোমারি হোক তোমারি তৃপ্তিতে আমার জীবনের শ্রে তৃপ্তি।

মনে মনে মাকে প্রণাম করি, মন্দি গঙ্গাদেবীর মূর্তি মায়েরই মূর্তি স্মরণ করায়।

হঠাৎ, তাকিয়ে দেখি, ওপারে এ মহাত্মা সাধু গঙ্গাস্নান সেরে চলেছেন।

আশার আলো আরও প্রোজ্জ্বল হয় মনে হয়, প্রভাতে উঠিয়া ও-মুখ হেরিন দিন যাবে মোর ভালো।

পুল পার হয়ে গঙ্গার অপর পা এলাম।

গঙ্গোত্রী থেকে গোমুখ যাবার কো বাঁধাধরা নির্দিষ্ট পথ নেই। যতদ সম্ভব, গঙ্গার ধারা ধরে যেতে হবে সাধারণত গঙ্গোত্রীর অপর পার দিয়ে যেতে হয়। যদি কোন বছর সে-প দিয়ে চলাচল অসম্ভব হয়ে উঠে, তব এ-পার দিয়ে যাতায়াতের চেষ্টা হয় কিন্তু, এ-পারের পাহাড়গুলি অনে জায়গায় একেবারে জলের ভিতর থে উঠেছে—তাই চলাচল আরও কঠিন।

এ বছর আমাদের আগে আ একটি দল অপরপার ধরেই গিয়েছিলে তাই আমরাও সেই পথই ধরেছি।

সাধুদের আশ্রমগুলি ছাড়িয়ে এলাম। এ-টুকু জানা পথ, পথও আছে।

গঙ্গার অপরপারে কিছু দূরে গঙ্গোত্রীর মন্দির, ঘরবাড়ী—এমন কি লোকচলাচলও দেখা যাচ্ছে।

এইবার দাঁড়িয়ে দলের হিসাব নেওয়া গেল।

১৫

কলিকাতা থেকে এসেছি আমরা তিনজন।

হৃষীকেশ থেকে পেলাম দুই কুলি।

রান্নার ও কাজকর্ম দেখার জন্যে সঙ্গে এসেছে উত্তরকাশীর একটি ছেলে। ভরত সিং—ওরফে ভর্তু। কারিৎকর্মা, চালাক-চতুর; সম্পূর্ণ বিশ্বাসী—সেটা এই হিমালয়েরই অবদান। আমাদের খুচরা জিনিসপত্রের থলিটি সে পিঠে বয় —ফ্লাস্ক, ক্যামেরা, বাইনোকুলারও। ধর্মশালায় পৌঁছুবার দুই-এক মাইল আগে ত্বরিতগতিতে চলে যায়, জায়গা দেখে ঘর বেছে পরিষ্কার করে রাখে; কখন কখন রান্নাও চড়িয়ে দেয়। মনে স্ফূর্তি রাখে, কাজে আনন্দ পায়। চমৎকার ছেলে।

পাণ্ডার ছেলেও চলেছে। সে-ও ছোকরা। তবে যাত্রীর কাছে পাণ্ডার যে একটা বিশেষ দায়িত্ব আছে—সে-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সজাগ। কেবলি এসে খোঁজ নেয়, আর কি সেবায় লাগতে পারি, বাবুজি? বেশ ভাল করে আর একবার চা তৈরি করিয়ে আনি?

চা ত নয়। তার এক অপরূপ স্বাদ। অনেকখানি দুধ, অনেকখানি চিনি—তবেই হলো ভাল চা। আর 'বেশ ভাল' অর্থে হলো—তাতে লবঙ্গ-দারচিনি সিদ্ধ, এলাচের গুঁড়ো দেওয়া। হাসিমুখে বলে, বাবুজি, এ 'এস্‌পেশাল্' চা আছে—'বড় বড়িয়া'!

অদ্ভুত লাগলেও, খারাপ নয়। খেয়ে শরীর গরম বোধ হয়।

সে-ও চলেছে সঙ্গে। গোমুখ পথে তারও এই প্রথম যাত্রা।

গঙ্গোত্রী-বাসী এক সাধুও চলেছেন। নাগাও নন্, মৌনীও নন্। গেরুয়া বাস; একটা মোটা কম্বলও নিয়েছেন। কথাবার্তায় ভালই বোধ হয়।

গঙ্গোত্রীতে গঙ্গার উপর পুল

শুনলাম, আরও দুজন সাধু এগিয়ে গেছেন। পথে দেখা হবে।

সকলেই এ-পথের নবীন যাত্রী। শুধু পথ-প্রদর্শকটিরই পরিচিত পথ। গঙ্গোত্রীর লোক। চেহারা দেখেই চমকে উঠলাম। বেঁটে-খাটো ছোট্ট মানুষ। রোগা লিক্‌লিক্ করছে। পরনে জুতো, পায়জামা, গায়ে ওভার-কোটের তলায় ওয়েস্ট-কোট। প্রৌঢ় বয়স। মুখে হাসি নেই—স্ফূর্তিরও কোন লক্ষণ নেই। অথচ, নাম শুনলাম শ্যামসুন্দর। তার চেহারা দেখেই জিজ্ঞাসা করেছিলাম, বাপু, পারবে ত যেতে?

শুনে বোধ করি অপমান বোধ করলে। বললে, বহুবার গেছি ওখানে। এ-বছরেও ত এই ক'দিন আগে যে-দল গেল—তার সঙ্গে ছিলাম। শরীরে আমি কম তাগদ্ রাখি? আপনাদের ঐ লম্বা-চওড়া কুলিদের চেয়ে ঢের বেশী।

তাদের দিকে অবজ্ঞার দৃষ্টি হানে। নিজের পিঠের উপর তার নিজেরই কম্বলের ছোট্ট বোঝাটি সোজা করে নেয়।

তারপর গম্ভীর মুখে বলে, চলুন বাবু, দেরি করবেন না। সামনে অনেক পথ, ভারি চড়াই—সন্ধ্যার আগে ডেরায় পৌঁছুতে হবে।

উত্তরে বলি, বাপু, তোমার সঙ্গে ত আমরা তাল রেখে চলতে পারবো না। তুমি জোয়ান্ আদ্‌মী। আমরা ধীরে ধীরে চলবো—যেমন যাচ্ছি। পৌঁছুতে না পারি—পথের ধারেই পড়ে থাকবো। যদি বাঘ-ভালুক আসে, খেয়েই ফেলবে। যাত্রীকে সেবা করা যদি পুণ্য হয়, যাত্রীকে উদরে পুরে সেবা করলে নিশ্চয় আরও পুণ্য হবে!

নিজের প্রশংসাটুকু বুঝে বুক ফুলিয়ে এগিয়ে চলে।

এরই আর এক রূপ দেখেছি তার কিছু পরেই।

গঙ্গোত্রীর পথে একটি মন্দিরঃ পাহাড় ধসে নিম্নভাগ ঢাকা পড়েছে

একটা বড় চড়াই ওঠা হয়েছে। সবাই ক্লান্ত, সে-ও শ্রান্ত। হবারই কথা।

দেখি, কুলিদের বোঝার উপর তার নিজের কম্বলের ছোট্ট বোঝাটিও চাপিয়ে দিচ্ছে। কুলিরা আপত্তি করছে, করার যথেষ্ট কারণও আছে। তাদের নিজেদের বোঝা বেশ ভারি, তবুও তাই নিয়ে তারা ধীরে ধীরে চলেছে। তার উপর আরও ভার চাপ্‌লে—তা সে যত সামান্যই হোক্‌ —তাদের বিরক্ত হবারই কথা।

তারা রুষ্ট হয়ে আপত্তি জানায়, বলে, বাবুজিদের কাজ করতে এসেছি—তোমার মোট বইব কেন?

লোকটি বাস্তবিকই ক্লান্ত হয়েছে। অনুনয়ের সুরে কুলিদের বলে, ছোট্ট বোঝা, এইটুকু নিয়ে নাও ভাই।

কুলিরা ছাড়ে না, ছোট্ট বোঝা তা তুমি নিজেই বও না!

আমি তার অসহায় অবস্থা দেখে কুলিদের নিতে বলি। তারা নেয়ও। নেবার সময় হাসতে হাসতে তাকে বলে, এবার চলে এসো, তুমি নিজেও এসে পিঠে বসে পড়ো! শরীরে খুব তাগদ রাখো, নয়।

তার শক্তিমত্তার দম্ভকে ব্যঙ্গ করে।

১৬

পথেরও স্রষ্টা আছে। তা সে মানুষই হোক্‌, কি পশুই হোক্‌। বার-বার একই স্থান দিয়ে চলাচলের ফলে পায়ের তলায় পথ জেগে উঠে। আর মানুষ যদি হাতে তৈরি করে ত কথাই নেই।

এখানে দুটোর কোনটাই খাটে না। রাস্তা-তৈরির প্রশ্ন উঠে না, কেন না, সারা বছরে এত কম লোকই যায় যে সেই কয়জনের সুবিধার জন্যে এত অর্থব্যয় করবে কে ও কেন?

তাছাড়া, অর্থ-ব্যয়ও যদি হয়, প্রকৃতির প্রকোপে পথ থাকতে পারে না। পাহাড় ধসে পড়ে, জলের ধারা নামে, বরফে ঢাকা পড়ে, বরফ গল্‌লে পাহাড়ের আকৃতিরও পরিবর্তন হয়। মানব-সৃষ্ট ও পথের এত আঘাত সইবার শক্তি নে

লোক-চলাচলেও পথ-সৃষ্টির নেই। সামান্য কয়েকজনের চকিত পাতে পথের চিহ্ন জাগে না। সে চিহ্ন পড়বেই বা কোথায়? ধারে বালির উপর, অথবা বনের মাটির পরে চরণ-রেখা আঁকা সম্ভব কিন্তু এখানে যে প্রায়ই পাথর। ম ত দেবতা নয় যে পাষাণের বুকেও চ চিহ্ন ফুটে উঠবে।

অনেকদিন আগেকার কথা জাগে।

চিত্রকূটে বেড়াতে গেছি। রামায় সেই স্মৃতি-ভরা চিত্রকূট। বিন্ধ্যপর্ব মধ্যে সব ঘুরে ফিরে দেখছি। রামায় কত কাহিনী আবার নতুন করে শুনে এখানে এই হয়েছিল, ওখানে ঐ ঘ ছিল। এক জায়গায় প্রকাণ্ড এ সমতল পাথর;—কে যেন ধরণীর পাথরে বেঁধে দিয়েছে। তারই উ দাঁড়িয়ে আছি। এখানকার স্থ মাহাত্ম্যের কাহিনী শুনছি।

এইখানেই 'ভরত-মিলাপ' হয়েছিল রামচন্দ্রজির সঙ্গে ভরতের মিলন। সী দেবী ছিলেন, লক্ষ্মণ ছিলেন, আরও কে কে। বনের পশু-পক্ষীরাও এই ম মিলন দেখতে এসে দাঁড়িয়েছি বিরহবিধুর দুই ভাই-এর মিলন—উ আলিঙ্গন করে স্নেহপাশে আ হয়েছিলেন;—'ভেটত ভুজ ভরি ভরত সো।' এই করুণ দৃশ্য দেখে সব চোখে ধারা বয়েছিল। পাষাণও দ্র ভূত হয়েছিল। তাই পাষাণের বু সবারই পদ-চিহ্ন পড়েছিল।

চিত্রকূটবাসী একজন দেখাচ্ছে —এই দেখুন, এইটে রামচন্দ্রজির, এ ভরতের,—এই এদিকে সীতাদেবীর; দেখুন সব পাখীর পায়ের ছাপ, এখানে সব বনের পশুর।

শুনছি আর দেখছি। আশ্চর্য ল পাথরের উপর এই অদ্ভুত চিহ্নগু মানুষের তৈরি নয়, দেখলেই বোঝা য কোন স্বাভাবিক প্রকৃতিগত কারণে পাথ উপর বিচিত্র এই সব রেখা। কোন কো মানুষের পায়ের ছাপের মতই ল কোনটি বা পশু-পক্ষীর মনে হয়।

বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞের মত নিশ্চয় বিজ্ঞানসম্মত এর কোন কারণ নির্দেশ করবেন। তা করুন, বাধা নেই।

তবে, সেই অপূর্ব আবেষ্টনীর মাঝে এই বিচিত্র রেখাগুলির সাহায্যে কারও কল্পনা-বিলাসী বিশ্বাসী মন যদি রামায়ণের সেই করুণ কাহিনীর আলেখ্য এঁকে ক্ষণিক তৃপ্তি পায়, তাতেই বা ক্ষতি কি!

সেই এক দেখেছিলাম, পাথরের বুকে সব পদ-চিহ্ন!

এখানে গোমুখের পথে সেই দেবতা-দের চরণচিহ্ন নেই, মানুষের পায়ের ছাপও নেই।

তবে, পায়ের চিহ্ন না থাকলেও হাতের চিহ্ন রেখে যাবার প্রয়াস আছে। মাঝে মাঝে পূর্বগামী যাত্রীরা পাথরের উপর ছোট ছোট কয়েকটি পাথর বসিয়ে বা সাজিয়ে রেখে যান্—দেখলেই বোঝা যায় মানুষের হাতের স্পর্শ। পরের যাত্রীরা তাই দেখে অনেক সময় চলেন।

এ যাত্রা-পথে এই একমাত্র সামান্য পথ-নির্দেশ।

১৭

সেই পথেই চলেছি আমরা।

কখনো গঙ্গার ধারার খুব কাছ দিয়ে, কখনো বা পাড়ের কিছু উপর দিয়ে। দুই কূলেই গগনস্পর্শী গিরিশ্রেণী। ওপারে পাহাড়ের চূড়া দেখা যায়। যেন তেজোদীপ্ত ব্রাহ্মণ। তাম্র-কান্তি দেহের ঊর্ধ্বাঙ্গে তুষার-শুভ্র উত্তরীয়। তুষারনিঃসৃত নির্ঝরিণীগুলি যেন বুকের উপর যজ্ঞোপবীত।

এ-পারের পাহাড়ের চূড়া মাথা তুলেও দেখা যায় না।

হঠাৎ সামনে দেখি বিশাল পাথরের স্তূপ গতি-পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে। জলের ভিতর থেকে সোজা উঠেছে পাহাড়ের মাথার দিকে। সে-সব পাথর বেয়ে উঠার ক্ষমতা আমাদের নেই। গাইড্-এর শরণাপন্ন হই। দিক-ভ্রম্ হয়নি ত?

জিজ্ঞাসা করি, যাবো কোন্ দিক দিয়ে?

ইতিমধ্যে সে একটা পাথরের একটু উপরে উঠে দাঁড়িয়েছে। একটা পা বেঁকিয়ে পাথরের উপর রেখেছে, কোমরে একটা হাত, অপর হাত দিয়ে দেখাচ্ছে—ঐ! ঐ ধার দিয়ে যেতে হবে, উঠে আসুন এই পাথরটার পাশ দিয়ে সাবধানে।

কলোম্বাসের আবিষ্কারের উচ্ছ্বাস!

পাথরের পাশ দিয়ে গিয়ে একটু

...র উপর থেকে শুধু গোল পাথরের ... বিপুল স্রোত নেমে এসে গঙ্গায় ...য়ে পড়ছিল, এমনি সময়ে কার যেন ...সনে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। ...থরগুলির অপূর্ব বর্ণবিন্যাস। সাদা, ...লাপী অথবা হলুদ রঙের বড় বড় ...াল পাথর—সারা অঙ্গে কালো কালো ...দু। কে যেন কলমের কালি ছিটিয়ে ...য়েছে!

একটা পাথর থেকে আর একটা ...থরের উপর লাফিয়ে লাফিয়ে চলতে ...চ্ছে। এমনি করেই এই প্রস্তর-প্রান্তর ...তীর্ণ হতে হবে। প্রথমে আশঙ্কা হয়ে-...ল হয়ত মসৃণ পাথরের উপর পা ...ড়লেই পিছ্‌লিয়ে যাবে—কিন্তু, তা ...োথাও যায় নি। দ্বিতীয় আশঙ্কা, ...েহের ভার পেলেই নিশ্চল পাথর হয়ত ...জাগ হয়ে হেলে উঠবে—গতির বেগে ...য়ত পদচ্যুতি ঘটবে। সে-রকম দুরন্ত ...াথরের সঙ্গে মাঝে মাঝে পরিচয় ঘটেছে, ...াই স্বচ্ছন্দে চলার ছন্দপতনও হচ্ছে। ...তর্কগতিতে পাথরের ভারসাম্য বিচার ...রে এগিয়ে চলেছি। কিন্তু, অল্প ...ময়েই দেখি, পাথরগুলির সঙ্গেও যেন ...িবিড় পরিচয় হয়ে যায়, দেখলেই চেনা ...ায়—কার উপর নির্ভয়ে দেহ-ভার দিয়ে বিশ্বাস করতে পারবো।

গাইড্ বলে, বাবুজি, গঙ্গোত্রীর ...থের প্রধান বৈচিত্র্য হোল এই সব পাথর, কেদার-বদরীর পথে এমন নেই, কেবলই লাফিয়ে লাফিয়ে এখানে যেতে হবে। এরকম অনেক জায়গাতেই পাবেন।

সঙ্গী একজন বলেন, তাতে ক্ষতিও নেই, ভয়ও নেই। বরং, বেশ ভালই তাড়াতাড়ি চলা যাচ্ছে—লাফিয়ে চলায় স্পীড্ বাড়ছে।

হেসে বলি, লাফিয়ে চলার অভ্যাসটি যাবে কোথায়?

সবাই সানন্দে এগিয়ে চলি। কিন্তু, কোন্‌দিকে যাচ্ছি বা যেতে হবে বুঝি না। কিছু নীচেই গঙ্গার স্রোত বয়ে চলেছে। শুধু বুঝি, ঐ গঙ্গারই উৎস-মুখে চলেছি। কিন্তু নদীর গতি-পথ সরল রেখায় ত চলে না। উত্তুঙ্গ গিরি-শ্রেণীর প্রাচীর ভেদ করে পথ খুঁজে খুঁজে পার্বত্য নদী উদ্দাম বেগে ছুটে চলেছে। চলেছি হয়ত উত্তর মুখে, গাইড্ দেখায় পূর্বদিকে বরফ-ঢাকা পাহাড়ের চূড়ো, বলে, বাবুজি, ঐ! ঐ পাহাড়ের পিছন দিয়ে আমরা যাবো।

মনে পড়ে, গঙ্গাসাগর যাবার কথা। স্টীমারে গঙ্গার উপর দিয়ে চলেছি হয়ত দক্ষিণ মুখে। সারেঙ্ দেখায় পশ্চিম দিকের আকাশে ধোঁয়ার কুণ্ডলী, বলে, ওধার দিয়ে স্টীমার আস্‌ছে—নদী গেছে ঐ দিক্ দিয়ে ঘুরে!

আবার মনে পড়ে, উড়ে চলেছি প্লেনে আকাশ-পথে। নীচে তাকিয়ে দেখতে থাকি, বড় বড় নদীর গতি-পথ—সবুজ পৃথিবীর বুকে বালুকাময় স্বর্ণ-রেখা—সর্পিল ভঙ্গীতে এঁকেবেঁকে চলেছে!

নদীর বিচিত্র গতি।

চারিদিকে অচল হিমাচলের ধ্যান-স্তিমিত মূর্তি, তারি মাঝে সচল নদীর উচ্ছল জলোচ্ছ্বাস।

দেবাদিদেব মহাদেবের শিরশীর্ষের জটাজালে এই-ই বুঝি বা গঙ্গাবতরণ!

গঙ্গার অপর পারে দৃষ্টি পড়ে। ধারার কিছু উপরেই সামান্য সমতলক্ষেত্র। তারি একধারে ছোট একটি গুহা। গুহার বাহিরে ছোট ছোট কয়েকটি সাজানো পাথর মানুষের অস্তিত্বের সাক্ষ্য দেয়।

গাইড্ বলে, এক বড় সাধুর আশ্রম ছিল। একাই সাধনা করতেন ওখানে। যাত্রীদের মধ্যে ক্বচিৎ কখনো কেহ কেহ এসে দর্শন করতেন। মহাপুরুষ ছিলেন। আজ কিছুকাল হলো দেহরক্ষা করেছেন।

এখন, শূন্য আশ্রম ভাঙা মন্দিরের মত পড়ে আছে।

এই নিভৃত-বাসের মধ্যে তিনি কি পেয়েছিলেন, কি দিয়ে গেছেন, তার সন্ধান কে দেবে, তাই ভাবি।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

সুকুমার রায় স্মরণে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাংলা সাহিত্যে, বাংলাদেশের বালকবালিকাদের হৃদয়ে সুকুমার রায়ের আসন চিরপ্রতিষ্ঠিত। সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠায় অবলুপ্ত তাঁহার অমূল্য রচনাবলী ক্রমশ গ্রন্থাকারে সংবদ্ধ হইয়া বাংলা সাহিত্যের স্বর্ণ-ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করিতেছে—এই প্রসঙ্গে, তাঁহার পরলোকগমন বার্ষিকী উপলক্ষ্যে, আমরা আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

রবীন্দ্রনাথের সহিত সুকুমার রায়ের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ ছিল। সুকুমার রায়ের মৃত্যু ঘটিলে (২৪ ভাদ্র ১৩৩০) রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন মন্দিরে তাঁহার স্মরণে যে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন (২৬ ভাদ্র ১৩৩০) তাহা শান্তিনিকেতন পত্রে (ভাদ্র ১৩৩০) প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহা পুনর্মুদ্রণ করিতেছি। এইসঙ্গে সুকুমার রায়ের দুটি বাল্যরচনা আমরা প্রকাশ করিতেছি—সম্ভবত এইগুলিই তাঁহার প্রথম মুদ্রিত রচনা।

শ্রীপুলিনবিহারী সেন এই কবিতা দুইটি আমাদের সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। —সম্পাদক, দেশ

মানুষ যখন সাংঘাতিক রোগে পীড়িত, তখন মৃত্যুর সঙ্গে তার প্রাণশক্তির সংগ্রামটাই সকলের চেয়ে প্রাধান্য লাভ করে। মানুষের প্রাণ যখন সঙ্কটাপন্ন তখন সে যে প্রাণী এই কথাটাই সকলের চেয়ে বড় হয়ে ওঠে। কিন্তু অন্যান্য জীবের মতই আমরা যে কেবলমাত্র প্রাণী মানুষের এই পরিচয় ত সম্পূর্ণ নয়। যে প্রাণশক্তি জন্মের ঘাট থেকে মৃত্যুর ঘাটে আমাদের পৌঁছিয়ে দেয়, আমরা তার চেয়ে বড় পাথেয় নিয়ে জন্মেছি। সেই পাথেয় মৃত্যুকে অতিক্রম করে আমাদের অমৃতলোকে উত্তীর্ণ করে

দেবার জন্যে। যারা কেবল প্রাণীমাত্র মৃত্যু তাদের পক্ষে একান্ত মৃত্যু। কিন্তু মানুষের জীবনে মৃত্যুই শেষ কথা নয়। জীবনের ক্ষেত্রে অনেক সময়ে এই কথাটি আমরা ভুলে যাই। সেইজন্যে সংসারে জীবনযাত্রার ব্যাপারে ভয়ে, লোভে, ক্ষোভে পদে পদে আমরা দীনতা প্রকাশ করে থাকি। সেই আত্মবিস্মৃতির অন্ধকারে আমাদের প্রাণের দাবী উগ্র হয়ে ওঠে, আত্মার প্রকাশ ম্লান হয়ে যায়। জীব-লোকের ঊর্ধ্বে অধ্যাত্মলোক আছে যে-কোনো মানুষ এই কথাটি নিঃসংশয় বিশ্বাসের দ্বারা নিজের জীবনে সুস্পষ্ট করে তোলেন অমৃতধামের তীর্থযাত্রায় তিনি আমাদের নেতা।

আমার পরম স্নেহভাজন যুবকবন্ধু সুকুমার রায়ের রোগশয্যার পাশে এসে যখন বসেছি এই কথাই বারবার আমার মনে হয়েছে। আমি অনেক মৃত্যু দেখেছি কিন্তু এই অল্পবয়স্ক যুবকটির মত, অল্পকালের আয়ুটিকে নিয়ে মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে এমন নিষ্ঠার সঙ্গে অমৃতময় পুরুষকে অর্ঘ্যদান করতে প্রায় আর কাউকে দেখিনি। মৃত্যুর দ্বারের কাছে দাঁড়িয়ে অসীম জীবনের জয়গান তিনি গাইলেন। তাঁর রোগশয্যার পাশে বসে সেই গানের সুরটিতে আমার চিত্ত পূর্ণ হয়েছে।

আমাদের প্রাণের বাহন দেহ যখন দীর্ঘকাল অপটু হয়, শরীরের ক্রিয়া বাধা-গ্রস্ত হয়ে যখন বিচিত্র দুঃখ দুর্বলতার সৃষ্টি করে, তখন অধিকাংশ মানুষ আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা রাখতে পারে না, তার সংশয় উপস্থিত হয়। কিন্তু মনুষ্যত্বের সত্যকে যাঁরা জানেন তাঁরা এই কথা জানেন যে, জরামৃত্যু রোগশোক ক্ষতি-অপমান সংসারে অপরিহার্য, তবু তার উপরেও মানবাত্মা জয়লাভ করতে পারে

এইটেই হল বড় কথা। সে[illegible] করবার জন্যেই মানুষ আছে; [illegible] থেকে পালাবার জন্যে নয়। [illegible] দ্বারা মানুষ ত্যাগ করে, দুঃখ[illegible] মৃত্যুকে তুচ্ছ করে সেই শক্তি [illegible] বুঝিয়ে দেয় যে তার অস্তিত্ব [illegible] সুখদুঃখবিক্ষুব্ধ আয়ু-কালের [illegible] সীমানার মধ্যে বদ্ধ নয়। ম[illegible] পরিধির বাইরে মানুষ যদি [illegible] দেখে তাহলে সে আপনার প্র[illegible] বর্তমানের স্বার্থ ও আরামকে [illegible] করে আঁকড়ে ধরে। কিন্তু [illegible] মৃত্যুঞ্জয়ী শক্তি আপনার মধ্যে [illegible] করেচে বলেই মৃত্যুর অতীত [illegible] শ্রদ্ধা করতে পারে।

জীবনের মাঝখানে মৃত্যু যে [illegible] আনে তাকে ছেদরূপে দে[illegible] সেই মানুষ যে মানুষ [illegible] জীবনেরই মধ্যে পূর্ণতাকে উ[illegible] করেচে। যে মানুষ রিপুর [illegible] বন্দীকৃত, পরকে যে আপন করে জ[illegible] বৈষয়িকতার বৃহৎ বিশ্ব থেকে [illegible] নির্বাসিত, মৃত্যু তার কাছে নিরব[illegible] ভয়ঙ্কর। কেননা জগতে মৃত্যুর [illegible] একমাত্র আমি-পদার্থের ক্ষতি। [illegible] সম্পত্তি, আমার উপকরণ দিয়ে [illegible] সংসারকে আমি নিরেট করে তুলছি [illegible] মৃত্যু হঠাৎ এসে এই আমি-জগৎ [illegible] ফাঁকা করে দেয়। যে-আমি নিজের অ[illegible] নির্মাণের জন্যে স্থূল বস্তু চাপা [illegible] কেবলি ফাঁক ভরাবার চেষ্টায় দি[illegible] নিযুক্ত ছিল সে এক মুহূর্তে কে[illegible] অন্তর্ধান করে এবং জিনিস-পত্রের [illegible] পুঞ্জীভূত নিরর্থকতা হয়ে পড়ে থ[illegible] সেইজন্যে যে বিষয়ী, যে আত্মম[illegible] মৃত্যু তার পক্ষেই অত্যন্ত ফাঁকি। আ[illegible] জীবনে যে অত্যন্ত বড় করে নি সে[illegible] মৃত্যুকে সার্থক করে জানে।

সাহিত্যে চিত্রকলায় ব্যঞ্জনাই র[illegible] প্রধান আধার। এই ব্যঞ্জনার মানে, ক[illegible] বিরল করে ফাঁকের ভিতর দিয়ে ভ[illegible] ধারা বইয়ে দেওয়া। বাক্য ও অলঙ্ক[illegible] বিরলতার ভিতর দিয়ে যাঁরা ইঙ্গি[illegible] রসকে নিবিড় করেন তাঁরাই গুণী, যাঁদের ভাবুক দৃষ্টিতে সেই বিরল রসে, পূর্ণরূপে প্রকাশ পায় তাঁরাই রস[illegible]

ভাবের মহলে যারা অর্বাচীন তারা উপকরণকেই বড় করে দেখে সত্যকে নয়। সুতরাং উপকরণের ফাঁক তাদের কাছে সম্পূর্ণই ফাঁক। তেমনি নিজের আয়ুকালটাকে যে মানুষ 'আমি' ও 'আমি'র আয়োজন দিয়েই ঠেসে ভরিয়ে দেয়, সেই মানুষের মধ্যে অসীমের ব্যঞ্জনা থাকে না—সেইজন্যে মৃত্যু তার পক্ষে একান্ত মৃত্যু।

দিনের বেলাটা কর্ম দিয়ে, খেলা দিয়ে ভরাট থাকে। রাত্রি যখন আসে, শিশু তখন ভয় পায়, কাঁদে। প্রত্যক্ষ তার কাছে আচ্ছন্ন হয়ে যায় বলে সে মনে করে সবই বুঝি গেল। কিন্তু আমরা জানি, ছেদ ঘটে না, রাত্রি ধাত্রীর মত দিনকে অঞ্চলের আবরণের মধ্যে পালন করে। রাত্রিতে অন্ধকারের কালো ফাঁকটা যদি না থাকত তাহলে নক্ষত্রলোকের জ্যোতির্ময় ব্যঞ্জনা পেতুম কেমন করে? সেই নক্ষত্র আমাদের বলচে, "তোমার পৃথিবী ত এক ফোঁটা মাটি, দিনের বেলায় তাকেই তোমার সর্বস্ব জেনে আঁকড়ে পড়ে আছ। অন্ধকারে আমাদের দিকে চেয়ে দেখ—আমরাও তোমার। আমাদের নিয়ে আর তোমাকে নিয়ে এক হয়ে আছে এই বিশ্ব, এইটেই সত্য।" অন্ধকারের মধ্যে নিখিল বিশ্বের ব্যঞ্জনা যেমন, মৃত্যুর মধ্যেও পরম প্রাণের ব্যঞ্জনা তেমনি।

আমরা ফাঁক মানব না। ফাঁককে মানাই নাস্তিকতা। চোখে যেখানে ফাঁক দেখি আমাদের অন্তরাত্মা সেইখানে যেন পূর্ণকে দেখে। আমার মধ্যে এবং অন্যের মধ্যে মানুষে মানুষে ত আকাশগত ফাঁক আছে; যে লোক সেই ফাঁকটাকেই অত্যন্ত বেশি করে সত্য জানে সেই হল স্বার্থপর সেই হল অহংনিষ্ঠ। সে বলে, ও আলাদা, আমি আলাদা। মহাত্মা কাকে বলি যিনি সেই ফাঁককে আত্মীয়সম্বন্ধের দ্বারা পূর্ণ করে জানেন, জ্যোতির্বিদ যেমন করে জানেন যে, পৃথিবী ও চন্দ্রের মাঝখানকার শূন্য পরস্পরের আত্মীয়তার আকর্ষণসূত্র বহন করচে। এক দেশের মানুষের সঙ্গে আরেক দেশের মানুষের ফাঁক আরো বড়। শুধু আকাশের ফাঁক নয়, আচারের ফাঁক, ভাষার ফাঁক, ইতিহাসের

সুকুমার রায়॥ 'জন্ম ১৩ কার্তিক ১২৯৪, মৃত্যু ২৪ ভাদ্র ১৩৩০

ফাঁক। এই ফাঁককে যারা পূর্ণ করে দেখতে পারলে না তারা পরস্পর লড়াই করে পরস্পরকে প্রতারণা করে মরচে। তারা প্রত্যেকেই "আমরা বড়" "আমরা স্বতন্ত্র" এই কথা গর্ব করে জয়ডঙ্কা বাজিয়ে ঘোষণা করে বেড়াচ্চে। অন্ধ যদি বুক ফুলিয়ে বলে, "আমি ছাড়া বিশ্বে আর কিছুই নেই" সে যেমন হয় এও তেমনি। আমাদের ঋষিরা বলেচেন, পরকে যে আত্মবৎ দেখেচে সেই সত্যকে দেখেচে। কেবল কুটুম্বকে, কেবল দেশের মানুষকে আত্মবৎ দেখা নয়, মহাপুরুষেরা বলেচেন শত্রুকেও আত্মবৎ দেখতে হবে। এই সত্যকে আমি আয়ত্ত করতে পারিনি বলে এ'কে অসত্য বলে উপহাস করতে পারব না, এ'কে আমার সাধনার মধ্যে গ্রহণ করতে হবে। কেননা সম্পূর্ণরূপে পূর্ণস্বরূপের বিশ্বে আমরা ফাঁক মানতে পারব না।

এই কথাটি আজ এত জোরের সঙ্গে

আমার মনে বেজে উঠেচে সেদিন সেই যুবকের মৃত্যুশয্যা সুদীর্ঘকাল দুঃখভোগের পরে প্রান্তে দাঁড়িয়ে মৃত্যুর মত বিচ্ছেদকে, প্রাণ যাকে পরম জানে, তাকেও তিনি পরি দেখতে পেয়েচেন। তাই আমা অনুরোধ করেছিলেন—

"আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু,
বিরহদহন
তবু অনন্ত
তবু আনন্দ
নাহি ক্ষয়, নাহি শেষ
নাহি নাহি দৈন্য
সেই পূর্ণতার পায়ে
মন স্থান মা

যে গানটি তিনি আমাকে দুবার করে শুনলেন সেটি এই :

দুঃখ এ নয়, সুখ নহে গো
গভীর শান্তি এ
আমার সকল ছাড়িয়ে গিয়ে
উঠল কোথায় বে
ছাড়িয়ে গৃহ, ছাড়িয়ে আরাম
ছাড়িয়ে আপ
সাথে করে নিলে আমায়
জন্মমরণ পা
এল পথিক সেজে॥
চরণে তার নিখিল ভুবন
নীরব গগনে
আলোআঁধার আঁচলখানি
আসন দিল পেতে
এত কালের ভয়ভাবনা
কোথায় যে যায় সরে
ভালোমন্দ ভাঙাচোরা
আলোয় ওঠে ভরে
কালিমা যায় মেজে।—
দুঃখ এ নয়, সুখ নহে গো
গভীর শান্তি এ যে॥

জীবনকে আমরা অত্যন্ত সত্য অনুভব করি কেন? কেননা জীবনের আশ্রয়ে আমাদের চৈতন্য বি বিচিত্রের সঙ্গে আপনার বহুবিধ সম্ব অনুভব করে। এই সম্বন্ধবোধ বজি হয়ে থাকলে আমরা জড় পদার্থের ম থাকতুম, সকলের সঙ্গে যোগে নিজে সত্য বলে উপলব্ধি করতে পারতুম না

এই সুযোগটি দিয়েচে বলেই প্রাণকে এত মূল্যবান জানি। মৃত্যুর সম্মুখেও যাঁদের চিত্ত প্রসন্ন ও প্রশান্ত থাকে তাঁরা মৃত্যুর মধ্যেও সেই মূল্যটি দেখতে পান। যিনি সকল সম্বন্ধের সেতু, সকল আত্মীয়তার আধার, বহুর মধ্য দিয়ে যিনি একেকে বিধৃত করে রেখেচেন, তাঁরা মৃত্যুর রিক্ততার মধ্যে তাঁকেই সুস্পষ্ট করে' দেখতে পান। সেই জন্যেই এই মৃত্যুপথের পথিক আমাকে গান গাইতে বলেছিলেন, পূর্ণতার গান, আনন্দের গান।

তাঁকে গান শুনিয়ে ফিরে এসে সে রাত্রে আমি একলা বসে ভাবলুম, মৃত্যু ত জীবনের সব শেষের ছেদ, কিন্তু জীবনেরই মাঝে-মাঝেও ত পদে পদে ছেদ আছে। জীবনের গান মরণের শমে এসে থামে বটে, কিন্তু প্রথম থেকে শেষ-পর্যন্ত তার তাল ত কেবলই মাত্রায় মাত্রায় ছেদ দেখিয়ে যায়। সেই ছেদগুলি যদি বেতালা না হয়, যদি তা ভিতরে ভিতরে ছন্দোময় সঙ্গীতের দ্বারা পূর্ণ হয় তাহলেই শমে এসে আনন্দের বিচ্ছেদ ঘটে না। কিন্তু ছেদগুলি যদি সঙ্গীতকে, পূর্ণতাকে বাধা দিয়ে চলে, তাহলেই শম একেবারে নিরর্থক হয়ে ওঠে। জীবনের ছেদগুলি যদি ত্যাগে, ভক্তিতে পূর্ণস্বরূপের কাছে আত্ম-নিবেদনে ভরিয়ে রাখতে পারি,—মৌচাকের কক্ষগুলি মৌমাছি যেমন মধুতে ভরিয়ে রাখে, তাহলে যাই ঘটুক না, কিছুতেই ক্ষতি নেই। তাহলে শূন্যই পূর্ণের ব্যঞ্জনাকে বহন করে। বিশ্বের মর্মকুহর থেকে নিরন্তর ধ্বনিত হচ্ছে ওঁ, হাঁ—আমি আছি। আমাদের অন্তর থেকে আত্মা সুখেদুঃখে উৎসবে শোকে সাড়া দিক্‌ ওঁ, হাঁ, সব পূর্ণ, পরিপূর্ণ! বলুক,

আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু,
বিরহদহন লাগে,
তবুও শান্তি, তবু আনন্দ,
তবু অনন্ত জাগে॥

২৬ ভাদ্র ১৩৩০
শান্তিনিকেতন

সম্মুখভাগে উপবিষ্ট বালক সুকুমার রায়। সঙ্গে যে তিনটি বালিকার ছবি আছে তাঁহারা যথাক্রমে (উপর হইতে) সুকুমার রায়ের জ্যেষ্ঠা ভগিনী, শিশুদের জন্য রচনায় যশস্বিনী, 'গল্পের বই' ও আরো গল্পে'র লেখিকা সুখলতা রাও; পুণ্যলতা চক্রবর্তী, ইহার অনেক রচনাও 'সন্দেশ' পত্রে প্রকাশিত হইয়া সমাদর লাভ করিয়াছে; সুরমা রায়, 'বনের খবর'-লেখক প্রমদারঞ্জন রায়ের সহধর্মিণী ও 'দিন-দুপুরে'-র লেখিকা লীলা মজুমদারের জননী। এই চিত্রটি শ্রীসত্যজিৎ রায়ের সৌজন্যে প্রকাশিত

কবিতা

সুকুমার রায়ের বাল্যরচনা

নদী

হে পর্বত, যত নদী করি নিরীক্ষণ,
তোমাতেই করে তারা জনম গ্রহণ।
ছোট বড় ঢেউ সব তাদের উপরে,
কল্‌কল্‌ শব্দ করি সদা ক্রীড়া করে,
সেই নদী বেঁকে চুরে যায় দেশে দেশে,
সাগরেতে পড়ে গিয়া সকলের শেষে।
পথে যেতে যেতে নদী দেখে কত শোভা,
কি সুন্দর সেই সব কিবা মনলোভা!
কোথাও কোকিলে দেখে বসি সাথী সনে,
কি সুন্দর কুহু গান গায় নিজ মনে।
কোথাও ময়ূরে দেখে পাখা প্রসারিয়া
বনধারে দলে দলে আছে দাঁড়াইয়া!
নদীতীরে কত লোক শ্রান্তি নাশ করে,
কত শত পক্ষী আসি তথায় বিচরে।
দেখিতে দেখিতে নদী মহাবেগে ধায়,
কভুও সে পশ্চাতেতে ফিরে নাহি চায়।

(বয়স ৮ বৎসর)

মুকুল, ২য় ভাগ, ২য় সংখ্যা
জ্যৈষ্ঠ ১৩০৩

টিক্‌-টিক্‌-টং

টিক্‌-টিক্‌ চলে ঘড়ী টিক্‌-টিক্‌-টিক্‌,
একটা ইঁদুর এল, সে সময়ে ঠিক!
ঘড়ী দেখে এক লাফে তাহাতে চড়িল,
টং করে অমনি ঘড়ী বাজিয়া উঠিল।
অমনি ইঁদুর ভায়া লেজ গুটাইয়া,
ঘড়ীর উপর থেকে পড়ে লাফাইয়া!
ছুটিয়া পালায়ে গেল, আর না আসিল,
টিক্‌-টিক্‌-টিক্‌ ঘড়ী চলিতে লাগিল!

(বয়স ৯ বৎসর

মুকুল, ৩য় ভাগ, ২য় সংখ্যা
জ্যৈষ্ঠ ১৩০৪

মুকুল পত্রিকার নাম বর্তমান কালের শিশু পাঠক-পা[illegible] কাছে অপরিচিত—ষাট বৎসর পূর্বে এই পত্রিকা বাং[illegible] সমাজের একটি প্রধান অভাব নিবৃত্ত করিয়াছিল। ১৩[illegible] আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর উৎসাহে যোগীন্দ্রনাথ স[illegible] রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় শিশুদের জন্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে[illegible] রবিবাসরীয় নীতিবিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে এই পত্রি[illegible] করেন—প্রথম বর্ষে সম্পাদক ছিলেন শিবনাথ শাস্ত্রী। বহু সুধী লেখকের রচনায় এই পত্রিকা সমৃদ্ধ হ[illegible] রবীন্দ্রনাথের বহু সুপরিচিত কবিতা, "ছুটি হলে রো[illegible] জলে", "কোশল-নৃপতির তুলনা নাই", "বসেছে অ[illegible] তলায় স্নানযাত্রার মেলা" প্রভৃতি, এই পত্রিকায় [illegible] হইয়াছিল; সুকুমার রায়ের যৌবনকালে লিখিত কোন[illegible] রচনাও ইহাতে মুদ্রিত হয়। "চব্বিশ বৎসর চলিয়া [illegible] প্রচার রহিত হয়।......১৩৩৫ সালের বৈশাখ মাসে ইহার [illegible] প্রকাশিত হয়; সম্পাদিকা শকুন্তলা দেবী। ৩য় ব[illegible] বাসন্তী চক্রবর্তী সম্পাদনভার গ্রহণ করেন; তিনি ১[illegible] পর্যন্ত মুকুল পরিচালনা করিয়াছিলেন। †

---

† ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, "সাময়িকপত্র সম্পাদনে [illegible]

॥ ১৫ ॥

আসতে একটু দেরিই হলো আজ অমলেন্দুর। ভিজিটিং আওয়ার্সের ঘণ্টা পড়ে গিয়েছিল অনেকক্ষণ। বিছানায় আধশোয়া হয়ে বাসনা শুনছিল পায়ের শব্দ আর জুতোর খসখসানি বাড়ছে, কথা আর কলরব। মাঝে মাঝে হাঁক ডাক।

অমলেন্দু এই এসে পড়ল বলে, এখুনি পর্দা সরে ওর মুখ ভেসে উঠবে। বাসনা আর কোনোদিকে নয়, পর্দার দিকে একদৃষ্টে চেয়েই ছিল প্রায় যতক্ষণ পারে. আর ভাবছিল, প্রতি মুহূর্তেই মনে হচ্ছিল পর্দার ওপাশে অমলেন্দু এসে দাঁড়িয়েছে, মুখ বাড়িয়ে দেবে এখুনি।

কিন্তু অমলেন্দু আসছিল না। বাসনা ধৈর্য হারাচ্ছিল। আজকের দিনেই যত দেরি ওর। অন্যদিন হলে কথা ছিল না। কিন্তু সুধাময় কমলা এমনকি বোধ হয় বৌদিও যখন আসছে না আজ, তখন এই সময়ের যে কী মূল্য তা অমলেন্দুরও বোঝা উচিত। এমন সুযোগ হাসপাতালে আর পেতে পারে ওরা এরপর।

ধৈর্য ফুরিয়ে গেলে বাসনা যখন দুশ্চিন্তা শুরু করেছে অমলেন্দু এসে হাজির।

এতোক্ষণ যেন মুখটা অন্ধকার হয়েছিল বাসনার, এবার দপ্ করে জ্বলে উঠল। খুশীর আলোয় ঝলমল করে উঠল। 'এতো দেরি?' শুধলো বাসনা। কথাটা বলার পর, ভিজিটিং আওয়ার্সের কতখানি সময় পেরিয়ে গেছে তা যেন মনে পড়ে গেল এবং বাকি সময়টুকুর হিসেব করতে গিয়ে খুশীর আলো ম্লান হয়ে এল খানিক।

আজও ফুল এনেছিল অমলেন্দু। ফুল এবং কিছু ফলও। ওভালটিন এক কৌটো।

মিটসেফের মধ্যে ফল, ওভালটিন রাখতে রাখতে জবাব দিল অমলেন্দু, 'বলো না আর। যত তাড়াতাড়ি বেরুতে চাই ততোই একটা না একটা ফ্যাকড়া জোটে।' মিটসেফ বন্ধ করে—ওপর থেকে কাঁচের গ্লাসটা তুলে নিল। আগের ফুলগুলো শুকিয়ে এসেছে। সেগুলো সরিয়ে একটু জল ছিটে দিয়ে নতুন ফুল রাখতে রাখতে বলছিল অমলেন্দু, 'কলেজ থেকে পালাই পালাই করছি ডাক পড়ল প্রিন্সিপ্যালের ঘরে। সেখানে ছোটখাটো এক মিটিংই প্রায়। উঠতে কি আর পারি!'

'কলেজ থেকেই সোজা আসছ?'

'হ্যাঁ, আগের মোড়ে বাজারের কাছে নেমে এগুলো নিয়ে নিলাম।' একটা ফুল, সাদার ওপর বেগুনি ছিট দেওয়া নরম ছোট্ট ফুল টুপ করে বাসনার কোলে ফেলে দিয়ে টুলে এসে বসল অমলেন্দু। 'কেমন আছো আজ?'

'ভালো, বেশ ভালো।' বাসনা কোল থেকে ফুলটা তুলে নিয়ে নাকের কাছে ধরল একটু. 'দেখতেই যা, একটুও গন্ধ নেই।' ফুলটা গালে-গলায় আলতো করে বুলিয়ে নিচ্ছিল বাসনা, 'তুমি আসছো না, দেখে দেখে আমি শেষ পর্যন্ত ভাবনায় পড়েছিলাম।'

'দূর, আজ আমাকে আসতেই হতো, কমলাবৌদিরা কেউ আসবে না।' অমলেন্দু বললে, 'কালই তো কথা হয়ে গেল!'

হাতের ফুলটা একটু সরিয়ে ভুরু ছোঁয়া চোখ করে বাসনা ঠোঁট টিপে হাসল, 'শুধু সেই জন্যেই এসেছো?' একটু থেমে আবার. 'কেউ আসবে না—তাই শুধু খোঁজ খবর নিতে?'

অমলেন্দু বাসনার এই মিষ্টি মধুর ভঙ্গিটা দেখছিল। এই কৌতুক, ঝকমকে ভাবটা।

'উপস্থিত'—অমলেন্দু একটু গম্ভীর-গম্ভীর হয়ে হতাশ গলায় ঠাট্টা করে বললে, 'উপস্থিত তো শুধু খোঁজ খবর নিতেই আসা। তার বেশি নিতে পারছি কই?'

'তা তো ঠিকই।' বাসনা যেন অন্য-পক্ষের হয়ে অমলেন্দুকেই পরিহাস করে

(সি

সান্ত্বনা দিচ্ছে—তেমন সুরে বললে, 'গোটা লোকটাকেই যার নিয়ে যাবার কথা।'

'ওই কথাই, কাজে আর হচ্ছে না।' এবার অমলেন্দু সত্যিই ক্ষোভের সুরে বললে।

সঙ্গে সঙ্গে না হলেও একটু পরে অমলেন্দুর দিকে চেয়ে চেয়ে নিবিড় আবেশে বললে বাসনা, 'এবার হবে। সত্যিই হবে। আর তো কটা দিন।' থামল একটু, 'তুমি ভেবো না আমি এখানে খুব সুখে শান্তিতে আছি। তোমার জন্যে এখন আমার রোজ ভাবনা।'

কথাগুলো শুনতে শুনতে অমলেন্দুরও কেমন আবেশ লাগছিল। বাসনা চোখ নামিয়ে নিলেও ও তাকিয়েছিল। এবং দেখছিল বাসনাকে। ক্লান্ত অসুস্থ মুখেও কেমন এক মধু-মোহ ফুটে উঠেছে।

'ভাল হয়ে তোমার সঙ্গে নিজের জায়গাটিতে পৌঁছতে পারলেই আমি বাঁচি। আর আমার অন্য সাধ নেই। সবুর করতেও ইচ্ছে করে না।' বাসনা মুখ নীচু করে নোখ দিয়ে ফুল খুঁটছিল।

শীতের শেষবেলার অন্ধকার আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকে আসছে। আবছা আবছা ঘর, দেওয়াল, বিছানা। মুখ দুটোও খুব স্পষ্ট নয়। একটু ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাওয়াও যেন আসছে। বাইরে থেকে বিচিত্র গুঞ্জন। বাতি জ্বলেছে করিডোরে।

চুপ। ঘর চুপ। দুটি মানুষ কাছাকাছি বসেও যেন দূরে দূরে।

বাসনা ভাবছিল। কথাটা এবার শুরু করা দরকার। এখনই। এই নিস্তব্ধতা এবং অস্পষ্টতার মধ্যে। এরপর সময় ফুরিয়ে যাবে। এই মন, এই আবেগও হয়তো কোনো ঠুনকো কারণে ছিঁড়ে যাবে, ছিঁড়ে যেতে পারে। বাধাও আসতে পারে।

'তোমায় একদিন একটা কথা বলবো বলেছিলাম মনে আছে?' বাসনা ছোট্ট করে একটু কেশে শুরু করল কথা। মৃদু গলায়।

'হ্যাঁ, কিন্তু বললে না তো?'

'সময় পেলাম কই!' বাসনা পিঠের পাশ থেকে বালিশটা সরিয়ে খাটের মাথায় ভর করে বসল। প্যা টান, চাদরটা কোল পর্যন্ত টানা।

একটু চুপ। হঠাৎ ঘাড় ফিরিে সহজ গলায় শুধলো বাসনা, 'আচ্ছা, —সেই যে যখন তুমি আমাদের ব থাকতে, একদিন মাঝরাতে ঘুম আ না আর মাথাটাথা ধরে কষ্ট হচ্ছিল আমায় একটা ওষুধ দিলে না খেতে-

অমলেন্দু মনে করবার করছিল। বেশ অবাক হয়েই। পড়ছিল না।

'মনে পড়ছে না?' বাসনা অপেক্ষা করে শুধলো।

'না! ঘুম হচ্ছে না বলে কি ও বা খেতে দেবো। মাথা ধরলে অ্যাস ঘুম না হলে ব্রোমাইড্। কিন্তু হঠাৎ এমন আজগুবি কথা তোমার এলো কেন?'

'আমাকে তুমি একটা জলজল দিয়েছিলে। কী বিশ্রী খেতে!'

'ব্রোমাইড দিয়েছিলাম আর আমার কাছে সব সময় থাকে। খুব ঘুম না এলেই। অভ্যেসটা খার অমলেন্দু লঘু সুরে বলছিল।

'এখনও খাও?'

'হ্যাঁ। তোমার জন্যে তো ঘুম প্রায়। ব্রোমাইডেও কুলোচ্ছে না।' অম হাসল। 'তা কি, এখনও কি তে সেই ওষুধ দরকার নাকি?'

'না।' বাসনা অন্যদিকে মুখ ফি বললে। একটু পরে, 'সে-দিন আমি অসাড়ে ঘুমিয়েছিলাম, দরজা খোলা রে কোনো হুঁশ ছিল না।'

'ডাক্তারীটা ভালোই হয়েছিল তাহ

অমলেন্দু হাত বাড়িয়ে বাসনার বালিশটা ঠিক করে দিল।

'কিন্তু আমি কি ভেবেছিলাম জানো, বোকার মতন! ইস্—!' নীচের চিবুক নামিয়ে দাঁতে-জিবে একটা অনুশোচনার শব্দ করলে বাসনা। তারপর অমলেন্দুর হাতটা ধরে রাখল মুঠো করে।

সময় যেন ভারী হয়ে আসছিল! অন্ধকার ঘন হচ্ছে। ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে ঘরে। কলরব থেমে এসেছে বাইরে। জানলার বাইরে একটু বুঝি বা কুয়াশা। বটগাছে পাখি-ফেরা-সন্ধ্যের কিচির-মিচিরও থেমে এলো। ঘণ্টা পড়ে গেছে—তবু আজ আর এখনই উঠে যেতে দিল না বাসনা।

সে বলছিল, তার কথা, সে যা ভেবেছিল তখন নিজের সম্পর্কে, অমলেন্দুর সম্পর্কে। কী সাংঘাতিক ভয় পেয়েছিল বাসনা—কেন ভয় পেয়েছিল এবং অমলেন্দুকে কেন তার সন্দেহ হচ্ছিল। সেই সন্দেহ আস্তে আস্তে বদ্ধমূলেই হলো প্রায়। তখন তার ব্যবহার বদলেছে। তার সন্দিগ্ধ কুটিল মনের বিশ্রী সব চিন্তা আর বিরাগ আর শঠতার কথা বললে ও। এবং এই বিয়ে, হঠাৎ ভালবাসার ভান আর রাতারাতি বিয়েই বা কেন করে বসলো অমলেন্দুকে, কি উদ্দেশ্য! তারপর কমলারা এল। হাসপাতাল। ডাক্তার। বাসনার মনের এক বিরাট অন্ধকার-যবনিকা কেমন করে যে উঠে গেল। এবং যখন ও একা—অসহায় তখন সেই অন্ধকার সরিয়ে কেমন করে চিনতে পারল ওর জন্যে একটি সুন্দর নক্ষত্র কতো উজ্জ্বল হয়েই না জ্বলছে। যা এতোদিন চোখে পড়েনি। দেখেও দেখেনি। আর হ্যাঁ, বীথির কথাও বললে বাসনা। বীথির সেদিনের সেই কথাগুলোও। এমনকি আজ পূর্ণিমার কাছে সে যা বলেছে, পূর্ণিমার সামনে বসে, সে যাওয়ার পরও যা-যা ভেবেছে—সব সমস্ত কথা।

কিছুই লুকোচ্ছিল না বাসনা। লুকোতে চাইছিল না। তার আবেগ তাকে আজ অনুশোচনায় শুদ্ধ করতে চাইছিল। শুদ্ধ এবং পবিত্র। ভালবাসার আগুনে তার খাদ গলিয়ে-পুড়িয়ে সোনাটুকুকে নিরেট, উজ্জ্বল, মূল্যবান করতে চাইছিল।

বাসনা আরও একবার কাঁদিল, ফুঁপিয়ে নয়, শান্ত আবেগহীন, অনুচ্ছ্বসিতভাবে। বললে থেমে থেমে, 'এই আমার কথা। এতো কথা আমি একলাই শুধু ভেবেছি এতোদিন। তোমায় বললাম সব।'

চুপ। তারপর কেবিনের অন্ধকারে সমস্ত চুপ। সব যেন কাঠ। দুটো মানুষ দুটো ছায়ার মতন একটু তফাৎ হয়ে বসে। দুজনের নিশ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ উঠছে। দীর্ঘনিশ্বাসেরও। অমলেন্দু হাত সরিয়ে নিয়েছে অনেকক্ষণ। বাসনা বুকের ওপর নিজের দুটি হাত পেতে রেখেছে।

এতো গুমোট, এই অন্ধকার, নিস্তব্ধতা আর আড়ষ্টতা যেন আর সহ্য করতে পারছিল না অমলেন্দু।

উঠল টুল ছেড়ে। দীর্ঘনিশ্বাসটা নিজের কাছেই কেমন যেন অদ্ভুত শোনাল। বাতিটা জ্বালিয়ে দিল।

ধক্ করে একরাশ অসহ্য উদ্বেগ যেন এতোক্ষণে বাসনার মুখের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

বাসনা ভাল করে দেখবার চেষ্টা করছিল অমলেন্দুকে। কেমন যেন ভয়ে ভয়ে, বিস্ময়ে, সংশয়ে, আশায় আশায়।

অমলেন্দুও তাকিয়েছিল। দেখছিল বাসনাকে।

আর এখন, বাসনার মনে হচ্ছিল, অমলেন্দুর কালো মুখের সমস্ত কোমলতা মুছে গিয়ে একটা বিরক্তি, হতাশা, ক্ষোভ আর বেদনা পুরু হয়ে জমে গেছে।

অমলেন্দুর চোখে বাসনার সুশ্রী, ধবল, আয়ত চক্ষু, ম্লান, বিষণ্ণ ওই মুখের যেন আর, অন্য একটি অর্থ ধরা পড়ছিল।

অমলেন্দু মুখ নীচু করে যাওয়ার জন্যে পা বাড়াচ্ছিল।

'যাচ্ছো?' বাসনা যেন অনেক দূর থেকে প্রশ্ন করলে। এতো ক্ষীণ শোনাল গলা।

'হ্যাঁ, যাই।' অমলেন্দু জুতো দিয়ে মেঝে ঘষে একটা শব্দ করলে।

একটু চুপ।

'কিছু বললে না?' বাসনা ভিক্ষে চাওয়ার মত সুর করে বললে।

'কি বলবো!'

'কিছুই নেই বলার?'

'তেমন আর কি! তবে হ্যাঁ, তুমি ভেবে দেখো—এটা কেমন লাগে। এই অবস্থাটা।'

'আমি তা বুঝতেই পারছি। মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল!'

'মন?' অমলেন্দুর পুরু পাশে অত্যন্ত নিষ্ঠুর বিদ্রূপ উঠল, 'যাকে তুমি একটা পাকা দুশ্চরিত্র পুরুষ ভাবতে তার মন স এখন একটু বাড়াবাড়ি রকমের সহান দেখাচ্ছ।'

বাসনা ভীষণভাবে চমকে (সমস্ত মুখটা সাদা হয়ে গেছে। এ অন্য এক অমলেন্দু কথা বলছে।

'ছি-ছি, এ তুমি কি বলছো?' ব শিউরে উঠে ঝুঁকে বসতে বসতে অবশ গলায় বললে।

'নিজের কথা তো নয়, তোমার ব বলেছি।' অমলেন্দু পকেট থেকে র বের করে মুখ মুছতে একটু যা নিল। তারপর কেবিনের বাইরে।

বাসনার চোখের সামনে কে বাতিটা হঠাৎ যেন নিভে গেল। দেও পর্দা—সব যেন কেমন তালগোল পা দৃষ্টিটাকে ঝাপসা করে তুলছিল।

(ক্র

ধীরাজ ভট্টাচার্য

॥ সাত ॥

বাইরের ঘরে কাকা ও বাবা কি একটা কথা নিয়ে হাসাহাসি করছিলেন, আমি ঘরে ঢুকতেই দুজনে চুপ করে গেলেন। কাকাকে নমস্কার করে চলে আসছিলাম, বাবা ডাকলেন—'ধীউ বাবা, ভূপতির অফিসের বড়বাবু আরও অনেক অফিসার তোমার 'গিরিবালা' দেখে এসেছেন। ওঁদের খুব ভাল লেগেছে। ভূপতির উপর হুকুম হয়েছে একদিন ওঁদের অফিসে তোমায় নিয়ে যেতে, আলাপ করবেন।'

দেখলাম পুত্রগর্বে বাবার মুখ বেশ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

আমার কাকার নাম ভূপতি বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবার মামাতোভাই। কলকাতার একটা বড় সওদাগরী আফিসে সিনিয়র কেরানী।

কাকা বললেন—'হ্যাঁ, আরও মুশকিল হয়েছে। ওরা কি করে জানতে পেরেছে ও আমার ভাইপো। তা যাস্ একদিন আফিসে আলাপ করিয়ে দেব।'

হঠাৎ কাকার এতখানি পরিবর্তনে মনে মনে বেশ খানিকটা বিস্মিত হলেও মুখে বললাম—'যাবো।'

কাকা—'বইটা লিখেছে তো রবি ঠাকুর। তা এইরকম বইয়ে নামলে লোকেও ভাল বলে আর নামও হয়।'

জবাব না দিয়ে চলে আসছিলাম, কাকা বললেন—'আজকাল আমাদের বাড়ি যাস্‌নে কেন?'

বললাম—'ছবির কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়—তা ছাড়া—'

—'তা ছাড়া কি?'

—'তা ছাড়াও বায়োস্কোপে কাজ করি, যখন-তখন আপনার বাড়ি গেলে লোকের কাছে আপনার—'

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে কাকা বললেন 'আমার মাথা নিচু হয়ে যাবে—না? জেঁপোমিটুকু ষোল আনা আছে। ওরে মুখ্যু, আমরা মানে গুরুজনেরা, যা বলি তোদের ভালর জন্যেই বলি। ওসব মনে রাখতে নেই।'

কাকার বিব্রত অবস্থাটা বুঝতে পেরেই বোধহয় বাবা বললেন—'হ্যাঁ হ্যাঁ—গুরুজনের কথায় রাগ করতে নেই। যেদিন শুটিং থাকবে না ঘুরে এস খিদিরপুরে ভূপতির বাসায়।'

ভূপতির বাসার চেয়েও বেশী আকর্ষণ আমার রায় বাহাদুরের প্রাসাদ। কাজেই তখনি সম্মতিসূচক ঘাড় নেড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লাম রিনির খোঁজে।

সারা বাড়ি নিঝুম নিস্তব্ধ, রিনির খোঁজ আর পাইনে। রান্নাঘরের পাশ দিয়ে আসবার সময় মা আর কাকিমার গলা পেলাম।

কাকিমা বলছেন—'এখনও বলছি তোমায় রাঙাদি ছেলের বিয়ে দিয়ে দাও। পরে একদিন দেখবে একটা মেমসাহেব, নয়তো বাজারের একটা অ্যাকট্রেসকে বিয়ে করে এনে তুলবে, নয়তো বিয়ে ন করে তাকে নিয়ে অন্য কোথাও থাকবে বাড়িই আর আসবে না।'

দেখতে না পেলেও বেশ বুঝতে পারলাম, মা আঁতকে উঠলেন—তারপর প্রায় কাঁদ কাঁদ গলায় বললেন—'কি হবে ছোটবৌ? আমি বলে বলে হার মেনে গিয়েছি। কর্তার ঐ এক কথা—ছেলে নিজে থেকে বিয়ে না করলে আমি কোনওদিন বলবো না। তুই একবার ঠাকুরপোকে দিয়ে বলাতে পারিস?'

উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। কাকিমা বললেন—'তুমি যদি চাও বলাতে পারি, কিন্তু তাতে কোনও ফল হবে বলে মনে হয় না। যাই বল দিদি—ভাসুর ঠাকুর একটু নরম প্রকৃতির, পুরুষমানুষ একটু শক্ত না হলে চলে?'

আর দাঁড়ানো নিরাপদ নয় মনে করে ডাকলাম—'বউরে পার্ল-হোয়াইট।' রান্নাঘরের ভিতর থেকে একটা অব্যক্ত গোঙানির আওয়াজ ভেসে এল। বিস্মিত হয়ে দরজার সামনে এসে দাঁড়ালাম। ভিতরে এক নজর চেয়েই হেসে ফেললাম। রান্নাঘরের একপাশে মা আর কাকিমা মুখোমুখি গম্ভীর হয়ে বসে—আর এক পাশে কাকার দু-তিনটে ছোট ছেলেমেয়ে নিয়ে রিনি একখানা বড় থালায় একগাদা পরোটা ও খানিকটা আলু-চচ্চড়ি নিয়ে তাদের সদ্ব্যবহারে ব্যস্ত। মনে হল একখানা আস্ত পরোটায় খানিকটা আলু-চচ্চড়ি দিয়ে সেটা তালগোল করে পাকিয়ে মুখে পুরে দিয়েছে রিনি, সেই
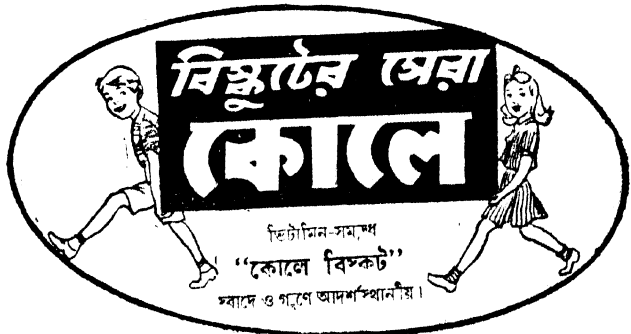
সময় আমার ডাকে সাড়া দিতে গিয়েই ঐ রকম গোঙানি আওয়াজ। দেখলাম, প্রাণপণে সেটা গেলবার চেষ্টা করেও পারছে না রিনি।

কষ্টে হাসি থামিয়ে বললাম—'ব্যস্ত হবার দরকার নেই পার্ল-হোয়াইট। পরশু রবিবারে তোদের বাড়ি গিয়ে গল্পটা শুনিয়ে আসব। এখন আমি বাইরে যাচ্ছি।'

চলে আসতে যাচ্ছি, বেশ একটু শ্লেষের সংগেই কাকিমা বললেন—'তবু ভাল, এতদিন বাদে গরিব কাকিমার কথা মনে পড়েছে ছেলের।'

একটু আগে রিনির কাছে শোনা কাকার কথাগুলো বুকের মধ্যে কিলবিল করে উঠল। একটা কড়া জবাব দিতে গিয়ে অতিকষ্টে সামলে নিয়ে হেসেই বললাম—'গরিব হওয়ার ঐ এক মস্ত অসুবিধে কাকিমা। কেউ ফিরে তাকায় না, এমন কি ভগবান পর্যন্ত। তিনিও তেলা মাথায় তেল মাখাতে ব্যস্ত।'

বলেই উত্তরের অপেক্ষা না করেই আমার ঘরে ঢুকে পড়লাম।

বাইরে যাচ্ছি ত বলে এলাম। এখন যাই কোথায়। হঠাৎ মনে পড়ল আজ ম্যাডান স্টুডিওতে জাল সাহেবের পরিচালনায় 'আলাদিন ও আশ্চর্য-প্রদীপ' হিন্দী ছবিটার শুটিং আছে। হিন্দি ছবি মানে টাইটেলগুলো হিন্দিতে লিখে দেওয়া হবে। তাড়াতাড়ি ফর্সা জামা-কাপড় প'রে বেরুতে যাচ্ছি, নজর পড়ল জুতোটার উপর। মনে হল যেন জিভ বার করে ভেংচি কাটছে। অনেকদিনের পুরোনো এলবার্ট, ডান পায়ের টো-এর বাঁদিকে খানিক সেলাই ছিঁড়ে যেন হাঁ করে আছে। ছেঁড়া সুতোর টুকরো-গুলো মনে হল দাঁত আর সেই ছেঁড়া ফাঁকের মধ্যে বুড়ো আঙুলের খানিকটা দেখা যাচ্ছে। একটু চললে বা পা নাড়লে ঠিক মনে হবে—জিভ বার করে ব্যাঙের হাসি হাসছে। হতাশ হয়ে বিছানার উপর বসে পড়লাম। কিছুদিন আগে হলেও না হয় কথা ছিল, কিন্তু সদ্য-মুক্তিপ্রাপ্ত 'গিরিবালা'র নায়ক এই ছেঁড়া জুতো পায়ে দিয়ে স্টুডিওতে যেতে পারে? বিদ্রোহী মন চিৎকার করে উঠল,—কখনই না। তাহলে উপায়? বাবার কাছ থেকে পাঁচটা টাকা চেয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

ট্রাম থেকে ধর্মতলায় নেমে চীনের দোকানের জুতো কিনব বলে বেণ্টিঙ্ক স্ট্রীট ধরে উত্তরমুখো এগিয়ে চলেছি, ও হরি সব দোকান বন্ধ। ব্যাপার কি! আশে-পাশের দু'একজন মুসলমান দোকানীকে জিজ্ঞাসা করেও কোনও সদুত্তর পেলাম না। জুতো-ব্যবসায়ী সব চীনেম্যান একজোট হয়ে ধর্মঘট করে বসল নাকি!

হতাশ হয়ে অদ্ভুত-নামের সাইন-বোর্ড-গুলো দেখতে দেখতে এগিয়ে চললাম। থা থট্, লুং ফো, লি চং সুং হিং, মা থিন্।

মাথিন? সারা দেহের উপর দিয়ে একটা বিদ্যুতের শিহরণ বয়ে গেল। ফুটপাথের একটা থাম ধরে দাঁড়িয়ে পড়লাম। তখনকার মত সর্বেন্দ্রিয় আমার অবশ পঙ্গু হয়ে গেছে। মাথা ঘুরছিল, পাশের একটি বন্ধ দোকানের সিঁড়ির উপর বসে পড়লাম।

কতক্ষণ এইভাবে বসেছিলাম মনে নেই। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালাম। মন অনেকটা শান্ত হয়ে এসেছে। এক পা দু পা করে সেই সর্বনেশে সাইন-বোর্ডের কাছে এসে দাঁড়ালাম। ভাল করে চেয়ে দেখি মাথিন নয় নামটা মং থিন। অনুস্বরটা আকারের মত এমন খাড়া করে লিখেছে যে, ম-এর মাত্রার সঙ্গে মিশে গেছে। একটু দূরে থেকে দেখলেই মা ছাড়া কিছুই মনে হবে না। হঠাৎ মনে পড়ল স্টুডিওর শুটিংএর কথা। আপাতত জুতো কেনা স্থগিত রেখে ধর্মতলা থেকে টালিগঞ্জের ট্রামে উঠে বসলাম।

স্টুডিওতে ঢুকে দেখি গেট থেকে শুরু করে সারা স্টুডিও চত্বরটা শুধু চীনেম্যান আর চীনেম্যান, কিলবিল করে বেড়াচ্ছে। বেণ্টিঙ্ক স্ট্রীটের জুতোর দোকানগুলো কেন আজ বন্ধ, এতক্ষণে বুঝতে পারলাম।

মাথার প্রকাণ্ড টিকিটা মাটিতে পায়ের কাছে লোটাচ্ছে—ঠোঁটের উপর নাকের নীচে খানিকটা ফাঁক, তারপর দুটো সরু গোঁফ গালের পাশ দিয়ে নেমে এসেছে বুকের কাছাকাছি। পরনে বিচিত্র রঙএর ঢিলে পায়জামা, তার উপর ঢিলে আলখেল্লার মত রঙচঙে চীনে প্যাটার্নের জামা, পায়ে চীনে চটি বা ক্যাম্বিসের অদ্ভুত জুতো; চণ্ডু আর চুরুটের ধোঁয়া, তার সঙ্গে অদ্ভুত দুর্বোধ্য ভাষা। সব মিলিয়ে মনে হল স্টুডিওর আবহাওয়াটাই বদলে গেছে। অতিকষ্টে ভিড় ঠেলে একটু একটু করে এগুচ্ছি, সামনে দেখি মুখার্জি। অকূলে কূল পেলাম যেন। কিছু জিজ্ঞাসা করবার আগে মুখার্জি বললে—

'চীনে-পাড়ায় আজ চীনেম্যান নেই—তিনখানা লরি বোঝাই করে সব ঝেঁটিয়ে নিয়ে এসেছি।'

জিজ্ঞাসা করলাম—'কিন্তু এসব অদ্ভুত পোশাক-আশাক—'

কথা শেষ করতে পারলাম না। মুখার্জি বললে—'পার্শি অ্যালফ্রেড থিয়েটার আর কোরিন্থিয়ান থিয়েটারের সমস্ত পোশাক, পরচুলো আর বারোজন ড্রেসার, মেকাপম্যান কাল রাত্রের শো শেষ হবার পর থেকেই এখানে এসেছে। জাল সাহেবের শুটিং, একেবারে দুর্গোৎসবের ব্যাপার!'

বেশ একটু কৌতূহল হল, বললাম—'আচ্ছা মুখার্জি, জাল সাহেব খুব বড় ডিরেক্টার, না?'

মিনিটখানেক চুপ করে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল মুখার্জি, তারপর কি ভেবে বললে—'নিশ্চয়। প্রথমত জাল সাহেব জাতে পার্শি, ম্যাডানদের আত্মীয়। তার উপর নিজে ক্যামের ঘোরান, সঙ্গে সঙ্গে ডাইরেকশান দিয়ে থাকেন। বাপরে, এতগুলো কোয়ালিফিকেশন যার, তাকে বড় ডিরেক্টর বলতেই হবে—না বললে চাকরিই থাকবে না।'

উত্তরের অপেক্ষা না করেই মুখার্জি চীন-সমুদ্রে তলিয়ে গেল। একবার ভাবলাম বাড়ি চলে যাই, আবার তখনই মনে হল এত বড় ব্যাপারটা না দেখে

গেলে আফসোস থেকে যাবে। এক পা দু পা করে ভিড় ঠেলে আবার এগুতে শুরু করলাম।

উত্তরমুখো আর একটু এগিয়ে দেখি পরিচালক জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়, মনমোহন এবং আরও দু-তিনজন বাঙালী স্টুডিও কর্মী দাঁড়িয়ে জটলা করছে। মনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাক-নাম মনু। অধুনা নিউথিয়েটার্সের চীফ ক্যামেরাম্যান। আমার সমবয়সী। ফুটফুটে সুন্দর চেহারা। সব সময় মুখে পান আর দোক্তা ঠাসা। প্রতি কথায় অকারণ খানিকটা হাসা, এই নিয়েই মনমোহন। সাদা জামাকাপড় প'রে মনমোহনের সামনে দাঁড়িয়ে কথা কওয়া খুব নিরাপদ ছিল না। তার ঐ অকারণ হাসির ধাক্কায় পান-দোক্তার রস পিচকারির মত প্রতিপক্ষের বুক রাঙিয়ে দিত। ভুক্তভোগী, তাই একটু দূর থেকেই জিজ্ঞেস করলাম—'ব্যাপার কি মনু, কাজ-কর্ম ছেড়ে এখানে দাঁড়িয়ে কি হচ্ছে?'

এখানে একটু বলে নেওয়া দরকার মনমোহন পরিচালক জ্যোতিষবাবুর নিকট-আত্মীয়। অভিনেতা হবার প্রবল ইচ্ছা নিয়ে জ্যোতিষবাবুকে অনেক সাধ্য-সাধনা করে ম্যাডানে ঢোকে। কিন্তু বাদ সাধলো ঐ পান আর দোক্তা। অনেক চেষ্টা করেও যখন মনমোহন ওদের নাগপাশ থেকে মুক্ত হতে পারল না, তখন অগত্যা জ্যোতিষবাবু এডিটিং ডিপার্ট-মেণ্টে ঢুকিয়ে দিলেন।

যা ভয় করেছিলাম তাই, নিমেষে কাছে এসে আমার ফর্সা সাদা জামাটা ডান হাত দিয়ে মুঠো করে ধরে এক পক্কড় হেসে নিল মনমোহন। তারপর বললে—'জাল সাহেবের শুটিং, এ ফেলে কাজ? পাগল হয়েছিস?'

ততক্ষণে আমার যা সর্বনাশ হবার তা হয়ে গেছে। জোর করে জামা থেকে ওর হাতখানা ছাড়িয়ে কি একটা বলতে যাচ্ছি, হঠাৎ হুড়মুড় করে আমায় দুহাতে জড়িয়ে ধরে বুকের উপর মুখ-খানা চেপে হাসতে শুরু করল মন-মোহন। বেশ বিরক্ত হয়েই বললাম—'কি ছেলেমানুষী হচ্ছে?'

হাসি থামিয়ে কানের কাছে মুখ এনে বললে মনমোহন—'জাল সাহেব, ঐ দ্যাখ্ ক্যামেরা ঘাড়ে করে চলেছে।'

নামই শুনেছিলাম, চোখে কোনওদিন দেখিনি। স্থান-কাল-পাত্র এমন কি আমার শখের জামাটার পরিণাম ভুলে অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম। লম্বা খুব বেশী যদি হয়ত সাড়ে চার ফুট, চওড়া তিন ফুট। প্রকাণ্ড জালার মত ভুঁড়িটা প্রায় বুক থেকে নেমেছে। গায়ে লম্বা কাল পার্শি কোট। পরনের সাদা জিনের প্যাণ্ট ঐ দীর্ঘ পার্শি কোটের আওতায় পড়ে অস্তিত্ব হারাতে বসেছে। প্রকাণ্ড একটা ধড়ের উপর ততোধিক প্রকাণ্ড একটা মুণ্ড কে যেন চেপে বসিয়ে দিয়েছে। গলা বলে কিছু নেই। মাংসল সুগোল লালচে মুখ, রোদে-পোড়া রঙ। ভাঁটার মত গোল দুটো চোখ, দেখলেই মনে হবে ভদ্রলোক সব সময় চটেই আছেন। ধ্যাবড়া বড়ির মত ছোট্ট নাকের দুপাশ দিয়ে দুগাছা শ্রীহীন গোঁফ গালের পাশে নেমে এসেছে, যেন অবহেলায় লজ্জায় মাথা উঁচু করে কারো দিকে চাইতে পারছে না। মাথায় লম্বা গোল পার্শি টুপি, একটু বেশী লম্বা, বোধ হয় খোদার উপর খোদকারি করে উচ্চতা বাড়াবার চেষ্টা।

মনে হল জীবনে এই একটিবার মনমোহন অকারণে হাসেনি। অপলক চোখে চেয়েই আছি। সব মিলিয়ে মানবদেহে এতবড় একটা গরমিল আর কোনওদিন আমার চোখে পড়েনি।

চারপাশে বিচিত্র পোশাকপরা অগণিত চীনেম্যান, মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন ক্যামেরায় হাত দিয়ে ম্যাডানের এস্ (Ace) পরিচালক জাল সাহেব। পুরো নাম জাল খাম্বাটা না জাল মার্চেণ্ট মনে নেই। মনমোহনের কাছে শুনলাম, জাল সাহেবের ছ'জন অ্যাসিস্ট্যাণ্ট। দুজন বাঙালী, অসিত ও জগন্নাথ। দুজন পার্শী, আর দুজনের একজন মুসলমান অপরটি পাঞ্জাবী। বলা বাহুল্য তখনকার দিনে একজন সহকারী হলেই পরিচালকের কাজ চলে যেত। গাঙ্গুলী মশাই, মধু বোস, জ্যোতিষবাবু, এঁদের একজনের বেশী সহকারী ছিল না। শ্রদ্ধা ও কৌতূহল বেড়ে গেল। এক পা দু পা করে ভিড় ঠেলে খুব কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। আধ ডজন সহকারীর মাঝে নেপোলিয়নের মত দাঁড়িয়ে আছেন জাল সাহেব, পাশে লম্বা তে-পায়া স্ট্যাণ্ড-এর উপর ফিট করা রয়েছে একটা কালো চৌকো কাঠের বাক্স। লম্বা প্রায় দেড় ফুট, চওড়া আট ইঞ্চি। বাক্সটার মাঝখানে একটা ছোট হ্যাণ্ডেল ফিট করা, ঐটেই হল ক্যামেরা।

বেশ একটু অবাক হয়ে মনমোহনকে জিজ্ঞাসা করলাম—'সতীন দাস যে ক্যামেরায় গাঙ্গুলী মশায় বা মধু বোসের ছবি তোলে সে ত হল এল্ মডেল ডেব্রি। এটা কী ক্যামেরা?'

এবার আমার পিঠের উপর মুখ রেখে হাসল মনমোহন। বুঝলাম পৃষ্ঠ-রক্ষা করার চেষ্টা বৃথা। ওর যা করবার তা হয়ে গেছে।

একটু পরে মুখ তুলে বললে মনমোহন—'ওটা হল প্যাথে নিউজ রীল ক্যামেরা—অতি পুরোনো মডেল, আজ-কাল লেটেস্ট মডেলের অনেক ভাল ভাল ক্যামেরা বেরিয়েছে, কিন্তু জাল সাহেব সিনেমার শুরু থেকে ঐটে আঁকড়ে পড়ে আছেন।'

হঠাৎ চুপ করে গেল মনমোহন। ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখি বিচিত্র পোশাক পরা চীনেম্যানের দল হৈ-হৈ করতে করতে পূর্বদিকের বাগানে ঢুকছে। এখানে বলে রাখি অত বড় ম্যাড স্টুডিওটার সিকি অংশ শুধু পরিষ্কার করে শুটিং-এর কাজ চলতো—বাকী বিশেষ করে পুব দিকটা ছিল একেবারে গভীর জঙ্গল, বড় বড় গাছ ও আগাছায় ভরতি।

চীনেম্যানের দল বাগানে ঢুকছে, যেন রক্তবীজের বংশ। শেষই হয় না। আমাদের কাছ থেকে কিছুদূরে ঐ অদ্ভুত ক্যামেরাটার উপর একটা হাত রেখে সেনাপতির মত অন্য হাত নেড়ে উত্তেজিতভাবে কি সব বলছেন জাল সাহেব। খানিকটা ইংরেজী, খানিকটা গুজরাটি আর উর্দু মেশানো। একটা কথারও মানে বুঝতে পারলাম না। সহকারী দু'জন ছুটোছুটি করে একবার যাচ্ছে চীনেম্যানদের কাছে, আবার ছুটে আসছে জাল সাহেবের কাছে। রীতিমত একটা যুদ্ধযাত্রার পূর্বাভাষ। মনমোহনের দিকে তাকিয়ে দেখি, তার স্বভাবসিদ্ধ হাসি নেই, রীতিমত অবাক হয়ে চেয়ে আছে।

একটু পরে সব চুপচাপ। বিস্মিত হয়ে দেখলাম, যেন কোন যাদুমন্ত্রে সব চীনেম্যান অদৃশ্য হয়ে গেছে স্টুডিওর জঙ্গলে। এইবার ক্যামেরাটি ঘাড়ে নিয়ে পুবমুখো করে দাঁড় করালেন জাল সাহেব। তারপর ডান হাত দিয়ে হাতলটা ঘোরাতে যাবেন, এমন সময় বাঙালী সহকারী জগন্নাথ কি যেন বলতে ছুটে এল জাল সাহেবের কাছে। বিকট পাশবিক হুংকার ছাড়লেন জাল সাহেব। ভাষা না বুঝলেও যার ভাবার্থ হল, এখন কোনও কথা নয়, ডোন্ট ডিস্টার্ব মি। বেশ একটু দমে গিয়ে হতাশ দৃষ্টিটা জঙ্গলের দিকে মেলে অপরাধীর মত চেয়ে রইল জগন্নাথ।

কানের কাছে ফিস ফিস করে বলে উঠল মনমোহন—'হুঁ হুঁ, এ বাবা বাঘা ডিরেক্টর! কাজের সময় আজেবাজে কোনও কথাই চলবে না।'

ক্যামেরার হাতল ঘোরাতে ঘোরাতে জাল সাহেব হাঁকলেন—'কাম ফরোয়ার্ড'!

মিনিটখানেক চুপচাপ। শুধু এক-

টানা ক্যামেরার ঘরর্ ঘরর্ আওয়াজ ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না।

কিন্তু কৈ? কেউ ত' এগিয়ে এলো না। আরও খানিকক্ষণ ক্যামেরা ঘুরিয়ে চললেন জাল সাহেব। তারপর হঠাৎ ক্যামেরা ছেড়ে দিয়ে চিৎকার করে উঠলেন হিন্দিতে—'ইধার আ যাও ইউ ফুলস্' এই হুঙ্কারে চীনেম্যান একটিও এলো না, এলো ছ'জন সহকারী পরিচালক। ভয়ে তাদের মুখ বিবর্ণ পাংশু হয়ে গেছে।

জাল সাহেবের লাল মুখ আরও লাল হয়ে গেছে। তার উপর ঘামে সমস্ত মুখখানা সপসপ করছে। রুমাল দিয়ে দু-তিনবার মুছেও কিছু হোল না। রাগে ভিজে রুমালখানা আছড়ে মাটিতে ফেলে হিন্দী ও ইংরেজীর তুবড়ী ছুটিয়ে দিলেন—'ক্যা মতলব? হোয়াট ইজ অল দিস? হামারা ইন্‌সট্রাকশনস ক্যা থা?'

প্রথমটা ভয়ে কেউই জবাব দেয় না। আবার গর্জন করে উঠলেন জাল সাহেব—'সে সামথিং ইউ বাঞ্চ অব ফুলস্।'

অসিত এগিয়ে এসে ভাঙা ভাঙা হিন্দি ও বাঙলায় এক নিশ্বাসে বলে গেল—'আপনি বলেছিলেন যে, আপনি প্রথমে আমাদের ইশারা করবেন, তারপর আমরা সাদা রুমাল নেড়ে ওদের আসতে বলব। আমরাও ওদের তাই বুঝিয়েছিলাম। কিন্তু আপনি সেসব কিছু না করেই চেঁচিয়ে উঠলেন—কাম ফরওয়ার্ড— ।'

—'এনাফ্! টেল দেম হোয়েন আই সে 'কাম ফরওয়ার্ড'—কাম।'

আবার ছুটল অ্যাসিস্ট্যান্টের দল জঙ্গলে। চারদিক থেকে শোনা গেল বহু-কণ্ঠের মৃদু গুঞ্জন। চিৎকার করে উঠলেন জাল সাহেব 'খামোশ।'

নিমেষে গুঞ্জন থেমে গেল। একটু পরে সহকারীর দল ফিরে এসে জানালে সব ঠিক আছে।

শুরু হোল শুটিং।

ক্যামেরা খানিকটা ঘুরিয়ে হাঁফ ছাড়লেন জাল সাহেব—'কাম ফরওয়ার্ড!' একটু পরে দেখি ভয়ে মড়ার মত পাংশু মুখে একটি একটি করে চীনেম্যান বেরিয়ে আসছে জঙ্গল থেকে, চোখে শঙ্কিত চাহনী।

আট দশজন এইভাবে আসার পর হঠাৎ ক্যামেরা ছেড়ে দিয়ে শূন্যে একটা তুড়িলাফ দেবার ব্যর্থ চেষ্টা করে চিৎকার করে উঠলেন জাল সাহেব—'স্টপ্, রোখ্‌খো!'

চীনেম্যানের দল কিন্তু থামল না। একটির পর একটি এগিয়েই চলল। দু-তিনটি সহকারী ছুটে গিয়ে ওদের হাত-মুখ নেড়ে কি সব বলতে তবে থামল।

এরই মধ্যে বেশ হাঁফিয়ে পড়েছেন জাল সাহেব। দু-হাত দিয়ে মাথার দুপাশের রগ দুটো টিপে ধরে হাঁপাতে হাঁপাতে সহকারীদের উদ্দেশ করে বললেন—উন লোগোঁকো বোল দো ইট্ ইজ নট ফিউনারেল সিন, ইট ইজ হ্যাপি সিন। হাসনে বোলো।

তাই হলো, অনেক কষ্টে হাত-মুখ নেড়ে হেসে ওদের বুঝিয়ে দেওয়া হল যে, এটা শোকের বা দুঃখের দৃশ্য নয়, সবাই হাসতে হাসতে আসবে। আবার চীনের দল জঙ্গলে ঢুকল।

ক্যামেরা নিয়ে প্রস্তুত হলেন জাল সাহেব। জগন্নাথ কাছে এসে বলল—'একটা কথা স্যার।'

আবার চিৎকার করে উঠলেন জাল সাহেব 'বাত্ নেহি মাঙ্‌তা, কাম মাঙ্‌তা। যাও, ডোণ্ট ডিসটার্ব মি নাউ।'

ক্ষুণ্ণ মনে ফিরে গিয়ে সঙ্গীদের ফিস্‌ফিস্ করে কি বললে জগন্নাথ। তারপর হতাশ দৃষ্টি মেলে জঙ্গলের দিকে চেয়ে রইল। ততক্ষণে জাল সাহেব ক্যামেরা ঘোরাতে শুরু করে দিয়েছেন। একটু পরেই কাম ফরোয়ার্ড বলার সঙ্গে সঙ্গেই পিলপিল করে চীনের দল আসতে শুরু করে দিলে। ভয়-ব্যাকুল দৃষ্টি তাদের জাল সাহেবের দিকে, মুখে জোর করে আনা এক অদ্ভুত হাসি বর্ষার ক্ষণিক ভিজে রোদের মত নিষ্প্রাণ। ক্যামেরার পাশ দিয়ে এক এক করে সবাই চলে গেলে হাতল ঘোরান বন্ধ করলেন জাল সাহেব। বুঝলাম এ-শট্‌টা শেষ হল।

বেশ একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলে মনমোহন 'এটা কি হাসি ভাই?'

হেসে জবাব দিলাম—'যে হাসিই হোক, তোমার হাসির চেয়ে ঢের নিরাপদ। এ হাসিতে মনে ত নয়ই, এমন কি জামা-কাপড়েও স্থায়ী ছাপ রেখে যায় না।'

জাল সাহেবের গলা শুনলাম—'সব কো বুলাকে জঙ্গল চলো।' সেনাপতির মত হুকুম দিয়েই স্ট্যাণ্ডসুদ্ধ ক্যামেরাটি ঘাড়ে করে জঙ্গলের পথ ধরলেন জাল সাহেব। সহকারীর দল ছুটোছুটি করে ঐ দেড় শ' দু'শ' চীনেম্যান নিয়ে সঙ্গে চলল। মনমোহন আর আমিও মন্ত্রমুগ্ধের মত কৌতূহলী হয়ে চলতে শুরু করলাম।

একটু যেতেই অসিত আর জগন্নাথ কাছে এসে বলল—'আর এগিও না ভাই। দেখছ ত' সাহেবের মেজাজ, তার উপর কড়া হুকুম দিয়েছে, যাদের কাজ আছে তারা ছাড়া কেউ যেন জঙ্গলে না ঢোকে।'

অগত্যা ফিরে গিয়ে আমগাছ তলায় দুখানা ভাঙা নড়বড়ে টিনের চেয়ার টেনে নিয়ে বসলাম।

একটু পরে বহু লোকের সম্মিলিত বিকট হাসির আওয়াজ ভেসে এল জঙ্গলের দিক থেকে। অনুমানে বুঝলাম, চোখ রাঙিয়ে বা ভয় দেখিয়ে ঐ চীনের পালকে হাসাতে শুরু করেছেন জাল সাহেব।

বেলা প্রায় সাড়ে চারটে বাজে। মনমোহনকে বললাম—'চল বাড়ি যাওয়া যাক। ওদের ঐ জঙ্গলপর্ব শেষ হতেই সন্ধ্যে হয়ে যাবে।'

নীরব সম্মতি দিয়ে উঠে দাঁড়াল মনমোহন। গল্প করতে করতে দুজনে গেটের কাছে এসে পড়লাম। হঠাৎ দেখি, একটি কুড়ি বাইশ বছরের ছেলে হন্তদন্ত হয়ে আমাদের দিকে ছুটে আসছে। কাছে এলে চিনলাম ও ভবেশ। ল্যাবরেটরিতে কাজ করে। জিজ্ঞাসা করলাম—'ব্যাপার কি ভবেশ? ও-রকম করে ছুটে চলেছ কোথায়?'

দাঁড়িয়ে একটু দম নিয়ে বললে ভবেশ—'আপনাদের কাছেই আসছিলাম।'

বেশ একটু অবাক হয়ে বললাম—'তার মানে?'

ভবেশ বললে—'এর মধ্যেই চললেন কোথায়?'

বললাম—'বাড়ি।'

বিজ্ঞের মত একটু হেসে বললে ভবেশ—'নাচ না দেখে বাড়ি যাবেন না। সারা জীবনের মত আপসোস থেকে যাবে।'

মনমোহন আর আমি প্রায় একসঙ্গে বলে উঠলাম—'নাচ? কোথায়?'

এক নিঃশ্বাসে বলে গেল ভবেশ—'একটা অপূর্ব সুন্দরী বাঙালী মেয়েকে নিয়ে এসেছে জাল সাহেব এই ছবিটায় একটা নাচের জন্যে। একটা সিনের ছোট্ট একটা নাচের পারিশ্রমিক পাঁচ শো টাকা। বেলা দুটো থেকে তিন তিনটে ড্রেসার হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে তাকে পোশাক পরাতে, এখনও শেষ হয়নি।'

উচ্ছ্বসিত হয়ে বললাম—'ভবেশ, তোমার উপকার জীবনে ভুলবো না। এ নাচ না দেখে যদি বাড়ি যাই, সারা জীবন তীব্র অনুশোচনায় তিলে তিলে দগ্ধ হয়ে মলেও তার ঠিক প্রায়শ্চিত্য হবে না।'

আর কোনও কথা না বলে এবাউট টার্ন করে স্টুডিওয় ঢুকতে যাব পিছনে জামাটায় টান পড়ল। ফিরে দেখি মনমোহন। কিছু জিজ্ঞাসা করবার আগেই বললে—'আমি বলছি নাচের এখনও বেশ দেরি আছে। ততক্ষণ চ' না ভাই, মোড়ের দোকান থেকে এক কাপ চা আর পান খেয়ে আসি।'

ভেবে দেখলাম, কথাটা মন্দ বলে নি মনমোহন। এতক্ষণ ভুলে একরকম ছিলাম ভাল। মনে করিয়ে দিতেই প্রাণটা চা চা করে আর্তনাদ করে উঠল। চেয়ে দেখি লোভাতুর দৃষ্টিটা গোপন করবার অছিলায় অন্য দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে ভবেশ। বললাম—'এত বড় একটা সুখবর এনেছ প্রতিদানে অন্তত এক কাপ চা না খাওয়ালে নেমকহারামি হবে. এস ভবেশ।'

তিনজনে দ্বিগুণ উৎসাহে হাঁটতে হাঁটতে টালিগঞ্জের তেমাথায় সবেধন নিলমণি

দোকানটিতে ঢুকে তিন কাপ চা ও তিনটে ওমলেটের অর্ডার দিয়ে বাইরের বেঞ্চিটায় বসে পড়লাম।

* * *

তখন পাঁচটা বেজে গেছে। সূর্য হেলে পড়েছে টালিগঞ্জের তেমাথার বৃহৎ বট-গাছটার আড়ালে। খানিকটা নিস্তেজ হলদে রোদ ছিটকে এসে পড়েছে স্টুডিওর সিমেন্ট-বাঁধানো চত্বরটার উপর। তারই শেষপ্রান্তে কোরিন্থিয়ান থিয়েটারের একটা জমকালো সিন টাঙিয়ে, মেঝেয় বহুমূল্যে কার্পেট বিছিয়ে, আশে-পাশে কয়েকটা সোফা টেবিল সাজিয়ে একটা কক্ষের দৃশ্য করা হয়েছে আর সেই কক্ষের ঠিক মাঝখানে কার্পেটের উপর বিচিত্র পোশাক পরে দাঁড়িয়ে আছে নর্তকী বীণা।

এত ভিড় ম্যাডান স্টুডিওয় এর আগে কখনো দেখিনি। অতি কষ্টে দু-হাতে ভিড় ঠেলে আমি আর মনমোহন একটু একটু করে সামনে এগোতে লাগলাম। আশেপাশের মৃদু গুঞ্জনের কয়েকটা কারো কানে এল। "কী আইডিয়া দেখেছেন?" "এই জন্যেই জাল সাহেবকে ম্যাডান কোম্পানী মাসে হাজার টাকা মাইনে দেয়।" "মেয়েটা কি সুন্দর দেখতে —ওকে হিরোইন করলেই ঠিক হতো।" ইত্যাদি ইত্যাদি। দ্বিগুণ উৎসাহে সামনে এগিয়ে চললাম। বেশ খানিকটা কাছে এসে বীণাকে দেখলাম। হ্যাঁ সত্যিই দেখবার মত। লম্বা ছিপছিপে চেহারা, রং বেশ ফরসা, আর তারি সংগে মিল রেখে নাক চোখ মুখ নিখুঁত সুন্দর। বেশ কিছুক্ষণ চেয়ে দেখতে ইচ্ছে করে।

ফিস্‌ফিস্ করে কানের কাছে মুখ এনে মনমোহন বললে—'এটা কোন্ দেশী পোশাক ভাই?'

এতক্ষণে মেয়েটার পোশাকের দিকে নজর পড়ল। সত্যিই অবাক হবার কথা। বাঙালী মেয়েদের ধরনে একখানা দামী গাঢ় নীল রঙের বেনারসি পরা। সোনালী জরির কাজ করা মোগল আমলের দু-হাতা লাউড রঙের বিচিত্র ব্লাউজ, জাহাঙ্গীর বাদশার আমলের ভারি ভারি জড়োয়া গহনায় বাহু, গলা, কান ভরতি। মাথায় আধুনিক ফাঁপানো খোঁপায় লাল আর সাদা ফুল গোঁজা। পাতলা ফিনফিনে গোলাপী ওড়নাটা মাথা থেকে বুকের দু'পাশে ঝোলানো, পায়ে মেম সাহেবদের হাই-হিল জুতো। এ যেন বিস্মৃতির অতলে ফেলে আসা দু-তিনটে যুগকে নাকে দড়ি দিয়ে টেনে এনে বর্তমানের সংগে মিল খাওয়ানোর চেষ্টা।

হঠাৎ হাসিতে ফেটে পড়ল মনমোহন। আমাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে পান-দোক্তা খাওয়া মুখখানা কাঁধের উপর ঘষতে ঘষতে অতি কষ্টে বললে—'জাল সাহেবের দিকে চেয়ে দ্যাখ!'

দেখলাম স্ট্যান্ডটাকে যথাসম্ভব ছোট করে তার উপর ক্যামেরা বসিয়ে বাঁ চোখটা ভিউ-ফাইন্ডারের উপর চেপে ধরে ডান হাত দিয়ে চোখটা টিপে ধ'রে উটের মত এক অদ্ভুত ভঙ্গীতে নিশ্চল পাথরের মত দাঁড়িয়ে আছেন জাল সাহেব। ঘামে ভিজে ব্লু-ব্ল্যাক পার্শি-কোটটার বুক পেট পিঠ ও হাত দুটো আবলুশ কাঠের মত আরও কালো দেখাচ্ছে। অবশিষ্ট কয়েকটা অংশ ঘামের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে অতি কষ্টে নিজের বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে লজ্জায় নীল হয়ে ফ্যালফ্যাল করে সবার দিকে চেয়ে আছে। টুপি মাথায় থাকলে ক্যামেরার মধ্যে দিয়ে দেখার অসুবিধা হয়, তাই সেটা খুলে ক্যামেরার হ্যান্ডেলটার উপর ঝুলিয়ে রেখে দেওয়া হয়েছে। হাসি আসাই স্বাভাবিক। হঠাৎ ক্যামেরা ছেড়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন জাল সাহেব। বদ্‌রাগের ডিনামাইট দিয়ে ঠাসা গোমড়ামুখো লোকটা হঠাৎ যেন কোন যাদুমন্ত্রে আগাগোড়া বদলে গেছে। হাসি-খুশীতে মাংসবহুল গোল মুখখানা আরও গোল হয়ে উঠেছে। দেখলাম, ঘামে স্যাঁত-সেঁতে মুখখানা ও টাকবহুল মসৃণ মাথাটা জামার হাতা দিয়ে বেশ যত্ন করে মুছে নিলেন জাল সাহেব। তারপর হেলে-দুলে গজেন্দ্রগমনে বীণার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। একটু পরে হঠাৎ দেখি, হাত দিয়ে বীণার ডান বুকের ওড়না সরিয়ে দিলেন, তারপর এক গাল হেসে কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে কি যেন বললেন। লজ্জায় লাল হয়ে মুখ নীচু করে রইলো মেয়েটা। বুঝলাম, এবার বক্স অফিসের দিকে নজর দিয়েছেন জাল সাহেব।

চুপি চুপি মনমোহনকে বললাম—'এই

না হলে বড় ডিরেক্টর! দেখেছিস সব দিকে কি রকম কড়া নজর!'

উত্তরে কি একটা বলতে যাচ্ছিল মনমোহন, বলা হল না। বিজয় গবে ফিরে এসে ক্যামেরার কাছে দাঁড়ালে জাল সাহেব। জগন্নাথ অসিত ও একা অবাঙালী সহকারী কাছে এসে বললে 'একটা কথা স্যার অনেকক্ষণ ধরে—'

কথা শেষ করতে পারল না ওর হঠাৎ ডিনামাইটে আগুন লেগে গেল অধৈর্য হয়ে চীৎকার করে উঠলেন জাল সাহেব—'গেট আউট, অল অব ইউ। বা নেহি মাঙতা, কাম মাঙতা। সমঝা? ই ফুলস!'

রাগে ক্যামেরার হাতল থেকে টুপি উঠিয়ে নিয়ে চেপে মাথায় বসিয়ে দিলে জাল সাহেব। তারপর ক্যামেরার লেন্স এর মধ্যে চোখ দিয়ে দেখতে লাগলেন নিস্তব্ধ জনতা ভয়ে বিস্ময়ে একটা কিছু অঘটন ঘটবার প্রত্যাশায় চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল, ঘটলোও তাই।

ক্যামেরায় চোখ রেখে ডান হাতখান নীচু থেকে উপরে তোলার সঙ্গে সঙ্গে বললেন জাল সাহেব—'শাড়ী উঠাও বীণা শাড়ী উঠাও।'

ভয়ে বিস্ফারিত চোখে বীণা চেয়ে রইল জাল সাহেবের দিকে। অপেক্ষমা জনতার ভেতর থেকেও খুশীর কি বিস্ময়ের জানি না, একটা অস্ফুট গুঞ্জ শুরু হয়ে গেল।

ক্রুদ্ধ চোখে চারদিক দেখে নিয়ে হা ইশারায় সহকারীদের কাছে ডাকলে জাল সাহেব। তারপর গলাটা একটু খাটো করে বীণাকে দেখিয়ে বললেন—উসক উধার লে যাও আওর আচ্ছা করকে সমঝা দো—হোয়াট আই ওয়াণ্ট।'

কক্ষের শেষ প্রান্তে খালি একা সোফায় বীণাকে নিয়ে বসালে জগন্নাথ তারপর হাত মুখ নেড়ে দু তিন জনে কি বোঝাতে লাগল, আর মাটির দিকে চো বীণা খালি মাথা নাড়ছে।

মনমোহনকে বললাম—'চল বাড়ি যাই। ঐ ধারে সন্ধ্যেরও ত আর দে নেই।'

আমাকে দু হাতে জড়িয়ে ধরে মন মোহন বললে—'পাগল হয়েছিস, এর শে না দেখে যাবি কোথায়? আর রোদ্দুর

থাকলেও জাল সাহেবের ছবি ওঠে। ওর লেন্স খুব পাওয়ার ফুল।'

ভাবলাম—'হবেও বা।'

ইতিমধ্যে হতাশ করুণ মুখে বীণা এসে দাঁড়িয়েছে স্ব স্থানে। দ্বিগুণ উৎসাহে জাল সাহেব ক্যামেরা নিয়ে ফোকাস করতে শুরু করে দিলেন। এবার ক্যামেরাটা যেন হুমড়ি খেয়ে পড়েছে বীণার পায়ের উপর। ঐ ভাবে ক্যামেরা ফিট করে আবার এগিয়ে বীণার ডান দিকের বুকের ওড়না সরিয়ে দিলেন জাল সাহেব। মনমোহন ফিস ফিস করে আমার কানের কাছে বললে—'ফটো তুলছে পায়ের, তখন বার বার ওর বুকের ওড়না সরাচ্ছে কেন ভাই?'

বেশ একটু বিরক্ত হয়েই চাপা গলায় বললাম—'ওরে মুখ্যু! ঐ ক্যামেরা যখন পায়ের দিক থেকে শুরু করে আস্তে আস্তে মুখ তুলে বীণার সারা দেহের উপর চোখ বোলাবে, তখন বুঝতে পারবি।'

বুঝতে পেরেই বোধ হয় চুপ করে গেল মনমোহন।

কিছু দূরে দাঁড়িয়ে জগন্নাথ ও অসিত বিবর্ণ মুখে পরস্পরকে জাল সাহেবের দিকে ইশারা করে কি যেন বলতে বলছে, কিন্তু দেখলাম শেষ পর্যন্ত কেউই সাহস করে এগোতে পারল না। শুটিং শুরু হল। ঐ হুমড়ি খেয়ে পড়া ক্যামেরায় চোখ ঢুকিয়ে একটা কালো কাপড়ে মাথা ঢেকে ডান হাত দিয়ে ক্যামেরা ঘোরাতে শুরু করলেন জাল সাহেব। একটু পরেই জাল সাহেবের গলা শুনতে পেলাম—'শাড়ী উঠাও বীণা, শাড়ী উঠাও।'

সবিস্ময়ে দেখলাম ভীত চকিত চোখদুটো দিয়ে চারদিক দেখে নিয়ে লজ্জানত মুখে আস্তে আস্তে ডান পায়ের দিকের শাড়ীটা গুটিয়ে উপরে ওঠাতে শুরু করল বীণা। কৌতূহলী জনতা লোলুপ দৃষ্টি নিয়ে যেন ভেঙে পড়ল পায়ের উপর। বেশ একটু শঙ্কিত হয়ে মনে মনে ভাবলাম 'বক্স অফিস থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে এবার কি জাল সাহেব কর্পোরেশনের কোনও বিশেষ ডিপার্ট-মেন্টের দিকে নজর দিতে চলেছেন?'

সন্দেহ ভঞ্জন হতে দেরি হল না। বীণা হাঁটু পর্যন্ত শাড়ীটা তুলেছে, আর হাঁটুর আঙুল ছয়েক নিচে নকল সোনার চওড়া একটা ব্যান্ড দিয়ে বাঁধা রয়েছে একটা গোল রিস্ট ওয়াচ। হঠাৎ মনে হল যেন ঘড়িটা আমাদের দিকে চেয়ে দাঁত বের করে নির্লজ্জের মত হাসছে। ভাবলাম আর কিছুদিন যদি সুস্থ দেহে বেঁচে থাকেন আর এই রকম তিন চারখানা নাচের ছবি তোলেন জাল সাহেব, তাহলে নারী দেহে রিস্ট ওয়াচের পরিণতি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? কল্পনা করেই আতঙ্কে চোখ বুজে ফেললাম।

জাল সাহেবের গলা শুনতে পেলাম, 'নাচো বীণা, হ্যাঁ ঐছন শাড়ী পাকড়কে নাচো ভাই।'

গালচের উপর শাড়ীখানা হাঁটু পর্যন্ত তুলে নাচতে শুরু করেছে বীণা। একটু পরেই দেখি ক্যামেরার হাতল বন্ধ হয়ে গেছে, কালো কাপড় দিয়ে মাথা থেকে গলা পর্যন্ত ঢেকে ত্রিভঙ্গ মূর্তিতে বেঁকে ক্যামেরার লেন্সে চোখ লাগিয়ে, কালো পার্শি-কোটে ঢাকা প্রকাণ্ড ব্যাক গ্রাউণ্ডটা হেলিয়ে দুলিয়ে নেচে চলেছেন জাল সাহেব। হঠাৎ ছেলেবেলায় পড়া 'আবোল তাবোলের একটি বিখ্যাত কবিতার প্রথম লাইনটা মনে পড়ে গেল—'যদি কুমড়োপটাশ নাচে।' নাচতে নাচতে মুখে তারিফ করতে লাগলেন জাল সাহেব—বহুৎ আচ্ছা মেরে জান! ভেরি গুড। হঠাৎ বোধ হয় মনে পড়ে গেল যে, ক্যামেরা চলছে না। নাচ থামিয়ে উৎসাহ-ভরে ক্যামেরা ঘোরাতে শুরু করলেন আবার। এইভাবে আরও দশ মিনিট ধরে চললো ঐ বিচিত্র অদ্ভুত নাচ। নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও সেদিনকার মত শুটিং শেষ করতে হল। বাহ্য জগতে ফিরে এসে দেখি বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে।

সারা দিনের অক্লান্ত পরিশ্রমে ঘর্মাক্ত অবশ দেহে একটা সোফার উপর এলিয়ে পড়ে সদ্য ডাঙগায় তোলা একটা বৃহৎ কালো মাছের মত হাঁফাতে লাগলেন জাল সাহেব।

সামনে চেয়ে দেখি এরই মধ্যে কাপড় বদলাতে বীণা চলে গিয়েছে মেকআপ রুমে। আশাহত দর্শকের দল ক্ষুণ্ণ মনে একে একে সরে পড়তে শুরু করছে। অনুসন্ধানী চোখ দিয়ে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও মনমোহনকে কোথাও দেখতে পেলাম না। অবাধ্য হাসি সামলাতে অথবা পান দোক্তা খেতে সে এরই মধ্যে কখন নিঃশব্দে চম্পট দিয়েছে। আমি কিন্তু তখনও হাসিনি। কি জন্যে জানি না চুপ করে এক পাশে দাঁড়িয়ে রইলাম। একটু বাদে খানিকটা সুস্থ হয়ে সোফার উপর উঠে বসলেন জাল সাহেব, তারপর হাত ইশারায় সহকারীদের কাছে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন—'বোলো, ক্যা বোলনে চাহতা থা!'

জগন্নাথ মুখখানা কাঁচুমাচু করে, বললে, 'এখন আর বলে কি হবে স্যার।'

বিস্ফারিত চোখে হুঙ্কার ছাড়লেন জাল সাহেব—'হোয়াট?'

সাহস করে এগিয়ে এসে অসিত বললে, 'সকাল থেকে যতবার কথাটা আপনাকে বলতে এসেছি, দূর দূর করে আমাদের তাড়িয়ে দিয়েছেন।'

অধৈর্য হয়ে চীৎকার করে উঠলেন, জাল সাহেব—'মগর মামলা ক্যা হ্যায়?'

জগন্নাথ কুঁই-কুঁই করে বললে, 'আজ সারাদিন খালি ক্যামেরায় ছবি তুলেছেন, ওতে ফিল্ম পরানই হয়নি।'

কোনও জবাব না দিয়ে আবার সোফায় শুয়ে পড়লেন জাল সাহেব। আর আমি? কোনও রকমে দম বন্ধ করে এক রকম ছুটে স্টুডিওর গেট পার হয়ে দুহাত দিয়ে পেটটাকে চেপে ধরে হাসতে হাসতে বসে পড়লাম রাস্তার উপর।

(ক্রমশঃ)

সঙ্গীতে কণ্ঠচর্চা

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে (অন্ধ গায়ক)

বাংলা দেশে কণ্ঠ সংগীতের বহুল প্রচারে সত্যই আমি সুখী। তবে একটা বিষয় আমাকে বড় হতাশ করছে। তা হচ্ছে বাংলা দেশে প্রকৃত কণ্ঠধনে ধনী এমন শিল্পীর খুবই অভাব। কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে, কণ্ঠচর্চাকে এড়িয়ে চলার জন্যই এই অবস্থা ঘটেছে। আর তার জন্যই শিল্পের ঘটছে অপমৃত্যু। আজ বাংলা দেশ থেকে ধ্রুপদ এবং টপ্পা লুপ্তপ্রায় আর তার একটিমাত্র কারণ কণ্ঠচর্চার অভাব।

যে উদাত্ত কণ্ঠস্বর ধ্রুপদের জন্য প্রয়োজন এবং যে তানভঙ্গি প্রয়োজন টপ্পার জন্য, তা যথেষ্ট সাধনাসাপেক্ষ, সেই সাধনার প্রতি ঔদাসীন্যই শিল্পের অকাল মৃত্যু ঘটাচ্ছে। ধ্রুপদ ছিল বাংলার একটি বিশিষ্ট সম্পদ এবং বহু বাঙ্গালী শিল্পী সেই সম্পদের অধিকারীও ছিলেন। আজ তাঁদের অবর্তমানে বাংলার সেই বৈশিষ্ট্য নষ্ট হতে চলেছে। তবে এখনও যা আছে, তা বাংলা ছাড়া অন্য কোথাও আছে বলে আমার মনে হয় না।

শ্রীরামনিধি গুপ্ত যিনি নিধুবাবু নামে প্রসিদ্ধ, তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন টপ্পা গায়ক এবং রচয়িতা হিসাবে, কিন্তু আজ তাঁর অবর্তমানে টপ্পা গানের সংগে সংগে আমরা সংগীত জগতের সেই কৃতী সন্তানকেও ভুলতে চলেছি। উদীয়মান শিল্পীগোষ্ঠী সেই লুপ্ত রত্ন ভাণ্ডারের উদ্ধার সাধনে যদি না সচেষ্ট হন, তাহলে সেই রত্ন ভাণ্ডার চিরকাল অন্ধকারে লুপ্তই থেকে যাবে।

গান আরম্ভ করার সময় প্রথা আছে প্রথমে গলায় সুর লাগানোর এবং তা সর্ববাদীসম্মত, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় সেই সুর লাগান হয় গলা চেপে। খোলা গলায় সুর লাগাতে যেন আমরা ভুলতেই বসেছি। এরও কারণ কণ্ঠচর্চার অভাব।

সংগীতের মধ্যে কণ্ঠসংগীতের স্থান সর্ব উচ্চে। কণ্ঠ ভগবানের দান। তাকে মার্জিত করে, সংগীতোপযোগী করে তোলার দায়িত্ব শিল্পীর। আমার সংগীত জীবনে যত বিখ্যাত শিল্পীর গান শুনেছি বা এখনও শুনছি, তাঁরা তাঁদের কণ্ঠচালনার দ্বারা বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, কঠিন পরিশ্রম ব্যতীত যে স্তরে তাঁরা উঠেছেন, সেই স্তরে পেঁছানো কোনরকমেই সম্ভব নয়। সুতরাং কণ্ঠচর্চা সদগুরুর নির্দেশমত হওয়াই বাঞ্ছনীয়, যাতে সুর এবং তাল একসাথেই আয়ত্ত করা যেতে পারে। সংগীতের আর একটি প্রধান অংগ হল এই তাল। কাজেই কোনটিকেই অবহেলা করা চলে না। আজকাল বাংলা গানে দেখা যায়, কেবল দাদরা ও কাহারবা তালেরই ব্যবহার বেশী এবং তাও যতদূর সম্ভব সরল উপায়ে, কিন্তু অন্যান্য যে তালগুলি আছে, সেসব তালে কেন বাংলা গান গাওয়া হয় না? আগেকার দিনে তাও হত, এখন আর তা বড় একটা শোনা যায় না।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ অসংখ্য গানের সৃষ্টি করে গেছেন চৌতাল, ধামার, এক-তাল, ত্রিতাল প্রভৃতি তালে। কিন্তু সেসব গানও খুব কম লোকেই গেয়ে থাকেন। কেবল তাঁর হালকা গানগুলিই শোনা যায় বেশী। এতে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট উচ্চাংগ সংগীতের প্রতি যেন একটা অবজ্ঞার ভাব লক্ষিত হয়। অনেক সময় দেখা গেছে কোনও রবীন্দ্র উচ্চাংগ সংগীত যদিও বা পরিবেশন করা হচ্ছে, কিন্তু তার সংগে কোনও তবলা বা পাখোয়াজ নেওয়া হয়নি। এমনকি তালের প্রতিও দৃষ্টি দেওয়া হয় না।

সংগীতশিল্পীর পক্ষে প্রয়োজন একটি শিল্পীসুলভ মনের। কোনও শিল্পীর গান শুনে হয়ত তাঁর সমালোচনা করার অধিকার আমার আছে, কিন্তু সেই সমালোচনা যেন এমন না হয়, যাতে সেই শিল্পী উদাম হারায়। এমন অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে, সংগীত পরিবেশন ভাল না হলেও শিক্ষনীয় বস্তু তার মধ্যেও অনেক থেকে যায়। তাই শিল্পীসুলভ মনের সংগে সংগে প্রয়োজন একটি শিক্ষার্থী মনেরও। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত যত গায়কের গান শোনার সৌভাগ্য হবে, তার প্রত্যেকের মধ্য থেকে নিতে হবে ভাল অংশটি। আমার অন্তত তাই-ই আদর্শ; এবং উদীয়মান শিল্পীদের প্রতিও আমার এই অনুরোধ।

দেশে উচ্চাংগ সংগীতের প্রসারকল্পে জাতীয় সরকার যথেষ্ট উৎসাহী হয়ে উঠেছেন। বেতার মারফত তার কিছু কিছু পরিচয়ও পাওয়া যাচ্ছে এবং অনেক প্রবীণ সংগীতশিল্পীকে সরকার সমাদরও জানিয়েছেন। কিন্তু উচ্চাংগ সংগীতকে জনপ্রিয় করে তোলা, সে এক অন্য জিনিস। যাতে জনসাধারণের মন থেকে উচ্চাংগ সংগীতের প্রতি বিতৃষ্ণা দূর করা যায়, তার জন্য অতি সহজ এবং সরল উপায় চিন্তা করতে হবে। সরকারের দৃষ্টি আমি এই দিকেই আকর্ষণ করছি। পরিশেষে অনুরোধ জানাচ্ছি সমগ্র শিক্ষককুলের প্রতি তাঁরা যেন ছাত্রছাত্রীবৃন্দকে কণ্ঠচর্চার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করান। শিক্ষককুল যেন কোনরূপ কার্পণ্য না করে তাঁদের শিক্ষা দেন। বাংলা ভবিষ্যৎ সংগীতজ্ঞরূপে বিশ্বের দরবারে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার যাতে এরা করতে পারে, বর্তমান যুগের গুরুরা যেন সেই গুরু দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হন।

ঝাঁসীর রানী ○ মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য

॥ ৬ ॥

এতদিন সিংহাসনে শুধু ছিলেন রাজা, এবার তাঁর পাশে এসে বসলেন রাণী। সমুজ্জ্বল হল ঝাঁসীর রাজ-সিংহাসন। কিন্তু রাণী যে ছোট্ট মেয়ে। সাত পেরিয়ে সবে আটে পড়েছেন তিনি।

তবু ভার নিতে হল নানাবিধ দায়িত্বের। মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ পরিবারের নানাবিধ আচার-নিয়ম শিখতে হল নাবালিকা রাণীকে। মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণরা নিরামিষাশী। তাঁদের আহারে নানাবিধ আচার, চাটনি এবং মুখরোচক আনুষঙ্গিকের নিত্য ব্যবহার। গঙ্গাধর রাও ভোজনরসিক ব্যক্তি। তাঁর জন্য শ্রীখণ্ড তৈরী করতে বিশেষ কুশলের প্রয়োজন হত। রন্ধন-কলাবিদ্ মহিলাদের তত্ত্বাবধানে অন্তঃপুরে বিবিধ সুখাদ্য তৈরী হত। রাণীকে দীর্ঘদিন সেখানে থেকে নানারকম আচার, চাটনি, ফল কাটবার শিল্প সব শিখতে হল। পূজার নানাবিধ নিয়ম এবং সেখানে ফুল, অর্ঘ্য, ভোগ ইত্যাদি সাজাবার প্রক্রিয়া তা-ও শিখতে হল। বিদ্যাভ্যাস ও অন্যান্য শিক্ষণীয় বিষয় শিখতে লাগলেন রাণী অন্তঃপুরে থেকে। বধূ যাতে রাজ-পরিবারের উপযুক্ত হয়ে ওঠেন, সেদিকে মনোযোগ ছিল গঙ্গাধরের। বধূকে তিনি যথাসম্ভব সুযোগ দিলেন। কখনো তত্ত্বাবধান করতে দিলেন রাজ-গ্রন্থাগারের। সেখানে সারি সারি আধারে রক্ষিত গ্রন্থগুলি দেখে বালিকার মনে অনেক জিজ্ঞাসা জাগত। গীতার একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ তাঁর অতি প্রিয় ছিল। বিদ্যাশিক্ষাতে তিনি মন দিলেন।

সেদিনকার রাজ-পরিবারের মেয়েরা থাকতেন একান্ত অন্তঃপুরিকা হয়ে। বিবাহের বন্ধন খুব কম ক্ষেত্রেই প্রাণের বন্ধনে রূপান্তরিত হত। রাজারা সাধারণত নিরন্তর ষড়যন্ত্রের ভয়ে সশঙ্কিত থাকতেন। রাজ-সিংহাসনের আসন যে নানাবিধ শঙ্কায় কণ্টকিত, তাই ভুলতেন তাঁরা বিলাস, শিকার, সুরা ও সঙ্গিনী নিয়ে। রাজ-মহিষীরা থাকতেন অন্তঃপুরে। সেখানে আশ্রিতা, দাসদাসী এবং অনুগৃহীতাদের উপর তাঁদের রাজত্ব চলত। এই ছিল সাধারণ রেওয়াজ। কিন্তু এই ক্ষেত্রে তার কথঞ্চিৎ ব্যতিক্রম হল। তার কারণ হয়তো গঙ্গাধর রাওয়ের খেয়ালী স্বভাব এবং সহজাত শিল্পী প্রকৃতি। গঙ্গাধর রাওকে কেউ কেউ বলেছেন ক্রোধী এবং উগ্রস্বভাব। সবটা হয়তো সত্য নয়। স্ত্রীকে কোনদিন বহির্জগতে এসে ঝাঁসীর দায়িত্ব নিতে হবে, তা তিনি ভাবেননি। অতএব অন্তঃপুরের বাইরে তাঁর আসা গঙ্গাধর পছন্দ করতেন না। কিন্তু লক্ষ্মীবাঈকে একটি ব্যক্তিত্ব অর্জনে সাহায্য করেছিলেন গঙ্গাধর রাও। তাঁর স্নেহশীতল প্রশ্রয়ে বড় হতে লাগলেন রাণী।

বিবাহের অব্যবহিত পরেই জরুরী অবস্থার অবসানে বৃটিশ সরকার গঙ্গাধর রাওয়ের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত করতে রাজী হলেন। ১৮৪৩ সালে গঙ্গাধর রাও এই শর্তে ঝাঁসীর স্বাধীন রাজা হিসেবে স্বীকৃত হলেন যে, ঝাঁসীতে একটি ব্রিটিশ সেনাবাহিনী রাখতে হবে। বুন্দেলা ও ঠাকুরদের মধ্যে সম্ভাব্য বিদ্রোহ দমনই তার উদ্দেশ্য। এই সেনাবাহিনীর ব্যয় নির্বাহের জন্য দুলিও, তালগঞ্জ এবং আরও দুটি জেলা, যার বার্ষিক আয় ঝাঁসীর মুদ্রামূল্যে ২,৫৫,৮৯১ টাকা গঙ্গাধর ব্রিটিশ সরকারকে দিলেন। শিবরাও ভাওয়ের সঙ্গে অনুষ্ঠিত শর্ত অনুযায়ী মোতে ও জালোন পরগণা বরাবরই ব্রিটিশাধীনে ছিল। গঙ্গাধর রাও নিজের তরফ থেকে জানালেন ঝাঁসীতে যে ব্রিটিশ সৈন্য

থাকবে, তা সংখ্যায় মাত্র দুই ডিভিশন হবে এবং তোপখানা থাকবে দুইটি।

খোলা দরবারে গঙ্গাধর রাওকে ক্ষমতা দেওয়া হল একটি সুষ্ঠু এবং শোভন অনুষ্ঠানের অন্তে।

বিবাহের পরে এই ঘটনাতে ঝাঁসী-বাসীর মনে ধারণা হল যে, নববধূ সত্যই ঝাঁসীতে মঙ্গল এনেছেন। রাজাও খুশী হলেন।

এবার রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শাসন-ব্যবস্থায় মন দিলেন গঙ্গাধর রাও। প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত করলেন রাঘো রামচন্দ্র সন্তকে। পরে এঁকে গোয়ালিয়ার পাঠান হয়েছিল। নরসিংহ ক্রোপা, নানাভোপট্‌কার প্রভৃতি বিভিন্ন পদ পেলেন। ঝাঁসী, অরছা ও দতিয়ার আভ্যন্তরীণ বিবাদ-বিদ্বেষের ইতিহাস দ্বিশতাধিক বছরের পুরনো। ঝাঁসীর রাজকোষের অর্থ যখনই অরছা দিয়ে আনা হত, তখনই অরছার রাজারা লোক লাগিয়ে সেই টাকা লুঠ করবার চেষ্টা করেছেন। অরছার রাজার নির্দেশেই ঝাঁসীর রাজপুত সর্দারেরা 'ভূমিয়াবৎ' জাহির করেছিলেন রামচন্দ্র রাওয়ের সময়ে। অরছার সীমান্তবর্তী জায়গাগুলি, যেখানে রাজপুত বিদ্রোহের সম্ভাবনা আছে, সেখানে গঙ্গাধর রাও কিছু কিছু ফৌজ রাখলেন। ভারতীয় রাজ্যের অধীনে ভারতীয় সৈন্য যাতে বেশী না থাকে সেদিকে ইংরেজ সরকারের যথেষ্ট নজর ছিল। ঝাঁসী সরকারের

রাজা গঙ্গাধর রাও

অধীনে ৩,২৪০ জন সৈন্য ছিল। ৩০০০ পদাতিক, ২০০ অশ্বারোহী এবং ৪০ জন গোলন্দাজ।

গঙ্গাধর রাও রাজা হবার পূর্বেও শৌখীন আমোদ-প্রমোদ ভালবাসতেন।

তাঁর উদ্যোগেই ঝাঁসীতে শৌখীন নাট্য-শালা স্থাপিত হয়েছিল। নাট্যশালার জন্য গঙ্গাধর রাও ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে অভিনেত্রীদের রেখে শিক্ষিত করতেন সংগীতে, নৃত্যে ও অভিনয়ে। তাঁর নাট্য-শালা আজ বিলুপ্ত। অভিনেত্রীদের নামও জানা যায় না। যে অভিনয় সেদিন সেখানে হত, তার চেয়ে অনেক বড় খেলা সেখানে দেখিয়েছিল সাগরপারের বিদেশী মানুষ—তারাও তল্পি-তল্পা গুটিয়ে চলে গেছে সাত-সমুদ্রের পারে। এক শতাব্দী বাদে, একটিমাত্র নাম সেখানে আজও শোনা যায়। সে হচ্ছে মোতি-বাঈয়ের নাম। ঝাঁসীর উর্বশী ছিল সেই রাজনর্তকী। তাকে গঙ্গাধর বলেছিলেন বুন্দেলখণ্ডের মোতি। আজও শোনা যায় অখ্যাত কবির গান তার রূপের স্তুতিতে—

"মোতি, মাথে মেঁ হীরা
মোতি গলে মেঁ হার—"॥

শতাব্দীর অন্ধকার সমুদ্র মন্থন করে শুভ্র মুক্তার মতো মোতির নাম আজও শোনা যায়।

ঝাঁসীর রাজ-প্রাসাদ গঙ্গাধর রাও নির্মাণ করেছিলেন। বুন্দেলখণ্ডের নিজস্ব ঢঙে নির্মিত এই চারতলা প্রাসাদের সর্বত্র প্রাচীরচিত্র দিয়ে দেয়াল হল সুশোভিত। অলিন্দে ও খিলানে হংসমিথুন, মাছ, ময়ূর ইত্যাদির মূর্তি উৎকীর্ণ করা হল পাথরে।

নাট্যকার ও অভিনেতাদের পৃষ্ঠ-পোষক বাবাসাহেব গঙ্গাধর রাওয়ের নাম-শুনে গোয়ালিয়র ও অন্যান্য শহরগুলি থেকে শিল্পী ও কলাকুশলীদের দল এনে ভিড় করলেন ঝাঁসীতে।

গঙ্গাধর রাওকে কোন কোন ইংরেজ ঐতিহাসিক বলেছেন, পূর্ব শাসকদের মতোই অপদার্থ। শতাধিক বর্ষ পূর্বের ভারতবর্ষের সামন্ত রাজাদের যোগ্যতা বিচার করা উচিত তৎকালীন অন্যান্য রাজাদের সঙ্গে তুলনা করে। সে মাপ-কাঠি ভিন্ন।

ঝাঁসীর রাজারা অপদার্থ বা অযোগ্য ছিলেন না। কেননা অতি সামান্য অবস্থা থেকে তাঁরা ঝাঁসীকে একটি প্রধান নগরীতে পরিণত করেছিলেন। গঙ্গাধর রাও রাজকার্য পরিচালনায় অযোগ্য

ছিলেন না। তাঁর রাজত্বকালে স্বল্প সময়ে তিনি ঝাঁসী রাজ্যের পূর্বঋণের পঞ্চাশ লক্ষ টাকা প্রায় শোধ করেছিলেন। বাকি ছিল ছত্রিশ হাজার টাকা।

গঙ্গাধর রাও এবং লক্ষ্মীবাঈয়ের বিবাহিত জীবন সম্পর্কে সমসাময়িক মহারাষ্ট্রীয় পরিব্রাজক ব্রাহ্মণ বিষ্ণুভট্ট গোড্‌সে বরসোইকর বলেছেন—'এই বিবাহে লক্ষ্মীবাঈ সুখী হননি। গঙ্গাধর রাও সর্বতোভাবে তাঁর স্বাধীনতা হরণ করেছিলেন।'

এই উক্তির সততা বোঝা যায় না। কেননা বিষ্ণুভট্ট গঙ্গাধরের জীবিতকালে ঝাঁসীতে আসেননি। রাজমহিষীদের বহির্গমনের প্রথা ছিল না বলেই লক্ষ্মীবাঈ অন্তঃপুরে থাকতেন। স্বামী তাঁর ব্যক্তিত্ব খর্ব করবার চেয়ে বিকশিত হতেই সাহায্য করেছিলেন, একথা রাণীর বিমাতা চিমাবাঈ এবং অন্যান্য রাজ-অন্তঃপুরিকা, যাঁরা বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক অবধি বেঁচেছিলেন, তাঁরাই বলে গেছেন।

রাণী হিসাবে লক্ষ্মীবাঈ বিভিন্ন দাসী ও পরিচারিকা পেয়েছিলেন। স্বীয় স্বভাবগুণে তিনি তাঁদের সখীর মর্যাদা দিয়েছিলেন। তাঁর সমকালীনদের মধ্যে সুন্দর, মান্দার, কাশী এঁদের নাম উল্লেখযোগ্য। হীরা কোরীণ, ঝলকারী, এঁদের নামও পাওয়া যায়।

তাঁর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে সামান্যই জানা যায়। তাঁর বিমাতা চিমাবাঈয়ের ১৮৯৭ সালে ৬২ বছর বয়সে মৃত্যু হয়। তখন চিমাবাঈয়ের পৌত্র এবং রাণীর ভ্রাতুষ্পুত্র গোবিন্দ চিন্তামণি তাম্বের বয়স ষোল বছর। ইনি আজও জীবিত। পিতামহীর অঙ্কে বসে শৈশব থেকে ইনি রাণীর সম্বন্ধে বিভিন্ন কথা শুনেছেন। দৈনন্দিন জীবনের আচারে ব্যবহারে নানা কথায়, রুচিতে, একটি চরিত্রকে বিশেষভাবে জানবার পক্ষে সেই কথাগুলির মূল্য আছে।

আহারে রাণীর আসক্তি ছিল না। তিনি সামান্য অধিকপক্ক ঘি পছন্দ করতেন। বিশেষ উৎসবের দিনে তিনি নিজহাতে স্বামীকে পরিবেশন করে খাওয়াতেন। অন্যথায় তাঁদের আহারের সময়, স্থান সবই ছিল বিভিন্ন।

রাণী লক্ষ্মীবাঈ

অপরিচ্ছন্ন বেশ, অ-সংস্কৃত কেশ এবং অ-মার্জিত ব্যবহার, যে-কোন রমণীর মধ্যে দেখলে তিনি বিরক্তিতে তীব্র ভ্রূকুটি করতেন।

কপালে তাঁর অর্ধচন্দ্র এবং তারকা চিহ্নিত উল্কি ছিল। চিমাবাঈ পরিণত বয়সে তাঁর পৌত্রীকে প্রায়ই বলতেন—"আয়, তোর কপালে উল্কি দিয়ে দিই, বাঈ সাহেবের যেমন ছিল।"

লক্ষ্মীবাঈ পরিণত যৌবনে কেমন দেখতে ছিলেন?

প্রায় সব মানুষই মনেপ্রাণে, চেতনে বা অবচেতনে একটু জমি, একটু মাটি ভালোবাসে। জমি, শস্য আর ক্ষেতের উপর সকলের সেই ভালোবাসা থেকে হয়তো এসেছে চরিত্র ও রূপের বিভিন্ন উপমা। মাটির মতো সহনশীলা, পাকা-কলার মতো গায়ের রঙ—ইত্যাদি।

রাণীর রূপবর্ণনা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ-দর্শী বলেছেন—গোল মুখ, পাকা গেঁহু (গম)-এর মতো গায়ের রঙ, ভুট্টার সুসম্বদ্ধ দানার মতো সুন্দর দাঁত, নাতি-দীর্ঘ, নাতিখর্ব দেহা, অতীব সুগঠনা, কেশ-সম্পদে সমৃদ্ধা, কণ্ঠস্বর সামান্য ভারী, কৃষ্ণ বিশাল আয়ত নেত্রা।

সধবাকালীন অবস্থায় তিনি নাকে নথ, কণ্ঠে চিঙপেটি বা চিক্, কণ্ঠি, সাতলহরী মুক্তাহার, কানে বুগড়ী বা কর্ণিকা, হাতে বালা, পায়ে নূপুর ইত্যাদি পরতেন।

মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণদের মধ্যে বিভিন্ন শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানে সৌভাগ্যবতী সধবা-

দের জায়গা বড় সম্মানের। তাঁদের বলা হয় 'শুভাসিনী'। রাণীর কাছে 'শুভাসিনী' হবার আমন্ত্রণ এলে তিনি পারতপক্ষে তা প্রত্যাখ্যান করতেন না। কোজাগরী লক্ষ্মীপূর্ণিমায় রাজপ্রাসাদে মহাধুমধামে উৎসব হত। ঝাঁসীর বিভিন্ন পরিবারের মেয়েরা সেখানে আমন্ত্রিত হতেন। রন্ধন-শালায়, সুবিশাল তামা পিতলের বাসনে বিবিধ সুখাদ্য তৈরী করতে করতে ঘর্মাক্ত কলেবরা ব্রাহ্মণীদের কলহে, ছোট ছেলেদের কান্নায়, বাক্যালাপনিরত রমণী দের কথায়, খেতে অধিক বিলম্ব হচে বলে অধৈর্য ব্রাহ্মণদের বারবার তাড় দেওয়াতে, শাস্ত্রী পণ্ডিতদের দ্রুত শির-শ্চালনা সহ উচ্চকণ্ঠে শাস্ত্র আলোচনায়, দাসদাসীদের কথাবার্তায় যে পরিবেশ রচিত হত, তার বিরুদ্ধে কেউ কিছু বললে নিশ্চয় প্রাচীনারা সেদিনও মারাঠি ভাষায় বলতেন—"ব্যাপার বাড়িতে এরকম হয়েই থাকে।"

চৈত্র মাসে গৌরীপূজার পর সংক্রান্তিতে ব্রত উদ্যাপন করবার সময় ঝাঁসীর বিভিন্ন গৃহ থেকে রাণীকে 'শুভাসিনী' হবার নিমন্ত্রণ আসতো। যেখানে নিমন্ত্রণকারিণী সঙ্গতিহীন, সেখানে রাণী পূর্বাহ্নে নিমন্ত্রণের সমস্ত উপকরণ পাঠাতেন।

হরিদ্রাকুঙ্কুমের উৎসবে বড় আনন্দ করতেন মেয়েরা। সকলে সকলকে ফুল ও কুঙ্কুম দিতেন। রাণীর ব্যবহারে মুগ্ধ অন্তঃপুরিকারা তাঁর প্রশংসা করতেন এবং আনন্দে গঙ্গাধর রাও তাঁকে প্রায়শই স্নেহ-কৌতুকে বলতেন—"তুমি কি তোমার নামের যোগ্য হবার জন্য এত চেষ্টা করছ?"

একদিন গঙ্গাধর রাও রাণীকে একটি উপহার দিয়ে মুগ্ধ করলেন। কাশী থেকে কারিগরকে দিয়ে নিজের আঁকা নক্সা অনুযায়ী একটি রুপোর তাঞ্জাম বা 'মেণা' তৈরী করিয়ে আনলেন। তার ভিতরে লাল ভেলভেটের উপর সোনার জরিতে কারু-কার্যখচিত গদি। জরির থোপ্না তার চারিপাশে, দুই দ্বারে কারুকার্যখচিত পর্দা।

এই পাল্কি চড়ে বিশেষ উৎসবের দিনে রাণী মহালক্ষ্মী মন্দিরে পুজো দিতে যাবেন। লছমীতাল হ্রদের ভেতরে অবস্থিত মন্দিরের তোরণে তখন সানাই বাজবে। লছমী দরওয়াজার পাশে প্রার্থী, ভিখারী, সবাই দাঁড়িয়ে থাকবে। তাদের হাতে মিষ্টান্ন আর পয়সা পড়লে হৃষ্ট-চিত্তে তারা আশীর্বাদ করবে। এতটুকু পর্দা ফাঁক করে রাণী প্রসন্ন নয়নে তাদের দিকে তাকাবেন।

সুখ ও আনন্দের পরিপূর্ণ পসরা বয়ে এনেছিল সেই দিনগুলি।

(ক্রমশ)

বিজ্ঞানের বিভীষিকা

রাজশেখর বসু

অনেক বৎসর আগেকার ঘটনা। দুটি ছেলে ভ্রুকুটি করে ঠোঁট কামড়ে হাতে ইট নিয়ে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। বয়স দশ-এগারো, সম্পর্কে মাসতুতো ভাই। এরা প্রচণ্ড ঝগড়া করেছে, এখন পরস্পর ভয় দেখাচ্ছে, হয়তো একটু পরেই ইট ছুড়বে। তার পরিণাম কি সাংঘাতিক হবে তা এরা মোটামুটি বোঝে, তবু মারতে প্রস্তুত আছে। এদের মায়েরা দূর থেকে দেখে ভয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন। দুজনেই আমার ভাগনে, একটু খাতিরও করে, সুতরাং এদের নিরস্ত্র করতে আমাকে বেগ পেতে হয় নি।

মার্কিন আর সোভিএট যুক্তরাষ্ট্রের কর্তাদের বর্তমান অবস্থা প্রায় ওই রকম, কিন্তু ওঁদের মামা নেই। এই দুই পরাক্রান্ত রাষ্ট্র পরমাণু-বোমা উদ্যত করে পরস্পর বিভীষিকা দেখাচ্ছে, মানবজাতি ত্রস্ত হয়ে আছে। রফার চেষ্টা হচ্ছে, কিন্তু তা সফল হবে কিনা বলা যায় না। বিগত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে দুই মহাযুদ্ধ হয়ে গেছে, আর একটা মহত্তর প্রলয়ংকর যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। অনেকে বলছেন, এই পৃথিবীব্যাপী আতঙ্ক আর অশান্তির মূলে হচ্ছে বিজ্ঞানের অতি-বৃদ্ধি। এঁদের যুক্তি এই রকম।—

পরমাণু-বোমা আবিষ্কারের পূর্বে যুদ্ধ এত ভয়াবহ ছিল না। প্রথম মহাযুদ্ধে আকাশযানের সংখ্যা কম ছিল সেজন্য বোমা-বর্ষণে ব্যাপকভাবে জনপদ ধ্বংস হয় নি। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের ফ্রান্স-প্রশিয়া যুদ্ধ, তার পর ব্রিটিশ-বোঅর আর রুশ-জাপান যুদ্ধ প্রধানত দুই পক্ষের সেনাদের মধ্যেই হয়েছিল, জনসাধারণের আর্থিক ক্ষতি হলেও লোকক্ষয় বেশী হয় নি। মেশিন-গান, দূরক্ষেপী কামান, টর্পিডো, সবমেরীন, বোমা-বর্ষী বিমান, এবং পরিশেষে পরমাণু-বোমা উদ্ভাবনের ফলে মানুষের নাশিকা শক্তি উত্তরোত্তর বেড়ে গেছে। ভবিষ্যতে হয়তো অন্যান্য উৎকট মারাত্মক উপায় প্রযুক্ত হবে, মহামারীর বীজ ছড়িয়ে বিপক্ষের দেশ নির্মনুষ্য করা হবে, অথবা এমন গ্যাস বা তেজস্ক্রিয় পদার্থ বা তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গ উদ্ভাবিত হবে যার স্পর্শে দেশের সমস্ত লোক জড়বুদ্ধি হয়ে ভেড়ার পালের মতন আত্মসমর্পণ করবে। মোট কথা, মানুষ বিজ্ঞান শিখেছে কিন্তু শ্রেয়স্কর জ্ঞান লাভ করে নি, বহিঃপ্রকৃতিকে কতকটা বশে আনলেও অন্তঃপ্রকৃতিকে সংযত করতে পারে নি। তার স্বার্থবুদ্ধি প্রাচীন কালে যেমন সংকীর্ণ ছিল এখনও তাই আছে। বানরের হাতে যেমন তলোয়ার, শিশুর হাতে যেমন জ্বলন্ত মশাল, অদূরদর্শী অপরিণতবুদ্ধি মানুষের হাতে বিজ্ঞানও তেমনি ভয়ংকর। অতএব বিজ্ঞানচর্চা কিছুকাল স্থগিত থাকুক—বিশেষ করে রসায়ন আর পদার্থবিদ্যা, কারণ এই দুটোই যত অনিষ্টের মূল। চন্দ্রলোকে যাবার বিমান, রেডিও-টেলিভিশন মারফত বিদেশবাসীর সঙ্গে মুখোমুখি আলাপ, রেশমের চাইতে মজবুত কাচের সুতোর কাপড়, ইত্যাদি বৈজ্ঞানিক অবদানের জন্য আমরা দশ-বিশ বৎসর সবুর করতে রাজী আছি। মানুষের ধর্মবুদ্ধি যাতে বাড়ে সেই চেষ্টাই এখন সর্বতোভাবে করা হক।

এই অভিযোগের প্রতিবাদে বিজ্ঞান-চর্চার সমর্থকগণ বলতে পারেন—সেকালে যখন বিজ্ঞানের এত উন্নতি হয় নি তখন কি মানুষের সংকট কম ছিল? নেপোলিয়নের আমলে যে সব যুদ্ধ হয়েছিল, তার আগে থার্টি ইয়ার্স ওঅর, ক্যাথলিক-প্রোটেস্টাণ্টদের ধর্মযুদ্ধ, তুর্ক কর্তৃক ভারত অধিকার, খ্রীষ্টান-মুসলমানদের ক্রুজেড ও জেহাদ, সম্রাট অশোক আর আলেকজাণ্ডারের দিগ্‌বিজয়, ইত্যাদিতেও বিস্তর প্রাণহানি আর বহু দেশের ক্ষতি হয়েছিল। সেকালে লোকসংখ্যার অনুপাতে যে লোকক্ষয় হত তা একালের তুলনায় কম নয়।

প্রতিবাদীরা আরও বলতে পারেন—বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগে কি অনিষ্ট হয়েছে শুধু তা দেখলে চলবে কেন, সুপ্রয়োগে কত উপকার হয়েছে তাও দেখতে হবে। খাদ্যোৎপাদন বেড়েছে, দুর্ভিক্ষ কমেছে, চিকিৎসার উন্নতির ফলে শিশুমৃত্যু কমেছে, লোকের পরমায়ু বেড়েছে। রেলগাড়ি টেলিগ্রাফ টেলিফোন মোটর গাড়ি এয়ারোপ্লেন সিনেমা রেডিও প্রভৃতির প্রচলনে মানুষের সুখ কত বেড়ে গেছে তার ইয়ত্তা নেই। অতএব বিজ্ঞানের চর্চা নিষিদ্ধ করা ঘোর মূর্খতা।

উক্ত বাদ-প্রতিবাদের বিচার করতে হলে দুটি বিষয় পরিষ্কার করে বোঝা দরকার—বিজ্ঞান শব্দের অর্থ, এবং মানব-স্বভাবের সঙ্গে বিজ্ঞানের সম্বন্ধ।

সায়েন্স বা বিজ্ঞান বললে দুই শ্রেণীর বিদ্যা বোঝায়। দুই বিদ্যাই পর্যবেক্ষণ আর পরীক্ষার ফলে লব্ধ, কিন্তু একটি নিষ্কাম, অপরটি সকাম অর্থাৎ অভীষ্টসিদ্ধির উপায় নির্ধারণ। প্রথমটি শুধুই জ্ঞান, দ্বিতীয় প্রকৃতপক্ষে শিল্প-সাধনা। মানুষের আদিম অবস্থা থেকে বিজ্ঞানের এই দুই ধারার চর্চা হয়ে আসছে। রবীন্দ্রনাথের একটি প্রাচীন গানে আছে- মহাবিশ্বে মহাকাশে মহাকাল মাঝে, আমি মানব একাকী ভ্রমি বিস্ময়ে ভ্রমি বিস্ময়ে। যারা বিস্ময় বোধ করেন না এমন প্রাকৃত জনের সংখ্যাই জগতে

বেশী। যাঁরা বিস্ময়ের ফলে
ভাবসমন্বিত হন তাঁরা কবি
আর, বিস্ময়ের মূলে যে রহস্য
তার সমাধানের চেষ্টা যাঁরা
বিজ্ঞানী। বিজ্ঞানীদের এক
লাভেই তৃপ্ত হন, এঁরা নিষ্কাম
বিজ্ঞানী। আর এক দল নিজের
লব্ধ জ্ঞান কাজে লাগান,
ফলিতবিজ্ঞানী। সংখ্যায় এঁরাই

জ্যোতিষের অধিকাংশ তত্ত্ব
বিদ্যা। হেলির ধূমকেতু
বৎসর অন্তর দেখা দেয়, মঙ্গলের
দুই উপগ্রহ আছে, ব্রহ্মাণ্ড
উঠছে—এই সব জেনে
হতে পারে কিন্তু অন্য
নেই, অন্তত আপাতত নেই।
ঘেঁটু একই বর্গের গাছ,
রাডারের মতন যন্ত্র আছে,
অন্ধকারে বাধা এড়িয়ে
পারে—ইত্যাদি বৈজ্ঞানিক
কোনও সৎ বা অসৎ
যায় নি। চুম্বক লোহা
প্রান্ত উত্তরে আর এক প্রান্ত
আকৃষ্ট হয়—এই আবিষ্কার
জ্ঞান মাত্র বা কৌতূহলের
কিন্তু পরে মানুষের
তপ্ত বা সিদ্ধ করলে
এই আবিষ্কারের সঙ্গে
উৎপত্তি হয়েছে।

ভাল মন্দ নানা রকম
জন্য মানুষ চিরকাল অন্ধভাবে
হয়ে চেষ্টা করে আসছে।
সিদ্ধি হলেই সাধারণ লোক
কিন্তু জনকতক কৃতূহলী
কার্য আর কারণের সম্বন্ধ
জানতে চান। তাঁরাই বিজ্ঞানী।
মানুষ আবিষ্কার করেছিল যে
উপর জল বসালে ক্রমশ গরম
তার পর ফোটে। বিজ্ঞানী পরীক্ষা
জানলেন—আঁচ যতই বাড়ানো
ফুটতে আরম্ভ করলে জলের
বাড়ে না। আমাদের দেশের
পাচিকা এই তত্ত্ব জানে না,
ইন্ধনের খরচ হয়তো একটু কমত।

কাণ্ডজ্ঞান (common
সাধারণ অভিজ্ঞতা, আর
তিনের মধ্যে আকাশ পাতাল
ব্যবধান নেই। স্থূল সূক্ষ্ম
জ্ঞানই পরীক্ষা পর্যবেক্ষণ
ইত্যাদির দ্বারা লব্ধ, কিন্তু
বৈশিষ্ট্য এই যে তা সাবধানে
বহু প্রমাণিত, এবং তাতে

যথাসম্ভব নিরূপিত। বিজ্ঞান শব্দের অপপ্রয়োগও খুব হয়। চিরাগত ভিত্তিহীন সংস্কার, শিল্পকলা, এমন কি খেলার নিয়মও বিজ্ঞান নামে চলে। ফলিত জ্যোতিষ আর সামুদ্রিককে বিজ্ঞান বলা হয়, দরজীবিজ্ঞান শতরঞ্জবিজ্ঞানও শোনা যায়।

যাঁরা নিষ্কাম জিজ্ঞাসু, লাভালাভের চিন্তা যাঁদের নেই, এমন জ্ঞানযোগী শুদ্ধজ্ঞানী অনেক আছেন। কিন্তু তাঁদের চাইতে অনেক বেশী আছেন যাঁরা ফলকামী, বিজ্ঞানের সাহায্যে অভীষ্ট সিদ্ধি করতে চান। নিউটন, ফ্যারাডে, কুরীপতি ও কন্যা, আইনস্টাইন প্রভৃতি প্রধানত শুদ্ধবিজ্ঞানী, যদিও তাঁদের আবিষ্কার অন্য লোকে কাজে লাগিয়েছে। কিন্তু এঞ্জিন টেলিফোন ফোনোগ্রাফ রেডিও রাডার প্রভৃতি যন্ত্রের, সালভার্সান স্ট্রেপ্টোমাইসিন প্রভৃতি ঔষধের, এবং বন্দুক কামান টরপিডো আর অ্যাটম-হাইড্রোজেন বোমা প্রভৃতি মারণাস্ত্রের উদ্ভাবকগণ ফললাভের জন্যই বিজ্ঞানচর্চা করেন। এঁদের কাছে বিজ্ঞান মুখ্যত অর্থসিদ্ধির উপায়, উকিলের কাছে আইনের জ্ঞান যেমন মকদ্দমা জেতবার উপায়। নব নব তত্ত্বের আবিষ্কার এবং তত্ত্বের প্রয়োগ—এই দুই বিদ্যাই বিজ্ঞান, কিন্তু বিদ্যার যদি অপপ্রয়োগ হয় তবেই ভয়ংকরী।

ইতর প্রাণীর যেটুকু জ্ঞান আছে তার প্রায় সমস্তই সহজাত, কিন্তু মানুষ নূতন জ্ঞান অর্জন করে, কাজে লাগায়, এবং অপরকে শেখায়। মানবস্বভাবের এই বৈশিষ্ট্যের ফলে শিল্পকলা আর বিজ্ঞানের প্রসার হয়েছে। মানুষ নিজের প্রবৃত্তি অনুসারে বিদ্যার সুপ্রয়োগ বা কুপ্রয়োগ করে। দুষ্ট লোকে দলিল জাল করে, অনিষ্টকর পুস্তক প্রচার করে, কিন্তু সেজন্য লেখাপড়া নিষিদ্ধ করতে কেউ বলে না। চোরের জন্য সিঁধকাঠি আর ডাকাতের জন্য ছোরা তৈরি হয়, বিষ-ঔষধ দিয়ে মানুষ খুন করা হয়, কিন্তু কেউ বলে না যে কামারের কাজ আর ঔষধ তৈরি স্থগিত থাকুক।

কুটবুদ্ধি নিষ্ঠুর লোকে বিজ্ঞানের অত্যন্ত অপপ্রয়োগ করেছে, অতএব সর্বসম্মতিক্রমে সকল রাষ্ট্রে বিজ্ঞানচর্চা স্থগিত থাকুক—এই আবদার করা বৃথা। রামচন্দ্রের রাজ্যে সে রকম ব্যবস্থা হতে পারত, কিন্তু এখনকার কোনও রাষ্ট্র এ প্রস্তাবে কর্ণপাত করবে না। যুদ্ধবিরোধী অহিংস ভারতরাষ্ট্র সর্বপ্রকার উৎকট মারণাস্ত্রের লোপ চায়, কিন্তু ভাল কাজে লাগতে পারে এই আশায় পারমাণবিক গবেষণাও চালাচ্ছে।

বিজ্ঞানচর্চা স্থগিত রাখলে এবং পরমাণু-বোমা নিষিদ্ধ করলেও সংকট দূর হবে না। আরও নানারকম নৃশংস যুদ্ধাস্ত্র আছে—টি-এন-টি আর ফসফরস বোমা, চালকহীন বিমান, শব্দভেদী টরপিডো, ইত্যাদি। যখন কামান বন্দুক ছিল না তখনও মানুষে ধনুর্বাণ তলোয়ার বর্শা নিয়ে যুদ্ধ করেছে। দোষ বিজ্ঞানের নয়, মানুষের স্বভাবেরই দোষ

অরণ্যবাসকালে শস্ত্রপাণি রামকে সীতা বলেছিলেন—কদর্যকলুষা বুদ্ধির্জায়তে শস্ত্রসেবনাৎ—শস্ত্রের সংসর্গে বুদ্ধি কদর্য ও কলুষিত হয়। এই বাক্য সকল যুগেই সত্য। পরম মারণাস্ত্র যদি হাতে থাকে তবে শক্তিশালী রাষ্ট্রের পক্ষে সংযম অবলম্বন করা কঠিন। কিন্তু সকল দেশের জনমত যদি প্রবল হয় তবে অতি পরাক্রান্ত রাষ্ট্রকেও অস্ত্রসংবরণ করতে হবে। প্রথম মহাযুদ্ধে বিষ-গ্যাস ছাড়া হয়েছিল, কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে হয় নি, আয়োজন থাকলেও জনমতের বিরোধিতার জন্য দুই পক্ষই সংযত হয়েছিল। পরমাণু-বোমার বিরুদ্ধেও যদি প্রবল আন্দোলন হয় তবে সমগ্র সভ্য মানবসমাজের ধিক্কারের ভয়ে আমেরিকা-রাশিয়াকেও সংযত হতে হবে। আশার কথা, যাঁদের কোনও কূট অভিসন্ধি নেই এমন শান্তিকামীরাও ঘোষণা করছেন যে পরমাণু-বোমা ফেলে জনপদ ধ্বংস আর অগণিত নিরীহ প্রজা হত্যার চাইতে মহাপাতক কিছু নেই। অনেক বিজ্ঞানীও প্রচার করছেন যে শুধু পরীক্ষার উদ্দেশ্যেও যদি পরমাণু-বোমার বার বার বিস্ফোরণ হয় তবে তার কুফল এখন দেখা না গেলেও ভবিষ্যৎ মানবসন্তানের দেহে প্রকট হবে।

ক্রীতদাসপ্রথা এক কালে বহুপ্রচলিত ছিল, কিন্তু জনমতের বিরোধিতায় এখন প্রায় লোপ পেয়েছে। শক্তিশালী জাতিদের উপনিবেশপদ্ধতি এবং দুর্বল জাতির উপর প্রভুত্ব ক্রমশ নিন্দিত হচ্ছে। কালক্রমে এই অন্যায়ের প্রতিকার হবে তাতে সন্দেহ নেই। আফিম কোকেন প্রভৃতি মাদকের অবাধ বাণিজ্য, জলদস্যুতা, পাপব্যবসায়ের জন্য নারীহরণ প্রভৃতি রাষ্ট্রসংঘের সমবেত চেষ্টায় বহু পরিমাণে নিবারিত হয়েছে। লোকমতের প্রভাবে

পরমাণুশক্তির যথেচ্ছ প্রয়োগও নিবারিত হতে পারবে। এচ জি ওয়েল্‌স, ওয়েন্ডেল উইল্‌কি প্রভৃতি যে একচ্ছত্রা বসুধার স্বপ্ন দেখেছেন তা যদি কোনও দিন সফল হয় তবে হয়তো যুদ্ধও নিবারিত হবে।

এক কালে পাশ্চাত্ত্য মনীষীদের আদর্শ ছিল—সরল জীবন ও মহৎ চিন্তা। আজকাল শোনা যায়—মহৎ চিন্তা অবশ্যই চাই, কিন্তু জীবনযাত্রার মান আর সর্ববিধ ভোগ বাড়িয়ে যেতে হবে তবেই মানবজীবন সার্থক হবে। পাশ্চাত্ত্য অর্থনীতি বলে—আরও কামনা কর, আরও পরিশ্রম কর, আরও উপার্জন কর; কামনার তাড়নায় খেটে যাও, আয় বাড়াও, তা হলে নব নব কামনা পূর্ণ হবে, জীবনযাত্রা উন্নত থেকে উন্নততর হবে। এই পরম পুরুষার্থ লাভের উপায় বিজ্ঞান। অনেক পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত মনে করেন, বিজ্ঞানের উদ্দেশ্যই চ্ছে মানুষের স্বাচ্ছন্দ্য আর ভোগসুখের বৃদ্ধি।

ভারতের শাস্ত্র বিপরীত কথা বলেছে—ঘি ঢাললে যেমন আগুন বেড়ে যায় তেমনি কাম্য বস্তুর উপভোগে কামনা শান্ত হয় না, আরও বেড়ে যায়। পাশ্চাত্ত্য সমৃদ্ধ দেশে বিলাসবহুল জীবনযাত্রার ফলে দুর্নীতি বাড়ছে, তারই পরিণাম স্বরূপ অন্য দেশেও লোভ ঈর্ষা আর অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হচ্ছে। কামনা সংযত না করলে মানুষের মঙ্গল নেই এই সত্য পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতেরা এখনও বোঝেন নি।

দরিদ্র দেশের জীবনযাত্রার মান অবশ্যই বাড়াতে হবে। সকলের জন্য যথোচিত খাদ্য বস্ত্র আবাস চাই, শিক্ষা সংস্কৃতি স্বাস্থ্য এবং উপযুক্ত মাত্রায় চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা চাই। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিজ্ঞানচর্চা একান্ত আবশ্যক। প্রতিবেশী রাষ্ট্রসকল যদি অহিংস না হয়, নিজ দেশ আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা যদি থাকে, তবে বিজ্ঞানের সাহায্যে আত্মরক্ষার ব্যবস্থাও করতে হবে। কিন্তু অস্ত্রের বাহুল্য আর বিলাসসামগ্রীর বাহুল্য দুটোই মানুষের পক্ষে অনিষ্টকর এই কথা মনে রাখা দরকার।

পৃথিবীতে বহুবার প্রাকৃতিক পরিবর্তন ঘটেছে। নূতন পরিবেশের সঙ্গে যে সব মানুষ নিজেকে খাপ খাওয়াতে পেরেছে তারা রক্ষা পেয়েছে, যারা পারে নি তারা লুপ্ত হয়েছে। বিজ্ঞানের বৃদ্ধির ফলে প্রকৃতির উপর মানুষের প্রভাব পড়ছে, তার জন্যও পরিবেশ বদলাচ্ছে। মানুষ এমন দূরদর্শী নয় যে তার সমস্ত কর্মের ভবিষ্যৎ পরিণাম অনুমান করতে পারে। বিজ্ঞানের সাহায্যে ব্যাপক ভাবে যে সব লোকহিতকর চেষ্টা হচ্ছে তার ফলেও সমস্যা দেখা দিচ্ছে। যদি দুর্ভিক্ষ শিশুমৃত্যু এবং ম্যালেরিয়া যক্ষ্মা প্রভৃতি ব্যাধি নিবারিত হয়, প্রজার স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি পায়, এবং সেই সঙ্গে যথেষ্ট জন্মনিয়ন্ত্রণ না হয় তবে জনসংখ্যা ভয়াবহ রূপে বাড়বে, প্রজার অভাব মেটানো অসম্ভব হবে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বনের ফলে এখনও কিছুকাল ক্রমবর্ধমান মানবজাতির খাদ্য ও অন্যান্য জীবনোপায়ের অভাব হবে না এমন আশা করা যেতে পারে। কিন্তু ভবিষ্যতের কথা বলা যায় না, মানুষ সকল ক্ষেত্রে অনাগত বিধাতা হতে পারে না।

প্রাচীন ভারতে চতুর্বর্গ বা পুরুষার্থ ছিল—ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ। সংসারী মানুষের পক্ষে এই চারিটি বিষয়ের সাধনা শ্রেয়স্কর বিবেচিত হত। বর্তমান কালে বিজ্ঞান পঞ্চম পুরুষার্থ তাতে সন্দেহ নেই। বিজ্ঞানের অবহেলার ফলে ভারতবাসী দীর্ঘকাল দুর্গতি ভোগ করেছে, এখন তাকে সযত্নে সাধনা করতে হবে। কিন্তু মনে রাখা আবশ্যক—কোনও নবাবিষ্কৃত বস্তুর প্রয়োগের পরিণাম দূর ভবিষ্যতে কি রকম দাঁড়াবে তা সকল ক্ষেত্রে অনুমান করা অসম্ভব। ডাক্তার বেণ্টলি বলে গেছেন, বাংলা দেশে ম্যালেরিয়ার বিস্তারের কারণ রেলপথের অসতর্ক বিন্যাস। পেনিসিলিনে বহু রোগের বীজ নষ্ট হয়, কিন্তু দেখা গেছে অসতর্ক প্রয়োগে এমন জীবাণুবংশের উদ্‌ভব হয় যা পেনিসিলিনে মরে না। ডি-ডি-টি প্রভৃতি কীটঘ্নের ক্রিয়া প্রতিরোধ করতে পারে এমন মশকবংশও দেখা দিয়েছে। বিকিনিতে যে পারমাণবিক বোমার পরীক্ষা হয়েছিল তার ফলে বহু দূরস্থ জাপানী জেলেরা ব্যাধিগ্রস্ত হবে এ কথা মার্কিন বিজ্ঞানীরা ভাবতে পারেন নি। মোট কথা, বিজ্ঞানের সুপ্রয়োগে যেমন মঙ্গল হয় তেমনি নিরঙ্কুশ প্রয়োগে অনেক ক্ষেত্রে সুফলের পরিবর্তে অবাঞ্ছিত ফলও দেখা দিতে পারে।

[বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ ১৩৬২]

হাড়কাটা

দেবেশ রায়

লেরে শালা—আর কত চিল্লাবি' —পাঁঠাটার ঘাড়ের ওপর ছুরিখানা একবার বুলিয়ে নেয় নানকু—'যা, মামাবাড়ি গিয়ে চিল্লাস'—পাঁঠাটার কবন্ধ দেহ ঐ জায়গাটা জুড়ে দাপাদাপি করতে লাগল।

'আয়-রে—' বলে আরেকটার ঘাড় ধরে একটা হ্যাঁচকা টান দিল মু্যনিসিপ্যাল মার্কেটের লাইসেন্সিয়েট কসাই নানকু কাহাড়।

দুটো পাঁঠার ছাল ছাড়িয়ে ফেলে দোকানে টাঙাল বাঁশের সঙ্গে।

—হে-এ শালা, এ সকালে সবাই ঘুমায়, ঘুম নাই শুধু তোর চোখে আর মোর চোখে। লে...লে...' অবিক্রেয় মাংস-হাড়-তন্তুগুলো দরজায় দাঁড়িয়ে রোঁয়া-ওঠা, জিভ-শোসানো কুকুরটার দিকে ছুঁড়ে দেয় নানকু। এক মুহূর্তের মধ্যেই কুকুরটা নিজেকে হারিয়ে ফেলে কয়েক টুকরো টাটকা রক্ত-মাখানো মাংস, হাড়, আর জট-পাকানো তন্ত্রীর জটিল গ্রন্থির মধ্যে। মাঝে মাঝে হাঁফ ছেড়ে দাঁড়ায়। ঘাড়টা সোজা করে। চারপাশে সন্ধানী দৃষ্টিতে তাকিয়ে নেয় ভাগীদার কেউ আছে কি না, অর্ধেক-কাটা লেজটা বার-কয়েক পিছনের ঘায়ে বসা মাছি তাড়ানোর উদ্দেশ্যে ব্যর্থভাবে এধার ওধার নাড়ায়। আবার নিবিষ্ট মনোযোগ।

সাত-সকালের খরিদ্দাররা না-আসা পর্যন্ত নানকু কান থেকে একটা বিড়ি বের করে, কানের কাছেই বারকতক দুই আঙুলে ঘুরিয়ে নেয়, কেমন একটা শিরশিরানি কান দিয়ে শরীরে ঢোকে, বিড়িটার আগুন ধরাবার মুখটায় দুটো ফুঁ দিয়ে নিয়ে, ওটাকে উলটিয়ে আগুন ধরায় নানকু। আর—একরাশ ঘন ধোঁয়ার পেছনে, আর একমুখ কালো ধোঁয়া ছেড়ে সমস্ত জায়গাটায় কেমন একটা আবছা কুয়াশা রচনা করে। ঐ কুয়াশার মধ্য দিয়েই নিজের মনের ধূসর অস্পষ্টতাকে চোখে এনে—তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে রোঁয়া-ওঠা, অর্ধেক লেজ-কাটা, দুর্বার লোভে চকচকানো চোখ—ঐ হাড় জির-জিরে কুকুরটার দিকে।

কুকুরটার দিকে তাকিয়ে একবার হাসে নানকু। কোন কুকুরবিলাসী ওকে হয়তো পুষতে চেয়েছিল, করতে চেয়েছিল নিজের একান্ত বিশ্বস্ত অনুচর, লেজটাও অর্ধেক কেটে দিয়েছিল নিশ্চয়ই সে।—লেজ কাটলে কুকুর নাকি খুব রাগী হয়, নামও হয়তো দিয়েছিল টাইগার, ওস্তাদ, বাঘা জাতীয় কিছু—যে সব নাম শুনেছে নানকু শহরের ভদ্র রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে। হাসল নানকু। ফুটো পয়সার ধাক্কাতেই বাবু-গিরি এসে ধোঁকাচ্ছে কসাইখানার দরজায়। সারাদিন ঘোরে বাজারের এ-কোণা, ও-কোণা। কিন্তু সকাল যখন ফোটে ফোটে, ফোটে না, আবছা স্যাঁতসেঁতে রক্তমাখা ঘরটাতে নানকুর ছুরি যখন অন্ধকারেই মিলিয়ে থাকে, অত ধারালো ছোরাটাকে ঝলসাবার মতো আলোও যখন থাকে না, অন্ধকার থেকেই ছুঁচলো মুখ নিয়ে ছুরিটা এসে তখন দু দুটো পাঁঠাকে কবন্ধ করে দেয়।—আর তারপর যে মুহূর্তে নানকু কয়েকটা হ্যাঁচকা টানে, আর ছুরির ছোঁয়ায় কখনও বা সাদা কালোর ডোরাকাটা, কখনও বা চকচকে কালোর মধ্যে গলার কাছে একটুখানি ধবধবে সাদামালা আঁকা, কখনও বা কোমরের চারপাশে সাদা বা খয়েরি রংয়ের প্রলেপ দেওয়া চামড়া পাঁঠাগুলোর গা থেকে ছিঁড়ে এনে মাটিতে ফেলে দেয়—ঠিক তখনই, সেই মুহূর্তেই সূর্য ওঠার মতো অনতিক্রম্য নিয়মে কুকুরটা দরজায় আসবে। আর শরীরটাকে দরজার বাইরে টনটনে সোজা রেখেই চকচকে খয়েরি রংয়ের চোখদুটো শুদ্ধু মাথাটাকে দরজার ভেতরে গলিয়ে দিয়ে লাল লাল জিভ বের করে শোসাতে থাকবে।

নানকু ওর নাম দিয়েছে 'দোস্ত'। কাক-না-ডাকা বিহান বেলায় নানকু যখন ওর মানুষের মনটাকে নিজের ঘরের বিছানার উষ্ণ আলিঙ্গনে রেখে দিয়ে কসাই মনটাকে নিয়ে এই ঘরের রক্তাক্ত, ভেজা, বুড়ো থুত্থুড়ে অন্ধকারের মধ্যে ঢোকে—একেবারে বিচ্ছিন্ন, একেবারে একা, সেই জগতে আর কোন দোস্ত নেই

নানকুর ঐ পেছনে ঘা-ওয়ালা, সমস্ত শরীরের লোম উঠে যাওয়া কুকুরের চকচকে হ্যাংলা চোখদুটো ছাড়া......

'কত করে হে আজকে' সাত সকালের খরিদ্দার এসেছে। বিড়িটায় টান দেয় নানকু। নাঃ, আগুন নেই—বিড়িটাকে ছুঁড়ে দিতে দিতে চোখে পড়ে, খাওয়া সেরে কুকুরটা চলে গেছে।

'সাড়ে তিন করে বাবু'—দাঁড়িপাল্লায় টান দেয় নানকু।

"ঘুম থিক্যা উইঠ্যা শোন পাঠার চিল্লানি আর ঘুমোব্যার আইস্যা শোন পাঠার বাচ্চার চিল্লানি।" হিন্দুস্থান-পাকিস্থানের বর্ডার ঘেঁষা বেরুবাড়ির শনিবারের হাট থেকে ফিরে রাত দশটায় যখন শুতে যাচ্ছে নানকু, ছোটছেলেটা কেঁদে ওঠায় হঠাৎ গায়ে ঢিল লাগা কোন কুকুরের মতো করে চেঁচিয়ে উঠল ঐ কথা কটি বলে।

'নে রে সর এট্টু'—বড় ছেলেটাকে ধাক্কা দিয়ে ডাইনে সরিয়ে একেবারে বাঁ কোণায় শুয়ে পড়ল নানকু। পাটা বাঙলা দ'য়ের মতো হয়ে থাকল, টান করতে গেলে মাচানের খোঁচা লেগে রক্তারক্তি কান্ড হয়ে যাবে। শুয়ে শুয়েই একটা বিড়ি ধরাল নানকু।

হলদিবাড়ি-শিলিগুড়ি প্রভিন্সিয়াল হাইওয়ে নিজের পঞ্চাশ মাইল লম্বা কালো কটকটে শরীরটাকে টান করে পড়ে আছে। শহর জলপাইগুড়ির মধ্যে তার যে মাইল নয়েক অংশ, তারই থেকে বাঁ-হাতি এই গলিটা বেরিয়েছে। একটা বিরাট অজগরের দেহ থেকে যেন নিতান্তই আকস্মিকভাবে ছিটকে বেরিয়ে পড়েছে একটা গুইসাপের বাচ্চা। হাই ওয়েটা যেন এই অন্ত্যজ গলির পিতৃত্ব অস্বীকার করতে পারলে বাঁচে।

এই গলিরই প্রথম দু তিনটা বাড়ি পেরিয়ে নানকু কাহাড়ের আড়াই হাত উঁচু ঝড়ো-ছনে ছাওয়া ঘর। মিউনিসিপ্যালিটির খাতায় লেখা আছে বাড়ি। তারপরেই মেথর বস্তি। ওদেরই ধোপা নানকুরও কাপড় কাচে, ওদের নাপিত ছাড়া কেউ-ই নানকুর মাথায় হাত দেবে না, এমনকি ওদেরই সান্ধ্য আড্ডায় দু-চার ঢোক তাড়ি খেয়ে গুন গুন গুন গান করতে করতে তেলচিটচিটে তাসও ভেজেছে নানকু, তবুও বাড়িটা ওদের বস্তি থেকে গজ কয়েক দূরে রেখে কেমন একটা স্বস্তি পেয়েছে সে। ঘরের মধ্যে বাঁ-দিকের বেড়া ঘেঁষে একটা মাচান তোলা হয়েছে। তার-ই ওপর দশ থেকে দু বছর পর্যন্ত গোটা পাঁচেক ছেলেমেয়ে নিয়ে শুয়ে থাকে গাধুলি। তারই মধ্যে বড় ছেলেটাকে ধাক্কিয়ে, ছোট ছেলেটাকে কাঁদিয়ে, মাচাটা মচমচিয়ে, গাধুলিকে নিতান্তই হরিজন ভাষায় গাল দিতে দিতে—একটা বিড়ি ধরাল নানকু। আর বিড়ির একটা টানের সংগে সংগেই মনে পড়ে গেল আজকে বর্ডারে কেমন করে একটা আট সেরি পাঠা হাতের মধ্যে থেকে ছিটকে গেল পাকিস্থানে। আহা—তিন টাকা সের বেচলেও এক কুড়ি চার টাকা।

'ধ্যুঃ শালা'—ব'লে বিড়িটা ফেলে পাশ ফিরে শুলো নানকু।

মোরগগুলো একবার ফোকর গলিয়ে দেখে নিল পুবেল আকাশ লালচে হয়েছে কিনা, তারপর মাথাটা ভেতরে

নিয়ে মুরগীর উষ্ণ রোমশ তুলতুলে বুকে মুখ গ‘ুজে দিল; বুনো অশথ গাছের ফোকরের মধ্যে কুণ্ডলী পাকানো গোখরো সাপটি বাঁ পাশ থেকে ডান পাশে মাথা নিল, আকাশে উড়তে থাকা পেঁচা আর বাদুড়েরা পূর্বদিকে তাকাল, গাছের পাতা সে রাতের শেষ শিশির ফেলল টিপ টিপ টপ, আসমানের পশ্চিম কোণায় পানশে চাঁদ ঝুলে যাচ্ছে—যেমন করে ঝুলে থাকে সোঁয়াকুল-কাঁটার সব পাপড়ি ঝরে যাওয়া হলদে বাসি ফুলের একটিমাত্র পাপড়ি। নানকু উঠে ফতুয়াটা গায়ে চড়াল।

বিছানা থেকে ঘুমজড়িত স্বরেই গাধুলি বলল: 'আজ এট্টু পাঁঠার 'মাট্টা' লিয়্যা আইস তো, বুন্দার আমাশা হইছে'।

বেড়ার গা থেকে সোজাসুজি লম্বা ছুরি দুটো টান দিয়ে তুলে নিতে নিতে নানকু বলল—নিজের 'মেটে' কাট্যা দিস। ভারি সুস্বাদ হব খাইতে'—ঘর থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল ও।

পায়ে মোটরের টায়ারের স্যান্ডেল, গায়ে ফতুয়া, হাতে দুটো লম্বা সরু ঝকঝকে ছুরি নিয়ে মিউনিসিপ্যাল মার্কেটের দিকে হনহন করে হেঁটে চলেছে নানকু কাহাড়। কাপড়খানা এসে পৌঁছেছে হাঁটু পর্যন্ত। চলার তালে তালে কেমন যেন কটকট আওয়াজ তোলে। বাঁশের মতো ছয় ফুট লম্বা আর পিচের মতো কুচকুচে কালো নানকু যখন ওর সরু সরু ঠ্যাং দুটো গজ দেড়েক তফাতে ফেলে ফেলে হাঁটে, তখন মনে হয় ওই পদক্ষেপেই বোধ হয় সমুদ্র পার হওয়া চলে। চোয়ালের হাড়দুটো বিদ্রোহ করেছে উপরের দিকে—আর তারই মধ্যে লাল টকটকে একজোড়া চোখ। লোকে বলে পাঁঠা কাটতে কাটতে পাঁঠার রক্তও এসে মিশেছে নানকুর চোখে। তাই ওর চোখ এতো লাল। কপালের ওপর অজস্র দাগ, মনে হয় একটা কালো আবলুস গাছের ওপর একটা বন্য বাঘ শিকার না পেয়ে হিংস্র-ভাবে থাবা মেরে মেরে গাছটার সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত করেছে। সর্বাঙ্গের হাড়-গুলো কোনরকম মাংসল প্রতিবন্ধকতা না পেয়ে ওর শরীরটাকে জ্যামিতিক কোণ-উপকোণের একটা উদাহরণমালা করে তুলেছে। ওর সরু লিকলিকে দুটো আঙুল শক্ত করে চেপে ধরা ঝকঝকে দুটো ছুরি মনে শঙ্কা জাগায়। লোকে ওকে আড়ালে ডাকে 'হাড়কাটা।'

সেই রক্তে-ভেজা বুড়ো অন্ধকারে ভরা ঘরটাতে এসে নানকুর মনে হল—ওটাই ওর নিজের জগত। পাঁঠা দুটো ঘুমিয়ে আছে—একটার মাথার ওপর দিয়ে আরেকটা পা তুলে দিয়েছে। গত রাতের দেওয়া কাঁঠাল পাতাগুলো ইতস্তত পড়ে আছে। ছুরি দুটোর পরস্পর সংঘাতে কেমন একটা কিচকিচ আওয়াজ তুলল ও, হাতের তালুর ওপর এপাশ ওপাশ করে ধার দিতে দিতে ভাবল: ঘুমন্ত অবস্থাতেই দেয় দুটোকে শেষ করে।

হঠাৎ এগিয়ে গেল।

ঘুমন্ত অবস্থায় নয়—জাগিয়ে নিয়েই কাটবে ও। হাড়কাটা নানকু কাহাড়ের মনে দয়ামায়ার আলস্য নেই। হ্যাঁচকা টান দিয়ে একটাকে তুলে নিল। পাঁঠাটা কিছু বুঝবার আগেই নিজের মাথা-ছাড়া ধড় নিয়ে লুটোপুটি খেতে থাকল। কালো চামড়া লাল হয়ে গেল। আরেকটাও লুটিয়ে পড়ল ওর পাশেই।

অস্বাভাবিক দ্রুততার সঙ্গে দুটোকে বাঁশে বেঁধে ছাল ছাড়িয়ে ফেলল নানকু। তারপর মেঝের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে প্রাত্যহিক অভ্যাসবশে দরজার দিকে তাকাতেই চোখটা আটকে গেল ওখানেই। কুকুরটি আজ একা নয়, তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে আর একটা দু পাওয়ালা জীব—মানুষ। একদৃষ্টিতেই বোঝা যায় সুস্থ মস্তিষ্ক নয়। কোমরের ওপর আর নিচের দিকটা পরস্পর টাল-খাওয়া—চলার সময় বেতালে নড়ে কোমর থেকে মাথা পর্যন্ত। পরনে এক টুকরো ন্যাকড়া আর কিছুই নেই। হাতে একটা মরচে পড়া পুরোন সিগারেটের টিন, কানে আধপোড়া বিড়ি গোঁজা। হলদে স্যাঁতলাপড়া দাঁতগুলো বেরিয়ে আছে

কালো বিবর্ণ ঠোঁট দুটোর মধ্যে দিয়ে। কালো কালো মাড়িগুলোর দিকে তাকালে মনে হয় কাউকে যেন বিদ্রূপ করছে। চোখদুটো হাসির ধমকে ঝলকাচ্ছে, না প্রতিহিংসায় জ্বলছে বোঝার উপায় নেই। নিজের চোখদুটোকে নামিয়ে আনল। দরজার দিকে ছুঁড়ে দিল মাংস-হাড়গুলো। গত কালের অবিক্রেয় মাংসগুলোতে রক্তের ছোপ লাগিয়ে টাটকা মাংসের সঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে দোকানে এসে বসল।

প্রতিদিন ঐ দোকানে বসে, একটা বিড়ি ধরিয়ে, আমেজ করে টানতে টানতে কুকুরটার মাংস খাওয়া দেখে নানকু। দেখতে দেখতে ঐ দৃশ্যটা অভ্যস্ত হয়ে গেছে। চোখের সম্মুখে প্রতিদিনই দেখে একটা জান্তব বুভুক্ষার পরিতৃপ্তি; তাই প্রতিদিন চোখ মেলা থাকলেও দেখতে পায় না। কুকুরটা কোন দিন অনুপস্থিত থাকলে হয়তো বা নানকুর মন থেকেই কুকুরটা বেরিয়ে এসে মাংস খেত সামনের ঐ তিনকোণা জমিটাতে। আজ ঐ অভ্যস্ত দৃশ্যের ব্যতিক্রম হয়েছে। ঐ তিন কোণা জমিটাতে কুকুরটার সঙ্গে খেলছে পাগলটা। কুকুরটা দু টুকরো মাংস খাচ্ছে, মাটির উপর চিৎ হয়ে পড়ে থাকা পাগলটার পেটের ওপর দিয়ে ডিগবাজি খেয়ে পড়ে যাচ্ছে ওদিকে। পাগলটা অ্যাঁউ অ্যাঁউ করে হাসতে হাসতে সরে যাচ্ছে। কুকুরটার খাওয়ার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে নেহাত-ই আকস্মিকভাবে নানকুর মনে হোল—খুন্নিবৃত্তির পরও খাওয়া চলে।

'মেটে আছে হে'—সাইকেল-চড়া এক বাবু জিজ্ঞেস করলেন।

'আছে কেনে, লেন' সবটুকু মেটের বেচে দিল নানকু। আসবার সময় গাধুলির বলা কথাগুলো মনে হওয়া সত্ত্বেও।

আজকাল—পুব আসমানের কোণটা কালো থাকতে থাকতে নিশাচর বাদুড় আর রক্তচোষা চামচিকের দলের নিশা পরিক্রমার শেষে বাড়ির গুমোট কামরার রেশের আস্তে আস্তে হারিয়ে যাওয়ার সময় নানকু কাহাড় যখন ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ঐ শলটার রুমের দরজা খোলে, দ্বাররক্ষী হয়ে দাঁড়ায় না কেবল ঐ কুকুরটাই—তার সঙ্গে এসে দাঁড়ায় ঐ পাগলটাও। পাগলটার অকারণ অ্যাঁউ অ্যাঁউ হাসির সঙ্গে মাংস খাওয়ার আশায় উৎফুল্ল কুকুরটার কেঁউ কেঁউ ধ্বনি মিশে মিউনিসিপ্যাল মার্কেটের শলটার রুমের একচ্ছত্র অধিপতি হাড়কাটা নানকু কাহাড়ের আবির্ভাবকে অভ্যর্থনা করে। রাজোচিত একটা উদাসীনতার সঙ্গেই হাড়-মাংসগুলো ছুঁড়ে দেয় দরজার দিকে। ক্ষণিকের ভ্রান্তিতে ঐ পাগলা আর কুকুরটার ধ্বন্যাত্মক বাজনা শুনে চকিতের জন্য হয়তো বা নিজেকে বাদশাহ বলেই মনে হয়।

কুকুরটা আর পাগলটা একটা সর্বজনীন প্রিয়তার অধিকারী হয়েছে। বাজারে কত লোক আসে যায়—কেউ বেদখল করে না ঐ তিন কোণা জমিটা, যেখানে ওরা খেলা করে, খায়, ঘুমায়। নানকুর দেওয়া মাংসগুলো খেতে কুকুরটার আগে মিনিট দশেকের বেশি

সময় লাগতো না, সেই মাংস নিয়েই এখন সকাল থেকে দুপুর কাটায় ওরা। বেলা গোটা দুয়েকের সময় বাজারের পশ্চিমা হোটেলওয়ালা একটা খবরের কাগজের উপর কতকগুলো ভাত আর ডাল রেখে যায় পাগলটার জন্যে। হাত দিয়ে খেতে পারে না। উপুড় হয়ে শুয়ে কেমন করে যেন একটা চতুষ্পদ জন্তুর মতো সপসপ আওয়াজ করতে করতে খায়। কুকুরটা ওর পিঠের উপর খেলা করে। তারপর কখন একসময় ঐ এঁটো কাটার মধ্যেই খবরের কাগজের ওপরেই দুজনে ঘুমিয়ে পড়ে। কুকুরটার দুটো ঠ্যাং পাগলটার নাক চোখের ওপর দিয়ে চলে যায়। সমস্ত বাজারের লোক, দুপুরের খাওয়া সেরে মুখে এক একটা বিড়ি গুঁজে তিন কোণা মাঠটাকে ঘিরে দেখতে থাকে—ওদের খেলা খাওয়া ঘুম।

লোকে দেখে আর হাসে। হাসে আর দেখে।

দিন গড়িয়ে চলে। বিষণ্ণ সূর্য আর কান্না-থরথর রাত্রি একটার পর একটা হিংস্র দাগ কেটে কেটে যায় হাড়কাটা নানকু কাহাড়ের কালো আবলুস কাঠের মতো কপালটাতে। দুটো বিদ্রোহী চোয়ালের গর্তে ঘুরপাক খাওয়া লাল টকটকে চোখ-জোড়া আরও লাল হয়। সরু লিকলিকে আঙ্গুলগুলো দিয়ে তীক্ষ্ম সরল ছুরির বাঁট চেপে ধরে নানকু কাহাড় ভাবে জীবনটাকেও যদি এমনি জোরালো মুঠোতে চেপে ধরা যেত। রাত্রি বেলায় মনে হয়ঃ সমস্ত পৃথিবীটা হয়ে গেছে কালো কটকটে একটা বিচ্ছিরি পেত্নী। সারাটা রাত ধরে সে খুনিয়ে খুনিয়ে কাঁদছে। মনে হয়, দিনের বেলার জ্বলন্ত সূর্যের দিকে তাকিয়ে—যেন একটা ক্ষুধার্ত শকুন মন্বন্তরের ক্ষুধা নিয়ে তাকিয়ে আছে তার দিকে। শকুন নাকি তাজা মানুষের চোখ উপড়ে নেয়—ছোটবেলায় শোনা সেই কথাটা কেমন করে যেন মনে পড়ে যায়। পথ চলতে চলতে হঠাৎ কোন সুগন্ধি ফুলের গন্ধ পেলে গা ঘিনঘিন করে ওঠে তার। বাজারে তারই দোকানের সামনে একটা বিরাট কদমগাছের সারাটা গা হলুদ ফুলে ছেয়ে আছে। অস্বস্তি হয় ওদিকে তাকালে,. ও গন্ধ নাকে লাগলে। চৈত্র মাসের তেপান্তরে একটা বিরাট ঘূর্ণির মতো কোন ঘূর্ণির বেগে উড়ে যাক এই শুকনো পাতার জীবন। —আর এই অনুভূতিকে সম্বল করেই মহাকালের পাতায় নামে শূন্যের পর শূন্য। নীরস, ব্যর্থ, অফলন্ত জীবন। দিন গড়িয়ে চলে। গড়িয়ে চলে দুপুরের রোদে একটা গরুর গাড়ি—কাতর কান্না তুলে।

সেদিন রাত্তিরে প্রচণ্ড ঝগড়া হয়ে গেল গাধুলির সঙ্গে। কথা নাই, বার্তা নাই, নিজের ছয়ফুট লম্বা দেহকে যখন তিন ফুট করে নিয়ে মাচানের ওপর শুয়ে আছে নানকু, তখন গাধুলি ওর বিদ্রোহী চোয়ালের হাড় দুটোতে হাত বুলিয়ে, গলাটা জড়িয়ে ধরে, আহ্লাদে প্রায় বোজা গলায় বললঃ জমাদারের বৌ কেমন একটা রুপোর হাসুলি গড়েছে। আমাকে দাওনা একটা গড়ে।

'কি?'—আঁতকে উঠল নানকু। ওর নিজের কাছেই মনে হোল ঘাড়ের ওপর ছোরার স্পর্শ পেলেও এমনভাবে আঁতকে ওঠে না কোন পাঁঠা। তারপর গাধুলির পিতার অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলে ওর তিন কোণা হাড়ের কনুই দিয়ে এমন একটা ধাক্কা মারলে—

বিকট শব্দ করে গাধুলি কেঁদে উঠল—আর তারপর চলল ওর বিনিয়ে বিনিয়ে কেঁদে কেঁদে গালিগালাজ। মাঝে মাঝে নানকুর আস্ফালন। শেষ পর্যন্ত নানকু উঠে গাধুলির চুলের গোছা ধরে টেনে ওর থলথলে মাংসল গালে নিজের সরু লিকলিকে আঙ্গুলগুলোর দাগ বসিয়ে দিল। গাধুলি চুপ করে পড়ে রইল। সেদিন শেয়ালগুলো শেষ প্রহর ঘোষণা করতেই উঠে বসল নানকু। অন্য দিনের চাইতে তাড়াতাড়িই বেরিয়ে পড়ল। বাঁশ লম্বা শরীরটা সোজা রেখে হাতের পাঁচটা সরু লিক-লিকে আঙ্গুলে ছুরির বাঁট শক্ত করে চেপে ধরে হনহন করে এগিয়ে চলল ও। ওকে দেখে ময়লার গাড়ি বের করতে করতে জমাদাররা ভাবল, এতো দৌড়ে দৌড়ে চলেছে কেন হাড়কাটা। রাস্তার ওপর পা-ভাঙ্গা একটা হোঁতকা শুয়োর কি খাচ্ছিল, ওকে দেখে দৌড়ে পালাল।

...টান মেরে শলটার রুমের দরজাটা খুলে ফেলল নানকু।

পাঁঠাদুটো চমকে দাঁড়িয়ে ভ্যাবাতে শুরু করল।

'শালা'—নানকুর ছুরির ঘায়ে ওদের ডাক বন্ধ হোল। দরজার দিকে তাকিয়ে দেখে কুকুরটা দরজার বাইরে বুক টান রেখে ঘরের ভেতর মুখ ঢুকিয়ে শোসাচ্ছে। হাতে মরচে পড়া সিগারেটের টিন নিয়ে পাগলাটা হাসছে ওর হলদে স্যাঁতলা পড়া দাঁত বের করে।

নানকুর সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল ওদের উপর।

'শালা কুত্তা—রোজ রোজ মাংস খেয়ে তোমার নোলা বেড়েছে'—সরল তীক্ষ্ম টাটকা রক্তমাখা ছুরিটা ছুঁড়ে দিল দরজার দিকে। রক্তাক্ত পিঠ নিয়ে দৌড়ুতে দৌড়ুতে পালাল কুকুরটা। আঁউ ম্যাঁউ শব্দ করতে করতে পেছন পেছন দৌড়ুল পাগলটাও।

কাটা মাংস নিয়ে দোকানে এসে বসল নানকু। কান থেকে বিড়ি বের করে ধরাল। 'শালা দুনিয়াটাই বেইমান'—একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে নানকু দেখল তিন কোণা মাঠটার ঐ যেখানে কুকুরটা আর পাগলটা খেলা করে, খায় আর ঘুমায়, সেখানেই মাটিতে মুখ গুঁজে শুয়ে আছে কুকুরটা আর পাগলটা একপাশে একরাশ কচু পাতা নিয়ে—একটার পর একটা পাতা থেকে ডাটা চুষে রস বের করে কুকুরটার পিঠে কাটা জায়গায় লাগিয়ে দিচ্ছে। কুঁই কুঁই শব্দ করছে কুকুরটা।

ঐ দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বিড়ির ধোঁয়াটা বাইরের আকাশে একটু একটু পাতলা হয়ে একেবারে মিলিয়ে যাবার মতো নানকুর মনে গত রাত থেকে সঞ্চিত দুশ্চিন্তা, ক্রোধ, ধীরে অতি ধীরে পাতলা হয়ে এলো। আর সেখানে জাগল কেমন যেন একটা অপরাধ বোধ। ভাবল কুকুরটাকে না মারলেই পারত। ভাবল কাল রাতে গাধুলিকে শুধু শুধু মারতে গেল কেন? কোন-ই তো দোষ করেনি ও, কতই বা বয়স হবে। নানকুরই তো দোষ। নিজের বৌয়ের দুয়েকটা সাধ আহ্লাদ যে মেটাতে পারে না, তার কেন যাওয়া বিয়ে করতে। গাধুলি একটা রুপোর হাসুলি চেয়েছে বলে কেমন করে মারল নানকু। না, শালা পাঁঠা কাটতে কাটতে কসাই-ই হয়ে গেছে নানকু। একটা রুপোর হাঁসুলি চাইতে পারবে না তার বৌ।

নানকুর মনে পড়ল তারাপুর গ্রামের মোড়লের মেয়ে গাধুলি। বিকেলে নদীতে গা ধুতে আসত সবাই। সবাই উঠত—গাধুলি উঠতে চাইত না। সাথীরা ঠাট্টা করে নাম দিয়েছিল গাধুলি।

মনে পড়ে গেল বছর দশেক আগের কথা। যুদ্ধে ছাগল পাঁঠা জোগাড় করে দিত ঠিকাদারকে। যুদ্ধের সময় পাঁঠা খুঁজতে খুঁজতে গিয়ে হাজির হোল নানকু তারাপুর গ্রামে। বিকেলের দিকে খুব খিদে পেয়েছে। জলে ভিজিয়ে ভাত খাবে বলে একটা পুকুর দেখে তাতে নাবতে গেছে—দেখে একটা বছর চোদ্দর কিশোরী বসে বাসন মাজছে। চোখ পাকিয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলে হাসিতে জবাব দিয়েছিল নানকু। দেখেছিল গাধুলির হাসির গমকে কেমন করে তার সারাটা শরীর টইটম্বুর কালো পুকুরের মতো টলটলিয়ে উঠল। দুটো ঔৎসুক্যের সন্ধ্যা। গ্রাম্য প্রেম। প্রাথমিক প্রস্তুতির পরই ঘর বাঁধবার স্বপ্ন। এক মাতাল রাত্রিতে গাধুলিকে নিয়ে পাড়ি জমাল নানকু। রূপখালাসী নদীর পারের তারাপুর গাঁয়ের কালোকিশোরী গাধুলি আর রাঢ়বঙ্গের নানকু কাহাড় এসে ছিটকে পড়ল উত্তরবঙ্গের এই অরণ্য ঘেরা শহরের অজগর গা থেকে ছিটকে বেরনো গুঁইসাপ গলিটার মধ্যে। তখন অবশ্য প্রভিন্সিয়াল হাই ওয়েটোয়ে কিছুই হয়নি। ঠিকাদারকে পাঁঠা জোগালিয়ে কমিশন পেত। একজনের পেট চলে গিয়েও বাঁচত। এবার নিজেই পাঁঠা কাটা শুরু করল। সঞ্চিত টাকা আর অর্জিত টাকা দুই-ই ঢেলে দিত কালো কিশোরীর জন্যে। নামের পাশের কাহাড় পদবীটা স্বর্গ কি নরকস্থ পিতৃপুরুষকে ব্যঙ্গ করতে লাগল। কোথায় পৈতৃক গ্রাম, পৈতৃক পেশা, পৈতৃক ভাষা সব উল্টে গেছে। গলায় এসে জুটেছে সারা বাংলার ভাষা। কোন বিশেষ ভাষা নয়। দক্ষিণদেশী ভাষার সঙ্গে চাটগাঁয়ের

চন্দ্রবিন্দু আর ঢাকাই টান। মাঝে মাঝে রাজবংশী অপভ্রংশ।

হঠাৎ চোখ মেলে তাকিয়ে দেখল পশ্চিমা হোটেলওয়ালার টিনের চালের ওপরকার সজনে গাছের মাথাটা সবুজ পাতায় ভরে গেছে। ভরে গেছে ফুলে। তারই একটা ডালের ওপর বসে একটা কাক আরেকটার পিঠ ঠুকরে দিচ্ছে। কয়েকটা বাচ্চা ছেলের নাড়ানাড়িতে টপটপ করে ঝরে পড়ছে সজনে ফুল, ঝির ঝির করে ঝরে পড়ছে ঝরঝরে সজনে পাতা। মাঠের ওপর একটা বাছুরের গা চেটে দিচ্ছে একটা গরু, তিন কোণা মাঠের মাঝখানে পাগলটা আর কুকুরটা খেলছে, হাসছে। পাগলটার গায়ের ওপর পা তুলে ডিগবাজি খাচ্ছে কুকুরটা। ওর মুখের ওপর থাবা বুলোচ্ছে কুকুরটা। আকস্মিকভাবে নানকুর মনে পড়ে গেল মাসটা ফাল্গুন। 'কত করে হে'—তিন টাকা করে দেবে নাকি'—এক বাবু এসে জিজ্ঞেস করে।

'ক'খানি বাবু'—ব্যগ্র হাতে দাঁড়িপাল্লাটা টেনে নেয় নানকু।

আপত্তি না করায় আশ্চর্য হয়েই ভদ্রলোক বললেন 'দাও সের দুয়েক'।—খদ্দের বিদায় নেয়। উঠে পড়ে নানকু। এক থাবা মাংস নিয়ে দিয়ে আসে ঐ তিন কোণা জমিটার মাঝখানে কুকুরটার সামনে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খাওয়া দেখল কিছুক্ষণ, পাগলটা ওর দিকে তাকিয়ে অ্যাঁউ অ্যাঁউ করে হেসে উঠল।

দোকানে চলে আসে। বাকি মাংসগুলো একটা ন্যাকড়ায় জড়িয়ে নেয়।

এক খদ্দের এসে জিজ্ঞেস করে, 'কি হে মাংস বেচবে না?'

'না বাবু' বলে পুঁটুলিটা তুলে নিল হাতে। ছুরি দুটো কেমন যেন হাতে নিতে লজ্জা করল। ও দুটো ফতুয়ার তলায় কাপড়ের মধ্যে গুঁজে নিল। তারপর বাঁশলম্বা হাড়কাটা নানকু কাহাড় ওর রণপায়ে হাঁটা শুরু করল অজগর গা থেকে ছিটকে বেরুনো গুঁই সাপের গলির দিকে।

গলিতে ঢুকে দেখে মাটির রাস্তার দুইপাশে দণ্ডকলসের সাদা সাদা ফুলের উপর মৌমাছি বসেছে। সোঁয়াকুল কাঁটার হলুদ ফুল হা করে সূর্যের দিকে তাকিয়ে আছে। দুই পাশের ঘরের ছায়ায় রাস্তাটা ঠাণ্ডা, ছায়ায় ছায়া, মধুর।—ঢেঁকি শাক আর লম্বা ঘাস কাঁচা নালার দুই পাশে।

বাড়িতে ঢুকে দেখে গাধুলি উনুনের সামনে বসে আছে। ছেলেমেয়েরা কোথায় বেরিয়েছে। কেউ বাড়িতে নেই।

'নেরে বৌ, খুব ভালো করে রাঁধবি, বুঝলি'—পুঁটুলিটা রেখে নানকু বলল। চমকে উঠে পেছন ফিরে একগাল হেসে ফেলল গাধুলি।

ওর সামনে মাটিতে বসে পড়ে নানকু বলল: 'খুব লেগেছিল কাল রাত্তিরে না? ইস গালে একেবারে দাগ পড়ি গেছে—'

'ধ্যেৎ'—আঁচল দিয়ে মুখ ঢাকল গাধুলি। ছলাৎ করে উঠল দশ বছর আগের কালো পুকুরের ঢেউ।

তারপর? দুটো বিদ্রোহী চোয়ালের গর্তে যার একজোড়া লাল চোখ সবসময় ঘুরপাক খাচ্ছে, মিউনিসিপ্যাল মার্কেটের শলটার ঘুমের রক্তাক্ত অন্ধকারে কেটেছে যার দশটা বসন্তের সবগুলো সকাল—সেই হাড়কাটা কসাই নানকু কাহাড়,—আর তারাপুর গাঁয়ের মোড়লের শ্যামলা মেয়ে গাধুলির প্রেম সম্মিলন কেমন করে হোল ইতিহাস তা বলে না। সেই ঝিরিঝিরি সজনে পাতা ওড়া ফাল্গুনের সকালে আড়াই হাতি ঘরে মুখোমুখি বসে-থাকা ঐ দুটি লৌহ যুগের নরনারী তার নায়ক-নায়িকা, তার সাক্ষী। পৃথিবীর কেউ কোনদিন সে কথা জানেনি—জানবেও না।

চক্রদত্ত

ক্যামেরার সঙ্গে ফ্লাশ লাইটের ব্যবহার আমাদের সকলেরই প্রায় জানা আছে। নতুন রকম ক্যামেরাটিতে এক সঙ্গে দুটি ফ্লাশ লাইট ব্যবহার করা হয়। একটি বোতাম টিপলেই দুটি আলো এক সঙ্গে জ্বলে। দুটো আলো এক সঙ্গে জ্বালবার সুবিধা এই যে, যে ছবিটি
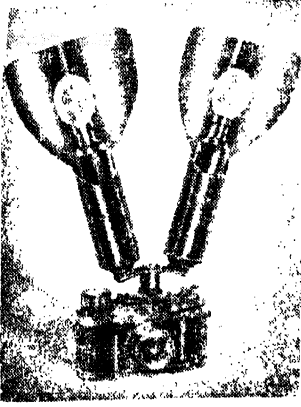
দুটি ফ্লাশ লাইটযুক্ত ক্যামেরা

নেওয়া হবে তার দুদিক থেকে আলো পড়ায় আলো-ছায়াজনিত কোনও অসুবিধাবশত ছবির কোনও ত্রুটি হয় না।

*

ক্যানসার রোগের কারণ সম্বন্ধে বিভিন্ন মত। সম্পূর্ণরূপে সঠিক কারণ নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত বিশেষজ্ঞরা ক্ষান্ত হবেন না। বর্তমানে বিশেষজ্ঞরা এর আর একটা কারণ খুঁজে বার করেছেন। মানুষের শরীরের শ্বেত-রক্ত-কণিকার কোষে এক নতুন ধরনের এনজাইমের সন্ধান পাওয়া গেছে। দেখা গেছে যে ক্যানসার রোগগ্রস্তদের শ্বেত-রক্ত-কণিকার কোষে একজন সাধারণ লোকের চেয়ে বেশী পরিমাণে এনজাইম পাওয়া যায়। এই এনজাইমকে আলাদা করে দেখা গেছে যে এটা 'গ্লুটামিক এসিড ডি হাইড্রো-জেনেসি'। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে, এনজাইমের নতুন তথ্য জানবার পর ক্যানসার চিকিৎসার অনেকটা সুবিধা হবে।

*

ইনজেকশন ভীতি অনেক লোকেরই থাকে। সূচটা শরীরের ভেতর ফুটবার সময় অল্পবিস্তর যে লাগে এ বিষয় কোন সন্দেহ নেই। এখন এক নতুন ইনজেক্‌শনের উপায় বার হয়েছে যার ফলে শরীরে সূচ ফোটাবার কষ্টের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। এছাড়া এই নতুন ইনজেক্‌শনে নিজে নিজেই শরীরে সূচ ফোটাবার বন্দোবস্ত করা আছে। এটার এমন বন্দোবস্ত করা আছে যে, চামড়ার ভেতরে খুব ছোট সূচের সাহায্যে ওষুধটা ঢুকিয়ে দেওয়া যাবে। সবচেয়ে যেটা বড় সুবিধা যে একবার ইনজেক্‌শন দেবার পর দ্বিতীয়বার ইনজেক্‌শন দেবার জন্য সূচটিকে শোধিত করে নিতে হয় না। ফলে এই নতুন উপায়ে অল্প সময়ের মধ্যে অনেককে ইনজেক্‌শন দেওয়া যায়।

*

গাছ করার শখ যাদের আছে তাদের পক্ষে গাছপালা সম্বন্ধে সামান্যতম
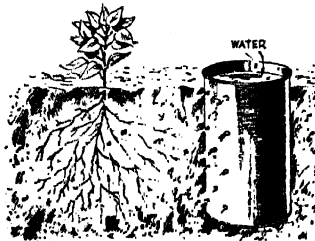
বহুদূর বিস্তৃত শিকড়ে জল সিঞ্চনের ব্যবস্থা

নির্দেশও খুব কার্যকরী মনে হ[বে]। গোলাপ ও টোম্যাটো গাছের শিকড় মা[টির] নীচে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয় এ[বং] অনেক সময়ে গাছের গোড়ায় [জল] ঢাললেও শেকড়ের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত জল পৌঁছায় না। এই ধরনের গাছে জ[ল] সিঞ্চনের নতুন পদ্ধতিটি খুবই কা[জের]। একটি লম্বা ধরনের টিনের কৌটার গা[য়ে] এক পাশে অনেকগুলি ছিদ্র করে ছিদ্রগুলো গাছের দিকে রেখে কৌটো মাটির নীচে ছয় থেকে আট ইঞ্চি পর্যন্ত গভীরে পুঁতে রেখে ঐ কৌটোতে জ[ল] ভরে দিলে আস্তে আস্তে মাটির তলা জল চুইয়ে গিয়ে মাটি ভিজে রাখে, ফলে শিকড়ের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত জল যায়।

*

পোকা ধরা দাঁতের চিকিৎসা করাতে গেলে দন্তচিকিৎসক পোকা ধরা স্থানটি তার ড্রিল করবার যন্ত্রের সাহায্যে আস্তে আস্তে ক্ষইয়ে ফেল্‌তে থাকে। এইভাবে দাঁতটা ঘষে ঘষে ক্ষইয়ে ফেল্‌তে রোগীর বেশ যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। কারণ দাঁতের ভেতরের নার্ভগুলি সব সক্রিয় থাকে ফলে খুব অল্প নাড়াচাড়া এবং ছোঁয়াতেই শরীরের ভেতর অদ্ভুত অনুভূতির সৃষ্টি হয়। কিন্তু চিকিৎসকের এইরকম ভাবে পোকা খাওয়া দাঁত আস্তে আস্তে ঘষে ফেলা ছাড়া আর অন্য কোন উপায় থাকে না। বর্তমানে একটি নতুন উপায় বার করা হয়েছে এর জন্য, যার ফলে রোগী আর কোনরকম যন্ত্রণা অথবা স্পর্শ অনুভব করতে পারবে না। ড্রিলটার ভেতর দিয়ে বৈদ্যুতিক প্রবাহ চালনা করবার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। এর ফলে বিদ্যুৎ দাঁতের কাছের টিস্যু-গুলির সাময়িকভাবে অনুভূতি শক্তি নষ্ট করে দেবে, আর রোগী যন্ত্রণার হাত থেকে রেহাই পাবে। রোগী অবশ্য এই বৈদ্যুতিক প্রবাহ শরীরে বুঝতেই পারবে না কারণ এটা খুবই মৃদু হবে। দেখা গেছে যে, প্রায় শতকরা ৯১ জন রোগীই এই বিদ্যুৎ প্রবাহযুক্ত ড্রিলের সাহায্যে দাঁত ঘষবার সময় কিছুই অনুভব করতে পারেনি।

উড়িষ্যার শাওরা উপজাতি

নিখিল মৈত্র ও সুনীল জানা

সুইডেনের গোটেবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্বের অধ্যাপক কার্ল গুস্তাফ ইৎসিকোভিৎস্ কোরাপুট জেলায় গদাবা উপজাতির সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেছিলেন। একবার তাঁর সঙ্গে গিয়েছিলাম এবং তখন ব্যবস্থা ছিল যে তাঁর ক্যাম্প তুলে দেবার আগে আর একবার সেখানে যেতে হবে। এবার তাই গদাবা দেশ দেখতেই বেরিয়েছিলাম। ওখানে গিয়ে শুনলাম যে ফেরার পথে শাওরা উপজাতি এলাকায় যাবার কথা অধ্যাপক চিন্তা করছেন। দুরধিগম্য জায়গা সুতরাং কিভাবে যাওয়া, কোথায় থাকা হবে এ সবকিছুই আগের থেকে ঠিক করে বেরোতে হবে। শাওরা উপজাতির স্বাভাবিক জীবনধারার সঙ্গে পরিচয় পেতে গেলে কোরাপুট, গঞ্জাম বা চিঙ্গলেপুট জেলার দুর্গম অঞ্চলে যাওয়া প্রয়োজন। বাইরের আবহাওয়া সেখানে উপজাতি জীবনকে সম্পূর্ণ রূপান্তরিত করে নি।

লোকমুখে মিস্ মানরো পরিচালিত খৃষ্টান মিশনের কথা শুনেছিলাম। তাঁদের কাজকর্মের ধারা অন্য সমস্ত মিশনারি সংগঠন থেকে স্বতন্ত্র এবং আদিবাসী জীবনকে অনাবশ্যক অনুশাসনের গন্ডিতে তাঁরা কোথাও আবদ্ধ করেন নি—এরকম প্রশংসাও শুনেছিলাম। তাঁদের প্রধান কেন্দ্র সেরাঙ্গো গ্রাম। আদিম শাওরা দেশের ঠিক কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। সেখান থেকে আশে পাশের শাওরা গ্রামে ঘোরাঘুরি করা যাবে। কিন্তু সেখানেই বা যাবার উপায় কি? খুরদা রোডের দক্ষিণে অন্ধ্রের স্বারদেশে পলাশা স্টেশনে নামলাম। সেখান থেকে পারলাকিমেদি পর্যন্ত ভালভাবে স্টেশন ওয়াগনে চড়ে গেলাম। তারপর? ভাল পথ, সাধারণ যন্ত্রযান সব কিছু এখান থেকে আর এগোতে পারে না। এরপরে পাহাড়ে রাস্তা এবং তাও খুবই খারাপ। মাঝে মধ্যে জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে আনার জন্যে শক্ত লরি এ পথে যাতায়াত করে। ভাগ্যক্রমে ঐরকম গাড়ি পেলেও আমাদের সমস্ত সমস্যার সমাধান হবে না। লরি থেকে নেমে আরও মাইল দশেক পথ মোটঘাট নিজেদেরই বয়ে নিয়ে যেতে হবে। সুতরাং সমস্যা একটু জটিল। আমরা অবশ্য সমস্ত অবস্থার জন্যেই প্রস্তুত হয়ে এসেছিলাম। যাবার ব্যবস্থা পাকা করার আগে একবার মিস মানরোর পর্লাকিমেদি মিশন অফিসে গেলাম জানতে যে আমাদের জন্যে কোনও চিঠি সেরাঙ্গো থেকে এসেছে কিনা। তাতে হয়তো কিছু সাহায্য পাওয়া যেতে পারে। ওখানে গিয়ে দেখি আমাদের জন্যে জীপ এসেছে সেরাঙ্গো থেকে। সরাসরি গাড়িতে করেই শেওরাদের দেশে যেতে পারব। আর এই গাড়ি এবং মিশনের দুই সায়েব আর এই ড্রাইভার ছাড়া সেরাঙ্গোর পথে নাকি অন্য কেউ যেতে পারে না। যাই হোক, আমরা কজন প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে গাড়িতে উঠলাম।

ড্রাইভার কিন্তু গাড়ি ছাড়ার আগে দীর্ঘ পনেরো মিনিট ধরে মেরী মাতা ও যীশুখৃষ্টের উদ্দেশে স্তবস্তুতি করলো। অস্ফুট স্বরে ওড়িয়া ভাষায় ভগবানকে সে কি নিবেদন করছে তা কিছু কিছু বুঝলাম। অতীতে এ পথে বহুবার সে এসেছে আর প্রতিবারই মেরী ও যীশুর করুণাতেই সে নির্বিঘ্নে পথ পারাপার করেছে। এবার এই সাহেবগণকেও যেন সে তার মেমসাহেবের কাছে নির্বিঘ্নে নিয়ে যেতে পারে। কোনওরকম অঘটন যেন না ঘটে। ছোট গাড়ির মধ্যে গাদাগাদি হয়ে বসে ঐশ্বরিক শক্তির এই দীর্ঘ আবাহনকে যে খুব স্বাগত করতে পেরেছিলাম, তা বোধহয় নয়। রাস্তায় বেরিয়ে কিন্তু বুঝেছিলাম যে পথের বিপদ এমনি মারাত্মক যে, যে কোনও মুহূর্তে অনর্থ ঘটতে পারে। একেবারে খাড়া চড়াই তারপরই হয়ত তেমনি মারাত্মক উতরাই। জীপে চলতে গিয়ে কেবলি মনে হচ্ছে যে এই বুঝি গাড়ি উল্টে গেলো আর আমরা গড়াতে গড়াতে পাহাড়ের তলায় চলে

শাওরা উপজাতিদের গ্রামে পুর পুর অনুষ্ঠানের প্রারম্ভিক অবস্থা

গেলাম। অসম্ভব দক্ষতার সঙ্গে এই দীর্ঘ বিপদসঙ্কুল পথ পার করে ড্রাইভার যখন সেরাঙ্গো গ্রামের উপকণ্ঠে আমাদের নিয়ে এলো তখন প্রায় সন্ধ্যে। গ্রামে ঢোকার মাইল খানেক আগে থেকে পাহাড়ী বাটের অস্পষ্ট রেখা প্রশস্ততর হয়ে সুন্দর এক রাস্তা হয়ে গিয়েছে। ড্রাইভার মিশনের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিল। স্কুল, হাসপাতাল, ডিসপেনসারি, বড় ইঁদারা—এমনি কত কি। মিশনের বাড়ি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। মিস মানরো হাসিমুখে আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন।

এর আগে উপজাতি অঞ্চলে গিয়ে কখনও মিশনারি সংগঠনের আতিথেয়তা স্বীকার করি নি। তাতে অনেক সময় কাজের অসুবিধে হবারই সম্ভাবনা বেশি। তাঁরা আদিবাসী জীবনকে যেভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে চান তাতে আমাদের সঙ্গে মতভেদের সম্ভাবনাই বেশি। সুতরাং, এখানে প্রথম যখন উঠি তখন যে খুব স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করি নি, তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু, শাওরা উপজাতি অঞ্চলে ব্যাপকভাবে অনুসন্ধান ও ঘোরাঘুরি করে যা দেখেছি তাতে বলতে কোনও বাধাই নেই যে মিস মানরোর মিশনারি সংগঠন আদিবাসী জীবনের নিজস্ব সহজ, সাবলীল ধারাকে কোথাও রুদ্ধ করে নি। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, জীবিকা অর্জন এই সমস্ত ব্যাপারে বাইরের জগতের উন্নত ধরনের ধ্যানধারণা মিশনারি সংগঠন প্রচার করেছে কিন্তু উপজাতির নিজস্ব নাচ, গান, আমোদ প্রমোদকে বন্ধ করে নি। অনাবশ্যক বস্ত্র-সম্ভারে শাওরা যুবক যুবতীকে ভারাক্রান্ত করার নির্দেশও জারি হয় নি।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে, পুরাণে, কাব্যে, কিম্বদন্তীতে শাওরা উপজাতি, বহুদিন থেকে পরিচিত। রামায়ণের শবরী ও রামচন্দ্রের কাহিনী সর্বজন-বিদিত। ঋষি বিশ্বামিত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্যে বশিষ্ঠের ধেনুর থেকে শবরদের উদ্ভব হয়েছিল বলে রামায়ণে উল্লেখ করা হয়েছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের মতে কিন্তু শবর জাতি বিশ্বামিত্রের বংশজ এবং পিতৃ আজ্ঞা লঙ্ঘন করার অপরাধে তাদের উপর অভিশাপ পড়ে, যার পর থেকে তারা অপবিত্র। সুদূর অতীতে পুরীধাম ছিল এক বিরাট বন। সেইখানে নীলাচল পাহাড়ে কল্পদ্রুমের ধারে নীল-কান্তমণির অপূর্ব নীলমাধবের মূর্তিকে পূজো করত শবর উপজাতির এক ব্যাধ। ক্রমে এই অলৌকিক বিগ্রহের সংবাদ মালওয়া রাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের কাছে পৌঁছলো। তিনি চারদিকে দূত পাঠালেন। পূর্বাচল-গামী রাজদূত বিদ্যাপতি নীলাচলের

শাওরা যুবতী

শবর ব্যাধ বিশ্ববসুর সন্ধান পেলো এবং বিগ্রহের সঠিক স্থিতি সম্বন্ধে সংবাদ রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নও পেলেন। বিরাট সেনা-বাহিনী নিয়ে শবর দেশের নীলমাধব মূর্তি আনতে তিনি যাত্রা করলেন। রাজার এই ঔদ্ধত্যে কুপিত হয়ে নীল-মাধব অন্তর্ধান করলেন এবং পরে রাজাকে নির্দেশ দিলেন যে, সমুদ্রে বিশেষ চিহ্নযুক্ত কাঠ ভেসে আসবে। তাই থেকে যেন বিগ্রহ তৈরি করা হয়। পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের অধিষ্ঠাতা দেবতাদের সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে বহু মত রয়েছে। তবে, এখনও জগন্নাথ মন্দিরে জ্যৈষ্ঠ স্নান পূর্ণিমা থেকে আষাঢ় পূর্ণিমা পর্যন্ত শবর বংশের সেবাইতরা পূজোর অধিকারী। শাওরা সমাজের বিভিন্ন দেবদেবীর মধ্যে প্রধানঃ জাকেরী পেনু, তানা পেনু এবং মুরুবী পেনু। জাকেরী পেনু ধরিত্রী দেবী তানা পেনুর ভ্রাতা এবং মুরারি পেনু ধরিত্রীর পতি। জগন্নাথ, সুভদ্রা এবং বলরামের সঙ্গে উপজাতির উপাস্য দেবতার সাদৃশ্য থেকে অনেকে মনে করেন যে, আদিম জাতির পূজো উপচার নবরূপে অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

ইতিহাসের পাতাতেও আমরা শবর রাজ উদয়নের পরিচয় পাই। ময়ূরের পালক দিয়ে তৈরী তাঁর রাজকেতন। প্লিনি শাওরা উপজাতিকে শুয়ারি এবং ক্লডিয়াস টলেমি শবরাই বলে অভিহিত করেছেন। রোমক ভৌগোলিক টলেমির বিবরণীতে আমরা জানতে পারি যে, গঙ্গার সমভূমির দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে এই উপজাতির বাস, সুতরাং শাওরা আদিম জাতিকেই যে তিনি উল্লেখ করেছিলেন সে সম্বন্ধে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই। সাম্প্রতিক ইতিহাসে শাওরাদের যাযাবর বৃত্তির কোনও চিহ্নই আমরা পাইনে। সেইসব দেখে মনে হয় যে, প্রতিবেশী দ্রাবিড় উপজাতি কোন্ডদের থেকে অনেক আগে শাওরা জাতির লোক উড়িষ্যার ও অন্ধ্রের পূর্বাঞ্চলে বসবাস করছে। মধ্যপ্রদেশের তামোয়া ও সৌগর জেলাতেও শবরেরা বসবাস করে এবং সুদূর উত্তর প্রদেশেও এই উপজাতির এক শাখা সুইর অথবা সুইরাই নামে পরিচিত। ভাষাবিদ্‌দের মতে শাওরা ভাষা অস্ট্রিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত এবং ছোটনাগপুর মালভূমির মুণ্ডা ভাষার সঙ্গে সাদৃশ্য আছে।

কোন্ডদের সঙ্গে তুলনায় শাওরাদের রঙ কালো এবং আকারেও ছোট। অসুখ বিসুখও যথেষ্ট রয়েছে। অনেকেই নানা-রকমের রোগে ভুগছে। সেরাঙ্গো গ্রামের আশে পাশে মিশনারি সংগঠনের চেষ্টায় ওষুধপত্র দেবার ব্যবস্থা আছে। দূর গ্রামে বিশেষ করে 'ইয়স' (Yaws) রোগের প্রাদুর্ভাব চোখে পড়লো। বস্ত্রের ব্যবহার অত্যন্ত পরিমিত। পুরুষেরা সাধারণত লেংটি ছাড়া অন্য কিছু ব্যবহার করে না। শীতকালে মোটা চাদর গায়ে জড়িয়ে
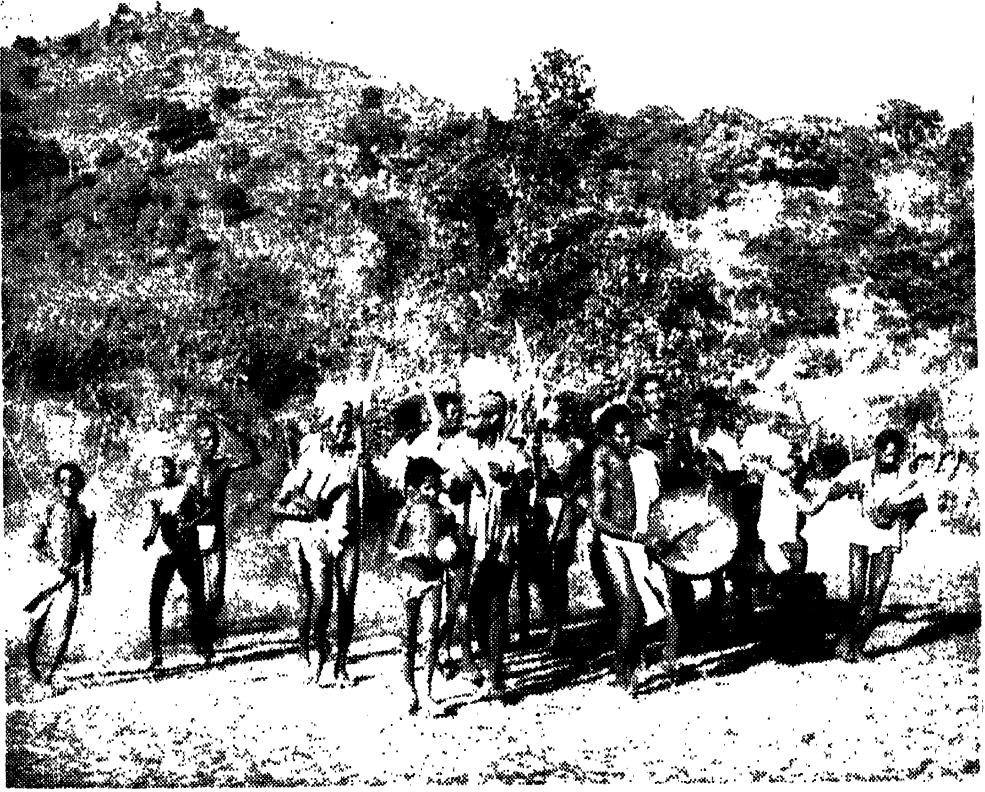
শাওরাদের নাচ

নেয়। পগাক্কা বা পাগড়ি এবং কোমর-বন্ধ বিশেষ কোনও উৎসব উপলক্ষে পরার রীতি প্রচলিত। অবশ্য গ্রামবৃদ্ধ গামঙ্গ এবং পারলৌকিক মঙ্গলের পুরোহিত বুইয়া—তাঁরা বিভিন্ন বর্ণের পাগড়ি যে কোন সময়েই পরতে পারে। পাগড়ি তাদের পক্ষে পদমর্যাদা পরি-চায়ক। শাওরা রমণী অপ্রশস্ত মোটা কাপড়ে নিজের দেহকে বেষ্টন করে রাখে। নিজেদের গ্রামে বা কাজে কর্মে পাহাড়ে গেলেও দেহের উপরিভাগ অনাবৃতই রাখে। তবে, যখন হাটের পথে মাথায় দ্রব্যসম্ভার বয়ে নিয়ে সে যায় তখন এক-খানা চাদর দিয়ে উপরের ভাগও আবৃত করে। একই চাদর দিয়ে আবার ছোট ছেলেকে পিঠের সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে নিয়ে চলে।

শাওরা রমণীর নানা বর্ণের আভরণে নিজেদের সজ্জিত করে। দুই কাণে বড়ো করে ফুটো করে তাতে প্রায় ডজনখানেক মাকড়ি প্রত্যেকে পরে। নাক বিঁধিয়ে নথ পরারও রেওয়াজ আছে। গলায় রুপোর হার, হাতে রুপো বা পেতলের বাজুবন্ধ (আর্মলেট)। চুড়ি ও আঙটির পরিমাণও আমাদের কাছে একটু বেশি বলে মনে হয়। পুরুষদের অনেকেই মাথার সামনের ভাগ কামিয়ে ফেলে, তারাও কাণ বেঁধায় কিন্তু নাকে অলঙ্কার পরে না। পুরুষ স্ত্রী সবাই পুঁতি খুব পছন্দ করে। একটু ভাল রঙচঙে পুঁতির মালা যে সংগ্রহ করতে পারবে সে বিশেষ ভাগ্যবান। অত্যন্ত সন্তর্পণে তা তুলে রাখবে। বিশেষ কোনও উৎসব বা নাচে, সেই মালা পরে শাওরা যুবক বা যুবতী নিজেকে সুসজ্জিত করবে। উল্কি পরার রীতিও প্রচলিত। জঙ্গলের কাঁটা এবং নানারকম গাছের বাকলের রস দিয়ে ও কাঠকয়লা মিশিয়ে রং তৈরি করে। বয়স্ক পুরুষ বা স্ত্রীলোকেরা সুনিপুণ হাতে পাখি, ফুল, বা শুধু রেখা ও বিন্দু দিয়ে যুবক যুবতীদের দেহে উল্কি করিয়ে দেয়।

শাওরা নাচ গ্রামের মধ্যে বিরাট মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। গ্রীষ্মের সময় ক্ষেতের কাজকর্ম শেষ করে সবাই মিলে নাচের উৎসবে মিলিত হয়। নাচের সঙ্গে তাল রাখার জন্যে ঢাক, ঢোল এবং গুপী-যন্ত্রের মত বাজনারও ব্যবস্থা হয়। উজ্জ্বল সূর্যালোকে নাচ আরম্ভ হয়। পুরুষেরা সবাই মাথায় রঙীন পাগড়ি পরেছে তাতে নানাবর্ণের পাখির পালকও
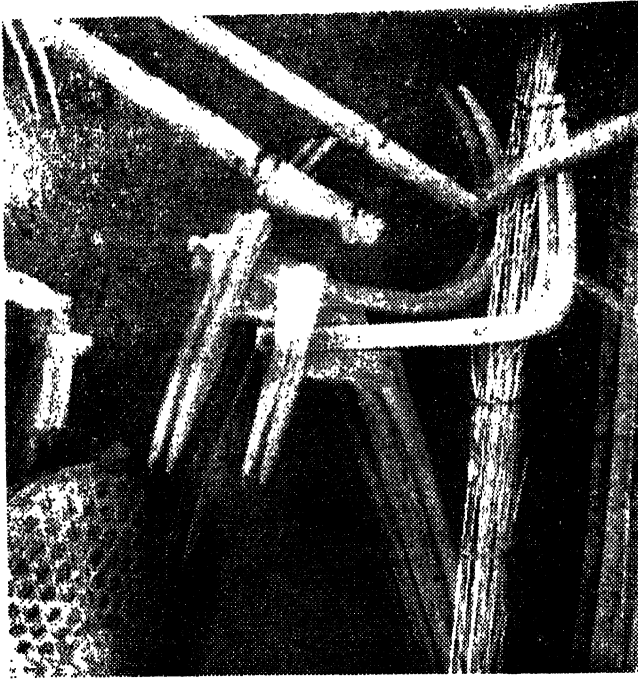
শাওরাদের চাষোপযোগী দ্রব্যাদি

গাঁথা আছে। মেয়েরা তাদের সমস্ত অলঙ্কার দিয়ে নিজেদের সুসজ্জিত করেছে। এমনি শাওরা তরুণীরা কেশ-প্রসাধনে বিশেষভাবে যত্ন নেয়। নাচের দিনে খোপা বড় পরিপাটি করে বেঁধে মেয়ের দল এসেছে। বাজনার তালে তালে মেয়েরা দলবেঁধে নাচছে। পুরুষেরা যেন অনেক বেশি উদ্দাম। হাতে তাদের ধনুক, বর্শা, কুড়োল এবং মাঝে মাঝে মেয়েদের ঘিরে বীরভাবের আতিশয্যে তারা সশব্দে নাচের আসরে নামছে। নাচের সঙ্গে পর্যাপ্ত পান-আহারেরও ব্যবস্থা আছে।

শাওরাদের সাধারণ আহার অত্যন্ত পরিমিত। ভাত এবং সামান্য কিছু তরকারি। শিকার করে মাংস পেলে তা দিয়ে মাঝে মাঝে একটু মতুনত্ব হয়। *একরকম সাগু গাছ থেকে সালফি নামে তাড়ি জাতীয় পানীয় পাওয়া যায়। তাছাড়া অবশ্য চাল, বাজরা প্রভৃতি চোলাই করে চোলাই মদও তৈরি করে। শাওরা গ্রামের মধ্যে সাধারণ ভাবে* দারিদ্র্যের যে ছাপ খাওয়ার ব্যাপারেও তাদের সেই অভাব, অনটনের চিত্রই দেখতে পাওয়া যায়।

শাওরা উপজাতি নানা উপশাখায় বিভক্ত। চিংগলেপুট জেলায় কাপু, খুট্টো, মালিরা প্রভৃতি শাখায় শাওরারা বিভক্ত। উড়িষ্যার পার্বত্য অঞ্চল নিবাসী শাওরাদের লাঞ্জিয়া শাওরা বলে অভিহিত করা হয়। এক শাখার মধ্যে সাধারণত বিভিন্ন গোত্রের অস্তিত্ব নেই। তা সত্ত্বেও, একজন পুরুষের পক্ষে নিজ গ্রামে বিবাহ করা অনুচিত বলে ধারণা। ছেলেমেয়েরা নিজেরা আগে পছন্দ করে ভবিষ্যৎ জীবনের সঙ্গী নির্বাচন করে। পাত্রের পিতা একটি তীর, শাদা সারসের পালক এবং সালফি মদ কন্যার পিতার কাছে *পাঠালেন। অনেক সময় কন্যাপক্ষের লোকজন এই সব উপঢৌকন ফেলে দেবে। তার অর্থ অবশ্য এ নয় যে, বিবাহ প্রস্তাবে তাদের অসম্মতি আছে। এটা অনেকটা আনুষ্ঠানিক ব্যাপার হয়ে* দাঁড়িয়েছে। মানিনীর মান ভঞ্জনের বরপক্ষ বারবার উপহার সম্ভার এ নিয়ে আসবে এবং পরে হয়তো সঙ্গে যুবকের বিবাহও স্থির হয়ে বহু যুবক যুবতী বিবাহে এই সব ক্রিয়াকলাপ সমর্থন না করে নিজেরা গ্রাম ছেড়ে জঙ্গলে পালিয়ে সেখানে স্বামী স্ত্রী হিসেবে কি বসবাস করার পর তারা প্রকাশ্যে বৃদ্ধদের সামনে এসে নিজেদের পরিচয় দেয়। আবার অনেক একাধিক পাণিপ্রার্থী যুবকদের সংঘাত, সংঘর্ষও হয়। অনেকের ধার অতীত যুগে শাওরাদের মধ্যে জোর কন্যাকে ধরে নিয়ে গিয়ে বিবাহের প্রচলিত ছিল। সেই ব্যবস্থা অ এখনও কোথাও কোথাও বিবাহের কন্যাকে বর নিয়ে যেতে গেলে, দেখানো বাধা কন্যার আত্মীয় স্বজন

গ্রাম প্রধানকে শাওরারা গো বলে এবং প্রতিটি ব্যাপারে তার মত বহিরাগতদের সঙ্গে সম্পর্ক গ্রামের সঙ্গে লেন দেন নিয়ন্ত্রিত একশো বছর আগে বিভিন্ন রা চারীর বিবরণী থেকে আমরা পারি যে শাওরা উপজাতি নি মধ্যে সংগ্রাম সংঘর্ষ প্রায়ই করত অন্য উপজাতিদের সঙ্গেও বিরোধ ছিল। অবশ্য প্রতিবেশী উপজাতিদের সম্পর্কে নরবলি বা হত্যার যে অভিযোগ করা হতো, দের সম্বন্ধে সেরকম কোনও কিছু শোনা যায় নি। শাওরারা তাদের সৎকার করে কিন্তু শরীর এবং অমরত্ব দুইয়েতেই তাদের পাথরে ও গাছে বহুরকমের দেব দের বাস এবং বিভিন্ন সময়ে সবাইকে তুষ্ট করার জন্যে পূজো বিধি প্রচলিত। শাওরা গ্রামে যে ঘুরেছি, কোথাও না কোথাও পূ উৎসবের আয়োজন লক্ষ্য করেছি ছোট পাতায় নানারকমের ভোগ রয়েছে। *তিনজন পুরোহিত গাছে হেলে দুলে বহুক্ষণ ধরে মন্ত্র করলো। এভাবে শুনলাম গ্রামের উপদ্রবী, অনিষ্টকারী শক্তিকে নি করা হলো।* গ্রামের পথে যেতে

খড়ের চালা প্রায়ই দেখা যায়। শুধু গ্রামের পথে কেন, জঙ্গলের ধারে রাস্তার পাশেও এইরকম খেলাঘরের মত ছোট খড়ের চাল কয়েকটা বাঁশের উপর পোঁতা। এ সব দেবতার স্থান। আবার কাঠ কুঁদে পুতুল তৈরি করে শাওরাদের দেশের চতুর্দিকে, বিশেষ করে পথের ধারে, পোঁতা রয়েছে। অপদেবতা যাতে প্রবেশ না করতে পারে তারই জন্যে এ বাধার প্রাচীর।

শাওরা উপজাতিকে সমস্ত জীবকেই যেন কেমন এক অস্পষ্ট ভয়, ভীতি ঘিরে রয়েছে। আদিমজাতির মধ্যে গেলেই অফুরন্ত হাসি, জীবনীশক্তির প্রাচুর্য আমাদেরও সমস্ত সংকোচকে দূরে করে দেয়। সংক্রামক হাসিতে বহিরাগত মানুষও সানন্দে যোগ দেয়। শাওরা দেশের মানুষের জীবন ধারা একটু ভিন্ন রকমের। অনাবশ্যক চিন্তায় সে যেন প্রপীড়িত। আনন্দ তার জীবন থেকে যে নির্বাসিত একথা কখনও বলবো না, তবু সে ধারা অন্তঃসলীলা। পরিচয় পেতে গেলে বহিরাবরণ ভেদ করে নিচে যেতে হয়। আমাদের সে যাত্রায় এইরকম এক অপূর্ব সুযোগ উপস্থিত হয়েছিল। আমাদের সঙ্গে একটা ছোট রেকর্ডিং মেশিন ছিল। তাইতে শাওরা গীত রেকর্ড করা হলো। গানের কোনও কোনও অংশ একটু আদিরসাশ্রিত। রেকর্ড হয়ে যাবার পর তাদের নিজেদের গান শোনানো হলো। প্রথম কয়েক মিনিট বিস্ময়ে তারা হতবাক্। একটু পরে যখন শুনতে অভ্যস্ত হয়ে গেলো তখন কি হাসির উচ্ছ্বাস। বিশেষ করে একটু আদিরসাশ্রিত কোনও কলি শুনে হেসে সবাই লুটিয়ে পড়ছে। এইরকম অসাধ্যসাধন করার পর আমাদের খ্যাতিও দ্রুত চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। তাতে আবার আর এক বিপদ! বিভিন্ন গ্রাম থেকে স্বাগত ভাষণ আসতে আরম্ভ করল আমরা যেন সেখানে গিয়ে এই অদ্ভুত গান বাজিয়ে আসি। আমরা বহুকষ্টে বুঝালাম যে বিজলী না হলে আমাদের বাজনা বাজবে না। আর মিশনে ছোট একটা জেনারেটর ছাড়া এখানে আর কোথাও বিজলী পাবার উপায় নেই। আমাদের

তীর ধনুক হাতে শাওরা যুবক

ব্যাটারীও পারলাকিমেদি থেকে নিয়ে আসি নি। তখন অগত্যা প্রস্তাব এলো রোজ রাত্রে মিশনে তাদেরি নিজেদের গাওয়া গান যেন আমরা আবার তাদেরি শোনাই। দূর দূর গ্রাম থেকে তরুণ-তরুণীরা দল বেঁধে নিজেদের গান শুনতে আসতো। যতক্ষণ গান হতো মিশনবাড়ির আশে পাশে বোধকরি কেউ ঘুমুতে পারতো না। হাসিতে আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে থাক্‌তো।

শাওরাদের সব থেকে অবিস্মরণীয় কীর্তি পাহাড়ের গা কেটে চাষবাস। গদাবা দেশে দেখেছি যে, সেখানে কোন্ড উপজাতিরা বহুদিন ধ'রে ঝুম প্রথায় চাষবাস ক'রে কিভাবে পাহাড়কে বন্ধ্যা, ব্যঞ্জর ক'রে দিয়েছে। মাইলের পর মাইল যেদিকে তাকাই পাহাড়ের গায়ে উদ্ভিদ-জগতের লেশমাত্র কোথাও অবশিষ্ট নেই। পাহাড়ের উপর মাটির যে পাতলা আবরণ ছিল বছরের পর বছর ধ'রে বর্ষার প্লাবনে তা ধুয়ে মুছে চলে গিয়েছে। পাহাড় আজ সেখানে খালি পাথরের স্তূপ। এরই অনতিদূরে শাওরাদের দেশে এলে সমস্ত পাহাড়, উপত্যকা চিরশ্যামল আবরণে আচ্ছাদিত। পাহাড়ের গায়ে মাটির স্তর গভীর নয়। কিন্তু বহু যত্নে যুগ যুগ ধ'রে কি বিরাট পরিশ্রমে অনগ্রসর এই বন্য আদিম জাতি প্রকৃতির দেওয়া এই মাটিকে রক্ষা করেছে। পাহাড়ের চূড়া থেকে পাদদেশ পর্যন্ত সযত্নে কাটা টেরাস। আর প্রতি ধাপে জলধারার বেগ রোধ করার জন্যে, চাষের জল সঞ্চয় করে রাখার জন্যে দেওয়াল। পাথর দিয়ে মজবুত সে দেওয়াল প্রতি ধাপে ধাপে তৈরি করতে হয়েছে এবং বছরের পর বছর তাকে সযত্নে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে। এইভাবে যতদূরে দেখা যায় পাহাড় কেটে কেটে চাষের জমি এবং তাইতে ধান বা বাজরার চাষ। আশে পাশে পাহাড়ী ঝোরা থাকলে, তার জলকেও চাষের কাজে অমনিভাবে নিয়োগ করা হয়েছে। এভাবে মাটিকে মেহনত করে রক্ষা করতে হয় একথা সুদূর অতীতে এই উপজাতিকে কে শিখিয়েছিল আজ তা বলা অসম্ভব। একথা কিন্তু আমরা জানি যে, আজ ভারতবর্ষের বহু কৃষককেই এ বিষয়ে অবহিত করা প্রয়োজন। ভূমি সংরক্ষণ সম্বন্ধে প্রচার আমাদের কৃষক সমাজের মধ্যে এখন আরম্ভ হয়েছে।

নিজেদের শ্রমে এবং বুদ্ধিতে শাওরারা যেভাবে কৃষিযোগ্য জমি তৈরি করেছে তা অনুকরণীয়। কিন্তু, দারিদ্র্যের সমস্যা সেখানে মেটে নি। অন্য উপজাতি এলাকায় বহিরাগত সভ্য মানুষ ব্যবসার নামে যেভাবে লুট করেছে, শাওরাদের বেলাতেও একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। তাদের ভাল ভাল জমি হাত-ছাড়া হয়ে গিয়েছে। নিজেদের বাড়তি ধান, চাল, বাজরা বা তরিতরকারি বিক্রী করে তারা যা দাম পায় তার থেকে অনেক বেশি তাদের দিতে হয় বাইরের জগতের জিনিস কিনতে। বনবিভাগের বিভিন্ন নিয়ম কানুনও অনেক সময় অসুবিধের সৃষ্টি করে। আমলা, পেয়াদা-দের দৌরাত্ম্যও কম নয়। এত দারিদ্র্যের মধ্যেও যে স্বতন্ত্র উপজাতি হিসেবে শাওরারা আজও তাদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পেরেছে তার কারণ তাদের দেশ দুরধিগম্য।

উত্তর ভারতে স্বামীজী

শ্রীসরলাবালা সরকার

গতবারে গুডউইনের ও পবহারী-বাবার দেহান্তরের কথা লিখিয়াছি। এই দুই ঘটনাতেই স্বামীজী মনে দারুণ আঘাত পাইয়াছিলেন। গুডউইনের মৃত্যুতে যে অপূরণীয় ক্ষতি হইল তাহা আর পূর্ণ হইবার নয়। স্বামীজী বলিয়াছিলেন, "আমার ডান হাত ভাঙিয়া গেল, বোধ হয় মার ইচ্ছা নয় যে, আর আমি কাজ করি। এবার আমাকে নিজের হাতে লিখিতে হইবে। লেকচার করা একেবারে বন্ধ হইয়া যাইবে।"

গুডউইনের কাগজপত্র যাহা ছিল আলাসিঙ্গা সমস্তই তাঁহার মায়ের কাছে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু সে কাগজগুলি গুডউইনের স্বামীজীর বক্তৃতার শর্টহ্যাণ্ড লিখন। সেগুলির কতক গুডউইন দীর্ঘলিপিতে রূপান্তরিত করিয়াছিলেন, কিন্তু বহু বক্তৃতার উপকরণ তখনও দীর্ঘলিপিতে রূপান্তরিত করা হয় নাই। আলাসিঙ্গা না জানিয়া সেই-গুলিই তাঁহার মার কাছে পাঠাইয়া দিয়া-ছিলেন। ফলে সেগুলির আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। কেননা গুড-উইনের মৃত্যুর সংবাদ পাইবার পর তাঁহার মা ও বোনেরা কোন ঠিকানা না রাখিয়াই অন্য স্থানে চলিয়া গিয়াছিলেন। নিবেদিতা যখন ইংলণ্ডে যান তখন সন্ধান করিবার জন্য সেই গ্রামে গিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের কোন উদ্দেশ পান নাই। এইভাবে স্বামীজীর অনেক বক্তৃতা একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

স্বামীজীর ভ্রাতা শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দত্ত স্বামীজীর সহিত লণ্ডনে ছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, "স্বামীজীর লণ্ডনে বক্তৃতার সময় একটি স্ত্রীলোক নার্সের পোশাক পরিয়া আসিয়া নিবিষ্ট মনে ক্ষিপ্রলিপিতে সমস্ত লিখিয়া লইতেন। কিন্তু তিনি কাহারও সহিত আলাপ করিতেন না। তাঁহার নিকট সেই বক্তৃতা-গুলি থাকা সম্ভব। কিন্তু তাঁহার নাম বা ঠিকানা কেহই জানে না। সময়টা হইতেছে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকাল।"

যাহা হউক, এখন আমরা স্বামীজীর অনুবর্তন করিব। প্রবুদ্ধ ভারতের সম্পাদকের মৃত্যুতে পত্রিকাখানি বন্ধ হইয়া যাইতে পারে এরূপ আশঙ্কা স্বামীজীর মাদ্রাজী গৃহস্থ শিষ্যগণ স্বামীজীকে জানাইলেন। স্বামীজী সে সময় সেভিয়ার দম্পতির বাড়িতে আলমোড়ায় ছিলেন। মিস্টার সেভিয়ার তাঁহাকে জানাইলেন যে, তিনি ঐ কাগজখানির ভার লইতে পারেন। একথা শুনিয়া স্বামীজী খুবই আনন্দিত হইলেন। তখন আলমোড়া হইতেই প্রবুদ্ধ ভারত প্রকাশিত হইবে, ইহাই ঠিক হইল এবং ইহাও স্থির হইল যে, স্বামীজীর শিষ্য স্বরূপানন্দ সম্পাদক ও মিস্টার সেভিয়ার ম্যানেজার হইবেন।

স্বামীজীর শিষ্য স্বরূপানন্দ ও স্বামী সদানন্দ ইঁহাদের উভয়ের সঙ্গেই ভগিনী নিবেদিতার ভারতবর্ষে আসিবার পর প্রথম আলাপ ও বন্ধুত্ব হয়। স্বামী সদানন্দের কাছে স্বামীজীর জীবন কাহিনী শুনিতে শুনিতে ভগিনী নিবেদিতা তন্ময় হইয়া যাইতেন। সেই কাহিনী তিনি তাঁহার গ্রন্থে অপূর্ব চিত্রাঙ্কনী প্রতিভায় বর্ণনা করিয়াছেন।

অতি প্রত্যূষে, অন্ধকার থা[...] থাকিতেই স্বামীজী "জাগো, [...] অমৃতের অধিকারী"—এই গানটি গ[...] সকলকে ঘুম হইতে উঠাইতেছেন,[...] পর তাঁহার সমস্তক্ষণের কার্যক[...] সন্ধ্যার পূর্বে কখনও বা ঝাঁসির [...] লক্ষ্মীবাইয়ের কখনও বা জোয়ান [...] আর্কের কাহিনী বর্ণন—আবার [...] বা কার্লাইলের 'ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লব' [...] আবৃত্তির সময় গুরু ভ্রাতৃগণ স[...] স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় দুলিতে দু[...] সমস্বরে বারবার "সাধারণতন্ত্রের [...] হউক" "সাধারণতন্ত্রের জয় হউক" [...] উচ্চারণ প্রভৃতি সদানন্দ যেন [...] ভগিনী নিবেদিতার মনের সম্মুখে [...] করিয়া যাইতেন। কখনও বা [...] সেণ্ট ফ্রান্সিস অব অ্যাসিসির [...] এমন তন্ময় হইয়া যাইতেন [...] মহাপুরুষের উক্তি "এস, এস [...] এই কথাটির মধ্যেই যেন নিমগ্ন [...] যাইতেন। নিবেদিতা এই স[...] শুনিতে শুনিতে মুগ্ধ হইয়া [...] এবং যিনি বক্তা তিনিও মূর্চ্ছি[...] যাইতেন।

নিবেদিতা মঠে আসিবার প[...] স্বরূপানন্দ মঠে আসেন, [...] ব্রহ্মচারী, কিন্তু অল্পদিনেই [...] স্বামীজীর নিকট সন্ন্যাসের দীক্ষা [...] করেন। প্রথম অবস্থায় ইনিই [...] নিবেদিতার শিক্ষক ছিলেন। [...] ও ধ্যানের প্রণালী সম্বন্ধে স্বরূপা[...] নিবেদিতার প্রাথমিক শিক্ষা[...] নিবেদিতা তহার "দি মাস্টার [...] স' হিম্" গ্রন্থে তাঁহার পূর্ব জী[...] ইতিহাস ও সন্ন্যাস গ্রহণের প্রেরণা [...] যেরূপ শুনিয়াছিলেন তাহাও [...] করিয়াছেন।

উত্তর ভারত ভ্রমণে ভগিনী নি[...] স্বামীজীর সঙ্গে গিয়াছিলেন [...] অমরনাথ তীর্থে যাইবার সময় স্বা[...] তাঁহার সঙ্গিগণের মধ্যে [...] নিবেদিতাকেই সঙ্গে লইয়াছি[...] ভগিনী নিবেদিতার "আচার্য দেবকে [...] দেখিয়াছি" গ্রন্থখানিতে তাঁহার [...] ভ্রমণ সময়ের যে একটি ছবি আছে [...] অপূর্ব ও হৃদয়গ্রাহী। ভগিনী নিবে[...]

আমাদের অনেক কিছু দান করিয়াছেন, তাহার মধ্যে তাঁহার এই গ্রন্থখানি এক মহামূল্য দান।

কাশ্মীরের পথে স্বামীজীর সঙ্গে একত্রে যাত্রা ভগিনী নিবেদিতার জীবনের একটি চিরস্মরণীয় ঘটনা। ১১ জুন তারিখে স্বামীজী আলমোড়া হইতে কাশ্মীরের পথে রওনা হইলেন এবং মিসেস অলিবুল তাঁহাদের আতিথ্যের ভার গ্রহণ করিলেন।

এই সময় স্বামীজী অত্যন্ত নির্জনতা প্রিয় হইয়াছিলেন। নিবেদিতা লিখিয়াছেন, "আমরা সর্বদা ভৃত্যগণের নিকট হইতে এই শুনিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতাম যে, স্বামীজীর নৌকা একঘণ্টা পূর্বে নোঙ্গর তুলিয়া চলিয়া গিয়াছে এবং সেদিন আর প্রত্যাবর্তন করিবে না।"

বারমুলায় উপস্থিত হইয়া তাঁহারা তিনখানি হাউস বোট ভাড়া করিয়াছিলেন, এবং স্বামীজী একা একখানি হাউস বোটে থাকিতেন। তবে প্রথম প্রথম তিনি তাঁহার সহযাত্রিগণের সহিত নানা বিষয়ে আলাপ করিতেন, কখনও বা পরিব্রাজক জীবনের কাহিনী, আবার কখনও বা কাশ্মীরের ইতিহাস কনিষ্কের কাহিনী এবং অশোকের বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার প্রভৃতির বিবরণ ছিল এই আলোচনার বিষয়।

নদী দিয়া চলিতে চলিতে দুই তীরের অপূর্ব দৃশ্য দেখিতে দেখিতে তাঁহারা ২৫শে জুন শ্রীনগরে উপস্থিত হইলেন। কাশ্মীরে আসিবার তাঁহার একটি বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। গতবারে যখন তিনি কাশ্মীরে আসেন তখন কাশ্মীরে একটি মঠ ও একটি সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, এবার সেই জন্য জায়গা মনোনীত করিতে মহারাজা তাঁহাকে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। এই জমি মনোনীত করিবার জন্য একটি প্রস্তাব কাউন্সিলে উত্থাপিত করিবার কথা ছিল। স্বামীজী ঝিলাম নদীর তীরে একটি জায়গা মনোনীতও করিয়াছিলেন, কিন্তু কাশ্মীরের রেসিডেণ্ট অ্যাডালবার্ট ট্যাবট সেই প্রস্তাবটি কাউন্সিলে তুলিতেই দেন নাই।

৪ঠা জুলাই আমেরিকার "স্বাধীনতা দিবস"। স্বামীজীর সঙ্গে তাঁহার আমেরিকান শিষ্যা যাঁহারা ছিলেন তাঁহাদের জন্য সেই দিবস পালনের আয়োজন করিলেন। তাঁহার হাউস বোটটি ফুল ও পাতায় সাজানো হইল এবং আমেরিকার জাতীয় পতাকা উড্ডীন করা হইল। সেই নৌকায় তিনি তাঁর আমেরিকান শিষ্যাদের ভোজনের জন্য আমন্ত্রণ করিলেন। এই নৌকা সাজানোর ব্যাপারে নিবেদিতা স্বামীজীর সহযোগিতা করিয়াছিলেন, কিন্তু নিমন্ত্রিতা শিষ্যারা আগে কিছুই জানিতে পারেন নাই।

এই দিন স্বামীজী '৪ঠা জুলাইর প্রতি' শীর্ষক একটি নিজের রচিত ইংরেজী কবিতা সকলকে শুনাইয়াছিলেন। এই অতি সুন্দর কবিতাটি স্বর্গত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় বাংলায় অনুবাদ করিয়াছিলেন, সেই অনুবাদ হইতে শেষের অংশটি এখানে উদ্ধৃত করিতেছি,—

"প্রতি পদে দলি শতেক বন্ধ, পরাণ শঙ্কাহীন,
তবে তো পূর্ণ করিয়া চেষ্টা উদিল পূণ্য দিন।
সফল হইল সাধনা ও প্রেম—সার্থক বলিদান,
সকল বেদনা ধন্য করিয়া সিদ্ধি লভিল স্থান।
তারপর তুমি মণ্ডলালয় জাগিয়া উঠিলে ধীরে,
মুক্তি কিরণ বর্ষি হরষে বিশ্বমানব শিরে।
চল অবিরাম বাধাহীন পথে—
জগত করিতে তৃপ্ত,
গগন কেন্দ্রে হে দেব,
ছড়ায়ে মুক্তি কিরণ দীপ্ত।
প্রতি প্রদেশের প্রতি নরনারী উন্নত শির তুলি,
হেরুক আনন্দে বন্ধন-পাশ
নিঃশেষে গেছে খুলি।
প্রফুল্ল, নবীন জীবন লভিয়া
হউক সফল প্রাণ,
মুক্তির দিন। আজিকে সবারে
স্বাধীনতা কর দান।

স্বামীজী এই সময় প্রায়ই মাঝে মাঝে নির্জনে চলিয়া যাইতেন। এই নির্জনতা সম্বন্ধে স্বামীজী একদিন ভগিনী নিবেদিতাকে বলিয়াছিলেন, "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে চিন্তাপ্রণালীর পার্থক্য এই ঘটনা হইতেই সর্বাপেক্ষা স্পষ্টরূপে বুঝা যায় যে, ইউরোপীয়রা ভাবে যে, মানুষ কুড়ি বৎসর একাকী থাকিলে পাগল না হইয়া পারে না, আর ভারতীয় ধারণা এই যে, মানুষ কুড়ি বৎসর একাকী না থাকিলে তাহাকে প্রকৃতিস্থই বলা যায় না।"

কাশ্মীরের এই দিন যাপনের ভিতর কত যে আনন্দ ও গভীর অনুভূতি-বিজড়িত থাকিত, স্বামীজীর প্রত্যেকটি আচরণ, প্রত্যেকটি কথার মধ্যে কত যে নিগূঢ় ভাব নিহিত থাকিত, নিবেদিতা যেভাবে তাহা অনুভব করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার রচনায় যেন আঁকিয়া রাখিয়া গিয়াছেন এবং এই ছবিটি জগতের জন্য দান করিয়া গিয়াছেন। যুগে যুগে মানবমন এই ছবির অনুভূতি-

সমূহের গভীর স্তরে অবগাহন করিয়া নূতন নূতন ভাবরত্ন আহরণ করিবে।

তাঁহার দুটি একটি কথা, যেমন—"তোমরা জান আমাদের মধ্যে একটা মত আছে ঈশ্বর শুধু খেলার জন্য আপনাকে জগতরূপে বিকাশ করেছেন বলে কল্পনা করা হয়। অবতারাদি শুধু লীলার জন্যই এখানে এসে বাস করে থাকেন। খেলা—সব খেলা। যীশু ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন কেন?—শুধু লীলা। জীবন সম্বন্ধেও তাই। ভগবানের সঙ্গে শুধু খেলা করে যাও,—বল এসব লীলা, লীলা। তুমি কিছু করেছ কি?' তারপরেই আর একটি কথাও না বলিয়া তিনি উঠিয়া নক্ষত্রালোকে বাহির হইয়া পড়িলেন এবং নিজের নৌকায় চলিয়া গেলেন। আমরাও গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে পরস্পরের নিকট রাত্রির মত বিদায় লইলাম।

আর একবার স্বামীজী জগতের হিতপ্রয়াসী কোন ব্যক্তির উক্তির উত্তরে তীব্রভাবে বলিয়াছিলেন,—"কোন বাহ্য-বস্তুই ভাল হয় না,—তারা কেবল যেমন আছে তেমনি থাকে। তাদের ভাল করতে গিয়ে আমরাই ভাল হয়ে যাই।"

নিবেদিতা বলিয়াছেন, "তাঁর এই শেষ কথাটি আমার নিকট বেদের মতই সারবান বলে মনে হয়—'তাদের ভাল করতে গিয়ে আমরাই ভাল হয়ে যাই।"

নিবেদিতা লিখেছেন—"আমার মনে আছে, আমাদের আলমোড়ায় থাকার সময়ে একজন প্রৌঢ়বয়স্ক নিরীহ প্রকৃতির লোক স্বামীজীর কাছে এসে একটি প্রশ্ন করেছিল। প্রশ্নটি এই,—যদি কেহ বলবানকে দুর্বলের উপর অত্যাচার করিতে দেখে, তখন তাহার কি করা উচিত? স্বামীজী এই প্রশ্ন শুনে বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে বলেছিলেন, —কেন, বলবানকে উত্তম-মধ্যম প্রহার দেওয়া—এর আর কথা কি আছে? এই কর্মের বিষয়ে তুমি তোমার নিজের কর্তব্যটুকু ভুলে যাচ্ছ,—অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার অধিকার যে তোমার চিরকালই আছে।"

স্বামীজী অমরনাথ যাত্রার জন্য একাই সোনামার্গের পথে চলিয়া গিয়াছিলেন। তখন জুলাই মাস, নানা স্থান হইতে যাত্রীরা ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীরা অমরনাথ দর্শনের জন্য আসিতেছেন। সেই সময় বরফ পড়ায় সোনামার্গের পথ একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে দেখিয়া স্বামীজীকে আবার ফিরিয়া শ্রীনগরে আসিতে হইল।

১৫ই জুলাই স্বামীজী শ্রীনগরে ফিরিয়া আসিয়া ইসলামাবাদের প্রাচীন দেবমন্দিরগুলি এবং ধ্বংসাবশেষগুলি দেখিয়া কয়েকদিন কাটাইলেন। এইভাবে ১৮ই জুলাই পর্যন্ত কাটিয়া গেল।

নিবেদিতা লিখিয়াছেন—"আচ্ছাবলের মোগলবাগে একদিন আমরা বাহিরে ভোজনে বসিয়াছি, এমন সময়ে স্বামীজী প্রকাশ করিলেন যে, তিনি যাত্রীদিগের সঙ্গে অমরনাথ যাইবেন এবং তাঁহার কন্যাকেও (অর্থাৎ নিবেদিতাকেও) সঙ্গে লইয়া যাইবেন। সকলেই এই সংবাদে এত আহ্লাদিত হইলেন এবং ঐ শিষ্যার সৌভাগ্যে এত আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন যে, তাঁহার অমরনাথ যাত্রায় কেহ কোন আপত্তিই উত্থাপন করি না।"

অমরনাথ যাত্রার জন্য আ আরম্ভ হইল। নিবেদিতা লিখিয়া "সেই কয় সপ্তাহ কাশ্মীর তীর্থযা পূর্ণ বলিয়া মনে হইতেছিল। * সকল স্থানেই দেখিলাম নূতন যাত্রীর দল চলিতেছে। সমস্তই নিস্তব্ধ, সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে নি হইতেছে। দুই তিন সহস্র লোক মাঠে ছাউনী ফেলিয়া আবার সূর্যো পূর্বেই উহা ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে উনানের ছাই ছাড়া তাহাদের সেই রাত্রিবাসের কোন চিহ্নই দেখা যাই না। সঙ্গে সঙ্গে বাজারও চলি প্রত্যেক স্থানে যেখানে যাত্রীরা করিবে, সেখানে তাঁবু খাটানোর এবং দোকান-বাজার সাজানোর অসম্ভব ক্ষিপ্রতার সহিত সম্প হইতেছে।"

ইসলামাবাদ হইতে তাঁবু ভাড়া করিবার পর যাত্রীদলের স্বামীজী ও নিবেদিতা পায়ে চলিলেন। সাধুদের তাঁবুগুলি রঙের, কোন তাঁবু আবার আকারের। সাধুর দলে সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী ছিলেন, এমন নাগা সন্ন্যাসীও ছিলেন। বিশ্রাম তাঁবু ফেলিবার পর স্বামীজীর তাঁ দলে দলে সাধুর আগমন হইত স্বামীজীকে বেষ্টন করিয়া বসিতেন যতক্ষণ দিনের আলো থাকিত, এই আলোচনা-সভা ভঙ্গ হইত না।

স্বামীজীর সহিত তাঁহাদের সময় মতের মিল হইত তাহা স্বামীজী দেশের দুঃখ-দুর্দশা প্র জন্য সাধুদের অগ্রসর হওয়া উচিত বলিলে তাঁহারা হয়তো উচ্চৈঃস্বরে শিব" ধ্বনি করিয়া উঠিতেন। আবার দেশ-বিদেশ কি? এই বাহিরের বিষয় নিয়া চিন্তা করা মোটেই উচিত নয়।"—বিদেশী ইংরেজ ও অন্যান্য ইউরোপীয় বুঝায়, তাঁহারা এই 'বিদেশী' সম্বন্ধে বার বার "বিদেশী ও এই কথা যদিও বলিতেছিলেন, মুসলমানদের সম্বন্ধে তাঁহাদের
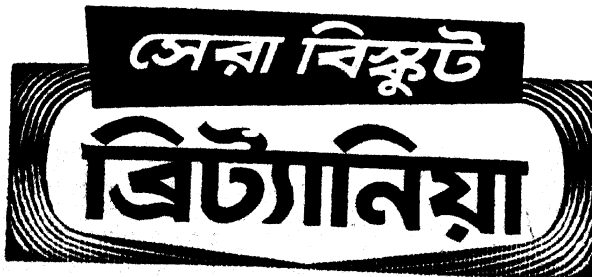
সেই ভাবটি দেখা যাইতেছিল না। তাঁহারা এই মুসলমানগণ কিভাবে হিন্দুদের উপর অত্যাচার করিয়াছে, সেই সমস্ত কাহিনীর উল্লেখ করিয়া উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছিলেন। "এই পঞ্চনদের ভূমি—যাঁহারা ধর্মের জন্য প্রাণ বিসর্জন করিয়াছেন, এমন বহু লোকের শোণিতে প্লাবিত হইয়াছে"—অতএব এক্ষেত্রে স্বামীজী যেন হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের একত্ব সম্বন্ধে ততটা উদার-ভাবে আচরণ না করেন—অর্থাৎ আচার আচরণের মধ্যে যেন পার্থক্য রাখিয়া চলেন, ইহাই তাঁহাদের অনুরোধ।

এইসব কথায় বেশ বুঝা যায়, সেই সব সাধুরা স্বামীজীর ব্যক্তিত্বকে বিশেষ-ভাবেই সম্মান দিয়াছিলেন; স্বামীজীর অভিমতের মূল্য সম্বন্ধে তাঁহাদের মনে সংশয় ছিল না।

নিবেদিতা লিখিয়াছেন, "স্বামীজী যখন সাধুদের সহিত তাঁহার এই তীব্র বাদ-প্রতিবাদের বর্ণনা করিতেছিলেন, তখন পাশ্চাত্যবাসী আমরা একটি মস্ত অসঙ্গতি দেখিয়া হাস্য সংবরণ করিতে পারি নাই যে, তহশীলদার স্বয়ং এবং এই যাত্রা-সংক্রান্ত বহু কর্মচারী ও ভৃত্য মুসলমান ছিলেন, আর ইঁহারা অবশেষে উক্ত তীর্থে (অর্থাৎ অমরনাথে) উপস্থিত হইলে ইঁহাদের গুহাপ্রবেশে যে কোন আপত্তি হইতে পারে, একথা কাহারও মনে স্বপ্নেও উদিত হয় নাই। আবার তহশীলদারজী ও তাঁহার কয়েকজন বন্ধু ...রে স্বামীজীর নিকট যথাবিধি শিষ্যত্ব গ্রহণের জন্য আগমন করিয়াছিলেন, এই ব্যাপারও কাহারও কিছু বিসদৃশ বা বিস্ময়কর ঠেকিয়াছিল বলিয়া বোধ হইল না।"

কাশ্মীরে হিন্দু ও মুসলমান যে ... রকম ঘনিষ্ঠভাবে বাস করিত, এই ...াগুলি হইতে তাহা বুঝা যায়। ...না যায়, একবার মহারাজা রামসিংহ ...হার সমস্ত প্রজাকেই হিন্দুধর্মে ...নয়ন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন ...ং মুসলমান প্রজারাও তাহাতে আপত্তি ... নাই, কিন্তু আপত্তি উঠিয়াছিল ...ীর যে সব শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত তাহাদের ...দুধর্মে দীক্ষিত করিবেন, তাঁহাদের ... হইতে। তাঁহারা কিছুতেই মুসলমানকে হিন্দুধর্মে দীক্ষিত করিতে রাজী হন নাই।

ইসলামাবাদ হইতে তীর্থযাত্রী দল বাওয়ান নামক স্থানে আসিয়া পৌঁছিলেন। ইসলামাবাদে নিবেদিতার তাঁবুটি যেখানে খাটানো হইয়াছিল, সেখানে একজন বিদেশিনী মহিলার তাঁবু খাটানো উচিত নয় বলিয়া সাধুরা বিষম আপত্তি তুলিয়াছিলেন, কিন্তু স্বামীজী কিছুতেই সেখান হইতে তাঁবু সরাইতে রাজী হন নাই। অবশেষে একজন নাগা সন্ন্যাসী আসিয়া তাঁহাকে যখন বলিলেন, "স্বামীজী আপনার অসাধারণ শক্তি আছে ইহা মানি, কিন্তু তাহা প্রকাশ করা উচিত নয়।" স্বামীজী তখনই তাঁবুগুলি সরাইয়া নিয়া যাইবার আদেশ দিলেন। আশ্চর্যের বিষয়, পরদিনই সন্ন্যাসীগণের আর একেবারেই সে ভাব রহিল না, তাঁহারা নিজেই উদ্‌যোগী হইয়া স্বামীজী ও নিবেদিতার তাঁবু তাঁহাদের কাছাকাছি খাটাইতে বলিলেন এবং সন্ধ্যার পর সকলে আসিয়া ধুনির চারিপাশে বসিয়া তাঁহার সহিত ধর্ম-আলোচনায় যোগ দিলেন।

স্বামীজী বাহিরের আচার অনুষ্ঠানের পক্ষপাতী ছিলেন না, কিন্তু এ-সময় তিনি সমস্ত নিয়মই পালন করিতে লাগিলেন। বাওয়ানে অনেকগুলি পার্বত্য নির্ঝর আছে, তাহার মধ্যে পাঁচটির স্রোত অতি পবিত্র বলিয়া তীর্থ-যাত্রীদের ধারণা। প্রত্যেকটি নির্ঝর ছোট ছোট নদীতে পরিণত হইয়াছে। যাত্রীরা একটিতে স্নান করিয়া আবার সেই ভিজা কাপড়েই অন্যটিতে স্নান করিতে যায়, এইভাবে পাঁচটি প্রবাহেই স্বামীজীও ভিজা কাপড়ে হাঁটিয়া গিয়া স্নান করিলেন।

পহেলগামে একাদশীর দিন একাদশী পালন ও বিশ্রাম। এখানেই মনুষ্য-বসতি শেষ হইল। এত শীত যে, ছোট ছোট নদীগুলি জমিয়া গিয়াছে। ইহার পর চড়াই ও উৎরাইয়ের পথ আরম্ভ হইল। তিন হাজার যাত্রী শ্রেণীবদ্ধ হইয়া এই পাকদণ্ডির পথ ধরিয়া চলিয়াছেন।

অবশেষে অমরনাথের গুহার সম্মুখে সকলে উপস্থিত হইলেন। যাত্রীগণের উল্লাস ধ্বনি "অমরনাথ জীউ কি জয়" গগন বিদীর্ণ করিল।

স্বামীজী যখন গুহায় প্রবেশ করিলেন তখন তাঁহার যেন বাহ্যজ্ঞান একেবারেই ছিল না। স্বামীজী পরে বলিয়াছেন তাঁহার যেন বোধ হইয়াছিল মহাদেব সশরীরে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি একবার ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন, তাহার পর দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেলেন, যেন

ভাবাবেশে তিনি আর স্থির থাকিতে পারিতেছেন না।

অতি শৈশবে তাঁহার জননী যখন দুরন্ত শিশুকে কোনমতেই শান্ত করিতে পারিতেন না তখন 'শিব', 'শিব' উচ্চারণ করিতেন সেই মুহূর্তেই অতি চঞ্চল অশান্ত শিশু শান্ত হইয়া যাইত। সেই সময় হইতে তাঁহার মনে একটা অস্পষ্ট ধারণা ছিল যে, কোন গিরিগহ্বরে শিব-মন্দিরে তাঁহার মৃত্যু হইবে। —স্বামীজী অমরনাথে মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়াছিলেন তাঁহার হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছিল এবং রক্তের চাপ এত বাড়িয়া গিয়াছিল যে বাঁ চোখে রক্ত জমিয়া গিয়াছিল। পরে একজন ডাক্তার তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছিলেন যে তাঁহার হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইবার উপক্রম হইলে হার্ট ডাইলেটেড (হৃৎ-পিণ্ডের বৃদ্ধি) হইয়া তখনকার মত তিনি রক্ষা পাইয়াছিলেন, কিন্তু হৃৎপিণ্ডের বৃদ্ধি রহিয়াই গেল।

অমরনাথ দর্শনের পর স্বামীজী যেন ভাবমগ্ন হইয়া রহিলেন। গুহা হইতে বাহিরে আসিয়াই দেখিতে পাইলেন আকাশে উড়িয়া চলিয়াছে শ্বেত পারাবত শ্রেণী। এইটি একটি শুভদর্শন। নিবেদিতাও গুহার মধ্যে গিয়া অমরনাথ দর্শন করিলেন। এই অমরনাথ দর্শনে কাহারও কোন বাধা নাই। অমরনাথের ইহাই বিশেষত্ব।

—ইহার ঘণ্টাখানেক পরে নদীর ধারে একটি পাথরের উপর বসিয়া একজন নাগা সন্ন্যাসী, ভগিনী নিবেদিতা ও তিনি জলযোগ করিতে বসিলেন। এখানে কোন পাণ্ডার জুলুম নাই, যাত্রীগণ নিজের ইচ্ছামত ধর্মাচরণ করিতেছে।

স্বামীজী নিবেদিতাকে বলিলেন, "দেবাদিদেব মহাদেব আমাকে আজ ইচ্ছা-মৃত্যু বর দিয়াছেন।"

তিনি নিবেদিতাকে আরও বলিয়া-ছিলেন, "আমি কল্পনা করিতে পারি কিভাবে এই গুহাটি প্রথম আবিষ্কৃত হ'ল। গ্রীষ্মকালে একদিন একদল মেষ-পালক ছেলে তাদের ভেড়ার খোঁজে এদিকে এসে পড়েছিল। এসে তারা এই গুহা আর গুহার মধ্যে ধবল তুষার লিঙ্গ দেখতে পেয়েছিল। তারা ফিরে বন্ধুদের কাছে গিয়ে বলেছিল যে, এই গুহায় তারা মহাদেবের দর্শনলাভ করেছে। সেই অবধি অমরনাথ লোক-সমাজে প্রকাশিত হইলেন।"

অমরনাথ দর্শন করিয়া ফিরিয়াও স্বামীজীর তন্ময়তা সমভাবেই রহিল। দর্শনলাভের পূর্বে এতদিন যেন যাত্রী-গণ সকলেই শিবধ্যানে মগ্ন ছিলেন। নিবেদিতা বলিয়াছেন, "প্রতিপদক্ষেপে আমাদের মনে হইতেছিল যেন আমরা সেই চিরতুষারমণ্ডিত মহান্ পর্বতমালার নিকটস্থ হইতেছি, যাহা একাধারে তাঁহার প্রতিরূপ ও আবাসভূমি। সায়াহ্নে যখন তুষারময় গিরিসংকটের ও দোদুল্যমান সরল গাছগুলির উপর দিয়া বালশশী নয়নপথে পতিত হইত, তখন মাহাদেবের কথাই স্মরণপথে উদিত হইত।"

কিন্তু এখন স্বামীজী যেভাবে অন-বরত রামপ্রসাদের গান গাহিতে আরম্ভ করিলেন এবং যেভাবে কালীর কথাই সর্বদাই সকল প্রসঙ্গে উল্লেখ করিতে লাগিলেন তাহাতে তাঁহার সঙ্গীগণের মনে হইল শিবদর্শন করিয়া আসিয়া এখন তিনি শিবের শক্তি স্বরূপা যিনি তাঁহাকেই মনোনেত্রে দর্শন করিতেছেন। স্বামীজী সে-সময় একবার কথার মধ্যে এব বলিয়াছিলেন যে, জগজ্জননী প্রত্যক্ষরূপে এই ঘরের মধ্যেই রহিয় তাহাই তিনি অনুভব করিতেছেন।

স্বামীজীর 'কালী দি মাদার' (ম রূপা মাতা) নামক কবিতাটি এই সম লিখিত হয়। নিবেদিতা লিখিয়া "আমরা একটি স্থান দর্শন করিয়া ব ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম তাঁহার লেখা "কালী দি মাদার" শ কবিতাটি আমাদের জন্য রহিয়াছে। সে-দিন তথায় আসিয়া কবিতাটি রা গিয়াছেন। আমরা পরে শুনিলাম, ভাবের আবেশে লিখিতে লিখিতে শেষ হইবামাত্র তিনি আবেশের তী ক্লান্ত হইয়া মেঝের উপর পড়িয়া ছিলেন।"

কিন্তু এই সময় স্বামীজীর কিছুদিন আর কাহারও দেখা হইল তিনি তাঁহার নৌকা-সঙ্গীগণের হইতে অনেক দূরে নিজেকে সর লইয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার কাছে কাহ যাইবার অনুমতি ছিল না। কেবল এ ডাক্তার তাঁহার কাছে প্রত্যহ যাই এবং তাঁহার কি কি জিনিস দরকার জানিয়া আসিতেন। ডাক্তারটি ধর্মাবলম্বী, কিন্তু স্বামীজীকে অত্যন্ত ভক্তি করিতেন। ডাক্তারটির স্বামীজীর সংবাদ পাওয়া যাইত।

"মৃত্যুরূপা মাতা" কবিতাটি ২ সেপ্টেম্বর লিখিত হয়। ২৯শে সেপ্ট সন্ধ্যায় ডাক্তারবাবু স্বামীজীর ব গিয়া দেখিলেন তিনি ধ্যানমগ্ন আছেন, তাই তাঁহাকে কোন প্রশ্ন করিয়াই ফিরিয়া আসিলেন। তারিখে স্বামীজীর বজরায় গিয়া ডা বাবু বজরার লোকেদের কাছে শুনি স্বামীজী 'ক্ষীরভবানী' চলিয়া গিয় এবং বলিয়া গিয়াছেন কেহ যেন সে তাঁহার কাছে না যায়।

ক্ষীরভবানী একটি পবিত্র কাশ্মীরের এটি একটি বিখ্যাত ত ৩০শে সেপ্টেম্বর হইতে ৬ই অ পর্যন্ত স্বামীজী ক্ষীরভবানী হ ফিরিয়া আসিলেন না। যেদিন ফি সেদিন বৈকালে তিনি যখন নে করিয়া তাঁহার শিষ্যগণের বজরার

শারদীয়া সংখ্যা সংবাদ

শারদীয়া রূপাঞ্জলির মুদ্রণকার্য এখন দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। যে প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের সঙ্গে রূপাঞ্জলির সম্পাদকমণ্ডলী কার্য সাধন করছেন তা পূর্ব পূর্ব বৎসর অপেক্ষাও বিশেষ আশাপ্রদ। সাধারণভাবে লেখা গ্রহণের শেষ তারিখ ধার্য ছিল বিগত ২৫শে জুলাই। তার পরদিবস থেকেই রচনাদি পাঠ করে মনোনয়ন পর্বের কাজে লেগে যান সম্পাদকীয় বিভাগের সহকারিবৃন্দ। তাঁদের মনোনয়নের পর লেখাগুলি যায় প্রধান সম্পাদকের দপ্তরে। তিনিও অতি দ্রুত তাঁর মনোনয়ন সেরেছেন। তারপরই অংকনদের সহায়তা গ্রহণ করা হয় শীর্ষক অলঙ্করণের প্রয়োজনে। ভারতের নানা স্থান থেকে আসতে থাকে বিশিষ্ট এ্যামেচার ফটোগ্রাফারদের ছবি। এদিকে রূপাঞ্জলির বোম্বাই ও কলকাতার আলোকচিত্র গ্রাহকরা তৎপর হয়ে চিত্ররাজ্য সংশ্লিষ্টদের ছবিগুলি তোলা শেষ করে ফেলেন! সংগে সংগে সেগুলোরও মনোনয়নকার্য চলতে থাকে। তারপর সে সব পাঠান হয় ব্লকপ্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানকে। সেখান থেকে বাণ্ডিল বাণ্ডিল ব্লক চলে আসতে আরম্ভ করেছে আগস্ট মাসের ৭ তারিখ থেকে। ইতিমধ্যে শারদীয় রূপাঞ্জলি মুদ্রণের কাজ এক-চতুর্থাংশ শেষ হয়েও গিয়েছে। এভাবে সকল বিভাগীয় কাজ এগিয়ে গেলে শারদীয়া রূপাঞ্জলি যে অন্যান্যবারের মতই যথানির্দিষ্ট সময়ে পাঠক-পাঠিকাদের হস্তচুম্বন করতে পারবে, তা বলাই বাহুল্য।

অনেকগুলি ছোটগল্প ও চিত্র-মঞ্চ-সংগীতবিষয়ক লেখাগুলি ছাড়া যে লেখাটি আয়তনে সবচেয়ে বড় হবে তা' হ'ল শ্রীযুধাজিৎ কৃত উপন্যাস **রাগ বিরাগ**। অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন গতবারও এই লেখকেরই উপন্যাস ছাপা হয়েছে, এ বছরও আবার তাঁরই লেখা নেওয়া হ'ল কেন? এর উত্তরে বলব যে, শ্রীযুধাজিৎ গত বৎসরে তাঁর প্রথম সার্থক রচনা সর্বশ্রেষ্ঠ শারদীয় উপন্যাস **'অনুরাধা'** দিয়ে বাংলার পাঠকমন সম্পূর্ণভাবে বশীভূত করতে পেরেছিলেন বলেই তাঁরই লেখা আবার নেওয়া হ'ল পাঠক-পাঠিকাদের পরিতৃপ্তির জন্যই। গত বৎসর **'অনুরাধা'**কে অভিনন্দন জানিয়ে যে শত শত পত্র পাওয়া গিয়েছিল, তার কয়েকটি পত্রের চুম্বক এখানে প্রকাশ করা হচ্ছে।

শ্রীমতী পারুল সেনগুপ্তা, বি এ, সাহিত্যভারতী, ১১, বৈষ্ণবঘাট লেন, কলিঃ—৩২ : বলেছেন—'অনুরাধা' মনস্তাত্ত্বিক দিক হইতে সার্থক উপন্যাস। উৎপলেন্দুর ন্যায় আদর্শ স্বামী যেদিন বাংলার ঘরে ঘরে জন্মাইবে, সেদিন বাংলার নারীর দুঃখ দূর হইয়া যাইবে।

শ্রীপ্রফুল্ল গাংগুলী, গরিফা, ২৪ পরগণা : বলেছেন—'অনুরাধা'র আবির্ভাব থেকে তিরোভাব অদ্ভুত এক মায়ায়, এক মিষ্টি ছোঁয়ায় লেখক ঘিরে রেখেছেন। সে যেন আমাদের মনের মাঝে লুকিয়ে রাখা বুকের সবটুকু প্রীতি দিয়ে গড়ে তোলা এক অনেক দিনের হারিয়ে যাওয়া মেয়ে—সে এসেছে কিছুক্ষণ—থাকলোও কিছুক্ষণ—কিন্তু জেগে থাকবে চিরকাল। শুধু যাবার বেলায় আমাদের এক ফোঁটা অশ্রু ঝরিয়ে দিয়ে গেল—মন-মর্মরে তুলে দিয়ে গেল অতলান্ত ব্যথার আকুতি। লেখক সার্থক এইখানে।

শ্রীঅরুণবিকাশ সাহা, মির্জাবাজার, মেদিনীপুর : বলেন—এবারের শারদীয়া সংখ্যার সম্ভার প্রথমেই যা পড়লাম, তা' হ'ল শ্রীযুধাজিৎ কৃত 'অনুরাধা'। চমৎকার লাগলো। পড়তে পড়তে চোখের জলকে ঠেকানো যায় না।

শ্রীপ্রণবেশ রায়, ২৬|১, বলরাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিঃ—৪ : বলেন—পূজাসংখ্যা রূপাঞ্জলিতে প্রকাশিত 'অনুরাধা' উপন্যাসখানা সুরু করার কিছু পূর্বে উদ্দেশ্য ছিল, ছুটির অলস মধ্যাহ্ন; সুগভীর দিবানিদ্রার মাধ্যমে অতিবাহিত করা। ভেবেছিলাম কয়েকখানা পাতা পড়ার পর দু'চোখ আসবে ঘুমে ভরে; চলে যাব ধীরে ধীরে স্বপ্নরাজ্যে। কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর এক। নিদ্রার আরাধনায় সাফল্যলাভ করার উদ্দেশ্যে যে উপন্যাসখানা পড়তে সুরু করেছিলাম, তা' শেষ না হওয়া পর্যন্ত আর ছাড়তে পারা গেল না। 'অনুরাধা'র কল্পিত জীবননাট্য পড়া শেষ হোল, কিন্তু মনের পরে রয়ে গেল সুস্পষ্ট সুগভীর ছাপ।

শ্রীকমলেশ মুখোপাধ্যায়, গোবরডাংগা, ২৪ পরগণা : বলেন—পরিশেষে বলিব যে, লেখকের লেখনী ও কল্পনাশক্তি অপূর্ব, যাহাতে সর্বদা পাঠকের মনে কৌতূহল সৃষ্টি করিয়া রচনাকে চিত্তাকর্ষক করিয়া তুলিয়াছেন। তিনি যে অপূর্ব এবং অভিনবভাবে উপন্যাসখানি লিখিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, তিনি যেন কলম লইয়া বসিয়াছেন এবং সপূর্ণ শেষ করিয়া উঠিয়াছেন। ভাষার লালিত্য ও সজীবতা অনন্য। অদ্ভুত চিত্তাকর্ষক ইহার ঘটনাবলী এবং অপূর্ব তাঁহার বর্ণনাশক্তি সত্যই আমাদের মুগ্ধ ও বিস্মিত করিয়াছে।

অমলেন্দু মিত্র এম, এ, লাইব্রেরিয়ান, রতন লাইব্রেরী, সিউড়ি, বীরভূম। বলেন—'অনুরাধা'র মধ্যে শ্রীযুধাজিৎ যে সামাজিক গঠনের ইঙ্গিত দিয়েছেন, তা আজকের দিনে এই পঙ্গু সমাজের পক্ষে প্রয়োজনীয়।...'অনুরাধা'র প্রকৃত আর্টের দেখা পাই কুণাল'-এর আগমনের পর। সহজ, সরল, আন্তরিকতায় ভরপুর অনুরাধায় চরিত্রের ক্রমপরিণতি, ভয়বিহ্বলতা, উচ্চকিত ভাব সবই অপূর্ব হয়ে উঠেছে। শেষ পর্যন্ত 'অনুরাধা'র যে শোচনীয় পরিণতি লেখক অংকন করেছেন তাও অসাধারণ শিল্পসৌকর্য লাভ করেছে। ...শ্রীযুধাজিৎকে অভিনন্দিত করব এইজন্য যে নব-দলে বলিষ্ঠ লেখনীহস্তে সামাজিক চেতনামূলক গ্রন্থ রচনায় তাঁর চরমতম সিদ্ধি হোক, সমাজ তাঁর কার্য হতে নূতন শিক্ষা গ্রহণ করে ধন্য হোক।

শারদীয়া রূপাঞ্জলিতে জনগণ অভিনন্দিত শ্রীযুধাজিতের নবতম উপন্যাস **রাগ-বিরাগ** স্থান পাবে।

আসিলেন তখন তাঁহাকে দেখিয়া নিবেদিতার মনে হইয়াছিল তাঁহার আকৃতি যেন একেবারেই অন্যরকম হইয়া গিয়াছে। তাঁহার হাতে একগাছি গাঁদা ফুলের মালা ছিল, সেই প্রসাদী মালাটি একে একে সকলের মাথায় স্পর্শ করাইলেন, তাহার পর মালাটি একজনের হাতে দিয়া বলিলেন, "আমি এই মালাছড়াটি মাকে নিবেদন করিয়াছিলাম।" আর তারপর বলিলেন, "হরি ওঁ নয়, এবার মা, মা!"

এই সাতদিন ক্ষীরভবানীতে স্বামীজী কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রত্যক্ষ দর্শন হইয়াছিল। পরে কয়েকদিন তিনি লোকসঙ্গ পরিহার করিয়া রহিলেন এবং তাহার পর নাপিত ডাকাইয়া মুণ্ডিত মস্তক হইলেন। এই মুণ্ডিত মস্তক গৈরিকধারী যেন নূতন-রূপে আবির্ভূত হইলেন। যেন একটি মায়ের একান্ত নির্ভরপরায়ণ শিশু। যেন তাঁহার প্রবল কর্মচেষ্টার একেবারেই অবসান হইয়াছে।

১১ই অক্টোবর কাশ্মীর হইতে বার-মুল্লা ফিরিবার দিন। সকলে একসঙ্গেই ফিরিলেন, কিন্তু স্বামীজী এ-সময় প্রায় মৌনী হইয়াই থাকিতেন। স্বামীজী পরদিন লাহোর হইতে চলিয়া যাইবেন, আর সকলে কিছুদিন লাহোরেই থাকিবেন এইরকম কথা হইয়াছিল। নিবেদিতার তখন মনে হইয়াছিল, "কে জানে কতদিন পরে আবার তাঁহাদের দেখা হইবে।" যে স্বামীজী তাঁহাদের কাছ হইতে তখনই বহুদূরে চলিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু ১২ই অক্টোবর বুধবার, সেদিন স্বামীজী তাঁহাদের বজরায় আসিয়া অনেকক্ষণ রহিলেন এবং কথা-বার্তা বলিলেন, নিবেদিতা বলিয়াছেন, "সেই সব কথাবার্তার বর্ণনা দেওয়ার চেয়ে কথার প্রভাব আমাদের মনে কিভাবে ক্রিয়া করিয়াছিল সেই কথাই বলা সহজ। কথা শুনিতে শুনিতে সে সময় আমরা যেন এক অন্তরতম পবিত্র রাজ্যে প্রবেশ করিলাম।"

এই সময় তিনি জগজ্জননীর কথাই বলিতেছিলেন। তিনি যেন সেই বিশ্ব-জননীর আদরের সন্তান, মা তাঁহাকে কোলে করিয়া আদর করিতেছেন—সে আদর হয়ত দুঃসহ যন্ত্রণারূপেই প্রকাশ পায়, কিন্তু তবুও সন্তান বুঝিতে পারে এ তাহার মায়েরই স্নেহের দান। তিনি বলিয়াছিলেন, "তীব্র যন্ত্রণার মধ্যেও পরম আনন্দ থাকিতে পারে।"

তিনি অনেকক্ষণ ধরিয়া "শ্যামা মা উড়াচ্ছ ঘুড়ি (ভবসংসার বাজার মাঝে)... ঘুড়ি লক্ষের দুটো-একটা কাটে, তখন হেসে দাও মা হাত চাপাড়ি—" এই গানটি বারবার গাহিয়াছিলেন।

আবার তিনি নিজের কবিতা থেকে আবৃত্তি করলেন,—

"দুঃখরাশি জগতে ছড়ায়,
নাচে তারা উন্মাদ তাণ্ডবে;
মৃত্যুরূপা মা আমার আর!
করালি, করাল তোর নাম
মৃত্যু তোর নিশ্বাসে প্রশ্বাসে।
তোর ভীম চরণ প্রক্ষেপে
প্রতিপদে ব্রহ্মাণ্ড বিনাসে।

আবৃত্তি করিতে করিতে মাঝখানে থামিয়া বলিলেন, "দেখেছিলাম, তা সব সত্য,—বর্ণে বর্ণে সত্য!"

সাহসে যে দুঃখ দৈন্য চায়,
মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে,
কালনৃত্য করে উপভোগ,
মাতৃরূপা তারি কাছে আসে।

"মা সত্যসত্যই তার কাছে আসেন, আমি নিজের জীবনে প্রত্যক্ষ করেছি। কারণ আমি মৃত্যুকে সাক্ষাৎভাবে আলিঙ্গন করেছি।"

তিনি তাঁহার নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও বলিলেন, *"আমার আর কোন কামনা নাই। আমি শুধু গঙ্গাতীরে মৌনী কৌপীনমাত্রধারী পরিব্রাজকের জীবন যাপন করতে চাই। আমার কিছুরই প্রয়োজন নাই। 'স্বামীজী' চিরদিনের জন্য মরেছে।* আমি কে যে জগৎকে শিক্ষা দিবার ভার যেন আমারই বলে মনে করছি? এ তো কেবল আস্ফালন ও বৃথা অহঙ্কার। জগন্মাতার আমাকে প্রয়োজন নাই, আমারই জগন্মাতাকে প্রয়োজন আছে।"

"প্রেমই একমাত্র পথ। যদি আমাদের প্রতি লোকে দুর্ব্যবহার করে, তা হলেও আমাদের তাদের ভালবেসেই যেতে হবে। এইরকম করতে করতে শেষে তারা এই ভালবাসার বশ না হয়ে থাকতে পারবে না। এই আর কি?"

ক্ষীরভবানীতে স্বামীজীর যে দিব্য-দর্শন হয়, তাহার পর হইতেই স্বামীজীর মন অবিরত এইভাবেই বিভাবিত রহিয়াছিল। এবং কাশ্মীর ত্যাগ সময় পর্যন্ত তাঁহার মনে এই পূর্ণরূপে বর্তমান ছিল।

স্বামীজী চলিয়া গেলেন। মাঝি, বন্ধু, শিষ্য, পিতামাতা ও [illegible] সন্তান (অর্থাৎ মাঝি ও তাঁহার এবং কন্যা প্রভৃতি) সকলেই তাঁহার সঙ্গে বড় রাস্তার উপর টাঙ্গা কাছ পর্যন্ত চলিল। সর্দার মাঝি বৎসরের একটি ছোট মেয়ে এক [illegible] ফল মাথায় লইয়া ছোট ছোট পা [illegible] তাঁহার পাশে পাশে হাঁটিয়া [illegible] গাড়ির কাছে পৌঁছিয়া সকলেই কাছে বিদায় লইল। তাঁহার গাড়ি দিয়া চলিয়া গেল। সকলেই গাড়িখানি দেখা যায় সেইদিকে রহিল।

"কুমারী পূজা" বেলুড় মঠের বিশেষভাবে পূজার অঙ্গ। স্বা[illegible] ক্ষীরভবানী কুণ্ডের নিকট যে স[illegible] তপস্যারত ছিলেন সে সাতদিন সেখানকার এক পণ্ডিত ব্রাহ্মণের কন্যাকে ভগবতী কুমারী উমার প্র[illegible] রূপে পূজা করিতেন। একটি [illegible] আশ্চর্য ব্যাপার এই যে পূজার শিশু কুমারিটিও যেন দেবীর [illegible] লাভ করে। *কেহ কেহ বলেন স্বাম[illegible] নৌকার মুসলমান মাঝির চার বৎ[illegible] মেয়েকে কুমারী উমারূপে শা[illegible] পদ্ধতিতে পূজা করিয়াছিলেন।*

১৮ই অক্টোবর তারিখে স্বামী[illegible] তাঁহার শিষ্য সদানন্দকে সঙ্গে লই[illegible] বেলুড় মঠে ফিরিয়া আসিলেন। এইভা[illegible] স্বামীজীর দ্বিতীয়বার কাশ্মীর ভ্র[illegible] শেষ হইল।

---

* গতবারের পরিত্যক্ত ফুটনোট ×ঃ স্বামীজীর যে কোন মতের স্বধর্মনি[illegible] শ্রদ্ধাবান ভক্তের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল তিনি কাশ্মীরের এক মুসলমান মহিল[illegible] উক্তি "খোদার কৃপায় আমি মুসলমানী [illegible] কথাটিতে বিশেষভাবে অভিভূত হইয়াছিলেন কিন্তু যাহারা অভাব অনটন অথবা এইরূ[illegible] নানা কারণে স্বধর্মত্যাগ করিয়াছে [illegible] করিতে বাধ্য হইয়াছে তাহারা আবা[illegible] স্বধর্মাশ্রয়ে ফিরিয়া আসিয়া ধর্মের প্রকৃ[illegible] তাৎপর্য যেন অনুভব করে ইহাই তাঁহা[illegible] প্রার্থনীয় ছিল।

পুস্তক পরিচয়

কবিতা সংকলন

বিষ্ণু দের শ্রেষ্ঠ কবিতা—নাভানা ৪৭, গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা—১৩, চার টাকা।

১৯২৬ থেকে ১৯৫৫-র মধ্যে প্রকাশিত মোট সাতখানি বই থেকে এবং তার বাইরে থেকেও সংকলিত মৌলিক ও অনুবাদ-কবিতায় মিলিয়ে শ্রীযুক্ত বিষ্ণু দের মোট ৮৮টি রচনার এই শোভন সংগ্রহখানি তাঁর অনুরাগী পাঠকদের কাছে তৃপ্তিকর মনে হবে।

বুদ্ধিনিষ্ঠ, পাণ্ডিত্যকণ্টকিত, দুর্বোধ্য 'আধুনিকতা'র অন্যতম বাহক হিসেবে ত্রৈমাসিক 'পরিচয়' পত্রিকায় তাঁর প্রথম প্রতিষ্ঠার পর্বে শ্রীযুক্ত বিষ্ণু দে ছিলেন অতি সংকীর্ণ একটি গোষ্ঠীর কবি; 'চোরাবালি'-র সমাদর-উচ্ছ্বসিত ভূমিকায় শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর 'ওফেলিয়া' ও 'ক্রেসিডা', এই দুটি কঠিন রচনার প্রশংসা করে লিখেছিলেন যে দুটিই "যেহেতু উৎকৃষ্ট কাব্য, তাই সে দুটির মর্মোদ্ঘাটন আমার অভিপ্রেত নয়।" 'অপস্মার' নামক রচনায় সুধীন্দ্রনাথ 'অপরিপাক' লক্ষ করেছিলেন; 'চোরাবালি' এবং 'ঘোড়সওয়ার' সম্বন্ধে বলেছিলেন যে সে দুটি শুধু রিরংসার রূপক নয়, তাদের উপরে প্রকৃতি-পুরুষ বা ভক্ত-ভগবানের সম্বন্ধারোপ সহজ ও শোভন। বিষ্ণু দে'র ছন্দস্বাচ্ছন্দ্যের কথা বাংলা কবিতার পাঠক সমাজে তখন থেকেই সুপরিচিত। 'চোরাবালি'র আগে ছাপা হয়েছিলো 'উর্বশী ও আর্টেমিস', পরে ছাপা হয় 'পূর্বলেখ'। শেষের বইখানি প্রকাশের সময়ে দেশে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের উত্তেজনা প্রবেশ করেছে। যুদ্ধের অস্থির, অশান্ত, ঘাত-প্রতিঘাতময় পর্বের এবং তার অব্যবহিত পরের মনন ফুটেছে তাঁর 'সাত ভাই চম্পা'য় এবং 'সন্দ্বীপের চর'-এ। 'পূর্বলেখ'-এর ধনতন্ত্রবিরোধী, গাঁয়ের-মাটি-অভিমুখী নব-ঘোষণার জের টেনে অপেক্ষাকৃত সহজ হয়ে তিনি তথাকথিত বিদগ্ধ-পাঠকের তারিফ জায় রেখেও বৃহত্তর পাঠক সমাজের কৌতূহল উদ্রেক করেছিলেন শেষোক্ত দু'খানি বইয়ে। 'পূর্বলেখ'-এর আগে 'প্রবাসী'-পত্রিকায় তাঁর রচনার দুর্বোধ্যতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের যে সংশয়হীন মন্তব্য ছাপা হয়েছিল, বিষ্ণু দে'র এই অনুশীলিত দুর্বোধ্যতার ফলে তাঁর সম্বন্ধে সেই মন্তব্যের তিরস্কার ক্রমশ মন্দীভূত হয়। কিন্তু ছন্দে, ব্যঙ্গে,—বই-পড়া জ্ঞানে, পুরাণোল্লেখে তাঁর এই সহজ-লেখার (?) প্রবাহেও তাঁর কৈশোরের প্রথম-স্বীকৃত পাণ্ডিত-স্বভাব ক্ষুণ্ণ হয়নি।

> বিশ্বামিত্র সৃষ্টি করে আল্‌কেমির
> নববিশ্ব
> ভুঁইফোঁড় গায়ত্রীর বরে।
> ইরার প্রণবছন্দে পুরোডাশে লালায়িত
> তাপসের সোমরস ঝরে।

—এ উক্তি এই 'সহজ' পর্বের কীর্তি। 'কাসান্ড্রা' 'আইসায়ার খেদ',—এবং সেই-সঙ্গে 'সাঁওতাল কবিতা', 'উরাওঁ গান' পাশাপাশি জায়গা পেয়েছে 'সন্দ্বীপের চর'-এ।

সমকালীন 'ফ্যাশান'-এর প্রশ্রয়ে পাণ্ডিত্যের দ্বিধাহীন উন্মার্গ বিলাস রোধ করা দুর্বলের সাধ্য নয়,—এও যেমন সত্য, অপর পক্ষে, যথার্থ কবিপ্রাণের প্রেরণায় কবিতার ধারায় নতুন রীতি, নতুন মনন, নতুন ভঙ্গির অভ্যুদয় যে অবশ্যম্ভাবী, সেও তেমনি সত্য। যে কারণেই হোক, বিষ্ণু দে'র বেশির ভাগ লেখাই সাধারণ পাঠকের পক্ষে কতকটা দুষ্প্রবেশ এবং কষ্টগ্রাহ্য। সুতরাং তাঁর কবিতা পড়ে যে তৃপ্তি পাওয়া যায়, সাধারণ পাঠকের অভিজ্ঞতায় সে হলো প্রধানত সমকালীন খ্যাতিমান একজন লেখকের মন বোঝবার প্রয়াসের সততা রক্ষার তৃপ্তি। বলা বাহুল্য, গত তিরিশ বছরের মধ্যে তাঁর মন একাধিকবার বদলেছে, যদিও তাঁর স্বভাবের পরিবর্তন হয়নি। তাঁর মন যত বিদ্যাময়, ঠিক সেই পরিমাণে অনুভূতিময় নয়। এই বিনীত মন্তব্যের বিতর্ক সম্ভাবনাময় ক্ষুরধার সীমাতে দাঁড়িয়ে সুধীন্দ্রনাথের বিজ্ঞ বচন মনে পড়া অনিবার্য। "কোমর বেঁধে ছিদ্রান্বেষে নামলে শুধু বিষ্ণু দে কেন, যে কোনো সাহিত্যিকের ত্রুটি তালিকা মহাভারত ছাপিয়ে উঠবে।"

অতএব নিন্দার কথা থাক। যেটা ভাববার কথা সে হলো বিষ্ণু দে'র প্রাপ্তি ও প্রকাশ, সিদ্ধি ও সাধনার প্রসঙ্গ। হাজার বছরের বাংলা সাহিত্যের ধারায় পণ্ডিত কবির সংখ্যা কম নয়। বেশি দূর অতীতে না

গিয়ে নিকট কালের ভারতচন্দ্র, মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথের কথা ধরা যাক। নিজেদের আয়ুষ্কালে,—অভ্যুদয়ের লগ্নে এঁরা যতো প্রশংসা পেয়েছেন, পরবর্তী পাঠকদের চেতনায় এঁদের সমাদর যে তার চেয়ে অনেক বেশি, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আমাদের বর্তমানতম 'আধুনিকতা'র সম্বন্ধে কোনো অপ্রিয় মন্তব্য প্রকাশ করার আগে পূর্ব অভিজ্ঞতার সত্য স্মরণ করা বিশেষ সমীচীন। কিন্তু সমালোচকের কর্তব্য এখানেই শেষ হয় না। সমকালীন কবি বৃহৎ, বিপুল মানব জীবনের সমস্ত খণ্ডতার মধ্যেও সর্বান্বয়ের সাক্ষী; তাঁর কীর্তি তাঁর জ্ঞানের বিপুলতায় নয়,—আনন্দের সৃষ্টিতেই! অবশ্য আনন্দের ভাষা পাঠকের পক্ষেও শিক্ষণীয়। চিত্রশিল্পে, সাহিত্যে, সঙ্গীতে ভাষার পার্থক্য আছে। যিনি কবিতা পড়ে আনন্দ পান, তিনি ছবির প্রযুক্তিগত সূক্ষ্ম কলাকৌশলে অনভিজ্ঞ থাকতেও পারেন। কিন্তু অন্য শিল্পের প্রসঙ্গ এড়িয়ে শুধু কবিতার প্রসঙ্গ মনে রেখেই একালের বহু পাণ্ডিত্যময় এক শ্রেণীর তির্যক, 'আধুনিক' কবিতা সম্বন্ধে আত্মসীমাচেতন, বিনয়ী সমালোচককে তাঁর অচরিতার্থ তৃপ্তির বেদনা স্বীকার করতেই হয়।

স্রষ্টা নিরঙ্কুশ নন, পাঠকও প্রয়াসহীন নন। উভয়ের আত্মীয়তা চাই, 'সত্য-আত্মীয়তা' চাই। এ অবস্থায় বিষ্ণু দের এই শ্রেষ্ঠ কবিতার সংগ্রহে দুর্বোধ্য অংশের কিছু কিছু অর্থ বা ভাবসংকেত ছাপা হলে অপেক্ষাকৃত অল্প জ্ঞানী পাঠকের সাহায্য হতো। তাতে কবির পক্ষেও সুব্যবস্থা হতো। বিদেশী কবিদের মধ্যে যাঁরা যে-কারণেই হোক অল্প-বিস্তর দুর্বোধ্য, তাঁদের কবিতাসংগ্রহ টীকা-টিপ্পনীর সাহায্যে বোঝবার রেওয়াজ আছে। আধুনিক কবিদের মধ্যে বিষ্ণু দে যে একজন দুর্বোধ্য কবি, এ মন্তব্য অগ্রাহ্য নয়। সুতরাং 'ওফেলিয়া', 'ক্রেসিডা'র মতো কবিতাগুলির সম্পর্কে তো বটেই, এমন কি সংগ্রহের শেষ পর্বের কোনো কোনো রচনার সঙ্গেও এই ধরনের ভাব বা অর্থসংকেত ছাপা হলে যাঁরা কেবল ফ্যাশানের খাতিরেই নির্বিচারে আধুনিক কবিতার বই কেনেন, সে রকম ক্রেতারাও হয়তো অন্য-নিয়োগ-মুক্ত দুর্লভ কোনো অবকাশে একজন আধুনিক পণ্ডিত-কবির আরো বাঞ্ছনীয়, আরো শিক্ষাপ্রদ সান্নিধ্য পেতেন।

রবীন্দ্রনাথের আয়ুষ্কালের মধ্যে যথাক্রমে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, প্রমথ চৌধুরী, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, নজরুল ইসলাম এবং এঁদের পরে জীবনানন্দ, প্রেমেন্দ্র, সুধীন্দ্রনাথ, বিষ্ণু দে, অমিয় চক্রবর্তী, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি কবিরা রবীন্দ্র-নাথের অনুকরণের পথ পরিহার করে, স্বাতন্ত্র্যের ঝোঁকে, মর্ত্য প্রয়োজনের স্বীকৃতিতে,—কতকটা নববৌবনের তাগিদে এবং বেশিটাই পাশ্চাত্ত্য ও 'আধুনিকতা'র অনুকরণে (এই শেষ কারণটি বিশেষভাবে তিরিশ ও চল্লিশের দশকের কবিদের পক্ষে প্রযোজ্য) বাংলা কবিতায় নতুন নতুন ভঙ্গি স্বীকার করে নিয়েছেন। সুতরাং বিষ্ণু দে আমাদের গত তিরিশ বছরের কবিতার ধারায় একক, বিচ্ছিন্ন, অদ্বিতীয় শিল্পী নন। তিনি যে-পর্বের লেখক সে পর্বের বিশ্বাস-অবিশ্বাস, সংশয়-উদ্বেগ, ক্লান্তি-বিষাদ সবই কিছু না কিছু ছায়া ফেলেছে তাঁর রচনায়। 'ঘোড়সওয়ার', 'ওফেলিয়া', 'মহাশ্বেতা', 'ক্রেসিডা' 'পদধ্বনি', 'জন্মাষ্টমী' ইত্যাদি ... কবিতায় তাঁর ভাবের প্রবাহ জটিল; 'গার্হস্থ্যাশ্রমের' লেখাগুলি আরো ... লেখার মতোই হঠাৎ ভালো লেগে যায়। মনে হয়, তাঁর ব্যঙ্গ-ভঙ্গির সবটাই নিছক ঠাট্টা নয়। মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের কথা—'ঠাট্টা করে শোনাই সখি আপন কথাটাই।' '৩১শে জানুয়ারী, ১৯৪৮', 'কোনার্ক', 'বৃষ্টি চাই বৃষ্টি অবিরাম' প্রভৃতি লেখায় আছে পাঠকের প্রতি অনুকূলতর মনোভাব,—এসব লেখা বুঝতে অসুবিধা হয় না। '২৫এ বৈশাখ' ... রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে বলা হয়েছে :—

> আমরা তো জানি তুমি
> আকস্মিকে গরম বাজা...
> রুদ্ধগতি, তাই গড়ি
> জীবনের ঝরণা, রাঁচ, ক...
> প্রাত্যহিক ফল্গুস্রোতে
> লাখে-লাখে হাজারে হাজা...
> সাগরে যে গঙ্গা আনি
> সে তোমারই আনন্দ-ভৈরবী।

'২২শে শ্রাবণ' কবিতায় তাঁর নিজের দেশ-কালের স্পষ্ট সমালোচনা দেখা গেল :—

> নেকড়ের হন্যেয় দেশ ছিন্নভিন্ন,
> সন্দেহ এ ভ...
> কলুষ ছড়ায় দুই হাতে
> গায় শৃগালে বাহবা
> তবুও আকাশ ছায়,
> আমাদের মুক্তি উচ্চৈঃশ্রবা,
> মানুষ দুর্জয়॥

হরপ্রসাদ মি...

২৪৫।৫...

উপন্যাস

সৃষ্টি—সঞ্জয় ভট্টাচার্য। প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কো লিঃ, ৯৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা—৭। মূল্য—৫৲ টাকা।

কথাসাহিত্যিক সঞ্জয় ভট্টাচার্যর উপন্যাসের সঙ্গে যে পাঠকেরই কিছুমাত্র পরিচয় আছে তিনিই জানেন, এ-লেখক একেবারেই গতানুগতিক ধারাবাহী নন। কাহিনীসৃষ্টিতে তাঁর 'মরামাটি' উপন্যাসটি যদিও প্রচলিত ধারাকে স্বীকার করে নিয়েছিলো, তথাপি তার বর্ণকৌশলে এমন একটা চমৎকারিত্ব ছিলো যাতে একটা নূতনতর আস্বাদ পাঠক সাধারণ অনুভব করতে

পেরেছেন। লক্ষ্য করবার বিষয়, এই নতুনত্ব বস্তুত ঘটনাসৃষ্টি বা ঘটনা-বিশ্লেষণে নয়। কারণ, বাঙলা উপন্যাস রচনা করতে এসে আরব্য উপন্যাস সৃষ্টি করার মধ্যে নতুনত্ব থাকতে পারে, সাহিত্যকলা নেই। অন্যপক্ষে, তাঁর রচনায় যে প্রতিবারই শিল্পশৈলীর সন্ধান পাওয়া যায় তাও নিতান্তই চোখ ধাঁধানো বা পাঠকমহলকে বিভ্রান্ত করে দেওয়ার জন্য নয়। আশা করি সঞ্জয় ভট্টাচার্যের পাঠকমাত্রই স্বীকার করবেন যে, উপন্যাস রচনায় তিনি যে-রীতিই ব্যবহার করুন না, বিষয়বস্তুর সঙ্গে তা এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে মিশিয়ে থাকে যে, শেষ পর্যন্ত সর্বাঙ্গীণভাবে তাদের সফলতাটুকুই পাঠকমনকে মুগ্ধ করে রাখে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, এ-লেখকের নতুনত্ব তাঁর বিষয়বস্তু নির্বাচনে নয়, এমন কি নতুন হলেও তাঁর রচনাশৈলীতেও নয়। আসল কথা, সমস্ত রচনার মধ্যেই এ নতুনত্বকে আনেন তিনি তাঁর ভাবনা-ধারণায়, তাঁর চিন্তায় আর মননে। সঞ্জয় ভট্টাচার্য যেদিন উপন্যাস-রচনায় নিজেকে নিয়োজিত করলেন, তার আগে থেকেও যেমন বহু উপন্যাস বাঙলা সাহিত্যে রচিত হয়েছে, সমসাময়িক কালেও তেমনি আরও অনেক উপন্যাস রচিত হচ্ছে এবং তার উপজীব্য বাঙলা দেশেরই সমাজ এবং বাংলা দেশেরই মানুষ। শিক্ষিত নগরজীবন বাঙলা উপন্যাসে এসে ঠাঁই পেয়েছে খুব আধুনিককালে, তা বলে তার জাতীয় বৈশিষ্ট্যটুকু তো তাতে হারিয়ে যায় নি। সুতরাং গ্রাম বা নগর যে জীবন বা সমাজই হোক, এতোদিন যেন একই রূপে একই ভাষায় তার প্রতিফলন ঘটেছে বাংলাসাহিত্যে। খুব সম্ভব সঞ্জয় ভট্টাচার্য এবং আধুনিক কালের আরো দু'একজন রচনাকারের ঠিক মনোমতো হয়নি এই একই পন্থায় বিষয়বস্তুর রূপায়নে, একই রীতির পুনরাবৃত্তিতে। তাঁরা দেখলেন, ব্যবহারিক চলনে-বলনে আর কার্যপরম্পরায় সে মানুষটিকে প্রত্যক্ষ করা যায়, কেবলমাত্র সেটুকু উপাদানেই সে একটি চরিত্র হয়ে উঠতে পারে না; সে কয়েকটি ঘটনা হয়তো সৃষ্টি করে তুলতে পারে, কিন্তু নিজে সৃষ্টি হয়ে ওঠে না। তার চিন্তা তার ভাবনা-ধারণা তার অভ্যাস তার অনভ্যাস এ সমস্ত নিয়েই সে সম্পূর্ণভাবে 'হয়ে ওঠে', তারপর সে তার কার্যাবলীর নায়ক। আবার অন্যদিকে মানুষ নিজেকে নিজে গড়ে তোলে এমন কথাও জোর করে বলা যায় না। তাকে তৈরী করে তার পারিপার্শ্বিক, তার দেশ, আত্মীয়-বন্ধু, তার চতুষ্পার্শ্বের সর্বকিছুই। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তেই সে রূপান্তর লাভ করে চলতে থাকে এবং প্রতি মুহূর্তেই সে সম্পূর্ণ হওয়ার পথে এগিয়ে চলে; কিন্তু কোনো মুহূর্তেই সে সম্পূর্ণ নয়। সুতরাং সাধারণ এবং স্বাভাবিক ব্যবহার দেখে বা একটা মানুষের তৈরী কোনো ঘটনা বিশ্লেষণ করে তাকে চিনতে গেলে সে-চেনায় অবশ্যই ভুল থেকে যাবে। সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে তাকে চিনতে হবে। সঞ্জয় ভট্টাচার্য এই দৃষ্টি নিয়েই তাঁর 'সৃষ্টি' উপন্যাসের নায়ককে চিনতে চেষ্টা করেছেন। সুতরাং বললে নিশ্চয়ই

কিছু, বেশী বলা হবে না যে, এ দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে যে অভিনবত্ব আছে তা বাংলাসাহিত্যে একেবারেই নতুন।

দীপায়ন কি একক সত্তার অধিকারী একটিমাত্র মানুষ? শিশুকাল থেকে নানা ঘটনা-দুর্ঘটনা পেরিয়ে বড় হয়ে উঠেছে তো বাংলা উপন্যাসের বহু নায়ক, তাদের অধিকাংশই হয়তো ছিলো মফঃস্বলের ভালো ছাত্র, কলকাতায় এসে পড়াশুনো করেছে, তাদেরও জীবনে এসেছে নারীর ভালোবাসা, বন্ধুর প্রীতি, মায়ের স্নেহ এবং স্বাভাবিক-ভাবে মানুষের জীবনে যা আসে তাই। ব্যক্তিজীবনে তারা সকলেই দীপায়ন। কিন্তু আশ্চর্য, 'সৃষ্টি' উপন্যাসের নায়ক দীপায়ন কেবলমাত্র একটি ব্যক্তি নয়, সে ব্যক্তিস্বরূপ। বিভিন্ন সময়ে, এমনকি বিভিন্ন মুহূর্তে, এক-একটি পরিবেশে কিংবা বিভিন্ন পরি-বেশের সমন্বয়ে নানা পানু ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে সম্পূর্ণ এক দীপায়নের লক্ষ্যে। ন' দাদুর প্রতি সহানুভূতিশীল পানুকে চেনে না, প্রতুল মানিকের বন্ধু পানু; শেফালী আর বীণাদিকে জেনেছিলো যে পানু তার সঙ্গে বোধ হয় কোনো সম্পর্কই নেই তার, সে ময়নাকেও সহ্য করতে পেরেছিলো। স্বাদেশিকতার আগুনে পোড়া দেবুদা আর বাসবকে বুঝতে ভুল হয়নি পানুর কিন্তু দু-জনই তার কাছে ধরা দিয়েছে ভিন্ন ভিন্ন রূপে। এক পানু আর এক পানুতে রূপান্তরিত হয়ে চলেছে—বিচ্ছিন্ন চরিত্ররূপে ধরলে কখনও কখনও এমনও মনে হতে পারে এক পানু বুঝি চেনে-না আর এক পানুকে; কিন্তু কেউই মিথ্যে নয়,—দীপায়ন ভুল করেনি, নির্বিকার বিধাতার মতো লক্ষ্য করেছে প্রতিটি পানুকে, তারা যেন নির্ভুলভাবে দীপায়নের সত্তায় এসে মিশেছে।

কিন্তু পানুকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাতির দেখালেও অন্যায় হবে। দীপায়নকে সে তৈরী হয়ে উঠতে সাহায্য করেছে সন্দেহ কি, সে-সঙ্গে বিভিন্ন মুহূর্তে এই পানুকেও তো তৈরী করে তুলেছে আর সকলে—ন'দাদু থেকে নীলু, আর শেফালী থেকে সুপর্ণা। প্রতুল মানিককে অবহেলা করলে যেমন মফঃস্বলের একটি ভালো ছেলেকে ঠিক ঠিক চেনা যাবে না, আলীকে না জানলে যেমন প্রকৃতির সঙ্গে পানুর সম্পর্ককে ঠিক বোঝা যাবে না, তেমনি বাসব বা সুপর্ণাকেও প্রয়োজন পানুর আরও কয়েকটি চরিত্র-বৈশিষ্ট্যকে চিনে নেওয়ার জন্য। পানুকে যথাযথভাবে সাহায্য করেছে তারা দীপায়নকে খুঁজে নিতে, এগিয়ে দিয়েছে একটা একক পরিণতির বিন্দুতে গিয়ে পৌঁছুতে। এখানে প্রতিটি চরিত্রই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপাদান। কোথাও যদি সামান্যমাত্র ভুল থেকে যায় তবে সমস্তটা পরিকল্পনাই বানচাল হয়ে যাবে। সঞ্জয় ভট্টাচার্য ধীমান সাহিত্যিক, ভুল তিনি করেননি। তাই 'সৃষ্টি' তাঁর অনন্য সৃষ্টি হয়ে রইলো।

এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকেই বোঝা যাবে, প্রচলিত রীতিতে কাহিনী রচনা করতে বসলে এ-উপন্যাস তৈরী করা সম্ভব হতো না। রচনাশৈলীতেও তাই লেখককে একটা বিশেষ আঙ্গিক খুঁজে নিতে হয়েছে, যার সন্ধান আজ পর্যন্ত কোনো বাংলা উপন্যাসে পাওয়া যায়নি। সঞ্জয় ভট্টাচার্যর পূর্বতন উপন্যাসগুলো সম্বন্ধে যে-কথা নিঃসঙ্কোচে বলা গেছে, 'সৃষ্টি' সম্বন্ধেও তা বলা যায় যে অভিনব হলেও এ আঙ্গিক উপন্যাসের বিষয়-বস্তুর সঙ্গে এমন অঙ্গাঙ্গী হয়ে গেছে যে, এখন মনে হয়, এ-রীতিকে অবলম্বন না করলেই লেখক ব্যর্থ হতেন। এ উপন্যাস পড়তে পড়তে কোনো কোনো পাঠকের মনে হয়তো ভেসে উঠবে য়ুরোপের কোনো প্রখ্যাত সাহিত্যিকের রচনাভঙ্গির কথা, কিন্তু তখনই তিনি লক্ষ্য করে দেখবেন, সঞ্জয় ভট্টাচার্য সাহিত্যিক-বৈশিষ্ট্যে এমনই স্বতন্ত্র যে তাঁর রচনার অঙ্গাবরণ আর অঙ্গাভরণ কখনোই কারো রচনারীতির অনুসারী হয়ে চলতে পারে না। বহুকালের বিদগ্ধ সাহিত্যপত্রের সম্পাদক সঞ্জয় ভট্টাচার্য অনেক নতুন লেখককে খ্যাতি-মান সাহিত্যিক হয়ে উঠতে সাহায্য করেছেন, 'সৃষ্টি' উপন্যাস রচনা করে তিনি এবার বুঝিয়ে দিলেন তিনি কেবল সাহিত্যিকই নন, সত্যি সত্যি সাহিত্যশিক্ষকও। ২৬৪।৫৫

ট্রামে-বাসে

পাক্ মন্ত্রিসভার সংবাদে প্রকাশ যে, আইন-সচিবের পদ হইতে সরাইয়া শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার দত্ত মহাশয়কে সম্প্রতি স্বাস্থ্য-মন্ত্রীর দায়িত্ব অর্পণ করা হইয়াছে।—"আমরা বলি বারবার রদবদল না করে সংখ্যালঘুর

কারুকে উজীরী দিতে হ'লে পোর্টফোলিও ছাড়া দেওয়াই ভালো, তাতে সাপও মরে, লাঠিও ভাঙে না"—মন্তব্য করিলেন বিশুখুড়ো।

* * *

শ্রীযুক্ত জওহরলাল তাঁর এক সাম্প্রতিক ভাষণে বলিয়াছেন যে দারিদ্র্যের পূর্ণ উচ্ছেদই হইল আমাদের লক্ষ্য।—"প্রার্থনা করি নেহরুজীর মনোবাসনা পূর্ণ হোক। কিন্তু আপাতত দারিদ্র্যের চেয়ে দরিদ্রের উচ্ছেদটাই বেশি চোখে পড়ছে"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

শ্রীযুক্ত গুলজারিলাল নন্দ বলিয়াছেন যে, দ্বিতীয় পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য জনসাধারণকে আরো কর-

ভার গ্রহণের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে।—"আমরা প্রস্তুত হয়েই আছি কিন্তু সর্বাঙ্গীন সফলতার জন্যে তৃতীয় পরিকল্পনার খসড়া যেন নন্দজী প্রস্তুত রাখেন"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

* * *

কেন্দ্র হইতে সমস্ত রাজ্যসরকারকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে তাঁহারা যেন নির্বাচনী প্রচারকার্যে ছাত্রছাত্রীদের অংশ গ্রহণ করিতে না দেন।—"আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশের সঙ্গে একমত। কিন্তু এই সঙ্গে সত্যের খাতিরে এ-কথাও স্বীকার করব যে এই ব্যবস্থায় নির্বাচনের জেল্লা আর থাকবে না"—বলেন অন্য এক সহযাত্রী।

* * *

খ্যানাপলীর সেন্ট্ জন কলেজের প্রেসিডেন্ট তাঁর রোটারি ক্লাবের বক্তৃতায় মন্তব্য করিয়াছেন যে, ছাত্রছাত্রীর ফাইন্যাল পরীক্ষার উপর কোনরকম গুরুত্ব আরোপ না করা উচিত।—"কর্তৃপক্ষ কী করিবেন জানিনে, আমরা কিন্তু বহুদিন থেকেই ফাইন্যাল পরীক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপের অভ্যেস ত্যাগ করেছি" মন্তব্য করিলেন জনৈক কিশোর সহযাত্রী।

* * *

একটি সংবাদে প্রকাশ কলিকাতার পার্ক, স্কোয়ার এবং "খোলা জায়গায়" নাকি কর্তৃপক্ষ প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের ব্যবস্থা করিতেছেন।—"জ্ঞানার্জনের প্রয়োজন অনস্বীকার্য কিন্তু মুক্ত বায়ু হলো জীবন। সোজা বাংলায় বলব আপনি বাঁচলে বাপের নাম। ব্যবস্থাটা পাকা হওয়ার আগে কর্তৃপক্ষ কথাটা ভেবে দেখবেন"—বলিলেন বিশুখুড়ো।

* * *

চীনের সাংস্কৃতিক সফর হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া পররাষ্ট্র বিভাগের উপমন্ত্রী শ্রীযুক্ত অনিল চন্দ বলিয়াছেন যে, চীন শহরের পরিচ্ছন্নতা দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইয়াছেন, তাঁর ধারণাই ছিল না এশিয়ার কোন দেশ এত পরিচ্ছন্ন হইতে পারে।—"সুতরাং বুঝতেই পারছি, চীনের সঙ্গে সংস্কৃতির আদান-প্রদান যতোই হোক, তাঁদের নাগরিক পরিচ্ছন্নতা এশিয়ার ঐতিহ্যের খাতিরেই আমাদের কাছে অগ্রাহ্য হয়ে থাকবে"!!

* * *

একটি সংবাদে শুনিলাম রাশ্যা নাকি শ্রীযুক্ত নেহরুকে একটি অশ্ব উপহার দিবেন।—"আগামী শীতের মরসুমে ঘোড়াটিকে কোন বাজিতে দৌড়
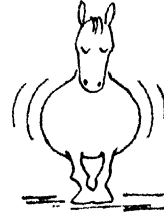
করানো হবে কিনা না জানা পর্যন্ত এ সম্বন্ধে আমরা কোন মতামত প্রকাশ করব না"—বলিলেন আমাদের জনৈক ঘোড়দৌড়রসিক সহযাত্রী।

* * *

ইতালীর এক সংবাদে জানা গেল যে, সেখানে খৃষ্টজন্ম চারশত বৎসরের পূর্ববর্তী একটি স্মৃতিসৌধে নাকি একটি আস্ত মরগীর ডিম পাওয়া গিয়াছে।—"ইতালীকে বাহাদুরী দিতে আমরা রাজী নই। খৃষ্টজন্মের অনেক আগেকার অশ্বডিম্ব আমরা শুধু আবিষ্কার করেই থামিনি, চিরকাল তা ব্যবহার করেও আসছি, বিশ্বাস করুন আর না-ই করুন"—কথাটি বলিতে বলিতে বিশুখুড়ো ট্রাম হইতে নামিয়া গেলেন।

দুঃসাহসিক প্রচেষ্টার দুষ্পরিণাম

নরেন্দ্রনাথ মিত্র রচিত 'গোধূলি'-র আখ্যানবস্তুটি এমনি এক জাতের যা হয়তো জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষায় বঞ্চিত অনেক মেয়ে বা পুরুষের মনের ওপরে রেখাপাত করতে পারে গল্পটি নিভৃতে একা বসে পড়ার সময়; হয়তো 'গোধূলি'র নায়ক বা নায়িকার কথা মনে করে অলক্ষ্যে তাদের চাপা দীর্ঘশ্বাসও

—শৌভিক—

বেরিয়ে আসবে। কিন্তু তাই বলে স্বামী ও সন্তান কাছে থাকা কালেও আর এক পুরুষের সংগে প্রেম করতে যাওয়ার প্রকাশ্য ঘটনা, অথবা অপর দিক থেকে, পরস্ত্রী জেনেও একজনকে নিবিড় প্রণয়ের টানে, তাকে নিজের করে পাবার জন্য আকুলতা প্রকাশ চোখের ঠিক সামনা সামনি ঘটতে দেখার মতো পর্দাহীন দৃষ্টি এখনও ঠিক তৈরী হয়েছে বলে মনে হয় না। নীতিবাগীশতার কথা নয়, এ হচ্ছে সমাজের বিচারে নৈতিকতাকে দূরে সরিয়ে রাখারই কাহিনী। এমন কাহিনীকে ছবির পর্দায় উদ্ভাসিত করতে চাওয়াটা যথেষ্টই দুঃসাহসিকতার পরিচয়, কিন্তু ছবিখানি যে চেহারা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে তাকে একটা বিড়ম্বনা বলেই অভিহিত করতে হয়। গ্রন্থ নিতে যা আছে ছবিতে তার পরিবর্তন হওয়া অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু পড়ার মধ্যে দিয়ে যে রস অনুভব করা যায়, ছবিতে সে অনুভূতিটাই গিয়েছে পালটে। ছবিতে বলি বলি করেও বলাটা রুখে যাওয়ার একটা সংকোচ উপন্যাসের স্পষ্টতাকে আচ্ছাদিত করে দিয়েছে।

* * *

ছবিতে রয়েছে ভব্য চেহারার মানসিক বিকারগ্রস্ত ক'টি চরিত্র। প্রথম ধরতে হয় ইন্দুর কথা। শিক্ষিতা রুচিসম্পন্না স্ত্রী এবং সন্তানের জননী। স্বামী অনুপমের সংগে তার অবনিবনা নেই, কিন্তু রুচির মিলও নেই। অনুপম আওয়াজ করে স্বামীত্ব বাজিয়ে চলার ধরনের লোক; এটা সেটা আনছে, ইচ্ছামত যা খুসী করছে কেবলমাত্র স্ত্রীর ওপর দখলটা বেশী করে বাগিয়ে রাখার তালে। চিন্ময় ইন্দুর শৈশবের সাথী ছিল; দীর্ঘকাল পরে যখন দেখা তখন চিন্ময় একজন অধ্যাপক। কিন্তু ইন্দুর আদরখাতিরের সোপান বেয়ে এক সময় প্রণয়ের কোঠায় গিয়ে হানা দিলে। এদের সংগে আ রয়েছে ইন্দুর মামাতো বোন ঝুনু—গা পড়ে প্রেম যাচ্ঞা করার ধরন তার। ছবিতে গল্প আরম্ভ থেকেই এমন একটা ভা ফুটে ওঠে যাতে বোঝা যায় যে, ইন্দ তার স্বামী, অনুপমের প্রতি সম্পূ অনুরক্ত নয়। অনুপমের মধ্যে স্বামী দেখাবার ভাবটা প্রখর। এই আবহাওয়া বাড়িতে ভাড়াটেরূপে উপস্থিত হলে চিন্ময়, তার মাকে সংগে নিয়ে। পুরনো দিনের জের থাকায় ইন্দুর সংগে আলাপ করার অসুবিধে হলো না, এদিকে কিন্তু চিন্ময় অতি মিনমিনে প্রকৃতির। প্রেস ও বাতের রোগী মা কতো করে চিন্ময়কে বলে বিয়ে করে ঘরে বৌ আনার জন্য কিন্তু বিয়ের কথাতে চিন্ময় বেঁকে দাঁড়ায়। দেখতে দেখতে চিন্ময় নিবিড়ভাবে ইন্দুর প্রেমে জড়িয়ে ফেললে নিজে মনকে, এবং ইন্দুর দিক থেকেও এম সাড়ার অভাব হলো না যাতে ইন্দুও চিন্ময়কে ভালোবাসতে আরম্ভ করে তা বুঝতে পারার কোন অসুবিধে হয় হঠাৎ একদিন উপস্থিত হলো কলেজে মেয়ে ঝুনু। চিন্ময়ের সংগে একরক গায়ে পড়েই আলাপ করলে। আর এক দিন বাসে চিন্ময়ের সংগে দেখা হ তাকে সংগে করে ঝুনু নিজেদের বাড়ি নিয়ে গেল। চিন্ময়ের সংগে তার মি চিন্ময় কবিতা ভালবাসে এবং লেখে ঝুনুও কবিতা পেলে আর কিছু চায় না অল্পতেই ঝুনু চিন্ময়কে ভালোবাস চোখে দেখলে। ইতিমধ্যে আবার চিন্ময়ে মা তার বিয়ের কথা তুললে। অনুপ দেখলে ঝুনুর সংগে চিন্ময়ের বিয়ে দি পারলে সে তার স্ত্রীর সন্দেহজনক গতি বিধি থেকে স্বস্তি পায়। ইন্দুও চিন্ময়ে প্রতি তার আকর্ষণ সত্ত্বেও নিজেকে কে কলঙ্ক থেকে বাঁচাবার জন্যই চিন্ময়ে বিয়েতে সায় দিল। ইতিমধ্যে ঝুনু এক দিন আড়াল থেকে চিন্ময় ও ইন্দু আলাপ শুনে বুঝে নেয় যে চিন্ময়ে মন সে পাবে না, ইন্দুর কাছে তা অগে বাঁধা পড়েছে। তবুও চিন্ময়কে ঝুনু প্রতি আকৃষ্ট করে তোলার চেষ্টা কর ইন্দু। ঠিক করলে পাশাপাশি থিয়েটা দেখতে বসিয়ে চিন্ময়ের প্রতি ঝুনু

দস্যু মোহন চিত্রে বিকাশ রায় ও সুমিত্রা

নের বিরাগ নষ্ট করে দেবে। তিনখানা টিকিট কিনে স্বামীর মত নিয়েই ইন্দু চিন্ময়কে সঙ্গে করে ঝুনুদের বাড়িতে গেলো তাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে। ঝুনুর ধারণা ইন্দুলেখার আসল মতলব চিন্ময়কে নিয়ে থিয়েটার দেখার, সে বে উপলক্ষ্য মাত্র। তাই ঝুনু যেতে মত করলে। ইন্দুলেখাও একা যেতে তেমন মত করেনি, টিকিট বিক্রী করে দিতেই চেয়েছিল। কিন্তু বিক্রী না হওয়ায় অগত্যা ওরাই দু'জনে থিয়েটার দেখতে গেলো। ইতিমধ্যে মেয়ের বায়না ভোলাবার জন্য অনুপম তাকে নিয়ে বেড়াতে এলো ঝুনুদের বাড়ি। এসে শুনলে ঝুনু থিয়েটারে যায়নি এবং ইন্দুরও আসলে চিন্ময়কে পাশে নিয়ে থিয়েটার দেখারই শখ তাই ওরাই দু'জনে গেছে। অনেক রাতে থিয়েটার দেখে বাড়ি ফিরতে অনুপমের হাতে ইন্দুকে প্রহার খেতে হলো। ক্ষিপ্ত অনুপম পরদিনই চিন্ময়দের সপ্তাহকাল মধ্যে বাড়ি ছেড়ে দেবার জন্যে নোটিশ দিলে। চিন্ময়ও রুখে দাঁড়িয়ে জানালে যতোদিন না অন্য বাড়ি পাওয়া যায় তারা উঠে যাবে না। তার জন্যে সে মামলা করতেও প্রস্তুত। ইন্দুর ওপরে কড়া হুকুম হলো সে যেন চিন্ময়দের এলাকার ত্রিসীমানায় না যায়। ইন্দুকে কিন্তু চিন্ময়দের ঘরে যেতেই হলো। চিন্ময়ের মার অসুখ, মুখে জল দেবার পর্যন্ত কেউ নেই। মেয়ের কাছ থেকে সেকথা শুনে ইন্দু গিয়ে জল খাইয়ে এলো, পথ্য দিয়ে এলো। বাবা বাড়িতে আসতে আবার মেয়ে নালিশও করে দিলে মার নামে চিন্ময়দের ঘরে গিয়েছিল বলে। অনুপম ইন্দ কে

তিরস্কার করলে। তারপর রাত্রে চিন্ময়ের মা মারা গেল। চিন্ময় গিয়ে ইন্দুর দরজায় ধাক্কা দিলে। ইন্দু এসে চিন্ময়ের মাথায় হাত বুলিয়ে তাকে সান্ত্বনা দিতে লাগলো। ওদিক থেকে অনুপম এসে দেখলে ইন্দুর কান্ড। ওপরে টেনে নিয়ে অনুপম ইন্দুর হাত ভেঙে দিলে। পরদিন ইন্দুর মেয়ের কাছে থেকে চিন্ময় সে খবর পেলে। অনেক রাত্রে চিন্ময় বাড়ি ফিরতে ইন্দু এসে সদর খুলে দিলে। চিন্ময় বাড়ি থেকে চলে যাওয়াই স্থির করলে কিন্তু ইন্দুকেও সে নিয়ে যেতে চায়। ইন্দু এতোটা ভাবেনি। তাছাড়া এতোদিনে চিন্ময়ের মধ্যে সে আর এক অনুপমকেই প্রচ্ছন্ন থাকতে দেখলে; তাই স্বামীর ঘর সে ছাড়তে রাজী হলো না। চিন্ময় বিদায় নিয়ে চলে গেল, ইন্দু তার পিছু পিছু দরজার বাইরে এসে দাঁড়ালো চিন্ময়কে আরেকটু বুঝিয়ে বলতে, পিচনে এসে দাঁড়ালো অনুপম। চিন্ময়ের জন্য ইন্দু যে-দরজার বাইরে পা দিয়েছে সে-দরজার ভিতরে অনুপম আর তাকে পা রাখতে দিলে না। কিন্তু ইন্দু যাবে কোথায়? এক পা করে এগোয় আর তার মেয়ের ডাক কানে ভেসে আসে। ইন্দু ফিরে গেল বাড়িতে এবং সারারাত উঠোনে সিঁড়ির নিচে কাটালো। পরদিন ভোরে অনুপম ইন্দুর খোঁজে ঝুনুদের বাড়িতে গেল। পথেই ঝুনুর বাবার সঙ্গে দেখা। তার কাছ থেকে অনুপম জানতে পারলে, চিন্ময় ঝুনুকে বিয়ে করার সম্মতি দিয়ে গেছে। অনুপম একটা স্বস্তি নিয়ে বাড়ি ফিরলো; ওপরে উঠতে যাবার মুখেই সিঁড়িতে দেখা পেলে ইন্দুর। এতোদিনে তার দুর্ভাবনা ঘুচলো।

* * *

গল্পের বিষয়বস্তুটাই এমনি যাকে প্রীতির চোখে সহ্য করা অসম্ভব হয়ে ওঠে। মানুষ হিসেবে অনুপম দুশ্চরিত্র বদ লোক নয়, স্ত্রীর ওপর কোন অত্যাচারও করতো না, তবুও ইন্দুর মনকে এক পরপুরুষের প্রতি কেন প্রেমাসক্ত হতে দেওয়া হবে তার যথেষ্ট কোন যুক্তি নেই। আর চিন্ময়ই বা কিরকম প্রকৃতির! —শিক্ষিত, ভদ্র অথচ এক পরস্ত্রীকে

স্বামী সন্তান ছেড়ে বের করে নিয়ে যেতে চায়!—তারই বা কি যুক্তি আর তাকে কোন মানুষ ভালো চোখে দেখতে পারে? নেহাতই পাশবিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তি ছাড়া এদের এই ঘরজ্বালানো প্রেম আর কারই বা সায় পেতে পারে? কাহিনীর বিন্যাসে এই অবৈধতা সম্পর্কে একটা সচেতনতার ছাপ পাওয়া যায়। বিন্যাসের মধ্যে একটা চাপা চাপা ভাসা ভাসা ভাব। অতি নিঝুম বিন্যাস। ছবিতে চিন্ময়কে কেবলমাত্র অধ্যাপক এবং কবি-রূপেই নয়, সেই সঙ্গে গায়করূপেও দেখা যায়। চিন্ময়ের এই বাড়তি গুণ চরিত্রটিকেই অসংগত করে তুলেছে। চিন্ময় কবি কিন্তু ওর কবিতা লেখার ভঙ্গী কবিসুলভ নয়; একবার তো ঘর

ঢুকেই চিঠি লেখার চেয়ে দ্রুত একটা আস্ত কবিতা লিখে সেই সঙ্গে সঙ্গে গেয়ে একটা অস্বাভাবিক ও প্রায় অসম্ভব কাজই করে ফেললে। এই কবিতাই হলো ইন্দুর পক্ষে কাল। ও চিন্ময়ের অনুপস্থিতিতে গানখানি নকল করলে এবং অনুপমের কাছে ধরা পড়লো, তাই নিয়ে বাঁধলো স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এক সংঘাত। ঘটনা সাজানোর মধ্যে একটা কৃত্রিমতার ছাপ এসে গিয়েছে। নাটকীয়তা কোন অংশে জমেনি, তার জন্য বিন্যাস ও অভিনয় দুই-ই দায়ী। অনুপমের নিষেধ সত্ত্বেও ইন্দু চিন্ময়ের রুগ্না মার সেবার জন্য ওদের ঘরে যাওয়ায় তার মেয়েকে দিয়ে সেকথা অনুপমকে জানিয়ে দিয়ে ছোট্ট মেয়েটিকে ভিলেন করে তোলার কোন প্রয়োজন ছিল না। আর শেষে ইন্দুকে অনুপমের গ্রহণ করে নেবারই বা কি ছার যুক্তি! এখানে হয়েছে চিন্ময় ঝনুকে বিয়ে করতে রাজী হওয়াতেই যেন অনুপম আপদ দূরে হয়েছে মনে করে ইন্দুকে গ্রহণ করে নিলো। ইন্দু যে সত্যি স্বামীকেই সার বলে মনে করলে তার কোন মূল্যই রইলো না। ছবির টেকনিকের দিকটা—ক্যামেরার কাজ, শিল্প নির্দেশ এবং সংগীতের দিকটা ভালো হয়েছে বলে ছবিখানি দেখতে বসে থাকা যায়, নয়তো গল্পাংশ ছবিতে যেভাবে পরিবেশিত হয়েছে তার কোন ক্ষমতা নেই মনকে টেনে ধরে রাখার, আবার তেমনই কারুরই অভিনয়ও নাটক জমানোর সহায়ক হয়নি। ইন্দুর চরিত্রে অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায় গুছিয়ে পরিপাটি করে কথাগুলি বলায় বেশ যত্ন নিয়েছেন, কিন্তু আঙ্গিক অভিব্যক্তির দিকটা তেমনি অসাড়। অধ্যাপক চিন্ময়ের চরিত্রে নির্মলকুমারকে বড়ো কচি মনে হয়। অনুপমকে একটি ভাঁড় করে তোলায় জহর গাঙ্গুলীর অভিনয়ও কম দায়ী নয়। ঝনুর চরিত্রে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়কে মন্দ লাগবে না। ভালো লাগবে ওর বাবার চরিত্রে তুলসী চক্রবর্তীকে আর চিন্ময়ের মায়ের চরিত্রে রাজলক্ষ্মীকে। বিন্যাসে কলতলা প্রীতির কারণ বোঝা গেল না—অনুপম আর ইন্দুর মধ্যে চিন্ময়দের বাড়িভাড়া দেওয়া নিয়ে কথা কাটাকাটি তাও কলতলায়

'ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ' চিত্রের নাম-ভূমিকায় কানু বন্দ্যোপাধ্যায়

আবার ঝুনুর বিয়ে নিয়ে ওর বাবা ও মার মধ্যে কথা তাও কলতলায়, আর চিন্ময়ের সংগে ঝুনুর বিয়ে সম্পর্কে ওর বাবা তো রাস্তায় দাঁড়িয়েই চিন্ময়ের কথা বলে দিলে। তুলসী লাহিড়ী এতে এক রসিক ডাক্তারের চরিত্রে নেমেছেন, কিন্তু ওর অল্পবয়সী বন্ধু চিন্ময় এক বিবাহিতা নারীর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে শুনে এবং পরে ইন্দুকে দেখে চিন্ময়কে উৎসাহিত করে তোলার রসিকতাটা ঠিক জমে না। নরেশ বোস ও কেষ্ট দাসকে নিয়ে ছবির উদ্বোধন। অনুপমের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে পরস্পরে আলাপ-আলোচনা করে অনুপমের পরিচয় জানিয়ে দেওয়ার কাজে ওদের লাগানো হয়েছে; বড়ো পুরনো ধারা। আর অভিনয়ে আছেন বাণী গাংগুলী, সান্ত্বনা বন্দ্যোপাধ্যায়, রমা, স্মৃতি ব্রহ্মচারি প্রভৃতি।

* * *

পরিচালক কার্তিক চট্টোপাধ্যায় নাটক জমিয়ে তুলতে সফলকাম হননি তবে দৃশ্যগুলি গুছিয়ে হাজির করে দেওয়ায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। এ বিষয়ে পরিপাটি কাজ দেখিয়েছেন আলোকচিত্র গ্রহণে শৈলজা চট্টোপাধ্যায় ও অমূল্য বোস, শিল্পনির্দেশে সৌরেন সেন এবং সংগীত পরিচালনায় রবীন চট্টোপাধ্যায়। একটা গণ্য করবার মতো যে ছবি সে রূপটা এরা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। রণজিৎ দত্তের শব্দ-গ্রহণ কিন্তু ত্রুটিহীন নয়। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের লেখা চারখানি গান আছে। সতীনাথ মুখোপাধ্যায় গানগুলি গেয়েছেন ভালো; বেশ ভাবোদ্দ্যোতক পরিবেশ গড়ে উঠেছে; একখানি গানের খানিকটা গেয়েছেন ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য। আবহসংগীত ভালো। ছবিখানি সম্পাদনা করেছেন সুবোধ রায়। "গোধূলি" সরকার প্রডাকসন্সের প্রথম ছবি।

অতি সেকেলে ধরনের একটি গল্প

পাঁচজন একজোট হয়ে ছবি পরিচালনায় নিযুক্ত হলেই যে গুণের ছবি সৃষ্টি করা সম্ভব হয় না সে প্রমাণ এনে দিয়েছে ভারত চিত্রমের "কালোবৌ"। যেমনি সেকেলে গল্প, তেমনি পুরনো আমলের বিন্যাস। কলাকুশলী আর অভিনয়শিল্পীদের মধ্যে নামকরা গুণী ব্যক্তি থাকায় ছবিখানি দর্শক আকর্ষণে সক্ষম হয়, কিন্তু দেখে ছবিখানি সম্পর্কে কোন আলোচনা করারও আর মেজাজ থাকে না। অসংগতি আর যুক্তিহীনতার হিসেবে তালিকা দীর্ঘ হয়ে যায়। শিল্পী সংঘ নাম দিয়ে ছবিখানির পরিচালনায় আছেন কাহিনী, চিত্রনাট্য ও সংলাপ রচয়িতা সুনীল বসু, আলোকচিত্রশিল্পী অনিল গুপ্ত, সম্পাদক সুবোধ রায়, দীর্ঘকাল সহকারী পরিচালকের কাজে অভিজ্ঞ অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। কোরা লোক এরা কেউই নন, কিন্তু তাঁদের সম্মিলিত চেষ্টায় যা তৈরী হয়েছে এতো কাঁচা কাজ ইদানীং বড়ো দেখা যায়

না। এর মধ্যে গল্পই হচ্ছে সবচেয়ে কাঁচা।

*   *   *

টাকার লোভে হরেন্দ্র তার পুত্র বিশুর বিয়ে দিলে সুরেন্দ্রচন্দ্রের কালো মেয়ে কাজলের সংগে। বলা বাহুল্য, বিশুর বৌ পছন্দ হল না। বিশুর বিমাতা ও পিসি দোষ দিলে বৌয়ের। পিসির অবশ্য মনঃক্ষুণ্ণ হবার কারণ তার শ্বশুরবাড়ির সম্পর্কে আত্মীয়ার কন্যা ঝর্ণার সংগে বিশুর বিয়ে না দেওয়ায়। বিশু আগে থেকেই ঝর্ণাকে ভালবাসতো। বিশুর বিয়ের পর ঝর্ণার আসা-যাওয়া অবারিত রইলো। এই সূত্রে বিশু ঝর্ণার কাছে নতুন করে প্রেম নিবেদন করলে। নিতাই ওরা অভিসারে যায়; কাজল মুখ বুজে দেখে যায়। কাজলের টান তার ছোট দেবর পাগল অজুর ওপর। অজুও কালোবৌ বলতে অজ্ঞান। বিশু কঠিন অসুখে পড়লো, কাজল বাপের বাড়ি থেকে এসে প্রাণঢালা সেবায় বিশুকে বাঁচিয়ে তুললে, তারপর আবার ফিরে গেল বাপের বাড়িতে। অজুকে তার পিসি জানালে যে, তারই জন্যে কালোবৌ চলে গিয়েছে; সেই দুঃখে অজু গৃহত্যাগ করলে। ওদিকে কাজল পড়লো কঠিন পীড়ায়। ইতিমধ্যে কাজলের বাবা ঝর্ণার বাবার কাছে ঝর্ণা ও বিশুর অভিসারের কথা জানিয়ে আসে। ঝর্ণার বাবা বিশুকে তাদের বাড়িতে আসা নিষেধ করে দেয়। এতোদিনে ঝর্ণাও তার ভুল বুঝতে পারে। বিশু আর ঝর্ণা মুমূর্ষু কাজলের কাছে ক্ষমা চাইতে গেল। পথে পথে ঘুরতে ঘুরতে অজু কাজলদের বাড়ির সামনে এসে কালোবৌয়ের অসুখের কথা শুনে কালীবাড়িতে গিয়ে প্রসাদী ফুল দিয়ে এলো। অজুকে দেখে কাজলের অসুখ ভালো হলো। বিশু ক্ষমা চেয়ে কাজলকে এতোদিনে গ্রহণ করলে।

*   *   *

অতি মামুলি সব ব্যাপার; চিন্তা বা কল্পনার কোন বালাই নেই। আঙ্গিক পারিপাট্য আর অভিনয়ের দিকটায় কিছু কিছু প্রশংসার অংশ পাওয়া যায়, এইমাত্র। ছবিখানি সংগঠনে শিল্পী সঙ্ঘ গোষ্ঠীর ক'জন ছাড়া আর আছেন শব্দ-গ্রহণে নৃপেন পাল, সঙ্গীত পরিচালনায় অনিল বাগচী ও শিল্পনির্দেশে সুনীতি মিত্র। অভিনয়ে আছেন বিকাশ রায়, ছবি বিশ্বাস, জহর গাঙ্গুলী, পাহাড়ী সান্যাল, সুখেন, নরেশ বসু, কেষ্ট দাস, সলিল দত্ত, ছবি ঘোষাল, সন্ধ্যারাণী, শোভা সেন, রেণুকা রায়, তপতী ঘোষ, রেবা বসু, তারা ভাদুড়ী, পদ্মা দেবী, শান্তা দেবী প্রভৃতি।

খেলার মাঠে

একলব্য

ভারতের শ্রেষ্ঠ নক আউট ফুটবল প্রতিযোগিতা—আই এফ এ শীল্ডের খেলা আরম্ভ হয়েছে। অবশ্য ডুরাণ্ড কাপ, আই এফ এ শীল্ড এবং রোভার্স কাপ—দিল্লী কলকাতা ও বোম্বাইয়ের এই তিনটি নক আউট প্রতিযোগিতাই ভারতের প্রধান ফুটবল প্রতিযোগিতা। এর মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ এবং কোনটি শ্রেষ্ঠতম, সেবিষয়ে মত বিরোধ আছে। দিল্লীর অধিবাসীদের কাছে ডুরাণ্ডই শ্রেষ্ঠ। তাদের যুক্তি—ডুরাণ্ড ভারতের সবচেয়ে পুরনো ফুটবল প্রতিযোগিতা। এর জন্ম ১৮৮৮ সালে। বোম্বাইয়ের লোকেরা হয়তো বলবে, তিন বছর পরে রোভার্স কাপের সৃষ্টি হলেও প্রথম সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতা হিসেবে রোভার্সের মর্যাদাই বেশী। কারণ ১৯২৮ সালের পূর্বে ডুরাণ্ডে কোন বে-সামরিক বা ভারতীয় দলের যোগদানের অধিকার ছিল না। ডুরাণ্ড ছিল শুধু সামরিক দলের প্রতিযোগিতা। সুতরাং সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতা হিসেবে রোভার্স পুরনো এবং প্রধান।
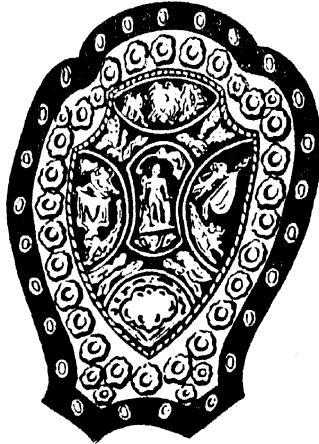
ঐতিহাসিক আই এফ এ শীল্ড

আমরা বাঙালী, আমাদের কাছে আই এফ এ শীল্ডই ভারতের শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগিতা। যেহেতু কলকাতা ভারতের শ্রেষ্ঠ ফুটবল কেন্দ্র এবং প্রাচ্যের সর্ব বৃহৎ ফুটবল সংস্থা আই এফ এ প্রতিযোগিতার পরিচালক। সুতরাং আই এফ এ শীল্ডের শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকার করবে কে? আই এফ এ শীল্ড রোভার্সের চেয়ে বয়সে দু বছরের ছোট হলে কি হবে! সত্যই খেলার আকর্ষণ এবং আভিজাত্য গর্বে আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতার মর্যাদা অনন্য। অতীতে এই খেলাকে কেন্দ্র করে কলকাতা তথা সারা ভারতে উৎসাহ উদ্দীপনার যে সাড়া জাগতো, আজ সে উৎসাহ কোথায়? লীগের খেলা শেষ হবার পরই আই এফ এ শীল্ডকে কেন্দ্র করে কলকাতা ময়দানে আরম্ভ হত সর্বভারতীয় ফুটবল মেলা। ভারতের বিভিন্ন সামরিক ঘাটির সব জাদরেল জাদরেল মিলিটারী টীম, নানা প্রদেশের নানা সিভিল টীম আর বাঙলার জেলা থেকে আসতো ডিস্ট্রিক্ট টীম। জেলা দলগুলির [illegible] বা কত উৎসাহ উদ্দীপনা! তৃতীয় চতুর্থ দশকেও আই এফ এ শী[illegible] রাউণ্ডে তিনটি, চারটি, পাঁচটি, [illegible] আরও বেশী খেলা অনুষ্ঠিত হ[illegible] এক দিনে। জেলা দলগুলির খেলা [illegible] জন্য জেলার লোকদের ভিড়ে মাঠও [illegible] পড়তো। কলকাতা ময়দানের এক [illegible] চলে যেত এক একটি জেলা[illegible] বরিশাল শহরটাই যেন উঠে [illegible] রেঞ্জার্স মাঠে। সেখানে রেঞ্জার্স [illegible] বরিশাল দলের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় [illegible] ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়ের ক্ষীণ ক[illegible] হস্তের পরিমিত তালির শব্দ বরিশা[illegible] দের হৈ-হুল্লোড় এবং প্রাণ[illegible] চীৎকারের মধ্যে ডুবে যেতো। [illegible] আবার দেখা যেতো, দুই [illegible] আধিপত্য, খুলনার সঙ্গে প্রতি[illegible] রাজসাহী বা ঢাকার সঙ্গে [illegible] টানে নতুন সুর। [illegible] নানা জেলার অধিবাসীদের [illegible] সমাবেশ। এক একটি [illegible] জেলার অধিবাসীদের এমন [illegible] ফুটবল খেলার [illegible] গেছে। অন্য কোন ব্যাপারে এমন [illegible] দেখা গেছে বলে মনে পড়ে [illegible] রাজনৈতিক ভাগ্য বিপর্যয় এবং [illegible] বিবর্তনে আজ অবস্থা অন্যরূপ। [illegible] চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল সবই [illegible] বাঙলা এবং আই এফ এ এর [illegible] বহির্ভূত, সব জেলার অধিবাসীই [illegible] আমাদের পর। দেশ বিভাগের [illegible] পাকিস্থানের জেলা হিসেবে দুই একটি [illegible] এখানে খেলতে এলেও সেই দলের খেলা [illegible] কলকাতার অধিবাসীদের প্রাণের সাড়া কোথায়? তাই আই এফ এ শীল্ডে জেলা দলগুলির খেলার এখন আর আকর্ষণ নেই। মিলিটারী এবং ইউরোপীয় সিভিল টীমের আধিপত্যও অনেকদিন খর্ব হয়েছে। কলকাতার জনপ্রিয় কয়েকটি দল এবং বোম্বাই, বাঙ্গালোর, দিল্লী, হায়দরাবাদ প্রভৃতি বাইরের কয়েকটি দলের খেলা নিয়েই এখন আই এফ এ শীল্ডের আকর্ষণ।

* * *

ইণ্ডিয়ান ফুটবল এসোসিয়েশনের দূরদৃষ্টির অভাব এবং পরিচালনার ত্রুটিও আই এফ এ শীল্ডের আকর্ষণ হানির অন্যতম কারণ। এ বছরের কথাই ধরা যাক। লীগের খেলা শেষ হয়েছে মাসখানেক আগে অথচ এখনো শীল্ডের খেলা পুরোদমে আরম্ভ হলো না। একটি আধটি করে নির্গিডিগিভাবে খেলা চলছে। অবশ্য ভারতীয় ফুটবল দলের রাশিয়া সফরই দেরিতে শীল্ডের খেলা

আরম্ভ করার প্রধান কারণ। কিন্তু এমন টিমে তাদের খেলায় কি প্রতিযোগিতার কোন মাধুর্য থাকে? রাশিয়া সফরের আগেই আই এফ এ শীল্ডের খেলা শেষ করা উচিত ছিল, সেটা যখন সম্ভব হয়নি, তখন হয় রাশিয়া সফরকারী খেলোয়াড়দের বাদ দিয়ে শীল্ডের খেলা শেষ করতে হবে কিম্বা তাদের জন্য আরও অপেক্ষা করতে হবে। তা না করে একটা খেলা আরম্ভের পর ৪ দিন পরে আর একটা খেলা আরম্ভের কোন অর্থ হয় না। কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্য—এইভাবে খেলা চালাতে চালাতে রাশিয়া সফরকারী খেলোয়াড়েরা দেশে ফিরে আসবে এবং খেলাও জমে উঠবে। শেষ-মুখে খেলা হয়তো সত্যিই জমে উঠবে, কিন্তু না জমারও সম্ভাবনা আছে। এমাসের বাইশ তেইশ তারিখ পর্যন্ত ভারতীয় খেলোয়াড়দের দেশে ফিরে আসবার কথা। কিন্তু এক অসমর্থিত সংবাদে জানা গেছে রাশিয়ার খেলা শেষ করে ভারতীয় দল হাঙ্গেরী, যুগোশ্লাভিয়া প্রভৃতি স্থানেও কয়েকটি খেলায় অংশ গ্রহণ করবে। একথা সত্যি হলে অক্টোবরের আগে ভারতীয় খেলোয়াড়দের দেশে ফেরবার সম্ভাবনা কোথায়? সুতরাং টিমে তাদের মধ্যে ভারতের শ্রেষ্ঠ নক আউট ফুটবল প্রতিযোগিতা আই এফ এ শীল্ডের তথাকথিত আকর্ষণ জীইয়ে রাখতে হবে। এটা অব্যবস্থারই নামান্তর। আমাদের ফুটবল মরসুম শেষ না হতে অপর দেশ সফরের কোনো অর্থ হয় না। অন্য সময় এই সফরের ব্যবস্থা করা যেতো, তাছাড়া মাত্র ছয় সাতটি অপ্রধান খেলার জন্য একটি দেশে দেড় মাস অবস্থান করতে হবে এই বা কেমন ব্যবস্থা? রাশিয়ায় ভারতের এই সফরকে ফুটবল সফর না বলে ফুটবলের মাধ্যমে প্রমোদ সফর বলাই সঙ্গত। ভারতীয় ফুটবলের পাণ্ডারা ফুটবল মরসুমে খেলোয়াড়দের নিয়ে এই প্রমোদ ভ্রমণ না করলেই ভাল করতেন। এই সফরের জন্য আই এফ এ শীল্ডের মত রোভার্স এবং ডুরাণ্ড প্রতিযোগিতার সুষ্ঠু পরিচালনাও কষ্টসাধ্য হয়ে উঠবে।

* * *

আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতার বার ৬২তম অনুষ্ঠান। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জন্য ১৯৪৬ সালের বিরতি ছাড়া ১৮৯৩ সাল থেকে এপর্যন্ত প্রতি বছরই জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে আই এফ এ শীল্ডের খেলা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। ১৮৯২ সালের শেষদিকে কয়েকজন বিশিষ্ট ক্রীড়ামোদীর প্রচেষ্টায় আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতা পরিচালনার এক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। আই এফ এ শীল্ডের বাস্তবরূপদানে যারা প্রধান উদ্যোগী ছিলেন তাদের মধ্যে কলকাতার প্রথম সৃষ্ট ক্লাব ডালহৌসীর সম্পাদক মিঃ এ ব্রাউন এবং ডালহৌসী ও ক্যালকাটার দুইজন বিশিষ্ট খেলোয়াড় লিণ্ডসে ও ওয়াটসনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অবশ্য শুধু ইউরোপীয় ক্রীড়ামোদীর প্রচেষ্টাতেই আই এফ এ শীল্ডের সৃষ্টি হয়নি। ইউরোপীয় কর্মপ্রচেষ্টার পিছনে একজন ভারতীয় ক্রীড়ামোদীর শ্রম ও অধ্যবসায় আই এফ এ শীল্ডের বাস্তব রূপদানে কম সহায়তা
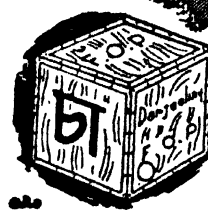
গত ১লা সেপ্টেম্বর ইংলিশ চ্যানেল আতক্রমের দ্বিতীয় প্র-চেষ্টার পূর্বে ভারতীয় সাঁতারু মিহির সেনের গায়ে 'গ্রীজ' মাখানো হচ্ছে। টর্চ ধরে দাঁড়িয়ে আছেন মিহির সেনের ভাবী পত্নী বেলা উইনগার্টেন

করেনি। এই ভারতীয় হচ্ছেন শোভাবাজার ক্লাবের পরলোকগত পরিচালক নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারী। ইনিই ভারতীয় ফুটবলের 'জনক' নামে পরিচিত। আই এফ এ শীল্ড তৈরির জন্য অর্থ সংগৃহীত হয় প্রধানত কোচবিহার ও পাতিয়ালার কোষাগার থেকে। খেলাধুলায় রাজা মহারাজারা চিরদিনই আগ্রহী। তাই আই এফ এ শীল্ডের পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গেই কোচবিহার অধীপ ও পাতিয়ালার মহারাজা এগিয়ে আসেন। স্যার আপকার এবং ডালহৌসীর অপর এক খেলোয়াড় সাদারল্যান্ডও কিছু অর্থ সাহায্য করেছিলেন। লন্ডনের বিখ্যাত কারুশিল্প প্রতিষ্ঠান এলকিংটন এন্ড কোম্পানীর কাছে তাদের কলকাতার এজেন্ট মারফৎ আই এফ এ শীল্ড নির্মাণের 'অর্ডার' দেওয়া হয়। এলকিংটন কোম্পানীর কলকাতার এজেন্টের নাম ছিল ওয়াল্টার লক এন্ড কোম্পানী।

১৮৯৩ সাল থেকে আই এফ এ শীল্ডের খেলা আরম্ভ হয়। সর্বভারতীয় ভিত্তিতে প্রতিযোগিতাকে জনপ্রিয় করবার উদ্দেশ্যে প্রথম বছর দুইটি অঞ্চলে খেলার আয়োজন করা হয়েছিল। এলহাবাদ ও কলকাতা। এলাহাবাদ অঞ্চলের খেলার বিজয়ী শক্তিশালী সামরিক টীম রয়্যাল আইরিশ রাইফেলস ফাইন্যালে কলকাতা অঞ্চলের বিজয়ী অপর মিলিটারী টীম ওয়েস্টার্ন ডিভিশনকে ১—০ গোলে হারিয়ে প্রথমবার আই এফ এ শীল্ড লাভ করে। প্রথম বছরের আই এফ এ শীল্ডে যোগদানকারী ১৩টি দলের মধ্যে একমাত্র ভারতীয় দল ছিল শোভাবাজার ক্লাব। শোভাবাজারের পক্ষে যে কয়জন বাঙালী আই এফ এ শীল্ডের প্রথমবারের প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন, এখানে তাদের নামোল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

শোভাবাজারের পক্ষে খেলেছিলেন কালী মিত্র; কালী মুখার্জি ও মুক্তিদা রায়; নগেন্দ্র সর্বাধিকারী, ডি এন চৌধুরী ও মতিলাল; এম দাশ, এ পাল, ইউ ব্যানার্জি, ডি দাশ ও সূর্যকান্ত দত্ত। আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতার ইতিহাসে এদের নাম চিরদিনই সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে।

ক্রমে ক্রমে আই এফ এ শীল্ডে ভারতীয় দলের সংখ্যা বাড়তে থাকে। কিন্তু ভারতভূমে ইউরোপীয় মিলিটারী ও সিভিল টীমগুলির প্রাধান্যের মধ্যে কোনো ভারতীয় দলই পাত্তা পায় না। তারপর আসে ঐতিহাসিক ১৯১১ সাল। মোহনবাগান ক্লাবের একাদশ বাঙালী ইউরোপীয় প্রাধান্য খর্ব করে লাভ করে আই এফ এ শীল্ড। সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় ফুটবলে নতুন যুগের সৃষ্টি হয়। তারপরও অবশ্য বহুদিন আই এফ এ শীল্ডে সামরিক ও ইউরোপীয় দলের থাকে একচেটিয়া অধিকার। ১৯৩৬ সালে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় শীল্ড ভারতীয় দলের করায়ত্ব হয়। ইউরোপীয় মিলিটারী টীম আই এফ এ শীল্ড লাভ করেছে ৩২বার, ১১বার শীল্ড লাভ করেছে ইউরোপীয় সিভিল টীম আর ভারতীয় দল ১৬বার শীল্ড পেয়েছে। এর মধ্যে পুলিস এবং বি এন্ড এ রেলওয়ে যখন শীল্ড পেয়েছিল, তখন তাদের ইউরোপীয় টীমের মর্যাদা ছিল, এখানে অবশ্য তাদের ভারতীয় দলের হিসেবের মধ্যেই ধরা হচ্ছে। ১৯৪৬ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জন্য শীল্ডের খেলা স্থগিত থাকে। ১৯৫২ সালে রাজস্থান ও মোহনবাগান ক্লাবের মধ্যে ফাইন্যাল খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হবার পর আর খেলার অনুষ্ঠান সম্ভব হয়নি। পরের বছর অর্থাৎ ১৯৫৩ সালেও বোম্বাইয়ের ইণ্ডিয়ান কালচার লীগ এবং ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের মধ্যে ফাইন্যাল খেলার ফলাফল থাকে অমীমাংসিত। শেষে হাইকোর্টের এক আপোস নিষ্পত্তির ফলে ইণ্ডিয়া কালচার লীগকে শীল্ড অর্পণ করা হয়। কলকাতার বাইরের কোন সিভিল টীমের পক্ষে এর আগে আই এফ এ শীল্ড লাভ করা সম্ভব হয়নি। কলকাতার দলগুলির মধ্যে পুলিস এবং বি এন্ড এ রেল

মালদহে অনুষ্ঠিত আন্তঃ জেলা ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইন্যাল খেলায় দুইটি প্রতিদ্বন্দ্বী দল ২৪ পরগণা ও মালদহ জেলা টীমের গ্রুপ ফটো। খেলায় ২৪ পরগণা ১—০ গোলে বিজয়ী হয়ে 'ও' মজুমদার কাপ লাভ করে

দল ছাড়া মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ৪বার করে, মহমেডান স্পোর্টিং তিনবার এবং এরিয়ান ক্লাব একবার আই এফ এ শীল্ড লাভ করেছে।

• • ■

এবার ৪০টি দলকে নিয়ে আই এফ এ শীল্ড খেলার তালিকা রচনা করা হয়েছে। এর মধ্যে ঢাকা ওয়াণ্ডারার্স বাদে বাঙলার বাইরের টীমের সংখ্যা পনেরো। অবশ্য ঢাকা ওয়াণ্ডারার্সও এখন বাঙলার বাইরের টীম, বাঙলার কেন ভারতের বাইরের টীমই বলা সঙ্গত। কলকাতার চারটি টীম মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, এরিয়ান ও রাজস্থান ক্লাব এবং বাইরের চারটি টীম ওয়েস্টার্ন রেলওয়ে (বোম্বাই), হিন্দুস্থান এয়ারক্র্যাফট (ব্যাঙ্গালোর), মহমেডান স্পোর্টিং (করাচী) ও হায়দরাবাদ স্পোর্টিং ক্লাবকে তৃতীয় রাউণ্ড খেলার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। দুইটি জনপ্রিয় দল মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের ফাইন্যালে মিলিত হবার আশা করে দুইটি দলকে রাখা হয়েছে দুই দিকে। মোহনবাগানের দিকে আছে বোম্বাইয়ের ওয়েস্টার্ন রেলওয়ে, ব্যাঙ্গালোরের হিন্দুস্থান এয়ারক্র্যাফট আর কলকাতার মহমেডান স্পোর্টিং ও এরিয়ান ক্লাব। ইস্টবেঙ্গলের দিকে পড়েছে হায়দরাবাদ স্পোর্টিং, করাচীর মহমেডান স্পোর্টিং আর কলকাতার রাজস্থান ক্লাব। রবীন্দ্র স্মৃতিভাণ্ডারে অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবকে প্রথম ম্যাচ 'চ্যারিটি' হিসেবে খেলতে হবে। এখানে তাদের উয়াড়ী কিম্বা রেলওয়ে স্পোর্টস ক্লাবের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সম্ভাবনা। আই এফ এ শীল্ডের দুইটি সেমিফাইন্যাল এবং ফাইন্যালে খেলাও চ্যারিটি ম্যাচ হিসেবে অনুষ্ঠিত হবে বলে ঠিক হয়েছে। অনেক দেরিতে খেলা আরম্ভ হওয়ায় তিনটি ঘেরা মাঠেই শীল্ডের খেলা অনুষ্ঠিত হতে পারবে। নতুন মাটি ফেলে, ঘাস লাগিয়ে এবং জল ছিটিয়ে মোহনবাগান ও মহমেডান মাঠকে বেশ সুন্দর করে তোলা হয়েছে। সাহেবী পরিচর্যার গুণে ক্যালকাটা মাঠ থেকে রাগবী খেলার ক্ষত অপসারণ করতে বেশী সময়ের প্রয়োজন হবে বলে মনে হয় না। পরিবেশ উন্নত ক্রীড়ানৈপুণ্যের অনুকূল। কিন্তু সবাই চাতক পাখীর মত হা করে চেয়ে আছে লাল মাটির দিকে। সোভিয়েট রাশিয়া থেকে ভারতীয় খেলোয়াড়দের ফেরবার কত দেরি!

* * *

প্রথম ভারতীয় হিসেবে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমের উৎকট বাসনা মিহির সেনকে পেয়ে বসেছে। দুবারের ব্যর্থ প্রচেষ্টায় তিনি ইংলিশ চ্যানেলের দরিয়ায় কম হাবুডুবু খাননি। তবু চ্যানেল অতিক্রমের তাঁর দুর্জয় সংকল্প। ইংলিশ চ্যানেল তো বটেই, তা ছাড়া বেচারী মিহির সেন বিদেশ-ভূমে নেশা, পেশা ও আশার দরিয়ায় কম হাবডুবু খাচ্ছেন না। লণ্ডন প্রবাসী মিহির সেনের পেশা ব্যারিস্টারী, নেশা সাঁতার আর আশা ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করবার পর মিস বেলা উইনগার্টেনের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হওয়া। চ্যানেল অতিক্রমের ব্যর্থতাই এঁদের বিয়ের ব্যাপারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। অবশ্য বেলা উইনগার্টেন বলছেন ঃ বিয়ে? ও তো যে কোন সময়েই হতে পারে; আমি তো উইন হয়েই বসে আছি, চ্যানেলের বেলাভূমিতে পেঁছবার অভীষ্ট সিদ্ধ হলেই আনুষ্ঠানিক বিয়ে সম্পন্ন হবে; সঙ্কল্প যেখানে অটুট সেখানে সিদ্ধি অনিবার্য। আমরাও তাই আশা করি।

দুরতিক্রম্য ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করা সহজসাধ্য নয়। পদে পদে বিপদের সম্ভাবনা। সামুদ্রিক জীবজন্তুর যখন তখন আবির্ভাব, 'জেলী ফিসের' অযাচিত আপ্যায়ন, হাড়-কাঁপানো শীতের প্রকোপ, তার উপর বিক্ষুব্ধ ফেনিল জলরাশি। এই অবস্থার মধ্যে দীর্ঘ পথ সাঁতার কেটে পার হওয়া একদিন স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। কিন্তু মানুষের দুর্জয় সংকল্প, তার সাধনা, তার অধ্যবসায় যুগে যুগে অসাধ্যকে সাধন করে চলেছে। ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম আজ আর অসাধ্য সাধনের পর্যায়ে পড়ে না। অনেক সাঁতারু এমন কি, কিশোর-কিশোরীও আজ ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিচ্ছেন; তবুও কোন ভারতীয়ের পক্ষে আজ পর্যন্ত ইংলিশ চ্যানেল জয় করা সম্ভব হয়নি। মিহির সেনের প্রচেষ্টায় সার্থক হলে ভারতীয় সাঁতারের ইতিহাসে তাঁর নাম সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে।

দেশী সংবাদ

২৯শে আগস্ট—আজ ডিব্রুগড়ে এক বিরাট জনসমাবেশে বক্তৃতা প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহরু বলেন, "আমি সুষ্ঠু ধনবণ্টন ও দারিদ্র্যের পূর্ণ উচ্ছেদের পক্ষপাতী। ভারতে যে সমাজবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে প্রত্যেক নরনারীর অন্নবস্ত্র ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করাই উহার লক্ষ্য।"

৩০শে আগস্ট—আজ পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় কোন কোন বিজ্ঞাপিত এলাকায় চা ও তালিকা-ভুক্ত কয়েকটি ফলের উপর প্রবেশকালীন কর ধার্যের জন্য একটি বিল উত্থাপন করিলে তাঁহাকে বিরোধী পক্ষের প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হইতে হয়।

ভারত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কানুনগো কমিটি দশমিক মুদ্রা পদ্ধতি সম্বন্ধে তাঁহাদের রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। শিল্পমন্ত্রী শ্রী নিত্যানন্দ কানুনগো এই কমিটির সভাপতি। তাঁহারা বলেন যে, এক টাকা প্রধান মুদ্রা হিসাবে প্রচলিত থাকিবে এবং ইহার পর হইতে একশত নূতন পয়সায় এক টাকা ধরা হইবে। সরকার এই রিপোর্ট সম্বন্ধে বিবেচনা করিতেছেন।

৩১শে আগস্ট—দিউ মুক্তি সত্যাগ্রহের আহ্বায়ক শ্রীকানুভাই লহরী ঘোষণা করেন যে, সৌরাষ্ট্রের উপকূলবর্তী ক্ষুদ্র পর্তুগীজ উপনিবেশ দিউ-এর মুক্তির জন্য সত্যাগ্রহ আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায় সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি আরম্ভ হইবে।

বর্তমানে উত্তর-বঙ্গের ডুয়ার্স ও তরাই অঞ্চলের চা-বাগানগুলিতে লক্ষাধিক চা-শ্রমিকের ধর্মঘটজনিত গুরুতর পরিস্থিতি সম্বন্ধে এবং হাওড়া, বাউড়িয়া ও উলুবেড়িয়ায় রাষ্ট্রীয় শ্রমিক বীমা বাবদ মজুরী কাটার বিরুদ্ধে চটকল ও সুতাকলের প্রায় ৪০ হাজার শ্রমিকের প্রতিবাদের ফলে যে গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে আলোচনার জন্য আজ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় বিরোধী পক্ষ হইতে দুইটি মুলতুবী প্রস্তাব উত্থাপনের চেষ্টা হয়। কিন্তু স্পীকার প্রস্তাব দুইটিতে অনুমতি না দেওয়ায় ঐগুলি সভায় উত্থাপিত হইতে পারে নাই।

১লা সেপ্টেম্বর—পরিকল্পনা মন্ত্রী শ্রীগুলজারীলাল নন্দ আজ নিঃ ভাঃ কংগ্রেস কমিটির নিকট লিখিত এক পত্রে বলেন, অধিকতর করভার বহনের জন্য দেশকে প্রস্তুত থাকিতে হইবে। কারণ জনসাধারণের নিকট হইতে সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য-ভাবে বাড়াইয়া তুলিতে না পারিলে কোন রূপ অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভবপর হইবে না।

শ্রীপ্রেমনাথ জৈনের নেতৃত্বে ৭১ জন সত্যাগ্রহীর একটি দল আজ ভোরে কারোয়ার সীমান্ত হইতে গোয়ায় প্রবেশ করিয়াছে।

শিলং-এ প্রাপ্ত সংবাদে জানা গিয়াছে যে, উত্তর-পূর্ব সীমান্তে স্বাধীন নাগা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য গত আট বৎসর যাবৎ যে আন্দোলন চলিতেছে, সম্ভবত শীঘ্রই তাহা প্রত্যাহৃত হইবে।

২রা সেপ্টেম্বর—নয়াদিল্লীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে গোয়ার সমস্যা, বিশেষ করিয়া গোয়া সত্যাগ্রহে কংগ্রেস কর্মীদের যোগদানের প্রশ্ন সম্পর্কে সুদীর্ঘ আলোচনা হয়।

বিখ্যাত শিক্ষাবিদ ও বিহার পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান ডাঃ অমরনাথ ঝা আজ পাটনায় অকস্মাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৫৯ বৎসর হইয়াছিল।

৩রা সেপ্টেম্বর—প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহরু আজ নয়াদিল্লীতে নিঃ ভাঃ কংগ্রেস কমিটির ঘরোয়া বৈঠকে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং সকলের কর্মসংস্থান পরিকল্পনার এই দুইটি প্রধান লক্ষ্যকে গণতান্ত্রিক ও শান্তিপূর্ণ উপায়ের দ্বারা বাস্তবে রূপায়িত করিতে হইবে। তিনি আরও বলেন যে, পরিকল্পনা অনুযায়ী উন্নয়নের কাজ দ্রুত সম্পাদন করিতে হইলে স্বভাবতই করভার বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়। এইহেতু পরিকল্পনার প্রত্যেক পর্যায়ে দেশবাসীকে বিস্তৃত অবস্থা ওয়াকিবহাল রাখা একান্ত প্রয়োজন।

৪ঠা সেপ্টেম্বর—নয়াদিল্লীতে নিঃ ভাঃ কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি কর্তৃক গৃহীত গোয়া সম্পর্কিত প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়। উক্ত প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে গোয়ায় ভারতীয় নাগরিকদের ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ পরিহার করা বাঞ্ছনীয়। প্রস্তাবে আরও বলা হইয়াছে যে, ভারত সরকার পর্তুগীজ সরকারের সহিত সহযোগিতার সম্পর্ক ছিন্ন করার পর ভারত ও ভারতস্থ পর্তুগীজ উপনিবেশসমূহের সীমান্ত বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। এমতাবস্থায় ভারতীয় নাগরিকদের গোয়া এলাকায় প্রবেশ ঠিক হইবে না।

নিঃ ভাঃ কংগ্রেস কমিটিতে গোয়া সম্পর্কিত প্রস্তাবটি গৃহীত হওয়ার প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহরু বক্তৃতা প্রসঙ্গে ব[illegible] যে, গোয়ায় ঔপনিবেশিক শাসনের অ[illegible] ঘটানোই গোয়া সম্পর্কে ভারতের নীতির [illegible] উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলে [illegible] ভারতের অন্তর্ভুক্ত হইবে কিনা, গোয়াবাসী তৎসম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

গতকল্য নিখিল ভারত কংগ্রেস ক[illegible] সদস্যগণের তিনটি দল দ্বিতীয় প[illegible] পরিকল্পনা, গ্রাম্যশিল্প ও কংগ্রেসের স[illegible] গত বিষয়ে যে তিনটি রিপোর্ট দেন, [illegible] নিঃ ভাঃ কংগ্রেস কমিটির এক ঘরোয়া স[illegible] সেই রিপোর্টগুলি সম্বন্ধে আলোচনা [illegible] পরিকল্পনা সংক্রান্ত কমিটির রিপোর্টে [illegible] শিক্ষিত বেকারের ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় উ[illegible] প্রকাশ করা হইয়াছে।

বিদেশী সংবাদ

২৯শে আগস্ট—মরক্কোতে এক [illegible] আন্দোলনের সংবাদ অবগত হইয়া দে[illegible] সর্বত্র প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে [illegible] সমাবেশ করিতে আরম্ভ করা হইয়াছে। [illegible] কালে দেশের সর্বত্র শস্যক্ষেত্রসমূহে [illegible] সংযোগ করা হইতেছে।

৩০শে আগস্ট—সমগ্র আলজেরিয়া[illegible] আপৎকালীন অবস্থা বলবৎ করা হইয়াছে।

৩১শে আগস্ট—মঃ গিলবার্ট গ্রা[illegible] মরক্কোর রেসিডেণ্ট জেনারেলের প[illegible] করিয়াছেন বলিয়া ফরাসী সরকার [illegible] সরকারীভাবে ঘোষণা করিয়াছেন।

১লা সেপ্টেম্বর—গাজা সীমান্তে[illegible] পুনরায় ইসরাইল ও মিশরের মধ্যে স[illegible] হয়। আজ এক আকাশ যুদ্ধে ইসরাইল [illegible] বিমানের আক্রমণে দুইটি মিশরীয় বি[illegible] ইসরাইলী এলাকায় ভাঙিয়া পড়ে।

২রা সেপ্টেম্বর—হংকংয়ে সরকারীভা[illegible] ঘোষণা করা হইয়াছে যে, গত এপ্রিল মা[illegible] কাশ্মীর প্রিন্সেস বিমান দুর্ঘটনা সম্প[illegible] বিচারের জন্য জনৈক চীনাকে হং[illegible] কর্তৃপক্ষের নিকট সমর্পণের জন্য জাতীয়[illegible] বাদী চীনের কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জান[illegible] হইবে।

৩রা সেপ্টেম্বর—প্যারিসে সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, আলজেরিয়ায় [illegible] শক্তিশালী সেনাদল রহিয়াছে, উহার আরও শক্তিবৃদ্ধিকল্পে ফ্রান্স সেখানে আরও [illegible] ব্যাটালিয়ন সৈন্য প্রেরণ করিবে।

৪ঠা সেপ্টেম্বর—মালয় ফেডারেশনের মুখ্যমন্ত্রী টেনকু আব্দুল রহমান এক বিবৃতিতে বলেন, বৃটিশ সরকার যদি মালয়কে দুই বৎসরের মধ্যে স্বায়ত্তশাসন এবং ৪ বৎসরের মধ্যে পূর্ণ স্বাধীনতা দানে অসম্মত হন, তবে মন্ত্রিসভা তৎক্ষণাৎ পদত্যাগ করিবে।

প্রতি সংখ্যা—[illegible] বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০,
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা, লিমিটেড, ৬ ও ৮, সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১৩
শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস লিমিটেড হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সম্পাদক—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন

সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

দুর্গত উড়িষ্যা

উত্তরপ্রদেশ, বিহার, আসাম এবং উত্তরবঙ্গের বন্যার্তের দুর্গতি এখনও দূর হয় নাই। কিন্তু সম্প্রতি উড়িষ্যার বালেশ্বর, পুরী এবং কটক জেলায় যে প্রলয়ংকর প্লাবন ঘটিয়াছে, তাহার ভয়াবহতা উত্তর ভারতের অপরাপর অঞ্চলের বন্যাকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে গত একশত বৎসরের মধ্যে উড়িষ্যায় এত বড় বন্যা ঘটে নাই, ভারতের অন্যত্র ঘটিয়াছে কি না, এ বিষয়েও সন্দেহ রহিয়াছে। বন্যার ফলে লক্ষ লক্ষ নরনারী অসহায় অবস্থায় অন্যান্য অঞ্চল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। কত লোক যে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, এখনও সুনিশ্চিতভাবে জানা যাইতেছে না। উড়িষ্যা সরকার হইতে যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে ৩৭ জন লোকের প্রাণহানি ঘটিয়াছে বলা হইয়াছে; কিন্তু সব অঞ্চল হইতে সঠিক খবর পাওয়া যায় নাই। সুতরাং সংখ্যা ইহার অপেক্ষা অনেক বেশী বলিয়াই আশঙ্কা হয়। বহু লোক জলে ভাসিয়া গিয়াছে, এবং অনেক নরনারী বিপন্ন অবস্থায় অবিশ্রান্ত বারিবর্ষণের ফলে হয়ত শীতে এবং অনাহারে মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়াছে। যাহারা কোন রকমে বাঁচিয়া আছে, তাহারা অন্নাভাবে একান্ত ক্লিষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। কটক, পুরী এবং বালেশ্বরে চাউলের দর অগ্নি-মূল্যে উঠিয়াছে। কোন কোন স্থানে চাউল একেবারেই পাওয়া যাইতেছে না। ক্ষুধার তাড়নায় লোকজন বেপরোয়া হইয়া উঠিয়াছে। ক্ষুধার্ত নরনারীরা কোথাও কোথাও খাদ্যবাহী সরকারী ট্রাক আটক করিয়া খাদ্যদ্রব্য লুঠিয়া লইয়াছে, এমন সংবাদও পাওয়া গিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ হইতে খাদ্য, নৌকা প্রভৃতি সরবরাহ করিয়া বন্যার্ত নরনারীর রক্ষার ব্যবস্থা করা হইতেছে। ভারত সরকারের সেনা-বিভাগ হইতে বহু সংখ্যক বিমান বন্যার্তদের রক্ষার জন্য নিযুক্ত করা হইয়াছে। বিপন্ন অঞ্চলে ক্রমাগত চাউল, ঔষধপত্র, বস্ত্র প্রভৃতি প্রেরিত হইতেছে। উদ্ধারকার্য পরিচালনার জন্য পশ্চিমবঙ্গ হইতে অনেক নৌকা গিয়াছে। ভারত সরকার ইহাও জানাইয়াছেন যে, বন্যার্ত-দের সাহায্যের জন্য তাঁহারা সর্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। ইহা আশার কথা। কিন্তু আবহাওয়া যেরূপ দুর্যোগপূর্ণ, তাহাতে সংকট সহজে কাটিবে না, ইহাই ভয় হয়। ৯ দিন পর বন্যার জল হ্রাস পাইয়াছে; কিন্তু ইহার পরও অনেকদিন পর্যন্ত দুর্গত নরনারীকে রক্ষার জন্য সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা ক্রমাগত চালাইতে হইবে। সরকারের সহিত আর্ত রক্ষার কার্যে জনসাধারণের সহ-যোগিতা একান্ত আবশ্যক। উড়িষ্যার বন্যাপীড়িত নরনারীদিগকে সাহায্য করিবার জন্য পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীকে পৃষ্ঠপোষক করিয়া একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে। মানব-সেবার এই মহান্ ব্রতে পশ্চিমবঙ্গ সর্বতোভাবে আগাইয়া আসিবে, আমরা ইহাই আশা করি।

প্রলয়ের পূর্বাভাস

গত ২৪শে ভাদ্র কলিকাতার ইউনিভার্সিটি ইন্স্টিটিউট হলে আয়োজিত জনকল্যাণ কার্যে আণবিক শক্তি প্রদর্শনীর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ভাষণ প্রসঙ্গে প্রখ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক সত্যেন বসু বলেন, বিভিন্ন স্থানে উদজান বোমা বিস্ফোরণের পরীক্ষার উপর কলিকাতার সমস্ত বাড়ী, এমন কি পল্লী অঞ্চলেও বাসগৃহের উপর তেজস্ক্রিয় ভস্ম জমিয়া থাকিতে দেখা গিয়াছে। কিছুকাল যাবৎ বৃষ্টির জলের সঙ্গেও তেজস্ক্রিয় ভস্ম পড়িতেছে। অধ্যাপক বসু গোপন কথা হিসাবেই ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি একথাও বলিয়াছেন যে, উদজান বোমা বিস্ফোরণের এইসব পরীক্ষার ফলেই আবহাওয়ার ক্ষেত্রে বর্তমানে নানাবিধ বিপর্যয় দেখা যাইতেছে অনেকের ইহা বিশ্বাস। কিন্তু তেজস্ক্রিয় পদার্থ এইভাবে বায়ুমণ্ডলে ব্যাপ্ত হইবার ফলে কি ঘটিতে পারে না পারে বৈজ্ঞানিকগণ অদ্যাপি তাহা স্থির করিয়া বলিতে পারেন না। উড়িষ্যার প্রলয়ংকর বন্যার মূলে তেজস্ক্রিয় ভস্ম আছে। অধ্যাপক বসুর মতে একথা বলা অত্যন্তই কঠিন। অনুষ্ঠানে বক্তাগণ সকলেই তাঁহাদের ভাষণে শান্তির কাজে আণবিক শক্তি প্রয়োগের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন এবং এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, শান্তির কাজে আণবিক শক্তি নিয়োজিত হইলে বিশ্বে সুখ ও সমৃদ্ধির এক নূতন যুগের সূচনা

রবীন্দ্রনাথের শেষ গল্প

[এই লেখাটি পূর্ণাঙ্গ ছোটগল্প নয়। গল্পের খসড়া মাত্র। এটি প্রথম রচিত হয় ২৪।৬।৪১ তারিখে পরে ২৫।৬।৪১ তারিখে পরিবর্তিত হয়। এই খসড়াটি রোগশয্যায় রবীন্দ্রনাথ মুখে মুখে বলে গিয়েছেন, অন্যেরা লিখে নিয়েছেন। এর পূর্ণ রূপ তিনি দিয়ে যেতে পারেননি। এইটিই তাঁর শেষ গল্প রচনার চেষ্টা। তাঁর কাহিনী রচনার প্রথমদিকে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব লক্ষ্য করা যায় এবং অত্যন্ত ঘটনামূলক প্লট রচনার ঝোঁকও দেখা যায়। এই অসম্পূর্ণ গল্পের প্লটটিতে এ দুয়ের ছাপ রয়েছে। এই খসড়া গল্পের ঠিক পূর্ববর্তী রচনা, "প্রগতি সংহার" এবং "শেষ কথা" ও তিনসঙ্গীর গল্পগুলির সঙ্গে এর মিল কম। এই প্রসঙ্গে শ্রীপ্রমথনাথ বিশীর "রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প" গ্রন্থের পরিশিষ্টে শ্রীপুলিনবিহারী সেন সঙ্কলিত রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের ইতিহাস দ্রষ্টব্য। — সম্পাদক]

তখন অরাজকতার চরগুলো কণ্টকিত করে রেখেছিল রাষ্ট্রশাসন, অপ্রত্যাশিত অত্যাচারের অভিঘাতে দোলায়িত হোত দিন রাত্রি। দুঃস্বপ্নের জাল জড়িয়েছিল জীবনযাত্রার সমস্ত ক্রিয়াকর্মে, গৃহস্থ কেবলি দেবতার মুখ তাকিয়ে থাকত, অপদেবতার কাল্পনিক আশঙ্কায় মানুষের মন থাকত আতঙ্কিত। মানুষে হোক আর দেবতাই হোক কাউকে বিশ্বাস করা কঠিন ছিল, কেবলি চোখের জলের দোহাই পাড়তে হোত। শুভ কর্ম এবং অশুভ কর্মের পরিণামের সীমারেখা ছিল ক্ষীণ। চলতে চলতে পদে পদে মানুষ হোঁচট খেয়ে খেয়ে পড়ত দুর্গতির মধ্যে, এমন অবস্থায় বাড়িতে রূপসী কন্যার অভ্যাগম ছিল যেন ভাগ্যবিধাতার অভিসম্পাত। এমন মেয়ে ঘরে এলে পরিজনেরা সবাই বলত পোড়ারমুখী বিদায় হোলেই বাঁচি, সেই রকমেরই একটা আপদ এসে জুটেছিল তিন মহলার তালুকদার বংশীবদনের ঘরে। কমলা ছিল সুন্দরী, তার বাপ মা গিয়েছিল মারা, সেই সঙ্গে সেও বিদায় নিলেই পরিবার নিশ্চিন্ত হোত। কিন্তু তা হোলো না, তার কাকা বংশী অত্যন্ত স্নেহে অত্যন্ত সতর্কভাবে এতকাল তাকে পালন করে এসেছে। তার কাকী কিন্তু প্রতিবেশিনীদের কাছে প্রায়ই বলত, "দেখ তো ভাই, মা বাপ ওকে রেখে গেল কেবল আমাদের মাথায় সর্বনাশ চাপিয়ে, কোন্ সময় কী হয় বলা যায় না; আমার এই ছেলেপিলের ঘর, তারি মাঝখানে ও যেন সর্বনাশের মশাল জ্বালিয়ে রেখেছে, চারিদিক থেকে কেবল দুষ্টলোকের দৃষ্টি এসে পড়ে, ঐ একলা ওকে নিয়ে আমার ভরাডুবি হবে কোন্‌দিন, সেই ভয়ে আমার ঘুম হয় না।"

এতদিন চলে যাচ্ছিল এক রকম করে, এখন আবার বিয়ের সম্বন্ধ এল। সেই ধুমধামের মধ্যে আর তো ওকে লুকিয়ে রাখা চলবে না। ওর কাকা বলত, "সেইজন্যই আমি এমন ঘরে পাত্র সন্ধান করছি যারা মেয়েকে রক্ষা করতে পারবে।" ছেলেটি মোচাখালির পরমানন্দ শেঠের মেজো ছেলে। অনেক টাকার তবিল চেপে বসে আছে, বাপ মলেই তার চিহ্ন পাওয়া যাবে না। ছেলেটি ছিল বেজায় শৌখিন—বাজপাখি উড়িয়ে, জুয়ো খেলে, বুলবুলের লড়াই দিয়ে খুব বুক ঠুকেই টাকা ওড়াবার পথ খোলসা করেছিল, নিজের সম্পদের গর্ব ছিল তার খুব, অনেক ছিল মাল। মোটা মোটা ভোজপুরী পালোয়ান ছিল, সব বিখ্যাত লাঠিয়াল। সে বলে বেড়াত, সমস্ত তল্লাটে কোন্ ভগ্নিপতির পুত্র আছে সে, ওর গায়ে হাত দিতে পারে। মেয়েদের সম্বন্ধে সে ছেলেটি বেশ একটু শৌখিন ছিল, তার এক স্ত্রী আছে, আর একটি নবীন বয়সের সন্ধানে সে ফিরছে, কমলার রূপের কথা তার কানে উঠল। শেঠবংশ খুব ধনী, খুব প্রবল। ওকে ঘরে নেবে এই হোলো তাদের পণ। কমলা কেঁদে বলে, "কাকামণি, কোথায় আমাকে ভাসিয়ে দিচ্ছ?"

"তোমাকে রক্ষা করবার শক্তি থাকলে চিরদিন তোমাকে বুকে করে রাখতুম, জানো তো মা!"

বিবাহের সম্বন্ধ যখন হোলো তখন ছেলেটি বুক ফুলিয়ে এল আসরে, বাজনা বাদ্যি সমারোহের অন্ত ছিল না। কাকা হাত জোড় করে বললে, "বাবাজী, এত ধুমধাম করা ভালো হচ্ছে না, সময় খুব খারাপ।" শুনে সে আবার ভগ্নিপতির পুত্রদের আস্পর্ধা করে বললে, "দেখা যাবে কেমন সে কাছে ঘেঁষে।" কাকা বললে, "বিবাহ অনুষ্ঠান পর্যন্ত মেয়ের দায় আমাদের, তারপর মেয়ে এখন তোমার, তুমি ওকে নিরাপদে বাড়ি পৌঁছবার দায় নাও, আমরা এ দায় নেবার যোগ্য নই, আমরা দুর্বল।" ও বুক ফুলিয়ে বললে, "কোনো ভয় নেই।" ভোজপুরী দারোয়ানরা গোঁফ চাড়া দিয়ে দাঁড়ালো সব লাঠি হাতে। কন্যা নিয়ে চললেন বর সেই বিখ্যাত মাঠের মধ্যে,

তালতড়ির মাঠ। মধুমোল্লার ছিল ডাকাতের সর্দার, সে তার দলবল নিয়ে রাত্রি যখন দুই প্রহর হবে, মশাল জ্বালিয়ে হাঁক দিয়ে এসে পড়ল। তখন ভোজপুরীদের বড়ো কেউ বাকি রইল না। মধুমোল্লার ছিল বিখ্যাত ডাকাত, তার হাতে পড়লে পরিত্রাণ নেই। কমলা ভয়ে চতুর্দোলা ছেড়ে ঝোপের মধ্যে লুকোতে যাচ্ছিল এমন সময় পিছনে এসে দাঁড়াল বৃদ্ধ হবির খাঁ, তাকে সবাই পয়গম্বরের মতোই ভক্তি করত। হবির সোজা দাঁড়িয়ে বললে, "বাবাসকল তফাৎ যাও, আমি হবির খাঁ।" ডাকাতরা বললে, "খাঁ সাহেব, আপনাকে তো কিছু বলতে পারব না কিন্তু আমাদের ব্যবসা মাটি করলেন কেন।" যাই হোক তাদের ভঙ্গ দিতেই হোলো। হবির এসে কমলাকে বললে, "তুমি আমার কন্যা। তোমার কোনো ভয় নেই, এখন এই বিপদের জায়গা থেকে চলো আমার ঘরে।" কমলা অত্যন্ত সংকুচিত হয়ে উঠল। হবির বললে, "বুঝেছি তুমি হিন্দু ব্রাহ্মণের মেয়ে, মুসলমানের ঘরে যেতে সংকোচ হচ্ছে, কিন্তু একটা কথা মনে রেখো যারা যথার্থ মুসলমান, তারা ধর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণকেও সম্মান করে, আমার ঘরে তুমি হিন্দুবাড়ির মেয়ের মতোই থাকবে। আমার নাম হবির খাঁ। আমার বাড়ি খুব নিকটে, তুমি চলো, তোমাকে আমি খুব নিরাপদে রেখে দেব।" কমলা ব্রাহ্মণের মেয়ে, সংকোচ কিছুতে যেতে চায় না। সেই দেখে হবির বলল, "দেখো, আমি বেঁচে থাকতে এই তল্লাটে কেউ নেই যে, তোমার ধর্মে হাত দিতে পারে। তুমি এসো আমার সঙ্গে, ভয় কোরো না।" হবির খাঁ কমলাকে নিয়ে গেল তার বাড়িতে। আশ্চর্য এই, মুসলমান বাড়ির আটমহলা বাড়ির এক মহলে আছে শিবের মন্দির আর হিন্দুয়ানির সমস্ত ব্যবস্থা। একটি বৃদ্ধ হিন্দু ব্রাহ্মণ এল। সে বললে, "মা, হিন্দুর ঘরের মতো এ জায়গা তুমি জেনো, এখানে তোমার জাত রক্ষা হবে।" কমলা কেঁদে বললে, "দয়া করে কাকাকে খবর দাও তিনি নিয়ে যাবেন।" হবির বললে, "বাছা, ভুল করছ, আজ তোমার বাড়িতে কেউ তোমাকে ফিরে নেবে না, তোমাকে পথের মধ্যে ফেলে দিয়ে যাবে। না হয় একবার পরীক্ষা করে দেখ।" হবির খাঁ কমলাকে তার কাকার খিড়কির দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে বললে, "আমি এখানেই অপেক্ষা করে রইলুম।" বাড়ির ভিতর গিয়ে কাকার গলা জড়িয়ে ধরে কমলা বললে, "কাকামণি আমাকে তুমি ত্যাগ কর না।" কাকার দুই চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। কাকী এসে দেখে বলে উঠল—"দূর করে দাও, দূর করে দাও অলক্ষ্মীকে, সর্বনাশিনী বেজাতের ঘর থেকে ফিরে এসেছিস, আবার তোর লজ্জা নেই।" কাকা বললে, "উপায় নেই মা, আমাদের যে হিন্দুর ঘর, এখানে তোমাকে কেউ ফিরে নেবে না, মাঝের থেকে আমাদেরও জাত যাবে।" মাথা হেঁট করে রইল কমলা কিছুক্ষণ, তারপর ধীর পদক্ষেপে খিড়কির দরজা পার হয়ে হবিরের সঙ্গে চলে গেল, চিরদিনের মত বন্ধ হল তার কাকার ঘরে ফেরার কপাট।

হবির খাঁর বাড়িতে তার আচার ধর্ম পালন করবার ব্যবস্থা রইল। হবির খাঁ বললে, "তোমার মহলে আমার ছেলেরা কেউ আসবে না, এই বুড়ো ব্রাহ্মণকে নিয়ে তোমার পূজা-আর্চা হিন্দুঘরের আচার-বিচার মেনে চলতে পারবে।" এই বাড়ি সম্বন্ধে পূর্বকালের একটু ইতিহাস ছিল। এই মহলকে লোকে বলত রাজপুতানীর মহল। পূর্বকালের নবাব এনেছিলেন রাজপুতের মেয়েকে কিন্তু তাকে তার জাত বাঁচিয়ে আলাদা করে রেখেছিলেন। সে শিবপূজা করত, মাঝে মাঝে তীর্থ ভ্রমণেও যেত। তখনকার অভিজাতবংশীয় মুসলমানেরা ধর্মনিষ্ঠ হিন্দুকে শ্রদ্ধা করত। সেই রাজপুতানী এই মহলে থেকে যত হিন্দু বেগমদের আশ্রয় দিত, তাদের আচার-বিচার থাকত অক্ষুণ্ণ। শোনা যায় এই হবির খাঁ সেই রাজপুতানীর পুত্র। যদিও সে মায়ের ধর্ম নেয়নি, কিন্তু সে মাকে পূজা করত অন্তরে, সে মা তো এখন আর নেই, কিন্তু তার স্মৃতি রক্ষাকল্পে এই রকম সমাজ-বিতাড়িত, অত্যাচারিত হিন্দু মেয়েদের বিশেষভাবে আশ্রয় দান করার ব্রত তিনি নিয়েছিলেন।

কমলা তাদের কাছে যা পেল তা সে নিজের বাড়িতে কোনদিন পেত না। সেখানে কাকী তাকে দূরছাই করত, কেবলি শুনত সে অলক্ষ্মী, সে সর্বনাশী, সঙ্গে এনেছে সে দুর্ভাগ্য, সে মলেই বংশ উদ্ধার পায়। তার কাকা তাকে লুকিয়ে মাঝে মাঝে কাপড়চোপড় কিছু দিতেন, কিন্তু কাকীর ভয়ে সেটা গোপন করতে হত। রাজপুতানীর মহলে এসে সে যেন মহিষীর পদ পেলে। এখানে তার আদরের অন্ত ছিল না। চারিদিকে তার দাসদাসী, সবই হিন্দু ঘরের ছিল।

অবশেষে যৌবনের আবেগ এসে পৌঁছল তার দেহে। বাড়ির একটি ছেলে লুকিয়ে লুকিয়ে আনাগোনা শুরু করল কমলার মহলে, তার সঙ্গে সে মনে মনে বাঁধা পড়ে গেল, তখন সে হবির খাঁকে একদিন বললে—"বাবা, আমার ধর্ম নেই, আমি যাকে ভালোবাসি সেই ভাগ্যবানই আমার ধর্ম। যে ধর্ম চিরদিন আমাকে জীবনের সব ভালবাসা থেকে বঞ্চিত করেছে, অবজ্ঞার আস্তা-কুঁড়ের পাশে আমাকে ফেলে রেখে দিয়েছে, সে ধর্মের মধ্যে আমি ত দেবতার প্রসন্নতা কোনদিন দেখতে পেলুম না। সেখানকার দেবতা . আমাকে প্রতিদিন
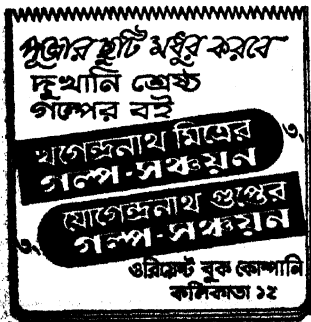
অপমানিত করেছে, সেকথা আজো আমি ভুলতে পারিনে। আমি প্রথম ভালবাসা পেলুম বাপজান তোমার ঘরে। জানতে পারলুম হতভাগিনী মেয়েরও জীবনের মূল্য আছে। যে দেবতা আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন, সেই ভালবাসার সম্মানের মধ্যে তাঁকেই আমি পুজো করি, তিনিই আমার দেবতা; তিনি হিন্দুও নন মুসলমানও নন। তোমার মেজো ছেলে করিম, তাকে আমি মনের মধ্যে গ্রহণ করেছি, আমার ধর্মকর্ম ওরি সঙ্গে বাঁধা পড়েছে। তুমি মুসলমান করে নাও আমাকে, তাতে আমার আপত্তি হবে না; আমার না হয় দুই ধর্মই থাকল।"

এমনি করে চলল ওদের জীবনযাত্রা, ওদের পূর্বতন পরিজনদের সঙ্গে আর দেখা সাক্ষাতের কোন সম্ভাবনা রইল না। এদিকে হবির খাঁ কমলা যে ওদের পরিবারের কেউ নয়, সে কথা ভুলিয়ে দবার চেষ্টা করলে, ওর নাম হল মহেরজান।

ইতিমধ্যে ওর কাকার দ্বিতীয় মেয়ের ববাহের সময় এল। তার বন্দোবস্তও ল পূর্বের মত, আবার এল সেই বিপদ। থের মধ্যে হুংকার দিয়ে এসে পড়ল সই ডাকাতের দল। শিকার থেকে কবার তারা বঞ্চিত হয়েছিল, সে দুঃখ দের ছিল, এবার তার শোধ নিতে চায়। কন্তু তারি পিছন পিছন আর এক ংকার এল "খবরদার।" "ঐরে, হবির ির চেলারা এসে সব নষ্ট করে দিলে।" ন্যাপক্ষরা যখন কন্যাকে পালকির মধ্যে লে রেখে যে যেখানে পেল দৌড় রতে চায়, তখন তাদের মাঝখানে দেখা ল হবির খাঁয়ের অর্ধচন্দ্র আঁকা তাকা-বাঁধা বর্শার ফলক। সেই বর্শা য়ে দাঁড়িয়েছে নির্ভয়ে একটি রমণী। লাকে তিনি বললেন, "বোন্, তোর র নেই। তোর জন্য আমি তাঁর আশ্রয় য়ে এসেছি যিনি সকলকে আশ্রয় ন। যিনি কারু জাত বিচার করেন । কাকা প্রণাম তোমাকে, ভয় নেই মার পা ছোঁব না। এখন একে মার ঘরে নিয়ে যাও, একে কিছুতে শ্য করেনি। কাকীকে বল অনেক- তাঁর অনিচ্ছুক অন্নবস্ত্রে মানুষ সে ঋণ যে আমি এমন করে আজ শুধতে পারব, তা ভাবিনি। ওর জন্যে একটি রাঙা চেলী এনেছি, সে এই নাও, আর একটি কিংখাবের আসন। আমার বোন যদি কখন দুঃখে পড়ে, তবে মনে থাকে যেন তার মুসলমান দিদি আছে তাকে রক্ষা করবার জন্যে।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[শান্তিনিকেতন হইতে প্রকাশিত 'ঋতু-পত্র' বর্ষা সংখ্যা ১৩৬২ হইতে উদ্ধৃত]

মনে এলো

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

অনেক দিন বাদে আবার লিখছি। 'সবুজ পত্রে' যখন লেখা শুরু করি, তখন 'দাদার ডায়েরি' দিয়েই আরম্ভ করি। তাতে খোলা-মেলা ভাবে অনেক কথাই বলা চলত। এই ফর্ম-টাই আমার পছন্দ, বাঁধা-ধরা ভাবে লিখতে হয় না। পাঁচ রকম ব্যাপার দেখে ও দু-দশটা নতুন বই পড়ে যেসব কথা মনে হচ্ছে তাই লিখছি। মধ্যে মধ্যে পুরানো দিনের কথা, পুরানো মানুষদের কথাও এসে যায়। তাই কলমের আগায় যেটা স্বতই আসছে, তাকে 'মনে এলো'—ছাড়া আর কি বলা যায়!

—লেখক

১৭-৭-৫৫

অসহ্য গরম, অসম্ভব গুমোট। অসভ্য শহর আলিগড়। এখানে বিশ্ববিদ্যালয় খাড়া করবার সংগত কারণ খুঁজে পাই না। আগে না হয় পাকিস্তানের রঙরুট তৈরী হতো এখানে, কিন্তু এখন? এমন একটি বই-এর দোকান নেই যেখানে যাওয়া যায়, বই ঘাঁটা যায়, বিদেশ থেকে বই আনাবার অর্ডার দেওয়া যায়। কফি পাওয়া যায় না, সিগারেট নয়। দেয়াশলাই যা পাওয়া যায়, তা জ্বলে না। এত বড় নোংরা শহর ভারতবর্ষে নেই। শহরের মধ্যে খোলা নালা; সেখানে ময়লা পচছে বছরের পর বছর, কেউ আপত্তি করে না। বহু পুরাতন শহর। গুপ্ত যুগের মূর্তি পাওয়া গেছে; পাঠান, মুঘল, রাজপুত, মারহাট্টা, ফরাসী সকলেই এসেছে আর গেছে।

তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপযুক্ত একাডেমিক স্বাধীনতা আছে। পজিটিভ কিছু নয়, তবে কাজে কোনো বাধা নেই। দেরি হয় খুব অবশ্য। ঢিলে জায়গা। কাজের কোনো ঐতিহ্য নেই। গড়ে তুলতে হবে—এবং গড়ছে বলে আমার বিশ্বাস। ছেলেদের মনে যেন একটু রঙ ধরেছে। ছাত্ররা ও নতুন লেকচারারের দল গ্রীষ্মের ছুটিতে লু ও আঁধির মধ্যেও খুব পরিশ্রম করলে। এরা দেশকে জানত না, এখন দেশ আছে বুঝেছে। অর্থনীতিতে বাস্তবতার ঝোঁক এনে দিতে পারলে আমি কৃতার্থ হব। সকলেই খুব ভদ্র। যৌবনসুলভ তেজ যেন একটু কম। ভালোই। ছাত্রসমাজের ব্যাপার দেখে ভয় হয়। তাদের ভবিষ্যৎ দেখে ততটা নয়, যতটা আমাদের বোঝবার অক্ষমতা ও নিঃস্পৃহতা দেখে। কী ভণ্ডুলটাই না হলো! এখনও হচ্ছে, এলাহাবাদ আর লক্ষ্ণৌএ।

সাতটি মেয়ে এম-এ ক্লাশে ভর্তি হয়েছে। বুরখা প'রে এলে ক্লাশে ঢুকতে দেবার অনিচ্ছা প্রকাশ করলাম। হেসে বুরখা খুলে ফেল্লে। নিজেরা কেউ চায় না পরতে, বাড়ির গিন্নীরাই চান। যারা বুরখা পরে না তাদের মধ্যে অনেকগুলি অত্যন্ত বুদ্ধিমতী, কর্মিষ্ঠা। একটি মেয়েকে লেকচারার নিযুক্ত করলাম। পর্দা চলে যাচ্ছে। আশা করি, সংযম টুটবে না। ভারতীয় মেয়েদের শরমের মধ্যে যে গাম্ভীর্য ও শালীনতা আছে, তার তুলনা কুত্রাপি নেই। এখনও—তবে যেন কমছে সন্দেহ হলো কোলকাতার হালচাল দেখে।

২০-৭-৫৫

ট্রেনে অমিয়ভূষণ মজুমদারের 'নীল ভুঁইয়া' পড়লাম। সহযাত্রী এক জার্মান এঞ্জিনীয়ার। দামোদর ভ্যালির কাজে এসেছেন। বাঙলা দেশ পছন্দ হয়েছে শুনে খুশী হতে পারলাম না। নিজের কাছেই আশ্চর্য ঠেকল। তেত্রিশ বৎসর বাঙলার বাইরে থাকার এবং যুক্তপ্রদেশের লোকেদের সঙ্গে আন্তরিকভাবে মেলামেশার দরুণ ঐ ধরনের আত্মতৃপ্তি আর বড় আসে না। তবে বাঙালী ভালো ও নতুন কাজ করছে শুনলে মনটা ভরে ওঠে।

অমিয়ভূষণের উপন্যাসখানি নতুন ধরনের। নিছক গল্প এবং গল্পের বহতা আছে। বহতার দুটি ধারা—সিপাহী বিদ্রোহের সময় সামাজিক পরিবর্তনের এবং চরিত্রের অভিব্যক্তির। অনেক দূর পর্যন্ত এই দুই ধারার বেশ যোগাযোগ রয়েছে। সামাজিক ঘাত-প্রতিঘাতের জন্য চরিত্রের যে অভিব্যক্তি, তাতে বেগ থাকে। কিন্তু যদি স্বতঃস্ফূর্ত, নিরালম্ব চরিত্রসৃষ্টি কাম্য হয়, যেমন নয়নতারা, তবে তার মধ্যে বেগ আনা প্রায় দুষ্কর। এইপ্রকার চরিত্রের বিকাশধর্ম ভিন্ন প্রকৃতির—ফুল ফোটার মতন, যদিও ফুল ফোটা প্রতিবেশ-নিরপেক্ষ নয়। ভারি কঠিন কাজ। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় পাঁকাল মাছ হতে হবে। যোগীদেরই সম্ভব; আর সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ প্রতিভার। হাড্‌সন-এর রিমা, গয়টের মিনং,—এইরকমের মুক্ত চিত্র কজনই বা ফোটাতে পারেন! বিকাশ ও অভিব্যক্তি পৃথক্। কখনও কখনও বিরোধী।

* * *

মানিক (সত্যজিৎ রায়) আমাকে পথের পাঁচালী ফিল্‌ম্ দেখালে। অপূর্ব সৃষ্টি। নানা ত্রুটি সত্ত্বেও অতুলনীয়। দেশী ফিল্‌ম্‌কে নতুন স্তরে তুলে দিলে। মানিকের প্রতিভা স্বীকার না করে থাকা যায় না। ওটা তার জন্মাধিকার সূত্রে পাওয়া। এমন 'সেন্‌সিটিভ' ফটোগ্রাফি আমার চোখে পড়েনি। এর সম্পূর্ণতা 'লিরিক্‌'-এর এবং এর গতি বিকাশধর্মের, সামাজিক ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে যে অভিব্যক্তি তার নয়। পাড়া-গাঁ উচ্ছন্ন গেল, নতুন কিছু যে আসছে তারও ইঙ্গিত অস্পষ্ট। কাশী যাওয়া সামাজিক প্রগতির ইঙ্গিত নয়, পলায়নের। ('খগেনবাবু'ও কাশী পালিয়েছিলেন।) কিন্তু তাতে বিশেষ কিছু আসে যাচ্ছে না। অপু বাড়ছে—এই যথেষ্ট। অপু মানুষ হবে কিনা তাও বলা যায় না। তবু সে বাড়ছে, সে কিশোর হবে। বাড়ছে, কিন্তু সত্যই ফুটছে কি? নীরেন লিখেছিল—অপু

অপরাজিত নয়, অপরিণত। বই-এর দিক থেকে খাঁটি কথা—কিন্তু ফিল্‌ম্‌-এ সে-কথা উঠছে না। অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখালে মানিক ও তার ফটোগ্রাফার।

* * *

ডাঃ বিধান রায়ের খাস্‌ কামরায় গিয়েছিলাম সেদিন। বাঙলা দেশের অর্থনীতিবিদ্‌রা তাঁর প্ল্যান সম্বন্ধে গোটা কয়েক প্রশ্ন করেছিলেন। ডাঃ রায় উত্তর দিলেন। আমি ছিলাম সুশীল দে-র অতিথি। উত্তরই শুনলাম; আলোচনার গন্ধ পর্যন্ত পেলাম না। অত্যন্ত হতাশ হয়ে বাড়ি ফিরলাম। ডাঃ রায়ের উত্তরের পর দুটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেলঃ (১) প্রশান্ত-বাবুর প্ল্যান-ফ্রেম্‌ ডিডাক্‌টিভ্‌, আর বিধানবাবুর ইন্‌ডাকটিভ্‌। (২) বিধান-বাবুর প্ল্যান ডিমোক্রেটিক, আর প্রশান্তবাবুর টোট্যালিটারিয়ন! সোজা ব্যাপার! কোলকাতায় আজকাল কোথায় নতুন বই পাওয়া যায় জানি না, নচেৎ ইচ্ছে হচ্ছিল কয়েকজনকে Weldon-এর 'Vocabulary of Politics' কিনে উপহার দিই। বইটা ছোট ও সস্তা—পেলিক্যান। টোট্যালিটারিয়ন, ডিমো-ক্রেটিক ইত্যাদি অর্থনীতির ভাষা নয়, পলিটিক্‌সের এবং পচা পলিটিক্‌সের। এবং সামাজিক ব্যাপারের শাস্ত্রে মিল সাহেব বহু পূর্বে দেখিয়েছেন যে, ডিডাক্‌টিভ্‌, ইন্‌ডাকটিভ্‌ প্রভৃতি সংজ্ঞা অচল। বাঙলা দেশে ডাঃ রায়ের কর্তৃত্ব অপ্রতিহত। মাথা তাঁর বৈজ্ঞানিকের, প্রতিপত্তি বৃদ্ধের ও অভিজ্ঞতার, এবং তথ্যের উপর তাঁর অদ্ভুত দখল। উপস্থিত অধ্যাপকদের ও-সবেরই অভাব ছিল সন্দেহ হোলো। এক এক সময় মনে হচ্ছিল, আমরা ছোট বলেই অন্যে অতটা বড় হয়। আমার ধারণা হচ্ছে যে, আমরা প্ল্যানিং জিনিসটা বুঝতে পারিনি এখনও এবং প্ল্যান-ফ্রেম্‌ যে ফ্রেম্‌ এটুকু বোঝবার উদারতাও আমাদের নেই। এই না-বোঝার মধ্যে অনেকখানি পরশ্রীকাতরতা ও বাঙলা দেশের বিশেষত্ব সম্বন্ধে অভিমান মিশে আছে।

অবশ্য প্রশান্তবাবু the gentle art of making enemies (and not always so gentle)-এর আর্টিস্ট। কিন্তু তিনি যে একটা বিরাট কাজ করেছেন, সেটুকু মানতে কৃপণ হওয়া নীচতা। সংখ্যা-বিজ্ঞান নামে বস্তুটির সঙ্গে ভারতবাসীর পরিচয় করিয়ে দেওয়া, দশ পনের বছরের মধ্যে একটা বিরাট অনুষ্ঠান খাড়া করা—যার তুলনার জন্য ভিন্ন দেশে যেতে হয়—এ-সব না হয় ছেড়ে দিলাম ইতিহাসের হাতে। কিন্তু প্ল্যানিং কমিশন যা পারেনি, ইকনমিস্টরা যা করেন নি, সেই কাজ একজন অর্থনীতিতে অনভিজ্ঞ লোক করেছেন তাইতে বাহাদুরী দেবো, না হিংসে করব! সভায় বুদ্ধির চেয়ে ডিমর্যালাইজেশান-এরই লক্ষণ যেন বেশী পেলাম। সুশীল দে বল্লেন, 'এত আশাই বা করেছিলেন কেন?' উত্তর দিলাম, 'শচীন চৌধুরী যে বলেছিল।' আমার স্বভাবই তাই বোধ হয়। আমার Cynicism is inverted idealism.—

আমরা যাবো

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

জলের কলে টিপ্ টিপ্
টিপ্ টিপ্।

এখুনি
বাসন ধোয়া জলে
নিজের মুখ দেখবে
ধোঁয়ায় ধোঁয়াকার আরও একটি সকাল।

ততক্ষণ শানবাঁধানো অন্ধকার
দেয়ালে দেয়ালে মাথা খুঁড়ে মরুক।
আর আমরা জলের কলে শুনি—
চোখ বড়ো বড়ো করা আকাশের নীচে
পাথরের নুড়িতে নুড়িতে লাফিয়ে-পড়া
এক দিগ্‌ভ্রান্ত দামালো নদীর
কলতান।

তারপর সারাটা দিনমান
মানুষ পায়ে চাকা বেঁধে চলুক।
যেখানে বন্দে মাতরম্ ব'লে মানুষ জীবন দিয়েছিলো
কাটা হাত নিয়ে সেখানে হেঁটে যাক
কাঠের পা।

জলের কলে টিপ্ টিপ্
টিপ্ টিপ্।

আমরা বলেছিলাম যাবো
সমুদ্রে।
নদী বলেছিলো যাবে
সমুদ্রে।
আমরা বলেছিলাম যাবো
সমুদ্রে।

আমরা যাবো।

কাশে বাতাসে, প্রতি অণু পরমাণুতে যে নাদধ্বনি অবিরাম নিত হচ্ছে, সে ধ্বনির স্বতঃস্ফূর্ত আমরা সংগীতের ভিতরও দেখতে ই। সেজন্যই বোধ হয় কোন স্বর নিত হবার সংগে সংগেই আমরা সেই রের সহিত অবিচ্ছিন্নভাবে সংযুক্ত ন্যান্য অনেকগুলি স্বরও অস্পষ্টভাবে তে পাই। তম্বুরার 'সা' খরজের র আঘাত করলেই আমরা কেবল জই শুনতে পাইনে, সংগে সংগে ধীরে রে মিলিয়ে যাওয়া সুর সপ্তকের ন্ত স্বরগুলিও কানে বাজে। তৈরী যাঁদের, বিশেষ করে যন্ত্রী যাঁরা, রা সকলেই আমার এ উক্তির সত্যাসত্য নেন। সংগীত-বিজ্ঞানীরা এই বাড়তি রগুলিকে অনেক রকম আখ্যায় ভিহিত করেন। কখনও বলেন, তস্বর (overtone); কখনও বলেন, শ বা অংশ-স্বর (partial); কখনও ইংরাজীতে যাকে বলা হয়, natural rmonies, অর্থাৎ শব্দব্রহ্মের ন্তর্নিহিত অনাহত স্বর। যেমন ধ্যাত্মিক জগতের সাধকেরা অবাঙ্‌-নসগোচর ব্রহ্মের সন্ধান পান, তেমনি গীত জগতের সাধকেরা সুরলোকের অশ্রুত স্বরের শিহরণ শ্রবণ করেন।

॥ রত্নাকর ॥

অশ্রুত বা অতি অস্পষ্টরূপে শ্রুত এই অতিস্বরগুলি মৌলিক স্বরের অংশ বলেই এদের অংশ-স্বর বলা হয়। একমাত্র শব্দ-ব্রহ্মই পূর্ণ, অক্ষত, অবিভক্ত। শব্দব্রহ্মের যে কোন বিভাগই তার অংশ। স্বয়ং মৌলিক স্বর (fundamental) ও এর ব্যতিক্রম হতে পারে না। এজন্যই মৌলিক স্বরকেও প্রথম অংশ-স্বর বলা হয়, অর্থাৎ first partial tone। কিন্তু পাশ্চাত্য সংগীতশাস্ত্রের এই "অংশ-স্বর" আর হিন্দু সংগীতশাস্ত্রের গ্রহস্বর, অংশস্বর ও ন্যাসস্বর সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এটি আমাদের মনে রাখা দরকার।

অতএব, দেখা যাচ্ছে যে, আমরা যাকে 'স্বর' বলে জানি, যেমন, সা-রে-গা-মা ইত্যাদি, এদের প্রত্যেকটিই এক একটি যৌগিক (compound) স্বর; সরল, অবিমিশ্র, অনলংকৃত (simple) স্বর নয়। যেমন, ঝাঁকড়া ঝোঁকড়া একটি দেবদারু গাছ বলতে আমরা তার কাণ্ড থেকে আরম্ভ করে পাতা পর্যন্ত সমস্ত বৃক্ষটিরই কল্পনা করে নিই, তেমনি একটি মৌলিক স্বর বলতে আমরা কেবল সেই স্বরটিকেই বুঝিনে, সেই সংগে তার যত সাংগপাংগ অতি-স্বরগুলিকেও বুঝি। যৌগিক স্বর যেমন "পত্র-পুষ্প-ফল-

॥ ১৬ ॥

হাসপাতাল থেকে সরাসরি বাড়ি। ট্রাম বাস ভিড় আলো শব্দ যেন একটা ঢেউ হয়ে মাথার ওপর ভেঙে পড়েছিল। দেখতে না দেখতে বুঝতে না বুঝতেই হুস করে বয়ে গেল এবং বেহুঁশ বিভ্রান্ত একটি মনকে সেই গ্রাস থেকে তুলে আনতে যে সময়টুকু লাগল ততো সময়ে নতুন বাড়ির দরজার কাছে এসে পেঁৗছে গেছে অমলেন্দু।

বাতিজ্বলা সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে একবার শুধু মনে হলো, এতো অনামনস্ক হওয়া তার উচিত হয়নি। কলকাতা শহরের গাড়ি ঘোড়া ট্রামবাসের গিজিগিজি ভিড়ে আরও একটু সুস্থির মনে পথ হাঁটা উচিত।

সুস্থির...! কথাটা মনে আসতে একটু হাসিই পাচ্ছিল অমলেন্দুর। এখন এ-সময়ে যেন একটা টিটকিরির দাঁত বসিয়ে গেল—এই শব্দটাই।

ঘরে ঢুকে বাতিটা জ্বালল অমলেন্দু। এটা তার, তাদের—তার এবং বাসনার শোবার ঘর হিসেবে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা ছিল। দুজন শোবার মতন একটা খাট। সেই মতন বিছানা। পাশাপাশি দুজোড়া বালিশ, বেডকভার। আর জানলার দিকে বাসনার জন্যে ছোট মতন একটা ড্রেসিং টেবিল। এককোণে হাত-প্রমাণ লেখার টেবিলও একটা। আরও সামান্য কিছু টুকটাক। চেয়ার, গদি আঁটা বেতের মোড়া এমনি সব।

প্রথম কয়েকটা দিন—এঘরে না শুয়ে

পাশের ঘরে, পড়াশোনা এবং বসার ঘরে অমলেন্দু শুয়েছিল। ভেবেছিল বাসনা এ-বাড়িতে আসার পর ওরা দুজনে এই ঘর, এই বিছানা ব্যবহার করবে এক সঙ্গে। নেহাতই একটা খেয়াল হয়েছিল এবং সেই খেয়ালের পিছনে বেশ একটা ছেলেমানুষী মন গুনগুন, চমক দেওয়া, চমক সওয়া, উচ্ছ্বাসময় সুখসুখ ভাব ছিল। অবশ্য পরে—বাসনার জন্যে আর অপেক্ষা করতে পারেনি অমলেন্দু। হাসপাতাল থেকে কবে ফিরবে বাসনা—কতোদিন পরে—ততদিন ধরে এই ছেলেমানুষী রোমাঞ্চ কী শিহরণ কী সুখের গন্ধ রাখা যায় না। এই বয়সে। অনেকক্ষণ ধরে নাকের কাছে ফুল ধরে থাকলে যেমন গন্ধ ফিকে হয়ে যায়।

ঘর এবং বিছানা ব্যবহার করতে শুরু করেছিল অমলেন্দু—বাসনার জন্যে বিছানার জায়গা ছেড়ে জোড়া বালিশ আলাদা ভাবে পাশটিতে সাজিয়ে রেখে।

আজ, ঘরে ঢুকে বাতি জ্বালতেই সেই যুগলশয্যা যেন একচাদর নিশ্চুপ উপহাস নিয়ে হেসে উঠল।

অমলেন্দু কটি মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকল। দেখল তাকিয়ে তাকিয়ে।

আর তারপর আশ্চর্য বিষণ্ণ চোখে এই ঘরের খুঁটিনাটি সব কিছু আবার দেখল।

সকালেও এই ঘর কী দিয়ে যেন ভরাট ছিল, ঠাসা ছিল। কেমন এক মোহ এবং স্বাদ মাখানো ছিল—অথচ এখন অদ্ভুত ফাঁকা লাগছে। পাখি উড়ে গেলে খাঁচা যেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগে তেমনি। অবিকল তেমনি।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে এবার একটু নড়াচড়া করলে অমলেন্দু। সামান্য একটু হাঁটাহাঁটি। বিছানাটা একবার ছুঁলে হাত দিয়ে, বালিশটা নড়িয়ে দিল, ড্রেসিং টেবিল থেকে পাউডারের কৌটোটা তুলল এবং রাখল। ড্রয়ার বন্ধ করার শব্দ করলে, জানলার পর্দাটা গুটিয়ে দিল।

মনে হচ্ছিল হঠাৎ দমবন্ধ হয়ে যাবার পর আবার যেন একটু একটু নিশ্বাস প্রশ্বাস নিতে শুরু করেছে ও। হ্যাঁ, এই নড়াচড়া হাত-পাকে কাজে লাগানো এবং নিজের ঘরের এটা সেটা দেখতে দেখতে একটু একটু করে সেই নিঃস্বতা কাটিয়ে চেতনার মধ্যে যেন ফিরে আসছিল ও।

জামাটা খুলে ফেলল অমলেন্দু।

চাকরটা দরজার গোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছিল। চা দিতে বলল তাকে। তারপর যেন জোর করে একটু লঘু হবার চেষ্টা করলে। শিস দেবার জন্যে ঠোঁট জিব কুঁচকে তুলল। অন্যরকম এক শব্দ হল। যেন কিছু হারিয়ে ফেলে ই—স্ করল।

মাথাটা ধরা ধরা লাগছিল। ভার ভার। চোখ দুটো জ্বালা করছে। ঘাড়ের আর কপালের মধ্যে কেমন এক দপ্‌দপ্।

চটিটা পায়ে গলিয়ে বাথরুমে চলে গেল অমলেন্দু। সমস্ত বিষয়টা পরিষ্কার করে বুঝতে এবং ভাবতে হলে আগে মাথাটা ঠাণ্ডা করা দরকার। স্নানই করে ফেলা যাক্। মনে মনে ভাবল অমলেন্দু। বাইরের শীত গায়ে কী মনে কোথাও লাগছিল না তার। বরং গরম লাগছিল। তেমনি এক অস্বস্তি এবং ঘর্মাক্ত অনুভূতি।

চা খেতে খেতে এইবার সমস্ত ঘটনাটা আগাগোড়া সাজিয়ে বেশ পরিচ্ছন্ন ভাবে ভাবতে চাইছিল অমলেন্দু। আজ হাসপাতালে যাবার পর থেকে শেষ পর্যন্ত। কেবিন ছেড়ে উঠে আসা অবধি।

তারপর আরও পিছনে চোখ দিল অমলেন্দু, মন ছড়িয়ে দিল।

সুধাদাদের সংসারে পা-দেওয়ার প্রথম

দিনটি আজও মনে আছে। সেই দিনটি থেকে ও-বাড়িতে যাবার শেষ দিন—এই সেদিনের কথা পর্যন্ত মোটামুটি সবই মনে আছে অমলেন্দুর।

অমলেন্দু ভাবছিল, পুরনো দিনের স্মৃতি হাতড়ে হাতড়ে, আমি এমন কি ব্যবহার করেছি এবং কোন্ দিন এমন কোন্ আচরণ প্রকাশ করেছি যা থেকে বাসনা সন্দেহ করল, করতে পারল যে, ওর শরীরের দিকে হ্যাংলার মতন নজর দেওয়া ছাড়া আমার আর কাজ ছিল না!

আঙুল মটকে, ঘাড় পিছনে হেলিয়ে, দাঁতে ঠোঁট কামড়ে খুব একটা অস্বস্তির মধ্যে নিজের হ্যাংলামিকে যেন খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে খুঁজছিল।

তুমি বলছো, অমলেন্দু সিগারেট ধরিয়ে চোখ বন্ধ করল। আর বাসনাকে সামনে দাঁড় করিয়ে যেন বলছিল মনে মনে, তুমি বলেছো প্রথম প্রথম আমার কথাবার্তা আচার-আচরণ দেখে তোমার ধারণা হয়েছিল, একটা অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে আমি তোমার সংগে মেলামেশা করার চেষ্টা করছিলাম।

মেলামেশার চেষ্টা করছিলাম বলাটা ঠিক নয়, তবে তোমার সংগে বাড়ির আর সকলের মতন আমি সহজ সম্পর্কটা রাখবার চেষ্টা করছিলাম। কথা বলতাম, হাসির কথায় হাসতাম, হাসাতে চাইতাম। দরকারে এটা সেটা চাইতাম। কিন্তু এ থেকে আমার অসৎ কিছু উদ্দেশ্য আছে এ-তুমি কি করে স্থির করে নিলে!

আমি তোমায় প্রেমপত্র লিখি নি, কু-প্রস্তাবের চিঠিও না, ঘরে ঢুকিনি আচমকা কোনোদিন, মাঝরাত্তিরে দরজা খুটখুট করিনি বা এমন কোনো বাঙলা উপন্যাসের নানা জায়গায় লাল পেন্সিলে দাগ দিয়ে দিয়ে পড়তে দিইনি—যা থেকে আমার সম্পর্কে তোমার ধারণাটা প্রথমেই অতো জঘন্য রকম হতে পারে।

বাসনাকে মনে হচ্ছিল নোংরা খুঁটে খাওয়া কোনো পোকামাকড় পাখিটাখি, আর অমলেন্দু বিশ্রী রকম একে ঘেন্নায় মুখ-চোখ-নাক কুঁচকে এই ইতর স্বভাবকে ধিক্কার দিচ্ছিল।

আর অসহ্য রাগ হচ্ছিল। সারা গায়ে মনে কেউ যেন ছেঁকা দিয়ে দিয়েছে। জ্বলছে, অসহ্য জ্বলনে। এর চেয়ে অপমান, থুথু, কোনো ভদ্রলোককে আর কি হিসেবে করা যেতে পারে। যাকে ভালবাসি, সেই মেয়ে শেষে বললে, তোমায় লম্পট, অসৎ চরিত্র ভাবতুম।

কোনো বিধবা মেয়ের সংগে—হ্যাঁ প্রায় সমবয়সী মেয়ের সংগে কথা বলা অসৎ চরিত্রের লক্ষণ বা লাম্পট্যের পরিচয় এই অদ্ভুত নীতিবোধ আমার ছিল না। বা এও আমি দেখিনি, সুধাদার সংসারে পুরুষ মহল এবং মেয়ে মহলের মধ্যে একটা শক্ত দেওয়াল দেওয়া আছে। তা থাকলে বীথির সংগে কিংবা কমলবৌদির সংগে আমার বাক্যালাপও হবার কথা নয়।

আমার চেহারা এবং চোখ মুখ দেখে নাকি তোমার এ সন্দেহ দৃঢ় হয়েছিল।

চোখ খুলে চাইল অমলেন্দু। তারপর হঠাৎ উঠে গিয়ে তার দাড়ি কামানো আয়নাটা এনে মুখের সামনে ধরে নিজেকে দেখতে লাগল।

কিছুই খুঁজে পাচ্ছিল না অমলেন্দু। তার রঙ কালো, মুখ গোলগাল, চোখ সাধারণ মানুষের মতন, চাউনিও সবার মতন, নাক একটু বসা, ঠোঁট পুরু, দাঁত সাদা সুশ্রী!

কি আছে এই মুখের মধ্যে—অমলেন্দু

অবাক হয়ে ভাবছিল এবং খুব তীক্ষ্ম চোখ করে করে দেখছিল তাকে দুশ্চরিত্র লম্পট লম্পট দেখায় কিনা হাসলে, চোখ বেঁকালে বা—

হঠাৎ কথাটা মনে পড়ল। আর বাসনাকে উদ্দেশ করে বললে অমলেন্দু, তখনকার সেই মুখ এখনও তো আছে আমার। বদলায় নি নিশ্চয়। তখন যদি দুশ্চরিত্র লম্পট দেখিয়ে থাকে তবে এখন কেন নয়। তুমি যে-মুখের গড়নে সেদিন পর্যন্ত মেয়ে ফুসলানো শয়তানীর মিটিমিটি চাউনি দেখেছ আজ কদিনের মধ্যেই হঠাৎ সেই মুখে ভালবাসার থৈ থৈ পবিত্রতা দেখতে পেয়ে গেলে! আশ্চর্য!

অনেকক্ষণ পরে অন্য একটা কথা মনে এল। অন্য ছবি সত্যিই সে দেখতে পেল অন্য-এক আয়নায়। আর তুলনাটা অমলেন্দুর নিজেরই মনে হচ্ছিল, এখন, এই অবস্থায়, একলা নিজের ঘরে বসে বসে আয়নায় মুখ দেখতে দেখতে। মনে হচ্ছিল, হঠাৎ কোথা থেকে এক ঢিল এসে আয়নাটাকে যেন গুঁড়িয়ে দিয়েছে—সারাটা আয়না ফেটে চিড় খেয়ে চৌচির। আর অমলেন্দু সেই ফাটা চিড়-চৌচির আয়নায় নিজের এক অদ্ভুত মুখ দেখছে, দেখতে পাচ্ছে যেন। একটা চোখ, দুটো দাঁত, এক খামচা গাল কোথাও; কোথাও যেন আধখানা চোখ, কাটা নাক। কপাল, গালগলা আঠায় আঁটা দাগদাগ টুকরো জোড়া ছবির মতন। এই মুখের কোথাও বড়, কোথাও ছোট, নাকের ডগা নখ-সমান তো দুটো দাঁত মুলোর মতন। বিচিত্র, অদ্ভুত, কিম্ভূত এবং বীভৎস।

অত্যন্ত বিশ্রী লাগছিল অমলেন্দুর। ভীষণ অস্বস্তি বোধ করছিল। দাড়ি কামানো আয়নাটা—বিছানার একপাশে ছুঁড়ে দিয়ে মুঠো করে করে চুল টানছিল মাথার। এবং স্নায়ুক্লান্তির অবসাদে রুক্ষ ও রুগ্ন মুখ নিয়ে বসেছিল।

তুলনাটা মনে হচ্ছিল। খুব সহজেই মনে আসছিল। এই আয়না বাসনা। এতোদিন বাসনার মধ্যে নিজের যে ছবি দেখেছে অমলেন্দু, এখন আর তা নয়। হঠাৎ কোনো এক কঠিন এবং নিষ্ঠুর আঘাতে চিড়-চৌচির আয়নার মতন বাসনার মন—মনের কাচে। নিজের

চেহারাটা অত্যন্ত বিশ্রী এবং বীভৎস হয়ে ফুটে উঠেছে। নিজেকে সেখানে চিনতে পারছে না অমলেন্দু এবং সেই ক্ষত-বিক্ষত, কুশ্রী চেহারাটা দেখে ওর ভয় হচ্ছে। ভয়, ঘৃণা, বিরাগ বিতৃষ্ণা সবই।

নিজেকে আজ আমি দেখলাম। তোমার ধারণা এবং ভাবনায়, মনের মধ্যে আমার চেহারাটা যেভাবে তুমি এঁকেছ—তা আজ আমি চিনতে পারলাম। অমলেন্দু মনে মনে বাসনাকে সামনে দাঁড় করিয়ে রেখে ভাবছিল আর বলছিল।

খুব চমৎকার হয়েছে। একটা ভূত কিংবা ভূতের এমন নিখুঁত চেহারা ছবিতেও চোখে পড়ে না। কিম্ভূত-কিমাকার যে জন্তু তুমি খাড়া করেছ তাকে চেনবার জন্যে কোথাও একচুল অদলবদলের দরকার হয় না। অন্তত আমার হচ্ছে না। আমি তো স্পষ্টই বুঝতে পারছি, দেখতে পাচ্ছি শুটা তার কালো কালো কুৎসিত মুখ, লাল লাল চোখ আর লালাঝরা জিভ বের করে গন্ধ শুঁকছে তোমার গায়ের।

অন্য ভাবেও এটা বলা যায়। সিনেমায় দেখা কোনো কোনো বাঙলা ছবির নারী-হরণ দৃশ্যের নায়কের মতন, কিংবা বাঈজী বাড়িতে ঢোকা নায়কের মতন লোভী, লালুপ, লম্পট, শয়তান শয়তান চেহারাটা তুমি আমায় নিয়ে বেশ গুছিয়ে এঁকে দিয়েছো। আমি নিজেও নিজের সেই চেহারাটা দেখতে পাচ্ছি। তুমি আমায় দেখাচ্ছ।

আর এটাও, এই শেষটাও চোখে ঘটানা উপন্যাসের শেষ পরিচ্ছদ দেখা হচ্ছে। সতী সাধ্বী নারী তুমি, পবিত্র প্রেমিকা, অনুশোচনায় গলে গলে কেঁদে কেঁদে গলা ফাটিয়ে তোমার সম্ভ্রান্তি অপরাধ, অন্যায়-টন্যায়গুলো ক্রমে স্বীকার করে যাচ্ছ। গলার শিরা নীল করে।

অবশ্য বইয়ের পাতায় এমন ঘটনা এসে চলে, পাতা উল্টে চলে যাওয়া যায়, কিংবা টান মেরে বইটা ছুঁড়ে ফেলে দিতেও পারা যায়। কিন্তু এখানে, এক্ষেত্রে আমাকে সবই দেখতে হলো। শুনতে হলো। সহ্য করতেও।

আর আমি বাস্তবিক কি ভাবছি জানো? ভাবছি, তোমাকে এতোদিন যা ভেবেছিলাম, তোমার চেহারা, কথাবার্তা, আচার-আচরণ থেকে যা ভাবা স্বাভাবিক আসলে তুমি ঠিক তার উল্টো। তোমার ওই সংযত সুশ্রীতা খুব পলকা একটা পোশাক। টানলে সঙ্গে সঙ্গে খুলে যায়—না হয় ছিঁড়ে যায়। আর ওই পবিত্র পবিত্র ভাবটা তোমার নিছক ভেজাল বস্তু। খাদমেশান ধাতুর ওপরকার সোনার পালিশ দেওয়া চাকচিক্য।

রাত বাড়ছিল। আর ক্লান্তি, অসহ এক ক্লান্তি মেরুদণ্ডের টান-টান হাড়টাকে যেন ক্রমশই নুইয়ে দিচ্ছিল। সারা পিঠ, কাঁধ ব্যথা ব্যথা। বোঝার ভারে আড়ষ্ট, অসাড়

মতন। মাথার মধ্যেও ঝিমঝিম করছিল।

অমলেন্দু উঠল। দশটা বাজে। খিদে নেই, ইচ্ছেও করছে না। তবু। তবু কিছু খেতে হল। আর যদিও কোন স্বাদ-বিস্বাদ বুঝছিল না, খেতে খেতে বাসনার রান্নার কথা মনে পড়ছিল। এবং রান্নাঘরের কথা, সুধাদাদের সংসারে বাসনাকে! সেই ধোঁয়া কয়লা, এঁটো কাঁটা ভরা দুহাত সংসারের বাসনাকে।

এই হয়। জগতটা এমনি। বিষণ্ণ হয়ে ভাবছিল অমলেন্দু, রান্না ভাঁড়ার আর ভাতের ফেন ঢেলে ঢেলে জীবনটাকে নিঃশেষ করে ফেলছিল, আমি শুধু সেই দমবন্ধ ছোট ঘর আর আঁশটে বাসি বাতাসের বাইরে তোমায় আনতে চেয়েছিলাম। আলো-হাওয়ায়।

খাওয়া শেষ করে আবার ঘরে এসে ঢুকল অমলেন্দু। সিগারেট ধরাল। জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

বাইরে অন্ধকার, আর শীত, আর কুয়াশা।

কষ্টই হচ্ছিল তার। বিশ্রী লাগছিল, নিজের কাছে নিজেকেই খুব ছোট মনে হচ্ছিল কথাটা ভাবতে যে, বাসনাকে—যে-মেয়েকে সে ভালবেসেছিল, বিয়ে করেছে—তার সম্পর্কে এতো সব রূঢ় কটু এবং তিক্ত চিন্তা অমলেন্দুকে করতে হচ্ছে।

মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে পর্যন্ত তোমার কথায়, তোমার নামে এবং তোমার চিন্তায় যে শ্রদ্ধা, নম্রতা ছিল—এখন কী আশ্চর্যভাবে সব—সমস্ত নষ্ট হয়ে গেছে। তোমায় নিয়ে এখন আমি যা খুশি ভাবতে পারছি। কোথায় না নামতে পারছি।

একটা সিগারেট শেষ হলো। আরও একটা। বিছানায় এসে শুল অমলেন্দু। পাশের শূন্যে জায়গাটুকু অদ্ভুত এক অনুভূতি আনছিল। মনে হচ্ছিল, এ-শূন্যতা তার অন্তরঙ্গ নয়, অথচ কাল অবধি তাই মনে হতো। যেন পাশের-জন আসছি বলে কোথায় চলে গেছে, এখনো আসছে না। আজ মনে হচ্ছে, এখন—এ-শূন্যতার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই, ট্রেনের কামরায় খালি বেঞ্চির মতন পড়ে আছে জায়গাটা।

পাশ ফিরে শুয়ে বালিশে মুখ চেপে হাত আড়াল করে সমস্ত ভাবনা অন্তত কিছুক্ষণের জন্য ভুলে থাকতে চাইছিল অমলেন্দু।

রাত এগিয়ে চলেছে। চাকরটা বাইরের সব আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ল। কোথাও আর শব্দ নেই। জানলা দিয়ে ঠান্ডা আসছে এবার। হয়তো বা কুয়াশাও। নীচে রাস্তা দিয়ে একটা রিক্‌শা চলে গেল। তার চাকার শব্দ খানিকক্ষণ কানে লেগে থাকল অমলেন্দুর।

বাতিটা নিভিয়ে দেবার জন্যে উঠল ও। জল পিপাসা পাচ্ছিল। জল খেল পুরো এক গ্লাস। খানিকটা ব্রোমাইড। মাথার মধ্যে টনটন করছে, চোখের কোল ঘিরে ব্যথা আর ভার। এবার একটু ঘুমনো দরকার। এই অস্বস্তি, উত্তেজনা, চিন্তা আর ক্লান্তি থেকে অবসর চাই।

ঘুম আসছিল না। তবে একটা ঘোর আসছিল। আর সেই ঘোরের মধ্যে অমলেন্দু অসহ্য কষ্টে এ-পাশ ও-পাশ করছিল। আর বলছিল বাসনাকে, তুমি আমায় ভালবাসনি। ভালবাসনি। ভালবাসার উপযুক্ত মনে করো নি।

বরং আমি—হ্যাঁ, আমি একটা শেষ-বেশের জিইয়ে রাখা মানুষ ছিলাম, যার কাঁধে ভর দিয়ে তুমি ভেবেছিলে তোমার বাড়ির চৌকাট ডিঙিয়ে আসা সহজ হবে। এর বেশি কিছু না। কে বলতে পারে, যে-সন্দেহ তুমি আমায় করেছিলে, আসলে এ-সন্দেহ অন্য কারো ওপর এবং সেই পাখি উড়ে গেছে—তাই ভয়ে ভয়ে, হিসেব কষে কষে তুমি আমার কাছে ভেসে

সেছো। এবং এখন ডুব জলে এসে পড়ে
লা জড়িয়ে ধরেছো আমার। বাধ্য হয়েই।

অমলেন্দু বুঝতে পারছিল, সে অত্যন্ত
ঠের এবং কঠিন হয়ে উঠেছে। হ্যাঁ,
য়েছে। হওয়া অন্যায় কি! বাসনার
ধ্য কী শুচিতা, কিংবা তার ভালবাসা
কিছুর ওপরই আর আস্থা-বিশ্বাস
খা যায় না।

আমি অন্তত পারছি না। অমলেন্দু
ন্ধকার ঘরে চিৎকার করে বলে উঠল।

এই কাঠিন্য কখন আবার ফিকে হয়ে
ল। চাপ চাপ গভীর নিরেট এক বেদনা
বং হতাশা বুক ভরে আঁট হয়ে বসে
ছে—এক সময় অমলেন্দু তাও বুঝতে
রল।

এর পর তোমাকেও আমার কোনো
নো কথা খোলাখুলি বলা উচিত।
মলেন্দু বাসনাকে মনে করে বলছিল,
খন হাসপাতালে তুমি আমায়
ন করেছিলে না, কোনো
া আমার বলার আছে কিনা!
ম চাইছিলে আমি কিছু বলি।
নিকটা দুঃখ, হা-হুতাশ করার পর
মার অনুশোচনায় গলে গিয়ে আমি
ন্বনা দেব—হয়তো এটাই তুমি
ছিলে। তা করতে পারলে দৃশ্যটা
াত। মিলনান্ত নাটকের মতন।

কিন্তু? কিন্তু আমি কথা বলতে
রি নি। বলার মতন কথা খুঁজে পাইনি।
সপাতালের কেবিনে যা বলা যায়।

অমলেন্দুর খেয়াল হল, বাসনাকে
ই কথা তার চিঠি লিখে জানিয়ে
ওয়াই সবচেয়ে ভাল। মুখে যা বলা
যাবে না, সে সুযোগও হবে না, চিঠিতে
তা মনখুলে বলা সোজা, অনেক সোজা।

আবার বাতি জ্বালিয়ে এই মাঝরাতেই
চিঠি লিখতে বসল অমলেন্দু।

কি লিখবে?

কটা কাগজ ছিঁড়ল, একটি কি দুটি
লাইন লিখে কাটাকুটি করল, সিগারেট
খেল পর পর।

তারপর লিখলঃ

ঘর সাজিয়েছিলাম। বিছানা তৈরি
করা ছিল। কাল পর্যন্ত মনে হয়েছে
এ আমার-তোমার সাজানো ঘর, এখানে
সুখ, শান্তি, আরাম, ভালবাসা ছড়ানো
আছে, আমরা তুলে নেব। এখন মনে হচ্ছে
—এটা ভাড়াটে খাট, আর আমরা, অন্তত
আমি ভাড়া গুনলে খাটের খানিকটা অংশ
পাবো। তার বেশি নয়। তোমার মনে
আমার সম্পর্কে যে ধারণা—তাতে ভদ্র
স্বামী হওয়াও যায় না। ভালবাসার পাত্র
তো নয়ই—কেননা, ভাবতেও আমার কষ্ট
হয়, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, সম্মানের বাইরে এই
কথার ভালবাসায় তুমি আমাকে ভাল-
বাসছ।

চিঠিখানা মুড়ে কলমটা বন্ধ করলে
অমলেন্দু।

কাল হাসপাতালে এই চিঠি বাসনার
হাতে দিয়ে আসবে, ভাবলে অমলেন্দু।

তার পর বাতি নিভিয়ে বিছানায় এসে
শুয়ে পড়ল।

বেলায় ঘুম ভেঙে উঠে—বাইরে
বেরুতে গিয়ে চিঠিটা প্রথমেই চোখে
পড়ল।

ভাঁজ খুলে চিঠিটা পড়ল অমলেন্দু।
এই সকালে। ঘুম ভাঙা চোখ আর সতেজ
মন নিয়ে।

আর মনে হল—মনের এই সব
একান্ত ঘনিষ্ঠ, এতো আপনার কথা
চিঠিতে বা মুখে বলার মতন নয়। এ
শুধু নিজের অনুভূতিতে আশ্চর্যভাবে
মিশে থাকে। নিজে অনুভব করা যায়।
বাসনাকে বা বাসনাদের বলা যায় না।
তাতে যেন এই মন, এই অনুভব ও
ইচ্ছা—সবই ছোট হয়ে যায়, জোলো
হয়ে আসে।

চিঠিটা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে
জানালা দিয়ে রোদে উড়িয়ে দিল
অমলেন্দু। যেন আকাশে-ওড়া নরম
একটি পাখির পালক হঠাৎ খসে খসে
রোদে হাওয়ায় ঝরে ঝরে উড়ে উড়ে
মাটিতে পড়তে লাগল। (ক্রমশ)

১৮

বা রে ধীরে সাবধানে এগিয়ে চলেছি। পূর্বগামী যাত্রীদের রেখে-ওয়া সাজানো ছোট ছোট পাথরগুলির পর দৃষ্টি আছে। গাইডের ডাকে চমক গে। তাকিয়ে দেখি পাহাড়ের উপর ক সে উঠে গেছে অনেকখানি।

আমরা গঙ্গার তীরের দিকে নেমে াছি। দু-দিকেই সাজানো পাথরের -নির্দেশ।

গাইড্ বলে, উপরদিক দিয়েই যেতে —নীচের পথে পুরাণো চিহ্ন— ক এখন পথ নেই।

অতএব, উপর দিকেই উঠ্‌তে হয়। পাহাড়ে ওঠার স্বাভাবিক কষ্ট ত ই। ক্লান্তি বোধ হয় আরো এই । যে শেষ পর্যন্ত গঙ্গার ধারে ত তই হবে, তবে কেন এই অকারণ াহণ। কিন্তু, পাহাড়-পথে চলার ত রীতি। তাই সন্তর্পণে অতি উঠতে থাকি। উপর থেকে নদীর পথ ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর দেখাতে ।

সঙ্গের কুলি দুটি দলের সঙ্গে নেই দেখে চিন্তিত হই। কোন্ সময়ে যূথভ্রষ্ট হয়েছে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করা হয়। শিস্ দিয়ে গাইড্ ইসারা করে—পাহাড়ে তার প্রতিধ্বনি ওঠে—তবুও তাদের কোন সাড়া পাওয়া যায় না।

সব মালপত্র তাদের কাছে। সে-সব হারাবার কিছুমাত্র আশঙ্কা নেই। কিন্তু, তারা পথ হারালে তাদের বিপদ আছে, ভাবি। বিরাট পাহাড়গুলির মাঝে নগণ্য দুটি মানব-শিশু। খুঁজে পাওয়া অসম্ভব, তাই চেষ্টাও বৃথা। অগত্যা, তাদের পথ-চেনার সহজ বিচার-বুদ্ধির উপর ভরসা রেখে আমরা এগিয়ে চলি।

পাথর ডিঙিয়ে চলা আপাতত শেষ হয়েছে। পাহাড়ের ঢালু গা বেয়ে চলেছি। সাম্‌নেই বিরাট ধস নেমে গেছে বহু নীচে নদী পর্যন্ত। পাহাড়ের গায়ে পা রাখার মত স্থানও নেই, তাই এগোবারও উপায় নেই। গাইড্ থম্‌কে দাঁড়িয়ে গেছে। সবাই বুঝতে পারি ভুল পথে চলে এসেছি। নদীর দিকেই নেমে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু, এখন এখান থেকে বহু নীচে নদীর দিকে তাকাতে মাথা ঘোরে, সোজা নামতে পারব কিনা সন্দেহ জাগে।

অযথা এতখানি পাহাড়ে ওঠায় সময়ও লেগেছে, শ্রান্তিও হয়েছে। গাইড্-এর উপর রাগ ও বিরক্তি হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু, আশ্চর্য, সে মনোভাব আসে না। সকলেই সানন্দে সব কিছু মেনে নিই। কারো উপর দোষারোপ করি না। ভাবি, এ-যেন স্ব-কৃতকর্মের ফল। এই পথিক-জীবনে এমনি বিপর্যয় যেন স্বাভাবিক পর্যায়। এতে চঞ্চল বা বিক্ষুব্ধ হলে এখানকার শান্তিময় জীবনধারায় অশান্তির সৃষ্টি করবে। অন্তরে বিশ্বাস রাখি, যে মহান্ আকর্ষণ এখানে এনেছে, সে-ই ঠিক গন্তব্যে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

সকলেই হাসিমুখে প্রকৃতির বিরাট্ শক্তিকে উপলব্ধি করি, তারি মাঝে পথের কাণ্ডারীর সন্ধান করি।

বহু নীচে গঙ্গার কিনারায় বিক্ষিপ্ত নিশ্চল পাথরগুলির মধ্যে ছোট্ট দুটি সচল জীবের ইঙ্গিত পাই। সবাই একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখি। আমাদের কুলি দুটি!

গোমুখে গঙ্গাবতরণ

এ-পথে নতুন হোলেও তারা ঠিকই গেছে। এখন আমরা ভুলপথে আট্‌কে গেছি দেখে তারা বোঝা ফেলে ছুটে এগিয়ে আসছে আমাদের সাহায্য করতে।

কি করে যে তারা পাহাড়ে উঠে আমাদের কাছে চলে এল বিস্ময় লাগে। উঠবার পথ নেই, পা রাখবার স্থান নেই। হাতে ভর দিয়ে কোথায় পা রেখে দেখতে দেখতে উঠে এল। মুখে অভয় বাণী। বলে, বাবুজি, হাত ধরুন, নেমে আসুন, কোন ভয় নেই।

[illegible] বলে [illegible] ভয় [illegible] নিশ্চিন্ত মনে নির্ভয়ে তাদের হাত ধরি। দেখতে দেখতে নীচে নেমেও আসি।

গঙ্গার ধারে পাথরের উপর ক্ষণিক বিশ্রাম করে আবার পথচলা শুরু হয়।

নদীর তীরে বড় বড় পাথর। তারই উপর লাফিয়ে লাফিয়ে এসে ক্লান্ত হলেও আবার পাশের পাহাড়ে ওঠা আরম্ভ হোল।

একটু উঠেই জঙ্গল। চারিদিকে শুধু ভূর্জপত্রের গাছ। বার্চ ট্রি (Birch Tree) মাটি থেকে একটু উঠেই ডালপালা বিস্তার করেছে। আঁকাবাঁকা শাখা। [illegible] মাঝে সাদা সাদা ডালগুলি,—গাছের গুঁড়িগুলিও সাদা। চারিদিকে সাদা রঙের দীপ্তি ছড়িয়েছে। গাছের ছাল টেনে তুললেই পাক খেয়ে খুলে আসে। মসৃণ কাগজের মত। যত টেনে তোলা যায় পাকের পর পাক খোলে। ডালের ক্ষত অংগ রক্তাভ হয়ে ওঠে। টেনে তোলা ছালের রঙ্‌ও রাঙা হয়ে আসে। গাছের একটা নীচু ডালের উপর পা ঝুলিয়ে বসে একজন সাথী সেই ভূর্জপত্রের উপর ফাউণ্টেনপেন্‌ দিয়ে চিঠি লেখেন।

গংগোত্রী-যমুনোত্রীর দিকে ভূর্জপত্রে লেখার প্রচলন এখনও কিছু কিছু আছে। জিনিসপত্র জড়িয়ে নেবার কাজেও এর ব্যবহার প্রচুর। আমাদের দেশে যেমন কলা বা শালপাতায় খাওয়ার প্রথা আছে, এখানে ভূর্জপত্রেরও তেমনি ব্যবহার হয়।

ভূর্জপত্র!—নাম শুনেই যেন কোন প্রাচীন যুগে মন চলে যায়।

তারই বিচিত্র বনানীর প্রান্তে বসে আমাদের দ্বিপ্রহরের আহার।

গঙ্গার তীর থেকে অনেকখানি উঠে এসেছি। তাই জলের অভাব। গাইড বলে, কোন ভাবনা নেই, কাছেই ঝরণা আছে, পাত্র দিন্‌—জল আন্‌ছি।

পাত্র নিয়ে একটা কুলির সঙ্গে গেল। কিন্তু ফিরতে আধ ঘণ্টার উপর দেরী হোল। বলে, ঝরণায় জল নেই, সব বরফ হয়ে আছে, বরফ ভেঙে গলিয়ে আনতে দেরি হোল।

আহার্য,—সংগে আনা রুটি, আলু-সিদ্ধ ও চুর্‌মা। চুর্‌মা—ঝর্‌ঝরে মোহনভোগের মত, সুজির বদলে আটার তৈরি। একবার তৈরি করলে তিন-চার দিন রেখে খাওয়া যায়—নষ্ট হয় না।

যা কিছু খাবার ছিল সকলে এক সংগে ভাগ করে খাওয়া হোল। কুলিদের বেশী করে দিই, বলি, তোমরা ভার বইছ তাই ভাগ বেশী পাবে।

খাওয়ার পর একটু বিশ্রাম। বিশ্রামে সুখ থাকলেও, সাম্‌নে পথ পড়ে থাক্‌লে সে-বিশ্রামে স্বস্তি নেই। তাই, আবার যাত্রা শুরু করি। খাওয়ার পর পথ-চলায় শরীর ভারী বোধ হয়। কিন্তু একটু চলার পর গতির ছন্দ আবার ফিরে আসে। দুপুরের রোদ্রের উত্তাপ তেমন

বোধ হয় না। হিম-শীতল বাতাসে বরং শীতই লাগে। বিকালে রাত্রি-বাসের আবাসে এলাম।

ধর্মশালা। পাথরের একতলা বাড়ি। খানচারেক ছোট ছোট ঘর। মেঝেতেও পাথর-বসানো—অসমতল। শুধু কম্বল বিছিয়ে শোওয়া বিশেষ কষ্টকর। নীচে থেকে ঠাণ্ডা ত ওঠেই. পাথরও বিঁধতে থাকে—শরশয্যার কথা স্মরণ করায়।

কুলিরা পাশের একটা ঘর থেকে লম্বা কয়টা তক্তা নিয়ে আসে, সারি সারি পেতে দেয়। বলে, এর উপর কম্বল বিছিয়ে শুলে কষ্ট নেই।

সেইমত ব্যবস্থাও হয়। কাল গোমুখ দর্শন করে এখানে ফিরে আবার রাত্রি-বাস হবে। তাই মালপত্র এখানেই সব পড়ে থাকবে।

লোকজন এখানে কেউ থাকে না, চৌকিদারও নয়।

জায়গার নাম ভূজবাস (১২,৪৪০ ফুট)। মানে হয়ত ভূর্জবৃক্ষের বাস। কিন্তু ভূর্জপত্রের বনও প্রায় শেষ হয়ে এল। এখন চারিদিকেই কঠিন কঠোর পাহাড়, মাথায় সব বরফের চূড়া, তার থেকে এক-একটা বরফের ধারা নেমে গঙ্গার কাছে চলে এসেছে। খানিকটা বরফের উপর হেঁটে ধর্মশালায় পৌঁছুতে হয়।

ধর্মশালার সামনেই গঙ্গা। ক্ষীণ কায়া, কলোচ্ছলা। তুষারশীতল জলধারা।

গঙ্গার পরপারে উত্তুঙ্গ গিরিশ্রেণী। তারই তুষারশীর্ষ থেকে বিপুল এক জল-ধারা সহস্র ধারায় বিচ্ছুরিত হয়ে গঙ্গার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

চারিদিকে যত নির্ঝরিণী সবই জাহ্নবী-জলে নিজেকে বিলিয়ে দিতে ছুটেছে।

রাত্রে গায়ের জামা কাপড় মোজা পরেই কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম। প্রচণ্ড শীত।

সঙ্গী সাধুটি মৃদুকণ্ঠে গঙ্গা-স্তব গান করছেন।

'গাঙ্গ্যং বারি মনোহারি
মুরারি-চরণ-চ্যুতম্।
ত্রিপুরারি-শিরশ্চারি পাপহারি
পুনাতু মাম্॥'

সেই মধুর সুরের মূর্ছনায় চোখে ঘুমের আবেশ আসে। সারারাত আধ-ঘুমঘোরে কেটে যায়।

১১

অতি ভোরে বিছানা ছেড়ে উঠেছি। প্রাতঃকৃত্য সমাপন করে সবাই তৈরি হয়েছি। রাত্রের রাখা রুটি একটা করে চায়ের সঙ্গে খাওয়া হোল।

গতকাল গঙ্গোত্রী থেকে মাইল বারো এসেছি, শুনলাম। মাপা মাইল নয়। অনুমান মাত্র। সরল পথের মাপে হয়ত বারো মাইল হতে পারে, কিন্তু এখানে যেন মনে হয় পঁচিশ-ত্রিশ মাইল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলেও পথ শেষ হতে চায় না। আজও তেমনি মাপে ছয় মাইল মাত্র পথ। যেতে আসতে বারো মাইল। কিন্তু সারাদিন লাগবে এ-পথ অতিক্রম করে ঘুরে আসতে।

এই ভূজবাসে ফিরে এসে আবার রাত্রিবাস। কাল এখান থেকে ভোরে রওনা হয়ে দুপুরের মধ্যেই গঙ্গোত্রী পৌঁছানো যাবে। গঙ্গোত্রী থেকে গো-মুখ আসা-যাওয়ার পথে এই একটিমাত্র আশ্রয়স্থল। সঙ্গে তাঁবু আনলে অবশ্য স্বতন্ত্র কথা।

'গঙ্গামায়ি কি জয়'—ধ্বনি তুলে যাত্রা শুরু হোল।

কখনও গঙ্গার ধারার পাশ দিয়ে, কখনও বা পাহাড়ের কিছু উপর দিয়ে ধীরে ধীরে চলেছি। পথ নেই। পা রাখার স্থানও কোথাও বা অতি সঙ্কীর্ণ। কুলিদের বা পাণ্ডার ছেলের হাত ধরে সে-সব স্থান অতিক্রম করি। বিপদ ঘটলে তারা যে হাতটুকু ধরে আটকে রাখতে পারবে এমন নয়। তবুও হাতের এই সামান্য ভরটুকু দিয়ে সাহসের সেতু বাঁধা হয়। শরীরও ভারসাম্য ফিরে পায়। কিন্তু ভয় যে সম্পূর্ণ মনের বিকার তা বুঝতে পারি চলার সঙ্গে। চলতে চলতে মনে সাহস জাগে, আত্মনির্ভরতা আসে, হাসিমুখে নির্ভয়ে সঙ্কটময় পথও একাই ক্রমে পার হয়ে এগিয়ে যাই।

গঙ্গার ধারে বালির উপর সব পায়ের চিহ্ন। গাইড্ ও কুলিরা দেখেই বলে —ভালুকের পায়ের ছাপ। শুনি, এ-অঞ্চলে বড় বড় ভালুক আছে।

ভূর্জবন

সাম্‌নাসাম্‌নি দেখাও যায়। ভাবি, দেখা হলে মন্দ নয়। কিন্তু, দেখা পাই না।

ফেরার পথে, গঙ্গার অপর পারে বড় একদল হরিণ দেখা গিয়েছিল। ঘোড়ার মত প্রকান্ড। একটার মাথায় বিরাট্‌ শিঙ্‌। দল বেঁধে চরছিল। আমরা এ-পারে দাঁড়িয়ে দেখছি, ওরাও অপর পারে দাঁড়িয়ে মুখ তুলে বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে আছে। আমরাও চলি, তারাও সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে। তারপর, হঠাৎ থেমে গিয়ে, যেন বিদায় জানিয়ে, পাহাড়ের উপর উঠে গেল।

ধীরে ধীরে গঙ্গার উৎসমুখে সবাই এগিয়ে চলেছি।

মনে এক অদ্ভুত অনুভূতি। বিগত-বিষয়-তৃষ্ণ।

জগৎ-সংসার সব ছেড়ে কোথায় যেন আর এক রাজ্যে চলে এসেছি। স্নেহ-মায়া, [illegible]—[illegible] ছিন্নভিন্ন [illegible]। চারিদিকে প্রকৃতির অপার শান্তির মাঝে নিজেকে যেন নিঃশেষ করে দিয়েছি।

পাহাড়ের মাথায় সব বরফ। বরফ গলে কেবলি ঝরণা নেমে এসেছে। কিছু নীচেই গঙ্গার ধারার সঙ্গে মিশছে। ঝরণার বুকে বড় বড় পাথর। সেই সব পাথরের উপর পা রেখে লাফিয়ে লাফিয়ে জলের ধারা পার হচ্ছি। ক্ষীণকায়া ধারাগুলি পার হতে অসুবিধা নেই।

গাইড্‌ জানায়, বাবুজি, ফেরবার পথে এই সব জায়গাতেই বিপদ। এখন সকালে বরফ গলতে শুরু করে নি। রৌদ্রের তেজ বাড়লেই দ্রুত গলতে থাকবে, ঝরণার জল বাড়বে, ধারা দশগুণ হয়ে প্রচন্ড বেগে ছুটে নামবে। তখন পার হওয়াই দুষ্কর। জলের ভিতর বড় বড় গোল পাথর গড়িয়ে ফেলে, তারি উপর পা রেখে কোনও রকমে পার হওয়া যায় ত ফেরা—নয়ত, এই সব ঝরণারই ধারে [illegible]। দিনের শেষভাগে এ-সব নদী পা[র] হওয়া অসম্ভব।

ভাবি, মিথ্যা এখন ও-সব চিন্তা অসম্ভব হয়-ই যদি, রাত্রিবাসও কর[া] যাবে। এখন শুধু অভিমন্যুর ব্যূহভে[দ] হলেও ক্ষতি কি?

হঠাৎ সাম্‌নে পড়ে অপরূপ রূপ!

ঝরণার আশেপাশে জল জমে আছে। তারই উপর কাঁচের মত পাত্‌লা বরফ জমেছে। সামান্য স্পর্শেই ভেঙে যায়, জল টল্‌মল্‌ করে ওঠে। তার কাছেই পাথরগুলির উপরও বরফের আচ্ছাদন। পাথরের নীচে বরফ গলে ধারা বয়ে চলেছে; উপরের পাথর থেকে বরফের সরু সরু ফালি বটগাছের ঝুরির মত নেমেছে। টপ্‌টপ্‌ করে ফোঁটা ফোঁটা জল মুক্তার মত তা থেকে পড়ছে। আর, সেই বরফের ঝুরিগুলির উপর সকালের রৌদ্র পড়ে রামধনুর সাতরঙা ছটা ছড়িয়েছে।

স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকি। কি বিচিত্র বর্ণ-বিন্যাস!

সকাল থেকে প্রায় ছয় ঘণ্টা চলেছি। এখনও ছয় মাইল পথের শেষ হয়নি। অথচ, পথে বিশ্রামও বিশেষ করি নি, ধীরে ধীরে এগিয়েই চলেছি।

গাইড্ বলে, এইবার পেণছে গেছি, পাহাড়ের ঐ বাঁকটা ঘুরলেই দর্শন মিলবে।

গঙ্গার দুই কূলের গিরিশ্রেণী কিছু দূরে সরে গেছে। নদীর উপত্যকা প্রসারিত হয়েছে। এ-পারের পাহাড় থেকে ও-পারের পাহাড় প্রায় মাইলখানেক দূর হবে। তারি মধ্যে সাগর-সৈকতের মত বিস্তীর্ণ বালুকারাশির উপর দিয়ে গঙ্গার ধারা নেমে আসছে। সম্মুখে উপত্যকার গতি-পথ রোধ করে এক বিরাট গিরিশ্রেণী দাঁড়িয়ে আছে। তারই দুইটি বরফ-ঢাকা চূড়া সূর্যকিরণে ঝলমল্ করছে। 'শতপন্থ' শিখর। উপত্যকাও তুষারাবৃত। পাহাড়ের উপর থেকে বিরাট 'গ্লাশিয়ার' নেমে এসেছে। সেই হিম-প্রবাহের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে গাইড্ জানালো, ওরই কাছে গঙ্গার উৎস-মুখ—গোমুখ। বরফের মধ্যে প্রকাণ্ড বরফেরই কয়েকটি গুহা। তারই ভিতর থেকে বরফ গলে গঙ্গা নদীর রূপ ধরে বা'র হয়ে আসছেন—'হিম-বিধু-মুক্তা-ধবল তরঙ্গে'।

জলের কিনারা দিয়ে পাথর ধরে ধরে আমরা এগিয়ে চললাম। প্রায় আধঘণ্টা চলার পর সেই বরফের গুহার মুখে পেণছুলাম। সাগরবক্ষ হতে ১৩,৭৭০ ফিট। এর পর সবই তুষার-আচ্ছন্ন। এই-খানেই প্রথম নদীআকারে ভাগীরথীর আবির্ভাব।

ম্যাপ্ খুলে চারিদিকের তুষার-শিখরগুলির নামের সঙ্গে পরিচয় করি। ভৃগুপন্থ, মেরুপর্বত, শিবলিঙ্, কীর্তিবাসক, ভাগীরথীপর্বত, শতপন্থ, কালিন্দী, চতুরঙ্গী, বাসুকীপর্বত, নীলাম্বর, রক্তবরণ, শ্বেতবরণ, সুদর্শন, —অপূর্ব সব নামকরণ। কে কবে এ-সব নাম দিল, তাই ভাবি।

শুভ্র-জটাজুট যোগ-মগ্ন সব যোগী-শ্বর। দেবতাত্মা হিমালয়ে যুগ-যুগান্তরের শাশ্বতবাণীর নির্বাক্ প্রতিমূর্তি।

২০

গোমুখ!

নাম-করণের কারণ খুঁজি। গাভীর মুখ,—হয়ত কবিচিত্তের কল্পনার কথা। তবুও মনে হয়, সামনের দুইটি বরফের চূড়ার সঙ্গে গরুর শিঙ-এর সাদৃশ্য এবং বরফের বিরাট গুহাটি মুখ-বিবর মাত্র। আবার মনে হয়, গো অর্থে পৃথিবীও ত হয়। পৃথিবীর এই তুষার-বিবরই ত এ-নদীর উৎস-মুখ—তা-ই বুঝি বা গো-মুখ।

বরফের প্রকাণ্ড গুহা। তিন চারশ ফিট্ উঁচু, শতখানেক ফিট্ চওড়া। ভিতরে অন্ধকার। সেই গোপন অন্ধকারের ভিতর থেকে তরল-তরঙ্গে জল বয়ে আসছে। গুহার মুখে বরফের চাঙর ভেঙে পড়ছে, জলের স্রোতে বরফ ভেসে চলেছে। বরফ-গলা জল,—নিদারুণ শীতল। জলের রঙ্ ঘোলাটে। গঙ্গার গৈরিকবাসের পূর্বাভাষ।

গঙ্গার জলে স্নান করলাম।

সঙ্গে-আনা মেজদাদার অস্থি বিসর্জন দিলাম।

জাহ্নবী-ধারার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখতে থাকি। স্রোতের আবর্তে চিতা-ভস্ম ও অস্থি-খণ্ড নিমিষে কোথায় অন্তর্ধান করে।

ঠিক এক বছর আগেকার কথা। সেদিন এমনি হিমালয়পথে ঘুরতে ঘুরতে বদরীনারায়ণে এসে পেণছেছি। পেণছানোমাত্র পাণ্ডাজি এসে ডাকের চিঠি হাতে দিলেন।

মেজদাদার লেখা। কাশ্মীরে তখন তিনি বন্দী।

লিখেছেন, এ-চিঠি যখন তোমার কাছে পেণছুবে ততদিনে তুমি হয়ত বদরিকাশ্রমে পেণছেছ। হিমালয়ের বিরাট ও অপরূপ সৌন্দর্য তুমি নিশ্চয় উপ-ভোগ করছ। এখানে আমিও ঐ মহান্ হিমালয়েরই আর এক অংশে আছি। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যও আছে। শুধু প্রভেদ

দূরে গোমুখ শতপন্থ

এই, তুমি স্বেচ্ছায় স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছ, আর আমার ঘোরাফেরার হুকুম নেই, স্থানও নেই,—চারিদিকে সশস্ত্র প্রহরী দিবারাত্র পাহারা দিচ্ছে। আমার খুবই ইচ্ছা ছিল, এবার তোমাদের সঙ্গে কেদার-বদরী ঘুরে আসি। কিন্তু, তা ভাগ্যে ছিল না। আগামী বছর ভাগ্য আরও প্রসন্ন হবেন, আশা করি।

এ-চিঠি পাবার দশ দিন পরে কলিকাতায় ফিরে আসি। তার দুই সপ্তাহ পরেই তিনিও ফিরলেন—চির-মুক্তি পেয়ে। কাশ্মীর-সরকার কাশ্মীরী শালে আচ্ছাদন করে তাঁর মর-দেহ ফেরৎ পাঠালেন!

সেদিনই শ্মশানে তাঁর চিতার পাশে বসে সঙ্কল্প করলাম, তাঁর চিতা-ভস্ম ও অস্থি-চূর্ণ নিয়ে আগামী বছর গোমুখে ও বদরিকাশ্রমে ব্রহ্মকপালে বিসর্জন দিয়ে আসব।

আজ বৎসরান্তে সেই উদ্দেশ্য সার্থক হোল।

তাকিয়ে দেখি, গঙ্গার প্রবল প্রবাহে যেন সেই প্রদীপ্ত চিতা-বহ্নিরই লেলিহান্ শিখা। আজ বুঝি বা জননী জাহ্নবীর শান্ত-স্নিগ্ধ স্পর্শে নির্বাপিত হোল।

'সুখদা মোক্ষদা গঙ্গা গঙ্গৈব পরমা গতিঃ।'

জল-ধারার ধারেই এক শীতল শিলা-খণ্ডের উপর আসন নিয়েছি। সামনেই গোমুখ-গুহা।

চারিদিক নিস্তব্ধ নিশ্চল। যোগমগ্ন হিমাচল। তুষারকান্তি জ্যোতির্ময়।

তারি মাঝে জাহ্নবীর জন্ম-কাকলী। সুরধুনীর সুরধ্বনি।

ভাগীরথীর মর্ত্যে অবতরণ।

স্থির হয়ে বসি। দেখি সুরেশ্বরি ভগবতি গঙ্গে'র অমর মাহাত্ম্য হৃদয়ে উপলব্ধি করি।

চোখের উপর ভেসে ওঠে এই শীর্ণ-কায়া পর্বত-নির্ঝরিণীর মহীয়সী মহিমা—বিশাল বিস্তৃতি। অঙ্কুরের মাঝে মহীরুহের ইঙ্গিত।

গঙ্গার স্রোতের সঙ্গে মন ভেসে চলে। ছল্ ছল্ কল্ কল্। পাহাড়-পর্বত ভেদ করে ছুটে চলে। যত বাধা, তত বেগ। উচ্ছল উদ্দাম। চারিদিকের গিরিদেবতা ঝরণার জলের অঞ্জলি দেয়।

জল বাড়ে, স্রোত বয়। পারাবার-বিহারিণী জাহ্নবী ছুটে চলে।

দেবাদিদেব মহাদেবের জটা বেয়ে স্বর্গের নির্ঝরিণী সব কলোচ্ছ্বাসে নেমে আসে। মন্দাকিনী, সরস্বতী, গৌরী, নন্দা, অলকানন্দার সহিত মিলিত হয়ে ছুটে আসে, ভাগীরথীতে নিঃশেষে বিলীন হয়।

মিলনের পুণ্যতীর্থে সঙ্গমে সঙ্গমে প্রয়াগের প্রতিষ্ঠা। পাহাড়ের মাঝেও গঙ্গার উভয়তীরে মানুষের বসতি জাগে। মন্দিরে শঙ্খঘণ্টার রোল ওঠে। গঙ্গার আবাহন জানায়,—পতিতপাবনি সুরধুনি গঙ্গে!

জাহ্নবী ছুটে চলে। পর্বত-কারায় অবরুদ্ধা প্রমত্তা নদী মুক্তির সন্ধানে বেগে ধেয়ে চলে। গিরি-দ্বার ভেদ করে হরিদ্বারে কল্যাণী জননী নেমে আসেন। শ্রান্তি-হরা, শান্তি-ভরা ভীষ্ম-জননী!

ভরা নদী বয়ে চলে। তীরে তীরে কত নগরী, কত তীর্থ গড়ে ওঠে। দুকূলের ক্ষেতে ক্ষেতে ফসল ফলে। অন্ন-দায়িনী শান্তি-প্রদায়িনী ভাগীরথী!

কলকল্লোলিনী জাহ্নবী তবু ছুটে চলে। বিশাল বিস্তৃতি—সুগভীর জল-রাশি। নৌকা চলে, জাহাজ ভাসে। সভ্যতার পণ্য আসে। যন্ত্র-দানবের বিরাট সৌধ জাগে।

সুধাপ্লাবিতা মকরবাহিনী তবুও ছুটে চলে।

জলস্রোতে বিগত বছরের কয়দিনের কাহিনী স্মৃতি-পথে ভেসে আসে।

গঙ্গাসাগর অভিমুখে চলেছি। এই ভাগীরথীরই আর এক রূপ। উচ্ছলা ঞ্চলা পার্বত্য নির্ঝরিণী নয়—দুবিস্তীর্ণ বারিরাশি। প্রশান্ত বিস্তার। দুই তীরে অভ্রভেদী গিরি-প্রহরী নয়,—দূর দিক্‌চক্রবালে তরুরাজির ঘনসবুজ রথা। দিগন্ত-প্রসারিণী প্রবাহিনী। াগর-সঙ্গমে ছুটে চলেছে।

সঙ্গমে মন্দির। তীর্থযাত্রার সমারোহ। লাকমুখে গঙ্গার মাহাত্ম্য কীর্তন। গীরথের কীর্তি, জহ্নুমুনির উপাখ্যান, গর-রাজের কাহিনী—কত পুণ্য-স্মৃতি-রা জাহ্নবী!

মহাসমুদ্রে ঊর্মিমালার মুকুট মাথায় মোলয়ের দুহিতাকে সাদর আহ্বান নায়। সহস্র তরঙ্গে আলিঙ্গন করে। গীরথীর পুণ্য-প্রবাহ সাগর-জলে লীন হয়। মিলনের কল্লোল-কলরব দ-ব্রহ্মের ধ্বনি তোলে।

মহাদ্রি-শিখর হতে মহাসাগর,—বিরাট ত বিশাল। ধ্যান-মগ্ন স্তব্ধ হিমাচলে শান্তি, চির-জাগ্রত উদ্বেল মহা-সমুদ্রে ...ন্ত।

বিপুল বিস্ময়ে দেখি, সাগরের বারিকণা মেঘাকারে আকাশ-পথে আবার ছুটে আসে। হিমগিরির হিমশিখরে তুষার জমে। গিরি-কন্দরে প্রাণের স্পন্দন জাগে, শিব-সুন্দর জটা-শীর্ষে গঙ্গার প্রচণ্ড ধারা বহন করেন, ভগীরথ শঙ্খনাদে আবাহন জানান। গঙ্গার চিরন্তন মঙ্গলময় যাত্রা আবার চক্রবৎ শুরু হয়।

গোমুখ-বিবর-নিঃসৃতা জাহ্নবীর ছল্‌ছল্‌ উচ্ছল বাণী উঠে; নির্ঝরিণীর সেই কলধ্বনির মাঝে মহাসাগরের মহাকল্লোল প্রতিধ্বনিত হয়।

গোমুখ-কল্লোল মাঝে শুনি আমি সাগর-সংগীত।

(সমাপ্ত)

প্রবন্ধে ব্যবহৃত আলোকচিত্র লেখক কর্তৃক গৃহীত।

ধীরাজ ভট্টাচার্য

॥ আট ॥

রা য় বাহাদুরের কলেজে-পড়া মেয়ে গোপা। স্টুডিও থেকে বাড়ি সে যতক্ষণ জেগেছিলাম সবাইকে জাল াহেবের ঐ বিচিত্র নাচ দেখালাম। মা র্যন্ত হেসে খুন। রাত্রে ঘুমিয়ে স্বপ্ন খলাম গোপাকে। হাতে ফুলের মালা য়ে ছাতের আলসের উপর ঝুঁকে ড়ে প্রতীক্ষাব্যাকুল চোখ দুটো দিয়ে ন কাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে গোপা। ওর ষ্টিপথে পড়ার অনেক রকম চেষ্টাই লাম কিন্তু সব বৃথা। আমি নিদের ছাতে পায়চারি করি ও তখন চু হয়ে খোঁজে নীচের রাস্তায় অথবা নিদের দোতালার জানালায়। আবার মি যখন নীচে দোতালায় জানালার র দাঁড়াই ও তখন চোখ তুলে খোঁজে নিদের ফাঁকা ছাদটায়।

ঘুম ভাঙল না বাঁচলাম। জেগে খ, বেশ বেলা হয়ে গেছে। রবিবার ও কাজের তাড়া নেই, আরও কিছু য় চোখ বুজে শুয়ে থাকলাম। উঠে হাত ধুয়ে জগুবাজার থেকে এক াড়া জুতো কিনে আনলাম। খাওয়া- ায়া শেষ হতে সেদিন একটু বেলাই । তারপর প্রসাধন পর্ব শেষ করে খিদিরপুরে রিনিদের বাড়ি রওনা ন তখন প্রায় বেলা একটা। হেমচন্দ্র ট থেকে বেরিয়ে ছোট্ট একটা গলি ধরে উত্তরমুখো গিয়ে যে বাড়িটার সামনে নিজের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলেছে সেইটেই হল রিনিদের বাড়ি। কড়া নাড়তে না নাড়তেই রিনি এসে দরজা খুলে দিলে।

বললাম—'কি করে বুঝলি আমি? আমি না হয়ে ইয়া দাড়িওলা কাবুলি-ওয়ালাও ত' হতে পারত!'

'বারে, তা হবে কেন! উপরের বারান্দা থেকে দেখলাম যে, তুমি বড় রাস্তা ছেড়ে গলিতে ঢুকছো। তাছাড়া, আমি জানতাম তুমি আসবেই।' বলেই এমন একটা দুষ্টুমি ভরা হাসি হাসলে রিনি যে, দেখলে সর্বাঙ্গ জ্বলে যায়।

বাইরের দরজায় খিল লাগাতে লাগাতে বললাম—'আজকাল বড্ড বেড়ে উঠেছিস, দাঁড়া কাকাকে বলে মজা দেখাচ্ছি।'

'বেশ, বেশ। দাও বলে তোমার কাকাকে।' অভিমান ভরে দুম দুম করে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেল রিনি।

মনে মনে ভাবলাম, রিনির রাগ জল করার ওষুধ ত' আমার হাতেই রয়েছে পার্ল হোয়াইটের 'দি আয়রন ক্ল।'

সদর দরজা খুললেই পড়ে দরদালান। উত্তরমুখো দুখানা ঘর, একখানায় রান্না হয়, অন্যটি কাকিমার ভাঁড়ার। পশ্চিম-দিকে একটা দরজা, সেটা খুললেই দেখা যায় লম্বা একখানা ঘর। সেইটে বাইরের ঘর। কাকার আফিসের লোকজন অথবা বন্ধুবান্ধব কেউ ছুটির দিনে এলে সেইটেতে বসে। পুবদিক দিয়ে উপরে ওঠবার সিঁড়ি, সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেলাম। উপরেও ঠিক নীচের মত চওড়া বারান্দা বা দরদালান আর তিন-খানা ঘর ঠিক একতলার মাপে। বারান্দায় একখানা চওড়া তক্তপোষ পাতা, মাদুর বা শতরঞ্চি কিছু নেই। রিনি তারই এক পাশে গুম হয়ে বসে একখানা খাতায় হিজিবিজি কাটছে।

বললাম—'কাকা কোথায় রে রিনি?'

কোনও জবাব না দিয়ে মুখ গুঁজে বসে রইল রিনি। বুঝলাম, অভিমান হয়েছে। আস্তে আস্তে ওর পাশে বসে আদর করে কাছে টেনে এনে বললাম—'দূর বোকা মেয়ে, দাদার কথায় রাগ করতে আছে? কাকা কোথায়?'

রাগ জল হয়ে গেল রিনির। চুপি চুপি পশ্চিমের বন্ধ দরজাটা দেখিয়ে বললে—'বাবা মা ঘুমুচ্ছে। ছুটির দিন হলেই বাবা দুপুরে লম্বা ঘুম দেয়।'

পিছন ফিরে দেখলাম, রিনির ছোট ভাই আর বোনটা এক রাশ খাতা বই-এর মাঝখানে দিব্যি হাঁ করে ঘুমুচ্ছে। আর কথা খুঁজে পাই না, চুপচাপ বসে রইলাম। বলি বলি করেও গোপার
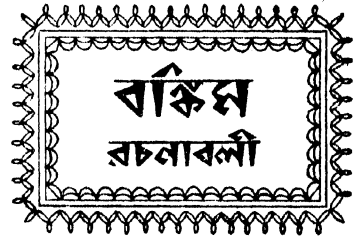
কথাটা রিনিকে কিছুতেই জিজ্ঞাসা করতে পারলাম না, কেমন লজ্জা করতে লাগল। আর হতভাগা মেয়েটাও সে দিক দিয়ে একদম মাড়াল না। কি করি, অগত্যা ওদেরই একখানা পাঠ্যপুস্তক টেনে নিয়ে অন্যমনস্কভাবে পাতা ওল্টাতে লাগলাম। খুট্ করে জানালা খোলার আওয়াজ হতেই বিদ্যুতের মত ছুটে এসে রিনি দক্ষিণদিকের জানালার কাছে, তারপর ফিরে এসে কোনও কথা না বলেই আমার হাত ধরে টানতে শুরু করে দিল। কি একটা আপত্তি করতে যাচ্ছিলাম, মুখে একটা আঙুল দিয়ে আমায় কথা না কইতে ইশারা করল রিনি। তারপর হাত ধরে হিড় হিড় করে টানতে টানতে ছাতের সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল। কেমন যেন ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলাম। ছাতে উঠে দক্ষিণদিকের আলসের কাছে এসে হাত ছেড়ে দিলে রিনি। রিনিদের বাড়ি থেকে মাত্র হাত তিনেক ব্যবধান, তার পরই দক্ষিণের সমস্ত আলো হাওয়া গ্রাস করে বিরাটকায় দৈত্যের মত মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে রায় বাহাদুরের প্রাসাদোপম প্রকাণ্ড অট্টালিকা। রিনিদের ছাত থেকে মুখোমুখি পড়ে একটা দোতালার জানালা, তারই একটা লোহার গরাদ ধরে এলো-চুলে রূপকথার বন্দিনী রাজকন্যার মত দাঁড়িয়ে আছে গোপা। পরিচয় করিয়ে দেবার দরকার হলো না, আমার কল্পনায় আঁকা গোপার সঙ্গে হুবহু না হলেও অনেকখানি মিল আছে। গোপাই আগে হাসিমুখে নমস্কার জানালে, হাত তুলে প্রতি নমস্কার করে স্থান কাল পাত্র ভুলে অপলক চোখে চেয়ে রইলাম।

রিনি বললে—'ছোড়দা!'

গোপা—'জানি।'

সমুদ্রের রহস্যভরা দুটি কালো হরিণ চোখ আর অজানুলম্বিত কোঁকড়া মেঘ বরণ চুলের পাহাড়—মাত্র এই দুটিতে যে নারী সৌন্দর্য কত গুণ বাড়িয়ে দিতে পারে, গোপাকে চোখে দেখার আগে তা উপলব্ধি করা যায় না। শান্ত অসীম কাব্যসমুদ্রে কোন্ সে কালো মেয়ের কালো হরিণ-চোখ দুটি কি করে তুফান তুলেছিল, আজ তা পরিষ্কার বুঝতে পারলাম। আরও বুঝতে পারলাম, ধবধবে ফর্সা রং-এর সঙ্গে ঐ চোখ আর চুল ঠিক খাপ খেলো না। গোপার রঙ খুব কালো না হলেও বেশ চাপা, নাক চোখ দেহের গড়ন এক কথায় নিখুঁত। গোপা যেন চুম্বকের মত শুধু আকর্ষণ
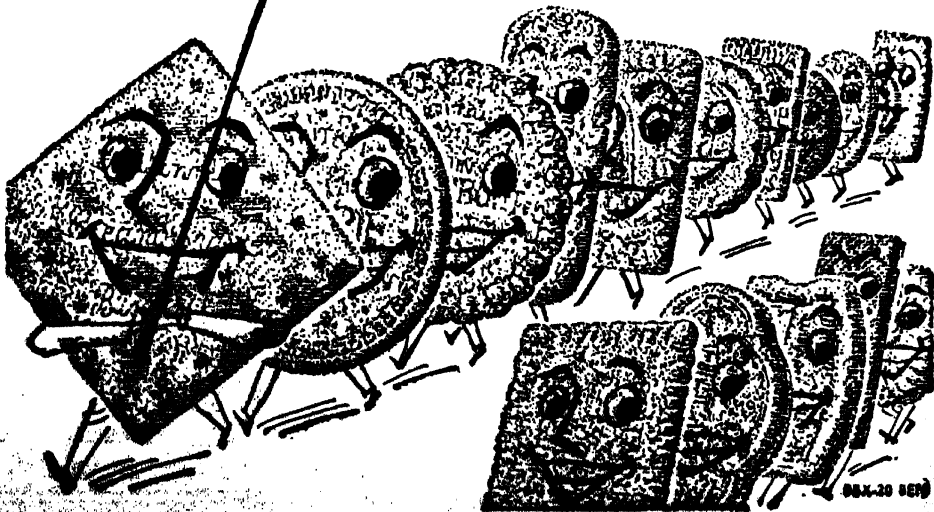
ফরে, ইচ্ছে করলেও ফেরা যায় না। নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়ে নর্লজ্জের মত শুধু চেয়েই আছি, স্বপ্ন চাঞ্চল রিনির কথায়।

—'বারে, তোমরা ত' বেশ লোক গোপাদি। এদিকে ত' আলাপ করবার জন্যে পাগল। যেই আলাপ করিয়ে দলাম, ব্যস, আর কথা নেই, একদম পচাপ। যাই বাবা, সামনে এগ্জামিন, পড়াশুনো করিগে যাই। এখুনি বাবা উঠে যদি দেখেন আমি পড়ছিনে—বকুনি লাগাবে।'

গোপা হেসে জবাব দিলে—'তুমি আরও কিছুক্ষণ নির্ভয়ে এখানে থাকতে পার রিনি। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তোমার বাবা মার রুদ্ধ দুয়ার এখনও খোলেনি।'

সাহস সঞ্চয় করে বলে ফেললাম—তদিন একটা ভুল ধারণা বুকের মধ্যে করে পুষে রেখেছিলাম। আজ পনাকে দেখে সেটা শুধরে নিলাম।'

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল গোপা। ত শঙ্কিত চোখে শুধু বললে—সের ধারণা?'

আমি আজ মরিয়া। বললাম—তদিন জানতাম সুন্দরী আখ্যা পেতে র রং ফর্সা হওয়াটা এসেনশিয়াল। জ বুঝলাম, মস্ত ভুল ধারণা।'

খুশী হলো কিনা বুঝলাম না, কিন্তু জ্জায় চোখ নামিয়ে নিয়ে নীচের গলি-থর দিকে চেয়ে রইল গোপা।

রিনি বললে—'গোপাদি কি বলে না ছোড়দা? বলে, তোমার ছোড়দা তা দেবী, ললিতা দেবী আরও কত সুন্দরী মেয়েদের সঙ্গে অভিনয় ন। আমার মত একটা কালো সত মেয়ের সঙ্গে হয়তো ঘেন্নায় ই কইবেন না।'

বেশ একটু উত্তেজিত হয়েই রিনিকে লাম—'ঐ কালো কুৎসিত মেয়ের হ দাঁড়াবার যোগ্যতাও ওদের—'

কথা শেষ হল না। এরই মধ্যে কখন শব্দে জানালা বন্ধ করে সরে পড়েছে পা। সমস্ত উৎসাহ উত্তেজনা নিমেষে ড় জল হয়ে গেল।'

কাছে ঘেঁষে এসে চুপি চুপি বললে —'গোপাদি ওভাবে চুপি চুপি জানালা বন্ধ করে সরে পড়ল কেন, কিছু বুঝতে পারলে ছোড়দা?'

ঐ বিরাট বন্দীশালার বন্ধ জানালাটার দিকে চেয়ে শুধু ঘাড় নাড়লাম।

রিনি বললে—'মাকে গোপাদি বাঘের মত ভয় করে। তাছাড়া, তিনি ভয়ানক সেকেলে। সিনেমা থিয়েটার দেখা একদম পছন্দ করেন না, তার উপর যদি দেখেন তোমার সঙ্গে আলাপ করছে গোপাদি—। মায়ের সাড়া পেয়েই পালিয়েছে গোপাদি। এস ছোড়দা, নীচে যাই। এক্ষুণি বাবা মা উঠে আসবেন।'

নীচে নেমে এলাম। রিনির ছোট ভাই বোনটা তখনও অকাতরে ঘুমুচ্ছে। একখানা ইংরেজি পাঠ্যপুস্তক আমার হাতে গুঁজে দিয়ে খাতা পেন্সিল নিয়ে রিনি বললে 'আমায় একটা ডিক্টেশন্ দাও না ছোড়দা।'

তারপর গলাটা নামিয়ে আস্তে আস্তে বললে—'আজ আর গল্প শোনা হল না। বাবা মা ঘরে কথা কইছেন, এক্ষুণি দরজা খুলবেন।'

ডিক্টেশনের মাঝখানেই কাকীমা দরজা খুলে বাইরে এলেন। আমাকে দেখেই হেসে বললেন—'তবু ভাল, গরীব কাকা কাকীমার কথা মনে পড়েছে ছেলের।'

বললাম—'ওসব পোশাকী ফরম্যালিটি শিকেয় তুলে রেখে দিয়ে শিগ্গির শিগ্গির এক থালা গরম লুচি হালুয়া আর এক কাপ চা খাওয়াও কাকীমা। ক্ষিদেয় একদম কথা বলতে পারছি না।'

হেসে ঝি মোক্ষদার নাম ধরে ডাকতে ডাকতে নীচে নেমে গেলেন কাকীমা। ইতিমধ্যে কখন কাকা এসে পাশে বসেছেন জানতে পারিনি। রিনির ডিক্টেশন্ শেষ করে সেই বইটারই পাতা ওল্টাতে লাগলাম।

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

হঠাৎ কোনও রকম ভূমিকা না করেই কাকা বললেন—'এই যে সিনেমায় নামছিস্ এর জন্যে মাসে মাসে কত দেবে ওরা তোকে?'

কাকার ঈর্ষার আগুনটা হাওয়া দিয়ে আরও খানিকটা বাড়িয়ে দিয়ে বললাম—'এখন দেড়শ' টাকা করে দিচ্ছে, কাল

পরিণয় ছবি রিলিজ হলে পাঁচশ' করে দেবে।'

বিস্ময়ে চোখ দুটো কপালে তুলে কাকা বললেন—'পাঁ-চ-শো?'

সহজভাবেই বললাম—'হ্যাঁ, এ আর বেশি কি! সিনেমা দিন দিন যে রকম জনপ্রিয় হয়ে উঠছে তাতে বছরখানেক বাদে হাজারখানেক টাকা মাসে অনায়াসে রোজগার করা যাবে।'

বাক্‌শক্তি রহিত হয়ে গোপাদের প্রকাণ্ড বাড়িটার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে বসে রইলেন কাকা।

টাট্‌কা গাওয়া ঘিয়ে লুচি ভাজার ক্ষিদে বাড়ানো গন্ধ নীচে থেকে ভেসে এল। রিনির ছোট ভাই বোন দুটো ঘুম ভেঙে আড়মোড়া খেয়ে উঠে বসল।

ঐভাবে গোপাদের বাড়িটার দিকে উদ্দেশ্যহীনভাবে চেয়েই কাকা বললেন—'তুই বলিস্ কি? বি এ, এম এ পাশ করে একশ' টাকা রোজগার করতে পারলে লোকে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করে। আর শুধু রং মেখে মাগীদের সঙ্গে নেচে গেয়ে তোরা অত টাকা রোজগার করবি?'

বেশ বুঝতে পারলাম, কিছুদিনের জন্যে কাকার আহার নিদ্রার রীতিমত ব্যাঘাত সৃষ্টি করে গেলাম।

নীচে থেকে রিনির ডাক পড়ল। বাপের সামনে থেকে উঠতে পেরে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো রিনি। চেয়ে দেখি, ছোট ভাই বোন দুটিও এই অছিলায় ঘুম জড়ানো কুৎকুতে চোখে সভয়ে বাপের দিকে চাইতে চাইতে রিনির পিছু নিয়েছে। অন্য সময় হলে এ দৃশ্য দেখে হেসে ফেলতাম কিন্তু কাকার মানসিক অবস্থা বিবেচনা করে সে ইচ্ছা দমন করলাম। কাটা ঘায়ে নুনের প্রলেপ দেবার এমন সুযোগটা ছাড়তে ইচ্ছা হোল না। মুখখানা যথাসম্ভব কাঁচুমাচু করে হতাশার ভঙ্গিতে বললাম—'টাকাটাই শুধু দেখলেন কাকা! সামাজিক বয়কট, তাচ্ছিল্য, শিক্ষিত ভদ্রসমাজের ঘেন্না এই রকম কতগুলো ঝক্কি মাথায় নিয়ে ঐ টাকাটা রোজগার হবে সেটা একবার ভেবে দেখলেন না?'

অধৈর্য হয়ে একরকম চেঁচিয়ে উঠলেন কাকা—'বাজে, মিথ্যে কথা। আমিও প্রথমে তাই মনে করেছিলাম এখন দেখছি, ভুল করেছিলাম। এই তো আমার সামনে বাড়ির রায় বাহাদুর সেদিন আফিস থেকে ফেরবার সময় গেটের সামনে দেখা। প্রথমেই বলে বসলেন—ধীরাজ ভট্টাচার্য আপনার ভাইপো? চমৎকার চেহারা ছেলেটির আর অভিনয়ও বেশ ভালই করছে। শেষে একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—আপনি সিনেমা থিয়েটারের একজন ভক্ত তাতো জানা ছিল না।

এক গাল হেসে জবাব দিলেন রায় বাহাদুর—'ভক্ত টক্ত নই মশাই, 'গিরিবালা' ছবিটা প্রথমত রবি ঠাকুরের গল্প। তার উপর আমার মেয়ে গোপা তিন চারবার দেখেছে। সেই-ই একদিন জোর করে দেখিয়ে আনলে। তা মন্দ লাগেনি মশাই।'

চুপ করে বসে রইলাম। কাকাই একটু পরে আবার শুরু করলেন—'তাছাড়া, আমাদের আফিসের বড়বাবু থেকে শুরু করে প্রায় সবই দেখে এসেছে। তাই ভাবছি, শিক্ষাদীক্ষার কোনও দামই রইল না। দেশটা দিন দিন রসাতলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।'

শিক্ষিত ভদ্রসমাজের হঠাৎ অধঃপতনে কাকার আক্ষেপোক্তি আরও হয়তো শুনতে হোত, বাঁচিয়ে দিল রিনি, সিঁড়ির মাথা বরাবর উঠে ডাকলে—'এস ছোড়দা খাবার দেওয়া হয়েছে।'

এবার কাকার সামনে থেকে উঠে আসবার একটা সুযোগ পাওয়া গেল।

(ক্রমশ)

ঝাঁসীর রানী ০ মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য

॥ ৭ ॥

বয়সের পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও রানীর সঙ্গে তাঁর স্বামীর একটি হৃদয়ের সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিল।

গঙ্গাধর রাও পরম শৌখীন লোক ছিলেন। ঘোড়া আর হাতীর বড় কদর বুঝতেন তিনি। তাঁর প্রিয় হাতী সিদ্ধবকসের নাম পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এই হাতীকে প্রত্যহ আখ ও জিলাপী খাওয়ান হ'ত। বিশেষ উৎসবে রাজা চড়তেন তার পিঠে। ১৮৫৮ সালের এপ্রিল মাসে ঝাঁসী নগরী অধিকার করবার পর খোলা রাজপথে, প্রকাশ্যে ঝাঁসীর রাজবাড়ির বিবিধ সম্পত্তি নীলামে বিক্রী করা হয়েছিল। ইন্দোরের বিখ্যাত ধনী সর্দার বুলে এই হাতীটিকে কিনেছিলেন। মালিক বদলে মন ভেঙে গিয়েছিল সিদ্ধবকসের। অনেক বিপর্যয় ঘটে গেল তার ভাগ্যে, তাই বুঝেই হয়তো, ঝাঁসী নগর ত্যাগ করবার সঙ্গে সঙ্গে সে আহার ত্যাগ করল। ইন্দোরে পৌঁছবার বহু আগেই পথেই তার মৃত্যু হয়।

অপর একটি হাতীর দাঁত ছিল অলংকার। তাতে শোভাযাত্রার সময় দুটি উজ্জ্বল মোমবাতির ঝাড় ঝুলিয়ে দেওয়া হ'ত। জ্বলন্ত বাতি নিয়ে যখন সেই হাতী চলত রাজপথে, তখন মুগ্ধ দর্শকরা চেয়ে থাকত। অশ্বশালাও তাঁর অতি সুন্দর ছিল। নাট্য ও সঙ্গীত কলায় তাঁর অনুরাগ ছিল। আচারে-ব্যবহারে তিনি গোঁড়া হিন্দু ছিলেন।

তাঁর রাজত্বকালে নারায়ণ শাস্ত্রী নামক জনৈক ব্রাহ্মণ একটি সুরূপা ভাঙ্গী রমণীর প্রেমাসক্ত হয়েছিলেন। অন্যান্য ব্রাহ্মণরা তাতে মর্মান্তিক ক্রুদ্ধ হ'লেন এবং যথাকালে গঙ্গাধর রাওয়ের সমীপে এই সংবাদ পৌঁছল। গঙ্গাধর রাও অপরাধী দুইজনকে তলব করলেন। নারায়ণরাও শাস্ত্রী শাস্ত্রমতে প্রায়শ্চিত্ত করলেই নিস্তার পেতেন এবং নিম্নবর্ণা স্ত্রীলোকটির হয়তো গুরুতর শাস্তি হ'ত। নারায়ণরাও কাপুরুষের মত স্ত্রীলোকটিকে ত্যাগ করতে রাজী হলেন না। ফলে ঝাঁসীর ছয়শো ব্রাহ্মণ পরিবারে তুমুল আলোড়ন উপস্থিত হ'ল। নারায়ণরাও হাসিমুখে সেই রমণীর সঙ্গে নগর ত্যাগ ক'রে গঙ্গাধর রাওকে সংকট থেকে নিস্তার দিয়ে গেলেন। তারপর নগরীর রাস্তাগুলি বিবিধভাবে শোধন করা হ'ল।

গঙ্গাধররাও ইংরেজের সঙ্গে ব্যবহারে স্বাতন্ত্র্য এবং আত্মমর্যাদা রেখে চলতেন। তাঁর সমসাময়িক ইংরাজ রেসিডেন্ট এবং সামরিক কর্মচারীদের মধ্যে তাঁর সম্পর্কে বিবিধ কাহিনী প্রচলিত ছিল। তাঁর নাট্যশালার অভিনেত্রীদের পোশাক ও অলংকার তাঁর ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে নির্মিত হ'ত। একদিন ক্যাপ্টেন গর্ডন প্রশ্ন করলেন—

ঃ দুষ্ট লোক বলে, মহারাজ অবসর সময়ে স্ত্রীলোকের বেশভূষা নিয়ে ব্যস্ত থাকেন?

গঙ্গাধর বললেন—

ঃ তোমরা দূর সমুদ্রপার থেকে এসে ভারতীয় রাজ্যগুলির স্বামী হয়ে বসেছ। পরনির্ভরশীল এই রাজ্যে আমাদের নিজেদের ত' কিছু করবার নেই। কাজেই অলংকার পরলেই বা অপরাধ কি?

অন্যসময়ে, কোন একবার, দশহরা উৎসবের দিন রবিবার ছিল। গঙ্গাধর হাতীর পিঠে নগর পরিক্রমায় বেরোবেন মনস্থ করলেন। ব্রিটিশ ফৌজের মিলিটারী ব্যাণ্ড তাঁকে অনুসরণ করতে রাজী হ'ল না। তাদের ধর্মে রবিবার পুণ্যদিবস। তারা সেদিন বেরোবে না। আত্মসম্মানে আঘাত লাগল। ক্রোধে

অধীর হ'লেন গঙ্গাধর রাও। সামন্ত-রাজাগ্নলির নৃপতিদের মনে অসন্তোষের কোন কারণ সৃষ্টি হয় তা সরকারের অভিপ্রেত ছিল না। গঙ্গাধর অসন্তুষ্ট হয়েছেন জেনে শশব্যস্তে মিলিটারী ব্যান্ডসহ ব্রিটিশ ফৌজ হাজির হ'ল। তারা নগরের পথে পথে ভ্রমণ করল রাজার পেছনে।

১৮৫০ সালে, মাঘী শুক্লাসপ্তমী তিথিতে, গঙ্গাধর রাও ত্রিস্থলী তীর্থ পরিক্রমার উদ্দেশ্যে সপরিবারে বেরোলেন। প্রথমে তাঁরা গেলেন কাশী। কাশীর ইংরেজ কমিশনার-এর কাছে হুকুম গিয়েছিল গঙ্গাধর রাওয়ের সম্বর্ধনার জন্য যেন যথোচিত আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন কাশীর বিখ্যাত ধনী ও বিশিষ্ট বাঙালী নাগরিক রাজেন্দ্র মিত্র। গঙ্গাধর রাও প্রবেশ করবার সময় তিনি উঠে দাঁড়া[illegible] গঙ্গাধর রাও তাঁকে হাত ধরে দাঁড় ক[illegible] দিয়েছিলেন।

কলকাতায় খাস দপ্তরে রা[illegible] মিত্রের যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। উ[illegible] ভারতবর্ষের গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোডটি মেরা[illegible] করবার সময়ে তিনি কাশীর সন্নি[illegible] তাঁর আট বিঘা জমি সরকারকে দি[illegible] ছিলেন। কলকাতায় চিঠি লিখে তি[illegible] গঙ্গাধর রাওয়ের এই ব্যবহারের প্রতিক[illegible] প্রার্থনা করলেন। গভর্নর জেনারেলে[illegible] সেক্রেটারী সবিনয়ে জানালেন, গঙ্গাধ[illegible] রাওয়ের সঙ্গে সরকারের সম্পর্ক বন্ধু[illegible] পূর্ণ। তিনি রাজা খেতাবধারী। তাঁ[illegible] সম্মান দেখাবার বাসনা না থাকলে[illegible] রাজেন্দ্রবাবুর উক্ত সভায় যাওয়া ঠি[illegible] হয়নি।

১৮৫৭-৫৮ সালের সিপাহী যুদ্ধে[illegible] উক্ত রাজেন্দ্র মিত্র মহাশয়ের পুত্রদ্ব[illegible] বরদা ও গুরুচরণ সরকারকে বিশে[illegible] সাহায্য ক'রে রায়বাহাদুর খেতাব পেয়ে[illegible] ছিলেন। এ'দের বংশধরগণ আজও[illegible] কাশীতে বাস করছেন।

কাশীতে বিবিধ দর্শনীয় স্থান দেখে, লক্ষ্মীবাঈ তাঁর জন্মস্থান, সেই বাসভবনটিও দেখলেন। বিশাল নগরী কাশী, বিবিধ দেবমন্দির। বিশ্বনাথের গলির অজস্র দোকান, দশাশ্বমেধ ঘাটে সন্ন্যাসী, সাধক ও গায়কদের আগমন, এইসব দেখে তাঁর চিত্ত আনন্দিত হ'ল।

গয়াতে পিতৃপুরুষের তর্পণ করে, প্রয়াগ তীর্থে স্নান করে তাঁরা ঝাঁসীতে ফিরলেন। গঙ্গাধরের পুরী যাবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু রানী সন্তানসম্ভাবিতা। সেই দীর্ঘ যাত্রার ফলে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়তে পারেন। তাই সেই সঙ্কল্প পরিত্যাগ করলেন গঙ্গাধর রাও।

সন্তান লাভের আনন্দে প্রফুল্লচিত্ত গঙ্গাধর রাও প্রত্যাবর্তনের কালে, প্রার্থী ও ভিখারীদের মুক্তহস্তে দান করতে করতে এলেন। ঝাঁসীতে ফিরে এসে রানীকে আনন্দে রাখবার জন্য বিবিধ আয়োজন করলেন তিনি। রানীর স্বাস্থ্য যাতে ভাল থাকে তার জন্য অন্তঃপুরে কলরব সহযোগে অন্তঃপুরিকারা বিবিধ সুখাদ্য তৈরী করতে লাগলেন।

১৮৫১ সালে মার্গশীর্ষ শুদ্ধ
াদশী তিথিতে রাণীর একটি পুত্র-
ান হ'ল। আনন্দে উৎফুল্ল গঙ্গাধর
।। দান, ধ্যান, মন্দিরে মন্দিরে পূজা
াণ, বাজি পোড়ান ইত্যাদি শুরু
লেন। পুত্র মানেই বংশধর। তার
, তাঁর নাম ধরে রাখবে পৃথিবীতে,
একজন রইল। নাম হ'ল নব-
কের দামোদর গঙ্গাধর রাও।

কিন্তু পুত্র তিন মাসের বেশী
ল না। গঙ্গাধর বালিকা জননীকে
না দেবেন কি, নিজেই ভেঙে
লেন। কাজে কর্মে রুচি চলে গেল,
ার প্রায় পরিত্যাগ করলেন। বিষণ্ণ
শোকাতুর গঙ্গাধর রাও বললেন—
ার জীবনের গ্রন্থি বিচ্ছিন্ন হয়ে
হ, কোনো উৎসাহ পাচ্ছি না।'

একাদিক্রমে জ্বর এবং পেটের পীড়ায়
তে লাগলেন গঙ্গাধর রাও। ১৮৫৩
লর সেপ্টেম্বর মাসে, শারদীয়া নব-
র উৎসবে, প্রয়োজনীয় উপবাস
াদি করে গৃহদেবতা মহালক্ষ্মীর
দরে হেঁটে গেলেন গঙ্গাধর রাও।
বা শ্বশুর কারো নিষেধই শুনলেন
সেই পরিশ্রমের ফলে স্বাস্থ্য দ্রুত
নতির পথে যেতে লাগল।

দশহরা অর্থাৎ বিজয়ার দিন, একটি
ীন সুন্দর অনুষ্ঠানের অনুকরণ হ'ত
ী ও অন্যান্য ভারতীয় রাজ্যে।
াকালে বিজয়া দশমীর দিন রাজারা
য়যাত্রায় বেরোতেন। শরতের সুন্দর
কাশ, মধুর বাতাস, প্রকৃতির উৎসব-
জ্ঞা, রৌদ্র ও বর্ষণের আবর্তন, স্পরম্
াবহ। তাই সেই সময়ে তাঁরা দেশ-
য় বেরোতেন। ১৮৫৩ সালে ঘোড়ায়
 দেশজয়ের আনন্দ থেকে রাজারা
দিন থেকেই বঞ্চিত। তবু, প্রাচীন
ার অনুসরণে "সীমা লঙ্ঘন" অনুষ্ঠান
তেন তাঁরা। স্বীয় রাজ্যের সীমা
তক্রম করে, অপর রাজ্যের সীমায়
বশ করে বনভোজনাদি উৎসব ক'রে
র আসতেন। গঙ্গাধর এবারও
ীমা লঙ্ঘন" করে দতিয়া রাজ্যের
মানায় গেলেন। কিন্তু সেখান থেকেই
াকি চড়ে ফিরে এলেন অসুস্থ হয়ে।
দিন থেকেই রাজপ্রাসাদে বৈদ্যের
যাওয়া চলতে লাগল। গোঁড়া হিন্দু

গঙ্গাধর রাও আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা ছাড়া অন্য মতে চিকিৎসায় রাজী ছিলেন না। কিন্তু আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসাতে কোনো উপকারই পাওয়া গেল না। রাণী সর্বদা স্বামীর শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত থেকে সেবা ও যত্নে, এতটুকু আরাম দিতে ব্যস্ত থাকলেন। কিন্তু অতিদ্রুত রোগ সমস্ত চিকিৎসার বাইরে চলে গেল। গোয়ালিয়র, রেওয়া ও বুন্দেলখণ্ডের রাজনৈতিক প্রতিনিধি ডি এ ম্যালকম (D. A. Malcolm), বুন্দেলখণ্ডের রাজনৈতিক সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এলিস (R. R. W. Ellis)কে জানালেন, তিনি নিজে অনুপস্থিত, অতএব এলিস যেন গঙ্গাধর রাওকে নিজে দেখা শুনো করেন।

নভেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে মোরোপন্ত্ তাম্বে প্রমুখ হিতৈষী শুভানুধ্যায়ীরা গঙ্গাধর রাওয়ের অবর্তমানে রাজ্যের অবস্থা কি হবে, তাই চিন্তা করতে লাগলেন। সমস্ত রোগ-যন্ত্রণা ছাপিয়ে, সেই চিন্তাই গঙ্গাধর রাওয়ের মনে প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছিল। তিনি দত্তক পুত্র গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। স্বামী স্বেচ্ছায় দত্তক গ্রহণে অভিলাষী দেখে রানীর মনে প্রবল আশংকা উপস্থিত হ'ল। আবার স্বামীর কথার যৌক্তিকতা উপলব্ধি করে তিনি কোনও মন্তব্য করলেন না। ঊনিশে নভেম্বর সন্ধ্যাবেলা গঙ্গাধরের ইচ্ছায় দেওয়ান নরসিংহ ক্রোপা, রাও আপ্পা, লালা লাহোরীমল্, লালা তটিচাঁদ সকলে মোরোপন্ত্ তাম্বের সঙ্গে পরামর্শ করে লক্ষ্মীবাঈয়ের অনুমতিক্রমে নেবালকর বংশীয় একটি ছেলের খোঁজ করার সিদ্ধান্ত করলেন। উপযুক্ত ছেলের সন্ধান করবার জন্য রামচাঁদ বাবাকে নিযুক্ত করা হ'ল।

ঝাঁসীর রাজবংশের মূলপুরুষ রঘুনাথ রাওয়ের ছোট ছেলে দামোদর রাওয়ের বংশই বরাবর ঝাঁসীতে রাজত্ব করেছেন। বড় ছেলে খণ্ডেরাওয়ের বংশধররা পারোলাতে ছিলেন। প'রোলাতে গঙ্গাধর রাওয়েরও জায়গীর ছিল এবং অন্যান্য নেবালকরদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ ছিল। দশহরা ইত্যাদি উৎসব উপলক্ষে পারোলা থেকে অনেকে

ঝাঁসী এসেছিলেন। গঙ্গাধরের অসুস্থতার জন্য তাঁরা আর ফিরে যান্‌নি। তাঁদের মধ্যে ছিলেন বাসুদেব। পাঁচ বছরের বালক পুত্র আনন্দকে নিয়ে তিনি এসেছিলেন। সময়ের স্বল্পতা এবং অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করে এই আনন্দকে দত্তক গ্রহণ করা স্থির হ'ল। বাসুদেবের ব্যক্তিগত কোনো আপত্তি ছিল না। ২০শে নভেম্বরই দত্তক গ্রহণের দিন ধার্য হ'ল।

এদিকে গঙ্গাধরের শেষ অবস্থা। রাজপ্রাসাদের সামনে জনতা ভিড় করে আছে। সর্বত্র উৎসুকভাবে খবরের আদান-প্রদান চলেছে। তারই মধ্যে লক্ষ্মীবাঈ দত্তক গ্রহণের অনুষ্ঠান সম্পর্কে দেখা-শোনা করতে লাগলেন। শোকাকুল, বিষণ্ণ মনে তিনি কর্তব্য করে যেতে লাগলেন।

রাজা মৃত্যুশয্যায় দত্তক গ্রহণ করছেন, এই সংবাদ ইংরেজ অফিসার মহলে পৌঁছল। এলিস যাতে এই কাজ অনুমোদন করেন ও সরকার তরফ থেকে যাতে কোন আপত্তি না ওঠে, সেটাই ছিল গঙ্গাধরের সবচেয়ে বেশী চিন্তা। কেননা, তৎকালীন বড়লাট ডালহৌসী একটি পুরোন আইন বহাল ক'রে ভারতীয় রাজ্যগুলিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করছিলেন। সেই আইনের পুঁথিগত নাম Doctrine of Lapse, এবং সাদা কথায় ভুক্তভোগী এই বুঝতেন, তাঁদের সুপ্রাচীন বংশগুলিকে রাজ্যাধিকার থেকে বঞ্চিত করে তাঁদের বৃত্তিভোগী করে রাখা। আইনজ্ঞ বলবেন, তার পক্ষে আইনের সমর্থন আছে। কিন্তু ভারতীয় নৃপতিরা মনে করতেন, বিদেশী এসে ভারতে বসেছে, সেই প্রথম চালটাই তো মস্ত বে-আইনী। তার আবার আইন কি!

সরকার তা মানতেন না। ভারতের জমিতে ভারতীয়ের অধিকার, তার কোনো যুক্তি ছিল না তাঁদের কাছে। থাকলে তাঁদের চলত না।

আইনের বিধানে কোনো সান্ত্বনা ছিল না রাজ্যচ্যুত নৃপতি এবং তাঁদের আশ্রিতবর্গের।

সাতারা, নাগপুর ইত্যাদি রাজ্যের নজীরে শঙ্কিতচিত্ত গঙ্গাধর রাওয়ের তাই মৃত্যুশয্যায়ও শান্তি ছিল না।

(ক্রমশ)

বেলুড় মঠ স্থাপনের পর

শ্রীসরলাবালা সরকার

স্বামীজী ভারতবর্ষে চলিয়া আসিবার পর স্বামী সারদা-ন্দও চলিয়া আসেন। সে সময় স্বামী ভেদানন্দই পাশ্চাত্যের কাজ চালাইবার ার গ্রহণ করেন।

দিন দিন প্রচারকার্যের প্রসার াড়িয়া যাইতেছে দেখিয়া নিউইয়র্ক দান্ত সমিতিকে আইনসংগতভাবে রেজেস্ট্রি করা উচিত বলিয়া স্বামী ভেদানন্দ ও ভক্তমণ্ডলী সকলেই মনে রিলেন ও এসম্বন্ধে সকলেই একমত ইয়া সমিতিটি আইনসংগতভাবে রেজেস্ট্রি করিয়া লইলেন।

রেজেস্ট্রি পুস্তকের অনুবাদ এই-পঃ 'নিউইয়র্ক' শহরে এই বেদান্ত মিতি ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে স্বামী বিবেকা-দ কর্তৃক স্থাপিত হয় এবং ১৮৯৮ ষ্টাব্দে ২৮শে অক্টোবর এই সমিতি মী অভেদানন্দের দ্বারা আইনসংগত-বে গঠিত হয়।

উদ্দেশ্য

(১) স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ভেদানন্দ অথবা তাঁহাদের উত্তরাধি-কারীরূপে নিযুক্ত ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত এই ঘর অন্য হিন্দু সন্ন্যাসিগণ কর্তৃক দান্ত দর্শনের সত্য ও সার্বভৌমিক সমূহ যেভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, ই সমুদয় আলোচনা এবং প্রচার করা।

(২) ঐ স্বামীগণ কর্তৃক আরব্ধ র্যের প্রচার ও সাফল্যের জন্য সর্ব-ার যুক্তিসংগতভাবে সাহায্য করা।

(৩) এবং ঐ সকল কার্যের সংশ্লিষ্ট ল বিষয়ের পরিচালন ও সম্পাদন া।

নিউইয়র্ক বেদান্ত সমিতির ট্রাস্টি-দের নাম।

১। ফ্র্যান্সিস এইচ লেগেট (Francis H Legget) নিউইয়র্ক।

২। বেসে ম্যাকলাউড লেগেট (Besse Macleod Legget) নিউইয়র্ক।

৩। মেরি বি কলস্টোন (Mary B Caulston)

(৪) ওয়ালটার গুডইয়ার (Walter Goodyear)

(৫) ফ্রান্সিস বি গুডইয়ার (Francis B Goodyear)

(৬) জর্জ এইচ টমসন (George H Thomson)

এই ট্রাস্টিগণ সকলেই গৃহীভক্ত এবং ইহার দ্বারা বুঝা যায়, আধ্যাত্মিক তত্ত্ব প্রচার বিভাগটির সন্ন্যাসিগণ তত্ত্বাবধান করিবেন এবং বৈষয়িক ব্যাপারগুলির ভার গৃহীদিগের উপরেই ন্যস্ত থাকিবে এই উদ্দেশ্যেই ঐভাবে সমিতি গঠিত হইয়াছিল।

ভারতবর্ষেও ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ১২ই নবেম্বর তারিখে একই দিনে বেলুড়মঠ ও নিবেদিতা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকার্য সম্পন্ন হয়। ১২ই নবেম্বর ছিল 'কালীপূজার দিন, ঐদিন জননী সারদাদেবী তাঁহার গোলাপ মা, যোগীন মা প্রভৃতি সঙ্গিনীগণকে সঙ্গে লইয়া বেলুড়ের মঠের জন্য কেনা জমিতে প্রথম শুভ পদার্পণ করেন।

মা স্বয়ং আসিয়াছেন, ইহাতে বেলুড়ে উৎসব ও আনন্দের সীমা রহিল না। মা ঠাকুরের যে ছবিখানি নিত্য পূজা করিতেন, সেখানি সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন এবং নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়িতে যে ছবিখানির নিত্য পূজা করা হইত, সেখানিও আনা হইল। মা সেই দুখানি ছবিই বেদীর উপর স্থাপন করিলেন এবং যথাবিধি ঠাকুরের পূজা করিলেন। স্বামীজী, ব্রহ্মানন্দ স্বামী, সারদানন্দ স্বামী প্রভৃতি জননীকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইয়া পূজা দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইলেন। বেলুড় মঠ প্রতিষ্ঠিত হইল।

সেই দিনই ১৭নং বোসপাড়া লেনে ফিরিয়া আসিয়া সেখানে শ্রীশ্রীমা নিবেদিতা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিলেন। স্বামীজীরা সকলেই তাঁহার সহিত আসিয়াছিলেন। মা এখানেও ঠাকুরের পূজা করিয়া পূজার শেষে যে প্রার্থনা করিলেন, গোলাপ মা সেই প্রার্থনাটি সমবেত ছাত্রিগণ ও অপর সকলকে শুনাইয়া দিলেন, কেননা মা অতি মৃদুস্বরে আশীর্বাদ ও প্রার্থনা বাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন। গোলাপ মা বলিলেন, "শ্রীশ্রীমা প্রার্থনা করছেন যেন এই বিদ্যালয়ের উপর জগন্মাতার

আশীর্বাদ বর্ষিত হয় এবং এখানের মেয়েরা যেন আদর্শ মেয়ে হয়।" নিবেদিতা একপাশে জোড় হাতে দাঁড়াইয়াছিলেন, জননীর এই আশীর্বাদ যেন তাঁহার যাত্রাপথের পরম সঞ্চয়, ইহাই হয়তো সে দিন তাঁহার মনে হইয়াছিল। এই বিদ্যালয়কে গড়িয়া তুলিবার জন্য নিবেদিতা কিভাবে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, যাঁহারা এই বিদ্যালয়ের সংস্পর্শে আসিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই তাহা জানেন।

নিবেদিতা সেদিনের ঘটনা লইয়া বলিয়াছিলেন, 'ভবিষ্যতের শিক্ষিতা হিন্দু নারীগণের পক্ষে শ্রীশ্রীমার আশীর্বাদ অপেক্ষা কোনও মহত্তর শুভ লক্ষণ আমি কল্পনা করিতে পারি না।"

মায়ের সেদিনের আশীর্বাদ কি আজ সার্থকতা লাভ করিয়াছে? নিবেদিতা বিদ্যালয়ের উপর দিয়া বহু ঝড় ঝঞ্ঝা চলিয়া গিয়াছে, নৌকাখানি যেন একদিন ডুবু ডুবু হইতেছিল, কিন্তু সেই নৌকা কি আজ 'প্রসাদ পবনে' পাল তুলিয়া সার্থকতার যথার্থ পথে অগ্রসর হইয়াছে? দেশবাসী কি আজ নিবেদিতার পরম ত্যাগের মহিমা মর্মে মর্মে অনুভব করিতে পারিয়াছেন? স্বামীজীর বহু আকাঙ্খিত স্বপ্ন 'ভারতীয়া নারী আবার মৈত্রেয়ী গার্গীর আসনে প্রতিষ্ঠিতা হইবেই', সেই স্বপ্ন কি আজ সার্থকতা লাভ করিয়াছে অথবা সার্থকতার পথে অগ্রসর হইয়াছে? আজ মনে এই প্রশ্নই জাগিতেছে।

"মা" এই একটি মাত্র শব্দ যে কি শক্তি সঞ্চারিণী মহামন্ত্র, স্বামীজী সব সময়েই যেন তাহা জীবন্তভাবে অনুভব করিতেন। 'মা' বলিতে স্বামীজী যেন শরীরধারিণী জননীর প্রত্যক্ষ উপলব্ধিই অনুভব করিতেন। মায়ের তিনি এক দুর্দান্ত সন্তান। তিনি তাঁর এক শিষ্যকে একসময় বলিয়াছিলেন, "মায়ের কাছে দীনহীন ভাব চলবে না, যা চাইবে তা আদায় করে নিতে হবে।"

ঠাকুরের গলায় যখন দারুণ কষ্ট, শশধর তর্কচূড়ামণি তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছেন। তিনি ঠাকুরকে বলিলেন, "আপনি যদি একটুখানি আপনার মানসিক শক্তিকে [illegible] স্থানে প্রয়োগ করে সুস্থ হবার জন্য ইচ্ছা করেন, সেই মুহূর্তেই তো আপনার অসুখ আরাম হয়ে যায়।'

ঠাকুর একথা শুনিয়া বলিলেন, "তুমি পণ্ডিত হয়ে একথা কি করে বললে গো! যে মন আমি সচ্চিদানন্দকে অর্পণ করেছি, সেই মন আবার ফিরিয়ে এনে হাড়মাসের খাঁচায় কি দিতে পারি?"

এইসব কথার সময় স্বামীজী সেখানে উপস্থিত ছিলেন। শশধর তর্কচূড়ামণি চলিয়া যাইবার পর তিনি নাছোড়বান্দা হইয়া ঠাকুরকে ধরিলেন, "আপনাকে অসুখটা সারাতেই হবে।"

ঠাকুর বলিলেন, "বলিস কিরে আমি কি কিছু পারি, মা যা করেন, তাইতো হবে।"

তখন স্বামীজী বলিলেন, "তবে মাকে বলুন, তিনি যেন অসুখটা সারিয়ে দেন।"

এইভাবে ঠাকুরের উপর মার কাছে বলিবার ভার দিয়া স্বামীজী বেড়াইতে বাহির হইয়া গেলেন এবং ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাকে বলেছিলেন? মা কি বললেন?" অর্থাৎ মার কাছে বলা এবং তাঁর উত্তর দেওয়া ব্যাপারটি এতই সহজ ও স্বাভাবিক।

মায়ের দক্ষিণ হাত দাক্ষিণ্য বিতরণ করে, আবার বাম হাতে রহিয়াছে খড়্গ। স্বামীজীর কাছে অভয়দান ও শাস্তিবিধান দুইই এক। তিনি ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "তাঁর শাপই বর।" আবার হয়তো ভাবাচ্ছন্ন হইয়া বলেন, "অন্তরঙ্গ ভক্তের হৃদয় কন্দরে মায়ের রুধির রঞ্জিত অসি ঝকমক করে।" তিনি "ঘোরা নৃমুণ্ডমালিনী সংহারকারিণী মূর্তির" উপাসনা করিতেন। তিনি বলিতেন, "এস আমরা ভয়ঙ্করকে ভয়ঙ্কর রূপেই আলিঙ্গন করি, তাঁর কাছে কোমল হবার প্রার্থনা যেন না জানাই।"

স্বামীজীর সাধনা পূর্ণ হইল, এত দিনে বেলুড় মঠ স্থাপিত হইল। কতক সাধু তখন নীলাম্বরবাবুর বাগানে এবং কতক মঠবাড়িতে রহিলেন। ৯ই ডিসেম্বর অতি প্রত্যুষে সাধুরা স্বামীজীকে অগ্রবর্তী করিয়া গঙ্গা স্নানে গেলেন, স্নানান্তে নূতন গৈরিক

য়া ঠাকুর ঘরে সকলে সমবেত লেন এবং কিছুক্ষণ ধ্যান ও তাহার যথাবিধি পূজা করিয়া সকলে বেলুড় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। শিষ্য চন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় স্বামীজীর দেশ অনুসারে শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহাবশেষ ক্ত তামার কৌটা ফিরাইয়া আনিয়া ঠাকুর ঘরে রাখিয়াছিলেন, সেইটি মীজী দক্ষিণ স্কন্ধে তুলিয়া লইলেন ং বেলুড়মঠের দিকে অগ্রসর হইলেন। হার পিছনে পিছনে শঙ্খ, ঘণ্টা ও শর বাজাইতে বাজাইতে অন্য সকলে লেন। শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী এদিনও হার পাশে পাশে চলিয়াছিলেন, হাকে স্বামীজী বলিলেন, "আজ কুরের পূণ্য অস্থি তাঁর প্রতীকস্বরূপ য়ে ভবিষ্য মঠে চলেছি। বৎস, স্থির নো, যতদিন তাঁর নামে তাঁর অনু-মীরা পবিত্রতা, আধ্যাত্মিকতা, সর্ব বে সমপ্রীতির আদর্শ রক্ষা করতে রবে, ততদিন ঠাকুর এই মঠকে তাঁর ব্য উপস্থিতির দ্বারা ধন্য করে খবেন।"

মঠের ভবিষ্যৎ কার্য প্রণালী সম্বন্ধে শ নিয়মাবলী প্রস্তুত হইতে লাগিল। ৩০৫ সালের ১লা মাঘ 'উদ্বোধন' মক মাসিক পত্রিকার প্রথম সংখ্যা হির হইল, স্বামী ত্রিগুণাতীত তাঁহার পাদনার ভার লইলেন।

অমরনাথ হইতে আসিয়া অবধি মীজীর শরীর অসুস্থই ছিল, এখন তিরিক্ত পরিশ্রমে তাহা একেবারে ঙিয়া পড়িল, সেই জন্য তিনি ১৯শে রিখে বৈদ্যনাথ চলিয়া গেলেন। বৈদ্য-থে পুরন্দহ নামক স্থানে অবিনাশচন্দ্র খোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ি ছিল, াহার বাড়িতেই স্বামীজী আতিথ্য হণ করিলেন।

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ২রা জানুয়ারী লাম্বরবাবুর বাগানবাড়ি থেকে মঠ রোপুরিভাবে বেলুড়মঠে স্থানান্তরিত ইল।

৩রা ফেব্রুয়ারী স্বামীজী বৈদ্যনাথ ইতে ফিরিয়া আসিলেন, সেই দিনই ... একটি সভা আহবান করিলেন, ... একটি ঘরোয়া সভা। মঠের ... কিভাবে চলিতেছে এবং

ইহার পর কিভাবে তাহার বিস্তৃতি সাধন আবশ্যক এই সভায় সেই সম্বন্ধে আলোচনা হইল। স্বামীজী বলিলেন, ভারতবর্ষের সকল স্থানেই প্রচারকার্য চালাইবার জন্য মঠবাসিগণের কয়েক জনকে বাহিরে যাইতে হইবে। পূর্ববঙ্গে স্বামী বিরজানন্দ ও প্রকাশানন্দ যাইবেন স্বামীজীর এই নির্দেশ শুনিয়া বিরজানন্দ ভীতভাবে বলিলেন, "আমি যে নিজেই কিছু জানি না, লোককে কি বলিব?" স্বামীজী তখনই বলিলেন, "কিছুই জান না? বেশ, তাহাই সকলকে গিয়া বল, বল যে আমি কিছুই জানি না।" তবুও বিরজানন্দ ইতস্তত করিতেছেন দেখিয়া স্বামীজী তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি কি চাও? নিজে মুক্ত হইবে এইজন্য সাধন করিতে চাও? যে নিজের মুক্তি চায় সে তো দারুণ স্বার্থপর। সাধনার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনা নিজের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা বিসর্জন দেওয়া। কখনও ভুলো না যে সন্ন্যাসীর দুটি ব্রত, একটি সত্য উপলব্ধি আর একটি জগতের হিত। বৎস, যদি পর-কল্যাণ কার্যে অগ্রসর হইয়া নরকেও যাইতে হয়, তাতেই বা কি যায় আসে?"

ইহার পর শিষ্যদের মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, "শুভ-কর্মে শ্রীভগবানই শক্তি সঞ্চার করেন, তিনিই সব সময় পথ দেখাইয়া দেন।" কিভাবে সকলকে উপদেশ দিতে হইবে, কেহ দীক্ষা চাহিলে তাহাকে কিভাবে দীক্ষা দিতে হইবে ইত্যাদি বিষয়েও তাঁহাদের উপদেশ দিলেন।

৭ই ফেব্রুয়ারী স্বামীজী স্বামী তুরিয়ানন্দ ও সদানন্দজীকেও গুজরা[ট] পাঠাইলেন।

এই সময় বেলুড় মঠে স্বামীজ[ীর] কাছে সর্বক্ষণই লোক সমাগম হই[ত।] কলেজের ছেলেরা অনেকেই আ[সিত] এবং গ্রাজুয়েট যুবকেরাও আসিত। [এই] সকল যুবকগণের মধ্যে অতি অল্প[ই] তাঁহার মনের মত হইত। শারীরিক [ও] নৈতিক দুর্বলতায় দেশবাসী তরুণ[গণ] যেন ক্ষয়ের পথে চলিতেছে. পরানুক[রণ] প্রবৃত্তি, ইংরেজী শিক্ষার মোহ এ[বং] নিজ দেশের প্রতি শ্রদ্ধাহীনতা তরু[ণ]গণের ভিতর যেন সংক্রামক রোগে[র] ন্যায়ই বিস্তৃত হইতেছিল; কি[ন্তু] সংসর্গের আশ্চর্য প্রভাবে তাহাদের মনের ভাব পরিবর্তিত হইতে লাগি[ল।]

স্বামীজীর শরীর এতই অসুস্থ [যে] তাঁহার পক্ষে এইভাবে সকলের স[ঙ্গে] কথাবার্তা বলা তাঁহার শরীরের পক্ষে [ছিল] বিশেষ ক্ষতিকর তাহা তাঁহার গুরু[-] ভাইরা বুঝিয়াও কিছুই করি[তে] পারিতেন না। কেননা, স্বামীজীর ইচ্ছা[য়] বাধা দেওয়া তাঁহাদের সাধ্যের অতীত[।]

স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামীজী যাঁহাকে 'রাজা' বলিতেন, স্বামীজী 'গুরুবৎ গুরুপুত্রেষু' বলিয়া যাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ হইয়া প্রণাম করিতেন, তিনিও স্বামীজী[র] কোন ইচ্ছাতেই বাধা দিতে পারিতেন না[।] কিন্তু ইনিই ছিলেন স্বামীজীর পরবর্তী উত্তরাধিকারী, একথা স্বামীজী জানিতে[ন।] তাই ইউরোপ হইতে ফিরিয়া আসিয়া সংগৃহীত যাহা কিছু টাকা স্বামীজী তাঁহারই হাতে দিয়াছিলেন. ব্রহ্মানন্দ স্বামী আবার পরে উইল করিয়া সে টাকা রামকৃষ্ণ মিশনের হাতে দেন। স্বামীজী তাঁহার সম্বন্ধে বলিতেন, "রাজা আমাদের মঠের প্রাণ, সে আমাদের রাজা।" তিনি একজন শ্বেতাঙ্গ ভক্তকে বলিয়াছিলেন, "এখানে একটা ডাইনামো চলেছে আমরা সকলে তারই অধীনে আছি।"

রামকৃষ্ণ মিশন তখনকার দিনে ছিল যেন স্নেহবন্ধনে আবদ্ধ একই পরিবার। গৃহ-পরিবারে ভাইয়ে ভাইয়ে ভালবাসার বন্ধন আছে বটে, কিন্তু তার মধ্যেও স্বার্থের সংস্পর্শ থাকে, কিন্তু এমন নিঃস্বার্থ এবং একান্ত ভালবাসার

ষ্টান্ত অন্যত্র একেবারেই দুর্লভ। মকৃষ্ণ মিশনের দুটি বিভাগ, একটি মশন ও অপরটি সংঘ। মিশনের কার্যে হীদিগের যোগ ছিল, এমন কি বলরাম-াবুর বাটীতে প্রথম যেদিন শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন (রামকৃষ্ণ প্রচার) স্থাপিত হইল তখন স্বামী ব্রহ্মানন্দ কলিকাতা কেন্দ্রের সভাপতি এবং স্বামী যোগানন্দ তাঁহার সহকারী হইয়াছিলেন এবং বাবু নরেন্দ্র-নাথ মিত্র মহাশয়ই ইহার সেক্রেটারী হইয়াছিলেন। ডাক্তার শশিভূষণ ঘোষ ও বাবু শরৎচন্দ্র সরকার সহ-সেক্রেটারী এবং স্বামী শিষ্য প্রণেতা শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় শাস্ত্রপাঠক নির্বাচিত হইয়াছিলেন। ইহার পর প্রচার কার্যের ভার সন্ন্যাসিগণের উপর ছিল, কিন্তু বিভিন্ন স্থানে সেবাকার্যে গৃহস্থগণও সাহায্যকারী হিসাবে যোগ দিয়াছেন।

স্বামীজী বলিয়াছিলেন, "সবাই আমাকে ত্যাগ করতে পারে, কিন্তু আমি জানি রাজা আমাকে কখনও ত্যাগ করবে না।" আমাদের স্বভাবতই এ কথায় মনে হয়, "সবাই আমাকে ত্যাগ করতে পারে", এ কথা স্বামীজী বলিলেন কেন? বোধ হয় প্রথম প্রথম অনেক গুরুভ্রাতা তাঁহার কার্যের সমর্থন করেন নাই। প্রথমত তাঁহারা সাধন-ভজন, ধ্যান-ধারণা প্রভৃতি লইয়া থাকাই শ্রেষ্ঠ পথ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু স্বামীজী গেলেন অন্য দিকে। তিনি বলিলেন, "ছাড় বিদ্যা যাগ যজ্ঞ বল, স্বার্থহীন প্রেম সে সম্বল"। তিনি বলিলেন,

"ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু, সর্বজীবে
সেই প্রেমময়,
প্রাণ মন শরীর অর্পণ কর সখা
এ সবার পায়।"

তিনি আবার বলিলেন, "তোমরা সব মায়ের সৈনিক এবং তোমরা সব মৃত্যু-ভয়হীন অগ্রগামী দল, পথ করে চল।"

"আগে যায় বীর্য পরিচয় পতাকা নিচয়,
দন্তে ঝরে রক্তধারা,
সঙ্গে সঙ্গে পদাতিক দল, বন্দুক প্রবল,
বীরমদে মাতোয়ারা।
ঐ পড়ে বীর ধ্বজাধারী অন্য বীর তারি
ধ্বজা লয়ে আগে চলে।
তলে তার ঢের হয়ে যায় মৃত বীর কায়,
তবু তাহে নাহি টলে।"

তিনি আরও বলিলেন,

জাগো বীর, ঘুচায়ে স্বপন,
শিয়রে শমন, ভয় কি তোমার সাজে?
দুঃখ-ভার এ ভব ঈশ্বর, মন্দির তাঁহার
প্রেতভূমি—চিতা মাঝে,—
পূজা তাঁর—সংগ্রাম অপার সদা পরাজয়,
তাহা না ডরাক তোমা—
চূর্ণ হোক স্বার্থ, সাধ, মান হৃদয় শ্মশান
নাচুক তাহাতে শ্যামা।"

কিন্তু এই সকল মঠ প্রভৃতি করা উচিত কি না এ সম্বন্ধে হয়তো কিছু সংশয়ও তাঁহার মনে উঠিয়াছিল। তাই তিনি নাগ মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়া-ছিলেন, "দেখুন এই সব মঠ, এই সেবাশ্রম প্রভৃতি, এসব কি ঠাকুরের ইচ্ছামত হচ্ছে?" গিরিশবাবুকেও তিনি ঐ কথাই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। প্লেগের সময় প্লেগের সেবাকার্যের টাকার জন্য মঠের জমি বিক্রি করিয়া দিতেও চাহিয়াছিলেন।

কিন্তু সংঘ করার প্রয়োজনীয়তাও তিনি বিশেষভাবেই অনুভব করিয়া-ছিলেন। তিনি এই সংঘ এমনভাবে গড়িতে চাহিয়াছিলেন যেন এর মধ্যে কোনও রকম বিভেদের সূত্রপাত না হয়। তিনি বলিয়াছেন, "ভারতবর্ষের একটি মহৎ দোষ, আমরা কোন স্থায়ী প্রতিষ্ঠান গড়তে পারি না, তার কারণ আমরা অন্যের সঙ্গে ক্ষমতা ভাগ করে নিতে চাই না।"

স্বামীজী গণতন্ত্র অপেক্ষা ডিক্টেটর-শিপেই অধিক আস্থাবান ছিলেন। তিনি বলিয়াছেন আমাদের দেশের জনগণ এখনও স্বাধীন মত দিবার মত মনোভাব সম্পন্ন হয় নাই। এইজন্য তিনি এমন একজন ডিক্টেটর চাহিয়াছিলেন যিনি তাঁহার অভাবে সংঘকে ঠিক পথে পরি-চালিত করিতে পারিবেন এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দকেই তিনি সেইরূপ যোগ্য পরি-

চালক মনে করিয়াছিলেন। তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন, "এমন মেশিন করো যে আপনি আপনি চলে যায়, যে মরে বা যে বাঁচে।"

তাঁর গুরুভাইদের সহিত একটি মতভেদের কারণ ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের প্রচার সম্বন্ধে। তাঁহার অনেক গুরুভাই চাহিতেন তিনি যেন বিশেষ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের সম্বন্ধেই প্রচার করেন, কিন্তু তিনি অনেক বক্তৃতায় ঠাকুরের নাম

পর্যন্ত উল্লেখ করিতেন না। আমেরিকায় তিনি যে নিউইয়র্ক বেদান্ত সমিতি স্থাপন করেন তাহা রেজেস্ট্রী করিবার সময় যে উদ্দেশ্যগুলি উল্লেখ করা হয় তাহার মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের নামও উল্লেখ করা হয় নাই। 'ঠাকুর ঘর' সম্বন্ধে নিয়মগুলির মধ্যে ২নং নিয়মে বলা হইয়াছে "ঠাকুর স্থাপন, পূজা, ভোগরাগ ইত্যাদি সম্বন্ধে তাঁহার কোন উপদেশ নাই, ইহা তাঁহার সম্মানের জন্য আমরা কল্পনা করিয়াছি।"

কিন্তু তাঁহাকে প্রকৃত সম্মান দেখানো যায় কিসে? এ কথাও স্বামীজী বলিয়াছেন ৪নং নিয়মে "প্রভুর উপদেশানুসারে কার্য করাই তাঁহাকে যথার্থ সম্মান করা।"

শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শ কি ছিল ইহা লইয়াও কোন কোন গুরুভ্রাতা তাঁহার সহিত বিতর্ক করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন স্বামীজী যেভাবে আদর্শ প্রচার করিতেছেন ইহার সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শের কোন মিল নাই। একান্ত ভক্তির সহিত শ্রীভগবানের ধ্যান, তাঁহারই ভজনা, তাঁহাকেই উপলব্ধির চেষ্টা ইহাই ছিল ঠাকুরের প্রদর্শিত সাধনপন্থা, কিন্তু স্বামীজীর এই স্বদেশপ্রেম, এই সর্বমানবের সেবায় কর্মতৎপরতা এগুলি সে আদর্শের সঙ্গে একেবারেই খাপ খায় না। এগুলি অনেকটা পাশ্চাত্য ভাবের কর্মপ্রচেষ্টা অর্থাৎ এক হিসাবে কর্মবন্ধন।" আবার কেহবা ইহাও বলিয়াছেন, "এ সমস্ত কর্ম সন্ন্যাস ধর্মের বিরোধী, সর্বত্যাগই সন্ন্যাস ধর্মের মূলমন্ত্র সর্ব গ্রহণ নয়। শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রচার হইতেছে না ইহা লইয়াও অনুযোগের অন্ত ছিল না, এই সব অনুযোগের উত্তরে স্বামীজী কখনও হাস্য-পরিহাস করিয়া উত্তর দিতেন। হয়তো বলিতেন, "শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রচার করবার কথা বলছো? তুমি আমি তাঁর অনন্ত ভাবের কতটুকু বুঝতে পেরেছি তাই তাঁকে প্রচার করবার স্পর্ধা রাখি?" আবার হয়তো সিংহ গর্জনে বলিয়া উঠিতেন, "কে তোমার রামকৃষ্ণকে চায়? কে তোমার ভক্তি-মুক্তি নিয়ে মাথা ঘামায়? শাস্ত্র কি বলছে না বলছে কে তা শুনতে চায়? যদি আমার এই ভারতের অগণ্য লোককে, যারা ডুবতে বসেছে,—অনাহারে আর অজ্ঞানের অন্ধকারে, তাদের মানুষ করবার জন্য দেহ পাত করতে পারি, যদি তাদের কয়েক জনকেও মানুষের মত মানুষ করে গড়ে তুলতে পারি তাহলে আমি নরকে যেতেও রাজী আছি। আমি তোমার রামকৃষ্ণ বা অন্য কারও চেলা নই, যারা নিজেদের ভক্তি-মুক্তির কামনা ত্যাগ করে দরিদ্রনারায়ণের সেবায় জীবন উৎসর্গ করবে আমি তাদেরই চেলা,—ভৃত্য-ক্রীতদাস।"

শ্রীরামকৃষ্ণকে উদ্দেশ করিয়া "জন্মে জন্মে দাস তব দয়ানিধে" এ কথা তিনি বার বার বলিয়াছেন, শ্রীরামকৃষ্ণের প্রসঙ্গমাত্র উল্লেখে তিনি ভক্তিতে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িতেন, এমন কি সময় সময় সংজ্ঞাশূন্যও হইয়া যাইতেন। আবার জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে বলিয়াছেন, "যার হৃদয় ভক্তিতে পূর্ণ হয়েছে তার স্নায়ুগুলি এত কোমল হয়ে পড়ে যে, সামান্য ফুলের ঘা পর্যন্ত সহ্য করতে পারে না। তোমরা জান, আমি আজকাল প্রেম-ভক্তি সম্বন্ধে কোন পুস্তক পড়তে পারি না।"

কিন্তু স্বামীজীর গুরুভাইরা শেষে স্বামীজীর মতেই মত দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ (শশী মহারাজ) পূজা অর্চনা লইয়া থাকিতেই ভালবাসিতেন। ঠাকুরকে প্রতিদিন ফুল দিয়া পূজা করিতে না পারিলে তাঁহার কোনমতেই চলিত না। তাই এর ওর বাগান হইতে ফুল সংগ্রহ করিয়া আনিতেন, কিন্তু স্বামীজী তাঁহাকেও পাঠাইলেন মাদ্রাজে, প্রচারকার্য ও জনসেবার জন্য।

গিরিশবাবুকে স্বামীজী 'জি সি' বলিতেন। ইউরোপ হইতে প্রত্যাবর্তনের পর স্বামীজী যখন শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন স্থাপন করিলেন তখন তিনি গৃহী-ভক্ত ও সন্ন্যাসী সকলকেই আহবান করিয়া বলিয়াছিলেন, "নানা দেশ ঘুরে আমার ধারণা হয়েছে সঙ্ঘ ব্যতীত কোন বড় কাজ হইতে পারে না।" তিনি সকলকেই সাহায্য করিবার জন্য আহবান করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমরা সকলেই প্রভুর দাস, আপনারা এ কার্যে সহায় হউন।"

শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় পাঠকের কার্যভার পাইয়াছিলেন, স্বামীজী তাঁহাকে ঋগ্বেদ পড়াইতে ভ করিলেন। পড়ানোর সময় নে গিরিশবাবু আসিয়া উপস্থিত। ীজী তাঁহাকে বলিলেন, "জি সি বোধ হয় এ সব পড়ার কোন রই মনে কর না, চিরকাল তো কৃষ্ণ নিয়েই কাটিয়ে দিলে।"

গিরিশবাবু বলিলেন, "বেদ পড়ে র কি হবে ভাই? বেদ বুঝবার আমার বুদ্ধিও নেই, অবসরও নেই। নমস্ত তোমার কাজ, তিনি তোমাকে লোকশিক্ষা দেবেন, ধর্মপ্রচার বেন, তাই ও সব তিনিই তোমাকে য়েছেন। ও সমস্ত জিনিসকে দূর প্রণাম করে আমি ভগবান রাম- র কৃপায় ভবসমুদ্র পার হয়ে চলে।" এই বলে তিনি ঋগ্বেদ গ্রন্থ- কে প্রণাম করিতে করিতে বলিতে গলেন, "জয় বেদরূপী শ্রীরামকৃষ্ণের!"

গিরিশবাবু তাঁহার নাটকে লোকের খ-দারিদ্র্য, নারীর উপর অত্যাচার, বিধবার জীবনের মর্মস্পর্শী দুঃখের হনী আঁকিয়াছেন, সেগুলি যেন র প্রাণ দিয়ে লেখা। তিনি মীজীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন "নরেন, মার বেদবেদান্তের মধ্যে এ সবের প্রতীকারের কথা লেখা আছে?" এই প্রশ্ন শুনিয়া স্বামীজীর খ জল আসিয়াছিল।

সংঘ পরিচালনার ভার স্বামীজী র্ণ করিলেন ব্রহ্মানন্দ স্বামীর উপর। ানন্দ স্বামী ছিলেন ঠাকুরের আদরের াল। সাংসারিক জীবনে তাঁহার াহ হইয়াছিল, একটি পুত্র সন্তানও । কিন্তু সে সব ত্যাগ করিয়া তিনি ্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বাবা ন্দমোহন বার বার তাঁহাকে সংসারে া লইতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু াইয়া লইতে পারেন নাই। ঠাকুরের সমাধির পর কাশীপুর হইতে চলিয়া সিলেন বরানগরে। সেখানেও তাঁহার া তাঁহাকে বার বার লইয়া যাইতে সিয়াছিলেন। বাড়িতে সাধ্বী পত্নী শিশুপুত্র রহিয়াছে, কিন্তু কোন আকর্ষণই তাঁহাকে সংসারে ফিরাইয়া লইতে পারিল না। ইহার পর শুরু হইল তাঁহার তীর্থভ্রমণ ও তপস্যা। একবার তিনি ছয় দিন ছয় রাত্রি একাসনে ধ্যানে মগ্ন হইয়াছিলেন। স্বামীজী তাঁহারই উপর সকল কার্যের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইতেন, আবার কোন কাজ ঠিক না হইলে সকল রাগ গিয়া পড়িত তাঁহারই উপর।

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে ২০শে জুন স্বামীজী দ্বিতীয়বার ইউরোপে যাত্রা করিলেন। এ সময় তাঁহার স্বাস্থ্য এত খারাপ হইয়াছিল যে, চিকিৎসকগণ জানাইলেন কিছুদিনের জন্য সমুদ্রের আবহাওয়া তাঁহার শরীরের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন। তাঁহার সঙ্গে ভগিনী নিবেদিতা ও স্বামী তুরীয়ানন্দ গিয়াছিলেন। তাঁহারা গোলকুণ্ডা' জাহাজে রওনা হন।

স্বামীজী রওনা হইয়াছেন এই সংবাদ মাদ্রাজে পৌঁছিলে সেখানে তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য আয়োজন আরম্ভ হইয়া গেল। মাননীয় আনন্দ চার্লুর নেতৃত্বে একটি সভা আহ্বান করা হইল এবং সভার পক্ষ হইতে স্বামীজীকে যেন কয়েক ঘণ্টার জন্য মাদ্রাজে অবতরণ করিতে দেওয়া হয় সেজন্য অনুরোধ করা হইল। কিন্তু ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট স্বামীজীর প্রভাব ভয়ের চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং সেই কারণেই কাশ্মীরের মহারাজা মঠের জন্য জমি দিতে অগ্রসর হইলেও রেসিডেণ্ট সাহেব মঠ ও সংস্কৃত কলেজ স্থাপনে বাধা দিয়াছিলেন এবং মাদ্রাজেও প্লেগের অজুহাত দেখাইয়া স্বামীজীকে মাদ্রাজে নামিতে দেওয়া হইল না। সুতরাং গোলকুণ্ডা জাহাজ মাদ্রাজের বন্দরে নোঙ্গর করিলেও তাঁহার দর্শনের জন্য উৎসুক জনগণ তাঁহার নিকটে যাইতে পারিলেন না। ডেকে দণ্ডায়মান স্বামীজীকে দূর হইতে দেখিয়াই তাঁহাদের তৃপ্তিলাভ করিতে হইল।

কিন্তু কলম্বোতে কর্তৃপক্ষ স্বামীজীকে তীরে নামিতে বাধা দেন

নাই। মাননীয় কুমারস্বামী ও মিস্টার অরুণাচলম অগ্রবর্তী হইয়া স্বামীজীকে সাদর সম্ভাষণ করিলেন এবং সহস্র সহস্র কলম্বোর অধিবাসী অতি আগ্রহের সংগে স্বামীজীকে অভ্যর্থনা জানাইল।

জাহাজে ছয় সংতাহ কাল নিবেদিতা স্বামীজীর সহিত ছিলেন। নিবেদিতা বলিয়াছেন, "এই দেড় মাসকালব্যাপী সমুদ্র যাত্রাটিকেই আমি আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা বলিয়া মনে করি।" এই সময় স্বামীজীর প্রত্যেকটি উক্তি নিবেদিতা তাঁহার মনে যেন খোদাই করিয়া লইয়াছিলেন। স্বামীজী এই সময় গল্পের মধ্য দিয়া অনেক কথাই বলিতেন, আর প্রত্যেকটি কথারই একটি বিশেষ তাৎপর্য থাকিত। নিবেদিতা বলিয়াছেন, "আমাদের আচার্যদেবের আবির্ভাব ও তিরোভাব দুইই আজ অতীতের ঘটনা, কিন্তু তিনি তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণের অন্তরে যে অমূল্য স্মৃতিসম্ভার রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার ভিতর বিশ্বমানবের প্রতি একান্ত ভালবাসাই সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বলতম রত্ন, তাহা আমরা অসংকোচে বলিতে পারি।"

এই ভালবাসা সর্বদাই তাঁহার সকল কার্যে এবং সকল কথায় প্রকাশিত হইত। তিনি কখনও দোষীর দোষ উদ্‌ঘাটন করিতেন না, বরং কেন যে সে দোষ করিতে বাধ্য হইয়াছে তাহাই বুঝাইতেন। দুর্বল ব্যক্তি বা দুর্বল জাতিসমূহের ভিতরও কি কি গুণ আছে তাহা শত-মুখে বর্ণনা করিতেন। যখন দেখিতেন যে কোন ব্যক্তি বা জাতির পক্ষ সমর্থনের কেহ নাই তখনই তাহার পক্ষ সমর্থনে অগ্রসর হইতেন।

সমুদ্রযাত্রায় হিন্দুদের জাতি যাইবে বলিয়া একটা সংস্কার আছে। স্বামীজী নিবেদিতাকে বলিয়াছিলেন—তাহার এক-মাত্র কারণ এই যে, সমুদ্রকে হিন্দুগণ মহা পবিত্র বলিয়া মনে করে, সেইজন্য সমুদ্রলংঘন তাহাদের নিকট বিশেষ অপরাধের কার্য বলিয়া গণ্য হইয়াছে।

ভাগীরথীর সীমা অতিক্রম করিয়া যখন জাহাজ সমুদ্রে গিয়া পড়িল স্বামীজী তখন যুক্তকরে প্রমাণ করিয় বলিলেন, "নমঃ শিবায়! নমঃ শিবায় ত্যাগ-বৈরাগ্যভূমি ছেড়ে ভোগৈশ্বর্যে ভূমিতে পদার্পণ করতে চললাম।"

স্বামীজী এ যাত্রায় বেশী দি ইউরোপে ছিলেন না। ৩১শে জুলা তাঁহারা লণ্ডনে পেঁছান এবং তা কয়েক সংতাহ পরেই আমেরিকায় চলিয় যান। স্বামী অভেদানন্দ আমেরিকা ছিলেন বটে, কিন্তু স্বামীজী যখ নিউইয়র্ক পেঁছিলেন তখন তিনি প্রচার কার্যের জন্য অন্যত্র গিয়াছিলেন। মিস্টা লিনেট ও মিসেস লিনেট স্বামীজীকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন এবং সেই দিনই বৈকালে তাঁহারা ১৫০ মাই দূরস্থ তাঁহাদের পল্লীভবন "রিজলে ম্যানরে" স্বামীজী ও তুরীয়ানন্দকে লই গেলেন। অভেদানন্দও কয়েকদিন প সেখানে আসিলেন। এখানে স্বামীজী স্বাস্থ্যের সামান্য উন্নতি হইয়াছিল নিবেদিতাও সেপ্টেম্বর মাসে শে সেখানে আসিয়া পেঁছিলেন এবং ৫ নভেম্বর পর্যন্ত তাঁহারা সেখানে ছিলে তাহার পর নিবেদিতা ও স্বামী তুরীয় নন্দকে সংগে লইয়া নিউইয়র্ক ফিরি আসিলেন।

নিউইয়র্কের কাজ বেশ ভাল চলিতেছিল। স্বামী অভেদানন্দ অক্লা পরিশ্রম করিয়া বেদান্ত সমিতির কা চালাইতেছিলেন এবং বেদান্ত সমিতি একটি নূতন গৃহও এই সময় প্রতিষ্ঠি হইল। স্বামী তুরীয়ানন্দও স্বা অভেদানন্দের সহিত বেদান্ত সমিতি কাজে যোগ দিলেন এবং কয়েক সপ্তাহে মধ্যে তাঁহারও প্রচারকার্যে বিশেষ খ্যা হইল। স্বামী তুরীয়ানন্দের 'শংকরাচা সম্বন্ধে ১০ই ডিসেম্বর তারিখের প্রব পাঠটিও সকলের প্রশংসা লাভ করি এইভাবে নবাগত স্বামী তুরীয়ান আমেরিকায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেন।

স্বামীজী এইভাবে তাঁহ পাশ্চাত্যের কার্যভার তাঁহার সহকর্মী হাতে তুলিয়া দিতে লাগিলেন। আ রিকায় তাঁহার অসংখ্য অনুরাগী ভ শিষ্য ও শিষ্যা আছেন, স্বামীজ আগমনে তাঁহারা সকলেই তাঁহা দর্শনের জন্য দলে দলে নিউইয়

আসিতে লাগিলেন, স্বামীজীও তাঁহাদের সঙ্গে অনবরত ধর্মালোচনা করিতে লাগিলেন, নিজের দুর্বল শরীর ও ভগ্নস্বাস্থ্যের সম্বন্ধে কিছুমাত্র লক্ষ্য করিলেন না। নিউইয়র্কের কাছাকাছি বোস্টন, ডিউয়েট, ব্রুকলীন প্রভৃতি জায়গাগুলিও তিনি ঘুরিয়া আসিলেন।

এ যাত্রা যেন তাঁহার বিদায় গ্রহণের পরিভ্রমণ। তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণ তাঁহার স্বাস্থ্যের অবস্থা লক্ষ্য করিয়া যদিও উদ্বিগ্ন হইতেছিলেন, কিন্তু লোকসমাগম প্রতিরোধ করিতে পারিতেছিলেন না। তাই তাঁহারা সকলে স্বামীজীকে কিছুদিন কালিফোর্নিয়ায় গিয়া যাপন করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কিন্তু কালিফোর্নিয়ার পথে বহু ভক্ত ও অনুরক্ত জনগণের অনুরোধে তাঁহাকে চিকাগোও নামিতে হইল। এখানে চিকাগোর অধিবাসিগণ তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য বিপুল আয়োজন করিয়াছিলেন। এখানে কয়েকদিন থাকিয়া তিনি কালিফোর্নিয়া যান।

কালিফোর্নিয়ায় স্বামীজী প্রায় সাত মাস ছিলেন। লস এঞ্জেলসে আসিয়া স্বামীজী মিসেস বোল্ডগেটের বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করেন। তাঁহার প্রিয় শিষ্যা মিস ম্যাকলাউড আগে হইতেই এখানে ছিলেন। এখানেও জনসমাগমের অন্ত রহিল না, বহু দূরস্থ নগর হইতেও স্বামীজীকে দেখিবার জন্য লোক আসিতে লাগিলেন এবং প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় প্রশ্নোত্তর সভাও যথারীতি আরম্ভ হইল। এখানে তাঁহাকে কয়েকটি বক্তৃতাও দিতে হইল। ৮ই ডিসেম্বর 'ব্ল্যাঙকার্ড বুক' হলে তিনি 'বেদান্তদর্শন' সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দেন। বলিতে গেলে তাঁহাকে প্রতিদিনই লস এঞ্জেলসের কোন না কোন স্থানে বক্তৃতা দিতে হইত, কিন্তু এত পরিশ্রমেও স্বামীজীর শরীর যে একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে নাই তাহার একমাত্র কারণ এখানকার জলবায়ু স্বামীজীর স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল ছিল।

ফেব্রুয়ারী মাসে ওক্‌ল্যান্ডের ইউনিটেরিয়ান চার্চের প্রধান ধর্মযাজক ডাক্তার বেঞ্জামিন মিলস্‌ মহাশয়ের আহ্বানে স্বামীজী ওক্‌ল্যান্ডে যান এবং সেখানকার চার্চে পর পর আটটি বক্তৃতা দেন। এই সময় রেভারেন্ড মিলস একটি ধর্মমহাসভা আহ্বান করিয়াছিলেন, কালিফোর্নিয়ার বিভিন্ন অংশ হইতে খৃষ্টধর্মপ্রচারকগণ সেই সভায় যোগ দিয়াছিলেন এবং তাঁহারা সকলেই স্বামীজীর বক্তৃতা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই অনুভব করিয়াছিলেন যে, এই এক নূতনভাবের ও নূতন ধরনের ধর্মপ্রচার এবং যেন এক নূতন আলো তাঁদের মনের সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়াই এক নবরাজ্যের পথ প্রদর্শন করিতেছে। ডাক্তার বেঞ্জামিন নিজে তাঁহার পরিচয় দিতে গিয়া বলিয়াছিলেন,

"A man of gigantic intellect indeed, one to whom our greatest university professors were as mere children."

ইনি এমন একজন মহাশক্তিমান বুদ্ধিমান যাঁহার কাছে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় বড় অধ্যাপকগণও শিশুমাত্র।

ওক্‌ল্যান্ড হইতে স্বামীজী ফেব্রুয়ারী মাসের শেষাশেষি সানফ্রান্সিস্কোয় যান, এখানে স্বামীজী 'গোল্ডেন গেট হলে' 'সার্বজনীন ধর্মের আদর্শ' নামে বক্তৃতাটি দেন। এই বক্তৃতা দিতে দুই ঘণ্টা সময় লাগিয়াছিল।

মার্চ মাসে স্বামীজী কৃষ্ণ, বুদ্ধ, খৃষ্ট ও মহম্মদ প্রভৃতি অবতার পুরুষগণের সম্বন্ধে কয়েকটি ধারাবাহিক বক্তৃতা দেন। এই সময় তিনি রাজযোগ সম্বন্ধেও বক্তৃতা দিতেন। এই সব

বক্তৃতা গুডউইন না থাকাতে নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

১৮ই এপ্রিল মিস ম্যাকলাউডকে তিনি যে চিঠি লিখিয়াছিলেন সে পত্রখানি অত্যন্ত দীর্ঘ। সেই পত্রের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছিঃ—

"কর্ম করা সব সময়েই কঠিন। আমার জন্য প্রার্থনা কর যেন চিরদিনের জন্য আমার কাজ করা বন্ধ হয়ে যায়। আর আমার সমুদয় মন প্রাণ যেন মায়ের সত্তায় মিলে একেবারে তন্ময় হইয়া যায়। তাঁর কাজ তিনিই জানেন।

"আমি ভাল আছি—মানসিক খুব ভাল আছি। শরীরের চেয়ে মনের শান্তি-সচ্ছন্দতাই খুব বেশী অনুভব করছি। লড়াইয়ে হারজিত দুই-ই হল—এখন পুঁটলী বেঁধে সেই মহান্ মুক্তিদাতার অপেক্ষায় বসে আছি। 'অব শিব পার কর মোরা নইয়া'—হে শিব, হে শিব! আমার তরী পারে নিয়ে যাও প্রভু!

"যতই যা' হোক, জো—, আমি এখন আগের সেই বালক বই আর কি'ছু নয়, যে বালক দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীর তলায় রামকৃষ্ণের অপূর্ব বাণী অবাক হ'য়ে শুনতো আর বিভোর হয়ে যেতো। ওই বালক ভাবটাই আমার আসল প্রকৃতি, আর কাজকর্ম, পরোপকার প্রভৃতি যা কিছু তা ঐ প্রকৃতির উপরে কিছুকালের জন্য আরোপিত একটা উপাধি মাত্র! আহা, আবার তাঁর সেই মধুর বাণী শুনতে পাচ্ছি, সেই চিরপরিচিত কণ্ঠস্বর—যাতে আমার প্রাণের ভিতরটাকে পর্যন্ত কণ্টকিত করে তুলছে। বন্ধন সব খসে যাচ্ছে —মানুষের মায়া উড়ে যাচ্ছে—কাজকর্ম বিস্বাদ বোধ হচ্ছে! জীবনের প্রতি আকর্ষণও প্রাণ থেকে কোথায় সরে দাঁড়িয়েছে! রয়েছে তার জায়গায় প্রভুর সেই মধুর গম্ভীর আহ্বান! যাই, প্রভু যাই! ঐ তিনি বলছেন—'মৃতের সৎকার মৃতেরা করুক গে, তুই ওসব ছুঁড়ে ফেলে আমার পেছনে পেছনে চলে আয়!' যাই, প্রভু যাই!

"হ্যাঁ, এইবার আমি ঠিক যাচ্ছি! আমার সামনে অপার নির্বাণ সমুদ্র দেখতে পাচ্ছি! সময় সময় তা' স্পষ্ট প্রত্যক্ষ ... অসীম অনন্ত শান্তি সমুদ্র! ... বাতাস বা ঢেউ পর্যন্ত যার ... না!

"আমি যে জন্মেছিলুম, ... খুসী আছি—এত যে দুঃখ ভুগে... খুসী। জীবনে কখনো কখনো ... করেছি, তাতেও খুসী। আবার ... নির্বাণের শান্তি সমুদ্রে ডুব দি... তাতেও খুসী।× × × দেহটা ... আমাকে মুক্তি দিক্ অথবা দেহ ... থাকতেই মুক্ত হই—সেই পুরোনো ... চলে গেছে—চিরদিনের জন্য চলে গেছে ... ফিরছে না। শিক্ষাদাতা, গুরু, নেতা ... চলে গেছে, রয়েছে আগেকার সেই ... প্রভুর সেই চিরশিষ্য, তাঁরই চিরপদাশ্রি...

"অনেক দিন হল নেতৃত্ব আমি ... দিয়েছি। কোন বিষয়েই 'এইটে আমার' বলবার অধিকার আমার নেই। তাঁর ... স্রোতে যখন আমি সম্পূর্ণরূপে গা ... থাকতুম, সেই সময়টাই আমার পরম ... মুহূর্তে বলে মনে হয়, এখন আবার সেই ... গা ভাসান দিয়েছি। উপরে দিবাকর ... কিরণ ছড়াচ্ছে, পৃথিবী চারিদিকে শস্যসম্ভারে পরিপূর্ণা হয়ে শোভা পাচ্ছেন—দিনের ... উত্তাপে সকল প্রাণীই এখন নিস্তব্ধ, ... শান্ত। আর আমি,—আমিও সেই ... নিজের ইচ্ছা বিন্দুমাত্রও না রেখে ... প্রভুর ইচ্ছারূপ প্রবাহিণীর সুশীতল ... ভেসে চলেছি। এটুকু হাত পা ... এ প্রবাহের গতি ভাঙ্গতে আ... সাহস ও প্রবৃত্তি হচ্ছে না—পাছে প্রা... এ অদ্ভুত নিস্তব্ধতা ও শান্তি আ... ভেঙ্গে যায়। × × × এর আগে আ... কর্মের ভিতরে মান যশের ভাবও উঠ... আমার ভালবাসার মধ্যে ব্যক্তিবিচারও আস... আমার পবিত্রতার পিছনে ফলভোগের আকাঙ্... থাকতো, আমার নেতৃত্বের ভিতর প্রভু... স্পৃহা আসতো। এখন সেসব উড়ে যাচ্ছে আর আমি সর্ববিষয়েই উদাসীন হয়ে তাঁ... ইচ্ছায় গা ভাসান দিয়ে চলেছি। যাই মা, যাই তোমার স্নেহের বক্ষে ধারণ করে—যেখা... তুমি নিয়ে যেতে চাচ্ছ, সেই অশব্দ, অস্পর্শ অজ্ঞাত অদ্ভুত রাজ্যে—অভিনেতার ভা... সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে কেবল মাত্র দ্রষ্টা ... সাক্ষীর মত ডুবে যেতে আর আমার দ্বিধা নাই।"

এই পত্রে তাঁহার তখনকার মনের ভাব স্পষ্টরূপে বুঝা যায়, কিন্তু বাহিরের ব্যবহারে তাঁহার কোন ভা... পরিবর্তনই দেখা যায় নাই। তখনও তিনি চলিয়া যাইবার আগে আমেরিকায় প্রচার কার্য যাহাতে স্থায়ীভাবে চলে তাহার ব্যবস্থা করিতেছিলেন।

ডাক্তারের ডায়েরী

—ডাঃ আনন্দকিশোর মুন্সী

॥ ১০ ॥

আজকাল প্রায়ই শুনি, জাপান নাকি কলকাতায় বোমাই ফেলেনি। যা ফেলেছিল তা আসল বোমা নয়। জাপানী মালের মতই নকল। আসলে ওগুলো বোমাই নয়। নেহাতই পট্‌কা।

কিন্তু ঐ পট্‌কার দাপটেই তখন কলকাতা জনমানবশূন্য হয়েছিল। পট্‌কা বলে যাঁরা এখন ঠাট্টা করছেন তাঁরাই সব চোঁচা দৌড় মেরে কলকাতা ছেড়ে পালিয়েছিলেন। জাপান সিঙাপুর পর্যন্ত এসে সত্যি সত্যিই থেমে গেল। এদিকে আর এগুলো না। কলকাতার ওপর বার কয়েক হামলা করেই চুপ করে গেল দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে ঐ পলাতকেরা আবার গুটি গুটি ফিরে এসেছিলেন।

আমরা কিন্তু এক পা'ও এখান থেকে নড়িনি। কলকাতার ফুটপাথ আঁকড়ে পড়েছিলাম। আমরা যারা কাজ নিয়েছিলাম এ আর পি অথবা সিভিল ডিফেন্সে, কলকাতা ছাড়বার উপায় আমাদের ছিল না। এখান থেকে পালিয়ে জীবিকা অর্জনের অন্য কোন পথ বাইরে কোথাও খোলা দেখিনি। তাই পেটের দায়ে অন্য সব ভয় তুচ্ছ করে জাপানকে রুখতে হবে বলে ধ্বনি তুলেছিলাম।

শহর ছেড়ে সবাই যখন বাইরে যাচ্ছে, কেউ ভাবেনি জাপানের হাত থেকে এ শহর রক্ষা পাবে। ইংরেজ এ শহর রক্ষা করবে না। পিছু হটে পালিয়ে যাবে বিহার কিংবা উত্তর প্রদেশে। যেমন করে পালিয়েছে ইয়োরোপ থেকে, ঈজিপ্ট থেকে, মালয়, বর্মা, সিঙাপুর থেকে। লোকে বুঝেছে, ইংরেজ জানে, শুধু পিছু হটতে। লড়তে জানে না। চৌরঙ্গীর ওপর একদিন দেখলাম, চাবুক খেয়েও ঘোড়া সামনে না এগিয়ে পিছু হট্‌ছে দেখে ছ্যাক্‌ড়া গাড়ির গাড়োয়ান পর্যন্ত গাল দিচ্ছে—শালা ঘোড়াভি আংরেজ বন্‌ গয়া।

এই পরিস্থিতিতে কলকাতা রক্ষা করবার জন্য এ আর পি-র প্রয়োজন হল। ফার্স্ট এইড পোস্ট কতকগুলি খোলা হল কিন্তু তা চালাবার জন্য পয়সা দিয়ে কোন ডাক্তার নিযুক্ত হল না। লেকচার প্রতি দশ টাকা দেওয়া হবে এই আশায় কয়েকজন ডাক্তার কিছুদিন বেগার খেটে কাজ ছেড়ে দিলেন।

গুজবে গুজবে শহর ভরে গেল। ডাক্তারদেরও কলকাতা ছাড়বার কথা ভাবতে হল। হঠাৎ একদিন শোনা গেল, ডাক্তারদের নাকি শহর ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া চলবে না। গভর্নমেণ্ট অর্ডিন্যান্স করে আটকাবে। কন্‌স্ক্রপশন করবে। শুনে আমাদের মধ্যে মহা আতঙ্কের সৃষ্টি হল। কোন পরাধীন দেশের প্রতি কোন বিদেশী রাষ্ট্র নাকি এমন জবরদস্তি কখনও করতে পারে না, এটা সম্পূর্ণ বে-আইনী, এমনি সব কথা নিয়ে আমাদের ক্লাবে, এসোসিয়েশনে খুব তর্ক বিতর্ক হল। কিন্তু সকলেরই প্রাণে ভয় যদি সত্যি কন্‌স্ক্রপশন করে তাহলে কি হবে?

আবার একদিন শোনা গেল, ডাক্তারদের গভর্নমেণ্ট আটকাবে না। একজন মন্ত্রী নাকি আশ্বাস দিয়েছেন যে, পঞ্চাশ টাকা মাইনে দিলে যত ইচ্ছে ডাক্তার নাকি তিনি এ আর পি-র জন্য জোগাড় করে দিতে পারেন। বেসরকারী বড় বড় দু'জন ডাক্তার বন্ধুর কাছ থেকে ভরসা পেয়েই নাকি তিনি ও কথা বলেছেন। শুনে আমরা খুব ক্ষেপে গেলাম। অপমানিত বোধ করলাম।

এই সময়ে মেডিক্যাল কলেজে একদিন স্ট্রাইক হয়ে গেল। প্রথম জমাদাররা, তারপর ডাক্তাররা কাজ বন্ধ করে দিল। প্রিন্সিপাল সে স্ট্রাইক মেটাতে পারলেন না, সার্জন জেনারেলও না। সার জন হার্বার্ট তখন বাংলার লাট। তাঁর নির্দেশে লোকাল সেল্‌ফ্‌ গভর্নমেণ্টের মন্ত্রী মশাই এলেন মিটমাট করতে। খুব ঝানু লোক। এসেই বুঝে নিলেন গলদ কোথায়। অন্য সব লোকের মত ডাক্তাররাও শহর ছেড়ে পালাবার সুযোগ খুঁজছে। ডাক্তারদের এসোসিয়েশনকে তুষ্ট না করলে এদের হাত করা যাবে না। অমনি বললেন—একটা মিটিং ডাকা যাক। ডাক্তারদের এসোসিয়েশনের এবং ক্লাবের সব সভ্যরা আসুক, বাইরের ডাক্তাররাও আসুক।

ডাক্তাররা তাদের কথা বলুক। গভর্ন-মেণ্টের তরফ থেকে তিনি এবং সার্জন জেনারেল থাকবেন। একটা মিটমাট করা যাবে।

ক্যালকাটা মেডিক্যাল ক্লাবে মিটিং ডাকা হল। হল লোকে ভর্তি হয়ে গেল। এত ডাক্তার এক সঙ্গে এর আগে কখনও কোন মিটিং-এ আসে নি। মন্ত্রী মশাই খুব জোর বক্তৃতা করলেন। আমাদের আঁতে ঘা দিয়ে বললেন—এই শহর আপনাদের লেখাপড়া শিখিয়েছে। এতদিন ধরে মার মত লালন পালন করেছে। আহার্য দিয়েছে। আজ এই বিপদের দিনে বিদেশী দস্যুর হাতে একে ছেড়ে দিয়ে আপনারা চলে যাবেন?

উত্তরে আমাদের মুখপাত্র একজন উঠে বললেন—আমরা যে এখানে থাকব খাব কি? বোমা? লোকে শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছে; আমাদেরও রোজগার পড়ে যাচ্ছে। গভর্নমেণ্ট আমাদের পরিবার সব বাইরে পাঠাতে বলেছে। সেখানে একটি সংসার, এখানে একটি। এই ডবল খরচ চালাব কি করে? গভর্নমেণ্ট ডবল মাইনে দিক, তখন ভেবে দেখব থাকব কিনা।

আর একজন বললেন—যে মন্ত্রীটি ভরসা দিয়েছিলেন পঞ্চাশ টাকা করে দিলেই অঢেল ডাক্তার পাওয়া যায়, তাঁর কাছেই যান না? এখানে আসা কেন? তিনি তো জীবনে বোধ হয় নিজের চিকিৎসার জন্য কোনওদিন একটি পয়সাও খরচ করেন নি। তিনি কি করে বুঝবেন ডাক্তারদের কি রকম কষ্টে খেটে অর্থ উপার্জন করতে হয়।

এমনি সব গরম গরম কথা কাটা-কাটির পর ঠিক হল পঞ্চাশ টাকার কথাটা নেহাতই গুজব। গভর্নমেণ্ট কখনও তা বলেন নি। ডাক্তারদের যাতে কষ্ট না হয় এমনি মাইনেই তাঁরা দেবেন। কত হলে ডাক্তাররা চালাতে পারেন তা বোঝার জন্য তিনজন ডাক্তার প্রতিনিধি ঠিক করা যাক। এঁরা আলোচনা করে যা বলবেন গভর্নমেণ্ট তাতেই রাজী হবেন।

মিটিংএ তিনজন বেসরকারী ডাক্তারের নাম ঠিক করা হল। এঁরা পরদিন সার্জন জেনারেলের আপিসে গিয়ে কথা বললেন। তারপর লাটসাহেবের কুঠিতে। ঠিক হল এ আর পির ডাক্তারদের আড়াইশ টাকা করে মাইনে হবে। কিন্তু বণ্ডে সই করতে হবে, কেউ পালাবে না।

বণ্ডে সই করবার নাম শুনেই অনেকে পিছিয়ে পড়ল। তাতেই আমার সুবিধে হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি বণ্ড সই করে চাকরিটি নিয়ে ফেললাম। তখনও জিনিসপত্রের দাম এত চড়েনি, দেশে দুর্ভিক্ষ হয় নি। তাই এই টাকাই মেলা টাকা বলে মনে হল।

চাকরি যখন নিলাম, তখন কিছুই জানি না কি কায। চাকরি যারা দিল তারাও জানত না কি কায। শহরের বিভিন্ন এলাকায় বড় বড় ইস্কুল বাড়ির দু'তিনখানা ঘর নিয়ে এক একটা ফার্স্ট এইড পোস্ট। থানার মত এলাকা ভাগ করা। যে এলাকায় বোমা পড়বে, সেই এলাকার পোস্টে আহতদের নিয়ে যাওয়া হবে। যারা সামান্য আহত, তাদের সেখানে রেখে চিকিৎসা করে ছেড়ে দেওয়া হবে। যারা বেশী আহত, তাদের হাসপাতালে পাঠান হবে।

আমরা যখন কাযে ঢুকি, তখন এ আর পি কিছুই না। শুধুই একটা নামমাত্র। মাইনে দিয়ে লোক নেবার পর থেকেই প্রতিষ্ঠানটি ক্রমশ গড়ে উঠল। একটা বড় গভর্নমেণ্ট অর্গানিজে-শানে দাঁড়িয়ে গেল।

ফার্স্ট এইড হল প্রাথমিক চিকিৎসা। এই প্রাথমিক চিকিৎসা কি এবং কি করেই বা যে কোন লোক একজন আহত ব্যক্তিকে এ চিকিৎসা দিতে পারে, তাই শেখানো আমার কাজ। [illegible] নিজেই জানি না এ চিকিৎসা কি, অপরকে শেখাব কি করে? এ সমস্যা আমার একার নয় যারা কায পেয়েছিল সব ডাক্তারেরই তখ এই সমস্যা। ডাক্তারী করা এক, প্রাথমি চিকিৎসা করা অন্য। সেণ্ট জন্ অ্যাম্বুলেন্সের রেডক্রসে এর শিক্ষ দেওয়া হ'ত। দশ বারোটা লেক্চারে আমাদের বেশীরভাগ ডাক্তারেরই ে ট্রেইনিং ছিল না।

সেণ্ট জন্‌স অ্যাম্বুলেন্সের ফার্স এইড টু দি ইন্‌জিওরড বইখানা পড়ে তার সব ছবি দেখে মিলিয়ে বাড়িে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা প্র্যাকটিস করে লেকচ দিতে যেতাম। কয়েকদিন পরেই ও রপ্ত হয়ে গেল।

আমার পোস্টে প্রথমে আটজন কম ছিল। এদের বলা হত ফার্স্ট এই ওয়ার্কার। আমার কায এদের শিখি পড়িয়ে তৈরী করে রাখা। এরা কে ম্যাট্রিক পর্যন্ত পাশ করে নি। ইংরেজিে নাম সই করতে পারে, ক্লাস সিক্স সেভে পর্যন্ত বিদ্যে। ত্রিশ টাকা মাইনে। আ ঘণ্টা ডিউটি। দুজন করে এক সঙ্গে ঘুরে-ফিরে দিন-রাত চব্বিশ ঘণ্টা তাছাড়া সকালবেলা ক্লাস, ড্রিল, প্যারেড স্ট্রেচার বওয়া। তার ওপর যখ সাইরেন বাজবে, তখুনি সবাইকে হাজি হতে হবে। কি দিন কি রাত।

পরে দুজন মেয়ে নেওয়া হল এদেরও এই কায এই মাইনে। শুধ ড্রিল প্যারেড আর স্ট্রেচার কাঁধে কর বাদ। আঠেরো থেকে পঁচিশ বছরে মধ্যে ভাল স্বাস্থ্য দেখে বাছাই করে ছেলে নেওয়া হত। কিছুদিন দেখে যদি বুঝতাম একে দিয়ে চলবে না, তাহলে তাকে ছাড়িয়ে নতুন লোক নেওয়া হত। অর্থাৎ চাকরি দেবার ক্ষমতাটি না দিয়ে চাকরি খাবার ষোল আনা ক্ষমতাটিই আমাকে দেওয়া হল। বণ্ডে সই করা সত্ত্বেও কেউ কাজ ছাড়তে চাইলে কখনও বাধা দেওয়া হত না। তাই লোকের মনের ভয় কেটে গেল। নতুন লোক পেতে কোন অসুবিধা হল না।

তখন আমার পোস্টে একটি কর্মী কায ছেড়ে চলে গেছে। আমার লোকের দরকার। আমাদের হেড অফিস রাইটার্স বিল্ডিংস থেকে ম্যাডান স্ট্রীটে উঠে

সেছে। হেড আপিসের এক সহকর্মী একদিন একটি লোক পাঠালেন। লোকটির দেখলাম অনেক বয়েস। চল্লিশের ওপর নে হল। চুলে পাক ধরেছে। গ'টি-কয়েক দাঁত পড়ে গেছে। নাম কালীপদ চক্রবর্তী। আমার পোস্টের সব কর্মীদের তুমি বলেই বলতাম। এই লোকটি দেখলাম আমার চেয়েও বয়সে বড়, তাই আপনি বলেই কথা শুরু করলাম।

বললাম—আপনার বয়েস কত?

কালীপদ বলল—আজ্ঞে, এই সবে তিরিশ পূর্ণ হয়েছে।

বুঝলাম, চাকরি পাছে ফস্‌কে যায় সেই ভয়ে মিথ্যে কথা বলছে। বললাম—এতদিন কি কাজ করতেন?

কালীপদ বলল—দরজীর।

আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—সেই কাজ ছেড়ে এই সামান্য টাকায় কি চলবে? এই বয়সে আবার পড়াশুনো, ক্লাশ করা, পরীক্ষা দেওয়া, ড্রিল প্যারেড, স্ট্রেচার কাঁধে করা এসব কি পারবেন?

খুব জোরের সঙ্গে কালীপদ বলল—খুব পারব।

বললাম—কিন্তু দরজীর কাজ ছাড়লেন কেন? ওসবেই তো আজকাল পয়সা।

কালীপদ বলল দরজীর দোকান কখনও করতে পারিনি। বাড়ি বাড়ি ঘুরে কাজ জোগাড় করতাম। ঘরে বসে সেলাই করতাম। যারা কাজ দিত সব কলকাতা ছেড়ে চলে গেছে আজ তিন মাস। এই চাকরিটি না হলে স্ত্রী পুত্র নিয়ে মারা পড়ব স্যার।

জিজ্ঞাসা করলাম—থাকেন কোথায়?

কালীপদ বলল—শোভাবাজার।

বললাম—অতদূর থেকে এখানে কাজ করবেন কি করে? সাইরেন বাজলেই বা হাজির হবেন কেমন করে?

কালীপদ বলল—চাকরি হলে এই পাড়াতেই ঘর নেব। কোন অসুবিধে হবে না।

বললাম—ত্রিশ টাকাতে বাড়ি ভাড়াই বা কত দেবেন, আর খাবেনই বা কি?

কালীপদ বলল—শোভাবাজারে দশ টাকা দিতাম ঘরভাড়া। এখানেও তার বেশী লাগবে না। নিজের একটা সিঙার মেশিন আছে। অফ্‌ টাইমে কাজ করে বাকীটা পুষিয়ে নেব। এতদিন ঐ করেই তো চালিয়েছি।

আমার পোস্টে যারা কাজ করত তারা সব ছেলে ছোকরা। নিজের খরচ ছাড়া আর কোন ভাবনা ছিল না। এর দেখলাম দায়িত্ব আছে। স্ত্রী পুত্র আছে। আমি বাগড়া দিলে বেচারা বিপদে পড়বে। তাই যোগ্যতার মাপকাঠি কিছুটা আল্‌গা করে একে কাজে বহাল করে নিলাম।

হেড আপিসে গিয়ে একদিন সেই সহকর্মীটির সঙ্গে দেখা হল। জিজ্ঞাসা করলেন—একটি লোককে আপনার কাছে পাঠিয়েছিলাম, দর্জীর কাজ জানে। কি রকম কাজ টাজ করছে?

বললাম—বয়েস হয়েছে, ছেলে-ছোকরার মত দৌড় ঝাঁপ পারবে কেন? চালিয়ে নিচ্ছি কোনও রকমে।

সহকর্মী বললেন—ওকে রাখবেন। অনেক কাজে লাগবে। বাড়ির সেলাইএর কাজ সব করে দেবে। এইটুকুও যদি না পাই তাহলে এসব লোককে চাকরি দিয়ে কি লাভ?

বয়েস বেশী হলেও দেখলাম কালী-পদর চেষ্টা আছে। মাসখানেকের মধ্যেই সব কাজ শিখে নিল। ছেলেদের সঙ্গে বেশ ভাব করে ফেলল। সবাই ওকে দাদা বলে ডাকতে শুরু করল। একদিন দেখলাম, ৬।৭ বৎসরের একটি সুন্দর ফুটফুটে ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে। ছেলেটি ভারি মিষ্টি দেখতে। ফর্সা রং, পাতলা চেহারা, দুষ্টুমি ভরা জ্বল জ্বল দুটি চোখ।

জিজ্ঞাসা করলাম—এটি কে?

সলজ্জ হাসি হেসে কালীপদ বলল—আমার ছেলে।

ছেলেটিকে পেয়ে পোস্টের ছেলেরা মহা খুশী। আদর করে মাথায় তুলে নিল। বল কিনে দিল। লজেঞ্জ খাওয়াল। খুব ভাব করে ফেলল। সেই থেকে প্রায়ই ওকে দেখতাম। কখনও ওর বাবার সঙ্গে, কখনও পোস্টের অন্য ছেলেদের সঙ্গে। পোস্টের মেয়ে দুটির সঙ্গেও দেখলাম ওর খুব ভাব হয়ে গেল। একটি মেয়ে ওর জন্য উলের মোজা বুনে দিল।

কালীপদ আমার বাড়ির সেলাইএর কাজও বাগিয়ে নিল। আমার ছেলেদের শার্ট পাঞ্জাবি সব করে দিল। আমার স্ত্রী প্রায়ই ওকে ডাকিয়ে এটা ওটা করিয়ে নিতে লাগলেন। সব কাজই যে পছন্দ মত হ'ত তা নয়। অনেক কাজ বার বার খুলে করালে তবে আমার স্ত্রীর পছন্দ হ'ত, কোন কাজ মোটেই হয়ত পছন্দ হত না। তবু ওকে ছাড়া আমাদের চলত না। হাসি মুখে এক কাজ বার বার খুলে করে দিত। প্রথম প্রথম মজুরী কিছু নিতে চাইত না কিন্তু আমি জোর করে গছিয়ে দিতাম। পুরো মজুরী কখনও অবিশ্যি দিই নি। বাজারের যা দর তার চেয়ে কিছু কমই দিতাম। কখনও অর্ধেক, কখনও হয়ত বা কিছু বেশী। তাইতেই কিন্তু ও খুশী থাকত। অনেক বেশী পাচ্ছে বলে মনে করত। আমার যে সহকর্মী ওকে কাজে ঢুকিয়েছিলেন ছ' মাস বাড়ির সব কাজ করিয়ে নিয়ে একটি পয়সাও নাকি ওকে দেন নি। একদিন নাকি সুতোর দাম বলে কিছু দিতে চেয়েছিলেন তা ও নেয় নি।

ওর ছেলেটিও ওর সঙ্গে মাঝে মাঝে আমার বাড়িতে আসত। আমার ছেলেদের সঙ্গে খেলা করত। ভারি ভাল লাগত দেখতে।

তখন জাপান আর বোমা ফেলছে না। দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে। যারা কলকাতা ছেড়ে পালিয়েছিল আবার সব ফিরে এসেছে। লোক ক্রমশ বাড়ছে। চালের দর চড়ছে। গভর্নমেণ্ট আমাদের সস্তা দরে চাল ডাল দিতে শুরু করলেন। শোনা গেল, শীগ্‌গিরই রেশন ব্যবস্থা চালু করা হবে।

সেই সময় ডিসেম্বর মাসের শেষে একদিন কালীপদ পোস্টে এসে বলল—স্যার একবার যদি দয়া করে আমার বাড়িতে একটু আসেন। আমার ছেলেটার খুব জ্বর। কেবল ছট্‌ফট্ করছে।

কাছেই গলির ভেতর একতলার একখানা ঘর নিয়ে কালীপদর বাসা। গিয়ে দেখলাম ছেলেটি জ্বরের ঘোরে গোঙাচ্ছে, ছট্‌ফট্ করছে। জ্বর দেখলাম ১০৪° ঘাড় শক্ত হয়নি। বুক পরীক্ষা করে কোন দোষ পেলাম না।

জিজ্ঞাসা করলাম—কখন জ্বর হ'ল? খুব শীত করে এসেছে কি?

ছেলের মা বলল—পরশু থেকেই কেমন যেন ঘ্যান ঘ্যান করছিল। কাল গায়ে হাত দিয়ে দেখি যেন পুড়ে যাচ্ছে। কাঁপুনি টাপুনি কিছু হয়নি। শীত টীতের কথাও কিছু বলেনি। আজ দেখছি সারা গা যেন লাল হয়ে গেছে। মাথায় পিঠে কোমরে খুব যন্ত্রণা বলছে। খালি কাঁদছে।

দেখলাম, সর্দি কাশি কিছু নেই। চোখও ছলছলে নয়। মুখে বুকে পেটে হাতে পায়ে এখানে ওখানে লাল লাল চাকা চাকা হয়ে রয়েছে। মনে হল, কিছু বোধ হয় বেরুবে।

তখন শহরে দুটি চারটি বসন্ত রোগ দেখা দিয়েছে। টিকে নেবার জন্য সিনেমায় স্লাইড দেওয়া হয়েছে। বিশেষ কিছু হৈ চৈ শুরু হয়নি।

জিজ্ঞাসা করলাম—টিকে নেওয়া হয়েছে কবে?

বোকা বোকা হাসি হেসে কালীপদ বলল—টিকে তো আমরা নিই না।

বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেলাম। লোকটা বলে কি?

জিজ্ঞাসা করলাম—এই ছেলের কখনও টিকা হয়নি?

কালীপদ বলল—আজ্ঞে না।

জিজ্ঞাসা করলাম—কেন?

কালীপদ বলল—টিকার বীজ শরীরে ঢুকে শরীর খারাপ হয় তাই আমরা টিকা কখনও নিই না। ওতে আমাদের বিশ্বাস নেই। আমরা বসন্তের সময় নিম পাতা আর কাঁচা হলুদ খাই। নিমপাতা সেদ্ধ করে তার জলে স্নান করি। নিমের তেল গায়ে মাখি। নিমের ডাল দিয়ে দাঁতন করি।

শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। ঐ সুন্দর ছেলেটার কি ভয়ঙ্কর দশা হতে পারে ভেবে আতঙ্কে বুক কেঁপে উঠল। ভয় হল ঐ সাংঘাতিক রোগই বুঝি ছেলেটাকে শেষে ধরল।

শুধু বললাম—মাথাটা এখন ভাল করে ঠান্ডা জলে ধুয়ে বরফ দিন। গা-টা গরম জলে ভাল করে মুছিয়ে দেয়া হোক। জল খেতে দিন খুব। তারপর কাল দেখা যাবে।

সাবান দিয়ে ভাল করে হাত ধুয়ে উঠে এলাম।

পরদিন কালীপদ ডিউটিতে এল। বেশ খুশী খুশী মুখ। হেসে নমস্কার করে বলল—আজ জ্বর ছেড়ে গেছে।

জিজ্ঞাসা করলাম—গায়ে কিছু বেরিয়েছে?

কালীপদ বলল—আজ্ঞে না। এখানে বড্ড মশা। কয়েকটা বোধ হয় কাল কামড়েছে। কিছু বেরোয় নি।

মুখ খুব গম্ভীর করে বললাম—চলুন একবার দেখে আসি।

কালীপদ একটু ইতস্তত করে বলল—কেন স্যার আর মিছিমিছি কষ্ট করবেন? ভালই তো আছে। খাচ্ছেও বেশ। জ্বরটাও ছেড়ে গেল।

উঠে বললাম—তা হোক। তবু চলুন একবার দেখে আসি।

গিয়ে দেখি জ্বর কমেছে ঠিক। কিন্তু মুখে পেটে বুকে হাতে পায়ে সারা গায়ে গুটি বেরিয়েছে। জ্বর নেই দেখে ছেলের মারও উদ্বেগ কেটে গেছে।

বেরিয়ে এসে কালীপদকে বললাম—আজ থেকে আপনি আর পোস্টে যাবেন না। আপনাকে ছুটি দিলাম।

এইবার কালীপদ ঘাবড়ে গেল। মুখ কাঁচুমাচু করে বলল—কেন স্যার? আমি কি দোষ করলাম?

বললাম—আপনার ছেলের আসল বসন্তই হয়েছে। জল বসন্ত নয়। তার জন্য আপনি নিশ্চয়ই দায়ী। কারণ এই ৬।৭ বৎসরেও আপনি ওকে টিকা দেননি। দিলে কখনও এ রোগ হত না। প্রাথমিক টিকা না দেওয়া যে একটা অপরাধ তা জানেন?

কালীপদ বলল—কৈ কখনও তো শুনিনি। আমি নিজেও কখনও টিকা নিই না; বাড়িতেও কাউকে কখনও নিতে দেখি নি।

বললাম—শার্টের হাতাটা তুলুন তো দেখি।

শার্টের হাতা তুলে দেখা গেল দুটি বাহুতেই বড় বড় দুটি করে বাংলা টিকার দাগ। বললাম—এগুলি কি?

কালীপদ বলল—ও তো বাংলা টিকে। কবে দেওয়া হয়েছে আমি জানিই না। আমার জ্ঞানে কখনও টিকে নেই নি।

বললাম—ঐটি ছেলেবেলায় দেওয়া হয়েছে বলেই এখনও টিঁকে আছেন। কিন্তু আমি ছুটি দিচ্ছি যাতে এখন আপনি বাইরে না যান, রোগটা না ছড়ান। এখন তিন সপ্তাহের জন্য কোয়ারেনটাইন লিভ আপনাকে দেওয়া হবে। মাইনে কাটা হবে না।

চাকরি যাবে না শুনে কালীপদ আশ্বস্ত হল। বলল—এখন তো জ্বর

ছেড়ে গেল; ভয় তো আবার যখন পাকবে?

ওর সঙ্গে এই নিয়ে কথা বলতে একটুও ইচ্ছে হচ্ছিল না। রাগে বিরক্তিতে গা যেন জ্বলে গেল। ওর কথার কোন উত্তর না দিয়ে গম্ভীর মুখে পোস্টে ফিরে এলাম।

আমার ঐ মুখ দেখে পোস্টের ছেলেরা ঘাবড়ে গেল। সবাইর চোখে মুখে উদ্বেগের চিহ্ন ফুটে উঠল। বলল —ছেলেটার কি হয়েছে স্যর?

ছেলেটা সবাইর এত আদরের, এত বেশী ভাল ওকে সবাই বাসত যে, আমার কাছ থেকে শুনে সবাইর মুখ শুকিয়ে গেল। গভীর আতংকে স্তব্ধ হয়ে গেল। একজন শুধু বলল—তাহলে কি হবে স্যর? বাঁচবে তো? এদের ঐ উদ্বেগে কোন ভরসা দিতে পারলাম না। শুধু বললাম—এ রোগের তো কোন অষুধ নেই। এখন দেখ কি হয়।

আমার কর্মীরা রোজই গিয়ে ছেলেটাকে দেখে আসত। খবর আনত। বলত কী চেহারা যে হয়েছে স্যর, চোখে দেখা যায় না। ভয় করে। আর সে কি কষ্ট! সারাদিন শুধু গোঙাচ্ছে। বসন্তের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক অবিশ্যি বলছে—এরকম হয়। ভয়ের কিছু নেই। সেরে যাবে। কালীপদদা এখন শুধু কাঁদছেন আর আপসোস করছেন।

কালীপদর নাম শুনেই আমার মেজাজ আবার বিগড়ে গেল। কি আশ্চর্য, এই লোকটার নাম পর্যন্ত যেন সহ্য করতে পারতাম না।

দিন সাতেক পরে একদিন দুপুর রাতে আমার দরজার কড়া খট্ খট্ করে নড়ছে শুনতে পেলাম। উঠে দেখি, কালীপদ দাঁড়িয়ে। মলিন বিমর্ষ মুখ। বলল—এক্ষুণি ছেলেটা মারা গেল। দশটা টাকা যদি দেন দয়া করে।

ঘরে ফিরে এসে দশটি টাকা বার করে কালীপদকে দিয়ে বললাম—আজ আপনার এই শোকের মুখে কিছু না বললেই বোধ হয় সঙ্গত হত। একটু সহানুভূতি কি সান্ত্বনা দেওয়াও বোধ হয় আমার উচিত ছিল। কিন্তু আমি তা পারব না। কারণ আমি জানি, কার দোষে আজ ওর মৃত্যু হল।

কিছু না বলে কালীপদ চলে গেল।

সেবার জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি কলকাতায় বসন্তের এপিডেমিক লেগে গেল। করপোরেশনের টিকা নেওয়া বিপজ্জনক বলে দুজন এক্সপার্ট এবং ট্রপিক্যাল স্কুলের ডাইরেক্টর এক সঙ্গে ঘোষণা করলেন, কলকাতা শহরে টিকে দেওয়ার দায়িত্ব করপোরেশনের হাত থেকে গভর্নমেণ্ট নিজের হাতে তুলে নিলেন। গভর্নমেণ্টের হেল্থ্ ডিপার্টমেণ্ট এ আর পির শরণাপন্ন হল। আমাদের রাইটার্স বিল্ডিংস-এ ডাক পড়ল।

এ আর পি তখন মস্ত বড় প্রতিষ্ঠান। সারা কলকাতাকে ভাগ ভাগ করে ৪০টি ফার্স্ট এইড পোস্ট হল। প্রতিটি পোস্টে একজন ডাক্তার এবং ১০ থেকে ১৫টি কর্মী। তাছাড়া, দশ বারোটি এ আর পি ডিপো। আমাদের বলা হল, আমাদের কর্মীদের শিখিয়ে ওদের বাড়ি বাড়ি পাঠিয়ে টিকে যদি দেওয়াতে পারি তাহলেই শুধু এই মহামারী বন্ধ করা সম্ভব। টিকে দেওয়ার সব সরঞ্জাম যখন যা দরকার সব স্বাস্থ্য বিভাগ সরবরাহ করবেন।

আমরা বললাম—কিন্তু লোকে আমাদের কাছ থেকে টিকে নেবে কেন?

স্বাস্থ্য বিভাগের ডাইরেক্টর বললেন—গভর্নমেণ্ট এক্ষুণি একটা অর্ডিন্যান্স অবিশ্যি জারি করতে পারেন কিন্তু তার প্রয়োজন হবে না। সংক্রামক রোগের একটা আইন আছেই। তারই জোরে ঘরে ঘরে টিকে দেওয়া চলবে। তাছাড়া, গভর্নমেণ্ট প্রেসনোট বার করবেন। বলবেন—প্রাথমিক টিকে নেওয়া বাধ্যতামূলক। না নিলে শাস্তি দেওয়া হবে। গভর্নমেণ্ট এ আর পির সাহায্যে ঘরে ঘরে টিকে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন।

আমরা রাজী হয়ে গেলাম। প্রেসনোট বেরিয়ে গেল। শহরে মহা হৈ চৈ পড়ে গেল। রটে গেল, টিকে এবার নিতেই হবে নইলে গভর্নমেণ্ট ছাড়বে না। শাস্তি দেবে।

আমার পোস্টে আটজন ছেলে, দুটি নার্স। সবাইকে টিকে দেওয়া শিখিয়ে দিলাম। প্রত্যেককে একটি করে থলি দেওয়া হল। তার মধ্যে টিকে দেওয়ার একটি যন্ত্র, রেক্টিফায়েড স্পিরিট, টিকের বীজ, তুলো, স্পিরিটল্যাম্প আর একখানা খাতা। কে কত বেশী লোককে টিকে দিতে পারে তাই দেখা হবে। কর্মীদের মধ্যে একটা প্রতিযোগিতার ভাব ঢুকিয়ে দেবার চেষ্টা করা হল।

মহা উৎসাহে সবাই কাজে লেগে গেল। কিন্তু দু' চারদিন বাড়ি বাড়ি ঘুরেই সবাই যেন একটু একটু করে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। উৎসাহ কমে গেল। কাজে ফাঁকি দিতে শুরু করল।

এমনি সময় কোয়ারেনটাইন লিভ শেষ করে কালীপদ এল। ওকে দেখেই আমার মুখ আবার কঠিন হয়ে উঠল। মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে গেল। নীল রং-এর ইউনিফরম পরে ফোক্লা দাঁত বার করে হেসে নমস্কার করে দাঁড়াল। দেখে গা আবার যেন জ্বালা করে উঠল।

রুক্ষ গলায় বললাম—এখন নতুন ডিউটি পড়েছে। আগে নিজে টিকে নিতে হবে। তারপর বাড়ি বাড়ি গিয়ে সকাল ৮টা থেকে বেলা ১২টা পর্যন্ত ঘুরে ঘুরে টিকে দিয়ে আসতে হবে। পারবেন?

বিনা দ্বিধায় কালীপদ বলল—কেন পারব না?

বললাম—তাহলে নিজে আগে নিন।

মৃদু হেসে হাত বাড়িয়ে কালীপদ বলল—দিন।

ডিউটির একটি ছেলেকে বললাম কালীপদকে টিকে দিতে। টিকে দেওয়া হলে বললাম—ওকে শিখিয়ে দাও কি করে দিতে হয়।

বড় রাস্তার ওপর টেবিল পেতে টিকে দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। রাস্তার লোক ডেকে ডেকে ছেলেরা টিকে দিত। সেদিন ঐখানেই কালীপদর ডিউটি দিলাম। দুপুর থেকে সন্ধ্যা।

সন্ধ্যার পর পোস্টে গিয়ে কে কত টিকে দিয়েছে মেলাতে গিয়ে দেখি, কালীপদর সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। রাস্তা থেকে ধরে এত বেশী লোককে টিকে এর আগে আর কোন কর্মী আমার পোস্টে দিতে পারেনি।

দেখে ওর প্রতি আজ সত্যি মায়া হল। রুক্ষ ভাব কেটে গিয়ে দুঃখ হল। সমবেদনায় এই প্রথম মনটা ভরে উঠল।

বিক্ষুব্ধ মরক্কো

শ্রীমৃত্যুঞ্জয় রায়

আলজেরিয়ার কন্সটানটাইন শহর থেকে মরক্কোর ক্যাসারাঙ্কা শহর পর্যন্ত দীর্ঘ ৮৫০ মাইল চাপ জুড়ে ফরাসী শাসনের বিরুদ্ধে সম্প্রতি যে গণঅভ্যুত্থান হল এবং তাকে দমন করার জন্য ফরাসী সরকার যে রক্ত-

ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী মঃ ফরে

স্নানের আয়োজন করেছে, তার প্রচণ্ডতায় ও বীভৎসতায় জগতের শান্তিপ্রিয় ও স্বাধীনতাপ্রিয় মানুষ স্তম্ভিত হয়ে গেছে। যতদূর সংবাদ পাওয়া গেছে, তাতে জানা যায়, ঐ অভ্যুত্থানের ফলে কমবেশী দ্বিসহস্রাধিক লোক (তার মধ্য ফরাসী ও অন্যান্য ইউরোপবাসীও আছে) নিহত হয়েছে। আহতের সংখ্যা এখনও সঠিক নির্ণীত হয়নি।

স্বাধীনতা অর্জনের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মরক্কোর আরব জাতি বার্বার উপ-জাতিদের সহযোগিতায় যে বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন করেছিল ২০শে আগস্ট, তা দমিত হয়েছে সত্য কিন্তু তার জের মেটেনি। কারণ, তারা প্রকাশ্য সংঘর্ষ এড়িয়ে এখন হঠাৎ-আঘাত দেওয়া অর্থাৎ গেরিলা যুদ্ধের পন্থা গ্রহণ করেছে এবং তা দমন করার জন্য ফরাসীরা মরক্কো ও আলজেরিয়াতে ফরাসী সৈন্য দিয়ে ভরে ফেলেছে। এ শুধু ওদের ভয় দেখাবার জন্য নয়—বিদ্রোহী নেটিভদের—শায়েস্তা করার জন্য। সৈন্যদের ঢালোয়া হুকুম দেওয়া হয়েছেঃ যে করে হোক হাঙ্গামা থামাও। বিদ্রোহের মূল উৎপাটন করতে চেষ্টা কর। একটি ফরাসী জীবনের পরিবর্তে অন্তত পাঁচটি মরক্কোবাসীর জীবন নেও। ধরে আনতে বললে যারা বেঁধে আনে, তারা এমন ঢালাও হুকুম পেলে যে বিভীষিকার রাজত্ব সৃষ্টি করবে, তাতে আর সন্দেহ কি? সৈন্যরা আলজেরিয়ার ন'খানি গ্রাম নিশ্চিহ্ন করেছে, কারণ ওগুলো নাকি বিদ্রোহীদের আড্ডা।

ক্যাসারাঙ্কাতেই ২০শে আগস্ট জাতীয়তাবাদীরা সর্বপ্রথম বিদ্রোহের ঝাণ্ডা উড়ায়। সংবাদপত্রের রিপোর্টে জানা যায়, তাঁরা ঐদিন এটলাস পর্বতের কেনিফ্রা শহরে ও ক্যাসারাঙ্কার দক্ষিণে উয়েদজেমে ও কুরিবগায় ফরাসীদের আক্রমণ করে। কেনিফ্রায় ও উয়েদজেমে তাঁরা ফরাসীদের বসতি জ্বালিয়ে দেয়। বহু বিদেশী এমন কি তাঁদের স্ত্রী আর শিশু পুত্রকন্যাও বিদ্রোহীদের আক্রমণ থেকে নিষ্কৃতি পায়নি। যেসব স্থানে প্রথম বিদ্রোহ আত্মপ্রকাশ করে, সেগুলোর কোনটিতে রয়েছে লৌহ খনি, কোনটিতে ফসফেট খনি। অর্থাৎ সব কটিতেই ফরাসীদের প্রধান আড্ডা। কারণ তারাই ঐ সব খনির মালিক।

বিদ্রোহ সুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই ফরাসী সরকার মরক্কোতে সৈন্য আমদানী করেন। এখন উত্তর আফ্রিকায় সর্ব সমেত প্রায় দশ ডিভিসন সৈন্য আছে. তার মানে তাঁর মোট সৈন্য বাহিনীর শতকরা ৭৫ ভাগই এখন মরক্কো-আলজেরিয়ার বিদ্রোহ দমনে নিযুক্ত। ইন্দোচীনে যুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ সময়েও সে এত সৈন্য সেখানে নিযুক্ত করেনি। তার উপর স্থানীয় ফরাসীদের নিয়ে যে বেসামরিক রক্ষা বাহিনী গঠিত হয়েছে, তারা তো আছেই।

ফরাসী বাহিনী ট্যাংক, বিমান ও ভারী কামান নিয়ে বিদ্রোহ দমনে নিযুক্ত হয়েছে। এটলাস পর্বতমালার চতুষ্পার্শ্বস্থ

মারাকেশের পাশা হাজ থামি এল গ্লাওই

গ্রামগুলি তারা কার্যত চষে ফেলেছে। বোমা ফেলে, নির্বিচারে হত্যা করে, ধ্বংসের বিভীষিকা সৃষ্টি করে তারা বিদ্রোহ দমন করছে। এই বিদ্রোহ দমন করতে ফরাসী বাহিনী যে অত্যাচার চালিয়েছে, তার একটি চাঞ্চল্যকর বর্ণনা দিয়েছেন 'নিউজ উইকে'র সংবাদদাতা। তিনি বলেছেন, উয়েদজেমের বিশ মাইল দূরে অবস্থিত আইত আম্মর গ্রাম। বিদ্রোহের দু সপ্তাহ আগে এখানে বাস করত ৬০০০ মরক্কোবাসী, আর ৭৩ ইউরোপীয়। এখানে রয়েছে অনেকগুলো লৌহখনি। এই খনিবহুল গ্রামটি আজ প্রায় জনশূন্য আর মৃত। সেখানে গুটি কয়েক নেটিভ মেয়ে মানুষ আছে সত্য

কিন্তু তারাও লোক দেখলেই পালিয়ে যায়।

বিনা যুদ্ধে ভারত ত্যাগ করার ফরাসীর মহানুভবতায় অনেকে খুশী হয়েছিলেন। ভেবেছিলেন হয়ত তাদের মানসিক পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের ভূত গুটিকয়েক ভাল মানুষ ফরাসীর কাঁধ থেকে নামলেও জাতি হিসাবে ফরাসী আজও পুরা-দস্তুর সাম্রাজ্যবাদী। সে যেমন ইন্দো-চীনকে ছাড়তে চায় না, তেমনি তার আফ্রিকার উপনিবেশকেও হাত ছাড়া করতে পারে না। উত্তর আফ্রিকা অর্থাৎ আল-জেরিয়া, টিউনিস (এখানে অবশ্য সর্তাধীন স্বাধীনতা ফরাসী সরকার স্বীকার করে নিয়েছেন), এবং মরক্কো যদিও নামত তার 'প্রোটেক্টরেট', কিন্তু কার্যত তার খাস জমিদারী। অন্তত আলজেরিয়া সম্পর্কে ফরাসীদের তাই দাবী। যেমন পর্তুগাল সরকার বলছেন, গোয়া-দমন-দিউ হচ্ছে পর্তুগালেরই অংশবিশেষ। এই খাস জমিদারী অর্থাৎ তার জীবনধারণের মূল উৎস হাতের বাইরে গেলে ফরাসীর পক্ষে বেঁচে থাকা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। তাই সে উত্তর আফ্রিকার উপনিবেশ হাতছাড়া করতে পারে না। করলে কি হবে, তা বিশদভাবে লিখেছে আমেরিকার 'টাইম' পত্রিকা। তাই উদ্ধৃত করছি।

মরক্কোর ভূতপূর্ব রেসিডেন্ট-জেনারেল মিঃ গিলবার্ট গ্রাদভাল

'টাইম' বলছেনঃ "এশিয়ায় ফরাসীর যে সাম্রাজ্য ছিল, তা শেষ হয়ে গেছে, এবার যদি তার আফ্রিকার উপনিবেশ চলে যায়, তবে বিশ্বের প্রধান শক্তি বলে দাবী করার পথ তার রুদ্ধ হয়ে যাবে তাই উত্তর আফ্রিকায় তার ঝুঁকি বিস্তর। তাছাড়া, ফ্রান্স, মরক্কো, আলজেরিয়া এবং টিউনিশিয়াতে কোটি কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে। ফ্রান্সের ব্যবসায়ীদের উত্তর আফ্রিকার বাজার, ওখানকার কাঁচা মাল এবং শ্রমিকের উপর একান্তভাবে নির্ভর করতে হয়। উত্তর আফ্রিকার সবচেয়ে সম্পদশালী অংশ হচ্ছে মরক্কো, কিন্তু এখানেই হাঙ্গামা সবচেয়ে বেশী। মরক্কো কালিফোর্নিয়ার চেয়ে আয়তনে বড় এবং খুব উর্বর। মরক্কোর মধ্যাঞ্চলে এটলাস পর্বতমালা এবং দক্ষিণে সাহারা মরুভূমি, কিন্তু দক্ষিণ ও পশ্চিমে, অতলান্তিক মহাসাগরের উপকূল বরাবর, রয়েছে অজস্র দ্রাক্ষাক্ষেত্র, জলপাই বন, সম্পদশালী অরণ্য আর শস্যক্ষেত্র। ৩ লক্ষাধিক ফরাসী, যারা এখানে বসবাস শুরু করেছে উপনিবেশ স্থাপন করার প্রথম যুগ থেকে মরক্কোর চাষ আবাদের উন্নতি সাধন করেছে, রাস্তাঘাট করেছে, অট্টালিকাদি নির্মাণ করে পার্বত্য অঞ্চলকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছে। এখানকার খনি থেকে ফরাসী ইঞ্জি-নীয়াররা প্রচুর অভ্র উত্তোলন করে, বিশ্বের বাজারের এক-ষষ্ঠমাংশ ফসফেট এখান থেকেই সংগ্রহ করে। ক্যাসাব্লাঙ্কায় রয়েছে তাদের লাভজনক মৎস ব্যবসায়।

"মরক্কোর চাষ-জমির এক সপ্তমাংশ মাত্র ফরাসী উপনিবেশকদের হাতে, কিন্তু তার সবটুকুই অত্যন্ত চমৎকার জমি। দেশের মোট উৎপন্ন শস্যের এক-

তৃতীয়াংশ মাত্র তারা উৎপন্ন করে, কিন্তু তাদের সম্পত্তির জন্য ট্যাক্সের উপর রিবেট পায় প্রায় ২০ শতাংশ।" 'ডেলি টেলিগ্রাফ'ও বলছেন, 'উত্তর আফ্রিকার আরবদের স্বাধীনতা দিলে ফ্রান্স আর পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ শক্তি থাকতে পারে না।" এর পরে একথা বলা আর দরকার হবে না যে, যে-মরক্কো তাকে বিশ্বের প্রধান শক্তি হবার ক্ষমতা যুগিয়েছে, তাকে সে হাত ছাড়া করবে। তাই সকলেই মনে করে, উত্তর আফ্রিকায় আর একটা 'দিয়েন বিয়েন ফু' না হওয়া পর্যন্ত ফ্রান্স সহজে এই কর্তৃত্ব ছাড়বে না। উত্তরোত্তর সামরিক বলের উপর নির্ভর করে তার আফ্রিকা উপনিবেশ করে রাখতে চেষ্টা করবে। কিন্তু জগতের ধারা আজ বদলেছে। কোন দেশ বা কোন ঘটনাই আজ আর বিচ্ছিন্ন নয়। বিশ্বের যে কোন স্থানে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা ধর্ম সম্বন্ধীয় যে কোন ঘটনা ঘটুক না কেন তার ঢেউ এসে লাগে অন্য রাষ্ট্রেও। ফ্রান্সের এই বর্বরোচিত কাজ তাই দোলা দিয়েছে বহু রাষ্ট্রকে, বিশেষ করে আরব রাষ্ট্রসমূহে। সতেরটি আরব ও এশীয় দেশ সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জকে অনুরোধ করেছে এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে। করাচীতে ৫ হাজার মুসলমান 'ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের' কুশপুত্তলিকা দাহ করে প্রতিবাদ জানিয়েছে। মিশরের প্রধানমন্ত্রী গামাল আবদেল নাসের তীব্র ভাষায় ফরাসী বর্বরতার নিন্দা করেছেন এবং এ ব্যাপারে আমেরিকা ও 'ন্যাটো' শক্তিপুঞ্জের উস্কানি আছে বলে দোষারোপ করেছেন। 'টাইম' বলছেন, মরক্কোর নানা স্থানে আমেরিকা বৃহত্তর নিরাপত্তার জন্য নৌ ও বিমানঘাঁটি করেছে সত্য, কিন্তু তারা আরবশক্তিবর্গের মুখ চেয়ে ফরাসীকে সাহায্য করতে ইচ্ছুক নয়। তবে মরক্কোতে আমেরিকান অস্ত্রাদি না ব্যবহার করার জন্য তাঁরা নির্দেশ দিয়েছেন।

আর একজন তীব্র ভাষায় ফরাসী-দের বিরুদ্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। তিনি হচ্ছেন ৭৩ বৎসর বয়স্ক নির্বাসিত রিফ্ নেতা আবদেল

উয়েদজেম-এ বিদ্রোহী সন্দেহে ধৃত মরক্কোবাসী

আমাদের সত্যিকারের স্বাধীনতা না দেওয়া পর্যন্ত হাঙ্গামা চলতেই থাকবে। এককালে যিনি স্বাধীনতার ঝাণ্ডা তুলে স্পেন ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে লড়াই করেছিলেন, তাঁর এই সাবধান বাণী থেকেই সাম্প্রতিক বিদ্রোহের কারণ জানা যাবে। ফরাসীরা গর্ব করে বলে যে, তাঁরা মরক্কোর শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস করেছে, তাদের সুস্থ ও সবল হতে সাহায্য করেছে। সেখানে স্কুল কলেজ করেছে, রাস্তাঘাট বানিয়েছে। চাষ আবাদ, শিল্প প্রভৃতির উন্নতিসাধন করেছে। এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে শাসন সংস্কারও দিয়েছে। কিন্তু পূর্ণ স্বাধীনতা পাওয়ার উপযুক্ত হয়নি বলে তা দেয়নি।

ইতিহাসের ছাত্ররা জানেন যে, এক সময় সুযোগ বুঝে ইউরোপের ছোটবড় সমস্ত শক্তি, যেমন পর্তুগীজ, স্পেন, ফরাসী, বৃটিশ, জার্মানী এসে উত্তর আফ্রিকার উপকূলে হানা দেয় এবং ঐ দেশের কাঁচা মালের লোভে বিভিন্ন বন্দর সুলতান অল হাসান ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে তেরোটি ইউরোপীয় শক্তির সঙ্গে আলাপ আলোচনা আরম্ভ করেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল আলাপ আলোচনা দ্বারা বৈদেশিক অনুপ্রবেশ রুদ্ধ করা। সেই আলোচনার ফল কিন্তু হয় বিপরীত। ইউরোপীয়দের মরক্কো প্রবেশের পথ সহজতর হয়। ফলে সমস্ত শক্তিই উত্তর আফ্রিকার বিশেষ করে আলজেরিয়া, টিউনিসিয়া, মরক্কো প্রভৃতি অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপনে সচেষ্ট হয়। তাতে নিজেদের মধ্যেই বিরোধ দেখা দেয়। যাহোক, ১৯১২ সালে এক চুক্তির ফলে মরক্কো ফরাসী 'প্রোটেক্টরেটে' পরিণত হয়। কিন্তু মরক্কোর কিছু অংশ স্পেন পেয়ে যায় আর এক চুক্তির বলে ওরই অপর একটি অংশ আন্তর্জাতিক ফ্রি স্টেটএ পরিণত হয়। এর নাম তাঞ্জিয়ার। বর্তমানে যে বিস্ফোরণ ঘটেছে, তা ফরাসী অধিকৃত মরক্কোতে।

এই বিদ্রোহ নূতন কিছু নয়। ১৯১২ সালে স্পেন ও ফরাসীর মধ্য

সশস্ত্র বিদ্রোহ করেন। সে বিদ্রোহ দমিত হয় ঠিকই, কিন্তু যে জাতীয়তার বীজ সেদিন উপ্ত হয়েছিল, তা কোনদিন ফরাসী শক্তি নষ্ট করতে পারেনি। এই জাতীয়তাবাদীদের দলের নাম হচ্ছে ইস্তিকলাল। বহুবার তারা বিদ্রোহের নিশান তুলেছে, রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের জন্য আন্দোলন করেছে। এবারও তাঁরাই অগ্রগামী। তাই তাঁদের উপর অত্যাচারের খড়্গ তো নেমে এসেছেই, নিষেধাজ্ঞাও জারী করা হয়েছে।

এই দল গঠিত হয়েছে মরক্কোর আরব অধিবাসীদের নিয়ে। এঁরা সহরবাসী, অনেকে শিক্ষিত। এঁদের সমর্থক হচ্ছে পার্বত্য বার্বার জাতি। এরা আদিম অধিবাসীদেরই বংশধর। এদেরই অনেকে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেছে আরবদের মরক্কো অভিযানের সময় খৃঃ পূঃ ৪৫৫ শতকে। মরক্কোর আয়তন হচ্ছে ১৭২১০৪ বর্গ মাইল। জনসংখ্যা—৯০ লক্ষ, এর মধ্যে মুর-আরবদের সংখ্যা ৪৫ লক্ষ, বার্বারদের সংখ্যা ৪০ লক্ষ আর ফরাসী ও অন্যান্য ইউরোপীয়দের সংখ্যা মাত্র ৩ লক্ষ ৫০ হাজার। এত অল্পসংখ্যক লোক বন্দুকের ভয় দেখিয়ে একটা জাতিকে দাবিয়ে রাখবে, একটা দেশকে যুগের পর যুগ শোষণ করবে, বিশেষ করে বিংশ শতাব্দীর এই শেষ পাদে, তা কখনও সম্ভব নয়। বারেবারে মরক্কোবাসী যে বিদ্রোহ করছে, ২০শে আগস্ট যে বিদ্রোহ হয়েছে, তার একমাত্র কারণই তাই। আফ্রিকার জাগ্রত জাতীয়তাবাদ চাইছে সর্বপ্রকার পরাধীনতা থেকে মুক্তি।

২০শে আগস্ট হচ্ছে মরক্কোবাসীদের পক্ষে একটি স্মরণীয় দিন। কারণ দুই বৎসর আগে এই দিনই ফরাসীরা মরক্কোর সুলতান সিদি মহম্মদ বিন ইউসুফকে গ্রেপ্তার করে নির্বাসিত করেন মাদাগাস্কারে। তাঁর অপরাধ তিনি সহানুভূতি দেখাতেন জাতীয়তাবাদীদের ওপর। তাঁর প্রাসাদে ইস্তিকলাল দলের (জাতীয়তাবাদী দল) লোকজন আশ্রয় পেত। ফরাসী সরকারের চক্ষে এতো অমার্জনীয় অপরাধ!

বিন ইউসুফ-এর সঙ্গে ফরাসীদের বিরোধের একটি কাহিনী 'টাইম' ছেপেছেন। তাতে বলা হয়েছে, ১৯৪৭ সালের একদিন বিন ইউসুফের তাঞ্জিয়ারে একটি বক্তৃতা করার কথা ছিল। তাতে অন্যান্য কথার সঙ্গে তাঁকে বলতে বলা হয়েছিল, "ফ্রান্সের উপর নির্ভর করুন, তাঁরা স্বাধীনতার উপাসক......ইত্যাদি।" কিন্তু বিন ইউসুফ ইচ্ছে করেই তা বাদ দিয়ে মুসলিম সংহতির উপর জোর দেন। ফলে ফরাসীরা অগ্নিশর্মা হয়ে ওঠে।

সুলতানকে শিক্ষা দেবার জন্য ফরাসী মন্ত্রিসভা জাঁদরেল রেসিডেণ্ট জেনারেল আলফাসোঁ জুইকে নিযুক্ত করেন। তিনি এসে দল বাঁধেন ফরাসী ঘেঁষা মারাকেশের পাশা এল গ্লাওই-এর সঙ্গে এবং ষড়যন্ত্র করতে থাকেন ইউসুফকে তাড়াবার।

তাঁর ষড়যন্ত্র সফল হয় এবং বিন ইউসুফের স্থলে এল গলুইর ক্রীড়নক, ভগ্নস্বাস্থ্য বৃদ্ধ মহম্মদ বেন আর্ফা মরক্কোর সুলতান হন। জাতীয়তাবাদীরা এ মনোনয়ন সহ্য করতে রাজি ছিল না। তাঁরা আর্ফাকে হত্যা করতে চেষ্টা করেছে। তাঁদের ভয়ে এল গলুই ঘরের বাইরে যান না। নানা ভাবে তাদের বিক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে। এই বিক্ষোভ বন্ধ করার জন্য ফরাসী মন্ত্রিসভা জুই-এর বদলে রেসিডেণ্ট জেনারেল করে পাঠিয়েছে গিলবার্ট গ্রাদ'ভালকে। ফরাসীরা শাসন সংস্কারেরও প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। গ্রাদ'ভালও সহানুভূতি দেখিয়েছে জনদাবীর প্রতি। তাঁর এই মনোভাবের ফলে স্থানীয় ফরাসীরা তাঁর প্রতি বিরূপ হয়ে উঠেছিল, ফলে তাকে পদত্যাগ করতে হয়েছে। গোঁড়া সাম্রাজ্যবাদীরা কিছুতেই মরক্কোর বিদ্রোহীদের সঙ্গে আপোষ করতে রাজি নন। মন্ত্রিসভাকে খুশী রাখবার জন্য ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী ফরেও মরক্কোর বিদ্রোহীদের শাস্তি দেবার নীতি মেনে নিয়ে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছেন। কিন্তু জাগ্রত জনচেতনাকে কি বন্দুকের ভয় দেখিয়ে চিরকালের জন্য স্তব্ধ রাখা যাবে? এর জবাব দিয়েছেন ফরাসী প্রতিনিধি সভার বিভিন্ন দলীয় পাঁচজন সদস্য। তাঁরা আলজেরিয়া ঘুরে এসে ফরাসী দেশরক্ষা বিভাগে রিপোর্ট দিয়েছেন, "বিদ্রোহ যেখানে এত ব্যাপক এবং জাতির অসন্তোষ ও অভিযোগের মধ্যে বিদ্রোহ এত গভীরভাবে শিকড় গেড়েছে যে, শুধু গায়ের জোরে তা কিছুতেই দমন করা যাবে না।"

এই রিপোর্টের সারবত্তা ফরাসী সরকার যত তাড়াতাড়ি বোঝেন এবং কালোপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, ততই, শুধু তাদের পক্ষে নয়, জগতের পক্ষেও মঙ্গল।

চক্রদত্ত

সাধারণত মানুষের শরীরের কোন-প্রকার বিকৃত অথবা ক্ষয়প্রাপ্ত অস্থি বা দন্ত কোনপ্রকার কৃত্রিম বস্তুর সাহায্যে বদল করা হয়। ডাঃ নরম্যান স্লোভিক কিন্তু এক নতুন উপায়ে এইসব স্থানে হাড় অথবা দাঁত সংযোগ করছেন—আর সেগুলো ঠিক স্বাভাবিক অবস্থায় কাজ করছে। এতদিন কিন্তু কৃত্রিম বস্তুগুলি হাড় এবং দাঁতে লাগাবার পরও ঠিক স্বাভাবিকভাবে সেই স্থানে কাজ করে নি—কারণ এগুলো কোনপ্রকার ধাতব বস্তুর সাহায্যে তৈরী করা হয়। ডাঃ স্লোভিক তাঁর নতুন পদ্ধতিতে খাদ্য থেকে ক্যালসিয়াম এবং ফসফরাস প্রয়োজনীয় স্থানে জমাবার বন্দোবস্ত করেছেন। আস্তে আস্তে এই দু'প্রকার বস্তু প্রয়োজনীয় স্থানে জমতে জমতে সেটা পরে ঠিক আসল হাড় অথবা দাঁতের রূপ নেয় এবং স্বাভাবিকভাবে হাড় কিম্বা দাঁতের সঙ্গে মিলে যায়। ডাঃ স্লোভিক শিশুদের নরম অস্থি, শিশু বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে কি করে শক্ত হয়ে পরিণত হয় জানতে গিয়ে এই নতুন উপায়টি আবিষ্কার করেছেন।

•

[illegible] হলো [illegible] সবচেয়ে দ্রুতগতি-[illegible] এ্যারোপ্লেনের [illegible] গতিও দ্রুত থেকে দ্রুততর করার চেষ্টা চলছে। খুব সম্প্রতি ক্যাম্বারা—একটি জেট চালিত এ্যারোপ্লেনে করে পাইলট জনহার্কেট লণ্ডন থেকে সকালে তার প্রাতরাশ খেয়ে যাত্রা করে নিউইয়র্কে পোঁছে তাঁর দ্বিপ্রাহরিক আহার সমাধা করেন আবার ঐদিন লণ্ডনে ফিরে নৈশ ভোজন করেন। সংবাদটি চমকপ্রদ বলেই মনে হয়। লণ্ডন ও নিউইয়র্কের দূরত্ব ৬৯২০ মাইল এবং এই পথ তিনি ১৪ ঘণ্টা ২১ মিনিটে যাতায়াত করেন। গড়-পড়তা ঘণ্টায় ৪২১ মাইল গতিতে চলে। এইরকম দ্রুতগতিবিশিষ্ট আরও কয়েকটি জেটচালিত এ্যারোপ্লেনের খবর জানা যায়। এই মাসের মধ্যেই আর একটি বৃটিশ জেট, সিঙ্গাপুর থেকে অস্ট্রেলিয়ার ডারউইন নামক একটি স্থানে ৪ ঘণ্টা ২ মিনিট ১৩ সেকেণ্ডের মধ্যে পোঁছেছিল। এই স্থানের দূরত্ব ২০৯০ মাইল। অতএব হিসাব করে দেখা যায় যে ঘণ্টায় ৫২০ মাইল গতিতে গিয়েছিল। একটি হকার হাণ্টার জেট এডিনবারা থেকে হ্যাম্পশায়ারে ২৭ মিনিট ৪৬ সেকেণ্ডে উড়ে গিয়েছিল। এই স্থানের দূরত্ব ৩৩৩ মাইল। তাহলে দেখা যায় যে ঘণ্টায় ৭১৭ মাইল গতিতে গিয়েছিল। অবশ্য এই জেটখানি ঐসব দূরগামী জেটের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে কী না বলা যায় না।

•

বর্তমানে বৈজ্ঞানিকদের মত হচ্ছে যদি সিগারেট লম্বা হয় তাহলে ধূমপান-কারীর কম পরিমাণে নিকোটিন গলার ভেতর যাবে। এদের মতে লম্বা সিগারেটে যদি ছাকনি (ফিল্টার) লাগান থাকে তাহলে সব চেয়ে ভাল হয়! বৈজ্ঞানিকরা বলেন যে, ধূমপানকারী লক্ষ্য রাখবে যে অন্তত ১½ ইঞ্চি থেকে যাতে সিগ্রেট ছোট না হয়। যদি এর চেয়ে ছোট হয়ে গেলেও সিগ্রেট টানা যায় তাহলে খুব বেশী পরিমাণে নিকোটিন গলার ভেতরে যাবে।

বৃটেনে মুদ্রাস্ফীতি

কয়েক মাস ধরিয়াই বৃটেনে মুদ্রাস্ফীতি ভয়াবহ আকার ধারণ করিয়াছে। মুদ্রাস্ফীতির প্রবল তরঙ্গ রোধ করিবার জন্য ব্রিটিশ সরকার উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। ইতিপূর্বে ব্যাঙ্ক রেট্ ৪½% পর্যন্ত বাড়ান হইয়াছে যাহাতে ঋণ গ্রহীতারা চড়া সুদের জন্য ধার করিতে অগ্রসর না হন। ধার না করার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হইবে অন্য দিক দিয়া ব্যয় সংকোচ এবং সঞ্চয় বৃদ্ধি করা। ফলে বাজারে অত্যধিক মুদ্রা চালু না থাকা বিধায় পণ্যমূল্যের গতি নিম্নগামী হওয়া। প্রথমদিকে কেবল ব্যাঙ্ক রেট্ বৃদ্ধি করিয়াই ব্রিটিশ সরকার মনে করিয়াছিলেন যে, অবস্থা আয়ত্তাধীনে আনা যাইবে। কিন্তু কার্যত দেখা গেল যে, ইহাতে মুদ্রাস্ফীতির উপসর্গগুলি প্রশমিত হয় নাই। ব্যাঙ্ক রেট্ বাড়ানোর ফলে যে কোন প্রতিক্রিয়া হয় নাই একথা বলা যায় না। তবে একমাত্র এই অস্ত্র দ্বারাই প্রতিকূল উপসর্গগুলি দমন করা সম্ভব হয় নাই। অন্য অস্ত্রের সাহায্যও নেওয়া হইয়াছে। যখন দেখা গেল, ব্যাঙ্ক রেট্ বাড়াইবার পরও কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কগুলি তাহাদের দাদন কমায় নাই—উপরন্তু স্বাভাবিকভাবে তাহা বৃদ্ধি করিয়াই চলিয়াছে, তখন ট্রেজারীর পক্ষ হইতে ব্যাঙ্কগুলিকে এইরূপ অনুরোধ জানান হইল যে, মুদ্রাস্ফীতির কুফল চিন্তা করিয়া তাহাদের দাদনের পরিমাণ সংকুচিত করা উচিত। ব্যাঙ্কের তরফ হইতে দাদনের পরিমাণ হ্রাস করিবার প্রধান বাধা এই যে, এরূপ অবস্থায় ব্যাঙ্কের মক্কেলগণ মনে করিবে যে, হয়ত ধার দেওয়ার মত উপযুক্ত অর্থসংস্থান ব্যাঙ্কের নাই। ফলে ব্যাঙ্কের বাজারে সম্ভ্রমে অনেকটা আঘাত লাগিতে পারে। ইহা ছাড়া, এক ব্যাঙ্কের সহিত অপর ব্যাঙ্কের প্রতিযোগিতার প্রশ্নও জড়িত আছে। প্রত্যেক ব্যাঙ্কই মনে করেন যে, উপযুক্ত দাদন না পাইলে খাতকগণ অপর ব্যাঙ্কের সহিত কাজকারবার করিবেন। ফলে দাদন হ্রাসকারী ব্যাঙ্কের লাভের অঙ্ক কমিয়া গিয়া অপর ব্যাঙ্কের মুনাফার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে পারে। এই প্রকার ভীতিটুকুও দাদন হ্রাস

তোডরমল

করিবার পক্ষে দুর্লঙ্ঘ্য বাধার সৃষ্টি করিতে পারে এবং কার্যক্ষেত্রে তাহা করিয়াছেও। ফলে দেখা গেল যে, অনেক ব্যাঙ্ক তাহাদের সরকারী ঋণপত্র বিক্রী করিয়াও অর্থসংস্থান করিয়াছে এবং তদ্দ্বারা দাদন বৃদ্ধি অটুট রাখিয়াছে। কাজেই ব্যাঙ্ক রেট্ বাড়াইয়াও দাদন বৃদ্ধি হ্রাস করা সম্ভব হইল না। এই অবস্থায় ব্যাঙ্কের তরফ হইতেই প্রস্তাব করা হইল যে, সত্যই—দাদন সংকোচন যদি সরকারের অভিপ্রেত হয় তবে এই মর্মে তাহাদিগকে অনুরোধ করা হউক যে, তাহারা যেন তাহাদের খাতকদের আর ধার না করিবার পরামর্শ দেয়, কারণ জাতীয় স্বার্থরক্ষার জন্য এইরূপ দাদন সংকোচনের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। ট্রেজারীও এই প্রস্তাব অনুসারে ব্যাঙ্কের মক্কেলগণের ধার কমান ব্যাপারে অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছেন। এই ব্যবস্থানুসারে আশা করা যায় যে, ব্যাঙ্কের দাদন প্রায় ২০০ মিলিয়ন পাউণ্ডের মত হ্রাস পাইতে পারে।

এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে, সাধারণ নির্বাচনের অব্যবহিত পূর্বে রক্ষণশীল দলীয় সরকার করভার লাঘব করিয়া জনসাধারণের ব্যয় বৃদ্ধির রাস্তা প্রশস্ত করিয়া দিয়াছিলেন বলিয়া মুদ্রাস্ফীতির প্লাবন এত উত্তাল হইয়া উঠিয়াছে। অনেকে মনে করেন যে, এরূপ অবস্থায় কর কমানো ব্যাপারটায় রক্ষণশীলদলের নির্বাচনকালে গণচিত্ত অধিকার করার একটা ফন্দি ছিল। ফলও হইয়াছে তাহাই। কারণ রক্ষণশীল দলই বিগত নির্বাচনে জয়লাভ করিয়া শাসনতন্ত্র হাতে পাইয়াছে। কর কমানোর ফলে অধিক অর্থ জনসাধারণের হাতে রহিয়া গেল এবং তাহারা মনের আনন্দে নানাপ্রকার দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করিয়া খরচের মাত্রা বাড়াইয়াই চলিল। গৃহনির্মাণ, কিস্তিবন্দোবস্তে জিনিস কেনা প্রভৃতি সম্পর্কে যে সকল বাধানিষেধ ছিল তাহা সরকার কর্তৃক শিথিল করা হইল। ফলে গৃহনির্মাণ কার্যে বিপুল অর্থ নিয়োজিত হইল এবং কিস্তিবন্দিতে রেডিও, টেলিভিশন সেট্, রেফ্রিজারেটার, মোটর গাড়ি প্রভৃতি কিনিবার হিড়িক পড়িয়া গেল। বহুদিন পর রুদ্ধ আগল ভাঙ্গিয়া জিনিস কিনিবার নেশা জনসাধারণকে পাইয়া বসিল। অতিরিক্ত চাহিদার ফলে পণ্যদ্রব্যের মূল্যও ঊর্ধ্বগামী হইল। মুদ্রাস্ফীতির কালো মেঘ সমস্ত দেশকে আবার আচ্ছন্ন করিল। সঙ্গে সঙ্গে "খরচ কমাও", "অনাবশ্যক ব্যয় সংকোচন কর" এই রব চতুর্দিকে উঠিল। কিন্তু রব উঠিবার ফলে ভবিষ্যৎ ব্যয় সংকোচন হইতে পারে কিন্তু ইতিমধ্যে যে অর্থ নিয়োজিত ও ব্যয়িত হইয়াছে তাহার প্রতিক্রিয়া দেখা দিবেই। কাজেই ব্যাঙ্ক রেট্ বাড়াইয়াও এই প্লাবন রোধ করা সম্ভব হয় নাই। কিস্তিবন্দিতে যে শতকরা ১৫ ভাগ জমা দিয়া জিনিস কিনিবার ব্যবস্থা ছিল সেই জমার ভাগ দ্বিগুণিত করা হইল। এইভাবে মুদ্রাস্ফীতির ছিদ্রপথগুলি বন্ধ করিবার চেষ্টা করা হইল। কিন্তু গৃহনির্মাণ কার্যে যাহারা একবার অর্থ নিয়োগ করিয়াছেন

তাঁহারা ত আর ঐ নির্মাণকার্য সমাধা না হওয়া পর্যন্ত নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারেন না। তাঁহারা হয়তো ব্যাঙ্কের সাথে ব্যবস্থা করিয়া নির্মাণকার্যের জন্য টাকা ধার করিয়াছেন এবং ব্যাঙ্কের স্বার্থের দিক হইতেও তাঁহাদের শেষ রক্ষা করিতে হইবে। কাজেই খরচ কমাইবার ইচ্ছা থাকিলেও এইসব কার্যে তাহা করা সম্ভব হয় নাই। এইসব অসম্পূর্ণ কাজ সম্পন্ন হইলে অবশ্য ব্যয় সঙ্কোচের একটি প্রধান বাধা অপসৃত হইবে। মুদ্রাস্ফীতির মারাত্মক রূপের জন্য ব্রিটিশ সরকারের উপরোক্ত অবিমৃষ্যকারিতাকেই অনেকে মূল কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

সে যাহাই হউক, হঠাৎ খরচ করিবার সুবিধা পাওয়াতে জনসাধারণের চাহিদা জোগানের চাইতে ২৪০ মিলিয়ন পাউণ্ডের মত বৃদ্ধি পায় এবং বর্ধিত চাহিদা মিটাইবার জন্য রপ্তানির পরিমাণ সঙ্কুচিত করিয়া আমদানির পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হয়। এতদিন অভ্যন্তরীণ চাহিদা না মিটাইয়া নিজস্ব মজুত তহবিল ও বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার জন্য বৃটেনকে রপ্তানির উপর বেশী নির্ভরশীল থাকিতে হয়। কিন্তু শ্রমিকদের অত্যধিক বেতন বৃদ্ধির জন্য ঐ দেশে পণ্যের উৎপাদন খরচাও বাড়িয়া যায় এবং সেই সঙ্গে বহির্বাণিজ্যের প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে ব্রিটিশ মালের চাহিদা অপরাপর দেশ হইতেও হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। এই কয় বৎসরে ব্রিটেনে ৫৪% বেতন বৃদ্ধি ঘটিয়াছে এবং সেই অনুপাতে পণ্যোৎপাদন মাত্র ২০% বাড়িয়াছে; ট্রেজারীর হিসাব অনুসারে প্রতি পণ্যের উৎপাদন খরচা ২৭% বৃদ্ধি পাইয়াছে। পণ্যোৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পাওয়াতে ব্রিটিশ মাল অপরাপর দেশোৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রীর সাথে প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করিতে পারিতেছে না। ফলে বিদেশে ব্রিটিশ মালের চাহিদা হ্রাস পাওয়ায় বহির্বাণিজ্যে রপ্তানির পরিমাণও কমিয়া গিয়াছে। ১৯৫৪ সালে প্রথম ছয় মাসে বহির্বাণিজ্যে যে ৯৬০ মিলিয়ন পাউণ্ড উদ্বৃত্ত ছিল তাহা অন্তর্হিত হইয়া ১৯৫৫ সালের প্রথম ছয় মাসে [illegible] পর্যবসিত হইয়াছে। [illegible]

অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটাইবার জন্য ১২০ মিলিয়ন পাউণ্ড পরিমিত দ্রব্যসামগ্রী রপ্তানি না করিয়া নিজ দেশেই ছাড়া হইয়াছে। ১৯৫৪ সালের বাজার দর হিসাবে বর্তমান বর্ষে ব্যক্তিগত ব্যয় ২৮০ মিলিয়ন পাউণ্ড বৃদ্ধি পাইয়াছে, স্থায়ী মূলধন বাবদ অর্থ বিনিয়োগ ১৩০ মিলিয়ন পাউণ্ড বাড়িয়াছে এবং মাল মজুত করিবার জন্য আনুমানিক ১৮০ মিলিয়ন পাউণ্ডের অধিক ব্যয়িত হইয়াছে। মুদ্রাস্ফীতির বীজাণু ছড়াইবার দুইটি কারণ দায়ী—এক রপ্তানি না করিয়া অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটাইবার তাগিদে ঐসব পণ্য স্বদেশে ছাড়া। আর এক জনসাধারণের আর্থিক উপার্জন বৃদ্ধি যাহার সাথে পণ্যোৎপাদন সমতালে ঘটিতেছে না। বরং উৎপাদন খরচা বাড়িয়াই চলিয়াছে। এই দুইটি লক্ষণ বিদূরিত না হইলে মুদ্রাস্ফীতির বীজাণুকে সহজে নাশ করা সম্ভব হইবে না। আশার কথা, বর্তমান বর্ষের প্রথম ছয় মাসে সরকারী ব্যয় আনুমানিক ১২০ মিলিয়ন পাউণ্ডের মত কমিয়াছে। এই ব্যয় সঙ্কোচন পণ্যমূল্যের উচ্চমুখী গতিকে কিছুটা বাধা দিবে।

আবার বৃটেনে কয়লা উৎপাদন অত্যধিক হ্রাসপ্রাপ্ত হওয়ায় আরেকটি অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে। ১৯৫৪ সালে কয়লা উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৭৬৫,২০০ টন। সেই অনুপাতে বর্তমান বর্ষের উৎপাদন এখনও তিন মিলিয়ন টনের মত কম আছে। ফলে বৃটেনকে বাহির হইতে কয়লা আমদানী করিয়া কম দামে স্বদেশে বিক্রয় করিতে হইয়াছে। এই বাবদ বৃটেনকে আনুপাতিক ৫,২০০,০০০ পাউণ্ডের মত ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছে। এতদিন তেলা মাথায় তেল দেওয়ার ব্যাপারটাকে বলা হইত "To send coal to New-castle", কিন্তু বর্তমান বর্ষে দেখা গেল যে, সত্যিই Newcastle-এও কয়লা পাঠাইবার প্রয়োজনীয়তা ছিল। এইসব নানা কারণে বৃটেনে মুদ্রাস্ফীতির উপসর্গগুলি অত্যন্ত প্রকট হইয়াছে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য [illegible] বসিতেছে। এই সম্পর্কে [illegible] যে, পরি-

সংখ্যানের হিসাব ঠিক না থাকিলে মুদ্রা-স্ফীতির বা মুদ্রাসঙ্কোচনের পরিম[illegible] নির্ণয় করা সুকঠিন। কাজেই পরি-সংখ্যান নির্ভুল না থাকিলে মুদ্রাস্ফীতি নিরোধ করিবার জন্য কোন সুচিন্তিত নীতি এবং কার্যকরী পন্থা অনুস[illegible] করা কঠিন। বৃটেনেও এই অসুবিধা বিশেষ করিয়া প্রকটিত হইয়াছে। খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ্ মিঃ রয় হ্যার[illegible] ব্যবসায়ীদের উপর দোষারোপ করিয়াছে[illegible] এই বলিয়া যে, মুদ্রাস্ফীতির উপসর্গগুলি থাকা সত্ত্বেও তাহারা অধিক মুনাফ[illegible] লোভে কারবার বাড়াইয়াই চলিয়াছে[illegible] এই অবস্থা নিয়ন্ত্রণ করিতে একদি[illegible] যেমন মুদ্রার পরিমাণ কমাইতে হই[illegible] অপরদিকে এমন পরিবেশের সৃ[illegible] করিতে হইবে যাহাতে ব্যবসায়ীরা ম[illegible] করেন যে, তাঁহাদের কারবার বাড়াইব[illegible] পথে লোকসান খাইবারও সম্ভাব[illegible] আছে। শেষের দিকে এই মনোভা[illegible] সৃষ্টি করিতে ব্রিটিশ সরকার কিছু[illegible] সক্ষম হইয়াছেন। ভবিষ্যতে আরও মুদ্রাস্ফীতি রোধমূলক ব্যবস্থা সরকা[illegible] দৃঢ়তার সহিত গ্রহণ করিতে পারেন এ[illegible] ভয়ে শেয়ার বাজারের দরও অনেকা[illegible] পড়িয়া গিয়াছে। আশা করা যায় অবিলম্বে অবস্থা হয়ত আয়ত্তে আসিতে পারে। বৃটেনে মুদ্রাস্ফীতির অভিজ্ঞতা হইতে ভারতের অনেক কিছু জানিবার ও শিখিবার আছে। আগামী দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার যে কাঠামো প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে ১০০০ কোটি টাকার মত deficit finance-এর প্রয়োজন হইবে। এই deficit finance-এর প্রতিক্রিয়াতে হয়তো ভারতেও মুদ্রাস্ফীতির আবির্ভাব ঘটিতে পারে এইরূপ আশঙ্কা অনেকে করেন। বৃটেনের সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা হইতে ভারত জানিতে পারিবে মুদ্রাস্ফীতি রোধের পথে কি কি বাধা রহিয়াছে এবং কিভাবে তাহা দূর করা যায়। এই অভিজ্ঞতার বর্মে আবৃত থাকিলে মুদ্রা-স্ফীতির আক্রমণ হইতে নিজেকে রক্ষা করা আর অসাধ্য ব্যাপার বলিয়া মনে হইবে না। কাজেই অর্থনীতির ছাত্রমাত্রই বৃটেনের কার্যাবলী অনুসন্ধিৎসার সহিত পর্যবেক্ষণ করিতেছেন।

বৃটেনের কোন বৈজ্ঞানিক নাকি এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, কৃত্রিম জীবন সৃষ্টির দিন আগতপ্রায়। "কৃত্রিম মৃত্যুর যুগে এমনিধারা জীবন-সৃষ্টি হয়ত কালেরই ইঙ্গিত"—সংক্ষেপে মন্তব্য করিলেন বিশু খুড়ো।

* * *

সিডনীর কোন এক বৈজ্ঞানিক নাকি আবিষ্কার করিয়াছেন যে, নরমাংস একটি পরম সুস্বাদু খাদ্য। শ্যামলাল

বলিল—"পৃথিবীর চারিদিকের কামড়া-কামড়ি দেখে অ-বৈজ্ঞানিক হয়েও আমরা এই রকম একটা অনুমান করেছিলাম।"

* * *

অন্য একটি বৈজ্ঞানিক-আবিষ্কারে জানা গেল যে, এখন হইতে বিবাহ ঠিক করার ব্যাপারে ঘটকের আর প্রয়োজন হইবে না; আবিষ্কৃত একটি বৈজ্ঞানিক যন্ত্রে মস্তিষ্কের বিদ্যুৎ তরঙ্গ মাপিয়া রাজযোটক প্রভৃতি বিবাহের শুভাশুভের কথা বলা সম্ভব হইবে। —"বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের সাহায্যে বিয়েটাই শুধু নির্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হবে, কিন্তু শুনলাম (সংবাদটি অবশ্য অসমর্থিত), বিয়ের পরের তালাক, ডিভোর্স, ছাড়াছাড়ির ব্যাপারে যন্ত্রটি নাকি একেবারেই অচল"—মন্তব্য করিলেন জনৈক সহযাত্রী।

* * *

শ্রীযুক্ত নেহরু মন্তব্য করিয়াছেন যে, জাতীয় উন্নয়ন কার্যে কংগ্রেস-কর্মীরা হাতেনাতে শিক্ষালাভ করিলে ভবিষ্যতে তাঁহাদের মধ্য হইতেই মন্ত্রী নির্বাচন করা সম্ভব হইবে। শ্যামলাল বলিল—"কিন্তু আমরা শুনেছি, অনেকে মন্ত্রিত্বের জন্যে হাতেনাতে কাজ করাকে নেহাৎ অবান্তর বলেই মনে করেন"!!

* * *

পশ্চিমবঙ্গের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের জন্য সরকার "ইস্টক" নির্মাণ শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন বলিয়া একটি সংবাদ পাঠ করিলাম। —"বেকারদের কর্ম-সংস্থান হলে আমরা খুবই খুশি হব। তবু অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে নিবেদন করব—ইস্টক নির্মাণের কাজটা আই এফ এ শীল্ড খেলার পরে শুরু করলেই ভালো হয়"—বলেন বিশু খুড়ো।

* * *

কোপেনহেগেনের এক সংবাদে প্রকাশ, সেখানে কোন্ পাখী কত বেগে উড়িতে পারে, সে সম্বন্ধে গবেষণা চলিতেছে। —"ফলাফল জেনে, জন-সাধারণ খুব উপকৃত হবেন বলে মনে হয় না। তার চেয়ে মানুষের মধ্যে কোন্ পুরুষ বা নারী কত 'fast', সে সম্বন্ধে

গবেষণা হলে অনেক দুর্ঘটনার হাত থেকে বাঁচা হয়ত সম্ভব হতো; —slow horse এবং fast woman অনেকে back করেন অজ্ঞতা থেকেই"—বলিলেন বিশু খুড়ো।

* * *

গাড়োয়াল জেলার ত্রিশূল পর্বতের নিকট "রূপ কুণ্ড" নামক একটি হ্রদের ধারে নাকি তিন শতাধিক মৃতদেহ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সব হতভাগ্যদের কী পরিচয়, তাহারা কোথা হইতে কবে কী কারণে এখানে আসিয়াছিল, কী অবস্থায় তাদের মৃত্যু হইয়াছে, তা কেউ জানে না। —"মৃত্যুর মতো শোকাবহ ঘটনা হাসি-তামাসার আওতায় আসে না। তবু আমরা বলি, ত্রিশূল পর্বতের বাইরের অনেক 'রূপকুণ্ডের' ধারে যারা মৃত্যু বরণ করেছে এবং করছে, তাদের সংখ্যা গণনায় ধরা যায় না"!!

* * *

ছায়াচিত্রে চুম্বনের দৃশ্য সম্বন্ধে পাক সরকার একটি ফরমান জারী করিয়াছেন, তাহাতে বলা হইয়াছে যে,

চুম্বনের স্থিতিকাল পনেরো সেকেণ্ডই যথেষ্ট। ভিড়ের মধ্য হইতে কে বলিয়া উঠিলেন—"সম্রাট মহানুভব"।

* * *

এডেন হইতে আমরা একটি 'পারি-বারিক মন্ত্রিসভার' সংবাদ পাইলাম। সেখানকার এক রাজা নিজে হইয়াছেন প্রধান মন্ত্রী, ছেলে উপ-প্রধান মন্ত্রী এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রী, দুই ভাই-এর মধ্যে একজন শিক্ষা এবং অন্য জন যোগাযোগ মন্ত্রী। —"রাজমহিষীকে কোন পোর্টফোলিও দেওয়া হল না বলে আমরা দুঃখিত হয়েছি। আমরা নিজেরা রাজা না হলেও মহিষীকে সচিবের পদে অনেক আগেই প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছি—মন্ত্রণা অবশ্য গ্রহণ করিনে, কেননা, সেক্ষেত্রে 'প্রলয়ঙ্করী বুদ্ধি' সম্বন্ধে আমরা খুবই সচেতন"!

পুস্তক পরিচয়

ছোট গল্প

বিস্ফোরণঃ তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশকঃ বেংগল পাবলিশার্স। কলিকাতা—১২। দাম—দু টাকা।

উত্তর-রবীন্দ্র বাঙলা সাহিত্যে যে কয়েকটি নাম শ্রদ্ধার সংগে স্মরণীয়, তাদের মধ্যে তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় নিঃসন্দেহে পুরোগণ্য। কল্লোল ও কল্লোলোত্তর কালে প্রচলিত ধারার বাইরে এসে নতুন মনন ও নতুন চরিত্রমালার সংবাদ যাঁরা এনেছিলেন, তারাশংকর অনেক কারণেই তাঁদের চেয়ে পৃথক। convention বা বরাবাধা রীতিকে চুরমার করার প্রেরণায় অনেক কথাকার 'শৌখীন মজদুরী' করেছেন। ভাষার হঠাৎ ঝলকানিতে, বক্তব্যের তাড়িৎ চমকে এই শতাব্দীর তৃতীয় দশক বিহ্বল। এই সন্ধিকালটি সাহিত্যের নানা বিবর্তনে, নানা ঘটনার জটিলায় জটিল। তারাশংকরের আবির্ভাব হঠাৎ আলোর-ঝলকানিতে নয়, সূর্যের আলোর মত ধীর-স্থির এবং স্বাভাবিক সঞ্চরণে বাঙলা সাহিত্যে তাঁর উজ্জ্বল উপস্থিতি। প্রথম থেকেই তিনি রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদধন্য। আশীর্বাদধন্য এই কারণে, যেহেতু তাঁর সাহিত্যে শৌখীন মজদুরীর চেয়ে সত্য মূল্যের সমৃদ্ধি অনেক পরিমাণে বেশী। তাঁর রচনায় আপাত চমকের চেয়ে মমতাময় গভীরতা (depth), বহিরংগের প্রসাধনের চেয়ে অন্তরংগের অতল-প্রদেশের হৃদয় নামক অংশটির উত্তাপ অনেক বেশী।

তারাশংকরের সাম্প্রতিক গল্পগ্রন্থ 'বিস্ফোরণ'। 'বিস্ফোরণ' মোট সাতটি গল্পের সংকলন। 'একটি মুহূর্ত', 'জটায়ু', 'বিস্ফোরণ', 'কালো মেয়ে', 'বিল্টু চক্রবর্তীর কাহিনী', 'গবিন সিংয়ের ঘোড়া' ও 'আফজল খেলোয়াড়ী ও রমজান শের আলি'। অন্যতম গল্প 'বিস্ফোরণে'র নামানুসারে গ্রন্থটির নামকরণ করা হয়েছে।

তারাশংকরের ছোট গল্পের মেজাজ একটু স্বতন্ত্র ধাতের। ছোট গল্পকে মুহূর্তের মিনার যে সূত্র থেকে বলা হয়, তাঁর গল্পে সেই সূত্র প্রয়োগ করা চলে না। তাঁর গল্পগুলি সামান্য মন্থর। ধীরে ধীরে একটি বক্তব্যের বস্তুকে পূর্ণ করে দেয়। তাই তাঁর ছোট গল্পগুলি আয়তনে দীর্ঘ। 'বিস্ফোরণে'র গল্পগুলি এই লক্ষণযুক্ত। 'বিস্ফোরণের' প্রতিটি গল্পে তারাশংকর নানাদিক থেকে নানা মানুষের কাহিনী তুলে ধরেছেন। 'একটি মুহূর্তের' বিমল পাঠকমনে নতুন রেখায় খোদিত থাকবে। নতুন উপলব্ধিতে তার জীবনে এক অমৃতের শিক্ষা। 'জটায়ু' গল্পের জটে পাগলা মহাকাব্যের কল্পচরিত্র নয়। সমাজ জীবনে সেই পবিত্র পক্ষীবীর এক অপরূপ প্রেরণায় জটে পাগলাকে মহনীয় করে দিয়েছে। 'কালো মেয়ে' সুমতির ট্র্যাজেডি পরিশেষে আশাবাদের আশ্বাসে উজ্জ্বল। 'বিল্টু চক্রবর্তীর কাহিনী' নির্বোধ বুলীর সততায় পুণ্যময়। 'গবিন সিংয়ের ঘোড়া' ও আফজল খেলোয়াড়ী ও রমজান শের আলি গল্প দুটিতে দুটি পশু চরিত্রকে অপূর্ব মমতায় মানবিক করে তুলেছেন লেখক। প্রতিটি গল্প সুস্বাদু। গ্রন্থখানির অংগসজ্জা মনোরম। (৩৩৭।৫৫)

কাদামাটির দুর্গ (দ্বিতীয় সংস্করণ)—শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল। বেংগল পাবলিশার্স, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম সাড়ে তিন টাকা।

তিনটি গল্পের সমষ্টি। সাধারণ অভিজ্ঞতার বহির্ভূত বৈচিত্র্যমণ্ডিত ঘটনা ও পরিবেশ রচনা করতে প্রবোধকুমার সান্যাল বিশিষ্ট। এ বইয়ের তিনটি গল্পেই তার দৃষ্টান্ত আছে। বইটি পড়বার সময়ে এমন কয়েকটি চরিত্র পাঠকের মনকে বিস্মিত করবে যারা প্রথম থেকেই অপরিচয়ের পরিবেষ্টনী নিয়ে এসেছে। কিন্তু প্রথমাবধি 'Suspense'এর উপর বেশি জোর দেওয়ার ফলে 'কাদা মাটির দুর্গ' এবং 'জয়ন্ত' দুটি গল্পের গতিই শেষ পর্যন্ত ক্ষুন্ন হয়েছে। বিশেষত শেষোক্ত গল্পের অবয়ব যদি হ্রস্বতর হতো তবেই বোধহয় তার আকর্ষণ অব্যাহত থাকতো।

তবুও সংলাপ ও বর্ণনার বৈশিষ্ট্যে এই বই তাঁর সম্পর্কে পাঠকের সশ্রদ্ধ প্রশংসার উদ্রেক করবে। ৩৪৬।৫৫

রম্য রচনা

নিরীক্ষা—ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত। প্রকাশক—মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২। দাম—৪৲ টাকা।

সবাই মুজতবা নন, কিন্তু সকলেরই মুজতবা হবার ইচ্ছে। ইচ্ছেটা যে রসরুচি থেকে জন্মায় তা নয়, তার মূল উৎস অন্যত্র। যেহেতু জীবন বিষয়ে গভীর ক'রে ভাববার স্থৈর্য নেই, কিংবা এমন কি ক্ষমতাই নেই ভাবনার, অথচ রচনা বিলাস পুরোপুরি বর্তমান—অতএব মুজতবা পন্থী হতে মনোযোগ। সাহিত্যের ইতিহাসে একে খুব সুখকর ইঙ্গিত বলা যায় না।

নিরীক্ষা গ্রন্থটি এই সাধারণ নিয়মের উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। এখানে বলবার ভঙ্গিটি হাল্কা, রচনায় যথেষ্ট আন্তরিকতার স্বাধীনতা নেওয়া হয়েছে। কিন্তু সেই সঙ্গে এও স্পষ্ট যে বলবার বস্তুটি গুরুতর এবং স্বাধীনতাকে যথেচ্ছাচারে পরিণত করা হয়নি।

জীবনের চতুস্পার্শ্বকে চোখ মেলে দেখবার অভিজ্ঞতা থেকেই ব্যক্তিগত প্রবন্ধ রচনার উপাদান সংগৃহীত হয়। যিনি সার্থক রচয়িতা, তাঁর এই দেখার পেছনে একটি বিশেষ জীবন দর্শন ঐক্যসূত্ররূপে বিরাজিত। মনে রাখা উচিত যে দেখবার সেই বিশেষ ভঙ্গিটি বর্জিত হলেই রচনার ভারসাম্যে অপঘাত আসে। সৌভাগ্যক্রমে নিরীক্ষায় এই অপঘাত লাগেনি—তা যথার্থই নিরীক্ষণ। 'নিরীক্ষা কথাটার মধ্যে যে একটা বিশেষভাবে দেখার অভিধা আছে তাহাই এখানকার সব লেখাগুলির সাধারণ ধর্ম'।—ভূমিকার এই প্রতিশ্রুতি লেখক পালন করেছেন। এবং সেই জন্যে রচনা কেবলমাত্র সুখপাঠ্য হয়নি, গভীরতর চিন্তারও প্রেরণা জুগিয়েছে।

বলা বাহুল্য (কেননা ব্যক্তিগত প্রবন্ধেরই এই ধর্ম) বিষয়বস্তু এখানে বিচিত্র। 'চোখ মেলিয়া আশে পাশে তাকাইয়া দেখা—ধর্ম রাজনীতি সমাজ শিক্ষা সংস্কৃতি দেশ গাঁ লোকজন—যাহা চোখে পড়ে'। তবে বিষয়গুলির আলোচনায় যে বিভিন্ন মেজাজ লক্ষিত হবে তাকে মূলত দুটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা সম্ভব। একদিকে 'অমাতঃ কুলি জিজ্ঞাসা' 'প্রহারপ্রকরণম' 'পদধ্বনি' 'আমি' 'খুড়োতত্ত্ব' ইত্যাদি রচনা। এগুলিকেই যথার্থ ব্যক্তিগত প্রবন্ধের পর্যায়ভুক্ত করা চলবে, কেননা এগুলি আবহপ্রধান রচনা। কিন্তু আরও কতকগুলি রচনা আছে যার বলবার ভঙ্গি এবং বিষয় দুই-ই গুরুতর। যেমন 'সাম্প্রতিক বিপর্যয়ের সত্যরূপ' 'বিপর্যস্ত হিন্দুর সত্যকার সমস্যা কি' 'অর্থ ব্যবস্থা ও মনোব্যবস্থা' ইত্যাদি ইত্যাদি। এগুলিকে গুরুতর মননশীল প্রবন্ধ বলা ছাড়া গতি নেই।

কিন্তু এই গ্রন্থের প্রচ্ছদে 'ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত' অভিধা-ব্যবহার কি সংগত হয়েছে? এখানে তিনি পণ্ডিত অধ্যাপক নন, এখানে তিনি সাহিত্যসেবী। অধ্যাপক জীবনের আড়াল-আবডাল থেকে যে কতিপয় মনীষী মাঝে মাঝে উন্মুক্ত সাহিত্য প্রাঙ্গণে উঁকি দেন, শশিভূষণ তাঁদের অন্যতম। স্বাধীনভাবে সাহিত্য রচনার এই অবকাশ যদি তিনি বাড়িয়ে তুলতে পারেন তো সেটা মঙ্গলপ্রদ হবে।

২৮৩।৫৫

উপন্যাস

জননী ঃ গুণময় মান্না। প্রকাশক ঃ বেঙ্গল পাবলিশার্স। কলিকাতা ঃ ১২। দাম ঃ দু টাকা।

আধুনিকতম বাঙলা সাহিত্যে গুণময় মান্না অন্যতম নবাগত কথাকার। প্রধানত আঞ্চলিক জীবনের সংবাদ তিনি দিয়েছেন। তাঁর সাহিত্যের ভূগোল মেদিনীপুর, রূপনারায়ণ-দামোদর ও ভাগিরথী তীরলগ্ন ভূখণ্ডে বিস্তৃত হয়ে রয়েছে। এই বিশাল অঞ্চলের হৃৎস্পন্দন বহুদিনকাল সাহিত্যে অনুপস্থিত ছিল। গুণময় মান্নার পূর্বোক্ত দু একজন কথাকার এই অঞ্চলের কাহিনী কিছু কিছু শুনিয়েছেন। বর্তমানকাল [illegible]

গুণময় মান্নার প্রথম দু'টি উপন্যাস 'লখীন্দর দিগর' ও 'কটা ভানারি'তে যে সম্ভাবনা ছিল, 'জননী' তার আশানুরূপ বিকাশ নয়।

ধানের চোরাচালান ও সরকারী প্রতিরোধে ঘাটাল-রাণীচক-গোপীগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলে যে ভয়াল পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল, সেই বিষপঙ্কে ডুব দিল সদ্যবিধবা মুকুল। তার গর্ভে অবৈধ সন্তানের দেহে এ যুগ তার অভিশাপের জন্ম দিল। 'জননী' তারই বেদনা-বিধুর কাহিনী। বিষয়বস্তুর জন্য আমাদের সন্দেহাতীত সহানুভূতি। কিন্তু সেই বিষয়বস্তুকে রূপ দিতে নিপুণ ভাবার প্রয়োজন। ঘটনাগ্রন্থন আরো নিবিড়-লগ্ন হওয়া বাঞ্ছনীয়। আরো প্রসাদগুণ উপস্থিত থাকা উচিত। গ্রন্থখানির প্রচ্ছদপট সুশোভন। ৩৪০।৫৫

ধর্মগ্রন্থ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাঃ—শ্রীগোকুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত। শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭।৩বি, হরি ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

নড়াইল কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ শ্রীগোকুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রবীণ শিক্ষাব্রতীদের অন্যতম। তাঁহার সম্পাদিত গীতার আলোচ্য সংস্করণ পাঠ করিয়া আমরা বিশেষভাবে উপকৃত হইয়াছি। এই সংস্করণে মূল শ্লোক, তাহার অন্বয় এবং শ্লোকের পদ্যানুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। অনুবাদের পাশে প্রতি শ্লোক-তাৎপর্য সুন্দরভাবে বিন্যস্ত হইয়াছে। অনুবাদ সহজ, সরল এবং মূলানুগ, তাৎপর্যস্বরূপ টিকা সম্পাদকের সুগভীর মনস্বিতার পরিচায়ক। আমরা এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

প্রাপ্তি স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থ আসিয়াছে।

বাংলার সাহিত্যের কথা—১ম খণ্ড ডক্টর মুহম্মদ শাহীদুল্লাহ্।

প্রতীক্ষা—শ্রীসমীরণ রুদ্র।

বাংলার কবি মনীষা—১ম খণ্ড—শ্রীমনোরঞ্জন জানা।

বর্ষপঞ্জী—১৩৬২—শ্রীসন্তোষরঞ্জন সেনগুপ্ত।

তাওহিদ্—মহম্মদ আব্দুর রব।

সংগীত পরিক্রমা—নারায়ণ চৌধুরী।

মুক্তির নূতন পথ—শ্রীআশুতোষ সেনগোপ্তা।

মুস্কিল-আসান—নারায়ণ সান্যাল।

গীতামৃত—শ্রীকুঞ্জবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়।

জেলা গর্দানের—মার্কসিম গর্কি, অনু—সত্য গুপ্ত।

মনকেতকী—শ্রীমতী ছবি মুখোপাধ্যায়।

স্তব্ধ গোধূলি—শ্রীনীরেন বসু।

গৌরীমা—শ্রীদুর্গাপুরী দেবী।

স্মিতা—অরুণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

উল্কা—নীহাররঞ্জন গুপ্ত।

সোমলতা—শ্রীসরোজকুমার রায় চৌধুরী।

পরমরমণীয়—সাগরময় ঘোষ সম্পাদিত।

উত্তরাশা—গী দ্য মোপাসাঁ অনুবাদক প্রফুল্লকুমার বসু।

দূরদীপশ...নিশিকান্ত।

সাবিত্রী—(সপ্তম পর্ব তৃতীয় সর্গ)—শ্রীঅরবিন্দ।

গরু মেরে জুতো দান

মার অর্থে নিধন এবং জুতোটিও তারই চামড়ার, এই উপমা প্রয়োগ করতে পারলে আজ প্রডাকসন্সের "দস্যু মোহন"-কে তবেই বিশ্লেষণ করা যায়। মোহনের পরিচয় দিতে যুক্তি নেওয়া হয়েছে রবিনহুডের; কাজে সে সব্যসাচী—দুষ্কৃতের দমন করে দরিদ্র ও অত্যাচারিতদের রক্ষাই তার ধর্ম কর্ম। আইনের চোখে সে খুনে ডাকাত, জনমানবের চোখে সে এক অতি দেশভক্ত বীর। কাহিনীর ঘটনাকাল ধরা হয়েছে ইংরেজ আমল, কাজেই এক বাঙালী সন্তান বিদেশীর আইনকে ফাঁকি দিয়ে শাসকদের নাস্তানাবুদ করে চলেছে এহেন ব্যক্তিকে এক পরম বীর বলে গণ্য করে নিতে কার আর আপত্তি থাকে! মোহনকে যাতে ডাকাত বলে মনে করা না যায় সেজন্য ওর পিছনে দাঁড় করানো হয়েছে এক সন্ন্যাসীকে, দেশোদ্ধারে ব্রতী সঙ্ঘের দলপতি। অর্থাৎ যা কিছু মোহন করছে তার কোনটাই দুষ্কার্য নয়, বরং শক্তিমান বিত্তবান পুরুষের আদর্শ বলতে মোহনই একজন। এইভাবে মোহনকে দেখিয়ে, ওর কীর্তিকলাপের ওপর লোকের শ্রদ্ধা ও আকর্ষণ ধরিয়ে শেষে আইন বাঁচাবার জন্য ওকে পুলিসের হাতে আত্মসমর্পণ করিয়ে দেওয়া হলো এই বলে যে, সে যে পথ ধরে 'দেশের সেবা' করে এসেছে সেটা ঠিক পথ নয়। আসলে মোহন 'হিরো'-ই হয়ে রইলো এবং আইন ওকে ধরায় আইনের ওপরেই লোকের শ্রদ্ধা নষ্ট হলো। এখানেও বেশ চাতুরির পরিচয় দিয়েছেন চিত্রনির্মাতা—আইনটাকে তিনি বৃটিশ অর্থাৎ বিদেশী শাসন আমলের আইন দেখিয়ে দিয়েছেন, যাতে এখন আর তা নিয়ে কোন প্রশ্ন না ওঠে।

—শৌভিক—

* * *

এই ধরনের উপাদান নির্বাচনে চিত্রনির্মাতার লক্ষ্য দেখা যায় মাত্র একটি দিকেই। সেটা হচ্ছে লোকের পকেটের ওপরে। পকেট থেকে পয়সা বের করে আনতে যা কিছু করা দরকার, তা-ই তারা করে গিয়েছেন। শশধর দত্ত সৃষ্ট মোহন সিরিজের পাঠক বড়ো কম নয়। প্রদীপকুমার বম্বেতে গিয়ে খুবই নাম করেছেন। তার সঙ্গে সুমিত্রা। আরও সম্মিলিত করা হয়েছে এখানকার নামকরাদের মধ্যে—ছবি বিশ্বাস, বিকাশ রায়, নীতিশ মুখোপাধ্যায়, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়, সুপ্রভা মুখোপাধ্যায়, রেণুকা রায়, তপতী ঘোষ, এবং ওদের সঙ্গে জহর রায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়, জীবেন বসু, হরিধন মুখোপাধ্যায়—এরাই তো এক মহা-আকর্ষণ। তার ওপর ছবির কতকাংশ তোলা হয়েছে বিদেশে রেঙ্গুনে গিয়ে, যা কোন বাঙলা ছবিতে হয় নি। আরও আকর্ষণ গেভাকলারে রাঙানো একটি দৃশ্য। নানাভাবে ছবিখানির আড়ম্বরের দিকটা বড়ো করে একটা চুম্বক সৃষ্টি করে সেটার মুখটা দর্শকসাধারণের পকেটের দিকে ফিরিয়ে ধরা হয়েছে; সেই চুম্বকের টানে পকেটের পয়সা যাতে চলে আসে। বলতে আপত্তি নেই যে, একাজে প্রযোজক দস্তুরমতো সাফল্য অর্জন করতে পেরেছেন। ছবিখানি দেখতে যে ভিড় প্রথম সপ্তাহে দেখা গেল, অনেককাল এমন দেখা যায় নি এবং দস্যুকে দেখার জন্য টিকিট কিনতে দস্যিপনাও বড়ো কম হয় নি প্রথম ক'দিনে। পয়সার দিকেই ছবিখানির লক্ষ্য এবং সে লক্ষ্যে পৌঁছতেও অপরাগ হবে না। দর্শকের হৃদয়ে পৌঁছবার লক্ষ্য ছিল না এবং বলা বাহুল্য ছবিখানি সেদিক থেকে কোন পারদর্শিতা প্রকাশও করে না।
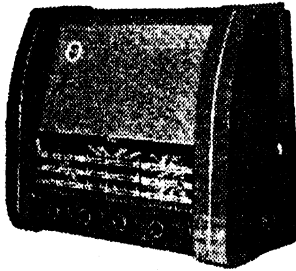
* * *

ছবিতে দস্যু মোহনের প্রথম কীর্তি
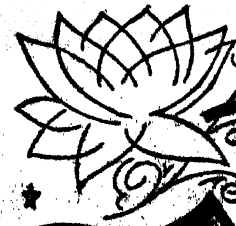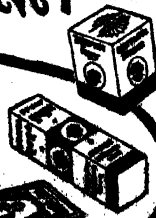
আড্ডায় নিয়ে এসে তাকে দিয়ে পঞ্চাশ হাজার টাকার এক চেক লিখিয়ে নেওয়া। আড্ডার বাসিন্দা জটাজুটধারী একদল সন্ন্যাসী। ব্যবসায়ীর সংগে কিন্তু তারা ব্যবহার করলে চমৎকার। চেক ভাঙানো হলো এবং সে টাকাটা এক অজ্ঞাতনামার নামে যক্ষ্মা সাহায্য তহবিলে দান করে দেওয়া হলো। ব্যবসায়ী লোকটি পুলিসে এসে ডায়েরী লেখালে, তার অপহরণকারীর নাম মোহন। পুলিসের কর্তা ইন্সপেক্টর সান্যালকে বকাবকি করলেন—দিনের পর দিন মোহন নামক দুর্ধর্ষ ব্যক্তিটি পুলিসের চোখে ধুলো দিয়ে একটার পর একটা ডাকাতি করে চলেছে, অথচ তাকে ধরা তো দূরের কথা কেউ তার পরিচয়ের কোন নিদর্শন পর্যন্ত ধরতে পারছে না। মোহনের খোঁজ সম্পর্কে যখন পুলিসের বড়কর্তা সহকারীদের নির্দেশ দিতে ব্যস্ত, তখন তাঁরই বাড়িতে তাঁরই স্ত্রীর কাছে চিত্রকর পরিচয় দিয়ে আলাপে রত স্বয়ং মোহন।

দেবী মালিনী চিত্রে কাবেরী বসু

বড়কর্তা বাড়ি ফিরলেন। তিনিও চিত্রকরের সংগে আলাপ করতে লাগলেন দস্যু মোহন সম্পর্কে—ওদিকে ছদ্মবেশী মোহন বড়কর্তার পকেট থেকে ঘড়িটি সরিয়ে নিজের পকেটে ফেলে বিদায় নিয়ে চলে গেল। বাইরে গিয়ে বেয়ারাকে ডেকে ঘড়িটি ফেরৎ পাঠিয়ে এক পত্রে মোহন বড়কর্তার কাছে নিজের পরিচয় জানিয়ে গেল। এর পরের ঘটনা এক দরিদ্রের ষোড়শী কন্যাকে বৃদ্ধ জমিদারের পানি-পীড়ন থেকে উদ্ধার। কাগজে আসন্ন বিয়ের খবর বের হলো। ইন্সপেক্টর সান্যাল বুঝলে এ অনাচার রোধ করতে মোহন নিশ্চয়ই সেই গ্রামে হানা দেবে। তবে পুলিসের বড়কর্তা সে গ্রামে যাবার জন্য নির্দেশ দিলেন ধুরন্ধর গোয়েন্দা রায়বাহাদুর পূর্ণ সিংহকে। মোহনের অনুচর সর্বত্র। কেউ গাঁজাখোর সেজে থাকে, কেউ বা ট্রেনে বেচে দাঁতের মাজন। পূর্ণ সিংহের যাওয়ার খবর মোহন পেলে এবং এক অভিজাত বৃদ্ধের বেশে এক কামরায় আসন করে নিলে। গন্তব্য-স্থলে ট্রেন পেঁছিতে দেখা গেল ট্রেন থেকে স্মার্ট ব্যক্তির বেশে নামলো মোহন এবং স্থানীয় পলিস অফিসারের কাছে নিজের পরিচয় দিলে পূর্ণ সিংহ বলে।

পুলিস বাহিনী সমভিব্যাহারে নকল পূর্ণ সিংহ হাজির হলো জমিদার বাড়িতে। মোহনকে ধরার জন্য সব ব্যবস্থা ঠিক। নকল পূর্ণ সিংহ জমিদারকে নিয়ে গেল তার শোবার ঘর দেখতে এবং কথায় কথায় তার আয়রন-সেফের খোঁজটা নিলে এবং জল খাবার ছুতোয় জমিদারকে ঘরের বাইরে পাঠিয়ে সেফ থেকে যে অসহায়া মেয়েটিকে জমিদার বিয়ে করতে যাচ্ছিল, তার বাবার বন্ধকী দলিলখানা সরিয়ে ফেললে। তারপর সেখান থেকে হাজির হলো মেয়েটির বাড়িতে আলাদা একখানা গাড়িতে। মেয়ের বাপের কাছে এবং পাড়ার যুবকদের কাছে নিজের পরিচয় দিয়ে মোহন একটি যুবককে উদ্বুদ্ধ করলে মেয়েটিকে বিয়ে করতে, মেয়েটিকে নিজের বোন বলে আশীর্বাদ করলে, তার হাতে দশ হাজার টাকা দিলে এবং তার বাবার হাতে ফিরিয়ে দিলে বন্ধকি দলিল, যার জোরে জমিদার তার মেয়ের সংগে বিয়েতে বাধ্য করছিল। ওদিকে ট্রেন

থেকে নকল পূর্ণ সিংহের ট্রাঙ্কটা জমিদার বাড়িতে পৌঁছতে তার ভিতর থেকে বের হলেন আসল পূর্ণ সিংহ। সবাই তখন ছুটলো নকল পূর্ণ সিংহ, অর্থাৎ মোহনকে ধরতে। মোহন তাদের চোখে ধুলো দিয়ে পালালো। এর পর মোহনকে দেখা গেল এক নাচের পার্টিতে। মোহনপুরের রাজকুমার পরিচয়ে। নাচ চলতে চলতে হঠাৎ আলো নিভে গেল এবং সেই ফাঁকে ধনী ঘনশ্যাম দাসের স্ত্রীর গলা থেকে দামী হীরের নেকলেস গেল চুরি হয়ে। পুলিস থেকে তদন্তে এলো ইন্সপেক্টর সান্যাল; মোহনপুরের রাজকুমারের ওপরে তার সন্দেহ হলো। মোহন সেই পার্টিতে আলাপ করলে মিস স্বপ্না রায়ের সঙ্গে। স্বপ্না মোহনকে তার বাড়িতে নিয়ে গেল, মায়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলে; আর পরিচয় হলো স্বপ্নার সেক্রেটারী অরবিন্দ ঘোষের সঙ্গে। স্বপ্নার বাগানে বেড়াতে বেড়াতে স্বপ্নার ক্ষণিক অনুপস্থিতিতে একটা কাকাতুয়ার মুখ থেকে মোহন 'চপলা' ডাক শুনলে। পরে জানা গেল স্বপ্নারই নাম চপলা, প্রেমের ফাঁদ পেতে বড়ো বড়ো ধনীদের বধ করে সে তার মা আর অরবিন্দের প্ররোচনায়। তবুও মোহন তার সঙ্গে প্রেম করার ভান করলে। ওদিকে ইন্সপেক্টর সান্যাল একবার মোহনের হোটেলে গিয়ে তার ঘর তল্লাস করে আসে। এর পর মোহন স্বপ্না রায়দেরও শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করে। যে সব ধনী ব্যক্তি স্বপ্না রায়ের খপ্পরে পড়েছিল, তারা মোহনের কাছ থেকে আশ্বাস পেয়ে বিভিন্ন খাতে হাজার কতক টাকা দান করে দিলে। এর পর স্বপ্না আর অরবিন্দ চললো রেংগুনে ঘনশ্যাম দাসের স্ত্রীর চুরি যাওয়া হীরের হারটা বিক্রী করতে। মোহনপুরের রাজকুমার সেজে মোহনও চললো সেই জাহাজে; তার সহচর বিলাসদাও আর এক ছদ্মবেশে চললো। স্বপ্না তার কুকুরের গলার বাকলেসে হারটা লুকিয়ে রেখেছিল। মোহন কৌশলে সেই হারটি হস্তগত করে। স্বপ্নার সঙ্গী অরবিন্দ আগেই মোহনের আসল পরিচয় পেয়ে গিয়েছে। হার চুরির প্রতিশোধ সে রেংগুনে নেমে নেবে বলে ঠিক করলে।

মোহনকে ওরা দুজনে ছায়ার মতো অনুসরণ করে চলে। একদিন সোয়েডাগন প্যাগোডার ধারে এক ইংরেজ কটি উলঙ্গ দরিদ্র শিশুর ছবি তুলতে এক বাঙালী তরুণী সাহেবের ক্যামেরা কেড়ে নিয়ে ঝগড়া বাধায়। দূরে থেকে ঘটনাটি লক্ষ্য করে মোহন এগিয়ে আসে এবং সাহেবকে বিতাড়িত করে। মেয়েটির নাম রমা, তার দাদা সরোজের সঙ্গে দেশ ভ্রমণে বেরিয়েছে। রমার সাহসে মোহন মুগ্ধ হলো; রমার কাছেও সে নিজের পরিচয় দিলে মোহনপুরের রাজকুমার বলে। ওদের আলাপ গভীর হলো; মোহন প্রেমে পড়লো। রোজই ওরা বের হয়; স্বপ্না আর অরবিন্দ ওদের অনুসরণ করে যায়। একদিন সুযোগ বুঝে স্বপ্না মোহন ও রমার সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ে নিজেকে মোহনের পরিত্যক্তা স্ত্রী বলে পরিচয় দিয়ে হৈচৈ এক কাণ্ড বাঁধালে। গুণ্ডার সাহায্যে অরবিন্দ ও স্বপ্না মোহনকে সেখান থেকে ধরে নিয়ে বন্দী করে রাখলে এবং জানালে যে, নেকলেস ফেরৎ পেলে তাকে ওরা ছেড়ে দেবে। মোহনের সহকারী বিলাস এসে নেকলেস দিলে। বিলাসকেও বন্দী করে রেখে স্বপ্না ও অরবিন্দ নেকলেস নিয়ে জহুরীর কাছে গেল; সেখানে জানতে পারলে নেকলেসটা ঝুটা জিনিস। ওরা এসে পড়ার আগেই মোহন ও বিলাস বাঁধন খুলে রক্ষীদের বন্দী করে পলাতক হয়েছে। মোহনকে আবার দেখা গেল কলকাতামুখী জাহাজে এক সুপুরুষ যুবার বেশে রমার সঙ্গে গল্প করতে। মোহনের এখন নাম তপন, দেশে দেশে ঘুরে ব্যবসা করে বেড়ায়। অরবিন্দ ও স্বপ্নাও এক মুসলমান দম্পতির ছদ্মবেশে সেই জাহাজে চলেছে। স্বপ্না মোহনের প্রেমে পড়েছিল, অরবিন্দ সেটা বুঝতে পেরে স্বপ্নাকে ফেরাবার চেষ্টা করে। স্বপ্না তাতে সায় না দেওয়ায় অরবিন্দ প্রতিশোধ নিতে জাহাজে মোহনের পরিচয় ভেঙে দেয়। দারুণ হট্টগোল; গুলি চললো। স্বপ্নার গুলীতে মোহন জলে পড়ে গেল। পরে স্বপ্না তার প্রেমের কথা রমার কাছে ব্যক্ত করে মোহনের পরিচয় দেয় এবং একথাও জানিয়ে দেয় যে, তার পিস্তল থেকে নির্গত হয়েছিল ফাঁকা গুলী যাতে মোহন মরতে পারে না। বিলাস পিছন দিক থেকে দড়ি ফেলে মোহনকে চুপি চুপি উদ্ধার করে। মোহন জাহাজে লুকিয়ে থাকে; স্বপ্না সে-খোঁজ পেলে এবং মোহনের কাছে এসে তাকে ছোট বোন বলে গ্রহণ করে অরবিন্দর হাত থেকে উদ্ধার করার জন্য অনুনয় করলে। এরপর দেখা গেল মোহন এক আশ্রমে তার গুরুদেব স্বামীজীর কাছে পৌঁছেচে এবং স্বপ্নাকে সেই আশ্রমে ভর্তি করে নেওয়া হলো। সেখান থেকে মোহন গেলে আগ্রায় রমার খোঁজে। রমার বাবা এক স্টেটে কাজ করতেন এবং সেখান থেকে আসবার সময় সাঙ্কেতিক অক্ষর সমন্বিত কতকগুলি প্রাচীন মথী চুরি করে আনেন যার পাঠোদ্ধার করতে

পারলে গুপ্তধনের সন্ধান পাওয়া যাবে। সেই স্টেটের রাজার নির্দেশে ইন্সপেক্টার সান্যাল পরিচয় গোপন করে রমার বাবার কাছে সেক্রেটারির কাজ নিয়েছে নথীগুলোর সন্ধান করতে ওদিকে অরবিন্দও মালি সেজে ওবাড়ীতে কাজ নিয়েছে। মোহন উপস্থিত হলো সন্ন্যাসীর বেশে। রমার বাবা তাকে দিয়ে সাংকেতিক অক্ষরগুলির অর্থ উদ্ধার করার চেষ্টা করলেন। সন্ন্যাসী মোহন, সান্যাল ও অরবিন্দকে দেখে ব্যাপার আন্দাজ করলে। রমা মোহনকে চিনতে পারে। মোহন রমাকে দিয়ে কৌশলে প্রাচীন নথীগুলো সরিয়ে ফেলে। সেই রাতেই সান্যাল নথীগুলো চুরি করতে এসে ধরা পড়ে যায়। সবায়ের কাছে সবায়ের আসল পরিচয় ধরা পড়ে গেল। রমা যে নথীগুলো সরিয়েছিল সেগুলো নকল; আসলগুলো নিয়ে সে মোটরে দৌড় দিলে স্টেটের সেই রাজার কাছে ফিরিয়ে দিতে। এদিকে অরবিন্দ একফাঁকে থানায় গিয়ে মোহনের কথা জানিয়ে এলো। সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী উপস্থিত হলো মোহনকে ধরতে। মোহন তার সহচর বিলাসকে নিয়ে পালাবার চেষ্টা করলে। ইতিমধ্যে রমা ফিরে এলো এবং মোহনকে সে আত্মসমর্পণ করতে বললে। জানালে দেশ সেবার এ পথ নয় এবং মোহন ফিরে না আসা পর্যন্ত সে তার অপেক্ষায় থাকবে। মোহন আত্মসমর্পণ করলে।

* * *

ঘটনার পর ঘটনা তরতর করে এগিয়ে গিয়েছে। সময়ের ব্যবধান, কার্যকারণ কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। কেবল একটার পর একটা উত্তেজনা ও রোমাঞ্চ নিয়ে আসার চেষ্টা। অনেকটা [illegible] 'স্টান্ট' জাতীয় ছবির মতো, [illegible] তার চেয়ে একটু ভব্য, এই যা। [illegible] রক্ষা করার জন্য ঘটনা [illegible] ব্যাহত হতে দেওয়া হয়নি। [illegible] নিয়ে [illegible] ও অরবিন্দর [illegible]

জের রইলো না তার। বলা বাহুল্য টুপিতে নেকলেসটি মোহনই গোপন করেছিল। জাহাজ কলকাতায় ফিরতে মোহন কি ভাবে যে সরে পড়লো এবং স্বপ্নাকেই বা অরবিন্দর খপ্পর থেকে উদ্ধার করে কিভাবে আশ্রমে পৌঁছে দিলে সে-রহস্য রহস্যই রয়ে গেছে। তবে মোহনকে যেরকম সিদ্ধ পুরুষ দেখানো হয়েছে তাতে তার দ্বারা অসম্ভব আর কিইবা থাকতে পারে। সুতরাং কোন কিছু উহ্য রেখে দিলে কোন ক্ষতিই নেই: এইভাবের মনোভাবই যেন ঘটনা বিন্যাসে কাজ করে গিয়েছে। অই কোত্থেকে কি হচ্ছে, কি করে মোহনের আবির্ভাব ঘটছে, অন্তর্ধান ঘটছে সবই যেন ম্যাজিকের ব্যাপার এবং এমনিই অলৌকিক কাণ্ড যে শেষে রাইফেলধারী পুলিস বাহিনী মোহনকে সামনাসামনি পেয়েও পাশ কাটিয়ে আছাড় খায় পড়ে পড়ে। সূক্ষ্ম রস উপভোগের কিছু নেই; রম্য অনুভূতিও সামান্যই। তবে গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত দৃষ্টি সম্পূর্ণ নিবদ্ধ করে রেখে দেয়, পলক ফেলারও অবকাশ দেয় না। গেভাকলারে রঙ করা পার্টিতে নাচের দৃশ্যটির কথা শুনতেই ভালো, দেখার পর ওর কোন প্রয়োজন ছিল বলে মনে হয় না।

* * *

নামভূমিকায় প্রদীপকুমার ছবির আকর্ষণ অবশ্যই বাড়িয়েছেন। আগের চেয়ে অভিনয়েও তার পারদর্শিতা বেড়েছে এবং একটা ব্যক্তিত্বও তিনি নিয়ে আসতে পেরেছেন। এই ব্যক্তিত্বের জোরটাই ছবিতে তার কার্যকলাপ অনুসরণ করে চরিত্রটির সঙ্গে সঙ্গে দর্শকের কৌতূহল এগিয়ে নিয়ে যেতে সহায়তা করেছে। পদ্মিনী দেবীর আবির্ভাব রেঙ্গুন থেকে, ছবির প্রায় মাঝ পথে রমার চরিত্রে। এরা ছাড়া অন্যান্যদেরও অভিনয়গুণে ঘটনাবলীতে নাটকীয়তা সৃষ্টি হতে পেরেছে। [illegible] রায়কে অরবিন্দর চরিত্রে মোহনের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে বিভিন্ন [illegible] যায়। [illegible] [illegible]

স্বপ্নার চরিত্রে অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায় অভিনয় করেছেন। দীপক মুখোপাধ্যায়কেও মোহনের সহচর বিলাসের চরিত্রে নানা ছদ্মবেশে দেখা যায় এবং অভিনয়ও তিনি ভালো করেছেন। ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও জহর রায় মোহনের দলের লোকরূপে যথাক্রমে ট্রেনে মাজন বিক্রেতা এবং এক গাঁজাখোরের চরিত্রে গুমোট ভাব কাটাবার সুযোগ দেন হাসি সৃষ্টি করে। শেষ দিকে রমার ভায়ের চরিত্রে ধুতির ওপর সোলার হ্যাট মাথায় দিয়ে জীবনে বসুও হাসি এনে দেন। অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় অবতরণ করেছেন মোহনের আর এক প্রতিদ্বন্দ্বী ইনসপেক্টার সান্যালের চরিত্রে এবং অভিনয়ও করেছেন বেশ ব্যক্তিত্ব ফুটিয়ে। হরিধনও বিয়ে পাগলা বৃদ্ধ জমিদারের একটি টাইপ চরিত্র সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছেন। এরা ছাড়া ছোট ছোট চরিত্র হলেও অভিনয়কে মানিয়ে নিয়ে গেছেন ছবি বিশ্বাস, নীতিশ মুখোপাধ্যায়, বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ হরেন, মিহির ভট্টাচার্য, পঞ্চানন ভট্টাচার্য, অজিত চট্টোপাধ্যায়, সুপ্রভা মুখোপাধ্যায়, রেণুকা রায় তপতী ঘোষ প্রভৃতি।

* * *

ছবিখানির কলাকৌশলের মধ্যে ক্যামেরায় কাজে সুহৃদ ঘোষ কতকাংশে দক্ষতা ফুটিয়েছেন। রেঙ্গুনের দৃশ্যাবলী ভালো। স্টুডিওতে তোলা আর রেঙ্গুনে তোলা দৃশ্যের মধ্যে মিলটা মন্দ রাখা হয়নি। শব্দগ্রহণ করেছেন শিশির চট্টোপাধ্যায়। সংগীত পরিচালনায় রাজেন সরকার ঘটনার সঙ্গে বা মৌলিকত্ব প্রকাশ করতে পারেননি। খানতিনেক গান গাওয়া ভালো। কিন্তু চৌরঙ্গীতে রাজকুমারের পাশে বসে স্বপ্নার গান গেয়ে মোটরে চলার মতো দৃশ্য পরিকল্পনা গানকে উপভোগে ব্যাহত করে। তবে ছবিখানির সবই তো এইপ্রকার উদ্ভট ও অসম্ভব পরিকল্পনা। চিত্রনাট্য রচনা ও পরিচালনা করেছেন অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়, সংলাপ রচনা করেছেন [illegible]।

খেলার মাঠে

একলব্য

রাশিয়া সফরকারী ভারতীয় দলের যুগ্ম ম্যানেজার শ্রীভৈরব মহান্তির অকস্মাৎ প্রত্যাবর্তনে এদেশের ক্রীড়া সমাজে কম বিস্ময়ের সৃষ্টি হয়নি। বলা নেই, কওয়া নেই, গভীর রাত্রে তার সহসা আবির্ভাব। অবশ্য উড়িষ্যার সহকারী মন্ত্রী ও রাশিয়া সফররত ভারতীয় দলের যুগ্ম ম্যানেজার শ্রীমহান্তির এই অপ্রত্যাশিত প্রত্যাবর্তনে ফুটবল মহলে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবার কথা ছিল উড়িষ্যার উপর বন্যার তাণ্ডবলীলা স্বাভাবিকভাবেই সে প্রতিক্রিয়ার পরিপন্থী হয়ে পড়েছে। সারা দেশই এখন উড়িষ্যার জন্য উদ্বিগ্ন। প্রকৃতির খেয়ালে আজ যারা রিক্ত, নিঃস্ব, সর্বহারা তাদের সেবায় শ্রীমহান্তিও কর্মব্যস্ত। সুতরাং খেলা বা খেলার প্রসঙ্গ একেবারেই অবান্তর। দেশসেবক এবং খেলা-পাগল শ্রী মহান্তির বড় সাধের বড়বাটি স্টেডিয়াম বন্যার্তদের জন্য আজ ক্যাম্প হাসপাতালে পরিণত হতে চলেছে। বড়বাটি স্টেডিয়াম রচনার মূলে রয়েছে উপমন্ত্রী শ্রীমহান্তিরই ঐকান্তিক প্রচেষ্টা। লটারীর সাহায্যে অর্থ সংগ্রহ করে তিনি ধীরে ধীরে এই ক্রীড়া-নিকেতন গড়ে তুলছেন। সেই ক্রীড়ানিকেতন এখন পাবে রাজ্যের আরোগ্যনিকেতনের মর্যাদা। দুঃখের মধ্যেও কংগ্রেস কর্মী মহান্তির এটা কম আনন্দের বিষয় নয়। উড়িষ্যার এই বিপর্যয়ে উপমন্ত্রী শ্রীমহান্তির উপস্থিতি এবং তাঁর সেবা একান্তই প্রয়োজন ছিল। ঘটনাক্রমে তিনি এই বিপর্যয়ের মধ্যে দেশে না এসে পৌঁছলে হয়তো তাঁকে আনবারই ব্যবস্থা করতে হত। তাই মনে হয় সোভিয়েট রাশিয়া থেকে শ্রীমহান্তির প্রত্যাবর্তন বুঝি ভগবানেরই অভিপ্রেত ছিল।

* * *

কিন্তু ভারতের খেলার মাঠের ভগবানদের লীলা খেলাই যে শ্রীমহান্তির অকস্মাৎ স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের প্রধান কারণ নানা সূত্র থেকে একথা ধীরে ধীরে প্রকাশ পাচ্ছে। মাদ্রাজের 'ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস' পত্রিকা লিখেছেন—রাশিয়া সফরের প্রাক্কালে ভারতীয় দলের কর্মকর্তাদের মধ্যে এক প্রধানের উক্তি ভারতের জাতীয় সম্মানের মর্যাদা হানিকর। তা ছাড়া রাশিয়ায় ভারতের জাতীয় কংগ্রেস এবং ভারত সরকারের উপর কটাক্ষ করে ভারতীয় কর্মকর্তারা যেসব বক্তৃতা করেছেন কংগ্রেস সেবক এবং উড়িষ্যার উপমন্ত্রী তা বরদাস্ত করতে পারেন নি। ফুটবল কর্মকর্তাদের এই সব উক্তি বিদেশের চোখে ভারতের মর্যাদা যথেষ্ট ক্ষুণ্ণ করেছে। শ্রীমহান্তি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী এবং ভারত সরকারের কাছেও নাকি এই বিবরণ জানিয়েছেন। 'ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস' প্রকাশিত সংবাদ কতদূর সত্য জানি না। তবে সংবাদ অসত্য বলে মনে করবারও কোন কারণ নেই। আমাদের দেশের ক্রীড়াক্ষেত্রের মোড়লদের পূর্বাপর আচরণের কথা স্মরণ করলে সংবাদ সত্য বলেই মনে হবে। ক্রীড়াক্ষেত্রে সরকারী হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে এরা বহুদিন থেকেই তারস্বরে চীৎকার আরম্ভ করেছেন। তারপর পশ্চিমবঙ্গ স্পোর্টস বিল এদের ক্ষমতা ত্যাগের আশঙ্কায় পাগল করে তুলেছে। জমিদারের লোলুপ দৃষ্টি থেকে তার ভোগ্য জমিদারী হাতছাড়া হবার আগে স্বেচ্ছাচারী জমিদারের মনের উপর যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় আমাদের দেশের ক্রীড়া পরিচালকদেরও আজ সেই অবস্থা। সাধের জমিদারী বুঝি যায় যায়। পশ্চিমবঙ্গ স্পোর্টস বিল আলোচনার মুখে এদেরকে বিদেশ যাত্রা করতে হয়েছে। সুতরাং সরকারের বিরুদ্ধে মনের কোণে পুঞ্জীভূত হয়ে আছে নানা অভিযোগ। তারপর সোভিয়েট দেশের খাদ্য ও পানীয়ের গুণে মনে কিছুটা রং লাগাও অস্বাভাবিক নয়। সুতরাং এরা যে কংগ্রেস এবং কংগ্রেসী সরকারের মুণ্ডপাত করবেন এটা খুবই স্বাভাবিক। উড়িষ্যার কংগ্রেসকর্মী শ্রীভৈরব মাহান্তি খেলাধূলায় খুবই আগ্রহী। বাঙলা তথা ভারতীয় ক্রীড়াক্ষেত্রের হোমরা-চোমরা পরিচালকদের সঙ্গে এঁর পরিচয় বহুদিনের, সৌহার্দ্যও কম নয়। কিন্তু শ্রী মাহান্তিও এই পরিচালকদের সাম্প্রতিক আচরণ কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারেন নি। পারবেনই বা কি করে? যারা একটি আদর্শের পূজারী তাদের সঙ্গে স্বার্থান্বেষীদের আকাশ পাতাল পার্থক্য, সুতরাং সংঘর্ষও অনিবার্য। আদর্শের আর এক পূজারী শ্রীভূপতি মজুমদারকেও এক সময় ক্রীড়া-পরিচালকদের স্বেচ্ছাচারের জন্য আই এফ এ-র সভাপতির পদ ত্যাগ করতে হয়েছিল। শেষে এ পথ থেকেই একেবারে সরে যেতে হয়েছে। কায়েমী স্বার্থ এবং স্বেচ্ছাচার যাদের মূলধন, সেখানে আদর্শের স্থান কোথায়?
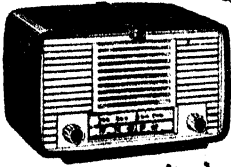
* * *

রাশিয়ায় ভারতের প্রথম প্রদর্শনী ফুটবল খেলার পূর্বে মস্কো ডায়নামো স্টেডিয়ামে ভারতের অধিনায়ক এস মান্না লোকোমোটিভ দলের অধিনায়ক ই রঘোভের সংগে করমর্দন করছেন

রাশিয়ার শেষ সংবাদে জানা গেছে, ভারতের ফুটবল টীম এই মাসের ২৪ তারিখ পর্যন্ত দেশে ফিরবে। হাঙ্গেরী এবং যুগো-স্লাভিয়ায় তাদের যে প্রদর্শনী খেলার কথা ছিল, তা বাতিল হয়ে গেছে। সোভিয়েট রাশিয়ায় ভারত এ পর্যন্ত যে পাঁচটি ম্যাচ খেলেছে তার মধ্যে তিনটি খেলায় পরাজয় করেছে আর অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে একটি খেলা। রাশিয়ায় ভারতের আরও দুটি খেলা বাকী। এর মধ্যে একটি খেলায় প্রতি-দ্বন্দ্বিতা করতে হবে সোভিয়েট রাশিয়ার জাতীয় দলের সংগে। বিশেষ উল্লেখযোগ্য—ভারতকে এ পর্যন্ত মস্কো ডায়নামো, স্পাটাক, কিয়েভ ডায়নামো, টর্পেডো প্রভৃতি রাশিয়ার

করতে হয়নি। হবেও না। কারণ ভারতের ক্রীড়ামান অনুযায়ী শক্তিহীন দলের সংগেই খেলার আয়োজন করা হয়েছে। তবে জাতীয় দলের সংগে একটা ম্যাচ না খেললে বড়ই বে-মানান দেখায়, তাই 'কনসোলেশন প্রাইজ' হিসেবেই জাতীয় দলের সংগে একটা খেলার আয়োজন। কিন্তু জাতীয় দলের সংগেই হোক আর অন্য দলের সংগেই হোক, রাশিয়ায় ভারতের খেলার আর তেমন যেন আকর্ষণ নেই। এখন যত তাড়াতাড়ি হয়, ঘরের ছেলে ভালোয় ভালোয় ঘরে ফিরে এলেই মংগল। আই এফ এ শীল্ডের পরিচালক এবং দেশের ক্রীড়ারসিকরা সাগ্রহে তাদের জন্য অপেক্ষা করছে।

* * *

উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন টনি ট্রাবার্টকে ডেভিস কাপের খেলায় অস্ট্রেলিয়ার কৃতী খেলোয়াড় লুই হোডের কাছে পরাজয় স্বীকার করতে হলেও 'ফরেস্ট হিলে' যুক্ত-রাষ্ট্রীয় লন টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপের খেলায় ট্রাবার্ট একে একে হোড ও কেন রোজওয়ালকে হারিয়ে বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেছেন। ট্রাবার্ট হোডকে পরাজিত করেন সেমি-ফাইনালে স্ট্রেট-সেটে, অস্ট্রেলিয়া চ্যাম্পিয়ন রোজওয়ালও স্ট্রেট-সেটে ট্রাবার্টের কাছে পরাজিত হন ফাইনালে। সুতরাং দুই সপ্তাহ আগে এই 'ফরেস্ট হিলের' কোর্টেই উইম্বল-ডন চ্যাম্পিয়নকে যাঁদের কাছে হার স্বীকার করতে হয়েছিল, দুই সপ্তাহ পরে তাঁদেরকেই হারিয়ে ট্রাবার্ট নিজ শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিলেন। আমেরিকার কীর্তিমান খেলোয়াড় টনি ট্রাবার্টকে এখন অনায়াসেই বিশ্বের পয়লা নম্বর টেনিস খেলোয়াড় বলা যেতে পারে। অবশ্য যিনি উইম্বলডন জয় করেছেন টেনিসে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব আগেই প্রমাণিত হয়েছে, তবুও

ফ্রান্স, উইম্বলডন ও যুক্তরাষ্ট্রীয় টেনিস চ্যাম্পিয়ন টনি ট্রাবার্টের খেলার ভঙ্গি

ট্রাবার্টের সাম্প্রতিক পরাজয় তাঁর খেলোয়াড় জীবনের দীপ্তিকে অনেকখানি ম্লান করে দিয়েছিল। অস্ট্রেলিয়ার দুই ধুরন্ধর খেলোয়াড়কে হারিয়ে সেই দীপ্তি পুনরুদ্ধার করলেন। টেনিস কোর্টের অপ্রত্যাশিত ফলাফল সর্বজনবিদিত ঘটনা। কিন্তু ডেভিস কাপের খেলায় হোডের হাতে ট্রাবার্টের পরাজয়ের মূলে ছিল তাঁর শারীরিক অপটুতা। উইম্বলডন জয়ের পর তিনি পিঠে যে আঘাত পেয়েছিলেন, তার ফলেই তাঁকে হার স্বীকার করতে হয়েছিল।

কীর্তিমান খেলোয়াড় ট্রাবার্ট এই বছর ফ্রান্স চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেছেন। উইম্বলডন জয়ের পর তিনি যুক্তরাষ্ট্রীয় চ্যাম্পিয়নশিপও লাভ করলেন। এরপর তিনি যদি অস্ট্রেলিয়ায় বিজয়ীর সম্মান অর্জন করতে পারেন, তবে তিনি যে সম্মানের অধিকারী হবেন, টেনিস-বিশ্বে মাত্র একজন খেলোয়াড়ের পক্ষেই সে সম্মান লাভ করা সম্ভব হয়েছে। ইনি হচ্ছেন যুক্তরাষ্ট্রেরই অন্যতম খেলোয়াড় ডোনাল্ড বাজ। ডোনাল্ড বাজ ১৯৩৮ সালে ফ্রান্স, উইম্বলডন, যুক্তরাষ্ট্র ও অস্ট্রেলিয়ার চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করে অক্ষয় কীর্তি স্থাপন করেন। বিশ্বের অন্য কোন খেলোয়াড়ের পক্ষেই বিশ্ব টেনিসের এই চারটি পীঠস্থানে বিজয়ীর সম্মান অর্জন করা সম্ভব হয়নি। চারটি কেন, তিনটি প্রধান প্রতিযোগিতা জয়ের গৌরবও বেশী খেলোয়াড় অর্জন করতে পারেন নি। ইংলণ্ডের খ্যাতনামা খেলোয়াড় ফ্রেড পেরী, যিনি উপর্যুপরি তিনবার উইম্বলডন বিজয়ের একক কৃতিত্ব এখনো অধিকার করে আছেন, তিনিই ১৯৩৩ সালে উইম্বলডনের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রীয় ও অস্ট্রেলিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেছিলেন। টনি ট্রাবার্ট ইতিমধ্যেই তিনটি প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়েছেন। অবশ্য এর মধ্যে ফ্রান্স চ্যাম্পিয়নশিপের মর্যাদা অপর তিনটি প্রতিযোগিতার সমতুল নয়। উইম্বলডনের প্রস্তুতি হিসেবে ফ্রান্সের মর্যাদা। এখানকার খেলার নৈপুণ্য দেখেই উইম্বলডনের গবেষণা করা হয়। উইম্বলডনে খেলার তালিকা রচনার ক্ষেত্রেও থাকে ফ্রান্সের খেলার নৈপুণ্যের প্রভাব। আভিজাত্য এবং মর্যাদায় উইম্বলডন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ টেনিস প্রতিযোগিতা বলে পরিগণিত হলেও উইম্বলডন, যুক্তরাষ্ট্রীয় ও অস্ট্রেলিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের খেলাকে বিশ্বের তিনটি প্রধান প্রতিযোগিতা বলে বিবেচনা করা হয়। এর যে কোন প্রতিযোগিতায়

আর কৃষ্ণন ও মার্ভিন রোজ—সম্প্রতি সাউথ ক্লাবে প্রদর্শনী টেনিস খেলায় এ'রা দর্শকদের প্রচুর আনন্দ দেন

বিজয়ী, বিশ্বের সম্মানিত টেনিস বীর; আর একের পক্ষে যদি তিনটি প্রতিযোগিতাই জয় করা সম্ভব হয়, তবে টেনিস-বিশ্বে তাঁর সম্মান অনন্য। টনি ট্রাবার্ট অস্ট্রেলিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করলে এই সম্মানেরই অধিকারী হবেন।

• • •

'ফরেস্ট হিলে' যুক্তরাষ্ট্রীয় লন টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপের খেলার সময় একদিন দেখা গেল, কোর্ট পুলিসে পুলিসে ছেয়ে গেছে। চারিদিকে অহেতুক সতর্কতা। সবার চোখেই জিজ্ঞাসার প্রশ্ন। ব্যাপার কি? জানা গেল, আমেরিকার টেনিস পটিয়সী মিসেস ডরোথী নোড সকালবেলা এক অজ্ঞাতনামা মহিলার কাছ থেকে টেলিফোনে খবর পেয়েছেন যে, তাঁকে আজ ফরেস্ট হিলে গুলী করে মারা হবে। মিসেস নোডের এইদিন সেমি-ফাইনাল খেলা ছিল মিস ডোরিস হার্টের সঙ্গে, যিনি শেষ পর্যন্ত চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেছেন। ভয়চকিত দৃষ্টি নিয়ে নোড 'ফরেস্ট হিলে' উপস্থিত হলেন। সেমি-ফাইনালে প্রতিদ্বন্দ্বিতাও করলেন হার্টের সঙ্গে, কিন্তু জিততে পারলেন না। স্ট্রেট-সেটেই হার স্বীকার করলেন। যদিও মিসেস নোড মুখে বললেন, টেলিফোনের দুঃসংবাদ তাঁর খেলার উপর কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেনি, কিন্তু খেলার সময় তাঁর অন্যমনস্কতা দর্শকের চোখে গোপন রইল না। এখানে প্রশ্ন, খেলার মাঠে নোডকে গুলী করে হত্যা করবার এ হুমকি দেখানর অর্থ কি? এ কি ডোরিস হার্টেরই রসিকতা না আর কিছু?

• • •

'ফরেস্ট হিলের' এই ঘটনার পরের দিন আমরা কলকাতার সাউথ ক্লাবে কিন্তু গুলী করবার সত্যিই এক রসিকতা প্রত্যক্ষ করেছি। এখানে খেলা হচ্ছিল অস্ট্রেলিয়ার খ্যাতনামা খেলোয়াড় মার্ভিন রোজের সঙ্গে ভারত চ্যাম্পিয়ন আর কৃষ্ণণের। কৃষ্ণণ লাইন ঘেঁষে একটা বল মেরেছেন—তীব্র চাপ মা'র, তীব্র কন, সুতীব্রই বলা যায়, রোজের বল প্রতিরোধের কোনই সম্ভাবনাই নেই, তিনি প্রায় নিরুপায়, বল প্রতিরোধের চেষ্টা না করে র‍্যাকেট উ'চু করে ধরলেন কৃষ্ণণের দিকে ঠিক বন্দুক দিয়ে গুলী করবার ভঙ্গিতে,—ভাবখানা : এমন বল তুমি মেরেছো কেন? তোমাকে গুলী করেই মারবো। খেলা তখন খুবই জমে উঠেছিল। দর্শকরা রোজের রসিকতায় হাসিতে ফেটে পড়লো। রোজের রসিকতার আর একটি ঘটনাও দর্শকদের কম আনন্দ দেয়নি। কৃষ্ণণ ও রোজের এক 'র‍্যালির' সময় সহসা র‍্যাকেট পড়ে গেল রোজের হাত থেকে। হাতে ছিল তাঁর একটি বল, বল ছুড়েই তিনি কৃষ্ণণের বল প্রতিরোধ করবার চেষ্টা করলেন, অবশ্য পারলেন না, তবে দর্শকদের যথেষ্টই আনন্দ দিলেন।

• • •

সাউথ ক্লাবে অস্ট্রেলিয়া টেনিসের দুই উদীয়মান তরুণ মার্ভিন রোজ ও ডব্লিউ গিলমোরের সঙ্গে ভারতের টেনিস ধুরন্ধরদের প্রদর্শনী খেলা বৃষ্টির জন্য ভাল জমতে পারেনি। এই প্রদর্শনী খেলাকে কেন্দ্র করে কলকাতার টেনিস মহলে যথেষ্টই সাড়া জেগেছিল। বৃষ্টির মধ্যে খেলা আরম্ভ হওয়া সত্ত্বেও সাউথ ক্লাবের সকল দর্শক-আসনই পূর্ণ হয়ে যায়। দুই দেশের খ্যাতনামা খেলোয়াড়রা উন্নত টেনিস নৈপুণ্যেরও পরিচয় দেন। মার্ভিন রোজ বিশ্বের কীর্তিমান টেনিস খেলোয়াড়দের অন্যতম। ইনি ন্যাটা খেলোয়াড়। টেনিস পণ্ডিত হ্যারী হপম্যানের হিসেবমত বিশ্ব টেনিস ক্রমপর্যায়ে রোজের স্থান অষ্টম। উইম্বলডনে রোজ এবার ড্রবনির সঙ্গে খেলে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছেন। অপরদিকে ভারত চ্যাম্পিয়ন কৃষ্ণণও ইউরোপে এবার ড্রবনি, মট্রাম প্রভৃতি ধুরন্ধর খেলোয়াড়কে হারিয়ে অর্জন করেছেন অকুণ্ঠ প্রশংসা। সুতরাং এঁদের খেলার আকর্ষণে সাউথ ক্লাব দর্শককে ভেঙে পড়বে এটা খুবই স্বাভাবিক। বর্ষাকালে লনে খেলার ব্যবস্থা করার অনর্থক ঝুঁকি না নিয়ে সাউথ ক্লাবের কর্তৃপক্ষ হার্ড কোর্টেই খেলার ব্যবস্থা করেন। রোজকে প্রদর্শনী খেলার আমেজেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে দেখা যায়। দুইটি সিঙ্গলস এবং একটি ডাবলসের মধ্যে প্রথম দিন অস্ট্রেলিয়ান খেলোয়াড়রা কোন খেলাতেই জিততে পারেন নি। পরের দিন ডব্লিউ গিলমোর সুমন্ত মিশ্রকে পরাজিত করেন আর রোজ ও কৃষ্ণণের খেলায় উভয়ে একটি করে সেট লাভ করবার পর তৃতীয় সেটে খেলা পরিত্যক্ত হয়ে যায়। এ খেলায় হার-জিতের প্রশ্ন বড় ছিল না। টেনিস-নৈপুণ্যের উন্নত কলাকৌশলে রোজ দেখিয়ে দেন, তিনি অন্য ধাতুতে গড়া। নেটের কোলে তাঁর খেলা সত্যিই আনন্দদায়ক।
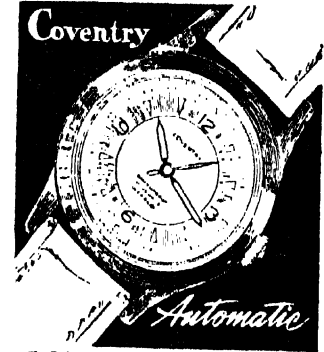
সাপ্তাহিক সংবাদ

দেশী সংবাদ
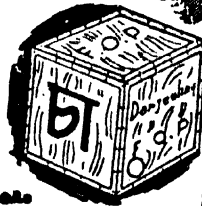
৫ই সেপ্টেম্বর—উড়িষ্যায় পুরী হইতে বালেশ্বর পর্যন্ত উপকূলবর্তী ১৭০ মাইল অঞ্চলে অভূতপূর্ব বন্যা দেখা দিয়াছে। গত এক শতাব্দীর মধ্যে ইহাই ভীষণতম বন্যা।

আজ পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় রাজ্যের স্বায়ত্তশাসন মন্ত্রী শ্রীঈশ্বরদাস জালান কর্তৃক উত্থাপিত পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েৎ বিলটি সকল পক্ষের সম্মতিতে উভয় সভার যুক্ত সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরিত হয়।

৬ই সেপ্টেম্বর—কটকের সংবাদে প্রকাশ, উড়িষ্যায় প্রলয়ঙ্কর প্লাবনে প্রায় ১৫০ জন লোকের প্রাণনাশ হইয়াছে। কটক, পুরী ও বালেশ্বর জেলায় আশ্রয়চ্যুত ও বিপন্ন লোকের সংখ্যা প্রায় তিন লক্ষ।

হাওড়া শহরের উন্নয়নের নিমিত্ত একটি পৃথক ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট গঠনের উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এক বিল প্রণয়ন করিয়াছেন।

চারিদিন প্রবল বিতর্কের পর আজ পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় "১৯৫৫ সালের বিজ্ঞাপিত এলাকায় চা ও আলিকাবন্দ কয়েকটি ফলের উপর প্রবেশকালীন কর ধার্যের বিলটি গৃহীত হয়।

৭ই সেপ্টেম্বর—রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ আজ প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুকে ভারতের সর্বোচ্চ সম্মান 'ভারত-রত্ন' উপাধিতে বিভূষিত করেন। ডাঃ ভগবান দাস এবং শ্রী এম বিশ্বেশ্বরায়াকেও আজ এই 'ভারত রত্ন' উপাধিতে বিভূষিত করা হয়।

আজ পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় পশ্চিমবঙ্গ নিরাপত্তা আইনের মেয়াদ ১৯৬১ সাল পর্যন্ত পাঁচ বৎসরের জন্য বৃদ্ধি করিবার প্রস্তাব করিয়া একটি সংশোধন বিল উত্থাপন করিলে সরকার ও বিরোধীপক্ষের মধ্যে প্রবল বাক-যুদ্ধের অবতারণা হয়।

ভারতীয় সত্যাগ্রহীদিগকে আর গোয়ায় প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে না। বোম্বাই সরকার আজ বোম্বাই-গোয়া ও বোম্বাই-দমন সীমান্তের পুলিসকে এই সব পর্তুগীজ উপনিবেশে ভারতীয় সত্যাগ্রহীদের প্রবেশ বন্ধ করার নির্দেশ দিয়াছেন। ক্ষুদ্র পর্তুগীজ উপনিবেশ দিউ সম্পর্কে সৌরাষ্ট্র সরকারও অনুরূপ এক আদেশ জারি করিয়াছেন।

৮ই সেপ্টেম্বর—কটকের সংবাদে জানা যায় যে, উদ্ধারকারীদল গত পাঁচ দিন ধরিয়া বন্যা-বিধ্বস্ত অঞ্চলে আটক হাজার হাজার লোকের সহিত সংযোগ স্থাপন করিয়াছে এবং বহু ব্যক্তিকে উদ্ধার করিয়াছে। সামরিক বাহিনী এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রেরিত নৌকাগুলিই এই উদ্ধারকার্য চালাইতেছে।

প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু আজ লোকসভায় এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত এজেন্সী অঞ্চলে নাগা ও আসাম রাইফেল বাহিনীর মধ্যে নয়টি সংঘর্ষে উভয়পক্ষে মোট ৩৬ জন নিহত ও ২২ জন আহত হইয়াছে।

৯ই সেপ্টেম্বর—কটকের সংবাদে প্রকাশ, মৌসুমী আবহাওয়া ও বৃষ্টিপাতের ফলে বন্যায় আটক সহস্র সহস্র নরনারীর উদ্ধার-কার্যে বিঘ্ন সৃষ্টি হইয়াছে। বিগত এক সপ্তাহ যাবৎ বন্যায় জল বেষ্টিত বহু গ্রামে নিদারুণ খাদ্যাভাব দেখা দিয়াছে।

ভারতীয় বিমান বাহিনীর বিমানসমূহ হইতে বিভিন্ন বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলে প্রায় ৫০ টন চাউল ও পুরী জগন্নাথ মন্দিরের মহাপ্রসাদ সরবরাহ করা হয়।

১০ই সেপ্টেম্বর—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ হইতে দিয়াশলাই, স্বর্ণালঙ্কার, কেরোসিন এবং সরিষার তৈল প্রভৃতির উপর বিক্রয়কর ধার্যের যে প্রস্তাব করা হইয়াছিল, তাহা আর কার্যকরী করা হইবে না বলিয়া জানা গিয়াছে। আজ পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী দলের এক সভায় উপরোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

কটকের সংবাদে প্রকাশ, কটকের ৪০ মাইল পূর্বে অবস্থিত কুজং এলাকায় বন্যার জল হ্রাস পাইতেছিল বটে, কিন্তু অদ্য ঐ এলাকায় বন্যা পুনরায় সংহারমূর্তি ধারণ করিয়াছে।

প্রখ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক সত্যেন বসু আজ কলিকাতায় 'জনকল্যাণে আণবিক শক্তি' প্রদর্শনীর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ভাষণ-দানকালে বলেন যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স-এর পক্ষ হইতে অনুসন্ধানের ফলে কলিকাতার সমস্ত বাড়ী, এমনকি পল্লী অঞ্চলে বাসগৃহের উপরও তেজস্ক্রিয় ভস্ম জমিয়া থাকিতে দেখা গিয়াছে।

১১ই সেপ্টেম্বর—আজ আচার্য বিনোবা ভাবের ৬১তম জন্মদিবস নানা স্থানে উদযাপিত হয়। হায়দরাবাদে বিনোবা জয়ন্তী অনুষ্ঠানে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বি রামকৃষ্ণ রাও ঘোষণা করেন, পোচামপল্লীতে প্রথম ভূমিদাতা প্রস্তাব করিয়াছেন যে, গ্রামের সমস্ত জমি একত্রিত করিয়া যৌথভাবে তাহার চাষ করা উচিত। মুখ্যমন্ত্রী আরও এই পরিকল্পনাকে অভিনন্দিত করিয়াছেন।

বিদেশী সংবাদ

৫ই সেপ্টেম্বর—পূর্ববঙ্গ বিধান সভার কংগ্রেসী দলের নেতা শ্রীবসন্তকুমার দাস পূর্ব পাকিস্থান মন্ত্রিসভার সদস্য নিযুক্ত হইয়াছেন। আর একজন কংগ্রেসকর্মী শ্রীশরৎ মজুমদার ও তপশীল জাতি ফেডারেশনের সদস্য শ্রীমনোরঞ্জন সরকারও পূর্ববঙ্গ মন্ত্রিসভার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন।

৬ই সেপ্টেম্বর—বৃটেন অদ্য গ্রীস ও তুরস্ককে একথা জ্ঞাপন করিয়াছে যে সাইপ্রাসের ৫ লক্ষ অধিবাসীকে বৃটিশ সার্বভৌমত্বের অধীনে অনেকটা স্বায়ত্তশাসন প্রদান করিয়া সেখানে নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্তন করিতে বৃটেন প্রস্তুত রহিয়াছে।

৮ই সেপ্টেম্বর ইস্তাম্বুলের সংবাদে প্রকাশ, গ্রীকদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনের ফলে ৫৪টি অট্টালিকায় অগ্নিসংযোগ ও ৫৭ জন আহত হওয়ায় আজ তুরস্কের ইস্তাম্বুল, আনকারা ও ইজমিরের রাস্তায় ট্যাঙ্ক ও সঙ্গীণধারী সেনারা টহল দিয়া বেড়ায়। তুরস্ক সরকার উপরোক্ত তিনটি শহরে সামরিক আইন ও কার্ফিউ জারি করিয়াছেন।

৯ই সেপ্টেম্বর—আজ মস্কোতে সোভিয়েট ইউনিয়ন ও পশ্চিম জার্মানীর নেতাদের মধ্যে আলোচনা আরম্ভ হয়।

১০ই সেপ্টেম্বর—আজ জেনেভায় চীন-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বৈঠকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আটক চীনা অসামরিক ব্যক্তিদের স্বদেশ প্রত্যাগমনে সাহায্য করিবার জন্য ভারতকে আমন্ত্রণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে।

১০ই সেপ্টেম্বর—মস্কোতে সোভিয়েট ইউনিয়ন ও পশ্চিম জার্মানীর মধ্যে আলোচনা অচল অবস্থায় উপনীত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ হয়। খণ্ডিত জার্মানীর পুনর্মিলনের প্রশ্নে উভয় পক্ষ যেরূপ দৃঢ়তার সহিত পরস্পর বিরোধী অভিমত ব্যক্ত করিয়াছে, তাহাতে মনে হয়, বোঝাপড়ার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে।

১১ই সেপ্টেম্বর—নেপালের রাজা মহেন্দ্র বিদ্রোহী নেতা ডাঃ কে আই সিং ও তাঁহার সহযোগিগণকে মার্জনা করিয়াছেন। বিদ্রোহী নেতা ও তাঁহার সহচরগণ বিনাশর্তে রাজার নিকট আত্মসমর্পণ করেন।

পূর্বাঞ্চলে যুক্ত বন্যা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অবলম্বন সম্পর্কে করাচীতে ভারত-পাকিস্থান আলোচনা আজ সমাপ্ত হইয়াছে। উভয় পক্ষের প্রতিনিধিগণই এ ব্যাপারে পরস্পরকে পূর্ণ সহযোগিতা দানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

প্রতি সংখ্যা—।৵ আনা, বার্ষিক—২০, ষান্মাসিক—১০,
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা, লিমিটেড, ৬ ও ৮, সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১৩
[illegible] কর্তৃক [illegible], কলিকাতা, [illegible] হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সম্পাদক—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন

সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়—

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় বিল পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় উপস্থাপিত হইয়াছে। বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতির মৌলিক পরিবর্তন সাধনের একটি নীতি আলোচ্য বিলে সুস্পষ্টভাবে অভিব্যক্ত করা হইয়াছে। শিক্ষাপদ্ধতির সংস্কার সাধনের প্রয়োজনীয়তা সকলেই উপলব্ধি করিয়া থাকেন, সুতরাং প্রস্তাবিত বিলটি জনসাধারণের পূর্ণ সমর্থন লাভ করিবে, একথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। বলা বাহুল্য, বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থদুষ্ট সংকীর্ণ নীতির দ্বারা প্রভাবিত এদেশের শিক্ষাকে জাতীয় সংস্কৃতি এবং দেশের সর্বাঙ্গীণ সমুন্নতি সাধনের উপযোগী করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যেই বাঙলার মনীষিবর্গের সাধনায় এবং দেশের কল্যাণব্রতে অনুপ্রাণিত পুরুষ-প্রধানগণের বদান্যতায় যাদবপুরের শিক্ষায়তনটি প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বদেশী আন্দোলনের সংগঠনমূলক সাধনা এই প্রতিষ্ঠানের ভিতর দিয়া মূর্তি পরিগ্রহ করে। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের প্রবল প্রতিকূলতার প্রতিবেশে শিক্ষায়তনটি তৎকালে পূর্ণাঙ্গতা লাভ করিতে পারে নাই; কিন্তু বিভিন্ন বিপর্যয়ের ভিতর দিয়াও প্রতিষ্ঠানের মৌলিক আদর্শটি অদ্যাপি অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। যাদবপুর কলেজের ছাত্রসমাজ স্বদেশের মুক্তিসংগ্রামে যেমন অংশ গ্রহণ করিয়াছে, সেইরূপ জাতির অর্থনীতির পুনরুজ্জীবনের ক্ষেত্রে এই কলেজের ছাত্রেরা উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিয়াছে। এই কলেজের ছেলেরা আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়াছে, তাহার জন্য অর্থ যোগাইয়াছে, আবার এদেশের যন্ত্রশিল্পের পুনরুজ্জীবনের ক্ষেত্রে এই কলেজের ছাত্রেরাই আজ বহুমুখীন কৃতিত্বের পরিচয় দিতেছে, নদী নিয়ন্ত্রণ এবং বিভিন্ন বিভিন্ন বাঁধ পরিকল্পনাতে এই কলেজের ছাত্রেরা অংশ গ্রহণ করিতেছে। নিজেদের কৃতিত্বের জোরেই এই কলেজের প্রদত্ত ডিগ্রি সমাদর লাভ করিয়াছে। ফলত ভারতের অপর কোন বিশ্ববিদ্যালয়ই যাদবপুর কলেজের ন্যায় এমন গৌরবের দাবী করিতে পারে না। শিক্ষাব্যবস্থার যে সব ত্রুটি দূর করিবার উদ্দেশ্য লইয়া যাদবপুরের শিক্ষায়তনটি প্রতিষ্ঠিত হয়, আমরা স্বাধীনতা লাভ করিলেও সেই সব ত্রুটি মূলত নিরাকৃত হয় নাই। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় বিলটির দ্বারা সেইসব ত্রুটি দূর করিয়া শিক্ষাক্ষেত্রে অভিনব উদ্যমের সূচনা করা হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বলিয়াছেন, শিক্ষক, ছাত্র এবং প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ ইঁহাদের পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর করিবার উদ্দেশ্যে আবাসিক শিক্ষায়তনস্বরূপে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রতিষ্ঠা করাই বিলটির উদ্দেশ্য। তিনি আশা প্রকাশ করিয়াছেন যে, যাদবপুর শিক্ষায়তনের প্রতিষ্ঠাতৃগণ যে মহান উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন, আমরা যদি সেই আদর্শ হইতে চ্যুত না হই, তবে প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সাফল্যের সম্বন্ধে কোনরূপ আশংকার কারণ আছে বলিয়া তিনি মনে করেন না। আমরাও এই অভিমত পোষণ করি। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এবং তাহার গৌরবময় ঐতিহ্য এদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে যুগান্তর সাধন করুক—বৈদেশিক শাসকদের স্বার্থ-প্রভাবিত জীর্ণতার গ্লানিময় গতানুগতিক ধারা অতিক্রম করিয়া জাতির প্রাণশক্তি আত্মসংগঠনের বলিষ্ঠ প্রেরণা লাভ করুক, আমরা ইহাই কামনা করি। শিক্ষাক্ষেত্রে পুনরুজ্জীবন সাধনের সেই বৈপ্লবিক প্রেরণা যাদবপুর কলেজের পুণ্যময় প্রতিবেশ হইতেই সমুত্থিত হয়, পথপ্রদর্শক হয় পশ্চিমবঙ্গ, আমরা ইহাই দেখিতে চাই।

গোয়ার ভবিষ্যৎ

ভারত সরকার ভারতের দিক হইতে গোয়া প্রবেশের পথ পুরোপুরি রকমে বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। ব্যক্তিগতভাবে কাহাকেও গোয়ায় গিয়া সত্যাগ্রহ করিতে দেওয়া হইতেছে না। ভারতের লোকসভায় সেদিন এই সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, গোয়ার বিরুদ্ধে সরকার হইতে যে সব অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে, সেগুলি অনেকাংশে কার্যকর হইয়াছে এবং ক্রমশ আরও কার্যকরী হইবে। প্রয়োজন হইলে পরে অন্য ব্যবস্থাও অবলম্বিত হইতে পারে, কিন্তু সৈন্য বা পুলিশ অভিযান নয়। প্রধানমন্ত্রী ইহাও স্পষ্ট করিয়া

দেওয়ার অর্থ ইহা নহে যে, গোয়া সম্পর্কিত সমস্যায় সরকার শৈথিল্য প্রকাশ করিতেছেন। তিনি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ যে, তাঁহাদের অবলম্বিত ব্যবস্থা যেভাবে কার্যকর হইতেছে তাহাতে গোয়া নিশ্চয়ই পর্তুগীজ প্রভুত্ব হইতে মুক্তি লাভ করিবে। লণ্ডন হইতে প্রাপ্ত সংবাদে দেখা যাইতেছে আগামী অক্টোবর মাসে পর্তুগালের প্রেসিডেণ্ট সরকারীভাবে সেখানে যাইতেছেন। সেই সময় পর্তুগীজ প্রধানমন্ত্রী ডাঃ সালজারের সঙ্গে ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী ও ভারতীয় হাই কমিশনার শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের গোয়া সম্পর্কে আলোচনা হইতে পারে। কেহ কেহ এই আশা করিতেছেন যে, এই আলোচনার ফলে ভারতভূমি হইতে ঔপনিবেশিকবাদের শেষ চিহ্ন বিলুপ্ত হইবে। এ সম্বন্ধে নিশ্চিত কোন মতামত প্রকাশ করা অবশ্য সম্ভব নয়। পর্তুগীজেরা সদিচ্ছাপরবশ হইয়া ভারত ছাড়িয়া যাইবে আমরা ইহা বিশ্বাস করি না। যদি তাহারা ভারত ছাড়িয়া যায়, অবস্থার চাপে বাধ্য হইয়া তাহাদিগকে যাইতে হইবে। বস্তুতঃ ভারতে পর্তুগীজ শাসনের যাহাতে অনতিবিলম্বে অবসান ঘটে, দেশের লোকে ইহাই চায়। এ সম্বন্ধে সকল দায়িত্ব এখন ষোলআনা রকমে ভারত সরকার নিজেদের স্কন্ধেই লইয়াছেন। ইহা বুঝিয়া তাঁহাদের নিজেদের নীতি নিয়ন্ত্রণ করা উচিত।

বন্যার বিপদ

উড়িষ্যার সাম্প্রতিক বন্যাজনিত বিপর্যয়ে এ দেশের বিভিন্ন রাজ্যের নদী নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নটি নূতন রকমে গুরুত্ব দিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ এবং আসামে বন্যা নিরোধের যে সব ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছিল মোটামুটিভাবে সেগুলি অনেকাংশে কার্যকর হইয়াছে, অভিজ্ঞদের ইহাই অভিমত। সরকারী রক্ষা-ব্যবস্থায় ডিব্রুগড় শহর ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছে। উত্তর বঙ্গের কয়েকটি শহরেও সে ব্যবস্থায় কাজ হইয়াছে। সম্প্রতি ভারতের শিল্প-বাণিজ্য সচিব এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, হীরাকুদের বাঁধ নির্মাণের কাজ আরম্ভ হইবার ফলে উড়িষ্যার বন্যার ভয়াবহতা অনেকাংশে রুদ্ধ হইয়াছে। বাঁধ না দেওয়া হইত বন্যার ক্ষতি আরও ভীষণ আকার ধারণ করিত। বন্যার জন্য প্রতি বৎসর বিভিন্ন রাজ্য এবং কেন্দ্র সরকারকে রক্ষা-ব্যবস্থা এবং সাহায্য কার্যের বাবদ বহু অর্থ ব্যয় করিতে হয়। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বিপন্ন নরনারীকে রক্ষাকার্যে সরকার পক্ষ হইতে তৎপরতা ইদানীং উল্লেখযোগ্য আকার ধারণ করিয়াছে। সামরিক এবং অসামরিক সকল শক্তি প্রয়োগ করিয়া আর্তত্রাণ কার্যে সরকারের ক্ষিপ্রতা এবং তৎপরতা তাঁহাদের সদাজাগ্রত কর্তব্যবুদ্ধিরই পরিচয় দেয়। কিন্তু বিপদে রক্ষা কার্যের ব্যবস্থা করার অপেক্ষা যাহাতে বিপদের কারণ না ঘটে, এমন ব্যবস্থা করাই সমীচীন। বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে প্রাকৃতিক বিপর্যয় হইতে মানুষকে রক্ষা করিবার পথ বর্তমানে অনেকটা সুগম হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক শক্তি প্রয়োগের দ্বারা নদীগুলির দুর্দান্ত গতিবেগ এখন নিরুদ্ধ করা যায় এবং প্রকৃতির শক্তিকে মানুষের কল্যাণকার্যে নিয়োগ করা সম্ভব হইয়া থাকে। গত কয়েক বৎসরের অভিজ্ঞতা হইতে এই সত্য প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, ভারত কয়েক বৎসরের মধ্যেই এই বিষয়ে কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছে। বন্যা নিরোধোপযোগী যন্ত্রবিজ্ঞানবেত্তার অভাব এদেশে নাই এবং টাকা খরচ করিলে আবশ্যক যন্ত্রাদি উপকরণ সংগ্রহ করাও সহজেই সম্ভব। এরূপ অবস্থায় দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নদী-নিয়ন্ত্রণের কাজটি সর্বাগ্রগণ্য হওয়া উচিত।

আমলাতন্ত্রী মেজাজ

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস প্রণয়নের জন্য ভারত গভর্নমেণ্ট কর্তৃক একটি সম্পাদক বোর্ড গঠিত হয়। ভারত সরকারের পক্ষ হইতে শিক্ষা বিভাগের সেক্রেটারী ডাঃ এম এম দাস সেদিন লোকসভায় একরকম রূঢ় ভাষাতেই জানাইয়া দিয়াছেন যে, গভর্নমেণ্ট বোর্ডের কাজের মেয়াদ বাড়াইতেই প্রস্তুত নহেন। ডাঃ দাস বলেন, বোর্ডকে তিন বৎসরের মধ্যে কাজ শেষ করিতে বলা হইয়াছিল। তৃতীয় বৎসর শেষ হইতে চলিল অথচ এ পর্যন্ত বোর্ড শুধু উপকরণই সংগ্রহ করিয়াছেন, এমন কি, উপকরণ সংগ্রহের সেই কাজও তাঁহারা শেষ করিতে পারেন নাই। তাঁহারা এজন্য সময়ের মেয়াদ বাড়াইতে সরকারকে অনুরোধ করেন। সরকারের কিন্তু মত এই যে, মূল্যবান উপকরণ অনেক কিছুই সংগৃহীত হইয়াছে এবং বৎসরের শেষের দিকেই সংগ্রহের কাজ সম্পন্ন হইবে, এরূপ অবস্থায় সময় বাড়ানো উচিত হইবে না। সরকারের পক্ষের উত্তরের ভঙ্গীতে ইহাই মনে হয় যে, বোর্ডের মতামতকে যেন তাঁহারা ধর্তব্যের মধ্যেই আনেন না। তাঁহাদের নিজেদের বা নিজেদের কর্মচারীদের মতই বড়। এমন সব যোগ্য কর্মচারীই যদি তাঁহাদের হাতে ছিল, তবে তিন বৎসর পূর্বে সম্পাদক-বোর্ড নিযুক্ত করিবার প্রয়োজন তাঁহারা কি কারণে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, ইহাই বোঝা যায় না। বোর্ডের সম্পাদকেরা সকলেই প্রতিভাবান পুরুষ, বোর্ডের যিনি অধ্যক্ষ তিনি ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক। এই সব বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তিদের মত অগ্রাহ্য করিবার সরকারী মনোভাবের অসঙ্গতি এবং অশোভনতা সকলেই উপলব্ধি করিবেন। সরকারী এই মনোভাবে দেশের সভ্যতা এবং সংস্কৃতি সম্পর্কিত কাজ ব্যাহতই হইবে এবং এক্ষেত্রে তাঁহাদের এই ধরণের প্রভুত্ব বরদাস্ত করিয়া লওয়া আমাদের পক্ষে কঠিন। তাঁহাদের অধিকতর সমীহার সঙ্গে এসব কাজে অগ্রসর হওয়া কর্তব্য। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা করিবার পক্ষে তিন বৎসর খুব বেশী সময় নয়। ইহার অপেক্ষা অনেক কম গুরুত্বসম্পন্ন গবেষণামূলক কাজের জন্য ইহার চেয়ে অনেক বেশী সময় লাগিয়াছে ইহা আমরা জানি সুতরাং, এই সম্পর্কে ভারত গভর্নমেণ্টের সিদ্ধান্ত আমরা কোনক্রমেই সমর্থন করিতে পারি না। আমাদের মতে সরকারের পক্ষে তাঁহাদের সিদ্ধান্ত এখনও পরিবর্তন করা উচিত এবং যাহাতে বোর্ডের আরব্ধ কাজ সুসম্পন্ন হয়, তাঁহাদিগকে সে সুযোগ দেওয়া দরকার।

আলোচনা

বিজ্ঞানের বিভীষিকা

সবিনয় নিবেদন, গত ১০ই সেপ্টেম্বরের 'দেশ' পত্রিকায় শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু মহাশয়ের সময়োপযোগী প্রবন্ধটি পাঠ করে আনন্দিত হলাম। বুদ্ধির দীপ্তিতে উজ্জ্বল ও গভীর অনুভূতির স্পর্শে সজীব এই প্রবন্ধের বক্তব্য বিষয় সত্যই গুরুত্বপূর্ণ। এ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলবার আছে।

আগের দিকে যাওয়ার ঝোঁকে যে আমরা কোথায় চলেছি সে কথা ভেবে দেখবার প্রয়োজন অনেকে বোধ করেন না। মনীষী হাক্সলী তাঁর একটি উপন্যাসে (Brave New World) এই প্রগতির ভবিষ্যৎ চিত্র করুণ ও মর্মভেদী শ্লেষে স্পষ্ট করে দেখিয়েছেন। সে পৃথিবীতে ভগবান নেই—ঈশ্বরের সিংহাসনে মহামতি ফোর্ড সুপ্রতিষ্ঠিত; পারিবারিক বন্ধন নেই, পিতামাতার অস্তিত্ব নেই (কারণ মানুষ উৎপাদন করা হয় Hatchery and Conditioning Centre-এ), বিবাহ * নেই, নিষ্ঠা নেই; চরিত্রের যে গুণগুলিকে আজকের পৃথিবীতেও আমরা প্রশংসার চোখে দেখি তা A. F. 640-র পৃথিবীতে উপহাসের বিষয়। ৬৪০ ফোর্ড অব্দে বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে মানুষের সুখ সুবিধারও সীমা নেই। কিন্তু এ সুখ তো দেহের সুখ; এতে তো মনের অসুখ কমে না! তাই চরম আঘাত এল—মানুষের মনও নিয়ন্ত্রিত করা হল। তাদের চিন্তা, ধ্যান, তাদের বাসনা, তাদের স্বপ্ন সবই বৈজ্ঞানিক উপায়ে "Conditioned"! মনের এই মৃত্যুর মত এত বেশি দাম দিয়ে আমরা চাই না ঘরে ঘরে হেলিকোপ্টর পেতে, চাই না রোগ-শোক-জরা-মৃত্যুর হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে। সাংসারিক বন্ধনের মধ্যে প্রীতি স্নিগ্ধ জীবন-যাত্রায় যে আনন্দের ভাণ্ডার রয়েছে—হোক না সে জীবন আর্থিক দিক থেকে দরিদ্র, হোক না তা মৃত্যু ভয়ে শঙ্কিত, ত্রস্ত, হোক না তা বাস্তবের সঙ্গে কঠোর সংগ্রামে বিপর্যস্ত—তবু সে আনন্দের বদলে আমরা আরাম চাই না, বিবাহের পরিবর্তে বিলাস চাই না, হৃদয় না পেয়ে চাই না দেহের স্বাদ পেতে।

শ্রদ্ধেয় রাজশেখরবাবু ঠিকই বলেছেন, "মানুষ বিজ্ঞান শিখেছে কিন্তু শ্রেয়স্কর জ্ঞান লাভ করেনি, বহিঃ প্রকৃতিকে কতকটা বশে আনলেও অন্তঃ প্রকৃতিকে সংযত করতে পারেনি।" তাই ৬৪০ ফোর্ড অব্দে ওয়েলস আর উইল্কির "One World"-এর স্বপ্ন সফল হলেও সে পৃথিবীতে মানুষের পরিবর্তে যন্ত্রের বসতি, সেখানে হৃদয়ের পরিবর্তে মস্তিষ্কের রাজত্ব!

বিজ্ঞানের সাধনা যদি না কল্যাণধর্মী হয় তবে বিজ্ঞানের বিভীষিকা মানুষের মন থেকে যাবে না। কল্যাণের দেবতার প্রতি যেখানে প্রণাম নিবেদিত, সুন্দর ও শুচিতার প্রতি যেখানে মানুষের অন্তরের যোগ বিজ্ঞানকে সেই তীর্থের দিকে যাত্রা করতে হবে ভবিষ্যতের পৃথিবীর স্বার্থের খাতিরেই। ইতি—

শ্রীঅসিতকুমার বিশ্বাস, রাঁচী।

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ক রচনা

মাননীয় মহাশয়,

বীরেশ্বর বন্দোপাধ্যায় রচিত ইতিহাস ও ৬ই আগস্ট প্রবন্ধ প্রসঙ্গে দেখলাম আপনাদের পত্রিকায় দুটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। বিজ্ঞান বিষয়ক রচনা বাংলা ভাষায় এখনও বিশেষ পরিপক্কতা লাভ করেনি, সুতরাং লেখকদের প্রকাশ ভঙ্গিমার মধ্যেই লেখার সাফল্য ও পাঠকদের তৃপ্তি নির্ভর করে। 'সম্মতি-জনক' শব্দটির ব্যবহারে রচনার অর্থ ব্যাহত হয়েছে বলে ত আমার মনে হয় না।

সমালোচক পুরানো 'দেশের' পাতা উল্টালেই দেখতে পেতেন যে, এই ধরনের আন্তরিক ঘরোয়া পরিবেশ সৃষ্টির প্রচেষ্টা বীরেশ্বর-বাবুর রচনার একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

আণবিক বোমা কথাটির ব্যবহারে সমালোচক কেন যে আপত্তি দেখিয়েছেন তা বুঝতে পারলাম না। বহুল প্রচলিত এরূপ অনেক শব্দই নানা অসঙ্গতি সত্ত্বেও পৃথিবীর নানা ভাষায় গৃহীত হ'য়েছে। ইংরাজী elastic কথাটাই ধরুন না। elastic কথাটা আমরা রবারের আগেই ব্যবহার করে থাকি—বলি রবার elastic। কিন্তু খাঁটি বিজ্ঞানসম্মত অর্থে elasticity বা স্থিতি-স্থাপকতা গুণ লোহারই সবচেয়ে বেশী। কিন্তু রবারের চরিত্র বিশ্লেষণে elastic কথাটা এত চালু হয়ে গেছে যে, সেটাকে আর অসঙ্গত মনে হয় না—ইংরাজী ভাষাও তাকে স্বীকার করে নিয়েছে। আণবিক বোমা কথাটার বেলাতেও ঠিক এই কথাই খাটে। কথাটা শুনে শুনে আমাদের কান এমন হয়েছে যে সংশোধিত 'পরমাণবিক বোমা' কথাটিই কেমন যেন শোনায়। তাই বলি বাংলা ভাষা যদি একটু উদার মনোভাব দেখিয়ে এই সব চলতি কথাগুলিকে তার ভাণ্ডারে স্থান না দেয় তবে তার সাবলীল অগ্রগতি রুদ্ধ হয়ে যাবে।

আর এও বলি যে, পুরানো বহুল প্রচলিত শব্দগুলির ব্যাকরণগত ও অন্যান্য খুঁত ধরে সেগুলি খারিজ করার কাজেই যদি লেখকের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত হয় তবে লেখার উৎকর্ষ সাধনে মনোনিবেশ করবেন তাঁরা কখন? ইতি—শ্রীবিন্দুমাধব ঘোষ, ইছাপুর।

ফরাসী সংস্কৃতি সংখ্যা

সবিনয় নিবেদন,—আপনাদের ফরাসী সংস্কৃতি সংখ্যা 'দেশ' পড়লাম। শিবনারায়ণ রায়ের 'ফরাসীর জীবনবোধ ও বাঙালী লেখক' খুব ভালো লাগলো। বাঙলা সাহিত্যের আশানুরূপ সাফল্যের অভাবের কারণ লেখক ঠিকই ধরেছেন। এই সংকোচ, এই কুণ্ঠাই আমাদের যতকিছু দুর্গতির মূল। এই কারণে আমাদের fleshly school of poetry একেবারেই জলো। রবীন্দ্র-নাথকে তো এ অপবাদ কেউই দেবে না ('কড়ি ও কোমল' স্মরণে রেখেই বলছি)। এমন কি যে বুদ্ধদেবকে আঁতুড়েই নুন খাইয়ে সংহার করার প্রস্তাব উঠেছিল, সেই তিনিও এই সংস্কার-মুক্ত নন। কেনা-জানে-যে, তাঁর মতো মনেপ্রাণে রবীন্দ্রভক্ত করাঙ্গুলিগণ্য? এ প্রবন্ধ পড়ে সত্যিই যদি বাঙালী পাঠকের রুচি পাল্টায়, তবে বাঙলা সাহিত্যের শাপ-মুক্তি ঘটবে। কেন-না সাহিত্যের উজ্জীবনে সাহিত্যিকের চেয়ে পাঠকের গুরুত্ব কিছু কম নয়। বরং বলা যেতে পারে পাঠকের মুখ চেয়ে লেখেন না এমন লেখকই বিরল। এই কারণেই হয়তো সাহিত্যের স্বরাজ একান্ত আপেক্ষিক। প্রতিযুগেই তা বহুরূপী। বিনীতা—মীরা বিশ্বাস, শিবপুর (নদীয়া)।

"রবীন্দ্রনাথের কর্ণ-কুন্তী সংবাদ"

সবিনয় নিবেদন,—গত ৪৬ সংখ্যা দেশ পত্রিকায় "আলোচনা বিভাগে" বীথিকা গুহ সরকার ৩৯ সংখ্যা দেশে প্রকাশিত মন্মথনাথ ঘোষ মহাশয়ের "রবীন্দ্রনাথের কর্ণ-কুন্তী সংবাদ"-এর কয়েকটি উদ্ধৃতির আলোচনা প্রসঙ্গে এক জায়গায় লিখেছেন, "লেখক অন্য এক জায়গায় বলেছেন, রামায়ণে বর্ণিত কর্ণ-কুন্তীর......ইত্যাদি।"

কিন্তু আমরা জানি, কর্ণ-কুন্তী মহাভারতের চরিত্র—রামায়ণের নয়। পত্র লেখিকার উক্ত ত্রুটিটি অকস্মাৎ। কারণ প্রতিবাদ, সমালোচনা বা আলোচনার ভুল থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। —ইতি জয়গোপাল ভট্টাচার্য, বোকারো, হাজারীবাগ।

মনে এলো

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

॥ ২ ॥

লিওনতিয়েফ-এর বই দুখানি* আবার নাড়াচাড়া করলাম। দেরাদুনে দুমাস ধরে চেষ্টা করলাম বুঝতে। এখনও পারছি না। একটা আবছায়া ভেসে উঠছে। 'কম্পারেটিভ স্ট্যাটিক অ্যাপ্রোচ'-এর কি এই শেষ কথা? উচ্চাঙ্গের গণিতশাস্ত্রের সাহায্য ব্যতিরেকে 'ডাইনামিক' বিশ্লেষণ কি অসম্ভব? টেক্‌নিক্যাল কো-এফিশিয়েণ্টগুলি আমাদের দেশের সব শ্রম-শিল্পে কি পাওয়া যাবে? ব্যাপারটা প্রধানত ইঞ্জিনীয়ারিংএর। অর্থনীতির সঙ্গে ইঞ্জিনীয়ারিংএর সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠভাবে স্থাপিত হোলো। কুটির-শিল্পের 'ইনপুট-আউটপুট' বিশ্লেষণ কিভাবে হবে? মাঝারি আয়তনের শ্রম-শিল্পগুলির? যন্ত্রপাতিগুলোও ত' আদ্যিকালের। টেক্‌নিক্যাল কো-এফিশিয়েণ্ট বা গুণক বার করতে টেক্‌নিক্যাল সমধর্মিত্ব ধরে নিতে হয় না কি? পরিশ্রমকে না হয় সম-হারে পরিণত করা গেল,—যথা খুব সুদক্ষ মজদুরি অদীক্ষিত পরিশ্রমের তিনগুণ, চারগুণ। কিন্তু যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে কি বলা যায় যে, আধুনিকতম মেশিনটি হাতুড়ির চেয়ে দশগুণ কি বিশগুণ কর্মঠ? ওদের জাতই আলাদা, কাজই আলাদা। এই ধরনের মূল্য পরিবর্তন ও ব্যবস্থাপনে আমার মন সায় দেয় না। অথচ উপায় নেই। আপেক্ষিক মূল্যের ব্যাপারেও একটা গলদ রয়েছে সন্দেহ হয়। রাশিয়ার প্ল্যানিংএ 'ইন্‌পুট-আউটপুট' বিশ্লেষণের ব্যবহার হয় না, যতদূর জানি। তবু সেখানে ভুলের অবকাশ খুবই অল্প শুনেছি। এতদিনের আন্দাজে ওরা মোটামুটি একটা কার্যকরী খসড়া দাঁড় করায়। কিন্তু অত ভুল, এত পরীক্ষা কি আমরা বরদাস্ত করতে পারব? ওদের চাপ ছিল বাইরের ও ভেতরের এক সঙ্গে—আমাদের প্রধানত ভেতরের। তাই বোধ হয় রাশিয়ান প্ল্যানিংএর ভুল-দোষগুলি কাটিয়ে উঠতে পারা যাবে। সহজে নয় অবশ্য। খুবই দেরী লাগবে।

এই ধরনের অর্থনীতিক বিশ্লেষণের বিপক্ষে উপায় ও সঙ্গতির নির্দেশকরণ সংক্রান্ত তর্ক অবাস্তব। নির্দেশকরণের জন্যই বিশ্লেষণ। কিন্তু এতে বণ্টনের থিওরি নেই। এতে মজুরি, সুদ ও মুনাফা হচ্ছে 'অ্যাজ গিভ্‌ন'। অথচ 'গিভ্‌ন' বলেই ত উড়িয়ে দেওয়া চলে না! মানুষের মনুষ্যত্ব প্রভৃতি কথা ছেড়ে দিচ্ছি। কিন্তু মানুষের আয়-ব্যয় ত' আছে! আয়কে কর্মের ভেতর ঢুকিয়ে দিলেই কি সমস্যার সমাধান হবে? টাকা, আয়-ব্যয় এদের প্রয়োজন হয়ত প্রাথমিক নয়, কিন্তু প্রাথমিক নয় বলেই কি উড়িয়ে দেওয়া চলে? আমার ধারণা, কীন্‌সের বিশ্লেষণের সঙ্গে লিওনতিয়েফের বিশ্লেষণের পার্থক্য স্তরের পার্থক্য, মৌলিক নয়। ভেবে দেখতে হবে। ভারি মজার ব্যাপার—সমস্যা ছিল এতদিন কীন্‌স্‌ ও মার্কসের সম্পর্কে।

---

*The Structure of American Economy: L and others—Studies in the Structure of American Economy.

থিওরিয়েকের প্রবেশে সমস্যাটি তেকোণা হয়ে উঠল। সমাধান হবে কর্মক্ষেত্রে—অধ্যাপকের কৃপায় নয়। সেই আদিম থিওরি ও প্র্যাকটিসএর ঝগড়া। এর নিষ্পত্তি চার্লস পিয়ার্স করতে পারেননি, মার্কসিজমের মধ্যেও নেই। ডায়েলেক্‌টিক-এর সাহায্যেও নিষ্পত্তি হয় না, একটা মনগড়া ব্যাখ্যা হয়।

*

আন্তর্জাতিক সমাজ-বিজ্ঞান বুলেটিন-এর চতুর্থ খণ্ড (১৯৫৪) চতুর্থ সংখ্যাটিতে গণিত ও সমাজ সংক্রান্ত বিদ্যার সম্বন্ধে অনেকগুলি গভীর প্রবন্ধ দেরাদুনে বসে পড়লাম। Leon Festuiger লিখছেন:

"One might ask why mathematics, representing as it does, a powerful aid to theoretical reasoning, is not used all the time. The difficulty lies in the fact that one must know exactly and specifically what one is talking about and what one is saying before it can be stated in terms amenable to mathematical techniques. In other words, before mathematics can be used as an aid to theoretical thinking, the theory in question must be very specific and unambiguous."

এই দুটো শর্ত, নির্দিষ্টতা আর সুনিশ্চয়তা যদি কোন থিওরীতে পূরণ হয়, তবেই সেখানে গণিতের ব্যবহার চলবে এবং অন্যদিকে গণিতের ব্যবহার যদি অচল হয়, তবে বুঝতে হবে থিওরীটি নিতান্ত ভাসা ভাসা, ধোঁয়াটে, অ-বিশেষ। সমাজতত্ত্বের থিওরী ঘোলা; অর্থনীতিক থিওরি অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার। প্ল্যানিং মাত্র আর্থিক নয়, অন্তত ভারতবর্ষের পক্ষে খুবই সামাজিক ব্যাপার ও ঘোলাটে। এই বিষয়গত পার্থক্যই কি অর্থনীতির থিওরি ও সামাজিক ব্যবহার, দুএর মধ্যে অসামঞ্জস্যের হেতু? আমাদের সমস্যাগুলোই দ্ব্যর্থবাচক, অপরিষ্কার ও অনির্দিষ্ট—তা না হয়েই যায় না! অতএব থিওরি ও ব্যবহারের বিবাদ আরো কিছুদিন চলবে—যতদিন পর্যন্ত যান্ত্রিক সভ্যতার চাপে সমস্যার ছাঁচ সহজে তৈরী না হয়, মানুষ সংখ্যায় পরিণত না হয়। প্রশ্ন উঠছে—সেটা কি সুদিন? এর উত্তর জানি না। অনুভব করি, নয়। অথচ ইতিহাসের গতি কি ক'রে অমান্য করি! ঐ দিকেই ভারতবর্ষ চলেছে! বোধ হয় কাপুরুষতা।

বুদ্ধিজীবীর কাজ কি ইতিহাসের গতির ওপর ব্রেক্ কষা? বাঞ্ছিত পথে চালাবার শক্তি যখন নেই, তখন আর কি সম্ভব? মোটর যে চালায়, সেই ব্রেক কষে। বুদ্ধিজীবীরা না চালিয়ে ব্রেক্ কষতে চান। তাই বেচারীদের এমন দুর্দশা।

২১-৭-৫৫

যে প্রবন্ধটি আমেরিকান পত্রিকার জন্য পাঠিয়েছি, তার মধ্যে একাধিক জায়গায় ফাঁকি আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনটেলেকচুয়ালদের আমি পাশ কাটিয়ে গেলাম। বিদেশীর কাছে নিজেদের কেচ্ছা গাইতে লজ্জা হোলো। লজ্জা এলো দেখে আরো লজ্জিত হলাম। মনোমোহন ঘোষ রবিবাবুকে বলেছিলেন, 'living apologetically'—আমাদের সকলের অবস্থাই তাই। সবই লজ্জিত হয়ে, পরের কৃপায় বেঁচে আছি। অন্য দেশে সমাজে ও সরকারের কাছে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের সম্মান আছে। এখানে অল্প কয়েকদিন হোলো বৈজ্ঞানিক ও অর্থনীতিজ্ঞদের কিছু খাতির হচ্ছে সরকারের কাছে। অনেকেই দিল্লী ছুটছেন। কিন্তু আমি জানি ভেতরকার কথা। বাইরে কোঁচার পত্তন, ভেতরে ছুঁচোর কীর্তন। বিশ্ববিদ্যালয়ে, কলেজে আমরা প্রত্যেক অড ম্যান আউট—শিকাগো বৈজ্ঞানিকদের ভাষায় 'মার্জিনাল' জীব। ধোবিকা কুত্তা,—না ঘরকা, না ঘাট্‌কা। ভারতবর্ষের বুদ্ধিজীবীরা মধ্যবিত্তের একটি অংশ,—ইংরেজী-শিক্ষিত, ইংরেজী চিন্তায় লালিতপালিত, দেশ সম্বন্ধে অজ্ঞান এবং স্বাধীন চিন্তায় অক্ষম। এই আমার তেত্রিশ বৎসরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা। পুরানো ব্রাহ্মণশ্রেণী গত, নতুন ব্রাহ্মণ সৃষ্টি হবার পূর্বেই পলিটিশিয়ানের প্রাদুর্ভাব। যুবকদের আদর্শ টাইপ পণ্ডিত নয়, উচ্চ কর্মচারী হয় সরকারের না হয় বড় ব্যবসার। অনেকখানি আমাদের নিজেদেরই দোষ। খুবই আফ্‌সোস হয়, কারণ তেজ ছিল বিদ্যাসাগরের, বিবেকানন্দের। রবীন্দ্রনাথের, রামেন্দ্রসুন্দরের, অশ্বিনীকুমারের, সতীশবাবুর, আরো অনেকের তেজ তো স্বচক্ষে দেখেছি। তাঁরা বলতে পারতেন, 'এ হয় না'। আর এখনও একাধিক বিখ্যাত পণ্ডিত, বাঙালী পণ্ডিত, বাঙলার বাইরে রয়েছেন। তাঁদের পক্ষে সবই সম্ভব। এমন নীচতা নেই, যেটা নিজেদের দরকার হলে তাঁরা করতে পারেন না। কথাটা ব্যক্তিগত মোটেই নয়। বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর পয়সা কোথাও থাকে না—এক রাশিয়ায় ছাড়া। অতএব কেবল আত্মসম্মানবোধটাই তাঁদের পুঁজি। আমার পুরানো অর্ধপণ্ডিত পণ্ডিত মশাইএর এঁদের চেয়ে বেশী চরিত্র ছিল। বিধবা বিবাহের সমর্থনের জন্য তাঁকে পাঁচশ' টাকার লোভ দেখান হয়। তিনি প্রস্রাব করতে উদ্যত হন। ভাষাটা অ-সংস্কৃতই ছিল। তখন তাঁর মাসিক বেতন ৩০৲।৩৫৲ মাত্র, যতদূর মনে পড়ে, এবং তাঁর স্ত্রী তখন বাতে ভুগছেন। সে যুগের অন্যান্য বহু দোষ ছিল, কিন্তু গ্রামের মাস্টারদেরও তেজ ছিল, তাই সম্মানও ছিল। আমার বিশ্বাস, এখানে বুদ্ধিজীবীদের কোন ভবিষ্যৎ নেই। প্ল্যানিং কমিশন যদি দীর্ঘ মেয়াদ

পরিকল্পনার পৃথক বন্দোবস্ত করেন, তবে বোধ হয় কিছুটা হতে পারে। এখনকার সরকারী বুদ্ধিজীবীরা মাত্র কেরানী, 'ব্যাক্‌-রুমে বয়েজ'।

অর্থনীতির দিক থেকে ব্যাপারটা কেবল 'ফুল এমপ্লয়মেণ্ট'-এর নয়। সমাজের কাজ পাবার অধিকারের। অর্থাৎ, জন্মালেই কাজ জুটবে এবং নিজের রুচি অনুযায়ী কাজ এবং যে কাজের বেতন জীবনযাত্রার পক্ষে মাত্র যথেষ্ট নয়, অবসরের জন্যও যথেষ্ট। এবং অন্য বেতনের কিংবা রোজগারের তুলনায় এমন কম নয়, যাতে শ্রেণীবোধ ফুটে উঠতে পারে। দেশ ত' এগুচ্ছে সমাজতান্ত্রিক আদর্শের দিকে শুনেছি। দোখ মাস্টার মশাইদের হাল কি হয়! আপাতত গ্রামের মাস্টারমশাই সরকারী পিওনদের চেয়ে অনেকক্ষেত্রে কম পান। পিওন-গিরীও দরকারী কাজ এদেশে—কারণ 'অফ্‌সার' সাহেবরা ফাইল বইতে পারেন না, তাঁদের গৃহিণীরা তরকারি কিনতে বাজারে যেতে পারেন না, ইত্যাদি। আমাদের সরকারী কাজটাও ত' 'লেবার ইনটেনসিভ'। দেশে অসংখ্য লোক; এবং ম্যালথস্‌ সাহেব আধিক্য কমাবার জন্য লোক-লস্কর রাখতে উপদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু দেশের শিক্ষা বিস্তার, চিন্তা বিস্তার—এগুলিও কম প্রয়োজনীয় নয়। একে একে সবই হবে, আগে হোক আন্তর্জাতিক স্টেটাস, পরে দেখা যাবে ইনটেলেকচুয়াল স্টেটাস! এই ধরনের যুক্তি ও আচরণের দোষ কাল-প্রত্যয়ে। ইতিহাসের সময় রেখমত চলে না। ঘটনাগুলো গোছার মতন ঘটে। Innovations occur in clusters—শুম্‌পীটার তাই বলেন নি কি?

আমাদের ইতিহাসে ইনোভেশ্যন, নতুন জিনিসের 'রোল'টা কি?

*

যদি আমাদের ধারণা এই হয় যে, সব সমস্যাই মূলত সামাজিক অর্থাৎ সমাজ না বদলালে কিছুই হবে না, তখন নতুন ইনটেলেকচুয়ালদের নজর পড়বে কোন্‌ পরিস্থিতিতে কি ধরনের ব্যবহার উপযোগী হবে তারই ওপর। ভাবের ওপর নয়, চিন্তার ওপর নয়, প্রকাশ-শৈলীর ওপরও নয়।

রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস-চিন্তা

শ্রীনির্মলচন্দ্র সিংহ

অতি সম্প্রতি ইতিহাসবিদ্যাকে নতুন দৃষ্টিতে আলোচনার চেষ্টা চলছে। পূর্বে ইতিহাসের কাহিনী ছিল প্রধানত রাজাবাদশাদের কাহিনী, তাঁদের নানাবিধ দেশজয় ও শত্রুনিপাতের ইতিহাস। কিন্তু রাজাবাদশা ছাড়াও যে একটা বিরাট দেশ আছে, বিপুল জনসাধারণ আছে, সুখেদুঃখে স্পন্দিত তাদের বিচিত্র জীবনযাত্রা আছে, তাদের সমাজগঠন আছে, রাজনীতি ছাড়াও তাদের জীবনে নানাবিধ প্রভাব আছে—এসব কথা ইতিহাসে স্থান পেত না। অথচ যে কোনও দেশের ইতিহাসে এই দিকটাই বেশী গুরুত্বপূর্ণ, সেবিষয়ে আজ আর কোনও সন্দেহ নেই। এ কথা ভারতবর্ষের মত দেশের পক্ষে আরও বেশি প্রযোজ্য। আলোচ্য গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ইংলণ্ডে ডেন স্যাকসন নর্মানদের কাড়াকাড়ি ছেঁড়াছেঁড়ির বৃত্তান্তে ইতিহাসের মূর্তি প্রকট নয়।

"কিন্তু ইংলণ্ডে যখন হইতে জাতি গড়িয়া উঠিতে লাগিল, নানা শক্তির মন্থনে যখন হইতে দেশের চিত্ত সজাগ হইয়া আপনার লক্ষ্য নির্ণয় ও তাহার পথ পরিষ্কার করিতে প্রবৃত্ত হইল, তখন হইতে ইংলণ্ডের ইতিহাস যেন দেহ ধারণ করিল এবং এই ইতিহাস মানুষের শিক্ষার বিষয় হইয়া উঠিল।" তা-ছাড়া আরও একটি কথা আছে। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশ ভারতবর্ষের মত বিরাট বিচিত্র দেশ নয়, তা ছাড়া রাজাবাদশাদের উত্থানপতন ছাড়া সমাজের মূলশক্তি সমাজের মধ্যেই নিহিত ছিল না। "স্বদেশী-সমাজ" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ এই কথাটাই বলেছেন, যে আমাদের দেশের মূলশক্তি রাষ্ট্রীয় উত্থানপতনের মধ্যে ততখানি নিহিত ছিল না, যতখানি ছিল সমাজে। ইংলণ্ডে তা হয় নি, কেননা সমাজের শক্তি ও দ্বন্দ্বই রাজাপ্রজার সম্বন্ধের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের কথায় "নর্মানে স্যাকসনে মিলিয়া ইংরেজ যখন এক হইয়া গেল, যখন তাহাদের মধ্যে সমাজভেদ রহিল না, তখন তাহাদের মধ্যে একটা বড়ো ভেদ রহিল—রাজার সঙ্গে প্রজার স্বার্থের ভেদ।...সেই ভেদ বিলুপ্ত করিয়া রাজশক্তিতে নানাপ্রকার বাঁধ বাঁধিয়া পরস্পরের সামঞ্জস্য সাধনের ইতিহাসই ইংলণ্ডের ইতিহাস। অর্থাৎ, ইংলণ্ডের যে সমস্যা প্রধান ছিল সেই সমস্যার সমাধান লইয়াই তাহার ইতিহাসের পরিণতি ঘটিয়াছে।" পূর্বেই বলা হয়েছে, ভারতবর্ষের ইতিহাস এ-ধরনের ইতিহাস নয়। সেজন্য যদি আমরা অন্য পদ্ধতিতে ভারতবর্ষের ইতিহাস আলোচনা না করি তাহলে আমরা ভারতবর্ষের ইতিহাসই খুঁজে পাব না। রবীন্দ্রনাথেরই কথায় "ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় দফতর হইতে তাহার রাজবংশমালা ও জয়পরাজয়ের কাগজপত্র না পাইলে যাঁহারা ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে হতাশ্বাস হইয়া পড়েন এবং বলেন, যেখানে পলিটিক্স নাই সেখানে আবার হিস্ট্রি কিসের, তাঁহারা ধানের খেতে বেগুন খুঁজিতে যান এবং না পাইলে মনের ক্ষোভে ধানকে শস্যের মধ্যেই গণ্য করেন না। সকল খেতের আবাদ এক নহে, ইহা জানিয়া যে ব্যক্তি যথাস্থানে উপযুক্ত শস্যের প্রত্যাশা করে সেই প্রাজ্ঞ।"

সেইজন্য আজকের দিনে ইতিহাসবিদ্যা বা হিস্টিরিয়োলজি আর মোটেই রাজাবাদশাদের কীর্তিকলাপে সীমাবদ্ধ নেই। তার প্রধান ঝোঁক পড়েছে মানুষের উপর। মানব-সভ্যতার বিকাশ হিসেবেই তার অনুশীলন শুরু হয়েছে। এই অনুশীলনের ফলে তার বহুদিকে প্রসার ঘটছে—বস্তুত তা ঘটতে বাধ্য, কেননা তা না হলে এই ব্যাপক পটভূমিকায় তার চর্চা হতে পারে না। প্রথম, সে চর্চা, পূর্বেই বলেছি, রাজাবাদশা ছেড়ে মানবসমাজ ও মানবসভ্যতার চর্চা হতে চলেছে। দ্বিতীয়, এই থেকেই স্বভাবতই ঝোঁক পড়েছে মানবসমাজ ও সভ্যতার ব্যাপক অনুশীলন করতে হলে কেবল যুদ্ধবিগ্রহ রাজ্যজয় ছাড়া আরও বহু জিনিসকে ইতিহাসের সঙ্গে মেলাবার উপর। যেমন শিল্পকলা। মানবসমাজের ও সভ্যতার বিবর্তনে যুদ্ধবিগ্রহের চেয়ে শিল্পকলার বিবর্তনও ইতিহাসের কম বড় সাক্ষী নয়। অথবা সমাজবন্ধন বা সমাজবিন্যাস। যাযাবর যুগে যে সমাজবিন্যাস থাকে কৃষিযুগে তা থাকে না, আবার শিল্পযুগে তার চেহারা অন্যরকম। আবার বিভিন্ন দেশের চেহারা অনুসারে তার চেহারা বিভিন্ন। এমন কি ভূতত্ত্ব-নৃতত্ত্বও এই চর্চার সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে। ভৌগোলিক সংস্থান ইতিহাসকে অনেক সময়ই নিয়ন্ত্রিত করে, নৃতত্ত্বও। কাজেই যখনই মানবসভ্যতা ও সমাজের বিবর্তনস্বরূপে ইতিহাসকে দেখবার ঝোঁক পড়ল, তখনই সে চর্চা অত্যন্ত ব্যাপক হয়ে দাঁড়াল, তখনই নিছক সাল-তারিখের হিসাবের সঙ্গে এইসব নানা বিদ্যা সংযুক্ত হয়ে গেল। কাজেই এই দিকে প্রথম প্রসার ঘটল ইতিহাসবিদ্যার—বহু শাস্ত্র বহু দিক হতে

মানুষকে বোঝবার চেষ্টাই তার প্রধান হয়ে উঠল। দ্বিতীয়ত, এরই থেকে আরও একটি দিকে সে প্রসারিত হতে থাকল। মানুষের সভ্যতা এক বিরাট ব্যাপক বস্তু, শেষ পর্যন্ত ভেবে দেখলে দেখা যায়, কোনও মানুষ বা কোনও দেশই স্থান ও কালের হিসেবে একেলা নেই। এর বর্তমান অতীতের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন তৈলধারাবৎ অভঙ্গপ্রক্রমে সংযুক্ত, আর এই জগতে বস্তুত সে একলাও নেই। টয়েনবী তাঁর বিখ্যাত ইতিহাস-গ্রন্থের গোড়ায় লিখেছেন, গত কয়েক শতাব্দী ধরে নেশন-স্টেট খুব বেড়ে ওঠার ফলে ঐতিহাসিকেরা সাধারণত জাতিগত রাষ্ট্রের ইতিহাস-চর্চাতেই তাঁদের আলোচনা সীমাবদ্ধ করে রাখেন। কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গী যে কত সঙ্কীর্ণ, অতএব ভুল, তা ইংলণ্ডের উদাহরণ আলোচনা করলেই বোঝা যাবে। একালে যত জাতিগত রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে, তার মধ্যে ইংলণ্ডই যে সবচেয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই ইংলণ্ডেও কি দেখি? একাল হতে পেছিয়ে পেছিয়ে গেলে দেখা যায়, ইংলণ্ডের ইতিহাসের খুব কয়েকটি বড় ঘটনা হলঃ— (১) শিল্পব্যবস্থার প্রচলন এবং তদনুযায়ী সমাজ গঠন (অষ্টাদশ শতকের শেষ পাদ হতে); (২) পার্লামেন্টারী শাসনপদ্ধতির প্রতিষ্ঠা (সপ্তদশ শতকের শেষ পাদ হতে); (৩) বহির্বিশ্বে বিস্তার (ষোড়শ শতাব্দীর তৃতীয় পাদ হতে প্রথমে জলদস্যুতা, পরে ক্রমে জগংজোড়া বহির্বাণিজ্য); (৪) রিফর্মেশন (ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদ হতে); (৫) রেনেশাঁস (পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ পাদ হতে); (৬) ভূমিজ ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা (একাদশ শতাব্দী হতে) এবং (৭) পশ্চিমী খৃষ্টধর্মের প্রতিষ্ঠা এবং হিরোয়িক যুগের বিলোপ (ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষের দিক্ হতে)। এখন বাস্তবিকপক্ষে এর কোনটাই কি ইংলণ্ডের একান্ত নিজস্ব? যেমন ভূমিতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা। ভিনোগ্রাডভ দেখিয়েছেন, এর বীজ ইংলণ্ডের মাটিতে পূর্বেই উপ্ত হয়েছিল, কিন্তু যে কারণে তা দ্রুত দানা বাঁধল, তা হল ডেনদের আক্রমণ। আবার এই ডেনদের আক্রমণও একটা আকস্মিক ঘটনা নয়, তা হল স্ক্যাণ্ডিনেভীয়দের দিগ্বিজয়ের একটা ধারা মাত্র, যার অন্যান্য ধারা পৌঁছেছিল ফরাসী দেশেও। অথবা রেনেশাঁসের কথা। ইটালীকে বাদ দিয়ে কেবল ইংলণ্ডের নবজীবনের কথা ভাবা চলে? সুতরাং এইসব কথা আলোচনা করে টয়েনবী বলেছেন, এইসব কারণ বহুবিস্তৃত বহু বিচিত্র এবং সুদূরপ্রসারী। সেই ব্যাপক পটভূমিকায় এর আলোচনা করতে হবে।

("The forces in action are not national but proceed from wider causes, which operate upon each of the parts and are not intelligible in their partial operation unless a comprehensive view is taken of their operation throughout the society").

টয়েনবী আরও বলেছেন, ভূতাত্ত্বিক গবেষণা আজ যে পর্যায়ে পৌঁছেছে, তাতে আর শতাব্দীর হিসাবে ইতিহাস না মেপে শত কোটি বছরের মাপে ইতিহাস মাপবার প্রয়োজন হয়েছে— [illegible]

মিশরীয় সভ্যতা ও বর্তমান সভ্যতা তো প্রায় সমকালীন এবং সগোত্র! সুতরাং আজকের দিনে ইতিহাসের প্রকৃত চর্চা করতে গেলে মানুষের ইতিহাসই চর্চা করতে হবে এবং তার জন্য একদিকে যেমন সাল-তারিখের সাক্ষ্যপ্রমাণের সঙ্গে সমাজশাস্ত্র-শিল্পশাস্ত্র, নৃতত্ত্ব-ভূতত্ত্বের সাক্ষ্যপ্রমাণকেও মেলাতে হবে, অন্যদিকে তার পরিধি ব্যাপকতর করে দিয়ে মানব-সভ্যতার বিবর্তনের একটি দিক হিসেবে তার আলোচনা করতে হবে। এ না হলে সত্যকারের ইতিহাসের চর্চা হয় না।

এই ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গীতে ইতিহাসের চর্চা য়ুরোপের নানা দেশ সম্বন্ধে কিছু কিছু হলেও প্রাচ্য-ভূখণ্ড সম্বন্ধে বিশেষ কেউই করেন নি। অথচ, প্রাচ্য-ভূখণ্ড সম্বন্ধেই এরকম আলোচনার অবসর সম্ভবত বেশী। প্রাচ্য ভূখণ্ডের ইতিহাস প্রাচীনতর, তার আয়তন আরও অনেক বিশাল, তার সমাজগঠন এবং জীবন-স্পন্দন আলাদা। নেশন-স্টেট এখানে গড়ে তেমন ওঠেনি, বরং একটি রাষ্ট্রের মধ্যে বহু জাতি উপজাতির মেলা। কাজেই এখানে রাষ্ট্র ছাড়াও সমাজের অন্য একটা স্থিতি ও গতি আছে। এই হিসেবে প্রাচ্য-ভূখণ্ড সম্বন্ধে এইরকম ব্যাপকভঙ্গীর ইতিহাসের চর্চা আরও বেশী প্রয়োজনীয়।

রবীন্দ্রনাথ ইতিহাস সম্বন্ধে নানা সময় যেসব লেখা লিখেছিলেন, সেই সব লেখা একত্রিত করে বিশ্বভারতী আলোচ্য গ্রন্থে প্রকাশ করেছেন। অনেকগুলি প্রবন্ধই অনেককাল আগে লেখা (প্রথমটি বাঙলা ১৩০৯ সালে—তিপ্পান্ন বছর আগে): যে সময় ইতিহাস-বিদ্যা নতুন রূপে ধারণ করে নি। অথচ আশ্চর্যের বিষয়, রবীন্দ্রনাথ এই বইটিতে আগা-গোড়া তো বটেই, বিশেষ করে প্রথম প্রবন্ধে, এই কথাই বলতে চেয়েছেন যে, কেবল রাজাবাদশাদের কার্যকলাপের তালিকাই ইতিহাস নয়। রবীন্দ্রনাথ বলছেন:—

> "ঝড়ের দিনে ঝড়ই যে সর্বপ্রধান ঘটনা, তাহা তাহার গর্জন সত্ত্বেও স্বীকার করা যায় না। সেদিনও সেই ধূলিসমাচ্ছন্ন আকাশের মধ্যে পল্লীর গৃহে গৃহে যে জন্ম-মৃত্যু সুখ-দুঃখের প্রবাহ চলিতে থাকে, তাহা ঢাকা পড়িলেও মানুষের পক্ষে তাহাই প্রধান। ....যে সকল দেশ ভাগ্যবান, তাহারা চিরন্তন স্বদেশকে দেশের ইতিহাসের মধ্যেই খুঁজিয়া পায়........ আমাদের ঠিক তাহার উল্টা। দেশের ইতিহাসই আমাদের স্বদেশকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। মামুদের আক্রমণ হইতে লর্ড কার্জনের সাম্রাজ্য-গর্বোদ্‌গারকাল পর্যন্ত যে কিছু ইতিহাসকথা তাহা ভারতবর্ষের পক্ষে বিচিত্র কুহেলিকা......সেই অন্ধকারের মধ্যে নবাবের বিলাস-শালার দীপালোকে নর্তকীর মণিভূষণ জ্বলিয়া ওঠে; বাদশাহের সুরাপাত্রের রক্তিম ফেনোচ্ছ্বাস উন্মত্ততার জাগররক্ত দীপ্ত নেত্রের ন্যায় দেখা দেয়। সেই অন্ধকারে আমাদের প্রাচীন দেবমন্দির সকল মস্তক আবৃত করে এবং সুলতান-প্রেয়সীদের শ্বেতমর্মররচিত কারুখচিত কবরচূড়া নক্ষত্রলোক চুম্বন

করিতে উদ্যত হয়।......তাহাকে ভারতবর্ষের ইতিহাস বলিয়া লাভ কী? তাহা ভারতবর্ষের পুণ্য-মন্ত্রের পুঁথিটিকে একটি অপরূপ আরব্য উপন্যাস দিয়া মুড়িয়া রাখিয়াছে।"

এইদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে কবি আরব্য উপন্যাসের পুঁথি মুড়ে ভারতবর্ষের মর্মস্থলে প্রবেশ করবার চেষ্টা করেছেন। যেখানে কেবল নর্তকীদের মণিভূষণ ঠিকরে ওঠে না, বাদশাদের সুরাপাত্রের রক্তিম ফেনোচ্ছ্বাস নেই, যেখানে সত্যকার ভারতবর্ষ, সেখানে এই দীর্ঘকাল বিবর্তনের মধ্যে কিছু মূল সূত্র আছে কি? এক কথায় তা বলা খুব কঠিন, কেননা "ইংরাজ বল, ফরাসী বল, কোন দেশের লোকই আপনার দেশীয় ভাবটি কী, দেশের মূল মর্মস্থানটি কোথায়, তাহা এক কথায় ব্যক্ত করতে পারে না; তাহা দেহস্থিত প্রাণের ন্যায় প্রত্যক্ষ সত্য, অথচ প্রাণের ন্যায় সংজ্ঞা ও ধারণার পক্ষে দুর্গম।" কিন্তু তবুও মোটামুটি বলা যায়, ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রধানতম লক্ষণ কি। রবীন্দ্রনাথের মতে—

"ভারতবর্ষের চিরদিনই একমাত্র চেষ্টা দেখিতেছি, প্রভেদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা, নানা পথকে একই লক্ষ্যের অভিমুখীন করিয়া দেওয়া এবং বহুর মধ্যে এককে নিঃসংশয়রূপে অন্তরতররূপে উপলব্ধি করা, বাহিরে যে সকল পার্থক্য প্রতীয়মান হয়, তাহাকে নষ্ট না করিয়া তাহার ভিতরকার নিগূঢ় যোগকে অধিকার করা।"

এক কথায় সূত্রাকারে ভারতেতিহাসের মর্মকথা বলা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। রবীন্দ্রনাথ যে সূত্র উপস্থাপিত করেছেন, তাই নিয়েও বহু তর্ক উঠতে পারে। বিশেষত যাঁরা বিশ্বাস করেন যে, সামাজিক দ্বন্দ্বই ইতিহাসের গতি (এবং অগ্রগতিরও) কারণ, তাঁরা এই সূত্র সম্বন্ধে সংশয়াকুল প্রশ্ন তুলতে পারেনঃ তবে কি ভারতবর্ষে ধনী-নির্ধনের দ্বন্দ্ব নেই, সমাজে অত্যাচারী অত্যাচারিতের দ্বন্দ্ব নেই? এমনতর কুসংস্কারজনিত দেশ,

সচেতনতা নেই, যেখানে ধর্মের নামে বা অর্থের জোরে খুব সহজেই একদল মানুষ অন্য সকলের উপর কর্তৃত্ব করতে পারে, সে দেশে ঐক্য কি সত্যকারের ঐক্য, না একদলের উপর অপর আর একদলের প্রতিকারহীন প্রতিবাদহীন অত্যাচার? এসব প্রশ্ন সহজেই উঠতে পারে, রবীন্দ্রনাথও এসব কথা বার বার বলেছেন। তবু ভারত ইতিহাসের বৃহত্তর পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের মর্মকথা ঐভাবেই স্থির করেছেন নানা যুক্তির ভিত্তিতে। তার একটা কারণ, আমাদের সমাজের মূল পশ্চিমের মত কেবল রাষ্ট্রেই প্রতিষ্ঠিত নয়।

"যাহারা পরকে একান্ত পর বলিয়া সর্বান্তঃকরণে অনুভব না করে, তাহারা রাষ্ট্রগৌরব লাভকে জীবনের চরম লক্ষ্য বলিয়া মনে করিতে পারে না। পরের বিরুদ্ধে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার যে চেষ্টা, তাহাই পোলিটিক্যাল উন্নতির ভিত্তি; এবং পরের সহিত আপনার সম্বন্ধ-বন্ধন ও নিজের ভিতরকার বিচিত্র বিভাগ ও বিরোধের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা, ইহাই ধর্মনৈতিক ও সামাজিক উন্নতির ভিত্তি।

য়ুরোপীয় সভ্যতা যে ঐক্যকে আশ্রয় করিয়াছে, তাহা বিরোধ-মূলক; ভারতবর্ষীয় সভ্যতা যে ঐক্যকে আশ্রয় করিয়াছে, তাহা মিলনমূলক।"

দ্বিতীয়ত রবীন্দ্রনাথ এই পূর্বপক্ষ স্থাপনায় জন্য ইতিহাসের অনেক সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থিত করেছেন। দ্বিতীয় প্রবন্ধে তার সবিশেষ আলোচনা আছে। যেমন প্রথম যুগে ভারতবর্ষের ইতিহাসে দেখা গেল আর্য-অনার্যের বিরোধ। কিন্তু সেই বিরোধেও ক্রমে একটি মিলনের সেতু রচিত হল, তার প্রধান সেতুকার হলেন জনক বিশ্বামিত্র ও রামচন্দ্র। এর মধ্যেও অন্য আরও দ্বন্দ্ব ছিল যেমন, ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয়ের দ্বন্দ্ব। কিন্তু ব্রাহ্মণদের নেতা বশিষ্ঠ রামচন্দ্রের কুল-পুরোহিত হলেও রামচন্দ্র বিশ্বামিত্রের অনুসরণ করে বেরোলেন বালকবয়সে, যে বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয়দের তরফ থেকে লড়াই করছেন ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে। সেই রাম আবার সহধর্মিণীরূপে গ্রহণ করলেন হলকর্ষণজাতা সীতাকে—ভঙ্গ করলেন শবরদেবতা শিবের হরধনু। এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ একটি অত্যন্ত চমৎকার রূপকের সন্ধান পেয়েছেন। আরণ্য-সভ্যতা ও কৃষিসভ্যতার মধ্যে দ্বন্দ্ব চিরন্তন—কৃষির বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে অরণ্যের সঙ্কোচ অবশ্যম্ভাবী। রাম আরণ্যকের দেবতার ধনু ভঙ্গ করলেন, কৃষি-লক্ষ্মীকে নিয়ে গেলেন বনে, রাক্ষসেরা সে লক্ষ্মীকে হরণ করল, কিন্তু রাম তাদের পরাস্ত করলেন। অথচ তা করলেন অন্য আরণ্যকদের সহায়তায়—বানর-ভল্লুকদের মিত্রতাতেই। এইভাবে আরণ্য-কৃষি, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় ইত্যাদিতে যে ভেদ রচিত হয়েছিল, তার যোগসূত্র রচিত হল। আর্যদের আদি দেবতা ছিলেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু পরবর্তী দেবতা। বিষ্ণুদৈবত উপাসনার বিরোধী ছিলেন ব্রাহ্মণেরা—বিষ্ণুকে ভৃগু পদাঘাত করেছিলেন। অথচ রাম সেই ভার্গবকে খর্ব করলেন, কিন্তু বিনাশ করলেন না। এ-ও নতুন যুগের দাবী অনুসারে নতুন সমন্বয় রচনা। মহাভারতের মধ্যেও এরকম সমন্বয়ের ইঙ্গিত আছে। তারপর এলো বৌদ্ধপ্লাবন। সেই প্লাবনের আতিশয্যের ফল যে সব সময় ভালো হয়েছিল তা নয়, "বৌদ্ধধর্মের ঐক্যের চেষ্টাতেই ঐক্য নষ্ট করিয়াছে"। আর তার উপর সে সময় শক, হূণ প্রভৃতি বহু বিদেশী দলে দলে আসায় সামাজিক সংহতিও কিছু পরিমাণে নষ্ট হয়েছিল।

এইভাবে ভারতবর্ষের ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে রবীন্দ্রনাথ তাঁর মূলকথাকে নানাভাবে বলেছেন। শিবাজী এবং মারাঠা সাম্রাজ্য, তার তুলনায় শিখ-অভ্যুদয় ইত্যাদি নানা ঘটনার আলোচনা এ বইটিতে আছে। তা ছাড়া কতকগুলি ঐতিহাসিক পুস্তক সমালোচনা (যেমন অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের সিরাজদ্দৌলার সমালোচনা) এতে আছে। তা ছাড়া আছে নানক, ঝান্সীর রাণী, গুরুগোবিন্দ প্রভৃতি সম্বন্ধে ছোট ছোট কিছু রচনা। রবীন্দ্রনাথের এইসব বিক্ষিপ্ত রচনাকে একত্রিত করে বিশ্বভারতী সকলেরই ধন্যবাদার্হ। বিশেষত ইতিহাসের ছাত্রদের, কারণ ভারত ইতিহাসের অনেক স্বল্পালোকিত কোণগুলিতে মহামনীষার এমন নতুন আলোর ঝলক পড়েছে, যা ইতিহাসের প্রবীণতম ছাত্রকেও একেবারে নতুন পথ দেখাবে।

ইতিহাস॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। বিশ্বভারতী কর্তৃক লোকশিক্ষা গ্রন্থমালায় প্রকাশিত॥ দাম আড়াই টাকা॥ প্রথম প্রকাশ, ২২ শ্রাবণ, ১৩৬২॥

আগামী পাঁচ বৎসর দেশবাসীর দুর্গতি বৃদ্ধির সম্ভাবনা—এই ভবিষ্যৎবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন ডাঃ রামমনোহর লোহিয়া। —"ডাঃ লোহিয়া অতঃপর কোলকাতার ফুটপাথে বসে

যদি গণনার কাজে আত্মনিয়োগ করেন, বিশেষ করে ঘোড় দৌড়ের মরসুমে, শনিবার দিন,—তা হলে দেশের দুর্গতি দূর না হলেও, গণৎকারের হিল্লে একটা হবেই"—বলেন খুড়ো।

* * *

পশ্চিমবঙ্গ বিধান-সভায় চিনির উপর কর ধার্যের বিতর্ক প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় জনসাধারণকে চিনির বদলে গুড় খাইতে পরামর্শ দিয়াছেন এবং উল্লেখ করিয়াছেন যে, গুড় চিনির চাইতে স্বাস্থ্যপ্রদ। —"খেতে আমরা প্রস্তুত সব সময়েই তবে 'সে গুড়ে বালি' না হলেই হয়"—মন্তব্য করে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

কলিকাতায় সম্প্রতি "এটম ফর পীস্" প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হইয়াছে। —"খুবই উত্তম ব্যবস্থা। কিন্তু জনসাধারণ বর্তমানে 'এটমের' চেয়ে 'পূজো শেল্' সম্বন্ধে আতঙ্কিত হয়ে আছেন, আর এ 'শেলের' প্রতিক্রিয়া যে বিপর্যয় ঘটায় তা হিরোশিমা-নাগাসাকীর চেয়ে কম ভয়াবহ নয়"—বলিলেন আমাদের জনৈক সহযাত্রী।

* * *

কলিকাতা ও পল্লী অঞ্চলের সমস্ত গৃহের ছাদে তেজস্ক্রিয় ভস্মের সন্ধান—একটি সংবাদ-শিরোনামা। শ্যাম-

লাল মন্তব্য করিল—"বৈজ্ঞানিকগণ সমস্ত গৃহের ভেতরটা অনুসন্ধান করলে দেখতে পেতেন তেজস্ক্রিয়তার ভস্ম সেখানেই বরং বেশী"!

* * *

কলিকাতায় সম্প্রতি "শিশু উৎসব" চলিতেছে। "প্রকাশ থাকে যে, পশ্চিমবঙ্গের বিধান-সভার সাম্প্রতিক হৈ হুল্লোড়ের সঙ্গে শিশুদের কোন সম্পর্ক ছিল না"—মন্তব্য করিলেন বিশুখুড়ো।

* * *

আমরা পাক-গণপরিষদের খুরো-সুরাবর্দী সংবাদ পাঠ করিলাম। খুরো সিন্ধে ত্রাসের সৃষ্টি করিয়াছেন—এই অভিযোগের উত্তরে খুরো বলিলেন যে সুরাবর্দী কলিকাতায় গুণ্ডার সর্দার ছিলেন। —"অতীতের কথা না তোলাই ভালো আর অপ্রিয় সত্য না বলা আরো ভালো। তা ছাড়া সুরাবর্দী সাহেবকে হোরাবর্দী ছাহেবের কার্যকলাপের জন্য এখন আর দায়ী করা চলে না"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ লোক-সভায় একটি বিল আলোচনার জন্য পেশ করিয়াছেন। বিলটির উদ্দেশ্য হইল—Ban on horror comic. —"আমরা আলোচনার ফলাফল জানবার জন্যে উদ্‌গ্রীব রইলাম। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে হয় "horrible" comic-এর ওপর বাধা-নিষেধ প্রয়োগ করা সর্বাগ্রে প্রয়োজন"—মন্তব্য করিলেন বিশুখুড়ো।

* * *

শ্রীযুক্ত গুলজারিলাল নন্দ সমস্ত ব্যবসায়ীদিগকে পঞ্চাশ উর্ধ্বে ব্যবসা ত্যাগ করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে তাঁহারা যদি নিজেদের অভিজ্ঞতা সর্বসাধারণের কল্যাণে নিযুক্ত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলির উন্নতিসাধনে নিয়োগ করেন তাহা হইলে দেশের উপকার হইবে। —"ব্যবসা ছেড়ে দেয়া না-দেয়া তাঁদের হাতে; তবে আমরা বলি তাঁদের অভিজ্ঞতা আর জনসাধারণের কল্যাণে নিয়োগ না করাই ভালো। আমাদের কথা কেউ মানতে রাজী না হলে এন্‌ফোর্সমেন্ট বিভাগকে জিজ্ঞেস করুন"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

* * *

আমরা লণ্ডনে ভবঘুরে ষাঁড়ের সমস্যার সংবাদ পাঠ করিলাম। শ্যামলাল বলিল—"কিন্তু আমরা তো
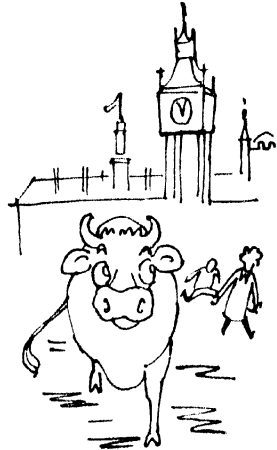
জানতাম ভবঘুরে ষাঁড়ের সমস্যা কাশীর, কোলকাতার বড়বাজার বা ডালহৌসীর এবং সম্প্রতি হয়েছে ছিটমহল গোয়ার"!!!

ছাত্রজীবন

সাধনা চট্টোপাধ্যায়

তোমরা মহৎ হও, সত্য পথে চল,
চরিত্র নির্মল রাখো,—ইত্যাদি ইত্যাদি
বড় বড় সভা হয়, জ্ঞানী গুণী
স্তেতাক বুলি বাঁধি,
আমাদের বলে যান,
এক কান শোনে আর, আরেকটি কান,
—আবর্জনা দূর করে দেয়।

নিরস বক্তৃতা চলে প্রতিদিন ক্লাসের সময়,
সাদা কাগজের রাশি কলমের আক্রমণে কজ্জলিত হয়।
অনেক জ্ঞানের কথা, সংখ্যা আর তথ্যমালা ঢের,
ছকে বাঁধা দিন-যাত্রা আমাদের পাঠ্য জীবনের
দৈনন্দিন একই কর্মসূচী
—অরুচি অরুচি!

কলেজের এ-জীবনে কাছে যদি না থাকতে তুমি,
কখন শুকিয়ে কাঠ হতাম সাহারা মরুভূমি।
তুমি কাছে আছ তাই বহুদিন সময় কুড়িয়ে,
নীরবে নিবিড় বসি হেথা হোথা কোনখানে গিয়ে।
চুপি চুপি ফিস্ ফিস্ শুরু হয় সার আলোচনা,
গুন্ গুন্ সুর দিয়ে গানের নদীটি হয় বোনা।
আর বহুদিনকার তৃষিত শুষ্ক এই মন
হঠাৎ রঙীন হয় : ধুক্ ধুক্ হৃৎস্পন্দন,
দ্রুত হতে দ্রুততর হয়ে ওঠে বাসন্তীক্ ঝড়ে,
ফুল ফোটে, মধু ঝরে, ছাত্রজীবনের বালুচরে।

হৃদয়ে জ্বলেনা তারে

অতীন্দ্র মজুমদার

হৃদয়ে জ্বলেনা তার কোনো আলো, তাই অন্ধকারে
সে একা বসেছে তার ছেঁড়া কাঁথা, ভাঙা হাড়ি নিয়ে
লোহার বেড়ার ধারে। তার পাশে খাটালের জল,
কাদা, মশা সব নিয়ে একপাল দুধালো গরুর
সমাবেশ; সেখানেও রৌদ্র আসে, বৃষ্টি নামে, রাতে
বিবর্ণ ঘাসের ঝোপে জোনাকীরা প্রদীপ সাজায়।
দু-একটা মোটরের চলন্তি আলোর চমকানি
পশুরও পিঙ্গল চোখে রক্তবর্ণ অঙ্গার জ্বালায়।
—সে শুধু নীরবে তার কোলের ছেলেকে বুকে চেপে,
অন্ধকারে এক দৃষ্টে চেয়ে থাকে। রাত ত অনেক—
এখনই ত ক্যানিংয়ের শেষ গাড়ি যাবার সময়।

আরো কিছু পরে তার স্বেদাক্ত বোঁচকা নামিয়ে
শতচ্ছিন্ন চাটাইয়ের একপাশে প্রমত্ত বসবে
কাপড়ের খুঁট খুলে সাড়ে সাত আনা হাতে নিয়ে
সামান্য দ্বিধার সঙ্গে তার হাতে গুঁজে দিয়ে, শেষে
অল্পক্ষণ চুপ ক'রে, ভাঙা কলসী থেকে ঢেলে নেবে
নিঃশব্দে একটু জল—তারপর কাছে এসে শোবে।

আর, আঁধার হৃদয় নিয়ে সে-ই শুধু ব'সে ব'সে, তার
কোলের ছেলেকে আরো কাছে, তার বুকে টেনে নেবে॥

পিছুটানে

শোভন সোম

পাথরে উৎকীর্ণ লিপি ক্ষয়ে ক্ষয়ে যায়
কালের হাওয়ায়
পুরাতন চাপা পড়ে নূতনের নিচে
অতীতের হাল ধরে বসে থাকা মিছে।

পান্থের কেবলি হবে ভারাতুর স্মৃতি
পিচনেই হাতড়াবে শুধু কেন মন?
বেঁধে রাখে সনাতন চিরাভ্যস্ত রীতি
হায়রে আঁধারে ঢাকা রয় দু' নয়ন।

জানিনে তবুও কেন কালের বালক

চক্রদত্ত

উড়োজাহাজের গতি বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে তার দ্রুততা বাড়াবার দিকে বৈজ্ঞানিকরা চিন্তা করছেন। কিছুদিন আগে 'শুটিং স্টার' জেটচালিত এক উড়োজাহাজ ম্যাগনেশিয়াম ধাতু দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। এতদিন বেশির ভাগ এলুমিনিয়াম অথবা কোন রকম মিশ্র ধাতুর সাহায্যে উড়োজাহাজ তৈরি করা হোত। ম্যাগনেশিয়াম দিয়ে তৈরি করার কারণ, দেখা গেছে যে, এই ধাতু এলুমিনিয়ামের চেয়ে বেশি শক্ত এবং উড়োজাহাজ তৈরির সময়ে ম্যাগনেশিয়ামকে এলুমিনিয়ামের মত এত বেশি শক্ত করে নেবার দরকার হয় না। তাছাড়া ম্যাগনেশিয়াম এলুমিনিয়মের চেয়ে হাল্কা হওয়ার দরুণ উড়োজাহাজের পাখা অনেক বড় এবং মোটা করা যায়, যার ফলে উড়োজাহাজের গতি দ্রুততর হতে পারে। বর্তমানে পরীক্ষায় এটা দেখা যাচ্ছে যে, যে কোন দ্রুতগতিসম্পন্ন এলুমিনিয়ামের তৈরি উড়োজাহাজের চেয়ে ম্যাগনেশিয়ামের তৈরি উড়োজাহাজ ঘণ্টায় দশ মাইল বেশী বেগে চলবে।

*

ক্যামেরা দিয়ে ছবি তোলার সখ অনেকেরই থাকে ,কিন্তু ভাল ছবি তুলতে খুব কম লোকেই পারে। অবশ্য ভাল ছবি না তুলতে পারার কারণ অনেক হতে পারে। এর মধ্যে একটা হচ্ছে ফিল্ম। বাজারে বিভিন্ন ধরনের ফিল্ম পাওয়া যায়. তার মধ্যে একটি লো স্পীড আর একটি ফাস্ট স্পীড অর্থাৎ এই স্পীডের ওপর ছবি তোলার সময় ক্যামেরার 'ডায়াফ্রাম' কতটা খুলতে হবে এবং কতখানি 'এক্সপোজার' দিতে হবে, সেটা নির্ভর করবে। 'হাই স্পীড'ওয়ালা ফিল্মে ছবি তুললে অনেক সময় এ সমস্ত জিনিস অত খুঁটিয়ে না

একটি সামান্য গুবরে পোকা যে ওজনের জিনিস নিয়ে যাচ্ছে, সেই অনুপাতে মানুষকে অন্তত ১৪ হাজার পাউণ্ড ওজনের জিনিস বহন করতে হয়

বাজারে একটা হাই স্পীড—যার নাম 'কোডাক ট্রাই এক্স' ফিল্ম চালু করছেন। এই ফিল্মে তাদের বর্তমানে 'কোডাক সুপার এক্স এক্স' ফিল্মের চেয়ে দুগুণ বেশি স্পীড। এই ফিল্ম ৩৫ মিলিমিটার ৬২০, ১২০ এবং 'ফিল্ম প্যাক' হিসাবে বাজারে পাওয়া যায়।

*

আমরা কীটপতঙ্গদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করি, কারণ তারা মানুষের তুলনায় খুবই ক্ষুদ্র, কিন্তু তাদের ক্ষমতা সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা থাকলে আশ্চর্য হতে হয়। যদি অনুমান করা যায় যে, একটি ছোট মাছি আকারে একটি কাঙ্গারুর মত হয়েছে এবং দেহের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দৈহিক শক্তিরও বৃদ্ধি পেয়েছে, তাহলে ঐ কাঙ্গারু খুব বড় অট্টালিকা লাফিয়ে পার হতে পারবে। এমন অনেক ধরনের পোকা দেখা যায়, যেগুলো তাদের দেহের অনুপাতে ৫২ গুণ ভারী পাথর সরাতে নড়াতে পারে। যদি মানুষের শক্তির সঙ্গে এদের শক্তির তুলনা করা যায়, তাহলে এদের ক্ষমতার অনুপাতে একটা মানুষের অন্তত চার টন ওজন তোলা উচিত। অনেক গুবরে পোকা তাদের নিজেদের দেহের ওজনের চেয়ে ৮৫০ গুণ বেশি ওজন পিঠের ওপর বহন করতে পারে। এই হিসাবে একটি হাতির অন্তত ... উচিত। একটি ফড়িং যেরকম লাফাতে পারে, সেই অনুপাতে মানুষের লাফানোর ক্ষমতা থাকলে একটি মানুষের পৃথিবীর উচ্চতম বাড়ি এক লাফে পার হতে পারা উচিত। বাস্তবিক পক্ষে যদি কীট-পতঙ্গরা তাদের স্বাভাবিক আকারের চেয়ে বড় হয়, তাহলে তাদের দৈহিক ক্ষমতার বৃদ্ধি না হয়ে হ্রাসই হবে। কারণ দেখা যায় যে, দেহের পেশীগুলি বড় হয়ে গেলে কার্যক্ষমতা কমে যায়।

*

লুডক্স বলে একটা নতুন রাসায়নিক বস্তু বের হয়েছে, যার সাহায্যে কম্বল, গালিচা, দেয়ালের রং করা কাগজ ইত্যাদিকে পরিষ্কার করা যাবে এবং নতুনের মত দেখাবে। লুডক্স কোলয়েড সিলিকা দিয়ে তৈরী করা হয়। সাধারণ ভাবে কম্বল, গালিচা ইত্যাদি ময়লা হবার কারণ যে, এর খুব ছোট ছোট গর্তগুলো ধুলোর কণায় ভরে যায়। আর একবার এইসব গর্তগুলো ধুলোয় ভর্তি হয়ে গেলে সেগুলো ঝেড়ে ফেলে পরিষ্কার করা যায় না। এইসব জিনিস যদি লুডক্স দিয়ে নেওয়া যায় তাহলে ছোট গর্তগুলো লুডক্সের সিলিকা কণায় ভরে যায়। এতে এই সুবিধা হয় যে, গর্তগুলো ভর্তি হয়ে যাওয়ার দরুণ আর ধূলিকণা গর্তের মধ্যে ঢোকবার সুযোগ পায় না—আর এগুলো তখনো ওপরে লেগে থাকে—ফলে সহজেই ঝেড়ে ফেলা যায়। লুডক্সের ভেতর যে সিলিকা কণা থাকে সেটা এতো ছোট যে প্রায় ৬০০,০০০,০০০ কণা একটা আলপিনের মাথাটি শুধু ঢাকবে।

কবিতা

১। **বসন্তবাহার**—গোপাল ভৌমিক। প্রকাশক, দেবকুমার বসু, গ্রন্থ জগৎ, ৭-জে, পণ্ডিতিয়া রোড, কলকাতা—২৯। দেড় টাকা।

২। পলাশের কাল—অরুণাচল বসু। প্রকাশক, শান্তা বসু, লোক-সাহিত্য প্রকাশনী, ৮।২, ভবানী দত্ত লেন, কলকাতা-৭। দাম—দেড় টাকা।

৩। **যখন প্রথম ধরেছে কলি**—কৃষ্ণ ধর। প্রকাশক—গল্পভবন, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম দুই টাকা।

পাঠক এই তিনটি বইয়ের নামকরণের মধ্যেই যে-যোগাযোগ অনুধাবন করেন, তা আকস্মিক নয়। কবিত্রয়ী একই সময় অধ্যায়ের নাগরিক প্রাণযাত্রার চুক্তিপত্রে নাম লিখেছেন, তারই দিনানুদিনের সংশয়-ভয়ের সঙ্গে তাঁরা প্রত্যক্ষ পরিচিত, শুধু প্রকৃতির স্থায়ী মূল্যে প্রত্যাবর্তনের আন্তরিক অভিপ্রায় এই তিন-জনেরই কবিতায় দেখা দিয়েছে।

গোপাল ভৌমিকের কবিতায় নগর-জীবনের সঙ্গে আপস-স্বীকারের একটি বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী দেখা যায়। প্রকৃতির সঙ্গে শহরের বিচ্ছেদ-বোধ তাঁর রচনায় তেমন কোনো অনুযোগ জাগায়নি একথা সত্যি, কিন্তু অবিরাম জীবিকা-যুদ্ধের ফলে এবং প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলের অভাবে নাগরিকতা যে অন্তঃসার হারিয়েছে এবিষয়ে তাঁর কবিচিত্ত এক সচেতন অথচ সুরসিক ভঙ্গিমা আয়ত্ত করে নিয়েছে। 'বসন্ত-বাহার'কে 'হাল্কা সুরের প্রেমধর্মী' কয়েকটি কবিতার সঞ্চয়নগ্রন্থ বলা হয়েছে। মহানগরের প্রাণধারণের ক্লান্তিকে সুদূরমূর্তি দেবার জন্যেই কবি এই হাল্কা-সুরে কথা বলেছেন। কিন্তু সব সময়েই যে এই চেষ্টা সার্থকতা পেয়েছে, মনে হয় না। কবি যেখানে গভীর ব্যথা ফোটাতে চেয়েছেন সেস্থলে গভীর সুরে পরিহার করার ফল খুব ভালো হয়নি—বিবরণ থেকে সেই উদাম ফিরে এসে কোনো-কোনো কবিতার মর্মকে আবৃত করেছে। কৃষ্ণধরের 'হে রবি ঠাকুর' কবিতা-পাঠান্তেও এই মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়। স্যাটায়ার-সিদ্ধি বিদ্রূপ-ক্ষমতাকে সহজেই অথচ সতর্কতার সঙ্গে ব্যবহার করে, ছন্দে বা শব্দে সামান্য অন্য-মনস্কতাও সহ্য করে না। শেষোক্ত কবিতায় ছন্দের ঢঙ প্রাচীনতাপন্থী বলেই যে আপত্তি উত্থাপন করছি তা নয়, শুধু শব্দ প্রয়োগে কথঞ্চিৎ মনোযোগী হলেই এই সম্ভাবনাময় কবিতাটির উদ্দেশ্য উতরে যেতো।

'বসন্তবাহার' গোপাল ভৌমিকের কবিকৃতি বৃহত্তর উন্মোচনের অব্যবহিত পূর্বস্তর সূচনা করছে। তাঁর স্বকীয়তার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা আছে, তাঁর কবিপ্রকৃতি আপাত-তুচ্ছ পারিপার্শ্বিকেও কাজ করে এবং চমক তোলে, একথা আমরা জানি, কিন্তু এবার তাঁর কাছে জীবনবেদনার সঙ্গে আরো ঘনিষ্ঠ কবিতা পেলে আমরা আরো পরিতৃপ্ত হবো।

বাংলা দেশের স্বয়ং ভাস্বর লোকসংস্কৃতির লালিত্যে কৃষ্ণ ধর আমাদের চোখ ফেরাতে চেয়েছেন। তারই পুনরুজ্জীবনের জন্যে রবীন্দ্রনাথ থেকে যামিনী রায় পর্যন্ত তাঁর দৃষ্টিকেন্দ্র সুবিস্তৃত। কিন্তু তাঁর নিজস্ব কোনো আঙ্গিক কিম্বা কণ্ঠস্বর এখনো পাইনি এবং তাই তাঁর কোনো-কোনো কবিতা আমাদের আকর্ষণ করলেও বেশিক্ষণ ধরে রাখে না। তৎসত্ত্বেও কৃষ্ণধরের সম্ভাবনায় আমরা আস্থাবান। 'পলাশের কালের' কবি তাঁর প্রসঙ্গকে যথোপযুক্ত আঙ্গিকের সহ-যোগিতা দিয়ে সমৃদ্ধ করেছেন। বহুদিন ধরেই তিনি কবিতা লিখেছেন এবং তাঁর একটি কাব্যগ্রন্থের প্রয়োজন আমরা এতোদিন অনুভব করেছি। আঙ্গিক চেতন ও আবেগ-আন্দোলিত রসোচ্ছলতায় তাঁর কবিতাগুলি প্রায়শই আমাদের মুগ্ধ করে। শব্দচয়নে তিনি পারঙ্গম এবং ছন্দোময় প্রসাধনে তাঁর নিপুণতা অনস্বীকার্য।

অরুণাচল বসু যেসব চিত্রকল্পের সন্নিবেশ এরকম কথা উঠতে পারে যে কোনো স্পষ্ট বক্তব্যে উপনীত হবার দিকে তাঁর ঝোঁক নেই। বক্তব্যের উপর অত্যধিক জোর দিতে গিয়ে অনেক কবিতাই যে কাব্যগুণ হারিয়ে ফেলে,

উচিত। একটি ফড়িং যেরকম লাফাতে পারে, সেই অনুপাতে মানুষের লাফানোর ক্ষমতা থাকলে একটি মানুষের পৃথিবীর উচ্চতম বাড়ি এক লাফে পার হতে পারা উচিত। বাস্তবিক পক্ষে যদি কীট-পতঙ্গরা তাদের স্বাভাবিক আকারের

একটি সামান্য গুবরে পোকা যে ওজনের জিনিস নিয়ে যাচ্ছে, সেই অনুপাতে মানুষকে অন্তত ১৪ হাজার পাউণ্ড ওজনের জিনিস বহন করতে হয়

বাজারে একটা হাই স্পীড—যার নাম 'কোডাক ট্রাই এক্স' ফিল্ম চালু করছেন। এই ফিল্মে তাঁদের বর্তমানে 'কোডাক সুপার এক্স এক্স' ফিল্মের চেয়ে দুগুণ বেশি স্পীড। এই ফিল্ম ৩৫ মিলিমিটার ৬২০, ১২০ এবং 'ফিল্ম প্যাক' হিসাবে বাজারে পাওয়া যায়।

*

আমরা কীটপতঙ্গদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করি, কারণ তারা মানুষের তুলনায় খুবই ক্ষুদ্র, কিন্তু তাদের ক্ষমতা সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা থাকলে আশ্চর্য হতে হয়। যদি অনুমান করা যায় যে, একটি ছোট মাছি আকারে একটি কাঙ্গারুর মত হয়েছে এবং দেহের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দৈহিক শক্তিরও বৃদ্ধি পেয়েছে, তাহলে ঐ কাঙ্গারু খুব বড় অট্টালিকা লাফিয়ে পার হতে পারবে। এমন অনেক ধরনের পোকা দেখা যায়, যেগুলো তাদের দেহের অনুপাতে ৫২ গুণ ভারী পাথর সরাতে নড়াতে পারে। যদি মানুষের শক্তির সঙ্গে এদের শক্তির তুলনা করা যায়, তাহলে এদের ক্ষমতার অনুপাতে একটা মানুষের অন্তত চার টন ওজন তোলা উচিত। অনেক গুবরে পোকা তাদের নিজেদের দেহের ওজনের চেয়ে ৮৫০ গুণ বেশি ওজন পিঠের ওপর বহন করতে পারে। এই হিসাবে একটি হাতির অন্তত ১০০০০০০০ পাউণ্ড ওজন বহন করা চেয়ে বড় হয়, তাহলে তাদের দৈহিক ক্ষমতার বৃদ্ধি না হয়ে হ্রাসই হবে। কারণ দেখা যায় যে, দেহের পেশীগুলি বড় হয়ে গেলে কার্যক্ষমতা কমে যায়।

*

লুডক্স বলে একটা নতুন রাসায়নিক বস্তু বের হয়েছে, যার সাহায্যে কম্বল, গালিচা, দেয়ালের রং করা কাগজ ইত্যাদিকে পরিষ্কার করা যাবে এবং নতুনের মত দেখাবে। লুডক্স কোলয়েড সিলিকা দিয়ে তৈরী করা হয়। সাধারণ ভাবে কম্বল, গালিচা ইত্যাদি ময়লা হবার কারণ যে, এর খুব ছোট ছোট গর্তগুলো ধুলোর কণায় ভরে যায়। আর একবার এইসব গর্তগুলো ধুলোয় ভর্তি হয়ে গেলে সেগুলো ঝেড়ে ফেলে পরিষ্কার করা যায় না। এইসব জিনিস যদি লুডক্স দিয়ে নেওয়া যায় তাহলে ছোট গর্তগুলো লুডক্সের সিলিকা কণায় ভরে যায়। এতে এই সুবিধা হয় যে, গর্তগুলো ভর্তি হয়ে যাওয়ার দরুণ আর ধূলিকণা গর্তের মধ্যে ঢোকবার সুযোগ পায় না—আর এগুলো তখনো ওপরে লেগে থাকে—ফলে সহজেই ঝেড়ে ফেলা যায়। লুডক্সের ভেতর যে সিলিকা কণা থাকে সেটা এতো ছোট যে প্রায় ৬০০,০০০,০০০ কণা একটা আলপিনের মাথাটি শুধু ঢাকবে।

কবিতা

১। **বসন্তবাহার**—গোপাল ভৌমিক। প্রকাশক, দেবকুমার বসু, গ্রন্থ জগৎ, ৭-জে, পণ্ডিতিয়া রোড, কলকাতা—২৯। দেড় টাকা।

২। পলাশের কাল—অরুণাচল বসু। প্রকাশক, শান্তা বসু, লোক-সাহিত্য প্রকাশনী, ৮।২, ভবানী দত্ত লেন, কলকাতা-৭। দাম—দেড় টাকা।

৩। **যখন প্রথম ধরেছে কলি**—কৃষ্ণ ধর। প্রকাশক—গল্পভবন, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম দুই টাকা।

পাঠক এই তিনটি বইয়ের নামকরণের মধ্যেই যে-যোগাযোগ অনুধাবন করেন, তা আকস্মিক নয়। কবিত্রয়ী একই সময়-অধ্যায়ের নাগরিক প্রাণ-যাত্রার চুক্তিপত্রে নাম লিখেছেন, তারই দিনানুদিনের সংশয়-ভয়ের সঙ্গে তারা প্রত্যক্ষ পরিচিত, তবু প্রকৃতির স্থায়ী মূল্যে প্রত্যাবর্তনের আন্তরিক অভিপ্রায় এই তিনজনেরই কবিতায় দেখা দিয়েছে।

গোপাল ভৌমিকের কবিতায় নগর-জীবনের সঙ্গে আপস-স্বীকারের একটি বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী দেখা যায়। প্রকৃতির সঙ্গে শহরের বিচ্ছেদ-বোধ তাঁর রচনায় তেমন কোনো অনুযোগ জাগায়নি একথা সত্য, কিন্তু অবিরাম জীবিকা-দ্বন্দ্বের ফলে এবং প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলের অভাবে নাগরিকতা যে অন্তঃসার হারিয়েছে এবিষয়ে তাঁর কবিচিত্ত এক সচেতন অথচ সুরসিক ভঙ্গিমা আয়ত্ত করে নিয়েছে। 'বসন্ত-বাহার'কে 'হাল্কা সুরের প্রেমধর্মী' কয়েকটি কবিতার সঞ্চয়নগ্রন্থ বলা হয়েছে। মহানগরের প্রাণধারণের ক্লান্তিকে

স্নেহস্মৃতি দেবার জন্যেই কবি এই হাল্কা-সুরে কথা বলেছেন। কিন্তু সব সময়েই যে এই চেষ্টা সার্থকতা পেয়েছে, মনে হয় না। কবি যেখানে গভীর ব্যথা ফোটাতে চেয়েছেন সেস্থলে গভীর সুর পরিহার করার ফল খুব ভালো হয়নি—বহিরঙ্গ থেকে সেই উদাম ফিরে এসে কোনো কোনো কবিতার মর্মকে আবৃত করেছে। কৃষ্ণধরের 'হে রবি ঠাকুর' কবিতা-পাঠান্তেও এই মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়। স্যাটায়ার-সিদ্ধি বিদ্রূপ-ক্ষমতাকে সহজেই অথচ সতর্কতার সঙ্গে ব্যবহার করে, ছন্দে না শব্দে সামান্য অন্য-মনস্কতাও সহ্য করে না। শেষোক্ত কবিতায় ছন্দের চঙ প্রাচীনতাপন্থী বলেই যে আপত্তি উত্থাপন করছি তা নয়, শুধু শব্দ প্রয়োগে কথঞ্চিৎ মনোযোগী হলেই এই সম্ভাবনাময় কবিতাটির উদ্দেশ্য উতরে যেতো।

'বসন্তবাহার' গোপাল ভৌমিকের কবিকৃতি বৃহত্তর উন্মোচনের অব্যবহিত পূর্বস্তর সূচনা করছে। তাঁর স্বকীয়তার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা আছে, তাঁর কবিপ্রকৃতি আপাত-তুচ্ছ পারিপার্শ্বিকেও কাজ করে এবং চমক তোলে, একথা আমরা জানি, কিন্তু এবার তাঁর কাছে জীবনবেদনার সঙ্গে আরো ঘনিষ্ঠ কবিতা পেলে আমরা আরো পরিতৃপ্ত হবো।

বাংলা দেশের স্বয়ং ভাস্বর লোকসংস্কৃতির লালিত্যে কৃষ্ণ ধর আমাদের চোখ ফেরাতে চেয়েছেন। তারই পুনরুজ্জীবনের জন্যে রবীন্দ্রনাথ থেকে যামিনী রায় পর্যন্ত তাঁর দৃষ্টিকেন্দ্র সুবিস্তৃত। কিন্তু তাঁর নিজেব কোনো আঙ্গিক কিম্বা কণ্ঠস্বর এখনো পাইনি এবং তাই তাঁর কোনো-কোনো কবিতা আমাদের আকর্ষণ করলেও বেশিক্ষণ ধরে রাখে না। তৎসত্ত্বেও কৃষ্ণধরের সম্ভাবনায় আমরা আস্থাবান। 'পলাশের কালের' কবি তাঁর প্রসঙ্গকে যথোপযুক্ত আঙ্গিকের সহ-যোগিতা দিয়ে সম্পন্ন করেছেন। বহুদিন ধরেই তিনি কবিতা লিখেছেন এবং তাঁর একটি কাব্যগ্রন্থের প্রয়োজন আমরা এতদিন অনুভব করেছি। আঙ্গিক চেতন ও আবেগ-আন্দোলিত রসোজ্জ্বলতায় তাঁর কবিতাগুলি প্রায়শই আমাদের মুগ্ধ করে। শব্দচয়নে তিনি পারঙ্গম এবং ছন্দোময় প্রসাধনে তাঁর নিপুণতা অনস্বীকার্য।

অরুণাচল বসু যেসব চিত্রকল্পের সন্নিবেশ করেন সেগুলির নিজস্ব মূল্য স্বীকার করেও এরকম কথা উঠতে পারে যে কোনো স্পষ্ট বক্তব্যে উপনীত হবার দিকে তাঁর ঝোঁক নেই। বক্তব্যের উপর অত্যধিক জোর দিতে গিয়ে অনেক কবিতাই যে কাব্যগুণ হারিয়ে ফেলে,

সেকথা চিন্তা করেই সম্ভবত তিনি এ প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেছেন। আমরা এদিকে তাঁকে অধিকতর অবহিত হতে অনুরোধ করছি।

মাতৃভূমির সঙ্গে নায়িকার সংযোগ সাধনের মহৎ কবিতার প্রাণবীজ মঞ্জুরিত হয়ে ওঠে, অরুণাচল সে সম্পর্কে অনবহিত নন। তাঁর এই চেতনার অভীপ্সিত বিবর্তন কামনা করে এ-বইয়ের সবশেষের কবিতাটির কয়েকছত্র পাঠকের কাছে উপস্থাপিত করছি:

> 'শ্যামল নীলে নীল দেশ
> তোমায় ভালোবাসলাম
> প্রাণের দাও উদ্দেশ,
> অথৈ স্রোতে ভাসলাম।'

১৫৯, ২৮৯, ২৫৪।৫৫

উপন্যাস

১। **ভুলি নাই** (রজত জয়ন্তী সংস্করণ) মনোজ বসু। বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম দু'টাকা।

২। **বাঁশের কেল্লা** (তৃতীয় সংস্করণ)—মনোজ বসু। বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দু'টাকা চার আনা।

এ-দুটি বই নিয়ে নতুন করে কিছু বলবার নেই। মুক্তিযুদ্ধে বাংলার মানুষ একদিন যোগ দিয়েছিলো। তার সেই উদ্বুদ্ধ প্রাণ-শক্তির উত্তপ্ত স্মরণ-বিহারে এই বই দুটি বাঙালী পাঠকের সাদর অভ্যর্থনা পেয়েছে। 'ভুলি নাই'-এর রজত-জয়ন্তী সংস্করণ তার জনপ্রিয়তার উদাহরণ হয়ে রইলো। 'বাঁশের কেল্লা' গল্পে টুকরো-টুকরো কাহিনীর মধ্য দিয়ে লেখক পাঠককে একটি সুসংশ্লিষ্ট জীবনসত্যের সম্মুখীন করেছেন। সেই জীবন বিগত দিনের, কিন্তু তার অন্তর্নিহিত সত্যের ক্ষয় নেই—লেখকের রচনাগুণে তার নজীর পাওয়া যাবে। ৩৬৩, ৩৬৪।৫৫

স্বয়ংবরা—মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক—নবভারত পাবলিশার্স। ১৫৩-১, রাধাবাজার স্ট্রীট। কলিকাতা—১। দাম—সাড়ে চার টাকা।

একখানি মামুলী উপন্যাস। শিশু বয়সের স্বয়ংবরা খেলা ঊর্মীর জীবনে নানা ঘাত প্রতিঘাতের মাধ্যমে সত্যরূপ পেলো। এই স্বয়ংবরা খেলাকে শিশু-খেয়ালের পটভূমি থেকে বাস্তবের দৃঢ়মূল ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে যে সকল চরিত্র সাহায্য করেছে, তারা হলো মহালয়জী, বাবুরাম, রামানন্দ রায়, সুদর্শনবাবু, সুমোহন, অনিলা, পিনাকী ইত্যাদি। মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় একদা খ্যাতিমান ও প্রবীণ লেখক। তাঁর কাছে বিনীত নিবেদন, বাঙলা সাহিত্যের বিষয়বস্তু আজ অপরূপ বিস্ময়ের পর্যায়ে উপস্থিত। মন ও মননের জীবন ও জনতার দিকে দিকে নানা লেখকের মানিক দৃষ্টি আজ অনুসন্ধানী। পাঠকের কৌতূহলও জীবনকে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার প্রেরণায় উন্মুখ। পরিতাপের বিষয়, স্বয়ংবরায় একটি সিনেমাগন্ধী কাহিনী, অপটু ভাষা, অনেক সময় ঘটনা গ্রন্থনের শিথিলতা পাঠকের কাছে সুখকর হয়ে উঠবে না। (৩৩৫।৫৫)

রঙ্গরাগ—স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়। বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। আড়াই টাকা।

কাহিনীতে কোনো অভিনবত্ব নেই। চরিত্রগুলি প্রায়ই আকার নিতে পারেনি। উপন্যাস-রচনার জন্যে বীক্ষণভঙ্গির যে-ব্যাপ্তি অনিবার্য এখানে তার অভাব চোখে পড়বে। বইটিতে কখনো-কখনো নাটকীয়তার লক্ষণ আছে। বীরেশ নামক চরিত্রটির উপরে একটি আদর্শসম্পাত করে লেখক আমাদের সেদিকে আগ্রহী করলেও উপযুক্ত ঘটনা-সন্নিবেশের বিরলতায় সেই চরিত্র স্থায়িত্ব পায়নি। 'রঙ্গরাগ' তবুও স্থানে স্থানে সুখপাঠ্য।

প্রচ্ছদপটের জন্যে আশু বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের ধন্যবাদার্হ। ৩৬২।৫৫

প্রাচীন সাহিত্য

বাইশ কবির মনসা-মঙ্গল বা বাইশা—ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত ও সংকলিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। মূল্য দশ টাকা।

প্রাচীনকালে কোনো-কোনো দেশে সঙ্গীতের সঙ্গে কবিতা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ ছিলো, এই প্রসঙ্গ উল্লেখ করে জর্জ টমসন একটি আকর্ষণীয় এবং প্রয়োজনীয় খবর পরিবেশন করেছেন:

In Irish, too, there is a close union between poetry and music. And here it is not just a matter of inference. It is still a living reality.

শেষ লাইনটি পড়ে তড়িৎস্পৃষ্টের মতো চমকে উঠতে হয়, কেননা বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে এ সত্য আজ শুধু সংবাদ, কিন্তু একদিন সত্যি গ্রীক বা আইরিশ কবিতার মতোই সেখানেও কবি এবং গীতিকার একই ব্যক্তি ছিলেন।

মঙ্গলকাব্যের প্রায় অন্যতম শ্রেষ্ঠশাখা মনসা-মঙ্গলও, বলা বাহুল্য, সুর-সাপেক্ষ ছিলো। এর কাহিনীতে ছিলো কঠোর এবং করুণের মৌলিক রস, নানাকবির হাতে তার এই সমন্বিত আবেদন বিচিত্রসুরে বেজে উঠেছিলো, এই সংকলন পড়তে গিয়ে তার একটি সামগ্রিক পরিচিতি লাভ করলাম।

গ্রন্থনকর্তা বলেছেন, 'এই সংকলনে আনুপূর্বিক মনসা-মঙ্গল কাহিনীর ঘটনাগত পারম্পর্য রক্ষা করিয়া প্রধান কবিদিগের উৎকৃষ্ট রচনাংশসমূহ নির্বাচন করা হইয়াছে।'

একাজ কঠিনসাধ্য সন্দেহ নেই। কিন্তু এই ব্যাপারে যিনি সুদীর্ঘকাল ব্রত আছেন তাঁর কাছে এই কাজ ততো কঠিন নয়।

গ্রন্থের আরম্ভে যে ভূমিকা সন্নিবিষ্ট হয়েছে তাতে ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্যের যৌক্তিক তথ্যানুরক্তি দেখা যাবে। সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে এখানে তিনি বিবিধ মূল্যবান তথ্যের সমাবেশ সাধন করেছেন। একদিকে তিনি যেমন মনসা-পূজার লুপ্তবিবর্তনের জন্মসূত্র ও জীবনছন্দ পুনরুদ্ধার করে ঐতিহাসিকের দায়িত্বপালন করেছেন অন্যদিকে মনসা-মঙ্গল রচয়িতাদের তুলনামূলক পর্যালোচনা করে সাহিত্যবোদ্ধার পরিচয় দিয়েছেন। উপেক্ষিত হরি দত্তের স্থান-নির্ণয় করতে গিয়ে তিনি বিজয় গুপ্তের নেতিবাচক উক্তি দ্বারা চালিত হননি, উভয়ের বিশিষ্টতার ভাবসত্রগুলির দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন। নারায়ণ দেবের সঙ্গে কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের যে পার্থক্য, কিংবা দ্বিজবংশীদাসের কাব্যের যে বৈশিষ্ট্য তার মধ্যে কোথায় গৌরাঙ্গদেবের মহাশ্চর্য আবির্ভাবের কার্যকারিতা প্রকটিত হয়েছে সে বিশ্লেষণে সম্পাদক ইতিহাসবোধ দেখিয়েছেন।

ব্যালাড এবং এপিক দুয়েরই কিছু-না-কিছু গুণাগুণ মঙ্গলকাব্যে আছে। তাই একটি সংজ্ঞাকে মাপকাঠি করেই যখন শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য মঙ্গলকাব্যকে 'Primitive epic'এর স্বধর্মী মনে করেন তখন সর্বান্তঃকরণ স্বীকৃতি-জ্ঞাপন করতে পারি না। বস্তুত Primitive epicও তো এক হিসাবে পরিকীর্ণ ব্যালাডগুলিকে ঐক্য দিতে গিয়েই রচিত হয়েছিলো। এবিষয়ে যে-সংজ্ঞাটির উপর তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন সেটি হডসনের "An Introduction To The Study Of Literature" থেকে গৃহীত; উক্ত সংজ্ঞার যেখানে তিনি ছেদ টেনেছেন তার পরের লাইনে আমাদের পূর্বোক্ত কথার সমর্থন আছে। এ সূত্রে আমাদের বক্তব্য ইংরেজী ব্যালাড বা এপিক, কোনোটি দিয়েই মঙ্গল-কাব্যের কুল-পরিচয় সর্বাংশে জানানো যায় না। বাংলার ভূখণ্ডে এই ফসল যেভাবে ফলেছে তাতে অবশ্য মনসা-মঙ্গলকে 'National poetry' বা 'বাঙ্গালীর জাতীয় কাব্য' বলে অভিহিত করতে আপত্তি নেই।

ইতিপূর্বে শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য যেসব গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন সেগুলি তাঁর পাণ্ডিত্যেরই সাক্ষ্যস্থল। এই গ্রন্থে সেই পাণ্ডিত্য আরো একটি চারিত্রগুণে পরিমণ্ডিত হয়েছে; মনসা-মঙ্গল কাব্যের প্রতিনিধি-স্থানীয় কবিদের রচনা থেকে সঞ্চয়ন করার কর্মে তিনি যে সুনিপুণ সম্পাদনা করেছেন তা থেকে এই বলা যায়, এ-গ্রন্থকে তিনি তাঁর নিজেরই একটি কবিকর্ম করে তুলেছেন।

৩৫২।৫৫

কিশোর সাহিত্য

বুদ্ধদেব বসুর ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প—অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির, ৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দু' টাকা।

উৎসর্গের ছোট কবিতাটিতে শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসু 'পাপ্পার জন্য' লিখেছেন—'আকাশে আমিও ভাসিয়েছিলাম ভেলা'। ছোটদের গল্পের ভেলা ভাসাবার জন্য যে বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন আছে, সে গুণ তাঁর অনায়ত্ত নয়। মোট চোদ্দটি গল্প এই সংকলনে জায়গা পেয়েছে। কিন্তু একসঙ্গে একখানি বইয়ের মধ্যে এতোগুলি গল্প দেখতে পেয়ে তাঁর ছোটদের গল্প সম্বন্ধে কেমন যেন নতুন একটি অনুভূতি জাগা অসম্ভব নয়। ভূমিকায় তিনি নিজেই সে কথা জানিয়েছেন—"গল্পগুলো আবার পড়ে আমার ধারণা হলো যে, আমার 'বড়োদের' আর 'ছোটদের' লেখা মূলত ভিন্ন নয়; একই ভাব, একই চিন্তা—কখনো কখনো একই মেজাজ—দুয়েরই মধ্য দিয়ে প্রকাশের জন্য প্রয়াসী।" বলা বাহুল্য, এটি বিশেষ লেখকের বৈশিষ্ট্য বটে,—কিন্তু অনুসরণীয় আদর্শ নয়। 'নিরক্ষরতা দূর করো' আর 'ঘুম-পাড়ানি',—দুটি দু'জাতের লেখা। প্রথমটিতে ছোটদের কাছে যে আবেদন পৌঁছোয়, শেষেরটিতে তার বিন্দুমাত্র সাদৃশ্য

নেই। প্রথমটি ছোটদের জন্যেই লেখা,—দ্বিতীয়টি বড়োদের উপভোগ্য ছোটদের কথা। 'প্রথম দুঃখ'ও এই শেষের শ্রেণীর। এ-বইয়ের বেশির ভাগ লেখাই তাই। বইখানির ছাপা, বাঁধাই সুন্দর।

২৪৩।৫৫

এক যে ছিল পুতুল—অশোক গুহ, রূপায়নী বুক শপ, কলকাতা। দুই টাকা।

'পিনোকিয়ো'-কাহিনীর ছায়া অবলম্বনে লেখা কাঠের-পুতুল পিণ্টুলালের এই গল্পটি কিশোর পাঠক পাঠিকার মনোরঞ্জন করবে। বইয়ের পাতায়-পাতায় ছবিগুলি যেমন তৃপ্তিকর হয়েছে, প্রায়-নির্ভুল ছাপার বিশেষত্বও তেমনি প্রশংসার যোগ্য। মূল গল্পটির একাধিক অনুবাদ বাংলায় জনপ্রিয় হয়েছে। শ্রীযুক্ত অশোক গুহের এ বইখানি ঠিক অনুবাদ নয়। মূলের সঙ্গে বর্তমান লেখকের কল্পনা মিলে-মিশে মনোরম মৌলিক সৃষ্টির স্বাদে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে।

২৪০।৫৫

ভ্রমণ কাহিনী

চীন দেখে এলাম (২য় পর্ব)—মনোজ বসু। প্রকাশক—বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলিকাতা—১২। দাম—৩॥০ টাকা।

'তাই ভাবি, এত যেখানে স্বতোৎসারিত প্রীতি—মানুষ কেমন করে বন্দুক বোমা তাক করে অপর মানুষের দিকে? এমন সহজ সারল্য মানুষের মধ্যে—তাদেরও হিংস্র জানোয়ার বানিয়ে তোলা হয়, সভ্য সমাজ ক্ষমতা ধরেন বটে।' সভ্যতার এই সঙ্কট। জীবনের বিপক্ষে তার অভিযান। কিন্তু এই সীমাহীন সঙ্কট ছায়ার মধ্যে কোনোই আশার আলো নেই? কোনো জীবনের আলো?

আধুনিক পৃথিবীর কোনো কোনো দেশ জীবনের সেই মায়া আলো জেলেছে বলে শুনি। আমরা দূরের দেশের লোক লোভী ছেলের মতো উঁকি দিয়ে দেখতে যাই সে আলোর রেশ, যদি তার কোনো ছটা গায়ে এসে লাগে। শুধু শুকনো সংবাদে তৃপ্তি নেই, তার মন ভরানো ছবিটাকে দেখতে চাই পুরোপুরি। তাই খবরের কাগজে কুলোয় না, আরো বড় কিছু খুঁজি। যাঁরা ঘুরে এলেন সেই সেই দেশ, জানতে চাই কী তাঁরা দেখলেন, দেখতে চাই তাঁদের দেখায় তার চেহারা

অন্যের দেখায় নিজের দেখা! কিন্তু সত্যি তা সম্ভব। অন্তত কিছুটা পরিমাণে সম্ভব। এই এখানে তাঁর স্বভাব অর্জিত মজলিসী স্বর নিয়ে আসর জমিয়ে বসেছেন মনোজ বসু, তুলে ধরেছেন একটি উচ্ছল স্বাস্থ্যে ভরা উজ্জ্বল দেশের উজ্জ্বল ছবি।

প্রথম পর্যায় পূর্বে প্রকাশিত। এটি বিবরণীর শেষার্ধ। আনন্দে অশ্রুতে লিপ্ত মন নিয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের কথায় তার শেষ।

২৬৩।৫৫

সাময়িক পত্রিকা

শ্রীশ্রীনিতাইসুন্দর (পারমার্থিক মাসিক পত্র)। শ্রাবণ সংখ্যা। সম্পাদক শ্রীদ্বিজপদ গোস্বামী। কার্যালয়—১০২।৩ বকুলবাগান রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা। বার্ষিক মূল্য ৬॥০ টাকা।

আলোচ্য সংখ্যায় ডক্টর মহানামব্রত ব্রহ্মচারী লিখিত 'সাধ্যতত্ত্ব ও মহাপ্রভু' শেষাংশ ক্রমিকভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীগুরুকথা-প্রসঙ্গ—রামদাস বাবাজী মহারাজের প্রসঙ্গ, সুলিখিত। কালনায় রামদাস বাবাজী মহারাজের নিতাইগৌর আগমন-লীলা সম্পর্কিত কীর্তনটি পাঠ করিয়া সকলেই অন্তরে ভগবানের স্পর্শ পাইবেন। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ চম্পূ মূলে এবং তাহার অনুবাদ ক্রমপ্রকাশিত হইতেছে। সুসম্পাদিত এই পত্রিকার বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

শ্রীসুদর্শন—ত্রৈমাসিক পত্র। সম্পাদক—শিশিরকুমার ব্রহ্মচারী। কার্যালয়—৩নং অন্নদা নিয়োগী লেন, কলিকাতা। বার্ষিক মূল্য ৪৲ টাকা।

বাঙলা ভাষায় প্রকাশিত ভারতীয় ধর্মতত্ত্ব এবং দার্শনিক সংস্কৃতি সম্পর্কিত পত্রিকাগুলির মধ্যে 'শ্রীসুদর্শন' উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিয়াছে। জন্মাষ্টমী সংখ্যা পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ উপকৃত হইয়াছি। আলোচ্য সংখ্যা মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদ তর্কাচার্য, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, ডক্টর মহানামব্রত ব্রহ্মচারী, মহামহোপাধ্যায় যোগেন্দ্রনাথ সাংখ্যতীর্থ, অনিলবরণ রায়, ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বহু মনীষী এবং সাহিত্যিকের লিখিত প্রবন্ধ এবং কবিতায় সমৃদ্ধ।

প্রাপ্তি স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থ আসিয়াছে।

এক সঙ্গে—গোলাম কুদ্দুস।

সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায়—ভি আই লেনিন।

বিপিনের সংসার—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সুখমনী—গোকুল দাস।

বইপড়া—সরোজ আচার্য।

হুইসল্—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত।

সমবায় সমিতির সংগঠন ও ব্যবস্থাপন—শ্রীপ্রমথনাথ মজুমদার।

হোমিওপ্যাথিক ফ্যামিলি ডক্টর—১ম ভাগ—ডাঃ পূর্ণচন্দ্র দাস।

পালা বদল—অমিয় চক্রবর্তী।

ধীরাজ ভট্টাচার্য

—নয়—

বাড়ি ফিরেই শুনলাম দু' তিনবার স্টুডিও থেকে লোক এসেছিল ডাকতে; দেখা না পেয়ে বলে গেছে, যখনই বাড়ি ফিরি অতি অবশ্য যেন একবার স্টুডিওতে গিয়ে পরিচালক জ্যোতিষ বাড়ুজ্যের সঙ্গে দেখা করি। রবিবার হঠাৎ এরকম জোর তলব? সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে টালিগঞ্জের ট্রামে উঠে বসলাম। গেট পেরিয়েই দেখি অগতির গতি আমগাছতলায় কয়েকখানা ভাঙা চেয়ার ও টুল পেতে জটলা করছেন পরিচালক জ্যোতিষবাবু, মনমোহন, একাধারে গাঙ্গুলী মশায়ের সহকারী ও এডিটর জ্যোতিষ মুখুজ্জে এবং আরও দু' তিনজন গোল টুপি পরা অবাঙ্গালী। আমায় দেখতে পেয়েই হৈ হৈ করে উঠল মুখার্জি ও মনমোহন।

মুখুজ্জ্যে বললে—'এই যে ডুমুরের ফুল! এক দণ্ড বাড়িতে থাকো না, যাও কোথায়?'

আমি কিছু বলবার আগেই মুখে রুমাল চাপা দিয়ে খুঁতখুঁত করে খানিকটা হেসে নিল মনমোহন। তারপর বললে—'বুঝলে মুখুজ্জ্যে, এখন থেকেই ওকে বাড়িতে পাওয়া যাচ্ছে না, এরপর 'কাল পরিণয়' রিলিজ হলে কলকাতাতেই খুঁজে পাওয়া যাবে না।' আবার সারা দেহ কাঁপিয়ে হাসতে লাগল মনমোহন।

কিছুই বুঝতে না পেরে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

জ্যোতিষবাবু বললেন—'ওহে বড় অ্যাকটর! না হয় 'কাল পরিণয়ে' ভাল অভিনয়ই করেছ। কিন্তু এ গরীবকে ভুলে যেও না। আমিই 'সতীলক্ষ্মী' ছবিতে তোমাকে প্রথম চান্স দিয়েছিলাম।'

বললাম—'দয়া করে হেঁয়ালি ছেড়ে আসল কথাটা বলবেন কি?'

মুখুজ্জ্যে বললে—'আসল কথা হল জ্যোতিষবাবু বঙ্কিমচন্দ্রের 'মৃণালিনী' ছবি তুলবেন ঠিক করেছেন। তাতে তোমায় নায়কের পার্ট মানে হেমচন্দ্রের ভূমিকা অভিনয় করতে হবে।'

বললাম—'এরই জন্যে এত জোর তলব? দয়া করে হুকুম করলেই তো হত।'

জ্যোতিষবাবু বললেন—'এই মাসেই বইটা আরম্ভ করতে চাই। কাজেই এখন থেকে তোড়জোড় না করলে শুরু করতে পারব না। এ তো আর সোশ্যাল বই নয়, রীতিমত ঐতিহাসিক উপন্যাস। পোশাক আশাক গহনা কাপড়, সিন সিনারি সব সময়োপযোগী হওয়া চাই। সেই জন্যে তোমার পোশাকের মাপ নেবার বিশেষ দরকার। মেক আপ রুমে কোরিন্থিয়ান থিয়েটারে দর্জি মকবুল ফিতে পেন্সিল নিয়ে বসে আছে, দয়া করে মাপটা দিয়ে এসো।'

নানা রকমের জামা সালোয়ার পাগড়ি প্রভৃতির মাপ দিয়ে যখন আমতলায় ফিরলাম তখন মনমোহন ও মুখুজ্জ্যে সরে পড়েছে। একা একখানা চেয়ারে বসে সিগারেট খাচ্ছিলেন জ্যোতিষবাবু। আমায় দেখেই উঠে পড়ে বললেন—'আর বসা নয়, চলো বাড়ি যাই। রাত প্রায় ন'টা বাজে।'

পথে যেতে যেতে জ্যোতিষবাবু বললেন—'তুমি ত এক্ষুণি ভবানীপুরে নেমে যাবে। আমায় যেতে হবে সেই হাওড়ায়, গোলাবাড়ি থানার কাছে।'

বললাম—'আপনি বসে না থেকে চলে গেলেই ত পারতেন।'

—'বাপ্ রে, হিরোকে একা ফেলে চলে যাই আর কাল এসে শুনবো আমার চাকরিটি খতম।'

হেসে ফেললাম। বললাম—'আমাকে নিয়ে আপনারা এত বাড়াবাড়ি করছেন কেন বলুন তো?'

ট্রাম স্টপেজের কিছু দূরে হঠাৎ থেমে চারদিক দেখে নিয়ে প্রায় আমার কানে কানে বললেন জ্যোতিষবাবু—'বাড়াবাড়ি একটুও নয় ভাই। তোমাকে হেমচন্দ্রের পার্ট দিতে চাই শুনে গাঙ্গুলী মশাই প্রবল আপত্তি তুলে বললেন—না না, সে হবে না। 'কাল পরিণয়ের' পরই আমি 'দেবী চৌধুরাণী' ধরব।

ওকে ছাড়তে পারিনে। শেষকালে ম্যানেজারের মেজ ছেলে ফ্রামজীকে ধরে তবে পারমিশন পেলাম। সবে ঢুকেছ। এখানকার ক্রিকের ব্যাপার তো কিছু জান না। ধরো তুমি অনেক খুঁজে পেতে একটা ভালো হিরোইন যোগাড় করলে। অমনি আমি পিছনে লেগে গেলাম কী করে সেটিকে হাত করে তোমার নাগালের বাইরে নিয়ে আসব। শুধু কি তাই? তুমি একখানা ভালো ছবি তুললে হিংসেয় আমি জ্বলে পুড়ে মরব, সবার কাছে তার নিন্দে করে বেড়াতেও ছাড়ব না।'

অবাক হয়ে গেলাম। বললাম—'বলেন কি মশাই! একই কোম্পানী এক সঙ্গে মিলে মিশে সবাই কাজ করছে, তার মধ্যেও এত নোংরামি?'

—'হ্যাঁ নোংরামি।' রীতিমত উত্তেজিত হয়ে উঠলেন জ্যোতিষবাবু। 'আর এরকম নোংরামি এক সিনেমা লাইনে ছাড়া আর কোথাও আছে বলে আমার জানা নেই। এর জন্যে দায়ী কারা জানো? কোম্পানী নয়, দায়ী আমরা। অর্থাৎ মুষ্টিমেয় ক'জন বাঙালী যারা এই কোম্পানীতে কাজ করছি। শুনবে তবে—' বলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেলেন জ্যোতিষবাবু। গলা নামিয়ে চুপি চুপি বললেন—'স্টুডিওর দু' তিনজন চেনা লোক আসছে। ট্রামও রেডি, চল উঠে পড়া যাক।'

ট্রামে আর কোনও কথা হয়নি। জ্যোতিষবাবু সস্তা সিরিজের বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর ভিতর থেকে 'মৃণালিনী' উপন্যাসখানির উপর হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। ট্রাম রসা থিয়েটারের (অধুনা পূর্ণ) সামনে এসে দাঁড়াতেই নেমে পড়লাম।

রাত্রে খাওয়ার সময় বাবাকে খিদিরপুরে কাকার সঙ্গে আমার ভবিষ্যৎ মাইনে নিয়ে যা যা কথাবার্তা হয়েছে খুলে বললাম। সব শুনে বাবা বললেন, 'এমনিতেই ও একটু ঈর্ষাকাতর। অত করে বাড়িয়ে না বললেও পারতে।'

স্টুডিওর কথা উঠতে বললাম—'কাল পরিণয়' ছবি রিলিজ হলে মনে হয় ভালো মাইনেতে ম্যাডেনে পারমান্যাণ্ট হয়ে যেতে পারব।'

বাবা বললেন—'দ্যাখো, তাহলে ত
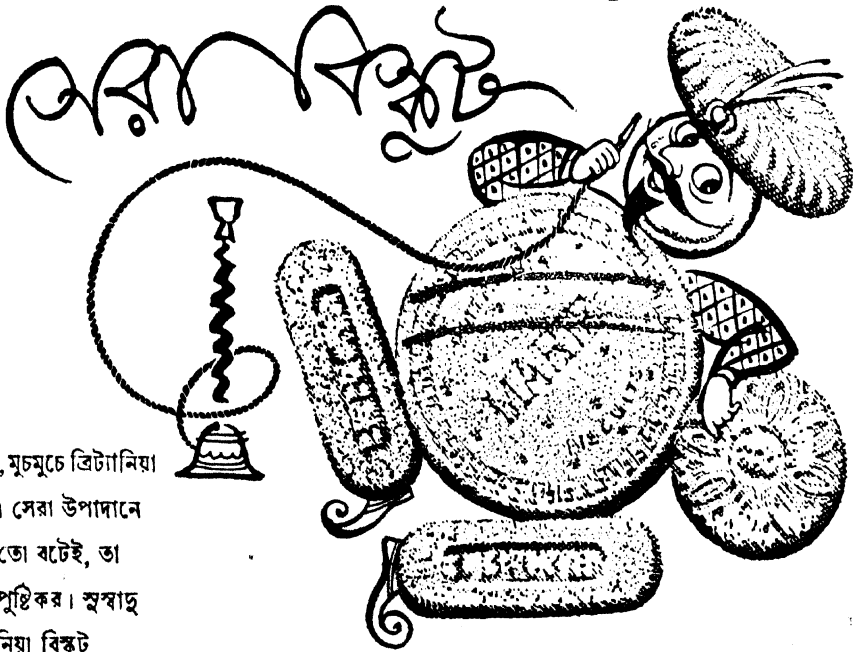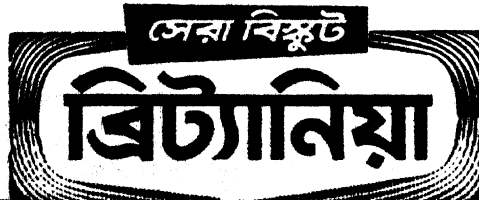
সব দিক রক্ষে হয়, নইলে পেটও ভরল না, জাতও গেল।'

রাত্রে অনেকক্ষণ অবধি ঘুমুতে পারলাম না। জেগে ছটফট করে কাটালাম। সব ছাপিয়ে গোপার বিচিত্র ব্যবহার মনের দুয়ারে বার বার এসে ঘা দিতে লাগল। সারাদিনের কথাবার্তা-গুলো নিয়ে তোলপাড় করে ফেললাম কিন্তু এমন কোনও কথা খুঁজে পেলাম না যার অছিলায় গোপা ওভাবে জানালা বন্ধ করে দিয়ে চলে যেতে পারে। আকাশ-পাতাল ভেবেও কোনও কূল-কিনারা না পেয়ে শেষকালে ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরদিন বেশ একটু বেলাতেই ঘুম ভাঙল। শুটিং নেই, অন্য কোনও জরুরি কাজের তাড়াও নেই। রবিবারেরও অনেক দেরি, আজ সবে সোমবার। সময় আর কাটতে চায় না। কি করি। দুপুরে খেয়ে দেয়ে কশে এক ঘুম দিলাম। বেলা তিনটেয় উঠে দেখি তখনও রোদ পড়েনি। জুতো জামা পরে স্টুডিওর হেড আফিস ৫নং ধর্মতলা মুখো রওনা হলাম।

ধর্মতলা স্ট্রীটের উপর এখন যেখানে নিউ সিনেমা, ঠিক তার উল্টোদিকে যে লম্বা প্রকাণ্ড বাড়িটা, সেইটের নীচের তলায় জে এফ্ ম্যাডান কোম্পানীর প্রসিদ্ধ বিলাতী মদের দোকান। তারই শেষ প্রান্তে খানিকটা জায়গা কাঁচের পার্টিশন করা। সেইটে হ'ল আফিস বা হেড কোয়ার্টার্স, ম্যাডানের জামাই রুস্তমজী সাহেব সেইখানে বসে কোম্পানীর হরেকরকম ব্যবসার হিসেব-পত্তর রাখেন ও তদারক করেন। সিনেমা ডিপার্টমেণ্টটাও তারই মধ্যে নগণ্য একটি। মদের দোকানের পাশ দিয়ে উপরে ওঠবার সিঁড়ি, তারপরই উত্তর-মুখো প্রকাণ্ড লম্বা বারান্দা। ঐ বারান্দায় উঠলেই দেখা যায় দক্ষিণমুখো খোপ খোপ ছোট অনেকগুলো ঘর। কোনওটায় বসেন গাঙ্গুলী মশাই, কোনওটায় জ্যোতিষবাবু, জাল সাহেব। তারপর দু' তিনটে ঘর, কাঁচিঘর বা এডিটিং রুম। বারান্দায় পায়চারি করতে করতে ওরই মধ্যে একটি ঘরে দেখলাম গাঙ্গুলী মশাই ও মুখুজ্জ্যে। এক রাশ ফিল্ম-এর মধ্যে ডুবে বসে একটা লেন্স দিয়ে সেগুলো

পরীক্ষা করছেন ও পাশের একখানা খাতায় পেন্সিল দিয়ে কি সব নোট করছেন। এই প্রসঙ্গে বলে রাখি, তখনও স্টুডিওতে এডিটিং রুম বলে কিছু ছিল না। ছবি তোলা হয়ে গেলে সেগুলো ডেভেলাপ করে সেই সব নেগেটিভ ফিল্ম নিয়ে আসা হত ৫নং ধর্মতলায়। তারপর সেগুলো কাট ছাঁট করে এডিট করা হত।

সিগারেট খাওয়ার অছিলায় বাইরে বেরিয়ে এল মুখার্জি। বললাম—'ছবি বেরুতে আর কত দেরি মুখুজ্জ্যে?'

নাক মুখ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে মুখার্জি বললে—'রোসো, আসল সিনটাই তো বাকী।'

অবাক হয়ে বললাম—'আসল সিন্, কোনটা?'

নিঃশব্দে সিগারেটে দু' তিনটা টান দিয়ে বেশ রসিয়ে বললে মুখার্জি—'কোর্ট সিন, মোক্ষদা হত্যার দায়ে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আছ তুমি। হয় ফাঁসি নয় দ্বীপান্তর!'

বেশ একটু নারভাস হয়ে বললাম—'কিন্তু মোক্ষদাকে রিভলবার দিয়ে গুলি করে মারলো ত' নরেশদা!'

আমার কথার জবাব না দিয়ে উল্টে প্রশ্ন করতে শুরু করলো মুখার্জি—'মোক্ষদার ঘর থেকে বেরিয়ে আসবার সময় হঠাৎ গুলির আওয়াজ শুনে এক-

রকম ছুটে তার ঘরে তুমি ঢুকেছিলে কিনা?'

বললাম—'হ্যাঁ।'

—'তারপর যখন দেখলে মেজেতে পড়ে আছে মোক্ষদা, রক্তে ভাসাভাসি, তখন তার পাশে হাঁটু গেড়ে বসেছিলে কিনা?'

—'হ্যাঁ।'

—'ঐ ভাবে বসবার পর যখন দেখলে মোক্ষদার ডান হাতে রয়েছে একটা রিভলবার তখন সেটা নিজের হাতে তুলে নিয়েছিলে কিনা?'

চুপ করে রইলাম। মুখার্জি বলে চলল—'ঐভাবে রিভলবার হাতে হাঁদারামের মত যখন বসে ছিলে তুমি মৃতা মোক্ষদার পাশে তখন দু' তিনজন লোক নিয়ে মোক্ষদার স্বামী নরেশদা মানে সারদা ঘরে ঢুকেছিল কিনা? এর পরও যদি বলতে চাও তুমি নির্দোষ, তাহলে আদালতে হাকিমকে বলো, আমাদের বলে কোনও ফল হবে না।' কেস জেতার পর বিজ্ঞ উকিলের মত হাসতে লাগল মুখার্জি।

সিনটার একটু আভাস এইখানে দিয়ে রাখি। 'কাল পরিণয়' ছবিতে সারদা হ'ল আমার দূর সম্পর্কের জ্ঞাতি ভাই। তার স্ত্রী মোক্ষদা মনে প্রাণে ভালবাসে আমাকে। নানা ছল ছুতোয় ডেকে পাঠায়। কখনও কালীবাড়ীতে, কখনও গঙ্গার ধারে। কিন্তু কোনও সুবিধে হয় না। আমি খাঁটি বাংলা ছবির নায়ক, পত্নীগত প্রাণ। অন্য স্ত্রীলোকের দিকে তাকাই সাধ্য কি আমার। মরীয়া হয়ে উঠল মোক্ষদা। একদিন অসুখের অজুহাতে ডেকে পাঠায় ওদের বাড়িতে। তখন মোক্ষদার স্বামী বাড়ি নেই। 'বার'-এ বসে মদ খাচ্ছে। সারদা হ'ল ছবির ভিলেন। কাজেই সবরকম পাপ কাজ তাকে করতেই হবে। এদিকে ঘরের মধ্যে মোক্ষদার প্রেম নিবেদন পুরোদমে চলেছে। মোক্ষদা মরীয়া হয়ে আলিঙ্গন করতে ছুটে আসে। আমি ঘৃণাভরে কঠিন হাতে ওর হাত দুখানা সরিয়ে ঠেলে ফেলে দিই। সেই সঙ্গে আউড়ে যাই চোখা চোখা ধর্মের বুলি—যথা, তোমার মত কুলটার নরকেও স্থান পাওয়া কষ্টকর, আর এক মিনিটও এ পাপ পুরীতে থাকলে আমি দম বন্ধ হয়ে মারা যাবো ইত্যাদি। এইসব ভালো ভালো কথাগুলো বলে আমি চাই ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে, মোক্ষদা যেতে দেয় না, পথ আগলে দাঁড়ায়। আমাদের এইসব প্রেমালাপের মাঝখানেই টলতে টলতে সারদা বাড়ি আসে এবং লুকিয়ে কথাগুলো শোনে এবং আমি মোক্ষদাকে ঠেলে ফেলে দিয়ে একরকম ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পরই গুলি করে মোক্ষদাকে এবং চক্ষের নিমেষে মৃতা স্ত্রীর হাতে রিভলবারটা গুঁজে দিয়ে অন্য দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গিয়ে লোক ডেকে আনে।

'গিরিবালা' রিলিজের পর ভিলেন-এর ভূমিকায় নরেশদার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে, তাই এ ছবিতেও শয়তান সারদার ভূমিকাটি ও'কেই দেওয়া হয়। মোক্ষদার চরিত্রটিও বেশ কঠিন, তাই বেছে বেছে পোড় খাওয়া পেশেন্স কুপারকে ঐ ভূমিকা দেওয়া হয়।

চারদিক চেয়ে আমার আরও কাছে এসে বললে মুখার্জি—'কাউকে বলো না যেন, সিনটা রিয়ালিস্টিক করবার জন্য আমরা সত্যিকার আদালতে শুটিং করবার ব্যবস্থা করছি। সেইজন্যই তো একটু দেরি হচ্ছে হে।'

বিস্মিত ও পুলকিত হয়ে বললাম—'বল কি মুখুজ্যে, রিয়্যাল কোর্ট সিন?'

—'শুধু কি তাই? আরও একটা কথা। না, থাক ভাই। তুমি আবার পাঁচজনকে বলে দেবে আর গাঙ্গুলী মশাই আমার উপর চটে যাবেন।'

মুখুজ্জের হাত দুটো চেপে ধরে বললাম—'দিব্যি গাল্‌ছি, কাউকে বলব না। বল না ভাই কি কথা!'

কানের কাছে মুখ এনে ফিস ফিস করে মুখার্জি বললে—'নাম করা অধ্যাপক চ্যাটার্জিকে দিয়ে 'কাল পরিণয়ে'র

টাইটেল লেখাবার ব্যবস্থা হচ্ছে। একটু সবুর কর, দ্যাখো না কি করি!'

কাঁচিঘর থেকে মুখুজ্জ্যের ডাক পড়ল। তাড়াতাড়ি আধ খাওয়া সিগারেটটা মাটিতে ফেলে পা দিয়ে মাড়িয়ে চলে গেল মুখার্জি।

'কাল পরিণয়' ছবিটা দেরি করে রিলিজ হওয়ার দুঃখটা অনেকখানি কমে গেল মুখুজ্জ্যের কথায়। বারান্দার উপর দিয়ে পশ্চিমমুখো হাঁটতে শুরু করলাম। দু' তিনটে বন্ধ ঘর পেরিয়ে একটা ঘরের কাছে এসে দেখি, ঘর ভরতি মেয়ে আর তার মাঝখানে সাদা কোট-প্যাণ্ট পরে এক গাল হাসি নিয়ে বসে আছেন পরিচালক জ্যোতিষবাবু। উঁকি দিয়ে চলে যাবো কিনা ভাবছি, কানে এলো—'আরে এস ধীরাজ, তোমার জন্যেই এত আয়োজন আর তুমি কিনা উঁকি দিয়ে সরে পড়তে চাইছ।'

এর পরে চলে আসা সম্ভব নয়, আর ইচ্ছাও ছিল না। ঘরে ঢুকে পড়লাম।

গাঙ্গুলী মশাই হচ্ছেন রাশভারি লোক, কম কথা বলেন। জ্যোতিষবাবু ঠিক তার উল্টো। মনে যা আসে মুখে তা বলতে আটকায় না। এর জন্যে এক এক সময় বিষম অপ্রস্তুত হতে হয়েছে। কিন্তু মনটা সাদা, সেখানে ঘোর প্যাঁচ কিছু নেই।

জড়সড় হয়ে জ্যোতিষবাবুর পাশের চেয়ারটায় বসে পড়লাম। কোনওরকম দ্বিধা না করে হাত দিয়ে মেয়েগুলোকে দেখিয়ে বললেন জ্যোতিষবাবু—'ভালো করে দ্যাখো এর মধ্যে কোনটি তোমার পছন্দ।'

নির্লজ্জ প্রশ্ন, ভারি লজ্জা পেলাম। দেখলাম, জ্যোতিষবাবুর সামনে পান দোক্তা খাওয়া দাঁতগুলো বের করে বেহায়ার মত হেসে এ ওর গায়ে লুটিয়ে পড়ছে মেয়েগুলো। বুঝলাম, খাস্ পাড়া থেকে আমদানি।

বেশ বিরক্ত হয়েই বললাম—' কি যা তা বলছেন।'

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে আমার দিকে কিছু সময় চেয়ে থেকে বললেন জ্যোতিষবাবু—'নায়ক, অথচ সামান্য কথার আঘাতেই মুষড়ে পড়? এর পরে দেখবে আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়ে সমস্ত উপলব্ধি হারিয়ে পাথর হয়ে গিয়েছ। প্রথম প্রথম ওরকম হয়।'

মেয়েদের দিকে ভালো করে চেয়ে দেখলাম। নায়িকা হবার যোগ্যতা ওদের মধ্যে কারও নেই। বয়স খুব বেশী না হলেও ও পাড়ার একটা বিশেষ ছাপ এরই মধ্যে ওদের অনেকের মুখে স্থায়ী আসন পেতে নিয়েছে।

মনের ভাব বুঝতে পেরেই বোধ হয় জ্যোতিষবাবু বললেন—'রোজ এইরকম ঝুড়ি ঝুড়ি আনাচ্ছি, কিন্তু মৃণালিনীকে খুঁজে পাচ্ছিনে।'

জরুরি কাজের অছিলায় জ্যোতিষবাবুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাইরে বেরিয়েই দেখি গাল ভরতি পান দোক্তা নিয়ে দরজার পাশে উৎকর্ণ হয়ে আড়ি পেতে দাঁড়িয়ে আছে মনমোহন। আমাকে দেখেই হাসতে গিয়ে বিষম খেতে খেতে অতি কষ্টে সামলে নিয়ে হাত ইশারায় একটু ঘুরে ডেকে বললে—'মেসো মশায়ের কাণ্ডটা দেখছিস্!'

বললাম—'হ্যাঁ, কিন্তু ব্যাপারটা কি বলতো?'

তাচ্ছিল্যভরে মনমোহন বললে—'কে জানে, রোজ গাদা গাদা মেয়ে আসছে আর বেলা দশটা থেকে ছ'টা পর্যন্ত বাছাই চলেছে।'

জিজ্ঞেস করলাম—'কি পার্ট ওদের দেবে বলতো?'

—'ঝি-এর নয়তো এক্সট্রার। হয়তো কোনও পার্টই দেবে না। এত করে মেসো মশায়কে বললাম যে, আমার একটি জানাশোনা ভালো মেয়ে আছে তাকে একবার দেখুন, তা দেখা দূরের কথা, উল্টে আমায় কতকগুলো গালাগালি দিয়ে বলে দিলে—'মেয়েদের সিলেক্শনের সময় আমি যেন সেখানে না থাকি।'

মনমোহনের ব্যথা কোথায় বুঝলাম। হেসে শুধু বললাম—'দাউ টু মনমোহন?'

একটু থতমত খেয়ে আবোল তাবোল যুক্তি দিয়ে বোঝাতে চাইল মনমোহন যে, একটা নিছক পরোপকার ছাড়া আর কিছু নয়। জানা শুনো মেয়ে, চেহারা ভালো, অবস্থা খারাপ। যদি তার কিছু উপকার করতে পারে এই আর কি। আরও অনেক কিছু হয়তো বলত মনমোহন, বাধা দিয়ে বললাম—'এক কাজ কর তুমি। ভরসা করে আমার সঙ্গে মেয়েটির আলাপ করিয়ে দাও। আমি যদি জ্যোতিষবাবুকে অনুরোধ করি, আশা করি ঠেলতে পারবেন না।'

হতভম্ব হয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল মনমোহন আমার মুখের দিকে। তারপর দুর্বার হাসিতে ওর সারা দেহ উঠলো কেঁপে—আমার দিকে ঐভাবে এগিয়ে আসছে দেখে তাড়াতাড়ি দু' পা পিছু হঠে ঘুঁষি বাগিয়ে বললাম শুধু—'খবরদার।' আর না এগিয়ে বসে পড়ল মনমোহন। হাসির রেশ কিছুটা কমলে রুমাল দিয়ে চোখ মুখ মুছে বললে—'দরকার নেই ওর ফিলিমে নেমে।'

মনমোহনের হাসিতে এবার আমিও যোগ দিলাম।

(ক্রমশ)

সতীন

সুনন্দা গুহ

ঠিক কিচেনের সামনে লোকটা বসে। নৌকোর মত একটা টিনের লম্বা পাত্রে বিক্রী করে কবিকল্পনার দুর্লভ সামগ্রী—লীলাকমল। সবুজ লম্বা লম্বা নাল আর তার শেষ প্রান্তে বন্ধ অমৃত-পাত্রের মত সবুজাভ পদ্মকুঁড়ি গোছা করে রাখা।

এখানে এসে প্রথমেই লক্ষ্য করেছিল বিজয়, খুব বিক্রী হয় ওর ফুল। হস্টেলের মেয়েরা প্রায় সবাই কেনে, ঘরে নিয়ে সাজায়। খেতে যাওয়ার সময় ওকে দেখলেই বলে—'এই চলে যেও না যেন—ফিরে এসে নেব, কিন্তু ভাল ফুল এনেছ তো?'

লোকটা হেসে বলে, 'খাইয়া আসেন দিদিমণি, সুন্দর ফুলই আনছি। আসেন আপনেরা।'

এখানে খাঁটি পশ্চিমবঙ্গের কথার মধ্যে ওর পূর্ববঙ্গের টান দেওয়া কথা শুনে ভারি ভাল লাগলো বিজয়ের—ও-ও এসেছে পূর্ববঙ্গ থেকে। ওর কাছে এগিয়ে এলো সে, 'কোত্থেকে আসছো তুমি, পাকিস্তান?'

'হ, আইজ্ঞা। ব্রাহ্মণবাইরা আছিলাম, থাকতে আর পারলাম কই?' লোকটা খেদোক্তি করলে।

বিজয় একবার লোকটার দিকে তাকালো—সাদা রংয়ের ফতুয়া গায়ে, চুল বেশ পরিপাটি আঁচড়ানো, মুখেও বেশ প্রসন্ন পরিতৃপ্তি, আগের আক্ষেপোক্তির সংগে খাপ খায় না।

সকৌতুকে সে বললো, ভালই তো আছ এদেশে, যার বেসাতি নিয়ে বসেছো আর যাদের কাছে বিক্রী করছো তা দেখে তো আমাদেরই হিংসে লাগে।'

এবার ওর মুখেও বেশ একটু হাসি ফুটলো, বললো, 'আমার বেচনে আর আপনেগো ফুল দ্যাওনে তফাৎ আছে কর্তা। আপনেরা তো শুধু ফুলই ধইরা দিবেন না, আরো কিছু দিবেন—সেই মনটা দিলে তবে না ফুলের দাম। লন না বাবু, মনের মানুষের লেইগা ফুল।' বিজয় হেসে ফেললো, 'সাবাস ওস্তাদ, ফুল সাজাবার চেয়ে তো কথা সাজাতে পারো তুমি বেশী ভাল, ব্যবসায় তোমার উন্নতি হবে, কিন্তু আমার দেবার মত মনের মানুষ কেউ নেই, কার জন্য নেব বল?'

যে মেয়েটি ফুল রাখবার কথা বলে গিয়েছিল, সে দ্রুতপায়ে ফিরে আসছে দেখা গেল। দেখি, ভাল দেখে বেছে দাও তো দুটো ফুল।' ভাল দেখেই বেছে দিল ফুলওয়ালা তারপর মিষ্টি হেসে বললো, 'সুন্দর হাতে আমি কি খারাপ ফুল তুইলা দিতে পারি।'

মেয়েটি এখানকার অন্যতমা শ্রেষ্ঠা সুন্দরী পদ্মা রায়—একবার ভ্রূ কুঁচকে তাকালেও মুখের হাসি লুকাতে পারলো না। বললো, 'তাই নাকি? তবে কালকের ফুলগুলো নীরেস হয়েছিল কেন?'

কথায় হারবার পাত্র নয়। প্রাণতোষ বললো, 'কাইল তো আপনেই বাইছা লইলেন। আমি দিলে কি আর খারাপ পাইতেন—রূপে যাচাই করে অন্য লোকে। —আয়নারে রোজ জিগান লাগে না? নিজে নিজে কি আর রূপ বোঝা যায়?'

পদ্মা চলে যেতে বিজয় প্রাণতোষের দিকে ফিরলো বললো, 'তোমার বেশ রস লেগে গেছে এখানে—ভালই তো আছ কি বল?'

প্রাণতোষ এবার লজ্জা পেলো বললো, 'কি যে কন্, গরীব মানুষে ব্যবসার খাতিরে হরেক কথাই কইতে হয়।'

* * *

কয়েক দিন পরে সাঁওতাল পাড়ার দিকে হাঁটিতে হাঁটিতে গিয়েছিল বিজয়। একটা বিলের ধারে এসে থমকে দাঁড়ালো সে, সে দিনের ফুলওয়ালা নয়?

'এই যে, কি করছ তুমি', গলা ছেড়ে হাঁক দিল বিজয়। জলের ধার থেকে মাথা তুলে তাকালো প্রাণতোষ, লম্বা একটা আঁকশী দিয়ে পদ্মফুলগুলো পাড়ে জড়ো করছে সে। বিজয়কে দেখে হাসলো বললো, 'কাইলের উৎসবের জন্য বেশী ফুল লাগবো তো তাই যোগাড় কইরা রাখতেছিলাম।'

'তোমার বাড়ি এইখানেই বুঝি?' বিজয় প্রশ্ন করল—।

'আছি এইখানেই। বাড়ি একখান করছি আপনেগো কৃপায়, তবে আমাগো বাড়ি ছাগল-গরুর খোয়ারের লাহান, লইয়া যাইতে লজ্জা লাগে।' প্রাণতোষ দ্বিধার সঙ্গে হাসলো।

'না না, আমি এই বেড়াতে এসেছিলাম, কোথাও যাবো না এখন। তুমি উঠে এসো না—এখানেই বসি। ফুল তো তোমার তোলা হয়েছে।' বিজয় বিলের ধারেই বসে পড়লো। ভোর সকালের হাওয়াটা ভারী মিষ্টি লাগছিল ওর।

প্রাণতোষ উঠে এলো। বললো, বেড়াইতে আইছিলেন? বড় সুন্দর এই বিলখান।'

'সত্যি, সুন্দর।' পদ্ম আকীর্ণ দীঘির দিকে তাকিয়ে বিজয় বললো, 'তোমার তো বেশ আয় হয় এখান থেকে, খুব ফুল ফোটে তো।'

'হ, চইলা যায়। বিলটা আপনেগো আশীর্বাদে দুধেলা গাইয়ের চেয়ে বেশী—দোয়ানের আগেই জমাট ক্ষীর আউগ্যাইয়া দেয়। দ্যাখেন না নমুনাখান।' ক্ষীরোদসাগরের মত বিলের দিকে তাকিয়ে সায় দিল বিজয়। পদ্মের রোমাঞ্চে বিলটা যেন যুবতী মেয়ের মত স্বপ্নবিহ্বল হয়ে আছে।

'অন্য ফুল বেচ না তুমি?' বিজয় ফুল দেখতে দেখতে প্রশ্ন করলো। প্রাণতোষ হাসলো। বললো, 'দ্যাখেন নাই। আমার ভাণ্ডে অন্য ফুলও আছে, দোপাটী অপরাজিতা—ওইগুলি আমার বউয়ের শখ। বিক্রী হয় পদ্মফুলই। অন্য ফুলের সাধ্য কি পদ্মর লগে টেক্কা দিব।' পাশে রাখা পদ্মর কুমারীশরীরে পরম আদরে হাত রাখলো প্রাণতোষ।

'তুমি এ ফুল বড় ভালবাস না?' বিজয় জিজ্ঞাসা করলো।

'তা আর কইতে?' প্রাণতোষ হাসলো।

'আর তোমার বউকে?' বিজয় হঠাৎ সকৌতুকে জিজ্ঞেস করলো।

প্রাণতোষ সলজ্জে জবাবটা এড়িয়ে পারিবারিক কথা পাড়লো, 'দেশে ওর গয়লার ব্যবসা ছিল। দেশ ভাগ হয়ে গেলে ব্যবসায় লোকসান দিয়ে যখন এখানে চলে এলো সস্ত্রীক, তখন থেকেই ফুলের ব্যবসা শুরু করেছে ও। বুদ্ধিটা ওর বউয়েরই। নিরুপমাই বলেছিল, মেয়েরা খুব ফুল ভালবাসে এখানে, উৎসবও হামেশাই হয়, তখন ফুলের জোগান দেওয়াটা খুব লাভের ব্যবসায় হবে। প্রথমটা ওর বউই বনটন ভেঙে ফুলের ডাল, ছোটখাটো বুনো ফুলের তোড়া সংগ্রহ করে দিত। কিন্তু তত বিক্রী হ'ত না তাতে! মেয়েরা বেজার হয়ে কিনতো নেহাৎ ভাল ফুল না পেয়ে, ওকে বলতো, 'জলপদ্ম যোগাড় করতে পারো না, কিংবা কেয়াফুল?'

কেয়াফুল সংগ্রহ করায় ভারী আপত্তি নিরুর, তাতে নাকি ভীষণ সাপের ভয়। এমন সময় হঠাৎ এই বিলের সন্ধান পেয়ে গেল প্রাণতোষ—শুভদৃষ্টি হ'লো সুহাসিনী পদ্মবনের সঙ্গে, সেই থেকে ওর ভাগ্যটা ফিরে গেছে, পয় আছে পঙ্ককন্যা পঙ্কজিনীর। তাই জন্যই এত আদর এই সলিল দুহিতাদের প্রাণতোষের কাছে।

প্রাণতোষ বললো, 'বউ আপনের মত জিগায়, কারে বেশী ভালবাসি। কয় কি ওই পদ্মফুল আমার সতীন। কেমন

পোলাপান দেখছেন—কারুর লগে
কারুর তুলনা হয়। নিরু হইল অ
অতুলের মা—রক্তমাংসের মানুষ, পদ্ম
কন দেখি কেমনে ওর সতীন হয়? আ
ওর ফুল যে বেশী বিক্রী হয় না এ
ওর মনে খুব লাগছে। কিন্তু দে
আপনে, আমি কলেজের দিদিমণিগো
কি না ওর ফুল লইতে?'

* * *

পরদিন সত্যি সত্যি ফুল বি
সময় ডাক দিল প্রাণতোষ, 'দাদা
আসেন দেখি এইদিকে একটু।'

বিজয় একটু দূরেই দাঁড়াে
ভীষণ ভীড় ওর ওখানে আজ। পদ
চিত্রলেখা, অনসূয়া কলেজের শ্রে
সুন্দরীরাই ভীড় করে কিনছে। 'আমা
পাঁচটা পদ্ম দাও।' অনসূয়া হা
বাড়ালো।

'কেন পাঁচটা কেন', কে ঠাট্টা করলো
খাটের চার সীমানায় চারটি রেখে একট
বুকে নিয়ে ঘুমুবি নাকি? তারপর
রাজপুত্তুর এসে দেখবে চারদিকে পদ্ম
ফুল, মাঝখানে টুলটুল রাজকন্যে।'

'আঃ অসভ্য!'

'আমাকে বারটা দাও তো—' পদ্মার
গলা শোনা গেল। 'আজকে আবার
আমাকে সভা সাজাতে হবে। তোরা
বাবা দয়া করে একটু হাত-পা নাড়িস
আমার সঙ্গে। এই ফুলওয়ালা ভাল
দেখে বেছে দাও। বেশী ফোটা দিও না
যেন, সব ঝরে যাবে।'

'আইজ উৎসব নাকি কোন?' প্রাণ-
তোষ এক ডজন পদ্মফুলের গোছা দাঁড়
দিয়ে জড়াতে জড়াতে বললো, 'তাহলে
অন্য ফুলও লন না—দোপাটী গন্ধরাজ
আছে এই যে।' এক পাশে পদ্মপাতায়
মোড়া ফুলের ভাগটা উন্মোচন করলো
সে।

পদ্মা ওর হাত থেকে পদ্মর তোড়াটা
নিতে নিতে বললো, 'ছাই, তোমার ওই
বাজে ফুল কেউ চায় না বাবা—তুমি কেন
যে ওগুলো আনো—বেশী করে পদ্ম
আনবে বুঝেছ?'

'হু', প্রাণতোষ বিগলিত স্বরে বললো।
'সে আমি ঠিকই আনুম। পদ্মর কাছে
কি অন্য ফুল লাগে। কিন্তু কইছিলাম
দুই আনার এই ফুলই যদি লইতেন।'

কিন্তু কেউই ও ফুলের দিকে তাকালো না। গোছা গোছা করে লীলা-কমল দু'হাতে ভরে ওরা সব কলধ্বনি করতে করতে হস্টেলের দিকে রওনা হল।

পুলকিত প্রাণতোষ বললো, 'দেখছেন পদ্মের কি আদর?' আমি কইছি না, আগেই কইছি নিরুরে, ওই ফুলগুলি তুইলা কোন লাভ নাই। উঠানে গাছ করছস, রোজ যত্ন করস কার, গাছের ফুল গাছেই শোভা। তা না বেতর তর্ক করবো 'তাহ'লে জলের পদ্ম জল থেকা তুমি বা তুল ক্যান্।' আরে বাবা তুলি কি সাধে, ও হইল আমার প্যাটের ভাত জোগাইনা লক্ষ্মী—পদ্ম না আইনা না খাইয়া মরুম নাকি?'

বিজয় বললো, 'তোমাদের যেন ফুল নিয়ে ভারী রেশারেশি চলে, এমন কেন?'

প্রাণতোষ মানুষটা একটু সোজা ধরনের। বললো, 'কি জানি, আগে তো আছিল না এই রকম—সহজ কথারে সহজে বুঝতো। পদ্ম বেইচা প্যাট ভইরা ভাত পাই এমনই বুঝ লইছিল। অখন কয় আমার নাকি লাটসাহেবী মাজাজ হইছে—কাছের ফুল গাছের ফুল চোখেই দেখি না—পদ্ম নাইলে মন ওঠে না—এর পিছে নাকি অন্যের গর্জ আছে। আইচ্ছা কন দেখি ক্যামন কথা।'

বিজয় রসের গন্ধ পেয়ে নড়ে বসলো। 'কার আবার গরজ দেখে ফুল তোল তুমি?'

প্রাণতোষ কিন্তু এবার সতর্ক হয়ে গেল। বললো, 'আরে থোন্ মাইয়া-মানুষের কথা। দেখি দ্যাশের কথা কন। বাড়ির থেইক্যা বাবুর পত্র পাইছেন?'

* * *

বেশ লাগে বিজয়ের প্রাণতোষের বাড়ির খবর জিজ্ঞেস করতে। খবরের মধ্যে ওই তো তার বউ—তা বউর গুণের কথা প্রায়ই বলে প্রাণতোষ—ভারী নাকি লক্ষ্মীমন্ত ওর বউ। খুব পরিশ্রমী। তার শেষকালে হেসে প্রাণতোষ বলে, রান্ধে য্যান অমৃত—প্রাণকাড়া।'

বিজয় একটু রসিকতার লোভ সামলাতে পারলো না। বললো, 'অতুলের মায়ের গুণের কথাই তো বল, রূপের কথাটাও বল না? বাড়িতে নিয়ে তো বউ আর দেখালে না, শুনি তোমার মুখেই, খুব সুন্দরী বুঝি।'

প্রাণতোষ লজ্জা পেয়ে গেল! কি আর কমু। আমাগো ঘরের বউ কি আর আপনেগো মত চতুর সুন্দর হয়, তবে কইতে নাই, ওর মুখখানা লক্ষ্মীর পারা। তবে আগুনের খাপরার মত রূপ কই পাইব কয়ন?'

বিজয় প্রাণতোষের বউকে কল্পনা করতে চেষ্টা করে। প্রাণতোষের অনেক দিনের টুকরো টুকরো কথার আলোয় যে আলোকচিত্র ও রচনা করে সেটা ওর কাছে একটুও অলীক ঠেকে না। একমেটে লক্ষ্মী প্রতিমার মত আধঘোমটা-টানা একটি শান্ত মেয়ে। সারাদিন মুখ বুজে ধান ভানে আর ডাল বাছে, আর অবসর পেলেই কোদাল দিয়ে কুপিয়ে উঠোনে ফুল আর সব্জীর বাগান করে। তারপরে সন্ধ্যে হলে দুধজোছনায় নিকোন উঠোনে মাদুর পেতে অতুলকে পায়ের ওপরে শুইয়ে ছড়া শোনাতে শোনাতে হঠাৎ ভারী মিঠে করে তাকায় প্রাণতোষের দিকে, বলে, 'চাইয়া দেইখা আশ মেটে না নাকি।'

প্রাণতোষ লোকটা মনে মনে কবি—লোভীর মত হেসে বললো, 'একখানা গান মনে লয় বউ তরে দেখলে।'

ফিক্ করে হেসে নিরু বলে, 'কি শুনি?'

'রূপ দেখ্‌লাম রে নয়নে
রূপ দেখ্‌লাম রে
আমার হিয়ার মাঝত বাইর
হইয়া রূপ দ্যাখ্‌লাম রে'

কোন এক বাউল গানের পূর্ববঙ্গীয় সংস্করণ গেয়ে শোনায় প্রাণতোষ।

'ঠাট্টা কর নাকি।' নিরুপমা গম্ভীর হতে চেষ্টা করে। 'আমি নাকি আবার সুন্দর? আইজ কাইল তো সুন্দরী দেইখা দেইখা ঘরে মনই লাগে না তোমার।'

শেষের অভিযোগটার উত্তর দিল না প্রাণতোষ। কিন্তু এক আঙুলে ওর থুতনী ছুঁয়ে বললো, 'তুমি হইলা আমার অতুলের মা—তোমার সুন্দর হওনের ঠ্যাকাটা কি কও?' কথাটা ঠিক প্রশংসা নয়, কিন্তু মধুর প্রসন্নতায় আস্তে আস্তে মনটা ভরে যায় নিরুর।

ঠিকই বলেছে প্রাণতোষ। নিরুর রূপ আগুনের খাপরার মতন নয় ও মৃত্তিকা-ময়ী—ফসল ফলায়।

* * *

কিন্তু প্রাণতোষের জীবনে তরঙ্গও তোলে এই মাটির মেয়েটিই। এক-একদিন ভারি শুকনো মুখ করে থাকে প্রাণতোষ। পদ্মফুল দিতে গিয়ে রসালো করে টিপ্পনীও কাটে না। বিজয় খাওয়ার পরে বেরিয়ে এসে ডাক দেয়, 'কি ওস্তাদ?'

টিনের পাত্রটা মাথায় তুলে প্রাণতোষ প্রায় রওনা হয়েছিল। একটু বিশ্রুক হে'টে আসি।' বিজয় ওর সংগ ধরে। যাই আমি।'

'চল না আমিও তোমার সংগে একটু হে'টে আসি।' বিজয় ওর সংগ ধরে।

খানিকটা গিয়ে আপন মনেই বলে প্রাণতোষ! খামাকা বেজার হইলে নি ভাল লাগে—দ্যাখেন তো। সহসা জেদ ধরবো, 'আইজ ফুল বেচতে বাইর হইও না।' ক্যান্, না তার শরীর খারাপ। আরে বাবা আমাগো দিন আনন দিন খাওন—আমরা নি জিনিস না বেইচা পারি? তাতে কত কথা যে শুনাইল, আমার নাকি বাইর টান হইছে। আইচ্ছা কন তো—কোনদিন ওর কথা ছাড়া কইছি আপনেরে।' প্রাণতোষের গলাটা বেজার শোনায়—'যাই দেখি, অখন আরেক পশলা হইব আর কি।'

* * *

নিরুর অভিযোগ একেবারে মিথ্যেও বোধ হয় নয়। প্রাণতোষ যেমন হাসি-হাসি মুখে মেয়েদের ফুল বিক্রী করে—এমন সব টিপ্পনি কাটে বিজয়েরও সং সময় খুব ভালো লাগে না।

'চারুদি আইজকাল আপনে প্রাণ-তোষরে ভুলছেন। কই আর তো খোঁজ হয় না।'

'পদ্মাদির হাতে পদ্ম না হইলে মানায় না। লন দুগা পদ্ম।' পদ্মা এক টুকরো হেসে দুটি পদ্ম তুলে নিল লীলাকমলধৃত পদ্মহস্তের দিকে তাকিয়ে প্রাণতোষ নিবিষ্ট হয়ে গেল। বি অপরূপ!

কিছুদিন ধরে বিজয় এ জিনিসট লক্ষ্য করেছে। শুধু লক্ষ্য করা নয় খারাপও লেগেছে ওর। পদ্মাকে বিক্র করতে একটু যেন বেশী ত্বরিত প্রাণতোষ পদ্মার সংগেই সবচেয়ে বেশী কথা হাসি

সেদিন প্রাণতোষের বিমুগ্ধ দৃষ্টি লক্ষ্য করে তাই একটু কষায়ভাবেই বলে ফেললো বিজয়। 'অমন হাঁ করে দেখছ কি?'

প্রাণতোষ আহতমুখে ফিরে তাকালো তারপরের কথাটা হাসতে হাসতে বললো বিজয়, কিন্তু তাতে তার তিক্তত ঢাকা রইল না। 'ভদ্রঘরের বৌঝির দিকে অমন করে তাকিওনা প্রাণতোষ, কোনদি অপমান হবে।'

প্রাণতোষের মুখে উত্তাপের রং ধরলো, সেও যোয়ান ছেলে বিজয়ের কথার উত্তরে তাই কথা কেটে বললো, 'সুন্দর জিনিস সকলেই দেখে, তাতে কর্তা ভদ্রলোক ছোটলোকের কথা চলে না।' তারপরই ঝাঁকা নিয়ে উঠে পড়লো প্রাণতোষ।

ও চলে যাওয়ার পর কিন্তু অনুতপ্ত বোধ করলো বিজয়—ভারি অপ্রস্তুত ও। ভাবলো পরের দিন দুটো ভাল কথা বলে আজকের অন্যায় কথার শোধ মিটিয়ে দেবে।

* * *

পরদিন কিচেনের সামনে অনেক আগে গিয়েই বসে রইল বিজয়, কিন্তু প্রাণতোষ এলো না, এলো পদ্মা—বিরক্ত ঝাঁজালো গলায় বললো, 'ফুলওয়ালা আসেনি না?'

বিজয় বললো, 'না।'

'দেখুন দেখি কি কাণ্ডজ্ঞানহীন লোকটা। আজ কিনা সভার সব ফুল আনবার ভার দেওয়া হয়েছে ওকে, আজই এলো না। ইস্ এমন দায়িত্বজ্ঞান-হীন, এমন সুযোগটা করে দিলাম ওকে।' রাগের চোটে দাঁত দিয়ে নখ খুঁটতে লাগলো পদ্মা।

কিন্তু পদ্মার সমস্ত প্রত্যাশা ব্যর্থ করে প্রাণতোষ সেদিন আর এলো না—এলোই না।

* * *

পরের দিন কিচেনের সামনে আবার দেখা গেল ওকে। বিজয় তক্কে তক্কেই ছিল, এগিয়ে এল—'এই যে কি ব্যাপার, কাল এলে না কেন?'

প্রাণতোষের দু চোখ ভীষণ লাল, চুলগুলোও উস্কোখুস্কো, বললো, 'এই-মাত্র শ্মশান থেকা আসতাছি বাবু।'

'সে কি কথা?' বিজয় চমকে উঠলো।

সে কথার জবাব দিতে গিয়ে দু' হাতে মুখ ঢেকে হঠাৎ ডুকরে উঠলো প্রাণতোষ।

তারপরে অনেকক্ষণ বাদে নিজেকে সংযত করে ঘটনাটা বললো—

অনেক দিন ধরেই নিরুপমার সঙ্গে মন কষাকষি চলছে প্রাণতোষের ফুল বিক্রীর ব্যাপার নিয়ে। দোষের মধ্যে পদ্মফুল বিক্রী করতে ভীষণ আসক্তি প্রাণতোষের, কিন্তু সে আসক্তি শুধু কি পদ্মে, না আর কোন পদ্মমুখীতে?

বলে বলে বোঝাতে পারেনি প্রাণতোষ পদ্ম ভাল লাগে টাকা বেশী আনে বলে, ভারি পয়া ফুল পদ্ম। কিন্তু বিশ্বাস হ'ল না নিরুর। সর্বদা কান্নাকাটি মান-অভিমান। রাগ করে প্রাণতোষ সারা দিনরাত বিলের ধারেই বসে থাকতে লাগলো বাড়ি ছেড়ে। আর থাকতে থাকতে ওকে যেন একটা নেশায়ও পেয়ে বসলো।

কি অপূর্ব পদ্মের বাহার! জ্যোৎস্না রাত্রিতে দেখায় যেন মোম আর মধু দিয়ে গড়া কুমারী মেয়ের শরীর, দেখতে দেখতে মাতাল হয়ে যেতো প্রাণতোষ। গোড়া শুদ্ধ তুলে নিয়ে আসতো উদ্ভিন্নযৌবনা জলকন্যাকাদের আর প্রত্যেক দিন উপহার তুলে দিত কমলাক্ষিদের হাতে। বাড়ির লাঞ্ছনা-গঞ্জনার পর ভারি মধুর লাগতো তাদের কলোচ্ছ্বাস, আকুল হাসি, অনুযোগ, রসিকতা। পদ্ম আর পদ্মাঙ্গীরা প্রাণতোষকে প্রায় উন্মত্ত করে তুলেছিল।

নিরু রাগ করতো, সেই রাগ প্রাণ-তোষকে কেবল ওর থেকে দূরেই সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল।

তারপর একদিন প্রাণতোষের ওপর হুকুম হ'ল উৎসবের সব ফুল জোগাবার, পদ্মাই বন্দোবস্ত করে দিল। হুকুম তো নয়, অঙ্গীকার—সফলতার প্রতিজ্ঞা। তা ছাড়া অন্য কোন রংও কি ছিল না সেই অনুরোধে?

প্রসাদবার্তা এলো পদ্মিনীরই মুখে, যাকে হ্যাঁ বলতে লজ্জা কি, প্রাণতোষের অন্য সকলের চেয়েই বেশী ভাল লাগতো। পদ্মফুলের সঙ্গে সত্যি কি দোপাটির তুলনা চলে?

নিরুপমা বুঝতে পেরেছিল মাটির মত মেয়ে নিরুপমা, কিন্তু আধঘোমটা টানা শরীরের নীচে ধুকপুক করে নরম হৃৎপিণ্ড—আর এক-একবার মোচড় দেয় নিদারুণ ক্ষোভে। কিন্তু কি করলে সে ফিরে পাবে নিজের জায়গা।

ঘুম ভেঙে উঠে প্রাণতোষের দিকে তাকালো সে, প্রাণতোষ নীচে শুয়েছিল। আজকাল ওরা আলাদাই শোয়। চওড়া কপাল প্রাণতোষের, তার মধ্যে গাঢ় হ'য়ে টানা রেখাগুলো চাঁদের আলোয় দেখতে পেলো নিরুপমা।

অনেকটা দূরে প্রাণতোষ ওর চৌকী থেকে, প্রায় চার-পাঁচ হাত। কিন্তু কোন-মতেই কি পার হওয়া যায় না এই ব্যবধান—এই ঈর্ষার আর অবিশ্বাসের, বিরাগের আর অমনোযোগের ফাঁক—সরে আসা যায় না স্বামীর সোহাগ বাহুবন্ধনীতে?

জ্যোৎস্না রাত্রে দরজা খুলে বেরিয়ে এল নিরুপমা। আঁকশিটা হাতে নিল। আজ সে-ই কালকের সব ফুল সংগ্রহ করে দেবে, যে ফুল পরম আদরে পদ্মাদের হাতে তুলে দেয় প্রাণতোষ।

তারপরেও কি প্রাণতোষ তার দিকে তাকাবে না, ডাকবে না একবার কাছে?

আকাশে অনেক চাঁদের আলো, দীঘির জলে আরো। কয়েক হাজার চাঁদই যেন ফুটে রয়েছে দীঘিতে। ধার থেকেই টান দিল আঁকশি দিয়ে। কিছু এলো, কিন্তু বেশী নয়। এবার একেবারে জলের মধ্যে নেবে পড়লো নিরুপমা—পূর্ববঙ্গের মেয়ে, জলে ওর ভয় নেই। দু'হাত ভরে পদ্মলতা বুকের কাছে জড়ো করে আনলো ও। ওর নরম গালে হঠাৎ কি যেন লাগলো। তাড়াতাড়ি উঠে আসবার আগেই কেউটে সাপ ছোবল মারলো কণ্ঠের ওপরে।

'সকাল বেলায় তুইলা আনলাম। পদ্মপাতার মধ্যে নীলপদ্মের মত নীল হইয়া ভাইসা উঠছিল।' প্রাণতোষ আর কাঁদছিল না।

বিজয় কি ভাবে কি বলবে বুঝতে পারলো না।

একবার হাসির চেষ্টা করে প্রাণতোষ বললো, 'আইজ শুধু ওর ফুলই আনছি, পদ্ম আর হাতে কইরা আনতে পারলাম না। ওরে ও সতীন কইত কিনা।'

টিনের পাত্রটায় সত্যি আজ পদ্ম ছিল না, শুধু পদ্মপাতার ওপর আহত হৃদয়ের মত লাল দোপাটির একটা ছোট স্তূপ।

বুকপকেট থেকে আস্তে আস্তে রুমালটা বের করলো বিজয়। বললো, 'দাও, আজ আমি তোমার ফুল নেব।'

সবাই জানেন –
সীলকরা প্যাকেটে পাওয়া যায় ব'লে ব্রুক বণ্ড চা নির্ভেজাল ও একেবারে খাঁটি থাকে
দামের তুলনায় ব্রুক বণ্ড চায়ে অনেক বেশী কাপ ভালো চা পাবেন
রোজ ২৪,৯০,৪৯৬ প্যাকেট ব্রুক বণ্ড চা লোকে কেনেন
এই জন্যেই
অন্য যে কোন মার্কা চায়ের চেয়ে
ব্রুক বণ্ড চা
বেশী লোকে খান!

॥ আট ॥

সুপ্রভাত। সূর্য উত্তরায়ণে আসীন। সপ্তাশ্ববাহিত স্বর্ণরথে যে দিব্য- তিমান দিবাকর পৃথিবীকে তাপ কিরণ করে প্রাণরসে সঞ্জীবিত করেন, আজ াতে তিনি তেজ-স্তিমিত। পশ্চিম ন্ত ব্যেপে মেঘ ঘিরে আছে। ঝাঁসীর াদিকে লছমীতাল হ্রদের পূর্ব ান্তের নহবৎখানায় ভোরাই সুর ছে। মহালক্ষ্মী মন্দিরে পূজা এল পুরী থেকে।

রাজপুরীতে যে উৎসবের প্রস্তুতি ছে, তাকে ত্বরান্বিত করবার জন্য রানী ়গন। গভীর উদ্বেগের মধ্যেও কর্তব্যের তাঁকে চালনা করছে। আজকের াশ আধখানা মেঘে ঢাকা, অন্য আধখানা দ ঝলমল করছে। রানীর চিত্তেও কে আশা-নিরাশার গঙ্গা-যমুনা। রো বছর আগে তিনি কণ্ঠে যে লসূত্র ধারণ করেছিলেন, বুঝি তার শেষ হয়ে এল। পিতা যদিও তাঁকে ার সান্ত্বনা দিচ্ছেন, তবু কোথাও যেন ট প্রহর বাজবার সংকেত শুনতে ন রানী। কোথাও যেন নিয়ত প্রহর চলেছে—সময় নেই, সময় নেই।

যখনই স্বামীর ঘরে প্রবেশ করছেন , তখনই স্বামীর দৃষ্টি তাঁর কাছে আশ্বাস চেয়ে অনুসরণ করছে। তিনি আশ্বাস দিচ্ছেন গঙ্গাধরকে, এতটুকু আরাম করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। হায়, অন্তরের টানে যদি এতটুকু রোগ- যন্ত্রণা লাঘব করতে পারতেন তিনি গঙ্গাধরের।

গঙ্গাধরের জীবনের প্রদীপ নিষ্প্রভ হয়ে এল—এখন নতুন মানুষের প্রয়োজন। আনন্দ রাওকে নিয়ে নতুন আয়োজনে ঝাঁসীতে নেবালকর বংশের আসনকে অক্ষয় করতে হবে।

২০শে নভেম্বর সকালে, গঙ্গাধরের অন্তিমশয্যার সামনে দত্তক গ্রহণের অনুষ্ঠান হল। বাসুদেব বালক আনন্দের ওপর সব অধিকার ত্যাগ করে গঙ্গাধরের হাতে পুত্রকে সমর্পণ করলেন। বালক আনন্দ এই অনুষ্ঠানের কিছুই বুঝতে পারলেন না। গতরাত্রি থেকে তাকে নিয়ে সকলে অনেক আলোচনা করছে। মাঝ- রাতেও আলো জ্বলেছে তার ঘরে, কতজন কথা বলেছেন তার বার সংগে। একজন এসেছিলেন, যাঁর সর্বাঙ্গে গহনা, আর সুন্দর শাড়ি পরনে, বড় বড় চোখ ভ'রে তিনি তাকে দেখেছেন। জিজ্ঞাসা করেছেন, তুমি আমাকে ভালোবাসবে তো? আমি তোমাকে খুব ভালোবাসব। আজ সকাল থেকে যত ব্যাপার চলেছে, তাতে সে-ই যে প্রধান মানুষ, তা আনন্দ বেশ বুঝতে পারছে। নইলে তাকে এ-রকম রেশমী জামা পরিয়ে গলায় মালা দিয়েছে কেন? কপালে কেন দিয়েছে চন্দনের তিলক?

দুরু দুরু বক্ষে রানী সমস্ত আয়োজন সমাপ্ত করে শুভকাজ যাতে সুনির্বাহ হয় সেই প্রার্থনা করছিলেন। স্বল্প সময়ে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হলে পরে গঙ্গাধর শিথিল কম্পিত হাতে আনন্দ রাওকে

সবাই জানেন —
সীলকরা প্যাকেটে পাওয়া যায় ব'লে
ব্রুক বণ্ড চা
নির্ভেজাল ও একেবারে খাঁটি থাকে
দামের তুলনায়
ব্রুক বণ্ড চায়ে
অনেক বেশী কাপ ভালো চা পাবেন
রোজ ২৪,৯০,৪৯৬ প্যাকেট
ব্রুক বণ্ড চা
লোকে কেনেন
এই জন্যেই
অন্য যে কোন মার্কা চায়ের চেয়ে
ব্রুক বণ্ড চা
বেশী লোকে খান !
BE 95 K
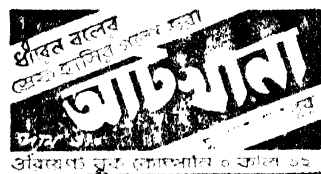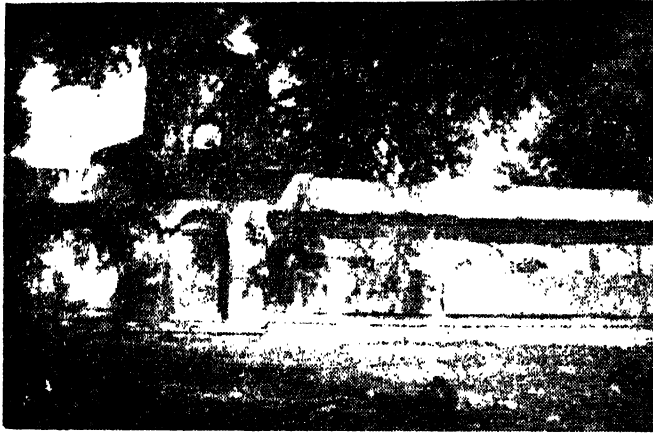
ঝাঁসীতে গংগাধর রাও-য়ের সমাধি উদ্যান

আশীর্বাদ করলেন। রানী আনন্দ রাওকে কোলে নিয়ে স্বামীর পাশে এলেন। আনন্দে গংগাধরের চোখ অশ্রুপূর্ণ হয়ে এল।

দত্তক গ্রহণ অনুষ্ঠানের পর আনন্দের নাম হল দামোদর গংগাধর রাও। এই অনুষ্ঠান দেখতে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন বুন্দেলখণ্ডের সহকারী রাজনৈতিক প্রতি-নিধি মেজর এলিস (Major Ellis) এবং ক্যাপটেন মার্টিন (Captain Martin), লাহোরীমল, তাট্টিচান্দ, মোরোপন্ত ও নরসিংহ ছিলেন সাক্ষী।

গংগাধর রাও ১৮৫৩ সালের ১৯শে নভেম্বর একখানি চিঠি লিখেছিলেন মেজর এলিস (Ellis)-এর নামে। কার্যত এলিস (Ellis) সেটি ২০-১১-১৮৫৩ তারিখে পান। গংগাধর লিখেছিলেন—

"বুন্দেলখণ্ডে ব্রিটিশ অধিকার স্থাপিত হবার অনেক আগে থেকেই আমার পূর্বপুরুষরা যেভাবে ব্রিটিশকে সাহায্য করেছেন, তা ইউরোপ এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিনিধির কাছে সুবিদিত। আমিও তাঁদের পন্থাই অনু-সরণ করেছি।

সম্প্রতি আমি অত্যন্ত অসুস্থ। আমার বিশ্বস্ততার প্রতিদানে একটি বিশাল ক্ষমতাশালী সরকারের অনুগ্রহ পেয়েছি। আমার বংশরক্ষার কে করাই সম্ভব হল না। আমার মৃ সংগে আমার পূর্বপুরুষের নাম যাবে, এই চিন্তায় আমি কাতর

সমস্ত বিবেচনা করে, ১৭-১ তারিখের শর্তের দ্বিতীয় দফা আমি আমার পৌত্র সম্পর্কিত রাওকে ২০-১১-১৮৫৩ তারিে গ্রহণ করছি।

ঈশ্বরেচ্ছায় আমি এখনো হবার আশা রাখি। হৃতস্বাস্থ্য ফি পারি। আমার বয়স বেশী নয় আমার সন্তান হবার সম্ভাব যদি সেরকম কোন পরিণতি ঘে আমি আমার দত্তক-পুত্রের বিষ যোগ্য ব্যবস্থা করব।

কিন্তু যদি না বাঁচি, তাহে পূর্ব বিশ্বস্ততার কথা বিবেচ আমার পুত্রের ওপর যেন কৃপা আমার বিধবা পত্নীকে এই ছেলে যেন জীবৎকালে স্বীকার করা হয় নাবালকত্বের সময় যেন এই রাে এবং মালকিন (শাসনকর্ত্রী) বলে করে কোন অবিচার না ঘটে, সে দৃষ্টি রাখা হয়।

(মেজর এলিস কর্তৃক এবং স

সাশ্রুনয়নে, ক্ষীণকণ্ঠে গংগাধর বারবার অনুরোধ করলে এই দত্তক গ্রহণ ব্রিটিশ সরকার অ করেন। এলিস (Ellis) অত্যন্ত ভূতির সংগে গংগাধরকে আশ্বস্ত মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্যে এলিস ও মার্টিন (Martin) ফিরে তিনটের সময় তাঁরা প্রাসাদে তখন গংগাধর ম্যালকমের (M নামে একখানি চিঠি লিখে মেজর হাতে দিলেন।

ম্যালকমকে (Malcolm) লেখ খানির প্রথম দু-টি প্রকরণ, লিখিত চিঠিখানির অনুরূপ। লেখা হল—

শর্তের দ্বিতীয় দফাটি হচ্ছে সরকারের প্রতি, ঝাঁসীরাজের বি ও অনুরক্তিকে চিরস্থায়ী করবা বুন্দেলখণ্ডে ব্রিটিশ আধিপত্য

হবার সমকালীন ঝাঁসীরাজ রামচন্দ্র রাও (শিবরাও ভাওয়ের পৌত্র)-এর বংশধরদের ঝাঁসীর সিংহাসনের উত্তরাধিকার ব্রিটিশ সরকার স্বীকার করেছেন। অথবা, শিবরাও ভাওয়ের বংশধরদের অধিকারই স্বীকৃত হয়েছে, এ কথাও বলা যায়।

আমার অনুরোধে মেজর এলিস ও ক্যাপ্টেন মার্টিন আমার সঙ্গে দেখা করেছেন। এই চিঠিতে যা যা লিখেছি, তার সবই আমি তাঁদের বুঝিয়ে বলেছি। তাঁদের হাতে আমি একটি চিঠি দিয়েছি। তাতেও আমার পৌত্র (নবীরাণ্-ই-খুর্দ্)-কে আমার জায়গায় বসাবার জন্য অনুরোধ আছে। আমার বিশ্বাস, সেই চিঠিখানিও আপনাকে দেওয়া হবে।”

এলিস (Ellis) এই দুখানি চিঠিই ম্যালকমকে (Malcolm) পাঠালেন। ম্যালকম (Malcolm) ছিলেন গোয়ালিয়ার, রেওয়া এবং বুন্দেলখণ্ডের রাজনৈতিক প্রতিনিধি। সর্বদাই তাঁকে ঘুরতে হত। মেজর এলিস (Ellis) ছিলেন তাঁর সহকারী। ম্যালকমকে (Malcolm) রাজার চিঠিখানি পাঠিয়ে এলিস (Ellis) সঙ্গে একখানি চিঠি লিখে দিলেন। লিখলেন,—

“ঝাঁসী—২০-১১-১৮৫৩

আপনার ২ তারিখের চিঠি অনুযায়ী মহারাজা গঙ্গাধর রাওয়ের মূল চিঠি আপনাকে পাঠাচ্ছি। এতে আনন্দ রাও নামক একটি পাঁচ বছরের শিশুকে দত্তক গ্রহণ বিষয়ে বিবৃতি আছে। তা ছাড়া, এই ছেলেকে তাঁর উত্তরাধিকারী হিসাবে স্বীকার করা এবং ছেলেটির নাবালকত্বের সময়ে তাঁর স্ত্রীকে রাজ্য-শাসনের ভার দেওয়া, এই দুই কাজে সরকারের অনুমোদন যাতে পাওয়া যায়, সেই বিষয়ে সাহায্য করার জন্য অনুরোধ আছে।

আজই সকালে আমি ক্যাম্প থেকে ফিরেছি। রাজার অনুরোধে মার্টিন (Martin) ও আমি তাঁকে দেখতে গিয়েছিলাম। খুব দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, রাজাকে আমরা শেষ অবস্থায় দেখলাম। খরীতাটি তাঁকে পড়ে শোনান হল। তাঁর শরীর যন্ত্রণার আক্ষেপে অস্থির হচ্ছে দেখে আমরা ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

স্বাক্ষরিত—

আর, আর, ডবলিউ এলিস,

ঝাঁসী—২০-১১-১৮৫৩”

২০শে নভেম্বর সন্ধ্যাবেলা প্রাসাদের বাইরে জনতা ভীড় করে এসেছে। চিকিৎসার আয়ত্তের বাইরে চলে গেছেন রাজা, তাই মহালক্ষ্মীর পুজো হচ্ছে। পুরোহিতরা বিভিন্ন মন্দিরে যাগযজ্ঞ, মাঙ্গলিক হোম ইত্যাদি করে গঙ্গাধর রাওয়ের জীবনের জন্য প্রার্থনা করছেন।

আজ সন্ধ্যায় রাজপ্রাসাদের সর্বত্র আলো জ্বলছে না। কথাবার্তা বলছেন না কেউ, সবাই পা টিপে টিপে চলাফেরা করছে। সকালে দত্তকবিধানের অনুষ্ঠানের সময়ে রানী যে উৎসব বেশ ধারণ করেছিলেন, তা খোলবার সময় হয়নি। সকাল থেকে একভাবে তিনি গঙ্গাধরের পাশে বসে আছেন। ঘরের এক কোণে সুবৃহৎ রুপোর বাতিদানে বাতিটি আড়াল করা। মৃদু আলোতে চিক্‌মিক্‌ করছে রানীর গলার গহনা, হাতের হীরার বালা, কপালের কুঙ্কুম তিলক। চোখে জল নেই। মুখ ব্যঞ্জনাবিহীন। বৈদ্য বলেছিলেন জানলা বন্ধ রাখতে, রানী জানলা খুলে দিয়েছেন। ঘরে তাঁর পিতা। অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন এবং অমাত্যরা বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন।

একজন সওয়ার এসে খবর দিল, মেজর এলিস (Ellis) ঝাঁসীর ব্রিটিশ সামরিক ছাউনির মেডিক্যাল অফিসার ডাঃ এ্যালেন (Dr. Allen)কে নিয়ে আসছেন। রাজা তখন সংজ্ঞাহীন। রানীর মুখের দিকে চেয়ে মোরোপন্ত সওয়ারকে আঙুল তুলে ইশারায় ‘না’ বললেন। সওয়ার ঘোড়া ছুটিয়ে গিয়ে তাঁদের খবর দিল, রাজার মুমূর্ষ অবস্থা। এলিস ও এ্যালেন ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে ছাউনিতে ফিরে চললেন।

ইতিমধ্যে গঙ্গাধরকে একতলায় গৃহ-দেবতা মহালক্ষ্মীর মন্দিরের সংলগ্ন ঘরে নামান হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জ্ঞান ফিরে এল। এই দারুণ রোগযন্ত্রণা গঙ্গাধরকে যত না পীড়িত করেছিল তার চেয়েও কাতর করেছিল তাঁকে দত্তক গ্রহণ বিষয়ে দুশ্চিন্তা। ব্রিটিশ সরকার যদি দত্তক গ্রহণ অনুমোদিত না করেন? চৈতন্য লোপ না হওয়া পর্যন্ত সেই চিন্তাই তাঁর মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, চৈতন্য ফিরে পাবার সঙ্গে সঙ্গে সেই চিন্তার অঙ্কুশ তাড়নার মধ্যেই তিনি ফিরে আসছিলেন।

চেতনা ফিরে পাবার সঙ্গে সঙ্গে রাজা এলিসের (Ellis) খোঁজ করলেন। তুফান গতিতে সওয়ার গিয়ে এলিস (Ellis) ও এ্যালেন (Allen)কে ডেকে আনল। এলিসের সঙ্গে রাজা ক্ষীণ অথচ স্বাভাবিক কণ্ঠে কথা বললেন। ডাক্তারকে তাঁর অসুখের বিষয়ে বিশদ বিবরণী দিলেন। এ্যালেন (Allen) দেখলেন, রাজার রোগটি ক্রমিক রক্তমাশয়। তাঁর ওষুধ খেতে অনুরোধ করলেন। রাজা বললেন, গঙ্গাজল মিশিয়ে তিনি ওষুধ খেতে পারেন। এলিস আসবার সময়ে রানী পর্দার আড়ালে চলে গিয়েছিলেন। স্বামীর কথাবার্তা আড়াল থেকে

শুনে তিনি একটু আশ্বস্ত হ'লেন। ডাক্তার ও এলিস (Ellis) চলে গেলেন। ডাক্তারের সহকারী জনৈক দেশীয় ডাক্তার ওষুধ নিয়ে এলেন। ততক্ষণে গঙ্গাধরের মত পরিবর্তিত হয়েছে। তিনি ওষুধ খেতে রাজী হলেন না। রাত যত বাড়তে লাগল অবস্থা খারাপের দিতে যেতে লাগল। এই কদিন রানী শোকবিহ্বলা হয়ে কখনো কেঁদেছেন, কখনো ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছেন, কখনো শোকে উন্মাদের মত হয়ে বলেছেন—মহালক্ষ্মী যদি আমার স্বামীকে বাঁচিয়ে দেন, তবে আমি আমার প্রাণ দিতেও প্রস্তুত আছি। কখনো বালিকার মতো আকুল ক্রন্দনে পিতাকে বলেছেন, আমার ভাগ্যে ছিল আমি 'চিরসৌভাগ্যবতী' হব, পতিকুলের মঙ্গল করব, কেন তার একটিও সফল হ'ল না?

তারপরে যেমন রাত বাড়তে লাগল, ধীরে ধীরে ক্লান্ত আত্মীয়-পরিজনেরা বিশ্রাম করতে গেলেন, কলকোলাহল ক্ষীণতর হ'য়ে এল, তেমনি গঙ্গাধরের মধ্যে জীবনের স্পন্দন কমে আসতে লাগল। পুরোহিত স্বস্ত্যয়ন করছেন। যাজ্ঞিকের কণ্ঠে গীতার শ্লোকগুলি রাত্রির নীরবতায় স্পষ্ট উচ্চারণে শোনা যাচ্ছে। প্রস্তর প্রতিমার মতো রানী বসে রইলেন শয্যাপার্শ্বে। মন্ত্রচালিতের মতো আঙুলে গুণতে লাগলেন মঙ্গলসূত্রের সোনা আর পুঁতির দানাগুলি। শুনতে লাগলেন—

> "বাসাংসি জীর্ণানি যথাবিহায়
> নবানি গৃহ্যাতি নরোঽপরানি—"

জীর্ণবাসের মতো দেহ ত্যাগ করে গঙ্গাধর রাও কি অন্য দেহের সন্ধানে অনিরীক্ষ্য লোকে ভ্রমণ করে ফিরবেন? "জাতস্য চ ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ। তস্মাদ পরিহার্যে হর্যে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি॥" যে জন্মেছে তার মৃত্যু নিশ্চয় হবে, তাই বলে কি এই অপরিহার্য বিষয়ে তিনি শোক করবেন না? গীতার মাধ্যমে কে তাঁকে বলছেন—মামেকং শরণং ব্রজ? কেমন করে তিনি শোক বিস্মৃত হবেন? সমস্ত শুভাশুভ সর্ব ধর্ম কাকে অর্পণ করে নিশ্চিন্ত হবেন তিনি?

কোথাও শান্তি পেলেন না। তাঁর স্পষ্ট মনে হল, যেন অ[illegible] নিদ্রিত রাজপুরীর খোলা দরজা[illegible] প্রবেশ করেছে মৃত্যু। তার [illegible] অন্তরালে কোথাও অপেক্ষা কর[illegible] মুহূর্তমাত্র অসতর্ক থাকা চল[illegible] নির্ণিমেষ নয়নে রাত্রির দিকে [illegible] রইলেন রানী।

প্রদীপে এতটুকু মাত্র আলো [illegible] আর সবই অন্ধকার।

২১শে নভেম্বর সকাল থেকে[illegible] ভূমি ও গো-দান চলতে লাগল। [illegible] চণ্ডীপাঠ করতে লাগলেন শাস্ত্রী[illegible]

বেলা একটার সময় গঙ্গাধর [illegible] মৃত্যু হ'ল। তখন তাঁর বয়স [illegible] সেইদিন লক্ষ্মীবাঈয়ের বয়স [illegible] পূর্ণ হ'ল।

নগরের সর্বত্র সংবাদ ছড়িয়ে [illegible] ছাউনিতে খবর গেল।

রাজপ্রাসাদে উপযুক্ত স[illegible] গঙ্গাধরের শেষকৃত্যের আয়োজ[illegible] লাগল। শোকাকুল জনসাধারণ [illegible] গমন করল। বালক দামোদর [illegible] করলেন। লছমীতাল হ্রদের [illegible] মহালক্ষ্মী মন্দিরের বিপরীত [illegible] গঙ্গাধরের সংকার হ'ল।

আজও সেখানে একটি প্রাচীর[illegible] বাগিচা বিদ্যমান। জীর্ণদেহ প্রা[illegible] গায়ে ফাটল ধরেছে। কোন উৎসুক [illegible] যদি বৃহৎ অশ্বত্থ গাছটির পাতায় প[illegible] বাতাস মর্মরিত নির্জন মধ্যাহ্নে সে[illegible] দাঁড়ায়, দরজার ওপরের লেখাটি [illegible] নজরে পড়বে—

"The Chhatri of Maharaja Gan[illegible] dhar Rao of Jhansi. Born 18[illegible] died 1853.".

লছমীতালের জল, সেই প্রাচীরগা[illegible] পূর্বদিকে নিয়ত ঢেউয়ে ঢেউয়ে আ[illegible] করে। সেই পল্লবকল্লোলমর্মরিত শ[illegible] পরিবেশে শায়িত গঙ্গাধর রাও কোনো[illegible] জানবেন না, তাঁর নাম ধরে রেখেছেন [illegible] দত্তক পুত্রের বংশ। কিন্তু তাঁরা [illegible] রাজপুত্র নন। স্থানীয় মানুষ শ[illegible] খাতির করে তাঁদের বলে ঝাঁসীওয়ালে

(ক্রম[illegible]

স্বামীজীর জীবনের শেষ অধ্যায়ে

শ্রীসরলাবালা সরকার

এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি ক্যালিফোর্নিয়ার নানা স্থানে 'বেদান্ত সমিতি' স্থাপিত হইতে লাগিল। এদিকে স্বামীজীর শিষ্যা মিসেস হেইবোরা লস এঞ্জেলসের বেদান্ত ক্লাসগুলি চালাইতে লাগিলেন। লস এঞ্জেলস হইতে বার বার আহ্বান আসিলেও সানফ্রান্সিস্কোয় যে কাজ আরম্ভ করা হইয়াছে তাহা ছাড়িয়া স্বামীজী অন্যত্র যাইতে ইচ্ছুক হইলেন না।

সানফ্রান্সিস্কোর বেদান্ত সমিতি নূতন স্থাপিত হইয়াছে, সেটি যাহাতে স্থায়িত্ব লাভ করে তজ্জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু স্বামীজী আর বেশী দিন থাকিবেন না, সুতরাং নবপ্রতিষ্ঠিত বেদান্ত সমিতির সভাপতি ডাক্তার এম এইচ লোগান এবং আরও কয়েকজন সমিতির সদস্য ও সদস্যা স্বামীজী যেন আর একজন ভারতীয় সন্ন্যাসীকে এখানকার কার্য পরিচালনের জন্য আনিয়া দেন সেজন্য অনুরোধ করিলেন।

আমেরিকায় তখন স্বামী অভেদানন্দজী আগে হইতেই ছিলেন এবং স্বামী তুরীয়ানন্দ স্বামীজীর সহিত আসিয়াছেন, ভারতীয় সন্ন্যাসীদের মধ্যে ইঁহারাই আছেন। অভেদানন্দ নিউইয়র্ক বেদান্ত সমিতির ভার তুরীয়ানন্দের হাতে দিয়া নিজে নানা স্থানে বক্তৃতা দিয়া বেড়াইতেছিলেন, সেজন্য তাঁহাদের কাহারও সে সময় সানফ্রান্সিস্কোয় আসা সম্ভব হইল না।

এই সময় ক্যালিফোর্নিয়াবাসিনী মিস্ মিন্নি সি বুক নাম্নী এক মহিলা একটি স্থায়ী আশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্য ১৬০ একর জমি দান করেন। স্বামীজী দান গ্রহণ করিলেন, কিন্তু আশ্রম প্রতিষ্ঠা দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। তিনি ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তনের পর স্বামী তুরীয়ানন্দ সেই জমিতে 'শান্তি আশ্রম' নামক আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

এপ্রিল মাস শেষ হইল, স্বামীজীর শরীর আবার অসুস্থ হইয়া পড়িল। কিছুদিনের জন্য অবসর গ্রহণ করিবেন বলিয়া তিনি "ক্যাম্প টেলর" পল্লীতে একটি পল্লীভবনে গেলেন, কিন্তু তিন সপ্তাহ পরেই আবার তাঁহাকে সানফ্রানসিস্কোয় ফিরিয়া আসিতে হইল। শরীর তখন এতই অসুস্থ যে, তাঁহার বক্তৃতা দিবার সামর্থ্য ছিল না। ডাক্তার উইলিয়ম ফস্টার নামে একজন সুচিকিৎসক তাঁহার চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। এই চিকিৎসাধীন অবস্থাতেই তিনি মে মাসের শেষের দিকে "শ্রীমদ্‌ভগবদ্ গীতার" ব্যাখ্যা করিয়া পর পর চারটি বক্তৃতা দেন। যদিও স্বামীজী বেশী বক্তৃতা দিতে পারিতেছেন না, কিন্তু তবুও তাঁহার বিশ্রাম ছিল না। তাঁহার নিকট জনসমাগমের অবাধ ছিল না এবং তিনি সকলের সহিতই আলাপ করিতেন। সেই মধুর আলাপে লোকে বিমুগ্ধ হইয়া যাইত, হাস্যোজ্জ্বল প্রসন্নবদন স্বামীজীকে দেখিয়া কেহ বুঝিতেও পারিত না যে, তিনি কতখানি অসুস্থ।

সেই সময় স্বামীজীর সম্বন্ধে ক্যালিফোর্নিয়ার সংবাদপত্রগুলিতে প্রতিদিনই নানাভাবে বর্ণনা থাকিত। "প্যাসিফিক বেদান্তিন" নামক পত্রিকায় স্বামীজীর সম্বন্ধে যে মন্তব্য বাহির হইয়াছিল তাহার কয়েক ছত্র এখানে উদ্ধৃত করিলামঃ—

"স্বামীজী সুগম্ভীর ভাবের দ্বারা সমস্ত পৃথিবীকে স্পন্দিত করিয়াছেন, তাঁহার এই ভাবরাজি প্রলয়ের কাল পর্যন্ত সর্বদা জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া প্রতিধ্বনিত হইবে। তাঁহার সঙ্গে কি শিশু, কি বৃদ্ধ, কি ভিক্ষুক, কি রাজা, ক্রীতদাস অথবা পতিতা নারী সকলেই সমান অধিকারে আলাপ করিতে পারে। তিনি বলেন,—ইহারা সকলেই এক পরিবারের অন্তর্গত; তিনি বলেন—আমি ইহাদের সকলের মধ্যেই আমার আমিত্ব দেখিতে পাই এবং আমার মধ্যেও আমি তাহাদের সকলের স্বরূপ অনুভব করি। এই পৃথিবী একই পরিবারসদৃশ, যুগান্তপূর্ব ব্যাপিয়া সত্যস্বরূপ অনন্ত ব্রহ্মসমুদ্রেই বিরাজমান।"

মে মাসের শেষে স্বামীজী মিস্টার লিগেট ও তাঁহার পত্নীর নিকট হইতে যে পত্র পাইলেন, তাহাতে তাঁহারা জানাইয়াছেন যে, তাঁহারা জুলাই মাসে লণ্ডন হইতে প্যারিসে যাইবেন, স্বামীজী যেন সেখানে গিয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হন। প্যারিসে সে সময় যে ধর্মমহাসভা বসিয়াছিল স্বামীজী তাহার একখানা নিমন্ত্রণপত্র পাইলেন, তাহাতে তাঁহাকে অনুরোধ করা হইয়াছিল যেন তিনি বৈদেশিক প্রতিনিধিরূপে সভায় যোগ দিয়া একটি বক্তৃতা দান করেন। বিভিন্ন ধর্মের উৎপত্তি ও ক্রমিক বিকাশ সম্বন্ধে তথ্যবিষয়ক আলোচনাই এই সভার উদ্দেশ্য ছিল।

স্বামীজী প্যারিস যাইবেন বলিয়া ক্যালিফোর্নিয়া হইতে নিউইয়র্ক আসিলেন। নিউইয়র্ক আসিবার পথে চিকাগো ও ডেট্রয়েটে নামিয়াছিলেন।

নিউইয়র্কে বেদান্ত সমিতির কাজ ভালভাবেই চলিতেছিল, বেদান্ত সমিতির প্রথম সভাপতি মিস্টার লিগেট পদত্যাগ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার স্থানে কলম্বিয়া কলেজের ডাক্তার হার্শেল পারকার সর্বসম্মতিক্রমে নিযুক্ত হইয়াছেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ এপ্রিল মাস হইতে বেদান্ত সমিতিতে নিয়মিতভাবে বক্তৃতা দান করিয়াছিলেন এবং যোগশিক্ষার ক্লাসও লইয়া-

ছিলেন। স্বামীজী তুরীয়ানন্দজীকে ক্যালিফোর্নিয়া যাইতে বলিলেন, কেননা, সেখানেই বিশেষ দরকার। তিনি নিজে এখানে প্রতি রবিবার 'গীতা' সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে লাগিলেন।
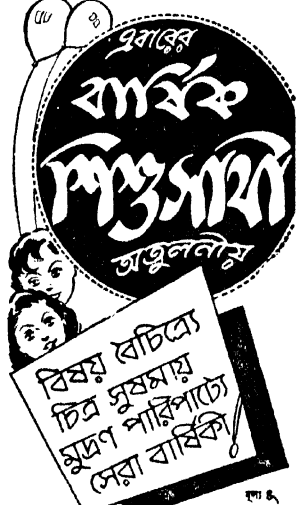
৩রা জুলাই স্বামীজী ডেট্রয়েটে যান এবং তুরীয়ানন্দ সেই দিন স্বামীজীর আশীর্বাদ লইয়া ক্যালিফোর্নিয়া যাত্রা করেন।

২০শে জুলাই স্বামীজী প্যারিস যাত্রা করেন এবং প্যারিসে লিগেট দম্পতির গৃহে অবস্থান করেন।

এই সময় প্যারিসে বিরাট এক প্রদর্শনী খোলা হইয়াছিল এবং ধর্মের ইতিহাস সম্বন্ধীয় সভায় যোগ দিবার জন্য এবং প্রদর্শনীতে যোগ দিবার জন্য নানা দেশের বিশ্বজ্জনমণ্ডলী প্যারিসে সমবেত হইয়াছিলেন, ইঁহারা অনেকেই স্বামীজীর দর্শনের আশায় মিস্টার লিগেটের গৃহে সমবেত হইতেন।

স্বামীজী পরিব্রাজক নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন, "কবি, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, রাজনৈতিক, সাংবাদিক, সামাজিক, গায়ক, গায়িকা, শিক্ষক, শিক্ষয়িত্রী, চিত্রকর, শিল্পী, ভাস্কর, বাদক প্রভৃতি নানা জাতির গুণিগণ-সমাবেশ, মিস্টার লিগেটের আতিথ্য-সমাদর-আকর্ষণে তাঁর গৃহে সে পর্বতনির্ঝরবৎ কথাচ্ছটা, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ-বৎ চতুর্দিক-সমুত্থিত-ভাববিকাশ, মোহিনী সঙ্গীত, মনীষী-মনঃ-সংঘর্ষ-সমুত্থিত-চিন্তা-মতপ্রবাহ সকলকে দেশ-কাল ভুলিয়ে মুগ্ধ করে রাখতো।"

প্যারিসে ধর্ম-ইতিহাস সম্মেলনে যে সব আলোচনা হইয়াছিল স... "ভাববার কথা" নামক পুস্তকে সে... বলিয়াছেন। এখানে স্বামীজী... বক্তৃতা দিয়াছিলেন। প্রথম বক্তৃতা... শিবলিঙ্গ ও শালগ্রাম শিলার... সম্বন্ধে ওপর্ট নামে একজন... পণ্ডিতের পঠিত প্রবন্ধের মত... করেন এবং দ্বিতীয় বক্তৃতায় হি... বৌদ্ধধর্মের প্রাচীন তত্ত্বসমূহের আ... করেন। গ্রীক সভ্যতা যে ... সভ্যতার দ্বারাই প্রভাবান্বিত হই... ইহাও যুক্তি দ্বারা প্রতিপন্ন করেন...

প্যারিসে এই সময় তাঁহার... শিল্পী, পণ্ডিত, ধর্মযাজক ও তা... প্রভৃতির সহিত আলাপ ও বন্ধুত্ব... ছিল। ইঁহাদের মধ্যে বিখ্যাত... নির্মাতা হিরম্ ম্যাক্সিম্, গায়িকা... ম্যাডাম ক্যালভে এবং বিখ্যাত অ... সারা বার্নহার্ড প্রভৃতিও আছেন। আছেন বৈজ্ঞানিক ডাক্তার জগদ... বসু। ইঁহার সম্বন্ধে স্বামীজীর... ব্রাজক" পুস্তকের গর্ব ও ভাবোচ্ছ্বা... উক্তিটি এখানে উদ্ধৃত করিতে... "আজ ২৩শে অক্টোবর ও কাল ... সময় প্যারিস হ'তে বিদায়। এ ক... এ প্যারিস সভ্য জগতের এক কেন্দ্র... বৎসর মহাপ্রদর্শনী। নানা দি... সমাগত সজ্জন-সঙ্গম। দেশ-দেশা... মনীষিগণ নিজ নিজ প্রতিভা প্র... স্বদেশের মহিমা বিস্তার করেছেন... এ প্যারিসে। মহাকেন্দ্রের ভে... আজ যাঁর নাম উচ্চারণ করবে, সে... তরঙ্গ সঙ্গে সঙ্গে তাঁর স্বদেশকে... জনসমক্ষে গৌরবান্বিত করবে। ... আমার জন্মভূমি!—এ জর্মান, ফ... ইংরাজ, ইতালী প্রভৃতি বুধমণ্ডলীম... মহারাজধানীতে তুমি কোথায় বঙ্গ... কে তোমার নাম নেয়? কে তো... অস্তিত্ব ঘোষণা করে? সে বহু গৌ... প্রতিভ-মণ্ডলীর মধ্য হইতে এক... যশস্বী বীর, বঙ্গভূমির—আমাদের... ভূমির নাম ঘোষণা করলেন—সে... জগৎপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডাক্তার জে... বোস। একা যুবা বাঙ্গালী বৈদ্যু... আজ বিদ্যুৎবেগে পাশ্চাত্যমণ্ডলী... নিজের প্রতিভা-মহিমায় মুগ্ধ কর... সে বিদ্যুৎসঞ্চার মাতৃভূমির মৃত... শরীরে নবজীবনতরঙ্গ সঞ্চার কর... সমগ্র বৈদ্যুতিকমণ্ডলীর শীর্ষস্থান... আজ জগদীশ বসু—ভারতবাসী—ব... বাসী! ধন্য বীর! বসুজ ও তাঁর স... সাধ্বী সর্বগুণসম্পন্না গেহিনী যে দে...

সেথাই ভারতের মুখ উজ্জ্বল করেন। দম্পতি!"

এই কথাগুলির মধ্য দিয়াই স্বামীজীর হয় সূর্যের ন্যায় গরিমাদীপ্ত মূর্তিটি াদের সম্মুখে প্রকাশিত হইতেছে। র্ব এক স্বদেশপ্রেম! অল্প কিছু-পূর্বে মিস ম্যাক্লিয়ডকে লিখিত স্বামীজীর যে রূপ আমরা দেখিয়াছি ূর্তিটি তাহা হইতে সম্পূর্ণ আলাদা। মূর্তিটিই আমরা তাঁহার টুকরো রো নানা কথার মধ্য দিয়া দেখিতে । নিবেদিতা লিখিতেছেন, "বাল্য-ন শের শা বাংলার রাস্তায় রাস্তায় াদৌড় করতেন" এই কথা বলিতে তে তিনি যেমন উৎফুল্ল হইয়া য়াছিলেন আজও তাহা আমার মনে ।। "এই শের শা, যিনি দিল্লীর সম্রাট য়নের রাজত্বে ত্রিশ বৎসরব্যাপী এক ছদ ঘটিয়ে দিয়েছিলেন, যিনি চট্টগ্রাম ক পেশোয়ার পর্যন্ত বিস্তৃত গ্র্যান্ড ; রাস্তা, ডাক চলাচলের বন্দোবস্ত সরকারী ব্যাঙ্ক স্থাপন—এ সমস্তই ছিলেন। আবার কর্সিকা দ্বীপের ণ উপকূল জাহাজ থেকে যখন চোখে লা, তখন স্বামীজী সসম্ভ্রমে অতি স্বরে বললেন, এই সেই সংগ্রাম ার জন্মভূমি।"

নিবেদিতা লিখেছেন "জিব্রালটার দ্বীর মধ্য দিয়া যাইবার সময় আমি ঃকালে ডেকের উপর আসিতেই তিনি কে সাগ্রহে এই বলিয়া সম্ভাষণ লেন, "তুমি তাদের দেখেছ কি? র দেখেছ কি? ওখানে জাহাজ থেকে ছ আর "দীন! দীন!" রবে গগন চ্ছে।" এই বলিয়া আধ ঘণ্টা ধরিয়া মুরদিগের বার বার স্পেন আক্রমণের ন্ত বর্ণনার দ্বারা আমাকে একেবারে ভূত করিয়া ফেলিলেন।"

ছোট ছোট কাজ, ছোট একটি কথাও মনের অনুভূতির পাত্রে কিভাবে তন করিয়া রাখিতেন স্বামীজীর নকাহিনীতে তার বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া । যেমন, ক্ষৌরকার উপালির কথা মি ক্ষৌরকার নির্বাণ আমার মত কর জন্যও।" অথবা খেতরির রাজার কাঁটা গাছের কাঁটায় যখন রক্ত তেছিল, সেটা তিনি গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিয়া স্বামীজীকে বলিয়াছিলেন, পনার গায়ে না আঘাত লাগে সেইটাই আমাকে দেখতে হবে; আমরা ক্ষত্রিয়, রাই তো ধর্মের রক্ষক।"

যেখানে ব্যক্তির মধ্য দিয়া অথবা সমগ্র

জাতির বা সম্প্রদায়ের মধ্য দিয়া মহান শক্তির ও মহান ত্যাগের বিকাশ হইয়াছে স্বামীজী সেইখানেই ভাবে অভিভূত হইয়াছেন, যেন সেই শক্তির বা সেই মহান ভাবের সঙ্গে নিজের অস্তিত্বের একাত্মতা অনুভব করিয়াছেন।

স্বামীজী প্যারিসে প্রায় তিন মাস ছিলেন, ২৪শে অক্টোবর তিনি ভিয়েনায় রওনা হন। কামান নির্মাতা ম্যাকসিম সাহেব তাঁহাকে যে পরিচয়পত্র দিয়াছিলেন সেই পরিচয়পত্রের দ্বারা ভিয়েনায় অনেক বিখ্যাত লোকের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হইল। কিন্তু তিনি বা তাঁহার সঙ্গী পাদ্রী লয়সন প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা দেবার অধিকার পান নাই।

কনস্টাণ্টিনোপল, এথেন্স এবং সেখান হইতে কায়রো স্বামীজী প্রত্যেক স্থানেই ঐতিহাসিক খুঁটিনাটি নিয়া আলোচনা করিতে ভালবাসিতেন এবং এগুলি যেন তাঁহার অনেক দিনের চর্চা করা বিষয়, এইভাবেই তিনি কথাবার্তা বলিতেন।

মিশরে আসিবার পর তিনি মায়াবতী হইতে মিস্টার সেভিয়ারের দেহান্তরের সংবাদ পাইলেন। মায়াবতীর অদ্বৈত আশ্রম সেভিয়ারই প্রতিষ্ঠা করেন এবং পরিচালনার ভারও তাঁহার উপর ছিল। এই সংবাদ পাইয়াই স্বামীজী কায়রো হইতেই ভারতবর্ষে ফিরিবার জন্য জাহাজে উঠিলেন।

১৯০০ খৃীষ্টাব্দের ৯ই ডিসেম্বর বেলুড় মঠের সাধুরা রাত্রের আহারে বসিবার উদ্যোগ করিতেছেন এমন সময় বাগানের মালী দৌড়িয়া আসিয়া তাঁহাদের কাছে গেট খুলিবার জন্য চাবি চাহিল। সে বলিল, গাড়ি করিয়া একজন সাহেব আসিয়াছেন, তিনি মঠে ঢুকিতে চাহিতেছেন। মঠের সাধুরা তাড়াতাড়ি গিয়া গেট খুলিলেন। দেখিলেন, গেটের সম্মুখে গাড়ি দাঁড়াইয়া আছে, কিন্তু আরোহী নামিয়া গিয়াছেন। "সাহেবটি গেলেন কোথায়?" ভাবিতে ভাবিতে তাঁহারা ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন রান্নাঘরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন তাঁহাদের প্রাণপ্রিয় স্বামী বিবেকানন্দ। সাহেবের পোশাক-পরা, মুখের উপর টুপিটা একটু নামাইয়া দিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের চিনিতে দেরি হইল না।

স্বামীজী উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন! বলিলেন, "গেট খোলা না হতেই কি করে এখানে এলুম তাই ভাবছিস? পাঁচিল ডিঙিয়ে এসেছি। খাবার ঘণ্টা পড়েছে শুনতে পেলাম, তাই ফটক ... দেরি না করে পাঁচিল ডিঙিয়ে চলে এলাম। ভাবলাম, দেরি হয়তো কপালে খাবার জুটবে না।"

অনেক দিন পরে সেদিন খা... আনন্দ কলরবে পরিপূর্ণ হইল। গুরুভাই একত্রে খিচুড়ি খাইতে ...

বেলুড় মঠে আসিয়া কয়েক ... থাকিয়া ২৭শে ডিসেম্বর ... মায়াবতী যাত্রা করিলেন। এই ... আশ্রম তাঁহার বড় আদরের স্থান। ...লয়ের এক নিভৃত স্থানে আশ্রম ... এ কল্পনা তাঁর অনেক দিন আগে ... আসিয়াছিল, কর্নেল সেভিয়ার সে... বাস্তবে পূর্ণ করিবার জন্য ... সহায় হইয়াছিলেন। ... গিয়াছেন, সেভিয়ারও ... প্রবুদ্ধ ভারত মায়াবতী হইতে ... হইতেছিল। স্বরূপানন্দজী ... সম্পাদনার ভার লইয়া আছেন ... সেভিয়ারের অভাবেও যাহাতে ... পত্রিকাটি যথারীতি পরিচালি... সেজন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া ... স্বামীজী ইহা দেখিয়া খুশী হই...

সেভিয়ার দম্পতি ভগবানের ... একত্রেই আত্মসমর্পণ করিয়া দেশ ... বান্ধব ত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষে ... ছিলেন। আজ মিসেস সেভিয়ার ... চিরদিনের সঙ্গীকে ... স্বামীজী তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবা... চেষ্টা না করিয়া নীরবে তাঁহার ... বসিয়া রহিলেন, তাঁহার চক্ষে ... যে নীরব সান্ত্বনা ছিল সে ... মিসেস সেভিয়ার নিজের শোকের ... ভুলিয়া গিয়া বলিয়া উঠিলেন, "... আপনার শরীর যে একেবারেই ... পড়িয়াছে।" স্বামীজী শুনিয়া ... বলিলেন, "সত্যই আমার দেহ ... পড়িয়াছে, কিন্তু আমার মস্তিষ্ক ... আগের মতই সবল ও কার্যক্ষম ..."

মায়াবতীর আশ্রমের নাম ... আশ্রম। কিন্তু আশ্রমের কয়েকজ... একটি ঘরকে ঠাকুরঘর করিয়া ... শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিমূর্তি প্রতিষ্ঠা ... ছিলেন, ঐ প্রতিমূর্তির নিত্যপূজা ... হইত এবং ভোগরাগ দেওয়া ... স্বামীজী আগেই বলিয়াছিলেন ... আশ্রমের নাম যখন অদ্বৈত আশ্রম, ... এখানে যেন ঐ রকম পূজার বাহুল্য ... করা না হয়। স্বামীজী কোন ... এ ভাবের পূজা অর্চনার পক্ষপাতী ... না। তিনি বার বার বলিয়াছেন, "ঠা... নির্দেশ পালন করিয়া চলাই তাঁহার ... পূজা।" এখানে এইভাবে ঠাকুর প্র...

[দে]খিয়া তিনি দুঃখিত হইলেন, কিন্তু [ত]াহাদের বারণ করিলেন না। কেবল [ব]ললেন, "যাঁহারা দ্বৈতভাবে উপাসনাই [প]ছন্দ করেন অদ্বৈত আশ্রম তাঁহাদের [উ]পযুক্ত স্থান নয়।" স্বামীজীর আনিচ্ছা [দে]খিয়া মিসেস সেভিয়ার ও স্বামী [স্ব]রূপানন্দ ঠাকুরের মূর্তিপূজা ও ভোগ-[রা]ন প্রভৃতি বন্ধ করিয়া দিলেন, তখন [এ]কজন সাধু শ্রীশ্রীমাঠাকুরানীর কাছে [জ]ানাইয়া ঠাকুরের নিত্যসেবা বন্ধ হওয়ার [জ]ন্য দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন। মাঠাকুরানী [স]মস্ত বিবরণ শুনিয়া বলিয়া-[ছি]লেন, "ঠাকুর নিজেই তো অদ্বৈতবাদী [ছি]লেন, তিনি অদ্বৈত মতেই সাধনা [ক]রেছেন, তাঁর শিষ্যেরা এক দিক দিয়া [দে]খলেই তো অদ্বৈতবাদী, তবে তুমি [দ্ব]ৈতভাবে সাধনায় দুঃখিত হয়েছ [কে]ন?"

শ্রীমার এই কথায় সাধুটির সন্দেহ [দূ]র হইয়া গেল। এর পর স্বামীজী [বে]লুড়ের মঠে এসে বলেছিলেন, "আমার [ই]চ্ছা ছিল যে, অন্তত আমাদের একটি [এ]মন মঠ থাকবে যেখানে এইভাবে পূজার [বা]হ্য অনুষ্ঠান থাকবে না। কিন্তু [ম]ায়াবতী গিয়া দেখি, সেই বুধ সেখানেও [আ]সন গেড়ে বসে আছেন, ভাল—ভাল।" [ব]ুধ অর্থাৎ পূজা অর্চনা সম্বন্ধে চির-[দি]নের সংস্কার)।

কিন্তু আমরা ইহাও দেখিতে পাই, [স্ব]ামীজী অমরনাথে গিয়া তীর্থযাত্রার [নি]য়মগুলি নিয়মই পালন করিতেছেন; [আ]র্দ্রবস্ত্রে পঞ্চকুণ্ডে স্নান, উপবাস, [এ]মন কি মালাজপা পর্যন্ত বাদ দেন নাই। [ক্ষ]ীর ভবানীতে প্রতিদিন নিজে হাতে [প]ায়স রাঁধিয়া কুণ্ডে ভোগ দিয়াছেন এবং [উ]পবাস প্রভৃতি পূজার কোন অনুষ্ঠানই [অ]সমাপ্ত রাখেন নাই।

মায়াবতীতে থাকিবার সময় [স্ব]ামীজীর এক মুহূর্তও বিশ্রাম ছিল না। [প্র]ত্যহ রাশি রাশি পত্রের উত্তর দিতে [হ]ইত। প্রবুদ্ধ ভারত পত্রিকার জন্য [প্র]বন্ধও লিখিতেন। "আর্য ও তামিল", "সামাজিক সভায় মিঃ রানাডের অভি-[ভা]ষণের সমালোচনা" এবং "থিয়সফি [স]ম্বন্ধে মন্তব্য" এই তিনটি যুক্তিপূর্ণ [প্র]বন্ধ সে সময় তিনি প্রবুদ্ধ ভারতের [জ]ন্য লিখিয়াছিলেন।

হিমালয় পাহাড়ে তখন অনবরত [তুষ]ারপাত হইতেছে। স্বামীজীকে সেজন্য [মায়]াবতীতে ঘরের মধ্যে বন্ধ হইয়াই [থা]কিতে হইত। শীতও অত্যন্ত প্রবল। [ঐ] বন্ধ ঘরের মধ্যে বসিয়াই স্বামীজী তাঁহার কাজ চালাইয়া যাইতেছেন। মঠের অধিবাসিগণকে শিক্ষা দিতেছেন, ভবিষ্যতে কিভাবে কাজ চালাইতে হইবে তাঁহাদের সে বিষয়েও পথ নির্দেশ করিয়া দিতেছেন।

১৯০১ খৃষ্টাব্দে ২৪শে জানুয়ারী স্বামীজী মায়াবতী হইতে বেলুড়ে ফিরিয়া আসিলেন এবং তাহার কয়েক দিন পরেই তিনি বেলুড় মঠের সমস্ত সম্পত্তি দেবোত্তর সম্পত্তিরূপে রেজেস্ট্রি করিয়া দেন।

এই দলিলে সাক্ষী ছিলেন—

(১) সলিসিটর প্রমথচন্দ্র কর (কলিকাতা)

(২) ডাক্তার বিপিনবিহারী ঘোষ এম বি

(৩) ত্রৈলক্যনাথ চ্যাটার্জি (কলিকাতা ৪নং হেম করের লেন)

১৯০১ খৃষ্টাব্দে ৬ই ফেব্রুয়ারী বেলা ১১টার সময় হাওড়ার সদর রেজেস্ট্রি অফিস হইতে এই দলিল রেজেস্ট্রি করা হয়। রেজিস্ট্রার ছিলেন রমেন্দ্রলাল মিত্র, —স্পেশ্যাল সাবরেজিস্ট্রার।

এই দলিলে বেলুড় মঠের সীমা এবং সম্পত্তি সম্বন্ধে উল্লেখ ছিল। কিভাবে এই সম্পত্তি প্রযুক্ত হইবে তাহারও দফাদারীভাবে উল্লেখ করা হইয়াছিল।

স্বামীজী স্বামী বিরজানন্দ ও প্রকাশানন্দকে ইতিপূর্বে ঢাকায় প্রচার-কার্যের জন্য পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহারা সেখান হইতে স্বামীজীকে বার বার আহ্বান করিতে লাগিলেন কিভাবে তাঁহাদের কাজ চলিতেছে তা একবার দেখিয়া আসিবার জন্য।

এদিকে আবার বুধাষ্টমী আসিয়া গিয়াছে। এই বুধাষ্টমী তিথিতে ময়মন-সিংহ লাঙ্গলবন্দে ব্রহ্মপুত্র নদীতে স্নানের একটি যোগ আছে, সেই যোগে ব্রহ্মপুত্র স্নানে কোটি কোটি বৎসরের পাপ মোচন হয়। স্বামীজীর জননী ভুবনেশ্বরী দেবী এই সময় ব্রহ্মপুত্র স্নান করিবার জন্য বিশেষ ব্যগ্র হইয়া স্বামীজীকে সে বিষয়ে জানাইয়াছিলেন। জননীর ইচ্ছানুসারে তিনি তাঁহাকে ও তাঁহার সঙ্গিনীবৃন্দ ও কয়েকজন সন্ন্যাসী শিষ্যকে লইয়া ঢাকা যাত্রা করিলেন।

স্বামীজী ঢাকায় আসিতেছেন, এই সংবাদ আগেই পৌঁছিয়াছিল এবং একটি অভ্যর্থনা সমিতিও গঠিত হইয়াছিল। গোয়ালন্দ হইতে স্টীমার নারায়ণগঞ্জে পৌঁছিবামাত্র দেখা গেল যে, অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যগণ ঘাটে অপেক্ষা

ছেন। সেখান হইতে সকলে ট্রেনে হণ করিয়া বৈকালে ঢাকায় গিয়া ছলেন। স্টেশনে ঢাকার বিখ্যাত ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ ও গগনচন্দ্র ঘোষ জীকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া র জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এবং ন জনাকীর্ণ হইয়াছিল। ঘন ঘন রামকৃষ্ণ", "স্বামী বিবেকানন্দের জয়" উঠিতেছিল। বিরাট শোভাযাত্রা য়া সকলে স্বামীজীকে ও তাঁহার র সকলকে জমিদার বাবু মোহিনী- ন দাসের বাড়ি লইয়া গেলেন।

ইহার পর লাঙলবন্দে ব্রহ্মপুত্র নের পর সকলে আবার ঢাকায় ফিরিয়া সিলেন। ঢাকায় ব্রাহ্ম-ধর্মাবলম্বি- র সে সময় বিশেষভাবেই প্রচারকার্য তেছিল। ব্রাহ্মগণের ভিতর আবার রণ, নববিধান এবং বিজয়কৃষ্ণ স্বামীর দল প্রভৃতি বিভিন্ন মতের য়ে ছিলেন। স্বামীজী ঢাকায় আসিলে কার বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁহার সঙ্গে লোচনা এবং তাঁহার উপদেশ প্রার্থনার ন্য আসিতেন, ইঁহাদের সকলের নুরোধে স্বামীজী ঢাকার জগন্নাথ হলে টি বক্তৃতা দেন। প্রথম বক্তৃতাটি "আমি কি শিখিয়াছি?" এবং দ্বিতীয় বক্তৃতাটি "আমার জন্মপ্রাপ্ত ধর্ম"। ঢাকার একটি স্কুলের প্রকাণ্ড উঠানে এই শেষের বক্তৃতাটি দেওয়া হইয়াছিল। এই দুটি বক্তৃতাতেই স্বামীজী ব্রাহ্মসমাজের ধর্মপ্রচার প্রণালীর তীব্রভাবে সমালোচনা করেন। ব্রাহ্মধর্মের সমাজ-সংস্কারক নামে অভিহিত প্রচারক সম্প্রদায় কিভাবে নিজের দেশকে ও জাতিকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন, কিভাবে ধর্মের মধ্য দিয়া বিদেশের ভাব নিজের দেশে চালাইবার চেষ্টা করিতেছেন, "মূর্তিপূজা" কথাটির ধুয়া তুলিয়া কিভাবে নিজের দেশবাসিগণকে "পৌত্তলিক" আখ্যায় অভিহিত করিতে- ছেন, সে সম্বন্ধে যখন উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বলিয়া যাইতে লাগিলেন, তখন তাঁহার একটি কথারও কেহ প্রতিবাদ করিতে পারিলেন না। স্বামীজী যখন বলিলেন, "এই যে মূর্তিপূজা—ইহার ভিতরে নানারকম জঘন্য ভাবও হয়তো কোন কোন স্থানে প্রবেশ করিয়াছে, কিন্তু তবু আমি উহার নিন্দা করি না। যদি সেই মূর্তি- পূজক ব্রাহ্মণের পদধূলি আমি না পাইতাম, তবে আমি কোথায় থাকিতাম? যে সকল সংস্কারক মূর্তিপূজার নিন্দা করিয়া থাকেন, তাঁদের আমি বলি,—"ভাই, তুমি যদি নিরাকার-উপাসনার যোগ্য হইয়া থাক, তবে তাহা কর,—কিন্তু অন্যকে গালাগালি দাও কেন? 'সংস্কার' কথাটির অর্থ পুরাতন অট্টালিকার জীর্ণ সংস্কার করা, জীর্ণ সংস্কার হইয়া গেলে আর তার প্রয়োজন কি? সংস্কারক দল এক স্বতন্ত্র সম্প্রদায় গঠন করিতে চান। তাঁহারা মহৎ কার্য করিতেছেন, তাঁহাদের মস্তকে ভগবানের আশীর্বাদ বর্ষিত হোক্। কিন্তু ভাই, তোমরা নিজেদের পৃথক্ করতে চাও কেন? 'হিন্দু' নাম নিতে লজ্জা পাও কেন?"

প্রত্যেক ধর্মাচরণেই নানা বাহিরের আচার ও অনুষ্ঠান আছে, আরও আছে প্রথা এবং সংস্কার। কতকগুলি হিন্দু- ধর্মের প্রচারক পাণ্ডিত্যের দিক দিয়া সেই প্রথাগুলির ব্যাখ্যা করিয়া বৈজ্ঞানিক যুক্তির দ্বারা সেগুলি সমর্থন করিতে চেষ্টা করিতেছেন, স্বামীজী তাঁহাদের সহিত একমত ছিলেন না। কিন্তু অন্য- ভাবে তিনি তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যেমন বিবাহিতা নারীর আয়তির প্রতীকের প্রতি একটা গভীরতম সংস্কার। গুরুজনগণ কন্যাকে আশীর্বাদ করেন, "বৎসে, তোমার সিঁথির সিঁদুর অক্ষয় হোক।" স্বামীজী নিবেদিতাকে বলিয়াছিলেন, ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে সমুদ্রে জাহাজে থাকার সময় একজন পাদরী তাঁহাকে কতকগুলি রূপার বালা দেখাইয়াছিলেন। ঐ বালাগুলি বিবাহিতা তামিল নারীদের সধবার চিহ্নস্বরূপ। দুর্ভিক্ষের সময় অন্নের জন্য সেই বালা- গুলিও তাহাদের বিক্রি করিতে হইয়াছে। এই সময় এই বিবাহের চিহ্ন ধারণ সম্বন্ধে কথা উঠিলে, পাশ্চাত্ত্য দেশের মেয়েরাও এই কুসংস্কার মানিয়া চলে, তারাও বিবাহের আংটি খুলিয়া দিতে আপত্তি করে। এই কুসংস্কারের কথা লইয়া বোধহয় কিছু বিদ্রূপও হইয়াছিল। নিবেদিতা লিখিতেছেন—শুনিয়াই স্বামীজী সবিস্ময়ে খেদপূর্ণ অনুচ্চ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "তোমরা ওটাকে কুসংস্কার বলছো? ওর পেছনে যে উঁচুদরের সতীত্বের আদর্শ রয়েছে, তা তোমরা দেখতে পাচ্ছ না?"

ঢাকায় স্বামীজীর থাকার সময় আর একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করিতেছি। একটি পতিতা মেয়ে, সম্ভবত সে নাচনেওয়ালী। তাহার মাকে সঙ্গে করিয়া স্বামীজীকে দর্শন করিতে আসিয়াছিল। মেয়েটির সর্বাঙ্গে গহনা। তাহারা যখন ঘোড়ার গাড়ি হইতে নামিল, তখন বাহিরে যেসব ভক্ত ছিলেন, তাঁহারা এরকম মেয়েকে স্বামীজীর কাছে লইয়া যাওয়া উচিত হইবে কি না, ভাবিয়া ইতস্তত করিতেছিলেন, পরে স্বামীজীকে খবর দিলে স্বামীজী তাহাদের লইয়া আসিতে বলিলেন। তাহারা স্বামীজীকে প্রণাম করিয়া তাঁহার সম্মুখে হাতজোড় করিয়া
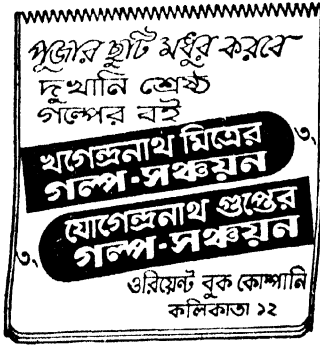
সসঙ্কোচে দাঁড়াইয়া রহিল। স্বামীজী যখন বলিলেন, "দাঁড়িয়ে আছেন কেন মা, বসুন।" তখন মেয়েটির মা সাহস পাইয়া স্বামীজীকে তাঁহার প্রার্থনা জানাইলেন। তাঁহার মেয়ে হাঁপানীতে ভুগিতেছে, যদি স্বামীজী কোন ঔষধ দেন, আর আশীর্বাদ করেন যেন অসুখটা ভাল হইয়া যায়। সেইজন্য তাহারা আসিয়াছে। স্বামীজী দয়ার্দ্র কণ্ঠে বলিলেন, "মা, আমার যদি ক্ষমতা থাকত, তোমার অসুখ সারিয়ে দিতাম। কিন্তু দেখ, আমি নিজেই হাঁপানীতে ভুগছি, নিজের অসুখই ভাল করতে পারি না। তোমরা যদি আশীর্বাদ পেলে খুশি হও, আমি আশীর্বাদ করছি, যেন তোমার অসুখ সেরে যায়।" সেই আশীর্বাদ পাইয়াই তাহারা খুশি হইয়া বিদায় গ্রহণ করিল।

পতিতাদের সম্বন্ধে এই যে করুণা এটি তাঁহার বরাবরের স্বভাব। বিখ্যাত গায়িকা ম্যাডাম ক্যালভে নিজের জীবনীতে স্বামীজীর সম্বন্ধে একটি পরিচ্ছেদ লিখিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি লিখিয়াছিলেন যে, স্বামীজী কিভাবে তাঁহার সাক্ষাৎ মাত্র তাঁহার আগমনের কারণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং তাঁহার মানসিক অবসাদ দূর করিয়াছিলেন।

স্বামীজীর সহিত তিনি তুরস্ক, গ্রীস ও মিশর ভ্রমণ করিয়াছিলেন। মিশরের একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া তিনি লিখিতেছেন, "একদিন আমরা কায়রোতে রাস্তা হারাইয়া ফেলিলাম। × × একটি অপরিচ্ছন্ন দুর্গন্ধময় গলিতে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, কতকগুলি অর্ধনগ্না নারী জানালায় ঝুঁকিয়া আছে, কেহ কেহ বা দরজার সম্মুখে জটলা করিতেছে। স্বামীজী প্রথমে কিছুই লক্ষ্য করেন নাই। একটি ভগ্ন অট্টালিকার সম্মুখে বেঞ্চের উপর উপবিষ্টা কয়েকটি নারী উচ্চহাস্যে তাঁহাকে আহ্বান করায় সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের উপর স্বামীজীর দৃষ্টি পড়িল। আমাদের দলের একজন মহিলা সত্বর সে স্থান ত্যাগ করিবার জন্য উদ্যত হইলেন, স্বামীজী সহসা আমাদিগের মধ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সেই নারীগণের সম্মুখীন হইলেন।

স্বামীজী বলিলেন, "হায় হতভাগ্য সন্তানগণ! বেচারীরা তাদের রূপের উপাসনায় ভগবানকে ভুলিয়া গিয়াছে। আহা, এদের দিকে চেয়ে দেখ!" পতিতা নারীর সম্মুখে দণ্ডায়মান যীশুখৃষ্টের মতই স্বামীজীর চোখ দিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল, নারীগণ নির্বাক ও লজ্জিত পরস্পরের দিকে চাহিল। একজন অগ্রসর হইয়া তাঁহার পরিচ্ছদ চুম্বন করিয়া গদগদকণ্ঠে স্পেনীয় বলিতে লাগিল—

Hombre de Dios—
Hombre de Dios—

(ঈশ্বরজানিত মহাপুরুষ)। অপর নারী বিস্মিত সম্ভ্রমে দুই হা[illegible] নিজের মুখ ঢাকিয়া ফেলিল, স্বামীজীর সেই দৃষ্টি সে সহ্য [illegible] পারিতেছে না।"

দক্ষিণেশ্বরে দেবী-দর্শনে [illegible] নারীগণের ভিড় হয় [illegible] মন্তব্য করিয়াছিলেন, "এখানে[illegible] জটলা! আমাদের আর [illegible] আসা চল্‌বে না দেখ্‌ছি।" [illegible] শুনিয়া বলিয়াছিলেন, "ওরা [illegible] যাবে?"

স্বামীজী বলিলেন বটে [illegible] হাঁপানি, কিন্তু তাঁর সেটা হাঁপানি [illegible] হৃৎপিণ্ডের বৃদ্ধির জন্য শ্বাস[illegible] কাশ্মীরে অমরনাথে তাঁহার হৃ[illegible] থামিয়া যাইতে যাইতে আত্মরক্ষার [illegible] এইভাবে বাড়িয়া গিয়াছিল এবং [illegible] দিনের জন্যই এই বিবৃদ্ধি [illegible] গিয়াছিল।

ঢাকায় অনেক গোঁড়া হিন[illegible] আছেন, স্বামীজী সকলের ছোঁয়া [illegible] ইহাতে তাঁহারা অসন্তুষ্ট হইয়াছিলে[illegible] স্বামীজী হাসিতে হাসিতে তাহা[illegible] একজনকে বলিয়াছিলেন, "বাবু, আ[illegible] ফকির, ভিখ্‌ মেগে খাই। আম[illegible] মাধুকরী করে সকলের বাড়ি থেকে খাবার সংগ্রহ করতে হবে। শাস্ত্রে আছে, সন্ন্যাসীর কোন জাত-বিচা[illegible] নাই।"

স্বামীজী নাগ মহাশয়ের জন্মভূ[illegible] দেওভোগে যাবেন, একথা নাগ মহাশয়[illegible] বলিয়াছিলেন। নাগমহাশয় সেক[illegible] শুনিয়া আনন্দে উন্মত্ত হইয়াছিলেন[illegible] তাই স্বামীজী সেই কথা রক্ষা করি[illegible] ঢাকা হইতে দেওভোগ গেলেন, কিন্তু নাগ মহাশয় নাই, তিনি দেহরক্ষা করিয়াছেন[illegible] দেওভোগে পুকুরে স্নান সাঁতার কাটা- অনেকদিন পরে যেন স্কুল-পালানে ছেলের মত ছাড়া পাইলেন স্বামীজী[illegible] নাগমহাশয়ের সহধর্মিণী নানারক[illegible] সুখাদ্য রাঁধিয়া পরিবেশন করিলেন। কিন্[illegible] নাগমহাশয়ের অভাবে দেওভোগ যে[illegible] কৃষ্ণশূন্য বৃন্দাবন। নাগমহাশয়ের স্ত্[illegible] স্বামীজীকে একখানি কাপড় দিলে[illegible]

...ান স্বামীজী মাথায় জড়াইয়া ...লেন।

স্বামীজী ইহার পর চন্দ্রনাথ তীর্থ কামাখ্যা দর্শন করিয়া গৌহাটি ও ...য়ালপাড়া হইয়া শিলং গেলেন।

সার হেনরী কটন ছিলেন তখন ...মের চীফ কমিশনার। ইনি একজন ...ত ভারতহিতৈষী ও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ...লেন। স্বামীজীর উপর তাঁহার আগে ...তেই শ্রদ্ধা ছিল, এখন স্বামীজী ...লংএ আসিতেছেন জানিয়া তিনি ...শেষ আনন্দিত হইলেন। কটন সাহেব ...জেই স্বামীজীর বাঙলোয় আসিয়া ...হার সঙ্গে দেখা করিলেন এবং কটন ...হেবের অনুরোধে স্বামীজী শিলংএ ...কাট বক্তৃতাও দিয়াছিলেন। কিন্তু ...র্টহ্যাণ্ডের ব্যবস্থা না থাকায় সে সমস্ত ...তাই নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

শিলংএ স্বামীজীর শ্বাসকষ্ট বাড়িয়াই ...ল, এক একদিন রাত্রে এতই শ্বাসকষ্ট ...ইত যে, মনে হইত এই মুহূর্তেই ...ৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যাইবে। ...ইতে পারিতেন না, সমস্ত রাত্রি বসিয়া ...কিতে হইত। একদিন রাত্রিকালে ...ন্ত্রণা যখন সহ্যসীমার অতীত হইয়াছে, ...খন স্বামীজী যে তরুণ ব্রহ্মচারী তাঁহার ...াথা দুই হাতে ধরিয়া ম্লানমুখে ...াড়াইয়া আছে, তাহার দিকে চাহিয়া ...লিয়াছিলেন, "বৎস, কেন অত অধীর ...ইতেছ? আমি যে দুঃখভোগ করিবার ...নাই জন্মগ্রহণ করিয়াছি।"

হয়তো সেই তরুণ শিষ্যের ঐকান্তিক ...র্থনায় যন্ত্রণার কিছু উপশম হইল ...বং সেই দারুণ রাত্রিও প্রভাত হইল।

আসাম হইতে স্বামীজী বেলুড় মঠে ...ফিরিলেন। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে বেলুড় ...ঠে সে-বার প্রথম দুর্গাপূজা হইল। ...ামীজী তখন খুবই অসুস্থ, ডায়োবিটিস ...াড়িয়াছে, পা দুটি ফুলিয়াছে। কিন্তু ...বুও দুর্গাপূজার বাধা হইল না। ...ঠের সামনে গঙ্গাতীরে বসিয়া ব্রহ্মানন্দ ...ামী যেন একটি দৃশ্য দেখিলেন। ...দেখিলেন—মা দুর্গা যেন দক্ষিণেশ্বরের ...দিক হইতে পায়ে হাঁটিয়া ...আসিতেছেন। বেলুড় মঠ আসিতে ...হইলে গঙ্গা পার হইয়া আসিতে হয়—...তাই তিনি গঙ্গার উপর দিয়া হাঁটিয়া ...আসিয়া বেলুড় মঠের বেলতলায় আসিয়া ...দাঁড়াইলেন। স্বামীজীও বলিলেন যে, ...তিনি ভাবচক্ষে দেখেছেন, বেলুড় মঠে ...দুর্গাপূজা হইতেছে। স্বামীজী শ্রীশ্রীমার ...অনুমতি চাহিয়া পাঠাইলেন। বলিলেন যে, তাঁহার নামেই সংকল্প করিয়া পূজা হইবে। মা অনুমতি দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে পূজার আয়োজন আরম্ভ হইল।

স্বামীজী অসুস্থ, ব্রহ্মানন্দ স্বামীই সমস্ত ভার লইলেন। কুমারটুলি হইতে নৌকায় করিয়া প্রতিমা আনা হইল। মা দুর্গা গঙ্গাপার হইয়াই বেলুড়মঠে আসিলেন। সপ্তমীর আগের দিন শ্রীশ্রীমাও বাগবাজার হইতে বেলুড়ে আসিলেন। সন্ন্যাসীর পূজার অধিকার নাই, তাই মায়ের অনুমতিতে ব্রহ্মচারী কৃষ্ণলাল মহারাজ পূজকের আসন গ্রহণ করিলেন এবং তন্ত্রোক্ত মতে পূজা হইবে, এজন্য স্বামীজীর আদেশে আগেই শিষ্য শরচ্চন্দ্র রঘুনন্দনের একখানি অষ্টবিংশতি তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন। কৌল ও তন্ত্রবিদ্ ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় তন্ত্রধারকের আসন গ্রহণ করিলেন। কিন্তু মায়ের অভিমত নাই বলিয়া পূজায় কোন পশু-বলিদান হইল না।

যদিও তখন বেলুড়মঠের এখনকার দিনের মত আর্থিক সচ্ছলতা ছিল না; কিন্তু পূজায় তিনদিন প্রসাদ বিতরণ যথারীতি হইয়াছিল, সে তিনদিন বালী, উত্তরপাড়া ও বেলুড়ের দরিদ্রগণ পেট ভরিয়া প্রসাদ পাইয়াছিল, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতও অনেক নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়া পূজায় যোগ দিয়াছিলেন এবং ইহার পর লক্ষ্মীপূজা ও কালীপূজাও যথারীতি সম্পন্ন হইল।

দুর্গাপূজার পর ঠাকুর বিসর্জন দিবার জন্য নৌকায় করিয়া যখন ঠাকুর লইয়া যাওয়া হইল, তখন ব্রহ্মানন্দ স্বামী ভাবাবেশে প্রতিমার সম্মুখে নৃত্য করিয়াছিলেন, স্বামীজী মঠের বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া সেই নৃত্য দেখিয়াছিলেন এবং গঙ্গাতীরের সমস্ত লোক, যাহারা বিসর্জন দেখিতে গিয়াছিল, তাহারা সকলেই সেই অপূর্ব নৃত্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিল।

স্বামীজীর মা ছেলেবেলায় স্বামীজীর যখন একবার কঠিন অসুখ হয়, তখন মানত করিয়াছিলেন কালীঘাটে ছেলেকে লইয়া গিয়া, মা কালীর বিশেষ পূজা দিবেন। এতদিন সে মানত শোধ করা হয় নাই। এখন স্বামীজীর অসুখের কথা শুনিয়া তাঁহার সেই মানতের কথা মনে পড়িয়া গেল। তিনি স্বামীজীকে খবর পাঠাইয়া দিলেন যে, মায়ের মানত

শোধ দিতে হইবে। মায়ের আদেশে স্বামীজী অসুস্থ শরীরেই মানত শোধ করিবার জন্য কালীঘাটে গেলেন। আদি-গঙ্গায় স্নান করিয়া ভিজা কাপড়েই সাতবার মন্দির প্রদক্ষিণ, তারপর মন্দিরের মধ্যে ঢুকিয়া শ্রীশ্রীকালীর পাদপদ্মের সম্মুখে তিনবার গড়াগড়ি দেওয়া, তাহার পর নাটমন্দিরের পশ্চিম পার্শ্বের চত্বরে হোম করা—মানতের এই সমস্ত নিয়ম-গুলিই অক্ষরে অক্ষরে পালন করিলেন স্বামীজী এবং মঠে ফিরিয়া বলিলেন,—"কালীঘাটে এখনও কেমন উদার ভাব রয়েছে। আমাকে বিলাত-ফেরৎ জেনেও হালদারেরা মায়ের মন্দিরে ঢুকতে বাধা দেন নি, বরং আগ্রহের সঙ্গেই পূজার কাজে ও হোমের কাজে সাহায্য করেছেন।"

অক্টোবর মাসে স্বামীজীকে বিছানা লইতে হইল। ডাক্তার সাণ্ডার্স তাঁহার চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। ডাক্তার বলিলেন, স্বামীজীর পূর্ণ বিশ্রাম প্রয়োজন, তাই এখন কিছুদিনের জন্য তাঁহার আগন্তুকগণের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ বন্ধ করা হইল। স্বামীজী এতে দুঃখিত হইলেন, কিন্তু চিকিৎসকের নির্দেশ মানিয়া চলিলেন। কাজ না করিয়া যিনি এক মুহূর্তও থাকিতে পারেন না, তাঁহার পক্ষে ইহা একটা দারুণ শাস্তি। সকাল ও সন্ধ্যায় বেদমন্ত্র আবৃত্তি করেন, কখনও বা গুরুভ্রাতাদের সহিত হাস্য-কৌতুক করেন, আবার কখনও বা গভীর ধ্যানে মগ্ন হইয়া থাকেন।

গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে আলাপের সময় তিনি যে এত অসুস্থ, তা যেন বোঝাই যায় না। তরুণ সাধুদের কাছে মহাবীরের মহিমা কীর্তন করেন। রামময় জীবন মহাবীর হনুমান, একদিকে দাস্য ও সেবার পরাকাষ্ঠা, আবার অন্যদিকে সাগর লঙ্ঘনেও দ্বিধা নাই। গন্ধমাদন আনিতে হইবে তো পাহাড়টাই কাঁধে করিয়া লইয়া আসিলেন। মহাবীর, মহাজিতেন্দ্রিয়, মহাসাধক।

'মানুষ গড়া' স্বামীজীর আজীবনের সাধনা। ছেলেরা হোক তেজিয়ান, সাহসী এবং জিতেন্দ্রিয়। মেয়েরা হোক্ অপার করুণাময়ী মাতৃমূর্তি এবং মহা-তেজস্বিনী। একথাও বলিয়াছেন, "কাম-গন্ধহীন উচ্চ সাধনার অনুসরণ করতে গিয়ে দেশটা তমসাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। দেশে দেশে গাঁয়ে গাঁয়ে যেখানে যাবি, দেখ্‌বি খোলকর্তাল বাজছে। ঢাক-ঢোল কি দেশে আর তৈরিই হয় না? তুরী-ভেরী কি ভারতে মেলে না? ... বেলা থেকেই করুণ রস আর মে... বাজনা শুনে শুনে সমস্ত দেশ... মেয়েমানুষ হয়ে গেল? এর ... কি অধঃপতন হবে? কবি-কল্প... দেশের এ অবস্থা আঁকতে হ... যায়? এখন কিছুদিনের ম... কোমল ভাব-উদ্দীপক গীতবা... রাখতে হবে, খেয়াল-টপ্পা বন্ধ ক... গানে লোকের কানকে অভ্যস্ত... হবে। ডমরু-সিঙা বাজাতে হ... ব্রহ্ম-রুদ্র তালের দুন্দুভি নাদ... হবে। "মহাবীর, মহাবীর!" ... "ব্যোম্ ব্যোম্" শব্দে দিগ্‌দেশ... কর্তে হবে।"

'আগুয়ান, সিন্ধুরোলে গা... জ...

প্রাণপণ থাক্...

—শোনাতে হবে সিন্ধুর ভী... নদীর কুলু কুলু তান বন্ধ থাকু... দিন।'

১৯০১ সালের ডিসেম্বরে ক... কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। ... নানা দেশ হইতে প্রতিনিধি আ... কলিকাতায়, তাঁহাদের অনেকেই ... সহিত আলাপ করিবার জন্য ... আসিতে লাগিলেন। তাঁহারা ... মনে করেন, স্বামীজীই নব্য ... পথপ্রদর্শক। তাঁহাদের একজন ... জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ... কংগ্রেস সম্বন্ধে আপনার মত ... স্বামীজী স্বল্প কথায় উত্তর দি... "সমগ্র ভারতে একতা প্রতিষ্ঠা ... একটা প্রতিষ্ঠান অবশ্য আবশ্যক..."

স্বামীজী তাঁহাদের সহিত ... কথাবার্তা বলিয়াছিলেন। ... পত্রিকার সম্পাদক লিখিয়াছে... কথিত হিন্দীভাষা যে কো... পশ্চিমাঞ্চলবাসীকে গৌরবান্বিত ... পারিত। যখন তিনি ... পুনরুত্থান সম্বন্ধে আলোচনা ... ছিলেন, তাঁহার মুখ উৎসাহে ... হইয়া উঠিতেছিল।"

কলিকাতায় একটি বেদ... প্রতিষ্ঠার সম্বন্ধেই স্বামীজী ... করিয়া তাঁহাদের সঙ্গে আলোচনা ... এই বেদ-বিদ্যালয় স্থাপন দেশে ... কতখানি প্রয়োজন, তিনি মনে ... তা' অনুভব করিতেন। কিন্তু ... বিদ্যালয়ের স্থাপনা করিতে প্রথ... প্রচুর টাকা, তারপরে চাই ... বলিষ্ঠমন ধর্মশীল বেদজ্ঞ

অন্তত কয়েকজন অধ্যাপকও প্রয়োজন। এই বিদ্যালয়ে প্রাচীন আর্য-আদর্শ অনুসারে আচার্য, প্রচারক ও সন্ন্যাসী গড়িয়া তোলা হইবে, সংস্কৃত সাহিত্য, দর্শনশাস্ত্র, বেদ ও উপনিষদ সম্বন্ধে শিক্ষাদান করিয়া অন্তত অল্পসংখ্যক লোকেরকেও সুশিক্ষিত ও একনিষ্ঠ প্রচারকরূপে গড়িয়া তোলা হইবে। কংগ্রেসের বিদেশের প্রতিনিধিগণ অনেকেই এইরূপ বেদ-বিদ্যালয় স্থাপন সম্বন্ধে সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, কিন্তু কাজের দিক দিয়া সে প্রতিশ্রুতির কোন সফলতা দেখা যায় নাই।

স্বামীজী জানিতেন, তাঁহার সময় অতি সংক্ষেপ, তাই মঠের ভিতরেই ছোট করিয়া একটি বেদ-বিদ্যালয় স্থাপনের ইচ্ছা করিয়াছিলেন এবং আংশিকভাবে তাঁহার সে ইচ্ছা কতকটা পরিপূর্ণও হইয়াছিল।

স্বামীজীর শেষবার ভ্রমণ বুদ্ধগয়ায় যাত্রা। তিনি ইতিমধ্যে জাপানে যাইবারও ইচ্ছা করিয়াছিলেন। জাপান হইতে দুইজন পণ্ডিত ১৯০১ খৃষ্টাব্দের একেবারে শেষের দিকে জাপানে একটি ধর্মমহাসভা আহ্বান করিবার বিষয়ে স্বামীজীর উপদেশ লইতে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন ছিলেন ডাক্তার ওকাকুরা। সভ্যতার দিক দিয়া জাপান কিভাবে অগ্রগামী হইয়াছে, স্বামীজী তাহা নিজের চোখেই দেখিয়া আসিয়াছেন, সেই জাপান ধর্মভাবের দিক দিয়া অগ্রসর হইবার পথে আগুয়ান হইবার জন্য তাঁহারই সাহায্য চাহিতে আসিয়াছে। তিনি কি তাহাতে সাড়া না দিয়া স্থির থাকিতে পারেন? তাই তিনি নিজের শরীরের কথা একেবারেই ভুলিয়া গিয়া জাপানে যাইবার জন্য তৈরী হইতে চাহিলেন।

কিন্তু সময় ছিল না, জাপান যাওয়া তাঁহার হয় নাই। তবে বৌদ্ধগয়ায় শেষবারের মত গিয়াছিলেন ওকাকুরার আমন্ত্রণে। আসিবার সময় কিছুদিন কাশীতেও থাকিয়াছিলেন সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্য।

ভগিনী নিবেদিতার কাছে তিনি বুদ্ধদেবের দেহত্যাগের দৃশ্য যেভাবে বর্ণনা করিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ এখানে তুলিয়া দিতেছি। "সেই আনন্দময় পুরুষ সিংহের ন্যায় দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিয়া মৃত্যু-প্রতীক্ষা করিতেছেন। এমন সময় সহসা এক ব্যক্তি উপদেশ গ্রহণের জন্য তাঁহার কাছে দৌড়িয়া আসিল।......তাঁহার শিষ্যেরা তাহাকে তাড়াইয়া দিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু ভগবান দূর হইতে তাহাদের কথোপকথন শুনিতে পাইয়া বলিলেন, "না, না! ফিরিয়ে দিও না। তথাগত সদাই প্রস্তুত আছেন।" তখনই তিনি কনুয়ের উপর ভর দিয়া একটু উঠিয়া তাহাকে উপদেশ দিলেন।" এই কনুয়ের উপর ভর দিয়া উঠিবার কথা বলিতে গিয়ে স্বামীজী একটু সময়ের জন্য থামিয়াছিলেন, আর তাহার পর বলিয়াছিলেন—"দেখ, ওটি আমি পরমহংসদেবের জীবনে স্বচক্ষে দেখেছি।"

পুরুষসিংহ শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের মহাপ্রয়াণও সেই একই ভাবের দ্যোতক। দেহকে যিনি কোনদিনই গ্রাহ্য করেন নাই, দৈহিক পীড়া ও বিলয় তাঁহার কাছে তো উল্লেখযোগ্য ব্যাপারই নয়।
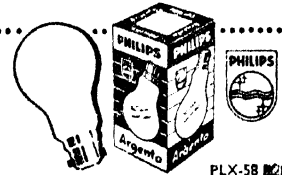
বন্যাবিধ্বস্ত উড়িষ্যা

অমিতাভ দাশগুপ্ত

জোরে হাওয়া বইছিল। সেই সঙ্গে বৃষ্টি, পশলায় পশলায়।

উড়িষ্যার কাটজুরী নদীর উঁচু বাঁধ। তারই নীচে ছোট একটা চালাঘর। মালিক ত্রিলোচন পাটনাইক। বয়েস হ'য়েছে। নাকের ডগায় সুতোয়বাঁধা চশমা। তারই ভিতর দিয়ে ঘোলাটে চোখদুটো বাইরের আকাশটা একবার দেখে নিল। তারপর বলল,—'আবার বৃষ্টি! এখন মেঘ দেখলে ভয়ে বুক কাঁপে।'

ওর চালাঘরের কিছু দূরে বাঁধের বিরাট ফাটল। তারই মধ্যে দিয়ে প্রবল-বেগে ছুটে চ'লেছে কাট্‌জুরীর জল, মাঠ ঘাট ভাসিয়ে দিয়ে। সেই জলোচ্ছ্বাসের গর্জন শোনা যায় ত্রিলোচনের চালাঘর থেকে। ফাটলটা দেখাও যায়।

সে-দিকে তাকিয়ে ত্রিলোচনের ভয়টা অহেতুক মনে হ'ল না। শুধু ত্রিলোচন কেন, উড়িষ্যার প্লাবন যে দেখেছে, সে-ই বুঝতে পারবে মেঘ দেখলে কেন বুক কেঁপে ওঠে, ভয়ে আর আশংকায়।

অথচ কয়েক সপ্তাহ আগেও, ত্রিলোচন বলছিল, উড়িষ্যায় এমন কেউ ছিল না যে মেঘ দেখে উৎফুল্ল হ'য়ে উঠত না।

দু' বছর ধ'রে অনাবৃষ্টি। ফলে, উড়িষ্যার যে-সব কৃষকরা বৃষ্টির উপর নির্ভর ক'রে চাষ আবাদ করে, তারা গত বছর ঘরে ফসল তুলতে পারেনি। সেজন্য তাদের ঋণ করতে হ'য়েছে, স্ত্রীপুত্র সংসার প্রতিপালন করার জন্য। এ-বছরের বীজ ধান সঞ্চয় করার জন্য।

এবারে তারা আশা ক'রেছিল, ভাল বৃষ্টি হবে; চাষ আবাদ ভাল হবে; ফসল ঘরে তুলবে; কিছুটা ঋণও হয়ত শোধ হ'য়ে যাবে। কিন্তু আবাদের সময় পার হ'য়ে গেল; তবু পান্ডুর আকাশে মেঘের চিহ্ন পর্যন্ত দেখা গেল না।

পর পর দু'বছর অজন্মা। মরে যাবে সবাই। তাই মরীয়া হ'য়ে শুকনো মাটিতে লাঙল দিয়েছিল। ঘরের ভিতর বীজ ধান ভিজিয়ে অঙ্কুর তুলেছিল। খন্ড মেঘের ঝিরঝিরে বৃষ্টিতে যতটুকু মাটি ভিজেছিল, সেইটুকু ভরসা ক'রেই লাগিয়েছিল ধানের অঙ্কুর মাঠে মাঠে।

এই অনাবৃষ্টি উপলক্ষ্য ক'রে রাজ-নৈতিক ধুলোর ঝড় উঠল শহরে গ্রামে; এমন কি উড়িষ্যার বিধানসভায়ও। তবু আকাশে মেঘাড়ম্বর দেখা গেল না। মাটি নরম হ'ল না।

এমনি সময়,—যখন হতাশায় ভেঙে পড়েছে কৃষকরা,—ঠিক এমনি সময়, দুর্যোগ ঘনিয়ে এল উড়িষ্যার আকাশে।

তারিখটা ছিল গত ১লা সেপ্টেম্বর। সেই দিন পূর্ব পাকিস্তানের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরে ঝড়ের সংকেত পাওয়া গেল। ২রা সেপ্টেম্বর সেই ঝড়ের নিশানা পাওয়া গেল ক'লকাতার একশ' মাইল দূরে। সেই দিনই উড়িষ্যার উত্তর প্রান্তে ঝড়জলের হুঁশিয়ারী প্রচার করা হ'ল কলকাতার হাওয়া আপিস থেকে।

সেইদিন বিকেল থেকে কালো মেঘে ছেয়ে গেল উড়িষ্যার আকাশ। কৃষকরা মনে করল, এবারের ধান বেঁচে গেল। তরা সেপ্টেম্বর সকাল বেলা ঝড়ের বেগ তীব্র হ'য়ে উঠল। বালেশ্বরের সমুদ্র উপকূল দিয়ে সেই ঝড় ঢুকে পড়ল উড়িষ্যার ভিতরে। সঙ্গে নিয়ে এল প্রবল বর্ষণ। ক্রমাগত ৪৮ ঘণ্টা ধ'রে বৃষ্টির ধারা নেমে এল সারা উড়িষ্যায়।

সম্বলপুরে বৃষ্টি হ'ল ১৪ ইঞ্চিরও বেশী; আঙ্গুলে প্রায় ৮ ইঞ্চি কটকে ১০ ইঞ্চিরও বেশী; চাঁদবালীতে প্রায় ৮ ইঞ্চি; বালেশ্বরে প্রায় ৬ ইঞ্চি। বৃষ্টির জল গড়িয়ে পড়ল ব্রাহ্মণী, মহানদী, কাটজুরীতে।

শীর্ণস্রোতা এই নদীগুলি ফুলে ফেঁপে উঠল। ৪ঠা সেপ্টেম্বর নদীর জল উপচে পড়তে চাইল দুকূলে ভাসিয়ে। সারা উড়িষ্যা আশংকায় কেঁপে উঠল। ব্রাহ্মণী প্রথম আঘাত হানল জেনাপুরের কাছে।

বন্যার জলে জলময় পুরী জেলার একটি ভূখন্ড

কটক স্টেশন ইয়ার্ডে সাহায্য-নৌকার সারি

ঐদিন কটক আর বালেশ্বরের মধ্যে কলকাতামুখী মাদ্রাজ মেইল, পুরী এক্সপ্রেস, জনতা এক্সপ্রেস আটকে পড়ল।

জেনাপুরের কাছে ব্রাহ্মণীর দুটো মুখ। একটা ব্রাহ্মণী, অপরটি খরসোয়া যার নীচের দিকে আর একটি মুখ আছে। তার নাম কেলুয়া।

ব্রাহ্মণী, খরসোয়া জলভার সইতে পারল না। ৪ তারিখেই জেনাপুরের কাছে বাঁধ ভেঙে বন্যার জল ঢুকে পড়ল গ্রামে প্রান্তরে। এই অঞ্চলটি অনাবৃষ্টির অঞ্চল। জলে ডুবে গেল এটা।

অপরদিকে ছিল, সংরক্ষিত অঞ্চল, অর্থাৎ যে অঞ্চলের কৃষকরা অনাবৃষ্টি সত্ত্বেও ক্যানাল থেকে জল পেত সারা বছর। ক্যানালের সু-উচ্চ বাঁধও ধসে পড়ল জলের চাপে। সংরক্ষিত অঞ্চলের সবুজ ধান বন্যার জলের নীচে তলিয়ে গেল।

অবিরাম বর্ষণ ক্ষান্ত হল বটে। কিন্তু মহানদী তখনও শান্ত হয়নি। সম্বলপুরের দিক থেকে জল তীব্র বেগে নেমে আসছিল নীচের দিকে।

কটক শহরের পূব দিকে মহানদী, পশ্চিমে কাটজুরী,—মহানদীর দক্ষিণ বাহু। প্রতি ঘণ্টায় জল বাড়তে লাগল এই নদীতে। ৫ তারিখে কটক শহর বিপন্ন হ'য়ে পড়ল। মহানদী, কাটজুরী তখন বিপদ সীমা ছাড়িয়ে গেছে।

নিদ্রাহীন রাত কাটল শহরবাসীর।

৬ই সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার, কটক শহর বেঁচে গেল। কাটজুরী নদী ঝাঁপিয়ে পড়ল গ্রামাঞ্চলে,—সংরক্ষিত অঞ্চলে।

বিস্তীর্ণ এই অঞ্চল দুলছিল সবুজ ধানের আন্দোলনে। কাটজুরী নদীর ধাঁদিক ধ'রে কটক থেকে জগৎসিংহপুর পর্যন্ত চ'লে গিয়েছে ক্যানাল। এই ক্যানালের দুদিকে উঁচু বাঁধ শুধু যে ক্যানালের জলই ধ'রে রেখেছে তা-ই নয়, কাটজুরীর হাত থেকেও গোটা অঞ্চলকে বাঁচিয়ে রেখেছে। একে স্থানীয় চলতি ভাষায় বলে ঘাই। এক এক জায়গায় এই ঘাই-এর এক এক নাম। কাটজুরী সোজা নেমে গিয়ে যেখানে ডানদিকে বেঁকে গেছে সেখানে ক্যানেল বাঁধের নাম দলাই ঘাই। আর কটক থেকে ১৫ মাইল নীচের দিকে এর নাম বড়ড়া ঘাই।

৬ই সেপ্টেম্বর প্রথম ভাঙল বড়ড়া ঘাই। খুব ভোরে। একটু পরেই ভাঙল দলাই ঘাই। বেলা দশটার মধ্যে সংরক্ষিত অঞ্চলকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল কাটজুরীর জল। কটক শহর বেঁচে গেল।

ক'লকাতায় এই খবর এসে পৌঁছুল দুপুরের দিকে। সাংবাদিকের কর্তব্য পালন ক'রতে সেদিন রাত্রেই কটকের পথে পা বাড়ালাম।

বুধবার সকালে, বড়ড়া ঘাইয়ের ভাঙনের মুখে গিয়ে যখন দাঁড়ালাম: তখন কাটজুরীর জল সগর্জনে ছুটে চলেছে গ্রাম ভাসিয়ে, পথঘাট ডুবিয়ে।

বড়ড়া ঘাইয়ের কাছেই কাইজঙ্গা গ্রাম। ত্রিলোচন এই গ্রামেরই প্রবীণ অধিবাসী। সে জীবনে কখনও এমন ধ্বংসলীলা দেখেনি।

শুধু যে ঘরবাড়ি, মাঠঘাট ধ্বংস ক'রে চলেছে, তা-ই নয়;—কৃষকের আর্থিক ভিতকে পর্যন্ত ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে।

ত্রিলোচনের কথা মিথ্যে নয়।

শুধু ত্রিলোচন কেন; বন্যাঞ্চলে ঘুরতে ঘুরতে যার সঙ্গে দেখা হয়েছে, কথা হয়েছে, সেই বলেছে,—সব গেছে থাকার বলতে কিছু নেই। ওদের মুখের কথা নয়, আমি নিজেই দেখেছি প্লাবিত অঞ্চলে ঘুরতে ঘুরতে কত ঘর নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে বন্যার স্রোতে; কত গ্রামবাসী কত কৃষকের চোখের জল বন্যার জলে

বিমানযোগে বন্যাপ্লাবিত অঞ্চলে খাদ্য সাহায্য প্রেরণ

মিশে গেছে। কে তার হদিস করবে? কে তার সংখ্যা নেবে?

আপাত-দৃষ্টিতে প্রথমেই যে অবস্থাটা চোখে পড়ে, সেটা বন্যায় যারা সুদূর অঞ্চলে এখনও আটকে আছে, তাদের সন্ধান করা, তাদের বাঁচিয়ে রাখা।

সমস্যাটা সহজেই বোঝা যাবে, যদি এটা মনে রাখা যায় যে, উড়িষ্যার সমগ্র উপকূলভাগ আজ বন্যায় বিধ্বস্ত। বালেশ্বর, কটক আর পুরী জেলার অন্তর্গত বিস্তীর্ণ এই উপকূলভাগ সারা উড়িষ্যার খাদ্যভান্ডারের এক বিরাট অংশ পূর্ণ করত। এই ছয় হাজার বর্গমাইল অঞ্চল যেমন জর্জরিত হয়েছে অনাবৃষ্টিতে, আজ তেমনি তলিয়ে গেছে বন্যার জলে।

ব্রাহ্মণী, মহানদী, কাটজুরী থেকে যে জল নেমে এসেছে প্রান্তর ভাসিয়ে, তা হঠাৎ যেন থমকে দাঁড়িয়ে গেছে এই উপকূল অঞ্চলে। ফলে, দূর দূরান্ত গ্রামে লক্ষ লক্ষ লোক বন্যার জলে আটকে পড়ে গেছে।

মাথায় শেষ সম্বলটুকু চাপিয়ে বন্যার জল ভেঙে চলেছে

শুধু দলাই ঘাই অঞ্চলেই নয়, বড়চনা থানা এলাকায়, পুরীর বহু জায়গায়, জাজপুরের বহু গ্রামে দেখেছি বন্যার জল স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অথচ বন্যার জল যখন ছুটে এসেছে, গ্রামবাসীরা এতটুকু সময় পায়নি নিরাপদ কোন জায়গায় স'রে গিয়ে আশ্রয় নেবার। অতর্কিতে যখন ভেসে গেছে গ্রাম, তখন তাড়াতাড়ি আশ্রয় নিয়েছে কুটিরের চালায়, গাছের আগ-ডালে।

সেখানে গিয়েও অনেকে ভেসে গেছে। ধর্মশালা থানা এলাকার অন্তর্গত কাইমা গ্রামে যখন কেলুয়ার ধ্বংসলীলা দেখছিলাম, তখন সে গাঁয়ের এক ভদ্রলোক বললেন, তিনি ভেসে-যাওয়া কুটিরের চালে দেখেছেন অসহায় নর-নারী। তাদের আর খোঁজ মেলেনি।

উড়িষ্যার বন্যায় প্রাণহানির প্রকৃত তথ্য যে তাড়াতাড়ি কিছু পাওয়া যাবে,

গ্রামবাসীরা বন্যার জল ভেঙে আশ্রয়ের আশায় এগিয়ে চলেছে

চালের আশায় অগণিত দুর্গতের ভিড়

তা মনে হয় না। কিন্তু সেটা আপাতত প্রধান কথা নয়। যারা এখনও বেঁচে আছে, অনাহারে, অনিদ্রায় দূর দূরাঞ্চলে, তাদের বাঁচিয়ে রাখা, তাদের খোঁজ-খবর নেওয়া, সেটাই হল এখন প্রধান সমস্যা।

সমস্যার সমাধান খুব সহজসাধ্য নয়। তার কারণ দুটো;—প্রথমত, বন্যার প্লাবনে মাঠ, ঘাট যখন ভাসল, তখন

ছাগলটিকে কোথায় ফেলে যাবে—!

উড়িষ্যা সরকারের হাতে জল পেরিয়ে দূরাঞ্চলে যাবার মত যথেষ্টসংখ্যক নৌকো ছিল না; আর দ্বিতীয়ত, বণ্টন করার মত প্রচুর পরিমাণে খাদ্যও মজুত ছিল না।

তাই, প্রথমদিকে বন্যাঞ্চলে গিয়ে উড়িষ্যা সরকারের এই অসহায় অবস্থাটা বিশেষভাবে চোখে পড়েছে এবং পশ্চিম বাঙলা সরকার ও সামরিক বিভাগের নৌকো যতদিন না উড়িষ্যায় গিয়ে পৌঁছেছে, ততদিন এই অবস্থা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়নি।

নৌকো যখন পৌঁছেছে, তখন অবশ্যি চারদিকে লোক ছুটে গিয়েছে সরকারের সাহায্য নিয়ে বন্যার্তদের কাছে। কিন্তু তাতেও সম্ভব হয়নি প্রতিটি গ্রামের খবর নেওয়া, উপবাসী গ্রামবাসীদের মুখে আহার তুলে দেওয়া।

উড়িষ্যা সরকারকে তাই সাহায্য নিতে হয়েছে ভারতীয় বিমান বাহিনীর। একদিকে পশ্চিম বাঙলা সরকার যেমন প্রতিদিন মালগাড়ি ভর্তি করে চাল পাঠিয়েছে, তেমনি বিমান বাহিনীও দূর দূরাঞ্চলে বন্যাবেষ্টিত গ্রামে গ্রামে প্রতিদিন চালের বস্তা ফেলে দিয়ে এসেছে আকাশ থেকে।

এর ফলে বহু গ্রামবাসী হয়ত অনাহারের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে, কিন্তু সবাই যে পেয়েছে তা বলা কঠিন। কারণ, এখনও অনেক গ্রাম আছে যেখানে হয়ত আকাশ থেকে আহার পৌঁছে দেওয়াও সম্ভব নয়। সেসব ক্ষেত্রে নৌকো বা লাঞ্চ দিয়ে আহার পৌঁছে দেবার চেষ্টা করা হয়েছে।

তবু স্থানীয় জনসাধারণের মনে লক্ষ্য করে দেখেছি, সরকারের বিরুদ্ধে যেন একটা অভিযোগ জমা হয়ে উঠেছে। ধর্মশালা এলাকায় যখন ঘুরছিলাম তখন প্রতিদিন দেখেছি দলে দলে লোক এসেছে সাহায্যের প্রত্যাশায়, চালের আশায়। এক জায়গায় দেখেছি সরকারি কর্মচারীদের পায়ে লুটিয়ে প'ড়ে কেউ বলেছে, 'একমুঠো চাল দিন।' বন্যার জলে যতদিন আটকে ছিল, ততদিন পেটে একটা দানা পড়েনি; শিশু যারা, তারা কাঁদতে কাঁদতে মায়ের কোলে ঘুমিয়ে পড়েছে। জল যখন কমেছে, তখন জলে

পচা শাকপাতা খেয়েছে; কারো কারো ঘরে হয়ত ছিল দ্'মুঠো ধান বা চাল,—কিন্তু জলে তা প'চে গেছে,—তাই খেয়েছে অনাহারের হাত থেকে বাঁচবার জন্য। কিন্তু আর তাদের দিন কাটতে চাইছে না। তারা চায় দু'মুঠো চাল। এতটুকু মুষ্টিভিক্ষা।

একটি বুড়ো কৃষককে দেখেছিলাম ধর্ম্মশালায়। পরনে ছিন্নবাস। কাঁধে একটা গামছা,—ময়লা, ছেঁড়া। তার গ্রাম অনাবৃষ্টি এলাকায়। সে বলছিল, বন্যার আগে তাদের ইউনিয়নে ছিল ধানের গোলা। সেখান থেকে ওরা পেত অল্পস্বল্প চাল প্রয়োজনের সময়। বন্যায় সেই গোলা গেছে ভেসে। এখন আছে শুধু বালির ঢিপি।

কান্নায় ফেটে পড়ছিল বৃদ্ধ কৃষক। বহুকষ্টে নদী পেরিয়ে এসেছে ধর্ম্মশালার ডাকবাঙলোয়—সরকারী কর্ম্মচারীদের কাছে চালের জন্য। শুধু সে আর তার ছেলে, বৌ, নাতিপুতি নয়, গোটা গাঁয়ের লোকই ৬।৭ দিন ধ'রে উপবাসী। আজ চাল না নিয়ে যেতে পারলে, মরে যাবে ওরা—হতাশায় আর অনাহারে। না খেয়ে খেয়ে, শিশুগুলো কাঁদতেও আর পারে না।

কিন্তু দেখেছি এরা নিরাশ হয়েই ফিরে গিয়েছে। উপায় নেই, সরকারী কর্ম্মচারী, পুলিস বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী বোঝাচ্ছিলেন এদের 'ধৈর্য ধর।' চাল এসে গেলেই বিলি হবে। যেটুকু চাল হাতে আছে, তা দূরাঞ্চলের গ্রামে যেখান থেকে বন্যার্তরা ছুটে আসতে পারে না ধর্ম্মশালায় চালের সন্ধানে, সেখানে আগে পেঁৗছে দিতে হবে। এসে যাবে চাল, একটু ধৈর্য, বোঝাচ্ছিলেন কর্ম্মচারীটি।

উপায় নেই তার। উপায় কি? উড়িষ্যা সরকার নিরুপায়। চাল পৌঁছুলেই তা গ্রামবাসীদের পেঁৗছে দেওয়া সম্ভব।

কিন্তু উপবাসীর ধৈর্য সীমাবদ্ধ। তাই এদের মধ্যে দেখেছি অসন্তোষ। তাই এদের বিক্ষুব্ধ।

সরকারের সাহায্য-ভাণ্ডার থেকে চাল ওরা পাবে। হয়ত তা পর্যাপ্ত নয়, তবু কিছু পাবেই,—এ বিশ্বাস আমার আছে।

কিন্তু, তারপর? কতদিন চলতে পারে এই খয়রাতি?

এই বিরাট সমস্যার রূপটাই আমার কাছে ভয়ংকর মনে হয়েছে। বন্যার জল, আজ না হয় কাল নেমে যাবে, সমুদ্রে মিলিয়ে যাবে; কিন্তু যে বালির স্তর পিছনে রেখে গেল, যে শূন্য শস্যভাণ্ডার রেখে গেল সারা উড়িষ্যার জন্য, তার কি হবে?

ত্রিলোচন বলছিল,—'দুর্ভিক্ষ হবেই। কোথা থেকে আসবে শস্য, আসবে আহার। ভেবে কূল পাই না।'

বললাম, উপায় হবেই। ভারত সরকার আছে, ভারতবর্ষ আছে। উড়িষ্যার আসন্ন বিপদের—বন্যার চাইতেও গুরুতর, প্লাবনের চাইতেও ভয়ংকর, আশংকার কথা চিন্তা করতে করতে কলকাতা ফিরে এলাম।

চন্দ্রে অভিযান কি সম্ভব?

বিজ্ঞান ভিক্ষু

(১)

আগেই বলিয়াছি চন্দ্রে অভিযানের একাধিক দুস্তর বাধা। তার মধ্যে প্রথম মাধ্যাকর্ষণ, যাকে পরাস্ত করিয়া আজও কোনও রকেট মহাশূন্যে পাড়ি দিতে পারে নাই। দ্বিতীয় বাধা মানুষ নিজে। কারণ যে দেহ একান্ত-ভাবে ক্ষুধা-তৃষ্ণা, শ্বাস-প্রশ্বাস, শীতোষ্ণ-তার দাস, যে জীবন অসহায়ভাবে এই পৃথিবীর ধূলিকে আঁকড়াইয়া আছে, সেই মানুষ শূন্যতলে সর্বত্র-উদ্যত মৃত্যুর সামনে কি করিয়া দাঁড়াইবে? কিন্তু ইহার

চেয়েও গুরুতর সমস্যা চন্দ্র নিজে। কারণ পথ যতই দুর্গম হউক, আশা থাকে যে সেই পথের শেষ আছে; পারাবার দুস্তর, কিন্তু মানুষ এই ভাবিয়া বুক বাঁধে যে ইহারও কূল আছে, যেখান থেকে তৃষ্ণার জল, ক্ষুধার অন্ন আর কোলাহলময় লোকালয় হাতছানি দেয়। তীর্থযাত্রী পথের ক্লেশকে যে উপেক্ষা করে তার কারণ, ঈপ্সিত ভূমিতে পৌঁছিয়া সে যেমন একান্তভাবে সেখানকার ধূলির মধ্যে নিজেকে লুটাইয়া দেয়, তেমনি সেই তীর্থভূমিও তাকে একমুহূর্তে আত্মীয়ের মত কোলে টানিয়া নেয়। কিন্তু চন্দ্রে অভিযাত্রীদের সেই আশা কোথায়? আমাদের বাঞ্ছিত ভূমি দুর্গম পথের চেয়েও দুর্গমতর, অনাত্মীয়ের চেয়েও যে অনাত্মীয়। সেখানে সর্বদা নিষেধের তর্জনী উদ্যত হইয়া আছে। সর্বত্র শাসনের রক্তচক্ষু জ্বলিতেছে।

প্রকৃতির মধ্যে কি বিচিত্র স্ব-বিরোধ! এক দিকে ধরিত্রী কত স্নেহে জীবনকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে, সেজন্য কত অক্লান্ত চেষ্টা, কত বিনিদ্র রজনী যাপন! আবার অন্যদিকে এই ধূলিমুষ্টির বাহিরে আর কোথাও আমাদের জন্য একতিল স্থান নাই, এক বিন্দু করুণা নাই! মানুষের এই দুঃখ কি কম? "লক্ষ যোজন দূরের তারকা, মোর নাম যেন জানে সে"— একি তবে শুধুই কবির কল্পনা? তবে কি এই বিশ্বসৃষ্টির মূলে কোন মমতা নাই? মনোবিজ্ঞানী বলিবেন যে এ ত' অতি অর্বাচীনের মত হইল। মমতা না পাইয়া মানুষ কবে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়াছে? 'সেক্স' নয় 'ইগো' নয়, শেষে কি না বিশ্ব রহস্যের মধ্যে এক ফোঁটা মমতার তল্লাস! কে না জানে মানুষের কাম্য ক্ষমতা লাভ এবং তারই লড়াই নিত্যনিয়ত চলিতেছে। এমনকি মৃত্যুসঙ্কুল চন্দ্রে অভিযানের সূত্রপাত মাত্রেই দুই মল্লবীরের মধ্যে কেমন পায়তাড়া শুরু হইয়া গিয়াছে; কার রকেট আগে মহাশূন্যে যাত্রা করিবে কার কৃত্রিম উপগ্রহ সর্বাগ্রে শূন্যে ভাসিতে থাকিবে? মারিবার এমনি মরিবার ক্ষমতা নিয়াও যাদের অহর্নিশ দ্বন্দ্ব চলিতেছে, সেই মানুষের মুখে ি মমতা শোভা পায়? যদি কোন দুঃ থাকে, সে মমতা নাই বলিয়া নয়, ক্ষমত চাই বলিয়া। তবে কি এই শেষ কথা আমাদের এই চন্দ্র অভিযানের মধ্যে ি শুধু বণিক বুদ্ধি, কেবলই কি ক্ষমতা পিপাসা, তাছাড়া আর কিছুই কি নাই আমাদের মনের মধ্যে যে সৌন্দর্য পিপাস লুকাইয়া আছে, এই বিপুল আয়োজনে মধ্যে সে কি একেবারেই নিষ্ক্রিয়? পৃথিবী ব্যাপী এই বিদায়-ব্যস্ততার মধ্যে আম কি চিরনূতনের কোন ডাক শুনিতে পা না? কেহ হয়ত বলিবেন যে চন্দ্রে আর নূতনত্ব কোথায়? বিজ্ঞানীরাই ত' বলে যে চন্দ্র দগ্ধ, রিক্ত, ক্ষতবিক্ষত। অতএ চন্দ্র ত' সৌন্দর্যহীন জড়পিণ্ড মাত্র।

কিন্তু সত্যই কি তাই? সৌন্দর্যে এই একদেশদর্শী দৃষ্টিভঙ্গী ছাড়া ি আর কিছুই নাই? পূর্ণতার মধ্যে কমনীয়তা তাহাই কি সব? রিক্ততার মা কি কোন সৌন্দর্য নাই? আলোর যা রূপ থাকে অন্ধকারের কি কোন রূ নাই? অন্তত শরৎ চট্টোপাধ্যায় বলেন, আছে।

(২)

চন্দ্রের কমনীয় স্নিগ্ধ সৌন্দর্যে পাশে তার ভয়ঙ্কর রূপের অনুভূতি উত্তীর্ণ হইতে বিজ্ঞানীদের যে কত যু পার হইয়া গিয়াছে তার ইয়ত্তা নাই। যেন মাতৃরূপের বন্দনা থেকে অর্ধনারীশ্ব রূপের আরাধনা। প্রাগৈতিহাসিক যু থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর মনস্বী গ্যালি লিও (পিসা, ইতালী ১৫৬৪—১৬৪ খৃঃ অঃ) পর্যন্ত কয়েক সহস্র বৎস মানুষ চন্দ্রকে শূন্যে ভাসমান একটা বির দর্পণ ছাড়া আর কিছু ভাবিতে পা নাই। যতদিন বিজ্ঞান অংগুলিমেয় জ কয়েক তত্ত্বদর্শীর মতামতের উপর নির্ভ শীল ছিল, যতদিন মানুষ ইন্দ্রি অনুভূতির মধ্যে তত্ত্বকে যাচাই করি নেওয়ার যন্ত্র উদ্ভাবন করিতে পারে নাই

ততদিন মতের অন্ত ছিল না, কলহের বিরাম ছিল না। ততদিন 'নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।' সেই সব অনুমান-নির্ভর নব নব তত্ত্বগুলি আজকের আশ্রয়-হীন রকেটের মত যেমন উৎক্ষিপ্ত হইত তেমনি আবার বিস্মৃতির মধ্যে মিলাইয়া যাইত। আশ্চর্য নয়, কারণ, অপরিণাম-দর্শী, মৃত্যুভয়হীন, কয়েকজন ক্ষ্যাপা ছাড়া গীর্জার বিরুদ্ধে কে দাঁড়াইবে? আলিঙ্গলনবদ্ধ আদম ইভের ছবি সমন্বিত যে অপূর্ব মানচিত্র তা দেখিয়া কে হাসিতে সাহস করিবে? নূতন কথা কে বলিতে যাইবে? যাঁরা গিয়াছিলেন তাঁদের মধ্যে কত সক্রেটিসকে (গ্রীস্ ৪৭০—৩৯৯ খৃঃ পূঃ) যে ওরা বিষ দিয়াছে, কত আনাক্সাগোরাসকে (এথেন্স্, ৫০০—৪২৮ খৃঃ পূঃ) যে ওরা নির্বাসিত করিয়াছে, তাহার ক'জনের সংবাদ আমরা জানি। এথেন্সের এই একগুঁয়ে মানুষটিই প্রথম বলিয়াছিলেন যে চন্দ্র পৃথিবীরই মত একটা মৃৎপিণ্ড। তিনিই প্রথম চন্দ্র গ্রহণের প্রকৃত কারণ নির্ণয় করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁর নির্বাসনের সঙ্গে এই তত্ত্বও কোন্ অরণ্যে নির্বাসিত হইল কে জানে। আনাক্সাগোরাসের নির্বাসন দেখিয়াও যাঁরা ভ্রূক্ষেপ করেন নাই, আরিস্টারকাস্ (শামস্, গ্রীস, ৩২০—২৫০ খৃ পূঃ) তাঁদের মধ্যে একজন। তিনি বলিয়াছিলেন যে আমাদের সৌরজগৎ সূর্যকেন্দ্রিক। চন্দ্র পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহ সূর্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে। কিন্তু তখন বিশ্বাস ছিল পৃথিবীই স্থির এবং চন্দ্র, সূর্য প্রভৃতি তার চারদিকে ঘুরিতেছে। ধর্মের ছদ্মবেশী মূঢ়তা আরিস্টারকাসের উপরেও খড়্গহস্ত হইয়া উঠিয়াছিল এবং তাঁহার যত না ক্ষতি করিয়াছে তার চেয়ে বেশী করিয়াছে মনুষ্য সমাজের। টলেমি (আলেকজান্দ্রিয়া ১০০—১৭০ খৃঃ অঃ) ও টাইকো ব্রাহেকে (ডেনমার্ক, ১৫৪৬-১৬০১ খৃঃ অঃ) বাদ দিলে আরিস্টারকাসের সার্থক উত্তরসাধক হইলেন জগদ্বিখ্যাত কোপার্নিকাস (পোল্যাণ্ড, ১৪৭৩—১৫৪৩ খৃঃ অঃ)। তিনি আবার এই তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন প্রাক্‌যীশু যুগের দার্শনিকদের মধ্যে ডিমোক্রিটাস (গ্রীস, ৪৬১—৩৭০ খৃঃ পূঃ) আশ্চর্য সূক্ষ্মদর্শিতার সহিত চন্দ্রের কলঙ্কের প্রকৃত কারণ উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। তিনি প্রথম চন্দ্র কলঙ্ককে অন্ধকারময় গিরিগহ্বর বলিয়া নির্দেশ করিয়াছিলেন। অথচ খৃষ্টীয় মধ্যযুগে এই তত্ত্ব বিস্মৃতির মধ্যে লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। তখন অনেক পণ্ডিতলোকও ভাবিতেন যে চন্দ্রের দর্পণের মধ্যে পৃথিবীর পর্বত ও অরণ্যের যে ছায়া পড়ে, তাহাই তার কলঙ্ক। আর তখন চন্দ্রের দূরত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান এতই অগাধ ছিল যে চন্দ্রে যাওয়ার স্বপ্ন হিন্দুস্থান যাওয়ার চেয়ে সহজ ছিল। লোকে কথায় কথায় বলিত চন্দ্র ত' আর হিন্দুস্থানের চেয়ে দূরে নয়। আকাশের চাঁদের চেয়েও মাটির হিন্দুস্থান তখন বেশী লোভনীয় ছিল, তাই কলম্বস আর ভাস্-কো-ডা-গামা, ডুপ্লে আর ক্লাইভ এবং পর্তুগীজ জল-দস্যু চাঁদের দিকে না গিয়া ভারতের দিকে যাত্রা করিয়াছিল। তবে সৌভাগ্য এই, যে সময় এই সব লুটেরার দল অন্যের ভাণ্ডার লুটিয়া নেওয়ার জন্য বাহির হইয়াছিল, ঠিক সেই সময়ে আর একদল লোক জ্ঞানভাণ্ডারের নিত্য নূতন দ্বার খুলিয়া দিয়া মানুষের জন্য অক্ষয় সম্পদ আহরণ করিয়া চলিয়াছিলেন।

তখন রেনেসাঁর যুগ। তখন নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ হইয়াছে। মুক্তির জন্য, পাষাণ কারার বাহিরে আসার জন্য ভিতরে ভিতরে সে উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে। সহসা গ্যালিলিও সেই অন্ধকারের মধ্যে পথ দেখাইলেন। তিনিই প্রথম দূরবীন আবিষ্কার (১৬১০ খৃঃ) করিয়া চন্দ্রের স্বরূপ উদ্ঘাটিত করিলেন। ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাস। যিনি মানুষের দৃষ্টিকে অন্ধকার ভেদ করিয়া লোকে-লোকান্তরে পৌঁছাইয়া দিলেন, তিনি নিজে কিন্তু গবেষণার সময়ে একদিন চোখে তীব্র সূর্যরশ্মি লাগিয়া জন্মের মত অন্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। মনে হয় যেন এই দূরবীন সামান্য যন্ত্রমাত্র নয়। মনে হয়, এ যেন সেই মনীষীর পাটলোৎ-পল প্রদীপ্ত চক্ষু। সেই বর্ষীয়ান্ মনস্বী যেন নিজের প্রিয়তম সম্পদ, তাঁর সেই দ্যুলোকভেদী দৃষ্টিশক্তিটুকু উত্তর-পুরুষকে উৎসর্গ করিয়া অন্ধত্ব বরণ করিয়াছিলেন।

জ্যোতিষ্ক বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে সেই দূরবীন যে কি বিপ্লব ঘটাইয়া দিয়াছে, আজ তিন শতাব্দী পরে সে কথা কল্পনা করাও দুঃসাধ্য। কেননা ভাবিয়া দেখুন,

এই দূরবীন ছাড়া আজকের জ্যোতিষ্ক বিজ্ঞান কোথায় দাঁড়াইত? চন্দ্র যে এই পৃথিবীরই মত একটা জড়পিণ্ড, সেখানেও যে ধূসর উত্তুঙ্গ পর্বত শ্রেণী সারি সারি দাঁড়াইয়া আছে, সকাল সন্ধ্যায় ছায়া দীর্ঘতর করিয়া তারাও যে নীরবে প্রহর যাপন করে সে কথা কে বিশ্বাস করিত? চন্দ্র পৃষ্ঠেও যে একদা বহু বিস্তৃত লাভা সমুদ্রগুলি তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিয়াছিল, রুদ্রের কোন্ প্রহরী আপন ওষ্ঠাধরে তর্জনী স্থাপন করিয়া 'তিষ্ঠ' বলিবামাত্র, সেই উত্তাল সমুদ্র যেন চিরকালের মত তদবস্থ হইয়া আছে,—গ্যালিলিওর আদিম দূরবীন, ঐ ক্ষুদ্র 'অপ্‌টিক্ টিউব্' ছাড়া —সেই অনুপম দৃশ্য কাহাকে দেখান যাইত? গ্যালিলিওর দৃষ্টিকে অনুসরণ না করিয়া আমাদের কাছে কি চন্দ্রের দিন রাত্রি তার সমস্ত বৈচিত্র্য লইয়া এমন করিয়া ধরা দিত? চন্দ্রে দুই সপ্তাহব্যাপী দীর্ঘ দিন ও রাত্রি নিরবচ্ছিন্নভাবে পর্যায়ক্রমে চলিতে থাকে। সেখানে শেষ হইয়া যখন দিন আসে অকস্মাৎ সমস্ত প্রদীপ্ত হইয়া সেজন্য কোন প্রস্তুতির দরকার না অন্ধকার সেখানে অনিচ্ছুক পদক্ষেপে ধীরে ধীরে সরিতে থাকে না ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করে। যেন বোতাম টেপা অপেক্ষা মাত্র। আমাদের পৃথিবীতে সূর্যোদয়ের আগে ও সূর্যাস্তের পরে যে ম্লান আভা আমাদের বিভ্রান্ত করে তার জন্য দায়ী এই বায়ুমণ্ডল। সূর্য যখন উদয়াগিরির আড়ালে অথবা পশ্চিম দিগন্তে অস্তরেখার নীচে থাকে, তখন আলো আমাদের কাছে সোজাসুজি আসিতে পারে না, মাটিতে ঠেকিয়া যায়। কিন্তু যে সব রশ্মি আকাশের দিকে যায়, সেগুলি বায়ুর ক্ষীণ স্তর থেকে ঊর্ধ্বে ক্ষীণতর স্তরে আরোহণ করিতে থাকে। দেখা গেছে, আলোর চলার পথে পরপর দুইটি স্বচ্ছ স্তরের মধ্যে যখনই ঘনত্বের পার্থক্য হয় তখনই আলোর কিছু অংশ দ্বিতীয় স্তরে ঠেকিয়া ফিরিয়া আসে, ইহাকে বলে প্রতিফলন (reflection), কিছু আলো শোষিত হয় আর বাকী অংশ দ্বিতীয় স্তরের মধ্যে একটা তির্যক পথে প্রবেশ করে, যাকে বলে প্রতিসরণ (refraction)। সুতরাং সূর্যরশ্মিগুলিও যতই উপরে উঠিতে থাকে, ততই সেগুলি বায়ুর ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর স্তরের সংস্পর্শে প্রতিসৃত হইয়া প্রতিবারে কিছুটা হেলিয়া পড়ে। এইরূপে ঊর্ধ্বগামী যে রশ্মি প্রায় খাড়া ছিল তাহাও কিছু উপরে গিয়া প্রায় শায়িত (horizontal) হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় আলো প্রতিসৃত হইতে পারে না, সম্পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হইয়া নীচের দিকে নামিয়া আসে। এইখানেই আলোর ঊর্ধ্বগতির শেষ সীমা। তারপর থেকেই সেই নিম্নমুখী রশ্মি আবার স্তরে স্তরে প্রতিসৃত ও প্রতিফলন দ্বারা অনুদিত বা অস্তগত সূর্যের আলো আমাদের কাছে পৌঁছাইয়া দেয় তাই নয়। বায়ুর অণুগুলি ও তাতে ভাসমান ধূলিকণা ও জলবিন্দুর সহিত আলোর রশ্মির ঠোকাঠুকি হইতে থাকে। ফলে যে আলোর স্রোত অচিন্তনীয় বেগে বিশেষ একটা পথে ঊর্ধ্বদিকে যাইতে-

ল তাহা বায়ুর অণু ও ভাসমান কণায় ঠোকিয়া ঠোকিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। হোস পাইপের জল যদি ল্যাম্প পোস্টে ঠেকিয়া যায় তাহা হইলে যেমন হয়। তবে তফাৎ এই যে এখানে হোস পাইপ একটা নয় এবং বায়ুর কণাগুলিকে সূর্যরশ্মির পথে লক্ষ লক্ষ ল্যাম্পপোস্ট বলার চেয়ে অগণিত বেলুনের ব্যারেজ বলাই ভাল। এইরূপে আলোর চারিদিকে ছড়াইয়া পড়াকে বলে বিচ্ছুরণ (scattering)। এই সব প্রতিসরণ, প্রতিফলন ও বিচ্ছুরণ মিলিয়া আমাদের ঊষা ও গোধূলির সৃষ্টি। ঠিক একই কারণে আলো শুধু বিচ্ছুরিত হয় না, তার মধ্যে যে লাল হলুদ নীল ইত্যাদি সাতটা রং মিশিয়া আছে সেগুলি বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে। এই বিশ্লেষণের ফলে নানা রঙের আবির আকাশে ছড়াইয়া পড়ে। আমাদের আকাশ যে নীল তার কারণ নীল আলো বায়ুর অতিক্ষুদ্র অণুগুলির দ্বারা সব চেয়ে সহজে বিচ্ছুরিত হইয়া চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। সুতরাং আমরা আকাশের দিকে যখনই চোখ ফেরাই অমনি সহস্র সহস্র নীল আলো চারিদিক থেকে আসিয়া আমাদের চোখ ভরিয়া দেয়। সেই বিপুল নীল রঙের স্রোতের মধ্যে লাল হলুদ ইত্যাদি স্বল্প পরিমাণ বিচ্ছুরিত আলো কোথায় ডুবিয়া যায়। তাই আমাদের কাছে আকাশ নীল। কিন্তু বায়ুর অবস্থার যদি তারতম্য ঘটে, যদি ধূলি বা জলকণাগুলি আকারে বা পরিমাণে বাড়িয়া যায়, সূর্যরশ্মিকে যদি বায়ুর মধ্য দিয়া অতি দীর্ঘ পথ পার হইতে হয় তবে হলুদ আলোর বিচ্ছুরণের পরিমাণ নীল আলোকে ছাড়াইয়া যায়। সেই জন্য দূরের তুষারমণ্ডিত শৃঙ্গ সোনালী রঙে রঙীন। আবার সকাল সন্ধ্যায় যখন সূর্য মাটির সমতলে দিগন্তে থাকে, তখন সূর্যরশ্মিকে আরও কত সহস্র যোজন দীর্ঘতর পথ যে বায়ুর স্তরের ভিতর দিয়া পার হইতে হয় তাহা সহজেই অনুমেয়। আর সেই ভূমি সংলগ্ন বায়ুস্তরে জল ও ধূলিকণার পরিমাণও বেশী। তাই তখন হলুদের চেয়ে লাল আলোর বিচ্ছুরণ প্রধান হইয়া উঠে। সেইজন্য সকাল সন্ধ্যায় আমাদের আকাশ লাল আলোতে ছাইয়া যায়।

চন্দ্রে বায়ুর লেশমাত্র নাই। সুতরাং আলোর প্রতিফলন নাই, প্রতিসরণ নাই, সর্বোপরি বিচ্ছুরণ নাই। সুতরাং চন্দ্র-পৃষ্ঠে দাঁড়াইয়া যে দৃশ্য আমাদের সব-চেয়ে বিস্মিত করিবে সে হইল চন্দ্রের আকাশ। সে আকাশ নীল নয়। গভীর কালো। সে কালর সঙ্গে কিসের তুলনা দিব? নিকষ পাথর, না রাস্তার পীচ্, না রহস্যের যবনিকা? সেই কাল আকাশের কোন পরিবর্তন নাই, সেখানে সকালে সন্ধ্যায় দিগন্তে আবির ছড়াইয়া পড়ে না। চন্দ্রে তাই প্রভাত আছে কিন্তু ঊষা নাই, সন্ধ্যা আছে কিন্তু গোধূলি নাই। মেঘহীন ধূলিহীন বর্ণবৈচিত্র্যহীন সেই গভীর কাল আকাশ আর তাতে জ্বলন্ত সূর্য সেই ভস্মাচ্ছাদিত প্রান্তরের দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকে।

আবার পদার্থের বৈশিষ্ট্য এই, সূর্যের যে আলো তাদের উপরে পড়ে তারা নিজ-ধর্মবশত সেই আলো থেকে কোনও কোনও রঙ্ শুষিয়া নেয় আর বাকীটা প্রতিফলিত করিয়া ফিরাইয়া দেয়। যে রঙ

সে ফিরাইয়া দেয় পদার্থকে সেই রঙে রঙীন মনে হয়। এই হেতু প্রাণী ও জড় পদার্থ বৈচিত্র্যে সম্পদশালী পৃথিবী বায়ুর ওড়না জড়াইয়া আকাশে ও মাটীতে রঙের পর রঙ সৃষ্টি করিয়া আমাদের কাছে রঙের যাদুকরী হইয়া উঠে। কিন্তু চন্দ্রদেহ পদার্থবৈচিত্র্যহীন। সুতরাং বর্ণবৈচিত্র্যহীন। তার দেহ গৈরিক লাভা, কৃষ্ণবর্ণ ভস্মরাশি আর ধূসর অথবা কাল পিউমিস্ পাথরে গঠিত। সুতরাং যেদিকে তাকাই হয় ধূসর নয়ত গৈরিক সজ্জা চোখে পড়ে।

চন্দ্রে কোথায় কোন্ পর্বত আছে, তাদের দৈর্ঘ্য কত, ঊর্ধ্ব আকাশে তাদের চূড়া কোথায় গিয়া ঠেকিয়াছে, চন্দ্রের মেয়ার বা লাভা সমুদ্রগুলি কত মাইল জুড়িয়া আছে, সেখানকার ক্রেটার বা পর্বত গহ্বরগুলির অবস্থানের বৈশিষ্ট্য কি, চন্দ্রপৃষ্ঠে অনতি-বিস্তৃত কিন্তু সুদীর্ঘ ফাটলগুলি চন্দ্রের জঠরের মধ্যে কোথায় গিয়া শেষ হইয়াছে, এই সব সংবাদ আজ আমাদের নখ-দর্পণে। চন্দ্রের মানচিত্রে পর্বত সমুদ্র গিরিগহ্বর প্রভৃতি জানা অজানা বহু পার্থিব নামের সঙ্গে জড়াইয়া চিহ্নিত করা হইয়াছে। চন্দ্রের উত্তর গোলার্ধে কার্পেথিয়ান, ককেশাস্, আল্পস্, আলতাই প্রভৃতি পূবে পশ্চিমে বিস্তৃত তৃণলেশহীন পর্বতশ্রেণী আমাদের অভিযাত্রীদের শ্যামল ধরিত্রীর কথা কি প্রতিদিন স্মরণ করাইয়া দিবে? আবার চন্দ্রের দক্ষিণ গোলার্ধে লাইবনীট্শ্, ডালেমবার্ট প্রভৃতি নগ্ন পর্বতমালা কত বিজ্ঞানীর স্মৃতিকে বক্ষে ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তবে তফাত এই যে, সেখানকার কোন কাঞ্চনজঙ্ঘার শিখরে প্রভাতের রবি সোনা মাখাইয়া দেয় না। তফাত এই যে, সেখানকার কোন আলপস্-এর চূড়ায় চূড়ায় শুভ্র তুষারপুঞ্জ স্তরে স্তরে সজ্জিত হইয়া ওঠে না। সেখানকার পর্বতের গা বাহিয়া কোন গ্লেশিয়ার নামিয়া আসে না; গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রীর পথে শুভ্র রজতধারা ঝর্ণার গুঞ্জন ছড়াইয়া সমতলের তটে তটে ফলে শস্যে ভরিয়া দিয়া সমুদ্রের দিকে ধাবিত হয় না, কারণ সমুদ্র ত' সেখানে 'জলধি' নয়; নদী সেখানে নদীখাত মাত্র। সেই পথে হয়ত গলিত লাভা একদিন বহিয়া গিয়াছিল, হয়ত ভস্মরাশিতে পূর্ণ হই[illegible] সেগুলি আজ মৃত্যুর গহ্বরে [illegible] লুকাইয়া আছে। সেখানকার পর্বতচূ[illegible] তুষারের চিহ্নমাত্র নাই। সেখানে [illegible] চন্দ্রচূড় তার গৈরিক জটাভার স[illegible] আকাশে মেলিয়া দিয়া কোন অল[illegible] নন্দাকে ধারণ করে না কারণ চন্দ্র[illegible] সেখানে পদতলে। তাই সেখান[illegible] আকাশে ঈষানের পুঞ্জমেঘ লক্ষ [illegible] বিস্তার করিয়া কোন আসন্ন আষা[illegible] বার্তা বহন করিয়া আনে না। চন্দ্রলো[illegible] জলহীন, বায়ুহীন, প্রাণহীন। চন্দ্রলো[illegible] ক্ষতবিক্ষত গহ্বরসঙ্কুল একটা ধূ[illegible] নির্জন শ্মশানের মত পড়িয়া আছে।

সন্ধ্যা হওয়া মাত্র সেই [illegible] শ্মশানে, মাথার উপরে উদয়াচল [illegible] অস্তাচল পর্যন্ত বিস্তৃত [illegible] আকাশে আমাদের এই পৃথিবী [illegible] সবুজে খচিত একটা [illegible] শোভা পায়। সেই সুদীর্ঘ রাত্রি[illegible] সেখানকার পর্বতের চূড়ায় [illegible] প্রান্তরে এই সাগরমেখলা শ্যামা ধরি[illegible] সবুজে মেশান সুনীল আলো [illegible] কেমন করিয়া ছড়াইয়া পড়ে। [illegible] দীর্ঘ রাত্রি ধরিয়া পৃথিবী [illegible] কলায় কলায় কেমন করিয়া [illegible] থাকে? আর এই বিরাট চন্দ্র[illegible] পৃথিবী যখন ষোলকলায় পূর্ণ হইয়া 'পূর্ণ পৃথিবী' রূপে সেখানকার আকাশের কৃষ্ণ সায়রে নীলোৎপলের মত ফুটিয়া ওঠে তখন নীলায় আর ধূসরে মিলিয়া সেই নির্জন প্রান্তরে যে ইন্দ্রজাল রচনা হয়, সেই অনুপম দৃশ্য না দেখিয়া মানুষ কি করিয়া শান্ত থাকিবে?

একথা নিশ্চিত যে সৌভাগ্যবান প্রথম চন্দ্রভূমিতে পদার্পণ করিবেন, দিগন্ত বিস্তৃত সেই শ্মশানে প্রথম চোখ মেলিয়া, রিক্ততার এমন সার্বিক পূর্ণতায়, জগন্মাতার তপঃদগ্ধ সেই নিবাত নিষ্কম্প অনুপম মাধুর্যের পার্শ্বে রুদ্রের ভয়াল রূপকে প্রত্যক্ষ করিয়া বিস্ময়ে বাক্রুদ্ধ হওয়া ছাড়া তার গত্যন্তর নাই। হয়ত অস্ফুটে তার মুখ হইতে বাহির হইবে—

জগতঃ পিতরৌ বন্দে,
পার্বতী পরমেশ্বরৌ।

॥ ১৭ ॥

'বলতে না বলতে অমলদা এসে ছে।' কেবিনের পর্দা নড়ে অমলেন্দুর খ উঁকি দিতেই বলে উঠল বীথি। নলায় পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়েছিল ও. রই চোখে পড়েছে প্রথমে।

বিছানায় বসেছিল বাসনা; পা টিয়ে। পাশে খাটের ধার ঘেঁষে লা। টুলের ওপর সুধাময়। তাকাল নজনেই।

'কি ব্যাপার হে, ক'দিন কোন খবরই ই?' সুধাময় শুধোয়।

'শরীরটা একটু খারাপ হয়েছিল।' মলেন্দু সুধাময়ের পাশে এসে দাঁড়াল; সনার দিকে আর একবার চেয়ে কমলার কে তাকিয়ে তাকিয়ে যেন তাকেই ছিল, একটু হেসে, 'কী করে ঠাণ্ডা গে জ্বর জ্বর মতন হলো। বাড়িতেই য়েছিলাম।'

'চেঞ্জ অফ্ ক্লাইমেট। এ সময় ণ্ডা একবার সকলেরই লাগবে।' ধাময় বললে। এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিল কটা টুলফুলের আশায়, 'তুমি বরং এই লটায় বসো, অমলেন্দু। আমি—'

'বসো, বসো; তুমি বসো তো সুধাদা—আমি বেশ আছি।' বাধা দিয়ে
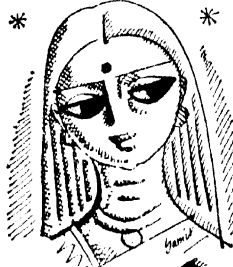
অমলেন্দু একটু সরে গেল। বাসনার দিকে তাকিয়ে শুধোলো, 'শরীর কেমন?'

'ভালোই।' বাসনা ছোট্ট করে জবাব দিল। চোখ ফিরিয়ে অন্য দিকে তাকাল।

এই হয়। কমলারা কেউ এখানে থাকলে কেমন একটা বাধো বাধো ভাব, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বাক্যালাপ। সম্বোধন পদটা সব সময় এড়িয়ে গিয়ে,—'আপনি' 'আছেন' বাদ দিয়ে।

'অপারেশান পরশুই হচ্ছে বোধ হয়।' সুধাময় বললে।

'পরশু!' অমলেন্দু সুধাময়ের দিকে চাইল, 'বোধ হয় কেন আবার?'

'কী করে বলবো। কালকেই অবশ্য সঠিক জানা যাবে।' সুধাময় উঠল, 'তোমরা বসো, আমি ক'টা কাজ সেরে আসি।'

সুধাময়ের টুলে বসে অমলেন্দু বললে, বাসনাকে উৎসাহ দিচ্ছে এমন-ভাবে, 'আজকাল সার্জিক্যাল ব্যাপারটা খুব ইজি হয়ে গেছে। দিনরাত কতো যে কাটা-ছেঁড়া হচ্ছে, ও প্রায় ডাল-ভাতের সমান। আর দেখছি তো সবাই বেশ ভাল হয়ে যাচ্ছে।'

'আমিও তো তাই বলছিলাম।' কমলা বললে, 'ভয় করবার কিছু নেই, ছোড়দি। এক দুদিন একটু কষ্টটষ্ট সইতে হবে।'

'অজ্ঞান করে কাটাকুটি করলে আর কষ্ট কি!' বীথি বলল, 'যা হবার ঘুমের মধ্যেই হয়ে গেল এক রকম।'

'তাই নাকি,—' বীথির দিকে চেয়ে হাসল অমলেন্দু, 'তাহলে তুমি যখন ঘুমিয়ে থাক, তোমার গায়ে একটা ছুঁচ ফুটিয়ে দেখতে হয়, কষ্ট লাগে না লাগে না।'

'দেখতে পারেন। আমি একবার

উঃ—পর্যন্ত করবো না।' বীথি হাসল।

'তা সত্যি, ওর একেবারে কুম্ভকর্ণের ঘুম।' কমলা হাসিমুখে বললে।

'ঘুম আমাদের ছোড়দির—!' বাসনার দিকে চেয়ে বীথি বলছিল, 'কোথাও একটু খুট্ করে শব্দ হোক্, অমনি বিছানায় উঠে বসবে। এতো পল্কা ঘুম আর দেখিনি।'

'ও—,' বাসনার দিকে চেয়ে এবার অমলেন্দু বললে, 'শুনেছি যারা মাথার কাছে টাকাকড়ি মণিমুক্তোর সম্পত্তি সিন্দুকে পুরে ঘুমোয়—তারা ওই রকম হয়; ভীষণ সতর্ক, সাবধানী, টিকটিকি ইঁদুর কী বাতাসের শব্দে চমকে ধড়ফড়িয়ে উঠে বসে।'

অমলেন্দু হাসবার ভঙ্গি করে বলছিল, যদিও কথাগুলোর অন্য অর্থ ছিল এবং একা বাসনা তা বুঝতে পারছিল। বাসনাকে বোঝানর জন্যেই হয়তো বলছিল অমলেন্দু।

'তোমার ছোড়দির বোধ হয় বেশ কিছু লুকোনো সম্পত্তি আছে, বীথি।' অমলেন্দু হাসল।

কমলাও জোরে হেসে ফেললে। বীথিও।

'তাই নাকি, ছোড়দি!' বীথি হাসতে হাসতে বলছিল বাসনার দিকে চেয়ে চেয়ে, 'আমায় কিছু দান করো না।'

'দেবার হলে কি আর আগলে রেখেছি।' বাসনা ঘাড় ঘুরিয়ে বললে। হাসবার চেষ্টা করছিল যদিও, তবুও সে হাসি অন্যরকম, অন্য রঙের।

'এক নম্বরের কিপ্টে তুমি।' বীথি বেণী দুলিয়ে ঠোঁট ওল্টাল। 'আমি বাপু দরাজ-হাত। আমার থাকলে বলতে হতো না, দিয়ে দিতুম, বিলি করেই চুকিয়ে দিতুম।'

'তা বুঝেচি।' কমলা হেসে বললে, 'যার ঘরের বউ হবে তুমি,—তার ঘটি-বাটি পর্যন্ত আর থাকবে না, পরনের কাপড়টা পর্যন্ত বেচারীর থাকে কিনা কে জানে!'

অমলেন্দু জোরে হেসে উঠল। বীথি নিজেও। বাসনাও হাসি চাপল।

এমনি সব কথা। কি হবে পরশু দিন তার কথা আজ নয়, এখন নয়। সাহস যা দেবার, সে তো রোজই একবার করে দেওয়া হচ্ছে। অন্য কথা বলো, হাসি-ঠাট্টার কথা, মন ভোলানর কথা।

অমলেন্দু ইচ্ছে করে একটা বাঁকা পথে আলোচনা টেনে নিয়ে যায় নি, চলে গিয়েছিল, কেমন করে যেন। কথায় কথায় আবার সহজ হাসি-ঠাট্টার মধ্যে ফিরে এল ওরা। ভালই লাগল অমলেন্দুর।

আর একটা কি কথা নিয়ে বীথি যখন হেসে গড়িয়ে পড়ছে, কমলাও মুখে আঁচল তুলেছে, বাসনা কিছুতেই হাসি চাপতে পারছে না—আর অমলেন্দু ঘাড় পিঠ নুইয়ে শরীর কাঁপিয়ে হাসছে—সুধাময় ঢুকল।

'কী সর্বনাশ, এতো হাসাহাসি করলে হাসপাতাল থেকে তাড়িয়ে দেবে যে—' সুধাময় বললে। বাতিটা জ্বালিয়ে দিল।

'বীথির কাণ্ড!' কমলার জল এসে গিয়েছিল চোখে হাসতে হাসতে। চোখ মুছছিল।

'আমাদের মৃগাঙ্কর সঙ্গে দেখা হলো, ওর বউ রয়েছে এখানে— পেয়িং ওয়ার্ডে ছেলে হয়েছে। ডাকছে তোমাদের। চলো একবার দেখা করে আসবে।'

'তৃপ্তির বাচ্চা হয়েছে, ওমা!' কমলা বলল, 'তো সেই খবরটা হাসপাতালে শুনতে হলো। তোমার আত্মীয়স্বজনের যা ভদ্রতাজ্ঞান!'

'বা, ছেলে হলো আজ সকালে—কাল রাত্তিরে বাড়ি বয়ে তোমায় এড্‌ভান্স খবর দিয়ে আসবে নাকি!'

আবার এক পশলা হাসি।

ওরা চলে গেলে বাসনা অমলেন্দুর দিকে ভাল করে আর একবার চাইল। একটু চুপচাপ। তারপরে বাসনাই বললে, 'তোমার জ্বর হয়েছিল?'

'জ্বর ঠিক নয়, জ্বর জ্বর মতন। ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা।'

'তা শুধু একটা সুতির পাঞ্জাবি জড়িয়ে বেরিয়েছ যে!'

'এখনই কেউ গরম জামা পরে?'

'কেন পরবে না! পৌষমাস পড়ে গেছে। সুধাময় শার্টের তলায় সোয়েটার রয়েছে।'

'সুধাদার কথা বাদ দাও!' অমলেন্দু উঠে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

বাসনা পা ঝুলিয়ে বসল। মুখ জানলার দিকে।

'সেই যে সেদিন গেলে অমন করে, তারপর তিনদিন আর কোন খবর নেই—! আমি যে কীভাবে দিন কাটাচ্ছিলাম!' আরও যেন কথা বলার থাকল, এমনভাবে অসম্পূর্ণ একটা টান দিয়ে থামল বাসনা। বললে একটু থেমে, 'একটা খবরও তো দিতে হয়! ভাবছি কী জানি কী হলো!'

অমলেন্দু জবাব দিল না কথার।

বাসনা কী ভাবছিল। ডাকল অমলেন্দুকে।

'শোনো।'

'কি?'

'এখানে এসো।'

অমলেন্দু সামনে এসে দাঁড়াল।

মুখ তুলে, অমলেন্দুর চোখে চোখ রেখে মৃদুগলায় বললে বাসনা, 'তুমি কি আমায় বিশ্বাস করতে পারছ না?'

কথাটা যেন কেমন লাগল অমলেন্দুর। বাসনার সুন্দর করুণ নিষ্প্রভ মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হয় না, এই মেয়ের মধ্যে কোনো শঠতা আছে।

'বিশ্বাস অবিশ্বাসের কি আছে।' অমলেন্দু ইতস্তত করে বলছিল, 'কি এলো-গেলো তাতে!'

'কী জানি, সেদিন তুমি এমনভাবে চলে গেলে—! আমার ভয় হচ্ছিল খুব। ভাবলাম, হয়তো তুমি বিশ্বাস করতে পারবে না, এখন—এখন আমি যা চাইছি তাই বা কতটা খাঁটি।' বাসনা মুখ নীচু করে নিল। ঘাড়ের পাশ দিয়ে ভাঙা খোঁপা পিঠের ওপর নেমে এসেছে। সাদা জামা। ফিতেপাড় শাড়ির একটা কালো দাগ পিঠ-বুক জড়িয়ে চকচক করছে।

অমলেন্দু দেখছিল। কথা বলছিল না।

'আমায় খুব খারাপ লাগছিল তোমার পুরনো কথা ভাবলে, না—?' বাসনা বললে আবার মুখ তুলে।

'ওসব কথা থাক্।' অমলেন্দু টুলটায় বসল।

'লজ্জা পাচ্ছ কেন! খারাপ লাগার কথাই তো, আমি কি তা বুঝি না।' বাসনা আস্তে করে অমলেন্দুর একটা হাত টেনে নিল, 'তখন আমি সত্যিই খারাপ ছিলাম; অন্যায় করেছি, ভুল করেছি, তোমায় ঠকিয়েছি। এখন আমি নতুন মানুষ। বাস্তবিকই অন্য বাসনা।' আবার একটু থামল বাসনা, 'তোমার কাছে আর আমায় মুখ লুকিয়ে, আড়াল দিয়ে থাকতে হবে না—ভাবতেই এতো ভাল লাগে।'

করিডোরে পায়ের শব্দ হচ্ছিল।

অমলেন্দুর হাতে একটু চাপ দিয়ে

ছেড়ে দিল বাসনা। চাপা গলায় বলল, 'কাল এসো। বলা যায় না, যদি মরে যাই পরশু!

'কিছু হবে না; ভয়ের কিছু নেই। সেরে উঠবে তুমি। বললাম আমি।' অমলেন্দুও কেমন এক ম্লান হাসি হেসে সান্ত্বনা দিচ্ছিল।

সুধাময়রা এসে পড়ল।

ভিজিটিং আওয়ার্স শেষ হবার ঘণ্টা পড়ছিল তখন।

॥ ১৮ ॥

আর এক সকাল।

ঘুম ভাঙতেই ভোরের ফরসায় সামনের দেওয়ালটা চোখে পড়ল, একটা হুক। বালিশের ওপর দিয়ে মাথা ঠেলে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল বাসনা, কুয়াশা-ঝাপসা শার্সির বাইরে ঝিকমিক আভা। রোদ উঠেছে।

আর আচমকা সকালের এই রোদ যেন মুছে গেল, পলকে অঢেল মেঘে অন্ধকার। বুকটা ধক্ করে উঠল বাসনার। হৃদপিণ্ডটা তলিয়ে গেল কোথায় যেন। আজ অপারেসান। অপারেসান। মনে পড়ল।

মনে পড়ল তো অদ্ভুত এক ভয়। হঠাৎ এক ঠাণ্ডা কনকনে ভাব। বুক, গা, পা, হাত অসাড় অসাড়। নিশ্বাস নিতেও কী ক্লান্তি। দাঁতগুলো ব্যথা করে উঠল, গাল, গলাও. খুক্ করে একবার কাশল বাসনা। আবার কাশল।

আমি কি আর বাঁচবো? বাঁচবো না। এই তো আমার শরীর! আমায় ওরা অজ্ঞান করে ফেলবে। জ্ঞান থাকবে না। কাটাকুটি করবে। লাগবে আমার? যদি একটু একটু [illegible] থাকে—কী ভীষণ লাগবে, কষ্ট হ[illegible] উঃ, কী যন্ত্রণাই না হবে তখন! [illegible] চিৎকার করব, কাঁদব। সহ্য ক[illegible] পারবো না। পারবো না।

হঠাৎ যদি মরে যাই? জ্ঞান [illegible] ফিরে না আসে?

হাতে একটু একটু ঘাম জমছি[illegible] মুঠো করতে শুরু করল, আঙুলগুলো[illegible] যেন অসাড়। জোর লাগছিল, [illegible] লাগছে মনে হচ্ছিল। আর বুকটা হ[illegible] এবার ধড়াস ধড়াস করে উঠল। পেট[illegible] মধ্যে একটা ব্যথা পাক দিয়ে গে[illegible] কানের কাছে ঝিঁ ঝিঁ ডেকে গেল। [illegible] চোখের সামনে বিচিত্র কালো কা[illegible] অস্পষ্ট ভাঙাচোরা ছবি—যেন ছড়া[illegible] পাতার মতন ছড়িয়ে গেল।

মনে জোর আনো। বিশ্বা[illegible] বাসনা নিজেকে নিজেই কখন [illegible] বলছিল। বিশ্বাস, বিশ্বাস, বিশ্বা[illegible] জোর। সাহস। মরা-বাঁচা ভগবা[illegible] হাতে। তুমি যে মরবেই, একথা [illegible] বললে। কপালে থাকলে রেলের চাক[illegible] মাথা দিলেও মানুষ মরে না। মধুসূদ[illegible] মাস্টার মরে নি। গাড়ি থেমে গিয়েছি[illegible]

আমার যদি আয়ু থাকে, বাঁচবো[illegible] ঠিক বেঁচে উঠবো।

ভগবান ঠাকুর দেবতাকে ভাবো [illegible] সাহস আসবে। আর সংসারে এভা[illegible] তো একদিন সকলকেই ছেড়ে যেতে হ[illegible] কালও তুমি মরতে পার। যাদের জ[illegible] এই মায়া, এতো ভালবাসা, এরাও তোমা[illegible] ফাঁকি দিয়ে চলে যেতে পারে। পরিম[illegible] কি যায় নি?

অমলেন্দু!—অমলেন্দু!

অমলেন্দুকে আমি মনে করে ম[illegible] যাবো—হ্যাঁ—শেষ পর্যন্ত, যতক্ষণ জ্ঞা[illegible] থাকবে, ভাবতে পারবো। ওর মুখ ম[illegible] করে, এতো সুখ আর দুঃখ নিয়ে খু[illegible] সুন্দর করে মরে যাই যদি ক্ষতি কি! আমার জন্যে ও কাঁদবে বার বার আমা[illegible] কথা মনে পড়বে ওর। আমার চিতায় ফু[illegible] ছড়িয়ে আসবে।

সত্যি, আমার কতো আশা ছিল—কতো সাধ বাসনা—আবার করে স্বামী

সংসার ছেলেপুলে......কিছুই হলো না, কিছু পেলাম না এ জন্মে।......

কটা বাজল......! ইনজেকসান দিয়ে গেছে কখন—ব্যথাটা এখনো রয়েছে। বড় দুর্বল লাগছে।

সুধাময় যদি এখন একবার আসত। কমলা, বীথি, মিন্টু। বাচ্চাগুলোকে কতোদিন দেখি নি। খোকাটা তবু দিন দুই এসেছে বড়মাসিকে দেখতে।

অমলেন্দু কাল এসেছিল। বেচারীর কষ্ট সবচেয়ে বেশি। কিছু বলতে পারছে না, করতে পারছে না। অথচ ও-ই তো আমার স্বামী। তোমার আশীর্বাদ থাকলে আমি সব কষ্ট সহ্য করে বেঁচে উঠবো।

কটা বাজল ...! গরম মোজা পরিয়ে দিল কেন পায়? কম্বলটা আবার কেন? ঢাকা দেবে। দাও, দাও। যা খুশি তোমাদের করো—। যা খুশি।

এবার বুঝি নিয়ে যাবে? ভগবান! কালী, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ। ঠাকুর আমায় সাহস দাও, শক্তি দাও। ঈশ্বর! ঈশ্বর!

রোদ, সকাল, পাখি, ফুল, গাছ—সুধাময়, কমলা, বীথি—সব সুন্দর, সবাই ভাল। আমার কারুর ওপর রাগ নেই। রাগ নিয়ে যাচ্ছি না। তোমরা জানছ না, কিন্তু সত্যি, আমি আজ আর কারুর ওপর রাগ-অভিমান নিয়ে যাচ্ছি না।

কটা বাজল! সেই ঠেলা গাড়ি। চলো, নিয়ে চলো। আলো, ছায়া, গন্ধ, শব্দ। গাড়িটা বেঁকে গেল। ঘর।

আবার.........

বমি আসল বাসনার। তলপেটের তলায় জ্বালা জ্বালা করছিল। আবার জ্বলছে। বমি করার জন্যে উঠে বসতে চাইছিল বাসনা। ওয়াক তুলছিল—। আর মাথাটা টলে পড়ছিল।

তারপর খেয়াল নেই।

ঘোর ভাঙল......। বাসনা চোখ মেলতে গিয়ে চমকে উঠল। কোথায় নিয়ে এসেছে তাকে! আলো, আলো! এ, কেমন সব মুখ! •

এরা......? আপনারা শুনতে পাচ্ছেন না, আমার ভীষণ তেষ্টা পেয়েছে। তেষ্টা।

বাসনার মনে হলো কথাটা সে বলেছে। কিন্তু তার জবাব নেই। জল নেই। কেউ দিল না।

বাসনা সটান শুয়ে, মুখ উঁচু। মুখের সামনে এ কি?

'ভয় কি, কোন ভয় নেই। কতক্ষণের আর ব্যাপার। চোখ বুজতে না বুজতে হয়ে যাবে। দিব্যি সেরে উঠবেন। চমৎকার শরীর হয়ে যাবে দুদিনে। কি নাম আপনার?'

'বাসনা—।'

আ, আ......গলার মধ্যে ভক্ করে কী যেন ঢুকে গেল। কাশল। মিষ্টি মিষ্টি কেমন যেন......

'এক দুই গুনে যান তো দেখি!'

'এক দুই তিন চার পাঁচ ছয়...... দশ এগারো...বারো......'। আ—আ—একী—একী মুখের ওপরটা জ্বালা করছে, গলা, গলার কাছে কার হাত? নিশ্বাস চেপে রইল বাসনা। কিছুতেই আমি নেবো না নিশ্বাস। দমবন্ধ হয়ে আসছে। চোখের সামনে একটা আলো যেন ঝিলিক দিয়ে গেল। কেমন একটা শব্দ হচ্ছে মাথার মধ্যে টিপ টিপ্ পট্...... চিকির...কির...। আবার যেন আলোর ঝিলিক...।

কে যেন কথা বলছে? আমি...... কমলা তুই, তুই আমায়......আমার নাম বাসনা। হাসপাতাল।

'মরে যাবো—ছেড়ে দি......' উঠতে চাইছিল......মাথা উঠল না বাসনার। উঠোতে দিল না। মুখ ফেরাতেও না।

গলার টুঁটি চেপে ধরেছে কেউ। বাতাস

বাতাস। থক্ থক্ থক্......। ওমা, মা, মা......

গলার মধ্যে দিয়ে কতো মিষ্টি আর ঠাণ্ডা হাওয়া বয়ে গেল না!

শুনতে না বলছে আবার। অসভ্য, বদমাস, নিষ্ঠুর।

আমি কোথায়?

যো......লো......আঠা......

এরা আমায় মেরে ফেলবে। না, মাগো, মা......

থুথু কাটছিল জিবে।

ক'টা বাজলো?

নিশ্বাস নিচ্ছে বাসনা। বুক ধক্ ধক্ করছে। চোখ দুটো কোথায় যেন আটকে গেছে।

কাঁদছিল বাসনা। জল পড়ছিল চোখ বেয়ে।

হাত পা মাথা আর নড়ছিল না। অবচেতনে বাসনা যেন হাত বাড়িয়ে কাকে খুঁজছিল।

অমলেন্দু কি নেই?

ও আমায় উঠিয়ে নিত বুকের মধ্যে —ফিট হয়ে গেলে। উঠিয়ে নিত বুকের মধ্যে। বেশ লাগতো।......ইচ্ছে করে করে ফিট হয়েছি।

ছবি আমি ভেঙে দিয়েছি। ও আমার কেউ না। আমি বিধবা। আমার...... ট্যাক্সি চলেছে—বীথি আয় চুল বেঁধে দি তোর।

......আমার ছেলেপুলে নেই। একটা ছেলে নষ্ট হয়ে.. ॥ কুকুর ডাকছে॥ হুস হুস হাওয়া, ঠুং ঠুং রিকশ॥ বারান্দা, ছাদ॥ বেড়াল লাফাল ধুপ্। পরিমল॥ বীথি গান গা। আমায় চেন কি......পথ ভোলা॥

আমি মাছ খাব। আর মাংস॥ সিঁদুর, গয়না। শাড়ি॥

হিস্......স্......খোকন হিসি করে নাও॥ ঝন্—ন্—ন্......থালা বাটি ভাঙল। ঘণ্টা বাজছে......মন্দির......॥

টিক্, টিক্......টিক্......। কতো রাত? অমলেন্দু, ও কমলা, ও যে আমার বর॥ আ, ছাড়ো॥ তোমার ঠোঁটে গন্ধ॥

সাবান দিতে গিয়ে দেখলাম॥ খুব সুন্দর। নরম॥

কে? আস্তে এসো। বাতি জ্বালাও।

আমি থুথু দি তোমার সংসারে॥ কোলে বসার কেউ নেই। আমার কে থাকলো?॥

হাওয়া, জল। টিপ্ টিপ্ জল পড়ছে......বৃষ্টি চাঁদ......আকাশ নীল......লজ্জা কি, আমায় নাও, চুমু দাও। আ, শব্দ থাক্।

ব্যাঙ্॥ বীথি॥ অসভ্য॥

কোথায় যাচ্ছি? আমি নেই। হাল্কা......মেঘের ফেনায়......সুতো বাঁধা ঘুড়ির মতন হাওয়ায়...আরো হাওয়ায়.. আরো......আরো......উঁচু......উঁচু

দুলছে॥ ভাসছে॥ ফুল মেঘ তুলো॥......

সমস্ত আকাশ জোড়া মেঘ যেন ঘন নরম নরম ঘুমের আঁচল ছড়িয়ে বসেছিল। ভাসা ঘুড়ি আর একটু উঠতেই ঢেকে নিল।

ঘুম। ঘুম। ঘুম। সব চুপ। অন্য জগৎ। অন্ধকার। নরম। কেউ নেই। বেদনা, ব্যথা সুখ, ভালবাসা, কান্না—কিছু না।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

কিম্ভূত কিমাকার

অভিজ্ঞ কৃতী ব্যক্তিরা মাঝে মাঝে তাঁদের ওপর থেকে আস্থা হঠিয়ে নিতে কেন যে চিত্রামোদীদের বাধ্য করায় ঝুঁকে পড়েন, সে রহস্য বুঝে ওঠা ভার। নীরেন লাহিড়ী চিত্র-পরিচালনায় বাঙলা চিত্র-জগতের কৃতীদের মধ্যে একজন বলে গণ্য। তেমনি চিত্র-কাহিনী ও ডায়মণ্ডকাটা সংলাপ রচনায় নিতাই ভট্টাচার্যেরও নামডাক কম নয়। কিন্তু এ তাঁরা কি করেছেন "দেবী মালিনী"তে? দেখে স্পষ্টভাবে এই ধারণা নিয়ে ফিরে আসতে হয়েছে যে, ছবিখানি তোলার সময় তাঁরা নিজেরাও জানতেন না, তাঁরা কি করছেন। অনাতোল ফ্রাঁসের 'থেইঁ' ধরে গল্প বেঁধে তারপর নকল করার দোষ ঢাকবার জন্যে গল্পের ধারা অন্য দিকে ঘুরিয়ে এমনভাবে শেষ করা হয়েছে, যাতে গল্প তার জাতও খুইয়েছে, কূলও ভেঙেছে, অথচ কিছুই হয়ে উঠতে পারেনি। থেইঁয়ের ঘটনাস্থল ছিল প্রাচীন মিশর, সেদিকেও পরিবর্তন আনতে বৈশালি আর

—শৌভিক—

মগধ বঙ্গে চালিয়ে এমন স্থান ও সংগকে রূপায়িত করা হয়েছে, যাকে 'কিম্ভূৎ-কিমাকার' ছাড়া আর কোন কথায় আখ্যায়িত করা যায় না। কেন এমন হলো, তা বিশ্লেষণ করতে আপাত দৃষ্টিতে এইটুকুই শুধু বোঝা যায় যে, কাহিনীকার গল্পটিকে চিত্রনাট্যে গাঁথার সময় ও নিয়ে যে ছবি তৈরি হবে এবং ছবি তৈরির একটা স্বতন্ত্র ব্যাকরণ আছে, সেকথা মনেও রাখেন নি। তিনি ভেবেছিলেন, লোকে ছবি পাঠ করে এবং সেই ভেবেই তিনি বাছা বাছা কথা চয়ন করে ভালো-ভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে কথা বলার ব্যবস্থা করে গিয়েছেন আগাগোড়া। আর পরি-চালককেও তেমনি পেয়ে বসেছিল একটা নির্ভেজাল উপাদানকে অনবদ্যতার পোশাকে আচ্ছাদিত করে সামনে তুলে ধরার মদালসতা। এ ছাড়া "দেবী মালিনী"কে ব্যাখ্যা করার তেমন জুতসই যুক্তি আর মনে আসছে না।

* * *

রূপোপজীবিনী মালিনী। বৈশালি রাজের উদ্যানপালকের কাছে সে মানুষ। তার পিতৃ পরিচয় বলতে নেই; সে জানে, কোন এক ভ্রষ্ট সন্ন্যাসী তার জনক। সন্ন্যাসীদের ওপরে তাই তার রাগ। রাজ-কুমার সুরেশ্বর ও মালিনীর মধ্যে প্রেম জন্মায় বাল্যকালে, খেলার সাথী ওরা যখন দুজনে। সুরেশ্বরের পিতার প্রতিজ্ঞা ছিল, এক পুত্রকে তিনি সন্ন্যাসীর মঠে দান করবেন। সুরেশ্বরকে তাই মঠে গিয়ে সন্ন্যাস ধর্ম গহণ করতে হলো। মালিনী ছুটলো তার পিছু পিছু, কিন্তু মঠের দরজা থেকে তাকে ফিরতে হলো। মালিনীকে আশ্রয় দিলে এক নর্তকী এবং সেই নর্তকীর শিক্ষকতাতেই মালিনী রাজ্যের সেরা নর্তকী হয়ে উঠলো। সন্ন্যাসী হয়ে সুরেশ্বরের নাম হলো শ্রীজ্ঞান। এর পর মালিনী সুরেশ্বরকে প্রলুব্ধ করে ব্রতচ্যুত করার চেষ্টায় রত হলো। বৈশালির রাজা এ-কাজে মালিনীর

সহায়ক হলেন। তার কারণ, তার আশঙ্কা ছিল, তার বিরুদ্ধে সন্ন্যাসীরা বিদ্রোহ করতে চায় বলে। মালিনী গিয়ে হানা দিলে একেবারে মঠে। সুরেশ্বর তাকে

লজ্জার জীবন ছেড়ে সদ্ধর্মে দীক্ষা নেবার উপদেশ দিলে। মালিনী তার এই লজ্জার জীবনের জন্য দায়ী করলে শ্রীজ্ঞানকে। মালিনী জানিয়ে দিলে তাকে যে, পৃথিবীর ভালো, সৎ, উদার ও মহৎকে চুরমার করে দেওয়ার ব্রতই সে নিয়েছে। শ্রীজ্ঞান মালিনীকে ফিরিয়ে দিলেও মঠের আচার্য পারলেন না। শ্রীজ্ঞানের কাছে সঙ্গীত শিক্ষার বিনিময়ে মালিনী অযুত স্বর্ণ-মুদ্রা প্রদানের লোভ দেখাতে আচার্য শ্রীজ্ঞানকে বাধ্য করলেন মালিনীকে শিক্ষা-দানের ভার গ্রহণ করতে। মালিনী শ্রীজ্ঞানকে নিয়ে গেল বিদ্বদ্বনমণ্ডলী সভায়। সবাই মালিনীর ভক্ত; মালিনীর প্রেমে নিজেকে লুটিয়ে দিতে পারলেই যেন ধন্য হয়ে যায়। শ্রীজ্ঞানই কেবল মালিনীকে ধর্মের পথে দীক্ষা দিতে চায়। আচার্য মালিনীর অর্থে অস্ত্র সংগ্রহ করে রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলো। মালিনী শ্রীজ্ঞানকে ভ্রষ্ট করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত শ্রীজ্ঞানেরই নির্দেশিত ধর্মপথে আসক্তা হয়ে পড়লো। ওদিকে শ্রীজ্ঞান মালিনীকে ধর্মপথের নির্দেশ দিয়ে নিজেকে হারিয়ে ফেললে মালিনীর প্রেমে। সন্ন্যাসী ধর্মভ্রষ্ট হওয়ায় রাজা তার বিচার করতে বসলেন। শ্রীজ্ঞানকে রক্ষা করার জন্যে সাক্ষী হয়ে উপস্থিত হলো মালিনী। রাজার আদেশে দুজনেরই রাজ্য থেকে নির্বাসন দণ্ড হলো। শ্রীজ্ঞান আবার সুরেশ্বররূপে মালিনীকে ফিরে পেতে চাইলে, কিন্তু মালিনী ভগবানের সেবায় প্রেমের নতুন পথ পেয়েছে তখন। সুরেশ্বরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মালিনী বৈশালির

নগরপ্রান্তে এক সাধুর আশ্রমে ... নিলে। আশ্রমে সে কুষ্ঠরোগী অ... পক্ষীর সেবার মধ্যে দিয়ে ভগবানে... করতে লাগলো। আর ওদিকে সু... দেশে দেশে মালিনীর গুণকীর্ত... বেড়াতে লাগলো। একদিন মা... কাহিনী পৌঁছলো মগধরাজের ক... মগধরাজ মালিনীর ওপর বৈশা... অন্যায় আচরণের প্রতিকারার্থে ... দেবকে পাঠালেন। বৈশালিতে কুষ্ঠ... দেখা দেওয়ায় রাজা রোগগ্রস্তদের ... থেকে তাড়িয়ে তাদের ঘরবাড়ী লুঠ ... জ্বালিয়ে দেবার হুকুম দিলেন। ... তালে তার শত্রুদেরও ঐ একই দ... পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন। প্রজারা ... বিদ্রোহী হয়ে উঠলো। এই সময়ে ম... রাজগুরু এলেন। বৈশালিরাজ ... নিজেই মহাব্যাধিগ্রস্ত। মগধরাজগু... আজ্ঞায় তাকে যেতে হলো মালিনীর ক... ক্ষমা ভিক্ষা করতে। মগধরাজগু... মালিনীকে আমন্ত্রণ জানালেন উজ্জয়িনী... তীর্থে সম্রাটের নবপ্রতিষ্ঠিত শ্যামসু... মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন করে দেবার জ... সাধ্বী নারীর স্পর্শ বিনা সে দ্বার উন্ম... হবার নয়। মালিনী দ্বার খুলতে ... পৌঁছবার আগে সুরেশ্বর অস্পৃশ্য... নিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করতে যায় কিন্তু দ্বারীরা প্রহার করে তাদের বিতাড়... করে। সুরেশ্বরের কপাল ফেটে রক্তপ... ঘটে। মালিনী এসে স্পর্শ করতে মন্দিরে... দ্বার উন্মুক্ত হলো, কিন্তু বিগ্রহের বেদীতে দেখা গেল বিগ্রহ নেই, সেস্থানে রয়েছে রক্তের দাগ। এ ঘটনায় সক... উতলা হয়ে উঠলো। দূর থেকে ভে... আসে সুরেশ্বরের কণ্ঠ। মালিনী সে স্ব... চিনতে পেরে ছুটে গিয়ে দাঁড়ালো সুরেশ্বরের পাশে। মগধরাজগুরু স... শুনে সাদরে সকল অস্পৃশ্যকে নিয়ে উঠলেন মন্দিরে। দেখা গেল শ্যাম... সুন্দরের মূর্তি আবার ফিরে এসেছে স্বস্থানে। রাজগুরু সুরেশ্বর আ... মালিনীকে সেই মন্দিরের আজীবন পূজারী নিযুক্ত করে দিলেন।

* * *

ক্ষণে ক্ষণে কথা বলার সুযোগ ক... দেবার মতো করেই গল্প সাজানো। একটি কেবল লক্ষ্য, বড়ো বড়ো কথা শোনানো।

আর সে কি দার্শনিক গূঢ় তত্ত্বভরা সব কথা! বাছা বাছা শব্দের যোগে কাব্যিক ঢঙে প্রযুক্ত হলেও শুনতে শুনতে ঝালা-পালা ধরে যায়। কথার ভীড় ঠেলে রসের গায়ে স্পর্শ পৌঁছে দেবার কোন উপায়ই আর রাখেননি চিত্রনাট্যকার নিতাই ভট্টাচার্য। পরিচালকও তাকে অবাধ সুযোগ করে দিয়েছেন বুকান শুনিয়ে যাবার। ফলঃ—কৃত্রিমতা আর কৃত্রিমতা—অস্বাভাবিকতা, অবান্তরতা আর কষ্টকল্পনার একটা দারুণ বিরাম্ভি-প্রবাহ। ফলে ছবি আরম্ভ হবার খানিক পর থেকেই এমন নিরস হয়ে পড়ে যে মাঝখান পর্যন্ত পৌঁছবার আগেই প্রেক্ষা-গৃহের 'EXIT' আলোগুলোই তখন দৃষ্টিতে বেশী আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। এর ওপর, যাও-বা গল্প সে পরিপ্রেক্ষিতে পরিবেশ অতীব ক্ষীণ ও দীন। ছবির আরম্ভ হচ্ছে একটা শোভাযাত্রার দৃশ্যে—একদিক থেকে বাহকের কাঁধে চতুর্দোলায় চড়ে আসছে মদালসা মালিনী, অপর দিক থেকে মঠাচার্যের নশ্বর দেহের কফিন বহন করে আসছে সন্ন্যাসীর দল যার পুরোভাগে শ্রীজ্ঞান। মালিনীর তখন বিরাট খ্যাতি, তার রূপের পায়ে লুটিয়ে পড়ে রাজাশুদ্ধ লোক ধন্য হতে চায়। কিন্তু রাস্তাটা একফালি সরু গলির একটুখানি, আর সাকুল্যে জন পঞ্চাশেক লোকের ভীড়, একপাশ থেকে মালিনীর স্তুতি গাইছে তাও মাত্র একটি কণ্ঠ, মালিনী চরিত্রের বিরাট ব্যক্তিত্ব তো ঐখানেই গেল দুমড়ে। রাজ্যভরা মালিনীর স্তাবক, কিন্তু রাজসভায় দেখা গেল একজন কবি, একজন কাপালিক, একজন দার্শনিক, একজন শ্রেষ্ঠী ও একজন বীণকার। থিয়েটারের মঞ্চের ব্যাপার হলে না হয় ঐ কয়েকটি চরিত্রকেই বহুর প্রতীক বলে ধরে নেওয়া যেতো, কিন্তু পর্দার ব্যাপকতার ক্ষেত্রে ওরা মাত্র কজন হওয়ায় মালিনীর ব্যক্তিত্বকে খর্ব করে দিয়েছে। সন্ন্যাসীদের মঠ, যেসব সন্ন্যাসী রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের চেষ্টা করছে, কিন্তু গুনতিতে তারা জন সাত আটের বেশী নয়। রাজপ্রাসাদ, রাজসভা বা মঠ, পথ ঘাট, সবই যেন থিয়েটারের মাপে তৈরী। শ্রীজ্ঞানের বিচার হচ্ছে মুক্ত অঙ্গনে, সবারের দেখা গেল অবারিত দ্বার, কিন্তু দেশব্যাপী খ্যাতিসম্পন্ন অমন এক ব্যক্তি যাকে অপরাধী করা হচ্ছে তার চেয়ে সর্বজনপ্রিয়া মালিনীর সঙ্গে লিপ্ত করে সে-বিচার দেখবার জন্যে কাতারে কাতারে লোকের বিরাট সমাবেশ যেক্ষেত্রে হওয়ার দরকার ছিল তার জায়গায় একটু কোণ বেছে ছোট্ট এক জায়গায় ব্যাপারটা সেরে নিলে কিইবা নাটকীয়তা জমতে পারে! শ্রীজ্ঞান মালিনীর গুণগান করে চলেছে পথে পথে; তার কথা শুনে মালিনীর প্রতি ভক্তিতে লোকে তার পিছু নিল, কিন্তু কতো লোক?—মাত্র জন আষ্টেক। তাতে কি করে কোন গুরুত্ব ফুটতে পারে ঘটনার ওপরে? অস্পৃশ্যদের নিয়ে শ্রীজ্ঞান এলো
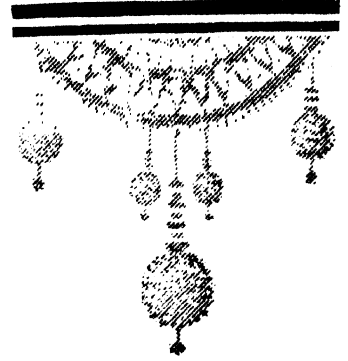
কলিকাতায়

হিন্দ·বীণা·বসুশ্রী

এবং অন্যান্য বহু কেন্দ্রে

ইনসানিয়ৎ

চিত্রনামের মতই বৃহৎ চিত্রার্ঘ

শ্রেষ্ঠাংশে

দিলীপকুমার·দেবানন্দ·বীণারায়

বিজয়লক্ষ্মী·জয়ন্ত·জয়রাজ

শোভনা সমর্থ·কুমার·বদ্রীপ্রসাদ

আঘা·মোহনা·এবং হলিউডের শিল্পী

প্রযোজনা ও পরিচালনা:- এস·এস·ভাসান

★★★সঙ্গীত:- সি, রামচন্দ্র ★★

★★★গান রচনা:- রাজেন্দ্র কৃষ্ণ★★

সংলাপ:- রামানন্দ সাগর★

উজ্জয়িনীর শ্যামসুন্দর মন্দিরে প্রবেশ করতে, কিন্তু এতো কম সংখ্যক সহচর যে, এ ব্যাপারেরও কোন গুরুত্ব ফোটে না। লোকজনও কম এবং ইমারতাদিও অপ্রশস্ত হওয়ায় অত্যন্ত স্বল্প পরিসরে সাজানো দৃশ্যে মনে ছাপ দেবার মতো কোন চমকই সৃষ্টি করতে পারেনি। মালিনী সাধুর আশ্রমে যাবার পর নগরীতে মহাব্যাধি দেখা দেওয়ায় রাজার আদেশে বহু ব্যাধিগ্রস্ত বিতাড়িত হলো। সাধু তার কুটিরের সামনে দাঁড়িয়ে একদিকে আঙুল উঁচিয়ে সেদিকে মালিনীর দৃষ্টি ফিরিয়ে বলছে সামনে অগণিত আর্তের সমাগমের কথা, কিন্তু প্রত্যক্ষক্ষেত্রে এলো জনকয়েক মাত্র। অথচ সত্যিই বহুলোকের সমাবেশ হলে দৃশ্যটার মধ্যে নাটকীয়তা আসতে পারতো। কেবল একটা জিনিষের ভিড় এনে দেওয়া হয়েছে, সেটা হচ্ছে কথার ভিড়। এমন কি দৃশ্যের অঙ্গ থেকে নাটকীয়তার রূপ ও বৈভব ছাঁটাই করেও কথার ঠাঁই করে দেওয়া হয়েছে।

* * *

গল্পের কোন ভিতও নেই, স্থানকালের নির্দিষ্টতাও নেই। গোড়ার আরম্ভ রূপকের মতো। রাজার মালির পালিতা রূপসী কন্যার সঙ্গে রাজপুত্রের প্রেম। তারপর রাস্তা ধরে ইতিহাসের ধার ঘেঁষে সন্ন্যাসী বিদ্রোহের কাহিনী। শেষটা ভক্তিমূলক পৌরাণিক ধরনের শ্যামসুন্দরের মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন, শ্যামসুন্দরের অন্তর্ধান ও আবির্ভাব ইত্যাদি অলৌকিক ব্যাপার। এর সঙ্গে আছে সাধুর আশ্রমে কুষ্ঠরোগীদের পরিচর্যার মধ্যে আর্তের সেবা করা ব্রত ও মানবিক ধর্ম; শ্যামসুন্দরের মন্দিরে অস্পৃশ্যদের প্রবেশ সংক্রান্ত সামাজিক সমস্যা ইত্যাদি। সন্ন্যাসীদের কিন্তু অত্যন্ত হেয় করা হয়েছে; ওদের জাতকে জাত সবাইকেই ভ্রষ্ট দেখা যায়। মালিনীর জন্ম এক ভ্রষ্ট সন্ন্যাসীর দ্বারা। শ্রীজ্ঞান মালিনীর প্রেমে ভ্রষ্ট হলো। আচার্য মালিনীর অযুত টাকার লোভে শ্রীজ্ঞানকে মালিনীর খপ্পরে ফেলে দিতে দ্বিধা করলে না, এমন কি মালিনীর অর্থ পাপার্জিত জেনেও। মঠের আর সব সন্ন্যাসীরাও সদাই মালিনীর চর্চাতেই মশগুল। কেউ কেউ লুকিয়ে আড়ালে দাঁড়িয়ে ঘোমটা টেনে মালিনীর নাচও দেখে আসে। তেমনি মালিনীর স্তাবক দার্শনিক, কাপালিক, বীণকার, শ্রেষ্ঠী সবাই এক একটি কমিক। বাড়ি দুয়ার, বেশবাস দেখে বোঝবার উপায় নেই কোন আমলের কাহিনী এটা। এখনকার মতো ঢিলে পাঞ্জাবী, মেরজাই, ধুতি শাড়ি ইত্যাদি প্রায় সবই। লোক-জনের আচার আচরণও অনেকটা এখন-কারই মতো। ছবি দীর্ঘ হওয়া সত্ত্বেও ঘটনা বিন্যাস যতোটা ফলিয়ে হওয়া উচিত ছিল তা হতে পারেনি সংলাপকে বেশী সময় দিতে গিয়ে। এক কথায় যা বলা যায় তাকে অলঙ্কারে সাজিয়ে নানা কথার বিতর্কে বলে যাওয়া হয়েছে। ফলে দেখার ভাগ হয়েছে সংক্ষিপ্ত। সুরেশ্বর সন্ন্যাসী হবার পর মালিনীর নর্তকীর গৃহে আশ্রয়লাভ এবং তার কাছ থেকে নাচ শিখে দেশের সেরা নর্তকী ও সেরা সুন্দরী বলে খ্যাতিসম্পন্না ও সর্বজন-প্রিয়া হয়ে ওঠাটা বিক্ষিপ্তভাবে প্রযুক্ত কয়েক প্রকারের নাচ দেখিয়েই সেরে নেওয়া হয়েছে। মোটেই ফোটেনি সে অধ্যায়। চরিত্রের পাশে চরিত্রের, ঘটনার পাশে ঘটনার, বেশে বাসে কোন ক্ষেত্রেই চারিত্রিক বা প্রকৃতিগত কোন ভারসাম্য নেই। একটা এলোপাথাড়ি ভাব সর্বত্র সর্বথা। মালিনী নিজেই শ্রীজ্ঞানের ধর্মের ফাঁদে পা দেবার আশঙ্কা নিয়ে রাজার সঙ্গে তার বিতর্ক হতে হতে হঠাৎ মালিনী ছুটে গিয়ে অলিন্দে দাঁড়িয়ে গান ধরলে "আমি শুধু ভাঙি"— অত্যন্ত অসঙ্গতভাবে। কিংবা ওর নাচতে নাচতে গাইতে গাইতে শ্যাম-সুন্দরের মন্দিরের দ্বার উদ্বোধন করতে আসা! অধ্যক্ষের মৃত্যুর পর শ্রীজ্ঞান হলো মঠের অধ্যক্ষ। একদিন বসলো তানপুরা নিয়ে, আরম্ভ করলে গানের উৎপত্তি নিয়ে বক্তৃতা। অধ্যক্ষ ক্লাস নিচ্ছেন, কাজেই যুক্তির দিকটা বেঁচে গেছে, কিন্তু গানের উৎপত্তি নিয়ে দীর্ঘ বক্তৃতা ফাঁদবার, অর্থাৎ কাহিনী রচয়িতার সঙ্গীত সম্পর্কে বিদ্যে জাহির করবার সময় ওটা নয়। জয়জয়ন্তীর উৎপত্তি সম্পর্কে বক্তৃতা অন্তে শ্রীজ্ঞান সেই রাগেই

গান আরম্ভ করলে। দরজার আড়ালে দাঁড়িয়েছিল মালিনী। শ্রীজ্ঞান বলে গাইতে পারলে সুর মূর্তিময়ী হয়ে আবির্ভূতা হয়। হলোও তাই—মালিনী সামনে এসে নাচতে আরম্ভ করলে; সন্ন্যাসীরা বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে দেখলে সুরের মূর্তিময়ী রূপ। কি অসঙ্গত কল্পনা! সমগ্রভাবে ছবিখানির চেহারায় একটা অসাধারণত্বের আভাস অবশ্যই পাওয়া যায়। কিন্তু অতি নিরস, নিরাবেগভাবে।

* * *

একটা মস্ত ত্রুটি ঘটেছে নামভূমিকার শিল্পী নির্বাচনে। মালিনীকে বর্ণনা করা হয়েছে অলোকসামান্যা, অপরূপলাবণ্যসম্ভারা, স্বৈরিণী, বারবিলাসিনী, চপলা, আলেয়া বলে। কাবেরী বসুর চেহারা ও ব্যক্তিত্বের মধ্যে ঠিক এই বিশেষণগুলো খাটে না; তিনি তা অভিব্যক্তও করে উঠতে পারেন নি। এক সরলা বালার ঝরঝরে মুখের ওপরে লাস্যময়ীর চটুলতা খোলবার নয়। তা ব্যঙ্গের ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। এবং তার মধ্যে যা নেই সেইটেই তাকে দিয়ে ফোটাতে গিয়ে চরিত্রটির চিত্রণে অনর্থ ঘটেছে। ছবি দমে যাবার বড়ো কারণগুলির মধ্যে এটি অন্যতম। অন্যান্য চরিত্রগুলির মধ্যেও কোনটিরই ভিত্তি যেন তেমন সুদৃঢ় নয়। তবুও ওরই মধ্যে বৈশালির রাজার চরিত্রে কমল মিত্রের অভিনয়ই সবচেয়ে ভালো লাগবে। সুরেশ্বর বা শ্রীজ্ঞানের চরিত্রে বসন্ত চৌধুরী সংলাপের আবৃত্তিতে যে পরিমাণ সাফল্য অর্জন করেছেন অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তোলায় ততোটা নয়। অবশ্য ঠাসাঠাসি কথার মধ্যে অভিব্যক্তি প্রকাশের ফাঁকও কম। মালিনী ও শ্রীজ্ঞানের ওপর বৈশালিরাজের অবিচার দূরীকরণার্থে মগধের রাজগুরুর চরিত্রে শেষের দিকে আবির্ভূত হয়েছেন ছবি বিশ্বাস; তাকেও ভালো লাগবে। যীশুর মতো দেখতে এক সাধুর চরিত্রে পাহাড়ী সান্যাল দৃষ্টি আকর্ষণ করেন মালিনীর আশ্রয়দাতা বলে। সন্ন্যাসীরা সবাই এখানে নীতিভ্রষ্ট। তাদের আচার্যের চরিত্রে নীতিশ মুখোপাধ্যায়ের অভিব্যক্তিতেও তাই ফুটেছে। কোন চরিত্রের বাঁধুনীও ঠিক নেই, সবই ভাসা ভাসা। একমাত্র মালিনীর ওপরেই যতো নজর, এমন কি পাছে তার ওপর থেকে দৃষ্টি সরে যাবার কোন কারণ ঘটে এই আশঙ্কাতেই বোধহয় আর দ্বিতীয় কোন স্ত্রী চরিত্র রাখা হয়নি কাহিনীটিতে কয়েকজন পরিচারিকা ছাড়া। অভিনয়ে আর শিল্পীদের মধ্যে আছেন রবীন মজুমদার, কালি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যাম লাহা, রবি রায়, প্রীতি মজুমদার, মিহির ভট্টাচার্য, তুলসী চক্রবর্তী, জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, সন্তোষ সিংহ, সলিল দত্ত, পঞ্চানন ভট্টাচার্য, অনুপকুমার, মনি শ্রীমানি প্রভৃতি।

* * *

কলাকৌশলের মধ্যে বিজয় ঘোষের ক্যামেরার কাজ ভালো। এ ছাড়া রবীন চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত সংগীতের কিছু কিছু ভালো লাগবে। প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় ও সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের কখানি গান ভালোই লাগবে। আর গান গেয়েছেন সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য ও রবীন মজুমদার। শিল্প নির্দেশনার কাজে ছিলেন সৌরেন সেন, এলোপাথাড়ি পরিকল্পনা, হয়তো গল্পের সঙ্গে তাল রাখতেই তা করা হয়েছে। শব্দগ্রহণ করেছেন জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় এবং সম্পাদনা করেছেন সন্তোষ গাঙ্গুলী। গানের লেখক প্রণব রায় ও গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার।

নূতন গ্রামোফোন রেকর্ড

হিজ মাস্টারস ভয়েস ও কলম্বিয়ার নিম্নোক্ত রেকর্ডগুলি এ মাসে বার হয়েছে। তাহার মধ্যে কয়েকখানি ভাল ভাল গান আছে:—

হিজ মাস্টারস ভয়েস :—উৎপলা সেন দুইটি অতি পুরাতন জনপ্রিয় ভক্তিমূলক গান গেয়েছেন (এন ৮২৬৫৯)—"আমায় কি দিয়ে সাজাবি মা" ও "হরি বল নৌকা খোল"। প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় (এন ৮২৬৬০) ও আল্পনা বন্দ্যোপাধ্যায় (এন ৮২৬৬১)—প্রত্যেকে দুইখানি করে আধুনিক গান গেয়েছেন। "প্রশ্ন" কথাচিত্রের ৪ খানি গানের মধ্যে দুইখানি গেয়েছেন আল্পনা বন্দ্যোপাধ্যায় (এন ৭৬০২০) ও দুইখানি তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় (এন ৭৬০১৯)।

কলম্বিয়া :—হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে দুইখানি রবীন্দ্র-সংগীত—"চলে যায় মরি হায়" ও "যামিনী না যেতে" (জি ই ২৪৭৬২) তৃপ্তি দেবে। অপরেশ লাহিড়ী গেয়েছেন দুইখানি আধুনিক গান (জি ই ২৪৭৬৩), রাধারাণী চণ্ডীদাসের দুইখানি কীর্তন গান (জি ই ২৪৭৬৪), সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় গেয়েছেন "রাতভোর" বাণীচিত্রের দুইখানি গান (জি ই ৩০২৯৫)। "শ্রী ৪২০" ও "জাগৃতি" ছবির দুইখানি গানের সুর শোনা যাবে ভ্যান শিপনের ইলেকট্রিক গীটার বাদ্যে (জি ই ৩০৯২৩)।

খেলার মাঠে

একলব্য

পাশের বাড়ীতে অনধিকার প্রবেশ করছি না জানি না। আর মাঠ ছেড়েও চলে সছি জলে। সুতরাং পদে পদে রয়েছে দ পতনের আশঙ্কা। আমার এই গৌর-ন্দ্রিকার অর্থ 'শৌভিকের' রঙ্গজগৎ-এ নধিকার প্রবেশ করা। অবশ্য আলোচনার বতাই রঙ্গজগৎ-এর চৌহদ্দির মধ্যে আবদ্ধ হ। উদ্দেশ্য খেলাধুলোর আর অনুষ্ঠান মোদ প্রমোদের। খেলাধুলোও আবার ঠের নয়, জলের অর্থাৎ সাঁতারের মধ্য দিয়ে ত্য ও অভিনয় আমার এ সপ্তাহের আলোচনার মূল বিষয়বস্তু। রঙ্গজগৎ সম্পাদক 'শৌভিকের' কলমে গতবার চিত্র-তারকাদের ক্রিকেট খেলার যে সুন্দর ছবি দেশের পাতায় ফুটে উঠেছিল, সাঁতারুদের জল-নাটিকা অভিনয়ের তেমনি ছবি আঁকা আমার সাধ্যাতীত। তবে কুজোরও তো অনেক সময় চিৎ হয়ে শোবার সাধ হয়; আমার এ সাধ অনেকটা সেই ধরনের।

ইণ্ডিয়ান লাইফ সেভিং সোসাইটির বার্ষিক অনুষ্ঠান হিসাবে সম্প্রতি ঢাকুরে লেকে 'ওয়াটার ব্যালে' বা জল-নাটিকা 'বেহুলার' যে অভিনয় হ'য়ে গেল তার সমালোচনা কোনো মঞ্চ ও পর্দা সমালোচকের দ্বারাই হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু যেহেতু উদ্যোগ ও আয়োজন একটি সাঁতার ক্লাবের এবং অভিনয়ের মধ্যে রয়েছে প্রচুর সাঁতারের কসরৎ সেহেতু ক্রীড়া সাংবাদিকরাই নিমন্ত্রণ পেয়েছিলেন। সুতরাং লেখার দায়িত্বও তাদের। তবে আমরা জানতে পেরেছি ভারত সরকারের ফিল্ম ডিভিশন 'বেহুলা' জল-নাটিকার চিত্র গ্রহণে উদ্যোগী হয়েছেন এবং ইণ্ডিয়ান লাইফ সেভিং সোসাইটিও রাজী হয়েছেন দ্বিতীয়-বার অভিনয় করতে। সুতরাং মঞ্চ ও পর্দার সমালোচকরাও এবার 'বেহুলা' দেখবার সুযোগ পাবেন।

*　　*　　*

জলের মধ্যে বেহুলা নৃত্যনাট্যের প্রযোজনায় ইণ্ডিয়ান লাইফ সেভিং সোসাইটি নতুন শিল্প সৃষ্টির ইঙ্গিত দিয়েছেন। এর মধ্যে একই সঙ্গে ফুটে উঠেছে সাঁতারের পটুতা আর শিল্পীর কলা-কৌশল। ছন্দ লয় তালের সঙ্গে সুরের মূর্ছনা, স্বচ্ছ জলের উপর আলোছায়ার খেলা। মূক অভিনয় কিন্তু মাইক সংযোগে ধারা বিবরণীর ব্যঞ্জনা। অর্কেস্ট্রার বাদ্যসম্ভারে সাঁতারের বিভিন্ন 'স্ট্রোক', নৈপুণ্যের নানা কসরৎ আর নৃত্যের রমণীয় ভঙ্গিমা। বিষয়টি সত্যিই অভিনব। অপূর্বও বলা যেতে পারে। গত বছর এঁরা জলের মধ্যে প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরুর 'ডিসকভারি অব ইণ্ডিয়ার' নাট্যরূপ ফুটিয়ে তুলেছিলেন, এবার মনসা মঙ্গল কাব্য থেকে বেহুলার উপাখ্যান অভিনয় করেছেন। 'ওয়াটার ব্যালে'তে 'বেহুলা' নাটিকা যে খুবই উপযোগী, একথা বলাই বাহুল্য। জল-নাটিকার আলোচনায় পরে ঘুরে আসছি। আগে সোসাইটির একটু পরিচয় দিয়ে রাখি।

*　　*　　*

ঢাকুরে লেকের এক প্রান্তে খানিকটা জলকে ইট সিমেণ্টে আবদ্ধ করে ইণ্ডিয়ান লাইফ সেভিং সোসাইটি তাদের সুইমিং পুল তৈরী করেছেন। চমৎকার পরিচ্ছন্ন ছোট্ট পুল। জল বাড়ানো কমানোর ব্যবস্থা আছে। আছে জলকে পরিশোধন করবার প্রক্রিয়া। অর্থাৎ সাহেবদের পরিচালিত কলকাতায় যে কয়টি সুইমিং পুল আছে, যেমন ক্যালকাটা সুইমিং ক্লাব, কাশীপুর ক্লাব, অর্ডিন্যান্স ক্লাব, মেরিন ক্লাব, ইণ্ডিয়ান লাইফ সেভিং সোসাইটির সুইমিং পুল তাদেরই ছোট্ট সংস্করণ। এদের সাঁতার বা সাঁতারের
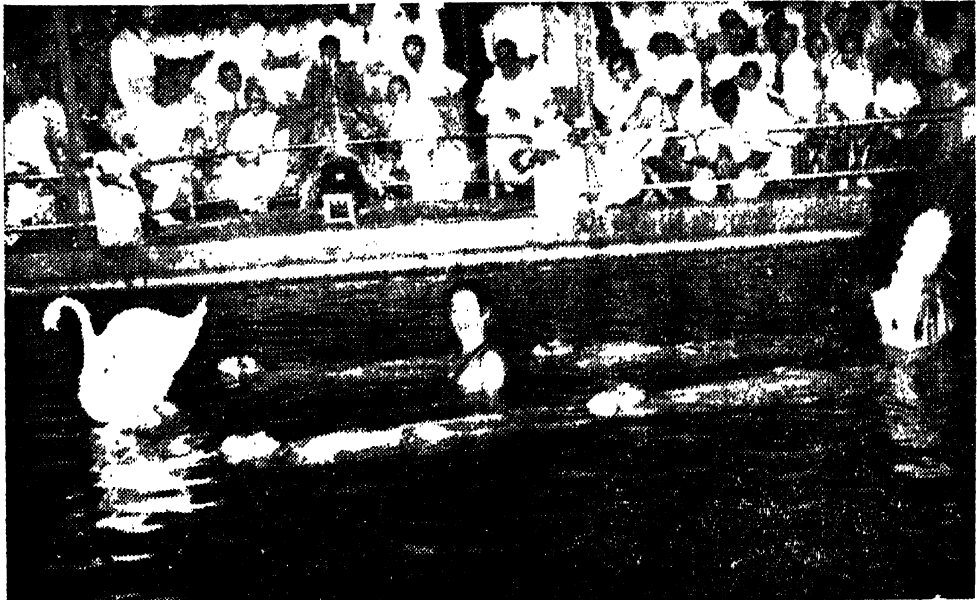
ঢাকুরে লেকে জল-নাটিকা 'বেহুলা'র অভিনয়ে সপ্তডিঙ্গা মধুকরে চড়ে চাঁদ সদাগরের বাণিজ্য যাত্রার দৃশ্য

বেহুলা জল-নাটিকায় লখীন্দর ও বেহুলার বাসর ঘরের দৃশ্য

প্রতিযোগিতা হয় ছোট লেকে। পুলে সাঁতার শেখানো হয় ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের। একটা ডাইভিং বোর্ডও রয়েছে এখানে। বিখ্যাত সাঁতারু নলিনী মালিক, যিনি ১৯৩২ সালে লস্ এঞ্জেল অলিম্পিকে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন, তিনি এদের প্রধান 'কোচ'। আরও কোচ রয়েছেন কয়েকজন। সভ্য সভ্যার অভাব নেই। বেশীর ভাগই অভিজাত পরিবারের। পৃষ্ঠপোষক এবং পরিচালক এদেরই অভিভাবকরা। তবে সব শ্রেণীর সভ্য-সভ্যার এখানে সমান অধিকার।

জলে নিমজ্জমান ব্যক্তিকে উদ্ধারের কলা-কৌশল ও মুমূর্ষের প্রাথমিক শুশ্রূষা পদ্ধতি শেখানোর উদ্দেশ্যে তেত্রিশ বছর আগে ইণ্ডিয়ান লাইফ সেভিং এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠা। সোসাইটি ইংলণ্ডের রয়্যাল লাইফ সেভিং সোসাইটির অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান। প্রতি দেশেই 'ফার্স্ট এড' বা প্রাথমিক শুশ্রূষা ও জীবন রক্ষার কলা-কৌশল শেখার ব্যবস্থা আছে। রয়্যাল লাইফ সেভিং সোসাইটির বিবরণী থেকে জানা যায় প্রতি বছর তারা পঞ্চাশ ষাট হাজার পরীক্ষোত্তীর্ণ যুবককে লাইফ সেভিংএ পারদর্শী হিসেবে সনদ দিয়ে থাকেন। ইংলণ্ডের তুলনায় আমাদের নদী বহুল এই বিরাট দেশে শিক্ষার্থী ও শিক্ষোত্তীর্ণ যুবকের সংখ্যা কত কম ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। নদী মাতৃক এই বাঙলা দেশে প্রতি বছর কত ভাগ্যহীন নরনারীর সলিল সমাধি ঘটছে তার ইয়ত্তা নেই। খালে, বিলে, পুকুরে, নদীতে সব সময়ই দুর্ঘটনার আশঙ্কা। তার উপর রয়েছে বন্যার তাণ্ডব। বন্যার ধ্বংসলীলায় বাঙলাকে কত জীবন আহুতি দিতে হয় তার হিসেব কে রাখে? শুশ্রূষা ও জীবন রক্ষায় কলাকৌশলে শিক্ষিত যুবক শহরে শহরে, গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে ছড়িয়ে থাকলে অকাল মৃত্যুর হাত থেকে বহু জীবন রক্ষা পেতে পারে। তাই ইণ্ডিয়ান লাইফ সেভিং সোসাইটির সমাজ কল্যাণধর্মী এই প্রচেষ্টায় জাতীয় সরকার এবং পৌর-সভারও এগিয়ে আসা উচিত। কলকাতাতেই বহু পুকুর রয়েছে। সেখানে সাঁতার শেখার ব্যবস্থাও আছে। নেই লাইফ সেভিং শেখার আয়োজন। সাঁতারের সঙ্গে সঙ্গে জীবন রক্ষা এবং প্রাথমিক শুশ্রূষা পদ্ধতি শেখাবার জন্য ক্লাবগুলিরও উৎসাহ চাই। কলকাতার সাঁতারের ক্লাব সৃষ্টির ইতিহাস বড়ই মর্মান্তিক। ১৯০৩ সালে শিবপুরে নৌকো নিমজ্জনের মর্মান্তিক ঘটনার পর পৌরসভার উদ্যোগে কলেজ স্কোয়ারে প্রথম সাঁতারের ক্লাব প্রতিষ্ঠা হয়। তার পর অবশ্য আরো কতকগুলি ক্লাব স্থাপিত হয়েছে; কিন্তু বর্তমানে সাঁতার ক্লাবগুলির কর্মপ্রবাহ খুবই মন্থর। শিবপুরের ঘটনার মত সারা বাঙলা দেশে এখন নৌকোডুবি ও মানুষ নিমজ্জনের কত মর্মান্তিক ঘটনা ঘটছে তার ইয়ত্তা নেই। তাই নিমজ্জনের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য সুইমিং, লাইফ সেভিং এবং ফার্স্ট এড শেখার আজ নিতান্ত প্রয়োজন।

* * *

ইণ্ডিয়ান লাইফ সেভিং সোসাইটির অনুষ্ঠানে এখন ফিরে আসা থাক। রাজ্যপাল ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখার্জি, অভিজাত সম্প্রদায়ের অগণিত দর্শক এবং শ্রীযুক্তা বঙ্গবালা মুখার্জির উপস্থিতিতে সোসাইটি চারটি দৃশ্যে "বেহুলা" জল-নাটিকা অভিনয় করেন। অভিনেতা অভিনেত্রীদের অধিকাংশই সোসাইটির শিশু সভ্য কেউ বা তরুণ, কেউ বা যুবক। সুইমিং পুলটি সুন্দরভাবে সাজানো। চারিদিক থেকে জলের উপর আলো ফেলে রাতকে দিন করে ঝলমল করছে সাঁতারুদের গায়ের পোশাক আর জলের

ট্র। ছোটদের অথৈ আর বড়দের কোথাও
ক সমান, কোথাও বা তার বেশী জল।
াশাক পরিচ্ছদ প্রায় সবই রাজকীয়।
র্থাৎ বেহুলো নাটিকায় যেমনটি হওয়া
চত। পোশাকের উপর শুভ্র এবং স্বচ্ছ
াস্টিকের আবরণ। জলে ভেজার আশংকা
ই। মাথার মুকুট এবং গায়ের গয়নাও
স্টিকে মোড়া। দুপাশে দুটি 'স্ক্রিন'
টানো হয়েছে 'এনট্রান্স' 'এক্সিটের' জন্য।

সূচনায় চাঁদ সদাগরের বাণিজ্য যাত্রার
শ্য। সপ্তডিঙ্গা মধুকরে আরোহণ করে
ন বাণিজ্যে চলেছেন। অর্কেস্ট্রার মিশ্টি
রের মধ্যে লাউড স্পীকারের মুখ থেকে
প ভেসে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে ভাসছে
দের বাণিজ্য তরী। সাঁতারের মাধ্যে নৌকোর
ংকার ফরমেশন। একটি ছেলে হাঁস হয়ে
তিবিম্ব চলেছে আগে আগে। তার মাথার
পর বসিয়ে দেওয়া হয়েছে একটি শুভ্র
জহাঁস, সাঁতাই যেন সপ্তডিঙ্গা মধুকরের
মুখভাগ অনেক পিছনে আর একটি
লের মাথায় হংসপাচ্ছ। দুজনই একই তালে
তার কাটছে, আর দুপাশে দুটি করে
লে হাত মেলে একই তালে কাটছে চিৎ-
তার, যেন জলের উপর দাঁড় পড়ছে;
বাখানে সোজাভাবে দাঁড়িয়ে সাঁতার কেটে
লছেন চাঁদ সদাগর। সহসা মনসাদেবী
বির্ভূতা হলেন। মাথায় তাঁর সাপের
কুট। লাউড স্পীকার থেকে স্ত্রীকণ্ঠ ভেসে
লো—"সাবধান চাঁদ, এখনো আমার পুজো
র, নইলে অমঙ্গল হবে।" মনসাদেবীও
তারের মধ্য দিয়ে অঙ্গভঙ্গিতে তাঁর
র্জনী জানালেন কিন্তু যে হাতে দেব
লপাণিকে পুজো করেছে সে হাতে
ণ্ডীকে পূজো করতে চাঁদ নারাজ। মনসা-
বীর অভিশাপ ঝড় উঠলো, নৌকাও
ব গেল। সাঁতারের নানা কসরৎ দেখালেন
ভিনেতারা। শেষ হল প্রথম দৃশ্য।

* * *

দ্বিতীয় দৃশ্য হচ্ছে সদাগরপুত্র
খীন্দরের বাসরঘর। উৎসবের বিচিত্র
ায়োজন। ৮ জন প্রহরী দিয়ে ঘিরে চাঁদ
রক্ষিত করে গেলেন লখীন্দরের বাসরঘর।
লনাগিনী যেন কোনভাবেই ঘরে ঢুকতে
পারে। প্রহরীদের ৪ জনের হাতে
লোয়ার, ৪ জনের হাতে বর্শা, বর্শার গলায়
দমালার মাঙ্গলিক চিহ্ন। বর-বধূ বেশে
সরঘরে ঢুকলেন লখীন্দর ও বেহুলা।
হু পরে ঘুমিয়ে পড়লো লখীন্দর,
হুলাও তন্দ্রায় অভিভূতা। অন্ধকার ঘনিয়ে
লো। ধীরে ধীরে ফোঁস ফোঁস শব্দ করে
লনাগিনী ঢুকলো বাসরঘরে। আলোছায়ার
লায় আর অর্কেস্ট্রার সুরে অদ্ভুত পরিবেশ
ষ্টি করা হল। একটা থমথমে ভাব। কাল-
গিনী ভীষণ গর্জনে দংশন করলো
লখীন্দরকে। সনকা ও চাঁদ ছুটে এলেন।
তাদের বুকফাটা আর্তনাদ আর বেহুলার
করুণ ক্রন্দনের মধ্যে দ্বিতীয় দৃশ্য শেষ হল।
সবই দেখানো হলো সাঁতারের মাধ্যমে।

* * *

তৃতীয় দৃশ্যে লখীন্দরের মৃতদেহ নিয়ে
সতী বেহুলার নদীর ঘাটে ঘাটে ভ্রমণ আর
নানা বিপদের মধ্যেও কোনভাবে আত্মরক্ষা।
অবশ্য মনসা-মঙ্গলের উপাখ্যানের বর্ণনামত
ভেলায় করে না ভেসে বেহুলা লখীন্দরকে
নিয়ে সাঁতার কেটে কেটে ঘাটে ঘাটে ঘুরছেন।
এ দৃশ্যে সাঁতারের প্রচুর কসরৎ দেখানো
হয়েছে। বেহুলার রূপে মুগ্ধ দুই গুণ্ডা
ধোনা মোনার মধ্যে কে বেহুলাকে লাভ করবে
এই নিয়ে বাধলো হাতাহাতি যুদ্ধ এবং শেষ
পর্যন্ত দুইজনই প্রাণ হারিয়ে জলের উপর
ভেসে চলতে আরম্ভ করলো। ধোনা মোনার
ধস্তাধস্তির মধ্যে বুকে চিৎ ও ডুব সাঁতারের
নানা প্রক্রিয়া দেখানো হয়েছে। সমবয়সী
ছেলেদের প্ররোচনায় বোকা গোধা পাগলার
বেহুলাকে বিয়ে করতে চাওয়া এবং তাজার
চেয়ে মরার প্রতি বেহুলার বেশী দরদ দেখে
বিমুখ হয়ে জলে ডুবে মরে যাবার দৃশ্য-
টুকুও অভিনয়নৈপুণ্যে আর সাঁতারের
পটুতায় সুন্দর ফুটে উঠেছে। বেহুলার
অঙ্গ থেকে টাঁটিয়া গুণ্ডার গয়না আত্মসাৎ
এবং পরে জলজন্তুর হাতে তার মৃত্যুর
অভিনয়টুকুও মনের উপর ছাপ রেখে গেছে।
এখানে বলা যেতে পারে, মনসা-মঙ্গলে
টাঁটিয়া চরিত্র অনেকেরই জানা নেই।
'বেহুলার' প্রযোজক শ্রীশচীন্দ্র ভট্টাচার্য
পণ্ডিত ব্যক্তি। তিনি হয়তো মনসা-মঙ্গলের
কোন উপাখ্যানে টাঁটিয়া চরিত্র পেয়ে
থাকবেন। এখানে আরও বলে রাখি, মাইকে
শ্রীশচীন্দ্র ভট্টাচার্যই নাটিকার গল্পাংশ
আবৃত্তি করছিলেন, স্ত্রী চরিত্রর অভিনয়
করছিলেন তাঁর সহধর্মিনী শেফালী ভট্টাচার্য।
যাই হোক, তৃতীয় দৃশ্যের শেষ দিকে নেতা
ধোপানীর দুষ্টু ছেলেকে মেরে ফেলা এবং
প্রয়োজনমত বাঁচিয়ে তোলার কাহিনী জেনে
বেহুলা নেতার শরণাপন্ন হন এবং নেতা
লখীন্দরের প্রাণদানের জন্য বেহুলাকে নিয়ে
দেবরাজ ইন্দ্রের কাছে গমন করেন।

* * *

চতুর্থ দৃশ্যে দেখানো হয় ইন্দ্রের রাজ-
সভা প্রস্ফুটিত পদ্মবনের মধ্যে নর্তকীদের
সুললিত নৃত্য। ছন্দ লয় তালে এবং নৃত্যের
মুদ্রায় দৃশ্যটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। বেহুলার
নৃত্যে দেবরাজ ইন্দ্র সন্তুষ্ট হন। শূলপাণিরও
আবির্ভাব ঘটে। মনসাদেবীও সন্তুষ্ট হয়ে
জীবন্ত লখীন্দরকে নিয়ে উপস্থিত হন।
জল-নাটিকার উপর যবনিকা পড়ে। সাঁতারের
মাধ্যমে সাঁতারু শিল্পীদের মূক অভিনয়-
দক্ষতায় দর্শকরা প্রশংসায় মুখর হয়ে ওঠেন।
সবার কানেই অনেকক্ষণ লেগে থাকে প্রশংসা-
বাণীর ঝংকার।

সাপ্তাহিক সংবাদ
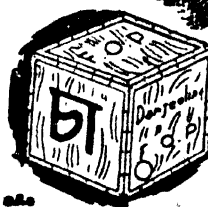
দেশী সংবাদ

১২ই সেপ্টেম্বর—লোকসভায় কোম্পানী বিলটি গৃহীত হইয়াছে। এই বিল দ্বারা কোম্পানী আইনের ব্যাপক সংস্কার সাধন করা হইয়াছে।

আজ হীরাকুদ বাঁধে একটি বাঁশের সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া পড়ায় ৭ জন নারী সমেত ১৩ জন নিহত হইয়াছে এবং একশত ব্যক্তি আহত হইয়াছে।

১৩ই সেপ্টেম্বর—আজ পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় পশ্চিমবঙ্গ বিক্রয় কর (দ্বিতীয় সংশোধন) বিল ১৪৮—৫৪ ভোটে গৃহীত হয়। এই বিলের বিধান বলে চিনি ও সোনার উপর বিক্রয় কর ধার্য করা হইবে।

কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রী মেহেরচাঁদ খান্না আজ লোকসভায় বলেন যে, তিনি যথাসম্ভব সত্বর পাকিস্তান সরকারের সহিত অস্থাবর উদ্বাস্তু সম্পত্তি সম্পর্কে আলোচনা করিবেন। উদ্বাস্তু সম্পত্তি বাবদ ভারত পাকিস্থানের নিকট ৪০০ কোটি টাকা পাইবে।

আজ রাজ্যসভায় সাধারণভাবে প্রেস কমিশনের রিপোর্ট, বিশেষভাবে বেতনভোগী সাংবাদিকগণের চাকুরীর শর্তাদি সংক্রান্ত প্রস্তাবসমূহ অনুমোদিত হয়।

১৪ই সেপ্টেম্বর—আজ রাজ্যসভায় বেতার ও তথ্য দপ্তরের মন্ত্রী ডাঃ কেশকার ঘোষণা করেন যে, দৈনিক সংবাদপত্রসমূহের পৃষ্ঠানুযায়ী মূল্য নির্ধারণের জন্য প্রেস কমিশন যে সুপারিশ করিয়াছেন, সরকার নীতিগতভাবে তাহা গ্রহণ করিয়াছেন।

কানাডা সরকারের প্রতিনিধি মিঃ ম্যাক-গাউয়ি আজ হাওড়া স্টেশনে পূর্ব রেলওয়ের ম্যানেজার শ্রী এস সাঙ্গপাণিকে আনুষ্ঠানিক-ভাবে একটি কানাডীয় ইঞ্জিন অর্পণ করেন।

১৫ই সেপ্টেম্বর—ভারতে বন্যা নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সেচ ও বিদ্যুৎ দপ্তর মোট ৯১৭ কোটি ব্যয়ের একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করিয়াছেন এবং উহা দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত থাকিবে।

শিলং-এর সংবাদে প্রকাশ, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত এজেন্সীর তুয়েনসাং বিভাগে অস্ত্র-সজ্জিত নাগা বিদ্রোহী দলকে দমন করার জন্য গত ১৯শে আগস্ট যে সেনাবাহিনী প্রেরণ করা হয়, তাহারা বিদ্রোহীদের দুইটি গুরুত্ব-পূর্ণ ঘাটি নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলিয়াছে।

উড়িষ্যায় বিধ্বংসী বন্যায় চরম দুর্দশাগ্রস্ত জনগণের সাহায্যকল্পে পশ্চিমবঙ্গ উড়িষ্যা বন্যা ত্রাণ কমিটি কর্তৃক একটি সাহায্য ভাণ্ডার গঠিত হইয়াছে। যাবতীয় সাহায্য কমিটির নামে মন্ত্রী আবাস, রাজভবন, কলিকাতা অথবা ইউনাইটেড ব্যাংক অব ইণ্ডিয়া লিঃ কলিকাতা এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

১৬ই সেপ্টেম্বর—যাদবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজকে একটি ইউনিটারী বিশ্ববিদ্যালয়রূপে গড়িয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় আজ পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় একটি বিল উত্থাপন করেন।

আটদিন বিতর্কের পর আজ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় নিরাপত্তা বিলটি বিরোধী পক্ষের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও ১৪১—৪৯ ভোটে গৃহীত হয়। এই বিলের দ্বারা নিরাপত্তা আইনের মেয়াদ আরও ৫ বৎসর বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী পণ্ডিত পন্থ আজ রাজ্য সভায় উড়িষ্যায় বন্যার ধ্বংসলীলার এবং বর্তমান সময় পর্যন্ত সরকারী সাহায্য ব্যবস্থার বিশদ বিবরণ দেন। তিনি বলেন, বন্যায় ৩৭ জন মারা গিয়াছে এবং ৫ জন নিখোঁজ হইয়াছে।

জাপানী পার্লামেন্টারী দলের নেতা মিঃ দাইসুকে তাকাওকা আজ কলিকাতায় পি টি আইকে বলেন যে, প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরু আগামী বসন্তকালের কোন সময়ে জাপান পরিদর্শন করিবেন বলিয়া আশা করা যায়।

১৭ই সেপ্টেম্বর—আজ লোকসভায় প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরু বিশেষ জোরের সহিত বলেন, গোয়া সম্পর্কে যে কোন প্রকার সত্যাগ্রহের বিরুদ্ধে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে, উহা দ্বারা সরকারী নীতির পরিবর্তন সূচিত হয় না।

প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরু আজ লোকসভায় বলেন যে, আগামী অল্প কয়েক মাসের মধ্যেই সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রধান মন্ত্রী ভারত পরিদর্শন করিবেন।

১৮ই সেপ্টেম্বর—কলিকাতায় পশ্চিমবঙ্গ মুদ্রক সম্মেলনের অধিবেশন আরম্ভ হয়। শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। সম্মেলনের সভাপতি শ্রীদ্বারিকানাথ ধর এবং অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীঅশোককুমার সরকার তাঁহাদের ভাষণে মুদ্রণ শিল্পকে দেশবাসীর কর্মসংস্থানে একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প হিসাবে সর্বপ্রকার সাহায্য দানের জন্য গভর্নমেণ্টের নিকট অনুরোধ জানান।

বিদেশী সংবাদ—

১২ই সেপ্টেম্বর—মিশরে প্রচণ্ড ভূকম্পনের ফলে ১৯ জন নিহত ও বহু লোক আহত হইয়াছে।

স্কটল্যাণ্ড ও ওয়েলসের জাতীয়তাবাদীরা আজ এক সম্মেলনে মিলিত হইয়া 'শান্তিপূর্ণ উপায়ে' পূর্ণ স্বাধীনতা সংগ্রাম চালাইয়া যাইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে।

১৩ই সেপ্টেম্বর—পশ্চিম জার্মানী এবং সোভিয়েট-রাশিয়ার মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন, বন ও মস্কোতে দূতাবাস প্রতিষ্ঠা এবং উভয় দেশের মধ্যে রাষ্ট্রদূত বিনিময় সম্পর্কে আজ মস্কোতে ডাঃ আডেনাওয়ার ও মার্শাল বুলগানিনের মধ্যে এক চুক্তি হইয়াছে।

১৬ই সেপ্টেম্বর—সমগ্র আর্জেণ্টিনায় অবরোধ অবস্থা ঘোষণা করা হইয়াছে। এক সরকারী ঘোষণায় বলা হইয়াছে যে আর্জেণ্টিনার কয়েকটি প্রদেশে সৈন্যবাহিনী এবং নৌবাহিনীর একাংশ অদ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছে।

আজ রাষ্ট্রপুঞ্জের পঞ্চশক্তি নিরস্ত্রীকরণ সাব কমিটিতে স্যার এণ্টনি ইডেনের নিরস্ত্রীকরণ উদ্যোগ পরিকল্পনা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও কানাডা কর্তৃক বিশেষভাবে সমর্থিত হইয়াছে এবং রাশিয়া উহা অনুধাবন করিয়া দেখিবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছে।

রাষ্ট্রপুঞ্জের শিশু তহবিলের কার্য নির্বাহক বোর্ড ভারতের শিশু কল্যাণ পরিকল্পনাসমূহের জন্য তিন লক্ষাধিক ডলার মঞ্জুর করিয়াছেন।

১৭ই সেপ্টেম্বর—লালকোর্তা নেতা খান আব্দুল গফফর খাঁ ও তাঁহার দুইজন সহকর্মীকে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করিয়া বেলুচি স্থানে প্রবেশ করায় গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

মার্কিন ভৌগোলিক সমিতি আজ ঘোষণা করেন যে, মঙ্গলগ্রহে এমন কিছু পরিদৃষ্ট হইয়াছে, যাহা জীবন্ত পদার্থ বলিয়া বিশ্বাস করা যাইতে পারে।

১৮ই সেপ্টেম্বর—আজ আর্জেণ্টিনার রাজধানীর উপর বোমা বর্ষণ করা হয়। প্রকাশ, বিদ্রোহীরা আজ আর্জেণ্টিনার মেণ্ডোজা প্রদেশের গভর্নমেণ্ট অধিকার করিয়াছে।

প্রতি সংখ্যা [illegible] আনা, বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০,
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : [illegible] প্রাইভেট লিমিটেড, ৬ ও ৮, সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১৩
শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস লিমিটেড হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

২২ বর্ষ

৪৮ সংখ্যা

শনিবার

১৪ আশ্বিন, ১৩৬২

DESH

SATURDAY, 1ST OCTOBER, 1955.

সম্পাদক—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন

সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

দুর্গাপুর ও ফারাক্কা

ব্রিটিশ বিশেষজ্ঞগণের সুপারিশ অনুসারে দুর্গাপুরে ইস্পাতের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইবে। বিশেষজ্ঞগণ দুর্গাপুরকে উপযুক্ত স্থান বলিয়া সুপারিশ করা সত্ত্বেও শেষটা ভারত সরকার সেই সুপারিশ অনুমোদন করিবেন কিনা এই বিষয়ে অনেকের মনে সন্দেহ ছিল। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সেই সন্দেহের নিরসন করিয়াছেন। তিনি জানাইয়াছেন, ভারত সরকার পশ্চিমবঙ্গের দাবীই মানিয়া লইয়াছেন, অর্থাৎ দুর্গাপুরেই ইস্পাতের কারখানা বসানো হইবে স্থির করিয়াছেন। ভারত সরকারের এই সিদ্ধান্তে পশ্চিমবঙ্গের সর্ব সম্প্রদায় সন্তুষ্ট হইবেন সন্দেহ নাই। দামোদর-বাঁধ সংগঠন পরিকল্পনা সম্পর্কে দুর্গাপুরের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং এই স্থানটি ইতোমধ্যেই ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্র স্বরূপে গড়িয়া উঠিতেছে। প্রস্তাবিত ইস্পাতের কারখানাটি প্রতিষ্ঠিত হইলে এইদিক হইতে ইহার গুরুত্ব অধিকতর সম্প্রসারিত হইবে। পশ্চিমবঙ্গের ব্যাপক বেকার সমস্যার সমাধান সম্পর্কে দুর্গাপুরের বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি বিশেষভাবে সহায়ক হইবে, ইহা খুবই আশার কথা। ফারাক্কার গঙ্গার উপর বাঁধ নির্মাণের জন্য পশ্চিমবঙ্গের পক্ষ হইতে বহুদিন হইতে ভারত সরকারের উপর চাপ দেওয়া হইতেছিল। কিন্তু তাঁহারা বিষয়টির উপর এতদিন পর্যন্ত যে কারণেই হোক্, বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন নাই। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর উক্তি অনুসারে বুঝা যাইতেছে, অবশেষে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন এবং ফারাক্কায় বাঁধ নির্মাণের প্রস্তাবটিকে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছেন। র‍্যাডক্লিফ সিদ্ধান্ত অনুসারে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য দুই অংশে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। এই দুই অংশের মধ্যে স্থলপথে কোন যোগসূত্র নাই। ইহার ফলে রাজ্যের শাসনকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রেই শুধু অসুবিধার সৃষ্টি হয় নাই, উত্তরবঙ্গের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধনের ক্ষেত্রেও বিঘ্ন ঘটিতেছে। পরিকল্পনা কমিশন ফারাক্কার বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনাটি মঞ্জুর করিবার ফলে বহুদিনের এই অসুবিধা অদূর ভবিষ্যতে দূর হইবে। ইহা ছাড়া গঙ্গার বাঁধ নির্মাণের ফলে হুগলী নদীর শুষ্কপ্রায় জলধারার বেগ বর্ধিত হইবে। পশ্চিমবঙ্গের ব্যাপক অঞ্চলের ভূমির উর্বরতা তাহার ফলে বাড়িবে। বিশেষভাবে হুগলী নদীর জলধারা বিশুষ্ক হইবার ফলে কলিকাতা নগরীর ধ্বংস হইবার যে আতঙ্ক দেখা দিয়াছিল, সেই সংকট কাটিয়া যাইবে। অধিকন্তু পশ্চিমবঙ্গের প্রাণকেন্দ্রস্বরূপ কলিকাতার সঙ্গে নদীপথে যাতায়াতের সুবিধা হওয়াতে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এই পরিকল্পনা সহায়ক হইবে। পশ্চিমবঙ্গের কল্যাণকামীমাত্রেই পরিকল্পনাগুলি কার্যে পরিণত দেখিবার জন্য আগ্রহান্বিত থাকিবেন এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

উড়িষ্যার বিপদ

বিপুল কর্মব্যস্ততার মধ্যেই বন্যা-পীড়িত উড়িষ্যা পরিদর্শন করিয়া প্রধান মন্ত্রী নেহরুজী সময়োচিত কর্তব্য প্রতিপালন করিয়াছেন। দুর্গত জনগণকে রক্ষা করিবার জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে পণ্ডিতজী এই বিষয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। পণ্ডিতজীর মতে বন্যার এই বিপদের ভিতর দিয়া মানবতার আহ্বান আমাদের নিকট আসিয়াছে এবং আমাদিগকে অদম্য উৎসাহ এবং উদ্যম সহকারে আর্তত্রাণ কার্যের দ্বারা নিজেদের মনুষ্যত্বের পরিচয় প্রদান করিতে হইবে। ভারতের প্রধান মন্ত্রী জাতির প্রাণশক্তিকে উদ্দীপিত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, বড় রকমের প্রাকৃতিক বিপর্যয় সব সময়েই যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগে প্রতিহত করা সম্ভব হয়, ইহা সত্য নয়। বিশ্ববিখ্যাত পূর্তবিদ্যা বিশারদ ইঞ্জিনীয়ারগণের পরিকল্পনা অনুযায়ী বাঁধ নির্মাণের পরেও আমেরিকায় বন্যাজনিত বিপর্যয় এখনও ঘটিয়া থাকে। সুতরাং এই ধরনের আকস্মিক প্লাবনের মধ্যেও যাহাতে

নিরাপদে থাকা সম্ভব হয়, সেইদিকেই লক্ষ্য রাখিতে হইবে। বন্যার ফলে শুধু অনিষ্টই হয় এমন নহে, পলি পড়িয়া ভূমির উন্নয়ন শক্তিও বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। বন্যা আসে আসুক, কিন্তু যাহাতে ফসলের গুরুতর রকম ক্ষতি সাধিত না হইতে পারে, জল তাড়াতাড়ি সরিয়া যায়—এমন ব্যবস্থা করা দরকার। ঘরবাড়ি উঁচু জমির উপর করা প্রয়োজন। বাঁধ নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা প্রধানমন্ত্রী অবশ্য অস্বীকার করেন না। এই ব্যবস্থায় সুফল পাওয়া গিয়াছে ইহাও অনস্বীকার্য। সম্ভবত গঠনমূলক অন্য কাজ সব উপেক্ষা করিয়া বাঁধ নির্মাণের জন্য সরকারের সব শক্তি প্রয়োগের তিনি পক্ষপাতী নহেন। তাঁহার মতে দারিদ্র্যই উড়িষ্যার পক্ষে সর্বাপেক্ষা প্রধান সমস্যা এবং এই সমস্যা নিরাকরণের জন্যই সকল রকম চেষ্টা করা উচিত। এই সব বিবেচনা করিয়া বাঁধ নির্মাণের বিষয়ে তাড়াতাড়ি কিছু করা সমীচীন হইবে না। বস্তুত প্রশ্নটি খুবই জটিল। বন্যার জল দুই-তিন দিনের মধ্যে যাহাতে সরিয়া যায়, এমন ব্যবস্থা করা যেমন সহজ নয়; সেইরূপ উচ্চ ভূমিতে গোটা গোটা গ্রাম সরাইয়া লইয়া যাওয়াও অসম্ভব ব্যাপার বলিয়া মনে হয়। প্রকৃতপক্ষে প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে প্রতিহত করিবার জন্য স্থায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে—মানবতার এই দাবী আজ দেখা দিয়াছে। উড়িষ্যার বন্যাজনিত বিপর্যয় অত্যন্তই ব্যাপক, দুঃখ যাতনাও অতি গভীর। সান্ত্বনার বিষয় এই যে, এই বিপদ সমগ্র ভারতের মানবতা-বোধকে রাষ্ট্রের সংযুক্ত স্বার্থে সংহত করিয়া তুলিয়াছে। দুর্যোগের ঘনঘটার ভিতর দিয়া অখণ্ড ভারতের আত্মচেতনার তড়িৎ-স্পর্শের চমক আমরা পাইয়াছি। আমরা দূরত্বের ব্যবধান ভুলিয়া গিয়া জাতির সকলকে আপন করিয়া পাইয়াছি।

উদ্বাস্তুদের ভবিষ্যৎ

পূর্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সেখানকার অবস্থার আশু পরিবর্তন সম্বন্ধে অনেক আশার কথা শুনাইয়াছেন। সম্প্রতি তিনি বলিয়াছেন, পূর্ববঙ্গের রাজনৈতিক বন্দীদের সংখ্যা ইতোমধ্যেই ৪৭৫ হইতে হ্রাস পাইয়া ১ শতে দাঁড়াইয়াছে। একজন রাজনৈতিক বন্দীও যতদিন পর্যন্ত কারা প্রাচীরের অন্তরালে থাকিবে ততদিন নূতন সরকার নিশ্চেষ্ট থাকিবেন না। ইহা ছাড়া বাঙলাভাষা পাকিস্থানের রাষ্ট্রভাষা স্বরূপে গণ্য হইবে এবং পূর্ব-বঙ্গ সম্প্রসারিত স্বায়ত্তশাসনের অধিকার লাভ করিবে, তাঁহার মতে ইহাও নিশ্চিত। ঐস্লামিক রাষ্ট্রের মোহবন্ধন হইতে পূর্ববঙ্গ যদি সত্যই মুক্ত হইতে পারে, তবে মানুষের অধিকার পাইয়া সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পক্ষে সেখানে সংস্থিত থাকা হয়ত সম্ভব হইবে, কিন্তু সে আশা এখনও সুনিশ্চিত নয়। সুতরাং পূর্ববঙ্গ হইতে আগত উদ্বাস্তুগণের পুনর্বাসনের সম্বন্ধে ভারত সরকারকে প্রস্তুত থাকিতে হইবে। পূর্ববঙ্গ হইতে আগত উদ্বাস্তু-গণকে একসঙ্গে বহু পরিবারকে লইয়া গোষ্ঠীবদ্ধভাবে পশ্চিমবঙ্গের বাহিরে বিভিন্ন রাজ্যে উপনিবিষ্ট করিবার ব্যবস্থা হইতেছে। এই সম্বন্ধে প্রধান মন্ত্রী বিভিন্ন রাজ্য সরকারের নিকট আবেদন করেন। সেই আবেদনে বিশেষভাবে সাড়া পাওয়া গিয়াছে। ক্ষুদ্র রাজ্য পশ্চিমবঙ্গে নিতান্তই স্থানাভাব, সুতরাং নবাগত উদ্বাস্তুদিগকে এইভাবে অন্য রাজ্যে উপনিবিষ্ট করা ছাড়া অন্য উপায় নাই। কিন্তু সংশ্লিষ্ট রাজ্যসমূহের সরকারের মতিগতির উপর এই ব্যবস্থার সাফল্য অনেকখানি নির্ভর করে। অন্য রাজ্যে জায়গা-জমি আছে, সুতরাং গাড়ি বোঝাই করিয়া আশ্রয়হীন উদ্বাস্তু-দিগকে সেই সব জায়গায় পাঠাইয়া দাও—সমস্যার সমাধান এতো সহজ নয়। অতীতে অনেকটা সেই ধরনের ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে, কিন্তু বিভিন্ন রাজ্য সরকারের সহানুভূতির অভাব এবং পুনর্বাসন পরিকল্পনার ত্রুটির জন্য উদ্বাস্তুদের পক্ষে পশ্চিমবঙ্গের বাহিরে টিকিয়া থাকা সম্ভব হয় নাই। ফলত বিভিন্ন উদ্বাস্তু কেন্দ্র ছাড়িয়া পুনরায় পশ্চিম-বঙ্গে ফিরিয়া উদ্বাস্তুদিগকে পথের আশ্রয় লইতে হইতেছে। ভবিষ্যতে যাহাতে পুনর্বাসন পরিকল্পনা সম্পর্কে অন্তত তেমন কোন ত্রুটি না থাকে পরিকল্পনা কমিশন সে সম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনা সহকারে বর্তমানে কার্যক্রম নির্ধারণ করিয়াছেন। আমরা আশা করি, অসহায় নরনারীদের সংস্থিতি-বিধানের এই ব্যাপারে অতীতের মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা আমাদিগকে অতঃপর অর্জন করিতে হইবে না।

গোয়ায় গান্ধী নীতির মূল্য

শ্রীগার্দে গুরুজী সাধু প্রকৃতির মানুষ। তিনি আচার্য বিনোবা ভাবেজীর একান্ত অনুগত, সুতরাং গান্ধী নীতির অনুরাগী। গোয়ার গভর্নর জেনারেলের নিকট চিঠি দিয়া তিনি সত্যাগ্রহ বিধিমার্গানুযায়ী গোয়ায় প্রবেশ করেন। শোনা গিয়াছিল, গোয়ার কর্তৃপক্ষ রাজকীয়ভাবে গুরুজীকে অভিনন্দিত করেন এবং সরকারী উদ্যোগে বিভিন্ন সভাসমিতিতে তাঁহাকে গান্ধীজীর অহিংস নীতির মাহাত্ম্য প্রচারের সুযোগ দেওয়া হয়। গুরুজী গোয়া হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া গোয়ায় তাঁহার অভিনন্দন এবং আপ্যায়নের প্রকৃত স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে গোয়ায় প্রবেশ করিবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে পুলিসের হাজতে নিয়া ভর্তি করা হয় এবং গোয়ার কর্তৃপক্ষ সেখানে সাধারণ কয়েদীসুলভ আতিথ্যের নীতিই তাঁহার সম্বন্ধেও অক্ষুণ্ণ রাখেন। এরূপ ১০ দিন বন্দীজীবন যাপন করিবার পর তাঁহাকে অবশেষে পুলিস পাহারায় ভারত সীমান্তে আনিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়। দেখা যাইতেছে শ্রীগার্দে গুরুজীর গোয়ায় প্রবেশ এবং তৎপরবর্তী ব্যাপার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ মিথ্যা সংবাদ প্রচার করা হইয়াছিল এবং দুরভিসন্ধিই সে প্রচারের মূলে ছিল। পর্তুগীজ ডিক্টেটার ডাঃ সালাজারের সাঙ্গোপাঙ্গগণ রাতারাতি গান্ধীজীর অহিংস নীতির মাহাত্ম্যে মাতিয়া যাইবে, ইহা বিশ্বাস করা অবশ্য আমাদের পক্ষে কঠিন হইয়াছিল; তবে রাজনীতিতে প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য সবই সম্ভব এবং সত্যকে চাপা দেওয়া, অন্ততপক্ষে তাহাকে বিকৃত করাই নাকি রাজনীতির রীতি। যাহা হোক্, প্রকৃত সত্য অতঃপর প্রকাশ পাইল। শ্রীগার্দে গুরুজী অক্ষত দেহে যে ভারতে ফিরিয়াছেন ইহাতেও অন্তত গান্ধী নীতির মাহাত্ম্য প্রকটিত হয়।

মহাত্মা

২রা অক্টোবর ভারতের পক্ষে মহা
ণাময় তিথি। এই দিবসে মহাত্মা
ন্ধীর আবির্ভাব ঘটে। মহাপুরুষের
ন্ম এবং কর্ম দিব্য। সকল দেশ এবং
কল জাতির মধ্যে সব সময় মহদাবির্ভাব
ম্ভবও নয়। বিশ্বমানবের অন্তরের
মক্ত বেদনা যুগে যুগে জমিয়া জমিয়া
মানবকে বিশ্বেরই প্রয়োজনে যেন
কর্ষণ করিয়া আনে। সমষ্টির আত্ম-
না ইঁহাদের জীবনে প্রমূর্ত হইয়া
ঠে। মানুষের নিঃস্ব জীবনে ইঁহারা
মহিমাকে সম্প্রসারিত করেন।

গান্ধীজী ভারতের জাতীয়তার
নক। জাতির তিনি মুক্তিদাতা, পিতা।
াধীনতা-সংগ্রামের গৌরবময় ঐতিহ্য
নেক দেশেরই আছে; কিন্তু গান্ধীজীর
তত্ত্বে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম
শ্বমানবের ইতিহাসে অভিনব অধ্যায়
ন্মাক্ত করে। পশুত্বের সংঘাত-সংঘর্ষের
র্দ্ধে মানুষের আত্মার অপরিম্লান
তিমা ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের
ন্তর দিয়া অভাবনীয় প্রভাবে বিকশিত
ইয়া উঠে। মানুষের মনোবল, তাহার
ক্তি যে অপরাজেয় এবং পশুবল যতই
পর্ধিত হোক না কেন, তাহাকে যে
ানুষের অন্তরে জাগ্রত নিত্য, শাশ্বত
সই শক্তির কাছে একান্তভাবে পরাভব
বীকার করিতে হয়, গান্ধীজী আধুনিক
গতে এই সত্য অভ্রান্তভাবে প্রতিষ্ঠিত
রিয়াছেন। অহিংসার কাছে হিংসাকে
খানে পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছে।
বচিত্র বিস্ময়কর গান্ধীজীর জীবন-
ীলা। কাব্যের মতই তাহা ছন্দোময়
ুন্দর। মানবমঙ্গলের সমুমূর্তিস্বরূপ
ঁহার অমৃতময় অবদান হইতে দিব্যশক্তি
বচ্ছুরিত হইয়া অঘটন ঘটাইল।
াহারা শত্রু ছিল, গান্ধীজী নেতৃত্ব-
হিমায় তাহাদিগকে নির্জিত করিয়া
মত্রে পরিণত করিলেন। জেতা-বিজিতের
মহিমা-স্বীকৃতির পথে তাহাদিগকে
াপন করিয়া পাইয়া কৃতার্থতা লাভ
রিল, নিজদিগকেই বড় করিয়া পাইল।

মানুষের এই যে স্বমহিমা—অব্যয়, অক্ষয় এবং অমোঘ তাহার এই যে আত্মশক্তি, যেখানে ইহার পরম প্রতিষ্ঠা নিহিত রহিয়াছে, মহাত্মা গান্ধী তাঁহার জীবনাদর্শে সেই উৎসের সন্ধান মানুষকে দিয়াছেন। গান্ধীজীর সাধনায় মানুষ সকল দৈন্য হইতে মুক্ত জীবনের অনাহত স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছে।

মৈত্রী ভারতের সনাতন আদর্শ, এক কথায় ভারতীয় সংস্কৃতির তাহাই স্বরূপ।

আগামী সংখ্যা হইতে জনপ্রিয় কথাশিল্পী শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্রের উপন্যাস 'উপনগর' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

—সম্পাদক

জগতের বিভিন্ন দেশেও মহাপুরুষগণ অবতীর্ণ হইয়া এই আদর্শে মানব-সমাজকে অনুপ্রাণিত করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের সেই আদর্শবাদ বস্তুব জীবনের দ্বন্দ্বসংঘাত হইতে বিচ্ছিন্ন মানস-প্রতিবেশের দিকেই অনেকটা আকর্ষণ করিয়াছে। ফলত সমাজের সঙ্গে তাঁহাদের আদর্শ ঠিক খাপ খায় নাই। কোন স্থায়ী ভিত্তি ধরিয়া রাজনীতির উপর সে আদর্শের শক্তি ইতিপূর্বে প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হয় নাই।

গান্ধীজীর সাধনার বিশেষত্ব এইখানে। তিনি দ্বন্দ্বসংঘাতময় রাজনৈতিক পটভূমিকাতেই তাঁহার অহিংস নীতি প্রত্যক্ষভাবে প্রয়োগ করিলেন। সাফল্য সম্বন্ধে সন্দেহ সকল দিক হইতে জাগিল। কিন্তু সত্যের জয় হইল। গান্ধীজীর প্রয়োগ-কৌশলে অহিংসার সর্বতোময় প্রভাব প্রদীপ্ত লাভ করিল এবং বিশ্বের কণ্ঠভাবনায় সেই আদর্শের অনুপ্রেরণা সক্রিয়ভাবে দেখা দিল।

ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের নেতৃরূপে গান্ধীজীর তপোমূর্তি প্রত্যক্ষ করিবার সৌভাগ্য আমাদের হইয়াছে। ভাস্বর সে দীপ্তি সমগ্র ভারতের প্রাণশক্তিতে আলোড়ন তুলিয়াছে, আত্মোৎসর্গের আবর্ত সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু ইহাও বাহ্য। গান্ধীজীর লোকোত্তর জীবনের ইহা অনেকটা বাহিরেরই দিক মাত্র। তাঁহার স্বরূপ লক্ষণ নয়। স্বরূপত গান্ধীজী রাজনীতিক নহেন। রাজনীতির অনেক ঊর্ধ্বে সকল নীতি যে মহামানবতার সামগ্রিক সত্তায় বিধৃত, গান্ধীজীর জীবন সেই পরম সত্যে প্রতিষ্ঠিত। প্রকৃতপক্ষে তাহা অধ্যাত্ম। আত্মাতেই মানুষের স্বমহিমা। বিশ্বকে নিজ করিয়া পাইবার মধ্যেই তাহার স্বত্ব বা নিজের অধিকার নিত্যতার সূত্রে পরিস্ফূর্ত। সেইখানেই অভয়, তাঁহার জীবন অনাময়।

ইহাই রাষ্ট্রভূমি। এই ভিত্তি ধরিয়াই মানুষ বড় হয়, নিজেকে বড় করিয়া পায় এবং ক্ষয়-ক্ষতি কোন প্রশ্নই আর তাহার পক্ষে থাকে না। গান্ধীজী এই অমৃতের সন্ধান মানুষকে দিয়াছেন। মানব-সভ্যতার যতই অগ্রগতি ঘটিবে, মানুষ পশু-জীবনের দৈন্য এবং জড়ভোগের জঞ্জাল হইতে মুক্ত হইয়া নিজেদের মহিমা যতই উপলব্ধি করিবে, মানুষ হিসাবে মানুষের মর্যাদা তাহারা যতই বুঝিবে, ত্যাগ এবং সেবার পথে নিজেদের ঋদ্ধি, সিদ্ধি তাহারা যতই খুঁজিয়া পাইবে, পরকে আপন করিয়া নিজেকে বড় করিয়া পাইবার ধারাটি যতই মানুষের মধ্যে সাড়া দিবে, ততই গান্ধীজীর জীবনাদর্শের বিরাটত্ব এবং বিশালত্ব তাহাদের অধিগম্য হইবে। গান্ধীজী দেশে দেশে জাতিতে জাতিতে পূজিত হইবেন।

সে পূজার আয়োজন ইতিমধ্যেই আরম্ভ হইয়াছে। হিংসা ও বিদ্বেষে বিক্ষুব্ধ জগৎ আজ গান্ধীজীর আদর্শকে বিশ্বশান্তির একমাত্র সম্বল-স্বরূপে গ্রহণ করিতেছে, তাকাইয়া আছে গান্ধীজীর যাঁহারা অনুবর্তী তাঁহাদেরই দিকে। এই হিসাবে গান্ধীজী শুধু ভারতের জাতীয়তারই জনক নহেন, অভিনব মানব-সংস্কৃতির তিনি জন্মদাতা। তিনি নবযুগের মন্ত্রগুরু নবীন জীবনতন্ত্রের তিনি উদ্গাতা। তাঁহার আবির্ভাবক্ষিপ্ত বিশ্বক্রন্দিত উঠিতেছে তাঁহার জয়গান। দিগন্ত-পরিব্যাপ্ত সেই নীতি, সেই সংস্কৃতির সঙ্গে নিজেদের কণ্ঠ মিলাইয়া দিয়া আমরাও গাহিতেছি গান্ধীজীর জয়।

গান্ধীজীর সঙ্গে আলোচনা

[দীনবন্ধু সি এফ এণ্ড্রুজ একবার রামচন্দ্রন নামে একটি ছাত্রকে গান্ধীজীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। ছাত্রটি গান্ধীজীকে কয়েকটি বিষয়ে প্রশ্ন করেন, গান্ধীজী বিস্তারিতভাবে সেগুলির উত্তর দেন। এই আলোচনার সংক্ষিপ্তসার মহাদেব দেশাই কর্তৃক 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রিকার ১৩।১১।২৪ তারিখের সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। গান্ধীজীর 'টু দি স্টুডেণ্টস' গ্রন্থে তা সংকলিত হয়েছে। তারই স্বচ্ছন্দ অনুবাদ এখানে দেয়া হল।]

॥ ১ শিল্প ॥

রামচন্দ্রন প্রথমেই জিজ্ঞাসা করল,—এটা কেমন ব্যাপার যে আপনাকে ভালোবাসেন, শ্রদ্ধা করেন এমন অনেক বুদ্ধিমান ও বিশিষ্ট ব্যক্তির ধারণা যে, আপনি জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে, আপনার কল্পনা থেকে শিল্পের জাতীয় পুনর্জাগরণের কথা বাদ দিয়েছেন?"

"আমি দুঃখিত," গান্ধীজী উত্তরে বললেন, "যে সাধারণত এ ব্যাপারে আমায় ভুল বোঝা হয়ে থাকে।

প্রতি বস্তুরই দুটি দিক আছে—বহিরঙ্গ আর অন্তরঙ্গ। আমি শুধু একটা দিককে প্রাধান্য দিয়ে থাকি। বহিরঙ্গের মূল্য আমার কাছে ততটুকুই অন্তরঙ্গকে বুঝতে তা আমায় যতটুকু সাহায্য করে।

সত্য শিল্প মাত্রেই অন্তরের প্রকাশ। রূপবন্ধের (ফর্ম-এর) মূল্য ততটুকুই, যতটা তা অন্তরসত্তার বহিঃপ্রকাশ।"

রামচন্দ্রন একটু দ্বিধার সঙ্গে বলল, "মহৎ শিল্পীরা নিজেরাই তো বলে গেছেন, শিল্পীর অন্তরের আবেগ ও অস্থিরতারই যে তর্জমা ঘটে শব্দ ও কথায়, রূপে ও রঙে, তাই হচ্ছে শিল্প।"

"হ্যাঁ। এই ধরনের শিল্পের আবেদনই আমার কাছে সবচেয়ে বেশি। কিন্তু আমি দেখি অনেকেই নিজেদের শিল্পী বলে দাবী করেন, তাঁদের দাবী মেনেও নেওয়া হয় অথচ তাঁদের সৃষ্টিতে অন্তরের ঊর্ধ্বের অভীপ্সা বা আন্দোলনের কোনো চিহ্নই থাকেনা।"

"এ রকম কোনো দৃষ্টান্ত আপনার মনে আসছে?"

"হ্যাঁ", গান্ধিজী বললেন, "ধর, অসকার ওয়াইল্ড। আমি যখন বিলেতে ছিলাম তখন তাঁর কথা খুব বলাবলি হ'ত।"

"আমি শুনেছি", রামচন্দ্রন বললো, "যে অসকার ওয়াইল্ড আধুনিক সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কারুশিল্পীদের অন্যতম।"

"হ্যাঁ। আর আমার মুশকিল হচ্ছে ঠিক ঐখানেই। নিছক বহিরঙ্গটাই ওয়াইল্ড শ্রেষ্ঠ শিল্পের নিদর্শন মনে করতেন আর তাই অনিত্যকে সুন্দর করে তুলতে তিনি সক্ষম হয়েছিলেন।

যথার্থ শিল্প মাত্রেই অন্তরকে তার অন্তরতম স্বরূপ চিনে নিতে সাহায্য করে। আমি নিজের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করে দেখেছি যে আমার অন্তরের স্বরূপের উপলব্ধির ব্যাপারে বহিরঙ্গ দিকটি না হলেও চলে। কাজেই, আমি দাবী করতে পারি যে আমার জীবনে সত্যিকারের শিল্প যথেষ্টই আছে, যদিও, তোমরা যাকে বল শিল্পসৃষ্টি তা হয়তো আমার মধ্যে তোমরা লক্ষ্য নাও করতে পার। আমার ঘরের দেয়াল খালিই থাকতে পারে, এমন কি ছাদ না থাকলেও আমার কিছু আপত্তি নেই কারণ তাহ'লে আমি তারাভরা আকাশের অন্তহীন সৌন্দর্য দেখতে পাই। সেই বিরাট পটের চিত্রের সঙ্গে কি তুলনা হয় মানুষের সচেতন কোনো শিল্পসৃষ্টির সঙ্গে? সৃষ্টির মূল্য দিতে আমি অস্বীকার করছি, আমি শুধু এই কথাটাই বলতে চাই যে প্রকৃতির সৌন্দর্যের চিরন্তন প্রতীকগুলির পাশে রেখে দেখলে এদের (মানুষের শিল্পসৃষ্টিগুলি) কতো অপূর্ণ বলে মনে হয়।"

"কিন্তু শিল্পীরা দাবী করেন যে তাঁরা বহিরঙ্গ সৌন্দর্যের মধ্য দিয়েই সত্যকে দেখতে পান ও উপলব্ধি করেন।" রামচন্দ্রন বললে, "আর সেভাবে কি সত্যের সন্ধান অলভ্য?"

"আমি ঠিক উল্টোটা বলতে চাই", গান্ধিজী তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন, "আমি

সত্যের মধ্যেই সুন্দরকে দেখি, কিংবা সত্যের সাহায্যে। সমস্ত সত্যই, শুধু সত্য ভাবগুলি নয়, সত্যাশ্রয়ীর মুখ, সত্যাশ্রয়ী চিত্র কিংবা সংগীত, এসবই পরম রমণীয়। লোকে সাধারণত সত্যের মধ্যে সুন্দরকে দেখতে পায়না। সাধারণ মানুষ এ থেকে দূরে থাকে আর এর যা সৌন্দর্য সে সম্পর্কে তারা অন্ধ। মানুষ যখনই সত্যের মধ্যে সুন্দরের সন্ধান পায় তখনই সার্থক শিল্পের সৃষ্টি হয়।"

রামচন্দ্রন প্রশ্ন করল: "কিন্তু সুন্দরকে সত্য থেকে আর সত্যকে সুন্দর থেকে পৃথক করা কি যায় না?"

"আমি জানতে চাই সুন্দর বলতে ঠিক কী বোঝায়?" গান্ধিজী উত্তরে বললেন। "সাধারণ লোক কথাটি যেসব অর্থে ব্যবহার করে সেগুলোর পরস্পরের মধ্যে অনেক পার্থক্য। সুঠামাঙ্গী একটি মেয়েকে কি বলতেই হবে সুন্দরী?"

"হুঁ", রামচন্দ্রন না ভেবেচিন্তেই বললো।

"যদি", গান্ধিজী তাঁর প্রশ্নটাই দীর্ঘায়িত করে বললেন, "সেই মেয়ে হীন চরিত্রের হয় তবুও?"

রামচন্দ্রন দ্বিধায় পড়ল। একটু পরে বললে কিন্তু সেক্ষেত্রে তার মুখ শ্রীমণ্ডিত হতে পারেনা কারণ মুখ মনের দর্পণ। কিন্তু ভালো শিল্পী মুখে মনের ছবি ঠিক ঠিক ফুটিয়ে তুলতে পারেন।"

"তুমি এখন স্বীকার করছ যে বহিরঙ্গই কোনো কিছুকে সুন্দর করে তুলতে পারেনা। সত্যিকারের শিল্পীর কাছে শুধু সেই মুখই সুন্দর যা অন্তরের সত্যে ভাস্বর। এক্ষেত্রে তাহলে সত্য ছাড়া সুন্দর নেই।

আবার অপর পক্ষে সত্য এমন রূপে প্রকাশ পেতে পারে যার বহিরঙ্গ মোটেই সুন্দর নয়। শোনা যায়, সক্রেটিস ছিলেন তাঁর সময়ের সবচেয়ে সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি কিন্তু তাঁর মতো কদাকার লোক সারা গ্রীসে খুঁজে পাওয়া যেত না। আমার মনে হয়, আজীবন সত্যের সাধক ছিলেন বলেই সক্রেটিস সুন্দর। মনে করে দেখ যে তাঁর বাইরের কদর্যতা সত্ত্বেও ফিডিয়াস তাঁর আন্তর সৌন্দর্যের প্রশংসা করেছিলেন যদিও শিল্পী হিসেবে বাইরের রূপ দেখতেই তিনি ছিলেন অভ্যস্ত।"

"কিন্তু বাপুজী", রামচন্দ্রন আগ্রহের সঙ্গে বললো, "খুব সুন্দর জিনিসও তো এমন লোকেরা সৃষ্টি করেছেন যাঁদের জীবন মোটেই সুন্দর ছিল না।"

"ও কথা শুধু এই প্রমাণ করে", গান্ধিজী বললেন, "যে সত্য আর অসত্য প্রায়ই সহাবস্থান করে, ভালো আর মন্দকে প্রায়ই একত্রে পাওয়া যায়। শিল্পীদের দৃষ্টিতেও অনেক সময়ে সত্য মিথ্যা জড়িয়ে থাকে। যখন তাঁদের অবিমিশ্র সত্যদৃষ্টি থাকে তখনই যথার্থ সুন্দর সৃষ্টি সম্ভব হয়। এমন

...র্তের সংখ্যা জীবনে খুব বেশী নয়, ...প আরো কম।"

গান্ধীজীর মত রামচন্দ্রনকে ভাবিয়ে ...লো। শুধু যদি সত্যপূর্ণ কিংবা ...ল জিনিসগুলিই সুন্দর হয় তাহ'লে ...সব কিছুর সঙ্গে নীতি বা নীতি-...তা কোনোটিরই যোগাযোগ নেই সে সুন্দর হয় কেমন ক'রে? কতকটা স্বগতভাবে আর কতক স্পষ্টভাবে ...গুলি বলে সে প্রশ্ন করলে "আচ্ছা ...জী, তাহলে যে জিনিসগুলির মধ্যে ...ত অনীতি কিছুই নেই তারা স্বতই সুন্দর? ধরুন সূর্যাস্ত কিংবা ...ভরা আকাশে এক ফালি বাঁকা চাঁদ, এ সবের মধ্যে কি কোনো সত্য ...ছে?"

"নিশ্চয়ই", গান্ধীজী বললেন, ...ই জিনিসগুলি সুন্দর কারণ তারা ...দের পেছনে যে স্রষ্টা তাঁর কথা ভাবিয়ে ...োলে আমায়। যখন সূর্যাস্ত কিংবা ...দের সৌন্দর্যে আমি বিস্মিত হই, ...খন আমার অন্তর আপনা থেকেই ...ষ্টার উদ্দেশ্যে প্রণতি নিবেদন করে। ...ই সৃষ্টির মধ্যে আমি তাঁকে আর তাঁর ...ণকে প্রত্যক্ষ করতে চেষ্টা করি। ...কিন্তু তাঁকে ভাবতে আমায় সাহায্য যদি ...া করতো তাহ'লে সূর্যেরও উদয় বা ...অস্ত শুধু অন্তরায় হয়েই থাকতো। ...যা কিছু অন্তরাত্মার ঊর্ধ্ব অভীপ্সার ...পথে বাধা দেয় তাই মায়া ও বন্ধনের ...ফাঁদ; এমন কি, এই দেহও তাই যদি সে ...মুক্তির পথে বাধা হয়ে ওঠে।"

রামচন্দ্রন বললে, "শিল্প সম্পর্কে আপনার মতামত জানানোর জন্যে আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ রইলাম। আমি ...তা বুঝলাম, গ্রহণও করলাম। কিন্তু এ সম্পর্কে আপনার মতামত আপনি যদি লিখে প্রচার করেন তার দ্বারা উত্তর-পুরুষ পরিচালিত হতে পারবে।"

"সে রকম কিছু করার স্বপ্নও আমি দেখি না", মৃদু হেসে গান্ধীজী বললেন, "তার কারণও খুব স্পষ্ট, শিল্প সম্পর্কে কোনো মত প্রচার করা আমার পক্ষে অনধিকার চর্চা হবে। এ সম্পর্কে আমার মতামতে যতই দৃঢ় হই না কেন শিল্পের ছাত্র তো আমি নই। এ সম্পর্কে আমি কিছু বলতে বা লিখতে চাই

না কারণ আমার সীমা সম্পর্কে আমি সচেতন। সেই সচেতনতাই আমার শক্তি। আমার জীবনে আমি যা কিছু করতে পেরেছি তার মূলে আছে আমার সীমা সম্পর্কে আমার উপলব্ধি। আমার কাজ শিল্পীদের থেকে পৃথক. আমার এক্তিয়ারের বাইরে গিয়ে তাঁদের স্থান নেওয়া আমার পক্ষে উচিত হবে না।"

॥ ২ যন্ত্র ॥

রামচন্দ্রন তার পরবর্তী প্রশ্নে এলো : "আপনি কি সমস্ত যন্ত্রেরই বিরোধী বাপুজী?"

"তা আমি কেমন করে হ'তে পারি", অকপট প্রশ্নটি শুনে মৃদু হেসে গান্ধীজী বললেন, "যখন আমি জানি যে এই দেহও একটি সুন্দর যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়? চরখাও তো একটি যন্ত্র।

আমার আপত্তি যন্ত্র সম্পর্কে ততটা নয় যতটা যন্ত্রের জন্যে আমাদের উন্মত্ত আকাঙ্ক্ষার প্রতি। এই আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে প্রধানত সেই যন্ত্রগুলির জন্যে যেগুলিকে বলা হয় শ্রম-সংক্ষেপক (labour saving) যন্ত্র। শ্রম তো কমাতে লাগলো মানুষ, ফল হল কী? না, হাজার হাজার বেকারের সৃষ্টি হ'ল—পথের ধারে ক্ষুধায় মরা ছাড়া যাদের ভাগ্যে আর কিছুই রইলো না। আমিও সময় ও শ্রমের অপচয় রোধ করতে চাই কিন্তু তা সমাজের একাংশের জন্যে নয় সকলের জন্যে। অল্প কয়েকজনের হাতে বিত্ত এসে জমুক তা আমি চাই না, আমি চাই তা ছড়িয়ে পড়বে সকলের হাতে। আজ যন্ত্র শুধু অল্প কয়েকজনকে সকলের পিঠে সওয়ার হয়ে বসতে সাহায্য করছে। এর প্রসারের তৎপরতার পেছনে যে মনোভাব তা শ্রম কমিয়ে মানব কল্যাণ সাধনের নয়, মুনাফা শিকারের। এ ধরনের অবস্থার বিরুদ্ধেই আমি সমস্ত জীবন আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে সংগ্রাম করেছি।"

"তাহ'লে, বাপুজী", রামচন্দ্রন খুব আগ্রহের সঙ্গে বললো, "আপনার সংগ্রাম যন্ত্রের বিরুদ্ধে নয় কিন্তু তার যে রকম অপব্যবহারের এত উদাহরণ আজ চোখে পড়ে, তারই বিরুদ্ধে। তাই না?"

"আমি বিনা দ্বিধায় বলব—হ্যাঁ কিন্তু তার সঙ্গে আমি এইটুকু যোগ করতে চাই যে বৈজ্ঞানিক সত্য ও আবিষ্কারগুলিকে মুনাফা ও লোভের উপায় হিসেবে ব্যবহার করা সর্বতো রহিত করতে হবে। যন্ত্র তাহলে কল্যাণের অন্তরায় হয়ে না থেকে [illegible] সহায়ক হয়ে উঠবে। আমি সব যন্ত্রের উচ্ছেদ চাই না—তাদের ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত ও সীমায়িত করতে চাই।"

রামচন্দ্রন বললে, "আপনার [illegible] মেনে নিলে শেষ পর্যন্ত মনে হয় [illegible] রকম জটিল বিদ্যুৎ চালিত যন্ত্রকে [illegible] দিতে হবে।"

"হয়তো হ'তে পারে", গান্ধীজী বললেন, "কিন্তু একটা জিনিস [illegible] স্পষ্ট করে বলতে চাই। আমাদের [illegible] লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের মঙ্গল। [illegible] মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ক্ষয় করুক [illegible] আমি চাই না। অবশ্য কিছু যন্ত্র [illegible] উল্লেখ্য ব্যতিক্রম।

সিংগার সেলাই কলের কথা [illegible] সত্যিকারের দরকারী যে সব [illegible] উদ্ভাবিত হয়েছে এটি তারই অন্যতম। এর উদ্ভাবনের পেছনে চমৎকার [illegible] কাহিনী আছে। সিংগারের স্ত্রী [illegible] হাতে সেলাই করতেন, ফলে সময় [illegible] লাগতো আর কাজটা তো ক্লান্তিকর ছিলই। স্ত্রীর প্রতি তাঁর ভালোবাসা এই রকম একটি সেলাই-কল আবিষ্কার করতে প্রেরণা দিয়েছিল সিংগারকে। তিনি অবশ্য শুধু তাঁর স্ত্রীর নয় [illegible] অনেককেই বাড়তি খাটুনি থেকে রেহাই দিয়েছেন।"

"কিন্তু সেক্ষেত্রে সিংগার-সেলাই কল তৈরী করতে হ'লেও তো কারখানা দরকার আর সেখানে বিদ্যুৎ-চালিত সাধারণ যন্ত্রাদিও তো দরকার।"—রামচন্দ্রন বললো।

"হ্যাঁ", গান্ধীজী মৃদু হেসে রামচন্দ্রের বিরোধিতা লক্ষ্য করে বললেন, "কিন্তু আমি অন্তত এতটুকু [illegible] তান্ত্রিক যে আমি বলি, ঐ ধরনের কারখানাগুলি জাতীয়-করণ ও [illegible] চালিত হওয়া উচিত। সেখানে কাজের আকর্ষণীয় ও আদর্শ পরিবেশে [illegible] চাই। আর সেগুলির পরিচালনার [illegible]

উদ্দেশ্য হওয়া চাই লোভ ও মুনাফা নয়, —মানুষের প্রতি ভালোবাসা ও তার কল্যাণ। শ্রমিকদের যে অবস্থায় কাজ করতে হয় আমি চাই তার সম্পূর্ণ পরিবর্তন। অর্থলালসার এই পাগলামি বন্ধ করতে হবে, শ্রমিকদের প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে তারা শুধু ভালো মজুরিই পাবে না, তাদের কাজও আনন্দময় পরিবেশে করতে পারবে। এই রকম ব্যবস্থায় যন্ত্র তার মালিক রাষ্ট্র ও চালক শ্রমিক উভয়েরই মঙ্গলে আসবে।

॥ ৩ বিবাহ ॥

"আমি আপনাকে তৃতীয় যে প্রশ্নটি করতে চাই", রামচন্দ্রন বললে, "তা হ'ল এই যে আপনি বিবাহের বিরোধী কিনা?"

"তোমার প্রশ্নটি আমায় একটু বিস্তারিতভাবে আলোচনা করতে হবে", গান্ধীজী বললেন। "মানুষের জীবনের চরম লক্ষ্য মোক্ষ। হিন্দু হিসেবে আমি বিশ্বাস করি যে মোক্ষ হচ্ছে জন্মমৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্তি, সমস্ত প্রবৃত্তির থেকে নিস্তার, ঈশ্বরের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া। এখন বিবাহ হচ্ছে এই চরমলক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হবার পক্ষে একটা বাধা, কারণ দেহের বন্ধনকেই তা দৃঢ়তর করে তোলে।

ব্রহ্মচর্য বিরাট সহায়, কারণ তা ঈশ্বরে পূর্ণ আত্মসমর্পিত জীবন যাপন করতে সাহায্য করে।

সাধারণত বিবাহের উদ্দেশ্য বলতে বংশ বৃদ্ধি ছাড়া আর কিই বা বোঝায়। আর তা হ'লে বিবাহের পক্ষে তোমায় ওকালতি করতে হবে কেন। তা নিজেই নিজের প্রচার করবে। তার সংখ্যা বাড়াবার জন্যে কাউকে মাথা ঘামাতে হবে না।"

"কিন্তু আপনি সকলকেই ব্রহ্মচর্য পালন করতে বলেন যে—"

"হ্যাঁ", গান্ধীজী বললেন। রামচন্দ্রন যেন কিছু বলতে ইতস্তত করছে দেখে তিনি আবার বললেন, "তোমার আশঙ্কা যে আমার কথা মেনে চললে সৃষ্টি বন্ধ হয়ে যাবে। না—তা হবে না। আমি যা বলি তা মেনে নিলে তার যৌক্তিক পরিণতি মানব জাতির বিলুপ্তি নয়, উর্ধ্বস্তরে তার উন্নয়ন।"

"কিন্তু একজন শিল্পী, কি একজন কবি কিংবা একজন প্রতিভাশালী ব্যক্তি কি তাঁর বংশধারার সাহায্যে উত্তরকালের জন্যে তাঁর প্রতিভাকে স্থায়ী রাখতে পারেন না?"

"নিশ্চয়ই না," গান্ধীজী জোর দিয়েই বললেন, "তিনি যত সন্তানাদি পেতে পারেন তার চেয়ে অনেক বেশি শিষ্য তিনি পাবেন, আর শিষ্য পরম্পরায় তাঁর দান তিনি ভাবীকালকে যেভাবে দিতে পারেন, তেমন আর কিছুর দ্বারা নয়।

না, বিবাহের স্বপক্ষে কথা বলা ছেড়ে দাও। বিবাহের ফল শুধুই পুনরাবৃত্তি, ক্রমোন্নতি নয়, কারণ কামই বিবাহের মধ্যে সবচেয়ে বেশি জায়গা দখল করে।"

"মিঃ এন্ড্রুজ কিন্তু ব্রহ্মচর্যের ওপর আপনার এতটা গুরুত্ব আরোপ করা পছন্দ করেন না।"

"হ্যাঁ, আমি তা জানি। এ হচ্ছে তাঁর প'রে প্রটেস্টান্ট মতের প্রভাবের ফল। প্রটেস্টান্ট মত অনেক ভালো জিনিস দিয়েছে, তা মানি; কিন্তু তাতে ব্রহ্মচর্যের আদর্শকে যে উপহাস করা হয়েছে—এটা তার একটা ত্রুটি"

"কিন্তু, তার কারণ," রামচন্দ্রন বলল, যাজক সম্প্রদায় সেযুগে যে গভীর পাপাচারে পতিত হয়েছিল, তার বিরুদ্ধে প্রটেস্টান্ট মতকে লড়তে হয়েছিল।"

"তার জন্যে ব্রহ্মচর্যের মৌল আদর্শকে দায়ী করা চলে না। ক্যাথলিক মত সংযমের আদর্শের জন্যেই আজ পর্যন্ত সজীব আছে।"

॥ ৪ চরখা ॥

রামচন্দ্রনের শেষ প্রশ্ন চরখা সম্পর্কে। সে প্রথমেই গান্ধীজীকে বলে রাখলে যে, সে নিজে নিয়মিত চরখা চালায়। অবশ্য এটা তার বেশিদিনের

অভ্যেস নয়, গান্ধীজীর অনশনের* পর থেকে সে ও শান্তিনিকেতনে তার আরো তিন বন্ধু চরখা কাটতে শুরু করে। সবাই চরখা কাটুক, এটাও সে চায়; কিন্তু কংগ্রেসের পক্ষ থেকে চরখাকাটা বাধ্যতামূলক করাটা সে পছন্দ করে না। বোঝানোর নীতিই এক্ষেত্রে অনুসৃত হওয়া দরকার—এই তার মনে হয়।

* হিন্দু-মুসলমান মৈত্রীর উদ্দেশ্যে ১৮ই সেপ্টেম্বর ১৯২৪ থেকে একুশ দিন মহাত্মা গান্ধী অনশন করেন। এখানে সেবারের অনশনের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে মনে হয়।
—অনুবাদক

"তুমি দেখছি মিঃ এন্ড্রুজের চেয়ে এক ধাপ বেশি যেতে চাও", গান্ধীজী বললেন। কংগ্রেস তার সদস্যদের চরখাকাটা বাধ্যতামূলক করুন, এটা তিনিও চান না, কিন্তু স্বেচ্ছায় যারা সুতো কাটতে চায়, তাদের নিয়ে সমিতি গড়লে ও সেই সমিতি তাদের নিয়ম-কানুন বেঁধে দিলে তিনি সানন্দে তাতে যোগ দিতে প্রস্তুত। তুমি, মনে হচ্ছে এ ধরনের সমিতিরও বিপক্ষে।"

রামচন্দ্রন চুপ করে রইলো।

"আচ্ছা, তাহলে আমি তোমাকে জিগ্যেস করি," গান্ধিজী যেন যুক্তিটা উপভোগ করতে করতে বললেন, "কংগ্রেস কি সদস্যদের মদ্যপান নিষেধ করার অধিকার রাখে না, না? তাতেও কি সদস্যদের ব্যক্তিস্বাধীনতা সীমিত করা হবে?"

কংগ্রেস এরকম কিছু বললে আপত্তি উঠবে না। কেন? কারণ মদ্যপানের কুফল সম্পর্কে সবাই একমত।

বেশ, আমি তাহলে বলব যে, ভারতে যখন লক্ষ লক্ষ লোক অর্ধাশনে এবং গভীর দুঃখের মধ্যে ডুবে আছে, তখন বিদেশী কাপড় আমদানি করা আরো গর্হিত কাজ।

উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকেদের কথা ভাবো। আমি তাদের কাছে গেছলাম। এ সময় একটি কুটির-শিল্পাশ্রমে আমি যাই। সেখানে অনেক শিশুকে দেখলাম চমৎকার উজ্জ্বল, স্বাস্থ্যপূর্ণ আর হাসিখুশি তারা: কেউ কার্পেট বুনছে, কেউ টুকরি বানাচ্ছে, এমনি নানা কাজে তারা ব্যস্ত। সেখানে অবশ্য চরখা ছিল না।

আর দুর্ভিক্ষপীড়িতদের আমি কেমন দেখলাম? অস্থিচর্মসার, মৃত্যু-পথযাত্রী। তাদের এমন হবার কারণ তারা কাজ করতে চায় নি। কাজ করতে না চাওয়ার জন্যে তাদের যদি গুলী করার ভয় দেখানো হ'ত, তবে তারা বোধ হয় শেষেরটি বেছে নিত। এই শ্রমবিমুখতা পানদোষের চেয়েও খারাপ।" মাতালের কাছ থেকেও কিছু কাজ পাওয়া যায়, তার হৃদয় ব'লে কিছু অবশিষ্ট থাকে। তার বুদ্ধিরও অভাব নেই। আর এই শ্রম-বিমুখ, অর্ধাশনে থাকা লোকগুলো একেবারেই পশুতুল্য। এখন ধরনের লোকেদের দিয়ে কীভাবে ক করানো যায়? সকলের পক্ষে চরখা ক ছাড়া আমি তো কোন উপায় দেখছি ন

এক গজ বিদেশী কাপড় আমদ করা মানে এদেশের একটি গরীবের ম থেকে এক টুকরো রুটি ছিনিয়ে নেও তুমি যদি আমার মতো দেখতে পে তাহলে বুঝতে বর্তমানের সব জরুরী দরকার হচ্ছে এদেশের গরীব আনন্দের সঙ্গে রুটি রোজগারের প্র বাতলে দেয়া।

আমি চাই, কংগ্রেস হবে এমন এক নরনারীর সংস্থা, যারা চরখায় বিশ্বাস কাজেই তার সদস্যভুক্ত হওয়ার চরখাকাটা বাধ্যতামূলক করলে দোষ কি

আর, তুমি বলছ বোঝানোর কথ কংগ্রেসের প্রত্যেক সদস্য যদি নিয়মি ভাবে প্রতি মাসে কিছুটা ক'রে সু কাটে, বোঝানোর বা প্রচারের প্রকৃষ্ট পন্থা আর কী হতে পারে? নিজে যা করবে না, অন্য লোককে তা করা বললে চলবে কেন?"

রামচন্দ্রন আন্তরিকভাবে প্রশ্ন করলো, "অন্যভাবে যাঁরা দেশের কা করছেন, শুধু সুতো কাটেন না বলেই আপনি তাঁদের কংগ্রেসের বাইরে রাখতে চান?"

"কেন নয়?" গান্ধীজী বললেন। "সম্পত্তি দেখে লোককে ভোটাধিকার দেয়া হয় কেন? কেন কংগ্রেস সদস্য হতে হলে চার আনা দিতে হয়? কেন ভোটাধিকারী হতে হলে সাবালক হতে হয়? ইতালিতে আট বছরের অসামান্য প্রতিভা—সম্পন্ন বেহালা-বাজিয়েকে কি ভোট দিতে দেয়া হয়? জন স্টুয়ার্ট মিল সাত বছর বয়সে গ্রীক-ল্যাটিনের যত বড় পণ্ডিতই হয়ে থাকুন না কেন, তাঁকে তো তখন ভোটাধিকার দেয়া হয় নি। যেভাবেই ভোট-ব্যবস্থা চালানো হোক না কেন, মোট জনসংখ্যার কিছু অংশ ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হবেই।

না, আজ হয়তো তোমরা আমার কথা বুঝবে না, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি সেদিন আসবে, যেদিন লোকে বলবে, "গান্ধী লোকটা ঠিকই বলেছিল।"

অনুবাদক—অমিয়কুমার

মনে এলো

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

॥ ৩ ॥

-৭-৫৫

বই কিনতে অনেক সময় ঠকতে হয়। কতবার বেশী দাম দিয়ে নতুন কিনলাম, বছর না ঘুরতেই সস্তা স্করণ পাওয়া গেল। আমার এই ভ্যাসের মধ্যে অধীরতা ছাড়া ধনিকতার মোহ, দম্ভ প্রভৃতি রিকে দোষ রয়েছে। বুদ্ধির চর্চার ক থেকে দোষটা গুরুতর। বাইরের ঘাত না পেলে মন সজাগ থাকে না; ং অভ্যাসের ফলে এমন হয়েছে যে, কে সজাগ রাখার জন্য অনবরত আঘাত না চাই, তাই কিনে আনি। এ এক-কারের masoschism মাত্র। একেই শাদারী রোগ বলে। দাওয়াই আছে, সিক্‌স্ পড়া। পড়িও প্রায়, আজকাল ই বেশি ভালো লাগে। তবু লেভ, ং কর্ম ও জীবিকার চাপ। বিদেশী র্নালের শেষ সংখ্যা না পড়লেই তল হয়ে যাবার ভয়! অবশ্য আমাদের স্ত্র বই লেখার পূর্বে নতুন বক্তব্য ন্ধাকারে বেরোয়। সেগুলি না পড়লেই ন না। যে-বিষয়ে প্রধান আগ্রহ মাত্র ই বিষয়-সংক্রান্ত নিবন্ধ পড়লেই নকটা রক্ষা পাওয়া যায়। কিন্তু তাদের খ্যারও শেষ নেই। সারাংশগুলোতেই কতটুকু দরকারী খবর মেলে! আজ-কার চিন্তাধারা পুরানো সীমান্ত তক্রম করেই অনেক সময় চলে। অবশ্য মার আগ্রহও একাগ্র নয়। যাঁরা আমার ন্ত শিক্ষক ছিলেন, তাঁরা আমাকে গোটা দ্বে হতে শিক্ষা দেন। অধীত দ্যা মনুষ্যত্বের উপাদান হোক—এই রা বলতেন। তাঁদের উপদেশ সফল নি। একদম বরবাদ হয়েছে, বলব না। রণ, ছাত্রেরা ত' ভালোবাসছে, আর ন শুনে, কবিতা পড়ে, ছবি দেখে তো এখনও চাঙ্গা হয়!

ডাঃ ও মিসেস ফ্রাঙ্কফোর্ট-এর সম্পাদিত—'The Intellectual Adventure of Ancient Man'-এর প্রথম সংস্করণ পড়ি, বোধ হয় পাঁচ ছ' বছর আগে। গত বছর আমস্টারডাম বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্ররা আমাকে চলে আসবার সময় আরেকটি কপি উপহার দিলে। ইতিমধ্যে পেলিক্যানের সংস্করণ বেরোলো। দু' তিন কপি কিনে ছাত্রদের উপহার দিলাম। খুব ইচ্ছে হচ্ছিল, ঐ ধরনের বই আমাদের প্রাক্ বৈদিক বৈদিক যুগ সম্বন্ধে যেন লেখা হয়। 'ডিমাগ' ও 'ক্যাম্বেল'-এর বইগুলো খানিকটা ঐ ধরনের। ভারতবাসীর লেখা বই-এর সন্ধানে আছি।

যদি কেউ প্রাচীন ভারতের মনো-জগতের অ্যাড্‌ভেঞ্চার সম্পর্কে গবেষণা করতে চান, তা' হলে ফ্রাঙ্কফোর্ট প্রভৃতির বই পড়তেই হবে। কিন্তু গোটা কয়েক বিষয়ে প্রথম থেকেই সাবধান না হলে ব্যাপারটা গুলিয়ে যাবে। হরাপ্পা, মহেঞ্জোদারোর মানসিক সভ্যতা সম্বন্ধে মালমশলা কম, যদিও ধারা-বাহিকতা হয়ত খুঁজলে পাওয়া যায় না যে তা নয়। প্রথম সতর্কতাঃ (১) কেবল 'মিথস্' ও পৌরাণিক কাহিনী নিলেই চলবে না। মাত্র সেগুলি নিলে মাইথো-পিইক মনোবৃত্তি এবং কার্যশক্তি তো প্রমাণ হবেই। এবং সেই সঙ্গে সহজেই প্রমাণিত হবে যে ভারতীয় চিন্তাধারা (বৈদিক যুগের) গ্রীক চিন্তাধারা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক্, এবং ব্যাবিলন-ঈজিপ্টের সমগোত্র। অবশ্য এতে এক-প্রকার আত্মতৃপ্তি আসবে—কিন্তু সেটা যথেষ্ট নয়। মাইথোপিইক প্রতিপাদ্যের গলদ সেই লেভি-ব্রুলের গলদ, 'প্রি-লজিক্যাল' বা প্রাক্-যুক্তিনিষ্ঠ আর 'লজিক্যাল' বা যুক্তিনিষ্ঠ মনের ঐতি-হাসিক বিভাগ। কেবল তাই নয়, এও দেখছি, আদিম ব্যবহারের একই ব্যাপারে 'লজিক্যাল' আর 'নন্-লজিক্যাল' মিশে
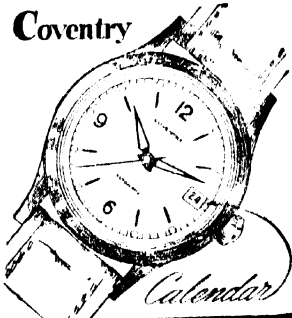
আছে। ('নন্-' আর 'প্রি-' এক বস্তু নয়।) যৌক্তিক কেমন করে অযৌক্তিকের পরে এল বুঝি না, যদি না বিশ্বাস করি যে, গ্রীক মনই সত্যকারের সভ্য মন; যদি না অবরোহ প্রণালীর জ্যামিতিক পদ্ধতিকে মনের সর্বশ্রেষ্ঠ বিকাশ ভাবি, যদি না মানসিক চিন্তাধারা সেই গ্রীকদের মত একই লাইনে চলছে, স্বীকার করি। যুক্তির দিক থেকেও—ইতিহাসের কথা না হয় ছেড়ে দিলাম—তা কি সম্ভব? এই ধরনের বিপদ থেকে প্রথমেই বাঁচতে হবে। অর্থাৎ বেদের ভাব-সংস্কারগুলোকেও বুঝতে হবে 'মিথস্' এবং কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে। ঐ দুটোর সম্বন্ধ স্থাপিত হচ্ছে ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে। ফ্রাঙ্কফোর্ট প্রভৃতির বইতে রিচুয়াল বা ক্রিয়ার বিশ্লেষণ নেই।

(২) দ্বিতীয় সতর্কতাঃ মাত্র মিথ্ ও কাহিনীর বিচার করলে আমরা বৈদিক ঋষিদের কাব্যশক্তিরই সন্ধান পাবো। অগ্নিদেবতার সঙ্গে সম্পর্ক কাব্যিক প্রাণ-প্রতিষ্ঠা না সত্তাসূচক অ্যানিমিজম্, সংজ্ঞা-জ্ঞাপক কল্পনা নাকি ক্যাসিরার-এর ভাষায় খাঁটি মৌলিক রূপকের দৃষ্টান্ত?

(৩) মাইথোপিয়াতে আরোপ হয় সকলেই জানে। সেই আরোপের প্রকৃতি বিচারের সময় যেন চরিত্রের সঙ্গে সত্ত তুলনার সঙ্গে সমতার প্রতিপাদন, ... সমতার সঙ্গে সজ্ঞানে একরূপে ... চেষ্টা গুলিয়ে না যায়।

(৪) চতুর্থ সতর্কতাঃ সমীকর... স্থান বা ক্রম-বিপর্যয়, অনুকল্প স্থা... আর মৌলিক রূপক ভিন্ন বস্তু।

(৫) শেষ সতর্কতাঃ বৈদিক যু... কল্পনাকাহিনী থেকে তার সামাজিক ও রাষ্ট্রিক অবস্থা সিদ্ধান্ত করার ... 'প্রশ্নভিক্ষা' আছে। যুক্তিটা এইপ্রকার: সামাজিক অবস্থা ও ধারণা থেকে কল্পনার জগৎ উঠেছে। অতএব কল্পনা... জগৎ থেকেই বাস্তব সামাজিক জগতে... পুরো ছবি পাওয়া যাবে। বাস্তব ও কাল্পনিক জগতের প্রকৃত সম্বন্ধ কি... এই যুক্তিতে ধরা পড়ল না। জ্ঞান বিজ্ঞা... মার্ক্সীয় সমাজ-দর্শনের বিপদ এইখানে... ম্যানহাইম, স্কেলার প্রভৃতি পণ্ডিতে... সামলাতে গেছেন, পারেননি। ম... বিজ্ঞানেও এ-বিষয়ে নতুন খবর পা... এখনও। Journal of the Histo... of Ideas- জুন, ১৯৫৫ সংখ্যা... ফ্রাঙ্কফোর্ট-এর পূর্বোক্ত সমালোচ... রয়েছে।

*

এই পত্রিকার এপ্রিল সংখ্যায় Piet... Geyl আর এক হাত নিয়েছে... টয়েনবি-র ওপর। জুন সংখ্যায় টয়ে... উত্তর দিয়েছেন। ইউট্রেক্ট-এ গেলাম ... সঙ্গে আলাপ করতে, সাহেবকে পে... না। টয়েনবি হলেন তাঁর কাছে ষাঁ... সামনে লাল কাপড়। আমারও টয়েনবি ভালো লাগে না, তবে অতখানি ... ওদেশে অধ্যাপকরা সাফ সাফ ... বলতে ভয় পান না। এখানে সা... কিছু বলেছ কি মরেছ, চিরশত্রু ... গেলে। পাৎলা চামড়া! একে স্প... কাতরতা বলা চলে না। মুলধনের অ... মার্গট অ্যাসকুইথের ভাষায়—I sh... forget but I shall ne... forgive; ভুলবো কিন্তু মাফ্ করব...

২৩।৭।৫৫

জেনেভাতে 'সামিট টকস্' চল... এভারেস্ট-কাঞ্চনজঙ্ঘা জয়ের পর শি...

পমা চালু হয়েছে। কোন উত্তেজনাই াসছে না। জার্মানীকে অ-বৈধ করাই লো। কিন্তু NATO-তে তা সম্ভব য়। য়ুরোপের সমস্যাকে প্রধান করার গে এশিয়া ও আফ্রিকায় কি ঘটছে, কে অগ্রাহ্য করার ইঙ্গিত পাই। াফ্রিকার জাগরণ আগামী পঞ্চাশ বছরের বচেয়ে অদ্ভুত ঘটনা হবে। অন্ধকার াদেশের কৃষ্ণকুটিল আক্রোশ ভয়াবহ িনিস। পন্থা কি ঐ শ্রমশিল্পায়ন না ার কিছু? গোল্ড কোস্ট-এ আমাদের তন ভদ্রলোক শ্রেণী তৈরী হচ্ছে। উত্তর-াফ্রিকার ইস্‌লাম সামাজিক প্রগতিকে াহায্য করছে বলে মনে হয় না। কল-জোরই জয় হবে শেষে, যা বুঝছি। থনে বাধা দেবার মত কিছুই নেই। াতীয়তাবাদ আর শ্রমশিল্পবাদ হরিহর।

*

সুধীন্দ্র দত্তের 'প্রতিধ্বনি' ব্রোমাইড । ঘুম যখন এলই না, তবে কেনই জাগ্রত অবস্থার সদ্ব্যবহার না করি! মিকার মন্তব্য সম্বন্ধে দুই মত থাকতে ারে; কিন্তু এই বইখানির বেলায় াত্যন্ত সত্য। তিনটে সেক্সপীয়রের নেট সুধীনের অনুবাদের সঙ্গে িলিয়ে দেখলুম। সুধীন নতুন কবিতাই েখেছেন। পরে অনুবাদের অপূর্ব ক্ষতা বুঝলাম। পরে, একসঙ্গে নয়। ইক্ষণে তার মননের অতুলনীয় সততাটাই ামাকে মুগ্ধ করছে। অনুবাদের জন্য ই কবিতাগুলোই বাছলে কেন সে? বশ্য ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তার ভালো েগেছিল জানি। তবু নির্বাচনের মধ্যে ার মনের প্রকৃতি ও ইতিহাস পাওয়া যায় কিনা, ভাবছি। অধিকাংশ কবিতায়—সবগুলিতে নয় নিশ্চয়—একটা হতাশার ছাপ রয়েছে সন্দেহ হয়। আবার পড়তে হবে।

সুধীন্দ্রের কবিতায় কি জীবন সম্পর্কে ট্র্যাজিক ধারণা, না মাত্র ব্যর্থতা-বোধ? অবশ্য সে বলবে, তাতে কিছুই আসে যায় না। এইখানে আমার সঙ্গে তার গরমিল হচ্ছে।

*

মালার্মের কবিতাটি ভীষণ শক্ত। দু-একটি ইংরেজী অনুবাদ পড়েছি। বুঝিনি। এবারও বুঝলাম না, সুধীন্দ্রনাথের ভাষ্যের সাহায্যেও। ওঁদের প্রতীকগুলো আমাদের নয়, তবে পশ্চিমী সভ্যতা যাঁদের মজ্জায় পৌঁচেছে তাঁদের পক্ষে হয়ত সেগুলি অভ্যস্ত। তবু যেন আঁতে ঘা দেয় না। মালার্মের কবিতা আমার পক্ষে একপ্রকার বুদ্ধির কুস্তি। সিম্বলিক কবিতা ভাবার্থ অতিক্রম করতে যায়, সুরের সাহায্যে। ফরাসী ভাষা জানি না, অতএব ফরাসী শব্দের অনুরণন কানে ধরা পড়ে না। বিদেশী সুর ও হার্মনিও ধরতে পারি না সব সময়। অতএব আমার পক্ষে বিদেশী প্রতীকী কবিতা মনপ্রাণ দিয়ে উপভোগ করা মুশকিল। তবু অদ্ভুত একটা কিছু মালার্মে লিখেছেন, আন্দাজ করতে পারি।

সুধীন্দ্রনাথের সনেটের হাত অতুলনীয়। ঘন অথচ সুস্পষ্ট। তার একটা শব্দ, একটা বাক্যও বদলান যায় না। (সে নিজে অবশ্য বদলায়।) এক এক সময় মনে হয় যে, গদ্যের প্যারাগ্রাফকেও সনেটের রূপে দিতে চাইছে। তার গদ্য ও পদ্য একই মনের একই ধর্ম মেনে চলে। সকলের বেলায় কি তাই? খুব সম্ভব তাই হবে। আরো কিছু যাচাই করতে হবে।

*

কেদারারা মধ্যম—ক'বার যথার্থ মধ্যম শুনেছি? তিনবারের বেশি মনে পড়ছে না। সম্মন খাঁর বড় সারেঙ্গীতে—১৯২৩(?) সালে; অলাবন্দে-নসীরুদ্দিনের মিলিত কণ্ঠে ১৯২৪ সালে; এবং জোহরা বাঈ-এর রেকর্ডে। বড়ে গোলাম আলির কেদারা রেকর্ডে শুনলাম। চমৎকার, কিন্তু সে-মধ্যম পেলাম না। গোলাম আলির স্বরবর্ণের প্রয়োগ আমার কানে অমধুর। পাঞ্জাবী ঘরানার ঐ এক প্রধান দোষ। হ্রস্ব ই ও দীর্ঘ ঈ, অ এবং ও-তে যাবার পথে 'য়্যা' হয়ে যায়। য়্যার জন্য তান শ্রুতি-কটু ঠেকে। অবশ্য ওস্তাদের কণ্ঠ এতই মধুর, তাঁর গায়নপদ্ধতি এতই সুললিত যে দোষটুকু কানে স্থান পায় না। গোলাম আলির গান সামনে বসে, মন দিয়ে, বহুবার শুনতে হবে আমাকে। যা শুনেছি তাতে মনে হয়, কপালে রাজ-তিলক নেই। তবু, অপূর্ব কণ্ঠ।

রত্নাকর

আমরা জানি যে, কান দিয়ে আমরা যে শব্দ শ্রবণ করি, সেটি বাস্তবিক পক্ষে 'শ্রবণ' নয়, 'গ্রহণ' মাত্র। শব্দের সংবাদ যতক্ষণ না স্নায়ু দ্বারা মস্তিষ্কে পরিবাহিত হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা শ্রবণ-চেতনা লাভ করিনে। কোন বস্তুর অণু পরমাণুর আন্দোলন দ্বারা যে গতির সঞ্চার হয়, সেই গতি (motion) হতেই আমাদের শরীরে অনুভূতি প্রাপ্তি হয়। এই অনুভূতিকেই আমরা নাদ, ধ্বনি, শব্দ প্রভৃতি বিভিন্ন নামে অভিহিত করি। এই ধ্বনি, সাধারণত বাতাসের মাধ্যমেই প্রসারিত হয়ে শ্রবণেন্দ্রিয়ের স্নায়ু কোষের মধ্য দিয়ে আমাদের শ্রুতিস্নায়ুতে এসে পৌঁছয়।

কর্ণ-পটহ (ear-drum) দুন্দুভির উপরকার ছাউনির মত, এক পাতলা পর্দা (membrane) দিয়ে ঢাকা থাকে, যার অন্তরালে অত্যন্ত জটিলধর্মী নানারূপ সূক্ষ্ম ও সংবেদনশীল ঝিল্লী বা তন্তু স্তরে স্তরে সাজান আছে। শব্দ কর্তৃক বায়ুতরঙ্গ কর্ণপটহে আঘাত করলেই উহাতে শিহরণ বা কম্পন জেগে ওঠে। সেই কম্পন অন্তরালের অন্তর্বর্তী বিভাগেও অনুরূপ স্পন্দন সৃষ্টি করে। শ্রবণেন্দ্রিয়ের অন্তরতম বিভাগ জলময়। শব্দের স্পন্দন কর্ণের বহির্ভাগ ও মধ্য-ভাগ এই দুইটি মহল অতিক্রম করে এসে অবশেষে এই জলে তরঙ্গ উত্থাপিত করে। এখানেই কক্লিয়া (cochlea) নামক প্রকৃত শ্রবণ-যন্ত্রের অধিষ্ঠান, যার মধ্যে স্নায়ুকোষগুলি সাজান এবং যে কোষ-গুলির সমষ্টি দ্বারাই শ্রুতিস্নায়ু প্রস্তুত হয়েছে। এই শ্রুতিস্নায়ু মস্তিষ্ক পর্যন্ত প্রসারিত বলেই আমরা কোন শব্দ শ্রবণ-মাত্রই উপলব্ধি করতে পারি।

কক্লিয়ার মধ্য দিয়ে একটি পর্দা নীচে হতে উপর পর্যন্ত বিস্তৃত। এই পর্দা কতকগুলি ছোট বড় তন্তু দ্বারা গঠিত। তন্তুগুলি যতই উপর দিকে উঠেছে, ততই দীর্ঘতর হতে হতে চলেছে। ঠিক যেন সারেঙ্গীর তরফের তার। বিভিন্ন তন্তু বিভিন্ন সুরে বাঁধা। যে কোন একটি সুর বললেই, তার অনুরূপ ধ্বনির তন্তু আপনা হতেই ঝঙ্কৃত হয়ে ওঠে (sympathetic vibration)। স্নায়ুকোষগুলি তখন সেই ঝঙ্কার বা স্পন্দনের চেতনা-গ্রহণ করে নির্দিষ্ট স্নায়ুতন্ত্রীর দ্বারা উহা মস্তিষ্কে প্রেরণ করে, উক্ত শব্দ বা স্বরের বিশিষ্ট পরিচয়টি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করে তোলে। সঙ্গীতজগতে এই আবিষ্কারটি হেলম্‌হোলৎসের একটি শ্রেষ্ঠ অবদান। শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিশ্লেষণ শক্তির কথা যতই আমরা চিন্তা করি, ততই আমরা বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে যাই। ধরুন, আমরা কোন এক সম্মেলন উপলক্ষে বিরাট এক প্রেক্ষাগৃহে বসে কোন সঙ্গীতানুষ্ঠান উপভোগ করছি। সেখানে কেবল বৃন্দবাদনই হচ্ছে না, বৃন্দ-বাদনের সঙ্গে কণ্ঠসঙ্গীতেরও পরিবেশন চলছে। এখন, যন্ত্রসঙ্গীতই বলুন আর কণ্ঠসঙ্গীতই বলুন, সঙ্গীত বলতে আমরা স্বরের বিভিন্ন প্রকারের উচ্চতা (pitch), তীব্রতা (loudness) ও স্বধর্মী বিশিষ্টতা (quality) বুঝি। এছাড়া, সেই অর্কেস্ট্রার গঠন কৌশলের মধ্যে আমরা ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্রও দেখতে পাই, যেমন ধরুন, নানাবিধ তন্তু ও তারের যন্ত্র (stringed instruments), বাঁশী-যন্ত্র (wood instruments), সঙ্গত-যন্ত্র (instruments of percussion) ইত্যাদি। হয়ত বা এই অর্কেস্ট্রার মধ্যে মধ্যে দু একটি কর্নেট বা ব্যারিটোন (brass instruments) জাতীয় যন্ত্রও আছে। এবং কেবল সুরই যে সেই আসরে আছে তা নয়, অনেক

-সুরও নিশ্চয় সেখানে আছে। যেমন ধুন, শ্রোতৃবৃন্দের আসা-যাওয়ায় পায়ের শব্দ, কানের কাছে ফিস্ ফিস্ করে কথা বলার শব্দ, ছোট বাচ্চার চীৎকার ছেড়ে কেঁদে ওঠার শব্দ, দরজা খোলা বা বন্ধ করার শব্দ, ইত্যাদি রকমারি আওয়াজ বা গোলমাল। কিন্তু আশ্চর্য এই শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিশ্লেষণ শক্তি। প্রতিটি ধ্বনি, তা সে সাংগীতিক ধ্বনিই হোক আর অ-সাংগীতিক ধ্বনিই হোক, এই শ্রবণেন্দ্রিয় সে সবগুলোকে বিশ্লেষণ করে নেবার শক্তি রাখে।

এর কারণ হচ্ছে, শ্রুতিস্নায়ু, পাঁচ-কম মিশ্রিত ধ্বনি দ্বারা যে শব্দতরঙ্গের সঞ্চার হয়, সেই যৌগিক শব্দতরঙ্গের জটিলরূপকে কখনও পরিগ্রহণ করে না। শ্রুতিস্নায়ুর কাজ হচ্ছে, প্রত্যেকটি যৌগিক শব্দতরঙ্গকে ভেঙেচুরে, তাকে সরলরূপে রূপান্তরিত করে, তবেই গ্রহণ করা। তখন এই জটিল শব্দতরঙ্গের রূপ এমনি সরল হয়ে যায় যে, মনে হয় ছোট ছোট তরঙ্গগুলি একটির পর একটি যেন পর্যায়ক্রমে কর্ণপথে প্রবেশ করছে, যেন তারা কিউ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে. এক সাথে ভিড় করে সকলেই এক সঙ্গে সেই সূচী-সমান সূক্ষ্ম দ্বারপথে প্রবেশের জন্য হট্টগোল করছে না। অথচ আশ্চর্য সংবাদ এই যে, শ্রোতার অজানিতেই এই ঘটনা নিত্য ঘটে আসছে। প্রত্যক্ষশ্রোতার নিকট শ্রবণেন্দ্রিয় এই অলৌকিক শক্তির বিষয় সম্যকরূপে পরিজ্ঞাত আছে। এখন, পূর্বোক্ত সম্মেলনের জলসাতে যে অনুষ্ঠান চলছে, তাতে ধরুন গানও হচ্ছে, তার সাথে তম্বুরাও ছাড়া হচ্ছে, তবলার সংগতও চলছে, আবার সারেঙ্গীও বাজছে। এক্ষেত্রে, আমরা ইচ্ছা করলে যে কোন একটি যন্ত্রের বিশিষ্ট স্বরটিকে আলাদা করে নিতে পারি, অন্য সব স্বর বর্জন করে। অর্থাৎ যদি ইচ্ছা করি, অন্য সব স্বরকে বধির কর্ণ দান করে আমরা কেবল তবলার বাদনই শুনতে পারি, অথবা গান ও সংগত বন্ধ করে কেবল তম্বুরার ধ্বনি শুনতে পারি। অথবা, পার্শ্বে যদি আমার স্ত্রী উপবিষ্টা থাকেন, তাঁর সঙ্গে এক ফাঁকে একটু সাংসারিক আলোচনাও করে নিতে পারি। প্রাচ্য সংগীতে অবশ্য এরূপভাবে কোন বিশিষ্ট স্বরনির্ধারণ বিশেষ কঠিন কার্য নয়, কারণ প্রাচ্য সংগীত মুখ্যত একস্বরধর্মী (unison)। কিন্তু প্রতীচ্য সংগীতে, যে সংগীতের মূলমন্ত্র হচ্ছে বহুস্বর-সম্মেলন (polyphony), এরূপ নীতি সুসাধ্য নয়। কিন্তু তবুও একটু অবহিত হলে, আমরা যে কোন একটি যন্ত্রের বা কণ্ঠের বিশিষ্ট-ধর্মী স্বরকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করে নিতে পারি।

বৈজ্ঞানিকরা বলেন যে স্পন্দনের ক্ষিপ্রগামিতার (rapidity) একটি সুনির্দিষ্ট প্রস্তর আছে। সূক্ষ্ম অনুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তির নিকট হয়ত এই সীমানার পরিসর কিছু বেশী বিস্তৃত। কিন্তু তবুও বলা যেতে পারে যে, স্পন্দন-বেগের শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য একটি বিশেষ রূপ আছে। এ'দের অভিমত যে প্রতি সেকেণ্ডে স্পন্দনসংখ্যা যদি ১৬র নীচে নামে, তাহলে সে স্পন্দন শ্রবণশক্তির অগোচরে থাকে। আবার এই সংখ্যা যদি

ঊর্ধ্বে ৩৮,০০০এর বেশী ওঠে, সেও শ্রবণশক্তির অগ্রাহ্য থেকে যায়। এই দুই সংখ্যার অন্তবর্তী স্পন্দন-চৌহদ্দীর ব্যাপ্তি প্রায় ১১ অক্টেভের সমান। এখন জিজ্ঞাসা এই যে, স্পন্দনের এই গতিবেগ কিরূপে নির্ণীত হয়? এবং কোন্ সাঙ্গীতিক স্বরের অনুরূপ কত স্পন্দন-সংখ্যা, এ-ই বা নিশ্চিতরূপে বোঝা যায় কি প্রকারে? বৈজ্ঞানিকরা এর উত্তর দিয়েছেন—'সাভার'-এর র‍্যাচেট্ চক্র (Savart's Ratchet Wheel)-এর উদ্ভাবনের দ্বারা। এই চক্রের পরিধিতে খাঁজ কেটে কেটে অসংখ্য দাঁতের সৃষ্টি করা হয়েছে। এই যন্ত্রে একটি হাতল আছে। হাতলটির মুখে একটি কার্ড ধরা হয় এবং সেই সঙ্গে চক্রটিও ঘোরান হয়। কার্ডটি এমনিভাবে বসানো যে চক্রটি ঘুরতে থাকলেই কার্ডের একটি দিক (tongue) চক্রের দাঁতের খাঁজে খাঁজে ঢুকে যায় এবং সেই ঘূর্ণায়মান চক্রের সঙ্গে সংঘর্ষে কার্ডে স্পন্দনের সৃষ্টি হয়, ঠিক যেমন সাইকেলের চাকার স্পোকে লেগে মাডগার্ডে বাঁধা পোস্ট কার্ডে আন্দোলনের সঞ্চার হয়। পরিক্রমণের গতিবেগ যতই বাড়তে থাকে, ধ্বনি ততই তার গোলমেলে আওয়াজ ত্যাগ করে সাঙ্গীতিক হতে থাকে। 'সাভার'-এর এই চক্রে যতগুলি দাঁত আছে, তাদের সংখ্যা নির্দিষ্ট। কাজেই, পরিক্রমণের সংখ্যা জানতে পারলেই আমরা স্পন্দনসংখ্যা জানতে পারি এবং কোন্ স্বরে কত স্পন্দনসংখ্যা হয়, এও জানতে পারি। এই চক্রের আবর্তনকে বিদ্যুৎ পরিচালিত করাও চলে।

বিজ্ঞানবিদ্‌রা বলেন যে, সাভার-এর এই চক্র অপেক্ষা এক প্রকারের সাইরেন (siren) দ্বারা স্বরের অনুরূপ স্পন্দন-সংখ্যার নির্ভুল পরিমাপ করা আরো বেশী কার্যকরী। এই যন্ত্রটি আর কিছুই নয়, একটি ঘূর্ণায়মান চাকতি, সেটি চাপ দেওয়া বায়ুপূর্ণ (compressed air) একটি বাক্সের মুখ পর্যায়ক্রমে একবার খোলে এবং পরক্ষণেই বন্ধ করে। বাক্সের মুখ খোলা থাকলেই বাতাস বেরিয়ে যায় এবং আবার সময় সেই চাপ দেওয়া বাতাসের মধ্যে তরঙ্গের সঞ্চার করে। এমনিভাবেই নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে বাতাস বেরুতে থাকে, এবং যেহেতু তরঙ্গের গতিবেগ অতি দ্রুত, সে সঙ্গীত স্বরের সৃষ্টি করে। চক্র আবর্তনের সংখ্যা জানতে পারলেই, প্রতি সেকেণ্ডে স্পন্দন সংখ্যাও নির্ণয় করা যায়। অর্থাৎ কোন্ স্বরের অনুরূপ কত স্পন্দন সংখ্যা এ খবরটি নিশ্চিতরূপে জানা যায়। এ ছাড়া, যে কোন তার তন্ত্র যন্ত্রের তারে দৈর্ঘ্য, ওজন ও টান (tension) যদি সঠিক জানতে পারা যায়, তা হলে অঙ্ক কষেও সেই তারে কোন স্বরের উৎপত্তি হচ্ছে সহজেই বলা যায়। কিন্তু এ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা ভবিষ্যতের জন্য তোলা রইল।

যে বেগে বাতাসের সংকোচন (compressive action) সম্প্রসারিত হয়, তাকেই শব্দের গতিবেগ বলা হয়। এ বেগের পরিমাপ সেকেণ্ডে ১১০০ ফিট। ধরুন, প্রতি সেকেণ্ডে পূর্ণ স্পন্দন সংখ্যা ২৫৬। তাহলে ১১০০ ÷ ২৫৬ =৪·২৮ ফিট হবে প্রতিটি শব্দতরঙ্গের দৈর্ঘ্য। অর্থাৎ একটি সেকেণ্ডের মধ্যে ৪·২৮ দীর্ঘ ২৫৬টি শব্দতরঙ্গ একটির পর একটি ঠিক ক্রম অনুযায়ী, বাতাসে উঠবে, ঠিক যেন কোন পুকুরের মধ্যখানে একটি ছোট ইষ্টকখণ্ড ফেলে তরঙ্গের সঞ্চার করা। একটির পর একটি তরঙ্গ উঠে শেষ পর্যন্ত কোন নতুন আবেগ বা উত্তেজনা (fresh impulse) না পেয়ে হয়ত মিলিয়ে যাবে অথবা নতুন নতুন উত্তেজনার সৃষ্টি পেয়ে সেই তরঙ্গের ক্রম অবিরাম চলতে থাকবে।

চিত্রপ্রিয়

দিল্লী

...তি বৎসরই নয়াদিল্লীতে বিভিন্ন
...শিল্পী ব্যক্তিগত চিত্র প্রদর্শনীর
...করিয়া থাকেন, এমনকি কোনো
...শিল্পী উপর্যুপরি তাঁর রচনাবলী
...করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মধ্যে
...কয়েকজনের রচনার মধ্যেই
...তা বা আপন বৈশিষ্ট্যের পরিচয়
...যায়। কিন্তু সম্প্রতি বিমল দাশ-
...যে ব্যক্তিগত প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান
...ন একাধিক কারণে তাহা রসিক
...রণের প্রশংসা অর্জন করিয়াছে।

...নীয় শিল্পী হইলেও বিমল দাশ-
...দেশের চিত্রমহলে সুপরিচিত। নানা
...নীতে তিনি পুরস্কার ও পদক লাভ
...ছেন, এদেশে ও বিদেশে বহু
...ক তাঁহার রচনা সংগ্রহ করিয়াছেন
...কি ভারত সরকারের কয়েকটি
...ও তাঁহার কয়েকটি চিত্রাদি ক্রয়
...ছেন। কিন্তু কেবলমাত্র ইহার জন্যই
...নি খ্যাতি লাভ করিয়াছেন তাহা
...শিল্পীমহলে তাঁহার খ্যাতির প্রথম
...তাঁহার মাধ্যমপ্রীতি ও ঐকান্তিক
...বিভিন্ন মাধ্যমে নানা পরীক্ষামূলক
...করিবার পর তিনি একমাত্র জল-
...ই নির্বাচিত করিয়া লন ও তদবধি
...এই মাধ্যমেই চিত্র রচনা করিয়া
...াছেন। কেবলমাত্র স্বচ্ছ জলরঙকে
...বন করিয়া অতি অল্প শিল্পীই
...হইয়াছেন।

...দর্শনীতে বিমল দাশগুপ্ত সর্ব-
...৪৭খানি রচনা পেশ করেন এবং
...ণভাবে বলিতে গেলে প্রায় সব
...নিই সুনির্বাচিত। পূর্বেই বলিয়াছি
...শিল্পী প্রাকৃতিক দৃশ্যের পক্ষপাতী।

বৃষ্টির পরে

সমগ্র প্রদর্শনীটিই নানা প্রাকৃতিক ও বাহদৃশ্যে পরিপূর্ণ। সুতরাং ইহাকে দুই ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। প্রথম ভাগে শস্যশ্যামলা বাঙলাদেশের নিজস্ব গ্রাম-প্রান্তর হইতে আরম্ভ করিয়া অন্যান্য প্রদেশের বিভিন্ন দৃশ্যাদি ও দ্বিতীয় ভাগে দক্ষিণ ভারতের বিশেষ করিয়া কেরালা ও সমুদ্র উপকূলের অন্যান্য রচনাবলী আলোচনা করিলে বিচারের সুবিধা হইবে।
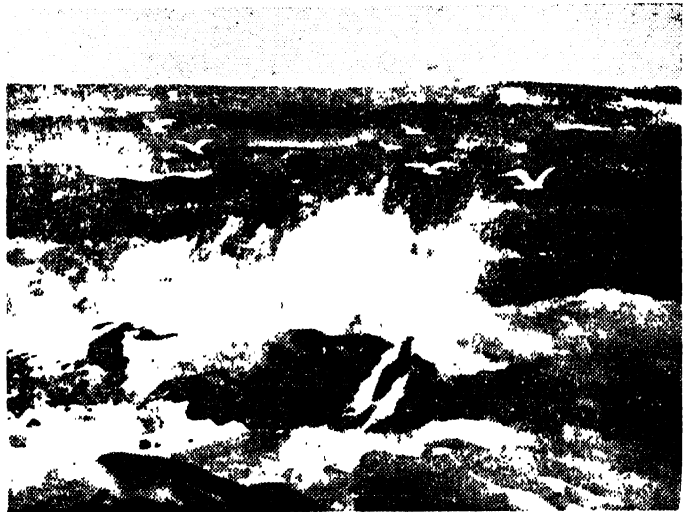
ভারতের সমুদ্র

বর্ষাকালে বাঙলাদেশের একটি বিশিষ্ট ঋতু। ইহার অশ্রুসজল রূপ নানাভাবে কবি ও শিল্পীচিত্তকে দোলা দিয়াছে। সেই জন্য প্রদর্শনীর মধ্যে সর্বাগ্রে 'বৃষ্টির পরে' চিত্রখানি সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইহার পরই চোখে পড়ে রাজস্থান ও কাশ্মীরের দৃশ্যগুলি। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই নানা মাধ্যমের সংমিশ্রণে রচিত, সুতরাং দৃশ্যগত বৈশিষ্ট্য ব্যতীত পরীক্ষামূলক রচনারীতি ও বিশেষ করিয়া আলোছায়ার সুনিপুণ প্রকাশভঙ্গিমার জন্য এগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উদাহরণ হিসাবে 'কাশ্মীরের রাস্তা', 'মরুপ্রান্তে' ও 'পাথরভাঙ্গা কল'-এর উল্লেখ করা যাইতে পারে।

সমুদ্র উপকূল ও কেরালা পটভূমিকে অবলম্বন করিয়া শিল্পী যে রচনাগুলি পেশ করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে কয়েকটিকে অনবদ্য বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। সর্বাপেক্ষা লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে বিষয়বস্তু অনেকাংশে এক হইলেও বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী ও একান্ত নিজস্ব বর্ণনা কৌশলের জন্য ইহাদের প্রত্যেকখানি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। প্রভাতকালে যে সমুদ্র অতি দুরন্ত বালকের ন্যায় অকারণ উচ্ছ্বাসে নিরন্তর সৈকতভূমিকে আলোড়িত করিয়া তুলে সন্ধ্যা সমাগমে সেই সমুদ্রই যেন আঁধারের চিররহস্যময় কৃষ্ণ আবরণে মুখখানি অবগুণ্ঠিত করিয়া বেলাভূমির সহিত অতি নিভৃত আলাপ করিয়া থাকে। সমুদ্রের এই যে বিভিন্ন রূপ—ইহা শিল্পীর চোখে ধরা পড়িয়াছে ও তিনি অতিশয় কৌশলের সহিত সুনিপুণ তুলিকা টানে সেইগুলি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

পরিশেষে একটি কথা বলা প্রয়োজন বোধ করি। সাধারণত ব্যক্তিগত প্রদর্শনীর অনুষ্ঠানকালে অধিকাংশ শিল্পীই যে ভুল করিয়া থাকেন বিমল দাশগুপ্তও সেই ভুল এড়াইতে পারেন নাই। অর্থাৎ পুরাতন ও অস্বাভাবিক পদ্ধতিতে রচিত চিত্রগুলির সহিত অতি আধুনিক, আকারপ্রধান ও তীব্র বর্ণবহুল কয়েকখানি রচনা পেশ করিবার লোভ তিনি সংবরণ করিতে পারেন নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় ইহাদের কোনোওটিই রসোত্তীর্ণ হয় নাই। অবশ্য এহেন ধারায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিবার অধিকার তাঁহার অবশ্যই আছে—তথাপি আমার স্থির বিশ্বাস অতি আধুনিকতার মিথ্যা মোহে অযথা তাঁহার সময় নষ্ট করা উচিত নহে। তিনি প্রতিভাবান শিল্পী। বস্তুতপক্ষে মৌলিকতা, বর্ণনাভঙ্গী ও তুলিকা ব্যবহারের দিক দিয়া দেখিতে গেলে সমসাময়িক শিল্পীদের মধ্যে অতি অল্প কয়েকজনই তাঁহার সমকক্ষতা দাবী করিতে পারেন। সুতরাং স্বকীয়তা বজায় রাখিয়া তিনি যদি নিজ সুনির্বাচিত পথেই দৃঢ়পদক্ষেপে চলিতে থাকেন তবেই অদূর ভবিষ্যতে এদেশের একজন শ্রেষ্ঠ প্রাকৃতিক চিত্রকর হিসাবে তিনি প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিবেন।

চক্রদত্ত

পিপিং টম" নামে একটি খুব
লী ক্যামেরা নতুন বার হয়েছে।
ক্যামেরা দিয়ে ত্রিশ মাইল দূরের
তোলা যায়। শুধু তাই নয়,
জন হলে চিক্ বা লোহার পর্দা
করেও এই ক্যামেরা দিয়ে ছবি
যায়। ১০০ ইঞ্চি একটি টেলি
লেন্স দিয়ে ক্যামেরাটি তৈরী করা
। যুদ্ধের সময় যখন ছোট
রা দিয়ে খুব দূরের ছবি তোলা
না কিংবা উড়োজাহাজ থেকেও ছবি
অসুবিধাজনক হয় তখন "পিপিং
খুব উপকারে লাগে। অবশ্য
ওয়ার তারতম্যের ওপর কতদূরের
তোলা যায় সেটা নির্ভর করে।
আবহাওয়া না হলে নিয়মানুযায়ী
মাইল দূরের ছবি তোলা সব সময়
হয় না। তবে ২০।২৫ মাইল
ছবি যে কোনও রকম আবহাওয়ায়
ভালই পাওয়া যায়। মাইল দুয়েকের
র মধ্যে যে সমস্ত ছবি তোলা
হ সেগুলো এত পরিষ্কার বোঝা
যে, তার মধ্যে একটা জীপ গাড়ি
কোনও রকম মোটর গাড়ির ছোট-
প্রতিটি অংশ স্পষ্টভাবে বোঝা যায়।
য়ে নিকটবর্তী দূরত্ব হবে ৫০০
অর্থাৎ ৫০০ গজের চেয়ে কাছের
সের ছবি আর "পিপিং টমে" তোলা
না। ক্যামেরাটিতে প্লেট ও ফিল্ম
জিনিসই ব্যবহার করা যায়। এতে
ম তোলার সময় এক সঙ্গে ত্রিশটি
পাজার দেওয়ার মত ব্যবস্থা আছে।
রাটিতে এমন বন্দোবস্ত আছে যে,
র হলে কয়েকটি ছবি তোলার পর
পাসার ওয়ালা ফিল্মগুলো ভেতর
কেটে বার করে নেওয়া যায়।
পর বাকী ফিল্মগুলোতে ইচ্ছে মত
তোলা যায়। ক্যামেরাটিতে প্রায়
রকম শাটার স্পীড্ দেবার ব্যবস্থা
। ১/২০০ সেকেণ্ড থেকে আরম্ভ
সময় দিয়ে ছবি তোলা পর্যন্ত
র স্পীডের ব্যবস্থা আছে।
রাটি এলুমিনিয়মের তৈরী। লম্বায়
ইঞ্চি, চওড়া ১২ ইঞ্চি এবং ২১
উঁচু। ৪০ পাউণ্ড লেন্সের ওজন
ও সমস্ত ক্যামেরাটির ওজন ১০০
পাউণ্ড। যে ছবি তোলা হবে সেটি দেখার জন্য টেলিস্কোপওয়ালা ভিউ ফাউণ্ডার ক্যামেরাটির সঙ্গে লাগানো আছে।

*

মোটর গাড়ির চাকা থেকে হাওয়া বের হয়ে গেলে অথবা কোন কারণে চাকা বদল করতে হলে গাড়িকে জ্যাকে তুলে তারপর করতে হয়। কিন্তু অনেক
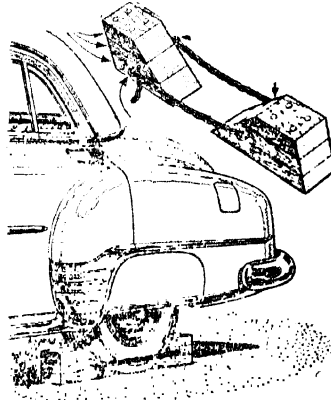
চাকার সঙ্গে কাঠের টুকরো দুটো লাগান আছে

ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, গাড়ির যে চাকাগুলো মাটির সঙ্গে লেগে আছে সেগুলো আগে কিম্বা পেছনে একটু সরে নড়ে গিয়ে গাড়ির তলায় শুয়ে অথবা নিচু হয়ে যে লোকটি কাজ করছে তার বিপদ ঘটাতে পারে। অনেক সময় যাতে মাটিতে লেগে থাকা চাকাগুলো আর না সরতে নড়তে পারে তার জন্য চাকাগুলোর সামনে পেছনে ইট পাথর অথবা কোন রকম কাঠের টুকরোর ঠেকা দেওয়া হয়। এই ধরনের ঠেকা যাতে খুব শক্ত করে দেওয়া যায় তার জন্য এক নতুন উপায় বার করা হয়েছে। কাঠের কয়েকটা টুকরো পেরেক দিয়ে জুড়ে নিয়ে একটা বড় টুকরো তৈরী করে ঐরকম আর একটা টুকরোর সঙ্গে লোহার চেন দিয়ে আটকে নেওয়া হয়। তারপর প্রয়োজন মত চেনটা ছোট বড় করে কাঠের টুকরো দুটো চাকার দুধারে শক্ত করে লাগাবার ব্যবস্থা করা যায়।

*

এককালে এক ধরনের ব্যাকটিরিয়ার হৃদ্‌যন্ত্রের বাইরের আবরণের ওপর আক্রমণের ফলে খুব মারাত্মক ধরনের রোগ দেখা দিত। পেনিসিলিনের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল যে, এই রোগ প্রায় সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা সম্ভব হচ্ছে। কিন্তু পাঁচ বছরের মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে, শতকরা ৫০ ভাগ রোগীর আর পেনিসিলিন দিয়ে কোন ফল পাওয়া যাচ্ছে না। বিশেষজ্ঞরা বলেন যে, এর কারণ হচ্ছে এ্যান্টিবাওটিকস্ প্রয়োগের ফলে ব্যাকটিরিয়াদের প্রতিরোধ ক্ষমতা ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে আর এদের ওষুধে কোন ক্ষতি করতে পারছে না। এইসব বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে, এমন একদিন আসবে যখন আর কোন এ্যান্টিবাওটিকস্ এদের ওপর শুধু কার্যকরী হবে না তা নয় এরা তখন আগের চেয়ে দ্বিগুণ শক্তিতে বাড়তে থাকবে, ফলে আগের চেয়ে অনেক বেশী মানুষ এই হৃদ্‌যন্ত্রের রোগে মারা পড়বে।

*

ডাক্তাররা বলেন যে, মানুষের উচ্চ রক্তের চাপ বংশানুক্রমে হতে দেখা যায়। এই কারণে ডাক্তাররা কোন লোকের রক্তের চাপ পরীক্ষা করতে গেলে, তার বংশের অন্য সব লোকদের সম্বন্ধে খোঁজখবর নেয়। প্রায় ৮০০টি ৪০ বছরের উর্ধ্বে রোগীর কাছ থেকে খবরাখবর সংগ্রহ করে কয়েকজন ডাক্তার প্রকাশ করেছেন যে, যে সমস্ত লোকের বাবা কিম্বা মার কোন-রকম হৃদ্‌রোগ অথবা রক্তধমনীর রোগ আছে তাদের রক্তচাপ বেশী হতে দেখা যায়। এর মধ্যে আর যদি এই ধরনের কোন রোগ থাকে তাহলে ছেলেমেয়ের ঐ

জাতীয় রোগ হবার সম্ভাবনা খুব বেশী থাকে।

*

রাত্রি বেলায় মোটরের 'হেড লাইট' না থাকলে মোটর চালান যায় না। আবার হেড লাইট থাকা সত্ত্বেও অনেক ক্ষেত্রে অনেক অসুবিধা দেখা দিতে পারে। যেমন বৃষ্টির সময় হেড লাইট থাকলেও ভাল করে রাস্তাঘাট দেখা যায় না। সেই রকম ঘন কুয়াশা হলেও হেড লাইট কোন কাজেই আসবে না। কিন্তু এক ইলেকট্রিক কোম্পানী এই হেড লাইটে [illegible] বন্দোবস্ত করেছে যে, বৃষ্টি অথবা কুয়া[illegible] মধ্যে এই আলোর কোন রকম [illegible] ঘটে না। সাধারণ অবস্থায় যে রকম [illegible] পাওয়া যায়, এতেও সেই রকম [illegible] পাওয়া যাবে।

বিজ্ঞানবিষয়ক সাহিত্য

সবিনয় নিবেদন—৪৭ সংখ্যা দেশ পত্রিকায় "আলোচনা" প্রসঙ্গে শ্রীবিন্দুমাধব ঘোষ মহাশয় "আণবিক বোমা" কথাটি সমর্থন করেছেন। কথাটি সম্পূর্ণ ভুল। ইংরেজি কথা হল "অ্যাটম বম্"। অ্যাটমের বাংলা অণু নয়, পরমাণু, অতএব "আণবিক বোমা" শুদ্ধ নয়। পরমাণবিক বোমা লিখতে বা বলতে যদি অসুবিধা হয় অ্যাটম বোমা বলতে বা লিখতে আপত্তি কি? আর আমরা অ্যাটম বোমাই বলে থাকি। বিশ বছর আগে "ব্ল্যাক-আউট" কথার অর্থ কজন বুঝতেন কিন্তু আজ সকলেই বোঝেন।

রবীন্দ্রনাথ ও পরবর্তী লেখকগণ বাংলা ভাষাকে অনেক উদার করেছেন এবং মনে হয় এখন মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। আরও "আণবিক বোমা" ঢুকিয়ে তাকে আরও উদার করা হবে কিনা ভেবে দেখবার সময় এসেছে। ইতি—অমর সেন, কলিকাতা।

পথের পাঁচালী

মহাশয়,—"পথের পাঁচালী" চলচ্চিত্রের সম্বন্ধে শ্রীসত্যজিৎ রায় মহাশয়ের প্রশংসনীয় শিল্পদক্ষতার বহু সমালোচনা বিভিন্ন সংবাদ-পত্রাদিতে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু ছবিখানি তোলার যে সব মূল উপাদান ও তথ্যের দিক-গুলি সমালোচকগণের সমালোচনার অন্তর্ভুক্ত হওয়া সম্ভবপর হয়নি, আমি বোড়াল গ্রামবাসী ও একজন প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে সেই দিক-গুলির কিছুটা এখানে বলব।

আজ থেকে প্রায় তিন বছর আগে 'পথের পাঁচালী' তোলার পরিকল্পনা নিয়ে সত্যজিৎ বাবু একজন সহকর্মীর সঙ্গে একদিন বোড়াল গ্রামে কবি রাজনারায়ণ বসু স্মৃতিমন্দিরে আসেন। গাঁয়ের ভিতর হঠাৎ সত্যজিৎবাবুর মত এক সুদীর্ঘ, বলিষ্ঠ ও সুন্দর চেহারার লোক দেখে আমরা সব অবাক হয়ে যাই। কিন্তু তাঁর অমায়িক ব্যবহারে গ্রামের যুবকবৃন্দ সকলেই তাঁর প্রতি সহজেই আকৃষ্ট হন। তাঁর কথা মত আমরা তাঁকে বোড়াল গ্রামের পথ ঘাট, এঁদো পোড়ো বাড়ি, বন জঙ্গল, লতাপাতা, নালা ডোবা দেখাতে লাগলাম। তিনিও তাঁর সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে প্রতিটি দৃশ্য, প্রতিটি বিষয়বস্তু ও গ্রামের প্রতিটি লোকের চেহারা দেখতে থাকেন। পরে চারিদিকে ঘন বনে ঘেরা শিয়াল, বরাহ, সাপ ও তক্ষকের আড্ডা—একটি পোড়ো বাড়ী তিনি মনোনীত করলেন। এই বাড়ীটিই হল 'পথের পাঁচালী'র প্রাণকেন্দ্র।

ঐ পোড়ো বাড়ীটিকে আরও করুণ ও আরও চিত্তাকর্ষক করবার জন্য তিনি নিরালায় একাকী বসে বসে বাড়ীটির পরিবেশের রদ-বদল করতে লাগলেন দীর্ঘকাল যাবৎ। বন-ঝোপে ঘেরা এই পোড়ো বাড়ীটির মধ্যে ঢুকে তিনি তাঁর নিজ পরিকল্পনার রূপদানের সাধনায় মগ্ন হয়ে যেতেন। সত্যজিৎ বাবু ঐখানেই থাকতেন সারাদিন—আর ঐ পোড়ো বাড়ীর মধ্যে নিজে যা পারতেন রেঁধে বেড়ে খেতেন। বেশী লোকের ভিড় জমতে দিতেন না ওখানে। আমরা দু'একবার চেষ্টা করে দেখেছি বাড়িতে এনে ওঁকে খাওয়াতে [illegible] রাজী হননি উনি কোনো বারেই। ওঁর [illegible] ভঙ্গ করতে আমরা বেশী সাহসও [illegible] এই বাড়িটি ছাড়া গ্রামের মহেন্দ্র মুখার্জী[illegible] একটা পুরনো দোতলা বাড়ি, "বকুল [illegible] নূপেন ঘোষের পোড়ো বহির্বাটী, মদনমোহ[illegible] নাটমন্দির ও ভেসেকেপদ জীর্ণ দুটি শিব[illegible] মনোনীত করেন। চিত্রে এগুলির দৃশ্য[illegible] প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

আরও একটা মজার কথা আছে। ইন্দ্রি[illegible] ভূমিকায় শ্রীহরিমোহন নাগ ও চুনি[illegible] ভূমিকায় শ্রীহরিধন নাগকে বোড়াল [illegible] মধ্যে একবার দেখেই সত্যজিৎবাবু মনে [illegible] ওঁদের ঠিক করে রেখেছিলেন; কিন্তু [illegible] তোলার সময় ওঁদের নাম না বলতে [illegible] গ্রামবাসীরা ওঁদের হাজির করতে পারেনি[illegible] না। তখন সত্যজিৎবাবু সঙ্গে সঙ্গে হ[illegible] বাবু ও হরিমোহনবাবুর অবয়ব [illegible] স্কেচে একটা কাগজের ওপর এঁকে দি[illegible] হুবহু আঁকা ছবি দেখে ওঁদের এনে কা[illegible] সামনে হাজির করতে আর কারও [illegible] বেগ পেতে হল না। অপূর্ব তাঁর চিত্র[illegible] প্রতিভা।

চিত্রে তক্ষকের (চতুষ্পদবি[illegible] সরীসৃপ) ডাক শুনতে পাবেন। ওটা [illegible] কাল্পনিক যান্ত্রিক শব্দ নয়। বোড়াল গ্রা[illegible] পোড়ো মন্দির ও বাড়ির ফাটলে পুরানো [illegible] বহু তক্ষক আছে। সত্যজিৎ [illegible] তক্ষকের ডাক শব্দযন্ত্রে ধরিয়েছেন। এ[illegible] এঁদো পুকুরের জলে ধাই মশার (অ[illegible] মাঁকড়শার মত দেখতে) খেলা, কলমী[illegible] আশ পাশে গাঙ ফড়িং-এর আনন্দ[illegible] ঝিল্লিরব, বাতাসলাগা পদ্মবনের [illegible] ঝিলমিল, কাশবনে হাওয়া লাগা [illegible] তরঙ্গ ঝরা বাঁশপাতা বিছান ঘন বাঁশ[illegible] সুদূরপ্রসারী সরু পথ বাঁশে বাঁশে ঘষা[illegible] কটাস শব্দ মাঝ প্রকৃতির নানা দৃশ্য ও [illegible] [illegible] গম্ভীর মূর্তি এই সমস্ত 'পথের পাঁ[illegible] সম্পূর্ণ ছবিখানিকে এমনই এক অনাস্ব[illegible] পূর্ব ভাবধারায় আপ্লুত করে তুলেছে [illegible] দর্শকমনে জাগিয়ে দেয় এই অসীম [illegible] জীবন রহস্যকে ভেদ করে পূর্ণানন্দ [illegible] করবার এক আকূতি।—শ্রীবিভূতিভূষণ [illegible]

ধীরাজ ভট্টাচার্য

॥ দশ ॥

সকালে ঘুম থেকে উঠে সবার আগে তাকাই ক্যালেণ্ডারের পাতার ।। বড় বড় কালো অঙ্কের সংখ্যা- া নির্দয়ভাবে মনে করিয়ে দেয় ারের এখনও অনেক দেরি, আজ সবে ার। হতাশায় চোখের পাতা দুটো নিই বুজে আসে, চুপ করে শুয়ে । কখনও ভাবি, উইক-ডেজের মধ্যে ার খিদিরপুরে সারপ্রাইজ ভিজিট এলে কেমন হয়? তখনই মনে পড়ে রে রিনি থাকবে স্কুলে আর কাকা ফসে। বাড়ি থাকবেন শুধু কাকিমা মোক্ষদা। সুতরাং না যাওয়াটাই বরং ধমানের কাজ।

দুপুরে খেয়ে-দেয়ে ভাবলাম যাই ার হেড আফিসে, সময়টা তবু র। বোধ হয়, একটু সকাল সকালই পড়েছিলাম। জ্যোতিষবাবুর ঘর ও খালি, তখনও এসে পৌঁছোন নি। খানা চেয়ার টেনে বসে ড্রয়ার থেকে লিনী' বইখানা বার করে লাল নীল সলে দাগানো পাতাগুলোর উপর বোলাতে লাগলাম

কানে এল গুরুগম্ভীর আওয়াজ— ইউ প্লীজ টেল্ মি হোয়ার ক্যান মীট ডায়রেক্টর ব্যানার্জি?'

প্রশ্নকারিণী বছর চল্লিশের একটি া অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মহিলা, দরজার ই দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসু চোখে আমার দিকে চেয়ে আছেন। উঠে দাঁড়িয়ে বললাম —'দিস্ ইজ হিজ চেম্বার। হি ইজ একস্পেকটেড্ এনি মোমেণ্ট। প্লীজ টেক ইয়োর সীট্।'

বসলেন না। ঐভাবে দাঁড়িয়ে গম্ভীর-ভাবে ডাকলেন—'লোলা!'

বছর আঠারো উনিশের একটি গোল-গাল মেয়ে মহিলাটির পাশে এসে দাঁড়াল। এ রকম গোল স্বাস্থ্যবতী মেয়ে আমি এই প্রথম দেখলাম। মুখ থেকে শুরু করে দেখলাম, লোলার সর্বাঙ্গ নিটোল গোল। ইচ্ছে করেই টাইট ফিটিং পাৎলা গাউনটা পরেছে কি না জানি না, মনে হচ্ছিল একটু জোরে হাসলে বা হাঁচলে কিংবা কোনও রকমে লোলাকে একটু ইমোশ্যানাল করে দিলেই গাউনটা ফেটে চৌচির হয়ে কাপড়ের টুকরোগুলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে।

লোলাকে সঙ্গে নিয়ে মহিলাটি ঘরে ঢুকে একখানা চেয়ার টেনে বসে পড়লেন। লোলা বসল না, একখানা চেয়ার ধরে দাঁড়িয়ে ঘরময় চোখ বুলিয়ে দেখতে দেখতে হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল— 'আমি লুক্।'

ওর বিস্ফারিত দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখলাম, একখানা ছবিওলা বাংলা ক্যালেণ্ডার। যমুনার তীরে কদম গাছে নীল রঙের কেষ্ট পা ছড়িয়ে বসে বাঁশি বাজাচ্ছেন, আশেপাশে ডালে ঝোলানো রয়েছে অনেকগুলো রঙ-বেরঙের শাড়ি ও ডুরে কাপড়। নীচে যমুনায় হাঁটু-জলে দাঁড়িয়ে গোপিনীর দল এক হাতে কোনও রকমে লজ্জা রক্ষা করে অন্য হাতে কৃষ্ণের কাছে কাপড় চাইছে।

এর আগে অনেকবার ছবিটা দেখেছি কিন্তু আজ যেন ওর অন্য একটা রূপ চোখের সামনে বেশী করে ফুটে উঠলো।

লোলার মা কষে এক ধমক দিয়ে উঠলেন—'ডোণ্ট বি সিলি লোলা, সিট ডাউন।'

একটু অপ্রস্তুত হয়েই যেন চেয়ারটায় বসে পড়ল লোলা, তারপর এই প্রথম আমার দিকে চেয়ে দেখল। ড্যাবডেবে সরল চাহনি। বুঝলাম, মায়ের কড়া শাসনে এখনও ও চোখে অন্য পুরুষের ছায়া পড়বার সুযোগ পায়নি।

হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকলেন জ্যোতিষবাবু। সোলার টুপিটা মাথা থেকে খুলে একরকম ছুঁড়ে ফেললেন টেবিলের উপর, তারপর হাতের লাল ফিতে বাঁধা ফাইলটা খুলতে খুলতে বললেন—'হাওড়া পুলের উপর গাড়ি জাম। বলো কেন আর দুর্ভোগের কথা।'

লোলার মাকে উদ্দেশ করে বললাম— 'হিয়ার ইজ্ ডায়রেক্টর ব্যানার্জি।'

লোলার মার গোমড়া মুখ হাসিতে

ভরে গেল। উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন—'আই অ্যাম্ মিসেস সিমসন, দিস ইজ মাই ডটর লোলা।'

করমর্দনের পালা শেষ করে লোলার দিকে হাঁ করে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন জ্যোতিষবাবু।

মিসেস সিমসন বললেন—'হামিদের কাছে শুনলাম আপনি আগামী নতুন ছবির জন্যে হিরোইন খুঁজছেন, তাই আমার মেয়েকে নিয়ে এসেছি।'

হামিদ কোরিন্থিয়ান থিয়েটারের এক-জন দালাল। মেয়ে সংগ্রহ করাই ওর কাজ।

জ্যোতিষবাবু বললেন—'ওর কোনও ফটো আছে কি?'

বলা বাহুল্য কথাবার্তাগুলো ইংরাজিতেই হচ্ছিল। ফটোর কথায় মিসেস সিমসন দ্বিধাভরে মাথা নাড়লেন দেখে, লোলা উৎসাহভরে বলে উঠল—'মাম্মি! আমার সেই বেদিং কস্টিউম পরে তোলা ছবিটা—'

শুধু একটা চাহনি। কথার চাইতে যে কত বেশী কাজ হয় ওতে, মিসেস সিমসনের ছোট্ট একটা চাউনিতে নিমেষে সঙ্কুচিত হয়ে লোলাকে মুখ নীচু করে বসতে দেখে সেদিন তা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করলাম।

মিসেস সিমসন বললেন—'না, কোনও ছবি ওর তোলা নেই। যদি বলেন তো একটা তুলে আপনাকে দেখাতে পারি।'

জ্যোতিষবাবু বললেন—'বেশ কথা, ছবিটা তুলে পরের সপ্তাহে আমাকে দেখাবেন।'

বিদায় নমস্কার করে মা-মেয়েতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। এতক্ষণে বসে সিগারেট ধরালেন জ্যোতিষবাবু। বললাম—'নেবেন না মেয়েটাকে জানি। মিছিমিছি ছবি তুলিয়ে আনতে বললেন কেন?'

আমার দিকে চেয়ে নিঃশব্দে সিগারেটে দু তিনটে টান দিলেন জ্যোতিষবাবু, তার-পর বললেন—'মিছিমিছি নয়, ওর একটা হিল্লে আমি করে দেবো।'

কিছু না বুঝতে পেরে চুপ করে চেয়ে রইলাম।

জ্যোতিষবাবু বললেন—'ঐ হিউম্যান রোলারকে আমি ইউটিলাইজ করতে পার[ব] না এটা ঠিক। যে পারবে, তার হাতেই তু[লে] দেবো।'

হেঁয়ালির কথা, বললাম—'কে?'

'—জাল সাহেব।'

কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই দুজ[নে] হো হো করে হেসে উঠলাম। হাসির বে[গ] একটু কমে এলে জ্যোতিষবাবু বললেন 'সাধারণ ফটোটায় যদি দেখি কাজ হল ন[া] তখন ঐ বেদিং কস্ট্যুম পরা ছবিটা জা[ল] সাহেবকে দেখাতে বলব। ব্যস্, নির্ঘা[ৎ]

আবার হাসতে যাবো, একজন বেয়া[রা] ঘরে ঢুকে সেলাম করে একটা সাদা কাগজে[র] চিরকুট জ্যোতিষবাবুর হাতে দিল। এ[ক]বার চোখ বুলিয়েই জ্যোতিষবাবু বললেন 'যা ভেবেছি তাই। একে আসতে দেরি, ত[ার] উপর হিরোইন এখনও ঠিক হয়নি। আ[জ] রুস্তমজী সাহেবের কাছে নির্ঘাৎ বকুনি' বেয়ারাটার দিকে চেয়ে বললেন—'য[া] গিয়ে বল, আমি যাচ্ছি।' আবার সেল[াম] করে বেয়ারাটা চলে গেল।

ফাইলটা ফিতে দিয়ে বেঁধে নি[য়ে]

সময় জ্যোতিষবাবু বললেন—'বসো
ন্ন, আমি আধ ঘণ্টার মধ্যেই আসছি।'
হাসি গল্পে তবু সময়টা কাটছিল।
করি কি? মনের অগোচর পাপ নেই,
র বারান্দাটার উপর একটা সতর্ক
বুলিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে গোপিনীদের
হরণের ছবিটা আবার নতুন চোখে
ত লাগলাম। কতক্ষণ ঐভাবে ছিলাম
নেই। হঠাৎ কি একটা আওয়াজে
ফিরে দেখি, পান দোক্তাভরা মুখে
আমার পিছনে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে
গ কাঁপিয়ে হাসছে মনমোহন। লজ্জা
ন বললে মিথ্যা বলা হবে। ওটা চাপা
ার জন্যে হেসে বললাম—'আজকাল
কর্ম ছেড়ে এ-ঘরে ও-ঘরে আড়ি পেতে
স কেন বলতো?'
ইচ্ছে থাকলেও কথা কইবার উপায়
না মনমোহনের। খপ করে আমার
ানা হাত ধরে হিড় হিড় করে টানতে
ত নিয়ে চললো বারান্দার পশ্চিম
ণ। রেলিং-এর কাছে এসে হাত ছেড়ে
কাছের একটা নর্দামায় গালভর্তি
পিক ফেলে চোখ ইশারায় সামনের একখানা ঘর দেখিয়ে চুপি চুপি বললে—'দেখ!'

দেখলাম।

সামনে দক্ষিণ দিকে ছোট একটা ঘরে একটা চেয়ারে ন্যাশনাল ড্রেসে মানে কালো পার্শি কোট ও লম্বা পার্শি টুপি মাথায় বসে আছেন ম্যাডানের শ্রেষ্ঠ ক্যামেরাম্যান-পরিচালক জাল সাহেব। সামনে একটা ছোট টেবিল তার পাশে আর একখানা চেয়ারে বসে আছেন—দেখেই বাকশক্তি রহিত হয়ে গেল আমার। বসা অবস্থাতেই অনুমান করা মোটেই শক্ত নয়, লম্বা ছ' ফুটের বেশী। মাথায় পাতলা রঙিন ওড়না, চোখে সুরমা, ঠোঁটে রঙ। পরনে সালওয়ার আর তার উপর হাঁটু পর্যন্ত ঝোলানো জরিদার ঘাগরা বা ঐ জাতীয় ঢিলে জামা পরে বসে আছে এক বিরাট—।

কানের কাছে মুখ এনে ফিস্ ফিস্ করে মনমোহন বললে—'পাঠানী! লাহোর থেকে আমদানী করেছে জাল সাহেব।'

হাঁ করে চেয়েই আছি। হাসি-খুশিতে জাল সাহেবের মুখখানা সিঁদুরের মত টকটকে লাল হয়ে উঠেছে। ভাঙা-ভাঙা উর্দুতে কি একটা বলতেই দেখলাম, পাঠানী কপট ক্রোধে ঘুঁষি বাগিয়ে হাত তুলেছে জাল সাহেবকে মারতে। হাতের কব্জি দেখেই আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেল। মনে হল, যে কোনো ব্যায়ামবিদের ঈর্ষার বস্তু। হঠাৎ উদ্যত ঘুঁষি বাগানো হাতখানা নামিয়ে একটা আঙুল দিয়ে জাল সাহেবের বুকে একটা খোঁচা দিয়ে হাসিতে চৌচির হয়ে ফেটে পড়ল পাঠানী। জাল সাহেবের তো কথাই নেই। ভয় হচ্ছিল, হাসতে হাসতে চেয়ার থেকে পড়ে না যায়।

অবাক হয়ে বললাম—'করছে কি ওরা?'

মনমোহন বললে—'রিহার্সাল দিচ্ছে।'

কি রিহার্সাল দিচ্ছে জিজ্ঞাসা করা বৃথা। জাল সাহেবের সব কাজেই একটা আরিজিন্যাল টাচ্ থাকবেই। তবুও সংশয়-ভরে জিজ্ঞাসা করলাম—'বাংলা দেশের হিরোইনরা কি দোষ করল যে লাহোর থেকে—'

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে মনমোহন

বললে—শুধু বাংলা? বাংলা বিহার উড়িষ্যা জাল সাহেবকে হিরোইন না দিতে পেরে লজ্জায় মুখ নীচু করে আছে। শেষ-কালে কোরিন্থিয়ান থিয়েটারের একজন মুসলমান অভিনেতা দোস্ত মহম্মদের কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে জাল সাহেব নিজে লাহোরে গিয়ে দিন পনেরো থেকে ঐ মৈনাক পর্বত ঘাড়ে করে কলকাতায় নিয়ে এসেছে।'

কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—'কি এমন ছবি, যাতে ঐ হস্তিনীকে হিরোইন না করলে চলতো না! নাম কি ছবিটার?'

উত্তরে এমন একটা খটোমটো উর্দু নাম করল মনমোহন যা উচ্চারণ করতে দাঁত ভেঙে যায়, চেষ্টা করেও নামটা মনে রাখতে পারিনি। বললাম—'ওর নাম কি?'

মনমোহন বললে—'গুলজার বেগম। দেখছিস না, এসেই নরক গুলজার করে বসেছে।' হঠাৎ দৃষ্টি নামিয়ে চোখ দুটো বিস্ফারিত করে মনমোহন বললে—'দ্যাখ দ্যাখ টেবিলটার নীচে চেয়ে দ্যাখ।'

দেখলাম গুলজার বেগমের বেড়রুম স্লিপার পরা পা দুটো নিয়ে জাল সাহেব ফুটবল খেলছে আর হাসিতে ফেটে পড়ছে।

অজ্ঞাতে একটা মারাত্মক অপরাধ করে ফেললাম, সশব্দে হেসে উঠলাম। পর-মুহূর্তে দেখি, হাসি থামিয়ে দু-জোড়া ক্রোধরক্তিম চোখ আমাদের দিকে চেয়ে আছে। মাত্র কয়েক সেকেন্ড, তারপর জাল সাহেব চেয়ার থেকে উঠে সবলে দরজাটা বন্ধ করে দিলে।

বেশ একটু অপ্রস্তুত হয়ে দুজনে পরস্পরের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলাম। একটু বিরক্ত হয়েই মনমোহন বললে—'দিলি তো হেসে সব মাটি করে! নাঃ তোকে ডেকে আনাটাই ভুল হয়েছে।'

হেসে জবাব দিলাম—'আরও কিছু দেখবার আশা করছিলি নাকি?'

কোনও জবাব না দিয়ে আস্তে আস্তে জাল-গুলজারের সীমানা ছাড়িয়ে পু দিকের রেলিং ধরে রাস্তার দিকে চেয়ে দাঁড়াল মনমোহন। অপরাধীর মত আমি পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। একটু চুপ করে থেকে বললাম—আচ্ছা, তোর কাজ হল কাঁচি দিয়ে ফিল্ম কেটে আঠা দিয়ে সেগুলো জুড়ে দেওয়া, সে সব ছেড়ে সব সময় এর ওর তার পেছনে ঘুরে ঘুরে অকারণ তাদের হাঁড়ির খবর সংগ্রহ করে বেড়াস কেন বলতে পারিস?'

বর্ষার আকাশ মনমোহন, এই রোদ্দুর এই বৃষ্টি। মেঘ কেটে গেল, খুঁতখুঁত করে খানিকটা হেসে নিল। তারপর বললে—'এমনি। বন্ধ ঘরে বসে একরাশ ফিল্ম কাটা আর জোড়া আমার ভাল লাগে না। শুধু মেসোমশায়ের ভয়ে মাঝে মাঝে গিয়ে বসি।'

জিজ্ঞাসা করলাম—'জাল সাহেবের এই নতুন ছবিটার গল্প জানিস?'

সবজান্তা মনমোহন তখনি উৎসাহভরে মাথা নেড়ে বলতে শুরু করলে—'অদ্ভুত গল্প। শুনবি? সাধারণ গল্পে কি হয়, হিরোরাই সব বীরত্বের কাজ করে। যুদ্ধ জেতে, দুশমনকে শায়েস্তা করে, এই তো। জাল সাহেবের এ গল্পে ঠিক তার উল্টো। হিরোইনই সব। নায়ক বুদ্ধুর মত মার খেয়ে বাড়ি আসে আর তখন নায়িকা একখানা তলোয়ার নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে অগুন্তি শত্রুদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে যুদ্ধ করে একাই চার পাঁচ শো লোককে কচু কাটা করে বুক ফুলিয়ে ফিরে আসে। বুঝলি কিছু?'

বোকার মত মাথা নাড়লাম। হেসে ফেললে মনমোহন, তারপর বললে—'আরে মুখ্যু, এটা বুঝলি না? 'ঝাঁসীর রাণী' নাটক থেকে এ আইডিয়াটা জাল সাহেবের মাথায় ঢুকেছে। সাহেবদের বুঝিয়েছে—এ ছবি শিওর হিট।'

জিজ্ঞাসা করলাম—'ছবিটা কি ঐতিহাসিক?'

...কটু ভেবে নিয়ে জবাব দিলে মন-...—'না, সামাজিক। হিরো-হিরোইন গরীব, গাঁয়ের শেষ প্রান্তে পাহাড়ের ... কাছে কুঁড়ে ঘরে বাস করে। ...তের একদল ডাকাত মাঝে মাঝে এসে হানা দেয়, গাঁয়ের লোকজনদের ধরে তছনছ করে—সেই সময় আমাদের ...লেজার বেগম তলোয়ার হাতে তাদের ঝাঁপিয়ে পড়বে। এবার বুঝলি হাঁদা-...'

জাল সাহেবের বন্ধ দরজাটার দিকে চুপ করে রইলাম।

...নমোহন বললে—'সেদিন কোরিন্থিয়ান ...টারের অডিটরিয়ামে বসে গল্পটা পড়া ...ল। পিছনে অন্ধকারে একখানা চেয়ারে ...যা শুনেছিলাম তাই তোকে বললাম।'

আমি আবার প্রশ্ন করলাম—'হতভাগ্য ... কাকে দেওয়া হল? এর জন্য আবার ...াল সাহেবকে কাবুল কান্দাহার পাড়ি ... হয়।'

মনমোহন বললে—'দূর, তা কেন? ...রিন্থিয়ান থিয়েটারের তালগাছের মত ...বিশ্রী চেহারা দোস্ত মহম্মদ, সেই ...। আরে সেই বেটাই তো ভুজুং দিয়ে ...জার বেগমকে আনতে জাল সাহেবকে ...র পাঠালে। ও বেশ জানে গুলজার ... ছাড়া ওর ভাগ্যে নায়কের পার্ট ...য়া অসম্ভব। আর তা ছাড়া অন্য ও গোপন ব্যাপারও হয়তো আছে, ও জানতে পারিনি।'

—'কত মাইনে ঠিক হলো?'

—'মাসে পাঁচশো টাকা।'

অবাক হতে যাচ্ছি, হাত তুলে বাধা ... মনমোহন বললে—'শুধু এই? তবে ...। দিন চারেক আগে দুপুরের দিকে বারান্দায় দাঁড়িয়ে পান খাচ্ছি। এক-...মাল বোঝাই লরি এসে দাঁড়াল। ... তিন চার বদনা, ঘটি, গোটা তিনেক ...ড়া, গোটা সাতেক বড় বড় বেডিং, ... বড় কাপড়ের পোঁটলা গোটা আষ্টেক, ...ছাড়া অনেকগুলো ছোট বড় অ্যালু-...মিনিয়মের ডেকচি হাঁড়ি, দুটো ঝুড়িতে ... মাটির ডিনার প্লেট, চায়ের কাপ ... কত নাম করব। লরিটার পিছনে ...খানা ট্যাক্সি, তাতে লোক ঠাসা। প্রথমে ...লাম, বোধ হয় কোরিন্থিয়ান থিয়েটার ...ই বায়নায় বিদেশে যাচ্ছে। হঠাৎ দেখি, একটা ট্যাক্সির দরজা খুলে নামল জাল সাহেব। আগে শুনেছিলাম হিরোইন আনতে জাল সাহেব লাহোর গিয়েছেন। সমস্ত ব্যাপারটা জলের মত পরিষ্কার হয়ে গেল। একরকম ছুটে নীচে নেমে গেলাম।

'ফুটপাথের উপর থেকে একবার উঁকি দিয়েই চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গেল। দেখলাম, তিনখানা ট্যাক্সিতে গুড়ের কলসির মত ঠাসা গুলজারের সংসার। ওখানে দাঁড়িয়েই কানাঘুষো শুনে গুণে দেখলাম, ওর নানী, ফুফু, ভাবী, গোটা তিনেক ভাই, তাদের আন্ডাবাচ্চা সব মিলিয়ে সতের আঠারো জন। জাল সাহেব লরির কাছে এসে মাল নামাতে হুকুম করলেন—এমন সময় দেখি, মদের দোকানটার বাইরে এসে দাঁড়ালেন রুস্তমজী সাহেব। জাল সাহেব তাড়াতাড়ি কাছে এসে ওদের দেখিয়ে কি যেন বললেন। কোনও জবাব না দিয়ে রুস্তমজী সাহেব ঢুকে পড়লেন কাঁচের পার্টিশন দেওয়া ঘরে। হাত মুখ নেড়ে কি সব বলতে বলতে জাল সাহেবও সঙ্গে গেলেন। একটু পরে দেখি, গম্ভীর হয়ে বেরিয়ে এলেন জাল সাহেব—তারপর গাড়ি-গুলোকে হাত দিয়ে এগিয়ে যেতে বলে গুলজার বিবির ট্যাক্সিতে উঠে বসলেন।'

হঠাৎ থেমে গিয়ে পকেট থেকে দলা-পাকানো একটা কাগজ বার করলে মন-মোহন। তারপর সেটা খুলে একটা পান বার করে মুখে পুরে দিলে। অসহিষ্ণু হয়ে বললাম—'কোথায় নিয়ে গেল ওদের?'

হেসে নিয়ে অন্য পকেট থেকে একটা দোক্তার কৌটো বার করে খানিকটা মুখে দিয়ে বললে মনমোহন—'রাস্তার দুধারে টুলেট দেখতে দেখতে মৌলালিতে মনের মত বাড়ি পাওয়া গেল। সেইখানেই ঐ রাবণের গুষ্টি নিয়ে তুলল। বাড়ি ভাড়া, খাওয়ার খরচ, গুলজারের জন্যে একখানা গাড়ি ইত্যাদি সব খরচ কোম্পানীর। তা ছাড়া মাসে পাঁচ শো টাকা মাইনে। বাংলা ছবির হিরো হয়ে কী ঘোড়ার ডিম হবে বলতে পারিস?'

বললাম—'এ সব দেখে শুনে কি মনে হচ্ছে জানিস?' জিজ্ঞাসু চোখে তাকালো মনমোহন।

ম্লান হেসে বললাম—'না, থাক, বলব না।' (ক্রমশ)

আর্থিক জগৎ

তোডরমল

পূর্ব প্রবন্ধে বৃটেনে মুদ্রাস্ফীতির প্রাবল্য বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে এবং তাহা নিবারণ করিতে কি কি বিধি-ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে, তাহারও একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী দেওয়া গিয়াছে। মুদ্রাস্ফীতি নিরোধ করিবার যেসব উপকরণ আছে, তাহাদের তিনভাগে ফেলা যায় (১) আর্থিক, (২) সরকারী ব্যয় ও করনীতিগত, (৩) অনার্থিক যথা মূল্যনিয়ন্ত্রণ, পণ্যবণ্টন নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি। অর্থসম্পর্কীয় বিধিব্যবস্থাগুলি সাধারণত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক মারফৎ রূপায়িত করা হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ধার দেওয়ার হারের সাহায্যে আর্থিক লেনদেনের কারবার অনেকখানি প্রভাবিত করা যায়।

যে মুহূর্তে দেখা গেল যে, বাজারে অর্থ-প্রাচুর্য থাকা বিধায় ব্যাঙ্ক প্রমুখ প্রতিষ্ঠানগুলি নির্বিবাদে ধারের অঙ্ক বাড়াইয়াই চলিল এবং অত্যধিক পরিমাণে ঋণ পাইবার সুবিধা থাকায় কারবারী লোকেরাও মনের সুখে ধার করিয়া ব্যবসায়ের পরিধি বিস্তৃত করিতে শুরু করিল, সেই মুহূর্তেই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অবস্থা স্বাভাবিক করিবার জন্য ধারের হার বাড়াইয়া দিতে পারে। ফলে অপরাপর ব্যাঙ্কদিগকে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাছ হইতে ধার করিলে বেশী সুদ দিতে হইবে এবং এই চড়া সুদ উসুল করিবার জন্য তাহারাও স্ব স্ব খাতকের কাছ হইতে অধিক সুদ আদায় করিবেন। ব্যবসায়ী খাতকেরা যখন দেখিলেন যে তাঁহাদের ঋণের উপর সুদও চড়িয়া গিয়াছে, তখন ধারের পরিমাণ আপনা হইতে কমাইবার প্রবৃত্তিও তাঁহাদের আসিবে। এইভাবে ব্যবসায়ের বিস্তৃতিও অনেকখানি সঙ্কুচিত হইবে।

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ঋণ দেওয়ার হার বাড়াইলেই যে উপরোক্ত প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে, তাহা হলফ করিয়া বলা যায় না। এইসব স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার পথেও বাধা-বিপত্তি রহিয়াছে। যদি কোন ব্যাঙ্কের হাতে প্রচুর সরকারী ঋণপত্র থাকে, সেই ব্যাঙ্ক কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হারের বৃদ্ধি সত্ত্বেও ঐ ঋণপত্র বিক্রয় করিয়া উপযুক্ত অর্থ সংস্থান করিতে পারে। সেই ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাছে হাত পাতিবার কোন প্রয়োজন পড়ে না। কাজেই ঐসব ব্যাঙ্ক নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী দাদন বৃদ্ধি করিয়া যাইতে পারে। ব্যাঙ্ক ছাড়াও অপরাপর প্রতিষ্ঠান আছে, উদাহরণস্বরূপ বীমা কোম্পানীর কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে, যাহারা সরকারী ঋণপত্র বিক্রি করিয়া নিজেদের নগদ টাকা বাড়াইতে পারে এবং এইসব প্রতিষ্ঠানের পক্ষে দাদন বৃদ্ধি করিবার বিশেষ কোন অসুবিধা নাই।

অনেকেই জানেন যে, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাছে অপরাপর ব্যাঙ্কের নগদ টাকা রাখিতে হয়। ঐ টাকার একটি অংশ বাধ্যতামূলকভাবে সব সময়ের জন্য জমা রাখিতে হয় এবং সচরাচর ঐ অংশটি তোলা যায় না। বাজারে মুদ্রাধিক্য ঘটিলে ব্যাঙ্কের আমানত সাধারণত বৃদ্ধি পায় এবং যাহাতে ঐ বর্ধিত আমানত অধিক দাদনদানে নিয়োজিত না হইতে পারে, সেইজন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ঐ বাধ্যতামূলক জমা

মাণ আরও বাড়াইয়া দিতে পারে। অপরাপর ব্যাঙ্কগুলি উক্ত বর্ধিত না তুলিতে পারিলে তাঁহাদের ধার য়ার শক্তিও ক্ষীণ হইবে। এই য়েও মুদ্রাস্ফীতি অনেকাংশে দমন যায়।

অপর উপায় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের মারফত পানীর কাগজ বাজারে বিক্রি করা। কাগজ বিক্রি করিলে জনসাধারণের যে উদ্বৃত্ত অর্থ আছে, তাহা ক্রমশ র হইতে অন্তর্হিত হইয়া সরকারী য় জমা হইবে। ফলে মুদ্রাধিক্যও পাইবে। কিন্তু এইক্ষেত্রে প্রধান বিধা এই যে, যদি কোন ব্যাঙ্ক রী ঋণপত্র বিক্রয় করিতে চায়, রীয় ব্যাঙ্ক তাহা না কিনিয়া থাকিতে বে না। কারণ এইখানে সরকারের মের প্রশ্ন জড়িত। কাজেই এক- কোম্পানীর কাগজ বিক্রয় করিয়া অর্থ বাজার হইতে তোলা হইল, দিকে অপরাপর ব্যাঙ্কের কাছ ত উক্ত কাগজ খরিদ করাতে অনুরূপ আবার চালু হইল। ফলে মুদ্রা- তির লক্ষণ যেমন ছিল, তেমনই ল।

কিস্তিবন্দিতে জিনিস কেনার যে ত আছে, তাহা নিয়ন্ত্রণ করিয়াও ক সময় মুদ্রাস্ফীতির উপসর্গগুলি করিবার প্রচেষ্টা করা হয়। কিস্তিতে নস কিনিতে হইলে প্রথমেই কিঞ্চিৎ অগ্রিম দিতে হয়, বাকি অংশ স্তিতে শোধ দিতে হয়। প্রাথমিক অগ্রিম টাকাটা দিতে হয়, সেই অর্থের মাণ বাড়াইলে অথবা কিস্তির টাকার মাণ বর্ধিত হারে দিতে হইলে এবং প কয়েক কিস্তিতেই বাকি টাকা শোধ করিতে হইলে স্বভাবতই ার উপযুক্ত অর্থ সংস্থান না থাকিলে স্তিবন্দিতে জিনিস কেনার আগ্রহও পায়। মুদ্রাস্ফীতি রোধ করিতে লে জনসাধারণের ব্যয়ের পরিমাণ ন দরকার এবং উপরোক্ত উপায়ে র এইদিকটা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। প্রবন্ধে বলা হইয়াছে যে, বৃটেনেও ভাবে মুদ্রাস্ফীতি নিবারণ করিবার ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। ছাড়া সকলেই অবগত আছেন—কোন

জামিন রাখিয়া ঋণ গ্রহণ করিতে হইলে উক্ত জামিনের বাজার-মূল্যের কতক অংশ পর্যন্ত ধারস্বরূপে পাওয়া যায়। জামিনের মূল্যের সম্পূর্ণ অংশই ধার পাওয়া যায় না। যখন ব্যাঙ্কের দাদন নিয়ন্ত্রণ করিবার প্রয়োজন অনুভূত হয়, সেই সময় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক মারফত এইরূপে নির্দেশ দেওয়া হয় যে, জামিন মূল্যের অল্পাংশই ধার বাবদ প্রদান করা উচিত। ধরুন, কোন মাল রাখিয়া স্বাভাবিক অবস্থায় উক্ত মালের যে বাজারদর আছে, তাহার শতকরা ৭৫ ভাগ পর্যন্ত ধার পাওয়া যায়। অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি হইলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অপরাপর ব্যাঙ্কদের এইরূপ আদেশ দিবেন যে, তাহারা যেন উক্ত মালের শতকরা ৪০ ভাগের বেশী দাদন না করে। ফলে ঋণগ্রহীতারা অল্প টাকার দাদন পাইবেন এবং দাদন বৃদ্ধির

প্রতিক্রিয়া এইভাবে রোধ করা যাইবে। শেয়ার জামিন রাখিয়া দাদন দেওয়ার কথাই ধরা যাক্। সাধারণত শেয়ারের বাজার-মূল্যের শতকরা ৫০।৬০ ভাগ পর্যন্ত ধার দেওয়া হয়। টাকার বাজার গরম থাকিলে শেয়ার বাজারও চড়িতে থাকে এবং সেই সময় দাদনের মাত্রা বাজারদরের ৭০।৭৫% পর্যন্ত উঠে। ফলে শেয়ার বাজারে ফট্‌কার সৃষ্টি হয় এবং ফট্‌কার অন্যান্য উপসর্গগুলিও উদিত হয়। মুদ্রাস্ফীতির এই কুফল দূর করিবার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কও ঐসব শেয়ারের বাজার-মূল্য অনুপাতে আরও কম ধার দিবার নির্দেশ অপরাপর ব্যাঙ্কদের দেয়। ধরুন, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নির্দেশ দিল যে, শেয়ার-মূল্যের শতকরা ২৫ ভাগের বেশী ধার দেওয়া যাইবে না। ফলে শেয়ার জামিনে পূর্বেকার মত অনায়াসে অধিক ধার পাওয়া যাইবে না এবং ফটকার যে সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাও ধীরে ধীরে স্তিমিত হইয়া পড়িবে।

ইহা ছাড়া উৎপাদন বৃদ্ধি মুদ্রাস্ফীতি নিবারণের আরেকটি উপায়। বাজারে অত্যধিক মুদ্রা চালু থাকায় এবং পণ্যদ্রব্যের উৎপাদন সেই অনুপাতে কম হওয়ার দরুণ পণ্যমূল্যের বৃদ্ধি ঘটে। কাজেই মূল্যের ঊর্ধ্বগতি রোধ করিতে হইলে উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজন। তবে কোন্ কোন্ পণ্যের উৎপাদন বাড়াইতে হইবে, তাহাও এইক্ষেত্রে বিচার্য। জনসাধারণের নিত্যপ্রয়োজনীয় এবং ব্যবহার্য দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা সকল সময়েই থাকে। ঐসব পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করিলে চাহিদা অনুপাতে জোগান দেওয়া সম্ভব হয় এবং তাহা হইলে ঐ সকল পণ্যের মূল্য আয়ত্তের মধ্যে থাকে। ইহা ছাড়া শ্রমিকদের মজুরি নিয়ন্ত্রণেরও প্রয়োজন আছে। পূর্ব প্রবন্ধে বলা হইয়াছে যে, বৃটেনে পণ্যোৎপাদনের অনুপাতে শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধি অস্বাভাবিকরূপে ঘটিয়াছে। কাজেই পণ্যোৎপাদন খরচ বৃটেনে অত্যধিক বাড়িয়া গিয়াছে এবং তাহাদের মূল্যও দিন দিন চড়িয়া যাইতেছে। এই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ না করিলে মুদ্রাস্ফীতির প্রবল তরঙ্গ রোধ করা কিছুতেই সম্ভব হইবে না। এই বিষয়ে শ্রমিক সঙ্ঘের সাথে একটা বোঝাপড়া হওয়া প্রয়োজন। এতদ্ব্যতীত পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ও মুদ্রাস্ফীতি নিরোধের আর একটি উপকরণ। বিগত মহাযুদ্ধের সময় এই দুইটি বিষয়েই আমাদের অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে।

জনসাধারণের খরচ কমানো ও সরকারী ব্যয় সঙ্কোচন মুদ্রাস্ফীতি নিবারণের অন্যতম অস্ত্র। সরকারী ব্যয় সঙ্কোচন করার অর্থ বাজারে অধিক মুদ্রা চালু না হওয়া। এই সঙ্গে জনসাধারণের সহযোগিতাও প্রয়োজন। সরকারী ব্যয় সঙ্কুচিত হইলেও যদি জনসাধারণ নিজেদের ব্যয়ের পরিমাণ বাড়াইতে থাকে, তবে সরকারী ব্যয় সঙ্কোচনের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া টাকার বাজারে অনুভূত হইবে না। কাজেই জনসাধারণের কম খরচ ও সঞ্চয় বৃদ্ধি করার দিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত। মুদ্রাস্ফীতিকালে সরকারী ঋণপত্র ক্রয় করিয়া, পোস্টঅফিস সেভিংস সার্টিফিকেট কিনিয়া উদ্বৃত্ত অর্থ বিনিয়োগ করিলে টাকার বাজার হইতে ঐ পরিমাণ অর্থ সরকারী কোষে জমা হওয়ায় পণ্যমূল্যের গতি নিম্নাভিমুখী হয়। কাজেই ব্যাপক সঞ্চয় বৃদ্ধির জন্য সরকার এত গুরুত্ব আরোপ করেন। ইহা ছাড়া ব্যক্তিগত আয়ের উপর করবৃদ্ধিও উদ্বৃত্ত অর্থ সরকার কোষে আকর্ষণ করার একটি উপায়। মুদ্রাস্ফীতি ও করবৃদ্ধি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। মুদ্রাস্ফীতির তরঙ্গ প্রবল হইলে তাহা রোধ করিবার জন্য করবৃদ্ধিরূপ বাঁধের প্রয়োজন।

শান্তির দূত পরমাণু

সূর্যেন্দুবিকাশ রায়

১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের ৮ই আগস্ট হিরোশিমার বুকে যে পরমাণু
মার বিস্ফোরণে প্রলয়ংকর ধ্বংস-
লার সৃষ্টি হ'য়েছিল—তার উৎস হ'ল
এক পাউন্ড ইউরেনিয়াম্। ১৯৩০
ষ্টাব্দে আবিষ্কৃত হ'য়েছিল বিদ্যুৎহীন
উট্রন' কণিকা। এই কণিকা দিয়ে
৫ সংখ্যক পরমাণু ইউরেনিয়ামকে
াত করলে পরমাণুটি ক্ষুদ্রতর
লিক পদার্থের পরমাণুতে বিভক্ত হয়ে
ড় ও বিপুল তেজের উদ্ভব হয়।
ড়া গড়ে প্রায় দু'টি নিউট্রন প্রত্যেক
রেনিয়াম-পরমাণুর বিভাজনে নির্গত
। এই দু'টি নিউট্রন আবার নতুন
রেনিয়াম পরমাণুর বিভাজন ঘটিয়ে
ও নিউট্রন ও তেজের সৃষ্টি করে।
টিমাত্র নিউট্রন থেকে ইউরেনিয়াম
ড়ে এই স্বতঃপ্রণোদিত তেজ সৃষ্টির
য়াকে শৃঙ্খল ক্রিয়া (chain re-
ion) নামে অভিহিত করা হয়।

কয়েক ইঞ্চি ব্যাসার্ধের বিশুদ্ধ ২৩৫
্যাক ইউরেনিয়াম বা ২৩৯ সংখ্যক
টোনিয়াম গোলকে একটি নিউট্রন
াতে অতি অল্প সময়ের ভেতর বিপুল
জর উদ্ভব হ'য়ে প্রচন্ড বিস্ফোরণের
ষ্ট করতে পারে। এই বিস্ফোরণ শুধু
সই ডেকে আনতে পারে। ইউরেনিয়াম
প্লুটোনিয়াম পরমাণু যেমন বিভাজনের
া বিপুল তেজের সৃষ্টি করে তেমনি
ড্রোজেন, ওয়েটরন, লিথিয়াম প্রভৃতি
্কা পরমাণু পরস্পর যুক্ত হ'য়ে ভারী
মাণুর সৃষ্টি হ'লেও ইউরেনিয়াম
াজনের চেয়ে বিপুলতর তেজের উদ্ভব
; তবে এই যোজন ক্রিয়ার জন্য
usion) প্রচন্ড তাপমাত্রা প্রয়োজন;
ন ইউরেনিয়াম পরমাণু বিভাজনে
াজন নিউট্রনের। সূর্যের তাপমাত্রা
াধিক বলে সেখানে হাইড্রোজেন পর-
র যোজন ক্রিয়ায় অনবরত হিলিয়ামের
ষ্ট হচ্ছে—ফলে যে বিপুল তেজের
উদ্ভব হচ্ছে তা' সূর্যকে বাঁচিয়ে রেখেছে এতদিন আরও কতকাল যে এই প্রক্রিয়ায় সূর্য তার তেজ আহরণ করবে তার সঠিক হিসেব নেই। ইউরেনিয়াম বোমায় যে তাপমাত্রা সৃষ্টি হয় তাতে হালকা পরমাণুর যোজনক্রিয়া সম্ভব-এর উপর ভিত্তি করে হাইড্রোজেন বোমা সফল হ'য়েছে।

এই ধ্বংসাত্মক সফলতার পেছনে
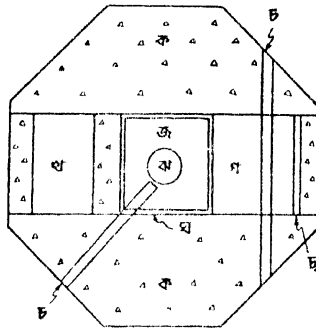
পরমাণু চুল্লী

ক—পরীক্ষককে নিউট্রন ও গামারশ্মি থেকে রক্ষা করার জন্য কংক্রীট ও বেরিয়াম প্রভৃতি দিয়ে তৈরী আবরণ।

খ—নিয়ন্ত্রণ দণ্ড ও অন্যান্য নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রাদির সন্নিবেশ।

গ—মন্দগতি নিউট্রন সন্নিবেশ।

ঘ—গামারশ্মি প্রতিরোধক সীসার আবরণ।

চ—নিউট্রন বহির্গমনের ছিদ্র।

ছ—নিউট্রন প্রতিরোধক বোরন আবরণ।

জ—নিউট্রন প্রতিফলক গ্রাফাইট ব্লক।

ঝ—চুল্লীকেন্দ্র—১৪ লিটার আয়তন স্টেইনলেস্ স্টীলের সিলিন্ডারে শতকরা ৯৩ ভাগ ২৩৫ সংখ্যক ইউরেনীয়াম্ সালফেট্ মিশ্রিত জল।

শান্তিকামী মানুষ ক্ষুব্ধ হ'য়েছে। বিজ্ঞানীরাও তাঁদের গবেষণার মোড় ফিরিয়ে পরমাণু তেজকে শান্তির কাজে লাগাবার জন্য বদ্ধপরিকর। এই সেদিন জেনেভায় যে 'এ্যাটম্ ফর্ পীস' সম্মেলন হ'য়ে গেল—তার কার্যসূচীতে সারা বিশ্বের বিজ্ঞানীদের শান্তি কামনায় এই প্রতিজ্ঞাই উজ্জ্বল হ'য়েছে। তা'ছাড়া সেখানকার প্রদর্শনীতে বিভিন্ন দেশ থেকে, পরমাণু তেজের শান্তিপূর্ণ প্রয়োগের যে সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি সমাবেশ করা হয়েছিল তাতে আগামী কালের শান্তিময় পৃথিবীর ছবি ফুটে উঠেছে। সেদিন আর দূরে নয়, যেদিন কয়লা, পেট্রোল প্রভৃতি রাসায়নিক জ্বালানীর স্থান দখল করবে ইউরেনিয়াম পরমাণু। অভিশপ্ত হিরোশিমার ধ্বংস-স্তূপের ওপর আগামী কাল গড়ে উঠবে এক সমৃদ্ধ ও সুখী পৃথিবী; জেনেভা সম্মেলন হ'ল সেই সৃষ্টির অবতরণিকা।

পরমাণু তেজকে কী করে আয়ত্তে এনে মানুষের কাজে লাগান সম্ভব—তা দু'এক কথায় বলা যায় না। তবে উদাহরণ-স্বরূপ একটা মোটর গাড়ির কথা ধরা যাক। চলন্ত মোটর গাড়ি যদি হঠাৎ একটা গাছে ধাক্কা পায় তবে দুর্ঘটনা ঘটবে, আর একটু বেশী সময় ধরে আস্তে আস্তে যদি ব্রেক কষে গাড়িটা থামান যায় তবে আর দুর্ঘটনার আশঙ্কা থাকে না। উভয় ক্ষেত্রেই গাড়িটা থামবে বটে, কিন্তু ধাক্কা খেয়ে থামাটা অল্প সময়ে হ'ল বলে দুর্ঘটনা ঘটবে। পরমাণু বোমার বিস্ফোরণ এই দুর্ঘটনার সাথে তুলনা করা যায়। ইউরেনিয়ামে হঠাৎ নিউট্রনের আঘাতে প্রায় এক সেকেন্ডের দশ লক্ষ ভাগের ভেতর বিপুল তেজ সৃষ্টি হয় বলে বিস্ফোরণ ঘটে। কিন্তু এই বিপুল তেজকে কোন রকম যদি নিয়ন্ত্রণ করে দীর্ঘ সময় ধরে আহরণ করা যায়, তবে তাকে কাজে লাগান সম্ভব।

এই সম্ভাবনার প্রথম প্রচেষ্টা হ'ল চিকাগোর 'পরমাণু পাইল' (atomic pile) এই যন্ত্রে ২০০ ওয়াট তেজের উদ্ভব সম্ভব হয়েছিল। তারপর এই ধরনের বহু যন্ত্র রাশিয়া আমেরিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে তৈরী হয়েছে, এই যন্ত্রগুলিকে পরমাণু চুল্লী

(nuclear reactor) বলা হয়। রিঅ্যাক্টরএর ভেতর ইউরেনিয়াম বা প্লুটোনিয়াম থাকে—এই সব পরমাণুর বিভাজনে যে নিউট্রন নির্গত হয়, তারা যাতে বাইরে যেতে না পারে সেজন্য চার পাশে থাকে গ্রাফাইট বা বেরিলিয়ামের বেষ্টনী। এই সব পদার্থের কাজ হ'ল নিউট্রনকে রিঅ্যাক্টরের উপর প্রতিফলিত করা। ২৩৫ সংখ্যক ইউরেনিয়াম বিভাজনে মন্দগতি নিউট্রন প্রয়োজন; তাই বিভাজনে নির্গত নিউট্রনকে মন্দীভূত করার জন্য জল, ভারী জল, বেরিলিয়াম বা গ্রাফাইট ব্যবহার করা হয়। ২৩৮ সংখ্যক ইউরেনিয়ামে নিউট্রন আহত হ'লে ২৩৯ সংখ্যক প্লুটোনিয়াম তৈরি হয়। এই ধাতুর বিভাজনেও রিঅ্যাক্টর তৈরী করা যায়। আবার ২৩২ সংখ্যক থোরিয়াম্ পরমাণু ও নিউট্রন মিশ্রণে ২৩৩ সংখ্যক ইউরেনিয়ামে রূপান্তরিত হয়। এই ইউরেনিয়াম ও নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টরে ব্যবহার করা যায়। ভারতবর্ষের পক্ষে আশার কথা যে, এখানকার মাটিতে ছড়ানো রয়েছে প্রচুর মোনাজাইট্ পাথর—যা থেকে পাওয়া যাবে থোরিয়াম। তবে থোরিয়ামও ২৩৮ সংখ্যক ইউরেনিয়ামকে কাজে লাগাতে হ'লে তাদের নিউট্রন দিয়ে যথাক্রমে ২৩৩ সংখ্যক ইউরেনিয়াম বা ২৩৯ সংখ্যক প্লুটোনিয়ামে রূপান্তরিত করতে হ'বে। এজন্য নিউট্রন পেতে হলে ২৩৫ সংখ্যক ইউরেনিয়াম দিয়ে তৈরী রিঅ্যাক্টর ছাড়া উপায় নেই। তাই কোন দেশকে পরমাণু তেজে স্বাবলম্বী হ'তে হ'লে ইউরেনিয়াম অপরিহার্য—আবার ২৩৮ ও ২৩৫ সংখ্যক ইউরেনিয়ামের

পরমাণু চুল্লী ও তেজ আহরণ

ক—নিউট্রন প্রতিফলক।
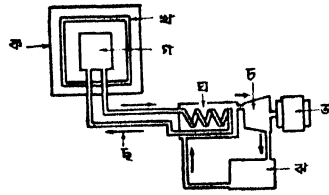
খ—২৩২ সংখ্যক থোরিয়াম্ বা ২৩৮ সংখ্যক ইউরেনীয়াম্ নিউট্রন আঘাতে এই আচ্ছাদনে শৃংখল প্রক্রিয়া ঘটে।

গ—২৩৫ সংখ্যক ইউরেনীয়াম থেকে নিউট্রন তৈরীর জন্য চুল্লীকেন্দ্র।

ঘ—তাপবিনিময় যন্ত্র।

চ—বাষ্পীয় টারবাইন্।

ছ—হিমকারক তরল ধাতু।

জ—তড়িৎ উৎপাদক যন্ত্র।

ঝ—বাষ্পঘনীভবনকেন্দ্র।

পৃথকীকরণও প্রয়োজন। প্রায় সবদেশেই এই সমস্যার আংশিক বা পুরোপুরি সমাধান হ'য়েছে। রিঅ্যাক্টরের মূল অংশ হ'ল নিয়ন্ত্রণ দণ্ড (Control rod) এই দণ্ডটি এমন পদার্থ দিয়ে তৈরী হওয়া চাই, যা সহজে নিউট্রন শোষণ করতে পারে। এই দণ্ডটি রিঅ্যাক্টরের ভেতর ঢুকিয়ে নিউট্রন সংখ্যা ইচ্ছামত বাড়ান কমান যায়, ফলে বিভাজনজনিত তেজও নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়।

নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টরের প্রথম কাজ হ'ল আইসোটোপ তৈরী করা। রিঅ্যাক্টর থেকে যে সব নিউট্রন বেরোয়, বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের উপর তাদের প্রতিক্রিয়ায় সেই পদার্থের রূপান্তর হয়। পরমাণু সংখ্যা হ'ল অক্সিজেন পরমাণুর ১৬ ওজন ধরে কোনও পরমাণুর আপেক্ষিক ওজন। স্বভাবত যে সব ওজনের পরমাণু পাওয়া যায়, একই রাসায়নিক ধর্মবিশিষ্ট দু, তিনটি বিভিন্ন সংখ্যার একই পরমাণুকে পরস্পরের আইসোটোপ বলা হয়। যেমন একটি কার্বন ১২ ও ১৩ ওজনের হয়, আবার ১৪ সংখ্যক কার্বন প্রকৃতিতে পাওয়া যায় না বটে, তবে নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টর নির্গত নিউট্রন দিয়ে ১৪ সংখ্যক নাইট্রোজেনকে ১৪ সংখ্যক কার্বনে রূপান্তরিত করা হয়। এই কার্বন তেজস্ক্রিয় ও বী[illegible] কণিকা বিকীরণ করে। বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় কার্বনের গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য এই তেজস্ক্রিয় কার্বন মিশিয়ে দেওয়া হয়—এর সামান্যতম অবস্থিতি[illegible] সূক্ষ্ম যন্ত্রে ধরা পড়ে। কার্বন ছাড়া নয়[illegible] সংখ্যক স্থায়ী ও তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের উৎস হ'ল নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টর।

তেজস্ক্রিয় লোহা দেহে সঞ্চারিত করে দেখা গেছে যে, জীব-কোষের মৃত্যুর সাথে সাথে এই ধাতু নষ্ট [illegible] হয়ে পুনর্ব্যবহৃত হয়। এ তথ্য পূর্বে জানা ছিল না। এরকম উদ্ভিদ ও প্রাণী দেহের বহু অজানা তথ্য তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের মাধ্যমে প্রকাশিত হ[illegible] পড়েছে। তেজস্ক্রিয় লোহা ও সোডিয়াম দিয়ে রক্ত চলাচলের ত্রুটি অনুধাবন করা সম্ভব হয়। তেজস্ক্রিয় আয়োডিন গ[illegible] গণ্ড রোগে অব্যর্থ মহোষধ বলে প্রমাণিত হ'য়েছে। ক্যান্সার রোগে তেজস্ক্রি[illegible]
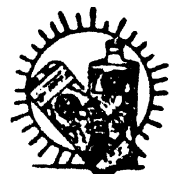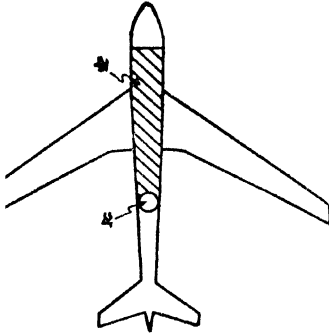
রমাণু তেজচালিত আকাশযানের পরিকল্পিত রূপ

ৈর্ঘ্য=১০৮ ফুট, পাখার দৈর্ঘ্য=
৬ ফুট, উচ্চতা=২৮ ফুট,
ওজন=১২৫০০০ পাউণ্ড।
-নিউট্রন ও গামারশ্মি প্রতিরোধক আবরণ।
-পরমাণু চুল্লী।

ল্ট-এর উপকারিতাও প্রমাণিত হ। তেজষ্ক্রিয় ফস্‌ফরাস দিয়ে কৃষির ম্ন তথ্য গবেষণা করেছেন বিজ্ঞানী এস হল। তিনি দেখিয়েছেন যে, উদ্ভিদ সার থেকে অধিকতর রাস আহরণ করে; বয়স্ক উদ্ভিদ মাটি থেকে। তাই বয়স্ক উদ্ভিদে প্রয়োগ করা উচিত নয়। তাছাড়া পরিমাণ বোরণ, তামা, ম্যাঙ্গানিজ ত ধাতু, প্রাণী ও উদ্ভিদদেহে প অাচরণ করে তেজষ্ক্রিয় এইসব সাটোপ দিয়ে তা জানা সম্ভব হয়। ড়া শিল্প ইঞ্জিনীয়ারিং, ভেষজ ন উদ্ভিদ ও প্রাণী বিজ্ঞান ভূবিদ্যা ত বিজ্ঞানের সমস্ত বিভাগেই নিউ-র রিঅ্যাক্টরজনিত আইসোটোপের গ এক নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি ছ। অদূর ভবিষ্যতে তাই আইসো- বিজ্ঞান এক গুরুত্বপূর্ণ আসন কার করবে সন্দেহ নাই।

এসব ছাড়া নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টরের ক্ষ প্রয়োগ হ'ল এর তেজ দিয়ে তিক শক্তি আহরণ করা। রাশিয়া মার্মেরিকা এ কাজে যথেষ্ট অগ্রসর ছ—তাদের প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ- া কিছু অংশ এখন নিউক্লিয়ার াক্টর থেকে আহরণ করা হচ্ছে, আরও গবেষণায় এইসব পরীক্ষা সাফল্য-মণ্ডিত হলে কয়লা, পেট্রোল প্রভৃতি রাসায়নিক জ্বালানী নিঃশেষিত হ'লেও পরমাণু তেজই বহুদিন মানুষের সভ্যতাকে বাঁচিয়ে রাখবে। তাছাড়া এরোপ্লেন, ডুবোজাহাজ প্রভৃতি পরমাণু-তেজের সাহায্যেই চালান যাবে এরূপ সম্ভাবনা রয়েছে—আর সেই সম্ভাবনা সফল হ'তে খুব দেরি হবে না মনে হয়।

এক পাউণ্ড ইউরেনিয়াম থেকে ১৭ লক্ষ পাউণ্ড পেট্রোলের তেজ পাওয়া যায়—আকাশবাহী যান, যেখানে অল্প ওজনের জ্বালানীতে অধিক তেজ আহরণের প্রয়োজনীয়তা বেশী সেখানে পরমাণু তেজ হবে মানুষের একান্ত আশ্রয়। তাই বিজ্ঞানীরা চিন্তা করছেন একদিন হয়ত পরমাণু তেজ চালিত রকেটে মানুষ বায়ুমণ্ডলের বহু ঊর্ধ্বে অনন্ত আকাশের বুকে পাড়ি জমাতে পারবে অথবা এই তেজ চালিত যানে চন্দ্রের মত কৃত্রিম উপগ্রহ সৃষ্টি করে পৃথিবীর বাহিরে গড়ে উঠবে নতুন উপ-নিবেশ। মানুষের সকল আশা, আকাঙ্খার, সুখসমৃদ্ধির সেই অনাগত দিনের আহ্বান জানিয়ে বিজ্ঞানীরা জেনেভা সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণা করেছেন। আর শান্তিকামী মানুষ আগামীকালের শান্তির দূত পরমাণুকে তাই জানাচ্ছে আন্তরিক অভিনন্দন।

ঝাঁসীর রানী ০ মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য
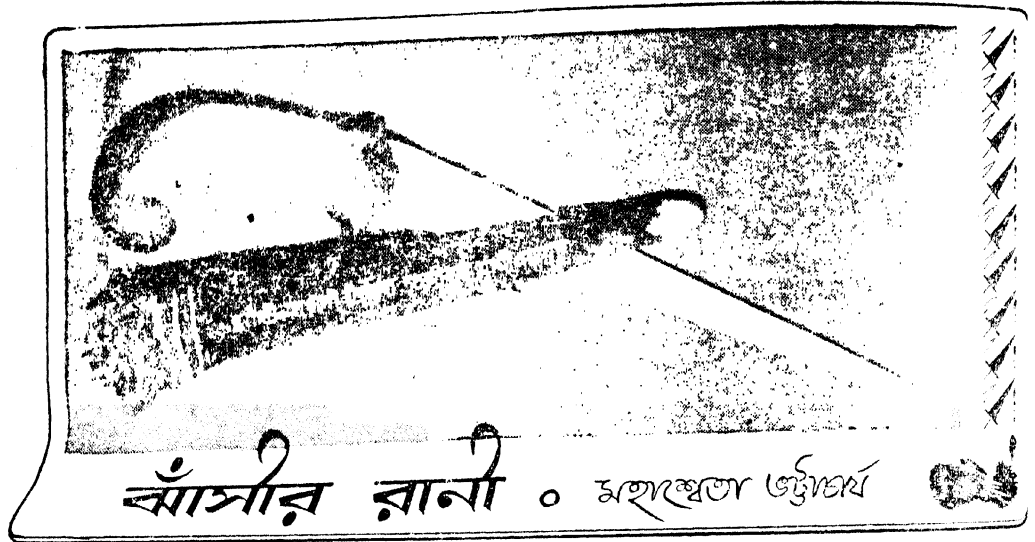
ঝাঁসী থেকে অনেক দূরে খাস্ শহর কলকাতায় তখন বড়লাট ডালহৌসী। ভারতবর্ষের ম্যাপখানা তিনি খুলে ঝুলিয়ে রেখেছিলেন। তদানীন্তন ভারতীয় রাজ্যগুলির মধ্যে ঝাঁসী নামে কোন রাজ্য আছে কি না, তা তাঁর খেয়াল ছিল না বোধ হয়।

গঙ্গাধরের শবানুগমন করেছিলেন এলিস। ছাউনীতে ফিরে এসে এলিস সাহেব ম্যালকমকে লিখে জানালেন—

"ঝাঁসী ২১-১১-১৮৫৩ (দুপুর)
অনুশোচনার সঙ্গে মাননীয় গভর্নর জেনারেলের বিজ্ঞপ্তির জন্য জানাচ্ছি, মহারাজা গঙ্গাধর রাও আজ বেলা একটার সময় মারা গেছেন।

আমি আপনার ২ তারিখের চিঠির নির্দেশ অনুযায়ী চলব। গভর্নর জেনারেলের কাছ থেকে নতুন আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত রাজ্যের ভার গ্রহণ করব। ইতিমধ্যে যখন যা ঘটে আপনাকে জানাব।"

রাজার মৃত্যুর খবর পেয়ে ম্যালকম পুণা ক্যাম্প থেকে (এই পুণা মহারাষ্ট্রের বিখ্যাত নগরী পুণা নয়), গভর্নরের সেক্রেটারী গ্র্যান্টকে লিখলেন—

"অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি মহারাজা গঙ্গাধর রাও ২১-১১-১৮৫৩ তারিখে ঝাঁসীতে মারা গেছেন।.

১। তাঁর মৃত্যুর আগের দিন মহারাজা, আনন্দরাও নামে একটি পাঁচ বছরের ছেলেকে দত্তক গ্রহণ করেন। তাঁর মতে ছেলেটি নবীরাণ-ই-খুর্দ, অথবা তাঁর পৌত্র। আমাদের মতে, ছেলেটি তাঁর মূলপুরুষ রঘুনাথ-হরির পঞ্চম পুরুষ এবং গত মহারাজার জ্ঞাতি ভাই।

২। মেজর এলিসের চিঠিপত্র আপনাকে পাঠাচ্ছি। আমাকে ও এলিসকে লিখিত মহারাজার চিঠিগুলির মূল ও অনুবাদ দুই-ই আপনাকে পাঠাচ্ছি। এই চিঠি দুটিতে তাঁর দত্তক গ্রহণের কারণ উল্লিখিত আছে।

৩। মহারাজের এই দত্তক গ্রহণের আকস্মিকতা নিশ্চয় তাঁর সভার সকলকেও বিস্মিত করেছে। মনে হয়েছিল, তিনি বড়জোর আমাদের অনুরোধ করবেন, যাতে তাঁর বিধবা স্ত্রী যাবজ্জীবন রাজত্ব করতে পারেন। শিবরাও ভাওয়ের বংশের আর কেউ বেঁচে নেই। এ তথ্য সর্বজনবিদিত বলে দত্তক গ্রহণের সম্ভাবনা আমরা কল্পনা করিনি।

৪। আমি একটি বংশ তালিকা পাঠাচ্ছি, তাতে দেখা যাবে, আনন্দ রাও, শিবরাও ভাওয়ের বংশের কেউ নয়।

৫। আমার ২ তারিখের চিঠির অনুলিপি আপনাকে পাঠিয়েছিলাম। সেই চিঠি অনুযায়ী মেজর এলিস, এই দত্তক-গ্রহণ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নেতিবাচক নীতি অবলম্বন করবেন। ঝাঁসী রাজ্য বিষয়ে শেষ পর্যন্ত কি ব্যবস্থা হবে, সেজন্য গভর্নর জেনারেলের চরম আদেশের অপেক্ষা করবেন।

৬। ঝাঁসীর রাজ... সম্পর্ক বিষয়ে একটি বিশদ ... দিচ্ছি। এতে আমাদের ... তালিকার সুবিধা হবে এবং মহা... বিধান দ্বারা উত্তরাধিকার ... অধিকার (আমার মতে যা অত্যন্ত ...) আছে কিনা, সে কথাও মাননীয় ... জেনারেল বুঝতে পারবেন।

৭। বুন্দেলখণ্ডের সঙ্গে ... প্রথম যোগাযোগ স্থাপনা হওয়ার ... ১৮০৪ সালে, পেশোয়ার কর্মচারী ... শিবরাও ভাওয়ের সঙ্গে আমাদের একটি ... হয়। ১৮১৭ সালে পেশোয়া যখন ব... খণ্ডের ওপর সমস্ত অধিকার ... সরকারকে দিলেন, আমরা শিবরাও ভা... পৌত্র রামচন্দ্র রাওকে এবং তাঁর স... সন্ততি ও উত্তরাধিকারীদের ঝাঁসীর ... বংশানুক্রমিক শাসক হিসাবে স্বীকার ... ১৮১৭ সালে একটি শর্ত করি। ... সালে ঝাঁসীর শাসককে রাজা উপাধি ... হয়। ঝাঁসীর শাসকরা প্রথমে পেশো... পরে আমাদের অধীনে সুবেদার ছিলেন।

৮। ১৮৩৫ সালে রামচন্দ্র রা... অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যু হ'লে, ঝাঁ... সিংহাসন নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। শি... ভাওয়ের দুই পুত্র রঘুনাথ ও গঙ্গাধর ... জীবিত। গঙ্গাধরের মৃত্যুর সঙ্গে শি... ভাওয়ের বংশলুপ্তি ঘটল।

৯। এখানে আমার জানানো উ... ১৮৩৫ সালে রামচন্দ্ররাওয়ের মৃত্যু ... দুইজন দাবীদার এসেছিলেন। একজন ...

...ক পত্রকে অনুমোদিত করবার জন্য, একজন ছিলেন রাজার বিধবা স্ত্রী (যিনি ...কে সিংহাসন দেবার স্বপক্ষে — Sleeman— Rambles and ...ections)। দুটি দাবীই নাকচ করা তৎকালীন কাগজপত্র আমার কাছে আপনার কাছে তার অনুলিপি ...দেখবেন। যে শর্তে ঝাঁসীতে শিবরাও ...র বংশধরদের অধিকার স্বীকৃত ..., সে শর্তে বৃটিশ সরকারের অমতে ...দেওয়া চলবে, এমন কোন কথা নেই।

১০। মহারাজা তাঁর বিধবা স্ত্রী লক্ষ্মী-...র উপর রাজশাসনের ভার দিতে ...। রাণী ঝাঁসীতে এবং তাঁর পরিচিত ...র কাছেই পরম শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্রী। ...সনের পুরুভার বহনে (আমার মতে) সম্পূর্ণ উপযুক্ত। তবে দেখেশুনে হয় না মাননীয় সরকার রাজ্যটি ...রাতে বিরত থাকবেন। আমি প্রার্থনা ... রাণীকে নিম্নলিখিত মর্মে আশ্বাস অনুমতি দেওয়া হোক;—রাজার সমস্ত ... সম্পত্তি (খাসগী), তিনি রাখতে ...ন; ঝাঁসীর রাজপ্রাসাদ তাঁকে দেওয়া তাঁর এবং রাজার প্রতিপালিত, আশ্রিত ...দের আজীবন সুখে স্বচ্ছন্দে কাটাবার পর্যাপ্ত মাসোহারা দেওয়া হবে।

১১। রাণীকে কি পরিমাণ বৃত্তি দিলে পক্ষে পর্যাপ্ত হবে জানি না। তবে এগুলি রাখা সমীচীন;—ঝাঁসীর রাজারা, ...লখণ্ডের শেষ মারাঠা বংশগুলির অন্যতম। ...য়া দ্বিতীয় বাজীরাও এবং সাগরের ...ক চন্দোবরকার মত। তাঁদের কাছ ... সাহায্য লাভে বঞ্চিত তাঁদের বহু ...য় পরিজন, রাণীর কাছে সাহায্যপ্রার্থী। ...রা, নাগপুর, সাগর, বিঠুর এই রাজ্য-...র আশ্রিত বিশাল অনুচরবৃন্দের অধি-...ই বেকার। রাণীর পোষ্যবৃন্দের কথা ...না করে, মাসিক পাঁচ হাজার টাকার ...দেওয়া সমীচীন হবে না।

১২। রাজার অনুচর ও পোষ্যবৃন্দের কি দেওয়া হবে তা আমার পক্ষে ঠিক এখনই সম্ভব নয়। তবে তাদের একটি ...কা তৈরী করে পাঠালে তাদের সম্বন্ধেও ...তে ব্যবস্থা করা যাবে।

১৩। ঝাঁসী দীর্ঘদিন আমাদের শাসনা-... ছিল। মেজর রসের শাসন ব্যবস্থার ঝাঁসীর অধিবাসীরা পরিচিত। শাসন ...া আমাদের হাতে এলেও খুব একটা ...লের প্রয়োজন হবে না। ঝাঁসীর ...বেশী যে পরগণা (সিন্ধিয়ার) গুলি ...া দেখছি, তাদের পদ্ধতিই ঝাঁসীতে ...ত হবে।

১৪। যদি গভর্নর জেনারেলের আদেশ ..., তাহলে আমাকে ঝাঁসীর শাসনভার ... হবে। কিন্তু মেজর এলিস বা আমার ...ধ আদায় সম্পর্কে কোনো অভিজ্ঞতা নেই। আমাদের রাজনৈতিক কাজের জন্য গোয়ালিয়ার, বুন্দেলখণ্ড ও রেওয়ার সর্বত্র ঘুরে বেড়াতে হয়। কাজেই ঝাঁসী যদি বুন্দেলখণ্ডের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে, জব্বলপুরের কমিশনার মেজর আরস্কাইনের অধীনে থাকে সবচেয়ে ভালো হয়।

স্বাক্ষরিত—
ডি এ ম্যালকম,
ক্যাম্প পুণা (PUNA),
২৫-১১-১৮৫৩।

বাইশে নবেম্বর মেজর এলিস ও ক্যাপ্টেন মার্টিন রাজপ্রাসাদে গেলেন। শোকবিহ্বলা রাণীকে তাঁদের শোকবার্তা জানালেন। তারপর কেল্লায় গেলেন। কেল্লাতে সরকারী তহবিল এবং বন্দীরা ছিল। কিল্লাদারকে এবং জ্বালানাথ পণ্ডিতকে ডেকে তাঁদের সাক্ষী রেখে এলিস খাজাঞ্চিখানার তালার উপর সীল-মোহর করলেন। সেখানে সোনা ও রূপার মুদ্রায় ২৪৫৭৩৮ টাকা ছিল। সিন্ধিয়ার ষষ্ঠ কণ্টিনজেণ্টের একজনকে কেল্লার ভেতর পাহারা দিতে বললেন। কেল্লাতে ঝাঁসী রাজের পাঁচজন নায়েক, দুইজন বাজনাদার, একশো সিপাহী, একজন সুবাদার, একজন জমাদার এবং পাঁচজন হাবিলদার ছিল।

রাজার মৃত্যুর চারদিন আগে মেজর এলিস, লাহোরীমল্ল, নরসিংহক্রোপা রাও আপ্পা এবং ফতে চাঁদের সঙ্গে দেখা করে জানিয়েছিলেন, রাজার রোগ ও সম্ভাব্য মৃত্যুর সুযোগ নিয়ে যদি কোন দুর্বৃত্ত রাজবন্দীদের ছেড়ে দিয়ে অরাজক অবস্থার সৃষ্টি করে, ভালো হবে না।

পরবর্তী ঘটনাগুলিতে বোঝা যাবে এলিস রাণীর শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন।

কিন্তু তাঁর প্রথম পরিচয় হচ্ছে, তিনি ইংরেজ। মার্টিন তাঁকে জানালেন—

রাজকোষ পাহারা দেওয়া, আড়াইশো' বন্দীর ওপর নজর রাখা, বিশাল দুর্গ এবং তার অন্তর্বর্তী প্রাসাদ-গুলির নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা, এই-জন্য ঝাঁসীরাজ ও সিন্ধিয়ার কন্‌টিন-জেণ্ট বাহিনীর যে সৈন্য মোতায়েন আছে, আমার মতে তারা সংখ্যায় অপর্যাপ্ত।

শহরের নিরাপত্তার ও জনসাধারণের অসহায় অবস্থার কথা বিবেচনা করে ঝাঁসীতে আরও সৈন্য রাখা উচিত।"

এলিস মার্টিনের চেয়ে দূরদর্শী ছিলেন। এখানে প্রচুর সৈন্য আমদানী করা সম্ভব নয়। তাতে জনসাধারণের মনে সন্দেহ হ'তে পারে। তাই তিনি উত্তর দিলেন—

"আপনার জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি, ঝাঁসী-দুর্গে সৈন্য মোতায়েন করবার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে ঝাঁসীবাসীর মনে এই বিশ্বাস অটুট রাখা যে, বিক্ষোভ সৃষ্টি করবার যে কোনো চক্রান্তই সমূলে বিনাশ করা হবে।"

এলিস তাঁর ও মার্টিনের চিঠি কয়খানি ম্যালকমকে পাঠালেন। ম্যালকম তখন ক্যাম্প সহাওয়াল-এ। তিনি কলকাতায় লিখলেন—

"মাননীয় গবর্ণর জেনারেলের জ্ঞাতার্থে, মেজর এলিসের লেখা যে চিঠিগুলো পাঠাচ্ছি, তাতে গঙ্গাধর রাওয়ের মৃত্যুর পর তিনি রাজ্য শাসন বিষয়ে যে ব্যবস্থা করেছেন, তার বিবৃতি এবং আমরা ঝাঁসীর শাসনভার গ্রহণ করলে, প্রয়োজনীয় সৈন্যের সম্ভাব্য সংখ্যার সম্বন্ধে তাঁর মতামত আছে।

১। আগে যখন ঝাঁসী আমাদের শাসনাধীন ছিল, তখন কিছু কিছু সামন্ত আমাদের বিরক্ত করেছে। কিন্তু এখন তাদের ক্ষমতা কমে গেছে। কাজে কাজেই আগেকার মতো বেশী সংখ্যায় সৈন্য প্রয়োজন হবে না বলেই মনে হয়।

২। তবু আমার মনে হয়, সরকারের ইচ্ছা, ঝাঁসীতে বেঙ্গল নেটিভ ইন্‌ফ্যান্‌ট্রির একটি wing রাখা। ঝাঁসী ও করেরার দুর্গে ফৌজ রাখা বিশেষ প্রয়োজন। অথচ ঝাঁসীস্থ ব্রিটিশ সেনার সংখ্যা সে আন্দাজে অপর্যাপ্ত। কম্পানীর সেনাবাহিনী এখন যদি না-ই পাওয়া যায়, মুলতান থেকে নেটিভ ইনফ্যান্‌ট্রি ঝাঁসীতে এসে না পৌঁছন পর্যন্ত, অন্তবর্তী সময়ের জন্য সিন্ধিয়ার ষষ্ঠ কন্‌টিন্‌জেণ্টের যে wingটি ঝাঁসীতে রয়েছে, সেটিকে ব্যবহার করবার অধিকার আমাকে দেওয়া উচিত।

নেটিভ ইন্‌ফ্যান্ট্রি বুন্দেলখণ্ডে কয়েক সপ্তাহ না গেলে পৌঁছতে পারবে না। অস্থায়ী ব্যবস্থা হিসাবে, মোরার (গোয়ালিয়ারের সামরিক ছাউনী) থেকে ব্রিগেডিয়ার পারসন্‌স (Brigadier Parsons)কে চারটি কম্প্যানী পাঠাতে অনুরোধ করা যায়। দুটি ঝাঁসী ও দুটি করেরার দুর্গে রাখা যাবে।

৪। ঝাঁসীর সম্পর্কে গবর্ণর জেনারেলের যে কোনো সিদ্ধান্তই হোক না কেন, আমার মনে হয় না, বিগত গঙ্গাধর রাওয়ের তরফ থেকে আমাদের বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদ করা হবে। তবু, অন্যান্য জমিদারদের মধ্যে বিদ্রোহের সম্ভাবনার কথা ভেবে, ঝাঁসীতে বর্তমানে নেটিভ ইন্‌ফ্যান্‌ট্রির একটি ও ইররেগুলার ক্যাভল্‌রির একটি করে দুইটি রেজিমেণ্ট রাখা সুবুদ্ধির পরিচায়ক হবে।

স্বাক্ষরিত—
ডি, এ, ম্যালকম,
ক্যাম্প ঃ—সহাওয়াল,
১।১২।১৮৫৩।"

ডালহৌসী তখন অযোধ্যাতে। ম্যালকমের চিঠি পেয়ে ডালহৌসীর অনুপস্থিতিতে প্রেসিডেণ্ট অব কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়ার তরফ থেকে অপর তিনজন সদস্য তাঁদের মতামত জানালেন। তাঁরা হচ্ছেন, ডোরিন (J. Dorin), লো (J. Low) এবং হালিডে (Frederick Jas Halliday)।

(১) "—আমার মনে হয় না এই দত্তক গ্রহণ অনুমোদন করা উচিত। তবে, বিষয়টি গবর্ণর জেনারেলের [illegible] জন্য মুলতুবী থাকল। ইতিমধ্যে [illegible] প্রতিনিধি যেন কিছু কবুল না করেন।

স্বাক্ষরিত—
জে ডোরিন,
৯।১২।[illegible]

(২) "এই বিষয়টি গবর্ণর [illegible] ফিরে না আসা পর্যন্ত অমীমাংসিত [illegible] ইতিমধ্যে রাজনৈতিক প্রতিনিধি [illegible] কর্তৃত্বাধীনে ঝাঁসীর শান্তি অক্ষুণ্ণ [illegible] এতাবৎ আচরিত শাসনব্যবস্থায় [illegible] পড়ে। কেরাউলির মতো ঝাঁসীতেও [illegible] মধ্য পন্থা চলতে থাকুক।

স্বাক্ষরিত—
এফ, জে, [illegible]
১০।১২।[illegible]

(৩) "আমার মনে [illegible] জেনারেলের সঙ্গে পরামর্শ না [illegible] বিষয়ে কোন মীমাংসা করা [illegible] প্রতিনিধি প্রয়োজন [illegible] পারসন্‌সের কাছ থেকে সাহায্য [illegible]

স্বাক্ষরিত—
জে ডোরিন,
জে, লো,
এফ জে [illegible]
১২।১২।১৮৫৩

এই তিনখানি চিঠি ম্যালকমকে [illegible] সাথে পাঠানো হ'ল। ১৬-১২-[illegible] তারিখে গভর্ণর জেনারেলের [illegible] সেক্রেটারী ড্যালরিম্পল [illegible] জানালেন,—

ঝাঁসীর বিষয় সিদ্ধান্ত [illegible] হবে। ইতিমধ্যে শান্তি [illegible] দেশীয় শাসন ব্যবস্থায় [illegible] প্রয়োজন হ'লে ব্রিঃ পারসন্‌[illegible] থেকে সামরিক সাহায্য [illegible]

এদিকে মেজর এলিস রাণীর [illegible] রেখে চলছেন। রাণী [illegible] মনোভাব সম্পর্কে উদ্বিগ্ন। [illegible] ডালহৌসী ভারতীয় রাজ্যগুলিকে [illegible] চিত্রে একটি লাল রঙে রঙিয়ে [illegible] পুরোন নথিপত্র ঘেঁটে তাঁর [illegible] ডক্‌ট্রিন অফ ল্যাপ্‌স কাজে লাগা[illegible] অতিশীঘ্র সমস্ত মানচিত্র লালে লাল [illegible] যাবে। একচক্ষু অন্ধ হলেও [illegible] কেশরী ভুল দেখেন নি। [illegible] ভবিষ্যদ্বাণী ভারতবর্ষের কপালে [illegible] সফল হয়েছিল, তখনও সামান্য [illegible] সেই বাকী অংশের মধ্যে ঝাঁসীও [illegible] খানি।

(ক্রমশ

স্বামীজীর মহাপ্রয়াণের পর

শ্রীসরলাবালো সরকার

৮৬৩ সালের ১২ জানুয়ারী ১ স্বামীজীর জন্মগ্রহণের দিন তাঁহার মহাপ্রয়াণের দিন ১৯০২ দের ৪ঠা জুলাই। ৩৯ বৎসর মাস মাত্র তাঁহার এই পৃথিবীতে যাপনের দিন।

তাঁহার কন্যাসমা শিষ্যা নিবেদিতার র সম্বন্ধে শেষ কথা। এই যে, র করুন যেন আমাদের আচার্য-র এই জীবন্ত সত্তা স্বয়ং মৃত্যুও দিগকে যাহা হইতে বঞ্চিত করিতে নাই, তাহা যেন তাঁহার শিষ্য দের নিকট শুধু একটা স্মরণীয় না হইয়া চিরকাল জলন্ত-জাগ্রত- সর্বদা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ।"

স্বামীজীর অন্তর্ধান শ্রীরামকৃষ্ণ নের পক্ষে এক সর্বধ্বংসী ভূমিকম্প অগ্ন্যুৎপাতের তুল্য। কিন্তু রামকৃষ্ণ-ন-তরণী ডুবিল না, হাল ধরিলেন ঠাকুরের মানসপুত্র স্বামী ব্রহ্মানন্দ। স্বামী ব্রহ্মানন্দের জীবনকাহিনী ত বিচিত্র। ১২৬৯ সালের ৮ই মাঘ ার জন্ম হয়। চব্বিশ পরগণার শিকরা নগ্রাম তাঁহার জন্মস্থান, পিতা ণচন্দ্র ছিলেন পল্লীগ্রামের প্রতাপ-ী জমিদার। পিতার তিনি জ্যেষ্ঠ এবং অল্প বয়সে মাতৃহীন বলিয়া শেষ আদরের পাত্র ছিলেন। পিতা তীয়বার যাঁহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন ই বিমাতাও তাঁহাকে ছেলের মতই লবাসিতেন।

অল্প বয়সেই তাঁহার বিবাহ হয়, বিশ্বেশ্বরী অতি মধুরস্বভাবা লা বালিকা। তাঁহাদের একটি পুত্র-তানও হইয়াছিল। কিন্তু এ বন্ধনও হার ভগবৎ-প্রাপ্তি-উন্মুখ মনকে বন্ধ করিতে পারে নাই।

তাঁহার পারিবারিক জীবনে নাম ন রাখালচন্দ্র ঘোষ। ছেলেবেলা তেই স্বামীজীর পরিবারের সহিত হার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা ছিল। স্বামীজী ন ছিলেন নরেন্দ্রনাথ এবং তিনিও লন রাখালচন্দ্র। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের স্পর্শে আসার পর এই আত্মীয়তা জাগতিক ভাব হইতে পরিবর্তিত হইয়া জগৎ-অতীত ভাবে পরিণত হইয়াছিল।

রাখালচন্দ্রের শাশুড়ী শ্যামাসুন্দরী ও শ্যালক মনোমোহন দুজনেই ছিলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের ভক্ত। তাঁহারা দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যাইতেন, সেই সঙ্গে রাখালও দক্ষিণেশ্বরে গিয়াছিলেন। কিন্তু দক্ষিণেশ্বর যাইবার পূর্বেও পরমহংসদেব যখন রামচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের বাড়িতে আসিতেন, তখন রাখাল নরেন্দ্র-নাথের সঙ্গে সেখানেও গিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় তাঁহার "অজাতশত্রু শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মা-নন্দের অনুধ্যান" নামক পুস্তকে তাঁহাদের ছেলেবেলার যে ছবি আঁকিয়াছেন, সেটি যেন একটি জীবন্ত ছবি। তাহার কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করিতেছি।

"রাখাল বিবাহের পর হইতেই পড়া-শুনা করিবার জন্য সিমলায় আসিয়া বাস করিতে লাগিল এবং সেই সময় হইতে আমাদের সহিত তাহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হইল। (ডাক্তার ভুবনমোহন মিত্রের কন্যা দশমবর্ষীয়া বিশ্বেশ্বরীর সঙ্গে রাখালের বিবাহ হইয়াছিল, ভুবনমোহন মিত্রের পুত্র মনোমোহন মিত্র রামদাদার মাসতুতো ভাই, সেজন্য মনোমোহনদাদাদের সঙ্গে আমাদের নিকট সম্পর্ক ছিল। রামদাদা আমাদের বাড়িতেই মানুষ হইয়াছিলেন, সেজন্য তিনি যেন বড় ভাই ও আমরা ছোট ভাইবোন—এইভাবে এক পরিবার-ভুক্তের মতই ছিলাম। সেই জন্যই মনো-মোহনদাদাদের সঙ্গেও আমাদের ঘনিষ্ঠতা ও মেশামেশি ছিল। বিশ্বেশ্বরী আমার মেজোদিদিকে 'দিদি' বলিত এবং নরেন্দ্রনাথকে নরেনদাদা বলিত) মনো-মোহনদাদা তখন কোন্নগর থেকে সিমলায় আমাদের বাড়ির পাশে বাড়ি খরিদ করিয়া বাস করিতেছেন। রাখাল পড়াশুনার জন্য সেখানে আসিয়া রহিল, এবং আমাদের বড় বাড়ি, পড়িবার জন্য আলাদা ঘর, অনেক ছেলে সেখানে পড়াশুনা করিত, আর বাড়িও পাশাপাশি, সেইজন্য আমা-দের পড়িবার ঘরেই সে পড়িবার বন্দোবস্ত করিল।"

তখনকার দিনে অতি সহজেই সকলে সকলের সঙ্গে আত্মীয়তায় আবদ্ধ হইত। ক্রমশ রাখাল নরেন্দ্রনাথদের বাড়ির ছেলেই হইয়া গেল ভুবনেশ্বরী দেবী তাঁহাকে নিজের সন্তানের মতই মনে করিতে লাগিলেন।

রাখাল অবশেষে শ্বশুরবাড়িতে থাকা ছাড়িয়া দিয়া নরেন্দ্রনাথদের (অর্থাৎ বিশ্বনাথবাবুর) বাড়িতেই থাকিতে লাগিল। সেই সময় অম্বিকাচরণ গুহ মহাশয়ের কুস্তির আখড়ায় অনেক ছেলে

কুস্তি করিতে যাইত। নরেন্দ্রনাথ এবং রাখালও কুস্তির আখড়ায় যাইত। রাখাল কুস্তি করিয়া আসিয়া প্রতিদিন আধ সের দোকানের খাবার জলখাবার খাইত। মহেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন, "তখন খাবারের দর ছিল ছয় আনা।" রাখাল কিভাবে পড়াশুনা করিত, সে সম্বন্ধে তাঁহার বর্ণনা—

"তাহার পড়া ছিল প্রথমে বসিয়া, পরে শুইয়া, তারপর ঘুমাইয়া।"

"রাখালের স্কুলের পড়া তেমন সুবিধা হইল না, পরে সে ডাক্তার প্রতাপ মজুমদারের কাছে কিছুদিন হোমিও-প্যাথী শিখিয়াছিল, অল্পদিন পরে তাহা ছাড়িয়া দিল।"

মহেন্দ্রনাথের পুস্তকে তাঁহাদের ছেলেবেলার সময়ের অনেকগুলি চিত্তা-কর্ষক কাহিনী আছে, তাহার মধ্যে একটি কাহিনীতে দুইজন জুয়াচোর কিভাবে একটি স্প্রিং দেওয়া কাগজের সাপ আনিয়া 'মনসাদেবীর সাপ' বলিয়া পূজার নৈবেদ্য, কাপড়, পয়সা প্রভৃতি লোকেদের কাছ হইতে আদায় করিতেছিল এবং কিভাবে রাখাল তাহার এই জুয়াচুরী ধরিয়া ফেলিয়াছিল তাহার কাহিনী আছে।

মহেন্দ্রনাথ আর একদিন রাত্রের ঘটনা এইভাবে লিখিয়াছেন, "১৮৮৪ বা ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে গ্রীষ্মকালে আমাদের পড়িবার ঘরে নরেন্দ্রনাথ ও রাখাল রাত্রে পাশাপাশি শুইয়া আছে। খানিক রাত্রে দুইজনের ভিতর তর্ক উঠিল। রাখাল বলিল যে, নরেন্দ্রনাথ অনেকদিন জিম-ন্যাস্টিক করা ছাড়িয়া দিয়াছে, সে এখন পীকক্ মার্চ বা ঊর্ধ্বপদে ভ্রমণ করিতে পারে না। এই তর্ক উঠিলে এক টাকা বাজি রাখা হইল। অর্ধেক রাত্রে দুইজনে উঠিয়া সম্মুখের দালানে জিম্ন্যাস্টিক শুরু করিল। নরেন্দ্রনাথ মালকোঁচা মারিয়া দালানটাতে ঊর্ধ্বপদে ভ্রমণ করিতে লাগিল আর রাখাল সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল। পার্শ্বের ঘরে যাহারা শুইয়াছিল, তাহাদের ঘুম ভাঙিলে বকাবকি শুরু করিল, "কি উৎপেতে ছেলে, আদ্দেক রাতে উঠে জিম্ন্যাস্টিক শুরু করেছে। ছোঁড়া দুটো মাথা পাগলা, একটু বিবেচনা নেই যে, লোক ঘুমুচ্ছে।"

মহেন্দ্রনাথ লিখেছেন, "কথাটা ঠিক। নরেন্দ্রনাথ জগৎটাকে উল্টাদিক হইতেই দেখিয়া যাইল, পায়ে হাঁটিয়া চলিল না, পা উঁচু করিয়া হাত দিয়া চলিল, ঘুমন্ত মানুষের ঘুম ভাঙাইল এবং নিরীহ রাখাল অনুগত আজ্ঞাবহের ন্যায় সমস্ত জীবনটাই তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল।"

ছেলেবেলা হইতেই দুজনার মধ্যে কি ভালবাসা! এ ভালবাসার যেন তুলনা হয় না। মহেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "আমরা সকলেই ছোট ছেলে। স্কুল হইতে আসিয়াই দুষ্টামি করা আমাদের এক কাজ। রাখাল যদিও দুষ্টামি করিত, কিন্তু সে কাহারও সহিত ঝগড়া করিত না। যাহাকে বলে—witty mischief—হাস্যপূর্ণ দুষ্টামি, সে তাহাই করিত; *** পাড়ার ভিতর সে তাহার মিষ্ট স্বভাবের জন্য সকলেরই প্রিয় হইয়াছিল। *** সিমলার ছেলে বলিয়া [illegible] একটা গর্বের ভাব ছিল [illegible] আমরা সর্ববিষয়ে মাত্রা [illegible] করিয়া কার্য করিতাম, কিন্তু রাখালকে দেখিতাম যে, সে স্থির ও ধীর থাকিত, প্রচণ্ড ভাব তাহার ছিল না।"

তিনি অন্যত্র লিখিয়াছেন, "রাখাল যদিও পাড়ার সকলের সঙ্গেই মেলামেশা করিত, কিন্তু দেখিতাম যে, নরেন্দ্রনাথের প্রতি তাহার একটি বিশেষ [illegible] কুস্তি লড়িতেই হউক, হাসি [illegible] হউক, রান্না করিতেই হউক, [illegible] করিতেই হউক বা বেড়াইতেই হউক রাখাল নরেন্দ্রনাথের পিছু পিছু [illegible] *** যেন একজন হইল [illegible] ভ্যানগার্ড, আর একজন [illegible] সেনা—রীয়ারগার্ড।"

রাখালের এই সময় [illegible] শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে [illegible] স্থাপিত হইতেছিল, [illegible] সম্বন্ধ একেবারে নিবিড় ও [illegible] হইয়া গেল, রাখাল [illegible] পারেন নাই। মহেন্দ্রনাথ [illegible] "দেখিতাম, রাখাল [illegible] বুজিয়া থাকিত, [illegible] স্বাভাবিক ধ্যানের ভাব [illegible] বুঝিতাম না। ভাবিতাম, [illegible] মানুষ, অতিশয় ভীতু [illegible] সে খানিকক্ষণ চোখ বুজিয়া [illegible] কিভাবে।" ***কিন্তু রাখাল [illegible] মহাশয়ের সংস্রবে আসিয়া [illegible] বুঝিতে পারিলেন যে, [illegible] স্বভাবসিদ্ধ গুণ। [illegible] বলিতেন, "রাখাল চুপ করে [illegible] কথাবার্তা কয় না, [illegible] অনবরত নড়ছে।" রাখালকে [illegible] নিস্তেজ ও অল্পবুদ্ধি [illegible] করিত এবং তাহাকে [illegible] উপযুক্ত বলিয়া বোধ করিত না। [illegible] একমাত্র পরমহংস মহাশয়ই [illegible] কি অদ্ভুত শক্তি বীজভাবে [illegible] তাহা দেখিতে পাইয়াছিলেন।"

রাখালের সমদর্শিতা এমন ছিল [illegible] মন্দ ছেলেদের সঙ্গেও সে [illegible] ব্যবহার করিত এবং তাহারাও [illegible] মিষ্ট স্বভাবের সংস্পর্শে [illegible] অশিষ্টতা ত্যাগ করিত। এই রাখাল [illegible] স্বামী ব্রহ্মানন্দ হইলেন এবং যখন তিনি বেলুড়মঠের পরিচালক তখন
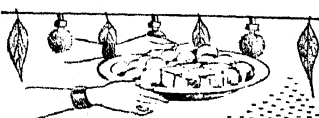
ভালমন্দ-নির্বিশেষে সকলেরই
দাতা হইয়াছিলেন।

খালচন্দ্রের পরিচয় দিতে গেলে
কথা এই যে, সে ছিল ঠাকুরের পুত্র,
কৃষ্ণ তাঁহাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করে-
। শ্রীশ্রীমার কাছে নিয়ে গিয়ে
লেন—"এই নাও গো—তোমার
।"

রাখালও ছিল যেন ঠাকুরের আদুরে
রই মত। রাখাল প্রথম প্রথম
শ্বরে মাঝে মাঝে আস্‌তো, শেষে
শ্বরে এসে আর বাড়ি ফিরে যেতে
ই না, দক্ষিণেশ্বরেই থেকে যেত।
ঠাকুরের ঘরে ঠাকুরের কাছেই
। মাঝে মাঝে তাঁর মুখে মুখে
ও দিত। ঠাকুর বলেছেন ধ্যানে
ত, কিন্তু রাখাল ধ্যানে বস্‌তে চায়
য়তো বললে, "ওসব করে কিছুই
না মশাই।" ঠাকুর ভাত খেয়ে উঠে
কে পান সাজতে বললেন, রাখাল
বস্‌লে—"পান সাজতে জানিনে
।"

ঠাকুর বল্‌তেন, "রাখালের দোষ
নেই, ওর গলা টিপলে এখনো দুধ
য়।" নয়তো বলতেন, "ও বড়
ল, ওকে তোরা কোন কাজ করতে
নি।"

বাস্তবিক তখন রাখাল দুর্বলও
. মাঝে মাঝে জ্বরে ভুগতো। তাই
র বলরামবাবু বৃন্দাবনে যাচ্ছেন দেখে
সঙ্গে তাঁকেও পাঠিয়ে দিলেন।
কে রাখালের বিয়ে হয়ে গিয়েছে,
র মাঝে মাঝে তাকে বাড়িতেও
তেন, তখন বলতেন, "রাখাল এখন
সন খাচ্ছে।"

রাখালের বাবাকেও ঠাকুর নানা মিষ্ট
বলে খুশী করতেন। হয়তো
তেন, "আহা, আজকাল রাখালের
ভাবটি কেমন হয়েছে দেখেছো? ওর
খের দিকে তাকালেই দেখতে পাবে
বরত ঠোঁট নড়ছে, অন্তরে ঈশ্বরের
জপ করে কিনা, তাই। তা রাখাল
এখানে আসে, তাতে তোমার অমত
ছে?"

রাখালকে শিক্ষা দিতেন, "বাবা হলেন
গুরু, সব সময় তাঁকে মান্য করে
বি।"

একবার রাখাল খুব বকুনিও খাইয়া-
ল তাঁহার কাছে, কালীঘরের প্রসাদ
সিতেই নিজে হাতে তুলিয়া লইয়া
বেদ্যের অগ্রমোণ্ডাটি খাইয়াছিল
জন্য।

আর রাখাল? তাহার মনের ভাব মুখে কিছু প্রকাশ না পাইলেও ভাবে বুঝা যাইত ঠাকুরের উপর তাহার কি গভীর ভালবাসা। বাবা তাকে তালাবন্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। সেই তালা খুলিয়া সে পলাইয়া আসিয়াছিল দক্ষিণেশ্বরে। এদিকে বিবাহ হইয়াছে, স্ত্রীর উপর ভালবাসাও আছে, কিন্তু এমন অবস্থা যে, ঠাকুরের সঙ্গ ছাড়া হইয়া থাকার কথা তাহার যেন কল্পনারও অতীত।

মহেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন, "রাখাল যখন দক্ষিণেশ্বরে যাইতে আরম্ভ করিল, তখন একদিন দুপুরবেলা, মনোমোহন-দাদার বাড়ির নিকট একটি বাড়িতে, রাখাল, আমি ও আর একজন ছেলে উপরকার একটি ঘরে বসিয়াছিলাম। কথা প্রসঙ্গে পরমহংস মহাশয়ের কথা উঠিল। দেখিলাম, রাখালের পূর্বভাব সহসা পরিবর্তিত হইয়া গেল। সে এলোমেলো হইয়া পড়িল, তাহার চোখ জলে ভরিয়া গেল এবং সে অনেকক্ষণ মৌন হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার খানিকক্ষণ পরে মনটা স্থির করিয়া সে কথা বলিতে লাগিল। পরমহংস মহাশয় তাহাকে কিরূপ ভালবাসেন, সেই বিষয়ে নানা ভাবের কথা কহিতে লাগিল।"

ইতিমধ্যে রাখালের একটি ছেলেও হইয়াছে। শ্রীশ্রীঠাকুরকে যখন চিকিৎসার জন্য দক্ষিণেশ্বর হইতে শ্যামপুকুরের একটি বাড়িতে আনা হয়, তাহার অল্প দিন পরে রাখালের ছেলের অন্নপ্রাশন হয়।

মহেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন, "শ্যাম-পুকুরে আসিবার অল্পদিন পরে রাখাল ছেলের অন্নপ্রাশনের জন্য সকলকে খাওয়াইয়াছিল। ছেলেটির নাম রাখা হইয়াছিল 'সত্যচরণ।' দিনটা ছিল রবিবার, সেদিন বড় গরম ছিল। শ্যামপুকুরের বাড়িতে থাকার সময় সত্যর অন্নপ্রাশন হইয়াছিল, তাহা হইলে ধরিতে হইবে যে, অন্তত ছয়মাস পূর্বেই তাহার জন্ম হইয়াছিল। অর্থাৎ রাখাল দক্ষিণেশ্বরে থাকার সময় ছেলেটি ভূমিষ্ঠ হয়। অন্নপ্রাশনের দিনটি বিশেষ করিয়া মনে রাখা আবশ্যক। কেননা, নরেন্দ্রনাথ এতাবৎকাল বাড়িতেও থাকিত এবং পরমহংস মহাশয়ের নিকটেও যাইত; কিন্তু ঐদিন হইতেই নরেন্দ্রনাথ প্রকৃত গৃহত্যাগ করিল।"

বেচারী বিশ্বেশ্বরী! তাহার অবস্থা বর্ণনা করা যায় না। ঠাকুরের অসুখ বেশী হওয়ার পর হইতে রাখাল আর বাড়ি আসে নাই, তাহার পর ঠাকুর দেহত্যাগ করিলে যখন কাশীপুরের বাড়ির 'লিজ' ফুরাইয়া গিয়াছে, আর দুই মাস পরেই বাড়ি ছাড়িয়া দিতে হইবে, ছেলেরা তখন কোথায় যায়? যাঁহারা গৃহীভক্ত, তাঁহাদের সঙ্গে ত্যাগী
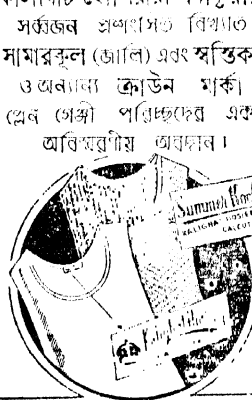
ছেলেদের ঠাকুরের অসুখের সময় মাঝে মাঝে বিরোধ হইয়াছে। বিরোধের প্রধান কারণ গৃহীভক্তগণ অর্থ সাহায্য করিতেন, ছেলেদের সেই অর্থ খরচ করিতে হইত, কিন্তু তাহাদের এই দারুণ সময়ে হিসাব-পত্র রাখিবার দিকে কাহারও একেবারেই মন ছিল না। অর্থদাতা গৃহীভক্তগণ

ইহাতে অসন্তুষ্ট হইলেন এবং এ বিষয়ে হয়তো কিছু কঠোর মন্তব্যও করিয়া থাকিবেন। নরেন্দ্রনাথ উগ্র-প্রকৃতি, তিনি বলিলেন—"আপনাদের টাকায় আমাদের দরকার নাই, আমরা দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া ঠাকুরের সেবা নির্বাহ করিব।" গিরীশবাবু মধ্যস্থ হইয়া তখন এই মীমাংসা করিলেন যে, হিসাবের ভার তিনিই লইবেন। ইহা ছাড়া আরও একটি কারণ ছিল, সেটি এই, শুশ্রূষাকারী ছেলেরা যখন তখন ঠাকুরের কাছে গৃহী-ভক্তগণকে আসিতে দিতে চাহিতেন না। তাঁহারা বলিতেন, যাহারা শুশ্রূষা করিবে, পালাক্রমে তাহারাই ঠাকুরের কাছে থাকিবে। অযথা ভিড় করিয়া পীড়িতের বিশ্রাম ও শান্তির ব্যাঘাত করিতে দেওয়া হইবে না। ইহাতেও গৃহীভক্তরা বিরক্ত হইয়াছিলেন।

ঠাকুরের দেহরক্ষার পর দেহাবশেষ লইয়াও বিরোধ বাধিল। মহেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন, "রামদাদা ও সুরেশ মিত্র প্রভৃতি বলিলেন,—"ছেলেরা সকলে যে যার বাড়িতে যাক্। নরেন আইন পড়ুক। শরৎ ও শশী কলেজে গিয়া পড়ুক। রাখালের স্ত্রী-পুত্র আছে, সে বাড়ি যাক্। আর যাদের চাকরি করবার ইচ্ছে আছে, তাদের চাকরি ক'রে দেওয়া হবে। কেবলমাত্র তারক, বুড়োগোপাল ও লাটু এই তিনজনের থাকিবার কোন স্থান ছিল না। সুরেশ মিত্র বলিলেন, "এদের থাকবার জন্য একটা বাড়ি ভাড়া করে দেওয়া হোক্।" রাখাল নিতান্ত ভালমানুষ, সে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া কোন কিছু ঠিক করিতে পারিতেছিল না।"

নরেন্দ্রনাথ রাখালকে বলিলেন, "সেই যে মাড়োয়াড়ীটা তাঁর কাছে আস্তো, তুই তার কাছে যা, বলগে যা আমরা সাধু হয়ে থাক্‌বো, সে তার বন্দোবস্ত করুক।"

নরেন্দ্রনাথ বাড়ি ফিরিয়া আসিলেন, আইনের বইও পড়িতে আরম্ভ করিলেন; কিন্তু সর্বদাই উন্মনা, কখনো গিরিশ-বাবুর কাছে কখনও বা বলরামবাবুর বাড়ি গিয়া যদি একটা আস্তানা করা যায়, সেইজন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাহার পর কাশীপুর হইতে চলিয়া আসিবার সময় ঠাকুরের ব্যবহৃত জিনিস-গুলি ও যে তাম্রপাত্রে তাঁর দেহাবশেষ ছিল, সে সবই বলরামবাবুর বাড়ি আনিয়া 'গোপনে' রাখা হইল।

তুলসী মহারাজ ব্যাঙ্গালোরের মোকদ্দমার স্টেটমেণ্টের সময় বলিয়া যে, রামবাবুই সেগুলি দাবী করিয়া... এবং নরেন্দ্রনাথ ইহা লইয়া কোন ... না হয় সেজন্য দিয়া দিতেও ... ছিলেন। কিন্তু অভেদানন্দ ... অর্থাৎ কালী মহারাজ সেগুলির ... ভাগ আলাদা করিয়া রাখিয়া ... রামবাবুকে দেন এবং সেই পূণ্য দেহ... রামবাবু কাঁকুড়গাছির বাগানে সমাধি... করেন।

এ সময় রাখাল কোথায় ছিলেন? সম্ভবত তিনি মনোমোহনবাবুর বাড়ি ফিরিয়া গিয়াছিলেন, কেননা তখনো ... আস্তানা ছিল না। বরানগরের ... যখন ভাড়া করা হইল, তখনই ... শয্যা, আসন ও পূণ্য দেহাবশেষ ... লইয়া সকলেই সেখানে গিয়া ... হইলেন এবং রাখালও সেই ... বরানগরে চলিয়া গেলেন।

রাখাল এবার ... হইলেন। যদিও ... তখনও বাকি ছিল। ... অল্পভাষী,—কণ্ঠস্বর ... সর্বদাই জপ করিতেছেন। ... রাখালের আর কোনই চেষ্টা ... সে যেন সহসা কঠোর ... হইয়া গেল।"

মহেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন, "... যখন বরানগর মঠে ছিল, ... তখন অনবরত খামে করিয়া চিঠি লিখি... তখন পোস্টকার্ড হয় নাই। ... কখনো চিঠি খুলিয়া পড়িত, ... হাতের লেখা দেখিয়া বুঝিতে ... বালন্দা-মাদুরের (চাটাইগোছের) ... গুঁজিয়া রাখিত, কোন উত্তর দিত ... কি ভয়ঙ্কর কঠিন সমস্যা। স্ত্রী ... করিয়া বার বার বাড়িতে ফিরিবার ... জন্য অনুরোধ করিতেছে, অন্ততঃ এক... বারও দেখা পাইবার জন্য প্র... করিতেছে, অল্পবয়স্কা স্ত্রী, বাপের ... থাকে কি শ্বশুরবাড়ি থাকে, তাহার ... ঠিক নাই।"

বেচারী বিশ্বেশ্বরী। বাপের ... মা নাই, বাপ নাই। শ্বশুরবাড়ি ... শাশুড়ীও নাই, আবার কোলে ... ছেলে। বুদ্ধদেব গোপাকে ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস লইয়াছিলেন, কিন্তু গোপা ছিল রাজবধূ। আর মহাপ্রভুও ত্যাগ করিয়া ছিলেন বিষ্ণুপ্রিয়াকে। কিন্তু রাখালের এই যে ত্যাগ, এ যেন সে-সব ত্যাগ হইতেও অতি-কঠোর ত্যাগ। স্ত্রী ছিল তার প্রিয়তমা, ছেলেও ছিল নয়নের মণি

ত্যাগ তাকে করিতেই হইয়াছিল। গৃহে ফেরা আর তাহার পক্ষে ছিল না।
শ্বরী যখন বুঝিল স্বামী আর না, তখন খাওয়া ও ঘুমানো াড়িল। "মেঝেতে শুইয়া থাকিত জপ করিত। মাঝে মাঝে সে দিকে চাহিয়া থাকিত।" এমন-মানুষ কতদিন বাঁচিতে পারে? রাও বাঁচিল না। তিন বৎসরের অনাথ করিয়া সে জীবনের দুঃখ-হাত এড়াইয়া চলিয়া গেল।
শ্বরীর মা মেয়েকে সঙ্গে রাখালের সঙ্গে বিবাহের পর লেন দক্ষিণেশ্বরে। ঠাকুর তাহাকে বলিয়াছিলেন, "মেয়েটি সুলক্ষণা, ধর্মলাভের বাধা হবে না, সহায় রাখাল ছিল ঠাকুরের মানসপুত্র, শ্রীমাকে টাকা দিয়া পুত্রবধূর মুখ বলিয়াছিলেন। বাস্তবিকই সে ধর্মের পথে বাধা হয় নাই, হয়তো হইয়াছিল। সাধ্বী পত্নীর স্বামীর যাত্রাপথ সহজ হইয়াছিল। খাল ভগবান লাভের জন্য অতি-তপস্যা করিয়াছিল এবং বরীর তপস্যাকেও আমরা কঠোর ই বলিব। "যেমন নিশ্বাসপ্রশ্বাস মানুষ থাকিতে পারে না, রাখালও জপ ছাড়া থাকিতে পারিত না।"
াবু রাখালের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, পতিপ্রাণা বিশ্বেশ্বরীর কাছে ছিল চিন্তাই নিশ্বাস ও প্রশ্বাস।
ালের বাবা আসিয়াছিলেন বরানগর াখালকে ফিরাইয়া লইয়া যাইবার মহেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন, "গরমী-দিনটা রবিবার। রাখালের পিতা ন্দ্র ঘোষ মহাশয় বরানগর মঠে াছিলেন এবং তিনি গঙ্গাস্নান সেখানে প্রসাদ পাইয়াছিলেন। বৈভবশালী ব্যক্তি ও রাখালের এইজন্য তাঁহাকে একটু দুধ দেওয়া হল এবং তরকারির মধ্যে অল্প ণ আলুর দম দেওয়া হইয়াছিল। (সদানন্দ) ও আমি তাঁহার দেখা-করিতে লাগিলাম। সকলের র পর তিনি একাকী আহার বসিলেন, আমরা দুইজনে কাছে া রহিলাম। আহারান্তে গুপ্ত ন্দ্র ঘোষ মহাশয়কে বলিল, ার পুত্র সাধু, আপনিও কেন সাধু খানে থাকুন না?" তিনি বলিলেন, ছু, আমি যে বিভবশালী লোক।

আমাকে তেল মাখিয়ে দেবে কে? আমার যে নানারকম আহারের জিনিস চাই। তোমাদের এ খাওয়া খেয়ে কি থাক্‌তে পারব?" যাইবার সময় তিনি মঠের খরচের দরুণ গুপ্তের হাতে পাঁচটি টাকা দিয়া যান।"

"বরানগর মঠে প্রথম অবস্থায় রাখালের পিতা তাহাকে একজোড়া বার্নিশকরা ঘোড়তোলা জুতা দিয়া যান। রাখাল কয়েক মাস মাত্র সেই জুতা ব্যবহার করিয়াছিল, কিন্তু আমার পায়ে জুতা না থাকায় আগ্রহ করিয়া সেই জুতা আমাকে পরাইয়াছিল এবং সে নিজে শুধু পায়ে রহিল।"

এই সময় মহেন্দ্রবাবু প্রায়ই বরানগর মঠে থাকিতেন, তাহার পাড়বার বই পর্যন্ত ছিল না, "দা-বাবুদের বাড়ি গিয়া পুরানো বই চাহিয়া আনিয়া তাহার পড়া করিতে হইয়াছিল। তিনি লিখিয়াছেন, "অপর একটি কথা উল্লেখ করা আবশ্যক যে, বলরামবাবু এই সময় টাকা পাঠাইয়া দেওয়ায় আমি পরীক্ষার 'ফি, দিতে পারিয়াছিলাম।"

বলরামবাবু রাখালকে তাঁহার গায়ের একটা পুরানো চিনা-কোট দিয়াছিলেন। রাখাল বলিত, জামাটি অতি পবিত্র; কেননা বলরামবাবুর দেওয়া পুরানো জামা।

বিশ্বেশ্বরীর চিঠি অনবরত আসিত বলিয়া রাখাল অস্থির হইয়া উঠিত, কখনও বা বরানগরের মঠ ছাড়িয়া কয়েক-দিন বলরামবাবুর বাড়ি গিয়া থাকিত, আবার কখনও বা বলরামবাবুদের উড়িষ্যা দেশের জমিদারী কোঠারে কিম্বা বৃন্দাবনের জমিদারীর ঠাকুরবাড়িতে চলিয়া যাইত, যাহাতে আর স্ত্রীর কাকুতিপূর্ণ পত্র না পাইতে হয়। রাখালের একবার বৃন্দাবন থাকিবার সময় বিশ্বেশ্বরী স্বপ্নে দেখিয়াছিল যে, রাখাল যেন দেহত্যাগ করিয়াছে, এই স্বপ্ন দেখিয়া তাহার মন এত উদ্‌ভ্রান্ত হয় যে, সে আত্মহত্যা করিয়া দেহত্যাগ করে।

"কোঠারী হইতে একবার রাখাল পুরী গিয়াছিল, সেবার শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিয়া রাখাল ভাবাবেশে অজস্র অশ্রুপাত করিয়াছিল। নরেন্দ্রনাথ এই ভক্তির প্রাবল্যে ক্রন্দন ও নৃত্য প্রভৃতি মোটেই পছন্দ করিতেন না। তিনি ইহা লইয়া অনেক বিদ্রূপ করিয়াছিলেন। বলিয়া-ছিলেন, "রাখাল যে ভীতু, জগন্নাথের খরতালের মত বড় বড় চোখ দেখে [illegible] কেঁদে ফেলেছে।"

"রাখাল এই সময় [illegible] বৃন্দাবন গিয়াছিল, ব্রজমণ্ডলের [illegible] স্থানে থাকিয়া তপস্যায় কাটাই[illegible] সময় রাখাল একদিন ব[illegible] "—এক আসন, এক জপ, এক [illegible] এইটি না করলে আসন জাগ্রত হয় [illegible]

সন্ন্যাস গ্রহণ করা হইয়া [illegible] এখন আর 'রাখাল' নন, এখন [illegible] স্বামী ব্রহ্মানন্দ। স্বামীজী [illegible] 'রাজা' বলে, কেননা ঠাকুর [illegible] রাখাল রাজাও বলতেন তাঁকে। [illegible] তাঁর 'রমতা সাধু' হয়ে প্রব্রজ্যার [illegible] এল। নানা দেশে কখনো একা [illegible] কোন গুরুভাইয়ের সঙ্গে, কখনো শ্রীশ্রীমার সঙ্গী হয়ে নানা তীর্থে [illegible] করলেন। স্বামীজী যখন প্রব্রজ্যায় [illegible] হন, মাঝে মাঝে তাঁর সঙ্গে দেখাও [illegible] স্বামীজী গুরুভাইদের সঙ্গ এড়া[illegible] জন্য কখনো 'বিবিদিষানন্দ', কখনো 'সচ্চিদানন্দ' নাম নিয়েছিলেন। [illegible] তাঁর মাঝে মাঝে গুরুভাইদের স[illegible] সাক্ষাৎ হয়ে যেত। কখনো কখনো [illegible] দিন সকলে একত্রেও ছিলেন। [illegible] ও হৃষিকেশে থাকবার সময় [illegible] একত্রে ছিলেন, শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠ [illegible] মহাশয়ও তখন তাঁদের সঙ্গে ছিলেন।

তখন তীর্থের পথ খুবই [illegible] ছিল। হৃষিকেশ ছিল নিবিড় জ[illegible] হরিদ্বারেও জঙ্গল ছিল, সেই জ[illegible] মাঝে মাঝে বুনো হাতির দলও [illegible] হত। সাহারাণপুর পর্যন্ত রেলপথ [illegible] হরিদ্বার গমনের জন্য রেলের [illegible] তখনও হয় নাই, কিন্তু সাধুরা [illegible] হাঁটিয়াই দুর্গম তীর্থে যাইতেন, [illegible] ভ্রমণ সাধুদের একটি ব্রত [illegible] তখনকার একটি প্রবাদ বাক্য—

"রম্‌তা সাধু, বহতা পানি,
ঐসে ন কোই মৈল লখানি।"

এই তীর্থযাত্রায় অনশন, [illegible] হইলে বৃক্ষতল আশ্রয় এসব তো [illegible] মাঝে মাঝে জীবন সংশয় বিপদও [illegible] যে সময় সমুদ্রে 'সার জন্‌ [illegible] জাহাজ ডুবিয়া যায়, সেই জাহা[illegible] স্বামী ব্রহ্মানন্দেরও যাইবার কথা [illegible] কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তিনি জাহাজ [illegible] নামিয়া গিয়াছিলেন।

স্বামীজী ও ব্রহ্মানন্দ একজ[illegible] কথা ছাড়িয়া যেন আর একজ[illegible] সম্পূর্ণভাবে অনুভব করাই যায় [illegible] দুজন যেন দুজনকে লইয়াই সম্প[illegible]

াছেন। সেই দুজনের একজন যখন য়া গেলেন, পড়িয়া রহিল তাঁহার পূর্ণ পরিকল্পনা, তখন ব্রহ্মানন্দ পরিকল্পনাকেই স্বামীজীর প্রতীক-ণ গ্রহণ করিয়া তাহারই শ্রীবৃদ্ধি ের জন্য জীবন উৎসর্গ করিলেন। একান্তভাবে উৎসর্গই অজেয় শক্তির । স্বামীজী যখন বিদেশে ছিলেন, মবাজার মঠে ব্রহ্মানন্দ ভ্রাতৃমণ্ডলীর কর্পে সমস্ত ভার লইয়া লন। স্বামীজী ভারতবর্ষে ফিরিয়া সতেছেন সংবাদ পাইয়াই ব্রহ্মানন্দ মী সকলকে লইয়া লাগিয়া গেলেন ার অভ্যর্থনার আয়োজনে। সকলেই শ্য তাঁহার সহযোগিতা করিয়াছিলেন, ন্তু অগ্রণী হইয়াছিলেন তিনি।

এই সময় তাঁহার মাতৃহীন ছেলেটির া যাওয়ার খবর পাইয়াছিলেন। হার বাবাও তাহার অল্পদিন পরে া যান। ছেলে কোনদিন বাপের স্নেহ ওয়া দূরে থাকুক, জ্ঞান হইয়া বাবাকে খেও দেখে নাই। তাহার মৃত্যু সংবাদ য়া সেই কঠোর তপস্বীর মনেও কি ণে আঘাত লাগে নাই? মহেন্দ্রনাথ ার পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, বহু । পরে বেলুড় মঠে একদিন কথায় মহেন্দ্রবাবু, স্বামী ব্রহ্মানন্দের লের অন্নপ্রাশনের দিনের উল্লেখ রবার সময় ব্রহ্মানন্দ স্বামীর মুখ হঠাৎ বিবর্ণ হইয়া গেল বলিয়া হার মনে হইয়াছিল।

স্বামীজীর চিকাগো ধর্মমহাসভায় তা দিবার খবর কালীপূজার দুই এক পরে স্টেটসম্যান পত্রে সিস্টার উইন মেরী স্নেলের লিখিত বক্তৃতার বিবরণ বাহির হয়, তাহাতেই সকলে নিতে পারিয়াছিলেন। ইহার পর

স্বামীজীর নিকট হইতে সমস্ত বিবরণ সম্বলিত পত্র আসিয়া পৌঁছিল, সেই সঙ্গে আসিল স্বামী ব্রহ্মানন্দের নামে একটি বাংলা চিঠি। চিঠির প্রথমে অনেক অনেক 'দণ্ডবৎ' লগুড়বৎ' লেখা ছিল, (এইটি ছিল স্বামীজীর রাজা মহারাজের সঙ্গে রহস্যালাপ) শেষে স্বাক্ষর ছিল 'তোমার নরেন'। তাঁহারা দুজনে যখন দুজনকে প্রণাম করিতেন একজন বলিতেন 'গুরুবৎ গুরুপুত্রেষু' আর একজন বলিতেন, 'জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সম পিতা।'

স্বামীজী ইউরোপ হইতে দেশে ফিরিয়া টাকাকড়ি সব কিছু ব্রহ্মানন্দ স্বামীকেই দিয়াছিলেন, আবার দ্বিতীয়-বার আমেরিকা যাত্রার সময় তাঁহার নামেই সব কিছু লিখিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু ব্রহ্মানন্দ স্বামী তাহাতে সম্মত হন নাই।

বিদেশে থাকা কালেই স্বামীজী মিশনের প্রেসিডেন্টের পদ পরিত্যাগ করিবার পর ব্রহ্মানন্দ স্বামীকেই তিনি সভাপতিরূপে নির্বাচন করিয়াছিলেন। স্বামীজীর শরীর অসুস্থ, রাগিলে তাঁহার জ্ঞান থাকিতে না, তাই ঠিকমত কাজ না হইলে সব ঝোঁকটাই গিয়া পড়িত রাজা মহারাজের উপর, পরে আবার ক্ষমাও চাহিতেন।

বুদ্ধগয়া হইতে ফিরিয়া কাশীতে স্বামীজী প্রায় দু' মাস ছিলেন, তার আগেই জনকতক উৎসাহী যুবক কাশী সেবাশ্রমের সূত্রপাত করিয়াছিলেন। তখনও তাহার নামকরণ হয় নাই। স্বামীজী তাহার নামকরণ করিলেন, সেবক ছেলেদের উৎসাহ ও উপদেশ দিলেন, ব্রহ্মানন্দ স্বামীকে বলিলেন, 'রাজা, কাশীর এই প্রতিষ্ঠানটির উপর দৃষ্টি রাখিস।'

এইরকম আরও অনেক ভার স্বামীজী রাজা মহারাজকেই দিয়া গিয়েছিলেন, যেমন নিজের গর্ভধারিণীর ও পারিবারিক ব্যাপারের সম্বন্ধে। বলিয়াছিলেন, 'তুই আমার মার আর বাড়ির বন্দোবস্ত করে দিস। তাঁর তীর্থ দর্শনের বড়ই ইচ্ছা তুই তাঁকে তীর্থ দর্শন করাস'। স্বামীজীর এ ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য ব্রহ্মানন্দ স্বামী বেলুড় মঠের শত সহস্র ঝঞ্ঝাটের মধ্যেও অনবরত হাইকোর্টে গিয়া স্বামীজীর জ্ঞাতিদের সহিত বিবাদ নিষ্পত্তি করিয়াছিলেন, গৌরমোহন মুখার্জির স্ট্রীটে স্বামীজীর জননীর জন্য বাড়ি ঠিক করিয়া দিয়া-

ছিলেন, এবং তাঁহার পুরী যাওয়ার সমস্ত বন্দোবস্তই করিয়া দিয়াছিলেন।

নরেন্দ্রনাথ জননীর ও বাড়ীর দেখাশুনার ভার রাজা মহারাজের হাতে দিয়াছিলেন, তাই তিনি ভুবনেশ্বরী

যখনই ডাকিতেন, তখনই আসিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিতেন। জগদ্ধাত্রী পূজার সময় তিনি স্বয়ং দাঁড়াইয়া থাকিয়া তত্ত্বাবধান করিয়াছিলেন, কেননা স্বামীজী তাঁহার মার জগদ্ধাত্রী পূজার সময় একবার নিজেই সমস্ত করেন।

বেলুড় মঠের মত প্রতিষ্ঠান, স্বামীজীর দেহান্তরের পর চারিদিকে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে। অর্থাভাব দেখা দিল, কেননা স্বামীজী যতদিন ছিলেন, নানাভাবে অর্থাগম হইত, লোকে খাবার জিনিসও দিয়া যাইত। কিন্তু এখন আর তেমনভাবে টাকা আসে না। আ… প্রতিষ্ঠানটি লোকসংখ্যার দিক দি… খুবই বড়। শিবানন্দ স্বামী কাশী… আছেন, তুরীয়ানন্দ আমেরিকা হই… ভারতবর্ষে আসবার পথে জাহা… আছেন। এদিকে আবার বালি মিউ… সিপ্যালিটি ট্যাক্সের জন্য মোকদ্দ… করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ত… বলিতেছেন, বেলুড় মঠ আসলে … স্থানই নয়। হুগলী কোর্টে … মোকদ্দমা হয়, সেজন্য ব্রহ্মানন্দ স্বামী অনবরত হুগলী ও বেলুড় … করিতে হইয়াছে। খরচ ও … অন্ত ছিল না, অবশেষে বেলুড় মঠ … জয় হইল এবং যে নজির স্থাপিত … তাহাতে কাশী, কনখল প্রভৃতি … স্থানের রামকৃষ্ণ মিশনের মঠগুলো … থেকে অব্যাহতি পাইল।

স্বামীজী বেলুড়ে মঠ … মায়াবতীতে মঠ করিয়া … মায়াবতী অদ্বৈতাশ্রমের … ছিলেন মিসেস সেভিয়ার, কেননা … সেভিয়ারই ঐ মঠ স্থাপন করেন … ও কনখলে সেবাশ্রমের … হইয়াছিল। এদিকে বেলুড় মঠ … চালনেরও ভার ছিল। বিশেষ… পরিচালনী শক্তি না থাকিলে … এ সমস্ত একসঙ্গে চালানো সম্ভব … না। স্বামীজী গণতন্ত্র অপেক্ষা … শিপ বা সর্বময় কর্তৃত্বই এদেশের … উপযুক্ত বলিয়া মনে করিতেন, ব্রহ্মা… স্বামীও সেই পন্থাই গ্রহণ করিয়াছি… কেননা সে সময় বেলুড় মঠের প… গণতন্ত্রের মতে চলা কিছুতেই সম্ভ… হইত না।

অনেক লোক একত্র থাকিলে … অথবা গৃহী যাহাই হোক না কেন, মা… মাঝে ছোটখাট গোলমাল হইয়াই থাকে… কিন্তু ব্রহ্মানন্দ স্বামীর এমন এক… ব্যক্তিত্ব ছিল যে, অন্যের নিকট … ব্যাপারটি গুরুতর বলিয়া বোধ হই… ব্রহ্মানন্দ স্বামী অতি সহজেই তাহা… মীমাংসা করিয়া দিতেন। তাঁহার পক্ষ… পাতশূন্য সদয় ব্যবহার সকলকে… তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাবান ও নির্ভরশী… করিত। তাঁহার অত্যাশ্চর্য সংগঠন শক্তি… ছিল। এই সংগঠন শক্তিতেই স্বামী… ব্রহ্মানন্দের সভাপতিত্বের সময় রামকৃষ্ণ… মিশন ও মঠ দিকে দিকে প্রসার লাভ… করিয়াছিল। তাঁহার সময়ে মঠে ব… মিশনে কোন বিশৃঙ্খলাই হয় নাই।

তাঁহার অর্থনীতির জ্ঞানও আশ্চর্য…

; ছিল। নিজে ধনীর সন্তান হইয়াও
বারে সর্বত্যাগী, অথচ কিভাবে
সংগ্রহ সম্ভব হইবে এবং সেই
হীত অর্থ কিভাবে মিশনের প্রচার
উন্নতির জন্য ব্যয় করা হইলে রামকৃষ্ণ
ন দিনে দিনে দেশব্যাপী প্রসারতা
করিবে, সেবিষয়ে তাঁহার স্বভাব-
দ্ধ ক্ষমতা ও বিচক্ষণতা ছিল। মহেন্দ্র-
তাঁর পুস্তকে লিখিয়াছেন,
ানন্দকে যদি একটি রাজ্য চালাইবার
দেওয়া থাকিত, তবে নিঃসংকোচে
যায় যে, সে ঐ রাজ্য অতি সুশৃঙ্খলা-
ব চালাইতে পারিত।" আসলে এই যে
এটি স্বামী ব্রহ্মানন্দের নিকট
ম তপস্যা' বলিয়াই মনে হইয়াছিল,
তিনি কায়মনোবাক্যে এই ভার বহন
তে পারিয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন ও মঠ ভারতবর্ষের
ল দেশেই বিস্তার লাভ করুক
ীজীর ছিল ইহা সঙ্কল্প, সেই
ল্প কার্যে পরিণত করিয়াছেন স্বামী
ানন্দ। স্বামীজী ছক আঁকিয়া দিয়া
াছিলেন, স্বামী ব্রহ্মানন্দ গঠন-
র্যের ভার লইলেন। এই গঠনকার্যে
ল সাধুগণই সহয়তা করিয়াছিলেন।
সেই একমত, একভাব ও একই মহান
দর্শের প্রেরণায় কার্য করিয়াছিলেন
টই, কিন্তু এই যে বিরোধহীনভাবে
ৃঙ্খলায় কার্য পরিচালিত হইয়াছিল,
র মূলে ছিল স্বামী ব্রহ্মানন্দের
ণা, নির্দেশ, প্রভাব এবং সকলের
ত সমদর্শিতা ও সস্নেহ ব্যবহার।

কাশীর সেবাশ্রম প্রথমে জনসাধারণ
া প্রবর্তিত হইয়াছিল, পরে ১৯০২
াব্দে ইহা মিশনের পরিচালনের
ীনে আসে। ইটালীর উপেন্দ্রনাথ দেব
ানন্দ স্বামীকে সেবাশ্রমের জন্য কিছু
দিয়াছিলেন। সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠার
স্বামী ব্রহ্মানন্দকে অনেক ঝামেলা
াইতে হইয়াছিল। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে
ীতে অদ্বৈত আশ্রম স্থাপিত হয়,
নন্দ স্বামীর উপর ইহার ভার দেওয়া
াছিল। তখন আশ্রম ভাড়া বাড়িতেই
। পরে ব্রহ্মানন্দ স্বামীর অক্লান্ত
ায় সেবাশ্রম সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

স্বামীজীর তিরোধানের পর স্বামী
নন্দ কয়েক বৎসর কাহাকেও দীক্ষা
নাই। মঠের ঠাকুরের ঘরে অথবা
ণেশ্বরের ঠাকুরের ঘরেও তিনি
শ করিতে সঙ্কুচিত হইতেন,
তেন, ঠাকুর-ঘরের ভিতর সাক্ষাৎ-
রূপেই রহিয়াছেন, তাঁহার বিনা আদেশে
হঠাৎ ঘরে ঢুকি কি করিয়া?

১৯০১ খৃষ্টাব্দে কনখলের সেবাশ্রম স্থাপন করা হয়, কলিকাতার এক ভদ্রলোক সে সময় সেবাশ্রম স্থাপনের জন্য দু হাজার তিন শো টাকা দিয়াছিলেন, পরে তিনিই আবার কয়েক বৎসর পরে টাকাটি ফিরাইয়া চাহিলেন। কেবল তাই নয় অনেক কটু কথাও বলিলেন।

তখন স্বামী ব্রহ্মানন্দ বিষম বিপদে পড়িলেন। কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছায় বিপদ কাটিয়া গেল। কনখল হইতে কল্যাণানন্দ স্বামী জানাইলেন যে, ভজনলাল লোহিয়া নামে এক ভদ্রলোক প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে, তিনি দুইজন মাড়োয়ারী ভদ্রলোকের কাছ হইতে আশ্রম স্থাপনের সমস্ত টাকাই সংগ্রহ করিয়া দিবেন। এইভাবে কনখলের আশ্রমও প্রতিষ্ঠিত হইল।

১৯০২ খৃষ্টাব্দে রাজা মহারাজ স্বামী ত্রিগুণাতীতকে ক্যালিফোর্নিয়া পাঠান।

১৯০৯ খৃষ্টাব্দে মঠ ও মিশন রেজেষ্ট্রি হয়। তখন মঠের আমূলে পরিবর্তন হইয়া যায়। মঠের কাজ দুইভাগে বিভক্ত হয়, একভাগ মিশন ও অন্য ভাগ মঠ। এই সময় বেলুড় মঠের ওয়ার্কিং কমিটি গঠিত হয়। তখন হইতেই রামকৃষ্ণ মিশন ও মঠ সন্ন্যাসীদের প্রতিষ্ঠানেই পরিণত হইল, কেননা ওয়ার্কিং কমিটিতে গৃহী কেহ রহিলেন না। গৃহস্থ ও ভক্তগণ ৫্ টাকা বার্ষিক চাঁদা দিয়া মেম্বর থাকিতে পারিবেন এবং মঠের সঙ্গে যোগ রাখিতে পারিবেন। আর যাঁরা একশো টাকা দিবেন, তাঁহারা আজীবন সদস্য থাকিতে পারিবেন, ইহাই স্থির হইল।

মঠ ও মিশন পৃথক হওয়াতে প্রচার বিভাগ এবং মঠ দুই আলাদা হইল; আয়-ব্যয়ের তহবিলও আলাদা হইয়া গেল। এক বিভাগের ভার লইলেন সভাপতি ব্রহ্মানন্দ স্বামী, অন্য বিভাগের ভার লইলেন সেক্রেটারী স্বামী সারদানন্দ। বস্তুত স্বামী সারদানন্দই ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সর্ববিধ শ্রীবৃদ্ধি ও প্রসারের কার্যে স্বামী ব্রহ্মানন্দের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ।
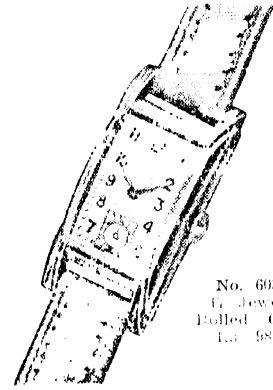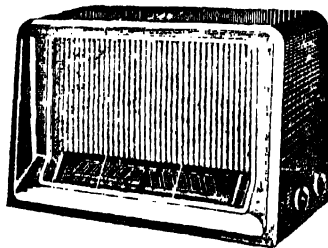
যে হেতু আমি চিকিৎসাব্যবসায়ী অসুখ নিরাময়ই আমার কাজ এই জেনে এসেছিলাম। রোগভোগ করতে আমরা চাইনে কিন্তু রোগ ভোগ না হওয়াটাও সচরাচর ঘটে না। সুতরাং চিকিৎসকরা কোনও কালেই বেকার নন। আমাদের দেশে চিকিৎসকের সৌভাগ্য নিশ্চিত অনেক বেশী। আমার সৌভাগ্য অন্যের দুর্ভাগ্যের কণ্ঠলগ্ন হয়েই আসবে আর সে সৌভাগ্যের পরিমাপ আমরা কিছুতেই করে উঠতে পারব না, যদি না বুঝি এমন সৌভাগ্যের সংগ্রামও সংসারেই রয়েছে যা মনুষ্যত্বকেই নাড়া দেয়। এমনি এক কাহিনী আমার অভিজ্ঞতায় আছে।

মোহনকে আমি প্রথম একবার ওর বস্তিঘরে দেখতে গিয়েছিলাম। চমকে উঠেছিলাম ওর সুন্দর স্বাস্থ্যের উজ্জ্বল্যে। জ্বরে প্রায় সম্বিতহীন হয়েছিল সে।

বস্তিঘরের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ। দড়ির খাটিয়ার দরিদ্র-মলিন সামান্য শয্যায় স্বল্প আলোয় মোহনের মুখ যেন ফুটপাথে বিছিয়ে রাখা আপেলের মত রক্তাভ মনে হল। অসুখে মানুষের মুখ অনেকসময় অসম্ভব সুন্দর হয়, মোহনকে দেখেও মনে হয়েছিল তাই। মৃত্যুর আগে অনেকের মুখে যে শান্ত উদ্বেগহীন সৌন্দর্যের দ্যুতি ফোটে ওর মুখও তেমনি।

কিন্তু মোহনকে পরীক্ষা করে ওর মৃত্যুর আশংকা হয়নি। মনে হল ম্যালেরিয়া জ্বর। ব্যবস্থাপত্র লিখে চলে আসছিলাম। একটি মেয়ে আমার পায়ের কাছে বসে পড়ল। এতক্ষণ ওকে ভাল করে লক্ষ্য করিনি। অসহায় চোখ মেলে বললে—ডাগতারবাবু মোহনকে জলদি ভালা কর দিজিয়ে। আমরা ঘর যাব। হিন্দী বাংলার দেহাত টান ওর কথায়।

কোথায় ঘর? প্রশ্ন করলুম আর বুঝলাম এটা হচ্ছে আমার কাছে দশ মকুব করে দেবার একটা অনুনয়।

বললে—লখনৌতে ওদের বাড়ি। আসামের চা-বাগান থেকে পালিয়ে এসে নানা অসুখে ভুগছে মোহন তাই যাবে বলেই এসেছিল। কিন্তু মোহন শহরে এসে আর যেতে চায় না। শ থেকেই সে রোগ বাঁধিয়েছে।

—এখানে কি করে ও? আমি করেছি।

—কি আর করে, বেকার! কে মোটর গাড়ির দোকানে কাজ ক হামেশাই সে কাজ থাকে না। বলে ত ঠেলা টানব। রোদে বাদলে ঠেলা বইত কেমন করে বলব, এ কাজটা তো ক পরিশ্রমের কাজ, যে মোটর গাড়ি চালা সে কেমন করে ঠেলা বইবে ডাগতারবা কথাগুলো বলে ও মুখ নিচু করলে। ল করলাম মোহনের স্ত্রী মোহনের একটুও কম সুন্দর নয়। সুঠাম উদ্ধত যৌবন খাটো শাড়িতে মানেনি, মুখে তেলচিক্কণ শ্যামলতা, চে সপ্রতিভ আকৃতি। সুন্দর পুরু

অন্তত মোহনের জীবনে সার্থক হয়েছে।

মোহনের স্ত্রীর কথায় কিছুটা সময় ব্যয়িত হল। চিকিৎসকের রোগীর বিষয়ে কিছুটা অন্তরংগ হওয়াটা যে চিকিৎসায় ফল দর্শায় একথা আমি মনে রাখতাম। চলে আসবার সময়ে বলে এলাম ডাক্তারখানায় লোক পাঠিও ওষুধ দিয়ে দেব।

বলা বাহুল্য, মোহনের স্ত্রীর হাত থেকে প্রথম দিনেই আমার দর্শনীর টাকা নিতে আমি অপারগ হলাম।

মোহনের স্ত্রী নিজেই এসেছিল ওষুধ নিতে। কিছুক্ষণ আগে ওকে যেমনটি দেখেছি তেমন আর ওকে মনে হল না। টানা টানা চোখে কাজল বা সুরমা কিছু পরেছে। উত্তর প্রদেশের মেয়েরা ওমনি ধরনের কিছু চোখে দিয়ে থাকে আমি জানতাম। কিন্তু ওর হলুদ শাড়ি লাল কামিজের মত আটো পেটের উপর পর্যন্ত ব্লাউসে ওকেই যে বস্তিঘরে দেখেছি বলে বিশ্বাস হচ্ছিল না। এক ঝলক ওকে দেখে নিয়েই বিস্ময়ে আনমনা হয়েছিলাম।

খেয়াল ছিল না যে আরও কয়েক-জন রোগী ঘরে অপেক্ষা করছে। কম্পাউন্ডার বা অন্য ব্যক্তির উপস্থিতিও আমাকে যথেষ্ট দৃঢ় থাকতে দিলে না যেহেতু বর্তমানে মেয়েটিকে বস্তিঘরের এক রোগীর স্ত্রী বলে আমি কিছুতেই মানতে পারছিলাম না।

মোহনের স্ত্রী আমার সামনে একটি চেয়ারে আসন গ্রহণ করলে; কারো অনুরোধের অপেক্ষা করেনি সে। সকালে যে অসহায়তা দেখেছিলুম ওর মধ্যে তার কিছু নেই। বৃষ্টি নয়, এক পশলা বাদলের ধোয়া মোছা আকাশের গায়ে মুঠো মুঠো নরম রোদের মত সে-মেয়ে যেন সজীবতা ছড়িয়ে দিলে। যেন আমার সংগে বহুকালের পরিচয় ওর, বললে—ডাগতার সাহেব ওষুধের কি করবেন?

ওর কথায় যেন রূঢ় নাটকীয়তা; আমি চমকে উঠেছি লজ্জায়। কর্তব্যের বিচ্যুতি ঘটছিল যে তাইতে নিজের প্রতি রাগ হল। স্তব্ধতা ভেঙে বললাম—মোহনের ওষুধ তো! আমার মনে আছে। বললাম।

অন্যান্য রোগীরা ব্যবস্থাপত্র নিয়ে বিদায় নিলে। চেম্বারটা বড়ই শূন্য মনে হচ্ছিল, যদিও মোহনের স্ত্রী তখনও ওষুধের জন্য অপেক্ষা করছিল। অন্যদিকে কম্পাউন্ডারের ওষুধ তৈরীর শব্দ হচ্ছিল—শিশির টুং টাং হামানদিস্তের ঠক্ ঠক্। সেই মুহূর্তে মনে হল পৃথিবী থেকে কেন্দ্রচ্যুত হয়ে আমি আর মোহনের স্ত্রী যেন অনন্তকাল মুখোমুখি অপেক্ষা করে রয়েছি। মোহনের স্ত্রীর সমস্ত অবয়ব যেন মংগল গ্রহের গল্পের মত আশ্চর্য রক্তাভ হয়ে উঠেছে।

—আপনাদের শহর ভাল নয় যাই বলুন! অতঃপর মোহনের স্ত্রীই আমাকে বাস্তববুদ্ধি ফিরিয়ে দিয়েছিল কথা বলে। আর আমি পুনর্বার আশ্চর্য বোধ করলুম ওর পরিষ্কার বাংলা কথা শুনে। বললাম—এমন চমৎকার বাংলা কেমন করে শিখলে?

হাসলে সে—শিখব কেন, ওটা আমার মায়ের পেট থেকেই শেখা। আবার হাসলে: এবার অনেক অন্তরংগ উচ্ছলতা ওর কথায়—কী অমন অবাক হচ্ছেন কেন, বাঙালীকে বাঙলা ভাষা শিখতে হয়!

—তবে যে বলেছিলে, মনে করে বললাম,—লখনৌতে তোমাদের দেশ।

—আমার নয় মোহনের।

—তুমি বাঙালী?

—হাঁ, খাঁটি ঢাকা জেলার মেয়ে আমি। এবার মোহনের স্ত্রী উঠে দাঁড়াল, বললে—কিন্তু অনেক সময় লাগছে, আমার ওষুধটা এবারে দিন।

আমি কম্পাউন্ডারকে কিছুটা তাগিদ দিয়ে মোহনের স্ত্রীকে বললাম, একটা হাত ওর, অনেক রোগীর ওষুধ পত্র ওকে একসংগে তৈরী করতে হচ্ছে বলেই একটু দেরি হয়ে যায়। এরই মধ্যে দু একজন রোগীর অভিভাবক অন্যদিকে ওষুধ নিয়ে চলে গিয়েছিল বা অপেক্ষা করছিল। মোহনের স্ত্রীকে আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়েছিল।

আমি মোহনের স্ত্রীকে অশালীন হলেও একটি প্রশ্ন না করে পারিনি—বললাম, আন্তঃপ্রাদেশিক বিয়ে তো বড়

তাতে.........

মোহনের স্ত্রী আমার কথায় বাধা দিয়ে বললে, ও প্রশ্ন করবেন না। একটু চুপ করেছিল, ঢোক গিললে, রক্তিম গালটায় ওর রঙ বদলাল। এক

থেকে ময়মনসিংহ গারো পাহাড়ের সারাটা তল্লাট সিলেট শিলচর সুনামগঞ্জ, অনেক শহর ঘুরেছি, হাজার লোকের চোখের কাঁটার মত অই এক প্রশ্ন—কেন ওকে বিয়ে করলে! তার আগে যে কেন ঘর ছেড়েছি, নদীতে ভেসেছি, জেলে কাটিয়েছি পর্যন্ত সে-সব কথা কেবলই মনে করতে হবে?

মোহনের স্ত্রীর কথায় অভিমান না অভিযোগ সরব হয়ে উঠল বুঝতে পারিনি। আমি ভাবলুম, বাঙালী-মেয়েরাও তাদের ভাগ্য নিয়ে সুন্দর কাহিনী রচনা করতে পারে, তেমনি কোনো কাহিনীর কিছু হয়তো মোহনের স্ত্রীকে সীমন্তিনী করেছে। কিন্তু মোহনের সঙ্গে ওর যা কিছু সম্পর্কই হোক না ওর রূপে যৌবনকে উপেক্ষা করবার নয়। সব কাহিনীর একটি আরম্ভ এবং শেষ থাকে। মোহনের স্ত্রীর বিবাহিত জীবনের আত্ম-বিশ্বাস কি এমন প্রচণ্ড অনমনীয়তা দিয়েছিল ওর যৌবনকে, ওর চরিত্রকে, যে সমস্ত আত্মপরিচয়ই উদ্ঘাটন করে দিতে পারে সে সহজেই? আমাকে গ্রথিত করতে হচ্ছিল সে প্রশ্নের উত্তর।

কম্পাউণ্ডার এসে ওকে ওষুধের শিশি দিলে। আঁচলের টাকা খুলতে খুলতে ও বললে, আর এত পুঁজি নেই যে মোহনকে ওষুধ খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখব।

আমি বললাম,—টাকা রেখে দাও; যখন পারবে তখন দিও, আর তোমার সবটা পরিচয় জানা হলো না তো!

—ও কথা থাক, নাই বা শুনলেন—একটু বিষণ্ণ আর কৌতুকমিশ্রিত চোখ মেলে মোহনের স্ত্রী হেসেছিল, বলেছিল—আপনি যে কত উপকার করলেন! আপনার মত দয়া কিন্তু সংসারে বেশি লোকের নেই।

মোহনের স্ত্রী চলে গেল।

মোহনের স্ত্রী আমার কাছে অপরিসীম রহস্যের মত। রোগীর থেকে রোগীর স্ত্রীর ইতিহাস জানবার জন্য মনটা আমার বিশ্রী রকমের লোলুপ হ'ল। এমন কি একথাও অসম্ভব নয়, ভাবলাম যে বাঙালী মেয়ের ঢল ঢলে চোখ এবং স্নিগ্ধ নদীর মত উচ্ছল একটি মন নিয়ে মোহনের স্ত্রী সংসারের কঠিন আঘাটায় এসে যেন মাথা

কোণায় একটা অসম্ভব ইচ্ছা উন্মাদ করে তুললে। যেমন করে হোক এ নদীর উৎসটি আমি জানব কী আঘাটার কিছু শুশ্রূষা আমার দ্বারা ঘটে তা আমি করব।

আশা করেছিলাম মোহনের স্ত্রী আসবে কিন্তু সে এল না। দুপুর রোদে পথে যারা ঘুরে বেড়ায় তাদের দি[illegible] তাকিয়ে থাকি, মোহনের মত সুন্দর উজ্জ্বল স্বাস্থ্যশ্রীতে কাউকে তো দেখিনে। সবাই পিঠ ভেঙে চলেছে ঘামে শ্রান্ত এ[illegible] অবোধ্য ভারবাহী ক্লান্তি তাদের মানুষের মুখশ্রী কেড়ে নিয়েছে। এই সব মানুষের ভিড়ে যারা ঠেলা টানে, মোটর চালায় নানা ধান্ধায় ঘোরে মোহনকে তাদের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে পারিনি। সে চা-বাগানে নেহাত জীবিকার জন্যেই গিয়েছিল। নইলে সে বিজয়ী। পুরুষের যা সাফল্য সেই অসাধারণ একটি আগুনের জীবনকে অনায়াসে সে জয় করেছে। একটি সুস্মিত-শ্রী মেয়ে, যে বাঙালী, পদ্মাপারের ঢেউভাঙা চর থেকে কলসীর বনঘেরা বিলের কিনার থেকে হিজল চালতার ছায়ায় ডাহুক পাখীরা নির্জন কান্নায় নিঃসঙ্গ দুপুরে কৈশোরের মনোরম জ্বরে পুড়ে পুড়ে যৌবনের ভীষণ সুন্দর আগুনের স্বাদকে পেতে চেয়েছিল, মোহন কী তাকে সেই আগুনের রূপকথাটি বুঝিয়ে দিয়েছিল!

আমি স্বভাবত কল্পনাপ্রবণ তাই দুপুরে যখন মাছিগুলি নীল পাখা মেলে গুঞ্জন করত যখন ওষুধের শিশিগুলি সোদাগন্ধ মুখে করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকত একলা, তখন আমি নানা কথা ভাবতুম।

ইদানীং মোহনের স্ত্রীর কথা ভাব-ছিলাম। মনে হল রুগ্ন মানুষ ঘেঁটে ঘেঁটে আমি প্রায় সুন্দর স্বাস্থ্যের মনো-হারিতা যে কি তা প্রায় ভুলে গিয়ে-ছিলাম। ভুলে গিয়েছিলাম যে মানুষের চোখেই অমন মারাত্মক ঔজ্জ্বল্য থাকে যেমনটি দেখেছি মোহনের স্ত্রীর চোখে—দ্বীপান্তরের স্তব্ধতা নিয়ে সে চোখ নিবিড়। গহন অরণ্যের শ্যামান্ধ বৈ[illegible] বিলাস যেন মোহনের স্ত্রীর শরীর—গণ্ড-দেশের স্থির পথে, গ্রীবার উচ্চকতায় অপ্রতিরোধ্য ইঙ্গিতের ছায়া—তার বক্ষ-

মনুষ্য দিনের অন্ধকার সঞ্চারী মৌনতার একটি গাছ কী পাতা সে মেয়ে। আমি সেদিন এমনি কিছু মোহনের স্ত্রীর মধ্যে দেখেছিলাম।

ডাস্টবিনের কাকগুলির উদ্ধত কলরবে আবার আমি রাস্তাটির প্রতি মনোযোগী হয়ে উঠি, ঘড়ির দিকে তাকাই, নারী মনের অস্পর্শ অনুভূতি থেকে নিজেকে প্রচণ্ড টানে টেনে তুলি। নিজের হাতে যে কল্পনার তাঁত বুনেছি তা কি আর নিজের হাতে কাটতে পারি? সন্দেহ কি মোহনের স্ত্রী আমাকে আকর্ষণ করেছিল! অতঃপর ব্যাগটা হাতে নিয়ে পথে বেরিয়ে পড়তে হয়।

হাসপাতাল বাড়ির পিছনেই বস্তি। নিচু টিনের ঘর—বাইরে সারি সারি দোকান, ভিতরে গৃহস্থালীর ভিড়। সন্ধ্যে হচ্ছিল, চাপ চাপ ধোঁয়া গলিটার মাথায়, কলের কাছে ভিড়, রুটি কাবাবের দোকানে হাঘরে মানুষের কলরব। মোহনের ঘরটার সামনে কখন দাঁড়িয়েছি—আর সব আমার চোখ থেকে মিলিয়ে গেছে কেবল একটা দর্জির দোকানের একটানা ক্রিট্ ক্রিট্ শব্দ ভেসে আসছিল। দাঁড়িয়েছিলাম। ঘর ভুল করিনি তো? না।—মোহনের স্ত্রী বেরিয়ে এল, খাটো কাপড় পরনে, সুডৌল দুখানা নগ্ন হাত নেড়ে বললে—'আপনি?'

আমার সঙ্কোচ হবার কথা নয়। বিশেষ করে এই বস্তিতে আমি যখন ডাক্তার হিসেবে ঈশ্বরের মত দোর্দণ্ড প্রতাপে মানুষকে বাঁচাতেও পারি মারতেও সক্ষম—এমনি একটা ভাব আমার। তবু মোহনের স্ত্রীর কাছে আমার সমস্ত ক্ষমতা যেন লোপ পেয়ে গেল। বললাম—কই মোহনের কোন খবর দিলেন না। আর...

—তাই এলেন, মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললে সে—আসুন ভিতরে আসুন কিন্তু কোথায় যে বসবেন। একটু যেন বাঁকা হাসি ছিল তার ঠোঁটে। ঘরে ঢুকলাম, কিন্তু মোহনকে দেখলাম না।

বললাম—মোহন কোথায়?

—সে বেরিয়েছে ফিকিরে, কালই জ্বর ছেড়ে যেতে বেরিয়েছিল, কি যে করে জানি না। দেখুন না কালই আমার জন্যে এই শাড়িটা কিনে এনেছে, কি খাটো ন

... এনেছে। হাসতে হাসতে ও নিজের পরনের শাড়ির আঁচলটা টেনে দেখালে। দড়ির খাটিয়াটা দেখিয়ে বললে, বসুন, কিন্তু আপনি কি এখানে বসতে পারবেন?

—এই জ্বর ভাল করে না সারতেই কাজে গেছে! ও কত পায় কাজ করে?—আমি প্রশ্ন করি।

—খুব কিছু পায় না হাতী, তবে আমাকে সুখী করার জন্যে একটা কিছু করে, কাজই করে যদি কাজ পায়, চুরি করে না। আমাকে সুখী করবার জন্যে ও খুন পর্যন্ত করতে পারে, ও বলে। বলেই মোহনের স্ত্রী গম্ভীর হয়ে গেল। বুঝলাম অসহনীয় দারিদ্র্যকে মোহনের স্ত্রী গরীবি জীবনের বিনা লবণের অন্নের মতই স্বাভাবিক বোধ করতে শিখেছে। চুপ করেছিল মোহনের স্ত্রী। আমি আবার হঠাৎ প্রশ্ন করে ফেলি—তুমি মোহনকে বিয়ে করলে কেন? ঘরে কতগুলি আরশুলা উড়ছিল, দড়ির খাটিয়ার কোণে আমি সন্ত্রস্ত হয়ে বসেছিলাম। একটি আরশুলা উঠে এসে আমার কানে নাকে তার পাখার ঝাপটা লাগিয়ে যেতে লাফিয়ে উঠলাম। মোহনের স্ত্রী খিল খিল করে হেসে উঠল। ওকে একটি কিশোরীর সুন্দর কৌতুকে ডুবে যেতে দেখলাম। আরশুলাগুলি তাড়াতে তাড়াতে বললে—কদিন বাদলা গেছে তাই ওদের শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে। মজা এই মোহন সারা রাত ওর ভারী জুতোটা দিয়ে ওদের পিটিয়ে মারে আর চিৎকার করে। পিঠ ফিরিয়ে ও হাসছিল তারপর চলে যেতে যেতে বললে—বসুন আলো আনি।

ফিরে আসতে লণ্ঠনের আলোয় মোহনের স্ত্রীর মুখ কঠিন মনে হল। আরশুলাগুলি অন্তর্হিত হয়েছিল। আমি আবার আগের প্রশ্নটি তুললাম—ডাক্তারী করতে এসে তোমাকে চিকিৎসা শাস্ত্রের বাইরের কিছু জিজ্ঞেস করছি বলে কিছু মনে কর না, জানতে ইচ্ছে করছে বাঙালী হয়ে তুমি অবাঙালীকে বিয়ে করলে কেন, ব্যাপারটা তো সচরাচর ঘটে না।

—সব শুনে আপনি আমার কি করবেন? বড় বড় চোখ মেলে ও আমার পাশে এসে বসে পড়ল। একটুক্ষণ নীরবতা, লণ্ঠনের স্থির আলোর দিকে

তারপর বলতে শুরু করলে—যুদ্ধের দিনে আমাদের শহরে অনেক সৈন্যের ছাউনি পড়েছিল। স্কুলে যাবার পথে মোহনকে সেই ছাউনি অঞ্চলে প্রথম দেখেছিলুম। ও হাসপাতালে ছিল। কখনও কখনও ওকে নদীর ধারে বাঁশী বাজাতে শুনেছি, সেই পথেই ওর সঙ্গে আমার আলাপ। ওর মত সুন্দর পুরুষ আমি কখনও দেখিনি। গল্প শুনতে শুনতে আমি পাগল হয়ে গিয়েছিলুম। আমি লক্ষ্য করছিলুম—ও ওর আঁচলের খুঁটটা কেবলই আঙুলে জড়াচ্ছিল।

—আমরা উঁচু ঘর ব্রাহ্মণ। বাবার বেশ ভাল ব্যবসা ছিল। বলছিল সে—আমার নাম মালতী, মা ডাকতেন মালু বলে, কতদিন বলেছেন তিনি—মালু নদীর পথে একলা যাসনি। কিন্তু আমি তখন মোহনকে রাজপুত্তুর ভেবেছি। একদিন মোহন হাসপাতাল থেকে ছুটি পেয়ে গেল—বললে—মাল-তি এমনি-ভাবে ও আমাকে ডাকত। বললে আমি দেশে যাচ্ছি, আমার অসুখ সারলেও মিলিটারীতে আর আমাকে কাজে নেবে না।

—আমি বলেছি আমাকে সঙ্গে নেবে!

বলতেই মোহন রাজী। সেই ঘর ছাড়লুম, কিছুই আমাকে ধরে রাখতে পারল না, কেবল মার সেই মালু ডাক আমাকে মাঝে মাঝে কাঁদাত, কেন না আমি তাদের বড় আদরের মেয়ে ছিলুম। কিন্তু আমার ভালবাসার সাধ—সব কিছু তার কাছে তুচ্ছ হয়ে গেল। একদিন পুলিসে আমাদের ধরে নিয়ে এল, কোর্টে বিচার হল—আমি বললুম মোহনকে আমি স্বেচ্ছায় বিয়ে করেছি। মা ও বাবা ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিলেন, আমার ভালবাসাকে তাঁরা ক্ষমা করলেন না।

ভালবাসার সাধ এক, ভালবাসা পাওয়া অন্য, মালতী বলছিল, জানেন ভালবাসা এক ব্যাধি এর চিকিৎসা নেই।

মালতীর চোখের কোণে অশ্রু টল-মল করে উঠেছিল, অনেকটা সময় কেটেছে, কুণ্ডলী কুণ্ডলী স্বল্প আলোর মধ্যে মালতীর মুখের দিকে তন্ময় হয়ে

ওর মুখ মৌসুমী মেঘের মত। অনেক বৃষ্টির জলধারা তাতে। ও যেন গুমোট দিনের পর নীলস্তবক কটি অপরাজিতা হাওয়ায় আন্দোলিত গ্রন্থিমুক্ত সময়ের এক ঝলক আলো। ওর বেদনাসিক্ত মুখ আমাকে দুঃসাহসী করলে, আমি ঠিকই ভেবেছি মালতী ভুল করেছে। ওর হাতদুখানা নিজের মুঠিতে নিয়ে বললাম—মালতী ছেলেবেলার অপরিণত বুদ্ধিতে তুমি ভুল করেছ।

সেই মুহূর্তে বিদ্যুতের শাণিত শলাকা যেন আমার রক্তকে পীড়িত করলে। বাইরে কার পায়ের শব্দ হচ্ছিল। মালতী আমার হাত ছাড়িয়ে উঠে দাঁড়াল, ম্লান হাসি ওর মুখে, বললে,—মোহন আসছে ওকে দেখে যেতে পারলেন ভালই হল। বাইরে আলো নিয়ে যাবার সময় বলছিল—বুঝিনে পুরুষ মানুষেরা মেয়েদের সহজ বিশ্বাসটুকু পেলে নিজেদের এত সাহসী ভাবে কেন?

আমি বোধবিহ্বল একদলা মাংস-পিণ্ডের মত নিজেকে অপেক্ষা করাতে বাধ্য হলাম।

মোহন এল। মালতী বললে—দেখ ডাক্তারবাবু কি ভাল, তোমাকে দেখবেন বলে বসে আছেন।

মোহন বললে—খুব ভাল দাওয়াই দিয়েছিলেন ডাক্তারবাবু তাই একদিনে জ্বর সেরে গেল।

আমি উঠে পড়েছিলাম—বললাম, তা হলে আজ যাই; মোহনকে খুব অল্প পরি-শ্রম করতে উপদেশ দিয়েছিলাম মনে আছে।

মোহন বললে—না কিছু পরিশ্রম নেই কাজই জোটে না তো পরিশ্রম হবে কোথা থেকে।

মালতী বললে—ওকে একটা কাজ দেবেন ডাক্তারবাবু?

চুপ রও আমার জন্যে তোমার দরবার করতে হবে না। মোহন চিৎকার করে উঠেছে, আহত পশুর মত রোষকষায়িত দৃষ্টিতে সে আমার দিকে চাইলে তারপর খাটের কোণায় গিয়ে সে চুপ করে বসে রইল।

ওর পুরুষকারে মালতী যেন কালি ছিটিয়ে দিয়েছে। ব্যাপারটা বিশ্রী রকমের

ছিলাম। মালতী আমাকে পথ পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এসে বলেছে, এমনি গোঁয়ার অবুঝ মোহন বুঝলেন।

আমি চলে এসেছিলাম, মোহনের ব্যবহারকে আমি ক্ষমা করতে পারিনি, আর ভেবেছি হাজার হলেও মোহন নিশ্চয়ই কোনও শিক্ষাদীক্ষার ধার ধারেনি সে কুলি কামিনদের মতনই অশালীন।

কিন্তু মোহন আমার চেয়ে যে সহস্র গুণে রূপবান। তবুও আমার সামাজিক স্বীকৃতি আমাকে উদ্ধত করলে, ভাবালে যে মালতী ভুল করেছে, ভুল মানুষকে নির্বাচন করেছে সে।

মোহন সম্বন্ধে আমার ধারণা যে ঠিক তা ভাবতে আমার যুক্তির অভাব হ'ত না। কিন্তু মালতীকে আমি বুঝে ফেলেছি, এ বিষয়ে আমার সন্দেহ ছিল না। আমার দিক থেকে একটা অন্তরঙ্গতা আর মালতীর আমার কাছে অকুণ্ঠ দাবী আমার সহায়তাকে প্রকট করলে, আর আমাদের সামাজিক ব্যবধান ক্রমশই অবান্তর হয়ে গেল।

কিছুকাল মালতী আমার কাছে প্রায়ই আসত, ছল করে একটা ওষুধের শিশিও সঙ্গে আনতে ভুলত না। ওর এই মন্দ ভাবকে আমিই উৎসাহিত করছিলাম কেননা আমি মালতীকে তার ভাগ্যকে জয় করবার জন্যে তার ভালবাসা স্বাধিকার-রূপ ফিরিয়ে পেতে দেখলে খুশীই হতাম। অথচ আমি বুঝিনি মালতী সেই জাতের মেয়ে—যে ভালবাসাকে জ্বালায় কিন্তু সেই ইন্ধনকেই যে মূল্য দেয় না। আমি মালতীর প্রতি হয়তো সেই কারণেই আসক্ত হয়েছিলুম।

মালতীর দুরাকাঙ্ক্ষা ও উচ্চাশা সব শহরের মতই, শহরে এসে ওর দেহের লাবণ্য শহরের মত প্রসাধিত হয়েছে, আর মোহন দারিদ্র্যের রূঢ় স্বভাবে মালতীর প্রেমকে ভেবেছে তুচ্ছ।

আমি ভেবেছি মোহনের সুন্দর কমনীয় দেহ যদি নোংরা হয়ে ওঠে, পশুর মত হিংস্র ও অবিবেকী হয়ে যদি সে হাত দিয়ে তাকে বিকৃত করে তবে ভাগ্যকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। মালতীর প্রতি আমার আকর্ষণ অজস্র হয়ে উঠল, সন্ধ্যার নদীর জলে ভেসে আসা ফুলের মতই ওকে উজ্জ্বল সুন্দর মনে হয়েছে। ওর সুন্দর দেহের ওর সুন্দর জীবনের সাধকে আমি কিছুতে মন্দ ভাবতে পারিনে। ও আমার কাছ থেকে অর্থ চাইত প্রায়ই। আমি দিতাম, আমি জানতাম ওরা প্রায় অনশনে আছে।

আর একদিন ও আমার কাছে অর্থ চাইতে আমি বললাম—কি করবে?

ও হাসল বললে—কাঁচের চুড়ি পরব, ব্লাউস কিনব।

—এই এতটুকু শখ, শাড়ি নয় গয়না নয়, তোমার স্বামীই তো কিনে দিতে পারবে—আমি পরিহাস করেছি।

—পারে না বলেই তো বলছি এটুকু জিনিস আমায় দিতে পার না—খিল খিল করে হাসতে থাকে মালতী, নিরপরাধ সে হাসিতে এতটুকু গ্লানি নেই।

নিরুপায় আমি। আমার সামাজিক অস্তিত্ব আমাকে বার বার পরিহাস করছিল। মালতী আমার কল্পনায় অনির্বচনীয় আকাশ সৃষ্টি করেছে যেখানে ধূমল মেঘের ভীষণ লুকোচুরিতে বিদ্যুতালোকের কঠিন পরিচয়টুকু আমাকে শান্ত হতে দেয় না। চাই চাই আমি মালতীর সমস্ত অস্তিত্ব বন্ধনহীন বর্ষণ স্রোতো নদীর মত পেতে চাই।

মালতী তুমি ছোট বেলায় যা করেছ তা ভুল মোহজালে করেছ, তুমি তোমার হাতেই এই ভাগ্যকে পরিহার কর। আমি অস্থির হয়ে বলেছি।

কেমন করে আর তা হবে আমি যে মোহনকে একদিন সত্যিই ভালবেসেছি,—মালতী অবোধ্য শূন্যতায় চেয়ে থাকে।

আমি বলি—তুমি ভদ্র জীবনে ফিরে আসতে চাও না, আমি তোমাকে সাহায্য করব, তুমি ধাত্রীর কাজ নাও।

মালতী খুশী হ'ত—বলত পারবে তুমি আমাকে কাজ দিতে?

আমি বুঝি মালতীও তার ভুল বুঝেছে ও আর বঞ্চিত হতে চায় না। ও ওর ভালবাসার নিরর্থকতা থেকে মুক্তি চায়।

—কিন্তু আমাকে টাকা দাও,—মালতী বললে আর মোহন যেন জানে না তুমিই আমাকে টাকা দিয়েছ, আমি বলব, সেলাইয়ের কাজ করে টাকা পেয়েছি মিথ্যা কথা বলব। কারণ ওকে আমি যেমন ভালবাসি তেমনি দুশমনের মত ভয়ও করি। মনে হয় চা-বাগানেই মোহন কেমন বদলে গেছে। ছুটির দিনেও আমার কাছে থাকত না, ওর বাঁশী বাজবার শখ মরে গিয়েছিল। চা-বাগানে মংলু বলে একটি ছোট ছেলের সঙ্গে আমার ভাব হয়েছিল, সকাল সন্ধ্যাতে মোহন যখন কাজে রইত তখন মংলুর সঙ্গে আমি বেড়াতাম গল্প করতাম। মোহন ওকে সইতে পারত না ওকে নিয়ে আমার সঙ্গে বিবাদ করত। একদিন মংলুকে আর দেখা গেল না। তারপর ওর মৃত দেহটা ওরা খুঁজে পেলে! আমার মন সেদিন থেকেই ভেঙে গেছে, আমি কেবল কেঁদেছি আর কেঁদেছি। আমি ভালবেসে কি পাপ করেছিলুম ডাক্তারবাবু......মালতী অঝোরে কেঁদে উঠল। মংলুকে হয়তো মোহনই খুন করেছে। তবু আমি মোহনকে ঘৃণা করতে পারি না। মালতীর সব কাহিনীই আমার জানা হয়ে গিয়েছিল, আমার মনে হল আমিও কি অর্থ দিয়ে মালতীর অসহায়তাকে আমার করায়ত্ত ভেবেছি, আমি কি মালতীকে ভুল আশা দিয়েছি আমি কি দুঃসাহসে মালতীর প্রেমিক হতে চলেছি?

মালতী চলে গিয়েছিল। মোহনের অস্তিত্ব যেন আমার প্রচণ্ড শত্রুতা সাধন করছিল, সেই মুহূর্তে আমি আর্ত বোধ করলাম নিজেকে। চেম্বারে রোগীর ভিড় নেই, কম্পাউণ্ডার কোথায় ছুটি নিয়ে গেছে। বৈশাখী সন্ধ্যায় উদাসী হাওয়া

মেঘ এসেছে, ঘন কৃষ্ণ মেঘ, রাস্তার গ্যাস-লাইটে সবুজ আলো চোখ মেলে আছে দূরায়ত স্মৃতির মত, ধুলো উড়ছে ঝলকে ঝলকে. ট্রামের ঘণ্টা উদাসী হাওয়ার গলায় সুর এনে দিচ্ছিল হঠাৎ হঠাৎ। আমি কি করব, আমি কেন মালতীকে ফেরাতে পারিনে, ও কেন আমার কাছে এমন অকুণ্ঠ দাবী নিয়ে আসে?

এই ধুলোর রাস্তা যদি বৈশাখের দাহশেষে বর্ষণধারায় নরম পিচ্ছিল হয়ে ওঠে, যদি সংসারের বিবিধ বাসনা আমার ঝরা কৃষ্ণচূড়ার মত পথিকের পায়ের নিচে নিজেকে হারিয়ে ফেলে, তবে কাল কি সূর্য উঠবে না? কল-কারখানায় আবার বাঁশী বাজবে, দরকারী জিনিসগুলি কলের পেট থেকে বেরিয়ে আসবে, সংসারে সবাই আবার কাজ করবে। আর একদিন কৃষ্ণচূড়াও দেখা দেবে মাঘে শীত-শেষের বৃক্ষে। কেবল আমার ভাবনাগুলি আমার বাইরে চলে যাবে কিংবা আমার অস্তিত্বকে পাকে পাকে জড়াবে। মোহন দারিদ্র্যে প্রচণ্ড ব্যর্থতায় নিজের হাতকে কৃশ কালিমায় পোড়াবে আর মালতী ক্ষুধায় জ্বলবে। নানা বঞ্চিত

কাছে আসবে আমার পুরুষ কল্পনার অলীক তন্তু কেটে ও আমাকে স্ত্রী মাকড়সার মতই গ্রাস করবে আমার অসহায়তাকে ও ধিকি ধিকি জ্বালাবে।

মালতী সে দিনই এল যেদিন ও টাকা নিয়ে গিয়েছিল বিকেলে; এল সন্ধ্যেতে। হাতে এক রাশ নীল কাচের চুড়ি, গায়ে নীল ব্লাউস, চোখে সুরমা যেন এক গাঁয়ের মেয়ে মেলা দেখে ফিরছে, যেন সে এক নটের ছবির মত—নদীর নূপুরে ওর অবয়ব ছন্দিত। এক ঝলক জ্যোৎস্নার শরৎলাবণি সে মেয়ে। কিন্তু ওর চোখে অসম্ভব দুর্যোগ নেচে উঠেছিল। আমার মুখের কাছে ক্ষিপ্র হাতখানি বাড়িয়ে ওর নীল কাচের চুড়ি-গুলি মট মট করে ভাঙতে ভাঙতে বললে—এই তোমার টাকার চুড়ি। আমার হাত ধরে কাছে টেনে নিয়ে পিঠ ফিরিয়ে ব্লাউস দুরন্ত আবেগে খুলে ফেলে দিয়ে পিঠ নিচু করে বললে—এই ব্লাউস তোমার টাকায় কেনা, আর এ-সব পাওয়ার মস্ত লাভ আমার পিঠে।

দেখলাম ওর সারা পিঠে আঘাত কালিমা, পিঠ নিচু করে ছিল মালতী তার সমস্ত শরীর ভাদ্রের গঙ্গার মত বিষাদ-ক্লিষ্ট কিন্তু দুরন্ত প্রতিবাদী। মোহন ওকে মেরেছে।

—তবু তোমরা আমাকে কেন দিতে চাও কেন আমার ভাল চাও, মোহনের এত ভালবাসার পরও কেন আমাকে তাড়িয়ে দাও না? মালতী কাঁদছিল।

অভাবিত সুন্দর সেই মুহূর্ত আমার মুঠোর মধ্যে। অনির্বচনীয় বেদনার রমণীয় স্বাদ আমার অঞ্জলি ভরে দিয়েছে,—আমার বর্তমান ভূত ভবিষ্যত মুছে গেল, মালতী আমার বুকে মুখ রেখেছিল, আমার হাতে-তার অন্ধকার চুলের মত একরাশ দুঃখ মুছিয়ে দেবার জন্য এক সমুদ্র প্রার্থনা। আমার বোধ হল এক অলক্ষ্য নিয়তি আমার বাইরে আমার বোধ ও বিবেকের বাইরে সময়কে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছিল।

অতঃপর মালতীই জেগে উঠেছিল—কঠিন লজ্জা আর মধুর অন্তরঙ্গতায় আমি তার মুখে চিরকালের নারীর এক ক্ষমা সুন্দর মুখ দেখলাম, আর তার মুখ

দুঃখ বিভাসে জেগে উঠেছিল। নদীর এক নৌকার মত সে ভালবাসার বিশ্বাসকে ফিরিয়ে চাইছিল যেন, যখন সে বলেছে—আমাকে তোমার নিজের করে নিতে না, তোমার কাছে আর আমি আসব এলেও তাড়িয়ে দিও আমি যে মোহনের ওর একলার। আমি যাই নইলে বাঁচবে ও কি আমাকে বেঁচে রইতে যে গাড়োল খুনে মোহন!

মালতী ফিরে গেল। আমার অভূত সত্তা আমারই হাতের রচনা নিয়তিকে অনুসরণ করেছে। তার আমাকেই তাই বইতে হল। কিন্তু কালের কিছু কি আমাদের ভাগে নিশ্চিতি দেয় না আলো দেয় দেয়, নইলে আমাদের সুখ সৌভাগ্য দুর্ভাগ্য মহৎ কোনও দিন রূপ পেত না। সেই টুকুই আমার এ কাহিনীর উপসংহার।

মালতীর যে দুর্ভাগ্যই মোহনের সৌভাগ্যের যে মূল্য আমি দিতে দেখেছি তার তুলনা একদিন হাসপাতালের মোহনকে আবার দেখতে পেলাম। খানায় লোহা ঘাটতে ঘাটতে বোমা কুড়িয়েছিল, সেই বোমা দুটো হাতই উড়ে যায়। ওর দুটো কাটা হয়ে গিয়েছিল। দেখলাম, মনে হল মোহনের কাটা ব্যথা যেন ও নিজের মধ্যে জড়িয়ে সে সময়ের বর্ণনা আমি লিখব না। মোহন জ্ঞান হতে যে কথা বলেছিল মনে পড়ছে! আশ্চর্য খুশী মোহনকে, হাসিতে ঝলমল ওর মুখ বলেছে—ডাক্তারবাবু আর নেই, এই কাটা হাত অনেক মাল-তীও, আর আমাকে মালতীর দুচোখ দিয়ে বেকার হাতের যন্ত্রণা যেতে দেখেছি।

আমি ভেবেছিলাম সংসারের অসুখের নিরাময় মানুষের কিন্তু আমার ক্ষেত্রে তা আমার মুর্খের সান্ত্বনাও রইল না!

ডাক্তারের ডায়েরী

—ডাঃ আনন্দকিশোর মুন্সী

॥ ১১ ॥

বছর কুড়ি আগে কলকাতা শহরে লোকের অনুপাতে বাড়ি অনেক বেশী ছিল। প্রথম মহাযুদ্ধে লোকে যে প্রচুর টাকা কামিয়েছিল তা দিয়ে নতুন বড় রাস্তার ওপরে ততদিনে অনেক চারতলা পাঁচতলা বাড়ি তৈরী হয়ে গেছে। কিন্তু তা ভাড়া নেবার মত যথেষ্ট লোক তখনও শহরে আসেনি।

মাসে গোটা কুড়ি টাকা দিতে পারলেই ভাল পাড়ায় দুখানি ঘর নিয়ে একটা ফ্ল্যাট পাওয়া মোটেই কিছু কঠিন ব্যাপার ছিল না। কিন্তু ঐ টাকাই মাস মাস পকেট থেকে বার করা আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল। তাই বিনা ভাড়ায় কি করে শহরে থাকা যায় তার একটা বুদ্ধি আমাকে বার করতে হল।

ভাবলাম কম ভাড়ায় বড় একটা বাড়ি যদি ভাড়া নিই, আর নিজের জন্য খান দুই ঘর রেখে বাকীগুলি যদি ভাড়া দিই তাহলে নিশ্চয়ই ভাড়াটা উঠে আসবে। আমার নিজের ঘর-ভাড়া লাগবে না। এই ভেবে আপিস এবং কলেজ পাড়ায় দু-চারদিন ঘুরে অনেক বড় বড় বাড়ির গায় 'টু লেট' লেখা দেখে একখানা চারতলা নতুন বাড়ি পছন্দ ক'রে ফেললাম। এক বন্ধুর কাছ থেকে কিছু টাকা ধার করে এক মাসের বাড়িভাড়া জমা দিয়ে বাইশখানা ঘরওয়ালা চারতলা একখানা বাড়ি একদিন দখল করে বসলাম। চারতলার ওপর নিজের জন্য দুখানা ঘর রেখে দোতলা তিনতলার কুড়িখানা ঘরে ভাড়াটে বসিয়ে দিলাম। অত বড় নতুন বাড়ি, ভাড়া মাত্র ১৬০৲। ভাড়াটে পেতে বিশেষ কষ্ট হল না।

কিন্তু কিছুদিন যেতেই বুঝলাম ভাড়াটে পাওয়া যত সহজ, ভাড়া আদায় করা তত সহজ ব্যাপার নয়। বিপাকে পড়ে অনেকেই বাকী ফেলে, কেউ কেউ ফেলে ইচ্ছে করে। একবার বাকী পড়লে সহজে আর তা আদায় হয় না। তবু মার্জিনটা বেশী থাকায় এবং ব্যবসাবুদ্ধি ক্রমশ ক্রমশ মাথায় ঢোকায় অনেকদিন ঐ বাড়িতে বিনে ভাড়ায় কাটিয়ে দিলাম।

তখন সবে গত মহাযুদ্ধ বেধেছে। নামকরা জার্মান অষুধ সব কালো বাজারে চলে গেছে। গভর্নমেণ্টের ড্রাগ কণ্ট্রোলকে কলা দেখিয়ে ঘুঘু ব্যবসায়ীরা দিশী কুইনিন পর্যন্ত বাজার থেকে সরিয়ে ফেলেছে। বাজার থেকে কুইনিন এম্পুল কিনে ইন্জেকশন দিলে তখন আর ম্যালেরিয়া সারে না। মরফিন দিলে ব্যথা কমে না। এমিটিন দিলে আমাশা বন্ধ হয় না। অথচ বেশী দাম দিলে সব অষুধই পাওয়া যায় এবং কাজও বেশ হয়। অচেনা কোন দোকান থেকে হঠাৎ কখনও অষুধ কিনতে তাই আমাদের সাহস হত না।

সেই সময় পূর্ব বঙ্গ থেকে আমার এক চেনা ভদ্রলোক একটি রুগী পাঠালেন। আমার নামে একখানা চিঠি হাতে করে সুটকেশ বিছানা সঙ্গে নিয়ে সস্ত্রীক এক ভদ্রলোক একদিন সকালে এসে হাজির হলেন।

শুনলাম ও'র স্ত্রীর অসুখ, চিকিৎসার সব ব্যবস্থা করে দিতে হবে। একখানা ঘর খালি ছিল, ভদ্রলোক আগাম ভাড়া দিয়ে সস্ত্রীক সেখানে ঢুকে পড়লেন।

দেখলাম ভদ্রলোকের বয়েস বেশী নয়, আমাদেরই সমবয়েসী। নাম সমীর রায়। কলকাতা থেকে ৫।৬ বছর আগে ল' পাশ করে দেশে গিয়ে ওকালতি শুরু করেন কিন্তু পসার তেমন জমেনি। তাই আদালত ছেড়ে অন্য কিছু ব্যবসা করার মতলবে আছেন। কিন্তু বাপ ভারি কড়া লোক। নিজে ব্যবসা করেন, জায়গা-জমি আছে, নগদও বেশ কিছু জমিয়েছেন; কিন্তু ছেলেকে ব্যবসায় নাবিয়ে সে সব নষ্ট হতে দিতে তিনি রাজী নন।

সমীর বলল—চিকিৎসার নাম করে

এসেছি কিন্তু শীগ্‌গীর আর ফিরে যাচ্ছি না। দেখি এখানেই যদি কিছু করতে পারি।

জিজ্ঞাসা করলাম—আপনার স্ত্রীর কি অসুখ?

সমীর বলল—কি নয় তাই জিজ্ঞাসা করুন। আজ চার বছর বিয়ে হয়েছে, বছর দুই বেশ ভাল ছিল। কোন অসুখ বিসুখের কথা শুনিনি। তারপর থেকেই কী যে শুরু হয়েছে, আজ মাথা ব্যথা, কাল জ্বর, পরশু পেটে ব্যথা। নিত্যি একটা না একটা কিছু লেগে আছে।

জিজ্ঞাসা করলাম—বাচ্চা টাচ্চা কিছু হয়নি?

সমীর বলল—বছর দুই আগে একটি হয়েছিল। সেই থেকেই যত গোলমালের শুরু। এই যে ছিপছিপে পাতলা চেহারাটি এখন দেখছেন আগে এমনটি ছিল না। তিনটি বছর ধরে মেয়ে দেখে দেখে বাবা ভাল স্বাস্থ্য আর লেখাপড়া জানা দেখে এই বৌটি ঘরে এনেছিলেন। একটি পয়সাও যৌতুক নেননি। সেই চেহারা দেখুন এখন কি হয়েছে।

বললাম—সেই বাচ্চার কি হল?

সমীর বলল—আর বলেন কেন? ডেলিভারি হওয়ার সময়েই সেটি মারা গেল। মফঃস্বলের ডাক্তার তো! জীবনে সেই বোধ হয় প্রথম ফরসেপস্‌ দিল। বলল মাথা শক্ত হয়ে গেছে অমনি বেরুবে না। ফরসেপস্‌ দিয়ে টানাটানি করে বার করে দেখা গেল বাচ্চা নীল হয়ে গেছে। তাকে আর বাঁচানো গেল না। সে না হয় গেল; গাছ বেঁচে থাকলে অনেক ফল হবে কিন্তু দেখুন সেই থেকেই ইনি পড়লেন। জ্বর, মাথা ঘোরা, রক্ত নেই, একটার পর একটা চলছে। চোখের ওপর দেখছি লতা দিনকে দিন শুকিয়ে যাচ্ছে। ওখানে চিকিৎসায় কিছু ফল হচ্ছে না দেখে অবশেষে বাবা এখানে পাঠাতে রাজী হলেন।

বললাম—বেশ তো, বিকেলে ওঁকে দেখে কাকে দেখানো ভাল হয় ঠিক করা যাবে এখন।

বিকেলে সমীরের স্ত্রী লতাকে দেখলাম। ২৫।২৬ বছরের শ্যাম বর্ণা মেয়েটি, ভারি সপ্রতিভ। মুখখানা ভারি মিষ্টি। অসুখে ভুগে ভুগে চেহারা একটু শুকনো, কিন্তু চোখ দুটি বুদ্ধিতে খুশীতে উজ্জ্বল।

হেসে বলল—দুবচ্ছরে অনেক চিকিৎসা হয়েছে এখন দেখি এখানে কি হয়। আমার অসুখ আপনারা সারাতে পারবেন না।

আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—কেন?

হেসে লতা বলল—অসুখই নেই তো সারাবেন কি?

কথার রকম শুনে হেসে ফেললাম। বললাম—তা হলে এখানে এলেন কেন?

লতা দুষ্টুমিভরা চোখে একবার সমীরের দিকে তাকিয়ে বলল—বেড়াতে। কিন্তু সে কথা বললে কখনও আসা যায়? তাই অসুখের নাম করে এসেছি।

বললাম—বেশ তো, আজকেই তাহলে ডাক্তার দেখিয়ে রাখা যাক। তারপর যা ইচ্ছে ঘুরে বেড়াবেন।

সমীর বলল—আজকেই ওটা চুকিয়ে ফেলুন। বাবা বলে দিয়েছেন আজকেই ডাক্তার দেখিয়ে কি হল একটা খবর দিতে। কখন উনি দেখবেন? আগে থেকে ফোন করে যাওয়া ভাল হবে না কি?

দেখলাম কাকে দেখানো হবে আগে থেকেই এরা ঠিক করে এসেছে। ইনি আমাদের কলেজের প্রধান অধ্যাপক। তখন এঁর খুব নাম। আমাদের কেস খুব যত্ন নিয়ে দেখতেন। ফি নিয়ে কখনো কড়াকড়ি করতেন না। যেমন ভাল পড়াতেন তেমনি ছিল তাঁর রোগ নির্ণয় এবং চিকিৎসা। আউট ডোরে যেদিন ইনি যেতেন রুগীতে ঘর ভর্তি হয়ে যেত। তার ওপর তিনি ছিলেন পরীক্ষক। কাজেই ছাত্ররা সুযোগ পেলেই এঁকে দিয়ে রুগী দেখাত।

বললাম—ফোন করবার কোন দরকার হবে না। কাছেই তো ওঁর বাড়ী। হেঁটে যেতে পাঁচ মিনিটও লাগবে না। এখনি রওনা হতে পারলে অন্য রুগী আসবার আগেই আমরা পৌঁছে যাব।

সমীর বলল—তাহলে তাই চলুন। আপনি ততক্ষণ এই রিপোর্টগুলো দেখুন। লতা তৈরী হয়ে নিক।

দেখলাম মল মূত্র রক্ত থুথু সব পরীক্ষা করানো হয়েছে। বুকের এক্‌স্‌রে ছবি

তোলা হয়েছে। মফঃস্বলের ছবি খুব ভাল ওঠেনি। রিপোর্টে দেখলাম বুকে একটা গ্ল্যাণ্ড ছাড়া অন্য কোন দোষ পাওয়া যায়নি। আগে রক্তশূন্যতা ছিল, অষুধ খেয়ে আর ইনজেকশন নিয়ে তা এখন ঠিক হয়ে গেছে। জ্বরটা শুধু ছাড়ে নি।

বাচ্চা হবার পরেই যে জ্বর হয় তিন মাস পরে তা ছাড়ে। তারপর গত ছ' মাস থেকে সমানে জ্বর হচ্ছে। অল্প ঘুষ ঘুষে জ্বর। কোন দিন দুপুরে, কোন দিন বিকেলে কখনও বা রাত্রে আসে। কোন দিন ৯৯° কোন দিন বা ১০০°। মাঝে মাঝে কিছুদিন আবার মোটেই জ্বর হয় না।

লতা তৈরী হয়ে এল। আমরা বেরিয়ে পড়লাম। অধ্যাপকের বাড়ী গিয়ে যখন পৌঁছলাম তখন তিনি সবে নীচে নেবেছেন। রুগীরা কেউ তখনও আসে নি। আমরাই প্রথম। স্লিপে নাম লিখে পাঠাতেই ডাক পড়ল।

লতার অসুখের কথা সব শুনে খুব ভাল করে ওকে পরীক্ষা করলেন। বুক পিঠ বাজিয়ে দেখলেন। নাক, কান চোখ, দাঁত জিভ, গলা সব পরীক্ষা করলেন। পেটে কিছু দোষ আছে কি না সব দেখে আগের রিপোর্টগুলো চাইলেন। রিপোর্ট ও জ্বরের খাতা দেখে এক্স্‌রে ছবিখানা আলো দেওয়া ভিউবক্সে চাপিয়ে দিলেন। বললেন—বুকে কিছু দোষ নেই। এটা বি কোলাই। ইউরিনটা একবার কালচার করিয়ে নাও।

লতাকে বললনে—কোন ভয় নেই। অষুধ লিখে দিলাম, সেরে যাবে।

পথে বেরিয়ে লতা জিজ্ঞাসা করল—বি কোলাইটা কি অসুখ?

বললাম—ওটা ইউরিনের এক রকম ইনফেক্‌শন। মেয়েদের খুব হয়। আর অনেক দিন ভোগায়। কোমরে ব্যথা হয়।

লতা বলল—আমার তো কোমরে কোন ব্যথা নেই। জ্বালা-যন্ত্রণাও কিছু বুঝি না। একটু গা গরম হয় তা এতদিনে সয়ে গেছে। ইউরিনে তো কখনও কোন দোষ পাওয়া যায় নি। এ অসুখ কি করে হল?

সত্যি বি কোলাই হলে ইউরিনে দোষ পাওয়া যাবেই। এতবার পরীক্ষা হয়েছে কখনও কোন দোষ পাওয়া যায় নি। তবু কেন মাস্টার মশাই বি কোলাইর কথা বললেন আমি নিজেই বুঝি নি। কিন্তু সে কথা লতাকে কি করে বলি?

বললাম—এমনি কোন দোষ পাওয়া যায় নি বলেই কালচার করতে বলেছেন। কাল ওটা করা যাবে। তাহলেই দেখবেন ঠিক ধরা যাবে।

পরদিন ইউরিন কালচারের জন্য পাঠান হল। কিন্তু বি, কোলাই পাওয়া গেল না। তবু মাস্টার মশাই— তাঁর ডায়গনোসিস বদলালেন না। বললেন অনেক দিন ধরে চিকিৎসা হচ্ছে তাই বীজাণু গজায় নি। রক্ত এবং স্টুলটা আর একবার পরীক্ষা করাও।

আবার রক্ত এবং স্টুল পরীক্ষা করানো হল। এবারেও কোন দোষ পাওয়া গেল না। মাস্টার মশাই বললেন—রুগী তো ভালই আছে। মুখে ৯৯° জ্বর; ও কিছুই না। সব খেতে দাও। দুবেলা একটু ঘুরে টুরে বেড়াক। দিন সাতেক জ্বর দেখা বন্ধ করে দাও।

শুনে লতার খুব ফুর্তি। বলল—দেখলেন তো, আমার কোন অসুখই হয়নি। এইবার রোজ থিয়েটার বায়োস্কোপ দেখে বেড়াব।

বললাম—অতটা বাড়াবাড়ি নাই বা করলেন। দিন সাতেক দেখুন। তার পর না হয় আর একজন কাউকে দেখানো যাবে।

লতা বলল—না না আর কাউকে আমি আর দেখাব না। এখানে এসে আমি তো বেশ ভাল আছি। জ্বর যে হয় তা তো টেরই পাই না।

এসেছি কিন্তু শীগ্গীর আর ফিরে যাচ্ছি না। দেখি এখানেই যদি কিছু করতে পারি।

জিজ্ঞাসা করলাম—আপনার স্ত্রীর কি অসুখ?

সমীর বলল—কি নয় তাই জিজ্ঞাসা করুন। আজ চার বছর বিয়ে হয়েছে, বছর দুই বেশ ভাল ছিল। কোন অসুখ বিসুখের কথা শুনিনি। তারপর থেকেই কী যে শুরু হয়েছে, আজ মাথা ব্যথা, কাল জ্বর, পরশু পেটে ব্যথা। নিত্যি একটা না একটা কিছু লেগে আছে।

জিজ্ঞাসা করলাম—বাচ্চা টাচ্চা কিছু হয়নি?

সমীর বলল—বছর দুই আগে একটি হয়েছিল। সেই থেকেই যত গোলমালের শুরু। এই যে ছিপছিপে পাতলা চেহারাটি এখন দেখছেন আগে এমনটি ছিল না। তিনটি বছর ধরে মেয়ে দেখে দেখে বাবা ভাল স্বাস্থ্য আর লেখাপড়া জানা দেখে এই বৌটি ঘরে এনেছিলেন। একটি পয়সাও যৌতুক নেননি। সেই চেহারা দেখুন এখন কি হয়েছে।

বললাম—সেই বাচ্চার কি হল?

সমীর বলল—আর বলেন কেন? ডেলিভারি হওয়ার সময়েই সেটি মারা গেল। মফঃস্বলের ডাক্তার তো! জীবনে সেই বোধ হয় প্রথম ফরসেপস্ দিল। বলল মাথা শক্ত হয়ে গেছে অমনি বেরুবে না। ফরসেপস্ দিয়ে টানাটানি করে বার করে দেখা গেল বাচ্চা নীল হয়ে গেছে। তাকে আর বাঁচানো গেল না। সে না হয় গেল; গাছ বেঁচে থাকলে অনেক ফল হবে কিন্তু দেখুন সেই থেকেই ইনি পড়লেন। জ্বর, মাথা ঘোরা, রক্ত নেই, একটার পর একটা চলছে। চোখের ওপর দেখছি লতা দিনকে দিন শুকিয়ে যাচ্ছে। ওখানে চিকিৎসায় কিছু ফল হচ্ছে না দেখে অবশেষে বাবা এখানে পাঠাতে রাজী হলেন।

বললাম—বেশ তো, বিকেলে ওঁকে দেখে কাকে দেখানো ভাল হয় ঠিক করা যাবে এখন।

বিকেলে সমীরের স্ত্রী লতাকে দেখলাম। ২৫।২৬ বছরের শ্যাম বর্ণা মেয়েটি, ভারি সপ্রতিভ। মুখখানা ভারি মিষ্টি। অসুখে ভুগে ভুগে চেহারা একটু শুকনো, কিন্তু চোখ দুটি বুদ্ধিতে খুশীতে উজ্জ্বল।

হেসে বলল—দুবচ্ছরে অনেক চিকিৎসা হয়েছে এখন দেখি এখানে কি হয়। আমার অসুখ আপনারা সারাতে পারবেন না।

আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—কেন?

হেসে লতা বলল—অসুখই নেই তো সারাবেন কি?

কথার রকম শুনে হেসে ফেললাম। বললাম—তা হলে এখানে এলেন কেন?

লতা দুষ্টুমিভরা চোখে একবার সমীরের দিকে তাকিয়ে বলল—বেড়াতে কিন্তু সে কথা বললে কখনও আসা যায়? তাই অসুখের নাম করে এসেছি।

বললাম—বেশ তো, আজকেই তাহলে ডাক্তার দেখিয়ে রাখা যাক। তারপর যত ইচ্ছে ঘুরে বেড়াবেন।

সমীর বলল—আজকেই ওটা চুকিয়ে ফেলুন। বাবা বলে দিয়েছেন আজকেই ডাক্তার দেখিয়ে কি হল একটা খবর দিতে। কখন উনি দেখবেন? আগে থেকে ফোন করে যাওয়া ভাল হবে না কি?

দেখলাম কাকে দেখানো হবে আগে থেকেই এরা ঠিক করে এসেছে। ইনি আমাদের কলেজের প্রধান অধ্যাপক। তখন এঁর খুব নাম। আমাদের কেস খুব যত্ন নিয়ে দেখতেন। ফি নিয়ে কখনো কড়াকড়ি করতেন না। যেমন ভাল পড়াতেন তেমনি ছিল তাঁর রোগ নির্ণয় এবং চিকিৎসা। আউট ডোরে যেদিন ইনি যেতেন রুগীতে ঘর ভর্তি হয়ে যেত। তার ওপর তিনি ছিলেন পরীক্ষক। কাজেই ছাত্ররা সুযোগ পেলেই এঁকে দিয়ে রুগী দেখাত।

বললাম—ফোন করবার কোন দরকার হবে না। কাছেই তো ওঁর বাড়ী। হেঁটে যেতে পাঁচ মিনিটও লাগবে না। এখনি রওনা হতে পারলে অন্য রুগী আসবার আগেই আমরা পৌঁছে যাব।

সমীর বলল—তাহলে তাই চলুন। আপনি ততক্ষণ এই রিপোর্টগুলো দেখুন। লতা তৈরী হয়ে নিক।

দেখলাম মল মূত্র রক্ত থুথু সব পরীক্ষা করানো হয়েছে। বুকের এক্স্‌রে ছবি

তোলা হয়েছে। মফঃস্বলের ছবি খুব ভাল ওঠেনি। রিপোর্টে দেখলাম বুকে একটা গ্ল্যান্ড ছাড়া অন্য কোন দোষ পাওয়া যায়নি। আগে রক্তশূন্যতা ছিল, অষুধ খেয়ে আর ইনজেকশন নিয়ে তা এখন ঠিক হয়ে গেছে। জ্বরটা শুধু ছাড়ে নি।

বাচ্চা হবার পরেই যে জ্বর হয় তিন মাস পরে তা ছাড়ে। তারপর গত ছ' মাস থেকে সমানে জ্বর হচ্ছে। অল্প ঘুষে ঘুষে জ্বর। কোন দিন দুপুরে, কোন দিন বিকেলে কখনও বা রাত্রে আসে। কোন দিন ৯৯° কোন দিন বা ১০০°। মাঝে মাঝে কিছুদিন আবার মোটেই জ্বর হয় না।

লতা তৈরী হয়ে এল। আমরা বেরিয়ে পড়লাম। অধ্যাপকের বাড়ী গিয়ে যখন পৌঁছলাম তখন তিনি সবে নীচে নেবেছেন। রুগীরা কেউ তখনও আসে নি। আমরাই প্রথম। স্লিপে নাম লিখে পাঠাতেই ডাক পড়ল।

লতার অসুখের কথা সব শুনে খুব ভাল করে ওকে পরীক্ষা করলেন। বুক পিঠ বাজিয়ে দেখলেন। নাক, কান চোখ, দাঁত জিভ, গলা সব পরীক্ষা করলেন। পেটে কিছু দোষ আছে কি না সব দেখে আগের রিপোর্টগুলো চাইলেন। রিপোর্ট ও জ্বরের খাতা দেখে এক্স্‌রে ছবিখানা আলো দেওয়া ভিউবক্সে চাপিয়ে দিলেন। বললেন—বুকে কিছু দোষ নেই। এটা বি কোলাই। ইউরিনটা একবার কালচার করিয়ে নাও।

লতাকে বললনে—কোন ভয় নেই। অষুধ লিখে দিলাম, সেরে যাবে।

পথে বেরিয়ে লতা জিজ্ঞাসা করল—বি কোলাইটা কি অসুখ?

বললাম—ওটা ইউরিনের এক রকম ইনফেক্‌শন। মেয়েদের খুব হয়। আর অনেক দিন ভোগায়। কোমরে ব্যথা হয়। লতা বলল—আমার তো কোমরে কোন ব্যথা নেই। জ্বালা-যন্ত্রণাও কিছু বুঝি না। একটু গা গরম হয় তা এতদিনে সয়ে গেছে। ইউরিনে তো কখনও কোন দোষ পাওয়া যায় নি। এ অসুখ কি করে হল?

সত্যি বি কোলাই হলে ইউরিনে দোষ পাওয়া যাবেই। এতবার পরীক্ষা হয়েছে কখনও কোন দোষ পাওয়া যায় নি। তবু কেন মাস্টার মশাই বি কোলাইর কথা বললেন আমি নিজেই বুঝি নি। কিন্তু সে কথা লতাকে কি করে বলি?

বললাম—এমনি কোন দোষ পাওয়া যায় নি বলেই কালচার করতে বলেছেন। কাল ওটা করা যাবে। তাহলেই দেখবেন ঠিক ধরা যাবে।

পরদিন ইউরিন কালচারের জন্য পাঠান হল। কিন্তু বি. কোলাই পাওয়া গেল না। তবু মাস্টার মশাই—তাঁর ডায়গনোসিস বদলালেন না। বললেন অনেক দিন ধরে চিকিৎসা হচ্ছে তাই বীজাণু গজায় নি। রক্ত এবং স্টুলটা আর একবার পরীক্ষা করাও।

আবার রক্ত এবং স্টুল পরীক্ষা করানো হল। এবারেও কোন দোষ পাওয়া গেল না। মাস্টার মশাই বললেন—রুগী তো ভালই আছে। মুখে ৯৯° জ্বর; ও কিছুই না। সব খেতে দাও। দুবেলা একটু ঘুরে টুরে বেড়াক। দিন সাতেক জ্বর দেখা বন্ধ করে দাও।

শুনে লতার খুব ফূর্তি। বলল—দেখলেন তো, আমার কোন অসুখই হয়নি। এইবার রোজ থিয়েটার বায়োস্কোপ দেখে বেড়াব।

বললাম—অতটা বাড়াবাড়ি নাই বা করলেন। দিন সাতেক দেখুন। তার পর না হয় আর একজন কাউকে দেখানো যাবে।

লতা বলল—না না আর কাউকে আমি আর দেখাব না। এখানে এসে আমি তো বেশ ভাল আছি। জ্বর যে হয় তা তো টেরই পাই না।

লতা শ্‌নল না। খ্‌ব কয়েকদিন থিয়েটার বায়োস্কোপ দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে রোজ এসে গল্প করত। একদিন বলল—মাথাটা বড় ধরেছে কি করি বল্‌ন তো?

নাড়ী দেখলাম খ্‌ব দ্রুত। গা বেশ গরম। জ্বরটা বেড়েছে মনে হল। বললাম—জ্বরটা একবার দেখ্‌ন তো থর্মোমিটার দিয়ে।

লতা বলল—জ্বর দেখতে না আপনার মাস্টার মশাই বারণ করেছেন? ও দেখে আর কাজ নেই। মাথাধরার একটা অষ্‌ধ কিছ্‌ দিন। তাইতেই ঠিক হয়ে যাবে।

এস্‌পিরিন দিয়ে একটা পাউডার করে দিলাম। মাথা ধরা ছেড়ে গেল। লতা খ্‌শী হল। কিন্তু পর দিনই বলল কাঁধে খ্‌ব ব্যথা। আবার ঐ পাউডার দিলাম।

মাস্টার মশাই বললেন—ওটা হিস্টিরিয়া। এস্‌পিরিন দিচ্ছ দাও। কিন্তু রোজ এক সি সি করে ডিস্‌টিল্‌ড্‌ ওয়াটার ইন্‌জেকশন কর মাস্‌ল্‌এর মধ্যে। তাইতেই সেরে যাবে।

শ্‌ধ্‌ শ্‌ধ্‌ ডিস্‌টিল্‌ড্‌ ওয়াটার কাউকে ইন্‌জেকশন এর আগে আর আমি করি নি। শ্‌নেছি র্‌গীর কাছ থেকে পয়সা বার করতে হলে এসব নাকি মাঝে মাঝে দিতে হয়।

লতাকে এক সি সি ইন্‌জেকশন দিতেই যন্ত্রণায় ও হাত সরিয়ে নিল। বলল—আপনি বড্ড লাগিয়ে দিলেন। এত ইন্‌জেক্‌শন নিয়েছি কৈ এত ব্যথা তো কখনও পাই নি।

এইবার ব্‌ঝলাম কেন মাস্টার মশাই এই ইন্‌জেক্‌শন দিতে বলেছেন।

বললাম—ঐ জায়গাটায় একট্‌ ম্যাসাজ কর্‌ন, ব্যথা চলে যাবে। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই ব্যথা চলে গেল।

রোজ ডিস্‌টিল্‌ড্‌ ওয়াটার ইনজেক্‌শন দিই আর এস্‌পিরিন খাওয়াই। লতা কিন্তু সারল না। ক্রমশ কেমন যেন নিস্তেজ হয়ে পড়ল। এত যে থিয়েটার বায়োস্কোপ আর বাইরে বের্‌বার শখ, তাও যেন কমে গেল। সারা দিন শ্‌য়ে-বসেই কাটাত। বলত ভাল লাগে না।

একদিন রাত বারোটার সময় লতার চীৎকার শ্‌নে ওপর থেকে ছ্‌টে নেবে ওর ঘরে গিয়ে দেখি লতা চিত হয়ে বিছানায় শ্‌য়ে দ্‌হাত দিয়ে মাথার চুল ধরে টানছে আর বলছে—গেল গেল সব ছিঁড়ে গেল। মাথার ভেতরে কে যেন স্‌চ ঢ্‌কিয়ে খোঁচা দিচ্ছে। মরে গেলাম।

পাশে হতভম্ব হয়ে সমীর দাঁড়িয়ে। আমি যেতেই বলল— এ কি হল ডাক্তার?

লতাকে জিজ্ঞাস করলাম—কি হয়েছে?

দ্‌ চোখ পাকিয়ে কপালে তুলে দ্‌হাত দিয়ে লতা চুল ছিঁড়তে লাগল। আমার কথা কিছ্‌ যে কানে গেল তা মনে হল না।

নাড়ী দেখলাম বেশ ভাল। একট্‌ দ্রুত। সে তো বরাবরই ওর থাকে। গা দেখলাম গরম নয়। বার কয়েক ঝাঁকুনি দিয়ে ডাকতে আমার দিকে একবার তাকিয়ে কিছ্‌ক্ষণ চুপ করে থেকে বলল—মাথা ছিঁড়ে যাচ্ছে। আর পাচ্ছি না। কিছ্‌ একটা কর্‌ন। উঃ। বলে দাঁতে দাঁত দিয়ে চেপে রইল। একটা কিছ্‌ অষ্‌ধ আনবার জন্য উঠতেই হঠাৎ শক্ত করে আমার হাতটা চেপে ধরল মনে হল ওর নখ ব্‌ঝি আমার হাতে বসে যাবে।

কোনও রকমে জোর করে ওর হাত ছাড়িয়ে উঠে এলাম। এটা যে হিস্টিরিয়া তাতে আর কোন সন্দেহ রইল না। ব্‌ঝলাম এক্ষ্‌নি কড়া দেখে একটা ঘ্‌মের অষ্‌ধ ওকে দেওয়া চাই। আর এক সি সি ডিস্‌টিল্‌ড্‌ ওয়াটার ইন্‌জেকশন।

সেই সময় কিছ্‌দিন আগে এক পাগল র্‌গীর চিকিৎসা আমি করেছিলাম। কোন অষ্‌ধে তার ঘ্‌ম হত না। যতই কড়া হোক, কোন কাজ হত না। সারা দিন রাত চেঁচিয়ে বক্তৃতা করত, কবিতা আওড়াত। বাড়ির কাউকে ঘ্‌ম্‌তে দিত না। একদিন জার্মানীর ই মার্কের একটি ফ্যানোডরম্‌ ট্যাবলেট দিয়ে দেখা হল। কি আশ্চর্য একটি ট্যাবলেটেই ঐ বদ্ধ পাগল বারো ঘণ্টা ঘ্‌মিয়ে রইল। খ্‌জে দেখলাম সেই অষ্‌ধ এক টিউব আমার বাক্সে আছে। তাই থেকে একটি বড়ি লতাকে খাইয়ে দিলাম। মাস্টার মশাইর নির্দেশ মত এক সি সি ডিস্‌টিল্‌ড্‌ ওয়াটার ইনজেক্‌শন দিলাম। আজ কিন্তু ইন্‌জেক্‌শনে অত ব্যথা লতা পেল না। উঃ আঃ কিছ্‌ই করল না। শ্‌ধ্‌ আমার দিকে কেমন যেন ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

আধ ঘণ্টার মধ্যে লতা ঘ্‌মিয়ে পড়ল। সমীরকে বললাম—ভয় নেই কিছ্‌। কাল ঘ্‌ম থেকে উঠলেই দেখবেন সব ঠিক হয়ে গেছে। আজকের রাত্রির কথা দেখবেন মনেও পড়বে না।

পরদিন সকালে দেখলাম লতা খ্‌ব ঘ্‌ম্‌চ্ছে। সমীরকে বললাম—যতক্ষণ নিজে থেকে ঘ্‌ম না ভাঙে ততক্ষণ আর ওকে জাগাবেন না। জাগলে চা টা সব খেতে দেবেন। তারপর স্নান করে ভাত খাবে।

দ্‌প্‌রে বাড়ি ফিরে শ্‌নলাম লতা একবার চোখ মেলে এক গ্লাশ জল খেয়ে আবার ঘ্‌মিয়ে পড়েছে।

বললাম—ভালোই হয়েছে। এই ঘ্‌মটা খ্‌ব ভাল লক্ষণ। যত বেশী ঘ্‌মোয় ততই ভাল।

বাইরে একট্‌ কাজ ছিল, খাওয়া-দাওয়া সেরে আবার বেরিয়ে পড়লাম। বিকেলে বাড়ি ফিরে সিঁড়ি দিয়ে তেতলায় উঠতেই দেখি লতার ঘরে মহা হ্‌ল্‌স্থ্‌ল কাণ্ড। পাশের ঘরের লোকেরা ওর দরজায় এসে ভিড় করেছে। সবাইর

চোখেমুখে একটা থমথমে ভয় বিষাদের ভাব। মনে হল যেন সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটেছে।

ভেতরে গিয়ে দেখি সমীর লতার মাথায় জল দিচ্ছে হাওয়া করছে। পাশের ঘরের কে একজন এক বালতি জল নিয়ে এসেছে। ঘরের মেঝে জলে ভেসে গেছে। মনে হল এক্ষুনি এরা লতার মাথায় জল ঢেলে ধুইয়ে দিয়েছে। বিছানা খানিকটা ভিজে গেছে। দেখলাম লতা চিত হয়ে শুয়ে আছে। দাঁতে দাঁত লেগে গেছে। চোখ দুটি খোলাটে, লাল রক্তবর্ণ। ঘাড় শক্ত হয়ে গেছে। মাথা এ-পাশ ও-পাশ নাড়ানো যায় না। বুকে ঘড় ঘড় আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

জিজ্ঞাসা করলাম—কখন এরকম হল?

সমীর বলল—বেশ ঘুমুচ্ছিল। আধ ঘণ্টা আগে হঠাৎ জেগে বলল জল খাব। এক গ্লাশ জল এনে দিতেই খানিকটা খেয়ে কি হল হাত থেকে গেলাস বিছানায় গড়িয়ে পড়ল। লতা বিছানায় চিত হয়ে পড়ে গেল। মুখ দিয়ে কি রকম শব্দ বেরুতে লাগল। জিজ্ঞাসা করলাম কি হয়েছে, কি কষ্ট কিছুই বলতে পারল না। চোখ দুটো বড় বড় করে শুধু তাকিয়ে রইল। আমার চীৎকার শুনে পাশের ঘর থেকে এঁরা সব ছুটে এসে মাথাটা ধুইয়ে দিলেন। কিন্তু আর জ্ঞান ফিরল না।

তাড়াতাড়ি একটা এট্রোপিন ইনজেকশন দিয়ে বললাম—এক্ষুনি একবার মাস্টার-মশাইকে আনা দরকার।

সমীর বলল—এক্ষুনি এখানকার এক ভদ্রলোক ও'র বাড়ি গিয়েছিলেন। তিনি বাড়ি নেই। কলে বেরিয়েছেন। ফিরতে দেরি হবে।

বললাম—তাহলে আমাদের অন্য এক প্রফেসরকে ডাকি। এমনি করে তো একে আর ফেলে রাখা যায় না।

সমীর বলল—বেশ, যা ভাল হয় তাই করুন।

কাছেই একটা দোকান থেকে ফোন করে দিলাম। প্রফেসর বললেন, এক্ষুনি আসবেন।

মিনিট পনরোর মধ্যেই প্রফেসর এসে গেলেন। খুব ধীর স্থির প্রবীণ চিকিৎসক। সব কথা শুনে লতাকে পরীক্ষা করে খুব গম্ভীর মুখে বললেন—বুকের কোন এক্স-রে তোলা হয়েছে?

বললাম—এখানে তোলা হয়নি। মাস-দেড়েক আগে বাইরে তোলা হয়েছে।

প্লেটখানা দেখালাম। বললাম—মফস্বলে তোলা বিশেষ ভাল হয়নি।

জানলার কাছে এনে প্লেটখানা দেখে প্রফেসর বুকের সেই গ্ল্যাণ্ডটা দেখিয়ে বললেন এইটে থেকেই ইনফেকশন স্প্রেড করেছে। টিউবারকুলার মেনিনজাইটিস্ হয়েছে।

তখনকার দিনে টি বি-রই কোন অষুধ বেরোয়নি। তার ওপর মেনইনজাইটিস্। টিউবারকুলার মেনইনজাইটিস্ বলে রোগ নির্ণয় করা আর মৃত্যু দণ্ড দেওয়া তখন একই কথা। এ রোগ হলে তিন সপ্তাহের মধ্যেই রুগীর মৃত্যু হত। বাঁচলে মনে হত রোগ নির্ণয়েই বুঝি ভুল হয়েছে। তাই প্রফেসরের মুখে এই কথা শুনে ভয়ে আতঙ্কে আমার মুখ শুকিয়ে গেল।

বললাম—তাহলে কি হবে?

প্রফেসর বললেন—তিন ঘণ্টা অন্তর অন্তর লামবার পাংচার করা দরকার হবে। এখানে তা পারবে কি?

বললাম—এখানে ওসব অসম্ভব। তার চেয়ে হাসপাতালে আপনার আণ্ডারে ভর্তি করে দিই।

প্রফেসর বললেন—সেই ভাল। এম্বুল্যান্স ডেকে তুমি নিজে সঙ্গে করে নিয়ে যাও। ভর্তি করে আমার হাউস ফিজিসিয়ানকে টেলিফোন করতে বোল। যা দরকার সব তখন বলে দেব। এট্রোপিন তো দিয়েইছ, একটা কার্ডিয়াজল ইন্-জেকশন দাও এক্ষুনি। ব্লাডটা ঝরিয়ে নাও।

প্রফেসর চলে গেলেন। কার্ডিয়াজল ইন্‌জেকশন করে দিলাম। লতার কোন হুঁশ নেই। টেরও পেল না। প্যাথলজিস্ট

এক বন্ধুকে টেলিফোন করে দিলাম। তিনি এসে রক্ত নিয়ে গিয়ে এক ঘণ্টার মধ্যেই রিপোর্ট পাঠিয়ে দিলেন। দেখা গেল মেনিনজাইটিসই বটে এবং টিউবারকুলার।

এতক্ষণে সমীর কথা বলল। জিজ্ঞাসা করল—রোগটা কি? টি বি?

বললাম—তাই ত সন্দেহ হচ্ছে।

দেখলাম সমীরের মুখ শুকিয়ে গেছে। ভয়ে আতঙ্কে কি বলবে বুঝে উঠতে পাচ্ছে না। কিন্তু ওকে ভরসাই বা দিই কি করে?

সমীর বলল—বাঁচবে কি?

যা জানতাম তা ওকে বলতে পারলাম না। শুধু বললাম—এ অতি কঠিন রোগ। এখানে রেখে কোন চেষ্টাই করা যাবে না। তাই প্রফেসর হাসপাতালে পাঠাতে বললেন। ওঁর নির্দেশ মত সব চেষ্টাই সেখানে করা যাবে।

সমীর মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। বলল—আমার এক কাকা থাকেন এখানে। তাঁকে একবার ফোন করি। দেখি তিনি কি বলেন। খবর পেলে তিনি নিশ্চয় আসবেন।

কাকার নিজের ফোন নেই। পাশের বাড়িতে ফোন করে খবরটা দেওয়া হল। কিন্তু আধ ঘণ্টার মধ্যেও তিনি এলেন না দেখে সমীর বলল—এম্বুল্যান্সই ডাকা যাক। চলুন হাসপাতালেই দিয়ে আসি।

তখনকার দিনে এম্বুল্যান্স ডাকলেই সাড়া পাওয়া যেত। দশ পনর মিনিটের মধ্যেই গাড়ি এসে গেল। স্ট্রেচারে করে লতাকে উঠিয়ে গাড়িতে তুলে দিল। সমীরকে নিয়ে আমি সঙ্গে চললাম।

হাসপাতালে এসে সোজা ইনফেকশন ওয়ার্ডে গিয়ে সুপারিনটেনডেণ্টকে বলে লতাকে ভর্তি করে দিলাম। হাউস ফিজি-সিয়ানকে প্রফেসরের কথা বললাম।

তৎক্ষণাৎ লাম্বার পাংচার করে শির দাঁড়া থেকে জল বার করে তা পরীক্ষা করা হল। টি বি'র বীজাণু তাতে পাওয়া গেল না কিন্তু টি বি'র অন্য সব প্রমাণ পাওয়া গেল। ঠিক হল এই জল কাল গিনিপিগের দেহে ইনজেকশন দেওয়া হবে। যদি টি বি হয় তিন চার সপ্তাহ পরে গিনিপিগের পেটে টিউবারকল্ পাওয়া যাবে।

হাসপাতাল থেকে যে অষুধপত্র কিনে দিতে বলা হল তা দিয়ে আমরা বাড়ি ফিরে এলাম। রাত তখন প্রায় ৯টা।

বাড়ি এসে নিজের ঘরে ঢুকে দু হাতে মুখ ঢেকে সমীর বসে পড়ল। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। আমি ওর কাঁধে হাত দিয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। পরে বললাম—চলুন ওপরে। আজ আমার সঙ্গেই খাবেন।

প্রথমে কিছুটা আপত্তি করে সমীর উঠে এল। কি একটা ছুটিতে ছেলেমেয়ে নিয়ে আমার স্ত্রী তখন দেশে। চারতলার দুখানা ঘরে আমি একা। ওপরে উঠে হাত-মুখ ধুয়ে চাকরকে খাবার দিতে বললাম। সমীর কোন কথা না বলে চুপ করে খেল। খাওয়া হলে বললাম—আজ এইখানেই শুয়ে পড়ুন। নীচে গিয়ে আর কাজ নেই।

সমীর কোন আপত্তি করল না। শুয়ে পড়ল। জিজ্ঞাসা করল—টি বি-ই যদি হবে তাহলে প্রথমে আপনাদের যে অধ্যাপক দেখেছিলেন তিনি কেন ধরতে পারলেন না?

খুবই কঠিন প্রশ্ন। আমিও সে কথাই এতক্ষণ ভেবেছি। কী উত্তর এর দেব? বললাম—তখন তো এক জ্বর ছাড়া অন্য কোন লক্ষণ দেখা যায়নি তাই ওটা উনি বি কোলাই ভেবেছিলেন।

সমীর বলল—অতবড় ডাক্তার; কল-কাতায় এবং বাইরে এত নাম তাঁর এরকম ভুল হয় কি করে?

বললাম—ভুল তো সবাইর হয়। সে কথা ভেবে এখন আর কি হবে।

পরদিন হাসপাতালে গিয়ে দেখলাম লাম্বার পাংচার করা হচ্ছে, প্রণটসিল দেওয়া হচ্ছে। লতার কোন হুঁশ নেই। একই রকম অবস্থা।

সমীর রোজ দুবেলা যায়, দেখে আসে অষুধ কিনে দেয়।

একদিন এসে বলল—ডাক্তাররা নিজেরা বলাবলি করছিল, এই রোগ হলে নাকি কেউ বাঁচে না এবং খুব নাকি ছোঁয়াছে?

বললাম—ছোঁয়াচে তো বটেই।

সমীর জিজ্ঞাসা করল—আমার নিজের এটা হবে না তো?

বললাম—রোগটা ধরার সঙ্গে সঙ্গেই তো হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে. তবু একথা কেন ভাবছেন?

সমীর বলল—কিন্তু আমি তো রোজ যাই। ঘণ্টাখানেক রুগীর পাশে বসে থাকি। সেই থেকে তো আমার হতে পারে।

এই সময় ওর এই উদ্বেগের বাড়াবাড়ি দেখে খুব খারাপ লাগল। বিরক্তি বোধ হল।

বললাম—তাহলে ডাক্তার নার্সরা কেউ বাঁচতো কি? আপনার অতই যদি ভয় তাহলে ঘরে না ঢুকলেই হল। দূরে থেকে দেখে অষুধ বিষুধের যা দরকার দিয়ে চলে আসবেন।

সমীরের সঙ্গে তারপর দিন আর দেখা হল না। হাসপাতালে গিয়ে শুনলাম রুগীর ঘরে ও ঢোকে না। নাকে রুমাল দিয়ে বাইরে থেকে একবার দেখেই পালিয়ে আসে।

একদিন সন্ধ্যে বেলা বাড়ি ফিরে দেখি সমীর সুটকেস গুছিয়ে বিছানা বাঁধছে। আমাকে দেখেই বলল—এই যে ডাক্তার, আমি আজ বাড়ি যাচ্ছি।

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম। লোকটি পাগল হয়ে গেল নাকি?

বললাম—সে কি? লতাকে ফেলে? এই সময়ে?

কিছুমাত্র অপ্রস্তুত না হয়ে একটু হেসে সমীর বলল—কাল থেকে লতার বাবা মা এসেছেন। তাঁরাই এখন সব দেখাশুনা করছেন। তা ছাড়া বাবার টেলিগ্রাম এসেছে। মার খুব অসুখ। কাজেই আমি আর থাকি কি করে?

কি বলব কিছুই ভেবে পেলাম না। মুখ ভার করে উপরে উঠে এলাম। সেই দিন রাত্রে সমীর সত্যি চলে গেল। তিন দিন পর লতার মৃত্যু হল।

॥ ১৯ ॥

ভাবলে মনে হয় সমস্তটাই এক দুঃস্বপ্ন; দীর্ঘ, দুঃসহ।

অথবা ভয়ঙ্কর এক দুর্যোগ।

মনে হয়নি, মৃত্যুর মত ওই কালো কঠিন আকাশ আবার কখনো ফরসা হতে পারে।

আর বাসনার আয়ু দুর্বল ক্ষীণ প্রদীপ-শিখার মতন যা কাঁপছিল নিভে যেতে পারত। যাওয়া অসম্ভব ছিল না।

কিন্তু নেভে নি। দুর্যোগ কাটল। দুঃস্বপ্ন সরে গেল। চোখ মেলে বাসনা নতুন সকাল দেখল, নতুন দিন। পৌষের হিমে ভেজা শার্সিতে উজ্জ্বল রোদ ঝরছিল; আকাশ নীল, পাখি উড়ছে, কেবিনের এই দু-হাত ঘরেও যেন কেমন এক মধুর অলস আলো এসে পড়েছে, কিসের এক গুঞ্জন এই হাওয়ায়, কেমন এক অন্য গন্ধ।

তেমন করে বাঁচতে চাইলে কে মরে? বাসনা একদিন ভেবেছিল। বাঁচতে চাওয়াটাই সব।

আমি চেয়েছি। বাঁচতেই চেয়েছি। এই চাওয়া যে কী তীব্র ছিল তা কেউ জানে না। মনে হতো, এই ইচ্ছা আমার প্রতিটি রক্তকণাকে প্রতি মুহূর্তে নতুন করেছে, মৃত্যুর পদক্ষেপকে কণ্টকিত করেছে। আমার মধ্যে এক দুরন্ত স্পন্দন ছিল। প্রাণ যেন তার অদ্ভুত অনায়ত্ত উষ্ণতা নিয়ে মৃত্যু-শূন্যতার সেই কঠিন কুয়াশাকে বার বার শুষে নিচ্ছিল।

এই আয়ু কেন, এতো উষ্ণতা, বিশ্বাস আশা এবং অভিলাষ কেন? নিজের জন্যে, আমার জন্যে—আবার আমি একটি সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ হয়ে বাঁচব, ভালবাসা আর ভালবাসা পাব, সংসার করব আর সুখ পাব—শুধু তাই।

আবার নতুন করে তার আয়ু ফিরে পেয়ে বাসনা এই-সব কথাই নানা ভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ভেবেছে। বিশ বাইশটা দিন এই একই চিন্তা। যেন একটা লতা পল্লবে পল্লবে তার সর্বাঙ্গ ঢেকে ফেলে ক্রমশই গা ছড়িয়ে মাথা তুলে ঊর্ধ্বে উঠে যাচ্ছিল। হ্যাঁ—অমলেন্দুকে কেন্দ্র করে, তাকে ঘিরে ঘিরে, জড়িয়ে।

অথচ আশ্চর্য অমলেন্দু আর আসছিল না। অপারেশনের পর এই বাইশ দিনের মধ্যে ক'বারই বা সে এসেছে। দিন পাঁচেক। হিসেব আছে বাসনার। বার পর্যন্ত সব মনে আছে, গত শনিবার তার আগে সোমবার, তার আগে গত হপ্তায় বুধবার। তার আগে......।

আর এসেছেও এমন সময় যখন কমলা, বীথি, সুধাময়রা সবাই আছে—সময়ও বেশি নেই হাতে তখন।

বাসনার কতো কথা থাকত, কতো ইচ্ছে। কিন্তু সে-সব কথা কি ইচ্ছে প্রকাশ করার অবসর পাওয়া যেত না। এর জন্যে মনে মনে ক্ষুব্ধ হতো বাসনা, নিরাশ হতো। অভিমানে মনটা ভার হয়ে যেত। দুশ্চিন্তাও হতো। কেন ও আসে না?

একটা অন্য আশংকাও কখনো কখনো ছায়া ফেলে যেত। চমকে উঠত বাসনা। চমকে উঠেই আবার সতর্ক হয়ে পড়ত।

আর এ-সব কথা ভাবতে গেলে যেন নিজের মন থেকে একটা ছোবল খেয়ে নিজেকে গুটিয়ে নিতে বাসনা। ছি, ছি আবার অবিশ্বাস! সেই অবিশ্বাস। না, অবিশ্বাস সে করবে না। অমলেন্দুকে অবিশ্বাস করা, বাসনা নিজেকে বলতো, আর তোমার ভালবাসাকে অবিশ্বাস করা একই কথা।

আমি নিশ্চয় সেই গ্লানি, মনের গ্লানি থেকে মুক্ত হয়েছি। আমার ভালবাসা অতোটা দৃঢ় এবং পবিত্র যা এইসব তুচ্ছতাকে অবজ্ঞা উপেক্ষা করতে পারে। আমি স্ত্রী, অমলেন্দুর স্ত্রী। প্রত্যহ হাস-পাতালে আসতে পারে না, এই নিয়ে অভিমান করা চলে কিন্তু অবিশ্বাস করা যায় না। করা উচিত নয়।

আর ওকে অবিশ্বাসই বা তুমি করবে কেন? লোকটা তোমার জন্যে শুধু

উদ্বেগ আর অশান্তি ভোগ করে চলেছে।

বাসনার মায়াই হয়। অপারেশানের পর একদিন অমলেন্দুর শুকনো, ক্লান্ত মুখ দেখে বাসনা বলেছিল, এক সুযোগে 'তুমি এতো মুষড়ে পড়েছো কেন?

জবাবে অমলেন্দু বলেছিল, করুণ চোখে চেয়ে, 'আমার হয়ত পাগল হয়ে যাওয়া উচিত ছিল।'

কথাটা বুকের শিরায় যেন টান দিয়ে টনটনিয়ে তুলেছিল। পাগল, সত্যিই বেচারীর পাগল হওয়ার মতই অবস্থা হয়েছে।

ওর কাজের চাপ পড়েছে আজকাল। যদিও সরাসরি নয়—কমলাদের বলছে এমন-ভাবে বাসনাকে শুনিয়ে শুনিয়ে অমলেন্দু তো বলেইছে, তার কাজের চাপ পড়ে গেছে বড়। কলেজে একটা টিউটোরিয়াল ক্লাশ নিতে হচ্ছে প্রায় বিকেলেই। তারপর কিছু বাড়তি কাজ চাপিয়ে দিয়েছে প্রিন্সিপ্যাল অফিসের; সে-সবও করতে হয়।

'একদম সময় পাচ্ছি না আজকাল!' অমলেন্দু দুঃখ করে আর বিরক্ত হয়ে বলছিল সেদিন। 'খাটিয়ে খাটিয়ে মেরে ফেলবে। ভাবছি এ চাকরি ছেড়ে দেবো।'

'ছেড়ে দেবে? তারপর—?' সুধাময় প্রশ্ন করেছিল।

'নাগপুরের এক কলেজে চিঠি লিখে-ছিলাম। আমার এক বন্ধু আছে সেখানে। হয়ে যেতে পারে। মাইনে টাইনেও ভাল। আমাকে একবার যেতে বলছে। ভাবছি যাবো।'

বাসনা শুনেছে সমস্ত কথা, মনে গেঁথে নিয়েছে। তারপর সকলে চলে গেলে মনে মনে হেসে বলেছে—অমলেন্দুকে ভাবতে ভাবতে—দেখো, আমি অতো বোকা নয়, তুমি যে কেন নাগপুর যেতে চাইছ কলকাতা ছেড়ে তা আমি বুঝতে পেরেছি। এই কলকাতায়, কমলারা যেখানে আছে—সেখানে আমি তোমার বউ হয়ে ঘর করতে অস্বস্তি বোধ করব, শুধু তাই—তাই তুমি বাইরে চলে যেতে চাও। কমলা আমার একমাত্র বোন। এক জায়গায় থেকেও আমাদের মুখ দেখাদেখি যদি না-থাকে, যদি কমলারা আমার সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিঁড়ে ফেলে আর আমি সেই দুঃখে, লজ্জায় মুষড়ে থাকি, মনমরা হয়ে—তাই এই দূরে চলে যাওয়া। দূরে থাকলে কমলাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক থাক না থাক আসে যায় না। বরং দূরেই ভাল।

তুমি কাছে থাকলে কলকাতা বা নাগপুর আমার কাছে সব সমান।

আমার আর কিছু, আর কারুর কথা ভাববার দরকার নেই।

কি-ই বা আর ভাববো বলো? নিজের এই আঠাশ উনিশ বছরের জীবনটা এতো-দিন তো শুধু অন্যের সুখে, আরামে, সন্তুষ্টির জন্যে তিল তিল করে বিলিয়ে এলাম। তার বদলে ভাত কাপড় ভালো মুখ পেয়েছি। কিন্তু ও-সবে কি যায় আসে। ভালো কাজ করলে ঝি বামুনেও তাই পায়।

আমি যে একটা আলাদা মানুষ, আর-এক মেয়ে, কমলার বোনই শুধু নয়—তার রান্নাঘর, ভাঁড়ার, তার ছেলে মেয়েই যে আমার সংসার নয়—একথা আমিই শুধু বুঝবো। ওরা বুঝবে না।

ওরা শুধু ছোড়দিকেই চিনেছে। এই বিশ্রী থান পরা, সিঁথি সাদা বাসনাকে। এক নিরাশ্রয়, অসহায়কে। ওরা আমায় করুণা করে, সহানুভূতি দেখায়, মমতায় আগলে রাখে। অস্বীকার করছি না কিন্তু শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে, ভক্তি করে—সবাই। তবু ওদের সংসারে, ওদের মধ্যে আমি কে? কিছু না। ওদের সুখ আনন্দ হাসি খুশীতে আমার ভাগ নেই।

সাত সকালে উঠে উনুনের আঁচ তুলে চায়ের জল গরম করা, কুটনো কোটা, লুচি ভাজা, মিণ্টুকে দুধ খাওয়ানো, বীথির চুল বাঁধা—এ-সব ওদের জন্যে, আমার জন্যে নয়। আমার কি সুখ তাতে? আমার সুখ আমি যখন নিজের চুল খোঁপা করে বাঁধব, চিরুনীর আগা দিয়ে সুন্দর করে সিঁদুর ছোঁয়াব সিঁথিতে, মাড়খসখসে হাল্কা রঙ শাড়ি পরবো বিকেলশেষে তারা উঁঠিউঁঠি সন্ধ্যেয়, আর তারপর তোমার জন্যে রান্নাঘরের সেই আঁচে খুশীর হলকায় গান-গুনগুন গলায় চায়ের জল তৈরি করব, চামচ নাড়ব, ডিমের খোলা ভাঙব, হয়তো-বা বলা যায় না একটা কাপ ভেঙে ফেলবো ঠন্-ন করে আচমকা তুমি পিছনে এসে দাঁড়িয়েছ ভেবে চমকে উঠে।

এ-সব আমার। বুঝলে মশাই—এই কাজ, এই বিরাম, এই অপেক্ষা এবং এই

সুখ—সব। মনে মনে সব ঠিক করে রেখেছি। আগের মতন অতো সাত-সকালে আর উঠবো না, বাপু। সূর্য ওঠার সময় উঠব। বাসি কাপড় কেচে এসে তারপর তোমার চা করব, আমারও। তোমায় ডাকব তারপর।

সকালটা তো হুশ্ করে কেটে যাবে। কলেজের ভাত দিতে দিতে। তুমি চলে যাবে—তারপর আমি একা। বেলা বাড়বে, বাড়ুক। ঘর গোছান সারব। তারপর স্নান। দুপুর ভরে, আমি ঠিক করে রেখেছি চুপিচুপি কিছু পড়ব। যাই বলো, আমার লেখাপড়া সামান্য। ম্যাট্রিকটাও পাশ করিনি। ওতে মানায় না। তুমি প্রফেসার—আমি তোমার বউ, দুটো ভাল কথা বললে বুঝতেই পারব না। একটু বই-পত্র নাড়া-চাড়া করতে হবে বৈ কি, বই পড়তে পড়তে ঘুম পেলে ঘুমোবো, কতো কি বোনারও আছে। তারপর দুপুর শেষ হলে ঘরদোর পরিষ্কার করা, বিছানা সাজানো, এটা-সেটা। বিকেল হবে। তুমি ফিরবে। তুমি ফিরলে আমার কি আর অবসর থাকবে! কিন্তু না, অবসর আমি ঠিক করে নেবই, করতেই হবে। বেড়ান, গল্প, মাঝে মাঝে সিনেমা থিয়েটার।

হঠাৎ কথাটা মনে পড়ল বাসনার। মাঝে মাঝে মনে পড়ে। ভীষণ উন্মনা হয়ে পড়ে তখন। মনটা ভার হয়ে আসে। বুকটা টনটন করে।

কিন্তু কি করবো বলো, এ আমার কপালে ছিল। সব সুখ ভগবান আমার কপালে লেখেন নি। আমি জানি, শুনেছি, একদিন কী কথায় যেন আমার নার্স গল্পে গল্পে বলছিল যে, এই রোগ হলে অপারেশান টপারেশানের পর মেয়েদের সবচেয়ে বড় ক্ষতি এই যে, ছেলেপুলে আর হয় না।

হবে না, আমারও হবে না! কী ভীষণ যে কষ্ট হয়েছিল এ-কথা শুনে সে শুধু মনেই চাপা থাকল। সারা রাত সে-দিন ছটফট করেছি। সমস্ত যেন ফাঁকা লাগছিল। ভাবছিলাম 'এর চেয়ে মরে গেলেই বা ক্ষতি কি ছিল! শুধু গাছে কি সুখ, কি শোভা, কিসের তৃপ্তি যদি ফুল ফল না ফুটলো।

পরে আমি মন বেঁধেছি। হা-হুতাশ করে তো লাভ নেই। কতো মেয়েরই যে ছেলেপুলে হয় না। তা বলে সেই দুঃখ নিয়ে পা ছড়িয়ে কাঁদব বসে অতো দুর্বলতা আর আমার নেই। হ্যাঁ, একটা আকর্ষণ থাকল না, আর-এক সম্বল, সান্ত্বনা, সুখ, তৃপ্তি।—কিন্তু তুমি তো আমার রয়েছ। যার বাগানে একটিই শুধু গাছ—তাকে শুধু সেই গাছের তলাতেই জল দিতে, ফুল তুলতে, ছায়া পেতে ফিরে ফিরে আসতে হয়, এসে বসতে হয়। তুমি আমার তেমনি—শুধু মাত্র এক। একটি।

হাসপাতাল ছাড়ার দিন খুব সকালেই ঘুম ভেঙে গেল বাসনার। চোখ বন্ধ করে পড়ে থাকতে আর ইচ্ছে করছিল না। ছুটির ঘণ্টা পড়ার ঠিক আগে আগে যেমন হয়— ছোট মেয়ের মতন ছটফট করছিল। কখন এই সকাল, আর দুপুর শেষ হয়ে বিকেল আসবে, কখন!

উঠছিল আর বার বার বিছানায় এসে বসছিল। মাঝে মাঝে জানলায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছিল। রোদের তাত দেখছিল, বেলা বাড়ল কতো! দশটা কি বেজে গেছে?

মনটা আজ কতো মিষ্টি আর নরম হয়ে গেছে। হাসপাতাল থেকে তো নয়, যেন জেলখানা থেকে বেরুচ্ছে—বেরুতে পারছে।

আর, বাসনা ভেবে ভেবে ঠিক করে রেখেছিল, এই যে হাসপাতাল থেকে বেরুচ্ছি—এবার আর বাসনা সেন নয়। আমার আর কোনো চিন্তা করার নেই, ভয় ভাবনা করার। যা সত্যি, যা আমি করেছি আর আমার এখন আসল যা পরিচয় আমি তাই স্বীকার করে তার ঘরে চলে যাব। হ্যাঁ, হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে—সুধাময়দের অন্য গাড়িতে চাপিয়ে দিয়ে আমি আর অমলেন্দু আর-এক গাড়িতে করে সোজা নিজেদের বাড়ি।

আমিই বলবো। কমলারা চমকে উঠবে—বিশ্বাস করতে পারবে না, কাঁদবে হয়তো গালাগাল দেবে, ছি ছি করবে। বলবে, এর চেয়ে মরলে না কেন, ছোড়দি —সে যে ভাল ছিল!

এ-সবের জবাব দেবার কোনো দরকার

নেই বাসনার। জবাব সে দেবেও না। দিয়ে লাভ। তবে হ্যাঁ মনে মনে বলবে, তোদের ছোড়দি হাসপাতালে মরে গেছে —নতুন যে বাসনা সে এখন অসঙ্কোচে তার স্বামীর ঘর করতে চলেছে।

সকাল গড়িয়ে দুপুরে এল। বাসনা স্নান করেছে। খেয়েছে অনেকক্ষণ হল। একটু শুয়েছে। নার্সের সঙ্গে হাল্কা হাসি ঠাট্টা করলে। তারপর নিজে নিজেই জিনিসপত্র গোছাচ্ছিল। তার সুটকেসে থান আর সাদা ব্লাউজ আর এটা ওটা পুরে রাখল। বেতের টুকরিটায় তোয়ালে, তেল চিরুনী আলাদা করল, অমলেন্দুর এনে দেওয়া ফুল রাখার সেই কাঁচের গ্লাস, আয়না, ক'টা বই, আরও এটা সেটা। সুটকেসটা কমলারা নিয়ে যাবে—ওই সাদা রুক্ষতায় আর কোনো প্রয়োজন নেই বাসনার। আর এই বেতের টুকরিতে চিরুনী, ফুলরাখা গ্লাস, আয়না, বই—এসব অমলেন্দুর, তারই—এগুলো নিয়ে যাবে বাসনা।

গুছোতে গুছোতে নিজের এই ছেলেমানুষীতে বাসনা হাসছিল। এই নিজের সংসারের ওপর টান দেখে, এই গোছাল ব্যবস্থা দেখে।

যায় না, যায় না করেও দুপুর শেষ হয়ে বিকেল হল। ঘণ্টা পড়ে গেল। খানিক পরেই সুধাময়রা হুড়মুড় করে এসে ঢুকল।

'ওমা, ছোড়দি যে একেবারে তৈরি হয়ে বসে আছ।' বীথি বলল—গালে আঙুল তুলে হাসতে হাসতে।

'ভালোই করেছ। এখন বিদেয় হতে পারলে বাঁচি।' বললে কমলা।

'তা হ'লে আমি এবার নিয়ে যাবার ব্যবস্থাটা সেরে আসি।' সুধাময় বললে। বলে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

অমলেন্দু আসছে না কেন এখনো? বাসনা মনে মনে অস্বস্তি বোধ করছিল।

ও জানে আজ যাবার দিন, আজও সেই দেরি—এখনো দেখা নেই।

'তোমার শরীরটা এমনিতে কিন্তু বেশ দেখাচ্ছে, ছোড়দি।' বীথি স্প্রিংয়ের খাটে কটা দোল খেয়ে বলল।

কে জানে কেন এই কথায় কেমন এক লজ্জা পেল বাসনা।

ঝি, জমাদারনি, চাকর, ঠাকুর, দ্বারোয়ান—একে একে সব এল। টাকা, হ্যাঁ—টাকাই গুঁজে দিল হাতে বাসনা। এটা সেটা বিলিয়ে দিল, সাবানের টুকরো আর গায়ের জামাও একটা। আর ভাবছিল এ যেন ঠিক বাপের বাড়ি থেকে শ্বশুরবাড়ি যাবার সময় বাড়ির যতো রাজ্যের না-ছোড় পাওনাদারদের সুখের কড়ি বিলিয়ে দেওয়া।

কিন্তু অমলেন্দু আসছে না কেন? বাসনা মনে মনে রাগ করছিল। সব তাতেই বেশি বেশি, বাড়াবাড়ি। কাজ দেখাতে গেছে, কি আমার কাজের মানুষ! নিজের বউকে হাসপাতাল থেকে নিয়ে যাবে, সময় মতন আসতে পারে না।

কিন্তু সত্যি সময় মতন আসতে পারছিল না অমলেন্দু। সুধাময় তার কাজ চুকিয়ে ফিরে এল। ছাড়-টিকিটের হাঙ্গামা মিটিয়ে। শীতের বিকেল ঘন হয়ে আসছিল। আবছা অন্ধকার।

বাসনা ভাবছিল অমলেন্দু এইবার এসে পড়বে। এসে পড়ল বলে।

তবুও না। আশ্চর্য!

'চলো চলো। গাড়ি নিচে রেখে এসেছি।' সুধাময় তাগাদা দিচ্ছিল।

কেবিন থেকে পা বাড়াল বাসনা। বীথি বেতের টুকরি হাতে আগে আগে, কমলা পাশে পাশে।

অমলেন্দু কই?

করিডোর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বাসনা ভাবল এইখানেই দেখা হয়ে যাবে, সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ভাবছিল, সিঁড়িতেই দেখা হয়ে যাবে।

না, অমলেন্দু নেই। ট্যাক্সির মধ্যে উঠে বসে রাস্তা আর চারপাশ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল বাসনা, ঝাপসা বিকেল—কতো লোক যাচ্ছে আসছে—অমলেন্দু নেই। অমলেন্দু আসে নি।

ট্যাক্সিতে স্টার্ট উঠল।

নিঃস্ব হয়ে গিয়েছে বাসনা। সম[illegible] শরীরটাতে যেন কিসের এক শূন্যতা রে[illegible] দিয়ে গেল।

তুমি এলে না! নিয়ে যেতে এ[illegible] না!

ট্যাক্সি ছাড়ল।

হঠাৎ, হ্যাঁ হঠাতই......

বাসনার মনে হচ্ছিল আশ্চর্য, অদ্ভুত এক শক্তি আর সঙ্কল্প যেন হঠাৎ তার বুকের কোন্ তলা থেকে মাথা ঠেলে উঠে দাঁড়িয়েছে।

তবে, তবে—?

অনমনীয় আর দৃঢ়, অদ্ভুত আর অবিচল এক সঙ্কল্পে যেন স্থির আর সুন্দর হয়ে বাসনা সোজা হয়ে বসল। নিষ্ঠায় দীপ্ত, বিশ্বাস আর ভালবাসায় পবিত্র হয়ে এক পলাতক মৃগের ভীরুতাকে আর ঘৃণাকে যেন হঠাৎ ডেকে উঠল ও।

'সুধাময়, তুমি তোমার বন্ধুর বাড়ি [illegible] চেন?' বাসনা কারুর দিকে না—সোজা সামনে তাকিয়েছিল।

'কার, অমলেন্দুর?'

'হ্যাঁ।'

'চিনি না, তবে রাস্তা [illegible] নম্বরটাও মনে আছে।'

'আমায় সেখানে নামিয়ে দিয়ে [illegible]'

কমলা, বীথি, সুধাময় [illegible] তাকাল। বাসনা কারুর দিকে [illegible] না। তার মুখের ওপর অত্যন্ত স্পষ্ট এবং অনাবৃত অর্থ লেখা ছিল।

॥ ২০ ॥

দরজার পাল্লায় হাত দিতে গিয়ে যেটুকু শব্দ হলো।

মুখ তুলে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল অমলেন্দু। আর সঙ্গে সঙ্গে চমক-খাওয়া দুটি চোখ স্থির হয়ে গেল।

বাসনা দাঁড়িয়ে রয়েছে। দরজার পাল্লা ঘেঁষে—একটা হাত রেখে, ওর দিকে তাকিয়ে। ঘরের আলোয় এই মূর্তিটা অত্যন্ত স্পষ্ট আর স্থির। হয়তো-বা ক্লান্ত কিন্তু অত্যন্ত নিশ্চিন্ত এবং নিরুদ্বেগ।

ইজিচেয়ার থেকে কেউ যেন ধাক্কা দিয়ে অমলেন্দুকে উঠিয়ে দিল। বিমূঢ় হয়ে পড়েছে ও।

আর কেউ আসছিল না; সুধাদা, কমলা বৌদি, বীথি—: কেউ না।

অমলেন্দু বুঝতে পারছিল পিছনে আর-কারুর পায়ের শব্দ সঙ্গে নিয়ে বাসনা এসে দাঁড়ায় নি। ও একাই এসেছে। একা।

অস্ফুট একটা শব্দ করতে গিয়েও পারল না অমলেন্দু, গলার মধ্যেই আটকে গেল।

অমলেন্দু যদিও এখন আর ভালভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে ভাবতে পারছিল না, তবু দমকা হাওয়ার মতন এক রাশ ক্ষোভ আর বিরক্তি মনের কোথায় যেন একটা অগোছাল ভাব সৃষ্টি করে গেল।

কেন এলে তুমি, কেন, কেন—? অমলেন্দু বাসনার দিকে চেয়ে চেয়ে যেন আক্রোশে রাগে ফেটে পড়তে চাইছিল। কিন্তু কথা বলতে পারছিল না। একটি শব্দও তার ঠোঁটের গোড়ায় ফুটছিল না।

বাসনাও চুপ। খানিকক্ষণ একইভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাটল। অমলেন্দুর দিকে কেমন এক অদ্ভুতভাবে চেয়ে, সোজাসুজি চোখের দিকে তাকিয়ে।

তারপর বাসনা দরজা ছেড়ে ঘরের মধ্যে সোজা এগিয়ে গিয়ে একটু দাঁড়াল। তাকাল চারপাশে।

টেবিল, বিছানা, আলনা, এক কোণে রাখা ট্রাঙ্ক, সুটকেস্।

টেবিলের কোণায় গা ঠেকিয়ে আবার দাঁড়াল একটু। অমলেন্দুর দিকে আর ও চাইছিল না। বরং এই ঘরে যেন ও একা—একেবারেই একা এমনই এক অন্যমনস্কতার মধ্যে সব দেখছিল আর ভাবছিল।

টেবিলের ওপরই চাবিটা পড়েছিল। কাগজের টুকরো চাপা ছিল। হাত বাড়িয়ে চাবিটা মুঠোর মধ্যে তুলে নিল বাসনা।

অসহ্য লাগছিল অমলেন্দুর, বিশ্রী রকম এক অস্বস্তি। আর রাগ: ঘৃণাও।

ঘর থেকে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। পায়চারি করলে ক'বার, তারপর এক পাশে গিয়ে রেলিং ধরে বাইরে তাকিয়ে থাকল।

অন্ধকার আর শীত। কুয়াশা। সামনে কালো কালো স্থূল কতকগুলো জন্তুর মতন বাড়িগুলো দাঁড়িয়ে আছে—

এদিক ওদিক বাতি। মিটমিট করে জ্বলছে। একটু আকাশ দেখা যায়, সামান্য ক'টি তারাও।

কী দুঃসাহস, অমলেন্দু বাসনার এই হঠাৎ বাড়ি বয়ে আসার কথা ভাবছিল আর ছটফট করছিল, তুমি আজ হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে সটান আমার কাছে চলে এলে! কেন, কিসের জন্যে? এই নাটক করার কি দরকার ছিল? এখন যদি আমি তোমায় মুখ ফুটে বলি, তুমি চলে যাও—এখুনি, এই বাড়ি ছেড়ে; হ্যাঁ, যদি আমি তোমায় তাড়িয়ে দি—কোথায় যাবে? কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? এখানে যখন এসেছ, বুঝতেই পারছি—পায়ের মাটি সরিয়ে দিয়ে এসেছ!

কেন এলে? কেন, কেন? আমি তো তোমায় আসতে বলিনি।......

এতো লোভী মেয়ে আর আমি দেখি নি। আশ্চর্য, তুমি কি চোখ বন্ধ করে ছিলে, আমার এই ভাবসাব, হাসপাতালে যাওয়া না-যাওয়া থেকে তুমি বোঝোনি, আমি তোমার ব্যাপারে হাত ধুয়ে ফেলেছি, অন্তত সেটাই চাইছি। মুখ ফুটে বলতে পারি নি—এই যা। ভদ্রতার দায়ে ক'বার গিয়েছি—দেখা করতে, তা ছাড়া আর কি!

অমলেন্দু আবার পায়চারি শুরু করল। আর ভাবল, ভাবছিল যে—বাসনা হয়ত অন্য এক দায়ে পড়ে এসেছে।

কিন্তু, কে যেত, আমি অন্তত কখনোই, কখনোই আর তোমার ওপর আমার স্বামীত্বের অধিকার আরোপ করতে যেতুম না। তুমি যদি সেই ভয়ে এসে থাক ভুল করেছ।

হঠাৎ থমকে গিয়ে দাঁড়াল অমলেন্দু। বাসনা ঘর থেকে বাইরে এসে আলোজ্বলা বারান্দা দিয়ে এ-পাশ ও-পাশ তাকাতে তাকাতে—এগিয়ে যাচ্ছে। বাথরুমের খোঁজেই। বেশ বুঝতে পারল অমলেন্দু। বাসনার হাতে নতুন শাড়িটাড়ি ছিল আর নতুন তোয়ালে।

বাসনা বাথরুমে ঢুকে পড়ে দরজা *বন্ধ করে দিল। চাকরটা রান্নাঘরের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে। একটু বা অবাক—একটু বা উৎফুল্ল। বাবু আগে বলতেন—মা আসবেন ক'দিন পরে। এই কি তবে সেই মা নাকি! কিন্তু—?*

অমলেন্দু বারান্দা থেকে সরে ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকল আবার। যা ভেবেছিল অমলেন্দু তাই। ট্রাঙ্ক খুলে শাড়িটাড়ি বের করে নিয়েছে বাসনা। ইচ্ছে হচ্ছিল ছুটে গিয়ে বাসনার হাত থেকে সব ছোঁ মেরে কেড়ে নিয়ে আসে। একদিন অবশ্য এ-সবই তোমার জন্যে এনেছিলাম—তোমাকে বলেছিও তাই, কিন্তু এখন এই ঘর দোর, জিনিসপত্র, শাড়ি জামা কিছুর ওপরই আর তোমার অধিকার নেই। হ্যাঁ, নেই।

অদ্ভুত বেহায়া তো এই মেয়ে! অমলেন্দু বিছানার ওপর একটু বসল। ভীষণ লোভী। যেন এটা ওরই সংসার। পরম নিশ্চিন্তে ওর যা খুশি করে যাচ্ছে। গ্রাহ্য নেই, ভয় নেই, ভাবনা নেই। বেহায়া, বেহায়া কোথাকার!

এ অধিকার তোমায় কে দিয়েছে? অমলেন্দু বিড় বিড় করে বললে এখন ঘরে যখন কেউ নেই, শুধু বাতিটা জ্বলছে আর খোলা জানলা দিয়ে শীত ঢুকছে।

কি করবে অমলেন্দু বুঝতে পারছিল না। শরীরের সবকটা স্নায়ু যেন শেষ পর্দায় গিয়ে ঝঙ্কার দিয়ে উঠেছে। চোখ জ্বলছে, ঘাড় ব্যথা করছে, মাথার মধ্যে গুমোট ধোঁয়ার মতন ঠাস অনুভূতি। কপালের কাছে দপ্‌দপ্‌।

একটা কিছু করতেই হবে। করা উচিত এখুনি—। আজই। নইলে এ-মেয়ে তার পা আরও শক্ত করে [illegible] জুড়ে নেবে এ সংসারে। ওর লক্ষণ-টক্ষণ তেমনি।

অমলেন্দু উঠল। সিগারেট ধরাল। ঘরের মধ্যে একটু হাঁটাহাঁটি করল। চাবির গোছাটা টেবিল থেকে তুলে নিল। এ-চাবি আর তোমার মুঠোয় পেতে দেব না। চাবিটা অমলেন্দু নিজের জামার পকেটে রেখে দিল।

রেখে দিচ্ছে—এমন সময় বাসনা আবার ঘরে ঢুকল। হাত মুখ ধুয়েছে, হাসপাতালের জামাকাপড়—সেই সাদা *থান, সাদা ব্লাউজ সব ছেড়ে এসেছে। এখন গায়ে খুব হাল্কা রঙের একটা শাড়ি। মুখটা ভিজে ভিজে, কপালের ওপর জল চিক্‌চিক্‌ করছে। গালে লেপ্টে গেছে ভিজে ক'টি চুল।*

একটা ভিজে ভিজে হাওয়া যেন বাসনার কাছ থেকে ছুটে এসে অমলেন্দুর চোখে ঝাপ্টা দিয়ে গেল। ক'টি মুহূর্তের জন্যে অন্য-এক চোখ এবং মন প্রথমে বিহ্বল পরে মুগ্ধ দৃষ্টি ভরে নিশ্চল হয়ে থাকল। বাসনা যেন এই ঘরের মধ্যে মেঘের ঈষৎ নীলাভ রঙ এনে এক-টুকরো ফিকে স্বপ্ন রচনা করে বসে থাকল। হঠাৎই যা অত্যন্ত সুন্দর আর জীবন্ত।

বাসনা এবার মুখ মুছে, আয়নার কাছে মোড়ায় বসে বসে চুলটা ঠিক করে নিচ্ছিল।

তাকিয়ে তাকিয়ে ক্রমে আবার সেই অস্বস্তি জাগছিল। এ-সবই অস্‌... ঠেকছিল। এই ঘর, এই আলো, ওই সুশ্রী মেয়ে। সবই। কেমন এক ভয় ভয় করছিল। অমলেন্দুর ভয় হচ্ছিল সত্যিই না এবার ও একটা কিছু করে বসে। বাসনার এই নীরব এবং দুঃসাহসী যদুর খেলা সহ্যাতীত।

চুল আঁচড়ানো শেষ করে—বাসনা ড্রেসিং টেবিলের এটা ওটা হাতড়াল। কী যেন খুঁজছিল। স্নো, পাউডার তো টেবিলের ওপরই আছে, তবে? যা খুঁজছিল পেল না। মোড়া ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে তাকাল অমলেন্দুর দিকে। কী যেন বলবার জন্যে ঠোঁট খুলেও—হঠাৎ থেমে গেল।

অমলেন্দু অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

অল্প একটু দাঁড়িয়ে থেকে বাইরে এল বাসনা—। বারান্দায় একটু দাঁড়াল। তারপর আস্তে আস্তে রান্নাঘরের দরজায় গিয়ে চৌকাটে হাত রেখে ভেতরে তাকাল।

অমলেন্দু ততক্ষণে জামাটা গায়ে গলিয়ে নিয়েছে। এই বাড়ি, বাসনার উপস্থিতি সে আর বরদাস্ত করতে পারছে না। দমবন্ধ হয়ে আসছে।

বাইরে বেরিয়ে আসতে আসতে অমলেন্দু দেখল, বাসনা রান্নাঘরের মধ্যে ঢুকে চাকরটাকে যেন কি বলছে। হাতে তেল-মশলা কিসের পাত্র যেন।

করুক যা খুশি! গ্রাহ্যই করলে না অমলেন্দু। তর তর করে সিঁড়ি বেয়ে রাস্তায় নেমে গেল।

রান্নাঘরেই একটা মোড়া আনিয়ে বসল বাসনা। উনুনের আঁচ লাগছে গায়, মুখে।

ভেতরে ভেতরে খুবই ক্লান্ত লাগছিল। বাসনার মনে হচ্ছিল এ যেন এক নিষ্ঠুর এবং অদ্ভুত পরীক্ষা। ওর সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হয়ে এল। আর কতোক্ষণই বা পারবে?

কিন্তু আমায় পারতেই হবে। বাসনা নিজের কাছে নিজেই শক্তি চাইছিল। আর মনে মনে বলছিল, আমার ভালবাসার, নিষ্ঠার আর বিশ্বাসের এই একমাত্র পরীক্ষা।

রাত বাড়ছিল। হাতের মধ্যে মুখ গুঁজে তবু চুপ করে বসেছিল বাসনা।

কোথায় গেল ও—ফিরবে কখন?

আর বসে থেকে বাসনার মনে হচ্ছিল—তার এই দুর্বল স্বাস্থ্যে শেষ শক্তিটুকু দিয়েও যেন ছিপটা সে ধরে রয়েছে—কাঁপছে থর থর করে আর একটা বিরাট মাছ তার ছিপের সব সুতো টেনে নিয়ে জলে ডুবে গেছে, ছিঁড়ে ফেলে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছে।

বাড়ির বাইরে এসে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরল খানিকটা অমলেন্দু। ভাল লাগল না। পার্কে গিয়ে বসল। অন্ধকার আর কুয়াশা, মিটমিট আলো। ঘাস, লতা-পাতার গন্ধ। ভাল লাগল। কিছুক্ষণ ভালই লাগল, তারপর এই পার্কও অসহ্য হয়ে উঠল।

কিছুতেই শান্তি নেই, স্বস্তি নেই। বাসনা যেন তার সঙ্গে ভীষণ এক শত্রুতা শুরু করেছে। একটি মুহূর্তের জন্যেও সুস্থির থাকতে দেবে না।

ওকে আর আমি অস্বীকার করবো কি করে, কেমন করে ঠেলে সরিয়ে দেবো তার জায়গা থেকে! অদ্ভুত—মনেই হয় না এ যেন সেই দুর্বল, ভীরু, সতর্ক সাবধানী, শঠ এক মেয়ে। এখন এই মেয়ে যেন কিসের জোরে মাথা উঁচু, পা সোজা করে দাঁড়াতে শিখেছে। চোখে চোখে তাকাতেও ওর আর ভয় করে না। এ বাড়িতে এসে উঠতেও। যেন সংসার তার, সবই তার। কী নিসঙ্কোচ, নিঃশঙ্ক। পরিপূর্ণ নির্ভরতা। লজ্জা নেই, কুণ্ঠা নেই, কোনো অস্বস্তিই তার নেই।

অমলেন্দু ভেবে দেখছিল, এর কোনো সমাধান নেই। এতো কাছে, একই ঘরের মধ্যে সে যখন এসে দাঁড়িয়েছে তখন তার আসাটাই যে অন্যরকম, তার রূপটা যে আলাদা।

আগে যাই হোক্‌ তবু বাসনা দূরে ছিল—আমার ঘরের বাইরে, গণ্ডি থেকে অন্য জায়গায়। আর এখন শুধু পা-বাড়িয়ে ঘরেই ঢোকে নি, তার নিজের

জায়গা বুঝে নিয়ে, অধিকারে সজাগ হয়ে অবিচল সংকল্পে দাঁড়িয়ে পড়েছে। অমলেন্দুর সাধ্য কি তাকে ঠেলে সরিয়ে দেয়।

আর এটাও অমলেন্দু বুঝতে পারছিল—বাসনার এই স্থৈর্যের কাছে সে মাথা তুলতে পারছে না,—মুখ খুলতে পারছে না। এবং সেই পাথরের মত নির্বাক অথচ এক কঠিন আশ্চর্য আকর্ষণ থেকে ছুটে পালিয়ে যাবার সাধ্যও তার নেই।

বাসনা তাকে কিসের এক প্রচণ্ড শক্তিতে যেন টানছে। যতোই ছটফট করুক, সে-টান থেকে নিজেকে মুক্ত করা অমলেন্দুর পক্ষে অসম্ভব। অসম্ভব।

মনে পড়ল, আসার সময় বাসনাকে রান্নাঘরে উঁকি দিতে দেখেছে ও। কথাটা মনে পড়তেই কেমন এক ভয় ধক্ করে বুকের ওপর ফেটে পড়লো।

এই মেয়ের ভীষণ গোঁ। হাসপাতাল থেকে এসেই অতো হাঁটাহাঁটি, জল ঘাটাঘাটি করল। তারপর আবার রান্না-ঘরে ঢুকেছে। জেদ করে হয়তো রান্নাই শুরু করবে, তারপর এক কেলেঙ্কারী—উনুনের পাশে কী মধ্যেই হয়ত মুখ থুবড়ে পড়ে থাকবে, মরে থাকবে বলা যায় না—যা দুর্বল এখন ওর শরীর।

অমলেন্দুর ভীষণ উদ্বেগ হচ্ছিল। আর ভয়। যেন বাসনাকে সত্যিই রান্না-ঘরের উনুনে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকতে দেখছে ও।

পার্ক, রাস্তা, অমলেন্দু ঊর্ধ্বশ্বাসে বাড়ি ফিরছিল।

বাড়ির মোড়ের মাথায় এসে দাঁড়াতেই—বঙ্কুদের মনিহারী দোকানটা হঠাৎ চোখে পড়ল। আলো জ্বলছে। ক্রীম স্নোর সেই নীল টিউব জ্বলা বিজ্ঞাপনটা চোখের ওপর দপ্ করে জ্বলেই নিভে গেল। আবার জ্বলল।

কী একটা মনে পড়ল অমলেন্দুর সেই ক্রীম স্নোর বিজ্ঞাপনের মেয়েটির হঠাৎ-জ্বলা-নেভা মুখটা দেখতে দেখতে।

তারপর পা পা করে অমলেন্দু বঙ্কুদের দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। পকেটে হাত দিল পয়সার জন্যে।

সিঁড়ি দিয়ে আস্তে আস্তে ওপরে উঠে এল অমলেন্দু। উঁকি দিয়ে দেখল। রান্নাঘরে মোড়ার ওপর বসে হাতে মাথা এলিয়ে যেন অপেক্ষা করতে করতে ঘুমিয়েই পড়েছে বাসনা।

ডাকবে কী ডাকবে না ভাবতে গিয়ে কেমন একটা শব্দই করে ফেলল অমলেন্দু।

বাসনা চোখ তুলে তাকাল।

অমলেন্দু একটুক্ষণ সেই মুখের দিকে তাকিয়ে ঘরে গিয়ে ঢুকল। যেতে যেতে অস্ফুট স্বরে জল চাইল। এমন দুর্বল আর নিস্তেজ স্বর যেন মনে হয় অনেক ঘুরে ঘুরে ভীষণ ক্লান্ত আর নির্জীব হয়ে শেষপর্যন্ত ফিরে এসেছে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে।

বাসনা নিজেই এল জল নিয়ে। অমলেন্দু গায়ের জামাটা ছাড়ছিল।

জামাটা মাথা গলিয়ে টেনে বার করতেই পকেট থেকে চকচকে কাগজে মোড়া ছোট মতন কিসের যেন একটা প্যাকেট বাসনার পায়ের কাছে পড়ল।

অমলেন্দু লক্ষ্য করে নি। জলের গ্লাসটা অমলেন্দুর হাতে দিয়ে বাসনা নুয়ে কাগজের প্যাকেটটা তুলে নিল।

সেই হাল্কা, ছোট্ট কাগজের প্যাকেটটা চোখের সামনে তুলে ধরতেই বাসনার হাত একটু কেঁপে গেল, বুক ধক্ ধক্ করে উঠল আর অসহ্য এক আনন্দ যেন বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে ঢেউয়ের ফণা হয়ে থমকে দাঁড়াল। জেনে ফেলেছে বাসনা, চিনে ফেলেছে। বড্ড চেনা জিনিস যে!

তবু, এতোক্ষণের এই নীরবতা এবং অপেক্ষাকে ছোট্ট একটি কথা দিয়ে যেন আশ্চর্য সুন্দর করে ভরাট করে তুলল বাসনা। বলল, 'আমায় বলতে নেই তোমাকে, নয়তো বলতুম আনতে। তখন খুঁজছিলাম। পাই নি।'

'হ্যাঁ, সবই ছিল—ওটাই শুধু বাদ পড়েছিল।' অমলেন্দু বাসনার চোখে চোখে চেয়ে একটু বিব্রত হওয়ার হাসি হাসল, এবং কথা গুছোতে না পেরেই বোধ হয় বললে, 'ওটা চীনে সিঁদুর. বেশ ভালোই হবে, না—?'

'খু—ব।' বাসনার মুখে এখন পৌষের এই রাত্তিরে কেমন করে যে বসন্তের এক ঝলক সিঁদুর রঙ রোদ ঠিকরে পড়ল কে জানে। আশ্চর্য!

অমলেন্দু মুগ্ধ আর খুব শান্ত হয়ে দেখছিল।

সমাপ্ত

ভারতের ঐতিহ্য

রাজগুরু যোগিবংশ—শ্রীসুরেশচন্দ্র নাথ মজুমদার প্রণীত। শ্রীপ্রথমনাথ নাথ বি এ কর্তৃক রাণাঘাট, নদীয়া হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৭্ টাকা।

সমগ্র ভারতের ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নাথ যোগী সম্প্রদায়ের অবদানের গুরুত্ব সর্বজনস্বীকৃত সত্য। নাথ যোগীগণের আধ্যাত্ম সাধনার দার্শনিকতা সম্বন্ধে এদেশের বহু মনীষী বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন। নাথ-সাহিত্যের ক্রমবিকাশের রীতি ভারতের বিভিন্ন ভাষা বিশেষভাবে বাঙলা ভাষার মূলে কিরূপ কাজ করিয়াছে এ সম্বন্ধেও পণ্ডিতবর্গের গবেষণার ফলে নানা তথ্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থখানিতে পৌরাণিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া নাথ যোগী সম্প্রদায়ের উৎপত্তির বিবরণ, তাঁহাদের প্রবর্তিত ধর্ম, প্রসিদ্ধ নাথাচার্যগণের জীবনী, নাথ-সাহিত্য প্রভৃতি বিষয় সুবিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। বহু তথ্যপূর্ণ এই আলোচনা গ্রন্থকারের প্রগাঢ় অনুসন্ধিৎসা এবং প্রভূত অধ্যবসায়ের পরিচায়ক। সাত শতাধিক পৃষ্ঠাব্যাপী এই পুস্তকে প্রাচীন যুগ হইতে বর্তমানকাল পর্যন্ত নাথ সম্প্রদায়ের সম্পর্কে জ্ঞাতব্য কোন বিষয়ই বাদ পড়ে নাই। গ্রন্থখানি পাঠে শুধু যে নাথ সম্প্রদায়ই উপকৃত হইবেন এরূপ নহে, পরন্তু পুস্তকখানি ভারতীয় সাংস্কৃতিক ইতিহাসের অঙ্গস্বরূপেও গণ্য হইবার উপযুক্ত। ২২২।৫৫

শঙ্করাচার্য—শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভৌমিক প্রণীত। ভৌমিক লাইব্রেরী, ২০০।১এ, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড, কলিকাতা ২৬ হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৫্ টাকা।

আচার্য শঙ্করের জীবনী এবং তৎসহ তৎপ্রণীত বেদান্ত সূত্রের প্রসিদ্ধ শারীরিক ভাষ্য এবং সমগ্র রচনাবলীর সযত্ন সংকলিত এবং সুসম্পাদিত আলোচ্য গ্রন্থখানির প্রথম সংস্করণ ইতিপূর্বে প্রকাশিত হইয়া বাঙলার চিন্তাশীল সমাজে বিশেষ খ্যাতি লাভ করে, ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশে আমরা প্রীতি লাভ করিয়াছি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত শাস্ত্রের অধ্যাপক ডাঃ শ্রীযুক্ত সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়ের লিখিত বিস্তৃত ভূমিকা গ্রন্থখানির সমৃদ্ধি বিশেষভাবে বর্ধিত করিয়াছে। প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যপূর্ণ এই ভূমিকা ভাগ। ইহাতে শঙ্করসিদ্ধান্তের দার্শনিকতা প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। বৌদ্ধ দর্শনের শূন্যবাদের সহিত মায়াবাদের পার্থক্য এবং বেদান্ত দর্শনের মূল-প্রতিপাদ্য মোক্ষের স্বরূপ নির্ধারণে এই ভূমিকা মনীষার প্রখর আলোকে উজ্জ্বল। গ্রন্থকার শঙ্করের জীবনী আলোচনায় তাঁহার বাঙলাদেশে আগমন বিশেষভাবে উত্তরবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গে লাঙ্গলবন্ধ ঢাকা প্রভৃতি স্থান পর্যটনের কথা উল্লেখ করেন নাই। আচার্য দেবের কম্বোজ এবং বাহ্লীক প্রদেশে দিগ্বিজয় যাত্রার কথাও পুস্তকখানিতে বাদ দেওয়া হইয়াছে দেখা যায়; বিষয়টি লক্ষ্যের মধ্যে পড়ে। শঙ্করের মোহমুদ্গর মণিরত্নমালা ভারতের সাধক সমাজের সর্বত্র সমাদৃত। বেদান্তসূত্র এবং এই রচনাগুলির বঙ্গানুবাদ সহজ ও সরল। আচার্য শংকরের সমগ্র অবদানের এই ৬ শত পৃষ্ঠায় পূর্ণ মূল্যবান্ সঙ্কলনগ্রন্থ সুধিসমাজের সর্বত্র সমাদৃত হইবে। ছাপা বাঁধাই, কাগজ সুন্দর এবং সুশোভন। ৩৮২।৫৫

Swami Bon Maharaj—শ্রীকমল-কৃষ্ণ দাস এম এ কর্তৃক সম্পাদিত এবং বৈষ্ণব থিয়োলজিক্যাল ইউনিভারসিটি, বৃন্দাবন, মথুরা হইতে প্রকাশিত।

বৃন্দাবনস্থ বৈষ্ণব থিয়োলজিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী ভক্তিহৃদয় বনমহারাজের পঞ্চ-পঞ্চাতিবর্ষে পদার্পণ উপলক্ষে পুস্তিকাখানি প্রকাশিত হয়। পুস্তিকাখানি শ্রীবনমহারাজের প্রশস্তিপূর্ণ প্রবন্ধের সংকলন। প্রবন্ধগুলি কতিপয়

মনীষী ব্যক্তি কর্তৃক লিখিত। এইগুলিতে বলমহারাজের ভবগদ্ভক্তি, তাঁহার বিদ্যাবত্তা এবং ভারতের বাহিরে ইউরোপ, আমেরিকা, চীন, জাপান প্রভৃতি স্থানে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারে তাঁহার কৃতিত্বের মহিমা পরিকীর্তিত হইয়াছে। ১৬৭।৫৫

জৈন ধর্মশাস্ত্র

আচারাঙ্গ সূত্র—শ্রীহীরাকুমারী ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ অনূদিত। শ্রীজৈন শ্বেতাম্বর তেরাপন্থী মহাসভা কর্তৃক ৩নং পর্তুগীজ চার্চ স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

আচারাঙ্গ সূত্র জৈন ধর্মশাস্ত্রের বহু প্রাচীন মৌলিক গ্রন্থ। জৈন ধর্মের প্রবর্তক মহাবীর তাঁহার প্রথম একাদশ শিষ্যকে যে ধর্মোপদেশ প্রদান করেন এই সূত্রে তাহাই সংকলিত হইয়াছে। জৈন ধর্মে সংযমকেই প্রধান স্থান দেওয়া হইয়াছে। রাগ-দ্বেষকে সংযত করিয়া মনের সংযম, বাক্ সংযম এবং শারীরিক কার্যকে সংযত করিয়া কায় সংযম এই ত্রিবিধ সংযম প্রতি-পালনের চারিত্র শক্তি সুদৃঢ় করিয়া নির্বাণ লাভ করাই জৈন মতে মোক্ষের আদর্শ। অহিংসাই নিবৃত্তি লাভের পরম উপায়। জৈন শাস্ত্রে অহিংসাকে সংযমের সূক্ষ্ম আচারণের সাহায্যে চারিত্রিক শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। পৃথিবীকায়, অপকায়, অগ্নিকায়, বনস্পতিকায়, ত্রসকায়, বায়ুকায় এই ষটকায়ে জীবসমূহকে বিভক্ত করিয়া সর্ববিধ জীব হিংসা হইতে মুক্তিকামীকে নিবৃত্ত হইতে হইবে। অন্য কথায় বহির্বিষয় সম্পর্কিত সুখ দুঃখের দ্বন্দ্ব-সংঘাত অতিক্রম করিয়া আত্মায় প্রতিষ্ঠিত হইবেন, ইহাই জৈন মার্গ। আচারাঙ্গ সূত্রে দুইটি শ্রুত-স্কন্ধে এই সাধনের আচারাঙ্গ উপদিষ্ট হইয়াছে। শেষ অধ্যায় ভগবান মহাবীর স্বীয় সাধক জীবন কিভাবে অতিবাহিত করিয়া-ছিলেন, তাহারই বর্ণনা আছে।

মূল গ্রন্থ অর্ধমাগধী প্রাকৃত ভাষায় লিখিত এবং অত্যন্তই দুরূহ। ইতিপূর্বে এই গ্রন্থের ইংরেজী, গুজরাটি প্রভৃতি ভাষায় অনুবাদ হইয়াছে। আচারাঙ্গ সূত্রের এই প্রথম বাংলা অনুবাদ। অনুবাদ গ্রন্থকর্ত্রীর পাণ্ডিত্য এবং শাস্ত্রানুসন্ধিৎসার বিশেষ পরিচায়ক। বাঙালী পাঠকগণ এই অনুবাদ পাঠ করিয়া জৈন ধর্মের মূল তত্ত্বের সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ লাভ করিবেন। পশ্চিমবঙ্গে রাঢ় প্রদেশ একদিন জৈন ধর্মাচার্য মহাবীরের প্রব্রজ্যার পুণ্য পীঠ-ভূমিতে পরিণত হইয়াছিল বাঙালীর সে কথা ভুলিলে চলিবে না। ভারতীয় সংস্কৃতির মর্মোপলব্ধির পক্ষেও এই সম্পর্কে আলো-চনার প্রয়োজন একান্তভাবেই রহিয়াছে। ৩৫০।৫৫

নাটক

দাস্য-মধুর— শ্রীসীতারাম ওংকারনাথ প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান মহেশ লাইব্রেরী, কলিকাতা ১২ এবং শ্রীরামাশ্রম, পোঃ ডুমুরদহ, হুগলী। মূল্য ২৲ টাকা।

গোস্বামী তুলসীদাস ও মীরাবাঈয়ের ঐতিহাসিক চরিত্র অবলম্বন করিয়া ভক্তিমূলক এই নাটিকাখানি লিখিত হইয়াছে। তুলসীর দাস্য এবং মীরার মধুর ভাবে উপাসনা। এই দুইয়ের রসানুভাবনাকে রূপ দেওয়াই নাটিকার উদ্দেশ্য। লেখক ঐ দুইটি চরিত্র সম্বন্ধে যে সব কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে, তাহার প্রায় সবগুলিই নাটকের উপাদানরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। আকবর, তানসেন, তাঁহার গুরু সংগীতাচার্য হরিদাস স্বামী, জীব গোস্বামী এ সব চরিত্রেরও অবতারণা করা হইয়াছে। দাস্য-মধুরের প্রকরণগত পার্থক্য দিব্যানুভূতির ক্ষেত্রে ঠিক কাট ছাট বাঁধা রকমে থাকে না। বস্তুত অপরিচ্ছিন্ন লাবণ্যেই উদ্ভিন্ন হইয়া উঠে। গ্রন্থকার সাধক পুরুষ, যিনি এই ভাবটি নাটকখানিতে পরিস্ফূর্ত করিতে চাহিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। মীরাবাঈ এবং রাণা কুম্ভকে অবলম্বন করিয়াই প্রধানত নাট্যরস জমিয়া উঠিয়াছে। বিভিন্ন চরিত্রের বৈচিত্র্য এবং দ্বন্দ্ব-সংঘাতের চেয়ে অন্তর্লীন দিব্যচেতনার বিকাশ এবং বিলাসকে সুষ্ঠু সংলাপের সম্বন্ধে পরিস্ফূর্ত করার উপরই এই শ্রেণীর ধর্মমূলক নাটকের সার্থকতা অনেকখানি নির্ভর করে। রসানুভূতি সে ক্ষেত্রে নৈতিক প্রেরণায় উদ্দীপ্ত হইয়া সৌন্দর্য এবং মাধুর্য লোকের গাঢ় এবং গভীর রহস্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়। এইভাবে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর প্রভৃতি বিভিন্ন রস চিত্তবৃত্তিতে এক অপরূপ সংগীত লাভ করে। ভক্তিরসাশ্রিত বহু সংগীতের কৌশলপূর্ণ সমাবেশ নাটকখানিতে তদুপযোগী পবিত্র প্রতিবেশ গড়িয়া উঠিয়াছে।

৭৩।৫৫

মধুপুরে চাঁদের উদয়—শ্রীহরিশ্চন্দ্র বসু বিরচিত। শ্রীললিতমোহন ভট্টাচার্য কর্তৃক সদ্গ্রন্থ প্রকাশনী, ৮।১-এম হাজরা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৷৹ আনা।

কীর্তন প্রধান নাটিকা। ব্রজলীলা অবলম্বনে লিখিত। লেখার ভাবটি বেশ জমাট বাঁধিয়াছে।

১০৫।৫৫

যোগবাণী—আসনবীর প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান চক্রবর্তী ব্রাদার্স, ৬, ফড়িয়াপুকুর স্ট্রীট।

আসনের পদ্ধতি এবং উপযোগিতা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত উপদেশ। প্রকরণ পদ্ধতি প্রদত্ত না হওয়াতে শিক্ষার্থীদের কাজে আসিবে বলিয়া মনে হয় না।

৩।৫৫

মর্মবাণী—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। লেখক কর্তৃক ১৫নং মোহনবাগান লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

গীতি-নাটিকা। মানবতা শাশ্বত-জীবনের সুরটি বাজিয়া উঠিয়াছে। রচয়িতা অমরত্বের অভিসারে জীবনের বিচিত্র রীতি এবং দুর্দম গতির জয় কীর্তন করিয়াছেন। ক্ষুদ্র এই গীতি-নাটিকায় প্রাণরসের উজ্জীবনাত্মক বীর্যময় প্রেরণার ছন্দোময় স্পর্শ মিলে। ১২২।৫৫

গল্প কিছু নয়—রামকৃষ্ণ গুপ্ত; প্রাপ্তি-স্থান—শ্রীবিদ্যানিকেতন, ৯এ, যতীন্দ্রমোহন এ্যাভিনু্য, কলিকাতা—৬। মূল্য দু'টাকা।

ছোট গল্পের সংকলন। কিন্তু ছোট হয়েও সবগুলি গল্প হয়ে ওঠেনি। অধিকাংশ রচনাই (কয়েকটি ব্যতীত) হয়েছে স্কেচ্ জাতীয়। সেদিক থেকে আলোচ্য পুস্তকের লেখক বাংলা সাহিত্যের দক্ষ ঔপন্যাসিক ও গল্পকার 'বনফুল' এর অনুসরণ (কয়েক ক্ষেত্রে অনুকরণও) করেছেন; কিন্তু উত্তরসূরী বলতে পারবো না। অভাব মুন্সিয়ানার। পড়বার পর অনুভূতিতে তেমন কোন রেখাপাত করে না। তবে ভূমিকাকার যে বলেছেন 'অনাবেগপন্থী' তা স্বীকার করবো। দু'একটি গল্পে বিদেশী গল্পের ছায়াপাত হয়েছে (যেমন 'প্রতিশোধ')। নইলে অধিকাংশ গল্পই সুখপাঠ্য ও দৈনন্দিন জীবনের প্রত্যক্ষ চিত্র। ছাপা, বাঁধাই এবং প্রচ্ছদপট ভালই। ২৮।৫৫

প্রাপ্তি স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থ আসিয়াছে।

ছায়া পথিক—শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
পাক প্রণালী—বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়
বিবস্ত্র মানব—শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য
স্বাধীন ভারতের শাসনতন্ত্র—শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়
জীবনস্মৃতি—লিও টলস্টয়—অনুবাদক—বিমল রায়
খেলাধুলোয় জ্ঞানের কথা—শ্রীখেলোয়াড়
মার্কিণে চারি মাস—বিপিনচন্দ্র পাল
একা—শ্রীসতোশচন্দ্র ভট্টাচার্য
খুনী দরওয়াজা—বিক্রমাদিত্য
দুরভাষিণী—নরেন্দ্রনাথ মিত্র
সুরুচির ভাগা—ডাঃ প্রতাপচন্দ্র গুহরায়
নন্দনপুর নাট্য সমিতি—রাতুল লাহিড়ী
ওপারের আলো—শিবকৃষ্ণ দত্ত
দুই ধ্রুব—ভি এস খন্দেকর—অনুবাদক—শ্রীভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিতরায়
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প—অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য সম্পাদিত
স্বর্ণসীতা—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
নারী ও নিয়তি—গজেন্দ্রকুমার মিত্র

—শৌভিক—

না গল্প না উপাদান

না ভাবের দিক থেকে, না শিল্প-সাহিত্যের দিক থেকে, না প্রমোদের দিক থেকে, না ব্যবসার দিক থেকে আর না কোন দিক থেকে শিল্পী, কলাকুশলী, ব্যবসায়ী কারুর কোন লাভের কারণ, তবুও "দুই বোন"-এর মতো অসাড় টিমটিমে ছবি কি করে যে তোলা হয়, কার যে কি উদ্দেশ্য সাধন হয় এমন ছবি তুলে তা বুঝে ওঠা ভার। গল্প একটা আছে, তা না থাকলে ফিল্ম এক্সপোজ হয় আর কিসের ওপর, সুতরাং এখানেও একটি গল্প আছে। গল্প যখন আছে তখন তাকে পর্দায় প্রতিফলিত করে তুলতে পরিচালক, চিত্রনাট্যকার, সংলাপ রচয়িতা, আলোকচিত্রশিল্পী, শব্দযোজক, শিল্পনির্দেশক, সুরযোজক, সম্পাদক ইত্যাদি বিভিন্ন বিভাগের কলাকুশলী এবং সেইসঙ্গে চরিত্রগুলির নাম নিয়ে অভিনয় করার জন্য শিল্পীদের নিযুক্ত করতেই হয়। "দুই বোন"-এর ক্ষেত্রেও তার কোন ব্যতিক্রম হয়নি, সব অংশই যথাযথভাবে পূরণ করা তো হয়েছেই, বরং দু'চারজন বেশী নেওয়া হয়েছে। যেমন সঙ্গীত পরিচালকের মাথায় একজন সঙ্গীত উপদেষ্টা, সম্পাদক ছাড়াও একজন সম্পাদনা তত্ত্ববিচারক, প্রযোজিকা একজন ছাড়া আরও একজন প্রয়োগশিল্পী, সেইসঙ্গে একজন পরিকল্পনাকারিণীও। প্রয়োগশিল্পী বা পরিকল্পনাকারিণী প্রভৃতির যে কি অংশ রয়েছে তা বোঝা গেল না। যাই হোক, এতোজন সব যে কাজ করেছেন তাঁরা সবাইই পদাধিকারে সহকারী পর্যায়ের। অবশ্য সহকারীরা মিলে ছবি করেছেন, তাতে আর অন্যায় কি হতে পারে কিন্তু তারা কেউই এমন কোন কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেননি যাতে ছবিখানি থেকে উপভোগ করার একটু কিছুও পাওয়া যেতে পারে। কারুরই কোন কৃতিত্বেরই পরিচয় নেই। নিরস, নিস্তেজ।

• • •

গল্পের কোন প্রাণ নেই, উপাদানে সামান্য একটু চমক লাগান মতোও

কল্পনার খেলা নেই। যা আছে তাও সেকেলে ঢঙের। গল্পটির রচয়িতা সুধীরেন্দ্র সান্যাল। গল্পের আরম্ভ এক প্রচারবিদের দপ্তর থেকে। চাকরি করে এসে নামলো জমিদারের ছেলে আনন্দ। প্রচারবিদ বুলবুল মিত্রকে জানালে বাপের সঙ্গে ঝগড়া করে সে এসেছে প্রমাণ করতে যে সাহিত্যচর্চা করে নিজের পায়ে দাঁড়ানো যায়। বুলবুল আনন্দকে তারই বাসায় থাকবার জন্যে বললেও আনন্দ এক রিক্সা ডেকে মালপত্র নিয়ে হাজির হলো একটি বাড়ির একতলায়। বাড়ির মালিক বিশ্বম্ভর দত্ত আনন্দকে ভাড়া দিতে রাজী হয়েছে এই পাঁচটি শর্তে যেঃ আনন্দ মেয়েদের দেখলে মাটির দিকে চোখ নামাবে, বাড়ির ভিতরের দিকের জানলা খুলবে না, মেয়েদের গলার গান শুনতে পারবে না, সকাল সকাল বাড়ি ফিরতে হবে, এবং কেউ এলে দরজা খুলে দিতে হবে। আনন্দ আগাম ক'মাসের ভাড়া চুকিয়ে দিলে। বিশ্বম্ভরের কন্যা উল্কা কলেজে পড়ে, সন্ধ্যায় সুজাতা দেবী নাম্নী এক বিলাসিনীর গৃহে আড্ডা দিয়ে অনেক রাত করে বাড়ি ফেরে এবং আনন্দকে একটা জঙলী বলে মনে করে। বিশ্বম্ভরের বাপ-মা মরা বোনঝি হিমানী বাড়ির সব কাজকর্ম করে; শান্তস্বভাবের সুশীলা মেয়ে। কয়েক-দিনেই আনন্দের ওপর বিশ্বম্ভরের আস্থা বাড়তে হিমানী এসে ওর ঘরের

কাজকর্ম করে যায়। তাছাড়া বিশ্বম্ভরের ছোট ছেলেটিকে পড়াবার বিনিময়ে আনন্দের খাওয়ার ব্যবস্থা হয়ে যায়। হিমানীর ওপরে উল্কার নির্যাতন কম নয়, আনন্দের তাই সহানুভূতি জাগে। আনন্দ হিমানীকেও পড়াতে রাজী হয়। আনন্দ তার সম্পাদক বন্ধুর সহযোগিতায় গৌতম বসু ছদ্মনামে 'ঝড়ের সংকেত' নামে একখানি উপন্যাস প্রকাশ করলে। বাজারে হৈ চৈ পড়ে গেল। সুজাতা দেবীর আড্ডা গরম হলো উপন্যাসখানির আলোচনায়। সবচেয়ে মুখর হলো উল্কা; স্পষ্টভাবে বলেই ফেললে যে সে লেখক গৌতম বসুর প্রেমে পড়ে গিয়েছে তাকে না দেখেই। গৌতম বসুকে ওরা সম্বর্ধনা জানানো ঠিক করলে। বুলবুল সঙ্গে করে নিয়ে এলো গৌতমকে; তাকে দেখেই উল্কার বাকরোধ হয়ে গেল—কি করেই বা সে জানবে যাকে সে গোড়া থেকেই ঘৃণা করে এসেছে সেই আনন্দই হয়ে দাঁড়াবে তার স্বপ্নের আরাধ্য গৌতম, গৌতম বসু। কিন্তু তখন বড়ো দেরি হয়ে গিয়েছে, কারণ ইতিমধ্যেই বিশ্বম্ভর আনন্দর সঙ্গে হিমানীর বিয়ে ঠিক করে ফেলেছে। বিয়ের দিন উল্কা মনের দুঃখে 'আফিঙ' খেলে, কিন্তু পরে জানা গেল সেটা আফিঙ নয়, মোদক।

* * *

একে তো গল্পের উপাদানে কোন বাহারও নেই, বস্তুও নেই, তার ওপর চিত্রনাট্যটিও বিমলচন্দ্র ঘোষ এমনভাবে রচনা করেছেন যার ওপর থেকে কলা-কুশলী বা অভিনয়শিল্পীর কারুর পক্ষেই ন্যূনতম উদ্দীপনা আহরণ করারও জোর নেই। বহু রকমের অবান্তর ঘটনা ও অসঙ্গতি। গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত এমন একটা দৃশ্যাংশও পাওয়া গেল না যেখানটায় ক্ষণিকমাত্রও মন বসে। বিস্তৃত আলোচনা বৃথা। ক'জন শক্তিমান শিল্পী আছেন বলে শেষ পর্যন্ত বসে থাকতে হয়, নয়তো দর্শককে ধরে রাখার মতো
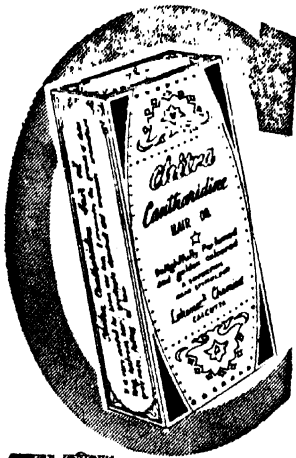
টানের জিনিস কিছু নেই। নিষ্প্রভ কাহিনী ও ঘটনাতে অভিনয় কিইবা ফুটে উঠতে পারে, আর শিল্পীরাও তার জন্যে কিইবা করবেন! শিল্পীদের মধ্যে এতে আছেন বিকাশ রায়, জহর গাঙ্গুলী, গৌরীশংকর, পারিজাত বসু, নলী মজুমদার, বিভু, নৃপতি, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, যমুনা সিংহ, অপর্ণা, তারা ভাদুড়ী, কমলা অধিকারি প্রভৃতি। কলা-কৌশলের দিকে আছেন পরিচালনায় চন্দ্রশেখর বসু; আলোকচিত্রগ্রহণে সুধীর বসু, শব্দগ্রহণে দুর্গাদাস মিত্র, শিল্প-নির্দেশে সুবোধ দাস, সঙ্গীত পরি-চালনায় মন্মথলাল দাস, সঙ্গীত উপ-দেষ্টা কালীপদ সেন, সম্পাদনা তত্ত্বাবধানে বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সম্পাদনায় মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায়।

একলব্য

প্রফুল্ল সরকার স্মৃতি কাপের ফাইনাল খেলায় 'দেশ' পত্রিকা বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেছে। প্রফুল্ল সরকার স্মৃতি কাপ সাংবাদিক ও সংবাদপত্র সেবীদের ফুটবল প্রতিযোগিতা। দৈনিক, মাসিক, সাপ্তাহিক বা পাক্ষিক পত্র-পত্রিকার কর্মী এবং সংবাদপত্রে সংবাদ ও বিজ্ঞাপন পরিবেশনকারী প্রতিষ্ঠান প্রফুল্ল স্মৃতি কাপে যোগদানের অধিকারী। আনন্দ-বাজার পত্রিকার স্বর্গত সম্পাদক প্রফুল্ল-কুমার সরকার আনন্দবাজার সংস্থার কর্মী-দের খেলাধুলো সম্পর্কেও পরম উৎসাহী ছিলেন। খেলাধুলোর মধ্যেও তাঁর স্মৃতিকে জাগরূক রাখবার উদ্দেশ্যে এই প্রতিযোগিতার প্রবর্তন করা হয়। প্রথমে এই কাপটি আনন্দবাজার পত্রিকার আন্তর্বিভাগীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার বিজয়ীর পুরস্কার ছিল। গত তিন বছর ধরে কলকাতার ক্রীড়া সাংবাদিকরা প্রফুল্লকুমার স্মৃতি কাপের পরিচালনা করে আসছেন এবং প্রতি-যোগিতাটি সাংবাদিক ও সংবাদপত্র সেবীদের ফুটবল প্রতিযোগিতায় পরিণত হয়েছে। প্রফুল্ল স্মৃতি কাপের খেলার সঙ্গে ফাইনালের পরাজিত দলকে সতীন্দ্র স্মৃতি কাপ প্রদানের বিধান আছে। সতীন্দ্র স্মৃতি কাপ আনন্দ-বাজার পত্রিকার খেলাধুলো বিভাগের কর্মীদের দান। সতীন ছিল তাদেরই সহকর্মী। নিষ্ঠুর নিয়তি অকালে তাদের কাছ থেকে সতীনকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়। তাই খেলাধুলোর মধ্যে সতীনের স্মৃতি জাগরূক রাখায় তাদের এই প্রচেষ্টা।

প্রফুল্ল স্মৃতি কাপ ও সতীন্দ্র কাপ আন্তঃসংবাদপত্র ফুটবল প্রতিযোগিতায় রূপান্তরিত হবার পর প্রথম বছর অমৃত-বাজার পত্রিকা বিজয়ীর সম্মান লাভ করে। দ্বিতীয়বার কাপ লাভ করে আনন্দবাজার পত্রিকা, এবার সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকা বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেছে। এবার ১২টি দল প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেছিল। আনন্দবাজার সংস্থা হতেই যোগ দিয়েছিল তিনটি দল—আনন্দবাজার পত্রিকা, হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড আর দেশ। শেষ পর্যন্ত দৈনিক জনসেবক পত্রিকাকে ৫—২ গোলে হারিয়ে সাপ্তাহিক 'দেশ' বিজয়ী হয়েছে। বলা বাহুল্য, আনন্দবাজার সংস্থার তিনটি দলের মধ্যে 'দেশ'ই ছিল শক্তিশালী; প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী ১২টি দলের মধ্যেও তাদের শক্তির শ্রেষ্ঠত্ব অনস্বীকার্য। সুতরাং দেশের প্রফুল্ল স্মৃতি কাপ লাভ প্রতিযোগিতার সঙ্গতিসূচক ফলাফল।

প্রফুল্ল সরকার স্মৃতি কাপের আলোচনা প্রসঙ্গে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন বলে মনে করেছি। সংবাদপত্রের কর্মী, যারা লেখালেখি নিয়ে ব্যস্ত থাকেন, বা কম্পোজ করেই দিন কাটান কিম্বা হাতে করে কাগজ ছেপে বের করেন, তারা যাতে খোলা মাঠে একটু পায়ের কসরৎ দেখাতে পারেন, খেলার মধ্য দিয়ে অন্যান্য সংবাদপত্র কর্মীদের সঙ্গে একটু মেলামেশার সুযোগ পান, সেই উদ্দেশ্যেই প্রতিযোগিতার সৃষ্টি। স্বর্গত প্রফুল্লকুমারও একদিন বলেছিলেন—সাধারণের ধারণা আছে সংবাদপত্র অফিসের কর্মীদের শুধু হাতই চলে, পা চলে না, কিন্তু খোলা মাঠে তারা যদি একটু পা চালায়, তবে

সাংবাদিক ও সংবাদপত্রসেবীদের ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলার পর বিজয়ী 'দেশ' পত্রিকার অধিনায়ক শৈলেন রায় অনুষ্ঠানের সভাপতি প্রখ্যাত সাংবাদিক শ্রীবিধুভূষণ সেনগুপ্তের কাছ থেকে 'প্রফুল্ল সরকার স্মৃতি কাপ' গ্রহণ করছেন

সাধারণের ধারণাও বদলে যাবে, কর্মীরাও লাভ করবে নির্মল আনন্দ। প্রফুল্ল সরকার স্মৃতি কাপের খেলার প্রবর্তনের এইটাই মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু বিজয়ীর পুরস্কার লাভের উদ্দেশ্যে যদি বাহিরের খেলোয়াড় আমদানী করা হয়, তবে প্রতিযোগিতার আসল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যায়। নিয়ম আছে দৈনিক কাগজ, মাসিক, সাপ্তাহিক বা পাক্ষিক পত্রপত্রিকা এবং সংবাদ ও বিজ্ঞাপন সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের যারা কর্মী, তারাই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের অধিকারী। কিন্তু শুধু প্রফুল্ল স্মৃতি কাপে খেলাবার উদ্দেশ্যে একখানি সনদ দিয়ে রাতারাতি কোন খেলোয়াড়কে যদি সাংবাদিকের মর্যাদা দেওয়া হয় বা মর্যাদা না দিয়েই তাকে দিয়ে খেলোনো হয়, তবে অদূর ভবিষ্যতে প্রতিযোগিতার আকর্ষণ নষ্ট হতে বাধ্য। দুঃখের সঙ্গেই বলতে হচ্ছে এবারকার প্রতিযোগিতায় কয়েকটি দলে এমনসব খেলোয়াড়কে খেলতে দেখা গেছে, যারা সত্যিকারের সংবাদপত্র অফিসের কর্মী নয়। মুখ্যত আন্তঃসংবাদপত্র ফুটবল প্রতিযোগিতায় বাইরের খেলোয়াড়দের এই অবাঞ্ছিত অনুপ্রবেশ বন্ধ না হলে প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্য এবং বৈশিষ্ট্য দুইই নষ্ট হয়ে যাবে।

*   *   *

ফুটবল মাঠে দর্শক ও সমর্থকদের উচ্ছৃঙ্খল আচরণ বিশেষ কোনো নতুন ঘটনা নয়। কিন্তু দর্শকদের উচ্ছৃঙ্খলতা যখন চরমে পৌঁছায়, তখন সেটা উল্লেখের বিষয় হয়ে দাঁড়ায় বৈকি। আন্তঃকলেজ ফুটবল প্রতিযোগিতা—ইলিয়ট শীল্ডের ফাইন্যাল খেলায় এই ধরনের চরম উচ্ছৃঙ্খলতারই পরিচয় পাওয়া গেছে। আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ আর আশুতোষ কলেজ ছিল ইলিয়ট শীল্ড ফাইন্যালে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী। প্রথম দিন ২—২ গোলে খেলাটি অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। দ্বিতীয় দিন আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ একটি গোল করবার পর আরম্ভ হয় ভীষণ গণ্ডগোল। অবশ্য অনেক আগে থেকেই একটা গোলযোগ সৃষ্টি করবার জন্য উচ্ছৃঙ্খল আচরণের রিহার্সেল দেওয়া হচ্ছিল; গোলটি হবার পর রঙ্গমঞ্চে দর্শক ও সমর্থকদের তাণ্ডব নৃত্যের যে দৃশ্য প্রত্যক্ষ করা গেল, তা কলকাতা ময়দানের কলঙ্কমলিন অতীত ঘটনারই পুনরাবৃত্তি।

খেলা হচ্ছিল মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল মাঠে এবং পরস্পর বিরোধী দুটি দলের মত এ খেলাতেও দুটি কলেজের ছাত্র দুদিকে আসন গ্রহণ করেছিল। আশুতোষ কলেজের ছাত্ররা ছিল ইস্টবেঙ্গল গ্যালারীতে আর আর জি করের ছাত্রেরা মোহনবাগান গ্যালারীতে। এখানে বলে রাখি এ দুইটি কলেজের ক্রীড়াক্ষেত্রের সম্পর্ক অনেকটা মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গলেরই মত। গতবার এদের হাড় নিয়ে মারামারির কথা অনেকের স্মৃতি থেকে এখনো মুছে যায়নি। হাড়—অর্থাৎ শরীরতত্ত্ব গবেষণার জন্য ডাক্তারী ছাত্রের অধ্যয়নের উপকরণ মনুষ্য অস্থি। যা দিয়ে 'ডিসেকশন হলে' এবং কলেজের ক্লাসে ছাত্রেরা আবিষ্কার করে মনুষ্য দেহের নানা জটিল সূত্র। সেই হাড় দিয়েই তাজা মানুষের হাড় ভাঙ্গার চেষ্টা হয়েছিল গতবার খেলার মাঠে। তাই এবার ইলিয়ট শীল্ড ফাইন্যালে এ দুটি কলেজের খেলায় রেষারেষি থাকবে এটা খুবই স্বাভাবিক। সূচনা থেকেই দুই গ্যালারীতে চলছিল বিদ্রূপ বাণের হানাহানি। এক পক্ষ গোল গোল বলে চীৎকার করলো তো, অপর পক্ষ দ্বিগুণ চীৎকারে তার বিদ্রূপাত্মক প্রতিধ্বনি করলো। সঙ্গে সঙ্গে নানা অঙ্গভঙ্গি আর কুরুচিপূর্ণ উক্তি। এরা হাত তুলে 'বক' দেখায় তো, ওরা হাত তুলে সাপের ছোবল মারে। ছাত্রদের একী আচরণ! আই এফ এর সভাপতি শ্রী এম এম বসু স্বকন্যা মাঠে উপস্থিত ছিলেন। খেলার শেষে তাঁরই পুরস্কার বিতরণের কথা ছিল। ছাত্রদের এই আচরণে তিনি মনে ব্যথা পেয়ে বিশ্রাম সময়ে মাইকযোগে ছাত্রদের কাছে এক আবেদন করলেন—'তোমরা দেশের ভবিষ্যৎ, তোমাদের এ কী আচরণ! তোমাদের এই বিকৃত অঙ্গভঙ্গির ছবি যদি কাল কোনো সংবাদপত্রে ছাপা হয়, তবে তোমাদের পক্ষে সেটা কী গৌরবের হবে?' দুই কলেজের অধ্যাপক, যারা মাঠে উপস্থিত ছিলেন, তাঁরাও জানালেন আবেদন। ছাত্রেরা সাময়িকভাবে শান্ত হল। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে আবার গোলমালের সূত্রপাত। তারপর যখন সন্দেহজনক পেনাল্টি কিক থেকে আর জি কর মেডিক্যাল গোল করলো তখন আর বাক যুদ্ধ বা অঙ্গভঙ্গি নয়। একেবারে হাতাহাতি সংগ্রাম। ইস্টবেঙ্গল গ্যালারীর দিক থেকে

একদল ইট ছ‍ুড়তে আরম্ভ করলো, অপরদিক থেকে প্রত্যুত্তর পেতে একটুও দেরি হল না। তারপর চললো অনর্গল ধারায় ইষ্টক বর্ষণ। কে কোথায় পালাবে? সবাই একসঙ্গে পালাতে চাইছে। পথ নেই। পুলিস কিছুক্ষণ নির্বাক দর্শকের ভূমিকা অভিনয় করে মৃদু লাঠি চালনা করতেই গোলমাল থেমে গেল। কিন্তু অল্প সময়ের খণ্ডযুদ্ধে যে কজন আঘাত পেলো, তাদের ক্ষতস্থানের রক্তধারা সহজে থামলো না। ওদিকে খেলাটি শেষ হল কোনভাবে। সেই 'সন্দেহজনক' পেনাল্টি গোলটি বহাল থাকায় আর জি কর মেডিক্যাল দলই হল বিজয়ী। কিন্তু পুরস্কার বিতরণের সময় অনুষ্ঠানের সভাপতিকে খ‍ুজে পাওয়া গেল না। তিনি আগেই পালিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছেন। পুরস্কার বিতরণের অনুষ্ঠান রইলো বন্ধ।

এই ঘটনায় দর্শক ও সমর্থক বলতে দুই কলেজের ছাত্রদেরই বোঝায়। ছাত্রদের খেলায় উৎসাহ উদ্দীপনা থাকবে, থাকবে হৈ-হুল্লোড়, গলা ফাটানো চীৎকারে কান ঝালা-পালা হবে, এটা খুবই স্বাভাবিক। কয়েক বছর আগের এক ঘটনা। সেও হয় এই ইলিয়ট শীল্ডেরই খেলা হবে। যাদবপুর কলেজের সঙ্গে এই আর জি কর মেডি-ক্যালেরই (তখন কারমাইকেল মেডিক্যাল) প্রতিদ্বন্দ্বিতা। উৎসাহ উদ্দীপনার অভাব নেই। চীৎকারে দু দলই গলা ফাটাচ্ছে, কিন্তু কুরুচির কোন পরিচয় নেই, সুস্থ এবং প্রকৃত খেলোয়াড়সুলভ পরিবেশ। খেলার কি একটা আইন সম্বন্ধে যাদবপুরের ছেলেরা চীৎকার করে উঠলো, কারমাইকেলের ছেলেরা হেসে বললো ওটা 'স্লাইড রুল।' একবার যাদবপুর কারমাইকেলকে ভীষণ চেপে ধরেছে। গোল হয় হয়। যাদবপুরের ছেলেরা বলছে অক্সিজেন অক্সিজেন, আর রক্ষা নেই। বেশ সরস বাকযুদ্ধ। উপভোগ্যও বটে। কিন্তু এখনকার বাকযুদ্ধে রসিকতা তো থাকেই না, অধিকাংশ মন্তব্যই শালীনতা ছাড়িয়ে যায়। যাই হোক, ইলিয়ট শীল্ড ফাইন্যালে দর্শকদের খণ্ডযুদ্ধের পর একদল পুলিসকে দোষারোপ করলেন, তারা আগে কেন লাঠি চার্জ করেনি। পুলিস বললো, 'ছাত্রদের উপর লাঠি চার্জের পরিণাম কি পাটনার পুলিস হাড়ে হাড়ে বুঝেছে। পুলিসে চাকরি তো করেননি, তা-হলে বুঝতে পারতেন'। একদল এগিয়ে এসে সাংবাদিকদের অনুরোধ করলেন সমস্ত ঘটনা ছেপে এসম্বন্ধে কঠোর মন্তব্য করতে। কিন্তু এক বৃদ্ধ হতাশভাবে বললেন, কাগজে ছেপেই বা কি হবে, ছাত্রদের দোষারোপ করেই বা লাভ কি? বিধানসভায় কি ঘটছে? সেখানে একজন আর একজনকে পাদুকা তুলে দেখাচ্ছে। তার খবরও তো কাগজে বেরোচ্ছে। কিন্তু প্রতিকার কিছু হচ্ছে কি? আমাদের জাতীয় চরিত্রই নষ্ট হয়ে গেছে এবং এজন্য নেতারা কম দায়ী নন।' খেলার মাঠে বৃদ্ধের কথাটি মনের উপর বেশ ছাপ রেখে গেল। সত্যিই কি তাই। ছাত্রদের এই আচরণের জন্য দায়ী কে?

* * *

এই দিনেরই খেলার মাঠের আর একটি ঘটনা। ডালহৌসী মাঠে আই এফ এ শীল্ডের খেলা ছিল জামসেদপুরের সঙ্গে শিবসাগর এমেচার স্পোর্টস ক্লাবের। শিবসাগর ক্লাব এই খেলায় ১—০ গোলে বিজয়ী হয়। খেলার শেষদিকে জামসেদপুর ক্লাব গোলটি শোধ করে দিয়েছিল, রেফারীও দিয়েছিলেন গোলের নির্দেশ। কিন্তু পরে লাইন্সম্যানের পরামর্শে রেফারী তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন। ফলে খেলা শেষে এক উন্মত্ত জনতা লাইন্সম্যানকে তাড়া করে এবং রেফারী এসোসিয়েশনের তাঁবুর উপর হামলা চালায়। অবশ্য পুলিসের হস্তক্ষেপে অল্পে অল্পেই ব্যাপারটি মিটে যায়। খেলার মাঠে দর্শকদের উচ্ছৃঙ্খলতা কোনভাবেই সমর্থন করা যায় না এবং অত্যন্ত কঠোর ভাষাতেই তাদের আচরণ নিন্দনীয়। কিন্তু একথাও স্মরণ রাখতে হবে, মোহন-বাগান ও ডালহৌসী মাঠের দুটি ঘটনার জন্যই রেফারীর ত্রুটিপূর্ণ পরিচালনা অনেকাংশে দায়ী। ইলিয়ট শীল্ড ফাইন্যালে রেফারী যেভাবে আর জি কর দলের পক্ষে পেনাল্টির নির্দেশ দিয়েছেন, মাঠের অধি-কাংশ দর্শক, এমন কি আর জি করের অনেক খেলোয়াড়ও তার যৌক্তিকতা স্বীকার করতে পারেননি। ডালহৌসী মাঠের ঘটনায়ও হয় রেফারী না হয় লাইন্সম্যান ভুল সিদ্ধান্ত করেছিলেন, এবিষয়েও কোন সন্দেহ নেই। সুতরাং যিনি খেলার দোষগুণের বিচারক, তার ভুলচুক দেখলে দর্শকেরা উত্তেজিত হয়ে উঠবে এটা স্বাভাবিক। খেলার মাঠের গণ্ডগোলের প্রায় সমস্ত ঘটনায় রেফারীর সিদ্ধান্ত কার্য-কারণ হয়ে পড়ে। কোনো ক্ষেত্রে রেফারীর দোষ থাকে, কোনো ক্ষেত্রে থাকে না। কিন্তু যিনি বিচারক, তার সমস্ত সিদ্ধান্তই অভ্রান্ত হওয়া উচিত।

১৯শে সেপ্টেম্বর—হিন্দু উত্তরাধিকার বিল সম্পর্কে সংসদ কর্তৃক নিযুক্ত যুক্ত সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট আজ লোকসভা এবং রাজ্যসভায় পেশ করা হয়। এই রিপোর্টে আইনসিদ্ধ উইল না করিয়া মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি কন্যা এবং পুত্রের মধ্যে সমানভাবে বণ্টন করার সুপারিশ করা হইয়াছে।

২০শে সেপ্টেম্বর—ভারত সরকারের পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীমেহেরচাঁদ খান্না আজ দপ্তরের উপদেষ্টা কমিটির বৈঠকে বলেন যে, ১৯৫৫ সালের ১লা মার্চ পর্যন্ত পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের সাহায্য ও পুনর্বাসনের জন্য ৭০ কোটিরও অধিক টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। কলিকাতার নিকটবর্তী জবর দখল কলোনীসমূহ সম্পর্কে সরকারী নীতি বিশ্লেষণ করিয়া শ্রীখান্না বলেন যে, ১৩৩টি জবর দখল কলোনী আইনসিদ্ধ করা হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে এবং তন্মধ্যে ১২টি ইতোমধ্যেই আইনসিদ্ধ করা হইয়াছে।

আজ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় হাওড়া উন্নয়ন বিলটি উত্থাপিত হইলে উহা সদস্যদের সর্বসম্মতিক্রমে উভয় সভার যুক্ত সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরণ করা হয়। এই বিল অনুসারে হাওড়ার উন্নয়নে ২৫ বৎসরব্যাপী ১৮টি পরিকল্পনায় ১২ কোটি টাকা ব্যয়ের এক বরাদ্দ করা হইয়াছে।

২১শে সেপ্টেম্বর—পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় দিল্লীতে পরিকল্পনা কমিশনের সহিত দুই দিনব্যাপী আলোচনার পর আজ কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। কলিকাতায় সাংবাদিকগণকে তিনি জানান যে, ভারতের অনুমোদিত দ্বিতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনা অনুসারে পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নমূলক কার্যে ৩৪৫ কোটি টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া আশা করা যায়। তন্মধ্যে উদ্বাস্তু পুনর্বাসন বাবদ ১১৩ কোটি টাকা বরাদ্দ আছে।

লোকসভায় শ্রমমন্ত্রী শ্রীখান্দুভাই দেশাই আজ শ্রমিক-মালিক বিরোধ সংশোধন বিল পেশ করেন। বিলে শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল রহিত করিয়া উহার স্থানে 'শ্রম আদালত', শিল্প ট্রাইব্যুনাল এবং ন্যাশনাল ট্রাইব্যুনালের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

২২শে সেপ্টেম্বর—উড়িষ্যার বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চল পর্যবেক্ষণের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু আজ বিমানযোগে ভুবনেশ্বরে উপনীত হন।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় আজ এক সাংবাদিক বৈঠকে এই রাজ্যে দ্বিতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনা সম্বন্ধে আলোচনা কালে জানান যে, আগামী পাঁচ বৎসরে পশ্চিমবঙ্গে মোট ৪ লক্ষ ৪৭ হাজার লোক কাজ পাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

২৩শে সেপ্টেম্বর—প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু আজ উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রীসহ বিমানে করিয়া দুই ঘণ্টাকাল উড়িষ্যার বন্যাপ্লাবিত অঞ্চল পরিদর্শন করেন।

আজ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় গৃহীত এক বেসরকারী প্রস্তাবে পশ্চিমবঙ্গ ব্যতীত ভারতের অন্যান্য স্থানে পূর্ববঙ্গ হইতে আগত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে সরকারী কর্মচারী এবং বেসরকারী দায়িত্বশীল সমাজ-কর্মীদের লইয়া একটি কমিটি গঠন করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ দিতে রাজ্য সরকারকে অনুরোধ জানান হয়।

হিমালয়ের ঊর্ধ্বদেশে রূপকুণ্ড হ্রদের তুষারাস্তীর্ণ তীরে তীরে অসংখ্য মানুষের মাথার খুলি, হাড়ের টুকরা ও নরকঙ্কাল পড়িয়া রহিয়াছে। সাত দিনের প্রাণান্তকর চেষ্টায় রয়টারের সংবাদদাতা শ্রীনারায় রূপকুণ্ডে গিয়া স্বচক্ষে এই দৃশ্য দেখিয়া আসিয়াছেন। তিনি বলেন, অকস্মাৎ পাহাড়ের ধস আর বরফের স্তূপ ধসিয়া পড়ার ফলে একদল তীর্থযাত্রীর এই শোচনীয় পরিণাম ঘটিয়াছে। ঘটনাটি সম্ভবত কয়েক শতাব্দী পূর্বের।

কলিকাতার বিভিন্ন হাসপাতাল ও ডিসপেন্সারী হইতে যে ঔষধাদি চুরি যাইতেছে, তৎসম্পর্কে কলিকাতা পুলিসের এনফোর্সমেণ্ট বিভাগ আজ রাত্রে বেলগাছিয়া রোডের এক ঔষধের দোকানে তল্লাসী চালাইয়া বহুল পরিমাণে ঔষধ উদ্ধার করে। এই সম্পর্কে পুলিস ঐ দোকানের মহিলা মালিক এবং ম্যানেজারকে গ্রেপ্তার করে। ঐ মহিলা জনৈক ডাক্তারের স্ত্রী বলিয়া জানা গিয়াছে।

২৪শে সেপ্টেম্বর—ব্যাঙ্ক রোয়েদাদ সম্পর্কে গজেন্দ্র গাদকার কমিশনের সুপারিশসমূহ কার্যকরী করিবার উদ্দেশ্যে ভারত সরকার কর্তৃক উত্থাপিত একটি বিল অদ্য লোকসভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট মার্শাল ভরোসিলভের আমন্ত্রণক্রমে রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের আগামী বৎসর সম্ভবত গ্রীষ্মকালে সোভিয়েট ইউনিয়ন পরিদর্শনের সম্ভাবনা রহিয়াছে।

ভুয়া নথীপত্রের সাহায্যে একদল দুষ্কৃতকারী কর্তৃক হাবড়ার সরকারী উদ্বাস্তু কলোনীতে নির্মিত অনেক পাকা বাড়ি উদ্বাস্তু বলিয়া বর্ণিত লোকদের মধ্যে বে-আইনীভাবে বণ্টন করিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে প্রাপ্ত টাকা আত্মসাৎ করিবার এক গভীর ষড়যন্ত্র সম্পর্কে পুলিস তদন্ত চালাইতেছে। এই সম্পর্কে পুলিস হাবড়া সরকারী কলোনীর ওয়েলফেয়ার অফিসার শ্রীঅশ্বিনীকুমার গাঙ্গুলী ও অপর কয়েক জনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

বিদেশী সংবাদ—

১৯শে সেপ্টেম্বর—পাকিস্থানের অস্থায়ী গবর্নর জেনারেল মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জা আগামী ৬ই অক্টোবর হইতে মিঃ গোলাম মহম্মদের স্থলে পাকিস্থানের গবর্নর জেনারেল নিযুক্ত হইয়াছেন।

আর্জেণ্টিনার পেরন সরকারের পতন হইয়াছে।

২০শে সেপ্টেম্বর—আর্জেণ্টিনার ভূতপূর্ব প্রেসিডেণ্ট জুয়ান পেরন বিমানযোগে বুয়েনস এয়ারস হইতে পলায়ন করিয়াছেন। বিদ্রোহী সৈন্যরা রাজধানীতে পৌঁছিয়াছে।

২১শে সেপ্টেম্বর—আজ পাকিস্থান গণপরিষদে বাংলা ভাষার ব্যবহার সম্পর্কিত প্রশ্নটি বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে এবং ডেপুটি স্পীকার সদস্যদিগকে বাংলায় বক্তৃতা করার অনুমতি না দিলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ ফজলুল হকসহ সদস্যগণ সভাকক্ষ ত্যাগ করিবেন বলিয়া হুমকি দেখান। অতঃপর বাঙ্গালী সদস্যদের বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে ডেপুটি স্পীকার বাংলায় বক্তৃতা করার অনুমতি দেন।

২৩শে সেপ্টেম্বর—করাচীতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, লালকোর্তা নেতা খান আবদুল গফফর খানের বেলুচিস্থান প্রবেশ নিষিদ্ধ করিয়া তাঁহার উপর যে আদেশ জারী করা হইয়াছিল, তাহা অমান্য করার জন্য আগামীকল্য বেলুচিস্থানের মচ জেলে তাঁহার বিচার হইবে।

জেনারেল এডুয়ার্ডো লোনার্ডি আজ আর্জেণ্টিনার অস্থায়ী প্রেসিডেণ্ট পদে বৃত হইয়াছেন। আজ অপরাহ্নে তিনি শপথ গ্রহণ করেন।

২৪শে সেপ্টেম্বর—পেরন সমর্থকদের সহিত প্রচণ্ড রকমের এক সংঘর্ষের সংবাদ পাইয়া আর্জেণ্টিনার প্রেসিডেণ্ট জেনারেল এডুয়ার্ডো লোনার্ডি সমগ্র দেশে কঠোর নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাবলী জারী করিয়াছেন। বুয়েনস আয়ার্স হইতে দুই শতাধিক মাইল দূরবর্তী রোজারিও নামক স্থানে এই সংঘর্ষ ঘটে। সংঘর্ষে সৈন্য বাহিনীর গুলী বর্ষণের ফলে পেরন সমর্থক ৫০জন বিক্ষোভকারী নিহত হয় বলিয়া প্রকাশ।

প্রতি সংখ্যা—১৵ আনা, বার্ষিক—২০৲, ষাণ্মাসিক—১০৲
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা, লিমিটেড, ৬ ও ৮, সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১৩
শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ওনং [illegible] লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস লিমিটেড হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

২২ বর্ষ

৪৯ সংখ্যা

দেশ

শনিবার

২১ আশ্বিন ১৩৬২

DESH

SATURDAY, 8TH OCT. 1955

সম্পাদক—**শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন**

সহকারী সম্পাদক—**শ্রীসাগরময় ঘোষ**

রাজ্য কমিশনের রিপোর্ট

রাজ্য কমিশনের রিপোর্ট অল্পদিনের মধ্যেই প্রকাশিত হইবে। সংসদ কর্তৃক কমিশনের রিপোর্ট বিবেচিত না হওয়া পর্যন্ত হয়ত ভারত সরকার রিপোর্ট সম্বন্ধে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন না এবং এই সম্পর্কে বিভিন্ন রাজ্য সরকারের অভিমতও তাঁহারা গ্রহণ করিবেন। প্রকৃতপক্ষে কমিশনের রিপোর্টটি যাহাতে ধীরভাবে বিবেচিত হয় এজন্য বিভিন্ন রাজ্যে প্রতিনিধিদিগকে সর্ববিধ সুবিধা দেওয়া হইবে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। কিন্তু ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠন সম্পর্কে ইতিমধ্যে জনসাধারণের এক শ্রেণীর মধ্যে অনুচিত রকমের উত্তেজনা এবং আবেগের সৃষ্টি হইয়াছে। দুঃখের বিষয় এই যে, কয়েকটি রাজ্য সরকার সাক্ষাৎ সম্পর্কে এইরূপ আন্দোলনের ইতঃপূর্বে প্রশ্রয় দিয়াছেন। তাঁহাদের সেই কাজের প্রতিক্রিয়া যে একেবারে উপশমিত হইয়াছে, আমাদের ইহা মনে হয় না। ইতিমধ্যেই রাজ্য কমিশনের রিপোর্ট সম্পর্কে কোন কোন রাজ্যের পদস্থ ব্যক্তিদের মন্তব্য আশঙ্কার কারণ সৃষ্টি করিয়াছে। আমাদের মতে বিভিন্ন রাজ্যের শাসন-কেন্দ্রে এইরূপ সাম্প্রদায়িক মনোভাব এমন গুরুত্বপূর্ণ সময়ে বিশেষভাবে মারাত্মক। রিপোর্টটি প্রকাশ পাইবার সঙ্গে সঙ্গে যদি এই প্রবৃত্তি মাথা চাড়া দিয়া উঠে, তবে ভারতের বৃহত্তর স্বার্থের দিক হইতে বিষয়টির সম্বন্ধে সুবিবেচনা করা অসম্ভব হইয়া উঠিবে এবং জনসাধারণের মধ্যে অন্ধ উত্তেজনা দেখা দেওয়াও অসম্ভব নয়। জনসাধারণের দিক হইতে আশঙ্কার তেমন কোন কারণ নাই বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। পশ্চিমবঙ্গের দাবী সম্পর্কিত প্রশ্নটি এমন কিছু গুরুতরও নয়। সে পক্ষে যৌক্তিকতা সুস্পষ্ট। প্রশ্নটি জিদে পরিণত করিলেই কেবল বিভিন্ন রাজ্যের শাসন বিভাগের যাঁহারা পদস্থ ব্যক্তি তাঁহারা অন্ধ আবেগের বশবর্তী না হইয়া যদি জনগণকে রাষ্ট্র হিসাবে সমগ্র ভারতের স্বার্থের সম্বন্ধে এখন হইতে অবহিত করেন, তবে সমস্যার সমাধানের পথ সুগম হইবে। বস্তুত এই শ্রেণীর কোন প্রস্তাব বা সিদ্ধান্তই সর্বজনসম্মত হইতে পারে না। জাতির বৃহত্তর স্বার্থই এক্ষেত্রে নিরিখ হওয়া উচিত। বিভিন্ন রাজ্যের শাসন-বিভাগের এইসব পদস্থ ব্যক্তিরা সকলেই কংগ্রেস-কর্মী। এক হিসাবে তাঁহারা কংগ্রেসের প্রতিনিধিস্বরূপেই কাজ করিতেছেন। কংগ্রেসের বিভিন্নমুখী জনকল্যাণমূলক গঠন প্রচেষ্টার প্রতি বর্তমানে জনসাধারণের দৃষ্টি সমধিক আকৃষ্ট হইয়াছে। এই সুযোগে সমগ্র ভারতের রাষ্ট্রীয় স্বার্থের বুদ্ধিকে সংহত করিয়া তুলিবার দিকেই দেশের কর্মপ্রচেষ্টা যাহাতে একান্তভাবে প্রযুক্ত হয় এবং বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে অনৈক্যের ভাব প্রশমিত হয়, দেশের কল্যাণকামীমাত্রেরই তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

ভারতের উদার স্বরূপ

সম্প্রতি ভারতের প্রধানমন্ত্রী লোকসভায় আসামের পার্বত্য জাতি, বিশেষভাবে নাগাদের সমস্যা সম্বন্ধে একটি বিবৃতি দিয়াছেন। এই বিবৃতিতে তিনি সংক্ষেপে এই সমস্যার সার কথাটি উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে হৃদ্যতার অভাবই এই সমস্যার মূলে রহিয়াছে। তিনি বলেন, ইংরেজেরা এইসব পার্বত্য জাতিকে সমতলবাসীদের সম্পর্ক হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে ক্রমাগত চেষ্টা করিয়াছে। খৃষ্টান মিশনারীরাও সেই কাজে যোগ দিয়াছে। তাহারা ইহাদিগকে ভারতবাসীদের বিরোধী করিয়া তুলিবার জন্য নানাপ্রকারে প্রচারকার্য চালাইয়াছে। এইসব কারণে ভারতের সমতলবাসীদের সঙ্গে ইহাদের সংযোগ সূত্র স্থাপিত হয় নাই এবং ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনেও এইসব পার্বত্য জাতি যোগ দিয়া একাত্মতা উপলব্ধি করে নাই। পণ্ডিতজী প্রকৃত কারণই নির্দেশ করিয়াছেন। ফলত ইংরেজ শাসন এদেশে প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে সর্বভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্র হইতে সীমান্তবর্তী এইসব পার্বত্য জাতিরা বিচ্ছিন্ন ছিল না। শুধু পৌরাণিক যুগে নয়, তৎপরবর্তীকালেও ভারতের সংস্কৃতিমূলক বিভিন্ন আন্দোলনের প্রভাব ইহাদিগের উপরও বিস্তার লাভ করিয়াছে এবং নিজেদের বিশিষ্ট মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ভারতের সমতলবাসীদের সঙ্গে একাত্মতা উপলব্ধি করিবার সুযোগ ইহারা লাভ করিয়াছে। ভারতের ধর্ম-

আন্দোলনের নেতৃগণ ইহাদিগকে উপেক্ষা করেন নাই। নেহরুজী সত্যই বলিয়াছেন, এইসব অঞ্চলে সরকারী কর্মচারীদের মতিগতি ইহাদের সম্বন্ধে হৃদ্যতাপূর্ণ হওয়া প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী। প্রকৃত প্রস্তাবে শিক্ষিতাভিমানী এইসব সরকারী কর্মচারীরা ইহাদিগকে ঠিক আপনার করিয়া লইতে পারেন না। আমলাতন্ত্র-সুলভ সেই আভিজাত্যবোধ স্বাধীনতা লাভ করিবার পরও শাসক সমাজকে প্রভাবিত করিয়া জনচেতনাকে বৃহত্তর রাষ্ট্রভাবনাতে সম্প্রসারিত করিবার পথে আজও বাধা সৃষ্টি করিতেছে। অখণ্ড ভারতের উদার স্বরূপ উপলব্ধির পথে ইহাই প্রধান অন্তরায়।

শিক্ষাব্রতীদের সমস্যা

ইউনিভার্সিটি গ্রাণ্টস কমিশন কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন। এই প্রস্তাব কার্যে পরিণত করিবার ভার ভারত সরকার, রাজ্য সরকার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ ইঁহাদের উপর অর্পিত হইয়াছে। কমিশনের অভিমত এই যে, ভারত সরকারের দিক হইতে বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব কার্যে পরিণত করিবার পক্ষে বিশেষ কোন অন্তরায় উপস্থিত হইবে না। প্রকৃত প্রস্তাবে এই বিষয় সম্পর্কে কর্তব্য সম্পাদনে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায় অনেকখানিই অগ্রাইয়া আছেন। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অতিরিক্ত ব্যয়ের শতকরা ৮০ ভাগ এবং কলেজের শতকরা ৫০ ভাগ ব্যয় ভারত সরকার বহন করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। কিন্তু অবশিষ্ট ব্যয়ের ঝুঁকি বিশ্ববিদ্যালয় এবং রাজ্য সরকারকে লইতে হইবে। ঐ দুই পক্ষের মতামত এখনো জানা যায় নাই। কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষকদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধনের প্রশ্ন দীর্ঘদিন হইতেই অমীমাংসিত রহিয়াছে। এইরূপ অবস্থায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাহারো যথোচিত আগ্রহের অভাবে কমিশনের প্রস্তাব যদি কার্যে পরিণত হইতে বিলম্ব ঘটে, তবে দুঃখের বিষয় হইবে।

টি বি শীল বিক্রয়

গত গান্ধী জয়ন্তী দিবস হইতে ভারতীয় টিউবার কিউলোসিস এসোসিয়েশন কর্তৃক টি বি শীল বা যক্ষ্মা নিরোধ প্রচেষ্টা-প্রতীক বিক্রয়ের অভিযান শুরু হইয়াছে। আগামী ২৬শে জানুয়ারী প্রজাতন্ত্র দিবসে এই বিতরণকালের মেয়াদ শেষ হইবে। যক্ষ্মা নিরোধ প্রচেষ্টার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অধিক কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেই এই ব্যাধির সংক্রমণ যাহাতে নিরুদ্ধ হয় সে সম্বন্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের গুরুত্ব উপলব্ধি করিবেন। পশ্চিমবঙ্গ এ সম্বন্ধে উদাসীন নয়। প্রকৃতপক্ষে এই মারাত্মক ব্যাধি প্রতিরোধের প্রথম উদ্যম বেসরকারীভাবে পশ্চিমবঙ্গ হইতেই প্রথমে আরম্ভ হয় এবং পরে তাহা ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের আকার ধারণ করে। প্রায় চার মাসকাল টি বি শীল বিক্রয়ের অভিযান পরিকল্পিত হয়। এই সময়ের মধ্যে দুর্গাপূজা, দেওয়ালী, বড়দিন প্রভৃতি প্রধান প্রধান উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। লক্ষ লক্ষ যক্ষ্মারোগী এই সকল উৎসবে যোগ দিতে পারে না। এইসব হতভাগ্য ভ্রাতা ও ভগিনীগণের কথা স্মরণ করিয়া টি বি শীল ক্রয় করিয়া এবং বিক্রয় কার্যে সাহায্য করিবার জন্য সকলেরই আগাইয়া আসা উচিত। মানুষ হিসাবে আমাদের প্রত্যেকের এ সম্বন্ধে কর্তব্য রহিয়াছে। আমরা যেন সে কর্তব্য বিস্মৃত না হই। আসুন, আমাদের যথাসাধ্য আর্ত নরনারীদের সেবাকার্যে অর্থসাহায্য করিয়া আমরা অর্জিত অর্থের সার্থকতা বিধান করি।

বর্বরতার পরিচয়

গোয়ার পর্তুগীজ শাসকদের প্রকৃতিগত বর্বরতার স্বরূপের পরাকাষ্ঠা পরিচয় বিশ্ববাসীদের দৃষ্টিতে নানাভাবে উন্মুক্ত হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে তাঁহারা যে কোনরূপে লজ্জিত, এরূপ অন্য লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। সম্প্রতি সংবাদ আসিয়াছে, গোয়ার পর্তুগীজ সরকার স্কুলপাঠ্য সমস্ত পুস্তক হইতে মহাত্মা গান্ধীর ছবি এবং ভারতের জাতীয় পতাকার চিত্রাদি ছিঁড়িয়া ফেলা ও ভস্মীভূত করিবার আদেশ জারী করিয়াছেন। পর্তুগীজ সরকারের কর্মচারিগণ সফরে বাহির হইয়া বিভিন্ন স্কুলে গিয়া সরকারী আদেশ কার্যে পরিণত হইতে তৎপর হইয়াছেন। এতদ্দ্বারা পর্তুগীজ কর্তারা ভারতের উপকূলে জলদস্যুতার ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে চাহিতেছেন, বুঝা যায়; কিন্তু তাঁহাদের কার্যের প্রতিক্রিয়া তাঁহাদের উপরই গিয়া পড়িবে, ইহা নিশ্চিত। কয়েকখানা পুঁথি হইতে মহাত্মা গান্ধীর ছবি ছিঁড়িয়া ফেলিলেই গান্ধীজীর মহিমা ক্ষুণ্ণ হইবে না কিংবা ভারতের জাতীয় পতাকা চিত্রাদি অপসারিত করিলেই ভারতের রাষ্ট্রীয় মর্যাদার হানি ঘটিবে না, পরন্তু পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষের কাজের ফলই বিপরীতভাবে তথাকার জনসাধারণের মনে বিক্ষোভের সৃষ্টি করিবে। এইসব অত্যাচারে গোয়াবাসীদের স্বাধীনতা-স্পৃহা উত্তরোত্তর প্রবল আকার ধারণ করিবে। পর্তুগীজ কর্তাদের পশুশক্তি প্রবল সেই জনমতের কাছে পর্যুদস্ত হইতে বাধ্য হইবে, ইহা নিশ্চিত। পশুপ্রবৃত্তির অন্ধতা পর্তুগীজদিগকে আত্মঘাতের দিকেই লইয়া চলিয়াছে।

সর্বরূপময়ী দেবী

সর্বদেবীময়ং জগৎ।

৬ সুতারকিন স্ট্রিট কলিকাতা-১৩

মহালয়ার পূর্বেই প্রকাশিত হবে

প্রাচীন এক কাব্যে এই রকম উল্লেখ আছে যে, যদি তুমি কবি, গায়ক, নৃত্যপটু নট-নটী অথবা সুরসিকজন হও তবে তোমার গুণপনা প্রদর্শনার্থে রাজসমাগমে আসবে তখন যখন প্রকৃতি নববেশে, নবযৌবনে, নবরূপে বিহ্বল ও মদির হয়ে থাকবে। প্রকৃতির এই বিহ্বলতা, সে-যুগে মনে করা হত একমাত্র বসন্তকালেই সুপরিস্ফুট হয়। প্রাচীনেরা তাই এই ঋতুর নামকরণ করেছিলেন মধুঋতু।

সে-কালের সেই বসন্তঋতু কেমন ছিল আমরা স্বপ্নেও তার স্বাদ বুঝি আজ আর পাবো না। উত্তর আর্যাবর্তের কবির চোখে হয়ত বসন্তই ছিল বিহ্বলতম ঋতু। বাংলা দেশের আর্দ্র শ্যামল ভূখণ্ডে সে-বসন্তের আবির্ভাবে কতটুকু রঙ ফুটত আকাশ আর তরুলতায় তিনি হয়ত তা প্রত্যক্ষ করেন নি। সে-কাল অবশ্য নেই, কিন্তু এ-কালের মানুষ হয়েও আমরা যেন অনুভব করতে পারি বসন্ত কোনো কালেই বাংলায় খুব অভ্যর্থিত ঋতু ছিল না। আমরা সম্ভবত তেমন সমাদর করেছি একমাত্র শরৎ ঋতুকে। বাঙালীর মনের সাড়া আছে এই ঋতুতে। লাবণ্যে, সুষমায়, স্নিগ্ধতায়, প্রকৃতির পূর্ণতায় শরৎ বাঙালীর, বাঙালী শরৎঋতুর। আমাদের মনে, কর্মে, স্বপ্নে—পুজোয় পার্বণে, উৎসব আর অনুষ্ঠানে এই ঋতু মুখর এবং মধুর।

রাজসমাগমে যাওয়ার যুগ এটা নয়, আনন্দ এবং রস পরিবেশনের মধুকুঞ্জ এখন পথে পথে, ঘরে ঘরে, মানুষের মনে মনে। মুখর মধুর শরতে গ্রামের মণ্ডপে খড়ের কাঠামোয় দশভুজার মূর্তি গড়ছে কত শিল্পী, আগমনী-গানের সুর চড়িয়েছে কত না বাউল। আর এই উৎসবে তাঁদের অর্ঘ্যও আজ সুসজ্জিত হয়েছে যাঁরা শিল্পী কথার আর রেখার।

বিচিত্র রূপ, রঙ, গন্ধে সাজানো, সুশোভিত সুনির্বাচিত এমনই একটি আনন্দ আয়োজন **'শারদীয়া দেশ'**। দেশের সাহিত্য-সংস্কৃতি অনুরাগীদের প্রত্যাশিত রসাস্বাদ পরিবেশনে কোথাও যে-পত্রিকা কার্পণ্য করে নি।

রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত পত্র : এই সংখ্যার বিশিষ্ট সম্পদ। অন্যতম আকর্ষণীয় অন্যান্য প্রবন্ধের মধ্যে রয়েছে **ক্ষিতিমোহন সেনের** নতুন ধরনের প্রবন্ধ 'বিচিত্র রূপিণী'; **ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের** চিন্তাশ্রয়ী রচনা 'কবির নির্দেশ'; আন্দামান ও তার অধিবাসী ওংগে জাতির সম্পর্কে লেখা ডক্টর **নবেন্দু দত্ত মজুমদারের** সচিত্র প্রবন্ধ। বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর এখন বিস্মৃতপ্রায়, তাঁর কবিতা প্রসঙ্গে সুন্দর একটি প্রবন্ধ রচনা করেছেন অধ্যাপক **ভবতোষ দত্ত**। ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীর সম্পর্কে জানবার মতন বহু তথ্য রয়েছে—**চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের** লেখায়। আরও যাঁরা লিখেছেন তাঁদের কয়েকজনের নাম **ধরণী সেন, সুধা বসু, রমেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, সুধীর বন্দ্যোপাধ্যায়।** রম্য রচনার অন্যতম আকর্ষণ **প্রবোধকুমার সান্যালের** 'আশ্রম সবরমতী', **মনোজ বসুর** 'নোঙর' ও **বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের** রচনা 'বিবাহ'।

বাংলার প্রবীণতম লেখক ও শ্রেষ্ঠ হাস্য-ব্যঙ্গ গল্পের রচনাকার **পরশুরামের** এবারের অনবদ্য রচনা 'দ্বান্দ্বিক কবিতা'। জনপ্রিয়, শক্তিমান ঔপন্যাসিক **তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়** অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলার পটভূমিকায় একটি উপন্যাস রচনা করেছেন, নাম 'রাধা'—শারদীয়া দেশের বিশিষ্ট আকর্ষণ এই উপন্যাস। **দিলীপকুমার রায়ের** সুদীর্ঘ কাহিনী 'গল্প না গল্পের মুখোশ?' এ ছাড়া প্রবীণদের মধ্যে গল্প লিখেছেন : **অন্নদাশংকর, সরলাবালা সরকার, প্রমথনাথ বিশী, শৈলজানন্দ, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়** ও অন্যান্যেরা। সাম্প্রতিক কালের শক্তিমান গল্পকারদের মধ্যে রয়েছেন : **সুবোধ ঘোষ, সতীনাথ ভাদুড়ী, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সন্তোষকুমার ঘোষ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, রঞ্জন, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, সমরেশ বসু, রমাপদ চৌধুরী, সুশীল রায়, প্রভাত দেব সরকার, বিমল কর** প্রভৃতি।

জীবনানন্দ দাশের কবিতা ছাড়াও এই সংখ্যায় অগ্রজ কবিকুলের মধ্যে রয়েছেন, **প্রেমেন্দ্র মিত্র, অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে, অজিত দত্ত, সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়।** কনিষ্ঠ কবিদের মধ্যে **হরপ্রসাদ মিত্র, দিনেশ দাস, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, জগন্নাথ চক্রবর্তী, মণীন্দ্র রায়, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, অরুণকুমার সরকার, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত** এবং অন্যান্য কয়েকজন।

স্যার আশুতোষ সংগৃহীত প্রাচীন বাংলার পট 'শ্রীশ্রীদুর্গা' ছাড়াও এই সংখ্যায় আরো দুটি রঙীন চিত্র আছে। একটি **আচার্য নন্দলালের** অপরটি **রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর।** এ ছাড়া আছে—**রামকিংকর, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়** ও **আচার্য নন্দলালের** বহু স্কেচ।

গত বছরের তুলনায় এবারের **শারদীয়া দেশ** পৃষ্ঠাসংখ্যায় ও আকারে বর্ধিত হয়েই প্রকাশিত হচ্ছে কিন্তু মূল্য বৃদ্ধি হয়নি। প্রতি সংখ্যা **আড়াই টাকা**, রেজেস্ট্রী ডাকে **দুটাকা পনেরো আনা**। ভি পি-তে পত্রিকা পাঠানো সম্ভব নয়। ৬ **সুতারকিন স্ট্রীট**, কলিকাতা ১৩।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী
শ্রীজওয়াহরলাল নেহরুর
মূল্যবান ভূমিকা সম্বলিত

দেবতাত্মা হিমালয়

প্রবোধকুমার সান্যালের
অনন্যসাধারণ সাহিত্য-কীর্তি
দেবতাত্মা হিমালয়

'......ওদের ওই জঠরে, কোটরে, গহবরে, গুহায়, ছায়ায়, মায়ায়, আমার আবহমান-কালের প্রাণসত্তা আছে লুকিয়ে। তাই আমার মন বার বার কেঁদে ওঠে ওই গুল্মলতাসমাকীর্ণ পাথর-জটলার মধ্যে আমার অজর অমর আত্মাকে আবিষ্কার করে। কেঁদে বেড়ায় আমার মন ঝরণার ধারায়, প্রাচীন পাইনের ছায়ায়, ভয়-ভীষণ প্রস্তর স্তূপে আর গিরিমেখলার আশে-পাশে।—প্রতি কীটে, পতঙ্গে, সরীসৃপে, প্রতি উপলের অনু-পরমাণুতে, প্রতি ঝরণার শিকরণিকায়, আমি উপলব্ধি করি আপন অস্তিত্বকে।........................"

॥ প্রগাঢ় উপলব্ধির রসঘন উপচারে হিমালয় বন্দনা ॥

আগামী সপ্তাহে প্রকাশিত হবে

অজস্র চিত্রমণ্ডিত
রেক্সিন্ বাঁধাই ॥ চাররঙা প্রচ্ছদ
॥ দাম সাড়ে ছ' টাকা ॥

বেঙ্গল পাবলিশার্স ॥ কলিকাতা ১২

আলোচনা

"বেলুড় মঠ স্থাপনের পর"

সবিনয় নিবেদন,

গত কিছুদিন যাবৎ সুবিখ্যাত "দেশ" পত্রিকায় সুলেখিকা শ্রদ্ধেয়া শ্রীসরলাবালা সরকার মহাশয়া সংকলিত চিরস্মরণীয় ও পূজনীয় স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের বিভিন্ন মূল্যবান তথ্যাবলী ও সুমহান কার্যাবলী সহজ ও সরল ভাষায় লিখিত বিষয়সমূহ পাঠ করিয়া আসিতেছি। আমাদের মত মধ্যম শিক্ষিত বাংগালী পাঠকদের জ্ঞানার্জন ও স্বামীজীর জীবনের নানা অমূল্য ঘটনার সহিত পরিচিত হইবার অপূর্ব সুযোগ দানকরত শ্রীসরলাবালা সরকার মহাশয়া আমাদের অন্তরের ভক্তি অর্ঘ্য কুড়াইতেছেন।

গত শনিবার ৩১শে ভাদ্র, ২২ বর্ষ, "দেশ" এর ৪৬ সংখ্যায় "বেলুড় মঠ স্থাপনের পর" শীর্ষক প্রবন্ধটিও তদ্রূপ মূল্যবান তথ্যাবলীতে পরিপূর্ণ। এই প্রবন্ধটি সম্বন্ধে একটি বিষয় আমার জিজ্ঞাস্য আছে। "১৮৯৮ সালে ১২ই নভেম্বর শ্রীশ্রীমাতা সারদা দেবী মঠ স্থাপনের জন্য ক্রীত পবিত্র ভূমিতে শুভ পদার্পণ করেন এবং জননী ঠাকুরের যে ছবিটি নিত্য পূজা করিতেন, তাহাও সংগে লইয়া গিয়াছিলেন।" কিন্তু নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়ি হইতে যে ছবিখানি পূজার জন্য আনান হইয়াছিল, সেই ছবিখানি কিসের, তাহা লেখিকা উল্লেখ করেন নাই। আমি মুসলমান। ও সম্বন্ধে আমার কোন অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান না থাকিবারই কথা। তবু প্রাতঃস্মরণীয় বা স্মরণীয়া মনীষী বা মনীষীদের মূল্যবান জীবনী সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন করিবার কৌতূহল জাগ্রত হওয়াও বিচিত্র নয়। কোন কোন হিন্দু বন্ধুর কাছে জিজ্ঞাসা করিয়াও ইহার সঠিক উত্তর পাইলাম না এবং সেই কারণেই শ্রদ্ধেয়া লেখিকা মহোদয়ার শরণাপন্ন হইতেছি। আদাব আরজ। বিনীত—আল-আজাদ হাবিবুর রহমান, উদনা, হুগলী।

লেখিকার বক্তব্য

নীলাম্বরবাবুর বাগান বাড়িতে যে ছবিটি ছিল, সেটি বরানগর মঠ হইতে বরাবরই শ্রীশ্রীঠাকুরের ত্যাগী সন্তানগণ পূজা করিয়া আসিতেছিলেন এবং সেখানি এখন বেলুড়মঠে ঠাকুরের ঘরে আছে।

অপরখানি শ্রীশ্রীমার নিত্যপূজার ছবি। মা যখন যেখানে যাইতেন সেখানি তাঁহার সঙ্গেই থাকিত। এখন সেখানি উদ্বোধন অফিস ১নং মুখার্জি লেনে "মায়ের বাড়ীতে" আছে ও তাহার নিত্যপূজা হয়।

আরও চারখানি ছবি স্বামীজী যাহা তুলিয়াছিলেন তাহার একখানি [illegible] আছে ও অপর তিনখানি তিনজন [illegible] ভক্তের বাড়ীতে আছে। ইতি—সরলা[illegible] সরকার।

ইতিহাস ও ৬ই আগস্ট

সবিনয় নিবেদন,—গত ১৭ই [illegible] 'দেশ' পত্রিকায় বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় [illegible] 'ইতিহাস ও ৬ই আগস্ট' (দেশ, ২৩শে শ্রা[illegible] প্রবন্ধের সমালোচনায় শান্তিদাশঙ্কর দাশগু[illegible] 'আণবিক বোমা' কথাটিতে ঘোরতর আপ[illegible] করেছেন। Atom Bomb-এর বা[illegible] আণবিক বোমা হওয়াতে সাহিত্যের [illegible] সাধারণের বুঝতে পারার দিকে কিছু ক্ষ[illegible] হয়েছে বলে মনে হয় না। কেন, একটি উদা[illegible] দিয়ে বলি, সমালোচকের ব্যবহৃত 'আক্ষরি[illegible] অনুবাদ' কথাটির দ্বারা আমরা 'অবিকল' [illegible] শব্দগত অনুবাদই বুঝব যদিও 'আক্ষরি[illegible] অনুবাদ' বলতে প্রকৃত যা বুঝায় তা অসম্ভ[illegible] Atom Bomb-এর বাংলা A. [illegible] Dev-এর Anglo Bengali Dictionar[illegible] তেও আণবিক বোমাই আছে, তার বোধহ[illegible] কারণ হচ্ছে এটি বহুল প্রচারিত ও প্রচলিত।

আবার Molecule ও Atom দু[illegible] বিশেষ অর্থ প্রকাশক বৈজ্ঞানিক শব্দ [illegible] আমাদের জানা আছে এবং বস্তু পরিমা[illegible] দুটোর মধ্যে পার্থক্য নাও থাকতে পারে, [illegible] সকল মৌলিক পদার্থের Molecule mon[illegible] atomic তাদের অণু ও পরমাণু একই। সুতরাং সমালোচক 'পরমাণুর বস্তুকণা' [illegible] 'কণাশক্তি' দ্বারা যা ব্যক্ত করতে চেয়েছেন [illegible] আরও অনির্দিষ্ট।

গত ৪৭ সংখ্যা দেশে এই প্রবন্ধে[illegible] সমালোচনায় বলেছেন বিন্দুমাধব ঘোষ [illegible] লোহার elasticity সব চাইতে বেশী, কিন্তু তা ঠিক নয়। লোহার চাইতে কাঁচের এ[illegible] গুণটি আরও বেশী।

নিবেদনান্তে জিজ্ঞাস্য, পরমাণুর বিশেষ[illegible] শান্তিদাশঙ্কর দাশগুপ্ত করেছে[illegible] 'পারমাণুবিক', গত ৪৭ সংখ্যা দেশে এর সমালোচক করেছেন, 'পরমাণবিক', রাজশেখ[illegible] বসু 'বিজ্ঞানের বিভীষিকা'য় করেছে[illegible] 'পারমাণবিক', বাংলা রসায়ন বইয়ে আ[illegible] 'পারমাণবিক', এইগুলির মধ্যে কোন[illegible] 'এগ্রিয়েবল?'

নমস্কার, ইতি—শ্রীগোলোকবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় ঝরিয়া (মানভূম)

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

২৪।৭।৫৫

শুমপীটার-এর 'History of Economic Analysis' গত বছরে পড়েছি। আবার পড়ছি। ভীষণ মোটা, অত্যন্ত দামী—তিন মাস লেগেছিল পড়তে। গ্রীষ্মের ছুটির পর নানা রিভিউ পড়লাম। আমার মনে যে দানা বেঁধেছে, তা নিয়ে মালা গাঁথা যায় না। তবু বলা চলেঃ (১) সম্পাদনার কৃতিত্ব অতুলনীয়। ভদ্রলোকের স্ত্রীভাগ্য ভালো। এই উপায়েই কি এপিক তৈরী হতো?

(২) সবচেয়ে ভালো লাগল তৃতীয় খণ্ড (১৭৯০—১৮৭০)......ক্ল্যাসিকাল পীরিয়ড এবং চতুর্থ খণ্ড (১৮৭০—১৯১৪)—ইকনমিক্স যে যুগে স্বাধীন হলো।

(৩) প্রতি যুগের ইকনমিক্সের ইনটেলেক্চুয়েল কনটেক্সট-এর বিবরণ অপূর্ব। স্টার্ক-এর দুখানি বইতে খানিকটা পেয়েছিলাম, কিন্তু এমন বিশদ-ভাবে নয়। শুম্পীটার উপদেশ দিতেন সকলকে ইকনমিক্সের বিশেষ ক্ষেত্রে আবদ্ধ থাকতে, আর নিজে উল্টো কাজ করলেন। এইটাই তাঁর মাহাত্ম্য। অর্থ-নৈতিক ও মানসিক ইতিহাস বাদ দিয়ে ইকনমিক ধারণা বা চিন্তাগুলি বোঝা যায় না। কেবল তাই নয় তার বিশ্লেষণ পদ্ধতিও হৃদয়ঙ্গম করা যায় না।

(৪) জেভনস্, ওয়লরাস, প্যারেটো, বম-বোয়র্ক সম্বন্ধে আলোচনা চমৎকার; একটু ভক্তিরস বেশী বটে, তবু...।

Ten Great Economists—এই আভাস ছিল।

সন্দেহ উঠল গোটাকয়েক বিষয়ে। (১) কে এই মোটা বই অত দাম দিয়ে কিনে পড়বে? গোটাকয়েক অধ্যায়ের জন্য তাঁরই আগেকার Economic Doctrines and Method (ইংরেজী অনুবাদ) বেশী উপকারী। এ যেন একটা বিরাট জঙ্গল। (২) প্লেটো, আডাম স্মিথ ও রিকার্ডোর প্রতি অবিচার হয়েছে আমার বিশ্বাস। (৩) শেষাংশ অসম্পূর্ণ, খাপছাড়া। তিনি নিজে সংশোধন করতে পারেন নি। (৪) আমি প্রত্যাশা করেছিলাম, 'টুল্স্ অফ্ অ্যানালিসিস'-এ ক্রমবিকাশ দেখতে পাব। তৃতীয় খণ্ডের মার্জিনাল অ্যানালিসিস্ ছেড়ে দিলে, চতুর্থ খণ্ডের ইকুইলিব্রিয়ম বর্ণনাতেই যেন সব কিছু ভরা রয়েছে। শুম্পীটার চাইতেন, একনমিক্স্ পদার্থবিদ্যার মতন শুদ্ধ ও সাধারণ বিজ্ঞানে পরিণত হোক। তাই তাঁর মতে ওয়লরাস হলেন সবচেয়ে বড় অর্থ-নীতিজ্ঞ। ঐ হিসেবে সত্য, কিন্তু অন্য হিসেবেও আছে নিশ্চয়। এতদিন কি

পৃথিবীর অর্থনীতি ওয়লরাসের জন্য অপেক্ষা করেছিল? সেই প্রকৃতি-বিজ্ঞান আর সমাজ-বিজ্ঞানের পার্থক্যের কথা আবার ওঠে। আমার মতে, যতদূর পারা যায় ততদূর পর্যন্ত পদার্থ-বিজ্ঞানের যুক্তিপদ্ধতি চলুক; তারপর যাদের বাদ দেওয়া হচ্ছে, তাদের গ্রহণ করতেই হবে কর্মক্ষেত্রে। তবে জীবন স্বল্প, আর্ট দীর্ঘ, আর বিজ্ঞানগুলোও জটিল। মানুষ কোথায়? মানুষ ধরলে অনিশ্চিত, vauge অথচ বাস্তব; মানুষ বাদ দিলে নিশ্চিত, বিশুদ্ধ অথচ অবাস্তব। অবশ্য একটা না একটা ক্ষণে নির্বাচন করতেই হবে। ভারতীয় ছাত্রদের পক্ষে এই বইখানির সার্থকতা মানসিক ইতিহাস প্রস্তুতির দিক থেকে, অবশ্য যদি তারা পড়ে কিংবা পড়তে পায়। আমার কাছে বইখানি মহামূল্যবান। ঘুরে ফিরে এখানে আসতেই হবে আমাকে। আসব নিশ্চয়, কিন্তু শুম্‌পীটার যাকে 'হিস্ট্রি' বলেন, অর্থাৎ the steady march towards the divine event of Walrasian analysis; তার প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাস না নিয়ে। শুম্‌পীটার ছিলেন মস্ত ইকনমিস্ট, দিগ্‌গজ পণ্ডিত, সর্বপ্রকার বিদ্যায় বিশারদ। কিন্তু তাঁর ইতিহাস সম্বন্ধে ধারণায় আমি সায় দিই না।

মানুষ এতদিনে দুটো বিদ্যা অর্জন করেছে—গণিত আর ইতিহাস; এবং সেই দুটোর সমন্বয়ের প্রয়াসের নাম 'ফিলজফি'। আমাদের দর্শন কিংবা মিস্টিসিজম্‌ ঐ দুটোর অতিরিক্ত, কেননা তার কালপ্রত্যয় নেই, বুদ্ধি-প্রত্যয়ও নেই। অতএব শুম্‌পীটারের *দোষ নেই। দোষ কারো নয় গো শ্যামা...। এই কি পূর্ব-পশ্চিমের তফাৎ? জানি না। কুমারস্বামী বলেছেন, সেদিন পর্যন্ত একটা সাধারণ গূঢ়তত্ত্বের ঐতিহ্যে মিল ছিল। মিলের চেয়ে গরমিলই চোখে পড়ে আজকাল।* গ্রীক-রোমান-জুডাইক ভাব-পরম্পরার ওপর যান্ত্রিক ও বৈজ্ঞানিক সভ্যতার প্রভাব, আর আমাদের হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলমান- পরম্পরার ওপর ঐ নতুন সভ্যতার প্রভাব—দুয়ের মধ্যে পার্থক্য থাকবেই। পার্থক্যে ভয়-কিসের? ইম্পিরিয়ালিজম্‌ ত' মেতে বসেছে। আপাতত 'কো-এক্সিস্টেন্স' তো হে... পরে দেখা যাবে। ভারতবর্ষের ব... সমালোচনামূলক, অপক্ষপাত নিউ... নয়। ভারতবর্ষ হচ্ছে নির্জ্জান ম... ডিম-পাড়া মাছি।

কী আশ্চর্য! পড়ছি অর্থশা... আর ভাবছি মানুষের কথা! ইকনা... হওয়া ধাতে বসল না। ওধারে হাই... জেন বোমা, আর হাতে শুম্‌পীটার কি... ইকনমিক জার্নাল! ভারতীয় বি... বিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক মহা... কি চমৎকার মূল্য-জ্ঞান! কত হাস্য... মূঢ়তা!

২৫।৭।৫৫

অসহ্য গরম ও গুমোট। পূর্বে... বন্যা, আর পশ্চিমাংশে অনাবৃ... এদেশে মার্ক্সিস্ট ব্যাখ্যা অচল। এ... ভৌগোলিক ব্যাখ্যাই উপযুক্ত। ম... ওপর আবহাওয়ার এতটা প্রভাব, প্র... নয় প্রতাপ, জানতাম না। এটা... প্রোজেক্টের মায়ার সাহেব একবার ব... ছিলেন, 'এদেশে কোনো কিছুই স... হবে না, যতদিন পর্যন্ত না প্রতি গ্র... ঠাণ্ডা-ঘরের বন্দোবস্ত হয়; গ... চব্বতারায় চলবে না। মানুষের উ... শুকিয়ে যায় তাপের চোটে।"

আবহাওয়া থেকে পরিত্রাণ পা... জন্য পড়ি। ক্যাসিরারের 'ফিলজফি অ... সিম্বলিক ফর্মস্‌'-এর দ্বিতীয় খণ্ড... মিথিকাল থিঙ্কিং আরম্ভ করেছি। মি... ও ধর্মের কালপ্রত্যয় নিউটনীয় নয়—ও... মধ্যে পরম্পরা নেই, অর্থাৎ সীকোয়ে... এর বিপরীত। একত্রে সব ঘটছে, এ... 'স্পেস'-এর সঙ্গে একত্রে। আইনস্টাই... মন এই হিসেবে মিথিকাল, ধর্মীয়, প্র... আদিম। পারম্পর্য নেই, অথচ গভীর ও মাত্রা আছে। হিন্দু দার্শনিকদে... কাছে কাল চক্রবৎ, অথবা ক্ষণিক ইত্যাদি ধর্মবিশ্বাসের বেলায় পারম্পরিক, যথ... ব্রহ্মার মুহূর্তে সৃষ্টি, স্থিতি লয়। কালের শ্রেষ্ঠ 'সিম্বল' মহাকাল। সেইজন্য পশ্চিমী ইতিহাসের ধারাবাহিকতা এদেশে ইতিহাসের প্রাণবস্তু নয়। যুগান্তর, যুগাবতার, যুগধর্ম হলো আমাদের সমাজের ম্যাক্রো-ডাইনামিক্‌স্‌ — আর মাইক্রো হলো অতিকথা, উপাখ্যান, রূপ-

কথা—যেগুলি প্রতি মানুষের ব্যবহারকে আদর্শ নমুনার ছকে টেনে আনে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, আমাদের ইতিহাসের মালমশলা ভিন্ন। আমি বলি, আমাদের ইতিহাসের কাল-প্রত্যয়ই ভিন্ন। অন্তত এতদিন তাই ছিল। বোধ হয় গ্রামের ইতিহাসে এখনও খানিকটা তাই পাওয়া যায়। সেখানেও বদ্‌লাচ্ছে যন্ত্র ও শহরের আশীর্বাদে। পরিবর্তন সহজ হচ্ছে না। সর্বত্রই তাই বাধ-বাধ ঠেকছে।

নতুন বাঙালী কবি যখন ইতিহাসের পর্যায় সম্বন্ধে কবিতা লেখেন তখন ঠিক রসসিদ্ধ হতে পারেন না কি এই আন্তরিক বিরোধের জন্য? মিথিকাল, ধর্মের যুগ হলো মাইথোপিইক,—কবিতার পক্ষে উপযোগী, আমাদেরও অভ্যাস-সুলভ। নতুন যুগ হলো নিউটনীয়, অনুক্রমিক, স্বতন্ত্র। অতএব কবিতার পক্ষে ততটা উপযোগী নয়, বিশেষত আমাদের মনে ধরে যে-কবিতা সে-কবিতার পক্ষে ততটা নয়। অবশ্য পরিবর্তনের পরে সবই অভ্যাস হয়ে যাবে। এখনও হয়নি, যোগাড় চলছে।

অর্থনীতিক পরিকল্পনার কাল-প্রত্যয় ক্ষণিক-বাদ নয়। তার অ্যাপ্রোচ যেকালে সমষ্টি-বাচক, তখন তার ইউনিট হবে প্রোডাকসন ফেজিং ও তার গতির হার নির্ধারিত হবে যন্ত্রপাতি ও মানুষের কার্য-সম্পাদিকা শক্তি এবং জিনিসপত্রের অবারিত গতি ও কাজে লাগানো—এই দুটির সমন্বয়ের ওপর। সমন্বয়কে বলা যেতে পারে ব্যবস্থাপনের আকার বা দিক্। কিন্তু তার অন্তরের প্রত্যয় ঐ অনুক্রম, পারম্পর্য। অর্থাৎ ভিন্ন কাজের গ্রুপ-এর ভিন্ন সময়; এবং সেই গ্রুপ-টাইমিং অনুসারে অংশ বিশেষকে চলতে হবে। কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার অথরিটির কাল ঐ ভিন্ন ভিন্ন গ্রুপ-টাইমিংএর সামঞ্জস্যে। তারও বাইরে আর একটি কাল আছে—সেটি জাতীয় প্রয়োজনের। অর্থনীতিবিদ্‌রা একে র‍্যান্ডম কারণ বা প্রয়োজন বলে অবহেলা করেন। জাতীয় প্রয়োজনের সময়কে আবার আন্তর্জাতিক অবস্থা (এখানে ব্যালেন্স অফ পেমেন্টস্ ইত্যাদির কথা ওঠে) ও জগতের ঐতিহাসিক গতির কাল-প্রত্যয়ের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে না পারলে মাত্র নতুন ব্লক তৈরী হবে। ব্লক-এর মানে হচ্ছে ইতিহাস থেকে কোন কারণে ভ্রষ্ট হওয়া। প্ল্যানিংএর মধ্যে অনেকগুলি কাল-প্রত্যয় লুকিয়ে থাকে। পৃথিবীর ইতিহাস সেগুলিকে বাইরে টেনে আনে; চিন্তাশীল ব্যক্তিরা তাদের যোগাযোগ ঘটান—অন্তত চেষ্টা করেন। আমাদের ইতিহাসে পণ্ডিত নেহরু শেষ দুটি কাল-প্রত্যয়ে সিদ্ধ। প্ল্যান-ফ্রেমে প্রথম দুটির সন্ধান পেয়েছি।

প্ল্যানিংএর সাইকলজি গেস্‌টল্ট সাইকলজি। কালেরও একটা গেস্‌টল্ট আছে। ক্ষেত্র, উদ্দেশ্য, জীবনের মাত্রা, প্রত্যাশা, উদ্দেশ্য সন্ধান ইত্যাদি প্রত্যয়ের সাহায্যে সোশ্যাল টাইমএর প্রকৃতি ও কাজ বোঝা সহজ। অর্থাৎ কর্ট লিউইন, প্যাভ্‌লভের দৌড় অতদূর নয়। তাঁদের রাস্তাই আলাদা। ফীলড্ সাইকলজি এসেছে পদার্থ-বিজ্ঞানের ফীলড্ থিওরি থেকে। তাই তার ঘাড়ে অঙ্ক ও পরীক্ষার ভূত। একবার দুঃসাহসী হয়ে ফীলড্ সাইকলজির মোটা মোটা সিদ্ধান্ত-গুলি সমাজতত্ত্ব ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে খাটাতে যাই। দু-তিনটি বক্তৃতার পর বিদ্যাবুদ্ধির শেষ। ছাত্রদের সাফ্ বলে দিলাম, ওর বেশি জানি না। পরে চেষ্টা চলছে দেখলাম। একবার ছুটি পেলে বেয়ে-চেয়ে দেখতে হবে।

উপনগর

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

কলকাতার দশ মাইল উত্তরে কীর্তিপুর কলোনীতে অধ্যাপক অমিয়ভূষণ সেনগুপ্তের বাড়ি তৈরীর কাজ চৈত্রমাসেই শেষ হয়ে গেছে। আজ সাতই বৈশাখ তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহপ্রবেশ করবেন। সকাল থেকে তার উদ্যোগ-আয়োজন চলছে। বাড়ির সামনে দুটি কলাগাছ পোঁতা হয়েছে। গাছের গোড়ায় জলভরা মাটির মঙ্গল-কলস। তার ওপরে বোঁটাসুদ্ধ একটি করে কাঁচ ডাব-নারকেল। পিতলের বড় একখানা বাটায় কিছু ফুল, দুর্বা, বেল-পাতা, তুলসীপাতা রাখা হয়েছে। অমিয়-ভূষণের বৃদ্ধা মা শতদলবাসিনী ঘুরে ঘুরে সব তদারক করছেন, আর সব ব্যাপারে খুঁত ধরে বেড়াচ্ছেন। কোন কিছুই তার পছন্দ হচ্ছে না। এরা একালকার বউ-ঝিরা কিচ্ছু জানে না, কিচ্ছু মানে না। শিখিয়ে দিলেও শিখতে চায় না। শতদল ডেকে ডেকে হয়রান হচ্ছেন, 'ও বউমা, ও করুণা, ও পুনটুরি, তোরা কোথায় গেলি সব? কারোরই যদি এখন পাত্তা মেলে। ঘরের মধ্যে কি গুজ গুজ ফিস ফিস করছিস তোরা, বাইরে আয়, বাইরে আয়। ও পুনটুরি, ও কালু, ও কালাচাঁদ।'

ডাকতে ডাকতে কালু আর পুন-টুরির দেখা মিলল। শতদলের দুই নাতি-নাতনী। কালু ওরফে কমলাক্ষ, আর পুনটুরি ওরফে এনাক্ষী। কমলাক্ষের বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ। শ্যাম-বর্ণ স্বাস্থ্যবান যুবক। আর এনাক্ষীর বাইশ-তেইশ। গৌরাঙ্গী। দাদার মত সাড়ে পাঁচ ফুট লম্বা না হলেও তাকে কোনক্রমেই বেঁটে বলা যায় না। ছিপ-ছিপে চেহারায় মাত্র পাঁচ ফুটেই তাকে বেশ দীর্ঘাঙ্গী মনে হয়। শুধু দাদার পাশাপাশি দাঁড়ালে চোখে পড়ে সে কত ছোট। কিন্তু দৈর্ঘ্যে একটু খাটো হলেও এনাক্ষী অনেক সুন্দরী। শুধু রঙে নয়, নাকের তীক্ষ্ণতায় আয়ত কালো চোখের সৌন্দর্যে মুখের মিষ্টি ডৌলে এনাক্ষীর রূপ সম্বন্ধে কারো সন্দেহ থাকে না। ছেলেবেলায় শতদলবাসিনী নাতনীকে আদর ক'রে ডাকতেন, 'আমার বাটামুখী, আমার চন্দনবাটা।' আর নাতিকে ক্ষেপাতেন, 'ডিবামুখো। একজন পানের বাটা আর একজন পানের ডিবা। পুনটুরির মুখ তোর মত হ'লেই হয়েছিল আর কি। ভগবানের বুদ্ধি বিবেচনা আছে বউমা। ছেলেকে কুচ্ছিৎ ক'রে মেয়েকে সুন্দরী করেছে। নইলে কি যে উপায় হত তোমাদের।'

কমলাক্ষের বেশ মনে আছে ছেলে-বেলায় কেউ তাকে কালো-কুচ্ছিৎ বললে ভারি রাগ হ'ত তার। একটু দূরে গিয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলত, 'কালো জগতের আলো, কালো জগতের আলো। সাদা—পায়ের কাদা। ধলা—পায়ের তলা, ধলা—পায়ের তলা।'

আজকাল আর রূপের দৈন্য নিয়ে অত প্রকাশ্যে মনের ক্ষোভ জানায় না কমলাক্ষ। বরং মুখ মুচকে হাসে। ঠাকুরমা একদিন বলেছিলেন, 'আজকাল তো তোকে একটু চোখাচোখাই দেখা যায় কালু। একটু যেন শ্রী ছাঁদ এসেছে চেহারায়।' কমলাক্ষ জবাব দিয়েছিল, 'আসবে না? যৌবনে কুকুরী পর্যন্ত ধন্যা হয়, আর আমার একটু শ্রী ছাঁদ হবে না ঠাকুরমা? সব শ্রী কি তোমার নাতনীটির মনোপলি?'

এনাক্ষীকে দেখে শতদল বললেন, 'কি করছিস্ তোরা ঘরের মধ্যে? এত ক'রে বললুম একটু চন্দন ঘষে রাখ, তা তুই ঘষতে পারলিনে। দুরকমের চন্দনই ঘষবি। শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন দুই-ই লাগবে। আর মুছিতে ক'রে একটু সিঁদুর গুলে নে। যদি তাড়াতাড়ি সিঁথিতে সিঁদুর পরতে চাস তাহলে এসব শুভ কাজ কর। ধূপে, দীপে, সিঁদুরে চন্দনে হাত দে। তবে তো বিয়ের ফুল ফুটবে। তোর মা কোথায়? সে কি করছে।'

এনাক্ষী বলল, 'মার আবার ফিক ব্যথা হয়েছে ঠাকুরমা। শুয়ে আছে ঘরে। আমরা তো এতক্ষণ সেখানেই ছিলাম। পিসীমাকে বসিয়ে রেখে এসেছি। ভয় পেয়ে বাবা নিজেই গেছেন ডাক্তার ডাকতে।'

শতদলবাসিনী বললেন, 'তা তো যাবেই। আজকে এই শুভদিনে ডাক্তার বৈদ্য না এলে চলবে কেন। আমার কপাল, সব আমার কপাল। ফিক ব্যথায় আবার ডাক্তার। সিভিল সার্জনকে ডেকে নিয়ে আসুক। অত আদর দিয়ে দিয়েই তো এই হয়েছে। ফিক ব্যথা না ছাই।

আসলে ওযে কিসের ব্যথা তা কি আর আমি বুঝিনে। জায়গা পছন্দ হয়নি, বাড়ি পছন্দ হয়নি। সেই রাগ, সেই দুঃখ, সেই জেদের জানান দিচ্ছে। ফিক ব্যথা ট্যাথা কিছু নয়।'

এনাক্ষী ঠোঁটে আঙুলে ছোঁয়াল, 'চুপ চুপ। তোমার গলা মা শুনতে পাচ্ছে।'

কমলাক্ষও বিরক্ত হয়ে ধমক দিল, 'চুপ কর ঠাকুরমা। তুমি কি আজও একটা ঝগড়া ঝাটি না বাঁধিয়ে ছাড়বে না? তোমার মত নিষ্ঠুরও তো আমি কাউকে দেখিনি। মানুষের অসুখ বিসুখেও তোমার মনে দয়া হয় না?'

নাতি নাতনীর কাছে মুখ না পেয়ে শতদলবাসিনী অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলেন, বললেন, 'অচ্ছা, নটবরটা আবার গেল কোথায়? সেই যে পুরুত মশাইকে ডাকতে গেছে আর ফেরবার নাম নেই। যত ফাঁকিবাজের পাল্লায় পড়েছি আমি।'

নটবর বাড়ির পুরোন চাকর। পদ-মর্যাদায় কর্তার ঠিক পরেই তার স্থান। রক্ষা যে ফাঁকিবাজ কথাটা তার কানে যায়নি। নইলে বুড়োঠাকরুণকে সে দশ কথা শুনিয়ে ছাড়ত। সে কারো পরোয়া করে না। কর্তার ওপরও কর্তৃত্ব করে।

কমলাক্ষ বিরক্ত হয়ে বলতে লাগল, 'কি দরকার ছিল এইসব হাঙ্গামার? অসুখ মানবে না, বিসুখ মানবে না। এখনো তোমার গুরু চাই, পুরুত চাই, ধোপা চাই, নাপিত চাই। কি দরকার ওসবের। আমরা যখন কিছু মানিনে, বিশ্বাস করিনে।'

শতদলবাসিনী বাধা দিয়ে বললেন, 'তোরা না করিস আমি করি, তোরা না মানিস আমি মানি। দেশ ছেড়েছি বলে তো আর ধম্মকম্ম সব ছেড়ে আসিনি। তা যদি ছাড়তাম তাহলে তো সেই ম্লেচ্ছ মুসলমানদের মধ্যেই পড়ে থাকতাম। আমি যতদিন আছি সব মানব, আমার ছেলেকে দিয়ে সব মানাব। তোদের আমলে যা খুশি তাই করিস তোরা।'

তরুণ বয়সী এক ডাক্তারের সঙ্গে প্রৌঢ় অমিয়ভূষণ বাড়িতে ঢুকলেন। বয়স পঞ্চাশ পেরিয়েছে। দেখলে অবশ্য অতটা বোঝা যায় না। নাতিদীর্ঘ, নাতিপুষ্ট ভদ্রলোক। গায়ে পুরোন একটা খদ্দরের জামা। পরনে খাটো ধুতি। ফর্সা রঙ। মুখটা একটু গোল ধরনের হলেও নাক চোখ লম্বা। মাথায় পাকা চুল হঠাৎ চোখে পড়ে না। কিন্তু একদিন দাড়ি না কামালে দুটি গাল রূপালী দানায় চিক চিক করে। আজও তাই করছিল। অমিয়ভূষণ বললেন, 'কি হয়েছে মা। অত চেঁচাচ্ছ কেন।'

শতদলবাসিনী বললেন, 'চেঁচাচ্ছি সাধে। তোমার ছেলেমেয়েরা আমাকে

খোটা দিচ্ছে ওদের কিচ্ছু দরকার নেই এইসব গৃহসজ্জার টঙার ওরা মানে না বামুন পুরুতে ওদের বিশ্বাস নেই আমি তোমাকে দিয়ে জোর করি করাচ্ছি।'

অমিয়ভূষণ বললেন, 'না হয় তা করাচ্ছি। তাতেই বা কি এসে গেল ওদের তো কিছু করতে হচ্ছে না করছি তো সব আমিই। ওরাতো স ঠুঁটো জগন্নাথ। নড়েও বসবে না, হা দিয়েও ছোঁবে না কিছু।' তারপর ছেলে দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমিও আস্তি নই। পার্সোন্যাল গডে আমি বিশ্বাস করিনে। কিন্তু এথিক্‌স্‌ মানি এস্‌থেটিক্‌স্‌ মানি। আমার সত্তর বছ বয়সের বুড়ো মায়ের হৃদয়কে মূল্য দিই আসুন ডাক্তারবাবু।'

একটু বিরক্তভাবেই ডানদিকের ছো ঘরখানিতে গিয়ে ঢুকলেন অমিয়ভূষণ তরুণ ডাক্তার সুকুমার মিত্র ব্যাগ হাতে তাঁর পিছনে পিছনে গেল।

বাবার ধমক শুনে নিজের মনে একটু হাসল কমলাক্ষ। নীতি সৌন্দয বোধ আর ঠাকুরমার হৃদয়ের দোহা দিয়ে বাবা একটু একটু ক'রে স কুসংস্কারকেই বাড়িতে ঢুকতে দিচ্ছেন এরই নাম বয়স, এরই নাম বার্ধক্য সৌন্দর্য! গামছা কাঁধে, পৈতে গলা অর্ধশিক্ষিত বামুনঠাকুরের অশু সংস্কৃত উচ্চারণের মধ্যে কোন সৌন্দ নেই, তাঁকে পোষণ করার মধ্যে কো নীতিও নেই। বাবা যদি নাস্তিব অন্ততপক্ষে অপৌত্তলিক, তবে শালগ্রাম শিলা কেন তাঁর বাড়িতে ঢোকে, কে আজও নারায়ণপুজো আর চৌরি ব্যবস্থা হয়? এর মূলে কি শুং ঠাকুরমার হৃদয়? তাঁর নিজের মনে দ্বিধা নেই? নেই যুক্তির ওপর অনাস্থা বাবা একথার জবাবে হেসে বলেন, 'ওে কিচ্ছু এসে যায় না।' মানে তাঁ ভিতরকার যুক্তির জোর এত বেশি সেখানে নাস্তিক্যবোধ এত অটুট যে এসব তুচ্ছ লোকাচার দেশাচারে অযৌক্তিকতায় তা টোল খায় না। কমলাক্ষ ভাবে, মিথ্যে কথা। বাবা আপো করছেন। ঠাকুরমার হৃদয়কে মে চলবার নামে তিনি আপোস করছে অশিক্ষা, অজ্ঞতা, কুসংস্কারের সঙ্গে

তিনি বন্ধকে আঘাত দেবেন না, নিরক্ষরকে দুঃখ দেবেন না, শুধু নিজে জ্ঞানী, বিজ্ঞানী আর পন্ডিত হয়ে থাকবেন। কোন মানে হয় না, কোন মানে হয় না। এর নাম ক্রিয়াকর্ম নয়, এর নাম প্রতিক্রিয়া কর্ম।

এনাক্ষী আগেই চলে গিয়েছিল। এবার কমলও ঘরে গিয়ে ঢুকল। কল্যাণী তক্তপোশের ওপর শুয়ে আছেন। একদিকে জিনিসপত্র টাল হয়ে পড়ে রয়েছে। এখনো সব গুছিয়ে তোলা হয়নি। এক পাশে অমিয়ভূষণের বোন করুণা দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার বয়স বছর চল্লিশেক। শ্যামবর্ণের ওপর মিষ্টি সুশ্রী চেহারা। দোহারা গড়ন। করুণা বিয়ে করেনি। কোনদিন করবেও না। এম এ. বি টি পাশ ক'রে হাইস্কুলে টিচারি করছে। অবশ্য স্কুলে যখন ঢুকেছিল তখন তার এত উ'চু ডিগ্রী ছিল না। আস্তে আস্তে কয়েক বছর বাদে বাদে এক একটি ক'রে এই ডিগ্রীর অধিকারিনী হয়েছেন। এখন হেডমিস্ট্রেস হবার কথা চলছে করুণাকণার।

সুকুমার কিছুক্ষণ ধরে পরীক্ষা ক'রে দেখল কল্যাণীকে। রোগের বিবরণ শুনল, উপসর্গের কথা শুনল। নাড়ি দেখল, থার্মোমিটারে টেম্পারেচার নিল, জিভ দেখল, তারপর সবাইকে ভরসা দিয়ে বলল, 'কিচ্ছু ভাববেন না, কলিক পেইন। এক ডোজ অষুধেই সব ঠিক হয়ে যাবে। আধ ঘণ্টার মধ্যে উঠে বসবেন উনি।'

করুণা উৎকণ্ঠার সুরে বলল, 'দেখুন তো কি কান্ড। আজ গৃহপ্রবেশ। পাঁচজন লোক আসবে বাড়িতে। আজই বউদি অসুস্থ হয়ে পড়ল। কি ক'রে যে কি হবে, আমি তো কিছুই ভেবে পাচ্ছিনে।'

কল্যাণীর বয়স বছর প'য়তাল্লিশ হয়েছে। বেশি মাত্রায় মোটা হয়ে পড়েছেন। কিন্তু এত মেদবাহুল্যেও তাঁর সৌন্দর্যকে ঢেকে ফেলতে পারেনি। গায়ের রঙে, নাক মুখ ঠোঁট চিবুকের গড়নে তিনি যে এনাক্ষীর মা, এমনকি যৌবনে এনাক্ষীর চেয়েও অনেক বেশি সুন্দরী ছিলেন তা বেশ বোঝা যায়। হঠাৎ দেখলে তাঁর এই স্থূলতাটা চোখে বিসদৃশ লাগে। কিন্তু একটু ভালো ক'রে দেখলে সেই মেদবাহুল্যের ভিতর থেকে এমন একটি কান্ত কমনীয় শ্রী ফুটে বেরোয় যে, দর্শকের চোখ সরিয়ে নিতে ইচ্ছা করে না। সেই শ্রীর মধ্যে শুধু মাধুর্য নয়, একটু বিষণ্ণতাও যেন জড়িয়ে রয়েছে। তাতে কল্যাণীর রূপে শুধু লাবণ্য নয়, একধরনের রহস্যের ছায়া পড়েছে।

রোগযন্ত্রণায় পাশ ফিরলেন কল্যাণী। পাশ ফিরতে ফিরতে বললেন, 'সেজন্যে ভেব না করুণা। আমি শুয়ে থাকলেও তোমাদের গৃহপ্রবেশের কোন বাধা হবে না। শুভ কাজ ঠিকমতই চলবে।'

করুণা একবার দাদার মুখের দিকে তাকাল, তারপর বলল, 'কি যে বল বউদি, তোমার কথার কোন মাথামুণ্ডু নেই। তুমি বাড়ির কর্ত্রী, তুমি শুয়ে থাকলে সব যে পণ্ড হয়ে যাবে তা বুঝতে পারছ না?'

ডাক্তার বলল, 'না না শুয়ে থাকবেন কেন। উনি এক্ষুণি সুস্থ হয়ে উঠবেন।'

আমার সঙ্গে কাউকে দিন। আমি ওষুধ পাঠিয়ে দিচ্ছি। উনি এক্ষুণি সেরে উঠবেন। অবশ্য ভালো ক'রে পরে ট্রিটমেণ্ট করাতে হবে।'

অমিয়ভূষণই গেলেন ডাক্তারের পিছনে পিছনে। বাড়ির সীমানা ছাড়াবার আগে সুকুমার বলল, 'ওকি, আপনি আবার কষ্ট ক'রে কেন আসছেন। কাজের বাড়ি। অন্য কাউকে দিন সঙ্গে। কেউ না থাকে, আমি কম্পাউন্ডারকে দিয়ে ওষুধ পাঠিয়ে দেব।'

অমিয়ভূষণ বললেন, 'সিরিয়াস কিছু নয় তো?'

সুকুমার হেসে বলল, 'মোটেই না। আপনি মোটেই ভাববেন না প্রফেসর সেন। আচ্ছা ও'র কি আগে হিস্টিরিয়া টিস্টিরিয়া কিছু ছিল?'

অমিয়ভূষণ বললেন, 'ছিল। প্রথম বয়সে অনেকদিন তাতে ভুগেছেন।'

সুকুমার বলল, 'এ বয়সেও তা একেবারে যায়নি। আচ্ছা, আপনি আসুন। আমার কম্পাউন্ডার এ ওষুধটা দিয়ে যাবে।'

তরুণ ডাক্তারটি খুবই ভ কলোনীর বাইরে বড় রাস্তার ও' ডিসপেনসারি খুলেছে। অল্পদিনে খুব সুনাম কিনেছে, জনপ্রিয় হ উঠেছে এখানে। বলতে গেলে বাড়ি ভিত পত্তনের দিন থেকে সুকুমারের সঙ্গে অমিয়ভূষণের আলাপ। তখন থেকে তিনি তার সৌজন্যে মুগ্ধ।

ভিজিটের চারটি টাকা সুকুমা হাতে দিলেন অমিয়ভূষণ। দু' টাক নোটখানি সুকুমার তাঁর হাতে ফে দিয়ে বলল, 'কলোনীর মধ্যে আম ভিজিট দু' টাকা।'

অমিয়ভূষণ বললেন, 'কিন্তু আপ তো এম বি, আপনি তো শুনে গায়নোকোলজিতে স্পেশ্যালিস্ট।'

সুকুমার হেসে বলল, 'তা হলামই ব এ তো আর কলকাতা শহর নয়। বেশি ভাগই দরিদ্র রিফিউজীদের বাস। এখানে ভিজিট চড়িয়ে রাখলে আমাকে উপো করতে হবে, বেকার হয়ে থাকতে হবে অবশ্য আপনাদের এই কীর্তিপু কলোনীর কথা স্বতন্ত্র। এখানে কীর্তি পুরকে সবাই বলে এদিককার চৌরঙ্গী বলে বালিগঞ্জ। গণ্যমান্য ধনী ভদ্র লোকেরা সব এসে রয়েছেন এখানে আচ্ছা চলি।'

নমস্কার জানিয়ে সুকুমার বিদা নিল। ছেলেকে ডেকে অমিয়ভূষ ডাক্তারের সঙ্গে পাঠালেন। দু' টাক ফেরৎ পেয়ে খুব যেন খুশী হলেন না কলকাতায় থাকতে বহুকাল দু' টাক ভিজিটের ডাক্তারকে বাড়িতে ডাকেনি অমিয়ভূষণ।

বাড়ির চারদিকে এখনো পাঁচি গাঁথা হয়নি। কলোনীর চারদিকে সুরক্ষিত উঁচু প্রাচীর। বাড়ির জন্যে আলাদা পাঁচিল অনেকেই করেনি অমিয়ভূষণ এ সম্বন্ধে মনস্থির করতে পারেননি। হয়ত পরে করে নেবেন বাড়ির এখনো অনেক কাজই বাকি রাজমিস্ত্রীকে আরো কতবার যে ডাকতে হবে তার ঠিক নেই।

পাঁচিল না তোলায় দক্ষিণ দিকট সম্পূর্ণ খোলা পড়ে আছে। শুধু দক্ষি

কেন, প্রায় সর্বদিক। বিশেষ করে পূব-দক্ষিণ দু'দিকই খোলা থাকবে অমিয়ভূষণের। পাশের ছোট ছোট বাড়িগুলি দেখা যাচ্ছে। বেশির ভাগই একতলা ভিলা প্যাটার্নের বাড়ি। ছবির মত সুন্দর দেখতে। অমিয়ভূষণের বাড়িটি সবচেয়ে সুন্দর। তাঁর শিল্পী বন্ধু বিজন রায় প্রথমে এই বাড়ির ছবি আঁকেন। তারপর ইঞ্জিনীয়ার বন্ধু সলিল দত্ত সেই ছবির একটু রদবদল করেন। তারপর কনট্রাক্টর আর রাজমিস্ত্রীরা সেই ছবিতে হাত দেয়। অবশ্য শিল্পীর মানসলোকের চেহারা তাতে অনেক পালটে গেছে। তবু গোলাপী রঙের এই একতলা বাড়িটি যে কলোনীর সবচেয়ে সুন্দর না হোক, সুন্দর বাড়িগুলির মধ্যে একটি, একথা সবাই স্বীকার করে।

বাড়ির জন্যে শেষ পর্যন্ত একটি ভালো নামও পাওয়া গিয়েছে—'মধু নিলয়'। এই নামকরণ নিয়ে মা, বোন, স্ত্রী, ছেলেমেয়ে সকলের সংগে আলোচনা আর তর্ক হয়েছে অমিয়ভূষণের। মাসের পর মাস গেছে সে তর্কের আর মীমাংসা হয়নি। অমিয়ভূষণের বাবার নাম ছিল মধুসূদন। আর মার নাম শতদলবাসিনী। অমিয়ভূষণের ইচ্ছা এই দুটি নামের দুটি শব্দ নিয়ে নাম রাখেন বাড়ির। মধুশতদল কি শতদল-মধু। শেষের নামটিই পছন্দ হয়েছিল অমিয়ভূষণের। কিন্তু স্ত্রী আর ছেলেমেয়ে কেউ পছন্দ করল না। তারা বলল, বড় সেকেলে, বড় সাবেকি। অমিয়ভূষণ নিজের বাপ মার নামে কিছু করতে চান, স্কুল করুন, লাইব্রেরী করুন, হাসপাতালে বেড করে দিন। টাকা থাকলে সৎকাজের অভাব নাকি পৃথিবীতে। কিন্তু ও ধরনের লম্বা নাম বাড়ির চলবে না। অমিয়ভূষণ শেষ পর্যন্ত হার মেনেছেন। কিন্তু তাই বলে স্ত্রী আর মেয়ের দেওয়া নামগুলিও নেননি। নীড়, স্বপ্ননীড়, শকুন্তলা, কেতকী এমনি আরো কত কি। চলন্তিকা আর সঞ্চয়িতা খুলে বসেছিল ওরা। অনেক বাদ বিসংবাদের পর অনেক চিন্তা ভাবনার পর জীবিতা মার নামটি বাদ দিয়েছেন অমিয়ভূষণ, কিন্তু পরলোকের বাপকে বাদ দেননি। অবশ্য নিজের নাম বাদ পড়ায় শতদলবাসিনীও মনে মনে খুব ক্ষুণ্ণ হয়েছেন। নিজের দীর্ঘ নামের অসুবিধার কথাটা তিনিও বোঝেন। কৈফিয়তের সুরে নাতিনাতনী আর পুত্রবধূর কাছে বলেছেন, 'আমাদের আমলে তো ওইরকমই ছিল। আমার ঠাকুরদা রেখেছিলেন ওই নাম। আমার দিদির নাম রেখেছিলেন শরদিন্দুনিভাননা, আর আমার নাম দিয়েছিলেন শতদলবাসিনী। বাবা আদর করে ডাকতেন সতী মা বলে। তোমরা আমার ওই ছোট নামটিও নিতে পার। ছোট নামই ভালো।'

লজ্জিত ভঙ্গিতে অবশিষ্ট গুটিকয়েক দাঁত মেলে হেসেছিলেন শতদলবাসিনী।

কিন্তু তাঁর এই আবেদন গ্রাহ্য হয়নি। অমিয়ভূষণ বলেছিলেন, 'তুমি ভেব না মা। আমি তোমার নামে অন্য কিছু একটা করব। তুমি বেঁচে থাকতে থাকতেই করব।'

শতদলবাসিনী জবাব দিয়েছিলেন, 'তোমার কিছু করতে হবে না বাবা। আমার নামে কিছু করতে হবে না। মায়ের নাম ছেলেকে মুখে আনতে নেই। মনের মধ্যে রাখতে হয়। তুমিই আমার বাড়ি, তুমিই আমার মন্দিরের চূড়া, তুমিই আমার সব। এখন তোমার সামনে আমি চোখ বুজতে পারি, এই আমার একমাত্র বাসনা। আমার আর কোন সাধ নেই।'

নটবর এল পুরুতঠাকুরকে নিয়ে।

সেই সঙ্গে বাজারও ক'রে এসেছে। পুরোহিত মাখনলাল চক্রবর্তীর বাড়িও পূর্ববঙ্গে। অমিয়ভূষণের একই জেলার মানুষ। এই কলোনীর দক্ষিণে রাস্তার ওপারে নেতাজীনগরে থাকে। খুঁজে পেতে তাকে যেন কি ক'রে বার করেছেন অমিয়ভূষণ।

মাখনলাল এসে বলল, 'তাড়াতাড়ি করুন, তাড়াতাড়ি করুন। শুভ কাজটা সময় মত আগে শেষ ক'রে নিন। আর সব পরে হবে।'

শতদলবাসিনী বললেন, 'আপনি আগে নারায়ণকে তুলসী দিয়ে নিন, ঠাকুরমশাই। আমি সব ব্যবস্থা ক'রে রেখেছি।'

বাড়িতে ছোট বড় চারখানা ঘর। সামনে বারান্দা। কোণের দিকের একখানা ঘরে পুজোর আয়োজন ক'রে দিলেন শতদলবাসিনী। সময় বুঝে মাখনলাল সংক্ষেপে পুজো সেরে দিল। বলল, 'চৌরী এসে পরে রাঁধব। আগে বাড়ির কর্তা গিন্নী গৃহপ্রদক্ষিণ ক'রে প্রবেশ করুন বাড়িতে। ভালো সময় চলে যাচ্ছে।'

ওষুধ খাওয়ার পর কল্যাণীর ব্যথা অনেকটা কমেছে। কিন্তু দুর্বলতা যায়নি। তিনি ননদকে বললেন, 'আমি উঠতে পারব না। ওসব তোমরা কর।'

কিন্তু কেউ সে কথা শুনল না। স্বামী, ছেলেমেয়ে, শাশুড়ী, ননদ সবাই এসে তাঁকে ঘিরে ধরল, 'তুমি না গেলে চলবে না, তুমি হলে ঘরের লক্ষ্মী।'

অমিয়ভূষণ বললেন, 'তাহ'লে সব বন্ধ ক'রে দিই। দরকার নেই কিছুর।'

কল্যাণী বললেন, 'এ তো আচ্ছা জ্বালায় পড়লাম। অসুখ হলেও তোমরা রেহাই দেবে না? না কি আমার অসুখ বিসুখ কিছু হ'তে নেই? আমি সব মিথ্যে বানিয়ে বলছি। ডাক্তার কি তাই বলে গেল নাকি?'

কমলাক্ষ বলল, 'না না তা কেন বলবে। ডাক্তারের ঘাড়ে ক'টা মাথা। তুমি একটু গিয়ে বাইরে দাঁড়ালে তোমার কোন ক্ষতি হবে না মা। যদি না যাও আমি তোমাকে পাঁজা কোলে ক'রে নিয়ে যাব। ওঠো, চল।'

ছেলে এসে হাত ধ'রে তাঁকে সত্যিই টেনে তুলল। আটপৌরে শাড়ি ছেড়ে লালপেড়ে গরদের শাড়ি পরলেন কল্যাণী। কপালে বড় ক'রে সিঁদুরের ফোঁটা দিলেন। বাইরে এসে শাশুড়ীকে প্রণাম করলেন। শতদলবাসিনী বললেন, 'আগে নারায়ণকে আর পুরুতঠাকুরকে প্রণাম কর বউমা।'

এবার গৃহপ্রদক্ষিণ শুরু হ'ল। স্বামীর সঙ্গে সাত পাক ঘুরতে হবে বাড়ির চারদিকে। যদি অতটা শরীরে না সয় অন্তত পাঁচ পাক। কাছে দাঁড়িয়ে আচারগুলি বলে বলে দিলেন শতদলবাসিনী। নতুন কাপড় পরে জলভরা একটি মাটির কলস কাঁধে নিতে হ'ল অমিয়ভূষণকে। কল্যাণী নিলেন কাঁখে বরণডালা আর হাতে মাছের থালুই। কমল আর এনাক্ষী দূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছিল, শতদলবাসিনী বললেন 'তোরাও ওদের সঙ্গে ঘোর। করুণা তুইও ঘুরতে থাক ওদের সঙ্গে। সবাইকে ঘুরতে হয়, তাই নিয়ম।'

করুণা হেসে বলল 'বউদি, তুমি একটু বেশি ক'রে ঘোর। তোমাদের আগেকার পাকটা তেমন কষে বসেনি।'

শতদলবাসিনী বলতে লাগলেন 'জোকার দে তোরা, হুলুধ্বনি দে ওলো ও পুনটুরী।'

কিন্তু এনাক্ষী উলু দিতে জানে না করুণাও না। তাই ব'লে অনুষ্ঠান কি বাদ যাবে? একটু আড়ালে দাঁড়িয়ে শতদলবাসিনীই হুলুধ্বনি দিতে শুরু করলেন। এক ঝাঁক, দুই ঝাঁক, তিন ঝাঁক। তাঁর ছেলেমেয়ে, বউ, নাতি নাতনী নাড়ি প্রদক্ষিণ করে এল। একবার দুইবার, তিনবার। আরো ঘুরুক, আরো ঘুরুক।

তারা যতবার ঘোরে শতদলবাসিনী ততবার হুলুধ্বনি দেন। দিতে দিতে এই আনন্দের দিনে তাঁর দুটি চোখ হঠাৎ জলে ভরে উঠল। কিন্তু সে জল তিনি আঁচল দিয়ে মুছলেন না।

নিমন্ত্রিত অনিমন্ত্রিত ছেলে বুড়ো আর কলোনীর নানা বয়সী মেয়েরা এসে উঠান ভরে ফেলতে লাগল।

সাত পাক ঘুরে অমিয়ভূষণ সপরিবারে বাড়ির বড় ঘরখানায় প্রবেশ করলেন। (ক্রমশ

বার্নহার্ড স্মিদ ও টেলিস্কোপ

বিমলেন্দু মিত্র

বন্ধু রতনলাল গেছে হামবুর্গে, ওখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর ছাত্র হিসাবে। ও চিঠি লিখেছে সেদিন—"কিছুদিন হল হামবুর্গে অবজারভেটরীতে স্মিদ টাইপের (Schmidt) দ্বিতীয় বৃহত্তম টেলিস্কোপ বসানো হল। এটাই বোধহয় হামবুর্গের একমাত্র ভাল জিনিস।"

"একমাত্র" ভাল জিনিস হোক আর নাই হোক, খবরটা ভাল খবর। তারপর আরও খবর পাওয়া গেল—গত ২০শে আগস্ট হামবুর্গে স্মিদ টেলিস্কোপ বসানো উপলক্ষ্যে পৃথিবীর বড় বড় জ্যোতির্বিদ মিলিত হয়েছিলেন—বার্নহার্ড স্মিদের স্মৃতিকে সম্মান দেখানোর জন্য।

এই বার্নহার্ড স্মিদ লোকটি কে? মানুষ হিসেবে তাকে ঠিক না জানলেও দুনিয়ার জ্যোতির্বিদ ঐ নামটি জানে,—জানে স্মিদ-টেলিস্কোপ আধুনিক জ্যোতিষের সর্বপ্রধান যন্ত্র। লোকটি ছিলেন ছোটখাট, প্রায় পুরো পাগল। বাপ জার্মান, মা সুইডেনের মেয়ে। ভয়ানক দুষ্টু ছেলে ছিলেন, যত কিম্ভুত যন্ত্রপাতি নাড়াচাড়া করা ছিল স্বভাব। একদিন ঘরে বোমা তৈরী করতে গিয়ে বাঁ হাতখানি উড়ে গেল বিস্ফোরণে। বার্নহার্ডের তখন বারো বছর বয়স।

স্যাক্সনির মিত্‌ভাইদা টেকনিক্যাল কলেজে বিজ্ঞানের শিক্ষা হল হাতেকলমে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি আর হল না। জীবনের পথে বিজ্ঞানীর চলা শুরু হল শুধু ডানহাতটি সম্বল করে। কিন্তু ঐ ডানহাতের দাম অনেক। গোড়া থেকেই ঝোঁক ছিল আলোকবিজ্ঞান সংক্রান্ত বিভিন্ন কাচের যন্ত্রপাতির দিকে। নিজের বাগানের এককোণায় ছোট একটি ঘরে নিজের মত ছোট্ট একটি কারখানা গড়ে নিয়ে ডানহাতে লেন্স ঘষতে শুরু করলেন। ঘষে ঘষে লেন্স তৈরী করা বড় শক্ত, বড় ধৈর্যের কাজ। কিন্তু কি অদ্ভুত পারদর্শিতা ঐ ডানহাতখানির! হামবুর্গের বার্গেডর্ফে নিজের ছোট্ট কারখানায় বসে তৈরী করা ঐসব লেন্স, বৃহত্তম অপ্টিক্যাল কাচের যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান ৎজাইসের তৈরী লেন্সকে হারিয়ে দেয়! ক্রমশ বার্নহার্ডের নাম হয়ে গেল। ৎজাইস তাঁকে চাকরি দিতে চাইলেন। কিন্তু কে কাজ করবে? বার্নহার্ডের এককথা—পরের চাকরি করা পোষাবে না। অন্য লোকের গোলাম প্রত্যহ নিয়মিত হাজিরা দিতে হবে চাকরিস্থলে একথা ভাবতেই ওঁর মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। লোকটি আসলে অদ্ভুত। ভয়ানক চুরুট খেতেন, আর খেতেন মদ—নির্জলা ব্রান্ডি! রাস্তায় যখন চলতেন নিজের মনে আঁক কষতে কষতে, টুপিটা থাকতো নামানো, চোখের কাছাকাছি। মুখে থাকতো লম্বা সিগার, আকাশপানে উঁচিয়ে। বার্গেডর্ফের ছেলেরা বলত—চুরুটের আগুনে টুপির কানা ধরে যাবে কোনদিন। তারা সেই দৃশ্য দেখবার জন্য পেছনে পেছনে হাঁটতো। যাই হোক, সে দুর্ঘটনা ঘটেনি কোনদিন।

বার্গেডর্ফে আছে হামবুর্গের মানমন্দির। হামবুর্গ বিরাট মহানগরী, তার মধ্যে বার্গেডর্ফ যেন আলাদা একটি সুন্দর

ছোট শহর। এই মানমন্দিরের কর্তা ছিলেন, ডাঃ ওয়ালটার বাডে। ডাঃ বাডে পণ্ডিত ব্যক্তি, পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিদ। কালিফোর্নিয়ার পাসাদেনায় মাউণ্ট পালোমার, যেখানে আছে পৃথিবীর বৃহত্তম ২০০" টেলিস্কোপ, ডাঃ বাডে এখন সেইখানে। তিনি বার্গেডর্ফে থাকতে জানলেন বার্নহার্ডের দক্ষতার খবর। বার্নহার্ড বন্ধু পেলেন তাঁকে। সত্যিই অকৃত্রিম বন্ধু। জীবনের পঁচিশটা বছর বার্নহার্ড স্মিদের কেটেছে নিজের বাড়ির বাগানের ধারের ছোট্ট কারখানাটিতে। ডাঃ বাডে বললেন—"তুমি আমার এখানে চলে এস, এই অবজারভেটরীর কারখানায় কাজ করবে।" স্মিদ বললেন—"পাগল! অন্যের তাঁবে কাজ করা আমার পোষাবে না। আমি চিরকাল স্বাধীন থাকতে চাই।" ডাঃ বাডে বললেন—"তোমার স্বাধীনতায় বাধা দিচ্ছে কে? তোমার বাড়ির মতই স্বাধীনভাবে সেখানে থাকবে, কাজ করবে।" তবুও স্মিদের দ্বিধা। বললেন—"কিন্তু আমার সর্বদা চুরুট আর ব্র্যাণ্ডি চাই, ও দুটি না হলে আমি কাজই করতে পারি না।" ডাঃ বাডে বললেন—"ঠিক আছে, অবজারভেটরীর কারখানা তোমায় যত ইচ্ছে চুরুট আর ব্র্যাণ্ডি জুগিয়ে যাবে।"

অবজারভেটরীর কারখানাটি খুব চমৎকার। কত ভাল ভাল, নতুন যন্ত্র সেখানে। স্মিদ খুশী হলেন। কাজ করতে লাগলেন। তাঁর বয়স তখন ৪৫।

এই সুযোগে একটু টেলিস্কোপের গল্প করে নেওয়া যেতে পারে। প্রথম টেলিস্কোপ তৈরী করেন গ্যালিলিও, সাধারণভাবে এই বিশ্বাসই প্রচলিত। সঠিকভাবে বলতে গেলে গ্যালিলিওর আগেই হল্যাণ্ডে প্রথম দূরবীন তৈরী হয়। দূরবীনের আবিষ্কার মধ্যযুগীয় ইউরোপের এক অতি অপূর্ব অধ্যায়। যতদূর জানা যায় ১৬০৮ সালে হান্স্ লিপারসে নামে হল্যাণ্ডের মিডলেবার্গ শহরের এক ওলন্দাজ চশমা-নির্মাতা প্রথম দূরবীন তৈরী করেন। গ্যালিলিওর Sidereus Nuncis ("নক্ষত্র-দূত") নামে রচনার প্রথম অংশে গ্যালিলিও স্বয়ং বলছেন (১৬০১) —"প্রায় দশ মাস আগে আমাদের কানে একটি খবর আসে যে জনৈক ওলন্দাজ একটি এমন যন্ত্র তৈরী করেছে যার সাহায্যে বহুদূরস্থিত বস্তুও অত্যন্ত স্পষ্ট দেখা যায়, যেন তারা অতি নিকটেই। এ বিষয়ে বহু গুজব প্রচলিত হয়েছে যা কেউ অবিশ্বাস করছে, কেউ-বা বিশ্বাস করছে। প্যারি থেকে এক সম্মানীয় ফরাসী ভদ্রলোক যাকোব বাদোভিয়ার আমাকে ঐ গল্পটি চিঠি লিখে জানান। এজন্য আমি নিজে এরূপ একটি যন্ত্র করা যায় কিনা সে বিষয়ে মনোনিবেশ করি। কিছু পরেই আলোর প্রতিসরণের সূত্র ধরে আমি এতে সফলকাম হই। আমি একটি সীসার নলের দুই মাথায় দুটি পারকলা বা লেন্স বসিয়ে দেই, তার একটির একদিক সমান, অপরদিক মাঝখানটি পুরু (Plano Convex) আর অন্যটিরও একদিক সমান, অপরদিক ধার-গুলি উঁচু, মাঝখানটি সরার মত নীচু (Plano Concave)"। এই হল টেলিস্কোপ বা দূরবীক্ষণ-যন্ত্রের জন্ম কথা। এই

দূরবীনই গৌণভাবে গ্যালিলিওকে শক্তি জুগিয়েছিল কোপার্নিকাসের সৌরকেন্দ্রিক জগতে বিশ্বাস করতে যার ফলে সেই ধর্মান্ধতার যুগে তাঁকে সহ্য করতে হয়েছিল চরম নির্যাতন। এই টেলিস্কোপের মধ্য দিয়েই সূর্য দেখার ফলে গ্যালিলিও অন্ধ হয়ে যান।

তারপর বিজ্ঞানের সেই রোমাঞ্চময় প্রথম যুগ থেকে দূরবীক্ষণযন্ত্রের বহু উন্নতি হয়েছে। বড় থেকে আরও বড় টেলিস্কোপ হয়েছে তৈরী। তারপর আবিষ্কৃত হয়েছে লেন্স দেওয়া টেলিস্কোপের বদলে প্রতিফলক-টেলিস্কোপ। এতে লেন্সের বদলে থাকে কাচের অথবা ধাতুর তৈরী প্রতিফলনকারী আয়না। এর আবিষ্কারক হিসেবে রোমের জেসুইট সন্ন্যাসী নিকোলো জুক্কি (১৫৮৬-১৬৭০), ফরাসী জেসুইট মারিন মার্সেলে এবং স্কচ্ জ্যোতির্বিদ জেমস গ্রেগরী প্রভৃতির নাম পাওয়া যায়। অবশ্য তাঁরা এর তত্ত্ব জানলেও সত্যিই এরূপ যন্ত্র তৈরী করেছিলেন কিনা তা জানা যায় না। নিউটনই ১৬৬৮ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রতিফলক শ্রেণীর টেলিস্কোপ তৈরী করেন বলা যায়।

বর্তমানে দুই শ্রেণীর টেলিস্কোপই ব্যবহার হয়। অবশ্য সেই প্রথম জিনিস অপেক্ষা অনেক, অনেক বড় ও ভাল। মাউন্ট পালোমারে যে ২০০" টেলিস্কোপ আছে তা হল প্রতিফলক শ্রেণীর।

প্রতিসরক শ্রেণীর (refracting) টেলিস্কোপে প্রতিচ্ছবির নানারকম দোষ থাকত। সেইসব দোষ এড়াবার জন্যই প্রতিফলক শ্রেণীর টেলিস্কোপ প্রয়োজন হয়েছিল। তার জন্য যে সরার আকৃতির কাচ ব্যবহার করা হত তাতেও দেখা গেল অনেক গলদ থেকে যায় দূরাস্থিত জিনিসের প্রতিচ্ছবিতে। প্রধানত দৃশ্য বস্তু বড় হয়ে গেলে তার ছবির ধারগুলো স্পষ্ট থাকে না। জ্যামিতির প্রাথমিক তত্ত্ব থেকেই দেখা যায় যে তা না হয়ে উপায় নেই। আরো ভাল করার জন্য অবশেষে সরার আকৃতি ছেড়ে বড় বড় দূরবীনের কাচ তৈরী করা হতে লাগল পরবলয়াকৃতি করে (paraboloid)। এইরকম পরবলয়াকৃতি প্রতিফলক বসিয়ে টেলিস্কোপ ধৃত প্রতিচ্ছায়া অনেক স্পষ্ট ও উজ্জ্বল হল বটে; কিন্তু মুশকিল একটা থেকেই গেল। গোলাকৃতি কাচের ছবির জ্যামিতিক ভুল ত্রুটি বা Spherical aberration শুদ্ধীকৃত হলেও, মুশকিলটা এই যে, যেদিকে টেলিস্কোপ ফেরানো যায় আকাশের সেই-

খানের অতি ছোট্ট একটি অংশেরই ছবি স্পষ্ট করা যেত। এখন এরকম একটি যন্ত্র দিয়ে আকাশের গ্রহ নক্ষত্র বহুগুণ বাড়িয়ে স্পষ্ট করে দেখা চললেও বিশাল বিশ্বের সমগ্র রূপের সামান্য অংশও, জ্যোতিষ্ক-তারকা-নীহারিকা খচিত মহাব্রহ্মাণ্ডের কিছুটাও স্পষ্ট করে, বড় করে পর্যবেক্ষণ করা চলত না। এ যন্ত্র দিয়ে বিশ্বের সমস্তটা ভাল করে দেখতে, আকাশের সঠিক মানচিত্র বা সমগ্র ফটোগ্রাফ তুলতে মানুষের হয়তো কত শতাব্দী কেটে যেত।

এইটুকু বলেই আমরা স্মিদের যুগান্তকারী আবিষ্কারের গল্পে চলে আসতে পারি। স্মিদের মাথায় সর্বদা ঘুরত নানারকম লেন্সের আইডিয়া। রাস্তা হাঁটতেন যখন, হাত দিয়ে শূন্যে অঙ্ক কষতেন—আলোকতত্ত্বের বিভিন্ন আঁক! মাঝে মাঝে এক অদ্ভুত নার্ভের রোগে ভুগতেন। প্রায় প্রতি তিন মাস অন্তর একবার করে তিনি কিছুদিনের জন্য অত্যন্ত হতাশাচ্ছন্ন হয়ে কাটাতেন, তারপর একদিন সব ঝেড়ে বেজায় স্ফূর্তিবাজ হয়ে উঠতেন এবং পরবর্তী কয়েকটা দিন কাটাতেন পাগলের মত কর্মতৎপরতায়। মেজাজ থাকত তুঙ্গ হয়ে। এই সময়-চক্রেই তাঁর মাথায় খেলত নতুন নতুন সম্ভাবনাময় আবিষ্কারের ইঙ্গিত। এইরকমই এক সময় তিনি একটি বৃহৎ সরার মত আয়না ঘষে ঘষে পরাবলয়াকৃতি করছিলেন। হঠাৎ তাঁর মনে হল এরকম কষ্ট করে ঘষে ঘষে আয়নাকে বিশুদ্ধ করার চেষ্টা না করে সরার আকৃতি রেখেই এমন কোন ব্যবস্থা করা যেতে পারে যার ফলে বিশুদ্ধ প্রতিচ্ছবি পাওয়া যাবে। করা যেতে পারে হয়ত সামনে বিশেষ চেহারার কোন লেন্স রেখে, যার ফলে প্রতিফলন ও প্রতিসরণের মিলিত ফলটা বিশুদ্ধ ছবি ফোটাবে। আর এর ফলে এমন ব্যবস্থাও করা যেতে পারে যাতে সামান্য একটুখানি আকাশের ছবি ছাড়া আরও বৃহত্তর জায়গা থেকে আসা বিভিন্ন দিকের আলোকরশ্মিকেও উপযুক্ত স্পষ্ট করা যেতে পারে। তারপর কাটল কিছুদিন আঁকজোক করতে। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত—ঠিক কি রকম লেন্স, কি চেহারার প্রতিফলক করলে এক সঙ্গে অনেকটা আকাশের ছবি স্পষ্ট হয়ে উঠবে টেলিস্কোপের ভিতর দিয়ে। বিভিন্ন ধরনের কাচ পরীক্ষা করা চলল সর্বদা। তারপর ঘষা আরম্ভ হল প্রথম লেন্সটি। এটি বসানো হবে টেলিস্কোপের সাধারণ অশুদ্ধ আয়নায়—প্রতি দিক থেকে আসা আলোকে "শুদ্ধ" করে প্রতিফলকের ওপর ফেলবে এরকম লেন্স।

অবশেষে তৈরী হল লেন্স। বিশেষ একটি চেহারা তার। গোলাকৃতি ধার ঘেঁষে একটি বিশেষ ধরনের নিম্নতা বা খোঁদল। তৈরী হল জ্যোতির্বিজ্ঞানের নতুন ইতিহাস। টেলিস্কোপের দৃষ্টিক্ষেত্র বেড়ে গেল প্রায় ৩০০ গুণ! গত তিন চার শতক ধরে মানুষের জ্যোতির্বিজ্ঞান যতদূর এগিয়ে ছিল সামান্য কয়েকটি বছরে তার অনেক বেশী এগিয়ে গেল। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড মানুষের দৃষ্টিপথে প্রসারিত হয়ে ওঠবার সম্ভাবনা দেখা দিল। আগে স্পষ্ট করে দেখা বা ফটো তোলা সম্ভব ছিল এক ডিগ্রীর এক ভগ্নাংশ পরিমাণ কোণ করে আকাশের দিকে এগিয়ে গেলে যেটুকু আকাশ ধরা পড়ে সেটুকু—স্মিদের তৈরী যন্ত্রে তা বেড়ে গিয়ে হল ২৫ ডিগ্রী! এতখানি আকাশ ঝলমল করে উঠল টেলিস্কোপের দৃষ্টিক্ষেত্রে একসঙ্গে, তার প্রতিটি জায়গা সমান স্পষ্ট, সমান উজ্জ্বল। সাধারণ টেলিস্কোপে এটুকু আকাশকে পর্যবেক্ষণ করতেই হয়তো শতাব্দী কেটে যেত।

স্মিদের আবিষ্কার বর্তমান শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার। তারপরে আরও অনেকে স্মিদ-লেন্সের বিভিন্ন উন্নতি করেছেন। আমেরিকায় রাইট ও রাশিয়ায় মাৎসুকফের নাম এই প্রসঙ্গে করা যেতে পারে।

স্মিদ মারা যান ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে। ডাঃ বাডে আমেরিকায় যান ১৯৩১ সালে। তিনি এই সরল কর্মীটিকে নিজেও ভোলেন নি, জগতকেও দেননি তাকে ভুলে যেতে। মাউন্ট পালোমারে বসানো হল সবসুদ্ধ তিনটি "স্মিদ", ১৯৩৬ সালে ১৮" স্মিদ (F/২) ১৯৪০ এ ছোট ৮" (F/১) স্মিদ। ১৯৩৮এ শুরু হয় কাজ ৪৮" প্রকাণ্ড "স্মিদ" বসানোর। এটিই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় স্মিদ টেলিস্কোপ। অবশ্য এটির নির্মাণ বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে। মূল ২০০" টেলিস্কোপের কাজও বন্ধ থাকে তখন প্রায়। আবার ১৯৪৬ এর নভেম্বর থেকে শুরু হয়ে ১৯৪৭এ শেষ হয়।

দ্বিতীয় বৃহত্তম "স্মিদ" বসানো হল হামবুর্গে, বার্নহার্ড স্মিদের কর্মস্থল বার্গেডর্ফ অবজারভেটরীতে। ডাঃ বাডে এসেছিলেন বার্গেডর্ফে, এসেছিলেন আরও অনেক জ্যোতির্বিদ। ২০শে আগস্ট শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করলেন তাঁরা বার্নহার্ড স্মিদের দান। হামবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে হল এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান। সেখানে স্মিদের একটি স্মৃতিফলক বসানো হল। জগত এই সাধারণ চেহারার পাগলাটে লেন্স-মিস্ত্রীটিকে ভোলেনি। আজ পৃথিবীর প্রায় সমস্ত বড় মানমন্দিরেই "স্মিদ"-টেলিস্কোপ মানুষের জ্ঞানের ভাণ্ডার বৃদ্ধিতে সাহায্য করছে।

ট্রামে-বাসে

একটি সংবাদে **প্রকাশ** যে, বন্যা-নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে সরকারী কর্ম-তৎপরতার সুখ্যাতি করিয়া লোকসভায় নাকি একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। —"কিন্তু শ্রীজহরলাল সম্প্রতি জানিয়েছিলেন যে, বাঁধ অপেক্ষা মনোবল গড়ে তোলাই নাকি বেশি প্রয়োজন। লোকসভার প্রস্তাবে জহরলালজীর পরামর্শের কোন ইংগিত নেই"—মন্তব্য করিলেন বিশুখুড়ো।

* * *

স্বরাষ্ট্র দপ্তরের উপমন্ত্রী শ্রীদাতার জানাইয়াছেন—দিল্লীতে আত্মহত্যার সংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, প্রেম, পারিবারিক গোলযোগ এবং দীর্ঘকালস্থায়ী বেকার অবস্থাই নাকি ইহার কারণ। —"প্রেম বা পারিবারিক গোলযোগ সম্বন্ধে কোন সমাধান সরকারের হাতে নেই বলেই আমরা মনে করি। কিন্তু বেকার সমস্যা, বিশেষ করে দিল্লীর, সমাধানের দায়িত্ব সরকার এড়াতে পারেন না; ইচ্ছে করলে মন্ত্রী বা উপমন্ত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি, কমিটি-কমিশনের নূতন নূতন ব্যবস্থা, সাংস্কৃতিক সফরের সুদীর্ঘ তালিকা প্রভৃতি অনেক কিছুতেই বেকারদের স্থান সংকুলান করে দিতে পারেন"!!

* * *

অক্টোবর মাসে পুণাতে গৃহপালিত পক্ষী সম্বন্ধে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনের ব্যবস্থা হইয়াছে
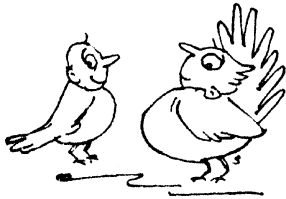
বলিয়া সংবাদ পাঠ করিলাম। শ্যামলাল বলিল—"পক্ষী সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান সীমাবদ্ধ, তা স্বীকার করতেই হবে। যা হোক, যে দু'একটি গৃহপালিত পক্ষী আমরা চিনি, তার মধ্যে বাস্তুঘুঘু এবং লক্কাপায়রার নাম আগে মনে পড়ছে। এদের গতিবিধি সম্বন্ধে সম্মেলনে কোন আলোচনা হলে জনসাধারণ উপকৃত হবে বলেই মনে করি।"

* * *

শুনিলাম, দিল্লীতে নাকি আবার "উড়ন্ত চাকী" পরিদৃষ্ট হইয়াছে। —"এই বস্তুটি দেখার সৌভাগ্য কোনদিনই আমাদের হয় নি। সত্যি কথা

বলতে এই নিয়ে কোন মাথা-ব্যথাও আমাদের নেই। আমরা দেখেছি, উড়ন্ত মানুষ অর্থাৎ পাখা বা এরোপ্লেন ছাড়াও যারা ওড়ে সেই মানুষ। আমাদের ভাবনা শুধু তাদের নিয়েই"—বলিলেন জনৈক সহযাত্রী।

* * *

কলিকাতার পুলিশ "ভুয়া বরের" সন্ধান করিতেছে বলিয়া একটি সংবাদ পাঠ **করিলাম**। "ভুয়া অর্থে শূন্যগর্ভ বা অন্তঃসারশূন্য যদি ধরা যায়, তাহলে পুলিশের এই প্রচেষ্টায় ঠগ বাছতে গাঁ উজোড় হয়ে যাবে"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

বৃষ্টি লইয়া জুয়াখেলার জন্য অর্থাৎ বৃষ্টি হইবে, কি হইবে না এই লইয়া বাজির খেলার জন্য কলিকাতা পুলিশ সাতজনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। —"এই জুয়োখেলা বন্ধ হলে সাধারণ বেঁচে যাবে, কেননা বৃষ্টি হওয়া বা না হওয়ার টিপ্‌স যাঁরা ছাড়েন, তাঁদের ওপর নির্ভর করা চলে না"—বলিলেন জনৈক ঘোড়দৌড় রসিক সহযাত্রী।

* * *

রাজকোটের সংবাদে জানা গেল যে বর্তমানে সিংহের নাকি বংশ বৃদ্ধি হইতেছে। —"এগুলি কোন্

যে শ্রেণী ভারত থেকে লুপ্ত হয়েছে

জাতীয় সিংহ তা অবশ্য সংবাদে বলা হয় নি। আমরা অন্তত জানতাম যে, একটি বিশেষ শ্রেণীর সিংহ ভারত থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে"—মন্তব্য করিলেন বিশুখুড়ো।

* * *

নিউইয়র্কে সূর্য-রশ্মির সাহায্যে টেলিফোন চালাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। —"কিন্তু তাড়াতাড়ি নম্বর পাওয়ার সুবিধে এতে হবে কিনা, তা না জানা পর্যন্ত এ সম্বন্ধে আমাদের কোন উৎসাহ বা কৌতূহল নেই"—বলেন জনৈক যাত্রী।

নিশিকান্ত

(বাউল)

নয়তো কাঙাল-হাতের কড়ি
নয়তো ধনীর মণির অলংকার,
এযে বিনি-সুতোয় সুরের ফুলের হার।
তার নেই কোনো দাম,
নেই কোনো ধাম তার;
সেযে বাউল-বেলার
একলা-মেলার উদাস-খেলার ক্ষণ;
তার নেই তো বারণ, নেই কোনোই কারণ;
নেই তো বাসর, নেই বিরহ-মিলন-অভিসার॥

অন্তরে মোর ঢেউ তুলেছে
সব সাগরের সকল-পারের পারী;
আমার সকল-ভোলা ভাবের সে ভান্ডারী।
আমার গানের গোলাপ—
প্রাণের প্রলাপ তারই;
এ মোর সরল-সত্য,
গভীর অর্থ-প্রমাণ-তত্ত্ব নয়,
এযে আপন-হারা-রসের ধারায় বয়;
চিনবে রসিক, এই রসে রয় হৃদয়খানি যার॥

ধীরাজ ভট্টাচার্য

॥ এগার ॥

ভীষণ যুদ্ধ হচ্ছে কুরুক্ষেত্রে। সপ্ত-রথী মিলে ঘিরে ফেলেছে কিশোর অভিমন্যুকে. আজ আর অর্জুনে তনয়ের নিস্তার নেই। এমন সময় দেখা গেল পাশ দিয়ে চলেছে একখানা খিদিরপুরের ট্রাম। অস্পষ্ট নয় পরিস্কার পড়লাম—ট্রামের পাশে বড় বড় করে লেখা রয়েছে 'খিদিরপুর, প্রথম শ্রেণী ভাড়া ছ' পয়সা'। সেকেন্ড ক্লাসের ট্রামেও লেখা 'দ্বিতীয় শ্রেণী ভাড়া পাঁচ পয়সা'।

ম্যাডান কোম্পানীর তোলা 'মহাভারত' ছবিটা টিকিট কেটে দেখেছিলাম বছরখানেক আগে এম্প্রেস থিয়েটারে। আর সব ভুলে গেলেও অভিমন্যু বধ দৃশ্যটা এখনও স্পষ্ট মনে আছে। তখনকার দিনে পায়োনিয়ার বলতে একমাত্র ম্যাডান কোম্পানীকে ছাড়া অন্য কিছু চিন্তা করাও যেত না। একমাত্র ও'রাই যা খুশী ছবি তুলে মানুষকে আনন্দ দেবার অছিলায় প্রচুর পয়সা রোজগার করতেন। ব্যতিক্রম দেখা গেল নরেশচন্দ্র মিত্র ও শিশিরকুমার ভাদুড়ীর যৌথ প্রচেষ্টায় গড়ে তোলা তাজমহল ফিল্ম কোম্পানীর তোলা দুখানি ছবিতে—'মান ভঞ্জন' ও 'আঁধারে আলো'। তারপর জ্যোতিষবাবুর ম্যাডান কোম্পানীর হয়ে তোলা 'সতীলক্ষ্মী' ছবি তখনকার দিনে কর্ন-ওয়ালিশ (অধুনা শ্রী) থিয়েটারে একাদিক্রমে চৌদ্দ সপ্তাহ চলেছিল। ভালরকম সাড়া জাগিয়ে দিল পি এন গাঙ্গুলীর পরিচালনায় তোলা বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইল'। এই একখানা ছবিতে কাজ করেই দুর্গাদাস বন্দোপাধ্যায় ও সীতা দেবী অসম্ভব জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন।

তখনকার দিনে প্রযোজক হওয়াটা মোটেই ব্যয়সাধ্য বা কষ্টকর ছিল না। মাত্র দশ বারো হাজার টাকা হলেই যে কেউ একখানি ছবি তুলে প্রযোজক হয়ে বসতে পারতো। স্টুডিও ভাড়া করার প্রয়োজন কিছু নেই বা সেট সেটিং-এর বালাই নেই। সামাজিক ছবি হলে পোশাক আশাকের খরচাও নেই। শুধু র' ফিল্ম আর একটা ক্যামেরা ভাড়া করা। ক্যামেরাম্যানের মাইনে আর প্রধান ভূমিকায় যারা নামবে তাদের কিছু টাকা এবং কলকাতার বাইরে গেলে বাড়িভাড়া থাকা-খাওয়ার খরচা। ব্যস ছবি হয়ে গেল।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (ডি জি) এইসময় দমদমে খানিকটা জমি লিজ নিয়ে ব্রিটিশ ডমিনিয়ান ফিল্মস্ নামে এক লিমিটেড কোম্পানী খাড়া করে ছবি তুলতে শুরু করেন। অধুনা বিখ্যাত পরিচালক দেবকী বসু ও প্রমথেশ বড়ুয়া এইখানেই অভিনেতা ও পরিচালক হয়ে যোগদান করেন। বাংলা ছবির বাজার বেশ সরগরম হয়ে উঠল। কলকাতার চারধারে নতুন নতুন সব কোম্পানী গজিয়ে উঠতে লাগল, বেশীর ভাগই দু' একখানা ছবি তুলে পটল তুলল। যারা টিকে গেল তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ইন্ডিয়ান সিনেমা আর্টস্। ঘনশ্যামদাস চওখানি নামে একজন ধনী মাড়োয়ারী কালিপ্রসাদ ঘোষকে পরিচালক নিযুক্ত করে কয়েকটি ছবি তোলেন। তার মধ্যে 'শঙ্করাচার্য', 'অপহৃতা', 'কণ্ঠহার', 'নিষিদ্ধ ফল' প্রভৃতি তখনকার দিনে জনসমাদর লাভ করেছিল। আর্য ফিল্মস্ নাম দিয়ে সুবিখ্যাত ইম্প্রেশারিও হরেন ঘোষ এই সময় দুর্গাদাসকে নিয়ে একখানি ছবি তোলেন। ছবিটির নাম 'বুকের বোঝা'।

বিখ্যাত পরিচালক নীতিন বসুর এইটেই প্রথম ছবি।

বর্তমান রিগ্যাল সিনেমার ঠিক সামনে রাস্তার উপর একখানা বড় ঘর ভাড়া নিয়ে টেবিল চেয়ার সোফা সাজিয়ে নিজের ব্যক্তিগত ব্যবসা উপলক্ষে বসতেন হরেন ঘোষ। ব্যবসা কতদূর কি হত বোঝা না গেলেও ঐ ঘরে প্রায় সব সময়ই অধুনাবিখ্যাত ফিল্মের চাঁইদের আড্ডা দিতে দেখা যেত। মধ্য কলিকাতার আড্ডা হিসাবে তখন ঐ ঘরটি সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করে। ওখানে নিয়মিত যাঁদের দেখা যেত তাঁদের মধ্যে বীরেন্দ্রনাথ সরকার, ছোটাই মিত্তির, অমর মল্লিক, চারু রায়, প্রফুল্ল রায়, অভিনেতা ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, হেম চন্দ্র, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, দীনেশরঞ্জন দাশ, পি এন রায় প্রভৃতি তাঁদের অন্যতম। বলা বাহুল্য হবে না, পরবর্তীকালে বিখ্যাত নিউ থিয়েটার্সের পরিকল্পনা ঐ আড্ডাঘরেই জন্মলাভ করে, ইতিমধ্যে চারু রায় ও প্রফুল্ল রায় যথাক্রমে 'চোরকাঁটা' ও 'চাষার মেয়ে' নামে দুখানি ছবি ওখান থেকেই শেষ করেন।

নির্বাক বাংলা ছবির বাজারে বেশ খানিকটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দিল। উত্তর মধ্য কলকাতা ছাড়াও আশেপাশে নিত্য নতুন মাশরুম কোম্পানী গজিয়ে উঠতে লাগল। পিছনে পড়ে রইল শুধু দক্ষিণ কলকাতা। তা কি হয়? পূর্ণ থিয়েটারের মালিক মনোময় বন্দ্যোপাধ্যায় (বর্তমান স্বত্বাধিকারী তুলসী বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা) বেশ তৎপর হয়ে উঠলেন। গ্রাফিক আর্টস্ নামে একটি নিজস্ব প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে চারু রায় ও প্রফুল্ল রায়ের পরিচালনায় তিনখানি ছবি পরপর তোলেন। 'বঙ্গবালা', 'বিগ্রহ' ও 'অভিষেক'। তখনকার বিখ্যাত ক্যামেরাম্যান দেবী ঘোষ স্থায়ীভাবে এই কোম্পানীতে যোগদান করেন। আর একটি বিশেষ কথা এই প্রসঙ্গে বলে রাখা দরকার। বিখ্যাত অভিনেত্রী উমা দেবী এই প্রতিষ্ঠানেই প্রথম আত্মপ্রকাশ করে প্রচুর জনপ্রিয়তা ও খ্যাতি লাভ করেন ও পরে নিউ-থিয়েটার্সে স্থায়ীভাবে যোগদান করেন।

নির্বাক 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র মুক্তির পর দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রচুর খ্যাতি

লাভ করেন। এরকম অসম্ভব জনপ্রিয়তা ক্বচিৎ দেখা যায়। টাকাকড়ির ব্যাপারে এই সময় মতান্তর হওয়ায় দুর্গাদাস ম্যাডানের চাকরি ছেড়ে হরেন ঘোষের সঙ্গে যোগদান করেন। বাইরে তখন দুর্গাদাসের একাধিপত্য। তবু ওরই মধ্যে দু' একটি নতুন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে নায়কের অফার পেলাম। মহা সমস্যায় পড়ে গেলাম। এদিকে আশা আছে ম্যাডানে গাঙ্গুলী মশাই একটা পাকাপাকি ব্যবস্থা করে দেবেন আবার ওদিকেও প্রলোভন রয়েছে ভাল টাকার, মানে ম্যাডানে 'গিরিবালায়' ও 'কালপরিণয়ে' যা পেয়েছিলাম তার চেয়ে বেশী টাকা। কি করি। অগত্যা বাবাকে গিয়ে সব বললাম। বেশ কিছুক্ষণ চিন্তা করে বাবা বললেন—'আমার মনে হয় তোমার ওসব অফার না নেওয়াই ভাল। হাজার হোক ম্যাডান একটা বনেদী প্রতিষ্ঠান। ওরা বরাবর ছবি তুলে যাবে। তাছাড়া গাঙ্গুলী মশাই যখন বলেছেন তখন একটা কিছু ব্যবস্থা হবেই।'

তাই হল। সব ছেড়ে ম্যাডানের মাটি আঁকড়ে পড়ে রইলাম।

আর একটা পরিবর্তন এই সময় লক্ষ্য করলাম। আগে, মানে বছর খানেক আগে, যাঁরা বায়োস্কোপে অভিনয় করি বললে নাক সিঁটকে সরে যেতেন, এখন তাঁরা দেখা হলে বায়োস্কোপের খুঁটিনাটি খবর জানবার জন্য ছুঁতোয় নাতায় আলাপ জমাবার চেষ্টা করেন। সামাজিক জীবনে বয়কটের গণ্ডিটা যেন ঢিলে হয়ে উঠল। একটা ঘটনার কথা বলি।

আমাদের বাড়ির ঠিক সামনে অমরেশবাবু বলে এক ভদ্রলোক ভাড়া থাকতেন। উপর নীচে চারখানা ঘর। বাইরের দরজাটা খুলে বেরোলেই নজর পড়ে উপরের দুটো জানলার দিকে। দেখতাম পনেরো থেকে বাইশ বছরের চারটি বয়স্কা মেয়ে একটু সাড়া পেলেই এসে দাঁড়ায় ওই জানালা দুটোয়। যে দিন দরজা খুলে বেরিয়ে ওদের দেখতে পেতাম না সেদিন দুষ্টুমি করে মাকে অথবা ছোট ভাইবোনদের উদ্দেশ করে গলা ছেড়ে বলতাম—'দরজাটা বন্ধ করে দাও, আমি স্টুডিওতে যাচ্ছি।' ব্যাস, আর দেখতে হত না। হয়তো খেতে

বসেছিল, সেই অবস্থায় এ'টো হাতে চার বোনে এসে দাঁড়িয়ে গেল। কিছুদিন বাদে ওদের দাঁড়ানোটা আর আমার কোথাও বেরোবার আগে চেয়ে দেখাটা একটা নেশার মত হয়ে উঠল। মেয়েরা দেখতে যে খুব অপরূপ সুন্দরী ছিল তা নয়, তবু সব মিলিয়ে ও-বয়সে মন্দ লাগতো না। আশে পাশের বাড়ির অনেকেই জেনে গেল ব্যাপারটা। সবাই যেন মজা দেখে আর কৌতূহল চেপে অপেক্ষা করে থাকে একটা অঘটনের আশায়।

অমরেশবাবু পোস্টঅফিসের কেরানী। দশটা-পাঁচটা ডিউটি, তাছাড়া সকাল বিকেল দুটো টিউশনি করেন, সংসারে নিজে স্ত্রী আর শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে আটটি মেয়ে। চারটি বিয়ের যোগ্যা আর চারটি ছোট, বাড়িতে বাপের কাছেই পড়া-শুনো করে। বড় মেয়ে চারটির 'বিয়ের' কথা নিয়েও কানা ঘুষো শুনলাম। কেউ বলে অমরেশবাবু হাড় কেপ্পন, পয়সা খরচের ভয়ে বিয়ে দিচ্ছে না। একথাও সবাই জানে যে ভদ্রলোক পোস্টাফিসে টাকা জমিয়েছেন যথেষ্ট, তবু টাকার নেশা তাঁর প্রবল। স্ত্রী-পুত্র পরিবারকে বঞ্চিত ক'রে শুধু টাকা জমিয়েই চলেছেন। কেউ বলে ওসব নয়, লোকটা ভয়ানক ধড়িবাজ, কারো সঙ্গে একটা লটঘট পাকিয়ে ফাঁকতালে বিয়েটা দেবার মতলব। হাতে বেশ পয়সা আছে অথচ খরচ করবে না। বাড়িতে অতগুলো লোক কিন্তু একটা ঠিকে ঝি পর্যন্ত রাখে না লোকটা পয়সা খরচের ভয়ে। সব কাজ মুখ বুজে করেন অমরেশবাবুর স্ত্রী। আমাদের পাড়ার আশে পাশের অনেকেই আমায় অ্যাভয়েড করে চলতেন। হয়তো ভাবতেন—বেশী আলাপ রাখলে একদিন যে লটঘটের অপেক্ষায় অমরেশবাবু বসে আছেন, অপ্রত্যাশিতভাবে সেইটেই আগে তাঁদের সংসারে ঘটে যাবে, নয়তো অন্য কি ভাবতেন তাঁরাই জানেন।

সেদিন স্টুডিও বন্ধ। পাঁচটার পর সিনেমায় যাব বলে সেজেগুজে বেরুচ্ছি অভ্যাসমত—ওপরে চেয়ে দেখি চার জোড়া হাসিমাখা চোখ সজাগ প্রহরীর মত ঠিক ডিউটি দিচ্ছে। ছোট ভাইবোন দুটি স্কুলের পর পার্কে গেছে খেলতে, বাবাও স্কুল থেকে এসে টিউশনিতে বেরিয়ে গেছেন। ঝি চাকরের বালাই নেই। বাড়িতে আছেন শুধু মা; দরজাটা বন্ধ করে দেবার জন্যে অগত্যা বাইরে দাঁড়িয়ে তাঁকেই ডাকলাম, তিনি দরজা বন্ধ করে দিয়ে চলে গেলেন। যাবার জন্য পা বাড়াতেই দেখি উপরের জানলায় মেয়েরা নেই। কোন যাদুমন্ত্রে নিমেষে তারা অদৃশ্য হয়ে গেছে। সেখানে দুটো কঠিন হাত দিয়ে লোহার রড দুটো ধরে ক্রুদ্ধ চোখে দাঁড়িয়ে আছেন অমরেশবাবু। মনে হল শাপভ্রষ্ট দুর্বাশা চোখ দিয়ে ভস্ম করার ক্ষমতা হারিয়ে নির্বিষ ঢোঁড়া সাপের মত রুদ্ধ আক্রোশে লোহার রডে মাথা খুঁড়ে মরছে। মনে মনে হেসে আস্তে আস্তে চলে গেলাম।

পরদিন সকালে উঠেই চোখে পড়ল জানালা দুটো পুরো কালো পর্দায় আগাগোড়া ঢাকা। সে আবরণ ভেদ করে ভেতর থেকে হয়তো বাইরের সব

কিছু দেখা যায় কিন্তু বাইরে থেকে অসম্ভব। সাময়িক একটু দমে গেলেও কিছুদিন বাদে পর্দা প্রথায় অভ্যস্ত হয়ে গেলাম। বেরিয়েই অভ্যাসমত পর্দার দিকে তাকাই। দেখতে না পেলেও বেশ অনুভব করি চার জোড়া চোখের উপস্থিতি। আর একটা নতুন জিনিস লক্ষ্য করলাম। আগে সকালে বা বিকেলে অমরেশবাবুকে বাড়িতে দেখতে পাওয়া যেত না। ইদানিং দেখলাম অফিসের সময়টা ছাড়া সব সময় তিনি বাড়িতে। কখনো উপরে ঘুরছেন আর বেশির ভাগ সময় নীচে বাইরের ঘরে দরজা খুলে বসে আছেন। অবাক হয়ে ভাবলাম ব্যাপার কি? আমার জন্যে ভদ্রলোক টিউশনি ছেড়ে বাড়ি বসে মেয়েদের পাহারা দিতে শুরু করলেন নাকি? একদিন রাত্রে খাওয়ার সময় মার কাছে শুনলাম অমরেশবাবু প্রায়ই উপরের ঘরে দাঁড়িয়ে আমাদের শুনিয়ে শুনিয়ে বলেন—'আগে যদি জানতাম থিয়েটার বায়োস্কোপের লোক এ-পাড়ায় থাকে, তাহলে কখনো এ বাড়ি ভাড়া নিতাম না। বাড়ি দেখছি, পেলেই উঠে যাব। বাবা নির্বিকার। মা শুধু কথার সূত্র ধরে খানিকক্ষণ হা-হুতাশ করে গেলেন। রাগে ভেতরটা আমার রি রি করে জ্বলতে লাগল। রাত্রে ভালো করে ঘুমুতে পারলাম না। মনে মনে কাতরভাবে বললাম—এর শোধ নেবার একটা সুযোগ তুমি আমায় করে দাও ভগবান। কথাটা বোধহয় ভগবান শুনেছিলেন।

আমাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে গলি বেয়ে বড় রাস্তায় পড়তে হলে অমরেশবাবুর বাইরের ঘরের দরজার সামনে দিয়ে যেতে হয়।

কয়েকদিন পরে যাবার সময় কানে এল—'শুনুন'।

থমকে দাঁড়িয়ে চেয়ে দেখি বাইরের ঘরের দরজার কাছে চশমাটা নাকের ডগায় নামিয়ে হাতে দৈনিক খবরের কাগজটা দলা পাকিয়ে ধরে এক অপরূপ ভঙ্গিতে আমার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছেন অমরেশবাবু। বেশ একটু বিরক্ত হয়েই বললাম—'আমায় কিছু বলছেন?'

তেমনিভাবেই অমরেশবাবু বললেন, —'খুব ব্যস্ত না থাকেন তো দয়া করে একটু বসুন। কয়েকটা কথা জানতে চাই।'

একবার ভাবলাম বলি যে, দাঁড়াবার সময় নেই কিন্তু কৌতূহল প্রবল হয়ে উঠল। কোনও জবাব না দিয়ে ঘরের মধ্যে একটা চেয়ারে বসে পড়লাম। সামনে চুপচাপ বসে খবরের কাগজটা নিয়ে উসখুস করতে লাগলেন অমরেশবাবু।

বললাম—'কি জানতে চান বলুন? বেশীক্ষণ বসতে পারবো না, কাজ আছে।'

একটু ইতস্তত করে অমরেশবাবু বললেন—'আমাদের অফিসের কয়েকটি সহকর্মীর কাছে শুনেছিলাম যে শিশির ভাদুড়ী নাকি প্রফেসারি ছেড়ে দিয়ে যোগ দিয়েছে আপনাদের থিয়েটার বায়োস্কোপের দলে? নরেশ মিত্তিরও তো শুনতে পাই বি-এল পাশ, প্র্যাকটিস ছেড়ে বায়োস্কোপ করে বেড়াচ্ছে।'

সংযত কণ্ঠে বললাম—'ঠিকই শুনেছেন, এইটে শোনাবার জন্যেই কি ডেকেছেন?'

—'হ্যাঁ, কিসের লোভে বলতে পারেন সুনাম, ইজ্জৎ প্রতিপত্তি ছেড়ে মনুষ্য-জীবনের অমূল্য সম্পদ চরিত্রটি খোয়াতে ও'রা এই বিপথে পা বাড়িয়েছেন?'

সহজভাবেই বললাম—'টাকা।'

অবাক হয়ে অমরেশবাবু বললেন—'টাকা? টাকাটাই জীবনে সব চাইতে বড় হল?'

বললাম—'নিশ্চয়ই, টাকা থাকলে আপনার ঐ অমূল্য সম্পদগুলো আপনিই এসে হাজির হয়। কষ্ট করে খুঁজে বেড়াতে হয় না। এতখানি বয়েস হ'ল এটাও আপনাকে বলে দিতে হবে?'

ঘরের মধ্যে জানালার খড়খড়িটা যেন একটু ফাঁক হল। নারীকণ্ঠের একটু অস্ফুট চাপা গুঞ্জনও যেন কানে এল। কটমট করে জানালার দিকে একবার দেখে নিয়ে একটু উত্তেজিত ভাবেই অমরেশবাবু বললেন— আপনিও তো শুনলাম ছ' বছরের পুলিসের চাকরি ছেড়ে—'

বাধা দিয়ে বললাম—'ছেড়ে নয় ছাড়িয়ে দিয়েছে।'

—'সে কি, কেন?' অবাক হয়ে বললেন অমরেশবাবু।

হেসে জবাব দিলাম—'ঐ আপনার অমূল্য সম্পদটির জন্যে। মগের মুলুকে;
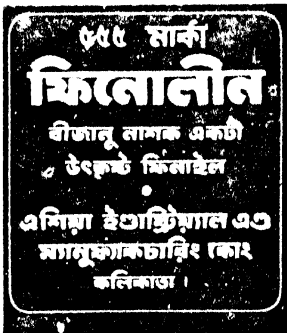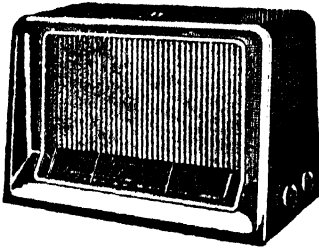
খোদ গভর্নমেণ্টের চাকরি করতে গিয়েও ওটা অক্ষত রাখতে পারলাম না। একটা গোলমেলে ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ে কেলেঙ্কারির ভয়ে পালিয়ে এলাম। উপরওলা জানতে পেরে দূর করে তাড়িয়ে দিলে। এখন বেশ আছি মশাই।'

দেখলাম ভদ্রলোক বেশ নারভাস হয়ে পড়েছেন, 'এরকম একটা উত্তর উনি আশাই করতে পারেন নি। আমি তখন মরীয়া, মাথায় খুন চেপে গেছে। বললাম—'এত সব খবর রাখেন আর এটা রাখেন না যে, যাদের অনুকরণ করে আমরা বেঁচে আছি, বিশেষ করে ঐ বায়োস্কোপ থিয়েটারে, তাদের দেশে নামকরা অভিনেতা অভিনেত্রীদের 'স্যার' প্রভৃতি সম্মানজনক উপাধিতে ভূষিত করা হয়? এমন কি রাজা রাণীও তাদের নেমন্তন্ন করে এক টেবিলে পাশে বসে খানা খেতে ইতস্তত করেন না?'

একটু আগে অবাক হয়ে যে হাঁ করেছিলেন, দেখলাম সেটি বন্ধ করতে ভুলে গিয়ে অমরেশবাবু ঠায় তেমনি আমার দিকে চেয়ে বসে আছেন। হাসি পাচ্ছিল, কষ্টে চেপে বললাম—'আজ দুজন শিক্ষিত গুণী লোক বায়োস্কোপ করতে নেমেছে শুনেই নাক সিঁটকাচ্ছেন। কিন্তু যেদিন ঐ দুয়ের সংখ্যা দুশোয় দাঁড়াবে সেদিন এতখানি তাচ্ছিল্যের সঙ্গে তাঁদের সম্বন্ধে কথা কইতে আপনার রুচিতে বাধবে।'

উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে অমরেশবাবু বললেন—'কখনই না। বায়োস্কোপ থিয়েটারের লোক কোনও-দিনই কারও সম্মান পাবে না। আর ঐসব চরিত্রহীনদের জীবনের মূল্যই বা কি?'

রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্ছিল। আস্তে আস্তে উঠে অমরেশবাবুর মুখের দিকে চেয়ে বললাম—'একটু আছে। বায়োস্কোপ থিয়েটারের লোক হলেই চরিত্রহীন হবে কি হবে না এ নিয়ে আপনার মত লোকের কাছে তর্ক করা বৃথা। আর সে প্রবৃত্তিও আমার নেই। শুধু একটা কথা বলে যাচ্ছি। পৃথিবীতে মানুষের খোলস নিয়ে জন্মে শেয়াল কুকুরের মত কত অগুনতি জানোয়ার খেয়ে দেয়ে বংশ বৃদ্ধি করে সবার অগোচরে রোজ টুপ টাপ করে

মরে যাচ্ছে—তাতে হচ্ছে কি? ঐ অসংখ্য চরিত্রবান জীবগুলোকে মনেই বা রাখছে কে? আপনার কথাই ধরুন। ভগবান না করুন, কাল যদি হঠাৎ হার্টফেল করে আপনি মারা যান—দোর বন্ধ করে কাঁদবে আপনার একপাল মেয়ে আর স্ত্রী। ব্যস চুকে গেল। আর এদিকে দেখুন কাল যদি শিশির ভাদুড়ী কিংবা নরেশ মিত্তির এমন কি কালকা যোগী আমিই হঠাৎ মরে যাই, খবরের কাগজগুলোয় খুব ছোট্ট করে হলেও খবরটা বেরুবে, আর খুব কম করেও অন্তত দুশো লোক শ্মশানে গিয়ে এইসব চরিত্রহীনের উদ্দেশে সমবেদনার এক ফোঁটা চোখের জল নয়তো একটা মৌখিক আহা অন্তত বলে আসবে। এইটেই কি কম লাভ?

দেখলাম রাগে সর্বাঙ্গ কাঁপছে অমরেশবাবুর। চেষ্টা করেও কথা কইতে পারছেন না। শুনেছিলাম পূর্ববঙ্গে বাড়ি, বহুদিন এদেশে আছেন বলে কথাবার্তায় কিছুই ধরা যায় না। শুধু উত্তেজিত হয়ে উঠলে বা রাগলে দু'একটা দেশের কথা বেরিয়ে পড়ে। প্রাণপণে নিজেকে সংযত করবার চেষ্টা করেও পারলেন না, রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন,—'বোঝলাম, আপনি এখন যাইতে পারেন।'

বিজয়ী সেনাপতির মত হেসে নমস্কার করে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। অনেকদিনবাদে মনটা হাল্কা হয়ে গেল। আনন্দাতিশয্যে নগদ তিন আনা খরচা করে চড়কডাঙার মোড়ে লক্ষ্মীর চায়ের দোকানে ঢুকে এক আনার একটা বড় মটন চপ আর দু' আনার একটা ডিমের ডেভিল খেয়ে ফেললাম।

দিন তিনেক বাদে একদিন সকালে উঠে অবাক হয়ে দেখলাম অমরেশবাবুর জানালা দরজা সব বন্ধ। ব্যাপার কি? বাড়িওলার কাছে শুনলাম আট মাসের বাড়িভাড়া মেরে দিয়ে ভদ্রলোক রাতারাতি অমূল্য সম্পদ বাঁচাতে অজ্ঞাতবাসে চলে গেছেন।

খুব খুশী হতে পারলাম না, হাজার হোক এতদিনের অভ্যাসটা!

শনিবার সকাল সকাল খেয়ে কাপড়-চোপড় পরে তৈরী হয়ে রইলাম। আজ 'কাল-পরিণয়' ছবির কোর্ট সিনটা নেওয়া হবে। এইটেই শেষ শুটিং। বেশ একটু বেলায় গাড়ি নিয়ে এল মুখার্জি, এসেই হতাশভাবে বললে—'নাঃ হোলো না।'

—'কি হোলো না?'

—'আলিপুর কোর্ট থেকে আসছি। অনেক চেষ্টা করে দেখলাম কোর্টের ভিতর রিফ্লেক্টার ও তিন চারখানা বড় আয়না দিয়েও আলো ঢোকানো গেল না।'

বললাম—'তা হ'লে উপায়?'

বিজ্ঞের হাসি হেসে মুখার্জি বললে—'উপায় একটা করেছি বৈকি! আমার আগেই সন্দেহ ছিল, সেইজন্যে খরবুজ মিস্ত্রিকে সঙ্গে করে তিন চারদিন আগে আলিপুরে আদালত ঘুরিয়ে নিয়ে এসেছি। সে তৈরি করেছে কাঠের ফ্রেম আর তার উপর কাপড় এ'টে রং লাগিয়েছেন দীনশা ইরাণী। কাল সারাদিন ধরে সিনটা ফিট করেছি। চল দেখবে। সিনটা দেখলেই মনে হবে আলিপুরের ম্যাজিস্ট্রেটের বিচারকক্ষটি কে যেন আলাদিনের মত স্রেফ তুলে এনে বসিয়ে দিয়েছে ম্যাডানের সিমেণ্ট করা ফ্লোরটার উপর।'

দীনশা ইরাণী, বর্তমান ইন্দ্রপুরী স্টুডিওর নামকরা রেকর্ডার জে ডি ইরাণীর পিতা। তখনকার দিনে উনি ছিলেন ম্যাডানের এক্সক্লুসিভ 'আর্ট' ডাইরেক্টর ও পেণ্টার। কোরিন্থিয়ান থিয়েটারের ও স্টুডিওর যাবতীয় সিন-সিনারি ও'রই নিজস্ব তত্ত্বাবধানে তৈরি হত।

স্টুডিওতে পেঁাছে তাড়াতাড়ি মেক

আপ রুমের দিকে চলে গেলাম। টালিগঞ্জ ট্রাম ডিপোর পিছনে রেলিং-এর গা ঘেঁসে যে ছোট্ট লাল রঙের ঘরখানা দেখা যায় সেইটেই ছিল তখন সবেধন নীলমণি মেক আপ রুম। বর্তমানে ওটাকে ইলেক্‌ট্রিক জেনারেটিং রুম করে ব্যবহার করা হয়।

মেক-আপ রুমে তিল ধরনের স্থান নেই। সাদা প্যাণ্ট আর কালো কোট গিসগিস করছে। মুখার্জি এসে ব'লে দিলে—'কোনও রঙ্‌ নয়, শুধু পাউডার আর কালো পেনসিল দিয়ে চোখ ভুরু এঁকে ছেড়ে দাও।'

এখানে বলা দরকার মাস দুই থেকে মেক-আপের জিনিসপত্তরও বদলে গেছে। সবেদা পিউড়ির পরিবর্তে চালু হয়েছে জার্মানির লিচ্‌নার কোম্পানীর স্টিক পেণ্ট, গায়ের রঙ অনুসারে শেড্‌ নম্বর দেওয়া। কাজল দিয়ে চোখ ভুরু আর আঁকতে হয় না এসেছে কালো পেনসিল। আলতার স্থান অধিকার করেছে লিপ্‌-স্টিক। প্রথম প্রথম ভয়ানক অসুবিধা হত, পরে অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল।

আমার ওসব বালাই ছিল না। তিন চারদিন না কামানো খোঁচা খোঁচা দাড়িতে ভুসো কালি মাখিয়ে ঘন করে নিলাম যাতে আগের সিনের সঙ্গে কণ্টিনিউইটি ব্যাহত না হয়। তেল-না-মাখা রুক্ষ চুলগুলো ফাঁপিয়ে আরও উসকো-খুস্‌কো করে নিলাম। তারপর রাজবেশ, সেই ছেঁড়া তালি দেওয়া কোটটি আর শতছিন্ন ময়লা কাপড়।

পোশাক পরে ভুসো কালি আঙুলে করে চোখের নীচেটায় লাগাতে যাচ্ছি, কানের কাছে মুখ এনে ফিস্‌ ফিস্‌ করে মুখার্জি বললে—'এদের মধ্যে বেশীর ভাগই সত্যিকারের উকিল। আলিপুরে বটতলা থেকে ধরে এনেছি।'

চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করলাম—'কত দিতে হবে?'

'এক পয়সাও না। ছবিতে নামছে এই ঢের। আবার পয়সা?' উকিলদের আর একবার তাড়া দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল মুখার্জি।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই শুটিং শুরু হ'ল, প্রথমে নেওয়া হ'ল একটা লঙ্‌ শট কোর্টের অ্যাটমস্‌ফেয়ারের জন্যে। তারপর সব ক্লোজ শটে নেওয়া হল—আমার, নরেশদার ও হাকিমের সিন-গুলো। পাঁচটার মধ্যেই শুটিং শেষ হয়ে গেল।

পরদিন ঘুম থেকে উঠে ক্যালেণ্ডারের দিকে চেয়ে মনে করতে হ'ল না যে, আজ আমার বহু আকাঙ্ক্ষিত রবিবার। দাড়ি কামিয়ে, মাথায় বেশ করে তেল মেখে, সাবান দিয়ে স্নান করে খেয়ে দেয়ে বারোটার আগেই রওনা হয়ে পড়লাম খিদিরপুরে। রিনিদের বাইরের দরজার কড়া নাড়তে না নাড়তেই দরজাটা খুলে গেল। সামনে বিষাক্ত সাপ দেখলে যে অবস্থা হয় ঠিক তেমনিভাবে এক পা পেছু হটে সবাক বিস্ময়ে হাঁ করে চেয়ে রইলাম।

দরজা খুলে সামনে দাঁড়িয়ে হাসছে রিনি নয়,—রায় বাহাদুরের মেয়ে গোপা!

(ক্রমশ)

ঝাঁসীর রানী ০ মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য

বণিকদের মানদণ্ড এক শতক পূর্ণ হতে না হতেই রাজদণ্ড হয়ে দেখা দিয়েছিল ভারতবর্ষে। মাত্র এক শতকের কথা। কিন্তু আজই মনে হয়, রূপকথার কল্পলোকে নির্বাসিত সেই যুগ। কলকাতার বুকে গড়ে উঠছে ইমারত। রেল গাড়ি নাকি চলেছে কোথায় যেন, কে তার খবর রাখে। শামলা এঁটে, চোগা-চাপকান পরে মাথায় পাগ্ বসিয়ে বাঙালী বাবুরা পাল্কি চড়ে ইংরেজী শিখতে যাচ্ছেন বটে, কিন্তু এসব কলকাতার কথা। ভারতবর্ষের আর সর্বত্র তখনো ঘোড়া চড়ে সাজপোশাক পরে সওয়ারী চলে, হাতীর পিঠে হাওদা দিয়ে রাজারাজড়ারা শোভা দেখিয়ে বেড়ান, উটের পিঠে সওদা নিয়ে দেশে দেশে ঘোরে সদাগর আর মাঠে মাঠে দেখ গিয়ে কিষাণ কিষাণী মান্ধাতার আমলের লাঙলখানা ঠেলছেই, ঠেলছেই। এ বছর বিষ্টি হবে নাকি? তাহলে মকাই, গেঁহুর কিছু আশা আছে, নয়তো শুকিয়ে মরতে হবে। লেখাপড়া শিখবে নাকি ছেলে? ভোরবেলা মুখস্ত করো, বলো বলো 'আলিফ বে পে'! শহর ফেরত কোন ফৌজী সিপাহী বলছিল যেন কলকাতায় মড়া কাটবার কলেজ বসিয়েছে কোম্পানী? কত গল্পই যে রটে!

ঝাঁসীতেও নিত্য দিনক্রম সেই ছন্দেই চলছিল রাণীর। ডালহৌসী ফিরবেন অযোধ্যা থেকে, তবে ঝাঁসীর ভাগ্য সম্বন্ধে জানা যাবে।

কোম্পানীর অনুগ্রহে যেসব রাজ্যের উৎপত্তি হয়েছিল, সেইসব রাজ্যের রাজারা অপুত্রক হলে মৃত্যুর পর তাঁদের রাজ্য কোম্পানীর অধিকারভুক্ত হত। ইংরেজ সরকারের অনুমোদন ছাড়া আশ্রিত রাজ্যের শাসকরা, দত্তক পুত্রকে রাজ্যাধিকার দিতে পারবেন না, রাজ্য নেবে ইংরেজ সরকার, এই হচ্ছে সুবিখ্যাত স্বত্ববিলোপ নীতি অথবা Doctrine of Lapse.

ডালহৌসী বিভিন্ন ভারতীয় রাজ্যের ক্ষেত্রে এই নীতি কাজে লাগিয়েছিলেন। বিঠুরে নির্বাসিত পেশবা দ্বিতীয় বাজীরাও-এর দত্তক পুত্র নানা সাহেব একজন ভুক্তভোগী। পেশবার আট লক্ষ টাকা বার্ষিক বৃত্তি নানাসাহেবের ক্ষেত্রে স্বীকার না করে ডালহৌসী পরোক্ষে বাজীরাওয়ের দত্তককেই উপেক্ষা করেছিলেন।

এইসব দৃষ্টান্ত দেখে সশঙ্কিত চিত্ত লক্ষ্মীবাঈ একটি আবেদন পাঠাবার সংকল্প করলেন। ইংরেজ সরকারের সাহায্য ও অনুমোদন ব্যতীত তাঁর অবস্থা একান্ত অরক্ষিত। তিনি রাজ পরিবারের কন্যা নয়। প্রতিপত্তিশালী পিতৃকুলের কাছ থেকে সাহায্য পাবার আশা তাঁর নেই। পতিকুলে গঙ্গাধর রাওয়ের মৃত্যুর পর থেকে তাঁর শত্রুর অভাব নেই। তাঁর শ্বশুর শিবরাও ভাওয়ের কাকা সদাশিব পন্থের প্রপৌত্র গঙ্গাধর রাওয়ের জ্ঞাতি ভ্রাতুষ্পুত্র সদাশিব রাও, সিংহাসনের উপর তাঁর দাবী জানাতে পারেন। প্রতিবেশী রাজ্য দতিয়া ও অরছা ঝাঁসীর শত্রু। ৩-১২-১৮৫৩ তারিখে তিনি একখানি খরীতা পাঠালেন কলকাতায়। লিখলেন, 'আমার স্বামী ১৯-১১-১৮৫৩ তারিখ সন্ধ্যাবেলা দেওয়ান, নরসিংহ, রাও আপ্পা, লালা লাহোরী মল্ল, লালা ভাট্টচান্দ এবং আমাকে ডাকলেন। নিজের অবস্থা উত্তরোত্তর অবনতির দিকে চলেছে বলে শাস্ত্র দেখে তাঁর স্বীয় 'গোত' (বংশ, গোত্র) থেকে একটি সুলক্ষণ শিশুকে তাঁর অবর্তমানে ঝাঁসীর সিংহাসনে বসাবার জন্য নির্বাচিত করতে বললেন।

রামচাঁদ বাবার [illegible]

পূত্রে আনন্দ রাওকে দত্তক ধার্য করা হল।

আমার স্বামীর আদেশে ২০-১১-১৮৫৩ তারিখে পণ্ডিত বিনায়ক রাও শাস্ত্রানুযায়ী সঙ্কল্প করলেন। যথাবিধি অনুষ্ঠানের পর বাসুদেব আমার স্বামীর হাতে জল ঢেলে দিলেন।

২১-১১-১৮৫৩ তারিখে আমার স্বামীর মৃত্যু হয়। আনন্দরাও শোককৃত্য সমাপন করেছে। আমার বিপন্ন অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করে আপনি আমার স্বামীর অন্তিম ইচ্ছা পূর্ণ করুন, এই সনির্বন্ধ অনুরোধ।'

রাণী এই চিঠিতে সীলমোহর দিলেন। এলিসসাহেব ফার্সি ভাষায় লেখা এই চিঠিটিকে ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়ে ম্যালকমকে পাঠালেন। ম্যালকম তখন ভীলসিয়া ক্যাম্পে। ১৪-১২-১৮৫৩ তারিখে চিঠি পেঁছিল তাঁর কাছে। ১৫-১২-১৮৫৩ তারিখে তিনি সেই চিঠি এবং ঝাঁসীর নেবালকর বংশের একটি তালিকা জে পি গ্র্যাণ্ট মারফত ডালহৌসীর কাছে পাঠালেন।

ইতিমধ্যে পারোলা থেকে সদাশিব রাও এবং সাগর থেকে কৃষ্ণ রাও তাঁদের দাবী জানালেন এলিসের কাছে। এই কৃষ্ণরাও হচ্ছেন মৃত রাজা রামচন্দ্র

রাওয়ের তথাকথিক দত্তক পুত্র। সম্পর্কে তাঁর স্বীয় ভগ্নীপুত্র। এলিস দুইখানি দাবীপত্র পড়ে, ম্যালকমকে জানালেন—

"ঝাঁসী,
১৪-১২-১৮৫৩
কৃষ্ণরাও এবং সদাসিব রাও, এই দুইজনের চিঠি পাওয়া গেছে। সদাসিব রাওয়ের দাবী সম্পূর্ণ নাকচ করা যায়, যে হেতু গত দুইবারই তাই করা হয়েছে।"

ম্যালকম তা ভাবতেন না। হাজার হলেও সদাশিব রাও গঙ্গাধর রাওয়ের জ্ঞাতি। রামচন্দ্র রাওয়ের বিধবা পত্নী কৃষ্ণ রাওয়ের চেয়ে সদাশিব রাওকে সিংহাসন দিতে উৎসুক ছিলেন। তিনি গ্রান্টকে লিখলেন—

"দুইজন দাবীদার উপস্থিত হয়েছে। কিষেণ রাও এবং দাক্ষিণাত্য থেকে সদাসিবরাও নারায়ণ। প্রথমজন, ১৮৩৫ সালে মৃত রামচন্দ্ররাওয়ের ভাগিনেয়। সেই সময় সে দাবী জানিয়েছিল, সেই দাবী প্রত্যাখ্যাত হয়।

সদাসিবরাওয়ের দাবীও ১৮৩৫ ও ১৮৩৮ সালে প্রত্যাখ্যাত হয়। গঙ্গাধর রাওয়ের যে সব জীবিত জ্ঞাতি বর্তমান, তাদের মধ্যে সে-ই নিকটতম। তার দাবীও ভিত্তিহীন নয়।

স্বাক্ষর
ডি এ ম্যালকম,
৩১-১২-১৮৫৩,

এইসব চিঠিপত্র যখন চলেছে, তখন এলিস নিত্য সাক্ষাৎ করতেন রাণীর সঙ্গে। মহারাষ্ট্রে রমণীদের স্বাধীনতা চিরদিনের। তবু রাজ পরিবারের মর্যাদা রেখে একখানি চিকণ চিক আড়াল দিয়ে বসতেন রাণী দরবার ঘরে। এলিসের সঙ্গে কথাবার্তা চলত তাঁর। সম্ভবত তাঁরা হিন্দীতে কথা বলতেন, কেননা রাণী খুব ভাল হিন্দী জানতেন। রাণীর তীক্ষ্ম বুদ্ধি, ব্যক্তিত্ব এবং চরিত্রের তেজস্বিতা দেখে এলিস শ্রদ্ধান্বিত হয়ে উঠলেন। তিনি এদেশে এসেছেন ইংরেজ সরকারের হয়ে উপনিবেশ সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য হাজার জনের একজন হয়ে একথা সত্য। কিন্তু তিনি শুধু একটি সংখ্যা মাত্র নন, তিনি মানুষ। একান্ত মানবিক সত্তা তাঁর সংবেদনশীল হয়ে উঠল। দত্তক পুত্রকে রাজ্যাধিকারী করবার অধিকার যে রাণীর আছে, সে কথা তিনি স্বীকার করলেন। শুধু স্বীকার করলেন না, ম্যালকমকে সে কথা জানিয়ে লিখলেন—

"ঝাঁসী,
২৪-১২-১৮৫৩,
অরছা রাজ্যের ক্ষেত্রে দত্তক গ্রহণ একদা অনুমোদিত হয়েছিল। ঝাঁসীর বেলায় তা কেন হবেনা এ আমার বোধাতীত। কোর্ট অফ্ ডিরেক্টরস্ অফ্ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নয়নম্বর ডেস্‌প্যাচ এর (The Despatch No 9, of Court of Directors of East India Company), ১৬ এবং ১৭ নম্বর প্রকরণে, ভারতীয় রাজাগুলির দত্তক গ্রহণের ক্ষমতা তো খোলাখুলি ভাবেই স্বীকৃত হয়েছে। আমার মনে হয়, ঝাঁসীর দত্তক গ্রহণের অধিকার নাকচ করা অন্যায় হবে।"

তারপরে এক শতাব্দী বিগত। কোমল হৃদয়, পরদুঃখ কাতর এলিস, একটি ভারতীয়া রমণীর দুঃখে কাতর হয়ে ডালহৌসীর সম্ভাব্য মনোভাব জানা সত্ত্বেও তাঁর মতামত জানাতে দ্বিধা বোধ করেননি। সেদিনকার ইংরেজ কর্মচারীর পক্ষে সে-কাজ কতখান দুঃসাহসিক হয়েছিল, চিন্তা করলে আজও এলিসের প্রতি শ্রদ্ধা হয়।

ম্যালকম কোন মন্তব্য না করেই সেই চিঠি পাঠিয়ে দিলেন গ্র্যাণ্টকে ১৩-১-১৮৫৪ তারিখে।

দিনের পর দিন চলেছে, কলকাতার কোন সাড়া শব্দ নেই। অতএব ১৬-২-১৮৫৪ তারিখে রাণী একখানি মস্ত খরীতা পাঠালেন। লিখলেন-–

ঝাঁসীর পরলোকগত মহারাজা গঙ্গাধর রাওয়ে বিধবা পত্নী মহারাণী লক্ষ্মীবাঈ কর্তৃক মার্কুইস অফ ডালহৌসী ভারতবর্ষের গবর্নর জেনারেল মহাশয়ের প্রতি উদ্দিষ্ট।

যথাবিহিত সম্মানান্তেঃ
আকস্মিক দুর্ভাগ্যের আঘাতে শোকাকুল হওয়াতে আপনাকে ৩-১২-১৮৫৩ তারিখে যে চিঠি লিখেছি, তাতে আমার স্বামীর দত্তক গ্রহণের কারণ বিশদ করে লেখা হয়নি। ত্রুটির জন্য আমি মার্জনা চাইছি।

আমার শ্বশুর শিবরাও ভাওয়ের

পুত্র আনন্দ রাওকে দত্তক ধার্য করা হল।

আমার স্বামীর আদেশে ২০-১১-১৮৫৩ তারিখে পণ্ডিত বিনায়ক রাও শাস্ত্রানুযায়ী সংকল্প করলেন। যথাবিধি অনুষ্ঠানের পর বাসুদেব আমার স্বামীর হাতে জল ঢেলে দিলেন।

২১-১১-১৮৫৩ তারিখে আমার স্বামীর মৃত্যু হয়। আনন্দরাও শেষকৃত্য সমাপন করেছে। আমার বিপন্ন অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করে আপনি আমার স্বামীর অন্তিম ইচ্ছা পূর্ণ করুন, এই সনির্বন্ধ অনুরোধ।'

রাণী এই চিঠিতে সীলমোহর দিলেন। এলিসসাহেব ফার্সি ভাষায় লেখা এই চিঠিটিকে ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়ে ম্যালকমকে পাঠালেন। ম্যালকম তখন ভীলসিয়া ক্যাম্পে। ১৪-১২-১৮৫৩ তারিখে চিঠি পৌঁছল তাঁর কাছে। ১৫-১২-১৮৫৩ তারিখে তিনি সেই চিঠি এবং ঝাঁসীর নেবালকর বংশের একটি তালিকা জে পি গ্র্যাণ্ট মারফত ডালহৌসীর কাছে পাঠালেন।

ইতিমধ্যে পারোলা থেকে সদাশিব রাও এবং সাগর থেকে কৃষ্ণ রাও তাঁদের দাবী জানালেন এলিসের কাছে। এই কৃষ্ণরাও হচ্ছেন মৃত রাজা রামচন্দ্র

রাওয়ের তথাকথিক দত্তক পুত্র। সম্পর্কে তাঁর স্বীয় ভগ্নীপুত্র। এলিস দুইখানি দাবীপত্র পড়ে, ম্যালকমকে জানালেন—

"ঝাঁসী,
১৪-১২-১৮৫৩
কৃষ্ণরাও এবং সদাসিব রাও, এই দুইজনের চিঠি পাওয়া গেছে। সদাসিব রাওয়ের দাবী সম্পূর্ণ নাকচ করা যায়, যে হেতু গত দুইবারই তাই করা হয়েছে।"

ম্যালকম তা ভাবতেন না। হাজার হলেও সদাশিব রাও গঙ্গাধর রাওয়ের জ্ঞাতি। রামচন্দ্র রাওয়ের বিধবা পত্নী কৃষ্ণ রাওয়ের চেয়ে সদাশিব রাওকে সিংহাসন দিতে উৎসুক ছিলেন। তিনি গ্র্যান্টকে লিখলেন—

"দুইজন দাবীদার উপস্থিত হয়েছে। কিষেণ রাও এবং দাক্ষিণাত্য থেকে সদাসিবরাও নারায়ণ। প্রথমজন, ১৮৩৫ সালে মৃত রামচন্দ্ররাওয়ের ভাগিনেয়। সেই সময় সে দাবী জানিয়েছিল, সেই দাবী প্রত্যাখ্যাত হয়।

সদাসিবরাওয়ের দাবীও ১৮৩৫ ও ১৮৩৮ সালে প্রত্যাখ্যাত হয়। গঙ্গাধর রাওয়ের যে সব জীবিত জ্ঞাতি বর্তমান, তাদের মধ্যে সে-ই নিকটতম। তার দাবীও ভিত্তিহীন নয়।

স্বাক্ষর
ডি এ ম্যালকম,
৩১-১২-১৮৫৩,

এইসব চিঠিপত্র যখন চলেছে, তখন এলিস নিত্য সাক্ষাৎ করতেন রাণীর সঙ্গে। মহারাষ্ট্রে রমণীদের স্বাধীনতা চিরদিনের। তবু রাজ পরিবারের মর্যাদা রেখে একখানি চিকণ চিক আড়াল দিয়ে বসতেন রাণী দরবার ঘরে। এলিসের সঙ্গে কথাবার্তা চলত তাঁর। সম্ভবত তাঁরা হিন্দীতে কথা বলতেন, কেননা রাণী খুব ভাল হিন্দী জানতেন। রাণীর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, ব্যক্তিত্ব এবং চরিত্রের তেজস্বিতা দেখে এলিস শ্রদ্ধান্বিত হয়ে উঠলেন। তিনি এদেশে এসেছেন ইংরেজ সরকারের হয়ে উপনিবেশ সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য হাজার জনের একজন হয়ে একথা সত্য। কিন্তু তিনি শুধু একটি সংখ্যা মাত্র নন, তিনি মানুষ। একান্ত মানবিক সত্তা তাঁর সংবেদনশীল হয়ে উঠল। দত্তক পুত্রকে রাজ্যাধিকারী করবার অধিকার যে রাণীর আছে, সে কথা তিনি স্বীকার করলেন। শুধু স্বীকার করলেন না, ম্যালকমকে সে কথা জানিয়ে লিখলেন—

"ঝাঁসী,
২৪-১২-১৮৫৩,
অরছা রাজ্যের ক্ষেত্রে দত্তক গ্রহণ একদা অনুমোদিত হয়েছিল। ঝাঁসীর বেলায় তা কেন হবে না এ আমার বোধাতীত। কোর্ট অফ্ ডিরেক্টরস্ অফ্ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নয়নম্বর ডেস্প্যাচ এর (The Despatch No 9 of Court of Directors of East India Company), ১৬ এবং ১৭ নম্বর প্রকরণে, ভারতীয় রাজন্যদের দত্তক গ্রহণের ক্ষমতা তো খোলাখুলি ভাবেই স্বীকৃত হয়েছে। আমার মনে হয়, ঝাঁসীর দত্তক গ্রহণের অধিকার নাকচ করা অন্যায় হবে।"

তারপরে এক শতাব্দী বিগত। কোমল হৃদয়, পরদুঃখ কাতর এলিস, একটি ভারতীয়া রমণীর দুঃখে কাতর হয়ে ডালহৌসীর সম্ভাব্য মনোভাব জানা সত্ত্বেও তাঁর মতামত জানাতে দ্বিধা বোধ করেননি। সেদিনকার ইংরেজ কর্মচারীর পক্ষে সে-কাজ কতখানি দুঃসাহসিক হয়েছিল, চিন্তা করলে আজও এলিসের প্রতি শ্রদ্ধা হয়।

ম্যালকম কোন মন্তব্য না করেই সেই চিঠি পাঠিয়ে দিলেন গ্র্যাণ্টকে ১৩-১-১৮৫৪ তারিখে।

দিনের পর দিন চলেছে, কলকাতার কোন সাড়া শব্দ নেই। অতএব ১৬-২-১৮৫৪ তারিখে রাণী একখানি মস্ত খরীতা পাঠালেন। লিখলেন—

ঝাঁসীর পরলোকগত মহারাজা গঙ্গাধর রাওয়ে বিধবা পত্নী মহারাণী লক্ষ্মীবাঈ কর্তৃক মার্কুইস অফ ডালহৌসী ভারতবর্ষের গবর্নর জেনারেল মহাশয়ের প্রতি উদ্দিষ্ট।

যথাবিহিত সম্মানান্তেঃ

আকস্মিক দুর্ভাগ্যের আঘাতে শোকাকুল হওয়াতে আপনাকে ৩-১২-১৮৫৩ তারিখে যে চিঠি লিখেছি, তাতে আমার স্বামীর দত্তক গ্রহণের কারণ বিশদ করে লেখা হয়নি। ত্রুটির জন্য আমি মার্জনা চাইছি।

আমার শ্বশুর শিবরাও ভাওয়ের পরম সৌভাগ্য যে, বুন্দেলখণ্ডের
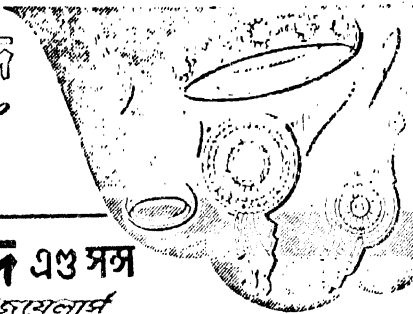
সামন্তদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম বৃটিশ সরকারের প্রতি স্বীয় আনুগত্য দেখাবার সুযোগ পান এবং ক্রমে ক্রমে অন্য প্রধান-দেরও তাঁর আদর্শ অনুসরণ করতে অনুপ্রাণিত করেন। লর্ড লেক (Lake) তাতে সন্তুষ্ট হয়ে আমার শ্বশুর ও তাঁর বংশধররা যাতে উপকৃত হতে পারেন, সেই মর্মের আর্জি সম্বলিত একটি দরখাস্ত করতে বলেন।

সেই আদেশ অনুযায়ী সাতটি প্রকরণ সম্বলিত একটি খরীতা (wajib-ul-urz), বুন্দেলখণ্ডের তৎকালীন রাজনৈতিক প্রতিনিধি ক্যাপ্টেন জন বেইলীর হাতে দেওয়া হয়। সেটি তৎকালীন গবর্নর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলী কর্তৃক ১৮০৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে অনুমোদিত এবং স্বাক্ষরিত হয়। ইতিমধ্যে শিবরাও ভাও সরকারকে আরও সাহায্য করেন। তখন পূর্বতন খরীতাটি বহাল রেখে আরও দুটি নূতন শর্ত যোগ করে, ১৮০৬ সালের অক্টোবর মাসে ক্যাপ্টেন জন বেইলীকে দেওয়া হয়। কোটরার অশ্বারোহী শিবিরে গবর্নর জেনারেল স্যার জর্জ বার্লো সেই খরীতাটিতে স্বাক্ষর করেন। এই দ্বিতীয় খরীতার ষষ্ঠ প্রকরণে শিবরাও ভাও ঝাঁসীর প্রতিবেশী রাজ্য গুলি সম্পর্কে লিখেছিলেন আর্চা, দতিয়া চন্দেরী ও অন্যান্য রাজ্যগুলি ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের আনুগত্য স্বীকারে এবং প্রাপ্য কর দিতে প্রস্তুত আছে, ঝাঁসি স্বরাজ্যে তাদের অধিকার সর্বরকমে স্বীকৃত হয়।

এই প্রকরণটির উপর ভিত্তি করে সরকার একটি বিজ্ঞপ্তি ঘোষণা করেন যে, শিবরাও ভাওয়ের অনুসরণে যে যে ভারতীয় রাজ্য বাধ্যতা ও অনুরক্তি দেখাবে, তাদের সমস্ত রাজনৈতিক অধিকার ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক স্বীকৃত হবে।

১৮১৭ সালে শিবরাও ভাওয়ের পৌত্র রামচন্দ্র রাওয়ের সংগে নবেম্বর মাসে ব্রিটিশ সরকার একটি সন্ধি করেন। তার দ্বিতীয় প্রকরণে রামচন্দ্র রাও তাঁর সন্তান এবং উত্তরাধিকারীদের ঝাঁসীর রাজসিংহাসনের বংশানুক্রমিক শাসক বলে স্বীকার করা হয়। অন্য

শত্রুর আক্রমণ থেকে ঝাঁসীকে রক্ষা করবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়।

১৮২৪ সালে বর্মার যুদ্ধে ব্রিটিশ ফৌজকে খাদ্য সরবরাহকারী রাজারাদের রামচন্দ্র রাও ৭০,০০০ টাকা ধার দেন। বুন্দেলখণ্ডের তৎকালীন রাজনৈতিক প্রতিনিধি এম আইনস্লী (M Ainslie)র মারফতে ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট সেই ধার শোধ করবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে রামচন্দ্রাও তা প্রত্যাখ্যান করেন। এই মিত্রতাদ্যোতক ব্যবহারে সন্তুষ্ট হয়ে তৎকালীন গবর্নর জেনারেল লর্ড আমহার্স্ট রামচন্দ্র রাওকে একখানি ধন্যবাদ জ্ঞাপক খরীতা ও একটি বহুমূল্য পোশাক পাঠান। এই খরীতাটি দুর্ভাগ্যবশত হারিয়ে গেছে। আপনি যদি অনুগ্রহ করে তার একটি অনুলিপি পাঠিয়ে দেন, বাধিত হব।

এর পর ভরতপুর এবং কাল্পীতে নানা পণ্ডিতের হানা দেবার সম্ভাবনায়, জালোনে সিপাহীদের বিদ্রোহের সময়, আইনস্লী, ঝাঁসীর কামদার ভিখাজীনানা কুঁচজেলাকে অরাজকতার হাত থেকে বাঁচাতে বলেন। ভিখাজীনানা ২টি কামান, ৪০০ অশ্বারোহী এবং ১০০০ পদাতিক পাঠিয়ে কুঁচজেলাতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

নাবালক রাজা রামচন্দ্র রাও এবং ভিখাজীনানাকে ধন্যবাদ দিয়ে মিঃ আইনস্লী চিঠি লেখেন। তিনি লেখেন, ব্রিটিশ সরকারের বিপদে সাহায্যের সময় ঝাঁসী রাজ্য সর্বদাই অগ্রগামী। ১৮৩২ সালের ৯ই ডিসেম্বর লর্ড বেণ্টিঙ্ক স্বয়ং ঝাঁসীতে উপস্থিত থেকে রামচন্দ্র রাওকে উপাধি দেন—মহারাজাধিরাজ ফিদ্‌ই বাদশাহ, জানুজা ইংলিস্তান, মহারাজ রামচন্দ্র রাও বাহাদুর।

এই উপাধি রাজার সীলমোহর নাগারা ও চামরের চিহ্নের সঙ্গে খোদাই করে ব্যবহার করতে বলে তিনি বলেন, বুন্দেলখণ্ডের সমগ্র সামন্ত মণ্ডলীর মধ্যে শিবরাও ভাও ব্রিটিশ সরকারের বিশেষ বন্ধুস্থানীয় ছিলেন। বেণ্টিঙ্কের প্রদত্ত এই সম্মান শিবরাও ভাওয়ের আনুগত্যের প্রতিদান মাত্র। সাগরে গিয়ে আর একখানি ধন্যবাদজ্ঞাপক চিঠি, ইংরাজি অক্ষরে সুদৃশ্য সোনালী কাগজে

লিখে রামচন্দ্রকে পাঠিয়েছিলেন বেণ্টিঙ্ক।

রামচন্দ্র রাওয়ের ১৮৩৫ সালে মৃত্যু হয়। তাঁর পিতৃব্য রঘুনাথ রাও রাজা হন। ১৮৩৮ সালে তাঁর মৃত্যু হলে আমার স্বামীর অধিকার স্বীকৃত হয়। তখন রাজ্য ঋণগ্রস্ত ছিল বলে, ক্যাপ্টেন ডি রস (D Ross)এর শাসনাধীনে পাঁচ বছর রাখা হয় এবং তারপর আমার স্বামীকে রাজ্য ফিরিয়ে দেওয়া হয়। ঝাঁসীতে একটি ব্রিটিশ ফৌজ রাখবার জন্য ঝাঁসীর সিক্কা টাকার ২,৫৫,৮৯১ টাকা বার্ষিক আয়ের দুলিও, তালগঞ্জ এবং আরো কয়েকটি জেলা ব্রিটিশ সরকারকে দেওয়া হয়। কর্নেল স্লীম্যান ১-১-১৮৪৩ সালে পূর্বতন শর্ত ও চুক্তিগুলি স্বীকার করেন।

রামচন্দ্র রাওয়ের সঙ্গে অনুষ্ঠিত শর্তের দ্বিতীয় প্রকরণে ব্যবহৃত 'ওয়ারিশান' উত্তরাধিকারী, বংশধর (Heir, Successor etc), এই কথাগুলি যে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে প্রযোজ্য তা অনস্বীকার্য।

'ওয়ারিশান' কথাটি একমাত্র স্বগোত্রীয় উত্তরাধিকারীদের সম্পর্কে প্রযোজ্য। 'জানিশিনান' কথাটি স্ব-বংশ বা গোত্রের উত্তরাধিকারী অভাবে গৃহীত দত্তকদের সম্পর্কে প্রযোজ্য।

কর্তৃপক্ষ এই বংশের প্রতি তাঁদের অনুগ্রহ চিরস্থায়ী করতে চেয়েছিলেন বলেই 'ওয়ারিশান' ও 'জানিশিনান' কথাগুলি ব্যবহার করেছিলেন। শর্তে যে কোনো কথা ব্যবহার করার আগে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করা হয়। শর্তের মত মহামূল্য পত্রে যখন 'জানিশিনান' কথাটি ব্যবহার করা হয়েছিল, তখন কর্তৃপক্ষ কি সে সম্বন্ধে চিন্তা করেননি? ঝাঁসীর রাজবংশকে চিরস্থায়ী করতে চেয়েছিলেন বলেই দত্তক উত্তরাধিকারীর অধিকার কায়েম করে 'জানিশিনান' কথাটি ব্যবহার করেছিলেন।

শর্তটির দ্বিতীয় প্রকরণের এই ব্যাখ্যাটি মনে রেখে আমার স্বামী, তাঁর মৃত্যুর পূর্বদিন প্রত্যূষে মেজর এলিস ও ক্যাপ্টেন মার্টিনকে ডেকে পাঠান এবং অন্তিম নিশ্বাস ত্যাগ করবার প্রাক্কালে তাঁর দত্তকপুত্র আনন্দরাওকে ব্রিটিশ সরকারের নিরাপদ আশ্রয়ে তুলে দেন। সেই সময় একটি খরীতাও তিনি লিখেছিলেন।

আমি কতকগুলি পূর্ববর্তী ঘটনার তালিকা দিচ্ছি, যাতে বুন্দেলখণ্ডের বিভিন্ন ভারতীয় রাজ্যে অপুত্রক অবস্থায় রাজাদের মৃত্যু হলে তাঁদের বিধবা রাণীরা দত্তক গ্রহণে অনুমোদন পেয়েছেন। এই অনুমোদন পেয়েছেন বলে, ব্রিটিশ সরকারের প্রতি তাঁদের আনুগত্যের বন্ধন দৃঢ়তর হয়েছে। তাঁরা সর্বতোভাবে সুখ ও শান্তিতে রয়েছেন।

এইসব দৃষ্টান্ত দেখে আমার মনে হয়, একটু সহানুভূতির সঙ্গে বিচার করলেই আপনি শিবরাও ভাওয়ের বিধবা পুত্রবধূকেও সেই অধিকার দেবেন। তার অসহায় অবস্থার কথা বিবেচনা করবেন।

স্বাক্ষরিত ঃ—সীলমোহর
মহারাণী লক্ষ্মীবাঈ সাহেবা।

স্বাক্ষরিত এবং ইংরাজীতে অনূদিত
আর আর এলিস।

এই খরীতার সঙ্গে আরও চারখানি চিঠি পাঠান হল। সেগুলি খরীতাটির সমর্থনে বিভিন্ন চিঠি। এলিস এবং হেডক্লার্ক জে উইলিয়ামস এই বিরাট খরীতা ও অন্যান্য চিঠিগুলি অনুবাদ করে স্বাক্ষর করলেন। ১৬-২-১৮৫৪ তারিখে এলিস সাহেব ম্যালকমকে রাণীর খরীতার অনুবাদ ও মূল দুই-ই পাঠালেন। ম্যালকম তখন বেওয়াতে। ২৭-২-১৮৫৪ তারিখে চিঠি পেয়ে তিনি জে পি গ্র্যাণ্টকে রাণীর চিঠির মূল ও অনুবাদ সহ এলিসের চিঠি পাঠালেন ২৮-২ তারিখে।

ঘোড়সওয়ার ডাক নিয়ে রওনা দিল কলকাতার দিকে। এখানে রাণী অপেক্ষা করতে লাগলেন উদ্বিগ্ন হৃদয়ে। রাতে ঘুম নেই। দিনে স্বস্তি নেই। বিনিদ্র-রজনী অলিন্দে পায়চারী করেন, আর কখনো এসে নিদ্রিত আনন্দের মুখের দিকে নির্নিমেষ চেয়ে থাকেন। রাজ্যরক্ষার জন্য এই শিশুকে মায়ের কোল থেকে এনেছেন, সে কি একেবারে অনাথ করবার জন্যে?

নিরুত্তর রজনী, নির্বাক নৈশ প্রকৃতি। রুপোর শামাদানে বাতিটি বাড়িয়ে দিলেন রাণী। আনন্দ অন্ধকারে ভয় পায়।

(ক্রমশ)

পেরঁ-র পতন

শ্রীমৃত্যুঞ্জয় রায়

গত ১৬ই জুনের ব্যর্থ সামরিক অভ্যুত্থানের পর স্বীয় শক্তি সম্বন্ধে আর্জেণ্টিনার প্রেসিডেণ্ট জেনারেল পেরঁ যদি আত্মপ্রসাদ বোধ করিয়া থাকেন তবে তা কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নয়। কারণ সেই বিদ্রোহে নৌবাহিনীর সামান্য অংশমাত্র যোগদান করে। দেশের সামরিক ও পুলিস বাহিনীর বৃহদংশ ও মেহনতী জনসাধারণের বিরাট অংশ তাঁকে অকুণ্ঠ সমর্থন করে এবং ঐ বিদ্রোহ দমন করার জন্য সর্বতোভাবে পেরঁ সরকারের প্রচেষ্টাকে সাহায্য করে। ফলে দু'দিনের

প্রেসিডেণ্ট পেরঁ

বেশী সে-বিদ্রোহ স্থায়ী হয় নাই। এই অকুণ্ঠ সমর্থন লাভ করিয়া প্রেসিডেণ্ট পেরঁ যদি নিশ্চিন্ততা অনুভব করিয়া থাকেন তবে তা নিশ্চয়ই নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক নহে। কিন্তু দেখা গেল আসলে তিনি নির্বুদ্ধিতারই পরিচয় দিয়াছেন। কারণ ঐ বিদ্রোহের পর তিন মাসও অতিক্রম করিল না, সামরিক বাহিনী আবার বিদ্রোহ করিল পেরঁ সরকারের বিরুদ্ধে। এবার আর নৌবাহিনীর একাংশ নয়, সমগ্র সামরিক বাহিনীর, যে বাহিনীকে তিনি নিজের হাতে গড়িয়া তুলিয়াছেন, বৃহৎ অংশ সেই বিদ্রোহে যোগদান করিয়াছেন। শুধু তাই নয় সেই বিদ্রোহে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছে র‍্যাডিক্যাল দল ও ভূস্বামিগণ। তা ছাড়া যে শ্রমিকদল ছিল তাঁর অকুণ্ঠ সমর্থক তারাও কেমন যেন দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। সক্রিয় ভাবে বিদ্রোহে যোগদান না করিলেও শ্রমিক সম্প্রদায় পেরঁ সরকারকে তেমনভাবে সাহায্য করিল না। তাহারা অনেকটা নিরপেক্ষ আর নিষ্ক্রিয় দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করিল। ফলে যাহা হইবার তাহাই হইয়াছে। ল্যাটিন আমেরিকার রাজনৈতিক রংগমঞ্চে একটি কর্ণাসাত্মক অভিনয় অভিনীত হইল। বিশ্বের অন্যতম জাঁদরেল ডিক্টেটরের পতন হইল।

গত ১৬ই সেপ্টেম্বর পেরঁ বিরোধী যে সামরিক বিদ্রোহ আরম্ভ হয় তাহার অন্তত সাময়িক অবসান হইয়াছে। পেরঁ সরকার বিনাশর্তে বিদ্রোহী সেনাদলের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। প্রেসিডেণ্ট পেরঁ প্রাণ লইয়া অজ্ঞাত স্থান অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। অনেকের ধারণা তিনি আত্মহত্যা করিয়াছেন। আবার এ গুজবও রটিয়াছে যে প্যারাগুয়েব দূতাবাসের সম্মুখে জনতা তাঁকে গুলী করিয়া হত্যা করিয়াছে। আবার অনেকের বিশ্বাস তিনি বুয়েনোস আয়ার্সের মার্কিন দূতাবাসে আশ্রয় নিয়াছেন। আর বিদ্রোহী দলের নেতা জেনারেল এডয়ার্ডো লোনার্ডি আজ (২৩শে সেপ্টেম্বর) আর্জেণ্টিনার নূতন অস্থায়ী প্রেসিডেণ্ট পদে বৃত হইয়াছেন।

প্রেসিডেণ্ট পেরঁর পতনের সঙ্গে সঙ্গে আর্জেণ্টিনার ডিক্টেটরী শাসন ব্যবস্থার (অবশ্য সেখানে গঠনতন্ত্র আছে, আইনসভা আছে এবং মন্ত্রিসভাও আছে, অর্থাৎ সব ব্যবস্থাই বর্তমান। কিন্তু সেই সব ব্যবস্থার উপরে ছিল প্রেসিডেণ্ট পেরঁর নিজস্ব ইচ্ছা এবং তাই ওখানে আইন)। অবসান হইয়া একটা নূতন অধ্যায়ের সূচনা হইল। নয়াশাসকদের অধীনে আসিয়া আর্জেণ্টিনাবাসীর মঙ্গল হইবে কিনা এখনই তা বলা মুশকিল, কারণ যে রক্তপাত দ্বারা পেরঁ সরকারের পতন ঘটান হইল, তাহা মাটিতেই শুকাইয়া যাইবে না, আরও রক্তপাত অর্থাৎ বিদ্রোহ-বিপ্লব-গৃহযুদ্ধের সূচনা করিবে তাহা অনুমান করা অসম্ভব। অবশ্য আর্জেণ্টিনায় শান্তি একদিন অবশ্যই ফিরিয়া আসিবে কিন্তু তার আগে বেশ কিছুদিন একটা বিশৃংখলা চলিবে এবং সেই সময় আরও রক্তপাত হওয়া সম্ভব।

৫৯ বৎসর বয়স্ক সুন্দর দর্শন জুয়ান

প্রেসিডেণ্ট পেরঁর পত্নী ইভা

ডোমিনিগো পেরঁ বুয়েনোস আয়ার্স প্রদেশের লোবো শহরে ১৮৯৫ খৃস্টাব্দের ৮ই অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন। ইনি মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। বুয়েনোস আয়ার্সের স্কুলে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া পেরঁ ১৯১১ সালে ১৫ বৎসর বয়সের সময় সামরিক শিক্ষালয়ে ভর্তি হন। শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি ১৯৩৯ সালে ইতালী যান সেখানকার সামরিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞানার্জনের জন্য। ইতালীতে তখন মুসোলিনীর দোর্দণ্ডপ্রতাপ। তাঁর এই ডিক্টেটরী শাসন পেরঁকে প্রভাবিত করে (সে জন্যই বোধহয় তাঁর পরিণতিও হইয়াছে হতভাগ্য ডিক্টেটর মুসোলিনীর মত)।

আর্জেণ্টিনার রাজনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়, সেখানে নিয়মতান্ত্রিক পথে রাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট খুব কমই নির্বাচিত হইয়াছেন। প্রেসিডেণ্ট-গণ বেশীর ভাগই হইতেছে সামরিক অফিসার। অর্থাৎ সামরিক অভ্যুত্থানের ফলেই তাঁরা প্রেসিডেণ্টের পদ জোর করিয়া দখল করিয়াছেন। যাহোক, তিনি সক্রিয়ভাবে ঐ প্রকার অভ্যুত্থানের ষড়যন্ত্রে যোগদান করেন ১৯৪৩ সাল হইতে। তবে তিনি তখনও সম্মুখে আসেন নাই। পশ্চাতে থেকেই ঐ সব বিদ্রোহে শক্তি জোগাইতেন।

দ্বিতীয় মহাসমরের সময় সমগ্র আর্জেণ্টিনা মিত্রপক্ষ সমর্থক ও চক্রপক্ষ সমর্থক—এই দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। পেরঁ সমর্থন করিতে থাকেন জেনারেল জিসাস্ এডেলমিরো ফ্যারেলকে। তিনি তাঁর পূর্ববর্তী প্রেসিডেণ্ট জেনারেল পেড্রো রামিরেজকে অপসারিত করিয়া প্রেসিডেণ্ট পদ গ্রহণ করেন ১৯৪৪ সালে।

পরে ইনি জেনারেল ফ্যারেল-এর যুদ্ধ ও শ্রমমন্ত্রী নিযুক্ত হন। তাঁকে ভাইস প্রেসিডেণ্টও করা হয়। তাঁর গঠন ক্ষমতা ছিল অনন্যসাধারণ। সহজেই তিনি কারখানা মজুর ও কৃষাণদের মধ্যে প্রচুর জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। তাঁর এই জনপ্রিয়তাকে সামরিক কর্তৃপক্ষ সন্দেহের চক্ষে দেখিতে সুরু করেন।

১৯৪৫ সালের অক্টোবর মাসে তাঁর সমর্থক শ্রমিক ও চাষী শ্রেণী আর্জেণ্টিনার রাজধানীতে এক শোভাযাত্রার আয়োজন করে। ফলে ভীতিবিহ্বল শাসন কর্তৃপক্ষ পেরঁকে বন্দী করিয়া জেলখানায় আটক করিয়া রাখেন। ইহাতে জনসাধারণ যেন ক্ষিপ্ত হইয়া ওঠে। হাজার হাজার কৃষক শ্রমিক তাঁর মুক্তি দাবী করিয়া সভা ও শোভাযাত্রার আয়োজন করে। ফলে কর্তৃপক্ষ পেরঁকে মুক্তি দিতে বাধ্য হন। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইবার পর তিনি ধীরে ধীরে চারিদিকে নিজের প্রভাব বিস্তার করিতে থাকেন এবং কিছুদিনের মধ্যে তিনি কার্যত আর্জেণ্টিনার বেসরকারী ডিক্টেটর হইয়া দাঁড়ান।

পরবর্তী প্রেসিডেণ্ট নির্বাচনে তাঁর প্রার্থীপদ সরকার সমর্থন করে এবং তিনি

১৯৪৬ সালে বহু ভোটে আর্জেণ্টিনার প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হন। তিনি পুনর্বাচিত হন ১৯৫১ সালে। ১৯৪৬ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারী হইতেই আর্জেণ্টিনায় পেরঁ যুগ আরম্ভ হয়।

পেরঁ প্রেসিডেণ্ট হইয়াই দেখিলেন যে, এখানে শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা অর্জনের একমাত্র যন্ত্র হইতেছে সামরিক বাহিনী। ইহারাই অর্থাৎ সামরিক বাহিনীর অফিসারেরাই বিদ্রোহ করিয়া প্রেসিডেণ্টের পদ দখল করিতেছেন। সুতরাং ইহাদের একটি বিপক্ষ শক্তি সৃষ্টি করা দরকার। তা ছাড়া নৌ ও স্থলবাহিনীতে তাঁর শত্রুর অভাব ছিল না। সুতরাং তাড়াতাড়ি তিনি তাঁর গোঁড়া সমর্থক শ্রমশক্তি গড়ে তোলার দিকে মন দিলেন। একাজে তাঁকে প্রভূত সহায়তা করিল তাঁর নববিবাহিত অভিনেত্রী স্ত্রী ইভা ডুয়ার্টি পেরঁ। ইভাকে তিনি গোপনে বিয়ে করেন ১৯৪৫ সালের ২১শে অক্টোবর (এই তাঁর প্রথম বিবাহ নয়। তাঁর প্রথম স্ত্রী ছিলেন একজন মাস্টারনী। তিনি মারা যান ১৯৩৯ সালে)।

যা হোক এখন থেকে পেরঁ ও ইভার কাজ হল মেহনতী জনতাকে তাঁদের পক্ষে আনা। তাঁরা নানাভাবে উহাদের সাহায্য করিতে লাগিলেন, উহাদের অবস্থার উন্নতির জন্য নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করিলেন, আইন করিয়া উহাদের সুখ সুবিধা পাইবার পথ প্রশস্ত করিলেন। তিনি প্রত্যেকটি শ্রমিককে ট্রেড ইউনিয়নপন্থী করিয়া বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা নিয়া বিরাট কনফেডারেশন অব লেবার গড়িয়া তুলিলেন। ইভা তাঁহাদের শিখাইল যে, "যাঁরা জেনারেল পেরঁর বিরোধিতা করিবে তাঁরা সত্যিকারের আর্জেণ্টিনাবাসী নয়"। সমগ্র শ্রমিক সমাজ গোঁড়া পেরঁপন্থী হইয়া উঠিল।

এই নূতন শক্তির সাহায্যে পেরঁ একের পরে একে তাঁর শত্রুদের ঘায়েল করিতে লাগিলেন। আর্জেণ্টিনায় ভূস্বামী ও শিল্পপতিদের যে অসীম ক্ষমতা ছিল তাও তিনি খর্ব করিলেন এবং রাজনৈতিক দলগুলির পরস্পরের বিরোধিতার সুযোগ নিয়া তাহাদের দুর্বল করিয়া ফেলিলেন। এইভাবে তিনি তাঁর শক্তি বাড়াইয়া
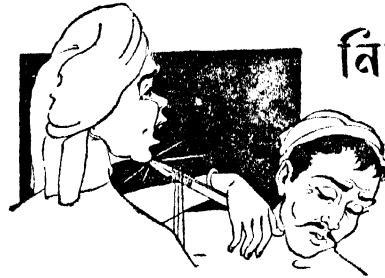
৬

আর্জেণ্টিনাকে শাসন করিতে লাগিলেন।

ডিক্টেটর শাসকের যে সব দোষগুণ সাধারণত থাকে সৈনিক-রাজনৈতিক জুয়ান ডোমিনগো পেরঁ তা থেকে মুক্ত ছিলেন না। তিনি দেশকে ভালবাসিতেন, ভালবাসিতেন তাঁর দেশবাসীকে। তাই দেশের উন্নতির জন্য তিনি চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। তিনি ইংরেজ মালিকদের নিকট হইতে রেলপথ কিনিয়া নেন, টেলিফোন, গ্যাস ও যোগাযোগ ব্যবস্থা রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীনে আনেন, ব্যাঙ্কের পুনর্গঠন করেন, নূতন বিচারক ও শিক্ষক নিযুক্ত করেন এবং নারীকে ভোটাধিকার দেন। তিনি আর্জেণ্টিনার অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে বিপ্লব আনেন। তাঁর শ্লোগান ছিলঃ আর্জেণ্টিনার অর্থনীতি হইবে অন্যভারমুক্ত, ন্যায়পরায়ণতা হইবে সমাজ ব্যবস্থার মূলমন্ত্র এবং রাজনৈতিক দিক হইতে আর্জেণ্টিনা সার্বভৌম শক্তি হইবে।

সমাজ, অর্থনীতি ও রাজনীতি ছাড়া প্রথম শ্রেণীর সামরিক বাহিনী সৃষ্টির দিকেও তাঁর প্রখর নজর ছিল। এবং তারই আপ্রাণ চেষ্টায় আর্জেণ্টিনায় অতীব শক্তিশালী নৌ, বিমান ও স্থল-বাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছে (অদৃষ্টের পরিহাস, এই বাহিনীর হাতে পরাজিত হইয়াই তাহাকে আজ নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা করিতে হইল)।

যাহা হউক, পূর্বেই বলিয়াছি তাঁর শাসন, তথা ডিক্টেটরী শাসন অবিমিশ্র মন্দ বা অবিমিশ্র ভাল নয়। তিনি যেমন দেশের মঙ্গল সাধন করিয়াছেন, তেমনি মঙ্গল সাধন করিতে গিয়া কতকগুলি অমঙ্গলকেও প্রশ্রয় দিয়াছেন, যেমন আর্জেণ্টিনায় নাগরিকগণের অনেক স্বাধীনতা, যেমন বাক্ স্বাধীনতা, পত্রিকার স্বাধীনতা, ধর্ম সম্পর্কে স্বাধীনতা ও দল গঠনের স্বাধীনতা ইত্যাদি হরণ করিয়াছেন। তাঁর বিরোধী দল তাঁর বিরুদ্ধে স্বজন পোষণ ও দুর্নীতি ব্যবস্থা আশ্রয়দানের যেমন অভিযোগ আনেন তেমনি বলেন যে, জনগণের আর্থিক উন্নতি সাধনের জন্য তিনি যা করিয়াছেন তা অতি সামান্য। তাদের দাবী হইতেছে, শাসনতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা চালু করিতে হইবে, গৃহযুদ্ধের
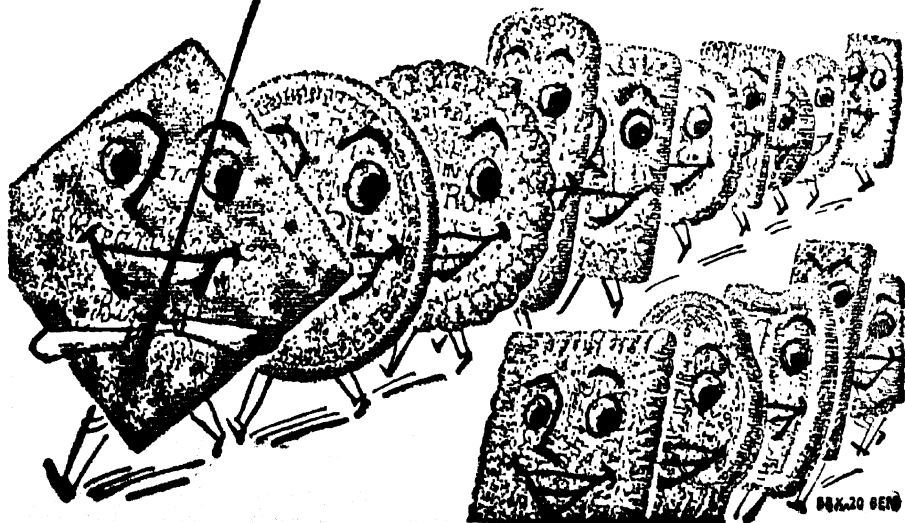
অবসান ঘটাইতে হইবে, যে সব জনপ্রিয় আইন বাতিল করা হইয়াছে তাহা চালু করিতে হইবে এবং সব কয়টি রাজনৈতিক দলের স্বাধীনতা স্বীকার করিতে হইবে এবং প্রেসের ও ধর্মের স্বাধীনতা মানিতে হইবে ইত্যাদি।

ঐসব দাবী পূরণ না হওয়াতেই যে বর্তমান বিদ্রোহ হইয়াছে তাহা মনে করা ভুল। ঐগুলো আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে, তাহার জন্য সামরিক অভ্যুত্থান অসম্ভব। বর্তমান সামরিক অভ্যুত্থানের কারণ ক্যাথলিক চার্চের সঙ্গে পেরঁর বিরোধ (১৭ই আষাঢ় এর 'দেশ' পত্রিকায় এ-সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি)। এই বিরোধ প্রথম উপস্থিত হয় ১৯৫২ সালে ইভার মৃত্যুর পর। তাছাড়া, ভূস্বামীগণের সক্রিয় সাহায্য এই বিদ্রোহকে আরও শক্তিশালী করিয়াছে।

১৬ই জুনের বিদ্রোহ ব্যর্থ যাইবার কারণ, অনেকে মনে করেন, বিদ্রোহ অসময়ে আরম্ভ করা হইয়াছিল অর্থাৎ উপযুক্ত ব্যবস্থা না করিয়াই নৌবাহিনীর একাংশ বিদ্রোহ করিয়া বসে। ফলে পেরঁর বিরোধী অন্যান্য দল সক্রিয়ভাবে বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করিবার পূর্বেই সরকারী বাহিনী বিদ্রোহ দমন করিয়া ফেলে এবং বিদ্রোহীদের অনেককে গ্রেপ্তার করিয়া বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে। ইহার মধ্যে ঐ বিদ্রোহের নেতা রিয়ার এডমিরাল টোরাঞ্জো ক্যালভারো প্রভৃতি ছয়জন রিয়ার এডমির্যাল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন। তাছাড়া, তৎকালীন নৌ দপ্তরের মন্ত্রী এডমির্যাল অলিভিয়ারীও কর্তব্যকার্যে অবহেলার দরুণ ১৮ মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

ইহার পর প্রেসিডেণ্ট পেরঁ কঠিন হস্তে বিদ্রোহীদের সমস্ত ঘাটি নষ্ট করিয়া নিজের ক্ষমতা প্রভাব বৃদ্ধি করিবার দিকে মনোনিবেশ করেন। পরে অবশ্য মনোভাব পরিবর্তন করিয়া বিরোধী দলগুলোর, যেমন র‍্যাডিক্যাল পার্টি প্রভৃতির দিকে সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করেন। কিন্তু বিরোধীরা ইহা তাঁহার রাজনৈতিক চাল বলিয়া উপলব্ধি করিয়া নানাভাবে হাঙ্গামা সৃষ্টি করিতে থাকে। আগস্ট মাসের মাঝামাঝি হইতে বুনোস আয়ার্সের নানাস্থানে ছোটখাট সংঘর্ষ ঘটিতে থাকে। ইতিমধ্যে সরকার পেরঁকে হত্যা করার একটি বিরাট ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন বলিয়া দাবী করেন। এর আগে অবশ্য পেরঁ দেশের শান্তি স্থাপনের আগ্রহে পদত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ইহাও পেরঁর চালবাজি বলিয়া বিরোধীরা উড়াইয়া দেয়।

যাহা হউক, এই অবস্থায় আরও এক মাস চলে। বিদ্রোহী দল ঘাটিগুলি শক্ত করে আক্রমণ শুরু করে। এই আক্রমণের চাপেই প্রেসিডেণ্ট পেরঁকে আর্জেণ্টিনা পরিত্যাগ করিতে হয়। সে কথা পূর্বেই বলিয়াছি। এবার নূতন সামরিক সরকারের অধীনে আর্জেণ্টিনার কি অবস্থা দাঁড়ায় তা দেখা যাক্।

আরও মস্থণ, কমনীয় ত্বক্
দিনে দিনে...
ক্যাডিল্ * যুক্ত রেক্সোনা'কে আপনার অবগুণ্ঠিত রূপকে উন্মোচন করতে দিন
রেক্সোনা'র ক্যাডিল্-সমৃদ্ধ ফেনা আপনার ত্বকে মোলায়েমভাবে রগড়ে নিয়ে ধূয়ে ফেলুন। দেখবেন, আপনার ত্বক্ দিনে দিনে মস্থণতর আর কোমল হয়ে' এক নতুন উজ্জ্বলতর কমনীয়তায় ভরে তুলেছে।
* ত্বক্-পোষক ও কোমলতাপ্রদ্ তৈল সমূহের এক বিশেষ সংমিশ্রণের মালিকানী নাম।
Rexona
রেক্সোনা
ক্যাডিল্‌যুক্ত একমাত্র সাবান
বড় সাইজেও পাওয়া যায়

রামকৃষ্ণ মিশনের প্রসার

শ্রীসরলাবালা সরকার

স্বামী ব্রহ্মানন্দ ইহার পর হইতে তাঁহার জীবিতকাল পর্যন্তই শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সভাপতি ছিলেন। দুই বৎসর সময় পর্যন্ত প্রত্যেক সভাপতির কার্যকাল, ইহার পর আবার প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করা হয়।

১৯০১, ৮ই ফেব্রুয়ারী হাওড়া কোর্টে স্বামীজীর মঠের দেবোত্তর দলিল রেজেস্ট্রী হওয়ার চারদিন পরেই মঠের প্রথম সাধারণ অধিবেশন হয়, সেই অধিবেশনে স্বামীজী স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন।

এই প্রথম অধিবেশন হয় ১৯০১ খৃঃ ১২ই ফেব্রুয়ারী। মঠের দেবোত্তর সম্পত্তির এগারোজন ট্রাস্টির মধ্যে সেদিন আটজন উপস্থিত ও তিনজন অনুপস্থিত ছিলেন। অনুপস্থিত ট্রাস্টিগণের মধ্যে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ তখন মাদ্রাজস্থ রামকৃষ্ণ মিশনের প্রচারকার্যের ভার নিয়া মাদ্রাজে ছিলেন, স্বামী তুরীয়ানন্দ ক্যালিফোর্নিয়ায় নবপ্রতিষ্ঠিত শান্তি আশ্রমে ছিলেন এবং স্বামী অভেদানন্দ যুক্তরাজ্যে বেদান্ত প্রচারকার্যে ছিলেন। আটজন ট্রাস্টি উপস্থিত ছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আদর্শ প্রচারের জন্য যে অপরিসীম যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছেন, এবং তাঁহার ভাব প্রচারের জন্য যাহারা জীবন সমর্পণ করিয়াছেন তাঁহাদের বাসের জন্য একটি স্থান তাঁহারই চেষ্টায় গড়িয়া উঠিয়াছে সেজন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া এই অধিবেশন আরম্ভ করা হয়।

তারপর ট্রাস্ট-ডিড পড়া হইবার পর তাহার মর্মার্থ ট্রাস্টিগণকে বুঝাইয়া দেওয়া হয়। অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন প্রবীণ সাধু অদ্বৈতানন্দ।

ইহার পর সভাপতি নির্বাচন। সভাপতির জন্য তিনটি নাম প্রস্তাব করা হইয়াছিল। (১) স্বামী ব্রহ্মানন্দ, (২) স্বামী সারদানন্দ, (৩) স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ। ভোটের ফল এইরূপ হয়ঃ—

প্রস্তাবিত নাম	পক্ষে	বিপক্ষে
স্বামী ব্রহ্মানন্দ	৫	৩
স্বামী সারদানন্দ	১	৭
স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ	২	৬

ইহার পর স্বামী প্রেমানন্দ প্রস্তাব করেন যে, স্বামী সারদানন্দ সেক্রেটারী এবং স্বামী নির্মলানন্দ অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সেক্রেটারী হইবেন। স্বামী ত্রিগুণাতীত প্রস্তাবটি সমর্থন করেন, এবং সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। কিন্তু স্বামী নির্মলানন্দ কোনরকম পদে থাকিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন।

দ্বিতীয় অধিবেশন হয় ১৯০২ খৃষ্টাব্দে ২২শে জুলাই। স্বামীজীর দেহত্যাগের কয়েকদিন পরেই এই অধিবেশন হয়।

সভাপতি ছিলেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ, এবং উপস্থিত সভ্যগণ, স্বামী সারদানন্দ, স্বামী অদ্বৈতানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী ত্রিগুণাতীত, স্বামী অখণ্ডানন্দ।

অধিবেশনের প্রথম প্রস্তাব ছিল স্বামীজীর প্রাইভেট ফণ্ড, যাহার টাকা সভাপতি ব্রহ্মানন্দ স্বামীর নিকট গচ্ছিত আছে, সেই অর্থের সম্বন্ধে। গভর্নমেণ্ট পেপারে টাকা ছিল ৩৭০০, এবং নগদ ছিল ১৭০০,। দেখা গেল, টাকাটি ঠিকমতই আছে।

প্রস্তাবে বলা হইল যে, স্বামীজীর শেষ ইচ্ছা অনুসারে টাকাটি তাঁহার মাকে দেওয়া হইবে, কিম্বা তাঁহার ইচ্ছানুসারে খরচ করা হইবে।

এ টাকা হইতে বাদ যাইবে

শান্তিরাম ঘোষের কাছে স্বামীজীর ধার	৯,
স্বামীজী তাঁর শিষ্যদের জন্য মশারি কিনিতে দেন	২০,
স্বামী অদ্বৈতানন্দের চোখ অস্ত্র করিবার ফি দেওয়ার জন্য স্বামীজীর নির্দেশ	৩০,
মোট	৫৯, টাকা

দ্বিতীয় প্রস্তাবে বলা হয়, ইউনাইটেড স্টেট নিবাসিনী মিসেস এস সি বুল স্বামীজীকে একটা ৭৫০, টাকার চেক দিয়াছিলেন ১৯০২ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে, মিসেস সি ক্রিয়েনেস্টি-ভ্যালেলের আমেরিকা ফিরিবার জাহাজ ভাড়ার জন্য। জাহাজ ভাড়াটি যদি মিসেস সেভিয়ার কি স্বামীজীর অন্য কোন বন্ধু দিয়া দেন তাহা হইলে ঐ

টাকাটাও স্বামীজীর মাকেই দেওয়া হইবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের হিসাবের প্রণালী ইহা হইতে অনেকটা বুঝা যায়। ঐ টাকা দিয়া পরে ব্রহ্মানন্দ স্বামী স্বামীজীর মাকে তীর্থ করাইয়াছিলেন এবং মামলা মোকদ্দমা করিয়া জ্ঞাতিদের হাত হইতে সমস্ত সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন। এর জন্য তাঁকে অনেক কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল।

স্বামীজী যখন ইউরোপে ছিলেন তাঁহার মার যা কিছু করিবার ব্রহ্মানন্দ স্বামীই করিতেন।

প্রত্যেক ব্যাপারের জন্য আলাদা আলাদা অর্থভাণ্ডার। "শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসব ফাণ্ড", "স্বামীজীর জন্মোৎসব ফাণ্ড" এই দুইই সম্পূর্ণ আলাদা। যে কোন ভক্ত উৎসবের জন্য টাকা দিলে সেটি স্বামীজীর জন্মোৎসব ফণ্ডে জমা হইবে, ঠাকুরের জন্মোৎসব ব্যাপারের সঙ্গে সে টাকার কোন সম্পর্ক থাকিবে না। এ বিষয়ে স্বামীজীর কঠোর নির্দেশ ছিল। তিনি বলিয়াছিলেন, "যদি তোমাকে অনাহারে মরতেও হয়, তবু অন্য বাবদের টাকা থেকে এক পয়সাও খরচ করবে না।"

মঠ আর মিশন দুই আলাদা। তাই যদি কোন ভক্ত প্রণামী দেন বা ঠাকুর-সেবার জন্য টাকা দেন সেটি মঠের অর্থ-ভাণ্ডারে সঞ্চিত হইবে, আর জনসাধারণ জনহিতকর কার্যের জন্য যে টাকা দান করিবে সেটি হইবে মিশনের টাকা। সে টাকার পাই পয়সার হিসাব পর্যন্ত হিসাব-পরীক্ষককে দিয়া মিলাইয়া লইতে হইবে।

স্বামীজীর দেহত্যাগের পর বেলুড় মঠের বিশেষ অর্থকষ্ট হইয়াছিল। সভাপতি স্বামী ব্রহ্মানন্দ কি উপায়ে টাকা সংগৃহীত হইবে দিবারাত্র সেই চিন্তা করিতেন। অবশ্য তাতে তাঁহার সাধন-ভজনের ব্যাঘাত হইত না। এটিও তাঁহার একরকম ভগবৎভজন ছাড়া আর কিছু নয়।

অর্থ-সংগ্রহ না হইলে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রসার হইতে পারে না, আর্ত সেবার কাজ চলিতে পারে না, নূতন নূতন পরিকল্পনাও কার্যে পরিণত হইতে পারে না। এজন্য সকলের আগে চাই অর্থ।

তাই প্রত্যেকটি অধিবেশনেই এই অর্থ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। তৃতীয় অধিবেশন হয় ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের ৭ই মে, এই মে মাসেই আরও তিনটি অধিবেশন হইয়াছিল।

কিন্তু অপূর্ব দক্ষতা ছিল এ বিষয়ে সভাপতি স্বামী ব্রহ্মানন্দের। প্রত্যেক কাজই তিনি সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন।

স্বামীজীর মহাপ্রয়াণের পরই প্রথম যে জন্মতিথি সেই পৌষ কৃষ্ণা সপ্তমীতে স্বামী ব্রহ্মানন্দ দরিদ্রনারায়ণ সেবা করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন।

স্বামীজী গরীব দুঃখীদের খাওয়াইতে বড়ই ভালবাসিতেন। স্বামীজীর জীবনের শেষ সময়ে বেলুড় মঠ পরিষ্কার করিতে যে সব সাঁওতালরা আসিয়াছিল, হুঁকা হাতে করিয়া তাহাদের সহিত তামাক খাইতে খাইতে গল্প আরম্ভ করিতেন। একদিন তাহাদের একজনকে বলিলেন, "হ্যাঁরে, তোরা আমাদের এখানে খাবি?"

সে বলিল, "নারে বাপ্, এখন যে আমাদের বিয়া হইছে, তুদের ছোঁয়া নুন খেলে আমাদের জাত যাবেক।"

"বিয়া হইছে" মানে এখন আমি বিবাহিত। সুতরাং স্বামীজী বলিলেন, "নুন দেওয়া তরকারি খাবি কেন? আলুনি তরকারি, লুচি আর দই মিষ্টি খাবি, তাতে তো জাত যাবে না।" তাহারা রাজী হইল। তখন স্বামীজীর নির্দেশে

আলুনি তরকারি, লুচি ও নানারকম মিষ্টি ও দই দিয়া সেই সব সাঁওতাল ভোজন করানো হইল। স্বামীজী নিজে দাঁড়াইয়া তাহাদের খাওয়ার তদারক করিয়াছিলেন। তাহারা এইসব খাবার খাইয়া খুবই খুশী, "আরে স্বামীজী বাপ্, এমন জিনিসটা তুরা কোথাকে পেলিরে।" আর স্বামীজীও খাওয়াইয়া ততোধিক খুশী, সকলকে ডাকিয়া বলিলেন, "দ্যাখ্ তোরা, জাগ্রত নারায়ণের ভোগ হচ্ছে, দেখে যা।"

রাজা মহারাজের সে সব কথাই মনে ছিল, এতো সেদিনের কথা। স্বামীজীর সম্বন্ধে অনেক পুরানো কথাও তাঁহার মনে গাঁথা হইয়া আছে। রাজা মহারাজ ভোজের ফর্দ করিতে বসিলেন। বলিলেন, "লুচির দরকার নেই, গরিবেরা ভাত-তরকারিই খেতে ভালবাসে। মাছের মুড়ো দিয়ে ডাল রান্না হোক্, মাছ আলু কপি দিয়ে একটা তরকারি আর রাঙা আলুর টক হোক্। আর দৈ আর বোঁদে, এই হলেই হবে।" গোপাল দুলী ঢোল কাঁধে লইয়া বাগী হইতে হাওড়া পর্যন্ত ঢেরা দিয়া দিল। অনেক দূর হইতে অনেক লোক আসিয়াছিল, কিন্তু সকলেই আহারে পরিতৃপ্ত। বেলুড় মঠে এইটিই স্বামীজীর প্রথম জন্মতিথির উৎসব।

স্বামীজী বেলুড় বাদে অন্যত্রও মঠ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, মায়াবতীর মঠও স্বামীজীর ইচ্ছানুসারে স্থাপিত হইয়াছে। কাশীতে অদ্বৈতাশ্রম স্থাপন করিবার চেষ্টা চলিতেছে, সেবাশ্রমও একরকম চলিতেছে, কিন্তু ব্রহ্মানন্দ স্বামী দেখিলেন মিশনের তত্ত্বাবধানের ভিতর না আসিলে কাশী সেবাশ্রম ঠিকমত চলিবে না, তাই সেটির জন্য একটা জমি সংগ্রহের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। কাশী সেবাশ্রম আর অদ্বৈতাশ্রম পাশাপাশি প্রতিষ্ঠিত হইল। সেবাশ্রমে সেবাকার্যের যাঁহারা কর্মী তাঁহারা সেবাশ্রম হইতেই আহার পাইবেন, কিন্তু অদ্বৈত আশ্রম তপস্যা ও সাধনার স্থান, সেখানে যাঁহারা তপস্যা করিতে আসিবেন তাঁহাদের নিজের আহার্য ভিক্ষা করিয়া নিজেদেরই সংগ্রহ করিয়া নিতে হইবে, ইহাই হইল নিয়ম। স্বামী শিবানন্দ সেখানে অধ্যক্ষ হইয়া গেলেন, এবং খুবই অর্থকষ্টের মধ্য দিয়া তাঁহাকে চলিতে হইল। ব্রহ্মানন্দ স্বামী অদ্বৈত আশ্রমের যাহাতে একটি অর্থ-ভাণ্ডার হয় সেজন্য কাশী গিয়া গৃহস্থদের বাড়ি বাড়ি অর্থসংগ্রহ করিয়াছিলেন।

কনখলে স্বামীজীর শিষ্য কল্যাণানন্দজী তিনটি চালাঘর তুলিয়া সেই চালাঘরেই অসুস্থ সাধুদের যথাসাধ্য সেবা করিয়াছিলেন। কলিকাতার এক ভদ্রলোক জমি কিনিবার জন্য যে টাকা দিয়াছিলেন (পরে আবার তিনি টাকাটা ফিরাইয়া লইতে চাহিয়াছিলেন) তাহাতে পনেরো বিঘা জমি কেনা হইয়াছিল। দুজন মাড়োয়ারী ভদ্রলোকের অর্থসাহায্যে সেখানে পাকা বাড়ি তোলা হইল। স্বামী বিজ্ঞানানন্দকে রাজা মহারাজ বাড়ি তৈরীর কাজে পাঠাইলেন।

এইভাবে বৃন্দাবনেও সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইল। এই প্রতিষ্ঠানের যিনি ভার লইয়াছিলেন তাঁহার নাম ছিল হরেন্দ্র নাথ। তিনি তখনও সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নাই, ব্রহ্মচারী ছিলেন। ইনি স্বামীজীর বংশের সন্তান, এবং চিকিৎসা সম্বন্ধেও অভিজ্ঞ ছিলেন। বৃন্দাবন সেবাশ্রমে অনেক রোগী আসিতেন, তাঁহাদের ইনি চিকিৎসা করিতেন এবং বৃন্দাবনের অধিবাসিগণের বাড়িতেও চিকিৎসা করিতেন। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে, ১৩ই ডিসেম্বর একটি অধিবেশন হয় সেই অধিবেশনে স্বামী সারদানন্দ তিনজন সাধুর নামে 'মিস্‌কন্‌ডাক্টের' অভিযোগ আনেন। ইহার মধ্যে একজন ব্রহ্মচারী হরেন্দ্রনাথ, অন্যজন উদ্বোধন পত্রিকার ম্যানেজার স্বামী সত্যকাম এবং তৃতীয়জন ক্যালিফোর্নিয়া লস্

এঞ্জেলসের আশ্রমের ভারপ্রাপ্ত স্বামী সচ্চিদানন্দ (নং ২)।

হরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অভিযোগ আসে যে, তিনি চিকিৎসা করিতে যে সব বাড়িতে যাইতেন তাহার এক বাড়ির কোন তরুণী বিধবার প্রেমে পড়িয়া গিয়াছেন। হরেন্দ্রনাথকে ট্রাস্টিগণের সম্মিলিত মতানুসারে বৃন্দাবন হইতে বেলুড় মঠে ফিরিয়া আসিবার আদেশ দেওয়া হইল। কিন্তু তিনি ঐ মেয়েটিকেই বিবাহ করিয়া সংসারী হইলেন।

ইহার কিছুদিন পরে হরেন্দ্রনাথ বেলুড় মঠে একবার স্বামী ব্রহ্মানন্দকে দর্শন করিতে আসেন। বেলুড়ের ঘাটে যখন তিনি নৌকা হইতে নামিতেছেন তখন স্বামী ব্রহ্মানন্দ দোতলা হইতে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া তাঁহার একজন সেবককে তাঁহাকে আনিবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। এবং তিনি যখন উপরে আসিয়া বারান্দায় রাজা মহারাজের পায়ের তলায় উপুড় হইয়া পড়িলেন, রাজা মহারাজ তাঁহাকে তুলিয়া বক্ষে ধারণ করিলেন। গদগদকণ্ঠে বলিলেন, "এতদিন কোথায় ছিলি? একটা চিঠি লিখেও তো বুড়োকে মনে করিস নি?" তখনই তাঁহার জন্য মাছ আনিতে লোক পাঠাইলেন, বলিলেন, "ও বৃন্দাবনে মাছ খেতে পায় না, ওর জন্য ভাল মাছ আন।" হরেন্দ্রনাথের ডাকনাম ছিল 'নাদুবাবু'। রাজা মহারাজ তাঁহার সেই ছেলেবেলার নাম 'নাদু' বলিয়াই ডাকিতেন এবং ইতিমধ্যে এই যে ঘটনাগুলি ঘটিয়া গিয়াছে তাহার কিছুই যেন ঘটে নাই, এইভাবেই তাঁহার সহিত ব্যবহার করিলেন।

ব্রহ্মানন্দ স্বামীর—যখন তিনি 'রাখাল' ছিলেন তখন হইতেই তাঁহার প্রকৃতি এইরূপ ছিল, কাহাকেও তিনি ত্যাগ করিতেন না। বিশেষতঃ হরেন্দ্রনাথের ব্যাপারটিকে তিনি হয়তো দোষ বলিয়াই মনে করেন নাই।

স্বামী সত্যকামও তাঁহার কাছে আশ্রয় চাহিয়াছিলেন। ব্রহ্মানন্দ স্বামী তখন কনখল সেবাশ্রমে ছিলেন, সত্যকামও কাছাকাছি কোন স্থানে ছিলেন, তিনি সেখান হইতে জানাইয়াছিলেন যে, যদি রাজা মহারাজ তাঁহাকে আশ্রয় দান ও ক্ষমা করেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ ক্ষমা করিবেন বলিয়াছিলেন, কিন্তু একটি শর্তে। সে শর্ত এই যে, তিনি বলিয়াছিলেন যে, "সে আশ্রয় পাবে, কিন্তু আমার কাছেই তাকে থাকতে হবে, আমার বিনানুমতিতে একদিনের জন্যও আমার কাছ থেকে অন্য কোথাও যেতে পারবে না।" কিন্তু সত্যকাম এই শর্তে রাজী হইতে পারিলেন না, তিনি হরিদ্বারেই রহিয়া গেলেন। ইহার পর হরিদ্বারের কতকগুলি নাগা সাধুর সঙ্গে মানদের দাঙ্গা বাঁধে, দাঙ্গার পর সাধুরা ফেরারী হইয়া আত্মগোপন থাকেন, সেই সময় সত্যকাম গভ ইন্‌ফরমার হইয়া অনেকগুলি ধরাইয়া দিয়াছিলেন। বস্তুত স্বভাব যথার্থই তেমন সং উদ্বোধনে থাকার সময় শ্রীশ্রীমাও সংশোধন করিতে পারেন নাই।

লস্ অ্যাঞ্জেলসের স্বামী সচ্চি গুরুতর অপরাধে অপরাধী হইয়া তাহাকে ভারতবর্ষে ফিরিয়া আ আদেশ দেওয়া হয় এবং তাঁহাকে মি বহির্ভূত বলিয়া ঘোষণা করা হয়।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ একদিকে স্নেহময়ী জননীর ন্যায় অতি স্বভাবের এবং অপরদিকে ছিলেন শাসক। তাঁহার গাম্ভীর্যের কাছে সাহসীও সহসা অগ্রসর হইয়া কথা বলিতে পারিত না, আবার মত চপলতা ও পরিহাসপটুতা রস পর্যন্তও ছিল। এমন কি শয্যাতেও তিনি সকলের সঙ্গে পরিহাস করেছেন।

প্রথম জীবনে তাঁহার কঠোর তপ পুরাকালের তপস্বীদের তপস্যা সমতুল্য, আবার কর্মজীবনেও তিনি সহস্র কর্মের মধ্যে মাঝে মাঝে একেবা সব ছাড়িয়া তপস্যায় চলিয়া যাইতেন

ঠাকুর তাঁহাকে জন্মগত 'জাপক' বলিয়াছিলেন, সেটি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন অনেকেই; সকল কর্মের মধ্যেই তাঁহার মন যেন দুইভাগে ভাগ হইয়া থাকিত। এক ভাগ একনিষ্ঠ কর্মতাপস, আর এক ভাগ ছিল সর্বদা ভগবৎভাবে নিমগ্ন সাধক।

তিনি বার বার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হইয়া সমস্ত অবশিষ্ট জীবনকাল রামকৃষ্ণ মিশনের প্রেসিডেন্ট ছিলেন, কেবল একবার কোন কারণে যথারীতি প্রেসিডেন্ট নির্বাচন না হওয়াতে বয়ঃজ্যেষ্ঠ সাধু স্বামী অদ্বৈতানন্দ বিনা ভোটেই প্রেসিডেন্ট হন। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে অদ্বৈতানন্দ প্রেসিডেন্ট হন এবং ঐ ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের শেষে ২৮শে নভেম্বরই তিনি দেহত্যাগ করেন, তারপর স্বামী ব্রহ্মানন্দ আবার প্রেসিডেন্ট হন।

তাঁহার শেষবার পুনর্নির্বাচন হয় ১৯২১ খৃষ্টাব্দের ২৪শে মার্চ। এই ১৯২১ খৃষ্টাব্দেই তিনি অনেক জায়গায় ঘুরিয়াছেন। কাশী সেবাশ্রমের বিরোধ ও বিশৃঙ্খলা দূর করিবার জন্য তিনি কাশী গিয়া সেখানে থাকিয়া সেখানকার বিশৃঙ্খলা দূর করেন, সেই বৎসর ঠাকুরের জন্মতিথিতে, স্বামীজীর জন্মতিথিতে এবং নিজের জন্মতিথিতে তিনি অনেককে সন্ন্যাস ও ব্রহ্মচর্য এবং দীক্ষা দিয়াছেন। প্রথম তিন বৎসর তিনি কাহাকেও দীক্ষা বা সন্ন্যাস দেন নাই, কিন্তু জীবনের শেষভাগে তিনি বহুজনকে দীক্ষা ও সন্ন্যাস দিয়াছেন।

ব্রহ্মানন্দ স্বামীর সভাপতিত্বের প্রত্যেকটি বৎসর রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষে এক একটি উন্নতির সোপান। ব্রহ্মানন্দ স্বামী সারদানন্দ স্বামীর সহযোগিতায় উদ্বোধন মঠ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন ১নং মুখার্জি স্ট্রীটে এবং উদ্বোধন পত্রিকার দারুণ অর্থসংকটের মধ্যেও যাহাতে পরিচালনার ব্যাঘাত না হয় সেজন্য চেষ্টা করিয়াছেন। উদ্বোধনের বাড়ি তৈরীর ভার স্বামী সারদানন্দই লইয়াছিলেন। শ্রীশ্রীমাঠাকুরাণী ওখানে থাকিবেন এইজন্য সারদানন্দ ধার করিয়াও বাড়ি করিতে কুণ্ঠিত হন নাই এবং ধার শোধ করিবার ভারও তিনিই লইয়াছিলেন।

উদ্বোধন পত্রিকাখানিই রামকৃষ্ণ মিশনের বাঙলা ভাষায় প্রচার পত্রিকা। স্বামী ত্রিগুণাতীত ক্যালিফোর্নিয়া চলিয়া যাইবার পর দারুণ অর্থাভাবে পত্রিকাখানি উঠিয়া যাইবার উপক্রম করিয়াছিল। স্বামী সারদানন্দ ও স্বামী শুদ্ধানন্দ পত্রিকার ভার লইলেন, কিন্তু আরও দুইজন সহকারীর প্রয়োজন। উদ্বোধন মঠের আর্থিক অবস্থা তখন এতই খারাপ যে, দুইজন কর্মীর আহার দিবার সংগতিও তাঁহাদের নাই। সে সময় বাগবাজার নিবাসী ডাক্তার শশীভূষণ ঘোষ মহাশয় সেই দুইজন কর্মী সাধুর ভার লইয়াছিলেন। পরে এই উদ্বোধন কার্যালয় হইতেই স্বামী সারদানন্দের শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসংগ প্রভৃতি বাঙলা গ্রন্থ এবং স্বামীজীর রচনার অনুবাদ পুস্তকাবলী (স্বামী শুদ্ধানন্দ এই সমস্ত অনুবাদ করিতেন) এবং আরও অনেক বাঙলা বই প্রকাশিত হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন যেভাবে অত্যন্ত আর্থিক অনটনের মধ্য দিয়া ক্রমে বিস্তার লাভ করিয়াছে, উদ্বোধন পত্রিকার প্রাথমিক ইতিহাসে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। স্বামী ত্রিগুণাতীত যখন আমেরিকা যান, তখন উদ্বোধন একেবারেই বন্ধ হইয়া যাইবে এইরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছিল। উদ্বোধনের নিজস্ব আস্তানা ছিল না, ১৪নং রামচন্দ্র মৈত্র লেনের সারদা প্রেস হইতে গিরীন্দ্রমোহন বসাকের তত্ত্বাবধানে পত্রিকাখানি কোন রকমে প্রকাশিত হইতেছিল, তাহার পর উদ্বোধন কার্যালয় ৩০নং বোসপাড়ায় স্থানান্তরিত হয়, ইহার পর ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ১৮ই ডিসেম্বর উদ্বোধন পত্রিকার স্বামী সারদানন্দের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ১নং মুখার্জি লেনে 'মায়ের বাড়ি'তে স্থায়ীভাবে কার্যালয় ও প্রেস স্থাপিত হয়। এবং স্বামী সারদানন্দ তাঁহার পরিচালনা ও প্রবন্ধ সম্ভারে পঞ্চম বর্ষ হইতে পত্রিকাটিকে নূতনভাবে পুনর্গঠন করেন।

১৯১০ খৃষ্টাব্দের ১৩ই ডিসেম্বরের অধিবেশনে স্বামী সারদানন্দ প্রস্তাব করেন যে, ট্রাস্টিগণের সমক্ষে কতকগুলি সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীর নাম তালিকাভুক্ত করা হোক্। নামগুলি এই:—

সন্ন্যাসী সদস্য : নির্মলানন্দ, বিরজানন্দ, কল্যাণানন্দ, প্রকাশানন্দ, পরমানন্দ (কেষ্টন), সাধনানন্দ, অদ্ভুতানন্দ, সত্যকাম, প্রিয়নাথ, পূর্ণানন্দ (মায়াবতী), অম্বিকানন্দ, বিশুদ্ধানন্দ, গিরিজানন্দ, সান্ত্বনানন্দ, নিশ্চয়ানন্দ, সোমানন্দ।

ব্রহ্মচারী সদস্য জ্ঞান, গণেশন, রাসবিহারী, শচীন্দ্রনাথ, কপিল, বিশ্বচৈতন্য, প্রজ্ঞানন্দ (দেবব্রত বসু), প্রকাশ,

যদুনাথ, লালমোহন, রামচন্দ্র, তিনকড়ি, নির্মল, তেজনারায়ণ, রুদ্র চৈতন্য, চন্দ্রনাথ, গুরুদাস (ইনি অ্যামেরিকান), হরেন্দ্রনাথ, জ্ঞানানন্দ, গঙ্গারাম, অতুলকৃষ্ণ।

ব্রহ্মচারীরা প্রায় সকলেই পরে সন্ন্যাস নিয়া অন্য নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

স্থানে স্থানে জনসাধারণও মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, পরে তাহার অনেকগুলি রামকৃষ্ণ মিশনেরই অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে ভুবনেশ্বরের মঠ প্রতিষ্ঠা হয়। স্বামী ব্রহ্মানন্দই এই মঠের প্রতিষ্ঠা করেন।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ মাদ্রাজেই ছিলেন, কিন্তু পীড়িত হইয়া কলিকাতায় আসেন, ১৯১১ খৃষ্টাব্দে আগস্ট মাসে তাঁহার দেহত্যাগ হয়, পীড়িত হইয়া কলিকাতায় তিনি উদ্বোধন মঠেই ছিলেন।

১৯১২ খৃষ্টাব্দে কনখলের সেবাশ্রমে দুর্গাপূজা হয়। সে সময় স্বামী ব্রহ্মানন্দ কনখলে ছিলেন, তিনিই এই দুর্গাপূজা করান।

১৯২২ খৃষ্টাব্দের ১০ই মার্চের অধিবেশনে স্বামী ব্রহ্মানন্দ শেষ সভাপতিত্ব করেন। এই সময় বেলুড় মঠের কিছু ঋণ হইয়াছিল। এই ধার শোধ দেবার জন্য সেবার ১৪টি আশ্রম থেকে এইভাবে টাকা দাবী করা হয়ঃ

১। উদ্বোধন আফিস	...	২০০্
২। গদাধর আশ্রম	...	২০্
৩। মাদ্রাজ মঠ	...	৫০্
৪। ব্যাঙ্গালোর মঠ	...	১০০্
৫। কোয়ালাপুর মঠ	...	৫০্
৬। মায়াবতী আশ্রম	...	২০০্
৭। ঢাকা মঠ	...	৫০্
৮। ভুবনেশ্বর মঠ	...	১০০্
৯। বেনারস অদ্বৈত আশ্রম	...	২০্
১০। এলাহাবাদ মঠ	...	২০্
১১। বিবেকানন্দ আশ্রম	...	১০্
১২। নিউইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটি		৫০০্
১৩। সান ফ্রান্সিসকো বেদান্ত সমিতি	...	৫০০্
১৪। বোস্টন বেদান্ত সমিতি	...	৫০০্

এই প্রতিষ্ঠানগুলি সে সময় রামকৃষ্ণ মঠের অন্তর্ভুক্ত ছিল। স্বামী পরমানন্দের আনন্দ আশ্রম পরে মিশন হইতে পৃথক হইয়া গিয়াছিল।

মিশনের বাহিরের ও ভিতরের যে সব ঝড় ঝাপটা স্বামী ব্রহ্মানন্দকে সহ্য করিতে হইয়াছিল, তাহা এখানে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা সম্ভব নয়, তবে সমস্ত বিষয়ে আলোচনা করিলে একথা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, স্বামী ব্রহ্মানন্দের মত নেতা না থাকিলে হয়তো সে সময় রামকৃষ্ণ মিশনের অস্তিত্বই বিপন্ন হইত।

বহু বিপ্লবী ছেলে মিশনের অনুরাগী হইয়া সেবাকার্য প্রভৃতিতে সাহায্য করিয়াছে। এই সেবাকার্য পরিচালনের ভার প্রধানত স্বামী সারদানন্দের উপরেই ছিল। সেজন্য বিপ্লবী ছেলেদের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠভাবেই মেলামেশা হইত। কোন কোন বিপ্লবী ছেলে রামকৃষ্ণ মিশনের অন্তর্ভুক্ত হইয়া ব্রহ্মচর্য গ্রহণ করিয়াছিল। এদিকে স্বামীজীর গ্রন্থগুলির অনুবাদ উদ্বোধন আফিস হইতে বাহির হইতেছিল এবং সেগুলি বিশেষভাবে জনপ্রিয় হইয়াছিল। এইসব কারণে ইংরাজ গভর্নমেন্টের বিরূপ দৃষ্টি মিশনের উপর পড়িল।

সে সময় স্বামী ব্রহ্মানন্দ কলিকাতায় ছিলেন না, স্বামী সারদানন্দকেই সমস্ত ঝুঁকি ঘাড়ে লইতে হইয়াছিল। [illegible] আন্দোলনের মূলে যে স্বামীজীর প্রভাব বিশেষভাবেই আছে, ইহা গভর্নমেন্ট প্রচারিত অ্যাডমিনস্ট্রেশন রিপোর্টে ঘোষণা করা হইল। তাহাতে লেখা হইল "নরেন্দ্রনাথ দত্ত নামক এক ভদ্রলোকই এই প্রতিক্রিয়ার মস্তিষ্ক।"

নিবেদিতাকেও এই একই কারণে স্বামীজীর দেহত্যাগের পরেই রামকৃষ্ণ মিশনের সহিত সম্পর্ক ত্যাগের ঘোষণা স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকায় বাহির করিতে হইয়াছিল, কেননা হয়তো নিবেদিতার কার্যাবলীতে রামকৃষ্ণ মিশন লিপ্ত হইবে।

শচীন, সতীশ ও প্রাণনাথ এই তিনটি ছেলেকে স্বামী সারদানন্দ আশ্রয় দিয়াছিলেন, দেবব্রতও উদ্বোধন মঠে ছিলেন। ইঁহারা পুলিসের সন্দেহভাজন, পুলিস সব সময় ইঁহাদের উপর নজর রাখিত। ইঁহাদের উপর হইতে পুলিসের নজর দেওয়া যাতে প্রত্যাহার করিয়া লওয়া হয়, তাহার জন্য স্বামী সারদানন্দ মাননীয় পি সি লায়নের সঙ্গে দেখা করিয়া তাঁহাদের বুঝাইয়াছিলেন। লর্ড কারমাইকেল যখন বাংলা দেশ হইতে চলিয়া যান, তাহার আগে একটা বক্তৃতায় রামকৃষ্ণ মিশনকে বিপ্লবীদের আড্ডা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন. স্বামী সারদানন্দ বম্বে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বুঝাইবার ফলে তিনি কথাটি

ফিরাইয়া নেন। দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক সবগুলি সংবাদপত্রই গভর্নমেণ্টের মন্তব্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়াছিল এবং প্রবাসী-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রবাসী পত্রিকায় খুব জোরের সহিত গভর্নমেণ্টের এই রিপোর্টের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। এবং সে যাত্রা রামকৃষ্ণ মিশন বিপদ কাটাইয়াছিল।

প্রতিষ্ঠান যখন প্রসারলাভ করে, তখন নানাভাবে বিরোধ ও বিশৃঙখলাও উপস্থিত হয়, কাশী সেবাশ্রমেও এইরকম একবার খুবেই গোলমাল হইয়াছিল। অদ্বৈতাশ্রম ও সেবাশ্রম দুটি আশ্রম পাশাপাশি এবং দুটিতে বরাবরই কোন না কোন বিষয় লইয়া বিরুদ্ধ ভাব চলে। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে এই রকম বিরোধ গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছিল। ক্রমে সেবাশ্রমের মধ্যে দুইদল হইয়া গেল এবং কাজের ব্যবস্থা লইয়া দুই দলে বিরোধ বাধিল—ইহার পর তৃতীয় দলস্বরূপে রহিলেন অদ্বৈতাশ্রম। ইহাতে বিরোধ আরও প্রবল হইতে লাগিল। স্বামী সারদানন্দ এই বিরোধের মীমাংসার জন্য গিয়াছিলেন। তাঁহার দিনলিপিতে প্রত্যেকটি ঘটনাই টোকা থাকিত। এই বিরোধের বিবরণটিও সেখানেই পাওয়া যায়।

শরৎ মহারাজ কাশী রওনা হইলেন ৮ই অগ্রহায়ণ—সঙ্গে ছিলেন সান্যাল মহাশয়, যোগীনমা ও স্বামী ভূমানন্দ। সান্যাল মহাশয় গৃহী-সাধু হইলেও শরৎ মহারাজ ইঁহাকে অতিশয় মান্য করিতেন এবং সব সময় ইঁহার পরামর্শ লইতেন।

স্বামীজী বলিয়াছিলেন, "শরতের রক্ত মাছের রক্তের মত, কিছুতেই তাতে না।" বস্তুতঃ তাঁহার মত এমন ধীরবুদ্ধি সাধু খুব কমই দেখা যায়। রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্যে তাঁহার দানই সর্বাগ্রগণ্য, একথা অসংশয়ে বলা যাইতে পারে। তিনি ছিলেন স্বামীগতপ্রাণ, আবার ব্রহ্মানন্দ স্বামীর প্রতি তাঁহার যে ভক্তি, তাহার তুলনা হয় না। গুরু-ভ্রাতাগণকে তিনি প্রাণের অধিক ভালবাসিতেন এবং সহজে কাহারও দুর্বলতা দেখিতেন না। কিন্তু এই ভালবাসার দিক দিয়া তাঁহার নিজেরও একটু দুর্বলতা ছিল, তিনি যাহাদের ভালবাসিতেন, অনেক সময় অতিরিক্ত ভালবাসার জন্যই তাহাদের দোষগুলি তাঁহার তীক্ষ্ণদৃষ্টি এড়াইয়া যাইত, ইহাতে পরিণামে বিপদ ঘটিত। তাঁহার

নিজের সম্মানের দিকে একেবারেই স্পৃহা ছিল না এবং তিনি ছিলেন 'অমানী মানদ।'

কাশীতে আসিয়া তিনি অদ্বৈতাশ্রমে রহিলেন এবং সকলকে ডাকাইয়া বলিলেন, "আমি এখানে কারও বিচার করতে আসিনি। সেবাশ্রমের কাজ এত বেড়ে গিয়েছে যে, তাতে কাজে বিশৃঙ্খলা হওয়াই স্বাভাবিক, এতে কারও দোষ নেই। তাই আমি কতকগুলি নিয়ম করতে চাই, যাতে কাজগুলি বেশ সুশৃঙ্খলে চলে যায়।" হরি মহারাজ (স্বামী তুরীয়ানন্দ) তখন সেবাশ্রমে ছিলেন। ইনি শরৎ মহারাজকে অতিশয় ভালবাসতেন। কিন্তু শরৎ মহারাজ যখন ২০০ টাকা মাইনা দিয়া একজন অস্থিচিকিৎসক রাখিবার কথা বলিলেন, তখন তিনি কাহারও কাহারও নিকট বলিয়াছিলেন, "মাইনা দিয়া লোক রাখা স্বামীজী কখনই পছন্দ করিতেন না।"

এ মন্তব্য অতি শীঘ্রই স্বামী সারদানন্দের কানে আসিল, তিনি হরি মহারাজের কাছে গিয়া বলিলেন, "হরি ভাই, আমি যদি স্বামীজীর ভাবের বিরুদ্ধে কোন কিছু কর্তে চাই, তাহলে তোমারই উচিত আমাকে ঠিক পথে চালানো।"

হরি মহারাজ অত্যন্ত অপ্রস্তুত হইলেন ও বলিলেন, "না, না ভাই, সে কি কথা? তুমি যা বলেছ, তাতে আমার কোন অমত নেই।"

কিন্তু যাঁহারা বিরুদ্ধপক্ষ, তাঁহারা স্পষ্টভাবেই বলিলেন, শরৎ মহারাজের এই নূতন নিয়মগুলি যতক্ষণ না স্বামী ব্রহ্মানন্দ স্বীকার করিয়া নিতে বলেন, ততক্ষণ তাঁহারা মানিতে বাধ্য নহেন।

শরৎ মহারাজ এই কথাতে অসন্তুষ্ট না হইয়া বলিলেন—"বেশ, বেশ, তাই হোক্।"

সভাপতি স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজকে ঘটনাটি জানানো হইল, তিনি এক কথায় উত্তর জানাইলেন, "শরৎ যাহা করিতেছে তাহা আমারই ব্যবস্থা বলিয়া জানিবে।" ইহার পর আর আপত্তির প্রশ্নই উঠিতে পারে না। তখন নূতন নিয়ম সম্বলিত ওয়ার্কিং কমিটি গঠিত হইল। এবং স্বামী সারদানন্দ সকল পক্ষের লোককেই কমিটিতে গ্রহণ করিলেন। চারুবাবু (স্বামী শুভানন্দ), কালীবাবু (স্বামী কালিকানন্দ) উভয়কেই ডাকিয়া দুজনের উপরেই এই নূতন ব্যবস্থাগুলি কার্যকরী করিবার ভার দিলেন। এবং ইহার পর হইতে মেয়ে-রোগীদের বিভাগ সম্পূর্ণ পৃথক হইয়া গেল, মেয়ে-সেবিকা ভিন্ন সেখানে পুরুষের প্রবেশের অধিকার রহিল না। ইহার পর স্বামী ব্রহ্মানন্দ কাশী গিয়া আর এক নূতন প্রণালীতে একেবারে বিবাদের মূল উচ্ছেদ করিয়া দিলেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ দেখিলেন, বিবাদটি আসলে সেবাশ্রমের গৃহী ও সন্ন্যাসী সদস্যগণের বিবাদ। তিনি চারুবাবু ও কালীবাবু উভয়কেই বুঝাইলেন যে, তাঁহারা যখন স্বামীজীর কার্যেই জীবন উৎসর্গ করিতে মনস্থ করিয়াছেন তখন তাঁহাদের সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেই কাজের দিক দিয়া এবং অন্যসব দিকেই মঙ্গল। এইভাবে তিনি চারুবাবু, কালীবাবু ও আরও অনেককে সন্ন্যাস দিয়া বিরোধের মীমাংসা করিয়া ফেলিলেন।

স্বামী সারদানন্দ সেবাকার্যের ভার লইয়া রামকৃষ্ণ মিশনকে ক্রিয়াশীল ও সজীব রাখিয়াছিলেন। এই সেবাকার্যের তালিকা দিতে গেলে তালিকা খুবই দীর্ঘ হইয়া পড়ে। কিন্তু কেবল সেবার দিক দিয়া নয়, প্রচারকার্যের দিক দিয়াও তাঁহার কৃতিত্ব কম নয়।

উদ্বোধন মঠ স্থাপনে তাঁহারই বেশীর ভাগ কৃতিত্ব। "মায়ের মন্দির স্থাপন করবো, মা সেখানে এসে অধিষ্ঠান করবেন"—এইটি তাঁর আকাঙ্ক্ষা ছিল এবং "আমি মায়ের বাড়ির দারোয়ান" এইটিই তাঁর গর্বের বিষয় ছিল। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে শ্রীশ্রীমা উদ্বোধনে আসেন, সেই অবধি কলিকাতার অনেক মেয়ে শ্রীশ্রীমার সঙ্গলাভের অধিকারী হইয়াছিল। এটি স্বামী সারদানন্দের জন্যই হইয়াছিল।

স্বামীজীর দেহান্তরের পর ১৯১১ খৃষ্টাব্দে ম্যাডাম ক্যালভে বেলুড় মঠ দেখিতে আসেন। ম্যাডাম ক্যালভে ফ্রান্সের বিখ্যাত গায়িকা, স্বামীজীর তিনি একান্ত অনুরক্তা ও ভক্ত হইয়াছিলেন। আজ তিনি ভারতবর্ষে স্বামীজীর প্রতিষ্ঠিত মঠ ও সমাধিস্থান দেখিতে আসিয়াছেন।

ম্যাডাম ক্যালভে ইংরাজীও জানিতেন না, সেজন্য তাঁর সঙ্গে একজন দোভাষী ছিল। তিনি প্রথমেই স্বামীজীর সমাধি মন্দির দেখিতে গেলেন। সে সময় স্বামী সারদানন্দ ও স্বামীজীর ভ্রাতা শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দুইজনেই মঠে ছিলেন। তাঁরাও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। ম্যাডাম ক্যালভে হাতে করিয়া ফুল নিয়া গিয়াছিলেন, স্বামীজীর সমাধি মন্দিরে

গিয়া জানু পাতিয়া বসিয়া সেই ফুল দিয়া অর্ঘ্য দিলেন। এই সময় ব্রহ্মানন্দ স্বামী আসিলেন, ব্রহ্মানন্দ স্বামীকে দেখিয়াই ম্যাডাম ক্যালভে সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং তাঁহার পরিচয় শুনিবামাত্র তাঁহার নিকট গিয়া তাঁহার একখানি হাত ধরিলেন, যেন তিনি কতদিনের পরিচিত।

স্বামী সারদানন্দ তাঁহাকে ঠাকুরঘরে নিয়া গেলেন। সে সময় স্বামীশিষ্য সংবাদ প্রণেতা শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ম্যাডাম ক্যালভে তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন, "আপনি যদি বৈদিকমন্ত্র কিছু পাঠ করিয়া শুনান তবে বিশেষ সুখী হইব।" সারদানন্দ স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "স্বামীজী একটি বৈদিক প্রার্থনা মন্ত্র পাঠ করিতেন, তাহার অর্থ 'অন্ধকার হইতে আমাদের আলোকের পথে লইয়া চল'. আপনি সেটি জানেন কি?" দোভাষী ইংরাজীতে এই কথাগুলি বুঝাইয়া বলিলে স্বামী সারদানন্দ সেই "অসতো মা সদ্‌গময় তমসো মা জ্যোতির্গময়" প্রার্থনামন্ত্রটি আবৃত্তি করিলেন। তাহার পর ম্যাডাম একটি গান গাহিয়াও ঠাকুরকে শুনাইয়াছিলেন।

স্বামী সারদানন্দের ম্যাডাম ক্যালভের সহিত পূর্বেই পরিচয় ছিল, সেইজন্য ম্যাডাম ক্যালভে সে সময় সারদানন্দ স্বামীর সাক্ষাৎ পাইয়া বিশেষ সুখী হইয়াছিলেন।

১৯১১ খৃষ্টাব্দে স্বামীজীর প্রথম সন্ন্যাসী শিষ্য গুপ্ত মহারাজ দেহত্যাগ করেন। ইনি হাতরাস স্টেশনের কর্মচারী ছিলেন, সেখানেই স্বামীজীর সহিত তাঁহার প্রথম দেখা হয়। ইনি বাঙ্গালী এবং বৈদ্যবংশীয়, কিন্তু অনেকদিন পশ্চিমাঞ্চলে থাকিয়া তাঁহার কথায় পশ্চিমা টান হইয়া গিয়াছিল। সন্ন্যাসাশ্রমে তাঁহার নাম হইয়াছিল "স্বামী সদানন্দ"। স্বামীজীর ইনি বড়ই প্রিয়পাত্র ছিলেন। ৮ই ফেব্রুয়ারী ইনি দেহত্যাগ করেন, এবং সেই বৎসর ২১শে আগস্ট রাম-কৃষ্ণানন্দ স্বামীও উদ্বোধন আফিসের বাড়িতে দেহত্যাগ করেন। এবং সেই বৎসরই ভগিনী নিবেদিতাও ১৩ই অক্টোবর তারিখে দার্জিলিং-এ মহাপ্রয়াণ করেন।

গুপ্ত মহারাজ অসুস্থ হইয়া প্রায় দুই বৎসর শ্রীযুক্ত বশীশ্বর সেনের বসুপাড়া লেনের ভাড়াবাড়িতে ছিলেন। বশীশ্বর সেন স্যর জগদীশ বসু মহাশয়ের বিজ্ঞান সাধনার ছাত্র ও সহকারী ছিলেন। ইনি রামকৃষ্ণ মিশনের অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন।

মঠের অপর একজনের নাম বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি স্বামী প্রেমানন্দ (বাবুরাম মহারাজ)। তিনি মঠের অল্পবয়স্ক সাধু বা ব্রহ্মচারীগণের মাতৃস্থানীয় ছিলেন। শশী মহারাজ বরানগর মঠে যেভাবে তাঁর গুরুভাইদের পরিচর্যা করিতেন, ইনি ঠিক সেইভাবেই মঠের সকলের পরিচর্যা করিতেন। তবে বরানগরে ছিলেন অল্প কয়েকজন মাত্র। আর বেলুড় মঠে দিনে দিনে ব্রহ্মচারীর সংখ্যা বাড়িয়া যাইতেছিল। হয়তো অসময়েও অনেক ভক্ত আসিয়া পড়িতেন, তখন খাবার সময় নয়, অথচ যিনি আসিয়াছেন বা যাঁহারা আসিয়াছেন সকলেই ক্ষুধার্ত। বাবুরাম মহারাজ তখন ডালচালের খিচুড়ি চড়াইয়া দিতেন, যেমন করিয়াই হউক, কোনরকমে আগন্তুকদের খাওয়াইয়া তবে শান্তি পাইতেন।

মঠে লোকসংখ্যা ছিল বেশী, আহার্য সে অনুসারে সংক্ষিপ্ত। ব্রহ্মচারী ছেলেরা সকালে মুড়ি জলখাবার পাইত, কিন্তু সেই মুড়ি এত শীঘ্র ফুরাইয়া যাইত যে, ঘণ্টার শব্দ শুনিয়া আসিতে আসিতে অনেকের ভাগ্যে মুড়ি জুটিত না। স্বামী ব্রহ্মানন্দের আদেশ ছিল, তাঁহার ঘরে যাহা কিছু থাকিবে যদি কেহ খাইতে না পাইয়া থাকে, সে যেন আসিয়া সেই জলখাবার লইয়া যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন যেন এক প্রেমের সূত্রে গ্রথিত বিশাল পরিবার। এই পরিবারে নানা বিভাগ, অথচ প্রত্যেক বিভাগ যেন সকলের সহিত সকলেই এক ও অখণ্ড। যেন এক মহান্ বনস্পতির শাখা প্রশাখা, একই ভূমি হইতে অমৃতরস আহরণ করিয়া একই দীপ্তিময় সূর্যের আলোকে সঞ্জীবিত হইয়া দিনে দিনে বর্ধিত ও প্রসারিত হইতেছে ও সমস্ত ভরতবর্ষ এমন কি ভারতবহির্ভূত নানা দেশেও কল্যাণময়ী ছায়া ও আধ্যাত্মিকতার প্রাণশক্তি বিতরণ করিতেছে।

* দেবদাস পাঠক *

জিনিসপত্র সব বাঁধাছাঁদা হয়ে গেছে। হাউস সার্জন যথাবিধি উপদেশ দিয়ে গেছেন। এখন সুপ্রভার চারদিকে মেয়েদের ভিড়। যদিও এখন বিকেল তিনটে, সুপ্রভার স্বামীর আসবার কথা সাড়ে চারটের ট্রেনে, তবু এখনই দেখা সাক্ষাৎ শেষ করবার সময়। এরপর চারটে থেকে শুরু হবে ভিজিটরদের ভিড়।

যারা চলে ফিরে বেড়াতে পারে তারা প্রায় সবাই এসে ঘিরে ধরেছে সুপ্রভাকে। এখানে বিছানায় শুয়ে সুপ্রভার মুখখানা ভালো করে দেখতে পারছে না বিশাখা। পাশের বেডের পার্টিশান স্ক্রীনটা কে যেন আড়াআড়ি করে প্যাসেজের দিকে টেনে দিয়েছে। বিশাখার বিছানা ছেড়ে ওঠা বারণ। এখনও রোজ জ্বর হয়। মাথা তুললেই ওয়ার্ড সিস্টার রমা সেন তেড়ে আসবে। বকবে যাচ্ছে-তাই করে। এসব বিষয়ে ভারি কড়া রমাদি। এতটুকু এদিক-ওদিক হবার জো নেই। মেয়েরা ওর নাম দিয়েছে জল্লাদ। এমন কিছু বয়স নয় রমা সেনের। মেয়েদের বয়স অবশ্য মেয়েরা নিরপেক্ষভাবেও দু'চার বছর বাড়িয়ে দেখে। কিন্তু অনেক বাড়িয়েও ত্রিশ বত্রিশের ওদিকে রমা সেনকে নিতে পারেনি বিশাখা। দেখতে শুনতে একবাক্যে ভালো বলা চলে। কপালের ওপর কুঞ্চনের যে রেখাগুলো চিলের মত ডানা ছড়িয়ে দিয়েছে, বিশাখার মনে হয়েছে, তা সব মিথ্যে। পোশাকী। গম্ভীর দুখানা ঠোঁটের নীচে স্নিগ্ধ হাসির রেখাটি বোধ-হয় ধমক খেয়ে মুখ গোমড়া করে আছে। শিয়রে এসে যখন কপালে হাত দেয় রমা সেন হাত দুখানা আর একটুক্ষণ চেপে ধরে রাখতে ইচ্ছা করে। সে হাতে এমন কিছু আছে রমা সেনের ভ্রূকুটিকুটিল কপালের সঙ্গে যার একেবারেই মিল নেই। কে জানে হয়তো সেই জন্যই তিন নম্বর ওয়ার্ডের মেয়েরা তাকে এত ভয় করে। রোগীদের এতটুকু শৈথিল্যের ক্ষমা নেই তার কাছে।

বিশাখা মাথা তুলতে গিয়েছিল কিন্তু রমা সেনের কথা মনে করে আর মাথা তুলল না। সুপ্রভা এবার উঠে দাঁড়াল। যেসব মেয়েরা বিছানায় শুয়ে আছে একে একে তাদের কাছে চলল। ওদিক থেকে ঘুরে এসে এক সময় বিশাখার সামনে দাঁড়াল। মাথায় বড় একটা খোঁপা, লাল-পাড় সাধারণ একখানা মিলের শাড়ি পরনে, কপালে টকটকে সিঁদুরের টিপ। মুখখানা কেমন ম্লান। সুপ্রভার মুখে হাসি নেই। একটু যেন থমথমে। অবশ্য হাসিমুখে এখান থেকে বড় কেউ যায় না। এখানে যারা আসে দু-এক বছর তাদের সবাইকেই থাকতে হয়। দীর্ঘদিন ধরে, একটু একটু করে কখন যেন সবাই জড়িয়ে যায়। আসবার পর প্রথম দু'চার দিন কেমন ভয় ভয় করে। ঘর ভর্তি রোগী। কেমন গা ছমছম করে। তারপর দু'চার দিন বাদে, আবার সব ঠিক হয়ে যায়। এ ওর সঙ্গে কেমন জড়িয়ে যায়। নতুন জীবনের শরিক হয়ে পড়ে। রোগমুক্ত হয়ে ফিরে যাবার সময় মনে হয় নিশ্চিত জীবন থেকে অনিশ্চিত পরিবেশের দিকে পা বাড়াচ্ছে বুঝি। যাদের ছেড়ে আসতে একদিন বেদনার অবধি ছিল না তাদের কাছে ফিরে যেতেও আবার অস্বস্তি লাগে। রোগ সারলেও অন্য লোকের ভয় সারে না। নিজেকে মনে হয় অবাঞ্ছিত। মুক্তির

প্রতীক্ষা করতে করতে একদিন সব মোহ কেটে যায়। ছাড়া পাবার স্বাদ যায় ফিকে হয়ে। সুপ্রভাও, বিশাখা ভাবল, তার ব্যতিক্রম নয়।

সুপ্রভা বলল, চললাম ভাই। আর তো থাকতে দেবে না।

কেন, থাকতে দিলে থেকে যেতে নাকি? বিশাখার সুরে কৌতুক।

কে জানে, হয়তো যেতাম। সুপ্রভার কথায় বিষাদটুকু বিশাখার কান এড়াল না।

বরং তোমার স্বামীকে জিজ্ঞাসা করে দেখো। তেমনি লঘু স্বরেই বলল বিশাখা।

সুপ্রভার মুখ দেখে মনে হলো না পরিহাসটুকু ওর মাথায় ঢুকেছে। বিশাখা কথার মোড় ঘোরাল। বলল, তোমার স্বামী তো থাকেন জলপাইগুড়ি। এখন তাহলে তো সেখানেই যাবে? আর বোধ-হয় দেখাই হবে না জীবনে। তুমি তো নিজের ঘরে চললে, আমি হয়তো, আর কোনদিন এখান থেকে বেরাতে পারব না।

ছিঃ ওকথা বলছ কেন? তোমার এমন কীইবা হয়েছে। একটা দিকে দু-তিনটে ক্যাভিটি মাত্র। ওতো কিছুই নয়। আমি এসেছিলাম যে অবস্থায় তা যদি দেখতে। দুটো দিকই ধরে গেছে। ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠত মুখ দিয়ে। এমনকি ডাক্তাররাও ভাবেনি আমি বাঁচব। তবু তো বেঁচে উঠলাম। রমাদিই বাঁচিয়ে তুললেন বলতে পার। তুমি তো দু এক মাসেই ভালো হয়ে যাবে, আমি রমাদিকে তোমার কথা জিজ্ঞাসা করেছিলাম। কিছু ভেবো না।

ওদিক থেকে তের নম্বর বেডের বাচ্চা মেয়েটা ডাকল সুপ্রভাকে।

বলল, সুপ্রভাদি আজ চলে যাচ্ছ?

হ্যাঁরে, সুপ্রভা ওর দিকে এগিয়ে গেল।

একে একে সবার কাছে গিয়ে দেখা করল সুপ্রভা। এদিকে ঘড়ির কাঁটা চারের ঘর ছুঁই-ছুঁই। শেষ ভাদ্রের বিকেলের রোদ লাল হয়ে জ্বলে উঠেছে জানালার কাচে। ভেন্টিলেটরের ফোকরে বসে একটা চড়ুই ঠোঁটে ক'রে খড়কাটা সাজিয়ে বাসা বাঁধছে। একাজোড়া কবর গলাগলি ঘুরে বেড়াচ্ছে সামনের বারান্দায়। বাইরে বিকাশ ... শব্দ হলো। ওয়ার্ডের প্রথম ভিজিটর ঘরে ঢুকলেন। হাতে ফলের ঠোঙা নাকে রুমাল। বোঝা গেল ইনি এসেছেন দু-মাইল দূরের শহর থেকে। বেশীর ভাগ লোকই আসে সঞ্চারটের ট্রেনে। একে একে আরও দুচারজন ভিজিটর ঘরে ঢুকল। যেসব রোগী উঠতে পারে তারা ভিজিটরের সঙ্গে বাইরে গিয়ে বসল। বিশাখা চেয়ে চেয়ে দেখছিল। তার কাছে আজ আর কেউ আসবে না। কলকাতা এখান থেকে ত্রিশ মাইল। সপ্তাহে একদিনের বেশী আসা সব সময়

সম্ভব হয় না। তবু বিশাখার স্বামী অমলেশ অন্তত দুদিন আসে।

দূরে ট্রেনের বাঁশী শোনা গেল। কলকাতার ট্রেন এলো। এই ট্রেনেই সুপ্রভার স্বামী আসবে। সুপ্রভার বেডের দিকে তাকাল বিশাখা। সুপ্রভা নেই। হয়তো বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। বেচারা কতদিন দেখেনি স্বামীকে। অতদূরে থাকে, আসতে পারে না।

ট্রেনের ভিজিটররা একে একে আসতে শুরু করল। কিন্তু সুপ্রভার স্বামী এলো না। দশ নম্বরের মেয়েটি বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল। এসে বলল, সুপ্রভাদি রমাদির সঙ্গে চলে গেল। একটু পরে আয়া এসে জিনিসপত্র নিয়ে গেল সুপ্রভার। ওয়ার্ডের মেয়েদের মধ্যে তখন নানারকম আলোচনা শুরু হয়ে গেছে। কিছু কিছু বিশাখার কানেও এলো। একজন বলল, বোধহয় একুশ নম্বর, তোমরা দেখে নিও ও নিশ্চয়ই আবার বিয়ে করেছে। পুরুষজাতটাকে চিনতে আমার বাকী নেই।

আর একজন বলল, এমন কথা বলছ কেন, হয়তো বেচারার কোন বিপদ-আপদ হয়েছে, তাই আসতে পারেনি।

বিপদ-আপদ, আবার একুশ নম্বরের গলা, তাহলে একটা টেলিগ্রামতো লোকে করে। গত ছ মাসের মধ্যে একটা চিঠি পর্যন্ত আসতে দেখিনি সুপ্রভার নামে।

এবার আর কেউ কথা বলল না। বিশাখার চোখে ভাসছিল সুপ্রভার ম্লান মুখে সিঁদুরের টিপটা। সুপ্রভার কথাগুলোও ভাববার চেষ্টা করছিল বিশাখা। কে জানে স্বামী যে আসবে না একথা হয়তো সুপ্রভা জানত।

দেয়াল ঘড়িতে ছটা বাজল। হাল্কা কুয়াশার ওড়না জড়িয়ে সন্ধ্যা নেমেছে। শেষ ভিজিটরটিকে দিয়ে সাইকেল রিকশ চলে গেল।

রমা সেন এলো টেম্পারেচার নিতে। অনেকক্ষণ থেকেই রমাদির সঙ্গে কথা বলতে চাইছিল বিশাখা।

থার্মমিটর মুখে দেবার আগেই জিজ্ঞাসা করল, সুপ্রভা কোথায় গেল রমাদি, ওর স্বামী তো আসেনি, তাই না?

রমা তাকাল বিশাখার মুখের দিকে। চোখ দুটো, বিশাখার মনে হলো, দপ করে জ্বলে উঠল বুঝি। কিন্তু বিশাখার চোখের দিকে তাকিয়েই আবার ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে এলো। বিশাখার দিকে তাকিয়ে কি বুঝল কে জানে। বলল, আমার ওখানেই আছে।

তোমার ওখানে কেন?

ওরতো রিলিজ অর্ডার হয়ে গেছে। আজ থেকে এখানে আর মীল পাবে না। আর কথা বলতে না দিয়ে বিশাখার মুখে থার্মমিটার পুরে দিল। থার্মমিটার তুলে জ্বর দেখল, চার্ট লিখল তারপর পাশের বেডে চলে গেল।

যে কথাটা জিজ্ঞাসা করবার ছিল তা আর হলো না। বিশাখার মনে কেবল ঘুরে ঘুরে সুপ্রভার কথাটাই আসছিল। বেচারা নিশ্চয়ই খুব মুষড়ে পড়েছে। নিজেকে দিয়ে বিচার করল বিশাখা। তার রিলিজ হবার দিনে যদি এমনি করে না আসে অমলেশ? তাহলে, তাহলে কী? এমন অসম্ভব কথা বিশাখা ভাবতে পারল না। অথচ সুপ্রভার স্বামী আসেনি। কিন্তু কেন এলো না? বিশাখা জানে এর জবাব দিতে পারে একমাত্র রমাদি। আর রমাদিকে একথা বিশাখা ছাড়া আর কেউ জিজ্ঞাসা করতে পারবে না। একমাত্র তাকেই কিছুটা প্রশ্রয় দেন রমাদি। গোমড়া মুখো মুখোশটা মাঝে মাঝে অসতর্ক মুহূর্তে একমাত্র তার কাছেই খুলে পড়ে।

নাইট সিস্টারকে চার্জ বুঝিয়ে দিয়ে যাবার সময় রোগীদের একবার খোঁজ খবর করে যান রমাদি। বিশাখার সঙ্গে রোজই দু চারটে কথা বলেন। বাড়ির কথা, ঘরের কথা। অমলেশকে নিয়ে অনেক সময় এক আধটু লঘু পরিহাসও করেন। বিশাখা ভাবল কথাটা তখনই জিজ্ঞাসা করবে।

ডিউটি শেষ করে যাবার পথে যথারীতি এলো রমা সেন।

বিশাখা ভয় ভয়ে বলল, রমাদি, একটা কথা বলবে?

বিশাখার চোখে চোখ রাখল রমা সেন। না, এবার আর তার চোখ জ্বলে উঠল না। বরং বিশাখার মনে হলো, রমাদির চোখে যেন প্রশ্রয়ের ইঙ্গিত আছে।

সুপ্রভার স্বামী এলো না কেন? কথাটা জিজ্ঞাসা করেই ভয়ে ভয়ে তাকাল বিশাখা।

বিশাখা কী জিজ্ঞাসা করবে তা যেন আগে থেকেই আন্দাজ করেছিল রমা সেন। বলল, সুপ্রভার স্বামী আর আসবে না। আশ্চর্য নির্লিপ্ত কণ্ঠ।

বিশাখা চমকে উঠল। বলল, তার মানে তুমি কি বলছ রমাদি?

আসবে না মানে আসবে না। এত সহজ কথাটা তুমি বুঝতে পারছ না কেন?

সহজ কথা! বিশাখার কথা প্রায় আর্তনাদের মত শোনাল। কিন্তু রমা সেনের মুখে কোন পরিবর্তন নেই। খুব সহজ গলায় বলল, বা, সহজ কথা নয়। স্ত্রীর থাইসিস হয়েছে, চেষ্টা চরিত্র করে হাসপাতালে ভর্তি করে দেওয়া হলো।

ফ্রি বেড মিলল, সরকারী সাহায্য পাওয়া গেল। সে কবে, কতদিনে সুস্থ হয়ে ফিরবে অথবা আদৌ ফিরবে কি না, ফিরলেও তাকে নিয়ে ঘরকরা নিরাপদ হবে কিনা কে বলতে পারে। স্ত্রীর না হয় অসুখ, স্বামীর তো আর অসুখ হয়নি। সে বেচারা অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে নিজেকে কেন বঞ্চিত করবে। তার চেয়ে আর একটা বিয়ে করা ঢের ভালো।

আর একটা বিয়ে! তুমি কী বলছ রমাদি, এ কি কখন সম্ভব? বিশাখার গলা কাঁপছিল। বোধ হয় হাতও।

রমা তার বাঁ হাতখানা নিজের হাতে তুলে নিল। বলল, কেন, অসম্ভব বলছ কেন বিশাখা?

অসম্ভব কেন—মনে মনে বলল বিশাখা। এমন অসম্ভব কথার যুক্তি খুঁজতে গিয়ে সব কেমন জট পাকিয়ে গেল। কেবল অমলেশের দুটো চোখ মনে এলো। কেবল দুটি চোখ, কিন্তু সেই কি সব নয়! কিন্তু একথা তো যুক্তি হিসেবে বলা যাবে না। এতো যুক্তি নয়, এ বিশ্বাস। যুক্তি কি এর চেয়ে বড়? বিশাখা নিজের মনে ভাবল। কোন কথা বলল না। চুপ করে রইল।

রমা যেন ব্যাপারটা আন্দাজ করে নিতে পেরেছিল। বলল বুঝতে পেরেছি কেন তোমার অসম্ভব মনে হবে। কিন্তু সবাইতো সমান নয়। একজনের কাছে যা অসম্ভব অন্যের কাছে তাই সম্ভব।

তাহলে তুমি কি বলতে চাও সুপ্রভার স্বামীর পক্ষে আবার বিয়ে করা সম্ভব? সম্ভব নয়—সে তাই করেছে।

তাই করেছে! তুমি কী করে জানলে?

কিছুটা উড়ো খবর পেয়েছিলাম। সবটাই তার বিশ্বাস করবার মত নয়। কিন্তু এখন আর অবিশ্বাস করার কিছু নেই। একটু থামল রমা। তারপর বলল, তেমনি ধীরে ধীরে, তেমনি নির্লিপ্ত গলায়, এ রকম ঘটনা এই প্রথম নয় বিশাখা। সুপ্রভা একাই এ দুঃখ পায়নি, ওর আগে অন্য মেয়েও পেয়েছে।

বিশাখা লক্ষ্য করল স্বরের দিকে রমাদির গলা আর তেমন নির্লিপ্ত নেই। কেমন যেন ধরা ধরা। যেন অনেক দূর থেকে অচেনা গলায় কেউ কথা বলছে। এ সেই দুঃসাহসী কর্তব্যপরায়ণ সর্বংসহ নার্স রমা সেন নয়। এ যেন অন্য কেউ, অন্য জন। বিশাখার মনে হলো রমা সেন তার মুখোশ খুলে ফেলেছে, যেমন খুলে ফেলে কাজের শেষে তার অ্যাপ্রণ।

রমার শেষ কথার খেই ধরে বলল বিশাখা, এমন ঘটনা আগেও ঘটেছে, তুমি

নিজে দেখেছ? যেন রমা না বললেই খুশী হতো বিশাখা।

হ্যাঁ, তাদের একজন ছিল আমার খুব চেনা।

সেরে গেল, তবু তার স্বামী তাকে নিয়ে গেল না? বিশাখার বিস্ময়ের আর সীমা নেই।

না, নিয়ে আর গেল কোথায়? কী করে নিয়ে যাবে বল? সে যে ততদিন আর একটা বিয়ে করেছে। নতুন করে জীবন শুরু করেছে আবার। দুঃস্বপ্নকে কে আর শখ করে বাড়ি বয়ে নিয়ে যায় বল!

তাই বলে নিজের স্ত্রী, তাকে সে ভালোবাসত—বিশাখা আর কী বলবে খুঁজে পেল না।

মেয়েটিও সেদিন তোমার মত এই কথাই ভেবেছিল—একী করে সম্ভব! বিয়ের পর একটা বছর তারা খুব সুখে কাটিয়েছিল। তার আগে মেয়েটি অনেক দুঃখ পেয়েছিল, তাই সুখের মূল্য জানত —কিন্তু সে অন্য গল্প। তুমি এবার শুয়ে পড়।

রমার হাত ধরে ছোট মেয়ের মত বলে উঠল বিশাখা, না, তুমি তার গল্প বল।

গল্পই বা কোথায়, নিতান্তই সাধারণ একটা ঘটনা।

তা হোক তুমি বল। বিশাখা রমার হাতে চাপ দিল।

একটু সময় চুপ করে রইল রমা সেন। তাকিয়ে আছে কি চোখ বুজে আছে, আবছা আলোয় বোঝা যায় না।

শোন তবে। ছোট বেলা থেকেই বুঝতে শিখেছে কাকার সংসারে সে বোঝা। কাকাকে তেমন দোষ দেওয়াও যায় না। অবস্থা তেমন ভালো নয়। তার ওপর অনেকগুলো ছেলেমেয়ে। তবু দেখতে শুনতে ভালো ছিল বলে নিখরচায় বিয়ে হয়ে গেল। মেয়েটির বয়েস তখন সতের হবে। ছেলেটি রেলে চাকরি করে। স্টেশনের লাগা ছোট বাসা। তারা দুজন আর বাড়ি শাশুড়ি। ঘরদোর গুছোতে ছেলেবেলা থেকেই খুব ভালোবাসত মেয়েটি। বিয়ের পর মনের মত করে গুছিয়ে তুলল নিজের সংসার। বাড়ির সামনে ছোট জায়গাটুকুতে ফুলের বাগান করল। পিছনে রইল সবজি ক্ষেত। রোজ প্রতিটি ফুলের গাছে নিজের হাতে জল না ঢাললে তার স্বস্তি ছিল না। স্বামী বলত, কী দরকার এত কষ্টের। বদলির চাকরি, দুদিন পরেই আবার অন্য কোথাও যেতে হবে। তোমার সাধের ফুলের বাগানে হয়তো ছাগল চরাবে পরের এ এস এম এর বউ।

মেয়েটি বলত, তা হোক, তাবলে যে-কদিন থাকি একটু ভালোভাবে থাকব না!

ট্রেনে যেতে যেতে জানালা দিয়ে কতলোক তার বাগানের দিকে আঙুল দেখিয়েছে। এদিক ওদিক সব স্টেশন থেকে লোক আসত তার বাগানে ফুল নিতে। এমন কি ত্রিশ মাইল দূর থেকে ডি টি এস-এর চাপরাসীও মাঝে মাঝে আসত মেম সাহেবের ফুলের বায়না নিয়ে।

স্বামী ঠাট্টা করে বলত, ভয় করে কোনদিনবা ওপরওয়ালার নজর ফুল ছেড়ে মালিনীর দিকে পড়ে।

মেয়েটি বলত, তোমার তো তাহলে পোয়া বারো। রাতারাতি স্টেশন মাস্টার। পুরুষেরা শুনেছি চকরির উন্নতির জন্যে সব পারে।

স্বামী হঠাৎ চটে উঠত। মেয়েটির মুখ চাপা দিয়ে বলত, দিক দেখি নজর আমার মালিনীর দিকে। তার চোখ কানা করে রেলের কোট ছেড়ে দিয়ে যাব না!

মেয়েটি অবাক হবার ভান করে বলত, সত্যি বলছ। কিন্তু চাকরি ছেড়ে দিলে খাবে কি?

বলত, মজুর খেটে।

মেয়েটিও নাছোড়। বলত, বটে, মজুর খেটে কত রোজ পাবে জান? তা থেকে রোজ অতগুলি সিগারেটের দাম বাদ দিয়ে চাল কিনবার পয়সা থাকবে ভেবেছ? আমি না হয় বাকল পরলাম। উত্তর হতো, মজুররা বুঝি সিগারেট খায়? তখন বিড়ি খাব। না জুটলে তাও খাব না।

এবার হাসি ফুটত মেয়েটির মুখে। বলত, তাই নাকি, তাহলে তো এখন থেকেই কম খাওয়া অভ্যাস করা উচিত, না হলে

পরে কষ্ট হবে। কাল থেকে এক প্যাকেট করে সিগারেট বরাদ্দ, কেমন?

এবার স্বামীও হেসে উঠত। বলত, ও এই জন্যে এত। সত্যি এ এস এম এর স্ত্রী না হয়ে তোমার উচিত ছিল উকিল হওয়া।

এই পর্যন্ত বলে রমা থামল। চোখ বুজে কী যেন ভাবল খানিকক্ষণ। বিশাখা কোন কথা বলল না। আগ্রহী দুটো চোখ মেলে তাকিয়ে রইল রমার দিকে।

রমার চোখ খুলল কি খুলল না। যেন নিজের মনেই বলতে শুরু করল, কখনও কখনও ছুটির দিনে তারা কলকাতা বেড়াতে যেত। কলকাতা গেলেই রেস্টুরেণ্টে খেত। রেস্টুরেণ্টে খেতে খুব ভালোবাসত মেয়েটি। তারপর সারাদিন এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াত। যাদুঘর, চিড়িয়াখানা, দক্ষিণেশ্বর কালিঘাট। কোনদিন বা ম্যাটিনি শোতে সিনেমা দেখে সন্ধ্যার ট্রেনে বাড়ি ফিরত।

দেখতে দেখতে ছমাস কেটে গেল। জীবনে যে এত সুখ এত আনন্দ আছে সতেরো বছরের জীবনে এর আগে তা জানতেই পারেনি। কাকার বহু সন্তানের সংসারে সে ছিল বাড়াত বোঝা। এমন কোন জীবনের কথা সে কল্পনাও করেনি কোনদিন। তার কিছুই ছিল না, সব হলো। তবু সেও বুঝি সব নয়। কোথায় যেন তবু একটু ফাঁক ছিল। স্বামী যখন ডিউটিতে, শাশুড়ী ঘুমে, কেমন যেন ফাঁকা লাগত বাড়িটা। কারণটা ধরা পড়তেই লজ্জায় লাল হয়ে উঠত। আশে পাশে তাকিয়ে দেখত কেউ আছে কিনা, কেউ থাকলে যেন মুখে দেখে তার মনের ইচ্ছেটাকে জেনে নেবে। ঘর গুছোতে গিয়ে কোনদিন মনে হয়েছে বারান্দার এখানে একটা দোলনা থাকলে বেশ হতো। কিন্তু পরম মুহূর্তেই আবার সেই লজ্জা। সে লজ্জাও একদিন ভাঙল। বুড়ো মানুষ শাশুড়ীকে ফাঁকি দেওয়া গেল না। আশ্চর্য, এতদিন যে মানুষ সংসারের এক কোণে নিজের জপতপ নিয়ে পড়ে ছিলেন, আছেন কি নেই তাও সব সময় বোঝা যেত না, তিনিও আবার সংসারে ফিরে এলেন। উঠতে বসতে উপদেশ। এটা করতে নেই, ওটা করো না। এটা খাও, ওটা খেও না। নিজেকে নিয়ে বিব্রত হয়ে উঠল মেয়েটি। শাশুড়ীকে কিছু বললে শুনবে না। অগত্যা সে চুপ করে রইলো। কাটল পাঁচ-ছ মাস। স্বামী চেষ্টা করছিল কলকাতার কাছে পিঠে বদলি হতে। ভালো ম্যাটারনিটি হোমে সীট পাওয়া সহজ হবে তাহলে। কিন্তু তার আর দরকার হলো না।

রমার নিঃশ্বাস দীর্ঘ হলো। কথা বন্ধ হলো কিছুক্ষণ। গাছের পাতা থেকে শিশির ঝরে পড়ার মত আস্তে আস্তে বলল, কলতলায় আছাড় খেয়ে পেটে ভীষণ চোট লাগল মেয়েটির। রক্ত দেখে ভয়ে অজ্ঞান হয়ে গেল। জ্ঞান হলো অনেক পরে। দোলনার দরকার হলো না। আর একজনের বদলে নিজের প্রাণ ফিরে পেল। কিন্তু শরীর সারল না। ক্রমেই খারাপ হতে লাগল। চিকিৎসার কোন ত্রুটি হলো না। হাওয়া খেতে বাইরেও গেল একবার ডাক্তারের পরামর্শে। কিন্তু কোন ফল

হলো না। মেয়েটি রাগ করে আর ডাক্তার ডাকতে দিল না। রোজই একটু একটু জ্বর হতো। খুসখুস কাশিও সেই সঙ্গে। স্বামীকে কিছু জানতে দিত না। একদিন কাশির সঙ্গে একটু রক্ত পড়ল। ভয় পেয়ে ডাক্তার ডেকে আনল ছেলেটি। ডাক্তার এসে সব শুনলেন, বুক দেখলেন, মুখ গম্ভীর করে বললেন এক্স-রে করতে।

এক্স-রে করা হলো। ডাক্তারের অনুমান ঠিক। স্বামী কেঁদে ফেলল, শাশুড়ী অদৃষ্টকে দোষ দিলেন, মেয়েটি কেবল কিছু বলল না। সে যেন মনে মনে তৈরী হয়েছিল। এরপর সীটের জন্যে হাসপাতালে ছোটাছুটি। দুতিন মাস পরে পাওয়াও গেল। তারপর একদিন তার ফুলের বাগান আর নিজের হাতে সাজান সংসার ফেলে রেখে মেয়েটি এসে হাসপাতালে উঠল।

প্রথম প্রথম কয়েকদিন বাড়ির কথা ভেবে খুব মন খারাপ হতো। চারদিকে রোগীদের দেখে কেমন ভয় ভয় করত। স্বামী আসতেন সপ্তাহে একদিন। কলকাতা কোন আত্মীয় স্বজন ছিল না যে খোঁজ নেবে। গোটা দিন মন মরা হয়ে থাকত। কেবল দিনান্তে বুড়ো সুপারিটেণ্ডেণ্ট এলে মনটা কেমন খুশী হয়ে উঠত। প্রথম দিন থেকেই বুড়োকে তার খুব ভালো লেগেছিল। বাবাকে তার মনেই পড়ে না। ছেলেবেলায় তিনি মারা গেছেন। থাকলে হয়তো এই রকমই হতেন। এসে কাছে বসতেন, মাথায় হাত বুলো[...] নানা রকম সান্ত্বনা দিয়ে চলে [...] কোন কোনদিন দুতিনবার আস[...] মেয়েরা বলত, বুড়ো কি তোমার আ[...] সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিজেতো এ[...] কোন রোগীর খোঁজ খবর নেয় না।

স্বামী প্রথমদিকে মাস দু[...] সপ্তাহে একদিন করে আসত। প্রথম চারটে বাজতে না বাজতেই [...] ঢুকত, বেরতো ছটার পরে। পরে [...] সপ্তাহে আসতে পারত না। [...] আসত পাঁচটা-সাড়ে পাঁচটার পর। [...] না বসতেই ছটা বেজে যেত। তার[...] একদিন হঠাৎ আরও দূরে বদলি [...] তাকে। যাবার আগে দেখা করতে এ[...] বলল, অনেক চেষ্টা করেছিল কাছে[...] থাকতে। কিন্তু কোনমতেই হলো [...] মেয়েটির মনে হলো স্বামী তার [...] বদলে গেছে। অনেক চেষ্টা করেও [...] হতে পারল না। খানিকটা অভিমা[...] খানিকটা হতাশায়।

প্রথম প্রথম অবশ্য মেয়েটি স্বামী[...] বেশী আসতে বারণ করত। বলত, এ[...] লোকের মধ্যে আমি বেশ থাকব। তুমি আ[...] এখানে বেশী এসো না। নিজের শরীরে[...] দিকে নজর দাও। কিন্তু পরে [...] স্বামী ঠিকমত দিনে আসতে পারত না [...] তার কান্না পেত। রাগ হতো স্বামী[...] ওপর। ভাবত, স্বার্থপর, স্বামী [...] স্বার্থপর। কাজ না ছাই, এ শুধু [...] অসুখের ভয়। অসুখ মেয়েটিকে এমনি করে বদলে দিয়েছিল।

সেদিন স্বামী চলে গেলে মনটা তার অনেকক্ষণ ভারি হয়ে রইল। কেন যেন মনে হলো বারান্দা পার হয়ে আস্তে আস্তে যে লোকটা অন্ধকারে মিলিয়ে গেল, সে বোধ হয় আর কোনদিন ফিরে আসবে না। সেই মুহূর্তেই মেয়েটির মনে হলো ওর বদলির কথা তাহলে মিথ্যা। এখানে আর আসতে চায় না তাই মিথ্যে কথা বলে গেল।

কদিন পরে সত্যি সত্যিই নতুন

স্টেশনের ঠিকানা থেকে চিঠি এলো। ঠিকানা দেখে বিশ্বাস না করে পোস্ট-অফিসের ছাপ লক্ষ্য করল। স্বামী তার মধ্যে কথা বলেন। কিন্তু এ কেমন চিঠি। নিতান্তই দায় সেরেছে, কর্তব্য পালন করেছে। নিবিঘ্নে পৌঁছেছ, কেমন আছ জানিও। কেবল এইটুকু। পরের চিঠি এলো প্রায় মাসদেড়েক পর। শাশুড়ীর মারা যাবার খবর নিয়ে। চিঠিখানা দু তিনবার পড়ল। তারপর বালিশের নীচে চাপা দিয়ে চুপ করে শুয়ে রইল। ভাবছিল একটি মানুষ ছিল সংসারের একধারে চুপ করে, সে আর নেই। সে নিজে তো ছিল স্বামীর সংসারের সবটুকু জুড়ে, এখন নেই। তাতে কতটুকু যায় আসে। তারপরেই মনে হলো স্বামীর আর কেউ রইল না। ভাবতেই মনটা খারাপ হয়ে গেল। অনেক ভেবে-চিন্তে সে চিঠির একটা জবাব লিখেছিল মেয়েটি। অনেক সান্ত্বনার কথা ছিল তাতে। কিন্তু অনেকদিন স্বামীর কাছ থেকে আর কোন চিঠি এলো না। মেয়েটি দুতিনখানা চিঠি লিখেছিল ব্যস্ত হয়ে। তারপর চিঠি এলো। কাজে ব্যস্ত ছিল বলে স্বামী চিঠি লিখতে পারেনি। এরপর তিনচারখানা চিঠির কোন জবাব না পেয়ে মেয়েটি চিঠি লেখা ছেড়ে দিল।

এই পর্যন্ত বলে রমা সেন থামল। বলল, তোমার হয়তো খারাপ লাগছে, রাতও অনেক হয়েছে, এবার শুয়ে পড়। ইচ্ছে থাকলে বাকীটা অন্য সময় শুনো। আর শুনবারইবা কি আছে। এ গল্পের শেষ তো চোখের সামনেই দেখলে।

না, না, তুমি বল—ছোট মেয়ের মত চেঁচিয়ে উঠল বিশাখা।

অঃ চেঁচিও না, পাশের বেডের ঘুম ভাঙবে।

লজ্জায় মুখ নীচু করল বিশাখা।

বলল, ভুলে গিয়েছিলাম। তুমি বল।

আজ কী হয়েছে রমা সেনের কে জানে। নটার পরে কোন রোগী যদি একটা কথা বলে আর রমা সেন যদি ডিউটিতে থাকে তাহলে নিস্তার নেই। অথচ আজ নিজেই বকে যাচ্ছে রোগীর শিয়রে বসে।

কই বল, বিশাখা মনে করিয়ে দিল।

আবার গল্পের পাজি তুলে নিল রমা সেন। কী বলছিলাম যেন—

মেয়েটি চিঠি লেখা ছেড়ে দিল, ছেঁড়া সুতোয় গিঁট পরিয়ে দিল বিশাখা।

হ্যাঁ, চিঠি লেখা ছেড়ে দিল। ততদিনে দুবছর কেটেছে। সে তখন সুস্থ। ফ্রি বেড পাওয়া গিয়েছিল। আর সুপারিন্টেণ্ডেন্টের চেষ্টায় সরকারী সাহায্য মিলেছিল কিছু। সবার ওপর ছিল সুপারিন্টেণ্ডেন্টের সজাগ চোখ। নিজে সব সময় দেখাশুনো করতেন। এই দুতিনখানা চিঠি লিখেছিল ব্যস্ত হয়ে। ঘরোয়া সম্পর্ক দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। কেবলমাত্র রোগী আর কর্তব্যপরায়ণ ডাক্তার নয়। কে জানে তিনি হয়তো বুঝতে পেরেছিলেন মেয়েটির অবস্থা।

যতদিন অসুখ ছিল কোন সমস্যা ছিল না। এবার সুস্থ হলে সমস্যা দেখা দিল। অনেক অসুস্থ লোক বাইরে পড়ে আছে, বেড খালি করে দিতেই হবে।

একদিন সুপারিন্টেণ্ডেন্ট বললেন, তোমার স্বামী কি অন্য কোথাও বদলি হয়েছেন? পুরনো ঠিকানায় চিঠি লেখা হয়েছিল সে চিঠি ফেরত এসেছে। নতুন ঠিকানা অফিসকে জানিয়ে দিও, তুমি নিজেও সব কথা জানিয়ে দিও তোমার চিঠিতে। আর দু সপ্তাহের বেশী তোমাকে রাখা যাবে না। কোন দরকার নেই।

মেয়েটি মুখ নীচু করে চুপ করে রইল। এ সমস্যা একদিন দেখা দেবে সেতো জানা কথা। তবু সে যখন সত্যি দেখা দিল মেয়েটি কী করবে ভেবে পেল না। যে-ঠিকানা থেকে শেষ চিঠি পেয়েছিল তাই দিল সুপারিন্টেণ্ডেন্টকে। বলল, চিঠিটা বরং স্টেশন মাস্টারের নামে লিখুন ওর ঠিকানার জন্যে। কথাটা বলতে লজ্জায় মরে গেল মেয়েটি।

সুপারিন্টেণ্ডেন্ট কেবল বললেন, ও!

এ সব কাজ সুপারিন্টেন্ডেন্টের করবার কথা নয়। কিন্তু মেয়েটির ব্যাপারে সুপারিন্টেন্ডেন্ট নিজেই আসতেন। আর এম ও আর হাউস সার্জনরা তটস্থ হয়ে থাকতো সব সময়। চিঠির জবাব এলো যথাসময়ে। স্টেশন মাস্টার লিখেছে মেয়েটির স্বামী ছুটি নিয়ে সস্ত্রীক পশ্চিমে বেড়াতে গেছে। একমাস পরে ফিরবে।

সুপারিন্টেন্ডেন্ট হয়তো অনেকটাই আঁচ করেছিলেন, কিন্তু এতটা ভাবেননি। মেয়েটিকে অফিসে ডেকে হাতে চিঠিখানা দিয়ে ওয়ার্ড ইনস্পেকশনে চলে গেলেন। ফেরার পথে আবার এলেন। বললেন তাহলে এবার কী ঠিক করলে? হাসপাতাল তো ছেড়ে দিতেই হবে।

মেয়েটি কী বলবে। চুপ করেই রইল।

তিনি আবার বললেন, তোমার কি এমন কেউ নেই এখন যার কাছে গিয়ে উঠতে পার? কথাগুলি খুব আস্তে আস্তে বলছিলেন। জায়গা যে নেই একথা তিনিও জানতেন।

মেয়েটি আড়াই বছর আগের তার সংসারের কথা ভাবছিল। টুকরো টুকরো সব ছবি ভাসছিল চোখের সামনে। সুপারিন্টেন্ডেন্টের দিকে যখন তাকাল চোখে বোধ হয় তার জল এসেছিল। সুপারিন্টেন্ডেন্ট বললেন, আচ্ছা আপাতত তুমি না হয় আমার বাড়িতেই চল। তারপরে দেখা যাবে।

মেয়েটি কী বলে তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাবে ভেবে পেল না। চোখের জল এবার গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল। হয়তো বিব্রত বোধ করলেন একটু। ওয়ার্ডে যাবার নাম করে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলেন।

দু তিনদিন পরেই হাসপাতাল ছেড়ে দিয়ে সুপারিন্টেন্ডেন্টের বাড়িতে উঠল। হাসপাতালের পাশেই কোয়ার্টার্স। বুড়ো-বুড়ি ছাড়া বাড়িতে আর কেউ নেই। একমাত্র ছেলে তখন বিলেতে। ডাক্তারী পড়ছিল। সে যে নিরাশ্রয় হয়ে এসেছে একথা মেয়েটিকে বুঝতেই দিল না। এখানে প্রায় এক বছর কাটল তার। নিজের কাছেই মেয়েটি কুণ্ঠিত হয়ে থাকত। এমনি করে কতদিন চলবে? তারপর একদিন সুযোগ বুঝে বুড়োকে কথাটা বলল। সে নার্সিং শিখতে চায়। এমনি করে বসে থাকতে আর ভালো লাগে না।

বুড়ো বুঝতে পারলেন তার মনের অবস্থা। বললেন, বেশ আমি চেষ্টা করে দেখছি। তার দুতিন মাস পরেই ভর্তি হলাম ট্রেনিংএ।

হঠাৎ থামল রমা সেন। অসতর্ক মুহূর্তে কখন নিজেকে প্রকাশ করে ফেলেছে। ধরা পড়ার অস্বস্তি নিয়ে তাকাল বিশাখার মুখের দিকে। কিন্তু বিশাখার মুখে বিস্ময়ের চিহ্নমাত্র নেই। কেবল সারামুখে কেমন একটু ম্লান হাসি ছড়ান। রমা সেনের ডান হাতটা অনেকক্ষণ থেকেই তার দু হাতে ধরা ছিল। একটু চাপ দিল শুধু। বলল, তারপর বল।

আর বলবার কী আছে! সে মেয়ের গল্প তো ফুরিয়েছে। ট্রেনিং শেষ করে এ হাসপাতাল থেকে সে হাসপাতাল। এই করে তো কাটল অনেক বছর। আমার মত অবস্থায় আরও দু তিনজনকে পড়তে দেখেছি, কিন্তু তাদের অন্য আত্মীয় ছিল। সুপ্রভার মত এমন অসহায় হতে আর কাউকে দেখিনি। ওকে দেখে আমার নিজের কথা মনে পড়ে গেল। রমা সেন জোরে নিঃশ্বাস ফেলল।

বিশাখা বলল, রমাদি—

না, আর কথা নয়। সাড়ে নটা বাজে. এবার ঘুমিয়ে পড়।

এ গলা সেই নার্স রমা সেনের। এতক্ষণের মুখোশ খোলা রমাদির নয়। বিশাখার গায়ের ওপর চাদর টেনে দিয়ে বেরিয়ে গেল রমা সেন। জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল বিশাখা। বারান্দা পেরিয়ে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে রমাদি। কেমন যেন ক্লান্ত মনে হচ্ছে। শেষ ভাদ্রের রাত। আবছা কুয়াশা নেমেছে মাঠে। খণ্ড তিথির একফালি চাঁদ দূরে গ্রামের পিছনে হেলে পড়েছে। ওর সঙ্গে একটু আগের রমা সেনের যেন আশ্চর্য একটা মিল ছিল। বিশাখা পাশ ফিরে শুলো। সেই মুহূর্তে বিশাখার মনে হলো কাল অমলেশের আসবার কথা। কিন্তু যদি না আসে— যদি না আসে—। না, না, অস্ফুট আর্তনাদ করল বিশাখা। স্ক্রীনের ওপাশে পনের নম্বরের ঘুম ভেঙে গেল। বলল, কী হলো বিশাখা।

বিশাখার চমক ভাঙল। বলল, না, কিছু না।

চক্রদত্ত

সাধারণভাবে একটি মোটর বোটের সঙ্গে আউট বোট ইঞ্জিন লাগান থাকে। বোট চালাবার সময় ইঞ্জিনটি জুড়ে নেওয়া হয় আবার প্রয়োজন মত সেটি বোট থেকে খুলে নিয়ে তুলে রাখা যায়। এই ধরনের মোটর বোট খুব কম জলে চালান যায় না কারণ ইঞ্জিন থেকে প্রপেলারটা
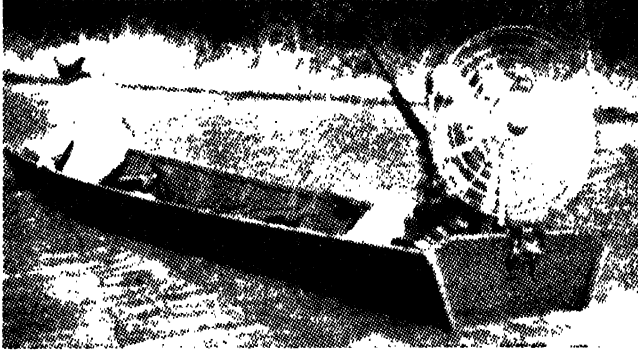
এয়ার প্রপেলার দেওয়া বোট

বাইরে একটি রডের সঙ্গে লাগান থাকে, সেটা জলের মধ্যে থেকে জল কাটতে কাটতে বোটখানিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। এখন যে নতুন ধরনের মোটর বোট বার হয়েছে তার প্রপেলারটি ফ্যানের মত হাওয়ার সাহায্যে চলে। এটা জলের তলায় থাকে না; বোটের ওপরে পাখার মত লাগান থাকে। এই প্রপেলারটিকে প্রয়োজন মত এদিক সেদিক ঘুরিয়ে বোটের গতি নির্ণয় করা হয়, এর জন্য আগের বন্দোবস্ত মত আলাদা হালের দরকার হয় না।

*

ন্যাশনাল জিওগ্র্যাফিক্যাল সোসাইটি থেকে প্রচার করা হয়েছে যে, মঙ্গল গ্রহের মধ্যে জীবন্ত বস্তুর অস্তিত্ব দেখা গেছে। ১২৫ বছর আগে যখন প্রথম মঙ্গল গ্রহের মানচিত্র আঁকা হয় আজকের দিনে তার চেয়ে অনেক পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। বর্তমানে মঙ্গল গ্রহের মধ্যের জমি নিয়ে প্রায় ২০০০০০ বর্গমাইল হরিৎবর্ণের ভূমি দেখা গেছে এবং এদের বিশ্বাস যে, ঐ হরিৎবর্ণের ভূমি গাছপালা সম্বলিত জমি ছাড়া আর কিছু নয়। জিওগ্র্যাফিক্যাল সোসাইটির পক্ষ থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার লোওয়েল মানমন্দির থেকে প্রায় বিশ হাজারখানি মঙ্গলগ্রহের ছবি তোলা হয়েছিল। আর এই ছবি থেকে আবিষ্কার করা গেছে যে, মঙ্গল গ্রহ জীব-বিবর্জিত স্থান নয়। সোসাইটি আন্দাজ করছে যে, পৃথিবীর অনুর্বর পাহাড় পর্বতের মাথার ওপর যে সব লাইকেন জাতীয় ছত্রক জন্মায় মঙ্গল গ্রহে সেই জাতীয় ছত্রকই খুব সম্ভবত জন্মাচ্ছে। মঙ্গল গ্রহে যে রকম আবহাওয়া ধারণা করা যায় সেইরকম আবহাওয়া গবেষণাগারে কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্টি করে লাইকেন প্রভৃতি কী জাতীয় উদ্ভিদ জন্মাতে পারে পরীক্ষা করে দেখে বোঝা যাবে মঙ্গল গ্রহের কী জাতীয় উদ্ভিদ জন্মায়।

*

ক্ষুধা তৃষ্ণা মানুষের শরীরের ধর্ম। কিন্তু ক্ষুধা কেন পায় একথা আমরা সঠিক কেউই জানি না। ক্যালিফোর্নিয়া

য়ুনিভার্সিটির লস্ এঞ্জেল মেডিক্যাল সেণ্টারে মানুষের ক্ষুধা কী কারণে পায় এই তত্ত্ব অন্বেষণ করে বার করেছে যে, মানুষের শরীরের রক্তে এ্যামিনো এ্যাসিডের পরিমাণের ওপর মানুষের ক্ষুধা নির্ভর করে। এদের মতে রক্তে এ্যামিনো এ্যাসিডের পরিমাণ খুব বেড়ে গেলে ক্ষুধার উদ্রেক হয় না এবং এ্যামিনো এসিড্ কম হলে বেশ ক্ষুধা হয়। পরীক্ষার জন্য কয়েকজনকে প্রচুর পরিমাণে দুধ ও ডিম ইত্যাদি প্রোটীন জাতীয় খাদ্য খাওয়ালেন। কারণ প্রোটীন এ্যামিনো এসিডে তৈরী। আর একটি পরীক্ষাতে কতকগুলি লোককে এ্যামিনো এসিড্ ইন্জেকসন দেওয়া হলো কিংবা এ্যামিনো এসিডের সলিউশন পান করানো হলো। দুই ক্ষেত্রেই স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হলো যে, দেহের এ্যামিনো এসিডের পরিমাণের সঙ্গে ক্ষুধা উদ্রেকের বেশ যোগাযোগ আছে। অবশ্য কী পরিমাণ এ্যামিনো এসিডে কতখানি ক্ষুধা কম হয় এবং কোন্ কার্যকারিতার বলে এ্যামিনো এসিড্ ক্ষুধা নিয়ন্ত্রণ করে সেকথা এখনও এঁরা বলতে পারেন না।

*

আমরা প্রায় বলে থাকি যে, চিনির চেয়ে মিষ্টি। মিষ্টির গুণ বোঝাতে গেলে, সাধারণভাবে চিনির কথাই মনে করি। কিন্তু চিনির চেয়ে কতগুণ মিষ্টি হতে পারে সেটার কোন ধারণা আমাদের নেই। এক জাতের শর্করার খোঁজ পাওয়া গেছে যেটা চিনির চেয়ে ৩০০ গুণ বেশী মিষ্টি। এই বস্তুটি প্যারাগুয়াতে জন্মায় এমন এক গাছের থেকে পাওয়া যাচ্ছে। গাছটা ঝোপ জাতীয়। প্যারাগুয়ার অধিবাসীরা এই গাছকে 'ক্যা হে' বলে। গাছের পাতা শুকিয়ে তাকে ভালভাবে গুড়ো করে প্যারাগুয়াবাসীরা তাদের চা অথবা অন্য খাদ্যদ্রব্য মিষ্টি করে। এই গাছের নাম হচ্ছে 'স্টেভিয়া'। অবশ্য বাণিজ্যিকভাবে স্টেভিয়া থেকে কোন কিছু তৈরী করা সম্ভব নয়—তার কারণ এই, গাছ খুব বেশী পরিমাণে জন্মায় না। কম জন্মাবার কারণ হচ্ছে যে, এই গাছের বেশীর ভাগ বিচি বন্ধ্যা। সেইজন্য এই গাছকে প্রচুরভাবে জন্মাতে গেলে ডাল থেকে গাছ তৈরী করতে হয়। এতে খুব বেশী সময় লাগে এবং সব দেশে জন্মান যায় না। বর্তমানে 'বোটানিক্যাল গার্ডেন' অথবা লোকের বাড়ি, যাদের গাছের খুব শখ আছে তাদের বাগানে মাঝে মাঝে স্টেভিয়া গাছ দেখতে পাওয়া যায়। বৈজ্ঞানিকদের কাছে মিষ্টি গুণ হিসবে এর কদর কারণ বর্তমানে যত মিষ্টি জিনিস আছে তার মধ্যে এটি শ্রেষ্ঠতম।

*

কিছুদিন আগে সিকাগোতে এক জোড়া যমজের জন্ম হয়—এদের একজনের মাথা আর একজনের মাথার সঙ্গে জোড়া। এই ধরনের যমজদের 'সায়ামিজ যমজ' বলা হয়। সিকাগোতে একটি নতুন সায়ামিজ যমজ জন্মের পর অনেকের মনে এই প্রশ্ন ওঠে খুব সম্ভবত আগের চেয়ে বর্তমানে এই ধরনের জোড়া যমজ বেশী জন্মাচ্ছে। অবশ্য বেশী জন্মাচ্ছে কি কম জন্মাচ্ছে সেটা জানা না গেলেও এটা আন্দাজ করা গেছে যে ৫০,০০০টি শিশুর ভেতর এ ধরনের ১ জোড়া যমজ জন্মাতে দেখা যায়। এই সব সায়ামিজ যমজদের বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই অস্ত্রোপচার করে আলাদা করবার চেষ্টা করা হয়। ১৬৮৯ সালে সুইটজারল্যাণ্ডের ডাক্তার ফেরিয়াস প্রথম এই ধরনের জোড়া যমজের ওপর অস্ত্রোপচার করেন। এই জোড়া যমজ ছিল দুই বোন—এদের যখন ১২ বছর বয়স তখন এদের ওপর অস্ত্রোপচার করা হয়। এটা করার কারণ যে, দুবোনের একজন যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হয়েছিল। যেটির যক্ষ্মা হয়েছিল সেটি অস্ত্রোপচার করার পর মারা যায় বটে কিন্তু সুস্থ বোনটি বেঁচেছিল। ১৯১২ সালে ইংলণ্ডে ডাঃ এয়ারড আর একটি জোড়া যমজের উপর অস্ত্রোপচার করেন। এরাও দুটি বোন—এদের একটি অস্ত্রোপচার করার পর ৪ মাস বয়সে নিউমোনিয়া রোগে মারা যায়—আর একজন এখনো বেশ সুস্থ সবল অবস্থায় বেঁচে আছে। ডাঃ এয়ারড নাইজিরিয়ার একটি জোড়া যমজ ইংলণ্ডে অস্ত্রোপচার করেন। অবশ্য অস্ত্রোপচারের একঘণ্টার মধ্যে একটি যমজ মারা যায়। ডাঃ এয়ারড বলেন যে একটি যমজ মারা যাওয়ার কারণ যে তার শরীরে এ্যাড্রিন্যালিন গ্রন্থি স্বাভাবিক গ্রন্থির ওজনের মাত্র তিন ভাগের একভাগ ছিল। জোড়া অবস্থায় থাকাকালীন দ্বিতীয় যমজের এ্যাড্রিন্যালিন গ্রন্থির নিঃসৃত রস প্রথমটিতে চলাচল করত। ১৯১২ সালের আগে এইরকম জোড়া যমজের আট ন'টা অস্ত্রোপচার করে আলাদা করা হয়েছে। ডাক্তাররা বলেন যে যদি এই দুই যমজের সংযোগ চামড়া, মাংস, কিম্বা কোমলাস্থির সাহায্যে হয় তাহলে অস্ত্রোপচার করলে দুই যমজকে বাঁচান যায়।

ছোট গল্প

প্রবোধকুমার সান্যালের স্বনির্বাচিত গল্প—ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ, ৯৩ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা—৭। ৪৲।

প্রবোধকুমার সান্যালের শ্রেষ্ঠ গল্প—মিত্র ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। ৫৲।

আধুনিক ছোট গল্প বাংলা সাহিত্যের সম্পদ। আমাদের সাহিত্যের অন্য কোনও বিভাগ এতখানি সমৃদ্ধ হয়েছে বলে মনে হয় না। যে কয়জন লেখকের রচনার গুণে এটা সম্ভব হয়েছে তাঁদের মধ্যে শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার সান্যালের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কল্লোল যুগের তিনি একজন প্রধান লেখক। তাঁর লেখা পড়ে খুশি হন নি এমন পাঠকের সংখ্যা খুব কম। সর্বজনীন হৃদয়ের আতিথ্যের চেয়ে লেখকের কাছে বড় পুরস্কার আর কি আছে?

আলোচ্য বই দুটিতে প্রবোধকুমারের কয়েকটি বিখ্যাত ছোট গল্প সংকলিত হয়েছে। প্রকাশকদের সাধুবাদ জানাই এই প্রচেষ্টার জন্যে। প্রবোধকুমারের সব গল্পের বই যাঁদের পক্ষে নানা কারণে সংগ্রহ করে পড়া সম্ভব নয় অথবা যাঁরা তাঁর ভালো গল্পের বই কিনতে বা উপহার দিতে চান, তাঁদের জন্যে এই ধরনের সংকলন বিশেষ প্রয়োজন।

প্রবোধকুমারের সাহিত্য-সৃষ্টির উৎস হল গভীর মানবতাবোধ। মানুষকে অন্তরঙ্গভাবে বোঝার যে চেষ্টা এখনকার সাহিত্যে দেখা যাচ্ছে তার স্বাক্ষর বই দুখানার প্রতি গল্পে বর্তমান। হাক্সলি যাকে whole truth বলেছেন, একে তার আভাস বলা যেতে পারে। প্রবোধকুমার বলেছেন, "সাহিত্য যদি জীবনের প্রতিফলনই হয়, তবে সেই জীবন কোনো সময়েই স্থির থাকছে না। তার সেই নিত্য অস্থির প্রকৃতির সাময়িক ছায়া শুধু প্রতিবিম্বিত হচ্ছে সাহিত্যে একাল থেকে সেকালে।" কথাটি মূল্যবান এবং তাঁর গল্পগুলিতে একথার প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। কেবল বাস্তব জীবনধারার অনুসরণ করেই লেখক ক্ষান্ত হননি, সমাজের প্রচলিত বিধিবিধানের বিরুদ্ধে ক্ষেত্রবিশেষে বিদ্রোহ ঘোষণা করতেও তিনি দ্বিধা বোধ করেন নি। স্বনির্বাচিত গল্পের পূর্বভাষণে এ কথার ইঙ্গিত পাই, "বাংলা দেশে মনের ভাঙন চলছে অনেক দিন থেকে। সেই ভাঙনের কথা সাহিত্যেও প্রকাশ পেয়ে আসছে। এ ভাঙন কোথায় গিয়ে শেষ হবে কেউ জানে না অতএব বঙ্গ সাহিত্যের ভবিষ্যতও অনির্দিষ্ট। বলা বাহুল্য, এই অনির্দিষ্ট ভাবটি কাব্য অপেক্ষা কথা-সাহিত্যে অধিকতর সুস্পষ্ট কারণ একালের চরিত্রসৃষ্টিতে সমাজ ও রাষ্ট্রচেতনা সম্মিলিত-ভাবে যেমন প্রকট এর আগে তেমন ছিল না। এ ভালো কি মন্দ, সেকথা ওঠে না। কেননা বাংলার বিদগ্ধ মনের এইটিই ধারাবাহিকতা।" প্রবোধকুমারের এই দৃষ্টিভঙ্গী যেমন আধুনিক তেমনই বৈপ্লবিক।

তাঁর ছোট গল্পে কত নরনারীর ভিড়, কত বিচিত্র চরিত্রের সমাবেশ। অতি তুচ্ছ থেকে অতি অদ্ভুত ঘটনার রূপায়নে তাঁর দক্ষতা বিস্ময়কর। হৃদয়াবেগের প্রাবল্য তাঁর গল্পের ঘটনা-স্রোতকে কোথাও ব্যাহত করেনি। 'এই যুদ্ধ', 'মুখবন্ধ', 'পুতুল', 'গুলবাগ', 'আত্মজান', 'আগ্নেয়গিরি', 'বিষ', 'তরঙ্গ', 'প্রেতিনী' প্রভৃতি গল্পগুলি ভাবাবেগাশ্রিত ঘটনা-সংবলিত গল্পধারার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। রহস্যময়তার দিক দিয়ে 'বন মানুষের হাড়' অতুলনীয়। এ ছাড়া আরও বহু জাতের সার্থক গল্পের সংকলনে বই দুখানা সুখপাঠ্য হয়েছে।

পরিশেষে প্রবোধকুমারের অননুকরণীয়

ভাষার উল্লেখ করতে হয়। এমন সহজ, সুন্দর ও বলিষ্ঠ ভাষা একালে দুর্লভ।

২০৩।৫৪' ৮১।৫৫

কিংশুক—মনোজ বসু। বেংগল পাবলিশার্স, কলিকাতা—১২। মূল্য দুই টাকা।

'কিংশুক' মনোজ বসুর সর্বশেষ গল্প-গ্রন্থ। উপন্যাস লিখে তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি হয়েছে। কিন্তু গুণগ্রাহী পাঠকের চোখে ছোট গল্পের রচয়িতা হিসেবে তাঁর শিল্প কৃতিত্বটাই যেন বেশি সমাদরের বস্তু। 'বনমর্মর' দেবী কিশোরীর লেখকের কলমে ছোট গল্পের একটা বিশিষ্ট রূপ মূর্তি নিয়েছিল, একথা অস্বীকার করতে কেউ পারবে না। বর্তমান বইখানিও ছোট গল্পের সমষ্টি। কিন্তু 'ছোট'রও প্রকারভেদ আছে। এ গল্পগুলি নিতান্তই ছোট। স্বল্পকায় ক্ষীণ পরিসর গল্পের মধ্যে বেখাচিত্রের বাদুতা অথচ জীবনের গভীরতা, এ দুয়ের সংমিশ্রণ লক্ষণীয়। এ ধরনের ছোট গল্প একমাত্র বনফুল আর ত্রিস্বর ছাড়া, আর কেউ তেমন মননশীল আগ্রহের সংগে চর্চা করেছেন বলে জানা নেই। মনোজ বাবুর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী আর ভাষা এ গ্রন্থে চমৎকার ফুটেছে। পড়তে পড়তে মনে হয় বিখ্যাত ফরাসী লেখক আঁদ্রে মোরোয়ার কথা। তাঁর 'Ricochets' বইখানিতে এর চেয়ে অবশ্য আরও ছোট ছোট গল্প আছে। সে যাই হোক, 'কিংশুকে'র গল্পগুলির মধ্যে 'একা রোগণী', 'বাতাবি নেবু', 'দিকপাল সরকার', 'পাটিহার' টেক্‌নিকের দিক থেকে ভালো-ভাবেই উত্তীর্ণ হয়েছে। 'পুণ্যাত্মা' গল্পটিতে বিদ্রূপের সুর উপভোগ্য। 'চোর' গল্পটি অপেক্ষাকৃত বড় কিন্তু এর মধ্যে মানব-প্রীতি ও সমবেদনা ভরপুর। শুধু 'কাজ নেই' কাহিনীটি উঁচু দরের গল্প হলেও ও-হেনরীর একটি বিখ্যাত গল্পেরই রকম-ফের।

৩৮৬।৫৫

পসারিনী : সমরেশ বসু। নতুন সাহিত্য ভবন, কলিকাতা—২০। মূল্য দু টাকা আট আনা।

আঙ্গিক, বিষয়বস্তু, প্রকাশবৈচিত্র্য ও সূক্ষ্ম শিল্পচাতুর্যে সাম্প্রতিক ছোটগল্প শুধু বাংলায় নয়, ভারতের গর্বের বস্তু। এমনকি বিশ্বসাহিত্যের দরবারেও এদেশের কয়েকটি ছোটগল্প অন্যান্য দেশের উৎকৃষ্ট ছোটগল্পের সংগে সমপংক্তিতে বসারও গৌরব অর্জন করতে পারে, প্রতিবাদের আশংকা না করে একথা বলা যায়।

ইদানীং নিষ্ঠা, শ্রম ও অধ্যবসায়ের দ্বারা সাহিত্যের এই বিশেষ অংগটির যাঁরা পরিপুষ্টি সাধন করছেন, তাঁদের সংখ্যা অল্প নয়। সর্ব-শ্রেণীর জীবন থেকে রসদ আহরণ করে প্রতিবেশী প্রদেশের সমস্যাকণ্টকিত জীবনযাত্রা প্রণালীর বিভিন্ন রূপ সংগ্রহ করে আজকের বাংলা সাহিত্যকে এ'রা রুচিগ্রাহ্য শিল্পসম্মত পরিণতির দিকে নিয়ে যাবার চেষ্টায় ব্যাপৃত।

নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে ভাষার সৌকর্য সাধনের জন্যও এঁরা প্রাণপাত পরিশ্রম করে চলেছেন।

এই নিতান্ত সাহিত্যসেবী দলের মধ্যে সমরেশ বসুও অন্যতম। তাঁর নাম রুচিশীল পাঠক সম্প্রদায়ের মধ্যে শুধু পরিচিতই নয়, প্রশংসিতও।

সমরেশবাবু সমাজ-সচেতন জীবনবাদী শিল্পী। তাঁর রচনা [illegible] সর্বস্ব নয়, [illegible] সংবেদনশীল মনের পরশ [illegible]। মানুষের কষ্ট আছে, দুঃখ আছে, বেদনা আছে, কিন্তু সেই নিষ্পেষিত সত্তার দুঃখকষ্ট [illegible] পাশাপাশি আছে মাথা তুলে দাঁড়াবার বলিষ্ঠ প্রয়াস, মহত্তর জীবনের প্রতি গভীর মমত্ববোধ। এই ভারসাম্যই সমরেশবাবুর রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য। 'পশারিণী'তে [illegible] হকারদের মধ্যে যেমন প্রতিযোগিতার [illegible] রয়েছে, তেমনি [illegible] এক [illegible] উঠেছে। [illegible] নিয়েছে [illegible]। [illegible] পাশাপাশি আছে [illegible]। সমরেশবাবুর মানুষ [illegible] দেখার [illegible], সেটা 'উত্তরঙ্গী' [illegible] 'বিকালিনী' [illegible] স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

আলোচ্য গ্রন্থটি সমরেশবাবুর সর্বাধুনিক গল্প-সংকলন। এই গ্রন্থে লেখকের ছটি গল্প সংযোজিত হয়েছে। গল্পগুলির উপজীব্য বিভিন্ন ধারার জীবন-সমীক্ষা হলেও গল্পগুলির অন্তরালে একটি সুরের আভাস, অনেকটা আবহ সঙ্গীতের মতন। পথ থেকে নিরাশ্রয়, সম্বলহীন এক মুঠো নরনারী সমরেশবাবু কুড়িয়ে নিয়েছেন বটে, কিন্তু তাদের তিনি ধুলো ঝেড়ে, মনের রঙে রাঙানো পোশাক পরিয়েছেন। মমতা-ছলছল দৃষ্টি বুলিয়েছেন তাদের সর্বাঙ্গে। চরিত্র চিত্রণের সার্থকতা তো এইখানেই। ২২৯।৫৫

বাংলা গানের সমস্যা

সংগীত পরিক্রমা—নারায়ণ চৌধুরী, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ। ৯৩ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা—৭। দাম—তিন টাকা চার আনা।

বইটিতে প্রধানত বর্তমান যুগের বাংলা গানের বিবিধ সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে বিভিন্ন প্রবন্ধে। ভারতীয় সঙ্গীত এবং শিল্পী সম্বন্ধেও কিছু কিছু আলোচনা আছে।

গ্রন্থকারের প্রধান লক্ষ্যস্থল রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্র সঙ্গীত সম্বন্ধে তাঁর বহু অভিযোগ: যথা—কবির গান বড় বেশী ধরা বাঁধা পূর্ব-নির্দিষ্ট; তাঁর উত্তর বয়সের গান বড় বেশি

সাদামাঠা নিরাভরণ; রবীন্দ্র সঙ্গীতে ফাঁকে সুরের স্থায়িত্ব বলে তার একান্ত অসম্ভাব ইত্যাদি। রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পীদের সম্বন্ধেও তার অভিযোগ যে, তাঁদের উচ্চারণ সানুনাসিক এবং ভঙ্গিমূলক। প্রায় প্রতি প্রবন্ধেই এই ধরনের মন্তব্যাদ ছড়িয়ে আছে। কিন্তু কেন যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে নিজস্ব ভঙ্গি এমনভাবে প্রয়োগ করেছেন, তার কারণ গ্রন্থকার অনুসন্ধান করে দেখেননি, দেখলে হয়তো এত কঠোর মত প্রকাশ করতেন না। রবীন্দ্রনাথের উত্তর বয়সের গান মোটেই নিরাভরণ নয়, বরঞ্চ তার বিপরীত। উত্তর কালের সঙ্গীতেই তাঁর অলঙ্করণ অত্যন্ত সূক্ষ্ম হয়ে উঠেছে এবং এই কারণেই তাঁকে সঙ্গীত সম্বন্ধে এত সাবধান হতে হয়েছে। বরঞ্চ তাঁর পূর্বের গান অপেক্ষাকৃত নিরাভরণ কারণ সে যুগের গানে তিনি অনেকাংশে ছকে বাঁধা প্রচলিত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের রীতি অবলম্বন করেছেন। ধ্রুপদধর্মী রবীন্দ্রনাথের গান সাধারণত চারটি কলিতে সম্পূর্ণভাবে সঞ্চারিত হয়েছে, অতএব রবীন্দ্র সঙ্গীতে সুরের স্থায়িত্বের অসম্ভাব আছে এমন অভিযোগের কারণ বোঝা গেল না। উচ্চারণ শিল্পীর ওপর নির্ভর করে। গ্রন্থকার রবীন্দ্র সঙ্গীত-শিল্পীদের উচ্চারণ সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছেন, তা বহু তথাকথিত রাগ-প্রধান গানের শিল্পীর পক্ষেও প্রযোজ্য। সুতরাং এসম্বন্ধে সাধারণভাবে অভিযোগ উল্লেখেও কিছু ত্রুটি ঘটেছে, যথা ৭১ পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রবন্ধে 'এমন দিনে তারে বলা যায়' গানের সুর ব্র্যাকেটে হাম্বির বলে দেখান হয়েছে। এটি হবে 'দেশ-মল্লার।'

রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন দিলীপকুমার থেকে অপর বহু শ্রদ্ধাভাজন সঙ্গীত রচয়িতা, শিল্পী এবং সমালোচক সম্বন্ধে এমন বহু বিরুদ্ধ মন্তব্য করা হয়েছে, যার স্বপক্ষে তেমন সুদৃঢ় যুক্তি নেই। গ্রন্থকার নজরুল সম্বন্ধে কিছু উচ্চ ধারণার বশবর্তী হয়ে বহু নূতনত্বের কৃতিত্ব তাঁকে অর্পণ করেছেন। কিন্তু কিছু কিছু কবির প্রাপ্যকে ছাড়িয়ে গেছে যথা বাংলা গজলের প্রবর্তন অতুলপ্রসাদই করেন এবং তাঁর রাগপ্রধান বা ঠুংরি গজল রচনা নজরুলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। গ্রন্থকার স্থানে স্থানে বলেছেন, কীর্তনাঙ্গ সুরে ভক্তি-প্রধান গান ছাড়া অপর কিছু রচিত হয়নি। এই ধারণা ঠিক নয় রবীন্দ্রনাথ এবং দ্বিজেন্দ্রলাল একাধিক গানে এই প্রচেষ্টা করেছেন। উদাহরণস্বরূপ 'ছিল বসি সে কুসুম কাননে' অথবা 'আর কেন মিছে আশা মিছে ভালবাসা' এই ধরণের গানের উল্লেখ করা যেতে পারে।

গ্রন্থের অধিকাংশ প্রবন্ধে সম্পূর্ণ বিচারের উপযোগী স্বপক্ষ-বিপক্ষীয় ভাবধারার সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়নি, কিছু একদেশ-

দর্শিতার প্রাধান্যও লক্ষিত হয়। রচনাগুলিতে গ্রন্থকারের পছন্দ-অপছন্দই প্রধান বস্তু হয়ে উঠেছে। ক্ষেত্রবিশেষে অপ্রিয় কথন রূঢ় ভাষণে পরিণত হয়ে সাহিত্যিক আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করেছে এবং অসহিষ্ণু মন্তব্যের বাহুল্য পীড়াদায়ক হয়ে উঠেছে। এইগুলি বাদ দিলে গ্রন্থকারের বলিষ্ঠ মনোভাব এবং বিশ্লেষণ প্রশংসার যোগ্য। 'গীতিকার অজয়-কুমার ভট্টাচার্য' এবং 'সুরকার হিমাংশু-কুমার' প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি পড়তে ভাল লাগে।

গ্রন্থের প্রচ্ছদপট এবং বাঁধাই মনোরম।

৬১২।৫৫

হিন্দুস্থানী রাগ সংগীত রাগেশ্বর—প্রথম ভাগ। প্রবন্ধকুমার চট্টোপাধ্যায়, মার্কেণ্টাইল ষ্টেশনার্স সিণ্ডিকেট, ৮৬, ডাঃ সুরেশ সরকার রোড, কলিকাতা—১৪।

গ্রন্থকারের স্বরচিত বাইশটি হিন্দি গানের স্বরলিপি সন্নিবেশিত হয়েছে। ইমন-কল্যাণ ভৈরবী ভীমপলশ্রী বিলাভল, খাম্বাজ ছায়ানট বেহাগ ভৈরব আড়ানা মালকোষ তিলককামোদ তিলং ঝিঁঝোট জয়জয়ন্তী বসন্ত—এই সব প্রচলিত রাগ ছাড়া পঞ্চম কোষ, পুষ্পচন্দ্রিকা, রাগেশ্বরী, কৌশিকী কৌষী ভৈঁরো, পুলিন্দিকা এই কটি অপ্রচলিত সুরের পরিচয়ও দেওয়া হয়েছে। ভাতখণ্ডের রীতিতে স্বরলিপি করা হয়েছে, তবে তার মধ্যেও কিছু স্বাতন্ত্র্য আছে।

৩৫৩।৫৫

কিশোর সাহিত্য

দুর্গমের ডাক—প্রবোধকুমার সান্যাল। বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলিকাতা—১২। দাম দেড় টাকা।

একশো কুড়ি পৃষ্ঠার ছোট্ট বই, কিশোর-কিশোরীদের জন্য লেখা। দুর্গমের ডাকে যাঁরা সাড়া দিয়েছেন, অজানাকে জানবার জন্য জীবনকে তুচ্ছ করে যাঁরা বিপৎসংকুল অভিযানে বেরিয়েছেন, তাঁদের কথাই লিখেছেন প্রবোধকুমার তাঁর নিজস্ব সাবলীল ও মনোহর ভাষায়। প্রবোধবাবু খ্যাতনামা সাহিত্যিক এবং সত্যিকারের সুলেখক। তাই সমালোচকের প্রত্যাশা বেশি। বিশেষ করে, এটা কিশোর-সাহিত্য। তরুণ ও অনভিজ্ঞ মনের ওপর এ জাতীয় রচনার প্রভাব অনেক, সে কথা সকলেই জানেন। লেখকের ভ্রমণ-অভিযান সম্পর্কে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও চেতনা আছে এবং এ ধরনের রচনায় তাঁর যোগ্যতা স্বীকৃত। কিন্তু ধারণাপ্রবণ কিশোর-মনের শিক্ষাকে নির্ভুল ও যথার্থ করে তোলার দায়িত্ব লেখকেরই।

বইখানা পড়ে মনে হল প্রবোধবাবু কিছু অসতর্কভাবে গ্রন্থ প্রকাশের অনুমতি দিয়েছেন। হয় তিনি সংশোধন করে দেননি, হয়তো প্রয়োজনীয় পুনঃপরীক্ষার সময় পাননি। ফলে কয়েকটি গুরুতর ত্রুটি রয়ে গেছে বইখানিতে, যা তথ্যের দিক থেকে ভুল, বাঁধুনির দিক থেকেও শিথিল। কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি :—'হিংস্র জানোয়ার-অধ্যুষিত ভূভাগ', 'অশরীরী মৃত্যু কাল-কটাক্ষ ছড়িয়ে রেখেছে'—এসব শব্দ সমষ্টি নিরর্থক ও সামঞ্জস্যহীন। প্রবোধবাবুর ভাষায় যাদু আছে, মানি। ঠিক সেই কারণেই ভাষা সহজ ও সংযত হওয়া দরকার। শিক্ষার মধ্যে কল্পনার স্থান উঁচুতে, জানি। কিন্তু প্রকাশভঙ্গীকে বেশি রোম্যাণ্টিক না করে বিষয়-অনুসারে আর একটু বস্তুনিষ্ঠ করলে ক্ষতি ছিল না। বই-খানিতে যখন অভিযান-সম্পর্কে তথ্য-পরিবেশন করা হয়েছে, বিশেষ করে ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক আবেষ্টনের অবতারণা করা হয়েছে, তখন তথ্য নির্ভুল হওয়াই উচিত। পড়তে পড়তে মনে হয়, প্রবোধবাবু 'ফ্যাক্ট' যাচিয়ে নেননি, একটু তাড়াহুড়ো করেই লিখে দিয়েছেন। দ্বিতীয় পৃষ্ঠার দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফে কয়েকজন

(সি ৪৯০২)

আর এক কাঁদ্বনে ছবি

"বৌ" শব্দটা বোধ হয় পয়মন্ত, তা না হলে চলচ্ছবি লিমিটেডের "মেজবৌ" ছবিখানির নাম হওয়া উচিত ছিল "জ্বয়া" বা "জ্বয়াড়ি" অমনি একটা কিছ্ব। কারণ গল্প হচ্ছে এক জ্বয়াড়িকে নিয়ে, রেসের জ্বয়াড়ি এবং চারটে ম্বখ্য চরিত্রের মধ্যে একটি চরিত্র হচ্ছে মেজবৌ। গল্পের কোনও মেজবৌয়ের ওপর নয়। যাই হোক, সাদাসিদে ঘর গেরস্তালির গল্প ভাই, দাদা, বৌদি, ভাইপো, বৃদ্ধা মা ইত্যাদিই পাত্র-পাত্রী এবং একান্তই পারিবারিক ঘটনা সব। ফরম্বলা বাঁধা আখ্যানবস্তু এবং সহজ আবেগস্বৃষ্টিতে অনেকখানি সাফল্যও অর্জন করেছে। তিনটি ভাই, তার মধ্যে বড়ো বৈমাত্রেয় ভাই। কিন্তু বিমাতার কাছে বড়ো অভয়ই স্নেহ পায় বেশী। তার নিজের ছেলে অশোককে তিনি দেখতে পারেন না, সে রেস খেলে বলে। অশোক ভাল চাকরি করে, কিন্তু সংসারে একটি পয়সা তো দেয়ই না, উপরন্তু সংসার খরচের টাকাও সে রেসের মাঠে দিয়ে আসে। মা এই নিয়ে অভয়ের কাছে অন্বযোগ তুললে অভয় অশোককে অব্বঝ ছেলে-মান্বষ বলে অভিহিত করে, মাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে। ওদের রেসের একটা আড্ডা আছে: খগেনবাব্ব তাদের অর্থের
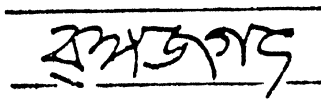
—শৌভিক—

জোগানদার। ওরা টাকা নিয়ে রেস খেলে এবং জেতার ভাগ থেকে টাকায় চার আনা কমিশন আদায় করে খগেনবাব্ব। অশোকের অব্যর্থ টিপ: যাকে যা বলে দেয়, সে তাই খেলেই জিতে আসে; অশোক নিজে কিন্তু হারে কেবলই। এইভাবে ওর দেনা বাড়তে থাকে। ওদিকে একদিন মা অশোককে সায়েস্তা করায় বদ্ধপরিকর হলেন। জিদ ধরলেন তিনি অভয়ের কাছে যে, অশোককে আলাদা করে না দিলে তিনি জলস্পর্শ করবেন না। আগের দিন একাদশীর উপবাস গিয়েছে, মায়ের প্রতিজ্ঞা অটল দেখে অভয়কে রাজী হতে হলো। অভয়ের দ্বঃখের অন্ত রইল না। খগেন-বাব্ব আলাদা হওয়া ব্যাপারটা আরও

ঘোরালো করে তোলার জন্যে দাদা-বৌদির ওপরে অশোকের মন বিষিয়ে তুললে। খগেনবাবু অশোককে প্ররোচিত করলে সম্পত্তির ভাগ দাবী করার জন্যে। কিন্তু সম্পত্তির স্বত্ব মার, তিনি তা ভাগ হতে দিলেন না। বাসা-ভাড়া করে নানা অসুবিধের মধ্যে অশোক স্ত্রী অলকাকে নিয়ে থাকে। অলকার সব গহনা অশোকের খপ্পরে খোয়া গিয়েছে। পাওনাদার এসে অপমান করে যায়। অলকা আড়াল থেকে তা শুনতে পায়, কিন্তু অশোক অন্য কথা দিয়ে তা চাপা দেবার চেষ্টা করে। অভয় অসুখে পড়লো, অবস্থা বাড়াবাড়ি হয়ে দাঁড়াতে অশোকের ছোটভাই অজয় এসে অলকাকে নিয়ে গেল। নিরাভরণা অলকাকে দেখে অভয় হাহাকার করে উঠলো। অশোকও এলো, কিন্তু দাদাকে জীবিত দেখতে পেলে না।
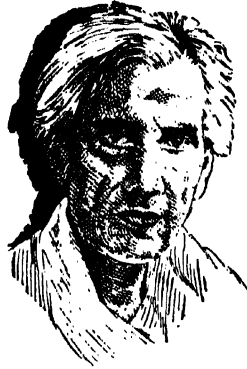
* * *

দাদার মৃত্যু অশোকের জীবনে পরিবর্তন নিয়ে এলো। রেস খেলা সে একেবারেই ছেড়ে দিলে; মায়ের মন খুশী ওর ওপরে। খগেনবাবুরা কিন্তু মুশকিলে পড়লো। অশোক টিপ দিতো বলে ওর আড্ডার কদর ছিলো, অশোক আসা ছেড়ে দেওয়ায় তার ব্যবসা বন্ধ। অনেকে অনেকভাবেই চেষ্টা করলে, কিন্তু অশোকের মন কিছুতেই টলাতে পারলে না। আগেকার এক পাওনাদার কিন্তু ওকে জব্দে ফেলার ব্যবস্থা করলে। আদালতে নালিশ করে অশোকের নামে ডিক্রি বের করালে এবং খগেনবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করে ওর নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী করিয়ে ওর অফিস থেকে ফেরবার পথে গ্রেপ্তার করিয়ে থানায় হাজির করালে। খগেনবাবু সাজানো ব্যাপার অনুসারে পাওনাদারদের টাকা মিটিয়ে দিয়ে অশোককে মুক্ত করে আনলে। তার মতলব এইভাবে অশোককে আবার আড্ডায় টেনে আনা। অশোক কিন্তু কিছুতেই রাজী হলো না। খগেনবাবু তখন তার টাকার জন্য চাপ দিলেন। নিরুপায় অশোক এক কাণ্ড করে বসলো। অভয় মারা যাবার আগে অলকার নিরাভরণা মূর্তি দেখে তার স্ত্রীকে বলে অলকাকে আবার যেন

লক্ষ্মীস্বরূপা করে সাজিয়ে দেওয়া হয়। সেই কথা মনে করেই বড়বৌ একদিন তার নিজের সব গহনা দিয়ে অলকাকে সাজিয়ে দিলে। খগেনবাবুর তাগাদার চাপে পড়ে অশোক সেই গহনা বন্ধক দিয়ে তার দেনা শোধ করে এলো।

গহনা ছাড়া বড় জায়ের সামনে সামনে থাকা অলকার পক্ষে অসম্ভব হলো। অলকা তার দাদার কাছে কৃষ্ণনগরে কিছুকাল থাকার জন্যে চলে গেল। অশোক ঠিক করলে বাড়তি কাজ করে যতো শীঘ্র সম্ভব টাকা জমিয়ে গহনা-গুলো ছাড়িয়ে নিয়ে আসবে।

দীর্ঘ চার বছর পর অলকা তার দাদার বাড়িতে এলো, কিন্তু অভাবের সংসারে তার বৌদির কাছ থেকে লাঞ্ছনা-গঞ্জনার অন্ত রইলো না। মুখ বুজে সে সব সয়ে যায়, যতদূর সম্ভব চাকরাণীর মতো বাড়ির কাজ করে যায়। ওদিকে অশোক সকালে উঠেই বেরিয়ে যায় ছেলে পড়াতে, ফিরে এসে নাকে-মুখে গুঁজে চলে যায় অফিসে; ছুটির পর দু-তিন জায়গায় যায় হিসেবের খাতা লিখতে। এইভাবে মাস চারেক পরিশ্রম করে প্রায় সব টাকা সঞ্চয় করে এনেছে, এমন সময় একটা ব্যাপার ঘটে গেলো। স্যাকরা এসেছিল বাঁধা দেওয়া গহনা-গুলো সম্পর্কে অশোকের কাছে তাগাদা দিতে। অশোক বাড়ি না থাকায় ছোট ভাই অজয়কেই স্যাকরা সেকথা জানিয়ে গেল। অজয় নিজের টাকা থেকে গহনা ছাড়িয়ে এনে বৌদিকে জানালে সে কথা। অজয়ের দৃঢ়বিশ্বাস, অশোক আবার রেস খেলতে আরম্ভ করেছে—তার প্রমাণ গহনা বাঁধা দেওয়া। অশোক আসতে সেই কথা নিয়ে ভায়ে ভায়ে ঝগড়া হয়ে গেল, অশোক কিন্তু কিছুই ভাঙলে না। ছোট ভায়ের কাছ থেকে অপমানটা তার মনে লগালো বড়ো। অশোক জানালে, ও-বাড়িতে তার থাকা চলবে না। এর পরই কৃষ্ণনগর থেকে অলকার দারুণ অসুখের তার এসে পেঁছিলো। অশোক নিজের কোন ঠিকানা দিয়ে যায় নি; অজয় তার খোঁজ করতে গেলো খগেন-বাবুর আড্ডায়। খগেনবাবুর কাছ থেকে অজয় জানতে পারলে, অশোক বহুকাল আগেই রেস খেলা ছেড়ে দিয়েছে। অজয়ের মনে অনুতাপ এলো। বড়-বৌদিকে সঙ্গে নিয়ে সে কৃষ্ণনগরে উপস্থিত হলো এবং সেখানে অলকার কাছ থেকে অশোকের দেনা শোধ করার দুর্জয় চেষ্টায় কথা শুনতে পেলে। অশোকও হাজির হলো অলকার পাশে।

ভুল বোঝাবুঝির সব মেঘ কেটে গেল।

* * *

ছিঁচকাঁদুনে গল্প। এর সার এই দাঁড়ায় যে, কোন দোষের দাগ একবার গায়ে লাগলে তা আর মুছে যাবার নয়। অশোক এককালে রেস খেলতো বলেই পরে যখন সে সৎভাবে অর্থ উপার্জনে প্রাণপাত পরিশ্রম করতে লাগলো, তখনও তার ওপর এমন কি তার ভায়েরও তার ওপরে সন্দেহ ঘোচেনি। জোর করে পাকিয়ে তোলা ঘটনা এবং সব সময়েই লক্ষ্য চোখের জল নিষ্কাশিত করিয়ে দেওয়ার দিকে, গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত তাই। মামুলি ধরনের উপাদান এবং বিন্যাসও অতি সাধারণ। তবে ঘটনাবলী উপস্থাপনে একটা নাটকীয় গতি বজায় আছে, যার জন্যে ছবিখানির ওপরে মন নিবদ্ধ রাখা যায়। শেষের দিকে কতক ঘটনা অস্পষ্ট। কৃষ্ণনগর থেকে অলকার অসুখের খবর আসতে অজয় অশোকের খোঁজ নিতে খগেনবাবুর আড্ডায় না গিয়ে অশোকের অফিসে গেল না কেন? গহনা বাঁধা দিতে হয়েছে বলে অলকাকে তার দাদার কাছে পাঠানো না হয় হলো. কিন্তু অশোক দীর্ঘ চার মাসে মাত্র একখানি চিঠি ছাড়া আর কোন খোঁজই রাখার প্রয়োজন মনে করে নি। এখানেও যুক্তির জোর কম। অশোককে শোধরাবার পথ করে দেবার জন্যেই যেন অভয়ের মৃত্যু ঘটানো হলো; এটা অভয়ের ওপর অত্যন্ত অবিচার। তেমনি দাদার সংসারে বৌদির কাছ থেকে অলকার নির্যাতন ভোগটা মাত্রাধিক্য হয়েছে। শেষে অলকার রোগশয্যায় কাহিনীর পরিসমাপ্তি টেনে আনা হয়েছে একরকম জোর করেই, যাতে 'মেজবৌ' নামটার একটা যুক্তি থাকে। প্রভাস ঘোষ রচিত একটি কাহিনীর ছায়া অবলম্বনে এই চিত্রনাট্য রচনা এবং এর পরিচালনা করেছেন দেবনারায়ণ গুপ্ত। খুব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কৃতিত্বের কোন পরিচয় না থাকলেও ছবিখানিকে মোটামুটিভাবে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন তিনি, দেখতে খারাপ লাগে না।

* * *

ছবিখানির সবচেয়ে বড়ো গুণ হচ্ছে ওর অভিনয়ের দিকটা। গান একেবারেই নেই এবং অন্যান্য দিকেরও কোন ক্ষেত্রে দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতো কোনরকম আড়ম্বরই নেই। তবুও ছবিখানি দৃষ্টি ধরে রাখে এবং মনও তা শুধু অভিনয়-শিল্পীদের কৃতিত্বের জন্য। বেশ ঝরঝরে অভিনয় বলতে যা বোঝায়, এক্ষেত্রে তা পাওয়া যায়। নাম ভূমিকায় সুচিত্রা সেনের ছিঁচকাঁদুনে অভিনয় কিন্তু একঘেয়ে হয়ে আসছে। অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে বিশেষ করে ভালো লাগবে অশোকের চরিত্রে বিকাশ রায়, বড়বৌয়ের চরিত্রে মলিনা দেবী, অভয়ের চরিত্রে জহর গাঙ্গুলী, অলকার দাদা ও বৌদির চরিত্রে পাহাড়ী সান্যাল ও রেণুকা রায় এবং এক রেসুড়ের চরিত্রে জহর রায়কে। আর শিল্পীদের মধ্যে আছেন নীতিশ মুখোপাধ্যায়, অনুপকুমার, অজিত চট্টোপাধ্যায়, পঞ্চানন ভট্টাচার্য, মণি শ্রীমাণী, চন্দ্রশেখর, শ্রীপতি চৌধুরী, সুপ্রভা মুখোপাধ্যায়, ইরা চক্রবর্তী, সন্ধ্যা প্রভৃতি। গান নেই বলে তার অভাবও বোধ হয় না। তবে আবহসঙ্গীত প্রযুক্ত হয়েছে, কিন্তু সঙ্গীত পরিচালকের কোন নাম নেই—অর্থাৎ এই চিত্রনির্মাতা বোঝাতে চাইছেন যে, সঙ্গীত পরিচালকের দরকার গান থাকলে নয়তো নয়। অন্যান্য কুশলীবৃন্দ হচ্ছেন আলোকচিত্র গ্রহণে অনিল গুপ্ত, শব্দযোজনায় সমর বসু, শিল্প-নির্দেশনায় নরেশ ঘোষ এবং সম্পাদনায় কমল গাঙ্গুলী।

খেলার মাঠে

একলব্য

রেফারীর সিদ্ধান্ত নিয়ে গোলমালের সূত্রপাত ফুটবল মাঠের প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। কোন্ অপরাধ ফাউলের পর্যায়ে পড়ে, কোন্ অপরাধ ফাউল নয়, কোনটি অফসাইড কোনটি অফসাইড নয়, বল গোলের মধ্যে ঢুকেছে কি ভেতরের কাঠে লেগে বের হয়ে এসেছে, হ্যাণ্ড বল ইচ্ছাকৃত কি অনিচ্ছাকৃত ইত্যাদি বিতর্কমূলক সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তর্কের শেষ নেই। এটা শুধু আমাদের দেশেরই ঘটনা নয়, ফুটবল মাঠের গণ্ডগোল প্রায় বিশ্বসমস্যার পর্যায়ভুক্ত। ফুটবল খেলার এই সব বিতর্কমূলক ঘটনার কথা স্মরণ রেখেই খেলার আইন প্রস্তুত করা হয়েছে এবং খেলার সময় আইনঘটিত প্রশ্ন থেকে যত রকমের সমস্যার উদ্ভব হতে পারে তার সমস্ত ঘটনারই সমাধান করা হয়েছে আইনের ব্যাখ্যায়। আবার যখন সমস্যা দেখা দেয়, সৃষ্টি হয় নতুন জটিলতা তখন আন্তর্জাতিক ফুটবলের বড় বড় মাথা এক হয়ে করেন আইনের রদবদল। তবুও তর্ক বাধে, গোলমালের সৃষ্টি হয়, খেলার মাঠে আইনের ব্যাখ্যা নিয়ে দর্শক সমর্থকের মাথা-ব্যথার অন্ত থাকে না, কারো বা মাথা ফাটে। অবশ্য ফুটবল মাঠের গোলমালের ব্যাপারে আইনের ব্যাখ্যা বা রেফারীর ত্রুটি-পূর্ণ পরিচালনাই সব ক্ষেত্রে কার্যকারণ নয়, বহু ক্ষেত্রে সমর্থকদের মনের ব্যাধিই গোল-মালের প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ক্লাব-বিশেষের প্রতি বিশেষ অনুরাগের ফলে সমর্থকদের মনে থাকে এমন একটা মোহ জড়ানো যে, প্রিয় ক্লাবের খেলোয়াড়দের কোনো দোষই তাদের চোখে পড়ে না, অপর দিক অপরের দোষ ধরবার জন্যই চোখ দুটি থাকে ব্যস্ত। এটা তাদের জানিত অপরাধ নয়, অজানিত অপরাধ,—মোহজড়িত মনের বৈকল্য। খেলা-পাগল এবং দলপ্রিয় দর্শক সমাজের মনের এই ব্যাধির চিকিৎসা করতে হলে ফুটবল আইন বইয়ের মধ্যে ওষুধের সন্ধান করতে হবে। আইন সম্বন্ধে ওয়াকি-বহাল করতে হবে সাধারণ দর্শক সমাজকে।

কোনটি গোল এবং কোনটি গোল নয়'—আইনে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে মাটিতে বা শূন্যে বলের সম্পূর্ণ অংশ লাইন অতিক্রম না করলে গোল হবে না। ছবিতে একেবারে উপরের বলটি এবং নীচের বাঁ দিকের বলটি গোলে প্রবেশ করেছে, আর কোনোটি গোলে প্রবেশ করেনি।

'ইচ্ছাকৃত হ্যাণ্ডবল'—এখানে খেলোয়াড়ের অপরাধ সম্পূর্ণ ইচ্ছাকৃত, তিনি হাত দিয়েই বল খেলছেন; সুতরাং শাস্তি তাঁর বিরুদ্ধে ডিরেক্ট ফ্রি কিক

'কোথায় বল লাগলে হ্যাণ্ডবল হয়?'—হাত বলতে কাঁধ বাদে সম্পূর্ণ হাতখানিই বোঝায়। ছবিতে দাগ-কাটা অংশের যে কোন স্থান দিয়ে ইচ্ছে করে বল খেললে হ্যাণ্ডবল হবে।

আমরা আগেও বলেছি, এখনো বলছি—দর্শকদের ফুটবল বা অন্যান্য আইন সম্বন্ধে সচেতন করবার দায়িত্ব সংবাদপত্র বা সাময়িক পত্রেরও যেমন, ক্রীড়া সংস্থা এবং রেফারী এসোসিয়েশনেরও তেমন। বেতার কর্তৃপক্ষও এ বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করতে পারেন। আমাদের দেশে খেলাধুলো এবং খেলার আইন সম্পর্কে বাঙ্গলা বইয়ের যথেষ্ট অভাব ছিল কিন্তু এ সম্বন্ধে প্রকাশিত কয়েকখানা বই বাঙ্গালী, বিশেষ করে তরুণ পাঠক সমাজের একটি বড় অভাব দূর করেছে। যদিও বিদেশের তুলনায় আমাদের দেশে প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা নগণ্য, তবুও প্রতি বছর কিছু কিছু খেলাধুলার বই ছাপা হচ্ছে এটা আশার কথা। সম্প্রতি একজন অভিজ্ঞ রেফারী রেফারিং সম্বন্ধে একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করেছেন। এতে খেলার সময় বিভিন্ন অপরাধের 'ডায়গ্রাম' সহ ফুটবল আইনের অনেক খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

* * *

কয়েক সপ্তাহ আগে আইনের ব্যাখ্যা সহ 'দেশে'র পাতায় (২২ বর্ষ, ৩৮ সংখ্যা) ফুটবল খেলার কতগুলি 'ডায়গ্রাম' ছাপা হয়েছিল এবং আরও কয়েকটি 'ডায়গ্রাম' ছাপার প্রতিশ্রুতি ছিল। এ সংখ্যায় সেই

ইচ্ছাকৃত হ্যাণ্ডবল'—এখানেও খেলোয়াড়ের অপরাধ ইচ্ছাকৃত। তিনি হাত দিয়ে বলটি ছ'ুড়ে দিচ্ছেন, সুতরাং শাস্তি তাঁর বিরুদ্ধে ডিরেক্ট ফ্রি কিক

'ডায়গ্রাম' গুলি ছাপা হচ্ছে আর সেই সঙ্গে দুই একটি আইন সম্বন্ধে আলোচনা করছি। যাঁরা বিভিন্ন রেফারী এসোসিয়েশনের পরীক্ষোত্তীর্ণ রেফারী বা যাঁরা ফুটবল খেলার আইন এবং নিয়ম-কানুন নিয়ে গবেষণা করেন, তাঁরা এই আলোচনায় নতুনত্বের কোনো সন্ধান পাবেন না, কিন্তু ফুটবল আইন সম্বন্ধে যাঁদের জ্ঞান সীমাবদ্ধ, যাঁরা শুধু খেলা দেখে আর লোকমুখে শুনে আইন সম্বন্ধে কিছুটা ওয়াকিবহাল হয়েছেন, তাঁরা এ আলোচনা থেকে কিছু রস পাবেন বই কি!

ফুটবল এসোসিয়েশন কর্তৃক প্রকাশিত আন্তর্জাতিক ফুটবলের আইন বই 'রেফারীস্ চার্ট' ৪৮ পৃষ্ঠা সম্বলিত একখানি চটি বই। খুব ছোট ছোট ইংরেজী অক্ষরে ছাপা। বাংলায় অনূদিত 'রেফারীস্ চার্টের' পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৮২। যাই হোক, এই ছোট বইয়ে মূল আইনের ধারাও বেশী নয়। মাত্র ১৭টি। কিন্তু এই সব ধারার ব্যাখ্যা আছে ভুরি ভুরি। শুধু এই ব্যাখ্যা নিয়ে ইংলণ্ডে যে কত বই প্রকাশিত হয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। ছোট ছোট চটি বই অজস্র প্রশ্নে ভরা থাকে। সমাধান করতে দাঁত ভেঙে যায়। অবশ্য বেশীর ভাগই জামাই ঠকানো প্রশ্ন, তবে আইনের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। কোনো কঠিন প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করা আমার আজকের লেখার উদ্দেশ্য নয়। সাধারণ কয়েকটি প্রশ্নের মধ্যেই আজকের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখতে চাই।

'অনিচ্ছাকৃত হ্যাণ্ডবল'—এখানে হ্যাণ্ডবল হয়েছে কিন্তু ইচ্ছাকৃত নয়। প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়ের শট করা বল হঠাৎ হাতে এসে লেগেছে। সুতরাং 'বল হাতে লাগলে হ্যাণ্ডবল হয় না—হাত বলে লাগলে হ্যাণ্ডবল হয়' এই মূলসূত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে অর্থাৎ অনিচ্ছাকৃত হ্যাণ্ডবলের জন্য শাস্তি দেওয়া চলবে না

• • •

ধরুন, রেলওয়ে স্পোর্টস আর এরিয়ানের খেলায় মেওয়ালাল গোল করতে ছুটে এগিয়ে গেছেন, তাঁকে বাধা দেবার কেউই নেই। একমাত্র গোলকিপার এস শেঠ গোলের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন—তিনিও এগিয়ে এলেন মেওয়ালালের পা থেকে বল কেড়ে নিতে, সুযোগ বুঝে মেওয়ালাল শট করলেন শেঠের মাথার উপর দিয়ে বল গোলে ঢুকছে, বিপথ-গামী হবার বা বলকে প্রতিরোধ করবার কোনো সম্ভাবনাই নেই; সুতরাং অনিবার্য গোল। কিন্তু গোলে ঢুকবার মুখে বলটি হঠাৎ গেল ফেটে এবং গতিবেগের ফলে সেই ফাটা বলটি প্রবেশ করলো গোলের মধ্যে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, রেফারী হিসেবে আপনি গোলের নির্দেশ দেবেন, না আর কিছুর নির্দেশ দেবেন? এখানে স্বাভাবিকভাবেই মনে হবে ওটা তো নিশ্চিত গোল, বাধা দিবার

'ডেঞ্জারাস্ প্লে বা বিপজ্জনক খেলা'—বলই লক্ষ্য, কিন্তু এমনভাবে পা তুলে বল মারার চেষ্টা করলেন যাতে যে কোন মুহূর্তে বিপদের সম্ভাবনা, এ ক্ষেত্রে অপরাধীর বিরুদ্ধে শাস্তি ইনডিরেক্ট ফ্রি কিক
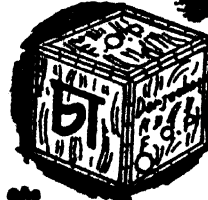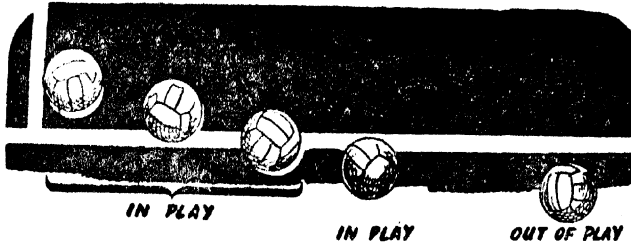
'ইন প্লে এণ্ড আউট অব প্লে'—অর্থাৎ বল খেলার মধ্যে কি বাইরে? এখানেও আইনে পরিস্কারভাবে বলা হয়েছে বলের সম্পূর্ণ অংশ যতক্ষণ না গোল লাইন বা টাচ্ লাইন অতিক্রম করবে ততক্ষণ বল খেলার মধ্যেই থাকবে। অর্থাৎ সম্পূর্ণ বলটি লাইন অতিক্রম করলেই বল আউট অব প্লে হবে। ছবির সাদা বড় লাইনটি টাচ লাইন এবং পাচটি বলের ডান দিকের বলটি ছাড়া আর কোন বলই খেলার বাইরে যায়নি

কেউ ছিল না, বলটিও ঢুকেছে গোলে, সুতরাং গোলেরই নির্দেশ দিতে হবে। কিন্তু 'বলটি' কি গোলে ঢুকেছে? যেটি গোলে ঢুকেছে সেটি বল নয়, বলের চামড়া আর ব্লাডার। আইনে বলের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে: বলের পরিধি ২৭ ইঞ্চির কম এবং ২৮ ইঞ্চির বেশী হবে না, বলের ওজন থাকবে ১৪ থেকে ১৬ আউন্সের মধ্যে। সুতরাং ফাটা বল যখন গোলে প্রবেশ করেছে, তখন সেটি আইন-মাফিক বল নয়, সুতরাং গোলও হবে না। রেফারীর কর্তব্য হবে, যেখানে বলটি ফেটেছে সেখানে 'ড্রপ' দিয়ে খেলা আরম্ভ করা।

'বলের' আইন সম্বন্ধে উল্লেখ করা যেতে পারে, বলের পাম্প সম্বন্ধে আইনে কিছু বলা হয়নি; এটা রেফারীর সিদ্ধান্ত সাপেক্ষ। অদূর ভবিষ্যতে আইনে বলের পাম্প সম্বন্ধে কিছু নির্দেশ আসা অস্বাভাবিক নয়। মোটর গাড়ীর চাকায় হাওয়া দেবার যেমন মাত্রা আছে, হয়তো তেমন কোন মাত্রা বিধিবন্ধ হতে পারে।

"স্লাইডিং ট্যাকেল"—কাৎ হয়ে বল খেলবার চেষ্টা অপরাধ নয়, যদি বলই লক্ষ্য থাকে। এভাবে বল কাড়তে চেষ্টা করলে প্রতিপক্ষের কিছু অসুবিধা হয় বটে, কিন্তু যদি প্রতিপক্ষকে আটকে রাখবার চেষ্টা না হয়, তবে দোষ কিছু নেই

'ডেঞ্জারাস প্লে' বা বিপজ্জনক খেলা—এখানেও লক্ষ্য বল, কিন্তু এমনভাবে একজন খেলোয়াড় জোড়পায়ে লাফিয়ে উঠেছেন যে, এইভাবে অপরের পায়ের উপর পড়লে তার পা গুঁড়ো হয়ে যেতে পারে, নিজেরও বিপদের সম্ভাবনা। এখানে শাস্তি ইনডিরেক্ট ফ্রি কিক

প্রথম প্রশ্নে মেওয়ালাল যেভাবে গোল করছিলেন, ঠিক এইভাবে গোল করবার সময় মাঠের কোনো দর্শক বা দলের কোনো সমর্থক বলটি গোলে ঢুকবার মুখে হাত দিয়ে থামিয়ে দিলেন, বল গোলে ঢুকলো না। রেফারী হিসেবে এখানে আপনার সিদ্ধান্ত কি? গোল না ড্রপ? এখানে তো বল আইন মাফিক ছিল, আর রক্ষণকারী দলের বলটি আটকাবার কোনই সুযোগ ছিল না, একটি নিশ্চিত গোল বাইরের লোকের পাগলামির ফলে কি নষ্ট হতে পারে? এর উত্তর—হ্যাঁ পারে। আইনে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে: গোল হবার যে সব নিয়ম আছে, সেই সব নিয়মে যখন বলের সম্পূর্ণ অংশ গোল-পোস্টের মধ্য দিয়ে এবং ক্রসবারের তল দিয়ে গোলে প্রবেশ করবে তখনই গোল হবে, এখানে বলটি তো গোলে প্রবেশ করবার সুযোগ পায়নি। সুতরাং আপনি কিভাবে গোলের নির্দেশ দেবেন? ড্রপ দিয়েই আপনাকে খেলা আরম্ভ করতে হবে।

আইনের কূট তর্কের ফলে মাত্র একটি অবস্থা পাওয়া গেছে, যে অবস্থায় বল গোলে না ঢুকলেও গোলের নির্দেশ দেওয়া যেতে পারে। সেটি হচ্ছে গোলকিপার যদি ক্রসবার ধরে ঝুলে থাকেন বা ক্রসবার টেনে ধরেন এবং সেই অবস্থায় বলটি ক্রসবারে লেগে ফিরে আসে; তাহলে রেফারী গোলের নির্দেশ দিতে পারেন, যদি তিনি মনে করেন, গোলকিপারের ক্রসবার টানার ফলে ক্রসবার নীচে নেমে গেছে। অন্য কোনভাবে ক্রসবার স্থানচ্যুত হলেও রেফারী তাঁর বিবেচনামত গোলের নির্দেশ দিতে পারেন।

* * *

আর একটি জামাই ঠকানো প্রশ্ন। একজন খেলোয়াড় এমন অবস্থায় পর পর দুটি গোল করতে পারেন কি না, যার মধ্যে আর কেউই বল স্পর্শ করবে না। স্পর্শ করা অর্থে এখানে আইনসঙ্গত খেলাকেই বোঝায়; অর্থাৎ একই খেলোয়াড় উপর্যুপরি এমনভাবে দুটি গোল করতে পারেন কি না, যার মধ্যে স্বপক্ষ বা বিপক্ষ কোন খেলোয়াড়েরই বল খেলবার প্রয়োজন হবে না। সাধারণভাবে মনে হবে, এ কি করে হয়? একটি গোল হবার পর যারা গোল খেয়েছে, তাদের তো মাঝ মাঠ থেকে খেলা আরম্ভ করতে হবে, তাহলেই তো অপরের স্পর্শ হয়ে গেল। আমি যদি বলি—গোল করার সঙ্গে সঙ্গেই বিশ্রাম সময়ের বাঁশী বেজে উঠলো এবং যারা গোল করেছে, তারাই দ্বিতীয়ার্ধে 'কিক অফ' অর্থাৎ মাঝ মাঠ থেকে খেলা আরম্ভ করলো, তাহলেও প্রশ্ন থাকে এক শটে তো গোল হবে না। যিনি বিশ্রামের আগে গোল করেছেন, দ্বিতীয়ার্ধের সূচনায় তিনি কিক করলেও আইনসঙ্গত গোলের জন্য হয় স্ব-পক্ষ না হয় প্রতিপক্ষ কোনো খেলোয়াড়ের বল স্পর্শ

'ট্রিপিং বা ট্রিপিংয়ের ভান করা'—ফুটবল আইনে ট্রিপিং বা ল্যাং মারা গুরুতর অপরাধ। ফৌজদারী কার্যবিধিতে যেমন খুন করা বা খুনের চেষ্টা করা একই ধরনের অপরাধ তেমন ল্যাং মারা বা ল্যাং মারার চেষ্টাও অপরাধ। কিন্তু এখানে কি সত্যিই ল্যাং মারার চেষ্টা হয়েছে না একজন পড়ে যাবার ভাণ করছেন, এ সিদ্ধান্তের একমাত্র বিচারক খেলার রেফারী

করতে হবে। কারণ 'কিক অফ' থেকে সরাসরি গোল হয় না, অপরের স্পর্শ ব্যতিরেকে। বড়ই সমস্যার ব্যাপার। তাহলে অপরের স্পর্শ ব্যতিরেকে একই খেলোয়াড়ের পর পর দুটি গোল হয় কিভাবে? নিশ্চয়ই হয়। ধরুন, বিশ্রাম মুহূর্তে আপনি গোল করেছিলেন, আর খেলা আরম্ভ হয়নি। দ্বিতীয়ার্ধে আপনাদের 'কিক অফ' করবার কথা—আপনিই খুব জোরে বিপক্ষ গোলের দিকে উঁচু কিক করলেন এবং অনুসরণ করলেন বলটির, বল যখন প্রতিপক্ষ এলাকার শূন্যে বিচরণ করছে, তখন প্রতিপক্ষের কেউ আপনাকে ফাউল করলো বা করলো পেনাল্টি—আপনারা ডিরেক্ট ফ্রি কিক বা পেনাল্টি কিক পেলেন এবং আপনিই শট করে গোল করলেন। একমাত্র এই অবস্থায় পর পর দুটি গোল করা আপনার পক্ষে সম্ভব; কিন্তু দুটির বেশী নয়।

হ্যাঁ, ডিরেক্ট ফ্রি কিক এবং ইনডিরেক্ট ফ্রি কিক করবার নির্দেশ সম্পর্কে নতুন আইনে যে ব্যবস্থা করা হয়েছে, কলকাতার মাঠের রেফারীদের মধ্যে অনেকে সেই নিয়ম পালন করেন, অনেকে করেন না। কয়েক বছর আগের এক ঘটনায় একটি ফ্রি কিক পেয়ে দুইজন বিখ্যাত খেলোয়াড় রেফারীকে প্রশ্ন করেছিলেন—এ শটে সরাসরি গোল হবে কি হবে না। কিন্তু নতুন নিয়মে মনে এমন সন্দেহ জাগবার কোনো কারণ নেই। রেফারীর নির্দেশ দেখেই খেলোয়াড় ও দর্শক বুঝতে পারেন, কিকটি ডিরেক্ট কি ইনডিরেক্ট। ইনডিরেক্ট ফ্রি কিক করবার সময় এখন বাঁশী বাজাবার নিয়ম নেই, রেফারী মাথার উপর দিয়ে হাত দুলিয়ে শুধু দেখিয়ে দেবেন কিক করো। বাঁশী বাজাবেন না। সব রেফারী এই নিয়ম পালন করলে অনেক বিতর্কের অবসান হতে পারে।

দেশী সংবাদ

২৬শে সেপ্টেম্বর—ভারত সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের সহকারী ইন্সিওরেন্স কন্ট্রোলার শ্রী এম জে রাও ভারত ইন্সিওরেন্সের এডমিনিস্ট্রেটর নিযুক্ত হইয়াছেন। দুই কোটি টাকা তছরূপ করার অভিযোগে ভারত ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর চেয়ারম্যান শেঠ রামকৃষ্ণ ডালমিয়াকে গ্রেপ্তার করার অব্যবহিত পরেই এই ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়।

২৭শে সেপ্টেম্বর—আজ পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার বিলটি উত্থাপিত হয়। এই বিলের বিধানানুযায়ী কাহাকেও একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের অতিরিক্ত জমি রাখিতে দেওয়া হইবে না এবং কোন মালিক জমির অপব্যবহার করিতে পারিবে না। জমির অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া জমির খাজনা নির্ধারিত হইবে।

প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরু আজ লোকসভায় জানান যে, চলতি বৎসরের ৩১শে জুলাই অবধি পূর্ব পাকিস্থান হইতে ৩৫ লক্ষ হিন্দু ভারতে চলিয়া আসিয়াছে।

আজ সংসদে ব্যয়বরাদ্দ কমিটি তাহাদের পঞ্চদশ রিপোর্ট পেশ করিয়াছে। উহাতে বলা হইয়াছে যে, শিল্পোন্নয়নের স্বার্থে যথাসময়ে কয়লা শিল্পকে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হইবে।

আজ লোকসভায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী পণ্ডিত পন্থ ঘোষণা করেন যে, কাহারও উপর হিন্দী ভাষা চাপাইয়া দেওয়ার কোন অভিপ্রায় সরকারের নাই।

২৮শে সেপ্টেম্বর—কেন্দ্রীয় সেচ ও বিদ্যুৎ সরবরাহ দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীগুলজারীলাল নন্দ অদ্য লোকসভায় বলেন, বন্যা প্রতিরোধ ব্যবস্থার জন্য দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ১১৭ কোটিরও অধিক টাকা ব্যয় হইবে।

আজ রাজ্য সভায় তথ্য ও বেতার মন্ত্রী ডাঃ বি ভি কেশকার বেতনভুক বার্তাজীবীদের চাকরির অবস্থা নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি বিল উত্থাপন করেন। বিলের এইরূপ বিধান আছে যে, বার্তাজীবীদের ন্যূনতম বেতনের হার নির্ধারিত করার জন্য সরকার একটি বোর্ড নিয়োগ করিবেন।
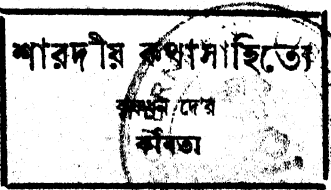
মহারাষ্ট্র প্রদেশ জনসঙ্ঘের সভাপতি ও বোম্বাই বিধান পরিষদের সভাপতি শ্রীউত্তমরাও পাতিল আগামী ২রা অক্টোবর ৫০জন সত্যাগ্রহীর একটি দলের গোয়া অভিযান পরিচালন করিবেন বলিয়া সর্বদলীয় গোয়া মুক্তি কমিটি আজ ঘোষণা করিয়াছেন।

২৯শে সেপ্টেম্বর—কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের বেতন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয় সাহায্য কমিশন রাজ্য সরকার এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে যথেষ্ট অর্থ সাহায্য প্রদানের প্রস্তাব করিয়াছেন। কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী বেতনের হার প্রবর্তিত হইলে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ক্ষেত্রে যে ব্যয় বৃদ্ধি পাইবে, তাহার শতকরা ৮০ ভাগ কমিশন বহন করিতে প্রস্তুত আছেন বলিয়া জানাইয়াছেন।

ভারতীয় প্রজা-সমাজতন্ত্রী নেতা শ্রী এন জি গোরে গোয়ার সামরিক আদালত কর্তৃক ১০ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। শ্রী গোরে গত ১৮ই মে গোয়ায় প্রথম ভারতীয় সত্যাগ্রহ দলটি পরিচালনা করেন।

আজ লোকসভায় প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরু বলেন যে, নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মৃত্যু সম্পর্কে তাঁহার কোন সংশয় নাই।

৩০শে সেপ্টেম্বর—আজ রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ ও প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরুর নিকট রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের রিপোর্ট পেশ করা হয়।

কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রী শ্রীঅজিতপ্রসাদ জৈন আজ লোকসভায় ঘোষণা করেন যে, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় খাদ্যশস্যের উৎপাদন এক কোটি টন বৃদ্ধি করাই গভর্নমেন্টের ইচ্ছা। ইহার ফলে ১৯৫৫—৫৬ সালে উৎপাদন শতকরা ১৫ ভাগ বৃদ্ধি পাইবে।

১লা অক্টোবর—কলিকাতার তথ্যাভিজ্ঞ মহল হইতে জানা যায় যে, রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন বিহারের অন্তর্গত মানভূম জেলার পুরুলিয়া মহকুমা এবং কিষণগঞ্জ মহকুমার কিয়দংশ পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্তির সুপারিশ করিয়াছেন। প্রকাশ, ত্রিপুরা রাজ্যকে কমিশন আসামের অন্তর্ভুক্তির সুপারিশ করিয়াছেন।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ আজ লোকসভায় বলেন যে, গতকল্য সরকারের নিকট রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের যে রিপোর্ট পেশ করা হইয়াছে তাহা সম্ভবত দুই সপ্তাহের মধ্যে প্রকাশ হইবে।

অর্থমন্ত্রী শ্রী সি ডি দেশমুখ আজ লোকসভায় জানান যে, শ্রীরামকৃষ্ণ ডালমিয়া বিরুদ্ধে ভারত ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর তহবিল তছরূপের অভিযোগ করা হইয়াছে শ্রী ডালমিয়ার জামাতা জনৈক শিল্পপতি টাকা পূরণ করিয়া দিবার যে প্রস্তাব করিয়াছেন, সরকার এখনও তাহা গ্রহণ করেন নাই।

২রা অক্টোবর—প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরু আজ পেরাম্বুরে পূর্ণাঙ্গ বগি নির্মাণ কারখানার উদ্বোধন করেন।

বিদেশী সংবাদ

২৭শে সেপ্টেম্বর—সীমান্ত গান্ধী লাল কোর্তা নেতা খান আবদুল গফ্‌ফর খান বেলুচিস্থানের মাচ জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। অদ্য তিনি ট্রেনযোগে করাচীতে আসিয়া পৌঁছেন।

মিশরের সহকারী প্রধান মন্ত্রী উইং কম্যাণ্ডার গামাল সালেম আজ ঢাকায় বলেন যে, কাশ্মীরের প্রশ্ন ভারত ও পাকিস্থানের পক্ষে নিজেদের মধ্যে মিটাইয়া ফেলা উচিত।

২৮শে সেপ্টেম্বর—নিউ ইয়র্কে পশ্চিমী বৃহৎ ত্রিশক্তির পররাষ্ট্র মন্ত্রিগণ আজ এক ইস্তাহারে ঘোষণা করেন যে, আগামী মাসে জেনেভায় যে চতুঃশক্তি পররাষ্ট্র মন্ত্রী বৈঠক অনুষ্ঠিত হইবে, উহাতে তাঁহারা ইউরোপীয় নিরাপত্তা পরিকল্পনার মধ্যে খণ্ডিত জার্মানীর পুনর্মিলনের প্রশ্নটিকেই প্রথম স্থান দিবেন।

করাচীস্থ ভারতীয় হাইকমিশনার কার্যালয়ের বাহিরে পাকিস্থানী নাগরিকগণ "ভারতের কাশ্মীর ত্যাগের" দাবী জানাইয়া যে বিক্ষোভ প্রদর্শন করিতেছে, ভারতীয় হাইকমিশনার শ্রী সি সি দেশাই আজ পাক পররাষ্ট্র দপ্তরে গিয়া উহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন।

২৯শে সেপ্টেম্বর—আজ লণ্ডনে সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে মিশর সোভিয়েট ইউনিয়ন ও চেকোশ্লোভাকিয়া হইতে অস্ত্রশস্ত্র ক্রয়ের যে সংকল্প করিয়াছে, বৃটেন তাহা গুরুতর ব্যাপার বলিয়া মনে করেন এবং সে কথাটি মিশরকে শীঘ্রই জানাইয়া দেওয়া হইবে।

১লা অক্টোবর—সোভিয়েট সরকার বৃটেন ও আমেরিকাকে এই কথা জানাইয়া দিয়াছে যে, তাঁহারা মনে করেন, প্রত্যেক রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বনের এবং অন্যান্য রাষ্ট্রের নিকট হইতে অস্ত্রশস্ত্র ক্রয়ের ন্যায়সঙ্গত অধিকার রহিয়াছে।

প্রতি সংখ্যা—৵০ আনা, বার্ষিক—২০৲, ষাণ্মাসিক—১০৲
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা, লিমিটেড, ৬ ও ৮, সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১৩
শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস লিমিটেড হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত
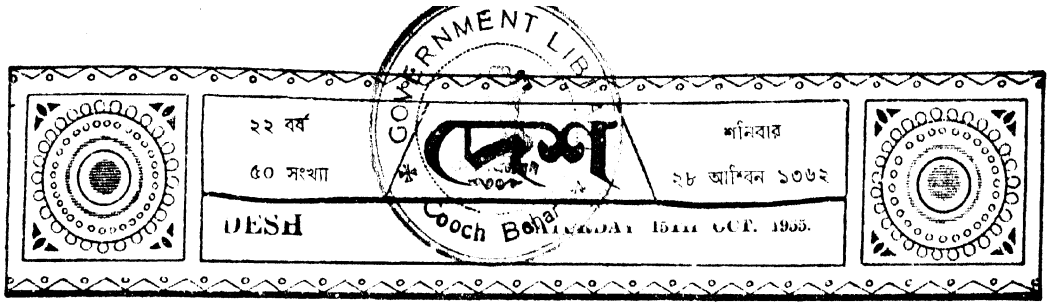
সম্পাদক—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন

সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

রাজ্য কমিশনের রিপোর্ট

রাজ্য কমিশনের প্রকাশিত রিপোর্ট সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে গভীর নৈরাশ্যের সঞ্চার করিবে। বাঙলাভাষাভাষী অঞ্চল সমূহ পুনরায় পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করিয়া বিখণ্ডিত পশ্চিমবঙ্গ সুসংহত এবং শাসন-ব্যবস্থার দিক হইতে সুসংস্থিত রাজ্যে পরিণত হইবে, এই আশা এতদিন পর্যন্তও বাঙালী অন্তরে পোষণ করিত, কমিশনের সুপারিশে সেই আশা সমূলে বিনষ্ট হইয়াছে। কিঞ্চিৎ দিও, বঞ্চিত করিও না, পশ্চিমবঙ্গের দাবী সম্বন্ধে কমিশনের সিদ্ধান্তে আগাগোড়া এইরূপ কার্পণ্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাঁহারা মানভূম জেলার সদর মহকুমাটি পশ্চিমবঙ্গকে দিয়াছেন, কিন্তু এইক্ষেত্রেও হিন্দী ভাষার অজুহাতে একটি থানা কাটিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, ধানবাদ বা ধলভূম অঞ্চলের ক্ষেত্রে আসিয়া পশ্চিমবঙ্গের সংলগ্ন বাঙলাভাষী থানাগুলি পশ্চিমবঙ্গকে দেওয়ার যুক্তিযুক্ততা তাঁহারা উপলব্ধি করেন নাই। কমিশনের সুপারিশগুলি অনুধাবন করিলে দেখা যায়, তাঁহারা অন্যান্য ক্ষেত্রে ভাষাভিত্তিক পুনর্গঠনের উপরই প্রধানত গুরুত্ব দিয়াছেন, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে স্পষ্টভাবেই সেই নীতি বর্জিত হইয়াছে পরন্তু কোন একটা নীতি মানিয়াই কমিশন চলেন নাই। ধলভূম, সাঁওতাল পরগণা, ধানবাদের পূর্বাংশ এবং আসামের গোয়ালপাড়া প্রভৃতি অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত না করিবার কোন কারণ ছিল না। পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাংশ এবং দক্ষিণাংশের মধ্যে ভৌগোলিক যোগ সাধনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া কমিশন পূর্ণিয়ার কিষেণগঞ্জ মহকুমার কিছুটা অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য সুপারিশ করিয়াছেন; কিন্তু এক্ষেত্রে তাঁহাদের সিদ্ধান্ত সুনিশ্চিত পথ ধরিতে সাহসী হয় নাই। তাঁহারা পুরাতন কোশী নদী পর্যন্ত অঞ্চলটি ছাড়িয়া দেন নাই। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই দাবী এক্ষেত্রে যদি রক্ষিত হইত, তবে সীমা নির্ধারণ সম্পর্কিত জটিলতার সহজেই সমাধান হইয়া যাইত। কিন্তু কমিশনের সিদ্ধান্ত এক্ষেত্রে ডামাডোল সৃষ্টি করিয়াছে। ত্রিপুরাকে আসামের অন্তর্ভুক্ত করিবার সিদ্ধান্ত আরও বিচিত্র; অধিকন্তু উৎকট। ত্রিপুরা পুরাপুরি বাঙলা-ভাষাভাষী রাজ্য। এই রাজ্যটিকে আসামের অন্তর্ভুক্ত করিবার পক্ষে কোন যুক্তিই খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার ত্রিপুরার জন্য দাবী করেন নাই, সুতরাং কমিশনকে যেন নিতান্ত দায়ে পড়িয়াই ত্রিপুরাকে আসামের মধ্যে ঠেলিয়া দিতে হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ত্রিপুরার জন্য দাবী কেন উত্থাপন করেন নাই, ইহা আমাদের কল্পনারও অতীত, কিন্তু সেইজনাই কি বিচার-বিবেচনাকে বিসর্জন দিতে হইবে? লাক্ষা দ্বীপ এবং আমিন দ্বীপ যদি প্রস্তাবিত কেরল রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে, তবে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ কেন পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিবে না, ইহাও আমাদের বুদ্ধির অগম্য। এই দ্বীপপুঞ্জকে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিলে পূর্ববঙ্গ হইতে আগত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন সমস্যার সমাধান সম্পর্কে সুবিবেচনার পরিচয় দেওয়া হইত। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে পূর্ববঙ্গ হইতে আগত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের পরিকল্পনা ইতোমধ্যেই সাফল্যের পথে অগ্রসর হইতে চলিয়াছে, কিন্তু এই ক্ষেত্রে কমিশন পশ্চিমবঙ্গকে বঞ্চিত করিয়াছেন। মোটের উপর কমিশনের সুপারিশ বাঙালী সমাজের বহুদিনের অভিযোগ এবং অসন্তোষের কারণ দূর করিতে যেরূপ কার্যকর হয় নাই, সেইরূপ পশ্চিমবঙ্গের শাসন-সম্পর্কিত সংকটও এতদ্দ্বারা চূড়ান্তভাবে নিরাকৃত হইবে না। পশ্চিমবঙ্গের দাবীর সম্বন্ধে সুবিচার করিলে ভারতের বৃহত্তর স্বার্থই রক্ষিত হইত এবং কমিশনের পক্ষে তাহা করাও খুব কঠিন ছিল না। কিন্তু সে আশায় আমরা বঞ্চিত হইয়াছি।

ভগিনী নিবেদিতা

১৩ই অক্টোবর ভগিনী নিবেদিতার তিরোভাব দিবস। ভারতের কল্যাণের জন্য নিবেদিতার সমগ্র জীবন উৎসর্গিত হইয়াছিল। স্বামী বিবেকানন্দ দীক্ষা-দানের পর তাঁহাকে ভারতের মঙ্গলব্রতে নিবেদিত করিয়াছিলেন। স্বামীজী

তাঁহাকে আশীর্বাদ করিয়াছিলেন, 'যদি আমার নিজের কোন অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য তোমাকে আমি বলিরূপে গ্রহণ করিয়া থাকি, তবে এই বলি বৃথা হউক; আর যদি ইহার মূলে সেই পরমাশক্তির ইচ্ছা থাকে, তবে তুমি সার্থক হও, তোমার জয় হউক।' স্বামীজীর এই আশীর্বাদ নিবেদিতার জীবনে সর্বাংশে সার্থকতা লাভ করে। অমল-ধবল কমল কোরকের মত লোকোত্তর-চরিত্র গুরুর কৃপাশক্তি-প্রভাবে নিবেদিতার জীবন বিকশিত হইয়া উঠে এবং ভারতের সভ্যতা, সংস্কৃতি এবং সর্বোপরি এই দেশের জাতীয় জীবনের বিকাশের পথে নবীন শক্তি সঞ্চার করে। ভারতের জন্য নিবেদিতার সাধনাকে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ শিবের জন্য সতীর তপস্যার সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে ভারতের সভ্যতা এবং সংস্কৃতির মর্মমূলে নিবেদিতা শিবের অচল প্রতিষ্ঠস্বরূপটি উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এদেশের দরিদ্র, উপেক্ষিত, অত্যাচারিত এবং লাঞ্ছিতের মধ্যে তিনি ঈশ্বর প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন এবং সেই পরম দেবতারই পায়ে নিজের জীবনটি কমলদলের মত উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। ভারতের মহত্ত্বকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ভগিনী নিবেদিতার প্রাণমূলে যে আবর্ত উত্থিত হইয়াছিল, তাহার বিকাশ এবং বৈভব বৈপ্লবিক যুগে বাঙলা দেশে আগুনের খেলা খেলে এবং বিদেশীর প্রভুত্বকে উৎখাত করিবার বলিষ্ঠ শক্তি উদ্বুদ্ধ করে। অত্যাচারিত, নিপীড়িত মানুষের বেদনার বিপুল আবেগে দুর্গমের সাধনায় জাতিকে তিনি আগাইয়া দেন। বুকের রক্ত দিয়া কাপুরুষতার গ্লানি হইতে জাতিকে মুক্ত করিতে হইবে, জাগাইতে হইবে মনুষ্যত্বকে, নিবেদিতার ইহাই ছিল জীবন-ব্রত। ভগিনী নিবেদিতার এখানে ভৈরবী মূর্তি, আবার এদেশের আর্ত-পীড়িত, দরিদ্রের সেবার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন মঙ্গলময়ী মাতা মূর্তিমতী মমতা। এইরূপে ঔজ্জ্বল্যে মধুরে নিবেদিতার জীবনলীলা ভারতের নব জাগরণের ইতিহাসকে সকল দিক দিয়া আলো করিয়াছে। তাঁহার তিরোভাব দিবসে আমরা তাঁহার চরণে নিজেদের আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

পূজার বাজার

কলিকাতায় পূজার বাজার আরম্ভ হইয়াছে। কলিকাতা শহর ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থান এবং সেই সূত্রে ধন-সম্পদ এখানে পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছে, সুতরাং বিত্তশালী ব্যক্তির অভাব এখানে নাই। পূজা উপলক্ষে দোকানে দোকানে ক্রেতার ভিড় শুরু হইয়াছে এবং কেনা-বেচার ক্ষেত্রেও তৎপরতা কিছুটা বৃদ্ধি পাইয়াছে; কিন্তু পূজার আনন্দ বলিতে বিশেষভাবে যাহা বুঝায়, সেই প্রাণের সাড়া পাওয়া যাইতেছে না। ইহার প্রধান কারণ এই যে, যে সামাজিক এবং অর্থ-নীতিক ভিত্তির উপর বাঙালী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের পারিবারিক সংস্থিতি ছিল কয়েক বৎসরে তাহা ভাঙিয়া পড়িয়াছে। বেকার সমস্যা গুরুতর জটিল হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ববঙ্গ হইতে উদ্বাস্তুদের সমাগমের সংখ্যাধিক্য এইখানে উত্তরোত্তর গুরুতর আকার ধারণ করিতেছে। দৈনন্দিন জীবন চালানোই যাহাদের পক্ষে দুর্ঘট, পূজার ব্যয়াধিক্য বহন করিবার সামর্থ্য তাহাদের কোথায়? প্রকৃতপক্ষে পূজা-সাহিত্যের সমারোহই শহরের পূজার প্রতিবেশ অনেকটা জমাইয়া তুলিয়াছে। পূজার বাজারে সাহিত্য সৃষ্টির এমন প্রাচুর্য ইতিপূর্বে পরিলক্ষিত হয় নাই। বাহিরের জীবনে মনের আশ্রয় না পাইয়া বাঙালী সমাজের চিন্তাধারা সম্ভবত অন্তরের আশ্রয় খুঁজিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ইহা শুভ লক্ষণ সন্দেহ নাই। এই পথে পশ্চিম-বঙ্গে সমাজ-জীবনে নব সৃষ্টির চেতনা জাগিবে, আশা করা যায়। স্বদেশীর যুগেও সাহিত্যের ভিতর দিয়াই বাঙালী নব-সৃষ্টির প্রেরণা পাইয়াছিল। স্রষ্টাদের দায়িত্ব এক্ষেত্রে সমধিক। শহরের সর্বত্র সর্বজনীন দুর্গোৎসবের আয়োজন এবারও সমানভাবেই আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু এইসব আয়োজন দুই দিনের হুজুগে পর্যবসিত না হইয়া যদি প্রাণশক্তিকে সংহত করিয়া তোলে এবং বহুজনের সেবার ভিতর দিয়া আনন্দকে ছন্দায়িত করে, তবেই উৎসব হিসাবে ইহার সার্থকতা।

কাপড়ের বাজারে ফাটকাবাজী

পূজার বাজারে কৃত্রিমভাবে কাপড়ের দাম চড়াইয়া মোটা লাভ করিবার দুষ্প্রবৃত্তি চাড়া দিয়া উঠিয়াছে। বাজারে কাপড়ের অভাব সৃষ্টি করিবার মতলবে শালিমার, হাওড়া প্রভৃতি রেলস্টেশন হইতে মাল ডেলিভারি লওয়া হয় নাই। ব্যবসায়ীদের দুরভিসন্ধি উপলব্ধি করিয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকার এক্ষেত্রে নিরাপত্তারক্ষা আইন প্রয়োগ করিবেন, এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। আমাদের মতে, দেশের লোকের সর্বনাশ করিবার জন্য যে শ্রেণীর ব্যবসায়ীরা এইরূপ ঘৃণ্য কৌশল অবলম্বনে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহাদের সম্বন্ধে কোনরূপ বিচার-বিবেচনা করা উচিত নয় এবং সরাসরি ইহাদের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা আইন প্রয়োগ করা কর্তব্য। বস্ত্র-ব্যবসায়ীরা যে নিজেদের কোন অসুবিধার জন্য মাল ডেলিভারি লইতেছে না, ইহা বিশ্বাস করা সম্ভব নয়। প্রকৃতপক্ষে এইভাবে বিভিন্ন রেলস্টেশনে এত পরিমাণে কাপড়ের গাঁইট জমা হইবার মূলে সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টা রহিয়াছে, ইহা সুস্পষ্ট। কতকগুলি বিত্তশালী ব্যক্তি নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য পূর্ব হইতে মতলব বাঁধিয়াই এই খেলা শুরু করিয়া দিয়াছে। এই শ্রেণীর লোভী সমাজদ্রোহী ব্যবসায়ী-দিগকে কঠোরহস্তে সায়েস্তা করা দরকার এবং চিরদিনের মত যাহাতে তাহারা শিক্ষালাভ করে, দণ্ড এমন হওয়াই সর্বতোভাবে প্রয়োজন।

পূর্ববঙ্গে সংস্কৃতের প্রসার—

পূর্ববঙ্গ সারস্বত সমাজ গত ৭৬ বৎসর ধরিয়া সংস্কৃত শিক্ষা প্রসারে নিয়োজিত আছে। পূর্বে সমগ্র বঙ্গদেশ জুড়িয়াই ইহার কর্মকেন্দ্র বিস্তৃত ছিল। বঙ্গদেশ বিভক্ত হইবার পর এই ক্ষেত্র প্রধানত সঙ্কুচিত হইয়াছে। তথাপি সমাজের পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীর সংখ্যা হ্রাস পায় নাই, ইহা সুখের বিষয়। শুধু বর্ণহিন্দু নহে, তপশীলী হিন্দু এবং মুসলমান সমাজেও পরীক্ষায় পরীক্ষার্থী হইতে আরম্ভ করিয়াছেন। পূর্ববঙ্গ সরকার সংস্কৃত শিক্ষার আনুকূল্য বিধানে সমধিক উদ্যোগী হইয়াছেন, ইহাও প্রণিধানযোগ্য।

সর্বরূপময়ী দেবী

সর্বদেবীময়ং জগৎ।

৬ সুটারকিন স্ট্রিট কলিকাতা-১৩

প্রকাশিত হল

বাংলা দেশে প্রতি বৎসর যতগুলি শারদীয়া সংখ্যা প্রকাশিত হয় **"শারদীয়া দেশ"** যে তার মধ্যে অন্যতম সুসম্পাদিত এবং উৎকর্ষের বিচারে বিশিষ্ট একটি সংখ্যা সে বিষয়ে পাঠক মহলে সন্দেহের অবকাশ নেই। রচনা, বিষয় ও লেখক নির্বাচনে এই সংখ্যা প্রতি বৎসরই বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। বর্তমান বৎসরেও রচনায় এবং চিত্রে সুসম্পাদিত সুশোভিত এই সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়েছে।

কনিষ্ঠ জামাতা পরলোকগত নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা **রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত পত্রাবলী** এই সংখ্যার বিশিষ্ট সম্পদ। অন্যতম আকর্ষণীয় অন্যান্য প্রবন্ধের মধ্যে রয়েছে **ক্ষিতিমোহন সেনের** নতুন ধরনের প্রবন্ধ 'বিচিত্ররূপিনী'; **ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের** চিন্তাশ্রয়ী ও সময়োপযোগী প্রবন্ধ 'কবির নির্দেশ', আন্দামান ও তার অধিবাসী ওঙ্গে জাতির সম্পর্কে লেখা ডক্টর **নবেন্দু দত্তমজুমদারের** সচিত্র প্রবন্ধ; বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর এখন বিস্মৃতপ্রায়, তাঁর কবিতা প্রসঙ্গে একটি মনোজ্ঞ প্রবন্ধ রচনা করেছেন অধ্যাপক **ভবতোষ দত্ত**। ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীর গোড়ার কথা ও তার সংগঠনের বিস্তৃত ইতিহাসই শুধু নয় আরও নানান জ্ঞাতব্য তথ্য আছে **চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের** রচনা 'ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরী' সচিত্র প্রবন্ধে। সেরাইকেলার ছোউ নৃত্যের উৎপত্তি ও বিবর্তন সংক্রান্ত তথ্যাদি পাওয়া যাবে **সুধীর বন্দ্যোপাধ্যায়ের** সচিত্র প্রবন্ধে। অধ্যাপক **ধরণী সেনের** সচিত্র প্রবন্ধ 'সাতপুরার চিত্রিত গুহা' ভারতের এক প্রাচীন গুহা চিত্র সম্বন্ধে নূতন আলোকপাত করেছে। 'প্রাচীন ভারতের মহিলা চিত্রশিল্পী'—প্রবন্ধের এই নামকরণ লেখিকা **সুধা বসুর** রচনাটির বক্তব্য সুপরিস্ফুট করছে, প্রাচীন মহিলা শিল্পীদের অঙ্কিত কয়েকটি চিত্রের প্রতিলিপি এই প্রবন্ধটিকে অলঙ্কৃত করেছে। **শুভময় ঘোষের** সচিত্র প্রবন্ধ 'শিল্পী রামকিংকর'। 'চলচ্চিত্রের ভবিষ্যৎ ধারা' **পংকজ দত্ত** আর একটি সচিত্র প্রবন্ধ, চলচ্চিত্র সংক্রান্ত। গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ নয় অথচ কাব্যাবেগমণ্ডিত সুন্দর রচনা **প্রবোধকুমার সান্যালের 'আশ্রম সবরমতী'**, রম্যরচনা আসরে নেমেছেন এবার **মনোজ বসু**, 'নোঙর' তাঁর লঘু রচনা, **বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের** মধুর ও দীপ্ত রম্যরচনা 'বিবাহ'।

বাংলার প্রবীণতম লেখক ও হাস্য-ব্যঙ্গ গল্পের শ্রেষ্ঠ রচনাকার **পরশুরামের** এবারকার অনবদ্য গল্প **'দ্বান্দ্বিক কবিতা'**। **তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের** উপন্যাসে প্রাচীন গ্রাম-বাংলার সাংস্কৃতিক ও ধর্মজীবনের বিভিন্ন রূপ একাধিক ক্ষেত্রে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। 'রাধা' উপন্যাসের কলেবর বৃহৎ নয়, ভাববস্তু মহৎ। অষ্টাদশ শতাব্দীর পটভূমিকায় রচিত এই উপন্যাসে তৎকালীন বৈষ্ণব সমাজের একটি অংশে যে নূতন ধর্ম-জিজ্ঞাসা, সন্দেহ এবং বিদ্রোহ দানা বাঁধতে চেয়েছিল এবং শেষাবধি ব্যর্থ হল তার অপূর্ব চিত্র ফুটেছে 'রাধা'য়। **দিলীপকুমার রায়ের** আধ্যাত্মিক উপলব্ধিমূলক সুদীর্ঘ কাহিনী 'গল্প? না গল্পের মুখোশ'?—আর একটি আকর্ষণীয় রচনা। এ ছাড়া প্রধান গল্প লেখকদের মধ্যে লিখেছেন **অন্নদাশংকর রায়** যাঁর গল্পের নাম 'বজ্র আঁটুনি', অন্যান্য গল্প ও লেখকদের নাম 'সেকালের রোমান্স' **সরলাবালা সরকার**, 'সেই সন্ন্যাসীটির কি হইল' **প্রমথনাথ বিশী**, 'এ-কূলে ও-কূলে' **শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়**, 'গীতা' **শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়**, 'অক্ষয় মুখুজ্জে' **শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায়**। সাম্প্রতিক কালের শক্তিমান গল্পকারদের মধ্যে রয়েছেন—**সতীনাথ ভাদুড়ী**, তাঁর গল্প 'রাতের আবেশ'। 'অঙ্গীকার' **নরেন্দ্রনাথ মিত্র**, 'ঘ্রাণ' **সন্তোষকুমার ঘোষ**, 'কলঙ্ক' **নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়**, 'জেণ্টলম্যান' **রঞ্জন** 'ট্যাক্সিওয়ালা' **জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী**, 'নজর আলি' **প্রভাত দেব সরকার**, 'যুবতী ধরম' **রমাপদ চৌধুরী** এবং 'অ্যালবাম' **বিমল কর**।

জীবনানন্দ দাশের কবিতা 'মহাযুদ্ধ শেষ হয়েছে' কবিতা অংশের অন্যতম সমৃদ্ধ রচনা। প্রবীণ কবিদের মধ্যে আরও আছেন **প্রেমেন্দ্র মিত্র**, তাঁর কবিতা 'আছে', 'আফ্রিকা স্বাক্ষর' **অমিয় চক্রবর্তী** **'এবং লখিন্দর'** বিষ্ণু দে, 'গন্তব্য' **অজিত দত্ত**, 'বাজপাখি' **সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়**।

নবীন খ্যাত কবিদের মধ্যে **হরপ্রসাদ মিত্র, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, দিনেশ দাশ**, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, **অরুণ কুমার সরকার**, সুশীল রায়, মণীন্দ্র রায়, **জগন্নাথ চক্রবর্তী**, **অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, দেবদাস পাঠক**, আর্যপুত্র সুপ্রিয়, **অমলকান্তি ঘোষ**, মহম্মদ মাহ্‌ফুজুল্লাহ আর **আবু হেণা মুস্তফা কামাল** আছেন।

রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সংগৃহীত প্রাচীন বাংলার পট 'শ্রীশ্রীদুর্গা' ছাড়াও এই সংখ্যায় আরো দুটি রঙীন চিত্র আছে। একটি **আচার্য নন্দলালের** অপরটি **রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর**। এ ছাড়া আছে—**রামকিংকর, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়** ও **আচার্য নন্দলালের** বহু স্কেচ।

গত বছরের তুলনায় এবারের শারদীয়া **দেশ** পৃষ্ঠাসংখ্যায় ও আকারে বর্ধিত হয়েই **প্রকাশিত** হল কিন্তু মূল্য বৃদ্ধি হয়নি। প্রতি সংখ্যা **আড়াই টাকা**, রেজেস্ট্রী ডাকে **দুটাকা পনেরো আনা**। ভি পি-তে পত্রিকা পাঠানো সম্ভব নয়।

"কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ"

মহাশয়,—

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ মহাশয়ের রবীন্দ্রনাথের "কর্ণ কুন্তী সংবাদ" আলোচনাটি পাঠ করিয়া একটি সত্য উপলব্ধি করিলাম যে, অবিকল বাস্তবতা লইয়া যে কাব্য বা সাহিত্য রচিত না হইবে তাহা প্রকৃত সাহিত্য পদবাচ্য নহে এবং সেই সাহিত্যিকও উৎকৃষ্ট রচনাকারী নহেন কারণ কবি মহাভারতীয় পাপী অত্যাচারী দুর্যোধনের সর্ব অপকর্মের সহায়ক কর্ণকে কেমন করিয়া মহানুভব, মাতৃ অনুরক্ত, শান্ত, সৌম্যরূপে চিত্রিত করিয়াছেন এবং কেমন করিয়াই বা কলঙ্কিনী কুন্তীকে পুত্র-স্নেহাতুরা মহীয়সী রমণীরূপে অঙ্কিত করেন।

শ্রীমন্মথবাবু যদি পাশ্চাত্ত্য সমালোচক বা প্রাচ্য সমালোচকগণের কাব্যধারার আলোচনা-গুলি পুনরায় চিন্তা করেন তাহা হইলে নিশ্চয় স্বীকার করিবেন যে, ঐতিহাসিক সত্যের উপরেও একটা কাব্যিক সত্য আছে।

পাশ্চাত্ত্য সমালোচক তাঁর Poeticsএর আলোচনায় এক স্থানে বলিয়াছেন—

"The truth of Poetry is not a copy of reality but a higher reality: what to be, not what is.......... Probable impossibilities are to be preferred to improbable possibilities." (Aristotle).

দরদী সত্য সুন্দরের উপাসক কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ভাষা ও ছন্দ'-এ বলিয়াছেন "ঘটে যা তা সব সত্য নহে। কবি তব মনোভূমি রামের জনমস্থান, অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো"

কবির আন্তরদৃষ্টি চির সত্যানুসন্ধানী সেইজন্য আমি মনে করি যদি দরদী কবিমন সত্য শিব ও সুন্দরের সন্ধান পাইয়া থাকেন সেই মহাভারতীয় চরিত্রাবলীর কর্ণ কুন্তীর ব্যবহারের মধ্যে এবং সৃষ্টি করে অপূর্ব কাব্য তাহা কি শ্রীমন্মথবাবুর কঠোর বিরূপ সমালোচনায় ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে আমার দৃঢ় বিশ্বাস ধারাবাহিকভাবে কয়েক সংখ্যায় এই কাব্য আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের কবিমনের ধ্যান ধারণা আরও সুন্দর সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে পাঠক সাধারণের মনে। ইতি—শ্রীআদ্যাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ইলাছাবা, হুগলী।

'পরমাণবিক'

সবিনয় নিবেদন,

গত ২১শে আশ্বিনের দেশ পত্রিকায় শ্রীগোলকবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোচনা পড়লাম। আমি তাঁর বক্তব্য সমর্থন করি।

আলোচনার শেষে তিনি জিজ্ঞাসা করেছেন পারমাণুবিক, পরমাণবিক ও পারমাণবিক এ তিনটির মধ্য কোনটি 'এগ্রিয়েবল'?

এ সম্বন্ধে আমার মত বলছি।

পারমাণুবিক কথাটি একেবারেই ... তদ্ধিতপ্রত্যয়ের স্বরবর্ণ পরে ... পাদিকের অন্তস্থিত উ-বর্ণের ... অণু+ইক=অনো (গুণ)+ইক ... হয়ে) সন্ধিতে আণবিক। —আণুবিক ... পারে না।

পরমাণবিক শব্দটিকে কিন্তু ... বাতিল করা যায় না। আগে আণবিক ... গঠন করে পরে 'পরম' শব্দের সঙ্গে সমাস করে পরমাণবিক শব্দ গঠিত হতে পারে কিন্তু ঈপ্সিত অর্থ তাতে হয় না। এটিকেও বাদ দিতে হচ্ছে।

পারমাণবিক কথাটিই শুদ্ধ। ... পদিক। পরম শব্দের সঙ্গে সমাস ... "পরমাণু" প্রাতিপদিক গঠিত হল। ... পরমাণু+ইক (ঠঞ্)=পারমাণবিক। তদ্ধিত প্রত্যয়ের আইন অনুসারে আদ্যস্বরের বৃদ্ধি অনিবার্য। ব্যাকরণগতভাবে বিচার করে 'পারমাণবিক' কথাটিই রাখতে হয়। ... প্রশ্ন বাদ দিয়ে অন্য দৃষ্টি থেকে ... পারমাণবিক শ্রুতিকটু, পারমাণবিক ... 'পরমাণবিক'ই প্রয়োগসহ বাংলা।

পূর্বস্বর বৃদ্ধি বিষয়ে আইনের ... দেখা যায়। পরমাণবিক শব্দটিকেও ... খাটলেই ব্যাকরণসম্মত করে তোলা যায়। আমার মনে হয় পরমাণবিক শব্দটিই বাংলায় চলা উচিত। নমস্কার। ইতি—জ্যোতির্ময় ... দাসী, ৪২।১, অলজলা লেন, কলিকাতা।
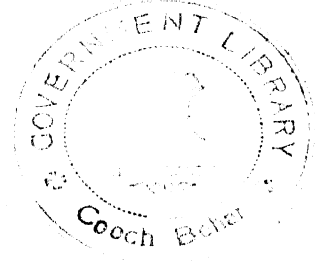
হাতে ভীরু দীপ

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

হাতে ভীরু দীপ, পথে উন্মাদ হাওয়া,
ভ্রূকুটিকুটিল সহস্র ভয় মনে।
কেন ভয়? কেন এমন সংগোপনে
পথে নেমে তোর বারে-বারে ফিরে চাওয়া?
এ কী ভয় তোর সকল সত্তা কাঁপায়?

আমি যে এসেছি, সে যেন জানতে না পায়।
দূরে হেলঙের পাহাড়, পাহাড়তলি
ছাড়িয়ে পিপলকোঠির চড়াই, আর
তারপর সাঁকো। বাঁয়ে গেলে গঙ্গার
ধারে সেই গ্রাম, আমৌঠি রঙ্কোলি।

সেইখানে যাব। সামনের শীতে যদি
পাওয়া যায় জমি ঢালু সিয়াসাঙে, তাই
চলেছি। এ ছাড়া—জানেন গঙ্গামাঈ—
কোনো আশা নেই। বরফের তাড়া খেয়ে
নির্জন পাকদণ্ডির পথ বেয়ে
নীচে নেমে যাই। কী ভয়ে আমাকে কাঁপায়—
জানে মানাগাঁও, জানে পাহাড়িয়া নদী।

আমি যে এসেছি, সে যেন জানতে না পায়।

মনে এলো

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

২৭।৭।৫৫

নতুন চিন্তা ও ধারণা নিয়ে, বক্‌বক্‌ না করলে আমার আবার মাথা খোলে না। এখানকার ছাত্ররা ও-ধরনে তৈরী হয়নি; শিক্ষকরাও বোধ হয় না। নিজের সঙ্গেই কথা কইতে হয়। তাই লিখতে শুরু করেছি। ডায়েরী নয়, যা মনে আসছে সব তাই নয়, নিজের ব্যক্তিগত বিষয় নয়, অথচ খানিকটা ত' তা বটেই। যা মনে আসছে, সেগুলি অনুপস্থিত, বুদ্ধিমান, সুশিক্ষিত, আগ্রহশীল বন্ধুর সঙ্গে নীরব কথাবার্তা। মার্টিন বুবার বলেন, সব কিছুই Thou and I-এর কথোপকথন, সংলাপ। Thou আমার ক্ষেত্রে ডিমন নয়, জীবন-দেবতা নয়, জীনিয়াস্‌ নয়—ভূত নয় প্রেত নয়; এমন একটি পুরুষ সে—স্ত্রীলোক নয়—যার আগ্রহ আমার আগ্রহের সমগোত্র; হয়ত আমার বিশেষ বন্ধুদের একটা আলকেমিক মিশ্রণ। তাদের সঙ্গে মনে মনে কথাবার্তা কইছি; লিখছি, কারণ সেই মিশ্রিত Thou-এর কোন উপাদান সামনে নেই। এক বই ছাড়া—অর্থাৎ লেখক ছাড়া এবং তাঁরাও নীরব। ক্যাসিরারের সঙ্গে কফি খেলে বেশ লাগত। ভদ্রলোক অত্যন্ত সুপুরুষ ছিলেন। কে একজন লিখেছেন, বর্তমানকালের অর্থনীতিজ্ঞ পণ্ডিতদের মধ্যে শুম্‌পীটার ছিলেন সেরা কথা কইয়ে। আলাপ করতে ইচ্ছে হচ্ছে।

* * *

আমার অভিজ্ঞতায় সবচেয়ে ভালো কথা-কইয়ের তালিকাঃ রবীন্দ্রনাথ, নাটোর, সাহেব সুরওয়ার্দি, অমৃতলাল, প্রমথ চৌধুরী, শরৎদা, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, অশ্বিনীকুমার দত্ত, সতীশ চট্টোপাধ্যায়, হারীতকৃষ্ণ দেব, হিরণকুমার সান্যাল, শিশির ভাদুড়ী—নামজাদাদের মধ্যে। লক্ষ্ণৌএ অনেক পেয়েছি। অজানাদের মধ্যে কত! এঁরা আড্ডা জমাতে পারতেন। সঙ্গীতজ্ঞদের মধ্যে এক ভাতখণ্ডেজী আর অমিয় সান্যাল। কিন্তু ওস্তাদদের মধ্যে অনেকেই—বিশেষ করে কেরামৎ খাঁ, হাফিজ আলি, ফৈয়াজ খাঁ। এঁদের wit ছিল অসাধারণ। অবনীবাবুর কথা ছিল খেয়ালী। ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ যে কোন আড্ডা জমাতে পারেন। শরৎদার মুখে বলা গল্প ছাপার অক্ষরে বেরিয়েছে, পড়লাম। সবগুলি না হোক, অনেকগুলিই আমার শোনা। ইদানীং একটু গরমিল হোতো। বলতেন, ভালো মিথ্যুক হবার জন্য সবচেয়ে প্রয়োজন স্মরণশক্তির, আজকাল একটু কমেছে, তাই ভাবছি বেশিদিন নয়। একদিন আমার বালিগঞ্জের বাড়িতে ৫।৬ ঘণ্টা কাটান। প্রমথবাবুও এসেছিলেন সন্ধ্যায়। কে কবে কোথায় বড় মাতাল দেখেছেন, তারই গল্প চলেছিল। প্রমথবাবু একটি য়ুরোপীয়ান মহিলার এবং শরৎদা একটি সাধুর গল্প বলেছিলেন। স্ত্রীলোকের সম্বন্ধে তাঁর বহু গল্প ছিল। একবার বলেছিলেন, তিনি মেয়েদের কাছ থেকে হাজার চিঠি পেয়েছিলেন, প্রত্যেকটাই নাকি আত্মচরিতের অধ্যায়। পতিতা রমণীর বহু জীবনী তিনি সংগ্রহ করেছিলেন, তিনি আমাকে বলেছিলেন। দেখাননি অবশ্য। বলতেন, হারিয়ে গেছে। তবে গল্প শোনাতেন অনেক। তাঁর কাছে স্ত্রী-চরিত্রের দু-তিনটি ছক ছিল। একদিন জিজ্ঞাসা করি, এত কম কেন? আমার ইঙ্গিত ছিল তাঁর নভেলের স্ত্রী-চরিত্রের বৈচিত্র্য-হীনতার প্রতি। তিনি বুঝে বল্লেন, 'ওদের মধ্যে বৈচিত্র্য নিতান্ত কম, যা পেয়েছি তাই লিখেছি।' আমার এখনও বিশ্বাস শরৎদা বহু স্ত্রীলোক জানলেও মাত্র যে টাইপের স্ত্রী-চরিত্র তাঁর হৃদয়ে আঘাত দিয়েছিল, মাত্র সেই টাইপ গুলোকেই 'জেনারেলাইজ' করতেন। এক 'সতী' ছাড়া। ঐ গল্পটি আমার অত্যন্ত ভালো লেগেছিল বলাতে তিনি নিজে এসে এক কপি উপহার দেন ও আমার স্ত্রীকে ঠাট্টায় বিব্রত করেন। সে যাই হোক, আড্ডা জমাতে পারতেন বটে; তবে তাতে দেরি হোতো। মধ্যে মধ্যে একেবারে গুম্‌ হয়ে যেতেন। রবীন্দ্রনাথের কথাবার্তার স্তর, ভঙ্গী, সবই ছিল অন্য। এমনটি হয় না, হবেও না। একদিন বলেছিলাম, 'রাত্রে না ঘুমিয়ে কথাগুলি বুঝি সাজিয়ে রাখেন?' 'না, তার প্রয়োজনই হয় না, পঞ্চাশ বছরের সাধনা ভুলছ কেন?'

অশ্বিনীকুমার দত্তের হাসি জীবনে ভুলব না। এক কোজাগর পূর্ণিমার রাত—প্রায় সারারাতই হাসি-গল্পের ফোয়ারা ছুটেছিল। বাঙালীর তাঁকে কি মনে আছে? মস্তলোক, মস্তলোক, মস্ত-লোক।

শ্যামবাজারের স্কুলপ্রাঙ্গণে অমৃত বাবুর সঙ্গে কথা কইতে দারুণ ইচ্ছে হচ্ছে।

লক্ষ্ণৌএর কথাবার্তায় রমাতা অনেক বেশি। উর্দু কবিতার জন্যে। রবীন্দ্রনাথের কবিতা যেমন আমাদের কথাবার্তার মধ্যে ঢুকেছে, তেমনই গালিব, মীর হালি, আকবর প্রভৃতির বহু কবিতা লক্ষ্ণৌএর মুসলমান, কায়স্থ কাশ্মীরীদের মুখে মুখে। গজলের প্রাণবস্তুটাই যে আলাপ, তাই 'উইট' সহজেই আসে।

৩১।৭।৫৫

বানডুঙ-এর বক্তৃতার জন্য পরিশ্রম করতে হচ্ছে। কেবল তথ্য-সংগ্রহ করলাম। কিন্তু এ-যুগে কো-অপারেশনের থিওরীর পিছনে রাষ্ট্র-সংক্রান্ত একটা থিওরী থাকা চাই। য়ুরোপে যখন কো-অপারেশন চলতে শুরু হোলো তখন ইংল্যাণ্ডে Laissez faire চলছে আর জার্মানীতে একপ্রকার আমলাতন্ত্রী রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন হচ্ছে। ফ্রান্স, ডেনমার্ক, ইত্যাদি দেশে রাষ্ট্র সম্বন্ধে কোন থিওরী ঐ সময়ে কি ছিল? যা কিছু চিন্তা, কেন্দ্র-বিচ্ছিন্ন সোশ্যাল ইকনমি ঘিরেই ছিল। তাছাড়া সামাজিক ও আর্থিক অবস্থাও ছিল ভিন্ন ভিন্ন। তাই কোথাও প্রোডিউসারস, কোথাও কনজ্যুমার্স কো-অপারেটিভসের প্রসার হলো। এদেশে মাদ্রাজ, বোম্বাই অঞ্চলে যা কিছু হয়েছে, তা প্রধানত রুর্যাল

ক্রেডিটএর দিকে। আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার এখনও ওরই ওপর জোর দিচ্ছেন। ভালো। স্টেট ব্যাংক তো হলো ঐ জন্যে প্রধানত, কিন্তু গ্রামোন্নতির অন্যদিকে কো-অপারেটিভগুলো কি করছে? রিজার্ভ ব্যাংকের শেষ রিপোর্ট পড়ে হতাশ হলাম। বরঞ্চ কম্যুনিটি প্রোজেক্ট, ন্যাশনাল এক্সটেনশান সার্ভিসএ বেশি কাজ হবে। গ্রাম একটা গোটা ও জীবন্ত জিনিস। তাকে গোটাভাবেই দেখতে হবে। এ-যুগে রাষ্ট্রকর্ম স্বেচ্ছাকর্মের অপেক্ষা সক্রিয় ও শক্তিশালী। সামাজিক সমগ্রতার ছবি রাষ্ট্রের আয়নাতেই ধরা পড়ছে আজকাল। পছন্দ হয় না। কিন্তু উপায় কি? বাকুনিন? আই ডু নট ওয়াণ্ট টু বি আই, আই ওয়াণ্ট টু বি উই? রোম্যাণ্টিক!

* * *

রাতে কেনিয়ন রিভিয়ুতে দোস্ত-য়েভ্স্কী সম্বন্ধে একটি চমৎকার প্রবন্ধ পড়লাম। বিশেষত 'দি পসেস্ড' নিয়েই আলোচনা। লেনিনগ্রাডের (না মস্কোতে?) একটি ঘটনা মনে পড়ল। য়েথানভের আর বে-খাতির নেই দেখে খুশী হলাম, যেমনি দোস্তয়েভ্স্কীর নাম কেউ করে না দেখে রাগ হলো। একজন সাহিত্যিককে বলেছিলাম, 'আবার আপনাদের দেশে আসব যেদিন দোস্তয়েভ্স্কীকে প্রতিক্রিয়াশীল বলে উড়িয়ে দেওয়া বন্ধ করবেন। তাঁর মাহাত্ম্যকে অত সহজে এক সামাজিক সূত্রের মধ্যে ফেলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তাতে রসবোধের পরিচয় পাওয়া যায় না। এবার আপনারা তো সামলে উঠেছেন, এবার তাঁর রচনা নিয়ে সাহিত্যালোচনা করুন না?' ভদ্রলোক সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন কোথাও, ঠিক মনে নেই। তিনি অবশ্য রাগেন নি, তবে দুঃখিত হয়েছিলেন। এই প্রবন্ধের পাদটীকায় গোটাকয়েক মজার কথা রয়েছে।

Lenin, The Possessed is "repulsive but great." Lunacharsky, he is "the most enthralling" of Russian writers. In a memorial published in 1920 for the hundredth anniversary of Dostoevsky's birth there appears this generous tribute: "Today we read the

Possessed, which has become reality; living with it and suffering with it, we create the novel afresh in union with the author. We see a dream realised and we marvel at the visionary clairvoyance of the dreamer who cast the spell of Revolution on Russia...."

অবশ্য মত বদলাবেই। আমি কিন্তু ভাবছি, দেশ যদি সমাজতন্ত্রীই হয়, তবে কি রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথকে প্রতিক্রিয়াশীল বলে ত্যাগ করব, তাঁদের কথা ভুলে যাবো, তাঁদের যারা নাম করবে তাদের গালাগালি দেবো? তাহলেই গেছি আর কি! কিছুদিন আগে বেশ ভয় হয়েছিল।

বৃষ্টি প'ড়ে উঠোনের নিমগাছ গন্ধে ভরপুর। টগর-চাঁদনী চকমক করছে। এতো দেরিতে, এতো রাত্রে বেলা কেন?

সাঙ্গীতিকী

রত্নাকর

এবারে কলকাতায় ফিরে এসে আমার "যদুভট্ট" ফিল্মখানি দেখবার খুব সুযোগ মিলে গেল। অনেকের মুখের অনেকরকম খবর কানে এসে ঠেকেছিল। তাই কৌতূহল হয়েছিল, কারণ বলতে লজ্জা নেই—আমি সাধারণত ফিল্ম দেখিনে। এমন কি অমন ঢাক-পেটান "বৈজু-বাওরা" বোম্বাই শহরে এত বছর বাস করেও দেখি নি। তবে চোখে না দেখলেও কানে শুনেছি। অর্থাৎ ওই ফিল্মের দু-চারখানি রেকর্ড শুনেছি। আমার এক ভীষণ বদ-অভ্যাস আছে। আমাদের শাস্ত্রীয় সংগীত আবার যার-তার মুখে শুনতে পারিনে। যাঁরা নামকরা 'প্লেব্যাক' গায়ক, তাঁরা হয়ত আমার এই স্পষ্ট কথায় চটে অগ্নিশর্মা হচ্ছেন। কিন্তু উপায় নেই। "লাইট মিউজিক" যাঁরা গেয়ে অভ্যস্ত, তাঁদের কণ্ঠে যেন "ক্লাসিক্যাল মিউজিক" কেমন কেমন শোনায়। তাই বোধ হয় 'বৈজুবাওরা' দেখতে সাহস করি নি। কিন্তু "যদুভট্ট" দেখার কৌতূহল যেন স্বতই হয়ে গেল। কথায় বলে, কৌতূহলই বিড়ালের মৃত্যুর কারণ। আমারও তাই হল। প্রাচীতে প্রদর্শিত তালিকায় যখন বাঙলার শ্রেষ্ঠ উচ্চাঙ্গ সংগীত-শিল্পীদের নাম দেখতে পেলুম, তখন স্বভাবতই কৌতূহল জাগ্রত হোল এবং তার ফলে পর পর দুদিন ফিল্মটি দেখে এলুম এবং শুধু নিজে নয়, সপরিবারে তো বটেই এবং সেই সঙ্গে আমার কতকগুলি অন্ধ ছাত্র-ছাত্রীদেরও নিয়ে গেলুম, যাঁরা বেশ একটু শাস্ত্রীয় সংগীতের চর্চা করেন।

আমি ফিল্মের ব্যাপারী নই, এখানে ফিল্মের সমালোচনা করতে বসি নি। আমি সামান্য আদার ব্যাপারী, কিন্তু তবুও বলব যে, "যদুভট্ট" দেখে আমরা, অন্তত আমি নিজে অভিভূত হয়েছি। অভিভূত হয়েছি বাঙালীর দিগ্‌বিজয় দেখে নয়, অভিভূত হয়েছি বাঙালীর সংগীতের স্ট্যান্ডার্ডের উচ্চতা দেখে, আর মনে ভেবে যে, সত্যিই একদিন বাঙালীর উচ্চাঙ্গ-সংগীতের জগতে কি স্থান ছিল—আর আজ কি স্থান হয়েছে। এই সাধনায় যদুভট্টের স্থান অবিসংবাদিত সন্দেহ নেই। আমরা রাণাঘাটের সংগীত-শিরোমণি 'নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের মুখে যদুভট্টের সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনেছি। এমন কি, তিনি আমাদের সেই পাইওনিয়ারের দু'চারখানি ধ্রুপদও শিখিয়েছিলেন—নটনারায়ণ, দেওশাখ প্রভৃতি রাগের। নগেনবাবু রঙ্গনাথকে জানতেন, যতদূর বুঝেছি ভালভাবেই জানতেন। নগেনবাবু দেহত্যাগ করেছেন, আজ প্রায় ২২ বছর হলো। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স প্রায় ৮৭।৮৮ হয়েছিল। অর্থাৎ তিনি প্রায় সেই স্বর্গীয় মহাপুরুষের সসাময়িক ছিলেন। তাঁর মুখে যা শুনেছি, তাতে প্রধানত তাঁকে ধ্রুপদীই মানা যেতে পারে। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, ফিল্মে তাঁকে খেয়াল ও ঠুংরি-গায়ক হিসাবেই প্রতিপন্ন করার চেষ্টা হয়েছে। আর এক কথা, জৌনপুরের যে ওস্তাদ আলিবক্স সাহেবের কাছে আমরা তাঁকে খেয়ালের তালিম নিতে দেখি, যতদূর জানি, আলিবক্স খাঁ ধামারী ছিলেন, যাঁর কাছে কিছুদিন বড়িষার স্বর্গীয় সংগীতাচার্য বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও শাস্ত্রীয় সংগীত শিক্ষা করেছিলেন, যাঁর ডাকনাম ছিল বড়কু মিঞা। বামাচরণবাবু যে চালে খেয়াল গান করতেন, সে চালের গান আজকাল শুনতে পাওয়া যায় না। তাঁর খেয়াল ছিল, মীড় গমকে পূর্ণ যেন ধ্রুপদ-ভাঙা খেয়াল। বারাণসীর সুবিখ্যাত ধ্রুপদিয়া স্বর্গীয় হরিনারাণবাবুও এই বড়কু মিঞার কাছে একখানা বড়হংস সারং শিখেছিলেন, সেও ধ্রুপদ গান।

"যদুভট্ট"-ফিল্মের ঐতিহাসিক ভিত্তি নিয়ে প্রশ্ন তোলার স্পৃহা আমার নেই। "বৈজুবাওরা"ও কিছু ঐতিহাসিক সত্যের উপর গঠিত নয়। ফিল্মের স কিছু অংশ ঐতিহাসিক বনিয়াদের উপ খাড়া হতে পারে না, এটা মেনে নি আমার এতটুকু আপত্তি নেই। তব এই ফিল্মের অন্তরালে যে অন্তঃসলি সত্যের বাণী নিহিত আছে, সে বিষ কোন বাঙালী সংগীত-শিল্পীর, বাঙা কেন সমস্ত ভারতবর্ষের হিন্দু সংগী শিল্পীর কিছু বলার নেই। উচ্চাঙ্গসংগী যে বাঙলার সীমানার ভিতরে সহ প্রবেশ করতে চায় নি, উচ্চাঙ্গ-সংগীত কেবল বাঙলার বাইরেই আত্মগোপন ক ছিল তা নয়, খুব কম অ-বাঙা হিন্দুরই সেই দুর্ভেদ্য দুর্গের ম অবস্থিত মন্দিরে প্রবেশের অধিক ছিল; এ বিষয়ে আমাদের দ্বিমত নে উচ্চাঙ্গ-সংগীত ছিল মুসলমান পোষ্য। সে মন্দিরে প্রবেশের অধি ছিল তাঁদেরই খানদানের, তাঁদে ঘরানার। অ-বাঙালী হিন্দুরা, বি বাঙালীরা হলেন অন্ত্যজ জাতির ম পরিগণিত। দু-একটি ব্যতিক্রম যে ছিল তা নয়। তবে মোটামুটি এই সে যুগের, এমন কি ৫০ বছর আগে ব্যাপার। ওস্তাদ মহম্মদ উমর স্বরদিয়া একদিন কথায় কথায় বলেছি "৩০ বছর পূর্বেও আমরা ছিলুম ক বাহিরাবরণের মধ্যে আত্মগোপনক

শামুকের মত—নিজের সন্তান আর জামাইয়ের জন্য আমাদের যা কিছু শিক্ষা-দীক্ষা, সব সঞ্চিত ছিল।" "যদুভট্ট" ফিল্মটি যে ইতিহাসের সেই পুরাতন পরিচ্ছেদের উপর একটি ঝলক পাত করেছে, এটি আনন্দের বিষয় সন্দেহ নেই।

তখনকার দিনে শাস্ত্রীয় সংগীত শিক্ষা করা যে কষ্টসাধ্য বা ব্যয়সাধ্য ছিল, তার ভূরি ভূরি উদাহরণ পাওয়া যায়। হরিনারায়ণবাবুর মুখে শুনেছি যে, কৈশোরে তাঁর উচ্চাঙ্গ-সংগীত শিক্ষার বড়ই শখ ছিল, কিন্তু তিনিও সংগীত-কেশরী স্বর্গীয় যদুনাথ ভট্টাচার্য মশায়ের ন্যায় সমস্ত ভারতের তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ কলাকারগণ কর্তৃক অবমানিত হয়ে শেষ পর্যন্ত খেয়াল গান শেখার আশা ত্যাগ করেন এবং ওস্তাদ রসুল বক্সের ঘরানা স্বর্গীয় রামদাস গোস্বামীজীর নিকট ধ্রুপদ শেখেন। আমাদের কৈশোরে, যখন আমরা উচ্চাঙ্গ-সংগীতের প্রতি ধীরে ধীরে আকৃষ্ট হতে থাকি; তখনও বাঙলাদেশে খেয়াল গায়কের সংখ্যা মুষ্টিমেয় ছিল। এর কারণ আর কিছু নয়—তখনও খেয়াল শিক্ষার তেমন সুযোগ ছিল না। রাণাঘাটের নগেনবাবুকে কিরূপভাবে খেয়াল ও টপ্পা শিখতে হয়েছিল, এ সংবাদ আমি তাঁর নিজের মুখেই শুনেছি। তিনি নিজে ছিলেন মালিপোতার (জেলা নদীয়া) জমিদার। রাণাঘাটের পালচৌধুরী বাবুদের, গোবরডাঙ্গার বাবুদের, কৃষ্ণনগর ও নাটোরের রাজবাড়ির সঙ্গে তাঁর খুব দহরম-মহরম ছিল। তখনকার দিনে মুসলমান কলাবিদ্‌গণ দরবারে দরবারে ঘুরে বেড়াতেন এবং যেখানে বেশী ইনাম পাওয়া যেত, সেখানেই আসন গাড়তেন। সমস্ত বাঙলাদেশে রাণাঘাটে ছিল এমনি এক সংগীতের পীঠস্থান, যেখানে ওস্তাদগণ কিছুদিন কাটাতে পছন্দ করতেন। নগেনবাবু বলেছিলেন যে, গত একশ বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষে এমন কোন প্রথম শ্রেণীর ওস্তাদ জন্মান নি, যিনি না একবার অন্তত পালচৌধুরী বংশের আতিথ্য গ্রহণ করে গেছেন। কাজেই, নগেনবাবুর অনেক সুযোগ মিলেছিল সেইসব গুণীজনের সংস্পর্শে আসতে এবং এসে অনেক কিছু দেখতে, শুনতে ও শিখতে। যদুনাথবাবুর মত হয়ত তিনি অতদূর শ্রুতিধর ছিলেন না, কিন্তু তিনি যে বাঙলার সংগীতক্ষেত্রে একজন অসাধারণ গুণী ছিলেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আমরা কখনও তাঁকে কোন আসরে একই গান দু'বার গাইতে শুনি নি, প্রত্যেক আসরেই আমাদের চমৎকৃত করে তিনি নতুন নতুন চালের গান শোনাতেন। এখন ভাবি, উচ্চাঙ্গসংগীতের কি অফুরন্ত ভান্ডারই না তাঁর ছিল!

কিন্তু তাঁকেও কতকটা বিনা তালিমে শিখতে হয়েছিল, যদিও ওস্তাদ বন্নে খাঁ ও ওস্তাদ আহমদ খাঁ ছিলেন তাঁর সত্যকার ওস্তাদ, যে দুজনের নিকট হতেই তিনি যথারীতি তালিম পেয়েছিলেন। তখনকার দিনে জলসায় একটা খুব আশ্চর্য ঘটনা ঘটত, যেটি এখন আর ঘটতে দেখিনে। ওস্তাদমহলে গানের হাতবদল হোত। অর্থাৎ ধরুন, আপনি এক রাগ গাইলেন—যা আমার ভাল লাগল, আর আমিও এমন এক গান গাইলুম, যা আপনার ভাল লাগল। তখন পরস্পরের সম্মতিক্রমে সেই গান দুটির অদলবদল হয়ে গেল, অর্থাৎ আপনি আমার গানটি শিখে নিলেন, আমিও আপনার গানটি শিখে নিলুম। এরকম আদানপ্রদানের ফলে পরস্পরের সুবিধাই হতো, ভিন্ন ভিন্ন চালের গানও জানা হতো, আবার ভান্ডারও সমৃদ্ধ হতো সংখ্যায়। এমনিভাবেই হরিনারায়ণবাবু, বামাচরণবাবু, নগেনবাবু প্রভৃতি সকলেই নিজ নিজ সংগীত-ভান্ডার পূর্ণ করে-ছিলেন। রাণাঘাটে তখন শ্রীজান, দিল-জান প্রভৃতি নামকরা বাইজীদের মধ্যে মধ্যে শুভাগমন হোত, তখন সেখানে

ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ টপ্পাগায়ক ওস্তাদ রমজান খাঁর নিয়মিত পদধূলি পড়ত, তখন বন্নে খাঁ, আহমদ খাঁ, দুনী খাঁর মত ভারতবিখ্যাত কলাবিদেরও সেখানে পদার্পণ হতো। তখন সঙ্গীত ছিল সীমাবদ্ধ, কয়েকটি বিশেষ বিশেষ ঘরের মধ্যেই তার চৌহদ্দির জমঘট ছিল। কিন্তু সঙ্গীত এখন হয়েছে উদার, ব্যাপক, আভিজাত্যহীন গণতান্ত্রিক। তাই তার প্রচার ঘরে ঘরে, তাই আজ গাইয়েতে গাইয়েতে, বাজিয়েতে বাজিয়েতে কলকাতা ছেয়ে গেছে।

সদারঙ্গ সংগীত সম্মেলন

(নিজস্ব সঙ্গীত প্রতিনিধি লিখিত)

দক্ষিণ কলিকাতার ভারতী সিনেমা গৃহে বিগত ২৩শে সেপ্টেম্বর থেকে ২৭শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই সম্মেলনের অধিবেশন হয়। প্রতিদিনকার অনুষ্ঠানে সারারাত ধরে সঙ্গীতসুধা পান করার মতো লোকের অভাব হয়নি। কিন্তু কর্তৃপক্ষের এ ধরনের অনুষ্ঠান সমর্থন করা যায় না এইজন্য যে, রাত্রি-জাগরণের স্বাভাবিক ক্লেশ শ্রোতাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা অনেক ক্ষেত্রে ব্যাহত করেছে। জীবনকে অগ্রাহ্য করে সঙ্গীতানুষ্ঠান বিশেষ কার্যকরী বলে মনে হয় না। আশা করি, সম্মেলনের কর্তৃপক্ষ বিষয়টির প্রতি নজর দেবেন।

অনুষ্ঠান পরিচালনার ব্যাপারে দেখা গেছে, রাতের বেশিরভাগ সময় এমন সব শিল্পীর অবতারণা করা হয়েছে, যাঁদের গান বা বাজনা শোনবার জন্য শ্রোতৃবর্গের কোনই আগ্রহ নেই। প্রেক্ষাগৃহ তখন খালি। বেশিরভাগ শ্রোতাই হয় তখন বাইরে পদচারণা করছেন, নয়তো বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে গল্পে মেতে রয়েছেন। যেসব শিল্পীর জন্য কায়িক ক্লেশ সহ্য করে রাত্রি জাগা, তাঁদের আবির্ভাব হয়েছে প্রত্যূষে। মন-প্রাণ তখন গীতসুধা পানের অনুকূলে কি না তা পাঠক বিচার করে দেখবেন। একটু পরেই প্রভাত এবং শিল্পী ও শ্রোতা দুয়েরই মানসিক অবস্থা তখন পিষ্ট, ক্লিষ্ট ও নিপীড়িত। এই অবস্থার মধ্যে রাত-জাগার শ্রম সার্থক হয় কি না, সম্মেলনের কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করে দেখবেন। আমরা শুধু বলতে চাই যে, সঙ্গীত সম্মেলন পরিচালনার মধ্যে অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টির প্রয়াস কিছুটা থাকা দরকার।

সঙ্গীত সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক শিল্পীর অনুষ্ঠানই যে রসোত্তীর্ণ হবে, এমন নিশ্চয়তা কেউ দিতে পারে না। মানসিক অবস্থার বৈগুণ্যে সঙ্গীত হয়তো নিকৃষ্ট আকার ধারণ করতে পারে। কিন্তু যেসব শিল্পীর পরিবেশন-রীতির মধ্যে এমনও পরিপক্কতার ছাপ পাওয়া যায় না, তাঁদের সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে কর্তৃপক্ষ কোন সার্থকতার সন্ধান পেতে পারেন, তা উপলব্ধি করতে পারলাম না। অবশ্য হৃদয়গ্রাহী সঙ্গীত যে সদারং সঙ্গীত সম্মেলনে হয়নি, এমন কথা বলছি না।

প্রথম আসরের সূত্রপাত হয় শ্রীমতী নীহারকণা মুখোপাধ্যায়ের কেদারা ও আড়ানার ধ্রুপদ ও ধামার দিয়ে। এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষ সদারং নামের তাৎপর্য রক্ষা করেছেন। কারণ সদারং ওরফে নিয়ামৎ খাঁ খেয়াল গানের প্রবর্তক হলেও নিজে কখনও খেয়াল গান করতেন না। ধ্রুপদ গানেরই তিনি উপাসক ছিলেন।

প্রথম আসরে আলী হোসেনের মালকোশ রাগে সানাই "পীর না জানা" নামক সুপ্রসিদ্ধ খেয়াল গানের অনুসরণে বাদিত হয়। তারপর তিনি একটি ঠুংরী পরিবেশন করেন। উভয় ক্ষেত্রেই তাড়াহুড়োর ভাব থাকাতে বাজনার পূর্ণাঙ্গ রূপ প্রকাশ পায় নি। এর পর শ্রীজগন্ময় মিত্রের নিধুবাবুর টপ্পা, সিনেমা-ঢংএর ভজন ও গীত সম্মেলনের সুনাম রক্ষা করতে সমর্থ হয় নি।

শ্রীধর পারশেকারের একক বেহালা বাদন মেকানিক্যাল ও একঘেয়ে মনে হয়েছে। তিনি বাজিয়েছিলেন কেদারার আলাপ, গৎ ও ঠুংরী। এই শিল্পীর দ্বিতীয় অনুষ্ঠানের বাদনে খানিকটা পার্থক্য লক্ষ্য করা গেছে বটে, কিন্তু তবুও রাগ পরিবেশনের মধ্যে সুর-মাধুর্যের যথেষ্ট অভাব ছিল। দ্বিতীয় আসরে তিনি বাজিয়েছিলেন চন্দ্রকোশের কাছাকাছি এক নব নামযুক্ত রাগ নটচন্দ্র। তিনি মান্ড সুরের একটি ধুনও পরিবেশন করেন, যার গঠন-প্রকৃতির মধ্যে গোলাম আলী সাহেব কর্তৃক গীত "তিরছি নজরিয়াকি বাণ" নামক ঠুংরীর খানিকটা ছোঁয়াচ আছে।

প্রথম আসরে স্থানীয় শিল্পী শ্রীমতী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের চন্দ্রকোশ রাগে খেয়াল গান শ্রোতাদের আনন্দ দিয়েছে। তাঁর পরিবেশন রীতির মধ্যে পরিণত গায়কির ছাপ ছিল। শিক্ষার্থীর ভাসা-ভাসা গীতরীতির যে অপরিণত অবস্থা তা তিনি এতদিনে কাটিয়ে উঠেছেন দেখে আশ্বস্ত হলাম।

এই আসরের উল্লেখযোগ্য সঙ্গীত শোনা গেছে জনাব ইমরাত খাঁর সেতারে। তিনি ঝিঁঝিট রাগে সেতার বাদনের নৈপুণ্য পুরোপুরিভাবে প্রকাশ করেন।

দ্বিতীয় আসরে প্রথমেই মিস শ্যালী মরিসের ভারতনাট্যম নৃত্য বাদ দিলেই সুবিবেচনার কাজ হতো। সঙ্গীত সম্মেলনের অনুরূপ স্ট্যান্ডার্ড তিনি এখনও আয়ত্ত করতে পারেন নি। এই আসরেই বোম্বাইর শ্রীমতী রোশনকুমারী কথক নৃত্যে যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। লয়ের নির্ভুল রূপায়ন তাঁর নাচে পাওয়া যায়। না ধিন ধিন ধা বোলের সঙ্গে তাঁর দ্রুত পদক্ষেপ সত্যই চমৎকার। সঙ্গে তবলা সঙ্গত করেন পণ্ডিত শান্তা প্রসাদ, কিন্তু তাঁর সঙ্গতের পূর্ণতা অনেক সময় ফকির মহম্মদ সাহেবের পাখোয়াজ সঙ্গতে ব্যাহত হয়েছে। ফকির মহম্মদ সাহেবের কন্যাই হচ্ছেন রোশন কুমারী। পিতার উদ্দাম পাখোয়াজ বাজনার কারণ অবশ্য অগ্রাহ্য করা যায় না।

দ্বিতীয় আসরের সর্বপ্রধান শিল্পী বড়ে গোলাম আলী খাঁর গান শোনবার জন্য শ্রোতৃবর্গকে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে দেখা গেছে। কিন্তু স্থানীয় শিল্পীদের কয়েকজন অযথা অপরিণত সঙ্গীত পরিবেশন করে সময় নষ্ট করেছেন। সময়ের অপব্যবহারের প্রতি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এইজন্য যে, অবাঞ্ছিত শিল্পীদের ভীড় কমিয়ে খাঁটি শিল্পীদের বেশি সময় দিলে শ্রম ও অর্থ দুয়েরই সার্থকতা পাওয়া যায়। বড়ে গোলাম আলী সাহেব প্রথমে বাগেশ্রীর বিলম্বিত ও দ্রুত খেয়াল গান করেন, পরে উক্ত রাগেরই তেলেনা পরিবেশন করেন। তাঁর গীত পদ্ধতির মধ্যে

সংকুচিত অবস্থার কোনও ছাপ এখন পর্যন্ত আসেনি। তিন সপ্তকের উপর প্রতিষ্ঠিত তাঁর সুরলহরী মনকে মাতিয়ে তোলে। তালের প্রস্রবণ যেন তাঁর উৎসারিত হয়ে চলে। রসমাধুর্যে ও ক্ষিপ্রগতিতে তাঁর সমকক্ষ খুব কমই আছে বলে মনে হয়। বাগেশ্রীর পর তিনি দরবারী কানাড়ার খেয়াল, গজল এবং দুরনুকরণীয় 'হরি ওম্' গান গেয়ে আসর শেষ করেন।

তারপর আবির্ভূত হন সেতারের স্বনামধন্য শিল্পী ওস্তাদ বিলায়েত খাঁ। শান্তাপ্রসাদের তবলা সহযোগে তিনি ভঁকার রাগে প্রথমে আলাপ এবং পরে গৎ বাজান। এই রাগটি সচরাচর শোনা যায় না। গঠন প্রকৃতির মধ্যে রুক্ষতা লক্ষ্য করা যায়। এটি একটি সম্পূর্ণ রাগ এবং ভাটিয়ার নামক রাগের সঙ্গে খানিকটা মিল আছে। পা গা পা গা ঋা গা ঋা সা প্রধান স্বর বলা যায়। রুক্ষ ধরনের এই রাগ শুনে শ্রোতৃবর্গ তেমন আনন্দ পাননি। ওস্তাদ বিলায়েত সম্ভবত সে ব্যাপার বুঝতে পেরে অতি লঘু ধরণের একটি ধুন বাজাতে শুরু করেন। কিন্তু তাতেও পূর্ণ রসোপলব্ধি না হওয়াতে তিনি সর্বশেষে শুদ্ধ ভৈরবী বাজিয়ে সকলকে তৃপ্ত দিতে সমর্থ হন।

এই আসরে হাবিবুদ্দিন খাঁর তবলা সঙ্গত শুনবার জন্য অনেকেই উৎকণ্ঠিত ছিলেন কিন্তু শেষপর্যন্ত দেখা গেল নামকরা কোনও শিল্পীর সঙ্গে তাঁর বাজনা কর্তৃপক্ষ আয়োজন করতে পারলেন না। তাঁর মতো তবলা শিল্পীর প্রতি এ-অনাদর অনেকের পছন্দ হয়নি।

তৃতীয় আসরে সুপ্রকাশ মুখোপাধ্যায় নামক ১২ বৎসরের অনধিক এক নবীন শিল্পীর তবলা লহরা উপস্থিত সকলকে মোহিত করেছে। এত অল্প বয়সে বোলের স্পষ্টতা রক্ষা করে বাজনা সাধারণত শোনা যায় না। এর পর কান্তি ভাই নামক শিল্পীর একক হারমনিয়াম বাজনা বিশেষ হৃদয়গ্রাহী না হলেও তাঁর রাগ চয়নের মধ্যে খানিকটা নতুনত্ব লক্ষ্য করা গেছে। তিনি সৌগন্ধ নামে এক রাগ বাজান। গঠন প্রকৃতি দেখে মনে হয় এ রাগ কার্নাটিক গোষ্ঠীর।

সা রা জ্ঞা ঋা পা ধা ণা মূলত প্রধান স্বর বলা যায়। স্থানে স্থানে উত্তর ভারতীয় সংগীতের পিলু রাগের ছায়াও লক্ষ্য করা গেল।

এই আসরে বেনারসের শ্রীমতী গিরিজা দেবীর কণ্ঠসংগীত প্রথমত সম্মেলনের অনুকূলে আবহাওয়া সৃষ্টি করে। তিনি প্রথমে আভোগী কানাড়ার খেয়াল গান করেন এবং একটি পূর্বী ঢং-এর ঠুংরী গেয়ে অনুষ্ঠান শেষ করেন। গলার সুউচ্চ স্বর এই শিল্পীর বিশেষ লক্ষ্য করবার বিষয়। গায়কীর মধ্যে তেমন কোনও বৈচিত্র্য না থাকলেও নিছক কণ্ঠস্বর দিয়ে তিনি শ্রোতাদের তৃপ্তিবিধান করেন। তাঁর পূর্বী ঢং-এর ঠুংরীটি ভালো বলা যায়। একই আসরে আর একটি নবীন শিল্পী শ্রীমতী বিমল ওয়াকাদের গান তেমন জমেনি। শুধু তান ছাড়া তাঁর গানে আর বিশেষ কোনও বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা গেল না। কণ্ঠও তাঁর অতি মৃদু। প্রথমে তিনি ভাটিয়ার রাগের খেয়াল গান করেন, পরে ঠুংরী।

তৃতীয় আসরে শ্রীরমেশ বন্দ্যোপাধ্যায় বেহাগ রাগে আলাপ ও ধ্রুপদ গান করেন। সঙ্গে সুমধুর পাখোয়াজ সংগত করেন শ্রীপ্রতাপ মিত্র। গানের সঙ্গে আবহ সংগীতের অভাব লক্ষ্য করলাম। শুধু তানপুরার আওয়াজ অনেক সময় কণ্ঠস্বরকে ধারণ করতে পারে না। রমেশ-বাবুর দৃষ্টি এবিষয়ে আকর্ষণ করছি। ধ্রুপদ গানের পর তাঁর দুটি রবীন্দ্র সঙ্গীত—'যে কেহ মোরে দিয়েছে দুখ' এবং 'যদি আমার হৃদয় দুয়ার বন্ধ রহে গো কভু'—উপযুক্ত ক্লাসিক্যাল চালে গীত হওয়ায় সকলের তৃপ্তি বিধান করে।

এই আসরে মীরাটের ওস্তাদ হবিবুদ্দিন খাঁর ত্রিতালে তবলা লহরা অপূর্ব বলা চলে। লঘু ও গুরুর সংমিশ্রণ তাঁর বাজনার প্রাণসম্পদ। তবলায় এমন সুমধুর ও সুনিপুণ হাত থাকা সত্ত্বেও সম্মেলনের কর্তৃপক্ষ সংগত বাজনায় তাঁর জন্য তেমন ব্যবস্থা করেননি এবং সেইজন্য অনেকে দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

আসরের সর্বশেষ শিল্পী পণ্ডিত রবিশঙ্কর সেতার বাজাতে শুরু করলেন প্রত্যুষে, তার মানে যখন শ্রোতাদের আগ্রহের ভিত ভেঙে পড়বার অবস্থা হয়েছে। এই বাজনা রাত ১২টা অথবা ২টার মধ্যে আরম্ভ হলে শিল্পী ও শ্রোতা উভয়েই কৃতার্থ হতেন এবং ভালো জিনিস ভালোভাবে শুনবার সুযোগ হতো। তা না করে কর্তৃপক্ষ সমস্ত রাত কৃপানুরাগী শিল্পীদের দিয়ে অনুষ্ঠান ভারাক্রান্ত করে শেষ রাতে দিলেন ওস্তাদের মার সামলাতে। অবশ্য এবিষয়ে তাঁরা প্রচলিত প্রবাদেরই সমর্থন করেছেন। কিন্তু তার মানবিক তাৎপর্যের কথা হয়তো ভেবে দেখেননি। রবিশঙ্কর প্রথমে আহির ভৈঁরো রাগ আলাপ করেন এবং পরে একই রাগের গৎ বাজান। কোমল রে ও নি সহযোগে যখন মধ্য সপ্তকে ধানিসাঁরেসাঁ স্বরসমষ্টিকে আশ্রয় করে এই রাগের রূপ প্রকাশ হতে থাকে তখন শ্রোতাদের অন্তর স্পর্শ না করে পারে না। বাজনার চমক, বিশেষ করে খাদ বাজানোর রীতি এবং ছুটের বৈচিত্র্য রবিশঙ্করের সেতার সংগীত-মহলে অমর করে রাখবে সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁর সঙ্গে সংগতকারী শ্রীচতুরলালের তবলা সম্বন্ধে আশান্বিত হতে পারলাম না। আহির ভৈঁরোর পর রবিশঙ্কর ভৈরবীর একটি গৎ বাজান।

চতুর্থ অধিবেশনে উপস্থিত থাকার মতো শারীরিক সামর্থ্য ছিল না বলে শোনা কথার উপর নির্ভর করে লিখতে সাহসী হলাম না। এই অধিবেশনে অংশগ্রহণকারী শিল্পীরা যদি তার জন্য কিছু মনে করে থাকেন সর্বাগ্রে তাঁরা যেন এই ধরণের রাত্রিব্যাপী সংগীত সম্মেলনের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে তারপর লেখকদের প্রতি দৃষ্টি দেন।

পঞ্চম বা শেষ অধিবেশন সদারং সংগীত সম্মেলনকে চিরস্মরণীয় করে রাখবে বলে মনে হয়। উপযুক্ত শিল্পী নির্বাচনের জন্য শ্রোতাদের ভীড় পূর্বের সব অধিবেশনকে ছাপিয়ে যায়। হাজার হাজার লোক লাউডস্পীকার মারফৎ গান শোনার জন্য সমস্ত রাত ধরে বাইরে অপেক্ষা করতে দেখা গেছে।

প্রথমে পণ্ডিত শান্তা প্রসাদের তবলা লহরা দিয়ে অধিবেশন শুরু হয় এবং তা অল ইণ্ডিয়া রেডিও কর্তৃক 'রীলে' করা হয়। অবশ্য 'রীলের' উপযোগী এ-অনুষ্ঠান বলা চলে না, কারণ বহুক্ষণ ধরে তবলার বোল শোনবার মতো ধৈর্য খুব কম লোকেরই আছে। অন্তত রেডিওর জন্য অন্য অনুষ্ঠান দিয়ে প্রোগ্রাম শুরু করলে ভালো হতো।

এর পর শ্রীমতী হীরাবাঈ কণ্ঠসংগীত পরিবেশন করেন। প্রথমে মারু বেহাগের খেয়াল ও পরে খাম্বাজের ঠুংরী এবং তারও পরে একটি ভজন গেয়ে তিনি অনুষ্ঠান শেষ করেন। কিছুক্ষণ গাওয়ার পর তাঁর কণ্ঠস্বর ভেঙে যায় এবং সেই কারণে গান তেমন উপভোগ্য হয়নি। এই কণ্ঠস্বর ভেঙে যাওয়ার জন্য আমার মনে হয় তাঁর গীতপদ্ধতি দায়ী। কারণ তিনি বেশির ভাগ সময়ে উচ্চগ্রামে স্বর-স্থাপনার পক্ষপাতী। এ ব্যাপার আজকের নয়, তাঁর গানের সঙ্গে পরিচিত সকলেই একথা স্বীকার করবেন। কণ্ঠস্বরের উপর এ ধরণের চাপ এতদিন হয়তো তাঁর পক্ষে সহ্য করা সম্ভব হয়েছে, কিন্তু এখন বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার সময় এসেছে। কিরানা

ঘরানার কণ্ঠসম্পদই হচ্ছে প্রধান। সেই ঘরানার অন্তর্ভুক্ত হয়ে তাঁর গানে সুর-মাধুর্যের অভাব হলে শুধু অস্থায়ী অন্তরায় গঠনপদ্ধতি নিয়ে তৃপ্তি পাওয়া যায় না।

এই আসরের তৃতীয় শিল্পী ওস্তাদ বিলায়েৎ খাঁ। তাঁর সেতারে এবার দেশ রাগের সূক্ষ্ম নিখাব মূর্ত হয়ে ওঠে। প্রায় ২ ঘণ্টা ধরে আলাপ ও গৎ বাজানোর মধ্যে হলক তানের অংশ সত্যই চমৎকার। এ ধরণের গুরু কারুকার্যের পর লঘু ও সূক্ষ্ম কাজের সংমিশ্রণ দিয়ে তিনি যখন সোমে আসেন তখন হর্ষধ্বনিতে প্রেক্ষাগৃহ পূর্ণ হয়ে যায়। এত অনুরাগ, এত দরদ দিয়ে সেতার বাজানো সত্যই বিরল। এর পর 'ভেঙে মোর ঘরের চাবি' নামক রবীন্দ্রনাথের ভাটিয়ালী গানের সুরে অবলম্বনে তিনি একটি বাজনার অবতারণা করেন। কিন্তু তার আগে তাঁর কাছ থেকে পাঞ্জাবী ঠুংরীর কিছু ধুন বা গৎ সকলেই শুনতে আশা করেছিলেন। ঠুংরী বাজিয়ে তারপর লঘু সংগীতের প্রবর্তন করলে ভালো হতো।

এরপর ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলীর খেয়াল ও ঠুংরী। শ্রোতাদের আগ্রহের ভিত তখন ভেঙে পড়বার অবস্থা। তিনি প্রথমে দেশকার রাগের খেয়াল গান করেন। এই রাগে মা ও নি বর্জিত। গাইবার সময়ে কিছুটা বিলাবল, কল্যাণ, শংকরা প্রভৃতি রাগের ছাপ এসে পড়ে এবং এই কারণে দেশকারে রেখাব দুর্বল রাখা হয়। শঙ্করার ছাপ পাওয়া যায় সা গা পা, ধা গা, পা গা সা প্রভৃতি স্বরগুচ্ছের প্রয়োগে, কিন্তু এক্ষেত্রেও রেখাবের প্রক্ষিপ্ত প্রয়োগ সমস্যার সমাধান করতে পারে। কিন্তু এবারে লক্ষ্য করলাম যে বড়ে গোলাম সাহেব দীর্ঘক্ষণস্থায়ী গীতপদ্ধতির পক্ষপাতী নয়। তানের ক্ষেত্রে তাঁর দক্ষতা সমানই আছে বলে মনে হয়। সুরের তিন সপ্তক বিচরণের ক্ষেত্রে এই একই কথা বলা যায়। দেশকারের পর তিনি যোগিয়ার আন্দোলিত কোমল রেখাব যুক্ত একটি রাগের খেয়াল গান করেন। কিন্তু নিখাবের ক্ষেত্রে যোগিয়ার সঙ্গে মিল না থাকাতে অনেকে রাগটিকে ভৈরো বলার পক্ষপাতী। সর্বশেষ তিনি যোগিয়ার আমেজ সম্বলিত একটি ঠুংরী গান করেন এবং তাতে পাঞ্জাবী তরকিপের প্রাচুর্য থাকাতে সকলেই আনন্দ পেয়েছেন।

রাত্রিশেষে আসেন পণ্ডিত রবিশংকর সেতারের সুরলহরী বিস্তার করতে। সময় বিশেষ অনুকূল না থাকা সত্ত্বেও শ্রোতাদের সংখ্যা তখনও বিশেষ কমে যায়নি। তিনি শুরু করলেন বিলাসখানি তোড়ির আলাপ। তানসেনের জ্যেষ্ঠ পুত্র বিলাস খাঁ এই রাগ ভৈরবী ও তোড়ি মিশ্রণ করে সৃষ্টি করেন। র্স র্ঋ ণ দ, ম প, দ ম জ্ঞ ঋ, ণ্ স প্রভৃতি পদ। তাঁর সুনিপুণ অঙ্গুলি স্পর্শে মহীয়ান হয়ে ওঠে। ঝাদের অংশ বিস্তারে তাঁর অসাধারণ দক্ষতা লক্ষ্য করা গেল। কিন্তু একথা বলা প্রয়োজন যে তাঁর বাজনা প্রাণ ভরে শোনবার মতো ব্যবস্থা সম্মেলনের কর্তৃপক্ষ করেন নি। আশা করি ভারতের এই সংগীত বিশারদদের ক্রিয়াকলাপ যথেষ্ট পরিমাণে শোনবার ব্যবস্থা সম্মেলনের কর্তৃপক্ষ ভবিষ্যতে করবেন।

আসামে সীমান্তের নাগা উপজাতি

নিখিল মৈত্র ও সুনীল জানা

১৯২৯ সালে নাগা পাহাড় অঞ্চল। বহুদিনের ধূমায়িত অসন্তোষ সেদিন প্রকাশ্য বিদ্রোহে আত্মপ্রকাশ করল। কাম্বিরনে জাদোনাঙ্গ সেদিন স্বাধীনতাপ্রিয় সীমান্ত উপজাতির মধ্যে নতুন জাগরণ সৃষ্টি করলেন। দূরে আসামের সমতলভূমিতেও তখন আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে। ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে মহাত্মা গান্ধীর আইন অমান্য আন্দোলনের সংবাদ প্রকৃতি ও মানুষের বাধা ভেদ করে নাগা পাহাড়েও ছড়িয়ে পড়েছে। জাদোনাঙ্গকে নরবলি দেবার অপরাধে ফাঁসী দেওয়া হলো। নাগা বিদ্রোহের আগুন কিন্তু নিভল না। সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের নেতৃত্বভার গ্রহণ করলেন ষোল বছরের বালিকা গইদিলিও। কাচা নাগারা সমস্ত অত্যাচার, উৎপীড়নকে তুচ্ছ করে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। গভীর জঙ্গলে আবৃত পাহাড়ের কোলে নাগা গ্রামে বালক, বৃদ্ধ, স্ত্রী, পুরুষ সকলে মিলে গোপনে বিদ্রোহের জন্যে তৈরি হতে আরম্ভ করল। গইদিলিওকে ধরবার জন্যে সরকার গ্রামে গ্রামে গুপ্তচর পাঠিয়ে দিলেন। মোটা পুরস্কার ধরিয়ে দেবার জন্যে ঘোষণা করা হলো। সশস্ত্র বাহিনী সমস্ত নাগা অঞ্চলকে তোলপাড় করে ফেললো। কিন্তু গইদিলিওএর সাক্ষাৎ মিলল না। বিপ্লবনেত্রী তখন গ্রামে গ্রামে সংগঠন গড়ে তুলছেন। পাহাড়ের মধ্যে দুর্গম পথে তাঁর যাতায়াত। কোনও গ্রামে বিদ্রোহী যুবকদের নিয়ে হয়ত তিনি সভা করছেন, এমন সময় খবর এলো যে, পুলিসের দলও হাঁটাপথে সেই গ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে। কিছুক্ষণ পরে সমস্ত গ্রাম ঘিরে ফেলে তল্লাসী শুরু হলো। গইদিলিওকে কিন্তু পাওয়া গেল না। কোথায় অন্ধকার পাহাড়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছেন। গ্রামবাসীরা তখন নিশ্চিন্তমনে নাচগানে মত্ত এবং পুলিসের সমস্ত প্রশ্নের উত্তরে একই জবাব— আমরা কিছুই জানিনে, এখানে কেউ আসেনি। বীর বালিকার প্রধান সহায়ক উত্তর কাছাড়ের মশাঙ্গ।

নাচের পোশাকে সেমি নাগা যুবক

লাকেমা সরকারী রেস্ট হাউসের কুকী চৌকিদারের বিশ্বাসঘাতকতায় একদিন গইদিলিও শৃঙ্খলিত হলেন। অতি গোপনে গুপ্তচর গইদিলিও-এর সংবাদ কোহিমায় পাঠিয়ে দিল। গভীর রাত্রে সুসজ্জিত বাহিনী এসে গ্রাম চড়াও করে এবং গইদিলিওকে গ্রেপ্তার করে কোহিমায় নিয়ে যায়। বিচারে বিপ্লব-নেত্রীর চোদ্দ বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়। তরুণীর এই অপূর্ব বীরত্ব কাহিনীর কথা সেদিন কোনও সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়নি। কারণ নাগা অঞ্চলে প্রবেশাধিকার ছিল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ এবং সরকারী নিয়ন্ত্রিত। বিদেশী শাসকের রিপোর্ট এবং কাহিনীতে ডাইনী বা যাদুকরী বলে গইদিলিওকে অভিহিত করা হয়েছে। দেশের লোক নাগা কুমারীর স্বাধীনতা-সংগ্রামের অসমসাহসিক বিবরণ প্রথম শুনতে পায় শ্রীজওহরলাল নেহরুর কাছ থেকে। অকুণ্ঠিত ভাষায় সেদিন তিনি নাগাদের স্বাধীনতাপ্রিয়তার প্রশংসা করেছিলেন। ঘটনাচক্রে স্বাধীন ভারতে প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরুকে নাগা উপজাতীয়দের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান করার অনুমতি দিতে হয়েছে!

কেন এরকম হলো তা বুঝতে গেলে নাগাদের ইতিহাস, রীতিনীতি সম্পর্কে আলোচনা প্রয়োজন। ভারতবর্ষে আরও বহু উপজাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে যেমন নিশ্চিত কিছু বলা সম্ভব নয়, নাগাদের অতীত ইতিহাসও তেমনি আজ সম্পূর্ণ অনুমানের বিষয়। শঙ্খ, কড়ি এবং সামুদ্রিক শামুকের অঙ্গাভরণের প্রতি তাদের অনুরাগ লক্ষ্য করে কেউ কেউ

বলেন যে, নাগারা প্রথমে সমুদ্রতীরে বসবাস করত। তাঁদের মতে, বোর্নিও ও মালয়ার আদিবাসীদের সঙ্গে নাগাদের সাদৃশ্য সম্পূর্ণ আকস্মিক নয়। নাগা-ভাষা পর্যালোচনা করে সুপণ্ডিত ভাষা-বিদ্‌ স্যার জি গ্রিয়ারসন মন্তব্য করেছেন যে উত্তর পূর্ব চীনের ইয়াংগ-সি-কিয়াংগ ও হোয়াংগ হো দোয়াব থেকে তিব্বতী, বর্মী দ্বিতীয় অভিযানে নাগাদের আগমন। অংগামি, কেজমা, সেমা এবং রেংগমা নাগাদের ভাষার মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। সেমি নাগাদের ভাষা নাগা-কুকি উপশাখার অন্তর্ভুক্ত।

আদি জন্ম সম্বন্ধে নাগা উপজাতিদের মধ্যে বহু কিম্বদন্তী প্রচলিত। অংগামি নাগাদের মতে তাদের বাসভূমি ছিল দক্ষিণের কোনও অধুনা বিস্মৃত অঞ্চলে। প্রথম পূর্বজদের জন্ম হয়েছিল ধরিত্রীর গর্ভ থেকে। কাচা নাগা লোক কথায় তাদের আগমন পথ জাপেভো পর্বতশ্রেণী থেকে। লোটা নাগাদের জনপ্রবাদে জানা যায় যে, প্রথমে অংগামি দেশেই তাদের বাসভূমি ছিল। তাদের গোত্রজ আও উপশাখা লোটাদের সংস্রব ত্যাগ করে উত্তর দিকে চলে যায়। অংগামি আক্রমণের বিরুদ্ধেও লোটাদের আত্মরক্ষা করতে হয়। পোমেভো নামে এক বিরাট শক্তিমান পুরুষের নেতৃত্বে লোটারা যুদ্ধবিগ্রহ করেছিল। সেমা শাখা কেজোবোমার নিকটে সুইয়েমি গ্রামকে আদি বাসভূমি বলে উল্লেখ করে। সুইয়েমি গ্রামের বিশেষত্ব এখনও লক্ষ্য করার। চারদিকে অংগামি নাগার মধ্যে এই গ্রামবাসীরা নিজেদের মধ্যে সেমা ভাষায় কথাবার্তা বলে। অবশ্য প্রতিবেশী অংগামিদের সঙ্গে অংগামি ভাষাতেই আলাপ-আলোচনা করে। সেজেমি, সোপভোমা এবং মাওএর সেমি নাগদের মধ্যে যেসব কাহিনী প্রচলিত আছে, তা থেকে জানতে পারা যায় যে, অতীতে কখনও মণিপুর মালভূমি থেকে তারা নাগা পাহাড়ে চলে আসে। অংগামি শাখা নাগা উপজাতির মধ্যে সংখ্যাধিক। তাদের মধ্যে বহুরকম বিচিত্র কাহিনী সুদূর অতীত সম্বন্ধে প্রচলিত। কেজামি গ্রামে বহুদিন পূর্বে এক বৃদ্ধ বাস করত। তার তিন পুত্র ছিল। প্রতিদিন ঘরের সামনে পরিবারের সবাই বিরাট এক পাথরের উপর ধান শুকোতে দিত। বিকেলে দেখা যেত যে, ধান ওজনে বেড়ে প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছে। পাথরের অধিষ্ঠাতা মঙ্গলময় এক শক্তির করুণায় এভাবে বৃদ্ধের ধান বেড়ে যেত। একদিন তিন ভাইয়ের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ শুরু হলো। ঝগড়া এমনই মারাত্মক আকার ধারণ করল যে, পিতা পাথরে অগ্নিসংযোগ করলেন। ভাইদের মধ্যে মনোমালিন্য হয়েছিল পাথরে ধান শুকোনো নিয়ে। আগুনের তেজে পাথর ফেটে গেল এবং অধিষ্ঠাতা দেবতাও পাথর ছেড়ে চলে গেলেন। ভাইয়েরাও এর পর আলাদা হয়ে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়লো। তিন ভাইয়ের সন্তানসন্ততিই অংগামি, লোটা এবং সেমা নাগা। এখনও অংগামি গ্রামের কোনও পূজাপার্বণ উপলক্ষে অনুমতি ...ও পুরোহিতদের নিকট নিতে হয়।

জেমি নাগা তরুণী

ইতিহাসের যে সামান্য বিবরণ বর্তমানে পাওয়া যায়, তা থেকে জানতে পারা যায় যে, এক সময়ে কাছাড়িরাই এ অঞ্চলে সব থেকে শক্তিশালী উপজাতি ছিল। ডিমাপুর কাছাড় রাজ্যের প্রথম রাজধানী। আহোম অভিযান আরম্ভ হবার পর কাছাড়িরা ডিমাপুর ত্যাগ করে মাইবঙ্গে তাদের রাজধানী স্থানান্তরিত করে। জেমি নাগারা বরাইল পর্বতশ্রেণী থেকে উত্তর-পূর্ব গিরিপথ দিয়ে এসে কাছাড়ি রাজত্বে বসবাস করে এবং রাজাকে করও অন্য প্রজাদের মত দিতে থাকে। দক্ষিণ অঞ্চল থেকে কুকি উপজাতিও নাগা ও কাছাড়ি অধ্যুষিত এলাকায় এসে বসবাস আরম্ভ করে। কুকিদের আগমনের পর কুকি ও জেমি নাগাদের মধ্যে এক বিরোধের সূত্রপাত হয়। জেমি নাগাদের চাষবাস ঝুম প্রথায় জঙ্গল কেটে হতো। সুতরাং বছর তিনেক চাষ করার পর সে জমি ছেড়ে দিয়ে অন্য কোনও জঙ্গল কেটে, পুড়িয়ে আবাদ করার ব্যবস্থা করতে হত। বেশ কয়েক বছর যাবার পর আবার পুরনো যায়গার ঝুম করা সম্ভব, ততদিনে জমির উর্বরতা আবার কিছু পরিমাণে হয়েছে। ধীরে ধীরে জেমি নাগা গ্রামের জনসংখ্যাও বাড়তে লাগলো। কিন্তু গ্রামকে বিভক্ত করে নতুন বসতি গড়াও তখন সম্ভব ছিল না। কারণ জেমিদের সব সময়েই প্রতিবেশী অন্য

নৃত্যভঙ্গিমায় নাগা তরুণী

নাগা শাখা উপজাতির সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহ করতে হতো। ছোট গ্রামের পক্ষে আত্মরক্ষা করা বড় শক্ত। তাই কয়েক বছর পর সমস্ত গ্রাম উঠে গিয়ে নতুন যায়গায় বসতি করত। পিতৃ-পিতামহের বাসভিটে ছেড়ে চলে যাবার সময় কিন্তু প্রতিটি পরিবার তার কোনও চিহ্ন রেখে যেত। গ্রাম বৃদ্ধেরা গ্রামের সীমানা ভাল-ভাবে যুবক দলকে বুঝিয়ে দিতেন। চল্লিশ পঞ্চাশ বছর পরও যদি আবার তারা নিজেদের আদি গ্রামে কার্জেপিওতে ফিরে আসে, তবে যাতে তাদের কোনও অসুবিধেই না হয়। প্রতিটি পরিবার আবার নিজেদের পুরনো যায়গাতেই বাড়ি-ঘর তৈরি করত। এইভাবে কোনও কোনও জেমি নাগা গ্রামের আদি কার্ডেপিও ছাড়া আরও তিন চারটে বিভিন্ন স্থানে বসতি ও ঝুম চাষের জায়গা ছিল। তারপর একদিন দলে দলে কুকিরা আসতে আরম্ভ করল। কুকিদের আগমন ও ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠা একই সময় হয়েছে। ইংরাজ রাজকর্মচারীরা উপজাতি কৃষি ব্যবস্থার প্রয়োজন সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন। এত অনাবাদি জমি নাগাদের কেন থাকবে তা তাঁরা কিছুতেই বুঝতে পারলেন না। সরকারি হুকুমে জেমিদের জমি কুকিদের বন্দো-বস্ত করে দেওয়া হল ফলে এলো অর্থ-নৈতিক বিপর্যয় এবং অশান্তি। তীব্র জীবনসংগ্রামের তাগিদে ঘন ঘন একই জমিতে ঝুম করা আরম্ভ হলো, বনজঙ্গল কেটে জমির উর্বরতা নষ্ট হয়ে গেল। পাহাড়ের খাড়া চড়াইয়ে নিরুপায় জেমি নাগারা গাছপালা কেটে ঝুম করতে আরম্ভ করল। বর্ষার প্লাবনে সে ক্ষেত ভেসে গেল এবং পাহাড়ের গায়ে অমূল্য মাটিও জলধারার সঙ্গে ধুয়ে গেল। পরবর্তী যুগে নাগা অঞ্চলে বিদ্রোহ এবং অশান্তির এক বড় কারণ অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা।

নাগা অঞ্চলের উপর কর্তৃত্ব নিয়ে কাছাড়ি ও মণিপুরি সামন্ত রাজাদের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ হতো, আসলে কিন্তু উপজাতিরা কারুরই বশ্যতা স্বীকার করত না। আহম্ রাজবাহিনীতে নাগা সৈন্য ছিল। আহম্ ও মণিপুর সামন্তরাজাদের সঙ্গে যে সম্পর্ক ছিল তা দেখে মনে হয় যে দুই রাজবংশের সঙ্গেই নাগা অঞ্চলের যোগ ছিল, কারণ মণিপুর থেকে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় যেতে গেলে নাগা এলাকার মধ্যে দিয়ে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। লোটা নাগাদের বাসভূমিতে চীনা রাজার এক লোহা তৈরির কামারশাল ছিল বলে কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। কামারশাল বর্মী রাজার বলেই মনে হয়। এ অঞ্চলে কখনও চীন সাম্রাজ্যের বিস্তার হয়েছিল বলে আর কোথাও প্রমাণ পাইনে। কোনও কোনও লোটা এবং আও গ্রাম আসাম রাজাদের সনদ নিয়ে পাহাড়ের সানুদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

ইংরাজ অধিকারের সময় থেকে নাগা ইতিহাস সহজলভ্য। ১৮৩২ খৃঃ জেনকিনস্ ও পেম্বারটন নাগা উপজাতি সম্পর্কে সঠিক বিবরণ সংগ্রহ করেন। ব্রিটিশ অধিকৃত ভারতের সীমানা ক্রমে যুগে অতিদ্রুত পরিবর্তনশীল। আসাম ও বর্মার মাঝে দুর্গম অঞ্চলে অভিযান-কারী বাহিনী, টহলদার সৈন্যদল পাঠানো হলো। একশো বছর আগে নাগারা কিন্তু প্রবল পরাক্রমশালী ব্রিটিশ শক্তির কাছে বিনাযুদ্ধে বশ্যতা স্বীকার করেনি। সমাগুটিঙে বহু চেষ্টা করে [illegible] ভোগচাঁদ দারোগার নেতৃত্বে এক সরকারী ঘাটি বসেছিল। [illegible] ঘাটি নাগারা আক্রমণ করে [illegible] দারোগা নিহত হয়। সরকার নাগাদের সমুচিত শিক্ষা দেবার জন্যে [illegible] সুসজ্জিত সৈন্যদল পাঠালেন। [illegible] দুর্গে নাগারা এই বাহিনীর [illegible] যথেষ্ট বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ [illegible] কিছুদিন ব্রিটিশ সরকার নাগাদের অভ্যন্তরীণ সমস্যায় হস্তক্ষেপ না করার নীতি গ্রহণ করলেন। ক্রমবর্ধমান ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পক্ষে এভাবে বেশিদিন থাকা সম্ভব ছিল না। ১৮৬৬ খৃঃ থেকে নাগা রাজ্য অধিকারের পরিকল্পনা নিয়ে ব্রিটিশ সরকার এগোতে আরম্ভ করেন। ১৮৭৮ খৃঃ অংগামি নাগাদের প্রধান কেন্দ্র কোহিমার পতনের পর, নাগা অঞ্চলের শাসন কেন্দ্রও কোহিমাতে স্থানান্তরিত হয়। ১৯১৮ খৃঃ কুকি বিদ্রোহ এবং ১৯৩১ সালে নাগা বিদ্রোহ সাম্প্রতিক ইতিহাসের সুবিদিত ঘটনা।

ব্রিটিশ শাসনকে পর্বতবাসী স্বাধীনতাপ্রিয় নাগারা কোনওদিনই মেনে নেয় নি। তার উপর আবাদি জমির অপ্রাচুর্য, করভার এবং শাসন ব্যাপারে অব্যবস্থা। নাগাদের মধ্যে ভীম রাজার কাহিনী বহুদিন থেকে প্রচলিত। আদি-বাসীদের বিগত যুগের স্বাধীনতার

...ীক ভীমরাজা। তিনি অমর এবং ...ভোর দক্ষিণে পর্বতকন্দরে নিদ্রামগ্ন। ...যাতে কোনও দিন তিনি ব্রিটিশ রাজ-...র বিরুদ্ধে পরাধীন নাগাজাতির ...ৃ গ্রহণ করবেন। আর যারা কাঠের ...ে এখন খায়, সেই আদিবাসীরা ...জদের বাসভূমিতে আবার একদিন ...ন্ত্র, স্বাধীন হবে। গইদিলিওর মধ্যে ... নেতৃত্বের বিকাশ নাগারা দেখেছিল। ...া ইতিহাসের এই শিক্ষা আজকের ...বর্তিত পটভূমিতে যখন বিক্ষোভ ...াও প্রকাশ্য সংঘর্ষের রূপ নিয়েছে, ...ন যেন আমরা না ভুলি।

...ব্রহ্মপুত্র নদের উপত্যকায় ভারত-...র বহু বিচিত্র উপজাতির বাস। ...ত থেকে ব্রহ্মপুত্র যেখানে হিমালয়ের ... সীমান্তের অনুচ্চ শৈলশ্রেণী ভেদ ... সাগরসঙ্গমের পথে আসামের সম-...তে প্রবেশ করেছে, সেইখানে আবার ...লা, মিরি মিশমি প্রভৃতি আদিবাসী ...দের বসতি গড়ে তুলেছে। ব্রহ্মপুত্রের ...শদ্বারের দক্ষিণে আর এক পর্বত-...া ভারত এবং ব্রহ্মের সীমারেখা ...ত করেছে। এই পর্বতমালার ধারে ...সামের স্বায়ত্তশাসিত নাগা জেলা। ...ত-বর্মা সীমানা এবং উত্তর-পূর্ব ...ান্ত অঞ্চলেও (নর্থ ইস্ট ফ্রন্টিয়ার ...জেন্সি—নেফা) নাগা উপজাতির ...ভিন্ন শাখা প্রশাখার বাস। এই সব ...াকার নাগাদের অবস্থান, রীতিনীতি ...ম্বন্ধে আমরা বিশেষ জানি নে।

... নাগা জেলা পর্বতসংকুল, ১৩৮ মাইল ...র্ঘ পাহাড়। পাহাড়ের মাঝে সংকীর্ণ ...পত্যকা। প্রস্থে কিন্তু গড়ে মাত্র ২৫ ...াইল। পর্বতমালার মধ্যে দিয়ে নির্ঝরিণী ...য়ে চলেছে সমভূমির দিকে। বর্ষা সমা-...মে ক্ষীণকায় ঝরণা রুদ্র মূর্তি ধারণ ...রে, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যাবার পথে ...ই বারিধারা বাধার প্রাচীর রচনা করে। ...াগা অঞ্চলে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য নদী ...াইয়াঙ্গ। মাও থানার নিকট নদীর উৎ-...ত্তি এবং রেঙ্গমাপানি ও ওকনা অঞ্চলের ...াট বড় সমস্ত স্রোতস্বিনী এসে এই ...দীতে মিলিত হয়েছে। পাহাড়ের মধ্যে ...র কয়েক মাইল এই নদীতে যাতায়াত ...রা সম্ভব। ধনশিরি, দোইয়াঙ্গ, দিসাই ... ঝর্নাকে নদী বললে অতিশয়োক্তি

হয়, আসলে স্রোতস্বিনী মাত্র। তিজু নদী গিয়ে ভারত সীমান্তের অপর পারে চিন্দুইনের সঙ্গে মিলিত হয়েছে।

নাগা উপজাতির মধ্যে বহু শাখা প্রশাখা। অধিকাংশ শাখাই স্বতন্ত্র সত্তার অধিকারী। আচার ব্যবহার, ভাষায় প্রতি-বেশী শাখা উপজাতির মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য। অঙ্গামি শাখা মণিপুর রাজ্যের উত্তরে, রেঙ্গমা পশ্চিম অঙ্গামি অঞ্চলের উত্তরে, রেঙ্গমা বাসভূমির উত্তরে লোটা, তাদের পূর্বে এবং উত্তর-পূর্বে সেমা, আও নাগা তারও উত্তরে, জেলার উত্তর-পূর্ব দিকে কোন্যাক এবং তার দক্ষিণে চাঙ্গ নাগা উপজাতির বাস। আদিবাসী নাগাদের তালিকা সম্পূর্ণ করতে গেলে পূর্ব অঞ্চলবাসী ইয়াচুমি, টুকোমি সাঙ্গতম্, উলাঙ্গ রেঙ্গমা, তঙ্গখুল, ক্যালো-কেঙ্গ্যু প্রভৃতি শাখা প্রশাখারও নাম করতে হবে।

নাগা শব্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে পণ্ডিত-দের মধ্যে মতভেদ আছে। আসামীয়া নাগো —হিন্দী নাঙ্গা—(উলঙ্গ) শব্দই বিকৃত-রূপে নাগা হয়েছে বলে কেউ কেউ অনু-মান করেন। অনেকের মতে নাগা শব্দের উৎপত্তি হয়েছে নোক্ থেকে। পূর্বাঞ্চলের নাগা উপজাতিরা নোক অর্থে মানুষকে বোঝায়। পর্বতবাসী বলেই নাগা নামকরণ হয়েছে এ মতও কোনও কোনও নৃতত্ত্ব-বিদ্ পোষণ করেন।

নাগা শাখা উপজাতিদের মধ্যে শরীর গঠনে বিরাট পার্থক্য। অঙ্গামিরা দৈর্ঘ্যে প্রায় ছ ফিট এবং স্বাস্থ্যের গঠনও সুন্দর। সোমা নাগাদের মধ্যে মঙ্গোলীয় দেহভঙ্গিমা অত্যন্ত সুস্পষ্ট। তাংগমা ও সেমো শাখার চোখ সম্পূর্ণ সরল এবং নাসিকাও উন্নত। সাজপোশাকেও নাগাদের মধ্যে ঐরকম বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। অঙ্গামি নাগা শীতকালে প্রায় চারটি উজ্জ্বল শালে নিজেকে আবৃত করে। 'কিল্ট' জাতীয় বস্ত্রাবরণে সজ্জিত বলিষ্ঠ সুদর্শন অঙ্গামি যুবক একদিকে, অপর-দিকে উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের কোনও কোনও নাগা উপজাতি সম্পূর্ণ উলঙ্গ। অঙ্গামি নাগাদের বস্ত্র সাধারণত গাঢ় নীল রংয়ের সুতো দিয়ে তৈরি। বহির্বাসে সবুজ ও জরদ রংয়ের চওড়া পাড়, অনেক সময় লাল-হলদে ডুরেকাটা আবরণও পরিধান করে। কাচা নাগারা সরু সবুজ পাড়ের শাদা কাপড়ই বিশেষ পছন্দ করে। সেমা ও লোটাদের কাপড় বড় বড় শাদা নীল ডুরে কাটা। আও নাগারা কিন্তু টকটকে লাল কাপড় বিশেষ পছন্দ করে। কেশ-বিন্যাসেও নানারকম বৈচিত্র্যের সন্ধান পাওয়া যায়। তাঙ্গখুলে নাগারা দুপাশের চুল ছোট করে কাটে। আবার কোন্যাক নাগারা চুল একেবারে কাটেই না। অনেক সময় কেশরাশি প্রায় ভূমিস্পর্শ করে। সমস্ত চুল মাথার উপর টেনে নিয়ে বিরাট খোঁপা বেঁধে কোন্যাক তরুণী কেশ-পরিচর্যা সম্পন্ন করে। আও, চাঙ্গ, ইয়াচুমি, সঙ্গতম, রেঙ্গমা, সেমা এবং লোটা নাগারা মাথার নিচের দিক মুণ্ডন করে। কাচা নাগারা কিন্তু কেশবিন্যাসের ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন, পুরুষ স্ত্রী সবাই বিভিন্ন প্রকারের অলঙ্কার পরিধান করে। হাঁটু পর্যন্ত পায়ে গোল গোল বেতের আঙটি প্রায় সবাই পরে। নানা-

সদিয়া গার্লস স্কুলের দুটি শিক্ষিতা নাগা তরুণী

রকম অর্কিড এবং বনাফুল বালকবালিকা, যুবক-যুবতীর দল কানে পরিধান করে। অনেক সময় কানে মার্কাড়ির ভার এত বেশি হয় যে ওজন কমাবার জন্যে ফিতে দিয়ে মাথার চারদিকে বাঁধতে হয়। কাপাস তুলোর মোটা পাঁজ অবিবাহিত যুবকেরা অনেক সময় চাদরের মত পে'চিয়ে গলায় পরে। এ প্রেমিকার প্রেমাস্পদকে উপহার।

নাগা জেলার মোট অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় দু' লক্ষ। উত্তর-পূর্ব সীমান্তের নাগা অধিবাসীদের নিয়ে মোট সংখ্যা প্রায় দু' লক্ষ দশ হাজারের মত হবে। প্রধান উপজীবিকা কৃষি। নাগা পাহাড়ের চার হাজার ফিট উ'চুতে অঙ্গামিরা পাহাড়ের গা কেটে সুন্দর ধাপ তৈরি করেছে। সেখানে তারা ধানের চাষ করে। ধাপের আল শক্ত করে বাঁধার জন্য পাথরের দেয়াল তৈরি করেছে। বহু নাগা ঝুম প্রথায় চাষবাস করে। তাতে একদিকে যেমন অযথা বনসম্পদ নষ্ট হয়, অন্যদিকে শস্যের পরিমাণও খুব কম পাওয়া যায়। অঙ্গামি নাগারা সংখ্যায় এত বেশী যে তাদের ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় ভালভাবে চাষ না করলে, প্রয়োজনীয় শস্য উৎপাদন করা অসম্ভব হবে। চার হাজার ফিট বা তার উপরে ঝুম প্রথায় চাষ আবাদ করলে ফসলও আশানুরূপ হয় না। নাগা জেলায় উল্লেখযোগ্য কোন শিল্পই গড়ে উঠেনি। তেল ও অন্যান্য খনিজ দ্রব্যের সন্ধান আরম্ভ হয়েছে। কুটীর শিল্পের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বয়নশিল্প। অতি সুন্দর এবং নানা উজ্জ্বল বর্ণের বস্ত্র অতি সাধারণ তাঁতে নাগারা বয়ন করে। বেত ও বাঁশের ঝুড়ি, চাটাই প্রভৃতি প্রতি পরিবারই নিজের ব্যবহারের জন্যে তৈরি করে। অঙ্গামি নাগারা ধান গোলাজাত করে বিরাট বেতের টুকরিতে। কোনও কোনও টুকরির প্রায় চার ফিট উ'চু। এই সব টুকরি গ্রামের বাইরে গোলায় রাখা হয়। আগুন লাগার ভয়ে ধানের গোলা গ্রামের বাইরে তৈরি করা হয়। লবনাক্ত কুয়োর জল ফুটিয়ে এক রকম লবণ নাগারা তৈরি করে। লবণ পরিষ্কৃত নয় বলে তার সঙ্গে অন্য নানা রকম খনিজ পদার্থ ও ময়লা মিশে থাকে। বাইরের থেকে আমদানী করা লবণের তুলনায়, নাগাদের স্বদেশী লবণ তৈরির খরচ অনেক বেশি। তা সত্ত্বেও মেলোমি, প্রিমি প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচুর লবণ তৈরি হয়। নাগাদের কাছে এই লবণ অতি লোভনীয় সুখাদ্য। নিজেদের তৈরি পচাই জু মদ পান করার সঙ্গে নিজেদের স্বদেশী লবণ চুষতে নাগাদের বড় ভাল লাগে।

নাগাদের প্রধান খাদ্য ভাত। মাংসও তাদের বিশেষ প্রিয়। গরু বা শুয়োর পোষার উদ্দেশ্য মাংস খাওয়া। গরুর দুধের উপর নাগাদেরও বিশেষ বিতৃষ্ণা। কুকুরের কাবাব কোনও কোনও নাগাদের নিকট বিশেষ লোভনীয়। এরা যে পরিমাণে চোলাই মদ পান করে তা দেখলে আশ্চর্য হতে হয়। নাগাদের মধ্যে অবিবাহিত যুবক যুবতীদের যৌথ বাস-গৃহ আছে। রেঙমা নাগা মোরুঙে কেবলমাত্র অবিবাহিত যুবকেরা (ও বালকেরা) বসবাস করে। কোনও স্ত্রী লোকের সেখানে প্রবেশ অধিকার নেই। আগেকার দিনে অস্ত্রশস্ত্রও এখানে রাখা হতো। অতর্কিতে আক্রমণ হলে যাতে যুবকেরা গ্রাম রক্ষা করতে পারে। এখন অবশ্য এ ব্যবস্থার কোনও প্রয়োজন নেই। বল্লম, তীর ধনুক, ঢাল প্রভৃতি প্রতি পরিবার এখন নিজ নিজ বাড়িতেই রাখে। মোরুঙের পবিত্রতা সম্বন্ধে নাগারা বিশেষ সচেতন। কোনও অপরাধীও যদি এইখানে এসে আশ্রয় নেয়, তবে তাকে

কেউ স্পর্শ করতে পারব না। মোরুঙ্গ থেকে কোনও কিছু চুরি করা অতি জঘন্য অপরাধ। কোনও অতিথি গ্রামে এলে তার রাত্রি বাসের ব্যবস্থাও হয় এইখানে। ছ সাত বছর বয়সে ছেলেরা মোরুঙ্গে যোগদান করে এবং বিয়ে হয়ে যাবার পর নতুন ঘর সংসার যখন দম্পতি শুরু করে তখন বিরাট এক ভোজ দিয়ে যৌথাবাস থেকে বিদায় নেয়। মেয়েদের যৌথ গৃহের নাম কাটসু এুয়ে। গ্রামের মধ্যে প্রতিটি 'খেল' (গোত্র) মোরুঙ্গকে সব থেকে সুদৃশ্য বাস গৃহ হিসেবে গড়ে তোলার জন্যে চেষ্টার ত্রুটি করে না। গ্রামের পরিচয় মোরুঙ্গ দেখলেই পাওয়া যায়।

জেমি নাগাদের মধ্যে নাচের চর্চা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নৃত্যানিপুণ যুবক-যুবতীদের সম্বন্ধে গ্রামে গ্রামে আলোচনা হয়। দল বেঁধে যুবক-যুবতীরা শীত ও গ্রীষ্মের সময় বিভিন্ন গ্রামে তাদের নৃত্যকলা প্রদর্শন করে। নাচের জন্যে দক্ষিণাও গ্রামবাসীদের দিতে হয়। গ্রামের মধ্যে বিরাট আঙিনায় সবাই গোল হয়ে বসে। চারদিকে বাঁশের মশালে আলোময়। নাচের পদক্ষেপ ভাল করে দেখার জন্যে মাটিতেও মশাল জ্বলছে। সুসজ্জিতা নাগা তরুণী অপরূপ উদ্দাম ছন্দে বহুক্ষণ ধরে নৃত্য করে। মাঝে মাঝে যুবকের দলও ধনেশ পাখির পালকের অর্ধগোলাকার মুকুট পরে নাচে যোগ দেয়। তরুণ-তরুণীদের মধ্যে পরিচয় ও প্রেমের স্থানও এই নৃত্য-গীতের আসর। আনন্দের দিনে প্রচুর ভোজন এবং ততোধিক পানের ব্যবস্থাও থাকে। সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থ বাড়ির সামনে উৎসবের নিদর্শন হিসেবে গেন্না স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত করেন। কাঠ দিয়ে স্তম্ভ তৈরি তবে বিভিন্ন শাখার মধ্যে নির্মাণ কলায় পার্থক্য আছে।

নাগাদের কিম্বদন্তীতে অস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে এমন এক সময় ছিল যখন লোহার ব্যবহার তারা জানত না। তখন মোটা মোটা কাঠের গদা দিয়েই তারা যুদ্ধ বিগ্রহ করত। পরে কিন্তু লৌহ প্রস্তর থেকে মজবুত লোহা তারা তৈরি করত। মধ্যপ্রদেশের উপজাতিদের মত নাগারাও নিজেদের কামারশালে লোহা তৈরি বন্ধ করে দিল যখন বিদেশ থেকে সমস্ত লোহার আমদানী হতে আরম্ভ করলে। রেঙ্গমা নাগাদের মধ্যে কেউ কেউ খুব উঁচুদরের কামার কিন্তু বাইরে থেকে আমদানী করা লোহা দিয়েই তারা কাজ করে। বনের পথে যে সমস্ত উপ-জাতিরা চলাফেরা করে, দা তাদের পক্ষে অপরিহার্য। দাকে আক্রমণাত্মক অস্ত্র বলে কিছুতেই অভিহিত করা সম্ভব নয়। বল্লম ও তীর ধনুকের ব্যবহারও খুব প্রচলিত। মণিপুর থেকে কিছু কিছু গাদা বন্দুক নাগারা অনেক আগেই সংগ্রহ করত। বিগত মহাযুদ্ধে নাগাদের অস্ত্রের স্বল্পতা সম্পূর্ণ দূর হয়েছে। রাইফেল রিভলবার প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে সে সময়ে যত্রতত্র এ অঞ্চলে পাওয়া যেতো।

নাগাদের সমস্যা নিয়ে দেশ নেতারা ও চিন্তাশীল সম্প্রদায় বিশেষ ভাবিত। জাপানী সৈন্যেরা যখন কোহিমা, উখরুল, বিষেণপুর, পালেল, টাম প্রভৃতি স্থানের ভৌগোলিক স্থিতি এবং নাগা উপজাতিদের সম্বন্ধে জনসাধারণ জানতে পারেন। ১৯৪৭ সালে ১৫ই আগস্ট ক্ষমতা হস্তান্তরের পর নাগা সমস্যা নতুন এক রূপে দেশের সামনে উপস্থিত হলো। আজ সেখানে সামরিক বাহিনী প্রেরণ করা হয়েছে। সম্প্রতি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করেছেন যে এরূপ শাস্তিমূলক অভিযান পাঠালেন, এরই ফলে উপদ্রুত অঞ্চলে শান্তি ফিরে আসবে। বিশেষ জটিল অবস্থা সৃষ্টি না হলে প্রধান মন্ত্রী উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে যে সামরিক বাহিনী পাঠাতে কখনই সম্মত হতেন না, তা বলাই বাহুল্য। তা সত্ত্বেও নাগাদের অতীত ইতিহাস দেখে মনে হয় যে, শাস্তিমূলক ব্যবস্থা দিয়ে তাদের বিক্ষোভকে প্রশমিত করা সম্ভব নয়। বেশ কিছুদিন ধরে পার্বত্য নাগা জেলায় স্বতন্ত্র স্বাধীন নাগা রাজ্যের দাবী শোনা গিয়েছিল এবং নাগা নেতারা ভারত সরকারের সঙ্গে প্রকাশ্য অসহযোগিতার নীতি গ্রহণ করেছিলেন।

অনেকে মনে করেন যে, মিশনারি সংগঠন এবং বৈদেশিক শক্তির প্ররোচনায় নাগারা এ পথে যাচ্ছে। এ ধারণা বহু পরিমাণে অমূলক। নাগাদের সঙ্গে কোনও বিদেশী শক্তির যোগ নেই একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। মিশনারি

সংগঠনের দায়িত্ব আছে, তবে যেভাবে এ অঞ্চলের মিশনারীর ষড়যন্ত্রের কাহিনী বাইরে ছড়িয়ে পড়েছে তা ভুল। নাগাদের তাঁরা উত্তেজিতও করেননি বা পরিচালিতও করছেন না। তবে অতীতে মিশনারীর প্রচারের ফলে নাগা উপজাতির মধ্যে স্বাতন্ত্র্যবোধ অত্যন্ত মারাত্মকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। আগেকার দিনে এ অঞ্চলে কোনও শিক্ষিত ভারতবাসীর পক্ষে প্রবেশ পথ সম্পূর্ণ রুদ্ধ ছিল। কোনও ভারতীয় সমাজ সংস্কারক বা অনুসন্ধানকারীকে ঢুকতে দেওয়া হত না। অন্য পক্ষে সরকারী সাহায্যে মিশনারির প্রচারকের দল গ্রামে গ্রামে নিজেদের ধর্মমত ও ভাবধারা প্রচার করেছেন। নাগা উপজাতি যে ভারতীয়দের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এ ধারণা মিশনারীর প্রচার এবং শিক্ষার ফল। এ ছাড়া অন্য কোনও অপরাধে মিশনারি সংগঠনেরা অপরাধী নয়।

স্বাধীনতা লাভের পর নাগা সমস্যা সমাধানের জন্যে সরকার এই অঞ্চলে বহু কর্মচারী, সমাজসেবীকে পাঠিয়েছেন। তাঁরা কিছু কিছু কাজও করেছেন। বিরাট এই কর্মচারী বাহিনী কিন্তু এক নতুন সমস্যারও সৃষ্টি করেছেন। মধ্য প্রদেশের উড়িষ্যা, মাদ্রাজ প্রভৃতি অঞ্চলে আগে কোনও সরকারী কর্মচারীকে শাস্তি দিতে হলে উপজাতি অঞ্চলে পাঠিয়ে দেওয়া হতো! অযোগ্য, অপদার্থ, দুরাচারী কার্যকর্তাদের উপযুক্ত কর্মক্ষেত্র সরল, অনগ্রসর উপজাতিদের বাসভূমি। নাগাদের ক্ষেত্রে অবশ্য সেরকম কিছু হয় নি। কিন্তু আদিম জনসমাজের মধ্যে কোনও কাজের দায়িত্ব দিয়ে কাউকে পাঠানোর আগে, বিশেষ সতর্কতার সংগে লোক নির্বাচন এবং তাকে যথাযোগ্য শিক্ষা দিয়ে পাঠানো প্রয়োজন। যেখানে সাধারণ কর্মচারীদের মধ্যে এত বেশি অধিকারী সংগ্রহ করতে হয়েছে, সেখানে স্বভাবতঃই ভাল, খারাপ —সব রকমের লোকই গিয়েছে। তার উপর এত বেশি সংখ্যায় সরকারী লোক-জন দেখে নাগারাও বিশেষভাবে বিরক্ত হয়েছে। গ্রামের আশে পাশে ভিন্ন গ্রামের লোককে—যারা আমাদের বন্ধু—সব সময় ঘোরাফেরা করতে দেখলে আমরাও খুব স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিনে।

নাগা উপজাতির প্রধান বাসভূমি স্বায়ত্ত শাসিত নাগা জেলা আসাম রাজ্য সরকারের অন্তর্ভুক্ত। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চল আসামের রাজ্যপাল ভারত সরকারের প্রতিনিধিরূপে শাসন করেন। দুই অঞ্চলেই সরকারের সুস্পষ্ট কর্মনীতির অভাবে যথেষ্ট অসুবিধে হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রাথমিক পাঠশালার উল্লেখ করা যেতে পারে। আশোভন বাগ্মতার সংগে সেখানে নাগা ছেলেমেয়েদের অসমীয়া শেখানোর ব্যবস্থা হচ্ছে। কোথাও বা তার সংগে হিন্দী যোগ করা হয়েছে। পাঠশালায় অসমীয়া পড়ানোর প্রয়োজন আছে কিনা একথা খুব স্থিরভাবে নৃতত্ত্ববিদ্ বা শিক্ষাবিদ্দের বিচার করতে হবে। সাময়িক কোনও রাজনৈতিক সুযোগের জন্য যেন এ প্রশ্নের বিচার না হয়।

তার উপরে রয়েছে অধৈর্য সমাজ সংস্কারকের কর্মপ্রচেষ্টা। উপজাতি অঞ্চলে সব থেকে বিপজ্জনক ব্যক্তি অধৈর্য আদর্শবাদী, যিনি এক বা পাঁচ বছরে আদিম জাতির জীবনে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করতে চান। সে ব্যক্তি মিশনারি হতে পারেন বা শুধু সমাজসেবীও হতে পারেন —তাতে কিছু এসে যায় না। নাগা অঞ্চলে এরকম মহাপ্রভুদের সন্ধান পাওয়া যায়। তাঁরা উপজাতি সমাজকে সব সময় নতুন কিছু ধারণা দিতে, নতুন কিছু শেখাতে ব্যস্ত। অথচ, যাদের জীবনকে নতুন করে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারায় গড়ে তুলতে চাইছেন তাদের সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র চিন্তা করার বা তাদের জীবন থেকে শেখার কোনও আগ্রহ তাঁদের নেই।

নাগা বিক্ষোভের সব থেকে বড় কারণ নাগাদের স্বাভাবিক যুদ্ধবিগ্রহ প্রীতি। প্রাচীনকাল থেকে এদের মধ্যে নরমুণ্ড সংগ্রহের বিধি প্রচলিত। ধরিত্রী মাতার উর্বরতা বৃদ্ধির জন্যে নরবলি দেবার প্রয়োজন আছে বলে নাগাদের দৃঢ় বিশ্বাস। অতীত দিনে প্রতি বৎসর চাষবাস আরম্ভ করার আগে নরমুণ্ড সংগ্রহ করার জন্যে যোদ্ধার দল বাইরে যেত। নাগা আদিবাসীদের বিভিন্ন শাখার মধ্যে সংগ্রাম, সংঘর্ষ, বন্দীদের হত্যা—এ প্রায় লেগেই থাকতো। পরবর্তী যুগে শাসন বহির্ভূত অঞ্চল ছাড়া অন্যত্র নরহত্যা একরকম বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আবার রাজনৈতিক প্ররোচনায় নাগাদের মধ্যে ভ্রাতৃহত্যা আরম্ভ হয়েছে। যুদ্ধের সময় বহু নাগা সৈন্যবাহিনীতে বা যুদ্ধ সংক্রান্ত বিভিন্ন আধা সামরিক বিভাগে ভর্তি হয়েছিল। আজ তারা বেকার কিন্তু সৈনিকজীবনের আস্বাদ তারা আবার পেতে চায়। সহজেই যুদ্ধ করার প্রবৃত্তির সংগে যখন আবার কোনও উত্তেজনা সৃষ্টি হয়, তখন স্বভাবতই বিস্ফোরণ সৃষ্টি হয়।

রামকৃষ্ণ মিশনের নাম ও উদ্দেশ্য

শ্রীসরলাবালা সরকার

১৯১৬ খৃষ্টাব্দে রামকৃষ্ণ মিশনের একটি Memorandum পুস্তিকা বাহির হয়। তাহাতে রামকৃষ্ণ মিশনের নাম ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে একটি বিবৃতি ছিল। এ সময় স্বামী ব্রহ্মানন্দই প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। এই সময় সমিতির গভর্নিং বডির সদস্যগণের যে নাম তালিকায় আছে তাহা এইরূপ:

১। স্বামী ব্রহ্মানন্দ, ২। সারদানন্দ, ৩। প্রেমানন্দ, ৪। শিবানন্দ, ৫। অখণ্ডানন্দ, ৬। সুবোধানন্দ, ৭। তুরীয়ানন্দ, ৮। শুদ্ধানন্দ, ৯। স্বামী বোধানন্দ, ১০। আত্মানন্দ, ১১। সচ্চিদানন্দ (১), ১২। বিরজানন্দ, ১৩। অচলানন্দ, ১৪। শঙ্করানন্দ, ১৫। মহিমানন্দ, ১৬। ধীরানন্দ, ১৭। নির্ভয়ানন্দ।

এই সতেরো জনই তখন বেলুড় মঠের ট্রাস্টি ছিলেন। স্বামী ত্রিগুণাতীত স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ও স্বামী অদ্বৈতানন্দ তখন দেহত্যাগ করিয়াছেন এবং স্বামী অভেদানন্দ সে সময় আমেরিকায় ছিলেন সেজন্য তাঁহাদের স্থানে স্বামী অচলানন্দ, শঙ্করানন্দ, মহিমানন্দ, ধীরানন্দ ও নির্ভয়ানন্দ—এই পাঁচ জনকে ট্রাস্টিগণের মধ্যে লওয়া হইয়াছিল।

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে রামকৃষ্ণ মিশন যখন রেজেস্ট্রী করা হয় তখন যে আট-জন ট্রাস্টি ছিলেন তাঁহাদের নাম এবং কি কি কার্যের ভার তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন তাহাও এই মেমোরেণ্ডাম বইতে আছে। মিশন রেজেস্ট্রীর সময়ে যে নিয়ম করা হইয়াছিল সেই নিয়মই চলিয়া আসিতেছিল। ১৯২৯ সালের মার্চ মাসে পঞ্চম সাধারণ কর্মবিবরণীর একখানি পুস্তিকা উদ্বোধন আফিস হইতে বাহির হয়। ইহাতে মিশন কি-ভাবে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে তাহার সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা হয়। প্রধান মঠগুলির নাম এইরূপঃ—১। বেলুড় রামকৃষ্ণ মঠ, ২। বাগবাজার রামকৃষ্ণ মঠ (উদ্বোধন আফিস), ৩। গদাধর আশ্রম, ভবানীপুর; ৪। শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রম, বেনারস সিটি; ৫। মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রম, আলমোড়া; ৬। ময়লাপুর রামকৃষ্ণ মঠ, মাদ্রাজ; ৭। শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, ব্যাঙ্গালোর; ৮। ব্রহ্মানন্দ আশ্রম, ত্রিবেন্দ্রাম; ৯। তীরুভেলা শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (ত্রিবাঙ্কুর), ১০। বিবেকানন্দ আশ্রম, শ্যামলাতাল; ১১। শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, খর (বোম্বাই), ১২। পাটনা শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, ১৩। উটকামণ্ড শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, ১৪। মাইশোর রামকৃষ্ণ আশ্রম।

অন্যান্য মঠ ও আশ্রম

১। মুঠিগঞ্জ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (এলাহাবাদ), ২। আলমোড়া শ্রীরামকৃষ্ণ কুটীর (হিমালয় প্রদেশ), ৩। ঢাকা শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, ৪। ভুবনেশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, ৫। কিষেণপুর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (দেরাদুন), ৬। মোরাবাদী শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (রাঁচি), ৭। জামতাড়া শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (সাঁওতাল পরগণা), ৮। জয়রামবাটী মাতৃমন্দির (বাঁকুড়া), ৯। আলেপ্পি ও অন্যান্য স্থানের শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (ত্রিবাঙ্কুর), ১০। কুইলান্দী এবং ওত্তাপালামের শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমসমূহ (ব্রিটিশ মালাবার), ১১। পন্নামপেট শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (কুর্গ), ১২। নাট্টারামপালী শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (উত্তম আর্কট), ১৩। রাজকোট রামকৃষ্ণ আশ্রম, ১৪। দিল্লী রামকৃষ্ণ মঠ, ১৫। নাগপুর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম।

বৈদেশিক কেন্দ্রসমূহ

১। নিউ ইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটি (ইউ এস এ), ২। সানফ্রান্সিস্কো বেদান্ত সোসাইটি (ইউ এস এ), ৩। শান্তি আশ্রম (ক্যালিফোর্ণিয়া), ৪। পোর্টল্যাণ্ড বেদান্ত সোসাইটি (উরেগোঁয়া), ৫। বোস্টন বেদান্ত কেন্দ্র

মাদ্রাজ - ময়লাপুরের স্টুডেন্টস হোমটি ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানে গরীব ছেলেরা যাহাতে অবৈতনিকভাবে আশ্রয় ও শিক্ষা পায় তাহাই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রতিষ্ঠানটি প্রথমে সামান্য আকারে আরম্ভ হইলেও পরে ইহার বিশেষভাবেই প্রসার হইয়াছিল। এই প্রসারের মূলে ছিলেন স্বামী ব্রহ্মানন্দের একজন মাদ্রাজী গৃহী শিষ্য, ইঁহার নাম ছিল রামস্বামী আয়েঙ্গার। ইঁনিই মাদ্রাজ স্টুডেন্টস হোমের প্রথম পরিচালক এবং স্টুডেন্টস হোমেই ইনি থাকতেন। তাঁহারই আন্তরিক চেষ্টায় মাদ্রাজ স্টুডেন্টস হোমের দিনে দিনে শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। বলিতে গেলে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সমস্ত বিদ্যাপীঠের মধ্যে মাদ্রাজের প্রতিষ্ঠানটিই অগ্রগণ্য। ইহার অর্থভাণ্ডারে লক্ষ লক্ষ টাকা সঞ্চিত হইয়াছিল এবং একটি হাই স্কুল ও একটি শিল্প বিদ্যালয় আশ্রিত বালকগণকে শিক্ষা দিবার জন্য স্থাপন করা হইয়াছিল। ছাত্রসংখ্যাও দিন দিন বাড়িয়া ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে ১৩৩ জন হইয়াছে। এর মধ্যে ৭৭ জন হাইস্কুলের ছাত্র ৩ জন মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র এবং অন্যান্য ছেলেরা নানা বিষয়ে কৃতিত্বের সঙ্গে শিক্ষা করিতেছে। এইসব ছেলেদের মধ্যে ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণ উভয় শ্রেণীরই ছেলে আছে। যদিও মাদ্রাজ জাতিভেদ সম্বন্ধে অত্যন্ত প্রাচীনপন্থী এবং স্বামী রামকৃষ্ণানন্দও ছিলেন অতিমাত্রায় শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণ, কিন্তু এই বিদ্যাপীঠে জাতিভেদ একেবারেই ছিল না। এই স্টুডেন্টস হোমটি শ্রীরামকৃষ্ণানন্দ স্বামীর জীবনব্যাপী সাধনার একটি প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ। ইহাতে একাধারে চারিত্রিক উন্নতি ও জীবন-সংগ্রামে শক্তির বিকাশ—ছেলেদের জীবন এই উভয় দিক দিয়াই গঠিত হইতেছিল। ইহার সঙ্গে একটি লাইব্রেরীও স্থাপিত আছে।

এখানকার ছেলেরা যেমন ধর্ম সম্বন্ধে শিক্ষা পাইত, সেই সঙ্গে আবার পীড়িতের সেবা, আর্তত্রাণ সম্বন্ধেও শিক্ষা পাইত। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব অথবা স্বামীজীর জন্মোৎসবে এই ছাত্রগণ তিন-চার হাজার গরীব লোককে খাওয়ানোর কাজ নিপুণতার সঙ্গে সমাধা করিত, আবার প্রতি শনিবারের সন্ধ্যায় কাছাকাছি গরীবপাড়ায় ল্যাণ্টার্ন-লেকচার দিত এবং এইভাবে গরীবদের পাড়ায়

স্বাস্থ্য ও জীবনযাপনের অন্যান্য বিষয়ে যাহাতে অজ্ঞানতা দূর হয় তাহার চেষ্টা করিত।

কলিকাতা স্টুডেন্টস্ হোমটি আমাদের হাতের কাছেই রহিয়াছে, ইহার সম্বন্ধে বেশী কিছু বলার দরকার আছে বলিয়া মনে হয় না। ইহা একদিক দিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণের একটি হস্টেল এবং অপর দিক দিয়া একটি নৈতিক শিক্ষা-নিকেতন।

নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়টি ভগিনী নিবেদিতা ১৯০২ খৃষ্টাব্দে স্থাপন করেন। এই বিদ্যালয়ের মাধ্যমে ভগিনী নিবেদিতা ভারতীয় নারীগণের মধ্যে তাঁদের কৌলিক উচ্চভাবগুলি যেন বিশেষভাবে পুনরায় জাগ্রত হয়, সেজন্য জীবনব্যাপী সাধনা করিয়া গিয়াছেন। সিস্টার ক্রিশ্চনাও স্কুল পরিচালনে তাঁহার সহকারিণী ছিলেন এবং পরিচালিকাগণের যখন যাহা প্রয়োজন তাহা সঙ্কুলান করিবার ভার মিশন কর্তৃক ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথের উপর অর্পিত ছিল। ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথ রামকৃষ্ণ মিশনের একজন বিশিষ্ট কর্মী ছিলেন। বর্তমানের স্কুলের অট্টালিকাটি তাঁহারই প্রযত্নে ও তত্ত্বাবধানে তৈরী হইয়াছিল। ভগিনী নিবেদিতার দেহত্যাগের পর নিবেদিতা বিদ্যালয়ের ভার পড়িয়াছিল কুমারী সুধীরা বসুর উপর। ইনি বিখ্যাত বিপ্লবী দেবব্রত বসুর (যিনি পরে সন্যাস গ্রহণ করিয়া স্বামী প্রজ্ঞানন্দ নাম গ্রহণ করেন) ভগিনী। ইনি বিদ্যালয়ের সুপরিচালিকা এবং শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর এবং স্বামী সারদানন্দের অশেষ স্নেহপাত্রী ছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বৃন্দাবনধাম হইতে ফিরিবার সময় ট্রেন-দুর্ঘটনায় তাঁহার দেহত্যাগ হয়। ইহার কয়েক বৎসর পরে স্বামী সারদানন্দও মহাপ্রয়াণ করেন এবং ইনিই ছিলেন নিবেদিতা বিদ্যালয়ের বিশেষভাবে পৃষ্ঠপোষক। ইহার পর কাণ্ডারীহীন নৌকার মত নিবেদিতা বিদ্যালয় অনেক বিপদ ও দুর্গতির মধ্যে পড়িয়াছিল; কিন্তু শ্রীশ্রীমায়ের কৃপায় ও ভগিনী নিবেদিতার পুণ্যবলে নিবেদিতা বিদ্যালয় এখন সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এবং সম্প্রতি একটি ব্রহ্মচারিণী মঠও স্থাপিত হইয়াছে।

সাঁওতাল পরগণার দেওঘর বিদ্যাপীঠ, ঢাকার অবৈতনিক বিদ্যালয় ডায়মণ্ড হারবার, সরিসার শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, সিংহলের শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমসমূহ, জামসেদপুরের বিবেকানন্দ সোসাইটি এগুলিও বিদ্যানিকেতন ও ছাত্রদের
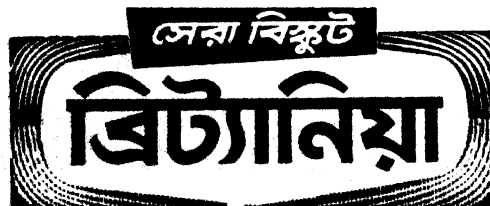
আশ্রয়স্থান। সিংহলের বিভিন্ন স্থানে প্রায় নয়টি শিক্ষালয় স্থাপিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া জনসাধারণের দ্বারা স্থাপিত অনেকগুলি শিক্ষানিকেতনও আছে, যেমনঃ—বাঁকুড়ায় শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, খাসিয়া পাহাড়ে রামকৃষ্ণ আশ্রম, দিনাজপুরের শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, মালদহে শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, মেদিনীপুরে গড়বেতায় সারদা পীঠ ও শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, ময়মনসিংহের শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, ফরিদপুরের শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম এবং সিঙ্গাপুরের শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম প্রভৃতি।

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের এই বিস্তৃতি স্বামী ব্রহ্মানন্দের সভাপতিত্বের সময় এবং বিশেষ করিয়া তাঁহারই চেষ্টায় হইয়াছিল। তাঁহার দেহান্তের পর ১৯২২ খৃষ্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল একটি অধিবেশনে স্বামী শিবানন্দকে প্রেসিডেন্ট-রূপে গ্রহণ করা হয়। ইনি ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে মহাপুরুষ মহারাজ নামে পরিচিত ছিলেন।

স্বামী অভেদানন্দ এই সময় বিদেশ হইতে ফিরিয়া বেলুড় মঠেই ছিলেন। কিন্তু পরে ইনি স্বতন্ত্র আশ্রম স্থাপন করেন।

১৯২৬ খৃষ্টাব্দে ৮ই এপ্রিল একটি অধিবেশনে শিবানন্দ স্বামীর সভাপতিত্বের সময় আরও দুই বৎসর বাড়াইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু এই সময় স্বামী শিবানন্দ তাঁহার অসুস্থতার জন্য কয়েকবার অধিবেশনে সভাপতির পদ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। এই ১৯২৬ খৃষ্টাব্দেই রামকৃষ্ণ মিশনে 'সন্ন্যাসী মহা-সম্মেলন' আহ্বান করা হইয়াছিল।

এই মহা-সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন স্বামী সারদানন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের নানাদেশস্থ বিভিন্ন শাখা হইতে কর্মী সন্ন্যাসীগণ এই সম্মেলনে একত্র হইয়াছিলেন। সুতরাং থাকিবার জায়গার অভাবের জন্য বেলুড় মঠের কাছে দুটি বড় বাড়ি ভাড়া নেওয়া হইয়াছিল। এত লোকের খাওয়া, চা ও জলখাবার এবং শয়ন প্রভৃতির ব্যবস্থা স্বামী সারদানন্দের পরিচালনে নিখুঁতভাবেই সম্পাদিত হইয়াছিল।

এই সম্মেলনের বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়, তবে এককথায় বলা চলে যে, সম্মেলনটি খুবই বিরাট হইয়াছিল। একদিকে সে সময় দিনের পর দিন সম্মেলন চলিতেছে, অন্যদিকে কলকাতায় চলিতেছে হিন্দু-মুসলমানে ভীষণ দাঙ্গা। সেজন্য সম্মেলন সম্বন্ধে কতকটা অসুবিধা হইলেও সম্মেলনটি সম্পূর্ণভাবেই সাফল্যলাভ করিয়াছিল। আটদিন ধরিয়া এই সম্মেলন চলিতেছিল এবং প্রতিদিন দুবার করিয়া সম্মেলনের অধিবেশন বসিত। প্রথম অধিবেশন হইত সকাল সাতটা হইতে বেলা এগারোটা পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় অধিবেশন হইত বৈকাল ২-৫৫ মিনিট হইতে ৫-৩০ পর্যন্ত। আধ ঘণ্টা করিয়া বিরতি থাকিত। অধিবেশন বসিবার ১৫ মিনিট আগে ঘণ্টাধ্বনি করিয়া সকলকে জানানো হইত যে, অধিবেশন বসিবার সময়

হইয়াছে এবং আরম্ভ হইবার আগে বৈদিক মন্ত্র পাঠ ও ভজন সংগীত প্রভৃতি হইত।

এই সম্মেলনে আমেরিকার কতিপয় স্বামীজীর শিষ্যাও যোগ দিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম—মিস্ জে ম্যাকলিয়ড, মিসেস সি ফ্রেণ্ড এবং অ্যামেরিকার রুস্টার পরিবারের কয়েকজন মহিলা। এ'দের গেস্ট হাউসে থাকিবার জায়গা দেওয়া হইয়াছিল। তাছাড়া ভারতীয় মহিলা,—যাঁহারা স্টাফের মেম্বর, তাঁহারাও সম্মেলনের দর্শকরূপে উপস্থিত ছিলেন।

গান-বাজনায় যাঁহারা অভিজ্ঞ, সাধুদের সেইরকম কয়েকজন সন্ধ্যাবেলায় গান-বাজনার আসরে যোগ দিয়াছিলেন। এই গান-বাজনার আসরটিও ছিল উল্লেখযোগ্য। নানা স্থানের গাইয়ে-বাজিয়ে এই আসরে যোগ দিয়াছিলেন। জ্ঞান গোস্বামী এই আসরে গান গাহিয়াছিলেন।

৮ দিন ধরিয়া এই মহাসম্মেলন চলিয়াছিল। ১লা এপ্রিল প্রথম সম্মেলনের উদ্বোধন হয় এবং শেষ হয় ৭ই এপ্রিল। ৮ই এপ্রিল একটি বিশেষ অধিবেশন হইয়া মহাসম্মেলন শেষ হয়। এই মহাসম্মেলনে বহু বক্তা বক্তৃতা দিয়াছিলেন ও প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন—ইঁহাদের মধ্যে অনেক বিশিষ্ট গৃহী ও মনস্বীও ছিলেন। ইঁহাদের কয়েকজনের নাম এখানে উল্লেখ করিতেছিঃ—

রায় চুনিলাল বসু বাহাদুর (তৃতীয় দিন) ঐদিন ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ মিত্রের প্রবন্ধ পঠিত হয়।

চতুর্থ দিনে সকালে স্বামী বিরজানন্দ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বৈকালের অধিবেশনে প্রিন্সিপাল কামাখ্যা মিত্র মহাশয় সভাপতি নির্বাচিত হন। এই বিকালের অধিবেশনে বোম্বাই রামকৃষ্ণ আশ্রমের সভাপতি স্বামী জ্যোতিশ্বরানন্দ রামকৃষ্ণ মিশনের আদর্শ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। ইহার পর কলিকাতা স্টুডেণ্টস হোমের প্রতিষ্ঠাতা এবং সেক্রেটারী স্বামী নির্বেদানন্দ একটি বক্তৃতা দেন এবং স্বামী নিখিলানন্দ "রামকৃষ্ণ মিশনের আদর্শ ও কর্ম তৎপরতা" সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। ইহার পর ৪টা হইতে ৬টা পর্যন্ত কালীকীর্তন হয়।

৫ই এপ্রিল অধিবেশনের পঞ্চম দিন সকালে স্বামী বিরজানন্দ সভাপতি হন এবং বৈকালের অধিবেশনে স্বামী সারদানন্দ সভাপতিত্ব করেন। এই

বৈকালের সভাগুলি জনসাধারণের সভা, সেজন্য ইহাতে বিপুল জনসমাগম হয়। কতকগুলি মহিলাও শ্রোতাদিগের মধ্যে ছিলেন। স্বামী সারদানন্দ বাঙলায় বক্তৃতা করেন যাঁহারা বাঙলা জানেন না, তাঁহাদের জন্য বক্তৃতাটি ইংরাজীতে পরে অনুবাদ করা হয়। বক্তৃতার বিষয় ছিল "শ্রীরামকৃষ্ণ এবং স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষার আলোকে ধর্ম ও দর্শন।"

প্রেসিডেণ্টের আহ্বানে আনন্দ আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী পরমানন্দ উঠিয়া একটি কবিতা আবৃত্তি ও তাহার ব্যাখ্যা করেন। তাহার পর বিভিন্ন ব্যক্তি কয়েকটি প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং কেহ কেহ বক্তৃতাও করেন।

এইদিন তৎকালীন আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক স্বর্গত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার "নবযুগের সংগ্রাম" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন।

ষষ্ঠ দিনে বিষয় নির্বাচনী সমিতিতে কতকগুলি রিজলিউসন গঠিত হয়; সর্বশুদ্ধ নয়টি রিজলিউসন গৃহীত হইয়া তাহা সম্মেলনের ট্রাস্ট কমিটি এবং রামকৃষ্ণ মিশনের গভর্নিং বডির নিকট পাঠানো হয়।

সপ্তম দিন সন্ন্যাসী মহাসম্মেলনের শেষদিন এবং সেইদিন সন্ধ্যায় অভিনয় ও নানারকম ক্রীড়াকৌতুক হয় এবং অষ্টম দিনে একটি এক্সট্রা-অর্ডিনারী মিটিং হয়।

এই অধিবেশনে ডাক্তার ডি এন মৈত্র (বেঙ্গল সোস্যাল সার্ভিস লীগ) একটি বক্তৃতা দেন।

ডাক্তার সরসীলাল সরকার * (সিভিল সার্জন নোয়াখালী) পল্লীসংগঠন সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দান করেন।

চব্বিশ পরগণার ডিস্ট্রিক্ট এগ্রিকাল্চার অফিসার শ্রীযুক্ত নির্মলকুমার দেব "বাঙলার কৃষির উন্নতি" সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দেন।

এবং ডাক্তার গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় "এপিডেমিক ডিজিজ এবং সে বিষয়ে সামাজিক কর্তব্য" সম্বন্ধে বক্তৃতা দান করেন। ডাক্তার চ্যাটার্জী যখন ম্যাজিক-লণ্ঠনসহযোগে কিভাবে জীবাণুর দ্বারা সংক্রামক রোগ সংক্রামিত হয়, তাহা দেখাইতেছিলেন তখন কলিকাতা থেকে

---

* ইনি প্রবন্ধ লেখিকার জ্যেষ্ঠভ্রাতা, রামকৃষ্ণ মিশনের সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

সংবাদ আসিল যে, দাঙ্গা ভীষণ হইয়া উঠিয়াছে। কাজেই খুব তাড়াতাড়ি অধিবেশন শেষ করা হইল।

সংন্যাসী মহাসম্মেলনের ইহাই সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

এই সম্মেলন আহ্বানের একটি বিশেষ কারণ ছিল। স্বামী ব্রহ্মানন্দ সমস্ত মঠবাসীর একান্ত শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। তাঁহার সময়ে মঠে কোনরূপ বিপ্লব ও গোলমাল কিছুই হয় নাই। রামকৃষ্ণ মিশনে কোন অপ্রীতিকর ঘটনাও ঘটে নাই।

কিন্তু তাঁহার মহাপ্রয়াণের পর মঠের মধ্যে নানারূপে গোলযোগ আরম্ভ হইল। তরুণ সাধুগণ ও ব্রহ্মচারিগণ ক্ষমতা-প্রয়াসী হইলেন, প্রাচীন সাধুগণের হস্তে সমস্ত ক্ষমতা থাকা তাঁহারা যেন আর সহ্য করিতে পারিতেছেন না, তাঁহাদের কার্যে ও কথায় অনেক সময় এইরূপ ভাবই প্রকাশ হইতেছিল।

এই মহাসম্মেলনের মাধ্যমে যে নূতন কার্যপ্রণালী রচনা করা হইল, তাহার ফলে কার্যকরী সমিতিতে রামকৃষ্ণ মিশনের সভাপতি বা সেক্রেটারীকে গ্রহণ করা হইল না, তবে বেলুড় মঠের ট্রাস্টিগণের মধ্যে তাঁহাদের নাম রহিল। ইহার ফলে পূর্বে তাঁহাদের যে ক্ষমতা ছিল, তাহা হ্রাস হইয়া সেই ক্ষমতা কার্যকরী সমিতির সভ্যগণের উপর ন্যস্ত হইল।

স্বামী সারদানন্দ নবীন সাধুগণের এই মনোভাবে যদিও দুঃখিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি এই পরিবর্তন প্রয়োজন বলিয়াই মনে করিয়াছিলেন। তিনি চাহিয়াছিলেন, এইসব নবীন সাধু—যাঁহারা স্বামীজীর আদর্শ মাথায় লইয়া ত্যাগধর্মে ও সেবাব্রতে দীক্ষিত হইয়াছেন, তাঁহারা যেন ক্ষমতালুব্ধ না হইয়া যে প্রেরণার আহ্বানে গৃহসংসার ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন, সেই প্রেরণাকেই তাঁহাদের যাত্রাপথের ধ্রুবতারাস্বরূপ গ্রহণ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রদর্শিত কর্মতপস্যায় তাঁহারা প্রত্যেকেই এক এক মহান্ তপস্বী হন এবং রামকৃষ্ণ মিশনকেও জয়যুক্ত করেন।

স্বামী সারদানন্দের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে প্রদত্ত অভি-ভাষণটি এখানে পুরাপুরিই দেওয়া হইলঃ—

এটি স্বামী সারদানন্দের অভিভাষণের বাঙলা অনুবাদ।

"যখনই কোন নূতন আন্দোলনের সূত্রপাত হয়, তখনই দেখা যায় সমাজ এবং সমগ্র মানবজাতি উহার মূল তত্ত্বগুলি মানিয়া লইবার পূর্বে প্রথমে উহার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, শেষে তাহার সম্বন্ধে উদাসীনতা অবলম্বন করে। যে কোন নূতন আন্দোলনকে এই দুটি অবস্থার ভিতর দিয়া যাইতে হয়—ইহা যেন প্রকৃতির অব্যর্থ নিয়ম। আর যখন মানবপ্রকৃতি সর্বত্রই সমান, তখন কি প্রাচ্যে, কি পাশ্চাত্যে জগতের সর্বত্রই এই নিয়মের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। সমাজ, নীতি, রাজনীতি বা ধর্ম—যে কোন ক্ষেত্রেই বলা যাক না কেন, যদি তুমি কোন নূতন সংস্কার করিতে চাও, তবে দেখিবে তোমার চারিপাশের লোক তোমার বিরুদ্ধে লাগিবে। আর তোমার প্রবর্তিত সংস্কার-আন্দোলনের ভাবগুলি প্রচলিত ভাবসমূহ হইতে যতই নূতন হইবে, বাধা ততই প্রবলতর হইবে। তেমনি বলিবে, উক্ত নব-আন্দোলনের মূলে

ভাবসমূহ—যে আদর্শ বিদ্যমান, তাহার প্রভাবে বর্তমান সমাজের যাহা কিছু ভুল ও অপ্রয়োজনীয় বিষয় আছে, তাহার ভিত্তি পর্যন্ত চূর্ণ হইয়া যাইবে। কিন্তু যদি ঐ আন্দোলনের ভিতর যথার্থ প্রাণশক্তি থাকে, যদি ঐ নূতন আন্দোলন মানব-প্রকৃতির ও তাহার বিভিন্ন অঙ্গ ও কার্যাবলীর পরিচালক সার সত্য-সমূহের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে প্রবল বাধা সত্ত্বেও উহার বিনাশ না হইয়া বরং উত্তরোত্তর উহার প্রভাব বাড়িতে থাকিবে এবং ক্রমে মানবহৃদয়ে উহা স্থায়ীভাবে শিকড় গাড়িয়া বসিবে। এই বাহিরের বাধার সংঘাতেই ঐ আন্দোলনকে নিজের শক্তিরাশি একমুখী করিতে এবং যে মূল সত্যসমূহের উপর উহা প্রতিষ্ঠিত, সেইগুলিকে ব্যবহারিক জীবনে প্রকাশ ও কার্যকরী করিতে সহায়ক হইয়া থাকে—সুতরাং প্রকৃতপক্ষে সকল দিক বিবেচনা করিয়া দেখিলে ঐ বাধাকেও অহিতকর বলিতে পারা যায় না।

"কিছুকাল পরে এই বাধা আপনা-আপনি ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইয়া যায় এবং উদাসীনতা আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করে। যাহারা প্রথমেই উহার বিরুদ্ধে লাগিয়াছিল তাহারাই বলিতে থাকে, 'দেখ, এই যে আন্দোলন দেখিতেছ ইহাতে নূতনত্ব আর কি আছে? ইহারা যে সকল তত্ত্ব প্রচার করিতেছে, আমাদের প্রাচীন গ্রন্থে ও শাস্ত্রে অমুক অমুক শ্লোকে সেই কথাগুলিই যে রহিয়াছে। ইহাতেই যথেষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে, আমাদের পূর্বপুরুষেরা বহুকাল পূর্বেই এ সকল কথা জানিতেন এবং বহুকাল পূর্ব হইতেই এগুলি করিয়া আসিতে-ছেন। অতএব এগুলি লইয়া অধিক মাথা ঘামাইবার আবশ্যক নাই। এই দ্বিতীয় অবস্থার বাধা অপসারিত হওয়ায় ঐ আন্দোলন বহু দূরে বিস্তৃত হইয়া পড়ে এবং কালে সমাজের লোকে যখন উহার অস্তিত্ব ও উপকারিতা স্বীকার করিয়া লয়, তখন উহা সমাজের একটা স্থান অধিকার করিয়া বসে, উহাকে বাধা দিবার, উহার বিরুদ্ধে লাগিবার আর কেহ থাকে না।

"সুতরাং এই দ্বিতীয় পর্যায়ের শেষে সর্বসাধারণের সম্মতিক্রমে উহা সমাজে পরিগৃহীত হইয়া থাকে আর এইরূপে সমাজে পরিগৃহীত ও আদৃত হইবার উপযুক্ত বলিয়া প্রমাণিত হওয়াতে তখন দলে দলে উহাতে লোক প্রবেশ করিতে থাকে। তবে ঐ আন্দোলনের উন্নতির ইতিহাসে এইরূপ সর্ব-সম্মতিক্রমে পরিগৃহীত হইলেই যে ঐ আন্দোলন উন্নতির চরম শিখরে উঠিয়াছে এমন মনে করা উচিত হইবে না। কারণ, বাধাহীন অবস্থায় পৌঁছিয়া প্রথম অবস্থার উৎসাহ ও উদ্যমে যেন একটু ভাটা পড়ে আর প্রথম অবস্থায় ঐ আন্দোলনের প্রবর্তক-গণের মধ্যে ভাবের যে গভীরতা ও উদ্দেশ্যের যে একতা ছিল হঠাৎ বিস্তারের সঙ্গে তাহা কমিয়া যায়। সুতরাং তখন বাহিরের বাধার স্থানে উহার অঙ্গগণের বিভিন্ন মতামতের ফলে একটা অন্তর্বিরোধের সৃষ্টি হয় এবং পরে প্রথম অবস্থায় যথার্থ সত্যের জন্য যে প্রবল স্বার্থত্যাগের ভাব ছিল তাহার স্থানে খাঁটি সত্যের সঙ্গে সত্যাভাসের আপস করিয়া সমাজে একটা প্রতিপত্তি লাভের চেষ্টা এবং ভিতরের যথার্থ জিনিসটার বদলে বাহিরের চাকচিক্যের দিকে, লোককে দেখাইবার দিকে একটা ঝোঁক হয়—বিশেষত যাহারা সত্যের জন্য কোনরূপ স্বার্থত্যাগ বা কষ্ট স্বীকার না করিয়া আরামে জীবন কাটাইতে চায়, তাহাদের স্বভাবত এই দিকেই প্রবৃত্তি হয়। আর যদি ঐ আন্দোলনের নেতাগণ সতর্ক দৃষ্টিতে জাগ্রত না থাকেন অথবা ঐ সকল দোষের উৎপত্তিতে বাধা দিবার জন্য দোষগুলিকে সমূলে বিনাশের জন্য কোনরূপ প্রতীকারের উপায় আবিষ্কার করিয়া ঐ অবস্থাকে সামলাইয়া লইবার চেষ্টা না করেন, তবে তাহার ফল যে কি হয় তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। প্রথমত এবং প্রধানত যতই স্বার্থের ভাব প্রবেশ করিতে থাকে, ততই যে প্রেমের সূত্রে এতদিন সকলে একত্র ও গ্রথিত ছিলেন, তাহা কমিতে থাকে এবং সঙ্ঘের অঙ্গগণের সমগ্র সঙ্ঘের উন্নতি ও কল্যাণের জন্য যে স্বার্থহীন, উদার ব্যাপক দৃষ্টির প্রয়োজন তাহা ভুলিয়া পৃথক পৃথক বিভিন্ন এক-একটা দল হইয়া সমগ্র সঙ্ঘের সহিত কোন সম্বন্ধ না রাখিয়া উহার পৃথক পৃথক এক-একটা অংশের উন্নতি বিধান ও তাহার স্থায়িত্ব সাধনের ভাব লইয়া কার্যে অগ্রসর হন। এইরূপে সঙ্ঘের ভিতর বিচ্ছিন্নতার ভাব এই সংকীর্ণ প্রণালীর মধ্য দিয়া প্রবেশ করিয়া সমস্ত সঙ্ঘটিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলে। আর কাল-

...দেরই মধ্য দিয়া তাহা সাধন ...ন, যদি তোমরা তাঁহাদের ...া, সংকল্পের একনিষ্ঠতা, ...দের স্বার্থত্যাগ এবং যাহা কিছু ...যাহা কিছু শুভ, যাহা কিছু মহৎ ...সমুদয়ের উপর আত্মসমর্পণরূপে ...দের জীবনের মহান গুণরাশির ...রণ করিতে পার এবং এতদিন যে ...ও নম্রতার সহিত তাঁহাদের ...নুসরণ করিয়াছ, যদি এখনও তাহাই করিয়া যাইতে পার। কারণ, যদি আমরা তাঁহাদের কার্য করিতে অন্য ভাব লইয়া অগ্রসর হই এবং তাঁহাদের কার্য করিতে নিবৃত্ত হইয়া এতদিন উহা করিতে পারিয়াছি বলিয়া যদি আমরা অহংকারে ফুলিয়া উঠি, তবে আমরা—সেই কর্মক্ষেত্র হইতে একেবারে অপসারিত হইয়াছি এবং আমাদের স্থানে কার্য করিবার জন্য অপরে নির্বাচিত হইয়াছে দেখিয়া শীঘ্রই আমাদের শোকের অশ্রু বিসর্জন করিতে হইবে। বাইবেলে উল্লিখিত তথাকথিত ঈশ্বর-নির্বাচিত ইস্রায়েল-দের কথা স্মরণ কর, তাহারা শ্রীপ্রভুর শাখা এবং "প্রভু অতি সামান্য ধূলিকণা হইতেও তাঁহার কার্য করিবার লোক গড়িয়া তুলিতে পারেন", তাঁহার এই সাবধান বাক্যে কর্ণপাত করে নাই—এবং তাহারা কি দুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছিল—ভাবিয়া দেখ! এই প্রসঙ্গে ভারতে এক সময়ে আমাদের কতকগুলি প্রবল সম্প্রদায়ের দুর্গতির কথাও স্মরণ রাখিও।

"অতএব বিগত ত্রিশ বর্ষ ধরিয়া আমাদের মিশন যেরূপ বিস্তার লাভ করিয়াছে, ইহা ভাবিতে গেলে যদিও আশ্চর্য হইতে হয়, ঐ সঙ্গে গভীরভাবে এ প্রশ্নটিও আপনা আপনি আসিয়া পড়ে যে, এই বিস্তারের ফলে কি আমাদের প্রথম অবস্থায় যে প্রবল ত্যাগের ভাব ও আদর্শের উপর তীব্র অনুরাগবশে ঐ আদর্শের জয় ঘোষণার জন্য যে সব কার্য করিতাম, তাহা বর্তমানে আমাদের নামযশোলিপ্সা, ক্ষমতাপ্রিয়তা ও নিজ নিজ পদগৌরবের প্রতি অতিরিক্ত আসক্তিবশত দাসত্ব ও বন্ধনে পরিণত হইয়াছে? সত্যই এক্ষণে এই সকল গুরুতর প্রশ্নের বিচার, চিন্তা ও সমাধানের—খাঁটি শস্য হইতে তুষ এবং বিশুদ্ধ ধাতু হইতে খাদ বাছিয়া পৃথক করিবার সময় আসিয়াছে।

"এই বর্তমান মহাসম্মেলন তোমাদিগকে এই সুযোগ দিবার জন্য আহূত হইয়াছে। ইহাতে সমবেত হইবার ফলে তোমরা তোমাদের অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ বা তোমাদের পূর্ববর্তী সহকর্মীদিগের সহিত এবং গুরুজনদিগের সহিত মিলিত হইবার এমন সুযোগ ও সৌভাগ্য লাভ করিয়াছ, যাহা সচরাচর ঘটে না। এই মহাসম্মেলনে যোগ দিয়া তাঁহাদের অভিজ্ঞতা হইতে তোমরা অনেক শিক্ষা পাইবার সুযোগ পাইবে, সমগ্র মিশনের কল্যাণের জন্য তাঁহাদের

সহিত মিলিত হইয়া ভবিষ্যৎ কার্য-প্রণালীর বিষয়ে আলোচনা করিয়া একটা স্থির করিতে এবং আমাদের সঙ্ঘের এই সংগঠন অবলম্বিয়া সর্বসাধারণ কর্তৃক উহার প্রচলিত ভাবরাশি পরিগৃহীত হইবার ফলে যে সকল বিপদ ও দোষ প্রবেশ করে বলিয়া ইতিপূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, তাহা হইতে নিজেদের দূরে রাখিবার অবকাশ পাইবে। আমি তোমাদিগকে অনুরোধ করিতেছি, তোমরা সকলে অকপটে ও সরলভাবে এই মহাসম্মেলনে যোগ দিয়া ভাল করিয়া তন্ন তন্ন করিয়া আমাদের অনুষ্ঠিত সমুদয় কার্যগুলি পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখ, তোমরা এই অদ্ভুত বিস্তারের জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন সেগুলি করিতে গিয়া আমাদের সেই গৌরবময় আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছ কি না। আদর্শটিকে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া থাক, কারণ সেই আদর্শের ভিতরই প্রত্যেক আন্দোলনের সঞ্চিত শক্তি,—কুণ্ডলিনী নিহিত থাকে। নিজেকে ও অপরকে ইহারই তীব্র আলোকে বিচার করিয়া লও। ইহা যদি করিতে পার, তবেই তুমি আমাদের কার্যের ভবিষ্যৎ স্থায়িত্ব ও উন্নতি সাধনের সহায়তা করিয়া এই মহাসম্মেলনকে সাফল্য-মণ্ডিত করিবে।

"এইরূপ সম্মেলন ভারতের ইতিহাসে নূতন নহে, ইহা যেন স্মরণ রাখিও। এইরূপেই আমাদের পূর্ববর্তী সঙ্ঘসমূহের উন্নতি সাধনের চেষ্টা হইয়াছিল,—আমাদের সেই প্রাচীন, বারম্বার পরীক্ষিত পথে ভ্রমণ করিবার জন্যই তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি। প্রাচীনকালে বৌদ্ধগণ কয়েকবার এই প্রণালী অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের সঙ্ঘের উন্নতি বিধানের চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহার ফলে তাঁহাদের সঙ্ঘ খুব বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল এবং সুদীর্ঘকাল ধরিয়া তাঁহাদের মহৎ কর্মের সর্বনাশ বা বিলোপসাধন ঠেকাইয়া রাখিয়াছিল। যীশুখৃষ্ট ও মহম্মদের শিষ্যগণও তাঁহাদের সঙ্ঘ-জীবনের প্রাচীন যুগে সময়ে সময়ে স্ব স্ব সম্প্রদায়ের উন্নতি বিধানের জন্য এই প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন। সুতরাং এই কার্যপ্রণালী কিছু নূতন নহে, কিন্তু যাহারা এক্ষণে নিজেদের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ইহা প্রয়োগ করিতে যাইতেছেন, তাঁহাদের অকপটতা ও লক্ষ্যের একতানতার উপরেই এই প্রণালী প্রয়োগের সফলতা সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। অতএব তোমরা স্বেচ্ছায় যে কার্যসাধনে উদ্যোগী হইয়াছ, তাহা শ্রীপ্রভুর কৃপায় যতদিন না সমাধা হইতেছে, ততদিন প্রাণপণে খাটিয়া যাও, আমাদের নেতা আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের প্রিয় 'ওঠো, জাগো, যতদিন না লক্ষ্যে পৌঁছিতেছ ততদিন অনলসভাবে অগ্রসর হইতে থাক', এই উক্তি বলিয়া আমি তোমাদের প্রত্যেককে ঐ উক্তি অনুসারে অগ্রসর হইতে আহ্বান করিতেছি। বন্ধুগণ, ভ্রাতৃগণ, সন্তানগণ, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আদর্শ প্রচাররূপ কর্মক্ষেত্রে সহযোগিগণ, আমি আমাদের প্রভু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পবিত্র নাম লইয়া এবং আমাদের ভূতপূর্ব সভাপতি আমাদের প্রভুর প্রিয়তম অন্তরঙ্গ স্বামী ব্রহ্মানন্দের নাম লইয়া তোমাদের সকলকে স্বাগত সম্ভাষণ করিতেছি।"

এই দীর্ঘ অভিভাষণ পাঠ করিবার সময় স্বামী সারদানন্দ ভাবাবেগে যেন উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। বিশেষত শেষের কথাগুলি তিনি প্রত্যেকটি কথার উপরেই জোর দিয়া দিয়া এমন-ভাবে বলিয়াছিলেন যে, কথাগুলি যেন তাঁহার মুখ হইতে নয়, অন্তর হইতে বাহির হইতেছে। যাঁহারা সেই অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা নিশ্চয়ই সেই দিনই সেই অভিভাষণ পাঠ ও সেই সময়ের তাঁহার মুখের ভাব ভুলিতে পারেন নাই।

তিনি বলিয়াছেন, "ইহা রামকৃষ্ণ মিশনের সংকট মুহূর্ত" সেই সংকট যে কোন পথে আসিতেছে তাহাও তিনি মর্মে মর্মে অনুভব করিয়াছিলেন।

এই মহাসম্মেলনের অব্যবহিত পরেই তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের সমস্ত কর্মিগণকে তাঁহার ও সভাপতি স্বামী শিবানন্দের নাম সংযুক্ত একখানি পত্র পাঠাইয়াছিলেন।

ঝাঁসীর রানী ০ মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য
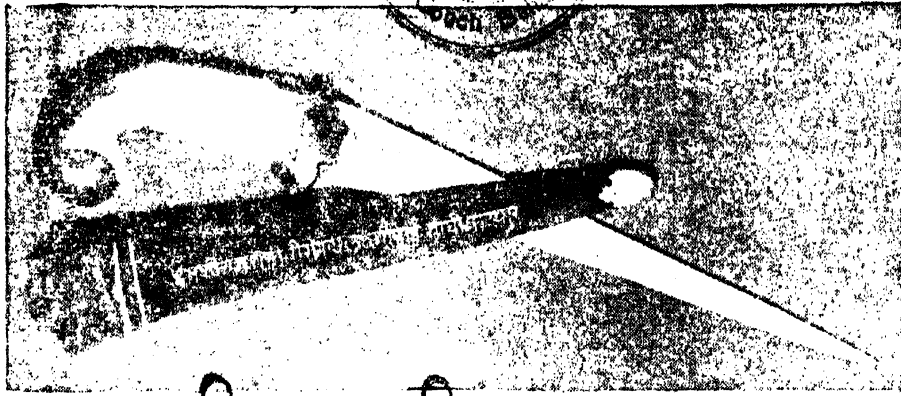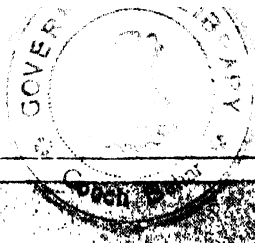
॥ ১১ ॥

এ কশো বছর আগেকার দুনিয়ায় নতুন জাত হচ্ছে ইংরেজ। শক্তি তাদের, উন্নতি তাদের, নতুন রাজনীতি তাদের, দুনিয়ার মালিক তারা। ভারতবর্ষে তখন সামন্ত যুগ মরছে। ঘুণ ধরা তার হাড়-পাঁজরা, বরবাদ সব রীতি নীতি। মুমূর্ষু সামন্ত যুগের উপর পা রেখে দাঁড়াচ্ছে নতুন যুগের প্রতিভূ ইংরেজ। কিন্তু মানুষগুলো মরে যায়নি। মরে যায়নি বলেই বিনা প্রতিবাদে আত্মসমর্পণ করতে পারেনি তারা। কোথাও প্রতিবাদ জমছে নাকি, লক্ষ কোটি মানুষের মনের অনুভূতি পাক খেয়ে অগ্নিগর্ভ পর্বতের মতো সময় গুণছে নাকি, তা দেখবার চোখ ইংরেজের ছিল না। তাই নির্বিচারে ভারতীয় রাজ্য-গুলির উপর শেষ পরোয়ানা জারী করছিলেন ডালহৌসী। রাণীর চিঠির সঙ্গে চিঠি লিখে ম্যালকম পাঠালেন ২৮-২-১৮৫৪ তারিখে। কিন্তু ডালহৌসী তার দুইদিন আগেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। ঝাঁসী ব্রিটিশের অধিকারে ফিরে আসবে।

॥ ঝাঁসীর অন্তর্ভুক্তি ॥

১। ঝাঁসী, সাতারার চেয়েও সুস্পষ্টভাবে ব্রিটিশ আশ্রিত রাজ্য। অতি অল্পদিন হ'ল ব্রিটিশ কর্তৃক অনুমোদিত হয়ে রামচন্দ্র রাও রাজত্ব করছিলেন। অতএব পুরুষ উত্তরাধিকারীর অভাবে ঝাঁসী স্বভাবতই ব্রিটিশ সরকারের অধীনে ফিরে আসবে।

২। ঝাঁসী যে একান্তভাবেই আশ্রিত রাজ্য তা বোঝবার জন্য যুক্তি নিষ্প্রয়োজন। ঝাঁসীর শাসক গোষ্ঠি স্বাধীন নন্। তেহরী অরছা যে অর্থে স্বাধীন রাজ্য, সে অর্থে ঝাঁসী কোনদিনই স্বাধীন রাজ্য ছিল না। প্রকৃত পক্ষে ঝাঁসী অরছা রাজ্যেরই একটি অংশ। পেশোয়া তাকে বিচ্ছিন্ন করে একটি স্বতন্ত্র সংস্থা গঠন করে সুবাদারের অধীনে রেখে-ছিলেন।

৩। দত্তক গ্রহণের আকস্মিকতা সন্দেহজনক। ম্যালকম নিজেও বলে-ছেন, দত্তক গ্রহণের কথা শুনে সকলেই বিস্মিত হয়েছিলেন।

৪। ঝাঁসীর পূর্ব ইতিহাস রাণীর যুক্তিগুলিকে খণ্ডন করবে। রামচন্দ্র রাওয়ের বিধবা পত্নী একটি দত্তক গ্রহণ করেছিলেন। সেই দত্তককে সামাজিক ও ব্যক্তিগত প্রয়োজনের জন্য বৈধ এবং রাজ-নীতিক প্রয়োজনের পক্ষে অ-বৈধ ঘোষণা করে অন্য রাজা নির্বাচিত করা হয়েছিল।

৫। আমাদের ঝাঁসী পুনর্গ্রহণ করবার একমাত্র কারণ হচ্ছে ন্যায়-সঙ্গত পুরুষ উত্তরাধিকারীর অভাব। সে বিষয়ে কোন দ্বি-মত পোষণ করা উচিত নয়।

৬। ঝাঁসী নিয়ে ব্রিটিশ সরকার কোন অংশেই লাভবান হবেন না। কেননা এই রাজ্যের সীমানা অতি ছোট। খাজনাও সামান্য। কিন্তু ঝাঁসীর অবস্থান বড়ই অদ্ভুত। অন্যান্য ব্রিটিশ অধিকৃত জেলার মধ্যে অবস্থিত বলে ঝাঁসীর অন্তর্ভুক্তি আমাদের অধিকৃত বুন্দেলখণ্ডের রাজ্যগুলির আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যবস্থাকে উন্নত এবং সুনিয়ন্ত্রিত করবে।

৭। অন্য রাজ্য সম্পর্কীয় অভিজ্ঞতা থেকে বোঝা যাবে যে, ব্রিটিশ সীমান্তগুলির সঙ্গে ঝাঁসীর অন্তর্ভুক্তিতে ঝাঁসীর জনসাধারণ পরম উপকৃত হবে।

৮। রাজনৈতিক প্রতিনিধির প্রস্তাব অনুযায়ী রাণীকে পর্যাপ্ত বৃত্তি দেওয়া হবে এবং ঝাঁসী বুন্দেলখণ্ডের অপরাপর ব্রিটিশ রাজ্য-

গুলির মতই উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের গভর্নরের শাসনাধীনে থাকবে।

স্বাক্ষর
২৭-২-১৮৫৪—ডালহৌসী
২৮-২-১৮৫৪—জে এ ডোরিন
১-৩-১৮৫৪—জে লো
২-৩-১৮৫৪—এফ জে হ্যালিডে।"

ডালহৌসীর এই যুক্তিতে রাজনীতিক কোন গলদ নেই। তবু সেদিনকার জনমতও এর পক্ষে কোন সমর্থন জানায়নি। তার কারণ একে সমর্থন করা মানে ভারতবর্ষে বৃটিশ শাসনকে সমর্থন করা। ঝাঁসীর জনসাধারণ ইংরেজের হিতাকাঙ্ক্ষার প্রতি কতটা আস্থা রাখত সে সম্বন্ধে ঐতিহাসিক কে ও ম্যালেসন (Kaye and Malleson) যে মন্তব্য করেছিলেন তা স্মরণীয়। তাঁরা বলেছিলেন—

> লর্ড ডালহৌসী লিখলেন, যেহেতু এই জেলাটি বুন্দেলখণ্ডের অন্যান্য ব্রিটিশাধিকৃত রাজ্যের মধ্যে অবস্থিত, সেহেতু এটির অধিকার দ্বারা বুন্দেলখণ্ডের সাধারণ আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যবস্থার উন্নতি হবে।
>
> ব্রিটিশ সীমানার সঙ্গে ঝাঁসী যুক্ত হবার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে ঝাঁসীবাসীর উপকার করা। অন্য রাজ্যগুলির সম্পর্কে অভিজ্ঞতা থেকেই তা পরিস্ফুট হবে।
>
> ঝাঁসীর জনসাধারণ এই অন্তর্ভুক্তিকে কতখানি ভালভাবে নিয়েছিল, ১৮৫৭ সালের অভিজ্ঞতা থেকেই তা ভালভাবে বোঝা গেছে।"

কে ও ম্যালেসনের উক্তির মর্ম হচ্ছে এই : শুধু তাঁরাই নন। বিভিন্ন ইংরেজ ঐতিহাসিকও ঝাঁসীর অন্তর্ভুক্তিকে সমর্থন করতে পারেননি। টি রাইস হোমস (T. Rice Holmes) বলেছেন—"এ কথা নিশ্চিত যে, ঝাঁসী ও অযোধ্যা যদি ব্রিটিশ কর্তৃক অধিকৃত না হ'ত তাহ'লে ১৮৫৭-৫৮ সালে যে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল ব্রিটিশ সরকার, তার অনেকখানি এড়ান যেত।"

ভারতে ব্রিটিশ অধিকারের পরিপূর্ণ সমর্থক বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঝাঁসীর অন্তর্ভুক্তি সমর্থন করতে পারেননি।

ডালহৌসীর এই সিদ্ধান্ত ম্যালকমের কাছে পৌঁছল। ম্যালকম পাঠালেন এলিসকে। তিনি লিখলেন—

> অন্তর্ভুক্তির আদেশ পেলাম। আমার ঘোষণা পত্র ঝাঁসীর সর্বত্র প্রচার করুন।
>
> মহারাজার পুরোন সৈন্যদের দুই মাসের মাইনে দিয়ে বিদায় করুন। রাজার পুরোন কর্মচারীদের যতদূর সম্ভব স্ব স্ব কাজে বহাল রাখুন।
>
> ঝাঁসীতে তিনটি ও করেরাতে দুইটি কম্প্যানী (Company) সেনা রাখুন।
>
> ঝাঁসীতে আপাতভাবে সিন্ধিয়ার ষষ্ঠ কন্‌টিন্‌জেন্ট রাখুন। করেরার জন্য সিপরী (শিবপুরী—গোয়ালিয়ার), থেকে ক্যাপ্টেন হেনেসী খবর পেলেই ৫০০ সৈন্য, ২টি কামান ও একদল অশ্বারোহী আনবেন।
>
> দ্বাদশ বেঙ্গল নেটিভ ইনফ্যান্ট্রি এসে পৌঁছলে সিন্ধিয়ার সৈন্যরা মোরারে ফিরে যাবে। তখন ঝাঁসীতে হেনেসীর সৈন্য সহ নেটিভ ইনফ্যান্ট্রির একটি পুরো রেজিমেন্ট, এক কোর (Coeps) অশ্বারোহী ও কামান থাকবে। প্রয়োজন হ'লে বুন্দেলখণ্ডের যে কোন স্থান থেকেই ঝাঁসীতে সামরিক সাহায্য পাঠান যাবে।
>
> রাণীর প্রাপ্য বৃত্তি ইত্যাদি বিষয়ে আমি গভর্নর জেনারেলের সঙ্গে পত্রালাপ করেছি। যথাসময়ে গৃহীত সিদ্ধান্ত জানতে পারবেন।

সাধারণের জন্য ম্যালকমের বিজ্ঞপ্তি :—

> ২০শে নভেম্বর ১৮৫৩তে আকস্মিক ভাবে দত্তক পুত্র গ্রহণ করে ২১শে নভেম্বর ১৮৫৩ মহারাজা গঙ্গাধর রাওয়ের মৃত্যু হওয়াতে আমি নিম্নোক্ত মর্মে গভর্নরের আদেশ পেয়েছি।
>
> ঝাঁসীর দত্তক বিধান অনুমোদিত হয়নি। স্বত্ববিলোপের ভিত্তিতে ব্রিটিশ সরকার ঝাঁসীকে ব্রিটিশ ভারতের সঙ্গে যুক্ত করছেন।
>
> বর্তমানের জন্য আমি মেজর এলিসকে ঝাঁসীর শাসক নিযুক্ত করেছি। ঝাঁসীর সর্বসাধারণ ব্রিটিশ সরকারের অধীনে এবং রাজস্ব মেজর এলিসের কাছে দেয়।
>
> স্বাক্ষর
> ডি এ ম্যালকম,
> ১৫-৩-১৮৫৪

১৫-৩-১৮৫৪ তারিখেই এলিস পেলেন ম্যালকমের চিঠি। ডালহৌসীর দীর্ঘ নীরবতা দেখেও এলিস সম্ভবত সিদ্ধান্তের সম্ভাব্য রূপের কথা বুঝতে

রেনি। রাণীকে যে তিনি আশ্বস্ত রেছিলেন এবং রাণী যে আশা পোষণ রছিলেন, তা মনে করবার কারণ আছে। খানে একটি কথা বলা সম্ভবত অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

এলিস রাণীর প্রতি তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে তৎকালীন ইংরাজদের মধ্যে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিলেন। রাণীর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাকে অন্য চোখে দেখে, ঝাঁসীর পটভূমিকায় উদ্দেশ্যমূলকভাবে রাণীর চরিত্রের প্রতি দোষারোপ করা হয়। গঙ্গাধর রাও, লক্ষ্মীবাঈ এবং শেক্সপীয়ার (এলিস) এই নাম ব্যবহার ক'রে একটি উপন্যাস রচনা করেছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীতে গিলিয়ান (Gillean) ছদ্মনামে জনৈক লেখক। উপন্যাসটির নাম হচ্ছে "The Rane" বা "রাণী"। এই গ্রন্থের শেক্সপীয়র হচ্ছেন প্রকৃত পক্ষে এলিস। রাণীর চরিত্র স্বৈরিণী, জিঘাংসু এবং হীন চরিত্রা একটি রমণীর তুল্য করে লেখা হয়েছে। লেখকের উদ্দেশ্য ছিল একটি নির্দোষ ও নির্ভীক ইংরেজ এবং একজন সর্বজন শ্রদ্ধেয়া ভারতীয় রমণীর সহজ ও স্বাভাবিক শ্রদ্ধার সম্বন্ধকে বিকৃত ক'রে দেখানো। আনন্দের বিষয় হচ্ছে, গিলিয়ানের 'The Rane' এবং Meadows Taylor-এর "Seeta" (রাণীর চরিত্র কেন্দ্র করে আর একটি কাল্পনিক উপন্যাস) ইংলণ্ডেও জনপ্রিয় হয়নি। সেই সুদূর ১৮৫৪ সালে রাণী তাঁর পরিচিত ইংরেজ ও ভারতীয় দুই মহলেই শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। বই দুখানিকে পাঠক সমাজ সমাদর করেনি। এর থেকেই বোঝা যাবে, যুগে যুগে সচেতন জনমতই সাহিত্য এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে শুভ সত্তাকে বাঁচিয়ে রাখে। অন্যান্য বহু বিষয়ের মত গিলিয়ানের 'রাণী', বই-খানির প্রসঙ্গ চিরতরে সমাপ্ত হ'ল কিন্তু বহুদিন বাদে। মাত্র কয়েক বছর আগে সেই বইখানির উপর ভিত্তি ক'রে একখানি নাটক লেখা হয়েছিল এবং সেই নাটক বোম্বাই-এ অভিনীত হবার কথাও শোনা গিয়েছিল। তারপরে সে কথা আর শোনা যাচ্ছে না। উদ্যোক্তারা যে নিরুদ্যম হয়েছেন, তাতেই বোঝা যাবে এতদিনে উপসংহারের অধ্যায় বন্ধ হয়েছে বইখানির। এ প্রসঙ্গে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

এলিস স্থির করলেন ১৬-৩-১৮৫৪ তারিখ প্রভাতে দরবারে যাবেন। খবর গেল রাজপ্রাসাদে।

পনেরোই মার্চের রজনীতে রাণীর উদ্বিগ্ন চোখে ঘুম এল না। সম্ভবত কাল প্রভাতেই তাঁর সমস্ত প্রতীক্ষা সার্থক হবে।

একটি দিন, অন্যদিনের চেয়ে কোন অংশে ভিন্ন নয়। ষোল তারিখও সকাল হ'ল। মহলকারনীরা প্রভাতেই মার্জনা করে ধুয়ে দিয়েছে দরবার গৃহের অঙ্গন। বিশাল দরবার গৃহের এক পাশে চিক আড়াল দিয়ে বসেছেন রাণী। স্নানান্তে শ্বেত চন্দেরী শাড়ী ও সাদা চোলী পরেছেন; সিক্তকেশ শুকিয়ে বেঁধেছেন 'আম্বাড়া' ছন্দে। কপালে পূজার চন্দন-তিলক, গলায় মুক্তামালা, হাতে হীরার বালা এবং আঙুলে হীরার আংটি। এই নিত্যকার বেশে বসেছেন রাণী গদিতে তাকিয়া রেখে। স্বভাবতই গৌরবর্ণা, ঘনকৃষ্ণ আকুঞ্চিত কেশা ঊনিশ বছরের তরুণী রাণীকে মূর্তিমতী সরস্বতী সদৃশ বোধ হচ্ছে। পাশে বসে আছেন দামোদর রাও।

হঠাৎ সভাস্থ সকলকে চকিত করে মেজর এলিস এলেন। দরবার ঘরের সারি সারি সিঁড়ি নেমে গেছে। তাই দিয়ে উঠতে লাগলেন এলিস। অন্তরাল-

কর্তনী রাণীকে শান্ত কণ্ঠে সম্মান জানিয়ে তিনি ডালহৌসীর আদেশ পত্র এবং ম্যালকমের বিজ্ঞপ্তি পড়তে লাগলেন। উপস্থিত সকলে বিস্মিত ও চকিত হ'লেন।

বজ্রাঘাতের মত নিশ্চিত হয়ে এলিসের কথাগুলো উচ্চারিত হ'তে লাগল।

এলিসের পড়া শেষ হ'তে না হ'তে পর্দার আড়াল থেকে এলিসের একটি পরিচিত কণ্ঠে, সম্পূর্ণ অপরিচিত দৃঢ়তা, অথচ সুগভীর দুঃখের সঙ্গে সংযত উচ্চারণে সুনিশ্চিত চারটি কথা ধ্বনিত হ'য়ে উঠল। লক্ষ্মীবাঈ বললেন—

"মেরী ঝাঁসী দুঙ্গী নহী॥"

ঐতিহাসিক উক্তি। কিন্তু এ উক্তি এই জন্য ঐতিহাসিক নয় যে, রাণী ইতিহাসের মত স্বর্গে নির্বাসিতা। এই জন্য ঐতিহাসিক নয় যে, তারও পরে ১৮৫৭ সালের অভ্যুত্থান ঘটেছিল। এই জন্য ঐতিহাসিক নয় যে, এই উক্তির নাটকীয়তা ভারতবাসীকে মুগ্ধ করেছিল। রাণীর প্রতিবাদ এই জন্য ঐতিহাসিক যে, সেই দিন সমগ্র ভারতভূমিতে ইংরেজের ক্রমবর্ধমান করাল গ্রাসে বিলীয়মান ভারতীয় রাজ্যগুলির পরাক্রান্ত মালিকরা এতদিন প্রতিবাদ করেননি, এই উক্তিই প্রথম ও একমাত্র প্রতিবাদ। এই জন্য ঐতিহাসিক যে, এ উক্তির কোনো সরকারী নজীর নেই। যে কথা বলেছিলেন একজন ভারতীয় রাণী তাঁর প্রাসাদের দরবার কক্ষে ইংরেজ রাজকর্মচারীর কাছে সেই উক্তির সেই প্রাসাদের গণ্ডি ছাড়িয়ে আরো অনেক জায়গায়, আরো অনেক মনে, আরো অনেক কাল অতিক্রম করে অমর হ'য়ে আছে। এই জন্য ঐতিহাসিক যে, সেইদিন সেই উক্তি ব্যক্তি, ব্যক্তিকে বলেনি; রাণীর মাধ্যমে যেন ক্ষুব্ধ ভারত প্রতিবাদ জানিয়েছিল ইংরেজকে—যে প্রতিবাদ তখনই জমে উঠেছে, যে প্রতিবাদ সময় গুণছে এবং যে প্রতিবাদ অতি শীঘ্র বিদীর্ণ হবে লক্ষ লক্ষ মানুষের সংগ্রামে।

এই কারণেই সে উক্তি ঐতিহাসিক। তাই আজও ভারতবাসীর ঘরে ঘরে অমর হয়ে আছে সেই কথা,—

"বড়ি বড়িয়া থী ওই রাণী
জিননে ঝাঁসী ন ছোড়েংগে বোলি—
জিননে সিপাইয়োঁকে লিয়ে লড়াই কিয়ে
ঔর অপনে খায়ে গোলি...
যবতক অজর ভারত কা পানি
তবতক অমর ঝাঁসী কি রাণী॥

ভারতবাসীর মনে সেই রাণী অমর, যিনি ঝাঁসী ছাড়ব না বলেছিলেন। যিনি সিপাহীদের জন্য লড়াই করেছিলেন ও নিজে গুলী খেয়েছিলেন। আজ একশত বছর পরে, পাঠক জানে, রাণীকে ঝাঁসী ছাড়তে হয়েছিল। অভিমানী উক্তির মর্যাদা রাখা তখন সম্ভব হয়নি। এও জানে যে, সেই উক্তি আজও ঝাঁসীর মনে গাঁথা হয়ে আছে। কত বছর, কত পল, কত মুহূর্ত, মুহূর্ত চলে গেছে; ঝাঁসীর মাঠে কতবার ফসল উঠেছে আর ফসল হয়ে গেছে; কতবার ঝাঁসীর আকাশে দাঁড়িয়ে জল দিয়ে গেছে চাষীকে; দুর্গের ভিতরে ভিতরে কত ধরেছে; ভারতের ভাগ্য কলকাতা দিল্লীতে এনে সিংহাসনে ভিনদেশীরাও চলে গেছে পেরিয়ে। ভারতে ইংরেজ শাসনও গল্প কথা হয়ে যাবে, কিন্তু স্মরণীয় উক্তির মতো সেইদিনের ভারতীয়া রমণীর তরুণ কণ্ঠের প্রতিবাদের আশ্চর্য অনুরণন ভারতবাসীর মনে মনে বারে বার ঝঙ্কার দেবেঃ—

মেরী ঝাঁসী দুঙ্গী নহী"

আবার আশ্চর্য হবে ভারতীয় সেদিনকার ভারতের মানচিত্রখানা দেখলে। সুবিস্তৃত ব্রিটিশ ভারতের তুলনায় ছোট ঝাঁসী আর সমগ্র ব্রিটিশ তুলনায় বছরে কুড়ি লাখ টাকা খাজনা ঝাঁসীরাজ কতো দুর্বল। তখন মনে হবে, এই উক্তি যিনি করেছিলেন, মানুষ কতো শ্রদ্ধেয় কতো বড় ব্যক্তিত্ব। তখন মনে হবে, এই উক্তি অমর করে রাখবার প্রয়োজন আছে। বিপদের সম্ভাবনা তুচ্ছ ক'রে যে মানুষ বাঁক সুতীক্ষ্ণ তরবারির মতো ঝলসে উঠতে পারে প্রতিবাদে, সে মানুষের প্রয়োজন যতদিন থাকবে ততদিন এই উক্তিও স্মরণীয়। ক্রমশ

ডাক্তারের ডায়েরী

—ডাঃ আনন্দকিশোর মুন্সী

॥ ১২ ॥

হাসপাতালে ভর্তি হওয়া আজকাল কত কঠিন এবং কতদিন যে সেজন্য ঘোরাঘুরি করতে হয় ভুক্তভোগী মাত্রই তা জানেন। প্রসূতি হাসপাতালে পর্যন্ত দেখি নোটিশ টাঙিয়ে দেয়—বিছানা খালি নাই, ভর্তি বন্ধ।

কিছুদিন আগে পূর্ব পাকিস্থান থেকে হাসপাতালে ভর্তি হবার জন্য আমার কাছে এক মুসলমান ভদ্রলোক এলেন। আমার ছোট ভাই-এর পরিচিত রুগী। চিঠি নিয়ে এসেছেন, ভর্তি করে দিতেই হবে।

দেখলাম মৌলভী সাহেবের বয়েস হয়েছে। পঞ্চাশের ওপর মনে হল। চাপ দাড়ি পাক ধরেছে। মাথায় টাক পড়েছে। লম্বা চওড়া দেহ, এখনও বেশ শক্ত সবল আছে।

জিজ্ঞাসা করলাম—আপনার কি অসুখ?

মৌলভী সাহেব হেসে বললেন—কি অসুখ তা জানতেই তো কলকাতায় আসা। ওখানকার ডাক্তাররা যা বলে তা আমার বিশ্বাস হয় না। কিচ্ছু বোঝে না, শুধু আন্দাজে ঢিল মারে।

জিজ্ঞাসা করলাম—আপনার কষ্টটা কি?

মৌলভী সাহেব বললেন—পেটে ব্যথা। কিছু খেতে পারি না।

জিজ্ঞাসা করলাম—কতদিন থেকে হয়েছে?

মৌলভী সাহেব বললেন—তা ধরুন গিয়ে এক বছর। প্রথম প্রথম মাঝে মাঝে ব্যথা হত। আবার কমে যেত। আপনার ভাই চিকিৎসা করতেন। কয়েকদিন পর বললেন এটা গ্যাস্ট্রিক আলসার। দুধ আর গলা ভাত খেতে হবে। কিছুদিন তাই খেয়ে দেখলাম। অনেকদিন ভালও ছিলাম। তারপর ভাবলাম ঝাল মাংসই যদি না খেতে পাই তাহলে বেঁচে কি সুখ? তাই আবার গোস্ত খেতে শুরু করলাম।

বললাম মাংস খেতে তো বারণ নেই, ঝাল লঙ্কা না খেলেই হল।

মৌলভী সাহেব বললেন—ঝাল ছাড়া কি খাবার কোর্মা হয়? সায়েবদের মত আধা সেদ্ধ আর আধ-পোড়া মাংস আমরা খাই না, প্রবৃত্তি হয় না। মাংসই যদি খাব ঠিক মত মশলা দিয়ে তা রান্না হওয়া চাই।

জিজ্ঞাসা করলাম—এই ঝাল মাংস খেয়েই আবার ব্যথা বাড়ল?

মৌলভী সাহেব বললেন—আপনার ভাই বলেছিলেন ঝাল খেলেই আবার ব্যথা হবে কিন্তু ওঁকে না জানিয়ে তিন মাস আমি ঝাল খেয়েছি কিছুই হয় নি।

বললাম—তারপর ব্যথা আবার হল কবে?

মৌলভী সাহেব বললেন—একদিন দুপুরে খেতে বসেছি দু তিন গ্রাস খাবার পরই মনে হল ওটা পেটে ঠিক যাচ্ছে না, কোথায় যেন আটকে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ ব্যথা। পেটে বুকে পিঠে পাঁজরে। মনে হল কে যেন বুকটা ভীষণ জোরে চেপে ধরেছে। দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তারপর ওটা বমি হয়ে উঠে গেল। কিছুক্ষণ পর ব্যথাটাও আস্তে আস্তে কমে গেল। ভয় পেয়ে আপনার ভাইকে ডেকে পাঠালাম। তিনি এসে অষুধ দিলেন আবার ওই দুধ আর গলা ভাত খেতে বললেন।

বললাম—ওতে ব্যথা কমল?

মৌলভী সাহেব বললেন—এবার কিন্তু আর কমল না। অষুধ খেলেও যা না খেলেও তাই। তখন আপনার ভাই বললনে এক্‌স্‌রে করাতে হবে। এক্‌স্‌রে করে আলসার ঠিক পাওয়া গেল না। তখন সন্দেহ করলেন ক্যানসার। বললেন—এক্ষুনি কলকাতা যান।

বললাম—কতদিন আগে?

মৌলভী সাহেব বললেন—তা মাস তিনেক হবে। জানেন তো কলকাতা আসা আজকাল কত হাঙ্গামা। ভিসাই পাওয়া যায় না। তারপর টাকা পয়সা নিয়ে আসা মুশকিল। তাই ঢাকা গেলাম।

বললাম—ওরা কি বলল?

মৌলভী সাহেব বললেন—ওখানকার মেডিক্যাল কলেজের বড় ডাক্তারেরা দেখে বলল এটা পাকস্থলীর ক্যানসার। এক্‌স্‌রে আলো দিতে হবে। দু মাসে একুশ-টা আলো দেওয়া হল। ব্যথাও অনেক কমে গেল। বলল ছ মাস পরে আবার যেতে। বাড়ি ফিরে আসতেই আবার ব্যথা, কিছু খেতে পারি না। যা খাই তাই উঠে আসে। আপনার ভাই এক্‌স্‌রে ছবি আর হাসপাতালের চিকিৎসার সব রিপোর্ট দেখে বললেন এটা ক্যানসারই বটে। এখনও বোধ হয় অপারেসন করা যায়। শীগ্‌গীর কলকাতা যান। এতদিনে ভিসাও পেলাম তাই তাড়াতাড়ি চলে এসেছি।

বললাম—দেখি সেই এক্‌স্‌রে ছবি আর রিপোর্ট।

মৌলভী সাহেব বললেন—ভুলে সে সব ফেলে এসেছি। প্রথম যে ছবি তোলা হয়েছিল সেটাই শুধু আছে।

দেখলাম ছবিটা বিশেষ ভাল হয় নি। কি হয়েছে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। রিপোর্টে অবশ্য সন্দেহ করা হয়েছে এটা বোধ হয় পাকস্থলীর ক্যানসার।

বললাম—এটা থেকে তো ভাল বোঝা যাচ্ছে না। আবার ছবি তুলতে হবে।

মৌলভী সাহেব বললেন—আপনার কি মনে হয় এটা ক্যানসার?

বুঝলাম ক্যানসার নয় বললেই মৌলভী সাহেব খুশী হন। কিন্তু তাই বা বলি কি করে?

বললাম—ঢাকাতে যখন ওরা আবার ছবি তুলে ডিপ এক্‌স্‌রে দিয়েছে তখন ঐটাই তো আগে ভাবতে হয়।

মৌলভী সাহেব বললেন—ওদেরও ভুল হতে পারে।

বললাম—তাই আবার ছবি তুলতে হবে। পাকস্থলীর রস ক্যানসারের জন্য পরীক্ষা করতে হবে। তবে ঠিক বোঝা যাবে এটা কি।

মৌলভী সাহেব যেন একটু ক্ষুণ্ণ হলেন, বললেন—আপনিও যখন ক্যানসারই ভাবছেন তখন দিন ক্যানসার হাসপাতালেই ভর্তি করে। পরীক্ষা টরীক্ষা যা দরকার সব ওখানেই হোক। শুনেছি এসিয়ার মধ্যে এইটেই নাকি সব চেয়ে বড় হাসপাতাল। মরি যদি এখানেই মরা ভাল। বুঝব বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু হয় নি।

বললাম—হাসপাতালে ভর্তি হতে চাইলেই কি ভর্তি হওয়া যায়? ওরা আগে দেখবে পরীক্ষা করবে। যদি বোঝে ভর্তি করলে রুগীর বাঁচবার তাহলেই শুধু ভর্তি করা সম্ভব হবে।

মৌলভী সাহেব বললেন—ওখানকার বড় কর্তাকে ফি দিয়ে যদি দেখাই?

বললাম—তাহলেও ভর্তি হওয়া যায় না, যদি ভর্তি করে রুগীর কোন উপকার হবার আশা না থাকে। তাই পরীক্ষা আগে করাতেই হবে। অন্তত কয়েকদি
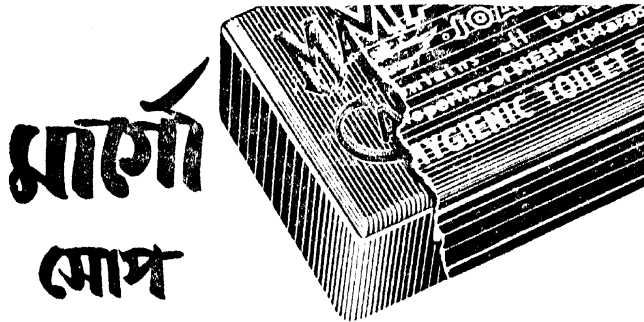
ময় লাগবে। সে ক'দিন হাসপাতালে তোয়াত করতেই হবে।

মৌলভী সাহেব খুশী হলেন না। ললেন—আপনার কাছে এলেই আপনি র্তি করে দেবেন আপনার ভাই বলেছিলেন। তাই এখানে আসা। এখন পনি বলছেন ঘুরতে হবে। তাহলে সে কি লাভ হল?

বললাম—ক্যানসার হাসপাতালে আমার চনা অনেক ডাক্তার আছেন। আজকে খোঁজ-রে নিই, কাল সকালে আসবেন, ক করলে ভাল হয় সব বলে দেব।

মৌলভী সাহেব উঠে যেতে যেতে লেন—হোটেলে উঠেছি। অনেক খরচ। র ওপর বিশ্রি খাওয়া। যত তাড়াতাড়ি য় ভর্তি করে দিন দয়া করে। আপনি কটু চেষ্টা করলেই পারবেন।

ক্যানসার হাসপাতালে গিয়ে এক ন্ধুকে কেসটা সব বললাম। কাউকে ফি দয়ে আগে দেখালে যদি সুবিধে হয় তেও রুগী রাজী সে কথাও জানালাম।

বন্ধুটি বললেন—কাউকেই ফি দিয়ে দেখাতে হবে না। যদি অপারেসন করা চলে এবং রুগী রাজী থাকে তাহলে নিশ্চয়ই ভর্তি করা হবে। তবে ফ্রি বেড পেতে কিছু দেরী হতে পারে। পেয়িং বেড হলে একটুও দেরী হবে না।

বললাম—পেয়িং বেডই করে দিন তাহলে।

বন্ধুটি বললেন—কালই ৮টার মধ্যে একটা চিঠি দিয়ে রুগীকে পাঠিয়ে দেবেন। যত শীগ্‌গীর সম্ভব ভর্তি করে দেব।

বললাম—বেশ তাই হবে।

বন্ধুটি বললেন—এই রুগী ভর্তি করা নিয়ে কত কাণ্ডই যে এখানে হয়। আউট-ডোরের টিকেটে রুগীর নাম ঠিকানা বয়েস ইত্যাদি লিখে মাসিক কত আয় তাও একটা কলমে লিখতে হয়। কেউ লেখে ৫০০, তবু ফ্রী বেড চায়। না দিলে চটে যায়। অনেকে আবার ঐ কলমটায় কিছুই লেখে না। আউটডোর অফিসার সেটা দেখে যদি জিজ্ঞাসা করে—আপনার রোজগার কত? তাতেই আবার অনেকে ক্ষেপে ওঠে। বলে, আমার ঘরের খবরে আপনার কি কাজ?

একবার হাসপাতালের ডিরেক্‌টরএর কাছে ২০।২৫ জন লোকের সই করা একখানা চিঠি এল। দেখা গেল লেখা আছে—

মহাশয়,

আপনি দেশের লোকের নিকট হইতে চাঁদা তুলিয়া ক্যানসার হাসপাতাল নামে লোকের যথাসর্বস্ব লুটিয়া লইবার একটি অতি চমৎকার ফাঁদ পাতিয়াছেন। কাহার কাছে কত টাকা আছে, কে মাসিক কত টাকা রোজগার করে তাহা লিখিয়া না দিলে কাহাকেও ভর্তি করেন না। ইহা জানিবার জন্য মাহিনা দিয়া একটি লোকও নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। ভাবিয়াছেন ইহার অর্থ কেহ বুঝিবে না। কিন্তু আমরা আপনার চাতুরী ধরিয়া ফেলিয়াছি। অতএব সাবধান। কাহার ঘরে কি আছে তাহা জানিবার চেষ্টা করিবেন না। এখনও

যদি সাবধান না হন তাহা হইলে এই জুয়াচুরী বন্ধ করিবার জন্য আমরা দেশ-ব্যাপী আন্দোলন শুরু করিব। জয় হিন্দ্।

পরদিন সকালে বন্ধুটির নামে একটা চিঠি দিয়ে মৌলভী সাহেবকে হাসপাতালে পাঠালাম—বললাম আমি বলে রেখেছি, পরীক্ষা করে যদি বোঝা যায় অপারেসন করলে ভাল হবে তাহলে ওরা নিশ্চয়ই ভর্তি করে নেবে। পেয়িং বেড হলে এক্ষুনি হয়ে যাবে। ফ্রী বেড পেতে দেরী হবে।

মৌলভী সাহেব বললেন—পেয়িং বেডে কত লাগবে?

বললাম—দিনে বোধ হয় তিন টাকা কি চার টাকা।

মৌলভী সাহেব বললেন—হোটেলেই রোজ ছ টাকা করে নিচ্ছে, তার ওপর খাওয়া অতি জঘন্য। এখানে থাকলে তবু যখন দরকার ডাক্তার নার্স সব পাব। ওখানে ব্যথায় মরে গেলেও দেখবার কেউ নেই। আপনি পেয়িং বেডেই ভর্তি করে দিন।

বললাম—অপারেসন করা ঠিক হলে রাজী হবেন তো?

মৌলভী সাহেব বললেন—আপনার ভাইও বলেছিলেন অপারেসন করলেই সেরে যাবে। সেই জনাই তো আসা। ঘাটা কেটে বাদ দিলে যদি সেরে যায় তাহলে অপারেশন করাতে কেন রাজী হব না?

বললাম— অপারেসন করাতে অনেকেই তো ভয় পায়।

মৌলভী সাহেব বললেন—ক্যানসার হলে এমনিতেই তো মরব। না হয় অপারেসন করিয়েই মরলাম। হয় দুদিন আগে নয় দুদিন পরে। আমার অত ভয় ডর নেই।

বললাম—তাহলে এই চিঠি নিয়ে যান। দেখবেন কোন অসুবিধে হবে না।

চিঠি নিয়ে মৌলবী সাহেব চলে গেলেন। ঘণ্টাখানেক পরে হাসপাতালে যাবার জন্য বেরুচ্ছি মৌলভী সাহেব ফিরে এলেন। বিরক্ত অপ্রসন্ন মুখ। বললেন—কৈ আজ তো কিছু হল না। শুধু নাম লিখে নিল। বলল কাল সকালে যেতে। ছবি তুলবে।

বললাম—ঠিক হয়েছে। কাল তার যাবেন।

পরদিন বিকেলে মৌলভী সাহে এসে বললেন—ছবি তোলা হয়েছে। এবার পাকস্থলীর রস পরীক্ষা করে কিছু না খেয়ে সকালে আসতে বলেছে আপনি আর একবার যাবেন দয়া করে একটু খোঁজ নিয়ে দেখবেন কি পাওয়া গেল।

বললাম—পরীক্ষা সব আগে হয়ে যাক্ তারপর খোঁজ নেব।

পরদিন মৌলভী সাহেব এসে বললেন— পাকস্থলীর রস বার করবার জন্য আজ টিউব ঢুকিয়েছিল মুখ দিয়ে রস তো কিছু বেরুল না শুধু রক্ত এল। এদিকে ব্যথায় আমার প্রাণ যায়। বলেছে কাল আবার যেতে। কাল আবার টিউব ঢোকালে ঠিক মরে যাব। আপনি আর একবার চলুন একটু বুঝিয়ে বলবেন আমি বললে ওরা শোনেই না।

দেখলাম মৌলভী সাহেব ভয় পেয়েছেন। বললাম—টিউব ঢোকাতে যাতে ব্যথা না লাগে তার জন্য অষুধ ওরা দেবে। কাল যাবেন ঠিক। আমি আজ গিয়ে বলে আসব এখন।

মৌলভী সাহেব বললেন—টিউব যখন দেয় তখন আপনি একবার যেতে পারেন না?

বললাম—এটা তো খুব সামান্য ব্যাপার। এজন্য আর আমি কি করব। অপারেসন যদি হয় তখন থাকব নিশ্চয়ই।

মৌলভী সাহেব বললেন—তাহলে ব্যথা কমবার একটা অষুধ কিছু দিন। টিউব ঢুকিয়ে ব্যথা আরও বেড়ে গেল।

একটা অষুধ লিখে দিলাম। বললাম কাল ঠিক যাবেন। আমি আজ গিয়ে খোঁজ নিচ্ছি।

হাসপাতালে গিয়ে শুনলাম পাকস্থলীর কোন দোষ এক্স-রেতে পাওয়া যায় নি কিন্তু খাদ্য নালী যেখানে পাকস্থলীর সংগে মেশে সেইখানটাতেই ক্যানসার হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। তাই টিউব ঢোকাতে কষ্ট হয়েছে, রক্ত বেরিয়েছে এখনও অপারেসন করলে রুগী বেঁচে যাবে। কাল আবার টিউব ঢুকিয়ে পাকস্থলীর রস পরীক্ষা হবে, তারপর

রিপোর্ট বোর্ড-মিটিং-এ পেশ করা। বিশেষজ্ঞরা সব বসে আলোচনা ঠিক করবেন কি করলে রুগীর চেয়ে বেশী উপকার হয়। যা ঠিক সেই মত ব্যবস্থা হবে। রুগীকে করা হবে কিনা ঠিক করা হবে।

খাদ্যনালীর ক্যানসার আজকাল গে অপারেসন হয়। যে জায়গাটায় আটকায় সেখানটা কেটে বাদ দিয়ে টি আবার পাকস্থলীর মুখে সেলাই জুড়ে দেওয়া হয়। রুগীর কষ্ট হয়। আগে এ রোগ হলে কিছুই যেত না। এ অপারেসন তখন নে হত না। ডিপ্ এক্স-রে দিয়েও উপকার পাওয়া যেত না।

আঠারো কুড়ি বছর আগের কথা। র সেই চারতলা বাড়ির তিনতলার খানা ঘরে আসাম থেকে এক ভদ্রলোক দিন এলেন। ভদ্রলোক প্রৌঢ়। গভর্ন-টের বড় চাকুরে। বছরখানেকের মধ্যেই সন নেবেন। ছেলেপিলে নেই। মাস-কের ছুটি নিয়ে স্ত্রীকে সঙ্গে করে র চিকিৎসার জন্য এসেছেন।

বললেন—যৌবনে বেশ অত্যাচার ছি তাই ছেলেপিলে আর কিছু হল তার জন্য দুঃখ নেই। কিন্তু এই গ বয়সে খেতে পারি না সেইটেই কষ্ট।

জিজ্ঞাসা করলাম—কেন? খেলে হয়?

ভদ্রলোক বললেন—কিছু খেলেই হঠাৎ যেন সেটা আটকে যায়। তখন দম বন্ধ হয়ে আসে। খানিকক্ষণ পরে হয় সেটা নেবে যায় নয় উঠে আসে। যতক্ষণ তা না হয় ততক্ষণ যে কী যন্ত্রণা তা আপনাকে বলে বোঝাতে পারব না।

ভদ্রলোক খেতে পারেন না বললেন, কিন্তু চেহারা দেখে তা মনে হল না। শ্যামবর্ণ লম্বা চেহারা। অনশনের চিহ্ন মাত্র নেই। শরীরেও বেশ শক্তি রাখেন দেখা গেল। নিজের বাক্স বিছানা যেভাবে ঘরে তুললেন দুর্বল বলে বোধ হল না।

জিজ্ঞাসা করলাম কতদিন এরকম হচ্ছে?

ভদ্রলোক বললেন—মাস তিনেক। যৌবনে রক্তে দোষ ছিল। অনেক চিকিৎসা করিয়েছি। ইন্‌জেকশন নিয়েছি। এখন সে সব কিছু নেই। কিন্তু এটা কি যে হল ডাক্তাররা কিছু বুঝচে না। তাই এখানে এলুম। আপনাদের কলেজের সবচেয়ে বড় ফিজিসিয়ানকে দেখিয়ে একটা ব্যবস্থা করে দিন।

বড় ফিজিসিয়ানকে দেখান হল। তিনি সব শুনে একটা অষুধও লিখে দিলেন। বললেন, এক সপ্তাহ খেয়ে খবর দিতে। কিন্তু কি রোগ কিছু বললেন না।

এক সপ্তাহ পর আবার যখন তাঁর কাছে যাওয়া হল তিনি বললেন এই অষুধই চলবে। ভদ্রলোককে আর দেখলেনও না, ওঁর কোন কথাও শুনলেন না। ফি দিতে গেলে ফিরিয়ে দিলেন।

দেখে এঁর ওপর ভদ্রলোকের ভক্তি চটে গেল। বললেন এঁকে আর দেখাব না। অন্য কাউকে দেখাবার ব্যবস্থা করুন। তখন আমাদের কলেজের দ্বিতীয় ফিজিসিয়ানের কাছে গেলাম।

তিনি অনেকক্ষণ এঁকে পরীক্ষা করলেন। এঁর সব কথা ধৈর্য ধরে শুনলেন। পরে একটা অষুধ দিয়ে দিন তিনেক পর খবর দিতে বললেন। দেখলাম ওটা হিস্টিরিয়ার অষুধ। মেয়েদের সাধারণত দেওয়া হয়। ভদ্রলোকের চেহারা দেখে তিনি কিছু যে খেতে পারেন না, বিশ্বাস করাই শক্ত। তার ওপর বলেন কখনও হয়ত শশা খেলেও সেটা আটকায়

না। আবার এক ঢোঁক জল খেলেও তা বুকে আটকে যায়।

দিন তিনেক অষুধ খাইয়ে বিশেষ কোন ফল পাওয়া গেল না। আরও তিন দিন ওটা চালানো হল। শেষে একদিন মাস্টারমশাই বললেন—কেসটা কি ঠিক ধরা যাচ্ছে না। হাসপাতালে ভর্তি করে দাও। ইনভেস্টিগেশন করা যাক্।

বললাম—আপনার আন্ডারেই তাহলে এঁকে ভর্তি করে দিই?

মাস্টারমশাই বললেন—তুমি ফার্স্ট ফিজিসিয়ানের বেডেই ভর্তি কর। আমি ওঁর সঙ্গে কথা বলে যা দরকার সব ব্যবস্থা করে দেব।
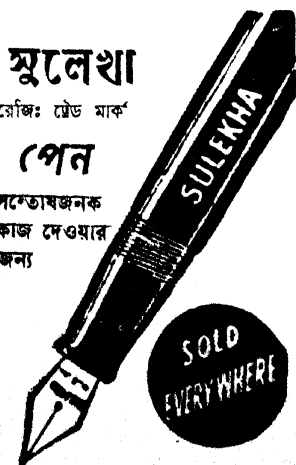
ভদ্রলোক ফার্স্ট ফিজিশিয়ানের ওপর চটে আছেন। মহা মুশকিলে পড়লাম। অনেকরকম ভজং ভাজং দিয়ে ভদ্রলোককে অবশেষে রাজী করানো গেল। বললাম দ্বিতীয় ফিজিসিয়ানের নিজের কোন বেড নেই। ইনিই দেখবেন নামটা শুধু থাকবে প্রথম ফিজিসিয়ানের। এই বুঝিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করে দিলাম। সাত-দিনের মধ্যেই সব পরীক্ষা হয়ে গেল। কোথাও কোন দোষ পাওয়া গেল না। তখন ঠিক্ হল বেরিয়াম মিল খাইয়ে এক্স-রে ছবি তোলা হবে। দেখা হবে খাদ্যটা কিভাবে কোথা দিয়ে যায়।

বেরিয়াম মিল খাইয়ে দেখা গেল ঢোঁক গিললেই খাদ্যটা পাকস্থলীতে যায় না। খাদ্যনালীর শেষে এবং পাকস্থলীর মুখে ওটা আটকে যায়। খাদ্যনালীটা ঐখানে ফুলে ওঠে। রুগী বোঝে খাবার বুকে আটকে গেল। ব্যথায় ছটফট করে। একটু পরেই খাবারটা পাকস্থলীতে নেবে যায়। তখন বোঝাই যায় না খাদ্য-নালীটা কখনও ওরকম ফুলে উঠতে পারে। খানকয়েক ছবি তুলেই বোঝা গেল রোগটা কি। পাকস্থলীর কোন দোষ নেই। হজমেরও তাই কোন ব্যাঘাত নেই। এটা খাদ্যনালীর ক্যানসার।

ছবিটা মাস্টারমশাইরা সব দেখলেন, হাউস স্টাফরা দেখল, ছেলেদের দেখানো হল রুগী নিজেও দেখলেন।

কিন্তু চিকিৎসা কি? আমাদের শাস্ত্রমত তখন এর কোন চিকিৎসা নেই। বিলেতে কয়েকটা অপারেসন হয়েছে, অনেকের তাতেই মৃত্যু হয়েছে।

তখনকার দিনে ছোট কিন্তু এখনকার একজন প্রবীন বড় সার্জন অপারেসন করতে রাজী ছিলেন, কিন্তু এ অপারেসন এখানে হয় নি শুনে ভদ্রলোক রাজী হলেন না। বললেন, আপনাদের যখন এর কোন চিকিৎসা নেই তখন আপনাদের চিকিৎসা আমি আর করাব না।

বললাম—চিকিৎসা যদিও নেই কিন্তু কষ্ট কমাবার অষুধ আমাদের আছে। যাতে আপনি একটু রিলিফ পান তার ব্যবস্থা আমরা সব সময়েই করতে পারব।

ভদ্রলোক বললেন—রিলিফ আমি চাই না। অন্য চিকিৎসায় যদি সারে সেই চেষ্টাই এখন করব।

হাসপাতাল থেকে এসে ভদ্রলো... আমার তেতলার ঘরে আবার উঠলে... বললেন এখানকার সবচেয়ে যিনি ... হোমিওপ্যাথ তাঁকে দেখাব। দেখি তি... কি বলেন।

৬৪৲ ফি দিয়ে বড় একজন হোমি... প্যাথ দেখান হল। প্রথম দু'চার ... ভদ্রলোক বেশ ভরসা পেয়েছেন মনে হ... বললেন—এই চিকিৎসায় বেশ কি... উপকার পাচ্ছি। আগে যতবার আটকা... এখন তার চেয়ে বারে অনেক ... আটকায়।

সপ্তাহে একবার করে হোমিওপ... আসেন ব্যবস্থা দিয়ে যান। ২।৩ সপ্ত... পরেই ভদ্রলোক ক্রমশ বিরক্ত হয়ে উঠলে... বললেন কিছু তো ফল হচ্ছে ... ক্রমশই যেন দুর্বল হয়ে পড়ছি। ... সারাদিন দশবার খাবার বুকে আ... গেছে। আজ পর্যন্ত কোন দিন তা হয়...

তবুও আরও ৩।৪ সপ্তাহ হোমি... প্যাথী চলল। ভদ্রলোকের অনেক ... খরচ হল কিন্তু কোন উপকার হল ... মাস দুই পরে তিনি ঠিক কর... কবিরাজী করে দেখবেন। হোমিওপ... আর করাবেন না।

শহরে তখন অনেক নাম... কবিরাজ। যাঁর নাম সবচেয়ে বেশী ... যাঁর ফি সবচেয়ে বেশী তাঁকে ... দেখানো হল। ইনিও ৬৪৲ টাকা ... ফি নিলেন; সপ্তাহে দু'বার করে আ... লাগলেন। নানা রকম বড়ি আর ... খেতে দিলেন। যেখানে জল খে... ভদ্রলোকের কষ্ট হয় সেখানে এই রক... অষুধ ও বাটি বাটি পাঁচন খাও... ভদ্রলোক দু'দিনেই কাহিল হয়ে পড়...

কবিরাজ মশাই বললেন—প্র... একটু কষ্ট হবে পরে ঠিক হয়ে ...

ভদ্রলোকের কষ্ট ক্রমশই ... লাগল। একদিন রাত্রে কবিরাজী ... খেতে গিয়ে বুকে আটকে গেল। ... হয় না, নামেও না। ভদ্রলোক ... গেলেন। যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগ...

খবর পেয়ে নীচে গিয়ে দেখি ... লোক হাঁসফাঁস করছেন। নাড়ী ... বললাম এক্ষুনি একটা ইনজেকশন দে... দরকার। ভদ্রলোক হাত নেড়ে ...

ন। মিনিট দশেক পরে বমি হয়ে
তখন বললেন—আমার যতক্ষণ
থাকবে আপনাদের কোন অষুধ
া। ইন্‌জেক্‌শনও নেব না। রিলিফ
চাই না।

লেলাম—আপনি যে রকম কষ্ট
ন তাতে চিকিৎসকের কর্তব্যটাই
আপনাকে একটু আরাম দেওয়া।
দূর করা। কিন্তু এই চিকিৎসাতে
আপনি তা পাচ্ছেন?

ভদ্রলোক বললেন—আমি জানি এ
র কোন অষুধ নেই। এলোপ্যাথী,
াজী, হেকিমী, বায়োকেমিক কোন
তেই এ রোগ সারে না। তবু
কেই আমি সুযোগ দেব। দেখুক
চেষ্টা করে। জানুক এ রোগ
না।

ভদ্রলোকের এই অদ্ভুত জেদ দেখে
ক হয়ে গেলাম। এত কষ্ট তবু
ইন্‌জেক্‌শন নেবেন না।

মাসখানেক কবিরাজী করবার পর
কেমিক শুরু হল, তার পর
মী। কিছুতেই কোন উপকার হল
মাস ছয়েক ভুগে ভদ্রলোক একদিন
গেলেন।

শেষদিন বললেন—দেখলেন ডাক্তার,
রোগের কোন অষুধ নেই। আপনারা
ফ দিলেও মরতাম, রিলিফ না
ও দেখুন কেমন মারা যাচ্ছি।

এখন বিজ্ঞানের আরও উন্নতি
ছে। রুগীকে অজ্ঞান করে রাখবার
নতুন ব্যবস্থা হয়েছে। বড় বড়
রেসন করা যাচ্ছে। শ্বাস-নালীর
সারও অপারেসন করা সম্ভব
ছে।

পরদিন মৌলভীসাহেব এসে বললেন
জ পাকস্থলীর রস নিয়েছে। পরশু
র যেতে হবে। আপনি গিয়েছিলেন?
যা শুনে এসেছি সব বললাম। শুনে
ভীসাহেব বললেন—পাকস্থলীর
হয় নি? তাহলে গলাভাত খাবার
র কি? দেখুন মিছিমিছি এতদিন
ই গলাভাত আর দুধ খাইয়েছে।

বললাম—এইবারে অপারেশন করিয়ে
যা ইচ্ছে সব খেতে পাবেন।

মৌলভীসাহেব বললেন—কবে ভর্তি
[illegible]

বললাম—৩।৪ দিনের মধ্যেই হবে মনে হয়।

মৌলবীসাহেব শুনে খুব খুশী হলেন। বললেন—যাক এতদিনে নিশ্চিন্ত হলাম। ভর্তি হলেই অপারেশন করবে তো?

বললাম—অপারেশনের জন্য যে ক'দিন রুগীকে তৈরী করতে হয় সে ক'দিন রেখেই অপারেশন হবে। ভর্তি তো আগে হয়ে যান, তারপর ওরা যা বলে তাই হবে।

৩।৪ দিনের মধ্যেই মৌলভী সাহেব হাসপাতালে ভর্তি হয়ে গেলেন। দেখে এলাম কার কোথায় ক্যানসার, কি চিকিৎসা হচ্ছে, রুগীদের কাছ থেকে সব খবর নিচ্ছেন। এতদিনের চেষ্টায় যে ভর্তি হতে পেরেছেন সেই আনন্দ সেই গর্ব চোখে মুখে ফুটে উঠেছে।

পরদিন যেতেই বললেন—আমার সব পরীক্ষা শুরু হয়েছে। কিন্তু এরকম অপারেশনের রুগী আর নেই। তাই কি হবে কিছু বুঝছি না।

বললাম—সব একরকম রুগী পাবেন কোথা?

মৌলভীসাহেব কাল যতটা উৎফুল্ল ছিলেন আজ দেখলাম তা যেন মিলিয়ে গেছে। ক্যানসারের এত কঠিন কঠিন পরিণতি দেখে ঘাবড়ে গেছেন। অনেক ভরসা দিয়ে চলে এলাম।

পরদিন গিয়ে দেখি মৌলবীসাহেবের মুখ শুকনো। চোখে আতঙ্কের ছায়া। জিজ্ঞাসা করলাম—কি ব্যাপার?

মৌলভীসাহেব বললেন—আমাকে ডিপ্ এক্স-রের আলো দেবারই ব্যবস্থা করে দিন। অপারেশন থাক।

বিস্ময়ে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—সে কি? ডিপ্ এক্স-রেতে তো এ রোগ সারে না। অপারেশনই যে এর একমাত্র চিকিৎসা।

মৌলভীসাহেব বললেন—অপারেশন করলে অনেকেরই আর নাকি জ্ঞান ফেরে না। এই অপারেশন করে কেউ নাকি ভাল হয়ে বাড়ি যায় নি শুনলাম। অপারেশন থাক। আপনি ঐ আলো দেবারই ব্যবস্থা করে দিন।

অনেক করে বুঝিয়ে সুঝিয়ে এলাম। বললাম—আজকাল অপারেশনের কোন ভয় নেই রাড দেওয়া হবে। ভাল হয়েই বাড়ি যেতে পারবেন। যা খুশী তাই খেতে পারবেন।

খাবার কথা শুনে মৌলভীসাহেব যেন একটু আশ্বাস পেলেন, একটু উৎফুল্ল হলেন। বললেন—সত্যি কোন ভয় নেই? আরও অনেক ভরসা দিয়ে বললাম—না সত্যি ভয় নেই। অপারেশন হলে দেখবেন খেতে আর কখনও বাধা হবে না। মৌলভীসাহেব বললেন—বেশ তাহলে হোক অপারেশন

পরদিন গিয়ে দেখি মৌলভীসাহেবের বিছানা খালি। পাশের রুগীরা বলল, আজ সকালে রিস্ক সই করে মৌলভী-সাহেব বাড়ি চলে গেছেন।

ধীরাজ ভট্টাচার্য

॥ বারো ॥

আমার অবস্থা দেখে হেসে গোপা বললে—'দয়া করে ভিতরে আসুন। আমাদের রান্নাঘর থেকে ওখানটা পরিষ্কার দেখা যায়।'

লজ্জা পেয়ে ভিতরে এসে দরজাটা বন্ধ করতেই হাততালি দিয়ে হাসতে হাসতে ভাঁড়ারঘর থেকে বেরিয়ে এল রিনি। গোপাকে জড়িয়ে ধরে বললে—'কেমন, বলিনি গোপাদি, আজ ছোড়দাকে বোকা বানিয়ে দেবো?'

বাকশক্তি ফিরে এল। কপট রাগের ভান করে বললাম—'চলো উপরে, কাকাকে বলে আজ মজা দেখাচ্ছি তোমার।'

কিছুমাত্র না দমে আবার হাসতে লাগলো রিনি।

গোপা বললে—'ছোট ভাই বোনদের নিয়ে রিনির মা বাবা সকালে আপিসের এক বন্ধুর বাড়িতে নেমন্তন্নে গেছেন। ফিরতে সেই সন্ধ্যে। বাড়িতে আছে শুধু রিনি আর মোক্ষদা।'

রিনি বললে—'মোক্ষদা আবার কানে কম শোনে।'

তিন জনেই হেসে উঠলাম। রিনি বললে—'বারে, এইখানে দাঁড়িয়েই কথা-বার্তা কইবে নাকি? উপরে চল!'

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে বললাম—'তোকে একা রেখে কাকা কাকিমা গেল যে বড়?'

রিনি বললে—'এমনিই কি গিয়েছে আমার যে জ্বর; তাছাড়া সামনে এক-জামিন, পড়াশুনোর ক্ষতি হবে যে!'

বললাম—'পড়াশুনো যা করছিলি তাতো নিজের চোখেই দেখলাম। আর জ্বর—'।

উপরে উঠে দেখি তক্তপোষের উপর একটা মাদুর পাতা, একটা মাথার বালিশ ও চাদরও রয়েছে এক পাশে। বুঝলাম সত্যিই রিনি অসুস্থ। গোপা তাড়াতাড়ি ওদের বাড়ির দিককার জানালাটা বন্ধ করে দিলে। তারপর মাদুরটার একপাশে বসে বললে—'বসুন?'

সকালে আজ কার মুখ দেখে উঠে-ছিলাম জানিনে। দূর থেকে শুধু দেখা নয় একেবারে পাশে বসে কথা কওয়া। দুরু দুরু বক্ষে এক পাশে অপরাধীর মত বসে পড়লাম। এরই মধ্যে রিনি চাদরটা গায়ে জড়িয়ে বালিশটা মাথায় দিয়ে শুয়ে এক দৃষ্টে আমাদের দিকে চেয়ে হাসছে।

গোপা বললে—'আপনি আমায় এ বাড়িতে দেখে খুব অবাক হয়ে গেছেন, না? মাসীমা মানে রিনির মা যাবার সময় আমায় ডেকে বললেন—'মেয়েটা একলা রইল, যদি পারো দুপুরে এসে ইংরাজী পড়াটা একটু দেখিয়ে দিও।'

বালিশ থেকে মাথা তুলে ... উঠল রিনি—'ওঃ সেই জন্যেই বুঝি ... সুড় সুড় করে চলে এসেছ ... জান ছোড়দা, তুমি আসবার আগে ... চার পাঁচ বার জিজ্ঞেস করেছে ... —তোমার ছোড়দা আসবেন ...'

'—আঃ রিনি!' বাধা দিয়ে ... লজ্জা পেয়ে আবার শুয়ে পড়ল রিনি।

মুখ নীচু করে মাদুরটার ... নখ দিয়ে খুঁটতে খুঁটতে গোপা বললে—'হ্যাঁ সত্যি, আপনি না এলে ... দুঃখ পেতাম। আমার সেদিনকার ... আপনি আমায় অভদ্র ইতর এই ... অনেক কিছুই ভেবে নিয়েছেন ... আর ভাবাটাই স্বাভাবিক। তাই ... আপনাকে খুলে জানিয়ে ক্ষমা চাইব ... রিনিকে আপনি আসবেন কিনা জিজ্ঞেস করেছিলাম।'

বললাম—'আপনি কেন এর ... নিজেকে অপরাধী মনে করে মিথ্যে ... পাচ্ছেন? রিনি আমাকে বলেছে ... ওভাবে হঠাৎ আপনি জানালা বন্ধ ... চলে গিয়েছিলেন।'

গোপা বললে—'রিনি আন্দাজ করেছে ... মাত্র, সব কথা না শুনলে আপনি বুঝতে পারবেন না।'

মনে মনে অবাক হয়ে ভাবছিলাম—আমার মত একজন সমাজের তুচ্ছ অব... নায়কের ভ্রান্ত ধারণা নিরসনের জন্য গোপার মত মেয়ের এত মাথা ব্যথা কেন ... সম্ভব অসম্ভব অনেক রকম যুক্তি দিয়েও কোন কূল কিনারা পেলাম না, হাল ছেড়ে দিয়ে ভাবলাম, —দুর্জ্ঞেয় নারী ... দেবা ন জানান্তি, আমিতো কোন্ ...

গোপা বলে চলল—'আমাকে ... ভাবছেন কলেজেপড়া মেয়ে, গায়ে ... সিনেমার নায়কের সংগে আলাপ ... নিশ্চয়ই বাড়ির অভিভাবকরা ... লিবারেল। ভুল, মস্ত ভুল ধারণা। আমার মা উগ্র সেকেলে পন্থী। তাঁর মতে ... হলে আরও দু তিনটে যুগ পিছু ... যেতে হয়। তিনি চান মেয়েরা বেশি ... পড়া শিখবে না। থেমে থমকে বড় ... সুর করে রামায়ণ মহাভারতটা পড়বে ...

য়ালা ও ধোপার হিসেবটা রাখবে। ব্ষের সান্নিধ্য একদম পরিহার করে বে। বয়েস দশ এগারো হলেই অভি-ভকরা বিয়ে দিয়ে গৌরীদানের অক্ষয় ণ্য সঞ্চয় করবে। সেই থেকে দেড় হাত মটা টেনে শ্বশুরবাড়ি আসবে। শ্বশুর-শাড়ী স্বামীর সেবা থেকে শুরু করে রান্না পর্যন্ত সংসারের যাবতীয় কাজ জের হাতে তুলে নেবে। ছেলে পিলে ল তাদের মানুষ করবে এবং বয়েস ঞ্চাশ পেরিয়ে গেলে প্রাণপণে চেষ্টা করে গে মরে ইহলোকে সতীত্বের ডঙ্কা জিয়ে পরলোকে স্বর্গের সিঁড়ির ধাপ-লো আঁচল দিয়ে মুছে পরিষ্কার করে মীর জন্যে অপেক্ষা করবে।

রিনি হেসে উঠল। ওর দিকে একবার খে নিয়ে শান্তকণ্ঠে আবার শুরু করল পা—'আমার বাবা কিন্তু ঠিক উল্টো। নি চান মেয়েরা শিক্ষায় দীক্ষায় ষের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে বে, সাংসারিক জ্ঞান-বুদ্ধি হবার পর জে দেখে পছন্দমত বিয়ে করবে। সারে অনটন বুঝলে স্বামীর সঙ্গে করির সন্ধানে বেরুতেও দ্বিধা করবে ।'

একটু থেমে আমার মুখের দিকে খ তুলে তাকালো গোপা। আমার জ্ঞাসু চোখের ভাষা বুঝতে পেরেই ধ হয় বলতে শুরু করলে—'আমি যথা-ভব আমার বাবার মতবাদকে অনুসরণ বার চেষ্টা করি, মায়ের ভয়ে সব সময় রে উঠিনে। তাইতো সেদিন মায়ের ড়া পেয়ে হঠাৎ জানালা বন্ধ করে সরে য়েছিলাম। কাজটা খুবই অশোভন ও ন্যায় হয়েছিল স্বীকার করছি, কিন্তু সারিক অশান্তি ও কেলেঙ্কারি বার ও ছাড়া আর পথও বা কি ছিল নে তো?'

এসরাজে পাকা দরদী হাতের দরবারী নাড়ার আলাপ শুনছিলাম এতক্ষণ। মে যেতেই মনটা খারাপ হয়ে গেল। ন মনে ভাবছিলাম শ্রোতার আসনে বসে নায়াসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতে রি শুধু কাছে বসে গোপা যদি কথা ল যায়, অপূর্ব সুরেলা কণ্ঠ গোপার! রে দেখি এরই মধ্যে কখন রিনি উঠে য়ে নির্জন বারান্দায় পাশাপাশি বসে আছি শুধু আমি আর গোপা। চুপ করে থাকি, কিছু বলবার চেষ্টা করি, কথা খুঁজে পাই না।

হঠাৎ রিনির কথায় চমক ভাঙে, নীচে থেকে উঠে সিঁড়ির শেষ ধাপে দাঁড়িয়ে টোল খাওয়া গালে দুষ্টুমি হাসি মাখিয়ে রিনি বললে—'তোমাদের দুজনকে পাশা-পাশি ওভাবে বসে থাকতে দেখে আমার কি মনে হচ্ছে জান?'

শঙ্কিত চোখে দুজনে তাকাই রিনির দিকে, না জানি দুষ্টু মেয়েটা কি কথা বলে ফেলে।

আমাদের অবস্থা দেখে খিল খিল করে হেসে রিনি বলে—'না বাবা, বোলবো না, জানি ছোড়দা খুশীই হবে কিন্তু গোপাদি যদি রাগ করে?'

বেশ রেগেই বললাম—'শুধু গোপাদি নয় আমিও ভীষণ রাগ করব রিনি। এরকম ফাজলামি যদি করো আর কখনও তোমাদের বাড়ি আসবো না।'

তুই থেকে 'তুমি' সম্বোধনে রিনির মুখের হাসি নিমেষে মিলিয়ে গেল। ও বেশ বুঝতে পারলে আমি সত্যিই রাগ করেছি।

মুখখানা কাচুমাচু করে কাছে এসে বললে—'আমায় মাপ করো ছোড়দা'

আদর করে কাছে টেনে নিয়ে গোপা বললে—'ওরে দুষ্টু মেয়ে, মনে হওয়া সব কথাগুলো যদি সবাই ভাষায় রূপ দিয়ে প্রকাশ্যে ছেড়ে দিত, পৃথিবীতে তাহলে এতদিন বিপ্লব শুরু হয়ে মানুষের অস্তিত্ব পর্যন্ত লোপ পেয়ে যেত।'

প্রসঙ্গটা চাপা দেবার জন্যে বললাম—'আপনি নিশ্চিন্ত মনে এখানে বসে গল্প করছেন ওদিকে আপনার মা যদি বাড়িতে দেখতে না পেয়ে—' ইচ্ছে করেই শেষ করলাম না কথাটা।

একটু গম্ভীর হয়ে গোপা বললে—'আজ অমাবস্যা, সেদিক থেকে কোনও ভয় নেই।'

কিছু বুঝতে না পেরে চেয়ে রইলাম। রিনিও দেখি বেশ একটু অবাক হয়ে চেয়ে আছে। গোপা বললে—অমাবস্যা ও পূর্ণিমা এই দুটো দিন আমরা মায়ের প্রভাব মুক্ত। কিছু বুঝতে না পেরে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলাম।

কপট গাম্ভীর্যের আবরণ খসে গেল,

হেসে ফেললে গোপা। বললে—'বুঝতে পারেন না? আমার মা খুব মোটাসোটা মানুষ। কাজেই সায়েটিকা বাতের হাত থেকে নিস্তার পাননি। অমাবস্যা আর পূর্ণিমায় বাতের ব্যথা খুব বেড়ে যায়, মা একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। আর ঐ সময় পেয়ারের ঝি হরিমতী ছাড়া আর কারও মায়ের ঘরে প্রবেশ নিষেধ।'

তিনজনে এক সংগে হেসে উঠলাম। হঠাৎ জানালা দিয়ে রাস্তার দিকে চেয়ে

হাসি থেমে গেল রিনির। ভয়ে পাংশু মুখে উঠে দাঁড়িয়ে বললে—'সর্বনাশ। গোপাদি, মা বাবা!'

উঠে উঁকি দিয়ে দেখি, রিনির মা বাবা ছোট ভাই বোনকে নিয়ে বড় রাস্তা ছেড়ে গলির পথ ধরেছেন। এতক্ষণ সময়ের হিসেব ছিল না। সন্ধ্যে হয় হয়। এ অবস্থায় রিনির মা বাবা আমাদের তিনজনকে একসংগে দেখলে যা ভাববেন, কল্পনা করেও আঁতকে উঠলাম।

রিনি—'কি হবে গোপাদি?'

গোপা—'তোমাদের ঝি মোক্ষদা কোথায়?'

রিনি—'এই তো একটু আগে তাকে বার করে বাইরের দরজা দিয়ে এলাম। আজ বাড়িতে রান্নার হাংগামা নেই বলে মা ওকে এ-বেলা ছুটি দিয়ে গেছেন।'

অদ্ভুত বুদ্ধিমতী মেয়ে গোপা। এক মিনিট চিন্তা করে বললে—'নীচে চল শিগগির, আমি ভাঁড়ার ঘরে লুকিয়ে থাকব, তোমার মা বাবাকে দরজা খুলে দাও। ও'রা উপরে এলে আমি বেরিয়ে যাব—তারপর দরজা বন্ধ করে তুমি উপরে উঠে আসবে।'

কথা শেষ হবার আগেই বাইরের দরজার কড়া নড়ে উঠল। রিনি ও গোপা তাড়াতাড়ি নীচে নেমে গেল। চুপ করে তক্তপোশের এক পাশে বসে রইলাম। কাকা আগে এলেন, আমায় দেখে একটু অবাক হয়েই যেন বললেন—'এই যে তুমি কতক্ষণ?'

যা থাকে কপালে বলে ফেললাম,—'এই ঘণ্টাখানেক আগে। বাড়িতে কেউ নেই—তাই রিনি বললে, মা বাবা না আসা পর্যন্ত যেতে পারবে না।'

পেছন থেকে কাকিমা বললেন—তা বেশ করেছিস। ঐ একফোঁটা মেয়েকে একলা বাড়িতে রেখে গেছি। আমি অনেকক্ষণ থেকে ছটফট করছি আসবার জন্যে তো ও'র আর গল্পই শেষ হয় না।'

দরকারী অদরকারী দু'চারটে সাংসারিক কথাবার্তার পর বাড়ির দিকে পা বাড়ালাম যখন, রায় বাহাদুরের বাড়ির পেটা ঘড়িতে তখন ঢং ঢং করে সাতটা বাজছে।

ট্রামে সারাটা পথ শুধু গোপার কথাই ভাবতে ভাবতে এলাম। বাড়ি আসতেই বাবা বললেন 'এলফিনস্টোন পিকচার প্যালেস (বর্তমান মিনার্ভা সিনেমা) থেকে গাঙ্গুলীমশাই ডেকে পাঠিয়েছেন। বলেছেন যত রাত্রই হোক তাঁর সংগে দেখা করা দরকার।'

ভাবলাম ব্যাপার কি? কালপরিণয় শুটিং তো শেষ—তবে কি?

বাবা বললেন—'বোধহয় ভালো খবর তোমার জন্যে হয়তো একটা মাস মাইনে ঠিক করেছেন।'

বাবার অনুমানই ঠিক বলে মনে হল। বহুবার একটা বাঁধা মাইনে করে দেবার জন্যে গাঙ্গুলীমশাইকে অনুরোধ করেছি। তাছাড়া 'গিরিবালা' ও 'কাল পরিণয়' ছবি দুটোয় কাজ ভালোই করেছি সুতরাং একটা ভালো মাইনে আশা করা খুব অন্যায় নয়। কাপড়চোপড় না ছেড়ে বাবা মা'র পায়ের ধুলো নিয়ে [illegible] ট্রামে উঠে বসলাম।

এলফিনস্টোন [illegible] লবিতে ঢুকেই বাঁ হাতে [illegible] বুকিং কাউণ্টার তার মধ্যে দিয়ে [illegible] একটা বড় ঘর। সেইটেই [illegible] মশায়ের আফিস। সিনেমার [illegible] স্টুডিওর শুটিং-এর যাবতীয় [illegible] কাজকর্ম এখানে বসেই করেন তিনি।

ঢুকেই দেখি ঘর ভর্তি [illegible] নমস্কার করে এক পাশে [illegible] রইলাম।

একটু বাদে গাঙ্গুলী মশাই [illegible] 'একটু ঘুরে এস ধীরাজ, [illegible]'

বেরিয়ে লবিতে এসে [illegible] আগামী ছবিগুলোর ফটো [illegible] চারদিকে বোর্ডে টাঙানো, [illegible] সেইগুলো দেখতে লাগলাম। [illegible] বোর্ডের কাছে এসে দেখি [illegible] বিখ্যাত ছবি 'শো-বোট'-এর [illegible] পুরোনো ফটো, উপরে বড় বড় [illegible] অক্ষরে লেখা রয়েছে—'সাউণ্ড [illegible] নাইজড্ 'চল্লিশ পারসেণ্ট টকি।' জিনিসটাই তখন ভাল করে [illegible] শুধু লোক-পরম্পরায় ও [illegible] ইংরাজি সিনেমার কাগজে [illegible] আমেরিকা ছবিকে কথা কওয়ানো [illegible] উঠে-পড়ে লেগেছে। তারিখটা [illegible] সামনের শনিবার। হঠাৎ দেখি [illegible] সমস্তভাবে মুখার্জি বেরিয়ে [illegible]
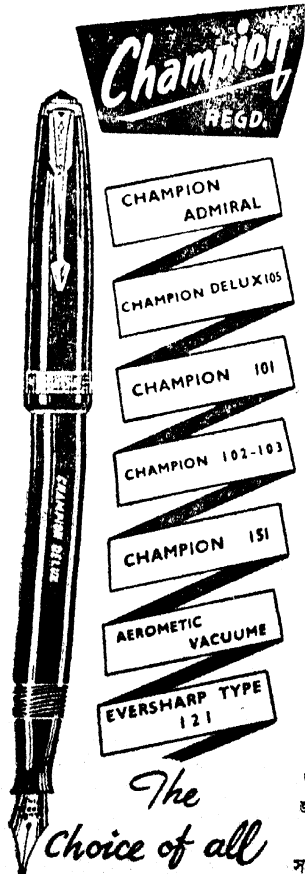
গ...মিশায়ের ঘরে থাকে। অকূলে ...ন পেলাম যেন। ডাকতেই কাছে ... দাঁড়াল মুখার্জি। বললাম—...ড সিনক্রোনাইজড, চল্লিশ পারসেণ্ট ... এগুলোর মানে কি মুখুজ্যে?'

কোনও জবাব না দিয়ে অনুকম্পাভরা ...তে বেশ কিছুক্ষণ আমার দিকে ... রইল মুখার্জি। তারপর হতাশ-...রে মাথা নেড়ে বললে—'না, তুমি ...কারে হোপলেস। চল্লিশ পারসেণ্ট ...র মানে ছবিটা পুরোপুরি সবাক নয়, ...ও বুঝতে পারলে না?'

বললাম—'তা বুঝেছি, নির্বাক 'শো...টি' আমি দেখেছি, বোর্ডের স্টীল ...গুলো দেখেও মনে হচ্ছে এটা সেই ...রেনো ছবিটা। তাহলে ও কথা-...লোর মানে কি?'

মুখুজ্যে বললে—'নির্বাক ছবিটায় ... রোবসনের গান শুনতে পেয়েছিলে ...?'

বললাম—'না।'

মুখুজ্যে—'এটায় পাবে।'

চল্লিশ পারসেণ্ট টকি কথাটার মানে ...ঝলাম এতক্ষণে। বললাম—'আর ঐ ... লেখা আছে, 'সাউণ্ড সিনক্রোনাইজড,' ...টার মানে?'

সামনে লক্ষ্যহীন দৃষ্টিতে চেয়ে কি ...ন ভাবলে মুখার্জি, তারপর মৃদু ...সে বললে—

'—ওসব সায়ান্সের গোলমেলে ...পার, তুমি বুঝবে না।' বলেই যাবার ...ন্যে পা বাড়ালো মুখার্জি। একরকম ...টে গিয়ে ধরলাম ওকে। বললাম—... দুটো কথার মধ্যে বিজ্ঞানের কি রাঘ-...বালুক লুকিয়ে থাকতে পারে—বুঝতে ...রছি না—বলো না ভাই মুখুজ্যে?'

দাঁড়িয়ে আশেপাশে চারদিক দেখে ...নয়ে চুপি চুপি বললে মুখার্জি—'সত্যি ...থা বলতে কি, ঐ 'সাউণ্ড সিনক্রো-...নাইজড' কথাটার মানে আমি নিজেই ...ভাল বুঝতে পারি নি।' বলেই ...কর্পোরেশন বিল্ডিংএর উত্তর দিকের ...রাস্তা ধরে হন হন করে হাঁটতে শুরু ...করলো মুখার্জি।

...বে ছোটবেলায় ঠাকুরদাদার কাছে ...শোনা একটা গল্প মনের মধ্যে ঝিলিক ...দিয়ে উঠল।

অনেক-অনেকদিন আগে, বোধ হয় ইংরেজ আমলেরও আগে, বাঙলা দেশের একটি ছোট্ট গ্রামে গল্পটির জন্ম হয়। গাঁয়ের অধিকাংশ লোকই অশিক্ষিত; দু-একজন একটু-আধটু লিখতে-পড়তে পারে। বিদেশে যাওয়া দূরের কথা, বেশিরভাগ লোকই গাঁয়ের বাইরে পা বাড়ায় নি। কিন্তু তাতে তাদের কোনও-দিন কোন অসুবিধেয় পড়তে হয় নি। চুরি-ডাকাতি থেকে শুরু করে সামাজিক জীবনের যত দুরূহ সমস্যাই হোক না কেন, এককথায় জলের মত মীমাংসা করে শান্তি ফিরিয়ে আনতে পারতেন মাত্র একটি লোক। তিনি গাঁয়ের মোড়ল, শ্রীবিষ্ণুপরমেশ্বর গড়গড়ি। বয়েস একশ' দশ পার হয়ে গেলেও মোড়ল অথর্ব বা অকর্মণ্য হয়ে পড়েন নি। প্রায়ই দেখা যেত ষোল বেহারার পালকি চড়ে মোড়ল চলেছেন কোনও না কোনও ব্যাপারের মীমাংসা করতে। মোট কথা মোড়ল যা

করবে তাই। তার উপর কথা কইবার সাহস বা ক্ষমতা কারও ছিল না।

গাঁয়ের শেষ প্রান্তে পথের ধারে এক বিরাট গর্ত। বোধ হয় পুকুর কাটবার মতলবে শুরু হয়ে কি কারণে বন্ধ হয়ে যায়। দৈবাৎ একটা দল ছাড়া হাতি কি করে যেন ঐ গর্তে পড়ে যায়। নিশুতি রাতে একটা বিকট আর্তনাদ শুনে কৌতূহলী গাঁয়ের লোক সব জড় হয় গর্তের চারপাশে। গর্তের মধ্যে একটা অদ্ভুত প্রকাণ্ড জানোয়ার দেখে ওরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়। চোখে দেখা দূরে থাক, এরকম একটা বিরাট জীবের অস্তিত্বও এতদিন ওদের কল্পনাতীত ছিল। সবাই মিলে ওখানে বসেই গবেষণা শুরু করে। অনেক যুক্তিতর্ক দিয়েও যখন কোনও মীমাংসায় পৌঁছানো গেল না, তখন ওদেরই মধ্যে একজন বললে আমরা তো আচ্ছা মুখ্যু, আমাদের সবজান্তা মোড়ল বেঁচে থাকতে এই রকম একটা জটিল ব্যাপারে মাথা ঘামিয়ে অনর্থক সময় নষ্ট করছি।'

অকূলে কূল পাওয়া গেল। সবাই একসঙ্গে বলে উঠল—'ডাক মোড়লকে!'

তখনই লোক ছুটলো মোড়লের বাড়ি। এক ঘণ্টার মধ্যে পাল্কি চড়ে মোড়ল এসে হাজির। পাল্কি থেকে নেমে বেশ কিছুক্ষণ হাতিটার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলো মোড়ল। চারপাশের অগণিত জনতা রুদ্ধনিশ্বাসে চুপ করে আছে। হঠাৎ কাঁদতে শুরু করলো মোড়ল, সে কান্না আর থামে না। জনতা প্রথমটা মোড়লকে ওভাবে কাঁদতে দেখে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেল, পরে একটু একটু করে সংক্রামক রোগের মত ছড়িয়ে পড়ল সে কান্না। পরে যারা এল, কিছু না বুঝে তারাও সবার সঙ্গে কাঁদতে শুরু করল। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে রীতিমত পরিশ্রান্ত হয়ে কান্না থামিয়ে আবার হাতিটার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো মোড়ল। নিস্তব্ধ জনতা মোড়লের দিকে চেয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

কান্নার মত হঠাৎ হাসতে শুরু করলো মোড়ল। প্রথমটা আস্তে, তারপর একটু একটু করে বাড়তে লাগলো হাসি। কিছু না বুঝে জনতাও হাসতে শুরু করল। ভাবলে মোড়ল যখন হাসছে, তখন হাসবার ব্যাপার একটা নিশ্চয়ই হয়েছে। সারা গাঁয়ে প্রতিধ্বনি তুলে হাসির ঝড় বয়েই চলল।

হাসতে হাসতে বসে পড়েছিল মোড়ল। খানিক বাদে হাসি থামিয়ে কাউকে কিছু না বলে পাল্কিতে উঠে বেহারাদের যাবার ইশারা করতেই জনতার মধ্যে অস্ফুট চাপা গুঞ্জনের ঢেউ বয়ে গেল। কেউ সাহস করে কিছু বলতে পারে না, এদিকে মোড়লও চলে যায়। অগত্যা সাহস করে একজন এগিয়ে আসে পাল্কির কাছে। মোড়ল বলে—'কি চাও?'

লোকটা ভয়ে ভয়ে বলে—'কিছু তো বলে গেলে না মোড়ল?'

'বলবার কিছু নেই বলেই বলিনি।' বেশ রেগেই বলে মোড়ল।

লোকটা বলে—'কিন্তু তুমি ওভাবে কাঁদলেই বা কেন, আর শেষকালে হেসে কিছু না বলে চলেই বা যাচ্ছ কেন, এটা বলে যাও!'

মোড়ল—'কাঁদলাম এই জন্যে যে আমি মরে গেলে তোদের মত হাঁদাগঙ্গারামদের উপায় কি হবে!'

লোকটি খুশী হয়ে বললে—'বেশ কিন্তু শেষকালে হাসলে কেন মোড়ল?'

মোড়লের রেখাবহুল কুঞ্চিত মুখখানায় একটু হাসির আভাস দেখা গেল— 'হাসলাম কেন শুনবি?' বলে হাতীটার দিকে হাত দিয়ে দেখিয়ে মোড়ল বললে— 'ও ঘোড়ার ডিম আমিও চিনতে পারলাম না।'

নিঃশব্দে নিজের মনে দাঁড়িয়ে হাসছিলাম। দেখলাম পার্টিশনের দরজা ঠেলে গাঙ্গুলীমশাই বাইরে বেরিয়ে আসছেন। হাসি থামিয়ে এক-পা দু-পা করে ও'র সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম।

(ক্রমশ)

২

গৃহপ্রবেশের অনুষ্ঠান সকালে শেষ হ'ল। কিন্তু এতো শেষ নয় । কাজ অনেক বাকি। পুব দিকের নিতে মাখন চক্রবর্তী নারায়ণ পুজো , যজ্ঞ করল, চৌরি বেঁধে দিল কে। নারায়ণের ভোগ তো অল্পেই গেল। এবার নরদেবতাদের ভোগ । সে ভোগ তো অত সহজে হয় না। এক মহাযজ্ঞের ব্যাপার। শতদলবাসিনী র এই যজ্ঞের জন্যেই তো সব। ষের এত ছুটোছুটি, এত ওঠা নামা, ভোগ ভোগান্তি। কোথায় লাগে এর অশ্বমেধ আর রাজসূয়। জঠর যজ্ঞে ষকে যদি রোজ আহুতি দিতে না তাহলে তার সংসারের চেহারা ও জের চেহারা যে কি রকম হ'ত তা যায় না।

এনাক্ষী হেসে বলে, 'কেন ভাবা যাবে ঠাকুরমা, মানুষ তখন এক সন্ধ্যা জপ ক'রে দিনরাত তোমার মত মালা ঠপ্ করত, আর নামকীর্তন শুনত।'

শতদলবাসিনী বলেন, 'তুই হাসিস যাই করিস পুনটুরি তা যদি হ'ত, ষের সুখের সীমা থাকত না। এই া পেটে দুটি দানা দেওয়ার জন্যে কি হানাহানি মানুষে মানুষে? কম ম্না খাওয়ি চলে?'

এনাক্ষী বলে, 'শুধু খাওয়া-য়িটাই বা দেখছ কেন ঠাকুরমা, খাওয়া খাওয়ানোও তো আছে। সেইটেই বড়। না হ'লে স্পেসিস হিসেবে মানুষ এতদিন লোপ পেয়ে যেত।'

তর্কে নাতনীর সঙ্গে পেরে ওঠেন না শতদলবাসিনী। ওর সব কথা বোঝেনও না। শুধু ইংরেজী শব্দ থাকে বলে নয়, ওর বাংলা কথাবার্তাও ইংরেজীর মত কঠিন আর অপরিচিত; অথচ এম এ পাশ করেছে নাকি মেয়ে বাংলাতেই। শতদলবাসিনী বলেছিলেন, 'মেয়েকে অত পড়িয়ে কি হবে অমিয়। ভালো ছেলে টেলে দেখে ওর বিয়ে দিয়ে দে। মেয়েদের বেশি পড়াশুনো করতে দিলে কি হয়, তাতো বোনকে দিয়েই দেখলি।'

কিন্তু অমিয় শোনেনি সে কথা। 'এ দেশের উল্টো বিধি, মেয়ের নাম রামনিধি।' পুনটুরিকে এম এ পাশ করিয়েছে অমিয়, কিন্তু ছেলেটিকে অতদূর পড়ায় নি। কোন রকমে বি এ পাশ করবার পর, কমলাক্ষ নিজেই পড়া ছেড়ে দিয়েছে। বাপ হয়ে যে কড়া ধমক টমক দেবে তা দেয়নি অমিয়। পড়তে চাও না! না পড়লে। এত নরম হলে কি ছেলেকে মানুষ করা যায়? মাঝে মাঝে চোখও গরম করতে হয় একটু আধটু। তা করেনি অমিয়। তার ফলে ওর ছেলে লেখাপড়া না শিখে সেতার বাজিয়ে বেড়াচ্ছে। নামমাত্র চাকরি করে ইনসিওরেন্স কোম্পানীর অফিসে। বাকি সময়টা সেতারে ঠুং ঠুং করে। ভদ্রলোকের ছেলে এ কি কাণ্ড। ও কি যাত্রার দলে চাকরি করবে যে সেতার বেহালা হাতে নিয়েছে? এ ছেলের যে কি গতি হবে, ভেবে পান না শতদলবাসিনী। কিন্তু যারা ভাববার তারা যদি না ভাবে তিনি ভেবে কি করবেন? সবই বোঝেন, তবু তো মন বোঝে না।

গৃহপ্রবেশ উপলক্ষে শুধু আচার-অনুষ্ঠানই নয়, কয়েকজন আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধবকেও নিমন্ত্রণ করেছেন অমিয়ভূষণ। তারা সবাই দুপুর বেলায় খাবে। তা, হবে না হবে না করেও, অনেক বাদ-সাদ দিয়েও ছেলেবুড়ো শ'খানেক লোক তো খাবেই। কলোনীরও কয়েকজনকে বলেছেন অমিয়ভূষণ। বাড়ির সকলেই নিষেধ করেছিলেন। কাজ নেই, অত হাঙ্গামায়। আজকাল এসব কেউ করে না। এতো আর দেশ গাঁ নয় যে সেই সব রীতিনীতি মেনে চলতে হবে। শুধু খরচের ভয়ই না, করে কর্মায় কে, কে খাটে-পেটে। অমিয়ভূষণ তো নিমন্ত্রণ করেই খালাস। নিজে এক গেলাস জলও কাউকে ভরে দিতে পারবে না। সব করতে হয় কল্যাণী করুণা আর কমল এনাক্ষীকে। কিন্তু এ ব্যাপারে ছেলেমেয়ে দুটিও যে খুব কাজের তা নয়। তারা কি এসব শিখেছে করেছে যে আজ করবে কিন্তু বাড়ি করার মত এ ব্যাপারেও
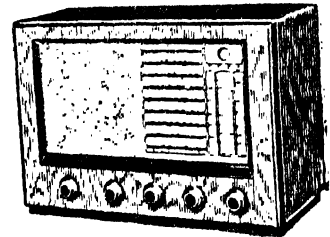
অমিয়ভূষণ কারো নিষেধ শোনেন নি। তিনি বলেছেন, 'আত্মীয়স্বজনের পাতে যদি দুটো ভাতই না দিতে পারলাম, তাহলে আর বাড়িঘর ক'রে কি সুখ হ'ল?'

এনাক্ষী হেসে বলল, 'বুঝলে দাদা, এটা হ'ল বাবার পার্বলিসিটি। তিনি বাড়ি করেছেন সবাই এসে তা দেখে যাক।'

কমলাক্ষ বলল, 'এর চেয়ে আড়াই টাকা খরচ করে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে দিলেই হ'ত। শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু অমিয়ভূষণ সেনগুপ্ত মহাশয় কীর্তিপুরে একখানি একতলা প্রাসাদ তুলে পৃথিবীতে অক্ষয় কীর্তি স্থাপন করেছেন।'

এনাক্ষী বলল, 'তাহ'লে তো আর তাঁদের চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন হ'ত না।'

কমলাক্ষ বলল, 'শুধু কি চক্ষুকর্ণ? রসনাটাকেই বা বাদ দিচ্ছিস কেন? জেনো বাসনার সেরা বাসা রসনায়।'

কিন্তু মুখে নিজেদের মধ্যে যত ঠাট্টা তামাসাই করুক অমিয়ভূষণের এই সেকেলে কীর্তিকলাপে যে যত অসন্তুষ্টই হোক, প্রত্যেকেই এসে কাজকর্মে হাত দিল। শতদলবাসিনী করুণাকে নিয়ে তরকারি কুটতে বসলেন। লোক খাওয়ানোর ব্যাপারে তাঁরই উৎসাহ বেশি। এই উপলক্ষে আত্মীয়স্বজন আসুক, দেখা-সাক্ষাৎ হোক। তাঁর ইচ্ছা যে ছেলে মেনে চলেছে, সে যে বউ আর ছেলেমেয়েদের কথামত হাত গুটিয়ে বসে থাকেনি এতে সব চেয়ে খুশী হয়েছেন শতদলবাসিনী। অবশ্য খরচের কথাটাও যে তিনি না ভাবছেন তা নয়। খরচ করতে হচ্ছে বই কি। খুবই খরচ করতে হ'চ্ছে অমিয়কে। সবই তো তার নিজের ঘাড়ে। করুণা অবশ্য নিজের মাইনে থেকে প্রায় শ'খানেক টাকা করে দেয় আজকাল। কিন্তু অমিয় বোনের টাকা যে সংসারী-খরচে পারত-পক্ষে ভাঙে না তা শতদলবাসিনী ভালো ক'রেই জানেন। বোনের নামে মোটা টাকার বীমা করেছে অমিয়, এই টাকায় তার প্রিমিয়াম দেয়। কিছু হয়ত ব্যাঙ্কে রাখে। এই নিয়ে ভাই-বোনের মধ্যে মস্ত বিবাদ। করুণা বলে, 'দাদা, তোমার সংসার কি আমার সংসারও নয় যে আলাদা ক'রে রাখছ?'

অমিয় বলে, 'সেজন্যে নয়। আমার টাকা তো কিছুই বাঁচে না, তোর টাকা কটা যদি এক জায়গায় ধরে রাখতে পারি, ভবিষ্যতে আমাদের সকলেরই কাজে লাগবে। আরো কত খরচ পড়ে রয়েছে সামনে। মেয়ের বিয়ে দিতে হবে, তাতে কি কম টাকা লাগবে?'

কিন্তু মুখে যাই বলুক অমিয় সে যে বোনের টাকা সহজে ছোঁবে না তা শতদলবাসিনী জানেন। আর জেনে একটু নিশ্চিতই হন। আহা মেয়েটার বিয়ে থা হয় না, স্বামী সন্তান হল না, নিজের রোজগারের ওই কটি টাকাইতো ওর সম্বল। তারপরে ভবিষ্যতে কে কাকে দেখবে, কে কাকে দেখতে পারবে না পারবে, তা কি এ সংসারে ঠিক করে কেউ বলতে পারে?

অমিয়ভূষণের একার রোজগারেই হয়েছে এই বাড়ি। একার রোজগারেই চলছে সংসার। শুধু যে দুটো সিফটে কলেজে পড়ান তাই নয়, নোট লেখেন, রীডার লেখেন, পরীক্ষার খাতা দেখেও কিছু পান। দু'একটি পাবলিশিং ফার্মের সঙ্গেও যোগাযোগ আছে। তাদের ইয়ারবুক এডিট করেন, অন্য দু একটি বইয়ের পাণ্ডুলিপি শুধরে দেন। আয়ের নানা পন্থা আছে অমিয়ভূষণের। কিন্তু এততেও কুলোয় না, এততেও যা আসে সবই চলে যায়। পাকিস্তানে দেশের বাড়ি আর জায়গাজমি বিক্রি করে যা পেয়েছিলেন তার সবই এখানকার জমি আর বাড়িতে লেগেছে। সেই সঙ্গে নিজের সমস্ত সঞ্চয়ও এর মধ্যে দিতে হয়েছে। তাতেও কুলোয়নি। বন্ধুবান্ধবদের কাছে ধারও করতে হয়েছে কিছু কিছু। সরকারী উদ্বাস্তু ঋণ তিনি সংগ্রহের চেষ্টা করেননি। কারণ পার্টিশনের অনেক আগেই তাঁরা দেশ ছেড়ে কলকাতায় বাস করেছেন। তবু একটু এদিক সেদিক করলে লোন পাওয়া যেত। কেউ কেউ তাঁকে সে পরামর্শও দিয়েছিলেন। কিন্তু অমিয়ভূষণ ও পথের ধার দিয়েও যাননি। যা করেছেন সৎভাবে সৎপথে থেকে নিজের শক্তি সামর্থ্যের জোরেই করেছেন। কল্যাণীর আশা আকাঙ্ক্ষা আরো অনেক বেশি ছিল। প্রত্যেক মেয়ের মধ্যেই একটি করে লেডী ম্যাকবেথ লুকিয়ে আছে। নিজেদের অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা তারা স্বামীর ভিতর দিয়ে পূর্ণ করতে যায়। যাদের কর্মক্ষেত্র নেই তাদের প্রধান ক্ষেত্র হ'ল স্বামী। নিজেদের সমস্ত উৎসাহ উদ্দীপনা উচ্চাকাঙ্ক্ষা তারা স্বামীর মধ্যে সঞ্চার করে দিতে চায়। স্বামীকে তাই দু'জনের হয়ে বড় হতে হয়। এই ডবলডেকার যেখানে সে

হতে পারে না সেখানেই গোলমাল বাধে।

অমিয়ভূষণ আর কল্যাণীর মধ্যেও এই গোলমাল বেধেছে। স্ত্রীর এত প্রেরণা এত অনুপ্রেরণা সত্ত্বেও অমিয়ভূষণ সাধ্যের সীমার বাইরে যাননি। অসাধ্য সাধনে উদ্যোগী হননি। এসব ব্যাপারে তিনি স্ত্রীর মত প্রায় সব ক্ষেত্রেই অগ্রাহ্য করেছেন। অবশ্য বুঝিয়ে শুনিয়ে যুক্তি দিয়েই করেছেন। কিন্তু কল্যাণী কিছুতেই বুঝতে চাননি। বাবার প্রবচন মনে পড়ে গেছে অমিয়ভূষণের। 'গৃহীতার্থং ন মুঞ্চন্তি নারী বর্বর কচ্ছপাঃ।' অবশ্য নারীকে বর্বর আর কচ্ছপের সঙ্গে একই সারিতে বসাবার মত প্রতিক্রিয়াশীল মানুষ নন অমিয়ভূষণ। তাহলে মেয়েকে উচ্চশিক্ষা দিতেন না, বোনকে তার ইচ্ছামত অনূঢ়া থাকতে দিতেন না। নারী পুরুষের সমান অধিকারে তিনি বিশ্বাস করেন। কিন্তু সে অধিকার যেমন পুরুষকে তেমনি নারীকেও তার ব্যক্তিগত চেষ্টায় শিক্ষাদীক্ষায় অর্জন করে নিতে হয়। অনধিকারিণীর অধিকার স্বীকার করেন না অমিয়ভূষণ। মেয়েরা জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গে আদ্যাশক্তির অংশ হয়ে যায় একথা তিনি মানেন না। এই নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে তার নিত্য বিরোধ। সে বিরোধ কখনো নির্বাক শীতল যুদ্ধে কখনো উত্তপ্ত বাক্‌সমরে রূপ নেয়। এই নিয়ে ছেলেমেয়ের মনেও অশান্তি কম নয়। তারা বেশির ভাগ সময়, মার পক্ষে যোগ দেয়, মার পক্ষ নিয়ে লড়ে। তাদের ধারণা তাদের বাবা একটি অটোক্র্যাট। পুরুষপ্রধান সমাজের নির্ভেজাল প্রতিভূ। তাদের ভাবভঙ্গি দেখে মনে মনে হাসেন অমিয়ভূষণ। তিনি যে কী তা তিনি নিজে জানেন।

রান্নাঘর থেকে স্বামীকে ডেকে পাঠালেন কল্যাণী। বললেন, মাছ আর দইয়ের কি ব্যবস্থা করেছ? অমিয়ভূষণ বললেন, 'কি ব্যবস্থা করেছি তাতো জানোই। আমি তো আর লুকিয়ে চুরিয়ে কিছু করিনি। তোমার সামনেই তো নটবরকে দমদমে পাঠালাম। সে মাছ আর দই নিয়ে আসবে। আরো দু'জন লোক দিয়েছি সঙ্গে।'

কল্যাণী বললেন, 'লোকই দাও আর যাই দাও তোমার সে মাছ সন্ধ্যার আগে এসে পৌঁছবে না। এবেলা যারা খাবে তারা তোমার বাড়ির চূণ-সুরকির তরকারী দিয়েই খেতে পারবে।'

ঝগড়াটা ফের লাগবার উপক্রম হতেই করুণা অমিয়ভূষণকে ডেকে নিয়ে গেল, 'দাদা বাইরে কারা সব এসেছেন দেখ এসে।'

আসলে দেখবার মত কেউ এখনো আসেননি। ওটা ছল। কিন্তু অমিয়ভূষণ তা বুঝতে পেরেও সরে গেলেন। আজ এই কাজকর্মের বাড়িতে স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর কথান্তর হোক তা তিনি নিজেও চান না। রাগলে কল্যাণীর আর কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। চেঁচিয়ে সারা বাড়ি সে মাথায় করে তোলে। নতুন জায়গা। নিজে যদি সবদিক বুঝে সমঝে না চলেন অমিয়ভূষণ তা হলে কেলেঙ্কারী হবে।

স্বামী অন্যদিকে চলে গেলে কল্যাণী শাশুড়ীকে বললেন, 'দেখুন, আমি যা বলেছিলাম তাই হল কিনা।'

শতদলবাসিনী বললেন, 'কিসের কথা বলছ তুমি বউমা।' কল্যাণী বললেন, 'এতদূরে এসে বাড়ি করার ফল এমন হবে আমি আগেই বলেছিলাম। পানটুকু আনতে চূণটুকু আনতে ছুটতে হবে কলকাতায় আমি আগেই জানতাম। স্কুল কলেজ অফিস আদালত চাকরি বাকরি সব সেখানে, আর আপনারা বাড়ি করলেন এসে এই বনজঙ্গলের মধ্যে। এখানে কাদের পোষায়? যাদের নিজেদের দু'একখানা গাড়ি থাকে তাদের। বড়লোকদের। আমি আর আপনি ছাড়া কেউতো আর ঘরে বসে থাকবে না এখানে? সবাই বেরোবে। কতগুলি করে টাকা বাসভাড়া জমবে প্রত্যেকের একবার ভেবে দেখুন।'

শতদলবাসিনী বিরক্ত হয়ে বললেন, 'সে কথা ভেবে এখন আর লাভ কি বউমা। এসব যে ভাববার সেই ভেবেছে, সেই ভাববে। এ কথা নিয়ে তোমাদের ঝগড়াঝাটিতো খুব হয়ে গেছে। এখন আর ফের তা খুঁচিয়ে তুলে লাভ কি। তার যা সাধ্য সে করেছে, এইটুকুই আমি বুঝি।'

মুখ ফিরিয়ে তিনি ফের বঁটিতে কুমড়ো কুটতে লাগলেন।

কল্যাণী আর কোন কথা বললেন না। শাশুড়ীকে কোন কথা বলে লাভ নেই। উনি ওঁর ছেলের কোন দোষই দেখতে পান না। না দেখতে পান না পেলেন। কল্যাণীও আর এ বাড়িতে থাকবেন না। কাজকর্ম শেষ হয়ে গেলে তিনিও চলে যাবেন কলকাতায়। যেখানে তাঁর নিজের কোন স্বাধীনতা নেই, যেখানে তাঁর কোন একটা কথা কেউ রাখে না, তেমন সংসারে তাঁর থেকে লাভ কি। এক-জীবন এই নিয়ে যুদ্ধ করে এলেন স্বামীর সঙ্গে। আর না। এখন আর ভাবনা কি তাঁর। দুদিন বাদে মেয়ের বিয়ে হয়ে যাবে। ছেলেরও ঘর সংসার পাতবার বয়স হয়ে গেছে। এখন আর আটকা পড়ে থাকবেন তিনি কিসের মায়ায়? কিসের বাঁধনে? অমিয়ভূষণের এই নতুন বাড়ির মোহে? কক্ষণো না, কক্ষণো না। এ বাড়িতে তিনি একাই ঘরসংসার করুন। তাঁর মা আছে, বোন আছে। তারাই সংসার চালিয়ে রাখতে পারবেন। কল্যাণীর আর দরকার কি এখানে? নিজের ব্যবস্থা তিনি নিজেই ক'রে নিতে পারবেন। একটা তো পেট যেমন ক'রে হোক চলে যাবেই। ভাবতে ভাবতে বড় কড়াটায় মুগের ডাল চাপিয়ে দিলেন কল্যাণী।

কোত্থেকে এনাক্ষী প্রায় ছুটতে ছুটতে এল। যেন বাইশ বছরের তরুণী নয়, বার বছরের বালিকা। তেমনি উচ্ছল উল্লাসে বলল, 'দেখ এসে মা, দেখ এসে। দাদু কত বড় একটা পাকা রুই নিয়ে এসেছে। দাদু বলছে ওজন নাকি আধ মণেরও বেশি।'

বেশি।' (ক্রমশ)

লক্ষ্য করে দেখা গেছে যে, রাত্রির চেয়ে দিনে মানুষের বেশী বাড় হয়। আরো দেখা গেছে যে, যমজ ভাই-বোনের মধ্যে বাড়টা প্রায় একই ধরনের হয়। এটা কিন্তু অনাত্মীয় এক বয়সের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে একটু কম দেখা যায়। পূর্ণবয়স্ক লোকদের বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে বাড়টাও কমতে থাকে। ছেলেবেলায় এই বয়সের মাপ হিসাবে নখ এবং শরীরের টিস্যুর বদল ধরা হয়েছে। পরীক্ষা হিসাবে ৩ থেকে ৮৮ বৎসর বয়সের ২৯৩ জন যমজ আর ঐ বয়সের ৫০০ জন পুরুষ এবং ২৫০ জন স্ত্রীলোক নেওয়া হয়েছিল।

*

আমরা জানি যে পটাসিয়াম সাইনাইড একটি মারাত্মক রকম বিষ। এই বিষে প্রায় সব জীবন্ত বস্তু মারা পড়ে, এটাই আমাদের জানা আছে। কিন্তু

বিজ্ঞান বৈচিত্র্য

চক্রদত্ত

এখন দেখা যাচ্ছে যে, এই বিষে এক জাতের বীজাণু স্বচ্ছন্দে বেঁচে থাকে। এই তথ্য জানা যায়, শহরের ময়লা জল নিকাশের ব্যাপার থেকে। ময়লা জল নিকাশের সময় জলের বীজাণু এবং অন্য সব প্রাণীদের মারবার জন্য এতে পট্যাসিয়াম সাইনাইড মেশান হয়। কিন্তু এই এক জাতের বীজাণু শুধু মারা পড়ে না।

*

ডাঃ ফ্রেডিক লিমেরি বলেন যে, মানুষের মদ খাবার নেশা জন্মায় 'ফেক্‌টার এক্স'এর জন্য। মদ খেতে খেতে দেখা যায় যে, এই ফেক্‌টার এক্স ক্রমশ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে; ফলে নেশাও ক্রমশ বাড়তে থাকে। এই ফেক্‌টার এক্স থাকে মানুষের মস্তিষ্কে। বেশী বেশী মদ খাওয়ার দরুণ মস্তিষ্কের যে স্থানে এটা থাকে, তার কোষগুলি নষ্ট হয়ে যায় এবং এই কোষগুলির কোনরকম আর সাড় থাকে না। একবার যদি মস্তিষ্কের কোষগুলি নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে আর সেগুলি সেখানে নতুন করে জন্মাতে পারে না। ফেক্‌টার এক্স নষ্ট হয়ে গিয়ে মানুষ একবার মদ খাওয়াতে অভ্যস্ত হয়ে পড়লে তার পক্ষে আর সেই অভ্যাস ছাড়া সম্ভব হয় না। অনেকে অবশ্য এই অভ্যাস ছাড়তে পারেন। কিন্তু সেটা তাঁদের পক্ষে কোনরকম চিকিৎসার সাহায্যে অথবা আধ্যাত্মিক উপায়ে সারান সম্ভব হতে পারে। ডাঃ ফ্রেডিক বলেন যে, এটাও দেখা গেছে যাঁরা বেশী মদ খান, তাঁদের মস্তিষ্কের কাজ করবার জন্য মদ খাওয়া দরকার।

*

পাবলিক হেলথ সার্ভিস হিসাব করে দেখেছেন যে, সালফা ড্রাগ যদি আবিষ্কৃত না হতো, তাহলে বর্তমান মৃত্যুহারের চেয়ে আরও বহু লক্ষ লোকের মৃত্যু ঘটতো। ১৯৩৮ সাল থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত ১৫ বৎসরের হিসাবানুসারে প্রায় দেড় লক্ষ লোক সালফা ড্রাগ আবিষ্কৃত হওয়ায় জীবন ফিরে পেয়েছে। এই দেড় লক্ষ লোকের ⅔ ভাগ লোক শুধু নিউমোনিয়া এবং ইনফ্লুয়েঞ্জাতে মারা পড়তে পারতো। এদের মধ্যে যাদের যক্ষ্মারোগে মৃত্যু ঘটার সম্ভাবনা ছিল, তাদের সংখ্যা অবশ্য ধরা হয়নি। আর যতগুলি লোক বেঁচেছে, তাদের মধ্যে কেবলমাত্র সূতিকা-জ্বরগ্রস্ত রোগী, সিফিলিস ও অ্যাপেণ্ডিসাইটিস রোগীর সংখ্যাই আছে।

*

পলাতক চোর-ডাকাত খুনে ইত্যাদি ধরার জন্য নানারকম কৌশল ব্যবহার করতে হয়। হাতের বুড়ো আঙুলের ছাপ মিলিয়ে অনেক সময় এদের ধরা হয়। এই আঙুলের ছাপও নকল করা যায়, অবশ্য নকল করার পদ্ধতি কোনও চোর-ডাকাতের মস্তিষ্কপ্রসূত নয়। নেদারল্যাণ্ডের এক পুলিসের বড়কর্তা ডাঃ লুই কী করে চোর-ডাকাতেরা নকল ছাপ দিতে পারে, তার উপায় বাতলেছেন। তিনি বলেন যে, পায়ের বুড়ো আঙুলের ছাপ দিলেই অনেকটা হাতের বুড়ো আঙুলের ছাপের মত হয়ে যাবে। তবে এটা একটু বড় হবে। ডাঃ লুই বলেন যে, একটুকরো কাগজ কেটে তার মধ্যে হাতের বুড়ো আঙুলের মাপের একটা ছিদ্র করে সেইটে পায়ের আঙুলের নীচে রেখে ছাপ দিলেই ছাপটা হাতের আঙুলের ছাপের মতই ছোট দেখতে হবে। আর একটু কায়দা করতে হলে পায়ের আঙুলের ছাপ নেওয়ার সময় যদি আঙুলটা একটু বাঁদিক কিংবা ডানদিকে চেপে যদি ছাপ দেওয়া যায়, তাহলে বাঁহাতের আঙুল বা ডানহাতের আঙুলের ছাপ বলেই মনে হবে। ডাঃ লুইকে একবার কোনও কারণে হল্যাণ্ড থেকে ইংলণ্ডে গোপনে যেতে হয়েছিল, সেই সময় তিনি এইভাবে নকল ছাপ দিয়ে লোকচক্ষে ধুলো দেন।

ট্রামে-বাসে

শ্রীযুক্ত জহরলাল তাঁর এক সাম্প্রতিক ভাষণে জানাইয়াছেন যে, তিনি কোনরকম বিজ্ঞাপন বরদাস্ত করিতে পারেন না। বিশুখুড়ো বলিলেন—"এটা যদি নেহরুজীর মনের কথা হয়ে থাকে, তাহলে জোড়া বলদ পর্যন্ত সখেদে বলে উঠবে—"হায় অকৃতজ্ঞ রাম, দড়ি ধরার কাজ কি তোমার ফুরাইয়া গিয়াছে !!"

* * *

বাঙ্গালোরের পৌরপ্রতিষ্ঠানের এক সভায় গৃহহীনদের প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, প্রতিষ্ঠান যদি ইহাদের সমস্যা মিটাইতে না পারেন, তাহা হইলে বস্তির চেয়ে অন্তত খোলামাঠে একটুখানি স্থান করিয়া দিতে পারেন, খোলামাঠ বস্তির চেয়ে ভাল। শ্যামলাল—"নিশ্চয়ই ভালো, অন্তত চরে খাবার জন্যে কিছু ঘাস উৎপাদনের ব্যবস্থা যদি করে দেওয়া হয়!"

* * *

কাঠমাণ্ডুর একটি সংবাদে শুনিলাম রাজা মহেন্দ্র নাকি কুড়ি হাজার টাকা ব্যয় করিয়া একটি কুকুর ক্রয়

করিয়াছেন। —"আমরা হালে শুনছি যে রাজারাজড়াদের সে জলুস আর নেই। কিন্তু আবার প্রমাণ পেলাম, মরা-হাতীর দামও লাখ টাকা"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার প্রফেসার সিদ্ধান্ত সাম্প্রতিক অনুষ্ঠিত এক সভায় ছাত্রদিগকে উপদেশ দিয়াছেন, তাহারা যেন পড়াশোনার সঙ্গে কিছু কাজ করিয়া উপার্জনের চেষ্টা করে এবং এইভাবেই স্বাবলম্বী হইবার চেষ্টা করে। কথাটা সত্যই শুনিতে উপদেশের মত উপদেশ। তবে কাজটা যে কী হইবে, তা আমরা অনেকেই বুঝিতে না পারায় জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"কেন, আপনারা কি আমাদের দেশের সুপ্রচলিত প্রবাদটি ভুলে গেছেন,—নেই কাজ তো খৈ ভাজ।"

* * *

ভারতের মানচিত্রে কাশ্মীরকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত অবস্থায় দেখানো হইয়াছে বলিয়া করাচীর জনৈক

নাপিত নাকি সত্যাগ্রহ করিয়াছে। বিশুখুড়ো বলিলেন—"ছাঁটাইর কাজে তার চেয়ে যোগ্যতর সত্যাগ্রহী সত্যিই মেলানো ভার!"

* * *

হাওড়া স্টেশনে নাকি সম্প্রতি টিকিট-চেকার ও যাত্রীদের মধ্যে একটি সংঘর্ষ হইয়াছে। সংবাদে প্রকাশ, বিনাটিকিটে ভ্রমণকারীদের টিকিট দেখিতে চাওয়ার ফলেই বিবাদের সূত্রপাত হয়। জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"টিকিট-চেকারদের এও তো বড় অন্যায়, হামলোকন কা যব "সুরাজ" ভৈল্, তখন টিকিট কেনা-কাটাটা নেহাৎ ফজুল নয় কি!!"

* * *

বিধান পরিষদে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় জানাইয়াছেন যে, সকলপ্রকার জুয়াখেলা নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি বিলের খসড়া প্রস্তুত করা হইয়াছে। আগামী পরিষদের অধিবেশনে উহা উত্থাপিত হইবে। —"আমরা আশা করছি, রাজনৈতিক জুয়ো এই বিলের আওতায় পড়বে না"—মন্তব্য করিলেন অন্য এক সহযাত্রী।

* * *

এবার আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতা থেকে মোহনবাগান আর ইস্টবেঙ্গলের বিদায় গ্রহণের মর্মান্তিকতা সম্বন্ধেই আলোচনা হইতেছিল। বিশুখুড়ো একটি অসমর্থিত

সংবাদ উদ্ধৃত করিয়া বলিলেন—"এই দুইটি দলের তাঁবুর মধ্যে নাকি তেজষ্ক্রিয় ভস্মের সন্ধান পাওয়া গেছে, বিশ্বাস করুন, আর না-ই করুন!!"

* * *

পাক্ পররাষ্ট্র মন্ত্রী কাশ্মীর প্রসঙ্গ লইয়া প্রায়োপবেশনের পক্ষপাতী নহেন বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। —"প্রায়োপবেশনকারীরা কথাটা ভেবে দেখলে উপকৃত হবেন। খাই-দাই আর মজা লুটির চেয়ে বড়ো নীতি আর নেই। আর তা ছাড়া পরধর্ম ভয়াবহের প্রশ্নও আছে। সত্যাগ্রহ, প্রায়োপবেশন-জাতীয় জিনিস, সবার ধাতে বরদাস্ত হয় না"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

চিত্রগ্রীব

গত সপ্তাহে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের ত্রয়োদশ বার্ষিক চারু ও কারুকলা প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ইনস্টিটিউট ভবনে। প্রদর্শনীটি উদ্বোধন করেন শ্রীসতীশচন্দ্র সিংহ। প্রদর্শনীটি এই কারণে বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, এখানে আর্ট কলেজ বা স্কুলের ছাত্রদের অর্থাৎ শিল্প-চর্চাই যাঁদের একমাত্র অধ্যয়ন কেবল তাঁদেরই আঁকা ছবি টাঙানো হয় নি। সাধারণ স্কুল, কলেজের ছাত্র-ছাত্রীকৃত ছবিও প্রদর্শিত হয়েছিল এবং এঁদের ছবিই ছিল সংখ্যায় বেশী। সবচেয়ে আকর্ষণ করেছে লা মার্টিনিয়ার স্কুলের ছাত্রদের ছবিগুলি। এই স্কুলের আয়োশিম ফ্যাংকনেল-এর 'কামিং থ্রু দি রে' এবং হান্স ফ্যাংকনেল-এর 'হারভেস্ট টাইম' অবশ্যই পুরস্কার পাবার মতন ছবি। কিন্তু বিচারকমণ্ডলী এগুলির কোনও প্রশংসা করেন নি। কারণ কি বুঝলাম না। এ ছাড়া স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে মিহির চক্রবর্তীর 'ফান অব দি ফেয়ার' ভি জেকবস-এর 'এ হিল স্টেশন' এবং 'ল্যান্ডস্কেপ', সিদ্ধার্থ সেনের 'বাস স্ট্যান্ড' ও শংকরলাল দাসের 'সাঁওতাল গ্রাম' বিশেষভাবে চিত্তাকর্ষণ করেছে। 'ফান অব দি ফেয়ার' ছবিটির কম্পোজিশন-এ অভিনবত্ব আছে স্বীকার করতেই হবে। এই ছবিটিই জল-রঙ চিত্র বিভাগে প্রথম পুরস্কার পেয়েছে। এ পুরস্কার মিহির চক্রবর্তীর অবশ্যই প্রাপ্য। কলেজের ছাত্রদের আঁকা ছবি খুব আকর্ষণীয় কিছু চোখে পড়ে নি। তবুও নরেশ রায়ের 'হিলি সাইড' এবং পার্থ মিত্রের 'স্টাডী অব এ সিটেড ম্যান' উল্লেখ করা যেতে পারে। কলেজের ছাত্রদের এ দৈন্যের পিছনে কারণ আছে যথেষ্ট। বাল্যাবস্থায় যেসব ছেলেমেয়ের শিল্প-প্রতিভা প্রকাশ পায়, তারা বেশীর-ভাগই স্কুলের পড়া শেষ করে ঢুকে পড়ে কোনও শিল্প শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। এদের মধ্যে যে ক'জন এসে ভর্তি হয় কলেজে, তাদেরও নানারকম পড়ার চাপে শিল্প-প্রতিভা সম্পূর্ণরূপে বিকাশ লাভ করতে পারে না। পড়াশোনার মধ্যেও যে সব ছাত্রছাত্রীরা শিল্পচর্চা চালিয়ে যায়, তাদের বাহাদুরী আছে নিশ্চয়। গভর্ন-মেণ্ট কলেজ অব আর্ট অ্যান্ড ক্র্যাফট এবং ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে যতটা আশা করেছিলাম, সে রকম কিছু দেখা গেল না। সবই নিতান্ত মামুলী ধরনের এবং এই মামুলী ধরনের ছবি অতো বেশী টাঙানোর পিছনে কি যুক্তি আছে, তা বুঝে উঠতে পারলাম না। মনে হয় অর্ধেকেরও

কবুতরের সংসার
—অনিল উকিল

বেশী ছবি অনায়াসেই বাতিল করা চলতো। এঁদের তৈল-চিত্রণ শোচনীয়। এঁদের শিক্ষায় কোথায় যেন গোলমাল থেকে গেছে মনে হয়। যাই হোক, এঁদের মধ্যে গণেশ হালোইর 'ওয়ে টু পাটনা' অজয় চট্টোপাধ্যায়ের 'এ লেন ইন শ্রীনগর', গৌরগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'থ্রী সান ফ্লাওয়ার্স' এবং দীপক নাথের 'ক্রোটন' উল্লেখ করা চলতে পারে। অ্যাপলায়েড আর্ট বিভাগটি খুবই দীন। গ্রাফিক আর্টে প্রভাত গঙ্গোপাধ্যায়ের উড কাট 'দি কুলি', অজয় চট্টোপাধ্যায়ের লিথোগ্রাফ এবং সুকুমার দাসের এচিং বেশ ভাল কাজ বলে মনে হয়ে ক্র্যাফ্টস বিভাগে ছিল উলের ে এমব্রয়ডারী, চালের নেকলেস, বটপ উপর ছবি, বাতিক প্রভৃতি। বাহুল্য, এ বিভাগে প্রতিযোগী ছি বেশীরভাগই মহিলা এবং এঁদের পুরস্কার পেয়েছেন ঊষারাণী লীলা চক্রবর্তী এবং ফিলোমিনা গো কিছু ফটোগ্রাফও এই প্রদর্শনীতে হয়। এগুলির মধ্যে খুব খারাপ চোখে পড়ল না একটিও। আ চিত্রকরদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দাবী ক আমার ব্যক্তিগত মতে অনিল উ এঁর এক ঝাঁক কবুতরের সংসার চ যে কোনও শিল্প-প্রদর্শনীর আকর্ষণ হবার যোগ্য। অ্যাকোয়া শ্রী উকিল তুলির টান-টোনে, রঙ-বি এবং কম্পোজিশনে অত্যন্ত প এরকম সচরাচর চোখে পড়ে না। করি, ভবিষ্যতে অন্যান্য প্রদর্শনী এঁর ছবি দেখতে পা'ব।

নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানের ছাত্র এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেছিলে

গভর্নমেণ্ট কলেজ অব আর্ট ক্র্যাফ্ট, ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুল, স্ক চার্চ কলেজ, বেঙ্গল ইঞ্জিনীয়ারিং ক বঙ্গবাসী কলেজ, বিদ্যাসাগর ক সিটি কলেজ, আশুতোষ ক ক্যালকাটা ন্যাশনাল মেডিক্যাল ই টিউট, পোস্ট গ্র্যাজুয়েট আর্টস কমার্স, লা মার্টিনিয়ার কলেজ, স নাথ কলেজ, মিত্র ইনস্টিটিউশন, ইনস্টিটিউশন, মহারাজা কাশিম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, স্কটিশ কলেজিয়েট স্কুল। মেট্রোপলিটান ই টিউশন, বিহারীলাল মিত্র ইনস্টি রাজা প্যারীমোহন কলেজ উত্তর প্রেসিডেন্সী কলেজ, ভিক্টোরিয়া ই টিউশন, সেণ্ট-জেভিয়ার্স কলেজ, টে ট্যানিং ইনস্টিটিউট, বরিষা ক রামকৃষ্ণ ব্রহ্মচর্য বালিকা বিদ্যালয়, কলেজিয়েট স্কুল, সুরেন্দ্রনাথ কলে স্কুল, রাজা পদ্মমণী গার্লস ক্যালকাটা অ্যাংলো গুজরাটি দুর্গাচরণ রক্ষিত বঙ্গ বিদ্যালয়, শীল শিশু পাঠশালা, জুনিয়র হ ইতাচুনা, বিবেকানন্দ ইনস্টি হাওড়া।

ন্যাস

দ্বরের মিছিল—সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়। ন পাবলিশার্স, কলিকাতা—১২। দাম টাকা।

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় অল্প সময়ের ই সাহিত্যের আসরে সামনের দিকেই এ করে নিয়েছেন। তবে নিতান্ত নবাগত তাঁর প্রথম বই 'রাহুর' মধ্যে গল্প-ের খাঁটি ছাপ ছিল। বর্তমানে তিনি ধ্যাস' নিয়ে লিখছেন। লণ্ডন-প্রবাসের জ্ঞতাকে তিনি শুধু কাজে লাগাননি, ই সংবেদনশীল মনের খোরাকে পরিণত ছেন। এটা কৃতিত্বের বিষয়। যদি শুধু গল্প হত অথবা উপন্যাসিক কেচ্ছা-কাহিনী, সে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার পুঁজি ভাঙিয়ে ঠিক জীবিকা গ্লানিকর হয়ে উঠত। ঞ্জন তা করতে চাননা, এটা প্রথমেই বলে ছি। কথা-সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর মনের মধ্যে টি আদর্শ আছে এবং সে আদর্শের কিছু নমুনা আলোচ্য উপন্যাসে পাওয়া গেল। অবশ্য 'অন্য নগর' বইখানিতে যে পরি-য়ন, 'দূরের মিছিল' উপন্যাস তারই ছিল। প্রথম বইয়ে ছিল বিলাতী শহরে বন্দরে টুটা-ফুটা মানুষের বিচিত্র জীবন-। সমাজে তারা 'রিফ্ র‍্যাফ্'। তাদের কথা জানত না, কেউ ভাবত না। বাবু তাদের পাংক্তেয় করেছেন। কিন্তু রের মিছিল' আরও উচ্চাশী। এর বিষয়- লণ্ডনের ভারতীয় দপ্তরকে কেন্দ্র করে উঠেছে। তাই মানুষগুলি মধ্যবিত্ত অথবা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। সেই মানুষগুলির ও মন এখানে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। এখানে প্রধান নয়, সহায়ক। চরিত্র-ত্র বা অংকনের পক্ষে। সুধীবাবু যে তে জানেন, তার প্রমাণ হুঁশিয়ার অমল বৈশ্য মন, সোমনাথের ব্যর্থতা, আর দাশের 'ডাউন রাইট' দৃষ্টিভঙ্গী ও ভাব। স্ত্রী ও পুরুষ সব ক'টি চরিত্রের সার্থক হয়েছে খোলা-মেলা ঐ অনঙ্গ মারিয়াকেও বুঝতে বেশি কষ্ট হয় না। পড়াশুনার ভক্ত, সাহিত্যের প্রতি ভক্তি বাক্তিকের সমান। কিন্তু চঞ্চলই বুদ্ধিমান কে বেগ দেবে। তার প্রাণ আছে, তো নিষ্ঠা আছে। কিন্তু মেরুদণ্ড সোজা ফলে মারিয়ার মতন একটি সমর্থক স্ত্রী- প্রয়োজন। বিলেতে গিয়ে কিছুই না

করে', শুধুই ওখানকার ভারতীয়দের জীবন-যাত্রা ও সুখ-দুঃখের সমস্যা নিয়ে সাহিত্য করতে বসার মধ্যে কিছু হাস্যকরতা নেই, অবাস্তবতা থাকতে পারে। কিন্তু সুধীবাবু আদর্শই খাড়া করতে চেয়েছেন এবং তার জন্যই মারিয়ার মুখ দিয়ে অনেক বড় বড় কথার আমদানী করতে হয়েছে।

কিন্তু মারিয়া কিসে মজ্‌লে বা ডুব্‌লে এবং যথাসর্বস্ব বিকিয়ে দিল? তার কোনও হদিস মেলে না, কেবল প্রথম দর্শনে প্রেমের অছিলা ছাড়া। তাই না হয় হল। কিন্তু অংকুশ দিয়ে পোষা ও আদুরে হাতীকে খাটানো যায় না। মারিয়াকে কি ওই সিঁদুর মাথায় নিয়ে মরতে হল? চঞ্চল না হয় নিজেই নিজের পুরোহিত, সাহিত্যের যজ্ঞে। কিন্তু মারিয়ার মতন লিখিয়ে-পড়িয়ে মেয়ে কি করে 'য়ুনিভার্সাল প্রীস্‌টহুড অব্ বিলিভার্স' ব্যাপারে বিশ্বাস করল ক্যাথলিক হয়ে? চঞ্চলের প্রতিভার কোন প্রমাণই নেই, কোন স্থায়ী আভাস পাওয়া যায়নি এ পর্যন্ত। তাহলে সবটাই কি ইচ্ছা-শক্তির প্রয়োগ, মারিয়ার প্রোজেকশ্যন? খৃষ্টান ধর্মতত্ত্বে 'জাস্‌টিফিকেশান বাই ফেথ' মেনে নিতে পারি। কিন্তু সাহিত্য-দৃষ্টিতে শুধু অহেতুক বিশ্বাসের ভিত্তি দেখলে মনে হয়, সবটাই মিরাক্‌ল। সুধীবাবু এইখানেই হোঁচট খেয়েছেন, অঞ্চলকে নিয়ে চঞ্চল হয়েছেন এবং দৃঢ়তাহীন চরিত্রটিতে মিষ্ট আদর্শের প্রলেপ লাগিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত চঞ্চল 'হয়ে' ওঠে নি। প্রতিশ্রুতি এবং স্বয়ংসিদ্ধ প্রতিজ্ঞা সত্ত্বেও।

তবু বইখানি পড়তে ভাল। মনের ওপর খুব দাগ কাটে না। কিন্তু সঞ্চারী মেঘের আলোছায়া ফেলে যায়। তাতে নায়ক না হোক, আশপাশের চরিত্র তাদের অসংগতির সংগতি নিয়ে বেশ ফুটে ওঠে। সুধীবাবুর মনটি সজীব। কিন্তু কথা বস্তু এবার বদলান দরকার। নইলে সুশ্রী ও সুস্বাদু 'আইসিং'এর পিছন থেকে বাসি নারকোলের গন্ধ বেরুতে পারে। ৩৪৩।৫৫

—বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

পরাধীন প্রেম ঃ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক ঃ রীডার্স কর্ণার। ৫ শংকর ঘোষ লেন, কলিকাতা—৬। দাম ঃ তিন টাকা।

বাংলা সাহিত্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবির্ভাব একটি নতুন দৃষ্টিকোণ, একটি

নতুন মননের কক্ষপথ রচনা করেছিল। বিশুদ্ধ বুদ্ধির তীক্ষ্মতায় তাঁর সর্বকালের রচনাগুলি অত্যন্ত ঋজু। নিখাদ বুদ্ধি দিয়ে জীবনকে বিচার করার দ্বিবিধ প্রতিক্রিয়া রয়েছে। প্রথমত বুদ্ধি-আশ্রিত কাহিনী পদে পদে নির্মমভাবে যুক্তিনির্ভর জীবন সবসময় কিন্তু সরল যুক্তিগ্রাহ্য নয়। দ্বিতীয়ত বুদ্ধির আলোয় মানব মনের দূরতম প্রদেশের অন্ধিসন্ধি-গুলো প্রকট হওয়ায় রাশি রাশি তিক্ততার অনুসন্ধান। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা আর একটি লক্ষণযুক্ত। মনের সহজ বীথি-পথ থেকে সরে এসে মননের জটিল আঁকি-বুঁকিতে তাঁর অবিরাম পদচারণা। তাই তাঁর রচনা সহজ কোমল নয়, জটিলতা আর নীরসতায় জীবনের সুষমা তাঁর সাহিত্যে সুদুর্লভ হয়ে পড়েছে। মানিকবাবুর সাম্প্রতিক উপন্যাস 'পরাধীন প্রেম'। উপন্যাসটি নতুন আঙ্গিকের ওপর একটি বুদ্ধিশাণিত বিচারবোধের নিরীক্ষা। বিষয়বস্তু প্রেম। বিভিন্ন চরিত্রের ক্যানভাসে একটি মাত্র বুদ্ধিনির্ভর দৃষ্টির 'কম্প্লিমেণ্টারী' রঙ তিনি চড়িয়েছেন। উপন্যাসটিতে অখণ্ড কোন কাহিনী নেই। বিভিন্ন নারীপুরুষের প্রেম, তার অগ্রসরণ ও পশ্চাৎগমনে অনেক-গুলো কাহিনী যুক্ত হয়েছে। অনিল-কানন, উমা-আনন্দময়, বিনয়-বকুল, মুকুল-অপর্ণা, কার্তিক-পাঁচী—প্রত্যেকের স্বতন্ত্র কাহিনী কিন্তু নিপুণ ভাষণ-বিন্যাসে সব মিলেমিশে একটা অখণ্ডতা লাভ করেছে। এই প্রেম বাধাবন্ধনহীন—এই গ্রন্থে মানিকবাবু এ যুক্তি মানতে নারাজ। তাঁর মতে তথাকথিত প্রেম সংস্কার ও অর্থের দুর্গে বন্দী। যে প্রে সহানুভূতি ও সমবেদনার প্রতিশ্রুতি আ সে প্রেম সুস্থ এবং সে প্রেমই নরনারীর মি সেতুবন্ধ। তাই সমীর-সুমতির মিল উপন্যাসের যবনিকা নেমেছে। গ্রন্থখানি অঙ্গসজ্জা সুরুচিশোভন। (২৯৩।৫

যাত্রা সহচরী : শ্রীমধুসূদন। প্রকাশক সান্যাল কোম্পানী। ১-১এ, ক স্কোয়ার। কলিকাতা—১২। দাম : টাকা।

রম্য রচনা ও উপন্যাসের মিশ্রণ। তার স যুক্ত হয়েছে ভ্রমণ চিত্র। গ্রন্থখানির প্র ও অপ্রত্যক্ষে একটি স্পষ্ট প্রেমের উচ্চ আগ্রা-দিল্লী ইত্যাদি ঐতিহাসিক স্থানে ভ্রমণের সময় নায়কের সঙ্গে শ্রীমতী তৃপ্তির পরিচয় হয়। এই তিনটি চ প্রধান। মনস্তাত্ত্বিক প্রতিঘাত ও ব্যর্থ প্রে হাহাকারে কাহিনীর যবনিকাপাত হয়ে লেখকের রচনা মধ্যে মধ্যে উপভোগ্য সামগ্রিক বিচারে রস ও রম্যতা ঠিক যেন ওঠেনি। (১৯৬।

ছোট গল্প

জর্ণাল ঃ সন্তোষ গঙ্গোপাধ্যায়। কাহিনী, ১৬।১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম দু' টাকা।

গল্প আর রম্যবচনার মাঝখানে সাহিত্যের যদি কোন ক্ষেত্র থাকে, তাহলে এই বইটিকে তার মধ্যে ধরা যেতে পারে। কেননা, 'জার্ণালের' সূচিতে যে দশটি রচনা আছে ঃ স্যানাটোরিয়ম, কবর, অন্ধ, উত্তর, উত্তমা, অচির খৃস্টমাস রিক্সা, রাত্রি, অপনয়ন, জর্ণাল ঃ তার একটিকেও পুরোপুরি গল্প বা রম্যরচনা বলে মনে করা যায় না। শেষ লেখাটির নামে বইটির নামকরণ, সে লেখাটি লেখকের সাহিত্য প্রয়াসের একটি বিশিষ্ট নমুনা। এই লেখাটি অর্থহীন সাঙ্কেতিকতা, তির্যকদৃষ্টি ও অপ্রাসঙ্গিক বাক্যবিস্তারে অদ্ভুত।

ভাষা নিয়ে সচেতনভাবে লেখক নানানভাবে পরীক্ষা করেছেন। ফলে ভাষাও মাঝে মাঝে অর্থহীন হয়ে পড়েছে। যেমন এক স্থানেঃ 'তাঁদেরই সৃষ্ট পথের প্রাগ্রসরতায় আশ্চর্য স্তালিনের দেশ থেকে সুদূর কলকাতার রাজপথে মিছিলের অসংখ্য চোখের আলো এ যুগের মহাকাব্যের জিজ্ঞাসায় অভি শ্রুতির প্রত্যাশায় সন্ধ্যার রক্তরাগ ধূসরে আকাশবাণীর মত কথা কয়েছে।' এমনি ভাষা সর্বত্র ছড়িয়ে এ বইয়ের।

মণীন্দ্র মিত্র অঙ্কিত প্রচ্ছদ সুন্দর। তবে বইটির মতো প্রচ্ছদে বিদেশী রীতির ব্যর্থ অনুকরণ। ছাপা, বাঁধাই ইত্যাদিতে প্রকাশকের দক্ষতার ছাপ নেই। ৯৮।৫৫

বাবুরামের বিবি—বরেন বসু। প্রকাশক—সাধারণ পাবলিশার্স, ৭, ওয়েস্ট রো, কলিকাতা—১৭। দাম—২, টাকা।

মোট এগারোটি গল্প নিয়ে সংকলিত হয়েছে 'বাবুরামের বিবি'। অধিকাংশ গল্পেই মহাযুদ্ধ সমসাময়িক বাংলা দেশ বা যুদ্ধকালের ভয়াবহ রূপচিত্রণে প্রয়াসী হয়েছেন লেখক। ফৌজীজীবনের অভিজ্ঞতাকে অতিক্রম করেও লেখক মধ্যবিত্ত সমাজের পটভূমিকায় কিছু রচনা অবশ্য লিখেছেন, তবে তুলনামূলে প্রথমোক্ত গল্পগুলোতেই লেখক বেশী উৎকর্ষের পরিচয় দিতে পেরেছেন বলে আমাদের বিশ্বাস। 'বাবুরামের বিবি', 'কিছুক্ষণের বন্ধু', 'দ্বন্দ্ব' এ গল্পগুলোকে উৎকৃষ্ট রচনা বলে স্বীকার করবেন সকলে। তবে 'কে' গল্পটি যুদ্ধকালীন বাংলা দেশ হলেও ভালো লাগলো না। যে ছেলে আরশুলাকে এখনও ভয় করে তার যে মিলিটারী সম্বন্ধেও যথেষ্ট ভয় থাকবে তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু শিশু অন্তুকে দিয়ে যেসব ভাবনা লেখক ভাবিয়েছেন তা প্রায় অস্বাভাবিক। শান্তিকালীন বাংলা দেশের মধ্যবিত্তদের নিয়ে লেখক যতগুলো গল্প লিখেছেন তার মধ্যে একটি সত্য সর্বত্রই প্রকট হয়ে উঠেছে যে, লেখক যেন এ-জাতীয় সব গল্পেই অনাবশ্যকভাবে রূক্ষ হয়ে ওঠেন। যার জন্য 'হলধর বারুই' গল্পটি যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও তেমন দানা বেঁধে উঠতে পারেনি। বেকারজীবনের বীভৎসতা অভিজ্ঞতালব্ধ মানুষ ছাড়াও প্রতিটি ব্যক্তিই

স্বীকার করবেন, তাই তাঁদের কাছে এই বীভৎস রূপ উপস্থাপিত করতে হলে লেখককে আরও একটু কারুকলার দিকে মনোনিবেশ করতে হবে। পথেঘাটে মানুষ অনাহারে সেদিনও মরেছে, কিন্তু তার নিখুঁত ছবিটি আঁকলেই তা গল্প হয়ে ওঠে না—সাংবাদিকতার মূল্য আর সাহিত্যের মূল্য এক জিনিস নয়। সত্যিকারের রসোত্তীর্ণ সাহিত্য সাংবাদিকতার ধর্মকে অতিক্রম করে আরও কিছু দূর যদি এগিয়ে না যেতে পারে তবে তার আয়ু কতটুকু। ২৬০।৫৫

শারদীয় কিশোর সাহিত্য

বার্ষিক শিশুসাথী (১৩৬২)। সম্পাদক শ্রীহরিশরণ ধর। প্রকাশক: আশুতোষ লাইব্রেরী, ৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য—৪৲।

ছবিতে, ছাপায়, গল্পের [illegible] এবং প্রচ্ছদপটের বিশেষত্বে যে কয়টি শিশু পূজা-বার্ষিকী ছোটদের মন হরণ [illegible] হয়, বার্ষিক শিশুসাথী তাহাদের [illegible] প্রধানতম বলিতেও দোষ নাই। [illegible] বৎসরের মত আলোচ্য বর্ষের [illegible] শিশুসাথীও উহার সুনাম অক্ষুণ্ণ [illegible] হইয়াছে। ইহাতে যেমন [illegible] সমস্ত শিশু সাহিত্যিকেরাই লেখা [illegible] হইয়াছে, তেমনি নামকরা [illegible] ছবি, কার্টুন প্রভৃতি স্থান পাইয়াছে [illegible] লেখাই সুন্দর ও শিক্ষাপ্রদ। [illegible] ছোটরা একাধারে আনন্দ ও শিক্ষালাভ [illegible] ছবিগুলি, বিশেষ করিয়া বহুরঙা [illegible] দেখিয়া উহারা অত্যন্ত পুলকিত [illegible] বইটির প্রচ্ছদপট চমৎকার। ছাপা ও [illegible] প্রকাশকের রুচি এবং সুনামই ঘোষণা করিতেছে। ৪৮৪।৫৫

দেবালয়। দেব সাহিত্য কুটীর, ২২।৫বি, ঝামাপুকুর লেন কলিকাতা—৯। দাম ৫, টাকা।

'দেবালয়' ছোটদের পূজা বার্ষিকী। এই সুশোভিত সচিত্র বার্ষিকীটির লেখক-সূচীতে বাংলা দেশের খ্যাতনামা সকল লেখকই আছেন। তাঁদের রচনার বিষয়বস্তুও বিভিন্ন। অবনীন্দ্রনাথের লেখা 'গজ কচ্ছপের বৃত্তান্ত' এই বার্ষিকীর প্রধান আকর্ষণ। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি চিঠি চমৎকার। প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার, শৈলজানন্দ, প্রবোধকুমার, বনফুল, বুদ্ধদেব, সুখলতা, অন্নদাশঙ্কর, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, সজনীকান্ত প্রভৃতি লেখকদের রচনাগুলি বাংলার কিশোর পাঠক সমাজকে অশেষ তৃপ্তি দেবে। বার্ষিকীর মধ্যে একমাত্র খুঁত তিন চার রঙা আর্ট পেপারে ছাপা ছবিগুলি দু একটি ছাড়া অন্যগুলি তেমন সুন্দর হয় নি। আর সব নিখুঁত। ৩৮১।৫৫

জীবনশিল্পী শেখভ ঃ কাজি আফসার উদ্দিন আহমদ। প্রকাশক ঃ কোহিনুর লাইব্রেরী। ইসলামপুর রোড, ঢাকা। দামঃ আড়াই টাকা।

পৃথিবীর সাহিত্যে পুরোগণ্য শিল্পীদের নামমালায় শেখভ হীরকদীপ্তিতে উজ্জ্বল। ছোটগল্প ও নাটকের তিনি নিপুণ কলাবিদ্। নানা মেজাজের মানুষ, নানা ভংগীর মনন তাঁর সাহিত্যে স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব নিয়ে বেরিয়েছে, জটিল জটলায় তারা একের ভিড়ে অপরে হারিয়ে যায় না। শেখভ তাই জীবনের, আর মননের অপরূপ সুদক্ষ কারিগর। বাংলা ভাষায় শেখভের রচনা কিছু কিছু অনুদিত হলেও, তাঁর জীবন ও শিল্পের পঠন-পাঠন বিশেষ ব্যাপক নয়। 'জীবন-শিল্পী শেখভ' সেদিক থেকে একটি স্থায়ী অভাব আংশিক পূর্ণ করতে সহায়ক হবে। বইখানি শেখভের আজন্ম জীবনকথা। দ্রুত লেখনের ফাঁকে ফাঁকে কিছু কিছু ত্রুটি রয়েছে। সেটুকু না থাকলে শেখভ জীবনের নানা ঘটনার সংকলন আরো সুষ্ঠু হতে পারতো। (২৮১।৫৫)

গল্পের আলপনা—শ্রীরাধারাণী দেবী। দেব সাহিত্য কুটীর, ২২।৫বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা—৯। দাম দুই টাকা।

'পুজোর বাজারে ছেলেমেয়েদের জন্য আপাততঃ ইহাই প্রথম উপহার-গ্রন্থ। একুশটি গল্প আর আটখানি রঙীন ছবি সমেত সবশুদ্ধ ১৬২ পৃষ্ঠার বই এত অল্প দামে বাহির করা সত্যই কৃতিত্বের কথা। ইহা ছাড়া, বইখানিতে অজস্র রেখাচিত্র আছে। 'গল্পের আলপনা' নামটিও সার্থক। কারণ, কাঁচ ও কাঁচা মনের অফুরন্ত আনন্দ আর বিস্ময় কিসে স্বাভাবিক স্ফূর্তি পায়, সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া লেখিকা কল্পনা ও খেয়াল খুশীকে ছুটির রাজ্যে মুক্তি দিয়াছেন। তিনি যে সুলেখিকা এবং 'পাকা মনের পুরু আড়ালে' তাঁহারও যে কাঁচা মন বিচিত্র অভিজ্ঞতার সংবেদনে সমৃদ্ধ, তাহার পরিচয় তিনি নিজস্ব তুলিতেই প্রকাশ করিয়াছেন।

প্রাপ্তি স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থ আসিয়াছে।

মনোগন্ধা—শ্রীরাধামোহন মহান্ত।
রবীন্দ্র কথা—বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।
ইরাণের শিল্প ও সংস্কৃতি (প্রাক্ মুসলিম যুগ)—গুরুদাস সরকার।
নিবেদিতা—শ্রীমতী লিজেল রেমঁ। অনুবাদিকা নারায়ণী দেবী।
গংগাবতরণ—শ্রীউমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।
The Divine Lift—Sri Srimat Swami Nityakrishnananda Abadhut Deb Maharaj.
ঈশ-কেন-কঠ—ব্রহ্মচারী শিশিরকুমার।
গল্পে সেক্সপীয়রের ম্যাকবেথ—শ্রীপ্রফুল্লরঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়।
নির্জন পৃথিবী—শ্রীআশাপূর্ণা দেবী।
দুন্দ—বিমল কর।
নিবেদিতা—মণি বাগচি।
নটের গুরু দক্ষিণা—ননীগোপাল দত্ত।
পথের আলো—সুখলতা রাও।
মন্দার ও মালঞ্চ—কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত।
গোপাল দেব—অসীম রায়।
সাঁঝের প্রদীপ—শ্রীকালীকিরণ চট্টোপাধ্যায়।
মরুতীর্থ হিংলাজ—অবধূত।
সার্কাস—দিলীপ রায়।
Industrial and construction Co-operatives—Champa Lal.

রূপজগৎ

—শৌভিক—

রূপকথার মত অদ্ভুত

সরল ভাবধারাকে কৃত্রিমতার অদ্ভুতে পৌঁছে সাধারণ্যে হাজির করাই বোধহয় জিনিয়াসের সম্পূর্তির লক্ষণ। হয়তো যা সহজ, যা শাশ্বত তাকে একটা জটিল প্রক্রিয়ার মধ্যে ফেলে মানুষের সরল রসানুভূতিকে স্তম্ভিত ও উৎকণ্ঠিত করে দেওয়াটাই পরিণত প্রতিভা। বিচারবুদ্ধি এমনি ধারাই ধাঁধিয়ে যায় 'ভালোবাসা'-র মতো ছবির বিষয়ে ভাবতে গেলে, যে ছবিখানির কাহিনী, চিত্রনাট্যরচনা ও পরিচালনা দেবকীকুমার বসুর মতো সর্বজনশ্রদ্ধেয় প্রতিভার কাছ থেকে পাওয়া গিয়েছে। নিজের বিচারবুদ্ধি সম্পর্কে নিজেকেই এমনিধারা সন্দিগ্ধ হয়ে উঠতে হয়। ভেবে ঠিক করতে পারা যায় না যে, সত্যিই 'ভালোবাসা'র মধ্যে দিয়ে দেবকীকুমার একটা মস্ত কিছু দিয়েছেন যা অনুধাবন করতে পারা যাচ্ছে না, না দেবকীকুমারেরই চিন্তার দীনতা দেখা দিয়েছে! নয়তো আর কিভাবে এই প্রচারধর্মী ছবিখানিকে মেনে নেওয়া যায়, যাতে দীর্ঘ ঘটনার জাল বুনে এই কথাটাই যেন দেখানো হয়েছে যে কোন সুন্দরী মেয়ের সহজে প্রচুর টাকা তাড়াতাড়ি পাবার দরকার হলে তার পক্ষে সবচেয়ে প্রশস্ত ও পবিত্র ক্ষেত্র হচ্ছে সিনেমায় অভিনয়। সিনেমা জগতকে ভদ্রদ্বারা বড়ো করা হয়েছে এবং দেবকীকুমার দীর্ঘ প্রায় পঁচিশ বছর সিনেমা জগতের সঙ্গে জড়িত থেকে এইভাবে তিনি যে সিনেমা জগতের প্রতি তার শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন তা তার পক্ষে স্বাভাবিকই হয়েছে। কিন্তু ছবিখানি তিনি তৈরী করেছেন তার নিজের একার চিত্তবিনোদনের জন্য তো নয় বরং ঠিক তার উল্টোটাই, ছবি তিনি করেছেন আর পাঁচজনের দিকে লক্ষ্য রেখে; কাজেই সেক্ষেত্রে তিনি সত্যকে চাপা দিয়ে একটা ভুল ধারণা লোকের মনে ধরিয়ে দিতে গিয়ে কাহিনীর

অংগ থেকে বাস্তবতার আবেদনকেই বর্জন করেছেন। আর সেইটেই হচ্ছে ছবিখানির দুর্বলতা। সামাজিক হয়েও রূপকথার মতো আচার আচরণ, বাস্তবের বদলে কৃত্রিমতার আভরণ।

* * *

একটা অতি পুরাতন আদর্শকে কাহিনীতে এনে দেওয়া হয়েছে। সেটা হচ্ছে সাবিত্রীর পতিভক্তির আদর্শ। গল্পটা ধরতে গেলে সাবিত্রী-সত্যবানেরই গল্প। এখানে সত্যবান হচ্ছে দর্শন-শাস্ত্রের অধ্যাপক শিবনাথ ঘোষ; আর সাবিত্রী তার স্ত্রী তপতী। এদের একটি শিশু কন্যা আছে, ঝিকিমিকি, তবে কেবল শিশু-আবেদন একটু ছুঁইয়ে রাখা ছাড়া ঝিকিমিকির কোন ভূমিকা নেই মূল গল্পতে। এক উদ্ভট উৎসব দৃশ্যে কাহিনীর উদ্বোধন—তপতীর বান্ধবী অঞ্জনার জন্মদিনে উৎসব সম্মেলন। তপতী তার স্বামী ও কন্যাকে নিয়ে উপস্থিত। অঞ্জনা জানালো আগের বছর এই উপলক্ষ্যে নানাজনের বক্তৃতাদি দীর্ঘ হয়ে পড়ায় রাতের ভোজ তাদের প্রাতরাশে পরিবেশন করতে হয়েছে, তাই এবারে লটারি করে মাত্র পাঁচজনকে জীবনের সার্থকতা কিসে সে সম্পর্কে বক্তৃতা দিতে দেওয়া হবে। একটা অতি কষ্টকল্পিত কৃত্রিম পরিবেশ। এইখানেই জানা গেল শিবনাথরা অবিলম্বেই যাবে তাদের গ্রামে প্রতি বছরের নিয়মে পূজার কটা দিন কাটাবার জন্যে। ট্রেন, স্টীমার, গরুর গাড়ি করে পৌঁছতে হয়, তা বলেও দেওয়া হলো এবং দেখানোও হলো। গ্রামে এসেই স্বামী-স্ত্রী নদীর ধারে নির্জনে প্রথম প্রেমের সুষমা কুড়লে গানে গানে। নির্জনতা ভেঙে ভেসে এলো মৃতের জন্য কান্না। জমিদার শিবনাথের কর্মচারী এসে জানালো গ্রামে ম্যালেরিয়ার মড়ক দেখা দিয়েছে। এরপরই দেখা গেল শিবনাথকে ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়ায় ধরেছে। অসুখ সারলো কিন্তু শিবনাথের দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে গেলো। তপতী তার সই অঞ্জনাকে জানালে সে খবর। অঞ্জনা তার সরকারকে পাঠিয়ে শিবনাথের চিকিৎসার জন্য ওদের তার কলকাতার বাড়িতে আসতে বললে। কলকাতায় এসে ডাক্তার সেন শিবনাথের চক্ষু পরীক্ষা করে

চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন এবং শিবনাথকে কোনরকম লেখাপড়ার কাজ করতে নিষেধ করে দিলেন। ডাক্তারের নিষেধ অমান্য করে শিবনাথ একদিন তার ছুটির দরখাস্ত লিখতে গিয়ে দৃষ্টিশক্তি একেবারেই হারিয়ে বসলো। ডাঃ সেন জানালেন শেষ চেষ্টা হিসেবে এক জার্মান চিকিৎসককে দেখানো দরকার। দিল্লীতে তিনি আসবেন, তাকে আনিয়ে নেওয়া যায় কিন্তু সে অনেক টাকার ব্যাপার। তপতী ঠিক করলে সে চাকরি করে টাকা রোজগার করে স্বামীর চিকিৎসা করবে। শিবনাথ তপতীকে চাকরি করতে দিতে রাজী নয়; তার চেয়ে সে গ্রামে চলে গিয়ে থাকবার কথাই বলে। ডাঃ সেন বলেন গ্রামে চলে গেলে দৃষ্টি ফিরে পাবার সব আশাই নির্মূল হবে। শেষ পর্যন্ত শিবনাথকে তপতীকে চাকরি করতে দিতে সম্মত হতে হয়। (অঞ্জনাদের খুবই অবস্থাপন্ন দেখা গিয়েছিল; ওদের বাড়িঘর ও ঠাট দেখে তাই মনে হয়। কিন্তু ওরা শিবনাথের চিকিৎসার জন্য অর্থ সাহায্য করতে কেন এলো না বা তপতীও অমন অভিন্নহৃদয় বাল্যসখীর কাছে টাকা চাইলে না, এ ধরনের প্রশ্ন চাপা দিতে অঞ্জনার স্বামীকে একটা মোটর দুর্ঘটনায় আহত করিয়ে ওদের এ ব্যাপার থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।) তপতী নানা জায়গায় চাকরির সন্ধান করে হয়রান হয়ে উঠলো। শিবনাথ গ্রামে যাবার জন্য জিদ ধরে। তপতী শেষ চেষ্টা করলে অঞ্জনার কি এক সম্পর্কে দাদা চলচ্চিত্র প্রযোজক-পরিচালক রবি দত্তর কাছে। তপতীকে দেখে তখনি 'ফিল্ম টেস্ট' ও 'সাউণ্ড টেস্ট' করিয়ে রবি দত্ত 'ওমর খৈয়াম'-এ সাকি চরিত্রের জন্য আড়াই হাজার টাকার চুক্তি সম্পাদন করলে। কথা হলো ছবি শেষ না হলে তপতীর নাম প্রকাশ করা হবে না। তপতী জানতো শিবনাথ তার অভিনেত্রী জীবিকা অর্জনে সম্মতি দেবে না। শিবনাথ জানালে যে, এক বিরা[ট] বড়লোকের বাড়িতে ছেলেমেয়ে পড়াবা[র] কাজ পেয়েছে। রবি দত্তর মা ও অ[...] তপতীর প্রতি আকৃষ্ট হলেন। তা[রা] তপতীর কাছে তার বৃত্তান্ত শুনলে[ন] এবং তপতী যে তাদের বাড়িতে কাজ ক[রে] শিবনাথের প্রত্যয়ে আনতে সহায়[তা] করলেন। তাছাড়া তপতীকে তারা [...] নিজের কাহিনী লিখতে বললে[ন] সে-কাহিনীর ছবি তোলার জন্য। [...] ছবিরও নায়িকা তপতী। রাত জে[গে] তপতী গল্প লিখে চলে। ওদিকে জার্মা[ন] ডাক্তারের আসবার সময় হলো। তপতী তার অর্জিত টাকা ও গহনা বিক্রীর টা[কা] জমা দিল ডাঃ সেনের কাছে। সেইসা[থে] রবি দত্তকে তাগাদা দিতে লাগলো [...] শিবনাথের চোখ ভালো হলে ওঠার আগে[ই] তার শুটিং শেষ করে ফেলা [...] শিবনাথকে নার্সিং হোমে নিয়ে গি[য়ে] রাখা হলো। জার্মান ডাক্তার এ[সে] অস্ত্রোপচার করে তপতীকে আশ্বা[স] দিয়ে গেলেন তার স্বামীর দৃষ্টি ফি[রে] পাওয়া সম্পর্কে। ছবি শেষ করার [...] অবিরাম কাজ করে চলে তপতী। তারপ[র] একদিন শিবনাথের চোখের ব্যাণ্ডে[জ] খোলা হলো। স্বামী-স্ত্রীর আবার চা[...] মিলন হলো। শিবনাথের চোখে তখনও কালো চশমা; নার্সিংহোমেই থা[...] কোন কারণে তার উত্তেজিত হওয়া [...] অঞ্জনার আশঙ্কা শিবনাথ তপতী[র] অভিনেত্রী বৃত্তি জানতে পারলে অ[...] ঘটাবে। তপতী জানায় ছবি শেষ হলে [...] নিজেই স্বামীকে জানাবে। কিন্তু [...] সুযোগ আসবার আগেই শিবনাথ জা[নতে] পারলো তপতীর জীবিকা বৃত্তির ক[থা]। স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ দেখা দি[লো] কিন্তু পরে শিবনাথ তার ভুল বুঝ[লো]।

ছবিখানির আঙ্গিক পারিপা[ট্য] এমনি উঁচু স্তরের যে দৃষ্টি সারাক্ষণ

আকৃষ্ট হয়ে থাকে। কিন্তু আরম্ভ থেকেই বিচিত্র ও উদ্ভট সব ঘটনা পরিকল্পনা ও কৃত্রিম সব চরিত্র দেখতে দেখতেই ছবির শেষে গিয়ে পেঁছিতে হয়। অন্ধত্বের চিকিৎসা এবং চোখে অস্ত্রোপচার ব্যাপারের ওপরেই নাটকীয় চমক সৃষ্টি করাতেই মনোনিবেশ করা হয়েছে। সে বিষয়ে পরিচালক প্রভূত সাফল্যও অর্জন করেছেন। সত্যিকারের জার্মান ডাক্তারকে দিয়ে, সত্যিকারের সহকারী চিকিৎসক ও নার্সদের সহায়তায় অস্ত্রোপচারের দৃশ্যটি সাজানো হয়েছে ভালো; মনের ওপরে বেশ একটা ছাপ এনে দেয়। নিজে দেবকীকুমার চিকিৎসক না হয়েও এমন দৃশ্য যেভাবে দেখিয়েছেন তা আমাদের ছবিতে থাকে না, অথচ নিজে চিত্র পরিচালকরূপে দীর্ঘজীবন অতিবাহিত করেও স্টুডিওর ব্যাপার যা দেখিয়েছেন তাতে কিছু কিছু অসঙ্গতি এসে পড়েছে। তা নয়তো, স্টুডিওতে ছবি তোলার কাজ ও আড়ম্বরের দৃশ্যাবলী দৃষ্টি ও মনকে আকর্ষণ করে। অবশ্য স্টুডিও এবং চিত্রজগতের ব্যাপারে যেমন দেখানো হয়েছে তেমনটি বাস্তবে হলে ভালই হতো। সে যাক্। আসল দৈন্য ঘটেছে চরিত্রগুলির সব কটিরই পরিকল্পনায়। সব কটিই বিচিত্র ও কৃত্রিম। তপতীই এ কাহিনীর মুখ্য চরিত্র। স্বামীর দৃষ্টি উদ্ধারে সাবিত্রীর মতো তার জীবন পণ; অথচ এমন কাঁদুনে আচরণ তার, যে অমন চরিত্রের যেমন চিত্তের দৃঢ়তা প্রকাশ পাওয়া দরকার তা চাপা পড়ে গিয়েছে। শিবনাথ দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক এবং এতোই উঁচুদরের দার্শনিক যে তার লেখা বই 'যে প্রেম মুক্তি আনে' তা প্রকাশ করছে বিলেতের প্রকাশক। শিবনাথের আচরণে দার্শনিকের দণ্ড নেই। গোড়া থেকেই গল্পটিকে এমনিভাবে সাজিয়ে যাওয়া হয়েছে যাতে তপতীকে এমন অসহায় অবস্থায় ফেলা যায় যখন স্বামীর চিকিৎসার জন্যে সহজে ও দ্রুত টাকা পেতে চলচ্চিত্রে যোগদানই হয়ে দাঁড়ায় একমাত্র পথ। সাবলীল গতিতে আসেনি ঘটনাস্রোত; সাজিয়ে নেওয়ার কৃত্রিমতাই স্পষ্ট। শিবনাথের দেশের জমিদারি বিক্রী করিয়ে চিকিৎসা চলবে না; তপতীর গহনা বিক্রী করে কুলোবে না; অঞ্জনার স্বামী দুর্ঘটনায় আহত কাজেই তপতীর ওপর তার আর টান থাকার কথা নয়; পরিচালক রবি দত্তের বাবা-মা অতীব সদাশয়, তপতীর দুঃখে তাদের সমবেদনার অন্ত নেই কিন্তু তপতী শিবনাথকে লুকিয়ে অভিনয় করছে জেনেও তারা শিবনাথের সঙ্গে তপতীর লুকোচুরিতেই সায় দিলেন তপতীর জীবনকাহিনী লিখে সেই ছবিতে অভিনয়ে তপতীর সঙ্গে চুক্তি করিয়ে দিয়ে, কিন্তু তপতীকে সহজ জীবনে ফিরে যেতে সহায়তা করলেন না তারা। এরা মুখে বলেন মানুষে মানুষে ভালবাসা নেই বলেই পৃথিবীর যতো দুর্গতি; প্রতি সপ্তাহে স্বামী ও স্ত্রী পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে দীনদরিদ্র আত্মীয়দের ডেকে ভোজ দেন, মানুষকে ভালবাসতে শেখাবার জন্য। ভালোবাসার সূত্রটা ছবিতে অদ্ভুতভাবেই রক্ষা করা হয়েছে। বাড়ির চাকর হলেও তাকে ভালোবাসতে হবে, তাই অঞ্জনাদের বাড়ির চাকরকে দেখা যায় প্রভু ও প্রভুপত্নীর সঙ্গে রঙ্গ-পরিহাস করতে যা দেখে তাকে প্রভুর শ্যালক বলে ভুল হওয়া অস্বাভাবিক নয়। শিবনাথের রোগই তো হলো গ্রামের লোকের প্রতি ভালোবাসা পরবশ হয়ে রোগাক্রান্তদের দেখতে গিয়ে। স্টুডিওতে ছবিও তোলা হয় ভালোবাসার প্রতীক 'ওমরখৈয়াম' এবং তারপরই তপতীর জীবনকাহিনী। এইভাবে ভালোবাসাকে একাকার করে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ছবিময়। গানে গানে, কথায় কথায়ও শুধু ভালোবাসারই কচকচানি।

* * *

যার যেমন চরিত্র অভিনয়ও হয়েছে তেমনি। তপতী অবশ্যই মুখ্য আকর্ষণ এবং আরও বেশী চরিত্রটিতে সুচিত্রা সেন থাকায়। কিন্তু এও অনেকটা কাঁদুনে প্রকৃতির চরিত্র এবং শ্রীমতী সেনও ফুটিয়েছেন সেইভাবেই। শিব-

নাথকে দার্শনিক বলে না ধরতে পারলে চরিত্রটিতে বিকাশ রায়ের অভিনয় বেশ নাটকীয়; সমগ্র ছবিখানিতে তার অভিনয়ই মনের ওপরে বেশী দাগ টানে। পরিচালক রবি দত্তের চরিত্রে বসন্ত চৌধুরী অতি নিরীহ, শান্ত প্রকৃতির একটি কর্মীর সহানুভূতিসম্পন্ন চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। রবির বাবা ও মা'র চরিত্রে যথাক্রমে জহর গাঙ্গুলী ও মলিনা দেবীর বিচিত্র রকমের সব আচরণ; ওরা যে অঞ্জনাদের কে হন তাও দুর্বোধ্য। ভালোবাসা শেখাতে ওদের আবির্ভাব: হাসিখুশি আমুদে লোক। বেশ খানিকটা আমোদ তারা পরিবেশন করেন। অঞ্জনা ও তার স্বামীর চরিত্রে যথাক্রমে বনানী চৌধুরী ও মিহির ভট্টাচার্যকে একটি সুখী দম্পতিরূপে দেখিয়েছে ভালোই। ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় অবতরণ করেছেন অঞ্জনাদের ভৃত্যের চরিত্রে: এও একটি মজার চরিত্র এবং এ চরিত্রটিও কৃত্রিম হলেও ভানু মজা দেখিয়ে হাসবার সুযোগ এনে দিয়েছেন। আর অভিনয়ে আছেন মেনকা, সন্তোষ সিংহ, কমল মিত্র, তুলসী লাহিড়ী সলিল দত্ত, সুখেন, শ্রীজাতা প্রভৃতি।

* *

কলাকৌশলের সুন্দর কাজে একটু উঁচুদরের ছবির চেহারা পাওয়া যায়। নদীর জলের ওপরে ঝিকিমিকি, সূর্যাস্ত, বহির্দৃশ্যাদি, অস্ত্রোপচারের দৃশ্য, স্টুডিওতে ছবি তোলার দৃশ্য ইত্যাদির প্রস্তুতিতে আলোকচিত্রশিল্পী প্রবোধ দাস অসাধারণ নৈপুণ্য ও শিল্পবোধের পরিচয় দিয়েছেন। সাজসজ্জাও বেশ শিল্পরুচিপূর্ণ, পরিবেশ গড়ে তোলায় শিল্পনির্দেশক সৌরেন সেনের কাজ বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। শব্দগ্রহণ করেছেন বাণী দত্ত মণি বসু। সংগীত পরিচালনায় নচিকেতা ঘোষের কাজও ছবির কাজে এসেছে। ছ'খানি গানের মধ্যে দু'খানি রবীন্দ্রনাথের, গেয়েছেন সুচিত্রা মিত্র। তা ছাড়া গৌরিপ্রসন্ন মজুমদারের চারখানি গান আছে যা গেয়েছেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ও প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়। মন্দ জমেনি গানগুলি। ছবির কাহিনী অন্তর্ভুক্ত স্টুডিওতে ছবি-তোলার দৃশ্যে কলাকুশলীদের অনেককেই যার যা কাজে অবতরণ করতে দেখা যায়

খেলার মাঠে

একলব্য

আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে এবছরের মত কলকাতার ফুটবল মরসুমের উপর যবনিকা নেমে এসেছে। এর পর সাগর-পারের কোনো শক্তিশালী টীম কলকাতার ফুটবল আসরকে সরগরম করে তুললেও সেটা ফুটবলের অকালবোধন বলেই গণ্য হবে। ছ'মাসব্যাপী ফুটবল মরসুমকে কেন্দ্র করে ভারতের ফুটবলের পীঠস্থান এই কলকাতা ময়দানে কত হৈ-হুল্লোড়, কত উৎসাহ, কত উদ্দীপনা, কত গুজব গবেষণায় ফুটবলপ্রিয় দর্শক সমাজের সময় কেটেছে তার সীমা নেই। উৎসাহ উদ্দীপনা ও গুজব গবেষণায় সময় কেটেছে অবশ্য সাধারণ দর্শকদের, কিন্তু দল সমর্থকদের সময় কেটেছে নানা দুশ্চিন্তার মধ্যে। তাদের মনে ছিল আশা নিরাশার দ্বন্দ্ব। গাণিতিক হিসাবের নানা জটিল প্রশ্ন। কত পয়েন্টে লীগের বিপদ কাটবে? কত পয়েন্ট পেলেই বা প্রিয় দল হবে লীগ চ্যাম্পিয়ন? ঘাড়ের শত্রু বাঘে মারবে কি বাঘের শত্রু ঘাড়ে মারবে, এমনধারা কত জল্পনা কল্পনায় অতিবাহিত হয়েছে ছ'মাস-ব্যাপী ফুটবল মরসুম। এর মধ্যে যোগ্য দল লাভ করেছে বিজয়ীর সম্মান কেউ বা অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়েছে, কেউ বা ভাগ্যের জোরে করেছে অভীষ্ট লাভ। কোথাও আবার ব্যর্থতা ও সাফল্যের সালতামামির হিসাব-নিকাশ, কোথাও আগামীবারের প্রস্তুতির আলোচনা।

ক্রীড়াচাতুর্য শক্তির পরীক্ষা আর দেহ-মনের আনন্দ লাভ ছাড়া এই ফুটবল কত লোকের অন্নবস্ত্রের সংস্থান করছে, কত লোক গুছিয়ে রাখছে সারা বছরের পাথেয়, সে আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু ইট কাঠ লোহার বন্দিশালায় ঘানিটানা নাগরিক জীবনে ফুটবল যে কিছুটা বৈচিত্র্য আনে, তা অনস্বীকার্য। এতে বৃদ্ধ দাদু থেকে ছোট্ট নাতির, কিশোর যুবক থেকে গৃহের কুলবধূর আগ্রহ। ফুটবল খেলা অনেকের কাছে আবার রথ দেখা এবং কলা বেচার সামিল। খেলা দেখতে গিয়ে তারা গড়ের মাঠ থেকে খেয়ে আসেন খানিকটা মুক্ত বাতাস। শ্যামলে শ্যামল আর নীলিমায় নীল গড়ের মাঠের আকর্ষণ তাদের কম নয়। ফুটবল মরসুমে ক্লাব তাঁবুর পাশে রোজই তাদের আনাগোনা। ফুটবলের মাতামাতির পর সূর্য যখন পশ্চিম দিগন্তে ঢলে পড়ে রূঢ় বাস্তব জীবনে ক্লাব তাঁবুর আঙিনা, তখন তাদের কাছে 'ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড়' বলেই মনে হয়। বালক বৃদ্ধ যুবকের মনে দোলা লাগানো সেই ফুটবল মরসুম এবারের মত বিদায় নিয়েছে।

* * *

অনেক আগেই কলকাতার ফুটবলের উপর যবনিকা পড়া উচিত ছিল, কিন্তু লীগের খেলা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় ফুটবল টীমের রাশিয়া সফরের জন্য শীল্ডের খেলা স্থগিত রাখতে হয়, ফলে কলকাতার ফুটবল মরসুম হয়ে পড়ে দীর্ঘ। পয়লা অক্টোবর থেকে ১০ই অক্টোবরের মধ্যে আই এফ এ শীল্ডের শেষ দিকের আকর্ষণীয় খেলাগুলি অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই সময়টা কলকাতার খেলাধুলা ক্ষেত্রের অকাল অর্থাৎ এই সময়ে কলকাতা ময়দানে খেলাধুলো করবার কোন বিধান নেই। এটা আইনের প্রশ্ন।

আই এফ এ শীল্ড বিজয়ী রাজস্থান ক্লাব—মহাবীর ও গোলকিপার ঘটকের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন ক্লাবের ফুটবল সম্পাদক শ্রী এম খৈতান

ময়দানে তাঁবুর অধিকারী কোনো ক্লাবের যাতে জমির উপর স্বত্ব সামিত্ব না জন্মায় সেই উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ আমলের ভারত সরকার আইন করেছিলেন বছরে ১৫ দিন ময়দানে কোনো তাঁবুর অস্তিত্ব থাকবে না, এই সময়ে খেলা-ধুলোও থাকবে স্থগিত। পয়লা থেকে অক্টোবরের ১৫ই তারিখ পর্যন্ত এই সময়ের গণ্ডি মেপে দেওয়া হয়। স্বাধীনতা লাভের পর আইনের কড়াকড়ি হ্রাস হয়েছে, কিন্তু ব্রিটিশ আইনের কাঠামো এখনো বিদ্যমান। এখন আর তাঁবু ভেঙে ফেলবার প্রয়োজন হয় না, তাঁবু আর ক্লাবের কাজকর্ম বন্ধ রাখতে হয়। কোনো বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিলে পুলিশ কমিশনার খেলাধুলোর প্রয়োজনে মাঠ ব্যবহারের অনুমতি দেন এবং ময়দানের অশৌচকালে খেলা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এবারও শীল্ডের শেষদিকের খেলাগুলি অনুষ্ঠিত হয়েছে মাঠের অশৌচ অবস্থার মধ্যে। এখনো অশৌচান্ত হয়নি।

* * *

রাজস্থান ক্লাব এবার সর্বপ্রথম আই এফ এ শীল্ড লাভ করে তাদের ক্লাব-ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি করেছে। দলগত শক্তি অনুযায়ী রাজস্থান ক্লাবের আই এফ এ শীল্ড লাভ প্রতিযোগিতার সংগতিসূচক ফলাফল সন্দেহ নেই। তবে সমস্ত তরুণ বাঙ্গালী খেলোয়াড় নিয়ে গড়া এরিয়ান ক্লাব প্রথম রাজস্থানের সঙ্গে যেভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে, তার অকুণ্ঠ প্রশংসা করা যায়। প্রথম দিনের খেলায় এরিয়ানেরই জয়লাভ করা উচিত ছিল, কিন্তু কোনো গোল না হওয়ায় খেলাটি অমীমাংসিত থাকে। দ্বিতীয় দিন রাজস্থান ক্লাব যোগ্য দল হিসাবেই অর্জন করে বিজয়ীর সম্মান। ১৯৪৯ সালে প্রথম ডিভিশনে আগমনের পর ধনাঢ্য মারোয়াড়ী বণিক সম্প্রদায়ের সমর্থন-পুষ্ট রাজস্থান ক্লাবের দলগত শক্তি কোন-দিনই কম ছিল না। ভারতের নানা স্থান থেকে নিপুণ ও সুকৌশলী খেলোয়াড় আহরণ করে এরা প্রতি বছরই শক্তিশালী করে দল গঠন করেছে; কিন্তু কি লীগ কি শীল্ড, কোনো প্রতিযোগিতায় সাফল্য লাভ করতে পারেনি। ১৯৫২ সালে শীল্ড বিজয়ী হবার গৌরব এদের প্রায় হাতের মুঠোর মধ্যে এসেও হাতছাড়া হয়ে যায়। এ ঘটনা কারো অবিদিত নেই। এবছর এরা যখন ঐতিহাসিক আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতায় অভীষ্ঠ লাভের পথের বাধার প্রাচীর অতিক্রম করেছে, তখন আশা করা যেতে পারে লীগ বিজয়ের পথের প্রাচীর পার হতে এদের বেশী দেরি করতে হবে না।

* * *

ইউরোপীয় মিলিটারী ও সিভিল তথা মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের শক্তি হানির পর আই এফ এ শীল্ড ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানেরই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার অধিকার একরকম কায়েম হয়ে গিয়েছিল। ১৯৪২ সাল থেকে গত বছর পর্যন্ত হয় ইস্টবেঙ্গল না হয় মোহনবাগান একটি না একটি দলকে শীল্ড ফাইন্যালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে দেখা গেছে এবং এই সময়ের মধ্যে এই দুটি দল পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে ৪ বার। এবছর দুটি জনপ্রিয় দলকেই সেমি-ফাইন্যালে পরাজয় স্বীকার করতে হয়, ফলে শীল্ড ফাইন্যালের আকর্ষণও কিছু কমে যায়। কিন্তু কোনো কিছুর উপরই কারো একচেটে অধিকার থাকা উচিত নয়, থাকেও না কোন-দিন। কালের গতি এবং ঘটনার বিবর্তনে সব কিছুই বদলায়, সৃষ্টি হয় নতুন ইতিহাস, খেলার ক্ষেত্রেও এর কোন ব্যতিক্রম নেই। এদেশে ফুটবলের প্রথম যুগে ব্রিটিশ সামরিক দলের সঙ্গে সামরিক দলের খেলারই আকর্ষণ বেশী ছিল, তারপর পল্টনী টীমের সঙ্গে ব্রিটিশ সিভিল টীমের খেলার আকর্ষণ বেশী হয়ে পড়ে। মোহনবাগানের ঐতিহাসিক শীল্ড বিজয়ের পর দ্বিতীয় দশকে ফুটবল রসিক-দের আগ্রহ বেড়ে যায় সাদা আর কালোর প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। মহমেডান স্পোর্টিংয়ের উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে আবার ফুটবলে সাম্প্রদায়িকতার ছোঁয়াছ লাগে। ফুটবলে দেখা দেয় 'ম্যাকডোনাল্ডী' মনোবৃত্তি। তারপর চতুর্থ দশক থেকে কলকাতার ফুটবলে লড়

...তনের কুখ্যাত নীতিই ক্রিয়াশীল ইস্ট এবং ওয়েস্টের প্রতিদ্বন্দ্বিতা। যদিও যাদের কেন্দ্র করে ইস্ট ও ওয়েস্টের এই কাল্পনিক মানসিক বৃত্তি তারা উভয়েই সাউথের পূজারী। দুই দলই দক্ষিণ ভারতীয় খেলোয়াড়দের উপর বেশী আস্থাশীল। যাই হোক এইসব অতীত ঘটনা থেকে মনে প্রশ্ন জাগে রাজস্থান ক্লাবের আগমনের সঙ্গে কলকাতার ফুটবলে বাঙ্গালী অবাঙ্গালীর প্রশ্ন দেখা দেবে না তো?

*   *   *

অনেক দেরিতে খেলা আরম্ভ করার জন্যই হোক কিম্বা বাইরের কয়েকটি শক্তিশালী দলের পরপর বিদায় গ্রহণের ফলেই হোক এই এক এ শীল্ডের খেলা এবার ভাল জমেনি। তাছাড়া জনপ্রিয় দুটি টীম মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের আশানুরূপ ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শনের ব্যর্থতা এবং গতবারের শীল্ড রানার্স শক্তিশালী হায়দরাবাদ স্পোর্টিংয়ের প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের অক্ষমতাও শীল্ডের খেলা না জমবার অন্য কারণ। মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গল কোন টীমই তাদের পুরো শক্তি নিয়ে শীল্ডের খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেনি। ইস্টবেঙ্গল দলের পরম নির্ভরযোগ্য এবং নিপুণ খেলোয়াড় আমেদ এবং খ্যাতিমান খেলোয়াড় এস রায়ের পায়ে চোট থাকায় শেষ দিনের খেলায় অনুপস্থিত ছিলেন। মোহনবাগানের দৃঢ়চেতা অধিনায়ক এস মান্না এবং ক্ষিপ্রগতি লেফ্‌ট আউট এস দত্তও শেষদিন নিজ দলকে সাহায্য করতে পারেননি। একই কারণ। পায়ের চোট। মোহনবাগানের অন্যতম কুশলী খেলোয়াড় এস ব্যানার্জিও আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল প্রতিযোগিতার জন্য ছিলেন কলকাতার বাইরে। সুতরাং অংশ গ্রহণ করতে পারেননি। দুটি টীমকে প্রথম দিকেও অনেকটা জোড়াতালি দিয়ে দল গঠন করতে হয়। ইস্টবেঙ্গল শেষ পর্যন্ত তাদের অতীত দিনের কৃতবিদ খেলোয়াড় প্রবীণ আপ্পারাওয়ের সাহায্য প্রার্থনা করে। ইস্টবেঙ্গল কর্তৃপক্ষের স্মরণ রাখা উচিত ছিল আপ্পারাওয়ের খেলোয়াড় জীবনের দিন ফুরিয়ে গেছে। তার মত একজন বিজ্ঞ খেলোয়াড়কে এখন মাঠে নামিয়ে হাস্যাস্পদ করা উচিত নয়। এদিক দিয়ে মোহনবাগানের প্রশংসা করি। খেলোয়াড়ের অভাব হলেও তারা অনিল দেকে মাঠে নামিয়ে তাকে হাস্যাস্পদ করেননি। বাইরের খ্যাতনামা টীমগুলির মধ্যে করাচীর মহমেডান স্পোর্টিং ছাড়া আর কোন টীমের খেলার প্রশংসা করা যায় না। শীল্ড বিজয়ী রাজস্থান ক্লাবের সঙ্গে প্রশংসনীয়ভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে করাচী দল কোয়াটার ফাইন্যাল থেকে বিদায় গ্রহণ করে। গতবারের ডুরাণ্ড ফাইন্যালিস্ট ব্যাঙ্গালোরের হিন্দুস্থান এয়ারক্র্যাফ্‌ট তৃতীয় রাউণ্ডে খেলার সুযোগ পেয়েছিল কিন্তু মহমেডান দলের কাছে পরাজয় স্বীকার করে এখান থেকেই তাদের বিদায় গ্রহণ করতে হয়। রাশিয়া প্রত্যাগত তিনজন খেলোয়াড়পুষ্ট টীম বোম্বাইয়ের ওয়েস্টার্ন রেলও জর্জ টেলিগ্রাফের কাছে হেরে পরপর বিদায় গ্রহণ করে। বাইরের টীমগুলির মধ্যে এবার শিবসাগর ওয়েস্টার্ন স্পোর্টস ক্লাব বেশ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছে। কোয়াটার ফাইনালে ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে দুইদিন তারা প্রশংসনীয়ভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে দ্বিতীয় দিন মাত্র একটি গোলে পরাজয় স্বীকার করে। বাইরের অন্য কোনো টীমই ক্রীড়ানৈপুণ্যে দর্শকমনে ছাপ রেখে যেতে পারেনি।

*   *   *

সম্প্রতি আজাদ হিন্দ বাগের পুকুরে আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় সাঁতার ও ওয়াটারপোলো প্রতিযোগিতার তিনদিনব্যাপী অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেছে। ভারতের আটটি আর কলম্বো বিশ্ববিদ্যালয়—এই নয়টি বিশ্ববিদ্যালয় এবার আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় সাঁতারে অংশ গ্রহণ করে, এর মধ্যে বোম্বাইয়ের সাঁতারুরা প্রায় সব বিষয়ে উন্নত সাঁতার পটুতার প্রমাণ দিয়েছে। ভারতে সাঁতারু বলতে এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাঁতারুদেরই বোঝায়। বোম্বাইয়ের বাজাজ, লাঠি, প্রভু, কলকাতার পাণ্ডে, কমল সাহা প্রভৃতি প্রত্যেকেই সাঁতারের নিপুণ শিল্পী। এর সঙ্গে সিংহলের অলিম্পিক সাঁতারু ডি সি মার্কস যোগদান করায় স্বাভাবিকভাবেই আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়। আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় সাঁতার প্রতিযোগিতার ১০টি বিষয়ের মধ্যে সাতটি বিষয়ে নতুন বিশ্ববিদ্যালয় রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর মধ্যে ১০০, ৪০০ ও ১৫০০ মিটার ফ্রি-স্টাইল এবং ১০০ মিটার ব্যাক স্ট্রোকের সময় ভারতীয় রেকর্ড নিরূপিত সময় অপেক্ষা উন্নত। কিন্তু যেহেতু নিয়ম আছে, নিখিল ভারত সন্তরণের অনুষ্ঠান ছাড়া কোন রেকর্ডকে রেকর্ড বলে গণ্য করা হবে না সেইহেতু বিশ্ববিদ্যালয়ের সাঁতারুরাও নতুন ভারতীয় রেকর্ড সৃষ্টিকারীর মর্যাদা পাবেন না। যাই হোক সাঁতারের মরসুম আরম্ভ হয়েছে এবং অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহেই আজাদ হিন্দ বাগে সর্বভারতীয় সাঁতারুদের প্রতিযোগিতার আসর বসছে, সুতরাং এই অনুষ্ঠানে সব বিষয়েই আমরা নতুন রেকর্ডের আশা করতে পারি।
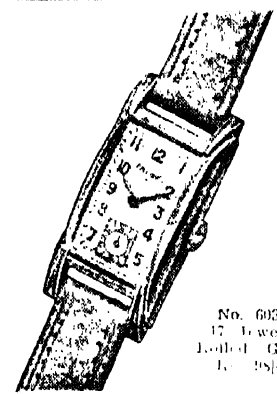
সাপ্তাহিক সংবাদ
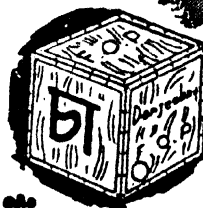
দেশী সংবাদ

৩রা অক্টোবর—কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদ অদ্য নয়াদিল্লীতে মধ্যশিক্ষার নিখিল ভারতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশনের উদ্বোধন করেন। তিনি ঘোষণা করেন যে, ভারতে মধ্যশিক্ষা পদ্ধতির সংস্কার ও উন্নতি বিধানের জন্য মধ্যশিক্ষা কমিশন যে সকল সুদূর প্রসারী সুপারিশ করিয়াছেন। সেগুলি কার্যকর করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন রাজ্য হইতে কর্মচারী সংগ্রহ করিয়া একটি ক্ষুদ্র কর্মিদল গঠনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

৪ঠা অক্টোবর—আজ প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু, পন্ডিচেরী প্রতিনিধি পরিষদের এক জরুরী অধিবেশনে বলেন যে, আগামী এক বা দুই মাসের মধ্যেই প্রাক্তন ফরাসী উপনিবেশসমূহের আইনতঃ হস্তান্তর ব্যবস্থা সম্পন্ন হইবে। তিনি ঘোষণা করেন যে, পন্ডিচেরীকে একটি বিরাট বন্দরে পরিণত করার উদ্দেশ্যে একটি জেটি নির্মাণ করা হইবে ও কয়েকটি নূতন শিল্পের পত্তন করা হইবে।

৫ই অক্টোবর—গত রবিবার হইতে প্রবল বারিপাতের ফলে পাঞ্জাব ও পেপসু ভারতের অবশিষ্ট অংশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। গত ৬০ বৎসরের মধ্যে এখানে আর এরূপ অধিক বারিপাত হয় নাই।

৬ই অক্টোবর—পাঞ্জাবের বন্যা সম্বন্ধে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায় যে, প্রায় একশত লোকের প্রাণহানি ঘটিয়াছে। শত শত গ্রামে বন্যায় আটক কয়েক হাজার লোককে উদ্ধারের জন্য সেনা বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের নিকট হেলিকপ্টার বিমান পাঠাইবার অনুরোধ জানানো হইয়াছে। গুরুদাসপুর, পাঠানকোট, জলন্ধর, লুধিয়ানা ও আম্বালা শহরে সহস্র সহস্র লোক গৃহহীন হইয়াছে।

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আজাদ আজ নয়াদিল্লীতে ঘোষণা করেন যে, ভারত সরকার জনসাধারণের জন্য সৎ ও কল্যাণধর্মী সাহিত্য রচনা ও প্রচারকল্পে একটি জাতীয় গ্রন্থ সংস্থা (ট্রাস্ট) গঠনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। মৌলানা আজাদ বলেন যে, জাতীয় গ্রন্থ সংস্থা উচ্চ শ্রেণীর সাহিত্য ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহে প্রামাণ্য পুস্তকাদি প্রকাশ এবং বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের উৎকৃষ্ট গ্রন্থরাজির অনুবাদের ব্যবস্থা করিবেন।

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহরু আজ বাঙ্গালোর হইতে আট মাইল দূরে জালাহাল্লী গ্রামে ভারতের প্রথম মেশিন টুল কারখানা হিন্দুস্থান মেশিন টুলস লিঃ-র দ্বারোদ্ঘাটন করেন। এই কারখানাটি ভারতের দ্রুত শিল্পায়নের পক্ষে অত্যাবশ্যক এবং উহা প্রায় ২৮০ একর জমির উপর স্থাপিত হইয়াছে।

৫ই অক্টোবর—আজ পশ্চিমবঙ্গ বিধান-পরিষদে এক বেসরকারী প্রস্তাবের আলোচনা-কালে পূর্তমন্ত্রী শ্রীখগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত জানান যে, এতদ্রাজ্যে বাসস্থানের অভাব পূরণের নিমিত্ত একটি গৃহনির্মাণ ফিনান্স কর্পোরেশন গঠনের প্রস্তাব এক্ষণে গভর্নমেন্টের বিবেচনাধীন আছে।

আজ অমৃতসরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট অমৃতসর জেলায় আপৎকালীন অবস্থা ঘোষণা করিয়াছেন। প্লাবিত অঞ্চল হইতে লোকজনকে উদ্ধারের জন্য বিমানযোগে রবারের নৌকা প্রেরণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করা হইয়াছে।

পাকিস্থান অধিকৃত 'আজাদ কাশ্মীরে' জনসাধারণের উপর নির্মম নির্যাতন চলিতেছে এবং 'আজাদ কাশ্মীর সরকারের' শাসন ব্যবস্থায় এই অঞ্চলে এক বিভীষিকার রাজ্য সৃষ্টি হইয়াছে। ইহার ফলে প্রায় ৩ সহস্র লোক সন্ত্রস্ত হইয়া যুদ্ধবিরতি সীমারেখা অতিক্রম করিয়া ভারতে আশ্রয় লইয়াছে।

আজ দ্বিপ্রহরে যমুনা নদীর জল বিপদ-সূচক চিহ্ন ছাড়াইয়া দুই ইঞ্চি উপরে উঠার ফলে কতকগুলি গ্রামসহ দিল্লীর শাহদারা অঞ্চলের ৬ বর্গমাইল পরিমিত স্থান বন্যার জলে প্লাবিত হইয়াছে এবং এই অঞ্চলের অধিবাসীরা স্থান ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইতেছে।

৮ই অক্টোবর—আজ কলিকাতায় ওয়েলিংটন স্কোয়ারে মধ্য কলিকাতা জেলা কংগ্রেস সম্মেলনের দুইদিনব্যাপী অধিবেশন আরম্ভ হয়। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় সম্মেলনের উদ্বোধন করেন।

পাঞ্জাবের বন্যা সম্পর্কে এক বিবৃতিতে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীভীমসেন সাচার আজ জানান যে, রাজ্যের ১৫ সহস্র গ্রামের মধ্যে সাত সহস্র গ্রাম প্লাবিত হইয়াছে এবং এক লক্ষ ১৫ হাজার গৃহ ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। জলন্ধর হইতে পি টি আই-র সংবাদে প্রকাশ, বন্যায় কয়েক সহস্র লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

৯ই অক্টোবর—ভারত গভর্নমেণ্ট কর্তৃক নিযুক্ত রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। কমিশন [illegible] মানভূম জেলার চাষ থানা বাদে পুরুলিয়া মহকুমা এবং উত্তরে পূর্ণিয়া জেলার কিষণগঞ্জ মহকুমার অধিকাংশ এবং গোপালপুর থানা পশ্চিমবঙ্গ-ভুক্তির সুপারিশ করিয়াছেন। ত্রিপুরার স্বতন্ত্র থাকিবার দাবী অগ্রাহ্য করিয়া কমিশন উহাকে আসামের সহিত যুক্ত করার সুপারিশ করিয়াছেন। কমিশন ভারতে বর্তমানের ২৭টি রাজ্যের পরিবর্তে ১৬টি রাজ্য ও ৩টি কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চল গঠন করিবার সুপারিশ করিয়াছেন। কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী দিল্লী, মণিপুর এবং আন্দামান ও নিকোবর কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলরূপে পরিগণিত হইবে।

বিদেশী সংবাদ

৩রা অক্টোবর—ফরাসী মরক্কোর ইমজোর-দ্য-মারমোচা এলাকায় প্রচন্ড সংগ্রাম শুরু হইয়া গিয়াছে। সংঘর্ষে নিহতের সংখ্যা প্রায় একশত। রিফ পর্বত এলাকাতেও সংগ্রাম জ্বলিয়া উঠিয়াছে। বিদ্রোহীরা এখানে দুইটি ফরাসী ঘাটি দখল করিয়াছে।

৪ঠা অক্টোবর—আজ রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতা শ্রী ভি কে কৃষ্ণমেনন বলেন যে, প্রজাতন্ত্রী চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে পুনর্মিলন ঘটানো সম্ভব বলিয়া তিনি মনে করেন।

৫ই অক্টোবর—মরক্কো ও আলজেরিয়ায় ফরাসী শাসনের বিরুদ্ধে যে সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন চলিতেছে, উহা এক নেতৃত্বাধীনে সংহত ও সঙ্ঘবদ্ধ করা হইয়াছে বলিয়া [illegible] ঘোষণা করা হইয়াছে।

পূর্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মিঃ আবু হোসেন সরকার আজ পূর্ববঙ্গের সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তি দেওয়ার আদেশ দিয়াছেন।

৬ই অক্টোবর—পাক গণপরিষদে গৃহীত এক-অঙ্গরাজ্য গঠন আইনের বিরুদ্ধে গণ-তান্ত্রিক ও নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সংগ্রাম [illegible] হইবে বলিয়া অদ্য এক ইউনিট বিরোধী পশ্চিম পাকিস্থান সম্মেলনের মন্ত্রণা [illegible] সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। লালকোর্তা [illegible] খাঁ আবদুল গফ্ফর খাঁ বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন।

পশ্চিম পাঞ্জাবের বর্তমান গভর্নর জনাব এম এ গুরমানী পশ্চিম পাকিস্থান প্রদেশের গভর্নর নিযুক্ত হইয়াছেন। ১৪ই অক্টোবর নূতন প্রদেশের উদ্বোধন হইবে।

৭ই অক্টোবর—বৃটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ হ্যারল্ড ম্যাকমিলন আজ রক্ষণশীল দলের বাৎসরিক সম্মেলনে বলেন যে, জার্মানীর পুনর্মিলনের পর রুশিয়ার নিরাপত্তার জন্য পাশ্চাত্য জাতিগুলি ইউরোপে নূতনভাবে তাহাদের সেনা-বিন্যাস করিতে প্রস্তুত আছে।

প্রতি সংখ্যা—।৵০ আনা, বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০,
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা, লিমিটেড, ৫ ও ৮/১ বর্মণ স্ট্রীট, কলিকাতা—১৩
শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস লিমিটেড হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদক—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

বাঙালীর শারদোৎসব

বাঙালীর শারদোৎসব আরম্ভ হইয়াছে। মাতৃপূজার মঙ্গল-শঙ্খ পশ্চিম-বঙ্গের রাজধানী কলিকাতা শহরে বিভিন্ন কেন্দ্রে বাজিয়া উঠিয়াছে। শহরে সার্বজনীন পূজার আকর্ষণই সর্বাধিক। দুর্গোৎসব বিশিষ্টতাই ইহার সার্বজনীনতা এবং চিরদিনই এই পূজার এই বৈশিষ্ট্য বাঙালী বজায় রাখিয়াছে। কিন্তু সার্বজনীনতা বলিতে এই ক্ষেত্রে সমাজের সকল স্তরের সহিত সহযোগিতা এবং এই পূজার সূত্রে তাহাদের সেবার ভাবটিই বোঝায়। প্রত্যুত খোলা মাঠে পূজার মণ্ডপ বাঁধিলেই পূজা সার্বজনীন হয় না। মাতৃপূজার সূত্রে দশ জনের সেবার সম্বন্ধে আমরা যে আনন্দ পাই তাহাতেই এই উৎসবের সার্থকতা। সার্বজনীন পূজার উদ্যোক্তৃগণের দৃষ্টি সর্বাগ্রে এই দিকে আকৃষ্ট থাকা উচিত। পূজার উপচার কিংবা আড়ম্বর এই দিক হইতে অপেক্ষাকৃত বাহ্যবস্তু এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ইহার বাহুল্যে উৎসবের মূল উদ্দেশ্য বিনষ্ট হয় এবং ইহা জনসাধারণের পক্ষে উপদ্রব-স্বরূপে পরিণত হয়। দেশের সমাজ-জীবন আজ বিপর্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে লোকের দুঃখ-কষ্টের অন্ত নাই। এই দুর্দিনে পূজার প্রতিবেশে যদি সকলের প্রতি আত্মীয়তার ভাবটি আমরা গড়িয়া তুলিতে পারি তাহা হইলে একাধারে আমাদের সমাজ-জীবনের আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক শক্তি সংহত হইয়া উঠিবে। এই দিক হইতেই আজ দুর্গাপূজার গুরুত্ব [illegible] এই পূজা এই দিক হইতেই বাঙালীর জাতীয় উৎসব। এদেশের উপদেষ্টা এবং আচার্যগণ দুর্গোৎসবের ভিতর দিয়া বৃহতের সেবার আনন্দ সম্বন্ধই জাতির অন্তরে উদ্দীপ্ত করিয়াছেন। বাঙালীর সভ্যতা এবং সংস্কৃতি এবং তাহাদের রাজনীতিক জীবনের অভ্যুদয়ের মূলে তাঁহাদের উপদিষ্ট সেই আদর্শই প্রত্যক্ষভাবে গ্রহণ করিয়া বাঙালীর গৌরবময় ঐতিহ্য গড়িয়া উঠিয়াছে। আদর্শের সেই ধারা অনুসরণ করিয়া যদি আমরা আজ মাতৃপূজায় ব্রতী হইতে পারি তবে বৈপ্লবিক প্রাণশক্তি আমাদের সমাজ-জীবনে জাগ্রত হইবে এবং দিক্‌চক্রবালের ঘনান্ধকার অপসৃত হইবে; জনগণের জন্য যিনি সংগ্রাম করেন সেই দুর্গতিহারিণী দুর্গা আমাদের পাশে আসিয়া দাঁড়াইবেন।

বিপ্লবের গতি ও রীতি

ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে আগমন করেন। তিনি কলিকাতার রাজভবনে ছাত্রদের এক সভায় দেশের বর্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে যে অভিভাষণ প্রদান করিয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পণ্ডিতজী বিভিন্ন দেশ বিশেষভাবে রাশিয়া এবং চীন এই দুই দেশের বিপ্লবের ঐতিহ্য সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তিনি বলেন কোন দেশেই বৈপ্লবিক পরিবর্তন রাতারাতি সংঘটিত হয় না। বস্তুত পরিবর্তনের গতিবেগ পূর্ব হইতে সমাজ-জীবনে সকল স্তরে সূক্ষ্মভাবে সঞ্চারিত হইয়া শেষ পর্যায়ে আসিয়া স্থূলে মূর্তি পরিগ্রহ করে। শেষের পর্যায়ের দিকটাতেই সাধারণত লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ভারতের ন্যায় বিশাল এবং বিরাট দেশের পক্ষে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের এই স্থূলে বিশিষ্টরূপটি প্রস্ফুট হইতে কিছুদিন বিলম্ব ঘটিতেছে, ইহা স্বাভাবিক। পণ্ডিতজীর যুক্তির মূল্য আমরাও স্বীকার করি। তিনি জাতিকে ধৈর্য ধারণ করিতে বলিয়াছেন, ইহারও প্রয়োজন আছে অস্বীকার করা চলে না। কিন্তু এক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য শুধু এই যে, মনের মূলে বীর্য লাভ না করিলে ধৈর্য বস্তুটি জোর করিয়া গড়িয়া তোলা যায় না। রাতারাতি বিপ্লব সংসাধন করা সম্ভব না হইতে পারে; কিন্তু জনসাধারণের মনের মূলে যাহাতে আশা জাগে, বীর্য উদ্দীপ্ত হয়, বৈপ্লবিক পরিবর্তনের গতি-বেগে অন্তত এতটুকু তীব্রতা বা ক্ষিপ্রতা থাকা প্রয়োজন। জাতি-সংগঠন প্রচেষ্টায় যদি সেই ক্ষিপ্রতা না থাকে, তবে ধৈর্য ধারণ করিবার উপদেশ নিরর্থক হইয়া পড়ে, অধিকন্তু লোকের মনে ভ্রান্তধারণা সৃষ্ট হইবার কারণ দেখা দেয়। পণ্ডিতজী ছাত্রসমাজকে চরিত্র গঠনের উপর বিশেষ জোর দিতে বলিয়াছেন। খুবই বড় কথা। কিন্তু সমস্যা হইতেছে এই যে, উপদেশের দ্বারা চরিত্র গঠিত হয় না। প্রত্যুত আদর্শের উপর ভিত্তি করিয়াই চরিত্র গড়িয়া উঠে জাতির দুঃখ-দুর্দশা দূরীকরণে গঠন-

মূলক প্রচেষ্টাসমূহকে ত্বরান্বিত করিতে গেলে ত্যাগ, তপস্যা ও পরার্থপরতা প্রভৃতি গুণগুলি পরিস্ফূর্ত হয় এবং সেই সূত্রে সমাজ-জীবনে চরিত্র-শক্তি বলিষ্ঠ হইয়া উঠিবার সুযোগ লাভ করে। এইরূপে নবজাগ্রত জাতির কর্মসাধনার ভিতর আদর্শের আগ্নেয় বীর্য যদি উদ্দীপ্ত না হয়, তবে সমাজ-জীবনে নৈরাশ্য দেখা দিবে, ইহাই স্বাভাবিক। মনস্তাত্ত্বিক এই ব্যাধি বর্তমানে জাতিকে অভিভূত করিয়া ফেলিতে উদ্যত হইয়াছে। ইহার প্রতিকার সাধন করিতে হইলে গঠনমূলক কার্যের ভিতর দিয়া বৃহত্তের স্বার্থচেতনা উদ্দীপ্ত করিয়া তোলা একান্ত প্রয়োজন। সেই পথে জাতির জীবনে প্রাণ বীর্য সঞ্চারিত হইবে, এবং চরিত্র গঠনেও জাতি আদর্শ পাইবে।

সংশোধনের দাবী

রাজ্য কমিশনের রিপোর্ট লইয়া ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। কমিশনের সিদ্ধান্ত যে চূড়ান্ত নয় এই সত্য এতদ্দ্বারা সুস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির বিগত অধিবেশনে এ সম্বন্ধে আলোচনা হয়; কিন্তু কমিটি রিপোর্ট সম্বন্ধে কোন দৃঢ় বা নিশ্চিন্ত মনোভাব প্রকাশ করিতে পারেন নাই। মনে হয় কংগ্রেসের ঊর্ধ্বতন নেতৃবৃন্দ রিপোর্ট সম্বন্ধে বিভিন্ন অঞ্চলের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করিতেছেন এবং ইহার গতি এবং পরিণতি দেখিয়া তাঁহারা এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন। আমাদের মতে পশ্চিমবঙ্গের দাবীটি এইরূপ অবস্থায় জনমতের দ্বারা সুদৃঢ় করিয়া তোলা প্রয়োজন। উত্তেজনার বশবর্তী হইতে আমরা কাহাকেও বলিতেছি না। প্রকৃতপক্ষে পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থকে ভারতের বৃহত্তর স্বার্থ হইতে আমরা বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিতে চাহি না। কিন্তু দেখিতেছি, বিহারের যে সামান্য অংশটুকু কমিশন পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য সুপারিশ করিয়াছেন তাহাতেই বিহারের কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দ ক্ষুব্ধ, রুষ্ট এবং চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন। পূর্ণিয়ার কিষণগঞ্জ অঞ্চলে ইতোমধ্যেই উত্তেজনা সৃষ্টি করিয়া অনর্থ ঘটাইবার উদ্যম আরম্ভ হইয়াছে। আমরা ইহাতে উদ্বেগ বোধ করিতেছি। আমাদের মতে পশ্চিমবঙ্গের দাবী ভারতের বৃহত্তর স্বার্থের দিক হইতে এতটাই সংগত যে সেগুলি পুনরুত্থাপিত হইলে কেন্দ্রীয় সরকার সহজেই সে সম্বন্ধে পুনর্বিবেচনা করিবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিবেন।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা উপলক্ষে দেশ পত্রিকা কার্যালয় এক সপ্তাহ বন্ধ থাকিবে। ২৯ অক্টোবর পত্রিকা প্রকাশিত হইবে না, আগামী ৫ই নভেম্বর দেশ পত্রিকা ২৩ বর্ষর ১ম সংখ্যা রূপে প্রকাশিত হইবে।

এই সংখ্যা হইতে কনিষ্ঠ জামাতা নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত পত্রাবলী ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে। ইহা ব্যতীত শ্রীমোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক লিখিত ডেনমার্ক, সুইডেন ও নরওয়ে সম্বন্ধে পায়ে-হাঁটা সচিত্র ভ্রমণকাহিনী 'লাফা-যাত্রা' এই সংখ্যা হইতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে। —সম্পাদক 'দেশ'

উদ্বাস্তু সমাগমের সমস্যা

দার্জিলিংয়ে পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের সমাগমজনিত সমস্যার সম্বন্ধে বিচার-বিবেচনা করিবার জন্য ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় কয়েকটি রাজ্যের পুনর্বাসন সচিবগণের কয়েকদিনব্যাপী অধিবেশন সম্পন্ন হইয়াছে। এই সভার আলোচনায় প্রকাশ পাইয়াছে যে, গত বৎসরের প্রথম ৮ মাসের তুলনায় বর্তমান বৎসরের প্রথম ৮ মাসে পূর্ববঙ্গ হইতে উদ্বাস্তুদের সমাগম তিন গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ফলত পূর্ববঙ্গ হইতে উদ্বাস্তুদের আগমন অবিচ্ছিন্নভাবে চলিতেছে। কতদিনে ইহার নিবৃত্তি ঘটিবে, এ সম্বন্ধে কিছুই নিশ্চয়তা দেখা যাইতেছে না। পূর্ববঙ্গের [illegible] পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তুদের সমাগম বৃদ্ধি স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে ইহা পূজার ভিড়। কিন্তু ইমিগ্রেশন সার্টিফিকেট লইয়া দলে দলে পূর্ববঙ্গের পল্লীর কৃষকেরা নিশ্চয়ই পশ্চিমবঙ্গে পূজা দেখিতে আসিতেছে না। মন্ত্রিমণ্ডলের অবলম্বিত নীতি সংখ্যালঘুদের মনে আশ্বস্তি সঞ্চারের পক্ষে অনেকটা উপযোগী গতি লইয়াছে, একথা অবশ্য স্বীকার্য। বাঙলা ভাষাকে পাকিস্থানের অন্যতম রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদা দানে পূর্ববঙ্গ সরকারের আন্তরিকতা এবং রাজনীতিক বন্দীদের মুক্তি বিধান ও মন্ত্রিমণ্ডলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের আস্থাভাজন ব্যক্তিদের গ্রহণ—এই সব পরিবর্তন অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। কিন্তু রাষ্ট্র-প্রতিবেশের মৌলিক ভিত্তির প্রশ্ন অদ্যাপি অমীমাংসিতই রহিয়া গিয়াছে। পাকিস্থানের ভাবী শাসনতন্ত্রে পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় যথাযোগ্য প্রতিনিধিত্বের সুযোগ পাইবে কি না এই সম্বন্ধে লোকের মনে প্রশ্ন জাগিতেছে। বাস্তবিকপক্ষে যুক্ত প্রতিনিধিত্বের দাবী সম্বন্ধে পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন দলের মধ্যে অদ্যাপি মতৈক্য দেখা যাইতেছে না। মৌলবী ফজলুল হক পাকিস্থানের কেন্দ্রীয় সরকারের বর্তমানে স্বরাষ্ট্র সচিব এবং শিক্ষামন্ত্রী। পূর্ববঙ্গের মন্ত্রিমণ্ডলের উপরও তাঁহার দলের পুরাপুরি প্রভাব। যুক্ত নির্বাচনের তিনি সমর্থক কি না তাঁহার নিকট এই প্রশ্ন সম্প্রতি উত্থাপিত হয়। উত্তরে তিনি বলিয়াছেন, যুক্ত নির্বাচন বা সাম্প্রদায়িক কোন পক্ষেই তিনি নাই। যুক্ত দলের অধিকাংশ সদস্য যে অভিমত প্রকাশ করিবেন তিনি তাহাই সমর্থন করিবেন। জনাব হক সাহেবের এই দ্বৈধ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মনে নৈরাশ্যেরই সৃষ্টি করিবে। এতদ্দ্বারা ইহাই প্রতীত হয় যে, সাম্প্রদায়িক নির্বাচনের সমর্থকদের শক্তিও সামান্য নয় এবং হক সাহেব তাহাদের মুখের দিকে চাহিয়াই ঐরূপ কথা বলিয়াছেন। তাঁহার অনুবর্তীদের মধ্যেও যুক্ত নির্বাচনের বিরোধী আছেন। মুসলিম লীগ দলে তো সেই পক্ষের জোর রহিয়াছেই। সুতরাং ভবিষ্যৎ এখনও অন্ধকার।

তুর্ক-ইরাকী সামরিক সহযোগিতার চুক্তিতে যোগদানকারীর সংখ্যা এখন পাঁচ হয়েছে। "বাগদাদ" চুক্তি নামে অভিহিত এই চুক্তি গত ফেব্রুয়ারী মাসে ইরাক এবং তুর্কীর মধ্যে প্রথম স্বাক্ষরিত হয়। তুর্কী NATO'র অন্তর্ভুক্ত, ইরাক তুর্কীর সঙ্গে পারস্পরিক সামরিক সহযোগিতার চুক্তি ক'রে সাক্ষাৎভাবে না হ'লেও পরোক্ষভাবে NATO'র আওতায় এসে পড়ল। আরব রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ইরাক একলা এইভাবে চুক্তিবদ্ধ হওয়ায় মধ্য-প্রাচ্যের আরব রাষ্ট্রগুলির জোটে আঘাত পড়ল। মিশর প্রভৃতি ইরাকের উপর চট্‌ল এবং তার চেয়ে বেশি চট্‌ল তুর্কীর উপরে—এইভাবে আরব রাষ্ট্রগোষ্ঠীর মধ্যে ভাঙ্গন ধরাবার জন্য। বাগদাদ-চুক্তি সম্পাদিত হবার কিছুদিন পরে বৃটেন তাতে যোগ দেয়। গত মাসে পাকিস্তান গভর্নমেণ্টের ঐ চুক্তিতে যোগদানের সঙ্কল্প ঘোষিত হয়েছে। সম্প্রতি ইরাণ সরকার ঘোষণা করেছেন যে, ইরাণও বাগদাদ চুক্তির শরিক হচ্ছে।

বলা বাহুল্য, প্রত্যেকেই বলছে, উদ্দেশ্য—শান্তি এবং স্বীয় নিরাপত্তা বৃদ্ধি। বৃটেনের কথা অবশ্য আলাদা, মধ্যপ্রাচ্যে বৃটিশ স্বার্থরক্ষার জন্য এই ধরনের সামরিক চুক্তির প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই আছে। কিন্তু অন্যদের সম্পর্কে একথা বলা চলে যে, এই ধরনের চুক্তির দ্বারা বস্তুত নিরাপত্তা বৃদ্ধি না হয়ে বরঞ্চ কমে। কারণ এইরকম স্পষ্টভাবে এক ব্লকের সঙ্গে সামরিক সূত্রে আবদ্ধ হওয়ায় অপর ব্লকের মনে ক্রোধ এবং শত্রুতা জাগবেই। সুতরাং আসলে নিরাপত্তা না বেড়ে কমল।

অবশ্য যদি কোনো দেশের এক ব্লকের কোনো বৃহৎ শক্তির দ্বারা আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা উপস্থিত হয় তখন বাধ্য হয়ে তাকে অন্য ব্লকের সহায়তা চাইতে হতে পারে কিন্তু যেখানে আপাতত সে সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না সেখানে মধ্য-প্রাচ্যের আরব রাষ্ট্রগুলির পক্ষে তার চেয়েও বেশি ইরাণ ও পাকিস্তানের পক্ষে এক ব্লকের সঙ্গে সামরিক গাঁটছড়া বেঁধে অন্য ব্লকের বিদ্বেষ উদ্রেক করা কখনই জাতীয় নিরাপত্তা বৃদ্ধির সহায়ক হতে পারে না। এইসব দেশের পক্ষে এই ধরনের সামরিক চুক্তিতে যোগ দিয়ে এক ব্লকের কাছ থেকে অস্ত্রশস্ত্রের খয়রাতি লাভ জাতির প্রকৃত নিরাপত্তা বা শক্তি বৃদ্ধি করতে পারে না। যেটুকু অস্ত্রবল বৃদ্ধি হয় তার দ্বারা রাজ্যের অভ্যন্তরে বিদ্রোহ দমন করার সুবিধা হতে পারে। অর্থাৎ বিদেশী সামরিক সাহায্য গ্রহণ করে এইসব দেশের বর্তমান গভর্নমেণ্ট-গুলির পক্ষে কেবল নিজেদের ক্ষমতা বজায় রাখার সুবিধা হতে পারে, কিন্তু বহিরাক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার প্রস্তুতি হিসাবে বিদেশী সামরিক সাহায্যের মূল্য অকিঞ্চিৎকর।

অবশ্য ব্লক-অধিকর্তাদের স্বার্থের দিক থেকে এর মূল্য আছে। কার্যত

সেই স্বার্থ প্রায়শই সামরিক সাহায্য গ্রহণকারী দেশের জনসাধারণের স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করে কারণ যে গভর্নমেণ্ট বিদেশী সাহায্য গ্রহণের চুক্তিতে আবদ্ধ হয় সে গভর্নমেণ্টের পক্ষে ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক সাহায্যদানকারী ব্লক-অধিকর্তাদের তাঁবেদারী করা অনিবার্য হয়ে ওঠে এবং অন্যদিকে ব্লক-অধিকর্তারাও যেন তেন প্রকারেণ সেই তাঁবেদার গভর্নমেণ্টের ক্ষমতা যাতে বজায় থাকে তার জন্য সচেষ্ট হন। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই জনসাধারণের স্বার্থের পরিপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠীর কর্তৃত্ব বজায় থাকার সুবিধা হয়।

মার্কিন সামরিক সাহায্য গ্রহণ করার নীতি অবলম্বন করার পরে পাকিস্তানের পক্ষে বাগদাদ চুক্তিতে যোগদান করা আদৌ অস্বাভাবিক নয় কিন্তু এতে পাকিস্তানের সত্যকারের নিরাপত্তা কিছুমাত্র বাড়েনি, বরঞ্চ উল্টাই হয়েছে। ইরাণের যে ভৌগোলিক অবস্থান তাতে ইরাণ সম্বন্ধে একথা আরো বেশি খাটে। ইরাণের জাতীয় নিরাপত্তার দিক থেকে কোনো ব্লকের সঙ্গে সামরিক সূত্রে আবদ্ধ না হয়ে নিরপেক্ষ থাকার চেষ্টাই সবচেয়ে নিরাপদ নীতি হোত। ইরাণ ও পাকিস্তান পশ্চিমা ব্লকের সঙ্গে সামরিক সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার ফলে কেবল যে *সোভিয়েট ব্লকের ক্রোধ বৃদ্ধি হোল তা নয়, মিশর প্রভৃতি আরব রাষ্ট্রগুলির বিরাগের কারণ হোল।*

এ অবস্থায় তথাকথিত "মুসলিম দুনিয়ার" একতা একটা বাজে কথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজ একদিকে মিশরের অনুগামী আরব রাষ্ট্রগুলির এবং অন্যদিকে ইরাক, ইরাণ, পাকিস্তান ও তুর্কীর জোট। এছাড়া পাকিস্তানের সঙ্গে আফগানিস্থানের আলাদা ঝগড়া আছে, পাকতুনিস্তান নিয়ে। পাকতুনিস্তান অঞ্চলগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে পশ্চিম পাকিস্তানকে "এক ইউনিট" করায় পাকিস্তান গভর্নমেণ্টের সঙ্গে আফগানিস্তানের সম্বন্ধের তিক্ততা জমে উঠেছে। মধ্যে কথা হয়েছিল আফগান প্রধানমন্ত্রী করাচীতে আসবেন, পাক প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনার জন্য। [illegible] "এক ইউনিট" শাসন চালু করা হয়েছে এবং পাকিস্তান গভর্নমেণ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, এ সম্পর্কে আফগান গভর্নমেণ্টের সঙ্গে তাঁরা কোনোরকম কথাবার্তা বলতে চান না, কারণ এটা সম্পূর্ণভাবে পাকিস্তানের ঘরোয়া ব্যাপার। ফলে আফগান প্রধানমন্ত্রীর করাচী আগমনের প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয়েছে। কেবল তাই নয়, আফগান সরকার তাঁকে করাচীস্থ রাষ্ট্রদূতকে করাচী ছেড়ে চলে আসবার জন্য হুকুম দিয়েছেন। প্রত্যুত্তরে পাকিস্তানী গভর্নমেণ্টও তাঁদের রাষ্ট্রদূতকে কাবুল ত্যাগ করার আদেশ দিয়াছেন। (পতাকা হাঙ্গামা বিবাদের একরকম একটা মীমাংসা হয়ে মাত্র কিছুদিন পূর্বে পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূত কাবুলে ফিরে গিয়েছিলেন।) দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক এখনো সোজাসুজি ছিন্ন করা হয়নি, কিন্তু যে-রকম ঘটনার গতি তাতে অদূরভবিষ্যতে সেটা হলে কেউ আশ্চর্য হবে না। যেহেতু এই ব্যাপার নিয়ে দুই গভর্নমেণ্টের মধ্যে সহজে ঝগড়া মিটবে না।

পশ্চিম পাকিস্তানকে 'এক ইউনিটে' পরিণত করার বিরুদ্ধে পাকিস্তানের ভিতরে পাঠানদের আন্দোলন সহজে নিবৃত্ত হবে না। এ প্রকারে পাঠানদের বিভক্ত করার নীতি অনুসরণ করা হচ্ছে, *যার দরুণ ডক্টর খান সাহেবের 'পশ্চিম পাকিস্তানের' মুখ্যমন্ত্রীর পদে নিযুক্ত* হওয়া সম্ভব হয়েছে। কিন্তু খান *আবদুল গফফর খানের নেতৃত্বে যে বিরোধী আন্দোলন গড়ে উঠছে সেটা* সহজে দমিত হবার নয় এবং বলা বাহুল্য এই আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে আফগানিস্তান ও পাকতুনিস্তানের পক্ষে এই আন্দোলন চালিয়ে যাবে। ফলে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে পাকিস্তান গভর্নমেণ্টের উষ্মা বাড়তেই থাকবে এবং পাকিস্তান গভর্নমেণ্ট পাকিস্তানের অভ্যন্তর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করছেন। এই তো দুই প্রতিবেশী 'মুসলিম' রাষ্ট্রের সম্বন্ধের অবস্থা।

অন্য দিকে সাক্ষাৎভাবে তুর্কীর এবং পরোক্ষভাবে ইরাক, ইরাণ এবং পাকিস্তানের NATO-র সঙ্গে [illegible] স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরুদ্ধে ফরাসী দমননীতির একরকম সহায়তাই করা হচ্ছে। মুখে অবশ্য প্রত্যেকেই মরক্কো, টিউনিসিয়া ও আলজেরিয়াতে ফরাসী চণ্ডনীতির সমালোচক কিন্তু সকলেই জানে যে, NATO'র নামে চিহ্নিত ফরাসী ফৌজ ফ্রান্স উত্তর আফ্রিকায় পাঠিয়েছে মরক্কো ও আলজেরিয়া স্বাধীনতাকামী 'বিদ্রোহী'দের পিষে মারার জন্য। এর বিরুদ্ধে NATO'র সাক্ষা অংশীদার তুর্কী এবং পরোক্ষ তাঁবেদার ইরাক, ইরান, পাকিস্তান কিছুই করতে পারছে না, করার শক্তিও নেই। অতএব দেখা যাচ্ছে 'মুসলিম দুনিয়ার' রাষ্ট্রগুলি পরস্পরবিরোধী নীতি অনুসরণ করছে।

'মুসলিম দুনিয়ার' একতা যেসব কারণে অসম্ভব হচ্ছে তার মধ্যে একটি প্রধান কারণ হোল মাতব্বরি নিয়ে বিবাদ। মিশর মধ্যপ্রাচ্যের আরব রাষ্ট্রগুলির নেতৃত্ব যেনতেন প্রকারেণ আঁকড়ে ধরে থাকতে চায়। পাকিস্তান সৃষ্টি হবার সময়ে বেশি মুসলমান অধিবাসীর দেশ হিসাবে পাকিস্তানকে মুসলিম দুনিয়ার মাতব্বর খাড়া করার অনেক চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু তা সফল হয়নি। আরব রাষ্ট্রগুলি একদা তুর্কীর অধীনে ছিল, সেজন্য তুর্কী মাতব্বরী তারা চায় না, বিশেষ করে ইজরেলের সম্পর্কে তুর্কীর নরম ভাব আরব রাষ্ট্রগুলির আদৌ পছন্দ নয়। অবশ্য তুর্কী ও *নিজেকে 'মুসলিম' রাষ্ট্র* হিসাবে জাহির করতে আগ্রহশীল নয়। ইরাণের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং *নিরচ্ছিন্ন স্বাধীনতার ইতিহাস ইরানীদের অন্য কোনো মুসলিম রাষ্ট্রের মাতব্বর'* সহ্য করতে অপারগ করে তুলেছে। অতএব 'মুসলিম দুনিয়ার' একতা বাস্তব হওয়া সম্ভব নয়।

মধ্যপ্রাচ্যের আরব রাষ্ট্র ক'টি পর্যন্ত এক হতে পারছে না। ইরাণ তো দল ভেঙ্গে এসেছে।* এখন যা আরব রাষ্ট্রগুলিকে যাহোক একটু একসঙ্গে বেঁধে রেখেছে সেটা হচ্ছে ইজরেলের প্রতি সর্ব-আরবীয় আক্রোশ। মিশর এই ইজরেল বিদ্বেষকেই কাজে লাগিয়ে আরব রাষ্ট্রগুলির উপর নিজের নেতৃত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করছে, কিন্তু পরিণামে এই নীতি [illegible] হয়ে যাচ্ছে। ১১।১০।৫৫

১।৮।৫৫

গত দশ বারো দিন বক্তৃতা তৈরী করতে ব্যস্ত ছিলাম। টাইপ করানো হল। পছন্দ হলো না, বিস্তর ঢিলে-ঢালা ফাঁক রয়েছে। এখানকার লাইব্রেরীতে রিপোর্ট খুব কম আসে। মনে থাকতে বিশেষ পরিচয় থাকলেও, একটা বিষয় সম্বন্ধে পঞ্চাশ মিনিট বক্তৃতা দিতে আমার অন্তত সাতদিনের প্রস্তুতি চাই এখনও। লোকের ধারণা আমি খুব অবাধভাবে বলি, লিখি ও যে কোনো বিষয়ে কথা কইতে পারি। কিন্তু আমি জানি আমাকে সে জন্য কতটা খাটতে হয়। সময় পেয়েছি অনেক—আমি জীবনে ব্রিজ পর্যন্ত খেলিনি। সময় কাটাবার উপায় থাকলে হয়তো সময় পেতাম না। তবু আমার মানসিক পরি-বেশের মধ্যে বিস্তর গলদ রয়েছে। লোকে যাকে 'অর্গানাইজেশ্যান' বলে, সেটা আমি কখনও শিখিনি। এটা চরিত্রের দোষ। অর্গ্যানাইজেশ্যান দুই ধরনের—এক ব্রাহ্মণেরা যেভাবে সমাজ বেঁধে-ছিলেন, আর এক যাকে বৈশ্যবৃত্তি বলা চলে। সমবার্ট 'ক্যাপিটালিস্টিক স্পিরিট' বা পুঁজিবাদের এক অর্থ র‍্যাশনালিস্ট' দিয়েছেন। সেটা দাঁড়ায় এ্যাকাউন্টিং'-এ। এই হিসেবের মধ্যে যে বিন্যাস-ধর্ম আছে, আমার সেটাও নেই। ব্রাহ্মণবৃত্তি তো দূরের কথা। অথচ প্ল্যানিং-এ আমি একান্ত বিশ্বাসী—তার মূল ধর্ম হল যুক্তিবত্তা আর প্রধান লক্ষ্য জাতীয় হিসাবকরণ। সমাজের, অর্থবিন্যাসের বেলায় প্ল্যানিং আর নিজের বেলায় অব্যবস্থা। বোধ হয় বুদ্ধি বিস্তার আর বিকাশ বা অভিব্যক্তি, পৃথক জিনিস। একটি জৈব, মানবীয় বুদ্ধিসর্বস্ব—র‍্যাশনা-লিজমের চরম কথা। অন্তত এই যুগে তো তাই—অন্য যুগে ভিন্ন অর্থ ছিল।

* * *

লেকীর 'হিস্ট্রি অব্ র‍্যাশনালিজম' বইখানা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। দেখে চিনতে পারলাম না, অর্ধেক পাতাই নেই। লেকী কি লিখেছেন ঠিক মনে নেই। নিজেই চিন্তা করা যাক্। এই রকম একটা নক্সা মনে ভাসছে—সেইটে সাজিয়ে গুজিয়ে যদি অন্য কেউ লেখেন, মন্দ হয় না। 'রীজন' বা বিচার-শক্তি হল মুখ্যত গ্রীক, পুরোপুরি নয়। ভারতীয় ভাব। অবরোহ প্রণালীর জ্যামিতিক যুক্তি (ইউক্লিড ও আলেক্-জান্দ্রিয়া)। অ্যারিস্টটলের ন্যায়শাস্ত্র। (পুরানো গ্রীক ডায়েলেক্‌টিক নির্লোপ হল কেন?) সেন্ট টমাস অ্যাকুইনাসের চেষ্টা, প্রজ্ঞা এবং বিশ্বাসের সমন্বয় করবার! আমাদের বৌদ্ধ ন্যায়, শংকর, রামানুজ কারোরই 'পিওর রীজন' নয়, আবার 'ডিভাইন রীজন'ও নয়। তবে একটা মিল থাকতে পারে। য়ুরোপের মধ্যযুগে ও ফরাসী বিপ্লবের সময় রীজন হচ্ছে প্রাকৃত নিয়ম বা আইনের সিদ্ধান্ত। আমাদের কর্মের দর্শনের ফল। কান্টের প্রথম বক্তব্য ও দ্বিতীয় বক্তব্য বিপরীত। কান্ট ও রুশো এদের মূলগত পার্থক্য কম। এ দুইই কার্টেজিয়ন রীজন-এর বিপক্ষতার ইতিহাস, এবং দুটোই এথি-কাল রীজন বা নীতির ন্যায়। অযৌক্তিকতার ইতিহাস শুরু হল রুশো থেকে নয়, জার্মানির রোম্যান্টিক মুভমেণ্ট থেকে। চলছে জাতীয় চরিত্র-নীতি থেকে বর্তমান "ঠাণ্ডা যুদ্ধ" পর্যন্ত। নীট্‌শে-লরেন্স সংবাদ। বিচার এবং বিশ্লেষণ—অর্থাৎ সংশয়ের দর্শন—ডেকার্ট থেকে ব্যালফোর পর্যন্ত। এই অধ্যায়ে হিউমের স্থান অনেকখানি জুড়ে রয়েছে। তারপর শেষে আসছে বিচার এবং আধুনিক বিজ্ঞান। মোট কথা যা দাঁড়াচ্ছে, তা এই: র‍্যাশনালিজম হচ্ছে হিউম্যানিজমের সব চেয়ে বর্ধিত রূপ; বিপরীতটা নয়। তারপর র‍্যাশনালিজমের সীমা-জ্ঞান। এখানে অনেককেই আনতে হবে। ভারতীয়দের মধ্যে শ্রীঅরবিন্দকে নিশ্চয়। এই জ্ঞান অযৌক্তিক নয়। তবে ভারতবর্ষে এক হয়ে যাবার ভয় আছে।

কিছুদিন আগে E A Preyre নামে ফরাসী লেখকের 'দ্য ফ্রীডম অব ডাউট' বলে একখানি ভালো বই পড়ি। ইনি প্রাকৃত সংশয়বাদীর চিন্তা নিয়ে নিজের মানসিক অভিব্যক্তির ইতিহাস

লিখেছেন। এঁর কাছে সংশয় হল নিশ্চিত বৈজ্ঞানিক দর্শন। চমৎকার চমৎকার উদ্ধৃতি আছে বইখানায়। আমাদের দর্শনের নেতিবাদ ভদ্রলোক জানেন না কেন, বুঝলাম না। একজন কাশীর পণ্ডিতের কাছে 'ন' কথাটির চমৎকার ব্যাখ্যা শুনেছিলাম। আমাদের নব্য ন্যায়ের 'অ' সদ্‌ভাবাত্মক। যেমন নন-ভায়োলেন্সের 'নন্‌' শব্দটি গান্ধীজীর মতে।

* * *

সন্দেহবাদ সম্বন্ধে আমার নিজের মানসিক স্থিতিটা কি? দুটি মন্তব্য মনে আসছে। শ্রীঅরবিন্দ আমার বিষয়ে (বোধ হয় দিলীপকে) একবার লিখেছিলেন, "Dhurjati, like a good chimney, is burning his somke." এখনও কিন্তু ধোঁয়া যায় নি। আর শ্রীকৃষ্ণপ্রেম (নিক্সন) একবার আমাকে বলেছিলেন,

Ever since I knew you, you have been standing on the brink." কৃষ্ণপ্রেম আমার বহু পুরাতন ও অন্তরঙ্গ বন্ধু। এখনও সেই মাটির শেষ কিনারায়, পার্থিব সীমান্তে দাঁড়িয়ে আছি। এটা বুদ্ধির দম্ভ, মনুষ্যত্বের আত্মগরিমা এবং সবটা অজানার ভয়ের সঙ্গে মিশে আছে। কিন্তু এতে লজ্জা পাই না। জানি আমার বিদ্যাবুদ্ধির দৌড়। জানি তার অতিরিক্ত প্রকাণ্ড আকাশ। সেখানে এই জীবনের অনুমান-পরিমাণ অচল। তবু সেখানেও এই বুদ্ধিরই প্রসার চাই। অন্য যন্ত্র, অন্য উপায় নেই। অনুভূতি? কে তাকে অস্বীকার করছে? কিন্তু অনভূতিরও আইন-কানুন আছে। সেটা অনুভূতি আবিষ্কার করবে না,—করবে ও করছে এই বুদ্ধি, যেমন অণু-পরমাণুর ক্ষেত্রে। ঠিক এই বুদ্ধি না হলেও মার্জিত বুদ্ধি। তবু বুদ্ধি—অনুভূতি নামে পৃথক বস্তু নয়। অতএব সংশয়ের অর্থ বুদ্ধির মার্জন-ক্রিয়া বা পদ্ধতি মাত্র। তারপর?

তারপর জানি না। তারও পরে আমার কৌতূহল নেই। মুখ ফিরিয়ে নেওয়াই ভালো। পাইলেট-এর মতন মুখ-ফেরানো নয়, বুদ্ধের মতন।

১৮।৮।৫৫

* * *

জাকর্তা-শহরে রাত কাটালাম। জাকর্তা প্রকাণ্ড শহর। খুব চওড়া রাস্তা, ধারে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাড়ি, প্রায় প্রত্যেকটাই শুনলাম ডাচ্‌ কোম্পানির। ডাচেদের কাছ থেকে ওরা পরিচ্ছন্নতা শিখেছে। প্রকাণ্ড হোটেল, পৃথক পরিবারের জন্য পৃথক বন্দোবস্ত। এক একটি সুইট্‌এর সামনে ছোটো বারান্দা, ফুল ও লতাপাতায় সাজানো। সবই য়ুরোপীয়ান প্রায়, দু'চার জন দোআঁশলা। সামনের হল্‌-এ তিনজন ডাচ ও একজন দো-আঁশলা ডাচ জিন্‌ খাচ্ছে। একজন আমাকে দেখে "নেহরু নেহরু" বলে চেঁচিয়ে উঠল। মাত্রা একটু বেশী হয়েছিল। আওয়াজে বিদ্রূপ ছিল সন্দেহ হোলো, তাই সটান তার সামনে দাঁড়ালাম। ডাচ্‌ ভাষায় কি বক্‌ বক্‌ করল। খানিক পরে বেসামাল হতে বন্ধুরা ধরে তার মোটরে তুলে দিলে। সন্দেহ হোলো, লোকটি দেশ স্বাধীন হতে সুখী হননি, এবং নেহরুকে সেই জন্য দায়ী করছেন। এই ধরনের "চীজ্‌" আমাদের দেশেও সেদিন পর্যন্ত ছিল। তবে আমার সন্দেহটা নিতান্ত অকারণ হতে পারে। আমার মাথার টাক্‌ নেহরুর মতন, আর ধুতি-পাঞ্জাবী ও রঙীন চশমা পরলে রাজাজীর মত দেখায়, অনেকেই বলেছেন। রানিখেতের রাস্তায় দূর থেকে শ্রীচণ্ডুলাল ত্রিবেদী রাজাজী বলে ভ্রম করেছিলেন; এলাহাবাদের প্রধান বিচারপতি শ্রীবিধু মল্লিক মোটর থেকে নেমে ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার পর তাঁর ভুল ভাঙ্গে। রামানন্দ বাবুকে রবীন্দ্রনাথ বলে ভুল করেছিল তিনি লিখেছিলেন। ফলে তাঁকে দেশবাসীর কাছে ঠাট্টা ভোগ করতে হয়েছিল। তবে হল্যাণ্ডে আমি ঐ ধরনের অনেক "চীজ্‌" দেখেছি। তাঁরা দেশ স্বাধীন হবার পর দেশত্যাগী হয়েছেন অবশ্য কোটি কোটি টাকা সরিয়ে ফেলে। এ ধরনের ভারতবাসীর সংখ্যা বিলেতে নিতান্ত কম—নেই বললেই চলে। অবশ্য ভারত ইংরাজের অধীনে ছিল দেড়শ বছর, আর এরা ডাচের অধীন ছিল তিনশ' বছর। দোকান পসারের ওপর সব ডাচ লেখা। গাছ পালা আবহাওয়া, আর অবশ্য চেহারা ছাড়া মনেই হোলো না এশিয়ার কোনো শহরে রাত কাটালাম। অথচ হাওয়াই বন্দর থেকে বেরুতে এত দেরী হোলো ... মজ্জায় মজ্জায় বুঝলাম এ দেশ এশিয়ার মধ্যে। খাওয়ার পর শহরে কিছু ঘুরলাম। রাতে প্রত্যেক শহরই সুন্দর দেখায়। বিকেলে বৃষ্টি হয়েছিল, ... আরও সুন্দর দেখাচ্ছিল। গাছের পাতা থেকে বড় বড় ফোঁটায় জল পড়ছিল। মস্ত মস্ত পাতা। রাত বারটা পর্যন্ত রাস্তায় মোটরের ভিড়। রাতের ... হোলো না। শরীর ভীষণ ক্লান্ত।

রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত

আন্তর্জাতিকতা কথাটি বড় খটমট। মনে হয় শব্দটি এখনও আমাদের ভাষায় ঠিক ধাতস্থ হয় নাই। কোন বিদেশী বস্তুর অর্বাচীন দেশী নামের ন্যায় কথাটি একটু উদ্ভট শোনায়। ইংরাজের কাছে ইণ্টারন্যাশনালিজম্ বা কস্‌মোপলিটানিজম্ যেমন একটি সহজ কথা আমাদের কাছে আন্তর্জাতিকতা তেমন সহজ কথা বলিয়া মনে হয় না। অথচ এই ইণ্টারন্যাশনালিজম্‌এর আদর্শ আমরা যত বুঝিয়াছি তত বোধ হয় অন্য কোন দেশ বোঝে নাই। বস্তুত ইণ্টারন্যাশনালিজম্ বলিতে যাহা বুঝি আমাদের অনুরূপ আদর্শের মূলবস্তু হইতে তাহা বহুলাংশে ভিন্ন। আমাদের ইণ্টারন্যাশনালিজম্-এর মূলে মিত্রতা, পাশ্চাত্ত্যের ইণ্টারন্যাশনালিজম্-এর মূলে অবৈর। আমাদের ইণ্টারন্যাশনালিজম্-এর আদর্শ মানবতার আদর্শ, ইহার সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক গৌণ। এবং ইহার বড় প্রমাণ এই যে আমরা যখন ন্যাশনালিজম্ লইয়া ব্যস্ত তখনও আমরা ইণ্টারন্যাশনালিজম্-এর আদর্শ প্রচারে তৎপর। ইউরোপ জাতিবৈর হইতে আন্তর্জাতিকতার আদর্শে উপনীত হইয়াছে। আমাদের আন্তর্জাতিকতার উৎস আমাদের ধর্মবোধ। আমরা পরাধীন অবস্থায়ও বিশ্বমৈত্রীর কথা চিন্তা করিয়াছি। প্রথম মহাযুদ্ধের পর গান্ধী বলিলেন, ভারতের স্বাধীনতায় বিশ্বের কল্যাণ; এবং সেই সময়ই রবীন্দ্রনাথ বলিলেন—সমস্ত বিশ্ব একটি নীড়। এ রাজনীতির কথা নয়; এ একান্তভাবে ধর্মের কথা, আধ্যাত্মিকতার কথা। এ তত্ত্ব উপনিষদের তত্ত্ব, এভাব আমাদের মজ্জাগত। যে কথা মহাভারতে সেই কথাই উপনিষদে এবং সেই কথাই শুনি চণ্ডীদাসের ও মধ্য যুগের [illegible]দের গানে।

ধারক রাজা রামমোহন রায়। আমাদের ধর্মজীবনের এ মূল কথাটি আমাদের জাতীয় জীবনে উপলব্ধি করিয়া রামমোহন তাহা সমস্ত বিশ্বের নিকট উপস্থিত করিয়াছেন। মনে হয় ধর্ম ও সমাজ সংস্কারে রামমোহনের কীর্তি

রাজা রামমোহন

স্মরণ করিতে যাইয়া তাঁহার এই বিশ্বমৈত্রীর আদর্শের কথা আমরা কিছুটা বিস্মৃত হইয়াছি। রামমোহনকে আমরা বোধ হয় এ পর্যন্ত একেবারে ঘরের মানুষ করিয়া রাখিয়াছি--সারা পৃথিবীর জন্য তিনি কি ভাবিয়াছেন, কি বলিয়াছেন তাহার ইতিহাস পণ্ডিতের গ্রন্থে নিবন্ধ --আমরা সে আলোচনা বড় করি না। কিন্তু বোধ হয় এ আলোচনার সময় আসিয়াছে। কারণ আজ আমরা সারা পৃথিবীকে যাহা শুনাইতে ও বুঝাইতে চাই তাহা একালে রামমোহনই প্রথম শুনাইয়াছেন।

রামমোহনের এক জীবনী গ্রন্থে এক ইংরাজ মহিলার এই উক্তিটি উদ্ধৃত হইয়াছে:

"I take a personal concern in ... since I have seen the excellent Rammohun Roy."

জেরেমি বেন্থাম রামমোহনকে বলিয়াছিলেন—"My collaboratior in work for humanity."

কিন্তু আজ কয়জন বিদেশী রামমোহনের কথা জানেন? প্রসিদ্ধ ইংরাজ ঐতিহাসিক টয়েনবী তাঁহাকে একজন বড় humanist বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন সত্য, কিন্তু সাধারণ ইংরাজ ঐতিহাসিক বা ইতিহাস পাঠক এত কথা জানেন বলিয়া মনে হয় না। তবে এ অভিযোগের অর্থ নাই। আমাদের প্রশ্ন রামমোহনকে আমরা বুঝিয়াছি কি না; তাঁহাকে অপরে বুঝিল কিনা সে প্রশ্ন এখানে অবান্তর।

রামমোহনের বিশ্বমৈত্রীর আদর্শ তাঁহার একেশ্বরবাদের সঙ্গে যুক্ত। তাঁহার মূলকথা—এক ঈশ্বর, এক বিশ্ব। সমস্ত পৃথিবীতে এক মানবসমাজ এবং তাহার এক ধর্ম এমন আদর্শের উল্লেখও তাঁহার বহু কথায় পাই:

"I can never hope in my day to find mankind of one faith, and it is my duty to exercise the charities of life with all men" (Life and Letters of Raja Rammohan Roy Collet. ২য় সং—পৃঃ LXIII)। তবে বিভিন্ন দেশের মধ্যে ঐক্য স্থাপন ও রক্ষার জন্য তিনি একটি জাতি সঙ্ঘের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে ফরাসী দেশে প্রবেশ করিবার অনুমতি চাহিয়া তিনি ফরাসী পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নিকট যে পত্র প্রেরণ করেন তাহাতেই তিনি এই বিশ্বসঙ্ঘের কথা উল্লেখ করেন। এ ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের কথা। ইহার এক বৎসর পরেই তাঁহার তিরোভাব। দীর্ঘতর জীবন পাইলে তিনি বোধ হয় এই ক্ষেত্রে আরো কিছুদূর অগ্রসর হইতেন। এই ঐতিহাসিক পত্রখানি ব্রজেন্দ্রনাথের রামমোহন রায়ের জীবনীতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। আমরা ইহা হইতে দুইটি অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করিলাম:

"It is now generally admitted that not religion only but unbiassed commonsense as well as the accurate deductions of scientific research lead to the conclusion that all mankind are one great family of which numerous nations and tribes existing are only various branches. Hence enlightened men in all countries

facilitate human intercourse in every manner by removing as far as possible all impediments to it in order to promote the reciprocal advantage and enjoyment of the whole human race.

I beg to observe that it appears to me, the ends of constitutional government might be better attained by submitting every matter of political difference between two countries to a Congress composed of an equal member from the Parliament of each; the decision of the majority to be acquiesced in by both nations and the chairman to be chosen by each nation alternately, for one year, and the place of meeting to be one year within the limits of one country and next within those of the other; such as at Dover and Calais for England and France.

By such a Congress all matters of difference, whether political or commercial, affecting the natives of any two civilized countries with constitutional governments, might be settled amicably and justly to the satisfaction of both and profound peace and friendly feelings might be preserved between them from generation to generation."

রামমোহন বুঝিয়াছিলেন যে কোন দেশের দুর্গতি সমস্ত মানবসমাজের দুর্গতি এবং সেই দুর্গতির নিরাকরণে সমস্ত মানবসমাজের কল্যাণ। পৃথিবীর যে কোন জাতির সমস্যা সমস্ত মানবজাতির সমস্যা এবং কোন একটি দেশের উন্নতিতে সমস্ত পৃথিবীরই উন্নতি। সমসাময়িক সমস্ত রাজনৈতিক আন্দোলনে তাঁহার সমান উৎসাহ। নেপ্‌লস স্বাধীনতা হারাইলে তিনি তাঁহার এক ইংরাজ বন্ধুকে লিখিলেন—

"From the late unhappy news I am obliged to conclude that I shall not leave to see liberty universally restored to the nations of Europe, and Asiatic nations, specially those that are European colonies, possessed of a greater degree of the same blessing than what they now enjoy. Under these circumstances I consider the cause of the Neopolitans as my own, and their enemies as hours. Enemies to liberty and friends of despotism have never been, and never will be, ultimately successful."

ইংলণ্ডে যাইবার পথে কেপ কলোনীর নিকটে দুখানি ফরাসী জাহাজে ফরাসী ত্রিবর্ণ পতাকা দেখিয়া রামমোহন তাহাকে স্বাধীনতার প্রতীক বলিয়া অভিবাদন করিয়াছিলেন। এই সম্বন্ধে তাঁহার ইংরাজ জীবনীকার লিখিয়াছেন:

"Lame as he then was, owing to a serious fall from the gangway ladder, he insisted on visiting them. The sight of the republican flag seemed to render him insensible to pain."

ইংলণ্ডের রিফর্ম বিল আন্দোলন সম্বন্ধে রামমোহনের মন্তব্যেও দেখি এই উদার মানবতার আদর্শ:

"The struggles are not merely between the reformers and anti-reformers, but between liberty and oppression throughout the world; between justice and injustice, and between right and wrong. But from a reflection of the past events of history, we clearly perceive that liberal principles in politics and religion have been long gradually but steadily gaining ground, notwithstanding the opposition and obstinacy of despots and bigots."

দেশের কাজেও রামমোহন অন্ধ দেশপ্রীতির দ্বারা কোন সময়ে আচ্ছন্ন হন নাই। তিনি হিন্দুশাস্ত্র মন্থন করিয়া

বেদান্তের একেশ্বরবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করলেন, নানা সংস্কৃত গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ প্রচার করিলেন। বাংলা ভাষার ব্যাকরণ রচনা করিলেন, বেদান্ত ইত্যাদি দর্শনের চর্চার ব্যবস্থা করিলেন, দেশের দুরবস্থা দূর করিবার জন্য বিদেশী সরকারের সঙ্গে সওয়াল করিলেন, তিনিই আবার দেশে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও জ্ঞানের বিস্তারের জন্য আগ্রহশীল। ইহাও তাঁহার মানবতারই আর এক প্রকাশ। যাহা কিছু মহৎ ও কল্যাণকর তাহা সমস্ত পৃথিবীরই সম্পদ। সে সম্পদ গ্রহণে ও ভোগে সমস্ত দেশের সমান অধিকার। যাহা আমার নাই তাহা আমি অন্যের নিকট হইতে লইব—যাহা আমার আছে, অন্যের নাই তাহা আমি অন্যকে দিব। রামমোহন অপর দেশের সামগ্রীকে নিজের করিয়া দেখিতে উৎসাহী; এক্ষেত্রে কোন অন্ধ জাতীয়তা বা চিত্তের কোনপ্রকারে সংকীর্ণতা তাঁহাকে কোনদিন আচ্ছন্ন করে নাই। তাই বলিতে পারি যে পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারের জন্য তিনি যাহা কিছু করিয়াছেন তাহার মূলেও এই বৃহৎ মানবতার ভাব। এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর রেনেসাঁস্ বলিতে আমরা যাহা বুঝি তাহা বহুলাংশে এই মানবতা বা বিশ্ব-বোধ দ্বারা প্রবুদ্ধ। যে ইংরাজের সঙ্গে আমরা রাজনৈতিক জীবনে নানা কলহ করিয়াছি তাঁহারই দেশের ভাষা, সাহিত্য, জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চায় আমরা কোন সংকোচ বোধ করি নাই। এক স্বাধীন জাতির এই উদার মানবতা বোধহয় কিছুটা বিস্ময়কর। আমরা যেমন দিতে চাহিয়াছি তেমন লইতে চাহিয়াছি, এবং আমাদের এই গ্রহণে যেমন ভিক্ষার ভাব ছিল না সেইরূপ আমরা যখন অন্যকে কিছু দান করিতে চাহিয়াছি তখনও বোধহয় আমরা অহংকারে মত্ত হই নাই। এ ভাব পাশ্চাত্ত্যে বিরল। সেখানে অপরের কথা বুঝিবার ইচ্ছা বড় নাই—অপরের কাছ হইতে লইবার আগ্রহ আদৌ নাই। এবং অধ্যাপক আর্নল্ড টয়েনবী যাহাকে "provincialism of the western mind" বলিয়াছেন তাহা জগতের পক্ষে বড় কল্যাণকর বলিয়া মনে হয় না। বিভিন্ন জাতির মধ্যে নানা-বিধ সম্বন্ধ রাজনৈতিক, বাণিজ্য, সমরসজ্জা প্রভৃতি নানা ব্যাপার লইয়া নানা চুক্তি। কিন্তু সকলের বড় সন্ধি ভাবের সন্ধি, চিত্তের সঙ্গে চিত্তের সংযোগ। এ সন্ধি বা সংযোগ না থাকিলে সমস্ত কাগজপত্রের বোঝাপড়া ব্যর্থ হইবেই। আজ যদি ইংরাজের সঙ্গে আমাদের কিছু সদ্ভাব হইয়া থাকে তাহা এই ধরনের সংযোগেরই ফল। অন্ততঃপক্ষে আমরা ইংরাজকে বুঝিয়াছি, তাহার ধর্ম, ভাষা, সাহিত্য, জ্ঞান বিজ্ঞান প্রভৃতির মূল্য উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিয়াছি এবং আমাদের প্রয়োজন অনুসারে তাহার সভ্যতার নানা বস্তু অসংকোচে গ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু ইংরাজ তাহা করে নাই। আমরা ইংরাজকে যত বুঝিয়াছি ইংরাজ আমাদের তত বোঝে নাই। এবং আমাদের সঙ্গে ইংরাজের সদ্ভাবের যদি কোনদিন অবসান ঘটে বোধহয় তাহা এই কারণেই ঘটিবে।

রামমোহন পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার প্রতি অবিদ্বিষ্ট, বরং সে সভ্যতার বহুকিছু আত্মসাৎ করিতে তিনি আগ্রহশীল। এ বিষয়ে লর্ড আমহার্স্টকে লিখিত শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার পত্রখানি স্মরণ করা যাইতে পারে। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দের ১১ই ডিসেম্বরে লিখিত এক পত্রে তিনি লর্ড আমহার্স্টকে বলেন,—

"The Sanskrit system of education would be the best calculated to keep this country in darkness. We want a more liberal and enlightened system of instruction, embracing mathematics, natural philosophy, chemistry, anatomy with other useful sciences."

তিনি যখন উপনিষদের একেশ্বরবাদ প্রচারে ব্যস্ত তখনও তিনি বেদান্ত চর্চার কুফল সম্বন্ধে সচেতন:

"Neither can much improvement arise from such speculations as the following, which are the themes suggested by the Vedanta,—in what manner is the soul absorved in the deity? What relation does it bear to the Divine Essence? Nor will youths be fitted to be better members of society by the Vedantic doctrines which teach them to believe that all visible things have no real existence, that as father, brother, etc. have no actual entity and therefore the sooner we escape from them and leave the world the better."

বিদ্রোহেও বোধহয় এত তেজ ও সাহস ছিল না। এই সাহসের মূলে আত্ম-বিশ্বাস এবং যেখানে গভীর আত্মবিশ্বাস সেখানেই মানবসমাজে বিশ্বাস। রামমোহনের দেশাত্মবোধ মানবতার আদর্শে পুষ্ট। এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর ও এ কালের সমস্ত বাঙালী মনীষী তাঁহার এই আদর্শেরই উত্তর অধিকারী। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে রামমোহন যে কথা লর্ড আমহার্স্টকে লিখিলেন, ঠিক সেই কথাই ত্রিশ বৎসর পর বিদ্যাসাগর লিখিলেন ডাঃ জে আর ব্যালান্টাইনকে:

"That the Vedanta and Sankhya are false systems of philosophy, is no more a matter of dispute. These systems, false as they are, command unbound reverence from the Hindus. Whilst teaching these in the Sanskrit course, we should oppose them by sound philosophy in the English course to counteract their influence."

যাহা সময়োপযোগী ও শ্রেয় তাহা বিদেশী হইলেও আমরা কোনকালে প্রত্যাখ্যান করি নাই। আমাদের জাতীয়তায় গোঁড়ামি নাই—আমাদের স্বাদেশিকতায় সংকীর্ণতা নাই।

ইউরোপে যাহা liberalism-এর আদর্শ বলিয়া পরিচিত তাহা ইউরোপীয় লিবারেলিজম্—সে উদারনীতি পরিমিত এবং খণ্ডিত উদারনীতি। তাহার পূর্বদিকের দুয়ার একেবারে বন্ধ। আমাদের উদারনীতির সকল দুয়ার খোলা বলিলে বোধহয় ভুল হইবে না। এই উন্মুক্ততা আমাদের জাতীয় আদর্শকে বিনষ্ট বা দুর্বল করে নাই বরং তাহাকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করিয়া এক মহৎ মানবতার আদর্শে পরিণত করিয়াছে। যাঁহারা গত শতাব্দীতে আমাদের মনের দুয়ার খুলিয়া দিয়া সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে তাহাকে যুক্ত করিয়া দিয়াছেন রামমোহন তাঁহাদের মধ্যে প্রথম।

ধীরাজ ভট্টাচার্য

॥ তেরো ॥

লবীর পশ্চিম দিকে দোতলায় উঠবার সিঁড়ি। নিঃশব্দে দুজনে উপরে উঠে বারান্দায় দুখানা চেয়ারে বসলাম। চার পাশে কেউ কোথাও নেই। পকেট থেকে সিগারেট কেস্‌টা বার করে তা থেকে একটা সিগারেট নিয়ে কেস্‌টার উপর ঠুকতে ঠুকতে গাঙ্গুলী মশায় বললেন—'তোমার কথা ফ্রামজী সাহেবকে বললাম ধীরাজ। সাহেব সামনের সপ্তাহেই আমেরিকা চলে যাচ্ছে। ভাবলাম, যাবার আগে তোমার একটা কিছু করে নেওয়া দরকার।'

কথা শেষ করলেন না গাঙ্গুলী মশাই। সিগারেটটা ধরিয়ে দু-তিনটে টান দিয়ে আবার শুরু করলেন—'সাহেব পারমানেণ্ট লোক নিতেই রাজি হয় না, অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তোমার অভিনয়ের সুখ্যাতি করতে খানিকটা নিম-রাজি হয়েছে। কিন্তু মাইনে খুব কম দিতে চাইছে। এখন তুমি যা ভালো মনে হয় কর।'

আশা নিরাশার দোলনায় দুলতে দুলতে সাহস করে জিজ্ঞাসা করলাম—'কত?'

সামনের ছোট গোল টেবিলটার উপর অ্যাশ্‌-ট্রেতে সিগারেটের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে গাঙ্গুলী মশাই বললেন—'ষাট টাকা মাসে।'

মনে হল কে যেন আমাকে দোতলার বারান্দা থেকে সবলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে নীচের কংক্রিটের রাস্তাটার উপর। আপনা থেকেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—'ষাট টাকা?'

গাঙ্গুলী মশাই বললেন—'হ্যাঁ, অনেক চেষ্টা করলাম, কিন্তু সাহেব ওর বেশী দিতে কিছুতেই রাজি হল না।' হঠাৎ হাত-ঘড়িটা দেখে উঠে দাঁড়ালেন গাঙ্গুলী মশাই। তারপর যেন নিজের মনেই বললেন—'এঃ দশটা বেজে গেছে, বড় ছেলেটার জ্বর দেখে এসেছি। আচ্ছা আমি চল্লাম।'

কাঠের সিঁড়িগুলোয় বিরাট পায়ের প্রতিধ্বনি তুলে নীচে নেমে গেলেন গাঙ্গুলী মশাই। ইচ্ছে থাকলেও উঠবার ক্ষমতা ছিল না, চুপ করে বসে রেসের আপসেট্‌ ঘোড়ার মত ভাগ্যের এই ডিগবাজির কথাই ভাবতে লাগলাম। হপ্তাখানেক আগে কার্তিক রায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় এরা নিজেরাই ফ্রামজীর সঙ্গে দেখা করে। সঙ্গে সঙ্গেই দেড়শ' টাকা মাইনেতে ম্যাডানের পারমান্যাণ্ট স্টাফে ভর্তি হয়ে যায়। রোজ একবার করে এসে করিন্থিয়ান থিয়েটারের অডিটরিয়মে বসে দু চারটে খোস গল্প করে চাকরি বজায় রেখে বাড়ি চলে যায়।

গাঙ্গুলীমশাইকে চাকরির তাগাদা দিতে প্রায় রোজই একবার করে হেড অফিসে যেতে হত। এখানেই ভানুদার সঙ্গে আলাপ। চমৎকার মানুষ। শিক্ষিত, অমায়িক, সদালাপী। একবার আলাপ হলে [illegible] সহজে ভোলা যায় না।

আজও স্পষ্ট মনে আছে সেদিনের কথাগুলো, আমায় দেখেই ভানুদা ডেকে কাছে বসিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—'কি ভায়া, পাকাপাকি ব্যবস্থা কিছু হল?'

ম্লান হেসে জবাব দিলাম—'না, গাঙ্গুলীমশাই বললেন এখনও ফ্রামজীর সঙ্গে কথা কইবার সুযোগ পাননি, সাহেব খুব ব্যস্ত।'

স্বভাবসিদ্ধ হাসি হেসে বললেন ভানুদা—'আমরা ভাই চুনোপুঁটি, সুপারিশ পাবো কোথায়? নিজেরাই সাহস করে সাহেবের সঙ্গে দেখা করে বললাম—ছবিতে নামতে চাই। ফ্রামজী কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করলেন, সত্যি মিথ্যে মিশিয়ে চটপট বলে দিলাম। ব্যস, চাকরি হয়ে গেল। মাসে দেড়শ' টাকা মাইনে, দু একটা ছবিতে কাজ দেখে পরে বাড়িয়ে দেবেন। কিন্তু তোমার কথা আলাদা। দু দুখনা বাঘা ছবির নায়ক তার উপর মুরুব্বি ধরেছ বড় রুই গাঙ্গুলীমশায়কে। ব্যস্ত হয়ো না ভাই, ধৈর্য ধরে একটু সবুর কর, মেওয়া ফলবেই।'

এত দুঃখেও হাসি এল। ভাবলাম ভানুদার সঙ্গে দেখা হলে বলবো—'মেওয়া ফলেছে ভানুদা। তবে দেরি একটু বেশী হয়েছে বলে খাওয়ার অযোগ্য, ভেতরটা পচা।'

মনে পড়লো খিদিরপুরে কাকার সঙ্গে এই মাইনের কথা নিয়ে আলোচনার সময় আমার দম্ভভরা উক্তিগুলো। সব ছাপিয়ে বাবার কথাগুলো বার বার কানে ভেসে আসছিল, গাঙ্গুলীমশাই যখন কথা দিয়েছেন একটা ভাল ব্যবস্থা হবেই।

দরোয়ান সামনে এসে দাঁড়ালো। ফিরে চাইতেই সেলাম করে বললে, 'হুজুর সাড়ে এগারো বাজ গিয়া, আবভি ফটক বন্ধ হোগা।'

উঠে সিঁড়ি দিয়ে নেমে রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম। জনবিরল পথ। হাঁটতে হাঁটতে ট্রাম রাস্তায় এসে দেখি লোক ভর্তি একখানা ট্রাম সবে ছাড়ছে, বোধ হয় শেষ ট্রাম। একটু চেষ্টা করলে হয়তো উঠতে যেতে পারতাম, প্রবৃত্তি হল না।

চুপ করে একটা টেলিগ্রাফের পোস্টে হেলান দিয়ে দাঁড়ালাম। সামনে নিঝুম অন্ধকার গড়ের মাঠ, দূরে তারার মালার মত অস্পষ্ট ল্যাম্প পোস্টের মাথার আলোগুলো। উদ্দেশ্যহীনভাবে সেই দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। রাজ্যের চিন্তা বিদ্রূপের রূপ ধরে ঘিরে ফেললে।

স্টুডিওর সহকর্মীদের ঠাট্টা বিদ্রূপ—বড় মুরুব্বি ধরে, দুখানা ছবিতে হিরো সেজে, তোর মাইনে হোলো ষাট টাকা?

কাকার অযাচিত তিরস্কার—তখন আমার কথা শুনলে না রাঙাদা, এখন ভোগো, অমন গভর্নমেন্টের চাকরীটা ছেড়ে দিয়ে তুমি ওকে বায়োস্কোপ করতে অনুমতি দিলে কিসের আশায় শুনি?

মায়ের অনুযোগভরা আক্ষেপ,—ইচ্ছে করে ছেলেটার পরকালটা ঝরঝরে করে দিলে তুমি—তুমি কী?

নীরবে সব অপরাধের বোঝা মাথায় নিয়ে মাঝখানে চুপ করে বসে আছেন মৌন সন্ন্যাসী আমার বাবা। বাবার মুখের দিকে চেষ্টা করেও চাইতে পারলাম না, চোখ বুজে ফেললাম। অনেকক্ষণ এক-ভাবে অন্ধকারের দিকে চেয়ে ছিলাম বলে নয়তো মাঠের ঠাণ্ডা হাওয়া লেগে চোখ দুটো ভারি হয়ে গিয়েছিল, দু ফোঁটা জল গড়িয়ে গালের পাশ দিয়ে পড়ে গেল। সমস্ত দেহের ভার ঐ পোস্টটার উপর দিয়ে চোখ বুজে দাঁড়িয়ে রইলাম। অন্ধকার মাঠের ভিতর দিয়ে গোপা যেন এসে সামনে দাঁড়ালো। কিছু বলবার আগেই গোপা বললে—সেদিন একটা দরকারি কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম—তাই বলতে এসেছি।

সাহস হোলো না জিজ্ঞাসা করি কি কথা।

গোপা বললে—আমাদের ড্রাইভার বটুক দাস কি করে জেনেছে আপনার সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে, আমাকে খুব ধরেছে আপনাকে বলে সিনেমায় ঢুকিয়ে দেবার জন্যে। সত্তর টাকা মাইনে পায় তাতে নাকি কুলোয় না। ওর ধারণা বায়োস্কোপ করলে অনেক টাকা রোজগার করতে পারবে।

এই চরম অপমানটুকুর জন্যই যেন প্রতীক্ষা করছিলাম। ম্লান হেসে চারদিক চাইলাম, পাশ দিয়ে লুঙিপরা একটা মুসলমান টলতে টলতে গজল গেয়ে চলেছে,—

'প্রীত্ রাখো না রাখো, তুহারি মরজি,
বদনামি তো হো গ্যায়ি উমের ভরকি।'

ওপারের ফুটপাথ থেকে আওয়াজ এল—এই, ইধার আও।

গান থেমে গেল। লুঙিপরা লোকটি থমকে দাঁড়িয়ে কি যেন দেখলে তারপর হাত দুটো উপরে তুলে বুড়ো আঙুল দুটো প্রশ্নকর্তার উদ্দেশে নাড়তে নাড়তে বললে—কুছ নেহি জমাদার সাব্। কথা শেষ করে আর দাঁড়ালো না লোকটা। সহজ মানুষের মত দ্রুত পা চালিয়ে সামনের অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল। দু এক পা এগিয়ে সামনে রাস্তার দিকে এসে দাঁড়ালাম। ওপারের ফুটপাথের একটা অন্ধকার লাইট পোস্টের নীচে থেকে একটি লালপাগড়ি দু হাতে খৈনি ডলতে ডলতে সোজা আমার দিকে এগিয়ে আসছে। লাল-পাগড়ি কাছে এলে দেখলাম বয়স চল্লিশের উপর। মোটা গোঁফ দুটো তা দিয়ে ডগ দুটো নাকের দু পাশে উঠিয়ে দেওয়া। কাছে এসে আমার আপাদমস্তক সন্দেহ-

ভরা দৃষ্টিতে দেখে নিয়ে প্রশ্ন হল—'যাওগে কি ধার?'
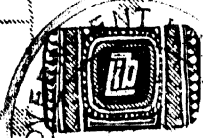
বললাম—'ভবানিপুর।'

প্রশ্ন—'আপকো সাথ অওর কোই হ্যায়?'

বললাম—'না।'

বিশ্বাস করলে না লালপাগড়ী। সামনের অন্ধকার ভেদ করে ঝুঁকে আসে পাশে বেশ ভালো করে দেখে নিয়ে আবার প্রশ্ন—'যাওগে ক্যায়সে?'

বললাম—'ট্রামে।'

বিস্ময়ে চোখ দুটো বড় করে আমার মুখের কাছে ঝুঁকে পড়ে কোনও বিশেষ গন্ধ আবিষ্কারের চেষ্টা করল লালপাগড়ী। কিছু না পেয়ে বেশ খানিকটা নিরাশ হয়ে সোজা দাঁড়িয়ে আরও রুক্ষ স্বরে প্রশ্ন করলো—'রাত এক্ বজ্ গিয়া, টেরাম উরাম সব বন্ধ হো গিয়া, খেয়াল নেহি?'

চেষ্টা করেও জবাব দেবার কোনও কথাই যখন খুঁজে পাচ্ছিনে। ত্রাণকর্তা-রূপে দেখা দিল একখানা বাতি নেবানো খালি গরুর গাড়ি। গাড়োয়ান একটা ময়লা চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছে, গলায় ঘণ্টা বাঁধা ঘর-মুখো গরু দুটো সারা দিনের গাধার খাটুনীর পর টুং টাং শব্দ করে রাস্তার মাঝখান দিয়ে বেশ জোরেই হেঁটে চলেছে। গাড়ির নীচে দড়ি বাঁধা ছোট্ট চৌকো লণ্ঠনের বাতিটা দোলনের চোটে অথবা হাওয়া লেগে নিভে গেছে। নিশ্চিত শিকারের সম্ভাবনায় লালপাগড়ী হুংকার ছাড়লো—'এই ভইসা গাড়ি, রোখ্খো!'

রোখা দূরে থাক গরু দুটো আচম্বিতে হেঁড়ে গলার আওয়াজ পেয়ে আরও জোরে পা চালিয়ে দিলে দক্ষিণমুখো। ছুটে গিয়ে রাস্তার মাঝখানে সামনে দাঁড়িয়ে অনেক কসরৎ করে গাড়ি থামালো লালপাগড়ী। ভাবলাম এই সুযোগ। আর এখানে থাকা কোনও দিক দিয়েই নিরাপদ হবে না। গাছের ছায়ায় ঢাকা আলো অন্ধকার ফুট-পাথ ধরে বাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করলাম। বাড়ি পেঁছুলাম যখন পাশের একটা বাড়ির দেয়াল ঘড়িতে ঢং ঢং করে দুটো বাজছে। সদর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ইতস্তত করতে লাগলাম, এত রাতে কড়া নেড়ে সবাইকে জাগাবো? দরজা একটু ঠেলতেই খুলে গেল।

দেখলাম বাবা উঠোনে পায়চারি করছেন। শুধু একটু থমকে দাঁড়ালাম। কোনও প্রশ্ন করলেন না বাবা। আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকে কোনও রকমে জুতো খুলে কাপড় জামা না ছেড়েই অন্ধকারে বিছানাটার উপর শুয়ে পড়লাম।

জেগেই ছিলাম, সময়ের হিসাব ছিল না। খানিকক্ষণ বাদে বাবা অন্ধকারে আস্তে আস্তে এসে আমার বিছানার পাশে বসলেন, তারপর একখানা হাত আমার মাথায় পিঠে বুলাতে বুলাতে শান্তকণ্ঠে বললেন, ধীউ বাবা! সুখ দুঃখ এ দুটো যদি ভগবানের দান বলে স্বীকার কর, তাহলে সুখের বেলায় আনন্দে আত্ম-হারা হয়ে দু হাত বাড়িয়ে ছুটে যাও আর দুঃখ দেখে ভীরুর মত কেঁদে কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে যাও কেন? ওতে দুঃখ আর অশান্তিটাই বাড়ে আর কোন লাভ হয় না।'

নিঃশব্দে কাঁদছিলাম, মাথার বালিশের খানিকটা জায়গা ভিজে গিয়েছিল। একটু চুপ করে থেকে বাবা বললেন,—'তোমার আসতে দেরি দেখেই আমি খানিকটা অনুমান করে নিয়েছিলাম। কিন্তু তাতে হয়েছে কি? সমস্ত ব্যাপারটা আমায় খুলে বলোতো?'

ধরা গলায় বললাম—'মোটে ষাট টাকা মাইনে, আমি কল্পনাও করতে পারি নি বাবা!'

বোধ হয় বাবাও কল্পনা করতে পারেন নি, অন্ধকারে বাবার চাপা দীর্ঘ-শ্বাসের আওয়াজও যেন একটা শুনতে পেলাম। একটু পরে বললেন,—'তা এর জন্যে তুমি এত কাতব হয়ে পড়েছ কেন? অবশ্যি তোমার একটা ভালো মাইনে, মানে দুশো আড়াইশো টাকা হলে আমি একটু বিশ্রাম পেতাম। ভোরে উঠে এক কাপ চা খেয়ে ছুটতে হয় টিউশনি করতে, বেলা দশটার মধ্যে দুটো টিউশনি সেরে বাড়ি ফিরে নাকে মুখে কোনও রকমে দুটো ভাত গুঁজেই দৌড়ই স্কুলে, চারটের পর বাড়ি এসে এক কাপ চা খেয়ে আবার ছুটি টিউশনি করতে। ফিরতে এক একদিন রাত দশটা বেজে যায়। তাই ভেবেছিলাম এই গাধার খাটুনী থেকে এবার হয়তো খানিকটা রেহাই পাব্যো। কিন্তু মানুষ যা ভাবে সব সময় তা হয় না—এটা জেনেও কুহকিনী আশার ছলনায় পড়ে যে ভুলটা করেছিলাম—এ তারই শাস্তি।'

একটু চুপ করে থেকে আবার বলতে শুরু করলেন,—'একটা কথা তুমি কোনও দিনই ভুলে যেয়ো না ধীউ বাবা, সংসারে দুঃখ দারিদ্র্যের ভিতর থেকে যারা বড় হয় —তারাই সত্যিকার মানুষ হয়। জীবনটাকে পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পারে শুধু তারাই। নইলে রুপোর চামচে মুখে করে জন্মে যে সব আলালের ঘরের দুলালরা ঐশ্বর্যের গদীর উপর বসে ধরাকে সরা জ্ঞান করে, কতটুকু মূল্য তাদের জীবনের? যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যে সৈনিক বিজয়ী হয়ে ফিরে আসে—জয়ের আনন্দ পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পারে শুধু সেই-ই: নইলে দাঁড়ানো মাত্রই যদি অপর পক্ষ নতি স্বীকার করে অথবা শান্তির প্রস্তাব করে বসে—সে যুদ্ধ জয়ের কোনও গৌরব বা আনন্দ নেই। আজ আমি তোমায় এই আশীর্বাদ করছি—জীবনযুদ্ধে দুঃখ দারিদ্র্যের কাছে নতি স্বীকার না করে তুমি বড় হও, সত্যিকার মানুষ হও। তখন পিছনে ফিরে তাকালে দেখতে পাবে পায়ে মাড়িয়ে আসা কাঁটাগুলো ফুল হয়ে হাসছে।'

বাবার কথায় মনে অনেকখানি শান্তি পেলাম, বিছানায় উঠে বসে শান্ত কণ্ঠে বললাম,—স্টুডিওর সবাই জেনে যাবে আমার মাইনের কথাটা। ওদের ঠাট্টা-বিদ্রূপ সহ্য করে—'

কথাটা শেষ করতে দিলেন না বাবা। বললেন,—'তাও আমি ভেবে দেখেছি ধীউ বাবা। তুমি হাসি মুখে ঠাট্টা বিদ্রূপ মাথা পেতে নিয়ে হেসেই জবাব দিও, "কি জানিস, টাকা রোজগারটাকেই মুখ্য উদ্দেশ্য করে এ লাইনে আসিনি—এসেছি শিল্পের সাধনা করে বড় শিল্পী হতে। নইলে ছ বছরের পুলিসের চাকরী ছেড়ে এ পথে আসতাম না। আর তা ছাড়া আমার রোজগারে সংসার চলে না, চলে বাবার রোজগারে। বাবা এখনও বেঁচে। দেখো আর কোনও দিন তারা তোমার মাইনের কথা তুলে ঠাট্টা করবেন না। রাত শেষ হতে চলল। এবার তুমি শুয়ে পড়ো।'

যাবার জন্যে উঠে দাঁড়িয়ে হেসে বললেন বাবা,—'আর 'কাল পরিণয়ে'র

পারিশ্রমিক দেড় বছরে দেড়শ টাকার চেয়ে এটা অনেক ভালো—নয় কি?'

ঘর থেকে বেরিয়ে আস্তে আস্তে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে বাবা চলে গেলেন। বন্ধ ঘরে জমাট অন্ধকারে বাবার কথাগুলো বেরুবার পথ না পেয়ে দৈববাণীর মত আমার চার পাশে গুঞ্জন করে ফিরতে লাগলো। যুক্তকরে বাবার উদ্দেশে প্রণাম করে শুয়ে পড়লাম।

কেউ না ডাকতেই ঘুম ভেঙে গেল। ঘরের চারদিক চেয়ে দেখি দরজা জানালার ফাঁক দিয়ে সামান্য আলোর আভাস এসে পড়েছে ঘরের মধ্যে। বাড়ির ভিতর সব চুপ চাপ, কারও সাড়া শব্দ নেই। তাড়াতাড়ি উঠে দরজাটা খুলতেই দমকা হাওয়ার মত এক ঝলক কড়া রোদ আমার সর্বাঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল। বুঝলাম বেলা অন্তত দশটা। আস্তে আস্তে বাড়ির ভিতরে ঢুকলাম। দেখি উঠোনে একটা বেশ বড় রুই মাছ কুটছেন মা—আর সামনে রকের উপর বই খুলে পড়বার অছিলায় পা ঝুলিয়ে বসে আড় চোখে তাই দেখছে আমার ছোট ভাই রাজকুমার আর বোনটা। আমার সাড়া পেয়েই এক নজর দেখে নিয়ে মা বললে—'যা চট করে স্নান করে নে।' কাল রাতে তো কিচ্ছুই খাসনি। আমি এখুনি মাছের ঝোলটা চড়িয়ে দিচ্ছি।'

অবাক হবার কিছু নেই, আজ সব কিছুতেই বাবার প্রচ্ছন্ন প্রভাব স্পষ্ট অনুভব করলাম। প্রাত্যহিক বাজার করার ভার ছিল আমার উপর, আজ বাবাই সেটা করে এনেছেন। লজ্জায় মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছে হচ্ছিল, তাড়াতাড়ি স্নান করতে চলে গেলাম।

দুপুরে খেয়ে দেয়ে কষে এক ঘুম দিলাম। ঘুম ভাঙলো বাইরে কড়া নাড়ার আওয়াজে। উঠে দোর খুলেই দেখি মনমোহন। বেশ একটু অবাক হয়ে বললাম—'তুই?'

গম্ভীরভাবে মনমোহন বললে—'কথা আছে, একটু বাইরে আয় না।'

বললাম—'দাঁড়া, জামাটা পরে আসি।'

ঘরে এসে আলনার উপর থেকে একটা ছিটের সার্ট গায়ে দিয়ে চটীটা পায়ে গলিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। কাছেই [illegible] পার্ক। দুজনে নিঃশব্দে পথটুকু হেটে ছোট পার্কের মধ্যে একটা খালি বেঞ্চের উপর বসলাম। দুজনেই চুপচাপ। হাসি আসছিল মনমোহনের অবস্থা দেখে। স্বভাবসিদ্ধ হাসি অতি কষ্টে দমিয়ে রেখে আমার সমবেদনা জানাতে এসেছে, বেচারা!

বললাম—'কিরে কি কথা বলবি বল?'

মনমোহন বললে—'আমি অবাক হয়ে গেছি ভাই। গাঙ্গুলীমশাই যে এরকম একটা ব্যাপার করতে পারেন কল্পনাও করতে পারিনি। মেসোমশাই বললেন—এ তো আমার জানাই ছিল—যেদিন সাহেবের পারমিশন নিয়ে ওকে হেমচন্দ্রের পার্ট দিয়েছি—সেইদিন থেকেই উনি চটেছেন।'

হেসে বললাম—'চটাচটির কথা নয় মনু, আমি অদৃষ্টবাদী, ভাগ্যছাড়া পথ নেই।'

চুপ করে কি যেন ভাবলো মনমোহন, তারপর বললে—'মেসোমশাই বলছিলেন—'।

বললাম—'কি?'

'তিনচারদিন বাদেই ফ্রামজী আমেরিকা যাচ্ছে। ও চলে গেলেই তোমাকে নিয়ে রুস্তমজী সাহেবের সঙ্গে দেখা করবেন। ওঁর খুব বিশ্বাস রুস্তমজী কখনই এতবড় একটা অন্যায় হতে দেবেন না।'

বললাম—'কিন্তু তোমার মেসোমশাই ভুলে যাচ্ছেন যে, গাঙ্গুলীমশাই ওদের ডান হাত, তিনি যে ব্যবস্থা একবার করে দিয়েছেন তার রদবদল ফ্রামজী কিছুতেই করবেন না—কিংবা ধরে নিলাম কিছু করলেন, তখন গাঙ্গুলী মশাই-এর মানটা কোথায় থাকবে সেটা ভেবে দেখেছ কি?'

অকাট্য যুক্তি। চুপ করে রইল মনমোহন। বেশ খানিকক্ষণ বাদে হতাশ ভাবে বললে—'নাঃ, তাহলে আর কোনও উপায় নেই। ও মাইনেতে তুমি কেন, কোনও ভাল আর্টিস্টই কাজ করবে না। অথচ তিন চারদিনের মধ্যে মেসোমশাই শুটিং শুরু করতে চান। এই অল্প সময়ের মধ্যে নতুন হিরো কাকেই বা নেবেন—।'

হেসে একখানা হাত দিয়ে ওর কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে বললাম—'জ্যোতিষবাবুকে বোলো নতুন হিরোও খুঁজতে হবে না আর রুস্তমজী সাহেবের কাছে মাইনে বাড়ানোর সুপারিশও করতে হবে না। গিরিবালা ও কালপরিণয়ের বিখ্যাত নায়ক আমিই 'মৃণালিনী'তে হেমচন্দ্রের ভূমিকা অভিনয় করবো।'

অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে চেয়ে রইল মনমোহন।

বললাম—সত্যি, ঠাট্টার কথা নয়—শুটিং-এর দিন গাড়িটা পাঠাতে বোলো—হাজার হোক অতবড় কোম্পানীর হিরো—মাইনে যাই হোক—ট্রামে বাসে তো আর যেতে পারিনে!'

অবাক হয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল মনমোহন। (ক্রমশঃ)
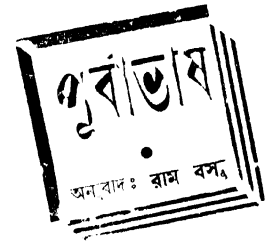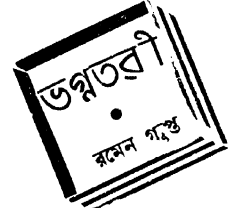
আমাদের জনৈক সহযাত্রী অত্যন্ত মনোনিবেশ সহকারে সংবাদপত্রের “এ সপ্তাহ কেমন যাইবে” কলামটি পড়িতেছিলেন। বিশুখুড়ো কাগজের পাতাটায় চোখ বুলাইয়া বলিলেন—“ঘরে ঘরে ছেলেমেয়েদের বায়নাক্কা, গিন্নীদের নাকীসুরের আব্দার, অফিসে

পিয়ন বেয়ারাদের সেলাম-নমস্কার, গয়লার যথাসময়ে দুধ (জল মেশানো হলেও) পৌঁছে দেওয়া, ধোপার যথাসময়ের আগেই জোগান নিয়ে আসা, জমাদারের ঝাড়ুর আকস্মিক কর্মতৎপরতা আর দোকানে দোকানে মহাপূজোর বিপুল আকর্ষণ—ইত্যাদি দেখার পর এ সপ্তাহ কেমন যাবে তার জন্যে আর রাশি নক্ষত্রের বিচারের প্রয়োজন নেই”!!

* * *

জনাব সুরাবর্দী সাহেব সম্প্রতি গোয়া সফরে গিয়াছিলেন। কারণটা অবশ্য গোড়াতে অনেকের কাছেই অস্পষ্ট ছিল, কিন্তু জনাব নিজেই তাহা জলের মতো বুঝাইয়া দিলেন। তিনি বিবৃতি ছাড়িলেন—গোয়াতে সাম্রাজ্যবাদের কোন চিহ্ন নাই, সংবাদপত্রে প্রকাশিত অবিচার-অত্যাচারের আভাসমাত্র সেখানে নাই। শ্যামলাল সংক্ষেপে বলিল—“And Suhrawardy is an হানার-able man”।

* * *

পাকিস্তানের শিল্প-প্রদর্শনীতে ভারতীয় স্টলের সম্মুখে নাপিত পরিচালিত একটি “মিথ্যাগ্রহের” উল্লেখ করিয়া অনেকে বলিতেছেন যে, নিমন্ত্রণ করিয়া নিয়া গিয়া পাকিস্তানের এই আচরণ কোনরকমেই সমর্থন করা যায় না।—“কিন্তু না-আঁচানো পর্যন্ত সমস্ত নিমন্ত্রণের সঠিক রূপ নির্ণয় কোনকালেই সহজ ছিল না”—বলিলেন জনৈক সহযাত্রী।

* * *

নিখিল ভারত মহিলা সমিতির সভানেত্রী শ্রীমতী লক্ষ্মী মেনন দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায়

ট্রামে-বাসে

মহিলাদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ চাকুরির দাবী জানাইয়াছেন। —“আমরা শুধু মা লক্ষ্মীকে তাঁতীর এঁড়ে গরু কেনার পরের অবস্থাটা ভেবে দেখতে বলছি”—বলে শ্যামলাল।

* * *

আমেরিকার একটি সংবাদপত্র পৃথিবীর আশ্চর্য বস্তু কী সে সম্বন্ধে পাঠকদের ভোট গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভোটাভুটির ফলে জানা গেল আমেরিকাবাসীরা ভারতের ‘তাজমহলকে’ আশ্চর্য বস্তুর শীর্ষে স্থান দিয়াছেন।—“আবিষ্কারটা অবশ্য নূতন নয়। কিন্তু আমেরিকাবাসী হয়ত জানেন না যে তাজমহলের দেশে সম্প্রতি যে উদ্বাস্তু মহল গড়ে উঠেছে তার চেয়ে পরমাশ্চর্যের আর কিছু নেই”—বলিলেন বিশুখুড়ো।

* * *

“EISENHOWER may run again for Presidency”—একটি সংবাদের শিরোনামা। আমাদের

জনৈক সহযাত্রী সংক্ষেপে মন্তব্য করিলেন—“এতবড় অসুখের পর দৌড়-ঝাঁপ করা কি ঠিক হবে?”

* * *

উপরাষ্ট্রপতি ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ সম্প্রতি মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, নরকই হইল ভগবানের বসবাস করিবার একমাত্র উপযুক্ত স্থান। বিশুখুড়ো বলিলেন—“আশা করি স্থানটা রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের সুপারিশে নির্দিষ্ট হয়নি”!!

* * *

ভগবানগোলার এক সংবাদে প্রকাশ সেখানকার অধিবাসীরা নাকি সম্প্রতি একটি নাম-না-জানা অতিকায় পক্ষী বধ করিয়াছে।—“নি-থাকী মা থেকে শুরু করে আমরা পরপর অনেক সংবাদই শুনেছি এবং মনে করছি ভগবান গোলায় কোনদিনই ‘গুলি’ বাড়ন্ত হবে না”—মন্তব্য করে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

ভারতস্থ ইউ কে-র হাইকমিশনার দুই হাজার পাঁচশত শব্দ সম্বলিত একটি লিখিত বক্তৃতার সমস্ত অংশ নাকি ‘মুখস্থ’ বলিয়াছেন—

“তারিফ তাঁকে করতেই হবে। তাছাড়া আমরা এ-কথাও জানি যে লিখিত বক্তৃতা মুখস্থ করার জন্যে একদিন ইউ কে-তে পাঠশালার ব্যবস্থাও ছিল। কিন্তু বর্তমান পরিবেশে খানিকটা ভুলে যাবার শিক্ষাই বোধহয় সু-শিক্ষা, আমরা সবিনয়ে হাইকমিশনারকে সেই কথাটাই স্মরণ করিয়ে দিতে চাই”।

৩

কল্যাণীর বাবা মহীতোষ মজুমদারের বয়স সত্তরের কাছাকাছি। দীর্ঘ চেহারা। বয়সের ভারে সামনের দিকে একটু নুয়ে পড়েছেন। মাথার পাকা চুল ছোট ক'রে ছাঁটা, বাঁধানো দাঁত। স্মল-কজ কোর্টের পুরোন উকিল। এখনো প্রাকটিস ছাড়েননি। শ্যামবাজারে ভাড়াটে বাসায় বহুকাল বাস করবার পর বছর দশেক হ'ল বেলগাছিয়ায় দোতলা বাড়ি করেছেন। বড় মেয়ে বাণী আছে গৌহাটীতে। জামাই প্রভাকরের সেখানে কাঠের ব্যবসা। বাড়ি গাড়ি ধনসম্পত্তিতে বাপের চেয়ে বাণী অনেক বড়লোক। ছেলেমেয়েও দুটি। বড় সংসারের বড় গৃহিণী। সেখান থেকে তার নড়বার-চড়বার উপায় নেই। যখন আসে অল্প-দিনের জন্যে আসে। আবার দিনকয়েক বাদে প্লেনে করে পাখীর মতই উড়ে চলে যায়। তার আসা-যাওয়ার কথা কলকাতার অনেক আত্মীয় স্বজনই টের পায় না। তাই ছোট জামাই মেয়েকে কাছাকাছি রাখতে চেয়েছিলেন মহীতোষ। তাঁর স্ত্রী সুনয়নীরও একান্ত তাই ইচ্ছা ছিল। বেলগাছিয়াতেই তিনি জামাইয়ের জন্যে প্রথমে জমি দেখেছিলেন। কিন্তু অমিয়-ভূষণ কিছুতেই শ্বশুরবাড়ির কাছে বাড়ি করতে রাজী নন। শ্বশুরের কোন সাহায্যই তিনি নিতে চান না। উপদেশ পরামর্শ তো নয়ই। অমিয়ভুষণ আগে আগে কল্যাণীকে বলেছেন, 'তোমার বাবাকে ব'লো, তাঁর পরামর্শ নেওয়ার জন্যে শাঁসালো মক্কেলের অভাব নেই। বহু টাকায় তা বিক্রি হবে। আমার মত গরীব মাস্টারকে কেন তিনি অত মূল্যবান জিনিস বিনা পয়সায় বিলাবেন।'

কল্যাণী জবাব দিয়েছেন, 'তাঁর মেয়েটিকে তো গরীব মাস্টার অসংকোচে হাত পেতে নিতে পেরেছেন। তাতে তো তাঁর কোন আপত্তি হয়নি? উকিলের পরামর্শের চেয়ে তাঁর মেয়ের দাম অনেক কম সেইজন্যেই বুঝি?'

ছোট জামাই যে তাঁকে বেশি পছন্দ করে না একথা বুঝতে বাকি নেই মহীতোষের। প্রথম প্রথম তিনি এতে কৌতুক বোধ করতেন। কিন্তু বয়স বাড়বার পরে অমিয়র ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে যাওয়ার পরেও যখন তার স্বভাব বদলালো না, তখন আর কৌতুকপ্রিয়তা রাখতে পারেননি মহীতোষ। জামাইয়ের ওপর বিরক্তি এমনকি বিদ্বেষ এসেছে মনে। কখনো কখনো এও ভেবেছেন, কোন সম্পর্ক রাখবেন না অমিয়ভূষণের সঙ্গে। নেহাতই ছোট মেয়ে কল্যাণীর মুখের দিকে চেয়ে অতখানি কঠোর হতে পারেননি মহীতোষ। মেয়ে আর নাতি-নাতনীর ডাক খোঁজ করেছেন, তাদের ডাকে সাড়া দিয়েছেন। তাও কি প্রাণ ধরে জামাই তার ছেলেমেয়েকে মহীতোষ-দের কাছে দু' চারদিনের বেশি থাকতে দিয়েছে? নিজের পুত্র সন্তান নেই। তাই ভেবেছিলেন কমলাক্ষকে এনে নিজের কাছে রাখবেন, ল' পড়াবেন। জুনিয়র করে নেবেন নিজের। তারপর মক্কেলপত্র সব দিয়ে যাবেন দৌহিত্রকে। কিন্তু গোঁয়ার জামাই তাঁর কোন আশা পূর্ণ করতে দেয়নি। যেমন দেয়নি তার ফলও পেয়েছে। অর্ডিনারী গ্রাজুয়েট হয়ে রয়েছে কমলাক্ষ। আজকালকার দিনে ওইটুকু বিদ্যা নিয়ে করে খাওয়া মুশকিল আছে। আরো যদি পাঁচ দশ বছর আয়ু বেশি পান মহীতোষ, নিজের চোখেই দেখে যেতে পারবেন, ছেলে তার বাপকে কত বড় রাজা করে তুলেছে।

জামাইয়ের সঙ্গে যে মেয়ের মোটেই বনিবনাও নেই তাও মহীতোষ ভালো করেই জানেন। এর আগে অনেকবার স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া ক'রে কল্যাণী তাঁর কাছে চলে এসেছে। তখন ওর ছেলে-মেয়ে দুটির বয়স কম ছিল। কোনবার

তাদের সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছে, কোন কোনবার শাশুড়ীর কাছে তাদের ফেলেও গেছে।

মহীতোষ একেকদিন বলেছেন, 'এত যখন কষ্ট দেয় তোর আর ফিরে গিয়ে কাজ নেই কল্যাণী। তুই আমার কাছেই থাক।'

কল্যাণী বলেছে, 'তাই থাকব বাবা।'

সুনয়নী স্বামীকে ধমক দিয়েছেন, 'বালাই, ও আবার কথার কি ছিরি তোমার। ঝগড়া বিবাদ হোক, ক্ষুদ খাক, কুঁড়ো খাক, স্বামীর ঘরই মেয়েদের আপন ঘর। তুমি বড়লোক আছ তাতে ওর কি।'

দু'দিন বাদে অবশ্য কল্যাণী নিজেই ফিরে গেছে, না হয় অমিয়ভূষণই ফিরিয়ে নিতে এসেছে। বয়স বেড়ে যাওয়ায়, ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে ওঠায় কল্যাণী এখন আর অবশ্য অত ছুটোছুটি করে না। কিন্তু ঝগড়া ঝাটি যে ওদের মধ্যে প্রায় নিত্যই চলে সে খবর অমিয়ভূষণ রাখেন।

গাড়ি একেবারে অমিয়ভূষণের উঠানের ওপর এসে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে নাতিনাতনী এসে ঘিরে দাঁড়াল, মহীতোষের খবর পেয়ে ঝি সুরধুনীকে রান্নাটা দেখতে বলে কল্যাণীও এসে বাপের গাড়ির কাছে দাঁড়ালেন। তার আগেই মহীতোষ আর সুনয়নী নেমে এসেছেন। ষাটের ওপরে বয়স হয়েছে সুনয়নীর। তবে মাথার চুল এখনও তেমন পাকেনি। দাঁতগুলিও নিজেরই আছে, নকল গড়াতে হয়নি। রোগা ছোটখাট পাতলা চেহারা। পিছন থেকে কল্যাণীকেই বরং তাঁর মা বলে মনে হয়।

মহীতোষ ড্রাইভারকে বললেন, 'শৈলেন, মাছটা ভিতরে দিয়ে এসো।' তারপর মেয়ের দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, 'জানিস খুকি, তোর বাড়িতে আজ কাজ আছে শুনে আমার মক্কেল কৈলাস বিশ্বাস এই মাছ পাঠিয়ে দিয়েছে। এ তার নিজের ফিশারির মাছ। এই মাছ আনতেই তো এত দেরি হয়ে গেল।'

কল্যাণী ছোট মেয়ের মতই অভিমানে মুখ ভার করে ঠোঁট ফুলিয়ে বললেন, 'দরকার নেই আমার মাছ দিয়ে। তোমরা বুঝি দু'ঘণ্টা আগে আসতে পারতে না বাবা? একদিন আগে এসে আমাদের বাড়িতে থাকলে তোমার জাত যেত?'

মহীতোষ সস্নেহে মেয়ের পিঠে হাত রেখে হেসে বললেন, 'আমার রণচণ্ডী মায়ের কথা শোন। ও খুকি, এখন যে আমার বাড়ি আমার বাড়ি করছিস বড়। তবে নাকি এ-বাড়ি তোর নয়? সব সেই গোঁয়ার গোবিন্দের? মেয়ের যখন বিয়ে থা দিবি, তখন একদিন কেন এক মাস আগে থেকে তোর বাড়িতে এসে থাকব। অবশ্য যদি আমার জামাইটি থাকতে দেন।'

বলে ঝকঝকে বাঁধানো দাঁত বের ক'রে হাসতে লাগলেন মহীতোষ।

কল্যাণী বললেন, 'হুঁ'। তখনও তোমার কত সময় থাকবে তা আমার জানা আছে। তখনও মক্কেলদের ভিড়ে তোমার নিঃশ্বাস ফেলবার জো থাকবে না।'

একটু দূরে কমল আর এনাক্ষী দাঁড়িয়ে মজা দেখছিল। চেয়ে চেয়ে দেখছিল একটি কিশোরী মেয়ের ভূমিকায় তাদের প্রৌঢ়া স্থূলাঙ্গী মাকে। দেখতে দেখতে কমলের মনে হচ্ছিল মানুষ বুঝি কোনদিন পুরোপুরি বুড়ো হয় না, বুড়ো হ'তে চায় না। বাবা যখন ছেলে সেজে তাঁর মার কাছে গিয়ে দাঁড়ান তখনও ঠিক এই কথাই মনে হয় কমলের। মানুষ তার শৈশবকে কৈশোরকে পথের ধারে ফেলে আসে না, নদীর স্রোতে ভাসিয়ে দিয়ে

আসে না, নিজের সঙ্গেই গোপনে গোপনে বয়ে নিয়ে আসে। তারপর সময়-মত সুযোগ মত ফের সেই শিশুর মুখোশ নিজে পরে বসে। কোনটা যে মুখ কোনটা যে মুখোশ বেছে বের করা শক্ত হয়ে ওঠে। মানুষ শিশুপুত্রের মধ্যে নিজেকে পায়, শিশু পৌত্রের মধ্যে নিজেকে দেখে, পাকা দাড়ি গোঁফের পরচুলা অনুক্ষণ সে বয়ে বেড়াতে পারে না।

বেয়াই বেয়ানের আসার খবর পেয়ে শতদলবাসিনী বাইরে এসে দাঁড়ালেন। সুনয়নীর হাত ধরে বললেন, 'আসুন বেয়ান ঘরে আসুন।' তারপর কল্যাণীর দিকে ফিরে তাকিয়ে হেসে বললেন 'কেবল বাপের সঙ্গেই কথা বলছ বউমা, আর মা'টি বুঝি সংমা? তার বুঝি খোঁজ-খবর নিতে নেই? এই সুযোগে একটু খোঁটা দিতেও ছাড়লেন না সুনয়নীকে। ফোকলা মুখে হেসে বললেন, 'দেখে শুনে আমার কিন্তু তাই মাঝে মাঝে মনে হয় বেয়ান। আমার বউমাটি তার সংমা কি মাসিমার কাছে বড় হয়েছে, নিজের মায়ের আদরে শাসনে মানুষ হয়নি।'

সুনয়নীও ছাড়বার পাত্রী নন। তিনিও হেসেই জবাব দিলেন, 'সংমাই হই আর মাসিমাই হই, মেয়েকে তার আসল মায়ের হাতে অনেককাল আগেই তুলে দিয়েছি বেয়ান। এখন যশ অপযশ সব আপনার। আমার কিছুই না।'

শতদলবাসিনী হার স্বীকার ক'রে বললেন, 'পাকা উকিলের পাকা গিন্নী। কথায় পেরে উঠব কেন।'

বেলা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে অভ্যাগতের ভিড় বাড়তে লাগল। কলকাতা থেকে অমিয়ভূষণের কয়েকজন সহকর্মী বন্ধু এলেন। একই কলেজের অধ্যাপক। ইংরেজীর সদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, ইতিহাসের হিরন্ময় গুপ্ত, বাংলার দেবব্রত শূর, কেমিস্ট্রির বিভুপদ সামন্ত। আরও কয়েকজনকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। অমিয়ভূষণ। তাঁরা আসেননি কি আসতে পারেননি। প্রকাশক টি পি চক্রবর্তী এন্ড সন্সের মেজো কর্তা সুধাময় চক্রবর্তী নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এলেন।

জায়গা দেখে, বাড়ি দেখে মনে মনে যে যা ভাবুন, মুখে প্রায় সকলেই উৎসাহ দিলেন অমিয়ভূষণকে। সদানন্দ বললেন, 'বেশ করেছ অমিয়। আমার প্রাণটাও এই চাইছিল অমিয়। শহর থেকে দূরে পালিয়ে আসি, পারলাম না। কিছুতেই গিন্নীকে বুঝিয়ে উঠতে পারলাম না। শহরটা হাটবাজার, ব্যবসা-বাণিজ্যের জায়গা। বসবাসের জায়গা নয়।'

দেবব্রত বললেন, 'তা তোমার ঢাকুরিয়াও তো আধা শহর আধা গ্রাম। তাকেও তুমি হ্যারিসন রোড কি ক্লাইভ স্ট্রীট বলতে পার না। তোমাকে উত্তরে আসতে না দিয়ে দক্ষিণে টেনে রেখে মিসেস ব্যানার্জি ভালোই করেছেন। শহরের বাইরে থাকতে চাও ভালো কথা; কিন্তু এদিকটায় এলে কেন অমিয়। এদিকটা develope করতে বহু সময় লাগবে। দক্ষিণের মলয় বায়ু ছেড়ে তুমি উত্তরের ঠান্ডা হাওয়ায় চলে এসেছ। তোমার পছন্দের তারিফ করতে পারলাম না।'

শূরের এই বেসুরো আলাপে বন্ধুরা অপ্রতিভ হলেন। বিভুপদ তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'আঃ কি বাজে বকছ দেবব্রত। এদিকে ইলেক্‌ট্রিক ট্রেন ফ্রেন এসে গেলে এ অঞ্চলের যথেষ্ট উন্নতি হবে। কীর্তিপুরের কীর্তির কাছে সদানন্দের ঢাকুরিয়া ঢাকা পড়ে যাবে। দু'দিন বাদে উত্তর-দক্ষিণে কোন ভেদ থাকবে না।'

দেবব্রত মুচকি হেসে বললেন, 'যেমন পূর্ব-পশ্চিমের ভেদটা লোপ পেয়েছে।'

বারান্দায় দামী শতরঞ্চি বিছিয়ে বন্ধুদের বসতে দিয়েছিলেন অমিয়ভূষণ। বিভুপদ দেয়ালে ঠেস দিয়ে পা ছড়িয়ে বসেছিলেন। দেবব্রতের পরিহাসের সুরে এবার সোজা হয়ে উঠে বসলেন। বললেন, 'পুরোপুরি না পেলেও পাচ্ছে। আলবৎ পাচ্ছে। সাহিত্য, সংস্কৃতি, রাজনীতি, দেশগঠন যে কোন বিষয় ধর সব ব্যাপারেই আমরা পশ্চিমমুখো, পশ্চিমের মুখাপেক্ষী একথা তুমি কিছুতেই অস্বীকার করতে পার না দেবব্রত।'

হিরন্ময় এঁদের সমবয়সী ও সহকর্মী, অতটা অন্তরঙ্গ নন। কারণ

আলাপ অল্পদিনের। তিনি হেসে বললেন, 'আপনাদের সেই পুরোন তর্ক শুরু হ'ল বুঝি? বাসে আসতে আসতে শুনছিলাম।'

সদানন্দ বললেন, 'হিরন্ময়বাবু, এ শুধু ওদের বাসের তর্ক নয় বাসি তর্ক। এর মীমাংসা বহুকাল আগেই হয়ে গেছে। আমরা পশ্চিমের মদ আমাদের দেশীয় মেটে হাঁড়িতে রাখব। তার ফলে একটু একটু তাড়ির গন্ধও পাব। তার ফলে তাকে স্বদেশী বলেও চালাতে কোন অসুবিধে হবে না।'

দেবব্রত আবার তিড় বিড় ক'রে উঠল, 'সদানন্দ, তুমি শুধু ইংরেজী ভাষার দাস হওনি, মনে মনে এখনও ইংরেজের দাস হয়ে আছ। তাই ভাবছ, আমরা সব দেউলিয়ার জাত। আমাদের নিজস্ব বলে কিছু নেই। আমরা সব পরের খেয়ে পরে মানুষ হয়েছি। পরের অনুকরণে জাতে উঠেছি। এইতো তোমাদের বলবার কথা?'

সদানন্দ বললেন, 'যদি উঠেও থাকি তাতে লজ্জার কিছু নেই। শাস্ত্রে পরস্ত্রী সম্বন্ধে নিষেধ আছে, দ্রব্যকেও তুচ্ছ করতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু পরের জ্ঞান বিজ্ঞান সভ্যতা সংস্কৃতি আত্মসাৎ করার বেলায় কোন বাধা নেই। কারণ এসব পরদ্রব্য নয়, পরম দ্রব্য। এক্ষেত্রে অয়ং নিজঃ পরবেতি গণনা লঘুচেতসাম।'

দেবব্রত বললেন, 'যতই বল, এর ফলে তোমার স্বাধীন চিন্তা লোপ পাচ্ছে, স্বাধীন চেষ্টা লোপ পাচ্ছে। জাত হিসেবে তুমি কিছুতেই স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে পারছ না। কারণ তোমার আত্মাদর নেই, আত্মবিশ্বাস নেই। বিভু যে বললে মুখাপেক্ষী ঠিক তাই। ওইটাই তার মুখের মোক্ষম কথা।'

নারী পুরুষের সম্পর্কের মত প্রাচ্য পাশ্চাত্যের সম্পর্ক নিয়ে এই পুরোন কিন্তু মুখরোচক তর্ক আরো কতক্ষণ চলত বলা যায় না। ট্রেতে ক'রে চায়ের কাপ সাজিয়ে এনাক্ষী এল সেখানে। পিছনে পিছনে এলেন অমিয়ভূষণ। প্রত্যেক বন্ধুর সঙ্গে মেয়ের পরিচয় করিয়ে দিয়ে তিনি বললেন, 'প্রণাম কর।'

এনাক্ষী মনে মনে হাসল। নির্দেশটি বাবা না দিলেও পারতেন। পিতৃবন্ধুদের যে পায়ের ধুলো নিয়েই প্রণাম করতে হয়, তা কি সে আর জানে না?

এনাক্ষীকে দেখে সবাই খুশী হয়ে উঠলেন। সদানন্দ বললেন, 'বাঃ বেশ মেয়ে, চমৎকার মেয়ে। অমিয়, মেয়ের আর এক নাম যে নন্দিনী, তা তোমার মেয়েকে দেখে ফের মনে পড়ল।'

লজ্জিত হয়ে চোখ নামাল এনাক্ষী। অমিয়ভূষণ স্মিতমুখে চুপ ক'রে রইলেন।

সদানন্দ বললেন, 'তোমার দাদা কোথায় মা?'

এনাক্ষী মৃদু হেসে বলল, 'দাদা ওদিকে আছে।'

একটু বাদে এনাক্ষী চলে গেলে সদানন্দ বললেন, 'আমরা বুড়ো হয়ে গেছি অমিয়, সত্যিই বুড়ো হয়ে গেছি।'

অমিয়ভূষণ বললেন, 'হঠাৎ তোমার এত খেদ যে।'

সদানন্দ বললেন, 'এর আগে আমি তোমার বাড়িতে এলে তোমার স্ত্রী এসে চা পান দিয়ে আপ্যায়ন করতেন, এখন আসে তোমার মেয়ে। আমার বাড়িতে গেলেও তাই দেখবে। আমার স্ত্রীর বদলে মেয়ে এসেই তোমার খোঁজ খবর নিচ্ছে। আমরা সব জেঠাবাবু কাকাবাবুর দলে ভর্তি হয়ে গেছি। হিরন্ময়বাবু, অমিয়র মেয়েটিকে দেখলেন?

হিরন্ময় চায়ের কাপ থেকে মুখ তুলে লজ্জিতভাবে বললেন, 'দেখলাম বইকি। বেশ সুন্দরী মেয়ে।'

সদানন্দ বললেন, 'শুধু সুন্দরী নয়, সুশিক্ষিতা। এম এ-তে ফার্স্ট ক্লাশ পেয়েছে বাংলায়।'

অমিয়ভূষণ প্রতিবাদ করে বললেন, 'না না, অত ভালো করতে পারেনি সদানন্দ। হাই সেকেণ্ড ক্লাস পেয়েছে।'

সদানন্দ বললেন, 'আরে ওই হ'ল। হয়ত দু চার নম্বরের জন্যেই ফস্কে গেছে বেচারার ফার্স্ট ক্লাসটা। এগজামিনার নিশ্চয়ই স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া ক'রে খাতা দেখতে বসেছিলেন। তাই নম্বরের বেলায় কার্পণ্য করেছেন। নইলে নিশ্চয়ই ও ফার্স্ট ক্লাশ পেত। তুমি আমি সবাই তো ভুক্তভোগী অমিয়। জীবনের প্রায় সব ব্যাপারেই আজকাল গৃহিণী আমাদের

ব্যারিস্টার। একথা লুকোতে চাইলেই কি আর লুকোতে পারবে?'

অমিয় হাসিমুখে চুপ করে রইলেন। কোন মন্তব্য করলেন না। সদানন্দ আবার হিরন্ময়ের দিকে তাকালেন, 'আচ্ছা হিরন্ময়বাবু।'

'বলুন।'

'আপনার ছেলে জ্যোতিশংকরও তো বেশ ভালো ছেলে। ও তো ডি ভি সি-তে ভালো চাকরি করে। কি পোস্টে আছে যেন।'

'সয়েল কেমিস্ট।'

'গতবার আমেরিকা ঘুরে এসেছে। তাই না?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

সদানন্দ বললেন, 'তাহলে আমাদের অমিয়র মেয়ের সঙ্গে লাগিয়ে দিন না। চমৎকার মানাবে। বন্ধুতা একেবারে কুটুম্বিতায় এসে চুম্বুকের মত আটকে থাকবে। চমৎকার হবে। আমরা দল বেঁধে ফের আসব এখানে। কি বল হে অমিয়?'

অমিয়ভূষণ মৃদু হাসলেন, 'আচ্ছা আচ্ছা, ওসব পরে হবে। তোমাকে আর এক কাপ চা দেবে কিনা তাই বল।' কৃতী ছেলের বাপ হিরন্ময় চায়ের কাপ সরিয়ে রেখে স্মিতমুখে সিগারেট ধরালেন। হঠাৎ কোন মন্তব্য করে বসবার মত কাঁচা মানুষ তিনি নন। তাঁর মাথার চুল এখানে সকলের চেয়ে বেশি পাকা।

কলোনীর নিমন্ত্রিত প্রতিবেশীরা আসতে শুরু করলেন এবার। এলেন রিটায়ার্ড সাব-জজ সুধামাধব সান্যাল, ইঞ্জিনিয়ার কুমুদকান্তি করগুপ্ত, ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর সুপারভাইজার বীরেশ্বর পোদ্দার এসে উপস্থিত হলেন। এই কয়েকদিনে এঁদের সঙ্গেই মোটামুটি বেশি আলাপ হয়েছে অমিয়ভূষণের। অল্প আলাপী ও দু' চারজনকে বলেছেন। তাঁরাও আসতে লাগলেন। তবে সবাই বিবেচক। সপরিবারে নিমন্ত্রিত হ'লেও কেউ ছেলেপুলে নিয়ে আসেননি, একাই এসেছেন।

ব্যতিক্রম দেখা গেল শুধু একজনের বেলায়। একটু বাদে আর একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক এলেন অমিয়ভূষণের বাড়িতে। তাঁর সঙ্গে ছোট বড় চারটি ছেলেমেয়ে, মুখের ওপর আধখানা ঘোমটা টানা স্ত্রী। তিনি ছেলেমেয়ে নিয়ে অন্দরমহলের দিকে চলে গেলেন। কিন্তু ভদ্রলোকটি ভিড় দেখে একটু যেন আড়ষ্ট আর কুণ্ঠিত হয়ে পড়লেন। ভিতরেই যাবেন না বাইরে বসবেন যেন ঠিক ক'রে উঠতে পারলেন না। সংকোচ দেখে অমিয়ভূষণ এগিয়ে গিয়ে তাঁর হাত ধরে সকলের মাঝখানে এনে বসিয়ে দিয়ে বললেন, 'নীলকান্ত রায়। আমার অনেককালের পুরোন বন্ধু। হারিয়ে গিয়েছিল। এই কীর্তিপুরে এসে ফের খুঁজে পেয়েছি। বলতে গেলে নীলুদার জন্যেই এখানে আসা হয়েছে আমার। এখন শুধু নাম করলে কি চেহারা দেখলে তোমরা একে চিনতে পারবে না। কিন্তু পরিচয় দিলে নিশ্চয়ই চিনবে।'

সকলের দিকে একবার তাকালেন অমিয়ভূষণ।

অধ্যাপক সাব-জজ, ইঞ্জিনীয়ার দল উৎসুক হয়ে রইলেন।

অমিয়ভূষণ বললেন, 'নীলকান্ত রায়। তখনকার দিনের বিখ্যাত ঔপন্যাসিক নীলকান্ত রায়। ওর সেই মালতীমালা, যৌবনস্বপ্ন পড়েছ নিশ্চয়ই?'

শ্বেতারা হঠাৎ কি বলবেন ভেবে পেলেন না।

কিন্তু সদানন্দ তাঁদের মুখপাত্র হয়ে বললেন, 'নিশ্চয়ই পড়েছি। অবশ্য পড়েছি। যৌবনে আমি আপনার দারুণ ভক্ত ছিলাম নীলকান্তবাবু। আপনি এই কলোনীর মধ্যেই থাকেন নাকি?'

অমিয়ভূষণ বললেন, 'না। ঠিক এ কলোনীতে নয়। এর বাইরে আর একটি কলোনী আছে। সেই নেতাজী কলোনীতে। আমার ইচ্ছা এই কীর্তিপুরেই নীলুদাকে নিয়ে আসব।'

সকলে বললেন, 'তাহ'লে তো ভালোই হয়।' (ক্রমশ)

চক্রদত্ত

চশমার কাঁচে প্লাসটিকের সানগ্লাস

পাওয়ারওয়ালা সানগ্লাস রাখতে হয় অথবা চশমার ওপর লাগাবার জন্য একটা ক্লিপ্‌ওয়ালা সানগ্লাস রাখতে হয়। এর দুটোই অসুবিধাজনক—কারণ প্রথম ক্ষেত্রে দুটো চশমাই সংগে রাখতে হবে—এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রেও ক্লিপওয়ালা সানগ্লাসটা যত্ন করে সংগে রাখতে হবে। তাছাড়া, চশমার ওপর ক্লিপওয়ালা সানগ্লাসটা লাগালে চশমাটা বেশ ভারী হয়ে উঠবে। এই অসুবিধা এখন দূর করা সম্ভব হয়েছে। এখন প্রয়োজন হলে সব সময়ের ব্যবহারের চশমার ওপর একটা আলাদা স্বচ্ছ প্ল্যাস্‌টিকের টুকরো লাগান চলবে। এই টুকরো এমনভাবে কেটে ঠিক করে নেওয়া যাবে যে ঠিক কাঁচের ওপর মাপে মাপ বসবে। প্রয়োজন হলেই সেটা কাঁচের ওপর থেকে টেনে খুলে নেওয়া যাবে এবং আবার দরকার হলে সেটাই কাঁচে এ'টে নেওয়া যাবে। এরকমভাবে একই প্ল্যাস্‌টিকের টুকরো বার বার খোলা এবং লাগান সম্ভব হবে। এছাড়া এর আরো সুবিধা হচ্ছে যে, এগুলো খুব হাল্কা এবং বিভিন্ন রংএর পাওয়া যায়।

ঘরের বাইরে ঘোরাফেরা করে যাদের কাজকর্ম করতে হয়, তাদের অনেককেই 'সান্‌গ্লাস' ব্যবহার করতে দেখা যায়। কারণ সূর্যের চড়া আলো চোখের পক্ষে কষ্টদায়ক। এদের কাজ হয়ে গেলে অথবা কোন কারণে ঘরের ভেতরে কাজ করতে হলে চোখের থেকে সান্‌গ্লাস খুলে কাজ করতে দেখা যায়—কারণ তখন আর চড়া আলো এদের চোখকে কষ্ট দিতে পারে না। কিন্তু যাদের চোখ খারাপ এবং সব সময় চশমা ব্যবহার করতে হয় তাদের হয় একটা আলাদা

*

ক্যানসারের কারণ নিয়ে গবেষণা করতে করতে ডাঃ গুডচাইল্ড একটা নতুন জিনিস লক্ষ্য করছেন। অবশ্য তিনি ইঁদুরের ক্ষেত্রে এটা প্রথম দেখেছেন। আরশুলায় খুব বেশী পরিমাণে ক্রিমি জাতীয় পোকা পাওয়া যায়। ইঁদুর এই সমস্ত আরশুলো খাবার পর তাদের শরীরের সমস্ত অংশই সহজে হজম করে ফেলতে পারে—কিন্তু আরশুলার পেটের ভেতরের ক্রিমিওয়ালা 'সিস্ট'গুলো হজম করতে পারে না। তখন এই ক্রিমিগুলো তাদের সিস্ট অর্থাৎ খোলসের মত ঢাকনা থেকে বের হয়ে ইঁদুরের পেটের ভেতরের দেওয়ালে আটকে থাকে এবং সেই স্থানটির সজীব কোষগুলি আস্তে আস্তে নষ্ট করে ফেলতে থাকে—ফলে সেখানে ক্যানসার হয়। ডাঃ গুড্‌চাইল্ড বলেন যে, কুকুরের গলায় এবং পেটে ইঁদুরের পোকা আটকে ক্যানসারের সৃষ্টি করে। তাঁর মনে হয় যে, এইরকমভাবে যদি ক্রমশ অন্য অন্য প্রাণীদের মধ্যে ক্যান্‌সারের কারণ খোঁজ করা যায়—তাহলে মানুষের [illegible] ক্যানসারের কারণ সম্বন্ধে কিছুটা আলোকপাত সম্ভব হবে।
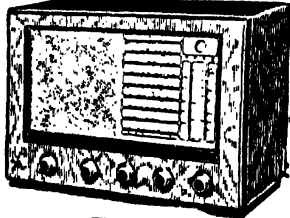
*

সাধারণ অসুখ বিসুখে মানুষ দুর্বল হলে অনেক সময় তাদের কার্যক্ষমতা একেবারেই নষ্ট হয়ে যায়। কিন্ত ক্ষুধা ও ক্লান্তিজনিত যে দুর্বলতা আসে তাতে মানুষ এতখানি অক্ষম হয় না। মাংসপেশী সঞ্চালিত করে কোন কিছু ভারী কাজ করবার ক্ষমতা চলে যায় তবে অল্প স্বল্প কাজ করবার ক্ষমতা কোনদিনই হারায় না। ক্ষুধায় মানুষ যত দুর্বলই হোক না কেন তাদের কোন কিছু ধরবার, কিছু বাঁকাবার ক্ষমতা অথবা কোন সুইচ নিভান জ্বালান ইত্যাদি ছোটখাট কাজ করার ক্ষমতা বজায় থাকে। কয়েকজন মনস্তত্ত্ববিদ ১৪ জন সৈন্য নিয়ে একটা পরীক্ষা করে দেখেছেন। তারা এদের ২৪ দিন ১০০০ হাজার ক্যালরী করে খাবার, কিছু ভিটামিন আর ৬ কাপ করে কাল কফি রোজ খেতে দিয়েছেন। এই সংগে এদের রোজ ব্যায়াম এবং ৫ মাইল করে হাঁটান হয়েছে। এই পরীক্ষার সময় দেখা গেল এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় তাদের হাত পা নড়বার ক্ষিপ্রতা ক্রমশ কমে আসছে। অবশ্য সূক্ষ্ম পরিচালনার ক্ষমতা ক্ষতিগ্রস্ত হয় না।

মহা সম্মেলনের পর

শ্রীসরলাবালা সরকার

মহাসম্মেলনের পর নূতন কার্যকরী সমিতি গঠিত হইল। ১২ জন সদস্য লইয়া এই কার্যকরী সমিতি গঠিত হইয়াছিল, তাঁহাদের নাম এখানে দেওয়া হইলঃ—

১। স্বামী বিরজানন্দ (সমিতির সম্পাদক), ২। স্বামী ধীরানন্দ, ৩। স্বামী অমৃতেশ্বরানন্দ, ৪। স্বামী জ্ঞানেশ্বরানন্দ, ৫। স্বামী কালিকানন্দ, ৬। স্বামী আত্মবোধানন্দ, ৭। স্বামী সুবোধানন্দ, ৮। স্বামী আত্মপ্রকাশানন্দ, ৯। স্বামী ওঁকারানন্দ, ১০। স্বামী নির্বেদানন্দ, ১১। স্বামী নির্বাণানন্দ, ১২। ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথ।

কার্যকরী সমিতির অধিবেশন মাসে অন্তত দুইবার করিয়া হইবে এবং প্রত্যেক অধিবেশনের দিন সদস্যগণ নিজেরা ঐ দিনের সভাপতি নির্বাচন করিবেন। কমিটির একজন স্থায়ী সেক্রেটারী থাকিবেন। সাতজন সদস্য একত্র না হইলে কোরাম হইবে না।

প্রত্যেক সদস্য একটি করিয়া ভোট দিতে পারিবেন, যখন কোন বিষয়ে সদস্যগণের মতভেদ হইবে, তখন দুই-দিকেই সমানসংখ্যক ভোট হইলে সভাপতি একটি অতিরিক্ত (কাস্টিং) ভোট দিতে পারিবেন।

ওয়ার্কিং কমিটির সেক্রেটারীকে এবং কমপক্ষে সাতজন সদস্যকে মঠে থাকিতে হইবে। প্রত্যেক সভ্যের কার্যকাল হইবে দুই বৎসর। এই দুই বৎসরের মধ্যে প্রত্যেক সদস্যকেই অন্তত আটটি অধিবেশনে উপস্থিত থাকিতে হইবে।

ওয়ার্কিং কমিটির কোন সভ্যের পদ যদি খালি হয়, তবে ওয়ার্কিং কমিটির অনুমোদন অনুসারে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সেক্রেটারী ও প্রেসিডেন্ট ঐ শূন্যপদে অন্য সদস্যকে নিয়োগ করিতে পারিবেন।

বেলুড় মঠের ট্রাস্টিগণের নামঃ—

১। স্বামী শিবানন্দ (সভাপতি), ২। স্বামী অখণ্ডানন্দ (সহ-সভাপতি), ৩। স্বামী সুবোধানন্দ, ৪। স্বামী সারদানন্দ (সেক্রেটারী), ৫। স্বামী শুদ্ধানন্দ (জয়েন্ট সেক্রেটারী), ৬। স্বামী বিরজানন্দ, ৭। স্বামী অভেদানন্দ, ৮। স্বামী ধীরানন্দ, ৯। স্বামী শংকরানন্দ, ১০। স্বামী অচলানন্দ, ১১। স্বামী সর্বানন্দ, ১২। স্বামী মাহিমানন্দ, ১৩। স্বামী বিশুদ্ধানন্দ, ১৪। স্বামী অমৃতেশ্বরানন্দ, ১৫। স্বামী মাধবানন্দ।

বিরজানন্দ, ধীরানন্দ ও অমৃতেশ্বরা-নন্দ উভয় কমিটিতেই রহিলেন।

বৎসরে অন্তত একবার করিয়া ট্রাস্টি কমিটি ওয়ার্কিং কমিটির কার্যাবলী সম্বন্ধে নিজেদের মতামত ব্যক্ত করিবেন এবং কার্য শীঘ্র সম্পাদন করিবার জন্য

স্বামী বিবেকানন্দর সহিত গুরুভ্রাতৃবৃন্দ। মধ্যে চাদর গায়ে উপবিষ্ট স্বামীজী

ট্রাস্টি-সভার পক্ষ থেকে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রেসিডেণ্ট বা সেক্রেটারী উপস্থিত থাকিবেন।

বস্তুত কার্য-পরিচালনের প্রায় সমস্ত দায়িত্বই ওয়ার্কিং কমিটির উপর অর্পিত হইল। অনেকে এইরূপ ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না, তাঁহারা বলিলেন, স্বামীজীর দেবোত্তর দলিলে ট্রাস্টিগণের এইভাবে ক্ষমতা অন্যের উপর দেওয়ার কোন অধিকার দেওয়া হয় নাই, বরং নিজেরা বরাবরই সেইভাবে কাজ করিয়া যাইবেন, প্রকারান্তরে এই-রূপেই নির্দেশ ছিল।

ইহা লইয়া সন্ন্যাসী মহাসম্মেলন শেষ হইবার সংগে সংগেই গোলমালের সূত্রপাত হইল, তরুণদলেরও অনেকে এই ব্যবস্থা মানিয়া নিতে রাজী হইলেন না। ইঁহাদের মধ্যে ব্রহ্মচারী জ্ঞানই অগ্রণী ছিলেন।

ব্রহ্মচারী জ্ঞান ও গণেন্দ্রনাথ ইঁহারা দুইজনই শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সর্বপ্রথম সময়ের ব্রহ্মচারী। অন্যান্য সকল ব্রহ্মচারীই ব্রহ্মচর্যের শেষে সন্ন্যাস লইয়া সন্ন্যাসী নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু ইঁহারা দুইজনেই ব্রহ্মচারীই থাকিয়া গিয়াছিলেন। জ্ঞান মহারাজ এখনও ব্রহ্মচারীরূপেই বেলুড়মঠে আছেন।

জ্ঞান মহারাজ অবশ্য স্বামীজীর কাছে সন্ন্যাসের প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন, কিন্তু স্বামীজী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "জ্ঞান, আমি চাই যে, অন্তত একজনও আজীবন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীরূপে এই মঠে আদর্শস্বরূপ হইয়া থাকুক।" স্বামীজীর এই কথার পর জ্ঞান মহারাজ আর সন্ন্যাস গ্রহণের অভিপ্রায় প্রকাশ করেন নাই।

স্বামী সারদানন্দ মঠবাসিগণ সকলেরই কেবল শ্রদ্ধার নয়, ভালবাসার পাত্র ছিলেন, তিনিই এইভাবে ওয়ার্কিং কমিটির হাতে সকল ক্ষমতা অর্পণ করিয়া নিজে যেন সরিয়া দাঁড়াইতে চাহিতেছেন, ইহাতে অনেকের দারুণ ক্ষোভ এবং তাঁহার উপর অভিমানও হইয়াছিল।

ট্রাস্টি কমিটির পক্ষ থেকে কতক-গুলি বিষয়ের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা ওয়ার্কিং কমিটিকে অর্পণ করা হইয়াছিল এবং বলা হইয়াছিল ঐ নিষ্পত্তির অনুকূলে অন্তত সাতজন সদস্যের ভোট থাকা প্রয়োজন। সেই বিষয়গুলি এইরূপঃ—

১। ট্রাস্টি কমিটি মঠ ও মিশনের যে সাধারণ নীতি নির্দেশ করিয়াছেন, সেই

অনুসারে মঠ ও মিশনের কার্যকারিতা নির্ণয় করা।

২। বিভিন্ন কেন্দ্রের (যদি পরস্পরের মধ্যে স্বার্থ সম্বন্ধ থাকে) অর্থনীতি পরিচালন।

৩। স্বামীজীর নিয়মাবলী অনুসারে প্রধান কেন্দ্র ও শাখা-কেন্দ্রগুলির কর্মিগণকে শিক্ষাদান।

৪। সম্প্রদায়ে সভ্য গ্রহণ এবং শাখা-কেন্দ্রে অধ্যক্ষ ও কর্মী প্রেরণ।

৫। বেলুড় মঠ ও মিশনের কার্য পরিচালন।

৬। অন্যান্য কেন্দ্রে মঠ ও মিশনের কার্য পরিদর্শন ও পরিচালন।

ইহা ছাড়া আরও কয়েকটি বিষয় ট্রাস্টি কমিটি ওয়ার্কিং কমিটির সহিত পরামর্শ করিয়া নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন, সেগুলি এইরূপঃ—

১। শাখা-কেন্দ্রগুলির মঠ বা মিশনের অন্তর্ভুক্ত করা অথবা মঠ হইতে বহিষ্কৃত করা।

২। স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ক্রয় বা বিক্রয় এবং ব্যাংক দেওয়া বা দান সংক্রান্ত আইনের ব্যাপারে।

শরৎ মহারাজ এই সকল ব্যাপার লইয়া যে অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে, তাহার মীমাংসার জন্য বেলুড়মঠে সকলকেই ডাকিয়া পাঠালেন এবং তিনি ও মহাপুরুষ মহারাজ প্রভৃতি সকল প্রাচীন সাধুই বেলুড় মঠে একত্র হইলেন। বেলুড় মঠের উঠানের আমগাছতলায় তিনি আসিয়া বসিলেন। মঠের প্রাচীন সাধুগণ এবং মঠে সে সময় গৃহীভক্ত বা সন্ন্যাসী যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা সকলেই সেখানে সমবেত হইলেন।

তখন শরৎ মহারাজ বলিলেন, "এই নূতন কমিটি সম্বন্ধে তোমাদের যার যা বলবার আছে বল।"

জ্ঞান মহারাজ বলিলেন, "আপনারা মঠ পরিচালনের সমস্ত ক্ষমতা নবীন সাধুদের হাতে দিয়া নিজেরা সরিয়া পড়িলেন কেন? এরকম আলাদা করিয়া ওয়ার্কিং কমিটি করিবার কি দরকার ছিল? যাঁহারা কাজ করিবেন, আপনারা সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তো তাঁহাদের চালাইতে পারিতেন।

উত্তরে স্বামী সারদানন্দ বলিলেন, "আমরা তো আর চিরদিন থাকবো না, আমাদের পরিবর্তে যারা পরে কার্যভার নেবে তারা এখন থেকে হাতে ক্ষমতা না পেলে তৈরী হবে কেমন করে? আমাদের এখন এই প্রতিষ্ঠান যা'তে বরাবর চালু

থাকে তাইতো করা দরকার। ঠাকুরের ইচ্ছাতেই এই ব্যবস্থা হয়েছে।”

কিন্তু অনেক করিয়া বুঝাইলেও প্রতিবাদী দল বুঝিতে চাহিলেন না, তাঁহারা বলিলেন, “এভাবে কাজ থেকে সরে দাঁড়ানো স্বামীজীরও অভিমত ছিল না। তিনি যতদিন দেহে ছিলেন, রুগ্ন-দেহেও কাজ করে গিয়েছেন। আপনাদের শিক্ষায় ও আপনাদের আদর্শেই এই মহাসঙ্ঘ গড়ে উঠেছে। সেই শিক্ষা ও আদর্শ থেকে যদি বঞ্চিত হয়, তবে সঙ্ঘ কি যথেচ্ছাচারের রাজত্ব হয়ে উঠবে না? সকল শিক্ষার ভিতর সঙ্ঘ গঠনে আজ্ঞাবহতাকেই স্বামীজী বিশেষ প্রয়োজন বলেছেন, একথা কেন আপনি একবারও মনে করছেন না?”

তখন স্বামী সারদানন্দ বলিলেন, “আচ্ছা, পরীক্ষা করে দেখাও তো প্রয়োজন। এ ব্যবস্থা তো চিরদিনের জন্য হচ্ছে না, দুই বৎসর পরীক্ষা করেই দেখা যাক্ না কেন, ফল কি রকম হয়। যদি ফল তেমন ভাল না হয়, তখন আবার বদল করলেই তো হবে।”

কিন্তু দুই বৎসরে ফল কেমন দাঁড়ায়, তাহা দেখিবার জন্য তিনি আর অপেক্ষা করেন নাই, দুই বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্বেই তিনি মহাপ্রয়াণ করেন।

এই সন্ন্যাসী মহাসম্মেলনে স্বামী নির্মলানন্দ ও বিজ্ঞানানন্দ (হরিপ্রসন্ন মহারাজ) যোগ দেন নাই। দূরদেশেও অনেক সাধু ছিলেন, যাঁহারা এই সম্মেলনে যোগ দিতে পারেন নাই—তাঁহাদের জন্য মহাসম্মেলনের পরে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারীর স্বাক্ষরিত একখানি যুক্ত-বিবৃতিপত্র প্রচার করা হইয়াছিল এবং সকল কেন্দ্রেই সেখানি পাঠানো হইয়াছিল। যুক্ত-বিবৃতিপত্রখানি এইরূপঃ—

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শরণং

Ramkrisna Math,
Howrah Dist.,
Belur P.O.,
Dated 17-5-26.

স্নেহাশীর্বাদমিদং

শ্রীশ্রীমঙ্গলময় ঠাকুরের অশেষ কৃপায় ও তোমাদের চেষ্টা এবং সহযোগিতায় তাঁহার সঙ্ঘের প্রথম মহাসম্মেলনের অধিবেশন সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। আশা করি, প্রতিনিধিবর্গের নিকট হইতে ও অন্যান্য প্রকারে তোমরা উক্ত মহতী মিলনসভার সমুদয় কার্য-বিবরণী অবগত হইয়াছ। এখন উহাকে অবলম্বন করিয়া আমরা তোমাদের পরস্পরের মধ্যে গূঢ়ভাবে প্রীতি, প্রেম এবং ভালবাসা ও একতার সম্বন্ধ স্থাপনের যে প্রয়াস পাইয়াছি, তাহা রক্ষা করার ও পুষ্ট করার ভার তোমাদের উপরেই রহিল। আমাদের স্থির বিশ্বাস, তোমাদের পরস্পরের মধ্যে ঐরূপ ভাব পূর্বে ছিল, এখনও আছে এবং পরেও থাকিবে এবং একমাত্র ঐ ভিত্তির উপরেই তোমাদের ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক উন্নতি, সঙ্ঘের উন্নতি ও আমাদের আশা-ভরসা সমস্তই নির্ভর করিতেছে।

এই মহাসম্মেলনে তোমাদের প্রতিনিধিবর্গের দ্বারা প্রস্তাবিত হইয়া আমাদের অনুমোদনে শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্ঘের সর্ববিষয়ে কল্যাণকর কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। ঐ প্রস্তাবগুলি তোমাদের জ্ঞাতার্থে পত্র-মধ্যেই পাঠানো হইল, আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা তোমরা সকলে মিলিয়া একমন ও প্রাণ হইয়া ঐগুলিকে বরণ করিয়া লইয়া কার্যে পরিণত করিবার জন্য সচেষ্ট হও।

এতদ্ব্যতীত, আমরা ট্রাস্টিগণ ও গভর্নিং-বডির মেম্বরগণ মিলিত বহুজন সভ্য দ্বারা একটি কার্যকরী সভা গঠন করিয়াছি, প্রধান প্রধান কেন্দ্রের জন্য উপযুক্ত অধ্যক্ষ ও কর্মী বাছিয়া যাহাদিগকে বর্তমানে বেলুড় মঠে বা উহার নিকটে রাখিয়া কাজকর্মে আমাদের সহায়তার জন্য লওয়া যাইতে পারে, তাহাদিগকে এই সভার সভ্যরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। ইঁহারা অতঃপর আমাদের সঙ্গে সর্ববিষয়ে পরামর্শ করিয়া আমাদেরই ভারপ্রাপ্ত বিশেষ অঙ্গরূপে মঠ ও মিশনের যাবতীয় কার্য পরিদর্শন ও পরিচালন করিবেন; সভ্যগণের নাম ও সভার গঠন, কার্যপ্রণালী এবং ঐ সভা কোন্ কোন্ বিষয় পরিদর্শন ও পরিচালন করিবার ভারপ্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহার সর্বশেষ বিবরণ পত্রমধ্যেই তোমাদের জ্ঞাতার্থে প্রেরিত হইল। সর্ববিষয় ও সকল অবস্থা ধীরভাবে ও সুচারুরূপে আলোচনা করিয়া ও বিবেচনা করিয়া আমরা উক্ত সভা গঠন ও সভ্য নির্বাচন করিয়াছি।

উক্ত কার্যকরী সভা গঠন করিবার কালে অন্যান্য অবস্থা ব্যতীত প্রধানত দুইটি বিষয় লক্ষ্য করিয়া উহার গঠন ও প্রবর্তন করা আশু প্রয়োজন বলিয়া আমাদের বোধ হইয়াছে, আশা করি তোমরাও এবিষয়ে আমাদের সহিত একমত হইবে। প্রথমত, শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজীর কার্য যেরূপ নানাভাবে বর্ধিত হইতেছে, তাহাতে আমাদের কয়েকজনের পক্ষে সকল বিষয় লক্ষ্য রাখিয়া উহাদের পুষ্টিকল্পে সকল সময় সাহায্য করা সম্ভবপর হইতেছে না। তাহার কারণ, আমরা অনেকেই বয়োবৃদ্ধির দরুণ তোমাদের সহিত কার্য করিবার ইচ্ছা থাকিলেও অক্ষম হইয়া পড়িতেছি, ইহাতে তোমাদের এবং আমাদের নানাবিধ অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে, সেজন্য আমাদের সহায়তা করিবার জন্যে কয়েকজন অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক বিচক্ষণ কর্মীর অভাব আমরা প্রত্যহ অনুভব করিতেছিলাম। দ্বিতীয়ত, ভবিষ্যতে তাঁহার সঙ্ঘের রক্ষণাবেক্ষণের ভার তো তোমাদের উপরেই ন্যস্ত হইবে, সেজন্য আমাদের আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা আমরা থাকিতে থাকিতেই তোমাদের মধ্যে যতজনকে পারি আমাদের সহিত সর্ববিষয়ে সহযোগী করিয়া লইয়া যতটা সম্ভব কার্যক্ষম করিয়া লই। এইরূপে কর্মভার লাঘব হইলে আমরাও যে কতকটা মানসিক শান্তি লাভ করিব তাহা তোমরা একটু বিবেচনা ও চিন্তা করিলেই ধারণা করিতে সক্ষম হইবে। অবশ্য শ্রীশ্রীঠাকুরকে লইয়া তোমাদের সহিত ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগতভাবে আমাদের যে প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে তাহা চিরকালই অক্ষুণ্ণ থাকিবে। অতঃপর তোমরা ব্যক্তিগতভাবে সাধনভজন ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে পরামর্শের জন্য যেরূপ আমাদের নিকট পূর্বে জানাইতে সেইরূপ বর্তমানে কার্যকরী সভার সম্পাদক কালীকৃষ্ণ মহারাজের (স্বামী বিরজানন্দের) নিকট জানাইয়া সুখী করিবে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করিতেছি তোমাদের সকলের তাঁর প্রতি ভক্তি বিশ্বাস বৃদ্ধি হউক।

ইতি—সতত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী
শ্রীসারদানন্দ
স্বাঃ শিবানন্দ

এই যুক্ত-স্বাক্ষরিত পত্রে নূতন কার্যকরী সমিতি গঠনে যাহারা বিরোধিতা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা

ও নবভাবে কার্যভার গ্রহণকারীদিগকেও কর্তব্যে উৎসাহিত করা হইয়াছে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় বর্তমানে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বহুবিস্তৃত ও সর্বজনহিতকর এক মহাপ্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু এই তরঙ্গায়িত পূলা স্রোতস্বিনীর উৎসের দিকে আমাদের মন যখন স্বতঃই আকৃষ্ট হয়, কতখানি ত্যাগ ও তপস্যার শক্তি যে এই প্রতিষ্ঠানের মৌলিক শক্তিরূপে ইহাকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়া নিয়ত সফলতার পথে অগ্রসর করিতেছে, তাহা যখন স্মরণ করি তখন আপনা হইতেই মন সেই মহত্ত্বের পদতলে লুণ্ঠিত হয়।

স্বামীজী শিক্ষাকে সর্বোপরি প্রাধান্য দিয়াছিলেন, তিনি বেদবিদ্যালয়, শিল্পবিদ্যালয় ও উচ্চশিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের যে পরিকল্পনা করিয়াছিলেন, আজ তাঁহার সে পরিকল্পনা কার্যে পরিণত হইয়াছে। অল্পদিন পূর্বে জননী সারদামণির শতবার্ষিকী পূজার অর্ঘ্যদান উপলক্ষে যে সমস্ত ভারতবর্ষব্যাপী আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তির তরঙ্গ জাগ্রত হইয়াছিল, তাহা সকলেরই স্মরণ আছে। সমস্ত দেশবাসীই আজ এই প্রতিষ্ঠানের সহিত আন্তরিক সহযোগিতা করিতেছে, এবং দেশের পক্ষে এইরূপ মনোভাব বিশেষ মঙ্গলকর।

স্বামীজী মেয়েদের সম্বন্ধে যে পরিকল্পনা করিয়াছিলেন, তাহাও আজ

কার্যকরী রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। ভগিনী নিবেদিতার তপস্যাপূতে নিবেদিতা বিদ্যালয় আজ সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ব্রহ্মচারিণীগণের স্বতন্ত্র মঠও স্থাপিত হইয়াছে।

কয়েকখানি পত্রের অনুলিপি এখানে উদ্ধৃত করিতেছি, এই পত্রগুলির মধ্যে দুইখানি স্বামী শুদ্ধানন্দ কর্তৃক তুলসী মহারাজকে (স্বামী নির্মলানন্দ) লিখিত, স্বামী সারদানন্দের একখানি পত্র, এবং তুলসী মহারাজের দুইখানি পত্র আছে এবং একখানি পত্র স্বামী শিবানন্দ মহারাজের তুলসী মহারাজকে লিখিত পত্র।

শ্রীশ্রীদুর্গা শরণং
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শরণং

শ্রীমান তুলসী,

আমার শুভ বিজয়ার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ ও কোলাকুলি জানবে।

আমি সব ভুলে গিয়েছি, তুমিও সব ভুলে যাও। একটু ভালবাসা নিয়ে এসো। ঠাকুর বড় ভালবাসার ঠাকুর। বুড়ো বয়সে আর কেন? দিনকতক আর বাকি বৈ তো নয়, এসো, ভালবেসে কাটিয়ে দেওয়া যাক্। তুমি এলেই একসঙ্গে মা কন্যাকুমারী দর্শন করে আসা যাবে। খরচপত্রের অভাব হবে না ঠাকুরের কৃপায়। এখানকার সব কুশল। একটা গরু কাল বিইয়েছে, এঁড়ে বাছুর। মহাষ্টমীর দিন বেশ ভোগরাগ হয়েছিল অনেকগুলি ভক্ত প্রসাদ পেয়েছিলেন, দরিদ্রনারায়ণও ২৫।৩০ জন সেবা করিয়াছেন, ভক্তও প্রায় ৫০।৬০ জন। আশা করি তোমার শরীর ভাল আছে। আসবার সময় সর্বানন্দকে আশীর্বাদ ক'রে এসো।

ইতি তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী—
শিবানন্দ

সম্ভবত পত্রখানি দাক্ষিণাত্যের কোন মঠ হইতেই লেখা, পত্রে ঠিকানা বা তারিখ ছিল না।

তুলসী মহারাজকে স্বামী সারদানন্দের লিখিত পত্রঃ—

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শরণং

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মঠ

উদ্বোধন কার্যালয়
১নং মুখার্জি লেন
বাগবাজার, কলিকাতা
ইং ১৭।৮।২৪

তুলসী মহারাজ,

শ্রীমান সুধীরকে যে দুইখানি পত্র লিখিয়াছ, তাহা পড়িয়া বিশেষ দুঃখিত হইলাম। শরীর আমার ভাল যাইতেছে না, mild type-এর বেরিবেরি ও পেটের অসুখ ইত্যাদিতে ভুগিতেছি, তাহার পর গোলাপ মা heartএর অসুখে শয্যাগতা, বোধ হয় আর অধিক দিন দেহ থাকিবে না, এইসব কারণে উত্তর দিতে বিলম্ব হইল।

আমি মহাপুরুষকে অদ্য লিখিয়া দিলাম যে, ঝগড়াঝাটি করিয়া সহসা তোমাকে ঐরূপে Bangaloreএর কাজ ছাড়িয়া দিতে বলা আমার মতে আদৌ ভাল নয়, তুমি ও তিনি এখানে চলিয়া আসিলে সকলে মিলিয়া যাহা ন্যায়সংগত এবং যাহাতে শ্রীশ্রীঠাকুর স্বামীজীর কার্যের উন্নতি হইবে এরূপভাবে একটা মীমাংসা স্থির করা যাইবে। জীবনের আর অল্পদিনই আমাদের অবশিষ্ট আছে, কয়টা দিনের জন্য এইরূপ ঝগড়া-বিবাদ করা তিক্তবোধ হয়।

অধিক আর কি লিখিব ভাই, মহাপুরুষের সঙ্গে তুমি একবার এদিকে কিছুদিনের জন্য চলিয়া আইস ইহাই অনুরোধ। আমার ভালবাসা ও নমস্কার জানিবে।

ইতি চিরপ্রেমাবদ্ধ—
স্বাঃ সারদানন্দ।

স্বামী শুদ্ধানন্দের পত্র।

(১) ওঁ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ
বেলুড় পোঃ
হাওড়া, ২৭শে মে
১৯২৪

পূজনীয় তুলসী মহারাজ,

আমার অসংখ্য সাষ্টাংগ জানিবেন। বহুদিন আপনাকে পত্রাদি লিখি নাই, তজ্জন্য ক্ষমা করিবেন। মধ্যে মধ্যে নানা source হইতে আপনার কিছু কিছু সংবাদও পাইয়া থাকি। মধ্যে শুনিয়াছিলাম আপনার নাকি ডায়েবেটিস হইয়াছে, আশা করি এখন অনেকটা ভাল আছেন। সম্প্রতি বুড়োবাবার পত্রে জানিলাম, আগামী পূজার সময় আপনার এদিকে আসিবার সম্ভাবনা আছে। যদি শরীর থাকে, তবে আপনার দর্শন পাইব। শুনিলাম, হরিপদ ব্যাণ্গালোর যাইতেছে বোধহয় এতদিনে গিয়াছে। সে আবার আমেরিকা যাইবে বলিতেছে। আমি তাহাকে এখানে থাকিতে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলাম তাহাতে সে বলে, "২।৩ বৎসর পরে একেবারে ফিরিব। আমি গেলে miss Morton নিউইয়র্ক সোসাইটির auditorium করিয়া দিতে পারে।" আমার তো মনে হয়, হরিপদ

বোধহয় ভারতীয় কার্যের বেশ সুশৃংখল হইতে পারে। কারণ, শরৎ মহারাজও আজকাল নানা কারণে কিছু দেখিতে পারেন না। মহাপুরুষ মহারাজও বৃদ্ধ ও রুগ্ন হইতেছেন এবং আমরাও বার্ধক্য-গ্রস্ত হইয়া ক্রমশ কর্মে অক্ষম হইয়া পড়িতেছি। আপনি কি মনে করেন? যদি ভাল বিবেচনা করেন, তাহার সহিত দেখা হইলে, তাহাকে ভারতে থাকিতে বলিবেন। বোধহয়, সে যদি Indian work বেশ organise করিতে পারে, তবে প্রয়োজন হইলে ২।৪টি ভাল ভাল চরিত্রবান উপযুক্ত লোক আমেরিকায় পাঠাইয়া তথাকার কার্যের সুবিধা করিতে পারি। এ সম্বন্ধে আপনি কি মনে করেন জানিবার জন্য উৎসুক রহিলাম।

আমি প্রায় সাতমাস হইল কাশী সেবাশ্রমে change-এ ছিলাম। দুর্গা ডাক্তারের ব্যবস্থা মত পথ্যাদি করিয়া কতকটা ভাল আছি। এখানে মাসখানেক হইল আসিয়াছি। মনে করিয়াছিলাম কাশীতে গরম কাটাইব। কিন্তু মহাপুরুষ change-এ যাওয়ায় তাঁহার অভিপ্রায় অনুসারে মঠ হইতে পুনঃ পুনঃ লিখায় এখানে আসিতে বাধ্য হইয়াছি। আশীর্বাদ করুন যেন এই শেষ বয়সে মন ঠাকুরের পাদপদ্মে সংলগ্ন হয়, আর বাজে হুজুগে যেন না কাটে। বাল্যকাল হইতে আপনা-দের আশ্রয় লইয়াছি, কত অপরাধ করিয়াছি, কত ঝগড়াঝাটি করিয়াছি, সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া আবার সদুপদেশ দিয়াছেন। এখন যাহাতে ঠাকুরের পাদপদ্মে মন যায় তাহার জন্য তাঁহার কাছে একটু বলুন। আপনারা তাঁর সন্তান, তিনি নিশ্চয়ই আপনাদের কথা শুনিবেন।

কাশীতে যাইবার কিছু পরেই সুকুল দেহত্যাগ করিল। আমাদের বাল্যসংগীও চলিয়া গেল। আপনারা ঠাকুরের ভক্ত-ত্যাগী-শিষ্যও কয়েকজন মাত্র আছেন। আপনাদের সংগে আমাদেরও টানিয়া লইয়া ঠাকুরের কাছে চলুন।

কাগজে দেখিয়া খুব সুখী হইলাম Trivandrum Math সম্পূর্ণ হইয়া উহা open করিয়াছেন—আরও আনন্দিত হইলাম জানিয়া যে ঐ দেশীয় কয়েক-জনকে ঠাকুরের ত্যাগের পথে আনিয়া সন্ন্যাস দিয়াছেন। দক্ষিণ দেশে থাকিয়া ঠাকুরের কাজ আপনার দ্বারা যেরূপ পাকা হইল, শত শত বক্তৃতা লেকচারেও বোধহয় তা হয় না। আমি আপনার মন-জোগানো কথা বলিতেছি না। আমার ইহাই আন্তরিক বিশ্বাস।

বেজায় sentiment করা গেল। আপনি হয়তো বলিবেন বুড়ো বয়সে আবার বৈষ্ণবীভাব এত কোথা হইতে আসিল? যাই বলুন, কিন্তু আপনার অনুগ্রহ চাই-ই—চাই, যথেষ্ট পাইয়াছিও। পূজনীয় স্বামীজী মহারাজ হইতে আপনারা সকলেই অল্পবিস্তর কৃপা করিয়াছেন। তার জোরেই এখনও একরূপ মঠে আপনাদের আশ্রয়েই টিকিয়া আছি।

এই চিঠিখানি লেখার occasion হইল মঠের কর্মীদের চাপে। মঠ হইতে mission-এর General Report বলিয়া ইতিপূর্বে দুইখানি বাহির হইয়াছে। ১৯১২তে প্রজ্ঞানন্দ করিয়াছিল, ১৯১৯-এ আমি ও শরৎ মহারাজ করি। সম্প্রতি অনেক লোক মঠ mission সম্বন্ধে মোটামুটি একটা Idea পাইতে চায় বলিয়া বহুদিন হইতে আর একটা General Report লিখিবার চেষ্টা চলিতেছে, কিন্তু এতদিন কার্যে পরিণত হয় নাই। 2nd General Reportটার এক কপি আপনাকে পাঠাইলাম। দয়া করিয়া এটা একটু উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিয়া 3rd-এর জন্য যদি আপনার ওদিককার কার্যের কিছু সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া উচিত মনে করেন তো পাঠাইয়া দিবেন আপনার সাবকাশ মত—তাড়াতাড়ি কিছু নাই। আরও কিরূপভাবে Report বাহির করিলে সাধারণের উপকার বেশী হইবে বলিয়া মনে করেন তৎসম্বন্ধে যদি কিছু suggestion দেন, তবে তাহাও যাহারা উহা সংকলন করিতেছে তাহাদের জানাইব।

এখনও মঠের climate ভাল,—বর্ষা নামিলেই হয়তো পালাই পালাই করিতে হইবে। শরৎ মঃ অপেক্ষাকৃত ভাল আছেন। তবে, তাঁহারও প্রস্রাবের ব্যায়রাম, বাত এবং রক্তপ্রস্রাব প্রভৃতি মাঝে মাঝে আছে। তার উপর আবার যোগীন মা বুড়ি একেবারে শয্যাশায়ী, তাঁর দিনরাত তত্ত্বাবধান। আর আর খবর একরূপ ভাল। আশা করি আপনার কুশল সংবাদ সত্বর পাইব। ইতি—

স্বাঃ শুদ্ধানন্দ।

ওঁ

শ্রীরামকৃষ্ণ শরণং

Seal.
R. K. Math

The Ramkrishna Math,
Belur, P. O. Howrah,
Dated the
12th August, 1924.
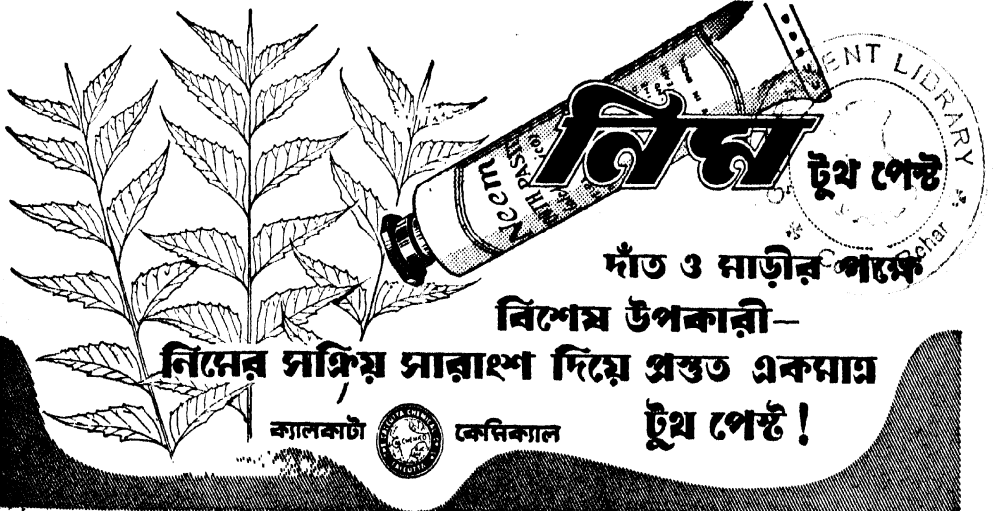
পূজনীয় তুলসী মহারাজ,—

আপনার ২৪ জুনের পত্র পাইয়া যে কি পর্যন্ত প্রীত হইয়াছিলাম, তাহা কি বলিব। × × আপনার প্রতিশ্রুত তৃতীয় General Report-এর জন্য ওদিককার কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণের প্রতীক্ষায় এতদিন পত্রের উত্তর দিই নাই, ইতিমধ্যে আপনার ৭ই আগস্টের পত্র আসিয়া পৌঁছিল।

পত্রখানি পড়িয়া কিছু আশ্চর্য হই নাই, কারণ আপনার পূর্বের পত্রে উহার কতকটা আভাস ছিল। আপনার আদেশ অনুসারে ঐদিনই উদ্বোধনে গিয়া পূজনীয় শরৎ মহারাজের নিকট পত্র পড়িয়া শুনাইলাম। এইরূপ একটা অপ্রীতিকর ব্যাপার হওয়াতে তিনি অতিশয় দুঃখিত হইলেন, আমিও মর্মাহত হইয়াছি। কাল তিনি মঠে আসিয়াছিলেন, তিনি এ বিষয়ে আপনাকে পত্র লিখিবেন বলিলেন।

এক স্থানের কার্যভার ত্যাগ করা এক কথা। মহাপুরুষ মহারাজের ইচ্ছা হইয়াছে যে, আপনি ওখানকার কার্য ছাড়িয়া দিন। তাঁহার উপর আপনার যথেষ্ট ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালবাসা আছে ইহাও জানি, আর মহাপুরুষ মহারাজ আপাতত যতই অন্যরূপ ব্যবহার করুন, তিনি যে আপনাকে আন্তরিক ভালবাসেন না বা আপনি ওদিকে যথেষ্ট কাজ করিয়াছেন, ঠাকুর স্বামীজীর নাম প্রচারে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন বলিয়া বিশ্বাস করেন না, একথাও আমি বিশ্বাস করি না।

কাল আবার আপনার আর একখানি পত্র পাইলাম এবং আপনার শরীর খারাপ হইয়াছে জানিয়া বিশেষ দুঃখিত হইলাম। আশা করি, এতদিনে মহাপুরুষ

মহারাজের রাগ পড়িয়া গিয়াছে এবং আপনার মনে এই ব্যাপারে যে একটা অশান্তির ভাব জাগিয়াছিল, তাহা কাটিয়া গিয়াছে এবং উভয়ে সৎভাবে ও শান্তভাবে পরামর্শ করিয়া যাহাতে ওদিককার কার্য বেশ ভালভাবে চলে, তাহার ব্যবস্থা করিতেছেন।

মহারাজ, আশীর্বাদ করুন, যাহাতে মনটা ক্রমশ বহির্মুখী ভাব হইতে সরিয়া একটু অন্তর্মুখী হয়। জীবনের শেষ দশায় আসিয়াছি। ঠাকুর স্বামীজীর মুখের দিকে চাহিয়া আপনাদের পদপ্রান্তে আশ্রয় নিয়াছিলাম, আশীর্বাদ করুন, তাঁহাদের মুখের দিকে চাহিয়া শেষ পর্যন্ত যেন আপনাদের সকলের উপরেই শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালবাসা অক্ষুন্ন রাখিতে পারি। আমাদের আজ মহা পরীক্ষার দিন. আমি যেন নিজের দোষ কেবল দেখি, আপনাদের গুণই যেন কেবল আমার লক্ষ্য হয়। স্বামীজী মহারাজ তাঁহার নিয়মাবলীতে বড় কঠোর একটি আদেশ করিয়া গিয়াছেন—"এ মঠের কেহই মন্দ নহে—মন্দ হইলে কখনও আসিত না. অতএব কাহাকেও মন্দ ভাবিবার পূর্বে কেন মন্দ ভাবি, এটা ভাবা উচিত।" আশীর্বাদ করুন, স্বামীজীর এই আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া জ্ঞান, ভক্তি লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারি। হরিপদর এডেন হইতে এক পত্র পাইয়াছি, মনসুনের ঝড়ে কষ্ট পাইয়াছে। অপরাপর কুশল, মধ্যে মধ্যে কুশল সংবাদ দানে সুখী করিবেন। শীঘ্র যদি ঐদিকে আসা হয়, আপনার বহুকাল পরে সাক্ষাৎ পাইয়া সুখী হইব। আমার অসংখ্য প্রণাম জানিবেন এবং পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজকেও জানাইবেন। আয়েঙ্গার প্রভৃতিকে ভালবাসা জানাইবেন। ইতি দাস,

(স্বাঃ) **শুদ্ধানন্দ।**

পুনশ্চঃ—ওদিককার কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠাইবেন বলিয়াছিলেন, মাঝখানে এইরূপ অপ্রীতিকর ব্যাপার হইয়া যাওয়াতে বোধ হয় তাহা পাইবার একটু বিঘ্ন ঘটিল। আশা করি, উহা আপনার স্মরণ আছে এবং উহা পাঠাইবার আপনি অন্য কোন ব্যবস্থা করিয়াছেন। রিপোর্ট প্রস্তুত হইয়া টাইপ হইতেছে ১০।১৫ দিনের মধ্যে ওদিককার সংক্ষিপ্ত বিবরণ আসিলে বিশেষ সুবিধা হয়। দয়া রাখিবেন। ইতি দাস,

(স্বাঃ) **শুদ্ধানন্দ।**

এবার স্বামী নির্মলানন্দের লিখিত দুইখানি পত্রের অনুলিপি দিয়া প্রবন্ধটির সমাপ্তি করিতেছি। স্বামী নির্মলানন্দ বহুদিন বাঙ্গালোরে ছিলেন এবং সেখানে অনেক মঠ স্থাপন করেন। মঠে ইঁহাকে তুলসী মহারাজ বলা হইত। এই পত্রাংশ হইতে ইঁহার কতকটা পরিচয় পাওয়া যাইবে। প্রথম পত্রখানির শেষের দিকটাই উদ্ধৃত করা হইল।

১০ই আগস্ট, ১৯১২

× × "তোমার শরীর ক্রমশ ভালোর দিকে যাইতেছে জানিয়া সুখী হইলাম. ঠাকুর শীগ্‌গির তোমাকে পূর্ববৎ সুস্থ ও সবল করুন এই প্রার্থনা করি।
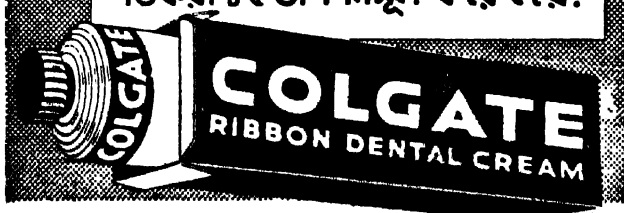
"এখানে বেশ শীত পড়িয়াছে। দিনের বেলাতেও গরম জামা ব্যবহার করিতে হয়, কিন্তু এখন এ বৎসর স্বাস্থ্য ততো ভাল নয়। চারিদিকেই 'সর্দিজ্বর' অর্থাৎ ইনফ্লুয়েঞ্জা মত হইতেছে।

তোমাকে আমাদের কলিকাতার নূতন মঠে (শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা মঠ) আমাদের সকলের (সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীদের) বাহিরের স্ত্রীলোকদের দ্বারা পরিচালিত ও সংগঠিত প্রতিষ্ঠানগুলির (যেমন সাবিত্রী) সম্মিলনী, সাবিত্রী শিক্ষালয় প্রভৃতি) সহিত কিরূপভাবে সংস্রব রাখা উচিত, সেই সম্বন্ধে কয়েকটি কথা লিখিতেছি, বিশেষ করিয়া চিন্তা ও অনুধাবন করিয়া দেখিবে।

প্রথমত, ঐগুলির প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা আমরা বিশেষভাবে জানি ও বুঝি, তাহা কখনও অস্বীকার করি না। কিন্তু আমরা সন্ন্যাসী, আমাদের ঐসব কাজের সঙ্গে কোন Direct সম্বন্ধ রাখা (যেমন ঐসব প্রতিষ্ঠানের কমিটির মেম্বর হওয়া বা অপরাপর সময়ে ঐ সংক্রান্ত কাজকর্মের দরুণ বা কাজের অছিলায় ঐসব স্ত্রী মেম্বরের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করা কিম্বা কোন স্ত্রী মেম্বরের বাড়ি গিয়া পরামর্শ বা আলাপ-পরিচয় করা ইত্যাদি) আমার ক্ষুদ্র মতে উচিত বলিয়া বোধ হয় না। আমাদের যদি ঐ সকল কার্যে সহায়তা করিতে হয় বা করিবার ঐকান্তিক ইচ্ছা থাকে, তবে তাহা ঘনিষ্ঠ সংস্রবে না আসিয়া দূরে থাকিয়া সকল প্রকার সাহায্যই আমরা অনায়াসে করিতে পারি।

Direct সম্বন্ধে ঐসব কাজের জন্য ডাক্তার দুর্গাপদ, মাখমবাবু, কিরণবাবু, যতীনবাবু প্রভৃতি মিশনের সুযোগ্য গৃহস্থ মেম্বররা থাকিলেই শোভনীয় ও নির্দুষ্য হয় ও সাধারণের সমালোচনার গণ্ডির বাহিরে থাকিয়া কাজটি সুচারু-

ভাবে চলিতে পারে। এইরূপ কাজের সম্বন্ধে ঠাকুর ও স্বামীজীর অভিমত আমার যতদূর জানা আছে, তাহাতে তাঁহাদের বিশেষভাবে তফাত হইতে সহায়তা করার নির্দেশ ও উপদেশ আছে, ঘনিষ্ঠভাবে নয়। আজকালকার হাল ফ্যাশানের যে কোন Movement হোক না কেন, তাতে দু'চারজন 'স্বামী' নামধারী থাকা যেন একটা Indispensable factor, তা না থাকিলে যেন সেই সব Movement, 'মুভমেণ্ট' নামেরই অযোগ্য (যেমন শ্রমিক দল, ধর্মঘটী দল, স্বরাজ, স্বদেশী, সমাজ-সংস্কার, বিধবা বিবাহ, শিশু-পালন ও সংগঠন ইত্যাদি ইত্যাদি)। শ্রীশ্রীঠাকুরের আশ্রিত যেসব সন্ন্যাসী, তাঁহাদের আদর্শ এই হাল ফ্যাশানের সন্ন্যাসীদের মত হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে মনে হয়, আমরা ঐরূপ হইলে আমাদের সন্ন্যাস গ্রহণ বিড়ম্বনা মাত্র। নিবেদিতা স্কুল যখন প্রথম আরম্ভ হয়, তখন আমি স্বামীজীর নিকটেই ছিলাম ও তিনি ঐ স্কুল পরিচালনে কিরূপ কঠোর নিয়মাবলী হওয়া উচিত, সে সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলাম, তাহা সব শুনিয়াছিলাম। আমি যাহা লিখিলাম, তাহা সেই উপদেশের একটু আংশিক ছায়া মাত্র।

আমরা যদি তাঁহার আদিষ্ট উপদেশে চলিতে পারি বা সতত চলিবার চেষ্টা করি, তাহা হইলে আমাদের সর্বতোভাবে কল্যাণ হইবে। আর যদি স্বেচ্ছানুযায়ী কাজ করি, তাহা হইলে নিজেদের ঘাড়ে দায়িত্ব নিয়া তাহার বিষময় পরিণাম ভোগ করিতে হইবে। যেটা যে ভাবের কাজ, তার ভালমন্দ বিচার করিয়া, আমাদের সন্ন্যাস-জীবনের সহিত ঐসব কাজের কোন অংশে কতটুকু খাপ খায় ও আমাদের ঐ কাজবিশেষের সঙ্গে কতটুকু সম্পর্ক ও সংস্রব রাখিলে নির্দোষ হয়, সে বিষয়ে আমাদের বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক অন্যথা পথভ্রষ্ট হওয়ার অথবা অনিষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে। বেশী আর কি লিখিব। আমার যাহা অভিমত লিখিতেছি, জীবন্মুক্তজী প্রভৃতি সকলকে ইহা জানাইয়া বলিবে, তাঁহারা যেন এই কথার যৌক্তিকতা বা অযৌক্তিকতা সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া দেখেন। আমরা যেন Impulsive Emotion ও সেণ্টিমেণ্টাল দাসত্বের কবলে না পড়ি।

আমার আন্তরিক স্নেহ ও শুভাশিস জানিবে ও মঠস্থ সকলকে এবং স্ত্রী-পুরুষ ভক্তদিগকে জানাইবে।

শুভানুধ্যায়ী,
নির্মলানন্দ।

হর-পার্বতীবাবুকে লিখিত পত্রের শেষাংশ :—

"* * * দোষ-ত্রুটির কথা লিখেছেন, সে তো আমাদের সকলেরই আছে। তা না থাকলে আমাদের পূর্ণত্ব প্রাপ্তির ইচ্ছা ও চেষ্টা হবে কেন? ঠাকুর বলতেন, 'খাদ নইলে গড়ন হয় না।' আমরা যত কাজ বা যা কিছু করি সবই ভালো ও মন্দের সংমিশ্রণ। কোনটাই একেবারে দোষশূন্য নয়। আর ঐ ভালো ও মন্দ উভয় কার্যই ব্যর্থ বা নিষ্প্রয়োজন নয়, উভয়ই মানুষের ভিতর কার্যকারিতা-শক্তি উৎপন্ন করে, মানুষকে গড়ে তোলবার সাহায্য ও চেষ্টা করে,—অর্থাৎ এই মানুষের ভিতর যে আসল মানুষ আছে, তার সন্ধানের পথ সুগম করে। পুরো সন্ধান পেলেই সেই আসল মনুষ্যত্বের চরমাবস্থায় উপনীত হবার উপায় হয়। "ভবতি ক্রমশঃ বিজ্ঞতমা জনাঃ"। এ-সবই সময় সাপেক্ষ।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও ক্রমবিকাশ-বাদীদের কাহারও কাহারও মতে এই সৃষ্টির একটা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য আছে, সকলেই যথাক্রমে এবং যথাসময়ে সেই নির্দিষ্ট অবস্থায় উপনীত হবে। অতএব, তাঁদের মতে সৃষ্টি অনাদি অনন্ত নয়, সাদি ও শান্ত। একদিন সৃষ্টির পূর্ণাবসান হবে যেদিন সৃষ্টি নির্দিষ্ট স্তরে গিয়ে পৌঁছবে। আর্য ঋষিগণের সিদ্ধান্ত ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁদের মতে এই সৃষ্টি প্রবাহরূপে নিত্য প্রবহমান, অনাদি ও অনন্ত। ইহার কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নাই, ইহা লীলাময়ের লীলা। তিনি আপ্তকাম, সুতরাং তাঁহাতে ইচ্ছা বা অভাব নাই, তাই ঋষিরা বলেন, "লোকেব তু লীলা কৈবল্যম্"। যে খেলছে ও যে খেলাচ্ছে দুই এক। তবে খেলুড়ে অজ্ঞান অবস্থায় সেটা প্রথমে বোঝে না, তাই তার কষ্ট।

যদি খেলা ভাল হয় তো সে সুখী, মন্দ হলে দুঃখী। ভালোতেই তার ভালবাসা ও আসক্তি, মন্দতে বিরাগ। এই ভাল-মন্দের সংঘর্ষের মধ্যে পড়ে ধাক্কা খেতে খেতে দৈবাৎ কোন অননুভূত দৈবী শক্তির প্রভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে যায় আর সঙ্গে সঙ্গেই খেলার স্বপ্ন ভেঙে যায়। যন্ত্র ও যন্ত্রীর স্বরূপ জ্ঞান লাভ হয়। তখন লীলাময়ের উপর তার এক নূতন রকমের ভালবাসা জন্মায়, সে বুঝতে পারে সংসার যাকে ভালবাসা বলে সেই তথাকথিত ভালবাসাটা ঐ আসল ভালবাসার একটা ছায়া মাত্র, আর কিছুই নয়। এই সময় থেকে তার খেলাটা রূপান্তর ধারণ করে, পূর্বের খেলা আর থাকে না। সে খেললেও খেলার হার-জিতে তাকে আর অভিভূত করে না, সে এখন বুড়ি ছুঁয়ে খেলছে। বুড়ি-ছোঁয়া ব্যাপারটা সময়-সাপেক্ষ। আজ এই পর্যন্ত। যদি সময় পাই তো কিছু লেখবার ইচ্ছা রইল। আমার আন্তরিক ভালবাসা ও শুভেচ্ছা জানবেন।"

ইতি শুভানুধ্যায়ী
নির্মলানন্দ।

এবার বেলুড় মঠের প্রেসিডেণ্টগণের নাম দিয়া আমরা এই রচনা সমাপ্ত করিব। আজ বেলুড় মঠে প্রাচীন সাধুগণের মধ্যে অনেকেই অন্তর্হিত হইয়াছেন। কেবলমাত্র অমূল্য মহারাজ (স্বামী শঙ্করানন্দ) ও স্বামী মাধবানন্দজীউ প্রমুখ দুই একজন মাত্র আছেন। কিন্তু সেই সব অগ্রগামীদের মহান তপস্যায় আজিও সেই পুণ্যভূমি পরিপূর্ণ রহিয়াছে। গঙ্গার এক পারে পুণ্যবতী রাণী রাসমণির প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণেশ্বরের দেব-নিকেতন এবং অপর পারে স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিষ্ঠিত বেলুড় মঠ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন, বাংলা দেশের এই দুই মহাতীর্থ।

বেলুড় মঠের প্রেসিডেণ্টগণ

- স্বামী ব্রহ্মানন্দ
- স্বামী শিবানন্দ
- স্বামী অখণ্ডানন্দ (গঙ্গাধর মহারাজ, ইনি মুর্শিদাবাদ অনাথ আশ্রম স্থাপন করেন)
- স্বামী বিজ্ঞানানন্দ (হরিপ্রসন্ন মহারাজ, ইনি ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন)
- স্বামী শুদ্ধানন্দ (স্বামীজীর শিষ্য ও স্বামীজীর গ্রন্থাবলীর অনুবাদক)
- স্বামী বিরজানন্দ (স্বামীজীর শিষ্য, মায়াবতী মঠের প্রেসিডেণ্ট ছিলেন, পরে আলমোড়া সামলাতালায় একটি আশ্রম স্থাপন করেন)
- স্বামী শঙ্করানন্দ (অমূল্য মহারাজ)

সমাপ্ত

ঝাঁসীর রানী ০ মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য

॥ ১২ ॥

ভারতে ইংরেজ রাজত্ব গড়ে তুলেছিলেন যে-কয়জন ইংরেজ, নিঃসন্দেহে ডালহৌসী তাঁদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। কর্মকুশলী, নিরলস, উৎসাহী এবং অদম্য ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ ডালহৌসী। ভারতীয় রাজ্যগুলির স্বাধীনতা লোপের স্বপক্ষে তাঁর যে যুক্তি ছিল তা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে।

রাণীর চিঠি যথাসময়ে পেলেন তিনি। বিলেতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কোর্ট অফ্ ডিরেক্টরস (Court of Directors of East India Company)-এর কাছে জানালেন। তাঁরা যথাসময়ে জানালেন, রাণীর খরীতার ফলে সিদ্ধান্ত পরিবর্তিত করবার কোনো প্রয়োজন নেই।

তাঁরা আনন্দরাওকে গঙ্গাধর রাওয়ের সম্পর্কিত ভাই বলে উল্লেখ করলেন এবং তিনি যে শিবরাও ভাওয়ের বংশের কেউ নন এবং সেই জন্যই তাঁকে দত্তক গ্রহণ রাজনৈতিকভাবে অবৈধ হয়েছে, এই যুক্তিকে সম্পূর্ণ সমর্থন করলেন। রাণীকে উপযুক্ত বৃত্তি দেবার কথা অনুমোদন করলেন।

বিলেতে যে চিঠি লিখলেন ডাল-হৌসী ...

খরীতাটির প্রত্যেকটি যুক্তিকে খণ্ডন করে অন্য যুক্তি ছিল। আশ্চর্য এই, এই বিষয়ে রাণীকে কিছু জানান নি তিনি।

আনন্দরাও শিবরাও ভাওয়ের প্রত্যক্ষ বংশধর ছিলেন না সত্য। কিন্তু হিন্দুদের কাছে প্রত্যক্ষ ঊর্ধ্ব এবং অধঃ পুরুষই শুধু স্বীয় বংশধর নয়, মূল পুরুষ থেকে যতগুলি পরিবারের উদ্ভব, তাদের সকলকেই এক বংশের বলে ধরা হয়। শিবরাও ভাওয়ের পিতামহ দামোদর রাও এবং আনন্দ রাওয়ের ঊর্ধ্বতন পঞ্চম পুরুষ খাত্তরাও সহোদর ভ্রাতা ছিলেন। সেইজন্য রাণীর স্বপক্ষে এই বলা চলে, আনন্দ রাওকে শিবরাও ভাওয়ের বংশধর বলে দাবি করবার যুক্তি তাঁর ছিল। কিন্তু কোন যুক্তিই ডাল-হৌসীর সিদ্ধান্তকে বিচলিত করতে পারল না।

ঝাঁসী অন্তর্ভুক্তির ঘোষণায় বজ্রাহত রাণীর গর্বিত উক্তির উপসংহারে মেনে নিতে হল সেই সিদ্ধান্ত। ঝাঁসী হস্তান্তরিত হয়ে গেল।

সর্বপ্রথমে ঝাঁসীর কেল্লা অধিকার করলেন এলিস। রাণীর বাসস্থান হল রাণীমহল, কেল্লার পূর্বে রাজপ্রাসাদ।

এই কেল্লা একদা তৈরি করেছিলেন পশ্চিমঘাট পর্বতমালা আর গিরি-স্রোতস্বিনী ভূষিত স্বীয় মাতৃভূমি মহারাষ্ট্র ত্যাগ করে উচ্চাভিলাষী বীর মহারাষ্ট্রনায়ক প্রথম বাজীরাও মধ্য ভারতে রাজ্য পত্তন করেছিলেন। সেদিন ঝাঁসীর কেল্লায় বুরুজে বুরুজে বসেছিল পেশোয়ার আমলের পিতলের কারুকার্য-খচিত লোহার কামান সব। সেই সব কামান গর্জন করেছিল রাণীর বিয়ের দিনে—সেই কত আলো, কত বাজনা, কত বাজী, কত আনন্দ। এই দুর্গের অন্তর্গত শিব মন্দিরে পূজা দিয়েছেন রাণী এগারো বছর ধরে। শৈশবে কতদিন কাটিয়েছেন এখানে। শিব-মন্দিরের একান্তে পলাশ গাছে বছর বছর ফাল্গুন মাসে ফুল ফুটেছে। সেই ফুল নিয়ে হরিদ্রা কুঙ্কুম উৎসবে আনন্দ করেছেন কত পুরনারী। ছত্রসালের রাসো গেয়ে গেয়ে বুন্দেলখণ্ডের গরীব ছেলেমেয়েরা হোলির দিনে ভিক্ষা নিয়ে গেছে।

সেই সব দিনকে বিদায় দিয়ে কেল্লা অধিকার করলেন এলিস। কেল্লার কোথাও বন্দীরা রয়েছে কয়েদখানা, কোথাও কোষাগারে টাকাকড়ি, ধনরত্ন, কোথাও অস্ত্রাগারে অস্ত্রশস্ত্র।

ঝাঁসীরাজের সৈন্যসামন্তকে তিন
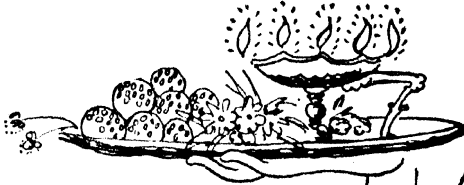
পূজা
দুর্গাপূজা ঘরে ঘরে আনন্দের, উৎসবের বার্তা নিয়ে আসে। সে উৎসবকে রমনীয় করে তুলতে গৃহলক্ষীরা পরিবার ও অতিথিবর্গের জন্য নানারকম মিষ্টান্ন ও খাবারের আয়োজন করেন। আর তার মানেই হচ্ছে ডালডা বনস্পতি, কারণ হিসেবী গৃহিনীরা জানেন যে উৎকৃষ্ট মুখরোচক খাবার করতে ডালডা চাইই। তাছাড়া ডালডায় খরচ কত কম হয়। আর একথা কে না জানেন যে ভিটামিন 'এ'র উৎপত্তিমূল হিসেবে ডালডা ঘি এর মতোই উপকারী। সীলকরা টিনে ডালডা সর্ব্বদাই তাজা ও বিশুদ্ধ থাকে।
এই সব কারণে আপনার পূজার বাজারের তালিকায় ডালডা বনস্পতি নামটা যোগ করতে ভুলবেন না। মনে রাখবেন ডালডা আপনার শরীরের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। সকলের সুবিধার জন্য ১।২ পাঃ, ১ পাঃ, ২ পাঃ, ৫ পাঃ, ও ১০ পাঃ টিনে সর্ব্বত্রই বিক্রী হয়।
DALDA
ডালডা
ডালডা
মার্কা
বনস্পতি
বিনামূল্যে
উৎসবের রান্নাবান্না
পাকপ্রনালী সম্বলিত এই ছোট বইটি আজই লিখে আনিয়ে নিন। এতে নানারকম রান্নার পাকপ্রণালী ও অন্য খুঁটিনাটি আছে। আজই লিখুন:
দি ডালডা এ্যাডভাইসারি সার্ভিস।
পোষ্ট বক্স নং ৩৫৩, বোম্বাই ১।
HVM. 254-X52 BG
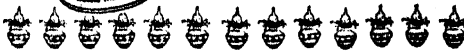
তাদের আর প্রয়োজন নেই। কোষে বন্ধ থাক তরোয়াল, তাতে মরচে পড়ুক, সাতকেলে পুরোন ঢালগুলোরও প্রয়োজন নেই, আর প্রয়োজন নেই উর্দিগুলোর। ক্ষুব্ধ হৃদয়ে অপমান চেপে রেখে অস্ত্র-শস্ত্র কিছু জমা দিয়ে কিছু কুয়োর ভেতর ফেলে দিয়ে, কিছু বা বেজেয়ার জলে ভাসিয়ে দিয়ে প্রাসাদের দিকে সেলাম জানিয়ে চলে গেল যত বুন্দেলা, মারাঠা, আফঘানী আর পাঠান সৈন্য।

প্রাসাদ থেকে দেখতে লাগলেন রাণী, কেল্লার দক্ষিণ বুরুজ থেকে, নাগরা ও চামর চিহ্নিত গৈরিক পতাকা নেমে এল। সেখানে ইউনিয়ন জ্যাক উঠল।

সেই সময় বিঠুরে নির্বাসিত পেশবা দ্বিতীয় বাজীরাও-এর মৃত্যুর পর বৃত্তি-বঞ্চিত দত্তকপুত্র ধুন্দুপন্থ নানা বিলাতে আপীল করবার জন্য কানপুরের সরকারী স্কুলের শিক্ষক আজিমউল্লাকে নিযুক্ত করলেন। ইংরেজী ও ফরাসী ভাষায় অভিজ্ঞ, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, উচ্চাভিলাষী আজিমউল্লা নানা সাহেবের আপীল নিয়ে বিলেতে গেলেন। এই যাত্রায় কোন ফল হল না বটে, কিন্তু ইয়োরোপ ভ্রমণকালে আজিমউল্লা রাশিয়া ও ফ্রান্সের শক্তি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন করলেন।

ভারতে যে ইংরেজ প্রবলতম শক্তি, তাকেও যে পরাজিত করা যেতে পারে, সে ধারণা তাঁর হয়েছিল বলে অনুমান করা হয়। ১৮৫৭ সালের অভ্যুত্থানের কিছু স্থানীয় চক্রান্ত করেছিলেন আজিমউল্লা।

নানা সাহেবের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে রাণীকে কেউ কিছু বলেছিলেন কি না, কে জানে। রাণী কোর্ট অফ ডিরেক্টরসের কাছে আপীল করবার সিদ্ধান্ত করলেন।

সেই দিনেও সুদূর ঝাঁসীতে কয়েক ঘর বাঙালী পরিবার বসতি স্থাপনা করেছিলেন। সাঁইয়ার গেট মহল্লা অঞ্চলের বাসিন্দা ছিলেন একটি মুখোপাধ্যায় পরিবার। বাঙালী পরিবারটির মাধ্যমে বাংলাদেশের বিখ্যাত আইনজীবী বাবু উমেশচন্দ্র ব্যানার্জির সঙ্গে যোগাযোগ ঘটে রাণীর। বিলাতে যাবার খরচ ইত্যাদির কথা বলে উমেশচন্দ্র ব্যানার্জিকে রাণীর তরফ থেকে ৬০,০০০ টাকা দেওয়া হয়। কিন্তু এই আপীলের কোন [illegible] রাণী পাননি।

এই উমেশচন্দ্র, বাংলার বিখ্যাত ব্যারিস্টার উমেশচন্দ্র বোনার্জি কি না, সেই রহস্য ভেদ করবার কোনো উপায় নেই। রাণীর পৌত্র শ্রীলক্ষ্মণরাও ঝাঁসী-ওয়ালের ভাষণে জানা যায়, সত্যই জনৈক উমেশ ব্যানার্জি, বিখ্যাত বাঙালী ব্যারিস্টার রাণীর কাছ থেকে ৬০,০০০ টাকা নিয়ে চলে যান এবং তাঁর পক্ষ থেকে আর কোন জবাব পাওয়া যায়নি। তিনি বলেন, দীর্ঘদিন ধরে তাঁর পিতা দামোদর রাও বিলাতে আপীল করে খাজগী সম্পত্তি উদ্ধার করবার প্রয়াস করেছিলেন। সেই সময় তিনি জানতে পারেন যে, বিলাতে সত্যই রাণীর আর্জি পৌঁছে-ছিল। অর্থাভাবে দামোদর রাওয়ের প্রচেষ্টা সফল হয়নি। তবে দামোদর রাও লক্ষ্মণ রাওকে বার বার বলেছিলেন, "১৮৫৭'র লড়াই বেধে গেল, সেই লড়াইয়ে রাণী যোগ দিলেন, কাজে কাজেই তাঁর আর্জি বা আপীল নাকচ হয়ে গেল। বাঙালী বাবুটি শুধু টাকা নিয়েই থেমে যাননি, কিছু কাজও করেছিলেন বটে, কিন্তু বাঙালীবাবুরা ইংরেজের পক্ষের লোক ছিল। ১৮৫৭ সালের লড়াইয়ে রাণী যোগ দিলেন এবং খোলাখুলিভাবে ব্রিটিশের বিদ্রোহিতা করলেন। তাঁর পক্ষ টেনে আপীলের কথা তুলতে বাঙালী বাবুটির ভরসা হয়নি। রাণী মারা গেলেন বলে প্রসঙ্গটি চাপা পড়ে গেল।"

কাজেই মনে হয়, রাণী আপীল করেছিলেন ঠিকই। তাঁর নিযুক্ত বাঙালী বাবু, কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা উমেশচন্দ্র বোনার্জি কি না, সে প্রসঙ্গ না জেনে মন্তব্য না করাই উচিত। তবে যে কোন বাঙালী ব্যারিস্টারের পক্ষে ১৮৫৭ সালের পর বিদ্রোহের প্রকাশ্য নেতা ঝাঁসীর রাণীর আপীল সম্পর্কে কথা না বলে সুধীজনের মত নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করে থাকা স্বাভাবিক।

আপীলের কোন জবাব এল না। ম্যালকম ডালহৌসীকে প্রতি চিঠিতে ঝাঁসীরাজের আশ্রিত এবং অনুগত ব্যক্তিদের যথাযথ সাহায্য দানের সুপারিশ করেছিলেন। রাণী যাতে গঙ্গাধর রাওয়ের ব্যক্তিগত সম্পত্তি 'খাজগী দৌলতী' পান, সে অনুরোধও ছিল। কার্যকালে ডালহৌসী রাণীকে মাসিক পাঁচ হাজার টাকা বৃত্তি দেওয়া ছাড়া অপর কোন আর্থিক সাহায্য বা প্রতিশ্রুতি দিলেন না।

রাণী প্রথমে এই বৃত্তি প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁর এই আশঙ্কা কখনোই হয়নি যে, ডালহৌসী তাঁকে তাঁর স্বামীর ব্যক্তিগত সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করতে পারেন।

গঙ্গাধর রাওয়ের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলতে পারোলা, পুণা ও কাশীতে বাড়ি, অর্থ এবং অলঙ্কার ছিল। ডালহৌসী এইবার রাজনৈতিক কূট পন্থা ধরলেন। তিনি ম্যালকমকে জানালেন, দামোদর রাওকে দত্তক গ্রহণের কোন রাজনৈতিক গুরুত্ব নেই। দামোদর রাও কোনদিনই ঝাঁসীর রাজা হতে পারবেন না। কিন্তু তাই বলে ডালহৌসী হিন্দু ধর্মের নির্দেশ অনুযায়ী এই দত্তক পুত্রের সামাজিক বৈধতা অস্বীকার করতে পারেন না। দামোদর রাও গঙ্গাধর

রাওয়ের পুত্র। তাঁর শ্রাদ্ধ, মৃতাশৌচ, তর্পণ ইত্যাদিতে দামোদরের পূর্ণাধিকার আছে। খাজগী দৌলতীও অতএব দামোদরেরই প্রাপ্য। রাণীর তাতে কোন অধিকার থাকতে পারে না। দামোদর যতদিন নাবালক থাকবেন, ততদিন সেই খাজগী থাকবে ইংরাজের তত্ত্বাবধানে।

গঙ্গাধর রাওয়ের গৃহীত দত্তক দামোদর রাওকে রাজনীতিকভাবে অবৈধ ঘোষণা করে ইংরাজ ঝাঁসী গ্রহণ করে এবং সামাজিকভাবে বৈধ স্বীকার করে নাবালকত্বের সময়ে সম্পত্তিতে তার অনধিকার এবং রাণীর চির অনধিকার ঘোষণা করে। এই দুই মুখো নীতির সম্পূর্ণ গুরুত্ব রাণী উপলব্ধি করলেন। উপলব্ধি ক'রে পুত্র এবং বিশাল আশ্রিত আত্মীয়গোষ্ঠীর মুখ চেয়ে তাঁকে পাঁচ হাজার টাকা বৃত্তি স্বীকার করতে হল। সেই অভিমানী গর্বিত হৃদয় সেইদিন চরম অসহায় অবস্থায় পড়ে প্রথম উপলব্ধি করলেন, ইংরাজ তাঁর শত্রু। তাঁর পিতা ও বিমাতাকে তিনি সেদিন থেকে বারবার বলেছেন, ইংরাজ আমার শত্রু। আমার পরম শত্রু। রাণীর প্রতি শ্রদ্ধাবশত ম্যালকম এই সময়ে এলিসকে জানালেন, ১৫ই মার্চ থেকে ৩০শে এপ্রিল, এই দেড় মাসের সম্পূর্ণ রাজস্ব যেন ঝাঁসীরাজ-এর কোষেই জমা পড়ে। এই টাকা থেকে রাণী তাঁর ব্যক্তিগত দায়িত্ব-গুলি কিছু কিছু মেটাতে সক্ষম হবেন।

ম্যালকম এবং এলিসের হাত থেকে ঝাঁসীর শাসনভার গ্রহণ করলেন উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের গভর্নরের অধীনে জব্বলপুরের মেজর এরস্কাইন (Major Erskine)। তিনি নর্মদা, সাগর ও জব্বলপুর ডিভিশানের কমিশনার ছিলেন। ঝাঁসীতে একজন জেলা কমিশনার থাকবার কথা। এলিস এই পদে থাকলে রাণী ও ঝাঁসীবাসী কিছুটা উপকৃত হতে পারতেন। কিন্তু এলিসকে বদলী করা হল পাল্পা রাজ্যে। কমিশনার হলেন ক্যাপ্টেন স্কীন (Captain Skene)।

চার বছর বাদে পুনর্বার এলিস এবং রাণীর যোগাযোগ ঘটেছিল। সেই পরোক্ষ সাক্ষাৎ কোন ব্যক্তিগত পরিচয়ের ভিত্তিতে নয়। তখন ইংরাজ ও ভারতীয় দুই শিবির বিভক্ত হয়ে গেছে। সেটা ১৮৫৮ সাল। ইংরাজ এলিস, হিউরোজের সেনা-বাহিনীর সঙ্গে বিদ্রোহী রাণী লক্ষ্মী বাঈয়ের বিরুদ্ধে চলেছিলেন।

রাণীর পরবর্তী জীবনের ব্রিটিশ-বিরোধী সংগ্রামের যদি কোন মানসিক প্রস্তুতি থেকে থাকে, সেই প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল এই সময় থেকে। ভাগ্য-বিপর্যয়ে মানুষের পরীক্ষা হয়। মাতা পিতার স্নেহাশ্রয়ে লালিত শিশু, অন্য হ'লে একদিনেই আশ্চর্য নিয়মে অবস্থা সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেবার চেষ্টা করে ক্ষুদ্র সামন্ত রাজ্যের একেশ্বরী রাণী লক্ষ্মীবাঈ। বিধবা হলেন, রাজ হারালেন, তাঁর অনেক ছিল। মুহূর্তে জানলেন, আজ কিছু নেই। স্বামীর আয়শ্রচ্যুত হয়ে জানলেন, শুধু ব্যক্তিগত জীবনেই নয় একেবারে চূড়ান্তভাবে অনাথ হয়েছেন তিনি। এই চরম অবস্থার জন্য দয়ী কে? কোন্ ভাগ্যবিধাতা ঈশ্বরকে দোষ দেবেন তিনি? শঙ্কিত হৃদয়ে আবার কোন্ বিধাতার মার্জনা ভিক্ষা করবেন? তিনি জানলেন, তাঁকে নিরাশ্রয় করল ইংরাজ। যে বালককে রাজ-সিংহাসনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে চিরতরে মায়ের কোল থেকে এনেছেন, জানলেন, সেই বালক পুনর্বার অনাথ হ'ল। জানলেন, তাঁর স্বামীর সম্পত্তিতে তাঁর অধিকার নেই। জানলেন, স্বামী মরণান্তে তীর্থস্থলে গিয়ে কেশ মুণ্ডন করবার যে ইচ্ছা ছিল, তাঁর তা সফল হবে না। কেননা, তাঁকে ঝাঁসীর বাইরে যেতে দিতে আপত্তি আছে ইংরাজের। জানলেন, আজ থেকে ঝাঁসীতে তাঁর সম্পূর্ণ অধিকার নেই। স্বচ্ছন্দ বিহারে ক্ষণে ক্ষণে নতুন মালিকের সম্মুখীন হতে হবে।

গ্রীষ্মের আতপ্ত প্রখর মধ্যাহ্নে যখন উজ্জ্বল নীল আকাশে স্থিরপক্ষ-বিস্তারে ভেসে থাকে চিল, যখন প্রান্তর দিয়ে রৌদ্রতপ্ত বাতাস মরীচিকা মায়াতে কাঁপে, তখন যে প্রকৃতি রুক্ষ, নিঃস্ব, গৈরিক বসনা হয়ে নির্ণিমেষ জাগে, তাঁর সঙ্গে রাণীর অন্তরের কোনো কি মিল ছিল! গৃহবধূ, রাজার রাণী, যাঁর সমস্ত ব্যক্তিত্ব গৃহের গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকবে, তার উপর বারবার আঘাত পড়ল অজান্তে তাঁর প্রকৃতি পরিবর্তিত হতে লাগল। একান্ত ব্যক্তিগতভাবে স্বার্থে আঘাত লেগেছিল তাঁর। তাতেই তিনি ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। বিক্ষুব্ধ হৃদয়ে রাণী চেষ্টা করলেন ধর্মকর্মে মনোনিবেশ করতে।

এই সময়ে প্রত্যহ তিনি প্রত্যুষে চারটেয় শয্যাত্যাগ করতেন। স্নানান্তে মাটি দিয়ে শিব গড়ে আটটা অর্বা
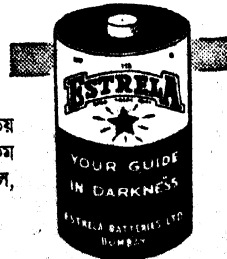
শিবপূজা করতেন। আটটার সময়ে দামোদরের প্রাতরাশ, গৃহশিক্ষকের কাছে পাঠশিক্ষার ইত্যাদির তত্ত্বাবধান করে ঘোড়া চড়ে বেরুতেন। আটটা থেকে এগারটা অবধি অশ্বরোহণ করে ফিরে এসে পুনর্বার স্নান করতেন। তারপরে আহার করে, সামান্য বিশ্রামান্তে, বেলা তিনটে অবধি ছোট ছোট কাগজে রামনাম লিখে, এগারোশো কাগজ আটার মণ্ডে ভরে কুণ্ডের মাছকে খেতে দিতেন। প্রবল উৎসাহে দামোদর মা-কে এই কাজে সাহায্য করতেন। সন্ধ্যাবেলা আটটা অবধি তিনি পুরাণ ও কীর্তন শুনতেন। এই সময় মোরোপন্থ তাম্বে সর্মাভিব্যাহারে বিভিন্ন বিশিষ্ট নাগরিকরা রাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসতেন। সাড়ে আটটায় স্নান করে, পূজা সমাপনে, আহারান্তে নিদ্রা যেতেন রাণী।

পণ্ডিত, শাস্ত্রী, গুরু ও আচার্য প্রত্যেকেই রাণীকে বলতেন ধর্মকর্মে ব্যাপৃত থাকো, ভাবনা চিন্তা ঈশ্বরকে অর্পণ কর।

কিন্তু এই নির্বেদের সাধনায় তাঁর শান্তি ছিল না। মন যেন সেই মন নয়। মন শুধু যাচাই করে। বুদ্ধি দিয়ে, যুক্তি দিয়ে, হৃদয় দিয়ে। হৃদয় আজ সেই হৃদয় নয়, শান্তি চায় না, নির্বিচারে ভাগ্যের বিধান মানতে চায় না। এই মন শান্ত হোক, এই হৃদয় নির্লিপ্ত হোক। শান্তি আছে পূজা, তপে, জপে। বিনা প্রশ্নে মেনে নিতে শিখুক অবাধ্য মন ভাগ্যের বিধানকে।

তাঁর সমগ্র প্রচেষ্টার উপর পুনর্বার আঘাত হানল ইংরাজ। এক সন্ধ্যায় যখন সূর্যাস্তের আভায় পশ্চিম দিগন্ত করুণ, তখন দুঃসংবাদ আনলেন শাস্ত্রী। মহালক্ষ্মীর মন্দিরের পূজা বন্ধ। যে দেবত্র গ্রাম দুখানির আয় থেকে পূজাব্যয় নির্বাহ হত কুলস্বামিনী মহালক্ষ্মীর, সেই গ্রাম দুখানি গ্রহণ করেছেন স্কীন। বৃথা পুতুল পূজায় রাজস্ব ব্যয় করা বিলাসিতা। এই স্পর্ধিত আচরণের তীব্র প্রতিবাদ জানালেন রাণী। স্কীন অবিচলিত। তিনি জানালেন, "Your God is our responsibility." যে ইংরাজ ঝাঁসী অধিকার করেছে, দেবতাও তাদেরই অধিকারে। তার পূজা বন্ধ করবার অধিকার তাদের আছে।

বন্দিনী ভুজঙ্গিনীর মত রাণী ক্রোধে ও নিষ্ফল আক্রোশে ও আবেগে একবার কাঁদলেন। তারপরে চুপ করলেন।

এই দুঃসংবাদে নগরের সর্বত্র মহা-দুঃখ সঞ্চারিত হল। শাস্ত্রীরা দুঃখ করতে লাগলেন, পুরনারীরা বলাবলি করতে লাগলেন, ঘোর অমঙ্গলের সূচনা হল। রাণী চুপ করে রইলেন।

সেই দিন থেকে মহালক্ষ্মীর মন্দিরে সন্ধ্যাদীপ আর জ্বলল না। চৌঘড়া বাজল না, নহবৎখানায় দীন-দুঃখী, গরীব, সন্ন্যাসী, সাধু সকলে বিদায় নিল বিতাড়িত হয়ে। কতজন এসে রাণীকে বললেন, পুনর্বার প্রতিবাদ জানান হোক। রাণী নীরবে অসম্মতি জানালেন।

অপমান ও আক্রোশে রাণীর অন্তরে সেই দিন থেকে যে ব্যক্তিত্ব ধীরে ধীরে রূপ পরিগ্রহ করতে লাগল তাঁর অজান্তে, সে যেন এক তীক্ষ্ণধার তরবারি। বিনিদ্র রজনী, অশ্রুহীন চোখে নিরুত্তর অন্ধকারের দিকে চেয়ে ভাবতে লাগলেন রাণী এই দুর্দিনের কথা।

[illegible]

জানেন, যেদিন ডালহৌসীর পরোয়ানা নিয়ে এসেছিলেন এলিস, সেই দিন গ্রীষ্মের নির্জন মধ্যাহ্নে রাজপুরী ছেড়ে রাজলক্ষ্মী নিজে সেধে নির্বাসনে গেছেন। অলক্ষ্যে, সন্তর্পণে সকলের অগোচরে তিনি চলে গেছেন। সেদিন থেকে রাণীর চোখে দুনিয়া গেছে বদলে। কোনো এক যুগ নির্বাসনে চলে গেছে, আর সে ফিরবে না।

(ক্রমশ)

জানালার ফ্রেমে একটুক্‌রো আকাশ। হিমঝরা সকালে সে ইন্দ্রনীল, দুপুরে সেখানে রাশি রাশি অভ্র জ্বলে। বেলাশেষে সে আকাশে চুনীর রক্তরাগ, তারও পর যখন ধূপছায়া রাত্রি নামে তখন শিলালিপির মত ফুটে বেরোয় সপ্তর্ষি। ফুটে বেরোয় ফাল্গুনী-ভদ্রা-অরুন্ধতী। তিনটে মাসের সমস্ত দিন-রাত্রি ঐ আকাশটুকুর ওপর দিয়ে বিন্দু বিন্দু ক্ষয়িত হ'য়ে গেল।

জানালার পাশেই একটা অর্জুন গাছ। চারদিকে রাশি রাশি উদার বাহু বাড়িয়ে দিয়েছে। এই অর্জুন গাছ আর ধু-ধু এক টুক্‌রো আকাশ। বাইরের সঙ্গে এরাই একমাত্র সেতুবন্ধ। একমাত্র যোগাযোগ।

দূরের আকাশে অলস চোখদুটো ছড়িয়ে দিয়েছিল সুমিতা। কিছু যাযাবর মেঘ, শঙ্খচিলের কয়েকটি বিন্দু, কিছু সোনালী রোদ। তাকিয়েই ছিল সুমিতা। একসময় অর্জুন পাতার ক্যানভাস থেকে আবীর গোধূলি মুছে গেল। মস্‌লিনের পর্দার মত নামতে লাগল প্রাক্‌সন্ধ্যা।

সেগুন কাঠের বেড্‌স্টেডের ওপর দু' ফুট উঁচু জাজিম। তার ওপর বকের পাখার মত ধব্‌ধবে চাদর। নরম। নিভাঁজ। তারও ওপরে হাল্‌কা একটি পালকের মত নিথর দেহভার। শুয়ে রয়েছে সুমিতা। তিন মাস ধরে শুয়েই আছে।

করিডরের ওপর দুপদাপ্‌ শব্দ করতে খুশির ঝড় এলো ঘরে। এসে থামল একেবারে বেড্‌স্টেডের পাশে। বাবলু, চন্দন আর মুনমুন্‌। পেছনে দরজার ওপর ছোক্‌রা চাকর সুখন। হিমসিম চেহারা। তিনটি ভাইবোনের ঝড়ে একেবারে নাস্তানাবুদ।

পাণ্ডুর হাসি ফুটলো সুমিতার দু' ঠোঁটের ফাঁকে; "তোকে বড় জ্বালাচ্ছে এই ডাকাতেরা না রে সুখন! কী করবি বল, আমি ভালো না হওয়া পর্যন্ত কষ্ট কর।"

কোন জবাব দিল না সুখন। শুধু হাসল। অকারণ হাসি। অবারণ হাসি।

বাবলু, চন্দন আর মুনমুন্‌। এক-সময় কলস্বর হয়ে উঠল তিনজনে। "জানো মা, পার্কে আজ একটা মস্ত বড় বাঘ দেখেছি। এত্‌তো বড় মুখ, বড় বড় চোখ।" বাঘের ছবিটা রীতিমত বিশ্বাস-যোগ্য করার জন্য ঘন ঘন হাত-পা নাড়ল মুনমুন। মুখখানা ভয়ানক হয়ে উঠল।

"বাঘ না হাতী। তুমি কিছু জানো না। ওটা কুকুর। ওর নাম বুলডগ।" দু বছরের বড় বাবলু প্রজ্ঞাবানের মত গম্ভীর হলো। আর সবচেয়ে ছোট চন্দন বেড্‌স্টেডের বাজু বেয়ে ওপরে উঠবার চেষ্টা করতে লাগল। নিঃশব্দে। অখণ্ড মনোযোগে।

একখানা শীর্ণ হাত সামনের দিকে বাড়িয়ে দিল সুমিতা। শাঁখসাদা রঙ্‌। বাবলুর চুল এলোমেলো করে, মুনমুনের পিঠে মৃদু হাত বুলিয়ে, চন্দনের ফুলো-ফুলো গাল দুটো টিপে দিয়ে হাতখানা নিস্পন্দ হলো। তারপর শামুকের গলার মত হাতটাকে বুকের ওপর গুটিয়ে নিল সুমিতা। আদরের সীমানা ঐ পর্যন্ত টেনে দিয়েছেন ডক্টর সেন। কোন কারণেই বিছানা থেকে ওটা সুমিতার জীবনের পক্ষে ভয়ংকর। এত-টুকু উত্তেজনা, এতটুকু পরিশ্রম বুকের মধ্যে অহরহ টিক্‌টিক্‌ পেন্ডুলামটাকে এক নিমেষে স্তব্ধ করে দিতে পারে। চিরকালের জন্য। দেহের মধ্যে নানা এ্যাপারেটেসের ডুবুরি নামিয়ে ডক্টর সেন কতকগুলি ভয়াল নাম তুলে এনেছেন। রক্তাল্পতা, স্নায়বিক দুর্বলতা, সূতিকা, সাস্‌পেক্‌টেড্‌ টি বি। তাই বাবলুদের

নিরাপদ দূরত্বে রাখা হয়েছে। তাই সুমিতার অন্দর নিষিদ্ধ হয়েছে।

সুখন তাড়া দিয়ে উঠল; "খুকাবাবু, খুকিদিদি চল।"

অসহায় চোখে তাকালো সুমিতা। ক্লান্ত প্রার্থনা ফুটলো দৃষ্টিতেঃ "ওরা আর একটু থাক্ না সুখন। তুই বাবুকে বলিস না।"

"নেহী মাইজী। আপনার অসুখ আছে।" গম্ভীর মুখ। ঘন ঘন মাথা নড়ল সুখনের।

অসুখ! শব্দটা যেন বিস্ফোরণের মত ফেটে পড়ল চেতনার মধ্যে। বিবর্ণ ঠোঁটে হাসির আলো জ্বালাবার চেষ্টা করল সুমিতা: "যা, ওদের নিয়ে যা। হাতমুখ মুছিয়ে জামা-কাপড় পাল্টিয়ে দিবি। যা এবার—"

চন্দনদের নিয়ে চয়ে গেল সুখন। দিনের বেলা সুখন ওদের পাহারা দেয়। আর সারা রাত্রি নেপালী আয়া সাইলীর অতন্দ্র হেফাজতে থাকে। নিজের বিন্দু বিন্দু রক্তমেদ দিয়ে ওদের স্বর্ণপদ্মের মত ফুটিয়ে তুলেছে সুমিতা। তবু আজ ওরা তার আদর-সোহাগের বাইরে। মাত্র ধূসর প্রাক্‌সন্ধ্যায় একবার ওরা আসে এ ঘরে। পার্ক থেকে একমুঠো বাইরের বাতাস ছড়িয়েই আবার চলে যায়। অসুখ! এই একটি শব্দ বিশাল একখানা পাহাড়ের মত উঠে গিয়েছে। তার এক-পাশে সুমিতা। আর এক দিকে গোটা পৃথিবীটা প্রসারিত হয়ে রয়েছে। ঐ একটা শব্দের কারসাজিতে এই ছোট্ট ঘরখানায় তার নির্বাসন। সুমিতার বুকের মধ্যে কান্না ওঠে উথল-পথল।

ঘরের মধ্যে এখনও আলো জ্বালিয়ে যায় নি সুখন। তবু প্রাক্‌সন্ধ্যার নিভু-নিভু আলো-অন্ধকারে ঘড়ির রেডিয়াম ডায়ালটা জ্বলছে। একচক্ষু কবন্ধের মত। চোখদুটো চক্রাকারে ঘুরে এসে স্থির হলো সুমিতার। সামনেই বর্মী ক্যাবিনেটের নিখুঁত টেবিল। তার ওপরেই মকরমুখী জাপানী ঘড়িটা বসানো রয়েছে। বৃত্তাকার ডায়লটার ওপর কঙ্কালবাহুর মত কাঁটাদুটো এগিয়ে চলেছে। টিক্‌- টিক্। টক্ টক্।

আর দশ মিনিট। দশটা মিনিট পরেই জাপানী ঘড়ির গংটা ডিং ডং শব্দে ঘোষণা করবে। রাত সাতটা। সেই ডিং ডং আবহবাজনার সঙ্গে তাল মিলিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসবে র‍্যান্ডাল কোম্পানীর একজোড়া কম্বি-নেশন্ শ্যু। মস্ মস্। বিনায়ক। তার পাশে খুট্ খুট্ আর একজোড়া লেডীজ্ ফ্যাশন্ শ্যু। অস্তিকা। বিনায়ক আর অস্তিকা।

কপালের ওপর বিন্দু বিন্দু ঘাম জমল সুমিতার। হৃৎপিণ্ডটা জলদ বাজনার মত তীব্রগামী হয়ে উঠল। কপালের দুপাশে রগে রগে মশাল দপ্ দপ্ করছে। তিন মাস ধরে এমন হচ্ছে। রোজ। নিয়মিত। যেদিন থেকে ডক্টর সেন সুমিতাকে বিছানায় নির্বাসন দিয়েছেন, ঠিক সেদিন থেকে। আর এই তিন মাস ধরে জাপানী ঘড়ির গং সাতবার ডিং ডং শব্দ করেছে। আর এই শব্দ একজোড়া কম্বিনেশন শ্যুর সঙ্গে একজোড়া লেডীজ ফ্যাশন শ্যুকে আমন্ত্রণ জানিয়ে এনেছে। বিনায়ক আর অস্তিকা।

একটু আগে পাবলুরা বাঘের কথা বলছিল। বাঘ নয় বাঘিনী। বাঘিনী নয় অস্তিকা।

ঘরের চৌকাঠ পেরিয়ে যে বিদেশী পৃথিবীটা ছড়িয়ে রয়েছে, সেখান থেকে একটি সংবাদও সুমিতার কাছে পৌঁছানো নিষিদ্ধ। নিষেধ জারী করেছে বিনায়ক। তবু সেই নিষেধ ডিঙিয়ে মাঝে মাঝে এসে পড়ে খবরের কাগজ। আসে চিত্র-মাসিক আর সাপ্তাহিক। নানা আকারের। নানা রুচির। বিচিত্র চিত্রিত। পাতায় পাতায় ছবি। নানা ভঙ্গিতে, নানা পট-ভূমিতে বিনায়ক আর অস্তিকাকে ক্যামেরা-বন্দী করে রাখা হয়েছে। ছবির নীচে উচ্ছ্বসিত স্তুতি, বিগলিত অভিনন্দন। ছায়াগ্রহের সবচেয়ে জনপ্রিয় দুই তারকা। দর্শকের নয়নলোভন নায়ক-নায়িকা। বিনায়ক আর অস্তিকা।

উপমা আসে হলিউড্ থেকে, ফ্রান্স থেকে, খাস ব্রিটিশ ফিল্ম-ওয়ার্ল্ড থেকে। গ্রেটা গার্বো, ক্লদেৎ কোলবয়ের, লরেন্স্ আলিভিয়ার, পল মুনি। রুপোলী পর্দার বহুবন্দিত কয়েকটি নামের তালিকায় যুক্ত হয় আরো দুটি নাম। বিনায়ক আর অস্তিকা। পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অস্তিকার রূপবন্দনা। উৎসাহী যারা, তারা সাত সমুদ্র পার করে এনে হেলনকে, এনেছে ভেনাসকে, এনে ক্লিওপেট্রাকে। রেইনাকেও রেহাই দেয় কেউ কেউ। তুলনার জন্য বিদেশী রূ কন্যারাই নয়, প্রাচীন কাব্যের সমা খুঁড়ে তুলে আনা হয়েছে মহাশ্বেতাকে কোন মৃগনয়না মালবিকাকে। তার পা পাশে বিনায়কের অভিনয়। এ অভি না কী ফ্রান্সের কোন ওপেন্-এয়ার স্টেজ কোন বিখ্যাত লাভ্ সিকোয়েন্সের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কোন শিভাল্রি দৃশ্যে হলিউড্‌কে অতিক্রম করে, কোন ট্র্যাজেডি চিত্রণে ইংলিশ্ থিয়েটার যোজন-পথ পেছনে থাকে।

ছায়া-পৃথিবীর মাসিক আর সাপ্তাহিক। সমস্ত পাতা জুড়ে শুধু বিনায়ক আর অস্তিকা! মাথার মধ্যে একটা নাগরদোলা বন্ বন্ ঘুরপাক খেয়েছে। আর দেখতে পারে নি সুমিতা। রাশি রাশি হরফ, রাশি রাশি ছবি কোটি কোটি চক্রচূড় সাপের মত ফণা তুলে দাঁড়িয়েছে। আতঙ্কে চিত্র-পত্রিকাগুলো ছুঁড়ে চৌকাঠ পার করে দিয়েছে সুমিতা। তারপর দুটি শীর্ণ হাতের পল্লবে মুখ-খানা ঢেকে ফেলেছে। বুকের মধ্যে নিঃশব্দ কান্না গুমরে গুমরে উঠেছে। তিন মাস ধরে সে-কান্না একটু একটু করে শিলী-ভূত হয়ে গিয়েছে।

বিনায়ক আর অস্তিকা। এই দুটি নামের প্রেতলোক থেকে পালিয়ে কোন ছায়াতরুর নীচে আশ্রয় খুঁজেছে সুমিতা। সে আশ্রয় বাবলুরা। কিন্তু নির্মম যবনিকা নেমে এসেছে সহসা। ডক্টর সেনের নির্দেশ, এই বিছানায় বন্দী থাকতে হ'বে। ছেলেমেয়েদের ছোঁয়া পর্যন্ত নিষেধ। একটি ভয়াল শব্দ রক্তের কণায় কণায় ভেঙে বেড়াচ্ছে। সাস্‌পেক্টেড টি বি। স্পর্শের সাঁকো বেয়ে যে কোন সময় সংক্রামিত হ'তে পারে।

দ্বীপের মত এই নিঃসঙ্গ বিছানায় চারপাশ থেকে রাশি রাশি রোমশ থাবার মত নেমে এসেছে দুটি নাম। বিনায়ক আর অস্তিকা। অহরহ। তিনমাস ধরে সমানে। নিঃশ্বাস থেমে থেমে যেতে চায় বার বার।

তিন মাসের অভ্যাস। এখনও জাপানী ঘড়িটার ডায়ালে চোখদুটো

...র হয়ে রয়েছে সুমিতার। মিনিটের ...কার কামরাগুলো পেরিয়ে ঘণ্টার ...কালবাহু সাতটার ঘরে পেশছবে। ...ভুল নিয়মে। এখনও দশটা মিনিট ...কী। এই দশ মিনিট সময় সুমিতা ...র্তমানের কবর থেকে ফিরে যায় কোন ...শি-খুশি অতীতের আশ্চর্য উজ্জ্বল ...তকগুলো দিনে। তিন মাস ধরে ...গিয়েছে। তিন মাস ধরে সে অতীত থেকে আশ্বাস খুঁজছে, আশ্রয় প্রার্থনা করেছে।

এই তিন মাস অতীতের নেপথ্যে আছে অনেকগুলো বছরের বেলাভূমি। অজস্র স্মৃতির ঝিনুক ছড়িয়ে ছড়িয়ে রয়েছে সে-সব দিনগুলোতে। বিনায়কের সে দিনগুলি একান্তই সুমিতাময়। অম্বিকা নামে কোন নারী তাদের অন্তরঙ্গ পৃথিবীতে সে দিন ঝড় নিয়ে আসে নি।

আকাশে কুর্চি ফুলের মত খণ্ড খণ্ড মেঘ। এগারো বছর আগের কোন এক মেদুর বিকেলের কথা মনে পড়ে সুমিতার।

বালিগঞ্জ অঞ্চলে তখন বাড়ির বুনন এত নিবিড় ছিল না। সতোন দত্ত রোডটা যে বিন্দুতে এসে ফুরিয়ে গেছে সেটি একটি নতুন বাংলো প্যাটার্নের বাড়ি। জানালায় আকাশী পর্দা, চক্রাকার বারান্দা ফুঁড়ে চকোলেট রঙের কলামন্ উঠে গিয়েছে ওপরের দিকে। চারপাশে রাশি রাশি ডালিয়া, হাইড্রেনজিয়া, ক্রিসেনথিমাম্ আর আকাশী অর্কিড। রঙে রঙে ইন্দ্রধনুর মায়া সৃষ্টি করেছে। দেওয়ালে শুভ্র পাথরের ফলকে রাবীন্দ্রিক হরফে খোদিত রয়েছে একটি নাম। মনোরম চৌধুরীঃ চিত্র পরিচালক। সব মিলিয়ে নয়নশোভন। শহরের উগ্র বাহুবিস্তারের ঠিক বাইরেই ছায়াকুঞ্জের মত শান্ত একটি আশ্রয়।

সুমিতা আর বিনায়ক, দুজনেই একসঙ্গে বাড়িটা থেকে বেরিয়ে এসেছিল। আকাশে কুর্চিফুলের মত খণ্ড খণ্ড মেঘ। মেদুর বিকেল।

বিনায়ক বলল; "আপনি কতদূর যাবেন?"

"বেলেঘাটা।"

"ভালই হলো, আমিও নারকেলডাঙা যাবো। অনেকটা পথ একসঙ্গে যাওয়া যাবে।" বিনায়কের দু চোখে খুশি টলমল করছে। একটু আগেই পরিচয় হয়েছে সুমিতার সঙ্গে। মনোরম চৌধুরীই আলাপ করিয়ে দিয়েছেন।

"আমি বালিগঞ্জ থেকে ট্রেন ধরে যাবো।" মৃদু গলায় বলল সুমিতা।

"সে যে অনেক পথ হাঁটতে হবে! না, না সে কী হয়!" বিনায়কের কণ্ঠ থেকে বিন্দু বিন্দু বিস্ময় ক্ষরিত হলো।

"না হয়ে উপায় কী? আসার সময় তাই তো এসেছিলাম। ট্রাম বাসে যাবার মত ভাড়াই নেই সঙ্গে।" গলাটা পাখীর বুকের মত ধুক ধুক করে থেমে গেল একসময়।

কিছু সময় বিহ্বল চোখে তাকিয়েছিল বিনায়ক। তারপর বিষণ্ন গলায় বলেছিল, "তাই তো, আমার খেয়াল হয় নি এতক্ষণ। এক্সট্রা গার্লের পার্টটাও তো আপনি পেলেন না। আমি আমার খুশি নিয়েই ব্যস্ত। ভারি তো একটা সাইড পার্ট দিয়েছে, তাতেই আমি কৃতার্থ হলাম আর কী? নিন চলুন। আমিও বালিগঞ্জ দিয়েই যাবো।"

আকাশে কুর্চি ফুলের মত খণ্ড খণ্ড মেঘ। মেদুর বিকেল। ছায়া-ছায়া একটা পর্দা নেমে এসেছে। মনে হয়, রাশি রাশি মেঘপাখী ডানা মেলে রোদটুকু মুছে নিয়েছে।

দুজনে এগিয়ে চলল। সুমিতা আর বিনায়ক। দু পাশে সবুজ খুশির মত ছড়িয়ে রয়েছে ঘাসবন। কোথায়ও দু-একটা নতুন বাড়ির প্রাথমিক কাঠামো। ইলেক্‌ট্রিকের তারে তারে শহরের দাক্ষিণ্য এগিয়ে আসছে। অনেক চোরকাঁটাভরা ঘাসের মাঠ পাড়ি দিয়ে ট্রামের সড়কে এসে পড়ল দুজনে।

অস্ফুট গলায় সুমিতা বলল; "কাজটা হলে বড় ভালো হতো। বড় আশা করে এসেছিলাম।"

মেঘভরা আকাশের কী এক মোহন মায়া আছে। বারে বারে, ফিরে ফিরে বিনায়কের চোখদুটো গন্ধমাতাল মৌমাছির মত সুমিতার চারপাশে চক্র দিয়ে ফিরছিল। পরিষ্কার একখানা মিলের শাড়ী আটপৌরে ছন্দে চাঁপারঙ্ দেহ ঘিরে উঠে গিয়েছে। মাথায় সাদাসিধে কবরী। আকাশনীল ব্লাউজের

হাতায় এম্‌ব্রয়ডারির আভাস। টানা টানা দুরায়ত চোখ। সেই চোখ থেকে এক-জোড়া কালো ভ্রমর যেন উড়ে উড়ে যেতে যায়।

আকাশে কুর্চি ফুলের মত মেঘ। ছায়া-ছায়া বিকেল। আর একটু আগেই পরিচয় হয়েছে সুমিতার সঙ্গে। দু'জনে একই প্রার্থনা নিয়ে এসেছিল চিত্র পরিচালকের কাছে। তার প্রার্থনা মনোরম চৌধুরীর দাক্ষিণ্যে চরিতার্থ হয়েছে। আর সুমিতা মুঠিভরা প্রত্যাখ্যান নিয়ে ফিরে যাচ্ছে। এ সব ভাবনা চেতনা থেকে জলের আল্‌পনার মত মুছে গেল বিনায়কের। শুধু মেঘপাখীর এই বিকেলে প্রথম পরিচয়ের এই মেয়েটিকে অপরূপা মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে, সুমিতা যেন মর্তকায়ার কোন মেয়ে নয়। একটা অবিশ্বাস্য ভোজবাজীর কুহকে মেঘময় আকাশ থেকে কোন সুতনুকা নেমে এসেছে। পাশাপাশি। কাছাকাছি। যে কোন মুহূর্তে আকাশে, মেঘে, হাওয়ায় মিলিয়ে যেতে পারে সে।

সুমিতা আবারও বলল; "বড় ভালো হ'ত কাজটা হ'লে। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে এসেছিলাম। এখন কিছু একটা না হলে বড় মুশকিলে পড়তে হবে।"

সুমিতার কথাগুলো মধুর তন্দ্রার আমেজটাকে ফালা ফালা করে দিল বিনায়কের। ত্রস্ত গলায় বলল; "এই বুঝি আপনার প্রথম কাজের সন্ধানে বেরিয়ে আসা। তাই না?"

"হ্যাঁ। খবরের কাগজে লিখেছিল ভালো ঘরের শিক্ষিতা মেয়ে হলে সিনেমায় চান্স দেবে। তাই এসেছিলাম।" সুমিতার কণ্ঠ অপরাধী শোনালো।

আশ্চর্য শব্দ করে হেসে উঠল বিনায়ক; "বড় তাড়াতাড়ি মোহভঙ্গ হয়ে গেল, তাই না! আমি বলি, ভালই হলো।"

আড়ষ্ট চোখে তাকালো সুমিতা; "এ কথা বলছেন কেন?"

"বলছি কি আর সাধে! পৃথিবীটা বড় সাঙ্ঘাতিক জায়গা। সবে ঘরের চৌকাঠ ডিঙিয়েছেন। দেখবেন ধীরে ধীরে। কতদিন ধরে আঠার মত লেগে রয়েছি ডাইরেক্টরদের পেছনে। আজ একটা চান্স মিলল। অথচ মুখে এদের ভালো ভালো কথা, বড় বড় বকুনি। ভদ্রঘরের ছেলেমেয়েদের নিয়ে আসবে এ লাইনে। আপনার যদি ফ্যামেলী স্ট্যাটাস্‌ থাকে, যদি আপনার স্বামী কী বাবা বড় একজন সিভিলিয়ান হয়, এক্ষুণি আপনার কাজ হয়ে যাবে। তা অভিনয় জানুন আর নাই জানুন।" রীতিমত উত্তেজিত হয়ে উঠল বিনায়ক।

বিনায়ককে দেখতে দেখতে, তার কথাগুলো শুনতে শুনতে ফিক করে হাসির পদ্ম ফোটালো সুমিতা; "আপনি ভারি ছেলেমানুষ কিন্তু।"

"তা তো বলবেনই। জানেন, ছোট-বেলা থেকে এর তার কাছে শুনেছি আমি নাকি একটা প্রতিভা। সিরাজের অভিনয় যখন করেছি, অনেক কঠোর চোখেই জল এসেছে। ঘর ভর্তি রাশি রাশি মেডেল কাপ জড়ো হয়ে রয়েছে। একটা যাদুঘর তৈরী করা যায় ইচ্ছা করলে। কিন্তু ডাইরেক্টরদের কাছে তার মূল্য কাণা-কড়িও নয়। দুটো জিনিস দরকার এ লাইনে, হয় তোষামোদ, নয় স্ট্যাটাস্‌। ব্যস্‌, পরীক্ষায় একেবারে ফুল মার্ক।" থর থর কাঁপল বিনায়কের গলা। আর্ত গমকের তারে তারে আশ্চর্য একটা রেশের মত ছড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ল কথাগুলো।

একসময় পায়ের নীচে ট্রামের সড়ক ফুরিয়ে এলো। ট্রেনের চাকার তলায় শেষ হলো রেলের রেখা। তারও পর বেলে-ঘাটার রেলসেতু পেরিয়ে শুরু হলো আঁকাবাঁকা গলিপথ। নানা পথের আঁকিবুকি পেরুতে পেরুতে বিনায়ক বলল; "রোজগারের এত পথ থাকতে সিনেমা লাইনে আসতে গেলেন কেন? অবশ্য কথাটা জিজ্ঞেস করা আমার উচিত নয়।"

"না, না তাতে কী? এতকাল শুনেছি এ লাইনে অনেক টাকা। আর অতি সহজেই তা পাওয়া যায়। তাড়াতাড়ি হয়ে যায় কাজ।" অপ্রস্তুত মুখে তাকালো সুমিতা।

"ও।" সহসা চুপ করে গেল বিনায়ক।

আকাশে এতক্ষণ কুর্চি ফুলের মত খণ্ড খণ্ড মেঘ জমেছিল। এখন সে মেঘ নিবিড় হয়েছে। গভীর হয়েছে। মেঘপাখীর ডাক শুরু হয়েছে। ছায়া-ছায়া পর্দাটা ঘনতর হয়েছে। সাপের জিভের মত লিক্‌লিক্‌ বিদ্যুতের চমক কেটে কেটে বসল মেঘের আকাশে। ঝুর ঝুর করে খইএর মত বৃষ্টি ঝরল গায়ে।

শঙ্কিত গলায় সুমিতা বলল; "তাড়াতাড়ি হাঁটুন বিনায়কবাবু। বৃষ্টি নামলো যে। ঐ সামনের গলিতে আমাদের বাসা।"

"আমি এখান থেকে আজ বিদায় নিচ্ছি। আপনি এবার যেতে পারবেন তো। এখন না ফিরলে আর নারকেল-ডাঙা পর্যন্ত পৌঁছতে পারবো না।"

"তাই কী কখনও হয়। এই বৃষ্টিতে যাবেন কোথায়, ঝড়ও উঠলো যে। এতদূরে এলেন যখন, মা'র সঙ্গে আলাপ করে যান। ঝড়বৃষ্টি থামলে যাবেন।" কেমন যেন অনুনয়ের মত শোনালো সুমিতার কণ্ঠ।

"তবে চলুন।" সুমিতার আমন্ত্রণের স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দিল বিনায়ক।

এলোমেলো ঝড় উঠেছে। বিস্রস্ত হয়ে যাচ্ছে চুল। উড়ে উড়ে যেতে চায় জামা-কাপড়। উথল-পাথল বৃষ্টি শুরু হওয়ার আগেই একতলা বাড়িটার সামনে এসে পৌঁছল দু'জনে।

একখানা মাত্র ঘর। সামনের বারান্দা-টাকে ঘিরে রান্নাঘরের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। চারদিকে একবার দৃষ্টিটাকে চক্রাকারে ঘুরিয়ে আনল বিনায়ক। দৃষ্টিটা মুগ্ধ প্রসন্নতায় ভরে গেল তার। তক্তপোশের ওপর রাজহাঁসের পাখার মত ধবধবে বিছানা। আলনায় নিখুঁত সাজানো দু'খানি শাড়ি, খান তিনেক থান। একপাশে কেরাসিন কাঠের একটি টেবিলে ফুলকাটা পর্দা। চীনে মাটির ফুলদানিতে কয়েকটি রক্তময় কৃষ্ণচূড়া। রাস্তার কোন গাছের উদার প্রাচুর্য থেকে নিয়ে আসা হয়েছে। পরিপাটি সাজানো কয়েকখানি বই। তার ঠিক ওপরেই রবীন্দ্রনাথের রিলিফ্‌ প্রতিমূর্তি। কবি আশীর্বাদময়। একটি গেরুয়া ধুনুচিতে গন্ধধূপ পুড়ছে।

প্রায় সারাটা জীবন এজমালি হস্টেল কী নানা শরিকের মেসে কাটিয়েছে বিনায়ক। সংসারের যে এমন একটা মোহন-মধুর চিত্র থাকতে পারে, এই নগণ্য কয়েকটি উপকরণে যে এমন

অভিরাম শিল্প রচনা করা যায় তা যেন অনেক আগের কতকগুলো দিনের স্বপ্নকে স্মরণ করিয়ে দিল। মনে পড়ল মায়ের কথা। গন্ধধূপের সৌরভের মত ঘুরে ঘুরে এলো নন্দনপুরের কতকগুলো আশ্চর্য উজ্জ্বল দিন। একটি মনোরম বাড়ি। ঝকঝকে নিকানো আঙিনা। ময়ূরমুখী টিনের চাল। লক্ষ্মীর পটচিত্রের সামনে সরষের তেলের প্রদীপ। ধূপাধার থেকে গন্ধ ছড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। বরলক্ষ্মীর মত মায়ের চেহারা। কপালে সিন্দুরের বিন্দু। রাঙা সীমন্তে বাবার পরমায়ুর নিশানা।

আশ্চর্য! সে ছবি একদিন ছায়া হয়ে মিলিয়ে গেল। মায়ের কপালে সিন্দুরের শুকতারা একদিন মুছে গেল। সিঁথিপথ রিক্ত হলো। শুভ্র হলো। তিনদিনের জ্বরবিকারে বাবা শেষবারের মত চোখ বুঁজলেন। তারপর তিনমাসের মধ্যে দক্ষিণের আমবাগানে বাবার পাশে মায়ের শ্মশানশয্যা রচনা করা হ'লো। সে আজ অনেকদিনের কথা। এক যুগ অতীতের ইতিহাস।

মা-বাবা নেই পৃথিবীর আলো-বাতাসে। এক দিদি ছিল। বিয়ে হয়ে সেও সুদূর হয়েছে। স্বামীর রেলের চাকরি। আজ চক্রধরপুর। কাল রাম-গড়। এখানে-সেখানে যাযাবরের মত ছুঁয়ে-ছুঁয়ে যাওয়া। প্রথম প্রথম খবর আসত। এনভেলপ থেকে পোস্টকার্ডের কুশলবার্তায় এসে একদিন সে অধ্যায়ের ওপরও যবনিকা নেমে এলো।

তারও পর কাকারা দলিল-পর্চার ফাঁক দিয়ে তালুকমুলুক বের করে নিল। সেই থেকে ভাসমান জীবনের কাহিনী শুরু। আজ এ হোটেলের বন্দর, কাল ও মেসের গঞ্জ। কয়েকদিনের বসতি। কিছু সময়ের বিরতি। তারপর আবার নিরুদ্দেশের ঠিকানায় বেরিয়ে পড়েছে বিনায়ক।

এই ঘরখানার আয়নায় স্বপ্নময় একটি অতীতকে দেখতে দেখতে চোখ-দুটো জ্বালা করে উঠল বিনায়কের।

ঘরের মধ্যে চলে এলো সুমিতা। [illegible] স্নান করে এসেছে। রাশি রাশি [illegible] মত ছড়িয়ে রয়েছে পিঠের [illegible]

আলুগোছ একটা গিঁট দিয়ে রেখেছে। পরনে খয়েরী রঙের একটি শাড়ি। ভারি মায়াময় মনে হচ্ছে সুমিতাকে। হ্যারিকেনের অস্পষ্ট আলো চার পাশে রহস্যের চালচিত্র রচনা করেছে যেন। অপলকে তাকিয়ে রইল বিনায়ক।

স্নিগ্ধ হাসি ফুটলো সুমিতার মুখে; "কী যেন ভাবছেন তন্ময় হয়ে।"

বিব্রত হ'লো বিনায়ক; "ও কিছু না। আপনাদের এই ঘরখানা দেখতে দেখতে আমার ছেলেবেলার কথা মনে পড়ল। তাই ভাবছিলাম। সত্যি, আপনাদের সংসার আমার বড় ভালো লাগছে।"

কোন জবাব দিল না সুমিতা। স্নিগ্ধ হাসিটা শুধু স্নিগ্ধতর হ'লো।

বিনায়ক বলল; "হোটেল-মেসে থাকতে থাকতে সংসারের স্বাদ একেবারে ভুলে গিয়েছি। কখনও-কখনও যদি আপনাদের বাড়ি আসি, তবে কী বিরক্ত হবেন!"

চমকে বিনায়কের দিকে তাকালো সুমিতা। কিন্তু না, বিনায়কের মুখে-চোখে কোন কুটিল কারসাজিই লিখিত নেই। শুধু মুগ্ধ এক ছেলেমানুষীতে মুখখানা টলমল করছে। ধীরে ধীরে সুমিতার শরীর থেকে চমকটা মুছে গেল। পরিচ্ছন্ন গলায় সে বলল; "যখন খুশি আসবেন। এলে খুশিই হবো।"

একটু পরেই ঘরের মধ্যে এলেন সুমিতার মা। সুনয়নী। সারা শরীর ঘিরে শুভ্র থানে থানে বৈধব্য লিখিত রয়েছে। নিজের মায়ের কথা মনে পড়ল বিনায়কের।

সুনয়নীর এক হাতে চায়ের কাপ। আর এক হাতে খাবারের রেকাবি। বিনায়কের সামনে সেগুলো নামিয়ে রেখে তিনি বললেন; "খাও বাবা।" একটু আগেই তাদের পরিচয় হয়েছে। সামনেই বসে পড়লেন সুনয়নী।

সোনালী চা থেকে উড়ে যাওয়া রেখায়িত ধোঁয়া। খাবারের থালা। সুনয়নীর মধুর উপস্থিতি—সব মিলিয়ে একটি নম্র মমতার পটভূমি যেন চারপাশে ছড়িয়ে রয়েছে। অপরূপ এক কৃতজ্ঞতায় মনটা ভরে গেল বিনায়কের।

সুনয়নী বলতে শুরু করলেন; "সবই বরাত বাবা। তা না হ'লে ঘরের মেয়েকে বেরোতে হয় পয়সা রোজগারের জন্যে। এমন অবস্থা তো ছিল না। সুমিতার বাবা যখন বেঁচে ছিলেন তখন অবস্থা আমাদের সচ্ছলই ছিল। তিন বছর ধরে জমানো টাকা ভেঙে ভেঙে খাচ্ছি। ব্যাঙের আধুলির পরমায়ু আর

ভাল জিনিস

যে-কোন ভাল জিনিস তৈরী করার একটা ন্যূনতম খরচা আছে। পড়তা না পুষিয়ে কোন উৎপাদনকারীই ভাল জিনিস দিতে পারেন না। বনস্পতির মত জিনিস অবশ্যই ভাল হওয়া চাই, কারণ বনস্পতি দিয়ে আপনার রান্না হয়। এজন্যে বনস্পতি যখন কিনবেন তখন সবচেয়ে ভাল যেটি সে-টিই কিনবেন। কুসুম-এর দামের চেয়ে কম দামে আপনি ভাল বনস্পতি পাবেন না।

Kusum

Kusum

VANASPATI
ENRICHED WITH VITAMIN A
ALSO CONTAINS VITAMIN D

5lbs.

কুসুমের চেয়ে ভাল বনস্পতি বেশী দাম দিয়েও কিনতে পাবেন না

কিনুন! নূতন

কুসুম

ভিটামিন এ দ্বারা সমৃদ্ধ আর ভিটামিন ডি-ও এতে আছে।

উচিত দামে শ্রেষ্ঠ বনস্পতি

KP/6/53

ক'দিন বলো। এই দেখ না, আগে ছিলাম পার্ক সার্কাসের সুন্দর ফ্ল্যাটে। এখন এই ঘিঞ্জি পাড়ায় এসে উঠতে হয়েছে। এখনও অদৃষ্টে কী আছে, শুধু ভগবানই জানেন।" বিষণ্ণ মূর্ছনায় গলাটি থামলো সুনয়নীর।

সুমিতা মৃদু অনুযোগ দিল; "আ মা থামো তো। তোমার এই এক বাতিক হয়েছে! যেই আসুক, তাকে শুধু অভাব আর দুঃখের কথা বলা চাই।"

সুনয়নী তাকালেন বিনায়কের দিকে। একটু সমর্থনের প্রত্যাশা তাঁর চোখে ঝিকমিক করলো; "কার কাছে আর বলবো, তুমিই বলো তো বাবা। তিন কূলে আর কী কেউ আছে! মাথা খারাপই হয়ত হয়েছে আমার, তাই বললাম। তুমি কিছু মনে করো না বাবা। সবই অদৃষ্ট।"

"না, না আপনি বলুন। আমি শুনছি।"

উৎসাহিত হয়ে উঠলেন সুনয়নী; "তবে একটা কথা রাখবে বাবা। তুমি যখন সুমির বন্ধু।"

"বেশ তো বলুন।" চায়ের কাপটা থমকে গেল মেঝে আর বিনায়কের ঠোঁটের মধ্যপথে।

"প্রথম দিনেই এমন অনুরোধ জানানো ঠিক সঙ্গত হচ্ছে না। আচ্ছা আজ থাক"—সহসা থমকে গেলেন সুনয়নী। দু'টি কুপিত চোখের দৃষ্টি তাঁর দিকে স্থির হ'য়ে রয়েছে। সুমিতা।

রাত্রি নিবিড় হয়েছে। ঘনতর হয়েছে। বৃষ্টির ঝমঝম বাজনা থেমেছে বাইরে। মেঘধোয়া আকাশটাকে আশ্চর্য নীল এক-খানা কাচের মত মনে হয়। জ্বল জ্বলে তারা দেখা দিয়েছে সেখানে। মল্লিকা ফুলের মত থরেথরে জ্যোৎস্না ঝরছে।

এক সময় উঠে দাঁড়ালো বিনায়ক।

সুমিতা বলল, "আবার আসবেন।"

"নিশ্চয়ই আসবো।" চারটে চোখ এক সময় নিবিড় হয়ে মিলল। হয়ত অকারণ। সুমিতা চৌকাঠে দাঁড়ালো। বিনায়ক পথের আঁকবাঁকিতে নামল। অনেকদূরে গলির বাঁকে এসে একবার তাকালো পেছনে। চৌকাঠের ওপর হ্যারিকেন হাতে এখনও দাঁড়িয়ে আছে একটি মনোরম ছবি। সে

বেলেঘাটা থেকে নারকেলডাঙ্গা। পথটুকু পেরিয়ে আসতে আসতে, চাঁদঝরা আকাশে আকাশে একটি উত্তর খুঁজতে লাগল। একটি বিকেলের মধ্যে সুমিতারা এত অন্তরঙ্গ হলো কেমন করে। কেমন করে এত কাছাকাছি এলো। চেতনায়-ভাবনায় এমন দোলা দিল কেন আজকের বিকেলটা!

বেলেঘাটা থেকে নারকেলডাঙ্গা। একটু একটু করে পথটুকু হ্রস্ব হয়ে এলো। আগে আগে মাসে একবার আসতো। মাস থেকে সপ্তাহে সঙ্কুচিত হলো ব্যবধানটা। তারও পর সূর্য-ওঠার মত প্রাত্যহিক হ'লো বিনায়কের আগমন। নিয়মিত হ'লো।

আরো অনেক নিবিড় হয়েছে সুমিতা। অনেক কাছাকাছি এসেছেন সুনয়নী।

দরজায় টক্ টক্ টোকা। পরিচিত সংকেত। কপাট খুললেই মধুর-হাসি আমন্ত্রণ জানাতো সুমিতা। আশ্চর্য তরল গলায় বলত; "প্রভাতে উঠিয়া ও-মুখ হেরিনু, দিবস যাইবে ভালো। আহা, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? ঘরে আসুন।"

কিছুক্ষণ বিমুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকতো বিনায়ক। প্রত্যেক দিন এই হাসির নিমন্ত্রণ তাকে নারকেলডাঙ্গার কোন এক এজমালি মেস্ থেকে অপরূপ আকর্ষণে টেনে আনে বেলেঘাটায়। সুমিতা নামে একটি স্নিগ্ধ বন্দরে এসে থামে বিনায়ক। কিছু সময়ের জন্য নোঙর ফেলে।

ঘরের মধ্যে এসে বসল বিনায়ক। সুমিতা মুখোমুখি। বারান্দায় রান্নার তদ্বিরে ছিলেন সুনয়নী। বললেন; "কে রে সুমি? বিনায়ক এসেছে?"

"হ্যাঁ, মা।"

একটু পরেই ঘরে এলেন সুনয়নী। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় চোখ দুটি রক্তাভ। শুভ্র কপালের ফলকে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটেছে। সুনয়নী বললেন; "দেখো বাবা, আমি অনেক ভেবেচিন্তে দেখলাম, এখনই ওর কিছু রোজগার করা দরকার। নইলে সংসার অচল হ'য়ে পড়বে। আর মাত্র কয়েক শ' টাকা রয়েছে ব্যাঙ্কে।"

নিভন্ত গলায় বিনায়ক বললো:

ডাইরেক্টররা বলছে এখন নয়, পরে। দেখি কী করা যায়।"

সুনয়নী বললেন; "সিনেমা লাইনে ও কাজ করুক, এ আমি পছন্দ করি না। শুনেছি ও লাইনটা তেমন ভালো না। আমার কথা তো আর শুনবে না। ছোট-বেলা থেকে আদর দিয়ে দিয়ে ওর বাবা একেবারে মাথা খেয়ে গিয়েছে। দেখ; তুমি বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বল। আই এ পাশ করেছে গত বছর। একটা চাকরি-বাকরির
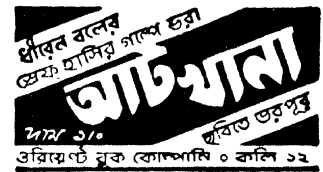
ব্যবস্থা করে দাও সুমির। তোমার তো কত জানাশোনা।"

"আচ্ছা, আমি দেখছি।"

উনুনে কী একটা তরকারি বসিয়ে এসেছিলেন। পুড়ে পুড়ে উগ্র গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে বাতাসে। ত্রস্তে বেরিয়ে গেলেন। সুনয়নী।

সুমিতা। নাম নয় বিচিত্র এক আকর্ষণ। মধুর এক প্রেরণা। শান্ত এক মিঠে জলের হ্রদ।

ফাল্গুনের এক মৌমাছি-গুন্-গুন্ বিকেলে আবার এলো বিনায়ক। আজ প্রথম বললে; "চলুন, ওই ওদিক থেকে বেড়িয়ে আসি। আপনার সঙ্গে কয়েকটা কথা আছে। মাসীমা কোথায়?"

"কালীঘাট গিয়েছে।"

দরজায় পিতলের তালা ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়ল। দুজনে। সুমিতা আর বিনায়ক।

সুমিতা বলল; "কী ব্যাপার, যাবেন কোথায়?"

"যদি বলি নিরুদ্দেশে।" আবিষ্ট চোখে তাকালো বিনায়ক।

ত্রস্তে দুটো চোখ নামল সুমিতার। বিনায়কের আবেশ হয়ত তার মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছে। কয়েকটি বিবশ মুহূর্ত। তারপরেই সহজ হ'লো সুমিতা; "ও তো কাব্যের ভাষা। ওর মধ্যে ফাঁক বেশী; ফাঁকি অনেক। তবে শুনতে ভালো।"

"আমি কবি নই এ্যাক্টর। দেহের অঙ্গভঙ্গি বিক্রী করে খেতে হয়। তবু আজকের এই বিকালটা আলাদা। আজ আমি কবি হতে পারি।"

"বটে!" হাসির খুশি ছড়ালো সুমিতা।

বেলেঘাটা আর নারকেলডাঙা। যেন উত্তরমেরু আর দক্ষিণ মেরু। মাঝখানে মাদারবন, তালের বীথি, বৈঁচির জঙ্গল। বিষুবরেখার মত সবুজ একটি দূর্বাপথ দূর দিগন্তে চলে গিয়েছে।

মাদারগাছের ছায়াতলে এসে বসল বিনায়ক আর সুমিতা। চারদিকে রাশি রাশি লাল ফুল মাটির কামনা হয়ে ছড়িয়ে রয়েছে।

আশ্চর্য এক দিন। শঙ্কামুক্ত শুভ্র মুক্তার মত একটি বিকেল।

বিনায়ক বলল, "আজ অনেকগুলো কনট্রাক্ট হ'য়ে গেল। অবশ্য সবই ছোট ছোট পার্ট, তবু মনোরমবাবু আশ্বাস দিয়েছেন। মেজর রোল একটা দেবেন শিগ্গিরই।"

"এই কথা বলতে এতদূর নিয়ে এসেছেন!" হতাশ চোখে তাকালো সুমিতা।

আচমকা সামনের বৈঁচিবন এলো-মেলো করে কলশব্দ উঠল। একজোড়া চখা-চখী চক্রাকারে পাক খেতে খেতে বিন্দু হয়ে আকাশে মিলালো।

বিব্রত হলো বিনায়ক, "না, না। আচ্ছা, এমন কিছু কী করা যায় না যাতে নারকেলডাঙা আর বেলেঘাটার ব্যবধান ঘুচে যেতে পারে।"

"কী করে ঘুচবে বলুন? দুটো আলাদা জায়গা যে। বুঝতে পারছি, সত্যি আপনি কবি হয়েছেন। তবে উদ্‌ভ্রান্ত কবি। যাক্, আমার চাকরির কী ব্যবস্থা করলেন; তাই বলুন।" দুষ্টুমি-ভরা দুটো চোখ তুলে ধরল সুমিতা। তারপর জলতরঙ্গের বাজনার মত ছড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ল তার খিল খিল হাসি।

পাখীর বুকের মত থরথর দুটি হাত নিজের মুঠোতে তুলে নিল বিনায়ক। ফিস ফিস গলায় বলল, "চাকরির একটা ব্যবস্থা করেছি।"

"কেমন চাকরি? টেম্পোরারি না পার্মানেণ্ট?" শ্বেতপদ্মের মত মুখখানা কেমন করে রক্তপলাশ হয়ে গিয়েছে সুমিতার। দুরু দুরু বুক, ছল ছল রঙ। দেহমন ঘিরে ঢেউ উঠেছে। ঘোর লেগেছে চোখে, নেশা নেমেছে গলায়।

বিনায়ক বলল, "একেবারে পার্মানেণ্ট। মাসীমা [illegible] বললেন, [illegible] চাকরি আর জোগাড় করি কী করে! সারা জীবনের মত আর একজনের সব ভার নিতে হ'বে। একেবারে মেইন্ পার্ট। নায়িকার ভূমিকা।"

"মনোরম চৌধুরী আমাকে একটা এক্সট্রা গার্লের পার্ট দিলেন না। আর এ যে নায়িকার রোল। অত ঝুঁকি নিতে সাহস করলেন কোন পরিচালক?" বঙ্কিম ভ্রূরেখা তুলে তাকালো সুমিতা। তার সমস্ত দেহটাকে আশ্চর্য একটা মিঠে জলের হ্রদ মনে হচ্ছে। সে দিকে তাকিয়ে চোখদুটো যেন জুড়িয়ে গেল বিনায়কের।

বিনায়ক বলল, "বিনায়ক নামে একটি যুবক। নিবাস, নারকেলডাঙার একটি শরিকী মেস্। রূপালী পর্দায় এক্সট্রা মেয়ের পার্ট নয়; তার জীবনের পর্দায়, সংসারের হাসিকান্নার ক্যামেরার সামনে হিরোইনের রোল দিতে রাজী হয়েছে। খুশী তো! মাইনে, সেই বিনায়কেরই তনুমন। ইহকাল-পরকাল।"

"বাবারে বাবা। খুশী না হয়ে উপায় কী!" হাল্কা একটি পালকের মত সুমিতার দেহভার বিনায়কের বুকের মধ্যে মিশে গেল।

তারপর ঝুর ঝুর করে মাদার ফুল ঝরল। কোন যাযাবর বাতাস এসে দোলা দিয়ে গেল বৈঁচী বনে। কাশফুলের মত টুক্রো টুক্রো সাদা মেঘ ভাসল আকাশে। আর চারটে নির্বাক চোখের আরশিতে অনেক গান, অনেক গুঞ্জন ছড়িয়ে ছড়িয়ে পলাতক হ'লো সেই অপরূপ বিকেলটা।

তারও পর অনেকগুলো মসৃণ বছরের ইতিহাস। মসৃণতম সাফল্যের কাহিনী। মাঝখানে শুধু কয়েকবিন্দু অশ্রুর যতি-পাত। এক হেমন্তের রাতশেষে সুনয়নীর সারা দেহে অর্থময় হিম নেমে এলো। টাইফাস্ হয়েছিল। মারা গেলেন সুনয়নী।

এজমালি মেস্ ছেড়ে সাদার্ন এভেনিউতে চলে এলো বিনায়ক। বেলে-ঘাটা থেকে এলো সুমিতা। রম্যদর্শন ফ্ল্যাট্। সুন্দর স্বীকৃতিতে ভরে উঠলো বোধ জীবন। কপোত-কপোতীর সুখী কূজনে নীড় চকিত হ'লো। বিনায়ক নামে

কোন গান সুমিতা নামে একটি রাগিণীতে মধুর হলো, মুখর হ'লো।

এ বছরগুলো নিরঙ্কুশ সফলতা দিয়ে ঘেরা। একটার পর একটা কনট্র্যাক্ট্ হয়ে গেল বিনায়কের। আজকাল আর সাইড্ রোল নয়। রীতিমত নায়কের ভূমিকা।

দুটি নিবিড় বাহুর ঘেরাটোপে বন্দী হয় সুমিতা। বিনায়ক বলে, "সবই তোমার জন্যে সুমি। তুমি আমার জীবনে একটা লাইট্‌হাউস্। এই সমস্ত সাকসেসে আমার কোন কৃতিত্ব নেই। সবই তোমার। এ কথা আমি সকলকে বলি।"

সুমিতার চোখের পাতা গভীর আবেশে নেমে আসে. "আমি কোন কৃতিত্ব চাই না। শুধু তোমাকে আরও পেতে চাই। আরও।"

কয়েকটা মুহূর্ত। নির্বাক অথচ ভাষাময়। সুখের উত্তাপে গলে গলে পড়ল দুজনের চোখে মুখে। গাঢ় গলায় বিনায়ক বলল, "আমি এক এক সময় ভাবি সুমি, কী আশ্চর্যভাবেই না আমাদের পরিচয়। ভাবি, সেদিন যদি আমাদের দেখা না হ'তো!"

"তা হলে কী হ'তো বল তো!"

"আমার মত দুর্ভাগ্য আর কারো হ'তো না।"

"ইস্। আর এখন?

"আমি পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী পুরুষ।"

"ওটা তোমার সিনেমার ভাষা।"

"না, না তোমার কানে যে কথা বলি, সবই আমার জীবনের ভাষা। মনোরম চৌধুরী সুমিতা নামে একটি মেয়েকে এক্সট্রা গার্লের মর্যাদা দিতে চান নি। আমি তাকে আমার জীবনের অধীশ্বরী করে এনেছি। তার কাছে আর যাই হোক্ সিনেমার ভাষা বলা চলে না।"

"আপসোস হচ্ছে, আমাকে জীবনে নায়িকা করে এনে?"

"হচ্ছে বৈ কী। সারাদিন তাকে পাই না। স্টুডিও-টুডিয়োর ঝামেলা যদি না থাকতো সারাদিন আমার নায়িকাটির মুখই দেখতাম।"

বুকের মধ্যে সুখের ঢেউ ছলছলিয়ে [illegible] সুমিতার। শিশুপাখীর কচি ডানার মত ধুকপুক ক'রে কণ্ঠ, "দারুণ বীরকর্ম [illegible]"

বিনায়ক বলল, "জানো সুমিতা, সিনেমার পর্দায় আমার কত নায়িকা। আজ অম্বিকা, কাল শোভনা, পরশু মালশ্রী। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপারটা কী জানো, আজ আমার সঙ্গে যে গাঢ় প্রেমের নাটক করছে, বলছে, আমাকে না পেলে আর প্রাণ রাখবে না; কালই সে মেক্-আপ মুছে হয়ত শঙ্খকুমারের গলায় ঝুলতে ঝুলতে ঐ একই কথা বলছে। কিন্তু আমার জীবনের নায়িকাটি আমাকে ছাড়া ও কথা আর কাউকে বলবে না। তাই তোমার সঙ্গে একটু মিথ্যা আচরণ করেছি।"

"কী হলো আবার?"

"জানো, চেষ্টাচরিত্র করলে তোমার দু একটা পার্ট আমি জুটিয়ে দিতে পারতাম। কিন্তু ভয়ে দিই নি। যদি তুমি অভিনয়ের খাতিরেও কারো সঙ্গে প্রেমের কথা বলো, তা আমি সইতে পারবো না।"

বিনায়কের বুকের ওপর সমস্ত দেহ ঢেলে লঘু গলায় সুমিতা বলল, "আমি তা জানতাম মশাই। অনেক আগেই জানতাম।"

"বা রে—আমি তো জানি না তোমার জানার কথা।"

বিনায়ক নামে একটি পুরুষের দেহ-মন সুমিতা নামক যে স্বরলিপিতে গান হয়ে ফুটেছে, সে গানের রেশ হয়ে এলো বাবুল, মুনমুন আর চন্দন। তারপর দিনগুলো আরো মসৃণ হলো, আরো মধুর হলো।

পেছনের এই দিনগুলির কাছে আশ্বাস চায় সুমিতা, আশ্রয় খোঁজে। তিনমাস ধরে চেয়ে এসেছে। অবিরাম। অবিশ্রাম।

ডক্টর সেন রায় দিয়েছিলেন। সূতিকা, রক্তাল্পতা, স্নায়বিক দুর্বলতা। তার কয়েকদিন পরে সাংঘাতিক একটা শব্দ উচ্চারণ করেছিলেন। সাস্‌পেক্টেড্ টি বি। সেদিন থেকেই সুমিতার এই দ্বীপান্তর হয়েছে। ঐ একটি শব্দ অতীতের কতকগুলি উদ্বেল দিনের ওপর যবনিকা টেনে দিয়েছে। তা দিক্, আপসোস ছিল না সুমিতার। কিন্তু ঐ শব্দটা কেন বিনায়কের হাসিতে অম্বিকার খুশী [illegible] চেতনার ওপর দুলতে দুলতে চলে সুমিতার।

সুমিতার মনে পড়ে, একদিন মনোরম চৌধুরী তাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। এক্সট্রা গার্লের প্রার্থনা যার ছিল তাকে বিনায়ক তুলে এনেছিল জীবনের নায়িকা করে। আজ ডক্টর সেনের ঐ ঘোষণায় গোটা পৃথিবীটা তাকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে। কিন্তু বিনায়ক কেন তাকে সুদূরে করবে? জীবনের সেতু থেকে সরিয়ে দেবে কোন অগৌরবের অন্ধকারে? ভাবনাটা চক্রচূড়ের বিষ হয়ে ছড়িয়ে পড়ে রক্তে রক্তে।

জাপানী ঘড়ির গঙটা ডিংডং করে উঠল। রাত সাতটা। আতঙ্কে চোখের মণি দুটো স্থির হয়ে রইল সুমিতার। রেডিয়াম ডায়ালের ওপর কংকাল বাহু দুটো নির্ভুল বিন্দুতে এসেছে।

আর সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়ির ওপর কলশব্দ চৌফালা হয়ে ফেটে পড়ল। একজোড়া কম্বিনেশন্ শু'র পাশাপাশি আর একজোড়া লেডিজ ফ্যাশন্ শু পাশের ঘরে এসে থামল। বিনায়ক আর অম্বিকা।

অম্বিকা বলল, "জানো বিনায়ক, এই একসপ্তাহে এক হাজার চিঠি এসেছে আমার নামে। বেশীর ভাগই স্কুল-কলেজের ছাত্র। 'লুটে নিল মন' বইটায়

...মার হিরোইন্ হয়েছিলাম মনে আছে? ছবিটা গত সপ্তাহে রিলিজ করেছে। ...মিতার পার্ট তাদের খুব ভালো ...গেছে।"

...এ ঘরে শিউরে উঠল সুমিতা। কখন ...র কেমন করে, কোন ঘনিষ্ঠতার সাঁকো ...য়ে আপনি থেকে তুমি হয়ে অস্তিকার ...ছে ধরা দিল বিনায়ক!

বিনায়ক বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমিও ঐ ...জারখানেকের মত চিঠি পেয়েছি। তবে, মেয়েদের চিঠিই বেশী। সংকর্ষণের অভিনয় তাদের খুব অ্যাপীল করেছে। তোমার-আমার কতকগুলো জয়েণ্ট্ চিঠি আছে। দেখবে না কী?"

"এখন থাক্। আমার কাছেও এসেছে। একান্তই তোমার আর আমার। আর কারুরই নাম নেই সেখানে।" ভারি উচ্ছল শোনালো অস্তিকার কণ্ঠ, "আমার ভালোও লাগে না আর কেউ থাক্।"

তোমার আর আমার! সেখানে আর কেউ নেই। আর কেউ অনাদৃত। অবাঞ্ছিত। অস্তিকার কথাগুলো বিস্ফোরকের মত ফেটে পড়ল সুমিতার চেতনায়।

বিনায়কের কণ্ঠটাও টল টল করছে, "ঠিক বলেছ। তোমার আর আমার পারফর্মেন্সে আজকালকার বই দাঁড়ায়। কম্প্লিমেণ্টস্ও একান্তভাবে তোমার আর আমারই প্রাপ্য।" শেষ শব্দ ক'টির ওপর অস্বাভাবিক জোর দিল বিনায়ক. "দেখেছো, 'ছায়ারূপা' কাগজটা তোমাকে-আমাকে নিয়ে কেমন ইঙ্গিত করেছে!"

"কৈ না তো! ভারি ইণ্টারেস্টিং। ওদের আর দোষ কী? এ কী আর চাপা থাকে?"

কিছুই যেন দেখতে পাচ্ছে না সুমিতা। চোখের ওপর বাদুড়ের কালো পর্দা ঝুলছে। সামনে জাপানী ঘড়ির অতন্দ্র রেডিয়াম ডায়ালটা কোথায় যেন হারিয়ে গিয়েছে। শুধু তার টিক্ টিক্ কানের ওপর উল্কার মত ভেঙে ভেঙে পড়ছে সুমিতার।

শীর্ণ হাতখানা সামনের দিকে প্রসারিত করে দিল সুমিতা। বেড্স্টেডের পাশেই সেগুনকাঠের তেপায়া। তার ওপর সারি সারি সাজানো ওষুধের শিশি। নানা আকারের। নানা রঙের। হাতড়ে হাতড়ে [illegible]

তারপর ক্ষীণ দেহটি থেকে নিঙড়ে নিঙড়ে সমস্ত শক্তি হাতখানায় কেন্দ্রিত করল। তারও পর শুভ্র দেওয়ালের গায়ে ছুঁড়ে মারল। ঝন্ ঝন্ করে রাশি রাশি কাচের টুকরো ছড়িয়ে পড়ল মেজেতে।

একটু পরেই খুট্ করে শব্দ উঠল সুইচে। এ ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে বিনায়ক। আর অজস্র আলোতে ভরে গিয়েছে ঘরটা।

অত্যন্ত কর্কশ শোনালো বিনায়কের গলা, "কী হলো? মেজার গ্লাসটা ভাঙ্লে কেন?"

"তুমি সারাদিনে আমার কাছে একবারও বসতে পারো না। জানো, আমার বুকটা কেমন যেন ধড়ফড় করে।" সুমিতার কথাগুলো ভেঙে ভেঙে টুক্রো টুক্রো হ'লো।

"এই জানাবার জন্যেই বুঝি দামী জিনিসটা ভাঙলে! ওটা আমাকে জানাবার ব্যাপার নয়। ডক্টর সেনকে একবার কল্ দিও। হার্টের দোষ হয়েছে তোমার।" টেনে টেনে নির্মম ব্যঙ্গে শব্দগুলিকে মুক্তি দিল বিনায়ক।

"তা নয় কল্ দেবো। তুমি এ চেয়ারটায় একটু বোসো। ভেবে দেখো তো, আমি তোমার স্ত্রী। আমার ওপর তোমার দায়িত্ব আছে তো!" আবহাওয়াটা সহজ করার জন্য হাসল সুমিতা। পাণ্ডুর আলোর মত সারা মুখে হাসিটা ছড়িয়ে পড়ল তার, "তুমি বোসো। কথা আছে।"

"তুমি বলো। কানের ধর্ম শোনা। আমি দাঁড়িয়েও শুনতে পারবো। তাছাড়া, কেন আসি না জানো। একটা রোগীর ঘরে বসে বসে নিজের মনটাকে অসুস্থ করতে ইচ্ছে করেনা আমার।" একটু থামলো বিনায়ক। তির্যক চোখে দেখতে লাগলো, কথাগুলো সুমিতার মুখে কী প্রতিক্রিয়া এঁকে চলেছে। তারপর আবার বলল সে, "নাও কী বলবে বলো।"

বিবর্ণ মুখ। বিনায়কের কথাগুলো রাশি রাশি তীক্ষ্ন নলের মত সুমিতার সে মুখ থেকে শুষে শুষে নিচ্ছে সমস্ত রক্ত। সুমিতা বলল। শরাহত পাখীর মত তার গলা থরথর, "তুমি স্বামী, যা খুশি বলতে পারো। তবু আমার একটা জিজ্ঞাস্য আছে। রোজ রোজ অস্তিকা [illegible]"

বিস্মিত হলো বিনায়ক, "বাঃ! অস্তিকা আসবে না কেন? তোমার কেবল হার্টেরই ব্যারাম নয়। মেণ্টাল হস্পিটালেও পাঠানো দরকার। ক'মাস তোমার অসুখ হয়েছে। আর এই ক'মাস ধরেই তুমি বড়ো অভদ্র হয়ে উঠেছো সুমিতা। ভারি
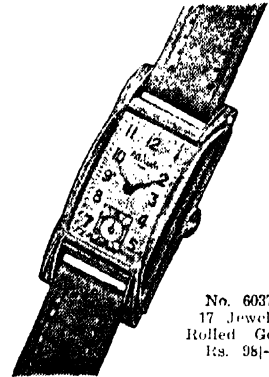
অসভ্য। তোমার সন্দেহটা এত বিশ্রী! যাক্, অস্তিকা আমার ওয়ার্কিং পার্টনার। আশা করি, ভবিষ্যতে তার সম্বন্ধে তোমার ইঙ্গিত ভদ্র হবে।"

সহসা ফুঁপিয়ে উঠল সুমিতা, "আমি সব বুঝি। ওয়ার্কিং পার্টনার নয়, এখন ও-ই তোমার আসল লাইফ্ পার্টনার।"

দুটো চোখ হাতের পাতায় লুকিয়ে ফেলেছিল সুমিতা। হাতের ঢাক্না সরাতেই চমকে উঠল। বিনায়ক চলে গিয়েছে।

একটু পরেই পাশের ঘরে যেন উল্কা-পাত হলো। বিনায়ক হাসছে। অস্তিকা হাসছে। হেসে হেসে ভেঙে পড়ছে বিনায়ক। টুকরো টুক্রো হচ্ছে অস্তিকা।

বিনায়ক বলল, "জানো অস্তু, সুমিতা সাংঘাতিক জেলাস্ হয়েছে তোমার ওপর। বলছে তুমি না কী শুধু ওয়ার্কিং পার্টনারই নও; লাইফ্ পার্টনারও।"

অস্তিকার কথাগুলো পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে, "ঠিক কথাই তো বলেছে সুমিতা। ওয়ার্কের সঙ্গে লাইফের যোগাযোগ কী কম? আচ্ছা বিনায়ক, তুমি সুমিতার ট্রিট্‌মেণ্ট্ ঠিক মত করাচ্ছ তো!"

"অর্থ দিয়ে যতটা সম্ভব, তার কোন ত্রুটি হচ্ছে না।"

পাশের ঘর থেকে সুমিতা আর্তনাদ করে উঠল, "কে বলেছে তোমাকে টাকা-পয়সা খরচ করতে। তুমি শুধু আমার পাশে বোসো। ওগো, তুমি শুধু আগের মত হও। তা হলেই আমি ভাল হয়ে যাবো। ক'টা দিন তুমি বাড়ি থাকো।"

"শুনলে অস্তু, বায়নাক্কাটা শুনলে। আমি একটা পেসেণ্ট্ আগলাই বসে বসে। আহ্লাদীর আহ্লাদখানা শোনো।" বিন্দু বিন্দু বিরক্তি ক্ষরিত হলো বিনায়কের কণ্ঠ থেকে।

"এ'টা একান্তই তোমাদের দাম্পত্য-ঘটিত। এখানে আমার কিছু মন্তব্য করা কী ঠিক হবে বিনায়ক!" নির্বেদের দুর্গে আশ্রয় নিল অস্তিকা।

"আমার ইচ্ছা করে কোথায়ও পালিয়ে যাই। এই দাম্পত্য জীবন যেন অক্টোপাসের মত ঘিরে ধরেছে আমাকে। তুমি কী আমাকে একটু রিলিফ দিতে পারো না অস্তু!"

"বেশ তো; চল না কয়েকদিন পুরী বেড়িয়ে আসি। কালই রওনা হওয়া যাক্। এখন বেশ সীজন টাইম্। আমার শ্যুটিং বন্ধ আছে কয়েক দিনের জন্য।" রীতিমত উৎসাহিত হয়ে উঠেছে অস্তিকা।

"ঠিক আছে, ঐ কথাই রইল। আমিও শ্যুটিং বন্ধ রাখতে বলবো ডাই-রেক্টারকে। আগে তো মনমেজাজ। এই বাড়িটায় ঢুকলে মনে হয়, গোরস্থানে এসেছি।" বিস্বাদ গলায় উচ্চারণ করলো অস্তিকা।

এ ঘরে জাপানী ঘড়ির চক্ষুটা জ্বলছে। একটা হিংস্র দ্যুতি ছড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। মিনিটের কামরাগুলো একটার পর একটা পার হয়ে চলেছে কঙ্কাল বাহু দুটো। নিহত দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়েই রয়েছে সুমিতা। টিক্ টিক্। টক্ টক্।

অনেকটা সময় পার হয়ে গিয়েছে। ও-ঘরটা আশ্চর্য নিস্তব্ধ। একটি কথা পর্যন্ত ভেসে আসছে না। হয়ত চলে গিয়েছে অস্তিকা। হয়ত উধাও হয়েছে বিনায়কও।

সহসা উঠে বসল সুমিতা। পাখীর পালকের মত লঘু দেহ। বেড্‌স্টেড থেকে মেঝেতে নেমে দাঁড়ালো। তারপর নিঃশব্দ দু'টি পা সামনের দিকে এগিয়ে দিল। মাথাটা একবার টললো তার, দেওয়ালে টাল সামলালো। এলোমেলো পদক্ষেপে একেবারে পাশের ঘরের চৌকাঠে এসে থমকে গেল সুমিতা। চোখ দুটো বিশ্বাস-ঘাতকতা করছে না তো।

বিশাল একখানা সোফা। বিনায়কের নিবিড় দু'টি বাহুর ফাঁসে বন্দী হয়ে রয়েছে অস্তিকা। ঘরের মধ্য থেকে দু জোড়া চোখ চৌকাঠের ওপর আর এক-জোড়া চোখের মশালে ঝল্‌সে গেল যেন। বিনায়কের আলিঙ্গনটা এখনও স্তব্ধ হয়ে রয়েছে। পাশাপাশি দু'টি দেহ ভাষাতীত আতঙ্কে শিলীভূত হয়ে গিয়েছে। মাত্র কয়েকটি মুহূর্ত। তারপরেই দু'টি দেহে বিদ্যুৎ বইল। দু দিকে ছিটকে গেল দুজনে। বিনায়ক আর অস্তিকা।

এক সময় চোখের মশাল নিভলো। রমণীয় হাসিতে মুখখানা ভরে গেল সুমিতার। শান্ত গলায় সে বলল; "ও মুখ্যুরা, এ কী হচ্ছে। এমনটা করতে নেই। লোকে কী বলবে! এক কাজ করো; রেজিস্ট্রির সব ব্যবস্থা করো। আর দুজন সাক্ষী নিয়ে এসো। তৃতীয় সাক্ষী হিসেবে আমিই সই করবো। বড্ড দুষ্টু হয়েছো তোমরা।"

ইতিমধ্যে উঠে দাঁড়িয়েছে বিনায়ক। সুমিতার এই রমণীয় হাসির মুখোমুখি দাঁড়াবার কোন শক্তিই নেই তার। কোন ভরসাই নেই। সিঁড়ি বেয়ে একটা বিভ্রান্ত ঝড়ের মত সে পলাতক হ'লো। ফেরারী হ'লো। তার পেছন পেছন উধাও হ'লো অস্তিকা।

চৌকাঠের ওপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই রুদ্ধশ্বাস পলায়নকে উপভোগ করল সুমিতা। তার পর একটু একটু করে দু'টি দূরায়ত চোখকে ভাসিয়ে দিল কোথা থেকে ফিন্‌কি দিয়ে আসা একটা বন্যা।

শাখানদীর মত তিনটে পথ এসে মিলেছে এই মোহানাতে। একপাশে একটা ছোট পানবিড়ির দোকান। বিশাল একখানা আয়না রয়েছে মাঝখানে। সেই আয়নায় একটা ভয়াল মুখের ছায়াপাত হ'লো। বসন্ত খোদিত মুখ। রাশি রাশি ক্ষতচিহ্নে অন্ধ একটি চোখে বীভৎস হয়ে উঠেছে। চমকে উঠল মানুষটা। আয়নার ঐ করাল মুখখানায় শিউরে উঠল একটা অবিশ্বাসী অতীত। সে দিনের বিনায়ক প্রেত হয়ে যেন উঠে এসেছে। এসে দাঁড়িয়েছে এই আয়নাটার মুখোমুখি।

বিনায়কের মনে পড়লো; স্টুডিও সেট্, হাজার পাওয়ারের ফ্লাশ্ আলোর দেওয়াল দিয়ে ঘেরা একটা কুহকিত পৃথিবী যেন কোথায় ছিল। মনে পড়লো, অস্তিকা নামে কোন ছায়া-নারী সুমিতা নামে একটি শান্ত নীড় থেকে তাকে ময়াল সাপের মত আকর্ষণ করে নিয়ে গিয়েছিল। তারপর চারটে বছর উগ্র নেশার মত মিলিয়ে গেল। তারও পর মসৃণ দেহের ওপর একদিন ফুটে ফুটে বেরিয়ে এলো রাশি রাশি ক্রুর চিহ্ন। বসন্ত। সঙ্গে সঙ্গে একটা রঙীন বাষ্পের মত মিলিয়ে গেল সেই ছায়া-সঙ্গিনী। অস্তিকা।

সারা মুখে মারীচিহ্ন। নগদ একটা চোখ খেসারৎ দিয়ে প্রাণটা বাঁচলো। সেই

মুখের সামনে সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল পৃথিবীর সিংহদ্বার। চিরকালের জন্য। আর সেই মুখখানাই এখন ছায়া ফেলেছে সামনের আয়নায়।

একটা ভীরু ভাবনা কেঁপে কেঁপে গেল মনের অতলে। সেদিন সুমিতার রোগশয্যা থেকে অম্বিকার পৃথিবীতে চলে গিয়েছিল বিনায়ক। আর একদিন তার যখন বসন্ত হয়েছিল, সেদিন তার শিয়র থেকে পলাতক হয়েছিল অম্বিকা। আশ্চর্য! আজ পাঁচ বছর পর সেই সুমিতার সন্ধানেই বেরিয়েছে বিনায়ক।

বিনায়ক বলল; "এটাই তো প্রিয়-গোপাল সেন লেন!"

দোকানদার বলল; "হ্যাঁ বাবু। কোথায় যাবেন?"

"আচ্ছা, সতের নম্বর বাড়ি কোন্‌টা বলতে পারো।"

"এটা দশ নম্বর, ভেতর দিকে এগিয়ে যান। সামনেই পড়বে।"

একটা বাঁক পেরিয়েই বাড়িটা পাওয়া গেল। নীল রঙের নাম্বার প্লেটটা দুপুরের খররোদে জ্বলছে। ওপরে টালির চাল, চারপাশে ইঁটের দেওয়াল।

একটু ইতস্তত করলো বিনায়ক, বুকের মধ্যটা ছম্‌ ছম্‌ করলো। চারদিকে চনমন তাকিয়ে দরজায় ভীরু ভীরু টোকা দিল বিনায়ক।

কপাট খুলে বেরিয়ে এলো একটি কিশোরী মেয়ে। বীভৎস মুখখানার দিকে তাকিয়ে একবার চমকে উঠলো; "কাকে চাই আপনার?"

একটি চোখের ওপর পৃথিবীর সমস্ত স্নেহ, সমস্ত পিপাসা যেন ঘনীভূত হ'লো বিনায়কের। তাকিয়েই রইলো সে। সেই মুনমুন অনেক বড় হয়েছে। মুখখানা ঠিক সুমিতার মতই। সেই শাঁখসাদা রঙ্‌। রাশি রাশি কোঁকড়া চুল। সেই ভ্রমরওড়া দুরায়ত চোখ। কথারা হারিয়ে গেল বিনায়কের সীমানা থেকে।

"কে রে মুনমুন?" আরও দু'টি কিশোর মুখ উঁকি দিল। চন্দন আর বাবলু। কত বড় হয়েছে ওরা। কত সুন্দর হয়েছে। কত মধুর হয়েছে।

একটা দীর্ঘশ্বাস হৃৎপিণ্ডটা বিদীর্ণ করে বেরিয়ে এলো বিনায়কের। ...

গলায় সে বলল; "তোমাদের মা কোথায়?"

"মা একটু সেক্রেটারীর বাড়ি গিয়েছেন। স্কুলের কী একটা মিটিং আছে। আপনি কী মার সঙ্গে দেখা করবেন?" বাবলু বলল।

"হ্যাঁ বাবা।" অত্যন্ত করুণ শোনালো বিনায়কের কণ্ঠ।

"আসুন। ভেতরে এসে বসুন।"

তারপর পাঁচ বছরের ওপর থেকে যবনিকা উঠল। নানা কথার ফাঁদে সুমিতাদের সমস্ত কাহিনী ধরে ফেলল বিনায়ক। এর মধ্যে প্রাইভেটে এম্‌ এ পাশ করেছে সুমিতা। এখন সে হেমাঙ্গিনী গার্লস্‌ হাই স্কুলের হেড্‌ মিস্ট্রেস্‌। বাবলু এ বছর স্কুল ফাইন্যাল দেবে। মুনমুন ক্লাস এইটে পড়ছে আর চন্দন ক্লাস সিক্সে। সুমিতা দু'টো টুইশানি করে। উদয়াস্ত তার পরিশ্রম।

কথাগুলো শুনতে শুনতে, বাবলু-দের দেখতে দেখতে অবশিষ্ট একটি চোখ আচ্ছন্ন হয়ে এলো বিনায়কের। বুকের মধ্যটা বার বার উথল-পাথল হচ্ছে।

এক সময় রূপোঝরা দুপুর সরে গেল। সোনাগলা বিকেল ছড়ালো আকাশে। ছোট্ট এই গলির জীবন ধুক্‌ ধুক্‌ করে উঠলো। দু' একটা পেরাম্বুলেটর চলে গেল সামনের পার্কে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মিছিল চলে গেল। নানা রঙের ফ্রক শার্ট। রাশি রাশি মরসুমী ফুলের মত।

একটু পরেই ঘরের মধ্যে এলো সুমিতা। ছোট ছাতাখানা হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে রাখতে রাখতে তার দৃষ্টিটা চমকে উঠলো।

একটা চোখ অপলকে তার দিকেই তাকিয়ে রয়েছে। অনেক মন্থর হয়েছে সুমিতা, অনেক গম্ভীর হয়েছে। এরই মধ্যে কপালের ওপর কয়েকটা প্রবীণ রেখা ফুটে বেরিয়েছে। সুমিতার চোখের কোলে কোলে নির্বিরাত পরিশ্রমের ছায়া। তিনটি চোখের ওপর দিয়ে কত পল-প্রহর পার হয়ে গেল। পার হলো পেছনের পাঁচটা বছরের সমস্ত ঘূর্ণিঝড়।

চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে বিনায়ক। ...

"তুমি কি আমাকে চিনতে পারছো না সুমিতা? আমি বিনায়ক।"

এতক্ষণে গলার সমস্ত অবরোধ সরিয়ে আর্ত শব্দ বেরিয়ে এলো সুমিতার; "এ কী, তোমার এ কী হয়েছে? এমন হলো কী করে?"

বিচিত্র হাসিতে মুখখানা ভরে গেল বিনায়কের; "ভালোই হয়েছে। বসন্ত হয়েছিল। সব পাপেরই তো প্রায়শ্চিত্ত আছে। এ তারই প্রমাণ। না হ'লে

বোঝাবো কেমন করে যে, প্রায়শ্চিত্ত করেছিলাম।"

সামনেই দাঁড়িয়ে আছে বাবলু, মুনমুন আর চন্দন। নির্বাক। বিস্মিত। সুমিতা বলল; "তোমার বাবা। প্রণাম করো।"

প্রণাম পর্ব শেষ হলো। সুমিতা বললো; "এবার তোমরা ও ঘরে যাও তো। আমরা কথা বলবো।" পাশের ঘরে অদৃশ্য হলো বাবলুরা।

এবার উচ্ছ্বসিত কান্নায় চুরমার হয়ে গেল বিনায়ক; "আমি এসেছি সুমিতা। বাবলুদের কাছে তোমাদের সব কথা শুনেছি। এই পাঁচ বছরে স্বামী কী বাপের কোন দায়িত্বই আমি পালন করতে পারিনি। জানি, এর কোন ক্ষমা নেই। তোমার কাছে ক্ষমা চাইবার সাহসও নেই আমার। তবু এখন তুমি ছাড়া আমার আর কোন আশ্রয়ই নেই। এই অসুখটা পৃথিবীর সব দরজা আমার কাছে বন্ধ করে দিয়েছে। তুমি কী দয়া করবে না সুমিতা?"

অত্যন্ত আর্দ্র শোনালো সুমিতার কণ্ঠ; "ও কথা বলছো কেন? তোমার সংসারে তুমি আসবে। এ তো তোমার অধিকার। অসুখ হলো, আমাকে একটা খবর দিতে পার নি এতদিন!"

কৃতার্থ দৃষ্টিতে তাকিয়েই রইল বিনায়ক; "এত দিন কত চেষ্টা করেছি, তবু তোমাকে একটা খবর দিতে সাহস হয় নি। আজ আর কোন উপায়ই নেই। তাই তোমার কাছেই ছুটে এসেছি।" একটু থামলো বিনায়ক; "আচ্ছা সুমিতা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি। জানি কোন অধিকারই আমার নেই। তবু বলছি, ডক্টর সেন তোমার সেই অসুখটার কথা বলেছিলেন। সেই যে সাসপেক্টেড টি বি—" সহসা থেমে গেল বিনায়ক।

আজকাল হাসলেও অত্যন্ত মনোরম দেখায় সুমিতাকে। শিথিল মুখের প্রবীণ রেখায় রেখায় মধুর স্নিগ্ধতা ছড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ে। সুমিতা হাসলো। তারপর বললো; "ভুল ডায়াগনোসিস্ হয়েছিল। আজ ওসব কথা থাক্। অন্য দিন শুনো।"

ঘরের মধ্যে ধূপছায়া সন্ধ্যা নেমে এসেছে। সেই ধূপছায়া পাঁচ বছর আগের কোন উচ্ছৃংখল ঝড় একটি ম্লান মিনতির মত এসে ধরা দিয়েছে। ধরা দিয়েছে একটি করুণ পরাজয়ের আত্ম-সমর্পণে।

একসময় বিনায়ক বললো। আকুল হয়ে উঠল তার কণ্ঠ; "আমাকে আজ তাড়িয়ে দিও না সুমিতা। এ সংসার ছাড়া আমার আর কোন আশ্রয়ই নেই।"

রোদন আর পুলক মেশানো অপূর্ব অনুভূতি। অসহ্য থর থর গলায় সুমিতা বলল; "এ অবস্থায় তোমাকে কোথায় তাড়িয়ে দিতে পারি। বার বার ঐ কথা বলে আমাকে ব্যথা দিচ্ছ কেন? তোমার সংসার, তোমার ছেলেমেয়ে। আমি জানতাম তুমি একদিন আসবে। সেই আশাতেই তো ছিলাম। মানুষেরই ভুল হয়, আবার নেশার মত সে ভুল মুছে যায়।"

প্রাক্ সন্ধ্যা আরো গাঢ় হয়েছে। আরো নিবিড় হয়েছে। সুমিতার মুখখানা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে না বিনায়ক। অনেক, অনেক বছর আগের একটা মেদুর বিকেল স্মরণের মধ্যে দোল খেয়ে উঠল তার। আকাশে সেদিন ছিল কুর্চি ফুলের মত খন্ড খন্ড মেঘ। সেদিন মনোরম চৌধুরী সুমিতাকে প্রত্যাখ্যান করে-ছিলেন। একটা এক্সট্রা গার্লের মর্যাদাও দেন নি। আজ এই ঘন কুয়াশার মত অস্পষ্ট অন্ধকারে সেই সুমিতার চার পাশে যেন স্নিগ্ধ জ্যোতির্লেখা ছড়িয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। বিপুল মহিমার মত এই ছোট্ট ঘরের আয়তন ছাড়িয়ে তার মাথা সুদূর আকাশে গিয়ে ঠেকেছে। অপরূপ আর ক্ষমাসুন্দর দেখাচ্ছে তাকে। বিনায়কের গৌরবের নাটকে কত অস্তিকারা এসেছে নায়িকা হয়ে। কত মালশ্রীরা এসেছে। এসেছে কত ছায়া কন্যা। কিন্তু তার পরাজয়ের, তার হতাশ্বাসের নাটকে সুমিতা ছাড়া আর কোন নারী নেই। আর কোন নায়িকা নেই। সুমিতার দিকে তাকিয়েই রইল বিনায়ক। তাকিয়েই রইল।

পাঁচ বছরের অগ্নিসমুদ্র পাড়ি দিয়ে এই মাত্র একটা মিঠে জলের হ্রদের কাছে এসে বসেছে বিনায়ক। কি মধুর তার আশ্বাস! কি নিশ্চিন্ত তার আশ্রয়! কি স্নিগ্ধ তার আমন্ত্রণ।

অম্বা-মা !

শ্রীসুধীররঞ্জন সেন

মা, মা, মা—অম্বা, অম্বা, অম্বা অম্বরভেদী অম্বুদ নাদে কাহার পুণ্য বিঘোষণ? সুপ্ত বুকের বন্ধ দুয়ারে কাহার মঙ্গল আবাহন, পাগল-করা মহা-মন্ত্রে মর্ম-প্লাবী বিচ্ছুরণ—মর্মে মর্মে মাতৃ-নামের এ কী বিপুল শিহরণ, মা, মা মা!

দুর্গা, দুর্গা, দুর্গা......আমার সুপ্তি-নীরব দহরাকাশে কে জাগিল ঐ দুঃখ-হরা, তাঁর শিরশিখরের বন্ধ জটায় জ্বলিয়া উঠিল কোটি তড়িতের দীপ্তিচ্ছটা, তাঁর পদনখরের দিব্য বিভায় ফুটিয়া উঠিল অনন্ত অহং-বিশ্বজান, তাঁর পীনপয়োধরে ক্ষরিত সুধায় বাঁচিয়া উঠিল মৃত্যু-আকুল মানবকুল, স্তিমিত হইল মর্ত হৃদয়ের আবেগ-ভরা আর্তনাদ। ওরে, কিসের জন সহসা থামিল কাতর করুণ রোদন রোল? চকিত চমকে আসে বুঝি ঐ দীপ্তা-দামিনী মা আমার, তাই ব্রহ্মচর্চার আনন্দ-জ্যোতিঃ দিগন্তে হয় বিচ্ছুরিত, মৃত্যু-ভীত মানবকুমার চমকে চমকে সঞ্জীবিত। এ যে চণ্ডীর আমার চমকদীপ্তি। চমকে তাঁহার বিশ্বজাল দিগন্তে হয় বিঘূর্ণিত: চমকে হয় সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কুহরে প্রবিষ্ট: চমকে বহে গন্ধবহ, চমকে বায়ু নিত্য স্থির, চমকে ঐ ব্যোম-বলো বিদ্যুদ্বহ্নির বিস্ফোরণ, চমকে চমকে সাগর-বুকে ঊর্মিমালার নৃত্যোচ্ছ্বাস, চমকে জ্বলে চন্দ্র-সূর্য, চমকে হয় নির্বাপিত. চমকে ঐ ডমকে ডমকে মহাকালের ডমরু-রব ডঙ্কারে তাঁর নিখিল বিশ্ব নিমেষে হয় নিঃশেষিত, আবার তাঁহারই চমকে তেজোবিভঙ্গে-রব-মুখর এই ব্রহ্মাণ্ড। এ যে চণ্ডী আমার, মা আমার—আমার জনম-মরণ-সফল-করা চণ্ড তাঁহার রুদ্র রূপ। চম্ ও ডম,—দীপ্তি ও নাদ নাম ও রূপ, আত্মা ও অনাত্মা—এই দু'খান চরণ প্রকাশ করিয়া ব্রহ্মময়ী মা আমার ব্রহ্মাণ্ড-রূপে রূপময়ী। শোন সাধক সনাতনীর ঐ শ্রুতি-নির্ঘোষ—"দ্বে বাব ব্রহ্মণোরূপে মূর্তঞ্চামূর্তঞ্চ, মর্ত্যঞ্চামৃতঞ্চ, যচ্চ ত্যচ্চ ......দ্বৈতাদ্বৈত মা আমার অরূপ স্বরূপার মূর্তামূর্ত, মর্ত্যামৃত দুইটি রূপ এই দুই রূপ নিয়েই নামরূপময়ী সার্থক তাঁহার অপার অসীম, অদ্বৈত-মহিমা। ওরে, মা আমার আসে রে, সে মহা-ক্ষণে সাধক দেখে, যে আসে সে মর্ত্যের বেশে অমর্ত্য, মৃত্যুর বেশে অমৃত। "সা বা এষা দেবতা দূর্নাম, দূরং হ্যস্যাঃ মৃত্যুঃ (বৃহদারণ্যক উপনিষৎ)—মৃত্যু এই দেবতা হইতে দূরে থাকে, তাই নামটি তাঁর দুঃ—সে দুঃ দেবতা মৃত্যু করিতে মথিত অমৃত করিতে ক্ষরিত মূর্তি ধরিয়া দ্যুতিময়ী মর্ত্যকে করিতে মৃত্যু-হীন দুর্গা এল তোর মৃত্যু-পুরে। ওরে দুঃখ-দীর্ণ, দুরিত-দলিত-মৃত্যু-মূঢ় জীব, তোর জীবত্ব-বোধের পসরা লইয়া অর্পণ কর ঐ পদ-মূলে, যাঁর রক্ত-চরণে দলিত হল মরণ-দলন মহাকাল, শশিসূর্যের রশ্মিবিভায় চরণ-তল যাঁর ঊর্মি-উচ্ছল, ওরে ঐ চরণে আহুতি দে তোর হৃদয়-হ্রদের নীল-কমল' জয় মা!!

দুর্গা আমার আসে রে! দুর্গা আমার দেবী আমার, দীপ্তা, দৃপ্তা কন্যা আমার হৃদয়-দহরে লহর তুলিয়া আনন্দ-ভঙ্গে আসে রে! সত্যই তাঁর গতি আছে, দ্যুতি আছে। দিগ্‌দিগন্তে ঐ ত তাঁরই অঙ্গের জ্যোতির ছটায় ঝলসিত দশ দিগঙ্গন। "তদেজতি তন্নৈজতি" (ঈশোপনিষৎ) এ যে আমার কম্পনময়ী কাম্পিল্যবাসিনী দুর্গা, ক্ষেমময়ী ক্ষেমংকরী মা! ঈক্ষণময়ী অম্বিকার চল চঞ্চল স্পন্দনছন্দে বিশ্বভুবন রচিত—রচে মর্ম, রচে প্রাণ, রচে সুখ-দুঃখ, জীবন-মরণ, মমতা প্রীতির কত মধুর কম্বেদন। ওরে, কোথায় খোঁজ মাকে আমার কোন্ আকাশের পরপারে, অন্তর্যামিনী মা যে তোমার ঐ অন্তর-লোকেই বিরাজিত—তোমার ঐ দেহপুরে, দহর-দুর্গে, হৃৎ-পুণ্ডরীকেই যে নিত্য দুর্গার সুখবাস। শ্রুতি বলেন,—

> "দহ্রং বিপাপং পরবেশ্মভূতং
> যৎপুণ্ডরীকং পুরমধ্য সংস্থম্।
> তত্রাপি দহ্রং গগনং বিশোকং
> তস্মিন্ যদন্তস্তদুপাসিতব্যম্॥"

—দেহপুরের মধ্যে একটি অতি ক্ষুদ্র

—দেহপুরের মধ্যে একটি অতি ক্ষুদ্র পুণ্ডরীক বিরাজিত। সেই পুণ্ডরীকে যে পরম দেবতা শোকহীন, পাপহীন. গগন-সদৃশ অধিষ্ঠিত আছেন, তাঁহাকে উপাসনা করিতে হইবে। সাধক, তোমার ঐ ভাবের ঘরে, ভবের ঘরে. হৃদয়ের অনাহত অঙ্গনে আজ আবাহন কর আনন্দময়ী মাকে—তোমার হৃদয়ে ঐ যে সুখের বেদন, দুঃখের উদ্বেলন, রোগশোক, হাসিকান্না, কামনা-বাসনা, অভাব উৎপীড়ন—উহারাই যে মায়ের আমার অগ্রদূত, মাতৃ-স্নেহের মূর্ত প্রকাশ, মাত্র ব্যথার ছদ্মবেশে যেন অলক্ষ্যে থাকিয়া মা-ই তোমায় আলিঙ্গন করিতে-ছেন। তুমিও তোমার জীবন-মরণ-প্রলয়ের মাঝে দেখ মায়ের নিত্য মঙ্গল, মোহন রূপ, তোমার ব্যগ্র দু'টি বাহু বাড়াইয়া দেও মায়ের সোহাগে, আদরে, চুম্বনে চুম্বনে ধন্য হইতে! জয় মা!

ওরে জাড্যের আঁধার দূর করিয়া, মৃত্যু-তমসা ভেদ করিয়া, নবজীবনের দীপ্ত আলোকে অন্তর বাহির উদ্ভাসিয়া কে আসে ঐ অন্তর-পুরে অমৃতজ্যোতি মা আমার! আমার মোহ মর্দিতে, ভীতি-দলিতে, ভ্রান্তি নাশিতে কে আসে ঐ? আমার রক্ত-পঙ্কিল মর্ম-ব্যথায় স্নেহের পরশ বুলাইতে, আমার অশ্রুমলিন অন্ধ চক্ষে জ্ঞানের কজ্জল পরাইতে, আমার ভক্তিবিহীন, ঊষর বক্ষে ভক্তি-অমিয়া বহাইতে, আমার তপ্ত তৃষিত, শুষ্ক কণ্ঠে স্তন্যসুধা ঢালিয়া দিতে কে আসে, ঐ কে আসে? মা, মা, মা—পুত্রস্নেহে বেপমানা তোর ঐ বক্ষোবাস স্খলিত হইতেছে, পীন পয়োধরে ক্ষীরধারা ঝরিয়া পড়িতেছে, আকুল আবেগে প্রেম-ব্যাকুল বাহু দুটি থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে—নে, কোলে নে, সন্তপ্ত সন্তানকে বুকে টানিয়া নে, দুর্গার বুকে অনুদুর্গা আমি দুর্গানন্দে মাতিয়া রহি, চুম্বন-রতা অম্বার বুকে আত্মহারা সন্তান, গুরুর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া অম্বুদনাদে গাহিয়া উঠি—

> "অহং হি দুর্গা মমতা চ দুর্গা
> মত্তঃ পরং যত্তদিহাস্তি দুর্গা।
> জ্ঞানামৃতস্তন্য সুদাত্রী দুর্গা
> দুর্গা স্বরূপাদপরং ন কিঞ্চিৎ॥"

—(ঠাকুর শ্রীশ্রীসত্যদেব)

শরৎ-রচনা পরেশ

আদর্শবাদী গুরুচরণ! দীর্ঘদিন সহধর্মিণী তাঁর গতায়ু হয়েছেন, রেখে গেছেন একমাত্র পুত্র বিমলকে। কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য, মোটেই সে মানুষ নয়। নিজের ছেলে বিমল মানুষ হয়নি দেখেও গুরুচরণ বিচলিত নন। বরং দ্বিগুণ উৎসাহে ভ্রাতুষ্পুত্র পরেশকে পাঁচজনের একজন করে তুলতে ব্যস্ত হয়ে আছেন। আহা, মা-হারা বালক, বাপের স্নেহ আর পেল কোথায়? সে আত্মকেন্দ্রিক লোকটি তো অর্থ সঞ্চয় করতে দীর্ঘদিন গাঁ ছাড়া। শুধু তাই নয়, আর একটি দার-পরিগ্রহও করেছে।

তাই পুত্রের অধিক স্নেহে পরেশকে শিক্ষায় দীক্ষায় আদর্শে অগ্রগণ্য করে তুলছেন গুরুচরণ। গুরুচরণ মজুমদারের কথা শ্রীকুঞ্জপুরের কোথাও উঠলেই শ্রদ্ধায় ভক্তিতে সকলের মাথা আপনি নুয়ে পড়ে। হ্যাঁ, মানুষ বলতে হয় এমনধারা লোককেই। টাকায় বড়ো—এমন মানুষ গাঁয়ে দু'চারজন তো আছে নিশ্চয়ই, নেই শুধু মানুষ-পদ-বাচ্য গুরুচরণের সমকক্ষ কোনো কেউ। জেলা ইস্কুলের মাস্টারের চরিত্রের দৃঢ়তা, অবিচলিত সাধুতার বিষয় লোকের মুখে মুখে ফেরে।

কাজেই এ হেন জ্যেঠতাতের সতর্ক দৃষ্টির সোনার কাঠির ছোঁয়ায় পরেশ একে একে বিশ্ববিদ্যালয়ের [illegible] করে নেবে এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। স্নাতকোত্তর পরীক্ষার জন্যে পরেশের কলকাতায় যাবার সময় সমুপস্থিত, হেডমাস্টার হৃষিকেশবাবু গুরুচরণকে স্মরণ করিয়ে দেন তাঁর প্রতিশ্রুতির কথা। হৃষিকেশ-তনয়া গৌরীর সংগে পরেশের পরিণয় সংঘটিত হওয়ার বাসনা উভয়েরই বহুদিনের। এতদিন তাঁরা অপেক্ষা করছেন এই দিনটির জন্যে। পরেশ কিন্তু আর কিছুদিনের সময় চেয়ে নেয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার আগে সংসারের বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে সে অনিচ্ছুক।

মহাকালের রথ এগিয়ে চলে। ইতি-মধ্যে পরেশ-জনক হরিচরণ শহরের মায়া কাটিয়ে ফিরে এসেছে স্বগৃহে। সেখানে নিজের আধিপত্য বিস্তার করতে বিশেষ তৎপর। হৃষিকেশ-তনয়া গৌরীর সাথে পরেশের বিবাহ বন্ধের জন্য পরেশের হস্তাক্ষর জাল করলো। তারপর? বৃদ্ধ হৃষিকেশ মর্মাহত হলেন, সেই সংগে ততোধিক আঘাত পেলেন গুরুচরণ। তাঁর হাতে-গড়া পরেশের এহেন আচরণ? পুত্র বিমল হীন চরিত্র, তার সংগে তাঁর সম্পর্ক পর্যন্ত নেই। কিন্তু পরেশ! আর প্রতীক্ষারতা গৌরী? সে যে কল্পনায় আকাশে কতো আকাশ-প্রদীপ জেলেছে [illegible]।

কুচক্রী হরিচরণের কিন্তু লালসার নিবৃত্তি হয় না, এরপর সে বিষয় আশয় ভদ্রাসন প্রভৃতি ভাগ করে নেয় এবং তারি জন্যে মধ্যম ভ্রাতৃজায়াকে শারীরিক পীড়ন পর্যন্ত করতে দ্বিধা করে না। গুরুচরণ রাজদ্বারে সমুপস্থিত—গৃহলক্ষ্মীর অবমাননার প্রতিবিধানের জন্যে। দুষ্কৃতকারীর জন্যে ক্ষমা নেই—আদর্শ-অন্তপ্রাণ গুরুচরণের কাছে।

এই সংকট-মুহূর্তে পরেশ কোথায়? সে যদি একবার হাজির হোতো জ্যেঠ-তাতের কাছে, তাহলে কি এই বিরোধের অবসান হয় না?

কিন্তু তার উপায় নেই। আদর্শ-বাদীরা কখনোই ভ্রষ্ট-আদর্শের কাউকে সহ্য করে না কোনোদিন। গুরুচরণের কাছে পরেশ আজ অস্পৃশ্য, অপাংক্তেয়।

হরিচরণের চক্রান্তে শ্রীকুঞ্জপুরের প্রাতঃস্মরণীয় মানুষ গুরুচরণ জগতের ওপর নিদারুণ ঘৃণায় ধিক্কারে নৈতিক আত্মহত্যার সংকল্প করলেন। সকলের নমস্য লোকটি ক্রমে সবার সম্পূর্ণ বিপরীত মনোভাবের কারণ হয়ে উঠলেন।

রাত্রির অবসান আছেই; দিনের পদধ্বনি তারায় তারায় ধ্বনিত হয়ে ওঠে; সেই আশায় এবং বিশ্বাসে আমরা স্থির নিশ্চিত শ্রদ্ধেয় আদর্শ-বাদী গুরুচরণ আবার সকলের শ্রদ্ধা সম্ভ্রম সমাদর লাভ করবেন। সংসার তাঁর আবার সুখের হয়ে উঠবে।।

নয়াদিল্লী

সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে তিনটি চিত্র-প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রথমটি মঁসিয়ে মিশোটুস্কিনের ব্যক্তিগত প্রদর্শনী—ইহা কনস্টিটিউশান্ ক্লাবে অনুষ্ঠিত হয় ও ভারতস্থিত ফরাসী দূত ইহার উদ্বোধন করেন। দ্বিতীয়টি প্রথিতযশা ইউরোপীয় শিল্পীদের বিভিন্ন চিত্রের প্রতিলিপি প্রদর্শনী। ইউনেস্কো গঠিত এই ভ্রাম্যমাণ প্রদর্শনী দিল্লী শিল্পীচক্রের উদ্যোগে মডার্ন স্কুলে অনুষ্ঠিত হয় ও হুমায়ুন কবীর বিশিষ্ট জনসাধারণের উপস্থিতিতে ইহার উদ্বোধন করেন। এবং তৃতীয়টি শ্রীলক্ষ্মণ পাইয়ের ব্যক্তিগত প্রদর্শনী, ইহা সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা কংগ্রেসের এসিয়া বিভাগস্থ দপ্তরে অনুষ্ঠিত হয় ও শ্রীউষানাথ সেন ইহার উদ্বোধন করেন।

মঁসিয়ে মিশোটুস্কিন ফরাসী যুবক। পৃথিবী পরিভ্রমণে বাহির হইয়া তিনি পাশ্চাত্ত্য বহু দেশ অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষে আসিয়াছেন ও কয়েকমাস যাবৎ দিল্লীতে বাস করিতেছেন। একাদি-ক্রমে এখানে কয়েকমাস থাকিলেও অন্যান্য দেশে তিনি অধিক দিন থাকিতে পারেন নাই। তথাপি তিনি যেখানেই গিয়াছেন সেখান হইতে উল্লেখযোগ্য স্থান ও দৃশ্যাদির স্কেচ করিয়া লইয়াছেন। ভারতবর্ষে থাকিয়া দিল্লী, কাশ্মীর, মথুরা ইত্যাদি স্থান হইতে তিনি বহু দৃশ্য সংগ্রহ করিয়াছেন এবং নানা দেশ হইতে সংগৃহীত বিভিন্ন স্কেচই তিনি তাঁহার প্রদর্শনীতে পেশ করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় মিশোটুস্কিনের কোনো রচনাকেই ঠিক চিত্রকলার পর্যায়ে ফেলা যায় না। প্রকৃতপক্ষে ভ্রাম্যমাণের দিন-পঞ্জিকায় এগুলিকে স্মৃতির রেখাচিত্র বলিলেই সমীচীন হইবে। কাল-নানা রচনার নিদর্শনই তিনি প্রদর্শন করিয়াছেন কিন্তু চিত্ররচনা হিসাবে দুই চারিখানি ব্যতীত কোনোটিই রসোত্তীর্ণ হইতে পারে নাই। সমগ্র প্রদর্শনীর মধ্যে "পাঞ্জাবী মহিলা" ও "শিকাবা"র নাম করা যাইতে পারে।

* * *

খ্যাতনামা শিল্পীদের মৌলিক রচনা দেখিবার সৌভাগ্য অনেকেরই হয় না, বিশেষ করিয়া প্রাচ্যদেশে, কারণ তাহাদের অধিকাংশই বিভিন্ন আর্ট গ্যালারীতে সযত্নে রক্ষিত থাকে। সুতরাং যাঁহাদের ভারতের বাহিরে যাইবার সুযোগ ঘটে না সেই সকল চিত্ররসিকগণকে এহেন রচনাদির প্রতিলিপি দেখিয়াই রসপিপাসা নিবৃত্ত করিতে হয়। অতএব ইউনেস্কো পরিচালিত এই প্রতিলিপি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিয়া দিল্লী শিল্পীচক্র স্থানীয়

রসিকজনদের ধন্যবাদ অর্জন করিয়াছেন সন্দেহ নাই।

এই প্রদর্শনীর বিষয় বলিতে গেলে সর্বপ্রথমেই প্রতিলিপিগুলির অতি সূক্ষ্ম ও পরিপাটি মুদ্রণ প্রণালীর কথা মনে জাগে। দীর্ঘাকার, একবর্ণ ও বহুবর্ণ সমুজ্জ্বল প্রতিলিপিগুলি দেখিলে সত্যই অনেক স্থলে এগুলিকে মৌলিক বলিয়া ভ্রম হয়। অর্থাৎ কেবলমাত্র প্রতিলিপির মধ্য দিয়াও ইউরোপের বিভিন্ন কৃতী শিল্পীর মানসিক গতি, বর্ণনাভঙ্গী ও বিশিষ্ট অঙ্কন-রীতির সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। যে দেশ আজ আ[illegible] আধুনিক ও আকারসর্বস্ব চিত্রশিল্পে[illegible] কেন্দ্রস্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছে সেই দেশে[illegible] শিল্পী তথা জনসাধারণ পুরাতন [illegible] প্রথাগত পদ্ধতিতে অঙ্কিত চিত্রসম্ভা[illegible] সযত্নে রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন—আধুনি[illegible] যুগের নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্যে[illegible] এহেন সৃষ্টির মূল্য তাঁহাদের নিক[illegible] এতটুকু হ্রাস হয় নাই। অথচ আমাদে[illegible] নিজ দেশের প্রথাগত ও পুরাতন অপূ[illegible] চিত্রসমারোহের প্রতি এক শ্রেণীর শিল্পী আজ আস্থা হারাইতে বসিয়াছেন।

ইউরোপের যে সকল শিল্পী ১৮৬০ সাল পর্যন্ত চিত্রাঙ্কণ করিয়া সমধিক খ্যাতিলাভ করিয়াছেন প্রদর্শনীতে তাঁহাদেরই রচনার প্রতিলিপি পেশ করা হইয়াছে এবং সেইদিক দিয়া দেখিতে গেলে অনেকের রচনা এই প্রদর্শনীতে স্থান পাওয়া উচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় শিল্পী নির্বাচন কার্যে ইউনেস্কো ঠিক সুবিচার করিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। অবশ্য সব রচনাদির সন্তোষজনক প্রতিলিপি সংগ্রহ করা যে অতীব দুরূহ তাহা ঠিক, তথাপি চিত্রকলার লীলাক্ষেত্র ইতালীর আরো কয়েকজন বিশ্ববিখ্যাত শিল্পীর রচনা প্রতিলিপির সন্ধান পাইলে চিত্রামোদিগণ সুখী হইবেন। ইতালী হইতে র‍্যাফেলের (১৪৮৩—১৫২০) "ম্যাডোনার" চিত্রখানিই উল্লেখযোগ্য। অপরাপর যে সকল শিল্পীর চিত্রপ্রতিলিপি প্রদর্শনীতে পেশ করা হয় তন্মধ্যে ইঁহাদের নাম করা যাইতে পারে: এঞ্জেলো ব্রোঞ্জিনো (১৫০৩—১৫৭২), পিটার ব্রুঘেল (১৫২৫—১৫৬৯), জাঁ ব্যাপ্তিস্ত সিমেঁ চার্দি (১৬৯৯—১৭৭৯), জন কনস্টেবল্ (১৭৭৬—১৮৩৭), আলব্রেট ডুরার (১৪৭১—১৫২৮), জাঁ অনরে ফ্রাগোনার্দ (১৭৩২—১৮০৬), হ্যান্স হলবিন্ (১৪৯৭—১৫৪৩), হারমেনজ রেমব্রাণ্ড্ট্ (১৬০৬—১৬৬৯), স্যার যশুয়া রেনল্ডস্ (১৭২৩—১৭৯২), পিটার পল রুবেন্স (১৫৭৭—১৬৪০), উইলিয়ম টার্নার (১৭৭৫—১৮৫১), রোডরিগস্ ভেলাস্কুইজ (১৫৯৯—১৬৬০) ও জান ভার্মিয়ার (১৬৩২—১৬৭৫)।

শ্রীলক্ষ্মণ পাই পরিচিত শিল্পী—১৯৫৩ সালের শেষভাগে দিল্লীতে ব্যক্তিগত প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করিয়া তিনি সুনাম অর্জন করেন। বর্তমান প্রদর্শনীতে তিনি মাত্র ২৫খানি রচনা পেশ করেন। প্রথম প্রদর্শনীতে এই শিল্পীর বিশিষ্ট মননশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। বিশেষ করিয়া রেখাসৌষ্ঠব ও জ্যামিতিক আকার প্রাধান্যের মধ্য দিয়া তিনি যে বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা অনেকেরই স্মরণ থাকিতে পারে। তবে বর্তমান প্রদর্শনীতে সব চিত্রের মধ্যেই সেই পরিচয় পাওয়া যায় না। শিল্পী সম্প্রতি পুনরায় ফ্রান্স পরিভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন, সুতরাং সেজন্যই হউক বা অন্য কোনো কারণেই হউক, কয়েকখানি চিত্রে অতিমাত্রায় ফরাসী প্রভাব লক্ষিত হয়। অতএব এহেন রচনার জন্য শিল্পী মৌলিকতা দাবী করিতে পারেন না। তথাপি সূক্ষ্ম বর্ণব্যঞ্জনা ও একটি সামগ্রিক আবেদনের জন্য ইহাদের মধ্যে কয়েকখানি শিল্পীর প্রতিভার পরিচয় দেয়। উদাহরণ হিসাবে "রাত্রির প্যারী" ও "নৌকার" নাম করা যাইতে পারে। তবে সুখের বিষয় ইম্প্রেশানিস্টিক রীতিতে রচনা করিলেও লক্ষ্মণ পাই নিজস্ব রেখা ও প্যাটার্ন-বহুল অঙ্কন পদ্ধতি একেবারে ত্যাগ করেন নাই। গীতগোবিন্দের বিভিন্ন শ্লোক অবলম্বন করিয়া তিনি যে কয়েকটি চিত্রের নমুনা পেশ করিয়াছেন তাহা একাধিক কারণে উল্লেখযোগ্য। বস্তুতপক্ষে এই শ্রেণীর প্রায় প্রত্যেক চিত্রের মধ্য দিয়াই তাঁহার মৌলিকতা ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় পাওয়া যায়। অন্যান্য রচনার মধ্যে বর্ণবহুল ও রেখা-প্রধান "গবাক্ষপথে" ও সমআকারের ক্ষুদ্র রেখা সমন্বয়ে রচিত "আমার মা" বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

—চিত্রপ্রিয়

ইসাবেলা অব স্পেন —রুবেনস

নাইগেরিয়ায় প্রগতিশীলতার চিহ্ন বর্তমান। 'আফ্রিকার চিত্র' পুস্তিকার লেখিকা স্বামীর সহিত রাষ্ট্রীয় কার্য উপলক্ষ্যে লাইবেরিয়ায় যান। সেখানে পশ্চিম আফ্রিকার সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়া লেখিকা কয়েকটি প্রবন্ধ রচনা করেন। সেইগুলি একত্র করিয়া এখন গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা হইল। গ্রন্থ-শেষে এক লাইবেরিয়ান লেখকের উপন্যাস হইতে অংশবিশেষ অনুবাদ করিয়া যুক্ত করা হইয়াছে। বইখানি পড়িলে বোঝা যায়, লেখিকার মন ও চোখ খোলা। কৃষ্ণকায় সমাজের একটি পরিচিতি তিনি সশ্রদ্ধভাবে বাঙালী পাঠকের সমক্ষে ধরিলেন, ইহার জন্য তিনি ধন্যবাদভাজন।

মাতা ও পুত্রী উভয়েই লাইবেরিয়ার যান। তাই সুনন্দা বন্দোপাধ্যায় এই সুযোগে কয়েকটি স্থানীয় উপকথা লইয়া গল্প লিখিয়াছেন। বইখানিতে তেরটি গল্প আছে। সেগুলি পড়িলে বোঝা যায়, লেখিকার নির্বাচন-শক্তি আছে। লোক-সাহিত্যের ভিতর দিয়া জাতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য ধরা যায়। সকলেই এই ছোট বইখানি পড়িলে খুশী হইবেন।

বই দুইখানির ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর। কয়েকখানি মনোরম ছবিতে ও অঙ্গসৌষ্ঠবে বইগুলি সত্যই চিত্তাকর্ষক হইয়াছে।

৩৫৭।৫৫

কিশোর সাহিত্য

আমরা বাঙালী—শিশু সাহিত্য সংসদ লিঃ। ৩২এ, আপার সার্কুলার রোড। কলিকাতা ৯। দাম—এক টাকা চার আনা।

মহাজীবন কাহিনী। সাধক, শিল্পী, কবি, সাহিত্যিক—বাঙলা দেশের বারোজন মনীষীর সংক্ষিপ্ত জীবন কথা। শিশু ও কিশোর পাঠকদের উপকারে আসবে।

২৭৬।৫৫

পৃথিবীর ইতিহাস প্রসঙ্গ : বিশ্বেশ্বর দাস। প্রকাশক : জিজ্ঞাসা। ১৩৩এ রাসবিহারী এভেন্যু। কলিকাতা : ২৯। দাম : সাড়ে তিন টাকা।

বিশাল এই পৃথিবী, বিপুলে তার ... আর নিরবধি এই কাল। কবে কোন ... দুর্নিরীক্ষ দিনে এই পৃথিবীতে ... স্পন্দন বেজে উঠেছিল তার কোন ... সাক্ষী নেই। মনীষীদের, চিন্তা- ...দের অনুমানের ওপর সেই অলক্ষ্য ... রোমাঞ্চকর কাহিনী এখনও ...।

পৃথিবীর জন্মের কত সহস্র বছর পর ... এলো। সমুদ্রের আর স্যাঁতসেঁতে ... পৃথিবীর প্রাচীন প্রাণের সুতিকাঘর, ...লো, তার কোন প্রমাণ নেই। শুধু ...র্জের সেই জীবনে ধীরে ধীরে মানুষেরও নানা বিবর্তনের মধ্যে অগ্রযাত্রা। মানুষ বানালো সমাজ, সভ্যতা, ধর্ম। উত্তর কালের বুনিয়াদ পূর্বসূরীরা তৈরী করে দিল। সেই মসৃণ ভিত্তির ওপর সভ্যতা আকাশচুম্বী হয়ে উঠছে।

ইতিহাসের দূরবীক্ষণ দিয়ে দূরতম কাল থেকে আজ পর্যন্ত পৃথিবীর জীবজগৎ, মানুষ, তার ধর্ম-সভ্যতা-রাজনীতির নানা ধারা, নানা পরিবর্তনকে লক্ষ্য করেছেন লেখক। এবং সংক্ষিপ্ত পটভূমিতে ধরে রেখেছেন। এই গ্রন্থখানি অনুসন্ধানী পাঠকের উপকারে আসবে।

২৬৬।৫৫

এক আকাশ তারা : স্বপন দাস। প্রকাশক : নন্দন প্রকাশনী। ১৮, কৈলাস বসু স্ট্রীট। কলিকাতা—৬। দাম : দু' টাকা আট আনা।

বাঙালী শিশু জীবনের কাহিনী। রচনাটিতে গভীরতার চেয়ে ছবি বেশী। সে ছবি বর্ণাঢ্য। পশু-পাখী, নদী বনের পরিবেশকে লেখক রূপমুগ্ধ তুলিতে এঁকেছেন। আর এই পটভূমিতে একটি সুকুমার শিশু মানসের মনোরম উদ্ঘাটন। বাঙলাদেশের প্রকৃতি ও শিশুমনের জন্য লেখকের মমতা আছে। সে মমতা তিনি পরিবেশন করতে বিফল হ'ন নি। তবে ঘটনা-গ্রন্থন অনেক স্থলে শিথিল। বহু স্থানে পারম্পর্য অনুপস্থিত। আর কাব্যের কুলীন ভাষায় মাঝে মাঝে হরিজন ভাষা মিশ্রিত হয়ে শ্রুতিতে অসুখকর হয়ে উঠেছে।

প্রথম উপন্যাসেই লেখক আশাময় ভবিষ্যতের আশ্বাস রেখেছেন, একথা বলা চলে।

(২২১।৫৫)

রাজ্যের রূপকথা :—প্রথম খণ্ড— শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, ইণ্ডিয়ান প্রেস লিঃ, এলাহাবাদ। মূল্য সাত টাকা।

গ্রন্থকার ও প্রকাশক এমন একখানি মূল্যবান ও সুন্দর গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন, যাহার জন্য তাঁহাদের সাধুবাদ জানাইতে হয়। সৌরীন্দ্রমোহন খ্যাতনামা লেখক ও শিশু-সাহিত্যিক। বর্তমান গ্রন্থে তিনি প্রথম পর্বে বলকান দেশের এগারটি রূপকথা আর দ্বিতীয় পর্বে কাফ্রী দেশের এগারটি রূপ-কথা পরিবেশন করিয়াছেন। কাফ্রী রূপকথার মধ্যে কঙ্গো, কেপ কলোনি এবং দক্ষিণ আফ্রিকা, এই তিনটি দেশের উপকথা স্থান পাইয়াছে। চিত্ররূপায়ন করিয়াছেন সৌম্যেন্দ্র-মোহন মুখোপাধ্যায় এবং 'আমার কথা' নামক

মুখবন্ধে তিনি রূপকথা সংগ্রহের ইতিহাসটুকু দিয়াছেন। এ কাজের জন্য যে যোগ্যতার প্রয়োজন, সে শিক্ষা ও সংস্কৃতি তাঁহার আছে, একথা বলা বাহুল্য। সৌরীন্দ্র-মোহন 'রূপকথার কথা' নামক ভূমিকায় রূপকথার আদি কাহিনী অর্থাৎ সৃষ্টি ও ক্রমবিকাশের একটি বিজ্ঞানসম্মত সুলিখিত আলোচনা সন্নিবেশিত করিয়াছেন। বহু চিত্রে সুশোভিত ও মনোহর ভঙ্গিতে রচিত এই রূপকথার সংকলন শিশু ও কিশোর হৃদয়কেই শুধু প্রচুর আনন্দ দিবে না, তাহাদের অভিভাবকদের মন ও দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। পরিকল্পনাহীন ছোটদের সাহিত্য প্রকাশ দেখিয়া যাঁহাদের বিরক্তি ধরিয়াছে, তাঁহারা যেন এই বইখানি ভাল করিয়া দেখেন ও ছেলেমেয়েদের উপহার দেন। কারণ, ইহা শুধু ব্যবসায়িক প্রচেষ্টাই নয় ইহার পিছনে সমাজ দৃষ্টি ও লোকসাহিত্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল অভিগম রহিয়াছে। আমরা দ্বিতীয় খণ্ডের সাগ্রহ প্রতীক্ষা করি।

২০৮।৫৫

ছোটদের বিজ্ঞান

বিদ্যুৎ বিশারদ—দেবীদাস মজুমদার। প্রকাশক: স্বাক্ষর, ১১বি চৌরঙ্গী টেরাস, কলিকাতা—২০। মূল্য—২ টাকা।

বিজ্ঞানের বিভিন্ন ব্যবহারিক শাখার সংক্ষিপ্ত পরিচয় ছোটদের সামনে সাবলীল ও সহজবোধ্য ভাষায় তুলে ধরবার জন্য 'আমরাও হতে পারি' গ্রন্থমালার পরিকল্পনা প্রশংসনীয়, কিন্তু বিষয় বস্তুর গুরুত্ব দেখে মনে হয় ছোটদের চেয়ে বড়রাই এই পুস্তক পাঠ করে নিঃসন্দেহে অনেক বেশী উপকৃত হবেন।

'বিদ্যুৎ বিশারদ' বইটিতে বিদ্যুৎ বিষয়ক যে সাধারণ জ্ঞান দেবার ইচ্ছা প্রচ্ছন্ন রয়েছে, তাকে সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণ করবার জন্য আরও কয়েকটি বিষয় আলোচনা করা উচিত ছিল। বাড়ীর ছেলে হয়তো ঘরে লাইন টানবে না কিন্তু প্রয়োজন বোধে 'বৈদ্যুতিক হীটার', 'ইস্ত্রি' অথবা 'কলিং বেল' নষ্ট হয়ে গেলে, মেরামত করার জন্য নিজে হাত লাগাতে পারে। বিদ্যুৎ বিশারদ হতে গেলে এই সব নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তুর কর্মকৌশলের সঙ্গে পরিচয় থাকা একান্ত দরকার ,কিন্তু এই পুস্তকে তা অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

বইটিতে 'ইলেকট্রিক' শব্দটির যথেচ্ছ ব্যবহার খুবই পীড়াদায়ক। প্রয়োজনীয় স্থলে 'ইলেকট্রিকের' পরিবর্তে 'ইলেকট্রিসিটি' ব্যবহার করা উচিত ছিল।

পুস্তকখানির ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে ব্যাটারীর দ্বারা বিদ্যুৎ সরবরাহের আলোচনা করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ব্যাটারী দিয়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ খুব কম স্থানেই করা হয়, কারণ ব্যাটারী ব্যবহারের প্রারম্ভিক খরচ অত্যন্ত বেশী। এছাড়াও ৩-৪ বৎসর পরে পরে ব্যাটারীর ... ও ... জন্য যে অর্থ ব্যয় হয়, তার পরিমাণও যথেষ্ট বেশ। ব্যাটারী দিয়ে সামান্য বিদ্যুৎ সরবরাহ ... চলতে পারে, কিন্তু কোন শহরের ২৪ ঘণ্টা প্রয়োজন পূরণ করা সম্ভব নয়।

ডায়নামোর ঘূর্ণনের গতি, ... সরবরাহের পরিমাণ এবং জ্বালানীর ... একটা সমতা রেখে চলে, সরবরাহ কম হ... জ্বালানীও কম খরচ হবে, সুতরাং ২৪ ঘ... চলার জন্য বেশী খরচের আশঙ্কা ... বেশী নয়। দিনের বেলা বিদ্যুতের প্রয়োজন যখন কম, তখন অবশ্য ... সামান্য খরচের কারণ হতে পারে। ... অঞ্চলের অনেক বিদ্যুৎ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানই কেবলমাত্র রাত্রের ১২ ... বিদ্যুৎ সরবরাহ করেন।

অজস্র তথ্যের সঞ্চয়নে ... বিষয় যে কোন পাঠকের কাছেই একটি ... সংগ্রহ বলে বিবেচিত হবে। ... আলোচনা প্রাঞ্জল ও চিত্তাকর্ষক ... ধরনের প্রচেষ্টা সব সময়েই ... রাখে।

বইটির প্রচ্ছদপট মনোরম, ... বাঁধাই ভাল।

২০৯।৫৫

পৃথিবী চলো—প্রথম খণ্ড—... বসু। প্রাপ্তিস্থান: বেঙ্গল ... ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য দুই টাকা।

অজ্ঞাত জগতের প্রতি ... বিশেষ করে কিশোর চিত্তের ... অজানা পৃথিবীর বিচিত্র ... এক পুরোপুরি বিজ্ঞানের ... কিশোরদের অন্য পন্থা নেই। ... কথা ভেবেই লেখক আকাশের ... তত্ত্বকে গল্পের আকারে সাজিয়ে ... সুবিধা এই গল্পভঙ্গীর নিজস্ব ... গতিতে চিত্তক্ষেত্র তৈরি ... বিজ্ঞানসত্যকে ভাল করে বোঝা ... চেয়েও বড় কথা, শিখে মনে ... বিজ্ঞান-পরিবেশনের এই ... দেশেই স্বীকৃত হয়েছে। ... লেখক পাঁচটি স্মৃতি-স্তবক ... ধূমকেতু ও তারকাপুঞ্জ ... সৌর জগতের রূপটি পরিস্ফুট ... জীনসের বইগুলি কত উপ... পাঠকমাত্রেই জানেন। তাই সেই ... সামনে রেখে খান কয়েক উপযোগী ... যদি গ্রন্থকার এ বই বার কর... আরও ভালো লাগত। পরবর্তী খণ্ডটিতে যদি কিছু নক্সা এবং ... দেওয়া হয়, তাহলে ভূতত্ত্ব ও জীবতত্ত্ব ... ভঙ্গিমায় ও চিত্ররূপে সরস ও ... হয়ে উঠবে। সেটা ব্যয়-সাপেক্ষ ব্যাপার ... বলা চলে, দীর্ঘমেয়াদী ... প্রকাশকের দায়িত্ব আছে এবং তা ... লোকসান নয়।

৩১২।৫৫

তীর্থ পরিচয়

বুদ্ধগয়াঃ—ভিক্ষু শীলাদার শাস্ত্রী প্রণীত। ধর্মাঙ্কুর বুক এজেন্সী, ১নং বুদ্ধিষ্টটেম্পল স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৷৷০ আনা।

বুদ্ধগয়া ভারতের অন্যতম প্রথম তীর্থ। ভারতের ঐতিহ্য এবং সংহতির সহিত ভগবান বুদ্ধের আদর্শ অঙ্গাঙ্গীভাবে বিজড়িত রহিয়াছে। পুস্তকখানি বুদ্ধ গয়া এবং তৎপার্শ্ববর্তী দর্শনীয় স্থানসমূহের সংক্ষিপ্ত অথচ সুন্দর পরিচয়পত্র। মোটামুটিভাবে ঐতিহ্য হিসাবে সেইগুলির বহুতর তথ্যও প্রদান করা হইয়াছে। বুদ্ধগয়ার ঐতিহ্য সম্বন্ধে আগ্রহসম্পন্ন সমাজ এবং তৈর্থিকগণ পুস্তকখানি পাঠে বিশেষভাবে উপকৃত হইবেন।

শারদীয়া সাহিত্য

জনসেবক ৷৷ ১৮এ, হরিতকীবাগান লেন, কলিকাতা ৬। দাম ২৲ টাকা।

জনসেবক শারদীয়া সংখ্যাটি দেখিয়া আমরা বিশেষ প্রীত হইয়াছি। ডাঃ যতীন্দ্রবিমল, ডাঃ সুনীতিকুমার, ডাঃ সুকুমার সেন, বিমলচন্দ্র সিংহ, হরপ্রসাদ মিত্র প্রভৃতির প্রবন্ধ এবং সুবোধ ঘোষ, প্রমথনাথ বিশী, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, সতীনাথ ভাদুড়ী, শিবরাম চক্রবর্তী, বিমল কর প্রভৃতির গল্প, নরেন্দ্র মিত্রের বড় গল্প—ইত্যাদি পাঠকসাধারণকে আনন্দ দিবে। কবিদের মধ্যে খ্যাতনামা ও নবীন কবি অনেকেই আছেন। সুশীল রায়ের বড় কবিতাটি ছাড়া নিশিকান্ত, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, বটকৃষ্ণ দাস, বটকৃষ্ণ দে, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত প্রভৃতি কবিদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। ছোটদের জন্য সপ্তডিঙা অধ্যায়টিও ভাল হইয়াছে।

মন্দিরা ৷৷ ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত। ৩২ অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা। দাম ১৷০।

অন্যান্য বৎসরের মত এবারেও শারদীয়া মন্দিরা সাহিত্যসম্ভারে সমৃদ্ধ হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, প্র-না-বি, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় [illegible] রায়, গজেন্দ্র মিত্র, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, নারায়ণ চৌধুরী, যোগেশচন্দ্র বাগল, নগেন দত্ত প্রমুখ সাহিত্যিকদের গল্প প্রবন্ধ কবিতায় সংকলনটি উল্লেখযোগ্য।

[illegible] সুনীল ভদ্র কর্তৃক সম্পাদিত। [illegible] কবিরাজ লেন, কলিকাতা [illegible] টাকা।

[illegible] চিত্রের প্রধান আকর্ষণ হচ্ছে [illegible] নায়ক নায়িকাদের হাফটোন [illegible]

এর বাইরে অভিনেতা-অভিনেত্রীর ঘরোয়া জীবনের ঘনিষ্ঠ পরিচয় পাওয়া যায়। এ-পত্রিকার আরেকটি বৈশিষ্ট্য যে চরিত্রভ্রষ্ট হয়নি। অর্থাৎ সিনেমা আর সাহিত্য নিয়ে জগাখিচুড়ি পত্রিকা এটা নয়, এ-কাগজের প্রতি রচনাই সিনেমা-সংক্রান্ত। সিনেমার নায়ক-নায়িকাদের অন্তরঙ্গ ভাবে জানবার সুযোগ রয়েছে এ-সব রচনায়। শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'অসবর্ণা' উপন্যাসের চিত্রনাট্যরূপ এই সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ।

জয়শ্রী ॥ লীলা রায় সম্পাদিত। ৪৭-এ, রাসবিহারী এভিনু, কলিকাতা। মূল্য ১৲।

এবারের শারদীয়া জয়শ্রীর সাহিত্যিক সমাবেশ উল্লেখযোগ্য। এ সংখ্যায় গল্প লিখেছেন প্রবোধকুমার সান্যাল, প্রতিভা বসু, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, সুশীল রায়, বাণী রায়, আশাপূর্ণা দেবী, সুবোধ বসু, অন্নপূর্ণা গোস্বামী। এ ছাড়া আছে প্রবন্ধ ও কবিতা, তার মধ্যে ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেনের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কাঠামো সম্বন্ধে প্রবন্ধটি বিশেষ মূল্যবান।

উত্তরসূরী ॥ ৬জি, রাজা অপূর্বকৃষ্ণ লেন, কলিকাতা ৬। দাম ১৲ টাকা।

ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'উত্তরসূরী'র এই বিশিষ্ট সংখ্যাটিতে ধূর্জটিপ্রসাদ, অন্নদাশংকর, রাজেশ্বর মিত্র, আঁতোয়ান প্রভৃতি বিদগ্ধজনের প্রবন্ধগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিষ্ণু দে, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, বুদ্ধ দেব, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, অরুণ ভট্টাচার্য প্রভৃতি কবিদের কবিতাগুলিও। গৌরকিশোর ঘোষের গল্পটি আমাদের ভাল লাগিয়াছে। নারায়ণ চৌধুরীর প্রবন্ধটি সম্পর্কে সন্দেহ হয়। ইহাকে প্রবন্ধ না বলিয়া প্রগলভতা বলিলে ক্ষতি কি।

কথাশিল্প ॥ ৫৫।১, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলিকাতা ১৯। দাম ২৲ টাকা।

কথাশিল্প শারদীয় সংখ্যায় ডাঃ প্রবোধচন্দ্র লাহিড়ী, তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ মিত্র, বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির প্রবন্ধ; সরোজকুমার, আশাপূর্ণা, বাণী রায়, প্রভৃতির গল্প এবং সজনীকান্ত, গোপাল ভৌমিক প্রভৃতির কবিতা স্থান পাইয়াছে। সংখ্যাটি মনোরম হইয়াছে। অবনীন্দ্রনাথের অঙ্কিত রঙীন চিত্রটি এই পত্রিকার বিশিষ্ট সম্পদ।

প্রাপ্তি স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থ আসিয়াছে।

তিন কাল—প্রভাত দেব সরকার।
রবীন্দ্রনাথের সোনার তরী—অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়।
পান্নাদ্বীপ—শেফালি নন্দী।
আমার পৃথিবী ভ্রমণ—শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
মনের মত বই—সুনির্মল বসু।
সুন্দরবনে আর্জান সর্দার—শিবশংকর মিত্র।
ঝড়ের পাখী—প্রেমাংকুর আতর্থী।
রাজসী—দেবেশ দাশ।
লাল ভুল—বান ভট্ট।
বিজ্ঞানে নোবেল প্রাইজ—রবীন চট্টোপাধ্যায়।
ফুটবল রেফারী—সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়।
গোধূলির রঙ—ইভান তুর্গেনিভ অনুবাদক—প্রদ্যোৎ গুহ।
বুভুক্ষা—আব্দুল জব্বার।
পঞ্চদশী—নির্মল দত্ত।
সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত—অরুণচন্দ্র গুহ।
শৈ-দি—গিরিশনন্দন।
শেষ প্রতিশ্রুতি—শ্রীশিবপ্রসাদ ঘটক।

আমেরিকা তথা বিশ্বের দুই ধুরন্ধর এ্যাথলীট জেসি ওয়েন্স ও বব ম্যাথিয়াসের ভারত সফরের বিষয় এদেশের এ্যাথলেটিকস ইতিহাসের বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ক্রীড়াজগতে চির-স্মরণীয় এই দুই মার্কিন এ্যাথলীটের মধ্যে জেসি ওয়েন্স অনেক আগেই ভারতে পৌঁছে গেছেন, তাঁর যাবারও সময় হয়ে এলো। বব্ ম্যাথিয়াস ভারতে আসছেন ৬ই নবেম্বর। দুজনেরই ভারতে আসার উদ্দেশ্য এক—ভারতের তরুণ তরুণীদের এ্যাথলেটিকসের কলাকৌশল শিক্ষা দেওয়া আর সেই সঙ্গে প্রীতি ও শুভেচ্ছা বিনিময় করা। মার্কিন মুলুক থেকে ইতিপূর্বে আরও একজন ধুরন্ধর এ্যাথলীট ভারত সফর করে গেছেন; ইনি হচ্ছেন অলিম্পিক পোল ভল্ট চ্যাম্পিয়ন বব্ রিচার্ড। রিচার্ড পোল ভল্টার হিসেবেই শুধু অ্যাথলেটিক বিশ্বে খ্যাতি অর্জন করেননি। তিনি একজন চৌকস এ্যাথলীট এবং ডেকাথলনের কৃতী প্রতিদ্বন্দ্বী। সর্বোপরি বব্ রিচার্ড একজন ধর্মযাজক—সাম্য মৈত্রী করুণা মন্ত্রের দীক্ষাদাতা। যাই হ'ক ভারতের উচ্চাভিলাষী তরুণ এ্যাথলীটদের উন্নত কলাকৌশল শিখিয়ে জীবনে সাফল্য-লাভের সোপান তৈরী করে দেবার মার্কিন নাগরিকদের এই প্রচেষ্টা খুবই প্রশংসার্হ সন্দেহ নেই। বব্ রিচার্ডের কাছ থেকে আমরা পোল ভল্টের কলাকৌশল শিখেছি আর তাঁর কাছ থেকে পেয়েছি এ্যাথ-লেটিক জীবনে সংযমী ও চরিত্রবান হবার অমূল্য উপদেশ, অনুশীলন এবং সাধনা করবার প্রেরণা। জেসি ওয়েন্সের কাছ থেকে দৌড়ঝাঁপের ছলাকলা শিখছি আর বব্ ম্যাথিয়াসের কাছ থেকে পাব সব রকমের এ্যাথলেটিকস্ নৈপুণ্যের হদিস। কারণ ম্যাথিয়াস বিশ্বের অদ্বিতীয় চৌকস এ্যাথলীট। এবারকার এ্যাথলেটিক মরসুমে জেটোপেক দম্পতিরও ভারতে আসবার কথা। এ্যাথলেটিকস্ ক্ষেত্রে স্বামী স্ত্রী দুজনেরই বিশ্বজোড়া নাম-ডাক। দূরপাল্লার দৌড়বীর জেটোপেক মানুষ যান নামে অভিহিত আর তার যোগ্যা সহধর্মিণী 'ডানা' বর্শা ছোড়ায় অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ান। মার্কিন এ্যাথলীট বীরদের সঙ্গে চেকোশ্লোভেকিয়ার এই এ্যাথলেটিক দম্পতিকেও আমরা স্বাগত জানাই। ভারতের এ্যাথলেটিকস্ মান উন্নয়নের জন্য বিদেশী এ্যাথলীটদের 'শুভেচ্ছা' সফরের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য

* * *

খেলার মাঠে

একলব্য

জে সি ওয়েন্সকে বলা হয় 'ফাস্টেস্ট হিউম্যান অব দি ওয়ার্ল্ড' অর্থাৎ বিশ্বের সর্বাপেক্ষা ক্ষিপ্রতম মানুষ। দীর্ঘ ১৯ বছর আগে ১০০ মিটার দৌড় এবং দীর্ঘ লাফে তিনি যে রেকর্ড করে রেখেছেন আজ পর্যন্ত কারো পক্ষেই তা ভাঙ্গা সম্ভব হয়নি। যে যুগে এ্যাথলেটিকের বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিনিয়ত সৃষ্টি হচ্ছে নতুন নতুন রেকর্ড সেই যুগে জেসি ওয়েন্স প্রতিষ্ঠিত একাধিক রেকর্ড দীর্ঘ-দিন ধরে অক্ষুণ্ণ থাকা সত্যই বিস্ময়কর। ওয়েন্স যে কতবড় এ্যাথলীট এতেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। একই অলিম্পিকে চারটি স্বর্ণপদক লাভ ওয়েন্সের জীবনের আর এক স্মরণীয় কীর্তি। একই অলিম্পিকে চারটি স্বর্ণপদক লাভ বিশ্বের বেশী এ্যাথলীটের পক্ষে সম্ভব হয়নি। মাত্র চারজন এ্যাথলীট এই সম্মান লাভ করেছেন; এর মধ্যে তিনজন পুরুষ আর একজন মহিলা। ওয়েন্স ছাড়া এ্যাথলেটিক বিশ্বে অপর দুই বীরের নাম এলভিন ক্রাঞ্জলিন ও পাভো নুর্মি। ক্রাঞ্জলিন ওয়েন্সেরই দেশের লোক আর নুর্মি ফিনল্যাণ্ডের অধিবাসী। মহিলা এ্যাথ-লীটের জন্য গর্বের অধিকারী নেদার-ল্যাণ্ড। ১৯৪৮ সালের লণ্ডন অলিম্পিকে ক্যানি ব্লাঙ্কার্স কোয়েন ১০০ ও ২০০ মিটার দৌড়, ৮০ মিটার হার্ডল ও ৪০০ মিটার রিলে রেসের বিজয়িনী হিসেবে চারটি স্বর্ণপদক লাভ করেছিলেন।

জেসি ওয়েন্স চারটি স্বর্ণপদক লাভ করেছিলেন ১৯৩৬ সালের বার্লিন অলিম্পিকে। এই অলিম্পিকে তিনি ১০০ ও ২০০ মিটার দৌড়, ৪০০ মিটার রিলে রেস ও দীর্ঘ লাফে বিজয়ীর সম্মান অর্জন করে অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচয় দেন। শুধু এ্যাথলেটিকসের বিস্ময়কর প্রতিভার জন্যই ওয়েন্স বিশ্বের সমাদর লাভ করেননি। প্রকৃত খেলোয়াড়সুলভ মনোবৃত্তি, শিষ্টাচার এবং মধুর স্বভাবের জন্য তিনি দেশ বিদেশে সবারই প্রিয় হয়ে উঠেছেন। বার্লিন অলিম্পিকে তাঁর খেলোয়াড়সুলভ মনোবৃত্তির ছোট একটি ঘটনার উল্লেখ এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। দীর্ঘ লাফে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের পথে ওয়েন্সের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন নাজী
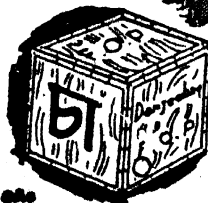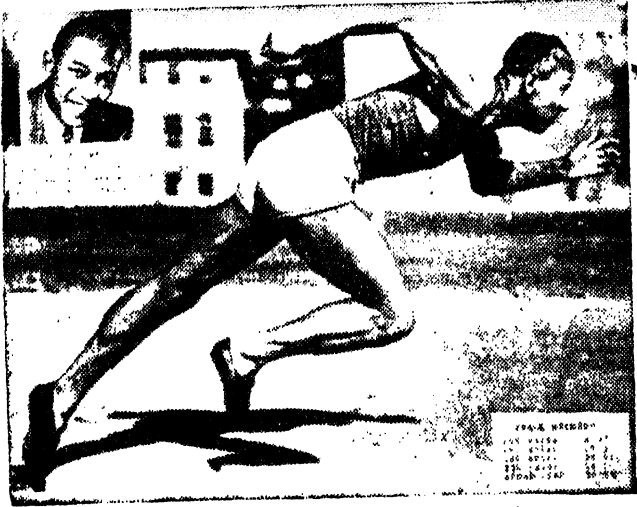
বিশ্ববিখ্যাত এ্যাথলীট জেসি ওয়েন্সের দৌড়বার ভঙ্গি

চ্যাম্পিয়ন লুটজ লং। হিটলারের দেশের লোক হিটলারের মতই তাঁর দাপট। প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়েছে। প্রত্যেক এ্যাথলীটের দুটি করে লাফ হবার পর তৃতীয় ও শেষ লাফের মুখে লুটজের পায়ের মাংসপেশীতে টান ধরলো। ওয়েন্স ছুটে এলেন, মালিশ করতে আরম্ভ করলেন লুটজের পায়ের মাংসপেশী। প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীকে সুস্থ করে তুলতে তাঁর আগ্রহের অন্ত নেই। ১০ মিনিট ধরে 'ম্যাসেজ' করবার পর লুটজের পা হাল্কা হলো এবং তিনি সাবলীলভাবে লাফিয়ে ২৫ ফুট ৯½ ইঞ্চি অতিক্রম করলেন। বলা বাহুল্য এই দূরত্ব ওয়েন্সের দূরত্বের চেয়েও বেশী। এবার ওয়েন্সের লাফাবার পালা। ৯০ হাজার দর্শক আগ্রহভরা দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে আছে ওয়েন্সের দিকে। তিনি যখন ২৬ ফুট ৫½ ইঞ্চি লাফিয়ে পার হলেন তখন বিপুল জনতার আনন্দ-রোলে বার্লিন স্টেডিয়াম মুখরিত হয়ে উঠল। দীর্ঘ লাফে সৃষ্টি হলো নতুন অলিম্পিক রেকর্ড। জেসি'র চারিত্রমাধুর্য, তার অতুলনীয় খেলোয়াড়ী মনোবৃত্তি এবং সর্বোপরি তার দৌড়ঝাঁপ করবার নিপুণ ভঙ্গিমায় আকৃষ্ট হয়ে অ্যাথ-লেটিকসের স্বনামধন্য সমালোচক এবং এককালের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন দৌড়বীর হ্যারোল্ড আব্রাহাম বলেছেন ঃ

"Owens' records will be beaten in time, but it is doubtful if there will ever be a more modest genius, or anyone who will show more perfect form on the track."

অনাগত দিনে ওয়েন্সের রেকর্ডগুলি ভেঙে যাবে, কিন্তু ট্র্যাকের এমন নিপুণ শিল্পী আর সৃষ্টি হবে কি? এমন প্রতিভাদীপ্ত বিনয়ী খেলোয়াড় জীবনের সাক্ষাৎ পাওয়াও হবে দুষ্কর—এই ছিল হ্যারোল্ড আব্রাহামের মন্তব্য। কিন্তু ওয়েন্সের দুটি রেকর্ড এখনো ভাঙেনি, তাঁর মত ট্র্যাকের নিপুণ শিল্পীও আর সৃষ্টি হয়েছে কিনা সন্দেহ। জেসি ওয়েন্স নিগ্রো এ্যাথলীট। বার্লিন অলিম্পিকে অসামান্য সাফল্য অর্জনের পর তাঁর দেশবাসী শ্বেতচর্মের সম্ভ্রান্ত আমেরিকানরা কৃষ্ণচর্মের নিগ্রোদের প্রতি স্বাভাবিক ঘৃণা ভুলে গিয়ে ওয়েন্সকে বীরোচিত সম্মানে ভূষিত করেন। বার্লিন অলিম্পিককে নিগ্রো বীরের অলিম্পিক বলেও মন্তব্য করা হয়। তখন দেশ-বিদেশের সংবাদপত্রে ওয়েন্স সম্বন্ধে যেসব সমালোচনা করা হয়েছিল তার সামান্য একটু অংশ এখানে উল্লেখ করছি ঃ

"A record of such commanding excellence demands explanation. A theory has been advanced that through some physical characteristic of the race involving the bone and muscle construction of the foot and leg the negro is ideally adapted to the sprinnt and jumping events."

এর ভাবার্থ ঃ নিগ্রোবীরের শারীরিক গঠন বৈচিত্র্যই তাঁর অবিশ্বাস্য রেকর্ড সৃষ্টির প্রধান কারণ। তাঁর হাড় মাংস-পেশী এবং পায়ের গঠনে এমনই বৈশিষ্ট্য আছে যা দৌড় ও লাফের পক্ষে পরম উপযোগী।

এ মন্তব্যের মধ্যে যথেষ্টই যুক্তি আছে। সত্যই নিগ্রোরা স্বল্প পাল্লার দৌড়ে অবিসংবাদিতভাবে বিশ্বশ্রেষ্ঠ। তাঁদের শারীরিক গঠন যতই অনুকূল হ'ক জয়যাত্রার পথ প্রশস্ত করতে হ...

য়োজন কঠোর সাধনার। ওয়েন্সের জীবনী রিদ্র্যের সঙ্গে কঠোর সংগ্রামের জীবনী। ভার অভিযোগ এবং বাধা-বিপত্তি উপেক্ষা রে কঠিন সাধনায় তিনি জীবনে ফলকাম হয়েছেন। ভারতে এসে তরুণ াথলীটদের তিনি এই উপদেশই য়েছেন যে, সাধনা করলে জীবনে সিদ্ধি নিবার্য। তবে সময় থাকতে সাধনা াতে হবে। বার্লিন অলিম্পিক ওয়েন্সের বিনের যেমন স্মরণীয় অধ্যায় তেমন রত সফরকেও তিনি জীবনের স্মরণীয় টনা বলে মনে করেন। ভারত স্বাধীনতা ভের পর দেশকে যথেষ্ট সমৃদ্ধ করেছে লে ওয়েন্স মন্তব্য করেন, আর আট ছরের মধ্যে ভারতের কোনো বিশ্ব-াম্পিয়ন এ্যাথলীটের মুখোমুখি তিনি াড়াতে চান। ভারতের উচ্চাভিলাষী রুণ এ্যাথলীট সম্প্রদায় যদি ওয়েন্সের াদেশমত সাধনা করেন আর পান পরি-লকদের সাহায্য ও প্রেরণা তবে ওয়েন্সের শা নিষ্ফল হবে না।

* * *

আমেরিকার স্বনামধন্য এ্যাথলীট র্ট ব্রুস্ ম্যাথিয়াস, যিনি এ্যাথলেটিক বে বব্-ম্যাথিয়াস নামে পরিচিত, তিনি য়েন্সের মত একটি কি দুটি বিষয়ে ষ্ঠত্ব অর্জন করতে না পারলেও এমন কটি বিষয়ে উপর্যুপরি দুবার অলিম্পিক াম্পিয়ন হয়েছেন বিশ্বক্রীড়া আসরে যাঁর মান অনন্য। বিষয়টির নাম হচ্ছে কাথলন' প্রতিযোগিতা। ১৮ বছর সের আগে এই প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠত্ব র্জন করার বিষয় এ্যাথলেটিক বিশ্বের ণাবহির্ভূত ঘটনা ছিল। কিন্তু ১৭ রের নাবালক স্কুলছাত্র বব্ ম্যাথিয়াস কাথলনের' অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন হয়ে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেন। থিয়াসের নতুন অধ্যায় রচনার স্পৃহা ানেই থেমে যায়নি। ১৯৪৮ সালে ন অলিম্পিকে সাফল্য লাভের পর ৫২ সালের হেলসিঙ্কি অলিম্পিকেও ন ডেকাথলনে শীর্ষস্থান অধিকার ন। উপর্যুপরি দুবার ডেকাথলন ম্পিয়ন হবার ঘটনাও এ্যাথলেটিকস ত্রে নতুন ইতিহাস। বব্ ম্যাথিয়াস বোর্ন অলিম্পিকে অংশগ্রহণ করে বারের 'ডেকাথলন' বিজয়ী হবার চেষ্টা না কি না এ সম্বন্ধে নিজের মুখ না সাধারণ ক্রীড়ামোদীর গবেষণার ষয়।

বিশ্বের সেরা চৌকস এ্যাথলীট বব্ ম্যাথিয়াসের ডিসকাস ছোড়বার দৃশ্য

'ডেকাথলন' অর্থাৎ দশটি বিষয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এতে বিভিন্ন বিষয়ের দৌড় আছে তিন রকমের—১০০ মিটার, ৪০০ মিটার ও ১৫০০ মিটার; তিন রকমের আছে লাফ—দীর্ঘ লাফ, উঁচু লাফ আর দণ্ডের সাহায্যে লাফ, ছুড়তে হয় তিন রকমের ভারী জিনিস—লোহার চাক্তি, লোহার ভারী বল আর বর্শা; দশম বিষয়টি হচ্ছে—হার্ডল অর্থাৎ প্রতি-বন্ধক দৌড়। এই দশটি বিষয়ের সামগ্রিক ফলাফলের উপর প্রতিযোগীর শ্রেষ্ঠত্ব বিচার করা হয়। সুতরাং সর্ববিশারদ এ্যাথলীট ছাড়া ডেকাথলনে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করা অসম্ভব। আর এ বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে হলে কতখানি শারীরিক পটুতা, কত নৈপুণ্য, কত অনুশীলন এবং কত সাধনার প্রয়োজন তা সহজেই অনুমেয়। শিশুবয়সে বব্ সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন না, তা ছাড়া কিছুদিন তাঁকে রক্তশূন্যতা রোগেও কষ্ট পেতে হয়েছিল, কিন্তু পরিবারের অন্যান্য সকলের খেলাধুলার প্রতি আসক্তি দেখে বব্‌ও খেলাধুলায় আগ্রহী হয়ে ওঠেন এবং নিয়মিত ব্যায়াম ও শরীরচর্চার ফলে অচিরেই সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হন। বর্তমানে ববের দেহের উচ্চতা ৬ ফুট ৩ ইঞ্চি। ওজন ২০৪ পাউন্ড। সুগঠিত দেহ প্রিয়দর্শন যুবক। বিশ্বের এই শ্রেষ্ঠ চৌকশ এ্যাথলীট ২৭শে নবেম্বর ২৫ বছরে পদার্পণ করছেন।

আমেরিকায় বব্ ম্যাথিয়াসের খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা অসম্ভব। যুক্তরাষ্ট্রে 'দি বব্ ম্যাথিয়াস স্টোরি' নামে তাঁর জীবনকাহিনী অবলম্বনে একখানি ছায়াচিত্র রচনা করা হয়েছে। স্বপন্নী বব্ এই চিত্রের প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করেছেন।

সাপ্তাহিক সংবাদ

দেশী সংবাদ

১০ই অক্টোবর—কটকের সংবাদে প্রকাশ, গত ২৪ ঘণ্টায় প্রবল ঝড়বৃষ্টির ফলে কটক, পুরী ও বালেশ্বর জিলার বন্যাবিধ্বস্ত গ্রামাঞ্চলে শত শত গৃহ ভূমিসাৎ হইয়াছে।

ভারতে বৃটিশ হাইকমিশনার মিঃ ম্যালকম ম্যাকডোনাল্ড আজ কলিকাতায় এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন যে, দ্বিতীয় পাচসালা পরিকল্পনায় ভারত সরকারকে সাহায্যদানের নিমিত্ত বৃটিশ সরকার অত্যন্ত আগ্রহশীল।

ভারতে শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার সাধনের আবশ্যকতার কথা উল্লেখ করিয়া প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরু বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের নিকট এক ইস্তাহার প্রেরণ করিয়াছেন। প্রকাশ, তিনি এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, দেশের উন্নয়ন সাধন করিতে হইলে ইংরাজীতে গভীর জ্ঞান থাকা আবশ্যক। প্রসঙ্গত তিনি হিন্দীর উপর মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপের নিন্দা করিয়াছেন।

১১ই অক্টোবর—রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের সুপারিশের বিরুদ্ধে নানাস্থানে বিক্ষোভ প্রদর্শনের সংবাদ পাওয়া যায়। বেলগাঁওয়ে বিক্ষুব্ধ জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য পুলিস কাঁদুনে গ্যাস ব্যবহার করে এবং বোম্বাইয়ে প্রায় দশ হাজার লোকের এক উত্তেজিত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য পুলিসকে লাঠি চালাইতে হয়। আগরতলায় কমিশনের সুপারিশের প্রতিবাদে পূর্ণ হরতাল পালন করা হয়।

আজ পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার বিলের দ্বিতীয় পর্যায়ে দফাওয়ারী আলোচনা সমাপ্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে বিধান সভার শরৎকালীন অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতুবী রাখা হয়।

১২ই অক্টোবর—আজ কলিকাতায় ভারতের পূর্বাঞ্চলের রাজ্যসমূহের ৩০ জন সংসদ সদস্যের সহিত আলোচনার সময় কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীমেহেরচাঁদ খান্না জানান যে, উদ্বাস্তুদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় মাঝারি ও ছোট শিল্প স্থাপনে সরকারী সাহায্য হিসাবে বৎসরে তিন কোটি টাকা ধার্য করা হইয়াছে।

১৩ই অক্টোবর—পাঞ্জাবের বন্যায় এক সহস্র লোক এবং পেপসুর বন্যায় দুই শত লোকের প্রাণহানি হইয়াছে বলিয়া সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি আজ সাধারণভাবে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের সুপারিশ গ্রহণের অনুকূলে মত প্রকাশ করেন। তবে সেই সঙ্গে এই অভিমতও প্রকাশ করেন যে, সংশ্লিষ্ট এলাকাসমূহের সম্মতিক্রমে উহা পরিবর্তনেরও সুযোগ থাকিবে।

১৪ই অক্টোবর—কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি শান্ত ও সহযোগিতামূলক মনোভাব লইয়া রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের রিপোর্ট বিবেচনা করিবার জন্য আবেদন জানাইয়াছেন।

নয়াদিল্লীর সংবাদে প্রকাশ, উভয় বঙ্গের মধ্যে গমনাগমনে ভিসা প্রথা রহিত করিবার জন্য নূতন করিয়া চেষ্টা করা হইতেছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

আজ কলিকাতায় বিশ্ব সরকার গঠন প্রয়াসী বিশ্ব কংগ্রেসের চারিদিবস স্থায়ী অধিবেশন আরম্ভ হয়।

১৫ই অক্টোবর—প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু আজ কোনার বাঁধের উদ্বোধন করেন। দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনার প্রথম পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত চারিটি বাঁধের মধ্যে কোনার দ্বিতীয়।

লক্ষ্ণৌর সংবাদে প্রকাশ, এই সপ্তাহের প্রথমে উত্তর প্রদেশের পশ্চিমাঞ্চলের উপর দিয়া ঘূর্ণিবাত্যা প্রবাহিত হওয়ায় এবং প্রবল বারিপাত ও গৃহ পতনের ফলে ১৭ জন নিহত হইয়াছে।

১৬ই অক্টোবর—প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু আজ কলিকাতায় রাজভবনের প্রাঙ্গণে ছাত্রগণের এক সভায় ভাষণদানকালে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের অধিবাসীদের ভাষাগত বিরোধের মনোভাবের ঊর্ধ্বে উঠিবার আহ্বান জানান।

বিদেশী সংবাদ

১১ই অক্টোবর—ইরান তুর্ক-ইরাক প্রতিরক্ষা চুক্তিতে স্বাক্ষর করিয়াছে।

লাহোরস্থ ভারতের ডেপুটি হাইকমিশনারের অফিসের সম্মুখে অনশন ধর্মঘট ও করাচীতে শিল্প মেলায় ভারতীয় স্টলের সম্মুখে পিকেটিং চালানোর বিরুদ্ধে ভারতীয় হাইকমিশনার পাক সরকারের নিকট প্রতিবাদ জানাইয়াছেন।

পাকিস্থানের সংখ্যালঘু মন্ত্রী নুরুল হক চৌধুরী করাচীর বিখ্যাত কালীমন্দির অবিলম্বে পুনর্নির্মাণের জন্য আদেশ দিয়াছেন।

১২ই অক্টোবর—পশ্চিম পাকিস্থানে অভূতপূর্ব বন্যার ফলে অন্তত দুই শত লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

১৩ই অক্টোবর—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট ইউনিয়নের সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে সামরিক পর্যবেক্ষকদল মোতায়েন করিবার জন্য রাশিয়া যে প্রস্তাব করিয়াছেন প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার তাহা গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছেন।

১৪ই অক্টোবর—এক ইউনিটভুক্ত পশ্চিম পাকিস্থান রাষ্ট্রের পত্তন হইয়াছে। আজ প্রাতে লাহোরে নবগঠিত পশ্চিম পাকিস্থানের প্রথম গভর্নর মিঃ মুস্তাক আমেদ গুরমানির শপথ গ্রহণ সম্পন্ন হয়।

১৫ই অক্টোবর—ওয়াশিংটনের সংবাদে প্রকাশ, ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে একটি আণবিক শক্তি চুক্তি সম্পাদন করিয়া আগামী পাঁচ বৎসরের মধ্যে ভারতে আণবিক শক্তি হইতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কারখানা স্থাপন সম্ভবপর কি না, সে সম্পর্কে বর্তমানে উভয় দেশের মধ্যে আলোচনা চলিতেছে।

১৬ই অক্টোবর—ফরাসী মরক্কোতে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত পরিষদ গঠন করা হইয়াছে। পরিষদ গঠনের সঙ্গে সঙ্গে মরক্কোতে শাসন সংস্কার পরিকল্পনা প্রবর্তনের কাজ আরম্ভ হইল।

পাখতুন ভাষাভাষী অঞ্চলসমূহ নবগঠিত পশ্চিম পাকিস্থান প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করার প্রতিবাদে আফগান সরকার করাচীস্থ আফগান রাষ্ট্রদূতকে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের আদেশ জানাইয়াছেন।

প্রতি সংখ্যা—।৵ আনা, বার্ষিক—২০৲, ষাণ্মাসিক—১০৲
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা, লিমিটেড, ৬ ও ৮, সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১৩
শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস লিমিটেড হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বর্ণানুক্রমিক সূচী

প্রথম সংখ্যা হইতে ত্রয়োদশ সংখ্যা

—অ—

অকুলকন্যা—আফলাতুন ৪৪০
অতিথি পরিচয়—শ্রীসরোজ আচার্য ২৪৯
অনবকাশ (কবিতা)—শ্রীগোবিন্দ মুখোপাধ্যায় ... ৩৮২
অন্য চোখে—আনিস চৌধুরী ৯২৩
অমরনাথ যাত্রা—শ্রীনিখিল মৈত্র ও শ্রীসুনীল জানা ... ৬৭৩
অশ্বত্থ—বিমল কর ৭৬৭

—আ—

আদিবাসীদের বিবাহপ্রথা—শ্রীনিখিল মৈত্র ও শ্রীসুনীল জানা ১৩৭
আধুনিক বাংলা কবিতা—শ্রীনীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ... ৭২৬
আবহসংগীত (কবিতা)—শ্রীফণিভূষণ আচার্য ... ৬১৫
আমি তেনজিং— ৭২১, ৮০১, ৮৯০, ৯৮১
আর এ শহরের কথা—শ্রীপ্রভাত দেব সরকার ... ৫৬৯
আলোচনা— ১৫৬, ২০৫, ৩৭০, ৪৫৮, ৪৯৬, ৬৫৬
আসামের মিকির উপজাতি—শ্রীনিখিল মৈত্র ও শ্রীসুনীল জানা ৫০৩

—উ—

উপনগর—শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র ২১, ১৪৭, ২১৮, ২৮৯, ৩৬৫, ৪০৯, ৫২৫, ৬০৩, ৬৫১, ৭৬১, ৮৩৯, ৯৯৭

—এ—

এইখানে সূর্যের (কবিতা)—জীবনানন্দ দাশ ... ১৭২
এক যুগের সংলাপ (কবিতা)—শ্রীবিষ্ণু দে ... ৯২

—ক—

কলকাতায় সংগীত সম্মেলন—শ্রীপংকজ দত্ত ... ৯২৯
কার্তিকের চাঁদ (কবিতা)—মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ্ ... ৬৫০
কালগ্রাস (কবিতা)—শ্রীসৌমিত্রশংকর দাশগুপ্ত ... ৩৮২
কৃষ্ণমূর্তি—তাপস ৩৭৭

—খ—

খেলার মাঠে—একলব্য ৭৬, ১৫৭, ২২৮, ৩০৯, ৩৮৮, ৪৬৯, ৫৪৮, ৬২৮, ৭০৮, ৭৮৭, ৮৬৮, ৯৪৮, ১০২৬

—গ—

গুরুজীর বৈঠকে—শ্রীঅমিয়নাথ সান্যাল ২৪৪, ৩৩৭, ৪১৭, ৪৯৭, ৫৭৭, ৬৫৭
গোলকধাম—শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায় ৫১৮
গ্রামীণ ভাষ্য—শ্রীঅলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ৯৪২

—চ—

চিত্রপ্রদর্শনী—৬৩, ২১৪, ৩৭৫, ৪৫৪, ৫৩৬, ৬১১, ৬৮৯, ৭৬৫, ৮৪৭, ৯৩৬

—ছ—

ছাব্বিশে জানুয়ারী— ৮৮১
ছায়ার সময় (কবিতা)—শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ ... ৮৫৬

—জ—

জগদীশচন্দ্র বসু প্রসঙ্গ— ৩৩০

—ঝ—

ঝড় (কবিতা)—শ্রীমানিক মুখোপাধ্যায় ... ১০২১
ঝান্সীর রাণী—শ্রীমহাশ্বেতা ভট্টাচার্য ৪৭, ১১৯, ২০৯, ২৯৩, ৩৫১, ৪৪৯, ৫৩৭, ৫৯৭, ৬৮৫

—ট—

ট্রামে-বাসে—২৪, ১৩১, ২৯৭, ৪৫৭, ৪৯৩, ৭০০, ৭৬৪, ৮৬০, ৯৪১, ১০১৪

—ড—

ডাক্তারের ডায়েরী—ডাঃ আনন্দকিশোর মুন্সী ৫৬, ৩৪৬, ৪৮৯, ৬৪৬, ৮৪৩

—ত—

তোমাকে চিঠি (কবিতা)—শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র ৯

—দ—

দত্তাত্রেয় পালুস্কর—শ্রীসুধীর বন্দ্যোপাধ্যায় ... ১৮
দিল্লীতে মুদ্রণ প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান—শ্রীঅনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায় ... ২২৫
দীপান্বিতা (কবিতা)—শ্রীসুনীল সরকার ৯২
দোকান (কবিতা)—শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র ৩২১

—ন—

নবজীবনের স্বপ্ন (কবিতা)—শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য ... ৮৫৬
নর্মসখী—শ্রীনির্মলেন্দু মান্না ৬৭৯

—প—

পঞ্চশীল—শ্রীসুধাংশুবিমল মুখোপাধ্যায় ৭৪২
পঞ্চম রাগ—শ্রীনবেন্দু ঘোষ ১০৫
পত্রাবলী—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১০, ৮৯, ১৬৯, ২৪১, ৩২২, ৪০১, ৪৮১, ৫৬১, ৬৪১
পলিনার্প কুশ ও তাঁর আবিষ্কার—বিজ্ঞান ভিক্ষু ... ২৭৯
পাওলো ও ফ্রানচেস্কা (কবিতা)—শ্রীবিষ্ণু দে ... ৫৬৩
পুস্তক পরিচয়—৫৫, ১৫০, ১৮১, ২৯৮, ৩৮৩, ৪৫৯,

৫৩৩, ৬১৭, ৬৯৭, ৭৭৮, ৮৫৭, ৯৩৭, ১০২২
পুরীর সমুদ্র (কবিতা)—শ্রীজয়শ্রী চৌধুরী ... ৬৫০
পৌষ উৎসবে পানিকর—শ্রীঅমিতাভ চৌধুরী ... ৮২১
প্রকৃতি তোমাকেই—শ্রীসুবন্ধু ভট্টাচার্য ৯৪২
প্রার্থনা—মো. ক. গান্ধী ৯৬১
প্রিয়তম (কবিতা)—শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ ১৭০

—ব—

বড় কাছের মানুষ—শ্রীঅরুণাচল বসু ৭৪৭
বনহরিণী—শ্রীসুশীল রায় ২৮১
বিজয়ার পালা—হিমাংশুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৪৪
বিজ্ঞান-বৈচিত্র্য—চক্রদত্ত ৪০, ২০৪, ২৮৫, ৩৩৬, ৬১৩, ৭৬০, ৮৫০, ৯২৮, ১০১৫
বেনোজল—শ্রীহরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ১৯০
বেলাশেষের গান—শ্রীসুধীন দত্ত ৯৬৯
বৃষ্টি এলো—শ্রীসুশীল বসু ৯৪২
বৈদেশিকী—৭, ৮৭, ১৬৭, ২৩৯, ৩১৯, ৩৯৯, ৪৭৯, ৫৫৯, ৬৩৯, ৭১৯, ৭৯৯, ৮৭৯, ৯৫৯
বৈয়াকরণ—শ্রীসতীনাথ ভাদুড়ী ৮০৯

—ভ—

ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেস—শ্রীমহাশ্বেতা ভট্টাচার্য ... ৮৯৭
ভারতীয় লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রে বৃক্ষপূজা—
শ্রীগোপীনাথ সেন ... ১৭৪
ভারতীয় শিল্প প্রদর্শনী—শ্রীপূর্ণিমা সরকার ... ৪৩১

—ম—

মনে এলো—শ্রীধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ৩৭, ১২৯, ২১২, ২৬২, ৩৭১, ৪০৪, ৪৮৫, ৫৬৫, ৬৯১, ৭৪৫, ৮০৬, ৮৯৫
মাইকেল ও বিদ্যাসাগর—শ্রীরবীন্দ্রকুমার দাসগুপ্ত ... ৯৬৩
মানবেন্দ্রনাথ রায়—শ্রীশিবনারায়ণ রায় ১০০৯
মিসেস চ্যাটার্জি—শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৩১

—য—

যখন নায়ক ছিলাম—শ্রীধীরাজ ভট্টাচার্য ২৫, ১৩৩, ২০০, ২৮৬, ৩৬১, ৪২৭, ৫১২, ৫৮৩, ৬৬১, ৭৩২, ৮১৭, ৯০১, ৯৮৭
যৌবনের স্বরলিপি (কবিতা)—শ্রীরথীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ১০২১

—র—

রংগজগৎ—শৌভিক ৬৯, ১৫৩, ২২৩, ৩০১, ৪৬৩, ৫৪৩, ৬২১, ৭০১, ৭৮১, ৮৬১, ৯৪৩, ১০১৬
রাগসংগীতের ভূমিকা—শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র ৫১
রুশ নেতাদের ভারত সফরে—
শ্রীখগেন দে সরকার ৭৫৫, ৮৩৩, ৯১৩

—ল—

লাফা যাত্রা—শ্রীমোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় ১৫, ১২৩, ১৮৭, ২৬৫, ৩৪১, ৪২৩, ৫০৭, ৫৮৩, ৬৬৫, ৭৩৭, ৮২৯, ৯০৮, ৯৭৭
লিপিকা : তোমাকে (কবিতা)—শ্রীমৈত্রেয়ী দত্ত ... ৬৫০
লোহ প্রস্তরের দেশে—শ্রীপরিতোষ দত্ত ৫৯৩

—শ—

শ্রীরামদাসবাবাজী স্মরণে—শ্রীসরলাবালা সরকার ... ৫১৫

—স—

সংস্কৃত শিক্ষার প্রসার—শ্রীমাখনলাল গঙ্গোপাধ্যায় ... ৬০৯
সরে দাঁড়াও (কবিতা)—শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ... ১০২১
সাময়িক প্রসংগ—৫, ৮৫, ১৬৫, ২৩৭, ৩১৭, ৩৯৭, ৪৭৭, ৫৫৭, ৬৩৭, ৭১৭, ৭৯৭, ৮৭৭, ৯৫৭
সাংগীতিকী—রত্নাকর ৪১, ১৭৮, ৩৩৬, ৪৯৪, ৬৯৫, ৮৫১, ১০০৫
সাপ্তাহিক সংবাদ—৮০, ১৬০, ২৩২, ৩১২, ৩৯২, ৪৭২, ৫৫২, ৬৩২, ৭১২, ৭৯২, ৮৭২, ৯৫২, ১০৩০
সায়াহ্ন যূথিকা—শ্রীশচীন ভৌমিক ৩৫৪
সুভাষচন্দ্রের ছাত্রজীবন—শ্রীসুবোধচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ... ৮৮৩
সে-আমার দেশ (কবিতা)—শ্রীঅজিত মুখোপাধ্যায় ... ৮৫৬
সোভিয়েট সংস্কৃতির নবরূপ—শ্রীনরেন্দ্র দেব ... ২৫৩
সোনার মেয়ে (কবিতা)—শ্রীসুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায় ... ৩৮২
স্বর্ণমারীচ (কবিতা)—শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্তী ... ৪৪৪
স্বপ্ন সঞ্চারিণী (কবিতা)—শ্রীশোভন সোম ... ৬১৫

—হ—

হয়ত পরী-ই (কবিতা)—শ্রীসুরজিৎ দাশগুপ্ত ... ৬১৫
হ্যালডর কিলজান ল্যাক্সনেস—শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ৯৫
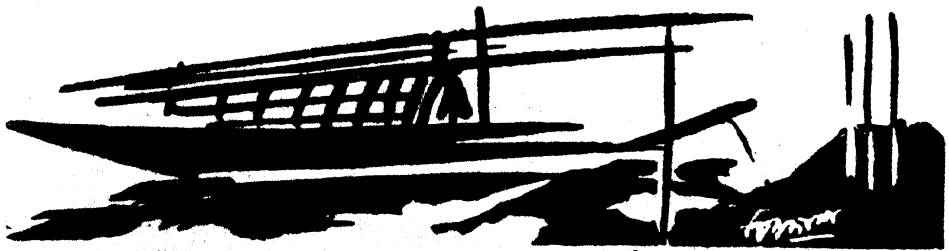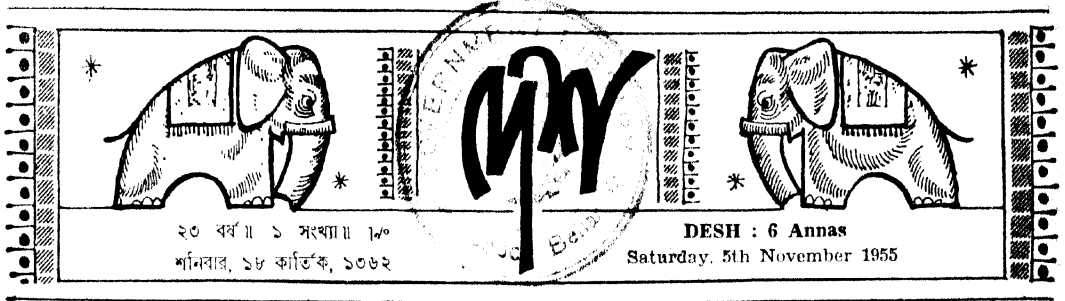
সম্পাদক—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন

সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

বিজয়ার অভিবাদন

শারদীয় মহাপূজার অবসানে আমরা আমাদের পাঠক-পাঠিকা, গ্রাহক-অনুগ্রাহক এবং পৃষ্ঠপোষকবর্গকে আমাদের বিজয়ার অভিবাদন জ্ঞাপন করিতেছি। যাঁহারা আমাদের, মিত্র আমাদের পথের যাঁহারা সহায়, তাঁহাদিগকে আমাদের নমস্কার। কর্তব্যের অনুরোধে যাঁহাদের কার্যের বিরুদ্ধে সমালোচনা করিতে আমরা বাধ্য হইয়াছি, তাঁহারাও আমাদের পর নহেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁহারাও আমাদের কর্তব্য সম্পাদনে সহায়তাই করিয়াছেন, এই উপলক্ষে তাঁহাদিগকেও আমরা নমস্কার নিবেদন করিতেছি। তাঁহাদের সকলের সহযোগিতায় আমাদের যাত্রা শুভ হোক্, মঙ্গলময় হোক্।

আমাদের নববর্ষ

'দেশ' দ্বাবিংশতি বর্ষ অতিক্রম করিয়া ত্রয়োবিংশতি বর্ষে পদার্পণ করিল। এ দেশের সাময়িক পত্রের পক্ষে জীবনের এই পরিমিতি নিতান্ত সামান্য নহে। এ সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে গেলে অতীতের নানা স্মৃতি আমাদের মনে উদিত হয়। পরাধীনতার প্রতিকূল প্রতিবেশের মধ্যে 'দেশে'র জীবন-যাত্রা শুরু হয়। বহু-বিধ বিঘ্ন এবং বিপর্যয়ের ভিতর দিয়া 'দেশে'র সেবায় আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইয়াছে। বিদেশী রাজশক্তির বিদ্যুৎবজ্র মুহুর্মুহু আমাদের মাথার উপর গর্জিয়া উঠিয়াছে এবং আমাদের গতিপথ রুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছে। কতই কঠোর সেদিনের সেই অগ্নিপরীক্ষা। কিন্তু 'দেশে'র প্রবর্তনমূলে স্বদেশ-প্রেমের যে আগ্নেয় বীর্য সঞ্চারিত ছিল, তাহা আমাদের অন্তরে অবিরত শক্তি দিয়াছে। আমাদের মনে সাহস জাগাইয়াছে। সেই বলেই আমরা প্রবল প্রতিকূল প্রতিবেশের মধ্যে নিজে-দের কর্তব্য প্রতিপালনে সামর্থ্য লাভ করিয়াছি। আমাদের পরম সৌভাগ্য এই যে, আমাদের কাজে আমরা দেশ-বাসীর অকুণ্ঠ সহযোগিতা পাইয়াছি। দেশবাসীর সেই প্রগাঢ় প্রীতি এবং অনুভূতি আমাদের পক্ষে প্রধান সম্বল স্বরূপে কাজ করিয়াছে। আমাদের নিজেদের ক্ষমতা অতি সামান্য এবং সীমাবদ্ধ। আমরা সে সত্য মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়া থাকি। প্রকৃতপক্ষে দেশ-বাসীর প্রাণের টানেই 'দেশে'র ক্রমবর্ধমান উন্নতি সম্ভব হইয়াছে। 'দেশ' বর্তমানে সাময়িকপত্রসমূহের মধ্যে যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে 'দেশে'র প্রতি দেশবাসীর দরদই ইহার কারণ। যেখানে বাঙালী, সেখানেই 'দেশ'। বাঙলার সংস্কৃতির ক্ষেত্রে 'দেশে'র এই প্রভাবে বাঙালী সমাজ সর্বত্র 'দেশ'কে প্রাণের কতটা নিবিড় সম্বন্ধে আপন করিয়া লইয়াছে, ইহাতেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। নববর্ষের প্রারম্ভে আমাদের প্রতি দেশবাসীর এই একান্ত এবং অত্যন্ত প্রীতিকে আমরা অভিনন্দন করিতেছি। আমরা দেশবাসী সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা অন্তরে লইয়া শ্রদ্ধিত চিত্তে এবং সশ্রদ্ধ-ভাবে আমাদের উপর ন্যস্ত কর্তব্য প্রতি-পালনে অগ্রসর হইতেছি। দেশবাসী সকলের কল্যাণেচ্ছা আমাদের যাত্রাপথ সুগম করুক—ইহাই প্রার্থনা।

বাস্তুত্যাগ বন্ধের উপায়

পূর্ববঙ্গ হইতে উদ্বাস্তুদের সমাগম বন্ধ করিবার উপায়স্বরূপে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় পূর্ববঙ্গ সফরে যাইবেন, ইহাই প্রস্তাবিত হইয়াছে। ডাঃ রায়ও ইহার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। পূর্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর সহিত ডাঃ রায় পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল পরিদর্শন করিবেন, পশ্চিমবঙ্গের পুনর্বাসন সচিব এবং পূর্ববঙ্গের হিন্দু মন্ত্রীরাও তাঁহাদের সঙ্গে থাকিবেন। এই প্রস্তাবে আপত্তির কোন কারণ অবশ্য নাই, কিন্তু এইভাবে সফরের ফলে পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মনে স্থায়ীভাবে আশ্বস্তির সঞ্চার হইবে এবং বাস্তুত্যাগ বন্ধ হইবে, আমাদের এমন আশা নাই। কারণ পূর্ববঙ্গের হিন্দু সম্প্রদায় যে কারণে বাস্তুত্যাগ করিতেছেন, তাহার কারণ পাকিস্থানের মৌলিক নীতির সঙ্গে জড়িত রহিয়াছে এবং সেই কারণ দূরীভূত না হইলে বাস্তুত্যাগ বন্ধ হইবে, এমন আশা করা যায় না। এই সম্বন্ধে পাকিস্থানের সংখ্যালঘু বিভাগের ভার-প্রাপ্ত মন্ত্রী মিঃ নুরুল হক চৌধুরী

...তি কলিকাতায় সাংবাদিকদের নিকট যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন বা যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা শুধু যে অযৌক্তিক ইহাই নয়, পরন্তু একান্তই উৎকট। তিনি বলিয়াছেন যে, পূর্ববঙ্গ হইতে উদ্বাস্তুদের পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ না করিতে দেওয়াই উদ্বাস্তু সমাগম বন্ধ করিবার একমাত্র উপায়। পাকিস্থানের শাসকদের এই ধরনের উক্তি নূতন নহে। তাঁহারা ইতঃপূর্বেও উদ্বাস্তু সমাগমের দায়িত্ব পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উপর চাপাইয়াছেন এবং স্পষ্টভাষাতেই এমন কথা বলিয়াছেন যে, ভারত সরকারের পুনর্বাসন ব্যবস্থায় প্রলুব্ধ হইয়াই দলে দলে হিন্দু পৈতৃক ভিটামাটি ছাড়িয়া ভারতের দিকে ছুটিতেছে। তাঁহারা সোজা এই সত্যটি স্বীকার করিতে চাহিতেছেন না যে, অর্থনৈতিক জীবন যেখানে অনিশ্চিত, রাজনৈতিক জীবনে যেখানে পরাধীনতা এবং একান্তভাবে পরমুখাপেক্ষিতা, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সাধনার ক্ষেত্রে ব্যষ্টি এবং সমষ্টি জীবন বিকাশের সকল পথ যেখানে অবরুদ্ধ, সমাজবদ্ধ জীব মানুষের পক্ষে সেখানে বসবাস করা অসম্ভব। যতদিন পর্যন্ত পাকিস্থান সরকার এই সহজ সত্যটি স্বীকার না করিতেছেন এবং উহা মানিয়া না লইতেছেন যে, ভারত সরকার পাকিস্থান সরকারেরই অনুষ্ঠিত পাপের ভারে বর্তমানে প্রপীড়িত, ততদিন এই সমস্যার সমাধান ঘটিবে বলিয়া আশা করা যায় না।

বর্তমান যুগের সমস্যা

সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে ভারতীয় শিল্পমেলার উদ্বোধন উপলক্ষে প্রধান মন্ত্রী পন্ডিত জওহরলাল নেহরু বর্তমান যুগের পরিস্থিতি এবং তৎসম্পর্কে মানবসংস্কৃতির পরিণতি সম্বন্ধে সংক্ষেপে কয়েকটি সার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে বিজ্ঞানের সহায়তায় মানুষ বর্তমানে তাহার সমস্ত প্রকার পার্থিব প্রয়োজন মিটাইতে পারে; সুতরাং এই যুগ প্রাচুর্যের যুগ, এবং প্রাচুর্যের মধ্যেই আমাদের বাস করা উচিত। কিন্তু মানুষের এতই যখন প্রাচুর্য, তখন জাতিতে জাতিতে মানুষে মানুষে দ্বন্দ্ব কেন? ভারতের প্রধান মন্ত্রী বিশ্বের দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় এই প্রতিবেশ উপলব্ধি করিয়া বিস্মিত হইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, অস্ত্রসজ্জা বা অনুরূপ ব্যাপার পরিহার করিয়া শান্তিপূর্ণ কাজে যদি পৃথিবীর সমস্ত মনুষের মনোবৃত্তি ও সম্পদ নিযুক্ত করা যায়, তাহা হইলে মানবজাতির কতই না কল্যাণ সাধিত হইতে পারে! প্রধান মন্ত্রী যাহা বলিয়াছেন, তাহা খুবই সত্য; কিন্তু প্রাচুর্যের এই যুগে প্রধানমন্ত্রী যাহাকে বন্যপশুর বৃত্তি বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন, সেই পশুপ্রবৃত্তিই উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিয়াছে, ইহা তো চারিদিকেই দেখা যাইতেছে। সুতরাং একথা স্বীকার করিতেই হয় যে, ব্যবহারিক জীবনে সুখসম্ভোগের প্রাচুর্যই মনুষ্যত্বের বীর্য প্রদীপ্ত করিবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। পক্ষান্তরে সেই প্রাচুর্য মনোধর্মের দিক হইতে মানুষের অবীর্যেরই হেতুভূত হইয়া থাকে। মানুষ যদি অন্তরের মহিমায় জাগ্রত না হয়, তবে বৈজ্ঞানিক যুগের এই প্রাচুর্য বিশ্ব-মানবসমাজের সমস্যা দূরীকরণে সমর্থ হইবে না এবং প্রাচুর্যের মাপে মানুষ হিসাবে মানুষের কোন লাভ হইবে না। বৈজ্ঞানিক সাধনা আজ মানব-সংস্কৃতির এই সংকট সন্ধিক্ষণে আসিয়া পড়িয়াছে। ভারত এই সংকট অতিক্রম করিবার পক্ষে কোন্ পথ প্রদর্শন করিবে, ইহাই বর্তমানে প্রধান প্রশ্ন। এইদিক হইতে স্বাধীন ভারতের দায়িত্ব সম্বন্ধে বিশেষভাবে বিচার-বিবেচনা করিবার সময় আসিয়াছে।

কানাডা বাঁধ

গত ১লা নবেম্বর কানাডার পররাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ লিস্টার পিয়ার্সন সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত ম্যাসাঞ্জোর বাঁধের উদ্বোধন করিয়াছেন। এই বাঁধ উদ্বোধিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা কার্যে পরিণত হইল। এই পরিকল্পনা কার্যে পরিণত হইবার ফলে বীরভূম জেলার ব্যাপক অঞ্চল ও মুর্শিদাবাদ ও বর্ধমান জেলার কয়েকটি অঞ্চলে জল সেচেরে ব্যবস্থা সুনিশ্চিত হইল। এই পরিকল্পনা সম্পর্কিত অপর কয়েকটি বাঁধের কাজ ইতঃপূর্বেই সম্পন্ন হইয়া গিয়াছিল। ময়ূরাক্ষী নদীতে বর্ষার সময় যে জল সঞ্চারিত হইয়া থাকে, তাহা যোল আনা জমির সমৃদ্ধি সাধনে সার্থকতা লাভ করে না; বন্যার আকারে এই জল প্রবল বেগে প্রবাহিত হইয়া অপচয়িত হয় এবং কোন সময় লোকের দুঃখদুর্দশার কারণ সৃষ্টি করে। ম্যাসাঞ্জোরের ৩০ বর্গমাইল বিস্তৃত কৃত্রিম হ্রদে ময়ূরাক্ষীর জল সঞ্চিত এবং সেখান হইতে নিয়ন্ত্রিত হওয়াতে সে আশংকা দূরীভূত হইল। কানাডার পররাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারী কর্তৃক এই বাঁধটির উদ্বোধন জগতের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার। অনেকেই হয়ত জানেন না যে, এই পরিকল্পনা সম্পন্ন করিবার পক্ষে কানাডার অর্থসাহায্য বিশেষভাবে আনুকূল্য বিধান করিয়াছে। কানাডার কৃষকদের প্রদত্ত গম বিক্রয় করিয়া ভারত সরকার যে টাকা পাইয়াছেন, তাঁহারা সেই টাকা এই বাঁধের নির্মাণকার্যে ব্যয় করিয়াছেন। কানাডার নামে বাঁধটির নামকরণ করিয়া ভারত সরকার মারণাস্ত্র সংগ্রহে উন্মত্ত শক্তি-গোষ্ঠীর প্রতিযোগিতার বর্তমান সংকট-জনক পরিস্থিতিতে মানব-মৈত্রীর আদর্শকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন। পারস্পরিক জিঘাংসার প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া জগতের বিভিন্ন শক্তি কানাডার আদর্শ অনুসরণ করিয়া যদি বিশ্বমানবের সেবার জন্য নিজের শক্তি এবং সম্পদ নিযুক্ত করিতেন তবে বিশ্বের মানবসংস্কৃতিতে সত্যই নূতন যুগ আসিত।
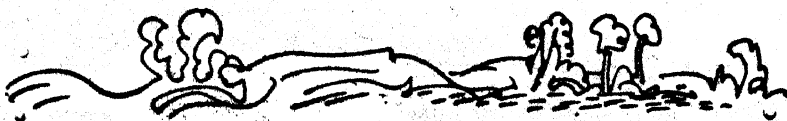
গত জুলাই মাসে জেনেভায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট এবং সোভিয়েট, বৃটিশ ও ফরাসী প্রধানমন্ত্রীরা মিলিত হয়েছিলেন। সোভিয়েট ব্লক এবং পশ্চিমা শক্তিদের মধ্যে বিরোধের বিষয়-সমূহে সম্বন্ধে—যথা ইউরোপের নিরাপত্তা, জার্মানীর ভবিষ্যৎ, অস্ত্রসজ্জার হ্রাস—দুই পক্ষের মত বিনিময় হয়। বলা বাহুল্য, কোনো প্রশ্নেরই মীমাংসা হয় না, হবে বলে বুদ্ধিমান লোকেরা আশাও করেননি। কিন্তু বৃহৎ চতুঃশক্তির বড়ো কর্তারা যে এক বৈঠকে মিলিত হলেন, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির স্বাস্থ্যের দিক থেকে এইটেই একটা বড়ো লাভ বলে বিবেচিত হয়েছিল। এই ব্লকের চাঁইদের মধ্যে সাক্ষাতে সমরের অর্থাৎ বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা যে কমে গিয়েছে, জেনেভা বৈঠকের দ্বারা এটা প্রমাণিত হয়। জেনেভা বৈঠকের ফলে যুদ্ধের সম্ভাবনা কমেছে তা নয়, যুদ্ধের সম্ভাবনা পূর্বেই কমে গিয়েছিল বলেই জেনেভার বৈঠক সম্ভব হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে অ্যাটম ও হাই-ড্রোজেন বোমার অধিকারী শক্তিদের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধলে যে দুই পক্ষই খতম হবার সম্ভাবনা আছে, এই ভয়ই আপাতত বড়ো যুদ্ধের সম্ভাবনা হ্রাসের কারণ। কিন্তু বড়ো যুদ্ধ লাগাতে কোনো পক্ষেরই উৎসাহ না থাকলেও বড়ো যুদ্ধ লাগলে যাতে বেকায়দায় পড়তে না হয়, তার জন্য উভয় পক্ষই প্রস্তুত থাকতে চায়। যদিও একথাও অনেকে বুঝছে যে, হাইড্রোজেন বোমার যুদ্ধ হলে কায়দা-বেকায়দার কম-বেশির উপর ফলাফলের পার্থক্য বিশেষ হবে না। কারণ যে-বিষের একমাত্রাই যথেষ্ট, তার একমাত্রা প্রয়োগেও যে-ফল হবে, তিন মাত্রা একসঙ্গে প্রয়োগ করলেও সেই ফলই পাওয়া যাবে—মরণং ধ্রুবম্। তবু মারণাস্ত্রের প্রস্তুতি চলেছে এবং চলবে কিন্তু অস্ত্রের অধিকারীরা অস্ত্রকে ভয় করতে আরম্ভ করেছে। সুতরাং অস্ত্রের প্রয়োগ সহসা হবে না, ইতিমধ্যে কূট-নৈতিক চাপ দ্বারা যে-যতটা পারে নিজের প্রভাবের ক্ষেত্র বাড়িয়ে নেবার চেষ্টা চলবে, চলছে।

জুলাই মাসে বড়ো কর্তাদের বৈঠকে কোনো বিষয়েই মতের ঐক্য স্থাপিত না হলেও স্থির হয়েছিল যে, ইউরোপের নিরাপত্তা, অস্ত্রসজ্জার হ্রাস, জার্মানীর ঐক্যসাধন প্রভৃতি সমস্যা সম্বন্ধে উভয় পক্ষের প্রস্তাবাদির বিস্তৃত আলোচনা চতুঃশক্তির পররাষ্ট্র সচিবগণের মধ্যে চলতে থাকবে এবং তাঁরা অক্টোবর মাসে মিলিত হয়ে মীমাংসার চেষ্টা করবেন। তদনুসারে ২৭শে অক্টোবর থেকে জেনেভায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট, বৃটেন ও ফ্রান্সের পররাষ্ট্র সচিবগণের কনফারেন্স আরম্ভ হয়েছে। যথারীতি বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে দুই পক্ষ আলাদা আলাদা প্রস্তাব উপস্থিত করেছে। এখন কয়েক দিন ধরে বাদানুবাদ চলবে, কোনো প্রশ্নেরই যে উভয়-পক্ষ-সম্মত কোনো মীমাংসা হবে, সে সম্ভাবনা অল্প।

কিন্তু তাই বলে পরিস্থিতি যে নিশ্চল হয়ে রয়েছে তাও নয়। সুবিধা-অসুবিধা কোনো বিষয়ে কোনো পক্ষের কমছে, কোনো পক্ষের বাড়ছে। গত তিন চার মাসের মধ্যে রাশিয়া বেশ কিছুটা সুবিধা বাগিয়েছে। বিশেষ করে জার্মানীর সম্পর্কে যার ফলে পশ্চিম জার্মানীর সঙ্গে NATO'র যোগ অধিকতর বিপন্ন হয়েছে। পশ্চিমা শক্তিদের বরাবর চেষ্টা হচ্ছে পশ্চিম জার্মানীর সঙ্গে NATO'র যোগ বজায় রেখে জার্মানীর ঐক্যসাধন ঘটানো। *তারা বলে, পুনর্যুক্ত জার্মানীকে ইচ্ছামতো তার পররাষ্ট্র নীতি চালাতে দিতে তারা প্রস্তুত অর্থাৎ পুনর্যুক্ত জার্মানী যদি NATO'র বন্ধন ছিন্ন করতে চায়, তবে তাও সে করতে পারবে। কিন্তু জার্মানীর ঐক্য সাধনের প্রণালী সম্বন্ধে পশ্চিমা শক্তিদের যে প্রস্তাব* তদনুসারে যদি জার্মানীর ঐক্য সাধন সংঘটিত হয়, তবে জার্মানী পশ্চিমা শক্তিদের দলভুক্ত হবে। এইটাই পশ্চিমা শক্তিদের আশা এবং সোভিয়েটের আশঙ্কা। পশ্চিমা শক্তিদের প্রস্তাব হচ্ছে, সারা জার্মানীতে চতুঃশক্তির তদারকে 'স্বাধীন' ইলেকশন হয়ে এক গবর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হোক। তারা আশা করে, এই-রকম ইলেকশন হলে কম্যুনিস্টরা পাত্তা পাবে না।

রাশিয়া বলে, পূর্ব এবং পশ্চিম জার্মানীর দুই গভর্নমেণ্ট একসঙ্গে ইলেকশনের ব্যবস্থা করুক। পূর্ব জার্মানীর কম্যুনিস্ট গবর্নমেণ্টকে কর্তৃত্বের অংশ না দিয়ে কোনো ব্যবস্থাই করতে দিতে রাশিয়া রাজি নয়। ভবিষ্যৎ জার্মানী পশ্চিমা শক্তিদের দলে যাবে না, অন্ততঃ নিরপেক্ষ থাকবে এবং রাশিয়ার বিরুদ্ধে যাবে না, এটা নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত রাশিয়া পূর্ব জার্মানীকে মুঠোর বার হতে দিতে রাজী নয়। সুতরাং রাশিয়া চাচ্ছে আগে ইউরোপীয় নিরাপত্তার প্রশ্নের মীমাংসা হোক অর্থাৎ ভবিষ্যৎ চিরে জার্মানীর স্থান নির্ণীত হোক, তারপর জার্মানীকে এক করার ব্যবস্থা হোক, যতদিন ভবিষ্যৎ জার্মানীর নিরপেক্ষতার গ্যারাণ্টি না পাওয়া যায়, ততদিন পূর্ব জার্মান গভর্নমেণ্টের অস্তিত্ব বজায় রাখতে হবে।

বস্তুত পূর্ব জার্মান গভর্নমেণ্টের মর্যাদা যাতে বৃদ্ধি পায়, তার জন্য রুশিয়ার চেষ্টার বিরাম নাই। জার্মানীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চতুঃশক্তির আলোচনার মধ্যেও রাশিয়া উভয় জার্মানীর গবর্নমেণ্টের প্রতিনিধিদের স্থান দিতে প্রস্তুত, কারণ তাতে পূর্ব জার্মান গবর্নমেণ্টের অস্তিত্ব ও মর্যাদার স্বীকৃতি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দৃঢ় হবে। সোভিয়েট গবর্নমেণ্ট পশ্চিম জার্মানীর চ্যান্সেলার *অ্যাদেনুয়েরকে মস্কোতে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়েছিলেন। ফলে যে আদানপ্রদান হয়েছে তা সোভিয়েট গভর্নমেণ্টের নীতির পরিপোষক হবে। সোভিয়েট গভর্নমেণ্ট এবং পশ্চিম জার্মান গভর্নমেণ্টের মধ্যে রাষ্ট্রদূত বিনিময়ের প্রস্তাব স্বীকৃত হয়েছে। বলা বাহুল্য, এটা পশ্চিমা শক্তিদের আদৌ ভালো* লাগেনি। কিন্তু এবিষয়ে অ্যাদেনুয়েরকে নিবারণ করাও সম্ভব ছিল না এবং যদিও সোভিয়েট গভর্নমেণ্টের সঙ্গে এই ব্যবস্থার ফলে অ্যাদেনুয়েরকে প্রকারান্তরে পূর্ব জার্মান গবর্নমেণ্টকে স্বীকার করে নিতে হোল (কারণ রাশিয়া পরিষ্কার করে দিয়েছে যে, তার নিকট পূর্ব জার্মান গবর্নমেণ্টের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকবে), তাহলেও অ্যাদেনুয়েরের পক্ষেও অন্যরূপ করার উপায় ছিল না। রাশিয়ার সঙ্গে পশ্চিম জার্মানীর যে লেনদেনের প্রস্তাব হয়েছে, তাতে ব্যবসা বাণিজ্যের দিক দিয়ে পশ্চিম জার্মানীর লাভবান হবার সম্ভাবনা আছে। তাছাড়া রাশিয়াতে যেসব জার্মান যুদ্ধবন্দী ছিল, তাদের অনেকগুলিকে (অবশ্য যারা জীবিত আছে) রাশিয়া জার্মানীতে ফেরৎ পাঠাতে রাজী হয়। কোনো রকমেই এটা প্রত্যাখ্যান করা অ্যাদেনুয়েরের পক্ষে সম্ভব ছিল না, নিজের মন এবং জার্মান লোকমত কোনটাই তা মানত না।

পশ্চিমা শক্তিরা ভয় পাচ্ছে যে, এখন থেকে পশ্চিম জার্মানীর রাজধানী বনএ বসে রুশ রাষ্ট্রদূত পশ্চিমা শক্তিদের প্রতি জার্মান মনোভাব প্রতিকূল করার জন্য নানারকম কৌশল বিস্তারের সুযোগ পাবেন। পশ্চিমা শক্তিদের চেষ্টা হবে জার্মানদের বুঝানো যে, তারা চায় যে, স্বাধীনভাবে জার্মানী পুনর্যুক্ত হোক এবং পুনর্যুক্ত হয়ে জার্মানী যেমন খুশি তার বৈদেশিক নীতি চালাক। কিন্তু জার্মানরা জানে যে, জার্মানীর কাম্য-বস্তুর বেশির ভাগ রয়েছে রাশিয়ার হাতে। জার্মানী থেকে খসিয়ে যেসব যায়গা পোলাণ্ড এবং চেকোস্লোভাকিয়াকে দেওয়া হয়েছে, তার কিছু কিছু প্রত্যর্পণও সোভিয়েট রাশিয়ার ইচ্ছা হলেই সম্ভব। সোভিয়েটের ইচ্ছা না হলে বিনা যুদ্ধে কিছু হবার নয়, *কিন্তু জার্মানীর পক্ষে যুদ্ধ করার চিন্তাও এখন সম্ভব নয় এবং পশ্চিমা শক্তিরাও জার্মানীর অঙ্গহানি (যে অঙ্গহানি পশ্চিমা শক্তিরা সোভিয়েটের সঙ্গে মিলে করেছিল) দূর করার জন্য সোভিয়েটের সঙ্গে যুদ্ধে নামবে না।* তাছাড়া পশ্চিমা শক্তিরাও জার্মানীকে বেশি বাড় বাড়তে দিতে চায় না। জার্মানদের সম্পর্কে ফ্রান্সের ভয় এবং বৃটেনের সন্দেহ গোপন ব্যাপার নয়, রাশিয়া তার সুযোগ নিতে সর্বদাই প্রস্তুত। এ অবস্থায় রাশিয়া যদি জার্মানদের বলতে থাকে যে, পূর্ব ও পশ্চিম জার্মান গবর্নমেণ্ট একসঙ্গে হয়ে কথাবার্তা কয়ে একযোগে কাজ করলেই জার্মানীর ঐক্যসাধন হতে পারে, তবে পশ্চিমা শক্তিদের বর্তমান নীতি রক্ষায় জার্মান লোকমতকে স্বপক্ষে রাখা দুষ্কর হবে।

পশ্চিম জার্মান পার্লামেণ্ট কর্তৃক 'প্যারিস চুক্তিসমূহ' অনুমোদিত হয়েছে বটে, কিন্তু অল্প ভোটাধিক্যে। জার্মানী কোনোপক্ষের সঙ্গে সামরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হব না—এই মতের পক্ষে অনেক লোক। প্রধান বিরোধী দল—সোশ্যাল ডেমোক্রাটরা—কম্যুনিস্ট ব্লকের প্রভাব থেকে জার্মানীকে মুক্ত রাখতে চাইলেও তারা NATOর সহিত সংযোগের বিরোধী। সুতরাং 'প্যারিস চুক্তিসমূহের' দ্বারা ভবিষ্যৎ স্থিরীকৃত হয়ে গেছে, এরূপ মনে করা ভুল হবে।

তোমাকে চিঠি

প্রেমেন্দ্র মিত্র

শুনেছি, পেয়েছ নাকি নিভৃতির দুর্গ সুদুর্গম
শান্ত এক নির্জনতা
—ফিস্ ফিস্ বন-ঝাউ কাঁপা
পড়-পড় পাহাড়ের কোল-আঁকড়ানো
আঁকাবাঁকা চড়াই-এর পথে
হঠাৎ শূন্যতা মেলে-ধরা।

দিন সেথা দিগন্ত-উদাসী
রাত সব নক্ষত্র-বিলাস।

ডাকো যদি,
যেতে পারি পার হয়ে দুর্লঙ্ঘ্য পরিখা,
শেষ চূড়া-সোপানে আসীন
নিতে পারি একবার
তোমার তৃপ্তির স্বাদ।

ভয় হয় শুধু
তোমার আমার প্রিয়-তারা
যদি ভিন্ন হয়,
দুজনায় অন্য নামে ডাকে!

তুমি আমি দুজনেই
চোরাবালি-মগ্ন স্বপ্ন জেনেছি অনেক
বানচাল সংকল্পের
একই ঘাটে হল ভরাডুবি।
তবু ছুটি নিতে পারি কই?
ফিরে ফিরে খেয়া বাই হাটে।

এত ভিড় কিলবিল ক্ষুধা ভয় অন্ধতা তাড়িত
এত গোল, দিশাহারা ধূলিধূম্র আকাশ বধির
জর্জর হৃদয় তবু কী বিশ্বাসে সব কিছু সয়?
হিজিবিজি এ-প্রলাপ—এরও হবে প্রাঞ্জল অন্বয়।

পত্রাবলী

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[কনিষ্ঠ জামাতা নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত। নগেন্দ্রনাথের কন্যা শ্রীমতী নন্দিতা কৃপালনীর সৌজন্যে প্রাপ্ত। বিশ্বভারতীর অনুমতিক্রমে মুদ্রিত]

নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

এই চিঠিগুলির প্রসঙ্গে১ নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কিছু পরিচয়ও পাঠকদের গোচর করা আবশ্যক—দীর্ঘকাল তিনি বিদেশকেই কর্মক্ষেত্ররূপে স্বীকার করে নিয়েছিলেন, সেখানেই গত বৎসর তাঁর মৃত্যু হয়েছে (লন্ডন, ১ ফেব্রুয়ারী ১৯৫৪)—এইজন্য স্বদেশে তাঁর পরিচয় সর্বজনবিদিত নয়।

নগেন্দ্রনাথের জন্ম (২ নভেম্বর, ১৮৮৯) বরিশালে, তাঁর পিতা সেখানে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি ছিলেন। ১৯০৭ সালে রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা কন্যার সঙ্গে নগেন্দ্রনাথের বিবাহ হয় (২৩ জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৪), অতঃপর তিনি কৃষিবিদ্যাশিক্ষার্থ আমেরিকায় যান—ইতিপূর্বেই একই উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র রথীন্দ্রনাথ ও পুত্র-প্রতিম সন্তোষচন্দ্র, কবির প্রিয় সুহৃৎ শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের পুত্র, সেদেশে গিয়েছিলেন। পল্লীকে স্বাস্থ্যে শিক্ষায় স্বাচ্ছন্দ্যে উদ্‌বোধিত করে তুলতে পারলেই দেশে প্রকৃত স্বরাজ প্রতিষ্ঠা হতে পারে কেবল রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের চেষ্টা দ্বারা নয়, দীর্ঘকাল পূর্বেই এ ভাবনা রবীন্দ্রনাথের চিত্তকে অধিকার করেছিল এবং বারংবার তিনি একক চেষ্টাতেও সে চিন্তাকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কার্যে প্রয়োগ করার চেষ্টা করে-ছিলেন একথা রবীন্দ্র-জীবনের অধ্যবসায়ী আলোচকের কাছে সুবিদিত—তিনি বিশেষ করে যাঁদের কল্যাণ ইচ্ছা করতেন তাঁদেরও সেই পথে প্রবৃত্ত করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের এই প্রেরণা নগেন্দ্রনাথের মনকে বিশেষভাবেই উদ্‌বুদ্ধ করেছিল। তাঁর পক্ষে কৃষিবিদ্যাশিক্ষা একটা বৃত্তি-শিক্ষামাত্র হয়নি, কোন্ পথে পল্লী ও পল্লীবাসী কৃষিজীবীর স্থায়ী উন্নতি হতে পারে তার চিন্তায় তিনি দীর্ঘকাল ধরে নিজের মনকে একান্তভাবেই নিবিষ্ট করেছিলেন; কর্মের মধ্য দিয়ে তার পরীক্ষাও কিছু করেছিলেন এবং রচনা দ্বারা এ বিষয়ে তাঁর শিক্ষা, অভিজ্ঞতা ও মননের ফল প্রচার করেছিলেন, রয়াল এগ্রিকালচার কমিশনের (১৯২৬) সদস্য-পদে নির্বাচনে যার স্বীকৃতি। (এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, তিনি অনেক বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষিবিদ্যার অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত ছিলেন এবং ১৯২৯—৩১ সালে ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল অব এগ্রিকালচারাল রিসার্চ-এর সদস্য ছিলেন)।

"কৃষির উন্নতির দৃষ্টান্ত" আখ্যায় তিনি ১৩১৮ ও ১৩১৯ সালের তত্ত্বোধিনী পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের প্রবর্তনায় ধারাবাহিক যে প্রবন্ধাবলী লিখেছিলেন এই প্রসঙ্গে তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জাপান, আয়র্লণ্ড, ইংলণ্ড, ডেনমার্ক—পৃথিবীর কোন্ দেশে কৃষি-পদ্ধতি ও কৃষিজীবী কোন্ পথে নানা অন্তরায় অতিক্রম করে সুপ্রতিষ্ঠ হয়েছে, বাংলাদেশের সঙ্গে এই সকল দেশের অবস্থার মিলই বা কোথায়, কোথায় বৈষম্য, এইসব দেশে স্বীকৃত বিভিন্ন পন্থা বাংলাদেশে কতদূর স্বীকার্য এই সকল বিষয়ে তিনি এই প্রবন্ধাবলীতে আলোচনা করেছিলেন—চল্লিশ বৎসরেরও উর্ধ্বকাল পূর্বে, অন্য দেশের পরি-প্রেক্ষিতে এদেশের সমস্যার আলোচনা তেমন সুলভ ছিল না।

তারপর অসহযোগ আন্দোলনের সময় রবীন্দ্রনাথ শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠা করলেন; নগেন্দ্রনাথও এই সময় প্রবাসী বঙ্গবাণী প্রভৃতি পত্রিকায় নূতন করে পল্লীসংস্কারের আদর্শ প্রচার করতে প্রবৃত্ত হন, একটি 'কর্মীসংঘ' প্রতিষ্ঠা করে হাতে-কলমে কিছু কাজও করে-ছিলেন। 'কর্মী' নামে একখানি পত্রিকাও তিনি এই সময় প্রকাশ করেন।

রবীন্দ্রনাথের এই পল্লীসংস্কারের আদর্শ মূলত সমবায় তত্ত্বের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, এবং তাতে তিনি সমর্থন পেয়েছিলেন আয়র্লণ্ডের দৃষ্টান্তে, হোরেস প্লাঙ্কেটের কীর্তিতে ও কবি ও কর্মবীর এ. ই.-র রচনায়। এই আদর্শকেই নগেন্দ্রনাথ যথাসাধ্য প্রচার করেছিলেন। তাঁর এই সকল রচনা তাঁর "জাতীয় ভিত্তি" (১৩৩৮) গ্রন্থে সংকলিত হয়েছিল।

পল্লীসংস্কারের ভূমিকারূপে নগেন্দ্র-নাথ পল্লী-জীবন সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করবার জন্য যে প্রশ্নাবলী এক সময় রচনা ও প্রচার করেন তা এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই প্রশ্নাবলীতে মোট ১৯৪টি প্রশ্ন ছিল, গ্রামের ভৌগোলিক তথ্য, জনসংখ্যা, জমি, জমি-বিলি, খাজনা, কৃষি ও কৃষিপ্রণালী, গোরুবাছুর, ব্যবসা, অন্নবস্ত্র সমস্যা, আর্থিক অবস্থা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সামাজিক তথ্য, শাসনব্যবস্থা প্রভৃতি সম্বন্ধে [illegible] বিস্তারিত প্রশ্নসূচীর সম্যক্ উত্তর [illegible] কোনো গ্রামকে কেন্দ্র ক'রে জানতে [illegible] করবেন সেই গ্রামের সঙ্গে তাঁর [illegible] মাত্রও অপরিচয় থাকবে না, এবং [illegible] তিনি যদি সেই পল্লীর হিতসাধনে [illegible] হন তবে কর্তব্য পালনে তাঁর [illegible] দৃষ্টিরও অভাব ঘটবে না এবং [illegible] সমাধানে দিক্‌নির্ণয় করতেও তাঁর [illegible] হবার কথা নয়।

পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনীর [illegible] থেকে—তার পূর্ব থেকেও—রবীন্দ্র[illegible]

---

১ তিনখানি চিঠি ১৩৬২ শারদীয়া সংখ্যায় [illegible]

দেশের সম্বন্ধে এই তথ্যাহরণের একান্ত প্রয়োজনের কথা বলে এসেছেন—"প্রথমে সমস্ত প্রদেশের সকল প্রকার তথ্য সম্পূর্ণরূপে সংগ্রহ করিবে—কারণ কর্মের ভূমিকাই জ্ঞান। যেখানে কাজ করিতে হইবে সর্বাগ্রে তাহার সমস্ত অবস্থা জানা চাই।"—তিনিই এই প্রশ্নাবলীর ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন, দুষ্প্রাপ্যবোধে সেটি উদ্ধৃত হল—

"দেশের সেবা সত্যভাবে করতে হবে, এই উৎসাহ সৌভাগ্যক্রমে আজ বাঙালী যুবকের মনকে বিচলিত করেছে। প্রখর উত্তেজনাতপ্ত বাক্যের মরীচিকারূপে তাঁরা দেশের মূর্তি দেখতে চান না, দেশের যেখানে ক্ষুধা তৃষ্ণা বেদনা, যেখান থেকে দেশ প্রাণ দেয় এবং প্রাণ দাবি করে সেই পল্লীনিকেতনে দেশের বাস্তব সত্তাকে প্রত্যক্ষ করবার ইচ্ছা জেগেছে।

"সেবার দ্বারাতেই প্রীতি সার্থক হয়। পল্লীর ক্ষীণ প্রাণকে পূর্ণ করে দেওয়ার দ্বারাই আজ আমাদের দেশসেবা সত্য হবে এই কথাটি দেশের যুবকদের মনে লেগেছে ব'লে বোধ করছি। কাজের ক্ষেত্রটি কোথায় তা তাঁরা বুঝেছেন। এমন শুভ অবসর ব্যর্থ হবে যদি কাজের ক্ষেত্র সম্বন্ধে আমাদের পরিচয় অস্পষ্ট ও আনুমানিক হয়। দুর্গতির কারণ-গুলি সম্পূর্ণভাবে ও যথাযথভাবে জানতে হবে।

"এই জানার কাজটি উত্তেজনার কাজ নয়, অভিনিবেশের কাজ। এতে মাদকতা নেই, সাধনা আছে। এজন্য এ কাজ কঠিন। এই কঠিন কাজের অপেক্ষা বহুদিন ছিল কিন্তু মন প্রস্তুত ছিল না। আজ মন জেগেছে, তাই আশা করি দেশের সত্য আবেদন ব্যর্থ হবে না, চিত্তবিক্ষেপের দ্বারা শক্তির অপব্যয় হবে না।

"উদ্যোগপর্বের আরম্ভে সন্ধানের কাজ। আজকের দিনে সন্ধানের দ্বারা তিনি কাজের পথকে পরিষ্কৃত করে দেবেন, কালকের দিনের মহাসিন্ধি তাঁকে সাম্রাজ্যে পুরস্কৃত করবে। কিন্তু তাঁর সবচেয়ে বড় পুরস্কার এই যে, দেশ-জনের মধ্যে তাঁর দেশপ্রীতি প্রতিদিনই আপন আশ্রয় বিস্তার করতে থাকবে, যে অজ্ঞান-আবরণের অন্তরালে ... কাছে থেকেও তাঁর পক্ষে বহু দূরে সেই আবরণ তাঁর প্রতি মুহূর্তের প্রয়াসে অপসারিত হতে থাকবে। বিশ্বকর্মা তাঁর দৃষ্টিতে শক্তি দিন, তাঁর অধ্যবসায়কে মোহমুক্ত করুন, তাঁর সাধনায় দেশের ভাবী সার্থকতার পথ প্রশস্ত হোক।"

১৯৩২ সাল থেকে তিনি স্থায়ীভাবে লণ্ডন বসবাস করতে থাকেন। অতঃপর দেশের কাজের সঙ্গে তাঁর আর প্রত্যক্ষ যোগ না থাকলেও তিনি ভারতবর্ষের পল্লীর উন্নতি সম্বন্ধে গ্রন্থাদি লিখে এ বিষয়ে প্রচার করতে থাকেন, যথা—

Problems of Rural India, The Indian Peasant and his environment; Health and Nutrition in India. ইত্যাদি। বাংলা ভাষায় এ বিষয়ে তার গ্রন্থ—"ভারতবর্ষের কৃষির উন্নতি", "জাতীয়

লণ্ডনে পিতা নগেন্দ্রনাথের সহিত কন্যা নন্দিতা কৃপালনী

ভিত্তি"। ভারতবর্ষের নূতন রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রবর্তন উপলক্ষেও তিনি কয়েকটি বই লেখেন—

Notes on constitutional Reform in India; The Making of Federal India. Constituent Assembly for India. ইত্যাদি। তিনি একাধিক ভক্তবাণী সংগ্রহও প্রকাশ করেছিলেন, যথা—

The Testament of Immortality; Thoughts for Meditation.

-টি এস এলিয়ট এগুলির ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন। নগেন্দ্রনাথের অন্যান্য কতকগুলি বইয়ের নাম—

The Battle of the Land; India, What Now; Indian in the Empire Overseas; Guiseppe Mazzini, Thomas Paine; The Teachings of Sun Yat-Sen; The Mind and Face of Nazi Germany,

ছোটদের জন্যও তিনি কয়েকখানি বই লিখেছিলেন—

Sher Shah: The Bengal Tiger; The Red Tortoise and Other Tales; Indian Folktales!

ছোটদের বই প্রসংগে উল্লেখ করতে হয় যে, এ বিষয়ে যৌবনকাল থেকেই তাঁর উৎসাহ ছিল, অনেকগুলি সুখপাঠ্য গ্রন্থ তখন তিনি ছেলেমেয়েদের জন্য লিখেছিলেন—"হাতে চাঁদ কপালে সূর্য্যি"; "ব্যাঙের আত্মকথা"; "জম্বু শিয়াল"; "উদোল বুড়োর সাঁওতালী গল্প, "উদোল বুড়োর আরো গল্প"। অপিচ উল্লেখযোগ্য তাঁর সম্পাদিত "পার্বণী" (১৩২৫ ও ১৩২৭)। এখন প্রতি বৎসর যে ছেলেমেয়েদের জন্য অনেকগুলি বার্ষিক সংকলন গ্রন্থ প্রকাশিত হয় তার সূচনা সম্ভবতঃ এই "পার্বণী"তেই। পার্বণী এখন সহজপ্রাপ্য নয়, তার প্রথম সংখ্যার আংশিক সূচী উদ্ধৃত করলেই সম্পাদকের কৃতিত্ব লক্ষ্য করা যাবে—কবিতা ও গান—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঠাকুর্দার ছুটি ইত্যাদি; শিবনাথ শাস্ত্রী, "দাদামশা'র সাধের নাতি" সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, "ছেলে ভুলানো গান", "শরতের ফুল" "গলার তোয়াজ"; সুকুমার রায়, "খাই খাই"। গল্প—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "ইচ্ছাপূরণ"; অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "চন্ড"; শ্রীসীতা দেবী, "পদ্মজা"; সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "পাষাণের স্মৃতি", "ছাতার কথা", শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, "মামলার দল"; শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, "টিকিরাম রায়"। প্রবন্ধ—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "আলপনা"; রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, "গণা আর মাপা"; জগদানন্দ রায়, "নক্ষত্রের কথা"; প্রিয়ম্বদা দেবী, "দেশ দেখা"; প্রাণকৃষ্ণ আচার্য, "স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন"; চুণীলাল বসু, "আমাদের খাদ্য"। স্বরলিপি—দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর; প্রচ্ছদপট, শ্রীনন্দলাল বসু; নামকরণ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। দ্বিতীয় সংখ্যার (১৩২৭) সম্বন্ধেও অনুরূপ।

ওঁ

বোলপুর

কল্যানীয় শ্রীমান নগেন্দ্র—

তোমাকে দীক্ষা দিয়া অবধি আমার মন তোমার এই নবজীবনব্রতের প্রতি আবিষ্ট হইয়া আছে। ঈশ্বরের প্রসাদবারিতে তোমার হৃদয় অভিষিক্ত হউক তাঁহার চরণে তোমার সমস্ত অন্তঃকরণ নত করিয়া দাও—আলোককে অমৃতকে জীবন পূর্ণ করিয়া গ্রহণ কর।

তোমার সংসার পথে সমস্ত সুখদুঃখ সমস্ত লাভক্ষতি মঙ্গলের পথপ্রদর্শক হইয়া তোমাকে যেন ঈশ্বরের দিকেই লইয়া যায়।

সুখং বা যদি বা দুঃখং
প্রিয়ং বা যদি বাপ্রিয়ং
প্রাপ্তম্ প্রাপ্তমুপাসীত
হৃদয়েনাপরাজিতা

সুখ হোক দুঃখ হোক
প্রিয় হোক অপ্রিয় হোক
জীবনে যাহাই আসুক
তাহাকেই অপরাজিত চিত্তে গ্রহণ করিবে।
ঈশ্বরের স্বহস্তের দান বলিয়া শিরোধার্য করিয়া লইবে।

আমার সমস্ত মনের প্রার্থনা এই যে ঈশ্বর তোমাকে প্রতিদিনই সত্যে বলিষ্ঠ, মঙ্গলে প্রতিষ্ঠ ও মাধুর্যে মণ্ডিত করিয়া তুলুন।

ইতি ৮ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার ১৩১৪
শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কল্যাণীয়েষু,

রথীর স্থানান্তরে যাওয়ার সম্ভাবনা শোনা গেল অতএব তোমার ও সন্তোষের টাকা তোমার নামেই পাঠানো যাবে। এবারে ৪০ টাকা বেশি পাঠাচ্ছি। নিম্নলিখিত কাগজগুলি subscribe করে আমাকে পাঠাতে হবে—ঃ

The Hibbert Journal
$2.50.
The Open Court
$1.00.
The Living Age
$6.00.

ডাক মাশুলের ব্যয় কত পড়বে আমার কোনো ধারণা নেই—সেই জন্যে একটা আন্দাজ করে ৪০ টাকা পাঠাই—যদি বেশি লাগে আমাকে খবর দিয়ো। তোমরা আমাকে April সংখ্যা পর্যন্ত Open Court পাঠাইয়া দিয়াছ—অতএব তারপর থেকে পাঠাবার ব্যবস্থা করে দিয়ো। যদি ইচ্ছা কর আগে তোমরা পড়ে তার পর সপ্তাহে আমাকে পাঠিয়ে দিয়ো।

মীরাকে নিয়ে আর দিন দশেক বাদে আমি কালকায় তোমার দাদার ওখানে যাচ্ছি। বিদ্যালয়ের ছুটি দেড় মাস—এই দেড় মাস সেখানে থাকব।

তোমাদেরও ত গ্রীষ্মের ছুটি আছে। সে সময়ে কি করবে? কোথাও বেড়াতে যাবে?

তুমি লিখেছিলে এখানকার জাতীয় কালেজে[১] যদি ইচ্ছা করেন তবে তোমার কোনো বন্ধুকে অধ্যাপনার জন্যে রাজি করতে পার। তাতে কি রকম খরচ হবে যদি আমাকে জানাও তাহলে আমি প্রস্তাব করে দেখতে পারি অথবা বোলপুরে রাখার কথাও একবার ভেবে দেখা যেতে পারে। বোলপুরে Technical বিভাগ করবার উপযুক্ত সামর্থ্য আমার নেই—সেইজন্যে আপাতত অর্থাভাবে সে সঙ্কল্প ত্যাগ করতে হল। অর্থের চেয়ে লোকের অভাব ঢের বেশি। বেশ হাতে কলমে রীতিমত কাজ শিখিয়ে ছেলেদের সকল রকমে তৈরি করে তুলতে পারেন এমন অধ্যাপক ত খুঁজে পাইনে।

এদেশে জনসাধারণের মধ্যে স্বল্প মূলধনে এবং অল্প বিদ্যায় যদি কোনো ব্যবসা চালাবার উপায় করে দেওয়া যায় তাহলে অত্যন্ত উপকার হয়। সেই রকম যে সব জিনিষ ওখানে তোমাদের চোখে পড়বে মনে করে রেখে দিয়ো। যেগুলোকে Cottage Industries বলে তাই আমাদের দেশের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়।

তোমার ও রথীর ছবি পেয়ে আমরা খুব খুসি হয়েছি। এতদিন তোমরা তিনজনে একত্রে যাপন করেছ এখন তোমাদের পরস্পর বিচ্ছিন্ন হবার সময় আসন্ন হয়েছে। সে কথা চিন্তা করে আমিও মনে বেদনা অনুভব করচি।

---

১ জাতীয় শিক্ষা পরিষদ

সকল অবস্থাতেই ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন।

ইতি ৯ই বৈশাখ ১৩১৫
আশীর্বাদক
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

এবারে তোমাদের কারো কোনো চিঠিপত্র পাওয়া যায়নি। রথীর কোথায় একজায়গায় যাবার কথা ছিল গিয়েছে কিনা জানিনে—তার পরীক্ষার ফল কি হল তারো কোনো খবর পাইনি।

Coming [Living] Age কাগজটা রামানন্দ বাবু[১] আমাকে পাঠিয়ে দেন—অতএব ওটা যদি subscribe না করে থাক তবে ঐ ছয় ডলারের উপযোগী ভাল কোনো বই আমাকে পাঠিয়ে দিয়ো। কোনো উঁচুদরের devotional বই হলেই খুসি হব।

"Obermann By Etienne Pivet de Senancour Translated from the French with introduction by Arthur Edward Waite"

বইটা যদি ওখানে পাও দেখো ত। Waite লোকটা আমেরিকান—তাই মনে হচ্চে ওখানে কোথাও পেতেও পার।

আমাদের বিদ্যালয়ের ছুটি আসন্ন হয়েছে। কাল বন্ধ হবে। ছেলেরা অনেকেই চলে গেছে। আমাদের এখানে আজকাল প্রায় ১০০ জন ছেলে—তারা চলে গেলে আশ্রম খুব নিস্তব্ধ হয়ে যাবে।

এ বৎসরটা এখনও গরম রীতিমত পড়েনি। প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যার সময়ই ঝড় বৃষ্টি হয়। আজ তো বৈশাখের মাঝামাঝি তবু রাত্রে এবং সকালে গায়ে গরম কাপড় দিতে হচ্চে। এখন এই অতিরিক্ত বৃষ্টি হওয়ার দরুণ বর্ষার সময় যদি বর্ষণের ব্যাঘাত ঘটে তাহলে এ বৎসর আমাদের ভারি দুর্গতি হবে। গত বৎসরে আমাদের জমিদারীতে বৃষ্টি না হওয়াতে রীতিমত দুর্ভিক্ষের মত হয়েছে।

ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন।

ইতি ১৪ই বৈশাখ ১৩১৫
আশীর্বাদক
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[ক্রমশ]

১ প্রবাসী-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। বিদেশী কাগজ হইতে প্রবাসীর জন্য শান্তিনিকেতনের ছাত্র ও অধ্যাপকদের জন্য সার-সংকলনের ব্যবস্থার ভার রবীন্দ্রনাথ কিছুকাল গ্রহণ করিয়াছিলেন।

লাফা-যাত্রা

মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়

আমাদের দেশে যেমন পুজোর ছুটি, ইয়োরোপে তেমনি গ্রীষ্মের ছুটি। আশ্বিনের রোদের মতো ওদেশের গ্রীষ্মের রোদ। তা যেদিন দেখা দেয় সেদিন আর ঘরে মন বসে না। ছাত্রদের মন বসেনা পড়ায়, দোকানীর মন বসেনা দোকানে, শহুরের শহরে মন বসেনা। দলে দলে সব যেন কোথায় বেরিয়ে পড়তে চায়। গ্রামের পথে, মাঠে ঘাটে, বনের কিনারায়, নদীর ধারে, পাহাড়ের চুড়োয়, যেখানেই খোলা রোদ আর বাতাস খেলে বেড়ায়, সেইখানেই ভিড় করে ঘর-ছাড়ার দল।

সকলেই যে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে চায় এমন কথা বলছিনে। গোমড়া-মুখো অনেকেই আছেন, যাঁরা বর্ষা বলো, গ্রীষ্ম বলো, দিন নেই, রাত নেই, মুখ বুঁজে কাজ করে চলেন, বাইরের দিকে তাকানই না। আমি কিন্তু ঐ দলের নই। দেশে শরতের আলো আমায় যেমন পাগল করে, ইয়োরোপের গ্রীষ্মের আলো ঠিক তেমনি করেই আমায় অস্থির করে তুলত। তা ছাড়া, যে বছরের কথা বলছি ঠিক তার আগে একটা গ্রীষ্মের ছুটি আমার অতি চমৎকারভাবে কেটেছে মধ্য ইয়োরোপের পাহাড়ে পর্বতে বনে জঙ্গলে পায়ে হেঁটে বেড়িয়ে। সেবারে সাড়ে তিন মাসের ছুটি যেন এক ফুঁয়ে সাড়ে তিন দিনে শেষ করেছি। তাই বছরের চাকা ঘুরতে ঘুরতে যখন আরো একটা গ্রীষ্মের ছুটি এসে পড়ল, আর লণ্ডন শহরের ধোঁয়ার পর্দা সরিয়ে সোনার বরণ রোদ এসে নামল আমার জানলার সামনে, তখন আমার মনের অবস্থা যে কি হল তা সহজেই বুঝতে পারা যায়।

কিছুদিন ধরেই মাথার মধ্যে ঘুরছে একটা নতুন দেশ দেখতে হবে। কি দেশ তা ও মনে মনে খানিকটা স্থির করে নিয়েছি—স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া। সঙ্গী যদি পাই ভালই, নইলে একাই যাবো। স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া শুনে আমার বন্ধুরা কেউ কেউ সঙ্গে যেতে রাজি হয়েছিল, কিন্তু যখন শুনল আমার মতলব পিঠ-ঝুলি ঘাড়ে বনে বাদাড়ে পায়ে হেঁটে ঘোরা, তখন সবাই পিছিয়ে পড়ল। বললে, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া যাবো হয়তো, কিন্তু তোমার সঙ্গে নয়। আমি এদের দোষ দিতে পারি না, কারণ চক্রে পড়ে আজই না হয় আমি চরণিক হয়েছি, কিন্তু এক বছর আগে নিজের মোট নিজে বইতে হবে শুনলে আমিও দেশ দেখবার লোভে এগতুম না।

সঙ্গী পাবার মধ্যে এক ছিল সত্যব্রত। কিন্তু সত্যব্রতও এবার তার পরীক্ষা শেষ করে দেশের দিকে এক-পা বাড়িয়ে বসে আছে, জাহাজের বাঁশি বাজলেই হয়। এই সত্যব্রত, মিরেক আর আমি গেলবারে গ্রীষ্মের ছুটিতে চেকোশ্লোভাকিয়ার পার্বত্য অঞ্চলে লাটুর মতো ঘুরেছি।* আহার নেই, বিশ্রাম নেই, দিনের আলো ফুটল কি মোট ঘাড়ে আমাদের চলা শুরু হল, রাতের আগে তার বিরাম নেই—সে এক অপূর্ব নেশা! মিরেককে চিঠি লিখে জানিয়েছিলুম, চেকোশ্লোভাকিয়ায় লব্ধ অভিজ্ঞতা এবারে আমার নরওয়ে আর সুইডেনে প্রয়োগ করবার ইচ্ছে। এই অভিযানে যোগ দেবার জন্যে তাকে একটা প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত করেছিলুম, কিন্তু স্পষ্ট করে অনুরোধ করতে পারিনি। তার কারণ, ছাত্র যারা তাদের সব দেশেই খরচের জন্যে গৃহমুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয়। মাসহারা থেকে মাসে মাসে কিছু জমিয়ে তবে দূরদেশে যাবার সঙ্গতি করতে হয় আমাদের সবাইকেই। মিরেকের হাতে চেকোশ্লোভেকিয়া থেকে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া পর্যন্ত পাড়ি দেবার কড়ি জমেছে কিনা না জেনে কি করে তাকে অনুরোধ করি? তাই কলেজের শেষ দিনে যেদিন বই-এর লেখাগুলো একেবারে চীনা অক্ষরের মতো নির্বোধ্য নিরর্থক ঠেকছে, আর ব্ল্যাকবোর্ডের মধ্যে দিয়ে আমার দৃষ্টি চলে গিয়েছে অজানা দেশের ঝর্ণাতলায়, পাইন বনের অন্ধকারে, হঠাৎ মিরেকের কাছ থেকে এক চিঠি পেয়ে চমকে গেলুম। মিরেক লিখছে, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ায় যাবার জন্যে সে প্রস্তুত, অমুক তারিখে কোপেনহাগেনে আমি যেন তার সঙ্গে দেখা করি।

চিঠিটা পেয়ে আমি লাফিয়ে উঠলুম। যাত্রার সঙ্গী হিসেবে মিরেকের মতো সঙ্গী আর হতে পারে না—গেলবারের অভিজ্ঞতা থেকে তা আমি জেনেছি। তখনই আমি ম্যাপ খুলে বসলুম। ম্যাপ জিনিসটা অন্য সময়ে দেশবিদেশের নিরস নক্সা ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু যাত্রার স্বপ্নে যারা বিভোর তাদের কাছে ঐসব নক্সা আর রঙ চঙ আর ক্ষুদে ক্ষুদে লেখা-জোকা সব জীবন্ত হয়ে ওঠে। যাত্রার আগেই ঐসব দাগ বেদাগের উপর দিয়ে এক দফা দেশ বেড়ানো হয়ে যায়। একটা খুব প্রকাণ্ড ম্যাপ পেয়েছিলুম। পাহাড়, বন, নদী, রেল, রাস্তা, গ্রাম, শহর, প্রায় সবই দেখানো আছে। যত দেখতে লাগলুম ততই যেন উত্তেজিত হয়ে উঠতে লাগলুম। কোন্ জায়গা বাদ দিয়ে কোন্ জায়গায় যাবো? মনে হল সব জায়গাতেই যেতে হবে। মোটামুটি একটা প্ল্যান ঠিক করব বলে বসেছিলুম, কিন্তু সমস্তই যেন গোলমাল হয়ে গেল, কিছুই হয়ে উঠল না। উঠে পড়লুম।

সেদিন রাত্রে ক্লাবে খাবার টেবিলে হঠাৎ এক নরোঈজান বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। বল্লুম—তোমাদের দেশে যাচ্ছি যে!

—কবে?

—পর্শু বেরচ্ছি এখান থেকে।

—পর্শু? অস্‌লো যাবে তো?

---

*লেখক প্রণীত চরণিক গ্রন্থ দ্রষ্টব্য

তাহলে এক্ষুনি আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি আমাদের বাড়িতে। তোমাকে দেখলে আমার মা, ভাই বোন খুব খুশী হবেন। যাবে তো?

—নিশ্চয়ই যাবো, যদি ঠিকানা দাও।

তুয়ার কাছ থেকে তার অস্‌লোর ঠিকানা আর মায়ের নাম নিলুম। নরোয়েজানরা প্রায় সকলেই এইরকম বিদেশী অতিথির ভক্ত। বিদেশী কেউ তাদের দেশ দেখতে যাচ্ছে সাগর-পাড়ি দিয়ে, এ শুনলে আর তারা স্থির থাকতে পারে না; সব রকম সাহায্য করবার জন্যে প্রস্তুত।

তুয়া বললে—তারপর? কোন্‌দিকে ঘুরবে তুমি? কতদিন থাকবে নর-ওয়েতে? কিছু প্ল্যান করেছ?

আমি বল্লুম—দেশটা এতই অজানা যে, প্ল্যান কিছু করে উঠতে পারছি না। পাহাড় অঞ্চলে পিঠ-ঝুলি কাঁধে কিছুদিন ঘোরবার ইচ্ছে আছে। কোথা যাই বলতে পারো?

—য়োটুন্‌হাইম্‌। —এর চেয়ে সেরা পাহাড় সারা নরওয়ে খুঁজলেও পাবে না।

আমি তাড়াতাড়ি ঐ নামটা আমার নোটবইএ টুকে নিলুম।

তুয়া তাদের দেশের পাহাড় আর হ্রদ আর ফিয়োর্ড আর ফিয়োর্ডের ধারে ছবির মতো জেলেদের গ্রামের অনেক গল্প করলে। যাবার আগে এইরকম গল্প শুনতে ভারি ভালো—তার কিছু মনে থাকে, কিছু মনে থাকে না, কিন্তু সব মিলিয়ে মনে হয়, যে দেশে যাচ্ছি, তার চেয়ে সেরা দেশ আর নেই।

হিলারি, আমার ইংরেজ বন্ধু, আমি স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া যাচ্ছি শুনে বললে—সুইডেনে যখন যাচ্ছো, তাহলে একটা জিনিস কিন্তু করতে ভুলো না।

আমি বললুম—সে জিনিসটা কি?

হিলারি বললে—সুইডেনের পুব থেকে পশ্চিম প্রান্ত অবধি একটা খাল আছে, তার নাম গোঅটা খাল। স্টীমারে করে এই খালটি দেখো—দেখবে সমস্ত সুইডেনই তোমার দেখা হয়ে গেল।

আমি বললুম—বেশ তবে কথা রইল গোঅটা খাল থেকে একখানা ছবির পোস্ট-কার্ড তোমায় পাঠাবো।

সস্তায় দেশ বেড়ানোর হদিস গেল-বছরেই অনেকটা শিখে নিয়েছি। যে সমস্ত অযোগ্য খরচ অল্প আয়াসেই বাঁচানো যায়, অল্প মাথা ঘামালেই লট-বহরের যে সব ঝঞ্ঝাট কমিয়ে সহজ সরল করে নেওয়া যায়, খাঁটি চরণিকের পক্ষে তা অবশ্য কর্তব্য। সেই রীতি অনুসারে আমি অতি যত্নে আমার পিঠ-ঝুলি গুছিয়ে নিলুম। চরণিকের পোশাক পরে হাল্কা হলুম। সংগে একটা ছোট সুটকেস রইল, যার মধ্যে দু-একটা দরকারী পোশাক-পরিচ্ছদ—যদি কোনদিন কোন শহরে গিয়ে শহুরে সাজবার হঠাৎ প্রয়োজন ঘটে।

লণ্ডনে ভারতীয় ছাত্র আমরা যারা থাকি, তাদের পুঁজিপাটা এমনিতেই খুব কম—গোটা দুই সুটকেসের মধ্যে সব কিছু ধরে যায়, মায় বইপত্র নোটবুক পর্যন্ত। তাই এইসব লম্বা ছুটিতে বাড়িওয়ালাকে নোটিশ দিয়ে আমরা লণ্ডনের পাট উঠিয়ে দিয়েই চলে যাই। আমার যথাসর্বস্ব সম্পত্তি দুটি সুটকেসের মধ্যে ভরে ক্লাবের জিম্মায় রেখে এলুম সাড়ে তিন মাসের জন্যে।

ক্লাব থেকে ফিরে সেদিন রাত্রে আমার ঘরে এসে বসলুম। কাল সকালে ট্রেন। যাত্রার উত্তেজনায় আজ কত রাত্রে ঘুম আসবে কে জানে? হয়তো আসবেই না। ম্যাণ্টল্‌পিসের উপর যেখানে আমার বইগুলো সাজানো থাকতো, সে জায়গাটা খালি হয়ে গেছে। চা গরম করবার কেটলিটা নেই, পেয়ালা-পিরিচও টেবিল থেকে অদৃশ্য হয়েছে। আর বিশেষ কিছু আসবাব ছিল না বটে, কিন্তু ঐ কটা জিনিস সরিয়ে ফেলাতেই ঘরটা যেন খাঁ খাঁ করছে। ঘরটার সংগে ইতি-মধ্যেই আমার সম্পর্ক চুকে গেছে বলে বোধ হয়। দরজার পাশে আমার পিঠ-ঝুলি আর ছোট সুটকেসটা দেখেই মনে হয় তারাও যাবার জন্যে তৈরী।

রাত্রে সত্যিই ভালো ঘুম হল না। ভোরবেলা চোখ খুলেই প্রথমেই চোখে পড়ল পিঠ-ঝুলিটা। দেখেই মনে হল, বাঃ এই তো চরণিক জীবন আরম্ভ হয়ে গেছে। লাফিয়ে উঠে পড়লুম বিছানা থেকে। পিঠ-ঝুলিটা পিঠে নিয়ে হাতে ছোট সুটকেসটা ঝুলিয়ে বাড়ি থেকে বেরলুম। তারপর লণ্ডনের মাটির নীচের ট্রেনে চড়ে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার ছোট্ট ম্যাপটা পকেট থেকে বার করলুম, হিলারি যে গোঅটা খালের কথা বলেছিল, সেটা কী দেখবার জন্যে। দেখলুম সুইডেনের পশ্চিম উপকূল থেকে আরম্ভ করে একটার পর একটা হ্রদ পার হয়ে পূর্ব উপকূলে শেষ হয়েছে। মনে মনে

যখন ছবি আঁকছি, ঝিরঝিরে হ্রদের হাওয়ায় স্টীমারের বেঞ্চিতে দুপুরের রোদে বসে দুপাড়ের দৃশ্য দেখছি—গ্রামের ফলন্ত গাছে ঢাকা রাস্তার, মাঠের, শস্যক্ষেতের ছোট ছোট কুটিরের, ঠিক তখনই মাটির নীচে আমার গন্তব্য স্টেশনে এসে পেঁছিলুম।

সেখান থেকে উপরে উঠে এবার মাটির উপরের ট্রেন ধরলুম ইংলণ্ডের পূব উপকূলের উদ্দেশে। হারউইচ্-এ গিয়ে স্টীমারে যখন উঠলুম, তখন সেই আগের দিনের মন-ভোলানো রোদ অদৃশ্য হয়েছে। ইংলণ্ডের দশাই এই। একদিন রোদ হয়তো দশদিন অন্ধকার। ঝুপ ঝুপ বৃষ্টির মধ্যে উত্তর সাগরের মধ্যে দিয়ে ডেনমার্কের দিকে আমাদের জাহাজ পাড়ি দিল।

জাহাজে নানারকম লোক ছিল, তার মধ্যে দেখছিলুম একটা দল। একদল ছেলেমেয়ে, সঙ্গে তাদের খানকতক সাইকেল—মহা ফূর্তি করতে করতে যাচ্ছে। এদের লক্ষ্য করছি দেখে একজন আমার সঙ্গে এসে আলাপ করল। এরা ইংলণ্ডের কোন এক শহরের স্কুলের ছাত্রছাত্রী। নিজেদের শহর ছেড়ে বেশী দূরে কখনো যায়নি। এবার চলেছে ডেনমার্কে—সাইকেলে করে ঘুরবে। সঙ্গে নিয়েছে একজন গাইড—একটি ডেনিস ছেলে, তাদেরই মতো স্কুলের পড়ুয়া।

আমি বললুম—কোথা থেকে পেলে এই গাইডকে?

সে বললে—তাও জানো না বুঝি? ইংলণ্ডে একটা প্রতিষ্ঠান আছে, তার নাম ন্যাশনাল য়ুনিয়ান অফ স্টুডেণ্টস—

আমি বললুম—হ্যাঁ, জানি বটে।

—তাদের লিখলুম, আমরা ডেনমার্কে যেতে চাই সাইকেল করে ঘুরতে—কিন্তু ওদেশের ভাষা আমরা কেউ জানিনে। এ বিষয়ে ওরা কিছু সাহায্য করতে পারে কি না? সঙ্গে সঙ্গে এই ইংরেজী-জানা ডেনিস গাইড এসে হাজির। ছেলেটি ভারি চমৎকার, চলো না, তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।

আমি তখন ডেনিশ ছেলেটির সঙ্গে আলাপ করলুম। সে যখন শুনলো আমিও ছুটিতে যাচ্ছি বেড়াতে, বলে বসল—এসো না আমাদের দলে—ডেনমার্ক যে কত সুন্দর দেশ দেখিয়ে দেব।

আমি বললুম—ডেনমার্ক তো নিশ্চয়ই সুন্দর দেশ। কিন্তু তোমরা যে সাইকেলে করে ঘুরবে।

সে বলল—তোমাকেও সাইকেল দেব একখানা। ডেনমার্কে কখনও সাইকেলের অভাব হয় না। আমাদের দেশে মানুষ যত, তার চেয়ে বেশী সাইকেল।

আমি বললুম—সে কথা বলছি না। সাইকেলে অত চড়া আমার অভ্যাস নেই।

সে বলল—কেন, তোমাদের দেশে কি লোকে সাইকেল চড়ে না?

আমি বললুম—আমাদের দেশেও লোকে সাইকেল চড়ে। কিন্তু আমি হেঁটে বেড়াতেই ভালবাসি।

ভাগ্যিস্ এদের দলে যোগ দিইনি—দিলে ডেনমার্কেই মারা পড়তুম। দুর্দান্ত সাইক্লিস্ট এরা সব। ঘরের চৌকাঠ থেকে সাইকেল নিয়ে বেরিয়েছে, জাহাজ-ঘাটা পর্যন্ত সেই সাইকেলের পিঠে, এর মধ্যে বিশ্রাম নেই, নিশ্বাস ফেলবার অবসর নেই। ট্রেন, বাস, লরি, কিছুই এরা মানে না, কিছুই এরা বিশ্বাস করে না। এদের কাছে পৃথিবীতে আছে একমাত্র সাইকেল, তাতে করেই এরা পৃথিবী মাৎ করে। এই রকম সাংঘাতিক প্রকৃতির বহু সাইক্লিস্ট ইয়োরোপের রাস্তায় রাস্তায় আমি দেখেছি। এদের তুলনা নেই।

পরের দিন সকালে যখন ডেনমার্কে পেঁছিলুম, তখন মেঘ কেটে রোদ উঠে পড়েছে। ট্রেন তৈরীই হয়ে ছিল আমাদের জন্যে। এই ট্রেনটা ভারি মজার। ডেনমার্কের ম্যাপ খুললে দেখা যাবে, সে দেশের পশ্চিম উপকূল থেকে পূব উপকূলে কোপেনহাগেনে যেতে হলে সমুদ্র পার না হয়ে উপায় নেই। কারণ বড় বড় চারখানা দ্বীপ এবং উপদ্বীপ নিয়ে হচ্ছে সমস্ত দেশ—জলে-স্থলে একেবারে মিশে রয়েছে। অথচ কোপেন-হাগেনে যাবার যে এক্সপ্রেস ট্রেনখানা সেটা ধরলে গাড়ি বদল না করেই কোপেন-হাগেনে পৌছান যায়। এটা কি করে সম্ভব? ব্যাপারটা বুঝলুম যখন একটা দ্বীপ পার হয়ে আমাদের ট্রেনখানা সমুদ্রের ধারে এসে দাঁড়াল। পেটের মধ্যে ফুটো করা প্রকাণ্ড একখানা জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে ঘাটে। ট্রেনটা সোজা গিয়ে ঢুকে পড়ল সেই জাহাজের পেটে। জাহাজ দিল ছেড়ে। ট্রেনের কামরা থেকে আমরা বেরিয়ে জাহাজের ডেকে গেলুম দৃশ্য দেখতে। এক ফালি সমুদ্র পার হতে বেশীক্ষণ সময় লাগল না। ওপারে এসে পেঁছতেই আমরা ট্রেনের কামরায় ফিরে গেলুম। হুস্ হুস্ শব্দ করতে করতে জাহাজের পেটের ভিতর থেকে আমাদের ইঞ্জিনখানা বেরিয়ে উঠল গিয়ে ডাঙায় পাতা লাইনের উপর। এইভাবে বোধ হয় বার দুই আমরা সমুদ্র পার হয়েছি। জাহাজের পেটের মধ্যে ট্রেন নিয়ে সমুদ্র পাড়ি দেওয়া এই হচ্ছে ডেনমার্কের রেলযাত্রার বিশেষত্ব।
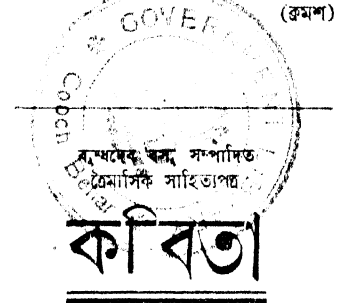
(ক্রমশ)

দত্তাত্রেয় পালুসকর

সুধীর বন্দ্যোপাধ্যায়

সংগীতনিপুণ দত্তাত্রেয় বিষ্ণু পালুসকরের জীবন বৃত্তান্ত যে এত শীঘ্র লেখার প্রয়োজন হবে, একথা ভাবতেই পারিনি। ভারতীয় সংগীতের এই উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মৃত্যু-সংবাদ এতই আকস্মিক ও অনভিপ্রেত যে বেশ কিছুক্ষণ মুহ্যমান থাকার পর যখন মনের সচেতনতা ফিরে এলো, তখন বুঝতে সমর্থ হলাম ভারতীয় সংগীতের আজ কত বড় ক্ষতি হলো।

বাংলার সংগীত সমাজের সংগে পালুসকরের যোগাযোগ আজ একদিনকার ব্যাপার নয়। বহুদিন থেকেই তিনি ভারতের অন্যান্য স্থানের মতো বাংলারও অন্তর জয় করেছিলেন। খেয়াল ও ভজন গানে তাঁর অপরিমিত দক্ষতার কথা কে না জানতো! "ঠুমক চলত রামচন্দ্র বাজত পায় জনিয়া" ও "চল মন গংগা যমুনা তীর" ভজন গান দুটি তাঁর কণ্ঠে যে অপরূপ সুরলালিত্যে ফুটে উঠতো তার কথাই আজ বার বার মনে হচ্ছে। খেয়াল গানের আসরে তাঁর বাহুল্যবর্জিত সুপরিকল্পিত ধারা আড়ম্বরহীন সূক্ষ্ম কারুকার্যের সাহচর্যে যেন মহীয়ান হয়ে উঠতো। মালগুঞ্জী রাগ, যা মনে হয় তাঁরই ঘরানার সৃষ্টি, তাঁর খেয়াল একাধিকবার শুনেও মনে হতো আরও শুনি। চিত্রশিল্পীর মতো সুরের তুলি বুলিয়ে তিনি যেভাবে সংগীতের কাঠামো তৈরী করতেন, তাতে রসবোধের সংগে থাকতো প্রয়োগ-নৈপুণ্যের নবাবকাশ। যেখানে যেটি প্রয়োজন—কমও নয়, বেশিও নয়—এই ছিল তাঁর সংগীত পরিবেশনের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এত ছিমছাম ধরনের গান খুব কমই শোনা যায়।

এই নূতন পরিবেশন পদ্ধতির প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করে তিনি মনে হয় এই মতবাদেরই প্রচলন করতে চেয়েছিলেন যে, প্রয়োগবিধির মধ্যে অহেতুক অলংকারের প্রয়োজন নেই। তাঁর গানের শৈলী এমন নিবিড় ও ঘন বিন্যস্ত ভিতকে আশ্রয় করে গড়ে উঠতো যে, তার কোনো অংশ থেকে কোনো অংশ বাদ দেওয়া যেতো না। অনেক সংগীতজ্ঞের ক্ষেত্রে দেখেছি, তান-কর্তবের সময় ক্ষিপ্রগতির সহায়তা নেওয়া হয় স্বরের বনিয়াদ বর্জন করে। কিন্তু পালুসকর সে-প্রথার পক্ষপাতী ছিলেন না। ক্ষিপ্রতার সংগে স্পষ্ট স্বরবিন্যাসের মিলন সাধন করে তিনি তাঁর সংগীতকে প্রদীপ্ত করে তুলতেন।

এই প্রাণবন্ত স্পষ্ট স্ফটিকসম গীত-প্রণালীর প্রবর্তন করে তিনি একদিকে যেমন সংগীতকে সমৃদ্ধ করেছিলেন, অন্য দিকে তেমন এক পুরাতন গীত-রীতির ভিত নব আকারে রচনা করে-ছিলেন, যার প্রতিষ্ঠা পঞ্চদশ শতাব্দীতে গোয়ালিয়রে হয়েছিল। এই অবলুপ্ত গীতরীতির অন্যতম বাহক ছিলেন তাঁর পিতা বিষ্ণু দিগম্বর। বালকৃষ্ণ বুয়া নামক একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সংগীতজ্ঞ সর্বপ্রথম গোয়ালিয়র ঘরানার খেয়াল গানের বলিষ্ঠ পদ্ধতি শিক্ষা করে মহারাষ্ট্রে প্রবর্তন করেন এবং তাঁর কাছ থেকেই পরে শিক্ষা গ্রহণ করে বিষ্ণু দিগম্বর এই পদ্ধতির গায়কদের মধ্যে একজন প্রখ্যাত শিল্পী হয়ে পড়েন।

বিষ্ণু দিগম্বর ছিলেন সংগীতের সার্থক পূজারী এবং প্রচারক। বহু কষ্ট স্বীকার করে এবং বহু অর্থ ব্যয়ে তিনি শিক্ষার্থীদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করে সংগীত শিক্ষা দিতেন। এই মুক্তহস্ত সংগীতজ্ঞের প্রচেষ্টায়ই এককালে ভারতের বিভিন্ন স্থানে গান্ধর্ব মহাবিদ্যালয় স্থাপিত হয় এবং তাতে অজস্র শিক্ষার্থীর সংগীত শিক্ষার পথ সুগম হয়। বিষ্ণু দিগম্বরের বারোটি সন্তানের মধ্যে দত্তাত্রেয় পালুসকরই ছিল সর্বশেষ জীবিত সন্তান। বাকি এগারোটি ১৯৩১ সালে পিতার মৃত্যুর পূর্বেই লোকান্তরিত হয়।

ডি ভি পালুসকরের সম্পূর্ণ নাম—দত্তাত্রেয় বিষ্ণু পালুসকর এবং তাঁর জন্ম হয় ১৯২১ সালের ২৮শে মে তারিখে কোলাপুরের নিকটবর্তী করুন্দবাড় নামক ছোট একটি শহরে। পরে দত্তাত্রেয় নাসিক চলে আসেন এবং সেইখানেই প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষা শুরু করেন।

মাত্র আট বৎসর বয়সে দত্তাত্রেয় পিতার কাছে সংগীত শিক্ষা আরম্ভ করেন। কিন্তু এ-শিক্ষা তাঁর বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। কারণ তাঁর মাত্র দশ বৎসর বয়সে পিতার মৃত্যু হয় এবং সংগে সংগেই এসে পড়ে জীবনযাত্রার নিষ্ঠুর কষাঘাত। দত্তাত্রেয়র জনৈক মাতুলপুত্র এবং পিতার প্রখ্যাত ছাত্রদের কল্যাণে তিনি এই সময়ে জীবনযাত্রা শুরু করলেন। এত অল্প বয়সে কী ভীষণ অবস্থার মধ্য দিয়ে তাঁকে পথ করতে হয়েছিল, তার সন্ধান পেলাম তাঁরই এক বন্ধুর কাছ থেকে। দত্তাত্রেয় তখন এসেছেন পুণায় সংগীত শিক্ষার বাসনা নিয়ে। সেখানে গান্ধর্ব মহা-বিদ্যালয়ে সংগীত শিক্ষা করেন, যার

প্রিন্সিপ্যাল তখন তাঁরই পিতার ছাত্র পণ্ডিত বিনায়করাও পটবর্ধন। সংগীত শিক্ষার সংগে সংগে সেকেণ্ডারী পর্যায়ে স্কুল শিক্ষার কাজও চলতে লাগলো। কিন্তু সংসারের গুরু চাপে দত্তাত্রেয় ক্রমেই মুহ্যমান হয়ে পড়তে লাগলেন। অনন্যোপায় হয়ে তিনি শেষ পর্যন্ত শিক্ষকতার কাজে নামলেন। তাঁর বন্ধুর কাছে শুনেছি যে, এই সময়ে তিনি মাসিক তিন টাকা বেতনে ছাত্রের বাড়ি গিয়ে সংগীত শিক্ষা দিতেন। এই তিন টাকাও অনেক সময়ে দুই মাসের আগে আদায় হতো না।

প্রায় ১৫ বৎসর ধরে এই ভীষণ অবস্থার মধ্যে সংসার চালিয়ে সংগীত শিক্ষার অনুকূলে মনোভাব বজায় রাখা আমার মনে হয় একমাত্র দত্তাত্রেয় পালুসকরের পক্ষেই সম্ভব হয়েছে। বিনায়ক পটবর্ধন, নারায়ণরাও ব্যাস প্রমুখ সংগীতজ্ঞদের কাছে মূল রীতি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান অর্জন করে তিনি ক্রমেই এগিয়ে চললেন। কণ্ঠজনিত ক্লান্তি বা হতাশার কোনও লক্ষণ তাঁর মধ্যে কখনও প্রকাশ পায়নি। সদা উৎফুল্ল হৃদয়ে তিনি সংগীত শিক্ষার কাজে ব্যাপৃত থাকতেন। এ প্রসংগে তাঁর পিতৃদেব রচিত কয়েকখানি সংগীতবিষয়ক পুস্তকও জ্ঞান আহরণের ব্যাপারে বিশেষ সহায়তা করেছিল। এই পুস্তকগুলি বহুদিন থেকেই বাজারে পাওয়া যায় না। বর্তমানে শিক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য তিনি কিছুদিন পূর্বে এগুলি পুনর্মুদ্রণের ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর এ-প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ হবার আগেই পরলোকের ডাক এলো।

দত্তাত্রেয় ১৯৩৫ সালে সর্বপ্রথম এক সংগীত সম্মেলনে নিজ গুণপনা প্রকাশের সুযোগ পেলেন। সম্মেলনের নাম জলন্ধর হরবল্লভ সংগীত সম্মেলন। এই সম্মেলনে তাঁর সংগীত শুনে প্রীত হয়ে বহু সংগীতরসিক স্থিরচিত্তে মেনে নিলেন যে, এক অভূতপূর্ব সংগীতজ্ঞের আবির্ভাব হয়েছে। অথচ ভেবে দেখুন বয়স তাঁর মাত্র ১৪। এত অল্প বয়সে এ ধরনের সংগীত প্রতিভার উন্মেষ সচরাচর খুব কমই দেখা যায়। জলন্ধর সংগীত সম্মেলনের পর দত্তাত্রেয়র সুনাম উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৩৮ সালে পিতৃদেবের তিরোধান স্মরণে যে বার্ষিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, তাতে তিনি বোম্বাই রেডিওতে সংগীত পরিবেশন করেন। রেডিওতে গান গাইবার এই প্রাথমিক প্রচেষ্টা পরবর্তীকালে যে কতটা প্রসার লাভ করেছিল, তা রেডিও শ্রোতামাত্রেই জানেন।

এর পর থেকেই শুরু হয় দত্তাত্রেয়র পুরোপুরিভাবে সংগীত-জীবন। ভারতের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত তিনি ঘুরে বেড়াতেন সংগীতপিপাসুদের চাহিদা মেটাতে। তাঁর জনপ্রিয়তার সন্ধান পেয়েছি এ বৎসরের প্রথম দিকে, যখন তিনি স্থানীয় নিখিল ভারত সংগীত সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করার পর বোম্বাইয়ে ফিরে যান। যে রেল কামরায় তাঁর স্থান নির্দিষ্ট ছিল, হাওড়া স্টেশন থেকে গাড়ি ছাড়বার প্রাক্কালে তা প্রায় ফুলের তোড়ায় ভরে ওঠে। অথচ তাঁরই পিতা যখন ১৯২৬ সালে কলিকাতায় আসেন, তখন তাঁর রেল টিকিট কিনে ফিরে যাওয়ার মতো সামর্থ্য ছিল না। কিন্তু তাতে তাঁর সংগীত-প্রতিভা ম্লান না হলেও জীবনের অর্থকরী দিকটার খানিকটা সন্ধান পাওয়া যায়। তাঁরই সুযোগ্য পুত্র উভয় দিকেই যে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিলেন, তা বড় কম গৌরবের কথা নয়।

গত বছর কলকাতায় সংগীত সম্মেলনে গান গাইছেন ডি ভি পালুসকর

গৌরব ও যশের শিখরে উঠেও দত্তাত্রেয়র মন পড়ে থাকে মায়ের দিকে। এই মহীয়সী মহিলা স্বামীর জীবদ্দশায়

মধ্যেই এগারোটি সন্তান হারিয়ে শুধু দত্তাত্রেয়কে নিয়ে বেঁচে ছিলেন আশায় বুক বেঁধে। বয়স এখন তাঁর প্রায় ৮০। নিষ্ঠুর নিয়তি তাঁকে সর্বস্বান্ত করেও মনের বলকে খর্ব করতে পারেনি, তাঁর কাছে যে মাতৃভক্ত সন্তান দত্তাত্রেয়র প্রাণ পড়ে থাকবে, সে অতি গৌরবের কথা! এ প্রসঙ্গে দু-একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না।

এ বৎসরের প্রথম দিকে যে ভারতীয় সাংস্কৃতিক দল রাশিয়া পরিভ্রমণ করেন, তাতে দত্তাত্রেয়রও যোগ দেওয়ার আহ্বান এসেছিল সরকারী তরফ থেকে। কিন্তু সর্বহারা মায়ের প্রাণ সন্তানের এ গৌরবে স্বস্তি পায়নি। অলক্ষ্যে তাঁর মনে ভেসে উঠেছে নানা অপ্রাসঙ্গিক ভীতি এবং এই কারণেই মাতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে রাশিয়ায় যাওয়া দত্তাত্রেয় স্থগিত রাখেন। কিন্তু কিছুদিন পূর্বে ভারতের যে সাংস্কৃতিক দল চীন পরিভ্রমণে যান, তার সঙ্গে যাওয়ার অনুমতি তিনি মাতার কাছ থেকে পান এবং চীনে গিয়ে ভারতীয় সংগীতের যথাযথ রূপ চীনা শিল্পীদের কাছে পেশ করেন। চীনা সাংস্কৃতিক মহল ও সংগীতানুরাগী সকলেই তাঁর গানে পরম প্রীতিলাভ করেন। চীনা জাতীয় বাহিনীর সহিত সংশিলষ্ট সাংস্কৃতিক পদস্থ কর্মচারী চেন চি-টুং লিখেছেন—"ডি ভি পালুসকরের প্রত্যেকটি গান শ্রোতাদের মন হরণ করেছে।"

প্রভূত যশের অধিকারী হয়ে তিনি যখন চীন হতে বিমানপথে স্বগৃহে ফিরে যান, তখন কিছুক্ষণের জন্য কলকাতায় অবস্থান করেন। কয়েকজন বন্ধু পূর্ব হতেই সংবাদ পেয়ে দমদমে যান তাঁকে অভিনন্দিত করতে। যথাসময়ে তিনি একটি ফটো দেখান, যাতে চৌ এন-লাইকে (চীনের প্রধান মন্ত্রী) দেখা যায় তাঁর শেরওয়ানীর বোতাম-ঘরে একটি ফুলের স্তবক পরিয়ে দিতে। ফটোটি জনৈক বন্ধু চেয়ে বসলেন কাগজে প্রকাশ করবার বাসনায়। দত্তাত্রেয় তার উত্তরে বললেন, আগে মাকে দেখিয়ে তারপর তিনি তাঁকে দিতে পারেন। মাতৃভক্ত সন্তানের এ-ভক্তি আশা করি সকলেই অনুধাবন করবেন।

প্রকৃত গুণের আধার দত্তাত্রেয়র মধ্যে ছিল বলে কথায় ও ব্যবহারে তাঁর নম্রতা ও শিষ্টাচার সকলকেই মুগ্ধ করতো। যে শুভ্র সুন্দর মনোভাব তাঁর স্বভাবে ফুটে উঠতো, তারও অধিক শুভ্র সুন্দর ছিল তাঁর সংগীত। স্বল্প পরিসরের মধ্যে তীক্ষ্ন স্বভাবসম্পন্ন তাঁর কণ্ঠস্বরে কী মোহিনী শক্তি ছিল জানি না, যতই শুনেছি, ততই আরো বেশি শুনতে ইচ্ছা হয়েছে। একথা শুধু আমারই নয়, বহু লোকের মুখে বহুভাবে শুনেছি। ভারতীয় সংগীতের বর্তমান অবস্থায়* তাঁর মতো শিল্পীর প্রয়োজন ছিল। শাস্ত্রজ্ঞানীরা সংগীতকে কাগজে-কলমে যতই সমৃদ্ধ করুক না কেন, প্রকৃত শিল্পীর অভাব হলে সে সংগীতকে বাঁচিয়ে রাখা যায় না। শিল্পীর রসবোধ এবং পরিবেশনের মধ্যে সঞ্জীবিত ধারার অভাব হলেও সংগীতের এই একই দশা ঘটে। কিন্তু দত্তাত্রেয় পালুসকরের গানে এবং গীতরীতির মধ্যে এসব অসংগতি কখনও লক্ষ্য করা যায়নি। বৈজু বাওড়া নামক চিত্রে তিনি নেপথ্যে কণ্ঠসংগীত পরিবেশন করেছেন, তার খবর যাঁরা রাখেন, তাঁরা জানেন, কণ্ঠস্বর তাঁর কতো নিখুঁত এবং কতো তীক্ষ্ন ছিল। বর্তমানে উচ্চাঙ্গ সংগীতে যে অনিশ্চিত অবস্থা দেখা দিয়েছে, তার প্রতিবিধান করতে পালুসকরের মতো মার্জিত রুচি-সম্পন্ন শিল্পীর প্রয়োজন। কারণ তা না হলে সংগীতের ক্ষেত্র জুড়ে আগাছার প্রাবল্যই বেশি হয়ে পড়বে। সংগীতের এ-স্তিমিত অবস্থার কথা ভাবলে পালুসকরের সংগীত ধারার প্রতিই মন আকৃষ্ট হয়। কিন্তু নিয়তির পরিহাসে তা বোধহয় আর হবার নয়।

মাত্র তিন-চার দিন অসুস্থতার পর হঠাৎ তাঁর অবস্থা খারাপ হয়ে পড়ে এবং বিগত ২৬শে অক্টোবর বেলা ২-১৫ মিনিটে তিনি দেহত্যাগ করেন। তাঁর পুত্রের বয়স এখন প্রায় নয় বৎসর, নাম বসন্ত কুমার। সংগীতে হাতেখড়ি তাঁর এরই মধ্যে হয়েছিল পিতার কাছে। আর একটি কন্যাও তিনি রেখে গেছেন। বয়সে সে আরও ছোট। মাদ্রাজের রসিকরঞ্জনী সভায় গান করার সময় এই কন্যার জন্ম হয় বলে সেখানকার রসিকবৃন্দের অনুরোধ অনুযায়ী পালুসকর তার নাম রেখেছিলেন রঞ্জনা।

॥ ৪ ॥

বন্ধুদের সঙ্গে অমিয়ভূষণ বেশিক্ষণ গল্প করবার সময় পেলেন না। ভিতর থেকে ডাক এল। রান্না হয়ে গেছে। দূর থেকে যাঁরা এসেছেন, তাঁদের এবার বসিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

অমিয়ভূষণ ভিতরে যেতে শতদলবাসিনী আর কল্যাণী একসঙ্গে অনুযোগ দিতে শুরু করলেন। ছেলের দিকে তাকিয়ে তিরস্কারের সুরে বললেন, 'আচ্ছা তোর আক্কেলখানা কি! বসে বসে শুধু গল্প করছিস তো গল্পই করছিস। কাজের বাড়িতে অত গা ছেড়ে বসে থাকলে চলে?'

কল্যাণীও স্বামীকে খোঁটা দিতে ছাড়লেন না।

তিনি বললেন, 'এরপর যদি কোন ত্রুটি হয়, তার জন্যে বাড়িশুদ্ধু লোককে দায়ী করবেন। হুঁশ নেই যে, এত কাজ-কর্ম রয়েছে।'

রান্নাঘরের সামনে নীলকান্তের স্ত্রী নির্মলা দাঁড়িয়ে মুখ টিপে হাসছিলেন। অন্দরে এসে তাঁর ঘোমটার দৈর্ঘ হ্রাস পেয়ে কপালের প্রান্তে উঠে গেছে। উজ্জ্বল সিঁদুরের ফোঁটাটি দেখা যাচ্ছে এবার। অবশ্য ফোঁটা যত উজ্জ্বল, মুখখানা তত উজ্জ্বল নয়। সে মুখে শুধু বয়সের ছাপই পড়েনি, কঠিন জীবন-সংগ্রামেরও আঁচড় পড়েছে। ছিপছিপে রোগা চেহারা নির্মলার। বয়স পঞ্চাশ ছাড়িয়েছে। কপালের কাছে চুলগুলি একটু বেশিরকমই পেকে গেছে। পরনে চওড়া লালপেড়ে শাড়ি। হাতে শাঁখা আর চুড়ি, কানে কমদামী দুটি ফুল। গায়ে আর কোথাও কোন আভরণ নেই। কিন্তু এই আড়ম্বরহীন বেশবাসের মধ্যেও বেশ একটু স্নিগ্ধ শ্রী ফুটে উঠেছে তাঁর চেহারায়।

নির্মলা কল্যাণীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আর বলবেন না দিদি। ওঁদের ওইরকমই ধরণ। বেহুঁশ হয়ে থাকতে পারলে ওঁরা আর কিছু চান না।'

অমিয়ভূষণ হেসে বললেন, 'এ কি বউদি, আপনিও বেদলী! আপনিও বিপক্ষের হয়ে ওকালতি করতে শুরু করলেন?'

নির্মলা বললেন, 'যা সত্যি তাই বলছি।'

অমিয়ভূষণ প্রসঙ্গ পাল্টে বললেন, 'ছেলেমেয়েরা কোথায়? মালা আসেনি?'

নির্মলা বললেন, 'সে তো আপনাদের সমুখ দিয়েই এল। আপনার মেয়ের সঙ্গে গল্পে মেতেছে বোধ হয়। ডানদিকের ঘরখানার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'মালা এদিকে এস। তোমার কাকাবাবু ডাকছেন।'

এনাক্ষীর সঙ্গে নীলকান্তবাবুর বড় মেয়ে মালা ঘর থেকে উঠানে এসে নামল। এনাক্ষীর চেয়ে সে শুধু মাথায় বড় নয়, বয়সেও বছর দুই বড়। তেইশ-চব্বিশ হবে বয়স। গড়ন অনেকটা মায়ের মত। ছিপছিপে দোহারা গড়ন। গায়ের রঙ মাজা গৌর। একটু লম্বাটে ধরনের মুখ। বয়সোচিত তারল্য কি তারুণ্য সে মুখে কম। চোখ দুটিতে একটু যেন বিষাদের ছায়া।

অমিয়ভূষণ তার দিকে তাকিয়ে সস্নেহে বললেন, 'ইস, কত বড় হয়ে গেছে। সেই ফ্রকপরা অবস্থায় দেখেছি, আর এখন রীতিমত মহিলা।'

নির্মলা হেসে বললেন, 'মহিলা আর হতে পারল কই অমিয়বাবু? বিয়ে-টিয়ে না হওয়া পর্যন্ত মেয়েরা কি মহিলা হয়? মালা, নমস্কার কর কাকাবাবুকে।'

মালা একটু অপ্রতিভ হল। নিচু হয়ে তাড়াতাড়ি পায়ের ধুলো নিতে যাচ্ছিল, অমিয়ভূষণ একটু পিছিয়ে গিয়ে বললেন, 'থাক থাক।'

এনাক্ষী একটু হেসে বলল, 'ও কি করছেন মালাদি, আপনারা যে বামুন।'

কিন্তু এবার আর অপ্রতিভ হল না। অমিয়ভূষণের দিকে চেয়ে হেসে বলল মালা, 'এনাদি ভারি দুষ্টু কাকাবাবু। বামুনই হই আর যাই হই, আমি আপনার স্নেহের পাত্রী।' এগিয়ে এসে মালা এবার পা ছুঁয়ে প্রণাম করল অমিয়-ভূষণের।

অস্বস্তিটুকু কোনরকমে কাটিয়ে উঠে অমিয়ভূষণ মালার মাথায় সস্নেহে হাত রেখে স্মিতমুখে বললেন, 'তা তো ঠিকই মা, তা তো ঠিকই। স্নেহের পাত্রী তো বটেই।'

শতদলবাসিনী ফের এসে তাড়া লাগালেন, 'তুই আবার গল্প করতে শুরু করলি অমিয়?'

অমিয়ভূষণ হেসে বললেন, 'কাজের বাড়িতে গল্প করাও একটা কাজ মা।'

কল্যাণী রান্নাঘরের ভিতর থেকে ফোড়ন কাটলেন, 'বাড়ির কর্তা যা করেন তাই কাজ; আর আমরা সবাই যদি গালে হাত দিয়ে কেবল কথা বলতুম আর কথা শুনতুম, তাহলে কাজের বাড়ির কোন কাজটা এগোত, তা দেখা যেত তখন।'

কমলাক্ষ এক আঁটি কলাপাতা নিয়ে ব্যস্তভাবে এসে হাজির হল। আরো ব্যস্ততার ভঙ্গিতে বলল, 'ঠাকুরমা, পাতা করব কোথায়?'

শতদলবাসিনী বিরক্ত হয়ে বললেন, 'আমার মাথায়। একেবারে বাপ-কা বেটা হয়েছিস। কোন কান্ডজ্ঞান যদি হয়ে থাকে। নটবরকে বল, ঘর আর বারান্দা ঝাঁট দিয়ে বৈঠক বসিয়ে দিক। আর দেরি করিসনে তোরা। দোহাই তোদের। বাইরের পাঁচজন ভদ্রলোককে বাড়িতে ডেকে এনেছিস। অথচ সময়মত তাদের পাতে দুটি ভাত দিতে পারবিনে। পাঁচশো লোককে খেতে বললেও তো এমন গোল-মাল হয় না। যত সব কুঁড়ের বাদশা। অকর্মার হাঁড়ি।'

অমিয়ভূষণ বললেন, 'সব হচ্ছে মা, সব হচ্ছে। তুমি অত চেঁচিয়ো না।'

শতদলবাসিনী আরো চটে উঠলেন, 'তুই তো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেবল হচ্ছে হচ্ছে করছিস। এদিকে বেলা কোথায় গড়িয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছিস? দুপুরের খাওয়া, এর পরে লোকে আর কখন খাবে বল তো?'

ধমক খেয়ে অমিয়ভূষণ নিজেই এবার কাজে হাত লাগালেন। যেখানে কলাপাতা পড়েছে, সেখানে কয়েকটা মেটে গ্লাস হাতে করে নিয়ে গেলেন। তা দেখে পুরোন চাকর নটবর হেসে বলল, 'আপনার এসব করতে হবে না বড়কর্তা, এগুলি আমরাই সেরে নিতে পারব। আপনি ভদ্রলোকদের নিয়ে এবার বসে পড়ুন।'

বছর চাল্লিশেক বয়স হয়েছে নটবরের। কুড়ি বছর ধরে অমিয়ভূষণের সঙ্গে। দীর্ঘদিনের সুখ-দুঃখের সঙ্গী। এতদিনে বাড়ির লোকের মতই হয়ে গেছে নটবর। আত্মীয়-বন্ধুর মত। ওর স্ত্রী-পুত্র আছে গাঁয়ের বাড়িতে। মাঝে মাঝে ছুটি নিয়ে তাদের খোঁজখবর নিতে যায়। অমিয়ভূষণের অনেকদিনের ইচ্ছা তাদেরও আনিয়ে নেবেন। নটবর কতকাল আর বউ-ছেলে ছেড়ে থাকবে। কিন্তু ইচ্ছা থাকলেও আজ পর্যন্ত তেমন কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। নটবর তাঁকে আশ্বাস দিয়ে রেখেছে, 'আপনি ওসব হাঙ্গামার মধ্যে থাকবেন না কর্তা, আমি এই বেশ আছি। চব্বিশ ঘণ্টা আষ্টেপৃষ্ঠে অত কড়া বাঁধন আমার সয় না'

সেই কথাগুলি মনে পড়ায় অমিয়-ভূষণ একটু হাসলেন। তারপর নটবরের ওপর ঠাঁই করার দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে তিনি বন্ধুদের ডেকে আনতে গেলেন।

বেলা দেড়টা বেজে গিয়েছিল। সদানন্দরা সকলেই খুশী হয়ে উঠে এলেন। খানিকক্ষণ আগে থেকেই তর্ক আর আলাপ-আলোচনার বেগটা মন্থর হয়ে এসেছিল।

সদানন্দ বললেন, 'ওহে অমিয়, তুমিও বসে পড় আমাদের দলে।'

হিরণ্ময় বললেন, 'উনি কি করে বসবেন। উনি হলেন গৃহকর্তা।'

অমিয়ভূষণ বললেন, 'সত্যি সদানন্দ, এখনো অনেকে বাকি আছেন।'

সদানন্দ বন্ধুর হাত ধরে টেনে বললেন, 'আরে তাঁদের আপ্যায়নের জন্যে তো তোমার গিন্নীই আছেন। তোমাকে পাশে নিয়েই যদি না খেলাম, তাহলে আর তোমার বাড়িতে এলাম কেন। স্টেশনের ধারে যে হোটেলটা আছে, সেখানে গেলেই হ'ত। তুমি এবার বসে যাও। পেটভরা থাকলে হাসিমুখে তুমি বাকি অতিথিদের আদর-আপ্যায়ন করতে পারবে। নইলে কেবল কাষ্ঠ হাসি হাসবে।'

অমিয়ভূষণকে দ্বিধাগ্রস্ত দেখে কমলাক্ষ বলল, 'বাবা, তুমি ওদের সঙ্গে খেতে বস। যাঁরা বাকি রইলেন, তাঁদের জন্যে তো আমরাই আছি।'

সদানন্দ বললেন, 'ঠিক বলেছ বাবা, খাঁটি কথা বলেছ। এখন তোমরাই আগে আগে আছ, আর তোমাদের পিছনে পিছনে আমরা আছি। পিছনেই বা বলি কেন, তোমাদের মধ্যে আমরা আছি। এখন তোমরা খাওয়াবে আমরা খাব, তোমরা কাজ করবে, আর আমরা বসে বসে আড্ডা দেব। কি বলেন নীলকান্তবাবু?'

সশব্দে হেসে উঠলেন সদানন্দ। জবাবে নীলকান্ত কোন কথা না বলে শুধু মৃদু একটু হাসলেন।

অমিয়ভূষণ এবার শ্বশুরের কথা জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার দাদু এলেন না কমল?'

কমলাক্ষ বলল, 'তিনি আলাদা বসেছেন বাবা।'

সদানন্দ হেসে বললেন, 'তাঁর জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না অমিয়। তিনি নিজের মেয়ের ভরসায় এসেছেন, তোমার ভরসায় আসেন নি।'

করুণা, কমল, এনাক্ষী সবাই পরিবেশন করতে শুরু করল। মালাও বসে রইল না। কল্যাণী আর এনাক্ষীর নিষেধ সত্ত্বেও মাছ-তরকারির থালাগুলি বয়ে নিয়ে এল মালা।

নির্মলা বললেন, 'করুক না। পাঁচ-জনকে দিতে-থুতে খুব ভালবাসে মেয়ে। নিজেদের বাড়িতে এমন উপলক্ষ্য তো বড় একটা হয় না।'

বলতে বলতে থেমে গেলেন নির্মলা।

জল আনবার জন্যে তাড়াতাড়ি বাইরে আসছিল কমল, উল্টোদিক থেকে মালা ঘরে ঢুকছিল তরকারির থালা হাতে। ঠোকাঠুকি হবার উপক্রম হতেই দু'পা পিছিয়ে গেল সে।

কমল অপ্রতিভ হয়ে বলল, 'সরি'।

মালা একটু হেসে চোখ নামিয়ে নিল।

এনাক্ষী তা লক্ষ্য করে হেসে বলল, 'আর একটু হলেই যে দুই মেল ট্রেনে কলিসন হয়ে যেত দাদা। হতাহতের সীমা-সংখ্যা থাকত না।'

'আচ্ছা ফাজিল হয়েছিস তুই।' বলে কমল সেখান থেকে সরে গেল।

খাওয়া দাওয়ার পর অমিয়ভূষণের স্বজন বন্ধুরা বিদায় নিলেন। কাজের বাড়ির লোকজনকে বেশিক্ষণ আটকে রাখা ঠিক নয়। তাছাড়া তাঁদের নিজেদেরও কাজকর্ম আছে। এক জায়গায় বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা দেওয়ার সময় কি আর আজকালকার দিনে জোটে জীবনে?

সদানন্দ হিরন্ময়ের দল অমিয়ভূষণের বাড়ি আর স্থান নির্বাচনের আর এক দফা সুখ্যাতি ক'রে গেলেন। কীর্তি-পুর অঞ্চল আরো উন্নত হবে। অমিয়-ভূষণের মত আরও কয়েকঘর গৃহস্থ এদিকে এলে কীর্তিপুরের বাসযোগ্যতা যে বাড়বে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

যাতায়াতে দু রকমের ব্যবস্থাই আছে। ট্রেন আর বাস। বন্ধুদের মধ্যে কেউ কেউ স্টেশনের দিকে গেলেন। একটু

দেরি হলেও ট্রেনে যাবেন তাঁরা। যাঁদের তাড়া বেশি তাঁরা তাড়াতাড়ি বাসে চাপলেন। বন্ধুর দলকে কলোনীর সীমানা পার হয়ে বড় রাস্তার মোড়ে বাসস্টপেজ অবধি এগিয়ে দিয়ে এলেন অমিয়ভূষণ।

ফিরে এসে দেখলেন স্ত্রী আর ছেলে-মেয়েদের নিয়ে নীলকান্তও বিদায় নেওয়ার জন্যে তৈরী হচ্ছেন।

অমিয়ভূষণ আপত্তি করে বললেন, 'ওকি নীলুদা, তুমি যাচ্ছ যে। তোমার বাড়ি তো আর এখান থেকে দূরে নয়। বড় জোর আট দশ মিনিটের পথ। জোর পায়ে হেঁটে গেলে বোধ হয় তাও লাগে না। তোমার এত তাড়া কিসের।'

নীলকান্ত মৃদু হাসলেন, 'তাড়া কিছু নেই। আমি তো প্রায় নিষ্কর্মা মানুষ। তুমিই বরং আজ ব্যস্ত আছ অমিয়। ব্যস্ত থাকাও উচিত।'

অমিয়ভূষণ প্রতিবাদ করে বললেন, 'না না, এখন আর এমন ব্যস্ত কি? কাজ-কর্ম খাওয়া-দাওয়া তো প্রায় মিটেই গেল। বাকি দু' চারজন যা আছেন তাঁদের ব্যবস্থা কমলরাই করতে পারবে। তুমি চল, ঘরে গিয়ে বসবে।'

নির্মলা পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি হেসে বললেন, 'শুধু বন্ধুকেই আপ্যায়ন করছেন অমিয়বাবু, আর আমরা বুঝি কেউ নই?'

অমিয়ভূষণ বললেন, 'তা কেন হবে। আমি তো জানি বন্ধুকে বললে বান্ধবীকেও বলা হয়। একজন তো আর একজন ছাড়া নন।'

নির্মলা বললেন, 'তবে বলি শুনুন, আপনার বন্ধু আসতে চাইছিলেন না, আমিই জোর ক'রে ধরে নিয়ে এসেছি। ও'র ইচ্ছা ছিল হয় একা আসবেন না হয় আসবেন না। আমি জোর ক'রে ছেলেমেয়ে নিয়ে ও'র সংগে এসেছি।'

অমিয়ভূষণ নীলকান্তের দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন, 'তাই নাকি নীলুদা? তুমি ভিতরে ভিতরে এত পর ভাব আমাকে? আমার বাড়িতে আসতেও তোমার লজ্জা?'

নীলকান্ত অভিযোগের কোন জবাব না দিয়ে অমিয়ভূষণদের দিকে পিছন ফিরে পাতি লেবুর চারা গাছটা থেকে একটা পাতা ছিঁড়ে স্মিতমুখে চুপ ক'রে রইলেন। আলোচনাটা যেন তাঁর সম্বন্ধে হচ্ছে না।

নির্মলা বললেন, 'আমরাই জোর ক'রে এলাম। আপনি সেদিন অত ক'রে বলে এলেন, না এসে কি পারি! আমরা না এলে আপনারা যাবেন কেন? বন্ধুতা বলুন, আত্মীয়তা বলুন এই আসা যাওয়া, দেখা-শোনা দেওয়া নেওয়ার মধ্যে। কারো কাছ থেকে কিছু নেবও না, কাউকে কিছু দেবও না, এইভাব নিয়ে কি সংসারে থাকা যায়?

অমিয়ভূষণ বললেন, 'ঠিক বলেছেন বউদি। আপনার মতের সংগে আমার বেশ মিল আছে। নীলুদার কথা আর বলবেন না ওকে তো আমরা পুরোপুরি সংসারী কেউ মনে করিনে। নীলুদা আধা-সন্ন্যাসী।'

নীলকান্তের এতক্ষণে বোধ হয় একটু ধৈর্যচ্যুতি হল। স্ত্রীর দিকে চেয়ে বললেন, 'ঢের হয়েছে। চল এবার যাওয়া যাক।'

নির্মলা অমিয়ভূষণকে আর একবার অনুরোধ করলেন, 'যাবেন কিন্তু অমিয়-বাবু, অবশ্য যাবেন। আপনার সংগে আমার অনেক কথা আছে। কাজের কথা।'

অমিয়ভূষণ হেসে বললেন, 'আমাকে বুঝি খুব কাজের মানুষ ভেবেছেন? আচ্ছা যাব। নিশ্চয়ই যাব।'

মালা বলল, 'কাকীমা, এনাদি ও'দের সবাইকে নিয়ে যাবেন কিন্তু।'

অমিয়ভূষণ বললেন, 'আচ্ছা, সবাইকে নিয়েই যাব। তুমিও এসো মাঝে মাঝে। এখন আর কি। এখন তো সব চেনা-শোনাই হয়ে গেল।'

মালার পরে আরো তিনটি ছেলে-মেয়ে নীলকান্তের। বিশু আর যীশু দুই ভাই পিঠাপিঠি। একটির বয়স চৌদ্দ আর একটির বার। দুজনেই স্কুলের ছাত্র। সম্প্রতি মাঠে যাওয়ার জন্যে চঞ্চল হয়ে উঠেছে। তাদের খেলার বেলা বয়ে যায়। ছোট মেয়ে রীণার বয়স সাত। তার মনও এখন আর টি'কছে না। মাকে বার বার তাগিদ দিচ্ছে, 'চল মা, বাড়ি চল।'

নির্মলা একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ চল। আচ্ছা বিপদ হয়েছে তোমাদের নিয়ে। বাড়িতেও থাকবে না, আবার একজায়গায় এসেও কেবল ছটফট করবে।'

আর একবার অমিয়ভূষণ আর কল্যাণীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে স্বামীর দিকে চেয়ে মৃদু হেসে নির্মলা বললেন, 'লেবুগাছটাকে আর মুড়ো ক'রে কাজ নেই। চল এবার এগোন যাক।'

(ক্রমশ)

ট্রামে-বাসে

বিজয়ার পর শুভেচ্ছা জ্ঞাপন চিরাচরিত রীতি। শুভই বলুন আর অশুভই বলুন ট্রামে-বাসের যাত্রীদের ইচ্ছা শুধু একটি—ট্রামে-বাসের সীট খালি পাওয়া। এত বড় একটি কাম্য বস্তু অন্যের ভাগ্যে জুটুক, এই ইচ্ছা বা কামনা যদি করি, তাহলে ধরে নিতে পারেন যে, মিথ্যা কথা বলছি। সুতরাং বিজয়ার রীতি পালন থেকে প্রতিনিবৃত্ত থাকাই শ্রেয়!

* * *

গাইঘাটার একটি বৃদ্ধা মহিলা প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত জওহরলালজীর নামে এক টাকা পাঁচ আনা মানিঅর্ডার করিয়া

পাঠাইয়া লিখিয়াছেন যে, তিনি যেন এই টাকা পুজার ব্যাপারে ব্যয় করেন। —"পুজার ব্যাপারে ব্যয়ের তালিকা অত্যন্ত দীর্ঘ। কিছু মিষ্টি আর ফুল-বেলপাতা দিয়ে যদি শুধু পুজো করতে চান, তাহলে হয়ত চলবে। কিন্তু পুজোর বাজার করতে গেলে জওহরলালজী দেখবেন যে, এই টাকায় তাঁর নাতিদের জন্যে দুটি হকার্স কর্ণারের জামাও কেনা যায় না"—বলেন বিশু খুড়ো।

* * *

কংগ্রেস সভাপতি শ্রীযুক্ত ডেবর মহিলাদের দশ বৎসর পর্যন্ত পুরুষদের দেওয়া গহনা ব্যবহার না করিবার জন্য পরামর্শ দিয়াছেন। —"বেচারী স্বামীদের আর্থিক এবং মানসিক শান্তির এত বড় সুব্যবস্থা আর হয় না"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

পুজার ছুটির পর ট্রামে বসে আমরা পুজার সময়কার প্রাকৃতিক দুর্যোগের কথাই আলোচনা করিতে-ছিলাম। জনৈক কিশোর যাত্রী হঠাৎ বলিয়া উঠিল—"হবে না? এটা হলো দেবতার মার, মাইক বন্ধ করার ঠেলা!"

* * *

শ্রীযুক্ত ডেবর আরো বলিয়াছেন যে, মহিলারা যেন লিপস্টিক-সভ্যতা ত্যাগ করেন। —"কতক দিন আগে ডেবরজী বাবু-সভ্যতা ত্যাগ করতে বলে-ছিলেন। আমরা বলি, গোটা সভ্যতা ত্যাগের পরামর্শ দিলেই আর ছাঁটাই-বাছাইর ঝঞ্ঝাট থাকে না"—মন্তব্য করিলেন জনৈক সহযাত্রী।

* * *

শ্রীযুক্ত শ্রীপ্রকাশ মাদ্রাজের কোন এক কলেজের একটি অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দিতে গিয়া নাকি মন্তব্য করিয়াছেন যে, স্ত্রীলোকদের বুদ্ধি পুরুষের চেয়ে চার গুণ বেশি। —"সংবাদে পড়েছি, শ্রীপ্রকাশজী সব সময় ছাতা ব্যবহার করেন। কতকদিন আগে তাঁর সম্বন্ধে রসিকতা করে বলা হয়েছিল যে, তিনি

চাঁদের আলোতেও ছাতা ব্যবহার এবারে ছাতা ব্যবহারের অর্থ পা —ওটা পুরুষদের নির্বুদ্ধিতা থে একমাত্র উপায়"!!

* * *

আন্তর্জাতিক ভ্রমণ সংস্থা দশম অধিবেশনে জওহর মন্তব্য করিয়াছেন যে, চিন্তার সংক দূরীকরণের জন্য ভ্রমণের প্রয়োজ আছে। শ্যামলাল বলিল—"কিন্তু

পকেটের সংকীর্ণতা দূরীকরণের উ সম্বন্ধে নেহরুজী কোন কথাই বলেন সুতরাং" — — — —

* * *

আচার্য কৃপালনী তাঁর এক সাম্প্রতি ভাষণে নাকি বলিয়াছেন কংগ্রেস-শাসন আরো পনর বৎসর চলি থাকিলে দেশের সর্বনাশ হইয়া যাই বিশু খুড়ো বলিলেন—"এতে কংগ্রেস খানিকটা বাহাদুরীই হয়ত দেওয়া হ নাম অবশ্য বলব না, কিন্তু এ প্রতিষ্ঠানও আছে, যাদের হাতে শা গেলে দেশের সর্বনাশের জন্য তে পোয়াবে না"!!

* * *

পর্তুগীজ পররাষ্ট্রমন্ত্রী না বলিয়াছেন যে ভারত ত্যা কিছুমাত্র ইচ্ছা তাদের নাই কেননা হলেন অতীত যুগের একটি বিশি প্রতীক। —"কিন্তু অতীতের প্রতী স্থান গোয়া-দমন-দিউতে না হয়ে জাদুঘ হলেই ভালো হতো নাকি?"—ব আমাদের শ্যামলাল।

যখন নায়ক ছিলাম

ধীরাজ ভট্টাচার্য

॥ চৌদ্দ ॥

ম্যাডান স্টুডিওর দক্ষিণ কোণ ঘেঁষে গড়িয়াহাট রোডের উপর বহুদিনের জীর্ণ পুরনো একখানি চালাঘর, বেশ খানিকটা দূর থেকে উগ্র গন্ধে বুঝতে মোটেই কষ্ট হয় না যে ওটা তাড়ির আড্ডা। সকাল থেকে শুরু করে রাত্রি আটটা নটা পর্যন্ত হই-হল্লা, মারামারি, অবিরাম গান চলে দোকানটিতে। পচা তাড়ির দুর্গন্ধে এক-এক সময় স্টুডিওতে কাজ করাও কষ্টকর হয়ে পড়তো। সব চেয়ে আশ্চর্য হয়ে যেতাম এই ভেবে যে দোকানটি ম্যাডান স্টুডিওর সীমানার মধ্যে হলেও কেউ প্রতিবাদ করে না বা ওদের তুলে দেবার জন্যে চেষ্টাও করে না।

সে দিন 'মৃণালিনী' ছবির শুটিং-এ মেক-আপ রুমে সবে এসে বসেছি, কানে এল তাড়ির আড্ডার বেসুরো গোলমাল। নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার মনে করে মেক্-আপ করেই চলেছি, হঠাৎ দেখি স্টুডিওর সব কর্মী এমন কি মেক্-আপ ম্যান পর্যন্ত ছুটেছে গেটের দিকে। কাকেই বা জিজ্ঞাসা করি। অসমাপ্ত মেক্-আপ নিয়ে মেক্-আপ রুমের দরজায় দাঁড়ালাম। স্পষ্ট দেখতে পেলাম দোকানটা, সামনে রাস্তায় গিস্ গিস্ করছে লোক। একটু বাদেই দেখি পুব দিক থেকে চার পাঁচটা খাকি পোশাক পরা পুলিস ছুটে চলেছে দোকানমুখো। কৌতূহলে ছট-ফট করতে লাগলাম। মুখে খানিকটা রঙ্ মাখা, নইলে নিজেই চলে যেতাম। গেটের দিক থেকে পরিচালক জ্যোতিষ-বাবুকে এদিকে আসতে দেখা গেল। একরকম ছুটে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—'ব্যাপার কি?'

জ্যোতিষবাবু বললেন—'ব্যাপার আর কি। নতুন কিছুই নয়। দুজনে তাড়ি খেতে খেতে ঝগড়া হয়। একজন আর একজনের মাথায় তাড়ির কলসি ভেঙেছে। মাথা ফেটে চৌচির।'

বেশ একটু উত্তেজিত হয়েই বললাম—'সাহেবরা ইচ্ছে করলেই তো ঝেঁটিয়ে দূর করে দিতে পারে, কি জন্যে এই সব নোংরা উৎপাত সহ্য করতে ওদের পুষে রেখেছে বলতে পারেন?'

—'পারি কিন্তু বলব না।' অর্থপূর্ণ হাসি হেসে বললেন জ্যোতিষবাবু।

—'আপনাদের এসব হেঁয়ালির কথা বুঝি না মশাই, পুলিসও কিছু করতে পারে না?'

—'না।'

গেটের কাছে একটা সোরগোল শুনে দুজনেই ফিরে চাইলাম। চার পাঁচটা লোককে কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে চলেছে থানামুখো, পিছনে হুজুগেপ্রিয় জনতা মজা দেখতে চলেছে সঙ্গে।

জ্যোতিষবাবু বললেন—'ঐ তো নিয়ে চলেছে, কাল সকালে এসে দেখো জম-জমাট আড্ডা, যেন কিছু হয়নি।'

বললাম—'দোহাই আপনার মিঃ ব্যানার্জি দয়া করে আসল কথাটা বলবেন কি?'

—'আসল কথা?'

চারদিক একবার ভাল করে দেখে নিলেন জ্যোতিষবাবু, তারপর আমায় আরও খানিকটা দূরে টেনে নিয়ে চুপি চুপি বললেন—'তাড়ির দোকান নিয়ে বেশি কৌতূহল দেখিয়ো না। শুধু এইটুকু জেনে রাখো ওদের পেছনে মুরুব্বি হল আমাদের সাহেবরা। নিজের চোখেই দেখলে ওদের ধরে নিয়ে গেল থানায়। সন্ধের মধ্যেই সাহেবদের যে-কেউ এসে জামিন হয়ে ওদের ছাড়িয়ে নেবে। তার পর কোর্টে কেস উঠলে যা ফাইন হবে তাও দিয়ে দেবে।'

হাঁ করে শুধু চেয়েই আছি। জ্যোতিষবাবু হেসে ফেললেন। তারপর বললেন—'এই সোজা কথাটা বুঝতে পারলে না? সাহেবরা ছেলেবুড়ো সবাই তাড়ি খায়। তাড়িটা ওদের ডাল ভাতের মত নিত্য প্রয়োজনীয় পানীয়। ভোর বেলায় টাটকা তাড়ির জোগান দ্যায় ঐ দোকান। এবার বুঝলে আসল কথাটা? এখন যাও আর দেরি কর না বেলা সাড়ে আটটা বাজে। মেক্-আপটা সেরে ফেল। আজ যেতে হবে বজবজের দিকে।'

মেক্-আপ শেষ করে হেমচন্দ্রোচিত পোশাক পরিচ্ছদ পরে বেরুতেই ন'টা বেজে গেল। ছোট প্রাইভেট গাড়িটায় আমি, জ্যোতিষবাবু আর ক্যামেরাম্যান চার্লস ক্রীড, পিছনে একটা বড় ভ্যানে ক্যামেরা ও তার সাজ সরঞ্জাম, গোটা দশ বারো রিফ্লেক্টার, পাঁচ ছ'টা বেতের মোড়া একটা বড় সতরঞ্চি, ডাব সোডা লেমনেড আর সব সহকর্মীরা।

দিন পনেরো হ'ল 'মৃণালিনী'র শুটিং আরম্ভ হয়েছে। রোজ শুটিং থাকে না, হপ্তায় দু তিন দিন শুটিং পড়ে। প্রথম দিন এসেই ক্যামেরায় যতীন দাসকে না দেখে তার বদলে সাত ফুট লম্বা চওড়া বিরাটকায় আইরিশ-ম্যান চার্লস ক্রীডকে দেখে অবাক হয়ে জ্যোতিষবাবুকে জিজ্ঞাসা করলুম—'যতীনকে নিলেন না কেন?'

জ্যোতিষবাবু বেশ একটু উত্তেজিত হয়েই বললেন—'কেন নেব? গাঙ্গুলীমশাই 'দেবী চৌধুরাণী' ছবিতে নিয়েছেন যতীনকে?'

কিছুই বুঝলাম না, চুপ করে রইলাম।

জ্যোতিষবাবু বলে চললেন—'ইটালীর জাহাজ কলকাতার জেটিতে ভিড়তে না ভিড়তেই কোত্থেকে খবর পেয়ে ইটালীর নামকরা ক্যামেরাম্যান টি মারকনিকে একেবারে ছোঁ মেরে গাঙ্গুলীমশাই নিয়ে তুললেন ৫নং ধর্মতলা ষ্ট্রীটে। সে দিন আবার ফ্রামজী আমেরিকা চলে যাচ্ছে। দু মিনিটের মধ্যে দেখি মারকনির কাঁধে হাত দিয়ে বিজয়গর্বে ফ্রামজীর ঘর থেকে বেরিয়ে আসছেন গাঙ্গুলীমশাই। শুনলাম মারকনি শুধু গাঙ্গুলীমশাইর ছবি তুলবে। যাকে বলে এক্সক্লুসিভ। মাসে দুশো টাকা মাইনে। তুমিই বলো ধীরাজ, আমি কেন তাহলে পঞ্চাশ টাকার ক্যামেরাম্যান যতীন দাসকে দিয়ে 'মৃণালিনী' তুলবো? খুঁজতে লেগে গেলুম, তারপর ক্রীড সাহেবকে রাজী করিয়ে ধরে নিয়ে গেলাম রুস্ত কাছে। চারশো টাকায় সব ঠিক করে দিন থেকে শুরু করলাম শুটিং।'

কথা শেষ করে বিজয়ী সেনা মত সোজা হয়ে সিগারেট ধর জ্যোতিষবাবু। বেচারি যতীনের একটি সমবেদনার দীর্ঘশ্বাস ফেলা আর কিছুই করবার রইল না।

চার্লস ক্রীড একজন নামকরা মে নিক। ক্যামেরা, প্রোজেক্টিং মেসিন এই সারাতে ক্রীড সাহেবের জোড়া কলকাতায় ছিল না। সদালাপী নিরহং মানুষ, অল্প সময়ের মধ্যেই চট হৃদ্যতা হয়ে যায়।

জ্যোতিষবাবুকে জিজ্ঞাসা করলা
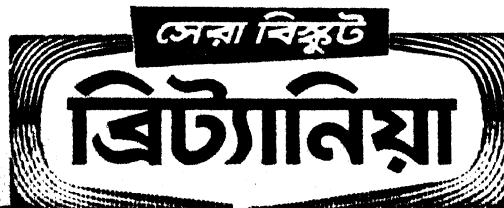
এত জায়গা থাকতে বজবজে এমন কি লোকেশান পেলেন?

ফলাও করে নাটকীয় ভঙ্গীতে হাত মুখ নেড়ে কথা বলা জ্যোতিষবাবুর একটা সহজাত অভ্যাস। বললেন—'চারদিক ধু ধু করছে তেপান্তর মাঠ। দূরে বহু দূরে দেখা যায় একটা বড় পুকুর, কাছে গেলে দেখা যাবে শান বাঁধানো ঘাট। ঘাটের দু'পাশে দুটি বিশাল বট-গাছ ছায়া মেলে দাঁড়িয়ে আছে পথশ্রান্ত হেমচন্দ্রকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাতে।'

আতঙ্কিত হয়ে বললাম—'এই কাঠ-ফাটা রোদ্দুরে ঐ ধু ধু করা তেপান্তর মাঠ ভেঙে হাঁটতে হবে আমাকে?'

সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে জ্যোতিষবাবু বললেন—'ইয়েস্।'

বললাম—'হেমচন্দ্র তো রাজা, লোকজন হাতি ঘোড়া এমন কি একটা ছাতা পর্যন্ত না নিয়ে তিনি হেঁটে চলেছেন—কেন বুঝলাম না।'

—'বুঝিয়ে দিচ্ছি।' বলে মহা উৎসাহে বলতে শুরু করলেন জ্যোতিষবাবু—কোনও গুরুতর রাজনৈতিক কারণে সকলের অগোচরে ছদ্মবেশে মানে রাজকীয় পরিচ্ছদ একটা চাদরে ঢেকে হাতি ঘোড়া লোকজন কিছু না নিয়ে সাধারণ নাগরিকের মত একাকী হেঁটে চলেছেন হেমচন্দ্র গুরুদেব মাধবাচার্যের সন্ধানে। সাধারণ রাজপথ, নগর গ্রামের মধ্যে দিয়ে গেলে হয়তো কেউ চিনে ফেলতে পারে তাই সাধারণের অগম্য মাঠ ঘাট ভেঙে চলেছেন তিনি। ঐ বাঁধানো ঘাটে গিয়ে বট গাছতলায় একটু বিশ্রাম করে—শান বাঁধানো সিঁড়ি দিয়ে ঘাটে নেমে অঞ্জলি করে জলপান করে তৃষ্ণা অপনোদন করবে তুমি—তার পর—?'

বাধা দিয়ে বললাম—'অজানা পুকুরের ঐসব যাতা নোংরা জল আমি কিন্তু খেতে পারবো না বাঁড়ুয্যেমশাই?'

একটু ভেবে নিয়ে জ্যোতিষবাবু বললেন—'কুছ পরোয়া নেই—খাওয়ার ভাণ কোরো—তাহলেই আমি ক্যামেরায় ম্যানেজ করে নেব।'

—'পুকুরের জল খেয়ে তারপর কি করবো?'

—'বাঁ পাশের রাস্তা ধরে সটান ঢুকবে গিয়ে জঙ্গলে, কিন্তু পুকুরের পাড় ঘেঁসে এমনভাবে হাঁটবে যাতে তোমার ছায়া পড়ে পুকুরের জলে।'

একে কাঠফাটা রোদ্দুর তার উপর শুটিং-এর যা ফর্দ শুনলাম তাতে খুশী হবার কথা নয়। চুপ করে বসে হতভাগ্য হেমচন্দ্রের কথা ভাবছিলাম, কানে এল—'পুওর ধীরাজ!'

চেয়ে দেখি আমার দিকে চেয়ে মিট মিট করে হাসছেন ক্রীড সাহেব। বেশ একটু অবাক হয়ে বললাম—'আপনি বাংলা বুঝতে পারেন?'

তেমনি হাসতে হাসতেই ক্রীড সাহেব বললেন—'ইয়েস, কিনটু বালো বুলতে পারে না।'

হাসি গল্পে বাকি সময়টা কেটে গেল। আমরা লোকেশানে পৌঁছে গেলাম। বহুদিন আগে বোধহয় কারও বাগানবাড়ি ছিল এখন বাড়ির চিহ্নও নেই। ধু ধু করছে মাঠ, সেই মাঠ ভেঙে সামনে পড়ে শান বাঁধানো পুকুরটা।

জ্যোতিষবাবু বললেন—'কাল ছ'

সাতজন লোক পাঠিয়ে পুকুরটার শ্যাওলা তুলিয়ে ঘাট পরিষ্কার করে রেখে গেছি। এ লোকেশানের একমাত্র সম্পদ হল ঘাটের দু পাশে দুটি বট গাছ। তারই ছায়ায় সতরঞ্জি মোড়া বিছিয়ে সবাই বসলাম।

মামুলি শুটিং। শুধু হাঁটা, কোনও বৈচিত্র্য নেই। রোদ্দুরের তাপ বেড়ে উঠলে মাঝে মাঝে বটগাছতলায় এসে বসি। ডাব, সোডা, লেমনেড খাই আবার হাঁটি। এইভাবে বেলা চারটে পর্যন্ত শুটিং চললো। সব গোছগাছ করে স্টুডিওতে গিয়ে মেক-আপ তুলে পোশাক আশাক ছেড়ে বাড়ি আসতেই সন্ধ্যে হয়ে গেল।

শোবার ঘরে তক্তপোশের পাশে ছোট গোল টেবিলটার উপর একখানা খামের চিঠি, অপরিচিত মেয়েলি হাতের লেখা। আকাশ পাতাল ভাবতে ভাবতে ভয়ে ভয়ে চিঠিটা খুললাম। খিদিরপুর লিখেছে,—

শ্রীচরণ কমলেষু,

ছোড়দা, আজ প্রায় ... চলিল তুমি আমাদের ... ব্যাপার কি? গোপাদির ... রোজই আমাকে পড়াইতে ... তোমার কথা বলেন। আমরা ... করিয়াছি যার জন্য তুমি ... দাও না? লক্ষ্মীটি ছোড়দা ... আসা চাইই কিন্তু। আমরা তোমা... বসে থাকবো। ইতি—তোমা...

ছোট্ট চিঠি। বক্তব্যও ... তবুও একবার দুবার তিনবার ... চিঠিখানা। খিদিরপুরে যাবার ... আহ্বান যে একা শুধু রিনির ... বুঝতেও কষ্ট হয় না। সংকল্প ... দিনই রাতে চৌরঙ্গি রোডে ... করে ফেলেছিলাম। কুহকিনী ... তবুও মনটাকে দোলা দিতে ... ভাবলাম যাই না রবিবারে, গোপা... কথা খুলে বলে আমার তাসের ... চিরদিনের মত ভূমিসাৎ করে দিয়ে ... পরক্ষণেই মনে হল সে দৃঢ় মনোবল ... নেই আর তা ছাড়া তাতে লাভই ... তার চেয়ে বরং রিনিকে লিখে ... পার্ল হোয়াইট, তোমার চিঠি ... ইচ্ছে থাকলেও অদৃষ্টের নিষ্ঠুর ... যাদের হাত পা বাঁধা সেই সব ... হতভাগ্য জীবগুলোর মধ্যে তোমার ... অন্যতম। নাঃ ঠিক হচ্ছে না। এই ... তোমার গোপাদিকে বোলো—'কুঁড়ে... শুয়ে অট্টালিকায় বাস করার স্বপ্ন ... ভাল, তাতে কারও কোনও ক্ষতি ... হয় না কিন্তু বিপদ হয় তখনই যখন ... ঘরের বাসিন্দা স্বপ্নকে সত্য মনে ... অট্টালিকার পানে হাত বাড়ায়—।'

হঠাৎ মনে হল খুব কবিত্ব ক... তো লিখছি কিন্তু চিঠিটা দেবো ... রিনিকে? রিনিকে চিঠি দেওয়া ... কাকা কাকিমার হাতে সে চিঠি ... তখন? চিঠি দিয়ে ক্ষণিক সান্ত্বনা ... পাবো কিন্তু আমাকে উপলক্ষ্য করে ... সংসার-অনভিজ্ঞা সরল মেয়ের ... যে অশান্তি ও বিপ্লবের আগুন ... তা নিভাতে অনেক সময় লাগবে ... ঠিক করে ফেললাম—রিনির

ও দেবো না, খিদিরপুরেও আর যাবো টুকরো টুকরো করে রিনির চিঠিটা লা দিয়ে রাস্তায় ফেলে দিলাম। দেখি, শুটিং থেকে এসে জামা ড়ই ছাড়িনি। তাড়াতাড়ি জামা ড় বদলে চোখ বুজে শুয়ে পড়লাম। কতক্ষণ মনে নেই—জেগেই ছিলাম। ক ভাঙল মায়ের কথায়। বিছানার ছে দাঁড়িয়ে মা বলছেন—'তোর আজ ল কি? শুটিং থেকে এসে মুখ হাত নিলে, খাবার খেলিনে। এদিকে রাত টা বাজে। এখন দয়া করে খেয়ে নিয়ে মায় রেহাই দাও। সারাদিনের টুনির পর একটু জিরিয়ে বাঁচি।'

সত্যিই লজ্জা পেলাম। তাড়াতাড়ি মুখ হাত ধুয়ে খেতে চলে গেলাম। খেয়ে দেয়ে বাইরের অন্ধকার রকটায় চুপ করে বসে রইলাম। একটু বাদে ঢং ঢং করে দশটা বাজল। বেশ চিন্তিত হয়ে পড়লাম। বাবা এখনও টিউশনি থেকে ফেরেননি। মাও না খেয়ে বাবার জন্যে বসে আছেন। সাধারণত ন'টা সাড়ে ন'টার মধ্যে ফেরেন, আজ এত দেরি হওয়ার কারণ কি? বাইরের দরজায় কে কড়া নাড়লে, তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দেখি বাবা। বাবার সাড়া পেয়ে মাও সামনে এসে দাঁড়ালেন। কিছু জিজ্ঞাসা করবার আগেই বাবা মাকে বললেন,—'তোমরা খেয়ে নাও, আমি কিছুই খাবো না, জ্বরটা একটু বেশি বলেই মনে হচ্ছে।'

গায়ে হাত দিয়ে দেখি বেশ গরম। বাবার সঙ্গে আস্তে আস্তে উপরে উঠে গেলাম। জুতো জামা খুলে দিতেই বাবা শুয়ে পড়লেন। কাছে বসে কপালটায় হাত বুলাতে বুলাতে জিজ্ঞাসা করলাম—'জ্বরটা কবে থেকে হচ্ছে?'

ঘরে ঢুকতে ঢুকতে জবাবটা মাই দিলেন—'আজ চার পাঁচ দিন রোজ বিকেলে স্কুল থেকে এসেই শুয়ে পড়েন। গায়ে হাত দিয়ে দেখি গরম। বিশ্রাম নিতে বললে বলেন—ও কিছু নয়, শীত-কালে বিকেলবেলায় ওরকম হয়।'

বললাম—'আমায় এসব জানাওনি কেন?'

মা বললেন—'উনিই বলতে দেননি। বলেন, মিছেমিছি ওকে ব্যস্ত কোরো না।'

লজ্জায় ধিক্কারে মরে যেতে ইচ্ছে হচ্ছিল। স্বার্থপরের মত নিজের ব্যক্তিগত সুখ দুঃখ অভিমান নিয়েই মত্ত হয়ে ছিলাম, আর কোনওদিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজনই মনে হয়নি।

বাবাকে বললাম—'কাল থেকে আপনাকে কমপ্লিট রেস্ট নিতে হবে বাবা, আমি সকালেই ডাঃ এন এন দাসকে ডেকে আনব।'

ডাঃ এন এন দাস বাবার বিশেষ বন্ধু এবং তখনকার দিনে ভবানীপুর অঞ্চলে বিখ্যাত ডাক্তার ছিলেন। পূর্ণ থিয়েটারের বিপরীতে পপুলার ফার্মেসী ওঁরই প্রতিষ্ঠিত।

ম্লান হেসে বাবা বললেন, 'এন দাসকে একবার ডাকতে পার তবে সম্পূর্ণ বিশ্রাম নেওয়া এখন আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। সামনে ছেলেদের বাৎসরিক পরীক্ষা, খুব ক্ষতি হবে। তাছাড়া সামান্য জ্বরে তোমরা এত ভয় পাচ্ছ কেন?'

বললাম—'সামান্য হোক আর যাই হোক, কাল থেকে ভালভাবে না সেরে ওঠা পর্যন্ত আপনি স্কুল বা টিউশনিতে যেতে পারবেন না।' মাও আমার সঙ্গে যোগ দিলেন দেখে বাবা দু একবার ক্ষীণ আপত্তি তুলে চুপ করে গেলেন।

মিত্র ইনস্টিটিউশনে দীর্ঘ কুড়ি বাইশ বছর চাকরির মধ্যে বাবা খুব কমই ছুটি নিয়েছিলেন। পরদিন পনেরো দিনের একটা ছুটির দরখাস্ত হেডমাস্টার মশাইকে দিয়ে সব ব্যবস্থা করে এলাম। ঠিক হ'ল দুজন উঁচু ক্লাসের ছাত্র বাড়িতে

এসে পড়ে যাবে, বাকি দুজন যারা নীচু ক্লাসে পড়ে তাদের সন্ধ্যার পর আমি গিয়ে পড়িয়ে আসবো।

সব শুনে মা বললেন—'সবই তো হল, কিন্তু রাত জেগে পড়াশুনোটা বন্ধ করতে পার?'

বাবার এই রাত জেগে পড়াশুনোর পেছনে একটা ছোট্ট ইতিহাস আছে। বাবা আমার ঠাকুর্দার একমাত্র ছেলে। শৈশবে মাতৃহীন কাজেই ছোটবেলা থেকেই ভীষণ একগুঁয়ে ও খেয়ালি ছিলেন। তখন স্কুলে পড়েন, এনট্রান্স্ পরীক্ষার মাত্র এক বছর বাকি। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন প্রবলভাবে শুরু হয়ে গেল বাংলা দেশে। বাবাও মেতে উঠলেন। স্কুল ছেড়ে দিয়ে ঠাকুর্দাকে বললেন—ম্লেচ্ছভাষা পড়ব না, দেবভাষা পড়বো। যে কথা সেই কাজ। কৃষ্ণনগরে গিয়ে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সংস্কৃত টোলে ভর্তি হয়ে পড়লেন। কুমার ক্ষৌণিশচন্দ্র তখন খুব ছোট। পরে বাবা তাঁর গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হন। এর পরের বিচিত্র ইতিহাস বর্তমান কাহিনীতে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক—তাই বর্তমানেই ফিরে যাচ্ছি।

মিত্র ইনস্টিটিউশনের হে[ড] সতীশচন্দ্র বোস বাবাকে খু[ব] বাসতেন। দুজনে বন্ধুত্বও ছি[ল]। ১৯২০ সালের মাঝামাঝি একদি[ন] ছুটির পর বাবাকে নিভৃতে বললেন—ভারি বিপদে পড়েছি বাবু: স্কুল ইন্সপেক্টর সা[র্কুলার] পাঠিয়েছে হাই স্কুলে নন[-ম্যাট্রিক] মাস্টার রাখা চলবে না। আ[পনাকে] ছাড়তেও প্রাণ চায় না অথচ [সার্কুলার] মানতে গেলে রাখতেও পারছিনে, কি করি বলুন তো? একটু চুপ করে [থেকে] বাবা বললেন,—সার্কুলারটা ঠিক [কবে] থেকে কার্যকরী হবে? সতীশ[বাবু] বললেন,—বছরখানেক তো বটেই, [আর] ছ' মাস চেষ্টা করলে বাড়িয়ে [নেওয়া] যাবে। বাবা বললেন,—ঠিক আ[ছে], আপনি ভাববেন না। এর পরই [রাত] জেগে পড়তে শুরু করেন বাবা। [দিনে] একদম সময় পেতেন না—রাত জেগে প[ড়ে] ম্যাট্রিক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হ[তে] লাগলেন। ১৯২২ সালে প্রাই[ভেট] পরীক্ষার্থীরূপে দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিং[য়ে] ছেলের বয়সী ছোট ছোট ছেলেদের স[ঙ্গে] পরীক্ষা দিলেন। ওর মধ্যে বা[বার] কয়েকটি ছাত্রও ছিল। যথাসময়ে পরী[ক্ষার] ফল বার হলে দেখা গেল, বাবা ফা[র্স্ট] ডিভিশনে পাস করেছেন। তখনক[ার] দিনের কয়েকটি নামকরা দৈনিকে [এ] সম্বন্ধে সরস মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছি[ল]।

ম্যাট্রিকের সার্টিফিকেটখানি হে[ড] মাস্টার সতীশবাবুর হাতে দিয়ে বা[বা] বললেন—নেশা যখন একবার লাগি[য়ে] দিয়েছেন তখন এতেই মামলা শেষ হ[বে] না—প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়ে আমি বি [এ] পর্যন্ত পাশ করে তবে থামবো। অদ্ভু[ত] অধ্যবসায় ও মেধা ছিল বাবার। আ[মি] বয়সের কথা উল্লেখ করলে বলতেন পড়াশুনার কি বয়েস আছে রে!

যে সময়ের কথা বলছি—বাবা ত[খন] প্রাইভেটে আই এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তু[ত] হচ্ছিলেন। এমনিতেই বাবা খুব রো[গা] ছিলেন। আজ লক্ষ্য করে দেখলাম যে[ন] আরো রোগা ও দুর্বল হয়ে পড়েছেন। মাথার বালিশ ও তোশকের নীচে লুকি[য়ে] রাখা আই এ কোর্সের বইগুলো জড়ো করে নীচে নেমে এলাম। (ক্রমশ[ঃ])

মিসেস চাটার্জি

॥ শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

বুধা বামুনদিদি দেশে গিয়া পর্যন্ত মাধুরীর শান্তি নাই। দীর্ঘকাল ীরের অযত্ন এবং অতিরিক্ত পরিশ্রমের ল নিজের স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙিয়া য়াছে, নিত্য মাথার যন্ত্রণা, পেটের ণো, শরীরের নানা অঙ্গে নানা অস্বস্তি গিয়া আছে। রোগ একটা নয়, তাহার কিৎসাও একরকম নয়; স্বামীর ার্জন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারের ন বাড়িয়াই চলিয়াছে। তবে তাহার যে া করা বাসন মাজা চলিবে না সে বিষয়ে ল ডাক্তারই একমত, সুতরাং লোক খতেই হইবে। কিন্তু মেলে কই? সা দিয়া মনের মতো লোক পাওয়ার য় বাঘের দুধ পাওয়া সহজ।

মাধুরীর স্বামী বোধিসত্ত্ব চট্টো-ধ্যায় মহাশয় একটু অন্যমনস্ক ৃতির লোক। চিঠি ফেলিতে য়া ডাকবাক্সে মনিব্যাগ ফেলিয়া সেন; কোনোদিন রাঁধা ভাত না য়া অফিস যান, আবার ছুটির দিন রতৃপ্তিপূর্বক আহার করিয়া ঘণ্টা-নেক পরে বলেন, "কই, আজ তোমরা তে দেবে না আমাকে?" সেবার তাঁহার য়রাভাইয়ের অসুখ শুনিয়া দেখিতে য়াছিলেন। শয্যাগত কমলাকান্তবাবুর টের পাশে চেয়ার টানিয়া লইয়া দুই-নের আলাপ আরম্ভ হইল। অফিস, লজ, আধুনিক ছাত্র সমাজের ৃঙ্খলতা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রিকেট, লিম্পিক পার হইয়া আলোচনা যখন রেজীর প্রসঙ্গে আসিয়া বিতর্কে ণত হইয়াছে সেই সময় জ্যেষ্ঠা লিকা সুলেখা স্বামীর মাথার দিকে একটা টিপয়ের উপর একবাটি চটকানো তরকারি ও ভাতের মণ্ড দিয়া গেলেন। বস্তুটি ডাক্তারের নির্দেশ অনুযায়ী প্রস্তুত রোগীর পথ্য। কমলাকান্ত-বাবু বালিশ হইতে মাথা তুলিয়া সেটির সদ্ব্যবহার করিবার পূর্বেই বোধিসত্ত্ব-বাবু বাটিটি হাতে তুলিয়া লইলেন এবং অম্লানবদনে চামচসহযোগে সেই অখাদ্যটি গলাধঃকরণ করিতে লাগিলেন। মিনিট কয়েক পরে সুলেখা গরম লুচি তরকারী এবং মিষ্টান্ন একটি রেকাবীতে সাজাইয়া আনিয়া দেখেন ভগ্নীপতি বাটি শেষ করিয়া জলের গ্লাসে চুমুক দিতেছেন আর ক্ষুধার্ত স্বামী হাস্যোজ্জ্বল বিস্মিত নেত্রে তাঁহার দিকে তাকাইয়া আছেন।

সে-হেন বোধিসত্ত্ববাবুরও পরপর দুইদিন তরকারির সঙ্গে পোড়া বড়ি চিবাইয়া ধৈর্যচ্যুতি ঘটিল, তিনি উঠিয়া পাচকটিকে জবাব দিলেন। তাহার পর আসিল হিন্দুস্থানী লছমন তেওয়ারী। সে শুধু ভাত, ডাল, সাদামাঠা তরকারি রাঁধিবে না, চপ, কাটলেট, কোর্মা, কাবাব অনেক কিছুই রাঁধিবে। বোধিসত্ত্ববাবু পঁচিশ টাকা বেতন এবং খাওয়া পরার দায়িত্ব লইয়া তাহাকে অবিলম্বে কাজে নিযুক্ত করিলেন। মাধুরী ঠাকুরকে রান্না-ঘর ভাঁড়ার ঘর দেখাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত-চিত্তে শয্যা লইল।

আধঘণ্টা পরে পোড়াভাতের দুর্গন্ধের সঙ্গে তারস্বরে আর্ত চীৎকার উঠিল, "মাইজি, এ মাইজি, জলদি আইয়ে।" মাধুরী ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া গিয়া দেখিল, হাঁড়ি ছাপাইয়া ফেনের সঙ্গে ভাত উনানে পড়িতেছে আর লছমন তিন হাত পিছাইয়া সভয় দৃষ্টিতে সেইদিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে। মাধুরীকে দেখিয়া তাহার মুখে কথা ফুটিল, সে করুণ স্বরে বলিল "ভাত ভাগ্‌তা।" ভাতের দোষ ছিল না, যে হাঁড়িতে এক সের চালের ভাত হয় তাহাতে দুই সের চাল পড়িয়াছে। অনেক কষ্টে হাঁড়ি সামলাইয়া মাধুরী ধমক দিল, "তবে না তুমি চপ কাটলেট রাঁধতে জানো। এক হাঁড়ি ভাত রাঁধতে পারো না, চাকরি করতে এসেছ মিথ্যা কথা বলে?" লছমন অনেক কষ্টে ভাঙা ভাঙা হিন্দীতে যাহা বলিল, তাহার অর্থ, তাহার দেশওয়ালী এক ভাই বড়লোকের বাড়ি চাকরি করে, সে তাহাকে ঐ নামগুলো শিখাইয়া দিয়াছিল কারণ এ-সব রাঁধিতে না জানিলে বেতন বাড়িবে না। রাঁধিতে শিখাইবার কথা ছিল, কিন্তু অন্নাভাবে তাহাকে অবিলম্বে কাজে নামিতে হইয়াছে বলিয়া তাহার শিখিবার সময় বা সুবিধা হয় নাই; একবার মাধুরী শিখাইয়া দিলেই সে ছত্রিশ ব্যঞ্জন রাঁধিয়া খাওয়াইবে। বাড়িতে চলিত কি করিয়া প্রশ্ন করায় জানা গেল, দেশে তাহার 'বুঢ়ী মাই' রাঁধিত, সে খাইত। রান্নাটা যে এমন কঠিন ব্যাপার তাহা সে কল্পনা করে নাই। তাহাকে ছাড়াইয়া দিলে দেশে তাহার বুড়ী মা না খাইয়া মরিবে।

মাধুরীর দয়া হইল, ফলে লছমনের অন্ন উঠিল না বটে, তবে বাড়ির লোকের

চিঠি ফেলিতে গিয়া ব্যাগ ফেলিয়া আসেন

অন্ন উঠিবার উপক্রম হইল। অর্ধেকদিন বোধিসত্ত্ববাবু নিঃশব্দে খাইয়া গেলেও ছেলে পবিত্র গোলমাল করে, "আজ ডালটায় একেবারে নুন দেয়নি," "ইঃ তরকারিটা যে শুধু লঙ্কা গোলা," "এঃ, ভাতগুলো পুড়ে চাপড়া বেঁধে গেছে। রোজ রোজ আর পোড়া ভাত খেতে পারি না মা, ওকে বিদায় করো।" মাধুরী প্রাণপণ যত্নে লছমনকে মানুষ করিয়া তুলিতেছে, বলে "আগের চেয়ে তো ভালো রাঁধছে বাপু। আর দিনকতক দেখ না, আমার মতো রাঁধতে পারবে।" পবিত্র হতাশ হইয়া বলিল, "সে আর এ কাঠামোয় হবে না, মা।"

এদিকে শীতকাল আসিয়া পড়িল। মাধুরী কয়েক বৎসর যাবৎ এইসময় দুই মাস কোথাও চেঞ্জে যায়। বন্ধুবান্ধবের সাহায্যে বোধিসত্ত্ববাবু কোনোবার পশ্চিমে কোনোবার দক্ষিণে কোনো স্বাস্থ্যকর স্থানে বাসা ভাড়া করিয়া ঠাকুর চাকর সমেত তাহাকে পেঁছাইয়া দিয়া আসেন এবং মাসান্তে একবার করিয়া দেখিয়া আসেন। সেখানে তাহার অভিভাবক বলিতে কোনো বন্ধুর বন্ধু স্থানীয় বাসিন্দা ভদ্রলোক থাকেন, একান্ত কেহ না জুটিলে পবিত্রকেই স্কুল কামাই করিয়া মায়ের কাছে দুইমাস থাকিতে হয়। অন্যান্যবার বামুনদিদির উপর কলিকাতার বাসার ভার দিয়া মাধুরী একজন অস্থায়ী পাচক সঙ্গে লইয়া যাইত, এবার লছমনই কলিকাতায় থাকিবে স্থির হইয়াছে, মাধুরীর সঙ্গে যাইবার লোক মিলিতেছে

মাইজি, এ মাইজি জল্দি আইয়ে

না। ট্রায়েল দিবার জন্য পরপর দুইদিন দুইজন আসিল, দুইজনই বাঙালী। এক-জন লছমনের তৈয়ারী চায়ের কাপে চুমুক দিয়া বলিল, "এ আপনারা কি রকম চা খান? চায়ে 'লিকার' নেই, 'সুগার' নেই।" পাঁচ মিনিটের মধ্যে সে ব্রুকবণ্ড, লিপটন, মণ্টিভিডিয়ট, অরেঞ্জ পিকো প্রভৃতি অনেক কিছু বলিয়া ফেলিল। মাধুরী বলিল, "খেতে হয় খাই, ও ঠাকুর কি আর চা করতে জানে? তুমি ভালো চা কিনে এনে ভালো ক'রে করো না? তা, রান্নাবান্না কি জানো?" কালীপদ অর্ধেক চা-শুদ্ধ কাপটি নামাইয়া রাখিয়া বলিল, "রান্না আমার বংশে কেউ কখনও

করেনি। নিতান্ত দেশছাড়া হ… পড়েছি। উদ্বাস্তু কলোনীতে… ঝামেলা, খেয়ে শুয়ে সুখ নে… ভাবছি দেখব চেষ্টা করে। তা… যেখানে যাবেন সেখানে সিনেম… তো? আমার কিন্তু সপ্তাহে… সিনেমা না দেখলে চলবে না।" … বলিল, "তাহলে তুমি কল… কোনো কাজের চেষ্টা দেখ, … তোমাকে দিয়ে চলবে না।"

কালীপদ চলিয়া গেল, … আনিয়া এভাবে বিদায় দেওয়া… বেশ কয়েকটা কড়া কথা শুনাই… গেল। মাধুরী সদর দরজা বন্ধ… ভুলিয়া গিয়া নিঃশব্দে তাহার … দিকে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল… সময় সেই খোলা দরজা দিয়া এ… মহিলা প্রবেশ করিলেন। … ভ্যানিটি ব্যাগ এবং ছাতাটি … নামাইয়া রাখিয়া মাধুরীর পায়ে… লইয়া প্রণাম করিয়া বলিলেন, '… তো মাধুরীদি?" পঁচিশ ছাব্বি… বয়সের সুশ্রী মেয়েটি, সীমন্তে… ললাটে সিন্দুর বিন্দু, মুখে… মাধুরী হাসিয়া বলিল, "চিনতে … না তো?" তরুণী সপ্রতিভভাবে … বলিল "আমাকে চিনতে পারবা… কথা নয়। বোধিসত্ত্ববাবুদের … আমার স্বামী কাজ করেন, তাঁ… খবর পেলুম, আপনি চেঞ্জে যাবে… জন সঙ্গিনী চান। তা আমাকে … আমি কখনও পাহাড় দেখিনি, … আপনার দয়ার—"

মাধুরী বিস্মিত হইয়া … "দেখুন, আপনি ভুল করছেন, … ঠিক সঙ্গিনী খুঁজছি না। তেমন … লোক আমরা নই, অসুখও আমার … ধরনের নয়। আমার চাই কেবল এ… রাঁধবার লোক।" তরুণী মাথা … বলিল, "আপনি একটু আবরণ … রেখেন না দেখছি। বেশ, আমি র… রাঁধতেই এসেছি। চাল্লশ টাকা … [illegible] চলছে না। … [illegible] বোধিসত্ত্ববাবুর … [illegible] বাড়ি হলে তিনি রাজী … [illegible]

অন্ন উঠিবার উপক্রম হইল। অর্ধেকদিন বোধিসত্ত্ববাবু নিঃশব্দে খাইয়া গেলেও ছেলে পবিত্র গোলমাল করে, "আজ ডালটায় একেবারে নুন দেয়নি," "ইঃ তরকারিটা যে শুধু লঙ্কা গোলা," "এঃ, ভাতগুলো পুড়ে চাপড়া বেঁধে গেছে। রোজ রোজ আর পোড়া ভাত খেতে পারি না মা, ওকে বিদায় করো।" মাধুরী প্রাণপণ যত্নে লছমনকে মানুষ করিয়া তুলিতেছে, বলে "আগের চেয়ে তো ভালো রাঁধছে বাপু। আর দিনকতক দেখ না, আমার মতো রাঁধতে পারবে।" পবিত্র হতাশ হইয়া বলিল, "সে আর এ কাঠামোয় হবে না, মা।"

এদিকে শীতকাল আসিয়া পড়িল। মাধুরী কয়েক বৎসর যাবৎ এইসময় দুই মাস কোথাও চেঞ্জে যায়। বন্ধুবান্ধবের সাহায্যে বোধিসত্ত্ববাবু কোনোবার পশ্চিমে কোনোবার দক্ষিণে কোনো স্বাস্থ্যকর স্থানে বাসা ভাড়া করিয়া ঠাকুর চাকর সমেত তাহাকে পৌঁছাইয়া দিয়া আসেন এবং মাসান্তে একবার করিয়া দেখিয়া আসেন। সেখানে তাহার অভিভাবক বলিতে কোনো বন্ধুর বন্ধু স্থানীয় বাসিন্দা ভদ্রলোক থাকেন, একান্ত কেহ না জুটিলে পবিত্রকেই স্কুল কামাই করিয়া মায়ের কাছে দুইমাস থাকিতে হয়। অন্যান্যবার বামুনদিদির উপর কলিকাতার বাসার ভার দিয়া মাধুরী একজন অস্থায়ী পাচক সঙ্গে লইয়া যাইত, এবার লছমনই কলিকাতায় থাকিবে স্থির হইয়াছে, মাধুরীর সঙ্গে যাইবার লোক মিলিতেছে

মাইজি, এ মাইজি জল্‌দি আইয়ে

না। ট্রায়েল দিবার জন্য পরপর দুইদিন দুইজন আসিল, দুইজনই বাঙালী। এক-জন লছমনের তৈয়ারী চায়ের কাপে চুমুক দিয়া বলিল, "এ আপনারা কি রকম চা খান? চায়ে 'লিকার' নেই, 'সুগার' নেই।" পাঁচ মিনিটের মধ্যে সে ব্রুকবণ্ড, লিপটন, মণ্টিভিডিয়েট, অরেঞ্জ পিকো প্রভৃতি অনেক কিছু বলিয়া ফেলিল। মাধুরী বলিল, "খেতে হয় খাই, ও ঠাকুর কি আর চা করতে জানে? তুমি ভালো চা কিনে এনে ভালো ক'রে করো না? তা, রান্নাবান্না কি জানো?" কালীপদ অর্ধেক চা-শুদ্ধ কাপটি নামাইয়া রাখিয়া বলিল, "রান্না আমার বংশে কেউ কখনও করেনি। নিতান্ত দেশছাড়া হয়ে পড়েছি। উদ্বাস্তু কলোনীতে ঝামেলা, খেয়ে শুয়ে সুখ নেই ভাবছি দেখব চেষ্টা করে। তা যেখানে যাবেন সেখানে সিনেমা তো? আমার কিন্তু সপ্তাহে সিনেমা না দেখলে চলবে না।" বলিল, "তাহলে তুমি কোনো কাজের চেষ্টা দেখ, তোমাকে দিয়ে চলবে না।"

কালীপদ চলিয়া গেল, আনিয়া এভাবে বিদায় দেওয়ার বেশ কয়েকটা কড়া কথা শুনাই গেল। মাধুরী সদর দরজা বন্ধ ভুলিয়া গিয়া নিঃশব্দে তাহার গ দিকে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল সময় সেই খোলা দরজা দিয়া এক মহিলা প্রবেশ করিলেন। ভ্যানিটি ব্যাগ এবং ছাতাটি নামাইয়া রাখিয়া মাধুরীর পায়ে লইয়া প্রণাম করিয়া বলিলেন, " তো মাধুরীদি?" পঁচিশ ছাব্বি বয়সের সুশ্রী মেয়েটি, সীমন্তে ললাটে সিন্দুর বিন্দু, মুখে মাধুরী হাসিয়া বলিল, "চিনতে না তো?" তরুণী সপ্রতিভভাবে বলিল "আমাকে চিনতে পারবার কথা নয়। বোধিসত্ত্ববাবুর আমার স্বামী কাজ করেন, তাঁর খবর পেলুম, আপনি চেঞ্জে যাবেন জন সঙ্গিনী চান। তা আমাকে আমি কখনও পাহাড় দেখিনি, আপনার দয়ায়—"

মাধুরী, বিস্মিত হইয়া "দেখুন, আপনি ভুল করছেন, ঠিক সঙ্গিনী খুঁজছি না। তেমন লোক আমরা নই, অসুখও আমার ধরনের নয়। আমার চাই কেবল এক রাঁধবার লোক।" তরুণী মাথা নাড়ি বলিল, "আপনি একটু আবরণ রাখ দেবেন না দেখছি। বেশ, আমি রাঁধ জন্যই এসেছি। চল্লিশ টাকা মাইনে আমাদের সংসার চলছে না। আ স্বামীর খুব শ্রদ্ধা বোধিসত্ত্ববাবুর ও যায় তার বাড়ি হলে তিনি রাজী হবে না। আপনার সঙ্গে দুমাস ঘুরে এ যদি কিছু আর্থিক সাহায্য নাও

ার মনের একটু উন্নতিতো হবে! ন না একবার ট্রায়াল দিয়ে?" মেয়েটি ভালোই, অফিসে তাহার স্বামীর তি পাওয়া গেল। অগত্যা তনুশ্রীকে গ লইয়াই সেবার মাধুরী চেঞ্জে গেল। গ রহিল পুরাতন ভৃত্য যমুনাপ্রসাদ পুত্র পবিত্র।

সাঁওতাল পরগণার যে ছোটো টিতে সেবারে মাধুরীরা বেড়াইতে সেল, সেখানে স্বাস্থ্যান্বেষী বাঙালী ও কয়েক ঘর ছিলেন। রেল লাইনের ধারে মাত্র দুইতিনখানি বাগানঘেরা , তাহার পরেই শালবন; অপরধারে ওয়েব বাবুদের কোয়ার্টার, কয়েকজন ী স্বাস্থ্যান্বেষীর পাকা বাড়ি এবং তালদের গ্রাম। মাধুরীরা আশ্রয় াছিল এপারে। তাহার লোকসঙ্গ ী ভাল লাগিত না, বারান্দায় শুইয়া য়া এবং বাগানে বেড়াইয়াই তাহার কাটিত। দূরের পাহাড় এবং বন, ার মধ্যে অপরূপ সূর্যোদয় এবং স্ত তাহার চোখ জুড়াইত, তাহার জর্জর দেহের এবং বিরহকাতর র সমস্ত বেদনা সাময়িকভাবে াইয়া রাখিত। তনুশ্রীর কিন্তু এই র্নতা ভালো লাগিত না। সে দুই দিন ছটফট করিয়া বেড়াইল। কাছা- ছি দুইখানি বাড়ির একটিতে এক থ অধ্যাপক অবসরজীবন যাপন করেন, াহার বাড়িতেও কেবলই লেখাপড়ার থা, সেখানে সুবিধা হইল না। আর কটিতে এই বাড়ির বাড়িওয়ালারা কেন। তাঁহাদের এখানে যথেষ্ট প্রতি- তি। তাহার দু'টি মেয়ে বকুল, মুকুল কালবিকাল মাধুরীর সঙ্গে আলাপ াইত, দায়ে দরকারে কাজে লাগিত, ড়িতে ভালোমন্দ কিছু রান্না হইলে াহকে ভাগ দিয়া যাইত। কথায় কথায় একদিন বলিল, "তনুদি আমাদের বেড়াতে যান গায়ে একটা নেটের িয়ে। ও কি রকম অসভ্যতা? রাগ করছিলেন?" মাধুরী করে নাই, তনুশ্রী বেড়াইয়া রেই সে ঘরে গিয়া শুইয়া সন্ধ্যার পর ইচ্ছা করিয়াই ল্যাম্পটা জ্বালিয়া বসিয়া রহিল। একটু

পরে তনুশ্রী ওপারের পাড়ায় মজলিস শেষ করিয়া ফিরিল, মাধুরীকে দেখিয়া বলিল, "হিম পড়ছে মাধুরীদি, আপনি আজ এখনও যে বাইরে?" মাধুরী বলিল, "আপনার জন্যেই বসেছিলুম। এই ঠাণ্ডায় এইরকম নেটের জামা গায়ে দিয়ে বেরিয়ে- ছিলেন, ঠাণ্ডা লেগে অসুখে পড়লে তখন আমাকেই তো ভুগতে হবে?" তনুশ্রী নিজের দেহের উপর একবার চোখ বুলাইয়া লইয়া তাচ্ছিল্যের সুরে বলিল, "আমার অত সহজে অসুখ করে না। গরীবের আবার অসুখ, ওসব আপনাদের মানায়।" মাধুরী কথার খোঁচাটা গায়ে না মাখিয়া বলিল, "অসুখ যদি নাও করে, এমন করে গা দেখিয়ে পাঁচটা ভদ্রলোকের বাড়িতে বেড়ানো উচিত নয়। এতে বদনাম হয়।" পরক্ষণে একটু ঠেস দিয়াই বলিল, "আপনি তো আবরণের খুব পক্ষপাতী ছিলেন, হঠাৎ এরকম নিরাবরণ হবার ঝোঁক হ'ল কেন?" তনুশ্রী এইবার গর্জন করিয়া বলিল, "যা তা বলবেন না, বুকে আমার কাপড়ের আঁচল থাকে। আর আমার তো আপনার মতো বিশ পঞ্চাশটা কাপড়জামা নেই, যা আছে তাই পরি।" মাধুরী বলিল, "বেশ, যতদিন আমার কাছে আছেন, ততদিন আমার কাপড়- জামাই পরবেন দু'চারখানা। আমাকে জিজ্ঞেস করে নেবেন অবশ্য।"

ইহার পর চক্ষুলজ্জা কাটিয়া গেল। তনুশ্রীর তনু নিত্য নূতন বসনে কিরূপ শ্রী ধারণ করিত মাধুরী তাহা সব সময়ে জানিতেও পারিত না। আলনায় সারি সারি কাপড় সাজানো থাকিত, তনুশ্রী যখন যেটা ইচ্ছা পরিত। মাধুরীর তিন জোড়া স্যাণ্ডালের মধ্যে সবচেয়ে শৌখীনটাই সে বাছিয়া লইয়াছিল। মাধুরী মাথার যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া যে সময়ে চোখ বুজিয়া পড়িয়া থাকিত, সেই সময়ে নিঃশব্দে তাহার টেবিল হইতে চাবিটি তুলিয়া লইয়া গিয়া তাহার ট্রাঙ্ক খুলিয়া নূতন নূতন কাপড়ও মাঝে মাঝে বাহির করিত, আবার সময় বুঝিয়া নিঃশব্দে তুলিয়া রাখিয়া যাইত। মাঝে মাঝে সোনার গহনাও কিছু কিছু খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না, পরদিন বা তাহার পরদিন সেগুলি আবার যথাস্থানে ফিরিয়া আসিত। মাধুরী জানিয়া শুনিয়া চোখ

খুজিয়া থাকিত; মেয়েটি রাঁধে ভালো, তাহাকে সহসা জবাব দিলে বিদেশে বিপদে পড়িতে হইবে। দিনের মধ্যে ছয়-ঘণ্টা সে বাড়ি থাকে না বটে, কিন্তু যতক্ষণ থাকে তখন বাড়িটি সাজাইয়া গুছাইয়া রাখে।

পবিত্রের সঙ্গে বাড়ির বিশেষ সম্পর্ক নাই, সে পাশের বাড়িতে দুইটি ছেলের সঙ্গে খুব ভাব জমাইয়াছে। সেখানে সারাদিন ক্যারমবোর্ড খেলা চলে, গল্প হয়, রাজাউজীর বধ হয়। মাঝে মাঝে সে এক একটা উদ্ভট প্রস্তাব লইয়া হাজির হয় মায়ের কাছে, তখন তাহাকে সামলাইতে প্রাণ যায়। "মা, ওদের তেরোটা মোষ আছে। একটা সাঁওতাল ছেলে চরিয়ে আনে, মাসে দু'টাকা পায়। আচ্ছা মা, আমি তো বসে আছি বেকার, এই দু'টাকা রোজগার বাড়লে আমাদের তো সংসারের উপকার হয়? আমি বলেছিলুম কাকাবাবুকে, তিনি বলেছেন, তুমি যদি আপত্তি না করো তবে তিনি আমাকেই মোষ চরাবার ভার দেবেন। সাঁওতালটা ভারী দুষ্টু, বাঁটে চুমুক দিয়ে দুধ খায়। আমি তো আর তা করব না।"

এ-হেন পবিত্রও এক একদিন এক একটা খবর আনিয়া মাধুরীর দুশ্চিন্তা বাড়াইয়া দেয়। "জানো মা, আজ তনু পিসিমারা ঝরণার ধারে চড়ুইভাতি করতে গেছলেন। টুনুদা বলছিল, চমৎকার গান গেয়েছেন নাকি। ফণিদা, গোপালদা, ব্রজেনদা সবাই 'তনুদি' বলতে অজ্ঞান। আমার কিন্তু কেন জানি ভালো লাগে না। রান্নাটা অবশ্য লছমনের চেয়ে ভালো কিন্তু দুধে জল যা ঢালেন আমার— বিস্কুটের টিন তো খালি করেছেন।"

ততদিনে অপরিচয়ের 'আপনি' 'তুমি'-তে দাঁড়িয়েছে। তা ছাড়া মনিব-ভৃত্যের সম্পর্কটাও মাধুরী আর লুকাইতে চায় না। সেদিন মাধুরী তনুশ্রীকে ডাকিয়া বলিল, "তনু, গোয়ালা বোধ হয় দুধে জল বেশী দিচ্ছে। তুমি দুধটা আজ আমার ঘরে নিয়ে যেও তো, আমি নিজে একবার পরীক্ষা করে দেখব। [illegible] আমার [illegible] ওভ্যালটিন করো, সেই সময় [illegible] [illegible] একটু [illegible] [illegible]

তনুশ্রী হাসিয়া বলিল, "তার কি দরকার, গোয়ালাটাকে আজ বকে দেব বেশ করে। ছাড়িয়ে দেবার ভয় দেখালেই দেখবেন সব ঠিক হয়ে যাবে। জানেন মা, আমাদের কাটোয়ার বাড়িতে একটা গোয়ালা দুধ দিত। গঙ্গার রং যত লাল হত, দুধের রঙও তেমনি সঙ্গে সঙ্গে বদলাত। একবার দেখা গেল, দুধের কড়াতে কুঁচো চিংড়ি লাফাচ্ছে। মা বলেছিলেন, "বাছা, জল দেবে কুয়ার জল দিয়ো, গঙ্গার জল

দূর থেকে পূজা দিই, কাছে যেতে সাহস হয় না

দিয়ো না।" দুইজনেই হাসিল, শেয়ানে শেয়ানে কোলাকুলি। যাহা হউক, দুধের জল কমিল। এক মাসের শেষে স্টেশনে ওজন লইয়া দেখা গেল, আর সকলে দুই চার পাউণ্ড বাড়িয়াছে, তনুশ্রী বাড়িয়াছে আট পাউণ্ড।

ক্রমে ভক্তদের আবাহন বাড়িতে আসিয়া পৌঁছিতে লাগিল। মাধুরীর নির্জনবাস অনেকেই বোধ হয় পছন্দ করিতেছেন না। সাঁওতাল ছেলের, গোয়ালার, এমন কি ডাক-হরকরার হাতেও চিঠি আসে, "মিসেস চ্যাটার্জি, লুকিয়েই যদি থাকবেন তবে বিদেশে আসা কেন? কলকাতাতে থাকলেই তো পারতেন।" "মিসেস চ্যাটার্জি, আজ সন্ধ্যায় আমরা [illegible] পাহাড়ে চড়ুইভাতি করছি, আপনার আসা চাই-ই।" "মিসেস চ্যাটার্জি, আপনার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

না তো?" "আচ্ছা, আপনি তর্ক করেন না কেন? নীরবে থেকেই জিততে চান?"

ক্রমেই মাধুরী বিস্মিত হইতেছিল, হঠাৎ তাহার কথা লইয়া এত লোক মাথা ঘামাইতে আরম্ভ করিল কেন? তাহার সঙ্গে অনেকগুলি গল্প উপন্যাস আসিয়াছিল। বইয়ে নাম লেখা তাহার স্বভাব নয়, কিন্তু দুই তিনখানা বই কয়েক দিনের মধ্যেই তাক হইতে অদৃশ্য হওয়ার পর আর ফিরিল না দেখিয়া সে একদিন সমস্ত বই লইয়া নিজের নাম লিখিতে বসিল। হঠাৎ একখানি বইয়ের মধ্যে একটা টুকরা কাগজ তাহার চোখে পড়িল। সে অনেকক্ষণ নিজের চোখকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না। দুই চোখ ভালো করিয়া রগড়াইয়া দ্বিতীয়বার পড়িল, "দূরে থেকে পূজা দিই, কাছে যেতে সাহস হয় না। আপনি বিবাহিতা, কিন্তু মন যে মানে না! কি করি বলুন তো?"—[illegible]

কি আপদ! এতদিন রোগ ভোগ করিয়াও কি তাহার পোড়া দেহের রূপ ঘুচিল না? মাঝে মাঝে সম্মুখের পথ দিয়া স্বাস্থ্যান্বেষীর দল বেড়াইতে যায়, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ তাহার দিকে চাহিতে চাহিতে যায় বটে। দিন দুই তাহার মধ্যে দুইটি ছোকরা 'মিসেস চ্যাটার্জি' বলিয়া ডাকও দিয়াছিল, পরক্ষণেই তাহাদের সঙ্গীদের ভ্রূকুটির শাসনে সংযত হইয়া চলিয়া গিয়াছিল। মাধুরীর বিস্ময় আর ঘুচে না। একদিন পবিত্র খবর দিল, "মা, আজ ওপারের শালবনে চাঁদের আলোয় গানবাজনা হবে রাত নটার পর। খুকু বলছিল, তনু পিসিমা যাবেন। আমি বলেছিলুম, সঙ্গে যাব তোমার মত নিয়ে। তা তিনি কিছুতেই নিতে চান না, বলেন, তুমি রাগ করবে। কেন মা, আমি সঙ্গে গেলে তো ভালোই হয়। চোর-ডাকাত, বাঘ-ভালুক এলে আমি তো রক্ষা করতে পারতুম। তা বললেন, তুমি ঘুমিয়ে পড়লে যাবেন অনেক রাত্রে। ফেরবার সময় দশজন সঙ্গে এসে তাঁকে রেল লাইন পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে যাবে নাকি।"

মাধুরী অনেকক্ষণ চিন্তা করিল, তারপর সেই দিনই স্বামীকে পত্র দিল, "[illegible] স্বামীকে তুমি একবার পাঠিয়ে দাও, [illegible] [illegible] করছে। এখন

কছু বোলো না, এখানে এলেই বুঝতে ারবেন সব। দিন চার পাঁচের ছুটি জুর করিয়ে দিয়ো।" মাধুরীর যখন াপের ছুঁচো গেলা' অবস্থা, তখন নুশ্রীকে ছাড়িলেও চলে না, রাখিতেও য় হয়। কোন্ দিন কি করিয়া বসে, াহার ঠিক নাই। তাহার তো লজ্জা নাই, াধুরীর যে মাথা কাটা যাইবে।

তিনদিন পরে পরমেশবাবু আসিলেন। দ্রলোক নিতান্ত গোবেচারা। ইদানীং াথায় টাক পড়িয়াছে, দেহও একটু ভারি ইয়াছে, কিন্তু দেখিলেই বোঝা যায়, এক ালে সুপুরুষ ছিলেন। মাধুরী তাঁহাকে াশের ঘরটা সম্পূর্ণ ছাড়িয়া দিল। তিনি াঁকাইয়া বসিয়া সারাদিন হাঁকডাক করিতে াগিলেন, তনুশ্রীও সারাদিন পতিসেবায় স্ত হইয়া রহিল, তিন দিনের মধ্যে াড়ি হইতে বাহির হইল না। তৃতীয় দিনে দ্রলোক দ্বিপ্রহরে আহারের পর শুইয়া- েন, মাধুরীও মাঝের দরজায় খিল দিয়া ামাইয়া পড়িয়াছে, এমন সময় পরমেশ- বুর চীৎকার শোনা গেল, "তারা, তারা, মা, আর যে পারি না, একি হল, ও তনু, তনু, গেলে কোথা? ও যমুনা, ও বাবা, ামার ভয়ানক যন্ত্রণা হচ্ছে, শিগ্গি তোর াসিমাকে ডাক।"

বোঝা গেল, তনুশ্রী স্বামীকে ঘুম াড়াইয়া কয়দিন পরে পাড়া বেড়াইতে াহির হইয়াছে। অগত্যা এদিক হইতে ধুরী এবং ওদিক হইতে যমুনাকে পর- শবাবুর ঘরে উপস্থিত হইতে হইল। ঙ্গে সঙ্গে বমি করিতে করিতে পরমেশ বু মাটিতে বসিয়া পড়িলেন। মাধুরী খা লইয়া মাথায় হাওয়া করিতে লাগিল, না জল লইয়া আসিল। পরমেশবাবু ধুরীর গায়ের উপরেই আর খানিকটা ি করিয়া দিয়া মাটিতে শুইয়া পড়িলেন। দিন ধরিয়া ষোড়শোপচারে অতিরিক্ত জন চলিতেছিল, বোঝা গেল তাহার ...টাই হজম হয় নাই। বাথরুমে এবং ... কাটাইয়া ভদ্রলোক ছুটি ... ফিরিয়া গেলেন, তখন ... ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়িল। ... চলিয়া যাইবার পর তনুশ্রী ... হইয়া উঠিল। তাহার ... প্রায়ই কাজলের অস্পষ্ট ... যায়। তাহার গালে যে রক্তিমা

ফুটিয়াছে, তাহার অনেকটা স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য স্বাভাবিক হইলেও বেড়াইতে বাহির হইবার সময় সেটা স্বাভাবিকতার মাত্রা অনেকখানিই ছাড়াইয়া যায়। মাধুরীর প্রসাধনদ্রব্য অনেক কিছুই ফুরাইতেছে, মাধুরী দেখিয়াও দেখে নাই। আর দশ- পনেরো দিন পরেই ফিরিতে হইবে, কি দরকার আর অশান্তি বাড়াইয়া? এমন সময় একদিন বোধিসত্ত্ববাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মাধুরীর প্রবাস যাপনের শেষ পনেরোটা দিন তিনি তাহার কাছে থাকিবেন বলিয়া ছুটি লইয়া আসিয়াছেন। সকালে বিকালে তিনি পবিত্রকে লইয়া বেড়াইতে বাহির হন। প্রায়ই যান লোকালয়ের বাহিরে পাহাড়ে জঙ্গলে। একেক দিন পবিত্রের তাগাদায় পাড়ার মধ্যেও ঢুকিতে হয়। সেখানে কোথাও বসেন না বেশীক্ষণ, দুই একজনের সঙ্গে পথে দাঁড়াইয়া শিষ্টালাপ সারিয়াই চলিয়া আসেন।

একদিন মাধুরীকে বলিলেন, "তুমি বাড়ি থেকে বেরোও না শুনি, এত ভক্ত যোগাড় করলে কি করে?"

মাধুরী কথাটা হাসিয়া উড়াইয়া দিল। কি লজ্জা!

ইহার কয়েকদিন পরে, মাধুরী সেদিন বেশ সুস্থ বোধ করিতেছিল। বলিল, "চল, আজ তোমাদের সঙ্গে আমি একটু যাই ঝরণা পর্যন্ত। কিছুই তো দেখা হল না, শুয়ে-বসেই দিন গেল।" বোধিসত্ত্ববাবু বলিলেন, "একটু একটু হাঁটলেই পারতে এতদিন। বেশ, পারো তো চলো। ক্লান্ত হলেই বসবে।" চাকর যমুনা বাড়িতে রহিল। মাধুরী, তনুশ্রী, বোধিসত্ত্ববাবু ও পবিত্র দল বাঁধিয়া বনপথে যাত্রা করিলেন।

ঝরণার কাছাকাছি তাঁহাদের দল যখন পৌঁছিল, তখন বেলা চারটা। ঝরণার অদূরে একখানি বাংলো প্যাটার্নের বাড়ির বারান্দায় একজন সাহেববেশী ভদ্রলোক পায়চারি করিতে- ছিলেন, তিনি তাঁহাদের দেখিয়া তাড়া- তাড়ি বারান্দা হইতে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিলেন। বাগানের রাস্তা পার হইতে হইতে উচ্চকণ্ঠে হাঁক দিলেন, "হ্যালো মিসেস চ্যাটার্জি, আজ আমাদের কি সৌভাগ্য? একেবারে

সবাহন সপরিবারে দেখছি যে! অনেক দিন ডুব মেরেছিলেন।"

মাধুরী থতমত খাইয়া দাঁড়াইয়া গেল। এত ঘনিষ্ঠতা তো তাহার ইঁহার সহিত আছে বলিয়া মনে পড়ে না? স্বামী বোধিসত্ত্ববাবু হাত তুলিয়া দূর হইতে নমস্কার জানাইলেন, একটু হাসিলেন। সকলেই একটু ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া গিয়াছিলেন, কেবল তনুশ্রী অগ্রসর হইয়া গেল। ভদ্রলোক বাগানের গেট পার হইবার পূর্বেই সে বাগানের গেটের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল, দুইজনে দুই-একটি বাক্যবিনিময় হইল, তাহার পর ভদ্রলোক গম্ভীর মুখে ফিরিয়া গেলেন, তনুশ্রীও দলে ফিরিয়া আসিল। মাধুরী বলিল, "কি ব্যাপার বলো তো?"

তনুশ্রী বলিল, "ভদ্রলোকের সঙ্গে সেদিন যাদববাবুদের বাড়িতে আলাপ হয়েছিল। আপনার সুখ্যাতি করেছিলুম কি না খুব তাই গায়ে পড়ে আত্মীয়তা করতে আসছিলেন। বলে দিলুম, আপনি ওসব পছন্দ করেন না। তা ছাড়া

আপনি অসুস্থ, ও ভদ্রলোক ভয়ানক বকতে পারে, একবার আরম্ভ করলে আর থামবে না, আপনার মাথা ধরিয়ে ছেড়ে দেবে।"

মাধুরী কথাটা বিশ্বাস করিবে কি করিবে না ভাবিতেছিল। বোধিসত্ত্ববাবু বলিলেন, "পাঁচটায় সূর্য ডুববে, চল এইবার ফেরা যাক। আমার অবশ্য ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করতে আপত্তি ছিল না। একটু যেন অভদ্রতা হল।"

তনুশ্রী অন্য কথা পাড়িল, "কাল কি মজা হয়েছে জানেন মাধুরীদি। সুহাসবাবুদের বাড়ি গেছলুম বেড়াতে, হঠাৎ তাঁর বুড়ো মা আমাকে দেখে বলে উঠলেন, "তোমাকে যেন চিনি চিনি মনে হচ্ছে। তুমি মধু সরকারের মেয়ে পটলী না? তুমি এখানে কবে এলে?" "শুনুন কথা! আমি তনুশ্রী সেন, আমি সরকারের পটলী হতে যাব কোন্ দুঃখে। পয়সাই না হয় নেই, রুচিটা তো ছিল বাপ-মায়ের?"

মাধুরী তাহার কথায় সায় দিল। কথায় কথায় পথ শেষ হইল, তাঁহারা বাড়ি পেঁৗছিল। আহার্যের ব্যবস্থা তনুশ্রীর স্বামীর জন্য যেমন প্রচুর হইত তেমন হয় নাই, কারণ তনুশ্রীকে বেড়াইবার সময় সঙ্গে লওয়া হইয়াছিল। রন্ধনের সময়াভাবে আহারের ত্রুটি হইল না, বেড়াইয়া আসিয়া সকলেরই বেশ ক্ষুধার উদ্রেক হয়েছে।

পরদিন দুপুর বেলা তনুশ্রী বেড়াইতে বাহির হইয়াছে, মাধুরীও দিবানিদ্রা সারিয়া সবে বিছানায় উঠিয়া বসিয়াছে, এমন সময় বকুল মুকুল আসিয়া মাধুরীর দ্বারের বাহিরে হাঁক দিল, "ও বামুনদি, 'বামুনদি'!"

মাধুরী বলিল, "ও আবার কি সম্বোধন?"

দুই বোন হাসিয়া গড়াইয়া পড়ে আর কি? "এতদিন আমাদের ফাঁকি দিয়ে আসছেন, আর কেন? এইবার সব জেনে ফেলেছি। আপনি তো মিসেস চ্যাটার্জির রাঁধুনি, রাঁধেন বাড়েন বাড়িতে থাকেন। বাড়ির গিন্নী তো তনুশ্রী চট্টোপাধ্যায়?"

মাধুরীর সমস্ত সমস্যার সমাধান হইল। বলিল, "তাই বলে বেড়াচ্ছে বুঝি? ও মা, কি হবে? অন্যের স্ত্রী বলে পরিচয় দিতে লজ্জা করে না? আমি তো ভাবতেই পারি না।"

বকুল বলিল, "বাবা পাড়ার বেড়ালো [illegible] পছন্দ করবেন না বলে আমি তো বেশি যাই না। কাল যাদববাবুদে[র] বাড়ি সত্যনারায়ণ পুজোর জন্য নেমন্ত[ন্ন] করেছিল বলে গেছলুম। সেখানে স[ব] শুনলুম। ও তনুশ্রীও নয়, মিসে[স] চ্যাটার্জিও নয়। ওর বাপের দেওয়া না[ম] 'কালীতারা সরকার'। আচ্ছা, ওর ডা[ন] হাতে একটু জড়ুল আছে না? ঠিক[...] যাদববাবুর মা ওদের খুব চেনেন। বাপ[...] মা বিয়ে দিয়েছিল যার সঙ্গে তা[...] পছন্দ হয়নি, শ্বশুর বাড়ির বারান[্দা] থেকে শাড়ী বেঁধে রাস্তায় নেমে ফু[ল]শয্যের রাত্রে পালিয়ে গেছল পাড়া[র] একটা ছোঁড়ার সঙ্গে। মরণ আর কি[!] আজই বিদেয় করুন মাধুরীদি[...] আমাদের বাড়িতে আপনাদের খাওয়া[র] ব্যবস্থা করব, তাড়ান ওকে।"

মাধুরী গুম হইয়া রহিল। সম[স্ত] শরীরটা ঘিনঘিন করিতেছে। তাহা[র] কাপড় জামা বিছানা এই মেয়েটি[কে] নির্বিচারে ব্যবহার করিতে দিয়াছে[...] এখন কি করিবে? কি বলিয়া তাহা[কে] তাড়াইবে?

কিছু বলিতে হইল না। তনু[শ্রী] বেড়াইয়া ফিরিল কাঁদো কাঁদো মু[খে]: "মাধুরীদি, পথে আসতে এই চিঠিখা[না] দিলে পিয়ন। কি করি বলুন তো[?] বাবার খুব অসুখ। আমি হঠাৎ চ[লে] গেলে আপনার কি খুব কষ্ট হবে!"

মাধুরী চিঠিখানা দেখিল। খ[াম] কোথায় সে প্রশ্ন তুলিল না, হাতে[র] লেখাটা সন্দেহজনক, সে বিষয়েও ত[র্ক] করিল না। বলিল, "সে কি কথা[!] বাবার অসুখ, যেতে হবে বৈকি! ও[ঃ] সন্ধ্যে পাঁচটায় একটা ট্রেন আছে না[?] তুমি তনুর পাওনাটা মিটিয়ে দাও তো[,] যমুনা গিয়ে পেঁৗছে দিয়ে আসু[ক।] না মা, দিনের হিসেব করতে হবে [না] পঞ্চাশ টাকা দু' মাসের পুরোই দি[য়ে] দাও আর কলকাতার ভাড়াটা দি[য়ে] সেই সঙ্গে। তুমি তাড়াতাড়ি গু[ছিয়ে] নাও তনু। বাবুর জন্যে যে লুচিগু[লো] ভাজা আছে তাই নিয়ে যাও স[ঙ্গে]। জাত তো আর রাত্রে জুটবে না। এক[া] ট্রেনে যেতে অসুবিধে হবে না তো[?] ওরে যমুনা, পিসিমার বিছানা বাক্স গোছানো হলে স্টেশনে একটু পেঁৗ[ছে] দিয়ে আসিস বাবা।"

মনে এলো

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

১৮।৮।৫৫

ভোর বেলায় বানডুঙ যাত্রা। চল্লিশ মিনিট লাগল পৌঁছুতে। ট্রেনে লাগত ঘণ্টা চারেক। বানডুঙ্ পাহাড়ের উপর সমতলভূমিতে। প্রায় হাজার চারেক ফুট উঁচু। আসবার পথ অপূর্ব সুন্দর। শহর একদম বিলেতী। দোকান-পশার, বাস, ট্রাম, মোটর, ট্যাকসী, হোটেল, রাস্তা, গতায়াত, মায় আব-হাওয়া পর্যন্ত সব বিদেশী। তিন দিন ধরে স্বাধীনতা দিবস পালন করছে—প্রতি বাড়িতে পতাকা ঝুলছে। আমাদের দেশ জাতীয় পতাকা সম্বন্ধে উদাসীন। আগেও লিখেছি, এখনও লিখছি আমাদের পতাকার পরিকল্পনা দুর্বল। যে সব রঙের সমাবেশ হয়েছে পতাকায় তাদের প্রতীক-মূল্য জীবন্ত নয় জন-সাধারণের কাছে। এ যুগে, এশিয়ার পক্ষে স্বাধীনতার প্রধান গুণ তেজ। এদের পতাকায় লালটা ডগ্‌ডগে। আমাদের শাদা রঙ 'এক্‌লেক্‌টিক', পবিত্রতার চিহ্ন নয়। চক্রের রং খোলে না ঐ সমাবেশে। হয়তো কেন নিশ্চয়ই, আমাদের পতাকার রং-এর ও চক্রের নিগূঢ় অর্থ আছে। কিন্তু যারা জানে তাদের কাছে, অর্থাৎ মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছে, কিন্তু জন-সাধারণ বোধ হয় সিম্বলের চেয়ে ইমেজ-ই চায়। ইমেজ সহজ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য। আমাদের পতাকায় সিম্বল আর ইমেজের মিলন হয়নি, তাই মিন্‌মিন্ করে। তার ওপর খদ্দর—তাই [illegible] পড়ে। পৎপৎ শব্দে হৃদয় [illegible] করে না।

[illegible] হোটেল—একেবারে নতুন [illegible]। অসম্ভব খরচ, অসম্ভব [illegible]-রুম, খাবার ঘর প্রকাণ্ড। [illegible] নতুন শিল্পীদের ছবি টাঙানো [illegible]। আলোর সমাবেশ সুন্দর; ল্যাম্পগুলি দেশী; আর কাঠের কারু-কার্য কল্পনাতীত। একটু জবড়জঙ, তিলমাত্র ফাঁক নেই। একেবারে ভরাট দ্রাবিড়ী। প্রাচুর্য্য যৌবনের চিহ্ন, রিনেসাঁস যুগের ইটালিয়ান দরজাতেও ফাঁক নেই। তারপর ব্যারোক্—প্রৌঢ়ত্ব—চেলিনির সল্ট-সেলার (নিমকদান)—পঞ্চদশ লুই-এর কমোর্ড-ফ্রাজোনার্ড, বুশেয়ারের ছবি। তারপর রকোকো—বার্ধক্যে যৌবন আনবার প্রাণপণ প্রয়াস। সব অবস্থাই চিদাম্বরমের নটরাজের মন্দিরে দেখেছি। ভার্সাইয়ে—ফনটেন-ব্লোর ছাতের ছবিতে মার্জিত রুচির লক্ষণ পাইনি। ভারতবর্ষের শিল্প-ঐতিহ্য যে প্রায় লুপ্ত হয়ে যায়, তাইতে একরকম বেঁচে গেছি। পরম্পরার বিপদ অনেক। এ-যুগে একটার বদলে দশটা বিড়লা মন্দির স্থাপিত হলে কি হতো ভাবলে হৃৎকম্প হয়।

* * *

অতিরঞ্জনেও রুচি চাই : আবুর জৈনমন্দির, রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা', লক্ষ্ণৌএর আলাদিয়া খাঁর তান, আর যবদ্বীপের কাঠের কাজ ও পুতুল। রুচিবিহীন অতিরঞ্জন : আমাদের যাত্রা অভিনয়, কোনো কোনো ঘরোয়ানার (নাম নাই করলাম) তানবাজি আর লয়কারি, হিন্দী ফিল্ম, দিল্লীর বিড়লা মন্দির, বাঙলা ভাষায় বহু অচল প্রেমের কবিতা, আর মস্কো শহরের মেট্রো স্টেশন।

১৯।৮।৫৫ (বিকেল),

তিন দিন স্বাধীনতা-দিবসের জন্য ছুটি। এখানকার ছুটি আমাদের দেশেরই মতন—কথায়-কথায়, প্রতি পার্বণে এবং পার্বণও হাজার রকমের। চ্যাডউইক নামে এক ইংরেজ এসেছেন একই কাজে। চির-জীবন নাইজিরিয়ায় কাটিয়েছেন, এখন ম্যানিলায় কম্যুনিটি প্রোজেক্টের ভার-প্রাপ্ত। খাসা লোক। আফ্রিকাকে ভাল-বাসেন, তাঁর জীবনশক্তিতে পোরুষে আস্থাবান এবং নাইজিরিয়া স্বায়ত্ত-শাসনের উপযুক্ত হয়েছে বললেন। কলোনিয়াল সার্ভিস—এর উৎকৃষ্ট নমুনা। জনসাধারণের শক্তিতে অগাধ বিশ্বাস। অনেক দৃষ্টান্ত দিলেন। গ্রাহাম গ্রীন-এর নায়ক নন। একটা রিকশ' চড়ে দুজনে শহর ঘোরা গেল। ট্যাক্সী চড়ার পয়সা দুজনের কারুরই নেই। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অত্যন্ত উচ্চ ধারণা। এশিয়ার নেতা ইত্যাদি। হার্পারেরও তাই মত। অত্যন্ত নরম হয়ে বিনয়ভরে আপত্তি জানালাম। বললাম, "এখনও আমরা বেশী কিছু করে উঠতে পারিনি, তবে

চেষ্টা করছি। ভুল হচ্ছে, তবু যেন মনে হয় একটা জাগরণ, একটু যৎসামান্য আত্মবিশ্বাস এসেছে।" দুজনেই বললেন, 'এ কথা তো অন্যে বলে না—একা ভারতবাসীই বলতে পারে! আমি তো হতভম্ব। ফিলিপিন অঞ্চলে পণ্ডিতজীর খাতির কম—আমেরিক্যান প্রেসেরই জন্য।

রাস্তাঘাট বানডুঙের সব বিলেতী। মেয়েরা সারঙ পরছে না—একদম আধুনিক। দেশী ও পুরনো রুচির মধ্যে ঐ যা ফুলের শখ। এখানকার শপিং সেণ্টার ঠিক যেন রটারডামের অনুকরণ। নতুন ডাচ্ ধরনের দোকান—প্রকাণ্ড, অত্যন্ত শৌখীন। বলে এরা প্যারিস, কিন্তু প্যারিস অত সাজানো ছিমছাম নয়। মানুষের গায়ের রঙ কালো, ঠিক কালো নয়, শ্যামবর্ণ! আর নাক খেঁদা যদি না হতো মেয়ে-পুরুষের, তবে বোঝা যেত না ডাচ্ প্রভুরা চলে গেছেন। তাঁরা গিয়েও যাচ্ছেন না। ওঁদের প্রতি মনোভাব বিষাক্ত। বহু প্রমাণ এই কয় ঘণ্টায় পেলাম। দেশের একাংশ তাঁরা এখনও ছাড়ছেন না, দেশে লুকিয়ে লুকিয়ে ঝগড়া বাধাচ্ছেন, এমন কি অস্ত্রশস্ত্র যুগিয়ে। য়ুরোপীয়ানদের এঁরা বিশ্বাস করছেন না একেবারেই। য়ুরোপীয়ানরাই বললেন। আভ্যন্তরীণ গোলমাল চলছে। দেশের ভেতরে যাওয়া মোটেই নিরাপদ নয় শুনলাম। কনফারেন্সের প্রতিনিধিরা গ্রাম দেখতে গেলেন, সঙ্গে সশস্ত্র পাহারা সমেত জীপ গেল।

গত ক্যাবিনেটের ন্যায়-মন্ত্রীকে পুলিসে ধরেছে নতুন ক্যাবিনেটের আদেশে। অভিযোগ ঘুষ নেওয়া; কেউ বলছেন ব্যাপারটা পোলিটিক্যাল। সত্য-মিথ্যা কে নির্ণয় করবে!

সন্ধ্যাবেলা ফুলযাত্রা দেখলাম। চমৎকার লাগলো। স্বাধীনতা-সংগ্রাম-নাটকের মূক-অভিনয়। সব বুঝলাম না। হাজার হাজার মেয়ে-পুরুষ অপেক্ষা করল তিন ঘণ্টা, নীরবে। তারপর শোভাযাত্রা এল। ভদ্র ভিড়—এমনটি দেখিনি। সকলের হাসিমুখ। এরা সর্বদাই হাসছে। খুব অল্পসংখ্যক লোক দেখলাম, যাদের পোশাক-আশাক গরীবের মতন। বেশ সাজতে জানে মেয়েরা। জাতটা স্ফূর্তিবাজ বলে মনে হয়।

* * *

কালোবাজারের পরিচয় পেলাম। শাদা-কালোয় চার-পাঁচ গুণ তফাৎ। একটা স্যুট আর টাই ইস্ত্রী করতে দশ রুপেয়া নিলে। হোটেলের বয়গুলো পর্যন্ত বলছে, এ-দেশে মানুষ থাকতে পারে না। প্রত্যেক জিনিস মহার্ঘ্য। যুদ্ধের পরও আমাদের দেশে এত দাম বাড়েনি। শুনলাম, বানডুং কনফারেন্স-এর পর এতটা বেড়েছে। জায়গাটা টুরিস্টদের জন্যে। ফি শনিবার হাজার-হাজার লোক নীচে থেকে বেড়াতে আর স্ফূর্তি করতে আসে। এ অবস্থা বেশি দিন চললে সর্বনাশ হবে।
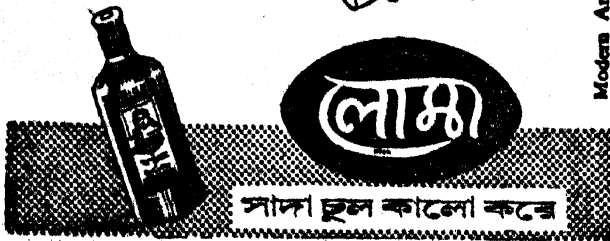
* * *

কিউরিও-দোকানে গেলাম। একটিও ভালো জিনিস নজরে পড়ল না। বাজে জিনিসও দামের চোটে ছোঁওয়া যায় না। সব যেন ট্যুরিস্টদেরই জন্যে। বলিদ্বীপের কাঠের কাজ যা দেখলাম, তার মধ্যে না আছে পুরাতনের স্বাদ, না আছে নতুনত্বের আগ্রহ। হতাশ হচ্ছি—ভালো নয়। কারুর কাছে জানবার সুযোগ পাচ্ছি না। যাত্রাটাই বিফল হবে না কি?

* * *

গ্রাম দেখার সুযোগ হলো না। আসতে না আসতেই ডেলিগেটরা গ্রামে বসবাস করতে চলে গেল। সঙ্গে সাঁজোয়া গাড়ি! বার জন সশস্ত্র সৈন্য! বরবদুর যাওয়া বিপজ্জনক—হাওয়াই জাহাজ রোজ ছাড়ে না। অতএব এটাও গেল। বলিদ্বীপে যাওয়াও বিপজ্জনক। একজন বিদেশী বললেন, 'ওখানে যেতে আপনাকে পরামর্শ দিই না।' এখনকার কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করলাম—কেমন যেন নিমরাজি। এখনও দেশে শান্তি আসেনি। মনে হলো, বেশ গোলমাল চলছে। আরেকজন মন্ত্রীকে ধরেছে শুনলাম। বিশ্বাস হচ্ছে না। ভারতবর্ষের ওপর ভক্তি আসছে। ধরা পড়েনি বলে? না। মানসিংহ অবশ্য এখনও বিরাজমান। তবু নির্ভয়ে প্রায় সর্বত্রই যাওয়া যায়।

এখনও এত ঘণ্টা পরেও ইলেকট্রিসিটি ফেল করেনি। আলিগড়ে দিনে গড়পড়তা তিনবার বর্ষাকালে, শীতের সময় একবার। অতএব এদের কর্মদক্ষতা আমাদের চেয়েও বেশি। তবে বানডুঙ বড় শহর, সাড়ে আট লক্ষ লোক —একেবারে বিলেত। বোধ হয় তার চেয়েও ভালো, বস্তি নেই কোথাও। আঠার হাজার ডাচ্ এখনও এই শহরে ব্যবসা-বাণিজ্য, কাজ-কর্ম চালাচ্ছেন। একজন ডাচ্ মহিলা থাকলেই যথেষ্ট [illegible]। শুচিবাই যদি কারুর থাকে তো [illegible] মহিলাদের।

[illegible] জার্মান পরিবারের সঙ্গে [illegible] হল। অত্যন্ত কর্মদক্ষ মহিলা। [illegible] মিনিটের মধ্যে ডিক্টেটারশিপের [illegible]তার উল্লেখ শুনলাম।

গলায় ক্যানসার হলে ডাক্তারেরা রোগ সারাবার জন্য এতদিন গলায় অস্ত্রোপচার করে স্বরযন্ত্র কেটে বাদ দিত। ফলে রোগীর কথা বলার শক্তি সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে যেত। কিন্তু পাঁচ বছর ধরে ২৫০ জন রোগীর উপর চিকিৎসা করে দেখা গেছে যে, এক্স-রে চিকিৎসায় গলার ক্যানসার অস্ত্রোপচারের চেয়ে বেশী কার্যকরী হয়। এক্স-রে চিকিৎসায় সবচেয়ে সুবিধা যে, এতে গলার স্বর নষ্ট হয় না। দেখা গেছে যে, ক্যানসারের প্রথম অবস্থায় শতকরা ৮০ জনকে এক্স-রের সাহায্যে নিরোগ করা যায়। অবশ্য অস্ত্রোপচারের বেলায় এটা শতকরা ৮৬ জন হয়। ক্যানসারের দ্বিতীয় অবস্থায় এক্স-রের সাহায্যে শতকরা ৭০ জন আর অস্ত্রোপচারের সাহায্যে ৬০ জন রোগীর রোগ সারে। অবশ্য তৃতীয় অবস্থায় অস্ত্রোপচারে এক্স-রের চেয়ে দুগুণ কাজ করে। এটা ঠিক যে, রোগীর স্বর বজায় রাখতে গেলে সর্ব-প্রথম এক্স-রের সাহায্যে চিকিৎসা করা ভাল—তারপর যদি এটা কার্যকরী না হয়—তাহলে অস্ত্রোপচার করা দরকার। আরো একটা জিনিস লক্ষ্য করা গেছে যে, পুরুষদের মেয়েদের চেয়ে শতকরা ১৯ ভাগ বেশী গলায় ক্যানসার হতে দেখা যায়।

*

এবার চিকিৎসা শাস্ত্রে নোবল পুরস্কার সুইডিশ্ ডাক্তার প্রোঃ হুগো থিওরেল পেয়েছেন। ডাঃ হুগো রক্তের ব্যাপারে একজন বিশেষজ্ঞ। ইনি দ্বিতীয় সুইডিশ্—নোবল পুরস্কার পাবার সম্মান লাভ করলেন। কিভাবে এবং কি অবস্থায় এনজাইথে অক্সিজেন যোগ হয় তা ডাঃ হুগোই আবিষ্কার করেন। তিনি মানুষের শরীরের জটিল কোষের ভাগ

চক্রদত্ত

এবং কোষের বিপাকের (metabolism) রহস্যের সম্বন্ধে প্রথম হদিশ্ দিতে পারেন। তিনি যে আবিষ্কারের জন্য এই পুরস্কার পেলেন সেটা তিনি ১৯৩৪ সালে গবেষণা করেছিলেন। সেই সময়ে তিনি প্রথম খাঁটি হলুদে এন্জাইথ তৈরী করতে পারেন। অবশ্য ১৯৩১ সালের জার্মান নোবল পুরস্কার প্রাপ্ত অটো ওয়ারবারগ এর প্রথম উল্লেখ করেন। ডাঃ হুগো অবশ্য কিছুকাল রকফেলার স্কলারশিপ নিয়ে অটোর সঙ্গে বার্লিনে কাজ করেছিলেন।

*

সম্প্রতি খবর পাওয়া গেছে যে, পূর্ব পাকিস্তানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ আমেদ এবং ইস্‌লাম যুক্তভাবে এক নতুন এ্যান্টিবাওটিক আবিষ্কার করেছেন। এঁরা এটার নাম দিয়েছেন 'রমনাসিন' কারণ যে বস্তু থেকে এই এ্যান্টিবাওটিক তৈরী করা হয়েছে সেটা ঢাকার রমনায় পাওয়া গেছে। যে জীবজন্তু থেকে এটা পাওয়া গেছে সেটা স্ট্রেপটোমাইসিনের গোষ্ঠীভুক্ত। এটা ছাতা (mould) এবং ছত্রাক (fungus)-এর মাঝামাঝি একটা বস্তু যার থেকে প্রথম এ্যান্টিবায়োটিক তৈরী করা হয়। রমনাসিন একটি স্থায়ী এ্যান্টিবায়োটিক এবং দেখা যাচ্ছে যে, এটা অনেক জাতীয় ব্যাকটিরিয়া এবং দুচার রকমের ছত্রকের উপর খুব কার্যকরী হচ্ছে।

*

সাধারণত ইট পাথর দিয়েই ঘরবাড়ি তৈরী করা হয়। আজকের দিনে নতুন পদার্থ দিয়ে বাড়ি তৈরী করার কথা ভাবা হচ্ছে। বায়ুপূর্ণ ইট দিয়েই আজকাল বাড়ি তৈরী করা হবে। এই ইটগুলি তিনকোণা প্লাস্টিকের বালিশের মত দেখতে। খুব কম চাপের বায়ু ভরে এগুলিকে দৃঢ় করা হয়। এই ইটগুলি দিয়ে গম্বুজাকৃতির ছাদ করার খুবই সুবিধা। বিমানবাহিনীর জরুরী আস্তানা তৈরী করতে সর্বপ্রথমে এই ইট ব্যবহার করা হয়, কারণ এই আস্তানাগুলি গম্বুজাকৃতির। এছাড়া কোনও ব্যারাক, দোকানপাতি অথবা বিমানের আস্তানা অর্থাৎ হ্যাংগার ইত্যাদি বড় বড় গম্বুজাকৃতির ঘরবাড়ি তৈরী করতেও সুবিধা হয়। বর্তমানে সেনাবাহিনীর জন্য ঘরবাড়ি করতেই বায়ুর ইটের বেশী ব্যবহার হচ্ছে কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে সর্বসাধারণের ব্যবহারেও এই ইটের প্রচলন হবে বলেও আশা করা যায়। বেসামরিক লোকদের জন্য এই ইট দিয়ে বাসবাড়ি, স্কুল, গুদামঘর, কারখানা, বড় বড় গোলাবাড়ি, অস্থায়ী থিয়েটার কিংবা স্টেডিয়াম ইত্যাদি তৈরী করা খুবই সুবিধা হবে। এইরকম ইট যাঁরা আবিষ্কার করেছেন তাঁরা একটি প্রদর্শনীতে তিন ফুট উঁচু ও ৬ ফুট চওড়া একটা গম্বুজাকৃতির ঘর তৈরী করে দেখিয়ে-ছেন। সমস্ত জিনিসটির ওজন মাত্র ১০ পাউন্ড আর ভেঙে নিলে দেখতে একটি পোশাকের বাক্সর মত হয়। এর জন্য ১১২টি প্লাস্টিকের তৈরী ইঁটের দরকার হয়েছে। এক একটি ইটে দু পাউণ্ডের বেশী হাওয়ার চাপ দরকার হয়নি। যদি কোনও কারণে একটি ইট ফুটো হয়ে যায় তাহ'লে অবশ্য সমস্ত বাড়িটা ধসে যায় না। কৃত্রিম উপায়ে ঐ ফুটোটি বন্ধ করে ফেলা যাবে। একটি ইঁট থেকে আর একটি ইঁটের সঙ্গে একটি স্বয়ংক্রিয় ভালব্ দিয়ে সংযোগ রক্ষা করা হয়। যদি একটি ইঁটে বায়ুর চাপ দু' পাউণ্ডের বেশী হয়ে যায় তাহ'লে বেশী বায়ুর চাপটা পরের ইঁটে চলে যায়। ইঁটগুলো এমনভাবে তৈরী হচ্ছে যে, ঠাণ্ডা প্রতিরোধ করতে পারবে কিন্তু সূর্যের তাপ যথারীতি ঘরে প্রবেশ করতে পারবে। যদি ইঁটের মধ্যে ধোঁয়া ভরে দেওয়া হয় তাহ'লে ঐ ইঁটের তৈরী বাড়িগুলির গরম প্রতিরোধ করারও ক্ষমতা থাকবে। ইচ্ছে করলে ইঁটগুলি রঙীন করে এর স্বচ্ছতা কিছুটা কম করা যায়।

রত্নাকর

কিছুদিন পূর্বে "দেশ" পত্রিকায় শ্রদ্ধেয় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে কর্তৃক লিখিত "কণ্ঠসঙ্গীত" শিরোনামায় একটি চিন্তাশীল প্রবন্ধ পড়লুম। আলোচনায় শ্রদ্ধেয় লেখক বেশ একটু হতাশ হয়েছেন, বেশ একটু আক্ষেপ করেছেন, বেশ একটু শিকায়ত জানিয়েছেন। শ্রদ্ধেয় লেখক অনুভবী ব্যক্তি, এক সময়ে বাঙ্গলার সঙ্গীত জগতের এক দিক্‌পাল ছিলেন। নিজের অদ্ভুত সুরেলা ও উদাত্ত কণ্ঠস্বরের মাধুর্যে তিনি লাইট্‌ মিউজিকে অনুরক্ত লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর, দেশে হোক, বিদেশে হোক, মন হরণ করে নিয়েছিলেন। সুদূর মরিশাশ্‌ দ্বীপেও তাঁর গ্রামোফোন রেকর্ড শত শত বিক্রী হয়েছে। ভবানীপুরের সুবিখ্যাত তন্ত্রকার, সঙ্গীতাচার্য শ্রীপ্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ম'শায়ের সুযোগ্য শিষ্য, শ্রদ্ধেয় শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দাশ ম'শায়কে বলতে শুনেছি যে, কেষ্টবাবুর মত একাধারে সর্বগুণে বিভূষিত সঙ্গীত শিল্পী সে যুগে কেউ ছিল না। গান-বাজনা যাঁদের পেশা, সাধারণত তাঁদের মুখে সমসাময়িক অপর কোন সঙ্গীত-কুশলের সুখ্যাতি শোনা যায় না। কিন্তু প্রবোধবাবু নিজে গুণী ব্যক্তি, গুণের কদর তিনি জানেন, তাই তিনি কেষ্টবাবুর গুণকীর্তনে পঞ্চমুখ ছিলেন। বাঙ্গলা মায়ের এহেন একজন কলাবিদ্‌ সুসন্তান যখন "কণ্ঠসঙ্গীত" নিয়ে খেদোক্তি করেছেন, তখন সে প্রসঙ্গে চিন্তা করবার অবশ্যই কিছু আছে। কিন্তু কতখানি আছে, বা কতটুকু আছে, আমি আজ এ প্রবন্ধে সে বিষয়েই আলোচনা করব। আলোচনা করব সমালোচকের দৃষ্টি নিয়ে, অর্থাৎ কেবল ছি ছি না করে, যে প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে, যথাযথভাবে সে প্রসঙ্গের গুণ গ্রহণ করতে, উপলব্ধি করতে।

প্রশ্ন হচ্ছে, সত্যই কি আমাদের কণ্ঠসঙ্গীতের অধঃপতন হয়েছে? এখানে "কণ্ঠসঙ্গীতের অধঃপতন" কথাটি আমি ব্যাপক অর্থেই ব্যবহার করেছি। কণ্ঠসঙ্গীত, কণ্ঠের বৈশিষ্ট্য, বলিষ্ঠতা, নমনীয়তা প্রভৃতি কতকগুলি গুণের উপর নির্ভর করে, যাকে আমরা ইংরাজিতে বলি tonality। উত্তম কণ্ঠস্বর থাকলেই সে কণ্ঠে উত্তম সঙ্গীতরূপ নির্গত হয়। শ্রদ্ধেয় কেষ্টদা বিচক্ষণ গায়ক, পণ্ডিত ও কলাকার। তিনি ভারতের প্রায় সকল সুরতীর্থের দরিয়াতে পাড়ি জমিয়ে এসেছেন। ভারতের কোথায় কিরূপ সঙ্গীতচর্চা হচ্ছে, এও জানতে তাঁর বাকী নেই। তবু কি তিনি বলতে চান যে, আমাদের বাঙ্গলা দেশে সাঙ্গীতিক মান নেমে গেছে? "সাঙ্গীতিক মান" মানে ঐ যে এখুনি বলে এলুম, "কণ্ঠসঙ্গীতের অধঃপতন" সম্পর্কীয় ব্যাপক ব্যাখ্যায়। তবুও কি তিনি বলবেন যে, আমরা পূর্বের ন্যায় কণ্ঠসাধনে মন দিচ্ছিনে, যেমন তেমন করে শিক্ষা গ্রহণ করি, স্বরের qualityকে অবহেলা করি! অবশ্য স্বীকার করতে বাধা নেই যে, তাঁর মত ঈশ্বরদত্ত বিশিষ্ট কণ্ঠস্বর বাঙ্গলা দেশে বিরল। তবুও বলতে আমার বাধা নেই যে, বহুবর্ষ বোম্বাই বাস করে আসার পর আমি কলকাতায় যে স্ট্যান্ডার্ডের গান শুনেছি, তা আমার বেশ ভালই লাগছে। এবং শুধু "ভাল লাগছে" বললে ভুল হবে, আমার মনে হচ্ছে যে, দেশে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রভূত উন্নতি হয়েছে। আমার বিশ্বাস যে, আমার এই মতের সঙ্গে কেষ্টদাও সহমত হবেন, কেননা, তিনিও বোম্বাই প্রদেশে অনেক কাল বাস করে এসেছেন এবং ভালই জানেন যে, ও দেশে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের, বিশেষ কণ্ঠসঙ্গীতের যেরূপ ব্যাপক প্রসার ভারতবর্ষের অন্য কোন প্রদেশে এত নেই। কিন্তু তবুও বলব, হয়ত ওদেশে এখনও বাঙ্গলার চেয়ে অনেক বেশী প্রথম শ্রেণীর আর্টিস্ট আছেন, কিন্তু স্বরমাধুর্যে বাঙ্গলা দেশ অন্য সব প্রদেশকে সব সময় টেক্কা দিয়ে এসেছে এবং এখনও দিতে পারে। প্রমাণস্বরূপ আমি ডজন ডজন বাঙ্গালী সঙ্গীতশিল্পীর নাম করতে পারি, যাঁদের কণ্ঠস্বর, এমন কি পাশ্চাত্য সঙ্গীতের মান অনুযায়ী, খুবই উচ্চশ্রেণীর। কিন্তু এক্ষেত্রে আমি দু' একজনের নামোল্লেখ করে বাকী আর্টিস্টদের মনঃকষ্টের কারণ হতে চাইনে। তাই, আমি এ প্রবন্ধে কোন আর্টিস্টদেরই নাম নেব না।

বোম্বাই প্রবাসকালে আমাকে খুব

ঘনিষ্ঠভাবে মহারাষ্ট্রীয়দের সঙ্গে মিশতে হয়েছে। অনেক মহারাষ্ট্রীয়কেই আমি অনেক বাঙগালীর গান শুনিয়েছি—নামকরা, নাম-অকরা। ওদেশীয় ব্যক্তিগণ সকলেই একবাক্যে স্বীকার করে নিয়েছেন যে, আমরা বাঙগালী, আমাদের কণ্ঠস্বর স্বভাবতই মধুর। কেবল মারাঠী গুজরাতী কেন, ভারতবর্ষের অনেক প্রদেশের লোকেরাই স্বীকার করেন যে বাঙগালীর কণ্ঠস্বর শ্লেষ্মাপ্রধান এবং সুমিষ্ট। হয়ত আমাদের এ স্বরমাধুর্যের জন্য কোন বায়োলজিক্যাল বা অন্য কোন কারণ আছে। এ আলোচ্য বিষয় নিয়ে পরে একদিন মাথা ঘামান যাবে। মোদ্দা দু'একজন ইংরাজ লেখক ও যাঁরা অল্প বিস্তর ভারতীয় সঙ্গীতের প্রতি সহানুভূতিশীল, এ সম্বন্ধে আলোচনা করে গেছেন এবং বাঙগালীর জাতীয় সঙ্গীতের প্রতি, বিশেষ করে রবীন্দ্র সঙ্গীতের প্রতি, আকৃষ্ট হয়েছেন। উচ্চাঙগ সঙ্গীতের কথা ছেড়ে দিলেও বেতার মারফত আমরা আজকাল যে ভূরি ভূরি লোকসঙ্গীত, কীর্তনাদির পরিবেশন শুনি, সেগুলিরও বিচার করলে আমরা দেখতে পাই যে, আমাদের বেতার কর্তৃপক্ষও এ বিষয়ে মোটেই উদাসীন ন'ন। তবে হ্যাঁ, উচ্চাঙগ সঙ্গীতের মান কষে যদি আমরা অনুচ্চাঙগ সঙ্গীতের বিচার করতে বসি, তাহলে আমাদের কানে সবই, ইংরাজিতে যাকে বলে ফ্ল্যাট তাই মনে হবে।

এই সেদিন এ বিষয়ে ওস্তাদ মুস্তাক আলির সুযোগ্য শিষ্য নৃপেনবাবুর সঙ্গে আলোচনা হচ্ছিল। লাইট মিউজিকের অনুরাগিগণ উচ্চাঙগ সঙ্গীত আরম্ভ হলেই রেডিও বন্ধ করে দ্যান, আবার উচ্চাঙগ সঙ্গীতের ভক্তরা তেমনি কীর্তন, রবীন্দ্র সঙ্গীত, শ্যামাসঙ্গীত প্রভৃতি কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারেন না। কথা হচ্ছে, আমরা বড় অসহনশীল। নিজ নিজ পরিধির বাইরেটাকে বুঝবার চেষ্টা কমই করে থাকি। আমরা যে বিংশ শতাব্দীর অর্ধেক পার হয়ে এসেছি, এটা ভুলে যাই। যুগধর্মের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে চলতে গিয়ে তার বদলে আমরা পায়ে পা বাধাই, আর তাই ঠোক্কর খাই। সময় যে স্থিতিশীল

নয়, সময় যে এগিয়েই চলেছে, আর কখনও পিছু হটবে না, এই শাশ্বত সত্য যদি আমরা মনে রাখতে পারি, তাহলে আর কোন গণ্ডগোল হয় না। চোখের সামনে আমরা দেখছি যে, গানের চাল সম্পূর্ণ বদলে গেছে। তবুও সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই, বলে আক্ষেপ করতে বসে যাই। কিন্তু তার মূলে যে কি আছে, সেটি জানবার চেষ্টাও করিনে। কোথায় গেল সেই ধ্রুপদের প্রাধান্য এবং সেই সঙ্গে মৃদঙ্গের মেঘ-গর্জন? গর্জনটুকু মধ্যে মধ্যে শোনা যায় বটে, তবে "কৌচিত্ গর্জন্তি বৃথা"। ধ্রুপদ মৃত্যুশয্যায় শায়িত, কাজেই ধ্রুপদ গাইবার উপযোগী কণ্ঠনিনাদেরও অভাব হয়েছে দেশে। এবং কেবল কি ধ্রুপদই মরণোন্মুখ, টপ্পা নয়? রাণাঘাটের স্বর্গীয় নগেনবাবু (কথক ম'শায়), তেলিনীপাড়ার কালোবাবু প্রভৃতি যে সব চালের টপ্পা গাইতেন, সে সব গেল কোথায়? কেষ্টদা প্রভৃতি আরো দু'চারজন মুষ্টিমেয় ধ্রুপদপ্রেমীর সমবেত চেষ্টায় হয়ত ধ্রুপদের পুনর্জীবন লাভ হতে পারে, কিন্তু টপ্পার দেখছি মৃত্যু অবধারিত, যদি না আমাদের গভর্নমেণ্ট এ বিষয়ে একটু অবহিত হন।

কিন্তু ধ্রুপদেরও "ফিজিওলজিক্যাল চেঞ্জ" দেখা দিয়েছে। সেদিন এ নিয়ে সুরশিল্পী শ্রীচিন্ময় লাহিড়ী ম'শায়ের সঙ্গে আলোচনা হচ্ছিল। কথায় কথায় ধ্রুপদ সঙ্গীত, খানদান, অ-বাঙ্গালী শিল্পীমণ্ডলী সম্বন্ধে অনেক আলোচনাই হোল। তিনি বললেন, "কোন্ বিষয়ে বাঙ্গালী গায়ক ভারতের অন্যান্য প্রদেশের গায়কমণ্ডলী হ'তে আজ কমা, বলুন তো? রাগের বিস্তারে, quality of toneএ, তালের সম্যক্ পরিচয়ে, না voice throwingএ, কোন্ বিষয়ে?" সত্যিই তো, কোন্ বিষয়ে? যন্ত্রশিল্পের তো কথাই নেই। বাঙ্গালী আলাউদ্দীন খাঁ সাহেব যে ঘরানার সৃষ্টি করে দিলেন, তার ঐতিহ্য বাঙ্গালী যুগ যুগ ধরে বইবে। কণ্ঠসঙ্গীতেও বাঙ্গালী আজ পিছু পা নয়, কারুর চেয়ে হীন নয়, না স্বরমাধুর্যে, না রাগালাপে, না লয়-কারীতে। সেদিন চলে গেছে, যখন বাঙ্গালী কলা-শিষ্ট সম্প্রদায়ের অপাংক্তেয় ছিল। সেদিন চলে গেছে, যখন মুসলমান ওস্তাদগণ বাঙ্গালীকে শেখাতে গররাজি ছিলেন। সেদিন চলে গেছে, যখন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ক্ষেত্র একটি নির্দিষ্ট গণ্ডির ভিতর আবদ্ধ ছিল। গত ৫০ বছরের মধ্যে বাঙ্গালী যা শিখেছে, যেরূপ উন্নতি করেছে, সে নিয়ে গৌরব করার আছে, সে নিয়ে আক্ষেপ করার কিছু নেই। প্রাচীরগাত্রে সে লেখা আমি এখন থেকেই দেখতে পাচ্ছি। অদূর ভবিষ্যতে যে অ-বাঙ্গালী শিক্ষার্থীকে সঙ্গীতবিদ্যা শিক্ষার জন্য এই বাঙ্গলা দেশেই আসতে হবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। জমানা ক্রমশই বদলাচ্ছে, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে আন্তঃপ্রাদেশিক কেন্দ্রও কক্ষচ্যুত হয়ে আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছে। আমাদের দুঃখ করার আর কোন কারণ নেই। তবে হ্যাঁ, মৃতপ্রায় ধ্রুপদ ও টপ্পাকে বাঁচাতেই হবে, এ বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই, কারুরই নেই। থাকতে পারেই না।

আসরের খবর

গীতবীথি সম্মিলনী

গত ১৮ই অক্টোবর, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় মহাবোধি সোসাইটি হলে গীতবীথি সম্মিলনীর মাসিক অধিবেশনে রবীন্দ্রসংগীতের আসরে কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সুবিনয় রায় গান করেন। রবীন্দ্রসংগীতের আসর হিসাবে গীতবীথি সম্মিলনীর এই অনুষ্ঠানটি সত্যই আকর্ষণীয় হয়। অধিবেশনে একক এবং দ্বৈতকণ্ঠে মোট বারোটি গান হয় এবং সব ক'খানা গানই অত্যন্ত উপভোগ্য হয়। সংগীত সহযোগিতা করেন সলিল মিত্র, অমল দেব, সুবোধ নন্দী এবং কালীপদ ঘোষাল। আরম্ভে সম্মিলনীর সচিব বলেন যে, প্রতি মাসে সংগীতের বিভিন্ন ধারার যশস্বী শিল্পীদের একটি গানের আসরে বন্দোবস্ত এবং সাহিত্য ও সংগীত সম্বন্ধীয় কয়েকটি আলোচনা সভার ব্যবস্থা এ'রা করবেন।

নিখিল ভারত তানসেন সংগীত সম্মেলন

আগামী ৩০শে নভেম্বর হইতে ৪ঠা ডিসেম্বর পর্যন্ত দক্ষিণ কলিকাতার "কালিকা" সিনেমা হলে নিখিল ভারত তানসেন সংগীত সম্মেলনের অষ্টম বার্ষিক অধিবেশন হইবে। স্থানীয় বিশিষ্ট শিল্পিগণ ব্যতীত নিখিল ভারতীয় খ্যাতি-সম্পন্ন ১৪ জন শিল্পী এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করিবেন এবং তাঁহারা হইতেছেন ওস্তাদ নিশার হোসেন খান (বুদাউন), পণ্ডিত নারায়ণ রাও ব্যাস (বোম্বাই), পণ্ডিত কুমার গন্ধর্ব (দেওয়াস), শ্রীমতী গাঙ্গুবাঈ হাঙ্গল (হুবলী), শ্রীমতী মালিনী যোশী (পুনা), প্রফেসর কমল সিং (বোম্বাই), ওস্তাদ আলী আকবর খান (বোম্বাই), পণ্ডিত রবিশংকর (দিল্লী), প্রফেসর আল্লা রাখা (বোম্বাই), প্রফেসর আশুতোষ ভট্টাচার্য (কাশী), প্রফেসর নন্দলাল ও সম্প্রদায় (কাশী), পণ্ডিত শত্রুঞ্জয় প্রসাদ সিং (আরা), প্রফেসর ক্ষীরোদ নট্ট (বরিশাল) ও কুমারী মোহিনী (নৃত্য—আরা)।

বিজয়ার পালা

হিমাংশুভূষণ মুখোপাধ্যায়

বাঙালীর প্রধান ও শ্রেষ্ঠ পার্বণ দুর্গোৎসব। বিজয়ার আনন্দোৎসবে তার চরম পরিসমাপ্তি। অতএব বাঙালীর জীবনে বিজয়ার মাহাত্ম্য যে কতখানি সে নিয়ে অধিক বলা বাহুল্য।

কিন্তু কয়েক বৎসর থেকে বিজয়োৎসব পালনের যে রূপটি চোখে পড়ছে, তাতে ক্রমশই এই চিন্তা বলবতী হচ্ছে যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে এই উৎসব বাঙালীর মতো সংস্কৃতিখ্যাতি-সম্পন্ন জাতির যথার্থ উপযুক্ত কি না।

অবশ্য আমার অভিজ্ঞতা সীমাবদ্ধ। পশ্চিমের কয়েকটি শহরে এ বিষয়ে আমার সামান্য দেখবার ও জানবার ক্ষেত্র হয়েছে তারই ওপর নির্ভর করে আমার যা-কিছু প্রশ্ন। জানি না, বাঙলা দেশের বড়ো বড়ো শহরে বা পল্লীগ্রামের ক্ষেত্রে এইসব উক্তি কতখানি প্রযোজ্য হবে।

প্রথমেই কোলাকুলির ব্যাপারটাকে ধরা যাক্। সপ্রেমে আলিঙ্গন: শুনতে অবশ্য ভালোই লাগে; আইডিয়াটাও চমৎকার। বস্তুত কিন্তু নানা গোলোযোগ দেখি। কোনো বৃহৎ সভায় যখন কোলাকুলির 'পালা' শুরু হয়, তখন অনভ্যস্ত দৃষ্টিতে তো বটেই, নিজেদের চোখেও ব্যাপারটা কেমন যেন অদ্ভুত ঠেকে।

মনে হয় যেন একটা বড়রকমের কাঠ-পুতুলীর নাচ শুরু হয়ে গেছে। কেউ দন্ত বিকশিত ক'রে, কেউ নির্বিকার মুখচ্ছবিতে, কেউ সুগম্ভীর বদনে, নীরবে, নিঃশব্দে, দিগ্‌বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হয়ে একের পর এক, কাঁধের পর কাঁধ মিলিয়ে চলেছেন। কিন্তু যেহেতু সমবেত ভদ্রমণ্ডলী সত্যই কলের পুতুল নন; রক্তমাংসে গড়া মানুষ, তাই সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু মানবীয় প্রতিক্রিয়ারও লক্ষণ দেখা যায়। কেউ বেপরোয়াভাবে ভীম-বেগে একের পর এক ব্যক্তিকে স্কন্ধাক্রমণ ক'রে মুহূর্তে তাঁকে বক্ষলগ্ন ক'রে পর-মুহূর্তে অন্যের প্রতি ধাবিত হচ্ছেন। কেউ অসহায়ভাবে নিজেকে ছেড়ে দিয়েছেন এই আলিঙ্গন-তরঙ্গের স্রোতে, যিনি এসে ধরছেন তাঁকেই ধরা দিচ্ছেন। কেউ স্থির নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন; ভাবটা এই যে, 'আমি নড়ছি না; যে আসবার এসো।' বক্ষস্পর্শের প্রক্রিয়ার মধ্যেও তারতম্য দেখা যায়। কেউ সোৎসাহে সবলে জড়িয়ে ধ'রে সবেগে স্বীয় বিশাল বক্ষস্থলে নিক্ষেপ করছেন, যাতে আক্রান্ত ব্যক্তির বক্ষপঞ্জর হয়তো কেঁপে উঠ্‌ছে। কেউ হেলায়-শ্রদ্ধায় কোনোরকমে আল্‌তোভাবে একটু স্পর্শ ক'রেই পরিত্যাগ করছেন। যখন 'পালা' শেষ হয় তখন সকলেই যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন। স্পর্শদোষকাতরজনেরা আদ্যোপান্ত বস্ত্রাদি পরিত্যাগ ক'রে তবে নিশ্চিন্ত বোধ করেন। এমনও অনুযোগ শুনেছি, কাঁধের ব্যথা সারতে দু-তিন দিন লেগেছে।

এরপর দেখা-সাক্ষাৎ, যাওয়া-আসার পালা। কোথায় আগে যাওয়া যায় এবং কে আগে যাবে বা আগে আসবে, এই সমস্যা এসে দাঁড়ায়। আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে একটা সহজ সমাধান হয়ে যায়। যাঁরা প্রবীণতম, ঠাকুর্দা-ঠাকুমাস্থানীয়, তাঁরা বাড়ি থাকেন, কনিষ্ঠরা পালা ক'রে এসে প্রণাম ক'রে যায়। খুড়ো-জ্যাঠা, মামী-মাসীদের নিয়ে অবশ্য কিছু গণ্ডগোল যে বাধে না তা নয়। খুড়োমশায়কে প্রণাম করতে তাঁর বাড়ি গিয়ে দেখি তিনি গিয়েছেন ছোট্‌ঠাকুর্দাকে প্রণাম করতে ও-পাড়ায়, অথবা হয়তো আমাদেরই বাড়ির দিকে গেছেন বাবাকে প্রণাম করতে; কিন্তু বাবা বেরিয়েছেন হয়তো বড়-পিসিমাকে প্রণাম করতে আর-এক পাড়ায়। ছোটোমাসীকে প্রণাম করতে গিয়ে দেখি হয়তো তিনি গেছেন মেজো-মাসীর বাড়ি এবং মেজোমাসী হয়তো গেছেন দিদিমার বাড়ি, এবং সেখানে হয়তো দৈবাৎ সব মাসীরা মিলিত হয়েছেন।

আত্মীয়স্বজনের গণ্ডি ছাড়িয়ে সাধারণ সামাজিক স্তরে এসেও এই ধরনের বিপর্যয় তো দেখা যায়ই; তাছাড়া আরো কিছু-কিছু জটিলতার সৃষ্টি হয়। আমি সপরিবার, এক রাস্তায় আপনার বাড়ি গেছি, আপনিও সপরিবারে অন্য রাস্তায় আমার বাড়ি এসেছেন এবং স্বভাবতই কেউ কাউকে পাই নি: এ ঘটনা বিরল তো নয়ই, বরং প্রায়ই ঘটে।

আজকাল একটা জিনিস দেখ্‌ছি যা আগে চোখে পড়্‌তো ব'লে মনে হয় না

আগে দেখেছি দুই বাড়ির ছোটরা পরস্পরের বাড়ির বড়দের গিয়ে প্রণাম করে আসত, এবং সমবয়স্ক যাঁরা তাঁদের কোনো-এক জায়গায় বিজয়া-সম্ভাষণ ঘটে গেলেই পালা চুকে যেত। আজকাল দেখি (অন্তত এদিকে) বিজয়া-সম্ভাষণেরও বিলাতি কায়দায় 'রিটার্ন কল'-এর দাবি ও প্রথা গ'ড়ে উঠ্‌ছে। অর্থাৎ, পুজো-প্রাঙ্গণে আপনাদের সঙ্গে আমাদের সর্ববিধ সম্ভাষণ ঘটে গেছে, তবু আমাকে সপরিবার আপনার বাড়ি যেতে হবে এবং আপনাকেও সপরিবার আমার বাড়ি আসতে হবে। এবং এই পাল্টাপাল্টি যাতায়াতের চক্রে ঘূর্ণায়িত হ'তে হ'তে একই পরিবারদের প্রত্যহ নানাস্থানে দেখা হচ্ছে এবং একই রকম আলাপ ঘট্‌ছে। এই সঙ্গে এটাও মনে রাখতে হবে যে, বহু জায়গায় যাওয়াটা হয়তো ব্যর্থই হচ্ছে, কারণ অপরপক্ষ হয়তো তাঁর তরফের প্রত্যভিগমন-অভিযানে ধাবমান রয়েছেন।

জটিলতার উল্লেখ করেছি। জটিলতার সৃষ্টি হ'তে দেখি 'কে আগে যাবে' এই গভীর গহন সমস্যা থেকে। অর্থাৎ, এক কথায় 'অহং'-এর অসীম রহস্য-লীলা। 'আমরা আগে যাব না, ওঁরা আগে আসুন'—এই তত্ত্বটির সমর্থনে বিবিধ বিচিত্র যুক্তির উদ্ভব ঘটতে দেখা যায়। "অমুকে বাবু আমার চেয়ে বয়সে বড় বটে, কিন্তু আমার বাবার বয়স ওঁর বাবার বয়সের চেয়ে বেশি; অতএব ওঁদেরই আগে আসা উচিত।" অথবা, "উনি আমার বয়োজ্যেষ্ঠ হ'লেও আমি ব্রাহ্মণ আর উনি শূদ্র, অতএব...।" অথবা ঠিক এর বিপরীত, অর্থাৎ, "আজকাল আর বামুন-কায়েত কে মানে? আমি তো বয়োজ্যেষ্ঠ, অতএব...।" অথবা, "আমাদের last visit, ওঁরা এখনো return দেন নি; অতএব...।" অথবা আরো সুদূরস্পর্শী চিন্তা, যথা, "গত বৎসর বিজয়া উপলক্ষে আমরা প্রথমে গিয়েছিলাম, এ-বছর ওঁদেরই আগে আসা উচিত।" অথবা, "আমি ধনী," অথবা "আমি মানী," অথবা "আমি উচ্চপদস্থ—অতএব..." ইত্যাদি ইত্যাদি।

মিষ্টান্ন-ভোজনের মতো মধুর ব্যাপারটিও নানা প্রক্রিয়ায় অম্ল ও তিক্ত হয়ে ওঠে। শারীরিক প্রক্রিয়াটি তো আছেই; অতিমাত্রায় খাদ্য-অখাদ্যের আকস্মিক উপদ্রবে পাকস্থলীর ঘোর প্রতিবাদ খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু মনের রাসায়নিক প্রক্রিয়াগুলিও কম গুরুতর দাঁড়ায় না। সুখাদ্যই হোক্ আর কুখাদ্যই হোক্, সময়েই হোক্ আর অসময়েই হোক্, একান্ত লৌকিকতার খাতিরে কিছু খেতেই হবে এই জবরদস্তিটাতেই মন বিদ্রোহ করে, বিশেষ ক'রে যেখানে আন্তরিক প্রীতির চেয়ে লৌকিক আচারেরই প্রাধান্য বেশি। সমস্ত জিনিসটার মধ্যেই কেমন একটা অসহায় মূঢ়তার সুর আছে। আপনার বাড়ি গেলাম, বিজয়ালিঙ্গন ইত্যাদি পূর্বেই কোথাও সমাধা হয়েছে, আপনার অনুরোধে উপবেশন করলাম, কথা কিছু-একটা হয়তো চল্‌ছে কি হয়তো চল্‌ছে না; মনের সম্মুখ আকাশে মিষ্টান্নের আবির্ভাবের চিন্তা, মিষ্টান্ন এল, খেলাম; মুখ মুছলাম, শোভনতানুযায়ী আরো একটু ব'সে উঠে পড়লাম, আবার আর-এক জায়গায় এই একই প্রহসনের অনুষ্ঠান করতে। আপনাকেও এই ব্রত উদ্‌যাপন করতে হবে ঠিক এই ভাবেই, কারণ নিস্কৃতি কারো নেই। আরো প্রশ্ন আছে। অর্পিত মিষ্টান্নের সমস্তটাই সাদরে নিঃশেষ করলে অধিকাংশ গৃহস্থই আপ্যায়িত বোধ করবেন; কিন্তু কোনো কোনো সঞ্চয়বুদ্ধিশীল গৃহস্বামী যদি আপনার এই অতিশিষ্টাচারে হতাশ হন তাহ'লে আশ্চর্য হবার কিছু নেই; কারণ আপনার সুরুচিসম্মত সৌজন্যের ওপর নির্ভর ক'রেই তিনি সমস্ত হিসেব করে-ছিলেন। আবার শৌখিনভাবে যদি মাত্র একটুক্‌রো ভেঙে মুখে দেন তাহ'লে আপনার উন্নাসিক ভাব বিরক্তি উৎপাদন করতে পারে। এই মিষ্টান্নের আয়োজনে একটা wholesome emulation-এর ক্ষেত্র হয়তো থাকতে পারে, কিন্তু সেই সঙ্গে গ্লানির দিকটাও অগ্রাহ্য নয়। অস্বচ্ছল গৃহস্থের সংকীর্ণ উপচারের গ্লানি সহজেই অনুমেয়। অভ্যাগতের অবাক্ত সমালোচনা তাকে আরও দুঃসহ ক'রে তোলে। "অমুকে বাড়ির মিষ্টি এবার সব চেয়ে ভালো" এই ধরনের মন্তব্য সকলকেই লজ্জিত করবে, এমনকি হয়তো 'অমুকে বাড়ির' লোকদেরও। সর্বোপরি এই ব্যাপারটা নিয়ে একটা নিরন্তর 'মহা আশঙ্কা জপিছে মৌন মন্তরে।' বাড়িতে মিষ্টান্নের প্রচুর সঞ্চয়, অথচ আগন্তুকের দেখা নেই দু'দিন ধরে। সব আয়োজন জীর্ণতাগ্রস্ত হয়ে পড়ছে, অথচ কে যে আসবেন তার কিছু-মাত্র নিশ্চয়তা নেই। আবার সঞ্চয় পাত্রের তলদেশে এসে ঠেকেছে, এমন সময় বন্যা-স্রোতের মতো আকস্মিক আবির্ভাব। যাঁদের সহজলভ্য উপায় নেই তাঁদের

লজ্জা রক্ষা করতে গেলে শেষ পর্যন্ত সেই মা দুর্গাকেই স্মরণ করা ছাড়া উপায় থাকে না। পশ্চিমের একটি শহরের কথা জানি, যেখানে শ'খানেক বাঙ্গালী পরিবার আছেন এবং প্রত্যেক পরিবারেরই অন্তত কুড়ি-পঁচিশটি পরিবারের সঙ্গে নিত্য-নৌমিত্তিক যাতায়াত আছে। বিশ্বাস করুন, সেখানে দীর্ঘ-বিলম্বিত অনিশ্চয়তাসংকুল এই চক্র পূর্ণভাবে ঘুরে আসতে কালী-পুজোও পার হয়ে যায় এবং ততদিন পর্যন্ত যেভাবেই হোক্ অন্নপূর্ণার মিষ্টান্নভাণ্ডারকে খোলা থাক্তেই হবে। ততদিন পর্যন্ত সামাজিক পরিস্থিতি স্বাভাবিক হ'তে পারবে না; নিশ্চিন্ত হয়ে অভ্যস্ত কাজে লাগা দুঃসাধ্য হবে।

আমার এই সব উক্তি ও মন্তব্যগুলি সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন উঠতে পারে। যদি ওঠে সেটা আমার সৌভাগ্য, কারণ তাতে তাদের মর্যাদা বাড়বে। কয়েকটা কথার অল্পস্বল্প জবাবদিহি আমারই করা প্রয়োজন। প্রথমেই আপত্তি উঠ্তে পারে, এ-সব হয় আমার মন-গড়া কথা, নতুবা অত্যন্ত অতিরঞ্জিত উক্তি। কবুল করছি, হাতে-হাতে প্রমাণ দিতে পারব না, আর সেটা সম্ভবও নয়। কোনো ব্যক্তি বা সমাজ সম্বন্ধে কোনোরকম সাধারণ মন্তব্য (general statements) কখনো নিঃসংশয় ও সর্ববাদিসম্মত হ'তে পারে না। পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার তারতম্য ঘটেই; তা' ছাড়া বোধশক্তিতেই মূলগত তারতম্য থাকে। এই ধরনের সত্যকে মোটামুটি ইন্‌টুইশান্-সিদ্ধ বলা যেতে পারে। এ নিয়ে তর্কের শেষ হয় না। আপন-আপন অভিজ্ঞতা অনুসারে কেউ হয়তো বলবেন এ-সব বাড়ানো কথা, আবার কেউ হয়তো বলবেন কথাগুলো নেহাৎ মিথ্যে নয়। ভোট নিয়ে হাত-গুণেও এ-তর্কের মীমাংসা হয়তো হ'তে পারে, কিন্তু সত্য-নিরূপণ সম্ভব নয়। শুধু এইটুকু বলতে পারি, অনেকেরই মেঘাচ্ছন্ন মনের নভস্তলে এই ধরনের চিন্তার ঝিলিক্ মেরে যেতে দেখেছি, কখনো ক্ষীণতর, কখনো স্পষ্টতর রেখায়। এইসব অস্পষ্ট চিন্তারাজির একটা জমাট রূপ দিতে চেষ্টা করেছি মাত্র, যা সাহিত্যিকের কাজ। হাতেকলমে লিখলেই জিনিসটা বাড়ানো ব'লে মনে হয়। তাই তো শাস্ত্রে বলেছেনঃ 'শতং বদ, মা লিখ।'

আর একটা সাংঘাতিক প্রতিবাদ আছে; লৌকিকতা মাত্রেই কিছুটা জবর-দস্তি ও কৃত্রিমতা থাকতে বাধ্য; অতএব এ-ব্যাপারে আপত্তি করলে আরো অনেক ব্যাপারে আপত্তি করা উচিত। যুক্তি হিসাবে এ-কথার গুরুত্ব স্বীকার কবি। কিন্তু পাঁচটা জিনিস মানি ব'লে যে দশটা জিনিসই মানতে হবে, এও তো সুযুক্তি নয়। বরং সভ্যসমাজের কর্তব্য হবে সামাজিক জীবনযাত্রাকে যতখানি সম্ভব সরল, স্বাভাবিক ও অকৃত্রিম ক'রে তোলা। যেটুকু কৃত্রিমতা জীবনে এবং বিশেষ ক'রে সামাজিক জীবনে অপরিহার্য তা অবশ্য মেনে নিতেই হবে বৈকি। তবে এই যুক্তির দোহাই দিয়ে আমরা যে সমস্ত সামাজিক আচারকে নির্বিচার অমরত্ব দিয়েছি তাও তো নয়। এরকম বহু আচার, বহু উৎসব যে অনাদরে আপনা থেকেই লোপ পেয়েছে, তার জায়গায় অবশ্য অন্য আচার-উৎসব এসে পড়েছে, তার কতকগুলি হয়তো ভালো, কতকগুলি হয়তো ভালো নয়। কিন্তু আসল তত্ত্বটি এই যে, কোনো আচার ও উৎসব আছে ব'লেই অথবা বহুদিন থেকে চ'লে এসেছে ব'লেই যে তাকে সম্পূর্ণভাবে স্বীকার ক'রে যেতে হবে চিরকাল, সভ্যতার ইতিহাসে এর সাক্ষ্য নেই।

পরিশেষে এই বক্তব্য যে, বিজয়ার উৎসবের মতো এত প্রাচীন ও ব্যাপক কোনো উৎসবকে এক কথায় একেবারে ভাঙা বা গড়া যায় না। জাতির সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের গভীরদেশে তার মূল। কিন্তু সংস্কারের কথা চিন্তা করা বোধ হয় অন্যায় হবে না। সমাজের রূপ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার বিভিন্ন উৎসব ও অনুষ্ঠানেরও পরিবর্তন ঘটে এবং অনেকক্ষেত্রে তা ঘটা উচিতও। তাই বর্তমান যুগের চেহারা অনুসারে বিজয়া-উৎসবেরও রূপ-বদল অকাম্য নয়। ঠিক কী রূপ হওয়া উচিত, সে বিষয়ে কোনো একতরফা ফতোয়া জারি করা সংগত নয়; তাতে লাভও নেই। কিন্তু বিভিন্ন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী স্বতন্ত্রভাবে এবিষয়ে চিন্তা ক'রে যদি বিজয়া-উৎসবের স্বতন্ত্র নব রূপায়নের প্রয়াস করেন এবং এ প্রয়াস যে একেবারে কোথাও হচ্ছে না, তাও নয়। একে এমন একটি রূপদান করতে সক্ষম হন যাতে নববর্ষ অথবা রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসবের মতো এর মধ্যে দিয়েও বাঙ্গালী জাতির বিশিষ্ট সুরুচি ও সংস্কৃতির ঘনীভূত প্রকাশ ঘটে, তাহ'লে আমার মতো বহু বঙ্গসন্তান যে তা'কে সমস্ত হৃদয় দিয়ে অভিনন্দিত করবে, সেবিষয়ে অন্তত আমার কোনো সংশয় নেই। তবে এ সম্বন্ধে আন্তরিক চিন্তার প্রয়োজন। ভাবনা-স্রোতের আঘাতে আঘাতে শৈবাল ছিন্ন হবে, বদ্ধজলায় সাড়া জাগবে, সঞ্চিত আবর্জনা ধুয়ে মুছে ভেসে গিয়ে ফুটে উঠবে নূতন সংস্কৃতির রূপ, এই আশা নিয়েই এই সামান্য রচনা।
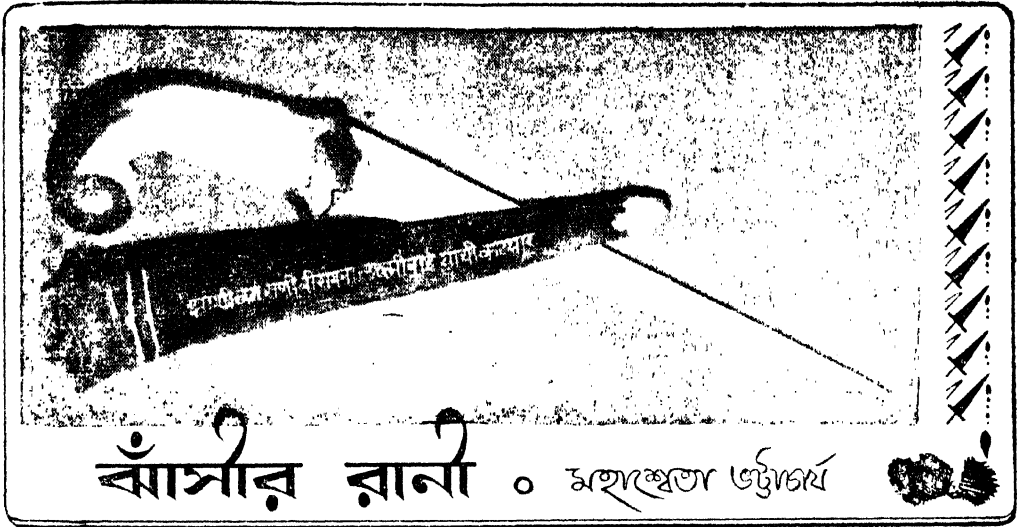
ঝাঁসীর রানী ০ মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য

॥ ১২ ॥

সেদিন রানী নিজ বাসভূমে পরবাসী। অন্য মানুষ তাঁর কাছে দাসখত লিখে নিয়েছে আর তাঁর ঘরে জ্বালিয়েছে নিজের বাতি। যে তিমিরে রয়েছেন তিনি, এই বনবাসের দিনে তা-ই যেন ভাল।

কিন্তু নতুন দুঃসংবাদে মর্মাহত হ'ল নগরবাসী। রানী স্তম্ভিত হ'লেন। নগরীর বুকে বসেছে কসাইখানা। সেখানে গরু ও শূকর হত্যা করেছে কসাই। মাংস যাবে সামরিক ছাউনীতে।

হিন্দু-মুসলমাননির্বিশেষে অনুভব করল, তাদের ধর্মবিশ্বাস, সংস্কার এবং ঐতিহ্যকে অপমান করা হয়েছে। শুধু মাংসের প্রয়োজনে হত্যা-ই করেনি তারা, নিহত পশুর রক্তাক্ত চামড়া ঝুলিয়ে নিয়ে গেছে বাঁকে করে খোলা রাজপথ দিয়ে। অপমানিতা রানী প্রতিবাদ জানালেন এবং দ্বিতীয়বার প্রত্যাখ্যাতা হ'লেন। সর্বত্র এই অপ্রীতিকর বিষয় নিয়ে আলোচনা চলতে লাগল। রাজনীতিক সচেতনতা যে সব সরল মানুষের মধ্যে ছিল না, তাদেরও সচেতন করল ইংরাজ। তারাও বুঝল, এই জাতির এতটুকু শ্রদ্ধা নেই আমাদের রীতিনীতি বিশ্বাসের ওপর।

এই সব ব্যবহারে সাধারণ মানুষ বুঝেছিল ইংরাজ তাদের বিরোধী। এই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়েছিল অভ্যুত্থানকারীরা তিন বছর বাদে। ইংরেজ যে শত্রু, এই কথা বোঝাবার জন্য এই নজীরগুলিই যথেষ্ট ছিল।

এই সময় উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের গভর্নর কোল্‌ভিন (Colvin) হিসেবনিকেশ খতিয়ে বের করলেন, পূর্বতন ঋণের জন্য ৩৬,০০০ টাকা আজও ঝাঁসীরাজের কাছে পাবেন তাঁরা। এই ঋণ একদা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন রামচন্দ্র রাও যখন বিক্ষুব্ধ রাজপুত সর্দাররা, বামে দতিয়া আর দক্ষিণে অরছা রাজ্যের নির্দেশে 'ভূমিয়াবৎ' জাহির করে পুরো রাজ্যখানা তোলপাড় করে ফেলেছিলেন। সেদিন চাষীর গোলা লুটে নিঃশেষ হ'য়ে গিয়েছিল, অন্ন ছিল না ঘরে। দলে দলে কিষাণ এসে প্রাসাদের বাইরে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আরজি জানিয়েছিল—'অন্নদাতা কিরপা হোই—জীউদাতা কিরপা হোই। সেদিন পরদুঃখকাতর হয়ে তরুণ রাজা রামচন্দ্র রাও প্রথমে গিয়েছিলেন মা সখুবাঈয়ের কাছে। কোষাগারের ধনরত্ন আত্মসাৎ করে নিষ্ঠুর চিত্তে অবিচল বসেছিলেন সখুবাঈ। নিরুপায় রামচন্দ্র অগত্যা ঋণ করেছিলেন পঞ্চাশ লক্ষ টাকা। এই ৩৬,০০০ টাকা তারই অবশিষ্ট। কোলভিন রানীকে জানালেন এই টাকা মাসিক বৃত্তির থেকে কিস্তিতে কিস্তিতে কাটা যাবে।

বৃথাই রানী বারবার জানালেন, তাঁর পাঁচ হাজার টাকা বৃত্তির থেকে কোনো টাকা দেওয়া সম্ভব হবে না; জানালেন যখন ঝাঁসীরাজ্য গ্রহণ করেছেন সরকার, রাজ্যের দায় এবং ঋণ-ও তাঁরাই গ্রহণ করেছেন। জানালেন তাঁর একলার পক্ষে মাসিক পাঁচ হাজার টাকা পর্যাপ্ত। কিন্তু তাঁকে ঘিরে বাঁচছে একটি বৃহৎ আশ্রিত গোষ্ঠী। তাদের প্রতিপালন ক'রে এই টাকার এতটুকু উদ্বৃত্ত থাকে না তাঁর। সমগ্র আশ্রিত মণ্ডলীকে প্রতিপালন করবার দায়িত্ব তাঁর-ই। কোল্‌ভিন কোন কথা শুনলেন না।

সেদিন সেই ছত্রিশ হাজার টাকা—ছেড়ে দিলে দেউলে হ'য়ে যেত না রাজকোষ, অসুবিধা হ'ত না সরকারের। ভ্রান্ত নীতির অনুশাসনে নিজেদের পাওনা আদায় করতে লাগলেন কোল্‌ভিন। অন্যত্র তাঁদের খাতায় লাভের ঘরে ক্ষতি জমতে লাগল।

এর থেকে সেদিনকার শাসক ও শাসিতের সম্পর্ক এতটুকু ধরবার চেষ্টা করা যায়। ১৮৫৭ সালের আগেই সমগ্র ভারতবর্ষে সুপ্রতিষ্ঠিত ইংরেজরাজ।

সুবিশাল জল, জঙ্গল, পর্বত, গ্রাম,

জনপদ, মরুভূমিসম্বলিত ভারতভূমির সেদিনও নিজস্ব শিল্প, সংস্কৃতি, শিক্ষা এবং ঐতিহ্য ছিল। ছিল না শুধু স্বাধীনতা। ইংরেজশাসনের নাগপাশে সেদিনকার ভারতবর্ষ রুদ্ধশ্বাস। নিজেদের প্রয়োজনে ইংরাজ ভারতবর্ষে বিজ্ঞানের সেই অগ্রগতি এনেছিল, যা ছাড়া আজকের দুনিয়া সম্ভব হোত না। কিছু কিছু সমাজসেবী ভারতহিতৈষী ইংরাজের ব্যতিক্রম দৃষ্টান্ত বাদ দিলে, বোঝা যায়, তাদের প্রচেষ্টার মূলে ছিল ব্যক্তিগত না, রাষ্ট্রগত স্বার্থ। অবশ্য জ্ঞান সর্বদা কল্যাণ আনে, বিজ্ঞান উন্নত করে সভ্যতাকে। তাই স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যেই হোক, বা দেশের হিতৈষণার উদ্দেশ্যেই হোক, আনীত বিদ্যা তার স্বীয়গরিমায় সার্থক হয়ে উঠেছিল আমাদের দেশে।

ভারতবর্ষে শাসন করতে এসেছিল বলে দেশটার বা মানুষগুলির প্রতি এতটুকু শ্রদ্ধা ছিল না শাসকগোষ্ঠীর। অতিসহজে তাঁরা উপেক্ষা করতেন ভারতবাসীর মতামতকে। তাই বিজ্ঞানের বহু নতুন নতুন দানে সেদিনকার মানুষ কোনো কল্যাণ কামনা দেখেনি। তারা শুধু দেখছিল এমনি করে ক্রমেই চেপে বসছে বিলিতী ফাঁস। তাই তাদের মনে জমছিল আক্রোশ। কিন্তু সে সম্বন্ধে এতটুকু অবহিত ছিলেন না সরকার। স্থবির সামন্ততান্ত্রিক ভারতবর্ষ তাঁদের চাহিদা অনুযায়ী যথেষ্ট গতিশীল ছিল না। তাঁদের ছিল গতির প্রয়োজন। তাই অর্থনীতিক বুনিয়াদ করতলগত রেখে চাপ দিতে লাগলেন তাঁরা। রথের চাকা নড়ল।

চাকাটা একবার চলতে শুরু করলে যে অনেক ভেঙেচুরে শেষ পর্যন্ত না গড়িয়ে থামবে না, তা বুঝতে পারেননি সরকার। বুঝতে পারলে সময়ে সচেতন হতেন। কলমের খোঁচায় চোদ্দ কোটি ভারতবাসীকে সবরকম অধিকারে বঞ্চিত করে, খস্‌খসের পর্দায় খাসা গুলাবপানি ছিটিয়ে খুস্‌বুতে দিল্ মশগুল করতেন না। খোলা বারান্দায় বিয়ারের বোতল খড়ের মোড়কে ঝুলিয়ে রেখে, জল ছিটিয়ে ঠাণ্ডা করে সন্ধ্যাবেলা এক চুমুকে পান করে বুঁদ হয়ে বসে বসে সময় কাটাতেন না। কি আনন্দেই কাটছে দিন। মাইনে যদি মেলে একশো টাকা, দেশে পাঠানো যায় মাসে পাঁচশো টাকা। অবিচ্ছিন্ন শান্তি। অফুরন্ত সুখ!

শাসিত জনসাধারণের প্রতি বর্ণ এবং সভ্যতার গরিমাজনিত ঔদাসীন্য ক্রমশ প্রকট হয়ে উঠেছিল। ঝাঁসীতে, অতি স্বল্প সময়ের মধ্যে, মহালক্ষ্মীর মন্দিরের জন্য নির্দিষ্ট দেবত্র সম্পত্তি অধিকার এবং প্রকাশ্যভাবে নগরীতে পশু হত্যা [illegible] একটুখানি নিদর্শন। রানীর বৃত্তি থেকে পূর্ব ঋণের জন্য টাকা কেটে নেওয়া সম্বন্ধে কে ও' ম্যালেসনের মন্তব্য স্মরণীয়—

"ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট তাঁর [illegible] ক্রোধ ও বিক্ষোভকে উপেক্ষা করেছেন তাচ্ছিল্য সহকারে। শুধু তাই নয়, [illegible] অপমানের সঙ্গে হীনতা ও [illegible] রাজ্য বাজেয়াপ্ত হবার সময়ে রানীকে বার্ষিক ছয় হাজার পাউণ্ড বৃত্তি দিয়েছিলেন। প্রথমে প্রত্যাখ্যান করে পরে সেই বৃত্তি গ্রহণ করতে সম্মত [illegible] রানী। যে টাকাকে তিনি সামান্য বলে জ্ঞান করতেন। তার থেকে [illegible] স্বামীর ঋণ বাবদ টাকা [illegible] যখন জানলেন, তখন তাঁর ক্ষোভ সহজেই অনুমেয়।

তিক্ত হৃদয়ে তাঁর প্রতিবাদ [illegible] ব্যাপারটা তাঁর কাছে যতখানি অপমানজনক ততখানি ভুয়া বলে বোধ হলো। [illegible] নিরুপায়। বৃথাই তিনি বললেন, যে রাজ্য থেকে তাঁকে বঞ্চিত করেছে ইংরাজ, সেই রাজ্যের দায়ঋণ সবই [illegible]। মিঃ কোল্‌ভিন না-ছোড়বান্দা। তিনি জোর করে সেই বৃত্তি থেকে ঋণের টাকা কেটে নিলেন।

হিন্দু নাগরিকদের মধ্যে [illegible] মন্দিরের জন্য নির্দিষ্ট ভূমি ও বৃত্তি বাজেয়াপ্ত করা, এই কারণগুলি [illegible] বদলে অসন্তুষ্ট জনসাধারণের মনে উদ্বেগ সঞ্চার করেছিল।

কিন্তু ব্যক্তিগত অপমানই [illegible] প্রধান কারণ যা রানীকে পরিণত করেছিল প্রতিশোধ নেবার জন্য অপেক্ষমান একটি ক্ষমাহীন শত্রুতে।"

(কে ও মালসেন, তৃতীয় খণ্ড, পৃ ১২০—২১)

কিন্তু কোনো ব্যক্তিগত অপমানই

ড়োন্ত হয়নি এতদিন। ১৮৫৫ সালে ামোদরের বয়স হ'ল সাত। তাঁর উপনয়ন দবার জন্য ব্যস্ত হ'লেন রানী। ামোদরের জন্য তাঁর মনে দুঃখের অবধি ছল না। আর দশটা বালকের মত দামো-রও হেসে খেলে আনন্দে দিন কাটাতেন। ানীর কাছে তিনি আনন্দ। যে রানীকে কলেই মান্য এবং ভয় করে, তিনি তাঁকে ায়ই বলে থাকেন "আনন্দ, তুমি-ই আমার ঃখের দিনে আনন্দ।" অবশ্য অবিচ্ছিন্ন খে নয়। সকালে ও বিকালে মৌলবী বং শাস্ত্রী এসে ফারসী ও সংস্কৃত ড়ান। অতি প্রত্যূষে ঘুম থেকে উঠে াখ বুজে মন্ত্রোচ্চারণ করতে শেখান নী। খাওয়ার সময়ে শুধু মিষ্টি খেতেন ল, কড়াকড়ি ব্যবস্থা হয়ে গেছে। দরজা ধ করে তাঁকে বুঝিয়েছেন রানী, সবরকম িনিস না খেলে শরীরে শক্তি হবে না, ার সিন্ধবকসের পিঠে চড়া বা ঘোড়া ানো কিছু হবে না। লাড্ডু থেকে ওয়া খুঁটে খুঁটে খেতেন বলে একদিন ি গিয়েছিলেন রানী। বলেছিলেন— তে হ'লে সবটুকু খাবে, না হ'লে খাবে । ও-রকম বাড়াবাড়ি করো না।' তাছাড়া নক কথা তাঁকে বোঝান রানী। তাঁকে ক মানুষ হতে হবে। ইংরেজের সংগে াজে কলমে লড়তে হবে। বিলেতে বড় আর্জি পাঠাতে হবে। এ-সব কাজ ব হবে কিনা কে জানে। ফৌজী রেডের সময়ে দেখেছেন একদিন াদর ফিরিংগীরা কি চমৎকার দেখতে। ঝকে বেয়নেট, লালনীল জামা, টক্‌টকে । আবার সম্প্রতি তাঁর দাদামশাই রাপন্ত্ তাঁকে বলে গেছেন উপনয়ন । তখন অনেক কিছু পাওয়া যাবে। াম হবে।

উৎসবের কথা ভাবতে লাগলেন রানী। আশ্রিত, কত দরিদ্র, কত অনুগৃহীত। উপলক্ষে তাদের কিছু কিছু দেওয়া । রাজা গঙ্গাধরের প্রিয় নাট্যশালা হয়ে রয়েছে। সাজপোশাকগুলো মতধানের তত্ত্বাবধানে। নাচনেওয়ালী না কি আজকাল উদাসচিত্ত হয়ে ভজন গায় আর স্নান করতে যায় । তবলা, মৃদঙ্গ, যন্ত্রগুলোয় । সেই নাট্যশালার কয়- করা যায়।

তবে অর্থের প্রয়োজন। কোথায় আছে টাকা? ঝাঁসীর রাজকোষে ছয় লক্ষ টাকা আছে দামোদরের নামে। তাছাড়া আছে সোনা এবং জহরৎ। তার থেকে কিছু নিলেই চলে যাবে। স্মরণ থাকতে পারে, এই টাকা রাজা গংগাধর রাওয়ের ব্যক্তি-গত টাকা। যে খাজগীদৌলতী রানীকে দেবার জন্য ম্যালকম্ বারবার সুপারিশ করেছিলেন এবং ডালহৌসী প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

সেই টাকা থেকে এক লক্ষ টাকা চেয়ে পাঠালেন রানী। সংগে সংগে পাঠালেন একখানি বিশদ তালিকা। যাতে তাঁর আবেদনের যৌক্তিকতা বুঝতে পারেন সরকার।

কিন্তু সরকার তা মানলেন না। কোল্‌ভিন জানালেন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের জন্য এক লক্ষ টাকা অতি বাহুল্য ব্যয়। এই টাকা বালক দামোদরের প্রাপ্য। সে যেদিন সাবালক হবে, সেদিন যদি এই প্রশ্ন করেন যে, তাঁর প্রাপ্য টাকা তাঁর মাকে কেন দেওয়া হয়েছিল? এ হ'ল গচ্ছিত টাকা বা Trust money। এই টাকা থেকে কিছু দিলে বিশ্বাস ভেঙে যাবে দামোদরের।

এই কথা জেনে রানী মর্মাহত হ'লেন। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাবশত ঝাঁসীর ধনীশ্রেষ্ঠ কয়েকজন লোক বারবার টাকা দিতে চাইলেন। তাঁরা জানালেন, দামোদরের উপনয়ন ব্যাপারে কিছু সাহায্য
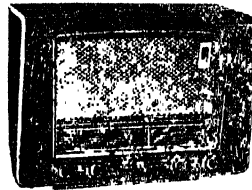
করতে পারলে তাঁরা আনন্দিত হবেন। এই অর্থকে যেন ঋণ বলে ধরা না হয়। যে রাজের নিমক তাঁরা খেয়েছেন, এ তারই প্রতি তাঁদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। রানী সম্মত হলেন না। তাঁর নিজের টাকা রয়েছে, তা সত্ত্বেও তিনি অপরের অর্থ গ্রহণ করবেন না। তবে তাঁদের সাহায্য তিনি প্রত্যাখ্যান করবেন না, তাঁরা যদি জামিন থাকেন। তিনি জানালেন—"যদি কোনদিন ভবিষ্যতে দামোদর রাও এই এক লক্ষ টাকা সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলেন, তা হ'লে নিম্নে স্বাক্ষরকারী পাঁচজন ব্যক্তি লিখিত জামানত থাকল যে, তারা ঝাঁসীর মুদ্রামূল্যে প্রত্যেকে কুড়ি হাজার সিক্কা টাকা হিসাবে দামোদরকে এই টাকা দেবে।"

এই পত্রে সই করলেন মোরোপন্ত, জয়পুরওয়ালা, লক্ষ্মীচাঁদ এবং আরও দুইজন।

এ'রা জামিন হলে পরে টাকা ধার দিলেন সরকার। অন্তরে প্রজ্বলিত অপমানের বহ্নি নিয়ে কর্তব্য সমাপন করলেন রানী। অভিভাবকশূন্য নিঃসহায় অবস্থা তাঁর। কর্তব্য সুসম্পাদন করবার দায়িত্বও তাঁরই।
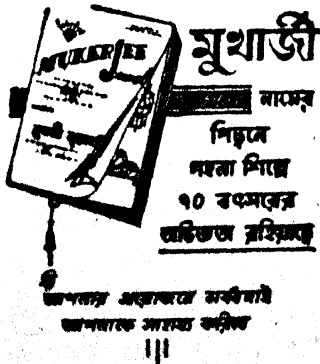
উপনয়নের সমস্ত কাজ শেষ হ'লে, গভীর রাতে জানলা দিয়ে দেখলেন শীতের আকাশে কুয়াশাম্লান জ্যোৎস্নার আর উত্তরে বাতাসে উড়ছে ব্রিটিশ পতাকা। দেখে ঘরে এসে তাঁর নিজস্ব শ্রীমদ্ভাগবত-গীতাখানির রেশমী প্রচ্ছদের পেছনে সাদাপাতায় ছোট ছোট অক্ষরে লিখলেন স্মরণে থাকবে।

আজন্ম ভাগ্যবাদে বিশ্বাসী লক্ষ্মী-বাঈ সেইদিন থেকে ভাগ্যের সঙ্গে বাজি ফেললেন। যে ভাগ্য তাঁকে রানী করেছিল একদা শৈশবে। প্রথম যৌবনে সেই ভাগ্য তাঁকে বিদেশী ও পরস্বাপহারী শত্রুর হাতে বারবার লাঞ্ছিত করছে। দেখা যাক একবার ভাগ্যকে রাশ টেনে মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া যায় কিনা। সংকল্প জাগিয়ে তিনি তাকিয়ে রইলেন সেই দিনের পথে।

দিন থেমে নেই, দিন এগিয়ে আসছে। আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষ যার হিমালয় নাম নগাধিরাজের সর্বোচ্চ শিখরের নামাকরণ থেকে, সর্বত্র বিদেশী শাসকের ধ্বজা সুদূর আশ্বাসে প্রোথিত, তার লক্ষ লক্ষ মানুষ অসহ্য অত্যাচারে নিষ্পিষ্ট হয়ে একটি মহান প্রতিবাদের অগ্ন্যুৎপাত আসন্ন করে তুলছে তিলতিল করে। একটি মোকাবিলা হবে রাজায় প্রজায়। সমাসন্ন সেই শুভদিন প্রচণ্ড গর্জনে এগিয়ে আসছে। আগামী দিনের সেই পদধ্বনি এগিয়ে আসতে আসতে একদিন ঘা দেবে ঝাঁসীর কেল্লার লৌহকপাটে। সেইদিন বোঝা যাবে রানী নিরামিষ ভোজী, ধর্মকর্মে ব্যাপৃতা, ইংরেজরাজের দয়াতে কৃতজ্ঞতা বিগলিত চিত্তা, ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের একটি অযোগ্য প্রতিনিধি মাত্র কিনা, অথবা তাঁর অন্য পরিচয় আছে?

সেইদিনের প্রতীক্ষায় কর্মময় দিন, নিদ্রাহীন রাত্রি কাটাতে লাগালেন রানী। তাঁর সেদিনকার চিন্তাধারার কথা কে বলবে? কে জানে তিনি কি ভাবতেন, কি চিন্তা করতেন, কি অস্থির আবেগে রাতের-পর-রাত কাটত তাঁর, কি অনির্বাণ আগুন জ্বলে যেত সেই মনে?

এইমাত্র জানা যায়, তাঁর চোখে ঘুম ছিল না।

আকাশে নক্ষত্রের কোনো ভাষা আছে কি? তারা কি কথা কয়? নক্ষত্রের অক্ষরে আগামী দিনের নিশানা মিলবে কি না, তাই খুঁজতেন হয়তো রানী।

এমনি করে এল ১৮৫৭ সাল। সমগ্র ভারতে অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি। সমগ্র ভারতের অনেক মানুষের অনেক স্বার্থে স্বার্থে ঘা দিয়েছে ইংরাজ। অনেক বিক্ষুব্ধ চিত্তের ইন্ধনে এক বিশাল জতুগৃহে।

দিল্লীর লালকেল্লার দেওয়ালে বারবার ইস্তাহার পড়তে লাগল—হিন্দুস্থান ছাড়ো। ধর্মের জন্য, দেশের জন্যে, তৈরী হও হিন্দুস্থানের মানুষ।

সেই ইস্তাহার ছিঁড়ে ফেললেন অফিসার। পরদিন সকালে ইস্তাহার পড়ল কলকাতা, মীরাট ও কানপুরে। ছিঁড়ে ফেলে দাও।—আবার ইস্তাহার।

ফৌজী ব্যারাকে ফিরতে লাগল হাতে হাতে চাপাটি।

কখনো কখনো সেইসঙ্গে লালপদ্মের পাপড়ি।

কানপুর শহরের বাজারে ইংরেজ অফিসারের গাড়ির চাকায় পিষে গেল একটি বালক। মায়ের হাতে পড়ল চাবুক।

মীরাট শহরে ১৮৫৬ সালে গ্রীষ্মের দুপুরে উন্মুক্ত রাজপথে চাবুক খেয়ে মরে গেল এক কিশোর সিপাহী। ক্ষতিপূরণ নেই।

ইংরাজকে আঘাতমাত্র করবার অপরাধে সশ্রম কারাদণ্ড এমনকি ফাঁসীও হ'তে পারে। ইংরাজ ভারতীয়কে যথেচ্ছ হত্যা করতে পারে। বিচার করা চলবে না। বিচার হবে শুধু কয়েকটি আদালতে—সেখানে গাঁয়ের সাধারণ মানুষ পৌঁছতে-ই পারবে না।

মাথা নীচে আর পা ওপরে করে টাঙিয়ে রেখেছে পেশোয়ারে তিনজন লোককে ব্যারাকের কাছে বসে তারা মদ খেয়েছিল। সন্ধ্যার পর তাদের নামিয়ে নেওয়া হ'ল। একজন মারা গেছে।

লক্ষ লক্ষ, ছোট ছোট, বড় বড় ঘটনা। আরো অনেক কথা, আরো অনেক দুঃখ, আরো অনেক জীবনের বিনিময়ে কেনা রক্তাক্ত সব অভিজ্ঞতা। এত অভিজ্ঞতার ফলে সম্ভব হয়েছিল ১৮৫৭ সাল। দুই বছরব্যাপী মহাপ্রলয়। ইংরেজ ঐতিহাসিক যাকে বলেছেন সিপাহী বিদ্রোহ মাত্র, আজকের ভারতীয় ভাষণে যা ভারতবর্ষের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম। (ক্রমশ)

রাগসংগীতের ভূমিকা

শ্রীরাজ্যেশ্বর রায়

"আচ্ছা ওস্তাদজী রাগ-রাগিণীগুলি কোথা থেকে এল, সে সম্বন্ধে যদি একটু উপদেশ দেন—" অতি বিনীত হাসি হেসে শিষ্য গুরুর পদতলে বসলেন। ওস্তাদজী হয়তো খোশমেজাজে আছেন। শিষ্যের পিঠ চাপড়ে বললেন, "বৈঠ্ যাও বেটা।" তারপর এ-গালের পান ও-গালে নিয়ে আরম্ভ করলেন—"তব্ শুনো—"। সেই ব্রহ্মার চার মুখ থেকে কোন্ কোন্ রাগ বেরিয়ে এলো, কাদের সঙ্গে তাদের বিয়ে হ'ল, ছেলেপুলেদের নাম কি—এই সব বৃত্তান্ত সবিস্তারে বুঝিয়ে শেষে বলেন—এসব ব্যাপার আর কেউ জানে না, আমার ঠাকুরদাদার বাবা জানতেন, আর সেই থেকে আমরাই জানি, আর কেউ নয়। পণ্ডিতজীরাও এই কথাই বলবেন। তাঁদের কেউ কেউ আবার নাদ-ব্রহ্ম পর্যন্ত উঠবেন। যে সব সাকরেদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয়নি, তাঁরা ঐ শূন্যেই মহাশূন্যে বার বার প্রণাম জানিয়ে কৃতজ্ঞ-চিত্তে বাড়ি ফিরবেন। যাঁরা এতে সন্তুষ্ট নন—বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ চান, তাঁরা ইংরেজী-বাংলা নানা গদ্যবন্ধ খুলে বসবেন। কিন্তু খানিক পরে সব গুলিয়ে যাবে; বিবিধ ফুটনোট এবং উদ্ধৃতির অরণ্য ভেদ করে আলো আর পৌঁছোবে না। তাঁরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই থেকে যাবেন।

তাই আশ্চর্য হয়ে ভাবি, কেন এমন হয়। সহজভাবে বলতে আমরা পারি না কেন? নিশ্চয়ই আমাদের বোঝার মধ্যে গলদ আছে। সেই গলদ কোথায়? আসলে আমরা সংগীত শাস্ত্রগুলি তেমন [illegible] করে পড়ি না এবং হয়তো সম্পূর্ণভাবেও পড়ি না। তাতে ধারণাটাই স্পষ্ট হয় না। আবার হয়তো শুধু [illegible] শাস্ত্রই পড়ে গেলুম, ইতিহাস [illegible] পড়লুমই না। এই রকম পড়ার [illegible] শীণ বোধ অসম্পূর্ণ থেকে [illegible] এর ফলেই আমরা যা বলি, [illegible] ভাসা ভাসা ঠেকে। আর এটাও বলে রাখা ভাল যে, শাস্ত্রও যে আমাদের দিক্‌ভ্রান্ত করে না এমন নয়। পাঁচটা শাস্ত্র খুলে বসলেই দেখা যাবে, যেখানটা আমাদের গোলমাল ঠেকছে, সেখানে শাস্ত্রকারদেরও গোলমাল এবং সেখানেই উদ্ধৃতি, অর্থাৎ পরমতের বাহুল্য। অমুক এই বলেছেন, অমুক সেই বলেছেন, এই-ভাবেই অনেক কথা বলা হয়ে গেল, কিন্তু আসল ব্যাপারটা যেখানে অস্পষ্ট, সেখানে অস্পষ্টই রয়ে গেল। বেশিরভাগ শাস্ত্রকার একই জায়গায়, একই রকম উদ্ধৃতি করেছেন। অর্থাৎ ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছে এই যে, যেখানে শ্যাম গোলমালে পড়েছেন, সেখানে তিনি রামের বই থেকে বেমালুম মেরে দিয়েছেন, তারপর যদু মধু সব ঐ একই কারবার করে গেছেন। এ না হ'লে মার্গ সংগীতের সঠিক সংজ্ঞা আমরা পাই না কেন? "জাতি" কথাটা কেমন করে হ'ল সেটা আমরা বুঝি না কেন? "রাগ" আর "জাতির" সম্বন্ধটাই বা পরিষ্কার হয় না কেন? "জাতির" পরিণতি আর রাগের ক্রমবিকাশ সেটাই বা স্পষ্ট ধরা যায় না কেন? সবই ধোঁয়াটে, ভাসা ভাসা। শাস্ত্রকারেরা শাস্ত্র রচনা করেছেন অথচ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করেন নি। এক "সংগীত রত্নাকর" ছাড়া এমন একখানা গ্রন্থ পাওয়া যায়নি (অবশ্য আমি অনেক পূর্বযুগের কথাই বলছি) যাতে একটা স্পষ্ট ব্যাখ্যার আয়াস লক্ষ্যগোচর হয়। আর টীকাকাররাও প্রায় তদ্রূপ বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া। সংগীত রত্নাকরের টীকাকার কল্লিনাথ—খুব নামডাক ও'র। কিন্তু হায়—কেবল বচনই সার। যে জায়গাটা সবাই বোঝে সেখানে খুব কেরামতি দেখিয়েছেন আর যেখানে আমার আপনার "ডাউট্" সেখানে টীকাকারের টিকের আগুন নিভে গেছে। সেখানটা টীকায় একেবারে বাদ। কাজের মধ্যে একটি কাজ তিনি করেছেন রত্নাকরের যুগে যেসব রাগের অপ্রচলিত বোধে বর্ণনা দেওয়া হয়নি সেগুলি উদ্ধার করে দিয়েছেন। কাজ তাতে খুব বেশি এগোয় নি। সংস্কৃত ভাষায় দার্শনিক এবং সাহিত্যিক আলো-চনার তুলনায় সংগীতালোচনা যথেষ্ট দুর্বল। অন্তত আজ পর্যন্ত এ ধারণা পাল্টে যাবার মতো কোন বই পাওয়া গেছে বলে জানি নে।

অবশ্য শাস্ত্রকারদেরও কিছু বিপদ ছিল। বিপদটা হ'চ্ছে এই যে, যে বিষয় নিয়ে তাঁরা লিখেছেন, তা তাঁদের অনেক আগেই লুপ্ত হ'য়ে গেছে। "জাতি" বা "গ্রামরাগ" যে কী ব্যাপার সেটা তাঁদের জানা থাকবার কথা নয়। কিন্তু সেটা স্বীকার করে এই সব সংগীত রীতির পারস্পরিক যোগাযোগের একটা সংগত ব্যাখ্যা দিতে তাঁরা চেষ্টা করেন নি। সকলেই নিজেদের অজ্ঞতা ঢাকতে চেষ্টা করেছেন এবং এই সব শব্দগুলি এবং এদের লক্ষণ অন্যান্য বই থেকে বেমালুম টুকে মেরেছেন। প্রায় ক্ষেত্রেই কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে সেটা বলা পর্যন্ত হয়নি।

অতএব এ যুগে গবেষকদের যে কী ভীষণ মুশকিলে পড়তে হয়েছে তা বলবার নয়। গ্রন্থগুলিকে পর পর সাজিয়ে নীর থেকে ক্ষীরটুকু সংগ্রহ ক'রে সাজিয়ে-গুছিয়ে ঐতিহাসিক তথ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে তবেই তাঁদের কাজ করতে হয়। তার মধ্যেও অনেকটা অনুমান থাকতে

বাধ্য। অতএব এক রাগ সংগীতের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধেই নানান মতবাদ উপস্থাপিত হয়েছে এবং এর মধ্যে আমারটিও পেশ করা গেল। বলা বাহুল্য এটিও অনুমান-খণ্ডে একটি যোজনা মাত্র।

"জাতি" কথাটা আগে বারকয়েক বলেছি, সুতরাং ওইটা থেকেই আরম্ভ করি এবং আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস জাতির খোলস থেকেই রাগের উৎপত্তি হয়েছে। অনেকে এটা অস্বীকার করেন, কিন্তু কেন করেন জানিনে, কেননা রাগ আর জাতির মধ্যে একটা সর্বাংগীণ মিল রয়েছে। দেশী সংগীতের মস্ত অথারিটি মতংগ বলছেন, সমস্ত রাগ জাতি থেকেই উদ্ভূত হয়েছে এবং এই উক্তিকে উড়িয়ে দেবার কোন কারণ নেই। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই জাতি জিনিসটা কি?

নানা কারণে আমাদের দেশে যেমন জাতিবিভাগ হয়েছে, তেমনি সংগীতের বিস্তৃতির সংগে সংগেই একটা জাতি-বিভাগের ব্যবস্থা অত্যাবশ্যক হ'য়ে পড়েছিল। সাতটি স্বরের অনেক রকম বিন্যাস হ'তে পারে এবং এই সব বিন্যাস থেকেই অলংকার, মূর্ছনার উৎপত্তি। গোড়ার দিকে অত বাঁধাবাঁধি ছিল না, কিন্তু ক্রমেই যখন সংগীতের প্রসার হ'তে লাগল, তখন বিভিন্ন লক্ষণ মিলিয়ে সুরের এক একটা

ছক তৈরি হ'ল; অর্থাৎ এই হ'ল জাতির গোড়াপত্তন। তারপর ক্রমে ক্রমে আঠার রকমের জাতি তৈরি হ'ল। এ'দের নাম-গ্লি চমৎকার, যথা—ষাড়্জী, আর্ষভী, গান্ধারী, মধ্যমা, পঞ্চমী, ধৈবতী, নৈষাদী, ষড়্জকৈশিকী, ষড়জদীচ্যবতী, ষড়জমধ্যমা, গান্ধারোদীচ্যবা, রক্তগান্ধারী, কৈশিকী, মধ্যমদীচ্যবা, কর্মারবী, গান্ধারপঞ্চমী, আন্ধ্রী এবং নন্দয়ন্তী। সবসুদ্ধ আঠারটি জাতি বহুদিন আমাদের দেশে চলে এসে-ছিল। ভরত যখন নাট্যশাস্ত্র রচনা করেন সেটা খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী বলেই পণ্ডিতেরা অনুমান করেন। এই সময় পর্যন্ত গানের ভিত্তি ছিল জাতি, তবে রাগের অভ্যুদয় ঘটতে শুরু করেছে এমন বিশ্বাস করবার কারণ আছে।

জাতি তো তৈরি হ'ল, কিন্তু লক্ষণ কি কি? লক্ষণ হ'চ্ছে দশটি—গ্রহ, অংশ, তার, মন্দ্র, ন্যাস, অপন্যাস, অল্পত্ব, বহুত্ব, ষাড়ব এবং ঔড়ব। অর্থাৎ কোথায় ধরতে হবে, কোথায় ছাড়তে হ'বে, কোন্ স্বরটার ব্যবহার বেশি হ'বে কোন্‌টার কম, কোনটায় ছয়টা স্বর কোনটায় পাঁচটা—এই সব লক্ষণ মিলিয়ে এক একটি জাতি তৈরি হ'ল। পরবর্তী যুগে ঠিক এই লক্ষণগুলিই রাগের ওপর অর্পিত হয়েছে। অতএব রাগ আর জাতির সম্বন্ধ অতিশয় নিকট একথা বলাই বাহুল্য।

এখন কথা হ'চ্ছে জাতি তো সুরের কাঠামো। গাওয়া হ'ত কি করে? এরা ছিল গানের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। ভারতের যুগে এসব গান "গান্ধর্ব" বলে পরিচিত ছিল। সুর, তাল এবং পদকে আশ্রয় ক'রে এসব গান রচিত হ'ত এবং এই সব গানের সুরের অংশটি জাতির মাধ্যমে প্রকাশ পেত। এই গানগুলির আখ্যা ছিল, "গীতি"! সেকালের গান, কিন্তু অত্যন্ত ধরাবাঁধা ছিল, তার প্রত্যেকটি লক্ষণ সুনির্দিষ্ট। কোন গানে কটি চরণ, কি কি সুর লাগবে, কোথায় ধরতে হ'বে কোথায় ছাড়তে হ'বে, কি কি মূর্ছনা—সমস্তই ছিল ধরাবাঁধা। এতটুকু নড়চড় হবার উপায় নেই, প্রত্যেকটি গতি সুনির্দিষ্ট।

এই গীতিগুলি কি কি? খ্রীষ্টীয় [illegible] শতকে চার রকমের গীতির উল্লেখ [illegible] যায়,—মাগধী, অর্ধমাগধী, সম্ভাবিতা আর পৃথুলা। এর সঙ্গে ছিল নানা রকমের নাট্যসংগীত যার নাম "ধ্রুবা"।

এর থেকে প্রমাণিত হ'চ্ছে যে মগধের সংগীত সংস্কৃতিই সে যুগে বিশেষ বিখ্যাত ছিল। এইটিই ছিল শ্রেষ্ঠ গীত-রূপ। তারপর এটা ভেঙে অর্ধমাগধীয় উৎপত্তি হ'ল এবং ক্রমে বৈচিত্র্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আর সে দেশগত আখ্যায় সীমাবদ্ধ রইল না, সংগীতের রীতি অনুযায়ী তার নাম হ'ল সম্ভাবিতা আর পৃথুলা। তবে এই চারটিই মাগধী গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই সব গানের উদাহরণ বহু পরবর্তীকালে শার্ঙ্গদেব সংগীতরত্নাকরে খুঁজে পেতে এনে সন্নিবেশিত করেছেন।

ভরত একবার মাত্র এ'দের উল্লেখ করে ছেড়ে দিয়েছেন, তার কারণ এ'রা নাটকে ব্যবহৃত হলেও নাট্যসংগীত ধ্রুবার মত নাটকের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত ছিল না। কিন্তু এ'দেরও ব্যবহার নাটকে ছিল এবং এই সময় থেকেই নাট্যের মাধ্যমেই আমাদের রাগসংগীত বিকশিত হয়ে উঠেছে। এটা অনুমান নয় পরবর্তীকালের শাস্ত্রীয় উল্লেখ থেকে এটা স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, রাগসংগীত নাটকের মাধ্যমেই পরিপুষ্ট হয়েছে।

ক্রমে আঠারটি জাতিতেও কুলিয়ে উঠলো না। বহুতর জাতির সঙ্গে আমাদের মিশ্রণ ঘটল, তাদের অনেক জিনিস আমরা আত্মসাৎ করতে লাগলুম। দ্রুতগতিতে সংগীতের সম্প্রসারণ ঘটতে লাগল। ফলে আস্তে আস্তে জাতিগুলির জাত যেতে লাগল এবং জাতিচ্যুত গায়নপদ্ধতিগুলি রাগের অন্তর্ভুক্ত হয়ে তাদের যুগোপযোগী রূপ প্রদান করতে লাগল। এই পরিবর্তনটা যখন বেশ কিছু অগ্রসর হয়েছে তখনকার একটি গ্রন্থ থেকে আমরা এই পরি-বর্তনের ব্যাপারটা খানিকটা আন্দাজ করতে পারি। এই গ্রন্থটির নাম "বৃহদ্দেশী"। এই সময়ে রাগসংগীতে "ভাষা" রাগের প্রাধান্য চলেছে।

বৃহদ্দেশী যিনি লিখেছেন তাঁর নাম মতঙ্গ। তিনি প্রধানত রাগসংগীত নিয়েই আলোচনা করেছেন, কিন্তু রাগের উৎপত্তি সম্বন্ধে কিছুই বুঝিয়ে বলেন নি। বস্তুত পরবর্তীকালে রত্নাকরে বর্ণনা স্পষ্ট না হ'লে [illegible] আমাদের বেশ বেগ পেতে হ'ত। তিনি বলেছেন স্বরবর্ণবিশেষে বা ধ্বনিভেদে যা রঞ্জন করে তাই রাগ। কিন্তু একই অর্থ বোঝাতে রাগ ছাড়া অন্য একটা নামও হ'তে পারত। "জাতি" কথাটা উঠেই বা গেল কেন সেসব ব্যাপারও তিনি কিছুই লেখেননি। তবে তিনি স্পষ্টভাষায় একথা বলেছেন যে, উক্ত দশলক্ষণযুক্ত গীতের

নামই রাগ এবং এই সব গীতিগুলি নাটকের পূর্বরঙ্গ, প্রস্তাবনা, গর্ভসন্ধি প্রভৃতিতে প্রযুক্ত হ'ত।

এই সময় যে গীতিগুলিকে আশ্রয় করে রাগসংগীত বিস্তৃত হচ্ছিল সেগুলি আর মাগধী-অর্ধমাগধী নয়, অনেক পরিবর্তনের ফলে সেগুলি তাদের রূপ অনুযায়ী আখ্যা পেয়েছিল। গীতিগুলি হচ্ছে শুদ্ধা, ভিন্না, গৌড়ী, বেসরা বা রাগগীতি, সাধারণী, ভাষা এবং বিভাষা।

শুদ্ধা গীতি ছিল সরল এবং অবক্র। এই গানে সুকুমার স্বরের প্রয়োগ হ'ত এবং এর প্রধান বৈশিষ্ট্য লালিত্য। ভিন্নাগীতি ছিল কিছুটা বিকৃত, তবে সূক্ষ্ম, মধুর এবং গমকযুক্ত। গৌড়ীগীতি ছিল প্রখর, এতে গমকের বাহুল্য ছিল। বেসরাগীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল আবেগের প্রাবল্য। বেসরাগীতির আর একটি নাম রাগগীতি। এর কারণ হ'ল গানক্রিয়ায় ব্যবহৃত স্থায়ী, আরোহী, অবরোহী এবং সঞ্চারী, এই চারটি বর্ণের সমান প্রয়োগ এই-জাতীয় গানে দেখা যেত। শুদ্ধা, ভিন্না, গৌড়ী এবং বেসরা এই চার রকমের গীতির নানা লক্ষণ মিশ্রিত যে সংগীত প্রচলিত ছিল তার নাম সাধারণী।

এই সব গীতিতে যে সুর প্রযুক্ত হ'ত, যেভাবে এসব গান গাওয়া হ'ত, মূলত তাতে জাতিগায়নপদ্ধতি অবলম্বিত হলেও তার নিজস্ব একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। এই বৈশিষ্ট্য অনুসারেই এই সব সুরের নাম হ'ল "গ্রামরাগ"। ষড়জ এবং মধ্যমগ্রামকে অবলম্বন করার জন্যই এই নামকরণ হয়েছে। কিভাবে এই উৎপত্তি হয়েছে সেটি এইভাবে সাজিয়ে দিলে স্পষ্ট বোঝা যাবে।

গ্রামরাগ—শুদ্ধসাধারিত
গীতি — শুদ্ধা
গ্রাম — ষড়জ
জাতি — ষড়জমধ্যমা
বিনিয়োগ — গর্ভসন্ধি
রস — বীর, রৌদ্র

এই বর্ণনা থেকে এটা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে রাগসংগীত বিশেষভাবে নাট্যে ব্যবহৃত হ'ত এবং নাট্যসংগীতই প্রধানত নাম এবং বর্ণনা অন্যান্য গ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করে দিয়েছেন। এখন এই গ্রামরাগের মধ্যে দু'টি নামই আমাদের পরিচিত—একটি হিন্দোল, অপরটি ককুভ।

ক্রমে এই পাঁচটি গীতিতেও নানা মিশ্রণ সংঘটিত হ'ল এবং আরও তিনটি গীতির সৃষ্টি হ'ল—ভাষা, বিভাষা এবং অন্তরভাষা। বলা বাহুল্য, এই ভাষাগীতি দেশ বিদেশের নানা জাতির ভাষা থেকেই সৃষ্ট হয়েছে। শাস্ত্রকারেরা বলেন, গ্রামরাগের আলাপপ্রকারই হ'ল এই ভাষা, বিভাষা এবং অন্তরভাষা রাগ। এই উক্তি থেকে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয় না। গ্রামরাগের আলাপপ্রকার অন্য শ্রেণীর রাগই বা হ'তে যাবে কেন? টীকাকারগণ এসব বোঝাননি, শাস্ত্রীয় উদ্ধৃতি করেই ছেড়ে দিয়েছেন। ভাষারাগকে মূল গ্রামরাগের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যাতে এই ধারণাই হয় যে, ভাষারাগ গ্রামরাগ থেকেই উৎপন্ন হয়েছে। এটা এইভাবে বোঝানো যায়।

রাগ সংগীতের প্রেরণা দিয়েছে। পূর্বরঙ্গ, গর্ভসন্ধি, নির্বহণ প্রভৃতিতে বিশেষভাবে গ্রামরাগের ব্যবহার ছিল। এছাড়া মৃগয়ায় প্রবৃত্ত নায়কের প্রবেশ, সূত্রধার প্রবেশ, গৃহী বা তাপসের প্রবেশ, কঞ্চুকী প্রবেশ, অরণ্যে শ্রান্ত অবস্থায় স্থিতি, পথভ্রষ্ট অবস্থায় স্থিতি—এই সব ব্যাপারেও রাগসংগীতের ব্যবহার ছিল। নাটকের নানা রসে এর প্রয়োগ তো বহুলভাবেই হ'ত।

সংগীত রত্নাকরে সবসুদ্ধ ত্রিশটি গ্রামরাগের উল্লেখ করা হয়েছে। এই [illegible]

ভাষারাগের চারটি প্রকারভেদ আছে—মূল, সংকীর্ণ, দেশজ এবং ছায়ামাত্রাশ্রয়। মূলভাষারাগের উদাহরণ একটি দুটির বেশি নেই—যেমন "মালবেসরিকা"—এটি গ্রামরাগ "টক্ক"র সঙ্গে যুক্ত। সংকীর্ণ ভাষারাগের নামগুলি সুন্দর—যেমন, "রবিচন্দ্রিকা", "কোলাহলী", "আদাবেসরী" ইত্যাদি। দেশজ ভাষারাগের সংখ্যা সাধারণতই বেশি। কেননা বলতে গেলে দেশজ রাগই আসল ভাষারাগ। এর উদাহরণ হ'ল—"গুর্জরী", "সৌরাষ্ট্রী", "[illegible]", "গৌরালী", "হর্ষপুরী", "[illegible]" ইত্যাদি।

এইসব মিলে মিশে তারও পরবর্তী-কালে উদ্ভূত হ'ল "রাগাঙ্গ", "ভাষাঙ্গ" এবং "ক্রিয়াঙ্গ" রাগ। শার্ঙ্গদেবের সময়েও এই রাগসংগীতের প্রচলন ছিল। এছাড়া কয়েকটি সুর ছিল যাদের বলা হ'ত উপরাগ এবং রাগ। এগুলির মূলও গীতি এবং গ্রামরাগ বলে নির্দেশ করা হয়েছে। রত্নাকরে অধুনাপ্রসিদ্ধ রাগাঙ্গগুলির বর্ণনা পড়লে স্পষ্টই বোঝা যায়, এইসব রাগসংগীতও নাট্য-সংগীতের অন্তর্ভুক্ত ছিল। একটি রত্নাকরোল্লিখিত রাগাঙ্গের ছক সামনে রাখলে ব্যাপারটা বুঝতে সুবিধে হবে।

রাগাঙ্গ—মধ্যমাদি

গীতি—শুদ্ধা
গ্রামরাগ—মধ্যমগ্রাম
গ্রাম—মধ্যম
জাতি—গান্ধারী-মধ্যমা-পঞ্চমী
বিনিয়োগ—মুখসন্ধি
রস—হাস্য, শৃঙ্গার
কাল—গ্রীষ্মদিবস

গীতি, গ্রামরাগ, জাতির উল্লেখ থাকলেও তার যে বিশেষ সার্থকতা ছিল এমন নয়, কেননা এগুলি তখন কারুর জানা থাকবার কথা নয়, তথাপি পণ্ডিতেরা ঠিকুজি কোষ্ঠী মিলিয়ে রেখেছেন। এইসব রাগাঙ্গ বিবিধ নাট্যসন্ধি, পূর্ব-রঙ্গ, সূত্রধার প্রবেশ প্রভৃতিতে প্রযুক্ত হ'ত। তবে কথা উঠতে পারে, হয়তো এসবও ছিল না; পণ্ডিতেরা যেহেতু মূলগ্রামরাগের সঙ্গে এদের সম্বন্ধ নির্ণয় করেছেন সেহেতু গ্রামরাগের রীতি অনুসারে একটা নাট্যবিনিয়োগও উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সেটি বিশ্বাস হয় না কেননা রাগসংগীতে একটা নাট্যগত tradition ছিল এবং সেটা বরাবরই চলে এসেছিল বলেই মনে হয়।

এর সঙ্গে ছিল ভাষাঙ্গ এবং ক্রিয়াঙ্গ রাগ। ক্রিয়াঙ্গ রাগগুলি বিবিধ ক্রিয়া-কর্মে প্রযুক্ত হ'ত। যেমন "রামকৃ" যেটি আজকাল "রামকেলি" নামে পরিচিত, সেটি রামের পুজো বা রামায়ণগানাদিতে ব্যবহৃত হ'ত। এইরকম অনেক "কৃতি" রাগ সেকালে প্রচলিত ছিল।

এইভাবে ক্রমাগত মিশ্রণ চলতে চলতে [illegible] মিশ্রিত হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত রাশি রাশি রাগ। পূর্বোল্লিখিত গীতিগুলির বদলে বিভিন্ন প্রবন্ধসংগীতের অভ্যুত্থান হ'ল, ক্রমে তাদের পরিচয়ও লুপ্ত হয়েছে। বর্তমানে রাগ-সংগীত আশ্রয় করে আছে ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরি এইসব প্রবন্ধকে। যথানিয়মে রাগসমূহের গোষ্ঠীবন্ধন আবশ্যক হয়েছিল এবং তার ফলেই বর্তমান ঠাট-মেল পদ্ধতি স্বীকৃত হয়েছে।

এইটুকুই হচ্ছে রাগসংগীতের ভূমিকা।

ডাক্তারের ডায়েরী

—ডাঃ আনন্দকিশোর মুন্সী

॥ ১৩ ॥

ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী চেম্বারলীন সাহেব যেবার স্বস্তিকা মার্কা জার্মান প্লেনে চড়ে মিউনিকে গিয়ে হিটলারের দাবী মেনে চেকোশ্লোভাকিয়াকে দুভাগ করে ছাতা হাতে মুখটি চুন করে দেশে ফিরে এলেন, সেবার আমার চারতলা বাড়ির একখানা ঘরের জন্য একটি ছেলে এল। এম-এ পাশ করেছে। ল' ফাইনাল পরীক্ষা দেবে। নিরিবিলি থাকতে চায়। পরীক্ষার পড়া তৈরী করবে। তারপর চাকরির চেষ্টা। বুঝলাম বেশ কিছুদিন থাকবে।

চেহারা দেখেই ছেলেটিকে যেন একটু ক্ল্যাসিক মনে হল। লম্বা রোগা ছিপছিপে গড়ন। মাথায় একরাশ চুল। চোখে চশমা। নাম ক্ষিতীন হালদার।

ক্ষিতীন বলল—সিংগল সিটেড ঘর যদি থাকে তাই একটা দিন।

দোতলায় একখানা ঘর খালি ছিল তাই ক্ষিতীন পছন্দ করল। বাক্স-বিছানা নিয়ে এসে পড়াশুনোয় ডুবে গেল। কারু সংগে বড় একটা মিশত না। নিজের ঘরে সারাদিন দরজা বন্ধ করে লেখাপড়া নিয়েই থাকত।

মাসখানেক পর ওর পরীক্ষা হয়ে গেল। তখনও দেখতাম ও কারু সঙ্গে মেশে না। সারাদিন কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়ায়। ঘরে ফিরলেই আগের মত দরজা বন্ধ করে দিত। হঠাৎ কখনও মুখোমুখি দেখা হলে একটু শুধু হাসত। কখনও-সখনও হয়ত দুটি একটি কথা বলত।

একদিন রাত দশটায় আমার বসবার ঘর বন্ধ করে ওপরে উঠব ভাবছি, এমনি সময় ক্ষিতীন হঠাৎ এসে ঘরে ঢুকল। উসকো-খুসকো চুল। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। চোখ দুটো গর্তে ঢুকে গেছে। মুখ শুকনো।

জিজ্ঞাসা করলাম—কি ব্যাপার? অসুখবিসুখ কিছু হল নাকি?

ক্ষিতীন বলল—না অসুখ কিছু হয় নি। কিন্তু ভারি বিপদে পড়েছি। আমাকে একটু সায়নাইড জোগাড় করে দিতে পারেন?

শুনে হঠাৎ চমকে উঠলাম। অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। বিস্ময়ের ঘোর কাটলে জিজ্ঞাসা করলাম—কেন? সায়নাইড দিয়ে কি হবে?

দুহাতে আমার টেবিলের কোণটা শক্ত করে ধরে আমার দিকে ঝুঁকে ক্ষিতীন বলল—খাব। পারবেন এনে দিতে?

ওর চোখের দিকে তাকিয়ে মনে হল ও ঠিক যেন প্রকৃতিস্থ নয়। কিন্তু মদ খেয়ে মাতাল হয় নি। যেভাবে ঝুঁকে কথা বলছে মদ খেলে ঠিক গন্ধ পেতাম।

বললাম—কিন্তু কেন সায়নাইড খাবেন?

ক্ষিতীন বলল—শুনেছি সায়নাইড খেলে খুব তাড়াতাড়ি মৃত্যু হয়। মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করতে হয় না। তাই নয় কি?

বললাম—খুব দ্রুত মৃত্যু হয় তা ঠিক। কিন্তু মৃত্যুযন্ত্রণা হয় না, তা ঠিক নয়। মরবার আগে যন্ত্রণা ঠিকই হয় এবং সে অতি-সাংঘাতিক। সাপের বিষের চেয়েও কষ্টকর।

শুনে ক্ষিতীন আরও যেন মুষড়ে পড়ল। বলল—তাহলে কি খাব?

বললাম—সে হবে পরে। আপাতত ঐ চেয়ারটায় বসে পড়ুন দেখি। তারপর শুনি কি ব্যাপার। মরবার হঠাৎ দরকার হল কেন?

চেয়ারে বসে নিজের চোয়াল দুটো দুহাতে ধরে কনুই দিয়ে টেবিলে ভর করে ক্ষিতীন বলল—পুরুষত্বই যার নষ্ট হয়ে গেছে, বেঁচে থেকে তার কী হবে? ক্লীব হয়ে অসমর্থ হয়ে আপনি আমাকে বেঁচে থাকতে বলেন?

বললাম—তা বলি না। কিন্তু এজন্য প্রাণনাশের প্রয়োজনটা কি? চিকিৎসা করালেই তো সেরে যায়।

ক্ষিতীন বলল—চিকিৎসায় কিছু হয় না। বিজ্ঞাপন দেখে দেখে অনেক টাকার অষুধ খেয়ে অনেকরকম প্রক্রিয়া করে দেখেছি কিছু হয় না। বুঝেচি এ আর সারবে না। তাই খুব তাড়াতাড়ি যাতে মৃত্যু হয় অথচ কষ্ট হয় না, এমনি একটা অষুধ চাই। দেবেন একটা কিছু দয়া করে?

বললাম—অষুধ আমি দিচ্ছি। কিন্তু তাতে মৃত্যু হবে না। ঘুম হবে। কাল সকালে আপনাকে পরীক্ষা করে যদি প্রয়োজন হয় বড় চিকিৎসক একজন দেখিয়ে কি করা উচিত সব ব্যবস্থা করে দেব।

ক্ষিতীন বলল—সত্যি এর চিকিৎসা আছে?

বললাম—নিশ্চয়ই আছে। এখন এই বড়িটা খেয়ে নিন দেখি। কাল সকালে আবার কথা হবে।

ব্যাগ থেকে একটা ঘুমের অষুধ ক্ষিতীনকে দিয়ে ওপরে উঠে এলাম। পরদিন সকালে ক্ষিতীনকে পরীক্ষা করে মনে হল ওর দেহে কোন রোগ নেই। আসলে রোগটা মনের। তখনকার দিনে মনের রোগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক আজকালকার মত এত বেশী ছিল না। যৌন-ব্যাধির বিশেষজ্ঞরাই এইসব রোগের চিকিৎসা করতেন। তাঁদেরই একজনের কাছে ক্ষিতীনকে নিয়ে গেলাম।

তিনি ক্ষিতীনকে পরীক্ষা করে আমাকে ভিতরের ঘরে আড়ালে ডেকে নিয়ে বললেন—লেখাপড়া জানা এই বয়সের ছেলেদের এইসব রোগ বেশীরভাগই কল্পনা থেকে হয়। অজানা ভয় আর আতঙ্ক থেকে নিজেকে অসমর্থ মনে করে। এ রকম কেস আমি অনেক সারিয়েছি। কিন্তু ২।১ দিনে কিছু হবে না। মাসখানেকের মধ্যেই ঠিক হয়ে যাবে মনে হয়। যতদিন আসতে বলব রুগী ঠিক আসবে তো?

ক্ষিতীনকে সে কথা বলতে তক্ষুনি রাজী হয়ে গেল।

বলল—এক মাস কেন, তিন মাস পর্যন্ত আমি দেখতে রাজী আছি।

আমার কাছ থেকে সেকথা শুনে বিশেষজ্ঞ বললেন—তাহলে ও ঠিক সেরে উঠবে। ঘুমের অষুধ ছাড়া অন্য কোন অষুধ দেবার দরকার হবে না। ওকে আস্তে আস্তে বুঝিয়ে ওর আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে হবে। শেষে দরকার হলে ২।১ দিন একটু মৃদু ইলেক্‌ট্রিক শক দেব। তাইতেই কন্‌ফিডেন্স ফিরে আসবে।

ক্ষিতীনকে ডেকে সেদিনকার মত একটা অষুধ দিয়ে পরদিন আবার যেতে বললেন।

সাতদিনের মধ্যেই ক্ষিতীনের বেশ পরিবর্তন দেখা গেল। চোখেমুখে খুশি ফুটে উঠল। চলায়, কথায় মনের ফূর্তি ছড়িয়ে পড়ল।

মাসখানেক পর একদিন বলল—ডাক্তারবাবু, আমি সত্যি একেবারে সেরে গেছি। হেসে বললাম—সায়নাইডের আর দরকার হবে না তো?

ক্ষিতীন লজ্জা পেল। হেসে বলল—সত্যি তখন পাগলই হয়ে গিয়েছিলাম। ভাগ্যি আপনি ছিলেন। নইলে কী যে হঠাৎ করে বসতাম!

তারপর অনেকদিন ক্ষিতীনের সঙ্গে দেখা হোল না। একটা টাইফয়েড রুগী নিয়ে মাসখানেক আমি আটকে গেলাম। যখন বাড়ি ফিরতাম, তখন হয় ও বাইরে থাকত, নয় ওর ঘর বন্ধ দেখতাম।

মাস দেড়েক পর রুগীটি ভাল হয়ে উঠলে আবার একটু ফুরসত পেলাম। একদিন সন্ধ্যের সময় বসে কি একটা কাগজ পড়ছি, ক্ষিতীন হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকল। দুই হাতে মুখ ঢেকে চেয়ারে বসে পড়ল।

কাগজ রেখে ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—কি হল?

মুখ থেকে হাত সরিয়ে ক্ষিতীন বলল—সর্বনাশ হয়ে গেছে। আর বেঁচে কি হবে? হয় সায়নাইড নয় অন্য কিছু যা হোক একটা দিন। এ লজ্জা আর আমি সইতে পারি না।

আশ্চর্য হয়ে বললাম—সে কি? এই তো সেদিন বললেন, একেবারে সেরে গেছেন?

ক্ষিতীন বলল—সেরে তো গেছিই। কিন্তু অন্য এক মুশকিলে পড়েছি।

জিজ্ঞাসা করলাম—মুশকিলটা কি?

ক্ষিতীন বলল—কাঞ্চন আমার মামাত বোন। বি-এ পাশ করে একটা স্কুলের টিচার। ওর সঙ্গে যেভাবে আমি মিশেছি, তাতে দুজনেরই এখন বিষ খাওয়া ছাড়া অন্য উপায় নেই।

বললাম—তা কেন? বিয়ে করলেই তো গোলমাল মিটে যায়। বিয়েটা কি দুজনের বিষ খাওয়ার চেয়েও খুব শক্ত?

ক্ষিতীন বলল—বিয়ে তো করবই ঠিক ছিল। ভেবেছিলাম, নিজে উপার্জন শুরু করলেই বিয়ে করব। কিন্তু সব ভেস্তে গেল।

জিজ্ঞাসা করলাম—মেয়েটির বিয়ে আর কোথাও ঠিক হয়েছে নাকি?

মাথা নেড়ে ক্ষিতীন বলল—না।

আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—তাহলে?

ক্ষিতীন একটু ইতস্তত করে খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে অবশেষে চোখ নিচু করে বলল—ওর সন্তান-সম্ভাবনা হয়েছে।

ডাক্তারের ডায়েরী

—ডাঃ আনন্দকিশোর মুন্সী

॥ ১৩ ॥

ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী চেম্বারলীন সাহেব যেবার স্বস্তিকা মার্কা জার্মান প্লেনে চড়ে মিউনিকে গিয়ে হিটলারের দাবী মেনে চেকোশ্লোভাকিয়াকে দ্বভাগ করে ছাতা হাতে ম্বখটি চুন করে দেশে ফিরে এলেন, সেবার আমার চারতলা বাড়ির একখানা ঘরের জন্য একটি ছেলে এল। এম-এ পাশ করেছে। ল' ফাইনাল পরীক্ষা দেবে। নিরিবিলি থাকতে চায়। পরীক্ষার পড়া তৈরী করবে। তারপর চাকরির চেষ্টা। ব্বঝলাম বেশ কিছ্বদিন থাকবে।

চেহারা দেখেই ছেলেটিকে যেন একট্ব লাজ্বক মনে হল। লম্বা রোগা ছিপছিপে গড়ন। মাথায় একরাশ চুল। চোখে চশমা। নাম ক্ষিতীন হালদার।

ক্ষিতীন বলল—সিংগ্বল সিটেড ঘর যদি থাকে তাই একটা দিন।

দোতলায় একখানা ঘর খালি ছিল তাই ক্ষিতীন পছন্দ করল। বাক্স-বিছানা নিয়ে এসে পড়াশ্বনায় ডুবে গেল। কার্ব সঙ্গে বড় একটা মিশত না। নিজের ঘরে সারাদিন দরজা বন্ধ করে লেখাপড়া নিয়েই থাকত।

মাসখানেক পর ওর পরীক্ষা হয়ে গেল। তখনও দেখতাম ও কার্ব সঙ্গে মেশে না। সারাদিন কোথায় কোথায় ঘ্বরে বেড়ায়। ঘরে ফিরলেই আগের মত দরজা বন্ধ করে দিত। হঠাৎ কখনও ম্বখোম্বখি দেখা হলে একট্ব শ্বধ্ব [illegible]। কখনও-সখনও হয়ত দ্বটি [illegible] কথা [illegible]।

[illegible]

জিজ্ঞাসা করলাম—কি ব্যাপার? অস্বখবিস্বখ কিছ্ব হল নাকি?

ক্ষিতীন বলল—না অস্বখ কিছ্ব হয় নি। কিন্তু ভারি বিপদে পড়েছি। আমাকে একট্ব সায়নাইড জোগাড় করে দিতে পারেন?

শ্বনে হঠাৎ চমকে উঠলাম। অবাক হয়ে ওর ম্বখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। বিস্ময়ের ঘোর কাটলে জিজ্ঞাসা করলাম—কেন? সায়নাইড দিয়ে কি হবে?

দ্বহাতে আমার টেবিলের কোণটা শক্ত করে ধরে আমার দিকে ঝ্বঁকে ক্ষিতীন বলল—খাব। পারবেন এনে দিতে?

ওর চোখের দিকে তাকিয়ে মনে হল ও ঠিক যেন প্রকৃতিস্থ নয়। কিন্তু মদ খেয়ে মাতাল হয় নি। যেভাবে ঝ্বঁকে কথা বলছে মদ খেলে ঠিক গন্ধ পেতাম।

বললাম—কিন্তু কেন সায়নাইড খাবেন?

ক্ষিতীন বলল—শ্বনেছি সায়নাইড খেলে খ্বব তাড়াতাড়ি ম্বত্যু হয়। ম্বত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করতে হয় না। তাই নয় কি?

বললাম—খ্বব দ্রুত ম্বত্যু হয় তা ঠিক। কিন্তু ম্বত্যুযন্ত্রণা হয় না, তা ঠিক নয়। মরবার আগে যন্ত্রণা ঠিকই হয় এবং সে অতি-সাংঘাতিক। সাপের বিষের চেয়েও কষ্টকর।

শ্বনে ক্ষিতীন আরও যেন ম্বষড়ে পড়ল। বলল—তাহলে কি খাব?

বললাম—সে হবে পরে। আপাতত ঐ চেয়ারটায় বসে পড়্বন দেখি। তারপর শ্বনি কি ব্যাপার। মরবার হঠাৎ দরকার হল কেন?

[illegible]

বললাম—তা বলি না। কিন্তু এজন্য প্রাণনাশের প্রয়োজনটা কি? চিকিৎসা করালেই তো সেরে যায়।

ক্ষিতীন বলল—চিকিৎসায় কিচ্ছ্ব হয় না। বিজ্ঞাপন দেখে দেখে অনেক টাকার অষ্বধ খেয়ে অনেকরকম প্রক্রিয়া করে দেখেছি কিছ্ব হয় না। ব্বঝেছি এ আর সারবে না। তাই খ্বব তাড়াতাড়ি যাতে ম্বত্যু হয় অথচ কষ্ট হয় না, এমনি একটা অষ্বধ চাই। দেবেন একটা কিছ্ব দয়া করে?

বললাম—অষ্বধ আমি দিচ্ছি। কিন্তু তাতে ম্বত্যু হবে না। ঘ্বম হবে। কাল সকালে আপনাকে পরীক্ষা করে যদি প্রয়োজন হয় বড় চিকিৎসক একজন দেখিয়ে কি করা উচিত সব ব্যবস্থা করে দেব।

ক্ষিতীন বলল—সত্যি এর চিকিৎসা আছে?

বললাম—নিশ্চয়ই আছে। এখন এই বড়িটা খেয়ে নিন দেখি। কাল সকালে আবার কথা হবে।

ব্যাগ থেকে একটা ঘ্বমের অষ্বধ ক্ষিতীনকে দিয়ে ওপরে উঠে এলাম। পরদিন সকালে ক্ষিতীনকে পরীক্ষা করে মনে হল ওর দেহে কোন রোগ নেই। আসলে রোগটা মনের। তখনকার দিনে মনের রোগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক আজ-কালকার মত এত বেশী ছিল না। যৌন-ব্যাধির বিশেষজ্ঞরাই এইসব রোগের চিকিৎসা করতেন। তাঁদেরই একজনের কাছে ক্ষিতীনকে নিয়ে গেলাম।

তিনি ক্ষিতীনকে পরীক্ষা করে আমাকে ভিতরের ঘরে আড়ালে ডেকে নিয়ে বললেন—লেখাপড়া জানা এই বয়সের ছেলেদের এইসব রোগ বেশীর-ভাগই কল্পনা থেকে হয়। অজানা ভয় আর আতঙ্ক থেকে নিজেকে অসমর্থ মনে করে। এ রকম কেস আমি অনেক সারিয়েছি। কিন্তু ২।১ দিনে কিছু হবে না। মাসখানেকের মধ্যেই ঠিক হয়ে যাবে মনে হয়। যতদিন আসবে [illegible] র্বগী ঠিক আসবে তো?

ক্ষিতীনকে সে কথা বলতে তৎক্ষণাৎ রাজী হয়ে গেল।

বলল—এক মাস কেন, তিন মাস [illegible] আমি দেখতে রাজী আছি।

আমার কাছ থেকে সেকথা শুনে বিশেষজ্ঞ বললেন—তাহলে ও ঠিক সেরে উঠবে। ঘুমের অষুধ ছাড়া অন্য কোন অষুধ দেবার দরকার হবে না। ওকে আস্তে আস্তে বুঝিয়ে ওর আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে হবে। শেষে দরকার হলে ২।১ দিন একটু মৃদু ইলেক্‌ট্রিক শক দেব। তাইতেই কন্‌ফিডেন্স ফিরে আসবে।

ক্ষিতীনকে ডেকে সেদিনকার মত একটা অষুধ দিয়ে পরদিন আবার যেতে বললেন।

সাতদিনের মধ্যেই ক্ষিতীনের বেশ পরিবর্তন দেখা গেল। চোখেমুখে খুশি ফুটে উঠল। চলায়, কথায় মনের ফূর্তি ছড়িয়ে পড়ল।

মাসখানেক পর একদিন বলল—ডাক্তারবাবু, আমি সত্যি একেবারে সেরে গেছি। হেসে বললাম—সায়নাইডের আর দরকার হবে না তো?

ক্ষিতীন লজ্জা পেল। হেসে বলল—সত্যি তখন পাগলই হয়ে গিয়েছিলাম। ভাগ্যি আপনি ছিলেন। নইলে কী যে হঠাৎ করে বসতাম!

তারপর অনেকদিন ক্ষিতীনের সঙ্গে দেখা হোল না। একটা টাইফয়েড রুগী নিয়ে মাসখানেক আমি আটকে গেলাম। যখন বাড়ি ফিরতাম, তখন হয় ও বাইরে থাকত, নয় ওর ঘর বন্ধ দেখতাম।

মাস দেড়েক পর রুগীটি ভাল হয়ে উঠলে আবার একটু ফুরসত পেলাম। একদিন সন্ধ্যের সময় বসে কি একটা কাগজ পড়ছি, ক্ষিতীন হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকল। দুই হাতে মুখ ঢেকে চেয়ারে বসে পড়ল।

কাগজ রেখে ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—কি হল?

মুখ থেকে হাত সরিয়ে ক্ষিতীন বলল—সর্বনাশ হয়ে গেছে। আর বেঁচে কি হবে? হয় সায়নাইড নয় অন্য কিছু যা হোক একটা দিন। এ লজ্জা আর আমি সইতে পারি না।

আশ্চর্য হয়ে বললাম—সে কি? এই সেদিন বললেন, একেবারে সেরে গেছেন?

ক্ষিতীন বলল—সেরে তো গেছিই। [illegible] এক মুশকিলে [illegible]।

জিজ্ঞাসা করলাম—মুশকিলটা কি?

ক্ষিতীন বলল—কাঞ্চন আমার মামাত বোন। বি-এ পাশ করে একটা স্কুলের টিচার। ওর সঙ্গে যেভাবে আমি মিশেছি, তাতে দুজনেরই এখন বিষ খাওয়া ছাড়া অন্য উপায় নেই।

বললাম—তা কেন? বিয়ে করলেই তো গোলমাল মিটে যায়। বিয়েটা কি দুজনের বিষ খাওয়ার চেয়েও খুব শক্ত?

ক্ষিতীন বলল—বিয়ে তো করবই ঠিক ছিল। ভেবেছিলাম, নিজে উপার্জন শুরু করলেই বিয়ে করব। কিন্তু সব ভেস্তে গেল।

জিজ্ঞাসা করলাম—মেয়েটির বিয়ে আর কোথাও ঠিক হয়েছে নাকি?

মাথা নেড়ে ক্ষিতীন বলল—না।

আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—তাহলে?

ক্ষিতীন একটু ইতস্তত করে খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে অবশেষে চোখ নিচু করে বলল—ওর সন্তান-সম্ভাবনা হয়েছে।

এইবার বুঝলাম। বললাম—বিয়েটা তাহলে এক্ষুনি করে ফেলেন না কেন?

ক্ষিতীন বলল—তা হয় না। আমি নিজে রোজগার করি না। দাদিকেই বাড়ির মতে বিয়ে করতে হবে। এক্ষুনি জানাজানি হয়ে গেলে ভীষণ কান্ড হবে।

বললাম—বেপরোয়াভাবে তাহলে এতটা এগুলেন কেন? জন্ম-নিরোধের ব্যবস্থাটা অন্তত নেওয়া উচিত ছিল না কি?

ক্ষিতীন বলল—সেইটেই দেখছি সবচেয়ে বড় ভুল হয়ে গেছে। কিন্তু কি করব আপনার সেই বিশেষজ্ঞ ডাক্তারবাবুই তো বারণ করেছেন।

শুনে অবাক হয়ে গেলাম। ওর কথা বিশ্বাস হল না।

বললাম—কি বলেছেন তিনি?

ক্ষিতীন বলল—তিনি বলেছেন, কখনও যেন জন্ম-নিরোধের ব্যবস্থা না নিই। নিলে আবার এ রোগ হতে পারে।

ওর কথা শুনে ভারী কৌতুক বোধ হল। নিজের অপরাধ কেমন অনায়াসে ডাক্তারের ঘাড়ে চাপিয়ে দিল।

বললাম—উনি কি করে বুঝবেন, আপনি এমন কান্ড করে বসবেন?

ক্ষিতীন বলল—কিন্তু এখন কি করি বলুন তো? সায়নাইড ছাড়া অন্য কি অষুধ খাওয়া যায়, বলুন দেখি।

ওর অবস্থা দেখে হাসি পেল। কিন্তু গম্ভীর মুখেই বললাম—উপায় একটা হবেই। আপাতত এই অষুধটা খেয়ে ফেলুন দেখি। তারপর কাল সব ঠিক করা যাবে। আমিও একটু ভেবে দেখি।

চাকরকে ডেকে এক গ্লাস জল আনিয়ে ক্ষিতীনকে ঘুমের অষুধ খাইয়ে ওপরে উঠে এলাম পরদিন সকালে বেরুবার সময় দেখি ক্ষিতীন খুব ঘুমুচ্ছে। দিনে-রাতে রোজ যে দরজা বন্ধ করে শোয়, কাল সে দরজায় খিল দিতে ভুলে গেছে। দুপুরে বাড়ি ফিরে দেখলাম ক্ষিতীনের ঘর খোলা। সিঁড়ি দিয়ে উঠতেই আমাকে দেখে ওর ঘরে ডাকল।

গিয়ে দেখি এক রাত ভাল করে ঘুমিয়েই ওর চোখ-মুখের ভাব বদলে গেছে। দাড়ি কামিয়ে স্নান-খাওয়া সেরে বেশ ফিটফাট হয়ে বসে আছে। ওর ঘরে আগে কখনও ঢুকিনি। তক্তাপোষের পাশে টেবিলের ওপর হাস্যময়ী তরুণীর একটি ফটো।

আমাকে ছবিটার দিকে তাকাতে দেখেই মৃদু হেসে ক্ষিতীন বলল—এই সেই কাঞ্চন। এখন বলুন দেখি কি করি?

বললাম—কিছু বলার আগে মেয়েটির সঙ্গে একটু কথা বলা দরকার। বিকেল-বেলা একবার ওঁকে নিয়ে আসুন।

শুনে ক্ষিতীন যেন সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। বলল—এইখানে? এত লোকের মধ্যে?

বললাম—তাতে কি? আমার ঘরে বসে কথা হবে। বাইরের কেউ তো থাকবে না।

ক্ষিতীন বলল—তা নয়। কিন্তু এইখানে কি ও আসবে?

বললাম—আমার কথা ভাল করে বুঝিয়ে বলবেন। নিশ্চয়ই আসবেন।

বিকেলে কাঞ্চনকে নিয়ে ক্ষিতীন এল। ২১।২২ বছরের সুন্দর মেয়েটি। বেশ ফর্সা। লম্বা দোহারা গড়ন। মুখখানি ভারী মিষ্টি। সদ্য কলেজ থেকে বেরিয়েছে। এখনও চোখে-মুখে চাকরীর ছাপ পড়ে নি। সারাদিন স্কুলের কাযের পর ঠোঁট দুটি শুধু শুকনো দেখাচ্ছে।

ক্ষিতীন পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল—ইনিই কাঞ্চন। আপনারা কথা বলুন। আমি একটু চায়ের জোগাড় করি।

কাঞ্চন বলল—তোমরা খাও। আমি খেয়ে এসেছি।

এই বলে হাত জোড় করে নমস্কার করল। আমিও চেয়ার ছেড়ে উঠে প্রতি-নমস্কার করে বললাম—বসুন।

টেবিলের ওপর ওর হাত-ব্যাগ রেখে কাঞ্চন বসল।

বললাম—কাল রাতে ক্ষিতীনবাবু সায়নাইড চেয়েছিলেন আপনাদের দুজনের জন্য। আমি একটা ঘুমের অষুধ দিয়েছিলাম। তাতেই দেখছি আজ অনেকটা প্রকৃতিস্থ হয়েছেন।

কাঞ্চন মৃদু হেসে বলল—ক্ষিতিদা ঐরকমই পাগল। কদিন ধরেই স্নান নেই, দাড়ি-গোঁফ কামানো নেই। পাগলের মত ঘুরছে। আজই হঠাৎ দেখলাম বেশ ফিটফাট।

বললাম—সবই ঐ ঘুমের অষুধের গুণ। ঘুম থেকে উঠে মাথা অনেক ঠান্ডা হয়েছে। কিন্তু আপনারা বিয়ে করছেন না কেন?

কাঞ্চন একটু গম্ভীর হয়ে গেল। বলল—এখন কি করে তা সম্ভব? বিয়ের পর থাকব কোথা? না না, এখন জানা-জানি হয়ে গেলে ভারী কেলেঙ্কারী হবে। আচ্ছা, এর কোন অষুধ নেই?

মাথা নেড়ে বললাম—না নেই।

কাঞ্চন ব্যাগ খুলে একটা শিশি বার করে আমার হাতে দিয়ে বলল—তাহলে এতে কোন কায হবে না?

দেখলাম কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে যেসব গাছগাছড়া সন্ন্যাসী-প্রদত্ত বলে বিক্রী হয় তারই একটি নমুনা।

বললাম—এসবে কিছু তো হবেই না, বরং খারাপ হবে। শেষে জানাজানি তো হবেই, হয়ত-বা প্রাণ নিয়েও টানাটানি পড়বে।

ভয়ে কাঞ্চনের মুখ শুকিয়ে গেল। বলল—ভাগ্যিস আগে ব্যবহার করি নি। তাহলে কি হবে? কোন উপায় কি নেই?

জিজ্ঞাসা করলাম—কতদিন হয়েছে?

কাঞ্চন মুখ নিচু করে বলল—মাস দেড়েক।

বললাম—একমাত্র উপায় হল অজ্ঞান করে কিউরেট করা।

কাঞ্চন জিজ্ঞাসা করল—অজ্ঞান না করে হয় না?

বললাম—না।

কাঞ্চন কি একটু ভাবল। বলল—কতক্ষণ পর জ্ঞান হবে?

বললাম—আধঘণ্টা কি এক ঘণ্টা। ৩।৪ ঘণ্টা পর বাড়ি যেতে পারবেন। সেইদিনটা একটু রেস্ট নিতে হবে। বিছানা ছেড়ে উঠতে পাবেন না।

কাঞ্চন বলল—তাহলে স্কুল থেকে ছুটি নিয়ে দু' একদিনের জন্য এক বন্ধুর বাড়ি গিয়ে থাকি। সেখান থেকেই এসব করা সুবিধে হবে।

এমনি সময় ক্ষিতীন এল। সঙ্গে চাকরের হাতে চা। কাঞ্চন নিল না।

খেতে খেতে জিজ্ঞাসা করলাম—অপারেশন হয়ে গেলেই বিয়েটা সত্যি হবে তো?

ক্ষিতীন বলল—কি অপারেশন?

সব ওকে বুঝিয়ে বললাম। শুনে ক্ষিতীনের মুখ খুশিতে জ্বল জ্বল করে উঠল। মনে হল মস্ত বড় বোঝা যেন ওর ঘাড় থেকে নেবে গেল।

বলল—নিশ্চয়। রে জি স্টা রী টা গোপনেই সেরে রাখা যাবে। পরে সুবিধে মত এক সময় বাড়িতে বললেই হবে।

একটা চিঠি লিখে ওদের একজন স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞর কাছে পাঠিয়ে দিলাম। বললাম—ইনি একজন নামকরা চিকিৎসক। পরীক্ষা করে যা দরকার সব ইনি করে দেবেন।

আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে ক্ষিতীন আর কাঞ্চন বেরিয়ে গেল।

তারপর কয়েকদিন ক্ষিতীনের সঙ্গে আর দেখা হল না। একদিন দুপুরে কাজ সেরে বাড়ি ফিরছি সিঁড়ির মুখে হঠাৎ দেখা! মুখখানা খুব খুশি খুশি।

বলল—আচ্ছা ভয় ধরিয়ে দিয়েছিলেন বটে! অজ্ঞান করতে হবে, অপারেশন করতে হবে। সেই বিশেষজ্ঞ দেখে বললেন ওসব কিচ্ছু না। একটা অষুধ খেতে দিলেন। দুদিনেই সব ঠিক হয়ে গেল।

বললাম—তাহলে তো আরো ভাল। বিয়েটা এবার হচ্ছে কবে?

শীগ্‌গীরই হবে বলে ক্ষিতীন বেরিয়ে গেল।

তারপর যখনি দেখা হত বলত শীগ্‌গীরই হবে কিন্তু বিয়ে ক্ষিতীন করল না। দেখা হলেই জিজ্ঞাসা করতাম। ক্ষিতীনও হেসে হেসেই জবাব দিত। শেষে দেখলাম হাসে না। গম্ভীর হয়ে যায়। বিরক্ত হয়। পরে দেখা হলেই মুখ ফিরিয়ে নিত। এড়িয়ে চলত।

ওর ব্যবহার দেখে তাজ্জব বনে গেলাম। দেখতাম আবার আগের মত ওর ঘরের দরজা সারাদিন বন্ধ থাকে। হঠাৎ কখনও দেখা হলেও ওর সঙ্গে কথা বলতে আর ইচ্ছে হত না। ক্ষিতীনও নিজে থেকে কোন কথা বলত না। মুখ গোমড়া করেই থাকত।

মাস কয়েক পরে একদিন বিকেল বেলা আমার বসবার ঘরে কাঞ্চন হঠাৎ এসে উপস্থিত। ক্ষিতীনের ঘর তালাবন্ধ। কোথায় যেন বেরিয়েছে এখনও ফেরে নি। আমার ঘরে ঢুকে নমস্কার করে কাঞ্চন বলল—ডাক্তারবাবু, আবার আপনার কাছে আসতে হল।

বললাম—বসুন। কি ব্যাপার বলুন তো?

কাঞ্চন বলল—ও একটা চাকরী পেয়েছে এলাহাবাদে একটা ব্যাঙ্কে। ২।৩ দিনের মধ্যেই চলে যাবে। তাই আপনার কাছে এলাম।

বললাম—তাহলে তো ভালই হোল। এইবারে বিয়ের আর বাধা কি?

কাঞ্চন চোখ ছলছল করে বলল—বাধা অনেক। বাড়ির বাধা তো আছেই সেজন্য ভয় পাই না। কিন্তু আসল বাধা ওকে নিয়েই। এখন বলছে আমাদের যা সম্পর্ক তাতে এ বিয়ে নাকি আইনত সিদ্ধ নয়। রেজিস্টারী নাকি হতে পারে না। বলছে—ফরগিভ এ্যান্ড ফরগেট। বলতে বলতেই কাঞ্চনের ঠোঁট দুটি কেঁপে উঠল। চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। ব্যাগ খুলে রুমাল বার করে কাঞ্চন চোখ নাক মুছতে লাগল।

ক্ষিতীনের যা প্রকৃতি, এ কথা শুনে একটুও অবাক হলাম না। কিছুদিন থেকে এই আশঙ্কাই মনে হচ্ছিল। ভাবছিলাম মেয়েটাকে পথে বসিয়ে ও নিশ্চয় একদিন কেটে পড়বে।

বললাম—বিয়ের জন্য আমি অনেকবার বলেছি তাই আজকাল আমাকে এড়িয়ে চলে। দেখা হলেও কথা বলে না। আমি আর কি করতে পারি বলুন দেখি?

রুমাল দিয়ে নাক মুছে কাঞ্চন বলল—পারলে একমাত্র আপনিই পারেন। তাই আপনার কাছে এসেছি।

জানতাম ক্ষিতীন আমার কোন কথাই রাখবে না। তাই কাঞ্চনের আমার ওপর এই ভরসা দেখে খুবই বিব্রত বোধ করলাম।

বললাম—কিন্তু কি করে?

চোখ নিচু করে দ্বিধাভরে কাঞ্চন বলল—আবার যাতে সন্তান নষ্ট না হয় তার ব্যবস্থা আপনিই শুধু করতে পারেন।

শুনে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।
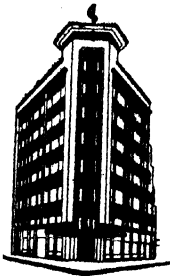
বললাম—বলেন কি- আবার?

মাথা নিচু করে দু'হাতে মুখ ঢেকে কাঞ্চন বার বার করে কেঁদে ফেলল। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে বলল—এইবার মৃত্যু ছাড়া আর আমার কোন পথ নেই।

শুনলাম কাঞ্চনকে নিয়ে ক্ষিতীন নাকি আবার সেই বিশেষজ্ঞর কাছে গিয়েছিল কিন্তু তিনি রাজী হন নি। বলেছেন আমার সঙ্গে কথা না বলে তিনি কিছুই করতে পারবেন না। তাই কাঞ্চনকে আমার কাছে ক্ষিতীন পাঠিয়েছে। নিজে আসতে সাহস পায় নি।

শুনে রাগে ঘৃণায় সর্ব শরীর যেন জ্বলে পুড়ে গেল। ছি ছি লোকটা এত ছোট? এত নীচ? দেহের শিরায় শিরায় অ্যাড্রিনালিন ছড়িয়ে গেল। দ্রুত রক্ত সঞ্চালন শুরু হল। মাথায় যেন খুন চেপে গেল। মনে মনে শপথ করলাম আজ এর প্রতিবিধান একটা করবই।

বললাম—আপনি অত অধীর হবেন না। ক্ষিতীন আসুক। একটা ব্যবস্থা আজ হবেই তা সে যেমন করেই হোক।

কাঞ্চন বলল—ও বলেছে সন্ধ্যার সময় ফিরবে।

বললাম—তাহলে আপনি ওপরে গিয়ে বসুন। আমার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করুন। ক্ষিতীন এলে আজই একটা ফয়-সলা করে দিচ্ছি।

কাঞ্চন প্রথমে একটু ইতস্তত করে পরে বলল—তাই চলুন তাহলে। এইখানে এতক্ষণ বসে থাকলে ও ঠিক চটে যাবে।

ওপরে গিয়ে কাঞ্চনের সঙ্গে আমার স্ত্রীর আলাপ করিয়ে দিলাম। দুজনেই স্কুলের টিচার। সহজেই ভাব হয়ে গেল।

সন্ধ্যাবেলা ক্ষিতীন ফিরল। লজ্জিত অপরাধী মুখে আমার ঘরে ঢুকল। বলল—কাঞ্চন এসেছিল?

বললাম—বসুন। আপনার জন্যই বসে আছি। কাঞ্চন এসেছে। ওপরে আমার স্ত্রীর সঙ্গে গল্প করছে।

ক্ষিতীন ব্যস্ত হয়ে বলল—সে কি? এখনও বাড়ি যায় নি? বাড়িতে সবাই ব্যস্ত হবে।

বললাম—হোক। আমিই যেতে বারণ করেছি। বলেছি বিয়েটা সেরেই বাড়ি যাবে।

ক্ষিতীন অবাক হয়ে আমার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। কিছুক্ষণ পরে বলল—সে কি? বিয়ে? কেমন করে?

বললাম আজ রাতেই কাঞ্চনকে আপনার বিয়ে করতে হবে। হিন্দুমতে, মুসলমান মতে কি রেজিস্টারী করে যেমন করেই হোক। আপনি যে ভেবেছেন একটা মেয়ের সর্বনাশ করে ফরগিভ এ্যান্ড ফরগেট বলে এলাহাবাদ পালিয়ে যাবেন তা চলবে না। আমি তা হতে দেব না। বলুন কি মতে আপনি বিবাহ করতে চান?

আমার কথার রকম শুনে ক্ষিতীন হক্‌চকিয়ে গেল।

বলল—রেজিস্ট্রার তো এ বিয়ে দেবে না। আমাদের দুজনের যা সম্পর্ক—মামাত পিসতুত ভাই বোন—তাতে তিন আইনে এ বিয়ে সিদ্ধ হয় না। হিন্দু মতেও হয় না। মুসলমান হতে আমার সংস্কারে বাধে। কাজেই বিয়ে কি করে হবে?

বললাম—বিয়ে আজ আমি দেবই, তাই হবে। রেজিস্ট্রারকে আপনাদের এই সম্পর্কের কথা বলা চলবে না। বলবেন আপনাদের দুজনের মধ্যে রক্তের কোন সম্পর্ক নেই। তাহলেই বিয়ে হয়ে যাবে। একবার বিয়ে হয়ে গেলে আপনাদের দু'জনের একজন ছাড়া অন্য কেউ এ বিয়ে নাকচ করতে পারবে না। আপনি যেমন আদালতে গিয়ে ডিভোর্স চাইলে পাবেন, কাঞ্চনও তাই পাবে। তাহলে আপনার আপত্তি কিসের?

ক্ষিতীন বলল—বিয়ের ব্যাপারে এমনি মিথ্যাচার আমার বিবেকে বাধে।

শুনে রাগে আমার গা জ্বলে গেল। বললাম—একটা মেয়ের সর্বনাশ করতে আপনার বিবেকে কিন্তু বাধে না! এবারেও কিছু হয়নি না? চমৎকার আপনার বিবেক। আসলে, কাঞ্চনকে বিয়ে করতে আপনার সাহসে কুলোচ্ছে না। আপনার মত এমন ভীরু, এমন ইতর, এমন কাপুরুষের এমনি নোংরা বিবেকই হয়। কিন্তু সেই বিবেককে চাবুক মেরে কি করে শায়েস্তা করতে হয় তা আমি জানি। এখুনি কাঞ্চনকে নিয়ে এসে এখানে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে যদি আপনার কীর্তি প্রকাশ করি এই বাড়ির এতগুলি লোকের হাতে আপনার কি অবস্থা হবে তা জানেন? তারপর কাঞ্চনের বাবার কাছে সব কথা যদি বলে দি? আপনার বাবা মা'র কাছে যদি চিঠি লিখি?

এইবার ক্ষিতীন ঘাবড়ে গেল। বলল—কাঞ্চন এই অসিদ্ধ বিয়েতে রাজী?

বললাম—বেশ ত ওপরেই যান না। জিজ্ঞাসা করেই আসুন। সিদ্ধ অসিদ্ধ

কিছুই আমি বুঝি না। শুধু জানি বিবাহ আজ আপনাকে করতেই হবে।

ক্ষিতীন আর কোন কথা না বলে আমার সঙ্গে ওপরে উঠে এল। দেখলাম এই অল্প সময়ের মধ্যেই কাঞ্চন আমার স্ত্রীর সঙ্গে, ছেলেমেয়ের সঙ্গে বেশ ভাব করে নিয়েছে। খাবার টেবিলের পাশে বসে আমার ছোট ছেলেটিকে কোলে নিয়ে হেসে হেসে আমার স্ত্রীর সঙ্গে গল্প করছে। আমরা ঢুকতেই হাসি থামিয়ে উঠে দাঁড়াল। ক্ষিতীনকে আমার স্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে কাঞ্চনকে বললাম—আপনার সঙ্গে ইনি কি কথা বলবেন। সামনেই প্রকান্ড খোলা ছাদ। ঘুরে ঘুরে যত ইচ্ছে প্রাইভেট কথা বলে আসুন।

ছেলেটিকে কোল থেকে নাবিয়ে মুচকি হেসে কাঞ্চন ক্ষিতীনের সঙ্গে ছাদে চলে গেল। আমার স্ত্রী মৃদু হেসে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি হেনে বললেন—কি ব্যাপার? ডাক্তারী ছেড়ে এখন ঘটকালী শুরু করলে না কি?

বললাম—আপত্তি কি? ডাক্তারী করে যা পাই, ঘটকালী করেও তাই পাব। সেই একই বদনাম। ছোকরা এই মেয়েটিকে এতদিন ধরে ভুলিয়ে ভালিয়ে এখন ফেলে পালাবার তালে ছিল। সেটি আজ আর হতে দিচ্ছি না।

স্ত্রী বললেন—কাঞ্চনের কাছে সব শুনলাম। তোমাদের জাতটাই এমনি।

শুনে বুক দুরু দুরু করে উঠল। কাঞ্চন সব কথাই ফাঁস করে দিয়েছে নাকি?

ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—কেমন লাগল মেয়েটিকে?

উচ্ছ্বসিত হয়ে স্ত্রী বললেন—চমৎকার মেয়ে। বি-এ পাশ করেছে কিন্তু একটুও অহঙ্কার নেই। এই মেয়েকে কিনা ক্ষিতীন বাবু এমন হেলাফেলা করছেন?

যাক সব তাহলে কাঞ্চন বলে নি। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

বললাম—তাহলে বিয়েটা দিয়ে দিই? কি বল?

তিনি বললেন—নিশ্চয়। এই সব ছেলেকে এমনি করে ধরেবেঁধেই গছিয়ে দিতে হয়। এ যেন বাঁদরের গলায় মুক্তার হার।

বললাম—তাহলে তুমিও তৈরি হয়ে নাও। নীচে থেকে ২।৩ জন সাক্ষী জোগাড় করে একসঙ্গেই রেজিস্ট্রারের বাড়ি যাওয়া যাক।

গিন্নী বললেন—আগে ওদের ডাক। না ডাকলে ওদের ফুসুর ফুসুর আর গুজুর গুজুর সারা রাতেও শেষ হবে না।

ছাদে বেরিয়ে দেখি এক কোণে পাশাপাশি রেলিং-এ ভর দিয়ে নীচে রাস্তার দিকে তাকিয়ে ওরা তন্ময় হয়ে ফিস ফিস করে কিসব বলছে। গলা খাঁকারি দিতে তবে ওরা চমকে উঠল।

ক্ষিতীনকে জিজ্ঞাসা করলাম—হল আপনাদের কথা? কি ঠিক হল?

ক্ষিতীন বলল—হ্যাঁ। আপনি যা বলবেন তাই হবে।

বললাম—তাহলে ঘরে যান। আমার স্ত্রী আপনাদের ডাকছেন।

ওদের ঘরে পাঠিয়ে সাক্ষীর খোঁজে নীচে নাবলাম। রেজিস্ট্রার আমাদের পরিচিত। আগে থেকে নোটিশ না দিলেও বিয়ের কোন অসুবিধা হবে না। তিনজন সাক্ষী চাই। তারও কোন অভাব হল না। একবার বলতেই সবাই রাজী হয়ে গেল। কেউ উকিল, কেউ ইঞ্জিনীয়ার, ছেলে-ছোকরা লোক, বিয়ে-থা করেনি। ঘর ভাড়া নিয়ে আমার ওখানে থাকে। এই রকম একটা মজার বিয়ের সাক্ষী হতে সকলেরই খুব উৎসাহ।

বললাম—আপনারা তৈরি হয়ে নিন। আধ ঘণ্টার মধ্যেই রওনা হব। আমি রেজিস্ট্রারকে টেলিফোন করে আসি।

এই বলে রাস্তায় বেরিয়ে একটা দোকান থেকে রেজিস্ট্রারকে টেলিফোন করে দিলাম। রেজিস্ট্রার বৃদ্ধ। কিন্তু ভারী রসিক। বললেন—গোলমালের বিয়ে? তা বেশ; নিয়ে এস। সব ঠিক করে দেব।

বাড়ি ফিরে ওপরে উঠে দেখি, গিন্নী এই শর্ট নোটিশেই অসাধ্য সাধন করে বসে আছেন। কাঞ্চনকে বিয়ের কনে

সাজিয়েছেন। পরনে লাল বেনারসী শাড়ি, গায়ে সিল্কের ব্লাউজ, পায়ে আলতা, কপালে, গালে চন্দনের সাজ; গলায় ফুলের মালা। একটা রেকাবীতে ধান-

দূর্বা, চন্দনবাটা।- মায় টোপরটি পর্যন্ত বাদ যায়নি।

দেখে ভয় হল, আমার ডাক্তারীর মত এই বিয়ে দিতে গিয়েও বুঝি নগদ কিছু খসল। জিজ্ঞাসা করলাম—এত তাড়াতাড়ি, এত বিরাট আয়োজন? কি করে হল?

গিন্নী হেসে বললেন—তোমার ভয় নেই। একটি পয়সাও তোমার খরচ হয়নি। সবই কাঞ্চনের টাকা। আজকে যে ও মাইনে পেয়েছে। ঐ দিয়ে বরের জন্য ধুতি-পাঞ্জাবীও কেনা হয়েছে।

শুনে খুব আনন্দ হল। বললাম—*কনেটিকে কিন্তু দেখাচ্ছে বেশ। আমি তো দেখে হঠাৎ চিনতে পারিনি। তা এই বেনারসীটি কোত্থেকে এল? এটিও কি নতুন কেনা হল নাকি?*

গিন্নী বললেন—তোমার যেমন কথা! স্কুল টিচার অত টাকা মাইনে পায় নাকি? ওটা আমার। সেই বিয়ের রাতে একবারই পরেছি। এখনও দেখ কেমন নতুন আছে। আজকের জন্য কাঞ্চনকে পরতে দিয়েছি। ব্লাউজটা নতুন।

বুঝলাম আবার একটি বেফাঁস কথা বলে ফেলেছি। গিন্নীর নিজের বেনারসী দেখেই আমার চেনা উচিত ছিল।

বললাম—তাই বল। দেখেই তাই তুমি-তুমি মনে হচ্ছিল। তা তোমাদের বরটি কোথায়?

গিন্নী হেসে পাশের ঘরটি দেখিয়ে বললেন—সাজতে গেছে।

পাশের ঘর থেকে নতুন জামা-কাপড় পরে ক্ষিতীন বেরিয়ে এল। দাড়ি-গোঁফ কামানো। চুল পরিপাটি করে ব্রাশ করা। কিন্তু চোখে-মুখে কোন ফূর্তি নেই। কেমন যেন মলিন বিমর্ষ গোবেচারা ভাব।

দেখে গিন্নী বললেন—বিয়ের দিনে মুখখানা অমন প্যাঁচার মত করে রয়েছেন কেন? এদিকে আসুন। এই মালাটা গলায় পরুন। আর কপালে চন্দনের ফোঁটা।

ম্লান হাসি হেসে ক্ষিতীন এগিয়ে গেল। গিন্নী চন্দন দিয়ে কপাল সাজিয়ে দিয়ে বললেন—এইবার চল। আমরা তৈরি। একটা খোলা ট্যাক্সি ডাক।

গ্রীষ্মকাল। সন্ধ্যের পর বেশ হাওয়া। তখনকার দিনে হুড-খোলা বড় ট্যাক্সিতে চড়ে বেড়াতে ভারী মজা লাগত। চাকরকে বলতেই একটা খোলা ট্যাক্সি নিয়ে এল। দুজন সাক্ষী, বর-কনে, গিন্নী আর আমি এই ছ'জনে খোলা ট্যাক্সিতে উঠে রেজিস্ট্রারের বাড়ি রওনা হলাম।

ক্ষিতীন বলল—ট্যাক্সির হুডটা তুলে দিলে হোত না?

বললাম—আপনার আবার মাথা খারাপ হল নাকি?

ক্ষিতীন বলল—তাহলে বড় রাস্তা দিয়ে না গিয়ে গলি দিয়েই চলুন।

জিজ্ঞাসা করলাম—কেন?

ক্ষিতীন বলল—কাঞ্চন এখনও বাড়ি ফেরে নি। ওঁরা ব্যস্ত হয়ে এখানে এসে দেখে ফলো করেন যদি?

শুনে আমরা সবাই হো-হো করে হেসে উঠলাম।

রেজিস্ট্রারের বাড়ি গিয়ে যথারীতি ফরম্ সই করে বিয়ে হয়ে গেল। আমরা তিনজন সাক্ষী হয়ে সই করলাম। একজন উকিল, একজন ইঞ্জিনীয়ার, আর একজন ডাক্তার। রেজিস্ট্রার ক্ষিতীন আর কাঞ্চনকে স্বামী-স্ত্রী বলে ঘোষণা করবার পর গিন্নী বললেন—এইবার মালা বদল হোক।

মালা বদল হলে কাঞ্চন আমাকে আর গিন্নীকে প্রণাম করে বলল—আজ থেকে আপনারা আমার দাদা-বৌদি। আর কিন্তু আপনি বলে ডাকতে পাবেন না। তুমি বলে ডাকা চাই।

গিন্নী খুশি হয়ে বললেন—বেশ ভাই, তাই ডাকব।

কাঞ্চনের দেখাদেখি ক্ষিতীনও গিন্নীকে টিপ করে একটি প্রণাম করে বসল। গিন্নী দেখলাম অবলীলাক্রমে ওর মাথায় হাত দিয়ে বললেন—কল্যাণ হোক।

আমি অতটা পেরে উঠলাম না। বললাম—থাক থাক আমাকে আর প্রণাম করতে হবে না।

রেজিস্ট্রারের বাড়ি থেকে বেরুবার পর কাঞ্চন ফিস ফিস করে আমার কানে বলল—বৌদিকে আবার আমার শরীরের কথা বলে দেবেন না তো।

বললাম—এমন বুদ্ধিমতী হয়ে আবার কি করে এ ফ্যাসাদ বাধালে দেখি?

মুচকি হেসে কাঞ্চন বলল—এ না হলে ওকে পেতাম কি করে?

কলিকাতা

সম্প্রতি চৌরঙ্গী টেরাস-এ দিলীপ রায় অঙ্কিত ৬৬ খানি ছবির একটি প্রদর্শনী হয়ে গিয়েছে।

আঁকার ধরন দেখে কৌতূহল হ'ল—অনুসন্ধান করে জানলাম দিলীপবাবু কোনও স্কুল বা শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষালাভ করেন নি। নিজে নিজেই বিদ্যাটি আয়ত্ত করেছেন। এ ছাড়া শিল্পী সম্বন্ধে বেশী কিছু খোঁজ-খবর নেওয়া সম্ভব হ'ল না, কারণ শিল্পীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ঘটেনি। যাই হোক, এঁর চিত্রাঙ্কনের পিছনে কোনও স্কুলের শিক্ষা না থাকায় অঙ্কন বিদ্যার নিয়মে কিছু কিছু ভুল চুক থাকলেও ছবিগুলি প্রত্যেকটিই অভিনব এবং অত্যন্ত বলিষ্ঠ। ইনি চিত্রাঙ্কন শুরু করেছেন খুবই অল্পদিন যাবত, সুতরাং এরই মধ্যে এঁকে একজন প্রথম শ্রেণীর শিল্পী বলে প্রচার করতে চাইনে। তবে এঁর মধ্যে যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। ঠিকভাবে অনুশীলন করলে এঁর পক্ষে একজন প্রথম শ্রেণীর শিল্পী হওয়া আশ্চর্য নয়। প্রতিটি ছবি থেকেই শিল্পীর কবি-মনের পরিচয় পাওয়া যায়। আর সবচেয়ে বড় কথা এঁর ছবিতে কোথাও কমার্শিয়াল আর্ট ঘেঁষা রচনা বা লে-আউট চোখে প'ড়ল না। আজকাল অনেক পয়লা নম্বরের শিল্পীর ছবিতেও মাঝে মাঝে লক্ষ্য করা যায় এই কমার্শিয়াল আর্টের প্রভাব এবং এই প্রভাব এড়িয়ে যাওয়া একজন নবাগত শিল্পীর পক্ষে খুবই কঠিন। দিলীপ-বাবুর ছবিতে এই প্রভাবের অনুপস্থিতি লক্ষ্য করে সত্যই প্রীত হয়েছি।

ছবির সংখ্যা থেকে এবং ছবির গুণাগুণ বিচার করলেও বোঝা যায়, অন্যান্য মাধ্যম অপেক্ষা প্যাস্টেল-এই ইনি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে থাকেন বেশী। মনে হ'ল ইনি আধুনিকতার কিছুটা পক্ষপাতী। মাঝে মাঝে পিকাশো মাঝে মাঝে শারদা, মাঝে মাঝে মাতীজ-এর আঁকার ধরন-ধারন এসে এড়েছে এঁর ছবিতে। রেখা অপেক্ষা টোনের উপরই এঁর প্রধান লক্ষ্য এবং রঙ সব সময়ই খুব রমণীয়। খুঁতের মধ্যে দেখলাম, এঁর অ্যানাটমী বোধ এখনও নির্দোষ নয়। সেই কারণে আধুনিকতা বর্জন ক'রে যখনই ইনি প্রথাগত শিল্পের আশ্রয় নেবার চেষ্টা করেছেন তখনই শোচনীয়-ভাবে অকৃতকার্য হয়েছেন। কিন্তু তাঁর এক্সপ্রেশনিস্টধর্মী ছবিগুলি আশ্চর্যরকম-ভাবে রসোত্তীর্ণ হয়েছে। নিউড স্টাডি-গুলি মোটেই ভাল লাগল না। এগুলি না প্রদর্শিত হলেই ভাল হ'ত। ২৩ নম্বরের ল্যান্ডস্‌কেপটি অতি চমৎকার ছবি। আমার ব্যক্তিগত মতে এইটিই এ প্রদর্শনীর শ্রেষ্ঠ ছবি। এ ছাড়া আমার চোখে ভাল লেগেছে 'ওয়ে সাইড স্টেশন', 'বৈরাগী', 'টেরর', 'ক্রাউড অ্যাট এ মিউজিক কনফারেন্স', 'বুচার্স শপ', 'ছৌ ডান্স' এবং আরও কয়েকটি ল্যান্ডস্‌কেপ। 'স্টীম রোলার' প্রভৃতি কয়েকটি ছবিতে ফর্ম এবং ঢালা রঙের ব্যবহারে শিশুসুলভ সরলতা প্রকাশ পেয়েছে। দু' একজন দর্শককে এ ছবি-গুলি সম্বন্ধে একেবারে কাঁচা আঁকা বলে মন্তব্য করতে শুনলাম। কিন্তু তাঁরা যা মনে করেছেন এগুলি ঠিক তা নয়। আজকাল মস্ত মস্ত এদেশী এবং বিদেশী শিল্পীদের মধ্যেও এই শিশুসুলভ সরলতা প্রকাশ করার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। দিলীপবাবু প্যাস্টেল ছাড়া তেল রঙ, বার্নিশ, পেন্সিল প্রভৃতি নানারকম মাধ্যম ব্যবহার করেছেন এবং তাঁর প্যাস্টেলের ছবিগুলি বেশীর ভাগ এঁকেছেন পেস্টবোর্ডের উপর।

দিলীপবাবুর ছবির সঙ্গে ছ' বছরের রূপংকর সরকারের ১২খানা ছবি প্রদর্শিত হয়েছে। সচরাচর ছোটদের আঁকা যেমন হয় এগুলি তার ব্যতিক্রম নয় বটে, তা হলেও দেখে বেশ আনন্দ পাওয়া যায়।

প্রদর্শনীটি 'মাঙ্গলিকীর' উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

—চিত্রগ্রীব

হায়দরাবাদ

অন্ধ্র সারস্বত পরিষদ এবং হায়দরাবাদ আর্ট সোসাইটির যৌথ উদ্যোগে হায়-দরাবাদের নবীন শিল্পী শ্রীশেষগিরি রাও-এর এক ব্যক্তিগত চিত্রপ্রদর্শনী সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়ে গেল হায়দরাবাদে। চিত্র-প্রদর্শনীটি স্থানীয় অজন্তা প্যাভিলিয়নে হায়দরাবাদ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বি রাম-কৃষ্ণ রাও উদ্বোধন করেন।

শিল্পী শ্রী শেষগিরি রাও হায়দরাবাদ চারুকলা মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষক। তিনি এই মহাবিদ্যালয়েরই প্রাক্তন কৃতীছাত্র। স্থানীয় মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি বিশেষ শিক্ষা লাভ করার জন্য শান্তিনিকেতনে আচার্য নন্দলাল বসুর নিকট এক বছর অবস্থান করেন। ভারত সরকারের উদ্যোগে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে যে ভারতীয় চিত্রপ্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়, তাতে এই শিল্পীর কয়েকটি রচনাও গৃহীত হয়। হায়দরাবাদ রাজ্য সরকার তাঁর কয়েকটি চিত্র ক্রয় করেছেন।

বিমুগ্ধা রমণী

প্রদর্শনীটিতে শ্রীশেষগিরি রাও তাঁর শতাধিক রচনা পেশ করেন। এই শিল্পীর

বিবাহের শোভাযাত্রা

ব্যক্তিগত প্রদর্শনী হিসেবে এইটিই প্রথম বলে কয়েকটি রচনা সুনির্বাচিত হয়নি। তবে তাঁর শিল্পজীবনের ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করার পক্ষে সুযোগ করে দিয়েছে তাঁর নির্বাচনের ত্রুটি। তাঁর প্রথম জীবনের রচনায় কিছুটা পশ্চাত্য রীতি পদ্ধতির ছোঁয়াচ আছে, তাহলেও তাঁকে ভারতীয় প্রথার একান্ত সাধক বলা চলে। তাঁর রচনার মধ্যে স্বকীয়তা ও আপন বৈশিষ্ট্যের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। জল রঙকে অবলম্বন করেই তিনি রচনায় নানারূপ কৌশল ও বৈশিষ্ট্য দেখিয়েছেন। তাঁর শিল্পচিত্তকে যে দৃশ্য দোলা দেয়, সেই দৃশ্যকে নিজের বিশ্বাস দিয়ে তিনি জল রঙের সাহায্যে রূপ দেন। তাঁর রঙের টানে শান্তভাবেই তা প্রকাশ পায়। রঙের অযথা জলুসের ওপর তাঁর আকর্ষণ নেই। এক বর্ণের গায়ে অন্য বর্ণ চাপিয়ে অসাম্য তিনি দেখাবার প্রয়াস পান না। বরং চোখকে বিশ্রাম দেবার জন্য তিনি বিভিন্ন রঙ ব্যবহার করেন।

শিল্পীর রচনার বিষয়বস্তু নির্বাচন গ্রামীণধর্মী। গ্রামের প্রাকৃতিক দৃশ্য, গ্রামের পালা-পার্বণ, কৃষক জীবনের খুঁটি-নাটি ঘটনা, প্রকৃতির ঋতু বিবর্তন, পশু-পাখী প্রভৃতি তাঁর রচনার প্রধান বিষয়-বস্তু। হালকা ও মোটা তুলির রেখায় সমস্ত গ্রাম্য জীবনকে তিনি সরল ও প্রাণময় করে তুলেছেন। শিল্পী গ্রামের লোক। গ্রামকে মনপ্রাণ দিয়ে ভালোবাসেন। নিজের জীবন দিয়ে গ্রামজীবন এবং গ্রামের প্রকৃতি পরিবেশকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন এবং উপভোগ করেছেন। তিনি যা প্রত্যক্ষ করেছেন, উপভোগ করেছেন, তা কাগজ, বোর্ড ও সিল্কের ওপর জল রঙ মাধ্যমে ঐকান্তিক নিষ্ঠার সঙ্গে জীবন্ত করে তুলেছেন। রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের গল্প নিয়েও তিনি চিত্র রচনা করেছেন।

শ্রীশেষগিরি রাও পূর্ণ জীবনের ভক্ত। জীবন, শুধু জীবনই তাঁর রচনায় তাঁর অজানিতেই স্থান পেয়ে আসছে। সাধারণ মানুষের বিচিত্র জীবন, পশুপাখীর জীবন এমনকি গাছলতাপাতার জীবন সব মিলিয়েই তো পূর্ণ জীবন। এই পূর্ণ জীবনই তাঁর রচনাবলীতে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। 'ডোবার ধারে বকের ঝাঁক' চিত্রে তিনি ডোবার জল, কাশবন এবং বকের ঝাঁক এ'কেছেন সত্যি। কিন্তু গ্রাম্য ডোবার সত্যিকারের জীবনই তিনি প্রকাশ করে-ছেন এই রচনায়। 'বিবাহ শোভাযাত্রা' চিত্রে তিনি গ্রামের সকলকে এনে উৎসবে মাতিয়ে তুলেছেন। 'বনের আগুন' চিত্রে সৌন্দর্যহীন শুকনো পলাশের ডালে রক্ত বর্ণের ফুল ফুটিয়েছেন। আপাতঃদৃষ্টিতে মানুষের মনে ভ্রম হয় জীবন বুঝি শুকিয়েই যাচ্ছে। পলাশের শুকনো ডালে ফুল ফুটিয়ে শিল্পী মানুষের জীবন সম্বন্ধে আশাবাদী হতে বলেছেন। যৌবনে ঢল ঢল রূপসী নারী, সুন্দর পাখী এবং ফুলে ফুলে ভরা গাছপালা এ'কে তিনি জীবনের জয়গান করার প্রয়াস করেননি। সাধারণ মানুষ, পশুপাখী, গাছপালা সব মিলিয়ে ভারতীয় গ্রাম জীবনের বিচিত্রতা তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর রচনার মাধ্যমে। মহাকালের সামান্যতম অংশ এই জীবন তা আবার প্রকৃতির সঙ্গে ওতপ্রোত-ভাবে জড়িত। জীবনের বিভিন্ন দৃশ্য জীবনের চলার গতির প্রকাশমাত্র। শিল্পীর রচনাবলী আমাদের জীবন সম্বন্ধে ভাবিয়ে তোলে। স্বপ্ন ও বাস্তবতা দুয়েরই সংঘাত ও সামঞ্জস্য পাওয়া যায়, তাঁর রচনাবলীতে।

শান্তিনিকেতনে কলাভবনে শিক্ষা নেবার সময় তিনি একজন চীনাশিল্পীর সংস্পর্শে আসেন। তার ফলে শান্তি-নিকেতনের রীতি পদ্ধতির সঙ্গে সঙ্গে তিনি চীনা ও জাপানী রীতি পদ্ধতিতে চিত্র আঁকতে শেখেন। কলাভবন হতে ফিরে এসে তিনি চীনা ও জাপানী ঢং-এর অনেক চিত্র রচনা করেছেন। চীনা ঢং শিল্পীকে অনেকখানি প্রভাবান্বিত করেছে। তাঁর চীনা ঢংএর চিত্রগুলি প্রদর্শনীর একটি আকর্ষণের বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তুলি চালানোর সবলতাও তাঁর অনেক রচনায় প্রকাশ পায়। তুলির মোটা টানে তিনি পশুপাখীর জীবন ছন্দ সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। উদাহরণ হিসেবে তার 'বনের মৃগ' সত্যিই অনবদ্য। ভারতীয় কবিগণ মৃগের যে বিচিত্র জীবন বর্ণনা করেছেন। তার পূর্ণচিত্র সামান্য তুলির টানে তিনি প্রকাশ করেছেন। সামান্য তুলির টানে তিনি গ্রাম্য বালিকার একটি চিত্র এ'কেছেন। এ চিত্রটি প্রাণধর্মী।

অতি আধুনিকতা প্রায় প্রত্যেক শিল্পীকেই বর্তমানে পেয়ে বসেছে। তার ফলে বিচিত্র ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাচ্ছে শিল্পীরা। শ্রীশেষগিরি রাও-এর মধ্যেও এর ব্যতিক্রম দেখছি না। রঙ ও তুলি, পেনসিল, কালি, হাতের আঙুল, রঙ-এর কেক প্রভৃতি সাহায্যে চিত্র রচনা করার বিচিত্র পরীক্ষণের প্রয়াস লক্ষ্য করা গেল কয়েকটি চিত্রে। তাঁর পরীক্ষা নিরীক্ষার অবকাশে শিল্পিমন হয়ত প্রচুর আনন্দ আহরণ করছে। কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই পরীক্ষা নিরীক্ষার ফাঁকে শিল্পী ও শিল্প রসিকদের ফাঁকিতেই পড়তে হচ্ছে তো। এই আধুনিকতার স্রোতে গা ও মন ভাসিয়ে দিয়ে যা শিল্পসৃষ্টি হয় তাতে কিন্তু শিল্পীকে খুঁজে পাওয়া যায় না। শিল্পী অপূর্ব সৃষ্টির নামে ফাঁকি দিচ্ছে বলেই রায় দিতে মন উন্মনা হয়ে ওঠে। —চিত্রগুপ্ত

তীর্থ ভ্রমণ

গঙ্গাবতরণ—শ্রীউমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়; রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ৫৭, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা—৩৭। দাম—তিন টাকা।

বইখানি এত স্বল্পকায় যে পড়তে না পড়তেই ফুরিয়ে যায়। মনে হয়, বড় কম কথায় শেষ করলেন উমাপ্রসাদবাবু। বিষয়টি অবশ্য পুরানো আর প্রচলিত অর্থে ভ্রমণ-কাহিনী তিনি লিখতে নারাজ। তাই বোধ হয় বক্তব্য শেষ হওয়ার সঙ্গেই তিনি থেমেছেন। কিন্তু তাঁর পরিবেশনের গুণে গঙ্গাবতরণের বিশেষ রূপ-ধারণা মনের মধ্যে গেঁথে যায়। এইখানেই তাঁর কৃতিত্ব। বোঝা যায়, তাঁর রচনায় যে সংযম, তা প্রায় অমানুষিক। তার পিছনে রয়েছে পরিণত সচেতন মনের গঠন। সে মন ভারতীয় সংস্কৃতির গভীর অনুরাগী ধীমান ছাত্রের। সাহিত্যিক প্রচেষ্টা হিসাবে এ পুস্তিকার একটি বিশেষ মূল্য ও আবেদন আছে, যদিও সাহিত্য করব বলে সংকল্প নিয়ে লেখক লিখতে বসেন নি। সাংবাদিক শিক্ষা, ঐতিহ্য-দীক্ষা আর অন্তরঙ্গ সাহিত্য-প্রীতি না থাকলে ঠিক এমন একখানি বই লেখা যায় না, মানে এমন সংক্ষিপ্ত বাচন আয়ত্ত করা খুব শক্ত। পাহাড় আর পথ, উপলবহুল ভাগীরথীধারা আর সাধু-সন্তের নির্জন বাস, এই হ'ল উপকরণ। এখানে ফেনায়িত বর্ণনা নেই, ভক্তি-কল্পনায় আদর্শায়িত অতিরঞ্জনের চেষ্টা নেই, পথের কষ্ট নিয়ে ইনিয়ে-বিনিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণী কাব্যোচ্ছ্বাসও নেই। শুধু সহজ স্বচ্ছ নিরাভরণ প্রকাশ। কারণ আত্ম-সচেতন মানুষ এখানে গৌণ, দ্রষ্টব্যই মুখ্য। দৃষ্টিভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলার জ্ঞান-কৃত প্রয়াস এখানে সাজে না। তুষারশুভ্র দেবতাত্মার সামনে দাঁড়িয়ে এই রকম ঋজু অথচ বিনম্র ভাষাই মানায়। এখানে আধ্যাত্মিক কল্পনার চেয়ে বড় হ'ল মানুষকে বোঝবার গ্রহণ করবার উপযুক্ত এক মনোরম চারণভূমি।

'গঙ্গাবতরণে' পেলাম সহনশীলতা এবং ...-অপসারণ, অনির্বচনীয় বিশাল হিমবান ... গোমুখ-নিঃসৃত দ্রবময়ীর শাশ্বত মর্ম-... ধীর-গম্ভীর উপলব্ধি। তাই উমা-প্রসাদবাবু বার বার ছুটেছেন এমন এক ... যেখানে গেলে কথা জমে না, জাগে ... নীরবতা। ছিয়ানব্বই পৃষ্ঠার বই. দাম তিন টাকা হয়তো বেশি। কিন্তু ... ঘোষের প্রচ্ছদপট, এগারখানি উৎকৃষ্ট ...চিত্র আর মোটা কাগজে এত পরিচ্ছন্ন এবং স্পেসিং দেখলে খুঁতখুঁতে হিসেবী ... চুপ করে থাকতে হয়।

৬৬১।৫৫

মরুতীর্থ হিংলাজ—অবধূত। মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট। দাম ৫৲

একে সন্যাসী, তায় তান্ত্রিক সাধক। তার ওপর লেখক 'ডার্ক হর্স'। এতদিন অবধূত কলম নিয়ে কি করছিলেন, জানি না। তবে এই কলমের জোরেই তিনি সশরীরে এবং বিস্ময়করভাবে বাংলার এক বিশেষ ধরনের সাহিত্য ক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়েছেন। বিস্ময়ের সঙ্গে প্রীতির মিশ্রণ হয়েছে বলেই চমকটা তৃপ্তিজনক। তীর্থ আর ভ্রমণ মিলিয়ে যে চারখানি বই আমার মনকে নাড়া দিয়েছে, সেগুলি 'মহাপ্রস্থানের পথে', 'তন্ত্রাভিলাসীর সাধুসঙ্গ', 'পূর্ণ কুম্ভ' আর এই চতুর্থ গ্রন্থ 'মরুতীর্থ হিংলাজ'। প্রবোধ সান্যাল খাঁটি যাযাবর ও সাহিত্যিক। ঘরে থাকতে হয় থাকেন, কিন্তু হিমালয় আর সুদূরে তীর্থগুলি তাঁকে হাতছানি দেয়, তাই ঘর মনকে বাঁধে না। সাহিত্যে তিনি মুক্ত, রোমান্টিক; ধর্মের প্রতি মনোভাব তাঁর কবি-জনোচিত কল্পনার প্রসার। এক কথায়, সেই দুর্গম অজানার ডাক। রাণী চন্দ জেনানা ফাটকে থেকেও মুক্তি-বিহারিণী। তাঁর লেখায় ভক্তির সঙ্গে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গীর চমৎকার সমন্বয়। মনের এক কোণে তাঁর সূক্ষ্ম দৃষ্টি জাগ্রত থেকে রেখাচিত্র আঁকে। সচেতন, ঈষৎ ভাবালু, কিন্তু দৃশ্য চরিত্রের বর্ণনায় আপনাকে সরিয়ে রেখে সমগ্র ছবিটা তুলে ধরেন। প্রমোদকুমারের মন অনুসন্ধিৎসু, গুহ্য সাধনার তত্ত্বজিজ্ঞাসু। জাত-চিত্রকর, তাই সাধক আর সাধনা সমগ্র পরিবেশ নিয়ে তাঁর তুলিতে মূর্ত হয়ে ওঠে। ঋজু দৃষ্টি, বাস্তব চিত্রণ, ভবঘুরের আনন্দ আর সরস মন্তব্যে তাঁর রচনা পুরোপুরি নির্বাধ।

অবধূতের লেখায় এমন একটি মনের পরিচয় পাওয়া গেল যার সজীবতা সংক্রামক। ভারত সীমানা ছাড়িয়ে বেলুচি দেশের কোলে মরুতীর্থ হিংলাজ দর্শনে চলেছেন তিনি। পথের সাথী যাত্রী দল। পথের মাঝে কাঁটা-ঝোপ, বালুর ঝড়, আটার রুটি, শুষ্ক নদী, অগ্নিবর্ষী হাওয়া, চন্দ্রকূপের বীভৎস স্মৃতি, অতল কর্দমের গহ্বর, হিংলাজের গুহা, পথ ভ্রান্তির বিপদ—কোনও খুঁটিনাটি বাদ পড়েনি। শোন বেণী থেকে শুরু করে কোটেশ্বর পরিক্রমা পর্যন্ত একটানা কাহিনীর মধ্যে কোথাও ছন্দপতন নেই। এটা আশ্চর্য কৃতিত্ব। প্রাকৃতিক দুর্যোগ,

মরুতৃষ্ণা, উন্মাদনা ও মৃত্যু, আবার মানুষের পাশবিকতা, স্বার্থলোভ, আর সেই সঙ্গে তীর্থ-প্রীতি, মানব-প্রীতি পাশাপাশি চলেছে। লেখকের মন সংস্কারমুক্ত, কলমও মুক্ত। 'মানুষে যেখানে নেই, দেবতার টানে সেখানে অগ্রসর হওয়া অতটা সহজ নয়'। এ উক্তি আন্তরিক, উপলব্ধ অভিজ্ঞতা। তাই সারা বইখানিতে 'পোজ'-এর চিহ্ন পেলাম না। চলমান যাত্রী দল নিয়ে চলমান ভাষা। মানুষই এখানে বড়, দেবতা দূরের লক্ষ্য। যাত্রাটাই বড়, তীর্থ উপলক্ষ্য। কুন্তী আর খিরুমল, সুখলাল আর রূপলাল, দিল মহম্মদ আর গুল মহম্মদ, ভৈরবী আর অঘোরী বাবা আর পরিশেষে উট-জননী আর দুহিতা উর্বশী—সবাই মিলে একটা জীবন, বিস্তৃত উদার জীবন রচনা করেছে। এদের প্রত্যেকেই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যে চিহ্নিত। অবধূত একাধারে 'ফ্রী', অর্থাৎ প্রাকৃত জন আবার 'আনকনভেনশ্যনাল' অর্থাৎ সংস্কারমুক্ত। *দীর্ঘ পথের যাত্রা কাহিনীকে কেমন করে সরস করতে হয়, তা তিনি জানেন।* প্রমাণ : উটের দেহ শোভা, হাঁটু গেড়ে বসার বর্ণনা। দৃষ্টি বিষয়মুখী কিন্তু গভীরতর কাব্য দৃষ্টির পরিচয় রয়েছে ঝড়ের বর্ণনায়, রাত্রির নিজস্ব ভাষা আবিষ্কারে। সব চেয়ে ভালো লাগল তাঁর লেখার ব্যালেন্স—সামঞ্জস্য জ্ঞান। কোথাও আত্মগোপন নেই আবার আত্মকথনও নেই। কঠিন কাজ। তিনি তন্ত্র-সাধক, কিন্তু মানুষের এবং তার ভাষার সাধকও নন কি? (৪৭৫।৫৫)

আসা যাওয়ার পথের ধারে—শিবতোষ মুখোপাধ্যায়। প্রজ্ঞা প্রকাশনী, ১৪ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৪। মূল্য দু টাকা।

তীর্থযাত্রা ও ভ্রমণকাহিনী, এ দুটিরই মরসুম চলেছে বর্তমানে। শুধু বর্ণনা আর ছবি অর্থাৎ ক্যামেরা-চোখের কাজ থাকলে বই প্রকাশ করা চলে, কিন্তু ঠিক সাহিত্যপদবাচ্য হয়না। তেমনি আবার হৃদয়বৃত্তির প্রাধান্য থাকলে ভক্তিরসের কারবার হয়, মগজের অভাব পূর্ণ হয় না। সেইজন্য সত্যিকারের তীর্থ বা ভ্রমণ-কাহিনী লেখা এবং জমিয়ে লেখা কিছু কঠিন। *বাংলা সাহিত্যে এই শ্রেণীর রচনা হাতের একটি আঙুলেই গোনা যায়। লেখক মাত্র ছিয়াশী পৃষ্ঠায় এমন একখানি বই লিখেছেন* যাতে সজাগ মনের পরিচয় পাওয়া যায়। পাঠক যখন ভাবছেন, জমি তৈরি এবং একটি মন-ভোলানো দৃশ্যের এবং তারি আনুষঙ্গিক রোম্যান্টিক ঘটনার বর্ণনা এবার আসছে, লেখক সেইখানে অন্যপথে চলতে শুরু করছেন। প্রশ্ন করেছেন নিজেকে, জবাব খুঁজেছেন জীবনের অসঙ্গতির। পাঠক হোঁচট খায় পাহাড়ী পথে, পাঠককেও থামতে হয় তীর্থকাহিনীর মধ্যে আপাত-অবান্তর প্রসঙ্গে। মোটের ওপর নতুন দৃষ্টির সন্ধান আছে বইখানিতে। তবে একটি কথা বলার আছে। কোন কোন জায়গায় স্বগতোক্তির মাত্রা ছাড়িয়েছে, বক্তব্যকে যেন একটু বাড়িয়ে বলা হয়েছে। অর্থাৎ কেমন করে দেখেছি না ... তা দেখো এবং বোঝো। মন্তব্য সংক্ষিপ্ত ও ইঙ্গিতপ্রাণ হলে পড়ে তৃপ্তি হয়। ... 'ট্র্যাভেলস্' লেখবার হাতে আছে, ... এই মন্তব্যটুকু করতে হল। বইখানি ... পরিচ্ছন্ন। ভালো কাগজ, ভালো ... ভালো ছাপা। প্রচ্ছদপট তেমন ... মামুলি বই হলে অঙ্গসজ্জার ত্রুটি চোখে পড়ত না। কিন্তু রেখাচিত্রটি পরিষ্কার ... 'কলার স্কীম' কাঁচা। ...

নাটক

তপস্বিনী—শ্রীপরেশপ্রসন্ন সেন প্রণীত। শ্রীরাধিকামোহন মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ... চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা—১৬ ... প্রকাশিত। মূল্য ২, টাকা।

সীতা চরিত্রকে অবলম্বন করিয়া ... নাটকখানি লিখিত। সীতার বনবাস ... হইতে আরম্ভ করিয়া পাতাল প্রবেশ, ... অন্ত্যলীলাই নাটকখানির পটভূমি। গ্রন্থকা... মতে জনকের উপনিষদ-সংস্কৃতিই জানকী বৈদেহী আত্মশক্তি যে শক্তিতে স্বার্থ... বিনষ্ট হয়, পরার্থনিষ্ঠার দীক্ষালাভ ... পরার্থ কর্ম অভ্যাসের ফলে সর্বভূতান্তর... ব্রহ্মের জ্ঞান ঘটে।

গ্রন্থকারের মতে রাম আদর্শ পুরু... বাল্মীকির রাম সত্যসন্ধ, জিতেন্দ্রিয়, রি... দলবিজয়ী। রামায়ণের উত্তরাকাণ্ডে রা... আদর্শ চরিত্রের অপহ্নব সাধিত হইয়া... নিরাপরাধা সীতার বনবাস উপনিষদ আ... নহে, ইহাতে গ্রন্থকার স্মার্ত ধর্মের প্র... দেখিয়াছেন। তাঁহার মতে স্মার্ত ধর্মানু... আত্মরক্ষাকল্পে পত্নীত্যাগ মানবধর্ম ... আত্মরক্ষা বলিতে আত্মকীর্তি রক্ষাও ... এইখানে রাম চরিত্রের আদর্শের বিচ্যু... সীতার দেহত্যাগ বা পাতাল প্রবেশ গ্রন্থ... স্মার্ত ধর্মের প্রতিবাদে উপনিষদ আদ... বেদনাময় উদ্দীপনাকেই নাট্যাকারে অভি... দিয়াছেন। গ্রন্থকারের যুক্তি অবশ্য দার্শ... দার্শনিক বিচারের সম্বন্ধে সতর্ক স... মনোবৃত্তি নাট্যরসস্ফূর্তির পক্ষে ব্যাঘা... গ্রন্থকারের রচনার মূলে দার্শনিকতা ... থাকুক, রসানুভাবনার দিক হইতে তাহা... খানি সার্থকতা লাভ করিয়াছে, ইহাই বি...
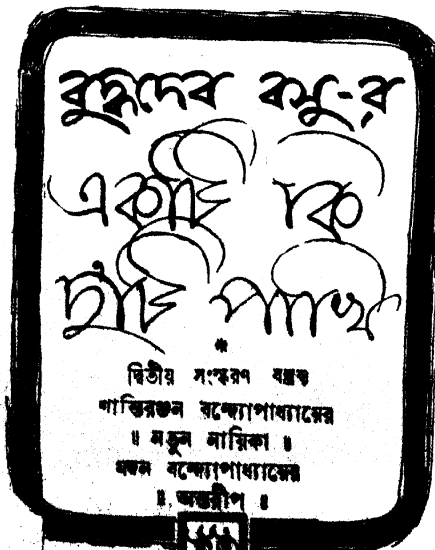
নাটকের কয়েকটি ত্রুটির কথা গ্রন্থকার নিজেই উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি নিজেই বলিয়াছেন নাটকটি কথাবহুল, ইহা অন্যতম ত্রুটি। দীর্ঘ আলোচনার মধ্যে রূপ ও রসের ব্যঞ্জনা নাটকখানিতে স্পষ্টভাবেই লক্ষিত হয়। নাটকে যাজ্ঞবল্ক ও তাঁহার পত্নীদ্বয় কাত্যায়ণী ও মৈত্রেয়ীর অবতারণা করা হইয়াছে। নাটকের নায়ক বাল্মীকির চরিত্র পরিস্ফুট করিবার জন্য ইহার প্রয়োজন ছিল। এ পরিপ্রেক্ষিতে বাহ্য আচার-বিচারগত সংস্কারের নির্মমতা এবং নিষ্ঠুরতা ফুটাইয়া তোলার পক্ষে গ্রন্থকার সাহায্য পাইয়াছেন। নিবিড় রস সম্বন্ধে মন ছন্দায়িত হইলে রসোপভোগের যে আগ্রহ সাধারণকে উন্মুখ করিয়া তোলে, নাটকখানিতে তাহার অভাব পরিলক্ষিত হয়। বাল্মীকি এবং সীতা দুইটিই প্রধান চরিত্র। দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া তবে রামের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হয়। কিন্তু সে চরিত্র মনের উপর কোনদিক হইতে সহানুভূতি বা অনুকূলে প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হয় না। লক্ষ্মণের স্বপ্নাংশ চরিত্রে মনে মধুর ভাবের স্পর্শ বরং কিছু পাওয়া যায়। লব কুশের স্নিগ্ধতা আছে; কিন্তু পৌরুষ নাই। পঞ্চম অঙ্ক হইতে নাটকের উপসংহার ভাগ বেশ একটু জমিয়া উঠিয়াছে। এই অংশের সংলাপ বেশ ছন্দোময় রূপ পাইয়াছে। সীতা এবং বাল্মীকির চরিত্রের মাধুর্য এখানে উজ্জ্বল হইয়া রসকে উদ্ভিন্ন করিয়াছে। নিরবচ্ছিন্ন আগ্রহ জানাইবার চারিত্রিক ঘাত-প্রতিঘাতে প্রতিবেশের অভাব নাটকখানিতে থাকিলেও নকে অপেক্ষমান রাখিবার মত একটি রসের তি নাটকখানির ভিতর রহিয়া গিয়াছে। ই রসকে প্রধানত শান্ত রস বলা যাইতে পারে। ইহা অনেকটা উচ্চ সংস্কৃতিমূলক বং উদার ইহার অভিব্যঞ্জনা; উদ্দীপনাংশের থানে অভাব। কিন্তু ইহারও সার্থকতা আছে। নাটকখানি এইদিক হইতে উল্লেখযোগ্য এবং উপভোগ্য বলিয়াও আমাদের শ্বাস।

ারদীয়া সাহিত্য

বিশ্বভারতী পত্রিকা। সম্পাদক—পুলিনহারী সেন। ৬।৩, দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, লকাতা। মূল্য—১৲।

কার্তিক-পৌষ সংখ্যা বিশ্বভারতী ত্রকা প্রবন্ধাবলী ও চিত্রসূচী গৌরবে ন্যসাধারণ। 'যোগাযোগ'-এর কুমুদিনী ত্র সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত পত্র ন্দ্র সাহিত্যে নূতন আলোকপাত করিবে। ছাড়া সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে ষণামূলক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন রাজশেখর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, জগন্নাথ সুকুমার সেন, নলিনীকান্ত গুপ্ত, ঘোষ, ক্ষিতিমোহন সেন, দেবব্রত মুখোায়। পরলোকগত শিল্পী রমেন্দ্রনাথ র্তীর শিল্পসাধনা সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়া-নন্দলাল বসু ও বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়। 'মনে রইল, সই, মনের বেদনা'—এই প্রাচীন বাংলা গানের স্বরলিপি করিয়াছেন ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী। ইহা ছাড়া নন্দলাল বসু ও রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর একাধিক রঙিন ও একরঙা চিত্র এই সংখ্যার অন্যতম আকর্ষণ।

তরুণের স্বপ্ন। সম্পাদিকা—মালবিকা দত্ত। ১ নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা। মূল্য—২৷৷০।

এবারের শারদীয়া তরুণের স্বপ্নের প্রধান আকর্ষণ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুদীর্ঘ উপন্যাস পঞ্চপুত্তলী এবং নন্দলাল বসুর সচিত্র প্রবন্ধ 'ছবির রঙ'। রাজশেখর বসু লিখিত ব্যঙ্গরচনা 'মাঙ্গলিক'ও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিশিষ্ট লেখকদের মধ্যে রহিয়াছেন প্রবন্ধে অন্নদাশংকর রায়, বিমলচন্দ্র সিংহ, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি, গল্পে আছেন শৈলজানন্দ, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, সমরেশ বসু, আশাপূর্ণা দেবী প্রভৃতি এবং কবিতায় প্রেমেন্দ্র মিত্র, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, গোবিন্দ চক্রবর্তী প্রভৃতি। আলোচ্য সংখ্যাটি আকারে বৃহৎ এবং নবীন ও প্রবীণ লেখকদের গল্পসম্ভারে সমৃদ্ধ। নন্দলাল, অবনীন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথের রঙিন ছবি এই সংখ্যার অন্যতম আকর্ষণ। সম্পাদনে রুচিবোধ ও পরিচ্ছন্নতা প্রশংসনীয়।

শারদীয়া দৈনিক বসুমতী। সম্পাদক—প্রাণতোষ ঘটক। ১৬৬ বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য—৩৲।

৩২৪ পৃষ্ঠার এই সংখ্যাটির প্রধান আকর্ষণ প্রবোধকুমার সান্যালের উপন্যাস 'পুষ্পধনু'। ইহা ব্যতীত ১৭টি প্রবন্ধ, ২৫টি গল্প, ৩৫টি কবিতা ও ৪টি রম্যরচনা রহিয়াছে। কিশোরদের জন্য 'ডাকঘর' বিভাগটিতে ১৩টি রচনাও আছে, আর আছে বিভিন্ন খ্যাতিমান ব্যক্তির ১৫টি অপ্রকাশিত পত্র। সাহিত্য সংকলনে এই সংখ্যাটি যেমন সমৃদ্ধ, রঙিন চিত্রে তেমন নহে।

শনিবারের চিঠি। সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস। ৫৭, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা—৩৭। দাম—২৲ টাকা।

শনিবারের চিঠি পূজা সংখ্যা এই পত্রিকার অনুরাগী পাঠকদের তৃপ্তি দিবে বলিয়া আশা করা যায়। শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসুশীলকুমার দে, শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ, শিবনারায়ণ রায়, পরিমল গোস্বামী প্রভৃতির

প্রবন্ধে বর্তমান সংখ্যাটি সমৃদ্ধ। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, সুবোধ ঘোষ, শৈলজানন্দ, অমলা দেবী, দীপক চৌধুরী, গৌরীশংকর ভট্টাচার্য প্রভৃতি গল্প লিখিয়াছেন। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোট উপন্যাস 'অপত্য'। কবিতার দিক হইতেও সংখ্যাটি মন্দ নয়।

গ্রন্থবাণী। সম্পাদক—সমীর ঘোষ ও প্রিয়নাথ জানা। ২১৭, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা—৬। মূল্য—১৷৷৹।

গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের একমাত্র মুখপত্র গ্রন্থবাণীর শারদীয়া সংখ্যাটি একাধিক কারণে অত্যন্ত মূল্যবান ও প্রয়োজনীয়। বাংলাদেশে গ্রন্থাগার ক্রমশই বাড়িয়া চলিয়াছে এবং অদূরে ভবিষ্যতে বাংলাদেশের প্রতি গ্রামে গ্রন্থাগার গড়িয়া উঠিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। যাঁহারা এইসব গ্রন্থাগার উপস্থিত পরিচালনা করিতেছেন ও ভবিষ্যতে করিবেন তাঁহাদের কাছে এই পত্রিকা অশেষ উপকারে লাগিবে। সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আজ যাঁহারা গবেষণাব্রতী তাঁহারাও এই পত্রিকা কাছে থাকিলে সহায়তা পাইবেন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নানা বিষয়ে যেসব উল্লেখযোগ্য রচনা প্রকাশিত হইতেছে তাহার তালিকা এই পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ায় গবেষকদের অনেকখানি পরিশ্রম লাঘব হইবে। এই সংখ্যায় বিশ্বভারতীর ভূতপূর্ব গ্রন্থাগারিক শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখিত 'কাজ চাই' পত্রটি প্রণিধানযোগ্য। মে মাস হইতে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত যে বাংলা গ্রন্থতালিকা প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে কয়েকটি উল্লেখ-যোগ্য গ্রন্থ বাদ পড়িয়া গিয়াছে এবং কয়েকটি বই যাহা মে মাসের বহু পূর্বে প্রকাশিত তাহা তালিকাভুক্ত হইয়াছে। এবিষয়ে সম্পাদকের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। কারণ এই তালিকা প্রামাণ্য ও যথার্থ না হইলে পাঠকদের আস্থা থাকিবে না।

কল্পনা সাহিত্য। সম্পাদক—সমরেন্দ্রমোহন রায়। ২০ স্ট্র্যান্ড রোড, কলিকাতা। মূল্য ১৷৷৹।

আলোচ্য সংখ্যায় যথারীতি বহু লেখকের গল্প প্রবন্ধ ও কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে প্র-না-বি, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কালিদাস রায় প্রভৃতির রচনা। আর্ট পেপারে একাধিক ফটোগ্রাফ ছাপা হইয়াছে। ইহাতেও একটি সুদীর্ঘ উপন্যাস প্রকাশিত হইয়াছে, লেখকের নাম পার্থসারথী।

সচিত্র ভারত। সম্পাদক—দিলীপ সেন-গুপ্ত, ৮৬ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা—১৩। মূল্য—১৷৹।

হাস্য ও ব্যঙ্গকৌতুকে ভরা গল্প, কার্টুন চিত্র, ছায়াচিত্রের নায়ক-নায়িকাদের একাধিক ফটো হইতেছে এই শারদীয়া সংকলনের বৈশিষ্ট্য। এই সংখ্যায় গল্প লিখিয়াছেন বনফুল, সুবোধ ঘোষ, বিমল কর, অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়, লীলা মজুমদার, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, প্র-না-বি, শৈলজানন্দ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র প্রভৃতি।

শারদীয় বর্ধমান। সম্পাদক—নারায়ণ চৌধুরী। বর্ধমান। দাম—২ টাকা।

শারদীয় বর্ধমান দেখিয়া আমরা প্রীত হইয়াছি। প্রতি বৎসরের মতন বর্তমান বৎসরেও বহু খ্যাতনামা লেখক-লেখিকা ও অপেক্ষাকৃত নবীন লেখকদের রচনাসম্ভারে অভিজাত হইয়া শারদীয় বর্ধমান প্রকাশিত হইয়াছে। সুবোধ ঘোষ, সুশীল রায়, নারায়ণ লেখকদের গল্প কবিতা বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য।

যাত্রী—গোপীমোহন সাহা সম্পাদিত। ১, বিডন স্কোয়ার, কলিকাতা—৬। দাম—৷৵৹ আনা।

নব প্রকাশিত শরৎ সংখ্যা যাত্রী কবিতা প্রবন্ধ ও গল্পে সমৃদ্ধ। পত্রিকা নূতন হইলেও লেখকরা প্রবীণ।

অভিযাত্রী—কুন্দবিকাশ চট্টোপাধ্যায় ও বসন্তকুমার রায় সম্পাদিত। ১৬।১৭, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য ৸৹ আনা।

শারদীয় সংখ্যা অভিযাত্রী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, কালিদাস রায় প্রমুখ কৃতী সাহিত্যিকদের রচনা সম্ভারে সমৃদ্ধ হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

দেবদত্ত—শ্রীপ্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত। ৪।৬৮ চিত্তরঞ্জন কলোনী, কলিকাতা—৩২। দাম—১৷৷৹ টাকা।

শারদীয় সংখ্যা দেবদত্ত কৃষ্ণময় ভট্টাচার্য ও সুনীল ঘোষের রচনাতে ইপূর্ণ। ইহার অন্য কোন আকর্ষণ নাই।

পাতাবাহার। সুভাষ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত। ন্যাশনাল বুক এজেন্সি লিঃ, ১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দু' টাকা।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত ছোটদের এই শারদীয় সংকলন-গ্রন্থখানি পাঠ করে আমরা অত্যন্তই তৃপ্ত হয়েছি। লেখকবৃন্দের মধ্যে আছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুখলতা রাও, লীলা মজুমদার, অন্নদাশংকর রায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, বিমলচন্দ্র ঘোষ, মণীন্দ্র রায়, ননী ভৌমিক, সমরেশ বসু এবং আরও অনেকে। সুকুমার রায়ের একটি অপ্রকাশিত কবিতা সংযোজিত হওয়ায় সঙ্কলনটির মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। ছোটরা যে এই সঙ্কলন-গ্রন্থটি হাতে পেলে খুবই খুশী হবে, তাতে সংশয়ের কারণ নেই।

প্রাপ্তি স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থ আসিয়াছে।

বিজ্ঞান ভারতী—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস।
টলসিল—বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়।
সাহিত্যে সংকট—অন্নদাশংকর রায়।
ইউরোপের চিঠি—অন্নদাশংকর রায়।
বিশ্বের জ্ঞান ভাণ্ডার—ক্যাথারিণ বি শিপেন।
খির বিজুরি—সুবোধ ঘোষ।
স্বপ্নসাধ—হুমায়ুন কবীর।
ভাগলদিঘির মাঠে—পাঁচুগোপাল ভাদুড়ী।
পাতাবাহার—সুভাষ মুখোপাধ্যায়।
মাঠের পুতুল—রূপদর্শী।
স্বপ্নবাসর—গৌরীশংকর ভট্টাচার্য।

পূজোর উপহার তিনটি

পূজোর সময় আমোদের গায়ে জোয়া বাড়িয়ে দেবার জন্য একসঙ্গে এবারে তিনখানি বাঙলা ছবি মুক্তিলাভ করে—"ব্রতচারিণী", "রাতভোর" ও "পরেশ"। পূজো নিয়ে মেতে থাকে বেশির ভাগই ছেলে-ছোকরাদের দল, তাদের অনেককেই সে ক'দিন নতুন ছবিগুলিকে উপেক্ষা করে যেতে হয়েছে। তার ওপর দিন তিনেকের প্রচণ্ড বৃষ্টি ছবিগুলিকে মুক্তিলাভের প্রথম ক'দিন বড়ো মন্দা অবস্থায় ফেলেছিল। পূজো পার হতে বাজার আবার অনেকটা চাঙা হয়ে উঠেছে। পূজোর আমোদের হাটে নতুন নতুন সাজ-পোশাকের সমারোহের মতো নতুন নতুন ছবির সমাবেশ দেখায় ভালো, মানায় ভালো। কিন্তু ব্যবসার কথা ধরলে একেবারে পূজোর সপ্তাহেই নতুন ছবির মুক্তিদান তেমন বিশেষ ফায়দাজনক হয় না। অন্য সময়ে মুক্তিদানের প্রথম সপ্তাহে ছবি দেখতে যে ভিড় হয়, পূজোর সময় তা হয় না, ফলে খুব জোরালো ছবি না হলে প্রথম আরম্ভতেই মন্দা জন-সমাবেশ ছবির সম্ভাব্য চলচ্ছক্তিকে দস্তুরমতো ব্যাহত করে দেয়, অর্থাৎ ছবির গুণাগুণের মাপে যে পরিমাণ দর্শক আসা উচিত, তা রুখে যায়।

* * *

চারুচিত্রের "পরেশ", এমকেজী প্রডাকসন্সের "ব্রতচারিণী" এবং এস বি প্রডাকসন্সের "রাতভোর", তিনেরই কাহিনী প্রকাশিত গ্রন্থ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে এবং তিনখানিরই বিষয়বস্তু সামাজিক। কাহিনীর রচয়িতাবৃন্দ হচ্ছেন যথাক্রমে শরৎচন্দ্র, প্রভাবতী দেবী সরস্বতী এবং স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়। এক জাতের কাহিনী অবশ্য নয়, তবে তিনটেই ব্যক্তি-প্রধান। এক একটি বিশেষ প্রকৃতির চরিত্রকে কেন্দ্র করে ঘটনার বুননী। "পরেশ" ও "রাতভোর" দুটি ছেলেকে নিয়ে গল্প এবং "ব্রতচারিণী"র নায়িকা নারী। "পরেশ" ও "রাতভোর"এর কিছু [illegible] ঝোঁক যেদিকে রাখা হয়েছে, তা [illegible] দুটিরই নাম অন্য কিছু হওয়া [illegible] ছিল। "পরেশ"-এর মুখ্য চরিত্র [illegible] বিচার করলে পরেশ নয়, 'হিরো' [illegible]জ্যাঠামশাই। আর, "রাতভোর"-এর

—শৌভিক—

মুখ্য চরিত্র একটি বালক হলেও ছবির নামটা কেন "রাতভোর" হলো তা অপ্রকাশ থেকে গিয়েছে। ছবি তিনখানি পাশাপাশি ধরলে ওদের শিল্পীদের মধ্যে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়ই পড়বেন সকলের নজরে, কারণ তিনখানিতেই তিনি আছেন এবং প্রায় একই রকমের চরিত্রে। এটা সাবিত্রীর কৃতিত্বেরই পরিচায়ক।

* * *

"পরেশ" শরৎচন্দ্র যেভাবে লিখে গিয়েছিলেন, তা যথাযথ রেখে বেশ নাট্য-বিভূতিযুক্ত একখানি রসসম্পৃক্ত ছবির কাহিনী হওয়া সুবিধাজনক বলে মনে না হওয়ারই সম্ভাবনা। ছবিতে যে কাহিনীটি এবং যেভাবে পরেশকে পাওয়া যায়, তা ছবির আখ্যানবস্তু হিসেবে অননুমোদিত হবার মতো নয়। বরং মূল গল্পের চেয়েও বেশি নাট্য-উপাদান পাওয়া যায় এই চিত্রনাট্যে। এই চিত্রনাট্যটি রচনায় তিন ব্যক্তির হাত রয়েছে—জ্যোতির্ময় রায়, চিত্রনাট্য রচয়িতা হিসেবে; সজনীকান্ত দাস অতিরিক্ত সংলাপ রচয়িতা হিসেবে এবং পরিচালক অজয় কর। ছবিখানির গুণও আছে, দোষত্রুটিও আছে এবং ছবির আখ্যানবস্তুর গঠনে এদের কার ভাগে কি পাওনা, সেটা তাঁরা নিজেরাই ঠিক করে নেবেন।

* * *

ছবি আরম্ভ স্কুল-মাস্টার গুরুচরণকে নিয়ে। পরেশ গুরুচরণের কনিষ্ঠ ভ্রাতার পুত্র। স্ত্রী মারা যাবার পর হরিচরণ পরেশকে তার দাদা এবং মৃত মেজদার বিধবার কাছে ফেলে রেখে প্রবাসে চলে যায়। গুরুচরণের পুত্র পরেশেরই সমবয়সী বিমল। পরেশ ভালো ছেলে, লেখা-পড়ায় তার মন, ক্লাসে ফার্স্ট হয়, তাই জ্যেঠামশাই ও জ্যেঠিমার নয়নের মণি সে। বিমল ঠিক তার উল্টো। হেডমাস্টার হৃষিকেশবাবুর মেয়ে গৌরী প্রায় এই সংসারেরই একজন। পরেশ বড়ো হলে গৌরীকে এ-বাড়ির বৌ করে নিয়ে আসার

অভিলাষ আছে গুরুচরণের। পরীক্ষার সময় বই থেকে টুকে উত্তর লেখার সময় বিমল ধরা পড়ে যায় এবং গুরুচরণের তিরস্কারের ভয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে নিরুদ্দেশ হয়। স্কুলের পড়া সসম্মানে সমাপ্ত করে পরেশ কলকাতায় পড়তে গেল এবং যথাসময়ে সম্মানের সঙ্গে বি-এ'ও পাশ করলে। এর পরেই ওর জীবনে যতো বিপর্যয় ঘনিয়ে এলো। বি-এ'র পর গুরুচরণ ওকে ওকালতি পড়তে পাঠালে; গৌরীর সঙ্গে ওর বিয়েও ঠিক। এই সময়ে হঠাৎ একদিন অন্ধকারে আড়াল দিয়ে গুরুচরণের সামনে উদয় হলো বিমল। গুরুচরণ তাকে তৎক্ষণাৎ বিদেয় করে দিলেন। যাবার সময়ে বিমল একটা ব্যাগ রেখে গেল ফিরে এসে একদিন নিয়ে যাবে বলে। এই সময়ে দীর্ঘকাল পর দ্বিতীয় পক্ষের মুখরা স্ত্রীকে নিয়ে হাজির হলো হরিচরণ। ভাইকে গুরুচরণ স্বাগতম জানিয়ে বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা করে দিলে। হরিচরণ ছুঁচ হয়ে ঢুকে ফাল হতে আরম্ভ করলে। স্ত্রীর সঙ্গে চক্রান্ত করে একই বাড়িতে ভিন্ন সংসার পেতে নিলে। পরেশ তাঁর ছেলে হলেও জ্যেঠামশায় গুরুচরণেরই কথায় চলে এবং তাঁকে মোটেই আমল দেয় না, এটা হরিচরণ এবং তাঁর স্ত্রীর কাছে মর্মান্তিক। হরিচরণ গৌরীর সঙ্গে পরেশের বিয়েতে আপত্তি জানালে। তাঁর ইচ্ছে কলকাতার কোন এক ব্যবসায়ীর কন্যার সঙ্গে পরেশের বিয়ে দেওয়া, যাতে তাঁর হাতে প্রচুর টাকা আসতে পারে। পরেশ তাতে কান দিলে না। হরিচরণ পরেশকে আইন পড়তে নিষেধ করলে; সুপারিশ করলে তাঁর ব্যবসায়ী বন্ধুর অফিসে চাকরি নিতে, যে-বন্ধুর কন্যার সঙ্গেই পরেশের বিয়ে দেওয়ার অভিপ্রায় তাঁর। পরেশ সেকথায়ও আমল দিলে না। হরিচরণের কুটচক্রী ঝগড়াটে স্ত্রী মেজজার সঙ্গে নিত্যই ঝগড়া বাঁধিয়ে সংসারকে অশান্তিতে ভরিয়ে তুললে। হেঁশেল আগেই ভাগ হয়েছিল, এবারে উঠোনের মাঝে বেড়া পড়লো। হরিচরণ এসব ব্যাপার পরেশের গোচর থেকে সরিয়ে রাখায় তৎপর। উল্টে একটা চিঠি জাল করে গুরুচরণকে দেখিয়ে দিলে যে, পরেশ নিজের জন্যে কনে দেখে পছন্দ করেছে, গৌরীকে সে বিবাহ করবে না। গুরুচরণ, হৃষিকেশ এবং সর্বোপরি গৌরী মর্মাহত হলো শুনে। পরেশ কিছুই জানলে না।

*   *   *

মাঝে খোঁজখবর নিয়ে বিমল একদিন পরেশের মেসে গিয়ে হাজির এবং বাবসার নাম করে ওর কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে গেল। টাকা সে প্রায়ই নিয়ে যেতে লাগল। গুরুচরণ সে খবর শুনে পরেশকে নিষেধ করে দিলে এবং বিমলের রেখে-যাওয়া সেই ব্যাগটা বিমলকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্যে সেটা পরেশের হাতে দিলে। পরেশ সেটা কলকাতায় মেসে এনে রাখলে এবং একদিন বিমল আসতে সেটা নিয়ে যাবার জন্যও বললে, কিন্তু বিমল সেটা ওখানেই রেখে চলে যায়। আলাদা হয়ে গেলেও হরিচরণের স্ত্রী তার মেজজাকে অনর্গল ঠেস দিয়ে দিয়ে পাঁচকথা শুনিয়ে যায়। সহ্য করতে করতে একদিন মেজজাও মুখ খুললে, তুমুল ঝগড়ার মাঝে হরিচরণ এসে তাঁর বৌদিকে প্রহার করে বাড়ি থেকে বের করে দিলে। গুরুচরণ আর থাকতে পারলে না, ভ্রাতৃবধূকে দিয়ে হরিচরণের নামে মামলা করলে। বিপদ দেখে হরিচরণ কলকাতায় হাজির হলো পরেশের কাছে এবং তাকে জানালে যে, গুরুচরণ উন্মাদ হয়ে গিয়ে তাঁর নামে মিথ্যা মামলা রুজু করিয়ে দিয়েছে। নানাভাবেই ঘটনা সাজিয়ে হরিচরণ পরেশের কাছে গুরুচরণকে এমন প্রতিপন্ন করিয়ে দিয়েছে যে, পরেশ এবার দেশে গিয়ে তার জ্যেঠামশায়ের সঙ্গে দেখাও করলে না। গুরুচরণ শুনলে পরেশের জ্বর হয়েছে, থাকতে না পেরে দেখা করতে গেল, কিন্তু হরিচরণের স্ত্রী ঝিকে দিয়ে বলে পাঠালে দেখা হবে না। পরেশ অসুখ থেকে যেদিন উঠলো, সেই-দিনই মামলার তারিখ। সকাল বেলা পরেশ বেরিয়ে পথে পথে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরতে লাগল এবং শেষে আর না থাকতে পেরে এলো তার মেজ জ্যেঠাইমার কাছে এবং মজুমদার বংশের কুলবধূ আদালতে সর্বসমক্ষে দাঁড়িয়ে মামলা করলে যে অপমান ও দুর্নাম রটবে, তার গুরুত্ব বুঝিয়ে মেজ জ্যেঠাইমাকে সেইক্ষণেই কাশীতে নিয়ে রেখে এলো। পরেশের এই কাজে হরিচরণ বাঁচলো, তবে তাতে সত্যিই উন্মাদপ্রায় হলো গুরুচরণ। সত্য

ও ন্যায়নিষ্ঠ গুরুচরণ একদিন দুধে জল মেশাবার জন্যে রাগে জ্ঞান হারিয়ে গোয়ালিনীকেই প্রহার করে বসলো। এই ঘটনায় হরিচরণের চেতনা ফুটলো, দাদাকে এমন অবস্থায় দেখতে হবে, সে ভাবেনি। কলকাতায় আর এক কান্ড ঘটে গেল। বিমল ও তার একজন সংগী ধরা পড়লো ডাকাতির অপরাধে। বিমলের কাছ থেকে অস্ত্রশস্ত্রের খোঁজ নিতে তার কথায় পুলিস হাজির হলো পরেশের মেসে এবং বিমলের সেই ব্যাগ থেকে অস্ত্র পেয়ে পরেশকেও ঐ ডাকাত দলের একজন বলে চালান দিলে। জটিল সংকট। গুরুচরণ যদি সাক্ষী দিয়ে ব্যাগের কথা জানায়, তাহলেই পরেশ রক্ষা পায়। কিন্তু হরিচরণ চেষ্টা করেও পারলে না গুরুচরণের সম্বিৎ ফিরিয়ে আনতে। হেডমাস্টার হৃষিকেশও চেষ্টা করলে, পারলে না। শেষে গৌরী গিয়ে কেঁদে পড়লো গুরুচরণের বুকে। গুরুচরণের সাক্ষ্যতে পরেশ ছাড়া পেলো, বিমলদের দীর্ঘদিনের জেল হয়ে গেল। আদালতের জনতার মধ্যে গুরুচরণকে পাওয়া গেল না। ওরা ছুটলো গ্রামে। তন্ন তন্ন করে খুঁজলে, পাওয়া গেল না গুরুচরণকে। শেষে একটা অবিশ্বাস্য সূত্র পাওয়া গেল—খেমটা নাচের আসরে নাকি গুরুচরণকে বসে থাকতে দেখা গিয়েছে। তাকে পাওয়া গেল সেইখানেই। একটা জরাজীর্ণ স্থবির। পরেশ লুটিয়ে পড়লো তার পায়ে।

* * *

বেশ ছিমছাম চেহারার নাট্য-সম্পাদানযুক্ত ছবি। সমষ্টিগতভাবে এবং একক অভিনয়কৃতিত্ব ও সুষ্ঠু কলা-কৌশলের কাজ, বিশেষ করে ক্যামেরার কারিত ছবিখানিতে বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলেছে। পরিচালনায়ও রসাশ্রিত নাট্য-মুহূর্ত সৃষ্টি করার মতো কল্পনাশক্তি-সম্পন্ন একটা মৌলিক চিন্তাশক্তির কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। ঘটনাকে নিয়ে বেশ খেলিয়ে দেওয়া হয়েছে, ঘুটোবার সময় গোলমাল একটু পাওয়া যায়। গুরুচরণ গোয়ালিনীকে মারার পরই তাকে হতবাক্ উন্মাদপ্রায় দেখেই হরিচরণের এতোদিনকার মনোবৃত্তির সংগে সংগেই পরিবর্তনটা অসংগতরকমের আচমকা। বিমলের ব্যাগটা নিয়ে একটা সাসপেন্স ঘনীভূত পাওয়া যায়, মনে বেশ একটা কৌতূহল পাকিয়ে তোলে। বিমলরা ধরা পড়লো এক গণিকালয়ে একটা ডাকাতির মতলব করার সময়, কিন্তু এমনভাবে পুলিসের হামলাটা সংঘটিত হলো যাতে ব্যাগের সেই রহস্যটা যেন হঠাৎ উবে গেল। অবশ্য শেষের নাট্য পরিণতি ওই ব্যাগটি নিয়েই, গুরুচরণকে দিয়ে ঐটির সনাক্তকরণ যার ওপর নির্ভর করে ছিল পরেশের মুক্তি। গল্পের ঝোঁকটা ছবি আরম্ভ হবার প্রথম দৃশ্য থেকেই গুরুচরণেরই ওপরে নিবন্ধ; গুরুচরণেরই অবস্থা ও আচরণকেই সবচেয়ে বেশী গণ্য করা হয়েছে। সেদিক থেকে ধরলে ছবির নাম 'পরেশ' ঠিক খাপ খায় না। ছবিখানির বিন্যাস ব্যাপারে আরও দু'একটি বলবার কথা আছে। বালক বয়সে বিমল বাড়ি থেকে পালিয়ে
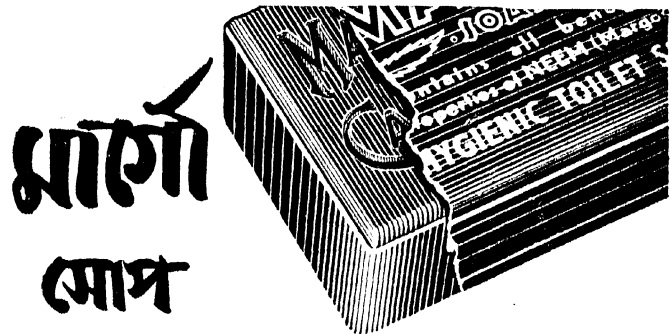
যাবার পর প্রথম তার বাবার সঙ্গে দেখা করলে বেশ কতক বছর পর; তার চেহারায় স্বভাবতই পরিবর্তন ঘটেছে যথেষ্টই কিন্তু অন্ধকারের আবছায়ায় দাঁড়িয়ে থাকলেও গুরুচরণ তাকে ঠিক সনাক্ত করলে; তেমনি পরেশও বহু বৎসর পর হলেও তাকে দেখামাত্রই চিনলে। এর মধ্যে অস্বাভাবিকতার একটা আঁচ পাওয়া যায়। এছাড়া গল্পের স্বভাবটা একটু যেন বেশী নির্মম করে তোলা হয়েছে। তার জন্যে ভুগতে হয়েছে বেশী গুরুচরণকে। পরেশকে হারিয়ে হরিচরণ এমন হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হয়ে পড়লো যে তার মতো সত্য ও ন্যায়নিষ্ঠ শান্তপ্রকৃতির শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি গোয়ালিনীকে প্রহার করে বসলো কিন্তু তাই বলে দিকবিদিকজ্ঞানশূন্যে দেখাবার জন্যে তাকে খেমটার আসরে হাজির না করালেই ভালো হতো; ওটা কীর্তন বা কথকতা জাতীয় আসর হলে ক্ষতি কি হতো?—খেমটার চেয়ে সেটা পরিচ্ছন্নও তো হতো!

* * *

শিল্পী অনুযায়ী চরিত্রবণ্টনে পরিচালক চমৎকার রসবেত্তার পরিচয় দিয়েছেন। পরিচিত ও জনপ্রিয় শিল্পীরাই রয়েছেন বেশীর ভাগই কিন্তু সচরাচর তাদের একজনকে যে ধরনের চরিত্রে দেখা যায় বা যে শিল্পী যে-প্রকৃতির চরিত্রাভিনয়ে নাম করেছেন এখানে তাদের ঠিক তার বিপরীত ধরনের চরিত্রে দেখা যায়। এই পরিবর্তন শিল্পীদের নতুন করে দেখবার সুযোগ করে দিয়েছে। নিজেদের অন্যরকমের চরিত্রে প্রকাশ করার সুযোগটা শিল্পীরাও প্রভূত কৃতিত্বের সঙ্গেই খাটিয়ে নিয়েছেন এবং কয়েকজনের চরিত্রাভিনয় তো স্মরণীয় হয়ে থাকার মতো। এদের মধ্যে গোড়াতেই গুরুচরণের চরিত্রে পাহাড়ী সান্যালের নাম মনে এসে পড়বে, ওর অংশ সবচেয়ে বড়ো ও বেশী বলেই নয়, চরিত্রটিকে অসাধারণ কৃতিত্বের সঙ্গে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন বলেই মনে থাকবে। আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত পরেশকে কেন্দ্র করে গুরুচরণের মধ্যে ধাপে ধাপে যে ভাবান্তর এবং আচরণের পরিবর্তন ঘটেছে তা তার অভিনয়ে অত্যন্ত নাটকীয়ভাবেই ফুটে উঠেছে। হরিচরণের ঝগড়াটে দাম্ভিক স্ত্রীর চরিত্রে মঞ্জু দে এবং সংসারেরই একজন এমনি এক দরদী ঝিয়ের চরিত্রে মলিনা দেবী—তাদের এই ভিন্নপ্রকারের চরিত্রাভিনয়ে দর্শকদের চমৎকৃত ও বিস্মিত করে তোলেন। এদের ক'জনের অভিনয় ছবিখানির আকর্ষণ অনেক বাড়িয়েছে। তাছাড়া রোমান্সের দিকে নামভূমিকায় নির্মলকুমার ও গৌরীর চরিত্রে সাবিত্রীরও অভিনয় কৃতিত্ব মনকে ধরে রাখার মতোই জোরালো। ক্রূর ও কুচক্রী হরিচরণের চরিত্রে গঙ্গাপদ বসু ভিলেন চরিত্র সৃষ্টিতে তার অভিনয়কে বেশ বৈশিষ্ট্যের সঙ্গেই ফুটিয়েছেন। তবে দুর্বৃত্ত হরিচরণ পরিণামের হাত থেকে বড়ো সহজে রেহাই পায়। মেজজেঠাইয়ের চরিত্রে শোভা সেন প্রথমে সহনশীলা মৌন এবং পরে ছোটজায়ের পীড়নে অতিষ্ঠা হয়ে পড়ার অভিনয়ে মনের ওপরে রেখাপাত করে যান। জহর রায় ছোট একটি গ্রাম্য চরিত্রে হাসি ফোটানোয় বৈশিষ্ট্য দেখিয়েছেন। বিমলের চরিত্রে অভিনয় করেছেন প্রেমাংশু বোস; দুর্বৃত্তের চেহারাটা ফুটিয়েছেন ভালো। আদালতে দুই উকীলের চরিত্রে ননী মজুমদার ও ধীরাজ দাস অভিনয়গুণে দৃষ্টিতে পড়বেন। এরা ছাড়া আর অভিনয়ে আছেন কমল মিত্র, তুলসী চক্রবর্তী, প্রীতি মজুমদার, নৃপতি, শিবকালি, সুখেন, হরিমোহন, ঋষি বন্দ্যোপাধ্যায়, বেচু সিংহ, লীলাবতী, শান্তা প্রভৃতি।

* * *

[illegible] আলোকচিত্র গ্রহণের কাজে পরিচালক [illegible] ছবির কলাকৌশলের মান বাড়িয়েছেন বললে অত্যুক্তি হয় না। কোন কোন দৃশ্যের কাজ দেখে বাহবা দিয়ে উঠতে ইচ্ছে করে। দৃশ্য রচনার মধ্যেও বেশ একটা বৈশিষ্ট্য আছে। সংগীতের দিকটা গ্রাম্য পরিবেশের মতো নয়, ঠিক খাপ খায়নি। গানের পরিবেশনে একটু বম্বাই-ধারা পরিচালনার এক দুর্বলতা। সংগীত পরিচালনা করেছেন অনুপম ঘটক। শব্দ গ্রহণ করেছেন বাণী দত্ত; ভালো কাজ হয়েছে। কলাকুশলীদের অন্যান্যেরা হচ্ছেন শিল্পনির্দেশে কার্তিক বসু, সম্পাদনায় কমল গাঙ্গুলী, গান রচনায় গৌরীপ্রসন্ন ও শিশির সেন।

* * *

"ব্রতচারিণী"র গল্প অতি পুরনো ধাঁচের। ছবির আরম্ভ একটা পার্টির দৃশ্য নিয়ে। অধ্যাপক কন্যা দেবযানীর জন্মোৎসব। অভ্যাগতাদের মধ্যে প্রধান হলো কয়েকজন মেমসাহেব। অধ্যাপকের ছাত্র জ্যোতি দেবযানীর পাণিপ্রার্থী হলো। এদের পরস্পরের জাত ধর্ম আলাদা। জ্যোতির দাদু বিহারীলাল জ্যোতির জন্য পাত্রী আগেই নির্বাচন করে রেখেছিলেন এবং সীতাকে তিনি বাড়িতে এনে রাখেন। জ্যোতি সীতাকে বিয়ে করতে অসম্মতি জানিয়ে দাদু ও মা ঈশানীর মনে আঘাত দেয়। জ্যোতি দেবযানীকে বিয়ে করলেও সীতা জানায় যে সে একবার যাকে পতি-রূপে গণ্য করেছে আনুষ্ঠানিকভাবে বিবাহ সম্পন্ন না হলেও তাকেই সে পতি আসনে বসিয়ে রাখবে; আর কাউকে বি করবে না। সীতা সেই গৃহেই থে গেল বিহারীলাল ও ঈশানীর স্নেহে আশ্রয়ে। গোলমাল বাঁধলো বিহারীলালে কনিষ্ঠ পুত্রের বিধবা জয়ন্তী হঠা কলকাতা থেকে ও-বাড়িতে আসার পর সীতার গৃহিণীপনা জয়ন্তীর কা অসহ্য হলো। জয়ন্তীর মেয়ে ইভা কি ভিন্ন প্রকৃতির; সীতার সঙ্গে সহজেই মানিয়ে নিলে। জয়ন্তীর কাছে সীত লাঞ্ছনা দেখে ঈশানী অসুখে পড়লো এ মারা গেল। জ্যোতি তখন বিলে ব্যারিস্টারী পড়তে গিয়েছে। বিলে থেকে ফিরে জ্যোতি দেবযানীকে অন্যর দেখলে; তার ওপরে দেবযানীর স্বাস টান যেন কম। মাঝে জয়ন্তী ইভ

পারিজাত থিয়েটার্সের "দৃষ্টি"র নায়িকা কাবেরী বসু

বিবাহের জন্য বিহারীলালের কাছ থেকে টাকা চায়, কিন্তু বিহারীলাল সীতার মাসতুতো ভাই প্রশান্তর সঙ্গে ইভার বিয়ের প্রস্তাব করায় জয়ন্তী কন্যাকে নিয়ে কলকাতায় চলে আসে এবং এক মাতালের সঙ্গে ইভার সম্বন্ধ করে। এ খবর পেয়ে মর্মাহত হয়ে বিহারীলাল অসুখে পড়ে মারা যায়। মৃত্যুর পূর্বে সমস্ত সম্পত্তির মালিক করে যায় সীতাকে। জ্যোতি ইভার এই বিয়ে বন্ধ করে অন্য পাত্রে বিয়ে দিতে পণের টাকার জন্য সীতার কাছে যায়। গ্রামে গিয়ে জ্যোতি বসন্ত রোগে পড়ে। খবর পেয়েই দেবযানী স্বামীর প্রতি কর্তব্যে সজাগ হয় এবং গ্রামে গিয়ে সীতার পাশে থেকে স্বামীর শুশ্রূষায় প্রাণ ঢেলে দেয়। জ্যোতি আরোগ্য লাভের পর ইভার সঙ্গে প্রশান্তর বিয়ে হয় এবং সীতা স্বামী ও দেবযানীর হাতে সর্বস্ব তুলে দিয়ে গৃহত্যাগ করে।

* * *

ইনিয়ে বিনিয়ে অত্যন্ত দীর্ঘ পথ ধরে ঘটনাকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বিন্যাসের লক্ষ্য দেখা গেলো কেবলমাত্র একটি দিকেই—যেমনভাবেই হোক খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ঘটনাকে এমন স্তরে রেখে দেওয়া যাতে কান্নার আবেগই প্রবলধারায় প্রবাহিত হয়ে যেতে পারে। আর এ বিষয়ে অভিনয়শিল্পীবৃন্দ পরিচালককে খুবই সহায়তা দিয়েছেন। যতো কান্নার দরকার তার চেয়ে তারা বেশীই পরিবেশন করেছেন, কম বলে আক্ষেপ করবার সুযোগ রাখেননি তারা। কাঁদুনে আবেগকে জাগিয়ে রাখার মতো করে ধাপে ধাপে ঘটনা জুগিয়ে যাওয়া। জ্যোতির বিলেত থেকে ফেরা উপলক্ষে উৎসব, ঠিক সেইক্ষণেই প্রশান্তর আবির্ভাব এবং জ্যোতিকে তার মায়ের মৃত্যু সংবাদ জ্ঞাপন। জ্যোতির সঙ্গে বিবাহ অনুষ্ঠিত না হলেও সীতাকে পুত্রবধূরূপে জ্ঞান করা, বিশেষ জ্যোতি যখন অন্যত্র বিবাহ করেছে তখন এটা অসংগত ও অশোভনীয়। বিহারীলাল জ্যোতির ওপর রাগ করে সীতাকে সমস্ত সম্পত্তি দিয়ে যেতে পারে, কিন্তু তাকে পুত্রবধূরূপে গণ্য করে কি হিসেবে? শুধু তাই নয় বিবাহানুষ্ঠান দ্বারা পরিবারের একজন না হলেও সীতাকে সমগোত্রীয় বলে ধরে নিয়ে সে বংশের চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী বিহারীলাল সীতাকে দিয়েই পুজোর ভোগ রাঁধা সিদ্ধ বলে গণ্য করলো! সীতাকে ভোগ রাঁধতে দেখে জয়ন্তী প্রতিবাদ করলে লাঞ্ছনার ভাবায়, তাই দুঃখে ঈশানী অসুখে পড়ে মারা গেল। তেমনি বিহারীলালের মৃত্যু ঘটানো হলো ইভার সঙ্গে এক মাতালের বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছে জানিয়ে। জ্যোতি বিলেত থেকে ফেরবার পরই দেবযানীর আচরণ যে কেন ওর ওপর বিগড়ে গেল তার কোন স্পষ্ট যুক্তি নেই। জ্যোতির মনকে সর্বদিক থেকে

উত্যক্ত দেখানো দরকার সেইজন্যই যেন দেবযানীর অমন বিরূদ্ধ আচরণ। মঞ্চের নাটকের মতো ঝাঁকুনি দিয়ে দিয়ে নাটকীয়তা সৃষ্টির লক্ষণ দৃশ্য সাজানোতেও যেমন তেমনি সংলাপের মধ্যেও। অত্যন্ত দীর্ঘায়িত ঘটনার চাল এবং একইভাবে আবেগ সৃষ্টি হতে থাকায় শেষের দিকে মন হাঁপিয়ে ওঠে। অসংগতিও আছে। জ্যোতির মা ঈশানীর ঘরে প্রবেশের আগে ইভা জুতো পায়ে বলে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে রইলো, যেন জুতো খুলে ঘরে প্রবেশের কায়দা সে জানে না! বিহারীলাল মারা যেতে ইভার মা জয়ন্তী টেলিগ্রামে সে খবর পেল, কিন্তু জ্যোতি পেলে সীতার পত্র—তার কারণ? প্রশান্তর সঙ্গে ইভার বিয়ে নিয়ে ঘটনাবলী সুন্দর একটা প্রণয়মূলক পরিবেশের মধ্যে নিয়ে গিয়ে শেষে ইভার বিয়ে এক-জন মাতালের সঙ্গে ঠিক করে এমন ট্র্যাজেডীর সুর এনে দেওয়া হলো যার ফলে বিহারীলালের মৃত্যু, অথচ এরপর থেকে এদের অংশ গল্পতে চাপা পড়ে রইলো। শেষে সীতার সর্বস্ব ত্যাগ করে চলে যাওয়া বেশ নাটকীয়ভাবেই উপ-স্থাপিত হয়েছে। সবায়ের চোখ ছলছল, বেদনায় আকুল মন, কিন্তু এ ট্র্যাজেডীটা জ্যোতির বিবাহিত স্ত্রী রয়েছে বলেই ঘটাতে হয়েছে সেই ভাবটাই যেন মনে জেগে ওঠে। তখন আগাগোড়া বিষয়-বস্তুটাই কেমন যেন অসার বলে মনে হয়।

* * *

দীর্ঘ ছবি, অনেক অবান্তরতা ও অসংগতি সত্ত্বেও কিন্তু মনকে টেনে ধরে রাখবার একটা ক্ষমতা বরাবরই আছে। দৃশ্যগুলি নাটকীয়তা সৃষ্টির মতো করে এমনভাবে সাজানো এবং শিল্পীবৃন্দও তাদের অভিনয় ক্ষমতার এমনি বলিষ্ঠ পরিচয় দিয়ে গিয়েছেন আগাগোড়া যে ছবিখানি দেখতে দেখতে আবেগ উচ্ছ্বলিত হয়ে উঠবেই। এ বিষয়ে পরিচালক সম্পাদক কমল গাঙ্গুলীর কৃতিত্ব স্বীকার করতেই হবে। তাছাড়া কতক-গুলি দৃশ্যরচনা এবং ঘটনা উপস্থাপনেও তার ক্ষমতা উপলব্ধি করা যায়। দেখার পরে মনকে থিতিয়ে বিচারপ্রবণ করে নিয়ে অনেক দুর্বলতা ও ত্রুটি ধরা পড়ে যাবে, কিন্তু দেখতে দেখতে নাটকীয় ভাবাবেগের প্রবাহে গড়িয়ে যাওয়া থেকে মনকে বাগিয়ে রাখা যায় না। অভিনয়ে সীতার চরিত্রে সন্ধ্যারাণীর অভিনয় সর্বোত্তম হলেও অন্যান্যদের অভিনয়ও ছবিখানিতে প্রাণ সঞ্চারিত করে রাখতে বড়ো কম সহায়তা করেনি। ক্ষমতাবান শিল্পীদের অনেকেই আছেন ভূমিকা-লিপিতে, যথা—উত্তমকুমার, অহীন্দ্র চৌধুরী, অসিতবরণ, ছবি বিশ্বাস, অনুভা গুপ্তা, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, মলিনা দেবী, ছায়া দেবী, চন্দ্রাবতী দেবী প্রভৃতি। এদের কারুর কারুর অভিনয় মঞ্চাভিনয়ের মতো অতিভাবযুক্ত হলেও সমগ্রতার বিচারে বেশ প্রাণ সঞ্চার করেছে চরিত্রগুলিতে। হাল্কা রস সৃষ্টির পরিসর বিশেষ রাখা হয়নি। কেবল ভানু বন্দ্যো-পাধ্যায় আছেন ভৃত্যের চরিত্রে এবং ওকে দেখে যেটুকু হাসা যায় সেইমাত্র।

* * *

কলাকৌশলের দিকে কাজ মাঝা-মাঝি শ্রেণীর। কুশলীবৃন্দের মধ্যে আছেন চিত্রনাট্য রচনায় মনি বর্মা, গান রচনায় প্রণব রায়, আলোকচিত্রগহণে অনিল গুপ্ত, শব্দগ্রহণে নৃপেন পাল, শিল্পনির্দেশে কার্তিক বসু ও সংগীত পরিচালনায় কমল দাশগুপ্ত। সংগীতের দিকে উল্লেখ করার মতো কোন বৈশিষ্ট্য নেই। সীতার যে চরিত্র দাঁড় করানো হয়েছে তার মুখে কোন গানই শোভা পায় না।

* * *

"রাতভোর" নববতী মৃণাল সেনের পরিচালনায় প্রথম প্রচেষ্টা। কিন্তু দেখা গেল গোড়াতেই তিনি ভুল করেছেন কাহিনীটির নির্বাচনে। গ্রামের একটি দুরন্ত ছেলে কলকাতার এলো এক অধ্যাপকের সঙ্গে। কিন্তু দেখলে গ্রামে দুষ্টুমী করার জন্যে লোকের কাছে শাস্তি পেতো, কিন্তু শহরে তাকে দেখেই বাড়ির গৃহকর্ত্রী এবং অন্যান্যরা মারমুখো। তার ওপর নিপীড়নের সীমা নেই। এই অবস্থায় পালিয়ে দেশে চলে যাওয়ার সূত্রে তার মৃত্যু হয়। গল্পটি বা চরিত্রটির মধ্যে এমন কোন বৈশিষ্ট্য পাওয়া গেল না যার জন্যে ছবিতে পরিবেশিত হবার যোগ্য বলে মনে করা যায়। আর পরি-চালনায় আন্তরিকতাটুকু ছাড়া, মৌলিক চিন্তা ও কর্মদক্ষতাও বা যদি তেমন থাকতো তাহলেও মূল গল্পের দুর্বলতা হয়তো অনেক কাটিয়ে ওঠা যেতো, কিন্তু সেদিক থেকে তেমন কোন জোর নেই। ঘটনা বৈচিত্র্যের মধ্যে দিয়ে গল্পকে এগিয়ে নিয়ে যেতেই পারেননি পরিচালক চিত্রনাট্যকার। এ ছবির বিস্তারিত বিশ্লেষণ নিষ্প্রয়োজন। কলাকুশলীদের মধ্যে এতে আছেন সংগীত পরিচালনায় সলিল চৌধুরী। এঁর সুর দেওয়া কয়েক-খানি গান বেশ ভালো লাগবে। আর ভালো লাগবে রামানন্দ সেনগুপ্তের আলোকচিত্রগ্রহণ। বেশ উদ্যমানের কাজ দেখিয়েছেন। কিন্তু গল্পই যদি না জমলো তো এদের কৃতিত্বের আর মূল্য বুঝবে কে! অন্যান্যদের মধ্যে আছেন গান রচনায় গৌরীপ্রসন্ন, শব্দগ্রহণে শচীন চক্রবর্তী (বড়ো জড়ানো সংলাপাংশ), শিল্পনির্দেশে বটু সেন এবং সম্পাদনায় রমেশ যোশী। চরিত্রগুলি দাঁড়াবার মতো শক্তি পায়নি বিন্যাস-দোষে, নয়তো ভালো অভিনয় ফোটাবার আভাস পাওয়া গিয়ে-ছিল কয়েকজনের ক্ষেত্রে। এদের মধ্যে পড়েন শোভা সেন, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, ছবি বিশ্বাস, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, উত্তমকুমার প্রভৃতি। মুখ্য চরিত্র লোটনের ভূমিকায় মানিককে মন্দ লাগবে না। জহর রায় যাত্রাদলের অধিকারীর চরিত্রে প্রভূত হাসি উপভোগের একটু সুযোগ এনে দেন। আর অভিনয়ে আছেন বীরেন চট্টোপাধ্যায়, ছায়া দেবী, স্বাগতা চক্রবর্তী, শান্তা দেবী, ধীরাজ দাস, শ্যামল, কেষ্ট মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি।

প্রগতির পরিচয়—স্ট্যানভ্যাক কুইজ—১
দেশের সর্বসাধারণের জীবন-যাত্রার মান উন্নয়নের জন্যেই ভারতের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, একথা আপনি জানেন। কিন্তু প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এ পর্যন্ত দেশের কতখানি উন্নতি হয়েছে তার খবর রাখেন কি? এসব প্রশ্ন ও উত্তরগুলোর সঙ্গে আপনার ধারণা পরখ করে দেখুন।
১ ১৯৫৩-৫৪ সালে ভারতবর্ষ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নির্ধারিত পরিমাণের চেয়ে বেশী চাল উৎপাদন করেছে। তিন বছরে চালের উৎপাদন বেড়েছে:
ক) ১,৪৬০,০০০ টন
খ) ৪,২৫০,০০০ টন
গ) ৬৩৭,০০০ টন
২ তুলা ভারতের অতি-প্রয়োজনীয় কৃষিজ দ্রব্য। ১৯৫৪-৫৫ সালের মধ্যে তুলার জমির আয়তন বেড়েছে:
ক) ১,২৫২,০০০ একর
খ) ৩,৭৪৬,০০০ একর
গ) ৬২৪,০০০ একর
৩ মূল পরিকল্পনার অন্তর্গত কতগুলি ছোটখাটো পরিকল্পনাও আছে—এগুলোর উদ্দেশ্য ভারতের আত্মসচ্ছলতা এবং বিদেশী মুদ্রা সঞ্চয়। ১৯৫৪-৫৫ সালে ভারতে তৈরী কাঁচের জিনিস রপ্তানীতে আয় হয়েছে:
ক) ৬ লক্ষ টাকা
খ) ১২ লক্ষ টাকা
গ) ২০.৪ লক্ষ টাকা
৪ শিল্পক্ষেত্রেও ভারতের উৎপাদন ক্রমেই বেড়ে চলেছে। ১৯৫৪-৫৫ সালে বাইসিকল তৈরী হয়েছে:
ক) ৩৭২,৩৬৫
খ) ৬০,২৬০
গ) ১২৪,১২০
স্ট্যাণ্ডার্ড-ভ্যাকুয়াম ভারতের প্রগতির পরিচায়ক এই তথ্য পরিবেশন করতে পেরে আজ গর্বিত—তা ছাড়া আমাদের পেট্রলজাত দ্রব্য উৎপাদন, পরিশোধন ও পরিবেশনের বিবিধ কর্মধারা দেশের এই অগ্রগতির সহায় বলে স্ট্যাণ্ডার্ড-ভ্যাকুয়াম আজ গৌরবান্বিত।
উত্তর
১ ৪,২৫০,০০০ টন—দেশের প্রত্যেক নারী, পুরুষ ও শিশুর জন্যে মাথাপিছু অতিরিক্ত ২৫½ পাউণ্ড!
২ ৩,৭৪৬,০০০ একর—পরিকল্পনা শুরুর প্রতি চার একর হিসেবে এক একর ক'রে অতিরিক্ত তুলাচাষের জমি!
৩ ভারতীয় কাঁচের বাসন রপ্তানীতে ২০.৪ লক্ষ টাকারও বেশী আয় হয়েছে—ফলে, অত্যাবশ্যক বিদেশী মাল আমদানীর জন্যে বিদেশী মুদ্রা হাতে পাওয়া গেছে!
৪ ৩৭২,৩৬৫ বাইসিকল—চারবছর আগেকার তুলনায় তিনগুণের বেশী!
নয়াদিল্লীতে ইণ্ডিয়ান ইণ্ডাস্ট্রীজ ফেয়ার দেখুন, ২৯-এ অক্টোবর থেকে ১৫ই ডিসেম্বর
V 2429

একলব্য

কলকাতায় খেলার মাঠ প্রায় নিস্তব্ধ। ছ' মাসের জন্য ফুটবল কুম্ভকর্ণের শয্যা নিয়েছে। বিদেশের কোন দল রণাঙ্গনে হাজির হলে ঘুম ভাঙিয়ে তাকে তুলতে হবে। হকির এটা অকাল। নিরুদ্দেশের বিজ্ঞাপনে সাড়া দেবার মত মরসুমের ডাকে ক্রিকেট সাড়া দিলেও লাজুক ছেলের মত আসরে হাজির হতে পারছে না; তল্পিতল্পা বেঁধে আগমনের দিন গুনছে শুধু। টেনিসেরও সেই হাল। শীতের আভাস

পাকিস্থানের কৃতী ব্যাটসম্যান ওয়াকার হাসান—ওয়াকার নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টে ১৮৯ রান করেছেন

পেতেই গ্রীষ্মকাতর ব্যাডমিণ্টনও উঁকিঝুঁকি মারছে। সুতরাং ময়দানে বড় রকমের কোনো খেলাধুলা নেই। বড় রকমেরই বা বলি কেন? ছোট খেলাই বা ময়দানে কি আছে? যা আছে তাতে সাধারণের কোনো আকর্ষণ নেই বলা চলে। বাস্কেটবল ক'জনেই বা খেলে, আর তা দেখতেই বা যায় ক'জনে। খেলার আসরে ধীরে ধীরে মাথা গলাতে চেষ্টা করলেও ময়দানে কৌলীন্যের মর্যাদা পেতে বাস্কেটবলের অনেক দেরী। আর ময়দানে এখনকার খেলার মধ্যে আছে গলফ্ খেলা। অবশ্য খেলা নয়, খেলার রেওয়াজ। আর সে রেওয়াজ তো মুষ্টিমেয় কতিপয় ময়দান-বিহারীর বিলাসের উপকরণ। সঙ্গী না হলেও রেওয়াজের বাধা নেই। একটা 'বলবয়' বা নিদেনপক্ষে একটা 'ট্রেণ্ড' কুকুর হলেই যথেষ্ট। পিঠে একটা তূণ বাঁধ, তার মধ্যে দু' একখানা স্টিক নাও; আর সঙ্গে নাও একটি কি দু'টি বল। তারপর ময়দানের নির্জন প্রান্তে গিয়ে রেওয়াজ করো; গায়ের জোরে আর কব্জির কসরতে বল মারো, বলবয় বা কুকুর দৌড়িয়ে দিয়ে বলটিকে ফিরিয়ে আন, আবার মারো। ব্যাস্! এতে সাধারণ ক্রীড়ামোদীর আনন্দ কোথায়? সাধারণের পক্ষে সম্ভবও নয় এ খেলার রেওয়াজ করা। ভারতপ্রবাসী শ্বেতচর্মের স্বপ্নবিলাসীর পক্ষেই গলফের একক রেওয়াজের মধ্যে কল্পনার জাল বুনে আনন্দের পালতোলা নৌকো-বিহার সম্ভব। গলফে ভারতবাসীর কোনো আগ্রহ নেই।

* * * *

ময়দান পাড়ার ঘরে ঘরে এখন ক্রিকেটের প্রস্তুতি। শীতের আমেজের সঙ্গে সঙ্গে মনেও রঙ ধরেছে। ক্রিকেটের নেশায় মেতে উঠেছে সবাই। ক্লাবের আশেপাশে তারই গুঞ্জরণ। ক্রিকেট বিজ্ঞানসম্মত খেলা। এর বিভিন্ন মারের মধ্যে আছে বিজ্ঞানের দুরূহ নিয়মকানুনের মূর্ত প্রকাশ। উপকরণে ত্রুটি থাকলে ক্রিকেট খেলা জমে না। খেলোয়াড় এবং ক্রীড়ারসিকও খেলা থেকে পায় না কোনো আনন্দ। তাই সব ক্লাবেই চলছে এখন ক্রিকেটের প্রস্তুতি। নতুন মাটি ফেলে, ঘাস লাগিয়ে, জল ছিটিয়ে খেলার 'পিচ' তৈরী করা হচ্ছে। ফুটবলের দাপটে ক্ষত-বিক্ষত অসমান মাঠের ছোট ছোট খানা-ডোবা ভরাট করে মাঠকে করা হচ্ছে সমতল। ব্যাটে তেল মাখিয়ে তার পরমায়ু বাড়ানো হচ্ছে, ব্যাটকে করা হচ্ছে খেলার উপযোগী। পায়ের প্যাড ও হাতের ছেঁড়া দস্তানা প্রয়োজন মত মেরামত করা হচ্ছে, সংগ্রহ করা হচ্ছে ক্রিকেট খেলার নতুন উপকরণ।

ফুটবলের মত ক্রিকেটে অবশ্য মাতামাতি

দ্বিতীয় টেস্টে নিউজিল্যাণ্ডের দুই কৃতী ব্যাটসম্যান ম্যাগ্রেগর ও হারফোর্ড

নেই। এ খেলার রসপিপাসু দর্শকের সংখ্যাও কম, কিন্তু ক্রিকেট যে খেলার রাজা—একথা কেউ অস্বীকার করে না। যারা এ খেলা খেলে, তারা এর থেকে প্রচুর আনন্দ পায়, আর রসিক দর্শক ক্রিকেটের মধ্যে প্রত্যক্ষ করে শিল্পীর সৌন্দর্য। ক্রিকেট সত্যিই খেলার রাজা।

কোনো বৈদেশিক দল আসর গরম না করলে বা রনজি প্রতিযোগিতার বাংলার সঙ্গে কোনো শক্তিশালী দলের খেলা না থাকলে কলকাতার ক্রিকেট তেমন জমে না।

নিউজিল্যাণ্ড ও পাকিস্থানের দ্বিতীয় টেস্টে একমাত্র ডাবল সেঞ্চুরীর অধিকারী ইমতিয়াজ আমেদ

শুধু সি এ বি লীগ ও ক্লাব ক্রিকেটের মধ্যে দর্শক সমাজের যা আনন্দ। গতবার বাইরের কোনো দল খেলতে না আসায় কলকাতায় ক্রিকেট আসর মোটেই জমেনি। এবার নিউজিল্যাণ্ডের ভারত সফরের ফলে ক্রিকেট মরসুমে কিছু বৈচিত্র্য দেখা যাবে বৈ কি। নিউজিল্যাণ্ডের সঙ্গে ভারতের চতুর্থ টেস্ট খেলা অনুষ্ঠিত হবে কলকাতায়। পাঁচ দিন ব্যাপী এই টেস্ট খেলা ৩০শে ডিসেম্বর 'ইডেন গার্ডেনে' আরম্ভ হবার কথা। নিউজিল্যাণ্ড ক্রিকেট দলের শক্তি সম্পর্কে ধারণা করা গিয়েছিল, এখন দেখা নিউজিল্যাণ্ড ক্রিকেট টীম তেমন শক্তিশালী নয়। পাকিস্থানে দু'টি টেস্ট নিয়ে এ পর্যন্ত চারটি খেলায় অংশ গ্রহণ এই চারটি খেলার মধ্যে তিনটি খেলায় স্বীকার করতে হয়েছে নিউজিল্যাণ্ড চীফ্ কমিশনারের দলের সঙ্গে তাদের উদ্বোধনী খেলা অমীমাংসিতভাবে হয়। তারপর প্রথম টেস্টে পাকিস্থান এক ইনিংস্ ও এক রানে নিউজিল্যাণ্ডকে পরাজিত করে। পাকিস্থানের প্রধান দলের কাছেও নিউজিল্যাণ্ডকে ৭

পরাজয় স্বীকার করতে হয়। সম্প্রতি দ্বিতীয় টেস্টেও ৪ উইকেটে হার স্বীকার করেছে নিউজিল্যাণ্ড দল। সুতরাং পাকিস্থান ও নিউজিল্যাণ্ডের তিনটি টেস্টের মধ্যে দুইটি খেলায় জয়লাভ করায় পাকিস্থান করেছে 'রাবার' লাভ। ঢাকা টেস্টের সঙ্গে 'রাবারের' আর কোনও সম্পর্ক নেই। এ টেস্টে নিউজিল্যাণ্ড জিতলেও পাকিস্থানের সম্মান কিছু ক্ষুণ্ণ হবে না। আর নিউজিল্যাণ্ড যে এ টেস্টে জিতবে তারই বা সম্ভাবনা কোথায়? কি বোলিং কি ব্যাটিং কোনো দিক দিয়েই নিউজিল্যাণ্ডকে প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট দল বলা যায় না। সুতরাং ঢাকাতে এদের খেলায় খুব হৈ চৈ না হবারই সম্ভাবনা। তবে এদেশের জলবায়ু এবং এখানের মাটির সঙ্গে ভালভাবে পরিচিত হলে নিউজিল্যাণ্ড দলের খেলায় উন্নতি দেখা যেতে পারে। নিউজিল্যাণ্ড দলে এমন দুজন খেলোয়াড় আছেন, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে যাঁদের নাম সুবিদিত। বার্ট সাটক্লিফ ও জে রিড। কিন্তু দ্বিতীয় টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে রিডের ৮৬ রান ছাড়া এরা এ পর্যন্ত সুনাম অনুযায়ী খেলতে পারেন নি। পাকিস্থানে নিউজিল্যাণ্ডের চারটি খেলার মধ্যে একজন মাত্র খেলোয়াড় সেঞ্চুরী করবার কৃতিত্ব অর্জন করেছেন তিনি হচ্ছেন ম্যাকগ্রেগার। দ্বিতীয় টেস্টে তিনি ১১১ রান করে আউট হন। অন্য দিকে নিউজিল্যাণ্ড দলের বিরুদ্ধে কৃতিত্বপূর্ণ সাফল্যের জন্য পাকিস্থানের দুইজন খেলোয়াড়ের নাম বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য। ওয়াকার হাসান আর ইমতিয়াজ আমেদ। ওয়াকার উদ্বোধনী খেলাতেই সেঞ্চুরী করেন; দ্বিতীয় টেস্টে মাত্র ১১ রানের জন্য তিনি ডাবল সেঞ্চুরী করতে পারেন নি। আর পাকিস্থানের সেরা ব্যাটসম্যান ইমতিয়াজ আমেদ দ্বিতীয় টেস্টে ডাবল সেঞ্চুরী করে অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেছেন। ইমতিয়াজ আর ওয়াকার হাসানের সহযোগিতায় সপ্তম উইকেটে পাকিস্থানের এক নতুন রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছে। এই দুই জন খেলোয়াড় সপ্তম উইকেটে সংগ্রহ করেছেন ৩০৮ রান। ইতিপূর্বে কোনো টেস্টেই পাকিস্থান কোনো উইকেটে এত বেশী রান সংগ্রহ করতে পারেনি। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন সপ্তম উইকেটের বিশ্ব রেকর্ড ৩৪৪ রান। ১৯০২ সালে ইংলণ্ডে সাসেক্স ও এসেক্সের খেলায় রণজিৎ সিংজী ও ডবলিউ নিউহাম এই রেকর্ড করে রেখেছেন। ওয়াকার ও ইমতিয়াজ আর ৩৭ রান করলে নতুন বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারী হতে পারতেন।

বৃটেনের দূরপাল্লার দৌড়বীর গর্ডন পিরি ও খ্যাতনাম্নী এ্যাথলেট মিস্ শার্লি হ্যাম্পটন; মেলবোর্ন অলিম্পিকের পর এরা পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হবেন বলে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন

* * * *

দিকপাল ক্রিকেট খেলোয়াড় সি কে নাইডু ১লা নবেম্বর ৬১ বছরে পদার্পণ করেছেন। তাঁর বয়সের ষাটপূর্তি উপলক্ষে ভারতের নানা স্থান থেকে তিনি পেয়েছেন শুভেচ্ছা বাণী আর বহু অভিনন্দন পত্র। ভারতীয় ক্রিকেটে নাইডুর দানের কথা স্মরণ করে ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের তরফ থেকেও 'নাইডুর ষাটপূর্তি অর্থভাণ্ডার' নামে এক অর্থভাণ্ডার খোলা হয়েছে। দিল্লীতে নিউজিল্যাণ্ড ও ভারতের তৃতীয় টেস্ট খেলার সময় নাইডুকে সম্বর্ধনা জানিয়ে এই অর্থ উপহার দেওয়া হবে। ভাণ্ডারে এ পর্যন্ত প্রায় পনেরো হাজার টাকা সংগৃহীত হয়েছে। সম্বর্ধনার সময় পর্যন্ত ৩০ হাজার টাকা সংগৃহীত হবে বলে কণ্ট্রোল বোর্ড আশা করেন। প্রতিভাদীপ্ত খেলোয়াড় জীবনে সি কে নাইডু 'মেজর নাইডু' নামে পরিচিত ছিলেন। মেজর ছিল তাঁর খেতাব। হোলকার রাজ্যের সামরিক বিভাগের কর্মী হিসাবে এই খেতাব তিনি লাভ করেন। পরে কর্ণেল পদে উন্নীত হওয়ায় কর্ণেল নাইডু নামে পরিচিত হন। কিন্তু দেশ বিদেশের ক্রিকেট সমাজে তিনি শুধু 'সি কে' নামেই সমধিক পরিচিত। তাঁর কনিষ্ঠ সহোদরের নামের সঙ্গে পার্থক্য রাখবার জন্যেই সম্ভবত তাঁর এই নামকরণ। কনিষ্ঠ সহোদরের নাম সি এস নাইডু। তাই ভারতীয় ক্রিকেটে এই অনন্য ভ্রাতৃযুগল 'সি কে' ও 'সি এস' নামেই পরিচিত।

ভারতের প্রখ্যাত সাতারু শ্রীচাঁদ বাজাজ

প্রতিভাবান ক্রিকেট খেলোয়াড় সি কে নাইডু

আজাদ হিন্দ বাগে ন্যাশনাল সুইমিং এসোসিয়েশনের নব নির্মিত কংক্রিট ডাইভিং বোর্ড

ক্রিকেট খেলায় অংশ গ্রহণ করেছেন; এর মধ্যে বাঙলা দেশে তার খেলার সংখ্যা কম নয়। বহু প্রতিনিধিমূলক খেলা এবং রণজি প্রতিযোগিতার খেলায় তাকে বাঙলার মাঠে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়েছে। ফলে বাঙলার সঙ্গে তার স্থাপিত হয়েছিল এক আত্মীয় সম্পর্ক। এই প্রীতির সম্পর্ক দৃঢ়তর করবার জন্য বাঙলা দেশেই প্রথম তার অভিনন্দনের আয়োজন হয়। তার জীবনের ৫০ বৎসর পূর্ণ হলে মোহনবাগান ক্লাব 'নাইডু জয়ন্তী'র আয়োজন করে এক বিশেষ প্রদর্শনী খেলার ব্যবস্থা করেন। আজ সি কের জীবনের ষাট পূর্তি উপলক্ষে নানা সম্বর্ধনার আয়োজন করা হচ্ছে। ক্রিকেট মাঠে বহু যুদ্ধের বিজয়ী বীর, বহু সেঞ্চুরীর অধিকারী জীবনের সেঞ্চুরী পূর্ণ করেও যেন নট আউট থাকেন, এই প্রার্থনা করি।

* * * *

নভেম্বর মাসের ৪ তারিখ থেকে আজাদ হিন্দ বাগের পুকুরে আরম্ভ হচ্ছে ভারতের জাতীয় সাঁতার প্রতিযোগিতা। জাতীয় সাঁতারের তিন দিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে বাঙলায় সাঁতারু ও সাঁতার পরিচালকদের কর্মতৎপরতার অন্ত নেই। আজাদ হিন্দ বাগের চার পাশ টিন দিয়ে ঘেরা হয়েছে এবং বহুদিন পরে সাঁতার দেখার জন্য হয়েছে টিকিট বিক্রীর ব্যবস্থা। আজাদ বাগের ন্যাশনাল সুইমিং এসোসিয়েশনের সীমানায় এই সাঁতার অনুষ্ঠিত হবে এবং ন্যাশনাল এসোসিয়েশনের নব নির্মিত ডাইভিং বোর্ড থেকে ডাইভাররা ডাইভিংয়ের কলাকৌশল প্রদর্শন করবেন।

ন্যাশনাল সুইমিং এসোসিয়েশন বহু অর্থ ব্যয়ে কংক্রিটের দ্বারা এই স্থায়ী ডাইভিং

সি কে'র পুরো নাম কোঠারী কনকাইয়া নাইডু।

* * * *

রণজিৎ সিংজী বা তার যোগ্য ভ্রাতুষ্পুত্র দলিপ সিংজীর মত সি কে অবশ্য ক্রিকেটে বিশ্বখ্যাতি অর্জন করেননি, তবুও সি কেকে রণজিৎ এবং দলিপের উত্তর সাধক বলা যেতে পারে। ভারতীয় ক্রিকেটে সি কে-র দান অতুলনীয়। তাঁর প্রতিভা তিনি নিজের মধ্যেই ধরে রাখেননি। বহু তরুণ খেলোয়াড় ও অনুরাগী শিষ্যের মধ্যে তার প্রতিভা বিলিয়ে ভারতীয় ক্রিকেটকে করেছেন সমৃদ্ধ। সুনিপুণ খেলোয়াড় মুস্তাক আলীর সঙ্গে সি কের গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক এবং সি কের বহু গুণী ছাত্রের মধ্যে মুস্তাক সবচেয়ে গুণী খেলোয়াড়।

কি ব্যাটিং, কি বোলিং, কি ফিল্ডিং, সি কে কোনো বিষয়েই কম কৃতিত্বসম্পন্ন নন। সব বিষয়েই তার সমান পারদর্শিতা। সর্বোপরি ক্রিকেট মাঠে এমন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন খেলোয়াড় খুবই কমই দেখা যায়। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সভাপতি বিজয়-নগরের মহারাজকুমার সি কে নাইডুর বয়সের ষষ্ঠিপূর্তি উপলক্ষে নাইডুকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেছেন—'প্রতিভায় ভাস্বর দীর্ঘ দেহী সি কের ব্যাটিংয়ে যে চারুসুষমা দেখা যেত, তা দেখার আকর্ষণ লাখ টাকায় তোলা ছায়াছবি দেখার আকর্ষণের চেয়েও বেশী।' খেলা ছাড়া কূট বুদ্ধির খেলাতেও সি কে সাগরপারের বহু জাঁদরেল অধিনায়ককে হার মানিয়েছেন।

সি কে নাইডু জীবনে বহু স্মরণীয়

দ্রুত সাঁতারের কৃতী সাঁতারু রূপ সিং

দেশী সংবাদ

১৭ই অক্টোবর—লক্ষ্ণৌর সংবাদে প্রকাশ, গতকল্য বড়বাঁকী জেলার একটি গ্রামে এক জনসভায় উত্তর প্রদেশ বিধান সভার সমাজতন্ত্রী সদস্য শ্রীঅবোধশরণ বর্মা এবং প্রজা-সমাজতন্ত্রী কর্মী শ্রীসীতারাম অনুমান পাঁচশত জনতার আক্রমণে নিহত হইয়াছেন।

১৯শে অক্টোবর—আজ দিল্লীতে আন্তর্জাতিক ভ্রমণ সংস্থা সঙ্ঘের দশম সাধারণ সম্মেলনের উদ্বোধন করিয়া বক্তৃতা প্রসঙ্গে প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু এইরূপ আশা প্রকাশ করেন যে, শীঘ্রই এমন এক সময় আসিতেছে যখন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ভ্রমণের বাধানিষেধ দূরীভূত হইবে।

বোম্বাই রাজ্য পুনর্গঠন সম্পর্কে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের সুপারিশ লইয়া মহারাষ্ট্র, বোম্বাই ও গুজরাটের কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের পরস্পর বিরোধী দাবী সম্পর্কে যে জটিল সমস্যা উদ্ভব হইয়াছে, তাহার মীমাংসার জন্য কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ড বিদর্ভ সহ মহারাষ্ট্র, গুজরাট ও বোম্বাই এই তিনটি পৃথক রাজ্য গঠনের প্রস্তাব করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

২০শে অক্টোবর—পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল আজ দার্জিলিংয়ে পূর্বাঞ্চলিক পুনর্বাসন মন্ত্রী সম্মেলনের দুইদিনব্যাপী অধিবেশনের উদ্বোধন করেন। পশ্চিমবঙ্গের পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীমতী রেণুকা রায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, উদ্বাস্তু সমাগম রোধ করা তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর নহে। কাজেই তিনি বিভিন্ন রাজ্য সরকারকে যথোপযুক্ত পুনর্বাসন পরিকল্পনা লইয়া প্রস্তুত থাকিবার জন্য আবেদন জানান।

২১শে অক্টোবর—দার্জিলিংয়ে পূর্বাঞ্চলিক পুনর্বাসন মন্ত্রী সম্মেলন আজ পূর্ব পাকিস্থানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে আস্থা পুনঃ প্রতিষ্ঠা এবং বাস্তুত্যাগ রোধকল্পে পাঁচ দফা বিষয় সম্বলিত একটি কার্যসূচী সুপারিশ করিয়াছেন।

২২শে অক্টোবর—রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের সুপারিশসমূহ আলোচনার জন্য আজ নয়াদিল্লীতে মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনের দুইদিনব্যাপী অধিবেশন আরম্ভ হয়। অধিবেশনে মধ্যপ্রদেশ সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা অধিক মতানৈক্য দেখা দেয়। বর্তমান মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী কমিশনের সুপারিশ পুরোপুরি সমর্থন করেন; কিন্তু মধ্য ভারত ভূপাল ও বিন্ধ্য প্রদেশের মুখ্য মন্ত্রিত্রয় তাঁহার বিরোধিতা করেন। কমিশন শেষোক্ত তিন রাজ্য মধ্যপ্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করিয়াছেন।

২৩শে অক্টোবর—নয়াদিল্লীতে মুখ্যমন্ত্রী

সম্মেলনে এইরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে যে, রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ১৯৫৬ সালের অক্টোবরের মধ্যে রাজ্যসমূহ পুনর্গঠন করিতে হইবে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় সম্মেলনে বলেন, জনসংখ্যাধিক্য হেতু সমস্যায় প্রপীড়িত বাঙলার দাবী কমিশন অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

১৫শে অক্টোবর—পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক গঠিত মাদক বর্জন তদন্ত কমিটি আগামী ১৯৫৮ সালের ১লা এপ্রিলের মধ্যে সমগ্র ভারতে মাদক নিবারণের সুপারিশ করিয়াছেন।

বোম্বাইয়ের নিকটে একটি উচ্চতর কারিগরী শিক্ষালয় স্থাপনে ভারতকে কারিগরী সাহায্য দান ব্যবস্থার জন্য ভারত সরকার ও সোভিয়েট রাশিয়ার মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে।

২৬শে অক্টোবর—অদ্য দুর্গা প্রতিমা বিসর্জনকালে নদীয়া জেলায় ইছামতী নদীর তাহিরপুর ফেরী ঘাটের নিকট এক শোচনীয় নৌকা দুর্ঘটনায় নয়জনের সলিল সমাধি ঘটে।

২৭শে অক্টোবর—পাকিস্থানের সংখ্যালঘু ও শ্রমমন্ত্রী মিঃ মহম্মদ নূরুল হক চৌধুরী আজ কলিকাতায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করেন। পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু সম্পর্কিত বিবিধ সমস্যা সম্পর্কে তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে আলোচনা হয়।

২৯শে অক্টোবর—প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরু আজ নয়াদিল্লীতে ভারতীয় শিল্প মেলার উদ্বোধন করেন। ভারতীয় বণিক ও শিল্প সমিতি সঙ্ঘের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই মেলায় ২১টি দেশের পণ্য প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পৃথিবীর যে কোন স্থানে অনুষ্ঠিত শিল্পমেলার মধ্যে ইহাই বৃহত্তম শিল্প মেলা।

বিদেশী সংবাদ

২০শে অক্টোবর—কলম্বো পরিকল্পনার এশীয় সদস্যগণের ব্যবহারের জন্য কানাডা ভারতে একটি উচ্চ শক্তিসম্পন্ন আণবিক চুল্লী স্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছে। আজ সিঙ্গাপুরে কলম্বো পরিকল্পনা বৈঠকে কানাডার পররাষ্ট্র মন্ত্রী প্রস্তাবটি আনুষ্ঠানিকভাবে উত্থাপন করেন।

২২শে অক্টোবর—ঢাকায় পূর্ব পাকিস্থান আওয়ামী মুসলিম লীগ সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে পূর্ব পাকিস্থান আওয়ামী মুসলিম লীগ নাম হইতে "মুসলিম" শব্দটি বর্জন করার প্রস্তাব গৃহীত হয়। ইহার ফলে পূর্ব পাকিস্থান আওয়ামী মুসলিম লীগের দ্বার সকল সম্প্রদায়ের জন্য উন্মুক্ত হইল।

২৪শে অক্টোবর—দক্ষিণ ভিয়েৎনামে অদ্য হইতে ভূতপূর্ব সম্রাট বাও দাইয়ের শাসন কর্তৃত্বের অবসান ঘটিল। ফরাসী সরকার ঘোষণা করিয়াছেন যে, বিগত ছয় বৎসর তাঁহারা বাও দাইকে সমর্থন করিলেও এখন হইতে আমেরিকান কর্তৃপক্ষের সমর্থিত প্রধান মন্ত্রী মিঃ দিয়েমকেই তাঁহারা সমর্থন করিবেন। অতঃপর মিঃ দিয়েমকেই রাষ্ট্র প্রধানরূপে গণ্য করা হইবে।

২৫শে অক্টোবর—নেপালী কংগ্রেস, নেপাল জাতীয় কংগ্রেস ও প্রজা পরিষদ—নেপালের এই তিনটি রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ এক কোয়ালিশন গভর্ণমেণ্ট গঠনের জন্য রাজা মহেন্দ্রের প্রস্তাবে আজ সম্মত হইয়াছেন।

২৬শে অক্টোবর—খান আবদুল গফফার খান আবদুস সামাদ খাঁকে আজ কোয়েটা বিভাগের কোয়ালাই নামক স্থানে গ্রেপ্তার করা হইয়া[illegible]

পাকিস্থানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ হামিদুল হক চৌধুরী ঘোষণা করেন যে, পাকিস্থান আফগানিস্থান সম্পর্কে কঠোর নীতি অবলম্বন করিবে।

২৭শে অক্টোবর—আইসল্যাণ্ডের [illegible] নাসিক ও নাট্যকার মিঃ হালডর কিলিয়ান ল্যাক্সনেসকে সাহিত্যের জন্য এ বৎসর নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হইয়াছে।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের [illegible] আচরণ সম্পর্কে একদিকে ভারত ও পাকিস্থান এবং অন্যদিকে দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যে [illegible] মীমাংসার ব্যাপারে রাষ্ট্রপুঞ্জের চেষ্টা [illegible] হইয়াছে বলিয়া রাষ্ট্রপুঞ্জের সেক্রেটারী জেনারেল সাধারণ পরিষদে এক বিবরণ [illegible] করিয়াছেন।

২৮শে অক্টোবর—আজ জেনেভায় [illegible] চতুঃশক্তি পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনে পাশ্চাত্য [illegible] এবং খণ্ডিত জার্মানীর পুনর্মিলন সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী পরিকল্পনার কথা [illegible] করেন।

আজ ইসরাইলী সৈন্যগণ একটি মিশরীয় ঘাটি আক্রমণ করিলে ইসরাইল-মিশর সীমান্তে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হয়।

২৯শে অক্টোবর—মরক্কোর [illegible] সুলতান বেন ইয়ুসুফকে পুনরায় সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করার দাবী জানাইয়া দেশের [illegible] ব্যাপক বিক্ষোভ চলিতেছে। অদ্য [illegible] সমর্থক নেতা মুস্তাফা বেন রাইসী আততায়ীর গুলীতে প্রাণ হারাইয়াছেন।

প্রতি সংখ্যা—৵০ আনা, বার্ষিক—২০৲, ষাণ্মাসিক—১০৲
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা, লিমিটেড, ৬ ও ৮, সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১৩
শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস লিমিটেড হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদক—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন
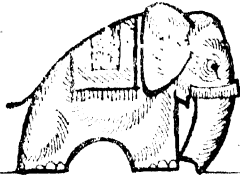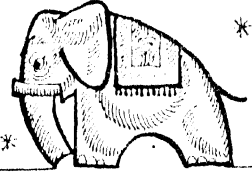
সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

পণ্ডিত জওহরলাল

১৪ই নবেম্বর ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর ষট্‌ষষ্টিতম জন্মদিবস। ক্ষণজন্মা পুরুষ তিনি। জগতের ইতিহাসে বহু ব্যক্তিত্বসম্পন্ন প্রতিভাবান্ পুরুষের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। স্বদেশপ্রেম এবং রাজনীতিক প্রতিভা-প্রভাবে তাঁহারা মানব-সমাজের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহাদিগকে পণ্ডিত জওহরলালের ন্যায় বিরাট এবং বিশাল দায়িত্বের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। প্রথমত ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামই জগতে এক অভূত-পূর্ব ব্যাপার। এই সংগ্রামে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে পণ্ডিত নেহরুর বীর্যবত্তা, তাঁহার সাহস এবং অকুতোভয়তা জগতের বিস্ময়-দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। স্বাধীনতা লাভ করিবার পর রাষ্ট্রস্বরূপে ভারতের প্রতিষ্ঠার মূলে নেহরুজীর অক্লান্ত কর্মসাধনা তাঁহার চরিত্রকে সমধিক মহিমান্বিত করিয়া তুলিয়াছে। পণ্ডিত জওহরলালের তরুণোচিত মনোবল এদেশের সুপ্ত মনুষ্যত্বকে উজ্জীবিত করিয়াছে। জড়ের বন্ধন ভাঙিয়া জীবনের দুর্নিবার শক্তি দিকে দিকে জাগিয়া উঠিতেছে। নবজাগ্রত জাতির অভ্যুত্থানের আলোড়ন আমরা রাষ্ট্র-সাধনার ক্ষেত্রে নানাভাবে উপলব্ধি করিতেছি। ভারতের মত দীর্ঘদিনের পরাধীনতায় অভিভূত এবং নানারূপ ভেদ ও বিরোধে বিচ্ছিন্ন জাতিকে এত অল্পদিনের মধ্যে পৃথিবীর অন্যতম প্রধান রাষ্ট্রের পরিপূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা সহজ ব্যাপার নয়। কিন্তু পণ্ডিত জওহরলাল তাঁহার অসামান্য চরিত্রশক্তি এবং রাজনীতিক মনীষা বলে সেই অসম্ভবকেই সম্ভব করিয়া তুলিয়াছেন। শুধু ইহাই নয়; ভারতের রাষ্ট্রসাধনাকে কেন্দ্র করিয়া পণ্ডিতজীর অবদান সমগ্র জগতে মানবতার অভিনব গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় উন্মুক্ত করিয়াছে। মহাত্মা গান্ধীর সুযোগ্য উত্তরাধিকারিস্বরূপে পণ্ডিত জওহরলাল ভারতীয় সংস্কৃতির মর্মোদ্ভিত মৈত্রীর আদর্শকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে উদ্দীপ্ত করিয়াছেন। ভারতের আবাল-বৃদ্ধ-নরনারী সকলের পক্ষে প্রিয় জওহরলাল বর্তমানে জগতের সর্বত্র শান্তির অগ্রদূতস্বরূপে সম্পূজিত এবং সমাদৃত হইতেছেন। এই গর্বে আমাদের প্রত্যেকের বুক পরিস্ফীত হয়। পণ্ডিত জওহরলালের মত মহাপুরুষকে আমরা প্রধানমন্ত্রিস্বরূপে পাইয়াছি, আমাদের এই পরম সৌভাগ্য উপলব্ধি করিয়া আমরা নিজদিগকে ধন্য বোধ করি; আমরা কৃতার্থ হই। পণ্ডিতজীর শুভ জন্মদিনে আমরা আমাদের সকলের আদরের, সকলের পক্ষে গৌরবের অধিকারী জওহরলালকে আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করি এবং শ্রীভগবানের নিকট তাঁহার দীর্ঘজীবন কামনা করিতেছি।

সুপারিশ ও সিদ্ধান্ত

রাজ্য কমিশনের সুপারিশ সম্বন্ধে চূড়ান্তভাবে সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইবার জন্য সম্প্রতি দিল্লীতে বিভিন্ন প্রদেশের কংগ্রেস-সভাপতি এবং মুখ্যমন্ত্রীদের সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। সম্মেলন অমীমাংসিত বিষয়গুলির বিবেচনার ভার পণ্ডিত জওহরলাল, মৌলানা আজাদ এবং পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ এই তিনজনকে লইয়া গঠিত কমিটির দ্বারা বিবেচিত হইবে স্থির করিয়াছেন। বোঝা যায়, পশ্চিমবঙ্গের সীমানা সম্পর্কিত প্রস্তাবটি এই কমিটি কর্তৃক বিবেচিত হইবে। খুবই আশার কথা। ফলত সকলের পক্ষে সন্তোষজনক হইতে পারে, এইরূপ বিষয় সম্বন্ধে এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছান খুবই কঠিন, এমন কি, অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। প্রকৃতপক্ষে একমাত্র ভারতের বৃহত্তর স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই এ সম্বন্ধে বিচার-বিবেচনা করা সম্ভব হইতে পারে এবং নিরপেক্ষ এবং উদার সেই পরি-প্রেক্ষিতেই জটিল এই সমস্যার সমাধানের পথ নিরূপিত হওয়া সম্ভব। দেশের স্বার্থ সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া কমিশন গঠিত হয়। কমিশন যখন গঠিত হইয়াছে এবং কমিশনের সিদ্ধান্তও দেশবাসীর নিকট উপস্থাপিত হইয়াছে, তখন এইসবকে এখন চাপা দিয়া আদর্শের নামে ডামাডোল পাকানো সমীচীন হইবে না বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। প্রকৃতপক্ষে জাতীয় জীবন ব্যক্তিজীবন হইতে বিচ্ছিন্ন বস্তু নয় এবং যুগাগত শিক্ষা ও সংস্কৃতির ভিতর দিয়া স্বাভাবিকভাবে যে ঐক্য এবং আত্মীয়তাবোধ গড়িয়া

উঠিয়াছে তাহাকে ফাঁকা নীতির দোহাই দিয়া একেবারে উড়াইয়া দেওয়া সম্ভব নহে। পরন্তু সেইভাবে আগাইতে গেলে জাতীয় সংস্কৃতির অপহ্নব ঘটিবে, এমন আশঙ্কারই কারণ রহিয়াছে। মাতৃ-ভাষা এবং সাহিত্য ঐক্যের সর্বপ্রধান ভিত্তিস্বরূপ; সুতরাং এই ভিত্তির উপরে সংহত রাষ্ট্র গঠিত হওয়াই স্বাভাবিক। বস্তুত ইহার মূলে প্রগতিবিরোধী কিংবা সঙ্কীর্ণতার ভাব রহিয়াছে, আমরা সর্বাংশে ইহা স্বীকার করিতে পারি না। রাজ্য কমিশনের সুপারিশ প্রকাশিত হইবার পর এই ধরণের যুক্তি উপস্থিত করিয়া গোলমালের মধ্যে কমিশনের সিদ্ধান্ত পুরোপুরি মানিয়া লইয়া ভেজাল ঢুকাইয়া দিবার মত মনোভাব অবলম্বন করিলে সমস্যা সমধিক জটিল আকার ধারণ করিবে, ইহাই আমাদের বিশ্বাস। বস্তুত বিভিন্ন ভাষা-সাহিত্য এবং সেই সম্পর্কে বিশিষ্ট সংস্কৃতির বিলোপ সাধন করা ভারতের মত বিরাট এবং বিশাল রাজ্যে সম্ভব নয়। প্রত্যুত ভাষা এবং সাহিত্যগত সংহত চেতনাকে ভারতের বৃহত্তর স্বার্থে সম্প্রসারিত করাই বর্তমানে সর্বপ্রথম প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গের দাবী এই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। প্রাদেশিকতার কোনরকম সংকীর্ণ মনোভাব সেই দাবীর মূলে একেবারেই নাই। দেশ বিভক্ত হইবার ফলে পশ্চিমবঙ্গে অর্থ-নীতি এবং সামাজিক পরিস্থিতি জটিল হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে সীমানা সম্প্রসারণের বিষয়টি জীবন-মরণের প্রশ্নে পরিণত হইয়াছে। রাজ্য কমিশনের সুপারিশসমূহ ভারতের বৃহত্তর স্বার্থ প্রতিপালনে প্রকৃত প্রস্তাবে সহায়ক হইবে কিনা পশ্চিমবঙ্গের দাবী মানিয়া লওয়ার উপরই তাহা নির্ভর করিতেছে। ফলত আমাদের রাজনীতিক সাধনা স্বাধীনতা লাভ করিবার পর সার্থকতার পথে কতখানি বলিষ্ঠতা লাভ করিয়াছে, পশ্চিমবঙ্গের দাবীর পরিণতি হইতেই আমরা সে পরিচয় পাইব।

বস্তি সমস্যার নিরাকরণ

নয়াদিল্লীতে সমাজ-কল্যাণ বোর্ডের উপদেষ্টা পরিষদের সভাপতিদের একটি সম্মেলনের উদ্বোধন করিতে গিয়া ভারতের প্রধানমন্ত্রী ভারতের শহরগুলির সংশিলষ্ট বস্তিসমূহের সমস্যার প্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। আমাদের স্মরণ হয়, তিন বৎসর পূর্বে কানপুরের একটি সভায় তিনি আবেগোদ্দীপ্ত ভাষায় বলিয়াছিলেন যে, এইসব বস্তিতে এই মুহূর্তে আগুন লাগাইয়া ভস্মসাৎ করা উচিত। কিন্তু দেখা যাইতেছে, আজও এই সমস্যার সমাধানের দিকে বিশেষ কিছু অগ্রগতি সাধিত হয় নাই। জনস্বাস্থ্যের সহিত বস্তি সমস্যার বিশেষ সম্পর্ক রহিয়াছে, একথা খুবই সত্য। কলিকাতা শহরের কয়েক বৎসরের অভিজ্ঞতা হইতে এই সত্য সুনিশ্চিত হইয়া পড়িয়াছে যে, বস্তিগুলি হইতে কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধি মহামারীর আকারে ছড়াইয়া পড়ে। পৌর কর্তৃপক্ষ ইহা স্বীকার করেন; কিন্তু স্বীকার করিয়াও তৎপ্রতীকারে তাঁহারা আশানুরূপ প্রতীকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারিতেছেন না, ইহা সর্বত্রই সুস্পষ্ট। কিন্তু ভারতের প্রধানমন্ত্রীর মতে জন-স্বাস্থ্যের প্রশ্নই এ সম্পর্কে সব কিছু নয়। এই সমস্যা সমধিক ব্যাপক, ইহা সমগ্রভাবে সমাজ-জীবনের সৌষ্ঠব হানি করে। বস্তির অন্ধকারে যে ক্লেদপঙ্ক আবর্জিত হয় তাহা সমাজের নৈতিক প্রতিবেশকে বিষাক্ত করিয়া তোলে। প্রকৃত-পক্ষে শহর হইতে বস্তিগুলি অপসারিত করিলেই এই সমস্যার সমাধান হইবে, ইহা মনে করা যায় না; কারণ শহরে কাজ করিয়া যাহাদের জীবিকা অর্জন করিতে হয়, তাহারা শহরের কাছেই নূতন বস্তি গড়িয়া তোলে এবং সেই নবগঠিত বস্তিও পরিচ্ছন্নতা বা সৌষ্ঠবের ক্ষেত্রে পরিণত হইবে না, ইহা স্বাভাবিক। এরূপ অবস্থায় শহরতলী অঞ্চলের সম্প্র-সারণ এবং সেইসব স্থানে জল সরবরাহ, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যবিধান সম্পর্কিত পন্থা অবলম্বন করাই এই সমস্যা সমাধানের প্রকৃষ্ট উপায়। বস্তি ঘৃণ্য ইহা সত্য, কিন্তু সামাজিক এবং অর্থ-নৈতিক যে দুর্নীতি এবং অর্থগৃধ্নুতার প্রভাবে বস্তি-জীবন এ দেশের দরিদ্র এবং মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের পক্ষে অপরিহার্য হইয়া উঠিতেছে, তাহা ততোধিক ঘৃণিত। প্রত্যুত আমাদের সমাজ-জীবনে বর্তমানে অপরিমেয় অর্থ-নৈতিক বৈষম্য রহিয়া গিয়াছে। বস্তি-বাসীদের দুর্গতির প্রতি সহানুভূতি প্রকাশের মামুলী মানস-বিলাসেই ইহার প্রতিকার হইবে না, প্রত্যুত এজন্য সমাজে বৈপ্লবিক এবং বলিষ্ঠ পন্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন। আামাদের বিশ্বাস, সমাজ-জীবনের অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করিবার দিকে রাষ্ট্রচেতনা এবং সমাজে মানবতা-বোধ জাগ্রত না হওয়া পর্যন্ত এই কলঙ্কভার আমাদিগকে বহন করিতে হইবে।

সমবায় আন্দোলনের গতি

ভারতের সর্বত্র সমবায় সংস্থা [illegible] পালিত হইয়াছে। ভারতের [illegible] ১০ জন লোকই কৃষি ও কুটীর[illegible] আশ্রয়ে জীবিকা অর্জন করে। [illegible] দেশে সমবায় আন্দোলনের প্রয়োজন [illegible] সবচেয়ে বেশী। কিন্তু দুঃখের [illegible] এই যে, ৫০ বৎসরের অধিককাল [illegible] সমবায় আন্দোলন প্রবর্তিত [illegible] এ পর্যন্ত শতক., মাত্র ২০ [illegible] সমবায় সমিতির মারফত [illegible] হইয়াছে। ইহার কারণ এই [illegible] সমবায় আন্দোলন অনেক[illegible] সরকারী ব্যাপার হইয়া [illegible] সেই আন্দোলনের মূলে জন[illegible] স্বার্থ এবং সেবার ভাবটি এতদিন [illegible] হইতে পারে নাই। বর্তমানে [illegible] জীবনের সর্বস্তরে যে দুর্নীতি [illegible] অযোগ্যতা অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে [illegible] সমিতিগুলি তাহা হইতে [illegible] যাঁহাদের হাতে এই সমিতি প[illegible] ভার ন্যস্ত হইয়াছে, তাহাদের [illegible] জন্যই অনেক সমিতিরই কারবার [illegible] লইতে হইয়াছে। দেশের সমবায় [illegible] যদি সম্প্রসারিত করিতে হয়, তাহা [illegible] সমিতিগুলির সুপরিচালনার উপর [illegible] দিতে হইবে। দশজনের ঘাড়ে [illegible] নিজেদের স্বার্থ গোছাইয়া [illegible] দুষ্প্রবৃত্তি যাঁহাদের রহিয়াছে, [illegible] সংস্পর্শ হইতে সমবায় সমিতি[illegible] মুক্ত করিয়া সমবায় পদ্ধতির [illegible] সূত্র জন-জীবনের সকল দিকে সম্প্র[illegible] করাই বর্তমানে প্রয়োজন।

মিশর-ইজরেল সীমান্তে এখানে সেখানে নাতিবৃহৎ সংঘর্ষ চলছে। বড়োরকমের যুদ্ধও বেধে যেতে পারে, এ আশঙ্কাও কেউ কেউ করছেন। আপাতদৃষ্টিতে সে ভয়ের কারণ দেখা গেলেও, এখন মধ্যপ্রাচ্যে পুরোদমে যুদ্ধ বাধবে বলে মনে হয় না। তার প্রধান কারণ এই যে, বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যের ভবিষ্যৎ নিয়ে পশ্চিমা ও সোভিয়েট ব্লকের মধ্যে যে "ঠান্ডা যুদ্ধ" চলছে তার সঙ্গে এমন "গরম যুদ্ধ" খাপ খাবে না যাতে সারা মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে যুদ্ধের আগুন জ্বলতে পারে। বড়োকর্তাদের "ঠান্ডা যুদ্ধের" সঙ্গে "স্থানীয়" যুদ্ধ local war যাতে বড়োরা প্রত্যক্ষভাবে পরস্পর বিরোধীরূপে জড়িত নয় এমন যুদ্ধ চলতে পারে। এমন কি, এইরূপ "স্থানীয়" যুদ্ধ অনেক ক্ষেত্রেই "ঠান্ডা যুদ্ধের"ই অঙ্গ বলা যেতে পারে। তবে তার একটা সীমা আছে। যখনই কোনো "স্থানীয়" যুদ্ধের অবস্থা এমন হয় যে, আরো বাড়লে দুই ব্লকের চাঁইদের মধ্যে সাক্ষাৎভাবে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা আছে তখন একটা ছেদ টানা হয়। যতদিন পর্যন্ত দুই ব্লকের চাঁইরা বিশ্বযুদ্ধ লাগাতে প্রস্তুত নয় ততদিন পর্যন্ত এই অবস্থা চলল।

মধ্যপ্রাচ্যে ইজরেলের সঙ্গে যদি মিশরের পুরোদস্তুর যুদ্ধ লাগে তবে তাতে সমস্ত আরব রাষ্ট্রগুলির জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা আছে যার ফলে একটা অত্যন্ত জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হবে। কারণ একদিকে যেমন ইজরেলকে নষ্ট হতে দিতে ইংরেজ এবং তারচেয়েও বেশি আমেরিকা চাইবে না, তেমনি অন্যদিকে মধ্যপ্রাচ্যে পশ্চিমা শক্তিরা যে-সব জোট তৈরি করেছে বা করার চেষ্টায় আছে তার খাতিরে আরব রাষ্ট্রগুলিকেও তারা চটাতে পারে না। ইতিমধ্যে বাগদাদ প্যাক্টের দরুণ মিশর, সৌদী আরব এবং সিরিয়া চটে গিয়ে নিজেদের মধ্যে আলাদা একটা সামরিক চুক্তি করেছে। মিশর পশ্চিমা শক্তিদের কাছ থেকে অপর্যাপ্ত

অস্ত্রশস্ত্র পাচ্ছে না বলে রেগে ছিল। এই অবস্থায় সোভিয়েট ব্লক মিশরের কাছে অস্ত্র বিক্রয় করার সুযোগ পেল। চেকোশ্লোভাকিয়া থেকে এক চালান অস্ত্র ইতিমধ্যেই মিশরে পৌঁছে গেছে। শুনা যাচ্ছে, সৌদী আরব গভর্নমেণ্টও সোভিয়েট ব্লক থেকে অস্ত্র কেনার বন্দোবস্ত করছেন। মোট কথা, মধ্যপ্রাচ্যে সোভিয়েট কূটনৈতিক হস্ত অনেকখানি প্রসারিত হয়েছে।

বাগদাদ প্যাক্ট প্রথমে ইরাক ও তুর্কির মধ্যে হয়, পরে তাতে পাকিস্তান, বৃটেন ও ইরাণ যোগ দিয়েছে। NATOর সূত্রে বাঁধা সোভিয়েটের সীমান্ত ঘেঁষে এই জোট সোভিয়েটের ক্রোধ ও উদ্বেগের কারণ হয়েছে এবং সোভিয়েট পাল্টা চাল চালতে আরম্ভ করেছে। আরব রাষ্ট্রগুলির ইজরেল-বিদ্বেষ এবং পশ্চিমা শক্তিদের ইজরেল ও আরবদের মধ্যে দো-টানা নীতি সোভিয়েটকে সেই সুযোগ দিয়েছে। বাগদাদ প্যাক্টের স্বাক্ষরকারী গভর্নমেণ্টগুলির মধ্যেও যে নীতির সম্পূর্ণ ঐক্য আছে তাও নয়। যেমন, ইরাক বলছে যে, ইজরেলের সঙ্গে মিশরের যুদ্ধ বাধলে ইরাক মিশরের সঙ্গে যোগ দেবে। ইরাক যদি মিশরের সঙ্গে যোগ দিয়ে ইজরেলের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয় তবে বাগদাদ প্যাক্টের অন্য শরিকদের কী কর্তব্য হবে বলা মুশকিল।

এদিকে পাকিস্তানের সঙ্গে আফগানিস্তানের ঝগড়ার দরুণ আফগানিস্তানে সোভিয়েট প্রভাব বিস্তারের সুযোগ হয়েছে। অবশ্য কোনো অবস্থায়ই আফগানিস্তানের পক্ষে সোভিয়েটের বৈরভাব উদ্রেক করা নিরাপদ হতে পারে না। কোনো ব্লকে না গিয়ে অথচ উভয় ব্লকের সঙ্গে সদ্ভাব রেখে চলাই আফগানিস্তানের পক্ষে সুষ্ঠু নীতি হোত। কিন্তু পাকিস্তানের সঙ্গে ঝগড়ার দরুণ তা সম্ভব হচ্ছে না। পশ্চিমা শক্তিরা পাকিস্তানের উপর চাপ দিয়ে পাকতুনিস্তান সমস্যার একটা আপস মীমাংসা করার ব্যবস্থা করে দিলে আফগানিস্তানের সোভিয়েট ব্লকের দিকে হেলার সম্ভাবনা কম হোত। কিন্তু পশ্চিমা শক্তিরা হয় পাকিস্তানের উপর চাপ দিয়ে কিছু করতে পারছে না অথবা তারাও পাকিস্তানের পাকতুনিস্তান বিরোধী নীতির সমর্থক। ফলে আফগানিস্তানের সঙ্গে সোভিয়েটের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর হচ্ছে। শুনা যাচ্ছে, আফগানিস্তানও কমুনিস্ট ব্লকের কাছ থেকে অস্ত্র সংগ্রহের ব্যবস্থা করছে। মার্শাল বুলগানিন ও মিঃ ক্রুশেভ তাঁদের ভারত ভ্রমণ শেষ করে আফগানিস্তানের অতিথি হবেন।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, আফগানিস্তান পাকিস্তান থেকে মধ্যপ্রাচ্যের পশ্চিম সীমা পর্যন্ত দুই ব্লকের মধ্যে "ঠাণ্ডা যুদ্ধের" একটি প্রধান ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। পূর্বে মধ্যপ্রাচ্যের খেলা এক হাতে অর্থাৎ পশ্চিমা শক্তিদের হাতে ছিল, এখন সোভিয়েটও তাতে ভাগ বসাতে সক্ষম হয়েছে। অল্পস্বল্প "স্থানীয়" যুদ্ধের সঙ্গে এ খেলা চলতে পারে কিন্তু মধ্যপ্রাচ্য এমন স্থান যে, সেখানে আগুন একটু বেশি জ্বল্‌লে চাঁইদেরও সাক্ষাৎভাবে তার আঁচ লাগার সম্ভাবনা আছে এবং ফলে "ঠাণ্ডা যুদ্ধ" গরম বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হওয়ার ভয় আছে। কারণ এই ক্ষেত্রের অবস্থান হচ্ছে সোভিয়েট রাজ্যের গা-ঘেঁষে এবং দ্বিতীয়ত, এটি তৈল-গর্ভ অঞ্চল। এই ক্ষেত্র সম্বন্ধে "আগুন নিয়ে খেলা করার" উপমাটি খাটে। সুতরাং দুই ব্লকের কর্তারাই সাবধান হবেন কারণ বিশ্বযুদ্ধ লাগাতে আপাতত কারোরই উৎসাহ নেই। কিন্তু কিছু গোলমাল এবং ভয়ের কারণ না থাকলে "ঠাণ্ডা যুদ্ধে"র খেলাও জমে না, "টেন্‌শন্‌" থাকা চাই-ই। সোভিয়েট যখন একবার মাথা গলাতে পেরেছে তখন মধ্যপ্রাচ্যের খেলা এখন আরো চটকদার হবে।

আশ্চর্যের বিষয়, আরব রাষ্ট্রগুলি এবং ইজরেল যুদ্ধের জন্য লালায়িত হয়ে যে যেখান থেকে পারে অস্ত্র সংগ্রহের চেষ্টা করছে, শান্তি স্থাপনে সহায়তা চাইতে ভারত গভর্নমেণ্টের কাছে কেউ আসছে না! পূর্বে কর্নেল নসের পণ্ডিত নেহরুর সঙ্গে সুর মিলিয়ে অনেক শান্তির কথা বলেছেন, তার দুটো একটা পণ্ডিত নেহরু এখন তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিতে পারেন। অবশ্য বর্তমান অবস্থার জন্য ইজরেলের কোনো দোষ নেই, মিশরই দায়ী, একথা আমরা বলছি না। কিন্তু ইজরেলের অস্তিত্ব বরদাস্ত করব না, মিশরের এবং তার অনুবর্তী আরব রাষ্ট্রগুলির এই মনোভাব যে অশান্তির একটা প্রধান কারণ সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। মিশর ও আরব রাষ্ট্রগুলির বন্ধু হিসেবে ভারত গভর্নমেণ্টের উচিত হচ্ছে এই মনোভাব যাতে দূর হয় তার চেষ্টা করা। কিন্তু আরব রাষ্ট্রগুলি পাছে চটে এই ভয়ে ভারত গভর্নমেণ্ট অন্তত প্রকাশ্যে কিছু বলেন নি, বরঞ্চ উল্টা কাজ করেছেন। বান্দুং কনফারেন্সে ইজরেলকে ডাকতে পারা যাবে না, [illegible] রাষ্ট্রগুলির এই অন্যায় দাবীর বিরু[illegible] জোর করে কিছু বলতে না পারা ভার[illegible] পক্ষে লজ্জাকর কাজ হয়েছে।

* * *

মরক্কোতে ফরাসী গভর্ন[illegible] সুলতান সিদি মহম্মদ বেন ইউসু[illegible] পুনরায় গদিতে প্রতিষ্ঠিত করতে [illegible] হয়েছেন। ১৯৫৩ সালে ফরাসী সুলতান বেন ইউসুফকে গদি [illegible] সরিয়ে দ্বীপান্তরিত করে এবং [illegible] জায়গায় ফরাসীদের এক তাঁবেদার[illegible] বসায়। তারপর দু বছর স্বাধীনতাক[illegible] মরক্কোবাসীদের সঙ্গে ফরাসীদের [illegible] চলছে। ফরাসীরা মরক্কোকে পিটি[illegible] ঠাণ্ডা করার চেষ্টা করে কৃতকার্য হয় নি[illegible] এখন স্বায়ত্ত শাসনের ভিত্তিতে এক[illegible] আপস মীমাংসার চেষ্টায় আছে। [illegible] ইউসুফকে পুনরায় সুলতান পদে ব[illegible] করায় জনসাধারণ খুশী হয়েছে কিন্তু প্রতিশ্রুত শাসন সংস্কার যদি মরক্[illegible] বাসীদের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা পূর[illegible] উপযোগী না হয় তবে শান্তি আসবে ন[illegible]

* * *

বাও দাইয়ের রাজাগিরি ঘুচো[illegible] ফ্রান্স থেকে তিনি দক্ষিণ ভিয়েৎনামে[illegible] প্রধানমন্ত্রী মিঃ এম্‌-এর পদচ্যুতির আ[illegible] দিয়েছিলেন। মিঃ এম্‌ তা গ্র[illegible] করেন নি। উল্টে তিনি এক প্লিবি[illegible] করিয়ে বাও দাইয়ের পরিবর্তে নিজে[illegible] রাষ্ট্রের প্রধান, হেড অব স্টেট্‌ [illegible] ঘোষণা করেছেন। সংবাদে প্রক[illegible] প্লিবিসিটে কোনো কোনো জা[illegible] ভোটারের তালিকার সংখ্যার চেয়েও [illegible] ভোট পড়েছে মিঃ এম্‌-এর প[illegible] এতো "বন্দোবস্ত" করার দরকার [illegible] না, কারণ বাও দাইকে কেউ চায় [illegible] আমেরিকা মিঃ এম্‌-কে সমর্থন [illegible] আসছে। ফ্রান্স মিঃ এম্‌-এর পক্ষপা[illegible] ছিল না। কিন্তু এখন আর উপায় ক[illegible] কিন্তু আসল কথা হচ্ছে মিঃ এম্‌ [illegible] তাঁর গভর্নমেণ্টের সংশোধন করতে [illegible] পারেন তবে বিদেশী সমর্থন বা সা[illegible] যতই আসুক না কেন, শেষ পর্[illegible] ভিয়েৎমিন-এর কাছে হারতে হবে।

৯।১১।৫৫

পত্রাবলী

[কনিষ্ঠ জামাতা নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত। নগেন্দ্রনাথের কন্যা শ্রীমতী নন্দিতা কৃপালনীর সৌজন্যে প্রাপ্ত। বিশ্বভারতীর অনুমতিক্রমে মুদ্রিত]

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

গ্রীষ্মাবকাশে কাজে প্রবৃত্ত হইয়াছ বলিয়া সুখী হইলাম।[১] কিন্তু এইরূপ কাজের ভার লওয়ার জন্য যদি তোমার অধ্যয়নের ব্যাঘাত ঘটে অথবা পড়া শেষ করিয়া ফিরিতে বিলম্ব পড়িয়া যায় তবে ইহাকে লাভ বলিয়া গণ্য করিতে পারিব না। আমাকে আমেরিকা প্রবাসী একটি বাঙালী ছাত্র অর্থসাহায্যের জন্য অনুনয় করিয়া পত্র লিখিতেছে—সে লিখিয়াছে কাজ করিয়া বিদ্যালয়ের খরচ সংগ্রহ করিতে হইলে পড়া অত্যন্ত পিছাইয়া যায়।

মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অন্যায় পন্থা অবলম্বন করিলে জাতীয় চরিত্র নষ্ট হইয়া যায়। আশু কোনো ফল লাভের চেয়ে জাতীয় সেই চরিত্র নষ্ট হওয়া অনেক বেশি হানিকর। কিন্তু পোলিটিকাল উদ্দেশ্য সাধনে ধর্ম্মাধর্ম্ম সত্যমিথ্যা কিছুই বিচার করিবার প্রয়োজন নাই এই উপদেশ আমরা আমাদের পশ্চিমের গুরুদের কাছে শিখিয়াছি। পশ্চিমের পদতলে আমাদের অন্তঃকরণ পর্য্যন্ত নাক দাসত্বে দীক্ষিত হইয়াছে সেইজন্যই ধর্ম্মকে আমরা দেশের কাছে ক্ষুদ্র বলিয়া জ্ঞান করিতেছি। আমরা বন্দে মাতরম বলিয়া যাহাকে বন্দনা করিতেছি তাহাকে ধর্ম্মরাজ ঈশ্বরের চেয়েও বড় আসন দিয়াছি। দেশহিতৈষা সম্বন্ধে আমাদের এত বড় ভয়ঙ্কর অন্ধ সংস্কার জন্মিয়া গেছে। কিন্তু এই অন্ধ সংস্কার নাকি পশ্চিমের অন্ধ সংস্কার সেইজন্যই ইহাকে আমরা নির্ব্বিচারে মাথায় করিয়া লইয়াছি। কিন্তু এরূপ ধর্ম্মভ্রষ্ট ঈশ্বর বিদ্রোহী অন্ধ সংস্কারের অপেক্ষা আমাদের দেশের হাঁচি টিকটিকি ভূতপ্রেতের সংস্কারও ভাল। দেশের স্বার্থের জন্য যদি পরমার্থকে ত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হই তবে কোন্ স্বার্থের কাছে তাহাকে ঠেকাইবে। আগে দেশ স্বাধীন করি তাহার পরে ধর্ম্মের দিকে তাকাইব ইহা নাস্তিকের কথা। বিধবার ধন লুঠ করিয়া চুরি ডাকাতি খুন ও মিথ্যাচরণ করিয়া দেশের মঙ্গল সাধন করিব ইহা যদি সম্ভব হয় তবে জগতে মনুষ্যত্ব একটা ফাঁকি মাত্র, ধর্ম্ম মিথ্যা—এবং ঈশ্বর নাই। ধর্ম্মভ্রষ্ট অভিশপ্ত দেশহিতৈষিতা হইতে ঈশ্বর এই হতভাগ্য দেশকে রক্ষা করুন।[২]

ইতি—২২শে আষাঢ়, ১৩১৫

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,

ওঁ

কল্যাণীয়েষু,

নগেন, তুমি আমার পত্র পড়ে বেদনা পেয়েছ শুনে আমিও ব্যথিত হয়েছি। আমি তোমাকে এই বিষয়ে সম্পূর্ণ ভুল বুঝেছিলুম একথাতে আমার আনন্দের বিষয়ও আছে। তুমি আমাদের উপর বিরক্ত বিমুখ হয়ে আছ এই কল্পনা আমাকে পীড়িত করেছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু আমার মনে

১ "আমার কনিষ্ঠ জামাতা নগেন্দ্র কলেজের ছুটির তিন মাসের মধ্যে ১৫০০ টাকা জমাইয়া তাহার বাড়িতে পাঠাইয়াছে।" মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র, ১ কার্তিক ১৩১৫

২ এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য, শ্রীঅরবিন্দমোহন বসুকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র, বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬২

দৃঢ় প্রত্যয় ছিল যে, ক্রমশ যখন আমরা পরস্পরের কাছে সুপরিচিত হব তখন তোমার হৃদয় সম্পূর্ণই আমাদের প্রতি অনুকূল হবে। যাই হোক যে ভুলটা হয়েছিল সেটা একেবারে ধুয়ে মুছে ফেলা কিছু বেশি কথা নয়।

ওখানে কর্ম্মক্ষেত্রে এবং বিদ্যালয়ে দুই জায়গাতেই তোমার সফলতার খবর পেয়ে আমি যে কত আনন্দ লাভ করেছি সে তোমাকে কি বলব! তোমার পৌরুষে ও অধ্যবসায়ের এই রকম পরিচয় আমার কাছে ভারি তৃপ্তিকর হয়েছে। ঈশ্বর যে তোমাকে সমস্ত অভাব ও বাধাবিপত্তির উপরে জয়ী করবেন তাতে আমার সন্দেহ নেই—আপনার উপরে তোমার শ্রদ্ধা ও নির্ভর তোমাকে যথার্থ সম্মানের পথেই নিয়ে যাবে।

এখানে কাল ৭ই পৌষের উৎসব। আজ থেকে লোক সমাগম হতে আরম্ভ হবে—আমরা সকলে তাই ব্যস্ত হয়ে আছি।

আমাদের বিদ্যালয় অল্পে অল্পে উন্নতির পথে যাচ্চে বলে অনুভব করচি। এর উপরে এখন দেশের লোকের বিশ্বাস আকৃষ্ট হয়েছে। ৮৫ জন ছেলে হয়েছে—আর রাখবার জায়গা নেই। শুধু ছাত্র বৃদ্ধিতেই যে আমরা উন্নতি অনুভব করচি তা নয়—আমাদের নিজের চিত্তও যেন কাজের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্চে। এই আশ্রমের উপর, কর্ম্মের উপর, আমাদের হৃদয়ের উপর ঈশ্বরের আবির্ভাব অল্পে অল্পে স্পষ্টতররূপে উপলব্ধি করচি—আমাদের সাধনার মধ্যে সেই সিদ্ধিদাতাও যে আছেন এখন সে কথাটা যেন আর প্রচ্ছন্ন হয়ে নেই।

চতুর্দ্দিকে নানা প্রকার দুঃখসংকটের মাঝখানে সেই ধ্রুবমঙ্গলের দিকে লক্ষ্য স্থির রেখে চিত্তকে শান্ত করবার চেষ্টা করচি। বহু যুগ হতে আমাদের অপরাধ পর্ব্বতপ্রমাণ জমে উঠেছে এখন বজ্রের পর বজ্রাঘাত তারই শাস্তিবর্ষণ চল্‌ছে। এর থেকে শুধু কি কেবল শাস্তিটুকুই নেব—এতে কি আমাদের জাতির ধর্ম্মবুদ্ধিকে সত্য চেষ্টায় প্রবর্ত্তিত করবে না? ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।

ইতি—৬ই পৌষ, ১৩১৫

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

সন্তোষ লিখিয়াছেন তিনি অ[illegible] ছাড়িবেন। তাহা হইলে সম্ভবতঃ এ[illegible] পৌঁছিবার পূর্ব্বেই সন্তোষ চলিয়া আসিয়া[illegible] যদি তাহাই হয় তবে তোমাকে এই সঙ্গে যে [illegible] টাকার ড্রাফ্‌ট্ পাঠাইতেছি তাহাতে তোমার [illegible] মাসের খরচ চলিবে। কিন্তু সন্তোষ য[illegible] ছাড়িয়া থাকেন ও ১২৫ টাকা যদি তাঁহাকে [illegible] হয় তবে সে খবর পাইতে আরো দুই [illegible] লাগিবে— অতএব যখন খবর পাওয়া যাইবে [illegible] প্রয়োজন বুঝিলে এক মাসের টাকা বাদ দে[illegible] যাইবে, আশা করি তাহাতে তোমার অসু[illegible] হইবে না।

রথী আসিয়াছেন। তাহার কাছ হই[illegible] তোমাদের সমস্ত খবর পাইয়া আনন্দিত হইয়া[illegible] তাহাকে এখন কিছুদিন বাড়ি বাড়ি ঘুরিতে [illegible] থাকিতে হইবে। তাহার কাজকর্ম্মের ব্য[illegible] করিয়া দিবার জন্যও চিন্তা করিতে হইতেছে।

তোমার মা বালিগঞ্জে একটা ফাঁকা জায়[illegible] উঠিয়া গেছেন। বাড়িটি বেশ ভাল চারিদিক খো[illegible] কিন্তু কাছে অনেকগুলি পানা পুকুর এবং প্র[illegible] বাবু বলিতেছেন জায়গাটিতে ম্যালেরিয়ার আশ[illegible] আছে—এই কারণে এই ম্যালেরিয়ার কয়েক [illegible] মীরাকে সেখানে পাঠাইতে কোনমতে স[illegible] করিতেছি না। তাহাকে এখন কলিকাতায় জো[illegible] সাঁকোর বাড়িতে রাখিয়া পড়ানোর বন্দোবস্ত [illegible] হইতেছে। অগ্রহায়ণের মাঝামাঝি তোমার [illegible] কাছে তাহাকে পাঠাইয়া দিব।

আমি সম্প্রতি নানাপ্রকার বৈষয়িক ঝ[illegible] ব্যস্ত হইয়া আছি। এটা কাটিয়া গেলে তাহার [illegible] রথী ও শরতের উপরে কার্য্যভার দিয়া [illegible] কতকটা ছুটি পাইতে পারিব। এই প্রত্যাশা[illegible] এতদিন প্রতীক্ষা করিয়া ছিলাম।

ছুটির সময়ে তোমার শরীর ভাল ছিল [illegible] ছুটিতেও তুমি বিশ্রাম করিতে পার না ই[illegible] আমার মন বড় উদ্বিগ্ন থাকে।

আগরতলায় ত্রিপুরার মহারাজ সেখান[illegible] রাজবংশীয় কুমারদের জন্য একটি ভাল [illegible] বোর্ডিং স্থাপন করিতে চান। তোমার জানা কো[illegible]

...মেরিকান অধ্যাপক পাঠাইতে পার? বেতন ...০০ টাকার বেশি না হয়। আরো একটা ... ভাবিবার আছে—লোকটি যেন সেখানকার ...সংক্রান্ত কোনো চক্রান্তে যোগ না দেয়।

ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

...ণীয়েষু

মাঘোৎসব এবং রথীর বিবাহ নিয়ে কিছু ... থেকে অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলুম তার উপরে ...রও কিছু অসুস্থ হয়ে পড়েছে। বৌমার ...দ বোধহয় এতদিন নানা স্থান থেকে পেয়েছ। ...লেরই তাকে খুব ভাল লেগেছে। শান্তি[১] ত ...বারে মুগ্ধ ধীরেনেরও[১] সেই দশা। ওরা ...াকে বারবার করে বলচে যে এবার বৌয়ের ...র কাছে বেলাকেও[২] নিষ্প্রভ করে তুলেছে।

শুধু রূপ নয় বৌমার ভাবখানিও বড় মিষ্ট। ... সর্ব্বদাই এমন একটি শান্ত ধীর সুপ্রসন্ন লেগে রয়েছে যে, যে তাকে দেখে সকলেই ...ষ্ট হয়।

বিবাহটি বিধবা বিবাহ হয়েছে তাও বোধহয় ...ছ। তা নিয়ে গোড়ায় একটা ঝড় ওঠবার ...বনা হয়েছিল কিন্তু তার প্রতি মনোযোগ ...রাতে সেটা কেটে গেল।

এইবার রথী ও বৌমাকে নিয়ে কিছুদিনের ... বোলপুরে যাব সেখানে থেকে সংসার পথের কিছু পাথেয় সঞ্চয় করে আনে এই আমার ...।

রথীর কাজেরও আয়োজন চলচে। যে ...টি পেয়েছে সেখানে ইচ্ছা করলে অনেক ...র করতে পারবে। দেশের নিম্নশ্রেণীর ...দের উন্নতি বিধান করাই এখন যথার্থ ...দের কাজ। এই কাজে তুমিও যদি ওর সঙ্গে যোগ দিতে পার তাহলেই রথী কৃতকার্য হতে পারবে—এইজন্যে ও তোমাকে চাচ্চে।

রথীর কাজে তুমি যদি সহযোগী হতে চাও তাহলে ক্ষেত্র প্রস্তুত আছে। চাষাদের সঙ্গে Cooperation এ চাষ করা, ব্যাঙ্ক করা, ওদের স্বাস্থ্যকর বাসস্থান স্থাপন করা, ঋণমোচন করা, ছেলেদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা, বৃদ্ধ বয়সের সংস্থান করে দেওয়া, রাস্তা করা, বাঁধ বেঁধে দেওয়া, জলকষ্ট দূর করা, পরস্পরকে পরস্পরের সহায়তা সূত্রে আবদ্ধ করা এমন কত কাজ আছে তার সীমা নেই। এক জায়গায় যদি আমরা এই রকম আদর্শ পল্লী স্থাপনে কৃতকার্য হতে পারি তবে সমস্ত দেশের পক্ষে তার চেয়ে লাভের আর কিছুই হতে পারে না। এই সমস্ত মঙ্গলকর্ম্মে জীবন উৎসর্গ করতে কাউকেই দেখতে পাইনে—কেবলি উত্তেজনা উন্মাদনা উৎপাত। যেখানে যথার্থ ত্যাগ, যথার্থ কাজ, সেখানে কারো উৎসাহ দেখিনে। পাড়াগাঁয়ের মধ্যে পড়ে হীন শ্রেণীর উন্নতির জন্যে পড়ে থাকায় কেউ সুখ পায় না তার কারণ, দেশকে সত্যভাবে কেউ ভালবাসে না কেউ সেবা করতে চায় না প্রভুত্ব করতেই চায়।

মঙ্গলের ভিতর দিয়ে দেশকে সৃষ্টি করে তোলার কাজে যদি তোমরা লাগ তাহলে বড় খুসি হব—এই হচ্চে ধর্ম্মের কাজ—এই হচ্চে পুণ্যকর্ম্ম—এই হচ্চে ঈশ্বরের সেবা। মনকে সমস্ত অনাবশ্যক বিরোধ বিদ্বেষ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে বিদেশী ইতিহাসের সমস্ত তামসিক অন্ধ সংস্কার থেকে চিত্তকে নির্ম্মল করে তুলে স্নিগ্ধভাবে শান্তভাবে সাত্ত্বিকভাবে একেবারে মূলের থেকে দেশের কাজে আমরা প্রবৃত্ত হব—অসাধ্য সাধন আমাদের ব্রত—আমরা পূর্ব্ব পশ্চিমকে শত্রু মিত্রকে মহৎ প্রেমে পরম মঙ্গলে এক করব এই আমাদের লক্ষ্য থাক্।

তোমার শিক্ষা কবে সম্পূর্ণ হবে এবং তুমি কবে ফিরে আসতে পারবে আমাকে লিখো।

ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। ইতি—

২০শে মাঘ ১৩১৬

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

১ নগেন্দ্রনাথের ভ্রাতা

২ রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা

এক যুগের সংলাপ

বিষ্ণু দে

১

তোমার হৃদয় আজও চৌমাথায় বাসার মতন,
অবিরাম চলাচল, নানা শব্দ নানা তীব্রতায়
দোতলায় ভেসে আসে, বিকালের খোলা জানলায়
চোখে চলে চলচ্চিত্র, জানোও না কেউ বা কখন
কোনো ছাপ কার ছাপ রেখে যায় স্বপ্নালু স্নায়ুতে,
হয়তো বা ভাবো এল যৌবনের পরম লগন,
একাকীর সন্ধ্যাঘোরে থেকে থেকে শিহরিত মন
মুহূর্তের মূর্তি দেখ জীবনের সমস্ত আয়ুতে।
এই স্বাভাবিক বটে বয়সের এ জলবায়ুতে,
তোমার মেয়েলি সত্তা আধোসত্যে আধোকল্পনায়
এমনি ঘুরুক স্বপ্নে আর প্রত্যক্ষের প্রতীক্ষায়।
যেদিন আসবে পথ ধরে' উঠে চেনায় অদ্ভুতে,
সেদিনের কৈলাসের মৃত্যু আর জন্মমুহূর্তের
একান্ত প্রহরে জেগে উঠো বাহুবন্ধনে মুক্তের॥

২

সেদিন গোলাপবনে বসন্তবাহার,
কেটে কেটে তুলে আনি বাইশটি ফুল,
সাজাই সযত্নে বন্ধু টেবিলে তোমার,
বহুমূল্য ফুলদানি, চিত্রিত বর্তুল।

বাইশটি গোলাপের বর্ণাঢ্য সৌরভে
সাজাই তোমার ঘরে নশ্বর যৌবন,—
শুনি প্রেম চিরজীবী আপন বৈভবে,
কুসুমের মৃত্যু দিয়ে পাই যদি মন॥

৩

বাজাবে বাজাও তবে নানা সুর ভিন্ন ভিন্ন তারে,
সত্যে-স্বপ্নে কল্পনায় মানসের আন্‌মনার গৎ,
তোমার সত্তায় সখী সবই স্বাভাবিক ও মহৎ।
তবু জানি কোনোদিন কোনোক্ষণে কানাড়ার রাতে
কিম্বা বুঝি রামকেলির শিশিরের শীতল আভাতে
তুমি আত্মহারা হবে অন্ধকারে একাগ্র উৎসুক,
বাজাবে বিহ্বল তুমি, জানবে না কোন ছিন্নতারে
নক্ষত্রের পায়ে পায়ে এসে গেছে স্তব্ধ আগন্তুক
দিও তাকে ভৈরবীতে নিঃশব্দ তীব্রতা দুই হা
বক্ষে নিও, সে তোমার সর্বস্বের ভৈরব ভিক্ষু

১৫

৪

ধু ধু মাঠে লাল হাওয়া সারাদিন বয়
ধুলোয় ধুলোয় কতো না পরাগ ওড়ে
বউল ঝামরে ঝরে আর উড়ে' যায়
সারাদিন ধরে পুরের গলির মোড়ে
নিমের পাতার কাঁপন প্রতীক্ষায়
সে কার জন্যে সারাদিন হাওয়া বয়
তারপরে হাওয়া নেমে যায় গোধূলিতে
দগ্ধদিনের ধুলোর জীবন রাঙে
দূরের মজুর মন্থর পথ ভাঙে
অন্ধকারের অদৃশ্য মৃদু তাপে
আবার কিসের আশায় আকাশ কাঁপে
দিনের জ্বালা কি ছড়াবে সে রাত্রিতে
সারাদিন কেন মিছে লাল হাওয়া বয়
তাই কি রাত্রি আতপ্ত তন্ময়?

৫

নিরবধি কাল আর পৃথিবী বিপুল—
তার মাঝে দিলে তুমি আমাকে সম্মান,
নিত্যের মর্যাদা নিয়ে নিস্তব্ধ পিপুল
আমি দেখি করে' যাও প্রত্যহের দান,
আমি শুনি স্রোতস্বিনী, দিনরাত্রি গান
অম্লান স্নেহের ভরে, শ্যাম মমতায়
তোমার চঞ্চল দেহে দেখি যে পৃথুল
আমার প্রাণের স্থির শিকড়ের স্নান।
যদি কোনো দিন অন্যপাড়ে আনো বান,
যে গ্রামে অনেক গাছ করবী শিমুল,
কে জানে ফিরবে কিনা নিঃসঙ্গ সোঁতায়—
আমি ডাকব না ব্যর্থ লুব্ধ সমতায়
নিস্তব্ধ নিরম্বু চরে নিশ্চল পিপুল॥

৬

তোমারই ছায়ায় বাসা, দিনরাত্রি তোমারই সঙ্গীতে
মর্মরিত আমার নিশ্বাস, শ্যামপত্র সমারোহ
আমাকেও ছায়াঘন করে, তবু মাঘের নিগ্রহ
তোমাকে ভোলায় যদি, উপবাসী তোমার ভঙ্গীতে
যদি ভুলি তোমার স্বরূপ, যদি ভুলি' হিম শীতে
শ্রাবণের ঘটা কিম্বা ভুলে' যাই বৈশাখী বিদ্রোহ
তোমার সর্বাঙ্গে যবে উন্মাদের ফাল্গুনী সম্মোহ,
আমাকে মার্জনা কোরো, সে ভুল যে করি অজানিতে।

যদি বা কখনো যাই গ্রামান্তের নবহরিতের
সন্ধানে তোমাকে ছেড়ে, যদি যাই অরণ্যের ভিড়ে
সে জেনো ক্ষণিক শুধু স্বভাবের চঞ্চল আকৃতি,
উন্মনা মুহূর্তে ভ্রান্ত উদাসীন শিথিল শীতের,
আমার প্রাঙ্গণে আমি গৃহস্থ যে তোমারই নিবিড়ে,
তুমি প্রত্যহের নীড়, ঘনিষ্ঠের নিত্য বনস্পতি॥

৭

জানি তো নই তোমার প্রেমে প্রথম আগন্তুক;
ষড়জে নয়, ঋষভে নয়, আমার পালা বুঝি
গান্ধারের বাঁধনে শুরু, নাকি সে মধ্যমে?
খুশিই তাতে, আনোনি তুমি আনাড়ী কৌতুক,
তোমার জন্যে আমার ধ্যানে তাই তো প্রেমে যুঝি
বিকাল-জোড়া দীর্ঘ মীড়ে লয়ের সংগমে।

আজও দেখি হঠাৎ হও উদাস উৎসুক;
থমকে শুনি, থামলে ভাবি আমার পালা বুঝি,
শঙ্কা হয় বাঁধবে সুরে এবারে পঞ্চমে,
নাকি নিখাদে? আমার প্রেম প্রবীণ ভিক্ষুক,
তোমার রাগমালার লোভে সেই বিরাম খুঁজি
যখন তুমি ক্লান্তি-ভোরে নামবে এসে সমে;

অন্তহীন ধৈর্য হবে ধন্য, তারে তারে
বাজবে শেষ গান্ধারের চরম ঝংকারে॥

দীপান্বিতা

সুনীলচন্দ্র সরকার

হাতে দীপ নিয়ে তুমি ঘোরো ঘরে ঘরে
...যদি কেউ জাগে,
রাতের সমস্ত কালো পিছনে পিছনে
তুমি আগে আগে।
কোথাও আপনমনে হেসে চলে যাও,
কোথাও দাঁড়াও,
খুলে-রাখা জানলার আকাঙ্ক্ষার ফাঁকে
বাতিটি বাড়াও!
সে দয়ায় কোনো নম্র ঘুমের হৃদয়ে
দেখা দেয় তারা,
হয়তো বা তা'ও নয় শুধু চমকায়
অভ্যস্ত পাহারা।
দৈবাৎ এমনও হয় জাগার যে জাগেঃ
...দেখে সে তোমাকে,
তখনি সাবধান রাত্রি অদাহ্য আঁচলে
সে বিপ্লব ঢাকে।
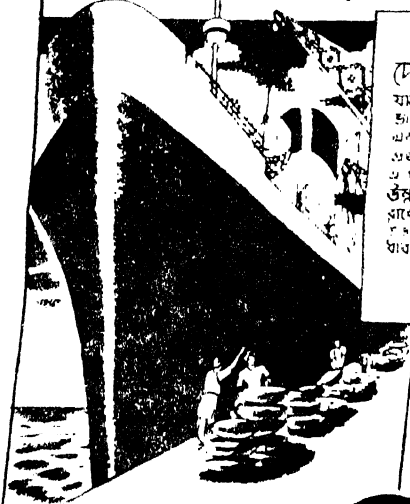
প্রগতির পরিচয়—স্ট্যানভ্যাক কুইজ-২
দেশের সর্বসাধারণের জীবন-
যাত্রার মান উন্নয়নের জন্যেই
কতখানি
উন্নতি
মধ্যে সেচপ্রাপ্ত জমির
আয়তন বেড়েছে :
ক) ৮১,০০,০০০ একর
খ) ১১,০০,০০০ একর
গ) ২৭,০০,০০০ একর
২ রপ্তানী বাণিজ্যের উপর দেশের সমৃদ্ধি অনেকখানি নির্ভর করে। ১৯৫৪-৫৫ সালে ভারত থেকে লবণ রপ্তানী হয়েছে মোট:
ক) ৪৫,৭৫,২৮০ মণ
খ) ১৫,০৫,২১১ মণ
গ) ৮,৩১,০১০ মণ
৩ টেলিফোন তৈরীতে পূর্ব-নির্ধারিত সংখ্যা ছাড়িয়ে যাওয়ায় নতুন করে সংখ্যা নির্ধারণ করতে হয়েছে। ১৯৫৪-৫৫ সালে টেলিফোন তৈরী হয়েছে মোট :
ক) ৮,২৩৩ খ) ১৬,০৭৮
গ) ৪৮,২৩৪
৪ শিক্ষা-বিস্তারের জন্যে নতুন নতুন স্কুল স্থাপন করা এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত। ১৯৫৪ সালের মধ্যে নতুন স্কুলের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে:
ক) ২৮,০৬৩
খ) ২৫,৭০০
গ) ১২,৪০০
উত্তর
১ ভারতে বেশী ফসল ফলাবার জন্যে উর্বর আবাদী জমির আয়তন বেড়েছে ৮১,০০,০০০ একর।
২ ১৯৫৪-৫৫ সালে লবণ রপ্তানী করা হয়েছে মোট ৪৫,৭৫,২৮০ মণ-এতে ৩৩,৬৭,৯০০ বিদেশী মুদ্রা খাতে সঞ্চয় হয়েছে।
৩ ১৯৫৪-৫৫ সালে ৪৮,২৩৪ টেলিফোন তৈরী করা হয়েছে। পরিকল্পনার প্রথম লক্ষ্য ছিল ২৫,০০০ টেলিফোন মাত্র।
৪ ১৯৫৪ সালের মধ্যে ২৫,৭০০ নতুন স্কুল খোলা হয়েছে— আগামীদিনের নাগরিকদের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারে আশ্চর্য অগ্রগতি!
স্ট্যাণ্ডার্ড-ভ্যাকুয়াম ভারতের প্রগতির পরিচায়ক এই তথ্য পরিবেশন করতে পেরে আজ গর্বিত-তা ছাড়া আমাদের পেট্রোল জাত দ্রব্য উৎপাদন, পরিশোধন ও পরিবেশনের বিবিধ কর্মধারা দেশের এই অগ্রগতির সহায় বলে স্ট্যাণ্ডার্ড ভ্যাকুয়াম আজ গৌরবান্বিত।
নয়াদিল্লীতে ইণ্ডিয়ান ইণ্ডাষ্ট্রীজ ফেয়ার দেখুন, ২৯-এ অক্টোবর থেকে ১৫ই ডিসেম্বর
V 2430

✻ হ্যালডর কিলজান ল্যাক্সনেস ✻

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

স্ক্যাণ্ডেনেভিয়া ও গ্রীনল্যাণ্ডের মধ্যে প্রকাণ্ড বড় দ্বীপ আইসল্যাণ্ড। আয়তন প্রায় চল্লিশ হাজার বর্গমাইল। কিন্তু লোকসংখ্যা মাত্র এক লক্ষ বত্রিশ হাজার। এর মধ্যে রাজধানী র‍্যাকিয়াভিকেই প্রায় পঞ্চান্ন হাজার লোকের বাস। পশ্চিমবঙ্গ অপেক্ষা আয়তনে দশ হাজার বর্গ মাইল বড় হলেও অধিকাংশ অঞ্চলই বাসের অনুপযোগী। তাই বসতি এত বিরল। তুষারে ঢাকা দেশ, চাষআবাদ বড় একটা হয় না। টাট্টু ঘোড়া, ভেড়া, সমুদ্রের মাছ, এবং গন্ধক রপ্তানি করা আইসল্যাণ্ডের অধিবাসীদের আয়ের প্রধান উপায়। আইসল্যাণ্ডে বেঁচে থাকবার সংগ্রাম বড় কঠোর, বিশেষ করে চাষী ও মজুরদের। প্রকৃতির সঙ্গে দাঁতে-নখে লড়াই করে বেঁচে থাকতে হয়, বাকি পৃথিবীর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ নেই; তবু আইসল্যাণ্ডের নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। আধুনিক পার্লামেন্টারী শাসনপদ্ধতির সূত্রপাত সর্বপ্রথম হয়েছে আইসল্যাণ্ডে। এদেশের বীরত্ব-গাথা সাগা ও এড্ডা বিশ্বসাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। আইসল্যাণ্ডের সাহিত্য মধ্যযুগের গাথাতেই থেমে যায়নি। আধুনিক আইসল্যাণ্ডীয় সাহিত্যের সমৃদ্ধিও বিস্ময়কর।

বছর দুই আগে বিখ্যাত প্রকাশক স্যার স্ট্যানলি আনউইন কলকাতা এসেছিলেন। তাঁর কাছে আইসল্যাণ্ডবাসীদের পুস্তকপ্রীতির কথা শুনেছি। এত অল্প-

এই বছরের সাহিত্যিক নোবেল পুরস্কারবিজয়ী হ্যালডর কিলজান ল্যাক্সনেস। তাঁর সঙ্গে আছেন স্ক্যাণ্ডেনেভিয়ার এক বিখ্যাত চিত্রাভিনেত্রী। ছবির হাসি পুরস্কার পাওয়ার আগেকার এবং তার উৎসের ইঙ্গিত আছে পুরস্কারের সংবাদ পাওয়ার উক্তিতেঃ প্রাইজের টাকার নব্বুই ভাগ নেবে সরকার, আয়করে। নিক। অবশিষ্ট টাকা দিয়ে কেনা হবে যা ছবিতে গেলাসে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে। কাঞ্চনে ল্যাক্সনেসের আসক্তি নেই; তিনি দরিদ্রের সন্তান, দারিদ্র্যের শত্রু—আর জীবনের বন্ধু

সংখ্যক লোকের দেশে বইয়ের এমন চাহিদা পৃথিবীর আর কোথাও নেই বলে তাঁর বিশ্বাস। আইসল্যাণ্ডের পাঠকদের পাঠ-স্পৃহা শুধু গল্প-উপন্যাসের মধ্যে নিবদ্ধ নয়। যে-কোনো বিষয়ের বই পড়তে তাদের আগ্রহ। অনুবাদ-সাহিত্যের সমাদরও কম নয়। এই প্রবল পাঠস্পৃহার প্রধান কারণ দুটি। প্রথমত, আইসল্যাণ্ডে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক; দ্বিতীয়ত, প্রচণ্ড শীতের দেশে অধিকাংশ সময় ঘরে বসে কাটাতে হয়; তাই বই পড়া চিত্ত-বিনোদনের প্রধান উপায়।

আইসল্যাণ্ডের আধুনিক লেখকদের মধ্যে অন্তত দশ-বারো জনকে প্রথম শ্রেণীর বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে। এঁদের মধ্যে গুনার গুনারসন, গুয়েমান্দুর কাম্বান, জি হ্যাগালিন, ক্রস্টমান গুয়োমান্দ-সন ও হালডোর ল্যাক্সনেস এই পাঁচজন ঔপন্যাসিকের নাম স্বদেশের গণ্ডীর বাইরে ছড়িয়ে পড়েছে। ইংরেজী ও অন্যান্য য়ুরোপীয় ভাষায় এঁদের লেখার অনুবাদ হয়েছে। এই পাঁচজন লেখকই সম-সাময়িক; বয়সের দিক থেকে ল্যাক্সনেস সর্বকনিষ্ঠ, কিন্তু তিনি যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী লেখক সে কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। ল্যাক্সনেস নিজেই আইসল্যাণ্ডের সাহিত্যে একটি নতুন যুগের সৃষ্টি করেছেন। সমসাময়িক লেখক এবং পর-বর্তী নবীন লেখকদের উপর ল্যাক্সনেসের রচনা গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে।

১৯০২ সালের ২৩ এপ্রিল রাকিয়া-ভিকে এক সাধারণ মজুর পরিবারে হালডোর কিলিয়ান ল্যাক্সনেস জন্মগ্রহণ করেন। ল্যাক্সনেসের বাবার কাজ ছিল রাজধানীর রাস্তা মেরামত করা। অল্পদিন পরেই তিনি এ কাজ ছেড়ে স্বাধীনভাবে চাষাবাদ আরম্ভ করেন। তাঁর বয়স যখন তিন তখন রাকিয়াভিকের নিকটবর্তী ল্যাক্সনেস গ্রামের কৃষিক্ষেত্রে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়। এই গ্রামের নাম তিনি প্রথম ছদ্মনাম হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। পরে এটাই হয়েছে তাঁর পদবী। বারো বছর বয়স পর্যন্ত মা-বাবার সঙ্গে ঐ গ্রামেই তাঁর দিন কেটেছে। এর পর তাঁকে পাঠানো হলো রাকিয়াভিকে পিয়ানো বাজানো শিখতে। কিন্তু সঙ্গীতের প্রতি তাঁর আকর্ষণ গভীর ছিল না। তাঁর ভালো লাগত গল্প ও কবিতা লিখতে। তিন বছর পরে সঙ্গীত চর্চা বন্ধ করে ল্যাক্স-নেস্ রাজধানীর ল্যাটিন স্কুলে ভর্তি হলেন।

ভালো করে লেখাপড়া শিখতে হলে তখন আইসল্যাণ্ডের ছাত্রদের ডেনমার্ক যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত আইসল্যাণ্ড ডেনমার্কের তাঁবেদারই ছিল। সুতরাং অনেক বিষয়ে আইসল্যাণ্ডকে ডেনমার্কের উপর নির্ভর করতে হতো। সতেরো বছর বয়সে ল্যাক্স-নেস ডেনমার্ক গেলেন পড়াশুনা করতে। এর আগেই তাঁর প্রথম উপন্যাস বেরিয়েছে।

ছাত্রজীবন থেকেই ল্যাক্সনেসের দেশ-ভ্রমণের প্রবল নেশা। তিনি য়ুরোপের বিভিন্ন দেশে এবং কানাডা ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণ করেছেন। এই পরিণত বয়সেও তাঁর ভ্রমণের নেশা যায়নি। কিছু-দিন পর পরই তিনি বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন। আজকাল অবশ্য উত্তর য়ুরোপের দেশগুলিতেই তাঁর ভ্রমণ নিবদ্ধ থাকে। দেশ ভ্রমণে বেরিয়েও ল্যাক্সনেস নিয়মিত-ভাবে লেখেন। তাঁর অনেক বই বিদেশে লেখা।

বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে ল্যাক্সনেসের জীবন গভীরভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছে। লুক্সেমবুর্গের মঠে বেড়াতে গিয়ে ১৯২৩ সালে তিনি ক্যাথলিক ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। জার্মানীর কাছ থেকে পেলেন এক্সপ্রেশো-নিজমের তত্ত্ব। ফ্রান্সে দু' বছর (১৯২৪—'২৬) কাটিয়ে পরিচিত হলেন সুররিয়ালিজমের সঙ্গে। আর আশ্চর্য, কানাডা ও ক্যালিফোর্নিয়ার মতো ধন-তান্ত্রিক দেশে ভ্রমণ করতে করতে (১৯২৭—'৩০) সাম্যবাদের আদর্শ তাঁকে আকৃষ্ট করল। নতুন জীবন-দর্শন নিয়ে ল্যাক্সনেস দেশে ফিরে এলেন ১৯৩০ সালে। ঐ বৎসরই তাঁর দু'টি বই প্রকাশিত হয়। 'The Book of the People' প্রবন্ধ পুস্তক। এই প্রবন্ধ সংগ্রহে তিনি শাণিত ভাষায় সাম্যবাদের আদর্শ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। দ্বিতীয় গ্রন্থটি ল্যাক্সনেসের আধুনিক গীতি কবিতার সঙ্কলন। এতদিন আইস-ল্যাণ্ডের কাব্য মধ্যযুগীয় সাগা[illegible] ছিল। ল্যাক্সনেস তাকে এই প্র[illegible] জগতের আলোয় টেনে আনলেন। [illegible] ল্যাণ্ডের পাঠকরা সাম্যবাদের [illegible] ও কাব্যরীতির নতুনত্বে চমকিত হ[illegible]

ল্যাক্সনেসের প্রথম উল্লেখযোগ[illegible] ন্যাস "The Great Weaver [illegible] Cashmere" প্রকাশিত হয় ১৯২[illegible] এটি লেখকের আত্মজীবনী[illegible] কাহিনী। ক্যাথলিক ধর্ম গ্রহণ [illegible] জীবনের আদর্শ ও লক্ষ্য সম্বন্ধে [illegible] নেসের সংশয় দূর হয়নি। পথ নি[illegible] দ্বন্দ্ব এই উপন্যাসের মূল প্র[illegible] বিষয়। রচনারীতির বৈশিষ্ট্যে এবং [illegible] গভীরতায় The Great Weaver [illegible] Cashmere আইসল্যাণ্ডের উ[illegible] সাহিত্যে নতুন যুগের সূচনা [illegible] কিন্তু এটি তাঁর পরিণত শিল্পকর্ম [illegible]

ল্যাক্সনেসের প্রতিভার স্বাক্ষর [illegible] যাবে নিম্নলিখিত তিনটি উপ[illegible] মধ্যেঃ 'সাল্কা ভল্কা' (১৯৩[illegible] 'ইনডিপেনডেণ্ট পিপল' (১৯৩[illegible] 'দি লাইট অফ দি ওআর্লড' (১৯৩[illegible] শেষোক্ত উপন্যাসের নায়ক জনগণের [illegible] কবির অর্থ ও প্রতিপত্তি ছিল না[illegible] তাঁকে নিষ্ঠুর লাঞ্ছনার সম্মুখীন [illegible] হয়েছে। কিন্তু সংসারের নির্মম [illegible] সত্ত্বেও কবির আত্মা পরাজয় বরণ [illegible] তাঁর চরিত্রবল ক্ষুণ্ণ হয়নি। [illegible] অপরাজিত আত্মার প্রতীক এই কা[illegible]

'দি বেল অব আইসল্যাণ্ড' ([illegible] এবং 'দি ফেয়ার মেইডেন' ([illegible] ল্যাক্সনেসের আর দুটি উপন্যাস। [illegible] ল্যাণ্ডের ইতিহাসের উপর ভিত্তি [illegible] এদের কাহিনী রচিত। ল্যাক্স[illegible] সাম্প্রতিক রচনায় ইতিহাসের উপর [illegible] দেখা যায়। আরো কয়েকখানি [illegible] উপন্যাস ও কবিতার বইও [illegible] লিখেছেন।

নানা দেশে ভ্রমণ করার ফলে [illegible] নেস আয়ত্ত করেছেন য়ুরোপের [illegible] ভাষা। ইংরেজী, ফরাসী, ডাচ [illegible] তিনি ভালো করেই শিখেছেন। [illegible] বিদেশী সাহিত্য থেকে অনুবাদ [illegible] মাতৃভাষাকে সমৃদ্ধ করা সম্ভব [illegible] ল্যাক্সনেস ভলটেয়ারের 'ক্যানডিড[illegible]

...ংওয়ের 'ফেয়ার ওয়েল টু আর্মস্' ...ইসল্যাণ্ডের ভাষায় অনুবাদ করেছেন। ...ল্যাক্সনেসের নিজের লেখা বই উত্তর ...রোপের বিভিন্ন দেশের ভাষায় অনুবাদ ...য়েছে। অনুবাদের মাধ্যমে তিনি ঐ ...ঞ্চলের জনপ্রিয় লেখক হয়ে উঠেছেন। ...র্মানীতে তাঁর বইয়ের প্রচার লক্ষ্য করে ...ৎসী সরকার নিষেধাজ্ঞা জারী করেছিল। ...ন্তু দুঃখের বিষয় ইংরেজীতে ল্যাক্স-...সের তিনখানি বই মাত্র অনুবাদ হয়েছে। ...দের মধ্যে The Great Weaver ...rom Cashmere দেখবার সুযোগ ...য়নি। Salka Valka ও Indepen-...ent People পড়বার সুযোগ পেয়েছি। ...সাল্‌কা ভল্‌কা' বর্তমানে ছাপা নেই। ...ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট পীপ্‌ল্' আমেরিকার ...জারে পাওয়া যায়। সুতরাং শুধু এই ...টি বইয়ের উপর নির্ভর করে ল্যাক্স-...নসের সাহিত্য আলোচনা করতে হয়। ...বে সৌভাগ্যের কথা যে 'সাল্‌কা ...ল্‌কা' ও 'ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট পীপ্‌ল্' ল্যাক্স-...নসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি। উৎকর্ষের ...ক থেকে এদের সমকক্ষ আর একটিমাত্র ...পন্যাস আছে; তার ইংরেজী অনুবাদ ...খনো হয়নি।

প্রচণ্ড শীতের দেশ আইসল্যাণ্ড। ...ত্তরাঞ্চলে শীতের প্রকোপ তীব্রতর। ...দিকে অপেক্ষাকৃত দরিদ্র লোকের বাস। ...দের জীবন বড় কঠোর। আইসল্যাণ্ডের ...ক্ষণাঞ্চলকে তারা বসন্তের দেশ বলে ...ন করে এবং উত্তরাঞ্চলে বাস করবার ...র্ভাগ্যকে ধিক্কার দেয়। 'সাল্‌কা ...কা' ও 'ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট পীপল'এর ...ভূমিকা আইসল্যাণ্ডের উত্তরাঞ্চল।

সমুদ্রের তীরে ছোট গ্রাম ওসিরি। ...ও দারিদ্র্যে ক্লিষ্ট দুঃখের জীবন ...নে। চাষাবাদের উপযোগী জমি নেই। ...নকার প্রধান কাজ সমুদ্রে মাছ ধরা এবং ...লবণ মেখে শুকিয়ে বিদেশে চালান ...রা। মাছের ব্যবসায়ে একচেটিয়া মালিক ...ল বোগেসেন। সকলেই কাজের জন্য ...কাছে আসে। বোগেসেন কাউকে নগদ ...দেয় না। কার কত টাকা পাওনা ...খাতায় লেখা থাকে। ও অঞ্চলের ...বিভাগীয় বিপণির মালিকও ...। ওই দোকান থেকে কর্মীরা উপার্জনের পরিমাণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সংগ্রহ করে।

ডিসেম্বর মাসের এক শীতার্ত রাত্রি। জাহাজ থেকে ওসিরির তীরে পা দিল সিগুর্‌লিনা, সংগে তার এগার বছরের মেয়ে সাল্‌কা ভল্‌কা। সম্পূর্ণ অপরিচিত জায়গা; অন্ধকার রাত্রি, তুষার পড়ছে। আশ্রয় কোথায় পাবে? সব বাড়ির দরজা

বন্ধু, অজানা লোককে কেউ স্থান দিতে চাইবে না। ঘুরে ঘুরে রাত্রির মতো আশ্রয় পেল সমুদ্রগামী জাহাজের নাবিকদের একটা আস্তানায়। ঘরের আলোয় সালকাকে দেখা গেল। লম্বাটে গড়ন, হাড়-সর্বস্ব দেহ; বয়সের চেয়ে বড় দেখায়। সমুদ্রের জলের মতো নীল রঙের দুটি চঞ্চল ক্ষুদ্রাকৃতি চোখ। হাসলে চোখ হারিয়ে যায়, নাকের দু'পাশে দু'টি গর্তের চিহ্ন ফুটে ওঠে। কথা বলবার সময় তার দৃঢ়-সংবদ্ধ দাঁতের সারি ও চওড়া মাড়ির কিয়দংশ বেরিয়ে পড়ে। সাল্কার আধ-ফোটা মুখের চেহারায় যে সজীবতা ও আত্মপ্রত্যয়ের ছাপ লেগে আছে তা কারো চোখ এড়াবার নয়।

ওসিরির ডাক্তার, রেক্টর ও বোগে-সেনের বাড়ীতে ঝি রাখা সম্ভব। মেয়েকে সঙ্গে করে সিগুরলিনা এই তিন বাড়িই গেল। কারো লোকের প্রয়োজন নেই। স্টেইনটর স্টেইনসন নামে একজন নাবিক দয়াপরবশ হয়ে এগিয়ে এলো সাহায্য করতে। তার মাসীর বাড়িতে থাকবার ব্যবস্থা করে দিল। মা ও মেয়েকে গরু-ভেড়া দেখাশোনা করতে হবে, আর রোজ দুধ পেঁৗছে দিতে হবে বাড়ি বাড়ি। স্টেইনটরের মুখে বসন্তের দাগ, চোখে লোভাতুর দৃষ্টি। চাইলেই আঁতকে উঠতে হয়। তার মনে এত দয়া?

স্টেইনটরের স্বরূপ প্রকাশ পেল কয়েক দিনের মধ্যেই। ওই ছোট মেয়ে সাল্কার উপরও তার লোভ। সাল্কার সঙ্গে ধস্তাধস্তি হলো একদিন। নিজেকে মুক্ত করে হাঁপাতে হাঁপাতে মার কাছে এসে বলল, "ঐ শয়তানটাকে আমি খুন করব।"

এক রাত্রিতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল সাল্কার। শুনতে পেল মা বলছে, "না, না, যীশুর নাম করে বলছি এ কাজ করো না; আমি লোক ডাকব। আমার মেয়ে রয়েছে পাশে।" তখনো সম্পূর্ণ ঘুম ভাঙেনি। সাল্কার মনে হলো কোনো হিংস্র পশু তার মাকে আক্রমণ করেছে। সাল্কা মাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে ভয়ার্ত কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল। এই চিৎকারে হকচকিয়ে পশুটা বেরিয়ে গেল। মানুষের আকার। স্টেইনটর।

একটু তন্দ্রার মতো এসেছিল। জেগে দেখল মা তার পাশে নেই। ডাকতে গিয়ে গলা আটকে গেল। এতদিন জানত ম একা তারই,—এখন পেল মার নতুন পরি-চয়। সিগুরলিনার সব চেয়ে বড় পরিচয় সে মেয়েমানুষ। মেয়ের সামনে আসবার সময় মায়ের মুখোশ পরে আসে। মেয়ে ঘুমোলেই আবার তা খুলে ফেলে। তখন মেয়েদের সহজাত কামনা-বাসনা জেগে ওঠে, তার মধ্যে মা হারিয়ে যায়। অন্ধকারে নিঃসঙ্গ শয্যায় শুয়ে শুয়ে সাল্কা মনে হলো তার মা নেই, বন্ধু নেই, কে নেই। হয়তো সত্যি করে কখনো ছিল না। সংসারে একাই দাঁড়াতে হবে। কে সঙ্গে আসবে না। সংকল্পে কঠোর হয়ে ওর মুখ।

সকালে প্রতিদিন বাড়ি বাড়ি দ পেঁৗছে দেবার জন্য পথে বের হতে হ সাল্কাকে। ছেঁড়া, তেলচিটচি পোশাক; জরাজীর্ণ জুতার ফাঁক দি আঙুল বেরিয়ে পড়ে। বৃষ্টি হোক তুষারপাত হোক, দুধ পেঁৗছে দিতে হবে। কিন্তু রাস্তায় বের হলেই পা ছেলেরা তার পেছনে লাগে। এ অঞ্চ সাল্কারা নতুন লোক বলে কেউ তা সহানুভূতির চোখে দেখে না। ছেলেরা গায়ে বরফের ডেলা, রাস্তার ময়লা ছ মারে; অশ্লীল কথা বলে। স্টেইনট সঙ্গে তার মার গুপ্ত প্রণয়ের কথা অ নেই, ছেলেরা তাকে বেশ্যার মেয়ে সম্বোধন করে। সাল্কা কখনো ক রুখে দাঁড়ায়; চোখ দিয়ে আগুন বের ওদের ডেকে বলে, আয় দেখি সা কেমন সাহস! এই মূর্তি দেখে ওরা পায়। বাড়ির আড়ালে অথবা মোড়ে আত্মগোপন করে। কিন্তু চ আরম্ভ করলেই আবার পেছন জ্বালাতন শুরু হয়।

সেই বয়সেই সালকার মনে জীবন-জিজ্ঞাসা। এই অকারণ নিষ্ঠুর কারণ কি? শুধু বেদনা দেওয়া ছাড়া কোনো উদ্দেশ্য নেই। তার মার ইঙ্গিতটা হয়তো সত্য; সে দেখতে তাও অস্বীকার করবার উপায় নেই তারা দরিদ্র ও অসহায়। তাই বলে দিন তাকে অকারণে অত্যাচার সইতে হ কেন? এর কি কোনো প্রতিকার নেই হে ঈশ্বর, তুমি সহায় থেকো, আমি

একদিন এর প্রতিশোধ নিতে পারি। কিন্তু এই ঈশ্বরই তো তার প্রতি বিরূপ। কেন এত কুশ্রী করেছেন ওকে?

সালকার এখনো অক্ষরপরিচয় হয়নি। দেশের আইন অনুযায়ী লেখাপড়া শিখতে হবে। সরকারী শিক্ষক তাঁর এক ছাত্রকে পাঠিয়ে দিলেন সাল্‌কাকে পড়াবার জন্য। একটু অগ্রসর হলে স্কুলে যাবে।

আর্নাল্‌দুর তার চেয়ে অল্প কিছু বড়। প্রথম তাকে দেখে সাল্‌কার সন্দেহ হলো, যে সব ছেলে তাকে জ্বালাতন করে এ-ও বুঝি তাদেরই একজন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই বুঝতে পারল আর্নাল্‌দুর ভিন্ন প্রকৃতির ছেলে। তার চোখে কৈশোর স্বপ্নের মায়া, রূপকথার রাজ্যে বিচরণ করে। সাল্‌কা অত্যন্ত বাস্তব রূঢ়জীবনের মধ্যে মানুষ, আর্নাল্‌-দুর স্বপ্নচারী ভিন্ন প্রকৃতির হলেও দুজনের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে উঠল। এর আগে কথা বলবার মতো বন্ধু পায়নি সাল্‌কা। আর্নাল্‌দুর এলো নতুন জগতের বার্তা নিয়ে।

একদিন কী নিয়ে কাড়াকাড়ি করতে করতে সাল্‌কা যেন এই নতুন করে উপলব্ধি করল সে মেয়ে, আর্নাল্‌দুর পুরুষ। পুরুষের অধিকার নিয়ে সে এগিয়ে আসতে চায়। সাল্‌কা উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠল, 'না, না, আমি মেয়ে হতে চাই না; মেয়ে হলে তো মা'র অবস্থা হবে! তা আমি কিছুতেই হতে দেব না।'

সাল্‌কা পুরুষের ছেঁড়া পোশাক গ্রহণ ক'রে পরে। চলাফেরায়, গলার স্বরে পুরুষালি ভাব। স্কুলে ভর্তি হয়েছে। আর বোগেসেনের মাছের কারখানায় মাছ ধোবার কাজও করে। হাড়ভাঙা খাটুনি খেটেও একটি নগদ পয়সা পায় না। মাসের শেষে মজুরীর সঞ্চিত টাকা নিয়ে বোগেসেনের দোকান থেকে জামা কিনতে গিয়ে দেখল সিগরুলিনা তার আগে আগেই নিজের জন্য পোশাক কিনে গেছে।

সিগরুলিনার মধ্যে হঠাৎ ধর্মোন্মাদনা দেখা দিয়েছে। গির্জায় গিয়ে সকলের সামনে নিজের জীবনের সকল দুষ্কৃতি স্বীকার করে ঈশ্বরের করুণা ভিক্ষা করল। তার নিজের কাহিনী থেকে জানা গেল সে দুঃখী; অসহায়তার সুযোগ নিয়ে দুষ্ট লোকেরা তাকে প্রলুব্ধ করে পথে বসিয়ে গেছে। সাল্‌কা তার অবৈধ সন্তান। ঈশ্বরের করুণা সিগরুলিনা পেল কিনা কে জানে কিন্তু সাল্‌কার জন্মের ইতিহাস ওসিরিতে কারো কাছে অজানা রইল না।

স্বীকারোক্তি করেও সিগরুলিনার কামনা-বাসনা দূর হয়নি। স্টেইনটরের প্রতি সে আকৃষ্ট। তার সন্তান এসেছে গর্ভে। তবু স্টেইনটরের দৃষ্টি সাল্‌কার উপর। সাল্‌কার তেজোদৃপ্ত ভঙ্গী, তীক্ষ্ম বাক্যবান এবং আত্মরক্ষার জন্য সংগ্রাম আরো বেশি করে আকর্ষণ করে। আবার একদিন রাত্রিতে স্টেইনটর এসেছে মাকে অপমান করতে। সাল্‌কার আর সহ্য হলো না। উন্মত্তের মতো সে ঝাঁপিয়ে পড়ল স্টেইনটরের উপর। কিন্তু শক্তিশালী নাবিকের বিরুদ্ধে সে কি করতে পারে? স্টেইনটরের দেহে জ্বালা ধরে গেল। সে সিগরুলিনাকে জোর করে ঘরের বাইরে ঠেলে দিয়ে দরজা বন্ধ করল। এতদিনে সে সাল্‌কাকে একা পেয়েছে।

কিছুক্ষণ পরে সিগরুলিনা যখন পাড়ার লোক সঙ্গে করে ফিরে এলো তখন ঘর খোলা, সাল্‌কা সংজ্ঞাহীন হয়ে বিছানায় পড়ে আছে। স্টেইনটর কোথাও নেই।

দু'বছর যাবৎ স্টেইনটর নিরুদ্দেশ। সিগরুলিনা আর একটি অবৈধ সন্তানের জন্ম দিয়েছে। স্টেইনটরের ছেলে। সালকার দেহ দিন দিন বিকশিত হয়ে উঠছে। পুরুষের পোশাকও তার প্রকৃত পরিচয় গোপন করতে পারে না। স্কুলে, বাড়িতে, মাছের কারখানায়—কোথাও তার বন্ধু নেই। একমাত্র সঙ্গী আর্নাল্‌দুর স্কুল ছেড়ে বোগেসেনের দোকানে কেরানীর চাকুরী করছে।

বোগেসেনের মেয়ে অগাস্টার সঙ্গে আজকাল আর্নাল্‌দুরের ভাব। অগাস্টা কোপেনহেগেনে পড়াশুনা করছে; দেখতে ভালো; দামী পোশাক পরে। সুতরাং আর্নাল্‌দুর তো চাইবেই তাকে। কিন্তু আর্নাল্‌দুর যদি জানত সালকার জীবনে তার স্থান কোথায়! পৃথিবীতে সাল্‌কার আর কেউ নেই; তার জীবনের একমাত্র সূর্য আর্নাল্‌দুর। সে যদি মুখ ফেরায় তাহলে সাল্‌কার জীবন বরফের মতো ঠাণ্ডা হয়ে নিভে যাবে। ব্যাকুল হয়ে প্রশ্ন করে, হে ঈশ্বর, সবাইকে তো তুমি সৃষ্টি করেছ, তবে সবাই দেখতে সুন্দর নয় কেন? সবাই কেন কোপেন-হেগেন যেতে পারে না? সবার জন্য ভালো খাবার কেন জোটে না? কি করেছি আমি যার জন্য তুমি রাগ করে আমাকে জীবনের স্বাদ থেকে বঞ্চিত করেছ?

উত্তর খুঁজে না পেয়ে কিশোরীর হৃদয় আরো ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

আর্নাল্‌দুর একদিন ডেনমার্ক চলে গেল। সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে

পড়বে। যাবার আগের দিন বিকেলে সাল্‌কা ও সে সমুদ্রের ধারে একটা নির্জন পাথর ঢিবির উপর এসে বসল। বিদায়ের পালা। আর্নাল্‌দুর পুরুষের চোখ দিয়েই দেখেছে সাল্‌কাকে। কিন্তু সাল্‌কা কিছুতেই এগিয়ে আসতে পারল না। অন্তরে প্রবল আকর্ষণ অনুভব করলেও মা'র দুরবস্থার ছবিটা দুঃস্বপ্নের মতো সামনে এসে সতর্ক করে দেয়ঃ ক্ষণিকের মোহে ভুল করো না। আর্নাল্‌দুর স্মারক হিসেবে একটা লকেট দিয়ে গেল। লকেটের উপর তার ছবি আঁকা।

অনেকদিন পার হয়ে গেছে। স্টেইনটর সিগুর্‌লিনাকে বিয়ে করবে বলে গির্জা থেকে ঘোষণা করা হয়েছে। সাল্‌কার উপর স্টেইনটরের লোভ এখনো যায়নি। সিগুর্‌লিনা এজন্য মেয়েকে ঈর্ষা করে। মেয়েকে অনুরোধ করে, আমার কাছ থেকে ওকে কেড়ে নিস্‌ না তুই।

আর্নাল্‌দুর চিঠি লিখেছে। সাল্‌কার জীবনে এই প্রথম চিঠি। তা আবার আর্নাল্‌দুরের কাছ থেকে। বেশ উৎফুল্ল মনে বেড়াতে বেরিয়েছে। পথে স্টেইনটরের সঙ্গে দেখা। স্টেইনটরও তার সঙ্গে চলল। আনন্দের দিনে ঝগড়া করতে ইচ্ছা হলো না, বাধা দিল না ওকে। কিন্তু ধূর্ত স্টেইনটর সালকাকে ভুলিয়ে নিয়ে এলো শূন্য একটা চালা ঘরে। সেদিন সাল্‌কার ভাগ্যে কি ছিল কে জানে! মা'র আকস্মিক উপস্থিতি তাকে রক্ষা করল। মা মেয়ে ও ভাবী স্বামীর সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে উঠেছিল বলে পশ্চাদ্ধাবন করেছে।

সাল্‌কা রক্ষা পেয়ে ফিরে এলো। কিন্তু এর পর থেকে মা'র সন্ধান নেই। কয়েকদিন পরে সমুদ্রের জলে পাওয়া গেল সিগুর্‌লিনার মৃতদেহ। স্টেইনটরও নিরুদ্দেশ হয়েছে।

সাল্‌কার অবস্থা এখন মোটামুটি ভালো। সে অবসর সময়ে বই পড়ে। দরিদ্রদের জন্য তার সহানুভূতির অন্ত নেই। নিজের বাড়িতে কয়েকটি অনাথ ছেলেমেয়েকে আশ্রয় দিয়েছে। ওসিরির নিঃস্ব, অসহায় নাগরিকদের সে ভরসাস্থল। সে তাদের শেখায়, 'দারিদ্র্যের বিপদে ঈশ্বর কিংবা মানুষ কেউ সাহায্য করতে আসে না। নিজেদের উপরই তোমাদের নির্ভর করতে হবে।' সাল্‌কা স্থানীয় নাবিক সমিতির সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছে।

আর্নাল্‌দুর হঠাৎ ফিরে এলো। আইস্‌ল্যান্ডের কম্যুনিস্ট নেতা টোরফ্‌ডালের প্রধান অনুচর সে। আর্নাল্‌দুর ওসিরিতে তার কার্যক্ষেত্র বেছে নিয়েছে। কিছুদিন পরেই মজুরী বৃদ্ধির দাবীতে বোগেসেনের শ্রমিকরা ধর্মঘট করল। দাঙ্গাহাঙ্গামা, লোকের অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশা; সালকা এই ধর্মঘটে যোগ দেয়নি। সে আর্নাল্‌দুরের প্রতিপক্ষ। ধর্মঘট ব্যর্থ হলো।

এতদিন পরে আবার দু'জনের মধ্যে পুরনো বন্ধুত্ব নতুন হয়ে এলো। ওদের পরিপূর্ণ যৌবন। বন্ধুত্ব প্রগাঢ় প্রেমে পরিণত হতে দেরি হলো না। সাল্‌কার সংশয় জাগে, ভয় করে। কিন্তু অন্ধকারের ভয়ে তো ফুল ফোটা বন্ধ থাকে না!

প্রতিদিন বিকেলে ওরা বেড়াতে যায়। সাল্‌কার মুখের রুক্ষতা দূর হয়ে কোথা থেকে হঠাৎ স্নিগ্ধ লাবণ্য নেমে এসেছে। ওদের দু'জনকে নিয়ে গুজবের শেষ নেই। কিন্তু কান দেয় না। দু'জনে মিলে নতুন জগত সৃষ্টি করেছে। সেখানে অন্য কারো প্রবেশাধিকার নেই।

প্রথম চুম্বন। আর্নাল্‌দুরের মুখ নেমে এসে হঠাৎ একটু থেমে যায়। সাল্‌কার চোখ বন্ধ, মুখ ঈষৎ ফাঁক হয়ে আছে, সমস্ত দেহ আকাঙ্ক্ষায় স্তব্ধ। সেই মুহূর্তে আর্নালদুর মনে হলো মৃত্যুর সঙ্গে এই ছবির আশ্চর্য মিল আছে। প্রেম যে মৃত্যুর এমন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় তা কে জানত!

সাল্‌কা সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করতে পারে না। আর্নাল্‌দুর সীমা লঙ্ঘন করতে চাইলে শঙ্কিত হয়ে 'মা! মা!' বলে চিৎকার করে ওঠে।

—কোথায় তোমার মা?

—জানো না, সে প্রেতিনী হয়ে বসে আছে আমার মধ্যে। না, না, আর্নাল্‌দুর আমাকে ক্ষমা করো। তাহলে যে আমি তলিয়ে যাবো, হারিয়ে যাবো মা'র মতো।

সাল্‌কা একদিন লক্ষ্য করল আর্নাল্‌দুর মুখ একটু বিষণ্ণ। —কি হয়েছে?

—এক বন্ধুর কাছ থেকে দু'শ টাকা ধার করেছিলুম। এখন সে ফেরত জরুরী প্রয়োজন।

অনেক কষ্টে কিছু টাকা করেছিল সাল্‌কা। হাসিমুখে তা দিল আর্নাল্‌দুরের হাতে। তার কুশ্রী মেয়েকে সে ভালোবেসেছে। জন্য কৃতজ্ঞতার পরিচয় দিতে পেরে হলো সে।

কিন্তু প্রকৃত ব্যাপারটা জানতে হলো না। আর্নাল্‌দুরের এক প্রণয়ের পরিণামকে গোপন করবার ডাক্তারকে দিতে হয়েছে ঐ টাকা। সাল্‌ বলল, তোমাকে আমি অন্য জগতের ভেবেছিলাম। তুমি এমন কাজ কর তা কল্পনাও করতে পারিনি।

আর্নাল্‌দুর বলল, "সাল্‌কা, তু আমার ঘুম ভাঙিয়েছ। তুমি আম ক্ষুধা জাগিয়ে দেহকে উপবাসী রেখেছ তাই......"

—কিন্তু তুমি কি আমাকে চিরদি ভালোবাসবে? কখনো ছেড়ে যাবে না

—মিথ্যা বলে তোমাকে ঠকাব না আজ তোমাকে ভালবাসি। কাল কি হ সে কথা তো আমার জানা নেই। বর্ত মানকে চিরন্তন করতে পারে শুধু মৃ আমার মন জীবন্ত, মৃত্যু-সুলভ প্রতি শ্রুতি তো তার পক্ষে দেওয়া সম্ভব না

সাল্‌কা আর দ্বিধা করল না আর্নাল্‌দুরের হাতে নিঃশেষে দান কর নিজেকে। এতদিনের পর্বতপ্রমাণ ও গ্লানি সাল্‌কার জীবন থেকে নিশ্চি হয়ে গেল। অসহ্য আনন্দের জী কিন্তু বেশিদিন সইলো না এই রাকিয়াভিক থেকে টেলিগ্রাম পে আর্নাল্‌দুর কিছুদিনের জন্য বি নিয়ে চলে গেল। তারপর অনেক প্রতি শ্রুত তারিখ পার করে আর্নালদুর যখ ফিরে এলো তখন তার দিকে চেয়ে চম উঠল সাল্‌কা। তার পরনে আমেরিক স্টাইলের পোশাক সেটাই বড় কথা ন পোশাকের সঙ্গে সঙ্গে মনটাও ব হয়েছে। এত গভীর সেই পরিবর্তন চোখে-মুখে স্পষ্ট তা ধরা পড়ে।

একদল আমেরিকান ভ্রমণকারী এসেছিল আইসল্যান্ডে বেড়াতে। তাদে গাইড হয়ে ঘুরেছে এতদিন। মোটা টাকা পেয়েছে পারিশ্রমিক। সেই দলে

কটি সুন্দরী বিদুষী তরুণী। তার গে হৃদ্যতা হয়েছিল আর্নাল্দুরের। বার সময় সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়ে ছে তাকে আমেরিকা যেতে। নতুন র্বাচনের পর কাজকর্মের কিছু সুবিধা বে ভেবেছিল আর্নাল্দুর। কিন্তু দের দল নির্বাচনে ভালো ফল করতে রেনি বলে সে আশাও নেই। সুতরাং মেরিকা গিয়ে ভাগ্যান্বেষণ করবার জন্য ব্যগ্র হয়েছে।

সাল্কা বুঝতে পেরেছে তার মনের থা। বলল, জোর করে ধরে রেখে মাকে আমি অসুখী করতে চাই না। মার যদি আমাকে ভালো না লাগে হলে চলে যাও।

আর্নাল্দুর বলল, সাল্কা, আমি কি উত্তর দেব বুঝতে পারছি না। কবার মনে হয় বলি, আমাকে জোর করে র রাখো, আবার মনে হয় মুক্তি চেয়ে ব তোমার কাছ থেকে।

শান্ত কণ্ঠে সাল্কা বলল, তোমাকে মি মুক্তি দিলাম।

সাল্কার মনে পড়ল আর্নাল্দুর তে, মানুষের চেয়ে আদর্শ বড়। ব্যক্তির রবর্তন হয়, কিন্তু আদর্শ স্থির। দর্শ মানুষকে চালনা করে, মানুষ দর্শকে পরিবর্তিত করতে পারে না। র্নাল্দুর চ্যুত হলো প্রেমের আদর্শ কে। তবু যে আদর্শ অবিকৃত থাকবে টাই তার আনন্দ।

সাল্কা বলল, আর্নাল্দুর, তুমি বই বলতে যে জীবনযাত্রার মান উন্নত হলে সুখী হওয়া সম্ভব নয়। তুমি মেরিকা যাও, সুখী হবে।

—কিন্তু তোমার কি হবে?

—আমার কিছুই হবে না, তার জন্য বো না। আমি মূর্তিমতী দুর্ভাগ্য। জন্মনিয়ন্ত্রণের কৌশল জানত না, ারের সাহায্য নেবার মতো টাকা ছিল তাই সকলের ঘৃণা সত্ত্বেও আমার র ঠেকানো যায়নি। আমি সকলের ছই অবাঞ্ছিত। শুধু তোমাকে যে দনের জন্য পেয়েছিলাম সেই দিনগুলি মালা হয়ে রইলো। আমার আকাশে অস্ত গেল, এবার সুন্দরী মার্কিন নীর আকাশে তার উদয় হোক্। জাহাজ একসঙ্গে যাত্রা করেছিল। একটির পাল ছিঁড়ল, হাল ভাঙল, পাটাতনের তক্তা খুলে ঢেউয়ের মাথায় নাচতে লাগল। তাই বলে অক্ষত জাহাজটির যাত্রা বন্ধ হবে কেন? তুমি এগিয়ে চলো। আমি ভাঙা জাহাজের মতো পড়ে থাকব ওসিরির সমুদ্রতীরে।

সাল্কা জাহাজ ছাড়ার ঘাটতি টাকাটা নিজের সঞ্চিত অর্থ থেকে পূরণ করে দিল। তারপর একদিন জাহাজে তুলে দিয়ে এলো আর্নাল্দুরকে। নির্জন সমুদ্রতীরে অন্ধকার নামছে। গ্রীষ্মের পাখীরা পালিয়েছে। প্রচণ্ড শীত পড়তে দেরি নেই। সমুদ্রের গর্জন ছাপিয়ে সাল্কার কানে বাজছে আর্নাল্দুরের শেষ কথা: মৃত্যুর সময় তোমাকে ডেকে ডেকে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করব।

'ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট পীপল' গাথা-ধর্মী এপিক উপন্যাস। আইস্ল্যাণ্ডের প্রাচীন সাহিত্যের ঐতিহ্যের সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। নায়ক বিয়ারতুর আঠারো বছর ধরে ক্রীতদাসের মতো একজন সম্পন্ন জমিদারের জমিতে মজুরের কাজ করেছে। সে স্বপ্ন দেখত একদিন জমির মালিক হবে। তা সফল হলো আঠারো বছর পরে। যে জমিটা সে লেখাপড়া করে নিল তার যে কোনো মূল্য থাকতে পারে তা কেউ ভাবতে পারেনি। তাই নগদ টাকা দিতে হলো না। দামটা কিস্তিতে শোধ করে দেবে।

লোকালয় থেকে দূরে পাহাড়ের গায়ে সেই মাঠ। বরফের মরুভূমির মতো। নবপরিণীতা স্ত্রী রোজাকে নিয়ে সেই জনমানবহীন অঞ্চলে ঘর বাঁধল। ঐ অঞ্চলে অনেক ভূত-প্রেত ও অপদেবতার বাস বলে প্রবাদ আছে। রোজা স্বামীকে অনুরোধ করল পূজো দিয়ে তাদের সন্তুষ্ট করতে। তা না হলে অমঙ্গল হবে। বিয়ারতুর হেসে উড়িয়ে দিল। রোজার কান্নাও তাকে টলাতে পারে না। আঠারো বছর পরে সে স্বাধীনতা পেয়েছে। এখন আবার কোন্ অপদেবতার বশ্যতা স্বীকার করবে? একে একে সে অনেক দুর্ভাগ্যের সম্মুখীন হয়েছে। কিন্তু অপদেবতার কাছে নতি স্বীকার করেনি। বিয়ারতুরের অনমনীয় দৃঢ়তার সঙ্গে চাঁদসদাগরের মনসাদেবীকে উপেক্ষা করবার তুলনাটা সহজেই মনে আসে।

পারশ্য দেশের ধর্মশাস্ত্রে বলে, স্বর্গের দেবতা ও নরকের দেবতার মধ্যে অনন্তকাল ধরে যুদ্ধ চলে আসছে। জমি চাষ করে যুদ্ধে স্বর্গের দেবতাকে সাহায্য করা মানুষের কর্তব্য। সে কর্তব্য প্রাণপণ পালন করছে বিয়ারতুর। জমির দেনা শোধ করবার জন্য কঠোর জীবন-যাপন করে পয়সা জমায়। লবন মাখানো শুকনো মাছ তাদের একমাত্র খাদ্য। রোজা প্রতিদিন শুকনো মাছ আর খেতে পারে

না। একটু মাংসের ঝোলের জন্য সে লালায়িত। বিয়ারতুর বলেঃ

"A free man can live on fish. Independence is better than meat."

রোজা সম্পন্ন ঘরে মানুষ হয়েছে। তার দুধেরও পিপাসা। একদিন ঘুমের ঘোরে দুধের পিপাসায় অস্থির হয়ে সে বেরিয়ে পড়েছিল। তরুণী স্ত্রীর এই সাধটুকুও সে পূর্ণ করবে না। সকলের আগে স্বাধীন চাষী হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে হবে। দেনা শোধ করতে হবে।

একদিন বাড়ি ফিরে দেখল রোজা রক্তাপ্লুত অবস্থায় পড়ে আছে, দেহে প্রাণ নেই। তার গর্ভের সন্তানকে হয়তো এখনো বাঁচানো যেতে পারে। সে ছুটে গেল তার ভূতপূর্ব মনিব নায়েবের বাড়ি। সেখান থেকে লোকজন নিয়ে এলো সাহায্যের জন্য। তারা একদিন ধরে কি সব করল। তারপর কাঁথা-জড়ানো একটি মাংসপিণ্ডকে সামনে এনে বলল, এই নাও তোমার মেয়ে।

মেয়ের নাম রাখল আস্টা সোলিলিয়া, অর্থাৎ 'স্বাধীনা।' আত্মায়, দেহে ও সর্ব-বিষয়ে স্বাধীন। অনেকদিন পরে বিয়ারতুর জানতে পেরেছে এ মেয়ে তার নয়। নায়েবের পুত্র ইংগলফুর জনসনের অবৈধ সন্তানকে ষড়যন্ত্র করে তার মেয়ে বলে দিয়ে গেছে।

বিয়ারতুর আবার বিয়ে করেছে। শাশুড়ীও তার বাড়িতে থাকে। চৌদ্দ বছর পশুর মতো খেটে জমির দেনা শোধ করতে পেরেছে। এখন সে স্বাধীন। এই স্বাধীনতার জন্য কোনো মূল্য দিতেই সে কার্পণ্য করেনি। সাহায্যকারী হিসেবে মজুর ডাকেনি; গরু পালন দরিদ্রের পক্ষে বিলাস; শুধু দুধ খাওয়া যায়। কিন্তু কত খড় লাগে! সেই ঘাস-খড় দিয়ে ভেড়া পালন করলে টাকা আসবে। বাজারে ভেড়ার মূল্য আছে, বিদেশে রপ্তানি হয়। তাই বিয়ারতুর ভেড়ার সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে। ভেড়ার দৌলতেই তার অবস্থা ফিরেছে। কিন্তু নায়েব যখন তাকে একটা গরু পাঠিয়ে দিল তখন বিয়ারতুর তাকে যত্ন করেই রাখল।

সেবার ঘাসের বড় অভাব। ভেড়ার পালে রোগ ঢুকেছে। রোজ দু'একটা করে মারা যায়। ওদের দৌলতেই বিয়ারতুর নিজের পায়ে দাঁড়াতে পেরেছে। ঘাসের সঞ্চয় বেশি নেই। গরুর অনেক ঘাস লাগে। গরুকে খেতে দিলে ভেড়াগুলোকে বাঁচানো যাবে না। স্ত্রী ফিনা ও ছেলেরা গরু ভালোবাসে। কিন্তু বিয়ারতুর স্থির করল গরু সরাতে হবে। স্ত্রী কেঁদে বাধা দিল; কিন্তু সে শুনল না। প্রতি বৎসর সন্তান জন্ম দিয়ে ফিনার শরীর দুর্বল। গরুটা হত্যা করবার কয়েকদিন পরে ফিনারও মৃত্যু হলো।

কি এক নতুন রোগ এসেছে, ভেড়াগুলি একে একে মারা যাচ্ছে। এর মধ্যে পঁচিশটার মৃত্যু হয়েছে। চারিদিকে গুজব রটল, অপদেবতার রোষদৃষ্টি পড়েছে। দলে দলে লোক দেখতে আসে। রোষ প্রশমিত করবার উপদেশ দেয়। কিন্তু বিয়ারতুর পুজো দেবে না। যে যা দেখতে চায় তাই সে দেখে,—ভূত যাদের মনে তারাই দেখে ভূত। বিয়ারতুর ভূত বিশ্বাস করে না।

বিয়ারতুর শহরে গেল চাকুরী করে নগদ টাকা উপার্জন করতে। যে ক্ষতি হলো তা পূরণ করা চাই। আরো ভেড়া কিনতে হবে। তার অনুপস্থিতিতে এক বাউণ্ডুলে যক্ষ্মারোগী অতিথির সংগে ঘনিষ্ঠতা হলো আস্টার। বিয়ারতুর বাড়ি ফিরে দেখল আস্টা গর্ভবতী। আস্টাকে সে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে। য়ুরোপ আইসল্যাণ্ডের পণ্য কিনতে ব্যগ্র। আইস্ল্যাণ্ডের সব জিনিসপত্র চড়া দামে বিক্রি হচ্ছে। প্রচুর টাকা আসছে দেশে। আর সেই সংগে আসছে নতুন ফ্যাশান, নতুন ভবধারা। বিয়ারতুরের বাড়ির সম্মুখ দিয়ে পাকা রাস্তা হয়েছে; মোটর গাড়ি চলতে আরম্ভ করেছে। বিয়ারতুর আসবার আগে যে জমির কোনো মূল্যই ছিল না এখন সেই জমি পনেরো হাজার টাকায় কিনতে চায় নায়েব নিজেই। এমন অসম্ভব চড়া দাম পেয়েও বিয়ারতুর জমি বিক্রির কথা ভাবতে পারে না।

বিয়ারতুরের অবস্থা এখন সচ্ছল। কিন্তু এর মধ্যে অনেক প্রিয়জনকে হারাতে হয়েছে। দুই স্ত্রী মারা গেছে, এক ছেলে বরফ ঢাকা পাহাড়ের কোন গহ্বরে হারিয়ে গেছে; আস্টা নেই; ছোট ছেলে নোম্নি বড় হবার স্বপ্ন নিয়ে গেছে আমেরিকা। এবার সতেরো বছরের ছেলে গোয়েন্দুর এসে বলল, সে-ও আমে[illegible] যাবে। আশা ছিল, এই ছেলে[illegible] কাজকর্ম শিখবে। বিয়ারতুর স্বাধী[illegible] পূজারী। তাই ছেলের স্বাধীনতায় [illegible] দিল না। শুধু বলল, 'নিজের [illegible] ছেড়ে তুমি যাচ্ছ অন্যের দাসত্ব কর[illegible] যাও, আমি বাধা দেব না। [illegible] বাঁচব একাই মাথা তুলে দাঁড়িয়ে [illegible]

বার্নার্ড শ বলেছিলেন, ঈশ্বর [illegible] তাই তিনি শক্তিশালী। [illegible] বলল, যে একা দাঁড়াতে পারে [illegible] সবচেয়ে বেশি। মানুষ পৃথিবীতে [illegible] আসে, পরলোকে যায় একা। [illegible] জীবনেও একা থাকাটাই তো স্বা[illegible] একা দাঁড়াতে পারার শক্তি অর্জন[illegible] জীবনের পূর্ণতা ও জীবনের লক্ষ্য [illegible]

আস্টার জন্মের জন্য দায়ী [illegible] আরনারসন এখন আইস্ল্যাণ্ডের [illegible] বড় নেতা। জনসাধারণের উন্নতি ক[illegible] জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে। সম[illegible] সমিতি, সমবায় ব্যাংক ইত্যাদি স্থাপ[illegible] করছে দরিদ্রের দুঃখ দূর করবার [illegible] নির্বাচন আসন্ন। বিয়ারতুরের ভোট [illegible] দলের লোক তাকে সন্তুষ্ট করবার [illegible] সমবায় সমিতি থেকে বাড়ি তৈরির ম[illegible] মশলা গছিয়ে দিয়ে গেল। ভালো [illegible] একটি বাড়ি তৈরি করবার আকাঙ্ক্ষা বিয়ারতুরের বহুদিন যাবৎ ছিল। [illegible] সে জোর করে 'না' বলতে পারল না।

বাড়ি শেষ করতে ব্যাংকের কাছে অনেক টাকা ঋণ হয়ে গেল। যুদ্ধ থেমে গেছে। ভেড়ার দাম দ্রুত নামতে লাগল। ঋণের সুদ শোধ করবার উপায় [illegible] নির্দিষ্ট দিনে ব্যাংকের টাকা পৌঁ[illegible] দিতে হবে। হৃদয়হীন নিয়ম। [illegible] এদিক-ওদিক হবার যো নেই। পু[illegible] আমলের সুদখোর মহাজন [illegible] বিয়ারতুরের কথা শুনত। যথা [illegible] ঋণ শোধ করতে না পারায় বিয়ারতু[illegible] সম্পত্তি নিলামে উঠল। যে খামার [illegible] তিলে তিলে বুকের রক্ত দিয়ে [illegible] তুলেছে, তা টাকার জোরে আর এক[illegible] অনায়াসে দখল করে বসল।

বিয়ারতুর তবু দমল না। লোকা[illegible] থেকে আরো দূরে নির্জন পাহাড়ের [illegible] আর একটা নতুন খামার সৃষ্টি করবে [illegible] প্রথমেই গেল আস্টার খোঁজে। আস্টার

মিক তাকে যক্ষ্মারোগ উপহার দিয়ে ছে। ক'দিন বাঁচবে ঠিক নেই। আস্টা, শাশুড়ী এবং বহুদিনের প্রিয়সঙ্গী গ্রস্ত ঘোড়াটাকে নিয়ে নিরুদ্দেশ করল। বিয়ারতুরের নিজেরও কম হয়নি। যে অঞ্চলে পথের নেই, মানুষের পায়ের চিহ্ন নি, সেখানে তারা মানুষের অদম্য য়াকাঙ্ক্ষার পতাকা তুলবে।

কিন্তু পারবে কি? বিয়ারতুরের আকাঙ্ক্ষা ও স্বাধীনতাপ্রীতি ও কাহিনীর সমাপ্তি একটি বেদনার রেখে যায়। সে এখন বৃদ্ধ; তার ও বৃদ্ধ ও অশক্ত। মনে হয়, ভাবধারার তাড়া খেয়ে আইস্-ন্ডের প্রাচীন ঐতিহ্য যেন আশ্রয় ছে।

ল্যাক্সনেসের উপন্যাসগুলি বৃহদায়তন। নার উৎকর্ষের জন্য পাঁচ শ' পৃষ্ঠার ও একটানা সমান আগ্রহে পড়া যায়। লের ক্ষীণকায় উপন্যাসের তুলনায় লেখকের পক্ষে কম কৃতিত্বের কথা। তাঁর কাহিনীগুলির পটভূমিকা বৃহৎ। "ইন্ডিপেন্ডেণ্ট পীপ্‌ল"কে ক্সনেস এপিক উপন্যাস বলেছেন। বেল কমিটি বিশেষ করে এই গুণটির ই তাঁকে এ বছরের পুরস্কার য়েছেন। ল্যাক্সনেসকে কেন পুরস্কার ওয়া হলো তার কারণ নির্দেশ করে রা বলেছেনঃ

'for vivid epic writing which s renewed the great Icelandic rrative art."

প্রথম মহাযুদ্ধ আইসল্যাণ্ডের সমাজ-বনে যে বিপ্লব এনেছিল তার ফলে রনো আদর্শ ভেঙে গেল, নতুন পথের শ্চিত সন্ধান না পেয়ে যুব সম্প্রদায় াহারা। ল্যাক্সনেস তাঁর প্রথম পর্বের ন্যাসে এই পথ খোঁজার কথা বলেছেন। শিয়া, ডেনমার্ক ও আমেরিকার আদর্শে সাধারণের অবস্থার উন্নতির জন্য ষ্টা চলছে, কিন্তু সিদ্ধান্তে ছানো এখনো সম্ভব হয়নি।

ল্যাক্সনেসের ভাষা স্বচ্ছ, সাবলীল ও মধুর। অনুবাদের মধ্যেও এদের প্রমাণ ওয়া যায়। তিনি নিপুণ গল্পকার। পর্যবেক্ষণ, সূক্ষ্ম মনোবিশ্লেষণ নাটকীয় ঘটনা সংস্থান কাহিনীর আকর্ষণ শেষ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ রাখে। সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য তাঁর চরিত্র সৃষ্টির ক্ষমতা। সাল্‌কা ভল্‌কা ও বিয়ারতুর অনন্যসাধারণ চরিত্র; এদের মতো নরনারী অন্যত্র দেখা যায় না। এরা অনন্যসাধারণ, কিন্তু অসম্ভব নয়। তবে, উপন্যাসের প্রধান চরিত্রের তুলনায় আগের চরিত্রগুলিকে বড় ম্লান মনে হয়। অবশ্য সিগরুলিনা, স্টেইনটর, রোজা, আস্টা প্রভৃতি চরিত্রগুলি নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর। কিন্তু মূল চরিত্রের সঙ্গে এদের প্রভেদ বড় বেশী। বিয়ারতুর কঠোর পরিশ্রমী, তার দৃষ্টি-ভঙ্গী সঙ্কীর্ণ; পাহাড়ের বন্ধুর পথে চলে অভ্যস্ত; শহরের অন্য কোনো বিষয়ে ভালো আলাপ করতে পারে না। স্ত্রী-পুত্রের চেয়ে ভেড়ার উপর তার টান বেশি। তবু তার মধ্যেও একজন কবি লুকিয়ে ছিল। তার কাব্য রচনার উৎস আস্টা। আস্টা ও বিয়ারতুরের সম্পর্কটা বিচিত্র ও করুণ। ল্যাক্সনেস এ সম্বন্ধে শুধু ইঙ্গিত করেছেন। ইঙ্গিতের সাহায্যেই অনেক বলা হয়েছে। ইঙ্গিত ও প্রতীকের ব্যবহার ল্যাক্সনেসের রচনার একটি বৈশিষ্ট্য। বিয়ারতুর আইসল্যাণ্ডের প্রতীক; সাল্‌কা রূঢ় বাস্তব জীবনের প্রতীক। প্রথম মিলনের মুহূর্তে আর্নালদুরের মৃত্যুর সঙ্গে প্রেমের সাদৃশ্য মনে এলো। তা থেকেই সাল্‌কার প্রেমের বিয়োগান্ত পরিণতির ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এমনি আরো অনেক দৃষ্টান্ত তাঁর রচনার সর্বত্র ছড়িয়ে আছে।

নোবেল পুরস্কারের ফলাফল ঘোষণা করবার পর থেকে ল্যাক্সনেসের সাহিত্য-বিচার উপেক্ষা করে তাঁর রাজনৈতিক মতামত আলোচনার উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। তিনি কি কম্যুনিস্ট? ল্যাক্সনেস বলেনঃ

"I am not a politician. I am a literary man writing novels. I have been accused of three 'C's--catholicism, communism and capitalism. I am no longer a practising Catholic, not a Communist; how far Capitalist may be seen from the books."

রাকিয়াভিকে দুই কন্যা ও পত্নীর সঙ্গে ল্যাক্সনেস বেশ সচ্ছলভাবে বাস করছেন। অনেকের ধারণা তিনি ধনী। তাই বিরুদ্ধ সমালোচকরা তাঁকে ক্যাপিটালিস্ট বলে প্রচার করে।

যে দুটি উপন্যাসের আলোচনা আমরা করেছি, তাদের মধ্যে কম্যুনিজম প্রাধান্য লাভ করেনি। কাহিনীর পরিণতি যে কম্যুনিজম প্রভাবান্বিত করেনি একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। বরং রাজনৈতিক মতবাদ হিসেবে লেখকের কম্যুনিজমের প্রতি সহানুভূতির অভাবটাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। উপন্যাসের নায়িকা সাল্‌কা ধর্মঘটীদের সঙ্গে যোগ দেয়নি; ওসিরিতে কম্যুনিস্টদের আন্দোলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে; আন্দোলনের স্থানীয় নেতা আর্নালদুর দুর্বলচরিত্র। শেষ পর্যন্ত সে দলের আদর্শ ত্যাগ করে আমেরিকা চলে গেল। বিয়ারতুরও বন্দরের ধর্মঘটী কর্মীদের লুণ্ঠতরাজ সমর্থন করতে পারেনি। তার বাড়ি বিক্রি হয়ে যাওয়ায় ধনতান্ত্রিক সমাজের বিরুদ্ধে

আন্দোলন সহজেই তাকে আকৃষ্ট করতে পারত। কিন্তু বিয়ার্তুর সে পথে গেল না। বিদেশ থেকে নানা ভাবধারার সংঘাত এসে কিভাবে আইসল্যান্ডের জীবনকে বিক্ষুব্ধ করছে, ল্যাক্সনেস তা দেখাবার জন্যই কম্যুনিজম এনেছেন।

তবে তাঁকে কম্যুনিস্ট বলা হয় কেন? তার কয়েকটি কারণ আছে। প্রথমত, তাঁর রচনায় দরিদ্র, নিপীড়িত ও লাঞ্ছিত জনসাধারণই মর্যাদা লাভ করেছে। এদের জন্য তাঁর গভীর দরদ। এই দরদ ও সাম্যবাদের মূলতত্ত্ব অনেকাংশে সগোত্র। প্রচলিত ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাকে তিনি সর্বত্র কঠোর ভাবে আক্রমণ করেছেন। তাই স্বদেশ ও বিদেশের রক্ষণশীল সমাজ তাঁর বিরুদ্ধবাদী।

দ্বিতীয় কারণ, ল্যাক্সনেসের প্রবল আমেরিকা বিদ্বেষ। আমেরিকা বিদ্বেষী হলেই অনেকে একটা সহজ সিদ্ধান্ত করে বসেন যে, তা হ'লে নিশ্চয়ই কম্যুনিজমের সমর্থক। আমেরিকা থেকেই প্রথম প্রচার করা হয়েছে যে, তিনি কম্যুনিস্ট। ১৯২৭ সালে জীবিকার্জনের উদ্দেশ্যে ল্যাক্সনেস আমেরিকা যান এবং সেখানকার নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। প্রথম তিনি আরম্ভ করলেন হলিউডে সিনেমার ব্যবসা। একাজে সাফল্য লাভ করতে না পেরে লেখার পেশা ধরলেন। আমেরিকার জীবন ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে তীব্র সমালোচনাত্মক কতকগুলি প্রবন্ধ লেখবার ফলে তাঁকে আমেরিকা থেকে বহিষ্কৃত করবার জন্য দাবী উঠল। ল্যাক্সনেস তখন স্বেচ্ছায় আইসল্যান্ডে ফিরে এলেন। আমেরিকার তিক্ত অভিজ্ঞতা তাঁকে প্রেরণা দিয়েছিল ধনতান্ত্রিক সমাজের বিরুদ্ধে কতকগুলি প্রবন্ধ রচনা করতে। এই প্রবন্ধ পুস্তকই (১৯৩০) তাঁকে কম্যুনিস্ট বলে প্রথম পরিচিত করবার জন্য দায়ী। এটি তাঁর সাহিত্যকীর্তি হিসেবে বিচার্য নয়।

ল্যাক্সনেসের উপন্যাসেও আমেরিকাকে আইসল্যান্ডের দুঃখের কারণ বলে দেখানো হয়েছে। আর্নাল্দুর আমেরিকার ঐশ্বর্যের আকর্ষণে সাল্কাকে ত্যাগ করে গেল; বিয়ার্তুরের ছেলেও গেছে। গোয়েন্দুর যখন বাবার কাছে আমেরিকা যাবার কথা বলতে এলো, তখন বিয়ার্তুর বলল, 'সাবধান; আমেরিকানরা হাজার হাজার নিরপরাধ লোককে গত যুদ্ধে মেরেছে। এখন একটা কাগজে সই করে যুদ্ধ বন্ধ করেছে বলেই তো তারা ভালোমানুষ হয়ে যায়নি! ওরা পাগলের জাত।'

আমেরিকার যুদ্ধোন্মাদনাকেও ল্যাক্সনেস বরাবর আক্রমণ করে এসেছেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ হবার কিছুদিন পরেই তিনি য়ুরোপ গিয়েছিলেন। যুদ্ধের ধ্বংসলীলা তাঁর তরুণ হৃদয় বেদনায় বিক্ষুব্ধ করেছিল। শান্তি খুঁজেছিলেন ক্যাথলিক ধর্মের মধ্যে। তখন থেকেই ল্যাক্সনেস শান্তিবাদী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তি আইসল্যান্ডে ঘাটি নির্মাণ করেছিল। ল্যাক্সনেস তার বিরুদ্ধাচারণ করেছিলেন। আইসল্যান্ডে আমেরিকার বিমান ঘাটি নির্মাণের তীব্র প্রতিবাদ ল্যাক্সনেস জানিয়েছেন তাঁর 'অ্যাটমিক বেস' (১৯৪৬) নামক উপন্যাসে। দীর্ঘকাল যাবৎ শান্তির বাণী প্রচারের জন্য ওয়ার্লড পীস কাউন্সিল ১৯৫৩ সালে ল্যাক্সনেসকে আন্তর্জাতিক শান্তি পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করেছেন। এই সংস্থা কম্যুনিস্ট সমর্থনে পুষ্ট বলে আর একবার তাঁর রাজনৈতিক মতামত সম্বন্ধে সন্দেহ সৃষ্টির অবকাশ হয়েছে।

১৯৩২, ১৯৩৮ ও ১৯৫৩ সালে ল্যাক্সনেস রাশিয়া ভ্রমণ করেছেন। রাশিয়ার উপর তাঁর দু'খানা বই আছে। রাশিয়ায় যা তাঁর ভালো লেগেছে, তাদের প্রশংসাও করেছেন। কিন্তু তাই বলে ল্যাক্সনেসকে কম্যুনিস্ট বলা যায় না। তাহলে 'রাশিয়ার চিঠি'র জন্য রবীন্দ্রনাথকেও কম্যুনিস্ট বলতে হয়।

ল্যাক্সনেস প্রথমশ্রেণীর লেখক, সার্থক শিল্পী—এটাই তাঁর একমাত্র পরিচয়। পাঠকরা তাঁর এই পরিচয়ই পাবেন। সাল্কা আর্নাল্দুরকে বলেছিল, তুমি বিদেশী বই পড়ে দরিদ্রের বন্ধু সেজেছ। আমি এদেরই একজন; যারা দরিদ্র তারা আমার আত্মীয়, তাদের আমি ভালোবাসি। এর সঙ্গে কোনো রাজনৈতিক তত্ত্বের সম্পর্ক নেই। এটা ল্যাক্সনেসেরই নিজের কথা।

ল্যাক্সনেসের এবার নোবেল পুরস্কার পাওয়াটা অপ্রত্যাশিত নয়। সুইডেন, নরওয়ে ও ডেনমার্কের লোকেরা কয়েক বছর থেকেই তাঁর পুরস্কারপ্রাপ্তি কামনা করে আসছে। গত বছর হেমিংওয়ের সঙ্গে ল্যাক্সনেসের নাম যেভাবে আলোচিত হয়েছে তাতে এবার তাঁর পুরস্কার পাওয়াটা সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাশিত ছিল। ল্যাক্সনেসকে সম্মানিত করে নোবেল কমিটি একটি সুষ্ঠু সিদ্ধান্তের প্রমাণ দিলেন।

পাঠপঞ্জী:

Laxness: Salka Valka; Allen & Unwin, London, 1936.

Laxness: Independent People; A. Knopf, New York; 1946; 15/-.

S. Einarsson: A contemporary Icelandic Author, in "Life & Letters To-day", Vol. XIV (1936).

Do : Five Icelandic Novelists, in "Books Abroad", July, 1942.

N. Krymova: A writer of the Isle of sagas in "Soviet Literature" No. 12 (1953).

হঠাৎ সাদিক হোসেনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। দীর্ঘ দশ বছর বাদে।

ফতেপুর নামক ছোট্ট একটা স্টেশনে ামরা আটকা পড়েছিলাম। আমি নবীর সিং আর স্যামুয়েল। ফতেপুর াকে রেলের একটা শাখা লাইন পঁচিশ ইল দূরবর্তী নিমগড় গ্রাম পর্যন্ত ায়ে যাওয়া হচ্ছে, তারই তদারক করে েরছিলাম আমরা। ফতেপুরে পৌঁছে নেলাম যে, রাত আটটার গাড়ি আসতে ত দুটো বাজবে; কারণ মাঝপথে কোন ক শিউনগরের কাছাকাছি একটা মাল-ড়ি 'ডিরেলড্' হয়েছে। রাত হবে নে রাতের খাবারের বন্দোবস্ত করবার ়া স্টেশনের বাইরের 'হিন্দু াজনালয়ে' গিয়ে নানারকম হুকুম জারি ়লাম। প্ল্যাটফর্মে ফিরে লালাসিক্ত না নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ সাদিক াসেনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

মিঞা আমাকে দেখে হেসে মীর্জা লিবের একটা 'শের' আওড়ালেন,

ন্দ্‌গী ইঁউভী গুজরহী যাতি
়ী তেরা রাহ্‌গুজর ইয়াদি আয়া।"

তার প্রসারিত হাতের প্রীতিকে কড়ে ধরে বললাম, "তার মানে?"

সাদিক হোসেন বললেন, "মানে বন তো এভাবেও কোনমতে কেটে ়, তবু কেন তোমার সঙ্গে আবার া হল?"

দশ বছর বাদে দেখার বিস্ময়-ঘোর তেই নজরে পড়ল যে, ছাড়াছাড়ি সময় যে সাদিক হোসেনের মাথার মরের কালো রং গাঢ় কালো হয়েছিল, তা এখন প্রায় সবটাই বুনো হাঁসের পালক হতে চলেছে। তখন তাঁর বয়স ছিল ত্রিশ, এখন চল্লিশ। চল্লিশে চুলে পাক ধরে বটে, কিন্তু কৈ, আমাদের তো অমন হয়নি!

জিজ্ঞেস করতেই সাদিক হোসেন মুচকি হাসলেন, বললেন, "অনেক ঘাটের জল খেয়েছি অশোক—অনেক রং দেখে দেখেই রং বদ্‌লেছে।"

সহকর্মীদের সঙ্গে সাদিক হোসেনের আলাপ করালাম। দশ বছর আগে যে বন্ধুত্বে আতর লাগিয়ে আমরা লক্ষ্ণৌ শহরের অলিগলিতে ঘুরে বেড়াতাম, সেই কথা স্মরণ করে বুকের ভেতরটা বেদনায় টন টন করে উঠল। এখন সাদিক হোসেন থাকেন হায়দ্রাবাদে, আর আমি থাকি নাগপুরে। সম্প্রতি তিনি জামসেদ-পুর থেকে নিজের শহরে ফিরছেন। লক্ষ্ণৌএর সাদিক হোসেন গরীব ছিলেন, কিন্তু আজ তাঁর চোখে-মুখে ঐশ্বর্যের সুস্পষ্ট ছাপ। প্রাচীন নবাব-বংশের আভিজাত্য তাঁর রক্তে, সেই রক্তের গর্বে ত্রিশ বছর পর্যন্ত নিজের কপালের পাঞ্জাবীকে ঘামে ভেজাননি তিনি; কিন্তু হঠাৎ তারপরেই তাঁর মোহমুক্তি ঘটল একদিন, তিনি উঠে-পড়ে লাগলেন। ভারতবর্ষের নানা জায়গা ঘুরে শেষে দক্ষিণ আফ্রিকা গিয়ে ভাগ্যের চাকা ঘুরিয়ে পাঁচ বছর যাবৎ তিনি এখন এক মিলের মালিক।

তাঁর এই উত্থানের কাহিনী শুনে খুব খুশী হলাম। বিজয়ী, পরোপকারী ও সুরসিক সাদিক হোসেনকে নিয়ে স্টেশনের দোকানে যখন রীতিমত উৎসবের হল্লা শুরু করলাম, তখন আমাদের অশুভ যাত্রার ওপর ঝড়-বৃষ্টি নেমে এল।

বনোয়ারী ঠাকুরের দোকানের পুরী খেয়ে পেট ভরিয়ে, তারপর বৃষ্টিতে আধভেজা হয়ে স্টেশনের ছোট্ট ওয়েটিং-রুমে ফিরে দেখলাম যে, রাত দশটা।

সাদিক হোসেন স্যুটকেস খুলে আধ বোতল হুইস্কি বের করে বললেন, "বহুদিন পরের এই মুলাকাতকে এসো একটু রঙীন করে নিয়ে নিই দোস্তরা"—

আমরা এক সুরে চেঁচিয়ে বললাম, "সাদিক হোসেন জিন্দাবাদ"—

ওয়েটিং-রুমের লোকটা সোডা এনে দিল। সেই আধবোতল হুইস্কি ভাগ করে খেলাম আমরা। তরল একটু নেশা চেতনার ওপর ঝিরঝিরে হাওয়ার মত দোলা দিতে লাগল। সেই মৃদু নেশা আর এলোমেলো গল্পকে সিগারেটের ধোঁয়া দিয়ে জটিল করতে করতে আমরা থামলাম গিয়ে প্রেমের গল্পে।

প্রশ্ন উঠল, প্রেম কি?

আমি বললাম যে, প্রেম একটা ব্যাধি।

রণধীর সিং বলল যে, প্রেমই জীবনকে সার্থক করে।

ম্যানুয়েল বলল যে, প্রেম শব্দটি একটি জৈবিক ক্ষুধার রোম্যান্টিক নাম।

নিজের নিজের উক্তিকে সপ্রমাণ করার জন্য প্রত্যেকেই এক একটি গল্প বলতে লাগলাম। সকলের মত্ত বাক্-বিতণ্ডা ও গল্পের মধ্যে একমাত্র সাদিক হোসেনই অটল গাম্ভীর্যের সঙ্গে একমাত্র

চার মালিক খানসাহেব মোহম্মদ ইউসুফের প্রপিতামহ আকবর আলির প্রপিতামহ দোর্দণ্ডপ্রতাপ নবাব আসাদুল্লা খাঁর পেয়ারের ক্রীতদাস ছিলেন। কিন্তু উপায় কি, যুগ বদলেছে। ইতিহাসের চাকার মারফৎ খোদাতাল্লাহ্ উঁচুকে নিচু, নিচুকে উঁচু করে তাঁর বিচিত্র লীলা খেলে চলেছেন—তাই আকবর আলি চুপ করে সয়েই যান, শুধু ভুলেও কখনো ইউসুফ মিঞার বাড়ির ধার-কাছ দিয়ে হাঁটেন না।

আপাতত নতুন বেগমকে নিয়ে মশগুল হলেন আকবর আলি। দিনরাত কেটে চলল। নতুনের উত্তেজনাটা কমতেই হঠাৎ একদিন তিনি আবিষ্কার করলেন যে, রোশানারা বেগম বড় ঠান্ডা, বড় বেশী ভদ্র, বড় বেশী ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। তাঁর রক্তের টগ্‌বগানির সঙ্গে বেগম সুর মেলাতে পারেন না, বেগমের কটাক্ষে কনিসের মত খোরাশানী ছোরার ধার নেই, তাঁর ঠোঁটের হাসির মধ্যে ফিরোজার মত ক্রূরতার প্রলেপ নেই। কোথায় কি যেন কাঁটার মত খচ্‌খচ্ করতে লাগল। এদিকে সংসারের অভাব একদিন আতরকে নিঃশেষ করল, বিলিতী মদের প্রার্থনাকে শ্লেষভরে প্রত্যাখ্যান করল, নিশীথ রাতের উষ্ণ ঘুমকে শীতের হাওয়া এসে আক্রমণ করল। আকবর আলি সচেতন হলেন, স্থির করলেন যে, এবার রোজগার করতে হবে।

নবাব আকবর আলি ইনসিওরেন্সের দালাল হলেন। কিছু কেস পেলেন, পেলেন কাঁচা টাকা। টাকা পেতেই মনের কাঁটা তুলে রক্তের মধ্যেকার আরবী ঘোড়াকে বল্‌গা খুলে কষাঘাত করতে করতে কনিসের দ্বারে গিয়ে আবার করাঘাত করলেন। হয়ত কাঁচা টাকার গন্ধ বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছিল বলেই কনিস আজ দরজা খুলল। তাকে দেখেই দ্বারপ্রান্তে একমুঠো নোট ছড়িয়ে আকবর আলি শের আউড়ে বললেন,

শোলয়ে ইশক! লগা আগ ন
দিলমেঁ মেরা,
ইয়েহ্ তো আল্লাহ্‌কা ঘার হ্যায়,
কিসী দুশ্‌মনকা নহীঁ।

হে ভালবাসার স্ফুলিঙ্গ, আমার বুকে কেন আগুন জ্বালাচ্ছ! আমার এই হৃদয়ে তো ভগবানই থাকেন, তোমার কোন শত্রু নয়।'

কনিস ছড়ানো নোটের ওপর এক নজর বুলিয়ে অতি মিষ্টি হেসে বলল, "আপ বড়ে জিন্দাদিল্ হ্যায় নবাব সাহব, আইয়ে আইয়ে, তশ্‌রীফ্ লাইয়ে"—

রোশানারা বেগম সব টের পেলেন, স্বামীকে [illegible]রোপুরি চিনলেন। কিন্তু কিছুই ব[illegible]লেন না তিনি, কোন মন্তব্যই করলেন না। আর কি-ইবা বলবেন—দরিদ্রকন্যা, অশিক্ষিতা তিনি, কিসের জোরে চোখ রাঙাবেন!

নবাবও টের পেলেন যে, বেগম বুঝতে পেরেছেন। কিন্তু তিনিও কোন কৈফিয়ৎ দিলেন না, অনুতাপ মনে এলেও প্রকাশ করলেন না। শুধু মাঝে মাঝে স্ত্রীকে অকারণে বুকে টেনে নিয়ে অপরাধ স্খালনের ব্যর্থ চেষ্টা করতে করতে আবার ভাবলেন যে, রোশানারা বড় ঠান্ডা, বড় উত্তেজনাহীন, বড় [illegible]

ধীরে ধীরে দুজনের মাঝে এক অদৃশ্য দেয়াল খাড়া হয়ে গেল।

এদিকে ইনসিওরেন্সের [illegible] জোটে না। অভাবে মাঝে মাঝে [illegible] আকবর আলি। শেষে [illegible] নিরুপায় চেষ্টা করতে [illegible] দিল্লীর এক [illegible] নিজামুদ্দীনের আমদানী [illegible] ফারমে চাকরী নিয়ে [illegible] চলে গেলেন তিনি। সেখানে [illegible]

নক থাকতে হবে। এখানে রোশানারার রোশানার জন্য রইল শুধু সাকিনা ও নারার দূর সম্পর্কের এক অতি- আফিংখোর মামা রহমৎ খাঁ। আর আগে গোলাম বংশের মোহম্মদ সুফকে তার বাড়ির ওপর একটু নজর তে বলতেও বাধ্য হলেন আকবর লি।

আফ্রিকা পোঁছেই তিনি চিঠি দিলেন। দেশে, প্রিয়জনহীন নিঃসঙ্গতায় পীড়িত নবাবের চিঠিতে যে করুণ বেদন ছিল তা রোশানারাকে একটু বিচলিত করল। কিন্তু গরীব ঘরের মেয়ে ন, লেখাপড়া জানেন না, চিঠির জবাব দেওয়া একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। খান-হেবের স্ত্রীকে দিয়ে চিঠিটা পড়িয়ে ন বটে কিন্তু তাঁকে দিয়ে জবাবটা তে বাধল। খানসাহেবের বিবি একটু উঁচু করে কথা বলেন, স্বামীর পুরুষদের বহুদিনের গোলামীকে তিনি একাই মিটিয়ে ফেলতে চান। রং তাঁর কাছে আর গেলেন না নারা অথচ কড়া পর্দার আড়ালে হয়েছেন তিনি, আর কাকে গিয়েই লবেন এ কথা?

রোশানারা পুরোন দাসী সাকিনার পন্ন হলেন। লিখতে জানে এমন বিশ্বাসী ভাল লোক চাই।

সাকিনা বলল, "হায় আল্লা, আমি ক ডাকব?"

রোশানারা বললেন, "কাকে ডাকবি লে কি আর তোকে জিজ্ঞেস করতাম?"

"আচ্ছা খোঁজ নিয়ে দেখছি বেগম-বা"—

ঘণ্টাখানেক বাদে ফিরে এল সাকিনা, "একজন লোক পেয়েছি বেগম-বা"—

"কে?"

"সোলেমান মিঞা—খানসাহেবের তে থাকে, ও'দের আশ্রিত, বড় গরীব বড় ভাল মানুষ বেচারা— ট্রেন্স পাশ"—

"কি করে?"

"খানসাহেবের ভাইয়ের মণিহারী নে কাজ করে"—

"আচ্ছা ডেকে আনিস বিকেলে"—

বেলা পড়তেই বাইরের ঘরে এসে মান দাঁড়াল। বিনীত, শান্ত ট, বয়স ত্রিশের কাছাকাছি।

সাকিনা গিয়ে রোশানারাকে খবর

বললেন, "তুই কাগজ কলম নিয়ে দে ও'কে—আমি আসছি"—

সাকিনা আদেশ পালন করল।

একটু বাদেই ভেতরের দিকের জাফরানী রংয়ের ভারী পর্দার আড়ালে টুং টাং চুড়ির শব্দ শোনা গেল।

সাকিনা মৃদুকণ্ঠে বলল, "বেগম-সাহেবা এসেছেন মিঞা"—

সোলেমান ঈষৎ ঝুঁকে বলল, "আদাব বাজাগতা হুঁ বেগমসাহেবা"—

বেগমের কণ্ঠস্বর ভেসে এল—"আদাব"।

চকিতে একবার পর্দার দিকে কেন যেন তাকাল সোলেমান মিঞা, তারপর বিনীত মৃদুকণ্ঠে বলল, "বান্দা হাজির, হুজুরাইন আদেশ করুন"—

বেগম বললেন, "আপনার মেহেরবানির জন্য ধন্যবাদ মিঞাসাহেব, একটা চিঠি লিখে দিতে হবে"—

"জী ফরমাইয়ে"—

রোশানারা তখন বলতে শুরু করলেন আর সোলেমান তাঁর কথা গুছিয়ে পত্রাকারে লিখতে লাগল। অত্যন্ত মামুলী ভঙ্গীর চিঠি। প্রবাসী স্বামীর জন্য উৎকণ্ঠা, তাঁকে চিন্তিত হতে নিষেধ করা, নিজেদের কুশল সংবাদ-দানের সঙ্গে স্বামীর কুশল প্রার্থনা করা ইত্যাদি। একজন অনাত্মীয় পুরুষকে দিয়ে এর বেশী আর কি-ইবা লেখান যেতে পারে? তাই সে চিঠির মধ্যে প্রিয়তম, দিলবর, "মেরে-আঁখ কে-রোশন' কোন কথাই রইল না, রইল না বিরহতপ্ত হৃদয়ের আকুলতা, রইল না দিনরাতব্যাপী বিচ্ছেদের শূন্যতার কথা। সে চিঠির তলায় 'তোমারই' লেখা রইল না, চোখের জলের ধারাতে লেখিকার নামও ধৌত হ'ল না। শুধু লেখা রইল 'আপ্‌কা খাদ্‌মা'—আপনার সেবিকা রোশানারা।

চিঠি শেষ হল।

পর্দার দিকে তাকিয়ে সোলেমন সসম্ভ্রমে বলল, "জী—লেখা হয়ে গেছে—আর কোন আদেশ?"

রোশানারা বললেন, "আজ্ঞে না—আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, শুধু আরজ্ এই যে, মাঝে মাঝে দরকারমত যদি এমনি এক আধটা চিঠি লিখে দেন তো কৃতজ্ঞ থাকব"—

ঝুঁকে পড়ে সেলামের ভঙ্গীতে

সোলেমান বলল, "বান্দা সব সময়েই সেবার জন্য তৈরী থাকবে—দরকার পড়লেই স্মরণ করবেন বেগমসাহেবা—আচ্ছা আদাব"—

"আদাব"—

মনের মধ্যে কিসের যেন একটা ঘোর নিয়ে সোলেমান মিঞা সেখান থেকে বেরিয়ে গেল।

সাকিনা বলল, "বেশ ভালো লোক, না বিবিসাহেবা?"

রোশানারা মাথা নেড়ে বললেন, "হ্যাঁ কথা শুনে তো ভাল বলেই মনে হল"—

"হ্যাঁ বিবি—লোকটা ভালই, তবে সব সময়েই বড় গম্ভীর হয়ে থাকে আর কারো সঙ্গে মেশে না"—

"কেন?"

সাকিনা ঠোঁট উল্‌টে বলল, "কেন তা খোদা জানেন—হয়ত লোকটার স্বভাবই অমনি বিবি"—

রোশানারা বললেন, "যে যার স্বভাব নিয়ে থাকুক না সাকিনা—আমাদের কি?"

সাকিনা সায় দিল, "সত্যি তো—আমাদের কি"—

এমন সময় কাশি শোনা গেল, বুড়ো রহমৎ খাঁ এসে জানাল, "বেটি মে[...] খোরাক্‌কে ওয়াস্তে"—

"দেতী হুঁ মামা"—

রহমৎ খাঁর আফিং-এর জন্য দৈনি[...] ছ' আনা লাগে, মাসে দুবার করে [...] বুড়ো। আফিং শেষ হয়ে এসেছিল [...] বুড়োর এই তাগিদ।

রোশানারা টাকা বের করতে [...] মনে মনে হাসলেন। আকবর আলি [...] রক্ষক বসিয়ে গেছেন। যদি রহমৎ [...] একটু লিখতে পড়তেও জানত তাহ[...] হয়ত কাজে লাগত একটু, অ[...] বাইরের লোককে ডাকতে হত না। চ[...] ঘণ্টা যে আফিং-এর নেশায় বুঁদ [...] আছে তাকে দিয়ে তাঁর কি হবে?

সপ্তাহে দুটো করে চিঠি আ[...] লাগল। আফ্রিকার কালো মানু[...] মাঝখানে বসে রোশানারা বেগমের [...] যেন নতুন করে স্মরণ করলেন [...] আকবর আলি। হাজার হাজার মাইল [...] গিয়ে তিনি যেন এই প্রথম বেগমের [...] বাসায় পড়লেন। সে ভালবাসা চি[...] প্রকাশ করার উপায়ও নেই কারণ [...] যে আর কেউ পড়ে শোনাবে স্ত্রী[...] তিনি জানতেন। ভাষা দিয়ে যে [...] প্রকাশ করার উপায় নেই, সেই কথাই [...] যেন ঘন ঘন চিঠি লিখে জাহির [...] চাইলেন এবং প্রতি চিঠিতেই অ[...] জানাতে লাগলেন তাড়াতাড়ি জবাব [...] জন্য।

সুতরাং চিঠি লেখার জন্য [...] মাঝেই সোলেমান মিঞার ডাক [...] লাগল। আর এই চিঠি লিখতে [...] এক বিচিত্র কাহিনীর সৃষ্টি কর[...] কোনো ঋতুর মন্ত্র দিয়েও যে [...] ফোটানো যায় না, সেই আশ্চর্য ফু[...] হৃদয়ে প্রস্ফুটিত হল। সোলেমান [...] পাগল হল, মারা পড়ল, সেই [...] সৌরভে আফিং-এর চেয়েও তীব্র [...] হল তার। জাফরানী রংয়ের [...] অন্তরাল থেকে যে মৃদু কণ্ঠস[...] কানে এসে পৌঁছতে লাগল [...] যেন বিচিত্র এক সংকেত খুঁজে [...] সোলেমান মিঞার হৃদয়কুঞ্জ শিহ[...] তোমাদের বৃন্দাবনের গোপিনীদে[...] তার মন যেন কৃষ্ণের বাঁশী শুনে [...] হারাল।

"কি লিখব বেগমসাহেবা?"

"লিখুন যে আমার জন্য নবা[...] কোন চিন্তা করবেন না—[...] দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। [...] আমাকে কোন কষ্টই পেতে দেন না—[...]
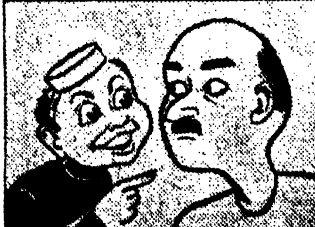
রোশানারা বলে যেতে থাকেন আর সোলেমান লিখতে থাকে। বিকেলের রোদ পশ্চিমের জানালা দিয়ে ঘরে এসে বিষণ্ণ রংস্যের ছায়াপাত করে, কার্নিসের ধারে-বসা পায়রাদের কূজন যেন মনের এই বিচিত্র অনুভূতিকে ধারালো করে তোলে। বসন্তের সুরভি-নিঃশ্বাসের মত মৃদু অথচ উত্তেজক রোশানারা বেগমের কণ্ঠস্বর। সেই স্বর শুনতে শুনতে জাফরানী রংয়ের পর্দাটা যেন মসলিনের চেয়েও সূক্ষ্ম ও স্বচ্ছ হয়ে ওঠে, তার গায়ে যেন এক ললিত-দেহী রমণীর মূর্তি ধীরে ধীরে ফুটে ওঠে। কিশোর বয়স থেকে নানা দুঃখের দিনে-রাতে সে যে মানসীর স্বপ্ন দেখে এসেছে, সেই মানসী যেন এতদিন বোবা ছিল, এই জাফরানী রংয়ের বিচিত্র কর্নিকার মুখোমুখী হতেই যেন সেই বোবা নারী এতদিনে সবাক হল।

"আর কি লিখব হুজুরাইন?"

"লিখুন যে, নিজের শরীরের যেন যত্ন নেন নবাব সাহেব—অপরিচিত বিদেশে অসুস্থ হলে তো চলবে না—"

সোলেমান মিঞা লেখে। লেখে আর বেগমসাহেবার কণ্ঠস্বর শুনতে শুনতে স্বপ্ন দেখে যেন সেই অন্তরালবর্তিনীর কালো চুলে কালো মেঘের সমারোহ, বাজপাখির ডানার মত বাঁকা তার ভুরু, ঠোঁটের রেখায় যেন রক্তগোলাপের নির্যাস, নার্গিস ফুলের মত সুকোমল দেহলতাকে ঘিরে তাঁর জরিদার পেশোয়াজ আর কুর্তা, চুমকি-বসানো ওড়না লুটোচ্ছে তাঁর মেহেদি-রাঙানো পায়ের কাছে।

হঠাৎ ঘোর কাটে, শোনা যায়, "আপনার খাদ্‌মা রোশানারা বেগম।"

চিঠি শেষ হয়। আদাব করে বেরিয়ে যায় সোলেমান মিঞা।

দরজার গোড়ায়, বাইরের রকটার ওপর শতরঞ্জি বিছিয়ে রহমৎ খাঁ বিড়ি টানতে টানতে সাপের চোখের মত কুটিল দৃষ্টি মেলে তাকায় আর নেশার ঘোরে হাসে, তারপর বলে, "চিঠি লেখা হল? বেশ বেশ—তা শোন মিঞা, এর পরের বার আমার নাম করে লিখো তো ওদিকে আফিং সস্তায় পেলে যেন বেশ কিছুটা নিয়ে আসে আকবর—লিখো কিন্তু, কেমন?"

ঘাড় নেড়ে চলে যায় সোলেমান।

তারপর একদিন কাটে, দুদিন কাটে। সোলেমান ছটফট করতে থাকে। কখন ডাক আসবে? আবার কখন সেই কণ্ঠস্বর শোনা যাবে?

শেষে তিনদিন বাদে ডাক আসে। ছুটে যায় সে।

"ফরমাইয়ে বেগমসাহেবা—"

"আগে এই চিঠিটা পড়ে দিন—আজই এসেছে—"

চিঠি পড়ে সোলেমান—তারপর জবাব লেখে।

"লিখুন যে, নবাব সাহেবের শরীর খারাপ জেনে আমরা চিন্তিত—দিনরাত আল্লার কাছে দুয়া চাইছি আমরা—তিনি যেন ভাল ডাক্তার দেখিয়ে জলদি জলদি সেরে ওঠেন—"

ইচ্ছে করে দেরী করে লেখে সোলেমান। আগে যে চিঠি দশ মিনিটে লিখত, ক্রমেই তা পনেরো, কুড়ি মিনিট ছাড়িয়ে আধ ঘণ্টায় গিয়ে পৌঁছয়।

"লিখেছেন?"

"জী লিখেছি—দুয়া চাইছি—তারপর?"

"তিনি যেন ভাল চিকিৎসার—"

"জী হাঁ—"

দেরী করে দোকানে ফেরে সোলেমান। খান সাহেবের ভাই আলতাফ রাগারাগি করে, শাসায়। সোলেমান চুপ করে থাকে। তার কানের কাছে তখনো ঘুরছে সেই আশ্চর্য কণ্ঠস্বর। তারই সুখস্মৃতি বহন করে তার রাত কাটে, একটা দিন কাটে। কিন্তু তারপর আর কাটতে চায় না। সময়মত আফিং না পেলে রহমৎ খাঁর যে দশা হয়, তেমনি দশা হয় সোলেমান মিঞার। কণ্ঠস্বরের সেই ভোগবতী ধারার জন্য তার দেহমন তৃষ্ণায় আকুল হয়ে ওঠে।

এবার সে না ডাকতেই গিয়ে হাজির হয়, সাকিনাকে ডাকে, বলে বেগমকে খবর দিতে।

"কেন, আমাকেই বলুন না—" সাকিনা বলে।

"না, বেগমসাহেবাকে দরকার—"

সাকিনা খবর দেয়। পর্দার আড়ালে লঘু পায়ের শব্দ এসে থামে, পর্দাটা দুলে ওঠে, সোলেমানের শরীর-মন দুলে ওঠে।

"কি চাই?" রোশানারা প্রশ্ন করেন।

"কোন চিঠি পড়ার নেই?" সোলেমান বলে।

"আজ তো কোন চিঠি আসেনি।" রোশানারা বলেন।

"ওঃ—কিন্তু কোন চিঠি লিখতে হবে না?"

"পরশুই তো চিঠি লেখা হল—আবার চিঠি পাই, তারপর—"

"ওঃ—"

সোলেমানের কণ্ঠে হতাশা। যতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে সে, যতক্ষণ কথা বলে সেই আশ্চর্য কণ্ঠস্বরকে সে মদের মত চুমুক দিতে থাকে। সেই কণ্ঠস্বরে যেন বসন্তের পুষ্প-সমারোহ, চুম্বনের মাদকতা, স্পর্শের বিহ্বলতা। সেই কণ্ঠস্বর যেন অদৃশ্য আগুনের মত—তার রক্তের মধ্যেও আগুনের জ্বালা ছড়ায়।

কিন্তু সাকিনার ভুরু আজ কুঞ্চিত হয়ে ওঠে, সোলেমান মিঞার চোখের তারাতে, দাঁড়ানোর ভঙ্গীতে আজ সে যেন কিছু খুঁজে পায়।

ফেরার সময় বুড়ো রহমৎ খাঁ দেখে সোলেমানকে।

"কি হে মিঞা, ভাগ্নের কি খবর?"

"আজ তো চিঠি আসেনি।"

"তবে কি লিখলে?"

"আজ তো লিখিনি।"

"তবে?"

"খোঁজ নিতে এসেছিলাম—"

আফিং-এর নেশায় ছলছল চোখ হঠাৎ সন্ধানী হয়ে ওঠে রহমৎ খাঁর, বলে, "বটে! খোঁজ নিতে এসেছিলে! তা ভালো—ভালো—"

কিন্তু সোলেমান আর রক্তমাংসের দুনিয়াতে থাকে না বলেই সে সাকিনার ভ্রূকুঞ্চন লক্ষ্য করল না, রহমৎ খাঁর চোখের চাউনিও সরল মনে হল তার কাছে। সে এখন শব্দের পৃথিবীতে থাকে, সে পৃথিবীতে শব্দ একটিমাত্র। একটি নারীকণ্ঠ।

ধীরে ধীরে মাথা খারাপ হয় সোলেমানের। আত্মকেন্দ্রিক, পৃথিবীতে একা সে, আঘাতে আঘাতে মৌনতার আবরণে নিজের ক্ষতবিক্ষত যে হৃদয়কে মুড়ে রেখেছিল সোলেমান, তা হঠাৎ বাস্তবতা থেকে ডানা মেলে আকাশে ওড়ে। হিসেবে ভুল হয় তার, গ্রাহকদের কথা কানে যায় না তার। আলতাফের তিরস্কারে ভয় হয় না, লজ্জা হয় না। দিন-রাতের হিসেবও শেষে একাকার হয়ে যায়। একটা চিঠি লিখেই আর একটা চিঠি লেখার আকুলতায় অধীর হয়ে ওঠে সে। কিছু চায় না সে, সে শুধু এই পথের কুকুরের অখ্যাত জীবনে একটিমাত্র ইন্দ্রজালকে প্রার্থনা করে, আমৃত্যু সে জাফরানী রংয়ের পর্দার সামনে বসে একটি কণ্ঠস্বরের ঝরণাধারায় অবগাহন করতে চায়, একটি সুরের আগুনে দগ্ধ হতে চায়।

এদিকে অনেক চোখ লক্ষ্য করতে থাকে সোলেমানকে, অনেক ভুরু কুঁচকে ওঠে তার দিকে তাকিয়ে, অনেকেই কানা-কানি আর হাসাহাসি করতে থাকে আল-তাফের দোকান আর নবাব আকবর আলির বাড়ির দিকে তাকিয়ে।

কিন্তু সোলেমান মিঞার হুঁশ নেই, কোন দিকেই লক্ষ্য নেই।

এবেলা চিঠি লিখেই একদিন ও-বেলা গিয়ে হাজির হল সে।

সাকিনা অবাক হল, "কি চান মিঞা সাব?"

"চিঠি পড়তে এসেছি—"

সাকিনার চোখ জ্বলে উঠল, "আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে—এই না ও-বেলা এসেছিলেন?"

"আচ্ছা, বেগমসাহেবাকে খবর দাও সাকিনা—"

"না—আপনি এখন যান।"

"একবার খবর দাও—একবার—"

"না—"

সোলেমান বিহ্বলের মত ... তারপর হঠাৎ উচ্চকণ্ঠে ডেকে উঠল, "বেগমসাহেবা—"

"সোলেমান মিঞা!" সাকিনা ...

কিন্তু রোশানারা বেগমের কানে ... পৌঁছেছিল, তাঁর দ্রুত পায়ের শব্দ এসে পর্দার ওপিঠে থামল।

সাকিনা বলল, "দরকার নেই, ... এসেছে সোলেমান মিঞা, আমি ... বলছি তবু যাচ্ছে না—"

"কেন সাকিনা—কি হয়েছে?"

সোলেমান এক-পা এগোল, ... স্থানের কোনো এক সম্রাজ্ঞীর সঙ্গে ... কথা কইছে এক ক্রীতদাস, এমনি ... ভঙ্গীতে সে বলল, "কোন চিঠি পড়তে হবে না বেগমসাহেবা?"

একটু নিঃশব্দতার পর আওয়াজ এল, "না।"

"তাহলে লিখতে হবে?"

"না।"

চোখের তারাতে বিচিত্র এক উত্তেজনা ... আলো নিয়ে সোলেমান বলল, ... বেগমসাহেবা, কতদূরে, সেই জঙ্গলা ... বিদেশে নবাব সাহেব একা একা ... কাটাচ্ছেন সেকথা কি আপনি ... দেখেছেন? রোজ একখানা করে ...

লিখে তাঁর নিঃসংগতার বেদনা কি কমানো উচিত নয় আপনার—"

রোশানারা বেগমের গলাতে দৃঢ়তা ধ্বনিত হল, "মিঞা সাব, আমার কি করা উচিত আর অনুচিত তা আমি ভালভাবেই জানি—"

"আজ্ঞে?"

"আপনি এবার আসুন—"

"আচ্ছা আদাব—"

"আদাব — আর শুনুন — আবার ডাকলেই আপনি আসবেন, বুঝলেন?"

"জী হাঁ বেগমসাহেবা—" বলে নত-মস্তকে ধীরে ধীরে সোলেমান চলে গেল।

বেড়ালের মত নিঃশব্দে রহমৎ খাঁ এসে হাজির হল সেখানে। এইমাত্র সে তার বিকেলের বাড়িটি গিলেছে। হেসে বলল, "আবার এবেলাও বুঝি চিঠি লেখা হল সাকিনা?"

সাকিনা মাথা নাড়ল, "জী না"—

"ওঃ"—বলে বুড়ো রহমৎ খাঁ বাইরে গেল। তার পাকা দাড়িগোঁফের আড়ালে একটা বিচিত্র হাসি ছড়িয়ে গেল।

জাফ্‌রানী রংয়ের পর্দা সরিয়ে সাকিনা ভেতরে গিয়ে দাঁড়াল, দেখল রোশানারা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। বিকেলের আলো ম্লান হয়ে এসেছে। খোলা জানালার ওপর চিক, তার ভেতর দিয়েও আকাশের রক্তমেঘ নজরে পড়ে। কার্নিসের ওপর পায়রাগুলো অনেকক্ষণ ফিরে এসেছে, তাদের কূজনের মধ্যে আসন্ন সন্ধ্যার পূরবী।

সাকিনা বলল, "বেগমসাহেবা, সোলেমান মিঞাকে আর কোনদিন ডাকবেন না।"

যেন চমকে উঠলেন রোশানারা বেগম, বললেন, "কেন?"

"কেন?" সাকিনা একবার থামল, তারপর তাকাল, বলল, "যদি গুস্তাকী মাপ করেন তো একটা কথা বলি"—

"বল"—

"সোলেমান মিঞা আপনার প্রেমে পড়েছে"—

"কি বললি!" রোশানারা বেগম যেন কেঁপে উঠলেন, তার চোখ জ্বলে উঠল, নাক ফুলে উঠল, ঘৃণা মেশানো সূক্ষ্ম একটা হাসির মত আভাস ঠোঁটের কোণে ঝিলিক মারল। তিনি ধীরে ধীরে বললেন, "আমাকে ভালবাসে!"

"জী—তার চালচলন লক্ষ্য করছেন কদিন ধরেই আপনাকে বলব বলব করে বলিনি, মহল্লার লোকেরা তো কানাকানি করছে। সোলেমান মিঞার পাগলামো এখন সবার চোখেই বড় হয়ে লাগছে"—

স্থির হয়ে সব কথা শুনলেন রোশানারা, সব শেষে বললেন, "তাহলে আর কোনদিন সোলেমান মিঞাকে বাড়িতে ঢুকতে দিস্‌নে!"

তারপর দ্রুত ঘটনা ঘটতে লাগল। সোলেমানের চাকরি গেল, মহম্মদ ইউসুফ তাঁর বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলেন তাকে। কোন কাজে মন দিচ্ছিল না সে, পাড়ার লোকের কানাকানি খানসাহেবের কানে গিয়ে তাকে উত্তেজিত করেছিল।

ফুটপাথে আশ্রয় নিল সোলেমান। লালা কিষণলালের বাড়ির গাড়িবারান্দার নীচেকার ফুটপাথে বসে থাকে সে, আর নবাব আকবর আলির বাড়ির দিকে তাকিয়ে থাকে।

সাকিনা সেই খবর দিল রোশানারাকে।

"সত্যি?" রোশানারা অবাক না হয়ে পারলেন না।

"হাঁ"—

"হায় আল্লা!" রোশানারা সখেদে বললেন।

সাকিনা বলল, "লোকটির মাথায় বোধ হয় ছিট ছিল, এখন পাগল হয়ে গেছে"—

হঠাৎ করাঘাত শোনা গেল দরজায়।

সাকিনা দরজা খুলেই সঙ্গে সঙ্গে দরজা বন্ধ করল।

"কে রে?" রোশানারা ভেতর থেকে প্রশ্ন করলেন। সাকিনা জবাব দিল না।

সঙ্গে সঙ্গেই বাইরে থেকে সোলেমানের গলা ভেসে এল, "চিঠি এসেছে বেগমসাহেবা—চিঠি?"

রোশানারা শুনতে পেলেন।

সাকিনা চেঁচিয়ে বলল, "না, চিঠি আসেনি। আপনি যান"—

আর কোন শব্দ এল না।

বুড়ো রহমৎ ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে, চারদিকে একবার কি যেন দেখল, তারপর নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে খুক্ খুক্ করে হাসতে হাসতে নিজের মনে বিড়বিড় করে বলল—

"কেয়া ক'হু কুছ কহাভী নহী যাতা
হায়, চুপ্‌ভী র‍্যাহা নহী যাতা।"

সোলেমান মিঞা পাগল হয়ে গেল। কোথায় খায় কেউ জানে না। ফুটপাথেই পড়ে থাকে সে। লোকেরা নিত্যদিন লক্ষ্য করে তাকে। ধুলো ওড়ে, বৃষ্টি পড়ে, রোদে তেতে ওঠে পাথরের ফুটপাথ কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই উন্মাদের। মাঝে মাঝে হঠাৎ এসে আকবর আলির বাড়ির চার-পাশে ঘুরে বেড়ায় সে। যদি একটাও কথার টুকরো শুনতে পাওয়া যায় তারই আশায়। তারপর আবার কি ভেবে সদর দরজায় ফিরে এসে করাঘাত করে চেঁচায়, "চিঠি লিখতে হবে না? চিঠি?"

দিন কাটে। দরজা বন্ধ করে ভেতরে পাথরের মত বসে রোশানারা বেগম পাগলের সেই চীৎকার শোনেন আর স্তব্ধ হয়ে থাকেন। তারপরে তাও পুরোন হয়ে ওঠে, সয়ে যায় তাঁর। রোজ সূর্য ওঠে, অস্ত যায়, রোজ রাস্তা দিয়ে গাড়িঘোড়া চলে, ফেরিওয়ালা ডেকে যায়,

"কেন, আমাকেই বলুন না—" সাকিনা বলে।

"না, বেগমসাহেবাকে দরকার—"

সাকিনা খবর দেয়। পর্দার আড়ালে লঘু পায়ের শব্দ এসে থামে, পর্দাটা দুলে ওঠে, সোলেমানের শরীর-মন দুলে ওঠে।

"কি চাই?" রোশানারা প্রশ্ন করেন।

"কোন চিঠি পড়ার নেই?" সোলেমান বলে।

"আজ তো কোন চিঠি আসেনি।" রোশানারা বলেন।

"ওঃ—কিন্তু কোন চিঠি লিখতে হবে না?"

"পরশুই তো চিঠি লেখা হল—আবার চিঠি পাই, তারপর—"

"ওঃ—"

সোলেমানের কণ্ঠে হতাশা। যতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে সে, যতক্ষণ কথা বলে সেই আশ্চর্য কণ্ঠস্বরকে সে মদের মত চুমুক দিতে থাকে। সেই কণ্ঠস্বরে যেন বসন্তের পুষ্প-সমারোহ, চুম্বনের মদিরতা, স্পর্শের বিহ্বলতা। সেই কণ্ঠস্বর যেন অদৃশ্য আগুনের মত—তার রক্তের মধ্যেও আগুনের জ্বালা ছড়ায়।

কিন্তু সাকিনার ভুরু আজ কুঞ্চিত হয়ে ওঠে. সোলেমান মিঞার চোখের তারাতে, দাঁড়ানোর ভঙ্গীতে আজ সে যেন কিছু খুঁজে পায়।

ফেরার সময় বুড়ো রহমৎ খাঁ দেখে সোলেমানকে।

"কি হে মিঞা, ভাগ্যের কি খবর?"

"আজ তো চিঠি আসেনি।"

"তবে কি লিখলে?"

"আজ তো লিখিনি।"

"তবে?"

"খোঁজ নিতে এসেছিলাম—"

আফিং-এর নেশায় ছলছল চোখ হঠাৎ সন্ধানী হয়ে ওঠে রহমৎ খাঁর, বলে, "বটে! খোঁজ নিতে এসেছিলে! তা ভালো—ভালো—"

কিন্তু সোলেমান আর রক্তমাংসের দুনিয়াতে থাকে না বলেই সে সাকিনার ভ্রূকুঞ্চন লক্ষ্য করল না, রহমৎ খাঁর চোখের চাউনিও সরল মনে হল তার কাছে। সে এখন শব্দের পৃথিবীতে থাকে, সে পৃথিবীতে শব্দ একটিমাত্র। একটি নারীকণ্ঠ।

ধীরে ধীরে মাথা খারাপ হয় সোলেমানের। আত্মকেন্দ্রিক, পৃথিবীতে একা সে, আঘাতে আঘাতে মৌনতার আবরণে নিজের ক্ষতবিক্ষত যে হৃদয়কে মুড়ে রেখেছিল সোলেমান, তা হঠাৎ বাস্তবতা থেকে ডানা মেলে আকাশে ওড়ে। হিসেবে ভুল হয় তার, গ্রাহকদের কথা কানে যায় না তার। আলতাফের তিরস্কারে ভয় হয় না, লজ্জা হয় না। দিন-রাতের হিসেবও শেষে একাকার হয়ে যায়। একটা চিঠি লিখেই আর একটা চিঠি লেখার আকুলতায় অধীর হয়ে ওঠে সে। কিছু চায় না সে, সে শুধু এই পথের কুকুরের অখ্যাত জীবনে একটিমাত্র ইন্দ্রজালকে প্রার্থনা করে, আমৃত্যু সে জাফরানী রংয়ের পর্দার সামনে বসে একটি কণ্ঠস্বরের ঝরণাধারায় অবগাহন করতে চায়, একটি সুরের আগুনে দগ্ধ হতে চায়।

এদিকে অনেক চোখ লক্ষ্য করতে থাকে সোলেমানকে, অনেক ভুরু কুঁচকে ওঠে তার দিকে তাকিয়ে, অনেকেই কানাকানি আর হাসাহাসি করতে থাকে আলতাফের দোকান আর নবাব আকবর আলি[illegible] বাড়ির দিকে তাকিয়ে।

কিন্তু সোলেমান মিঞার হুঁশ নেই, কোন দিকেই লক্ষ্য নেই।

এবেলা চিঠি লিখেই একদিন ওবেলা গিয়ে হাজির হল সে।

সাকিনা অবাক হল, "কি চান মিঞা সাব?"

"চিঠি পড়তে এসেছি—"

সাকিনার চোখ জ্বলে উঠল, "আপনা[illegible] কি মাথা খারাপ হয়েছে—এই না ওবেলা এসেছিলেন?"

"আচ্ছা, বেগমসাহেবাকে খবর দা[illegible] সাকিনা—"

"না—আপনি এখন যান।"

"একবার খবর দাও—একবার—"

"না—"

সোলেমান বিহ্বলের মত তাকা[illegible] তারপর হঠাৎ উচ্চকণ্ঠে ডেকে উ[illegible] "বেগমসাহেবা—"

"সোলেমান মিঞা!" সাকিনা চেঁচা[illegible]

কিন্তু রোশানারা বেগমের কানে [illegible] পৌঁছেছিল, তাঁর দ্রুত পায়ের শব্দ [illegible] পর্দার ওপিঠে থামল।

সাকিনা বলল, "দরকার নেই, [illegible] এসেছে সোলেমান মিঞা, আমি [illegible] বলছি তবু যাচ্ছে না—"

"কেন সাকিনা—কি হয়েছে?"

সোলেমান এক-পা এগোল, হিন্দু[illegible] স্থানের কোনো এক সম্রাজ্ঞীর সঙ্গে যেন কথা কইছে এক ক্রীতদাস, এমনি[illegible] ভঙ্গীতে সে বলল, "কোন চিঠি প[illegible] হবে না বেগমসাহেবা?"

একটু নিঃশব্দতার পর আওয়াজ এল, "না।"

"তাহলে লিখতে হবে?"

"না।"

চোখের তারাতে বিচিত্র এক উত্তেজনার আলো নিয়ে সোলেমান বলল, "কিন্তু বেগমসাহেবা, কতদূরে, সেই জঙ্গ[illegible] বিদেশে নবাব সাহেব একা একা দিন কাটাচ্ছেন সেকথা কি আপনি ভেবে দেখেছেন? রোজ একখানা করে চিঠি

লিখে তাঁর নিঃসঙ্গতার বেদনা কি কমানো উচিত নয় আপনার—"

রোশানারা বেগমের গলাতে দৃঢ়তা ধ্বনিত হল, "মিঞা সাব, আমার কি করা উচিত আর অনুচিত তা আমি ভালভাবেই জানি—"

"আজ্ঞে?"

"আপনি এবার আসুন—"

"আচ্ছা আদাব—"

"আদাব — আর শুনুন — আবার ডাকলেই আপনি আসবেন, বুঝলেন?"

"জী হাঁ বেগমসাহেবা—" বলে নত-মস্তকে ধীরে ধীরে সোলেমান চলে গেল।

বেড়ালের মত নিঃশব্দে রহমৎ খাঁ এসে হাজির হল সেখানে। এইমাত্র সে তার বিকেলের বাড়িটি গিলেছে। হেসে বলল, "আবার এবেলাও বুঝি চিঠি লেখা হল সাকিনা?"

সাকিনা মাথা নাড়ল, "জী না"—

"ওঃ"—বলে বুড়ো রহমৎ খাঁ বাইরে গেল। তার পাকা দাঁড়িগোফের আড়ালে একটা বিচিত্র হাসি ছড়িয়ে গেল।

জাফ্‌রানী রংয়ের পর্দা সরিয়ে সাকিনা ভেতরে গিয়ে দাঁড়াল, দেখল রোশানারা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। বিকেলের আলো ম্লান হয়ে এসেছে। খোলা জানালার ওপর চিক, তার ভেতর দিয়েও আকাশের রক্তমেঘ নজরে পড়ে। কার্নিসের ওপর পায়রাগুলো অনেকক্ষণ ফিরে এসেছে, তাদের কূজনের মধ্যে আসন্ন সন্ধ্যার পূরবী।

সাকিনা বলল, "বেগমসাহেবা, সোলেমান মিঞাকে আর কোনদিন ডাকবেন না।"

যেন চমকে উঠলেন রোশানারা বেগম, বললেন, "কেন?"

"কেন?" সাকিনা একবার থামল, তারপর তাকাল, বলল, "যদি গুস্তাকী মাপ করেন তো একটা কথা বলি"—

"বল"—

"সোলেমান মিঞা আপনার প্রেমে পড়েছে"—

"কি বললি!" রোশানারা বেগম যেন কেঁপে উঠলেন, তার চোখ জ্বলে উঠল, নাক ফুলে উঠল, ঘৃণা মেশানো সূক্ষ্ম একটা হাসির মত আভাস ঠোঁটের কোণে ঝিলিক মারল। তিনি ধীরে ধীরে বললেন, "আমাকে ভালবাসে!"

"হ্যাঁ—তার চালচলন লক্ষ্য করছেন না? ক'দিন ধরেই আপনাকে বলব বলব করেও বলিনি, মহল্লার লোকেরা তো কানাকানি করছে। সোলেমান মিঞার পাগলামো এখন সবার চোখেই বড় হয়ে লাগছে"—

স্থির হয়ে সব কথা শুনলেন রোশানারা, সব শেষে বললেন, "তাহলে আর কোনদিন সোলেমান মিঞাকে বাড়িতে ঢুকতে দিস্‌না।"

তারপর দ্রুত ঘটনা ঘটতে লাগল। সোলেমানের চাকরি গেল, মহম্মদ ইউসুফ তাঁর বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলেন তাকে। কোন কাজে মন দিচ্ছিল না সে, পাড়ার লোকের কানাকানি খানসাহেবের কানে গিয়ে তাকে উত্তেজিত করেছিল।

ফুটপাথে আশ্রয় নিল সোলেমান। লালা কিষণলালের বাড়ির গাড়িবারান্দার নীচেকার ফুটপাথে বসে থাকে সে, আর নবাব আকবর আলির বাড়ির দিকে তাকিয়ে থাকে।

সাকিনা সেই খবর দিল রোশানারাকে।

"সত্যি?" রোশানারা অবাক না হয়ে পারলেন না।

"হ্যাঁ"—

"হায় আল্লা!" রোশানারা সখেদে বললেন।

সাকিনা বলল, "লোকটির মাথায় বোধ হয় ছিট ছিল, এখন পাগল হয়ে গেছে"—

হঠাৎ করাঘাত শোনা গেল দরজায়।

সাকিনা দরজা খুলেই সঙ্গে সঙ্গে দরজা বন্ধ করল।

"কে রে?" রোশানারা ভেতর থেকে প্রশ্ন করলেন। সাকিনা জবাব দিল না।

সঙ্গে সঙ্গেই বাইরে থেকে সোলেমানের গলা ভেসে এল, "চিঠি এসেছে বেগমসাহেবা—চিঠি?"

রোশানারা শুনতে পেলেন।

সাকিনা চেঁচিয়ে বলল, "না, চিঠি আসেনি। আপনি যান"—

আর কোন শব্দ এল না।

বুড়ো রহমৎ ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে, চারদিকে একবার কি যেন দেখল, তারপর নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে খুক্ খুক্ করে হাসতে হাসতে নিজের মনে বিড়বিড় করে বলল—

"কেয়া ক'হুঁ কুছ কহাভী নহী যাতা
হায়, চুপ্‌ভী র‍্যহা নহী যাতা।"

সোলেমান মিঞা পাগল হয়ে গেল। কোথায় যায় কেউ জানে না। ফুটপাথেই পড়ে থাকে সে। লোকেরা নিত্যদিন লক্ষ্য করে তাকে। ধুলো ওড়ে, বৃষ্টি পড়ে, রোদে তেতে ওঠে পাথরের ফুটপাথ কিন্তু দ্রূক্ষেপ নেই উম্মাদের। মাঝে মাঝে হঠাৎ এসে আকবর আলির বাড়ির চারপাশে ঘুরে বেড়ায় সে। যদি একটাও কথার টুকরো শুনতে পাওয়া যায় তারই আশায়। তারপর আবার কি ভেবে সদর দরজায় ফিরে এসে করাঘাত করে চেঁচায়, "চিঠি লিখতে হবে না? চিঠি?"

দিন কাটে। দরজা বন্ধ করে ভেতরে পাথরের মত বসে রোশানারা বেগম পাগলের সেই চীৎকার শোনেন আর স্তব্ধ হয়ে থাকেন। তারপরে তাও পুরোন হয়ে ওঠে, সয়ে যায় তাঁর। রোজ সূর্য ওঠে, অস্ত যায়, রোজ রাস্তা দিয়ে গাড়িঘোড়া চলে, ফিরিওয়ালা ডেকে যায়,

সামনের তেলের কলের সিটি তিনচারবার বাজে—সেই সঙ্গে একটা পাগলের চীৎকারও নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

শুধু লোকেরা নিত্য নতুন ব্যাখ্যা খুঁজে পায়, রসালো আলোচনার খোরাক পায়। ওরা পাগলের দিকে তাকায় আর কত কী কল্পনা করে। মাঝে মাঝে এক আধজন ছোকরা সোলেমানের পেছনে গিয়ে হঠাৎ বলে ওঠে, "চিঠি লিখবে মিঞা? চিঠি?"

সোলেমান চমকে তাকায়, তারপর মৃদু মৃদু হাসে। তারপর ভুলেই যায় ব্যাপারটা, কান পেতে কি যেন সে শুনবার চেষ্টা করে। হাওয়াতে কি কোন কণ্ঠস্বর ভেসে এল?

দশমাস বাদে একদিন আকবর আলি ফিরে এলেন। আর তাঁকে আফ্রিকা যেতে হবে না, এখন থেকে তিনি লক্ষ্ণৌ-এর অফিসেই থাকবেন, মাইনেও বেড়েছে।

দশ মাস বাদে এসে নতুন আবেগ নিয়ে রোশানারাকে তিনি মধ্যাহ্নের অলস মুহূর্তে বুকের কাছে টানলেন। আর ঠিক সেই সময়েই নীচে থেকে ডাক ভেসে এল, "চিঠি লেখাতে হবে? চিঠি?"

সে ডাক শুনে সাকিনা ভয় পেল, রহমৎ খাঁ হাসল, রোশানারা চমকে উঠল।

আর আকবর আলি বললেন, "কে!"

রোশানারা শান্তকণ্ঠে বললেন, "এ পাড়ার এক পাগল—"

"পাগল! তা চিঠি লেখাতে হবে বলছে কেন?"

রোশানারা শীর্ণ হাসি হাসলেন, "পাগলের কথার অর্থ কি কেউ বোঝে?"

আকবর আলি হাসলেন, "হ্যাঁ তা বটে।" তারপর আবার বেগমের দিকে তাকালেন। রোশানারার চোখের নীচে ক্ষীণ ছায়ার আভাস, রক্তের আভাও নেই গালে। রোশানারাও কি তাঁর কথা ভেবে তাঁরই মত জেগে থাকত মাঝে মাঝে?

তিনি বললেন, "রোশানারা, দূরে গিয়ে তোমার দাম বুঝেছি। প্রতিদিন তোমার চিঠির জন্য কী আকুলতাই যে বুকের মধ্যে তোলপাড় করেছে। ওয়াজিদ আলি যখন কলকাতায় নির্বাসিত হলেন, সঙ্গে তাঁর সব বেগমেরা যাননি। বদর আলম বেগম রয়ে গেলেন এই লক্ষ্ণৌতেই। বেগমের মনের আকুলতার সঙ্গে মিল ছিল আমারো মনের—ওয়াজিদ আলির একটি চিঠি পেয়ে তিনি যে শের লিখেছিলেন, আমারো তাই মনে হত—

'তুমহারে খত্‌কো জ্যব দেখা
তনেমুর্দামেঁ জান আই
হুয়া সাবিত কি হ্যায় তহ্‌রীরমেঁ
ইজজে মসীহাই।
বলায়ে হিজ্রমেঁ জ্যবসে ফঁসী হুঁ
ম্যয় অঙ্গারোঁকে উপর লোটতী হুঁ।'

তোমার চিঠি পেয়ে আমারও মৃত-প্রায় দেহে যেন নতুন প্রাণ আসত—সেই মুহূর্তে মনে হত যেন ভগবান আছেন। কি বলব রোশানারা, যেদিন থেকে বিচ্ছেদ শুরু হল, সেদিন থেকে যেন জ্বলন্ত অঙ্গারের ওপরেই শুয়ে ছিলাম—"

রোশানারা আবার শীর্ণ হাসি হাসলেন।

আকবর আলি প্রশ্ন করলেন, "চিঠি লেখাতে কাকে দিয়ে? খান সাহেবের বিবি?"

রোশানারা স্বামীর আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে বললেন, "না—"

"তবে?"

"ওদের বাড়ির এক সোলেমান মিঞা—"

"হ্যাঁ হ্যাঁ—আলতাফের দোকানে কাজ করে। তা লোকটার হাতের লেখাটা ভালই।"

কথাটা সেখানেই থেমে গেল।

বিকেলে বেড়াতে বেরোলেন আকবর আলি। লক্ষ্য করলেন যে, রাস্তার সবাই, পাড়ার সবাই তার দিকে বিশেষভাবে তাকাচ্ছে। কেন? এতদিন বাদে ফিরেছেন বলেই হয়ত। খান সাহেবের বাড়িতেও কেমন যেন একটা বিশেষ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাচ্ছে সবাই! কেন?

সন্ধ্যার পর বাড়ির দিকে পা দিলেন আকবর আলি। লালা কিষণলালের গাড়ি-বারান্দার সামনে দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন তিনি।

সোলেমান তখন নিজের মনে কথা বলে যাচ্ছে, "চিঠি লেখাবেন না বেগম সাহেবা? চিঠি?"

আকবর আলি চিনতে পারলেন পাগল। চিনতে পারলেন যে সোলেমান মিঞাই পাগল।

পাগল তখন হেসে কবিতা আবৃত্তি করছে,

"মুহব্বৎমে নহীঁ হ্যায় ফর্ক
জীনে অওর মরনেকা
উসীকো দেখ্‌কর জীতে হ্যায়
যিস কাফিরপে দম নিকলে।"

বাড়ি ফিরতে ফিরতে আকবর আলির মাথায় ঝড় উঠল। পাগল চিঠি লেখোনো

কথা কাকে বলছিল তা যেন আঁচ করতে পারলেন তিনি। আর ও কবিতা কেন আওড়াচ্ছে সে! 'প্রেমে পড়লে জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করার ক্ষমতাও লোপ পায়—যে প্রিয়তম শত্রুর জন্য মৃত্যু হয় আবার তাকে দেখেই জীবন ফিরে আসে।' এই কবিতার অর্থ সোলেমান পাগলার জীবনে কি খুঁজে পাওয়া যাবে!

বাড়িতে ঢুকে তিনি সোজা রহমৎ খাঁর ঘরে ঢুকলেন। বুড়োর পেটে তখন আফিং-এর গুলি আর আস্ত নেই, আকবর আলিকে দেখেই সহাস্যে বলল, "আও বেটা—আও—"

"মামুজী—একটা কথা—"

"বল বাবা, বল—"

"সোলেমান পাগল হয়েছে কেন জানো?"

রহমৎ খাঁ তাকাল তাঁর দিকে, তারপর হাসল, বলল, "আজ থাক না, আপনা থেকেই জানবে—"

"না—আমাকে বল—এখুনি—"

রহমৎ আবার হাসল, "তাহলে বোস বাবাজী—সিগারেট আছে? একটা দাও দেখি—তুমি যখন জিদ করছ তখন বলতে হবে বৈকি—"

বেশ কিছুক্ষণ পরে শোবার ঘরে ফিরলেন আকবর আলি। দু'চোখ তখন লাল। সোজা বিছানায় গড়িয়ে পড়লেন তিনি।

রোশানারা কাছে এসে বললেন, "শুনছ গো, খানা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে—"

আকবর আলি উঠে বসলেন, তীব্র দৃষ্টি মেলে তাকালেন বেগমের দিকে, বললেন, "তুমি মিথ্যে কথা বলেছ আমার কাছে।"

"কেন?" রোশানারা তাকালেন পূর্ণ-দৃষ্টি মেলে।

"সোলেমান মিঞার 'চিঠি লেখাবে' কথার অর্থ সেদিন বলনি।"

রোশানারার ঠোঁটে ম্লান হাসি ফুটল, "তুমি সব শুনেছ?"

"হ্যাঁ—শুনব না কেন? সবাই যে সব কথা জানে।"

"আমার বলতে ঘেন্না হয়েছিল। আমার তো কোন দোষ নেই।"

"হুঁ—"

নিস্তব্ধতা নেমে আসে ঘরের মধ্যে। আকবর আলি বিছানায় গড়িয়ে পড়েন। সাকিনা আজ ঘরের মধ্যে শখ করে বেল ফুলের মালা ঝুলিয়ে রেখে গিয়েছিল—তার মিষ্টি গন্ধে বাতাস ভারি। কিন্তু তবু সে দিকে চোখ গেল না আকবর আলির। রোশানারাও চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

অনেকক্ষণ পরে মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন তিনি, "খাবে না।"

আকবর আলি প্রায় অস্পষ্ট কণ্ঠে বললেন, "না।"

মাঝরাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল রোশানারার, দেখলেন যে আকবর আলি একদৃষ্টে তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন। ঘরে আলো জ্বলছে। রোশানারা উঠে বসবার চেষ্টা করতেই হঠাৎ আকবর আলি তাঁকে বুকে টেনে নিলেন। উন্মত্ত আবেগে নিজের দেহের সঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে তিনি বললেন, "তোমাকে আমি এতদিন ভালো করে দেখিনি রোশানারা—এতদিন আমি শুধু অবহেলাই করেছি—"

কিন্তু এই ব্যগ্র আকুলতার মধ্যেও সেই পুরনো অনুভূতিটাই আরো তীব্র হয়ে ফিরে এল। রোশানারা বড় ঠাণ্ডা, বড় সুন্দর।

কিন্তু সেই অনুভূতির সঙ্গে কানিস বেগম আর ফিরোজা বাঈয়ের কথা আজ আর মনে পড়ল না আকবর আলির। শুধু এই অদম্য বাসনার আগুন বুকের মধ্যে জ্বলে উঠল যে রোশানারাকেও জ্বলন্ত করবেন তিনি, তাঁকে নিজের নিকটতম আয়ত্তের মধ্যে টেনে আনবেন।

কিন্তু প্রেতের মত সেই ডাকটা শোনা যায় রোজ। 'চিঠি লেখাবেন বেগমসাহেবা? চিঠি?' আকবর আলির গায়ে যেন কশাঘাত হয় সেই শব্দে, তাঁর রক্তে যেন উন্মত্ততা টগবগ করে।

রাস্তায় বেরোলেই সোলেমানকে দেখতে পান তিনি। পাগল নিজের মনে বিড়বিড় করছে আর মাঝে মাঝে তাঁর বাড়ির দিকে তাকাচ্ছে। একটা অন্ধ উত্তেজনায় ছটফট করেন তিনি।

ক' দিন পরে সেদিন বিকেল থেকে আকাশ মেঘে মেঘে অন্ধকার হয়ে গেল। সন্ধ্যে পার হয়ে গেল। ঝড়বৃষ্টি শুরু হল, ক্রমে উঠল তাদের দ্বৈত গান, কিন্তু তখনো অফিস থেকে ফিরলেন না আকবর আলি।

সাকিনা বলল, "নবাব সাহেব বোধ হয় ঝড়বৃষ্টির জন্য আসছেন না—"

রোশানারা বললেন, "তাই তো মনে হচ্ছে—"

কিন্তু ঝড়বৃষ্টি থেমে গেল একটু বাদেই। আকাশ পরিষ্কার হয়ে চাঁদও উঠল খানিক বাদে। থানার ঘণ্টা রাত ন'টা থেকে একটা পর্যন্ত বেজে গেল। তারপর এলেন আকবর আলি। এলেন মাতাল হয়ে, গান গাইতে গাইতে।

সাকিনা দরজা খুলে সরে দাঁড়াল।

ঘরে ঢুকে রোশানারার সামনে দাঁড়িয়ে গান বন্ধ করলেন আকবর আলি।

"কি দেখছ বেগম?"

"তুমি মদ খেয়েছ!"

"খেয়েছি।"

"হঠাৎ?"

"হঠাৎই—সবই তো হঠাৎ বেগম-সাহেবা—মানুষ হঠাৎ জন্মায়, হঠাৎ মরে—এও হঠাৎ।" বলেই হো হো করে হেসে
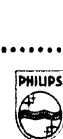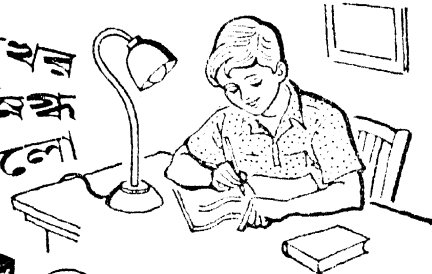
উঠলেন আকবর আলি, হাসতে হাসতে বললেন,

"হংসী আতী হায় অপনে রোনেপর
অওর রোনা হায় জগ্ হংসাইকা।"

রোশানারা বললেন, "তার মানে?"

"মানে?" কাছে এলেন আকবর আলি, দু'হাতে বেগমকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "সব কথার কি মানে থাকে? মাতালের কথার কি অর্থ হয়? রোশানারা, আজ আমার বড় আনন্দ হচ্ছে—"

"কেন?"

"জানি না। রোশানারা, তোমার চোখের তারা কী কালো, কী সুন্দর—"

"নেশার ঘোরে এসব আমাকে কেন বলছেন নবাব? আমি কনিস বেগম নই—"

আকবর আলি স্থির দৃষ্টিতে তাকাতে চাইলেন, বিকৃতকণ্ঠে বললেন, "আমি জানি—কনিস বেগমের কথা আর মনে পড়ে না রোশানারা বেগম—আজকাল তোমার দাম আমার কাছে অনেক বেশী—"

রোশানারা চোখ বুজলেন। চোখ বুজে বুজে অনেকক্ষণ ধরে মাতাল নবাবের প্রেমগুঞ্জন শুনলেন, তারপর আকবর আলির নাক যখন ডাকতে লাগল তখন ধীরে ধীরে উঠে বাতিটা নিভিয়ে জানালা থেকে চিক সরিয়ে দিয়ে বাইরের দিকে তাকালেন তিনি। বৃষ্টিধৌত নির্মল আকাশে কোথাও মেঘের মালিন্য নেই, এয়োদশীর চাঁদের আলোতে সমস্ত শহরকে যেন রুপোলী তবকে-মোড়া মনে হচ্ছে। ঐ চাঁদের দিকে তাকিয়ে রোশানারা বেগমের হঠাৎ কান্না পেল। তাঁর সে কান্না কেউ শুনল না, শুধু চাঁদই শুনল।

পরদিন মহল্লার সবাই একটা জিনিস আবিষ্কার করল। সোলেমান পাগলা নিরুদ্দিষ্ট। মহল্লার সমস্ত শব্দের মধ্যে পাগলের চীৎকারটা আজ আর ধ্বনিত হল না। সারা দিনের পর রোশানারারও কথাটা মনে পড়ল, ইচ্ছে হল একবার সাকিনাকে ডেকে জিজ্ঞেস করেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত রুচি হল না।

শেষে সাকিনাই এক সময়ে তাঁকে আড়ালে বলল, "আপদটা চলে গেছে বেগমসাহেবা—"

"কে?"

"কে আবার—ঐ পাগলা—"

"কোথায় গেছে?" রোশানারা প্রশ্ন করলেন।

"তা কেউ জানে না।"

"হুঁ—"

আকবর আলি সেদিন রাতে এক বোতল মদ বগলে নিয়ে ফিরে এলেন। বাড়িতেই প্রকাশ্যে পান শুরু করলেন তিনি। রোশানারা কিছুই বললেন না। শুধু বসে বসে দেখতে লাগলেন যে একটা প্রচণ্ড অস্থিরতাকে দমন করার জন্য আকবর আলি উঠে-পড়ে লেগেছেন।

হঠাৎ তিনি তাকালেন স্ত্রীর দিকে, "কি দেখছ?"

"তোমায়।"

"কেন?"

"তুমিও তো আমাকে দেখ।"

"দেখি—তোমার ভেতরটা দেখার চেষ্টা করি।"

"কি দেখতে পাও?" রোশানারা মৃদুকণ্ঠে বললেন।

"শুধু রক্ত-মাংস।"

"আমিও তাই দেখি।"

"শুধু তাই? আর আমার মন? তা দেখ না?" আকবর আলি ঝুঁকে পড়লেন।

"তোমার মনের নাগাল এখনো পাইনি আমি—"

"পেতেও তো চাওনি।"

রোশানারা হাসলেন, "খেলা তো একতরফা জমে না নবাব সাহেব—"

"বুঝেছি।"

সেদিন কাটে। তারপর আরো কটা দিন। রোজই একই পালা চলে। রোজই ঘরে বসে মদ খান আকবর আলি আর রোজই রোশানারা বসে বসে দেখেন।

সেদিন মদ ঢালতে গিয়ে রোশানারাই গেলাসটা এগিয়ে দিলেন। আকবর আলি হাসলেন।

"হঠাৎ এ কী বেগম?"

"সতীনের সঙ্গে সন্ধি করছি।"

"ভালো ভালো—" গেলাসটা এক চুমুকে নিঃশেষ করে হাসতে লাগলেন আকবর আলি, "সুন্দর বলেছ বেগম—"

হঠাৎ রোশানারা বলে উঠলেন, "একটা খবর শুনেছ—"

"কি?"

"সেই আপদটা এ মহল্লা থেকে চলে গেছে।"

"কে?"

"সেই পাগল—"

আকবর আলি ঢুলু-ঢুলু চোখ তুলে তাকালেন, রোশানারা আবার বললেন, "আবার ফিরে না এলেই বাঁচি এখন—"

রোশানারার একটা হাতের ওপর হাত রেখে আকবর আলি প্রশ্ন করলেন, "কেন বেগম?"

"কেন সে-কথাও বোঝাতে হবে তোমায়?"

মাতালের হাসি হেসে আকবর আলি গলা নামিয়ে বললেন, "আর ফিরে আসবে না সেই কাফির—"

"কেন? তুমি কি করে জানলে?"

আকবর আলি তেমনি মৃদুকণ্ঠে বললেন, "শ্‌শ্‌শ্‌—আস্তে—আমি ওকে জাহান্নমে পাঠিয়ে দিয়েছি রোশানারা—"

রোশানারাও গলার সুর নামিয়ে বললেন, "তার মানে?"

"মানে শেষ করে দিয়েছি।"

"না!" প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন রোশানারা—"না—না—"

"হ্যাঁ—"

"কিন্তু কেন?"

"কেন নয়? রোজই ওর চীৎকার শুনব আমি, ওকে দেখব, লোকদের হাসি দেখব! ইজ্জৎ চলে গেলে আমি বাঁচতে পারব না বেগম—"

একটু চুপ করে থেকে রোশানারা বললেন, "যা করেছ ভালই করেছ—কিন্তু কি দিয়ে ওকে—"

আকবর আলি বললেন, "অতি সহজে—গোমতীর পুলের ওপর থেকে ঠেলে ফেলে দিয়েছি—"

রোশানারা উঠে দাঁড়ালেন, বললেন "চল ফাতেহা পড়ে আসি নবাব সাহেব—"

আকবর আলি অবাক হয়ে গেলেন, "কি বলছ তুমি!"

"হ্যাঁ, ফাতেহা না পড়লে আমার মনে শান্তি হবে না—"

"তোমার এসব মিথ্যে ভয়—"

"না, আমি যাবই—যত বড় [illegible] থাকনা তোমার, তবু খোদার বিচারে এ খুন—"

"তোমার জন্যই খুন করেছি বেগম—" দাঁতে দাঁত চেপে বললেন নবাব সাহেব, "দরকার পড়লে আরো খুন করব—"

"তবু খুন খুনই—তা ছাড়া লোকটা তো আমাদের কোন ক্ষতি করেনি নবাব সাহেব—"

"ক্ষতি করেনি!"

"কি ক্ষতি করেছে বল?"

"পাগলামি করে লোক হাসিয়েছে, তোমার আমার অপমান করেছে—"

"কিন্তু লোকেরা আবার ভুলে যেত। পাগলের কথা কে মনে রাখে? তা ছাড়া ক্ষতি লোকটারই হয়েছিল [illegible]

পাগল হয়ে গিয়েছিল। খোদাই তাকে শাস্তি দিয়েছিলেন—"

আকবর চট করে জবাব দিলেন না, শুধু বিন্দু বিন্দু ঘাম জমতে লাগল তার ললাটের ওপর, ক্রমে চোখের তারাতে একটা নিষ্প্রভ দীপ্তিও ধীরে ধীরে ছড়াতে লাগল, তারপর ফিস্‌ফিস্ করে তিনি বললেন, "সেদিন থেকে কিন্তু আমার মনে আর শান্তি নেই রোশানারা বেগম—"

"তাহলে চল ফাতেহা পড়ে আসি—তুমি শান্তি ফিরে পাবে।"

"শান্তি পাব? আচ্ছা তাহলে চল—"

বোতল থেকে আর একটু মদ ঢেলে এক চুমুকে শেষ করে আকবর আলি উঠে দাঁড়ালেন।

রোশানারা বললেন, "চলতে পারবে?"

"পারব—কিন্তু গোমতীর পুল তো একটু দূরে, চল একটা টাঙা নিই—"

"চল।"

বোরখা পরে নবাবের পিছু পিছু রোশানারা বাড়ি থেকে বেরোলেন।

বাইরের ঘরে আফিং-এর নেশায় বুঁদ রহমৎ খাঁ মৃদুকণ্ঠে চোখ না খুলেই বলল, "কে বাবা!"

নবাব ও বেগম একটিও কথা বললেন না। রহমৎ খাঁ আবার নেশার স্রোতে ভেসে চলল।

টাঙায় চড়ে তারা দুজনে চললেন। নিঃশব্দে।

তখন এগারোটা বেজে গেছে, রাস্তাতে লোক চলাচল কমে এসেছে। টাঙাটা শহর-সীমান্তের অধিকতর নির্জনতার দিকে এগিয়ে চলল। চাঁদের আলোয় সব ঝকঝক করছে। মাঝে একটা বাড়ি থেকে কাওয়ালীর সুর ভেসে এল। সেই অদৃশ্য গায়কের কথাগুলো ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজ ছাপিয়েও ভেসে এল কানে ঃ

'ইস্ ইশ্‌কনে রুসওয়া কিয়া—
ম্যঁয় কেয়া বতাউ কেয়া কিয়া
আহে দিল নাশাদনে অওর
আস্‌মাঁ পায়দা কিয়া।'

কথাগুলো শুনে নবাব আকবর আলি একবার বেগমের দিকে তাকালেন, দেখলেন রোশানারা অন্য দিকে তাকিয়ে আছেন।

পুলের কাছাকাছি আসতেই আকবর আলি বললেন, "রোকো—"

টাঙাটাকে বিদায় করে দিলেন তিনি, তারপর স্ত্রীকে বললেন, "চল—"

হাঁটতে হাঁটতে পুলের মুখে এলেন তারা, পুলের ওপর দিয়ে হাঁটতে লাগলেন। চন্দ্রালোকে অদ্ভুত দেখাচ্ছে চারদিক। গোমতীর জল চিকচিক করছে গলানো রুপো হয়ে, নিরবচ্ছিন্ন স্তিমিত স্রোতের একটানা মৃদু শব্দে আর ঝির-ঝিরে বাতাসে হঠাৎ নবাবের নেশা গাঢ় হয়ে উঠতে লাগল।

"বেগম, এমনভাবে আর কোনোদিন হাঁটিনি আমরা।" আকবর আলি বললেন।

"না—" রোশানারা জবাব দিলেন।

একটু টললেন আকবর আলি, তাঁর গলা আবেগে কেঁপে উঠল এবার, তিনি আবার বললেন, "খোদার পৃথিবী কত সুন্দর বেগম—"

"হুঁ—"

"কিন্তু মানুষের মন এত কুৎসিত কেন?"

"হুঁ—"

"বেগম—"

"উঁ?"

"কেউ নেই এই পুলের ওপর—বোরখাটা তুলে ফেল না—এই আশ্চর্য জ্যোৎস্নার মধ্যে একবার তোমার মুখটা দেখি—"

রোশানারা থামলেন, বোরখা তুললেন। নবাব আকবর আলির নিশ্বাস দ্রুত হয়ে উঠল। রোশানারাকে কি আজই তিনি জীবনে প্রথম দেখছেন?

"কি দেখছ?" রোশানারা বললেন।

"তোমাকে।"

"আমি তো শুধু রক্ত-মাংস।" রোশানারা হাসলেন।

"না বেগম—আজ মনে হচ্ছে শুধু তাই নয়।" আকবর আলির গলা কেঁপে উঠল।

পা বাড়িয়ে রোশানারা বললেন, "তাহলে হয়ত চাঁদের আলোর জন্য অমন মনে হচ্ছে নবাব। এগিয়ে চল—"

কিন্তু ক' পা এগিয়েই হঠাৎ থামলেন আকবর আলি, বললেন, "এখানেই।"

"কী এখানে?"

নবাব আকবর আলি চারদিকে একবার তাকালেন, একটু টাল সামলে নিয়ে সুর নামিয়ে বললেন, "এখানেই এসে দাঁড়িয়েছিল সে—"

"কে?" রোশানারা বেগমের কণ্ঠস্বরে কোন কৌতূহল নেই।

নবাব বিরক্ত হলেন, "সে—সেই পাগল—"

হঠাৎ যেন নড়ে উঠলেন রোশানারা, বললেন, "কিন্তু এখানে এসেছিল কি করে? কেন এসেছিল?"

পুলের দেয়ালের ওপর হেলান দিলেন আকবর আলি, বললেন, "আমিই আসতে বলেছিলাম তাকে, বলেছিলাম, যার হুকুমমত চিঠি লিখে লিখে তুমি পাগল হয়েছ, আবার তার কথা শুনবে, তাকে একবার দেখবে? সে আমার দিকে একবার অবাক হয়ে তাকিয়ে বলেছিল, হ্যাঁ, কথা শুনব, দেখব। আমি বলেছিলাম, তাকে দেখলে কি করবে তুমি? সে হেসে বলেছিল, শুধুই দেখব, দেখব আর তার কথা শুনব—"

রোশানারা স্থির হয়ে শুনতে লাগলেন, একটুও নড়লেন না।

আকবর আলি বলে চললেন, "আমি তখন তাকে বলেছিলাম, কিন্তু বাড়িতে তো দেখা হবে না—পাড়ার লোকে নিন্দে করবে। তার চেয়ে তুমি গোমতীর পুলে রাত এগারোটায় এসো, সেখানে তুমি নির্জনে বেগমসাহেবাকে প্রাণভরে দেখবে।
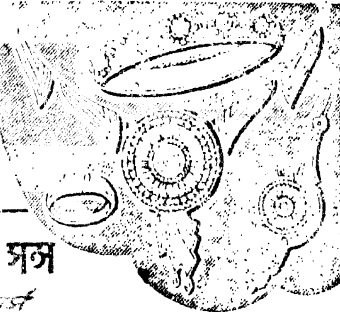
—শুনে সে বলেছিল, যাব, আমি এগারোটায় পুলে হাজির হব। ঠিক রাত এগারোটায় আমি এসে দেখলাম, সে দাঁড়িয়ে আছে—"

রোশানারা বললেন, "কোথায়?"

"ঐ যে—ওখানে—"

"তারপর?"

"তারপর আমি তাকে বললাম, বেগম এসেছেন, কিন্তু তুমি মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়িয়ে থাক, বেগমের লজ্জা হচ্ছে। আমি তোমাকে ঘুরতে বললে তবে ঘুরো। সে বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই করব। বলেই সে মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়াল, পুলের নীচেকার জলের দিকে তাকিয়ে রইল আর কি যেন বিড়-বিড় করে বলতে লাগল। আমি শব্দ করে এগিয়ে এলাম ওদিকে, তারপর জুতোটা খুলে পা টিপে টিপে ফিরে এসে ঠিক তার পেছনে গিয়ে দাঁড়ালাম। সে টের পেল না, একবার ফিরেও তাকাল না, গোমতীর জলের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে তখনও সে কি যেন ভাবছে। এদিক ওদিক তাকালাম, দেখলাম কেউ কোথাও নেই—হঠাৎ পেছন থেকে তাকে তুলে ধরে নীচের দিকে ঠেলে দিলাম—"

আকবর আলির কথা থামতেই আচমকা একটা দমকা হাওয়া যেন গোমতীর গর্ভ থেকে উঠে এল, চিলের ঝাপটের মত নবাবের চোখে ধুলোর কণা ফেলে, অচঞ্চল রোশানারা বেগমের বোরখা দুলিয়ে, পুলের ওপরে ইতস্তত ছড়ানো শালপাতা আর ছেঁড়া কাগজ উড়িয়ে নিয়ে হুহু করে বয়ে গেল আর বহু দূর থেকে কোনো নাম-না-জানা পাখির ডাক ভেসে এল। অনেকটা মানুষের গলার মত। যেন সোলেমান মিঞা প্রেতলোকের ওপার থেকে ডাক দিল, 'চিঠি লেখাতে হবে বেগমসাহেবা? চিঠি?' আকবর আলি কেঁপে উঠলেন আর দমকা হাওয়ার শনশন শব্দটা মিলিয়ে গেল। আবার স্তব্ধতা ফিরে এল, গোমতীর জলকল্লোলের শব্দ মৃদু বিলাপের মত একটানা শোনা যেতে লাগল আর চাঁদের ভৌতিক আলোর নীচে বাসনা কামনায় জটিল এই পৃথিবীটা আবার স্বপ্ন দেখতে লাগল।

রোশানারা বেগম বললেন, "কোথায় দাঁড়িয়েছিল সেই পাগলা নবাব সাহেব।"

আকবর আলি নিঃশব্দে আঙুলে তুলে দেখালেন। রোশানারা সেখানে গিয়ে দাঁড়ালেন, একবার ঝুঁকে জলের দিকে দেখলেন। জলের ওপর তরঙ্গভঙ্গে চাঁদের আলো ভাঙা আরসির অসংখ্য টুকরোর মত চমকাচ্ছে।

রোশানারা বললেন, "আমি এবার ফাতেহা পড়ছি। ততক্ষণ তুমি চোখ বুজে আল্লার নাম স্মরণ কর নবাব সাহেব—যেন তোমার পাপকে ক্ষমা করেন তিনি"।

আকবর আলি চোখ বুজলেন।

রোশানারা দুহাত বুকের সামনে অঞ্জলি করে ফাতেহা আবৃত্তি করতে লাগলেন। মৃদু, বিষণ্ণ অথচ ভারি মিষ্টি সেই সুর। হে খোদা, আমরা পাপের পঙ্কে আকণ্ঠ নিমজ্জিত, তুমি আমাদের ক্ষমা কর। হে করিম, হে রহিম, এজীবনে মৃতের যে তৃষ্ণা মিটল না, যে স্বপ্ন সার্থক হল না, তা এবার তুমি মিটিয়ে দিও, সার্থক করো। হে আল্লা, তোমার জয় হোক।

হঠাৎ কণ্ঠস্বর থেমে গেল। একটা খচমচ বেসুরো আওয়াজ। আকবর আলি চোখ খুলে মুহূর্তের জন্য দেখলেন যে, রোশানারা বেগম দেয়ালের ওপর থেকে জলের ওপর লাফ দিচ্ছেন। মুহূর্তমাত্র। সেই এক মুহূর্তে আকবর আলি পাথর হয়েই আবার নড়ে উঠলেন। সেই এক মুহূর্তেই আকবর আলি মৃত্যুকে নিবিড়ভাবে অনুভব করলেন। তিনি মুহূর্তের জন্য দেখলেন যে, দুহাত সামনে প্রসারিত করে এক উড়ন্ত পরী-কন্যার মত মুহূর্তমাত্র এক বিভ্রমের ছবি তৈরি করে রোশানারা বেগম ভারি পাথরের মত নীচে নেমে গেলেন। গোমতীর জলের ওপর ঝপাং শব্দে তাঁর দেহ পড়ল। মুহূর্তমাত্র। তার পরেই গোমতীর ঠাণ্ডা, গভীর, স্রোতসংকুল জলের মধ্যে বেগম সাহেবার ইহজীবন নিমজ্জিত হল। দেয়ালের ওপর ঝুঁকে পড়ে পাগলের মত আকবর আলি আর্ত চীৎকার করে উঠলেন—"রো-শা-না-রা-আ-আ-আ—"

গোমতীর বুক থেকে প্রতিধ্বনি ব্যঙ্গ করল, "রো-শা-না-রা-আ-আ-আ—"

তারপর স্তব্ধ হয়ে গেলেন আ... আলি। রোশানারার মৃত্যু ... রহস্যের সমাধান করে ... উদ্ঘাটিত করল। মৃত্যুর ... সেই সত্য।

সাদিক হোসেন থামলেন। ... বিন্দু ঘাম জমেছে তার কপালে ... থামতেই ঘরের মধ্যে নৈশব্দ ... বাইরে তখন ঝড়বৃষ্টি থেমেছে ... ঘড়িতে রাত একটা।

রণবীর সিং বলল, ... সাহেবের কি হল তারপর ...

সাদিক হোসেন ... নিজের গোঁফের ... মৃদু হেসে বললেন, ... গল্পটো তা নয় ... আমাদের বক্তব্য নয়—

আমি বললাম, ... বেগম? তুমি কি ...

সাদিক হোসেন ... ক্লান্ত, বিষণ্ণ ... ব্যাখ্যা করলে ... আলোক। হ্যাঁ, ... রোশানারা বেগম ... কণ্ঠস্বর শুনে প্রেমে ... জাফরাণী রঙের ... দুজনেই সেদিন ... বাঁশির সুরে পাগল হয়ে ... সোলেমান মিঞার ... পাওয়া গিয়েছিল, ... মনের কথা আর ... দাগের কবিতার ... বিশ্বাস করতেন হয়ত ... এমনি—

'অপুনে দিলকো তো ...

সবুনে জানা, জো ...

তোমার ঠিকানা আমার নিজের ... জানাই না, কারণ একজন ... সবাই জানতে পারবে"—

হঠাৎ বহুদূর থেকে ... হুইসলের শব্দ ভেসে এল। ... মনে হল যেন হতভাগ্য আক... আর্ত চীৎকার ভেসে এল ... আ-আ—'।

হুইসলের সেই তীক্ষ্ণ শব্দে ... সাদিক হোসেনের দিকে ... তাকালাম। হঠাৎ আমার ... নবাব সাদিক হোসেন আর ... আলি বোধ হয় একই লোক।

ঝাঁসীর রানী ০ মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য

॥ ১৪ ॥

ঊনবিংশ শতকের নবজাগরণ সমস্ত বাঙালীর জীবনে আশীর্বাদ আনেনি। তার ফলে উপকৃত হয়েছিল একমাত্র শিক্ষিত বাঙালী, নতুন মধ্যবিত্ত। সেদিনকার রাজধানী কলকাতা। তার বুকে সামন্ততন্ত্রের উচ্ছেদ ঘটেছে বহু পূর্বে। ইংরাজী শিক্ষায় লাভবান বাঙালী সেদিন সমগ্র ভারতবর্ষের থেকে এক ধাপ এগিয়ে ভাবছেন। তাঁদের যে জাতীয়তাবোধ ছিল, তা নিশ্চয় ইংরাজের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে তাঁদের উদ্বুদ্ধ করেনি। এই ইংরাজী-জানা বাঙালীরা অনেকেই কমিসারিয়েটের কেরানী হয়ে দূরে কানপুর, লাহোর, মীরাট সর্বত্র যেতেন। আজকের কেরানীকুলের তাঁরাই ছিলেন প্রথম পুরুষ। অ-বাঙালীরা তাঁদের 'বাবু' বলে অভিধান করতেন। ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ভারতীয় ইঞ্জিনীয়ার মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় সামরিক দফ্তরে কাজ করতেন এবং উল্লেখযোগ্য এই যে, ঝাঁসী আক্রমণের সময় তিনি হিউরোজের দলে ছিলেন। ভারতবর্ষের প্রথম স্বাধীনতা-সংগ্রামে শিক্ষিত বাঙালীর কোন সক্রিয় ভূমিকা নেই।

১৮৫৭ সালের অভ্যুত্থানের কারণ সম্পর্কে যতো কথা ইংরেজ ঐতিহাসিকরা বলে গেছেন, তার মধ্যে সবচেয়ে বাজে হয়ে গেছে চর্বিমাখা কার্তুজের কথা। চর্বিমাখা কার্তুজ কিন্তু সত্যিই একটি প্রত্যক্ষ কারণ।

আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, ভারতবর্ষের ক্রমবর্ধমান বিক্ষোভ সম্পর্কে ভারতবাসী ইংরেজেরা উদাসীন ছিলেন।

ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ১৮৫৭ সালের অভ্যুত্থান একটি পারম্পর্য-বিহীন একক ঘটনা নয়।

১৭৫৭ এবং ১৮৫৭ সালের মধ্যে পুরো ভারতে বার বার খণ্ড খণ্ড বিদ্রোহ হয়েছে কৃষিজীবী সাধারণ মানুষের মধ্যে। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় ১৮১৬ সালে সোরিলীর বিদ্রোহ, ১৮৩১-৩২ সালের কোল বিদ্রোহ, ছোটনাগপুর এবং পালামৌ অঞ্চলে বিভিন্ন আদিবাসী অভ্যুত্থান। পালামৌ-এর লাডেহার ও কৈন্তুর আশে-পাশে এখনো টুকরো টুকরো ছড়া ও গানের মধ্যে সেই অভ্যুত্থানের স্মৃতি বেঁচে আছে। ১৮৩১ সালে বারাসতে সৈয়দ আহ্‌মদ এবং তিতুমীরের নেতৃত্বে কেরানী বিদ্রোহ, ১৮৪৭ সালে ফরিদপুরে দিদুমীরের বিদ্রোহ, ১৮৪৯, ১৮৫১-৫২, ১৮৫৫ সালের মোপলা বিদ্রোহ, ১৮৫৫-৫৬ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহ স্মরণীয়। বাঙলার কৃষক বারবার অভ্যুত্থানে তাদের বিক্ষোভ জানিয়েছে। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে, পাবনার গ্রামে ১৯৩৭-৩৮ সালে অতিবৃদ্ধ মুসলমান চাষীদের দেখা মিলেছে, পাবনার কৃষক বিদ্রোহের বাল্য-স্মৃতির কথা যাদের কাছে শোনা যেত।

তারপরে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ১৮৫৭ সালের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য নাম ভারতীয় সিপাহীদের কথা। ১৮৫৮ সালের পর ইংরেজদের কাছে বিভিন্ন ভারতীয় সিপাহী জবানবন্দী দিয়েছেন। এমনই বর্বর নিষ্ঠুরতার সঙ্গে দমন করা হয়েছিল ১৮৫৭-৫৮ সালের অভ্যুত্থান। এমন মহাশ্মশান রচনা করেছিল ইংরেজ, ভারতবর্ষের ঘরে ঘরে যে, তার বর্ণনা-মাত্রেই অতিরঞ্জিত বোধ হবে। সেই দৃষ্টান্ত সামনে রেখে সত্য-ভাষণের সাহস যদি বাদী সিপাহীদের না মিলে থাকে, তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। তবু সত্য বলেছিলেন অনেকে। ইংরেজের প্রতি বিশ্বস্ত একজন ভারতীয় সিপাহীর বিবৃতিতে সিপাহী-দের বিক্ষোভের বহু কারণ স্পষ্ট হবে। বেঙ্গল আর্মি'র (Bengal Army) বিদ্রোহ সম্পর্কে, বেঙ্গল শিখ পুলিস

শনের সুবেদার ও সর্দার বাহাদুর সেখ দায়েং আলির বিবৃতি। উর্দুতে খিত. ক্যাপ্টেন টি র‍্যাট্রে (T. Rattray) তৃক অনূদিত।

"যতদূর মনে পড়ে সিপাহীরা টিশদের প্রতি প্রথম অসন্তোষ দেখিয়েল কাবুলে যাবার সময়। ১৮৩৮।৩৯ ল হবে। সিন্ধুনদ পার হয়ে আটক-এ পৌঁছে সিপাহীরা নিজেদের মধ্যে অক্ষোভ প্রদর্শন করতে লাগল। সুরজনারায়ণ দোবে বলতে লাগলঃ রাজা নসিংহ যখন সিন্ধু অতিক্রম করেছিলেন, বিষ্ণু মন্দিরে 'জনাও' রেখে গিয়েছিলেন। রাজ 'মান নহী' তো মান কৌন রাখেগা?'

আফগানিস্তানে সব মুসলমান। তাদের ছোঁয়া খাবার কিনে খেতে হত বলে হিন্দুরা বিক্ষুব্ধ হয়েছিল। সেখানে প্রবল শীতে ভেড়ার চামড়ার জামা 'পোস্তিন' পরতে হত। পশুর চামড়ায় কি হিন্দু, কি মুসলমান, সকলেরই ছিল ঘৃণা। প্রকাশ্যে প্রতিবাদ জানিয়েছিল তারা, কেননা, তাদের আশঙ্কা ছিল, এই অসন্তোষের কথা জানতে পারলে তাদের আফগানিস্তানে রেখে দিয়ে যাবে ইংরেজরা।

কাবুল থেকে যারা ফিরে এল, তাদের মধ্যে হিন্দুরা হল জাতিচ্যুত। মুসলমানরা আফগানে স্বধর্মীদের বিরুদ্ধে লড়ে। কোরানের নির্দেশ অমান্য করেছে বলে নিন্দিত হল।

ইংরেজ আমাদের সঙ্গে বেইমানী করেছে, এই কথা বলবার জন্য 27th Native Infantry-র মুসলমান সুবেদার মকবুল হায়দারকে গুলী করে মারা হল। 64th Native Infantry-র কিছু লোক সিন্ধু দেশে যাবার সময় বিদ্রোহ করে। ফলে ৩০ জনকে বরখাস্ত করা হয় এবং ১১ জনকে ফাঁসী দেওয়া হয়।

পাঞ্জাব গ্রহণের পর ডবল বাট্টার লোভ দেখিয়ে কিছু সৈন্য সেখানে রাখা হয়েছিল। উপরি বেতনের লোভে সেখানকার স্থায়ী সৈন্যদলে যারা নাম লেখাল, তাদের আর ডবল বাট্টা দেওয়া হল না। ফলে তারা বিক্ষুব্ধ হয়।

১৮৫০ সালে সাহারাণপুরে একটি সরকারী হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়, সেখানে জাতিধর্ম-নির্বিশেষে সকলকে চিকিৎসা করা হবে। ফলে জোর গুজব রটে গেল, হাসপাতালে গেলেই জাত যাবে, সরকার তাদের ক্রীতদাস বানাবে। এই গুজবের ফলে মানুষ এত ক্ষেপে গেল যে, সেই বিজ্ঞপ্তি প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয় কর্তৃপক্ষ।

সামান্য অপরাধে সিপাহীদের জেলে পাঠানো হত। জেলে খাওয়া-দাওয়ার কোন বিচার থাকত না বলে জেল-ফেরত সিপাহীরা প্রায়ই জাতিচ্যুত হত।

মিশনারী সাহেব-মেমরা গ্রামে গ্রামে ঘুরে আমাদের ধর্মকে নিন্দা করতেন। পুতুল পুজো কোর না, পৈতে ফেলে দাও, মেয়েদের পর্দা তুলে দাও, এই সব কথা শুনে আমাদের দুশ্চিন্তা হয়েছিল।

অযোধ্যার অন্তর্ভুক্তির পর, আমি র‍্যাট্রে সাহেবের সঙ্গে কানপুরে ছিলাম। বাজারে শুনলাম সবাই জটলা করে বলছে, এর ফলে সরকারকে গোলমালে পড়তে হবে।

১৮৫৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ফতোয়া বেরোল, কোম্পানীর কাজে যেখানেই পাঠানো হোক, যেতে হবে, এই চুক্তিতে সই করতে হবে সিপাহীদের। আফগানিস্তান ফেরত সিপাহীরা বিশ বছর বাদেও জাতে ওঠেনি। এই ফতোয়া পেয়ে সিপাহীরা বলতে লাগল, কোনদিন হুকুম আসবে লণ্ডন চলো, তাই যেতে হবে।

নতুন কার্তুজের কথাও বলি। এনফিল্ড রাইফেল পাল্লা দিত ৯০০ গজ। কিন্তু তার কাগজ দাঁতে কেটে ভরতে হত।

প্রোমোশনের অব্যবস্থা, অল্প মাইনে, ভাতার গোলমাল, এসব বরাবরই আছে।

এই সব কারণেই সিপাহীরা ক্ষেপে গিয়েছিল।"

এই জবানবন্দীর কারণগুলি নিশ্চয়ই সব নয়। সিপাহীরা এসেছিল কৃষকশ্রেণী থেকে। জমিহীন কৃষকশ্রেণী, ঋণ এব করভারে জর্জরিত হয়ে নগদ টাকার লোভে সিপাহী দলে নাম লেখায়। সেখানে তার বিন্দুমাত্র সুবিচার পায়নি। ১৮১৬ সা থেকে বারবার সিপাহীদের সশস অভ্যুত্থান ঘটেছে। সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলন ন বলে সহজেই দমন করা গেছে সেই স বিক্ষোভ।

রাজ্যবিচ্যুত, বৃত্তিবঞ্চিত, দেশী রাজন্যবর্গের অসন্তোষ ছিল, গদীচ্যু রাজা ও জমিদারদের বেকার কর্মচার আমলা, সিপাহীদের অসন্তোষ ছি কৃষকদের অভিযোগ ছিল। মূলত কৃ জীবী শ্রেণীর সিপাহীরা চোট খেয়েছি দুদিক থেকেই। কি চাষী, কি সিপাহ তারা দুই জীবনের কোথাও সে সুবিচ পায়নি।

সবগুলি কারণ ঘটিয়ে এব অবশ্যম্ভাবী পরিণতির পথে নি চলেছিল ইংরেজের অদূরদর্শী নীতি। ভারতবর্ষে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পান

ভারতবর্ষের রাজত্বের ফলাফল সম্পর্কে বিলেতে সুধী ইংরেজরাও ভাবছিলেন। ১৮৫৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে পার্লামেণ্টে ক্ল্যারিন কেয়ার্ড (Marquis of Clarin Carde) ভারত শাসনে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শোচনীয় ব্যর্থতা সম্পর্কে আলোচনা তোলেন। তিনি বলেছিলেন, গত একশ' বছর ধরে অযোগ্য শাসন-ব্যবস্থার ফলে ভারত শাসন একটি শোচনীয় প্রহসনে পরিণত হয়েছে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কোর্ট অব ডিরেক্টার্সের নির্বাচন একটি গুরুতর প্রহসন। কোম্পানীর স্টক যাঁদের আছে, তাঁরাই হচ্ছেন ভোটাধিকারী। ইংল্যাণ্ড ও ইয়োরোপের তাঁরা হচ্ছেন স্থায়ী বাসিন্দা। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁদের সামান্যতম অভিজ্ঞতা বা সহানুভূতি নেই। একান্ত অযোগ্য এই সব নির্বাচনকারীরা এমন সব লোককে নির্বাচন করেছেন, যাঁদের স্বার্থ শুধু কোম্পানীর মুনাফার সংগে জড়িত। এর ফলে ভারতের অবস্থার এতটুকু উন্নতি হয়নি। তিনি জোর দিয়ে বলেন—"উন্নত হয়নি, inspite of the much publicised Railways, Postoffices, schools and hospitals."

স্বদেশে ভারতবাসীদের সব রকম শাসনাধিকার থেকে এমন লজ্জাকরভাবে বঞ্চিত করা হয়েছে, যার তুলনা অন্য দেশে বিরল। ভারতবর্ষকে শোষণ করে বিলেতে অফিস রাখা হয়েছে বার্ষিক এক লক্ষ আশী হাজার পাউণ্ড খরচ করে। যার কোন প্রয়োজন নেই। ভারতবর্ষে যে ইংরেজ কর্মচারী বছরে ১০০০ পাউণ্ড মাইনে পেয়েছেন, তিনি ২০,০০০ পাউণ্ড করে রোজগার করেছেন, অথচ এই জন্য কখনো কোন জবাবদিহি করতে হয়নি তাঁকে।

যে মহারানীর রাজত্বে সূর্য অস্ত যায় না, তাঁরই রাজত্বে ভারতবর্ষের ১৪,০০,০০,০০০ মানুষের জীবন ও সম্পত্তি একান্ত বিপন্ন। সুপ্রীম কোর্ট ছাড়া ইংরেজের বিচার হয় না বলে কলকাতা থেকে ১৫০০ মাইল দূরে পাঞ্জাবে যদি কোন ভারতীয়কে হত্যা করে ইংরেজ, তার বিচার কোনদিনই সম্ভব হয় না। দরিদ্র ভারতীয়রা সুবিচার পাবে না বলে নিশ্চিত জেনেছে। ইংরেজরা যতো অপরাধই করুক না কেন, আইন তাদের আশ্রয় দেবেই।

চাকরীতে সিভিল সার্ভিসে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় পাশ করে যে কোন ব্যক্তি ঢুকতে পারেন বলে কুড়ি-একুশ বছরের অনভিজ্ঞ ইংরেজ যুবকদের হাতে শাসনভার ছেড়ে দিয়ে দায়িত্বহীনের কাজ করা হয়েছে। ভারত ও ভারতবাসী সম্পর্কে সাধারণ ইংরেজদের অসীম অশ্রদ্ধা। এ-ও আশ্চর্য এবং শোচনীয় যে, ভারতের চোদ্দ কোটি মানুষের মধ্যে দায়িত্বপূর্ণ কাজ-কারবারে যোগ্য একজনকেও পাওয়া যায়নি। ইংরেজরা আসলে বিশ্বাস করেন না ভারতীয়দের। এই বৈষম্য নীতির ফলে তীব্র বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে ভারতীয়দের মধ্যে। সেনা-বিভাগের অবিচার আরও প্রকট। যোগ্যতম ভারতীয় অফিসারও সুবেদার পদের উপর উঠতে পারেন না। বলা হয় বটে সুবেদার পদটি ইংরেজ ক্যাপ্টেনের সমান, কিন্তু ইংরেজ ক্যাপ্টেন ভারতীয় সুবেদারের দ্বিগুণ বেতন এবং অন্য সুবিধা পান। উচ্চপদস্থ ভারতীয় কর্মচারীরাই যখন এই

বিচারের ভুক্তভোগী, তখন সাধারণ সিপাহীদের কথা বলাই বাহুল্য।

ওয়েলিংটন, এলফিনস্টোন, মেটকাফ এবং বেণ্টিংক প্রমুখ ইংরেজরা ভারতীয়দের দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করার কথা বার বার বলে গেছেন; কিন্তু সেরকম কোন ঘটনা ঘটলে সমস্ত এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান প্রেস এবং ইংরেজ কর্মচারীরা সশস্ত্র বিদ্রোহ করতেন। একবার কোনো প্রদেশের গভর্নর কোন ভারতীয়কে সেক্রেটারী করতে চেয়েছিলেন বলে সিভিল সার্ভিসের সমস্ত কর্মচারীরা একসঙ্গে পদত্যাগ-পত্র দিয়েছিলেন। ফলে প্রস্তাবটি প্রত্যাহৃত হয়।

সেদিন প্রবল প্রতিপক্ষ জোর প্রতিবাদে ম্যারিন কেয়ার্ডের এই বিবৃতিকে খণ্ডন করেন। ভারত সম্বন্ধে ভাববার কিছু নেই, ভারত সম্পর্কে তাঁদের আচরণ ঠিক।

এদিকে সমগ্র ভারতে তখন এক প্রস্তুতি। সাধু সন্ন্যাসী ফকিররা সর্বদা আনাগোনা করছে শহর থেকে শহরে, গ্রাম থেকে গ্রামে। পায়েহাঁটা এই দেশের পথে পথে ছিল লুঠেরা ডাকাত। জীব-জন্তুর ভয়। বিত্তবানের বিপদ পদে পদে। বিত্তহীন সাধু-সন্ন্যাসীরা দণ্ডহাতে ভ্রমণ করে গ্রামে, বাজারে, হাটে সংবাদ দিতেন। ১৭৫৭ সালের পর পুরো একশো বছর কেটে গেছে। এবার ব্রিটিশরাজের পতন অনিবার্য। বাজারে-হাটে, সাধু-সন্ন্যাসীদের ঘিরে গাঁয়ের মানুষ কথা বলছে, এ-দৃশ্য দেখে এতটুকু বিস্মিত হবার কারণ ছিল না সরকারী কর্মচারীদের।

রুটি আর কমলের সঙ্কেতের কথা আজ সর্বজনবিদিত। বিশ্বাস করবার

কারণ আছে, এই রুটি ও কমল ছিল ফৌজী দলের সঙ্কেত চিহ্ন।

সঙ্কেত। কিন্তু কার সঙ্কেত? কাদের পরিকল্পনাকে কার্যকরী করবার সঙ্কেত? কাদের বার্তা কার কাছে নিরন্তর নিয়ে চলেছিল সেই সঙ্কেত? তবে কি আসন্ন যুদ্ধের কোন চক্রান্ত ছিল?

এই বিদ্রোহের নেতা হিসাবে অযোধ্যার গদীচ্যুত নবাব ওয়াজিদ আলি শাহের পরামর্শদাতা আহ্মদ উল্লাহ্, নানাসাহেব, তাঁতিয়া টোপী, আজিম উল্লা, ঝাঁসীর রানী, ফিরোজশাহ্, কুনওয়ার সিং নামই প্রধান। এমন কথা বলা হয়েছে, ঝাঁসীর রানী এঁদের সহযোগিতায় বিদ্রোহের বার্তা প্রচার করতেন দূতের মাধ্যমে। পরিকল্পনায় তাঁর অংশ ছিল।

এই কথা মনে করবার কোন কারণ আমি খুঁজে পাইনি। পরবর্তী ঘটনায় দেখা যাবে, বিদ্রোহে রানীর অংশ গ্রহণে স্বাধীনতা সমরের উন্মাদনা রাজনীতিক কূটবুদ্ধি দ্বারা চালিত হয়েছিল। তাঁতিয়া টোপীর সঙ্গে যোগদানে তিনি গোয়ালিয়রে যে লড়াই করেন, ১৮৫৭ সালের যুদ্ধের তাই হচ্ছে উপসংহার। মৃত্যু-পূর্বের জবানবন্দীতে তাঁতিয়া টোপী রানীর সঙ্গে পূর্ব মন্ত্রণা বা পরিকল্পনার কথা বলেন নি। তখন রানী নিহত। যুদ্ধের অন্তিম স্ফুলিঙ্গ নির্বাপিত। কাজেই কাউকে বাঁচাবার উদ্দেশ্যে তিনি সে কথা বলেন নি বলেই মনে হয়।

কাল্পীর যুদ্ধের পর হিউরোজ যে সরকারী বিবরণ দিয়েছিলেন, তাতে লিখেছিলেন, 'যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত হয়ে ভারতীয়রা পালিয়ে যাবার পর একটি মূল্যবান চামড়ার পেটিকায় রানীর ব্যক্তিগত কাগজপত্র পাওয়া গেছে। এই চিঠিপত্র থেকে বিদ্রোহের চক্রান্তকারীদের সম্বন্ধে অনেক জানা যায়।'

এই কাগজপত্রের কোন হদিশ তারপরে মেলেনি। সরকারী দফ্তর থেকে প্রকাশিত সাময়িক কাগজপত্রে তার কোন নিশানা নেই। India Office Library-তে কোথাও তার নিশানা মিলতে পারে। এই কাগজপত্র পাওয়া গেলে ১৮৫৭ সাল সম্পর্কে মূল্যবান খবরাখবর মেলা অসম্ভব নয়।

তার মানে এই নয় যে, বিদ্রোহের কোন চক্রান্ত ছিল না। মনে হয়, পরিকল্পনা ছিল সিপাহীদের মধ্যে। পূর্বে বহু অভ্যুত্থান তাদের বিফল হয়েছে, এইবার সাধারণ মানুষের সঙ্গে ভাগ্য জড়িয়ে একটি বিশাল অভ্যুত্থান তারা গড়েছিল—রুটি আর কমল তারই সঙ্কেত। হয়তো স্ব স্ব স্থানে নেতারা সিপাহীদের সঙ্গে যোগদান করেছিলেন, কিন্তু তাঁরা সত্যিকারের নেতৃত্ব দিতে পারেন নি। যুদ্ধের সময়ে দেখা গেছে, সিপাহীরা যেখানে ব্যর্থ হয়েছে, সেখানেই নেতাদের মধ্যে দুর্বলতা ছিল। দুর্বল নেতৃত্ব এবং পারস্পরিক সমঝোতার অভাবই বিদ্রোহের বিফলতার জন্য দায়ী। এখানে নেতৃবর্গ বলতে রানীকে ধরা হয়নি।

সর্বশেষে আসছে প্রত্যক্ষ কারণ এনফিল্ড রাইফেল (টোটার প্রচলন)। ১৮৫৭ সালে এই নতুন রাইফেল চালু হয়। এর পাল্লা ছিল ৯০০ গজ। নল এবং হাতলের মধ্যে একটি ছোট খাপ ছিল। তাতে দাঁতে কেটে ভরতে হত টোটা। চর্বিমাখান কাগজে মোড়ান [illegible] টোটা। এই টোটা ব্যবহারের [illegible] সঙ্গে যে প্রতিবাদের ঝড় উঠল, তাতে ক্যানিং হুকুম দিলেন, এই টোটা ব্যবহার বন্ধ করতে। কিন্তু তখন ঘটনা ঘটে চলেছে দুরারোধ্য গতিতে। এক একটি ঘটনা ঘটছে আর রচিত হচ্ছে ইতিহাস।

২৬শে ফেব্রুয়ারী বহরমপুরে ঊনবিংশ রেজিমেণ্ট বিদ্রোহ করল সত্য, কিন্তু ব্যারাকপুরের ২৯শে মার্চের ঘটনা হল দাবানলের প্রথম অগ্নিসঞ্চার। মঙ্গল পাণ্ডে সার্জেণ্ট মেজর হিউসনকে গুলী করলেন। বললেন—'ভাই সব, ধর্মরক্ষার জন্য, জাতি রক্ষার জন্য রুখে দাঁড়াও।'

আতঙ্কিত হিউসন জমাদার ঈশ্বর পাণ্ডেকে বার বার অনুরোধ করলেন সাহায্য করতে। জমাদার এক-পাও অগ্রসর হলেন না। উপরন্তু বললেন—

যে মঙ্গল পাণ্ডেকে ধরবে, গুলী করে তার মাথা উড়িয়ে দেব।'

সমস্ত রেজিমেণ্ট দাঁড়িয়ে রইল চিত্রার্পিত মানুষের মতই সেই আদেশ মাথায় পেতে নিয়ে।

শুরু হয়ে গেল ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা-সংগ্রাম। দুই বছর ধরে কেঁপে গেল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বনিয়াদ।

(ক্রমশ)

লাফো-যাত্রা

মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়
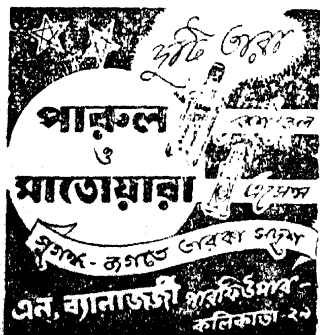
॥ ২ ॥

বিকেলের দিকে কোপেনহাগেনে এসে পৌঁছলুম। মিরেক কয়েক ঘণ্টা আগে সেখানে এসে পৌঁচেছে। স্টেশনের পোস্ট আপিসের ঠিকানায় মিরেকের নামে চিঠি দিয়েছিলুম, কোন ট্রেনে আমি পৌঁছচ্ছি সেই খবর দিয়ে। মিরেক সেই চিঠি পেয়ে স্টেশনেই থেকে গিয়েছিল। মিরেকও আমার নামে চিঠি দিয়েছিল তার আসার ট্রেনের সময় জানিয়ে দিতে। আমি যদি আগে পৌঁছতুম তাহলে আমিই মিরেকের জন্যে স্টেশনে অপেক্ষা করতুম। দূরদেশে অচেনা শহরে পরস্পরকে খুঁজে বার করবার এই হচ্ছে সহজ ব্যবস্থা। ট্রেনের চলন্ত কামরা থেকে প্লাটফর্মে পিঠঝুলি পিঠে মিরেকের মূর্তি দেখে আমার পা-জোড়া আনন্দে লাফিয়ে উঠল। মনে হল, এখনই শুরু হয়ে যাক আমাদের চলা। আমার পিঠঝুলিটা কাঁধে তুলে ট্রেন থেকে নেমে পড়লুম। অনেক দিন বাদে মিরেককে দেখে খুব আনন্দ হল। বল্লুম যাত্রার প্ল্যান কিছু ঠিক করেছ মিরেক?

মিরেক বল্লে—না, কিছু ঠিক করিনি। ভেবেছিলুম, দুজনে একসঙ্গে বসে পরামর্শ করা যাবে।

আমি বল্লুম—লণ্ডন থেকে বেরোবার ঠিক আগে মধ্য নরওয়ের পাহাড়ের পাহাড়-শ্রেণী য়োটুনহাইম্-এর কথা শুনে এসেছি। আর শুনেছি সুইডেনের গোঅটা খালের কথা। এই দুই জায়গায়ই আমার যাবার ইচ্ছে। তুমি কি বল?

মিরক বল্লে—বেশ, আপাতত তাই ঠিক রইল।

আমরা উভয়েই আন্তর্জাতিক য়ুথ হস্টেল সমিতির সভ্য, কাজেই কোপেন-হাগেনের য়ুথ হস্টেলে থাকার ব্যবস্থা করে নিলুম। ভ্রাম্যমান ছাত্রদের পক্ষে এর চেয়ে সুবিধের রাত্রিবাসের বন্দোবস্ত ইয়োরোপের কোথাও নেই। যেমন সস্তা, তেমনি আবার প্রাণবন্ত সুস্থ সতেজ যাত্রীতে ভরা এই সব হস্টেল। নানাদিক থেকে নানারকম চরণিক আর সাই-ক্লিস্টের মিলন হয় এখানে। পরের দিনের ভ্রমণের খুঁটি নাটি জ্ঞাতব্য বিষয় প্রত্যেকে প্রত্যেককে জিজ্ঞেস করে জেনে নেয়। খাবার ঘরের টেবিলে টেবিলে ম্যাপ বিছিয়ে ছোট ছোট দল যাত্রাপথের আলোচনায় মগ্ন থাকে। ভ্রমণের গল্প প্রায় সকলেই করে; ঐতিহাসিক বা ভৌগোলিক আলোচনাও প্রচুর হয়। না হলে গান বা গল্প। মোটের উপর মুখ বুজে কেউ বসে থাকে না। সাধারণ হোটেলের সঙ্গে য়ুথ হস্টেলের এই তফাৎ। তবে য়ুথ হস্টেলে প্রতিদিন বিকেল থেকে সন্ধ্যার মধ্যে যেমন মুসাফিরের সঙ্গে মুসাফিরের আলাপ, সম্ভাব, মনের মিল অতি দ্রুত জমে ওঠে; মনে হয় যেন একই পরিবারের বহুদিনের পরিচিত আত্মীয়েরা অভূতপূর্ব উপায়ে এক আস্তানায় এসে মিলেছে, ঠিক তেমনি দ্রুত সকাল বেলায়ই জমা হাট কিসের স্পর্শে যেন ভেঙে যায়। ভোর থেকেই হুড়োহুড়ি লেগে যায়। সকলেই পালাবার জন্যে যেন ব্যস্ত। অত সাধের আস্তানা, অমন জমাট আড্ডা, অত মন খুলে দেওয়া, অত প্রাণভরা সখ্য এ সবই যেন লোকে ভুলতে আরম্ভ করে। সকালের আলো ফোটবার সঙ্গে সঙ্গে সবই যেন আস্তে আস্তে মন থেকে মুছে যায়। তখন দিকে বিদিকে বেরিয়ে পড়বার নেশায় সবাই পাগল—শুধু নিজের দলের সঙ্গী ছাড়া আর কারো দিকে তাকাবার কারো সময় নেই। খাবার ঘরে বা ঝরণার ধারে মুখ ধোবার সময় দেখা হলো তো বিদায় সম্ভাষণ হলো, তা নইলে গত রাতের বন্ধুর সঙ্গে দেখা না করেই যে যার যাত্রা পথে বেরিয়ে পড়ে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে য়ুথ হস্টেল খালি হয়ে যায়। ম্যানেজার মশাই শূন্য বাড়ির মধ্যে একা পড়ে থাকেন, যতক্ষণ না পর্যন্ত বিকেলের দিকে একটি দুটি করে যাত্রী আবার এসে জুটতে থাকে।

আমরা সেদিন সন্ধ্যায় য়ুথ হস্টেলের কামরায় আলোচনা প্রসঙ্গে শুনলুম কোপেনহাগেন থেকে কয়েক মাইল উত্তরে ডেনমার্কের প্রাচীন যুগের রাজপুত্র হ্যামলেটের ঐতিহাসিক রাজপ্রাসাদ আছে।

রক বা আমি শেক্সপীয়ার পড়বার পর উই মনে করে রাখিনি হ্যামলেটের স্থান ল ডেনমার্ক। তা ছাড়া হ্যামলেট যে ন্দ্ গল্পের রাজপুত্র নন ঐ নামে যে ত্যকারের একজন যুবরাজ ছিলেন নিয়েও আমাদের কোনো মাথা ব্যথা ল না। এবারে সেই হ্যামলেটের জলন্ত রাজপ্রাসাদের কথা শোনামাত্র রেক আর আমি আমাদের পরদিনের াগ্রাম ঠিক করে ফেললুম। সকালে ঠেই ট্রেনে করে হ্যামলেটের প্রাসাদ খতে যাবো। তারপর সেখান থেকে টিন দেব ডেনমার্কের উত্তর উপকূল র্যন্ত। হাঁটতে প্রায় সারা দুপুর লাগবে সেখানে সমুদ্রতীরে হর্নবেক নামক য়গায় একটি যুথ হস্টেল আছে।

পরদিন ভোরে উঠেই পিঠঝুলি নিয়ে রিয়ে পড়লুম আমরা। হ্যামলেটের াসাদ দেখতে দেখতে মনে মনে অনেক চষ্টা করলুম সেই সেক্সপীয়রের যুগে ফরে যাবার; হ্যামলেটের নিহত পিতার প্রতাত্মার উপস্থিতি কল্পনা করবার চষ্টা করলুম, কিন্তু সুর খুঁজে পেলুম া। প্রাসাদের দোষ নেই, আসলে ামাদের রক্তে তখন চরৈবেতির ছন্দ এসে প্রবেশ করেছে। ডেনমার্কের উদার প্রান্তরে তখন রোদ আর উষ্ণ বাতাসের খেলা, াছের ঝিরঝিরে পাতা তখন ঘন সবুজ য়ে এসেছে। তখন কি আর পাথরের ্সের প্রাসাদ আর স্থাপত্য মনকে টানতে পারে, যতই কেন বড় কবি আর নাট্যকার হোন না শেক্সপীয়ার।

প্রাসাদ থেকে বার হয়ে একটা সরাই খানায় কিছু খেয়ে বেরিয়ে পড়লুম সোজা উত্তরমুখো। পীচ ঢালা সমান রাস্তা মাঝে মাঝে মোটর গাড়ি চলেছে—চরণিকদের হাঁটবার উপযুক্ত মোটেই নয়। তাহলেও আমরা চলেছি। ম্যাপে দেখছি ডেনমার্কের সবটাই সমভূমি, পাহাড় বলে কোথাও কিছু নেই। এখানে সাইকেল নিয়ে ঘোরার খুব সুবিধে কিন্তু হেঁটে মজা নেই। প্রায় এক ঘণ্টা হেঁটেছি। বহুদিন পরে পিঠঝুলি নিয়ে রাস্তায় নেমেছি, এতেই মশগুল, কিন্তু বাঁধানো রাস্তায় হাঁটার মধ্যে বিশেষ রস পাচ্ছি না। আশপাশের দৃশ্য, মাঠের সুগোল ঢালু জমির পিছনে ডেনিশ কুটিরের শ্রেণী, কখনো মাঠ আর ঝলমলে তরু গুচ্ছ, সব নিয়ে ভারি সুন্দর একটা ঘরোয়ানা ভাবের সৃষ্টি করেছে। মনে হচ্ছে যেন কোনো সাজানো পার্কের মধ্যে দিয়ে বেড়াতে বেড়াতে চলেছি। এ হাঁটায় মধুরতা আছে কিন্তু মাদকতা নেই, স্নিগ্ধতা আছে কিন্তু ফূর্তি নেই।

মিরেককে সবেমাত্র বলেছি—মিরেক, ডেনমার্ক ছেড়ে সুইডেনের দিকে কবে আমরা পা বাড়াবো? এমন সময় আমাদের বাঁ পাশে ভোঁ করে একটা ভেঁপুর শব্দ শুনলুম। দেখি একটা ছোট্ট সবুজ মোটর গাড়ি এসে পাশে দাঁড়িয়েছে। আমরা চমকে গিয়েছিলুম। তাকিয়ে দেখি, একজন মহিলা, সঙ্গে একটি ছোট্ট ছেলে, মোটর থামিয়ে আমাদের সঙ্গে কথা বলার জন্যে প্রস্তুত। আমরা এগিয়ে যেতেই ইংরেজীতে বল্লেন—আপনারা ছাত্র?

আমরা বল্লুম—বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র।

—বেশ তো তবে আমার গাড়িতে উঠুন না, আপনাদের দিকেই তো আমি যাচ্ছি! কতদূর যাবেন?

—আমরা তো হাঁটব ভেবেছিলুম হর্নবেক পর্যন্ত।

মহিলা বল্লেন—ওঃ সে অনেক দূর। অতদূর আমি যাবো না যদিও, তাহলেও কিছুটা আপনাদের এগিয়ে দিতে পারি।

গাড়ির দরজা খোলা পেয়ে আমরা তৎক্ষণে ভিতরে গিয়ে পিঠঝুলিটা কোলে নিয়ে গুছিয়ে বসেছি। এ অভিজ্ঞতা আমাদের আগে কখনো হয়নি। ইংলণ্ডে থাকতে হিচ্-হাইকিংয়ের গল্প কিছু কিছু শুনেছিলুম বটে কিন্তু কি করে যে সেটা করতে হয় তার কায়দা কানুন কিছুই আমাদের জানা ছিল না। কোনোদিন জানবার চেষ্টাও করিনি।

ভদ্রমহিলা বলে চলেন এ দেশে বিদেশী ছাত্রদের গাড়ি করে পৌঁছে দিতে আমরা খুব ভালবাসি।

আমার ভারি আশ্চর্য লাগল। বল্লুম—কেন আপনাদের ভাল লাগে?

মহিলা বল্লেন—তা বলতে পারি না। কিন্তু ডেনমার্কে তরুণ জীবনকে, খোলা হাওয়াকে, সজীব প্রকৃতিকে সবাই ভালবাসে। ছাত্রেরা যখন পিঠঝুলি ঘাড়ে নিয়ে বহিঃপ্রকৃতির মধ্যে নেমে এসে প্রকৃতির আনন্দের স্রোতে নিজেদের ভাসিয়ে দেয়, তখন সে স্রোত আমাদেরও মনে এসে লাগে বৈ কি! তাই বোধহয় আমরা গাড়ি থামিয়ে তাদের তুলে নিই। অবশ্য সকলেই যে আপনাদের তুলে নেবে তা নয়। অনেকেই হয় তো ব্যস্ত হয়ে কাজের তাড়ায় ছুটেছে, তাদের কোনো দিকে দেখবার অবসর নেই। কিন্তু ডেনমার্কের রাস্তায় দাঁড়িয়ে আপনি যদি হাত দেখান, দেখবেন বেশীর ভাগ চালকই থেমে গিয়ে তাদের গাড়িতে আপনাদের জায়গা দেবে। বিশেষ করে, দেখলেই যখন বোঝা যায় আপনারা ছাত্র।

এইভাবে গল্প করতে করতে বেশ কয়েক মাইল এগিয়ে মহিলা একটি মোড়ের মাথায় আমাদের নামিয়ে দিয়ে চলে গেলেন। যাবার সময় বলে গেলেন—ডেনমার্ক ভাল করে দেখুন। কষ্ট করে হাঁটবেন কেন? এক এক লাফে দশ মাইল বিশ মাইল করে যান, কোনো কষ্ট নেই। দেশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত এমনি লাফা-যাত্রা করেই যেতে পারবেন। বিদেশী ছাত্রেরা অনেকেই এইভাবে এদেশ দেখে।

আমাদের নিজেদের উপর কেমন একটা শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। তাই তো, আমরা তাহলে ছাত্র? আমাদেরও খাতির আছে—লোকে গাড়ি দাঁড় করিয়ে আমাদের রাস্তা থেকে তুলে নেয়! নাঃ, ডেনমার্ক একটা দেশ বটে! যেখানে ছাত্রদের এত খাতির তার মতো দেশ আর হয় না।

মিরেককে বল্লুম—মিরেক, দাঁড়াও আরেকটা ডেনিশ গাড়ি আমি তাহলে দাঁড় করাই।

মিরেক বল্লে—দাঁড় করাতে হবে কেন? আমাদের দেখে ছাত্র বলে চিনতে পারলে আপনিই তো গাড়ি দাঁড়িয়ে যাবে।

মিরেকের রসিকতায় আমি হেসে বল্লুম—বেশ, যদি প্রথমটা না থামে, দ্বিতীয়টার বেলা আমি কিন্তু হাত তুলবো।

এই বলে আবার আমরা হাঁটতে শুরু করে দিলুম। অল্পক্ষণ পরেই একটা মোটর গাড়ি এসে পড়ল, কিন্তু আমাদের ছাত্র বলে চিনতে পারলে না, অর্থাৎ থামলো না। দ্বিতীয় গাড়িটাও প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এসে পড়ল আমি মরিয়া হয়ে হাত তুল্লুম। গাড়িটা যখন হুস্ করে বেরিয়ে চলে গেল, দেখলুম বাইরের ভিতরের সমস্ত জায়গাগুলিই ভর্তি। চালকের মুখে বেশ দেখতে পেলুম একটু হাসি লেগে রয়েছে। এ হাসির যে কি অর্থ আমরা বুঝতে পারলুম না। হয়তো কোনো অর্থই নেই। তবু মনে হতে লাগল, বোধহয় ঠাট্টা করে গেল। এইবার যখন একটা গাড়িকে এগিয়ে আসতে দেখলুম তখন হঠাৎ যেন নিজেকে খাটো মনে হতে লাগল। হাত তুলবো কি তুলবো না মনস্থির করে উঠতে পারলুম না। গাড়িটা কাছে এসে পড়ল। ভাবছি, হয়তো এ গাড়িটাও ভর্তি, হাত তুলে লাভ কি? এর চালকও হয়তো একটু হেসে চলে যাবে। উঃ ঐ হাসিটাই যত সর্বনাশের মূল। বেশ নিজেদের উপর একটা শ্রদ্ধা একটা আত্মবিশ্বাস গড়ে উঠেছিল, ঐ এক হাসির ধাক্কায় সব ধূলিসাৎ হয়ে গেল। এ গাড়িটায় দেখলুম পিছনের জায়গাটা খালিই আছে—কিন্তু হাত আর আমার উঠল না—কেমন মনমরা হয়ে চলতে লাগলুম।

মিরেক বল্লে—কি হল তোমার?

আমি বল্লুম আমরা হাঁটতেই তো বেরিয়েছি। গাড়ি থামিয়ে পরদেশে ভ্রমণ করে কি হবে? এসো হাঁটা যাক—সন্ধ্যের আগেই ওর্দেকে পৌঁছে যাবো।

দুজনে মিলে মুখ গুঁজে হাঁটতে লাগলুম। গাড়ির পর গাড়ি চলে যেতে লাগল—কোনো দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই।

কিন্তু একটুক্ষণ পরেই মনে হল—এ কি? এ যে হার স্বীকার করা হয়ে গেল। ঐ একটা গাড়ির একজন চালক গাড়ি না থামিয়ে হেসে চলে গেল, এতেই আমরা মুষড়ে পড়লুম? এমনটা কিছুতেই হতে দেওয়া হবে না—গাড়ি একটা থামাতেই হবে। মিরেককে বল্লুম—মিরেক, চালাক তো আমরা হয়েইছি। কিন্তু লাফা-যাত্রী হতে গিয়ে হটে যাবো এ সহ্য হয় না। এসো দুজনে মিলে এবার চেষ্টা করা যাক, গাড়ি থামাতে পারি কিনা দেখি।

মিরেক রাজি হল। একটা আগন্তুক গাড়ি দেখে দুজনে মিলে একসঙ্গে হাত তুল্লুম, কিন্তু কোনো ফল হল না।

মিরেক বল্লে—শুধু হাত তুল্লে হবে না, ঐ সঙ্গে একটু হাসিমুখ দেখাতে হবে, তবে না গাড়ি থামবে!

এবারকার গাড়িটা এগিয়ে আসতেই দুজনে যথাসম্ভব হাসিমুখে হাত তুলে দাঁড়ালুম। কিন্তু এবারেও নিস্ফল।

মনে মনে দমে গেলেও মুখে সে ভাব কিছুতেই প্রকাশ করতে দেওয়া হবে না। তাই গাড়িওয়ালাদের নিয়ে নিজেদের মধ্যে ঠাট্টা শুরু করলুম। ঠাট্টার বস্তু হচ্ছে এমন দুজন উপযুক্ত ছাত্রকে আজকের দিনটায় ডেনিশরা কেন চিনতে পারছে না?

এইভাবে চলেছিলুম। পাঁচ পাঁচটা মোটর আমাদের উদ্যত বাহুকে উপেক্ষা করে চলে গেল, তাদের গতি পর্যন্ত একটুও কমালো না।

আমি মিরেককে সবে মাত্র বলেছি—দেখ মিরেক, সব মানুষে পৃথিবীটাকে নিজের মত করে দেখে। তা নইলে, এ যে মহিলা আমাদের বলে গেলেন, ডেনমার্কে লাফা যাত্রা কত সহজ, কই তাঁর মতো একজনও মোটর চালক এতক্ষণ পর্যন্ত

আমাদের চোখে পড়ল না। বলতে বলতেই দেখি মিরেকের হাত তোলা দেখে একখানা গাড়ি রাস্তার ধারে থেমেছে। হঠাৎ ভারি আনন্দ হল। দৌড়ে গিয়ে দেখি, হলদে রংএর গেঞ্জি গায়ে একটি ছেলে স্টীয়ারিংএ বসে। বোধহল গাড়ির ড্রাইভার, নিজের গাড়ি নয়। যাই হোক, তাতে আমাদের কি এসে যায়? আমরা গিয়ে বল্লুম—আপনি হর্নবেকের দিকে যাচ্ছেন?

ইংরেজী ভাষায় বল্লুম, জার্মান ভাষায় বল্লুম। কিছু যে বুঝতে পারল তা মনে হল না। ছেলেটি ইঙ্গিতে আমাদের গাড়িতে উঠতে বল্লে। সেটাই নিশ্চিত হওয়া গেল না যে, আমাদের গন্তব্য পথে গাড়িটা যাবে। অথচ এমন সুযোগ ছেড়ে দেওয়া শক্ত হল। উঠলুম দুজনে এবং লক্ষ্য রাখলুম গাড়িটা সোজা উত্তর দিকে যায় কি না। যদি দেখি অন্য কোনো দিকে মোড় ঘুরেছে, সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে মেচিয়ে গাড়িকে থামাতে হবে। কিন্তু বৃথা আমাদের ভয়। গাড়ি সিধে সোজা চল্লো এবং [illegible] শহরের প্রান্তে এসে তবে থামলো। [illegible] পাশে গাড়িটা থামিয়ে একটা [illegible] খুঁটির দিকে আঙুল নির্দেশ করে দেখিয়ে দিলে। দেখলুম একটা খুঁটিতে বড় বড় করে লেখা রয়েছে হর্নবেক, এক কিলোমিটার।

আমরা বুঝলুম ড্রাইভার আমাদের আর কোনো কথা না বুঝুক হর্নবেক কথাটা ঠিক বুঝেছে। আমরা ধন্যবাদ জানিয়ে গাড়ি থেকে নেমে পড়লুম।

একটু হেঁটেই আমাদের আস্তানা মিললো। ভারি সুন্দর তক্‌তকে একটি কুটির হর্নবেকের এই য়ুথ হস্টেল। আমরা পিঠের মোট নামিয়ে আমাদের টিকিট দেখিয়ে, খাতায় নাম লিখিয়ে নিজেদের বিছানা পছন্দ করে নিলুম। এক এক ঘরে প্রায় জন কুড়ির জায়গা—প্রত্যেকটা খাটই দোতালা। নিজেদের বিছানা নিজেরাই করে নিতে হয়। পিঠ-ঝুলিতে প্রত্যেক যাত্রীরই স্লিপিং ব্যাগ থাকে—কাজেই বিছানা করতে দু'মিনিটের বেশী সময় লাগে না। হাত মুখ ধুয়ে পিঠঝুলির মধ্যে থেকে কিছু বেকন, ডিম,

রুটি, মাখন চা আর ফল বার করে আমরা রান্না ঘরের দিকে এগলুম। রান্নার বাসন-পত্র য়ুথ হস্টেলেই পাওয়া যায়। কাজ হয়ে গেলে বাসন ধুয়ে যেখানকার জিনিস সেখানে গুছিয়ে রাখতে হয়, এই নিয়ম। আমাদের সামান্য আহার-পর্ব খুব শীঘ্রই সমাধা হয়ে গেল। তখন আমরা বেরলুম সমুদ্রের দিকে।

সমুদ্রের ধারে আমরা যখন পৌঁছলুম, রাত তখন ন'টা। কিন্তু উত্তর ডেনমার্কের গ্রীষ্মের আকাশে সূর্য তখনও অস্ত যায়নি। দিব্যি আলোতে বহু লোক সমুদ্র তীরে পায়চারী করছে। আমার মতো ভারতীয়ের পক্ষে এ এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা। সমুদ্রের তীরে বসে রাত ন'টার পর সূর্যাস্ত দেখলুম। মিরেক বল্লে—আরো ঘণ্টা দুই এখনও আলো থাকবে। আর এখানে গ্রীষ্মের রাতই বা কতটুকু।

আমি বল্লুম—আমাদের দেশে যারা [illegible] বিশ্বাস করা শক্ত। তুমি বরঞ্চ সমুদ্রকে পিছনে রেখে আমার একটা ছবি তোলো। তার নীচে আমি লিখে দেব উত্তর ডেন-মার্কে রাত ন'টায় তোলা, অমুক তারিখ, অমুক সাল। তা হলে আর অবিশ্বাস করার কিছু থাকবে না।

মিরেক আমাদের দেশের ভূগোল না-পড়া লোকদের সম্বন্ধে কি ভাবলে জানি না, কিন্তু ক্যামেরা বার করে তখনই আমার একটা ছবি তুলে নিলে।

এর কিছু পরেই আমরা কুটিরে ফিরে গেলুম। গিয়ে দেখলুম বহু চরণিকের সমাগম হয়েছে—প্রায় সকলেই বিছানায় গা এলিয়ে দিয়েছে, দু' একজন ছাড়া। আমাদেরও সেদিন ঘুমিয়ে পড়তে দেরী হল না।

পরদিন সকালে উঠেই আমরা সমুদ্রে স্নান করবার জন্যে প্রস্তুত হলুম। মিরেক একটা দোকানে ঢুকে সমুদ্রে খেলবার জন্যে একটা রবারের বল কিনে নিয়ে এল। সমুদ্রতীরে গিয়ে দেখলুম, দিনটাও যেমন সুন্দর লোকের ভীড়ও তেমনি। জলে অবশ্য খুব বেশী লোক নেই কিন্তু বালির উপর মনে হয় যেন আর মানুষ ধরছে না। আমরা স্নানের পর্ব সেরে নিলুম। বলটাকে যতবারই যতদূরেই হোক জলের মধ্যে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতে লাগলুম, সমুদ্রের ঢেউ ততবারই তাকে তীরে পৌঁছে দিতে থাকল। আরো অনেকেই বল ছুঁড়ে খেলা করছিল, তা ছাড়া দুজন লোক জলে 'সার্ফ রাইডিং' করছিল। একটা দুরন্ত মোটর বোটের পিছনে লম্বা দড়ি বাঁধা—দড়ির সঙ্গে একটা ছোট কাঠের তক্তা। তক্তার গায়ে লাঠির মতো খাড়া লাগানো আর একটুকরো কাঠ। এই তক্তাটুকুর উপর পা রেখে দাঁড়িয়ে লাঠিটা দু'হাতে চেপে ঢেউএর উপর দিয়ে মোটর বোটের পিছনে পিছনে ছোটা। ঢেউএর উপর দিয়ে এই ভাবে তীরবেগে ছুটো যাওয়াও নিশ্চয় খুব মজা—যে দুজন সার্ফ রাইডিং করছিল তাদের হাবভাব দেখে তাই মনে হয়। কিন্তু তাদের হাবভাব দেখে আরো মনে হচ্ছিল, থেকে-থেকে তারা যে জলে আছাড় খাচ্ছে আর হাবুডুবু খাচ্ছে, তাতেও কম মজা পাচ্ছে না।

আমরা স্থির করেছিলুম, সেইদিনই সুইডেনে গিয়ে পৌঁছতে হবে। সুতরাং সমুদ্রতীরে বেশী বেলা না করে বেরিয়ে পড়লুম। ডেনমার্ক আর সুইডেনের মাঝ-খানে এক ফালি সমুদ্র। সমুদ্র যেখানে সব চেয়ে সরু হয়ে এসেছে সেইখানেই পারা-পারের জাহাজ। সেইখানকে লক্ষ্য করে বেরিয়ে পড়লুম আমরা হেঁটে।

কিন্তু বেশী দূর যেতে হলনা। হাঁটতে হাঁটতে মিরেকের পিঠঝুলির পিছনের থলিটা থেকে ম্যাপটাকে টেনে বার করতে গেছি, সেই থলির মধ্যে ছিল বলটা, সেটা গড়িয়ে পড়েছে মাটিতে। একেবারে রাস্তার মাঝখানে! সেই সময় রাস্তা দিয়ে খুব জোরে একটা মোটর আসছিল—রাস্তার উপর লালের উপর সবুজের কাজ করা বলটাকে দেখতে পেয়ে, বোধ হয় বলটাকে বাঁচাবার জন্যেই ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ল। ড্রাইভারের এই অদ্ভুত বদান্যতার কথা ভাবতে ভাবতে বলটা কুড়িয়ে নিতে যাচ্ছি, এমন সময় দেখি চালক নিজে রাস্তায় নেমে দাঁড়িয়ে গাড়ির দরজা খুলে আমাদের আহ্বান করলেন। আমরা ভদ্রলোকের মতো বলটা কুড়িয়ে তাঁর গাড়িতে গিয়ে বসলুম এবং ধন্যবাদ জানালুম। কিসের জন্যে যে তাঁকে ধন্যবাদ দিলুম—লালের উপর সবুজ কাজ করা বলটা বাঁচাবার জন্যে না আমাদের গাড়িতে আহ্বান করার জন্যে তা আমরা আজও জানি না। আরো একটা জিনিস আমরা জানি না, কারণ মিরেক বা আমি কেউই ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করিনি—তিনি বলটা দেখে গাড়ি থামিয়েছিলেন না আমাদের দেখে গাড়ি থামিয়েছিলেন।

যাই হোক ভদ্রলোক গাড়িতে উঠেই নিজের পরিচয় দিলেন। তিনি একজন ব্যবসায়ী, কর্মোপলক্ষে চলেছেন হেলসিংওর। আমরা কোথায় যাচ্ছি?

আমরা বল্লুম—আমরাও যাচ্ছি হেলসিংওর। জাহাজ ধরতে।

ভদ্রলোক বল্লেন—জাহাজ ধরতে কেন? সুইডেনে যাবেন বুঝি? তা বেশ, হেলসিংওরএ হ্যামলেটের প্রাসাদটা দেখে যাবেন তো?

আমরা বল্লুম—সে তো আমরা কাল দেখে নিয়েছি। ডেনমার্কের পর্ব আমাদের শেষ। এখন চলেছি সুইডেনে।

বলে বুঝলুম বড় ভুল করেছি। ভদ্রলোকের দেশপ্রীতির গোড়ায় যেন ঘা দিয়ে বসেছি। তিনি বল্লেন—আপনারা কবে ডেনমার্কে এসেছেন?

মাত্র দুদিন ডেনমার্কে থেকে চলে যাচ্ছি শুনে তাঁর মুখ বিমর্ষ হয়ে গেল। কিন্তু তখনই আবার উৎসাহিত হয়ে বল্লেন—তবে যাবার আগে 'হিলেরড'এর প্রাসাদটা দেখে যান। হ্যামলেটের প্রাসাদের থেকে কিছু কম নয়। জানেন তো ডেন-মার্কের এই সব ঐতিহাসিক প্রাসাদগুলি বড় সুন্দর।

আমরা কিছুই জানতুম না, তাই বল্লুম—হুঁ। ভদ্রলোক গাড়িতে ব্রেক কষলেন। আমি তাড়াতাড়ি ম্যাপ খুলে দেখি হিলেরড একেবারে উল্টো দিকে। হাঁ হাঁ করে বলে উঠলুম—আরে করেন কি, এ যে একেবারে বিপরীত দিকে যেতে হচ্ছে।

আর, করেন কি! ততক্ষণে গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে উল্টো দিকে আমরা চলতে আরম্ভ করেছি। ভদ্রলোক বল্লেন—কিছু ভাববেন না। হেলসিংওর থেকে অনেক স্টীমার যাচ্ছে। বিকেল বেলা বেশ আরাম করে সমুদ্র পার হবেন। হিলেরডএর ফ্রেডেরিকবুর্গ প্রাসাদ না দেখে চলে গেলে আপনাদের ডেনমার্ক দেখাই বৃথা হত।

আমাদের আর কিছু বলবার ছিল না। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আমরা ফ্রেডেরিকবুর্গ

[প্র]াসাদের দরজায় এসে পেঁছিলুম। [প]রিখায় ঘেরা প্রকাণ্ড সেকেলে রাজ-[প্র]াসাদ। পরিখার জলের মধ্যে সারি সারি [গাছ]মের ছায়া পড়েছে। তখনকার দিনের [রা]জন্যরা এই সব দুর্গের মতো প্রাসাদে [থে]কে প্রবল প্রতাপে রাজ্য শাসন করে [গে]ছেন। এখন এ সবই মিউজিয়ামে পরিণত [হ]য়েছে। সামান্য দক্ষিণা দিয়ে সাধারণ লোকে এই সব মিউজিয়াম দেখতে আসে।

আমাদের নামিয়ে দেশভক্ত ডেনিশ ব্যবসায়িটি বিদায় সম্ভাষণ জানালেন আর বলে গেলেন—আপনাদের হয়তো ঘণ্টা খানেক ঘণ্টা দেড়েক লাগবে এই প্রাসাদ দেখতে। এখান থেকে হেলসিংওর ফিরে বেলা চারটের সময় একটা জাহাজ পাবেন সুইডেনে যাবার। বিদায়। আশা করি আবার আপনাদের দেখা পাবো কখনো।

আমরা বল্লুম—নিশ্চয়! নিশ্চয়!

ভদ্রলোক বল্লেন—যে কোন চলন্ত গাড়িতে হাত দেখাবেন, থেমে যাবে। কোন চিন্তা নাই, আপানাদের দেখেই বোঝা যায় বিদেশী ছাত্র বলে। বিদেশী ছাত্রদের আমরা খুব পছন্দ করি।

ভদ্রলোক চলে যেতে আমি মিরেককে বল্লুম—মিরেক, সর্বনাশ হয়েছে। বিদেশী ছাত্র হিসেবে আমরা এদেশে মার্কা-মারা হয়ে গেছি। চলো, যত তাড়াতাড়ি পারি এখন পালানো যাক।

মিরেক বল্লে—এই ঐতিহাসিক প্রাসাদটা দেখে তবে তো?

আমি বল্লুম—হ্যাঁ, এইটে দেখে তার-পর আর এক মুহূর্ত নয়।

কামরার পর কামরা, আসবাবপত্র আর দেয়ালে টাঙানো ছবি আর পর্দা দেখে আর আমাদের ভালো লাগছিল না। মন পড়ে ছিল দরোয়ানের কাছে জমা দেওয়া পিঠঝুলির প্রতি। আর সেই পিঠঝুলির মধ্যে দিয়ে আমাদের চোখ চলে গিয়েছিল অজানা মাঠের অজানা পথে, অজানা গাছ-তলায় কোথায় কত দূরে কে জানে! কিন্তু যাদের দেশের ঐতিহাসিক সম্পদ এই সব সুদৃশ্য স্থাপত্য তাদের দেশের দরোয়ানের মনে তো কষ্ট দেওয়া যায় না তাড়াহুড়ো করে মিউজিয়াম থেকে বেরিয়ে। কাজেই হিলেরড প্রাসাদের অভ্যন্তরে আরো প্রচুর দর্শকদের সঙ্গে আমরা প্রায় ঘণ্টা-খানেক ঘুরলুম।

তারপর দরোয়ানের কাছে পিঠঝুলি ফিরিয়ে নিতে যাচ্ছি, এমন সময় সে একটা লালের উপর সবুজের কাজ করা রবারের বল আমার হাতে দিয়ে বল্লে—এই বলটা একজন ভদ্রলোক এইমাত্র দিয়ে গেলেন আপনাদের দিতে। এটা নাকি আপনারা তাঁর গাড়িতে ফেলে গিয়েছিলেন।

বলটা দেখেই আমরা চিনলুম। মিরেকের পিঠঝুলির পিছনের খাপে বোতামটা লাগানো হয়নি, তাতেই হয়তো বলটা গড়িয়ে গাড়িতে পড়ে গিয়ে থাকবে। কিন্তু ভদ্রলোকও তো আচ্ছা! এই চার আনার একটা বলের জন্যে হেলসিংওর থেকে ফিরে এলেন?

আমরা বলটা আর একবার পিঠ-ঝুলিতে ভরছি, এমন সময় দরোয়ান বলে উঠল—হয়তো সে ভদ্রলোক এখনও এখান থেকে যাননি। ঐ দিকের দোকান থেকে ছবির পোস্ট কার্ড কিনছিলেন দেখ-ছিলুম। গিয়ে একবার দেখতে পারেন।

গিয়ে সত্যিই দেখা মিলল। ভদ্রলোক বল্লেন—ভালই হোলো। বলেছিলুম, আবার আমাদের সঙ্গে দেখা হবে। তাই হোলো। চলুন, তাহলে আপনাদের হেলসিংওরএ পেঁছে দিই।

আমরা বল্লুম—সে কি? আপনি আবার হেলসিংওরএ যাচ্ছেন নাকি?

—যাচ্ছিলুম কোপেনহাগেন। কিন্তু আপনাদের দেখে মনে করছি উল্টো দিকেই যাই।

আমরা বল্লুম—আপনার কপালে দেখছি আজ কেবলই উল্টো যাত্রা।

ভদ্রলোক বল্লেন—ঠিক বলেছেন। দেখুন না, হেলসিংওরএও ঐ কাণ্ড। ওখানে গিয়েছিলুম আমি যার কাছ থেকে কাঁচা মাল কিনি তাকে দামটা দিতে। তার দেখা পেলুম না। উল্টে তার দোকানে আমার এক পাইকারী খদ্দের ছিল—সে হঠাৎ আমাকে দেখতে পেয়ে তার পাওনার টাকাটা দিয়ে গেল।

আমরা হো হো করে হাসতে হাসতে ভদ্রলোকের গাড়িতে উঠে বসলুম।

রাস্তায় যেতে যেতে ভদ্রলোকের সঙ্গে নানা গল্প হল। ডেনমার্কের সমবায় প্রথার কথা তিনি আমাদের বোঝাতে লাগলেন। পৃথিবীর যে যে দেশে সমবায় প্রথা সাফল্যলাভ করেছে তার মধ্যে ডেনমার্ক প্রধানতম। কৃষিতে বিরাট বিরাট সমবায়, শিল্পে সমবায়, হোটেলের সমবায়, দোকানের সমবায়, সব জায়গাতেই সমবায়। ডেনমার্কের বিরাট বিরাট গো-সমবায়ে এত দুধ তৈরী হয় যে সারা দেশে দুধ সরবরাহ করে, বিদেশে রপ্তানি করেও প্রচুর দুধ উদ্বৃত্ত থাকে। এই কথাটা যখন বলছেন তখন আমরা একটি ছোট শহরের মধ্যে দিয়ে চলেছি। হঠাৎ ভদ্রলোক বড় রাস্তা ছেড়ে সাঁ করে একটা গলির মধ্যে ঢুকে এক তেমাথায় গাড়িটাকে দাঁড় করালেন। বল্লেন—আসুন আমি যা বলছিলুম, এইখানেই তার চাক্ষুষ প্রমাণ পাবেন। মিউজিয়ামে ঘুরে ঘুরে আপনারা নিশ্চয় খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। একটু কফি খেয়ে চাঙ্গা হয়ে নিন।

বলে আর কথা বলবার অবসর না দিয়েই আমাদের নিয়ে এক কফিখানায় ঢুকলেন। দুটো কফি আর নিজের জন্যে একটা গরম চকোলেটের ফরমাস দিয়ে ভদ্রলোক মুখে একটু স্মিতহাস্য ফুটিয়ে চুপটি করে বসে রইলেন। কি হয় দেখবার জন্যে আমরাও মুখ বুজে রইলুম।

দু 'পট্' কফি, এক 'পট্' চকোলেট চিনি, ছোট ছোট তিন জগ দুধ, তা ছাড়া প্রকাণ্ড এক আড়াই সেরী জগে আরো এক জগ দুধ এলো। আমরা কফি খাওয়া শেষ করতেই ভদ্রলোক সেই বিরাট জগটা এগিয়ে দিয়ে বল্লেন—নিন্ এবার দুধ খান। এই হচ্ছে আমাদের দেশের বাড়তি দুধ, এর জন্যে রেস্তরাঁতে আলাদা দাম দিতে হয় না। দেশের বাড়তি দুধের এইভাবে আমরা সদ্ব্যবহার করি।

আমরা একেবারে তাজ্জব। ভদ্রলোকের সঙ্গে বসে বসে সেইখানে ডেনমার্কের খাঁটি ঘন বাড়তি দুধ দু'তিন পেয়ালা খেতেই হল। ভদ্রলোক নিজেও খেলেন তারিফ করে।

এই অতুলনীয় ব্যবসায়ী ভদ্রলোকের সঙ্গে এতটা পরিচিত হওয়ায় আমরা সেদিন নিজেদের ভাগ্যবান বলে মনে করেছিলুম। কারণ এঁর সঙ্গে আলাপ না হলে এবং এঁর সঙ্গে সেই পথপ্রান্তের কফিখানায় কফি খেতে না ঢুকলে ডেনমার্কের আসল গৌরবই আমাদের অজানা থেকে যেত। (ক্রমশ)

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

২১।৮।৫৫

গ্রাম থেকে ফিরে এসে সকলে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করছে। এমন পরিপাটি গ্রাম ভূভারতে নেই। ঝক্‌ঝকে তরতরে রঙগীন, সুচারু, সুরুচি। একজন বাঙালী ডেলিগেট বল্লেন, "এদের রক্তে মাংসে, হাড়ে আর্ট মিশে গেছে। ভারতীয় আর্ট।" শুনে খুশি হলাম। তবে বেশী দিন নয়। মেয়েরা বিলেতী ঘাঘরাই তো পরছে দেখলাম।

কে একজন হোটেলে এলেন। তিন গাড়ি সশস্ত্র সান্ত্রী প্রহরী আগে—পিছে সশস্ত্র মোটর-স্কাউট। মিশরের উপ-প্রধানমন্ত্রী। পণ্ডিতজী একবার লক্ষ্ণৌ এসেছিলেন দু তিনদিন পুলিস পাহারার জ্বালায় অস্থির সকলে। তিনি নাকি ভীষণ চটেছিলেন ঐ প্রকার ব্যবস্থা দেখে। তবে গান্ধীজীর মৃত্যুর পর বোধ হয় দরকার ছিল। হয়তো এখানেও দরকার আছে। মধ্য প্রাচ্য থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া পর্যন্ত সিভিল আর মিলিটারির বিরোধ এবং সেই সঙ্গে মোল্লা জুটেছে। খুব বেঁচে গেছি আমরা। গান্ধীজি প্রাণ দিয়ে আমাদের বাঁচালেন। এ-যুগে এই প্রায়শ্চিত্তের তুলনা নেই। আউঙসানের মৃত্যুও ঐ জাতেরই। এঁরাই প্রকৃত খৃষ্টান। হয়তো বা বোধিসত্ত্ব।

২২।৮।৫৫

সকাল ৮টা থেকে ৯টা পর্যন্ত বক্তৃতা; তারপর এক ঘণ্টা প্রশ্নোত্তর। পনের মিনিট বিশ্রামের পর পাঠচক্র দেড় ঘণ্টা। আবার আলোচনা চলল ১-১৫ মিনিট পর্যন্ত। একটু ভয় ভয় করছিল, শীঘ্রই কেটে গেল। লেখা বক্তৃতা পড়লাম না, মুখেই বলে গেলাম। মনে হোলো খারাপ হয়নি। পূর্বেকার মত অনর্গল নয়।

বিকেলে শহরে ঘুরলাম। ছবি একখানা। একটাও কি ভাঙা বাড়ি নেই, নর্দমা নেই, একটা বাড়িরও কী রং চটে যায়নি! এমন দোকান বোম্বাই-কলকাতাতেও নেই। কারা কেনে? কোত্থেকে কেনে? এত পয়সা কোথায় পেলে? প্রায় সব দোকানই বিদেশীর, আর ক্রেতা অনেকেই দেশী। রাস্তার ধারে বসে চা-কফি-পানীয় চলছে। অপেয় চা। এরা দুধ খায় না—সব কেমিক্যাল দুধ ব্যবহার করে। গ্রামে নাকি গরু নেই, মোষ কিছু আছে। বাচ্চারা কি খেয়ে বাঁচে? রাস্তা-ঘাটে বেশী বাচ্চা দেখলাম না। আমার ঘরের পাশে এক জোড়াই যথেষ্ট। বৃদ্ধ-বৃদ্ধাও কম নজরে এলো। সবই যেন ১৫ থেকে ৪০ এর মধ্যে। অবশ্য বয়স বোঝা যায় না খাঁদা নাকে। গ্রামে প্রতি কুটিরের সামনে একটি পুকুর, মাছে ভরতি। 'বাঙাল' গৃহিণীদের স্বর্গ! কিন্তু সব-চেয়ে ভালো মাছও তো অখাদ্য। এরা মাছ খায় খুব, কিন্তু মাছ কুটতে জানে না। কি করে জানবে! এদের বঁটি নেই, ছোরা-ছুরি দিয়েই মাছ কাটে! তা না থাকুক! এমন হাসিখুশি, পরিচ্ছন্ন জাত জগতে দুটি নেই। ডাচেরা পরিচ্ছন্ন, কিন্তু রাম-গরুড়ের ছানা।

২৩।৮।৫৫

সকাল বিকেল বক্তৃতা। সকালেরটা জমে ছিল, বিকেলেরটা বাজে হলো।

বিকেলে কর্তৃপক্ষের একজন মোটরে খুব খানিকটা বেড়িয়ে নিয়ে এলেন। পাহাড়ের ওপর অনেকক্ষণ বসে গল্প-গুজব হলো। কি চমৎকার সাজানো! মুসৌরী থেকে দেরাদুনের দৃশ্য এর তুলনায় কিছুই না। এত ফুল, এত গাছ, এত সবুজ, এত নীল মেঘের খেলা রানি-ক্ষেতেও নেই। কেবল বরফের চূড়া নেই। আগ্নেয়গিরি চারধারে; একটা গোলমাল করছে এখনও। বানডুঙ শহর নাকি আদিম কালে হ্রদ ছিল। দেখলে তাই মনে হয়।

ভদ্রলোক নিতান্ত স্বল্পভাষী। তবু যা বললেন, তাতে অনেক কিছু শিখলাম। হোটেলে এসে ম্যাপ দেখলাম। সাড়ে তিন হাজার দ্বীপে শান্তি স্থাপনা অসম্ভব। এমন সব দ্বীপ আছে যেখানে যেতেই চার পাঁচ দিন লেগে যায়। তার ওপর মহা-প্রভুদের কৃপা। অস্ত্র জোগাচ্ছেন এখনও। একাংশ এখনও ছাড়বেন না। তা ছাড়া, তেল-চুক্তির উত্তরাধিকার। সেই শর্তে ডাচ বণিকদের ব্যবসায়ের ওপর হস্তক্ষেপ চলবে না। ওঁরা এখনও টুঁটি চেপে রয়েছেন। তাই কথায় কথায় এদের রাগ ফুটে ওঠে। আমাদের কনফারেন্সে ডাচ

অধ্যাপক আসতে পারেননি, আসতে দেওয়া হয়নি। শুনে রাগ ও দুঃখ হয়েছিল। এখন বুঝলাম। কিন্তু ও'রা এখনও ফিরে পাবার স্বপ্ন দেখছেন। নিতান্ত অলীক স্বপ্ন। এখানে একটা খুন-খারাপি হওয়া আশ্চর্য নয়। ইংরাজেরা সোনার চাঁদ এদের তুলনায়। এশিয়ার জাগরণের খবর ও'দের অনেকেরই কানে পৌঁছয়নি মনে হয়। আজ আমার হঠাৎ চোখ খুলে গেল।

২৪।৮।৫৫

আজ শেষ বক্তৃতা দিলাম। গোটা কয়েক মূল বক্তব্য সাজিয়ে বক্তৃতা শেষ করলাম। মোদ্দা কথা এইঃ
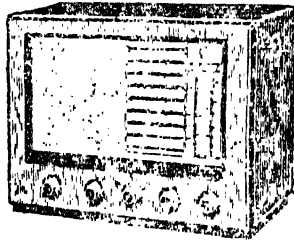
কো-অপারেটিভ মুভমেণ্ট বা সমবায়-আন্দোলনকে প্ল্যানিং-এর অঙ্গ করতে হবে, নইলে মাত্র পলিসি-ই থেকে যাবে। যখন আজকালকার 'রাষ্ট্র' অন্য ধর্ম গ্রহণ করেছে কিংবা করছে, তখন রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব বা হস্তক্ষেপের প্রশ্ন অবাস্তব। আজ যদি সমবায়-সমিতিগুলি কম্যুনিটি প্রোজেক্টস-এর মাধ্যমে এক্সটেনশন সার্ভিসের অঙ্গ হয়, তবে দু দিক থেকেই লাভ হবে। জনসাধারণের স্বেচ্ছাসেবার সুযোগ যাবে না, বরঞ্চ বৃদ্ধি পাবে। এবং সেই সঙ্গে আমলাতন্ত্রের দোষগুলি সংশোধিত হবে। আমার মতে—এবং আমার মতটি বিশদ করে বোঝাতে প্রায় দু ঘণ্টা লাগল—কো-অপারেটিভের অর্থনীতি এতদিন আমাদের দেশে কেবল ক্রেডিট-পলিসিই ছিল, তাও ক্রেডিট সকলে পেত না, কেবল মাতব্বরেরাই পেতেন। এখন ক্রেডিট-পলিসিকে অল্প সঞ্চয়ের এবং ছোট মাপের (এমন কি সম্ভব হলে মাঝারি ঠাঠেরও) উৎপাদন-নীতিতে পরিণত করতে হবে। অনেক প্রশ্ন উঠল। অধিকাংশ প্রশ্নেরই মূলে সন্দেহ ও ভয় ছিল যে আমি বুঝি কো-অপারেটিভ ডিপার্টমেণ্ট তুলে দিতে চাইছি। সকলেই ঐ বিভাগের উচ্চ কর্ম-চারী। আমলাতন্ত্রের দোষ আমরা সকলেই জানি, কিন্তু দপ্তরখানার বিভাগীয় মনো-বৃত্তি আরও ভয়ঙ্কর।

এ'রা সকলেই বিশ্বাসী ও বিশেষজ্ঞ। ব্যাপারটাকে বড় প্রতিবেশে দেখাতে গিয়ে আধুনিক অর্থশাস্ত্রের একাধিক প্রত্যয় ও সংজ্ঞার ব্যাখ্যা করতে হলো আমাকে। কো-অপারেটরদের আধুনিক অর্থনীতির একটা দ্রুত প্রাথমিক পাঠক্রম নিতে বাধ্য করা উচিত। লোকগুলি নিতান্ত ভদ্র, একাগ্রচিত্ত; কর্মিষ্ঠ—সবকিছু। কিন্তু 'চামড়ার মতন কিছুই নয়' অর্থাৎ সমবায় তথা সমবায়-সমিতির দপ্তরের কাছে কেউ কিছু নয়!

এই নিয়ে ছ' সাতটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগদান করলাম। এক একজন প্রতিনিধি যেন নিজ নিজ দেশের দূত। এ মনোভাব নিয়ে কেউ কিছু লিখতে পারে না। মুখে বিনয়, বুকে দম্ভ! আর একটি বস্তু এই প্রথম লক্ষ্য করলাম, আমাদের প্রাদেশিকতা। মাদ্রাজ জানে না বোম্বাইকে, বোম্বাই জানে না পঞ্জাবকে, আর কেউ জানে না বাঙলাকে। চমৎকার! একটা সমগ্র ছবি দেবার চেষ্টা করলাম। দোষ স্বীকার করলাম, গুণ দেখালাম না। কেবল বললাম, এই ধরনের চেষ্টা চলছে। এই হিসেবে আমার যাওয়াটা সার্থক হয়েছে মনে হয়।

দুপুর বেলা ব্রিটিশ কাউন্সিলের কর্তা তাঁর অফিসে নিয়ে গেলেন। প্রকাণ্ড লাইব্রেরি। আমাদের দেশের খুব কম কলেজেই এতো ভালো বই এতো সংখ্যায় আছে। ইংরেজী ভাষা শেখাবার বন্দোবস্ত দেখে হিংসা হলো। সেই চার-পাঁচ বছর বয়স থেকে ইংরেজী অক্ষর-শিক্ষার আরম্ভ হয়েছিল, এখন প্রিপোজিশন আর গ্রামাটি-ক্যাল্-এর ভুল হয়। অথচ কত হাতে আর আমাদের ইংরেজ আমেরিকান লেখকের রচনাই না পড়লাম। সব ব্যর্থ শিক্ষার দোষে। নতুন শিক্ষাপদ্ধতিতে শক্তির এত অপচয় হয় না। ব্রিটিশ কাউন্সিল পাঠাগারের লেন্‌ডিং সেক্‌শান থেকে সপ্তাহে প্রায় হাজার বই ধার নেয় এদেশের লোকেরা। এতদিন রাজকীয় ভাষা ছিল ডাচ, যেমন আমাদের ছিল ইংরেজী। এখন ইংরেজীর চলন। আমরা ছাড়ছি, ওরা ধরছে।

তিন চার শ' বছর রাজত্ব করেছে ডাচেরা। কিন্তু শিক্ষাবিস্তারের দিকে মোটেই নজর দেয়নি। অত বড় দেশ একটি নামমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। প্রকৃতপক্ষে সেটা ছিল কলেজ। এখন চার পাঁচটা বিশ্ব-বিদ্যালয়, কিন্তু ডাচ ধরনের। পরীক্ষা লিখে নয়—পঁয়তাল্লিশ মিনিট মৌখিক পরীক্ষা মাত্র। পছন্দ হলো না। শিক্ষকের সংখ্যা অত্যন্ত কম, ছাত্রের সংখ্যা অত্যন্ত বেশী। জাকর্তা, বানডুঙ থেকে চার পাঁচ শ' মাইল দূরে অন্য শহরে কোনো কোনো অধ্যাপকদের বক্তৃতা দিতে যেতে হয়। এ ব্যবস্থা অচল।

উপনিবেশের শিক্ষিত ব্যক্তিরা জাতীয় আন্দোলনের নেতা হন। স্বাধীনতা পাবার পর তাঁরাই শিক্ষাপদ্ধতির পরিবর্তনে বাধা দেন। এ এক অদ্ভুত ব্যাপার। 'কালচারাল ল্যাগ' বা সংস্কৃতির জের-এর মজার দৃষ্টান্ত। ইন্দোনেশিয়ার নতুন শিক্ষা-পদ্ধতি সম্বন্ধে বেশী খবর কেউ দিতে পারলেন না।

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীযুক্ত দেশমুখ জানাইয়াছেন যে, প্রথম পঞ্চবার্ষিকীর সময় দেশে বেকারের সংখ্যা চল্লিশ লক্ষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই প্রসঙ্গে তিনি আরো জানাইয়াছেন যে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকীর জন্য ৪,৮০০ কোটি টাকা মূলধনের প্রয়োজন। বিশুখুড়ো মন্তব্য করিলেন—"মূলধনের অনুপাতে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকীতে বেকারের সংখ্যা কি পরিমান বাড়বে তা অবশ্য তিনি জানান নি।"

* * *

শ্রীযুক্ত জহরলালজী জানাইয়াছেন যে ভারতে সাধুসন্ন্যাসীর সংখ্যা বর্তমানে পঞ্চান্ন লক্ষ, তার মধ্যে দশ পনর হাজার সত্যিকারের সাধু আছেন কিনা সন্দেহ।—"সত্যিকারের কোন-কিছুর পরিসন্ধান নেওয়ার বিপদ আছে, ঢাক বাজলে গাঁ উজোড় অনেক সময়েই হয়ে যায়" —বলে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

আমরা সংবাদে জানিলাম যে নূতন বিবাহ আইন নাকি খুব লোকপ্রিয় হইয়াছে:—এর মধ্যে এক পশ্চিমবঙ্গে ছয় শতাধিক নূতন আইনের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"বিবাহের চেয়ে বড়-র লোকপ্রিয়তা এতে কিছুমাত্র কমেছে ব'লে খবর আমরা পাইনি!"

* * *

কোন এক এরোপ্লেন কোম্পানী সব চেয়ে দীর্ঘ টিকিট প্রবর্তন করিয়াছেন—লম্বায় সেটা পনর ফুট আট ইঞ্চি এবং ওজনে সোয়া তিন পাউন্ড। —"আমরা অবশ্য লম্বা চওড়া টিকিটে কৌতূহলী নই, বরং তার পরিমাপ ক্ষীণ হতে হতে শেষ পর্যন্ত একেবারেই থাকবে না, এই ধরনের টিকিটই আমাদের পছন্দসই"—বলিলেন অন্য এক সহযাত্রী।

* * *

চিকাগোর সংবাদে প্রকাশ যে সেখানে সূর্যরশ্মির সাহায্যে রেডিও চালাইবার এক অভিনব ব্যবস্থা করা হইতেছে। শ্যামলাল বলিল—"সূর্য কেন, চাঁদ বা তারকারশ্মিতেও আমাদের

আপত্তি নেই, শুধু অনুরোধের আসর চললেই হলো!!"

* * *

আগামী গ্রীষ্মে বিলাতের পার্লামেন্টের সদস্যদের সঙ্গে ভারতীয় পার্লামেন্টের সদস্যদের ক্রিকেট খেলা হইবে বলিয়া সংবাদ পাইলাম। ভারতীয় দলের অধিনায়কত্ব করিবেন শ্রীযুক্ত নেহরু। —"দেখে শুনে মনে হচ্ছে নেহরুজী Straight bat-এর ওপরই নির্ভর করবেন, আর বিলেতের আশা একমাত্র Googly. আমরা ফলাফলের জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে আছি"—বলেন ক্রিকেট-রসিক খুড়ো।

* * *

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীযুক্তা অমৃত কাউর জানাইয়াছেন যে, চীনে নাকি প্রতিটি নাগরিককে দিনে অন্তত কুড়িটি মাছি মারিয়া নগর-পিতাকে দেখাইতে হয়, সংখ্যাটা কুড়ির ঊর্ধ্বে হইলে পুরস্কারও দেওয়া হয়।—"আমরা কেরাণীগিরিতে মাছি মেরে থাকি বটে, পুরস্কার লবডংকা"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

এক সংবাদে জানা গেল আগামী ১৯৫৮ সালের পয়লা এপ্রিল হইতে ভারতে ব্যাপকভাবে মদ বন্ধ হইয়া যাইবে।—"কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ আগেই গেছে, এখন মদ আর মাৎসর্যটা গেলেই আমরা একবারে ধোয়া তুলসীপাতা"—জড়িত কণ্ঠে মন্তব্য করিতে করিতে জনৈক সহযাত্রী ট্রাম হইতে নামিয়া গেলেন, আমরা বিস্মিত হইয়া তাঁহার দিকে তাকাইয়া রহিলাম!

ধীরাজ ভট্টাচার্য

॥ পনেরো ॥

রাজাহারা মগধ রাজকুমার হেমচন্দ্র। লোকালয় ছেড়ে মানুষের অগম্য বন জঙ্গল ভেঙে হেঁটেই চলেছেন। অবশেষে দেখা গেল দূরে গুরুদেব মাধবাচার্যের ক্ষুদ্র পর্ণকুটির। কুটিরের নিকটবর্তী হয়ে হেমচন্দ্র দেখলেন বাইরে কুটিরসংলগ্ন উঠানে মৃগচর্মাসনে আচার্য চক্ষু মুদ্রিত করে জপে নিযুক্ত আছেন। যুক্ত করে হাঁটু গেড়ে বসে গড়ুরপক্ষীর মত হেমচন্দ্র গুরুদেবের ধ্যান ভঙ্গের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।

জ্যোতিষবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন—'কাট্'।

ক্রীড সাহেব ক্যামেরার হাতল ঘোরান বন্ধ করলেন। আমি ঐ অস্বস্তিকর হাঁটু ভেঙে বসা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বাঁচলাম। মাধবাচার্য মৃগচর্মের নীচে লুকিয়ে রাখা একটা চৌকো টিনের কৌটো থেকে বিড়ি বার করে ধরিয়ে পরমানন্দে টানতে লাগলেন।

শুটিং হচ্ছিল স্টুডিওর পূবে দিকের জঙ্গলে। বাঁশ খড় লতা পাতা দিয়ে স্টুডিওর মিস্ত্রীরা তিন চার দিন ধরে তৈরি করেছে এই ঘরখানি। দূরে থেকে দেখলে আঁকা ছবির মত দেখায়। মাটির দেওয়াল। মাটি উঁচু করে দাওয়া। সামনে খানিকটা জায়গা ঘাসগুলো কোদাল দিয়ে চেঁছে—গোবর নিকিয়ে হয়েছে উঠোন। পাশে ছোট্ট একটা মাটির বেদীর উপর তুলসী গাছ। ছিমছাম পরিস্কার পরিচ্ছন্ন কুটিরখানি। চারপাশে ঘন গাছ-আগাছার জঙ্গল। ঘরের মধ্যে ধ্যানে বসলে আলো পাওয়া যাবে না অগত্যা বাধ্য হয়েই গুরুদেবকে উঠোনে মৃগচর্ম বিছিয়ে বসতে হয়েছে। মাধবাচার্যের ভূমিকায় অভিনয় করছিলেন 'কার্তিকচন্দ্র দে'। বিরাট দেহ, প্রায় সাড়ে ছ' ফুট লম্বা। সাদা দাড়ি গোঁফ, মাথায় বিরাট জটা। পরনে গেরুয়া কাপড় ও আলখাল্লা, তার উপর বাঘছাল আঁটা। দেখলে ভক্তি দেশ ছেড়ে পালায়, আসে ভয়।

জ্যোতিষবাবু ক্রিড সাহেবকে ক্যামেরা কাছে আনতে বললেন। এবার ক্লোজ শটে নেওয়া হবে ডায়লগগুলো। একটু পরেই ক্রীড সাহেব বললেন—ইয়েস, আই অ্যাম রেডি মিঃ চ্যাটার্জি। আবার সেই আগের মত হাঁটু গেড়ে হাত জোড় করে বসলাম। জ্যোতিষবাবু বললেন—'স্টার্ট'।' ক্রীড সাহেব ক্যামেরার হাতল ঘোরাতে শুরু করলেন।

গুরুদেবের ধ্যান ভঙ্গ হল। ধীরে ধীরে চোখ মেলে আমার দিকে চাইলেন। ভক্তিভরে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বললাম—'গুরুদেব! আমাদিগের সকল যত্ন বিফল হইল। এখন ভৃত্যের প্রতি আর কি আদেশ করেন? যবন গৌড় অধিকার করিয়াছে। বুঝি এ ভারতভূমির অদৃষ্টে যবনের দাসত্ব বিধিলিপি। নচেৎ বিনা বিবাদে যবনেরা গৌড় জয় করিল কি প্রকারে?

মাধবাচার্য—বৎসে! দুঃখিত হইও না; দৈব নির্দেশ কখনও বিফল হইবার নহে। আমি যখন গণনা করিয়াছি—'

গুরুদেব আর বলতে পারলেন না। নিস্তব্ধ জঙ্গলে কাঁসার মত গলায় মাধবাচার্যের গম্ভীর গলাকে চাপা দিয়ে কে বলে উঠল—চুপ কর! আঃ চুপ কর!!

চমকে আমি ও কার্তিকবাবু জ্যোতিষবাবুর দিকে তাকালাম। ক্যামেরার হাতল বন্ধ করে ক্রীড সাহেবও অবাক হয়ে চারদিকে চাইছেন। জ্যোতিষবাবু গর্জন করে উঠলেন—'তোমরা এ্যাক্টিং থামিয়ে ক্যামেরার দিকে চাইলে কেন?' বললাম—'বাঃ—আমরা ভাবলাম অভিনয় ঠিক হচ্ছে না বলে আপনিই আমাদের থামতে বললেন।'

'—আমি তো কিছুই বলিনি!' অবাক হয়ে বললেন জ্যোতিষবাবু। তবে বললো কে? সবাই পরস্পরের মুখের দিকে চাইতে লাগল। নিস্তব্ধ জঙ্গলে কারও মুখে কথা নেই।

জ্যোতিষবাবু বললেন—'এমন শটটা মাটি হয়ে গেল। এখন আবার রিফ্লেক্টার সাজিয়ে শট নিতে গেলে দেরি হয়ে যাবে। কি যে করি। হঠাৎ ক্যামেরার পিছনে তাকিয়ে লাফিয়ে উঠলেন জ্যোতিষবাবু—'এত ভিড় কেন? শুটিং-এর লোক ছাড়া এখানে কেউ থাকবে না। আপনারা দয়া করে বাইরে যান।'

বাইরের অচেনা অনেকগুলি দর্শক ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে ক্যামেরার পিছনে। জ্যোতিষবাবুর কথায় নিতান্ত অনিচ্ছায় একে একে সরে পড়ল সবাই।

জ্যোতিষবাবু বললেন—'ঠিক আছে। শটটা যেখানে বন্ধ হয়েছে সেইখানে কেটে মাধবাচার্যের বাকি দরকারি কথাগুলো টাইটেলে লিখে জুড়ে দেব। ভালই হল।'

ক্যামেরা আরো কাছে আনা হল। বারো তেরোখানা রিফ্লেক্টার আশে পাশে সাজিয়ে ক্রীড সাহেব প্রস্তুত হলেন।

জ্যোতিষবাবু বললেন—'তাড়াতাড়ি এই

শটগুলো সেরে নিতে হবে নইলে এ জঙ্গলে বেশিক্ষণ রোদ্দুর পাওয়া যাবে না, তার পর সন্ধ্যের সময় আসল সিনটা নেওয়া হবে। তোমরা সংলাপগুলো ভালো করে মুখস্ত করে নাও—যেন আটকে না যায়।'

কার্তিকবাবু ও আমি রীতিমত তালিম দিতে শুরু করে দিলাম। জ্যোতিষবাবু 'মৃণালিনী' বইটার লাল পেন্সিলে দাগ দেওয়া সংলাপগুলো প্রম্‌ট করতে শুরু করলেন। আবার শুটিং আরম্ভ হল।

হেমচন্দ্র—গুরুদেব! আপনি আশামাত্রের আশ্রয় লইতেছেন; আমিও তাহাই করিলাম; এক্ষণে আমি কি করিব—আজ্ঞা করুন।

মাধবাচার্য—আমিও তাহাই চিন্তা করিতেছিলাম। এ নগরমধ্যে তোমার আর অবস্থিতি করা অকর্তব্য। কেন না, যবনেরা তোমার মৃত্যুসাধন সংকল্প করিয়াছে। আমার আজ্ঞা তুমি অদ্যই এ নগর ত্যাগ করিবে।

হেমচন্দ্র—কোথায় যাইব?

—'চুলোয়!' আবার সেই কণ্ঠস্বর, আরো তীব্র আরো ক্রুদ্ধ। —'শালারা জ্বালায়ে মারলো, দূর হ! নইলে একক্কেরে মাইর‍্যা ফ্যালামু?'

উঠে দাঁড়িয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে জ্যোতিষবাবুর দিকে চাইলাম। জ্যোতিষবাবুও দেখলাম বেশ হকচকিয়ে গেছেন। হাঁ করে চারদিকে চাইতে চাইতে বললেন—এ তো বড় তাজ্জব ব্যাপার! কে এইভাবে শুটিং ডিস্টার্ব করছে? বাইরের লোক যারা ছিল, সব সরিয়ে দিয়েছি। আমার ইউনিটের কারও সাহস হবে না, তবে?'

মাধবাচার্যরূপী কার্তিকবাবু হেঁড়ে গলায় বললেন—'ভূত!'

জঙ্গলের থমথেম নীরবতা মুহূর্তের জন্যে হাল্কা হাসিতে কেঁপে উঠল। জ্যোতিষবাবু বললেন—'জঙ্গলটা একবার ভাল করে দেখতো—মনে হয় ওর ভিতর লুকিয়ে থেকে কোনও দুষ্টু লোক এইসব করছে। দু'তিন জন সেটিংএর লোক জঙ্গলে ঢুকে পড়ে তন্ন তন্ন করে খুঁজে এল, কোথাও কেউ নেই। শুধু কয়েকটা শেয়াল ছুটে পালিয়ে গেল আর কতক

গুলো ছোটবড় পাখি ডানা ঝেড়ে বৃক্ষান্তরে উড়ে গিয়ে বসল।

জ্যোতিষবাবু জঙ্গলের চারপাশে চার পাঁচ জনকে দাঁড় করিয়ে দিলেন। আবার রিফ্লেকটার ঠিক করে শুটিং আরম্ভ হল। ক্লোজ শটে মিড শটে আমার আর কার্তিকবাবুর সিনগুলো ঘণ্টাখানেকের মধ্যে শেষ হয়ে গেল। আর কোনও রকম ডিস্টারবেনস্ হল না।

হেমচন্দ্রের নিকট 'মৃণালিনী'র বিবাহ এবং পরে ব্যোমকেশের সব বৃত্তান্ত শুনে গুরুদেব খুশী হয়ে হেমচন্দ্রকে সস্ত্রীক মথুরায় গিয়ে বাস করবার নির্দেশ দিলেন। ঠিক হল মাধবাচার্য এখান থেকে সোজা কামরূপ চলে যাবেন এবং উপযুক্ত সময় এলে হেমচন্দ্রকে কামরূপাধিপতি দূতে পাঠিয়ে আহ্বান করবেন। মৃগচর্ম কমণ্ডলু প্রভৃতি আবশ্যকীয় জিনিসগুলো নিয়ে মাধবাচার্য উঠে দাঁড়ালেন, হেমচন্দ্রও প্রণাম করে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন হঠাৎ মাধবাচার্য বললেন—দাঁড়াও!

সিনটা এইখানে কাট্ হল। জ্যোতিষবাবু বললেন—'ব্রেক ফর লাঞ্চ।' কাছে গিয়ে বললাম—'সিনটা তো শেষ হল না বাড়ুয্যেমশাই—কাট বললেন কেন?'

হেসে জবাব দিলেন জ্যোতিষবাবু—'পরিচালক হও, তখন বুঝতে পারবে।'

স্টুডিওর বাবুর্চি আহমেদ-এর রান্না খুব ভাল। সেদিন খেলাম মাংসের চাপাটি, মুগের ডাল, মুরগীর কারি জাতীয় একটা প্রিপারেশন। সরু সুগন্ধি চালের ভাত আর বড় একটা মর্তমান কলা। খেতে খেতে গল্প হচ্ছিল। বললাম, —'দুপুরের ভুতুড়ে ব্যাপারটা সম্বন্ধে আপনার কি ধারণা!'

একটু ভেবে নিয়ে জ্যোতিষবাবু বললেন—'সত্যি কথা যদি শুনতে চাও আমাদেরই মধ্যে কেউ কাছে থেকে ঐরকম আওয়াজ করেছে। ক্যামেরার আওয়াজ, তার উপর অতগুলো রিফ্লেকটার হঠাৎ অন্যদিকে চাইলে চোখ ধাঁধিয়ে দেয়—এ অবস্থায় ধরা না পড়ে একটু মজা করা খুব আশ্চর্য নয়। আচ্ছা! কালকের মধ্যেই আমি রিয়েল কালপ্রিটকে বার করব।'

খাওয়া-দাওয়ার পর প্রসঙ্গ বদলে গেল, বললাম—'খালি তো আমাকে নিয়েই শুটিং চালাচ্ছেন। আপনার নায়িকা মৃণালিনীর তো দর্শন আজও পেলাম না।'

বেশ একটু গম্ভীর হয়ে জ্যোতিষবাবু বললেন—'পাবে, পাবে, ধৈর্য ধর। একদিন শুটিং করে চার পাঁচদিন বন্ধ দিচ্ছি কিসের জন্যে? শুধু মৃণালিনীকে তালিম দেওয়ার জন্যে। যেদিন শুটিং না থাকে ডরিসকে হেড অফিসে এনে রীতিমত ট্রেনিং দিচ্ছি। এর পর যখন বাজারে ছাড়ব, সবার তাক লেগে যাবে।'

অবাক হয়ে বললাম—'ডরিস? বাঙ্গালী মেয়ে নয়?'

মাথা নেড়ে জ্যোতিষবাবু বললেন—'নো! কিন্তু এ মেয়ে অদূর ভবিষ্যতে বাঙ্গালী মেয়েকে লজ্জা দেবে—এ আমি ভবিষ্যদ্বাণী করলাম। আরও একটা বিশেষ কারণে হুট্ করে নাবাচ্ছিনে।'

বললাম—'কি কারণ?'

আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে আশে-পাশে একবার দেখে নিয়ে চুপি চুপি বললেন জ্যোতিষবাবু—'ভাংচি দেবে।'

চুপ করে রইলাম। দ্বিগুণ উৎসাহে জ্যোতিষবাবু শুরু করলেন—'মেয়েটার নাম মিস্ ডরিস স্মিথ। কিন্তু বাংলা ছবির নায়িকার ও নাম তো চলবে না, দাওনা একটা প্রাণমাতানো বুককাঁপানো মিষ্টি বাংলা নাম!'

ম্লান হেসে বললাম—'মাফ করবেন স্যার, ফিরিঙ্গি মেয়েদের দেখলেই আমার এমনিতেই বুক কেঁপে ওঠে। আপনিই যা হয় একটা নাম দিয়ে দিন না!'

চিন্তিত মুখে আকাশের দিকে চেয়ে সিগারেট টানতে লাগলেন জ্যোতিষবাবু। মনে হল নাম-সাগরে তলিয়ে গেছেন।

চুপ চাপ বসে চারদিক চাইছি, হঠাৎ দেখি, উত্তরদিকে একটা আমগাছের আড়াল থেকে বকের মত গলাটা বাড়িয়ে হাসছে মনমোহন। আস্তে আস্তে উঠে এক পা দু'পা করে কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। একটা আঙুল মুখে দিয়ে আমাকে চুপ করতে বলে একরকম টেনে নিলে গাছটার আড়ালে। বেশ একটু অবাক হয়ে বললাম—'কি মনমোহন! এতক্ষণ ছিলি কোথায়?'

—'এখানে।'

—'এখানে ছিলি অথচ এতক্ষণ খুঁজে পেলাম না, ব্যাপার কি?'

এতক্ষণ বাদে শুরু হল মনমোহনের ভাবসিদ্ধ হাসি। বললে—'মেশোমশাই না করে দিয়েছে শুটিংএ আসতে। আমি কিন্তু আগাগোড়া তোদের শুটিং দেখেছি।'

অবাক হয়ে বললাম,—'কি করে?'

হাত দিয়ে আমগাছটার উঁচু ডালটা দেখিয়ে মনমোহন বললে,—'ওখানে বসে। হাঁরে তোদের মাধবাচার্য কি পূর্ববঙ্গের ভাষায় সংলাপ বলছে?'

—'কেন বলতো?'

—'ডালে বসে পাতার আড়াল থেকে অদূরে স্পষ্ট দেখা না গেলেও মনে হল মাধবাচার্য ভয়ানক রেগে গিয়ে তোকে ভাল ভাষায় তড়পাচ্ছে।'

রহস্যের মাঝখানে একটুখানি ক্ষীণ-আশার আলো দেখতে পেলাম যেন।

বললাম,—'ছিঃ মনমোহন, কাজটা ভাল করনি, জ্যোতিষবাবু ভীষণ চটে গেছেন।'

ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেল মনমোহনের, বললে—'কি বলতে চাইছিস্ তুই?'

বললাম—'আমি অবিশ্যি তোর নাম বলবো না কিন্তু উনি যদি কোনওরকমে জানতে পারেন—'।

কথা কেড়ে নিয়ে মনমোহন বললে—'কি জানতে পারেন, আমি গাছ থেকে লুকিয়ে শুটিং দেখেছি, এই কথা?'

জবাব দেবার আগেই শুটিংএ ডাক পড়ল। তাড়াতাড়ি জঙ্গলে ঢুকে পড়লাম। সূর্য গাছের আড়ালে ঢাকা, মাধবাচার্যের কুটীরের চারপাশ অন্ধকার হয়ে আসছে। মনে মনে ভাবলাম, এই আলোকে শুটিং হবে কি করে।

জ্যোতিষবাবু বললেন—একটু অন্ধকার না হলে এ সিনটা নেওয়া বৃথা হ'ত—সেইজন্যেই এতক্ষণ অপেক্ষা করছিলাম।'

এরই মধ্যে দেখলাম, জ্যোতিষবাবুর সহকারী জয়নারায়ণ মাধবাচার্যের দাওয়ায় মাটির পিলসুজের উপরে রাখা একটি মাটির প্রদীপ তেল সলতে দিয়ে জ্বালিয়ে দিল। ব্যাপারটা ঠিক তখনও বুঝতে পারিনি। প্রদীপ জ্বালা হলে জ্যোতিষবাবু কার্তিকবাবু ও আমাকে ডেকে বললেন—'সিনটা ভাল করে শুনে নাও কি করতে হবে তোমাদের। আগের শটে তোমাকে দাঁড়াও বলেছেন মাধবাচার্য, এবার শট আরম্ভ হলেই তিনি দাওয়ার উপর থেকে মাটির প্রদীপটা হাতে করে নিয়ে সলতেটা একটু বাড়িয়ে দিয়ে কুটীরের ঐ খড়ের চালায় আগুন লাগিয়ে দেবেন—তুমি ধীরাজ অবাক হয়ে বলবে—গুরুদেব, এ কি করছেন? তখন কার্তিকবাবু বলবেন—বৎস হেমচন্দ্র, রাজনীতি, যুদ্ধনীতি বড়ই জটিল, পিছনে যবন সৈন্য আমাদের অনুসরণ করছে, এমতাবস্থায় সামনে কোনও চিহ্ন রেখে যাওয়া মূর্খতার পরিচায়ক—তাই এ স্থান ত্যাগ করবার পূর্বে কুটির ভস্মীভূত করে যাচ্ছি। তারপর তোমরা যখন দেখবে যে, আগুন বেশ জ্বলে উঠেছে তখন আস্তে আস্তে ক্যামেরার ডান পাশ দিয়ে সিন থেকে আউট হয়ে যাবে। বুঝেছ?'

দুজনে উৎসাহভরে মাথা নাড়লাম।

জঙ্গলের উপর একটু একটু করে পাৎলা অন্ধকার নেমে আসছে। জ্যোতিষবাবুর নির্দেশ মত কুটিরে আগুন লাগিয়ে আমরা সরে এলাম। শুকনো বাঁশ-খড়-দরমা দেখতে দেখতে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। সমস্ত জঙ্গলের উপর কে যেন ধামা ধামা আবির ছড়িয়ে দিয়েছে। মুগ্ধ তন্ময় হয়ে ক্যামেরার পাশে দাঁড়িয়ে দেখছি, হঠাৎ গগনভেদী চিৎকার—'বাঁচাও, পুইড়্যা মল্লাম, আমারে বাঁচাও!!'

কণ্ঠস্বর পরিচিত। সবাই চঞ্চল হয়ে উঠলাম। এবার বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারলাম—আওয়াজ আসছে মাধবাচার্যের জ্বলন্ত কুটিরের ভিতর থেকে। বোধ হয়, কয়েক সেকেন্ড। তারপরই চার পাঁচজন সেটিং-এর লোক ছুটে অনেক কষ্টে ঢুকে পড়ল ঐ জ্বলন্ত কুটিরে। এদিকে চিৎকারের কামাই নেই—বাঁচাও আমারে, বাঁচাও। আজও মনে হলে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।

ক্যামেরা থামিয়ে সবাই এক সঙ্গে চিৎকার করে বললাম—তোমরা বেরিয়ে এস, এক্ষুনি ঘর পড়ে যাবে। শুধু ফটাস্ ফটাস্—বাঁশের গিরেগুলো ফাটার শব্দ। একটু পরেই একটা লোককে চাঙদোলা করে ধরে আধমরা হয়ে বেরিয়ে এল সেটিং-এর লোকগুলো। একরকম সঙ্গে সঙ্গেই ঝুপ করে জ্বলন্ত কুটিরের চালখানা পড়ে গেল।

বাইরে এনে আধপোড়া লোকটাকে ঘাসের উপর শুইয়ে দিল। কুটিরের আগুনে মুখ দেখে সবাই এক সঙ্গে চিৎকার করে উঠলো—'মধুসূদন!'

মধুসূদন ধাড়ার বাড়ি পূর্ববঙ্গে, বছর তিনেক আগে চাকরীর চেষ্টায় কলকাতায় এসে কি করে সেটিং মাস্টার দীনশা ইরানীর নজরে পড়ে যায়। সেই থেকে সেটিং ডিপার্টমেন্টে কাজ করে। আগের দিন মাইনে পেয়েছে, আজ কি কারণে যেন সেটিং ডিপার্টমেণ্ট বন্ধ। সকাল থেকে স্টুডিও সংলগ্ন বিখ্যাত তাড়ির দোকানে বসে অকুণ্ঠ তাড়ি খেয়ে বেলা দশটার মধ্যেই প্রায় বেহুঁশ হয়ে নির্জনে বিশ্রাম নেবার জন্যে মাধবাচার্যের কুটিরে ঢুকে খড় লতাপাতা জড় করে তার উপর শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। পরের দুর্ঘটনা না বললেও চলে।

ভিড় ঠেলে কাছে গিয়ে দেখলাম, দু' তিন জায়গায় ফোস্কা পড়ে গেছে। বেশ কয়েকদিন ভুগবে, প্রাণে মরবে না।

রাগে চুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে জ্যোতিষবাবু বললেন—'ব্যাটা পুড়ে মলে আমি সবচেয়ে খুশি হতাম।'

এরকম নিষ্ঠুর কথা জ্যোতিষবাবুর মুখে এর আগে কখনও শুনিনি, অবাক হয়ে মুখের দিকে চাইলাম। আমার দিকে চেয়ে জ্যোতিষবাবু বললেন—'কথাটা কেন বললাম বুঝতে পারলে না? ব্যাটা মলে খবরটা সাহেবদের কানে যেত। তাহলে যত অশান্তির মূল ঐ তাড়ির দোকানটা তুলে দেবার একটা ছুতো অন্তত খুঁজে পেতাম।' (ক্রমশ)

* আদিবাসীদের বিবাহ-প্রথা *

নিখিল মৈত্র ও সুনীল জানা

ভারতবর্ষের বিরাট আদিবাসী সমাজের জীবনযাত্রায় বহু বৈচিত্র্য রয়েছে। তাদের প্রতিটি উৎসব অনুষ্ঠান অফুরন্ত আনন্দময় জীবনীশক্তির স্পর্শে সজীব হয়ে ওঠে। বিবাহ বাসর আদিম জাতির সব থেকে স্মরণীয় উৎসব। নাচ, গান, ভোজন এবং পানে গ্রামের প্রতিবেশীরা মিলিত হয়, সকলে মিলে নব দম্পতীকে নতুন জীবন শুরু করার শুভ মুহূর্তে স্বাগত সম্ভাষণ জানায়।

বিবাহের আগে যুবক যুবতী বহু ক্ষেত্রেই নিজেদের ভবিষ্যৎ জীবনের সঙ্গী নির্বাচন করে। শিশু বিবাহ বা অভিভাবকদের দ্বারা পাত্রী মনোনয়ন—এসব প্রথাও কোনও কোনও উপজাতিদের মধ্যে প্রচলিত। তবে তা হিন্দুসমাজের সংস্পর্শে আসার ফলেই আদিবাসী সমাজে সংক্রামিত হয়েছে বলে মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। যেমন বিবাহ বিচ্ছেদ না করেই একাধিক বিবাহ করা এ বিধি কয়েকটি হিন্দু ভাবাপন্ন উপজাতি খুব সম্প্রতি গ্রহণ করেছে। উপজাতিদের মধ্যে ছেলেমেয়েদের মেলা মেশায় কোনও বাধা নেই। কয়েকটি আদিম জাতির মধ্যে কিশোর কিশোরীদের সঙ্গে নাচে, গানে যাতে অবাধ আলাপ পরিচয় হতে পারে তারও বিশেষ ব্যবস্থা আছে। এই প্রসঙ্গে মধ্যপ্রদেশের মুরিয়া ঘোটুলের কথা বলা প্রয়োজন। দশ এগারো বছর থেকে ছেলে মেয়েরা একসঙ্গে গ্রামের যৌথাবাস—ঘোটুলে—বসবাস করে। আগে অনেক ঘোটুলেই ছেলে মেয়েরা একই সঙ্গে থাকত, এখন আলাদা বাসগৃহে তারা থাকে। যুবকদের বাসগৃহকে চেলিক ঘোটুল এবং যুবতীদের আবাসস্থলকে মোতিয়ারী ঘোটুল বলে উল্লেখ করা হয়। প্রতিটি ঘোটুলের কাজ কর্ম দেখা শুনো শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যে বয়স্ক যুবকদের (বা যুবতীদের) দায়িত্ব দেওয়া হয়। বিভিন্ন পদবীতেও এই সব পদাধিকারীদের ভূষিত করা হয়েছে। তবে, নামকরণ করা হয়েছে জমিদারী সেরেস্তার আমলাদের পদবী অনুযায়ী। ছেলেদের ঘোটুলে সর্বাধিনায়ক সিরেদর, তার নিচে সুবেদার, লাহরাস প্রভৃতি। তেমনি মেয়েদের মোতিয়ারী ঘোটুলের নেত্রী ঝালিইয়ারু, তারপর লাহারি, মানজোরো প্রভৃতি।

বৃষ্টিবাদল বা অন্য কোনও বাধা নিষেধ (টাবু) না থাকলে প্রতি সন্ধ্যায় মোতিয়ারি ও চেলিকদের দল সেজেগুজে একসঙ্গে নাচগান করে। নতুন শিক্ষানবীশের দল বড়দের দেখে গান ও নাচের তাল শেখে। অল্প কিছুদিনের মধ্যে প্রথম পরিচয়ের জড়তা কেটে যায় এবং যুবক যুবতীরা নিজেদের পছন্দমত সঙ্গী নির্বাচন করে। নির্বাচনের সময় অবশ্য সমগোত্রের যাতে দুইজন না হয় সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হয়। এক গোত্রের ছেলেমেয়েদের 'দাদাভাই' সম্পর্ক। সুতরাং তাদের মধ্যে বিবাহ বা প্রেম অবৈধ। অন্য গোত্রের (আকোমামা) মধ্যে থেকে সঙ্গী-সঙ্গিনী নির্বাচনের পূর্ণ অধিকার ঘোটুল সভ্য-সভ্যাদের আছে। সামাজিক বিধান অনুযায়ী বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ না হলেও প্রেমিক-প্রেমিকারা কখনও নিজেদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে না। বিবাহের আগে যৌন-সম্পর্কে কোন বাধা নেই, তবে অন্তঃসত্ত্বা হলে অপরাধ। সেরকম ক্ষেত্রে তাদের টিকা প্রথায় বিবাহ দিয়ে দেওয়াই বিধেয়। এমন বহু গ্রাম আছে যেখানে একই গোত্রের লোক বসবাস করে, সেখানে অবশ্য বিবাহ বা চেলিক-মোতিয়ারীর প্রেম কিছুই সম্ভব নয়। অনেক ক্ষেত্রে অবশ্য গোত্রজদের মধ্যেও পূর্বরাগ বা যৌন সম্পর্ক হয়েছে বলে শুনতে পাওয়া যায়। ঘোটুলের প্রেমিক-প্রেমিকাদের বিবাহ কোনও বিশেষ কারণে না হলে এবং অন্যত্র বিবাহ স্থির হলে, সমস্ত চেলিক

সাঁওতাল বিবাহ মণ্ডপ

মোতিয়ারিদের সামনে সে কথা জানিয়ে য় দুজনে মিলিতভাবে ঘোষণা করে এরপর থেকে তাদের সম্বন্ধ ভাই-নের মত। বিবাহ করার পর পুরাতন মাস্পদের সঙ্গে গোপন সম্পর্ক কেউ খে না এবং ব্যভিচারের অভিযোগও নতে পাওয়া যায় নি। মুরিয়া ঘোটুলে বতীরা চেলিক প্রেমিককে প্রতিদিন রিচর্যা করে এবং দিনের বেলাতেও থভাবে চাষবাস করে। ঘোটুলে মাজিক ক্রিয়াকলাপও শেখানো হয়। ববাহ হয়ে যাবার পর বন্ধুবান্ধবীদের ভাজনে, পানে আপ্যায়িত করে দম্পতী ঘাটুল থেকে বিদায় নিয়ে নিজেদের বতন্ত্র বাসস্থানে চলে যায়।

পার্বত্য মুরিয়া ও ঝরিয়া মুরিয়াদের ধ্যেও ঘোটুল প্রথা আছে, তবে মুরিয়া-দের মত অত বিস্তৃত ও ব্যাপক নয়। অনেকে মনে করেন যে, পার্বত্য মুরিয়ারা অপরিচ্ছন্ন এবং স্নানে বীতরাগী—তার প্রধান কারণ যে, তাদের ঘোটুলে কোনও যুবতীর প্রবেশ অধিকার নেই। পদম আবরদের (আসাম) মধ্যেও যৌথবাস গৃহের প্রচলন আছে। যুবকদের আবাস-স্থলকে মুণ্ডপ এবং যুবতীদের যৌথ-গৃহকে রাসেঙ্গ বলে অভিহিত করা হয়। এখানেও বিবাহের পূর্বে যৌন সম্বন্ধে কোনও বাধা নেই তবে সন্তানসম্ভবা হলে যুবতীকে বিবাহ করতে প্রেমিক বাধ্য। কোন্যাক নাগাদের মধ্যেও মোরুঙে গ্রামের যুবকেরা মিলিত হয় এবং যুবতীদেরও স্বতন্ত্র বাসগৃহ আছে। একই গ্রামের মোরুঙগদের মধ্যে বিবাহ বা প্রেম বিনিময় সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এমন কি প্রেম সম্বন্ধে কোনও আলোচনাও সেই মোরুঙের যুবতীর সামনে করা অন্যায়। আসামের হিন্দুভাবাপন্ন মিকির উপ-জাতির মধ্যে কিন্তু বিবাহের আগে যুবক যুবতীদের যৌন সম্পর্ক একেবারেই হয় না। তবে গ্রাম বৃদ্ধেরা বলেন যে, সুদূর অতীতে তেরাঙ্গ নামে যৌথগৃহ মিকিরদেরও ছিল, সেখানে যুবক-যুবতীরা একই সঙ্গে থাকত। বিবাহের আগেই অনেক সময় শিশুর জন্ম সে সময়ে হতো। ওরাঁও যুবকদের সমষ্টিগত জীবন জোনখ্ এরপা (বা ধাঙ্গর কুরিয়া)তে ও যুবতীদের পেল-এরপা (বা পেলো কোটওয়ার)তে অতিবাহিত হয়। যৌথাবাসে প্রবেশের তিন বছরের মধ্যে কোনও যুবকের যুবতীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ-ভাবে মেলামেশা করা নিষিদ্ধ। এক গোত্রের অবিবাহিত প্রেমিক প্রেমিকার মধ্যে যৌন সম্পর্কেও কোনও বাধা নেই, তবে বিবাহ কখনই হতে পারবে না।

অনেক ক্ষেত্রে উপজাতি যুবক-যুবতী নিজেদের মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধে আলোচনা করে স্থির করে এবং বিশেষ কোনও অনুষ্ঠানের সাহায্যে নিজেদের মতামত অগ্রজদের জানিয়ে দেয়। বিশাখাপত্তন জেলার (অন্ধ্রের) নাগ্গা পোরোজা উপ-জাতির মধ্যে এইরকম এক প্রথা প্রচলিত। বসন্তের এক শুভ দিনে গ্রামের বিবাহ-যোগ্যা যুবতীদের এক বিরাট গর্ত করে তার মধ্যে রাখা হয়। এক এক করে তরুণেরা সেখানে এসে নিজের প্রেমিকার নাম ধরে গান গাইতে আরম্ভ করে। প্রেমের এই অর্ঘ্য যুবতী যদি গ্রহণ করতে রাজি থাকে, তবে সে উপরে উঠে আসে। শুভ সংবাদ সবাইকে জানাবার জন্যে আগুন জ্বালান হয়। সবাই মিলে আগুনের চারদিকে বহুক্ষণ ধরে নাচগান করে। যুবতী অসম্মতি জানাতে চাইলেও সুললিত কণ্ঠে গান গেয়ে যুবককে জানিয়ে দেয় যে, এই প্রস্তাব গ্রহণ করতে সে অক্ষম। একবার নাকি অপেক্ষমান এক যুবতীদলের উপর অতর্কিতে এক নর-খাদক ব্যাঘ্র আক্রমণ করে। কিছুদূর থেকে প্রেমপ্রার্থী যুবকেরা সাহায্য করতে আসার আগেই বাঘ তরুণী-রক্ত পান করে সরে পড়েছিলো। পশ্চিম বিন্ধ্য পর্বতমালার অধিবাসী ভীল সমাজের মধ্যে বিবাহের আগে যৌন সম্পর্কে কোনও বাধা নেই কিন্তু সেক্ষেত্রে বিধিসম্মত আচার অনুষ্ঠানে বিবাহ উৎসব উদ্‌যাপিত হয় না। মণিপুরের নাগারা সগোত্রজদের মধ্যে (যাদের বিবাহ কখনই হতে পারে না) বিয়ের আগে যৌন সম্বন্ধে কোনও আপত্তি করে না, কিন্তু বিবাহের পর ব্যভিচার কঠোর হস্তে দমন করা হয়। কোনও কোনও উৎসব অনুষ্ঠানের পর অনূঢ়া যুবক যুবতী এক সঙ্গে রাত্রি যাপন করার বিধিও প্রচলিত।

যে সমস্ত উপজাতির মধ্যে শিশু-বিবাহ বা শৈশবঅবস্থায় বাগ্‌দত্ত করার রীতি প্রচলিত সেখানে স্বভাবতই পূর্ব-রাগের অবসর নেই। মহারাষ্ট্রের ওয়ারাল উপজাতির মধ্যে সাধারণত ১০ থেকে ১৪ বছর বয়সেই বিয়ে হয়। তারও কয়েক বছর আগে অভিভাবকরা বিয়ে স্থির করে বোল উৎসব অনুষ্ঠান করেন। বোল অর্থ শর্ত। ভাবী বরের বাড়ির কয়েক-জন বয়স্ক অভিভাবক পর্যাপ্ত ভোজনদ্রব্য ও ততোধিক পানীয় নিয়ে একদিন কন্যার বাড়িতে যান। সেইখানে পান ও আহারের সঙ্গে কথাবার্তা ঠিক হয়। গ্রামবৃদ্ধ-কর্তাব্যক্তি-আমন্ত্রিত হয়ে উপস্থিত থাকেন। তাঁরই সামনে দুই পক্ষ থেকেই পাকা কথা হয়ে যায়। বিবাহ তার পরেই হতে পারে। তবে আর্থিক অনটন বা অন্য কোনও কারণে কয়েক বছরও অপেক্ষা করতে হতে পারে। পরে যদি বরপক্ষ এ বিবাহ-প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে চায়, তবে, বিনা কোনও ক্ষতিপূরণ দিয়েই তা করা সম্ভব। কন্যাপক্ষকে বিবাহ বন্ধ করতে গেলে বরপক্ষ আগে যা খরচ করেছে তা দিতে হয়। ময়ূর-ভঞ্জের বাথুরিয়া উপজাতির জীবনধারা হিন্দুসমাজের রীতি নীতি দ্বারা বহু পরিমাণে প্রভাবান্বিত। সেখানেও বিয়ে ১৪।১৫ বছরেই হয়ে যায় এবং অভি-ভাবকরা নিজেদের পছন্দের কথা গণৎ-কারদের জানান, তাঁদের সম্মতি পেলে পাকা কথাবার্তা হতে পারে। শাওড়া উপজাতির কয়েকটি শাখা এবং ভুনজিয়া আদিবাসী (মধ্য প্রদেশ) যৌবনে পদার্পণ করার পর বিবাহ বিধিকে অন্যায় বলে মনে করে। অনেক সময় উপযুক্ত পাত্রের অভাবে আসন্ন যৌবনসম্ভবা কিশোরীর বিবাহ তীরের সঙ্গে সম্পন্ন হয়। এই বিবাহের নামঃ কাণ্ড বিবাহ। পরে উপযুক্ত বর পাওয়া গেলে বিধবার যে রীতিতে পুনর্বিবাহ হয় সেভাবে 'বাণ পত্নী'দেরও বিবাহ হয়।

মধ্যপ্রদেশের বইগা উপজাতির মধ্যে বিয়ের আগে যে কোনও সময়ে বাক্‌দান করার উৎসব অনুষ্ঠান করা যেতে পারে। সাধারণত বরকন্যা যৌবনে পদার্পণ করার পরই এ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বরপক্ষের এক দল গিয়ে মেয়ের বাড়িতে খবর দেয় যে, ছেলের বাবা, মা, ছেলে ও অন্যান্য আত্মীয়েরা আসছে। বরযাত্রীরা যাবার

মধ্য ভারতের মুরিয়া তরুণ তরুণী

সময় মুরগি, নারকেল, কাপড়, চুড়ি এবং পর্যাপ্ত পানীয় (মদ) নিয়ে মেয়ের বাড়ি গিয়ে উপস্থিত হয়। মেয়ের বাবা অতিথিদের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করেন। ভাবী বেয়াই উত্তর দেনঃ "আমার বীজ রাখার এক পাত্রের প্রয়োজন। আপনার কাছে কি কোনও পাত্র আছে?" এ পক্ষ থেকে জবাব মেলেঃ "হ্যাঁ, আছে।" সবাই মিলে তখন বাড়িতে প্রবেশ করেন। মেয়ের বাবা একপাত্র মদ নিয়ে কয়েক ফোঁটা দুলহা দেও, ভিত্রহা দেও, করিআত, ভবানী মাতা, নারায়ণ মাতা, ঘরের অধিষ্ঠাতা দেবতা, পূর্বজ এবং সমস্ত পুণ্যবস্তুর উদ্দেশ্যে অর্পণ করেন। তারপর বাবা মেয়েকে বিয়ের প্রস্তাবের কথা জানান। যতক্ষণ মেয়ে সম্মতি না দিচ্ছে, ততক্ষণ পিতা বিবাহ সম্বন্ধে কোনও কথাই বলার অধিকারী নয়। সময়ে ভীল যুবক তার বন্ধুদের নিয়ে ভগোরিয়া মেলে চড়াও করে প্রেমিকাকে সঙ্গে করে নিয়ে যায়। পরে গ্রামবৃদ্ধেরা এক উৎসব অনুষ্ঠান করেও এ বিবাহকে স্বীকার করে নেয়। প্রতিবেশী হিন্দু (যারা আদিবাসী নয়) সমাজে এভাবে কন্যাকে নিয়ে যাওয়াকে 'ঘিঘ কর লে জানা' বলে উল্লেখ করা হয়। মিকির আদিবাসীদের আকে জোই বিবাহে কোনও কিছু দিতে হয় না এবং বিবাহ আচারও অতি সাধারণ। পার্বত্য খারিয়াদের মধ্যে অসাহিফু প্রেমিক বাজারে সকলের সামনে নিজের প্রেমিকাকে সিন্দুর লেপন করে দেয়। মাথায় সিঁদুর দেওয়ার অর্থই হল যে তাদের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। মিরি উপজাতির যুবক-যুবতীও গ্রাম থেকে জঙ্গলে পালিয়ে গিয়ে কয়েকদিন স্বামী-স্ত্রী রূপে বসবাস করে। তারপর গ্রামে ফিরে এসে সেকথা ঘোষণা করলে সমাজ তাদের স্বামী-স্ত্রীর মর্যাদা দেয়। খারিয়াদের মধ্যে ঢুকু চোলিক বা ঢুকু দিয়ারকি প্রথায় বিবাহের একটু বৈশিষ্ট্য আছে। এক্ষেত্রে বিধবা বা কুমারী উদ্যোগী। এক ভাঁড় যেনো মদ অথবা এক ঝুড়ি মহুয়া ফুল নিয়ে বিবাহেচ্ছু নারী গিয়ে প্রেমিকের বাড়িতে চড়াও হয়ে বসে। সেখানে সে কয়েকদিন থাকে—যতক্ষণ তাকে স্ত্রী বলে গ্রহণ না করছে, অথবা জোর করে বাড়ির থেকে তাড়িয়ে না দিচ্ছে। খারিয়াদের ধারণা যে পুরুষের কোনও সম্মোহন ওষুধেই স্ত্রী এভাবে আকর্ষিত হয়ে নিজের বিয়ের দায়িত্বভার গ্রহণ করে। এরকম অবস্থায় কন্যাপক্ষকে কোনও কিছু দেবার প্রশ্ন উঠে না। তবে, সদ্ভাব বজায় রাখার জন্যে কুমারীর পিতাকে বরপক্ষ যৌতুক দেয়। বিধবার জন্যে কোনও অবস্থাতেই কিছু দিতে হয় না, এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয় না। উদ্রা উদ্রি চোলিক প্রথা

সারে প্রেমিক প্রেমিকা নাচের আসর বাজার থেকে পালিয়ে জঙ্গলে চলে । যুবক সকলের সামনে প্রেমিকাকে র করে ধরে নিয়ে পালাবার ভান করে। খানে কিছুদিন থাকার পর তারা জেরা স্বেচ্ছায় ফিরে আসে, অথবা ত্মীয় স্বজনেরা খুঁজে তাদের বের র নিয়ে আসে। সেক্ষেত্রে কন্যাপক্ষকে া টাকা দিতে হয় এবং সকলের সামনে িঁদুর দিয়ে বধূবরণ করে নেওয়া হয়। পেদ্রোম তাপপায় প্রথায় প্রেমিক জোর র সিঁদুর লাগিয়ে দেয়, তার জন্যে টি ছয়টি পশু বরপক্ষকে কন্যার পিতাকে তে হয়। এখানে মনে রাখা দরকার যে য়েয়র পক্ষ থেকে যদি অভিযোগ করা য় যে তার সঙ্গে যুবকের কোনও প্রেম ছল না বা এখনও নেই এবং যা কিছু ন করেছে সব মেয়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, াহলে বিবাহ হবে না দুর্বৃত্ত যুবককে খন ভীষণ প্রহার দিয়ে পঞ্চ বিদায় করে।

দরিদ্র বিবাহেচ্ছু যুবকের পক্ষে আরও এক উপায়ে বিবাহ করা সম্ভব। আমাদের ভাষাতে এ ব্যবস্থাকে কতকটা ঘরজামাই প্রথা বলা যেতে পারে। ওয়ারলি-দের মধ্যে ঘরোর (ঘরজামাই) পাঁচ বছর ধরে শ্বশুরের বাড়িতে কাজকর্ম করে। বস্তুত সে পরিবারেরই একজন হয়ে থাকে। তারপর বিবাহের যা কিছু খরচ সমস্ত শ্বশুরকেই দিতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে কন্যা হয়ত বিবাহে আপত্তি করে, তখন এতদিন কাজ করার জন্যে ভগ্ন-মনোরথ ঘরোরকে ক্ষতিপূরণ মেয়ের বাবাকে দিতে হয়। বইগাদের মধ্যেও লামসেনা বা গহনিয়া হিসেবে যুবকেরা ভাবী শ্বশুরের বাড়িতে থেকে কাজ কর্ম করে। কাজে যোগদানের সময় বিশেষ কোনও উৎসব অনুষ্ঠান হয় না, কেবল এক বোতল মদ উপহার দিয়েই যুবক বিয়ের জন্যে শ্রমদান আরম্ভ করে। বিবাহযোগ্য বয়েস হলে কাজ করার সময়েই লামসেনার বিয়ে হয়ে যায়। শ্বশুরের ঋণ সে ধীরে ধীরে পরিশোধ করে। বিবাহ না হলে লামসেনা ও তার ভাবী স্ত্রীর মধ্যে যৌন সম্পর্ক নিষিদ্ধ। বিধবার বাড়িতে কোনও লামসেনা থাকার নিয়ম নেই। আর তার প্রয়োজনও হয় না; কারণ, বিধবা বিবাহে কন্যার পিতাকে কোনও যৌতুকই দিতে হয় না। গোন্ড উপজাতিদের মধ্যে সাধারণত ঘরজামাইকে বহুক্ষেত্রে তার দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে বঞ্চিত করা হয়। কয়েকবছর খাটিয়ে নেবার পর ঘরজামাইকে ছুতোনাতা করে বের করে দেওয়া হয়। বিবাহ বা ক্ষতি-পূরণ কোনও কিছুই তাকে দেওয়া হয় না। অনেক সময় আবার আইন বাঁচাবার জন্যে বিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু সে খালি আনুষ্ঠানিক ব্যাপার। বিয়ের কয়েক-মাসের মধ্যেই কন্যা স্বামীকে পরিত্যাগ করে অন্য কারুর সঙ্গে চলে যায়। গোন্ড সমাজ প্রতিবেশী অগ্রসর হিন্দু ভাব-ধারায় যথেষ্ট প্রভাবান্বিত।

উপজাতি সমাজে সাধারণভাবে সগোত্রের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিবাহ সম্পর্কে উপ-জাতির বাইরের কারুর সঙ্গে স্থাপিত হতে পারে না। গোন্ড, মারিয়া, মুরিয়া, ঝোরিয়া মুরিয়া প্রভৃতি কয়েকটি উপ-জাতি বা শাখা উপজাতির মধ্যে বিবাহ বিধি প্রচলিত কিন্তু কোনও ক্ষেত্রেই বহিরাগত সভ্য মানুষের সঙ্গে উপজাতির বিবাহ সম্পর্ক সামাজিক স্বীকৃতি লাভ করে নি। এ বিধি লঙ্ঘন করলে সমাজ তাকে কঠোর হস্তে শাস্তি দেয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাকে সমাজচ্যুত হতে হয়। বইগাদের মধ্যে কোনও পুরুষ সম-সংখ্যক দেবদেবীর উপাসক গোত্রে বিবাহ করতে পারে না। মায়ের গোত্রে বিবাহে কোনও বাধা নেই, এবং কোনও ক্ষেত্রে খুড়তুতো, জেঠতুতো ভাইবোনের মধ্যে বিবাহও প্রচলিত। পরজা উপজাতির জনসমষ্টি এবং গোত্রের সংখ্যা সীমাবদ্ধ। অনেক সময় মনস্থির করার জন্যে কয়েক-দিন ধরেও মেয়ে চিন্তাভাবনা করতে পারে। স্পষ্ট ভাষায় কন্যার সম্মতি পাবার পর বিলাসপুর ভইরা বইগাদের মধ্যে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী মেয়ের বাবা বেয়াইকে পিঠে করে ঘরে নিয়ে আসে। একরাত্রি যুবক-যুবতী একসঙ্গে কাটাবার পর, কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে পাত্রকে তার পছন্দ হয়েছে কিনা। কাওয়ার্ধা বইগা যুবক-যুবতী নিজেদের মধ্যে কথা-বার্তা বলে এবং তারপর মেয়ে তার মত দেয়। মিকির উপজাতির মধ্যেও বরপক্ষ যখন মেয়ের বাড়িতে আসে, তখন আসার কারণ জিজ্ঞেস করলে ছেলের বাবা জবাব দেয়ঃ "তোমার ভগ্নী (বেয়ান) বুড়ি হয়েছে। কাজে সাহায্য করার জন্যে লোক দরকার। তাই তোমার ছেলের সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দিতে চাই।" বিনয় করে মেয়ের বাবা বলেঃ "আমার মেয়ে যে কিছুই জানে না—না জানে কাপড় বুনতে, না পারে ঘরের কাজকর্ম করতে।"

—"তাতে কি হয়েছে। আমার ঘরে সব শিখে নেবে।" তখন মেয়ের মত জিজ্ঞেস করা হয়। তার সম্মতি না পেলে বিবাহ হতে পারে না। তারপর কাম ঘরে (অতিথির জন্যে নির্দিষ্ট বাইরের ঘরে) ছেলে মেয়ে একসঙ্গে রাত্রিবাস করে। অনেক সময় লজ্জায় ছেলে নিজে যায় না। প্রতিনিধিরূপে অঙ্গাবরণ পাঠিয়ে দেয়। মেয়ের পাশে বিছনায় ঐ পোশাক রেখে দেওয়া হয়। মিকিরদের মধ্যে বিবাহেচ্ছু যুবক প্রেমিকার উদ্দেশ্যে নানারকম উপ-হারও পাঠায়। সে সব গৃহীত হলে বুঝতে হবে যে বিবাহে যুবতীর সম্মতি আছে। তখন ছেলের বাবা মেয়ের বাড়িতে গিয়ে তাকে আংটি ও হার দিয়ে উপহার দেন।

অনেক সময় বিয়ের আগে কন্যার পিতাকে বরপক্ষের তরফ থেকে টাকা দিতে হয়। কন্যার মূল্য হিসেবে দেয় অর্থের পরিমাণ বিভিন্ন উপজাতিদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের। সাধারণত কুমারীর মূল্য বিধবা বা দ্বিতীয়বার বিবাহেচ্ছু স্ত্রীলোকের থেকে বেশি। কোনও কোনও ক্ষেত্রে কুমারী ছাড়া অন্য মেয়েদের জন্যে কোনওরকম দামই দিতে হয় না। অঙ্গামি নাগাদের মধ্যে ঘটকিনী বিবাহেচ্ছু যুবকযুবতীদের দেওয়া থোওয়ার ব্যাপার ঠিক করে দেয়। বরকে সাধারণত বল্লম, শুয়োর, মুরগি দিতে হয়। সব কিছু ঠিক হবার পর মেয়েদের জ্ঞাতি কয়েকজন যুবক বরের বাড়িতে যায়। সেখান থেকে জোর করে দেয় যৌতুক নিয়ে আসার ভান করে। সংগৃহীত শুয়োর, মুরগি দিয়ে মেয়ের বাড়িতে মহাভোজের আয়োজন হয়। ভীলদের মধ্যে পাকা কথা হয়ে গেলে তা কিছুতেই ভাঙ্গা যায় না, আর সে বিয়ে হবেই। পাকা কথার সময় (বড়ি সগাই)

বরপক্ষ গ্রাম বৃদ্ধদের পানভোজনের জন্যে দক্ষিণা দেয় এবং মেয়ের বাবাকেও। ৪০।৫০ টাকা যৌতুক দেয়। বাথুরিয়া উপজাতির কন্যামূল্যে অনেক কম— তিন টাকার থেকে শুরু। থারিয়া মুণ্ডা উপজাতির গোত্রজ। তাদেরও বিবাহের প্রস্তুতি পর্যায়ে দাণ্ডিয়া বা ঘটকের বিশেষ প্রয়োজন। প্রাথমিক কথাবার্তা হয়ে যাবার পর চিড়া, মিঠাই, হার ও হলদি দিয়ে রাঙ্গানো নতুন কাপড় বরপক্ষ নিয়ে গিয়ে ভাবী বধূকে উপহার দেয়। কড়ি দিয়ে দুই (বেয়াইয়ের) মধ্যে কন্যামূল্যে নিয়ে অনেকক্ষণ দরাদরি চলে। এ কতকটা খেলার মত। কারণ দাম যাই ঠিক হোক না কেন, তা দিতে হয় টাকাতেই। আর কারিৎকর্মা ঘটক অনেক আগের থেকে যথাযোগ্য ব্যবস্থা করে রেখেছে। ওরাল উপজাতির মধ্যে কন্যাপক্ষকে ছেলের বাবা 'দেজ' (যৌতুক দেয়)। চাল, বরবটি, মদ এবং সামান্য কিছু টাকা দিয়ে যৌতুক দান সম্পন্ন করতে হয়।

বিবাহের খরচ ও কন্যামূল্য অনেক উপজাতি যুবকের পক্ষে সংগ্রহ করা শক্ত হয়ে পড়ে। সে ক্ষেত্রে গন্ধর্ব বিবাহ জাতীয় আচারের প্রচলনও আছে। হোলি পড়বার আগের দিন ভাগোরিয়া উৎসবের সেখানে একই গোত্রের মধ্যে বিবাহে কোনও বাধা নেই, তবে বরবধূ একই গ্রামের যেন না হয়। বাথুবিয়াদের মধ্যে রক্তের সম্বন্ধ আছে এমন তিনপুরুষের যুবক-যুবতীর বিবাহ নিষিদ্ধ। অঙ্গামি নাগাদের মধ্যে শালীর সঙ্গে বিবাহ নিষিদ্ধ। খাসী উপজাতির মধ্যে মামার জীবদ্দশায় মামাতো বোনের সঙ্গে বিয়ে হতে পারে না। এর কারণ হিসেবে পণ্ডিতেরা বলেন যে, খাসী উপজাতির কাছে মামা বাবার মতই সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র—তাঁকে অভিহিতও করা হয় 'ঐত্র' বলে। একই কারণে বাবা বেঁচে থাকতে পিসতুতো বোনের সঙ্গে বিবাহ সম্ভব নয়। কিন্তু জেঠতুতো, খুড়তুতো বোনের সঙ্গে কোনও অবস্থাতেই বিবাহ হতে পারে না। কারণ তারা জন্মের থেকেই ভাইভগিনী (পরা খা)। খাসী, সিনটেংগ, ওয়ার এবং লিনংগম শাখা উপজাতিদের মধ্যে বিবাহ সম্পর্ক সচরাচর

মিজাও মিকামি উপজাতি তরুণী

না হলেও, একেবারে নিষিদ্ধ নয়। স্ত্রী মরে যাবার পর শোক জ্ঞাপক এক বছর পর উপযুক্ত যৌতুক দিয়ে মৃত স্ত্রীর ভগিনীর সঙ্গে খাসি যুবকের বিবাহ হতে পারে। কোনাক নাগার দ্বিতীয় পক্ষের বিবাহের আগে নিজের পুরনো ঘর ভেঙ্গে ফেলে নতুন করে ঘর বানাতে হয়। যে ঘরে এক স্ত্রী বাস করেছে, সেখানে অন্য স্ত্রীকে নিয়ে বাস করলে অপবিত্র হতে হয়।

সাধারণত উপজাতিদের মধ্যে এক বিবাহই প্রচলিত এবং প্রায় সব ক্ষেত্রেই বিবাহ বিচ্ছেদের স্বাধীনতা স্ত্রী-পুরুষ দুই পক্ষেরই আছে। বিধবা বিবাহও সমাজস্বীকৃত। অসাধারণ বিবাহ ব্যবস্থার মধ্যে প্রথমেই নীলগিরি পাহাড়ের টোডা আদিবাসীদের কথা বলা যেতে পারে। টোডা উপজাতির মধ্যে তরথর ও তেভেলি নামে দুই শ্রেণী। প্রতিটি শ্রেণী আবার কয়েকটি মোড (গোত্রে) বিভক্ত। একই গোত্রের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ। খুব অল্পবয়সেই টোডা ছেলেমেয়েদের বিবাহ দেওয়ার বিধি আছে। সাধারণত মামাতো, পিসতুতো বোনের সঙ্গেই বিয়ে হয়। কোনও কারণে শৈশবে বিবাহ না হলে প্রাপ্তবয়স্ক যুবক নিজের বিবাহ নিজেই

মধ্যভারতের মুরিয়া যুবক যুবতীর অনুরাগ পর্ব

ঠিক করতে পারে। শিশুবিবাহ হয়ে গেলে স্ত্রী নিজের বাবার বাড়িতেই থাকে। প্রত্যেক বছর স্বামীকে ছোট কাপড় মেয়েকে উপহার দিতে হয়। মেয়ের দশ বছর বয়স হলে বড় পুটকুলি কাপড় উপহার দেবার বিধি প্রচলিত। ১৫।১৬ বছর বয়সে স্ত্রী স্বামীর ঘর করতে যায়। আগেকার দিনে এক ভাইয়ের সঙ্গে বিয়ে হলে মনে করে নেওয়া হতো যে সব ভাইয়ের সঙ্গেই স্ত্রীর বিবাহ হয়েছে। সাধারণত এক পরিবারের ভাইয়েদের মধ্যেই সবাই পতি বলে স্বীকৃত হত। ভাই না থাকলে, খুড়তুতো, জেঠতুতো ভাইয়েদের সঙ্গেও একই স্ত্রীর বিয়ে হতো। যতদূর জানতে পারা যায় যে, স্ত্রীকে নিয়ে ভাইদের মধ্যে বিবাদ, বিসম্বাদ প্রায় হতো না। ছেলে মেয়ে হলে তাদের আইনগত পিতৃত্ব নিরূপণ করার জন্যে বিশেষ একরকম বিধি প্রচলিত ছিল। স্ত্রী যখন সাত মাসের অন্তঃসত্ত্বা তখন তীরধনুক দেবার এক বিশেষ উৎসব অনুষ্ঠিত হতো। কৃষ্ণ-পক্ষের চতুর্দশীতে পুন্ডত্ত্বপিমি উৎসবের আয়োজন করা হতো। গ্রামের সবাইকে ভূরিভোজে আপ্যায়িত করে বড় ভাই পত্নীকে খেলার তীর ধনুক দিতো। সেদিন থেকে স্বামীর স্থান বড় ভাই অধিকার করলো এবং সন্তানের পিতাও হবে সে। পরে আবার যতদিন পুন্ডত্ত্ব-পিমি আচার অনুষ্ঠান না হচ্ছে, ততদিন যে সমস্ত সন্তান জন্মাবে তার পিতা সেই হবে। অবশ্য যে কোনও সময় (স্ত্রীর গর্ভাবস্থার সপ্তম মাসে এবং কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীতে) আর একজনকে সন্তানের স্বামী করা যেতে পারে। অনেক সময় অন্য ভাইরাও বিয়ে করে, কিন্তু আগেকার দিনে সবার সঙ্গেই সবার স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধ। বিশেষভাবে এক পতির পরিচর্যা করার বিধি অজ্ঞাত ছিল। এক ভাই জীবিত থাকলে সব ছেলেমেয়েদের পিতা বলে তাকেই অভিহিত করা হয়। এখন অবশ্য বহু-পতিক বিবাহ পদ্ধতি প্রায় বিলুপ্ত। হিমালয়ের পার্বত্য জাতি কাশ্মীর ও পাঞ্জাবের কোনও কোনও অঞ্চলে বহু-পতিক বিবাহ প্রচলিত। ত্রিবাঙ্কুরের মুদুভার উপজাতির মধ্যেও এক স্ত্রী এক সঙ্গে একাধিক স্বামীর পরিচর্যা করে। তবে সেখানে স্বামী ভিন্ন ভিন্ন পরিবারে বিবাহ করে। টোডা বা কুরুম্বদের মত স্বামীর ভাইয়েদেরই বিবাহ করতে হবে এমন কোনও বাধা-বাধকতা নেই। বিবাহের এই রীতি সাধারণত দারিদ্র্যের ফলেই হয় এবং কোনো জায়গায় অতীতে শিশুকন্যা হত্যার বিধিও প্রচলিত ছিল। জীবন ধারণের সংগ্রাম এত তীব্র যে, সেখানে বালিকার সংখ্যা যত কম ততই ভাল। পুরুষ স্ত্রীর সংখ্যা-বৈষম্য এরই ফলে সৃষ্টি হতো, তা দূর করার জন্যে বহুপতিক বিবাহ। সাঁওতালদের মধ্যেও এরকম আচার প্রচলিত ছিল। অনেকের মতে এরই থেকে বিধবাকে দেওরের সঙ্গে বিবাহ দেবার প্রথার সৃষ্টি হয়েছে। ওরাওঁদের মধ্যে বিধবা ভাশুরকেও বিয়ে করতে পারে, কিন্তু দেওরের সঙ্গে পাট প্রথায় বিবাহই বিধেয়। পাট প্রথায় বিবাহ আচার খুবই সাধারণ। গ্রাম পুরোহিত ভগত এবং বিবাহের (স্ত্রী) পুরোহিত ধাবালেরি ও কয়েকজন গ্রাম বৃদ্ধের সামনে বিধবার বাড়ির উঠোনে বিয়ে হয়। বর কনে দুজনে পরস্পরের গায়ে হলুদ মাখিয়ে দেয় এবং কনের গলায় বর পুঁতির মালা পরিয়ে দেয়। সামান্য কিছু টাকা ও কাপড় উপহার দিয়ে বিবাহ উৎসব শেষ হয়। ভীলদের মধ্যে কিন্তু বিধবার বিবাহ সম্পর্কে কোনও বিশেষ নিয়ম নেই যে, স্বামীর ঘরেই আবার বিবাহ করতে হবে। এদের মধ্যেও বিধবা

বিবাহের আচার খুব সংক্ষিপ্ত। বর কয়েকজন বন্ধুবান্ধব নিয়ে কনের বাড়িতে যায়। সেখানে বিধবার বৌদি বা পিসিমা উপস্থিত থাকলে তাদেরও কিছু উপহার দেওয়া হয়। তারপর প্রচুর পান আহার করে বিবাহ উৎসব সুসম্পন্ন করা হয়।

পুরুষের বহুবিবাহ সামাজিক প্রতিষ্ঠা, বিত্ত এবং ক্ষমতাপ্রিয়তার লক্ষণ। সাধারণত উপজাতিদের মধ্যে বহুবিবাহের প্রচলন খুব কম এবং কোনও ক্ষেত্রে হিন্দুসমাজের সংস্পর্শে এসে এরকম বিবাহ প্রচলিত হয়েছে। বইগাদের মধ্যে কেউ একাধিক বিয়ে করলে প্রথমা স্ত্রীকে বড়কি এবং তার পরবর্তীকে ছোটকি বলে উল্লেখ করা হয়। ছোটকির বিবাহে বড়কিও যোগ দেয়। বিবাহের পরে সামাজিক আচার অনুষ্ঠানে বড়কির স্থান ছোটকির উপরে। ওরাওঁ, খাসিয়া প্রভৃতি উপজাতিদের মধ্যে একাধিক বিবাহে আপত্তি না থাকলেও খুব কমক্ষেত্রেই কোন পুরুষ একটির বেশি বিয়ে করে। গারো উপজাতির মধ্যেও বিবাহবিধি বড় বৈচিত্র্যময়। নোকম জামাতা সাধারণত সর্বকনিষ্ঠা মামাতো ভগ্নীকে বিবাহ করে। বিয়ের পর অন্য (চাওয়ারি) জামাইয়ের মত নোকম জামাতাও এসে শ্বশুরবাড়িতে বসবাস করে এবং স্ত্রীর পরিবারেরই সে একজন বলে পরিগণিত হয়। শ্বশুরের মৃত্যুর পর আনুষ্ঠানিকভাবে তার সঙ্গে শাশুড়ীর বিয়ে হয় এবং সম্পত্তির অধিকারীও শাশুড়ীর মৃত্যুর পর প্রথমা স্ত্রী হয়। স্ত্রীর প্রতিনিধি হিসেবে দেখাশুনো করার সম্পূর্ণ অধিকার কিন্তু চিরদিনই স্বামীর। শাশুড়ীকে বিয়ে করতে রাজি না হলে বিষয় আশয় মেয়ে-জামাই কেউই পাবে না, তখন তা হস্তান্তরিত হবে শাশুড়ীকে যে আবার বিয়ে করবে তার কাছে। এক্ষেত্রে বিধবাকে স্বামীর অবিবাহিত ভাই বা বিবাহযোগ্য ভাই না থাকলে স্বামীর গোত্রের কাউকে বিয়ে করতে হবে। গারোদের মধ্যে অনেক সময় বিবাহ প্রস্তাবে লজ্জা প্রকাশ করতে গিয়ে যুবক জঙ্গলে পালিয়ে যায়। বন্ধুবান্ধব আত্মীয়দের দল পলাতক যুবককে খোঁজ করে বের করে। তিনবার এভাবে পালিয়ে গেলে ধরে নিতে হবে যে, যুবক এ বিবাহ করতে চায় না। তাকে এরপর আর কেউ ত্যক্ত করে না। যে সব গারো জামাই চাওয়ারি তাদের অবশ্য সম্পত্তি লাভের কোনও সম্ভাবনা নেই এবং বিধবা শাশুড়ী সম্বন্ধেও কোনও করণীয় নেই। প্রত্যেক জামাইকেই শ্বশুরের গ্রামে এসে তার পরিবারভুক্ত হয়ে বাস করতে হয়।

মধ্যপ্রদেশ ও মধ্যভারতের বইগা উপজাতির বিবাহ পদ্ধতিও বড় বৈচিত্র্যময়। এ বিবাহে পুরোহিতের কোনও করণীয় নেই। বরের সঙ্গে সব সময় কয়েকজন বয়স্ক আত্মীয়-দোসি, মেয়ের সঙ্গে অনূঢ়া সুয়াসিনের দল বিবাহ উৎসবে থাকে। বিয়ের দিন ঠাকুর দেওতার কাছে দোসি আগুন জ্বালিয়ে ধুপধুনো দিয়ে উপদ্রবকারী শক্তির বিরুদ্ধে দেবতার আশীর্বাদ চায়। সুয়াসিনেরাও কলসে জল ভরে এবং কিছু অন্ন নিয়ে পুজোস্থানে যায়। বর কনে শক্তিমান পুরুষ এবং স্ত্রীলোকের পিঠে চড়ে উইয়ের ঢিবি খুঁজতে বেরোয়। দোসিরা ঢিবির চারদিকে সমচতুষ্কোণের আলপনা এঁকে দেয়। তারপর ধানকুটনি দিয়ে বর ও কনে মায়ের কোলে বসে ঢিবি খুঁড়তে আরম্ভ করে। খোঁড়া হয়ে গেলে কুটনি নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। শেষে অবশ্য বরপক্ষেরই জয় হয়। একদল লোক জঙ্গলে গিয়ে সরাই গাছ কাটতে আরম্ভ করে। উপর থেকে কাটা ডাল চিত হয়ে পড়লে বুঝতে হবে যে, প্রথম পুত্র সন্তান হবে, আর উপুড় হয়ে পড়লে কন্যা জন্মগ্রহণ করবে। সন্ধ্যার বিবাহবাসরে সবাই এক একটা ডাল নিয়ে আসে। সমস্ত রাত ধরে গ্রামের যুবক-যুবতীরা মিলে উদ্দাম নাচের অনুষ্ঠান করে। তিনটে খাটিয়া দিয়ে বিবাহের হাতী তৈরি হয়। হাতীর উপরে কনের ভাইকে চড়িয়ে সমস্ত গ্রাম ঘুরিয়ে নিয়ে আসা হয়। বিবাহ আচারে বইগা ও গণ্ডদের মধ্যে মঙ্গরোহি গাছের ডালের চারদিকে বরবধূকে সাত পাক ঘুরিয়ে নেবার আচার প্রচলিত। বিবাহে হলদির

বিহারেও খুব প্রচলিত। এইসব প্রথা হিন্দুসমাজ থেকেই উপজাতিরা নিয়েছে, না উপজাতি আদিম আচারই হিন্দু রীতি বলে পরবর্তী সময়ে প্রচলিত হয়েছে তা নিশ্চিতরূপে বলা শক্ত। জনপ্রবাদ আছে যে, আগেকার যুগে বইগা দম্পতী তাদের প্রথম মধুযামিনী যাপন করত লোকালয় ছেড়ে জঙ্গলের মধ্যে। এখনও যারা নাচ গানের উদ্দামতা, পানভোজনের কোলাহল থেকে কিছুক্ষণ নিরালায় শান্তিতে থাকতে চায় তারা বনদেবতার শরণাপন্ন হয়। তার পরদিন স্বামী-স্ত্রী মিলে কোনও নদীতে (স্রোতস্বিনী বললেই ঠিক হয়) গিয়ে বেণী ছোড়না আচার অনুষ্ঠান করে। নদীর জল নিয়ে একজন আর একজনের উপর ছোঁড়ে এবং জোর করে পরস্পরের চুল খুলে দেয়। এ সময় চারদিকে সবাই খুব সন্দিগ্ধ দৃষ্টি রাখে। ভূত এসে স্ত্রীর বেণীর মধ্যে গোপনে বাসা বাঁধতে পারে। ফলে স্বামীকে সমস্ত জীবন স্ত্রীর গঞ্জনা সইতে হবে। ঠিক ততখানি যায়গা জুড়ে পুরুষের চুলে অপদেবতা থাকলেও, দুষ্টশক্তি পতির কেশে ভর করলেও স্ত্রীর জীবনও খুব আনন্দময় হবে না! কাদা দিয়ে স্ত্রীর প্রতিমূর্তি নদীর ধারে তৈরি করা হয়। স্বামীকে ধনুর্বিদ্যার পরিচয় দিতে হবে তীর দিয়ে কাদার মূর্তিকে বিদ্ধ করে। প্রথমবারের চেষ্টায় সফল হবার অর্থ যে, স্ত্রী স্বামীগৃহেই মৃত্যু পর্যন্ত থাকবে। আর তা না পারলে সবাই মনে করবে যে, স্ত্রী চঞ্চলা এবং স্বামীর আশ্রয় পরিত্যাগ করে যাবে। বইগা বিবাহের শেষ অধ্যায় সব থেকে বিচিত্র। স্বামী যখন প্রথম স্ত্রীর সঙ্গে একান্তে দেখা করে, তখন নিছক রহস্যচ্ছলে স্ত্রী সাহায্যের জন্যে ব্যাকুল চিৎকার শুরু করে। আমোদপ্রিয় যুবকের দল আর্তের ক্রন্দন শোনামাত্রই চারদিক থেকে বাসরঘরের সামনে এসে জড়ো হয়। তারপর কয়েকদিন বরের পক্ষে বন্ধুবান্ধবের টিকা টিপ্পনীর ঠেলায় গ্রামে বেরোনই অসম্ভব হয়ে উঠে।

বইগাদের মধ্যে সহজ প্রথায় বিবাহ-বিধিও প্রচলিত। হলদি পানি বা চুড়ি পইরানা বিবাহে বরবধূ চাটাইয়ের উপর বসে। বন্ধুবান্ধবেরা হলদি মাখিয়ে দেয়। নতুন কাপড়ে আবৃত হয়ে তারা উঠে দাঁড়ায়। প্রতিবেশীরা হলদি জল গায়ে ছিটিয়ে দেয়। বর কনের হাতে চুড়ি পরিয়ে দেবার পর উৎসব শেষ হয়। সাধারণত বিধবা বা দ্বিতীয়বার যার বিবাহ হচ্ছে তারাই এভাবে বিয়ে করে। সমাজে কিন্তু দুইরকম প্রথায় বিবাহই স্বীকৃত।

আগারিয়া (মধ্যপ্রদেশ) বিবাহ পদ্ধতিও বইগাদের মতন। বিয়ের পরদিন আগারিয়া দম্পতী নদীতে গিয়ে ঘড়ার লুকোচুরি খেলে। বইগাদের মত আগারিয়া পুরুষকেও নিজের পৌরুষের প্রমাণ দিতে হয় ধনুক ছুঁড়ে। তবে, এখানে স্ত্রীর রাহুর মধ্যে দিয়ে শর চালিয়ে হরিণ মূর্তিকে বিদ্ধ করতে হয়। আগারিয়া বিবাহে বিশেষভাবে নতুন তৈরি লোহার ব্যবহার লক্ষ্য করার। বিবাহবাসরে নানারকম কারুকরা লোহার পিলসুজ ও দীপ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বরও সেইরকম লোহার তৈরি জাঁতি বিবাহ অনুষ্ঠানে সব সময়ে নিজেদের সঙ্গে রাখে। কখনও লোহার হারও বর ব্যবহার করে। বিয়ের পর স্ত্রী যখন প্রথমে স্বামীর ঘরে প্রবেশ করে তখন চৌকাঠে পোঁতা পেরেকের উপর পা রেখে ঢোকে। লোহা যে ভূতবিতাড়নে সাহায্য করে সে ধারণা কিন্তু আদিবাসী ছাড়া অন্য বহুলোকের মধ্যে আছে। হিন্দুভাবাপন্ন বাথুরিয়া বিবাহে হোম, পাণ্ডা বামুন প্রভৃতি সব কিছুই দেখতে পাওয়া যায়। অঙ্গামি নাগার বিবাহ বরের বাড়িতে অনুষ্ঠিত হয়। কন্যা, ছোট একটি ছেলে, তিনজন বালিকা এবং কন্যার আত্মীয় যুবকের দল ও কয়েকজন বৃদ্ধ মিলে কন্যাযাত্রীর দল। যুবক-যুবতীর দল বিবাহ গীত গাইতে গাইতে নাগা পাহাড়ের ঢেউখেলানো রাস্তা দিয়ে চলে। বরের বাড়িতে কিন্তু জনসমাগম খুব কম—কেবল বর ও তার বাবা মা। পানভোজনের মধ্যে দিয়ে বিবাহ উৎসব সম্পন্ন হয়। বিবাহের পরই কিন্তু অঙ্গামি যুবক স্ত্রীর সঙ্গে এক যায়গায় বসবাস করে না। কোনও কোনও ক্ষেত্রে ছ সাত মাস পর্যন্ত নাগা যুবকের যৌথ-বাসে—মোরুঙে—স্বামী রাত্রিযাপন করে। লজ্জাই নাকি এই অদ্ভুত আচরণের কারণ।

উপজাতিদের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদের রীতিও প্রচলিত। খাসিদের মধ্যে ব্যভিচার, বন্ধ্যা পত্নী, স্বামী-স্ত্রীর অবনিবনা এবং নিয়ত কলহবিবাদ প্রভৃতি কারণে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হতে পারে। সাধারণত দুই পক্ষের সম্মতি নিয়েই বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হয়। একতরফা দাবী জানালে সেই পক্ষকে ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। গ্রাম বৃদ্ধদের সামনে নিজেদের অভিমত জানাবার পর স্ত্রী স্বামীকে পাঁচটি কড়ি দেয়। স্বামী তার সঙ্গে আরও পাঁচটি কড়ি মিশিয়ে দশটি কড়ি স্ত্রীকে দেয়। পত্নী পতিকে সে দশটি কড়ি আবার ফেরৎ দেয়। এবার স্বামী সবকটা কড়িই মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। এভাবেই বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়। সে সংবাদ গ্রামের ঢুলি সবাইকে জানিয়ে দেয়। আর তার সঙ্গে সে গ্রামের যুবকদের আমন্ত্রণ জানায় যে, বিবাহ-যোগ্যা ভূতপূর্ব পত্নীর তারা পানিপ্রার্থী হতে পারে। তেমনি তরুণীদেরও স্বামীর প্রতি দৃষ্টি দিতে বলা হয়! ভীল উপজাতির স্বামীরা বিশেষ সন্দেহপরায়ণ। সুতরাং সামান্য কারণেই বিবাহ ভেঙে যায়। স্ত্রীর চরিত্রে সন্দেহ হলে গ্রাম পঞ্চায়েতের সামনে ভীল স্বামী পাগড়ির থেকে এক টুকরো ছিঁড়ে, স্ত্রীর হাতে দেয় এবং চিৎকার করে ঘোষণা করে যে, তাদের স্বামী স্ত্রী সম্পর্ক ছিন্ন হল, এর পর তাদের সম্বন্ধ হবে ভাই বোনের মত। স্ত্রী ছেঁড়া পাগড়ির টুকরো তার ঘরের সামনে (বাবার বাড়িতে) এক মাস টাঙিয়ে রাখে। সেই দেখে সবাই বুঝবে যে, তার বিবাহ ভেঙে গিয়েছে। স্ত্রীর সঙ্গে ব্যভিচার করেছে বলে প্রমাণিত হলে স্বামীকে ক্ষতিপূরণও দিতে হয়।

বাথুরিয়া আদিবাসীদের মধ্যে ব্যাভিচারের অভিযোগে বিয়ে ভেঙেগ যায় কিন্তু স্ত্রীর আর বিয়ে করা সম্ভব নয়। অন্য ক্ষেত্রে গ্রামবৃদ্ধেরা দুই পক্ষকেই 'মুক্তি' দেয় এবং তারা আবার বিয়ে করতে পারে। থারিয়া বিবাহ বিচ্ছেদ স্ত্রীর ব্যাভিচারের জন্যে হলে, স্ত্রীর পিতামাতাকে বিয়ের সময় পাত্রপক্ষ যে যৌতুক দিয়েছিল তা প্রত্যর্পণ করতে হয়। গণ্ড ও বৈগিয়া উপজাতিরা গ্রাম প্রধানদের সামনে বিবাহ ভঙেগর কারণ বর্ণনা করে। গ্রামপ্রধানরা অনুমতি দিলে—এক টুকরো খড়কে মাঝখান থেকে ভেঙেগ মাটিতে ফেলে দেওয়া হয়, যাতে দু টুকরো আলাদা যায়গায় পড়ে। মাটির ভাঁড় ভেঙেগ ফেলা হয়, একটা টাকাও মাটিতে ফেলে দেওয়া হয়। তারপর আনুষ্ঠানিকভাবে পঞ্চ ঘোষণা করে যে তাদের স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক এইখানেই শেষ হলো। স্বামী স্ত্রীকে কোনও অলঙকার দিয়ে থাকলে, স্ত্রীকে তাও ফেরৎ দিতে হয়। মিকিরদের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ খুব কম, তবে বিধি আছে। স্ত্রীর সন্তান না হলে অথবা স্ত্রী বিয়ের পর স্বামীগৃহে আসতে অস্বীকার করলে, স্বামী এক ভাঁড় মদ নিয়ে শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে নিজের বিবাহ বিচ্ছেদের কথা জানিয়ে দেয়। ব্যাভিচারের অপরাধে গ্রাম সভা মী অপরাধীকে অর্থ-দণ্ড দেয়। অনেক উপজাতির মধ্যে ব্যাভিচারের জন্যে কঠোর শাস্তি দেওয়া হয়—অপরাধীকে সমাজচ্যুত করা হয়। মৃত্যুদণ্ডের পরই আদিবাসীর জীবনে সব থেকে বড় শাস্তি সমাজচ্যুত হওয়া। জন্ম, বিবাহ, মৃত্যু, উৎসব, আনন্দ, চাষ-বাস বা অন্য কাজ—সব কিছুতেই সমাজ আর তার সঙেগ কোনও সহযোগিতাই করবে না।

আদিবাসী বিবাহ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে আরও দুই একটা বিষয় সম্বন্ধে খুব সামান্য কিছু বলা প্রয়োজন। আদিম জাতির মধ্যে নীতিজ্ঞান খুব কম এবং যৌন সম্পর্কে ব্যাভিচারই প্রচলিত, এরকম ধারণা অনেকেরই মধ্যে আছে। ভারত-বর্ষের আদিম জাতিরা (শীতপ্রধান হিমালয় পাহাড়ের সানুদেশ ছাড়া) খুব সীমিত বস্ত্রাবরণে নিজেদের আবৃত করে থাকে। অনেকে মনে করেন যে, যৌন সম্পর্কেও তাদের শালীনতা বোধ কম। এ ধারণা একেবারেই অমূলক এবং সম্পূর্ণ অজ্ঞতাপ্রসূত। সম্পূর্ণ উলঙগ আদিবাসীরাও যৌন সম্পর্ক সম্বন্ধে ভব্যতার সঙেগ কথা বলে। এ সম্বন্ধে কুৎসিত রসিকতা করলে তারাও চটে যায়। আন্দামানের ওঙ্গি উপজাতির দেহাবরণ বলতে মেয়েদের অত্যন্ত ছোট ঘাসের ঘাগরা (লম্বায় যা এক ফুটের থেকে একটু বেশি) তাও খালি সামনের অংশকে আবৃত করে থাকে। অথচ তারা এভাবে কোনও অস্বাচ্ছন্দ্যও বোধ করে না ও যৌন সম্পর্কের কথাও অনবরত চিন্তা করে না।

বিয়ের আগে যুবক যুবতীর মধ্যে অবাধ মিলন বা কোনও ক্ষেত্রে যৌন সম্পর্ক স্থাপিত হলেও পরবর্তী সময়ে সুখী দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করেছে—অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ দৃষ্টান্তই আমরা পাই। বিবাহ সম্পর্ক স্থাপিত হবার আগে সন্তান সন্ততি হলে সমাজ তার দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করে না এবং জন্মের কোনও অভিশাপই সে সন্তানকে সমাজ দেয় না। ব্যাভিচার এ সমাজেও অনুষ্ঠিত হয় কিন্তু যেখানে সভ্য মানুষের চিন্তাধারা প্রবেশ করেনি বা আদিবাসী সমাজকে ব্যাপকভাবে প্রভাবান্বিত করতে পারেনি, সেখানে কৃত্রিম কোনও উপায়ে এ সমস্যা সমাধানের চেষ্টা হয় না। মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে অসঙগত যৌন আচরণকে প্রশ্রয়ও দেয় না।

আজ অবশ্য বহুক্ষেত্রেই বহিরাগত মানুষের প্রভাব, খৃষ্টান মিশনারি প্রতিষ্ঠান, হিন্দুধর্মের প্রভাব, শাসনতান্ত্রিক নিয়ম-কানুন সব কিছু মিলে উপজাতি জীবনে বিরাট পরিবর্তন আনছে। নাগাদের মোরুঙগ, মুরিয়া-মারিয়াদের ঘোটুল প্রথার বিরুদ্ধে উপজাতি অঞ্চলে বহু প্রচার হয়েছে এবং বহু গ্রামে যৌথবাস উঠে গিয়েছে বা তার রূপের পরিবর্তন ঘটেছে। খৃষ্টান গারো, ওরাঁও, মুণ্ডা বা সাঁওতাল গ্রামে যুবকযুবতীর বহু আচরণ, বিবাহ প্রভৃতি ব্যাপারে পরিবর্তন এসেছে। তার ফলে কি আদিবাসীরা বেশি ভব্য হয়েছে? তারা কি নীতি-বাগীশদের কাছে অনেক বেশি গ্রহণীয় হয়েছে? এর উত্তর কি তা সঠিক বলতে পারিনে। কিন্তু একথা সত্য যে, জোর করে অসহিষ্ণু সংস্কারক বা প্রচারক অথবা সর্বক্ষমতাসম্পন্ন শাসক আদিবাসীর বিবাহ বিধিতে বা তার যৌন সম্পর্কে যখন পরিবর্তন আনার চেষ্টা করেছেন, তখন অনর্থের সৃষ্টিই হয়েছে। আদিম সমাজে অর্থের বিনিময়ে দেহ বিক্রয়ের কোনও দৃষ্টান্ত চোখে পড়ে না। অথচ আজ হিমালয়ের পার্বত্য উপজাতি বা মধ্যভারতের কোনও কোনও আদিবাসী-দের নিয়ে পতিতাবৃত্তিও আরম্ভ হয়েছে।

অনেক ক্ষেত্রে বহিরাগত মানুষ উপজাতি অঞ্চলে স্ত্রী-পুরুষের স্বাধীনতা দেখে ভাবেন যে, এ বুঝি ব্যাভিচারেরই নামান্তর। মিলিত নৃত্য, হাসিপরিহাস, যুবক যুবতীর মিলিত কাজকর্ম দেখে কেউ কেউ স্বাধীনতা নেবার চেষ্টা করে। এরকম ঘটনা ঘটলে উপজাতি সমাজ আরও বেশি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠে বহিরাগত মানুষের উপর।

আদিবাসী সমাজের বিবাহবিধিতে যে আনন্দ, যে সরল সজীবতা লক্ষ্য করেছি অন্য কোনও অগ্রসর সভ্য সমাজে তা দেখিনি। নাচ, হাসি, খাওয়া, পান সব কিছু মিলিয়ে এ বিবাহকে কেমন একটা স্বতন্ত্র রূপ দিয়েছে।

৫

নীলকান্ত রায় সপরিবারে যে কলোনীতে থাকেন তার নাম নেতাজীনগর। এখানে আশে পাশে এ-ধরনের 'নগর' আরো অনেকগুলি আছে। বাপুজীনগর, বীরনগর, সুভাষ-নগর। সবগুলিই পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের জবরদখল কলোনী। কামার, কুমোর, ছুতোর মিস্ত্রী থেকে শুরু করে ধোপা, নাপিত, সাহা, কৈবর্ত, কায়েত, বামুন সবশ্রেণীর সবরকম জীবিকার লোকেই এখানে এসে বসতি বিস্তার করেছে। আবার জীবিকাহীন বেকার লোকেরও অভাব নেই। এক একটি গৃহস্থের ভাগে দু' কাঠা আড়াই কাঠার এক একটি প্লট। অপেক্ষাকৃত যারা স্বচ্ছল, যারা একটু বেশি ক্ষমতাবান তারা একসঙ্গে দুইটা প্লট দখল করেছে। টিন দিয়ে, টালি দিয়ে ঘর তুলে নিয়েছে। কেউ এক-খানা, সামর্থ্য যার বেশি, পরিবারে লোকের সংখ্যা যার বেশি সে দু'তিন-খানা পর্যন্ত তুলেছে। প্রায় প্রত্যেকেরই ঘরের সামনে একফালি করে উঠোন। সে উঠোন কেউ মিছামিছি ফেলে রাখেনি। বেগুন মুলো লাউ কুমড়ো সিম সজনে বছরের নানা ঋতুর নানা তরকারির চাষ হয় সেখানে। সেই সঙ্গে ফুলের চাষও আছে। গাঁদা, দোপাটি, বেল, যুঁই। যার শখ একটু বেশি সে সাদা কি লাল গোলাপের চাষও করে। যে ফুল বুড়িদের পুজোর থালায় উঠে না, তরুণীদের কালো খোঁপায় শোভা পায়।

নেতাজী নগরে চার কাঠা জমির ওপর উত্তর আর পশ্চিমের ভিটিতে দুখানি টিনের ঘর নীলকান্ত রায়ের। পূব-দক্ষিণে শাকসব্জীর বাগান। বাড়ির চারদিকে বাঁখারির বেড়ার সীমানা। বড় উত্তর ঘরখানার পিছনে একটি পুকুর। সে পুকুর যদিও সকলেরই সম্পত্তি, তবু নীলকান্তর বাড়ির লাগা বলে তিনিই এর সুযোগ-সুবিধা বেশি পান। পুকুরের দক্ষিণপাড়ে, নীলকান্ত রায়ের ঘরের পিছনে বেশ বড় একটি বাতাবি লেবুর গাছ। লেবুর ভাগ নিয়ে প্রতিবেশীদের সঙ্গে বাদবিসম্বাদ হলেও গাছের ছায়াটুকু, তার সবুজ শোভাটুকু নীলকান্ত রায়ের নিজস্ব। নিজের ঘর-খানিতে জানলার ধারে বসে তিনি প্রকৃতির এই অনায়াসলব্ধ স্বল্প সৌন্দর্য-টুকু ঘন্টার পর ঘণ্টা ধরে উপভোগ করতে পারেন। তাঁর মোটেই একঘেয়ে লাগে না, ক্লান্তি আসে না।

ফলজল শস্যভরা, ছায়াঘেরা এই বাড়িঘর নীলকান্তকে নিজের হাতে গড়ে তুলতে হয়নি। পরের জমি জবরদস্তির সঙ্গে দখল করে তাতে বসতি বিস্তারের যে প্রাথমিক হাঙ্গামা কলোনীর বাসিন্দারা ভোগ করেছে, জমির মালিকের সঙ্গে মাসের পর মাস যে লড়াই তাদের চালাতে হয়েছে তার বিবরণ নীলকান্ত এখানে এসে কিছু কিছু শুনেছেন। কিন্তু নিজের চোখে তাঁকে সে সব দেখতে হয়নি, নিজের হাতে গড়তে হয়নি। তাঁর লড়াই ভিন্ন ধরনের। তাঁর সংগ্রাম নিজের মধ্যে। নিজের সঙ্গে নিজের।

এই বাড়ি নীলকান্তের মামাশ্বশুর পান্নালাল চক্রবর্তীর। সংসার আর স্ত্রী-পুত্র ছেড়ে নীলকান্ত যখন দীর্ঘকাল থিয়েটারের অভিনেত্রী নীরজাবালার প্রথমে প্রেমিক তারপরে পোষ্য হয়েছিলেন তখন নিঃসন্তান পান্নালাল নীলকান্তের পুত্রকে আশ্রয় দেন। দেশ বিভাগের পর তিনি পাকিস্তান ছেড়ে সেখানকার বাড়িঘর বিক্রি করে এই নেতাজী নগরের জবরদখল কলোনীতে এসে বাড় করেন। কিন্তু এই নতুন বাড়িতে নিজে বেশিদিন বাস করতে পারেননি। বছর পাঁচেক আগে কলেরায় মৃত্যু হয়েছে তাঁর। তাঁর স্ত্রী দেশে থাকতেই মারা গিয়েছিলেন। নীলকান্তের স্ত্রী নির্মলাই এখন মামার স্থাবর অস্থাবরের উত্তরাধিকারিণী। দূর সম্পর্কের ওয়ারিশ হয়ত এখনো দু'একজন আছে। কিন্তু তারা অবস্থাপন্ন। ভালো চাকরি বাকরি করে। কলকাতায় বেশি ভাড়া দিয়ে বাসা করে রয়েছে। কলোনীর চার কাঠা জমি আর দু'খানা টিনের ঘর তারা এসে কোনদিন দাবি করবে এমন আশংকা নেই। সেদিক থেকে নির্মলা নিশ্চিন্ত। কিন্তু মাথা গোঁজার স্থান মিললেই সব চিন্তা দূর হয় না। চিন্তা-ভাবনার আরো অনেক বিষয় থেকে যায়। নির্মলারও রয়েছে। ছেলেমেয়েদের খাওয়া-পরা পাড়িয়ে শুনিয়ে তাদের মানুষ করে

তোলবার সমস্যা আগেও যেমন ছিল এখনও তেমনি আছে। এতদিন বাদে নীলকান্ত স্থায়ীভাবেই ফিরে এসেছেন। নির্মলা স্বামী ফিরে পেয়েছেন, ছেলে-মেয়েরা পেয়েছে তাদের বাপকে। কিন্তু নীলকান্তের কোন রোজগার নির্মলা আগেও যেমন পাননি, এখনো তেমনি পাচ্ছেন না। সংসারে একমাত্র সম্বল, এক-মাত্র ভরসা মালা। কলকাতার হাসপাতালে সে নার্সের কাজ করে। তারই আয়ে সংসার চলে। নির্মলা নিজেও বসে নেই। মেয়েদের স্কুলে নিচের ক্লাস-গুলিতে পড়ান। নূতন স্কুল। টাকা তিরিশের বেশি দিতে পারে না। সে টাকাও নিয়মিত আদায় হয় না। তবু যতদিন এর চেয়ে ভালো আয়ের ব্যবস্থা না হয় এ চাকরি ছাড়তে পারেন না নির্মলা। বেশি মাইনের ভালো কোন কাজ এ বয়সে জোটবার আশা আর নেই। বিদ্যাও তো বেশি নয়। স্কুলের গণ্ডি পার হতে পারেননি। মাঝে মাঝে বইপত্র নিয়ে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেওয়ার জন্যে তৈরি হয়েছেন, কিন্তু নানা বাধাবিঘ্নে সংকল্প-চ্যুতি ঘটতে দেরি হয়নি।

স্ত্রী আর মেয়ের রোজগারের ওপর নির্ভরশীল হয়ে বাড়িতে এসে বসেছেন নীলকান্ত রায়। বয়স পঞ্চান্ন ছাপ্পান্ন। দেখায় আরো বেশি। তাঁর মধ্য-যৌবনের সাহিত্যকীর্তির কথা লোকে ভুলে গেছে। কিন্তু প্রৌঢ় বয়সের অপকীর্তির কথা মনে করে রেখেছে। শোনা যায়, ছেলে-ছোকরাদের মধ্যে এখনো তাঁর সেই অসংযত, উচ্ছৃংখল কিন্তু বর্ণাঢ্য জীবন-বৃত্তান্ত নিয়ে আলোচনা চলে। তিনি নিজে এখন আর উপন্যাসকার নয়, উপন্যাসের বিষয়বস্তু।

নিজের জীবন নিয়ে সরাসরিভাবে উপন্যাস লেখার কথা কিছুকাল ধরে ভাবছেন নীলকান্ত। মাঝে মাঝে কাগজে কলমে চেষ্টাও করছেন। কিন্তু দু'চার পাতা লেখার পরে টুকরো টুকরো ক'রে সেগুলি ছিঁড়ে ফেলতেও দেরি হচ্ছে না। তাঁর জানলার নীচে সেই ছেঁড়া কাগজের টুকরো পথে উড়ছে। কিন্তু বেশিদিন সেখানে স্তূপীকৃত থাকতে পারছে না। কিছু হাওয়ায় উড়ে যাচ্ছে কিছু বা নিজের হাতে ঝাঁট দিয়ে সরিয়ে ফেলছেন নির্মলা। স্বামীর অনেক অসদ অভ্যাস এতদিনে দূর হয়েছে। কিন্তু সৃষ্টির নামে এই অনাসৃষ্টির নেশা আজও নীলকান্ত কাটাতে পারেননি।

জানলার ধারে টেবিল চেয়ার পাতা। নীলকান্ত অনেকক্ষণ ধরে সেখানে বসে কি যেন লিখছিলেন। লেখা পাতাগুলির ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিতে নিতে হঠাৎ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন নীলকান্ত। নির্মমভাবে মুঠির মধ্যে চেপে ধরলেন পাতাগুলো। জানলার দুই শিকের ভিতর দিয়ে গলিয়ে নিচে ফেলে দিতে যাচ্ছেন পিছন থেকে নির্মলা এসে স্বামীর হাত চেপে ধরলেন। 'আজ আর ফেলতে পারবে না। আমি দেখব কি লিখেচ।' নীলকান্ত হাত ছাড়াবার চেষ্টা করে বললেন, 'কেন পাগলামি করছ ছেড়ে দাও।'

নির্মলা বললেন, 'পাগলামি আমি করছি না তুমি করছ' দিনের পর দিন কি হচ্ছে বল দেখি। আচ্ছা কালি আর কাগজেরও তো দাম আছে। তাও তো আমাকে পয়সা দিয়েই কিনতে হয়। নাকি মাগনা দেয় কেউ? এভাবে কাগজ নষ্ট না করে তুমি যদি বিশু যীশুকে দিয়ে দাও তাদের কাজ হয়।'

নীলকান্ত বললেন, 'কাল থেকে তাই দেব। আজ ছেড়ে দাও আমাকে।'

নির্মলা বোধ হয় আরো জোর করতেন, কিন্তু পাশের ঘর থেকে মালা ডাকল, 'মা এদিকে এস।' নির্মলা একটু-কাল স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কাল থেকে আর কাগজ নষ্ট করো না। লিখতে ইচ্ছা হয়, গাছের পাতায় লিখো।'

স্বামীর হাত ছেড়ে দিয়ে চলে গেলেন নির্মলা।

নীলকান্ত পাতাগুলি ফেলে দেবেন কিনা অন্যদিনের মত আজও একবার ভেবে দেখলেন। কিন্তু কি হবে রেখে। ওগুলি কিছু হয়নি। যে জীবনের ভিতর দিয়ে তিনি এসেছেন, যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা তিনি সঞ্চয় করেছেন, যে জীবন এক মুহূর্তে স্বাদু পরমুহূর্তে বিস্বাদ—তার কোন কথাই তো তিনি লিখতে পারেননি। যা লিখেছেন, জোলো, তা ফিকে। তাঁর অভিজ্ঞতার মত জমাট না, অনুভূতির মত গাঢ় নয়। নিজের লেখার মধ্যে অসংকোচে তিনি যদি নিজেকে উন্মোচিত না করতে পারলেন তাহলে কি হবে লিখে। সেই উন্মোচনের বাধাও বাইরে না, ভিতরে। একবার ভাবেন ব্যক্তি-গত জীবনের ক্লেদ কলঙ্ক, পরাজয় নৈরাশ্যের কথা তিনি কেন লিখবেন। তিনি তো শুধু ব্যক্তি-মানুষই নন। তাঁর মানসলোক আছে। সে লোকের বাসিন্দা শুধু তিনি নন। তাঁর সেই কল্পলোক বহুবর্ণ, বহুলোকের জীবনে

পূর্ণ। সেই সব জীবনের কথা তিনি লিখতে পারেন, আর লিখতে লিখতে একএকবার করে সে সব জীবন যাপনও করতে পারেন। তিনি এক নন, তিনি বহু। সেই বহু মানুষের কথা লিখতে যান নীলকান্ত। যারা তার মত নয়, তাঁর চেয়ে স্বতন্ত্র। কিন্তু লিখতে লিখতে হঠাৎ মনে হয়, তিনি বাজে কথা লিখছেন, মিথ্যে কথা লিখছেন। যা বিশ্বাস করেন না, অথচ যা বিশ্বাস করা উচিত বলে মনে করেন, যা অনুভব করেন না, অথচ অনুভব করা সঙ্গত বলে জানেন তাই লিখে যাচ্ছেন। ফলে মানুষগুলিকে হয় ছায়ার মত দেখাচ্ছে, না হয় কাঠের পুতুলের মত। এ লেখার আনন্দ নেই। দু-এক পাতা পড়ে খাতা সুদ্ধু ছিঁড়ে ফেলেন নীলকান্ত। আবার কিছুদিন চুপচাপ কাটে। পাপ পুণ্যের, জয়-পরাজয়ের ব্যর্থতা সাফল্যের গতানুগতিক ব্যাখ্যায় তাঁর মন সায় দেয় না। যতদিন নিজের ব্যাখ্যা নিজে ফের খুঁজে না পাবেন ততদিন আর কলম ধরবেন না। যাকে তিনি আজ পাপ বলছেন, ভুল বলছেন, যে অশুচিতার জন্যে তিনি আজ অনুশোচনা করছেন কাল তা উপভোগ করেছেন, কাল তাতে আনন্দ পেয়েছেন। কালকের সেই মত্ততা, সেই ভোগবাদকে যদি আজ শুধু দুর্ভোগ বলে ধিক্কার দেন তা মিথ্যে শোনাবে।

পাশের ঘর থেকে নির্মলা আর মালার কথাবার্তা কানে গেল নীলকান্তের।

মালা বলল, 'বাবাকে কেন বাধা দিচ্ছ মা। ও'র যা ভালো লাগে করুন না। ও'কে এখন ও'র ছোটখাট খেয়াল-গুলি মেটাতে দেওয়া ভালো।'

নির্মলা বললেন, 'তুই বলিস কি মালা। তাই বলে এই রাশ রাশ কাগজ নষ্ট করবেন উনি?'

মালা বলল, 'যা নষ্ট করেছেন তার তুলনায় কয়েক দিস্তা কাগজের দাম বেশি নয় মা। কাগজ ছিঁড়ে উনি যদি শান্ত থাকেন, শান্তিতে থাকেন তাই থাকতে দাও ও'কে।'

নীলকান্ত কান পেতে রইলেন, আড়ি পেতে রইলেন। নিজের সম্বন্ধে নিজের স্ত্রী আর মেয়ের ধারণা আড়াল থেকে শুনতে মন্দ লাগে না। এর আগে কত গল্পে উপন্যাসে কত নারীচরিত্রকে রূপ দিয়েছেন নীলকান্ত। আজ এই দুটি জীবন্ত নারী তাঁর চরিত্রের ব্যাখ্যা আর বিশ্লেষণে ব্যস্ত। এতদিন মানস কন্যাদের নিয়ে কেটেছে। কলমের ডগায় যেখানে খুশি নিয়ে গেছেন তাদের। যা খুশি তাই করিয়েছেন বলিয়েছেন। আজ নীলকান্তের নিজের রক্তমাংসের কন্যার হাতে কর্তৃত্ব। তার খবরদারী মানতে হয়। শাসন অনুশাসনের একেবারে অবাধ্য হলে ধমকও শুনতে হয় মাঝে মাঝে।

মৃদু হেসে কান পেতে রইলেন নীল-কান্ত। কিন্তু নিজের সম্বন্ধে আর কোন কথা শুনতে পেলেন না। হাসপাতালে নাইট ডিউটি পড়েছে মালার। তাকে এখনই বেরোতে হবে। সেই উদ্যোগ আয়োজন চলেছে।

(ক্রমশঃ)

উপন্যাস

আরোগ্য-নিকেতন—তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়। দ্বিতীয় সংস্করণ। বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা--১২। দাম ছয় টাকা।

১৯৫৫ সালের রবীন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার-প্রাপ্ত উপন্যাসের দ্বিতীয় সংস্করণ হওয়া বিচিত্র নয়। বাংলা সাহিত্যে কবিগুরুর পুণ্য-

স্মৃতিজড়িত একটি জাতীয় পুরস্কারের সম্মান শ্রদ্ধাভরে স্বীকার করেও বলা চলে, তারাশংকরবাবু ইতিপূর্বে অন্তত আরও পাঁচ সাতখানি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এবং উচ্চাঙ্গ কথাসাহিত্যের নমুনা রচনা করেছেন। দ্বিতীয় কথা, 'আরোগ্য-নিকেতন'-এর প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হতে তিন বছরের ওপর সময় লাগল। অর্থাৎ পুরস্কার-প্রাপ্তি পর্যন্ত! তারাশংকরের রচনার সঙ্গে যাঁদের ঘনিষ্ঠ পরিচয়, তাঁরাই জানেন লেখকের শক্তিমত্তার বৈশিষ্ট্য কোনখানে। মাটির আর মানুষের সহজ ও স্বাভাবিক সংমিশ্রণে। কৌলিক পদ্ধতিতে চিকিৎসার কেন্দ্র ছিল 'মশায়ের কবিরাজখানা'। জন্মগত অধিকার ও স্বভাবসিদ্ধ নৈপুণ্যে জীবনবন্ধু তাঁর ঐতিহ্যের সম্মান রেখেছিলেন। প্রচলিত অর্থে তিনি ঐশ্বর্য পাননি হয়তো। কিন্তু ঐ অঞ্চলের সকলের কাছ থেকে, এমন কি আধুনিক শিক্ষিত চিকিৎসকের কাছ থেকেও তাঁর প্রতিভা স্বীকৃতি পেয়েছিল। গ্রাম-পরিবেশে জীবন মশায়কে কেন্দ্র করে তারাশংকর এমন এক কাহিনী রচনা করেছেন, যেখানে বহু মানুষের ভিড়ে একটি মানুষও হারায় না, আপন উজ্জ্বলতায়, নির্লোভিতায় ও প্রকৃতি-জাত সুস্থ দার্শনিকতায় গ্রাম্য কবিরাজ মহতের পর্যায়ে ওঠেন। কেউ কেউ হয়তো বলবেন, নাড়ী-জ্ঞান ও 'নিদান হাঁকা'র ক্ষমতা যেন ঐশ্বরিক হয়ে উঠেছে। তারাশংকর নায়ক-চরিত্রকে আদর্শায়িত করেছেন। হয় তো তাই। কিন্তু প্রাথমিক প্রতিজ্ঞা নিয়ে শিল্পীর কাজে খুঁত ধরা সাজে না। দেখতে হবে, প্রতিশ্রুতি সম্পূর্ণ হল কিনা, আর অভিব্যক্তিটা স্বাভাবিক ও সার্থক হল কি না। জীবনবন্ধু অভিব্যক্ত চরিত্র; আশ-পাশের ঘটনা আর চরিত্র নিয়ে তাঁর স্নিগ্ধোজ্জ্বল পরিণতি। নিজের 'নিদান' নিজেই ডাকলেন এবং নিয়তির অভ্রান্ত ইঙ্গিত মেনে প্রস্তুত হলেন। কাজেই সে হিসাবে, এ উপন্যাস সিদ্ধ ও সত্য। 'আরোগ্য-নিকেতন' গতানুগতিক কাহিনী নয়। এর বিশেষ ধরনের আবেদন গ্রহণ করতে হলে তারাশংকর বর্ণিত (আধুনিক কালের মধ্য দিয়েও) শাশ্বত গ্রাম আর আদিম মৃত্তিকার জীবন্ত প্রভাবকে প্রত্যক্ষ করা দরকার।

৩৮৪।৫৫

বিপিনের সংসার—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃতীয় সংস্করণ। বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলিকাতা-১২। দাম চার টাকা।

চৌদ্দ বছর আগেকার লেখা বইয়ের তৃতীয় সংস্করণ, কিন্তু মাধুর্য একটুও ম্লান হয় নাই। কারণ, বিভূতিবাবুর লেখার যে প্রসাদগুণ, পল্লী অঞ্চলের মানুষদের ছোটখাট সুখ-দুঃখ, আশা-ভরসাকে তিনি যেভাবে রূপায়িত করিতে জানিতেন, তাহার একটি স্থায়ী মূল্য আছে। বিভূতিবাবুর মানস-মণ্ডলকে ঘিরিয়া আছে রাণাঘাট-বনগাঁ অঞ্চলের প্রাকৃতিক দৃশ্য ও সরল গার্হস্থ্য জীবন, যাহার রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ তাঁহাকে বারে বারেই আবেগকম্পিত করিয়াছে। প্রকৃতির নির্জন ও গভীর উপাসক ছাড়াও তাঁহার আর একটি পরিচয়, তিনি চোখে-দেখা মানুষকে, বিশেষ করিয়া নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর গ্রাম্য চরিত্রকে, অশেষ সহানুভূতি দিয়া আঁকিতে জানিতেন। 'আদর্শ হিন্দু হোটেল', 'বিপিনের সংসার' এবং আরও কয়েকখানি বই একই ছাঁচের রচনা। অর্ধশিক্ষিত মুহুরী, নায়েব, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক আর পাচক—ইহারাই তাঁহার উপন্যাসের প্রধান চরিত্র। আর সেই চরিত্রগুলির বিকাশে সাহায্য করে কয়েকটি স্বভাব-সুন্দর রমণীর সরল প্রীতি। ইহারা সকলেই নাগরিকতার জটিলতাবর্জিত। শুধু অন্তরের স্বচ্ছন্দ প্রকাশে তাহারা উজ্জ্বল। তাই মানী, কামিনী, শান্তি, ভগ্নী বীণা প্রভৃতি স্ত্রী-চরিত্রগুলি পাঠকের চিত্ত জয় করে। স্ত্রীলোকের স্বভাব-দাক্ষিণ্য, স্নেহ কোমলতা ও সেবা-প্রবৃত্তি তাই পুরুষ-চরিত্রের চেয়ে বিভূতিবাবুর কলমে এত ভালো ফুটিত। সহজ আন্তরিকতাই বিভূতিবাবুর মহৎ গুণ। কি প্রকাশভঙ্গীতে, কি চরিত্র-সৃষ্টিতে। বিপিনের মতন সরল, আশাপ্রবণ এবং স্বল্প চাহিদার এক অর্ধ-পরিণত মানুষের সহিত তিনি একাত্মভাবে মিশিয়া যাইতেন, ইহাই তাঁহার কৃতিত্ব। ৪২৯।৫৫

হ্রদ—বিমল কর। মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম তিন টাকা। তৃতীয় সংস্করণ।

বিমল করের এই উপন্যাসখানিকে মোটামুটি বলা চলে, মনঃসমীক্ষণ আর অপরাধ-তত্ত্বের সমন্বয়। বাণীব্রতকে খুনী সাব্যস্ত করা হয় ডাক্তার দিব্যেন্দু চক্রবর্তীকে হত্যা করার জন্য। বাণীব্রত লীলার উপর আসক্ত ছিল আর তারই খুড়তুতো ভাই দিব্যেন্দু সেই লীলাকে গৃহিণী করে। কাজেই উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট। কিন্তু মেণ্টাল হসপিটালের বিজ্ঞান-প্রিয় ডাক্তার প্রণব দাশগুপ্ত এ কাহিনী মেনে নিতে পারল না। অনুসন্ধান করে সুদক্ষিণার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে আত্মবিস্মৃত রোগী বাণীব্রতের চিকিৎসার ভার নিল। তারপর অনেক ধৈর্য ধরে মনঃসমীক্ষণের প্রয়োগ করে বাণীব্রতের সুপ্ত সত্তাকে জাগ্রত করা হল। ধীরে ধীরে তার স্মৃতিশক্তি ফিরে এসে কেমন করে হত্যার যথার্থ অপরাধীর নির্ণয় সম্ভব করল, 'এসোসিয়েশ্যান' বা একটি বিশেষ স্মৃতির অনুষঙ্গ কেমন করে বিস্মৃত অতীতকে ফিরিয়ে আনল, 'হ্রদ'

উপন্যাসে এই সব কথাই বেশ নিপুণভাবে চিত্রিত হয়েছে। বিভিন্ন দৃশ্যের সংলগ্নতার ও যথাযথ সংস্থাপনে বইখানির মধ্যে নাটকীয় আবেদন আছে। তাই এর চিত্ররূপে ছবির পর্দায় দেখা গেল। বইখানি জনপ্রিয় হয়েছে নানা কারণে, আঙ্গিকের মূল্য একটি। কিন্তু বিমল কর আসলে গল্পকার, বড় এবং ছোট গল্পেরই যত্নবান শিল্পী। সার্থক উপন্যাসে সূক্ষ্ম দৃষ্টির সঙ্গে গভীরতর জীবনবোধ এবং মানবিকতার সংযোগ ঘটে। পাঠকেরা সেই ধরনের উপন্যাস শক্তিমান লেখকের কাছে প্রত্যাশা করছে। ৪৬৬।৫৫

সোমলতা—শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী। ন্যাশনাল পাবলিশার্স, ১৪৫বি, সাউথ সিঁথি রোড, কলিকাতা—২। দাম সাড়ে তিন টাকা।

'সোমলতা' সরোজকুমারের বিখ্যাত উপন্যাস। 'পরিচয়ের' পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হবার সময়ে 'সোমলতা' রসিক ও বিদগ্ধ পাঠক-সমাজের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। সরোজকুমারের কথা-সাহিত্যিক হিসাবে যে খ্যাতি, তার পরিণতি বোধ হয় তাঁর ত্রয়ী-উপন্যাসে। রাঢ় দেশের মাটি আর মানুষ, সমাজ ও সংস্কার নিয়ে লেখা 'ময়ূরাক্ষী', 'গৃহকপোতী' আর সোমলতা হল তাঁর ট্রিলজি এবং বোধ করি তাঁর শিল্প শক্তির উৎকৃষ্ট নিদর্শন। প্রথম খণ্ডে পল্লী-নায়িকা বিনোদিনীর গার্হস্থ্য জীবন, দ্বিতীয় খণ্ডে বাউলের আখড়ায় তার নূতন মুক্তি-স্বাদ। তৃতীয় খণ্ডে পিতৃগৃহে আবার এক জীবনের অধ্যায়। প্রথম দু খণ্ড পড়া না থাকলেও 'সোমলতা'র রসাস্বাদনে অসুবিধা নেই। বিনোদিনী এখানে নূতন মানুষ, সরোজ-কুমারের পরিণত সৃষ্টি। কলঙ্কের ঊর্ধ্বে, জীবন-মহিমায় উজ্জ্বল। গ্লানিহীন সর্বংসহা ধরণীর মতই তার আবর্তিত প্রাণ-শক্তি। ধর্মমূলে সমাজে বাউল-সম্প্রদায়ের সহজ রসাশ্রয়ী প্রীতি,—এই আবহের মধ্যে বিনোদিনীর চরিত্র আশ্চর্যভাবে সজীব হয়ে উঠেছে। (৪২২/৫৫)

বিষের ধোঁয়া (৬ষ্ঠ সংস্করণ)—**শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়।** বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলিকাতা—১২। দাম—তিন টাকা।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় খ্যাতনামা এবং সুলেখক। 'বিষের ধোঁয়া' উপন্যাসখানিও সুপরিচিত এবং বহু-পঠিত। ইহার চিত্ররূপও সফলতা অর্জন করিয়াছে। বিস্তৃত পরিচয়ের প্রয়োজন নাই। শুধু এইটুকু বলিলেই চলিবে যে, শরদিন্দুবাবু গল্প বলিতে জানেন এবং তাঁহার বাচনভঙ্গী এতই সরস যে অনেক কথা মনে রাখিবারই মত। বিশেষ করিয়া তাঁহার সংলাপ। আঙ্গিকেও তাঁহার যথেষ্ট দখল আছে। সাধারণ মানুষের সাধারণ সমস্যা লইয়াই তাঁহার কথাবস্তু গড়িয়া ওঠে। তাহার মধ্যে ঘটনার সংস্থানই বৈচিত্র্য আনে, অবস্থার মধ্য দিয়াই চরিত্র স্ফুরিত হয় এবং সমস্তক্ষণ একটি স্মিত কৌতুকবোধ গল্পের গতিকে এমনভাবে ঘিরিয়া থাকে যে, মনে হয় না, কোথাও কৃত্রিমতার সাহায্য লওয়া হইয়াছে। বর্তমান জীবনের কঠোর ও বাস্তব রূপ হয় তো তাঁহার রচনায় মিলিবে না; কিন্তু কুটিলতা ও প্রসন্নতার মিশ্রণে জটিল জীবনের রূপায়ন কেমন অনায়াসে ফুটিয়া ওঠে। ৩৩১।৫৫

রম্যরচনা

মুখর লণ্ডন (দ্বিতীয় সংস্করণ)—সুধী-রঞ্জন মুখোপাধ্যায়। বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলিকাতা—১২। দাম—দুই টাকা।

দ্বিতীয় সংস্করণ হইতেই বোঝা যায়, সুধীরঞ্জনের বিদেশী চিত্র-রচনা সত্যই জনপ্রিয় হইয়াছে। লেখকের হাত বড় মিষ্ট, ভাষাও সহজ স্বচ্ছ ও সুকুমার। মধ্যাদিনের গান, সপ্তাহ শেষের ইংল্যান্ড আর ইউরোপের সমুদ্রতীর সুলিখিত এবং রীতিমত উপভোগ্য। লণ্ডনে ভারতীয় লেখক এবং আধুনিক বাংলা সাহিত্য ও নোবেল পুরস্কার, এই দুটি রচনায় কেবল সূক্ষ্ম সামঞ্জস্য-জ্ঞানের অভাব ঠেকিল। অবশ্য সুধীবাবু স্বদেশী সাহিত্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বেশি উৎসাহী। তপন-মোহনবাবুর 'স্মৃতিরঙ্গ' পড়িয়া যেরূপ আন্তরিক তৃপ্তি হয়, 'মুখর লণ্ডনে' তাহা নাই। তবে অন্য ধরনের আবেদন এবং লঘু সাহিত্যের আকর্ষণ বর্তমান। ৩৪৪।৫৫

কুশী প্রাঙ্গণের চিঠি (২য় সংস্করণ)—বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়। বেঙ্গল পাবলি-শার্স। কলিকাতা-১২। দাম তিন টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থখানির দ্বিতীয় সংস্করণ হলেও এ বই এমন একটি রচনা, যার পুনরালোচনায় লাভ ছাড়া লোকসান নেই। প্রথমে একবার পড়েছিলুম, এখন আবার পড়ে দেখি, তেমনি ভালো লাগছে। অর্থাৎ মজা নষ্ট হয় নি। কেন?

(১) প্রথমত, বিভূতিবাবুর চিত্রধর্মী মন ও কলম সমান পাল্লা দিয়েছে।

(২) তাঁর বর্ণনা ইঙ্গিতে ব্যক্ত হয় না, বর্ণে অভিব্যক্ত হয়। তবে বর্ণবাহুল্যে নেই আবার সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণের অভাব নেই। রঙ আছে, অথচ রেখাচিত্রের চিকণ সৌন্দর্য আছে।

(৩) এ ধরনের রচনায় মনের লাগাম ছেড়ে দেওয়া যায় না। না গল্প, না ভ্রমণ কাহিনী, অথচ উভয় শিল্পেরই নিদর্শন আছে। কালীঘাট-ফলতা লাইট রেলওয়েতে চড়ে যে ব্যক্তি অনেক চরিত্র দেখতে ও দেখাতে জানেন, এত অল্প সময়ের পরিসরে স্মিত-করুণ অভিজ্ঞতা বিষয়ভুক্ত করতে পারেন, তাঁর ক্ষমতা আছে নিশ্চয়ই। কুশীর ধূসর-শ্যামল প্রাঙ্গণেও সেই আপাত বৈচিত্র্যহীন কিন্তু অন্তর-সমৃদ্ধ দর্শনের পরিচয় রয়ে গেল।

(৪) কুশীর শান্ত মূর্তি ও সর্বনাশী ছলনার রূপ হয়তো একটু বেশি করেই পুনরাবৃত্ত হয়েছে। কিন্তু কুশীই তো নায়িকা এবং প্রচ্ছন্নাও নয়।

(৫) 'ল্যাণ্ডস্কেপ' আর দেহাতী ঘর-বাড়ি ও মানুষ বেমালুম মিশে গেছে।

(৬) বিভূতিবাবুর পরিচিত দুর্বলতা শিশু-প্রীতি ও স্নিগ্ধ গার্হস্থ্য পুরোমাত্রায় বজায় আছে। ঘুরে ফিরে পাণ্ডুল উঁকি দিচ্ছে।

(৭) কবি-মন অর্থাৎ কাব্যদৃষ্টি না থাকলে এ বই রিপোর্টিং হয়ে যেত। কল্পনা এখানে মুক্ত কিন্তু বিশৃঙ্খল নয়, অসংলগ্ন নয়।

(৮) কৌতুকবোধ এবং বিস্ময়বোধ সামান্যকে অসামান্য করে তোলে, বিভূতিবাবু তা দেখাতে পেরেছেন। দু চার জায়গায় ভাবের উচ্ছ্বাস এসে গেছে কিন্তু লেখক হেসে সামলে নিয়েছেন।

(৯) কুশীকে যে বাগ মানানো যাচ্ছে না বৈজ্ঞানিক চেষ্টা সত্ত্বেও, তাতে বিভূতিবাবু বেশ খুশি-খুশি। এবং আমিও, যেহেতু মুক্তা নায়িকাকে যথার্থ পরিবেশে না পেলে 'রেনেশাঁস অফ ওঅণ্ডর' সম্ভব নয়।

কিশোর সাহিত্য

সুন্দরবনে আর্জান সর্দার—শিবশঙ্কর মিত্র। দীপায়ন, ২০, কেশব সেন স্ট্রীট, কলিকাতা—৯। দাম ৩।০।

খুলনা জেলার লোক মাত্রই এই বইখানির সমাদর করবেন। চালনা ছাড়িয়ে পশর নদী ফেলে চুন কুড়ি ও ভদ্রা নদী, ঢাকর খাল, বড় শিবসা ও হড্ডা নদী,—এই সব নদী-বেষ্টিত পরিচিত অঞ্চলের দক্ষিণেই আবাদ। কর্মসূত্রে এই নদীপথে যেতে যেতে লেখক আর্জান সর্দার নামে একটি ছোট, শান্ত চেহারার কিন্তু দুর্জয় সাহসের মানুষের দেখা পান। বইখানি সুন্দরবন অঞ্চলে সেই আর্জান সর্দারেরই কাহিনী। শুধু মধু-সংগ্রহ আর বাঘ শিকারের গল্প নয়। বইখানির মারফৎ বিচিত্র সুন্দরবনের সৌন্দর্য ও বিশিষ্ট আকর্ষণ যেন মূর্ত হয়ে ওঠে। লেখকের বলবার ভংগীটি ভালো। আখ্যানের সঙ্গে আর্জান, ধনাই, ফতিমা ও তুফান প্রভৃতি চরিত্রগুলি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। যাঁরা শ্বাপদ সংকুল সুন্দরবনের দুঃসাহসিক জীবন আর জীবিকা সম্পর্কে আগ্রহান্বিত, তাঁরা এ বই পড়ে তৃপ্ত হবেন। 'যুগান্তর' পত্রিকায় যখন আর্জান সর্দারের কাহিনী ধারাবাহিক প্রকাশিত হচ্ছিল, তখন অনেকেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। বইখানি পড়ে শুধু বালক-বালিকাই মুগ্ধ হবে না, অভিভাবকেরাও উপহার দেবার আগে নিজেরাই পড়ে নিতে চাইবেন। কারণ এ বই সকলের জন্য লেখা। (৫৮৩।৫৫)

পত্রিকা

উজ্জীবন—মাসিক পত্র। কার্তিক সংখ্যা। সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্র রামকৃষ্ণ দাস, শ্রীবলরাম ধর্ম সোপান, খড়দহ, ২৪ পরগণা হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক মূল্য ৫, প্রতি সংখ্যা ৷৷০ আনা।

ধর্ম এবং সংস্কৃতিমূলক এই পত্রিকাখানি অল্প দিনের মধ্যেই বাংলার চিন্তাশীল সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। সুসম্পাদিত এই পত্রের আলোচনায় সর্বত্র চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। বাংলা দেশের বহু মনীষীবৃন্দের লিখিত প্রবন্ধ এবং বিশিষ্ট কবিগণের কবিতায় আলোচ্য সংখ্যা সমৃদ্ধ। কীর্তনের সুরযোজনা এবং স্বরলিপি উজ্জীবনের প্রতি সংখ্যার গৌরব বৃদ্ধি করে। আলোচ্য সংখ্যাতেও কয়েক পদ কীর্তন এবং নাম কীর্তনের স্বরলিপি প্রদত্ত হইয়াছে' আমরা এই পত্রের বহুল প্রচার কামনা করি।

প্রাপ্তি স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থ আসিয়াছে।

বাঙালীর ইতিকথা—শ্রীসমেরন্দ্রকিশোর দত্ত।

কন্যাবিদ্যাপীঠ—নির্মল গঙ্গোপাধ্যায়।

গৌরব গাথা—জগদানন্দ বাজপেয়ী।

উত্তম রহস্য—শ্রীমা।

কাগজের ফুল—দেবপ্রসাদ।

রাওয়ালা—গোপালক মজুমদার।

ভুল হলো মধুময়—"ভ্রমর"।

শৈলজানন্দের শ্রেষ্ঠ গল্প—থ্যাকার স্পিংক এণ্ড কোং (১৯৩৩) লিঃ, ৩, এ্যাসপ্ল্যানেড ইষ্ট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

রাত পোহাল—সুধীররঞ্জন গুহ।

যা দেখেছি যা শুনেছি—শশিশেখর বসু।

পদ্মরাগ—হরকিংকর ভট্টাচার্য।

এ ক্রিসমাস ক্যারোল—চার্লস ডিকেন্স অনুবাদক—শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায়।

বারনেবি রাজ—চার্লস ডিকেন্স অনুবাদক —শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায়।

ভ্রম সংশোধন

গত সংখ্যায় প্রকাশিত 'রাগসঙ্গীতের ভূমিকা' নামক প্রবন্ধটির লেখক রাজ্যেশ্বর মিত্র। ভুলবশত 'মিত্রের' পরিবর্তে 'রায়' হইয়া গিয়াছে।

—শৌণ্ডিক—

কাহিনীর নির্বাসন

হিন্দী ছবির কাহিনীর দুর্বলতা যথাপূর্বং। যদিও পাশ্চাত্যের অনুকরণ ছেড়ে দেশের ঐতিহ্যের প্রতি ঝোঁক হচ্ছে আস্তে আস্তে। গান নাচ সাজ পোশাক আগের চেয়ে ভদ্রের দিকেই এগিয়ে চলেছে। কিন্তু গল্পের ব্যাপারে উদ্ভটতাকে কিছুতেই ওরা কাটিয়ে উঠতে পারছে না। ওরা তা চায়না বলেই যেন মনে হচ্ছে। না চাওয়ার কারণও অবশ্য ওরা পেয়েছে। ওরা বলবে গল্পের জোরের ওপরে তোলা ছবি শ্রদ্ধাই শুধু পায়, পয়সা টানার মতো চুম্বকী শক্তি তার থাকে না; পরন্তু উদ্ভট ও অস্বাভাবিক গল্প হওয়া সত্বেও অন্যান্য দিকে খুব ঘটা প্রকাশ করতে পারলে শ্রদ্ধা হয়তো নাও জুটতে পারে কিন্তু টাকা গুণে তোলার জন্য অতিরিক্ত লোকের দরকার হয়ে থাকে। যেমন জেমিনীর "ইনসানীয়ৎ।" রূপক গল্পেও অস্বাভাবিকত্ব বা উদ্ভটত্বের মধ্যে যেটুকু ব্যালেন্স থাকে "ইনসানীয়ৎ"-য়ে তাও নেই অথচ "ইনসানীয়ৎ" ছেলেবুড়ো সব বয়সের এতো লোক আকর্ষণ করছে যা এবছরকার একটা রেকর্ড বললেই চলে। "ইনসানীয়ৎ"-এর গল্প আজগুবি হলে কি হবে, যে সব কাণ্ড মানুষের অনুভূতিতে রোমাঞ্চ এনে দেয়, উত্তেজনা ও কৌতূহল জাগিয়ে তোলে, রাগ দ্বেষ করুণার সৃষ্টি করে, মানুষকে শক্তি ও বৈভবের বিলাসের সামনে হাজির করে দেয়, বেছে বেছে সেইরকম সব উপাদানে ভর্তি করে দেওয়া হয়েছে ছবিখানিকে। তাতে গল্পেব সঙ্গতি রক্ষিত হলো কি-না তা নিয়ে মাথা ঘামাবার কোন প্রয়োজনই দেখেননি চিত্রনির্মাতা। একজন নয়, একটি দল মিলে এইসব উপাদান ভেবে চিন্তে বের করেছেন—যার নাম দেওয়া হয়েছে 'জেমিনী কাহিনী বিভাগ'। 'কাহিনী' কথাটা বাদ দিয়ে 'চিত্র-উপাদান আহরণ' বিভাগ নামটাই ঠিক হতো। কারণ কাহিনী কথাটায় রসসঙ্গত সাহিত্যের আভাস যেন ছুঁয়ে রয়েছে যা এছবিখানিতে অনুপস্থিত। জেমিনী যে ফরমুলোতে "চন্দ্রলেখা", "মঙ্গলা", "বহুৎ দিন হুয়ে" প্রভৃতি ছবিগুলি তৈরী করেছে, "ইনসানীয়ৎ"-য়ে সেই একই ফরমুলোই খাটানো হয়েছে। সেই দুটি রাজ্য, একটি দরিদ্র ও নিপীড়িত কিন্তু সরল, সৎ ও বীর; এবং অপরটি বিপুল ধন ঐশ্বর্যের অধিকারী এবং উৎপীড়ক; সেই একটি গ্রাম্যবালাকে দুই যুবকের ভালোবাসা এবং শেষে

(২৭৬ এ)

একজনের আত্মত্যাগ; সেই বিরাট দুর্গ থেকে লড়াই এবং দুর্গ আক্রমণ করে শেষে দখল করে নেওয়া, এমন কি, বিরাট দুর্গের প্রহরীকে নাচ-গানে ভুলিয়ে ফাঁকি দিয়ে দুর্গের ভিতর ঢুকে পড়ার সেই একই ঘটনা; একটা উৎসব উপলক্ষে বিচিত্র নাচ-গানের সমারোহ; বিরাট প্রাসাদ বহুলোকজন; একটা বাজারের দৃশ্য; একটা বনের দৃশ্য; অত্যাচারী রাজার বিরুদ্ধে রাণীর বিদ্রোহভাব, গুপ্ত সুড়ঙ্গে কারাগার এবং সেই কারাগার থেকে গুপ্তচরের সাহায্যে পলায়ন; খানিকটা বন এবং বনে শত্রু কর্তৃক শিশু অপহরণ; ঘোড়ার পিঠে তাড়া; হাতাহাতি তলওয়ার খেলা ইত্যাদি জেমিনীর আগেকার ছবির ঘটনাবলী নিয়েই "ইনসানীয়ৎ"-য়ের ঘটনাগুলো সাজানো, কেবল অন্যরকমভাবে; আর কতকাংশে পার্থক্য সাজ-পোশাক এবং সেটসেটিংয়ের চেহারা, গানের সুর, নাচের রচনা ও ভূমিকালিপিতে। নতুন কোন বিষয়বস্তু জেমিনী পরিবেশন করেনি। একটি অতিরিক্ত আকর্ষণ একটি শিম্পাঞ্জী; হলিউড থেকে আনানো জিপ্পী। একটা বানরের মতো বানর বটে! তবে জিপ্পী না থাকলেও ছবিখানি সমগ্রভাবে একটা পুরো সার্কাস দেখার মতো মজা ও আমোদই উপভোগ করিয়ে দেয়। বহুসংখ্যক চিত্রামোদী এতেই সন্তুষ্ট, তা না হলে সপ্তাহের পর সপ্তাহ 'হাউস ফুল' চলে কি করে?—কাজেই জেমিনী কেন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একই জিনিস এনে দেবে না। প্রযোজক-পরিচালক এস এস ভাসনের বহু লক্ষ টাকা ব্যয় হয় ছবি তৈরিতে সুতরাং যাতে টাকাটা অবার্থ তোলা যায় সেই চেষ্টাই তো বুদ্ধিমানের কাজ! অবশ্য বুদ্ধিমান মানে স্রেফ বিষয়বুদ্ধি।

* * *

আরও একরকমের ছবি তোলায় বম্বের প্রযোজকদের ঝোঁক দেখা দিয়েছে। ভারতীয় শিল্পকলার ঐতিহ্য বম্বের ছবিতে থাকে না বলে অভিযোগ তুলে হিন্দী ছবির বিরোধিতা পাকিয়ে তোলা হয়েছে। কিন্তু শান্তারামের "ঝনক ঝনক পায়েল বাজে" দেখবার পর তাদের কারুর মুখে আর রা-টি কাড়বে না। কতো চাই শিল্পকলা ঐতিহ্যের নিদর্শন?—কেউ যতোটা আশা করতে পারে তার চেয়ে বহুগুণে বেশী উপাদানে ছবিখানি ভর্তি। সঙ্গতিপূর্ণ কাহিনী গড়ে উঠলো না তো বয়েই গেল—তার জায়গায় ছবি কানায় কানায় ভরে থাক কথক নাচের ছন্দ আর রাগরাগিণীর সুরচ্ছটায়; জয়পুরে মহীশূরের শিল্পকলা আর প্রাকৃতিক শোভার বিরাট মিছিলে। তাই দেখতেই লোক আর ধরছে না সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে। গল্প নেই বললেই চলে; চরিত্র বা ঘটনা নিমিত্তমাত্র, তাই অভিনয়ও নেই দেখবার। কিন্তু দেখবার জন্য রয়েছে ঢালাও রঙ, সুরের ঝঞ্ঝা এবং নৃত্যছন্দের উত্তাল প্রস্রবণ। এই পেয়েই অসংখ্য লোকে খুশ খুশি, গল্পের তাহলে প্রয়োজন কি?

* * *

আবার গল্প নিয়েও বিরাট ছবি তৈরি হয়েছে "শ্রী৪২০"। দোষত্রুটি এবং বাড়াবাড়ি অবশ্য আছে, তবুও এছবির ভিত্তি কাহিনীকে কেন্দ্র করেই। সেই সঙ্গে দৃশ্যসজ্জা ও সেট সেটিংয়ে

এস, এম, প্রোডাকসন্সের নির্মীয়মান কৌতুকচিত্র 'নাগরদোলা'র একটি দৃশ্য

বিরাটত্বও কম নয়। তবে গল্প ও ঘটনার ওপরেই জোর, ফলে এতে গোটা গোটা চরিত্র পাওয়া যায়, মানবিক আবেদন একটা পাওয়া যায় এবং নাট্যরসপুষ্ট অভিনয়ও পাওয়া যায়। এছবিখানিও আগের ছবি দুখানির মতোই দৃষ্টি ও শ্রুতিকে তাক লাগিয়ে দেবার মতো বৈচিত্র্যে ভরা এবং এছবি বুদ্ধির আঁচে তাতানো অনুভূতি নিয়ে উপভোগ করার মতো ছবি হওয়া সত্ত্বেও দেখবার জন্য ঐ দুখানি ছবির মতোই জনতা আকর্ষণ করছে। তিনখানি ছবির মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে মিল কেবল বিরাটত্বের দিক থেকে, তা নয়তো প্রকৃতিগতভাবে তিনখানিই আলাদা আলাদা ধাঁচের। অথচ তিনখানিই প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। কি প্রতিপাদ্য দাঁড় করানো যায় তাহলে

এ থেকে? প্রায় সাট-প'য়ষট্টি লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে এই ছবি তিনখানি তৈরি হতে—তাহলে কি ধরে নিতে হবে যে, মানানসই ও মনোজ্ঞ নাটকীয় কাহিনীর দিকে ঝোঁক না দিয়ে বহু অর্থ ব্যয়ে বিরাট সমারোহপূর্ণ ও জমকালো দৃশ্যের সমন্বয় করে নিতে পারলেই লোকের মন পাওয়া যাবে?—না ভারতীয় ঐতিহ্যকে অচেলভাবে সামনে তুলে ধরলেই লোকে খুশি হবে? এই যদি নিরীখ হয় তা'হলে তো এখন যে জায়গায় দশখানি ছবি যতো টাকায় তোলা হচ্ছে তার জায়গায় সংখ্যা দু'তিনখানি করে নিতে হবে। নয়তো অমন বিরাট বিরাট ছবি তোলার জন্য অতো লক্ষ লক্ষ টাকা জুটবে কোথা থেকে? আর যদি জুটেও যায় তো সাহিত্যরসপুষ্ট কাহিনীকে ছবি থেকে নির্বাসিত করে মানুষের চেতনাকে বিবিধ বিষয়ে সজ্ঞাত করে তোলার উপায় থাকবে কোথায় তখন? ভালো কাহিনীর আর কিছু না হোক, ছবির আবেদনকে দীর্ঘস্থায়ী করে তোলার ক্ষমতাটা তার থাকে, অন্যথায় নয়।

এ মাসের নতুন রেকর্ড

পূজোর মাসে হিজ মাস্টারস ভয়েস ও কলম্বিয়া অনেকগুলি নামকরা গায়ক-গায়িকার বাছাইকরা গান ও নক্সার রেকর্ড বাজারে ছেড়েছেন।

হিজ মাস্টারস ভয়েস যে সমস্ত রেকর্ড বের করেছেন তার ভেতর আছে রবীন্দ্র সঙ্গীত, আধুনিক গান ও কৌতুক নক্সা। রবীন্দ্র গীতি গেয়েছেন সুচিত্রা মিত্র (N 82671)—"সকল জনম ভোরে" ও "সাঁঝ ঐ বুঝি"—ভাষায়, ভাবে ও কণ্ঠমাধুর্যে প্রাণবন্ত। ১৪ খানি আধুনিক গানের সাতখানি রেকর্ড করেছেন যশস্বী শিল্পীবৃন্দ—সতীনাথ মুখোপাধ্যায় (N 82668), আল্পনা বন্দ্যোপাধ্যায় (N 82669), বাণী ঘোষাল (N 82670)। উৎপলা সেন (N 82672), তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় (N 82673), শ্যামল মিত্র (N 82674) ও সুপ্রীতি ঘোষ (N 82675), নমিতা সেনগুপ্তা ও ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় গেয়েছেন কৌতুক রচনা (N 82676)।

প্রকাশিত কলম্বিয়া রেকর্ড আধুনিক ও ভক্তিমূলক গান সম্ভারে পূর্ণ—, গেয়েছেন শ্রেষ্ঠ শিল্পীরা—হেমন্ত মুখার্জি (GE 24771), গায়ত্রী বসু (GE 24772), পান্নালাল ভট্টাচার্য (GE 24773), শচীন গুপ্ত (GE 24774), প্রতিমা ব্যানার্জি (GE 24775), ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য (GE 24776), সন্ধ্যা মুখার্জি (GE 24777), ও ছবি ব্যানার্জি (GE24778)।

'ঝাঁসীর রাণী'

মহাশয়,

'দেশ' পত্রিকায় ৪ঠা কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত 'ঝাঁসীর রাণী' প্রবন্ধে লেখিকা মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য লিখিয়াছেন, "বাঙালী পরিবারটির মাধ্যমে বাংলাদেশের বিখ্যাত আইনজীবি বাবু উমেশচন্দ্র ব্যানার্জির সঙ্গে যোগাযোগ ঘটে রাণীর। বিলাতে যাবার খরচ ইত্যাদির কথা বলে উমেশচন্দ্র ব্যানার্জিকে রাণীর তরফ থেকে ৬০,০০০ টাকা দেওয়া হয়।" তিনি আরও লিখিয়াছেন, "এই উমেশ-চন্দ্র, বাংলার বিখ্যাত ব্যারিস্টার উমেশচন্দ্র বোনার্জি কি-না সেই রহস্য ভেদ করবার কোন উপায় নেই।" উমেশচন্দ্র বোনার্জি বলিতে সম্ভবতঃ লেখিকা বিখ্যাত ব্যারিস্টার W. C. Bonerjee-র কথাই বলিতে চাহিতেছেন। তাঁর নিম্ন উদ্ধৃত উক্তিতে আমাদের সন্দেহ আরও স্পষ্ট হয়। "তাঁর নিযুক্ত বাঙালী-বাবু কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা উমেশচন্দ্র বোনার্জি কি-না, সে প্রসঙ্গ না জেনে মন্তব্য না করাই উচিত।" কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এইরূপ সংশয়ের অর্থাৎ রাণীর প্রেরিত উমেশচন্দ্র ব্যানার্জি কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি উমেশচন্দ্র বোনার্জি নহেন সে সম্বন্ধে কোনো সংশয়ের অবসর নাই।

"১৮৪৪ খৃঃ অব্দের ২৯শে ডিসেম্বর খিদিরপুরে W. C. Bonerjee-র জন্ম। কিছুদিন কলিকাতার ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী ও হিন্দু স্কুলে পাঠান্তে ১৮৬৪ খৃঃ অব্দে বোম্বের রুস্তমজী প্রদত্ত বৃত্তি গ্রহণ করিয়া আইন পাঠের জন্য উমেশচন্দ্র বিলাত যাত্রা করেন। ইনি ১৮৬৮ খৃঃ অব্দে ব্যারিস্টার হইয়া ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগমন করেন এবং হাইকোর্টে ব্যারিস্টারি ব্যবসায় প্রবৃত্ত হন।" (দ্রষ্টব্য ঃ সুবল মিত্রের সরল বাংলা অভিধান)

সুতরাং ১৮৫৭ খৃঃ অব্দের সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে তাঁহার বয়স মাত্র তের বৎসর এবং ইহারও এগারো বৎসর পরে ১৮৬৮ খৃঃ অব্দে তিনি ব্যারিস্টার হন। তাই W. C. Bonerjee-কে রাণীর তরফ থেকে ৬০,০০০ টাকা দিয়া বিলাত পাঠানোর কথা উঠিতেই পারে না।

উমেশচন্দ্র বোনার্জি সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত "জ্ঞান ভারতীর" ২য় খণ্ডের প্রথম ভাগও দ্রষ্টব্য। ইতি—বিনীত—শ্রীঅরুণকুমার চক্রবর্তী, দুইল্যা, হাওড়া।

"রামমোহন রায়"

মহাশয়,—সাম্প্রতিক কালে রামমোহনকে বোঝবার একটা সযত্ন প্রচেষ্টা চলেছে। সেই প্রচেষ্টা প্রধানত রামমোহনের সমাজসংস্কারক রূপটিই বিশেষভাবে উদ্ঘাটিত করেছে। রামমোহনের আরো যে একটা মহান রূপ আছে, দেশের ৫১ সংখ্যায় প্রকাশিত রবীন্দ্র-কুমার দাশগুপ্ত মহাশয়ের লেখা 'রামমোহন ও বিশ্ব মৈত্রীর আদর্শ' সেই দিকেই আলোকপাত করছে। আমরা রামমোহনকে এদেশের নবজাগরণের দূত হিসাবে শ্রদ্ধা জানাই। সমগ্র বিশ্বও তাঁকে এক হিসেবে শ্রদ্ধা জানাতে পারে। রামমোহনের সে রূপ তাঁর বিশ্ব মৈত্রীর আদর্শের আলোকে উজ্জ্বল। চিন্তার যে উদারতা ও আন্তর্জাতিকতা তাঁকে ধর্ম ও সমাজসংস্কারক করেছিল, চিন্তার সেই বিশিষ্টতাই তাঁকে বিশ্বপ্রেমিক ও বিশ্বের প্রকৃত শান্তিকামীতে পরিণত না করে পারেনি। ফরাসী পররাষ্ট্র সচিবের নিকট লিখিত তাঁর পত্রটি তাঁর সেই চিন্তাধারার একটি মূল্যবান দলিল। প্রবন্ধ লেখক পত্রটির বহু অংশ উদ্ধৃত করেছেন। এতে লীগ অব নেশনস ও 'ইউ এন ও'র পূর্বাভাস রয়েছে পাঠকমাত্রই তা পড়ে বিস্মিত হবেন। পত্রটির বহুল প্রচার কাম্য। রামমোহনের রূপটির বিশেষ করে আজকের দিনে যথেষ্ট আলোচনা ও প্রচার, স্বদেশে ও বিদেশে, সমগ্র পৃথিবীতেই প্রয়োজন। ভারতের শান্তিনীতি যে রাজনৈতিক চাল নয়, তা' যে ভারতের চিরকালের অন্তরের বাণী, রামমোহনের বিশ্বমৈত্রীর আদর্শ তারই আরও এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

অভিমন্যু মুখোপাধ্যায়, জসিডি

একলব্য

জাতীয় সাঁতার প্রতিযোগিতার তিন দিনব্যাপী অনুষ্ঠান সম্প্রতি আজাদ হিন্দ বাগে শেষ হয়ে গেল। অনেক দিন পরে কলকাতায় ভারতের জাতীয় সাঁতারের অনুষ্ঠান উপলক্ষে সাঁতারপ্রিয় দর্শকদের মধ্যে যে উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা গেছে, তা সহজে ভুলবার নয়। সত্যিই জাতীয় সাঁতারের এই বিরাট অনুষ্ঠান কলকাতা তথা বাঙলার সন্তরণ ক্ষেত্রের এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ১৯৪১ সালের পর কলকাতায় জাতীয় সাঁতারের অনুষ্ঠান হয়নি। ১৯৪৮ সালে অলিম্পিক টীম গঠনের জন্য কলকাতায় সর্ব ভারতীয় সাঁতারুদের মধ্যে এক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল, অলিম্পিক ট্রায়াল নামে সেই প্রতিযোগিতা অভিহিত হয়। তারপর কলকাতায় কোন বড় সাঁতারের অনুষ্ঠান হয়নি। কলকাতার সাঁতারের মানও নেমে গেছে অনেক নীচে। ভারতীয় সন্তরণ ক্ষেত্রে কলকাতারই ছিল একচেটিয়া অধিকার। এ অবশ্য প্রাক-যুদ্ধকালীন অবস্থা। যুদ্ধোত্তর সাঁতারেও কলকাতার প্রাধান্য খর্ব হয়নি, কিন্তু সম্প্রতি কয়েক বছর বাঙলায় সাঁতারের মান যেমন নেমে গেছে, তেমন বোম্বাই ও সামরিক বিভাগের সাঁতারুরা প্রভূত উন্নতি করেছেন। তাই এবারকার জাতীয় সাঁতারে অন্যান্য কয়েকটি প্রদেশ অংশ গ্রহণ করলেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা সীমাবদ্ধ ছিল প্রধানত বোম্বাই, বাঙলা ও সামরিক বিভাগের সন্তরণ বীরদের মধ্যে। সাঁতার, ডাইভিং ও ওয়াটারপোলো খেলার উন্নত কলাকৌশলে এঁরা আজাদ হিন্দ বাগের পুকুরের জল যেমন তোলপাড় করে তুলেছিলেন, তেমন দর্শকদের মনে তুলেছিলেন আনন্দের ঢেউ। সত্যিই এর আগে ভারতের জাতীয় সাঁতারের কোন অনুষ্ঠানে এমন তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রত্যক্ষ করা যায়নি।

• • •

এবারকার জাতীয় সাঁতারে সবশুদ্ধ ১৩টি বিষয়ে নতুন রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এর মধ্যে মেয়েদের রেকর্ডের সংখ্যা দুই। পুরুষদের যে দুইটি বিষয়ে রেকর্ড হয়নি, তার মধ্যে একটি বিষয়ের বিজয়ী সাঁতারু রেকর্ড নিরূপিত সময়ে দূরত্ব অতিক্রম করেছেন, অপর বিষয়ের বিজয়ী রেকর্ড সময়ের চেয়ে মাত্র এক সেকেন্ড পিছিয়ে আছেন। অবশ্য বিষয়টিতে ইনিই রেকর্ডের অধিকারী। বিষয়টির নাম ২০০ মিটার ফ্রি-স্টাইল আর সাঁতারুর নাম শ্রীচাঁদ বাজাজ—বোম্বাইয়ের কীর্তিমান সন্তরণ বীর, ভারতের সন্তরণ ক্ষেত্রের আশা ভরসা। ২০০ মিটারে বাজাজের নতুন রেকর্ড না করার কারণ হিসেবে তাঁর শ্রমজনিত কাতরতার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ১০০ থেকে ১৫০০ মিটার পর্যন্ত ফ্রি-স্টাইলের রেকর্ডের পাশে যাঁর নাম খোদিত, যিনি এই সাঁতারেও ৪টি ফ্রি-স্টাইলের মধ্যে তিনটিতে তাঁর আগের রেকর্ড ম্লান করে দিয়ে সৃষ্টি করেছেন নতুন রেকর্ড, ২০০ মিটারে তাঁর রেকর্ড করবার ব্যর্থতা শ্রমজনিত কাতরতা ছাড়া কি? বাজাজের তিনটি নতুন রেকর্ডের মধ্যে ১৫০০ মিটারের দূরপাল্লার সাঁতারের বিরাট কৃতিত্বে অধিক ভাস্বর। অ্যাথলেটিকস-এও সাঁতারের বিষয়ে সময়ের এক সেকেন্ড আধ সেকেন্ড উন্নতি করতে হলে হিমশিম খেয়ে উঠতে হয়, প্রয়োজন হয় কত সাধনার। পোল ভল্টের অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন বব রিচার্ড কলকাতায় বলে গেছেন সাড়ে ১৪ ফুট উচ্চতা অতিক্রমের পর চিকিৎসকেরা মন্তব্য করেছিলেন রিচার্ডের পক্ষে আর উচ্চতা অতিক্রম করা দৈহিক ক্ষমতার বহির্ভূত। কিন্তু দীর্ঘ এক বছরের সাধনায় তিনি আরও দেড় ইঞ্চি উচ্চতা অতিক্রম করেছিলেন এবং অধ্যবসায় ও সাধনার বলে ১৪ ফুট ১১½ ইঞ্চি লাফিয়ে হয়েছিলেন অলিম্পিক পোল ভল্ট চ্যাম্পিয়ন। পরে তিনি আরও উচ্চতা অতিক্রম করেছেন। যাই হক ১৫০০ মিটার ফ্রি-স্টাইলে বাজাজের রেকর্ড ছিল ২১ মিনিট ৪৬.৫ সেকেন্ড। এক বছরের সাধনার ফলে বাজাজ ৩৮ সেকেন্ড কম সময়ে এই দূরত্ব অতিক্রম করেছেন। অবশ্য ভারতীয় সাঁতারুদের বর্তমান সাঁতারের মান মানুষের সাধ্যায়ত্ত ক্ষমতার বহু নীচে পড়ে আছে বলেই বাজাজের পক্ষে এতখানি উন্নতি করা সম্ভব হয়েছে। তবুও এ কৃতিত্বের জন্য আমরা গর্ব অনুভব করি। সাঁতারে যে ভারত ধীরে ধীরে উন্নতি করছে, এ তারই প্রমাণ। কয়েকটি বিষয়ে একাধিক সাঁতারু আগের রেকর্ড ম্লান করে দিয়েছেন এবং কয়েকজনের সাঁতার কাটবার বিজ্ঞানসম্মত কলাকৌশল ভবিষ্যৎ উন্নতির ইঙ্গিত দিয়েছে। এখনো আমরা অনেক পেছনে। এত কৃতিত্ব এবং এত হৈচৈ সত্ত্বেও কত পেছনে শুনলে অবাক হতে হয় বৈকি! একমাত্র ১০০ মিটার ফ্রি-স্টাইল ছাড়া আমাদের সাঁতারের বীরপুরুষদের কোনো রেকর্ডই বিশ্বের বীর রমণীদের রেকর্ডের কাছাকাছি পৌঁছুতে পারেনি। পুরুষদের রেকর্ড তো দূরের কথা। এই সঙ্গে বিশ্ব, অলিম্পিক এবং ভারতীয় ভালভাবে লক্ষ্য করা যাবে। কয়েকটি বিষয়ের বিশ্ব রেকর্ড আরও উন্নত। চার্টে শুধু অনুমোদিত রেকর্ডেরই হিসাব দেওয়া হয়েছে।
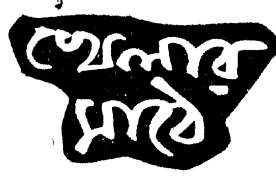
• • •

জাতীয় সাঁতারে স্প্রিং বোর্ড ও ফিক্সড বোর্ড ডাইভিংএ প্রথম স্থান অধিকারী বোম্বাইয়ের কে পি ঠক্করের ডাইভিংয়ের বিভিন্ন ভঙ্গী

জাতীয় সাঁতারে মেয়েদের ১০০ মিটার পিঠ সাঁতারে প্রথম ডলি নাজির (বোম্বাই—বাঁ দিকে), দ্বিতীয়—ডি চিত্তল (মহারাষ্ট্র—মধ্যে), তৃতীয়—আরতি সাহা (বাঙলা—ডান দিকে)

রেকর্ডের যে তুলনামূলক হিসাব দেওয়া হল, তার উপর চোখ বুলালেই এই অবস্থা

বিশ্ব রেকর্ডের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় রেকর্ডের এই দৈন্যের কারণ সম্পর্কে বলা যেতে পারে সাঁতারে যুবকদের পরাঙমুখতা, উপযুক্ত শিক্ষার অসুবিধা এবং সাঁতার কাটবার পুকুর 'পুল' বা 'বাথের' অভাব। এই যে জাতীয় সাঁতারের এত বড় অনুষ্ঠান হয়ে গেল, এতে যোগ দিয়েছিল মাত্র ভারতের ছয়টি রাজ্য—বাঙলা, বোম্বাই, মহারাষ্ট্র, মহীশূর, দিল্লী, হায়দরাবাদ ও সার্ভিসেস এই ৭টি দল। ভারতের অন্যান্য রাজ্য জাতীয় সাঁতারে অংশ গ্রহণ করেনি। কল্পনা করা যেতে পারে।

অন্যান্য রাজ্যে সাঁতারের প্রচলন কম, মানও মোটেই উন্নত নয়। পুরুষ এবং মহিলা উভয় বিভাগেই বোম্বাই দলগত চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেছে তার কারণ বোম্বাইয়ে সাঁতারের প্রচলনও বেশী, বিজ্ঞানসম্মতভাবে সাঁতার শেখবার সুযোগও তাদের প্রচুর। বোম্বাইয়ে সাঁতার শেখবার এবং অনুশীলন করবার তিনটি বিজ্ঞানসম্মত 'বাথ' আছে। মহাত্মা গান্ধী মেমোরিয়াল সুইমিং বাথ, হিন্দু বাথ আর গোলওয়ালা বাথ। এ ছাড়া ক্রিকেট ক্লাব অব ইণ্ডিয়ারও ছোট একটি বাথ আছে। সুতরাং সাঁতারে তাদের উন্নতির কারণ খুবই স্পষ্ট। সামরিক সাঁতারুদের কৃতিত্ব প্রদর্শন করবার কারণ অনুমান করাও খুব কষ্টসাধ্য নয়। সামরিক বিভাগ থেকে এরা পায় যথেষ্ট সুযোগ সুবিধা, তাছাড়া নিজেদের আছে উন্নতির চেষ্টা। ভারতীয় সাঁতারে যখন বাঙলার প্রাধান্য ছিল তখন কলকাতার বিভিন্ন সাঁতার ক্লাবে যথেষ্টই কর্মচাঞ্চল্য দেখা যেত। কিন্তু এখন কলকাতার সাঁতারে আর তেমন উৎসাহ উদ্দীপনা নেই। অনেকগুলি ক্লাবের অস্তিত্বও বিলুপ্ত হয়েছে।

* * *

আশা করা যায় কলকাতার জাতীয় সাঁতারের অনুষ্ঠানের পর কলকাতার সাঁতার ক্লাবগুলিতে আবার কর্মচাঞ্চল্য ফিরে আসবে। জাতীয় সাঁতারে উৎসাহ উদ্দীপনার কথা আগেই বলা হয়েছে। অনবরত বৃষ্টিপাত সত্ত্বেও শেষ দিনের সাঁতার দেখবার জন্য আজাদ হিন্দ বাগে যেমন দর্শকের সমাবেশ হয়েছিল তা সত্যিই কল্পনাতীত। বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই সবাই দুপুরে নিস্যাড বোর্ড ডাইভিং-এর নানা কসরৎ দেখলো। তারপর দেখলো বাঙলা ও বোম্বাইয়ের মধ্যে জাতীয় ওয়াটারপোলো প্রতিযোগিতার ফাইন্যাল খেলা। ঠিক যেন আকর্ষণীয় ফুটবল খেলার পরিবেশ। সেই আকাশ বাণীর ধারা বিবরণী প্রচার, সেই দর্শকদের আনন্দরোল—কাসর-ঘণ্টার ধ্বনি, তেমনই উৎসাহ উদ্দীপনা। এখানে বলা প্রয়োজন আকাশ বাণী থেকে ওয়াটারপোলো খেলার ধারাবিবরণী প্রচারের এটা প্রথম ঘটনা। সাঁতার ও ডাইভিংএ বোম্বাই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করলেও ওয়াটারপোলো প্রতিযোগিতায় বাঙলার প্রাধান্য এখনো খর্ব হয়নি। বাঙলা দলই ওয়াটারপোলো প্রতিযোগিতায় বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেছে। ১৯৫২ সাল ছাড়া ওয়াটারপোলো প্রতিযোগিতায় বাঙলা পরাজিতও হয়নি কোনবার। যাই হোক ওয়াটারপোলো খেলার পর বৃষ্টির বেগ বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে দর্শকদেরও আগ্রহ বেড়ে গেল এবং রাত্রিকালীন অনুষ্ঠানে দর্শকের চাপে আজাদ হিন্দ বাগ ভেঙে পড়লো। অধিকাংশ বিষয়ে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ঘন ঘন করতালি ধ্বনি ও আনন্দরোলের মধ্যে যখন সাঁতার শেষ হল তখন দেখা গেল বৃষ্টিতে সবারই আপাদমস্তক সিক্ত। যেন জল থেকে সাঁতার কেটে উঠেছে। আগের দুইদিনও উৎসাহের কোন অভাব দেখা যায়নি এবং বেশীর ভাগ বিষয়ে বিজয়ী সাঁতারুবৃন্দ মুহূর্তের ব্যবধানে দূরত্ব অতিক্রম করেছেন।
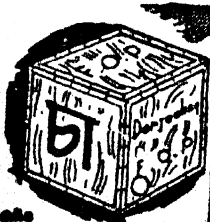
ভারতীয় রেকর্ডের সংগে অলিম্পিক ও বিশ্ব রেকর্ডের তুলনামূলক হিসাব

বিষয়	ভারতীয় রেকর্ড	অলিম্পিক রেকর্ড	বিশ্ব রেকর্ড
১০০ মিটার ফ্রি স্টাইল	এস বাজাজ (বোম্বাই) ১ মিঃ ২·৭ সেঃ	ডব্লিউ রিস (ইউ এস এ) ০ মিঃ ৫৭·৩ সেঃ	ক্লিভল্যাণ্ড (ইউ এস এ) ০ মিঃ ৫৪·৮ সেঃ
২০০ মিটার ফ্রি স্টাইল	এস বাজাজ (বোম্বাই) ২ মিঃ ২৪ সেঃ	(অলিম্পিক বিষয় নয়)	জ্যাক ওয়ারড্রপ (ব্রিটেন) ২ মিঃ ৩·৪ সেঃ
৪০০ মিটার ফ্রি স্টাইল	এস বাজাজ (বোম্বাই) ৫ মিঃ ১৬·২ সেঃ	জেঃ বয়টক্স (ফ্রান্স) ৪ মিঃ ৩০·৭ সেঃ	ফোর্ড কোনো (ইউ এস এ) ৪ মিঃ ২৬·৭ সেঃ
১৫০০ মিটার ফ্রি স্টাইল	এস বাজাজ (বোম্বাই) ২১ মিঃ ৮·৫ সেঃ	ফোর্ড কোনো (ইউ এস এ) ১৮ মিঃ ৩০ সেঃ	এইচ ফুরোহাসি (জাপান) ১৮ মিঃ ১৯ সেঃ
১০০ মিটার পিঠ সাঁতার	কান্তি শা (বোম্বাই) ও রূপচাঁদ (সার্ভিস) ১ মিঃ ১৫·৩ সেঃ	ওয়াই ওয়াকাওয়া (ইউ এস এ) ১ মিঃ ৫·৭ সেঃ	গিলবার্ট বোজন (ফ্রান্স) ১ মিঃ ২·১ সেঃ
২০০ মিটার পিঠ সাঁতার	২ মিঃ ৪৭ ৬ সেঃ চন্দ্রশেখরণ (সার্ভিস)	(অলিম্পিক বিষয় নয়)	গিলবার্ট বোজেন (ফ্রান্স) ২ মিঃ ১৮·৩ সেঃ
১০০ মিটার বুক সাঁতার	কমল সাহা (বাঙলা) ১ মিঃ ২২·৩ সেঃ	(অলিম্পিক বিষয় নয়)	পি উইক (পোল্যাণ্ড) ১ মিঃ ২·১ সেঃ
২০০ মিটার বুক সাঁতার	রামচন্দ্র (সার্ভিস) ৩ মিঃ ৪·৪ সেঃ	টি হামুরা (জাপান) ২ মিঃ ৪২·৫ সেঃ	এম ফুরোকাওয়া (জাপান) ২ মিঃ ৩৩·৭ সেঃ
১০০ মিটার বাটারফ্লাই	এস জি লাঠি (বোম্বাই) ১ মিঃ ১৪·৭ সেঃ	(অলিম্পিক বিষয় নয়)	জি টাম্পেক (হাঙ্গেরী) ১ মিঃ ২ সেঃ
২০০ মিটার বাটারফ্লাই	এস জি লাঠি (বোম্বাই) ২ মিঃ ৫৫·৩ সেঃ	(অলিম্পিক বিষয় নয়)	নাগাসাওয়া (জাপান) ২ মিঃ ২১·৬ সেঃ
৪×১০০ মিটার ফ্রি স্টাইল রিলে	বোম্বাই টীম ৪ মিঃ ২৬·৫ সেঃ	(অলিম্পিক বিষয় নয়)	জাপান ৩ মিঃ ৪৬·৮ সেঃ
৪×২০০ মিটার ফ্রি স্টাইল রিলে	সার্ভিসেস টীম ১০ মিঃ ১১·৪ সেঃ	ইউ এস এ টীম ৮ মিঃ ৩১·১ সেঃ	ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় (ইউ এস এ) ৮ মিঃ ২৯·৪ সেঃ
৪×১০০ মিটার মেড্‌লী রিলে	বোম্বাই টীম ৫ মিঃ ১·৬ সেঃ	(অলিম্পিক বিষয় নয়)	হাঙ্গেরী টীম ৪ মিঃ ১৮·১ সেঃ

[মহিলা বিভাগ]

বিষয়	ভারতীয় রেকর্ড	অলিম্পিক রেকর্ড	বিশ্ব রেকর্ড
১০০ মিটার ফ্রি স্টাইল	পি ব্যালেন্টাইন (বোম্বাই) ১ মিঃ ১৮·৬ সেঃ	এইচ এম ওয়ার্ড (হল্যাণ্ড) ১ মিঃ ৫·৯ সেঃ	ডব্লিউ ডেনেনডেন (হল্যাণ্ড) ১ মিঃ ৪·৬ সেঃ
২০০ মিটার ফ্রি স্টাইল	পি ব্যালেন্টাইন (বোম্বাই) ৩ মিঃ ২·৪ সেঃ	(অলিম্পিক বিষয় নয়)	আন ভেগার (ডেনমার্ক) ২ মিঃ ২১·৭ সেঃ
৪০০ মিটার ফ্রি স্টাইল	ডলি নাজির (বোম্বাই) ৬ মিঃ ৫২·২ সেঃ	ভি গাইয়েঞ্জ (হাঙ্গেরী) ৫ মিঃ ১২·১ সেঃ	আর ভেগার (ডেনমার্ক) ৫ মিঃ ০·১ সেঃ
১০০ মিটার পিঠ সাঁতার	জে ম্যাক্‌ক্রাম্পা (বোম্বাই) ১ মিঃ ৩৯ সেঃ	জে সি হ্যারিসন (দক্ষিণ আফ্রিকা) ১ মিঃ ১৪·৩ সেঃ	সি কিন্ট (হল্যাণ্ড) ১ মিঃ ১০·৯ সেঃ
১০০ মিটার বুক সাঁতার	ডলি নাজির (বোম্বাই) ১ মিঃ ৩৮ সেঃ	(অলিম্পিক বিষয় নয়)	ই জেকেলী (হাঙ্গেরী) ১ মিঃ ১৬·৯ সেঃ
২০০ মিটার বুক সাঁতার	ডলি নাজির (বোম্বাই) ৩ মিঃ ২৮·৯ সেঃ	ই জেকেলী (হাঙ্গেরী) ২ মিঃ ৫৭·৭ সেঃ	ই নোভাক (হাঙ্গেরী) ২ মিঃ ৪৮·৫ সেঃ
৪×১০০ মিটার ফ্রি স্টাইল রিলে	বোম্বাই টীম ৬ মিঃ ২৬ সেঃ	হাঙ্গেরী টীম ৪ মিঃ ২৪·৪ সেঃ	হাঙ্গেরী ৪ মিঃ ২৪·৪ সেঃ

দেশী সংবাদ

৩১শে অক্টোবর—দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা ও বেকার সমস্যার বিরুদ্ধে সরকারের সংগ্রামে অকুণ্ঠভাবে পূর্ণ সহযোগিতা করার জন্য প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু আজ আমেদাবাদে জনগণের উদ্দেশে আহ্বান জানান।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ আজ গৌহাটিতে এক বিরাট জনসভায় বলেন, রাজ্যের সীমানা লইয়া কলহে মত্ত হইলে দেশের অকল্যাণ হইবে। জনসাধারণকে এমনভাবে কাজ করিতে হইবে যেন দেশ বড় ও ঐক্যবদ্ধ হয়।

১লা নবেম্বর—কানাডার পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ এল বি পিয়ার্সন আজ ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত মসানজোড় বাঁধের উদ্বোধন করেন। কলম্বো পরিকল্পনায় কানাডা ভারতকে যে আর্থিক সাহায্য দান করিয়াছে, তাহার অনেকখানি এই বাঁধ নির্মাণের কার্যে ব্যয়িত হইয়াছে। কানাডার সেই দানের স্মারক হিসাবে এই বাঁধের নাম 'কানাডা বাঁধ' দেওয়া হইয়াছে।

আজ রাষ্ট্রপতি বীমা আইনের ১০৬ ধারার প্রয়োগক্ষেত্র সম্প্রসারণ করিয়া একটি অর্ডিন্যান্স জারী করিয়াছেন। উহাতে কোম্পানীর পরিচালকবর্গের বৈধ ক্ষমতার অপপ্রয়োগ সম্পর্কে ব্যবস্থাবলম্বন বিহিত হইয়াছে।

সুপরিচিত ভূপর্যটক শ্রীরামনাথ বিশ্বাস অকস্মাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া কলিকাতায় পরলোকগমন করিয়াছেন।

২রা নবেম্বর—কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রী সি ডি দেশমুখ সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনাকালের মধ্যে ভারতে বেকারের সংখ্যা অন্তত ৪০ লক্ষ বাড়িয়া গিয়াছে। তিনি আরও বলেন যে, দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় প্রায় ৪,৮০০ কোটি টাকা ব্যয় হইবে।

৩রা নবেম্বর—কলিকাতা কর্পোরেশনের কর্তৃপক্ষ মহানগরীর টালিগঞ্জ, কাশীপুর, গোবরা প্রভৃতি অনুন্নত অঞ্চলে অগোণে উন্নয়নকার্য আরম্ভ করার জন্য কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্টকে অনুরোধ করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

বর্ধমান জেলার অন্তর্গত মেমারীতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে একটি সমবায় সমিতির মাধ্যমে কৃষিজাত দ্রব্য, বিশেষ করিয়া আলু মজুদ করিবার উদ্দেশ্যে ২০ হাজার মণ মাল রাখিবার স্থান বিশিষ্ট একটি 'কোল্ড ষ্টোরেজ' স্থাপনের সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

বর্তমান বৎসরের রবি শস্য মরশুমের জন্য সিন্ধু নদ ও উহার শাখা নদীসমূহের জল ব্যবহার সম্পর্কে ভারত সরকার ও পাকিস্থান

সরকারের মধ্যে এক সামরিক চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে।

কাশ্মীর গণপরিষদের সভাপতি মিঃ জি এম সাদিক আজ শিলং-এ বলেন যে, পাক অধিকৃত কাশ্মীরের জনগণের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ এবং সেখানেই গণভোট গ্রহণ করা উচিত।

৪ঠা নবেম্বর—আজ কলেজ স্ট্রীটস্থ কলিকাতা কর্পোরেশন মিউজিয়াম ভবনের নিবতলে একটি পায়খানার ভিতর হইতে পুলিশ একটি দশ বৎসরের বালিকার মৃতদেহ উদ্ধার করে। বালিকাটির গলা টিপিয়া শ্বাসরোধ করিয়া মৃত্যু ঘটানো হইয়াছে বলিয়া পুলিশ সন্দেহ করিতেছে। বালিকাটির হাতে দুইটি সোনার চুড়ি ছিল বলিয়া প্রকাশ।

ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনস্ কর্পোরেশনের নৈশ বিমান পরিবহন ব্যবস্থায় ৫ই নবেম্বর হইতে ৪ ইঞ্জিনযুক্ত স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ স্কাই মাস্টার বিমান চলাচল আরম্ভ হইবে।

৫ই নবেম্বর—আজ হইতে ভারতের সর্বত্র সমবায় সপ্তাহের উদ্‌যাপন আরম্ভ হইয়াছে।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু আজ নয়াদিল্লীতে বিভিন্ন রাজ্যের সমাজ কল্যাণ উপদেষ্টা বোর্ডের সভাপতিবৃন্দের সম্মেলনে বলেন, কদর্য বস্তি হইতেই বহু রোগের সৃষ্টি হয়। এই সকল বস্তি উচ্ছেদ করিতে না পারিলে রোগব্যাধির উৎস থাকিয়াই যাইবে।

কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী শ্রী ডি পি কারমারকার অদ্য বোম্বাইয়ে ভারত-আরব বাণিজ্য সম্মেলনের উদ্বোধন করেন।

বেতার ও তথ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, মুদ্রণ সম্পর্কিত প্রদর্শনী উপলক্ষে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'কে উৎকৃষ্ট মুদ্রণের জন্য সার্টিফিকেট দেওয়া হইয়াছে।

কানাডার পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ পিয়ার্সন আজ ঘোষণা করেন যে, ভারতে কানাডার উদ্যোগে তিনটি নূতন পরিকল্পনা রূপায়িত করা হইবে এবং ভারত ও পাকিস্থানের বন্যার্তদের সাহায্যার্থ কানাডা এক লক্ষ ডলার দান করিবে।

৬ই নবেম্বর—নেপালের রাজা মহেন্দ্র বিক্রম রাজমহিষী সমভিব্যাহারে আজ নয়াদিল্লীতে পৌঁছিলে বিপুলভাবে সম্বর্ধিত হন। এক মাসব্যাপী শুভেচ্ছা ভ্রমণ ব্যপদেশে তিনি ভারতে আগমন করিয়াছেন।

বিদেশী সংবাদ

৩১শে অক্টোবর—প্রিন্সেস মার্গারেট আজ ঘোষণা করেন যে, তিনি গ্রুপ ক্যাপ্টেন পিটার টাউনসেণ্ডকে বিবাহ করিবেন না।

মরক্কোর বর্তমান সুলতান মহম্মদ বেন আরাফা ভূতপূর্ব সুলতান মহম্মদ বেন ইউসুফের অনুকূলে মরক্কোর সিংহাসন ত্যাগ করিয়াছেন।

২রা নবেম্বর—বৃটেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মঃ [illegible] আজ জেনেভায় চতুঃশক্তি পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনে [illegible] [illegible] পূর্ব [illegible] পথ প্রদর্শন করিবার উদ্দেশে একটি সর্বজার্মান [illegible] [illegible] [illegible]

১৯৫৫ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইতে [illegible] [illegible] [illegible] হইয়াছে। [illegible] হইয়াছেন [illegible] [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] স্কুস।

৩রা নবেম্বর—মিশরীয় ও [illegible] বাহিনী আজ [illegible] [illegible] [illegible] প্রবৃত্ত হয়। ১৯৫৬ [illegible] [illegible] বিরতি চুক্তি সম্পাদিত [illegible] [illegible] এইরূপ প্রচণ্ড [illegible] [illegible]

দক্ষিণ আফ্রিকা [illegible] [illegible] আফ্রিকায় যেভাবে শাসন [illegible] উল্লেখ করিয়া ভারতবর্ষ আজ [illegible] কমিটিতে দক্ষিণ আফ্রিকা [illegible] ১৪ দফা অভিযোগ পেশ [illegible]

শান্তির জন্য ১৯৫৫ [illegible] পুরস্কার রাষ্ট্রপুঞ্জের [illegible] বিষয়ের হাইকমিশনার [illegible] ভানইভেন গডহার্টকে প্রদত্ত [illegible] ঘোষণা করা হইয়াছে।

৪ঠা নভেম্বর—মস্কোর [illegible] আজ জানান যে, মার্শাল বুলগানিন ও মিঃ ক্রুশেভ সোভিয়েট এশিয়া হইতে [illegible] সরাসরি হিমালয়ের উপর দিয়া [illegible] নভেম্বর ভারতে আসিয়া পৌঁছিবেন।

৫ই নভেম্বর—মার্কিন রাষ্ট্র [illegible] ঘোষণায় বলা হইয়াছে যে, মিশরের [illegible] সম্পাদিত সাম্প্রতিক চুক্তি অনুযায়ী [illegible] শ্লোভাকিয়া কয়েকবার জাহাজযোগে [illegible] অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করিয়াছে। [illegible] কম্যুনিষ্ট যন্ত্রবিদগণও মিশরে [illegible] হইয়াছেন।

কায়রোর সংবাদে প্রকাশ, গাজা [illegible] গাজোয়া বাহিনীর সাহায্যপুষ্ট [illegible] সৈন্যদল আক্রমণ চালায়; মিশরীয় [illegible] পাল্টা আক্রমণ চালায়।

প্রতি সংখ্যা /৬ আনা, বার্ষিক—২০, ষান্মাসিক—১০

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা, লিমিটেড, ৬ ও ৮, সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১৩

শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস লিমিটেড হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দেশ

২৩ বর্ষ ॥ ৩ সংখ্যা ॥ ।৶০
শনিবার, ৩ অগ্রহায়ণ, ১৩৬২

DESH : 6 Annas
SATURDAY, 19TH NOV. 1955

সম্পাদক—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন   সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

ভারতে বুলগানিন

সোভিয়েট রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী মার্শাল বুলগানিন এবং তাঁহার সহকর্মিগণকে বর্তমানে আমরা আমাদের দেশে সম্মানীয় অতিথিরূপে পাইবার অধিকারী হইয়াছি। নয়াদিল্লীতে সোভিয়েট নায়কের বিপুল সম্বর্ধনা এবং সেখানে সর্বশ্রেণীর জনগণের অপরিসীম আগ্রহ ও উদ্দীপনায় এদেশে তাঁহার লোকপ্রিয়তা সূচিত হইয়াছে। কয়েক দিনের মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গ জগতের অন্যতম প্রধান রাষ্ট্রনায়কস্বরূপে কলিকাতা শহরে তাঁহাকে সম্বর্ধিত করিয়া ধন্য হইবে। শহরের সর্বত্র একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। কয়েক বৎসরের মধ্যে জগতের আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিপুল পরিবর্তন ঘটিয়াছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশসমূহের মধ্যে ব্যবধান দূর হইয়া সমগ্র মানবসমাজ এক অখন্ড চেতনাবোধে আজ জাগিয়া উঠিতেছে। বিশ্বের কোন রাষ্ট্রই বর্তমানে অপর রাষ্ট্রের প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ বিনির্মুক্ত নয়। কিন্তু বিশ্বের রাষ্ট্র-সমাজে এই নৈকট্যবোধ এতটা নিবিড় হইবার পূর্বেও ভারতের সহিত রাশিয়ার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। রাশিয়ার স্বৈরাচারবিরোধী রাজনীতিক আন্দোলনের প্রভাব, সেখানকার মানব-মুক্তিব্রতী স্বদেশপ্রেমিক এবং মনীষী দার্শনিক ও সাহিত্যিকদের অবদান-মহিমা ভারতের রাজনীতিক জাগরণের মূলে বিশেষ-ভাবে অনুপ্রেরণা সঞ্চার করে। টলস্টয়ের দেশ, ডাস্টিওভেস্কির দেশ, মাক্সিম গোর্কির জন্মভূমিকে ভারতের স্বাধীনতাকামী সন্তানগণ ইতঃপূর্বেই আপন করিয়া লইয়াছিলেন। রাশিয়ার বৈপ্লবিক আন্দোলন পরাধীন রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে নূতন শক্তি এবং বলিষ্ঠ অনুপ্রেরণা সঞ্চার করে, স্বাধীনতালব্ধ ভারতও রাশিয়ার ন্যায় বৈপ্লবিক প্রেরণা লইয়া রাষ্ট্রীয় অভ্যুন্নতির পথে অগ্রসর হইতে চলিয়াছে। এক্ষেত্রে রাশিয়া তাহার দিকে মৈত্রীর হাত বাড়াইয়া দিয়াছে। মার্শাল বুলগানিন জগতের শান্তি প্রতিষ্ঠা ব্রতে ভারতের প্রধান মন্ত্রীর পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। স্বাধীনতালব্ধ ভারত আজ আত্মস্বরূপের পরিপূর্ণ মহিমাটিকেই বিশ্বজনমান্য অতিথিদের নিকট উন্মুক্ত করিবে। পরানুকরণের মোহ এবং পরবশ্যতার সর্বপ্রভাববিনির্মুক্ত ভারতের অন্তর শতদলের রূপ, রস, স্পর্শ, গন্ধের স্বতঃস্ফূর্ত লীলা এখানে আসিয়া তাঁহারা উপলব্ধি করুন, আমরা ইহাই আশা করি। তাঁহারা দেখুন, স্বাধীন ভারত আজ নিজের উদার বীর্যে সমষ্টি-চেতনায় জাগ্রত হইয়াছে। সে ভিক্ষার জন্য কাহারো কাছে আতুরের অঞ্জলি বাড়ায় নাই; বলিষ্ঠ তাহার প্রাণশক্তি, অদীন তাহার আত্মচৈতন্য এবং অনপেক্ষ তাহার জীবনের সাধনা এবং উদার তাহার আত্ম-ভাবনাকে তাঁহারা উপলব্ধি করুন। ভারতের নিজস্ব গৌরবময় যে সংস্কৃতি এবং উদার তাহার যে ঐতিহ্য, তাহাকে ভিত্তি করিয়াই স্বাধীন ভারত শ্রেণী বা সাম্প্রদায়িকতার সীমা নির্ধারিত করিয়া অভিনব রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিতেছে। স্বাধীন ভারতের মর্যাদাময় অবদান বিশ্বকল্যাণ সাধনার ক্ষেত্রে সহযোগিতার সাধনায় আজ সকল রাষ্ট্রের পক্ষে মহীয়ান্ হইয়া উঠিয়াছে। সোভিয়েট রাষ্ট্রনায়ক বুলগানিনের সম্বর্ধনায় এই সত্যই সার্থকতা লাভ করুক।

রাষ্ট্রীয় মর্যাদার মানদণ্ড

গত জুলাই মাস পর্যন্ত ৯ মাস-কালের হিসাবে দেখা যায়, এই সময়ের মধ্যে ৭ জন মাত্র মুসলমান উদ্বাস্তু হিসাবে পূর্ববঙ্গে গিয়াছে, অথচ এই কয়েক মাসে পূর্ববঙ্গ হইতে দুই লক্ষেরও অধিক হিন্দু পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু হিসাবে আসিয়াছে। গত ১৯৫২ সালের ১৫ই অক্টোবর হইতে পূর্ব এবং পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে ছাড়পত্র-প্রথা প্রবর্তিত হয়। ইহার পর মাত্র ১০জন মুসলমান ভারত হইতে পূর্ববঙ্গে গিয়াছে, কিন্তু ৪ লক্ষেরও বেশী হিন্দু পূর্ববঙ্গ হইতে পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু হিসাবে আগমন করিয়াছে। অসাম্প্রদায়িক উদার আদর্শ ভারতের রাষ্ট্র-জীবনে কতটা সত্য হইয়া উঠিয়াছে এই হিসাবেই সে পরিচয় স্পষ্ট হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে পাকিস্থানের রাষ্ট্রনৈতিক পরিস্থিতির স্বরূপ অভিব্যক্ত হয়। পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে তাহার সমাজ-জীবনকে বিপুল বিপর্যয়ের মধ্যেও

কতটা সর্বজনীন প্রীতিতে সংস্থিত করিয়াছে তাহার পরিচয়ও এই হিসাবে আমরা পাইয়াছি। দুঃখের বিষয় এই যে, ইহা সত্ত্বেও বিহারের কংগ্রেস নেতা এইরূপ ভ্রান্ত প্রচারকার্যে ব্রতী হইয়াছেন যে, পূর্ণিয়ার কিষণগঞ্জ অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হইলে ঐ অঞ্চলের মুসলমানদের পক্ষে গুরুতররকমের অসুবিধা সৃষ্টি হইবে। তাঁহাদের কেহ কেহ এই সম্পর্কে কিষণগঞ্জ অঞ্চলের অধিবাসীদের গণভোট লইবার প্রস্তাব পর্যন্ত করিয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহাদের এই প্রচারকার্য যে কতটা ভ্রান্ত উপরের হিসাব হইতেই তাহা প্রতিপন্ন হয়। বলা বাহুল্য, বিহারের নেতৃবৃন্দ ভারতের বৃহত্তর স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গত দাবীর গুরুত্ব উপলব্ধি করিতেছেন না। তাঁহারা নানারকমে সেই দাবীর প্রতিবন্ধকতা করিয়া প্রাদেশিকতার ভাবকেই উত্তেজনা দিতেছেন, ইহা খুবই দুঃখের বিষয়। বলা বাহুল্য, এইরূপ সংকীর্ণ মনোভাব হইতে আমাদের রাষ্ট্র-জীবন যদি মুক্ত না হয়, তবে রাষ্ট্র-হিসাবে ভারতের অগ্রগতি অসম্ভব হইয়া পড়িবে। আমরা পূর্বেও বলিয়াছি, এখনও আমাদের এই বিশ্বাস যে, পশ্চিমবঙ্গের সীমানা সম্প্রসারণের প্রশ্নটি এমন কিছু জটিল নয়। ভারতের বৃহত্তর স্বার্থ সম্বন্ধে নেতৃবর্গ যদি নিরপেক্ষ দৃষ্টি অবলম্বন করিতেন, তাহা হইলে এই সমস্যার ইতিপূর্বেই সমাধান হইয়া যাইত এবং সেজন্য রাজ্য কমিশনের সুপারিশের অপেক্ষা করাও প্রয়োজন হইত না। দেখা গেল, রাজ্য কমিশন পশ্চিমবঙ্গের নিতান্ত সঙ্গত দাবী মিটাইতে পারেন নাই। ভারতের বৃহত্তর স্বার্থ সম্বন্ধে বিবেচনা তাঁহাদের এতৎ-সম্পর্কিত নীতিকে প্রভাবিত করিতে সমর্থ হয় নাই।

সুবিচারের আশা

পশ্চিমবঙ্গের সীমানা সম্পর্কিত সমস্যার সম্বন্ধে বিচারের ভার কংগ্রেস-সভাপতি শ্রী ধেবর, ভারতের প্রধানমন্ত্রী, পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ এবং মৌলানা আজাদকে লইয়া গঠিত সাব-কমিটির উপর ন্যস্ত হইয়াছে। কমিটি পশ্চিমবঙ্গের সম্বন্ধে সুবিচার করিবেন, এই ভরসা আমাদের আছে। প্রকৃত-পক্ষে ওয়ার্কিং কমিটি ভাষার ভিত্তিতেই দক্ষিণ ভারত বিশেষভাবে বোম্বাইয়ের সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। আমরা আশা করি, পশ্চিমবঙ্গের সম্পর্কে তাঁহাদের নীতি এইদিক হইতে নির্ধারিত হইবে। বলা বাহুল্য, এই সম্বন্ধে কমিটির নির্দেশে কোনরূপ অস্পষ্টতা থাকা উচিত নয় এবং তাঁহাদের নির্দেশ বলিষ্ঠ হওয়া প্রয়োজন। সংশ্লিষ্ট রাজ্যসমূহের পরস্পরের সম্মতির একটা কথা এই সম্পর্কে দেখা দিয়াছে। আমাদের মতে এই সমস্যা সমাধানের প্রকৃত পথ ইহা নয়। পারস্পরিক সম্মতির পথে এই সমস্যার যদি মীমাংসা করা সম্ভব হইত, তবে বহু পূর্বে ইহার সমাধান হইয়া যাইত, তাহা সম্ভব হয় নাই, হইবেও না। পক্ষান্তরে সেদিকে গেলে সমস্যার জট আরও পাকাইয়া উঠিবে। বিহার এবং আসামের বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করাই এই সমস্যা সমাধানের সহজ উপায় এবং এই সম্পর্কে ভাষাভিত্তিক এই যুক্তিই সবচেয়ে সঙ্গত।

শিশুপালন ও পরিচর্যা-ব্রত

ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলালের জন্মতিথি উপলক্ষে গত ১৪ই নবেম্বর সমগ্র ভারতের চতুর্থ শিশুদিবস প্রতিপালিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এই কৃত্য শুধু একদিনের জন্য নয়, শিশুপালন এবং শিশুদের পরিচর্যার পবিত্র ব্রতের প্রতি জাতির দৃষ্টি আকৃষ্ট করাই ইহার উদ্দেশ্য। অন্নহীন, বস্ত্রহীন অনাথ বালকবালিকার সংখ্যা এদেশে কোনদিনই কম ছিল না। ভারত বিভক্ত হইবার পর ইহাদের সংখ্যা পশ্চিমবঙ্গে বিশেষভাবেই বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহারা কেহ কেহ নিঃস্ব নিরন্ন পিতামাতার আশ্রয়ে কোনরকমে বাঁচিয়া আছে, আবার কেহ কেহ একেবারেই অনাথ। এ জগতে ইহাদের কেহ নাই। ইহাদের এই নিঃস্ব অবস্থার সুযোগ লইয়া সমাজের অধমতম স্তরের দুর্বৃত্তের দল ইহাদিগকে লইয়া পাপ-ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ইহার ফলে সমাজ-জীবনে নানাদিক হইতে ক্লেদ পঙ্ক জমিয়া উঠিতেছে। এই নিদারুণ দুর্গতির, এই পাপ-পঙ্কিল প্রতিবেশ হইতে জাতিকে উদ্ধার করিবার চেতনা যদি শিশুদিবস প্রতিপালনের ভিতর দিয়া আমাদের অন্তরে জাগে, তবেই শিশুদিবসের ব্রতচর্যা আমাদের পক্ষে সার্থক হইতে পারে। শিশুসেবা একদিন আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির অন্যতম অঙ্গস্বরূপে বিবেচিত হইত। বালগোপালের সাধনার এই দেশ, কুমারী-পূজার ইহা ক্ষেত্র। কিন্তু কয়েক বৎসরের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে এই সমস্যা খুব ব্যাপক আকার ধারণ করিয়াছে এবং নিঃস্ব শিশুদের দুঃখ কষ্ট যেন আমাদের কতকটা গা-সহা হইয়া গিয়াছে। এতদিন সমাজের ব্যক্তিগত কর্তব্য বলিয়া যাহা বিবেচিত হইত, তাহা একান্ত রাষ্ট্রের কর্তব্যস্বরূপে উপলব্ধিতে এই সম্পর্কে কতকটা উদাসীনতার ভাব আমাদের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। এই সম্পর্কে রাষ্ট্রের কর্তব্য অবশ্য অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু মানুষ হিসাবে মানুষের কর্তব্যও উপেক্ষা করা চলে না। ব্যক্তি-চেতনা রাষ্ট্রের দায়িত্ববোধকে উদ্বুদ্ধ করে। আমাদের ব্যক্তি-জীবনে মানবতাবোধ যদি জাগ্রত না হয়, তবে রাষ্ট্র হিসাবেও আমরা বড় হইতে পারিব না। অনাথ শিশুদের পরিচর্যা, তাহাদের অন্নের সংস্থান, শিক্ষার ব্যবস্থা এবং শুশ্রূষা বিধানের চেয়ে মানবতা, অন্য কথায় মানুষের কর্তব্য আর কি থাকিতে পারে? জাতির অগণিত, নিঃস্ব, নিরাশ্রয়, অনাথ বালক-বালিকার প্রতি মানবতার নিতান্ত কর্তব্য সম্পাদনে যদি আমাদের সমাজ-জীবনে সাড়া না জাগে, তবে আমরা মানুষ হইতে পারি নাই, ইহা বুঝিতে হইবে এবং আমাদের স্বাধীনতা লাভ তাহা হইলে ব্যর্থ হইয়াছে।

সংস্কৃত ভাষার মর্যাদা

সম্প্রতি মাদ্রাজের অন্তর্গত তিরুপথীতে সংস্কৃত বিশ্বপরিষদের চতুর্থ অধিবেশন সম্পন্ন হইয়াছে। পরিষদ বিভিন্ন রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে ভারতের উচ্চ বিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতকে আবশ্যিক পাঠ্যস্বরূপে নির্ধারিত করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। আমরা এই প্রস্তাবের গুরুত্ব সর্বাংশে স্বীকার করি।

এ সপ্তাহে সোভিয়েট প্রধান মন্ত্রী মিঃ বুলগানিন ভারত ভ্রমণে আসছেন। তাঁর সঙ্গে সোভিয়েট কম্যুনিস্ট পার্টির প্রধান সম্পাদক মিঃ ক্রুশেভ আসছেন। সোভিয়েট রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে মিঃ ক্রুশেভের ক্ষমতা ও প্রভাব মিঃ বুলগানিনের চেয়ে কম নয়। অবশ্য কাগজপত্রে মিঃ ক্রুশেভ কম্যুনিস্ট পার্টির সম্পাদক হিসাবে আসছেন না, সুপ্রীম সোভিয়েটের সদস্য এবং সোভিয়েট গভর্নমেণ্টের অন্যতম প্রধান নেতা হিসাবে আসছেন। প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত নেহরুর সঙ্গে কংগ্রেস-সভাপতি শ্রীযুক্ত ঢেবর যদি কোথাও বড়াতে যান, তাহলে যে রকম হয় তার সঙ্গে মিঃ বুলগানিনের সঙ্গে মিঃ ক্রুশেভের আসার কোন তুলনাই হতে পারে না। শ্রীযুক্ত নেহরুর সঙ্গে শ্রীযুক্ত গোবিন্দবল্লভ পন্থ এবং মৌলানা আজাদ, এমন কি বাকি সব ক'টি মন্ত্রী গেলেও তুলনা চলত না; কারণ এঁরা সকলেই শ্রীযুক্ত নেহরুর ছায়ামাত্র হয়ে যেতেন। মিঃ বুলগানিন ও মিঃ ক্রুশেভের মধ্যে সে সম্বন্ধ নয়। স্তালিনের পরবর্তী রাশিয়ায় সত্যসত্যই একপ্রকার "কলেক্টিভ্ লিডারশিপ্" প্রবর্তিত হয়েছে, একক নেতৃত্ব নেই। অন্য বিষয়ে যাই হোক, অন্তত প্রধান নেতারা নিজেদের মধ্যে সমান সমানভাবে চলছেন।

"ডেমোক্রাসি"র উপাসক ভারতে কিন্তু প্রধান নেতার এবং অন্যদের আসনের মধ্যে দূরত্ব ক্রমশ বেড়ে বেড়ে (এবং বাড়িয়ে বাড়িয়ে) এখন অবস্থা হয়েছে যে, মানসিকতার দিক থেকে এখানে এক-নায়কত্বের আদর্শই যেন প্রতীক্ষিত হতে চলেছে। অবশ্য শ্রীযুক্ত নেহরুর সঙ্গে মুসোলিনী, হিটলার বা স্তালিনের তুলনার কথাই উঠে না; অথবা ফাসিস্ত ইতালি, নাৎসি জার্মানী বা সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের তুলনাও কেউ করতে পারে না; কিন্তু সুস্থ, সবল ডেমোক্রাটিক আদর্শের সেবার পক্ষে জনসাধারণের মধ্যে যে ধরনের মানসিকতার অনুশীলন আবশ্যক, ভারতে তার বিপরীত ভাবের স্রোত বইছে এবং সরকারী-বেসরকারী প্রায় সমস্ত রকম প্রচার-যন্ত্র তার বেগ বৃদ্ধি করার কাজে নিযুক্ত হয়েছে বলে মনে হয়।

সে যাই হোক, সোভিয়েট নেতাদের আগমনে ভারতবর্ষ সত্যই আনন্দিত। সম্মানিত অতিথিদের অভ্যর্থনা করার জন্য বিরাট ব্যবস্থা হচ্ছে। জনসাধারণ যাতে সন্তুষ্ট হয়, তার জন্য কোন চেষ্টাই ত্রুটি হবে না। শ্রীযুক্ত নেহরু রাশিয়ায় গিয়ে যে রকম অভ্যর্থনা পেয়েছিলেন, ভারতে সোভিয়েট অতিথিদের অভ্যর্থনা যেন কোন অংশেই তার চেয়ে কম না হয়—তা দেখা অবশ্য কর্তব্য। যেখানে জনসাধারণের ঔৎসুক্যের অভাব নেই, সেখানে যদি জাঁকজমকের সুবন্দোবস্ত থাকে, তবে অতিথিদের স্বাগত জানাবার জন্য বিপুল লোক সমাগম হবেই এবং দক্ষ প্রচারধর্মী রাজনৈতিক পরিচালনার দ্বারা "historic" বা "memorable scenes" সৃষ্টি করা মোটেই কঠিন হবে না।

এসব ক্ষেত্রে জনতার ভাবাতিশয্য আন্তরিক নয়, এরূপ মনে করার কারণ নেই। চীনে অথবা রাশিয়ায় শ্রীযুক্ত নেহরুকে জনসাধারণ যে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল, তা আন্তরিক ছিল না, সেটা তারা সরকারের হুকুমে করেছিল, এরূপ মনে করা ভুল। প্রকৃতপক্ষে জনতার অভ্যর্থনা আন্তরিকই ছিল। শুধু ভাববার কথা এই যে, জনতার মনে এরূপ আন্তরিকতা ইচ্ছামতো সৃষ্টি করার উপকরণ কর্তাদের হাতে আছে, যার দরুণ দেখা যায় যে, আজ যাঁকে জনতা "প্রাণকল্প" বলে অভিনন্দন জানাচ্ছে, কাল তিনি ক্ষমতাচ্যুত হলে তাঁর প্রতিপক্ষের জয়ধ্বনিই আবার জনতার কণ্ঠ থেকে সমান জোরে বার করা যায়।

উভয় ক্ষেত্রেই হয়ত জনতার উল্লাস সমান "আন্তরিক" এবং সেইটেই হচ্ছে আসল মুশকিল। মিশরে নাজিবের জয়ধ্বনিও আন্তরিক ছিল, নাসেরের জয়ধ্বনিও আন্তরিক। কেবল সরকার যাকে চান না, তার জয়ধ্বনি চলবে না। চীনের অথবা রাশিয়ার সরকার যদি শ্রীযুক্ত নেহরুকে না চাইতেন, তবে সেখানকার জনতা তাঁকে দেখতেই পেতেন না, জয়ধ্বনি করা তো দূরের কথা। সরকারের না চাওয়া পর্যন্ত জনতাও যাতে মনে মনেও না চায়, সেই ব্যবস্থারই চেষ্টা

চলে। বিদেশ বা বিদেশী সম্বন্ধে জ্ঞান যদি সরকারের ইচ্ছামতো পরিবেশন করা যায়, তবে সরকারের চাওয়ার বিপরীত কোন চাওয়া জনতার মনে সহজে আসে না; সুতরাং সে সম্বন্ধে কোন অভাব-বোধও থাকে না। ফলে জনতার চাওয়া না-চাওয়া দুইই একদিক দিয়ে "আন্তরিক" হতে পারে। অবশ্য স্বাধীন মনুষ্যত্বের দিক দিয়ে এরূপ "আন্তরিকতার" মূল্য কী, সেটা অন্য প্রশ্ন।

এ বিষয়ে কম্যুনিস্ট গভর্নমেণ্ট-গুলিই বিশেষভাবে অপরাধী, অন্যেরা নয়, এটা মনে করা ভুল হবে। অবশ্য রকম-ফের আছে এবং প্রত্যেক গভর্নমেণ্টের কর্মক্ষমতার উপরও নির্ভর করে 'দেয়াল' কতটা নিশ্ছিদ্র'। প্রকৃতপক্ষে বর্তমানে বিদেশ ও বিদেশী সম্বন্ধে সোভিয়েট ও মার্কিন গভর্নমেণ্টের আচরণ একই রকম। উভয় গভর্নমেণ্টই দেশের কাউকে বাইরে যেতে এবং বিদেশ থেকে কাউকে ঢুকতে দিতে মূলত এই নীতি অনুসরণ করছেন। সোভিয়েট সরকার যাকে অবাঞ্ছিত বলে মনে করেন, এমন কোনো বিদেশীরই সোভিয়েট রাজ্য দেখার উপায় নেই। আমেরিকার সম্বন্ধেও একথা প্রযোজ্য এবং উভয় গভর্নমেণ্টের লোক বাছাই করার মাপকাঠিও সমান শক্ত।

এ ব্যাপারে অন্য সকল গভর্নমেণ্টের আচরণে হয়ত ইতরবিশেষ আছে; কিন্তু মূলত সকলেরই চেষ্টা হচ্ছে গমনাগমনের উপর সরকারী কর্তৃত্বের শৃঙ্খল দৃঢ়তর করা। পাসপোর্ট, ভিসা, এক্সচেঞ্জ কণ্ট্রোল প্রভৃতির অসংখ্য শৃঙ্খল সরকার নিজের মুঠোয় ধরে বসে আছেন। শুধু তাই নয়, দেশ-বিদেশের মধ্যে ধর্ম, জ্ঞান-বিজ্ঞান, কলা-কৃষ্টি সব কিছুর আদান-প্রদানের উপর সরকারী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। কোনক্ষেত্রেই এক দেশের মানুষ অন্য দেশের মানুষের সঙ্গে মিলতে পারবে না সরকারের বিনা অনুমতিতে। যা কিছু কর, সবই সরকারের মারফতে বা সরকারের উদ্যোগে বা সম্মতিতে করতে হবে। সরকার যদি আপত্তি করেন, তবে এক দেশের ধার্মিক মানুষ আর এক দেশের মানুষকে ধর্মের কথা শুনাতে পারবেন না। বিজ্ঞানীরা জ্ঞানের আদানপ্রদান করতে পারবেন না, কলাবিদ আনন্দ পরিবেশন করতে পারবেন না। মানুষের শ্রেষ্ঠ সাধনার সর্বক্ষেত্রে, সরকারী ছাপ না থাকলে কোন কিছুরই আমদানী-রপ্তানি চলবে না। বাইরে কী যাবে বা কারা যাবে, তা বাছাই করবেন গভর্নমেণ্ট। ধর্ম, বিজ্ঞান, কলা সমস্ত কিছুর বিচারক হচ্ছেন তাঁরা, যাঁদের হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা। গভর্নমেণ্ট কর্তৃক মনোনীত না হলে তাঁর বাইরে যাওয়া তো চলবেই না, অনেক ক্ষেত্রে দেশের মধ্যেও তাঁর অস্তিত্ব অসম্ভব বা বিপন্ন। গভর্নমেণ্ট যাঁকে সম্মান দেবেন, তাঁরই সম্মান। বড়ো, ছোট, ভাল-মন্দের সকলের বিচার হচ্ছে রাজনৈতিক কর্তাদের দ্বারা।

বর্তমানে দেশের নামে যখন কোন বিদেশীকে সম্মান করা হয়, তখন কাদের জন্য সবচেয়ে বড়ো আয়োজন হয়? বলা বাহুল্য, রাজনৈতিক কর্তাদের জন্য। কাদের অভ্যর্থনার জন্য সবচেয়ে অর্থব্যয় হয়? রাজনৈতিক কর্তাদের জন্য। বিজ্ঞানী, আর্টিস্ট যে সম্মান পান না তা নয়; কিন্তু তুলনায় তা অকিঞ্চিৎকর, তার জন্য ব্যয়ও সামান্য এবং তাও বিজ্ঞানী বা আর্টিস্টের নিজের খাতিরে ততটা নয়, যতটা তাঁরা সরকার-মনোনীত অতিথি বলে।

ক্ষমতা গভর্নমেণ্টের হাতে, টাকা গভর্নমেণ্টের হাতে, সমারোহ করার ব্যবস্থা গভর্নমেণ্টের হাতে; সুতরাং এক দেশের গভর্নমেণ্টের কর্তারা অন্য দেশের গভর্নমেণ্টের কর্তাদের সাঙ্গাতি-জ্ঞানে সবচেয়ে বেশি খাতির করেন, তাঁদের জন্য বেশি খরচ করেন। টাকাটা অবশ্য জোগায় জনসাধারণ, তার জন্য তারা দূরে থেকে শোভাযাত্রা দেখে বা শোভা-যাত্রায় অংশ নিয়েই খুসী। সাধারণ মানুষকে যদি এইভাবে খুসী করা না যেত, তবে রাজা, প্রেসিডেণ্ট বা মন্ত্রীদের জাঁকজমকের সঙ্গে পোষা এতদিনে পৃথিবী থেকে লুপ্ত হয়ে যেতো।

যেদিন এক দেশের সাধারণ মানুষ অন্য দেশের সাধারণ মানুষকে সহজ আতিথ্যদানের অবাধ অধিকার পাবে, যেদিন এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের বন্ধুতার প্রমাণের জন্য বড়-কর্তাদের মধ্যে সাধারণের অর্থে বিপুল ব্যয়সাধ্য খানাপিনা ও জাঁকজমকের আদানপ্রদানের প্রয়োজন হবে না, সেই দিনই সত্যকারের বিশ্বমৈত্রী স্থাপিত হতে পারে। যাই হোক্, আপাতত সে চিন্তা স্থগিত থাক। এখন সোভিয়েট নেতারা ভারতবর্ষ দেখে যেন খুসী হন, ভারতবর্ষের লোক রাশিয়ার তথা সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ হতে চায়, এরূপ যেন তাঁরা বোধ করতে পারেন, এইটাই কাম্য।

১৬।১১।৫৫

পত্রাবলী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[কনিষ্ঠ জামাতা নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত। নগেন্দ্রনাথের কন্যা শ্রীমতী নন্দিতা কৃপালনীর সৌজন্যে প্রাপ্ত। বিশ্বভারতীর অনুমতিক্রমে মুদ্রিত]

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

নগেন, অনেকদিন পরে তোমার চিঠি পেয়ে খুসি হয়েছি।

রথীর বিবাহে অনেক আঘাত ও ব্যাঘাত সহ্য করতে হবে বলে মনকে প্রস্তুত করেছিলুম কিন্তু ঈশ্বরের প্রসাদে শুভকর্ম্ম নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়ে গেছে। তুমি ফিরে এসে বৌমাকে দেখতে পাবে এবং দেখলে খুসি হবে।

দেশে ফিরে আসা সম্বন্ধে তুমি যেমন ভাল মনে কর তেমনি কোরো। যাতে তোমার মঙ্গল হয় আমি তাই ইচ্ছা করি। দেখলুম তোমার মায়ের মন উৎসুক হয়েছে এবং রথীও তার কাজকর্ম্মে তোমাকে সহায়করূপে শীঘ্র পাবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত হয়েছে সেইজন্যে আমিও তোমাকে পরীক্ষার পরে চলে আসবার কথা লিখেছিলুম। কিন্তু তোমার যদি আরো কিছু শিক্ষা করে আসবার সঙ্কল্প থাকে তাহলে আমি তাতে বাধা দিতে ইচ্ছে করিনে।

সন্তোষ পাঁচটি গোরু নিয়ে বোলপুর বিদ্যালয়েই একটি ছোটখাট dairy খুলেছে।

বোলপুরে গোরু রাখার বিস্তর অসুবিধা—ঘাস নেই, গোরুর অন্যান্য খাবারও বহুদূরে থেকে বেশি দাম দিয়ে আনিয়ে নিতে হয়। তবু দেখা যাচ্চে লোকসান হবার আশঙ্কা নেই। আরো যদি গোটা দশেক গোরু আনা যায় তাহলে ঐ জায়গাতেই ১৫০।২০০ টাকা মাসে খরচ বাদে পাওয়া যেতে পারে। সন্তোষকে ম্যানেজার রেখে ব্যবসা খোলবার জন্যে দুতিন জায়গা থেকে বড় বড় প্রস্তাব এসেছে। এটা বেশ দেখা যাচ্চে চাষের চেয়ে আপাতত আমাদের দেশে গোরুর ব্যবসা অনেক বেশি লাভজনক। দেশে গোরুর উন্নতি করার বিশেষ প্রয়োজন। নইলে আর কিছুদিন পরে চাষের ভয়ানক দুর্গতি হবার আশঙ্কা আছে। বাংলা দেশের সকল পড়াগাঁয়েই দুধ ঘি দুর্ম্মূল্যে এবং দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছে শুধু কতকগুলো মসলাগোলা জল দিয়ে ভাত খেয়ে বাঙালী কখনো মানুষ হতে পারবে?

দেশের অবস্থা যতই দেখতে পাচ্চি ততই বুঝতে পারচি সর্ব্বসাধারণকে নিয়ে Co-operative প্রথা অবলম্বন না করলে আমরা কোনোমতেই দাঁড়াতে পারব না। কিন্তু আমাদের দেশে পরস্পরের মধ্যে এত বিচ্ছেদ এবং চাষারা ভদ্রলোকদের এতই অবিশ্বাস করে যে সমবায় মণ্ডলী গড়ে তোলা আমাদের দেশে অত্যন্ত দুঃসাধ্য। শুনতে পাই আয়ার্ল্যাণ্ডে এই সমবায় মণ্ডলীর খুব প্রচলন এবং উন্নতি হয়েছে। সেখান থেকে Co-operative Dairy প্রভৃতি কাজের প্রণালী যদি তুমি কিছুদিন দেখেশুনে আসতে পার তাহলে এদেশে সেটা কাজে খাটাতে পার। আয়ার্ল্যাণ্ডের অবস্থা নানা কারণে অনেকটা আমাদের দেশের মত তারা রক্ষা পাবার জন্যে কি রকম চেষ্টা করচে তা দেখে এলে বোধহয় সে অভিজ্ঞতা এখানে কাজে লাগবে।

আমার বিশ্বাস কুষ্টিয়ায় আমাদের প্রজাদের নিয়ে Co-operative Dairy খোলার ভাল ক্ষেত্র আছে—এই সকল কাজ সম্বন্ধেই তোমার আসার প্রতীক্ষা করচি। আমি দেখচি তোমার উপরেই রথীর সম্পূর্ণ ভরসা রয়েছে এবং সেই জন্যেই সে তোমার শীঘ্র ফিরে আসার দিকে তাকিয়ে আছে—এসব কাজ ঠিক একলা চলে না। তোমার উপর রথীর এই বিশ্বাস ও নির্ভর দেখে আমার মন খুব আনন্দিত হয়েছে। তোমরা দুজনে একত্র হয়ে

পরস্পরের সহায় হয়ে কাজ করবে এর চেয়ে সুখের বিষয় আমার পক্ষে আর কিছুই হতে পারে না।

তোমার চিঠিতে Miss Bourdettএর কথা পড়ে মনে হচ্চে তাঁকে পেলে খুব ভালই হবে। কি রকম সর্ত্তে তিনি এখানে আস্‌তে চাইবেন এবং তাঁকে কত দিতে হবে আমাকে লিখো। একটা কথা চিন্তা করে দেখো—এখানে আমেরিকা বা য়ুরোপের মহিলাদের পক্ষে কতকগুলি গুরুতর অসুবিধা আছে। প্রথমত তাঁদের মেলামেশার উপযুক্ত সমাজ নেই—তারপরে ইংরেজ সমাজ ভারতবর্ষীয়কে হীনচক্ষে দেখে সুতরাং কোনো ভারতবর্ষীয় পরিবারের মধ্যে থাক্‌লে ইংরেজের কাছে কতকটা অপদস্থ হতেই হবে তারপরে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় আমোদ প্রমোদ এবং উত্তেজনা কিছুই নেই—যাকে বলে dull তাই—তারপরে যদি তাঁকে মেয়েদের সঙ্গে মফস্বলে থাকতে হয় তাহলে অত্যন্ত quiet রকমে জীবন-যাপন করতে হবে—এমন অবস্থায় কিছুকালের মধ্যে পাছে তাঁর অনুতাপের কারণ ঘটে এবং আমাদের সম্বন্ধে তাঁর মনের ভাব প্রতিকূল ও অবজ্ঞাপরায়ণ হয়ে ওঠে।

মীরাকে আমেরিকায় পাঠাবার জন্যে আমার বিশেষ ইচ্ছা ছিল। কিন্তু যে টাকাটা আমি সে জন্যে ঠিক করে রেখেছিলুম সেটা বোলপুর Dairyর জন্যেই খরচ করবার সম্ভাবনা আছে বলে তাকে পাঠাতে সাহস হল না। যদি একজন ভাল মেয়েকে ওখান থেকে পাওয়া যায় তাহলে প্রতিমা এবং মীরা উভয়েরই শিক্ষার জন্যে কাজে লাগে—এই কারণেই এই প্রস্তাবটা আমার মনে আসে। যদি সুবিধামত কাউকে পাও তাহলে চেষ্টা করে দেখা উচিত।

আগরতলার রাজকুমার বোর্ডিঙের জন্য সেখানকার মন্ত্রী একজন Principal চেয়েছিলেন—রথীর কথা অনুসারে Truman Kellyর কথা তাঁদের লিখেছিলুম। তাতে তাঁরা আমাকে লিখেছেন প্রস্তাব সম্বন্ধে তাঁরা Mrs Besantএর সঙ্গে পরামর্শ করে কর্তব্য স্থির করবেন। তার থেকেই বোঝা যাচ্ছে তাঁরা Mrs Besantএরই নির্বাচিত কোনো লোককে নেবেন এমন স্থলে আমেরিকা থেকে কাউকে যে তাঁরা গ্রহণ করবেন সে আশা ত্যাগ করেছি।

তোমাদের কলেজে নূতন হিন্দু ছাত্ররা আমাদের দেশের নাম না খারাপ করে সে জন্যে চেষ্টা দেখতে হবে—ওখানে ভারতবর্ষের প্রতি তোমরা যে শ্রদ্ধার সঞ্চার করে এসেছ সেটি নষ্ট হলে অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হবে। ক্রমে ক্রমে আমার বিদ্যালয়ের দুই একটি ভাল ছেলেকে ওখানে পাঠাব এই রকম আমার ইচ্ছা আছে তাদের দ্বারা সেখানে কখনই আমাদের দেশের লজ্জার কারণ হবে না এ সম্বন্ধে আমার সন্দেহমাত্র নেই। সেখানে তোমরা যে সমিতি গঠন করেছ তাতে বিশেষ ভাল ফল হবে বলেই মনে করি;—সাহায্য যদি চাও আমি নিজে কিছু সাহায্য চেষ্টা করতে পারি কিন্তু আর কেউ করবে না সেই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। দেশের অনেক গুরুতর অভাব মোচনের জন্যেই উৎসাহ জাগ্রত করা এত কঠিন তাতে আমেরিকার কলেজের হিন্দু ছাত্রদের উন্নতির জন্যে যে কাউকে সচেষ্ট করতে পারব সে আশা আমি রাখিনে।

তোমাদের অধ্যাপক ব্রুকস্ সপরিবারে এখানে এসেছিলেন—তাঁদের সঙ্গে আলাপ করে আমরা সকলে খুব খুসি হয়েছি। Mrs. Brooks বলছিলেন মীরাকে যদি আমেরিকায় পাঠাও তাহলে নিশ্চয় যেন আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিয়ো।

কিছুদিনের জন্যে কার্য্য উপলক্ষ্য করে রথীকে নিয়ে শিলাইদহে এসেছি। বস্তুতঃ কাজের ছুটি নেবার জন্যেই আমি এখানে আসি। কাজ সেটুকু ছিল সে শেষ হয়ে গেছে কিন্তু কোনো না কোনো ছুতোয় এই পদ্মার উপর বসন্তযাপনটা দীর্ঘ করে নিচ্চি।

ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।

ইতি ৩০শে ফাল্গুন ১৩১৬

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

নগেন, তোমার দুই টিন ফল পেয়ে আজ থেকেই খেতে আরম্ভ করেছি।

কুমারস্বামীকে নিয়ে ব্যস্ত ছিলুম, তাঁর এখানকার সমস্ত ভাল লেগেছে—সমস্ত দিন আমার কাব্যগ্রন্থ নিয়ে আলোচনা করেছেন—তাঁর ভারি ইচ্ছা ওর থেকে উনি অনেকগুলো অনুবাদ করে ছাপান।[1] সেই জন্যে আগামী বৎসরে এখানে এসে দুমাস থাক্‌তে চেয়েছেন। উনি একজন খুব cultured ইংরেজ মেয়ের কথা আমাকে বল্‌চেন—শুনে বৌমার জন্যে তাকে রাখ্‌তে আমি খুব উৎসুক হয়েছি। সেজন্যে রথীর চিঠির মধ্যে কুমারস্বামীকে একখানা চিঠি লিখে দিয়েছি বোধহয় দেখেছ।

তুমি কী রকম ব্যবস্থা করলে শুনতে পেলে আমি নিশ্চিন্ত হই। তুমি এই কথাটাই সকলের চেয়ে বড় করে চিন্তা কোরো যাতে তোমাদের উভয়েরই মঙ্গল হয়। আমি যে রকম ইচ্ছা করচি সেটা যদি তোমার মনের সঙ্গে না মেলে তাতে আমি দুঃখিত হব না—যাতে তোমার ভাল হয় সে সম্বন্ধে সকল দিক চিন্তা করে তুমি যা স্থির করবে তাতেই আমি প্রসন্ন মনে সম্মতি দেব—তোমার জীবন সকল দিক দিয়ে বড় হয়ে উঠুক সার্থক হয়ে উঠুক এই আমার ইচ্ছা—কোনো ছোট দিক থেকে ঘরকরনার দিক থেকে আমি তোমাকে কোনো দিন কিছু অনুরোধ করব না—কেবল একান্ত মনে কামনা করব ঈশ্বর তোমার অন্তঃকরণকে শুভবুদ্ধিতে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ করুন।

ইতি ৭ই ফাল্গুনে ১৩১৭

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

নগেন্দ্র, তোমরা সকলে মিলে শিলাইদহে যাচ্চ এই খবর মীরা ও রথীর চিঠিতে পেয়ে আনন্দিত হয়েছি। রথীর সঙ্গে তুমি একত্র হলে বাংলা দেশে আদর্শ পল্লী রচনা সম্বন্ধে আমার অনেকদিনের অভিপ্রায় সফল হবার পথে যাবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

জ্ঞানকে[1] কোনো উপলক্ষ্যে আমাদের এই বিদ্যালয়ে আনবার ইচ্ছা আমার মনের মধ্যে ছিল। কেননা, জ্ঞানের প্রতি আমার খুব একটি স্নেহ এবং শ্রদ্ধা আছে। আমার বিশ্বাস জ্ঞান যদি এখানে এসে কিছুদিন থাকে তাহলে তার উপকার হবে এবং তার দ্বারা আমরাও যথেষ্ট সাহায্য পাব। জ্ঞানকে এখানে রাখবার জন্যে তোমাদের কিছুই দিতে হবে না—কেননা তাকে আমরা কাজে লাগাতে পারব—এবং তার পরিবর্তে যাতে সে এখানে পড়াশোনার সুবিধা করতে পারে আমরা তার ব্যবস্থা করে দেব।

মিস্ বুর্ডেটের বোঝা নেবে গেছে শুনে নিশ্চিন্ত হয়েছি। বৌমাকে তোমরাই একটু একটু করে পড়াতে পারবে, তাতেই তার বেশি উপকার হবে।

কুমারস্বামীর কাছ থেকে আজ আবার একটা চিঠি পেয়েছি। সেই ইংরেজ মেয়েকে এখানে আনবার জন্যেই চেষ্টা করা যাবে। তাতে কোরে ছেলেদের ইংরেজি শেখবার অনেকটা সুবিধা হতে পারবে।

তোমরা আপাতত যদি গায়ক সুরেন্দ্রের[2] ভাইকে তোমাদের সঙ্গীতের জন্যে রাখ তাহলে সে মেয়েদের গান ও সেতার শেখাতে পারে—তাকে মাসিক পনেরো টাকার বেশি দিতে হবে না। সে সেতার ভালই জানে—গানও শেখাতে পারে। যদি এ প্রস্তাব ভাল মনে হয় তাহলে সুরেন্দ্রের হাতে তার পাথেয় দিলেই দেশ থেকে তাকে আনিয়ে দেবে।

বোলপুরে গরম পড়েছে বটে কিন্তু বেশ লাগ্‌চে। ফুলের গন্ধে আকাশ আকুল হয়ে উঠেছে। অনেক রাত পর্যন্ত বাইরে পড়ে থাকি—বেশ আরাম বোধহয়। এই সময় তোমাদের শিলাইদাও খুব ভাল লাগ্‌বে। গরমি ছুটি হলে আমিও একবার তোমাদের সঙ্গে গিয়ে যোগ দিতে পারব—ততদিন তোমরা অনেকটা গুছিয়ে বস্‌বে।

বেয়ানকে আমার সাদর নমস্কার জানিয়ো।

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(ক্রমশ)

১ আনন্দকুমারস্বামী অজিতকুমার চক্রবর্তী ও রবীন্দ্রনাথের সহযোগে রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি কবিতা অনুবাদ করেন; এগুলি তাঁহার Art and Swadeshi গ্রন্থে "Poems of Rabindranath Tagore" প্রবন্ধে সংকলিত আছে।

১ নগেন্দ্রনাথের ভ্রাতা

২ গীতবিশারদ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

জীবনানন্দ দাশ

এইখানে সূর্যের ততদূর উজ্জ্বলতা নেই।
মানুষ অনেক দিন পৃথিবীতে আছে।
"মানুষের প্রয়াণের পথে অন্ধকার
ক্রমেই আলোর মতো হতে চায়;"—
ওরা বলে, ওরা আজো এই কথা ভাবে।
একদিন সৃষ্টির পরিধি ঘিরে কেমন আশ্চর্য এক আভা
দেখা গিয়েছিল; মাদালীন দেখেছিল—আরো কেউ কেউ;
অম্বাপালী সুজাতা ও সংঘমিত্রা পৃথিবীর লৌকিক সূর্যের
আড়ালে আর এক আলো দেখেছিল;—
হয়তো তা লুপ্ত এক বড় পৃথিবীর
আলোকের নিজ গুণ,
অথবা তখনকার মানুষের চোখের ও হৃদয়ের দোষ।

এই বিশ শতকে এখন
মানুষের কাছে আলো আঁধারের আর এক রকম মানে:
যেখানে সূর্যের আলো নক্ষত্র বা প্রদীপের ব্যবহার নেই
সেইখানে অন্ধকার;
যেখানে চিন্তার ধারা রীতিহীন—শব্দের প্রয়োগ অসংগত—
প্রাণের আবেগ ঢের শতকের আপ্রাণ চেষ্টায়
যেখানে সহিষ্ণু স্থির মানুষের সাধনার ফলে
বিপ্লাবিনী নদীর বাঁধের মতো হয়ে—তবু কোনো একদিন
কেন যেন জলের গর্জনে আলুলায়িত হয়েছে
সেখানে (ওদের মতে) আলো নেই;
অথবা নিজেকে নিজে প্রতিহত করে ফেলে আলো
সেইখানে অন্ধকার।

মনীষীরা এরকম ভাবে আজ শুদ্ধ চিন্তা করে,
সমাজের কল্যাণ চায়,
দিক নির্ণয় করে।
অটুট বাঁধের মতো মনে হয় জ্ঞানীদের মন যেন—
টেনিসির দামোদর অথবা কোশীর।
তবুও আগুন জল বাতাসের প্লাবনের মানে
সেতু ভেঙে নব সেতু প্রণয়ন:—আজ তা আত্মস্থ সেতু জানে?
মাঝে মাঝে বাসুকির লিপ্ত মাথা টলে,
ক্লান্ত হয়ে শান্তি পায় অপরূপ প্রলয় কম্পনে;
পৃথিবীর বন্দিনীরা হেসে ওঠে।......
রেলের লাইনের মতো পাতা জ্ঞানবিজ্ঞানের অন্তহীন
কার্যকারিতায়
সুখ আছে, সৃষ্টি নেই। অনেক প্রসাদ আছে, প্রেম নেই।

অনেক কল্যাণশীল নগর জাগছে;
সেইখানে দিনে সূর্য নিজে;
নীয়ন টিউব গ্যাস রাত্রির;
উন্মুক্ত বন্দর সব নীল সমুদ্রের
পারে পারে মানুষ ও মেশিনের যৌথ শক্তিবলে
নীলিমাকে আটকেছে ইঁদুরের কলে।
সূর্য ভারত চীন মিশরের ক্যালডিয়ার আদিম ভোরের
প্রাথমিক উজ্জ্বলতা হারিয়ে ফেলেছে?

দিন প্রায় শেষ হয়ে এলে শাদা ডানার ঝিলিকে
আলো ঠিকরিয়ে গেলে বুঝেছি সংবাদবাহী আশ্চর্য পায়রা
উড়ে যায় সূর্যকে টুকরো করে ফেলে;
খণ্ড আলোর মতো সঞ্চারিত করেছে আবেগে
প্রকৃতিতে:—কোনো কোনো মানুষের বুকে;—তারপরে
মানুষের সাধারণ ভাবনার বজেট ইনকম ট্যাক্স প্রভৃতি বিষয়ে
ঠেকে নিভে গেছে।

উৎসব হৃদয় মনে কাজ করে গেছে একদিন:
সমুদ্রের নীল পথে মহেন্দ্র চলেছে,—
সমস্ত ভারত শিলালিপির উদামে আনন্দে ভরে গেছে;
এরকম উৎসাহের দিন আজ তবুও তো নেই আর?
আমাদের কাজ আজ ছক ছলা, কিছু দূর চিন্তার সাধুতা
তত দূর শব্দ যোজনার সতর্ক সংগতি নিয়ে;
মাঝে মাঝে হৃদয়েরও খুচরো টুকরো ব্যবহারে;
(শাদা কালো রং এসে বার বার—কেবলি মিশছে অন্ধকারের)
সে হৃদয় মানুষের আধুনিক সভ্যতার পটভূমিকায়
শচীর সংগে এসে দাঁড়াচ্ছে;
অথবা সে ইন্দ্রানীকে ভেদ করে অহল্যার মতো;
সহস্র চোখ না যোনি এতদিন পরে আজ কলকাতায়
ইন্দ্রের শরীরে?

ইন্দ্র আজ এরা—ওরা;
ইন্দ্রের আসনে আজ বেটপ্‌কা অন্তত বসা যায়
ইস্ক আয়বার সুদ—বেশি ক্ষুদ অল্পকে অস্পষ্টভাবে দিলে।

*　　*　　*

আজো তবু অবিরাম প্রয়াণ চলেছে মানুষের:
শব্দের অঙ্গার থেকে স্ফুলিঙ্গের মতো ভাষা জ্ঞান
জ্ঞানের নিরবচ্ছিন্ন শববাহনের শক্তি খুঁজে তবু প্রেম
পাওয়া যায় কিনা তার অক্লান্ত সন্ধানে?

মল্লযুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে
আবার যুদ্ধের ছায়া;
পটভূমি দ্রুত সরে গেলে রূঢ় দেয়ালের মুখোমুখি এসে
আমরা সূর্যের যেই প্রাণ উজ্জ্বলতা
চীনে কুরুবর্ষে গ্রীসে বেথলেহমে হারিয়ে ফেলেছি—
তাকে শিশুসরলতা মূর্খের আরবিৎ স্বর্গ ভেবে
সূর্যের মাধ্যান্দিন বড় ভাস্বরতা
এখনও পাইনি খুঁজে।

এখানে দিনের—জীবনের স্পষ্ট বড় আলো নেই;
ধ্যানের সনির্বন্ধ অন্ধকার এখনো আসেনি।
চারিদিকে ভোরের কি বিকেলের কাকজ্যোৎস্না ছায়ার ভিতরে
আহত নগরীগুলো কোনো এক মৃত পৃথিবীর
ভেতরের চিহ্ন বলে মনে হয়; তবু
মৃত্যু এক শেষ শান্ত দীন পবিত্রতা;
আমাদের আজকের পৃথিবীর মানুষ নগরগুলো সেরকম
আন্তরিকভাবে মৃত নয়।

বাজার দরের চেয়ে বেশি কালো টাকা ঘুষ দিয়ে
জীবনকে পাওয়া যাবে ভেবে
যেন কোনো জীবনের উৎস অন্বেষণে তারা সকলে চলেছে:
পরস্পরের থেকে দূরে থেকে;—ছিন্ন হয়ে;—
বিরোধিতা করেছে
সকলের আগে নিজে—অথবা নিজের দেশ—নিজের নেশন
সবের উপর সত্য মনে করে;—জ্ঞানপাপে, অস্পষ্ট আবেগে।

মানুষের সকল ঘটনা গল্প নিষ্ফলতা সফলতা যদি
হাইড্রোজেনে
পুড়ে ছাই হয়ে যায় তবে হয়ে যাকঃ
এরকম অপূর্ব অপ্রীতি চারিদিকে
আমাদের রক্তের ভেতরে অনুরণিত হচ্ছে।

কোথাও সার্থককাম কেউ নয়;—
আমাদের শতাব্দীর মানুষের ছোট বড় সফলতা সব
মুষ্টিমেয় মানুষের যার যার নিজের জিনিস,
কোটি মানুষের মাঝে সমীচীন সমতায় বিতরিত হবার তা নয়।
এইখানে মর্মে কীট রয়ে গেছে মানুষের রীতির ভিতরে
রীতির বিধানদাতা মানুষের শোকাবহ দোষে।

প্রকৃতি আনিল কিছু, তবু মানুষের
প্রয়োজন মতো তাতে নির্মলতা আছে।
আরো কিছু আছে তাতে; যেন মানুষের সব রকম প্রার্থনা
মিটিয়ে বা না মিটিয়ে প্রকৃতি ঘাসের শীর্ষে একফোঁটা
নিঃশব্দ শিশিরে
নিঃশব্দ শিশির কণা,—সব মূল্য বিনাশের তীরে।

পাখিদের ডানা পালকের থেকে বিকেলের আলো
নিভে গেলে রাত্রির নক্ষত্রেরা হৃদয়ের আচ্ছন্নতা নেড়ে
বাতাসের মুক্ত প্রবাহের মতো; যেন কোনো ঘুমন্তের মনে
কথা বাজে চিন্তা স্বপ্ন অকুতোভয়তা
নিজের স্বদেশে এলো।

চারিদিকে অবিরল নিমিত্তের ভাগীর মতন
এই সব আকাশ নক্ষত্র নীড় জল;
মানুষের দিনরাত্রি প্রণয়নে অহেতুক নির্দেশের মতো
রয়ে গেছে শতাব্দীর আঁধারে আলোয়।
কেউ তাকে না বলতে এ পৃথিবী সকালের গভীর আলোয়
দেখা দেয়; কেউ তাকে না চাইতে তবু ইতিহাসে
দুপুরের ঢেউ তার কেমন কর্কশ ক্রন্দনে কেঁপে ওঠে;
নিসর্গের কাছে থেকে স্বচ্ছ জল পেয়ে তবু নদী মানুষের
মূঢ় রক্তে ভরে যায়;—সময় সন্দিগ্ধ হয়ে প্রশ্ন করে, 'নদী
নির্ঝরের থেকে নেমে এসেছ কি? মানুষের হৃদয়ের
থেকে?'

প্রিয়তম

বারীন্দ্রকুমার ঘোষ

সবই যদি চলে যায়,
তুমি কাছে থেকো
সদা মম।

এই মাটি, জল আর—
ওই নীলিমায়;
প্রিয়তম॥

শ্রীগোপীনাথ সেন

ভারতে বৃক্ষ-পূজা আর্য ও অনার্য উভয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিরাট প্রভাব বিস্তার করিয়া আছে। অনাদ্যমান-কাল হইতে বৃক্ষ মানবজাতির যে সেবা করিয়া আসিতেছে তাহা অন্য কোন প্রকৃতি-সম্পদ দ্বারা হয় নাই। বিশাল বৃক্ষের ছায়া যেমন ভ্রমণ-ক্লিষ্ট পথিকের ক্লান্তি দূর করে, তেমন ইহা ফল, পুষ্প, রস, বল্কল, কাষ্ঠ এবং আশ্রয় দিয়া মানব-সমাজের কল্যাণ করিয়া থাকে। সেইজন্য শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন--

অহো এষাং বরং জন্ম সর্বপ্রাণ্যুপজীবনম্।
ধন্যা মহীরুহো যেভ্যো নিরাশা যান্তি নার্থিনঃ॥
পত্রপুষ্পফলচ্ছায়াম্লবল্কলদারুভিঃ।
গন্ধনির্যাস ভস্মাস্থিতোক্মৈঃ সর্বকামান্
বিতন্বতে॥
ছায়াম্ অন্যস্যকুর্বন্তি তিষ্ঠন্তি স্বয়মাতপে।
ফলান্যপি পরার্থায় বৃক্ষাঃ সৎপুরুষা ইব॥
হেতবঃ সম্পদাম্ লোকে বেত্তব্যো ধরণীশ্রিয়ঃ।
জীবাতবোহত্র জীবানাং জীবন্তু তরবোহক্ষতাঃ॥

সর্বজীবের প্রাণধারক এই বৃক্ষকুলের জন্ম সার্থক। ধন্য তাহারা, কোনো প্রার্থীই তাহাদের নিকট হইতে নিরাশ হইয়া ফেরে না।

বৃক্ষেরা আপন পত্র পুষ্প ফল ছায়া কাষ্ঠ সুগন্ধ রস সারক্ষার অঙ্কুর ইত্যাদির দ্বারা সকলের কাম্যবস্তু বিতরণ করে। অন্যকে ছায়াদান করিয়া নিজেরা রৌদ্র-তাপে অবস্থান করে। তাহাদের ফলও পরের উপকারের নিমিত্ত।

ইহলোকের সম্পদের কারণ, পৃথিবীর সৌন্দর্যের নির্দেশকারী নিশান, জীবের আয়ুষ্কর ঔষধরূপে এই বৃক্ষসকল অক্ষত হইয়া জীবিত থাকুক।

যুগে যুগে মানব ও জীবজন্তু বৃক্ষাশ্রয় ব্যতীত তিলার্ধ জীবন ধারণ করিতে পারে না। বৃক্ষ চিরকালই তাহাদের আশ্রয়স্থল। অনার্যরা পত্র পুষ্প দিয়া দেবতার পূজা করিত এবং আর্যদের রীতি হইতেছে মদ্য মাংস যজ্ঞে উৎসর্গ করা। পরে যখন আর্য ও অনার্যদের সংমিশ্রণ হয় ও যাগ যজ্ঞ সাধারণ উপাসনা হইতে চলিয়া যায় তখন দেবতাদিগের পত্রপুষ্প দ্বারা কিংবা ভেষজ-সুগন্ধির দ্বারা পূজার রীতি প্রচলিত হয়। বৈদিক যুগে শমী বৃক্ষ যাহা এখন ঝন্দ, খিজরা বা সউনডাড নামে পরিচিত, তাহাই যজ্ঞের জন্য আহরণ করা হইত। চন্দনচর্চিত ব্যতীত পরমেশ্বর তুষ্ট হন না। ভারতে বৃক্ষ একমাত্র নির্বিচারে জনগণের আশ্রয়স্থল। চিরজন্ম বৃক্ষকাষ্ঠ ব্যতীত আর কিছুই তত প্রয়োজনে লাগে না, এমন কি, অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ায় কাষ্ঠের প্রয়োজন। সমগ্র পৃথিবীতে আদিমকালে পবিত্র মন্দির, স্তম্ভ এবং সিংহাসন কাষ্ঠ হইতে নির্মিত হইয়াছিল। বৃক্ষ-পূজা বা Tree worship সম্বন্ধে এনসাইক্লোপিডিয়ায় বহু দৃষ্টান্ত আছে। ইহার সমর্থন করিতে গিয়া লেখক দেখাইয়াছেন—

"Even the temples of Dodona and of Jupiter capitoliness stood on the sites of older tree-worship."

ইউরোপে বৃক্ষ-পূজার সংরক্ষিত আর একটি দৃষ্টান্তস্থল হইতেছে—

"Tradition has preserved some recollections of the overthrow of tree-cult in Europe, Bonifacius destroyed the great oak of Jupiter at Geisnear in Hesse, and built of the wood chapel to St. Peter.

সমগ্র পৃথিবীতে বৃক্ষ মানুষের মনে ভয় ও ভক্তি সঞ্চার করিয়াছে তাহার দৃষ্টান্ত ভিন্ন ভিন্নভাবে সকল দেশের সংস্কৃতির আলোচনা করিলে প্রমাণিত হইবে। মানবদিগের হিতকারী বৃক্ষ যাহা হইতে সকল জীব প্রাণ ধারণ করে। ইহার মত দাতা জগতে জন্মায় নাই। উহা নিজের জন্য কিছুই রাখে না, ক[illegible] পরহিতার্থে। বৃক্ষ ও তৃণের উপর [illegible] অত্যাচার করা হউক না কেন, [illegible] নিশ্চল ও নির্ভয় হইয়া দাঁড়াইয়া [illegible] ইহার সহিষ্ণুতার তুলনা হয় না। [illegible] জন্য মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য বলিয়াছেন "তৃণের মত সুনীচ হইও এবং তরুর [illegible] সহ্য করিতে শিখিও।" বৈষ্ণবদের [illegible] তিনি এই উপদেশ দিয়াছিলেন, যাহা[illegible] তাহারা তরুর মত সহিষ্ণুতা শিক্ষা ক[illegible] ও শত ঝড় আসিলেও মহীরুহের [illegible] অচল এবং অটল থাকে। সমগ্র প্রাণ[illegible] জগতে নির্বাক বৃক্ষ সকল মানুষের ম[illegible] বিস্ময় সৃষ্টি করিয়াছে। মানুষ অবা[ক] হইয়া যায়, কিরূপে বৃক্ষসকল স্থল[illegible] পর্বত ও মরুভূমি ভেদ করিয়া উঠে[illegible] কেহ উহাকে দেবতা ভাবে এবং কেহ [illegible] দানব ভাবিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে। উহার সম্বন্ধে এক ইংরাজ বিশেষজ্ঞ বলিয়াছেন—

"The worship of trees and plant[s] as objects of awe and wonde[r] based on the mystery of the[ir] growth, the movement of the[ir] leaves and branches, which pro[-] duce uncanny sounds at night their periodical rest and awaken[-] ing in spring, the sudden growth of the plant from its seeds belong[s] to the pre-animistic stage."

বিজ্ঞান প্রমাণ করিয়াছে, বৃক্ষের প্রা[ণ] আছে। উহাদের নিশ্বাসে প্রাতঃকা[লে] মানুষের দেহ সুস্থ সবল করে এবং রা[তে] উহারা বিষাক্ত নিশ্বাস ত্যাগ করে[।] মানুষের মনে বৃক্ষের লতাপাতাগু[লি] সত্যই বিস্ময়ের সৃষ্টি করিয়া থাকে।

আর্য ও অনার্য বৃক্ষকে সমভাবে পূজা করিয়া থাকে। আর্যদের পূজা[র] পদ্ধতি তফাৎ হইলেও একই ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ধারণার উপর অবস্থিত। ক্ষুদ্র [illegible] হইতে বিরাট মহীরুহ পর্যন্ত আর্য[illegible] কিছুই বাদ দেয় নাই। সকল দেবদেবী[র] পূজার সময় দূর্বা, বিল্বপত্র ও ফু[ল] উহার বিশিষ্ট অঙ্গ। কথিত আ[ছে] শ্রীরামচন্দ্র লঙ্কা বিজয়ের সময় য[খন] দশভূজা দুর্গার পূজা করিতেছিলে[ন] তখন মাতা ছলনা করিবার জন্য একটি

পদ্ম লুকাইয়া রাখেন। তিনি একশত টি পদ্মের বদলে একশত সাতটি পাইয়া চঞ্চল হইয়া পড়েন। স্থির করিতে না পারিয়া নিজের চক্ষু উপড়াইয়া উহা পূর্ণ করিতে যাইবেন ঐ সময় শ্রীদুর্গা নীলপদ্মটি দিয়া রাবণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বিজয়ের আশীর্বাদ করেন। কথিত আছে, শ্রীদুর্গার প্রতীক হইতেছে নবপত্রিকা। উহা ব্যতীত পূজা সিদ্ধ হয় না। সেইজন্য দুর্গার নিকট যে কলাগাছ বা গণেশের কলাবউ কে তাহাতে নয়টি বৃক্ষের ফল বাঁধা থাকে। ইহার নাম হইল, (১) রম্ভা, (২) কচু, (৩) হরিদ্রা, (৪) জয়ন্তি বা জয়ন্তী, (৫) বিল্বফল, (৬) দাড়িম্ব, (৭) অশোক, (৮) মান এবং (৯) ধান্য এই নবপত্রিকার যতক্ষণ না পূজা হয় ততক্ষণ দুর্গাপূজার বোধন আরম্ভ হয় না। সেইজন্য দেখা যায়, দুর্গার পূজায় একশত আটটি পদ্ম, শিবের পূজায় একশত আটটি বিল্বদল ও নারায়ণের পূজায় একশত আটটি তুলসী পাতা দিয়া পূজা করিতে হয়। যদি একশত আটটি উপকরণ না পাওয়া যায়, অন্ততঃ আটটি দিয়াও পূজা করিতে হয়; তাহা না হইলে দেবতা রুষ্ট হন। নানা দেবদেবীর যে সকল বৃক্ষ প্রিয় তাহা আর হিন্দুদের নিকট বিশেষ পবিত্র।

আর্যদের ভিতর শৈবগণ বিল্ববৃক্ষ, বৈষ্ণবগণ তুলসীবৃক্ষ ও শাক্তগণ পঞ্চবটীকে পূজা করিয়া থাকে। অশ্বত্থ, বট, অশোক, নিম ও বেল বৃক্ষগুলিকে হিন্দুগণ পূজা দিয়া থাকে এবং কখনও ইহা কাটিয়া ফেলে না। অনেকে মনে করে যে, নিম ও বেল বৃক্ষে ব্রহ্মদৈত্য বাস করে। এই ধারণা যদিও অমূলক কিন্তু যাহারা ইহার প্রচার করিয়াছিল তাহাদের বক্তব্য ছিল। নিমবৃক্ষের বায়ু স্বাস্থ্যকর, যেই স্থানে উহা থাকে সেথায় কোন ব্যাধি প্রবেশ করিতে পারে না। একটি প্রচলিত প্রবাদ আছে—

নিম নিষিন্দে যেথা।
রোগ নেইকো সেথা॥

সেইরূপ বেল পেটের বড় উপকারী। ইহা আহার ও ঔষধ উভয় কার্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সেইরূপ পিপুল, হরি-

তকি, সুপারি, কদলী ও নারিকেল বৃক্ষের ফল, যাহা দেবতার ভোগে লাগে, তাহাই হিন্দুদের নিকট উপাস্য। কদলী বৃক্ষ বা কলাগাছকে গণেশের স্ত্রী বা কলাবউ বলা হয়। দুর্গাপূজায় প্রথমে কলাবউকে গঙ্গায় না স্নান করাইয়া দশভুজার পূজা হয় না। বাংলায় কোন কোন স্থলে যদি কোন পুরুষ দ্বিতীয়বার পাণিগ্রহণ করিতে যায় তাহা হইলে কলাগাছের সহিত মালাবদল করিয়া বিবাহ করিতে যাইতে হয়। উত্তর ভারতে যদি কোন পুরুষ বিধবাকে বিবাহ করিতে যায় তাহা হইলে তাহার সামি বা রুই বৃক্ষের সহিত বিবাহ হইয়া থাকে। এই প্রথা প্রাচীনকালে পারস্যে মুসলমানদের ভিতরে প্রচলিত ছিল। মারাঠীরা এই বিবাহ প্রথাকে দেবক বলে। দ্রাবিড়গণ কানাড়ী ভাষায় বালি ও তামিল ভাষায় বেদাগু বলিয়া থাকে। যে সকল স্ত্রী কিংবা পুরুষ যে বৃক্ষের সহিত পরিণয়-

সূত্রে আবদ্ধ হইয়া থাকে তাহারা উহাকে বিশেষ ভক্তি করে, এমন কি সেই বৃক্ষের পত্র পর্যন্ত ছিঁড়ে না। পশ্চিম ভারতে এইরূপ বৃক্ষের সহিত বিবাহের বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। প্রধানত পিপুল, নদুক, পিপলি, পিপরি এবং উম্বর বৃক্ষের সহিত তাহারা পরিণয় সম্বন্ধ পাতাইয়া থাকে। অনেক সময় তেঁতুল, শাল ও কাঁঠাল বৃক্ষের সহিত পরিণয় হয়। সকল উচ্চ সম্প্রদায় বিবাহে পান-সুপারি মাঙ্গলিক বরণডালায় শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে। উচ্চ সম্প্রদায় হিন্দুজাতি-দের শ্রাদ্ধের সময় বেনাবৃক্ষ পূজো করা হয়। তাহাদের ধারণা, এই বৃক্ষ বিষ্ণুর প্রতীক। পল্লীগ্রামে যে সকল শিক্ষিত পুত্রকন্যা পিতামাতাকে জীবিতকালে দেখে না তাহাদিগকে গ্রামবৃদ্ধরা বিদ্রূপ করিয়া বলে—
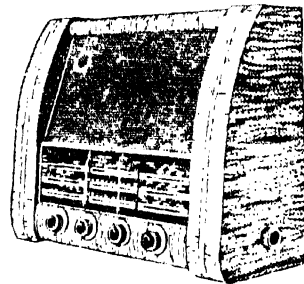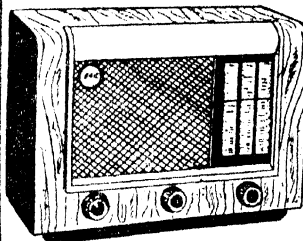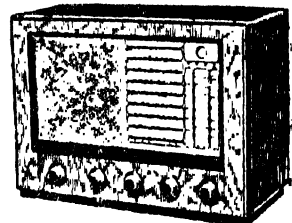
বাপ মা থাকতে বেঁচে
দিলে নাতাদের মুখে জল,
এখন দিচ্ছে
বেনা গাছে জল।

এইরূপ দৃষ্টান্ত হয়ত অন্যান্য ভারতীয়দের মধ্যে দেখা যায় কিন্তু তাহার বিশেষ কোন প্রমাণ না থাকায় এইস্থানে দেখান সম্ভব হইল না।

বৃক্ষপূজা পল্লীবাসীদের ভিতর বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছিল। এই সম্বন্ধে ডাঃ সুকুমার সেন তাঁহার 'প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী' গ্রন্থে উহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়াছেন। প্রাচীনকাল হইতে বৃক্ষের সহিত পল্লীজনগণের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। নানাপ্রকার দেবদেবীর মত বৃক্ষও যে শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল, ইহার পরিচয় গোবর্ধন আচার্য দিয়াছেন—

ত্বয়ি কুগ্রামবটদ্রুম বৈশ্রবণো বসতু বা লক্ষ্মী
পামরকুঠার পাতাৎ কাসর শিরসৈবতে রক্ষা

হে কুগ্রামের বটদ্রুম, তোমাতে কুবের অথবা লক্ষ্মীর অধিষ্ঠান থাক বা না থাক মূর্খ গ্রামীণ লোকের কুঠারাঘাত থেকে তোমার রক্ষা হয় শুধু মহিষের শৃঙ্গ তাড়নায়।

কবি গ্রাম্য বটবৃক্ষের তাৎপর্য সম্বন্ধে ব্যক্ত করিয়াছেন। গ্রামে বৃদ্ধ বট যেন এক মাত্র রক্ষক উহার কৃপায় গ্রামজনগণের ধনসম্পত্তি বৃদ্ধি হয়। সেইজন্য এই বিরাট বৃক্ষের তলায় তাহারা বনদুর্গা বা বন-বিবি, ক্ষেত্রপাল, কালিয়াদানা, হেঁটাল-চণ্ডী, নেকড়াইচণ্ডী, ঝকড়াইচণ্ডী, ফাতাইচণ্ডী, দিদিঠাকরুণ ইত্যাদি দেব-দেবীকে পূজো করে। এই বৃক্ষটি তাহা-দের নিকট পীঠস্থান হইয়া থাকে। সদুক্তিকর্ণামৃতের একটি শ্লোকে এইরূপ গ্রাম্যপূজার বিবরণ পাওয়া যায়।

তৈস্তৈর্জীবোপহারৈর্গিরি
কুহরশিলা সংশ্রয়ামর্চয়িত্বা
দেবীং কান্তারদুর্গাং রুধিরমুপে তরু
ক্ষেত্রপালায় দত্বা।
তূর্বীবীনাবিনোদ ব্যবহৃত
-সুরকামাহি জীর্ণে পুরানীং
হালাং মালুর কোষৈ যুবতি সহচরা
বর্বরাঃ শীলয়ন্তি॥

নানাবিধ জীব বলি দিয়ে দেবী বন-দুর্গাকে পূজো করে, গাছের তলায় ক্ষেত্র-পালকে রক্ত দিয়ে দিনশেষে বর্বরলোকেরা তাদের সহচরীদের নিয়ে একতারা বাজিয়ে নাচগান করতে করতে বেলের খোলায় মদ্যপান করছে।

বনদুর্গা যেমন পশ্চিম বাংলায় গ্রাম-বাসীদের নিকট পূজো পাইয়া থাকে সেই-রূপ পূর্ব বাংলার ময়মনসিংহের পূর্ব অঞ্চলে এই দেবী পূজিত হয়। তিনি সেথায় শেওড়াবৃক্ষে অবস্থান করেন। সেইজন্য ভয়ে কেহ ইহার নিকট যায় না। কোন কোন স্থলে জনগণেরা বনদুর্গার প্রতীক উরুমা বৃক্ষকে পূজো দিয়া থাকে। এই পূজার সময় তাহাকে খই, চিঁড়া-ভাজা, বিচেকলা এবং একটি হাঁসের ডিমকে লাল সিঁদুর মাখাইয়া দেবীর

পূজার নৈবেদ্য হিসাবে নিবেদন করে। কোন কোন সময় পশুবলিও দেওয়া হইয়া থাকে। ত্রিপুরা জেলায় কামিনীবৃক্ষকে বনদুর্গার প্রতীক বলিয়া পূজা করা হয়। সাধারণ লোকেরা সেইজন্য ইহাকে কামিনীর পূজা বলে। বনদুর্গার পূজার পুরোহিত নিম্নোক্ত মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া থাকে—

ওম্ বনদুর্গা বেলপাতাবনমালা বিভূষিতা
শাকোটবাসিনী দেবী সুতারক্ষং কুরুণ মে।

এইরূপ বনদুর্গা পূজা বিভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে। বৃক্ষপূজা অন্ধকারাচ্ছন্ন জনগণের উপর যেরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহা নয় উহার দৃষ্টান্ত অর্থ বাদে পাওয়া যায়।

বাংলার ব্রতে বৃক্ষ লৌকিক পূজার শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়া আছে। এই সকল ব্রতে দেখা যায় অশত্থগাছ ষষ্ঠীদেবীর প্রতীক, বটগাছ শীতলাদেবীর অধিষ্ঠাত্রী, তুলসী হরির পূর্ণমূর্তি ইত্যাদি। এইরূপ প্রতিটি ব্রতে তাহাদের পূজা, গান, ছড়া, আচার ও অনুষ্ঠান দেখা যায়। মনসাগাছ সর্পভয় হইতে রক্ষা করে। ধানছড়াকে লক্ষ্মীর প্রতীক বলিয়া পূজা করা হয়। সেইরূপ পেরুতে লোকেরা ভুট্টার ডগা দিয়া তাহাদের মা লক্ষ্মীর মূর্তিটি গড়ে। শস্য উৎপাদক বৃক্ষগুলি দেবদেবীর স্থান অধিকার করিয়া আছে। পল্লীগ্রামে মেয়েরা অলক্ষ্মী বিদায় নিজেরা করে না। পূজারী এই কাজ করিয়া থাকে। এই অলক্ষ্মী ইলেন অনার্যদের লক্ষ্মী বা শস্য দেবতা। অবনীন্দ্রনাথ 'বাংলার ব্রত' গ্রন্থে দেখাইয়াছেন 'মেক্সিকোতেও শস্যের নানা অবস্থায় এক এক দেবী রক্ষা করেন। তাঁদের নাম হচ্ছে Centeotl এবং তাঁদের একজন Xilonen সবুজ, অপক্ক শস্যের অধিষ্ঠাত্রী। সেইজন্য অন্নকে লক্ষ্মীর দান বলিয়া অন্নভক্ষকরা মনে করে। বরকনেকে আশীর্বাদ ধান দিয়া উচ্চ সম্প্রদায়গণ করিয়া থাকে। ক্ষেতের তোষলা ব্রতে মেয়েরা মূলোর ফুল, শিমের ফুল ও সরষের ফুল দিয়া ক্ষেতের পূজা করে। ব্রত উদ্‌যাপন করিতে অশত্থপাতা আলতা বিনা হয় না। অশত্থপাতা ব্রতকে যেভাবে লোক গ্রহণ করিয়াছে, তাহা ঠাকুর ঠাকরুণের কথোপকথন হইতে পাওয়া যায়—

ঠাকুর জিজ্ঞাসেন : ঠাকরুণ! নরলোকে গঙ্গার ঘাটে কি ব্রত করে?

উত্তর। অশথ পাতার ব্রত করে।

প্রশ্ন। এ ব্রত করলে কি হয়?

উত্তর। সুখ হয়, সহায় হয়, সোয়াস্তি হয়।

অশত্থ ও বটবৃক্ষ ও উহার পাতা কতখানি গ্রাম্য মেয়েদের নিকট পবিত্র তাহা ব্রতকথার মধ্যে পাওয়া যায়। একটি ব্রতের ছড়ার ভিতর ইহা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে—

অশত্থ বট পূজন
সোনার থালে ভোজন॥

অশত্থ ও বটবৃক্ষ পূজা করিলে চিরকাল এত সুখশান্তি বৃদ্ধি পায় যে সোনার থালায় খাইতে পারিবে। গৃহ সুস্বাস্থ্যের জন্য নারীরা ব্রত করে যেন তাহাদের ভ্রাতা, স্বামী ও পিতার কখনও অভাব না হয়। মেয়েলি ব্রতে পাতাটি যেন ভাগ্যবিধাতার কাজ করে। ব্রতকথার ছড়ায় পাতার উল্লেখ আছে—

পাকা পাতাটি মাথায় দিয়ে
পাকা চুলে সিঁদুর পরে।
কাঁচা পাতাটি মাথায় দিয়ে
কাঁচা সোনার বর্ণ হয়।
শুকনো পাতাটি মাথায় দিয়ে
সুখ সম্পত্তি বৃদ্ধি করে।
ঝরা পাতাটি মাথায় দিয়ে
মণি মুক্তোর ঝুরি পরে।
কচি পাতাটি মাথায় দিয়ে
কোলে কমল পুত্র ধরে।

অশত্থ নারায়ণ ব্রতে ব্রতী বলিতেছে—

পুরোনো যায় নূতন আসে
পাতায় পাতায় রৌদ্র হাসে।
বৃক্ষ হলেন কি? স্বয়ং নারায়ণ
অশত্থ নারায়ণ
ব্রতে পাই ধনজন॥

সেইরূপ তুলসী গাছের ব্রতে বলা হয়—

তুলসী তুলসী নারায়ণ
তুমি তুলসী ব্রাহ্মণ
তোমার মাথায় দিয়ে জল
আমার যেন হয় স্বর্গে স্থল।

আর্য ও দ্রাবিড়দের সহিত বৃক্ষপূজার ক্ষেত্রে মিল পাওয়া যায়। অশত্থবৃক্ষকে যেমন আর্যরা নারায়ণ বলে সেইরূপ নিমবৃক্ষকে দ্রাবিড়েরা দেবী মারি অম্মা বলিয়া পূজা করিয়া থাকে। দ্রাবিড়েরা বলে অশত্থবৃক্ষের সহিত নিমবৃক্ষের বিবাহ হইয়াছে, সেইজন্য আর্যদের সহিত দ্রাবিড়দের মিলন সম্ভব হইয়াছিল। বৃক্ষকে আর্য ও অনার্য উভয়েই দেবতাস্থান দিয়াছে এমনকি উচ্চশিক্ষিতগণ বনমহোৎসব করিয়া বৃক্ষপূজার ব্যাপকতা প্রচার করিতেছেন। লোকসংস্কৃতি ক্ষেত্রে বৃক্ষপূজার নানা তথ্য উপজাতিদের নিকট হইতে পাওয়া যায়।

গায়কী। "গায়কী" শব্দটিকে নিয়ে অনেক ওস্তাদকেই মাথা ঘামাতে দেখেছি। কিন্তু "গায়কী" কথাটি আসলে যে কি বস্তু, সেটি এখনও আমার এই ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি। হয়ত বা বুঝেছি, কিন্তু মেনে নিতে কেমন বাধ বাধ ঠেকে। এ যেন আমাদের সেই মনে মনে গর্ব করা যে, আমাদের ধমনীতে ধমনীতে আর্যঋষিদের বিশুদ্ধ শোনিত-ধারা প্রবাহিত হচ্ছে। হাজার হাজার বৎসর ধরে কত মিলন, কত মিশ্রণ হয়ে গেল, গোমুখ থেকে নির্গত পূত বারি-ধারার মধ্যে কত কত নদনদীর অনির্মল জলরাশি এসে মিশে সেই পবিত্র ধারাকে পঙ্কিল করে তুলল, তবুও "গাঙ্গং বারি মনোহারি মুরারিচরণচ্যুতম্"—আমাদের মনে মজ্জাগত হয়ে রইল। গায়কী। কোন বিশেষ গায়কের বৈশিষ্ট্য যে ঢংএর মধ্যে পাওয়া যায়, সেই না গায়কী? কিন্তু বৈশিষ্টকে যদি মানতে হয়, তেমনি গায়কের সৃষ্টিধর্মকেও মানতে হয়।

রত্নাকর

এর মানে কোন গায়কের নিজস্ব চাল যদি গায়কী হয়, তাহলে তিনি যাঁদের সেই চাল শেখালেন, তাঁরাও সেই বিশিষ্ট ঢংএর প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হলেন। তা যদি হয় তো যাঁরা শিখলেন, তাঁরা কেবল অনুকরণই করে গেলেন, নিজের নিজের সৃষ্টিধর্মকে ক্ষুণ্ণ করে গেলেন, নিজের ক্রিয়েটিভ জিনিয়াসকে কাজে লাগালেন কোথায়, কখন? তাই কখনও হয়? প্রত্যেক মানুষই যে স্রষ্টা, প্রত্যেক মানুষই যে নিজস্ব অবদান কিছু কিছু সংযোগ না করে থাকতে পারে না, একথা আমরা কি করে ভুলতে পারি! ফরাসী সাহিত্যের সেই গল্পটি মনে পড়ছে, যাতে সেই সাদা মুর্গীর একটি পালক পড়ে যায় এবং পাঁচ কান হয়ে সেই খবরটি পাড়ায় রটে গেল যে, মুর্গীটি ইচ্ছা করে নিজের সমস্ত পালক তুলে ফেলে নিজের নগ্নরূপ মোরগদের দেখিয়ে বেড়াচ্ছে। সামান্য একটি কাহিনী, পাঁচ মুখে যদি এমনি বদলায় তো একখানা গান, তা সে তার মধ্যে যতই "গায়কী" থাকুক, বদলাতে পারে না? আমাদের গান তো পাশ্চাত্য সঙ্গীতের মত অত কঠিন নোটেশনের বেড়াজালে বাঁধা নয়। তবুও পাশ্চাত্য সঙ্গীতে এক এক virtuoso এক এক রকমে inter-pret করে থাকেন। আর আমাদের সঙ্গীত, যা উদার, মুক্ত, বন্ধনহীন, তাকে "গায়কী"র বন্ধনে কি করে যে বাঁধা যেতে পারে, এ আমি ভেবেই পাইনে। এত rigidity যদি থাকত তো কবেই আমাদের সঙ্গীতের মৃত্যু হোত।

মানব চরিত্রের সৃষ্টিধর্ম তাকে যুগ যুগ ধরে এগিয়েই নিয়ে চলেছে। পিছিয়ে নয়। কারণ সময় কখনও পশ্চাদ্গামী হতেই পারে না। যতই বাঁধাধরার মধ্যেই কেননা আমরা গান শিখি, গাইবার সময় তার মধ্যে আমরা নিজস্ব কিছু নতুনত্ব ঢোকাবই। কারণ আমরা যা প্রকাশ করি, তার মধ্যে আমাদের ভঙ্গী, আমাদের ব্যক্তিত্ব, আমাদের প্রকৃতিগত চিন্তাধারাই প্রকাশিত হয়ে পড়ে। নিছক নকলের জন্য মানবজাতির সৃষ্টি হয়নি। বুদ্ধিজীবী মানব, নিজ নিজ বুদ্ধি অনুযায়ী সকল জিনিস বোঝবার চেষ্টা করে এবং করেই সেগুলিকে আপনার অন্তরঙ্গ করে ফেলে। এই-ই হচ্ছে মানবের স্বভাব, মানবের ধর্ম। এর ব্যতিক্রম কখনই হয় না, হলে বুঝব যে সে মানবের মধ্যে প্রাণের স্পন্দন নেই, সে মানব বদ্ধ জলের মত অবরুদ্ধ গতি। সে মানবের মনে দুষ্টক্ষত দেখা দিয়েছে, যার ফল কখনও ভাল হতে পারে না। সামান্য বাউল, ভাটিয়ালী, ভজন সঙ্গীতই এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ, যে সঙ্গীতের মধ্যে সুর-লয়ের কচকচি নেই, অত্যন্ত সহজ সরল যার রূপ। সেখানেও এই স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম অবশ্যই দেখা যায়। আপনারা একই গান বিভিন্ন মুখে শুনুন, তাহলেই আমার কথার সত্যাসত্য নির্ধারণ করতে পারবেন। উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতে তো এর কথাই নেই। তান, বাঁটের কথা তো ছেড়েই দিলুম, সে সব তো অনির্দিষ্টকাল মুখস্থ করে গাওয়া চলেই না—কত আর মুখস্থ করবেন বলুন। রাগের সংখ্যাও ঝুড়ি ঝুড়ি, আজকাল আবার নিত্য-নূতন রাগ সৃষ্টি হচ্ছে, তানেরও সংখ্যা অফুরন্ত। কিছুদিন না হয় আপনি ওস্তাদ-প্রদর্শিত পথে এক নম্বরের পর দু-নম্বর তান তারপর তিন নম্বর করে চালালেন। কিন্তু তারপর? যখন আপনার ভাণ্ডার ক্রমশই ভরে যেতে থাকবে, তখন? তখন আপনাকে আপনার ব্যক্তিগত সৃষ্টিধর্মের উপর নির্ভর করতেই হবে, এইসব স্বর-প্রস্তারের জন্য, বিভিন্ন অলঙ্কার প্রদর্শনের জন্য। এ তো গেল তান-বাঁটের কথা। শুধু কাঠামোটুকুর কথা ধরলেও আপনি কি মনে করেন যে, খুব বিলম্বিত তালে গাইবার সময় আপনার স্থায়ীর এতটুকুও রদবদল হয় না? ইমন্ রাগের "আল্লা মাডি অরজ" গাইবার সময়, কখনও "আল্লা"র "আ"এর উপর মাত্রার ইতরবিশেষ হয় না। প্রত্যেকবারই

আপনি একইভাবে গাইতে পারেন? যদি বলেন, "পারি", আমি আপনাকে নমস্কার করি; কিন্তু আপনাকে আমি স্রষ্টা বলে প্রাণের অভিবাদন জানাতে পারলুম না।

শুনেছি যে, ধ্রুপদ গীতের অনেক-রকম বাণী আছে, যেমন গওরহার, নওর-হার, খাণ্ডার ও ডাগর বাণী। এ ছাড়া শুদ্ধ বাণীও আছে। এই যে পাঁচ বাণী ধ্রুপদের আমাদের জানা আছে, তারা কি কেবল বাণীর পার্থক্যের জন্যই বিভিন্ন, না এর মধ্যে আরো কথা আছে? শোনা যায় যে, চাল, ঢং বা কায়দাতেও এরা পরস্পর পরস্পর হতে বিচ্ছিন্ন, অন্তত একদিন ছিল, যেটা এখন আর নেই। এটা গণতন্ত্রের যুগ কিনা, তাই ধর্মগত, বর্ণগত, জাতিগত একটি সমতা এসেছে। সকলেই সমান, কেউ কারো থেকে কম নয়, খাটো নয়, পৃথক নয়। এই দেখুন না কেন, আল্লাবন্দে খাঁর ঘরের গায়কী, খাঁটি ডাগরবাণীর ধ্রুপদের যিনি এক দিক্‌পাল ছিলেন। তাঁর ঘরেরই নাসিরুদ্দীন খাঁ, আবার তাঁদেরই ঘরের ডাগর ব্রাদার্স। কিন্তু কত ঢং-এর তফাৎ। ডাগর ব্রাদার্স এখন যে স্টাইলে গমকের কাজ দেখান, আপনারা কি বলতে চান, সেটা ধ্রুপদাঙ্গ? তা যদি না হয় তো ডাগর ভ্রাতৃদ্বয়ের ধ্রুপদের রূপের মধ্য দিয়ে খেয়ালী তানের প্রচেষ্টাকে আমরা নতুন ভঙ্গীর গায়কী বলব কি না? এঁদের এই অভিনব প্রথাকে আমি সর্বতোভাবে সমর্থন করি, কারণ এঁরা সত্যকার আর্টিস্ট এবং আর্টিস্ট বলে গতানুগতিকতার অনুসরণকারী নন। একটা নতুন কিছু সৃষ্টির চেষ্টায় আছেন। সকলেই জানেন যে, শান্তিপুরে অনেক তাঁতীর বাস। নোনার ছোটা দিয়ে তাঁত বাঁধা দেখে একবার জিজ্ঞেস করেছিলুম, তোমরা নারকেলের দড়ি ব্যবহার কর না কেন? উত্তর পেয়েছিলুম, বাপ্‌-ঠাকুর্দা নাকি নোনার ছোটা দিয়েই কাজ চালাতেন। আল্লাবন্দে খাঁর মত কণ্ঠস্বর সকল ডাগর ব্রাদার্সের নয়। মিনমিনে আওয়াজে যদি তাঁরা তাঁদের ঠাকুর্দাকে নকল করতে যেতেন তো আজ এঁদের ভারতজোড়া এত নাম হত না। এঁদের নতুন সৃষ্টি প্রচেষ্টাকে আমি সার্থক বলে

মনে করি। যদিও বিশুদ্ধ ধ্রুপদের কাঠামো আজকে বদলে গেছে।

এমনি অনেক দৃষ্টান্তই দেওয়া যেতে পারে। কথা হচ্ছে, সৃষ্টি ধর্মের সঙ্গে আরো কিছু বিশেষ গুণ এই গায়কীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছে। এটিকে আমরা সংগীত পারদর্শিতা বলতে পারি। ওস্তাদ বা গুরুর অনেক সাগির্দ বা শিষ্য থাকতে পারে, কিন্তু সকল ছাত্রই তো সমান উতরে যায় না। স্বর্গীয় বিষ্ণু-দিগম্বরজীর অনেক শিষ্য হয়েছিলেন, কিন্তু বোধ করি, পণ্ডিত ওঙ্কারনাথের মত কেউ অত বড় হননি। স্বর্গীয় বাদল খাঁর কাছে কলকাতার যাঁরাই একটু-আধটু হাঁ করতে পারেন, তাঁদের প্রায় সকলেরই গতিবিধি ছিল। কিন্তু যে কজন সে ঘরের গায়কী ঠিক রপ্ত করেছেন, তাঁদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। এ হতেই হবে, এ হচ্ছে প্রকৃতির খেলা। ক্লাসের সব ছাত্রের মেধা, বুদ্ধি, কর্মশক্তি প্রভৃতি সমান হতেই পারে না, কেউ ক্লাসের সর্বপ্রথমে থাকে, কেউ বা সর্বনিম্ন। সংসার যাত্রায়, জীবন-সংগ্রামে যে প্রথম, সে সর্বদাই যে প্রথম থাকবে, এমন কোন কথা নেই। এমনও দেখা যায় যে, জীবন-সংগ্রামে সর্বনিম্ন সর্বোচ্চকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গেছে। কাজেই সংগীতে দক্ষতা সব শিষ্যের সমান থাকতে পারে না এবং সমান থাকে না বলেই দু-একজন খুব ওঠেন, বাকী সকলে "সাধারণ"এর কোঠায় পড়েন। কিন্তু "সাধারণ" যাঁরা, তাঁদেরও রুটির যোগাড় দেখতে হয়, তাঁদেরও দিব্য প্রশিষ্য জোটেন, তাঁরাও শিক্ষাদানে ব্রতী হন। 'যদুভট্ট' ফিল্মে যদুভট্ট নিজের গুরুভাই, ওস্তাদের পুত্রের ভুল ধরিয়ে দিচ্ছেন, দেখা যায়। ব্যবহারিক জীবনে এমন ঘটনা কত যে ঘটছে, তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু দুঃখ এই যে, ভুল সংশোধনকারী যদুভট্টকে সব স্থানে মেলে না। এই ধরুন, "আহমামাতে আরজ" ইমনের খেয়াল আমি একতালা ও ত্রিতালে দুটি তালেই শুনেছি। 'জানে না দেহ"দ" খেয়াল আমি শ্যাম, নটকেদার, শুদ্ধ কেদারা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন রাগে শুনেছি। 'পীর ন জানে' খেয়াল মালকোশ ও তাড়ানা এই দুই রাগেই শুনেছি। এমনি যদি হয় তো গায়কী কোথায় রইল পড়ে।

আসরের খবর

আলাউদ্দিন সংগীত সমাজ

আগামী ২৫শে নবেম্বর থেকে ২৮শে নবেম্বর, চারদিনব্যাপী আলাউদ্দিন সংগীত সমাজের তৃতীয় বার্ষিক সংগীত সম্মেলন রঙমহলে অনুষ্ঠিত হবে। বিশ্ব-বিশ্রুত সংগীতসাধক আলাউদ্দিন খাঁ ত উপস্থিত থাকবেনই সেই সঙ্গে উপস্থিত থাকবেন অশীতিপর বৃদ্ধ ভারতবিশ্রুত কণ্ঠসংগীতসাধক রামপুরের ওস্তাদ মুস্তাক হোসেন খাঁ। এই সম্মেলনের আরেকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ভারতের সেরা যন্ত্রীদের, বিশেষ করে সেতার ও স্বরোদের, একত্র সমাবেশ। বিলায়েৎ খাঁ আলী আকবর, রবিশংকর ত আছেনই, তাছাড়া আছেন বোম্বাই, মীরাট, বেনারস ও দিল্লীর একাধিক গুণী শিল্পী।

নিখিল ভারত তানসেন সংগীত সম্মেলন

আগামী বুধবার, ৩০শে নবেম্বর থেকে দক্ষিণ কলিকাতার কালিকা সিনেমা হলে অষ্টম বার্ষিক নিখিল ভারত তানসেন সংগীত সম্মেলনের পাঁচদিন-ব্যাপী অধিবেশন আরম্ভ হবে।

এই সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করবেন ওস্তাদ নিশার হোসেন খান (বদাউন), প্রফেসর আল্লা রাখা (বোম্বাই), প্রফেসর আশুতোষ ভট্টাচার্য (বেনারস), পণ্ডিত কুমার গন্ধর্ব (দেওয়া), পণ্ডিত নারায়ণ রাও ব্যাস (বোম্বাই), শ্রীমতী গাঙ্গুবাঈ হাঙ্গল (হুবলী), শ্রীমতী মালিনী যোশী (পুনা), প্রফেসর কমল সিং (বোম্বাই), ওস্তাদ আলী আকবর খান (বোম্বাই), পণ্ডিত রবিশংকর (দিল্লী), প্রফেসর নন্দলাল ও সম্প্রদায় (বেনারস), পণ্ডিত শত্রুঞ্জয়প্রসাদ সিং (আরা), কুমারী মোহিনী (নৃত্য—আরা), প্রফেসর ভবানীপ্রসাদ মিশ্র (বেনারস), প্রফেসর নাগেশ্বর প্রসাদ (বেনারস), প্রফেসর যশোবন্ত যোশী (দিল্লী), প্রফেসর রাধাশ্যাম দাস (মুর্শিদাবাদ), ও স্থানীয় বিশিষ্ট শিল্পীরা।

এই উপলক্ষে এ মাসের গোড়ায় কলিকাতার ডেপুটি মেয়রের সভাপতিত্বে সাংবাদিকদের আমন্ত্রণ জানিয়ে তানসেন সংগীত সংঘ তাঁদের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলীর বিস্তৃত বিবরণ দেন।

দার্শনিক প্রবন্ধ

প্রবন্ধাবলী—(পঞ্চম ভাগ) পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য শ্রীমৎস্বামী মহাদেবানন্দগিরি প্রণীত। শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা ৬ হইতে প্রকাশিত। মূল্য ২, টাকা।

ভোলাগিরি সম্প্রদায়ের বর্তমান আচার্য শ্রীমৎ মহাদেবানন্দগিরি মহারাজ সর্বজন-বিদিত সাধক পুরুষ। তাঁহার লিখিত প্রবন্ধাবলীর পঞ্চম ভাগ আলোচ্য পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমরা পরম উপকৃত হইয়াছি। পুস্তকখানিতে ১৯টি প্রবন্ধ সঙ্কলিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলিকে প্রধানত দার্শনিক সিদ্ধান্তমূলক এবং তথ্যমূলক এই দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রত্যেকটি প্রবন্ধ লেখকের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, অনন্যসাধারণ সত্যানুসন্ধিৎসা এবং প্রখর মনীষার পরিচায়ক। বেদ বেদান্ত, পুরাণ অবলম্বন করিয়া প্রবন্ধগুলি লিখিত হইয়াছে। দার্শনিক সিদ্ধান্তমূলক আলোচনায় সাধক গ্রন্থকার সর্বত্র শাস্ত্রবৈত সিদ্ধান্তের আলোকসম্পাত করিয়াছেন। এমন সিদ্ধান্ত সকলে সমর্থন করিবেন ইহা মনে করা যায় না। দৃষ্টান্তস্বরূপে রাসলীলার আলোচনার উল্লেখ করা যাইতে পারে। কামের পথে গোপীদের পরমার্থসিদ্ধি ঘটিয়াছিল, গ্রন্থকার এই মত সমর্থন করেন নাই। তাঁহার অভিমত এই যে, বৃন্দাবনে রাসলীলার অনেক পরে কুরুক্ষেত্রে বাসুদেবের যজ্ঞে গোপীগণ উপস্থিত হইলে শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে আধ্যাত্ম শিক্ষা লাভ করিয়া তাঁহাদের ব্রহ্ম-প্রাপ্তি ঘটে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগকে ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশ করিয়াছিলেন ইহা ঠিক; কিন্তু তাঁহারা সে শিক্ষা স্বীকার করিয়া লন নাই। ভাগবতের পরবর্তী শ্লোকই তাহার প্রমাণ। শিক্ষা পাইবার পরও গোপীদের কথা মিটে নাই। তাঁহারা বলেন—"তোমার চরণ মোর ব্রজপুর ঘরে, উদয় করাহ যদি তবে বাঞ্ছা পূরে।" তত্ত্ব সিদ্ধান্ত ছাড়া তথ্যমূলক আলোচনার ক্ষেত্রেও এইরূপে মতভেদের কারণ রহিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপে আলোচ্য গ্রন্থের "কুরুক্ষেত্রে পাণ্ডব যুদ্ধ" শীর্ষক সন্দর্ভটির কথা বলা চলে। পূজ্যপাদ স্বামীজী মহারাজ দুর্যোধনের পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। পাণ্ডব-দের কার্য লোকধর্ম বিগর্হিত হইয়াছে, তাঁহার লেখায় এই ভাবই অনেকটা আসিয়া পড়িয়াছে। তাঁহার এই মতের প্রতিবাদ ইতোমধ্যেই উত্থাপিত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে এইসব ক্ষেত্রে মতভেদ থাকিবে এবং তাহা অবাঞ্ছনীয়ও নয়। সকলের মত মানিয়া চলিতে গেলে মনীষার গতি অন্যরূপ হইয়া পড়ে এবং জাতীয় সংস্কৃতির অবস্থা অচল হইয়া দাঁড়ায়, কূপমণ্ডূকতা নিশ্চয়ই কাম্য নয়। আলোচ্য প্রবন্ধগুলিতে সুপণ্ডিত সাধক মহাদেবানন্দগিরি মহারাজ স্বাধীন চিন্তাধারার যে উজ্জ্বল আলোকসম্পাত করিয়াছেন, আমরা তাহা সম্বর্ধিত করিয়া লইতেছি। 'সমুদ্র মন্থন', 'বাইবেল ও পুরাণ', 'বেদে নারীর স্থান' প্রভৃতি আলোচনা বাংলা সাহিত্যে নূতন সমৃদ্ধি সৃষ্টি করিবে। বাংলার চিন্তা-শীল সমাজ আলোচ্য পুস্তকের প্রত্যেকটি প্রবন্ধে মনের প্রচুর নূতন খোরাক পাইবেন। চিন্তার গাঢ়তা সম্পাদনে সামর্থ্যসম্পন্ন এমন সৎসাহিত্যের বহুল প্রচার বর্তমানে বিশেষ-ভাবে বাঞ্ছনীয়। ২৯৪।৫৫

বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য—শ্রীগুণদাচরণ সেন প্রণীত। প্রবর্তক পাবলিশার্স, ৬১নং বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য ২।০ টাকা।

বেদান্ত ভারতীয় অধ্যাত্ম সাধনার ভিত্তি-স্বরূপ। বেদান্তশাস্ত্রের ব্যাপকতা কম নয়। সাধারণের দৃষ্টিতে বেদান্তে বা উপনিষদে পরস্পর-বিরোধী মতের সন্নিবেশ পরিদৃষ্ট হয়। বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের সহিত যোগ রক্ষা করিয়া চলার কালোপযোগী প্রয়োজনসূত্রে এই সম্পর্কে জটিলতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। বেদান্ত-সূত্রে এই সমস্যার সমাধানের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বিভিন্ন মতবাদ প্রভাবিত ভাষ্যে সূত্রের অন্তর্নিহিত শাশ্বত এবং সার্বভৌম সত্যটি সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। সাধ্য এবং সাধন-তত্ত্ব বিনির্ণয় করা এজন্য কঠিন। উপনিষদের সাধ্য ও সাধনতত্ত্ব দেশকালের বর্তমান অবস্থার উপযোগীভাবে একত্র সঙ্কলন করিবার উদ্দেশ্যে গ্রন্থকারের প্রচেষ্টা এবং এজন্য তিনি বৃহদারণ্যক এবং ছান্দোগ্য এই দুইখানা উপনিষদ বাছিয়া লইয়াছেন। কারণ, এই দুই-খানি উপনিষদে সত্যের স্বরূপে সুপরিস্ফুট এবং মাধুর্যের ভাব সমধিক ঘনিষ্ঠ। প্রকৃত-পক্ষে উপনিষদে সাধ্য বস্তুকে শুধু বিচার-সিদ্ধান্ত স্বরূপেই উপস্থিত করা হয় নাই; সাধন-প্রকরণের সঙ্গে সাধ্যের রস সম্বন্ধের সংযোগ-ধারার পরিস্ফূর্তির রীতি বা অনুভূতির ছন্দও ধরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই ধারার সঞ্জীবন সংস্পর্শে সাধক শুধু ব্যক্তিগতভাবে তাঁহার নিজের মধ্যেই আত্মসত্তাকে উপলব্ধি করেন না, পরন্তু সেই সূত্রে তিনি বিশ্ববীজেও নিজকে অবিচ্ছিন্ন চৈতন্যময় সত্তায় এক করিয়া পান। রস সম্বন্ধে সর্বতোব্যাপ্ত অখণ্ড এবং অব্যয় এই যে আত্মচেতনা, ইহার মূলীভূত প্রজ্ঞানময় প্রভাবকেই বলা যায় প্রেম। বিচার-সিদ্ধান্ত শুধু আমাদের স্থূল বুদ্ধিবৃত্তিরই কতকটা পরিমার্জনা করিতে পারে, কিন্তু রসধর্মকে আশ্রয় করিয়াই সত্য সাক্ষাৎ-সম্পর্কে অন্তরে জীবন্ত হইয়া উঠে। গ্রন্থকার আলোচ্য সঙ্কলনে সাধ্য ও সাধন তত্ত্বের মধ্যে এই রস-সম্বন্ধের নিবিড়তা ও নৈকট্য স্থাপনের দিকেই প্রধানত লক্ষ্য রাখিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। মন্ত্রগুলির সঙ্কলন এবং সন্নিবেশে তাঁহার এই মনীষা বিশেষভাবেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বস্তুত ঔপনিষদ-সত্যের পরিপূর্ণ স্বরূপটি তিনি সংক্ষেপের মধ্যে অথচ খুব সহজ, সরল এবং সুমধুর-

ভাবে আমাদের দৃষ্টিতে উপস্থিত করিয়াছেন। বিভিন্ন মতবাদের দার্শনিক পরিভাষার জটিলতা এক্ষেত্রে একেবারে নাই। বহু কথার পাকে পড়িয়া এজন্য সত্যের সম্বন্ধে তাক্ আমরা হারাই না। প্রত্যুত বিভিন্ন মন্ত্রগুলির আরম্ভেই আমাদের মন নিবিষ্ট হইবার পথ পায়। গ্রন্থখানি চিন্তাশীল সমাজের সর্বত্র সমাদৃত হইবে, সন্দেহ নাই। ৩০৭।৫৫

শ্রীগুরুতত্ত্ব ও গীতা—আচার্য শ্রীগোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। শ্রীমহেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী কর্তৃক ১৫-১৬, একডালিয়া প্লেস, বালিগঞ্জ হইতে প্রকাশিত।

গ্রন্থকার স্বর্গীয় চট্টোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীগোপাল ঠাকুর নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি সাধক পুরুষ। গীতার ব্যাখ্যাতা বক্তা হিসাবে তাঁহার খ্যাতি ছিল। আলোচ্য গ্রন্থখানিতে তিনি গুরুতত্ত্বের অনেক নিগূঢ় রহস্য উন্মুক্ত করিয়াছেন। গুরুতত্ত্ব বলিতে অনেকে অন্যভাবে মানুষের পূজা বা কর্তাভজাগিরি মনে করেন এবং সেজন্য আধুনিক সমাজে এ সম্বন্ধে একটা নিদিষ্ট ভাবও দেখা যায়। আচার্য গোপাল ঠাকুর তাঁহার প্রগাঢ় অনুভূতির আলোকে সেই ভ্রান্তির নিরসন করিয়াছেন। তিনি গুরুতত্ত্বের ভিতর দিয়া সার্বভৌম সনাতন সত্যের সংযোগসূত্র আমাদিগকে ধরাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার বিশ্লেষণভঙ্গী বড়ই সুন্দর, ভাষা প্রাঞ্জল এবং সরস। প্রকৃত প্রস্তাবে গুরুদত্ত মন্ত্রের ভিতর দিয়া শিষ্যের মনে শ্রীভগবানের আত্মভাবটি প্রাণরসের উজ্জীবন ধর্মে পরিস্ফুর্ত হইয়া দীপ্তি এবং ব্যাপ্তি লাভ করে। ভগবানের সঙ্গে প্রেমের নিবিড় ছন্দটি মনের মূলে এইভাবে পাওয়া যায়। গ্রন্থকার গীতার বুদ্ধিযোগের ব্যাখ্যার সাহায্যে গুরুরূপে ভগবৎ-কৃপায় বীর্যময় প্রভাবের স্পর্শ আলোচ্য গ্রন্থে সঞ্চার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে গুরুতত্ত্বেই ভগবানের অস্তিত্বকে মনে প্রাণে একান্তভাবে উপলব্ধি করিবার সূত্র নিহিত রহিয়াছে। নতুবা শুধু অনুমান বা প্রমাণের জোরে সে সম্বন্ধে বুদ্ধি নিঃসংশয় হয় না এবং ব্যবসায়াত্মিকা বৃত্তি লইয়া সাধন-ভজনের পথে অগ্রসর হওয়াই সম্ভব নহে। গ্রন্থখানি অধ্যাত্মতত্ত্ব-পিপাসু সমাজের সর্বত্র সমাদৃত হইবে। ৩৫৬।৫৫

প্রাচীন সাহিত্য

বিদ্যাপতি শতক—ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সম্পাদিত। রেনেসাঁস প্রিণ্টার্স কর্তৃক ১০ নর্থব্রুক হল রোড, ঢাকা, পূর্ব পাকিস্থান হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৩্ টাকা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের বর্তমান অধ্যক্ষ ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সাহেবের পরিচয় বাঙালী সমাজে দেওয়া অনাবশ্যক। তাঁহার পাণ্ডিত্য-প্রতিভা এবং সাহিত্যনিষ্ঠা সর্বজনবিদিত। তাঁহার প্রণীত বিদ্যাপতি শতক পাঠ করিয়া আমরা পরম উপকৃত হইয়াছি এবং আনন্দ লাভ করিয়াছি। আলোচ্য গ্রন্থখানিতে বিদ্যাপতির কবি-প্রতিভা, তাঁহার গীতির রসতাৎপর্য কিংবা অলঙ্কার-মাধুর্যের বিচার ও বিশ্লেষণ করা হয় নাই। জনসাধারণ, বিশেষভাবে ছাত্রসমাজ যাহাতে কবির অবদান সহজে উপলব্ধি করিতে পারেন এবং তাঁহাদের চিত্তবৃত্তিতে যাহাতে সাহিত্যের রসধর্ম পরিস্ফূর্তি লাভ করে সুপণ্ডিত গ্রন্থকারের ইহাই লক্ষ্য। এই উদ্দেশ্যে পুস্তকখানিকে তিনি সর্বতোভাবে উপযোগী করিবার জন্য প্রয়াস পাইয়াছেন। বিদ্যাপতি মৈথিলী কবি। সুতরাং তাঁহার গীতিগুলির ভাষা তৎকাল-প্রচলিত বাঙলা ভাষা হইতে পৃথক ছিল। গ্রন্থকার কবির মূল বা শুদ্ধ পদগুলি পুস্তকখানিতে দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ভূমিকাভাগে মৈথিল ব্যাকরণের সূত্রগুলি সংক্ষেপে প্রদত্ত হইয়াছে। গ্রন্থের পরিশিষ্টভাগের শব্দসূচীতে মৈথিল শব্দগুলির বাঙলায় মূল রূপ ভাঙিয়া দেখানো হইয়াছে। মূল সংস্কৃত হইতে প্রাকৃত, তাহা হইতে শব্দগুলির বাঙলায় অভিব্যক্তির ধারা ইহাতে সহজেই ধরা যায়।

আলোচ্য পুস্তকে কবি বিদ্যাপতির একশত পদ সঙ্কলিত হইয়াছে। গ্রন্থকার কবির ছন্দ অনুকরণ করিয়া প্রত্যেক পদের পদানুবাদ সঙ্গে সঙ্গে দিয়াছেন। পরিমিতির মধ্যে ভাষা এবং ভাবের পরিপূর্ণ সঙ্গতি রক্ষা করিয়া আলঙ্কারিক তাৎপর্যপূর্ণ এমন আক্ষরিকভাবে পদাবলীর অনুবাদ করা খুবই কঠিন কাজ। শহীদুল্লাহ্ সাহেবের ন্যায় জ্ঞানী এবং গুণী ব্যক্তির পক্ষেই ইহা সম্ভব হইয়াছে। বাঙলাদেশের রস-সাহিত্যে বিদ্যাপতি-শতক স্থায়ী আসন অধিকার করিবে। ৪০৬।৫৫

অনুবাদ সাহিত্য

ফোমা গর্দিয়েফ—ম্যাক্সিম গর্কি—অনুবাদক সত্য গুপ্ত। সংস্কৃতি ভবন, ১১৭, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা—১৩। দাম পাঁচ টাকা।

উনিশ শতকের শেষে রুশ দেশে পুঁজিবাদের যে বৃদ্ধি ও বিস্তার হয়, গর্কি তারই পটভূমিতে এই বিখ্যাত উপন্যাস রচনা করেন। ধনী ব্যবসায়ীর পুত্র ফোমা। তাকেই গর্কি পুঁজিবাদের নির্মম শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্রতিমূর্তি হিসেবে অঙ্কিত করেছেন। আপনার গোষ্ঠীর স্বরূপ বুঝেছিল ফোমা, তাই সে নির্ভয়ে দাঁড়াতে পেরেছিল এই মালিকানা স্বত্বের অত্যাচারী মনোবৃত্তি এবং কুটিল কার্যকলাপের বিপক্ষে। ফোমার বিদ্রোহ সার্থক হয়নি কিন্তু তার পরাজয় ছিল প্রস্তুতি, আগামী বিপ্লবের নিশ্চিত পূর্বাভাস। এই যুগের লেখা বইগুলি থেকেই প্রমাণ হয় গর্কির ভবিষ্যদৃষ্টি, মুনাফালোভী স্বার্থ-সংঘ প্রতিষ্ঠানের উপর তাঁর তিক্ত বিরক্তি এবং শ্রমিক-সাধারণের নিপীড়িত বঞ্চিত জীবনের প্রতি তাঁর অসীম সহানুভূতি। গর্কির এই উপন্যাসখানি অনুবাদ করার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। অনুবাদক শ্রীসত্য গুপ্ত তাঁর কাজ ভালো ভাবেই করেছেন শ্রদ্ধা ও আন্তরিক সততা নিয়ে। অনুবাদে কোনও আড়ষ্টতা নেই। বাংলা ভাষায় গর্কির তীব্র আবেগ সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। গর্কির প্রতিভা ও মহত্ত্ব বুঝতে হলে বাঙালী পাঠককে এ বইখানি অবশ্যই পড়তে হবে। ৩৬৮।৫৫

স্বাধীনতার অষ্টম বর্ষ

This Eighth Year of Freedom: Aug. 1954—Aug. 1955. All-India Congress Committee. New Delhi. Price Rs 3.

ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের তরফ হইতে প্রতি বৎসরই এইরূপ একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়। স্বাধীনতা লাভের পরে ইহা অষ্টম বর্ষের কার্য-কলাপের বিবরণী। পরিশিষ্ট সমেত ইহা ৪৩২ পৃষ্ঠার একখানি বৃহৎ গ্রন্থ। অষ্টম বর্ষে জাতীয় সরকারের কর্ম-

প্রণালী ও কার্যসূচী পড়িলেই বুঝা যাইবে আমরা জাতীয় পরিকল্পনায় কতদূর অগ্রসর হইতে পারিয়াছি। সাধারণ ভূমিকার পর এই গ্রন্থে সতেরটি অধ্যায় সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রতিটি অধ্যায় গুরুত্বপূর্ণ এবং তাহাতে অনেক জানিবার কথা রহিয়াছে। অর্থনৈতিক অবস্থা, প্রথম পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা, শ্রম-শিল্প ও ব্যবসায়, শ্রমিক-কল্যাণ, স্বাস্থ্য, সমাজ ও শিক্ষা, রাষ্ট্রীয় পরিবহন, উদ্বাস্তুদের পুনর্বসতি, গ্রাম-পঞ্চায়েৎ ও স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন, শাসনতন্ত্র এবং আইন ও বিচার বিভাগের সংস্কার প্রভৃতি বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ের তথ্য-সম্বলিত বিবরণী এই গ্রন্থে একত্র পাওয়া যাইবে। শিক্ষক-অধ্যাপক, সাংবাদিক, রাষ্ট্রকর্মী, ছাত্র এবং জিজ্ঞাসু জনসাধারণের উপযুক্ত এমন একখানি গ্রন্থ এত সুলভে পাওয়া যায় না। প্রচার-বিভাগের প্রচেষ্টা ভাবিলে বইখানির উপর অবিচার করা হইবে, যদিও সে দিক দিয়া বইখানি সুযোগ্যভাবেই সম্পাদিত হইয়াছে। ইহাকে 'ডকুমেণ্টারি' হিসাবেই ব্যবহার করিতে হইবে। চার্ট, নক্সা, মানচিত্র এবং অনেকগুলি আলোকচিত্র সংযুক্ত হওয়ায় গ্রন্থখানির ব্যবহারিক মূল্য বাড়িয়াছে। খাদ্য ও কৃষি, অন্য শ্রমিক, সমাজ-সেবক ও মধ্যবিত্ত গৃহস্থদের বাসগৃহ নির্মাণের যেসব ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং ভূমি সংস্কার—এই তিনটি অধ্যায় সংক্ষিপ্ত, সুলিখিত ও মূল্যবান। ৪০২।৫৫

কিশোর সাহিত্য

লালু ভুলু—বাণভট্ট। বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলিকাতা—১২। দাম আড়াই টাকা।

আনন্দবাজার পত্রিকার 'আনন্দমেলা' বিভাগে এই কিশোর উপন্যাসখানি প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এখন গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়ায় পাঠক সংখ্যা আরও বাড়িল। মানিক জোড় লালু ভুলুর মাউথ অর্গ্যান আর শিস দেওয়া সুরের ঐকতান, তাহাদের বিচিত্র জীবন ও পরিণতি যেমন করুণ, তেমনি মধুর। খোঁড়া আর কানা ছেলে দুইটির জীবন কাহিনী দিয়া গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন রক্ত সম্পর্কহীন পরও কেমন করিয়া কতখানি আপন হয়।

(৪৮৭।৫৫)

বিবিধ

হোমিওপ্যাথিক ফ্যামিলি ডক্টর—(প্রথম ভাগ) ডাঃ পি সি দাশ এম ডি (ইউ এস এ) প্রণীত। গ্রন্থকার কর্তৃক পি ৩১০ সুদিয়ালী রোড, কলিকাতা ২৪ হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১৷৷০ টাকা।

ডাঃ দাশ প্রবীণ চিকিৎসক স্বরূপে লব্ধ-প্রতিষ্ঠ। হোমিওপ্যাথি শাস্ত্রে তিনি সুপণ্ডিত ব্যক্তি। তাঁহার লিখিত আলোচ্য পুস্তকখানির দ্বিতীয় সংস্করণ সময়োপযোগীভাবে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত আকারে প্রকাশিত হইয়াছে দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম। হোমিওপ্যাথি শিক্ষার্থীদের পক্ষে পুস্তকখানি বিশেষ কাজে আসিবে। ইহা ছাড়া সাধারণভাবেও বিভিন্ন রোগের সম্বন্ধে সতর্কতা এবং সেগুলির প্রতিকারে পুস্তকখানি বিশেষভাবে কাজে আসিবে। পুস্তকখানি সরল ভাষায় লিখিত। ডাক্তারী পরিভাষা সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরাও ইহাতে সহজেই সব বিষয় বুঝিতে পারিবেন। বহুদর্শী চিকিৎসকের সম্বন্ধে সর্বসাধারণের উপযোগী সরল ও সহজ ভাষায় এইরূপ উপদেশ ও নির্দেশ দান সম্ভব। ৪৩৪।৫৫

পাকপ্রণালী : দশম সংস্করণ—বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩-১-১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, স্ট্রীট, কলিকাতা—৬। মূল্য—ছয় টাকা।

আমরা অনেকেই ছোটবেলা থেকে এই বইখানি দেখে আসছি। সাড়ে চারশ' পৃষ্ঠার বইখানির দশম সংস্করণ হাতে নিয়ে মনে হ'ল এ বইয়ের জনপ্রিয়তা ও চাহিদা কমবে না। এ বই শুধু গৃহিণী বা রন্ধনকারিণীর জন্যই নয়। অলস মুহূর্তে কিংবা অসুস্থ অবস্থায় এর পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বেশ সময় কেটে যায়। নানা রকমের ও লোভনীয় রান্নার প্রণালী দেখে বুঝতে দেরি হয় না যে বাঙালীর কাছে রান্না কত সূক্ষ্ম অথচ বৈচিত্র্যময় শিল্প-কলা। মনে হয়, বাঙালী শাড়ীর পাড় আর রান্নার রকমারি চিন্তা করতে করতেই অন্তিম-নিশ্বাস ফেলবে। কিন্তু ততদিন 'পাকপ্রণালী' বেঁচে থাকু। ৪৩৭।৫৫

বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষা সংস্কার—শ্রীজনার্দন সাহু প্রণীত। যোগদা মঠ; ৭৮, অক্ষয়কুমার মুখার্জি রোড, বরাহনগর, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৷৷০ আনা।

লেখক প্রবীণ শিক্ষক এবং পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার তিনি অন্যতম সদস্য। তিনি মহাত্মা গান্ধীর আদর্শে অনুপ্রাণিত। প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহকে বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে পরিণত করিবার আদর্শ তিনি পুস্তকখানিতে উপস্থিত করিয়াছেন। স্বাধীন ভারতের কল্যাণে বিদ্যালয়সমূহকে দেশহিতব্রতী কর্মী গঠনের কেন্দ্রে রূপায়িত করিবার তিনি পক্ষপাতী। তাঁহার যুক্তিরাজী সুচিন্তিত এবং বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য। শিক্ষা সংস্কার সম্পর্কে আগ্রহশীল চিন্তাশীল সমাজে এই আলোচনা সমাদৃত হইবে।

৩৬৯।৫৪

প্রাপ্তি স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থ আসিয়াছে।

বাংলার সৃজনী প্রতিভা—শ্রীযামিনীকান্ত সোম।

ভাতের কথা—শ্রীচিত্তরঞ্জন বিশ্বাস।

উত্তরাপথ—সমর গুহ।

আমার জীবন (২য় খণ্ড)—শ্রীভারতী দেবী।

সাংবাদিকের স্মৃতি কথা—বিধুভূষণ সেনগুপ্ত।

শরৎচন্দ্রের হাস্য পরিহাস—শ্রীগোপালচন্দ্র রায়।

রবীন্দ্রনাথের হাস্য পরিহাস—শ্রীগোপালচন্দ্র রায়।

জীবনী সংগ্রহ—শ্রীআনন্দ।

সাঁওতালী কথা—শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভৌমিক।

যক্ষ্মারোগ ও রোগী—ডাঃ সুবলচরণ লাহা।

অফুরন্ত—প্রেমেন্দ্র মিত্র।

মালা চন্দন—গজেন্দ্রকুমার মিত্র।

ভীমপলশ্রী—বনফুল।

মনোলীনা—প্রতিভা বসু।

অবিস্মরণীয় মুহূর্ত—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়।

জন্ম ও মৃত্যু—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

কাচঘর—নীহাররঞ্জন গুপ্ত।

অগ্রগামী—প্রবোধকুমার সান্যাল।

পোনুর চিঠি—বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

শিক্ষার ভিত্তি—বনফুল।

এখন যাঁদের দেখছি—হেমেন্দ্রকুমার রায়।

প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর স্বনির্বাচিত গল্প।

আশাপূর্ণা দেবীর স্বনির্বাচিত গল্প।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের স্বনির্বাচিত গল্প।

সাধক—শ্রীশ্রীরাধারমণ দেব।

ত্রি-ধারা—শ্রীভুবনেশ প্রসাদ ঘোষ।

শ্রীশ্রীরামলীলা—(মূল, অন্বয় ও অন্বয়ানুবাদসহ) **পদ্যানুবাদ**—শ্রীজিতেন্দ্রনাথ গোস্বামী।

পথ ও প্রান্তর—অতুল চক্রবর্তী।

শিক্ষক আন্দোলনের কয়েকদিন—অবনীকুমার রায়।

Gotama the Buddha—Ananda K. Coomaraswamy and I. B. Horner.

আমার নাম চা
আপনাদের জীবনে
আমার স্থান কতখানি সেই
কথাটাই বলছি
আমাকে চেনেন বলে আপনাদের ধারণা থাকলেও, মনে হয় আমাকে বুঝি তেমন ভালো করে চেনেন না। আমার পাতার নানা রকম কালো বা বাদামী রঙের গুঁড়া বা পাকানো রূপটাই আপনারা দেখেছেন। কিন্তু জানেন কি, ছোট্ট একটী বীজ থেকে জন্মাবার পর আমার চারা তুলে নিয়ে চায়ের আসল বাগানে রোপন করা হয়? আমার মাথার ওপরে খোলা আকাশ, আশে পাশে বিঘের পর বিঘে চায়ের বাগান। আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, কাংড়া, নীলগিরি, আন্নামালাই অঞ্চলে প্রায় চব্বিশ লক্ষ বিঘা জমিতে ছ'হাজারের ওপর চায়ের বাগান আছে — আয়তনে তা দিল্লী রাজ্যের প্রায় দ্বিগুণ।
মাসের পর মাস খোলা আকাশের নীচে বেড়ে ওঠার পর আমাকে ছেঁটে দেওয়া হয়; ছাঁটার পর আমি সবুজ পাতা ভরা ঝোপে পরিণত হই। এর পর আসে পাতা তোলার পালা। মেয়েরা সুনিপুণ হাতে কুঁড়ি সমেত আমার দুটী পাতা তোলেন। আমি কত গর্ব্বই না অনুভব করি, কেন না পৃথিবীর চায়ের চাহিদার শতকরা পঞ্চাশ ভাগ মেটাতে এখন থেকেই দিকে দিকে দেশে দেশে আমার যাত্রা শুরু হলো। তারের দড়িতে, লরীতে, গরুর গাড়ীতে কিংবা যারা তুলেছে তারাই মাথায় করে আমার কাঁচা পাতা কারখানায় নিয়ে যায়। সেখানে নানা প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে আসতে আসতে আমার সবুজ রঙ হয় কালো, আর আমি অপূর্ব প্রাণ মাতানো গন্ধে ভরে উঠি। তখন থেকেই আমি লক্ষ লক্ষ গৃহে আনন্দময় পরিবেশ সৃষ্টির যোগ্যতা লাভ করি।
আমার নাম চা - লক্ষ লক্ষ লোকের প্রিয় পানীয় আমিই
TEA BOARD
INDIA
PST141

লাক্ষা-যাত্রা

মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়

॥ ৩ ॥

আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ডেনমার্কের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা ুইডেন-যাত্রী জাহাজে চড়ে বসলুম। দিনকার সোনালী রোদের আলোয় মুদ্রের নীল ঢেউগুলি বড় নরম, বড় লায়েম দেখাচ্ছিল। নীল আকাশের টে দলে দলে গাং চিল সাদা পাখনা লে উড়ে চলেছে জাহাজের সঙ্গে সঙ্গে -তাদের সুতীক্ষ্ম ডাক কানে এসে গেছে। ডাকটার মধ্যে এমন একটা কি ল আছে যা চোখ বুজে শুনলেও খের সামনে দিগন্তব্যাপী বিরাট দ্রের মূর্তি ভেসে ওঠে। সারা পৃথিবীর মুদ্রতীরে এই পাখীর দল ছড়িয়ে। এরা থাকলে কোনো সমুদ্রযাত্রাই সম্পূর্ণ য় না।

আমাদের স্বল্পপরিসর সমুদ্র কিছু-ণের মধ্যেই ফুরিয়ে গেল। ওপারে মরা সুইডেনে 'হেলসিং ফোর্স'-এর টে নামলুম। আমার ইংরেজ বন্ধু হলারি আমায় বলেছিল, সুইডেনের গ্যাটা খালের কথা। সুইডেনের পশ্চিম পকূল গ্যোটেবুর্গ থেকে পূর্ব উপকূলে টকহলম পর্যন্ত এই খাল—স্টীমারে রে পার হতে আড়াই দিন লাগে। মামাদের অবশ্য সমস্ত খালটা পার হবার তো অত অর্থ ছিল না। গ্যোটা খালের শাখিন স্টীমারে খরচ বড় বেশী। তাই মামরা স্থির করেছিলুম—অর্ধেকটা খাল াড়ি দেব। মাঝামাঝি জায়গা থেকে ঠে স্টীমারে করে স্টকহলম পর্যন্ত াবো। এই উদ্দেশ্যে আমরা খালের ারে 'য়োন্‌শোপিং' নামক এক শহরের টকিট কিনলুম—এটা গ্যোটা খালের ধ্যস্থলে এক প্রকাণ্ড হ্রদের তীরে।

ভ্যাটার্ন হ্রদ-তীরে য়োনশোপিং! য়োনশোপিং, য়োনশোপিং, ভ্যাটার্ন হ্রদ—বার বার নামগুলো যেন মনের মধ্যে উঁকি ঝুঁকি দিতে লাগল। কোথায় যেন বহুদিন আগে শুনেছি এ নামগুলো। বহু পুরোনো স্মৃতির মধ্যে ঝাপসা একটা ছবি থেকে থেকে জেগে উঠছে। ম্যাপটা খুল্লুম। দক্ষিণ সুইডেনের যে অংশে ভ্যাটার্ন হ্রদ সেখানে চোখ বুলিয়ে চল্লুম। তারপর আস্তে আস্তে মনে পড়ল। কতকাল আগে পড়েছিলুম, ভুলেই গিয়েছিলুম প্রায়। কিন্তু এইবার ধীরে ধীরে মনে পড়তে লাগল 'সেলমা লেগারলফ্'এর এক বিখ্যাত উপন্যাসের কথা।

ট্রেনে উঠতে উঠতে মিরেককে জিজ্ঞেস করলুম—মিরেক, তুমি সুইডিশ লেখিকা লেগারলফ্'এর একটি উপন্যাস পড়েছ—নিল্‌স্‌-এর অ্যাডভেঞ্চার?

মিরেক বল্লে—কই, না তো!

আমি বল্লুম—বইটার কথা আমি একেবারে ভুলে গিয়েছিলুম, কিন্তু ভাবতে ভাবতে গল্পটা মনের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। সুইডেনে যারা বেড়াতে আসে, তাদের পক্ষে পড়বার মতো এমন সুখপাঠ্য বই আর হতে পারে না।

মিরেক বল্লে—তবে তো ফিরে গিয়েই বইটা পড়ে ফেলতে হবে।

আমি বল্লুম—তা যখন পড়তে চাও, আমি আগে থেকে গল্পটা বলে তোমার পাঠ মাটি করে দিতে চাই না। কিন্তু আমরা সুইডেনের যে অংশে এখন চলেছি ঠিক সেই জেলার একটি চমৎকার উপাখ্যান এই বই-এর এক জায়গায় আছে, শুনবে?

মিরেক বল্লে—রেলে সময় কাটাবার পক্ষে স্থানীয় উপকথার মতো শ্রোতব্য

বিষয় আর কিছুই হতে পারে না। তু শুরু কর।

সমুদ্রতীর ত্যাগ করে আমাদের ট্রে তখন আঁকা বাঁকা পাহাড়ী পথে হেলে দুলে এগিয়ে চলেছে। জানলার বাইরে দৃষ্টি মেলে দিয়ে আমি গল্প শুরু করলুম।

সুইডেনের ম্যাপ খুলে দেখ এদেশের দক্ষিণতম জেলার নাম হচ্ছে 'স্কোনে'। এইখানেই ছিল নিল্‌স্‌-এর বাড়ি। নিল্‌স্‌ হাঁস চরাতো। একবার সে গ্রীষ্মের সময় দূরের এক গ্রামে হাঁ চরাবার কাজ পেয়েছিল। সেখানে প্রা প্রতিদিনই তার দেখা হতো তারই সম বয়সী দুটি ছোট ছেলে মেয়ের সঙ্গে তারা ছিল ভাই আর বোন। স্কোনে উত্তরে 'স্মোলাণ্ড' জেলা থেকে তার এখানে এসেছিল। ভাই-এর নাম ছি ম্যাট্‌স্‌, বোনের নাম ওসা।

ম্যাট্‌স্‌ একদিন নিল্‌স্‌কে বল্লে নিল্‌স্‌, তোমাদের জেলা স্কোনে আ আমাদের জেলা স্মোলাণ্ড কি করে তৈ হল তার গল্প জানো?

নিল্‌স্‌ যেই না বলা না—অম ম্যাট্‌স্‌ তার মুখে মুখে শোনা উপন্যা আরম্ভ করে দিলে।

বহুদিন আগেকার কথা। সৃষ্টি কর্তা তখন পৃথিবী সৃষ্টি করছিলে কাজে মগ্ন আছেন, সেই সময় মহ পীটার সেখানে এসে হাজির। পীট দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঈশ্বরের কাজ দেখ লাগলেন, তারপর বল্লেন—কাজটা খু শক্ত নাকি? ঈশ্বর গম্ভীরভাবে বল্লেন খুব সহজ তো নয়ই। মহর্ষি পীট আরো খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়ি দেখলেন। একটার পর একটা পাহা পর্বত নদী নালা বন মাঠ কেমন ফ ফস্‌ করে হয়ে যাচ্ছে দেখে তাঁরও ম ইচ্ছে হল, তিনিও সৃষ্টি করবেন। মহ পীটার বল্লেন—দেখুন ঈশ্বর, আপ হয়তো ক্লান্তি বোধ করছেন, একটু বিশ্রা করবেন? আমি ততক্ষণ আপনার হা কিছু কাজ এগিয়ে দিতে পারি।

কিন্তু ঈশ্বর রাজি হলেন না। তি বল্লেন—"দেখ মহর্ষি, এ কাজে তো তুমি দড় নও। আমি যেখানে ছাড়ব সেখা থেকে তুমি আরম্ভ করে ঠিকমত চালি

নিয়ে যেতে পারবে বলে আমার মনে হয় না।

মহর্ষি পীটার গেলেন চটে। বল্লেন—হুঃ, দেশ সৃষ্টি করাটা কি আর এমন শক্ত কাজ? তিনিও ভালো ভালো দেশ তৈরি করতে পারেন।

হবি তো হ' ঈশ্বর সেই সময় স্মোলান্ড জেলায় সবেমাত্র হাত দিয়েছেন। আধখানাও তৈরি হয়নি—কিন্তু ঐটুকুতেই মনে হচ্ছে যে, আশ্চর্য সুন্দর এবং অতি উর্বর একটা দেশ তৈরি হচ্ছে। মহর্ষি পীটারকে চটাতে স্বয়ং ঈশ্বরও ভয় পেতেন, তা ছাড়া তিনি ভাবলেন, কাজটা যখন এত ভালোভাবে আরম্ভ হয়েছে পীটার এখন চেষ্টা করলেও একে খারাপ করতে পারবেন না। কাজেই তিনি বল্লেন—দেখ পীটার, এক কাজ করা যাক। দেখা যাক আমাদের দুজনের মধ্যে কে এই সৃষ্টির কাজ ভাল বোঝে। তুমি নতুন লোক, তুমি বরং আমার এই আধ-শেষ করা দেশটাকে সম্পূর্ণ করে তোলো; আর আমি আরেকটা নতুন দেশ সৃষ্টি করি।

পীটার রাজি হলেন। দুজনের কাজ আরম্ভ হল। সৃষ্টিকর্তা একটু দক্ষিণে সরে গেলেন; সেখানে গিয়ে তিনি স্কোনে জেলা তৈরি করায় হাত দিলেন। ঈশ্বরের কাজ যখন সারা হল, ঈশ্বর পীটারকে ডেকে বল্লেন—তোমার কাজ কতদূর এগলো? দেখে যাও আমার জেলা কেমন হয়েছে।

পীটার বল্লেন—আমি তো অনেকক্ষণ কাজ সেরে হাত গুটিয়ে বসে আছি। পীটারের গলার স্বরে ঈশ্বর বুঝলেন, পীটার নিজের কাজ দেখে খুব সন্তুষ্ট হয়েছেন।

পীটার এসে স্কোনে জেলা পরিদর্শন করলেন এবং স্বীকার করলেন, দেশটা সর্বদিক থেকে নিখুঁত হয়েছে। উর্বর মাটি সহজেই চাষ করা যাবে। বড় বড় সমতল মাঠ, প্রচুর জল, পাহাড় পর্বত নেই বল্লেই চলে। মানুষ যাতে সত্যিই সুখে থাকতে পারে তার ব্যবস্থা করে দিতে ভগবান একটুও কার্পণ্য করেননি। পীটার বল্লেন—সত্যিই চমৎকার দেশ গড়েছেন সৃষ্টিকর্তা। কিন্তু আমার মনে হয়, আমার গড়া দেশটি আরো সুন্দর হয়েছে।

ঈশ্বর বল্লেন—বেশ চলো তবে দেখা যাক।

কিন্তু স্মোলান্ডের সামনে এসে ঈশ্বর এমনই হকচকিয়ে গেলেন যে, প্রথমটা তাঁর মুখে কোনো কথাই যুগোলো না। একটু সামলে নিয়ে তিনি পীটারের মুখের দিকে চেয়ে ভর্ৎসনার সুরে বল্লেন—পীটার, কি কাণ্ড করেছ?

ঈশ্বরের কথায় চমকে পীটার চারিদিকে চোখ বোলালেন এবং যা চোখে পড়ল তা দেখে তিনি অবাকই হয়ে গেলেন। মহর্ষি পীটার ছিলেন শীত-কাতুরে, এই তাঁর ধারণা ছিল, দেশকে যত গরম করা যায় ততই ভাল। তিনি সেখানকার মত চাংড়া চাংড়া পাথর এনে স্মোলান্ডের উপর বোঝাই করে যতটা পারেন দেশটাকে সূর্যের কাছে তুলে ধরলেন। তারপর সেই পাথরের উপর এক স্তর মাটি বিছিয়ে দিয়ে কাজ সেরে দিলেন। কাজ সেরে তাঁর ধারণা হল এমন সুন্দর দেশ আর নেই।

এদিকে পীটার যখন স্কোনেতে গিয়েছিলেন সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি দেখতে, ঠিক সেই সময়েই স্মোলান্ডের উপর এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল এবং পীটারের দেওয়া মাটির পলেস্তারা ধুয়ে হয়ে গেল সাফ। কাজেই ভগবান যখন স্মোলান্ড দেখতে এলেন তিনি দেখলেন, চারিদিকে শুধু পাথর আর পাথর, মাটির চিহ্নই নেই কোনোদিকে। একটিমাত্র জিনিস চারিদিকে প্রচুর—তা হচ্ছে জল আর জল। পাথরের গায়ে যে সব বড় বড় ফাটল আর গর্ত ছিল সব জলে ভরে গেছে। চারিদিকে শুধু হ্রদ নদী আর ঝরণা আর বড় বড় জলা।

ভগবান বল্লেন—বলো মহর্ষি পীটার এই দেশ তুমি কি উদ্দেশ্যে গড়লে?

পীটার তখন পালাতে পারলে বাঁচেন। এ কথা বলেন, ও কথা বলেন, শেষে বল্লেন—দেশটাকে সূর্যের উত্তাপ দেবার জন্যে উঁচু করে গড়েছি—যাতে সূর্যের একটু কাছাকাছি হয়।

ঈশ্বর বল্লেন—সর্বনাশ! দিনের বেলার কথা ভেবেছ মহর্ষি, রাতের কথা ভাবোনি? সূর্য যখন থাকবে না, এত উঁচুতে রাতের হিমে যে সব কিছু জমে যাবে। নাঃ, এ দেশে কোন কিছুই ফলবে বলে মনে হয় না। সামান্য যদি কিছুও বা হোতো শীতে তা-ও মরে যাবে।

পীটারের মাথায় এ কথাটা আগে আসেনি, কাজেই তিনি মাথা হেঁট করে রইলেন।

গল্পটা যখন এতখানি বলা হয়েছে, মাট্‌স্‌-এর বোন ওসা আর থাকতে না পেরে বল্লে দেখ্ মাট্‌স্, স্মোলান্ডের তুই এত নিন্দে করবি এ আমি কিছুতেই সহ্য করব না। স্মোলান্ডে কি চাষের জমি নেই নাকি? কত চমৎকার সুন্দর জমি রয়েছে। কেন, 'কালমার'-এর কাছে 'মোরে' পরগনা? সেখানে মাঠের পর মাঠে যখন ফসল ধরে তখন তার কাছে স্কোনের মাঠ লাগে কোথায়? এমন ফসল নেই যা মোরে পরগনায় জন্মায় না!

মাট্‌স্ বল্লে—তা আমি কি করব? সকলে যেমন করে স্মোলান্ডের গল্প বলে, আমিও তাই করছি।

ওসা বল্লে কেন, আমিও তো

অনেকের মুখে শুনেছি 'টিউস্ট' উপ-কূলের মতো অমন সুজলা সুফলা জমিই কোথাও নেই।

ম্যাট্স্ বল্লে—তা ঠিক বটে।

ওসা বলে চল্লো—মাস্টারমশাই কি পড়াচ্ছিলেন, মনে নেই? তিনি বলছিলেন, ভ্যাটার্ন হ্রদের দক্ষিণে স্মোলান্ডের যে অংশ তার মতো সুন্দর দৃশ্য সারা সুইডেনের কোথাও দেখা যায় না। ভেবে দেখ দেখি, ছবির মতো ভ্যাটার্ন হ্রদ—দু পাশে হলুদ বরণ পাহাড়, তার কোলে য়োনশোপিং আর তার দেশলাইয়ের কারখানা। একটু দূরেই 'হুস্ক্‌ভার্না' শহর, সেখানেও বা কত কারখানা। স্মোলান্ডকে তুমি গরীব জেলা বলতে চাও?

ম্যাট্স্ আবার বল্লে—হ্যাঁ, এগুলোও সত্যি বটে।

ওসা বলে চল্লো—এ ছাড়া আরো আছে। ইমোন নদী যেখান দিয়ে রয়েছে, তার দুপাশে কত গ্রাম, কত ময়দার কারখানা, কত করাতের কারখানা।

ম্যাট্স্ এবারে একটু বিপদে পড়েছে বলে মনে হল, সে আমতা আমতা করে বল্লে—তাও ঠিক বটে।

তারপর হঠাৎ ম্যাট্স্ লাফিয়ে উঠল। বল্লে—আমরা আচ্ছা বোকা তো! ওসব জায়গাগুলো তো ভগবানের স্মোলান্ড। পীটার আসবার আগেই ভগবান এসব করে রেখেছেন। কিন্তু মহর্ষি পীটারের স্মোলান্ডে একবার যাও দেখি—ঠিক গল্পে যেমন আছে হুবহু তেমনি দেখবে। এই বলে সে তার গল্পের ছেঁড়া খেই ধরে আবার কাহিনী শুরু করলে।

ভগবান যখন পীটারের কীর্তি দেখলেন, এবং যখন দেখলেন তাঁর নিজের সৃষ্টিকে পীটার তছনছ করে দিয়েছেন, তাঁর খুবই দুঃখ হল। কিন্তু মহর্ষি পীটার তখনও নিজের প্রতি আস্থা হারাননি। তিনি ঈশ্বরকে স্তোক দিয়ে বল্লেন—আপনি একটুও দুঃখ করবেন না। দেখুন আগে এখানকার বাসিন্দাদের কেমন করে আমি তৈরি করি। আমার গড়া মানুষরা জলার মধ্যেই চাষ করবে। তারা পাথর ভেঙে গুঁড়িয়ে চারিদিকে সোনার ফসল ফলিয়ে দেবে।

ঈশ্বর আর ধৈর্য ধরতে পারলেন না। তিনি বল্লেন—যথেষ্ট হয়েছে। তুমি স্কোনেতে যেতে পারো। স্কোনেকে আমি বহু পরিশ্রমে সুজলা সুফলা করে সাজিয়েছি—তুমি সেখানে গিয়ে স্কোনের বাসিন্দা সৃষ্টি কর। স্মোলান্ডে যারা থাকবে, তাদের গড়ার ভার আমার উপর। এই বলে ভগবান স্মোলান্ডবাসীদের সৃষ্টি করতে লেগে গেলেন। তারা হল দক্ষ, পরিশ্রমী, হাসিখুসী, নিজের অবস্থায় সন্তুষ্ট এবং মিতব্যয়ী। এমনভাবে তারা তৈরি হল যাতে করে স্মোলান্ডের মতো জেলায় তারা নিজেদের পেটের ভাত জুগিয়ে নিতে পারে।

এই বলে ম্যাট্স্ চুপ করলে।

নিল্স্ আর থাকতে পারলে না। সে জিজ্ঞেস করলে—আর স্কোনেবাসীরা?

ম্যাট্স্ বল্লে—সে তো তুমি নিজেই বলতে পারবে। বলে নিল্স্-এর দিকে এমন একটা অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাকালো যে, নিল্স্ একেবারে জ্বলে উঠলো।

তখনই লেগে গেল হাতাহাতি। ভাগ্যিস ওসা মাঝখানে ছিল তাই রক্ষে, নইলে সেইদিনই স্কোনেবাসী আর স্মোলান্ডবাসীর যুদ্ধের এক ভয়াবহ পরিণাম ইতিহাসে লেখা থেকে যেত।

এইখানে গল্প শেষ করে আমি মিরেককে বল্লুম—কি রকম গল্পটা?

মিরেক বল্লে—চমৎকার! সেল্মা লেগারলফ কোথায় থাকেন? সুইডেনে এসেছি যখন, খুঁজে একবার বার করতে হবে। কি বল?

আমি বল্লুম—ঠিক বলেছ।

আমাদের ট্রেন এসে য়োনশোপিং-এ পৌঁছল। পিঠঝুলি নিয়ে আমরা নেমে পড়লুম। সত্যি ভারি সুন্দর শহর এই য়োনশোপিং। ছোট্ট শহর, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, হ্রদের নীল জলে যেন সবে গা ধুয়ে উঠে এসেছে। সেখানকার যুব হস্টেলে থাকার ব্যবস্থা করে আমরা স্টীমারের খোঁজ নিতে গেলুম। খোঁজ নিয়ে জানলুম তিন দিনের দিন একটা স্টীমার য়োনশোপিং-এ এসে পৌঁছবে এবং তাতে করে আমরা ভ্যাটার্ন হ্রদ ও গোটা খালের মধ্যে দিয়ে স্টকহলম-এ পৌঁছতে পারব। সুতরাং তিন দিন য়োনশোপিংএ থাকা স্থির হল।

পরের দিন ভোরবেলা উঠে স্নানের ঘরে দাড়ি কামাচ্ছি, এমন সময় এক বিদেশী ছেলে এসে বল্লে—আপনার কা[ছে] একটা বাড়তি ক্ষুরের ফলা হবে?

আমি বল্লুম—নিশ্চয়ই হবে। আমার পিঠ-ঝুলি থেকে বের করে একটা ক্ষুরের ফলা তাকে দিলুম। তারপর দাড়ি কামা[তে] কামাতে তার সঙ্গে আলাপ হল। ছেলেটি[র] বাড়ি ডেনমার্কে। বাড়ি থেকে এখান অ[বধি] লাফা-যাত্রা করতে করতে এসেছে।

আমি জিজ্ঞেস করলুম—কত [দিন] লাগল?

ছেলেটি বল্লে—তা তো হিসেব করি[নি], তবে কয়েকটা দিন লেগেছে বটে।

এরকম ধরনের উত্তর শুনব আমি একেবারেই প্রস্তুত ছিলুম [না]। বরাবর দেখে এসেছি ইয়োরোপের লোকে হিসেবী মানুষ। এ আবার কি [রকম] লোক? তখন মনে হল, আচ্ছা, এত[দিন] ইয়োরোপে আছি, কই আজ অবধি [কেউ] তো আমার কাছে দাড়ি কামাবার [জন্য] ক্ষুরের ফলা ধার চায়নি। দেশে এ ধর[নের] ব্যাপার নিয়ে নিশ্চয়ই মাথা ঘামাতুম [না]। এর মধ্যে যে কিছু বিশেষত্ব আছে, এ [কথা] মনেই হত না। কিন্তু এখানে এই য়ো[ন]শোপিং শহরে এই ডেনিশ সাহেবের [কথা]বার্তাগুলো শুনে আমার বেশ ভা[লো] লাগল। আরও ভাব জমিয়ে ফে[লে] বল্লুম—আপনি লাফা-যাত্রা করছেন কে[ন]

ছেলেটি বল্লে—শুনুন তবে বলি। আপনি ইটালিয়ান ভাষা জানেন?

আমি বল্লুম—কিছুই জানি না।

ছেলেটি বল্লে—জানলে বুঝতেন। আমার পিঠ-ঝুলিতে একটি বই আছে। একজন ইটালিয়ান কবির লেখা। এই দেখুন বইখানা। বলে আমার হাতে বইটা দিলে দেখতে।

আমি দেখলুম একখানি কবিতার বই। বুঝলুম না অবশ্য কিছুই।

ছেলেটি বল্লে—এই ইটালিয়ান কবি গত বছর গ্রীষ্মকালে ইটালি থেকে লাফা-যাত্রা করে সুইডেনে এসেছিলেন। সারা সুইডেন ঐভাবেই ঘুরেছিলেন। ছন্দে লিখেছেন তাঁর সেই অভিজ্ঞতা। এরকম আশ্চর্য বই খুব কমই লেখা হয়েছে।

আমি তখন বুঝলুম। বল্লুম—এই বই পড়েই তাহলে আপনি সুইডেন দেখতে বেরিয়ে পড়েছেন?

ছেলেটি বল্লে—এরকম কবিতা পড়ে কেউ যদি তখনই বেরিয়ে না পড়ে লাফা-যাত্রা করতে, তাহলে বুঝবেন সে কাব্য-রসের কিছুই পায় না।

আমি বল্লুম—তা তো বুঝলুম। কিন্তু আপনি কি এর আগে লাফা-যাত্রা করেছেন?

সে বল্লে—কোন দিনও নয়। তা ছাড়া ডেনমার্কে আমাদের নিজেদের জেলার বাইরেই আমি কোনদিন যাইনি।

আমি বল্লুম—সুইডেনে লাফা-যাত্রা কেমন চলে? আপনার খুব অসুবিধে হচ্ছে না তো?

ছেলেটি বল্লে—অসুবিধে খুবই হচ্ছে। বেশীর ভাগ মোটর গাড়িই থামছে না। প্রায়ই মাইলের পর মাইল হাঁটতে হয়। এদিকে আমার বুট-জোড়াটা বাড়িতেই ফেলে এসেছি না পথেই কোথাও হারিয়ে গেছে জানি না। এখন আমার একমাত্র সম্বল এই স্যাণ্ডেল। ভাগ্যিস কয়েকটা মোটা মোটা মোজা আছে, নইলে হাঁটতেই পারতুম না।

এরকম ভোলা ভোলা কবি-কবি মানুষ সত্যি বলছি ইয়োরোপে আমি এর আগে কোনদিন দেখিনি। আমি বল্লুম—এত অসুবিধার মধ্যেও আপনি লাফা-যাত্রা করে যাবেন?

সে হঠাৎ দাড়ি কামানো থামিয়ে পিঠ-ঝুলি থেকে সেই কবিতার বইটা আরেক-বার একটানে বার করে নাটকীয় ভঙ্গিতে বল্লে—এরই জোরে চলব। যখনই মোটর গাড়িতে জায়গা পাই না, পা-ও অবশ হয়ে আসে, এই কাব্য আমায় চালিয়ে নিয়ে চলে। এর মধ্যে আছে সমস্ত চলমান পৃথিবী। শুনুন শুনুন এইখানটা।

বলে সাবান-মাখা মুখে, আধ-কামানো অবস্থায় এক হাতে 'সেফটি' ক্ষুর অন্য হাতে সেই অমর কাব্য ধরে গড়গড় করে পড়ে যেতে লাগল। আমি যে একবর্ণও বুঝলুম না তাতে কিছুমাত্র এসে গেল না।

কবিতা শেষ হবার আগেই আমার দাড়ি কামানো শেষ হয়ে গিয়েছিল। আমি তাড়াতাড়ি গেলুম মিরেকের খোঁজে। মিরেক যুথ হস্টেলের সাধারণের রান্না-ঘরে উনুনের পাশে দাঁড়িয়ে ডিম ভাজছিল। মিরেককে বল্লুম সেই ডেনিশ কাব্যিক ছেলেটির কথা।

মিরেক শুনে বল্লে—এঁর সঙ্গে তো আজ ভোরেই আমার আলাপ হয়েছে।

আমি বল্লুম—কি রকম?

মিরেক বল্লে—কলতলায় সাবান দিয়ে আমার মোজা কাচছি, হঠাৎ ঐ ছেলেটি এসে একটু সাবান ধার চাইল। আমি সাবানটা দিলুম। তারপরে আর লক্ষ্য করিনি ভেবেছিলুম সাবান দিয়ে হাত-টাত ধোবে হয়তো। কি সর্বনাশ, হঠাৎ পিছন ফিরে দেখি, তার দাঁতের বুরুশে আমার সাবান লাগিয়ে দিব্যি দাঁত মাজছে। দেখে আমি এমনই হতভম্ব হয়ে গেলুম যে, আমার মুখে কোন কথাই যোগাল না। পরে মনে হয়েছিল ছেলেটিকে আমার দাঁতের মাজন ধার দেবার কথা। কিন্তু আমার হতভম্ব ভাব কাটবার আগেই সে তার দাঁত মাজা শেষ করে আমার সাবান ফেরত দিয়ে ধন্যবাদ জানিয়ে একটু ঘাড় নেড়ে চলে গেল।

আমি বল্লুম—এরকম অপূর্ব চীজ ইয়োরোপে আর কটি আছে মিরেক?

মিরেক বল্লে—আমি তো আমাদের দেশে একটিকেও দেখিনি।

আমি বল্লুম—আমার কিন্তু একে দেখে আমার দেশের সুতো ঠাকুরের কথা মনে পড়ে। চরিত্রের এরকম আশ্চর্য মিল সচরাচর দেখা যায় না।

মিরেক বল্লে—সুতো ঠাকুর আবার কে? রবি ঠাকুরের কেউ নাকি?

এর মধ্যে আবার রবীন্দ্রনাথ জড়িয়ে পড়েন দেখে আমি তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে বল্লুম—না না, আমারই একজন আত্মীয়।

সকালের খাওয়া সেরে মিরেক আর আমি বেরিয়ে পড়লুম ভ্যাটার্ন হ্রদ দেখতে। (ক্রমশ)
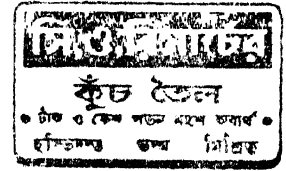
হাড়-জিরজির চেহারা। পাঁজরা সম্বল। মাংসের বালাই নেই। কাঁচা-পাকা গোঁফের বাহার। কোটরগত চোখ, কিন্তু দৃষ্টি ধারালো। অবশ্য এসব ব্যাপারে দৃষ্টিই তো সব। ভাগাড়ে গরুর দেহ ঠিক নজরে পড়ে শকুনের। পাক খেয়ে খেয়ে বিদ্যুৎগতিতে নেমে আসে। সে রকম কিছুর সন্ধান পেয়েই বুঝি এখানে এসে জুটেছে।

দাদার ডাকে সুরমা এগিয়ে এসেছিল, এমন একটা চেহারা চোখে পড়তে চৌকাঠ-বরাবর দাঁড়িয়ে পড়লো।

সুকান্ত চোখ তুলে বোনকে দেখলো, তারপর অভয় দেওয়ার ভঙ্গিতে বলল, কই রে আয়। এঁকে আবার লজ্জা কি?

লজ্জা নয় ভয়। কিছুটা বুঝি ঘৃণারও মিশেল। একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছে লোকটা নিষ্পলক।

সুরমা গায়ের কাপড় ভালো করে টেনে টুনে দিয়ে দাদার কাছ ঘেঁষে দাঁড়াল।

—ইনিই চণ্ডীবাবু। সুকান্ত সামনের ভদ্রলোকের দিকে আঙুল দেখাল, একটু হেসে বলল, পরাগ পিকচার্সের।

বাস, এবার বেশ বোঝা গেল লোকটিকে। এতক্ষণ রূপই দেখছিল সুরমা, এবার স্বরূপ। কদিন ধরেই ভদ্রলোকের আসবার কথা। সুকান্ত রোজই অফিস ফেরত অপেক্ষা করে।

সুরমা হাত তুলে নমস্কার করল।

উত্তরে চণ্ডীবাবুও হাত তুলল। দুহাতেই মাদুলীর গোছা, তাবিজের বাহার।

—দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বসো, বসো।

চণ্ডীবাবু কোণের দিকে রাখা খালি চেয়ারটা দেখিয়ে দিল। বসতে বসতেই সুরমা শুনতে পেলো, দাদা ফিরিস্তি দিয়ে চলেছে। আট বছর বয়সে ধ্রুব, তারপর একটু বড় হতে বিসর্জনে অপর্ণা, তারপর একটানা নাম। সবই যে ঠিক তা নয়, তবে জিনিস বিক্রীর সময়ে অতিরঞ্জন দোষের নয়।

—একটা ফটো যে দরকার। চণ্ডীবাবু গলার আওয়াজ মোলায়েম করল।

—ফটো, হ্যাঁ, অনেক আছে, কখানা চাই।

আশ্চর্য লোক, বোনকে অচেনা লোকের সামনে বসিয়ে সুকান্ত ছবির খোঁজে অন্দরে ঢুকল!

এই ধরনের অবস্থা সুরমার আগেও হয়েছে, তবে এতটা মারাত্মক নয়।

কিছুদিন আগেও প্রতি শনি আর রবিবার এক ব্যাপার। সেজেগুজে ঘামজবজব অবস্থায় মাথা নিচু করে লজ্জার ভান করা। মাঝে মাঝে নতুন পাকপ্রণালী থেকে শুরু করে অশোকের রাজ্যশাসন প্রণালীর প্রশ্নের খোঁচা।

দু একজন মেয়েকে দেখেই চিনতে পেরেছে। কাগজে ছবিও বেরিয়েছে। 'মেঘসঞ্চার' নাটকে নায়িকা। মি... এম্পায়ারে একটানা সাত দিন অভি... চলেছিল।

সামনের সারিতে বসে এমন মেয়ে... অভিনয়ের ছলাকলা উপভোগ করা যা... কিন্তু বিয়ে করে পাশে বসানো যায় ন...

আজ অবশ্য ব্যাপার অন্য। সুরমা... পেশাদারী দলের সঙ্গে অভিনয় করে, ... কথা ঘুণাক্ষরে কেউ না জানতে পা... এতদিন সে চেষ্টাই করা হতো। ঘুরি... ফিরিয়ে সংসারের কাহিনী, পুজোপার্ব... ব্রতকথা, লেখাপড়ার ব্যাপার, কিন্তু আ... সব উল্টো। কোথায় কবে কোন দ... সুরমা কেমন অভিনয় করেছে, তার বিবরণ। ফুলের মালা আর হাততালি... বহরের নিখুঁত বর্ণনা।

এর মধ্যেই ফটোর গোছা হাতে ক... সুকান্ত ফিরে এল। অ্যালবাম এক... আছে, কিন্তু তাতে বেমানান দু এক... ফটো রয়েছে। শিক্ষানবীশ ফটোগ্রাফারে... আনাড়ী হাতের তোলা। সুকান্ত অ্যালব... থেকে বাছাই করে এনেছে। অপেক্ষাকৃ... ভালো জিনিস। যাতে অপছন্দ না হ... চণ্ডীবাবুর, মুখ না ফেরায়।

ফটোগুলো অনেকক্ষণ ধরে চণ্ডীবা... নিবিষ্টচিত্তে দেখল। চোখ কুঁচকে, ... বাঁকিয়ে, ঠোঁট চেপে। তারপর ওরই ম... থেকে গোটা তিনেক বেছে নিয়ে নিজে... জামার পকেটে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল

—আজ উঠি সুকান্তবাবু, কাল সকালেই এগুলো যথাস্থানে পৌঁছে দেব, দিন সাতেকের মধ্যেই পাকা খবর পেয়ে যাবেন।

—দেখবেন দয়া করে। সুকান্ত দুটো হাত যোড় করল। বিনয়ে বিগলিত।

সুরমার মনে পড়ে গেল। ঠিক এক ভঙ্গি, এক গলার স্বর।

পাত্রী দেখে বরপক্ষরা উঠে যাবার সময় সুকান্ত ঠিক এইভাবে এগিয়ে যেত। এমনি ঘাড় কাত, এমনি ভিজে ভিজে গলা। কিন্তু তাতে কোন সুরাহা হয়নি। রূপে আর রূপায় সেতুবন্ধন সম্ভব হয়নি বলেই লোকেরা পিছিয়ে গিয়েছে। কেউ কেউ সোজাসুজি বলেই গিয়েছে। মুখের ওপর। অন্যেরা পোস্টকার্ডকে শিখণ্ডী করে মনের কথা জানিয়েছে।

কতদিন দেখাশোনার এ টানাপোড়েন চলতো ঠিক নেই, উদ্ধার করল পাড়ার প্রীতি। কোথাও কিছু নেই, কি একটা সিনেমার বইয়ে ছোটখাট একটা পার্ট করে পাড়ায় তুমুল আলোড়ন তুলল। রাতারাতি। বুড়োর দল ক্ষেপে অস্থির, ছোকরারা জয়ধ্বনি। এমন বেমরো পাড়ায় আর্টিস্টের উদ্ভব হওয়া পঙ্কে পঙ্কজের জন্ম নেওয়ারই সামিল।

আলোড়ন উঠল বটে, কিন্তু সে আলোড়ন শুধু চারপাশের জলকেই ঘোলাটে করে তুলল, পদ্মের পাপড়ি রইল অম্লান। বরং প্রীতির দরজায় গড়-পড়তা দৈনিক গোটা দুই বিরাটায়তন গাড়ি এসে দাঁড়াতে শুরু করল। ঝলমলে পোশাকে, উগ্র প্রসাধনে নিজেকে সাজিয়ে হিলের শব্দে পাড়া কাঁপিয়ে প্রীতি গাড়িতে গিয়ে উঠতে লাগল। ছোকরারা বলল, আর মাস কয়েক, তারপর জোনাকির এই স্বল্প দীপ্তি রূপান্তরিত হবে তারকার অম্লান জ্যোতিতে।

বুড়োরা বলল, হারাধন বসাকের মেয়েটা অধঃপাতে গেল। নিজে তো গেলই, সঙ্গে সঙ্গে পাড়ার ছেলেগুলোরও যে মাথা ঘুরিয়ে দিল, এটাই আরো আক্ষেপের।

ঠিক এমনি সময়ে কথা তুলল মিনতি, সুরমার বৌদি। প্রথমে ফিসফিসিয়ে সুকান্তর কানে কানে, নিরালা শয়নকক্ষে, আট-ঘাট বন্ধ করে, তারপর একদিন সুরমার সামনেই বলল।

লোক তো ওই তিনটি। শ্বশুর-শাশুড়ীর বালাই নেই, শ্বশুরকুলের গুরুজনও কেউ নয়। কর্তা বলতে সুকান্ত। সব ভারই ওর ওপর।

প্রথমে একটু ইতস্তত করলেও, সুকান্ত রাজি হয়ে গেল। অন্তত বিয়ে দেবার হাঙ্গামা থেকে তো নিশ্চিন্ত। বিয়ে ঠিক হলেই করকরে টাকার গোছা বের করতে হতো, সুকান্তর তিল তিল করে জমিয়ে তোলা তহবিল থেকে। বেহালায় বহু কষ্টে ছোটখাট একটা প্লট কিনে রেখেছে, সুযোগ সুবিধা পেলেই সাড়ে তিনখানি ঘরের একটি ভদ্রাসন তুলবে, গোপন বাসনা তাই। সে আশা অঙ্কুরেই বিনষ্ট।

অবশ্য আত্মীয় স্বজনদের কথা ভাববার আছে। বাড়ি বয়ে উপদেশ দিয়ে থাকে। চতুর্দশ পুরুষ নরকস্থ হচ্ছে সে বিষয়ে সাবধানবাণী।

কিন্তু সুকান্তই বা কি করবে? বয়স হয়েছে মেয়ের, নিজের ভালমন্দ দেখতে শিখছে, এখন তার পথে বাধা দিতে গেলে সে শুনেবেই বা কেন? আত্মীয় পরিজন পড়শীদের মুখ বন্ধ করার পক্ষে এই যথেষ্ট।

সুরমাও ঠিক গররাজী নয়। মা-বাপ নেই, ঢিলে শাসন সংসারে অযত্নে পুঁই ডগার মতন আপনিই বেড়ে উঠেছে। প্রথম প্রথম বিয়ের চেষ্টা হয়েছিল। এদিক ওদিক থেকে দু একজন দেখতেও আসছিল। চেহারাও নিন্দার নয়। নাক-মুখের চটক আছে, শক্তসমর্থ শরীর।

তবে খরচ করতে নারাজ। প্রথমেই নেই নেই ভাব, সোমত্ত বোন গলায় পড়েছে, দম বন্ধ হয়ে আসার দাখিল। কথার ধরন দেখে পাত্রপক্ষ পিছিয়ে যেতে শুরু করল। না হয় দেনে-থোবে কম, তা বলে একেবারে বিনা-সওদার কারবার? শাঁখা-সিঁদুর ছুঁইয়ে! আজকালকার বাজারে তা কখনো হয়? ঘর-খরচা দিয়ে বিয়ে হবে ছেলের! বেশ তো অনেক না দিতে পারেন, সাধ্যমত দিন। সোনার ভরি কমান, ছেলের নগদ। কিন্তু নি-খরচায় কি হয় এসব।

একেবারে নি-খরচায় সুকান্ত হয়তো করতে চায়নি, কিন্তু গোড়া থেকে এমন সুতো-টান করলে মাছ ডাঙ্গায় উঠবে কি করে।

মা যখন মারা যান, সুরমার মনে থাকবার কথা নয়, কিন্তু বাপ যখন চোখ বুজলেন, তখন এমন কিছু খুকি নয় সুরমা। বয়স আন্দাজে বেশ বুঝতে শিখেছে। শোক পাওয়া, ঘা খাওয়া মেয়েরা একটু বেশীই বোঝে। একেবারে নিঃসম্বল ছিলেন না তিনি। মেয়ের বিয়ের জন্য কিছু টাকা রেখেও গিয়েছিলেন। মাস গেলে মাইনে এমন কিছু ছিল না, কিন্তু উপরি ছিল। মদের দোকানের বড় বাবু। একটু এদিক ওদিক করতে পারলেই কাঁচা পয়সা। লুকোছাপা করতেন না, স্পষ্টই বলতেন বাড়িতে এসে। ছেলেমেয়ের সামনে, বৌমার সামনেও।

কিন্তু সে কথা মুখ ফুটে সুরমা বলবেই বা কি করে। কোথায় গেল জমানো টাকা, তাই নিয়ে দাদার সঙ্গে হাতাহাতি করবে, তর্কের ঘূর্ণী তুলবে।

তা ছাড়া সুকান্ত ওর মতও নিয়েছে। জিজ্ঞাসা করেছে মোলায়েম ভাষায়। অন্য স্বাধীন দেশে ছেলেমেয়েদের নিজের মনের মত পথে চলতে দেওয়া হয়, তার নজিরও দিয়েছে।

এমনে হবার কথা নয়। সুকান্তের হিসাব ঠিকই ছিল, সেই জন্যই যখনই কোন ভদ্র দল এসেছে সুরমাকে নিয়ে যাবার জন্য, সুকান্ত বাধা দেয়নি। অভিনয় হচ্ছে উচ্চ স্তরের শিল্প, অভিনয় করার ক্ষমতা সকলের থাকে না, কাজেই যাবে বই কি সুরমা, নিশ্চয় যাবে। কেবল দলটা যেমন ভদ্র, তেমনি টাকাটাও ভদ্রগোছের হওয়া উচিত। গুনে গুনে সুকান্ত টাকা নিয়েছে, নিজে রাখে নি, সুরমাকে সমস্ত ফেরত দিয়েছে। ওর রোজগারের টাকা, এ টাকা আর কোরো ছোঁবার অধিকার নেই।

সুরমা না হয় রাজি হলো, কিন্তু এমন কে উদার হৃদয় ডিরেক্টর আছেন, কনট্রাক্টের ফর্ম হাতে এগিয়ে এসে বরণ করে তাকে স্টুডিয়োতে নিয়ে গিয়ে তুলবেন। এ লাইনে জানাশোনা যে কজন ছিল সুকান্তর, সকলকেই কথাটা বলা হলো। ঘাড় নেড়ে আশ্বাস দিল সকলেই, কিন্তু ওই পর্যন্ত। কাজ আর এগোল না।

হাল ছেড়ে আবার বিয়ের জন্য পাত্রের খোঁজ করার মুখে সুকান্ত খবর পেল। ও-সব বাজে লোকের কর্ম নয়, যদি সত্যিই বোনকে সিনেমায় দিতে চায় তো পরাগ পিকচার্সের চণ্ডী ঘোষালের কাছে গিয়ে দাঁড়াক। বিশ বছরের ওপর

হয়েছে এ লাইনে। ওর দৌলতে কত গুবরে পোকা প্রজাপতি বনে গেল, কত চাকরানী প্রমোশন পেয়ে রাজরানী।

বহু কষ্টে চণ্ডী ঘোষালের আস্তানা মিলল। সুকান্তর বরাত। বাড়িতে নেই চণ্ডীবাবু। কখন থাকেন বলা কঠিন। রাতে ফিরবেন কি না, ঠিক-ঠিকানা নেই। পর পর তিন দিন সুকান্ত এলো অফিস-ফেরত। চারদিনের দিন দেখা হয়ে গেল। কোঁচানো ধুতি, হরিণ-শিঙের ছড়ি ঘুরিয়ে বাইরে বেরোচ্ছিল, সুকান্তকে দেখে থমকে দাঁড়াল।

সকাল থেকে লোক আসার কামাই নেই। হরেক রকমের লোক। নানান বয়সের। কেউ কেউ ঘরে ঢুকে হঠাৎ পা জড়িয়ে ধরেছে, আমাকে বাঁচান।

চণ্ডী খিঁচিয়ে উঠেছে, তার আগে পা ছেড়ে আমায় বাঁচাও দিকি নি। আর একটু হলে হুমড়ি খেয়ে যে পড়ে মরতাম।

সেই ধরনেরই কিছু একটা মনে করে চণ্ডী মুখ-চোখের ভাব বদলাল না, কি মশাই, পার্ট করতে চান সিনেমায় তো? আজ হবে না, আর একদিন আসবেন।

—আমার নিজের জন্য নয়।

—বন্ধুবান্ধবদের জন্য তো? ওই একই কথা। পরে আসবেন।

—আমার বোনের জন্য এসেছিলাম।

বোনের জন্য! চণ্ডী ঘোষাল ঘুরে দাঁড়াল। চোখ কুঁচকে দেখল সুকান্তর আপাদমস্তক। ভাইয়ের মাপকাঠিতে বোনকে জরিপ করার প্রয়াস। মেয়েও বড়ো কম আসে না এ লাইনে, তবে চণ্ডী ঘোষালের কাছে যারা আসে, তারা বেশীর ভাগই বস্তিবাসিনী কিংবা আরো অধঃপতিত সমাজের বাসিন্দা। ভদ্রঘরের মেয়েরা সোজা ডিরেক্টর কিংবা প্রযোজকের সঙ্গে দেখা করে বড়লোকের সুপারিশপত্রের মাধ্যমে।

ফিরে এসে চণ্ডী ঘোষাল তক্তপোশে বসলো, কি ব্যাপার বলুন তো? বোনটিকে দেখতে কেমন? ফিল্ম ফেস আছে? গানের গলা? চেহারার বাঁধুনি?

সুকান্ত এক কথায় সব প্রশ্নের উত্তর দিল।

—আপনি যদি দয়া করে একবার পায়ের ধুলো দেন গরীবের বাড়িতে তো নিজের চোখেই দেখে আসতে পারেন। আমি আর কি বলবো।

কিন্তু চণ্ডী ঘোষালের সন্দেহ গেল না। এমন ব্যাপার ওর আগেও হয়েছে। মেয়ে দেখাতে নিয়ে গিয়ে তুলেছে নাম-করা গলিতে। সাজিয়ে গুজিয়ে মেয়েকে এনে বসালে হবে কি, চোখের কোলের কালি কাড়তে পারে নি, চড়ুল চাউনিতেই জাতের নিশানা। পালিয়ে আসতে চণ্ডী পথ পায় নি।

তবু কি ভেবে চণ্ডী ঘোষাল উঠে তাকের ওপর থেকে এক ডায়েরি বের করল। সুকান্তর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, দিন ঠিকানাটা লিখে। সময় করে একবার না হয় যাবই এখন বেড়াতে বেড়াতে।

সুকান্ত কৃতার্থ। ঠিকানা লিখে নমস্কার করে বাইরে এসে দাঁড়াল।

চণ্ডী ঘোষাল এক কথার মানুষ। কখনো কথার খেলাপ করে না। ঠিক সাত দিনের মাথায় এসে হাজির।

কড়া নাড়তেই সুকান্ত বেরিয়ে এল। সমাদরে নিয়ে গিয়ে বসালো বাইরের ঘরে। আশা চকচক চোখে একদৃষ্টে চণ্ডীর দিকে চেয়ে বলল, —হলো কিছু?

হবে না মানে? চণ্ডী ঘোষাল আলতো গোঁফের ওপর হাত বোলাল, চণ্ডীরাম নিজে হাতে করে যখন ফটো নিয়ে গেছে, তখন জানবেন কাজ অর্ধেক হাসিল হয়েই গেছে।

সুকান্ত হাতের আঙুলে আঙুলে জড়িয়ে বিগলিত হবার ভান করল, তা আর জানি না। এ লাইনে আপনার কথার ওপর কথা বলার সাধ্য আছে কারুর? সেই জন্যই তো আপনার দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম।

আবেগের মুখেই চণ্ডী ঘোষাল সুকান্তকে থামিয়ে দিল, তবে কথা আছে।

কথা? কথা আবার কিসের? কাজটা করে দেবার জন্য কিছু হাত-খরচা চাই বুঝি? না রোজগারের কিছু অংশ?

—মানে, এতো শুধু প্রথম ধাপ। এর পরে পাকাপাকি বন্দোবস্ত হবার আগে আপনার বোনকে যেতে হবে স্টুডিয়োতে। ক্যামেরাম্যান পরখ করে দেখবেন ছবি তুলে। তারপর ডিরেক্টরও দেখবেন একবার। চলন বলন সব একবার পরীক্ষা করে নিতে হবে বই কি। লাখ লাখ টাকার খেলা, বাজিয়ে নেবে না।

তা তো নিশ্চয়। প্রথম সুযোগটা করে দিলে চণ্ডী ঘোষাল, এরপর মেয়ের বরাত।

তবে সুকান্ত ভরসা রাখে বোনের ওপর। আনকোরা তো আর নয়। বড় বড় স্টেজে প্লে করে এসেছে, জমজমাট হলে। তবে সে ছিল কায়ার খেলা আর এ ছায়ার মায়া।

চৌকাঠের কাছে গিয়ে সুকান্ত বোনকে ডাকল: বেশ চড়া গলায়। উদ্দেশ্য শুধু বোনকে ডাকাই নয়, বোনের বৌদিকেও শোনান। শুধু সুরমারই স্বপ্ন সফল হবে না, মিনতিরও সাধনার সিদ্ধি। দুজনেই খুশি হবে।

এলো চুলে বিনুনি বাঁধতে বাঁধতে সুরমা এসে দাঁড়াল, কিন্তু পর্দার এপারে আসার আগেই সুকান্তর চোখের ইশারায় থেমে গেল।

কি মুশকিল, তীরে এনে তরী ডোবাবার মতলব। এমন অগোছাল পোশাকে বাইরের লোকের কাছে গিয়ে দাঁড়াতে আছে। তাও আবার আসল শুভলগ্নে।

সুকান্ত বোনের পাশে দাঁড়িয়ে চাপা গলায় বলল, এইভাবে যাস নি বাইরে। চুলটুল ঠিক করে আয়। চণ্ডী ঘোষাল এসেছে, পরাগ পিকচার্সের।

সেটুকু বুদ্ধি সুরমার আছে। দাদার আচমকা ডাকে খেয়াল করেনি প্রথমে, কিন্তু পর্দার কাছে এসেই বুঝতে পেরেছে। চোখের ইশারায় কাজ হয়েছে। সামনে আর পা বাড়ায় নি সুরমা।

মিনিট পাঁচেক। সুকান্ত আর সুরমা পাশাপাশি বাইরের ঘরে এসে দাঁড়াল। এই অল্প সময়ের মধ্যে শুধু চুলই আঁচড়ায় নি সুরমা, মুখে পাউডারের হাল্কা প্রলেপও দিয়েছে, দুগালে রুজের অস্পষ্ট আভা ও লালিমা যেন ধার করা নয় নিজেরই, এমন একটা সন্দেহ জাগায়। পরনের শাড়িটাও বদলেছে। হাতে ধূমায়িত চায়ের কাপ।

চণ্ডী ঘোষাল আর একবার বলল কথাটা। সুরমার সামনে। ঠিক হল দেরি নয়, দিন দুয়েকের মধ্যেই ব্যবস্থা করতে হবে। অফিস থেকে একদিনের ছুটি নিয়ে বোনকে নিয়ে যাবে স্টুডিয়োতে। ভগবান যদি মুখ তুলে চান, একটা গতি হবে সুরমার।

সে রাত্রে অনেকক্ষণ ধরে কথা হলো দুজনে। সুকান্ত আর মিনতি।

মিনতি মুচকি হাসলো, কিগো কেমন মতলব দিয়েছি? সিগারেট ধরাতে ধরাতে সুকান্ত ঘাড় নাড়লো, আরে দাঁড়াও, সবে তো কলির সন্ধ্যে। ভালোয় ভালোয় পরীক্ষায় উতরে যাক। তবেই না।

—তোমার বোন পরীক্ষায় ঠিক উতরোবে, ভেবো না। শক্ত জাল, রাঘব বোয়ালও যেমন আটকায়, চুনো পুঁটির পালাবার পথ নেই। কাল বিকেলে গিয়েছিলাম যে প্রীতিদের বাড়ি।

বার চারেক চেষ্টা করে সুকান্ত সিগারেট জ্বালালো। পোড়া কাঠিগুলো কুড়োতে কুড়োতে ঘাড় ফিরিয়ে বললো, তাই নাকি।

—প্রীতির মা আর দিদির কি কান্না। মেয়ে ঠিকমতো বাড়িতেও আসে না। যেদিন আসে সেদিন মদে চুর।

—আঃ! সুকান্ত রীতিমত চমকে উঠলো এমন মেয়েকে ঘরে ঢুকতে দেয় এখনো?

—বাপ বিদেশে, মেয়েছেলের সংসার, কে শক্ত হবে বলো। আর ও মেয়েও কিছুদিন পরে আর ফিরবে না ঘরে। শিকল কাটা টিয়ে দাঁড়ের মোহ কাটলো বলে।

জুতসই হয়ে সুকান্ত মিনতির পাশে বসলো, কিন্তু ছবির ব্যাপার কতদূর?

মিনতি চোখ ঘোরালো, রাখো রাখো, অত সহজ হলে আর ভাবনা ছিলো না। সব পার্টই পঙ্কজিনী হয়ে যেতো। দুটো বইয়ে তো মোটে নেমেছে, একটায় চাকরানী আর একটায় নায়িকার পিসতুতো বোন। আড়াই মিনিটের পার্ট।

—তাতেই এই? সুকান্ত অবাক। হাত দিয়ে ধুতির ভাঁজে জমা ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে বললো, জাতও গেলো, পেটও তো ভরলো না।

—এই নেশার তো এই মজা। একেবারে রাধিকার অবস্থা। কুলও খোয়াতে হয়, মানও অটুট থাকবে না, অথচ শ্রীকৃষ্ণ নাগালের বাইরে দ্বারকায়।

শেষ টান দিয়ে সুকান্ত সিগারেটটা হাত বাড়িয়ে বাইরে ফেলে দিলো। মিনতির দিকে একটু হেসে বললো, কিন্তু সুরমা আবার যে ধরনের মেয়ে, তেমন সুবিধা না হলে হয়তো যাবেই না স্টুডিওতে। সোমত্ত বোন ঘরে থাকলে বিয়ের চেষ্টাও একটা করতে হবে।

তা হলে আর উপকারটা কি হলো। মাঝ থেকে কেবল দৌড়োদৌড়ি আর পয়সা খরচই সার।

— ও মেয়ে এলেই অমনি ঘরে ঢুকতে দিচ্ছে কে? দু গালে রঙ মাখা ও তো চুন-কালি মাখারই সামিল। সাধ হয় তোমার বোনকে তুমি নিয়ে ঘর করো আলাদা, আমি ওর সঙ্গে এক চালায় বাস করতে পারবো না। মানিকতলার বোসেদের বাড়ি বললে লোকে এক ডাকে চেনে। সে বাড়ির মেয়ে হয়ে কাদা মাখতে পারবো না সর্বাঙ্গে।

মানিকতলায় মিনতির বাপের বাড়ি। এক সময়ে অবস্থা ভালোই ছিলো। কিন্তু এখন নামেই তালপুকুর, আধ ক্রোশের মধ্যে তালগাছ তো নেই, পুকুরের জলে যা বহর তাতে ঘটিও ডোবে না। একশো বছরের পুরোনো বাড়ি সাতাশ ভাগ। এক এক ভাগে আড়াইখানা ঘর আর এক ফালি বারান্দা। নগদ যা ছিলো, সবই উকিলের পেটে।

কিন্তু এসব কথা বলা আর সাপের ল্যাজে পা দেওয়া একই কথা। এখনি মিনতি ফণা তুলে দাঁড়াবে।

সুকান্ত সে দিক দিয়ে গেলো না। বললো, কি জানি ঠিক বুঝতে পারছি না, মেয়ে যে এক ধরনের। আমি তো ভেবেছিলাম ছেলেদের সঙ্গে থিয়েটার করে, নিজের আখের ঠিক গুছিয়ে নিতে পারবে। বড় ঘরের ছেলেও তো থাকে দু-একটা, কিন্তু দেখলে তো কান্ড। থিয়েটার চুকলো তো সম্পর্কও চুকলো। মেয়ে আর সে পথ মাড়ায় না। সুরমাকে রাজি করাতে কম বেগ পেতে হয়েছে আমাকে।

মিনতি আর কথা বাড়ালো না। হাই তুলে শুয়ে পড়লো বিছানায়।

পরীক্ষায় ভালোয় ভালোয় সুরমা উতরে গেল। ছবি ভালোই এলো, গলার আওয়াজ চমৎকার। সামান্য আড়ষ্টভাব রয়েছে, নতুন নতুন ওটুকু থাকেও, ওটা ঠিক কাটিয়ে উঠবে। আনন্দে সুকান্ত সেদিন ট্যাক্সি করে বাড়ি ফিরলো।

বেশী নয়, গোটা দুই বইয়েতে নামলেই কাজ ফতে। একটা চেঁচামেচির সৃষ্টি করে বাড়ি থেকে সরিয়ে দিলেই হবে। সেটা মিনতি ঠিক পারবে। স্টেজে নেমে অভিনয় করে না বটে, কিন্তু এলেম আছে মিনতির। আজ ছ বছরের ওপর ঘর করছে সুকান্তর। মানুষ চিনতে ওর বাকি নেই।

দিন কুড়ির মধ্যেই সুরমার ডাক এলো। "পান্থশালা" ছবিতে কাজ করতে হবে। দিন পাঁচেকের কাজ। দক্ষিণার ব্যাপারে সুরমার একটু মন খুঁতখুঁতানি ছিলো, কিন্তু সুকান্ত আর মিনতি দুজনে ওকে বোঝালো। হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলতে আছে কখনো। এই তো শুরু। একটু নাম করতে পারলে সুরমা নিশ্বাস ফেলার সময় পাবে না। ডিরেক্টর আর প্রযোজকে উঠান ছেয়ে যাবে।

মাস তিনেক পরেই সুরমা প্রজেকশন দেখলো। ডিরেক্টর ভারি খুশি। ছোট পার্ট, কিন্তু কোন জড়তা নেই, ঠিক ফুটিয়েছে সুরমা। প্রথমবারে অনেকেই ক্যামেরা-কনশাস হয়ে পড়ে, চলাফেরায় আড়ষ্টভাব। প্রথম বইতেই সুরমা সেটা কাটিয়ে উঠেছে।

ডিরেক্টর হাজরা কথা দিলো সুরমাকে, এর পরের বইতে উপনায়িকার পার্ট ওর বাঁধা। দক্ষিণার মাত্রাও বাড়বে।

'পান্থশালা' ছবি শুরু হবার সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই এক কান্ড।

কড়া নাড়ার শব্দে দরজা খুলেই সুকান্ত পিছিয়ে এলো। হাফ শার্ট আর ফুল প্যাণ্ট পরা প্রৌঢ় ভদ্রলোক। চোখে ফিতে লাগানো চশমা, মাথায় সোলার হ্যাট। পিছনে ছোকরা গোছের একজন।

—এটা কি সুরমা দেবীর বাড়ি?

বাড়ি অবশ্য বাড়িওয়ালার। কটন স্ট্রীটের পুনামচাঁদ আগরওয়ালা। ভাড়া দেয় সুকান্ত গুহ। সুরমা দেবীর কোন এক্তিয়ার নেই। কিন্তু এত সব কথা তো আর সামনে দাঁড়ানো ভদ্রলোকদের বলা চলে না।

সুকান্ত মিহি করলো গলার স্বর, সুরমা আমার বোন। কি দরকার বলুন?

সামনের ভদ্রলোক চোখ থেকে চশমা টেনে বুকে ঝোলালেন, সবটুকু একটা পা চৌকাঠে তুলে দিয়ে বললেন, দরকারটা তাঁকেই বলবো। দয়া করে ডেকে দিন।

—কি নাম বলবো।

—বলুন মডার্ন স্টুডিয়োর মিস্টার রে এসেছেন।

দুটো চেয়ার এগিয়ে দিয়ে সুকান্ত ভিতরে চলে গেল।

রবিবার। সুকান্তর যেমন অফিসের ঝামেলা নেই, তেমনি সুরমারও শুটিংয়ের বালাই নেই।

রান্নাঘরে মিনতি আর সুরমা মিলে কি একটা নতুন রান্নার আয়োজন করছিলো, সুকান্ত গিয়ে সেখানে দাঁড়ালো।

—কে এক মিঃ রে এসেছে দেখা করতে। কি মেজাজ, আমাকে তো পাত্তাই দিল না।

কোমরে আঁচল জড়িয়ে সুরমা উনানে কড়া চাপাচ্ছিলো, সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললো, মিঃ রে, মডার্ন স্টুডিয়োর?

—ওই রকমই যেন কি একটা বললে। সুকান্ত আমতা আমতা করলো। জামার হাতায় মুখ মুছে বললো, লোকটা কে?

—ও বাবা, সুরমা আঁচল খুলে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বললো, মস্ত বড়ো ডিরেক্টর। 'পথের নেশা', 'কেয়াফুল' সবই তো ও'র বই। প্রত্যেকটি হিট পিকচার।

—তাই নাকি? সুকান্ত মনে মনে উৎফুল্ল হলো, কিন্তু তোর কাছে কেন?

—কি জানি। পান্থশালার সেটেও কদিন গিয়েছিলেন। আমার কাজ দেখেছেন দু দিন।

সুরমা আর দাঁড়ালো না। পোশাক পাল্টাতে পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

মিনতি সুকান্তর কাছ ঘেঁষে দাঁড়ালো। চাপা গলায় বললো, দেখো তোমার বোনের বুঝি বরাত খুললো।

সুকান্ত হাসলো, আরে ওর বরাত খোলা মানেই তো আমাদেরও বরাত খোলা। আর কিছুদিন, তারপর একদিন সোরগোল শুরু করো। বলো তোমাদের বাপের বাড়ির লোকেরা ছি ছি করছে। এক বাড়িতে সুরমার সঙ্গে থাকা আমাদের চলবে না। পাড়ায় ঢি ঢি পড়ে গেছে, পথ চলা দুষ্কর। ও যদি এ

বাড়িতে থাকতে চায় ভালো কথা, আমরা সরে যাচ্ছি অন্য কোথাও।

মিনতি আরো সরে এলো সুকান্তর দিকে। গায়ে গা ঠেকিয়ে। ভ্রূ বাঁকা করে বললো, জানি গো জানি। আমাকে আর শেখাতে এসো না। কি করবো আমার মনেই আছে। তাড়াহুড়োর কাজ নয়। আর কিছুদিন অপেক্ষা করো।

মাঝপথেই মিনতি থেমে গেলো। সুরমা বেরিয়েছে প্রসাধন সেরে। অগুরুর হালকা সুরভি। স্নো-রুজ-পাউডারে পালটে ফেলেছে মুখশ্রী। পরনে দামী সিফন।

মিস্টার রে কাজের মানুষ। ভনিতার বালাই নেই, এদিক সেদিক কথাবার্তা নয়। একেবারে দরকারী কথা পাড়লেন। ওঁর নতুন বইয়ের বাছাইকরা নায়িকা কেতকী দেবী বোম্বে রওনা হয়েছেন, সুরমার কাজ তিনি দেখেছেন, একটু মেজে ঘষে নিলে ভালোই হবে। সুরমা কি রাজি আছে?

রাজি! হাতে যেন চাঁদ পেলো সুরমা। কণ্ট্রাক্টের পাতায় টাকার বহর দেখে সুকান্ত নিশ্বাস ফেললো। পাঁজর কাঁপিয়ে এমন বরাত সচরাচর দেখা যায় না। এক ছবিতে অর্ধেক কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে আরেক ছবিতে ডাক।

তবু সাজপোশাকই নয়, সুরমার চেহারাও বদলে গেল। ভোর সাড়ে সাতটায় বেরোয়, বাড়ি ফেরে দশটা। কোন কোনদিন রাত কাটিয়ে ভোরের দিকে।

মিনতি কিছু বলবার আগে সুরমাই বললো।

রাত সাড়ে এগারোটায় বাড়ি ফিরে সুরমা আয়নার সামনে বসে ঘষে ঘষে মেক-আপ তুলছিলো, দরজায় শব্দ হতেই ঘাড় ফিরিয়ে দেখলো মিনতি এসে দাঁড়িয়েছে।

দরজা খুলে দিয়েছিলো বাড়ির বুড়ি ঝি মোহিনী, সুকান্ত আর মিনতি দুজনেই ঘুমিয়ে পড়েছিলো। হঠাৎ ঘুমচোখে যে উঠে এলো মিনতি!

ভালোই হয়েছে. কথাটা কদিন বলি

ঠিক করেও বলা হচ্ছে না সুরমার, অথচ না বলে নিজেরই ক্ষতি হচ্ছে।

—শোনো বৌদি। সুরমা চাপা গলায় ডাকলো।

ঠিক এই সুযোগেরই মিনতি অপেক্ষা করছিলো। সকাল থেকে কথা-গুলো অনেকবার আউড়েছে নিজের মনে মনে। আর নয়, এবার স্পষ্ট করে বলবে। এভাবে থাকা আর সম্ভব নয়। সুরমার না হয় লোকলজ্জার ভয় নেই, মানের বালাই নেই, কিন্তু মিনতি তো তেমন ঘরের মেয়ে নয়। লোকে যে ওর নামে থুথু দেবে, মাথা হেঁট হবে দাদাকে।

মিনতি কাছে যেতেই সুরমা চেয়ার ঘুরিয়ে বসলো, কিছু মনে করো না বৌদি, আমার বলতেও কেমন লজ্জা লজ্জা করছে, অথচ না বলেও উপায় নেই।

মিনতি ভ্রূ তুললো। সুরমার আবার বলার কি আছে। মাঝরাতে কপট ঘুম ছেড়ে কথা বলবার জন্য তো মিনতিই উঠে এসেছে।

—আমার এখানে বড়ো অসুবিধা হচ্ছে বৌদি। স্টুডিয়োগুলো বড্ড দূরে হয়ে পড়েছে। যেতে আসতে অনেক সময় নষ্ট হয়। তা ছাড়া ঠিক এ পাড়ায় আমাদের থাকলেও চলে না। অন্য সবাই ঠাট্টা করে. মানে ঠিক অ্যারিস্টোক্রেটিক পাড়া বলতে যা বোঝায়, তা তো এটা নয়।

কথা থামিয়ে সুরমা ভিজে তোয়ালে দিয়ে ঠোঁটের রঙ তুলতে লাগলো। মিনতির মুখের রঙ কিন্তু এমনিতেই শুকিয়ে গেলো। কথাগুলো ঠিক শুনেছে তো। সারা জন্ম গেলো বিপিন সাধুখাঁ লেনে, আর এতোদিন পরে বুঝি এ পরিবেশ বাতিল হয়ে গেলো। পাঁচ-জনে পাঁচ কথা বলবে এ গলি থেকে বের হলে?

ভালোই হলো, শাপে বর। সাপেরও দফা নিকেশ অথচ লাঠিও অটুট। বদনামের ভাগী হতে হলো না মিনতিকে। সুরমাই থাকতে চাইছে না একসঙ্গে তো সে কি করবে।

কিন্তু তবু তেরচাভাবে মাছের কাঁটা দাঁতের ফাঁকে বিঁধে থাকার মতন কোথায় একটা কাঁটা ফুটে রইলো। নড়তে চড়তে প্রাণান্তকর ব্যথা। রসিয়ে রসিয়ে নিজের থেকে বলবে যে কথা, সে কথা অন্য লোকের মুখ থেকে শুনতে কখনো ভালো লাগে। আগ বাড়িয়ে লাঠি উঁচিয়ে মারতে গিয়ে উল্টে তারই হাতে সেই লাঠিতে মার খাওয়ার মতন। এ জ্বালা সহজে যাবার নয়।

—আমি আর সুপ্রিয়াদি বালিগঞ্জে এক ফ্ল্যাট ঠিক করেছি. সামনের মাস থেকে উঠে যাবো। আমার বাপু দাদাকে বলতে কেমন লজ্জা করে, তুমিই বলে দিও, বুঝলে?

আয়নার খুব কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে সুরমা আঁকা ভ্রূ তুলতে লাগলো। খুব সাবধানে। একটু অন্যমনস্ক হলে ভ্রূর রং গালে কপালে লেগে যাবে।

তার চেয়েও বুঝি বেশী সাবধানে পা টিপে টিপে মিনতি পিছিয়ে এলো। মুখ দেখে মনে হলো সুরমার ভ্রূর যত কালি কোন ফাঁকে ওর মুখে কে মাখিয়ে দিয়েছে। সারা রাত ধরে ঘষলেও এ কালি বুঝি উঠবে না, সারাটা জীবন ধরে ঘষলেও নয়।

সুরমা উঠে গেলো বটে, কিন্তু সম্পর্ক ছাড়লো না। সুযোগ সুবিধা পেলেই আসতে লাগলো। একেবারে খালি হাতে নয়। ফল মিষ্টি তো আছেই, মাঝে মাঝে দামী শাড়ী মিনতির জন্য, সুকান্তর জন্য পাঞ্জাবীর গরম কাপড়।

সুকান্ত বাড়িতে থাকে কম। বাড়ি শুরু হয়েছে বেহালায়। অফিস ফেরত রোজ একবার করে যেতে হয় তদারকে। ঠিকেদারকে বিশ্বাস নেই। আড়াই ইঞ্চি দেওয়াল কমিয়ে দেড় ইঞ্চি কিম্বা সেগুনে বলে বেমালুম জারুল চালিয়ে দেবে। কাগজে এদিক ওদিক বোনের নাম নজরে আসে, পোস্টারে লীলায়িত ছবি। আত্মীয়-পরিজন তারিফ করে সুকান্তর। বুকের পাটা আছে। বোন বিপথে পা বাড়িয়েছে বলে ঘরেও তার ঠাই হয়নি। আজকালকার তেমন ছেলে হলে ওই বোনকে শুধু পুষতোই না, ওর উপর নির্ভরও করতো। প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে হাতও পাততো।

সুকান্ত ভেবে রেখেছে। তেমন তেমন হলে ঠিক চাইবে টাকা। দাক্ষিণ্য নয়, ধার। পাই পয়সাটি পর্যন্ত গুনে গুনে ফেরৎ দেবে। ঋণ রাখবে না। একতলা বাড়ি আরম্ভ করেছে, বোনের সাহায্য পেলে আড়াই তলার চেষ্টা।

কিন্তু যার জন্য এত করা, তারই কেমন ঢিলে ভাব। আগে মিনতি বাড়ির নক্সা নিয়ে নাড়াচাড়া করতো দিনের পর দিন, আজ সিকি তৈরি বাড়ির দিকেও খেয়াল নেই। বাড়ির ভিত্তি স্থাপনের
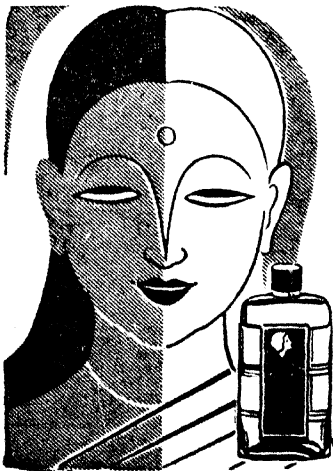
সময় কি নাম হবে বাড়ির এ নিয়ে মিনতির ভাবনার অন্ত ছিলো না, কিন্তু ছাদ ঢালাই হয়েছে সেদিকে মনও নেই। জিজ্ঞাসা করলে খিঁচিয়ে উঠেছে। অত লাফালাফি করায় কি দরকার। বাড়ি শেষই হোক আগে, নাম তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না।

সুরমার সঙ্গে মাঝে মাঝে সুকান্তর দেখা হয়েছে। চালচলন আবরণ আভরণই শুধু বদলায়নি, চেহারাও পালটেছে। আরো নিটোল হয়েছে গড়ন, রং বেশ ফর্সা দুগালের লালিমা যে রুজ-সঞ্জাত নয়, তা বেশ বোঝা যায়।

হবে নাই বা কেন? মিনতি আক্ষেপ করে, মুঠোমুঠো টাকা আনছে দিনের পর দিন। ভাবনা চিন্তার বালাই নেই। ভালো জিনিস খাচ্ছে দুবেলা, বাজারের সেরা জিনিস কিনছে খুশিমত।

শেষদিকের কথাগুলোয় কান্নার ছিটে।

ইদানীং সুকান্ত লক্ষ্য করেছে। সিনেমা দেখতে দেখতে আগে মিনতি ঘৃণায় নাক সিঁটকাতো। নায়িকা সেজে সুরমা যেখানে নায়কের সঙ্গে পূর্ব রাগের পালা জমাতো কিংবা বিবাহোত্তর প্রেম, মিনতি মুখ ফেরাতো, কি বেহায়াপনা ছি, ছি। একটুও লজ্জাও করে না ঠাকুর-ঝির। আজকাল কিন্তু মন দিয়ে সব দেখে। ঘাড় টান করে চোখ না সরিয়ে। শুধু সুরমার অভিনয়ই নয়, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে তার শাড়ি পরার ধরন ব্লাউজের নবতম ফ্যাসান, নতুন ডিজাইনের কর্ণাভরণ।

সুকান্ত কিছু বলতে গেলে তর্ক করে মিনতি, বারে ঠাকুরঝির কি দোষ। ডিরেক্টর যেমন বলবে, যেমন সংলাপ, তেমনি তো করবে। তারপর স্বামীর কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিসিয়ে বলেছে, জানো ঠাকুরঝি গাড়ি কিনবে একটা। লাল রংয়ের, তাই বলছিলো। আমার বাপু লাল রংটা ভালো লাগে না, আমি বলেছি বটল-গ্রীনের কথা। আজকাল কেমন আইভরি স্টিয়ারিং হয়েছে?

সুকান্ত কোন উত্তর দেয় না। মনে মনে হিসাব কষে! বেশী নয় আর হাজার কয়েক টাকা হলেই দোতলাটা উঠে যেতে পারে। গোটা চারেক ঘর, আর তিনতলায় ছোট একটা ঠাকুর ঘর। তাহলে একতলাটা ভাড়া দিয়ে, ওরা দোতলায় গিয়ে থাকতে পারে। মিনতিকে দিয়েই বলাতে হবে সুরমাকে। এই বেলা। সুরমা আরো বড় হয়ে গেলে আর নাগালই পাওয়া যাবে না। আজকাল আসা অনেকটা কমিয়ে দিয়েছে। সুরমা বলে কাজের চাপ, কিন্তু তা যে নয় তা ভালো করেই সুকান্ত জানে। সুরমা এখন গ্রহান্তরের বাসিন্দা। বিপিন সাধু খাঁ লেনে তাকে নেমে আসতে হলে, অনেক কানা গলি পার হয়ে আসতে হয়, অনেক গা-ঘিনঘিন পথের বাঁক।

সেদিন অফিস হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেলো। বন্ধ হবার কথা নয়, কিন্তু কর্মকর্তারা খোস মেজাজে ছিলেন, সবাই মিলে গিয়ে দাঁড়াতেই বললেন তথাস্তু। অফিস টীম ফুটবলে জিতে কাপ পেয়েছে। তারই সম্মানে।

সুকান্ত এক মুহূর্ত দাঁড়ালো না। সারাটা দিন বেহালায় থাকতে পারলে কাজ অনেকটা এগিয়ে যাবে। মজুরদের ফাঁকি বন্ধ হবে, মিস্ত্রিদের ঢিলে গতি। মিনতিকেও সঙ্গে নিয়ে যাবে। ট্রামে বাসে ভিড় কম। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাতে হবে। বসবার ঘর, শোবার ঘরের লাগোয়া বাথ-রুম, ফালি বারান্দা, ঠিক যেমনটি মিনতি ফরমাশ করেছিলো। মিনতির কোন ওজর শুনবে না আজ, ঠিক নিয়ে যাবে টেনে।

বাড়ির দরজায় কড়া নাড়তে গিয়েই সুকান্ত থেমে গেলো। কপাট ভেজানো। হাত দিতেই খুলে গেল। ভিতরে পা দিয়েই যেন ভূত দেখলো সুকান্ত। অতর্কিতে গলা দিয়ে একটা আওয়াজ বেরিয়ে গেলো।

সামনের চেয়ারে চণ্ডী ঘোষাল গিলে করা পাঞ্জাবী, কোঁচানো ধুতি, দুপায়ের ফাঁকে হরিণ-শিংয়ের লাঠি। একটু তন্দ্রাব ভাব এসেছিলো, সুকান্তর গলার আওয়াজে চমকে উঠে বসলো।

—কি ব্যাপার আপনি? সুকান্ত অবাক গলায় প্রশ্ন করলো।

—আর বলেন কেন, চিঠির ওপর চিঠি। মরবার সময় নেই, দুখানা নতুন বই কর্তারা শুরু করেছেন, এদিকে আমার প্রাণান্ত।

—চিঠি?

—এই দেখুন না। পকেট থেকে চণ্ডী ঘোষাল দোমড়ানো একটা পোস্ট কার্ড বের করলো। এগিয়ে দিলো সুকান্তর সামনে।

একবার চোখ বুলিয়েই সুকান্ত বসে পড়লো চেয়ারে। লেখার ধরন দেখে মনে হলো চেয়ারে না পেয়েই বুঝি বসেছে। আঁকাবাঁকা হাতের লেখা। এ অক্ষর খুব চেনা সুকান্তর। দেশে থাকতে সপ্তাহে একখানা করে এই হাতের চিঠি আসতো। কিন্তু ভাষায় আকাশ পাতাল তফাৎ।

সুকান্ত আর ভিতরে ঢুকলো না। কি দরকার। গেজেগুজে এখানেই তো আসবে মিনতি। সদ্যতোলা ফটোর গোছা হাতে নিয়ে।

ধীরাজ ভট্টাচার্য

॥ ষোলো ॥

দেড় মাস পরের কথা। 'মৃণালিনী' ছবি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। উল্লেখযোগ্য ঘটনা এর মধ্যে বিশেষ কিছু ঘটেনি, আর ঘটে থাকলেও সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেবার মত মনের অবস্থা আমার ছিল না। স্টুডিওতে একটা বিশেষ উৎসাহ উদ্দীপনার ভাবও লক্ষ্য করলাম। গেট দিয়ে ঢুকেই সামনের বড় আম গাছটা কেটে ফেলে গাড়ি গাড়ি ইট চুন সুরকি সিমেণ্ট গাদা করা রয়েছে। শুনলাম ওখানে একটা বড় ফ্লোর তৈরি হবে টকি-ছবি তোলার জন্য। ফ্রামজী এক লক্ষ ষাট হাজার টাকা দিয়ে আমেরিকার আর সি এ কোম্পানীর সঙ্গে চুক্তি করে এসেছেন। মাস খানেকের মধ্যেই টকী মেসিন ও দু তিনজন বিশেষজ্ঞ এসে যাবে, তার আগেই ফ্লোর কমপ্লিট করা চাই-ই চাই। রাত দিন মিস্ত্রী খাটতে লাগল।

মন ভাল নেই। বাবার শরীরটা আবার খারাপ হয়েছে। পনেরো দিন বিশ্রাম নিয়ে বেশ একটু সুস্থ হয়েই আবার স্কুল টিউসানি এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস রাতে লুকিয়ে আই এ-র পড়া শুরু করে দেন। ফলে দিন সাতেক বাদেই আবার বুকের ব্যথায় শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। স্কুলে হেড মাস্টার মশায়ের সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি বললেন, এবার ছুটি নিলে বিনা বেতনেই নিতে হবে। কেননা পাওনা ছুটি আর নেই। দ্বিতীয় উপায় ওঁর জায়গায় আর একটি মাস্টার সাময়িকভাবে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু তাঁর মাইনে বাবার মাইনে থেকে কেটে দিয়ে যা অবশিষ্ট থাকবে, তাই দেওয়া হবে। স্কুলে বাবা মাইনে পেতেন মাত্র সত্তর টাকা। তা থেকে টেম্পরারি মাস্টারকে অন্ততঃ চল্লিশ টাকা দিলে অবশিষ্ট থাকে মাত্র ত্রিশ টাকা। মহা ভাবনায় পড়ে গেলাম। হঠাৎ একটা আইডিয়া মাথায় এসে গেল। বললাম, স্যার। আমি তো ম্যাট্রিক পাশ, বাবা যত দিন ভালরকম সুস্থ না হন, ততদিন যদি পড়াতে অনুমতি করেন, তাহলে সবদিক রক্ষা হয়। হেড মাস্টার সতীশচন্দ্র বোস একটুখানি গুম হয়ে কি ভেবে নিলেন, তারপর হেসে আমার পিঠ চাপড়ে বললেন, ভেরি গুড আইডিয়া।

তাই ঠিক হল। সকালে নিচু ক্লাসের ছেলে দুটিকে পড়িয়ে এসে দুপুরে স্কুলে মাস্টারি করতে শুরু করে দিলাম। উঁচু ক্লাসের ছেলে দুটি বাবার অসুখের কথা শুনে বাড়িতে এসে বাবার কাছে পড়ে যেতে সানন্দে রাজি হয়ে গেল।

গোল বাধল স্টুডিও নিয়ে। জ্যোতিষবাবুকে সব খুলে বললাম। সব শুনে বললেন, 'সে জন্য তুমি ভাবছ কেন? মৃণালিনীতে তোমার কাজ শেষ হয়ে গেছে। বক্তিয়ার খিলিজির সসৈন্যে অশ্বপৃষ্ঠে কতকগুলো পাসিং সট নিতে বাইরে যাব। তুমি সঙ্গে থাকলে ভালই হত. কিন্তু এ অবস্থায় তোমার যাওয়া কোনমতেই চলতে পারে না। বাড়ি গিয়ে নাকে সরষে তেল দিয়ে ঘুমোও, আর প্রতি মাসের তিন তারিখে হেড আফিসে এসে মাইনে নিয়ে যেও। তাছাড়া টকী আসছে—কর্তাদের এখন মাথা খারাপ। হৈ চৈ করেই তো ছ' মাস কাটবে।'

নিশ্চিন্ত মনে মিত্র স্কুলে মাস্টারি শুরু করলাম। আমাকে বেশীর ভাগ নিচু ক্লাসেই পড়াতে দিতেন। কখনও কখনও উঁচু ক্লাসে পড়াতাম। পড়াতাম বললে ভুল হবে, গল্প বলতাম। ক্লাসে ঢুকতে না ঢুকতেই ছেলের দল হৈহৈ করে উঠত, 'গল্প বলুন স্যার, গল্প!' সত্যি কথা বলতে কি পড়াবার আমি জানিই-বা কি! ক্লাসে ঢুকবার আগে বুকের ভিতরটা কাঁপতো। যদি ভুল হয়, অথবা কোনও কথার ভুল মানে বলে ফেলি, আর ছেলেরা ধরে ফেলে? তাই গল্প বলতে অনুরুদ্ধ হয়ে মৌখিক দু একবার আপত্তি করলেও মনে মনে খুশিই হতাম। এখানে উল্লেখযোগ্য, অধুনা ফিল্মের বিখ্যাত অভিনেতা বিকাশ রায় ও 'কঙ্কাল' ও 'দুজনায়' প্রভৃতি বহু নাম করা ছবির অন্যতম প্রযোজক গোবিন্দ রায় আমার ছাত্র। স্কুলে আমার কাছে পড়েছেন বা গল্প শুনেছেন।

একটা বিচিত্র জগৎ বিচিত্র তার অভিজ্ঞতা। বেশ লাগতো। কোনও ছেলে হয়তো স্লেটে বাঁদর এঁকে নিচে লিখেছে অজয় নন্দী। রাগে কাঁপতে কাঁপতে অজয় নন্দী স্লেট সমেত আসামী নিয়ে একেবারে আমার কাছে হাজির। অন্য সময় হলে হেসে ফেলতাম, কিন্তু মনে পড়ে গেল, এখন আমি বিচারক মাস্টার। বেশ খানিকটা ধমকে দিলাম অপরাধীকে, খুশি হয়ে অজয় নন্দী সিটে বসল। এরকম খুঁটিনাটি ব্যাপার অসংখ্য।

হয়তো কোনও ক্লাসে অনেক কষ্টে গল্প না বলে ডিকটেসনে দিতে শুরু

করিছি। মাঝপথে একটি ছেলে উঠে দাঁড়িয়ে বললে—'স্যার!'

বেশ একটু বিরক্ত হয়েই বলি—'কি?'

একটু ইতস্তত করে ছেলেটি বলে—'হনুমানের বাপের নাম জাম্বুমান নয় স্যার?'

আশ্চর্য হয়ে বলি—'কে বলেছে তোমায়?'

চুপ করে থাকে ছেলেটি, রাগ হয়, বলি—'কাল তোমার বাবাকে জিজ্ঞাসা করে এসো। তিনি কি বলেন শুনে তারপর বলব। এখন ডিসটার্ব কোরো না, কাজ কর।'

তবু দাঁড়িয়ে থাকে ছেলেটি। বলি—'কি হল?'

আমতা আমতা করে ছেলেটি বলে—'জিজ্ঞাসা করেছিলাম বাবাকে!'

অসহিষ্ণু হয়ে বলি 'কি বললেন তিনি?'

লজ্জায় লাল হয়ে সহপাঠিদের দিকে চাইতে থাকে ছেলেটি। এবার বেশ একটু ধমকে উঠি 'কি বলেছেন তোমার বাবা?'

—'বাবা বললেন, আমি নাকি একটা জাম্বুবান।'

হাসির রোল উঠল ক্লাসে। ম্যানেজ করতে প্রাণ ওষ্ঠাগত। অনেক চেষ্টা করেও সেদিন আর ডিকটেসন দিতে পারলাম না।

আর একদিন একটু উঁচু ক্লাসে বাংলা পড়াবার ভার পড়ল আমার। মনে মনে ঠিক করলাম আজ আর কিছুতেই গল্প বলব না। সব ক্লাসেই যদি না পড়িয়ে গল্প বলে কাটিয়ে দিই, হেড মাস্টার মশায় তাহলে ভাববেন কি! চেষ্টাকৃত গাম্ভীর্যে মুখখানা যথাসাধ্য গোমড়া করে ঢুকলাম ক্লাসে। হৈ চৈ করে উঠল ছেলের দল, গল্প বলুন স্যার, রবার্ট ব্রেকের গল্প।

হাত তুলে ওদের চুপ করতে বলে গম্ভীরভাবে বললাম—'রোজ রোজ পড়ার আওয়ারে গল্প বলা ঠিক নয়। হেড মাস্টার মশায় ওতে রাগ করেন—'

বাধা দিয়ে একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল ছেলের দল—'মোটেই না। এইতো খানিক আগে আমরা হেড স্যারের কাছে গিয়ে বললাম। তিনি তো হেসেই মত দিলেন।' ক্লাস শুদ্ধ ছেলের কাছে বেশ অপ্রস্তুত হয়ে গেলাম। পড়ান আর হল না, হল রবার্ট ব্রেকের গল্প।

৬

মাসের তিন তারিখে হেড আফিসে গিয়ে খাতায় সই করে মাইনে নিয়ে আসি আর বাকি উনত্রিশ দিন স্টুডিওর সঙ্গে সম্পর্ক নেই, স্কুল মাস্টারি আর টিউসনি করে কাটিয়ে দিই। একদিন নরেশদার সঙ্গে দেখা। তিনিও মাইনে নিতে এসেছেন। সব খুলে বললাম নরেশদাকে। একটু চিন্তা করে বললেন—'তাইত, খুবই ভাবনার কথা। এভাবে তো বেশি দিন চলবে না। দুদিন বাদে যখন টকি ছবির শুটিং আরম্ভ হবে, তখন ছুটি একদম পাবে না। তাছাড়া জাহাঙ্গীর সাহেব এখন ইণ্ডিয়ায়। তিনি বলছেন, রবীন্দ্রনাথের 'নৌকা ডুবি' ছবিটা টকিতে তুলতে।'

সাগ্রহে বললাম 'আপনিই পরিচালনা করবেন তো নরেশদা?'

স্বভাবসিদ্ধ হাসি হেসে নরেশদা বললেন—'দেখ! শেষ পর্যন্ত কি হয়।'

এখানে জাহাঙ্গীরজী ম্যাডানের একটু পরিচয় দিয়ে রাখি। রুস্তমজী সাহেব সার্ ও কে এম ম্যাডানের জামাতা, তিনিই সর্বেসর্বা। ম্যাডানের বড় ছেলে বজুরজী মদের দোকান ও শো-হাউসগুলো দেখা-শুনো করতেন। সেজ ফ্রামজীর উপর ভার ছিল ফিল্ম প্রডাকসনের তত্ত্বাবধান করা। তৃতীয় পুত্র হলেন জাহাঙ্গীর সাহেব কোম্পানীর দালালের মত সব ডিপার্টমেন্টে ঘুরে বেড়াতেন, ফ্রামজী আমেরিকা চলে গেলে ওঁর উপর স্টুডিও দেখাশোনার ভার পড়ে। মিষ্টভাষী, অমায়িক, নিরহংকার জাহাঙ্গীর সবার প্রিয় ছিলেন। তার দুটি ছেলে স্কুলে বা কলেজে পড়ত। স্টুডিওর সংস্রবে তাদের আসতে দেওয়া রুস্তমজীর নিষেধ ছিল।

মাইনে নিয়ে আসবার সময় সিঁড়িতে জাহাঙ্গীর সাহেবের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। নরেশদা আলাপ করিয়ে দিলেন। আমার মাইনের কথাটাও সাহেবকে শুনিয়ে দিলেন নরেশদা। বললেন—'সত্যি ওর উপর অবিচার করা হয়েছে। সব শুনে হাসিমুখে আমার কাঁধে হাত রেখে জাহাঙ্গীর সাহেব বললেন—'আমি বেশ বুঝতে পারছি, এটা মিঃ গাঙ্গুলীজ ডুইং। হাউ এভার স্টুডিয়োও আমার সঙ্গে দেখা কোরো তুমি।'

রাস্তায় নেমে দুজনে হাঁটতে হাঁটতে ধর্মতলার মোড় পর্যন্ত এসে ট্রামের

অপেক্ষায় দাঁড়ালাম। নরেশদা বললেন—'তুমি বোধ হয় শোননি ধীরাজ, আমরা একটা ভ্রাম্যমান থিয়েটার পার্টি করিছি। কলকাতার কাছাকাছি সব জায়গায় শো দেখাবার ব্যবস্থা হয়েছে। আমাদের দলে আছেন- কৃষ্ণচন্দ্র দে, রবি রায়, ভূমেন রায়, মেয়েদের মধ্যে মিস লাইট, চারুবালা, পদ্মাদেবী প্রভৃতি আরও অনেক মেয়ে। আমাদের মূলে উদ্দেশ্য হল যতদিন না নিজস্ব হাউস কলকাতায় হয়, ততদিন বাইরে বাইরে শো করে বেড়ান। আর একটি কথা। এখন কাউকে বোলো না। কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের উপর বড়তলা থানার পশ্চিম গা ঘেঁষে যে জমিটা, ওটা লিজ নিয়ে ওখানে আমাদের হাউস তৈরি হবে নাম হবে 'রঙমহল', কেমন নাম?'

বললাম—'চমৎকার।'

'তা তোমার বাবার যদি মত হয় তাহলে আমাদের দলে তোমাকে নিতে পারি। বাড়ীর আর নিজেদের কথাটা ভেবে দেখো।'

কালিঘাটের ট্রাম এসে গেল, দুজনে উঠে পড়লাম।

সেই দিন রাত্রেই কথাটা বাবার কাছে পাড়লাম। শুনে কিছুক্ষণ চোখ বুজে শুয়ে রইলেন বাবা। তারপর বললেন—'না ধীউবাবা, থিয়েটারে তোমার ঢুকে কাজ নেই। সিনেমা করছ ঐ কর। তা ছাড়া এসব সংসর্গে রাতবিরাতে দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়ান—না না দরকার নেই।'

বাবার একান্ত অনিচ্ছায় আমি থিয়েটারে যোগদান করি। চুপ করে গেলাম। এরই মধ্যে একদিন রবিবারে রিনির দল এসে হাজির, মানে রিনির বাবা মা ভাই বোনেরা, বাবার অসুখের খবর পেয়ে দেখতে এসেছে। একটু নিরিবিলি হতেই রিনি বললে—'তুমি আর যাওনা কেন ছোড়দা?'

হেসে বললাম—'বামন হয়ে চাঁদে হাত দেবার চেষ্টা না করে, চাঁদের দূরত্ব মনে রেখে দূরে থাকাই ভাল নয়কি?'

—'তোমাদের ওসব হেঁয়ালির কথা বুঝি না, গোপাদি কিন্তু সত্যি তোমাকে ভালবাসে।'

তাড়াতাড়ি রিনির মুখে হাত চাপা দিয়ে বলি—'ভুলেও আর কোনও দিন ঐ সর্বনেশে কথা উচ্চারণ করিসনে রিনি।

সত্যি যদি ছোড়দার ভাল চাস আমার এ অনুরোধটা রাখিস বোন।' তাড়াতাড়ি বাইরের ঘরে এসে সেদিনকার দৈনিক কাগজটা পড়বার ভান করি, বাথা ভরা চোখে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে রিনি।

পরদিন সকাল থেকে আবার চললো সেই রুটিনবাঁধা কাজ। টিউশানি স্কুল বাবার অসুখের রিপোর্ট নিয়ে ডাক্তার বাড়ি। দিন পনেরো এইভাবে কাটলো। বাবার জ্বর ও বুকের সর্দি একটুও কমলো না, বরং খারাপের দিকেই গেল। আগে জ্বর রেমিশন হয়ে আবার আসতো। কদিন থেকে দেখলাম রেমিশন হয় না, নামে একশ কোনও দিন নিরানব্বই পয়েন্ট চার—আবার তার উপরই জ্বর আসে একশো তিন চার পর্যন্ত।

ডাক্তার নগেন দাসকে একদিন খোলাখুলি জিজ্ঞাসা করলাম—কি রকম বুঝছেন ডাক্তারবাবু?'

ডাক্তার 'জ্বরটা রেমিটেন্ট টাইপের মনে হচ্ছে। বুকের সর্দিটা কমে গেলে জ্বরটাও বন্ধ হয়ে যাবে। দেখি, চেষ্টার তো কসুর করছি নে।'

বুকের একটা মালিশ দিলেন ডাক্তারবাবু আর জ্বরের এক শিশি মিকশ্চার। কি একটা পর্বোপলক্ষে স্কুল দুদিন বন্ধ, দুপুরে খেয়ে দেয়ে স্টুডিওতে গেলাম। বোধ হয় দিন পনেরো আসিনি। এর মধ্যেই চেহারা পালটে গেছে স্টুডিওর। ঢুকেই বাঁ হাতে প্রকাণ্ড ফ্লোর। সামনে লাল সুরকি আর খোয়া দিয়ে পেটা পথ, পূর্বদিকের জঙ্গলটাও প্রায় পরিষ্কার। সবাই ব্যস্ত কাজে। জ্যোতিষবাবু সদলে বাইরে গেছেন ছবি তুলতে, এখনও ফেরেননি। গাঙ্গুলী মশাই ও মুখুজ্জে দেবী চৌধুরাণীর এডিটিং নিয়ে ব্যস্ত। উদ্দেশ্যহীনের মত খানিক ঘুরে বেড়িয়ে বাড়ি চলে আসব কিনা ভাবছি, দেখি একখানা মোটর থেকে জাহাঙ্গীর সাহেব ও নরেশদা নামছেন। নমস্কার করে কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। নরেশদা বললেন—'কথা আছে ধীরাজ, এখুনি চলে যেও না যেন।'

জাহাঙ্গীর সাহেবের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে সমস্ত স্টুডিওটা দেখতে লাগলেন নরেশদা। প্রায় ঘণ্টা খানেক বাদে সাহেব গাড়ি করে চলে গেলেন।

কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন নরেশদা —'তারপর, তোমার বাবার শরীর কেমন আছে বল!'

সব বললাম। শুনে নরেশদা বললেন—'আমার খুব ভাল মনে হচ্ছে না। জ্বরটা কেমন বোঁকা বোঁকা, তুমি অন্য ডাক্তার দেখাও।'

বললাম—'বাবা রাজি হচ্ছেন না। ওঁর ধারণা ডাক্তার এন দাসই ওঁকে ভাল করে দেবেন।' একথা সে কথার পর নরেশদা বললেন—'একটা মজের ভাল খবর তোমায় দিয়ে রাখি শোন। জাহাঙ্গীর সাহেব তোমার কুড়ি টাকা মাইনে বাড়িয়ে দিয়েছেন। আমার পরিচালিত 'জোনাকী' ছবির শুরু থেকে ঐ বাড়তি মাইনে পাবে।'

জিজ্ঞাসা করলাম—'কবে থেকে শুরু হবে নরেশদা?'

একটু ভেবে নিয়ে নরেশদা বললেন—'দেখি, তবে তাড়াহুড়ো করে এ ছবি আমি তোলবো না। এটা খাস জাহাঙ্গীর সাহেবের ছবি। তার উপর টকী মেশিন এলে এইটেই হবে প্রথম বাংলা সবাক ছবি।'

মনে মনে বেশ উৎফুল্ল হয়ে বললাম—'আমায় কি পার্ট দেবেন নরেশদা?'

নরেশদা বললেন—'সাহেব বলছে নায়ক রমেশের পার্ট তোমায় দিতে। আমার ইচ্ছে নীলাম্বরের পার্টটা তুমি কর।'

চোখের সামনে জোনাকী উপন্যাসের রোমাঞ্চকর ঘটনাগুলো ভেসে উঠলো। নরেশদার হাত দুটো ধরে বললাম—'না নরেশদা, নীলাম্বর অথবা ব্যাকিং পার্ট, খুব সুখ্যাতি পাওয়া যাবে। কিন্তু রমেশের ভূমিকা সম্পূর্ণ জটিল হলেও লোভনীয়। আমি রমেশ কোরবো।'

একটু চিন্তা করে নরেশদা বললেন—'তা যেন হোল। কিন্তু এতো আর নির্বাক ছবি নয়—সবাক। রীতিমত রিহার্সাল দেবে কি করে!'

মহা চিন্তায় পড়ে গেলাম। এক দিকে অতবড় একটা চান্স অন্য দিকে কর্তব্য। কোনটা ছেড়ে কোনটা রাখি।

নরেশদাই সমাধান করে দিলেন। বললেন—'তোমার ইস্কুল তো চারটেয় ছুটি হয়?' মাথা নেড়ে সায় দিলাম।

—'তা হলে একটা কাজ আমি করতে পারি। দুপুর দুটো থেকে মেয়েদের নিয়ে রিহার্সাল শুরু করে দেব। চারটের পর তুমি এলে পুরো রিহার্সাল চলবে।'

কৃতজ্ঞতায় মন ভরে গেল।

বাড়ি চলে এলাম। বাবার জ্বর অন্যান্য দিনের তুলনায় কম। নিরানব্বই থেকে উঠেছে একশ' পয়েন্ট চার। বুকের মালিশটাতেও কিছু কাজ হয়েছে মনে হল। সর্দিটা সহজভাবেই উঠে যাচ্ছে। বালিশে হেলান দিয়ে সেদিনকার দৈনিক কাগজটা পড়ছিলেন বাবা। কাছে বসে নরেশদার কথাগুলো সব বললাম। শুনে একটু চিন্তা করে বললেন—'ভালো কথা। তবে মুখের কথায় খুব বেশি আশান্বিত হোয়ো না, দুঃখটা কম পাবে।'

রাতে খেয়ে দেয়ে অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরদিন সকালে টিউশানি থেকে ফিরতেই সাড়ে নটা হয়ে গেল। বাড়ির দরজার কাছে পিওনের সঙ্গে দেখা, আমার নামে একখানা খামের চিঠি।

অপরিচিত হাতের লেখা। বেশ একটু অবাক হয়ে গেলাম। ইতস্তত করে খুলে ফেললাম। লিখেছে,—

> ধীরাজবাবু! কালকে সকালে অতি অবশ্য আমার সঙ্গে দেখা করবেন। বিশেষ দরকার। আমি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের উত্তর দিকের রাস্তায় দাঁড়িয়ে আপনার জন্য সকাল ছটা থেকে সাতটা পর্যন্ত অপেক্ষা করবো। আমাদের ফোন নম্বর ৫৫৭৮০, একটু মনে রাখবেন।
>
> গোপা।

(ক্রমশঃ)

চক্রদত্ত

এবারে পদার্থ বিদ্যায় আমেরিকার দুজন বৈজ্ঞানিক নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। এঁদের মধ্যে একজন প্রোঃ ল্যাম্ব। তিনি ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত আছেন। আর একজনের নাম প্রোঃ কুশ। তিনি কলোম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত আছেন। রসায়ন বিদ্যায় প্রোঃ ভিগনিঅড নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। তিনি কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত আছেন।

*

সম্প্রতি পাঞ্জাবের বিপাশা নদীর উপত্যকায় কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ ৩০০,০০০ বছর আগেকার পাথরের তৈরী অনেক হাতিয়ার খুঁজে বার করেছেন। এগুলো নদীর নুড়ি-জাতীয় পাথর থেকে তৈরী করা হয়েছে। এই জাতীয় হাতিয়ার দিয়ে সেই যুগের লোকেরা গাছের গোড়া খুঁড়তো, গাছের ডালপালা কাটতো, জন্তু-জানোয়ার শিকার করতো অথবা জন্তু-জানোয়ারের চামড়া ছাড়াতো। এই সমস্ত জিনিস কাংগরা উপত্যকার দক্ষিণে ৯ থেকে ১৮ মাইলের মধ্যে পাওয়া গেছে। নদীর উপত্যকার ২০০ থেকে ৩০০ ফিট মাটির নিচেই এগুলো খুঁজে পাওয়া গেছে। যদিও প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ এগুলো কোন্ যুগের, সে সম্বন্ধে সঠিক কোন হদিশ দিতে পারেন নি, তবে তাঁদের ধারণা যে, এটা 'প্লেসটোসিনের' একটা হিমযুগের (glacial) কাছ বরাবর কোন সময়ের। ১৯৩৫ সালে ইয়েল-কেমব্রিজ অভিযানে দক্ষিণ পাঞ্জাব, পাকিস্থানে এই ধরনের হাতিয়ার পাওয়া গেছে। ভারতবর্ষের বাইরে এই জাতীয় পাথরের হাতিয়ার বর্মা, মালয়, জাভা, চীনেতে পাওয়া গেছে। খুব সম্ভবত এই সমস্ত সংগ্রহ করে ভাল করে গবেষণা করলে সেই কালের একটা সভ্যতার ধারার খোঁজ পাওয়া যাবে।

*

'পেট্রোম্যাক্স' বা 'ডে লাইটের' ব্যবহার ইলেকট্রিক আলোর বদলে অনেক শহর এবং বড় গ্রামে আজও খুব দেখা যায়। পেট্রোম্যাক্স ব্যবহার করার সময় একটু সাবধানে ব্যবহার করতে হয়। কারণ খুব বেশী নাড়াচাড়া করলে অথবা মাটিতে অথবা টেবিলের ওপর রাখতে গেলে ধাক্কা লেগে ম্যান্টেলটা ভেঙে যেতে পারে। ম্যান্টেলটা পেট্রোম্যাক্স প্রথমবার জ্বালাবার পর পুড়ে ছাই হয়ে পেট্রোম্যাক্সের

পেট্রোম্যাক্সের তলায় চাকতি লাগান

ম্যান্টেলের আটকাবার জায়গায় লেগে থাকে। যাতে এই পোড়া ম্যান্টেলটা ধাক্কা খেয়ে না ভেঙে যায়, সেটার একটা সহজ উপায় বের হয়েছে। পেট্রোম্যাক্সের তলায় বসাবার জায়গায় একটা রবার অথবা স্পঞ্জের তৈরী গোল চাকতি লাগিয়ে দিতে হয়। তাহলে আলোটা বসাবার সময় ধাক্কাটা ঐ চাকতির ওপর দিয়ে যাবে। আলোটার ওপরে আর লাগবে না। এছাড়া আরো একটা সুবিধা এই যে, এই চাকতিটা লাগান থাকার দরুণ আলোটা যে কোন স্থানে বসান যায়—কারণ এখন সেটা সহজে গড়িয়ে যাবে না।

*

আমাদের খাদ্যবস্তুতে লোহা এবং ক্যালসিয়াম থাকা খুবই প্রয়োজন। কারণ এই দুটোই আমরা আমাদের খাদ্য থেকে পাই। কিন্তু বর্তমানে বিশেষজ্ঞেরা যে তালিকা প্রস্তুত করেছেন, তাতে তাঁরা খাদ্যে ১৫টি খনিজ পদার্থের নাম দিয়েছেন। এগুলো হচ্ছে ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, ম্যাগনেসিয়াম, সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ক্লোরিন, সালফার, আইরন, কপার, কোবাল্ট, আয়োডিন, ম্যাঙ্গানিজ, জিঙ্ক, ফ্লোরিন এবং মলিবডিনাম্। প্রথম সাতটি হচ্ছে খাদ্যের প্রধান খনিজ পদার্থ। পরের ছয়টি খনিজ খুব সামান্য পরিমাণে দরকার, কিন্তু এদের অস্তিত্ব না থাকলে শরীরে রক্ত তৈরী হবে না। শ্বাস-প্রশ্বাসের অসুবিধা ঘটবে। ফ্লোরিন দাঁতের ক্ষয় বন্ধ করতে সাহায্য করে। আর মলিবডিনাম হচ্ছে একটি অনুঘটক (Catalyst)। এর সাহায্যে লৌহ এবং অন্যান্য যন্ত্রের কার্যক্ষমতা বাড়ায়।

*

আজকাল প্রায় সব বড় বড় শহরের রাস্তায় আলোর সংকেতের সাহায্যে যানবাহন নিয়ন্ত্রণের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। বর্তমানে লাল আলো যানবাহন থামবার জন্য আর সবুজ আলো চলবার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে। কিন্তু অনেকে সবুজ আলোর বদলে নীল আলোর যানবাহন চলবার জন্য ব্যবহার করার কথা বলছেন। তাঁরা কারণ দেখাচ্ছেন যে, বেশীর ভাগ গাড়ির চালক লাল এবং নীল আলো চোখে দেখে ঠাহর করতে পারে না। সেই কারণে ঐ সমস্ত চালকরা গড্ডালিকা প্রবাহের মত অন্য গাড়ির অনুসরণ করে চলতে থাকে। ফলে যথেষ্ট পরিমাণে দুর্ঘটনা ঘটতে দেখা যায়। এই কারণে অনেকের মত হচ্ছে যে লাল এবং সবুজ আলোর বদলে নীল এবং হলদে আলো-ওয়ালা সংকেত তৈরী করতে।

ঝাঁসীর রানী ○ মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য

॥ ১৫ ॥

ঝাঁসীতে সে সময় যে সেনাবাহিনী ছিল, তারা মুলতান ফেরত। ভারতবর্ষের নিয়তবর্ধমান ব্রিটিশ এলাকার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ইংরেজ সৈন্য আর অফিসার রাখা সম্ভব হয়নি। ভারতীয় রাজ্যগুলিতে সর্বদাই ভারতীয় সেনাবাহিনী রাখা হয়েছিল। অযোধ্যা নিবাসী কৃষক শ্রেণীর এই সিপাহীরা স্বদেশ থেকে এতদূরে মোতায়েন থাকাতে স্বভাবতই অসন্তুষ্ট ছিল। অন্যান্য জায়গার মত ঝাঁসীর সেনাবাহিনীতেও তখন অসন্তোষ ধূমায়িত।

ঝাঁসীতে ছিল 12th Regiment Native Infantry'র চারশো বেয়নেটধারী পদাতিক এবং 14th Irregular Cavelry'র দুশো উনিশজন অশ্বারোহী। ক্যাপ্টেন ডানলপ (Captain Dunlop) ছিলেন অফিসার। ক্যাপ্টেন আলেকজাণ্ডার স্কীন (Captain Alexander Skene) ছিলেন ঝাঁসী, জালৌন এবং চন্দেরীর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট।

ঝাঁসী শহরের দক্ষিণ দিকে পাঁচিলের বাইরে সামরিক ছাউনী। আজ সেই জায়গা পুরানো ক্যাণ্টনমেণ্ট নামে পরিচিত। সেখানে ছিল কর্মচারীদের বাড়ি, সেনাছাউনী, জেল এবং স্টারফোর্ট। এই ছোট্ট তারকা আকৃতির দুর্গটি ছিল রসদখানা। ক্যাণ্টনমেণ্ট থেকে ঝাঁসীর কেল্লার দূরত্ব আনুমানিক দুই মাইল।

ডানলপ তাঁর গুপ্তচরের কাছে খবর পান, বেনামী চিঠিতে সেনাবাহিনীতে উত্তেজনা ছড়াচ্ছেন স্বার্থসন্ধী। ছদ্ম-স্বাক্ষর 'নারায়ণ রাও' দেখে ডানলপ মনে করলেন, সম্ভবত রাণীর দেওয়ান লছমনরাও ইনি।

ক্যাণ্টনমেণ্ট ছেড়ে কেল্লায় আশ্রয় নেবার কথা ডানলপের মনে হলেও, সিপাহীদের মনে কোন সংশয় সৃষ্টি করতে রাজী ছিলেন না তিনি। নিরাপত্তার কথা ভেবে মহিলা ও শিশুদের কেল্লায় পাঠিয়ে দিলেন ডানলপ। পুরুষেরা রাতে কেল্লায় থাকতেন।

৪ঠা জুন সকালে দ্বাদশ রেজিমেণ্টের সপ্তম কোম্পানী হাবিলদার জোনা গুরুবক্স-এর নেতৃত্বে স্টারফোর্ট অধিকৃত হ'ল। নওগঙ্গ-এ ছিলেন কর্নেল কার্ক (Colonel Kirke)। তাঁকে ডানলপ জানালেন—

"ঝাঁসী,
৪।৬।১৮৫৭,
বিকাল—৪ ঘটিকা।

ঝাঁসীর গোলন্দাজ ও পদাতিকরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে স্টারফোর্ট অধিকার করেছে। দলত্যাগীদের ওপর নজর রাখবেন।" —ডানলপ

ডানলপ এবং টেইলার (Taylor), ক্যাণ্টনমেণ্ট ময়দানে বাকি ফৌজ জমায়েৎ করে কঠোর শাসন করলেন। গোয়ালিয়র এবং সাগরে সাহায্য চেয়ে পাঠালেন।

সমস্ত সামরিক এবং বে-সামরিক ইংরাজ কর্মচারীরা সপরিবারে কেল্লায় এসে আশ্রয় নিলেন। সামান্য রসদ ও গোলাগুলী ছাড়া কিছুই তাঁদের সঙ্গে ছিল না। স্টারফোর্টের সঙ্গে সঙ্গে সবই বেদখল হয়ে গিয়েছে। বাবুর্চি এবং খিদমদগার পাঠিয়ে কেউ কেউ মিঠাই, ফল, মাংস ইত্যাদি জোগাড় করলেন।

শহরময় জোর গুজব। রানীমহলে খবর পৌঁছল। ৪ঠা জুন তিনি কেল্লাতে দেওয়ান লছমন সিংহকে পাঠিয়ে প্রস্তাব করলেন, স্কীন যেন সকলকে নিয়ে সাগর অথবা দাতিয়া চলে যান। বিপদ বোধে নরনারী ও শিশুদের রানীমহলেও পাঠান যেতে পারে। স্কীন কর্ণপাত করলেন না।

দিল্লী ও মীরাটের দুর্ঘটনায় ঝাঁসীর সেনাছাউনী এখন গরম হয়ে আছে। শহরের বাসিন্দারা পুরোদস্তুর ওয়াকিবহাল। ইংরাজদের ভবিষ্যৎ ভেবে শঙ্কিত হয়েছিলেন রানী। আরো শঙ্কিত হয়ে-

ছিলেন ঝাঁসীর অরক্ষিত অবস্থায় সামরিক অভ্যুত্থানের পরিণতির কথা ভেবে। পঁয়ষট্টিজন নিরস্ত্র ইংরেজ আর ছয়শোজন সশস্ত্র সিপাহী, সংঘর্ষের ফল আগে থেকেই বোঝা যায়। স্কীন যদি রানীর কথা মানতেন, তা হ'লে ইংরেজ নর-নারীদের জীবন বেঁচে যেত। রানীমহালের চল্লিশজন পাহারাদারকে রানী কেল্লায় পাঠালেন। তাঁর নিজের অরক্ষিত অবস্থায় বিপন্ন ইংরেজদের প্রতি এই সহানুভূতি দেখিয়ে তিনি সিপাহীদের অসন্তোষ উদ্রেক করলেন।

৫ই জুন খিদমৎগার ও বাবুর্চি যথেষ্ট খাদ্য সরবরাহ করেছিল। ৬ই জুন আর এক নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হ'ল। ডানলপ ও টেইলার ডাকঘর থেকে ফিরছিলেন। দ্বাদশ রেজিমেন্টের কয়জন সিপাহী এগিয়ে এসে তাঁদের গুলী করল। তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হ'ল তাঁদের। লেফ্‌টেনান্ট ক্যাম্পবেল পিছনে ছিলেন। তিনবার গুলী খেয়েও তিনি দ্রুতবেগে ঘোড়া চালিয়ে কেল্লায় পৌঁছে গেলেন। কেল্লার ইংরেজরা তৎক্ষণাৎ ফটক বন্ধ করে দিলেন। অ্যাসিস্টেণ্ট সারভেয়র অব্ রেভিনিউ, টার্নবুল আসছিলেন হেঁটে। প্রাণভয়ে তিনি দৌড়ে একটা গাছে উঠে পড়লেন। কিন্তু উঁচু ডালে ওঠবার আগেই তাঁর গুলীবিদ্ধ দেহ মাটিতে পড়ে গেল।

শহরের সর্বত্র দারুণ উত্তেজনা। অবরুদ্ধ ইংরেজদের সাহায্যকল্পে কিছু অনুগত লোক খাবার জিনিস পাঁচিলের বাইরে ধরতে লাগল, উপর থেকে ইংরেজরা দড়ি বেঁধে তাই তুলে নিতে লাগলেন। সিপাহীদের ভয়ে সে ভাবে খাদ্য সরবরাহ বেশীক্ষণ চলল না।
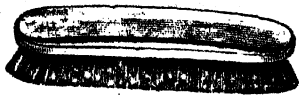
পোস্ট অফিসের বাঙালী কেরানী-বাবু মিঃ ফ্লেমিং নামক জনৈক ইংরেজকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। তাঁর বাড়ি চড়াও হয়ে ফ্লেমিংকে হত্যা করল সিপাহীরা। বাঙালী বাসিন্দাদের ইংরেজদের পক্ষের লোক বলে তাদের বাড়ি ঘেরাও করে লুট করল কিছু কিছু। লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, মধ্যভারতের অন্যতম ধনী নগরী ঝাঁসীর দোকানপাট বা ঘরবাড়ি লুট করে টাকা নেবার চেষ্টা ছিল না সিপাহীদের।

কেল্লার ভিতরে তখন ইংরেজরা অবরুদ্ধ। বিপন্ন স্কীন পার্সেল, স্কট এবং অ্যান্ড্রুজকে পাঠালেন রানীর কাছে। ইতিমধ্যে সিপাহীদের দৃষ্টান্তে মেতে উঠেছে সাধারণ মানুষ। রানীর প্রেরিত পূর্বের চল্লিশজন রক্ষী কেল্লার বাইরে জমায়েৎ হয়েছে সিপাহীদের সঙ্গে। তিন জন ইংরেজ ভারতীয়দের ছদ্মবেশে রানী-মহালে গেলেন।

রানীমহালে পৌঁছবার আগেই পথে নিহত হলেন পার্সেল এবং স্কট। কয়েক দিন আগেই ঝড়ু কুমারকে অপমান করে-ছিলেন অ্যান্ড্রুজ। জুতো মেরেছিলেন গুনে গুনে। তাঁর ঘোড়া যখন রানীমহালে ঢোকে ঢোকে, তখন ঝড়ু কুমারের ছেলে লাফিয়ে পড়ল সামনে। ঘোড়া দুই-পা তুলে অ্যান্ড্রুজকে ফেলে দিল। নিহত হলেন অ্যান্ড্রুজ।

রানীমহালের ফটক বন্ধ হয়ে গেল। কেল্লা ঘিরে তখন ছয়শো সিপাহী ক্ষেপে গেছে। দিল্লীতে ইংরেজরাজ খতম হয়ে গেছে, মীরাটে পুড়ে গেছে ইংরেজ ছাউনী। দিল্লীর তখ্‌তে বাহাদুর শাহ। এই শাহী তাদের। তরছা গেটের সামনে কেউ-না-কেউ সর্বদা বক্তৃতা দিতে লাগল।

বাইরে থেকে সিপাহীদের গোলমাল পৌঁছতে লাগল কেল্লার ভেতরেও। অবরুদ্ধ ভারতীয়রা বেরিয়ে পড়বার জন্য ব্যস্ত হলেন। ক্যাপ্টেন বার্জেসের খিদমৎগার একটি দরজার মুখের পাথর সরিয়ে ফেলতে চেষ্টা করল। লেফ্‌টেনান্ট পাওইস তাকে গুলী করলেন। পাওইসকে তাঁরই ভৃত্য তলোয়ার দিয়ে কেটে ফেলল। বার্জেস এই ভৃত্যটিকে হত্যা করলেন। ভারতীয় চাকর, খিদমৎগারেরা বিশ্বাস-ঘাতকতা করছে, এই খবর ছড়িয়ে পড়া মাত্রই, কেল্লার ভেতরে পাঁচিশজন ভারতীয়কে হত্যা করা হয়।

৭ই জুন ক্যাপ্টেন স্কীন আত্ম-সমর্পণ করতে চাইলেন। ইতিমধ্যে সর্ব-জনপ্রিয় ক্যাপ্টেন গর্ডন নিহত হয়েছেন, প্রাচীরে দাঁড়িয়ে খাবার টেনে তোলবার সময়। গুলীবারুদ নেই, খাবার নেই। অতএব ৮ই জুন সকালে ক্যাপ্টেন স্কীন সাদাজামা উড়িয়ে সন্ধির প্রস্তাব করলেন।

সন্ধির শর্ত সম্পর্কে কথা বলতে ভিতরে এলেন হাকিম সালেহ্‌ মাহ্‌মুদ, ঝাঁসীর বিশিষ্ট বয়স্ক নাগরিক। স্কীন বললেন—"আমাদের আত্মসমর্পণের এক-মাত্র শর্ত হচ্ছে, আমাদের বিনাবাধায় সাগর চলে যেতে দেবে। কেশাগ্রও স্পর্শ করবে না।" সালেহ্‌ মাহ্‌মুদ কথা দিলেন। একে একে বেরিয়ে এলেন অবরুদ্ধ ইংরেজ নরনারী ও শিশু। তাঁদের নিয়ে যাওয়া হ'ল কেল্লার সন্নিকটে জোখানবাগের বাগানে।

14th Irregular Cavalry'র তিনজন সওয়ার এসে জানাল, রিসালাদার কালে খাঁর হুকুম ইংরেজদের হত্যা করতে হবে। হতভাগ্য ইংরেজ পুরুষেরা বুঝলেন তাঁদের ভাগ্য। মাকে জড়িয়ে তাকিয়ে রইল বিস্মিত বালক। জেলদারোগা বখ্‌শিস্‌ আলির নেতৃত্বে কয়েকজন সিপাহী সমস্ত ইংরেজ নরনারী, বালিকা ও শিশুদের হত্যা করল।

একটি মর্মর স্মৃতিসৌধ আজও ঝাঁসীর জোখানবাগে সেই কলঙ্কিত হত্যাকাণ্ডের স্মৃতি বহন করছে।

সিপাহীরা তারপরেই জিগীর দিল দিল্লী চলো। রানীমহালের সামনে গিয়ে তারা জানাল, তাদের অন্তত তিন লাখ টাকা দরকার। অন্যথায় তারা শহর লুট করবে। নিরুপায় রানী তাঁর খানগী দৌলতী বা নিজের গহনা থেকে এক লক্ষ টাকা দামের মোতির হার ও বালা ফেলে দিলেন। সিপাহীরা তখন ঝাঁসী ছেড়ে দিল্লীর দিকে চলল। যাবার আগে বলে গেল—

"মুলুক খুদাতাল্লাহ্‌ কা—
মুলুক বাহাদুর শাহ্‌ কা—
অম্মল লক্ষ্মীবাঈ কা
ঝাঁসী লক্ষ্মীবাঈ কা॥"

রানী ৯ই জুন ইংরেজদের দেহগুলি জোখানবাগে কবর দিলেন। তারপর ঝাঁসীর অবস্থা জানিয়ে জব্বলপুরের

কমিশনার মেজর এরস্কাইনকে চিঠি লিখলেন।

তাঁর জীবনে এই হত্যাকাণ্ড একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি করল। প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে তিনি এই হত্যার জন্য দায়ী নন। সমগ্র ভারতে তখনও প্রবল ইংরেজ। বিদ্রোহের সেটা গোড়ার দিক। রাজপুত রাজ্য দিয়ে ঘেরা ঝাঁসী। দতিয়া বা অরছা তাঁকে কোন সাহায্য করবে না। তিনি নিজে অসহায়। যে সিপাহীরা আজ চলে গেল, তারা যুক্ত-প্রদেশের লোক। ঝাঁসী রাজ্যের রানীর প্রতি তাদের কোন আনুগত্য নেই। ঝাঁসীর উপর তাদের কাজের দায় চাপিয়ে তারা চলে গেছে। এই অবস্থায় তিনি নিজের নির্দোষিতা জানাবার জন্য কর্তৃপক্ষকে চিঠি লিখতে লাগলেন।

ঝাঁসীস্থ ইংরেজদের মধ্যে পালিয়েছিলেন একমাত্র লেফটেনাণ্ট রাইডস। ১৪ই জুন তিনি গোয়ালিয়রে পৌঁছলেন। সার্জেণ্ট নিউটন, তাঁর স্ত্রী ও চার ছেলে-মেয়েকে নিয়ে পালিয়েছিলেন। কর্নেল মার্টিন (সম্ভবত তিনি ভারতীয় খৃীষ্টান ছিলেন) পালিয়ে গিয়ে আগ্রায় স্থায়িভাবে বসবাস করেন। আগ্রায় কর্নেল ফ্রেজারের নামে একখানি চিঠি রানী তাঁকে দিলেন। ফ্রেজার সেই চিঠি পড়ে পর্যন্ত দেখেননি। ১৮৮৯ সালে কর্নেল মার্টিন দামোদর রাওকে একখানি চিঠি লেখেন। সেই চিঠির যথাযথ অনুবাদ এখানে তুলে দেওয়া গেল ঃ—

২০-৮-১৮৮৯,

......আপনার হতভাগিনী মাতার সঙ্গে আমরা অত্যন্ত অন্যায় ব্যবহার করেছি। তাঁর বিষয়ে সত্যাসত্য আমি যতটা জানি এমন আর কেউ জানে না। সেই নিরপরাধিনী মহৎ চরিত্রা মহিলা ঝাঁসীর জুন মাসের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে একেবারেই জড়িত ছিলেন না। দুইদিন ধরে গোপনে তিনি দুর্গে চানার ডাল, চাপাটি ও গুড় পাঠিয়েছিলেন। কড়েয়া থেকে একশো বন্দুকধারী সৈন্য আনিয়ে ছিলেন। স্কীনের প্রত্যাখ্যানে তারা মাঝপথ থেকেই ফিরে যায়। স্কীন ও গর্ডনকে তিনি দতিয়া চলে যেতে বলেন। আজ তাঁরা সকলেই পরলোকে. একজন ইংরেজ বেঁচে থাকলেও সত্যাসত্য নিরূপিত হতে পারত।

সৈন্যরা ঝাঁসী ত্যাগ করলে পরে তিনি শাসনভার গ্রহণ করেন। দতিয়া ও ডেহরী স্বচ্ছন্দে ইংরেজদের সাহায্য করতে পারত। অরছার সীমানা ঝাঁসীর কুচকাওয়াজের ময়দান থেকে মাত্র দেড় মাইল দূরে এবং দতিয়ার সীমানা ঝাঁসী থেকে ছয় মাইল দূরে। তাদের সশস্ত্র সেনাবাহিনীও ছিল। তবু এই দুটি রাজ্য এতটুকু সাহায্য করেননি ইংরেজদের। উপরন্তু ঝাঁসী বার বার আক্রমণ করেছেন। তাঁদের তৎকালীন আচার-ব্যবহার অতি নিন্দনীয়।

দুঃখের বিষয় এই যে, ঝাঁসীর সঙ্গে অরছা ও দতিয়ার লড়াইয়ের জন্যেও রানীকেই দায়ী করা হয়েছে।

জব্বলপুরে এরস্কাইনকে এবং উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের চীফ কমিশনার কর্নেল ফ্রেজারের কাছে আগ্রায় তিনি যে চিঠি লেখেন, ফ্রেজার তা খুলেও দেখেননি।

ঝাঁসীর নাম অপরাধীর খাতায় উঠে গেল এবং বিনা বিচারেই ঝাঁসীর ভাগ্যে শাস্তি বিধান হ'ল।

এই হত্যার সম্বন্ধে ক্যাপ্টেন পিকনী একটি রিপোর্ট দেন এবং পি জি স্কট সরকারী বিবরণী তৈরী করেন। যেসব প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণী থেকে তিনি রিপোর্ট তৈরী করেছিলেন, সেগুলি হচ্ছে,

১। জনৈক উপস্থিত ব্যক্তি;
২। জনৈক বাঙ্গালী;
৩। স্কীনের খানসামা সহীবুদ্দিন;
৪। মিসেস মাটলো।

এই বিবৃতিগুলি বিশদ অনুধাবনের প্রয়োজন নেই। তবে এই বললেই যথেষ্ট হবে যে, বিবৃতিগুলির মধ্যে পরস্পর মিল নেই। সবচেয়ে সন্দেহজনক মিসেস মাটলোর বিবৃতি। কেননা, তাতে ইংরেজদের হত্যার কোন উল্লেখ নেই। বাঙ্গালী সাক্ষী বলেন—রানী আশ্রয়প্রার্থী অ্যাণ্ড্রুজকে বলেছিলেন—I have no concern with English Swine অথচ অ্যাণ্ড্রুজের সঙ্গে রানীর কোন সাক্ষাৎই হয়নি। সরকার রানীকে এই হত্যার জন্য দায়ী করলেন।

এদিকে দুখানা ফাঁপা লাঠির ভেতরে রানীর চিঠি ভরে নিয়ে দূত চলে গেল জব্বলপুরে। এরস্কাইন রানীকে একখানা চিঠি লিখে ঝাঁসীর শাসনভার গ্রহণ করার অধিকার দিলেন। একটি ঘোষণাপত্রে ব্রিটিশ প্রজাদের রানীর আনুগত্য স্বীকার করতে ও রানীর কাছে খাজনা দিতে আদেশ দিলেন।

অতএব রানী ঝাঁসীর শাসনভার গ্রহণ করলেন। (ক্রমশ)

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

সন্ধ্যাবেলায় খবর পেলাম নাচের বন্দোবস্ত হবে। গিয়ে দেখলাম মস্ত জলসা এবং আমারই জন্য। বালিদ্বীপে যাওয়া হোলো না, গান শোনা হোলো না, নতুন ছবি দেখা হোলো না বলে আফসোস করেছিলাম। তাই শুনেই বোধ হয় আয়োজন। গিয়ে দেখি, বিরাট ব্যাপার! বিদায়-অভিনন্দন। এই চমক-দেওয়ার মধ্যে যে সুরুচির পরিচয় পেলাম, সেটা হাজার বছরের সভ্যতার পলি থেকেই জন্মাতে পারে। ফুল-যাত্রার সময়ও দেখেছি, এ সভাতেও দেখলাম সংযম। ঠিক কি ধরনের শান্ত ভাব ধরতে পারলাম না, পরাধীনতার শান্তি না বলিষ্ঠ সংযম? একজন বিদেশী সেদিন বলছিলেন, 'জাতটা বড় নরম, সফ্ট্'। নিশ্চয়ই 'সফ্ট্' কিন্তু নরম স্বভাব আভিজাত্যেরও চিহ্ন হতে পারে। যেভাবে মেয়েরা হাঁটে, তাঁর নমনীয়তা, আশ্চর্য শ্রী দুর্বলের নয়। আমার সন্দেহ বিশ্বাসে পরিণত হল নাচ দেখে।

এ দেশে আসবার জন্য তৈরী হয়েছিলাম নৃত্য সম্বন্ধে বই পড়ে এবং স্থাপত্যের ফোটো দেখে। এক রবীন্দ্রনাথই এই নৃত্যের অন্তরাত্মার সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। এমন অপূর্ব সৌকুমার্য কোনো নাচেই দেখিনি। চার ধরনের নাচ দেখলাম। দুটি অত্যন্ত বলিষ্ঠ, যুদ্ধ এবং আত্মরক্ষা সংক্রান্ত। লোকনৃত্যের শক্তিমত্তা রয়েছে, কিন্তু স্থূলতা নেই। ছাঁদের আকারে রীতিবদ্ধ না হলে আর্ট হয় না। লোকনৃত্য, লোকসংগীত, লোকশিক্ষা নিয়ে মাতামাতির মধ্যে সজীব রুচির চেয়ে শহর সুলভ ক্লান্তিরই পরিচয় বেশী। যা দেখলাম, তা লোক-শিল্প নয়।

যুদ্ধের নাচটি সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ায় এক রাজার কল্পনা। ছুরি নিয়ে নাচ আততায়ীর হাত থেকে আত্মরক্ষার নাচ নয়, আক্রমণের নয়। এইটিই বোধ হয় এদের জাতিগত বৈশিষ্ট্য। হাতে লাল কাপড় (স্কার্ফ), পরনে লুঙ্গী, মাথায় ফাট্টা বাঁধা—গ্রামের পোশাক। কিন্তু পদক্ষেপগুলো বিধিবৎ। মুখে চোখে সব রকমের ভাব। কিন্তু সেগুলোও আমাদের রস-শাস্ত্রে বর্ণিত ভাবের মতন। রাজার পোশাক রঙীন, অথচ সুরুচিসম্পন্ন। সুন্দানীজ্ নৃত্য দুটিঃ রাজকুমারীদের নৃত্য ও পদ্মদীঘির ধারে স্বপন—দুটি ব্যালে। বলশই থিয়েটারে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ব্যালে দেখেছি। প্রযোজনা বাদ দিলে এই দুটি নাচ কোনো অংশে শ্রেষ্ঠ রুশ ব্যালের চেয়ে খাটো নয়। বরঞ্চ আরও পেলব, আরও সুকুমার মনে হোলো। আঙ্গুল, চোখ, হাতের ভঙ্গির ব্যঞ্জনা আরও সূক্ষ্ম, আরও গভীর মনে হোলো। স্কন্ধ ও পায়ের কাজ কম—এখানে কথকের বাহাদুরী। নৃত্যের ভূমি ভারতনৃত্যের নিশ্চয়, কিন্তু ব্যালে হিসেবে কথাকলির চেয়ে আরোও পরিপাটি। ভারতনৃত্যের কম্পোজিশন যেন একটি বন্ধ বৃত্ত, প্রত্যেকটি স্ব সম্পূর্ণ, বন্দেশ আঁটসাঁট, পান থেকে চুন খসবার জো নেই। এ-নৃত্য খোলা—পরাবৃত্ত। তাই মন উধাও হয়ে গেল।

দেশবাসী হয়ত বিশ্বাস করবেন না, কিন্তু আমার বিশ্বাস হয়েছে যে আমাদের প্রচলিত নৃত্যপদ্ধতি এর চেয়ে অনেক অপটু, অনেক কাঁচা। আমাদের আকাডেমি যব ও বালিদ্বীপ থেকে একদল কলাবিদ্ আনালে দেশের বহু ছাত্রছাত্রী সত্যকারের নাচ শিখতে পারবে। আমাদের নতুন নাচ অনেক ক্ষেত্রেই গানের অবয়ব-সংস্থান। তাও সংস্থান পুরোপুরি নয়, বিকৃত দেহ-ভঙ্গ মাত্র। হয় এঁদের একদল ভারতবর্ষে আসুন, না হয় আমাদের একদল এখানে বছর তিনেক এসে থাকুন, ও প্রকৃতি-পরিবেশে শিখুন। ইন্দোনেশিয়ার নৃত্যে বহু বৈচিত্র্য আছে। এক-একটি দ্বীপে এক ধরনের নাচ গড়ে উঠেছে। তা ছাড় শ্যাম, বর্মা, কাম্বোডিয়া থেকে অনেক পদ্ধতি এই দ্বীপপুঞ্জে একত্রে বসবাস করছে। সংস্কৃতির দিক থেকে ইন্দোনেশিয় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভূমিখণ্ডের অঙ্গ কিন্তু অঙ্গ হয়েও স্বাধীন। হিন্দু মুসলমান-বৌদ্ধ কৃষ্টির এমন সমাবেশের তুলনা নেই। সমাজতাত্ত্বিকের স্বর্গ। দশ পনের দিনে এতো বড়ো, এতো দিনের সভ্যতার সমন্বয় কি বোঝা যায়! আবার আসবার সুযোগ কিছুতেই হবে না।

এদের অর্কেস্ট্রেশন কিন্তু অ-পরিণত। সবগুলোই যেন তিলঙ না হয় মালশ্রী। মাত্র পাঁচটি স্বর; কোমলের মধ্যে কেবল কোমল নিখাদ। প্রায় সবই ব্রাস্, একটা বাঁশের বাঁশি, আর খাড় বেহালা, আর একটা বড় ড্রাম। একঘেয়ে লাগল।

একটা নতুন পরীক্ষা করছে বাঁশের যন্ত্র দিয়ে, অথচ ফুঁ দিচ্ছে না। তি চারটে মাথা তেরচা করে কাটা বাঁশ, নীচে বাঁশ দিয়ে জোড়া—সেইটের গর্ত দিয়ে একটা কাঁণ্ড নাড়ে। এক একটি যন্ত্র এক একটি স্বরের, যেমন সা রে গা ইত্যাদি কারুর হাতে দুটো—মোটা স্বরের। প্রা জন পনের মেয়ে একত্রে বাজাল। প্রথম সুর জাতীয় সঙ্গীত, দ্বিতীয়টি গেরিলা গান—বীরের গৃহ-প্রত্যাবর্তন। কম্পোজিশন হিসেবে খাসা, কিন্তু বৈচিত্র্য নেই। এদের যুদ্ধের গানও নমনীয়, পেলব। সকলেই আগ্রহ দেখালেন। কিন্তু স্কার্ট পরে কেন? তাও সবুজ! ব্যান্ড মাস্টারের কি দরকার ছিল। কালো কো পরা আবার! ঐ একটি মাত্র ভিন্নরুচির পরিচয় পেলাম!

২৬।৮।৫৫

জাকর্তায় সরকারী কর্তৃপক্ষেরা খু যত্ন করলেন। আমাদের ভারতীয় দূ তায়েবজীর সঙ্গে দেখা হোলো। এখানে বেশ জনপ্রিয় হয়েছেন। অনেক ক হোলো, বিদগ্ধ পুরুষ। ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের সজ্ঞানতা অত কম বলে আক্ষেপ করলেন। ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করলাম। আমার ইম্প্রেশ্যনগুলি নিয়ে লিখতে অনুরোধ করলেন।

দেশী চিত্রকরের আঁকা খানকয়েক পশ্চিমী ঢঙের ছবি দেখলাম। র লাগাতে এবং বাস্তব সত্য এরা আঁকে

ভয় পায় না। দুজনেই মুসলমান। এখানে প্রায় সকলেই মুসলমান। কিন্তু আমাদের পরিচিত মুসলিম লীগের মুসলমান নয়। (একটা দার-উল-ইসলাম গড়ে উঠছে।)

কো-অপারেটিভ সোসাইটির রেজিস্ট্রার রহিম সাহেব অত্যন্ত কর্মিষ্ঠ লোক। বিস্তর স্ট্যাটিস্টিক্‌স্ ঘাঁটা গেল।

প্ল্যানিং দপ্তরে গেলাম। শুনলাম অনেকটা আমাদের পরিকল্পনার ছকে ঢালা। অবশ্য অদল-বদল করা হয়েছে। তিনটি বিষয় নিয়ে আলোচনা হোলোঃ (১) মুদ্রাস্ফীতি ও তার ফলে কালো-বাজার, (২) শিপিং ও ট্রান্সপোর্টঃ জাতীয় আয়ের এক-চতুর্থাংশ খরচ করা হবে। (৩) ব্যালেন্স অব্ পেমেন্টের অবস্থা—ওদের ঘাটতি বাজেট চলছে। সরকারী খরচ কমাবার প্রয়োজন ভীষণ। এতো ফালতু লোক রাখলে চলবে না শুনলাম। অথচ কমাতে গেলে ভোট পাওয়া যাবে না। ম্যান-পাওয়ার বাজেট ও সেন্সস অব প্রোডাকশ্যনের কাজ কিছু কিছু আরম্ভ হয়েছে। ওদের সমস্যা আমাদের চেয়ে ঢের বেশী মারাত্মক। হেগ কনভেনশ্যন বদলাতেই হবে। এদের 'ইকনমি'র টুঁটি চেপে রেখেছে ঐ কনভেন-শ্যন। নতুন অর্থমন্ত্রী ডাঃ সুমিত্রো। এক-জন ব্রিলিয়ান্ট অর্থনীতিজ্ঞ। ট্রিবার্গেনের ছাত্র। দেখা যাক কি করেন। ডাঃ হাট্টাকে কো-অপারেশনের জনক বলে লোকে। ডাঃ সুমিত্রোকে 'প্ল্যানিং-এর পিতা' বলতে শুরু হবে কবে?

* * *

এদের মধ্যে এখনও বিরোধী মনো-ভাব প্রবল,—গেরিলা যুদ্ধের ফলই তাই। নঞর্থক মনোভাবকে সদর্থক করে তোলাই এদের প্রধান কাজ। একমাত্র প্ল্যানিং-এর দ্বারাই সম্ভব। দুজন প্রাক্তন মন্ত্রীকে আটক রাখবার সঙ্গে সঙ্গে দাম কমতে আরম্ভ হয়েছে। যথেষ্ট নয়। আমদানির র‍্যাকেট ভাঙতেই হবে।

২৮।৮।৫৫

সিঙ্গাপুরে রাত কাটিয়ে পরের দিন দুপুরে কলোম্বো। ডাঃ ভানু দাশগুপ্তের বাড়ি উঠলাম। পুরানো লক্ষ্মৌএর বন্ধু। একসঙ্গে চাকরী করেছি, টেনিস খেলেছি। গত চার পাঁচ বছর সিংহল বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরী ছেড়ে স্টেট সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের অর্থনীতিক গবেষণার ডিরেক্টর হয়েছেন। সিংহলের সরকার এঁকে বিশিষ্ট নাগরিক অধিকার দিয়েছেন। প্রায় সাতাশ বৎসর আছেন, ও বেশ ভালোই আছেন। তাঁর মা'র বয়স ৮৩ বৎসর, চশমা পরেন না, নিজে বাঙলা রান্না রেঁধে খাওয়ালেন। অমৃত লাগল। খালের মাছের ঝাল, লাউ-চিংড়ি, সুক্তো, পেঁপে আর আদা দিয়ে ডাল। মা-ছেলের ভাব কী মিষ্টি! একটি বাঙালী (পূর্ববঙ্গীয়) পরিবারের সঙ্গে আলাপ হোলো। ভাষা বুঝতে কষ্ট হলেও তাঁদের মিষ্ট স্বভাব হৃদয়ঙ্গম করতে কষ্ট হোলো না। আরেকজন বাঙালী (পূর্ব-বঙ্গীয়) ও কয়েকজন সিন্ধী ব্যবসায়ীর সঙ্গে পরিচয়ে অনেক খবর পেলাম।

* * *

এরা বড় সাহেব হয়ে গেছে। পাড়া-গেঁয়ে চাষীদের বাড়িতেও চেয়ার-টেবিল, পর্দা টাঙান, ঝক্ ঝক্ তর্ তর্ করছে। যা রোজগার করে তার চেয়ে বেশী খরচ করে এরা। একটু প্রকটভাবে কন-জাম্পশনে বিশ্বাসী। আমদানী সামগ্রী অত্যন্ত সস্তা। ভারতবাসীর পক্ষে সুখের জায়গা নয়। ভয়ানক খুনখারাপী হয়। যে-ক'জন সিংহলী মহিলার সঙ্গে পরিচয় হোলো, তাঁরা প্রত্যেকেই উচ্চশিক্ষিত ও অত্যন্ত দক্ষ। তারা মেম বনে যায়নি। অথচ টাইপিস্ট মেয়েও বিলেত যায়। এঁরাই যদি কিছু করতে পারেন।

* * *

গ্রামগুলো যেন পটে আঁকা ছবি। পুরানো মন্দির সংস্কার করে নতুন হয়েছে। চল্লিশ বৎসর আগে পুরোনোই ছিল। তবু চিনতে পারলাম।

* * *

'ইণ্টারন্যাশনাল অ্যালায়েন্স অব্ উইমেন'এর সুবর্ণ জয়ন্তীতে বক্তৃতা দিলাম ভারতীয় মহিলার অর্থনৈতিক অবস্থা নিয়ে। কিভাবে (অর্থাৎ ক্যাপি-ট্যালিজম্ কথাটি উচ্চারণ না করে) আমা-দের পারিবারিক জীবন ভাঙছে দেখালাম। একমাত্র নগরবাসী শ্রমিক-পরিবার আর শহুরে নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবার—এই দুটি নিয়ে বিচার করলাম। বক্তৃতার পর অনেকে প্রশ্ন করলেন। সিয়েরা লিয়ন, আইসল্যাণ্ড ইরাক, সুইডেন, পাকিস্তান-এর প্রতি-নিধিদের সতেজ বুদ্ধি দেখে অত্যন্ত খুশি হলাম। আমাদের লক্ষ্মী মেনন আগের দিন এমন সুন্দর বক্তৃতা দেন যে তাঁর সুখ্যাতিতে সকলে মুখর। আমি আশ্চর্য হইনি, কারণ তিনি আমার বহু পুরাতন বন্ধু।

* * *

ভারতের নেতৃত্ব সকলেই মানে। কিন্তু গোপনে, কোথায় যেন একটু হিংসাও রয়েছে। আমাদের বিনয়ী হতে হবে—একটু বেশী করে।

৩০।৮।৫৫

দেশের মাটিকে চুমু খেতে ইচ্ছে করছে। এতো অল্প দিনে অত দেশ ঘোরা, অত পরিশ্রম করা, অত বক্তৃতা দেওয়া, অত জনের সঙ্গে মেলামেশার অর্থ হয় না। হাওয়াই জাহাজ আমাদের 'আমেরিকা-নাইজ্' করে দেবে।

একটা বিশ্বাস নিয়ে ফিরলাম—ঔপনিবেশিক মনোভাবকে যেতেই হবে। এ ভূত ছাড়তেই হবে। ছাড়বার সময় ভূত হাত-পা ভেঙে দিয়ে যায়। তা যাক্—না হয় নুলো খোঁড়াই হয়ে থাকা যাবে। তবু ভূতগ্রস্ত অবস্থার চেয়ে ঢের ভালো। স্বাধীনতার দাম দিতেই হবে। দুর্নীতি একটা দাম, অনিশ্চয়তা আরেকটা দাম, রাজনৈতিক দলের প্রাচুর্য আরেকটা দাম। এ-সব দাম আমরা দিচ্ছি, দেব। কিন্তু তাড়াতাড়ি দিয়ে কাজে লাগাতে হবে। প্যাণ্ডোরার বাক্সকে রত্নগর্ভে পরিণত করতে হবে, প্রধানত নিজেদের সমবেত চেষ্টায়। নতুন বিদেশীর সাহায্য নিতে ভয় হয়। আর নয়!

* * *

ভারতের আত্মবিশ্বাস কিছু এসেছে। কিন্তু বিনয়ী হতেই হবে। আমাদের সংস্কৃতি এতদিন বাঁচিয়েছে, আরও কিছু দিন বাঁচালে মন্দ হয় না। ক্রমেই আমি ঐতিহ্যে বিশ্বাসী হয়ে পড়ছি, প্রাণের দায়ে। আমাদের 'ভ্যালুজ' বা মানগুলো মরেও মরছে না—এটা মস্ত কথা। ঐতিহ্যে দিক্-নির্ণয় নেই, কিন্তু প্রয়াসের সমর্থন আছে।

॥ কলকাতা ॥

ফোটোগ্রাফিক অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গল একটি সংগঠনধর্মী প্রতিষ্ঠান। সম্প্রতি এক নম্বর চৌরঙ্গী টেরাসে উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানের সভ্যবৃন্দের ছবির প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। যদিচ এটি কোনো আন্তর্জাতিক পর্যায়ের প্রদর্শনী নয়, তবু অনেকগুলি উচ্চশ্রেণীর ছবির সমাবেশ ঘটেছিল। এক কথায় বলা যায় যে, দর্শকের সময়ের অপব্যয় হয়নি। আলাদা-আলাদাভাবে বিচার করলে প্রত্যেকটি ছবিই যে প্রথমশ্রেণীর তা বলা চলে না, বা এমনও বলা যায় যে কিছু কিছু ছবি প্রদর্শনযোগ্য হয়নি—তৎসত্ত্বেও একথা ঠিক যে প্রদর্শনীটির সামগ্রিক মূল্য, যেকোনো সর্বভারতীয় প্রদর্শনীর শিল্পমানের বোধ হয় সমকক্ষ। একটি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি দল হিসেবে এই প্রতিষ্ঠান সত্যিই প্রশংসার যোগ্য। এ বছরের প্রদর্শনীতে কলকাতার কয়েকজন খ্যাতিমান ক্যামেরাম্যানের অনুপস্থিতি লক্ষ্য করলাম, যেমন, এরল এ নিস্ কিংবা আহ্‌মেদ আলি, চেম্বারস। বি কে সান্যাল, বি কে মুখার্জি, পি মিত্র, বি সি ধবলদেব, জি এস ভট্টাচার্য, স্নেহাংশু সেন প্রভৃতি আলোকচিত্র-শিল্পীরা এই প্রদর্শনীতে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সত্যই তাঁরা ক্যামেরার জানালা দিয়ে কয়েকটি অবিস্মরণীয় মুহূর্ত স্থায়ী করে তুলেছেন।

চাহনী—দেবকুমার সরকার

বিশেষ ক'রে পি মিত্রের A Buffalo Ph D (৪৬ নং) ছবিখানিতে মহিষের কপালের শিরার স্ফুরণ যেন চোখ দিয়ে ছোঁয়া যায়। বি কে মুখার্জির একখানি মাত্র ছবি View Point (৫২)—এতে তাঁর বিষয়বস্তু নির্বাচনের দক্ষতা, পরিবেশ রচনার সরল অথচ সুন্দর মানসিকতা সবকিছুই সহজে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বি কে সান্যালের ছবিতে শিল্পীর মনের দুটি ধারা।—দুখানি ছবি সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী। প্রথম ছবি সংকেতময়ী (৭৬) রহস্যের গহনগভীর মনোলোকে দর্শককে টেনে নিয়ে যায়। আর তার পাশেই ওয়াটগঞ্জের পথের (৭৭) ছবি—সেখানে স্বপ্নের দ্বিতীয় ছবিখানিকে যদি প্রথমটির পরিপ্রেক্ষিতে পরিপূরক হিসেবে দেখে তবেই এর মূল্য স্বীকৃত হবে। নতুবা পৃথক ছবি হিসেবে বিচারে সান্যাল মশায়ের দ্বিতীয় ছবিটি শিল্পসৃষ্টির নিদর্শন হিসেবে টেঁকে না। এই প্রদর্শনীতে প্রায় আশীজন আলোকচিত্র-শিল্পীর ছবি রয়েছে। কলকাতা থেকে প্রদর্শনীর ছবিগুলি জামসেদপুরে যাচ্ছে, পি এ বি-র টাটানগর গ্রুপ সেখানে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করেছেন।

—দেবদত্ত

বর্ষায় পথ—অমৃতময় মুখোপাধ্যায়

॥ দিল্লী ॥

সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে তিনটি প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে। প্রথম, তৃতীয় আন্তর্জাতিক ফটোগ্রাফ প্রদর্শনী—দিল্লী ক্যামেরা সোসাইটির উদ্যোগে ইহা নিখিল ভারত শিল্প ও চারুকলা সমিতিতে অনুষ্ঠিত হয় ও শ্রীহুমায়ুন কবীর বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সম্মুখে ইহার উদ্বোধন করেন। দ্বিতীয় সামারফিল্ড স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের চিত্রপ্রদর্শনী—ইন্দোনেশীয়ার ভারতস্থিত দূত ডাঃ এল এন পালার ইহার উদ্বোধন করেন। তৃতীয় জাপানী কাষ্ঠখোদাই প্রতিলিপি প্রদর্শনী—জাপানের ভারতস্থিত দূত

সিসিফাস—অচ্ছ্যুনয় ফর (১৪ বৎসর)

মহোদয় মডার্ন স্কুল আর্ট গ্যালারিতে ইহার উদ্বোধন করেন।

ফটোগ্রাফ প্রদর্শনীতে পৃথিবীর ৩৫টি দেশ হইতে ৫০৬জন ফটোশিল্পীর নিকট হইতে সর্বসমেত ১৮৫০টি ফটোগ্রাফ কর্তৃপক্ষদের হস্তগত হয় ও তন্মধ্যে মাত্র ২৫৬ খানি প্রদর্শনীতে পেশ করা হয়। সুতরাং মনোনয়ন ব্যাপারে যে কর্তৃপক্ষগণ অতিমাত্রায় সজাগ ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই—শুধু তাহাই নহে অধিকাংশ ফটোগ্রাফই সুনির্বাচিত হইয়াছে।

কয়েকটি কারণে এবারে আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী উল্লেখযোগ্য। প্রথমত, অধিকাংশ দেশের ফটোশিল্পীই বিষয় নির্বাচনে নূতনত্ব দেখাইয়াছেন। দ্বিতীয়ত, ক্যামেরা ব্যবহার প্রণালীর মধ্য দিয়া কয়েকজন কুশলতার পরিচয় দিয়াছেন। সর্বোপরি ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে আগত ফটোগ্রাফ গুলিতে সেই সেই দেশের নিজস্ব রুচি ও চিন্তাধারার নিদর্শন পাওয়া যায়।

সর্বপ্রথমেই হংকং-এর ফটোগ্রাফগুলি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নূতন দৃষ্টিভঙ্গি ও সম্পূর্ণ নূতন প্রণালীর দিক দিয়া এই দেশের প্রায় অধিকাংশ ফটোগ্রাফে মৌলিকতা ও শিল্প কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়। "ঠাকুরদার গল্প" (ডোসি উ) "রৌদ্রালোকে ভ্রমণ" (কে সি চিউ) ও "গ্রীষ্মের আনন্দ" (উন সোম লিউ) বিশেষভাবে চোখে পড়ে।

আমেরিকার ফটোগ্রাফগুলির মধ্যে সর্বপ্রথমেই "সিটি ডন"-এর উল্লেখ করিতে হয়। শত শত গগনচুম্বী ইমারত-শোভিত বিরাট শহর সূর্যালোকের প্রথম স্পর্শে জাগিয়া উঠিতেছে—আলোছায়ার অপূর্ব সংমিশ্রণে শার্লি এম হল এই রূপটি প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার পর "নবজীবন" (চার্লস জন্সন) ও "টম নিমবোর্গ"-এর (আর আর ভ্যালেন্টাইন) নাম করা যাইতে পারে। অন্যান্য ফটোগ্রাফের মধ্যে "পাইপ মুখে বৃদ্ধা স্ত্রীলোক" (ফুচ লিউ এন—মালয়) "ক্লাস ব্লোয়ার" (ডাঃ গারহার্ড গ্রায়েব—জার্মানি) "কলোশিয়াম" (এস কেপার—জার্মানি) "স্প্রিং ক্লিনিং" (বহুস্ল্যাভ বুবিয়ান — চেকোশ্লোভাকিয়া) "হ্রদের উপকূলে সন্ধ্যা" (এইচ আর থর্নটন—ইংলণ্ড) "ধাঁধা" (ফ্রেডারিক পেস্লো—স্কটল্যান্ড) আপনাপন বৈশিষ্ট্যের জন্য উল্লেখযোগ্য। দুঃখের বিষয় ভারতবর্ষ হইতে মনোনীত ফটোগ্রাফগুলির মানদণ্ড খুব উচ্চ বলিয়া মনে হয় না—যদিও কয়েকজন রঙীন ফটোগ্রাফীর নিদর্শনও পেশ করিয়াছেন। এই বিভাগের মধ্যে সর্বপ্রথমেই এইচ টি কিং-এর "প্রাতঃকাল" দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নীরোদ রায়ের "বাঙলার পল্লীপ্রান্তে" ভালই লাগে, তথাপি তাঁহার নিকট হইতে অধিকতর উচ্চাঙ্গের ফটো আশা করিয়াছিলাম। এতদ্ব্যতীত "কাশ্মীরী রূপসী" (রাজেশ্বর বালী) "ডোদি তাল" (বলদেব কাপুর) "কুয়াশা" (কে বি মাথুর) ও "ধূলির

কপোত দম্পতি—(বের্নোডিক্ট র‍্যাফেল (ফটোগ্রাফ প্রদর্শনী)

শেবা—ইচির উসাই হিরোশিগে (জাপানী প্রতিলিপি প্রদর্শনী)

আবরণ"-এর (ডাঃ কে এল কোঠারী) নাম করা যায়।

সামারফিল্ড স্কুলের ছাত্রছাত্রীগণ অঙ্কিত ১০৭ খানি চিত্র ও ১৫টি কাষ্ঠ-খোদাইয়ের নমুনা প্রদর্শনীতে পেশ করা হয়। এই স্কুল কর্তৃপক্ষ প্রথম প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করেন ১৯৫৩ সালে। এবারকার প্রদর্শনী দেখিলেই বুঝা যায় যে, ছাত্র-ছাত্রীগণ যাহাতে আপনাপন রুচি ও কল্পনা অনুযায়ী প্রাথমিক অঙ্কন ও বর্ণ ব্যবহার করিতে পারে সে বিষয়ে তাঁহারা বিশেষ সচেতন হইয়াছেন। অধিকাংশ রচনাই সুনির্বাচিত বিশেষ করিয়া কয়েকটি চিত্রের মধ্য দিয়া মৌলিক চিন্তা-ধারারও পরিচয় পাওয়া যায়। লক্ষ্য করি-বার বিষয় এই যে, প্রত্যেকেই আপনাপন কল্পনা অনুযায়ী বিষয়বস্তু মনোনয়ন করিয়াছে ও আপনার খেয়ালমত সেগুলিকে বিভিন্ন বর্ণে সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে।

সর্বপ্রথমেই অশোক সচদেব-এর (১১ বৎসর) "নিজ প্রতিকৃতি" চোখে পড়ে। ১১ বৎসরের বালকের পক্ষে এ হেন প্রচেষ্টা সত্যই প্রশংসনীয়। ইহার পরেই কুমারী জীবন সাউণ্ডের "প্রার্থনা" চিত্র-খানি উল্লেখযোগ্য। ১৩ বৎসরের বালিকার ব্যক্তিত্ব যেন এই রচনাটির মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সুষ্ঠু অঙ্কনপদ্ধতি ও বর্ণনা-ভঙ্গির দিক দিয়া কুমারী উষা ভুটানীর (১২) "ব্যাক উইথ ওয়াটার" শিবনন্দনের (১২) "নৌকা" যশপাল সিংহের (১২) "প্রাতঃকাল"—এর নাম করা যাইতে পারে। স্টাডির মধ্যে কুমারী সুষমা ধাওয়ানের (১২) "মনুমেণ্ট" ও দেবেন্দ্র সিরোথিয়ার "স্টিল লাইফ" উল্লেখযোগ্য। রাজচৌধুরী (১৫) ও ইন্দ্রমোহিনী (১৫) যথাক্রমে "আমার সতীর্থ" ও "প্রাকৃতিক দৃশ্যে" যথেষ্ট মুনশীয়ানার পরিচয় দিয়াছেন।

কিন্তু কয়েকটি ছাত্র কাষ্টখোদাইয়ের যে নিদর্শন পেশ করিয়াছে, তাহা সত্যই অপূর্ব। কঠিন ও একখণ্ড কাষ্ঠফলককে ক্রমাগত খোদাই করিয়া মানুষের দৈনন্দিন জীবনের এক-একটি বিশিষ্ট রূপকে ইহারা অতি অপরূপভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছে। বস্তুতপক্ষে অচ্ছু নায়ারের "সিসিফাস" ও রণজিৎ তলোয়ারের "হেল্পিং হ্যাণ্ডের" আয়তনিক সমতা ও প্রকাশভঙ্গিমার দিক দিয়া সত্যই প্রশংসার দাবী করিতে পারে। সুধীর দাসের "ষাঁড়ও সজীবতা ও বলিষ্ঠতার প্রতীক। মোটের উপর সামার-ফিল্ড স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের রচনা ও কাষ্ঠ-খোদাই সত্যই আশাপ্রদ এবং এজন্য এই বিদ্যালয়ের আর্ট শিক্ষক, শ্রীক্ষিতীন চক্রবর্তীর কৃতিত্ব কম নহে।

কাষ্টখোদাইশিল্প যে কত সূক্ষ্ম ও কারুকার্যমণ্ডিত হইতে পারে, তাহা জাপানী প্রতিলিপি প্রদর্শনী না দেখিলে সঠিক বুঝা যাইত না। এই অপূর্ব শিল্প দেখিবার সুযোগ দিয়া ইউনেস্কো তথা দিল্লী শিল্পিচক্র চিত্ররসিকবর্গের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

জাপানী কাষ্ঠখোদাই সাধারণত "উকিও—এ" নামে পরিচিত। ইহা জাপানের নিজস্ব শিল্প—জাপানী চিত্র-কলা হইতে ইহার জন্ম ও আনুমানিক দশম শতাব্দী হইতে ইহার প্রচলন হয়। সপ্তদশ শতাব্দী হইতে এবং বিশেষ করিয়া, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে "নিশিকি—এ" অর্থাৎ বহুবর্ণ কাষ্ঠখোদাই মুদ্রণপ্রণালী আবিষ্কৃত হইবার পর হইতেই এই শিল্প জনপ্রিয়তা অর্জন করে। সর্বাপেক্ষা লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ইউরোপে এই শিল্প সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শুধু তাহাই নহে ঐ দেশের খ্যাতনামা বহু ইম্প্রেশনিস্ট শিল্পী পর্যন্ত জাপানের এই একান্ত নিজস্ব শিল্পকলা হইতে প্রেরণা লাভ করেন এবং তাঁহাদের অনেকের রচনাতেই এই জাপানী শিল্পের প্রভাব লক্ষিত হয়।

এই প্রদর্শনীটি বিশেভাবে লক্ষ্য করিলে একটি জিনিস চোখে পড়ে এবং তাহা মূল কাষ্ঠখোদাই হইতে প্রতিলিপি গ্রহণ করিবার সুনিপুণ পদ্ধতি। প্রকৃত-পক্ষে প্রতিলিপিগুলির অধিকাংশই রঙীন—অতি সূক্ষ্ম রেখা-সৌষ্ঠব ও বিশিষ্ট অঙ্কনপদ্ধতি দেখিলে সত্যই এগুলিকে মৌলিক বলিয়া ভ্রম হয়। কাঠের ব্লক হইতে আরম্ভ করিয়া মুদ্রণপ্রণালী পর্যন্ত এগুলি জাপানের একান্ত নিজস্ব রীতিতে তৈয়ারী—সুতরাং প্রতিলিপির মধ্য দিয়া প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে মৌলিক খোদাইএর সর্বপ্রকার বিশেষত্বই ধরা পড়িয়াছে।

দুইশত বৎসরের বিভিন্ন খ্যাতনামা শিল্পীর ১০০ শত নিদর্শন প্রদর্শনীতে পেশ করা হয়। দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন চিত্র হইতে আরম্ভ করিয়া সাহিত্য ও রস, পশুজীবন ও পোশাক-পরিচ্ছদের নানা বর্ণবহুল পারিপাট্য এই কাষ্ঠখোদাইয়ের মধ্য দিয়া রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে। বিশেষ করিয়া জাপানী নাটকের নানা দৃশ্য, নট ও নটীর বিভিন্ন ভঙ্গি ও অভিব্যক্তি অপরূপ প্রকাশভঙ্গিমায় ইহা-দের মধ্যে সজীবতা লাভ করিয়াছে। অতি সূক্ষ্ম রেখাছন্দ, সাবলীল ও স্বাভাবিক বর্ণমাধুর্য এবং নিখুঁত অঙ্কনপদ্ধতির দিক দিয়া এই প্রতিলিপিগুলি শিল্প-

জগতের শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। বিশেষ করিয়া কাট্সুশিকা হোকুসাই (১৭৬০—১৮৪৯) ও ইচির-উসাই হিরোশিগের (১৭৯৭—১৮৫৮) রচনাগুলি অপূর্ব। হোকুশাইয়ের "উশি-গাফুচির প্রাকৃতিক দৃশ্য" "ফাইন এ্যান্ড ব্রীজ" "সমুদ্র তরঙ্গ হইতে ফুজিয়ামা" ও হিরোশিগের "ওহাশি পুলে বৃষ্টি" "শেবা" ও "য়োগোকুতে সন্ধ্যার চন্দ্র" অনবদ্য সৃষ্টি। কমনীয়তার দিক হইতে সুজুকি হারুনোবু ও তোরি কিয়ো-হিরোর রচনাগুলি উল্লেখযোগ্য। স্বল্প রেখা মাধ্যমে নট-নটীর বিভিন্ন অভিব্যক্তি ব্যঞ্জনার জন্য কাত্সুকাওয়া শুনকো, তোসুসাই শারাফু ও কাবুকিদো এন-কিরোর নিদর্শনগুলি বিশেষভাবে চোখে পড়ে।

মোটের উপর বহুদিন যাবৎ এহেন উচ্চাঙ্গের প্রদর্শনী দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হয় নাই। দুঃখের বিষয় প্রদর্শনীটি মাত্র তিন চার দিন খোলা ছিল। শিল্পিচক্রের নিকট অনুরোধ ভবিষ্যতে এহেন প্রদর্শনীর অনুষ্ঠানকালে তাঁহারা যেন ইহার মেয়াদ বৃদ্ধি করিয়া দেন—তাহা হইলে তাঁহারা সত্যই রসিকজনের কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন।

—চিত্রপ্রিয়

॥ বোম্বাই ॥

শান্তিনিকেতন কলাভবনের অধ্যাপক শ্রীসুখময় মিত্র প্রথম একক চিত্রপ্রদর্শনী হয়ে গেল এখানকার "আর্টিস্টস্ এইড্ ফান্ড সেণ্টার হল"এ (৭-১৪ নবেম্বর)। স্থানীয় শিল্পী ও কলারসিকদের উপস্থিতিতে প্রদর্শনীর উদ্বোধন করলেন এখানকার সর্ববৃহৎ সংবাদ ও সাময়িকপত্র-গোষ্ঠীর কর্মকর্তা শ্রী পি কে রায়। আচার্য নন্দলালের শিষ্য ও নবীনশিল্পী এ অঞ্চলে সম্পূর্ণ অপরিচিত হলেও স্থানীয় শিল্পীদের সহযোগিতায় প্রদর্শনী খুবই সাফল্যমণ্ডিত হয়। কলাভবনে ছাত্রাবস্থায় হরিপুরা কংগ্রেসের মণ্ডপ ইত্যাদির অলংকরণে ও বরোদায় "কীর্তিমন্দির"-এর প্রাচীরচিত্র অঙ্কনে আচার্য নন্দলাল [illegible] মিত্রকে তাঁর সহযোগিতা করার [illegible] নির্বাচন করেন। তাছাড়া পরবর্তী-[illegible] রাজঘাটে প্রথম সর্বোদয় [illegible], ১৯৫২ সালের অল্

খেলা —সুখময় মিত্র

ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির কলিকাতা অধি-বেশনের মণ্ডপ, কল্যাণী কংগ্রেসের মণ্ডপ, তোরণ ইত্যাদির অলংকরণেও অংশ গ্রহণ করেন। কয়েক বৎসর তিনি দাক্ষিণ ভারতের মদনপল্লী থিওসফিক্যাল সোসাইটি, আড়িয়ার মণ্টেসরী ট্রেনিং সেণ্টার ও কলা-ক্ষেত্র এবং আমেদাবাদেও শিক্ষকরূপে সুনাম অর্জন করেন। এই সময় তিনি শ্রীমতী রুক্মিণী অরুণ্ডেল, মাদাম মারিয়া মণ্টেসরী, প্রফেসর জেমস্ কাজিনস্ ও শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসেন।

এই প্রদর্শনীতে শ্রীসুখময় মিত্রের ৬৫টি রচনা প্রদর্শিত হয়েছিল, জলরঙ ও টেম্পারার ছবি, লিনোকাট, উডকাট্ ইত্যাদি। শ্রীসুখময়ের রচনায়, বিশেষ করে নৈসর্গিক দৃশ্যচিত্রে পল্লী বাঙলার একটি স্নিগ্ধ রূপ প্রকাশ পেয়েছে এবং প্রকৃতির প্রতি তাঁর গভীর ভালবাসা বিশেষভাবে ধরা দিয়েছে। রঙের ব্যবহারে তিনি চমক-প্রদ বা চটকদার কিছু করেননি, যাতে তাঁর সহজ সরল শিল্পীমনের, ব্যক্তিত্বের ও আন্তরিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর দু একটি টেম্পারাচিত্রে উজ্জ্বল রঙ-এর ব্যবহার সার্থক হয়েছে, যেমন "শরৎকাল" ছবিটিতে (১৯ নং)। "বাস্তুহারা বিধবা" ছবিটি খুবই হৃদয়গ্রাহী। চারজন বাস্তু-হারা নিঃসম্বল মহিলার মুখের অভি-ব্যক্তিতে তাদের বেদনা ফুটে উঠেছে, কিন্তু সে বেদনার মধ্যে কোথাও কোন অনুযোগ বা হতাশা নেই। এই প্রদর্শনীর স্বল্প-সংখ্যক লিনোকাট ও উডকাট, সকলের নিকট খুবই সমাদৃত হয়, অংকনের বলিষ্ঠতার জন্য এবং প্রদর্শনীতে আরও অধিকসংখ্যক লিনোকাট ও উডকাট রাখা উচিত ছিল। প্রদর্শনীর কয়েকটি ছবিতে, আকৃতি অংকনে শিল্পীর দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে এবং খুবসম্ভব এই কয়েকটি ছবি শিল্পীর ছাত্রাবস্থায় অংকিত এবং আমার মনে হয় তা বাদ দিলেই ভাল হত। সুখময়ের বিভিন্ন রচনার বিষয়বস্তু ও অংকনের বৈচিত্র্যের জন্য প্রদর্শনীটি খুবই কৌতূহলোদ্দীপক হয়।

—চিত্রসেন

মালা হাসপতালে বেরোবার জন্যে তৈরি হচ্ছিল। রাত্রে ডিউটি থাকলে খাওয়াদাওয়া সেরে সন্ধ্যার আগে আগেই বেরিয়ে পড়ে। ওকে তাড়াতাড়ি রওয়ানা করিয়ে দেওয়ার গরজ নির্মলারই বেশি। তিনি বলেন, 'যেতে যখন হবেই একটু আগে বেরোনোই ভালো। বেশি রাত্রে চলাফেরা করা ভালো না বাপু। বিপদ-আপদ ঘটতে আর কতক্ষণ লাগে।'

অবশ্য বেশি রাতকে নির্মলার যত ভয়, মালার তেমন ভয় নেই। একা একা চলাফেরা করা তার অভ্যাস হয়ে গেছে। এখান থেকে রাত আটটায় শেষ বাস ছাড়ে। তার ঘণ্টাখানেক আগে থেকেই পথে লোক-চলাচল প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। কাঁচা মাটির রাস্তার দু'দিকের ঝোপ-ঝাড়ের ফাঁক দিয়ে গৃহস্থবাড়ির ক্ষীণ আলোর রেখা অবশ্য মাঝে মাঝে চোখে পড়ে। কিন্তু তাতে নিঃসঙ্গ পথের সবখানি অন্ধকার কাটে না। একবার কলোনীর কয়েকটি বকাটে ছোকরা মালার পিছু নিয়েছিল—অশ্লীল ভঙ্গিতে শিস দিতে দিতে অনেকক্ষণ অবধি গিয়েছিল সঙ্গে সঙ্গে। সেকথা কানে যাওয়ার পর নির্মলা মেয়েকে আর কিছুতেই বাস-স্টপ পর্যন্ত একা যেতে দেন না। তিনি বলেন, 'না বাপু, অত বেশি সাহসে দরকার নেই তোমার। তুমি হয় বেলা থাকতে যাও, নইলে বিশু-যীশুকে সঙ্গে নাও। ওরা টর্চ নিয়ে তোমাকে বড় রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসুক।'

ছোট ভাই দুটি অবশ্য তাকে এগিয়ে দিতে পারলেই খুশী। কিন্তু মালার তা ইচ্ছা নয়। ওরা এই অজুহাতে পড়া কামাই করুক, কি সন্ধ্যার পর বাড়ির বাইরে থেকে কলোনীর বকাটে ছেলেদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে বেড়াক, তা মালা চায় না। একবার বেরোতে দিলে ওরা কি আর সহজে বাড়িতে ফিরবে? তার চেয়ে মালা একটু বেলা থাকতে বেরোবে, সেই ভালো।

শাড়ি পালটে, ছোট আয়নাখানার সামনে দাঁড়িয়ে মুখে পাউডারের পাফটা একটু বুলিয়ে নিচ্ছিল মালা—বিশু, যীশু, রীণা প্রায় একসঙ্গে ছুটতে ছুটতে এসে খবর দিল—'দিদি, দিদি মণিমামা আজ আবার এক থলি আম নিয়ে এসেছে, দেখ এসে।'

মালা মুখ ফিরিয়ে একটু হেসে বলল, 'তোরাই দেখ। খাওয়ার ব্যাপারে এত লোভী হয়েছিস তোরা!'

'লোভ নেই কেবল শ্রীমতী মালার।'

বলতে বলতে মণিময় এসে ঘরে [illegible]

পঁয়তাল্লিশের কাছাকাছি। কিন্তু স্বাস্থ্য ভালো বলে অতটা মনে হয় না। পরণে খদ্দরের ধুতি-পাঞ্জাবী। মালার দিকে চেয়ে মণিময় একটু হেসে বলল, 'কি, সাজসজ্জা হচ্ছে বুঝি? ঘটাপটা তো খুব দেখছি।'

মণিময়ের এ ধরনের কথাবার্তায় মালা প্রথম প্রথম ভারি লজ্জা পেত। বয়সে অনেক বড়, সম্পর্কেও গুরুজন। তাঁর মুখে এরকম হাসিঠাট্টায় মালা অপ্রস্তুত হয়ে পড়ত গোড়ার দিকে। কিন্তু এখন শুনতে শুনতে মণিময়ের চালচলন দেখতে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে মালা। কোন সংকোচ নেই মনে। সে জানে, স্বভাবগম্ভীর মণিমামা তাদের সংস্পর্শে এলে অনেক লঘু হয়ে পড়েন। বয়সের গুরুত্ব, সম্পর্কের গুরুত্ব কিছুক্ষণের জন্যে সব ঝেড়ে ফেলে ভাগ্নে-ভাগ্নীদের সমবয়সী হতে চান যেন। শুধু মালা নয়, বিশু-যীশুরাও তা উপভোগ করে।

মণিময়ের কথার জবাবে মালা বলল, 'আমার সাজের আর কি ঘটাপটা দেখলেন মণিমামা—আমাদের স্টাফ-নার্স রাণীদির সাজসজ্জাটা যদি দেখতেন, আপনার মাথা ঘুরে যেত।'

নির্মলা কাছেই ছিলেন। মেয়ের কথা শুনতে পেয়ে তিনি তাকে ধমক দিয়ে উঠলেন, 'ছিঃ, ওসব কি ঠাট্টা মালা, মণি না তোর গুরুজন! তার সঙ্গে একি ঠাট্টা-তামাসা। আর মণি তোমাকেও বলি ভাই, ওদের আস্কারা দিয়ে দিয়ে তুমি একেবারে কাঁধে তুলে ফেলেছ। ওরা এখন আর তোমাকে মোটে ভয়ই করে না।'

মণিময় হেসে বলল, 'না করে না করুক রাঙাদি, তার জন্যে আপনাকে অত ভাবতে হবে না। আমাকে ভয় করে এমন লোক অনেক আছে, ভালোবাসে তাদের সংখ্যাই বরং কম রাঙাদি।'

তক্তপোশের ওপর পা তুলে বসে মণিময় একটু হাসল।

বিশু-যীশু থলি থেকে আমগুলি ঢেলে ফেলে গুণে গুণে আলাদা করে রাখছিল, নির্মলা তাদের দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন, 'থাক থাক, তোমাদের আর বাঁটোয়ারা করতে হবে না, আমিই

ব বেটে দিয়ে আসব। এখন দয়া
য়ে পড়তে বস গিয়ে। পড়াশুনোর
র দিয়েও যদি কেউ হাঁটতে চায়।'

মায়ের ধমক খেয়ে মুখ ভার ক'রে
ভাই সেখান থেকে সরে গেল।

মণিময়ের দিকে তাকিয়ে নির্মলা
ললেন, 'ওটা তোমার বিনয়ের কথা
ণিময়। তোমার কাজের গুণে তোমাকে
শ্রদ্ধা করবার, ভালবাসবার মানুষের অভাব
ই। তবু ঘরে গেলে একেক সময়
াধ হয় ফাঁকা ফাঁকা লাগে। নিজের
উ-ছেলের কাছ থেকে যা পাওয়া যায়,
া কি আর কারো কাছে মেলে? শতজনে
ত করুক, শত দিক, তা মেলে না।
োমাকে অত ক'রে বললাম, বিয়ে কর।
া তো কিছুতেই শুনলে না। সময়মত
য়ে-থা করলে এতদিনে ঘর যে ভরে
েত।'

নির্মলার হঠাৎ খেয়াল হল মালা
াঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব শুনেছে। তিনি
ায়ের দিকে চেয়ে বললেন, 'তোর সময়
ল না মালা? আর রাত করছিস
েন? এর পর অতটা পথ একা একা
বি কি করে?'

মালা বলল, 'আমি ঠিক যেতে পারব
। তুমি আমার জন্যে ভেব না।'

নির্মলা বললেন, 'না আমি ভাবব
েন। আমাকে কারো জন্যেই কিছু
বতে হয় না। যত ভাবনা কেবল
মিই ভাব।'

মণিময় বলল, 'মালার একা একা
য়ে কাজ নেই রাঙাদি। ও বরং আমার
ঙ্গেই যাবে। আমিও এক্ষুনি উঠব।'

নির্মলা ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'সে কি
া, তুমি এখনই যেতে চাও নাকি
ণময়? না না তা হবে না। এই রাত্রে
োথায় যাবে?'

মণিময় হেসে বলল, 'একেবারে চলে
া না রাঙাদি। এসোসিয়েশনের অফিস
হয়ে যাব। তারপর দরকার-টরকার
সেরে এখানে এসে শ্রীহস্তের দুটি রাঁধা
খেয়ে যাব। সেই নিমন্ত্রণটুকু করে
রাখার জন্যেই এখানে প্রথমে এলাম।'

নির্মলা হেসে বললেন, 'বেশ তো।'

মণিময় মালার দিকে চেয়ে বলল,
'তাহলে চল মালা, ওঠা যাক।'
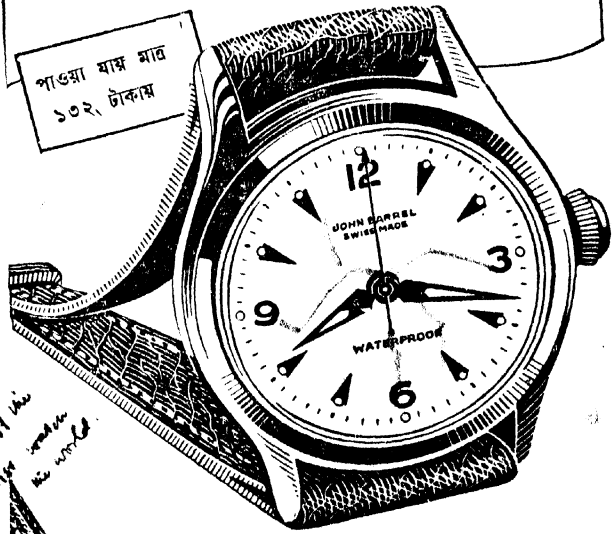
কার্যোদ্ধার তো হয়েই গেল। আর দেরি করে লাভ কি।'

নির্মলা বাধা দিয়ে বললেন, 'এক কাপ চা অন্তত খেয়ে যাও, দেরি হবে না বেশি।'

মণিময় একটু ইতস্তত করে বলল, 'চা বরং এখন থাক রাঙাদি। আমি চায়ের তেমন ভক্ত নই।'

নির্মলা বললেন, 'তাই কি হয়। গরম চা না হলে গরম গরম বক্তৃতা জমবে কি করে?'

মণিময় বলল, 'আমি শুধু গরম গরম বক্তৃতা করি, এই বুঝি আপনার ধারণা?'

নির্মলা মৃদু হেসে বললেন, 'তাছাড়া কি।'

তারপর চা, চিনি, মিল্ক পাউডার আর কেটলিটা গুছিয়ে নিয়ে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকলেন। ডালের কড়া নামিয়ে রেখে জলভরা কেটলিটা বসিয়ে দিলেন উনানে। প্রথমে দু'কাপ জল নিয়েছিলেন। তারপর স্বামীর কথা মনে পড়ায় এক কাপ জল বেশি নিলেন কেটলিতে।

মণিময় এ বাড়িতে এলে শুধু ছেলে-মেয়েরা কেন, নির্মলা নিজেও বেশ উৎসাহ বোধ করেন। ওর আসার সংগে সংগে এখানকার দীর্ঘদিনের একঘেয়েমি কেটে যায়। যেন এক নতুন জগতের সংবাদ বয়ে নিয়ে আসে মণিময়। সে জগৎ কর্মে-কীর্তিতে পরিপূর্ণ। প্রাণ-শক্তিতে চঞ্চল। এখানকার মন্থর নৈরাশ্যময় জীবনযাত্রার সংগে কোন মিল ে মণিময়ের। তবু সে আসে, দু'একব করে আসে।

আর আসা-যাওয়া, দেখা-শোন মধ্যেই সব। মেলামেশার ভিতর দিয় আস্তে আস্তে পরও আপন হয়, কুটু ও আত্মীয়ও হয়ে ওঠে। নই মণিময় তো নির্মলার আপন কেউ ন জেঠতুতো জায়ের ভাই। ধরতে গে কত দূরের সম্পর্ক। কিন্তু এখন অ দূরের বলে ওকে ভাবাই যায় ন আলাপে-ব্যবহারে এমন অন্তরঙ্গতা হ গেছে মণিময়ের সংগে যে, নির্মল ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত ওর একান্ত অনুগ হয়ে পড়েছে।

প্রথম প্রথম মণিময় এখানে বেড়াতে আসত। শহরের বাইরে এই গাছপাল আর আগাছা জঙ্গলে ঘেরা গ্রাে পরিবেশ তার ভালোই লাগত। মণি নিজের মুখেই সেকথা একদিন স্বীক করেছিল। বলেছিল, 'দশটা পাঁচ অফিসে বসে ঘাড় গুঁজে বিজ্ঞাপনে কপি লিখি রাঙাদি। কখন যে সূ ওঠে, কখন যে অস্ত যায়, তা টের পাইনে। আকাশ-মাটি-গাছপালার অস্তিত্ব আছে সংসারে, তা প্রায় ভুলে গেছি। অবশ্য কলকাতা যে মরুভূ তা নয়; সেখানেও গাছপালা, পার পুকুরের অভাব নেই। কিন্তু চোখ থা না দেখবার। অভ্যাসের ঠুলি পরে থ থাকি। গাছপাতার রঙ যে এত সবু এখানে এসে হঠাৎ যেন তা আমার নতু করে চোখে পড়ল।'

নির্মলা হেসে বলেছিলেন, 'তোমা শহরের লোক গাঁয়ে এসে মাঝে মাঝে এম কবিত্ব করে বটে। কিন্তু আমরা যা এখানে পড়ে থাকি তারা টের পা পাড়াগাঁয়ের কি সুখ-সুবিধে। শুধু তো গাছপালা নিয়েই মানুষের দি কাটে না। মানুষ মানুষের সঙ্গই চায় কিন্তু এখানকার লোকজনের যা ধর ধারন তাতে কারো সংগে মিশবার ভর হয় না ভাই।'

মণিময় হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল একটু চুপ করে থেকে বলেছিল, 'আমা যথেষ্ট লজ্জা দিলেন রাঙাদি। জেনো বা দু' চার ছত্র পদ্য লিখলেও আমি যে কা

এমন অপবাদ আমার কোন শত্রুতেও দেয়নি। শুধু গাছপালার সবুজ রঙ নয়, এইসব কলোনীর লোকজনের বিবর্ণ ফ্যাকাসে রঙ, পাঁশুটে রঙও আমার চোখে পড়েছে। কিন্তু আপনার ছুঁৎমার্গের তত্ত্ব আমি মানিনে। মিশতে পারবেন না কেন? ভালো মন্দ ছোট বড় সবাইর সঙ্গে মিশতে হবে। তবে তো মানুষের ভিতরকার আসল রঙ চোখে পড়বে আপনার।'

নির্মলা হেসে বলেছিলেন, 'আর মুখে মুখে কেন। ও ঘর থেকে কাগজ কলম নিয়ে আসি, লিখলেই কাব্য টাব্য যা হোক একটা কিছু হয়ে যাবে।'

কিন্তু কাগজ কলমেই কেবল কাব্য করেনি মণিময়। কথাকে ও কাজে রূপ দেওয়ার চেষ্টাও করেছে। এই কীর্তি-পুর অঞ্চলে ওকে আজ সবাই চেনে। অবসর যাপনের ক্ষেত্রকে মণিময় নিজের কর্মক্ষেত্র ক'রে তুলেছে। ওর চেষ্টাতেই এখানে আজ হাইস্কুল হয়েছে, ছেলেদের ছোটমত একটা লাইব্রেরী আর পাঠচক্র গড়ে উঠেছে। যে উদ্বাস্তু কলোনীর ঘরে ঘরে দলাদলি ছাড়া আর কিছু ছিল না তাদের নিয়ে ও দল গড়ে তুলেছে। আজকাল আর অবসর যাপনের জন্যে নয়, কাজের জন্যেই এখানে আসে মণিময়। সবদিন নির্মলার সঙ্গে দেখা করে যাওয়ার সময় পায় না। তাই নিয়ে নির্মলা মাঝে মাঝে অভিযোগ করেন, অনুযোগ দেন। ইচ্ছা থাকলে যে কাজের অভাব হয় না, কর্মক্ষেত্রের অভাব হয় না, মণিময় তার উজ্জ্বল প্রমাণ।

এক কাপ চা স্বামীকে পাঠিয়ে দিয়ে মণিময়ের কাপ নিজে নিয়ে এলেন নির্মলা। নিজের কাপটিও আনলেন সেই সঙ্গে। মণিময়ের দিকে চেয়ে বললেন, 'তারপর আর কি খবর টবর বল। দেশোদ্ধার—থুড়ি, দেশোদ্ধার তো হয়েই গেছে, উদ্বাস্তু উদ্ধারের কাজ কেমন চলছে তোমাদের।'

মণিময় হেসে বলল, 'খুব ঠাট্টা ক'রে নিচ্ছেন। ওসব উদ্ধার-টুদ্ধারের কথা থাক এখন। আপনার কথা বলুন।'

নির্মলা বললেন, 'আমার আর নতুন কি আছে। দু' বেলা রান্না-বান্না, ছেলেমেয়েদের কাজ। ছেলেমেয়ে আর স্বামীশাসন। দুপুরে এক ফাঁকে গিয়ে কয়েকটি বেয়াড়া মেয়েকে ধমকানো। কারোরই কিছু হবে না। মিছামিছি হয়রানি।'

মালা এর আগেও লক্ষ্য করেছে, আজও দেখল, মণিময়ের সঙ্গে কথাবার্তা বলবার সময় নির্মলা একটু প্রগলভ হয়ে ওঠেন। তাঁরও বয়সের ভার কমে যায়। কথায় কোত্থেকে একটু যেন লঘু কৌতুকের সুর আসে। মায়ের এই রূপান্তরটুকু মনে মনে উপভোগ করে মালা। মণিময় শুধু তার ভাইয়ের স্থান নেয়নি, বন্ধুর আসনও নিয়েছে। মণি-ময়ের সঙ্গে আলাপের সময় প্রসন্নতা আসে নির্মলার মনে, রুক্ষ মুখে যেন স্নিগ্ধতার ছোঁয়া লাগে একটু।

মণিময় বলল, 'বিনয়ে আপনিও বড় কম যান না। জানেন, স্কুলের কাজে আপনার খুব সুনাম হচ্ছে।'

মাত্র এইটুকু প্রশংসায় ভারি লজ্জা পেলেন নির্মলা। কিশোর বয়সী মেয়ের মুখের মত তাঁর মুখখানাও অপ্রতিভ আর আরক্ত দেখাল। একটু বাদে বললেন, 'কি যে বল, সুনাম না আরো কিছু। ওসব বাজে কথা রাখ। হ্যাঁ, খবরের কথা জিজ্ঞেস করছিলে, একটা বড় খবর দিতে পারি। এতক্ষণ ভুলেই গিয়েছিলুম বলতে।'

মণিময় উৎসাহিত হয়ে বলল, 'বলুন, বলুন। আমরা সব শহুরে লোক। কাগজ পড়ি, আর খবর শুনি। খবর ছাড়া আমাদের একদিন তো ভালো, এক মুহূর্তও চলে না। কীর্তিপুরের কোন খবর থাকলে চটপট বলে ফেলুন।'

কলোনীগুলির আলাদা আলাদা নাম থাকলেও মোটাটা একসঙ্গে কীর্তিপুর নামেই পরিচিত। কিন্তু নির্মলা কথাটা ইচ্ছা ক'রেই অন্য অর্থে নিলেন। হেসে বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, কীর্তিপুরেরই খবর। আমাদের হেঁজিপেঁজি গরীব কলোনীর নয়। জানো, সেদিন আমরা এই কীর্তি-পুর থেকে নিমন্ত্রণ খেয়ে এলাম।'

মণিময় কৃত্রিম বিস্ময়ের ভঙ্গিতে বলল, 'সেকি কথা। অমন বড়লোকদের আস্তানায় ঢুকে পড়তে সাহস হ'ল আপনার? আমি হলে তো কিছুতেই ভরসা পেতাম না রাঙাদি।'

একটু দূরে বিশু যীশু আর রীণা মাদুর পেতে হ্যারিকেনের আলোয় বই নিয়ে বসেছিল। বইয়ের পাতায় চোখ থাকলেও কান ছিল গল্পের দিকে।

বিশু আর থাকতে পারল না। মায়ের শাসনের কথা ভুলে গিয়ে বলে উঠল, 'আমরাও গিয়েছিলাম মণিমামা।' যীশু প্রতিধ্বনি করল, 'আমিও গিয়েছিলাম। আমরা সবাই গিয়েছিলাম। বাবা, দিদি, রীণা—'

নির্মলা ছেলেকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'থাক থাক; তোমকে আর গোণা গোষ্ঠীর হিসেব দিতে হবে না। একটু-কাল পরেই তো ঢুলতে থাকবে।'

মণিময় বলল, 'এ বড় অন্যায় রাঙাদি। আপনি ওর আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতায় বাধা দিচ্ছেন। আমি ফিরে এসে তোমার কাছ থেকে সব শুনব যীশু। তুমি ততক্ষণ দু এক পাতা যা পড়বার আছে পড়ে নাও।' আর নির্মলার দিকে ফিরে তাকিয়ে একটু হেসে বলল, 'তাহ'লে সপরিবারেই গিয়েছিলেন। নেমন্তন্নটা খুব জমকালো রকমেরই হয়েছিল বোধ হয়। ব্যাপারখানা কি।'

নির্মলা অমিয়ভূষণের গৃহপ্রবেশের বিবরণ সংক্ষেপে বর্ণনা করে বললেন, 'তা যাই বল চমৎকার লোক অমিয়বাবু। বড়লোক হয়েও পুরোন গরীব বন্ধুকে এমন ক'রে ক'জনে মনে রাখেন। তা আবার ও'র মত বন্ধু। ও'র গুণের কথা তো কারোরই আর জানতে বাকি নেই। অন্য কেউ হ'লে যেতাম না। কিন্তু অমিয়বাবু নিজে এসে এতবার ক'রে বললেন যে, না গিয়ে পারলাম না। ভাবলাম, ভালো লোকের সঙ্গে তো আলাপ পরিচয় বড় একটা হয় না। এতদিন বাদে সে সুযোগ যখন এসেছে, হাতছাড়া না করাই ভালো।'

মণিময় গম্ভীরভাবে বলল, 'হ্যাঁ, দু' একজন বড়লোকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় রাখা ভালো বই কি।'

নির্মলা বললেন, 'তুমি যা ভাবছ তা নয়। তাঁদের কাছে আমিও কিছু প্রত্যাশা করিনে, আমাদের কাছেই বা অমিয়বাবুদের কি চাওয়ার থাকতে পারে। তুমি যা ভাবছ তা নয় মণিময়। বড়-লোকের সঙ্গে গায়ে পড়ে ঘনিষ্ঠতা আমি করতে চাইনে। এমনিই আলাপ-পরিচয় রাখতে চাই। তিনি নিজে থেকে যখন এগিয়ে এলেন আমার পক্ষে পিছিয়ে যাওয়া কি ভালো হ'ত?'

মণিময় একটু হেসে বলল, 'আমি আপনাকে ঠাট্টা করছিলাম রাঙাদি। আপনি যে কি ধরনের মানুষ তা কি আপনি মুখ ফুটে বলবেন তবে আমি বুঝব? সৎলোকের সঙ্গে সম্পর্ক রাখবেন বই কি। তাদের সঙ্গে দুটো কথা বলেও আনন্দ আছে। ভদ্রতা, সভ্যতা মানুষের অবস্থার ওপর অনেকখানি নির্ভর করে। তবু কিছুটা প্রকৃতি ভেদও না মেনে পারা যায় না। চল মালা, রাত হয়ে যাচ্ছে।'

মালা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আপনি যান আর না যান, আমার এবার ছুটতে হবে।'

মণিময়ও উঠে পড়ল।

নির্মলা বললেন, 'ভালো কথা, একটা খবর তো বাদই গেছে। বলতে গেলে সেইটাই আসল খবর।'

কি ভেবে নির্মলা যেন মুখ টিপে হাসলেন।

মণিময় ঘর থেকে বেরোতে বেরোতে আর একবার ফিরে তাকাল। কিছু না বুঝে হেসে বলল, 'কি ব্যাপার, অ[illegible] হাসছেন যে।'

নির্মলা বললেন, 'একটা কথা ম[illegible] পড়ল। এখানে তুমি যেমন এক[illegible] আইবুড়ো ছেলে রয়েছ, সেখানে সে অমিয়বাবুদের বাড়িতে তেমনি আইবুড়ো একটি মেয়ে আছে। তোমারই বয়সী দু' চার পাঁচ বছর কম হ'তে পারে নামটিও বেশ। শ্রীমতী করুণাকণা সেন গুপ্ত। আলাপ হওয়ার পর থেকে ভাবছি তোমার জন্যে তার কাছে করুণ[illegible] ভিক্ষে করলে কেমন হয়? যদিও জাতে মিল নেই। আমরা বামুন, ওরা বদ্যি কিন্তু তুমি তো আর অত জাত টা[illegible] মানো না। জেলে কত জাতের ভা[illegible] খেয়েছ ঠিক নেই। কি বল, ঘটকালি শুরু ক'রে দেব নাকি?'

মণিময় একটুকাল থমকে রইল। তারপর ঠোঁটে একটু হাসি টেনে বলল, 'ঘটকালি ক'রে লাভ নেই রাঙাদি। এর আগেও একবার সে চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু সুবিধে যে হয়নি তা তো দেখতেই পাচ্ছেন। মালা চল, সত্যিই দেরি হয়ে যাচ্ছে আমার।'

মালা বলল, 'চলুন।'

কিন্তু অল্পবয়সী মেয়ের ম[illegible] কৌতূহলী নির্মলা পিছনে পিছনে এলেন। উচ্ছল তরলকণ্ঠে বলতে লাগলেন, 'ও মণিময়, শোন শোন সবটুকু বলে যাও। ব্যাপারটা সব শুনি।'

কাছে যে মেয়ে আছে সেকথা যেন ভুলে গেলেন নির্মলা। একটি পুরুষের অবিবাহিত থাকার কারণ আবিষ্কার করার চেয়ে বড় আবিষ্কার যেন আর কিছু নেই।

কিন্তু মণিময় এবার আর তাঁর অনুরোধ রাখল না। উঠানের সীমানা পার হবার আগে আবছা অন্ধকারে তাঁর দিকে একবার ফিরে তাকিয়ে বলল, 'এখন সময় নেই রাঙাদি। মালাকে এগিয়ে দিয়ে নিজের কাজকর্ম সেরে আসি তারপর ধীরে সুস্থে সে গল্প করা যাবে অত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন?'

শেষ কথাটায় একটু যেন তিরস্কারের সুর বাজল।

নির্মলা লজ্জিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। (ক্রমশ

ভূতৌষধি

ভূত ঝাড়ই মটকায়, অবশ্য ভূতের অস্তিত্ব যদি বিশ্বাস করতে হয়। ছাড়াও ভূতের হাতে ঘাড়টি বাবার ভয়ে কে যে শায়েস্তাও হয়ে যায় তার জ্যান্ত দৃষ্টান্ত পারিজাত থিয়েটার্সের ষ্টি"। দৃষ্টিটা মানুষের নয়, ভূতের। লের মায়ায় ভূত হয়ে সর্বত্র বিরাজ করা ং ছেলের অযত্ন দেখে সতীনের ঘাড় কাবার চেষ্টা করা। এই হলো ষ্টি"-র গল্প, অবশ্য সতীনের শুধরে ওয়াতে ভূতের প্রস্থানটা ঘটে যায়। কৃতি ও বাস্তবে চুণকালি লেপে দিয়ে নুষের সহজাত বুদ্ধিবৃত্তিকে অন্ধকার গে পিছিয়ে নিয়ে যাব'র নতুন চেষ্টা গ্রেসিভ' দলের বলে পরিচিত "নবান্ন"-র ষ্টা বিজন ভট্টাচার্যের মতো লেখকের পনাতেও যে আসতে পেরেছে সেইটেই চ্ছে সবচেয়ে বিস্ময়কর। এছাড়া, ল্পেতে আর নেইও কিছু এবং পরি- লক চিত্ত বসুও গল্পেতে মৌলিক াঁচখাঁচ সৃষ্টি করে আর কোনভাবে

—শৌভিক—

নাটকীয়তাও ফুটিয়ে তুলতে পারেননি।

* * *

অত্যন্ত বিলম্বিত লয়ে গল্পের চাল। গল্পের আরম্ভ নায়ক কল্যাণ ও নায়িকা মালতীর শৈশবকালে বৌবাটি খেলা থেকে। এমন কোন ঘটনা পাওয়া গেল না বা অন্যদিকেও উজ্জ্বল কিছুই নেই যাতে ওদের এই শৈশবাংশের সার্থকতা আছে বলে ধরে নেওয়া যায়। কল্যাণ জমিদারের ছেলে, মালতী দেওয়ানের মেয়ে। শিশুকাল থেকেই ওদের ভালোবাসা। কল্যাণ মালতীকেই বিয়ে করবে ঠিক করলে, কিন্তু কল্যাণের বাবা ওর বিয়ে ঠিক করে অন্যত্র। কল্যাণ তাতে অমত করায় জমিদার দীননাথ তাকে গৃহত্যাগ করতে বললেন। কল্যাণও গৃহত্যাগ করে মালতীকে বিয়ে করে শহরে এসে চাকরি করতে লাগলো। পরে দীননাথ অনুতপ্ত হন কিন্তু পাছে তিনি মালতীকে গৃহে ঠাঁই না দেন এই আশংকায় কল্যাণ মায়ের পত্র পেলেও দেশে ফিরে যায়নি। দীননাথ কল্যাণের শোকে দেহত্যাগ করলেন। মালতীকে বিয়ে করায় কল্যাণের মায়ের সম্মতি ছিল। পিতার মৃত্যুর পর মায়ের আহ্বানে কল্যাণ মালতীকে নিয়ে দেশে ফিরলো। সুখেই ওরা ঘরকন্না করতে লাগলো, কালে ওদের একটি পুত্র জন্মালো। মালতীর সব দৃষ্টি ভালোবাসা সব দখল করলে তার ছেলে। তাই নিয়ে কল্যাণের অনুযোগ। জমিদারীর আদায়-পত্তর আল্‌গা হয়ে পড়ায় পুজোর সময় কল্যাণ তালুক পরিভ্রমণে বের হলো, কথা দিয়ে গেল ফিরবে বিজয়ার দিন। জমিদার বাড়িতে পুজো ছেড়ে জমিদার নিজে বেরিয়ে গেলো খাজনা আদায় করতে এ ঘটনা দেখাবার কি কায়দা বোঝাই ভার। অবশ্য এটা করতে হলো, তা না হ'লে বিজয়ার ভাসান দিতে গিয়ে নৌকা থেকে মালতীর ছেলেকে জলে

ফেলে দেওয়া যায় না, আর ছেলের খোঁজে মালতীকেও জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে ডুবিয়ে মেরে ফেলা যায় না! সর্বোপরি বিজয়ার দিন রাতে বাড়ি ফিরে কল্যাণকেও আর মালতীর বিজয়ার ঘটনাও শুনতে হয় না। অদ্ভুত ঘটনা সাজানো!!

* * *

ডুবে মারা গেলেও মালতী কিন্তু ওবাড়ির ত্রিসীমানা ত্যাগ করলে না। ভূত হয়ে বিচরণ করতে লাগলো ছেলেকে ঘিরে। খোকার অযত্ন দেখে মা কল্যাণকে আবার বিয়ে করতে বললেন, কিন্তু কল্যাণ মালতীর কথা মনে করে অন্য কাউকে তার আসনে বসাবার চিন্তা মনেও ঠাঁই দিতে চাইলে না। দুরন্ত খোকা একদিন সিঁড়ি দিয়ে প্যারাম্বুলেটার গড়িয়ে তার সঙ্গে নিজেও গড়িয়ে গেল, কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার—খোকা কোন আঘাত পেলে না, কে যেন ওকে প্যারাম্বুলেটারে বসিয়ে দিয়ে গেল অক্ষত অবস্থায়। খোকা একা কাঁদলে কে যেন ওকে ঘুম পাড়িয়ে যায়। চাঁদনী রাতে কল্যাণ মালতীর গান শুনতে পায়; ওর পায়ের নূপুরের শব্দ শোনে। একদিন খোকা খেলতে খেলতে বাগানে বেরিয়ে গেল, কোত্থেকে ওর সামনে ফণা তুলে দাঁড়ালো প্রকাণ্ড এক সাপ। কিংকর্তব্য-বিমূঢ় কল্যাণ। একটু এগোলেই সাপ নির্ঘাত খোকাকে ছোবল দেবে, অনন্যোপায় কল্যাণ। হঠাৎ প্রকাণ্ড ঝড় আর সেই ঝড়ে একটা টিন উড়ে এসে সাপের মাথায় পড়ে ওটাকে শুইয়ে দিলে। এ যাত্রা খোকা বাঁচলো। এরপর অন্তত খোকাকে দেখাশোনা করার জন্য কল্যাণ আবার বিয়েতে সম্মতি দান করলে।
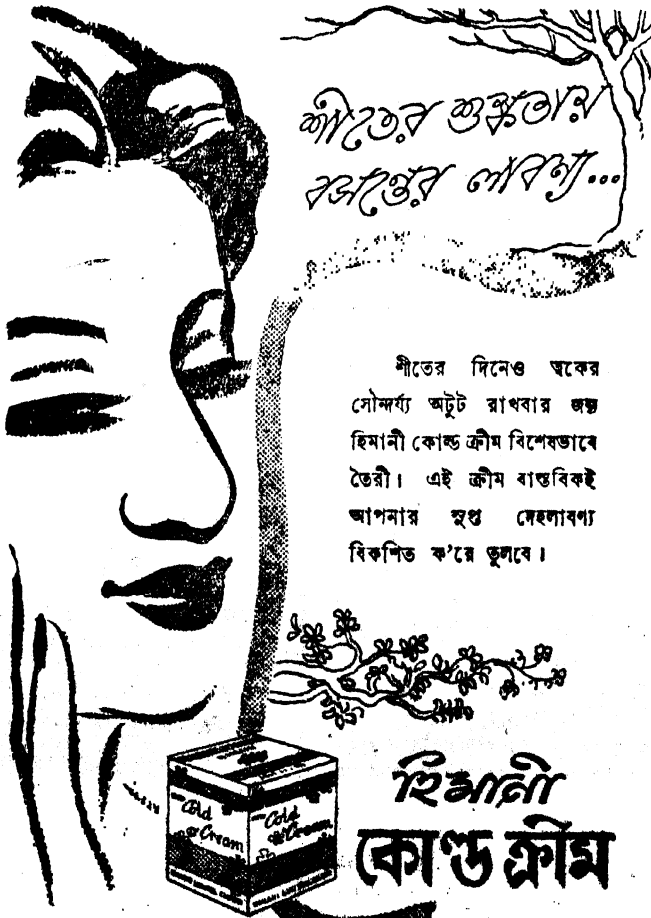
* * *

নতুন বউ বকুল এসে দেখলে, তার স্বামীর মনে তার কোন আসন নেই, তার অন্তর জুড়ে আছে খোকন। কল্যাণ থেকে থেকেই উদাস হয়ে পড়ে। যে জন্যে বকুলকে বিয়ে করা বকুল সেকাজে মোটেই আগ্রহ দেখালে না, বরং অবজ্ঞা ও অবহেলাই করতে লাগলো। বকুলকে কুমন্ত্রণা দিয়ে আরো বিষিয়ে তুলতো তার বাপের বাড়ির ঝি মতির মা। বকুল ক্রমশই কল্যাণের ঔদাসীন্যে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে লাগলো। কল্যাণ সদাই মালতীর চিন্তায় মগ্ন, রাতে মালতীর গান আর নূপুরধ্বনি শুনে বেরিয়ে বাগানে এসে দাঁড়ায় উদ্‌ভ্রান্তের মতো। একদিন বকুলের বিছানায় হঠাৎ আগুন লেগে গেল। কোনরকমে সে যাত্রায় রক্ষে পাওয়া গেল। ভূতুড়ে কাণ্ড। বকুলের ব্যবহারে কল্যাণের মা বৃন্দাবনবাসিনী হন। তারপর বকুল আরও ক্ষেপে উঠলো। একদিন সব ভেঙে তছনছ করে দিলে, তারপর আয়নায় দেখলে মালতীকে; মালতী যেন তার ছেলের অনাদরের শোধ নিতে এসেছে। বকুল খোকনের ভার দিয়েছে মতির মার ওপরে। মতির মার ব্যবহার নির্দয়। খোকা কাঁদলে কে যেন ওকে দোল দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে যায়, খোঁজ করতে এসে কল্যাণ মালতীর নূপুরের শব্দ শোনে। এইভাবে একদিন ব্যাপার চরমে উঠলো। খোকার কান্না কোনমতে থামাতে না পেরে মতির মা ওকে প্রহার করে ছাদের এক অন্ধকার কুঠরীতে বন্ধ করে রেখে এলো। ঘর থেকে বেরিয়ে

আসার সংগেই কে যেন মতির মাকে ধাক্কা দিয়ে সিঁড়ি দিয়ে ফেলে দিলে। মতির মা পড়লো অজ্ঞান হয়ে। কল্যাণ এসে খোকাকে খ‍ুঁজে বের করলে। সে ঘর থেকে বের করে আনতে দেখলে খোকার দারুণ জবর। কল্যাণ উন্মাদপ্রায় হলো। এইসব দেখে বকুলের এতদিনে শুভবুদ্ধি এলো, খোকাকে বুকে জড়িয়ে কল্যাণকে ডাক্তার আনতে পাঠালে। কল্যাণ বের হতে যাবে, দেখে ঘরের বাইরেই ডাক্তার হাজির। কে খবর দিয়েছে জানতে চাইতেই দেখলে মালতী ছাদের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছে। ডাক্তার জানালে, খোকার বাঁচবার আশা নেই। বকুল জানালে, তার বুক থেকে খোকার জীবন হরণ করে নিয়ে যেতে পারবে না কোন শক্তি। অসহায় কল্যাণ কেঁদে গিয়ে দাঁড়ালো মালতীর ছবির সামনে। মালতীর উদ্দেশে জানালে, খোকা তারও বুকের নিধি তবে কেন মালতী তাকে ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ছবির কাঁচ ফেটে গেল। ভোরের সংগে দেখা গেল, মালতীর ছায়া ঘর ছেড়ে চলে যাচ্ছে। আর খোকাও সেরে উঠেছে।

• • •

'বিজয়ার দিনে প্রতিমা বিসর্জন দিতে এসে মালতীর জলে ডুবে যাওয়া এবং তার দেহের তল্লাসে গ্রামবাসীদের ঝাপাঝাপি হাঁকডাক দাপাদাপির দৃশ্যের আগে ছবির ওপরে আগ্রহ সৃষ্টির কিছুই পাওয়া যায় না। আরম্ভে ওদের শিশু-বয়সে ঘরকন্নার খেলার দৃশ্য তো নেহাতই অবান্তর; অনর্থক দৈর্ঘ্য বাড়িয়েছে। দীননাথ যেন জমিদার বলেই হঠাৎ তাকে জোর করে বিয়ের ব্যাপারে কল্যাণের ওপরে ক্ষণেকের জন্য রূঢ় করিয়ে দেওয়া হয়েছে, না হ'লে কল্যাণকে গৃহত্যাগ করিয়ে মালতীর সংগে বিয়ে দেখাবার আর কোন উপায়ই যেন ছিল না। অথচ দীননাথ লোকটি অতি নরম ও উদার প্রকৃতির; ছেলেবয়েস থেকেই তিনি কল্যাণ ও মালতীর অন্তরংগতা দেখে আসছেন এবং স্রেফ ঘটনা পাকিয়ে তোলার জন্যই কল্যাণের বিয়ে-ব্যাপারে ওকে বেমানান রকম বিরোধীচরিত্র করে তোলা হলো। মালতীর মৃত্যু পর্যন্ত ঘটনা ইনিয়ে বিনিয়ে চলে এসেছে অতি সব মামুলী ব্যাপার ধরে। তারপর খোকনের বার বার দুর্ঘটনার হাত থেকে অলৌকিকভাবে রক্ষা পাওয়া এবং মালতীর নূপুরের শব্দ, হাওয়ায় হাওয়ায় তার গান, খোকাকে ঘুম পাড়িয়ে যাওয়া ইত্যাদির সাহায্যে খানিকটা রহস্যময় রোমাঞ্চকর পরিবেশ গড়ে তোলা হয়েছে।

দর্শকের কৌতূহল জাগতে থাকে। মালতীকে অলক্ষ্য থেকে শরীরীনি করে দেখিয়েই গল্পকে একেবারে গোঁজিয়ে ফেলা হয়েছে। গোড়াতে যা ছিল ফেলে যাওয়া সন্তানের মায়ায় স্নেহময়ী মাতৃ-আত্মার আকুল প্রহরা, সেটা দাঁড়িয়ে গেল ভুতুড়ে কান্ড কারবারে। শেষে বকুলের পরিবর্তন ব্যাপারটা তো নেহাৎ হাস্যকর। তার প্রতি স্বামীর অনাদর ও ঔদাসীন্য দূর করে ফেলার জন্য সে খোকাকে শেষে বুকে জড়িয়ে ধরেনি, এমনভাবে ঘটনা সাজানো যে ভূতের হাতে ঘাড় মটকাবার ভয়েই যেন সে রুগ্ন খোকাকে কোলে তুলে নিলে, নারীর সহজাত মাতৃত্ববোধের জন্য নয়। কাহিনীটির পরিকল্পনায় এবং ছবিতে তার বিন্যাসে সহজ, সুস্থ ও শিল্প-সাহিত্য রসপুষ্ট চিন্তাধারার অভাবটাই সবচেয়ে বেশী উপলব্ধি হয়। একটা মরবিড চেহারাই সার।

* * *

ছবির মাঝপথে মালতীর মৃত্যু ঘটলেও ওই নায়িকা হয়ে রইলো, একেবারে শেষে বকুলের বুকে খোকাকে নিরাপদ দেখে কল্যাণের অনুনয়ে খোকার প্রাণ না নিয়ে চলে যাওয়া পর্যন্তই, ছবিরও শেষ ঐখানেই। কাবেরী বসুর রূপায়নে চরিত্রটিতে একটা আদুরে আলতোভাব ফুটে উঠেছে, যাতে দেখতে দেখতে ওকে ঠিক ভালো লাগছে কি না ভেবে সংশয়ে পড়তে হয়। যেমনটি ঠিক দরকার চরিত্রটির বিকাশে অভিনয়ে ঠিক সেই মতো যেন ছোঁয়াচটা নেই, কোথাও একটু ফাঁক রয়েছে, কি যেন একটু কম। নয়তো পরিচালক তো অনেকরকমভাবেই ওকে দেখাবার চেষ্টা করেছেন। হাস্যময়ী, লাস্যময়ী, নির্যাতিতা, বিরহকাতরা, প্রণয়-বিহ্বলা, গৃহিণী, মাতা, কোনদিকই বাদ রাখেন নি, এমন কি শেষে প্রেতিনীরূপেও। কিন্তু এতো সত্ত্বেও বেশ মনে ধরে রাখবার মতো করে পাওয়া যায় না চরিত্রটিকে। নায়ক কল্যাণের চরিত্রে নির্মলকুমারের অভিনয় বরং বেশী ভালো লাগবে; চরিত্রটিতে একটা ভাব ফুটিয়ে তুলতে তিনি সক্ষম হয়েছেন। তবে অভিনয়ে সবচেয়ে ভালো লাগবে বাড়ির পুরাতন চাকর দয়ালের চরিত্রে পাহাড়ী সান্যালকে। "পরেশ"-এর সুকৃতির পর এ আরেক রকমের চরিত্রে তিনি অবতরণ করেছেন এবং কল্যাণের স্নেহশীল প্রতিরক্ষীরূপে বেশ একটা মানবিক আবেদনপূর্ণ চরিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। খোকার প্রতি অযত্নের জন্য মতির মা'র সঙ্গে ঝগড়া এবং মতির মা তথা বকুলের কাজে অপমানিত হয়ে প্রাণাধিক কল্যাণ ও খোকাকে ছেড়ে চলে যেতে চাওয়া এবং শেষে থেকে যাওয়া প্রভৃতি মুহূর্তে পাহাড়ী বেশ নাটক জমিয়ে তুলেছেন। জমিদার দীননাথের চরিত্রে ছবি বিশ্বাসকে অল্পক্ষণই পাওয়া যায়, তবে তারই মধ্যে কল্যাণ ওর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গৃহত্যাগ করে চলে যাওয়ার সময় দীননাথের অভিমানক্ষুব্ধ ব্যথিত অন্তরটিকে চমৎকারভাবে তিনি অভিব্যক্ত করেছেন। বকুলের চরিত্রে সাবিত্রীর

এম পি প্রডাকসন্সের আগামী ছবি "সবার উপরে"-র একটি দৃশ্যে উত্তমকুমার ও সুচিত্রা সেন

কল্যাণের প্রতি বিরোধের ভাবটা ফুটেছে এবং ছবির শেষদিকে নাটক জমানোর জন্য তাঁরও অভিনয়-কৃতিত্ব খানিকটা আছে; কিন্তু চেহারায় যদি একটু কমনীয়তা থাকতো তো ভাল হতো। কল্যাণের মায়ের চরিত্রে মলিনা দেবী যথোচিত অভিনয়ে চরিত্রটি ফুটিয়েছেন। কুচুটে মতির মা'র চরিত্রে রেণুকা রায়ের অভিনয় প্রশংসা পাবে, বিশেষ করে খোকাকে অন্ধকার ঘরে বন্ধ করে রাখার পর ভূতের ভয়ে ওর ভয়ার্ত অভিব্যক্তি ঘটনানুযায়ী আবহাওয়াটাকে বেশ ঘনীভূত করে তুলেছে। এ শট্‌গুলি নেওয়ায় অবশ্য ক্যামেরার কৃতিত্ব অনেকখানি। কমল মিত্র আছেন ছোট একটি দৃশ্যে; কল্যাণের চাকুরীস্থলে তার ওপরওয়ালার চরিত্রে। পুত্রের পিতাকে ছেড়ে যাবার পর পিতার মনের ব্যথাটা তিনি কল্যাণের কাছে ব্যক্ত করেন। গঙ্গাপদ বসুও আছেন একটি ছোট চরিত্রে, মালতীর নির্দয় মামার ভূমিকায়। টাইপ চরিত্রটি তিনি ফুটিয়েছেন। অপর অভিনয়ে আছেন—সন্তোষ সিংহ, শিবকালী চট্টোপাধ্যায়, শান্তি ভট্টাচার্য, প্রীতি ভট্টাচার্য, ঋষি বন্দ্যোপাধ্যায়, আশা, বাবুয়া প্রভৃতি।'

* * *

বিন্যাসে কোন সূক্ষ্ম বা রসসৃষ্টিতে মৌলিক কৃতিত্বের কিছু পাওয়া যায় না। কালক্ষেপণ বোঝাবার জন্য কথার বিবৃতিতে ইতিমধ্যেকার ঘটনা জানিয়ে গল্পের সূত্র রক্ষা করার মতো অবান্তর প্রসঙ্গও রয়েছে। যেমন, দীননাথের মৃত্যুর পর কল্যাণ মালতীকে নিয়ে দেশে ফিরে এসে বাস আরম্ভ করার পর সেরেস্তার একটা দৃশ্য এনে কর্মচারীদের মধ্যে নতুন আমলের প্রসঙ্গ তুলে সময় অতিবাহিত হওয়ার কথা জানিয়ে দেয়। বড়ো মোটা কাজের ধরন। তবে ছবির কলাকৌশলের দিকটায় বেশ ভালো কাজের পরিচয় পাওয়া যায়। এর মধ্যে অনুপম ঘটকের সঙ্গীত পরিচালনার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। কয়েক স্থানে আবহসঙ্গীত ঝালাপালা বলে মনে হয়, তা নয় তো গানের সুরে এবং কয়েক স্থানে নাট্য আবহাওয়া গড়ে তোলায় তিনি সাফল্য অর্জন করেছেন। সঙ্গীতাংশের রেকর্ডিংয়েও সত্যেন চট্টোপাধ্যায়ের কৃতিত্ব পাওয়া যায়। সঙ্গীতাংশ ছাড়া সংলাপাংশে এবং শব্দের বিশেষ প্রয়োগেও সত্যেনের কাজের বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়। আগাগোড়া না হলেও বিমল মুখোপাধ্যায় ক্যামেরার কাজে শেষের দিকের ভৌতিক রোমাঞ্চটা ফুটে উঠেছে। ছবিখানি সম্পাদনা করেছেন রবীন দাস।

একলব্য

মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে ২—০ গোলে পরাজিত করে মোহনবাগান ক্লাব সর্বপ্রথম রোভার্স কাপ লাভ করেছে। রোভার্স কাপ পশ্চিম ভারতের শ্রেষ্ঠ ফুটবল প্রতিযোগিতা এবং আই এফ এ শীল্ড এবং ডুরাণ্ড কাপ বিজয়ীর মতই রোভার্স বিজয়ীর সম্মান। ১৮৯১ সাল থেকে রোভার্স কাপের খেলা আরম্ভ হলেও এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে বেশী ভারতীয় দলের পক্ষে রোভার্স কাপ লাভ করা সম্ভব হয়নি। ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত পশ্চিম ভারতের এই প্রতিযোগিতায় বিজয়ীর

সুপ্রসিদ্ধ রোভার্স কাপ

পুরস্কারে বৃটিশ মিলিটারী ও সিভিল টীমের একচেটিয়া অধিকার ছিল। ১৯৩৭ সালে বাঙ্গালোর মুসলিম ক্লাব সর্বপ্রথম রোভার্স কাপ বিজয়ী হয়ে এক নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি করে। তারপর অবশ্য অন্যান্য ভারতীয় দলের পক্ষে জয়লাভ সম্ভব হলেও এপর্যন্ত মাত্র পাঁচটি ভারতীয় ক্লাব রোভার্স কাপ ঘরে তুলেছে। মোহনবাগান ক্লাব ষষ্ঠ ক্লাব হিসাবে রোভার্স ঘরে তুললো। বিশেষ উল্লেখযোগ্য বোম্বাইয়ের এই শ্রেষ্ঠ ফুটবল প্রতিযোগিতায় বোম্বাইয়ের কোনো টীম এপর্যন্ত বিজয়ীর সম্মান অর্জন করতে পারেনি।

১৯২৩ ও ১৯৪৮ সালের রানার্স মোহনবাগান ক্লাবের পক্ষে এবার রোভার্স বিজয় বিশেষ কৃতিত্বপূর্ণ সন্দেহ নেই।

বর্তমানে ভারতের বিভিন্ন ক্লাবের মধ্যে শক্তির পার্থক্য খুবই কম। পরম শক্তিশালী ক্লাব বলে যারা অভিহিত তাদেরকেও অখ্যাত ক্লাবের কাছে হার স্বীকার করতে হচ্ছে। দিল্লী ক্লথ মিল ফুটবল প্রতিযোগিতা ও ডুরাণ্ড থেকে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের পরাজয় এবং পাঁচ বছরের রোভার্স বিজয়ী শক্তিশালী হায়দরাবাদ পুলিসের বার্মাশেলের কাছে হার স্বীকার এই ঘটনার সাক্ষ্য দেয়। এই অবস্থার মধ্যে কলকাতার লীগ চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগানের রোভার্স কাপ লাভ খুবই কৃতিত্বপূর্ণ।

* * *

যুক্তরাষ্ট্রের বাস্কেটবল কোচ ফ্র্যাঙ্ক কফম্যান এখন বাঙলার ছেলেমেয়েদের বাস্কেটবল খেলার উন্নত পদ্ধতি শিক্ষা দেবার কাজে নিযুক্ত আছেন। তিনি প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় ময়দানে বাস্কেটবল এসোসিয়েশনের মাঠে ছেলেমেয়েদের খেলা শেখাচ্ছেন। কফম্যান ভারতে এসেছেন রাজকুমারী অমৃত কাউরের শিক্ষা ব্যবস্থায় ভারতের বাস্কেটবল খেলোয়াড়দের খেলা শেখাতে। কলকাতায় আসবার আগে তিনি দিল্লী ও আজমীরে খেলা শিখিয়েছেন। পরে মাদ্রাজ, বাঙ্গালোর ও হায়দরাবাদ সফর করবেন। জানুয়ারী মাসে হায়দরাবাদে জাতীয় বাস্কেটবল প্রতিযোগিতায় তার শিক্ষার ফলাফল দেখে কফম্যান স্বদেশ অভিমুখে যাত্রা করবেন।

* * *

ভারতের টেবিল টেনিসে আর এক বালক বীরের সন্ধান পাওয়া গেছে। টেবিল টেনিসের গুরুজী জগৎপূজ্য খেলোয়াড় ভিক্টর বার্না বলেছেন—টেবিল টেনিসের বালক খেলোয়াড় দ্বারা ভারত যেমন সমৃদ্ধ বিশ্বের আর কোন দেশই তেমন সমৃদ্ধ নয়; আজ যদি ছোটদের বিভাগে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের ব্যবস্থা হয় তবে ভারত নিঃসন্দেহে বিজয়ীর পুরস্কার লাভ করবে। চেকোশ্লোভোকিয়ার ধুরন্ধর খেলোয়াড় আইভান আন্দ্রিয়াদিজ এবং ভ্যাক্লাব টেরেবা, যাঁরা গতবার ভারত সফর করে গেছেন তাঁদেরকেও এই মন্তব্য করতে শোনা গেছে। সত্যিই আজম আর ভোরার অপূর্ব টেবিল টেনিস নৈপুণ্য দেখে আন্দ্রিয়াদিজ ও টেরেবা বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলেন। আজম হায়দরাবাদের বাচ্চা খেলোয়াড় আর ভোরা

রাজকুমারী অমৃত কাউরের শিক্ষা পরিকল্পনায় নিযুক্ত ভারতের বাস্কেটবল কোচ ফ্রাংক কফম্যান

বোম্বাইয়ের। দু'জনেরই টেবিল টেনিস খ্যাতি সর্বজনবিদিত। যেমন হাতের মার, তেমন পায়ের চটুল ভঙ্গি, তেমনই খেলার উন্নত পদ্ধতি। আজম ও ভোরার মত এত নিপুণ না হলেও এদের কাছাকাছি পৌঁছুতে পারে ভারতে এমন খেলোয়াড়ের অভাব নেই। সম্প্রতি বেঙ্গল টেবিল টেনিসের টীম চ্যাম্পিয়নশিপের খেলায় হ্যারী অ' নামক এক খেলোয়াড় বাঙলার পয়লা নম্বর খেলোয়াড় ই সোলোমনকে হারিয়ে যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন তাতে হ্যারী অ'কে আজম ভোরার সমকক্ষ বলা যেতে পারে। হ্যারী ভিক্টর বার্নারই অন্যতম শিষ্য। রাজকুমারী অমৃতকুমারীর শিক্ষা পরিকল্পনায় বাঙলার খেলোয়াড়দের খেলা শেখাতে গতবার বার্না যখন কলকাতায় এসেছিলেন তখন হ্যারী তার কাছ থেকেই খেলার উন্নত পাঠ গ্রহণ করেছিল। এখন সেই পাঠই কাজে লাগাচ্ছে। হ্যারীর বয়স ১২ বছর পার হয়নি। দেহের উচ্চতা মাত্র ৩ ফুট ৮ ইঞ্চি।

তু দেহের উচ্চতা এবং গায়ের জোর কম কলে কি হয় ছোট ব্যাটে সেলুলয়েডের বল রাতে সে সিদ্ধহস্ত। মারের চোটে টেবিলে ফান ছোটায়। সব রকমের মার আছে য়ারীর হাতে। ব্যাক হ্যাণ্ড এবং ফোরহ্যাণ্ড ন্যাসিংয়ে' যেমন জোর, 'চপ' এবং 'ড্রপ সট' রবার বেলাতেও তেমন ওস্তাদ। হ্যারী অ' সলিম ইনষ্টিটিউটের সভ্য। বেঙ্গল মি চ্যাম্পিয়নশিপে ওয়াই এম সি এ—চৌরঙ্গী ও মুসলিম ইনষ্টিটিউটের খেলায় ারী ২১-১৯ ও ২১-১৩ পয়েণ্ট সালোমনকে স্ট্রেট সেটে পরাজিত করে। সালোমন বাঙলার এক নম্বর খেলোয়াড়।

* * *

টেবিল টেনিসের দলগত লীগে ভবানী-রে ক্লাব এবার চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেছে। টেবিল টেনিস লীগে ভবানীপুর ক্লাবের এ ম্মান অবশ্য নতুন ঘটনা নয়। ১৯৫৩ লেও ভবানীপুর চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করে-ছল। গতবার ওয়াই এম সি এ—চৌরঙ্গী ল ভবানীপুর ক্লাবের কাছ থেকে চ্যাম্পিয়ন শপের গৌরব ছিনিয়ে নেয়। এবার চূড়ান্ত খলায় ওয়াই এম সি এ চৌরঙ্গীর কাছ থেকেই ভবানীপুর ক্লাব তাদের নষ্ট গৌরব পুনরুদ্ধার করেছে।

১৪টি দল এবার টেবিল টেনিস লীগে অংশ গ্রহণ করেছিল, এদের দুইভাগে ভাগ করে দুইটি গ্রুপে লীগ পরিচালনা করা হয়। প্রতি ক্লাবকে প্রতি ক্লাবের সঙ্গে পাঁচটি করে গেম খেলতে হয়েছে। এ গ্রুপে ওয়াই এম সি এ চৌরঙ্গী এবং বি গ্রুপে ভবানীপুর ক্লাব শীর্ষস্থান অধিকার করায় দুই ক্লাবের মধ্যে চূড়ান্ত খেলার ব্যবস্থা করা হয়। এই খেলায় ভবানীপুর সহজেই জয়লাভ করে। নীচে কোন ক্লাব কয়টি খেলায় জিতেছে ও হেরেছে তার তালিকা দেওয়া হল।

পুল 'এ'

	খেঃ	জঃ	পরাঃ
ওয়াই এম সি এ—চৌরঙ্গী	৬	৬	০
মুসলিম ইন্‌	৬	৫	১
সালকিয়া ফ্রেণ্ডস	৬	৪	২
ওয়াই এম সি এ—কলেজ	৬	৩	৩
সাউথ ইণ্ডিয়া ক্লাব	৬	২	৪
রাজস্থান ক্লাব—ব্লু	৬	১	৫
বেহালা ক্লাব	৬	০	৬

পুল 'বি'

	খেঃ	জঃ	পরাঃ
ভবানীপুর ক্লাব	৬	৬	০
রাজস্থান ক্লাব—রেড	৬	৫	১
ডিনামাইটস	৬	৪	২
ওয়াই এম সি এ—কলেজ এক্স	৬	৩	৩
বি বি এ সি	৬	২	৪
এক্সসেলসর	৬	১	৫
গ্রিণ্ডলেস ই এ	৬	০	৬

ফাইন্যাল

	খেঃ	জঃ	পরাঃ
ভবানীপুর	১	১	০
ওয়াই এম সি এ—চৌরঙ্গী	১	০	১

* * *

যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেণ্ট মিঃ নিক্সন বিশ্বের হেভিওয়েট ভারোত্তোলন চ্যাম্পিয়ন পল এ্যাণ্ডারসনের মাংসপেশী পরীক্ষা করে দেখছেন। আমেরিকার ভারোত্তোলক এণ্ডারসন সম্প্রতি রাশিয়া থেকে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নসিপ লাভ করে ভারতে এসেছেন এবং ২০শে নভেম্বর কলকাতায় এসে পৌঁছচ্ছেন

হেভি ওয়েটের প্রাক্তন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন মুষ্টিযোদ্ধা জার্সি জো ওয়ালকট চলচ্চিত্রে অভিনয়ের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। কলম্বিয়ার "দি হার্ডার দে ফল" চিত্রের এক প্রধান ভূমিকায় তিনি অভিনয় করবেন। ক্রীড়াক্ষেত্রের স্মরণীয় বীরদের চলচ্চিত্রে অভিনয় কোন নতুন ঘটনা নয়। ইতিপূর্বে বহু কীর্তিমান ক্রীড়াবিদ ছায়া ছবিতে অভিনয় করে আরও যশস্বী হয়েছেন। প্রধান দৃষ্টান্ত সন্তরণবীর জনি উইসমুলার। অনেকে আবার চলচ্চিত্রে প্রতিষ্ঠা অর্জন করে ক্রীড়াভূমিও মাতিয়ে তুলেছেন—দৃষ্টান্ত টেনিস পটিয়সী গাসি মোরান। জীবনের একদিকে প্রতিষ্ঠা অর্জন করলে অন্যদিকে প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে বিশেষ বেগ পেতে হয় না এবং এই প্রতিষ্ঠা লাভের মূলসূত্র খেলা বা অভিনয়ে তার জনপ্রিয়তা। একটা ছোট ঘটনাঃ আজাদ হিন্দ বাগে জাতীয় সাঁতার প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠানকালে সম্মানিত অতিথিবৃন্দের দ্বারা বিজয়ী সাঁতারুদের পুরস্কার বিতরণের ব্যবস্থা করা হয় এবং মন্ত্রী থেকে আরম্ভ করে বহু শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন বিষয়ের পুরস্কার বিতরণের ভার পান। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি পুরস্কার বিতরণকারী কোন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিকেই দেখবার আশায় দর্শকরা তেমন উন্মুখ ছিলেন না যেমন উন্মুখ ছিলেন বিজয়ী সাঁতারুদের দেখবার আশায়। কিন্তু শেষ দিনের অনুষ্ঠানে দুইবারের অলিম্পিক ডেকাথলন চ্যাম্পিয়ন বব্‌ ম্যাথিয়াজ যখন ওয়াটারপোলো খেলার বিজয়ী ও বিজিত দলের হাতে পুরস্কার বিতরণ করতে এলেন তখন দর্শকরা ম্যাথিয়াজকে দেখবার আশায় ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। দীর্ঘকান্তি প্রিয়-দর্শন যুবক—শক্তিধর এ্যাথলীট ম্যাথিয়াজকে তগত্যা 'ভিক্টরী স্ট্যাণ্ডের' উপর দাঁড়িয়ে
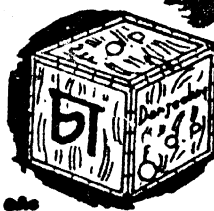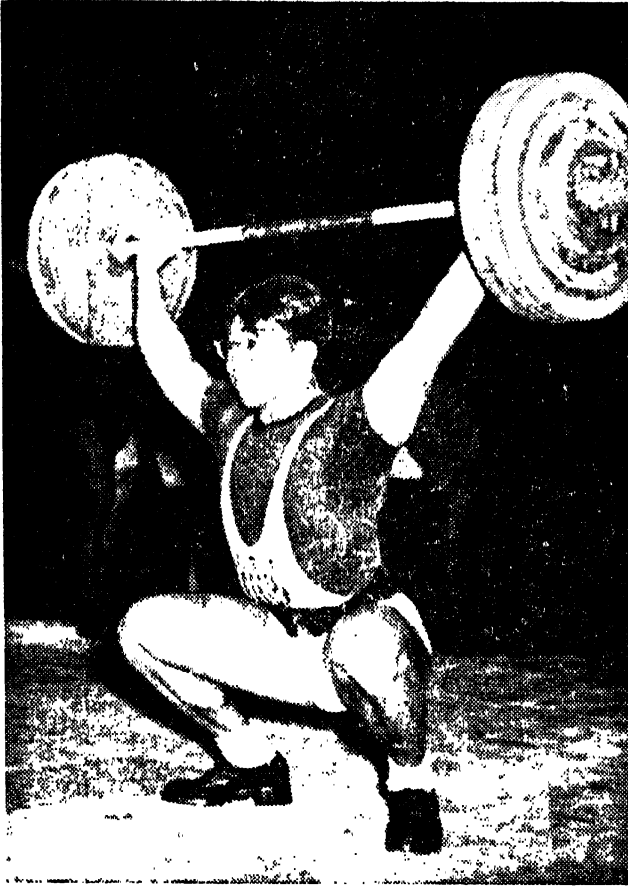
লাইট হেভিওয়েট ভারোত্তোলনের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন এবং ১৯৫৫ সালের বিশ্বশ্রী আখ্যা লাভকারী আমেরিকান চ্যাম্পিয়ন টমিকোনোর ভারোত্তোলনের দৃশ্য। যুক্তরাষ্ট্রের ভারোত্তোলক দলের সংগে কোনোও ২০শে নবেম্বর কলকাতায় আসছেন।

সমবেত দর্শকের হর্ষোৎফুল্ল অভিনন্দন গ্রহণ করতে হল। এই জনপ্রিয়তাই খেলোয়াড় তথা অভিনেতার প্রতিষ্ঠা অর্জনের সোপান। বব্ ম্যাথিয়াজও 'দি বব্ ম্যাথিয়াজ স্টোরী' নামক চিত্রে অভিনয় করে প্রশংসা অর্জন করেছেন। অবশ্য এজন্য তার ' এমেচারের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়েছে এবং তিনি হারিয়েছেন তৃতীয়বার অলিম্পিকে অংশ গ্রহণের অধিকার। জো ওয়ালকটের কোন কিছুই হারাবার আশঙ্কা নেই। মুষ্টিযোদ্ধাজীবনে তিনি লাভ করেছেন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সম্মান এবং প্রভূত অর্থ। এখন চলচ্চিত্র থেকে তার অর্থ এবং যশ লাভের সুযোগ উপস্থিত।

* * *

অস্ট্রেলিয়ার কীর্তিমান ক্রিকেট খেলোয়াড়

আর্থার মরিস প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলা থেকে অবসর গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। এর অর্থ এই বছর ইংলণ্ডে অ্যাংলো-অস্ট্রেলিয়ান টেস্টে মরিসকে আর খেলতে দেখা যাবে না। মরিস অস্ট্রেলিয়া—তথা বিশ্বের একজন নিপুণ ওপেনিং ব্যাটসম্যান। ওয়ারেন বার্ডসলের পর অস্ট্রেলিয়ায় মরিসের মত এমন কৃতী ন্যাটা খেলোয়াড় জন্ম গ্রহণ করেনি এটা ক্রিকেট পণ্ডিতদেরই অভিমত। যাইহোক, অস্ট্রেলিয়া দলে মরিসের অভাব সহজে পূরণ হবার নয় এবং ইংলণ্ডে অস্ট্রেলিয়া দলকে মরিসের অভাব বেশ ভালভাবেই অনুভব করতে হবে।

খেলার ক্ষমতা এবং খেলার মধ্যে মাধুর্য থাকতে থাকতেই খেলা থেকে অবসর গ্রহণ করা উচিত—এই মূল নীতি অবলম্বন করেই অস্ট্রেলিয়ান খেলোয়াড়রা গৌরবদীপ্ত খেলোয়াড় জীবনে খেলা থেকে অবসর গ্রহণ করে থাকেন। তারা কারও বলবার অপেক্ষা রাখেন না। ইতিপূর্বেও এর যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে, মরিসের ক্ষেত্রেও প্রমাণ পাওয়া গেল। তবে মরিস অবসর গ্রহণের যে কারণ দেখিয়েছেন তাতে সাধারণের মনে একটু খোঁকা লেগেছে বৈকি! স্ত্রীর অসুখই নাকি তার অবসর গ্রহণের কারণ। তিনি বলেন—মন প্রাণ ঢেলে দিয়ে ক্রিকেট খেলতে হলে পারিপার্শ্বিক অবস্থাও অনুকূল হওয়া প্রয়োজন। স্ত্রীর অসুখের দুশ্চিন্তা নিয়ে ক্রিকেট খেলা যায় না। মরিস আরও বলেছেন যদি আমি ইংলণ্ড সফরকারী অস্ট্রেলিয়া দলে স্থান পাই তবে আমার স্ত্রী ভিভিয়ান আমার সঙ্গে যেতে পারবে না, কারণ অস্ট্রেলিয়ার কোন খেলোয়াড়ের সস্ত্রীক সফর করবার অধিকার নেই। যাই হোক অস্ট্রেলিয়া এবং ইংলণ্ডের খেলোয়াড়দের স্ত্রী সমভিব্যাহারে বিদেশ সফর করবার দাবী অনেকদিনের। কিন্তু দলের শৃঙ্খলা এবং খেলার প্রতি খেলোয়াড়দের নিষ্ঠা ক্ষুণ্ণ হবার আশঙ্কায় কি এম সি সি কি অস্ট্রেলিয়ান বোর্ড কেউই সস্ত্রীক সফর অনুমোদন করেননি। ভারতীয় ফুটবল টীমের রাশিয়া সফরের সময় ভারতীয় টীমের দলপতি শ্রী পি গুপ্ত তাঁর সহধর্মিণীকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। এজন্য বিভিন্ন সংবাদপত্র এবং সাময়িকপত্রে কম আলোচনা হয়নি। সংবাদপত্রের কঠোর সমালোচনায় এক সাংবাদিক মস্করা করে বলেছিলেন পি গুপ্ত পরস্ত্রী সঙ্গে নিয়ে গেলে এত কথা উঠতো কিনা সন্দেহ। হয়তো উঠতো না; কিন্তু নিজের স্ত্রী সঙ্গে নেবার জন্য কেন কথা উঠেছিল সাংবাদিকবন্ধু এখন হয়তো সেটা অনুভব করতে পারবেন।

* * *

ন্যাশন্যাল ক্রিকেট ক্লাবের ইনডোর স্টেডিয়ামে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত পূর্ব-ভারত ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতায় ইন্দোনেশিয়ার খ্যাতনামা খেলোয়াড় এ ডি ইউসুফ বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেছেন। সিঙ্গলসের ফাইনাল খেলায় তিনি পরাজিত করেছেন ভারতের কৃতী খেলোয়াড় অমৃত দেওয়ানকে। যদিও নন্দ নাটেকার, টি এন শেঠ প্রভৃতি ভারতের কীর্তিমান কয়েকজন খেলোয়াড় পূর্বভারত ব্যাডমিণ্টনে অংশ গ্রহণ করেননি তবুও ভারত ইন্দোনেশিয় খেলোয়াড়ের এই সাফল্যে অভিনন্দন জানাই। লখনৌতে নর্দার্ন ইণ্ডিয়া চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইন্যাল খেলায় ইউসুফকে ভারতের টমাস কাপ দলের অধিনায়ক টি এন শেঠের কাছেই পরাজয় স্বীকার করতে হয়। বিশ্বের ব্যাডমিণ্টন ক্ষেত্রে এতদিন মালয়েরই একচেটিয়া প্রাধান্য ছিল; কিন্তু ইন্দোনেশিয় খেলোয়াড় ফেনি সোনেভিলের কাছে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন এডি চুংয়ের পরাজয়ের পর স্বাভাবিকভাবেই ইন্দোনেশিয় খেলোয়াড়দের

ইন্দোনেশিয়ার পয়লা নম্বর খেলোয়াড়। সোনেভিলের পরেই ইউসুফের স্থান। এ ডি ইউসুফ ইন্দোনেশিয়ার দুই নম্বরের খেলোয়াড়। ইন্দোনেশিয়ার আর একজন খেলোয়াড়ও পূর্ব ভারতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন এর নাম অনিচ; কিন্তু এল অনিচ বেশী দূর অগ্রসর হতে পারেননি; সেমি-ফাইনালে ধনাডের কাছে পরাজিত হয়েছেন। ইন্দোনেশিয় ব্যাডমিন্টন ক্রমপর্যায়ে এল অনিচ তৃতীয় স্থানের অধিকারী। ইন্দোনেশিয়ার এই খ্যাতনামা খেলোয়াড় ছাড়া পূর্ব ভারত ব্যাডমিন্টনে আর একজন বিদেশী খেলোয়াড় অংশ গ্রহণ করেছিলেন—এর নাম সামসেদ আলী, পাকিস্থানের পয়লা নম্বর খেলোয়াড়। সামসেদ সেমি-ফাইন্যালে পরাজিত হয়েছেন এ ডি ইউসুফের কাছে। বিদেশের কয়েকজন খেলোয়াড়ের আগমনের ফলে পূর্ব ভারত ব্যাডমিন্টন বেশ জমে উঠেছিল, খেলা দেখেও দর্শকেরা বেশ আনন্দ উপভোগ করেছেন। নীচে সমস্ত বিভাগের ফাইন্যাল খেলাগুলির ফলাফল দেওয়া হল—

সিংগলস ফাইন্যাল—এ ডি ইউসুফ (ইন্দোনেশিয়া) ১৫—১০ ও ১৫—৯ পয়েন্টে অমৃত দেওয়ানকে পরাজিত করেন।

ডাবলস ফাইন্যাল—মনোজ গুহ ও জোনন হেমোডি ১৭—১৪ ও ১৫—৬ পয়েন্টে সামসেদ আলী (পাকিস্থান) ও টি এন ধনাডেকে পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস ফাইন্যাল—কুমারী নীলিমা ঘোষ ও সামসেদ আলী (পাকিস্থান) ১৭—১৬ ও ১৫—১১ পয়েন্টে কুমারী মীরা দাশ ও এ ডি ইউসুফকে (ইন্দোনেশিয়া) পরাজিত করেন।

মেয়েদের সিংগলস ফাইন্যাল—মিস এস সুইনি ১১—৫ ও ১১—৮ পয়েন্টে কুমারী মীরা দাশকে পরাজিত করেন।

জুনিয়ার সিংগলস ফাইন্যাল—দীপু ঘোষ ১৫—৮ ও ১৫—১১ পয়েন্টে গোরা ঘোষকে পরাজিত করে।

সপ্তাহের টুকরো খবর

আন্তর্জাতিক ফুটবল—গত সপ্তাহে অনেকগুলি আন্তর্জাতিক ফুটবল খেলা অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। এর মধ্যে রাশিয়া চ্যাম্পিয়ন মস্কো ডায়নামো এবং ইংল্যাণ্ডের খ্যাতনামা ক্লাব উলভারহ্যামটন ওয়াণ্ডারার্স দলের খেলাটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উলভ মাঠে ফ্লাড লাইটে খেলাটি অনুষ্ঠিত হয় এবং উলভ দল ২—১ গোলে ডায়নামোকে পরাজিত করে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে গত ১০ বছরের মধ্যে ৬ বার ডায়নামো টীম ব্রিটিশ ক্লাবের সংগে ফুটবল ম্যাচ খেলেছে—এর মধ্যে এই খেলা ছাড়া অন্য কোন খেলায় তাদেরকে হার স্বীকার করতে হয়নি।

ইংল্যাণ্ডের টটেনহ্যাম হর্সপার মাঠে জার্মানী ও ইংলণ্ড দলের খেলাটির কথাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইংল্যাণ্ড দল ২—০ গোলে এগিয়ে থাকা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত জার্মানী ৩—২ গোলে ইংল্যাণ্ডকে হারিয়ে দেয়।

বুদাপেস্টে আর এক আন্তর্জাতিক খেলায় শক্তিশালী হাঙ্গেরী দল ৪—১ গোলে সুইডেনকে হারিয়ে দিয়েছে। আমস্টার্ডাম অলিম্পিক স্টেডিয়ামে হল্যাণ্ড নরওয়েকে হারিয়েছে ৩—০ গোলে।

মস্কো ডায়নামো দল আর একটি খেলায় ইংলেণ্ডের সাণ্ডারল্যাণ্ড দলকে ১—০ গোলে হারিয়ে দিয়েছে।

লোহার বল ছোড়ায় নতুন বিশ্ব রেকর্ড—রাশিয়ার মহিলা অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ান মিস গ্যালিনা জিবিনা লোহার বল ছোড়ায় নতুন বিশ্ব রেকর্ড করেছেন। ১৯৫৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে গ্যালিনা ৫৩ ফুট ৪½ ইঞ্চি দূরে লোহার বল ছুড়ে নতুন বিশ্ব রেকর্ড করেছিলেন; কিন্তু সম্প্রতি তিনি স্টালিনগ্রাডে ৫৩ ফুট ১১½ ইঞ্চি দূরে বল ছুড়েছেন। জিবিনার এ রেকর্ড অবশ্য অনুমোদন সাপেক্ষ।

বর্শা ছোড়ায় নতুন ভারতীয় রেকর্ড—ব্যাঙ্গালোরে প্রসন্নকুমার এ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতায় কেনেথ বর্শা ছোড়ায় নতুন ভারতীয় রেকর্ড করেছেন। কেনেথ বর্শা ছুড়েছেন ১৮৯ ফুট ২ ইঞ্চি দূরে। পাতিয়ালার পার্শ্বা সিং ১৮৫ ফুট ৪½ ইঞ্চি দূরে বর্শা ছুড়ে রেকর্ড করেছিলেন। কেনেথের নতুন রেকর্ড অবশ্য অনুমোদন সাপেক্ষ। এখানে বলা যেতে পারে বর্শা ছোড়ায় অলিম্পিক রেকর্ড ২৪২ ফুট ৩ ইঞ্চি আর বিশ্ব রেকর্ড ২৬৩ ফুট ১০ ইঞ্চি।

জাতীয় ওয়াটারপোলো প্রতিযোগিতার বিজয়ী বাঙলা দল

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ভলিবল—আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ভলিবল প্রতিযোগিতার ফাইন্যাল খেলায় পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় ৩—১ খেলায় মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়কে হারিয়ে চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেছে। পাঞ্জাব ১৫-১১, ৫-১৫, ১৫-১০ ও ১৫-১৩ পয়েন্টে মাদ্রাজকে পরাজিত করে।

নিউজিল্যাণ্ড ও ভারতের টেস্ট খেলা—নিউজিল্যাণ্ড ও ভারতের প্রথম টেস্ট খেলা ১৯শে নবেম্বর থেকে হায়দরাবাদে আরম্ভ হচ্ছে। প্রথম টেস্ট খেলবার জন্য ভারতের পক্ষে যারা মনোনীত হয়েছেন, নীচে তাদের নাম দেওয়া হল। এর মধ্যে কৃপাল সিং স্বামী টেস্ট টীমে নবাগত।

গোলাম আমেদ (অধিনায়ক), পি উমরিগর (সহ অধিনায়ক), ভি মানকড়, পি রায়, কৃপাল সিং, জি এস রামচাঁদ, এন এস তামানে, এস পি গুপ্তে, ডি জি ফাদকার, ভি এল মঞ্জরেকার, স্বামী ও পি ভাণ্ডারী (দ্বাদশ খেলোয়াড়)।

দেশী সংবাদ

৭ই নভেম্বর—রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের সুপারিশসমূহ আলোচনার জন্য আজ নয়াদিল্লীতে বিভিন্ন প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতিগণ এক বৈঠকে মিলিত হন। কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঢেবর উহাতে সভাপতিত্ব করেন। পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গের দাবী সম্পর্কে এক স্মারকলিপি পেশ করেন।

৮ই নভেম্বর—নয়াদিল্লীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের বিভিন্ন সুপারিশ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা হয়। মধ্যভারত, মহাকোশল, বিন্ধ্য প্রদেশ ও ভূপালকে লইয়া একটি নূতন মধ্যপ্রদেশ রাজ্য গঠনের জন্য কমিশন যে প্রস্তাব করিয়াছেন, কমিটি তাহা গ্রহণের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কমিটি স্থির করিয়াছেন যে, বোম্বাই, গুজরাট ও মহারাষ্ট্র—এই তিনটি পৃথক রাজ্য গঠন করা হইবে।

পশ্চিমবঙ্গের সমুদয় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা সরকারী পরিচালনায় পরিচালিত করার প্রস্তাব করা হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। এতদুদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি পরিকল্পনা চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করিতে চলিয়াছে।

গোয়া জাতীয় কংগ্রেসের সভানেত্রী শ্রীমতী যোশী সামরিক ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক ১০ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

৯ই নভেম্বর—রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের রিপোর্ট সম্পর্কে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে এক সুদীর্ঘ প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, ত্রিপুরা ইত্যাদি রাজ্যের সমস্যা সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য শ্রীনেহরু, শ্রীঢেবর, শ্রীপন্থ ও মৌলানা আজাদকে লইয়া উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন এক সাব-কমিটি গঠন করা হইয়াছে।

১০ই নভেম্বর—দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার কার্যকালে দেশের কয়লার উৎপাদন বৎসরে ২ কোটি ২০ লক্ষ টন বাড়াইবার জন্য বেসরকারী শিল্পের ক্ষেত্রে যে সকল কয়লা খনি অঞ্চল হইতে কয়লা উত্তোলনের কাজ আরম্ভ হয় নাই, সেইগুলি রাষ্ট্রীকরণের বিষয় ভারত সরকার বিবেচনা করিতেছেন।

কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন দপ্তরের সেক্রেটারী শ্রী সি এন চন্দ এক বিবৃতিতে বলেন যে, পশ্চিমবঙ্গে ইতোমধ্যেই পূর্ব-পাকিস্থান হইতে ২৮ লক্ষ উদ্বাস্তু আসিয়াছে—এখন মাসে প্রায় ২৫ হাজার লোক পূর্ব পাকিস্থান হইতে ভারতে চলিয়া আসিতেছে। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী।

বিহারের মানভূম জেলার লোকসেবক সংঘ এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের লইয়া গঠিত এক প্রতিনিধিদল আজ নয়াদিল্লীতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পণ্ডিত পন্থ, কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঢেবর প্রমুখ নেতৃবৃন্দের সহিত

সাক্ষাৎ করেন। ধানবাদের চাস থানা, ধলভূম ও সাঁওতাল পরগণার অংশ প্রভৃতি বিহারের বাঙলা ভাষী এলাকা সম্পর্কে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের সুপারিশ সংশোধন করিবার জন্য ইঁহারা দাবী জানান।

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের রহস্যজনক অন্তর্ধান সম্পর্কে সরকারীভাবে তদন্ত আরম্ভ করার প্রস্তাব এখন ভারত সরকারের বিবেচনাধীন রহিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

১১ই নভেম্বর—প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরু আজ অমৃতসরে এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে দেশের জনগণকে [illegible]দের ক্ষুদ্র বিভেদ ভুলিয়া পরমতসহিষ্ণু হইতে এবং সংঘবদ্ধভাবে 'সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নূতন পথে' যাত্রা করিতে আহ্বান জানান।

আজ কলিকাতায় ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে অনুষ্ঠিত এক বিরাট জনসভায় একটি প্রস্তাবক্রমে রাজ্য-সীমানা-বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য কংগ্রেস নিযুক্ত কমিটির উদ্দেশে এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয় যে, পশ্চিমবঙ্গ ও উড়িষ্যার সঙ্গত দাবী যদি অবিলম্বে পূরণ করা না হয়, তবে গণ-আন্দোলন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে।

রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ আজ অন্ধের তীর্থক্ষেত্র তিরুপতিতে সংস্কৃত বিশ্বপরিষদের চতুর্থ অধিবেশনের উদ্বোধন প্রসঙ্গে সমবেত বিদ্বম্মণ্ডলীকে সংস্কৃত ভাষার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে পরিকল্পনা রচনার আহ্বান জানান।

১২ই নভেম্বর—কেন্দ্রীয় যোগাযোগ মন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম আজ এইরূপ আভাস দেন যে, ভারত ও সোভিয়েট সরকারের মধ্যে সম্পাদিত এক চুক্তি অনুযায়ী ভারত ও রাশিয়ার মধ্যে সরাসরি বিমান চলাচলের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইয়াছে।

১৩ই নভেম্বর—ভারত ও বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নেতৃবৃন্দ প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরুকে তাঁহার ৬৭তম জন্মদিবস উপলক্ষে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়া বাণী প্রেরণ করিয়াছেন।

বিদেশী সংবাদ

৬ই নভেম্বর—মরোক্কোর নির্বাসিত সুলতান সিদি মহম্মদ বেন ইউসুফকে মরক্কোর সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। বেন ইউসুফ দুই বৎসর নির্বাসিত ছিলেন।

আমেরিকার সহকারী রাষ্ট্রসচিব মিঃ জর্জ এলেন ঘোষণা করেন যে, আরব বা ইসরাই[ল] পশ্চিম এশিয়ার যে কোন দেশই আক্র[ান্ত] হউক না কেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্ভ[ব] সকল উপায়ে উহাকে সাহায্য করিবে।

৯ই নভেম্বর—অদ্য পশ্চিম পাকিস্থানে উয়াজিরিস্থানে সরকারী বাহিনী এবং 'শ[ত্রু] ভাবাপন্ন' এক দলের মধ্যে সংঘর্ষের ফ[লে] ৫ জন নিহত হইয়াছে ও একজনকে ব[ন্দী] করা হইয়াছে।

রাষ্ট্রপুঞ্জে সাধারণ পরিষদের বিশেষ রাজ[নৈতিক] কমিটি অদ্য দক্ষিণ আফ্রিক[ার] বর্ণ-সমস্যা সংক্রান্ত পরিস্থিতির দি[কে] ভবিষ্যতেও সতর্ক দৃষ্টি রাখার সিদ্ধান্ত গ্র[হণ] করেন এবং তদনুযায়ী পূর্বতন কমিশনকে পুনরায় এ কার্যে নিয়োগ করেন।

১০ই নভেম্বর—বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী স[্যার] এণ্টনী ইডেন আজ রাশিয়ার বিরুদ্ধে এ[ই] অভিযোগ করেন যে, আরব জগতে কম্যুনিজমের প্রবেশ সহজ করিয়া তুলিবার জন্য পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে আর[ব] রাষ্ট্রসমূহে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করা হইতেছে।

রুশ পররাষ্ট্র সচিব মঃ মলোটভ আজ জেনেভা সম্মেলনে চতুঃশক্তির সশস্ত্র [illegible] হ্রাসের পরিকল্পনা পেশ করেন। বৃহৎ চতু[ঃ]শক্তি পররাষ্ট্র মন্ত্রিগণ অদ্য খণ্ডিত জা[র্মানীর] পুনর্মিলন ও ইউরোপীয় নিরাপত্তা সম্পর্কে আলোচনা স্থগিত রাখিয়াছেন।

১১ই নভেম্বর—ব্রেজিলে স্থল বাহিনী[র] আকস্মিক অভ্যুত্থানের ফলে ক্ষমতাচ্যুত অস্থায়ী প্রেসিডেণ্ট কার্লস লুজ আজ একখানি রণজাহাজযোগে অজ্ঞাতস্থানাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। নূতন প্রেসিডেণ্ট সেনর নেরেউ রামস আজ কার্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

ঢাকার সংবাদে প্রকাশ, সমাজবিরোধীদের বিরুদ্ধে পূর্ববঙ্গ সরকার এক ব্যাপক অভিযান আরম্ভ করিয়াছেন। স্বল্পমূল্যে বিক্রয়ের জন্য সরকারী খাদ্য দপ্তর হইতে প্রচুর পরিমাণ ধান-চাউল দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু মুনাফার মতলবে সমাজবিরোধীরা উহা গুদামজাত করিয়া ফেলিয়াছে। ফলে ধান-চাউলের দর বাড়িয়া গিয়াছে।

১২ই নভেম্বর—জেনেভায় বৃহৎ চতুঃশক্তি পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের বৈঠকে নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কিত আলোচনা আজ সম্পূর্ণ অচল অবস্থার মধ্যে শেষ হইয়াছে।

১৩ই নভেম্বর—অনতিবিলম্বে দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের বর্ণবৈষম্য নীতি পরিত্যক্ত না হইলে বিশ্বের শান্তি ব্যাহত হইবে বলিয়া অভিযোগ করিয়া ভারত সরকার রাষ্ট্রপুঞ্জে এক স্মারকলিপি প্রেরণ করিয়াছেন।

আর্জেণ্টিনা সরকার তিন দিন আগে এক রাজনৈতিক উপদেষ্টা কমিটি গঠন করিয়াছিলেন। প্রেসিডেণ্ট এডোয়ার্ডো লোনার্ডির সহিত গুরুতর মতভেদ উপস্থিত হওয়ায় কমিটির সদস্যগণ আজ একযোগে পদত্যাগ করিয়াছেন।

প্রতি সংখ্যা—।৵ আনা, বার্ষিক—২০৲, ষাণ্মাসিক—১০৲
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা, লিমিটেড, ৬ ও ৮, সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১৩
শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস লিমিটেড হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদক—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন   সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

স্বাগত

সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী মিঃ বুলগানিন এবং সর্বোচ্চ সোভিয়েট সভাপতিমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য মিঃ খ্রুশ্চেভ সপ্তাহকাল অতীত হইতে চলিল ভারত সফরে আসিয়াছেন। আমরা আমাদের মহামান্য অতিথিস্বরূপে তাঁহাদিগকে নিজেদের মধ্যে পাইয়া ধন্য হইয়াছি। কয়েকদিনের মধ্যেই তাঁহারা কলিকাতায় আগমন করিতেছেন। পশ্চিমবঙ্গ তাঁহাদিগকে অভিনন্দন করিবার জন্য আগ্রহে আকুল হইয়া উঠিয়াছে। কলিকাতা শহরে তাঁহাদের এই অভিনন্দন ঐতিহাসিকভাবে উল্লেখযোগ্য হইবে আমরা এই আশা করিতেছি। আমাদের সকলের সহযোগিতার এই অভিনন্দন সশ্রদ্ধ, সংযত এবং সর্বাংশে সৌষ্ঠব-মণ্ডিত হয়, ইহাই আমাদের কামনা। জাতীয়তার জন্মভূমি এই পশ্চিমবঙ্গ। বাঙালীর এই জাতীয়তাবাদ মানবতাকে ভিত্তি করিয়াই জাগ্রত হইয়াছে এবং সমগ্র ভারতের সংস্কৃতিতে অভিনব শক্তি সঞ্চার করিয়াছে। মানবতামূলক সেই সংস্কৃতির অনুভূতি আজ সোভিয়েট রাশিয়ার জননায়কগণকে সংবর্ধিত করিবার আগ্রহ আমাদের অন্তরকে উদ্দীপ্ত করিতেছে। বাঙালী জানে, যে রাষ্ট্রের প্রতিনিধি-স্বরূপে তাঁহারা আসিতেছেন শাসিত ও শোষিত জনসাধারণের অভ্যুন্নতির জন্য সেই রাষ্ট্র বর্তমানে বিপুল সাধনায় প্রবৃত্ত রহিয়াছে। কোটি কোটি নিপীড়িত নরনারীর বেদনা তাঁহাদের সাধনার মূলে অনুপ্রেরণা সঞ্চার করিতেছে। বাঙালী এই সাধনার মর্যাদা বিশেষভাবেই বোঝে। বাঙলার বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ সত্তর বৎসর পূর্বেই নিপীড়িত এবং শোষিত লোকগণের জন্য এমন বেদনা জাতির অন্তরে উদ্দীপ্ত করেন। শাসকশ্রেণীর শোষণমুক্ত রাষ্ট্রের কল্পনা পাশ্চাত্যের চিন্তাজগতেও তখনো উদিত হয় নাই। বাঙলার সন্ন্যাসীর বজ্রবাণী সেই যুগেই সমাজ-জীবনে এবং রাষ্ট্র সাধনার ক্ষেত্রে মানবতার অগ্নিময় প্রেরণা সঞ্চয় করে। সোভিয়েট রাষ্ট্রসাধনায় সেই বেদনারই আমরা অভিব্যঞ্জনা উপলব্ধি করিতেছি এবং ভারতের রাষ্ট্র গঠনে সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনার মূলেও বীর সন্ন্যাসীর সেই বাণীরই বাস্তব চেতনা এতদিনে পরিলক্ষিত হইতেছে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ রাশিয়া পরিদর্শনে গিয়া সেখানকার রাষ্ট্রসাধনায় মানবতার এই চেতনাকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। কবির 'রাশিয়ার চিঠি'তে এই সংবর্ধনার দৃপ্ত রব ধ্বনিত হইয়া বিদেশী রাজশক্তির অন্তরে শঙ্কার সঞ্চার করে। বাস্তবিকপক্ষে ভারতের বিশিষ্ট সংস্কৃতিকে ভিত্তি করিয়াই গণরাষ্ট্রের রূপ এখানে বাস্তব মূর্তি পরিগ্রহ করিতে চলিয়াছে, ইহা বাহিরের ধার করা বস্তু নয়। ভারতীয় সংস্কৃতির মূলীভূত এই আত্মচেতনাই সোভিয়েট রাষ্ট্রনায়কদিগকে আমাদের পক্ষে একান্ত আপনার জন করিয়া তুলিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে এই আত্মীয়তা-বোধের মূলে উৎসটি রাজনীতিক নহে, ইহা সাংস্কৃতিক। সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী মিঃ বুলগানিন ভারত এবং রাশিয়া পারস্পরিক এই সংস্কৃতিগত আত্মীয়তার স্বরূপ বিশ্লেষণ করিতে গিয়া ইহাকে আধ্যাত্মিক বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এই আধ্যাত্মিকতার সংজ্ঞা দিতে গেলে ইহাকে মানবধর্ম বলিতে হয়। পশুত্বের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ঊর্ধ্বে মানুষ হিসাবে মানুষের মধ্যে ইহা একাত্মতাবোধ। স্বাধীনতালব্ধ ভারত তাহার অভিনব রাষ্ট্র গঠনে এই মানবধর্মকেই প্রতিষ্ঠা দিতে অগ্রসর হইয়াছে। সোভিয়েট রাষ্ট্রনায়ক-গণের ভারত পরিদর্শনে আমরা এই ক্ষেত্রে তাঁহাদের আন্তরিক সহযোগিতার পরিচয়ে অভিনব আশায় উদ্দীপ্ত হইতেছি। ভারত এবং রাশিয়ার এই পারস্পরিক মৈত্রী বিশ্বের নিপীড়িত এবং নিগৃহীত মানব-সমাজের মুক্তির পথ প্রশস্ত করুক এবং জগতের সর্বত্র শান্তি প্রতিষ্ঠার সহায়ক হোক্ এই কামনা অন্তরে লইয়া পশ্চিম-বঙ্গের পক্ষ হইতে মহামান্য অতিথিদিগকে আমরা আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

ভারতের সংস্কৃতি ও হিমালয়

মার্শাল বুলগানিন এবং তাঁহার সহকর্মীদিগকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতে গিয়া ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিমালয়ের প্রসঙ্গ অবতারণা করেন। সোভিয়েট রাষ্ট্রনায়ক স্বয়ং এবং তাঁহার সহ-কর্মিগণ সোজাসুজি হিমালয়ের উপর দিয়া উড়োজাহাজযোগে ভারতে আসিয়া-

ছেন, এই প্রসংগে কথাটি উত্থাপিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া হিমালয়ের প্রতি আমাদের প্রধান মন্ত্রীর বিশেষ আকর্ষণও রহিয়াছে। পণ্ডিত জওহরলালের মতে হিমালয় এতদিন ভারতের সহিত বহির্জগতের ব্যবধান সৃষ্টি করিতেছিল, এতদিনে সেই বাধা দূর হইল। অতঃপর হিমালয় ভারতের সহিত বহির্জগতের সংযোগ-সূত্রস্বরূপে কাজ করিবে; তিনি এই আশা প্রকাশ করিয়াছেন। প্রকৃত-পক্ষে ভারতের প্রধান মন্ত্রীর এই বিচার অনেকটা ভৌগোলিক এবং আধুনিক জগতের গতিবিধির পরিস্থিতির উপর অনেকটা প্রতিষ্ঠিত। ফলত বহির্জগতের সংগে ভারতের সংযোগের ব্যবধান সৃষ্টির দিক হইতে হিমালয় সম্পর্কে এই বিচার সর্বাংগীণ হিসাবে সত্য নহে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। হিমালয় ভারতের তপোমূর্তি,—ভারতের সংস্কৃতির অধ্যাত্মস্বরূপ হিমালয়। সেই সংস্কৃতি জড় ভোগ—সুখ এবং তৎসম্পর্কিত আসুরী প্রবৃত্তিকে বড় করিয়া দেখে নাই; মৈত্রীই ভারতের সংস্কৃতির মর্মকথা। প্রকৃতপক্ষে ভারতের সংস্কৃতি-গত এই মৈত্রী এবং মানবতাকে যাহারা বড় বলিয়া বুঝে নাই, হিমালয়ের উত্তুংগ শৃংগের পাষাণ-প্রাচীর ভারতের সহিত সম্পর্ক স্থাপনে তাহাদের পক্ষেই বাধা সৃষ্টি করিয়াছে। ত্যাগের পথে ভোগকে যাহারা বড় বলিয়া বুঝে নাই, হিমালয়ের যোগ-বিভূতি তাহাদের গতিকেই ব্যাহত করিয়াছে। পক্ষান্তরে বিশ্ব-মানব মৈত্রীর প্রতি যাহারা শ্রদ্ধিত-চিত্ত হইয়াছেন, রজতগিরিসন্নিভ হিমাচলের মনোময় মাধুরী তাঁহাদিগকে অভিনন্দিত করিয়াছে এবং ভারতের প্রাণসূত্রের সংগে তাঁহাদের সংযোগ সাধন করিয়াছে। তপোমূর্তি হিমালয়ের ধ্যানগম্ভীর সাধনা ভারতের অধ্যাত্ম চেতনাকে যুগে যুগে এইভাবে জগতে ব্যাপ্তি দীপ্তি দিয়াছে। ভারতের মানসলোকে হিমালয়ের তপঃপ্রভাব প্রবন্ধ এই পুণ্যপ্রভাব উদার কারুণ্যের অপরূপ মহিমায় মানবতাকে উদ্ভিন্ন করিয়াছে। হিমালয়ের তপোবীর্যস্বরূপ সেই পরম ঔদার্য যদি আমরা উপলব্ধি করিতে পারি, তবে হিমালয়ের সহিত বিশ্বজগতের সংযোগের সনাতন স্বাভাবিক সূত্রটি আমাদের দৃষ্টিতে উন্মুক্ত হইবে। বিশ্বজগৎ ভারতকে আপনার করিয়া পাইবে। ফলতঃ হিমালয়ের পাষাণ প্রাচীরের প্রতীয়মান ব্যবধান তখন আর থাকিবে না। আমরা সেই দিনের পুনরভ্যুদয় প্রত্যক্ষ করিতে চাই।

পূর্ববংগের সমস্যার মূলে

পূর্ববংগের যুক্তফ্রন্টদলে যুক্ত নির্বাচন এবং বাঙলা ভাষাকে পাকিস্থানের রাষ্ট্রভাষাস্বরূপে মর্যাদাদানের সংকল্প গৃহীত হইয়াছে। পাকিস্থানের গণ-পরিষদে অল্পদিনের মধ্যেই শাসনতন্ত্রের মুসাবিদা উপস্থাপিত হইবে, পশ্চিম পাকিস্থানের বিরোধিতা সত্ত্বেও তৎকালে যুক্তফ্রন্টের প্রস্তাব দুইটি পাক-শাসন-তন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হইবে বলিয়া আশা করা যায়। বাঙলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য ঢাকার যেসব ছাত্র পুলিসের গুলীতে প্রাণ দিয়াছিলেন, পূর্ববংগের মুখ্যমন্ত্রী সম্প্রতি ঘোষণা করিয়াছেন যে, তাঁহাদের স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে এবং তাঁহাদের আত্মদানের দিবসে সরকারী ছুটি থাকিবে। এসব খুবই আশার কথা; কিন্তু প্রগতিবিরোধী দলও সেখানে নিশ্চিন্ত নহে। পূর্ববংগের অন্যতম মন্ত্রী শ্রীবসন্তকুমার দাস সম্প্রতি একটি বিবৃতিতে প্রকাশ করিয়াছেন যে, করাচীতে পূর্ববংগ নিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত সংশ্লিষ্ট কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি পূর্ববংগের মোল্লা-মৌলবীদিগকে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষে উত্তেজিত করিতেছেন এবং পূর্ববংগ সরকারের বিরুদ্ধে প্রচার-কার্য চালাইতেছেন। এই প্রচারকার্যের তাৎপর্য এই যে, হিন্দুদিগকে মন্ত্রিপদে গ্রহণ করা ইস্‌লাম রাষ্ট্রের পক্ষে অন্যায় কার্য। বস্তুত পাকিস্থানকে আধুনিক জগতে উন্নত রাষ্ট্রের পর্যায়ভুক্ত করিতে হইলে মধ্যযুগীয় এই শ্রেণীর সাম্প্র-দায়িকতার অন্ধতা হইতে তাহাকে মুক্ত করা প্রয়োজন। কিন্তু পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার মূলে রাজনীতিক সেইরূপ কোন উদার আদর্শ ছিল না, এবং আজ পর্যন্ত তাহা জাগে নাই, এইখানে যত রকমের গোল ঘটিতেছে। পূর্ববংগের সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় এই শ্রেণীর ধর্মান্ধতার অনিষ্টকারিতা যতদিন উপলব্ধি করিতে না পারিবে, রাষ্ট্র হিসাবে পাকিস্থানে বিড়ম্বনার অবসান ঘটিবে বলিয়া মনে হয় না। পূর্ববংগ ছাড়া পাকিস্থানে অন্যত্র সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গত সমস্যা নাই এবং পূর্ববংগের অধিবাসীরাই পাকিস্থানের জনসংখ্যার সবচেয়ে বেশী। এজন্য পূর্ববংগের উপর পাকিস্থানে রাষ্ট্রাধিকার সর্বাপেক্ষা অধিক গুরু আসিয়া বর্তিয়াছে।

ভারতে শিশুদের দুর্দশা

রাষ্ট্রপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের মিঃ টি জে ডেভিড সম্প্রতি এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন যে, বর্তমানে জগতে ৩৯ কোটি শিশু রহিয়াছে, ইহাদের মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ শিশুই দুধ খাইতে পায় না। তিনি একথাও জানাইয়াছেন যে, এইরূপ শিশুর সংখ্যা ভারতেই সবচেয়ে বেশী। এত আড়ম্বরের সহিত শিশু-সপ্তাহ প্রতি-পালন করিবার পর মিঃ ডেভিডের এই মন্তব্য শুনিয়া আমরা শুধু মর্মপীড়াই অনুভব করি নাই, ইহাতে বিশ্বের দৃষ্টিতে নিদারুণ লজ্জায় আমাদের মাথা নত হইয়াছে। ঠিক হিসাব আমরা জানি না, তবে আমাদের ইহাই মনে হয় যে, দুধের অভাবে যেসব শিশুর জীবন-দীপ অকালে নির্বাণোন্মুখ হইতেছে, এই পশ্চিমবংগে তাহাদের সংখ্যা সামান্য নহে, বরং ভারতের অন্যান্য প্রদেশের চেয়ে বেশী হওয়াই সম্ভব। পূর্ববংগ হইতে উদ্বাস্তু সমাগমের ফলে এই সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই কলিকাতা শহরের অলিতে-গলিতে এবং বস্তীসমূহে কত শিশু দুধের অভাবে কষ্ট পাইতেছে, কে জানে? অথচ মিষ্টান্ন প্রভৃতি রসনার বিলাস ব্যাপারে এই শহরে দুধের খরচ কম হইতেছে না। দেখা যাইতেছে, ভারতের মধ্যে একমাত্র বোম্বাই শহরে দুধ সরবরাহের ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়া চলিতেছে। ইতিমধ্যেই বোম্বাই শহরের প্রায় অর্ধেকসংখ্যক অধিবাসীর বাড়িতে স্বল্পমূল্যে দুগ্ধ সরবরাহ করা হইতেছে। আগামী ৫ বৎসরের মধ্যে দুগ্ধ সরবরাহের ক্ষেত্র সেখানে আরও সম্প্রসারিত করা হইবে। দেশে দুগ্ধের সংস্থা বৃদ্ধির ব্যাপারে বোম্বাই রাজ্যের এই প্রশংসনীয় উদ্যম ভারতের অন্যান্য রাজ্যের অনুকরণীয়।

মিঃ বুলগানিন, মিঃ খ্রুশ্চেভ এবং এঁদের সহযাত্রী সোভিয়েট াদের আগমনে ভারতে যে বিপুল ্যুক্যের সৃষ্টি হয়েছে এবং ঔৎসুক্য ট করার জন্য সরকারী বেসরকারী উদ্যম দেখা গেছে, পূর্বে কোনো দেশী রাজপুরুষের আগমনে তা দেখা য়নি। এরূপ সম্বর্ধনার আয়োজনও র্বে কখনো হয়নি। অবশ্য ইংরেজ াজত্বের কালে বৃটিশ রাজারাণী বা প্রিন্স অব ওয়েলসদের ভারত পরিদর্শনের কথা এখানে ধরছি না। সরকারী প্রচারের কথা বাদ দিলেও রুশ নেতাদের সম্বন্ধে সাধারণের কৌতূহল ও ঔৎসুক্য স্বাভাবিক।

প্রথমত, এঁরা ভারতবাসীর চক্ষে নূতন। অতীত ইতিহাস খুঁজে রুশ-ভারত যোগাযোগের যতই নূতন আবিষ্কারের কথা প্রচারিত হোক না কেন প্রকৃতপক্ষে রাশিয়ানদের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ পরিচয় প্রায় ছিলই না। পর্তুগীজ, ডাচ, ইংরেজ, ফরাসীদের সঙ্গে ভারতের যে-ধরনের পরিচয় হয়েছে, তার স্মৃতি বহু বিষয়েই সুখস্মৃতি নয়। পশ্চিম ইউরোপের নৌ-শক্তিবান জাতিগুলির সঙ্গে যে-ধরনের পরিচয় ভারতের হয়েছে জার-শাসিত রাশিয়ার সঙ্গে সে-ধরনের পরিচয় ভারতের হয়নি। রাশিয়া যাতে নৌ-শক্তিবান রাষ্ট্র হতে না পারে, তার চেষ্টাই ইংরেজ প্রভৃতি জাতিরা করেছে। সমুদ্রের পথে এগুতে না পেরে রাশিয়া স্থলপথে এশিয়ায় তার সাম্রাজ্য বিস্তার করেছে। রুশ শক্তি ভারতের দিকে অকসাস নদী পর্যন্ত এসেছে, তার এদিকে বৃটিশ সাম্রাজ্য তাকে আসতে দেয়নি। আফগানিস্তান দুই সাম্রাজ্যের মধ্যে 'buffer state' হয়েছিল। আফগানিস্তান রুশ প্রভাবাধীন না হয়, এটা বৃটিশ সাম্রাজ্যিক নীতির অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল। আফগানিস্তানের সঙ্গে ইংরেজের যত যুদ্ধ হয়েছে, প্রত্যেকটার সঙ্গেই রুশ-বৃটিশ সাম্রাজ্যিক স্বার্থের সংঘর্ষ কোনো না কোনো ভাবে জড়িত ছিল। যাই হোক জার-শাসিত রাশিয়াকে ইংরেজ ভারতে ঢুকতে দেয়নি। যদি জার-শাসিত রাশিয়া ভারতে ঢুকতে পারত, তবে বর্তমানে ভারতে রাশিয়ানদের অভিনন্দন থাকত না এবং রাশিয়ানদের প্রতি ভারতবাসীর যে কোনো রকম বিরূপ ভাব নেই, যা অন্য অনেক ইউরোপীয় জাতির সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অধিক আছে, এ অবস্থাও হোত না। জার-শাসিত রাশিয়াকে যে বৃটিশ ভারতে নাক গলাতে দেয়নি, তার সুফল বর্তমানে সোভিয়েট সরকার ভোগ করছেন। অবশ্য ভারতের কোনো অংশ যদি অতীতে জার-শাসিত রাশিয়ার কবলে গিয়ে পড়ত, তবে সেটা আজ হয়ত U S S R-এর অন্তর্গত একটি সোভিয়েট সোস্যালিস্ট রিপাবলিকরূপে দেখা যেত। কারণ সোভিয়েট শক্তি জার-শাসিত সাম্রাজ্যের কোনো অংশকেই মস্কোর কর্তৃত্বের বাইরে

যেতে দেয়নি। এমন কি U S S R-এর পরিধি আজ জার-শাসিত সাম্রাজ্যের চেয়েও বড়ো। বলা বাহুল্য জার-শাসিত সাম্রাজ্যের প্রকৃতি ও U S S R-এর প্রকৃতি এক নয়। যাই হোক ভারতের সঙ্গে জার-শাসিত রাশিয়ার যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ঘনিষ্ট হতে পারেনি, তার জন্য বর্তমানে রাশিয়ানদের সঙ্গে ভারতবাসীর মেলামেশা সহজ হওয়া সম্ভব, পূর্ব সম্বন্ধের স্মৃতির দ্বারা বর্তমান সম্বন্ধ পীড়িত হবার কারণ নেই।

পূর্ব সম্বন্ধে বেদনাকর স্মৃতির অভাবের সঙ্গে আর একটা বড়ো কারণ যোগ হয়েছে, যার জন্য রাশিয়ানদের সম্বন্ধে আমাদের ঔৎসুক্য অনুরাগসিক্ত হওয়া স্বাভাবিক। লেনিন পরবর্তী রাশিয়ান রাজনীতি সম্বন্ধে নানা মতের উদ্ভব হয়েছে, রাশিয়ার বা অন্য দেশের পথ যে আমাদের পথ নয়, ভারতের মুক্তি ও উন্নতি যে ভারতের নিজের পথেই আনতে হবে, একথা এখন প্রায় সকলেই উপলব্ধি করে, কিন্তু সোভিয়েট বিপ্লব ও সোভিয়েট রাষ্ট্রের বহুমুখী কীর্তির অভিনবত্ব ও বিরাটত্ব ভারতবর্ষের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছে। অনেক বিষয়ে প্রেরণাও জুগিয়েছে। মানবতার দিক দিয়ে লোক-সানের ঘরেও হয়ত দুটো একটা বড়ো অঙ্ক পড়েছে, কিন্তু মানব অভিজ্ঞতা এবং ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাসে সোভিয়েট যে একটা প্রকাণ্ড নূতন অধ্যায় যোগ দিয়ে চলেছে, এসম্বন্ধে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না।

তৃতীয়ত, নিছক শক্তির দিক দিয়ে সোভিয়েট আজ জগতের দুটি প্রধান শক্তির মধ্যে একটি। সমস্ত মিলিয়ে আমেরিকার শক্তি সোভিয়েটের সমান হতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সংহতি সোভিয়েট সরকারের হাতে যে রকম হয়েছে, আমেরিকাতেও সেরূপ হয়নি। এই শক্তির সংহতি আবার অনেকটা রহস্যময়, তার প্রকৃত রূপ সম্বন্ধে বাইরের জগতের জ্ঞান অল্প, সেই জন্য এটা কারো কাছে ভয়, কারো কাছে বা পূজার ভাব উদ্রেক করে, যেমন আমেরিকার শক্তি করে না কারণ, আমেরিকার শক্তি এতো রহস্যময় নয়, তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি সম্বন্ধে অনেক বেশি জানা আছে। সুতরাং সোভিয়েট রাষ্ট্রের নেতাদের আগমনে যে এদেশে এতো ঔৎসুক্য ও আলোড়ন উপস্থিত হবে, এটা আশ্চর্যের বিষয় নয়।

প্রিয় অপ্রিয় নির্বিচারে সত্য কথা বলার সময় এটা নয়। প্রিয় অতিশয়োক্তি ও অপ্রিয়গোপন এসময়ে কিছুটা অবশ্যম্ভাবী। রাশিয়া ও ভারতের উভয়ের লাভ যাতে হতে পারে, তার জন্যই এই অতিথি সংকার।

অতিথি সংকারের মধ্যে খানিকটা বেহিসাবী ভাব না থাকলে তার পূর্ণ মাধুর্য ফোটে না (এবং তার পুরো লাভটাও পাওয়া যায় না)। কিন্তু একে-বারে অসাবধান হওয়ার বিপদ আছে। কারণ পৃথিবী কেবল ভারত ও রাশিয়া নিয়ে নয়। রুশ নেতারা কিন্তু নিজেদের দিক থেকে বেশ সাবধান আছেন বলে মনে হয়। সেটা ভালো।

রুশ নেতারা নিজেরা সাবধানী হলেও অন্যের অসাবধনতার সুযোগ নিতে তাঁরা আপত্তি করবেন, এটা আশা করা যায় না। কারণ তাঁরা রাজনীতিক এবং সোভিয়েটের স্বার্থেই এদেশে এসেছেন, যেমন (আশা করি) পণ্ডিত নেহরু প্রধানত ভারতের স্বার্থেই রাশিয়ার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলেন। ভারতীয় পার্লামেণ্টে মিঃ বুলগানিন ও মিঃ খ্রুশ্চেভ যে বক্তৃতা দিয়েছেন, সেরকম বক্তৃতা ভারতীয় পার্লামেণ্টে ভারতের স্বার্থের দিক থেকে হওয়া উচিত ছিল কিনা সন্দেহ হয়। সম্মানার্থে বিদেশী অতিথিদের পার্লামেণ্টে বক্তৃতা দেওয়ার প্রথা মন্দ একথা বলছি না। কিন্তু সে বক্তৃতা যত-দূর সম্ভব অ-বিতর্কমূলক হওয়াই উচিত। রুশনেতারা তাঁদের বক্তৃতায় সোভিয়েট পররাষ্ট্র নীতির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রতিপক্ষদের নিন্দা করেছেন। এ নজিরটা মোটেই ভাল হল না। **সোভিয়েট নীতি ও সোভিয়েটের বিপক্ষ-দের নীতি সম্বন্ধে মিঃ বুলগানিন যা বলেছেন, তা ঠিক কিনা সে বিচারের কথা এখানে হচ্ছে না। এই ধরনের বক্তৃতা ভারতীয় পার্লামেণ্টে হওয়া উচিত কিনা** সেইটাই বিচার্য। ভবিষ্যতে মার্কিণ অ... বৃটিশ কোনো নেতাকে কি অ... ভারতীয় পার্লামেণ্টে সোভিয়েট পর... নীতির এরূপ সমালোচনা করতে দে...

ভারত যদি নিজেরা কোনো এ... ব্লকের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করত, তা... অবশ্য আলাদা কথা ছিল। মিঃ... সোভিয়েট পার্লামেণ্টে যদি পশ্চিমা শ... দের নিন্দা করে বক্তৃতা করেন, ত... কিছু বলার থাকে না। কারণ চীন... রাশিয়া একই ব্লকের অংশীদার।

সোভিয়েট নেতারা তাঁদের বক্তৃ... দ্বারা এই ধরনের একটা ধারণার স... করছেন যে, ভারত ও সোভিয়েট পরর... নীতি যেন একই সুরে বাঁধা। উভ... 'শান্তি' চায় বলে উভয়ের পররাষ্ট্র নী... এক, এরকম ধারণা হতে দেওয়া ভু... ভারতবর্ষ SEADO অথবা বাগদ... চুক্তির বিরোধী। রাশিয়াও এগুলি... বিরোধী, অতএব রাশিয়া ও ভারতে... পররাষ্ট্র নীতির প্রকৃতি এক, এ... ধারণা করলে ভুল হবে। একটা সো... পরীক্ষার দ্বারা এটা প্রমাণিত হ... রাশিয়া সামরিক জোটের নিন্দা করে... কিন্তু বিপক্ষের সামরিক জোটের বিরু... নিজে সামরিক জোট তৈরি কর... পিছপাও নয়, বরঞ্চ প্রয়োজনীয় ব... মনে করে। এ ব্যাপারে কোন পক্ষের দায়ি... বেশি, সে বিচার করছি না। প্রশ্ন হচ্ছে... সামরিক জোট সম্বন্ধে রাশিয়ার ক্রি... বা প্রতিক্রিয়া কি ধরনের এবং ভারত... বর্ষেরইবা কি ধরনের। ভারত SEADO চায় না, কিন্তু SEADO হয়েছে বলে সে তার পাল্টা কোন সামরিক জো... সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে না। বাগদাদ প্যাক্ট হয়েছে বলেও ভারত তার কোনো সামরিক প্রতিষেধক ব্যবস্থার চেষ্টা নেই, যদিও বাগদাদ প্যাক্টের সব... অংশীদার ভারতের প্রতি মিত্রভাবাপন্ন নয়। ভারত মিশরকে অথবা আফগানি-স্তানকে বা অন্য কোনো রাষ্ট্রকে অস্ত্রপাতি দিতেও আগ্রহশীল নয়। এ ব্যাপারে সোভিয়েটে নীতির নিন্দা বা প্রশংসা করছি না, শুধু দেখাতে চাই যে, ভারত ও সোভিয়েটের পররাষ্ট্র নীতির প্রকৃতি এক নয়।

পত্রাবলী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[কনিষ্ঠ জামাতা নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত। নগেন্দ্রনাথের কন্যা শ্রীমতী নন্দিতা কৃপালনীর সৌজন্যে প্রাপ্ত। বিশ্বভারতীর অনুমতিক্রমে মুদ্রিত]

ওঁ

কল্যাণীয়েষু,

···শুভকৃষ্ণ আয়ার নামক একজন মাদ্রাজী যুবক আমার এখানে থাকেন—তিনি এতদিন শাস্ত্রীমশায়ের[১] কাছে ছিলেন। লোকটি বড় ভাল এবং উৎসাহী। এঁর ইচ্ছা ইনি কৃষিবিদ্যা সম্বন্ধে খানিকটা কেজো অথচ বৈজ্ঞানিক শিক্ষা-লাভ করেন। আমি রথীর কাছে প্রস্তাব করে পাঠিয়েছি এঁকে তোমাদের সহকারীরূপে নিযুক্ত করে নিতে। অবশ্য বেতন দিতে হবে। ইনি ভদ্রব্রাহ্মণ—এঁকে অসঙ্কোচে ঘরে রাখতে পার। লোকটি যে অত্যন্ত গম্ভীর এবং গোঁড়া তাও নয়—বেশ হাসিখুশি—যথেষ্ট বুদ্ধিমান—বাংলাও জানেন ইংরেজীও জানেন। তোমাদের ল্যাবরেটরি এবং ক্ষেতের পরিদর্শন ও পরীক্ষাদি কাজে ইনি তোমাদের বিশেষ সহায় করতে পারবেন। তোমাদের কাজকর্মে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার দিকটা এখনো জেগে ওঠেনি—এরকম একজন লোক কাছে থাকলে সেটা তোমাদের আপনি হয়ে উঠবে। আমি বরাবর মনে করেছিলুম এইরকম দুই একজন উৎসাহী লোককে এপ্রেণ্টিসরূপে রেখে তোমরা তোমাদের বিদ্যাটাকে দেশে ক্রমে ছড়িয়ে দিতে পারবে। এতে তোমাদেরও কাজের যথেষ্ট সুবিধা হবে।

রথীকে জিজ্ঞেস কোরো তার লোকের দরকার আছে কিনা। মুঙ্গের জেলা থেকে হিন্দুস্থানী অনেক চাকর পাওয়া যেতে পারে—তারা গ্রাম্য কিন্তু চাষের কাজ গোয়ালের কাজ প্রভৃতিতে পাকা। যদি পাল্কি বওয়ার উপযুক্ত কাহার চায় তারও সন্ধান দেখতে পারি। পশ্চিমের লোকেরা পরিশ্রমী চাষা মুটে সেখানে জল সেঁচ দিয়ে খুব পরিশ্রম করে তবে ফসল ফলাতে হয়। ওরা গোরু মোষের যত্ন করতেও ভাল।

বড়দাদার শরীর এখন ভালই—আমারও নিতান্ত মন্দ নেই। শিলাইদহে গিয়ে সমস্ত খবর লিখো এবং রথীকে বোলো শুভকৃষ্ণ সম্বন্ধে তার অভিপ্রায় কি আমাকে যেন শীঘ্র জানায়। ইতি ১৫ই শ্রাবণ ১৩১৮

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১ শিবনাথ শাস্ত্রী

ওঁ

The Ellarman Lines Ltd.
City Lines
George Smith & Sons
Glasgow

কল্যাণীয়েষু,

আমাদের জাহাজ এডেনে থামে না, Port soudan বলে একটা নতুন বন্দরে থামে। কাল সকালে সেখানে জাহাজ পৌঁছবে—কিন্তু সেখানে চিঠি পোস্ট করলে কবে পাবে কে জানে! কেন না সেখানে Mail steamer যায় না। অতএব একেবারে সেই Port saidএ গিয়ে চিঠি দেওয়াই সব চেয়ে সুবিধা হবে। সেখানে পৌঁছতে আর চারদিন আছে।

এ পর্যন্ত বেশ আরামে আসা গেছে। সমুদ্র বেশ শান্ত ছিল। আর বরাবর যথেষ্ট হাওয়া পাওয়া গিয়েছে—গরমে কষ্ট পেতে হয়নি। কেবল Red seaতে ঢুকে দুটো দিন মাঝে মাঝে খুব গুমোট গিয়েছে। আবার কাল থেকে বেশ হাওয়া দিয়েছে। অতএব না জল না হাওয়া কারও বিরুদ্ধে নালিশ করবার আমাদের কিছুই নেই।

বৌমাও বেশ আছেন। সোমেন্দ্র[১] যথাসাধ্য তাঁর বিদ্যুতের কাজ করচে।

আপাতত আমাদের প্রোগ্রামটা এই রকম স্থির করা যাচ্ছে। মার্সেল্‌সে নেবে একেবারে প্যারিস হয়ে লণ্ডনে চলে যাব। সেখানে ডাক্তারের সঙ্গে নিজের শরীরের সম্বন্ধে পরামর্শ করে দেখা যাবে। যদি কোনো চিকিৎসা করবার থাকে সেইটে সেরে নিয়ে তার পরে ভ্রমণের ব্যবস্থা করা যাবে।

তোমাদের সকলের খবর পেতে এখনো ঢের দেরি। আশা করি খবর সব ভালই। এতদিনে নিশ্চয়ই তোমরা শিলাইদহে ফিরে গিয়েছ।

এই সুযোগে জমিদারীর সমস্ত কাজের ভার তোমার উপরে পড়েছে এতে আমি খুব খুশি হয়েছি। দায়িত্ব সম্পূর্ণ হাতে পেলে আপনি তোমার হাত পেকে যাবে। তুমি জমিদারীর কাজটাকে কেবল উপর উপর থেকে দেখো না। ওর যত কিছু technicalities সমস্ত বেশ ভাল করে আয়ত্ত করে নিয়ো। অর্থাৎ কোনো বিষয়েই আমলাদের মুখের কথার উপরেই যেন তোমাকে নির্ভর করতে না হয়। কাজের সমস্ত খুঁটিনাটি আয়ত্ত করতে পারলে ওর মধ্যে কোথায় কি পরিবর্তন ও উন্নতি সম্ভব তা তুমি ভাবতে পারবে। তাছাড়া, জমিদারীর বৈষয়িক অংশকেই একান্ত করে তুললে হবে না। তার চেয়ে বড় দিকটাকেও তুমি যদি খানিকটা এগিয়ে দিতে পার তাহলে আমি ভারি খুশি হব। অন্তত কালিগ্রামে এই-দিকে যথেষ্ট কাজ করবার ও উন্নতি দেখাবার রাস্তা আছে। সেখানকার বিভাগীয় ম্যানেজারদের সঙ্গে তোমার সর্বদা যোগ থাকা চাই। তারা যেন তোমাকে sympathetic বলে জানে—তাদের খুব উৎসাহ দিয়ে তাদের হৃদয় অধিকার করে কেবল প্রভু নয়, বন্ধুর মত করে তাদের কাছ থেকে কাজ আদায় কোরো। অথচ তাদের প্রত্যেকের নিজের নিজের কিছু কিছু initiative থাকাও দরকার। খানিকটা পরিমাণে যাতে তারা নিজের প্রণালী অনুসারে পরীক্ষা করে দেখতে পারে সেটুকু তাদের স্বাধীনতা দেওয়া উচিত—নইলে কেবলমাত্র আদেশ পালন করতে করতে তারা যন্ত্র হয়ে উঠলে তার দ্বারা যথার্থ উঁচুদরের কাজ পাওয়া যায় না। মনে মনে আশা করে রইলুম ফিরে গিয়ে আমাদের দুই পরগণাতেই সব বিষয়েই যথেষ্ট উন্নতি দেখতে পাব—এবং এ দেখব তুমি সকলের হৃদয় জয় করে নিয়েছ।

ইতি ৫ই জুন ১৯১২

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

কাল আমার জন্মদিনে তোমার চিঠিখানি পেয়ে খুশি হলুম। আমার জন্মদিন এখন শেষ হবার দিকে আসচে—আমার জীবন এখন যদি তোমাদের জীবনে নবজন্মলাভ করে তাহলেই আমার সার্থকতা। তোমার তপস্যা সফল হোক —সমস্ত বন্ধন ছেদন করে তোমার মধ্যে ভূমার প্রকাশ সম্পূর্ণ হোক্ এই আমার আশীর্বাদ।

পিয়ার্সনকে[১] আমার সর্বান্তঃকরণের প্রীতি জানিয়ো। মীরা খোকাকে[২] আমার আশীর্বাদ।

ইতি ২৬ বৈশাখ ১৩২২

একান্ত শুভানুধ্যায়ী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শিলাইদা

কল্যাণীয়েষু

কিছুদিন শিলাইদহে আছি। প্রজাদের অবস্থা ভাল নয়—দুর্বৎসরের আশংকা দেখা যাচ্ছে। সেইজন্যেই এখানে এসেছি যদি এদের কোনো ভার লাঘব করতে পারি। এখন আমার কোথাও যাওয়া সম্ভবপর হল না।

ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন এই আমার একান্ত মনের কামনা।

পিয়ার্সনের কাছ থেকে তোমাদের সব খবর পেয়ে আনন্দিত হয়েছি।

মীরুকে খোকাকে আমার আশীর্বাদ জানিয়ো।

ইতি ৭ শ্রাবণ ১৩২২

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

১ শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র সোমেন্দ্র দেববর্মণ

১ শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক উইলিয়াম উইনস্ট্যানলি পিয়ার্সন

২ নগেন্দ্রনাথের পুত্র নীতীন্দ্রনাথ বা নীতু

ওঁ

ক...ণীয়েষু

তোমার ms পেয়েছি। কিন্তু স্কুলপাঠ্য ...রেজি বই সংশোধন করবার মত সাহস ও যোগ্যতা আমার নেই। আপাতত এটা পিয়ার্সনের ...তে তারপর এণ্ড্রুজের হাতে দিয়ে সংশোধন ...রিয়ে নিলে তবে নিশ্চিন্ত হওয়া যেতে পারে। কিন্তু মুশকিল এই বাঙালীর লেখা ইংরেজি Reader আমাদের বিদ্যালয়ে চলবে না—Text Book Committeeর হাত দিয়ে কখনই পার হবে না। তবু চেষ্টা দেখা যেতে পারে। আমি নিজে কোনোমতে অন্যমনস্ক হয়ে ইংরেজি লিখে ফেলি কিন্তু ইংরেজির গলদ আমার চোখে পড়ে না—অর্থাৎ ভেবেচিন্তে কিছু করতে গেলেই বাধা লাগে। আমি যেটুকু ইংরেজি জানি সে অজ্ঞানে। সজ্ঞানে নয়।

কাল হাতের কাছে যে কয়টা কাগজ ছিল পাঠিয়ে দিয়েছি। আশা করি তোমার হাতে পৌঁছবে।

মীরু খোকাকে আমার আশীর্বাদ দিয়ো।

ইতি ২০ শ্রাবণ ১৩২২

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

য়োকোহামা

কল্যাণীয়েষু

. . . তোমাদের আমি মনে মনে আশীর্বাদ করি, তোমাদের আমি কল্যাণ কামনা করে থাকি—এই পর্যন্তই আমার অধিকার। কিন্তু তোমাদের জীবনযাত্রা তোমাদের নিজের হাতে। তোমাদের সুখদুঃখ ভালোমন্দর প্রতি হস্তক্ষেপ করতে গিয়ে আর কোনো ফল হয় না কেবল আমার নিজেকে নষ্ট করা হয়। বারে বারে পরীক্ষা করে আমি স্পষ্ট বুঝেচি যে আমি আমার সংসারের মানুষ নই—সমস্ত পৃথিবীর কাজে আমার ডাক আছে। সেইজন্যেই যেমনি ক্লান্ত দেহে আমি ঘরের মধ্যে গুছিয়ে বসতে চেষ্টা করি অমনি সেই ঘর আমাকে তাড়া করে। আমাকে বেরতেই হবে তাতে আমার যত অসুবিধা যত কষ্টই হোক্।

তোমরা নিজের অন্তর্যামীর কাছে দায়ী, আমার কাছে না। অতএব যা তোমরা ভাল মনে করবে তাই পালন কোরো, আমার কথা ভেবোনা। এমন কি, তোমাদের যদি মন্দও ঘটে তার বোঝা আমি আমার মনের মধ্যে বহন করব না। তোমরা সংসারের সমস্ত আঘাত সংঘাতের ভিতর দিয়ে সত্যের মধ্যে কল্যাণের মধ্যে মুক্তির মধ্যে উত্তীর্ণ হও তোমাদের নিজের শক্তিতে।

হায়দ্রাবাদে তুমি কোনো কাজ পেয়েছ খবর পেলে খুসি হব। না যদি পাও তাহলেও পৃথিবীতে ঢের কাজ আছে। আমি ঘরের থেকে বেরিয়ে এসে জীবনের ক্ষেত্রকে আর একবার বিশ্বব্যাপী করে দেখতে পাচ্চি—তাই সাংসারিক সমস্ত উদ্বেগ আমার কাছে হাস্যকর বলে মনে হচ্চে। তোমাদের মধ্যে যেটি চিরন্তন সেইটেকেই আজ আমি স্পষ্ট করে দেখবার চেষ্টা করচি—যেটি বৈষয়িক, যেটি সাংসারিক তার জন্যে কিসের ভাবনা! অন্তত সে ভাবনা নিয়ে আমি আমার কাজ নষ্ট আমার জীবন ব্যর্থ করতে পারব না।

জাপানে আর বেশিদিন থাকব না। ২১ জুলাই তারিখে "Ixion" Steamerএ করে Seattle হয়ে United Statesএ যাওয়া ঠিক করেচি। আমার সঙ্গে কেবল পিয়ার্সন যাবে। চারজনে মিলে ভ্রমণ করার খরচ যেমন তার ল্যাঠাও তেমনি। এখানে এসে অবধি একদিনও হোটেলে উঠতে হয়নি—কারো না কারো বাড়িতে আশ্রয় পেয়েচি। কিন্তু দুজনের বেশি কারো বাড়িতে থাকা নিতান্ত দস্যুবৃত্তি।

জাপানে এসে অনেক কাজ হয়েচে—অন্তত এখানকার লোকেরা ত তাই বলচে। এত অজস্র আদর অভ্যর্থনা আমার জীবনে আর কোথাও কখনো পাইনি।

আমেরিকায় যদি চিঠি দাও তাহলে Mrs Moodyর ঠিকানায় লিখো। তার ঠিকানা হচ্চে—2970 Groveland Avenue Chicago.

ঈশ্বর তোমাদের কল্যাণ করুন।

ইতি ৩রা আষাঢ় ১৩২৩

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ক্রমশ

॥ ১ ॥

মহামুনি ভরত রাগ-সাধারণ্যের ব্যাখ্যা করতে ঋতুসন্ধির দৃষ্টান্ত করে বলেছেন,

ছায়াসু ভবতি শীতং
প্রস্বেদো বা ভবতি চাতপস্থস্য
ন চ নাগতো বসন্তো
ন চ নিঃশেষঃ শিশিরকালঃ॥

শীত ও বসন্ত ঋতুর সন্ধিক্ষণে বসন্ত এসে পড়ে অথচ শীতও নিঃশেষে বিদায় নেয় না। প্রমাণ? এ সময়ে ছায়ায় উপস্থিত হ'লে শীত বোধ হয়; কিন্তু রৌদ্রসেবী জনের শরীরে প্রস্বেদ অর্থাৎ মৃদুমধুর ঘর্মও দেখা দেয়। সন্ধির অবস্থায় নানারকমের বিপরীত ব্যাপার ঘটে যায়। তবে, বিপরীত হ'লেও অনুভবী লোকের উপভোগ্য। মহামুনি ভরত বলতে চেয়েছেন, অনেকরকম রাগের মিশ্রণের ফলে লক্ষণগুলি দেখা দেয় যেন পরস্পরের প্রতি দ্বেষ ভাব নিয়ে। কিন্তু নাট্যশিল্প ও শিল্পপ্রতিভা এমনই বিচিত্র ব্যাপার যে, বিরোধের সমন্বয় যেন অবিরোধের থেকেও মধুর ও চমৎকার লাগে।

গুরুদেব শ্যামলালজীর বৈঠক অর্থাৎ ১০১নং হ্যারিসন রোডের বাড়িতে দোতলার ঘরে নিত্যনৈমিত্তিকের আসরগুলি আমাকে ভরতমুনির দৃষ্টান্ত স্মরণ করিয়ে দেয়।

বাইরের আবহাওয়া যেমনই হ'ক, বৈঠকী আবহাওয়ায় দেখা দিত বিদায়ী শীত ও আগন্তুক বসন্তের কিছু ত্রস্ত, কিছু আকুল, কখনও স্থির, কখনও বা চঞ্চল পরিচয়গুলি; সব সময়েই। নানা দেশের লোক;—সিন্ধু প্রদেশের করাচী-হায়দরাবাদ থেকে আরম্ভ করে বাংলা-দেশের কলিকাতা কৃষ্ণনগর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকার নানারকমের মনোভূমির নমুনা সব। কতো রকমের ব্যক্তিত্বের সরস নীরস কাঠামো! তাদেরই মধ্যে কোমল কঠোর কতো রকমের প্রাণের পরিচয় ঘটেছে, বিনা নিয়মে, বিনা নিমন্ত্রণে। পাঁচমেশালী জল্পনা-কল্পনার হাল্কা রঙগীন মেঘমালা উড়ে যায় বৈঠকী আকাশপথে। এদিক ওদিক থেকে বয়ে আসে রঙ্গপরিহাসের হিল্লোল। বয়োবৃদ্ধেরা এসে উপস্থিত হ'লেই মনে হ'ত যেন শিশিরাবসানের কুয়াশাও তাঁদের সঙ্গে এসে জমলো। তবুও, তাঁদেরই মুখের কথা কাহিনীর সরস প্রসঙ্গ আমাদের মনের আকস্মিক আড়ষ্ট ভব দূর করে দিয়েছে। উত্তেজনার রৌদ্র অথচ রম্য মুহূর্তগুলির মধ্যেই দিগন্তে সহসা দেখা দেয় মতভেদের অভাবনীয় ঝটিকা; বৈঠকী আশ্রম ত্রস্ত হয়ে ওঠে কলরবের ঘূর্ণী বায়ুতে। কিন্তু এরকম ক্ষণিকের আভাস, কদাচিতের আবির্ভাবকে আমরা দুই তরুণ অর্থাৎ ননী ও আমি উপেক্ষা করিনি; ক্ষণিক বা অনিত্য জেনেও। বরং তাদের প্রিয়তরই মনে করেছি এই ভেবে যে, দ্বিতীয়বার এদের হয়ত সাক্ষাৎ করব না। উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নের কালসন্ধিতে শিশিরভেজা মাটির ওপরে আর ঝরঝরে নীল আকাশের তলে যে এলোমেলো বাতাসের খেলা চলতে থাকে তাকে নশ্বর বা অনিত্য বলা যেতে পারে, কিন্তু অবজ্ঞা করা যায় না।

বৈঠকের তরুণ প্রৌঢ় বৃদ্ধ আর প্রবৃদ্ধদের সঙ্গমই ছিল আমাদের অপূর্ব অভিজ্ঞতা, আন্তরিক আকর্ষণ। বৃদ্ধ প্রবৃদ্ধদের সঙ্গে সঙ্গেই শীতের সঙ্কোচ বোধ করেছি। কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই সঙ্গীতের প্রসঙ্গ উঠেছে। প্রৌঢ় রসিকতার সূত্র দিয়ে কখন কি রকমে যে বসন্তের বিশদতা এসে পড়েছে বুঝতেও পারিনি। মাত্র বুঝেছি আমাদের হৃদয় থেকে যেন শীতের প্রভাব কেটে গেল। মজলিশী ভ্রমরগুঞ্জনের মধ্যে নির্বিশেষ শব্দব্রহ্ম নেই, একথা আমরা দুজন স্বীকার করতাম না। অথবা সঙ্গীতের প্রসঙ্গই হয়ত বৈঠকের বয়স্য ধর্ম আর একপ্রাণতা জাগিয়ে দিয়েছে। বয়সের চড়াই-উতরাই তখন সমান হয়ে মিলিয়ে গিয়েছে অনুভব-সাধারণ্যের সমান ভূমিতে। তখনই দেখা দিত শীত ও বসন্তের মিলনসন্ধি; দুর্লক্ষ্য সার্থকতার মধুর ইঙ্গিতে ভরে উঠেছে বৈঠকী ঋতুচক্রের এলোমেলো অভিযান। মাঘের আলোর তেজটাই বেশী তৃপ্তিকর! নাকি ছায়ার শিহরণই বেশী উত্তেজক! এ বিষয়ে মীমাংসার প্রয়োজন বোধ করিনি।

বৈঠকের বসন্ত প্রতিদিন আনাগোনা

রয়েছে। বসন্তের কথাই যে কাব্য, তার সুরেই হ'ল সঙ্গীত! বসন্তের ভূরি-ভঙ্গিম উন্মাদনার মধ্যেই সন্ধান ক'রে পেয়েছি নৃত্যনাট্যের ছন্দ আর অভিনয়! অবশ্য বৈঠকের বসন্তের কথাই বলছি। মনপ্রাণ দিয়ে বরণ ক'রে নিয়েছি একে। বাইরে স্বতন্ত্র যে একটা বসন্ত তাকে সমাদর করেছি মাত্র অন্তরের অবকাশকে কিছু ভরে দিত বলে। নচেৎ বসন্ত-তান্ত্রিক কবিকথাকে আমলই দেয়নি।

বৈঠকের বসন্তকে বরণ করে' নিয়েছি বলেই আজ মেনে নিতে হচ্ছে ভাগ্যে শীত আগে এসেছিল, তাইতে বসন্ত অত মধুর বোধ হয়েছে। শীতই বার বার শিক্ষা দিয়েছে কেমন করে বসন্তের মাধুর্য অনুশীলন করতে হয়। বৈঠকী শীতের অবধূতস্বরূপ আজ আমার স্মৃতিকে আচ্ছন্ন করে; নিকটের কুয়াসার মতো। মনে পড়ে তার নিশ্চিন্ত সংযম, নিরাভরণ সৌন্দর্য। বাইরের রুক্ষ মূর্তির অন্তরালে এই অবধূত না জানি কত অতীত বসন্তের সম্ভার থেকে রস আহরণ করে অন্তরের চিরস্থায়ী সম্পদ করে রেখেছেন। অতীতের স্মরণে আজ নূতন চোখে দেখি শীতের রূপ, কিন্তু পুরান মনে অনুভব করি তার হৈমন্তিক শ্রীসম্পদ।

গুরুজীর বৈঠকের প্রসঙ্গে আজ সকলের আগে মনে পড়ে প্রবুদ্ধ রসিক-দের মধ্যে প্রবীণতম দু'জন পুরুষকে; তখনকার বিরাশী বৎসর বয়সের খলিফা বদল খাঁ সাহেব আর আন্দাজ সত্তর বৎসর বয়সের ওস্তাদ গণপতরাও ভাইয়া-সাহেব। সবে মাত্র এ'দের স্মরণের সূত্রটি খুঁজে নিচ্ছি, এমন সময় আমাকে না জানিয়েই আমার চোখ দুটি ঐতিহাসিক দূরবীণ তুলে নিয়েছে। অস্বস্তি বোধ করলাম। এক সঙ্গে দূরে আর কাছে ত' দেখা চলে না। চোখ বলে উঠল দেখ, ঐ পশ্চিম দিগন্তের কাছে মেঘের মধ্যে আধ-ঢাকা দু'টি পাহাড়ের চূড়া রয়েছে; তুমি কি এদের দিকে তাকাবে না? বাস্তবিক,—দূরবীণ চোখে দেখি কাশীধামের শ্রীজয়-করণ মিশ্রকে; আমি যখন এ'কে সাক্ষাৎ করি (অর্থাৎ ইংরাজি ১৯২০ সালে) তখন ঐ মিশ্রজীর বয়স একশ কুড়ি বৎসর হবে! আর দেখি গয়াধামের হনুমান-দাস ওস্তাদকে; তখন এ'র বয়স কমপক্ষে আশী হবে জেনেছিলাম। দূরবীণ নামিয়ে রাখলাম। চোখকে আমার স্মরণলোলুপ মন বলল—ভাই, তোমার দূরবীণের সার্থকতার জন্য ত' আমার স্মৃতি নয়, বরং আমার স্মরণের সার্থকতার জন্য যদি দূরবীণ কাজে লাগে তখন ওটা না হয় ব্যবহার করা যাবে। আপাতত ওটা নামিয়ে রেখে দেওয়া যাক; কারণ ঐ দুটি পাহাড়ের সন্ধানে আজ আমার স্মৃতির অভিযান নয়।

খলিফা বদল খাঁ সাহেবের সঙ্গেই প্রথম পরিচয় হয়েছিল, পরে ওস্তাদ গণপতরাও ভাইয়াসাহেবের সঙ্গে। কিন্তু স্মৃতির পরিবেশ ইতিহাসের নিয়ম

মানতে চায় না। ভাইয়াসাহেব ছিলেন শ্যামলালজীর গুরু; অর্থাৎ আমার গুরুর গুরু। আর বদল খাঁ সাহেবও আমার গুরু ছিলেন। ভাইয়াসাহেবের গুরুত্বটাই দ্বিগুণ মনে হ'ল স্মৃতিতে। নমস্কারটা তাঁরই প্রাপ্য সকলের আগে।

বৎসরান্তে একবার ক'রে এক পক্ষকালের অতিথি হয়ে দেখা দিতেন ওস্তাদ গণপত্ রাও ভাইয়াসাহেব। কার্তিক শুক্লপক্ষের ওপর পক্ষপাতিত্ব ছিল তাঁর; কেন বলতে পারিনে। কিছুদিন শ্যামলালজীর বাসায় আর কিছুদিন শেঠ দুলীচাঁদজীর বাগানবাড়িতে হ'ত উদয় আর অস্তের লীলা। আমাদের মনে হ'ত যেন শিশিরসন্ধ্যায় দরবেশী শীতপাণ্ডুর একখানি চন্দ্রকলা এসে সসম্ভ্রমে উদিত হ'লেন, হেমন্তের শুভ্র জ্যোৎস্না সঙ্গে নিয়ে; দেখে যাবেন শীতের রজনীতে কে জেগে আছে, কেই বা তপস্যা করছে। তাঁর দেহের গড়ন ছিল একহারা ছিপ্‌ছিপে; মাথায় কাঁচাপাকা নাতিবিরল কেশের পরিপাটি থেকে পায়ের আঙুলের সুন্দর নখশোভা পর্যন্ত যেন একটি ছবি, যাকে আগাগোড়াই চোস্ত বলা যায়। সর্বপ্রথম পরিচয়ের মুহূর্তে অন্য কিছু লক্ষ্য করতে পারিনি আমরা। বুঝলাম আমাদের থেকে, সকলের থেকে বড্ড উঁচুতে রয়েছেন তিনি। আমাদের কথাবার্তা স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। প্রথমে ভাবতেই পারিনি যে, কোনও কালে তাঁর নাগাল পাব, কাছে বসে সহজভাবে কথালাপ করব।

শ্যামলালজীর বাড়িতে প্রথমে যেবার তাঁকে দেখলাম সেইবার কয়েকটি দিন সকালবেলা ননী আর আমি বৈঠকে হাজির হ'তাম, মাত্র তাঁকে দর্শন করব এই ভেবে। বেলা ন'টা। আমরা কি জানি যে, তিনি তখনও শয্যাত্যাগ করেননি! বৈঠকের এক প্রান্তে সতরঞ্চের উপর রীতিমত পুরুষ্টু তোষক; মিহি-ঝালর-কাটা। তার ওপরেই পাতলা গোলাপী রং-এর বালাপোষের মধ্যে পাশ মোড়া হয়ে শুয়ে আছেন তিনি। আমরা অতি সন্তর্পণে প্রায় দম বন্ধ করে' বৈঠকের দেয়াল ঘেঁষে একটু দূরে বসে পড়লাম। খুব সাবধানে ঐ শয়ান পুরুষের দিকে তাকাই। দেখলাম বালাপোষের জরিদার ঘের অল্পস্বল্প ন'ড়ে উঠেছে। তাঁর মাথার দিকে জানালা খোলা; বাইরের কিছু আলো আর ঘরোয়া কিছু ছায়া, এরাও যেন খুব সতর্ক হয়ে সেই বালাপোষের ওপরে তাদের দাবী নিয়ে নিঃশব্দে বোঝাপড়া করছে। সমস্ত বৈঠকখানা অভিনব অপরিচিত একটা সুগন্ধে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। পরে জেনেছিলাম, মালতীর আতর দিয়ে তোষক বালিশ বালাপোষ প্রতিদিন অভিষিক্ত না হ'লে ভাইয়াসাহেব শয্যাগ্রহণই করতেন না।

শ্যামলালজী ভিতর বাড়ি থেকে এসে ঘরে গেলেন; কপালে ভস্মের টিপ্, খালি গায়ের ওপর পাতলা নামাবলী, কিন্তু মুখে কথা নেই। এমন সময়ে বশীর আর মৌজুদ্দিন এসে নিঃশব্দে ভাইয়াসাহেবের পায়ের দিকে জাজিমের উপরে বীরাসনে বসে পড়লেন। তাঁদের দুটিকে আমরা নীরবে নমস্কার জানালাম। চুপ ক'রে ব'সে খুব ভাল লাগছিল না। মৌজুদ্দিনের পাগড়ী বাঁধাটি নেহাৎ সুন্দর লাগছে মাত্র এই কথাটি ফিস্‌ফিস্ করে ননীকে জানিয়ে দিচ্ছি এমন সময়ে ননী আমার গা টিপে ইশারা করল। মুখ ফিরিয়ে দেখি, একজন পশ্চিমদেশীয় অনুচর হাতে একখানি আয়না আর চিরুণ আর পরিষ্কার একখানি তোয়ালে নিয়ে ভাইয়াসাহেবের বিছানার পাশে রাখল। আর রেখেই আস্তে আস্তে ভাইয়াসাহেবের পায়ের কাছে ব'সে তাঁর পা টিপে দিতে আরম্ভ করল।

বেলা ন'টার সময়ে ঘুমন্ত লোকের পদসেবার অর্থ বুঝলাম না। তবে যদি শরীর খারাপ হয়ে থাকে......।

হঠাৎ বালাপোষের মধ্যে থেকে মোলায়েম কণ্ঠের আওয়াজ এল,—"আরে শ্যামলাল"। কণ্ঠধ্বনি নিশ্চয়ই শ্যামলালজীর অতিপরিচিত ছিল। না হ'লে অত মৃদুস্বর পাশের ঘরে শ্যামলালজীর কানে পৌঁছুত না, আর "কহিয়ে ওস্তাদ্" বলে' আওয়াজটা মুখে করে' শ্যামলালজী এসে ভাইয়াসাহেবের মাথার কাছে বসতেন না।

তখন বালাপোষের মধ্যে থেকে একটি মুখমণ্ডল বার হ'ল আর সেই মুখখানির

মধ্যে ঘনকেশ ভুরুযুগলের নীচে চোখের পাতা খুলে গেল; ঝক্‌ঝকে দু'টি চোখ দেখলাম। চোখ দু'টি কিন্তু আমাদের দিকে তাকায়নি।

ব্যাপারটা এই। ঘুম ভেঙ্গে সর্ব-প্রথমে শ্যামলালজীর মুখ দেখা চাই, অন্য কারুর মুখ হলে চলবে না। হঠাৎ যদি তিনি অন্য কোনও জনের মুখ দেখে ফেলেন, তাহলে মেজাজ নষ্ট হয়ে গেল সেই দিনের যত কিছু দুর্ঘটনা, যথা মুখ ধুতে গিয়ে জিভে দাঁতনের খোঁচা লাগা, গোঁফ জোড়াটা বেবন্দোবস্ত হয়ে যাওয়া, পানের মধ্যে মশলা কম-বেশী বোধ হওয়া প্রভৃতি সমস্ত কিছুর দোষ পড়বে সেই মনহুস্ অর্থাৎ অনামুখো অভাগ্য জনের ওপর। মনহুস লোকের সম্বন্ধে ভাইয়া সাহেবের স্মৃতি ছিল তীক্ষ্ম ও ধারণা ছিল অপরিবর্তনীয়। এসব কথা পরে জেনেছিলাম দুলী-চাঁদজীর মুখে ভাইয়া সাহেবের প্রসঙ্গে; দুলীচাঁদজীও ছিলেন ভাইয়া সাহেবের শিষ্য। দুলীচাঁদজীর বাগানবাড়িতে দুলীচাঁদজী নিজেই একদিন মনহুস্ বনে গেলেন; খুব বিপদ! যাই হ'ক, ভাইয়াসাহেবের দৈনন্দিন মঙ্গলের জন্য প্রতিদিন সকালে শ্যামলালজী সেখানে গিয়ে হাজির হ'তেন। শ্যামলালজী উপস্থিত হ'লে তবে চাকরটি পা টিপে দেওয়ার অছিলায় তাঁর ঘুম ভাঙিয়ে দিত অথবা জানিয়ে দিত শ্যামলালজী এসেছেন, অথবা বদল খাঁ এসেছেন। বদল খাঁ সাহেব বহু পূর্বকাল থেকেই গণপতরাওজীর মায়ের স্নেহাশ্রিত ছিলেন। গণপতরাওজীর মা চন্দ্রভাগা ছিলেন বিশিষ্ট রাজোয়াড়ার ঘরের দুয়োরাণী অর্থাৎ দ্বিতীয়া রাণী; ইনিই গণপতরাওজীর মনে ছেলেবেলা থেকে ওরকম সংস্কার তৈরী করে দিয়েছিলেন। দুলীচাঁদজী হাসতে হাসতে বললেন—সম্প্রতি কলিকাতার মণ্ডলের মধ্যে তাঁর ও অন্য কয়েকজনের 'অপয়া' নাম খারিজ হয়ে গিয়েছে, কিন্তু ওস্তাদ গোফুর খাঁ এখনও মনহুস্ আছে। বেচারা! অবশ্য ভাইয়াসাহেবের নজরে "খুশনসিব্" (অর্থাৎ মুখ সৌভাগ্যশালী বা পয়া) হওয়াটা খুব শক্ত ছিল না। সকালে মুখ দেখার পরে ভাইয়াসাহেবের তৃপ্তির জন্য কোনও উপহার, যথা—ভাল তামাক বা সুগন্ধী ফুলের তোড়া বা আতর এসে পড়লেই সেই লোকটি তৎক্ষণাৎ পয়া হয়ে যেত। বলা উচিত, উপহার প্রায়ই আসত। ফলে অনেক অভাগ্য জন পরে ভাগ্যমন্ত হয়েছে। আপাতত দুলীচাঁদ নিজে, শ্যামলালজী আর বদল খাঁ সাহেব এই তিনজন পয়মন্ত পুরুষের জন্যই ভাইয়াসাহেবের কলিকাতা বাসকালের জীবন সুরক্ষিত আছে! দুলীচাঁদজী বললেন—ওস্তাদ ত' ওস্তাদই! কিন্তু একেবারে আস্ত ছেলেমানুষ একটা! আমি অবাক হয়েছি। কিন্তু ননী খুব শ্রদ্ধাগম্ভীর মুখ করে বলল—"শেঠজী! আমাদের কি হবে! আমরা ত' ওরকম উপহার পাঠিয়ে দেওয়া ম্যানেজ করতে পারব না! তবে কি, ধরুন ঠন্‌ঠনে কালীবাড়িতে ফুলজলের বন্দোবস্ত করব?" ননী ও আমি তখনও শেঠজীর স্বরূপ বুঝতে পারিনি। শেঠজী ননীর থেকেও ভক্তিগদ্‌গদ মুখে বললেন—আপনারা এ সবের মধ্যে যাবেন না। আমিই ভার নিয়েছি। বাড়িতে প্রতিদিন পুজো-হোম হয়। ওস্তাদ এলে তাঁর জন্য বিশেষ করে হোম-স্বস্ত্যয়নের বন্দোবস্ত করাই আছে। আপনারা মাথা ঘামাবেন না।"—পরে ননী বলেছিল ভাইয়াসাহেব আস্ত ছেলেমানুষ সন্দেহ নেই। তবে দুলীচাঁদজী হলেন সাংঘাতিক ছেলেমানুষ!

প্রসঙ্গে ফিরে যাই। শ্যামলালজী হাত জোড় করে ভাইয়াসাহেবের সামনে বসে। মৌজুদ্দিন আর বশীরও হাত জোড় করে ফেলেছে। আমরা যে হাত জোড় করিনি তার কারণ এ নয় যে, ঐ কাজটা খুব শক্ত; আমাদের অভ্যাস ছিল না এই যা।

শ্যামলালজী ওস্তাদকে জিজ্ঞাসা করতে থাকেন রাতে ভাল ঘুম হয়েছে কিনা। মশায় কেটেছে কিনা ইত্যাদি। এরই মধ্যে সেই অনুচরটি হাতে আয়না-খানি উঠিয়ে নিয়ে যন্ত্রের মত বিড় বিড় করে কিছু প্রাতঃকালীন অভিনন্দন শুনিয়ে যাচ্ছে, যথা—ভগবান ভাইয়া-সাহেবের তন্দুরুস্তি (স্বাস্থ্য) রক্ষা করুন, দীর্ঘ ও সুখের জীবন দান করুন ইত্যাদি। আর তার দেখাদেখি বশীর আর মৌজুদ্দিনও ওপরের দিকে চোখ-মুখ তুলে কত কী প্রার্থনা আউড়ে যায়।

ভাইয়াসাহেব বিছানার ওপর উঠে-বসেই আগে বাঁ-হাত বাড়িয়ে আয়নাখানি নিয়ে নিজের চেহারা দেখে নিলেন। পরে ডান হাত দিয়ে গোঁফ জোড়াটা সায়েস্তা
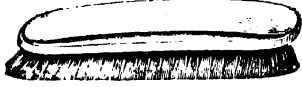
করতে করতে—সে কী গোঁফ! ঠোঁটের উপরে মিহি ছাঁট, কিন্তু ঠোঁটের কোণায় এসেই ফুলে দু'দিকে দুটি গুচ্ছ হয়েছে। এই গুচ্ছের নীচে থেকে সরু কেয়ারি করা গালপাট্টার রেখা বেঁকে উঁচু হয়ে কানের পাশ দিয়ে জুলফি হয়ে চুলের সঙ্গে মিলিয়ে গিয়েছে। চিবুক পরিষ্কার তক্‌তকে।

গোঁফের গুচ্ছ কষতে কষতে তিনি চাপা গলায় শ্যামলালজীকে জানিয়ে দিলেন মচ্ছড় কেটেছে বই কি! লেকিন্‌ কলকত্তার মচ্ছড় খুব হুঁশিয়ার জানোয়ার! বালাপোষের ওপর দিয়ে হুলা (বর্শা-খেলার পারিভাষিক শব্দ) চালিয়েছে কিন্তু একটুও সুর ছাড়েনি! দমদমার মচ্ছড় ত' কাছে এলেই সুর-নিখাদের জোড় শুরু করে"—। বশীর আর মোজুদ্দীন আর সেই অনুচরটির "আঃ হাঃ"র চোটে ভাইয়াসাহেবের কথা ডুবে গেল। অবশ্য, দমদমে শেঠজীর "অর্কিড হাউস" বাগানবাড়িতে প্রচুর সুরেলা মশা ছিল, এমন অভিজ্ঞতা আমিও সংগ্রহ করেছিলাম। কিন্তু শ্যামলালজীর বাড়িতে মশা আছে কখনও বুঝতে পারি নি। মশার প্রসঙ্গে ভাইসাহেবের শেষ মন্তব্য হল—"হন্দ্‌ কিয়া শ্যামলাল! হন্দ্‌ কিয়া তুম্‌হারা কল্‌কাত্তাকা মচ্ছড়!"

গোঁফজোড়া কায়দাবন্দী করে ভাইয়া-সাহেব চিরুন নিয়ে চুল আঁচড়াতে থাকেন। হঠাৎ শ্যামলালজীকে জিজ্ঞাসা করলেন, "ঐ ছোকরা দুটি কোথা থেকে আমদানী করলে?" ছোকরা অর্থাৎ আমি ও ননী। আমাদের অবস্থা যেন আসামীর সনাক্তকরণের মতো। ভয়ে ভয়ে একটু উঁচু হয়ে উঠে তাঁকে নমস্কার জানালাম। তিনিও প্রতি-নমস্কার করলেন; শুনলেন এই ছোকরা যুগল শ্যামলালজীর শিষ্য, তার ওপর আবার ডাক্তার। আমার দেহে মৃদুমন্দ স্বেদ দেখা দিতে আরম্ভ করেছে; স্বস্তিবোধ করলাম—যখন তিনি শ্যামলালজীকে বললেন—"বহুৎ খুশী কি বাত্‌" আর বশীর সায় দিয়ে বলল, জী হাঁ, ওস্তাদ।"

গণপতরাও ভাইয়াসাহেবের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের স্মৃতিতে এ রকম দু'-চারটি ছায়া-রেখা জমে আছে। যাঁকে দেখে শ্যামলালজীর মত প্রৌঢ় লোক হাতজোড় করে বসে থাকেন, আর বশীর-মোজুদ্দিনের দল তটস্থ হয়ে অপেক্ষা করে, কিছু জিজ্ঞাসা না করা পর্যন্ত যেচে কথা বলতে সাহস করে না, সেরকম লোকের সঙ্গে আমরা দুজন অর্বাচীন কথা বলব কোন্‌ ভরসায়!

সন্ধ্যাবেলার আসরে বসে আমরা আশ্চর্য মেনেছি এই চন্দ্রপ্রভা দিয়ে ঘেরা একহারা মানুষটিকে দেখে। সারা বৈঠক ভরে যায় আহূত রবাহূত লোকদের আগমনে। জঙ্গী, বশীর, গোফুর, মোজুদ্দীন প্রভৃতি গুণীর দল গ্রহ-উপগ্রহের মতো আপন আপন আলো নিয়ে ছুটে এসেছে, আর আত্মসমর্পণ করছে এঁর পরিমণ্ডলের মধ্যে। গহর, আগ্রাওয়ালী প্রভৃতি গান্ধর্বিকার দল নক্ষত্র-তারকার মতো নিত্য নৈমিত্তিক দ্যুতি নিয়ে ফুটে উঠেছেন সেই আসরে। কিন্তু তাঁদের সান্ধ্য শৃঙ্গারসজ্জাই বা কি, আর হাব-ভাবের নিত্য-নবীন মাধুর্যই বা কি, মনে হয়েছে এসব যেন তাঁদের দৈনন্দিন দায়িত্ব মাত্র। ব্যক্তিত্ব বলতে এঁদের যা কিছু মান-অভিমান, স্পর্ধা ও প্রগল্‌ভতা বলতে যা কিছু স্বভাব ও প্রতিভার ঝিকিমিকি, তা সমস্তই যেন বিলীন নিষ্প্রভ হয়ে যায় ঐ জোছনার কাছে। বিস্ময়ে তাকিয়েছি এঁদের মুখের দিকে; অর্ধ-মুকুলিত নেত্রে বিচিত্র সঙ্কোচ সম্মোহ দেখেছি সত্য; কিন্তু এও যেন কিছু নয়। কারণ সেই সঙ্কোচ-সম্মোহ ভেদ করে ঝলক দিয়ে যায় সদ্যোমুগ্ধ প্রণয়ের আশা আর আনন্দ। শ্রদ্ধা মনে হয়েছে তুচ্ছ সামান্য কথা। সেই চন্দ্রশোভার মধ্যে নিজকে আত্মসমর্পণ করাই সবচেয়ে বড়ো কথা আর আশ্চর্যের কথা মনে হয়েছে; বার বার মনে হয়েছে। বৈঠকে পরস্পরের প্রতি স্বাভাবিক কুতূহল থাকে। গণপত্‌-রাও ভাইয়াসাহেব সেই কুতূহলও যে কেড়ে নিলেন! অদ্ভুত এই হেমন্তের চন্দ্রমা, যিনি একপক্ষের কটাক্ষপাতে সমস্ত ব্যক্তিত্বের গুরুদক্ষিণা আহরণ করে পশ্চিমদিকে অন্তর্হিত হয়ে যেতেন; স্নিগ্ধ-শীতল স্মৃতি মাত্র রেখে যেতেন বৈঠকের আকাশে-বাতাসে। ভাইয়াসাহেব যেন একটি মূর্তিমান সমস্যার শুভ্র রূপ। তিনি এলে কখন কি হয় বলা যায় না, অথচ উদয়টা জমতে না জমতেই বিদায়। তাঁর আবির্ভাব ছিল রহস্যে উজ্জ্বল; শীতের জোছনার রহস্য।

(ক্রমশ)

সরোজ আচার্য

নিকোলাই আলেক্‌জান্দ্রোভিচ্‌ বুলগানিন; নিকিতা সার্জিয়েভিচ্‌ ক্রুশ্চেভ—একজন সোভিয়েট ইউনিয়নের মন্ত্রী পরিষদের সভাপতি অর্থাৎ প্রধান মন্ত্রী; আর একজন সোভিয়েট ইউনিয়নের কম্যুনিস্ট পার্টির প্রধান সম্পাদক। কে বড়, কে ছোট, তা রাজনীতির দাঁড়িপাল্লায় ওজন করে বলা যায় না। বুলগানিন অথবা ক্রুশ্চেভ কেউই সোভিয়েট রাজনীতিক্ষেত্রে নবাগত নন, হঠাৎ এক-লাফে সিঁড়ির অনেক ধাপ ডিঙিয়ে উপরে ওঠেন নি। সোভিয়েট নেতাদের প্রত্যেককেই দীর্ঘকাল নানা কাজ এবং দায়িত্বের পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যেতে হয় এবং যেতে হয়েছে। বুলগানিন, ক্রুশ্চেভের বেলায় এর কোন ব্যতিক্রম হয়নি। একথা ঠিক যে, গত ফেব্রুয়ারী মাসের পূর্বে তাঁদের নাম বাইরের জগতে সুপরিচিত ছিল না। তবে স্টালিনের মৃত্যুর পরে সোভিয়েট ইউনিয়নের বৃহৎ নেতৃত্বের গড়ন বদলানো শুরু করে। ম্যালেনকভ যখন প্রধান মন্ত্রী হন, তখন বুলগানিন নিযুক্ত হন চারজন উপ-প্রধান মন্ত্রীর একজন। স্টালিনের মৃত্যুর পূর্বেই ক্রুশ্চেভ সোভিয়েট কম্যুনিস্ট পার্টির সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য হন এবং ১৯৫২ সনে পার্টির পুনর্গঠিত সম্পাদকমণ্ডলীর আটজনের মধ্যে স্থান পান। স্টালিনের মৃত্যুর ১৫।১৬ দিন পরেই ম্যালনকভের স্থানে ক্রুশ্চেভ সোভিয়েট কম্যুনিস্ট পার্টির প্রধান সম্পাদক নিযুক্ত হন। কাজেই গত ফেব্রুয়ারী মাসে সোভিয়েট নেতৃত্বের অদলবদলের পূর্বেও বুলগানিন এবং ক্রুশ্চেভ নেতামণ্ডলীর প্রথম সারিতে ছিলেন। সোভিয়েট নেতাদের মধ্যে সবচেয়ে মান্যগণ্য হলেন "ওল্ড বলশেভিক"রা অর্থাৎ যাঁরা ১৯১৭ সনের নবেম্বর বিপ্লবের পূর্বেই বলশেভিক দলের সদস্য হয়েছিলেন। স্টালিনের মৃত্যুর পরে নেতৃস্থানীয় "ওল্ড বলশেভিক" বলতে আছেন ৪ জন—ভরশিলভ, মলটভ, কাগানোভিচ এবং বুলগানিন। এই বিশিষ্ট মর্যাদায় বুলগানিন ক্রুশ্চেভের কিছু উপরে স্থান পেতে পারেন। ক্রুশ্চেভ বুলগানিনের চেয়ে বয়সে এক বৎসরের বড়; তবে ক্রুশ্চেভ বলশেভিক দলে যোগ দেন ১৯১৮ সনে অর্থাৎ নবেম্বর বিপ্লবের পরে, আর বুলগানিন যোগ দেন ১৯১৭ সনে নবেম্বর বিপ্লবের কয়েক মাস পূর্বে।

বয়স ষাট হলেও নিকোলাই আলেক-জান্দ্রোভিচ্‌ বুলগানিন বেশ কর্মঠ এবং প্রাণবন্ত। এদিক দিয়ে অবশ্য আমাদের প্রধান মন্ত্রী নেহরুও কারো কাছে হার মানবার নন। মাঝারী হৃষ্টপুষ্ট হাসি-খুশী চেহারা বুলগানিনকে সুপুরুষই বলা চলে। "নিউইয়র্ক টাইমস্‌" ও বুলগানিন প্রধান মন্ত্রী হওয়ার পরে

মার্শাল বুলগানিন

মঃ ক্রুশ্চেভ

তাঁর অমায়িক চেহারা এবং পালিশ-করা আদবকায়দার বর্ণনার নানা তুলনার অবতারণা করেন—যেন পুরোনো আমলের জার্মানীর মফঃস্বল শহরের কনসার্ট পার্টির ব্যাণ্ডমাস্টার অথবা যেন সেয়ানা ঠাকুর্দা। বুলগানিনের প্রসন্ন মুখশ্রী, সুচল দাড়ি, সংযত মর্যাদাপূর্ণ চালচলন দেখে মনেই হয় না যে, বাইশ বৎসর বয়স থেকে তাঁকে অনেক কঠিন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এগুতে হয়েছে। পেশাদার যোদ্ধা না হলেও, অন্য অনেক সোভিয়েট নেতার মত তাঁকেও যুদ্ধক্ষেত্রে নেতৃত্ব করতে হয়েছে—সোভিয়েট মার্শালের পোশাকে তাঁকে বেমানান দেখায় নি। আবার মার্জিত কথাবার্তা এবং বনেদী শিষ্টাচারে তাঁকে কেতা-দুরস্ত দেখে পশ্চিম য়ুরোপের একজন পর্যবেক্ষক মন্তব্য করেছেন, বুলগানিনকে কালো ফ্রককোর্ট আর ডোরা-কাটা প্যাণ্ট পরিয়ে য়ুরোপের যে কোন পার্লামেণ্টে বসিয়ে দিলে তিনি বেশ মানিয়ে নিতে পারবেন। যা হোক, এসব হ'ল জল্পনা এবং কল্পনা। পোশাক-পরিচ্ছদ, আদব-কায়দা দিয়েই কারো সবটা পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে অন্য সব দেশের মানুষ থেকে বুলগানিন, ক্রুশ্চেভ এবং অন্য সোভিয়েট নেতারা একেবারে বেয়াড়া রকমের আলাদা ধরনের, এ-ও ঠিক নয়। বুলগানিনের স্ত্রী এলেনা মিখাই-লোভনার বয়স ৫৬; তিনি মস্কোর একটি হাইস্কুলে ইংরেজী ভাষার শিক্ষয়িত্রী। একটি ছেলে ও একটি মেয়ে আছে, তারা প্রাপ্তবয়স্ক এবং বিবাহিত। একজন ড্যানিশ সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমতী বুলগানিন বলেন, যেমন সব পরিবারে হয় তেমনি আমরাও, স্বামী-স্ত্রী আমাদের কাজকর্ম নিয়ে আলোচনা করি, রবিবার ও ছুটির দিনগুলি একসঙ্গে কাটাই, থিয়েটার অথবা সিনেমায় যাই।

ঠিক মজুর পরিবারে বুলগানিনের জন্ম নয়—তাঁর বাবা ছিলেন কোন অফিসের কেরানী। ভলগার তীরে নিজনী নভগরড শহরে (এখন যার নাম গর্কি) ১৮৯৫ সনে বুলগানিনের জন্ম হয়। অর্থসামর্থ্য বেশি না থাকলেও বুলগানিন টেকনিক্যাল হাইস্কুলে পড়বার সুযোগ পান—ঐ সময়ে গণিত, পদার্থ বিজ্ঞান এবং জার্মান ভাষা মোটামুটি ভাবে আয়ত্ত করেন। ১৯১৭ স[ne] নভেম্বর বিপ্লবের কিছুদিন প[রে] বলশেভিক দলের রাজনৈতিক কাজে তাঁ[র] হাতেখড়ি হয়। তখন তিনি মজু[র] শ্রেণীর মধ্যে আন্দোলন পরিচাল[না] করেন। বিপ্লবের পরে গৃহযুদ্ধে[র] সময়ে বিশেষ কমিশনের সদস্য হিসা[বে] বুলগানিনকে নানা জায়গায় শৃঙ্খ[লা] প্রতিষ্ঠার জন্য পাঠান হয়। এই সম[য়] বুলগানিন কাজ করেন কাগানোভি[চ,] মলটভ এবং মিকোয়ানের অধীন[ে।] সম্ভবত কাগানোভিচই বুলগানিন[কে] বিশ্বস্ত বলশেভিক হিসাবে স্টালি[নের] কাছে পরিচিত করেন। ১৯২৭ [সনে] প্রথম পঞ্চবার্ষিকী সংকল্পের কাজ শ[ুরু] হলে মস্কোর বিরাট ইলেক[ট্রিক] যন্ত্রপাতির কারখানার ডাইরেক্টর নি[যুক্ত] হন বুলগানিন। এই সময়ে এক সুইস এঞ্জিনীয়ার ঐ কারখানার কাজ দেখে বলেছিলেন, বুলগানিন ডাই[রে]

হওয়ার পরে কারখানার ঢিলেমি রাতারাতি উধাও হয়েছে। এর পর বুলগানিন মস্কো সোভিয়েটের চেয়ারম্যান অর্থাৎ মস্কো শহরের মেয়র নিযুক্ত হন। মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথের সম্বর্ধনা-সভায় বুলগানিন উপস্থিত ছিলেন দেখা যায়। মস্কো শহরের উন্নতির জন্য মেয়র বুলগানিন য়ুরোপের নানা দেশ থেকে যানবাহন এবং নিয়ম-কানুন আমদানী করেন। মস্কোর বিখ্যাত ভূগর্ভস্থ রেলওয়ে তৈরীর কাজে বুলগানিন, কাগানোভিচ্ এবং ক্রুশেভ (তখন মস্কো জেলা পার্টির সম্পাদক) একসঙ্গে হাত লাগান।

শীর্ষস্থানীয় সোভিয়েট নেতাদের মধ্যে খুব কম লোকই দেশের বাইরে ঘুরেছেন। মস্কোর মেয়র বুলগানিন পশ্চিম য়ুরোপে নানা শহর পরিদর্শন করেছিলেন। বর্তমানে পশ্চিম জার্মানীর চ্যান্সেলর ডাঃ আদেনুয়েব সে সময়ে কলোন শহরের মেয়র। বুলগানিনের সঙ্গে তখন তাঁর পরিচয় হয়েছিল, সে কথা স্মরণ করে ২০ বৎসর পর ডাঃ আদেনুয়ের বলেন, বেশ মনে আছে বুলগানিনের কথা, তখন আমরা দুজনেই ছিলাম মেয়র, এখন আমি চ্যান্সেলর তিনি প্রধানমন্ত্রী—মোটের উপরে আমরা মন্দ করিনি।

যতদূরে জানা যায়, সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রায় সব বিভাগের কাজেই বুলগানিন অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন, কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তিনি সকল কাজের কাণ্ডারী না হলেও, সব রকম কাজই করেছেন উৎসাহের সঙ্গে। ১৯৩৮ সনে তিনি ছিলেন সোভিয়েট ইউনিয়নের রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সভাপতি। ১৯৩৯ সনে মলটভের সঙ্গে বুলগানিন যুদ্ধ সরঞ্জাম ও গোলা বারুদ তৈরী কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি করার ভার নেন।

হিটলার যখন সোভিয়েট ইউনিয়ন আক্রমণ করে, বুলগানিন তখন সোভিয়েট কম্যুনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্য। সভ্যদের মধ্যে তিনিই প্রথম সোজা যুদ্ধ-ক্ষেত্রে যাওয়ার জন্য নাম লেখান। এর জন্য বুলগানিনের দেশ-প্রেমিক খ্যাতি বিস্তৃত হয়, সোভিয়েট সেনাপতিমণ্ডলীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়। মস্কো রক্ষার কাজে তিনি মার্শাল ঝুকভের সহযোগী হন। যুদ্ধকালে বুলগানিনের সাহস ও সংগঠন ক্ষমতা খুবই প্রশংসা পায়। তিনি রেড আর্মির জেনারেল পদে নিযুক্ত হন এবং পরে মার্শাল পদবীতে ভূষিত হন। যুদ্ধ অন্তে বুলগানিন সোভিয়েট সৈন্য বিভাগের মন্ত্রী নিযুক্ত হন। এর পর তাঁর পদবী ও মর্যাদা সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। গত ৮ই ফেব্রুয়ারী সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ার পরে বুলগানিনের কার্যকলাপ বাইরের জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে যুগোশ্লাভিয়ার পুরানো কলহের মীমাংসা, নেহেরুর ঐতিহাসিক সম্বর্ধনা, জেনেভায় চার প্রধানের বৈঠক এবং বর্তমান ভারত ভ্রমণ এসবই বুলগানিন-ক্রুশেভের নেতৃত্বে সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে বাইরের জগতের সম্পর্কে নতুন অধ্যায় সূচনা করছে বলা যায়।

নিকিতা ক্রুশেভ বেঁটে-খাট গোলগাল চেহারা, হাবভাব কথাবার্তায় বুলগানিনের বিপরীত,—ইংরেজীতে যাকে বলা যায় "ফয়েল (Foil) লরেল-হার্ডি যুগলের হার্ডির মতই ক্রুশেভকে অভিনয়-নিপুণ মনে হয়। অনর্গল কথা বলায় তাঁর সমকক্ষ নাকি পাওয়া দুষ্কর। চেহারার মত কথাবার্তাও চাঁচাছোলা, ব্যাকরণ এবং শব্দ নির্বাচনের ধার ধারেন না। খুব সোজা-সুজি স্পষ্টবক্তা। বুলগানিন সুবক্তা—অলঙ্কারবহুল, উচ্ছ্বাসময় বক্তৃতা তাঁর, তবে খুব মৌলিকতা থাকে না তাতে। ক্রুশেভের বক্তৃতা ধারালো বেশি, সহজ গ্রাম্যতার গুণ এবং দোষে ভরপুর। পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চি লম্বা হৃষ্টপুষ্ট স্পষ্ট-ভাষী ক্রুশেভ এক খনিমজুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৯৪ সালে কুর্স্ক গুবেরিনার অন্তর্গত কালিভকা গ্রামে তাঁর জন্ম হয়। ছেলেবেলায় তাঁর কাজ ছিল ভেড়া চরান; তারপর কারখানায় ফিটারের কাজ ও খনিতে মজুরী। ১৯১৮ সনে গৃহযুদ্ধের সময়ে তিনি বলশেভিক দলে যোগ দেন। প্রথমে সৈনিক তার পর মজুর সংগঠনকর্মী হিসাবে ক্রুশেভ ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। ডনবাসের খনি এলাকায় কাজের সময় মজুরদের শিক্ষাকেন্দ্র থেকে তিনি গ্রাজুয়েট হন। কর্মীহিসাবে যেমন বুলগানিন তেমনি ক্রুশেভও স্ট্যালিনের বিশ্বস্ত সহযোগী কাগানোভিচের নজরে পড়েন। ১৯২৯ সালে ক্রুশেভের কর্মকেন্দ্র হয় মস্কো। ১৯৩২-৩৪ সালে মস্কো শহরের পার্টি কমিটির সম্পাদকের কাজ থেকে শুরু করে ক্রুশেভের দ্রুত উন্নতি হতে থাকে। ১৯৩৮ সালে তিনি য়ুক্রেনের মত গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রে কম্যুনিস্ট পার্টির প্রথম সম্পাদক নির্বাচিত হন। য়ুক্রেনের নানা সমস্যা সম্বন্ধে তিনি বিশেষজ্ঞ গণ্য হন। ১৯৪৭ সনে তিনি কিছুকাল য়ুক্রেনের প্রধানমন্ত্রীও হয়েছিলেন। এই সময় থেকে তিনি সোভিয়েট কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃমণ্ডলীর মধ্যে যেসব পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন তার বিস্তৃত বর্ণনা দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। যুদ্ধের সময়ে স্ট্যালিন তাঁকে লেফটন্যান্টজেনারেল নিযুক্ত করেন এবং জেনারেল কোনিয়েভের সঙ্গে ক্রুশেভ য়ুক্রেন রণাঙ্গণের পরি-চালনা ভার নেন।

ক্রুশেভের ব্যক্তিত্বই বাইরের জগতে বেশি কৌতূহল এবং কৌতুক সৃষ্টি করেছে। স্ট্যালিনের মত সুদৃঢ়, গম্ভীর স্বল্পভাষী তিনি নন, বুলগানিনের মত কেতাদুরস্ত চালচলনও তিনি আয়ত্ত করেননি। ক্রুশেভ এবং বুলগানিন দুজনের জীবনই গড়ে উঠেছে কঠিন সংকটময় অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে। সহ-অস্তিত্বের ঐক্যতানে দুজনের ব্যক্তিত্ব দুরকম সুর সংযোজন করছে।

উত্তরাখণ্ডের জন্যে রয়েছে রেমণ্ডের ট্যুইড্, ফ্লানেল্ ও ভারী পোষাকের কাপড়। দেহকে শীতের কষ্ট থেকে ঢেকে রাখতে রয়েছে বিশুদ্ধ মেরিনো পশম দিয়ে বোনা গরম কাপড়। ভারতের দাক্ষিনাত্য ও অন্যান্য গরম প্রদেশের জন্যে রয়েছে রেমণ্ডের হাল্কা ধরনের ঠাণ্ডা ও ট্রপিক্যাল্ কাপড়, যা স্নিগ্ধ আরামদায়ক পরিধানের জন্যে কতক তৈরী হয়েছে পশম দিয়ে আর কতক হয়েছে কৃত্রিম রেশমের সঙ্গে মিশ্রিত করে'।

মনে রাখবেন যে রেমণ্ডের জেকে স্যুটিং যে কোনও আমদানী করা কাপড়ের মতোই জেল্লাদার আর দামেও সস্তা

সব রকমের বুনুনীতে পাওয়া যায়।

দার্জ্জিলিং হইতে শিলিগুড়ি এবং কালিম্পং সমেত পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও উড়িষ্যার সেলিং এজেন্টস:
মেসার্স যুগীলাল কমলাপৎ (এজেন্সী) লিঃ,
৭, কাউন্সিল হাউস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সাব-এজেন্টদের নাম ঠিকানা:

মেসার্স মহম্মদ আলী গোলাম আলী এণ্ড কোং
বেণ্টিক ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
মেসার্স জে এস মহম্মদ আলী
টাওয়ার হাউস, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা।
মেসার্স মামচাঁদ শিউচাঁদ, কালিম্পং

রেমণ্ড এর **Jaykay** JK

'জেকে' গরম কাপড়

বেশীদিন টিকবে বলে বেশী ভালো করে বোনা

দি রেমণ্ড উলেন মিল্স লিমিটেড, বম্বে।

দি রেমণ্ড উলেন মিলস্ লিমিটেড, জে, কে, বিল্ডিং, ডওগাল রোড, বোম্বাই—১

* সোভিয়েট সংস্কৃতির নবরূপ *

নরেন্দ্র দেব

সংস্কৃতি সম্বন্ধে একটি সুস্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন ধারণা আমাদের অনেকেরই নেই। অত্যন্ত শিথিলভাবে যত্রতত্র এই শব্দটি প্রয়োগের ফলে আমরা একে অধিকতর দুর্বোধ্য করে তুলেছি। শব্দটি ইংরাজী 'কালচার' কথাটার রবীন্দ্র-রচিত পরিভাষা। প্রাচীন কোনো শব্দ-কোষে এ কথাটির সন্ধান মেলে না। বর্ত-মানে 'সংস্কৃতি' শব্দের কৌষিকী অর্থ হল শিক্ষা ও চর্চার দ্বারা লব্ধ উৎকর্ষ। শিক্ষিত ও সভ্য মানুষের মধ্যেই এর সন্ধান মেলে। কিন্তু সকলের মধ্যে নয়। কেবলমাত্র সেই মানুষের মধ্যেই সংস্কৃতির সম্পদ আছে যিনি সুক্ষ্মরুচি ও রসবোধ-সম্পন্ন। যাঁর জীবনধারার মধ্যে আছে একটা উদার চরিত্রের অভিব্যক্তি। একটা বংশপরম্পরায় অর্জিত সামাজিক শিষ্টাচার। এই চরিত্রগত উচ্চ নীতি ও উদার আদর্শ যে জাতির সামাজিক আচার-আচরণের মধ্যে পরিস্ফুট দেখা যায়, কেবলমাত্র তাদেরই সংস্কৃতিবান জাতি বলা চলে। য়ুরোপে ফরাসীরা একদা সংস্কৃতির এই পর্যায়ে এসে পৌঁছতে পেরেছিল। ইতালিয়ানরা তার অনুসরণ করেছে। ইংরাজের চেষ্টাও প্রশংসনীয়। জার্মানদের মধ্যেও এটা সংক্রামিত হয়েছিল।

য়ুরোপের এই প্রগতিশীল প্রদেশ-গুলির তুলনায় প্রাক্-বিপ্লব যুগের রাশিয়া ছিল পিছিয়ে পড়ে। কিন্তু বিপ্লবোত্তর যুগের লোকায়ত্ত সোভিয়েৎ সরকারের অধীনে রাশিয়ার সাংস্কৃতিক উন্নতি বর্তমানে বিশ্বের বিস্ময় উৎপাদন করেছে। বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষা প্রবর্তনের কল্যাণে সোভিয়েৎ রাশিয়ার প্রত্যেকটি নরনারী আজ শিক্ষিত হয়ে উঠেছে।

কিন্তু শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রকেই যদি আমরা সংস্কৃতিবান বলে মনে করি, তাহলে ভুল করা হবে। আমাদের দেশে শিক্ষিত সম্প্রদায় বলে চিহ্নিত যাঁরা, তাদের মধ্যে এমন অনেক দিঙ্নাগ-জাতীয় প্রচণ্ড বিদ্বান আছেন, যাঁরা সংস্কৃতির কোনও ধার ধারেন না। তাই তাঁদের মধ্যে পাওয়া যায় শুধু বিদ্যার উদগ্র দম্ভ! 'বিদ্যা দদাতি বিনয়ম্' কেবলমাত্র সেইখানেই, যেখানে বিদ্যার সঙ্গে সংস্কৃতির শুভ সম্মেলন ঘটে।

স্ট্যালীনগ্রাদে সোভিয়েৎ ছেলেমেয়েদের একটি স্কুল

মুরাল শ্রমিকদের ছেলেমেয়েরা তাদের "পাইয়োনীয়ার প্যালেসে" ছুটি কাটাতে এসেছে

শিক্ষা ও সভ্যতা অনুশীলনের সঙ্গে সুক্ষ্মরুচিরও চর্চার প্রয়োজন। বৈদগ্ধজাত মানসিক রসবোধও তদনুপাতে উদ্বুদ্ধ হওয়া চাই। সংস্কৃতির উৎকর্ষ সাধনে এ সকল গুণানুশীলনের আবশ্যকতা অনস্বীকার্য। বিপ্লবোত্তর সোভিয়েৎ রাশিয়া এর মূল্য অনুধাবন করে দেশে শিক্ষার আমূলে পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। ভবিষ্যৎ জাতিকে তাঁরা এক নূতন আদর্শে গড়ে তুলছেন। তাঁদের শিক্ষা ও সভ্যতার অগ্রগতির সম্যক পরিচয় প্রত্যক্ষগোচর হয় তাদের বিদ্যায়তনগুলির উন্নত শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে, তাদের শিল্প-সাধনার মধ্যে, তাদের চারুকলার ঐশ্বর্যে, কারিগরি বিদ্যার অনুশীলনে, সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে, গ্রন্থাগারের অভ্যন্তরে, স্বাস্থ্য ও শরীর-চর্চায়, সঙ্গীত, নৃত্য ও অভিনয়ে, জীবন-যাত্রা প্রণালীতে, সমাজব্যবস্থার মধ্যে ও নগরীর মনোরম রূপসজ্জায়।

শিক্ষাব্যবস্থা নিয়েই কথারম্ভ করা যাক। সোভিয়েৎ রাশিয়ার ছেলেমেয়েরা শিশুকাল থেকেই রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে সযত্নে পালিত হয়। প্রতি শহর ও পল্লীতে এঁরা শিশুদের জন্য নার্সারী স্কুল, ক্রীড়াপ্রাঙ্গণ ও কিন্ডারগার্টেন স্থাপন করেছেন। এগুলি শহরের বড় বড় শিল্প-প্রতিষ্ঠান এবং গ্রামের যৌথ ক্ষেতখামার ও সরকারী কৃষিক্ষেত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। অভিজ্ঞ শিক্ষক ও সুদক্ষ চিকিৎসকগণের তত্ত্বাবধানে শিশুরা সারাদিন সেখানেই কাটায়। তাদের পিতামাতা ও অভিভাবকেরা ক্ষেত বা কলকারখানার কাজকর্ম থেকে ছুটি পাবার পর যে যার ছেলেমেয়েদের বাড়ি নিয়ে যান।

শিশুদের সাত বছর বয়স হলেই তাকে স্কুলে যেতেই হবে। এর কোনও ব্যতিক্রম হবার উপায় নেই। পুরো দশটি বছর ধরে তাকে মাধ্যমিক শিক্ষার অধীনে থাকতে হবেই। এখানে শিক্ষাপদ্ধতি এমনভাবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে যে, প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ে তার মাতৃভাষা ও সাহিত্যে সম্যক জ্ঞানলাভের সঙ্গে ইতিহাস, ন্যায়শাস্ত্র, মনস্তত্ত্ব, অঙ্কশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জ্যোতির্বিদ্যা ও অন্যান্য বিজ্ঞান বিষয়েও বিশেষ শিক্ষা পায়। প্রত্যেক স্কুলেই একটি না একটি বিদেশী ভাষা শেখানো হয়। ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার জন্য সোভিয়েট রাষ্ট্র প্রতি বৎসর অকৃপণভাবে প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। কিছুদিনের মধ্যেই সেখানে পঁচিশ হাজার নূতন স্কুলবাড়ি নির্মিত হয়েছে। এই বিদ্যাভবনের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। বর্তমানে প্রায় সওয়া দু'লক্ষ স্কুলে পৌনে চার কোটি ছাত্রছাত্রী পড়ছে। শিক্ষকের সংখ্যা ষোল লক্ষের উপর।

শিক্ষায়তনের বাইরে, ছেলেমেয়েদের নির্দিষ্ট পাঠ্যতালিকার বহির্ভূত আরও অনেক কিছু বিষয়ে তাদের স্বেচ্ছা-শিক্ষার সুযোগ দেবার জন্য সোভিয়েৎ রাশিয়ায় অসংখ্য প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এইসব প্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের অবসর-কালীন আনন্দ উপভোগের সঙ্গে তাদের স্বাধীন ইচ্ছামত, তাদের পছন্দ ও রুচিমত বিবিধ চিত্তাকর্ষক বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়। এগুলির মধ্যে কিশোরদের 'পাইয়োনীয়ার প্যালেস' ও পাইয়োনীয়ার ক্যাম্পগুলি তাদের সবচেয়ে প্রিয় হয়ে উঠেছে। এই পাইয়োনীয়ার প্যালেস-গুলিতে ছেলেমেয়েদের উপযোগী শৌখীন শিল্পকলা, তাদের খেয়ালখুশি-মতো যন্ত্র-বিজ্ঞান শিক্ষাচক্র, ছোটদের নাট্যশালা, সঙ্গীত, নৃত্য ও বাদ্যযন্ত্র শিক্ষা এবং গ্রন্থাগারাদি দশ-বারো রকমের রম্য বিদ্যানুশীলনের ব্যবস্থা আছে। গ্রন্থাগারগুলিতে সোভিয়েট রাশিয়ার নানা প্রদেশে প্রচলিত বিভিন্ন ভাষার পুস্তক ও বিদেশী ভাষার বইও রাখা হয়। এখানে ছেলেমেয়েদের উত্তর-জীবনে প্রয়োজনীয়--ব্যাঙ্ক, পোস্টঅফিস, দোকান, স্কুল চালাতে শেখানো হয়।

যেসব ছেলেমেয়ের যন্ত্র-বিজ্ঞান শেখার ঝোঁক বেশি, তারা ওই যন্ত্র-বিজ্ঞান চক্রের সদস্য হবার জন্য নাম লেখায়। এখানে তারা ছোট ছোট জাহাজ তৈরি করতে শেখে, বিমান নির্মাণ করতে শেখে, ইঞ্জিন তৈরি শেখে এবং আরও নানা যন্ত্রপাতির প্রতিরূপ গড়তে শেখে। কেউ কেউ ফটোগ্রাফি শিখতে লেগে যায়। সাইকেলচড়া তারা প্রায় দোলনা থেকে নেমেই শেখে। যেসব ছেলেমেয়ের বাগান করার ঝোঁক, চাষবাসের প্রতি আকর্ষণ দেখা যায়, তাদের প্রত্যেককে এক এক টুকরো করে জমি দেওয়া হয় এবং আনুষঙ্গিক বীজ চারাসহ চাষের যন্ত্রপাতিও সরবরাহ করা হয়। তাদের সেই জমি তৈরি থেকে বীজ বপন, চারা রোপণ, বৃক্ষলতা পালন ও ফল-ফুলের চাষ নিখুঁতভাবে শেখানো হয়। এখানে

ক্ষুদ্রাকারে অনুশীলনাগার, গবেষণাগৃহ পরীক্ষা-মন্দির সবই আছে।

ছেলেমেয়েদের রেলগাড়ি সম্বন্ধে সব কিছু শেখাবার জন্য বড় বড় শহরের উপকণ্ঠে ছোট রেললাইন পেতে, স্টেশন করে দিয়ে, সিগন্যাল, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, পয়েণ্ট, গুমটি সব কিছুই তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। খানকয়েক যাত্রীবাহী গাড়ি ও ছোট রেলইঞ্জিনও রাখা হয়েছে। এই রেললাইনে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা বড়দের তত্ত্বাবধানে রেলগাড়ি চালাবার সমস্ত কৌশলই শিক্ষা করবার সুযোগ পায়।

ছেলেমেয়েদের শরীর-চর্চা ও স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য সোভিয়েৎ রাষ্ট্র প্রতি বৎসর বহু অর্থ ব্যয় করেন। জাতির ভবিষ্যৎ বংশধরদের নীরোগ ও স্বাস্থ্য সবল করে তোলবার ভার তাঁরা অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের উপর ন্যস্ত করেছেন। সেখানে শিশুদের স্বাস্থ্য-নিকেতনের বহুদর্শী কর্মীরা দেশের ছেলেমেয়েদের শরীরের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখেন, যাতে ভবিষ্যৎ যুগের মানুষগুলি কোনদিক থেকেই দুর্বল না হয়ে পড়ে। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে নিয়মিত ব্যায়ামানুশীলনের সুব্যবস্থা আছে।

গ্রীষ্মাবকাশে সমস্ত ছেলেমেয়ে শহরের বাইরে চলে গিয়ে ক্যাম্পে থাকে। সেখানেও নিয়মিত ব্যায়াম, খেলাধুলো, বনভোজন, মাছধরা, নৌকা-বাওয়া, শিকার, সাঁতার—এইসব নিয়ে কাটায়। খোলা আলো-বাতাসের মধ্যে থেকে পুষ্টিকর খাদ্য ও শারীরিক শ্রমের গুণে এবং খেলাধুলো ও পুরুষোচিত ব্যায়ামের ফলে তারা নূতন স্বাস্থ্যে বলীয়ান হয়ে ওঠে।

ভবিষ্যৎ জাতকে মানুষ করে গড়ে তোলবার জন্য সোভিয়েৎ রাষ্ট্রের এই যে অকৃপণ ব্যয় ও নিরলস প্রয়াস দেখে এসেছি, এর ফলে সেখানে আজ একটি ছেলেমেয়েও রুগ্ন ও দুর্বল নেই। প্রত্যেকের হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ও আনন্দময় মূর্তি। শিক্ষার দিক থেকে, সাধারণ জ্ঞানের দিক থেকে তারা যে কোনও দেশের ছেলেমেয়ের চেয়ে এগিয়ে চলেছে।

এইবার তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ-শিক্ষার কথা বলি। শুধু মস্কো য়ুনিভার্সিটির কথা বললেই সোভিয়েৎ রাষ্ট্রের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধেও কতকটা সুস্পষ্ট ধারণা হয়ে যাবে। এদের প্রতি শহরেই বিশ্ববিদ্যালয় আছে।
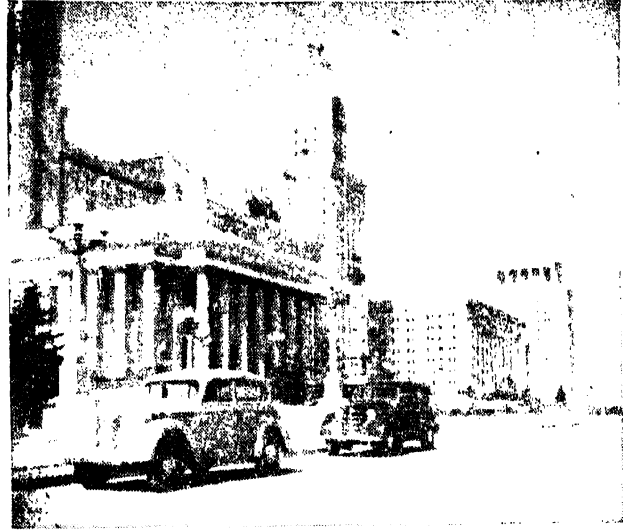
মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশদ্বার

মস্কোবা নদীর মোহানা যেখানে লেনিন পর্বতের কোল ঘেঁষে বৃহৎ এক বাঁকের সৃষ্টি করেছে, সেই বেলাভূমির সমতটের উপর সুবিন্যস্ত ফলমূলের বাগানে ঘেরা উচ্চভূমির উপর নির্মিত হয়েছে গগনস্পর্শী বিরাট 'মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়'। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই নূতন ভবনটি হালে নির্মিত হলেও মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের বয়স হল প্রায় দুশো বছর। এর প্রতিষ্ঠাতা রুশের বিজ্ঞানী-শ্রেষ্ঠ মিখাইলভ্ লমোনোসফের নামেই বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরণ করা হয়েছিল বটে, কিন্তু বিশ্ববাসীর কাছে এটি 'মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়' নামেই পরিচিত হয়ে উঠেছে।

নবনির্মিত বিশ্ববিদ্যালয় ভবনটি বত্রিশতলা উঁচু হ'লেও স্থাপত্য সৌষ্ঠবের গুণে একে মার্কিন স্কাই-স্ক্র্যাপারের মতো অসহ্য লাগে না। এর নির্মাণ কৌশল এই সুবৃহৎ ও সুউচ্চ ভবনটিকেও অপূর্ব শ্রীসম্পন্ন করে তুলেছে। মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বাদশটি বিভিন্ন বিদ্যানুশীলনের বিভাগ আছে। বিজ্ঞানের প্রায় সমস্ত শাখায় শিক্ষাদানের জন্য দুশো দশখানি 'চেয়ার' আছে এখানে। শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীগণের মধ্যে আছেন সোভিয়েৎ য়ুনিয়নের বিজ্ঞান পরিষদের তিরিশজন এ্যাকাডেমিশিয়ান। সোভিয়েৎ যুক্তরাষ্ট্র যোলটি বিভিন্ন স্বায়ত্বশাসিত প্রজাতন্ত্রে বিভক্ত। এই প্রজাতন্ত্রগুলির বিজ্ঞান পরিষদ ও শাখা বিজ্ঞান পরিষদের তেত্রিশজন এ্যাকা-ডেমিশিয়ানও আছেন। এ ছাড়া সোভিয়েৎ যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞান পরিষদের করেসপণ্ডিং মেম্বার বা পত্রযোগে শিক্ষাদাতার সংখ্যা উপস্থিত উনষাট জন। অধ্যাপক আছেন চারশত এবং পাঁচশত পঞ্চাশজন 'ডোসেণ্ট' বা শিক্ষক।

মস্কো বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী-দের সংখ্যা আবাসিক দৈনিক ও পত্রযোগে শিক্ষার্থী নিয়ে বর্তমানে মোট বাইশ হাজার। পৃথিবীর ৫৯টি বিভিন্ন জাতির ছাত্র ছাত্রীরা এখানে উচ্চশিক্ষার সুযোগ পেয়েছে। শিক্ষার বিচিত্র নূতন সাজসরঞ্জামের দিক থেকে মস্কো বিশ্ব-বিদ্যালয় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়গুলির মধ্যে অন্যতম। দেখে আশ্চর্য না-হয়ে পারা যায় না যে, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের

মস্কোর প্রসিদ্ধ বলসয় থিয়েটারের সম্মুখে

বিবিধ বিভাগে ব্যবহার হচ্ছে প্রায় দশ লক্ষাধিক সাজসরঞ্জাম। যন্ত্রপাতি, টেলিস্কোপ, মাইক্রস্কোপ, রকমারী সন্ধানী আলো, ল্যাণ্টার্ন স্লাইড ও সিনেমা প্রোজেক্টর প্রভৃতি। অধিকতর আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এইসব বৈজ্ঞানিক গবেষণার ও রসায়নাগারে অনুশীলন উপযোগী এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানের সহায়ক যন্ত্রপাতি সমস্তই সোবিয়েৎ রাশিয়ার নিজেদের কারখানায় প্রস্তুত হয়েছে। একটি টুকরোও বিদেশ থেকে আমদানি করা হয়নি। এক সেকেণ্ডের দশলক্ষ ভাগের একভাগ সময়ের মধ্যেও যা ঘটে, শিক্ষার্থীরা অনায়াসে এখানে তা পর্যবেক্ষণ করতে পারে। অণুপরমাণুর সঙ্গে তাদের পরিচয় সহজ হয়। গ্যাসের চাপ ও বাষ্পের বেগ মুহূর্তে মেপে বলে দিতে পারবে তারা। এখানকার টেক্‌নিক্যাল বিভাগগুলিতে সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির সাহায্যে জটিল বৈদ্যুতিক গতির তড়িৎ-পরিমাপ সন্তোষজনকভাবে ধরতে পারা যায়। অতি কঠিন ও গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার কাজ অতি সহজে করা যায় এখানে।

মস্কো বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মানমন্দিরে দেখলুম আলোকশক্তি ও সূর্যরশ্মি কেন্দ্রীভূত ও ঘনীভূত করার প্রয়োজনে সোভিয়েৎ বিজ্ঞানীদের তৈরি এক বিরাট রিফ্রাক্টর। শুধু যে এইগুলিই আমাদের আশ্চর্য লেগেছে তাই নয়, এখানকার এক একটি বিভাগের আকার ও আয়তনও যথার্থই বিস্ময়কর। সব কিছুই এ'রা বৃহৎভাবে পরিকল্পনা করেন। একমাত্র ভূতত্ত্ব বিভাগই বিশ্ববিদ্যালয়ের সাতটি তলা জুড়ে বিস্তৃত! ভূতত্ত্ব বিভাগের পাঠকক্ষ এবং ল্যাবরেটোরিগুলিতে আছে খনিজদ্রব্য পরীক্ষা ও পর্যালোচনা করার উপযুক্ত বহুসংখ্যক যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জাম, যেমন, বর্ণচ্ছত্র সম্বন্ধীয় সব কিছু প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম, নিখুঁত ভূকম্পন জ্ঞাপক যন্ত্র, ম্যাগ্নেটোমিটার, এক্সরে, রেডিয়োর যন্ত্রপাতি, তেল আর কয়লা বিশ্লেষণের কলকব্জা, বিভিন্ন মিশ্রিত ধাতু ও রাসায়নিক পদার্থের বিশ্লেষক যন্ত্রপাতি, ভূগর্ভস্থ পাতাল গঙ্গার গতিপ্রবাহ যাতে উপর থেকেই দৃষ্টিগ্রাহ্য হ'তে পারে এবং তার হিসাবটা করা সুসাধ্য হয় এজন্য প্রকাণ্ড এক 'হাইড্রো জেনারেটার' বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা সমগ্র তলা জুড়ে বসানো হয়েছে। মৃত্তিকা-বিজ্ঞান শেখবার আয়োজনও দেখলুম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাতটি তলা জুড়ে রয়েছে!

এখানে বোটানিক্যাল গার্ডেন রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন ৩১৫ বিঘে জমিতে বিস্তৃত। তারই প্রাঙ্গণে জীব-বিজ্ঞান ও মৃত্তিকাতত্ত্বের বিভাগটিও তৈরি হয়েছে। এখানে সারা সোভিয়েৎ দেশের যেখানে যতরকম উদ্ভিদ জন্মায় তার নমুনা আর বর্ণনা সংগ্রহ করে রাখা হয়েছে। আর আছে একটি শাখা প্রশাখা বিস্তৃত বৃক্ষের আকারে খনিজ পদার্থ সংগ্রহ। যাতে ছাত্র ছাত্রীরা সহজেই বুঝতে পারে কিভাবে কেমন করে কোন শাখা থেকে কোনটি এসেছে এবং একটির সঙ্গে আর একটির সংযোগ ও স্তর বিভাগ কিভাবে সম্ভব হয়েছে। এখানে যে ফলের বাগান আছে সেখানে দেখানো হয় কেমন করে নির্বাচন-প্রজননের গুণে মিশ্র ফল উৎপাদন করা যেতে পারে, যা আকারে বড় হবে, খোসা পাতলা হবে, বীচি বিরল হবে, খেতে সুস্বাদু ও সুগন্ধ হবে ইত্যাদি। আল্পস্ পর্বতে যা-যা পাওয়া যায় তার একটি পৃথক উদ্ভিদশালা রয়েছে। অসংখ্য কাঁচের ঘর—প্রত্যেকটির অভ্যন্তরস্থ আবহাওয়া বৈজ্ঞানিক উপায়ে আনুষঙ্গিক উদ্ভিদের অনুকূল করে রাখা হয়েছে। মৎস্য সম্বন্ধে গবেষণার উপযোগী একাধিক জলাশয় এবং প্রাণী বিজ্ঞানের জন্য চিড়িয়াখানা রয়েছে। এখানকার সমস্ত বিভাগগুলিই সুসজ্জিত ও স্বয়ং সম্পূর্ণ! বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীতে গিয়ে দেখি রুশদেশীয় বিভিন্ন ভাষা ছাড়াও নানা বিদেশী ভাষার প্রসিদ্ধ গ্রন্থাদি ও বিবিধ সাময়িক পত্র পত্রিকাও রয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় ভবনের সঙ্গেই রয়েছে

স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থীদের বাসভবন, অনুশীলনাগার, গবেষণা কক্ষ এবং ছাত্র-ছাত্রীদের অবসর বিনোদনের সুব্যবস্থা। ছ' হাজার সুসজ্জিত ঘরে ছ' হাজার ছেলে-মেয়ে থাকে ও পড়াশুনো করে। আর একটি ছাত্রাবাসে চার হাজার ছেলেমেয়ে আছে। বিশ্ববিদ্যালয় ভবনের প্রত্যেক তলায় শিক্ষার্থীদের জন্য 'মিলনাসর' আছে। প্রমোদ কক্ষ আছে। প্রমোদ কক্ষে পিয়ানো, দাবা খেলার ছক কাটা টেবিল, আরাম চৌকি, সোফা, গদি প্রভৃতি আছে। এঘরে সদ্য প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলি ও সাময়িক পত্রাদিও রাখা হয়। এইসব ক্লাব-ঘরগুলির সংখ্যা অনেক। এর আবার উপ-প্রকোষ্ঠও আছে। সেখানে ব্যায়াম, খেলাধুলো, পড়ুয়াদের সঙ্ঘ, সমিতি, চক্রাদির অনুষ্ঠান হয়। এ ছাড়া ভোজন গৃহ আছে অনেকগুলি, সেখানে তারা সস্তায় প্রচুর পুষ্টিকর খাদ্য পেতে পারে।

মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত বিভাগ খুঁটিয়ে দেখা একদিনের কাজ নয়। সে একটি বিদ্যানগরের জ্ঞানসমৃদ্ধি বিশেষ। নয়েক মাইল জুড়ে এর বিস্তার! সব কিছু সবিস্তারে বর্ণনা করারও স্থানাভাব। দশ হাজার ছাত্রছাত্রী এখানে বিবিধ বিষয়ে জ্ঞানলাভার্থে বসবাস করছে শুনে বারবার আমাদের নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা মনে পড়তে লাগল।

পৃথিবীর এক নূতন জাতির নব-জীবন এখানে নূতন আদর্শের উচ্ছল প্রাণছন্দে স্পন্দমান দেখে এলুম, যাদের মধ্যে জাতিভেদ নেই, বর্ণভেদ নেই, ধর্মান্ধতা নেই এবং সবচেয়ে বড় কথা—ধনগর্ব ও বিদ্যার অহঙ্কার নেই! এখানে গোটা মানুষটাই বড়, আর সবই এদের কাছে—'এহ বাহ্য।' আমরা মুখে বলি বটে 'শুনহ মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই!' কিন্তু কাজে দেখি মানুষের অসম্মান আমাদের দেশেই সকলের চেয়ে বেশি। সোবিয়েৎ দেশেই প্রথম দেখলুম—'সবার উপরে মানুষ!'

থাক সেকথা। এইবার সোবিয়েৎ রাশিয়ার শিল্পসাধনা, তাদের চারু কারুর ঐশ্বর্য ও কারিগরি বিদ্যানু-শীলনের কথা বলি। সমগ্র রুশ দেশের বিভিন্ন প্রদেশে অসংখ্য শিল্প প্রদর্শনী, কলা বিদ্যালয়, সংগীত ভবন, নৃত্যশালা, নাট্যশালা, অর্কেস্ট্রা ও কনসার্ট প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র শিক্ষালয়, সিনেমা, পুতুলনাচ, ও বারোমাস স্থায়ী পাকা প্রেক্ষাগারে নিত্য সার্কাসের আয়োজন রয়েছে। প্রতি বৎসর এখানকার প্রত্যেক প্রদেশে দশদিন ধরে একটি সাংস্কৃতিক উৎসব হয়। পূর্বেই বলেছি সোবিয়েৎ যুক্তরাজ্য ষোলটি ভিন্ন ভিন্ন স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশে বিভক্ত। এগুলির নাম যথাক্রমে রাশিয়ান ফেডারেশন, য়ুক্রেন, বেলো-রুশিয়া, লিথুয়ানিয়া, মোলদাভিয়া, ল্যাৎভিয়া, এস্তোনিয়া, কারলোফিনিশ। এই আটটি সোভিয়েট রাশিয়ার য়ুরোপীয় প্রজাতন্ত্র। বাকি আটটি হল এশিয়াটিক রিপাবলিক। যথা, কির্ঘিজিয়া, জর্জিয়া, আজারবৈজান, আর্মেনিয়া, তুর্কোমেনিয়া, কাজাক্-ই-স্তান, উজ্বেগ্-ই-স্তান ও তাজিক্-ই-স্তান। এই সকল প্রদেশের প্রত্যেকটিতে দৈনিক আমোদ প্রমোদের নিয়মিত ব্যবস্থা ত আছেই, এ ছাড়া এই রুশ প্রজাতন্ত্রগুলির দেশজ ললিতকলারও প্রতি বৎসর দশদিন ধরে বার্ষিক উৎসব হয়। এটা যেন সোবিয়েৎ সংস্কৃতি উৎসবের একটা ঐতিহ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিভিন্ন প্রদেশের সুরশিল্পী, নৃত্যশিল্পী, বাদক ও অভিনেতৃবৃন্দের পরস্পর আদান-প্রদানও ঘটে এই উৎসব উপলক্ষে। আর যাঁরা যে প্রদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ সুরশিল্পী, যন্ত্রসংগীতবিদ্ ও নৃত্যকলাকুশলী তাঁরা তো এই স্থানীয় উৎসবে এসে যোগ দেনই। প্রখ্যাতনামা অভিনেতা অভিনেত্রীর বিবিধ নাট্যাভিনয়ের আয়োজন করেন। তার মধ্যে গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্যই সমধিক জন-প্রিয়। চেখফ্, গোগোল, চাইকভ্স্কি প্রভৃতি বিখ্যাত রুশ নাট্যকার ছাড়াও তাদের রঙ্গমঞ্চে নিয়মিত সেক্সপীয়র, মোলিয়ার, ইবসেন, গলস্ওয়ার্দি, বার্নাড শ' প্রভৃতি বিশ্ববিশ্রুত নাট্যকারদের প্রসিদ্ধ নাটকগুলিরও অভিনয় হয়। লক্ষ লক্ষ দর্শক ভিড় করে এই সব অভিনয় দেখতে আসেন। আমরা সোভিয়েৎ

"দি ভাও" নাটকের প্রধানা চরিত্র 'পেত্রোভা'র ভূমিকায় প্রতিভাময়ী সোবিয়েৎ অভিনেত্রী শ্রীমতী জিয়ার্ৎসিনতোভা

পুতুল নাচের একটি পুতুল

দেশে যতদিন ছিলুম প্রতি রাত্রেই হয় অপেরা, নয় ব্যালে নাচ, নয় নাট্যাভিনয় অথবা সিনেমা, সার্কাস ও পুতুলনাচ দেখতুম।

বিবিধ চারুশিল্পকলা, গীতবাদ্য, নাট্যাভিনয় এসব বিষয়ে শিশুকাল থেকেই সোভিয়েৎ রাশিয়ার ছেলেমেয়েদের তালিম দেওয়া হয়। স্কুলে লেখাপড়া শেখার সংগে সংগে তারা এই সব ললিতকলা শেখবার সুযোগ পায়। মস্কো শহরে এর বিরাট আয়োজন দেখেছি। পিয়ানো, তারের যন্ত্র, অর্কেস্ট্রা, একক সঙ্গীত, 'কোরাস্' বা সমবেত কণ্ঠসঙ্গীত এবং নৃত্যকলা ও অভিনয়ে তারা শিক্ষার গুণে সুদক্ষ হয়ে ওঠে। 'মস্কো কনজারভেওয়ার' বা সঙ্গীত বিদ্যালয়ে অসংখ্য ছাত্রছাত্রী এই ললিতকলায় অভিজ্ঞ হয়ে উঠছে। প্রত্যেক স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষার পর ছাত্র-ছাত্রীদের সাংবৎসরিক মিলনোৎসব হয়। এই উপলক্ষে তারা সঙ্গীত, নৃত্য, অভিনয় ও কনসার্টের আয়োজন করে। সমবেত কণ্ঠে অগণিত ছাত্রছাত্রী যখন তাদের জাতীয় সঙ্গীত আরম্ভ করে সমস্ত দর্শকবৃন্দ দাঁড়িয়ে উঠে তাঁদের সংগে কণ্ঠ মিলিয়ে জাতীয় সঙ্গীতে যোগ দেয়। আমাদের দেশে কোনও উৎসব অনুষ্ঠানে যখন জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হয় তখন দেখি একমাত্র যিনি বা যাঁরা গায় তাঁরাই গান করেন আর আমরা দাঁড়িয়ে উঠে মূকের মতো নির্বাক হয়ে তাই শুনি। তাদের সঙ্গে কণ্ঠ মেলাতে পারিনি। কারণ, সে শিক্ষা আমাদের নেই। আমাদের দেশেও প্রত্যেক স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের অন্তত জাতীয় সঙ্গীতটি সমবেত কণ্ঠে সকলকে গাইতে শেখানো অত্যাবশ্যক বলে মনে করি। সপ্তাহে দু' একদিনও যদি প্রত্যেক স্কুলের ছেলেমেয়েদের ভারতের জাতীয় সংগীত গাইতে শেখানো হয়, তাহলে অদূর ভবিষ্যতে হয়ত আমরা এই অক্ষমতার লজ্জা থেকে পরিত্রাণ পেতে পারি। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারী শিক্ষা বিভাগ এ বিষয়ে একটু মনোযোগী হলেই সহজে এটা সম্ভব হতে পারে।

লোকসংগীত ও লোকনৃত্যের সংগে সোবিয়েৎ দেশের প্রত্যেকটি মেলায় পুতুলনাচের আয়োজন হয়। মস্কোর 'পাপেট্ ডান্স' এ বিষয়ে অগ্রণী। ছেলে-বুড়ো সবাই এটা খুব উপভোগ করে। পুতুলনাচের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে এখানে। পুতুলনাচের সাহায্যে এখানে 'ডন কুইকজোট' 'আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপ' প্রভৃতির সংগে বহু শিক্ষামূলক কাহিনীও রূপায়িত করা হয়। জীব-জন্তুদের ভূমিকাও পুতুলনাচের একটি বিশেষ অংশ জুড়ে থাকে।

এদেশের 'কালচারাল পার্ক'গুলি সোবিয়েৎ রাশিয়ার একটি বিশেষ সম্পদ বলা চলে। দীর্ঘিকা, সরোবার ও ফোয়ারা সংযুক্ত, ফলফুলের তরুলতায় শ্যামশ্রীমণ্ডিত ও ভাস্কর্যকলার শ্রেষ্ঠ পরিচয়বাহী অসংখ্য শ্বেতমর্মর মূর্তি শোভিত এই পার্কগুলির মধ্যে আছে অভিনয় মঞ্চ, সিনেমা গৃহ, কনসার্ট হল, বক্তৃতামঞ্চ, বনভোজনের মণ্ডপ, নৌকা বাচ খেলা ও সাঁতার কাটার ব্যবস্থা প্রভৃতি অবসর-বিনোদন ও শিক্ষার একত্র সমাবেশ। মস্কোর গর্কি পার্কের ব্যবস্থা দেখে আমরা মুগ্ধ না হয়ে পারিনি।

সোবিয়েৎ দেশে সাহিত্যিকের বিপুল সমাদর দেখলে সহজেই এদের অসাধারণ সাহিত্য-প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। এদেশের সাহিত্যিক ও শিল্পীরা কেউ দুঃস্থ নন। আপন আপন প্রতিভার প্রভাবে তাঁরা রাষ্ট্রের সম্মানিত ব্যক্তিরূপে গণ্য হয়ে ওঠবার সুযোগ পেয়েছেন। রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যাপারেও তাঁরা কেউ কেউ স্থান পেয়েছেন। আমরা লেনিনগ্রাদ ও মস্কোর "সোভিয়েট রাইটার্স য়ুনিয়ন" বা লেখক সঙ্ঘের সঙ্গে মিলিত হবার সুযোগ পেয়েছিলুম। এদেশে সংবাদপত্রগুলি যেমন সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রের অধীন, তেমনি পুস্তক মুদ্রণ ও প্রকাশ সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রের অধীন। বাক

হিসাবে সংবাদপত্রের মালিক হয়ে যেমন কারো ধনকুবের হয়ে ওঠবার সুযোগ নেই, তেমনি প্রকাশকের ব্যবসা ফেঁদে লেখকদের বঞ্চিত করে কারো গাড়ি-বাড়ি করবার উপায় নেই। লেখক ও সাংবাদিকরা সেখানে পুঁজিপতি মালিকদের শোষণ থেকে মুক্তি পেয়েছেন। তাঁরা ভাল খান, ভাল পোশাক পরেন, ভাল বাড়িতে থাকেন। মোটরগাড়িও আছে। তবে একথা ঠিক যে, লেখকদের সেখানে যা খুশি লেখবার স্বাধীনতা নেই। রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে সরাসরি কোন চাপ না থাকলেও 'সোভিয়েট রাইটার্স য়ুনিয়ন' কতকগুলি নিয়ম-শৃঙ্খলা বিধিবদ্ধ করেছেন, যেগুলি প্রত্যেক লেখককেই মেনে চলতে হবে। যদি কেউ না মানেন, তবে তিনি লেখক-গোষ্ঠী থেকে বিতাড়িত হবেন। সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রের সম্পাদকেরাও এই লেখক সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত। যদি কেউ তাঁর স্বদেশ ও স্বজাতির কল্যাণের পরিপন্থী কিছু লেখেন, তবে সে লেখা তাঁর কোনওদিনই সোবিয়েৎ রাশিয়ায় কোনও পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হবার উপায় নেই, কারণ সংবাদপত্র ও পুস্তক প্রকাশের অধিকার সেখানে রাষ্ট্রের হাতে। কেবলমাত্র যে রচনা সোবিয়েৎ আদর্শের অনুকূল, যা দেশের ও জাতির চরিত্র গঠনে ও সামাজিক মঙ্গল সাধনের সহায়ক, যার মধ্যে বাস্তব জীবনের সত্য চিত্র রূপায়িত হয়ে উঠেছে, কারখানার শ্রমিক ও ক্ষেতের চাষীর গৌরবময় ভূমিকা যে সকল গ্রন্থে উজ্জ্বল বর্ণে বর্ণনা করা হয়েছে, সমাজতান্ত্রিকতার জয়গান যে পুস্তকের মধ্যে কলাসম্মতভাবে অন্তর্নিবিষ্ট করে দেওয়া সম্ভব হয়েছে, সেই সকল রচনাই সাগ্রহে সেখানে প্রকাশিত হয়। অনবধানতাবশত লেখকদের রচনার মধ্যে যদি কোনও ত্রুটিবিচ্যুতি ধরা পড়ে, তবে 'সোভিয়েট রাইটার্স য়ুনিয়ন' সেই লেখকের কৈফিয়ৎ তলব করেন। তিনি যদি দোষ স্বীকার করে দুঃখপ্রকাশ করেন এবং ক্ষমা চান, তাহলে তাঁকে রেহাই দেওয়া হয় বটে, কিন্তু তাঁর রচনাটি বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়।

প্রাক্-বিপ্লব যুগের রুশ সাহিত্যের সঙ্গে তাই বিপ্লবোত্তর রুশ সাহিত্যের বিপুল পার্থক্য চোখে পড়ে। টলস্টয়, টুর্গেনিফ, ডস্টয়ভস্কী, পুশ্‌কিন, গোগল, এমন কি বিপ্লব-গুরু ম্যাক্সিম গর্কীর রচনার মধ্যেও একটা বিশ্বজনীন আবেদনের সন্ধান মেলে, কিন্তু গত পঁচিশ বৎসরের রুশ সাহিত্য আর বিশ্ব-সাহিত্য হয়ে উঠতে পারেনি। তা সোবিয়েৎ জীবনের সাময়িক গণ্ডীর মধ্যেই সমাজতান্ত্রিকতার প্রচার-প্রাচীরের আবেষ্টনে সীমাবদ্ধ রয়েছে। যদিও কয়েকজন বিপ্লবোত্তর যুগের অসাধারণ প্রতিভাবান সাহিত্যিক, যেমন 'রেনবো' ও 'জাস্টলাভ্' রচয়িত্রী বান্দা ব্যাসিলিউস্কা, 'নো অর্ডিনারী সামার, ও আর্লিলাভ্' রচয়িতা কনস্তান্তিন ফেদিন, শক্তিশালী লেখক 'দি ফল অফ প্যারিস', 'দি নাইনথ্ ওয়েভ' প্রভৃতি যুগ সাহিত্যস্রষ্টা এলিয়া এরেনবুর্গ, 'কোয়ায়েট ফ্লোজ দি ডনের' বিখ্যাত লেখক মিখাইল শলোকভ্, সোবিয়েতের অসামান্য কবি-ভ্যাদিমির মায়াকোভস্কী এবং সুরেকভ্, তরুণ প্রহরীর ঔপন্যাসিক আলেকজান্দার ফাদায়েভ্, এঁদের একাধিক রচনা পৃথিবীর কয়েকটি শ্রেষ্ঠ ভাষায় অনূদিত হয়েছে বটে, কিন্তু এর সবগুলির মধ্যেই যুদ্ধের মর্মন্তুদ দৃশ্য, রাজপুরুষ, নির্মম সৈনিক ও সামাজিক নরপশুদের অত্যাচার, অনাচার, উৎপীড়ন, দেশপ্রেমিকদের অদ্ভুত আত্মত্যাগ, আদর্শ রক্ষার জন্য নরনারীর কঠোর মৃত্যুপণ প্রভৃতি যুদ্ধকালীন ভয়াবহ অবস্থা ও জীবনের বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতে রচিত মানব-ইতিহাসের অকপট চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। দেশাত্মবোধের দিক থেকে এবং মানুষের মনকে যুদ্ধবিরোধী ও শান্তির অনুরাগী করে তোলার দিক থেকে এর প্রচার-মূল্য যতটা, সাহিত্যিক-মূল্যও যে ঠিক ততটাই, একথা জোর করে বলা না গেলেও স্বীকার করতেই হবে যে, এই নূতন রুশ-সাহিত্য সোবিয়েৎ জনগণের জঙ্গীজীবন, পারিবারিক জীবন ও সামাজিক বিপ্লবাত্মক সংগ্রামের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সূচনা থেকে তার ক্রমবিকাশ ও অগ্রগতির কয়েকটি বিশেষ অধ্যায় এ যুগের রুশ সাহিত্যের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে।

এইবার একটি গ্রন্থাগারের পরিচয় দিয়ে সোবিয়েৎ সংস্কৃতি প্রসঙ্গ শেষ করবো। সোবিয়েৎ দেশ সম্বন্ধে অনেক কিছুই বলবার আছে, যা আমরা জানি না; কিন্তু স্থানাভাবে তা বলা সম্ভব নয় এ প্রবন্ধে। সোবিয়েৎ দেশে গেলে আজ এমন একজন লোকও খুঁজে পাওয়া যাবে না, যে লেখাপড়া শেখেনি; যার জ্ঞানের সম্যক বিকাশ ও উন্নতি হয়নি, অথবা যে সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসেনি। গ্রন্থ আজ সেদেশে জীবনের এক অত্যাবশ্যকীয়

বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুনে বিস্মিত হতে হয় যে, দুশো কোটি লোকের বাস যে দেশে, সেখানে বছরে আশী কোটি শুধু বইই বিক্রী হয়। বর্তমানে সারা সোবিয়েৎ দেশে লাইব্রেরীর সংখ্যা তিন লক্ষ সত্তর হাজার ছাড়িয়ে গেছে। প্রত্যেকটি শহর ছাড়া প্রতি সুদূর পল্লী ও গণ্ডগ্রামে, উত্তরের মেরু অঞ্চলে, দক্ষিণের পার্বত্য বসতিগুলিতে, এমন কি সৈনিকদের চলন্ত শিবির ও রাখালদের অস্থায়ী পটমণ্ডপেও গ্রন্থাগার রয়েছে দেখতে পাওয়া যাবে।

যে গ্রন্থাগারটির কথা বলচি, সেটি শুধু সোবিয়েৎ দেশের মধ্যেই নয়, পৃথিবীর মধ্যেও বৃহত্তম গ্রন্থাগার। মস্কোর লেনিন লাইব্রেরীর বিরাট প্রাসাদে প্রবেশ করে দিশাহারা হয়ে পড়তে হয়। পাঁচখানি নূতন বাড়ি নির্মাণ করতে হয়েছে এই গ্রন্থশালার সম্পদ রক্ষার জন্য। এখানকার প্রত্যেকটি তলার বইয়ের শেল্‌ফগুলি নামিয়ে পাশাপাশি সাজালে প্রায় একশ তিরিশ মাইল লম্বা হবে। পুস্তক সংখ্যা উপস্থিত দেড় কোটি। বহু পাণ্ডুলিপি, দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন গ্রন্থ ও দুর্লভ বিশ্ব-সাহিত্যও সংগৃহীত রয়েছে এখানে। আমি এখানে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, মাইকেল মধুসূদন, দীনবন্ধু মিত্র, এমন কি বাঙলার প্রগতি সাহিত্যের ধুরন্ধর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বইগুলিও দেখেছি। এক কথায়, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় এ পর্যন্ত যা কিছু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে পৃথিবীতে, তার প্রত্যেকটি এখানে পাওয়া যাবে। কিন্তু গ্রন্থাগারের পরিচয় তো কেবলমাত্র কতগুলি প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য পুরাতন সংস্করণের পুস্তক ও পাণ্ডু-লিপি সংগ্রহের সংখ্যাধিক্যের দ্বারা প্রকাশ পায় না, লাইব্রেরীর সার্থকতা বোঝা যায় কত লোক সে গ্রন্থাগারটি প্রতিদিন ব্যবহার করে তাই থেকে। কি পরিমাণ পুস্তকের সেখানে নিত্য আদান-প্রদান চলছে তাই থেকে।

লেনিন লাইব্রেরীর বিশাল পাঠকক্ষে পড়তে আসেন অসংখ্য ছাত্রছাত্রী, বহু কলা-শিল্পী, কত জ্ঞানপিপাসু অনুসন্ধিৎসুপরায়ণ সাধারণ লোক। কত বিশেষজ্ঞেরা আসেন তাঁদের সমস্যা

ভঞ্জনের জন্য। শুনে আশ্চর্য হতে হয় যে, প্রতিদিন লক্ষাধিক পাঠকের মনের খোরাক যোগায় এই পাঠাগার। প্রতি বছর আঠারো থেকে কুড়ি লক্ষ লোককে বই যোগানো হয় এই পাঠাগার থেকে এবং বইয়ের লেনদেন হয় প্রায় নব্বুই লক্ষের উপর। বই একখানি চাইবার পনেরো কুড়ি মিনিটের মধ্যে সেখানি এসে হাজির হবে। ইলেক্‌ট্রিক ইঞ্জিন, লিফ্‌ট ও নানা যন্ত্রচালিত 'কণ্ডক্টর' ও 'কনভেয়ার বেল্টের' সাহায্যে বইখানি শেলফ থেকে পাঠকক্ষে এসে আপনিই হাজির হচ্ছে! সমস্ত দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ আজ এঁরা জনসাধারণের কাছে সহজলভ্য করেছেন ফটো-ফিল্‌মের সাহায্যে তার নকল তুলে। শুধু এখানেই শেষ নয়, মূল্যবান বই ছাপার উপযুক্ত কাগজ কি, মলাটের স্থায়িত্ব কিসে হয়, বইয়ে ড্যাম্প লাগবে না, পোকা ধরবে না, শুকিয়ে জীর্ণ হবে না—এসব বিষয়ে অনুশীলন ও গবেষণা এখানে চলে। বইয়ের স্বাস্থ্যরক্ষা ও জরাগ্রস্ত বইয়ের চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়। কি রকম আবহাওয়ার মধ্যে বই রাখলে ভাল থাকে, বৈজ্ঞানিক উপায়ে লাইব্রেরীর মধ্যে সেই কৃত্রিম আবহাওয়া সৃষ্টি করা হয়।

বিশ্বের সবগুলি প্রাচীন ও আধুনিক শ্রেষ্ঠ ক্ল্যাসিকের রুশ ভাষায় অনুবাদ করে এঁরা সভ্যজগতে এক অদ্ভুত কীর্তি স্থাপন করেছেন। ভারতবর্ষের বাল্মিকী রামায়ণ, তুলসীদাসের রামায়ণ, বেদব্যাসের মহাভারত, মহাকবি কালিদাসের গ্রন্থাবলী থেকে রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলী, প্রেমচাঁদ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ হিন্দী লেখকদের রচনাবলী তাঁরা রুশভাষায় অনুবাদ করে আমাদের বিস্ময় ও শ্রদ্ধা উদ্রেক করেছেন। সোবিয়েৎ দেশের ছেলেমেয়েরা অনেকেই বাঙলা, সংস্কৃত, হিন্দি, উর্দু অতি পরিষ্কার বলতে পারেন।

উপসংহারে আর একটি কথা বলা দরকার বলে মনে করি। বিশেষ ক'রে আমাদের দেশের জ্ঞানী ও মনীষীরা অনেকেই ভারতীয় সংস্কৃতিকে জাতির আস্তিক্যবুদ্ধি ও ধর্মাচরণের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলে এমনভাবে সংস্কারের ভূতকে সংস্কৃতির ঘাড়ে চাপিয়ে বসে আছেন যে, তার বেড়াজাল থেকে

মস্কোয় 'গর্কী কাল্‌চারাল্‌ পার্ক'

সংস্কৃতিকে উদ্ধার করা এক দুরূহ ব্যাপার! কিন্তু সোবিয়েৎ সংস্কৃতি সম্পূর্ণভাবে ধর্মনিরপেক্ষ। কারণ সেদেশে ভারতবর্ষের মতই বহুভাষী ও বহু বিভিন্ন জাতীয় মানুষের বসবাস। তাদের ধর্মবিশ্বাসও ভিন্ন ভিন্ন। কাজেই রাষ্ট্র কোনও ধর্ম মানে না বটে, কিন্তু সোবিয়েৎ যুক্তরাষ্ট্রের সকল অধিবাসীকেই তাঁরা স্ব স্ব ধর্মাচরণের স্বাধীনতা দিয়েছেন। সেখানে আর কোনও স্কুলে এখন জোর করে বাইবেল পড়ানো বা ভগবানের স্তবগান করানো হয় না। ওটা বিদ্যালয়ের বাইরে বিভিন্ন ধর্মপ্রতিষ্ঠান-গুলির কাজ। তাদেরই হাতে তাদের নিজ নিজ ধর্মমত ও ধর্মবিশ্বাস প্রচারের অবাধ সুযোগ দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন ধর্মের গুরু, পুরোহিত, মোহন্ত ও যাজকেরা তাঁদের স্ব স্ব গির্জা, মসজিদ্‌, মঠ ও বৌদ্ধমন্দির প্রভৃতি ধর্মাচরণের বিশেষ বিশেষ স্থানে উপাসনা, প্রার্থনা বা ধর্মোপদেশ মারফৎ তাঁদের ধর্মবিশ্বাসের মূল নীতিগুলি প্রচার করতে পারেন। শুনে আশ্চর্য হবেন যে, সোবিয়েৎ য়ুনিয়নের মধ্যে এখনও বিশ হাজারের উপর রুশ অর্থোডক্স খৃষ্টান চার্চ আছে। এর পরই সেখানে ইসলাম ধর্মের প্রভাব। অসংখ্য মসজিদ রুশের এশিয়াটিক রিপাবলিকগুলির চতুর্দিকে তাদের মিনার খাড়া করে রয়েছে দেখতে পাবেন। জুম্মাবারে হাজারে হাজারে ধর্মপ্রাণ মুসলমান সেখানে নমাজ করতে আসেন। অবশ্য একথাও মনে রাখতে হবে যে, সোবিয়েৎ রাষ্ট্রের সঙ্গে কোনও ধর্মেরই সেখানে যোগাযোগ নেই। কিন্তু বহু মঠ, আশ্রম, গির্জা, মন্দির ও মসজিদকে সোবিয়েৎ রাষ্ট্র জমি দিয়ে ও অর্থসাহায্য দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছেন। ধর্ম সম্বন্ধে তাঁদের এই গোঁড়ামিবর্জিত উদারতা যথার্থই প্রশংসনীয়। সোবিয়েৎ সংস্কৃতির একটি প্রধান গুণ বলা চলে একে। *

---

* এই প্রবন্ধে ব্যবহৃত চিত্রগুলি লেখকের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

মনে এলো

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

৯।৯।৫৫

আজ সকালে বাঙলাদেশের বৃষ্টি শুখো আলিগড়ে নামল। অমনি বিজলী বন্ধ। সরকারী হাইড্রো-ইলেকট্রিক থেকে আমরা বিজলী ধার নিই, অথচ কথায় কথায় বন্ধ হলে আপত্তি জানাই না বা জানাতে চাই না। গোঁজ গোঁজ করেই ক্ষান্ত হই। একেই হয়ত পণ্ডিতজী ছাত্রদের আত্ম-সংযম বলবেন! ভারতবর্ষের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তিনি ছিলেন না, তাই হয়ত ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারেন না।

শিক্ষার জন্য বিলেত যাওয়ার আমি বিপক্ষে, বিশেষত শৈশবাবস্থায় এবং পাবলিক স্কুলে। গত বৎসর য়ুরোপ যাবার পথে প্রায় ডজন পনের দেশী বালক-বালিকা আমার সহযাত্রী ছিল। ক্লিফটন স্যার, হ্যারো স্যার, ঈটন্ স্যার, শ্রুজ্-বেরী স্যার, উনচেস্টার স্যার, (একটি মেয়ে) চেলটেনহ্যাম স্যার.........এই শুনলাম। গুজব অথচ দেশ স্বাধীন হয়েছে। এঁদের জননীরা বোধ হয় বিদেশিনী, তাই বোধ হয় জানেন না যে, জগদীশ বসু, প্রফুল্ল রায় থেকে রমন, মেঘনাদা সাহা, জ্ঞান ঘোষ, বীরবল সাহানি, প্রশান্ত মহলানবীশ, ভাটনগর প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকের দেশী ডিগ্রীর ওপরই বিদেশী ডিগ্রী। সত্যেন বোসের আবার বিদেশী ডিগ্রীই নেই। একমাত্র ভাবা-ই খাঁটি বিদেশী শিক্ষাগ্রস্ত। সুরেন দাশ-গুপ্ত মশায় যখন কেম্ব্রিজের ডক্টরেট পেলেন, তখন আমরা লজ্জিত হই। রাধাকৃষ্ণনের ওপর বিদেশী ডিগ্রীর বর্ষণ হয়। সমরফেল্ট সাহেব একবার একজন ভারতীয় ছাত্রকে বলেছিলেন, "ভোঁস—অর্থাৎ সত্যেন বোস থাকতে এই বিষয় শেখবার জন্য জার্মানিতে আসার অর্থ হয় না। এবার শুনে এলাম ডেরেকসন ঈডেনবার্গ টিনবার্গেন প্রভৃতির কাছে, সংখ্যাতত্ত্ব শেখবার জন্য কোন ভারতবাসীর বিদেশে যাবার প্রয়োজন নেই। কিন্তু মা-লক্ষ্মীরা কিছুতেই বুঝবেন না! বিলেত না হলে দুন-স্কুল। সেখানেও পাঁচ বৎসরের ধন্নার পর ঢুকতে পায়।

* * *

দর্শনশাস্ত্রের দুটি পদ্ধতি প্রচলিত; (১) ডায়লগ,—কথোপকথন, আর (২) ডায়েলেকটিক। ডায়লগ বিভিন্ন মনোভাব ও পরিশীলনের প্রতি শ্রদ্ধা, আর ডায়েলেকটিকে মতবাদের পার্থক্য উত্তীর্ণ হয়ে নৈর্ব্যক্তিক সত্যের সন্ধান। শ্রদ্ধার পর সত্যের সন্ধান না-ও মিলতে পারে; এবং উত্তীর্ণ হওয়ার পথে অশ্রদ্ধা আসাও স্বাভাবিক।

উপনিষদ, প্লেটো থেকে গুরু-শিষ্য সংবাদ সব কথোপকথন। সুফী, সাধু-সন্ত, যোগী-ঋষিদের এই আঙ্গিক। হেরাক্লিটাস, হেগেল, মার্ক্স থেকে বর্তমান বৈজ্ঞানিক পন্থা সব ডায়েলেকটিক। বিশ্বজনীন নিরালম্ব সত্যের নিষ্ঠা নিষ্ঠুর। কথোপকথন তুমি তুমি রইলে, আমি আমি রইলাম। ভদ্রজনোপযুক্ত।

* * *

আজ সন্ধ্যায় পুরোনো কথা মনে এলো। হিন্দুস্থান ইন্সিওরেন্সের বাড়িতে (সমবায় ম্যানশনসে) ছবির প্রদর্শনী খোলা হবে। তার প্রী-ভিয়ুএর নিমন্ত্রণ পেয়েছিলাম। ইন্দিরা দেবী আমাকে নিয়ে গেলেন। অবনীবাবু, গগনবাবু ও সমরবাবু আলখাল্লা পরে ঘুরছেন। হল-এ দুজন দীর্ঘাকৃতি ইংরেজ, উড্রফ আর কেস্‌টেভেন। অসিত হালদার, নন্দলাল বসু, সুরেন কর ছিলেন। অসিত হালদারের অপ্সরা ও দুর্গাশঙ্করের পলাশ ফুল, চৈতন্যদেবের মহাপ্রভু, নন্দলালবাবুর শিব, আর বোধ হয় তায়কান ও আরেকটি জাপানীর ছবি মনে ভেসে উঠল। একপাশে গগনবাবুর খানকয়েক ল্যান্ডস্কেপ ছিল। তখন তিনি কিউবিজ্‌ম নিয়ে পরীক্ষা করছিলেন। নতুন ঢঙ বলে সেগুলিকে অন্যত্র রাখা হলো। এখন মনে হচ্ছে, তখন হয়নি। কিউবিজ্‌মএর ঋজুতা আর স্থিতি-স্থাপকতার সঙ্গে 'সেন্‌স অব্ মিস্টরি' খাপ খায় না। তখন সিঁড়ির মোড়ে কালো ঘোমটা অদ্ভুত লেগেছিল। অসিত হালদারের রেখা কাঁপে, নাচে, এলিয়ে পড়ে; আবার তীরের মতন ছোটে। খাড়া দাঁড়ায় কি মনে পড়ছে না। অসিতের আসলে কবি-মন। গাঙ্গুলী মশাই পাশে এসে দাঁড়ালেন। অসিত হালদারের ছবি লিরিক্যাল বল্লেন। কাজিন্‌স সাহেবও তাই লিখেছিলেন। প্রকাণ্ড হলটা বিদ্যুৎভরা। অত উত্তেজনা, অত চঞ্চলতা আর ফেরৎ পাব না। যৌবনের জন্য? বাঙলাদেশই ছিল বিদ্যুৎভরা।

(কলেজ স্ট্রীট আর হ্যারিসন রোডের মোড়ের মাথায় শিশির ভাদুড়ী বড়, না নরেশ মিত্র বড়—এই নিয়ে দু'দলের বচসা এক রাত্রে ঘুষোঘুষিতে পরিণত হলো। আরো আগে অমর দত্ত-দানিবাবু নিয়ে ছাতা চলত।)

পরের দিন প্রদর্শনী খোলা হলো। গগনবাবু বল্লেন, দর্শকদের নিয়ে ঘোরাতে, যৎসামান্য বুঝিয়ে দিতে। কোণে একটা নক্ষত্রপাতের ছবি ছিল—একজন সাহেব পা বেঁকিয়ে খুব মনোযোগের সঙ্গে দেখছিলেন। আলোর মধ্যে একটা মূর্তি ছিল—গূঢ়ার্থ বুঝতে পারিনি, বোঝাতেও পারলাম না। ভদ্রলোকের গোঁফটা উঁচুতে তোলা। ভঙ্গীটাই দুষ্টুমি মাখানো—'রেকিশ'। বোধ হয়, প্রমোদকুমারের ছবির সামনে এসে কথাবার্তা হলো। সাহেবের সাথে ইন্দিরা দেবীকে কে একজন পরিচয় করিয়ে দিলেন। ইন্দিরা দেবী হাঁটু ভেঙে 'কার্টসি' করলেন। তখন বুঝলাম রোন্যাল্ডসে। ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিল। পরে তাঁর বই পড়ি। একজন ফরাসী ভদ্রলোকের সঙ্গে ইন্দিরা দেবী ফরাসী ভাষায় কথা কইলেন। সমরবাবু আমাকে অন্যধারে নিয়ে গেলেন। আজকাল ক'জন সমরবাবুর নাম জানেন! অথচ চিত্র সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান ছিল গভীর। অত্যন্ত লাজুক প্রকৃতি—দুই ভাই ও রবিকাকার আবডালে নিজেকে লুকিয়ে রাখতেন। সমরবাবু ও গগনবাবুর মতন ভদ্র ও বিদগ্ধ জন দেখিনি। সেই গগনবাবুর জিব্ আড়ষ্ট হয়ে গেল। 'বিচিত্রা'র এক আসর থেকে আসছি, হঠাৎ পাঞ্জাবী ধরে কে টানল, ফিরে দেখি গগনবাবু। কি বললেন এক বর্ণও বুঝলাম না। মস্ত মানুষ ছিলেন। মনে হলে চোখে জল আসে।

১০।৯।৫৫

পড়বার সময় 'অবজেকটিভিটি' কথাটা দু'তিনবার প্রয়োগ করলাম। ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট পড়াচ্ছিলাম। এটা নূতন বিষয়। পূর্বে নাম ছিল ইকনমিক হিস্ট্রি, এখন নতুন নাম দেওয়া হলো কেন বোঝাচ্ছিলাম। সেই প্রসঙ্গে হিস্ট্রির কথা উঠল। র‍্যাঙ্কে বলতেন, ইতিহাসের একমাত্র আগ্রহ ও বিষয় তথ্য এবং তার পদ্ধতি "অবজেক্টিভ," বৈজ্ঞানিক। গ্রোথ্-এর আলোচনা পদ্ধতি একটু পৃথক; সেটা বুঝতে হলে নানাপ্রকার মডেল তৈরী করলে সুবিধা হয়। ডেভেলপমেণ্ট আরেকটু ভিন্ন। এর মধ্যেকার ইতিহাস প্রগতিশীল; এবং প্রগতিবাদের অন্তরালে উন্নতি-অবনতির সংজ্ঞা প্রচ্ছন্ন থাকে। অথচ উন্নতি-অবনতি র‍্যাঙ্কের মতানুযায়ী তথ্য নয়। যদি তাই হয়, তবে অব্জেক্টিভিটির মধ্যে মূল্যের স্থান আছে। ভ্যালুস আর ফ্যাক্টস, বাট অল ফ্যাক্টস আর নট ভ্যালুস। মার্কস ধনিকতন্ত্রকে ভ্যালু-ফ্যাক্ট হিসেবে দেখেছেন। ড্রয়সেন বলতেন, র‍্যাঙ্কে হ্যাড দি অব্জেক্টিভিটি অব ইউনাক্। সত্যই তাই,—ঐ ধরনের মনোভাব নিয়ে ইকনমিক্ হিস্ট্রি পড়ান যায়, ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট পড়ান অচল।

এই প্রসঙ্গে সোশ্যাল ফোর্সের আলোচনা করলাম। প্রায় বিশ বছর আগে যা লিখেছিলাম, তাতে মন সায় দেয় না। 'ফোর্স' কথাটি এক্ষেত্রে কিভাবে গ্রহণ করা যায় বলবার সময় ছাত্র-ছাত্রীরা নীরব রইল। কিন্তু ছাড়ব না, আরো দু'একদিন বেয়ে-চেয়ে দেখতে হবে। ঘণ্টার পর একটা গল্প শোনালাম।

কলেজে পড়বার সময় আমার কেমিস্ট্রি, ফিজিক্স, অঙ্ক প্রভৃতি ছিল। বি-এ থার্ড ইয়ারে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মশাই পড়াতে এলেন। তিনি আমার পিতার বন্ধু ছিলেন এবং বোধ হয় আমাকে চিনতে পেরেছিলেন। সামান্য দু'একটা কথাবার্তার পর জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা ত কেমিস্ট্রি পড়ে এসেছ, চার্লস ল-টা কি?' গড় গড় করে মুখস্থ বলে গেলাম। আবার প্রশ্ন করলেন, 'এভোগ্যাড্রোর হাইপথেসিসটা কি?' তাও মুখস্থ বল্লাম। 'আচ্ছা, এখন বল দেখি ল' আর হাইপথেসিস্ কাকে বলে, তাদের পার্থক্যটা কি?' সব চুপ। বড় বড় চোখ মেলে বল্লেন, 'অঃ, তোমাদের একটু লজিক পড়াতে হবে, পরে যন্ত্রপাতি নিয়ে কারবারের সুবিধে হবে।' সেই আরম্ভ হলো কার্ল পিয়ার্সন-এর গ্রামার অব্ সায়েন্স আর হাঁরি পোয়াঁকারের সায়েন্স এণ্ড মেথড্। তিন মাস পুরো তাই পড়ালেন। এই গল্পটি শোনবার পর ছেলেরা হাসলে। বল্লাম, 'ভয় নেই, সে বিদ্যে আমার নেই।'

* * *

পুরাতন অধ্যাপকদের কথা মনে উঠছে। আমাদের সমবয়সী অনেক অধ্যাপক বিদ্বান, দিগ্‌গজ পণ্ডিত। কিন্তু কোথায় যেন আমাদের কিছুর

অভাব আছে। হয়ত বা নস্টালজিয়া। ঠিক বুঝতে পারছি না। বিদ্যার গভীরতা? ব্রজেন শীলের বক্তৃতা ও তাঁর কথাবার্তা শোনবার অনেক সুবিধা আমার হয়েছিল। একটা ঘটনা লিখে রাখি। আমি তখন বি-এ ক্লাসে পড়ি। দার্জিলিং বেড়াতে গেছি, জুবিলী স্যানিটোরিয়মে একটা ঘর নিয়ে আছি। বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে ইংরেজী নাটক অভিনয়ের মহলা চলছে। সন্ধ্যার পর ডাঃ শিশির পাল ঘরে এসে বল্লেন, 'ধূর্জটি, একটু বিপদে পড়েছি। কাল সকালে ব্রজেনবাবু আসছেন। ঘরের সঙ্কুলান হচ্ছে না। পরশু সকালে তাঁকে ভালো কামরা দিতে পারব। যদি কাল রাত্রের জন্য তুমি তোমার ঘরটা ছেড়ে দাও, বড়ই ভালো হয়।' আমার ঘরের সঙ্গে বসবার একটা ছোট্ট কাঁচের বারান্দা ছিল। 'নিশ্চয়ই, আমি ঐ বারান্দাতেই শোব। সে ত আমার সৌভাগ্য!' ব্রজেনবাবু পরের দিন এলেন। ঠিক এলেন নয়, ঝড়ের মতন ঢুকলেন। শিশিরবাবু ব্যাপারটা ব্রজেনবাবুকে বুঝিয়ে দিলেন। কিছুতেই রাজি হন না, তখন আমি বল্লাম, 'আপনার সঙ্গে এক জায়গায় থাকার গৌরব থেকে আমাকে বঞ্চিত করবেন?'

"আচ্ছা, বেশ, বেশ, তুমি কি পড়?'

'বি-এ পড়ি মাত্র। কিন্তু আপনার একটা বই পড়েছি।'

কলেজ স্ট্রীটের রাস্তার ওপর থেকে চার পয়সায় তাঁর 'নিও-রোমান্টিক মুভমেণ্ট ইন (বেঙ্গলী?) লিটারেচার' (নামটা মনে পড়ছে না) কিনেছিলম্।

উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম আর হ্যাথার্ন-এর আলোচনার পর কীট্‌স সম্বন্ধে সেখানে কিছু বক্তব্য আছে। আমি তখন কীট্‌সের খুব ভক্ত, সব কবিতা ও রচনার সঙ্গে পরিচিত।

তাই সাহস ভরে বল্লাম, 'আপনার কীট্‌স সম্বন্ধে মন্তব্যগুলি আমার খুব ভালো লেগেছে।'

'ও বই কখনো পড়ে! আমি তখন নাবালক ছিলাম। ও-সব ছেলেমানুষী কথা এখন ভুলেই গেছি।'

'আজ্ঞে না, আমাদের কাছে ঐ যথেষ্ট। তবে দু-একটা কথা বুঝতে পারিনি।'

"কোন্‌টা হে?"

"আজ্ঞে, আপনি লিখেছেন, কীট্‌সের সৌন্দর্যতত্ত্ব হেলেনিক। সেটা না হয় বুঝলাম। কিন্তু তার পরে আপনি একটা সন্ধি করেছেন, Indo-Sino-Mazdean philosophy of the East. ও-সব কি?"

সেই শুনে বিরাট এক হাসি। এমন ছাদফাটা হাসি এক অঘোর চট্টোপাধ্যায় (সরোজিনী দেবীর পিতা), আর অশ্বিনী দত্ত ছাড়া আর কারুর কাছে শুনিনি। হাসবার পর ব্রজেনবাবু দাঁড়িতে হাত বোলাতেন।

এতে হাসবার কি পেলেন, না বুঝে বল্লাম, 'আপনি বড় শক্ত শক্ত কথা প্রয়োগ করেন।' আরো হাসি!

'তা বুঝি জানো না—কার্জন সাহেব কি বলেছিলেন, 'You say he is Seal, But he writes like a hippopotamus.' কার্জন সাহেব ইংরেজ, তাই মুখ ফুটে বলেন নি, 'he looks like one too.' হাসি আর থামে না। বল্লাম 'সিনো-টা কি?'

"ওটা চীন।" তারপর আধ ঘণ্টা তান-হান-সুঙ-মিঙ ইত্যাদি কথার ছড়াছড়ি শুরু হল। প্রতি যুগের সৌন্দর্য তত্ত্বের বিচার চলল।

"আজ্ঞে Mazdeanটা কি?" তার ব্যাখ্যাও আধ ঘণ্টা।

'কিন্তু দ্যাখ, ওটাতে আমার ভুল ছিল। ঐ যে হেলেনিক বলেছি সেটার ব্যাখ্যা করলে পারতাম। ওর পেছনে ছিল ক্রীট্, তারও পিছনে ইজিপশ্যান।' হাঁপিয়ে উঠেছিলাম মনে আছে। বহু পরে চৈনিক আর্ট সম্বন্ধে কিছু পড়ি; পরীক্ষার জন্য ঈজিপ্ট সম্বন্ধেও কিছু পড়তে হয়। তখন দেখলাম যে, কত মূল্যবান কথাই না সেদিন ব্রজেনবাবু একজন ১৭।১৮ বছরের যুবককে বলেছিলেন। বলবার কি আগ্রহ! (দিলীপকুমার একবার মহীশূরে ব্রজেনবাবুর অতিথি হন। সেখান থেকে তিনি আমাকে লেখেন, 'ধূর্জটি, ভারতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে জানতে চাও ত' এখনই এখানে এঁর কাছে চলে এস।')

লাফা-যাত্রা

মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়

॥ ৪ ॥

একটা মনিহারীর দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ছবির পোস্টকার্ড কিনছি, হঠাৎ এক ভদ্রলোক এসে দুর্বোধ্য ভাষায় আমাদের সঙ্গে আলাপ শুরু করে দিলেন। সুইডিশ ভাষা আমাদের জানা না থাকলেও যতটুকু জ্ঞান ছিল তাতেই বুঝলুম ভদ্রলোক সুইডিশ ভাষায় কথা বলছেন না। আমরা চুপ করে শুনে যেতে লাগলুম। বুঝলুম তাঁর কথা ক্রমে বক্তৃতার আকার ধারণ করছে। তারপর হঠাৎ তাঁর বক্তৃতা থেমে যায় এবং তিনি বেশ স্পষ্ট ইংরেজীতে বলেন—দেখছি আপনারা 'এস্‌পেরাণ্টো' বোঝেন না। আমি আপনাদের এস্‌পেরাণ্টো ভাষা সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই। কোনদিকে যাচ্ছেন আপনারা?

আমরা বললুম—হ্রদের ধারে বেড়াতে যাচ্ছি।

ভদ্রলোক বললেন—চলুন তবে আমিও যাই। আশা করি কিছু মনে করবেন না। আমার যথেষ্ট সম্পত্তি আছে, কাজেই বুঝছেন তো আমার অবসর প্রচুর। আপনারা এখানে নতুন এসেছেন—আমি মনে করছি য়োনশোপিং জায়গাটা আমিই আপনাদের দেখাবো। ক'দিন থাকবেন এখানে?

—পরশু গ্যোটা খালের স্টীমার এখানে আসছে, তাতে করে স্টকহলম যাবো স্থির করেছি।

—তা বেশ, এর মধ্যেই য়োনশোপিং দেখা আপনাদের হয়ে যাবে। হ্যাঁ, তারপর যা বলছিলুম। এস্‌পেরাণ্টো এক অপূর্ব ভাষা। এই ভাষার চল যেদিন সারা পৃথিবীতে হবে সেদিন মানুষের এক মহা মিলনের দিন। মানুষে মানুষে ঝগড়া, ঈর্ষা, যুদ্ধ, বিগ্রহ সব কিছুর অবসান। ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে যে এত দ্বন্দ্ব তার আসল কারণ নানা জাতির নানা ভাষা এটা মানেন তো?

আমি বললুম—না মেনে আর উপায় কি? বাইবেলেই তো সে গল্প আছে।

—তবেই বলুন, সব মানুষের এক ভাষা হলে কোনো গণ্ডগোলই আর থাকতো না। এই যে আমি এস্‌পেরাণ্টো বললুম অথচ আপনারা বুঝতে পারলেন না এতেই তো আপনারা আমার কাছে পর হয়ে গেলেন। অথচ ভাবুন দেখি, আপনারা কত দূর দেশ থেকে সুইডেনে এলেন, এখানে এসে যদি দেখতেন আপনাদেরই ভাষায় এদেশের লোক কথা বলছে, তাহলে সকলেই আপনাদের আপন হয়ে যেত, কেউ আর পর থাকতো না। তাহলেই দেখা যাচ্ছে, পৃথিবীতে নানা ভাষার বদলে এক ভাষা থাকা দরকার। কোন্ ভাষা তাহলে পৃথিবীর ভাষা হবে? ইংরেজরা বলে ইংরেজী হোক, ফরাসীরা বলে ফরাসী হোক, সবাই নিজেদের ভাষা চাইবে—কিন্তু তা হলে তো আর চলে না। তাই শেষে এই এস্‌পেরাণ্টো ভাষার উৎপত্তি। এতে প্রায় সব ভাষারই কিছু কিছু আছে, ব্যাকরণটাকেও করা হয়েছে সোজা—কাজেই কারুর কিছু বলবার নেই। শুনবেন একটু এস্‌পেরাণ্টো? দেখবেন কেমন সুললিত সহজ ভাষা? মনে হবে যেন একান্ত নিজের। বিশ্বশান্তি বিষয়ে একটি ছোট বক্তৃতা দিই—

এই বলে ভদ্রলোক আবার এস্‌পেরাণ্টোতে বক্তৃতা শুরু করলেন। আমরা চলতে চলতে হ্রদের তীরে এক মনোরম জায়গায় এসে উপস্থিত হলুম। তখন বিশ্বশান্তির বক্তৃতা শেষ হল। ভদ্রলোক তখন হাঁপাচ্ছেন। নিজেই বললেন—আমি এখানে একটু বসি। আপনারা বরং ঘুরে আসুন, যাবার সময় আমায় ডেকে নিয়ে যাবেন।

আমরা পা বাড়াতেই তিনি বললেন—কই আমার বক্তৃতা কেমন লাগল বললেন না তো?

মিরেক বললে—চমৎকার হয়েছে। ফিরে এসে আবার একটা কিছু শুনবো আপনার মুখে।

ভদ্রলোক স্মিত হেসে বললেন—আশা করি আপনারা এস্‌পেরাণ্টো শেখবার জন্যে একটু চেষ্টা করবেন। পৃথিবীর শান্তিকামী লোকেদের অধিকাংশই আজকাল এস্‌পেরাণ্টোর চর্চা করে। আন্তর্জাতিক এস্‌পেরাণ্টো সমিতির সভ্য প্রায় প্রত্যেক শহরে পাবেন। শুধু একবার বলা যে আমি এস্‌পেরাণ্টো জানি, তাহলেই পৃথিবীর যেখানেই যান, চেনা হোক, অচেনা হোক, অন্য সভ্যেরা আপনাদের দু বাহু বাড়িয়ে গ্রহণ করবে।

আমরা নমস্কার করে হ্রদের ধারে যে পথ গেছে তাই ধরে এগিয়ে চললুম হ্রদের টলটলে নীল জলকে ডান পাশে রেখে।

আমি মিরেককে বললুম—মিরেক, এস্‌পেরাণ্টোর বক্তৃতা শুনলে তো? বিশ্বশান্তির বিষয়ে কিছু বুঝলে?

মিরেক বললে—দেখ, বিশ্ব বলতে আমরা ইয়োরোপীয়েরা বুঝি ইয়োরোপকে। আর না হলে বড় জোর আমেরিকা পর্যন্ত। ঐ যে ভদ্রলোক বললেন সব ভাষা থেকে কিছু কিছু নিয়ে এস্‌পেরাণ্টো তৈরী হয়েছে, অথচ বলবার সময় একবারও ভাবলেন না, তুমি একজন ভারতীয় দাঁড়িয়ে আছ। তোমার দেশের মতো অত বড় একটা দেশের ভাষার কোন স্থান এস্‌পেরাণ্টোতে নেই। তবে আর ভারতের সঙ্গে মহামিলন হবে কি করে?

আমি আরো টিপ্পনী কাটলুম—তারপর মহাচীন, তারপর আফ্রিকা মহাদেশ, এরাই বা যায় কোথায়?

মিরেক বললে—হ্যাঁ, ও-সব তো আছেই। বিশ্বশান্তি না কচু। সম্পত্তি আছে, প্রচুর অবসর, তাদেরই পোষায় এস্‌পেরাণ্টো।

গলানো সোনার মতো রোদে আলোয় তখন মাঠঘাট, গাছপালা, আকাশ বাতাস হাসছে—তখন কি আর এস্পেরাণ্টো মাথায় ঢোকে? হ্রদের জলের ছোট ছোট ঢেউ গড়িয়ে গড়িয়ে তীরের উপর এসে পড়ছে যেন ভাঁজ করা কাগজের মতো যার একপিঠ নীল একপিঠ রূপোলী। কয়েকটি নৌকো পাল তুলে ভারি লঘু সুরে জলের উপর ভেসে বেড়াচ্ছে। নৌকোর মানুষগুলিও যেন খুশিতে হালকা হয়ে উঠেছে। তাদের কথাবার্তা, দু-একটা গানের কলি কানে এসে লাগছে। এই হ্রদের উপর দিয়ে স্টীমারে করে পাড়ি জমাতে যে কেমন লাগবে তা মনে করে আমরাও পুলকিত হয়ে উঠলুম। কাজেই হ্রদ ধরে বেশ কয়েক মাইল হাঁটবার পর আমাদের খেয়াল হল কতদূরেই না চলে এসেছি। মনে হল, তাই ত, হ্রদের ধারে বুড়ো লোকটি আমাদের জন্যে হয়তো এখনও বসে রয়েছেন!

তাড়াতাড়ি ফিরলুম। অনেকক্ষণ সময় লাগল অতটা পথ ফিরতে। কিন্তু ফিরে দেখলুম সেই এস্পেরাণ্টো-দক্ষ ভদ্রলোক আমাদের আশা ত্যাগ করে সেখান থেকে চলে গেছেন। কাজেই আমরা ম্যাপ খুলে বালির উপর বসে পড়লুম কাল কোথায় যাওয়া যেতে পারে তাই দেখতে।

ভ্যাটার্ন হ্রদের মধ্যে একটি ছোট্ট দ্বীপ আছে—ভিসিংস্ দ্বীপ। য়োনশোপিং থেকে কাছেই গ্রানা বলে একটি গ্রাম সেই-খান থেকে মনে হল দ্বীপে যাবার কোনো উপায় থাকতে পারে। হোস্টেলে ফেরবার পথে রেলের স্টেশনে গেলুম খবর করতে। রেলের অনুসন্ধান দপ্তরে ভিসিংস্ দ্বীপের রঙিন ছবি সংবলিত পুস্তিকা পেলুম বিনামূল্যে। ভিসিংস্ এক ঐতিহাসিক স্থান। ঐ অঞ্চলের জমিদার বংশ আগেকার দিনে ঐ দ্বীপে তাঁদের প্রাসাদ বানিয়েছিলেন, সেই প্রাসাদ দেখতে অনেক যাত্রী যায়। গ্রানা গ্রাম থেকে নৌকো যায় প্রায়ই—পারাপারের ভাড়া মাথা-পিছু এক আনা।

এই সব খবর সংগ্রহ করে ট্রেন কখন কখন ছাড়ে জিজ্ঞেস করে একটা কাগজে লিখে নিচ্ছিলুম। লেখা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে এমন সময় কে একজন ইংরেজীতে

বলে উঠল—আপনাদের কিছু সাহায্য করতে পারি কি?

আমরা ফিরে দেখলুম বছর পঁচিশের একটি ছেলে।

ছেলেটি বললে—এখানে ভাষা বোঝাবার যদি কিছু অসুবিধে হয় তো আমি দোভাষারী কাজ করে দিতে পারি। আমেরিকানরা এখানে এলে আমি প্রায়ই তাদের গাইড হই।

আমি কি রকম যেন ঘাবড়ে গিয়ে বললুম—না, না, অনেক ধন্যবাদ। আমরা শুধু ট্রেনের সময় নিচ্ছিলুম, নেওয়া হয়ে গেছে। হঠাৎ কেন জানি না তীর্থের পান্ডার কথা এবং পান্ডাদের জুলুমের কথা মনে পড়ে গেল।

ছেলেটি বললে—আপনারা কি ছাত্র?

আমি বললুম—দুজনেই।

ছেলেটি বললে—তাহলে আপনাদের কাছ থেকে কোনো মূল্য নেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। অবশ্য আপনারা যদি দয়া করে আমাকে গাইড হিসেবে নিযুক্ত করেন। আমিও ছাত্র। ছুটির সময় আমেরিকানদের পান্ডাগিরি করি—কিন্তু যখন হাতে আমেরিকান যাত্রী থাকে না তখন বিদেশী ছাত্র পেলে তাদের নিজের ভাইএর মতো করে য়োনশোপিং দেখিয়ে বেড়াই।

ছেলেটিকে এইবার বড় ভালো বড় সৎ বলে মনে হল। কিন্তু আমরা আর গাইড নিয়ে কি করব? মিরেক বললে—দেখুন, আপনাকে কি বলে ধন্যবাদ দেব? কাল আমরা ভিসিংস্ দ্বীপে যাচ্ছি এবং পরশুই চলে যাচ্ছি য়োনপোশিং ছেড়ে।

ছেলেটি বললে—তবে বলি আপনাদের। ট্রেনে করে গ্রানা যাবেন না। অনেক আরামে যেতে পারবেন যদি লাফা-যাত্রা করে যান।

আমরা অবাক হয়ে বললুম—লাফা-যাত্রা করা চলে এখানে?

—কেন চলবে না? সুইডেনে নরওয়েতে লাফা-যাত্রা চলবে না তো চলবে কোথায়?

আমরা বললুম—এ প্রস্তাব মন্দ নয়। দেখা যাবে কাল চেষ্টা করে।

ছেলেটি বললে—লাফা-যাত্রা হচ্ছে দেশ বেড়াবার এবং দেশকে জানবার শ্রেষ্ঠ উপায়। আজ বিদায়। হয়তো আবার একদিন আপনাদের সঙ্গে কোথাও দেখা হয়ে যাবে।

আমরা বিদায় নিয়ে হোস্টেলে ফিরে গেলুম। মিরেক বললে—লাফা-যাত্রার প্রস্তাবটা কেমন লাগল?

আমি বললুম—আমার তো মনে হয় লাফা-যাত্রাই দেশকে জানবার শ্রেষ্ঠ উপায়।

রাত্রে যখন খাচ্ছি সেই সময় কোথা থেকে এস্পেরান্টো বুড়ো এসে উদিত হলেন। বললেন—আপনাদের পিঠে পিঠঝুলি দেখেই আমি আন্দাজ করেছিলুম আপনারা য়ুথ হোস্টেলে থাকবেন। কাল আপনাদের মধ্যাহ্নভোজনের নিমন্ত্রণ করতে এসেছি। সুইডেনে এক বিশেষ প্রকারের রেস্তরাঁ আছে, সেইটি আপনাদের দেখাবো।

মিরেক বলে উঠল—কিন্তু আমরা যে কাল ভিসিংস্ দ্বীপে যাচ্ছি। দুপুরে তো এখানে থাকবো না।

বুড়ো বললেন—বেশ তাহলে কাল প্রাতর্ভোজনে আসুন। আমার পক্ষে একই কথা। আমার সারাদিনই অবসর। আমায় তো চাকরি করতে হয় না, আমার যথেষ্ট সম্পত্তি আছে।

ভদ্রলোকের পোশাক জুতো এবং হাবভাব দেখে ধনী বলে মোটেই মনে হয় না, বরং উল্টোটাই মনে হবার কথা। যাই হোক, আমাদের তাতে কি-ই বা এসে যায়? বিদেশে এসে এমন আতিথেয়তা এত হৃদ্যতা, সেইটাই আমাদের লভ্য। ভদ্রলোক বললেন—সকাল সাতটার সময় এসে আমাদের নিয়ে যাবেন।

যে রেস্তরাঁয় পরের দিন আমরা গেলুম সেটা সুইডেনের একটা বিশেষত্ব। এ ধরনের চমৎকার নিয়ম কোনো দেশের কোনো রেস্তরাঁয় এর আগে আমরা কখনো দেখিনি। একটা প্রকান্ড হল। হলের দরজায় দাঁড়িয়ে একজন খাবারের টিকিট বিক্রী করছে। টিকিটের নির্দিষ্ট মূল্য মাথা-পিছু দু' টাকা। টিকিট কিনে ভিতরে ঢুকে যাও—দেখবে একটা প্রকান্ড লম্বা টেবিল, তাতে অগুনতি রকমের খাবার সাজানো। আমিষ, নিরামিষ, চর্ব, চোষ্য, "যত কিছু খাওয়া লেখে সুইডিশ ভাষাতে" সব জড়ো করা হয়েছে। গরম খাবার, ঠান্ডা খাবার, যা খুশি, যত খুশি নিজের প্লেটে তোলো আর খাও, কেউ

কিছু বলবে না। খেতে গিয়েছিলুম আমরা প্রাতর্ভোজন, হল আমাদের মহাভোজন। পেট ভরিয়ে যখন মিরেক আর আমি দুজনে দু' পেয়ালা কফি নিয়ে চুমুক দিচ্ছি, দেখি এস্পেরান্টো বুড়ো কোথায় যেন সরে গেছেন। এদিক ওদিক চেয়ে দেখি যে-টেবিলে পাঁউরুটি, মাখন, পনির, হ্যাম্ প্রভৃতির স্তূপ সেইখানে দাঁড়িয়ে নিপুণ হস্তে স্যান্ডউইচ তৈরী করছেন। স্যান্ডউইচ তো নয়—স্যান্ডউইচের পাহাড়। সেই অত স্যান্ডউইচ বুড়ো ভদ্রলোক আমাদের দুজনের পিঠঝুলিতে ভরতে লাগলেন।

আমরা বাধা দিয়ে বললুম—এ কি করছেন? দু' টাকার বদলে অন্তত চার টাকার খাবার খেয়েছি প্রত্যেকে। আবার ছাঁদা বাঁধছি দেখলে এরা মেরে তাড়াবে।

ভদ্রলোক হেসে বললেন—এখানকার নিয়মই এই। দেখুন প্রায় প্রত্যেকেই স্যান্ডউইচ নিয়ে যাচ্ছেন। সঙ্গে কিছু না নিয়ে গেলে এরাই বরং ক্ষুণ্ণ হয়, মনে করে এদের খাবার খেয়ে আপনারা তৃপ্ত হননি। এরকম আশ্চর্য প্রথা আমরা এ পূর্বে কোথাও দেখিনি, কল্পনাও করে পারি না। যাই হোক পিঠঝুলিতে খা বোঝাই করে ভদ্রলোককে ধন্যবাদ জানি আমরা বেরিয়ে পড়লুম পথে। একা চৌমাথার মোড়ে এসে প্রথমে খুঁজে বা করলুম গ্রানা গ্রাম কোন্ পথে কয় কিলো মিটার দূরে। এ-সব দেশে রাস্তার মো লোহার খুঁটির গায়ে ফলক লাগিয়ে এ ধরনের নির্দেশ সর্বত্র দেওয়া থাকে বোঝবার কোনো কষ্ট হয় না। কাজে শুরু করলুম আমরা গ্রানার দিকে হাঁটতে

আধ ঘণ্টাটাক হেঁটেছি। শহর প্রা পার হয়ে এলুম। এর আগে কোনো মোটার থামাবার চেষ্টা করিনি; কারণ শুনেছিলুম শহরের মধ্যে লাফা-যাত্রীর গাড়ি থামায় না। গাড়ি বিশেষ থামতেও চায় না। তা ছাড়া যদিও বা কেউ থামে হয়তো দেখা যাবে শহরের মধ্যেই গাড়িটা কোথাও যাচ্ছে। কাজেই কোনো দিক দিয়েই লাভ হয় না। শহরতলীর দৃশ্য চোখে পড়ল ক্রমে। আর ঘেঁষাঘেঁষি দালান নেই। দূরে দূরে বাড়ি, বড় বড় জমি আর তার পিছনে ছোট ছোট পাহাড় দেখা যাচ্ছে। এক ঝাঁক পাখির শব্দ কানে এল গাছের পাতার আড়াল থেকে।

সেই সময় দেখি পিছন থেকে একটা গাড়ি আসছে। দেখলুম সামনের সীট-এ দুজন বসে, তার মধ্যে একজনের মাথায় ড্রাইভারের টুপি। পিছনের সীটটা খালি। লাফা-যাত্রা করার উপযুক্ত গাড়ি। আমরা দুজনেই হাত তুললুম। ড্রাইভার একটা সেলাম করে গাড়িখানা থামালো। সেলাম করা দেখে আমি একটু ঘাবড়ে গেলুম—আমাদের আবার সেলাম করে কেন? আমরা কি গাড়ির মালিক? আমরা তো প্রার্থী। তবে? হবেও-বা সুইডিশ ভদ্রতাই এই রকম—যাকে কৃতার্থ করছে তার কাছেই হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে। এই সব ভাবতে ভাবতে মোটার গাড়ির ভিতরে গিয়ে বসলুম। সেলাম করার ফলেই বোধহয় বলতে ভুলে গেলুম আমরা কোথায় যেতে চাই। ড্রাইভারের পাশে যিনি বসেছিলেন তিনি সুইডিশ ভাষায় দু-তিনবার প্রশ্ন করায় আমাদের চৈতন্য হল। আমরা তখন লজ্জিত হয়ে বললুম—গ্রানা গ্রানা গ্রানা।

ভদ্রলোক ঘাড় নেড়ে কি বলতে লাগলেন। সবটা না বুঝলেও এটা বুঝলুম যে গাড়ি গ্রানায় যাবে না। আর সময় নষ্ট করা উচিত নয় এই ভেবে আমরা যেই গাড়ি থেকে নামতে যাবো অমনি ড্রাইভার সাহেব কি একটা বলে দড়াম করে দরজা বন্ধ করে গাড়ি ছুটিয়ে দিলেন। আমাদের আর নামা হল না।

আমি মিরেককে বললুম—ব্যাপারটা কি হল? আমরা কি বন্দী হলুম?

মিরেক বললে—আশ্চর্য কিছু নয়। ভাষা না জানলে অসুবিধে অনেক।

আমি বললুম—মিরেক, তুমি অসুবিধের কথা বলছ। আমি কিন্তু ইয়োরোপে এসে দেখেছি ভাষা না জানার সুবিধে কত। কেন জানি না এরা এই ইয়োরোপের মানুষগুলো অসহায় লোক দেখলেই তাকে সাহায্য করতে ছুটে আসে। ঠিক আমাদের দেশের উল্টো।

মিরেক বললে—তোমার নিজের দেশ সম্বন্ধে যেগুলো বলো তার কতটা ঠাট্টা আর কতটা সত্যি আমার পক্ষে বোঝা শক্ত।

আমি বললুম—বিশ্বাস করো কলকাতা শহরে যদি একজন ইটালিয়ান ঘুরে বেড়ায় যে ইটালিয়ান ভাষা ছাড়া আর কিছুই জানে না, তাকে শুধু ঘুরেই বেড়াতে হবে। কেউ তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে না। অথচ এখানে যেই লোকে বুঝতে পারে আমি তাদের দেশে এসেছি অথচ তাদের ভাষা জানিনে, অমনি আর রক্ষে নেই—হোটেল খুঁজে দাও, মিউজিয়াম দেখাও, দোকানে নিয়ে যাও, কফি, কেক খাওয়াও, আদরের আর ইয়ত্তা নেই। ইংরিজীটা জানি বলে ইংলণ্ডে ঐ জন্যে আমরা বিশেষ সুবিধে করে উঠতে পারি না।

বলতে বলতে য়েনশোপিং ছাড়িয়ে হুস্ক্‌ভার্নাতে এসে আমাদের গাড়ি পৌঁছল। সেখানে পৌঁছেই ভীষণ শব্দে হর্ন দিতে দিতে আমাদের গাড়িখানা আরেকটা চলন্ত মোটারের পিছনে তাড়া করে প্রায় তাকে ধাক্কা মেরে শেষে হাত দেখিয়ে থামাল। আমরা যখন ভাবছি, এ আবার কি ব্যাপার, দেখি আমাদের ড্রাইভার গাড়ি থেকে নেমে দরজা খুলে সেলাম করে দাঁড়িয়ে আছে। বুঝলুম আমাদের নামতে বলছে। কিন্তু আবার সেলাম কেন রে বাবা! আমরা গাড়ি থেকে নামলুম। ততক্ষণে দেখি অন্য গাড়ির দরজা খুলে গেছে। বুঝলুম, এইবার আমাদের ঐ গাড়িতে উঠতে হবে। সমস্ত ব্যাপারটা মনে হল যেন বায়োস্কোপের পর্দায় ঘটছে। আমরা গাড়ির মধ্যে উঠে বসতে না বসতেই প্রথম গাড়িটা ধোঁয়া ছেড়ে উধাও হয়ে গেল।

তখন আমরা এই গাড়ির চালকটিকে লক্ষ্য করলুম। দেখলুম, একজন মধ্যবয়সী ভদ্রলোক—তাঁর মাথার সিঁথিটা দেখবার মতো। আমাদের সিঁথি আমরা যত যত্নেই কাটি ঠিক ব্রহ্মতালুর কাছে এসেই সেটা শেষ হয়ে যায়। কিন্তু এই ভদ্রলোকের সিঁথি অতি পরিপাটিভাবে একেবারে ঘাড় পর্যন্ত নেমে এসেছে। পিছনে বসে তাই দেখতে লাগলুম এবং আমাদের চোখ বড় বড় হয়ে উঠতে লাগল। এ রকম আশ্চর্য সিঁথি মিরেককেও স্বীকার করতে হল, আমাকেও স্বীকার করতে হল, আমরা কোথাও দেখিনি।

বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কাটা কেটে যাবার পর আমরা গোড়ায় জার্মান ভাষায়, তারপর ইংরেজীতে ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করলুম, তিনি 'গ্রানার' পথে যাচ্ছেন কি না। ভদ্রলোক দেখলুম কিছু ইংরেজী জানে। বললেন, গ্রানার অর্ধেকটা পথ আমাদের পৌঁছে দিতে পারবেন।

মিরেক তখন সিঁথিওয়ালা ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করলে, যাঁরা এই মাত্র আমাদের নামিয়ে দিয়ে গেলেন তাদের কি তিনি চেনেন?

ভদ্রলোক বললেন—ট্যাক্সি ড্রাইভারটিকে চিনি—আমাদেরই এই শহরের ট্যাক্সি তো। কিন্তু অন্য যাত্রীটিকে চিনি না।

—কি সর্বনাশ! ট্যাক্সি! বলে মিরেক আমি দুজনেই চমকে উঠলুম। আমরা বললুম কই? তাহলে ভাড়া তো নিল না, গেল কোথায় লোকটা?

সিঁথিওয়ালা ভদ্রলোক বললেন—বাঃ রে, আপনারা লাফা-যাত্রা করছিলেন না?

আমরা বললুম—তাই বলে ট্যাক্সিতে? প্রাইভেট গাড়িতে চড়ি, লরিতে চড়ি সে কথা আলাদা। ট্যাক্সি করে লাফা-যাত্রা হয় নাকি?

ভদ্রলোক বললেন—কেন হবে না? এই তো হল দেখলেন। সুইডেনে সব হয়। ট্যাক্সিওয়ালা উল্টো পথে এতদূর এসে আমার গাড়িতে আপনাদের চড়িয়ে দিয়ে গেল, চোখের সামনেই তো দেখলেন। এই বলে তিনি তাঁর গাড়িতে স্টার্ট দিলেন।

এতক্ষণে আমাদের কাছে গাড়ির ড্রাইভারের সেলাম করার রহস্যটা পরিষ্কার হল। বুঝলুম ট্যাক্সি ড্রাইভারের খদ্দেরকে সেলাম করা অভ্যেস বলে সে কৃপার্থীকেও সেলাম করতে কসুর করেনি।

চললুম আমরা হুস্ক্‌ভার্না ছাড়িয়ে গ্রানার পথে। ভদ্রলোক একহাতে স্টিয়ারিং ধরে মাঝে মাঝে ঘাড় ফিরিয়ে আমাদের সঙ্গে গল্প করতে করতে চললেন। বেশীদূর আমাদের যেতে হল না। একটা ফাঁকা জায়গায় এক তেমাথার মোড়ে তিনি গাড়ি দাঁড় করালেন। আমরা নেমে যেতে তিনি বিদায় নিয়ে গ্রানার পথ ছেড়ে অন্য রাস্তায় ঘুরিয়ে নিলেন তাঁর গাড়ি। তারপর তাঁর সেই ঘাড় অবধি অদ্ভুত সিঁথি যতক্ষণ দেখা যায় আমরা তার দিকে চেয়ে রইলুম। তারপর তা-ও মিলিয়ে গেল।

(ক্রমশ)
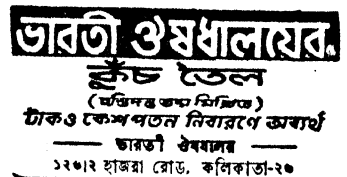
আমি আপনার বন্ধু, লক্ষ লক্ষ লোকের বন্ধু, আমি বন্ধু ধনী আর দরিদ্রের। যুবা বা বৃদ্ধ সবাই আমায় ভালোবাসেন ;—আমি সর্বত্র সবারই বিশেষ প্রিয়।

আমি সহজেই ক্লান্তি দূর করি, উদ্বেগে বা দুর্ভাবনায় আপনার মনের প্রশান্তি আমি-ই আনি। আমি গরমে শীতল এবং শীতে গরম। আপনি ভগ্নোদ্যম হ'লে আমি আপনাকে উৎসাহ দিই, উত্তেজিত হলে শান্ত করি। আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ এবং আপনার মনের মতো সঙ্গী।

আপনি যখন বিশ্রামের জন্যে ব্যাকুল হয়ে ওঠেন, অতিরিক্ত পরিশ্রমে যখন চোখের পাতা বুজে আসে, যখন মনে হয় কর্মভারাক্রান্ত দিন বুঝি দীর্ঘতর হয়ে উঠলো—সময় বুঝি আর কিছুতেই কাটেনা তখন আমি-ই কাজে উৎসাহ-উদ্দীপনা এনে দিই। তারপর আপনি যখন বাড়ী ফিরে যান তখন আপনার সারা দিনের ক্লান্তি দূর করতে আমি সেখানে অপেক্ষা ক'রে থাকি।

আপনি যেখানেই থাকুন, যা-ই করুন এবং আপনার মনের অবস্থা যা-ই হোক-না-কেন, সব অবস্থায়. আমাতে পাবেন পরম তৃপ্তি। আর সব চেয়ে বড় কথা এই যে আমার এতো গুণ সত্ত্বেও আমি এখনো সব চেয়ে সস্তা পানীয়। সত্যি সত্যি চায়ের কোন বিকল্প পানীয় নেই।

আমার নাম চা - আমি চির-আনন্দের উৎস

TEA BOARD INDIA

PST 143

বনহরিণী

সুশীল রায়

যেমন ফিগার, তেমনি রং, আর তেমনি চোখ।

রূপের মত রূপ, দেখলে আনন্দে পুলকিত হয়ে ওঠার কথা। কিন্তু, অনেক দিন আগের কথাই হল, আমরা তখন সবে স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে কলেজে ঢুকেছি, সেই সময় এই অপরূপ রূপ দেখে মনে ভীষণ গুমট হয়ে গিয়েছিল; সেই ভারি বিষাদটা অনেক দিন পর্যন্ত বুকের উপর ভীষণ ওজনের মত চেপে বসে ছিল। যখনই ওই রূপের কথা মনে হত তখনই স্তব্ধ একটা অকারণ বেদনা নিঃশব্দে হাহাকার করে উঠত মনের মধ্যে।

নাম মেনকা। আমাদের সহপাঠী মেঘনাদ হালদারের স্ত্রী।

মেঘনাদ আমাদের সহপাঠী। কিন্তু বয়সে আমাদের চেয়ে অনেক বড়। স্কুলের গণ্ডি পার হয়ে আমরা এপারে চলে এলাম, কিন্তু মেঘনাদ পড়ে রইল ওপারে।

বিরাট বাড়ি মেঘনাদদের। কী উঁচু প্রাচীর! ক বিঘে বলতে পারব না, কিন্তু কয়েক বিঘে জমির উপর সার সার পাকা বাড়ির মিছিল, ওই উঁচু প্রাচীর দিয়ে সেই বাড়িগুলো ঘেরাও করা। মস্ত ফটক দিয়ে ঢুকে ওই বাড়ির অরণ্যের মধ্যে রোজ স্কুল থেকে ফেরার পথে মেঘনাদ কোথায় যেন হারিয়ে যেত। ওই বাড়ি, ওই বিরাটত্ব, আর ওই মেঘনাদ—এই সবই আমাদের চোখে আরো বিরাটতর বিস্ময় ছিল সেকালে।

সেই মেঘনাদ কাল এসেছিল। আমাকে বলল, আমার জীবনের কথা তোকে বলব। এই নিয়ে দ্যাখ্-না একটা উপন্যাস হয় কি না।

মেঘনাদের কথায় বিশেষ কান দিইনি, আমলও দিইনি তাকে। কিন্তু ওর মুখের দিকে চেয়ে মনটা কেমন ভারি হয়ে উঠল। সে চেহারা নেই ওর, সে স্বাস্থ্য নেই, সে স্ফূর্তি নেই।

বললাম, শুনব একদিন।

আজ একে দেখে মন ভারি হল। মনে পড়ল—কতদিন আগে যেন?—ওর বৌকে দেখে মন এমনই ভারি হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তার কারণ অবশ্য আলাদা।

মনে আছে, বলেছিলাম, গ্র্যাণ্ড বৌ পেয়েছিস। নামটা কিন্তু বদলানো উচিত। ওর নাম হওয়া দরকার উর্বশী। রূপের সঙ্গে মানায় তাহলে।

হরিহর আচার্য ছিল একটু গুরু-গম্ভীর প্রকৃতির। কোনো কথায় বিশেষ মন্তব্য করে না। কিন্তু সেও সায় দিল আমার কথায়, বলল, ঠিক। নামটা উর্বশী হলে মানায়।

বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে হেরম্ব বলল, যদি নাম পালটাতেই হয় তাহলে রম্ভা রাখ। উর্বশী মেনকা রম্ভা সবাই এক ক্যাটেগরির।

সকলে হেসে উঠলাম একসঙ্গে।

হেরম্ব মেঘনাদকে বলল, না রে। বেশ আছে। বেশ নাম। মেনকা। ওর সঙ্গে মিলিয়ে তুই নিজের একটা নাম রাখ।

হরিহর আচার্য কথা বলল, মুচকে হেসে বলল, মেঘনাদের নাম তাহলে হোক মানিক।

আবার হেসে উঠলাম আমরা এক-সঙ্গে।

সেই হাসির পর সম্ভবত আর এমন প্রাণ-খোলা হাসি হাসিনি কোনো দিন। আর যাকে উপলক্ষ্য করে হাসি, তাকে ঐ বিয়ের আর বৌ-ভাতের দিন ছাড়া আর দেখিওনি কখনো। ওই বিরাট বাড়ির অরণ্যে হারিয়ে গেছে সেই রূপের ডালিটা।

কিন্তু মেঘনাদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল এর পরেও অনেক দিন পর্যন্ত। চেহারায় চটকে বিলাসে আর বৈভবে চৌকশ হলেও খুঁত ছিল তার জীবনে। বিদ্যায় এবং কিছুটা বুদ্ধিতে সে ছিল একটু কাঁচা।

কেয়াতলার মোড়ে হঠাৎ মেঘনাদের সঙ্গে দেখা। আমাকে দেখেই আহ্লাদে আটখানা হয়ে গেল, বলল, কাল থেকে খুঁজছি তোকে। চিঠি এসেছে।

এ কথার আর ব্যাখ্যা দরকার ছিল না। বৌ গেছে বাপের বাড়ি। সেখান থেকে চিঠি লিখেছে। তার জবাবের খসড়া করে দিতে হবে।

সন্ধ্যা আসছে ঘনিয়ে, এই অবেলায় কোথায় বসেই-বা চিঠিটা পড়ব, আর কোথায় বসেই-বা তার উত্তরের ড্র্যাফট লিখব—এ এক সমস্যা।

বুক পকেট থেকে নীল খাম বের করতে করতে আমার জামার কোণ ধরে মেঘনাদ টানল, বলল, এদিকে আয়। এই গ্যাসলাইটের নীচে।

গ্যাসের আবছা আলোয় পড়তে লাগলাম চিঠি। কাঁচা হাতে লেখা বিস্তর পাকা পাকা কথা। স্বীকার করি, ওই সব চিঠি পড়েই আমি জীবনে অনেক জ্ঞান লাভ করেছি, উত্তরজীবনে যে জ্ঞান আমাকে অনেক দুরূহ সংকট থেকে ত্রাণ করেছে।

ওখানে বসেই ঘাসের উপর কাগজ রেখে পেন্সিল দিয়ে খসখস ক'রে লিখে দিয়েছি ওই চিঠির উত্তর। আরো স্বীকার করব, মেঘনাদের জবানিতে অকপটে নানা কথা অনর্গল লিখে লিখে উত্তরজীবনে আমি প্রভূত উপকৃত হয়েছি। কত অজানা কথার সঙ্গে যে তখন অন্তরঙ্গ কোলাকুলি হয়েছে তার সংখ্যা দিতে পারব না।

কোনো কোনো চিঠিতে মেনকা লিখত—ইতি উর্বশী।

দেখে খুশি হয়ে উঠতাম আ[illegible] কেননা, এই নামটা সর্বপ্রথম সাজে[illegible] করি আমিই। আমিও ছাড়ার পাত্র ন[illegible] ওই উর্বশীর সূত্র ধরে আমার নিজে[illegible] অনেক বক্তব্য মেঘনাদের জবানি[illegible] চালিয়ে দিয়েছি। লিখেছি—মনোহারি[illegible] বনহরিণী তুমি, তোমার চোখের [illegible] জাদুতে নিশ্চয় কোনো হলাহল আ[illegible] ওই বিষে আমি জর্জরিত। তোম[illegible]

রূপের মদিরায় আমার মন প্রমত্ত হয়েছে। তাই তোমার রূপ দেখে আমি উল্লসিত না হয়ে বিমর্ষ হয়ে বসে আছি এক কোণে।

এইটুকুই পড়ে মেঘনাদ বলল, গ্র্যান্ড। আমার মনের কথাগুলো তুই এমন টুকে নিস কী করে, ভূপতি? অবিকল আমার মনের কথাগুলো গুছিয়ে তুই লিখে দিলি?

খসড়াটা পকেটে রেখে মেঘনাদ বলল, রূপ রূপ করে তো লাফাচ্ছি। কিন্তু গুণের দিক থেকেও কিন্তু ও যা-তা না। গানের গলা অদ্ভুত। আমাদের বাড়ির হালচাল তো জানিস। গান গাওয়া মানা। অনেক রাত্রে চারদিক যখন নিশুতি হয়ে যায়। বাড়ির সব ঘরের দরজা হয়ে যায় বন্ধ, তখন আমার কানের মধ্যে ফিসফিস ক'রে গান শোনায়। কী সুইট। কী মিষ্টি। আহা। গানের উপর টানও খুব। বলে, আমি শিখব গান, ওস্তাদ রেখে দাও।

—কি উত্তর দিস?

—কি আর দেব। বলি, যদি সুদিন পাই নিশ্চয়ই শেখাব গান।

হেসে উঠলাম, বললাম, তাহলে এখন খুব দুর্দিন চলেছে বলতে হবে।

মেঘনাদ ঘনিষ্ঠ হয়ে বসল, বলল, বৌ নিয়ে নিজের খুশিমত চলতে না পারাটা দুঃখের কি না, বল।

মেঘনাদের কথায় সায় দিতে হয়। ওই রকম পর্দানশীন বাড়ি। ওই অপরূপ রূপ আর কোনো দিন দেখা হবে না—এটা দুঃখেরই কথা। যদি কোনো সুযোগ ঘটে, আর দেখতে পাই ওই রূপ, তাহলে কিছু দিনের জন্যে মন আবার ভারি হয়ে উঠবে জানি, কিন্তু সেই বিষাদের অন্ধকারের মধ্যেও আনন্দের স্ফুলিঙ্গ যে আছেই।

মেঘনাদের অনেক চিঠির উত্তর লিখতে হয়েছে আমাকে। উত্তর লিখতে অনেক দিন মন পুলকে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে। চমৎকার মিল হয়েছে দুজনের, দুজনের উপর দুজনের টান হয়েছে অকৃত্রিম। বিদ্যায়, এবং কিছুটা বুদ্ধিতে মেঘনাদ কিঞ্চিৎ কাঁচা হলেও বেশ মানিয়ে নিয়েছে মেয়েটা। রূপের দেমাক নেই কোনো চিঠির কোনো ছত্রের ফাঁকে। রূপ অবশ্য আছে মেঘনাদেরও, কিন্তু তফাৎ এই—মেঘনাদের রূপে কোনো জেল্লা নেই।

এইভাবে মেঘনাদের সংগে অনেক দিন পর্যন্ত যোগাযোগ আমার ছিল, তারপর সময়ের সংগে বয়স বাড়তে লাগল, সেই সংগে জীবনের জটিলতাও। সেই জটিলতায় জড়িয়ে গিয়ে কবে যে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেলাম মনে নেই।

কিন্তু কেউ কাউকে একেবারে ভুলে যাইনি। ওই নিবিড় অন্তরংগতা একেবারে উহ্য ক'রে দেওয়া যায় না। ঘন-মেঘের ফাঁকে ফাঁকে হঠাৎ বিদ্যুৎ যেমন চমকে ওঠে, অনেক নিবিড় চিন্তার ফাঁকেও তেমনি ঝলকে উঠেছে মেঘনাদের স্ত্রীর রূপের স্ফুলিঙ্গ।

ভেবেছি, মনোহারিণী বনহরিণী আখ্যাটা তবে নিতান্ত বাজে হয়নি।

ওই চোখ, ও তো সত্যি চকিত-হরিণীপ্রেক্ষণা। তার চোখের ওই দৃষ্টির এবং ওই দীপ্তির কথা মনে হলে মন এখনো গুমোট হয়ে ওঠে।

কিন্তু জীবন এখন সরল নয়, একটি কোমল চোখের কথা ভাবতে ভাবতে অনেকটা সময় কাটিয়ে দেওয়া গেছে আগে। এখন তা সম্ভব নয়। সুতরাং ওই সব অবান্তর কথা বাদ দিয়ে নিজের কাজে মন দিতে হয়।

স্মৃতির অগাধে যা তলিয়ে গিয়েছিল, যার কথা চিন্তাও করিনি বহুকাল, হঠাৎ কি না সেই বুদ্বুদের মত ভেসে উঠে আমাকে একদিন সত্যিই অবাক করে দিল।

সন্ধ্যা পার হয়ে গিয়েছে। আপিস থেকে ফিরেছি একটু আগে। ঘর অন্ধকার করে একা একা বসে আছি চুপচাপ। ক্লান্তিটা দূর করছি ধীরে ধীরে।

দরজায় কড়া নাড়ার শব্দে উঠে আলো জেলে দরজা খুললাম। অবাক হয়ে গেলাম। মেঘনাদ।

—ভালো আছ ভূপতি ভায়া?

—ভিতরে এস। আশ্চর্য, তুমি এখানে পদার্পণ করবে স্বপ্নেও ভাবিনি হে। ও কে, সংগে কে?

মেঘনাদ হাসল, বলল, দ্যাখ, চিনতে পার কিনা।

বিশ্বাস করতে পারলাম না, বললাম কে ও?

—আমার স্ত্রী। মেনকা। কি হে, চিনতেই পারছ না?

আধো ঘোমটায় ঢাকা মুখ, পরনে তাঁতের একটা ডুরে শাড়ি। লজ্জায় জড়োসড়ো হয়ে এক পাশ কুঁকড়ে দাঁড়িয়ে আছে একটি ফিগার। এ ফিগার চিনতে পারা একটু কঠিন বৈ-কি। তার চেয়েও কঠিন এই শক-টা, এই ধাক্কাটা। বুকের ভিতরটা হঠাৎ দপ করে উঠল আমার।

বললাম, কী সৌভাগ্য। কী সৌভাগ্য। ভিতরে নিয়ে এস।

ত্রস্ত হাতে চেয়ারগুলো টেনে টেনে এগিয়ে এগিয়ে দিলাম, বললাম, বসুন। আপনি আমাকে চিনবেন না। কিন্তু আমি—

বাধা দিল মেঘনাদ, বলল, চিনবে না বল কী হে। তোমাকে চিনবে না আমাদের বাড়িতে এমন কে আছে?

নিজের ভাগ্যের জন্যে আমার নিজেরই হিংসে হতে লাগল। কিন্তু সেই সঙ্গে নিজের দুর্ভাগ্যের জন্যেও ব্যথিত হলাম। আমার বহুদিনের সঞ্চিত একটা সুখস্বপ্ন আজ নিমেষে ধূলিসাৎ হয়ে গেল। এই সেই মেনকা? এ যে অন্য মানুষ। এ রম্ভাও নয়, উর্বশীও নয়—এ নিতান্তই অতি সাধারণ একজন মহিলা—নিতান্তই মেঘনাদের স্ত্রী।

চেয়ারের একটা হাতলের দিকে শরীরটা জড়ো ক'রে সংকোচে কুঁকড়ে বসে আছে মেনকা। আধো ঘোমটার ফাঁক দিয়ে দেখার চেষ্টা করলাম সেই মুখ আর সেই চোখ। দেখতে পেলাম না। নিবিড় আব্রুর আড়ালে বাস করলে বুঝি সংকোচটা এইভাবেই বিজ্ঞাপিত করতে হয়?

মেঘনাদকে বললাম, খবর কি বল।

—খবর ভালো। এবার ভাবছি ওকে একটু গান শেখাব। ওর বেজায় ইচ্ছে।

এই ইচ্ছের কথা শুনেছিলাম অনেক দিন আগে। ভুলে গিয়েছিলাম। আজ নতুন করে শুনে মনে পড়ে গেল কথাটা।

মেঘনাদ বলল, তোমার বৌ কই হে?

বললাম, আসছে।

বুঝতে পারছিলাম, হেনা ওদিকে অপ্রস্তুত হয়ে আছে, অতিথি সমাগমের আওয়াজ শুনে প্রস্তুত হয়ে নিচ্ছে।

হেনা আসতেই মেনকা একটু সোজা হয়ে বসল, মুখ তুলে তাকাল। ওই মুখ আর ওই চোখ দেখলাম।

আমার বয়স বাড়ার জন্যেই কিংবা ওই মুখ আর চোখের কিঞ্চিৎ বদলের জন্যেই আজ আর আনন্দের বিষাদে ভারি হয়ে উঠল না আমার মন। প্রফুল্ল মনেই কথাবার্তা বলতে লাগলাম ওদের সঙ্গে।

দু জোড়া হয়ে গেলাম আমরা। হেনা মেনকার সঙ্গে, আর আমি মেঘনাদের সঙ্গে গল্প করতে লাগলাম।

মেঘনাদের বাড়ির সেই প্রাচীর নুনে খেয়ে নরম হয়েই গিয়েছিল, সে প্রাচীর নাকি ভেঙে ফেলা হয়েছে একেবারে। আর, পার্টিশান হয়ে সব হ... আলাদা-আলাদা। ভাগ তো ... মেঘনাদের ভাগে দক্ষিণ-পুব ... নিমগাছ-ঘেঁষা একটা ঘর ... কিন্তু সে ঘর তার পছন্দ হয়নি ... তার বিনিময়ে সে মল্লিকদের ... গায়ের লাইব্রেরী ঘরটা নিয়েছে ... বাড়িটা ছিল ওদেরই এক্তিয়ারে। সুবিধে অনেক। হাত-পা ছড়িয়ে খুশিমত থাকা যাবে। ... পাঁচজনের গায়ে গায়ে ঘেঁষাঘেঁষি ... আলাদা হাঁড়িতে ভাত খাওয়া ... কথা। আসলে এটা নাকি ... পরামর্শ।

না বললেও হত। উদ্যোগী ... কোনো ব্যবস্থার প্রস্তাব করা মেঘ... পক্ষে যে সম্ভব নয়, এ আমি জা...

গানের কথা যখন উঠেছে, তখন গান না শুনে ছাড়তে চাই... হারমোনিয়ম এল। চৌকির উপ... ঝুলিয়ে বসে এক পাশের কপাল ... গালের উপর দিয়ে শাড়ির পাড় ... নিয়ে মেনকা সলজ্জ ভঙ্গিতে ... লাগল গান।

হেনা তাকাতে লাগল আমার দিকে। আমি মাথা নিচু করে বস...

গান থামলে বললাম, বা, বেশ...

হেনা বলল, সুন্দর লাগল। একদিন শুনব কিন্তু ভালো করে।

মেঘনাদের ও আমার তুই ... তুমি হয়ে গিয়েছিল। আজ ... সস্ত্রীক আলাপ আর গল্প করতে ... আবার তুই হয়ে দাঁড়ালাম।

মেঘনাদকে বললাম, আবার ... কিন্তু।

—নিশ্চয় আসব। তোদেরও যাওয়া চাই।

ওরা চলে গেলে হেনা বলল, আশ্চর্য। ওই গলায় গান হবে?

আমার মনে কেমন ফূর্তি যে... গেছে। চেয়ারের হাতলের উপর বাজিয়ে বললাম, হবে হবে। শুধু... নহে তো গান।

—আর কি দরকার? বাঁকা ... চেয়ে জিজ্ঞাসা করল হেনা।

বললাম, উদ্যম আর চেষ্টা।

মেঘনাদের ওই প্রকাণ্ড প্রাসাদ এখন প্রাসাদ নয়। কতকগুলি কুঠুরির বেশ মাত্র। এই প্রাসাদের বন্দীশালা ক বেরিয়ে এসে বুঝি সুদিনের দেখা য় গিয়েছে সে। ইঁটের খাঁচায় ক করে রাখা হয়েছিল যে বন-ণীকে সে আজ মুক্ত, আজ সে ধীন।

চৌধুরীদের মাঠের গায়ে রেল-নের লাগোয়া একটা বাড়ি। বাড়ির জার গায়ে চকখড়ি দিয়ে বড় বড় ফে লেখা—ওস্তাদ। এইখানে থাকে ন্দাবন আর তার শাগরেদ নরহরি। ী খুব কম, মাসিক পাঁচ টাকায় ত্তাহে দুই দিন গান শেখানো হয়, ব রকমের গান। গীত ভজন কীর্তন খেয়াল টপ্পা আধুনিক—সব।

মেঘনাদ এসে বলল, এবার নিশ্চিন্দি। ভর্তি করে দিলাম আজ। বৃন্দাবনের ইস্কুলে দিলাম মেনকাকে।

বললাম, ভালোই করলে। তোমার জীবনের একটা উচ্চাশা পূরণ এবার।

মেঘনাদ বলল, শুধু আমার কেন। মেনকারও।

বললাম, ওই হল। তুমি আর তিনি কি আলাদা।

হেসে উঠল মেঘনাদ হালদার। এ হাসির মধ্যে বেশ একটা গর্ব আর গৌরবের ভাব মেশানো।

বেশ মৌতাতে আছে এখন মেঘ-নাদরা। স্বামী আর স্ত্রী, আর স্ত্রী আর স্বামী—এই নিয়ে সংসার।

মেঘনাদ বলল, মাইনে পাঁচ টাকা। কিন্তু বায়না কত দ্যাখ। তবলা আর তানপুরা কিনে দিতে হবে এক্ষুনি। কী রকম দাম রে এসবের?

ও লাইন সম্বন্ধে আমি একেবারে আনাড়ি। বললাম, নানা দামের আছে। শোও আছে পাঁচ শোও আছে, ঞ্চাশও আছে।

বৃন্দাবনটা ঝানু লোক। আগে যাত্রাপার্টি ছিল একটা। সে দল ভেঙে গেছে, কিন্তু বৃন্দাবন ভাঙেনি। নাম-ডাক আছে লোকটার। গাইয়ে হিসেবে ত নয়, যতটা পাখোয়াজ লোক বলে। ছু করে না, কিন্তু থাকে তেল-চুকে। লোকটা করিৎকর্মা বটে।

হালদার-বাড়ি নাম-করা বাড়ি। সে বাড়ির ইঁটে ঘুণ ধরলেও আর তার দেয়াল ধসে পড়লেও ঐ বৃহৎ প্রাসাদের খাতির এর মধ্যেই খসে পড়েনি।

সেই বাড়ির বৌ তার কাছে আসে গান গাইতে। বৃন্দাবনের বুক ফুলে গেল রাতারাতি। ভাবখানা এই—আর তাকে পায় কে। এবার সে গড়ে তুলবে একটা মস্ত গানের ইস্কুল।

নরহরি ব্যস্তসমস্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়। তার যেন সময় নেই। বিরাট একটা দায়িত্ব যেন এসে পড়েছে তার মাথার উপর।

মেঘনাদ একদিন জিজ্ঞাসা করল, বৃন্দাবন লোকটা কেমন রে?

আমি ওর চোখের দিকে চেয়ে আল-গোছে মাথা নেড়ে বললাম, ভালোই।

মেঘনাদ বলল, আমারও তাই মনে হয়। এর মধ্যেই তিনটে গান তুলিয়ে দিয়েছে। আর ইয়ে মেনকারও বাহাদুরি আছে বলতে হবে। ফাস্ট ক্লাস গাইছে। এর মধ্যেই, মাস-তিন তো হল মাত্র, এর মধ্যে জলসায় যেতে আরম্ভ করেছে। বৃন্দাবন খুব খুশ করছে ওকে।

সংবাদ শুনে খুশি হলাম। মেঘনাদ এত দিনে তার স্ত্রীর মনের ইচ্ছা যে পূরণ করতে পেরেছে, এটা আনন্দেরই সংবাদ। বললাম, দিব্যি আছিস কিন্তু। হিংসেই হয়। বৌ-এর গলার গান শুনেছিস বুঝি খুব?

একটু লাজুক হাসি হাসল মেঘনাদ, বলল, গানের কী আর বুঝি ভাই? ও-সব আর্ট, ওরা সব আর্টিস্ট, কিন্তু শুনতে ভালো লাগে। বাড়িতে বসে যখন রেওয়াজ করে, মশগুল হয়ে শুনি। সাত্যি, গান-জিনিসটা বড় ইয়ে, সুইট—

মেঘনাদ এখন নেশায় বুঁদ হয়ে আছে, তার কথা শুনে বেশ বুঝতে পারা যাচ্ছে। এত দিন ওই বিরাট প্রাসাদের দেয়ালে-ঘেরা কারাগারে সে নিজেই বন্দী ছিল না, তার কামনা বাসনা আকাঙ্ক্ষা সব কিছুই ছিল বন্দী হয়ে। এখন মুক্ত হয়েছে সে—তার আকাঙ্ক্ষাও সেই সঙ্গে মুক্ত পাখির মত পাখা মেলে দিয়েছে শূন্যে। সে-ও মুক্ত হয়েছে, সমাজের ও সংস্কারের, পরিবারের ও আভি-

জাত্যের শিকল থেকেও মুক্ত ক[...] দিয়েছে ওই বনহরিণীকে।

নতুন জীবনে জীবন্ত হয়ে উঠে[...] এই দুটি প্রাণী।

মেঘনাদের চোখমুখের দীপ্তি দে[...] এক-এক সময় নিজের জীবন সম্ব[...] হতাশ হয়ে পড়ি। আমাদের জী[...] বয়ে চলেছে মরানদীর স্তিমিত স্রোতে[...] মত, তাতে নেই কোনো আনন্দের তর[...] কিংবা উল্লাসের কল্লোল। কিন্তু মে[...]নাদের জীবনে এখন মধুর আওয়া[...] বেজে চলেছে অপরূপ জলতরঙ্গ।

তাদের ওই বৃহৎ পরিবারটি তো[...] শতখান হয়ে যে ছত্রখান হয়ে গিয়েছে[...] সে-প্রসঙ্গ একদিনও তোলে না মেঘনা[...] একদিনও তার জন্যে এতটুকু আক্ষেপ[...] করতে শুনলাম না তাকে।

বছর ঘুরে যায়। শুনতে পাই[...] মেনকা ইতিমধ্যেই বেশ গাইয়ে হয়ে[...] উঠেছে। দেয়ালে-দেয়ালে বিচিত্র অনু[...]ষ্ঠানের প্রকান্ড বিজ্ঞাপনে অনেক নামের মধ্যে একটা নাম দেখতে পাই—মেনকা হালদার।

খুশি হই। আশ্চর্যও হই। বাড়িতে[...] ফিরে হেনাকে বলি, উদ্যমে আর চেষ্টায় কী না হয়। তোমার বোনের কথা ধর, কেতকীটা সেই কবে থেকে অতবড়[...] একজন ভারতবিখ্যাত ওস্তাদের কাছে[...] গান শিখছে, এতদিনেও তার শেখা শে[...] হল না।

হেনা বলল, ভূমিকা তো শুনলাম কি বলতে চাচ্ছ বল না।

বললাম, মেঘনাদের স্ত্রী। মেনকা দেবী। সত্যি, নমস্কারই করতে ইচ্ছে[...] করে। এক বছর যেতে না যেতে কেম[...] নাম করে ফেলেছে।

হেনা বলল, তুমি গিয়ে নমস্কা[...] করে এস গিয়ে। আমি পারব না[...] আমি ওর গান শুনেছি।

—কবে?

—এর মধ্যেই শুনেছি একদিন।

আমি আর জেরা করলাম [...] হেনাও আর ও-কথা নিয়ে আমাকে জে[...] করল না।

কিন্তু নিজেকেই প্রশ্ন করি[...] মনোহারিণী বনচারিণী আখ্যা দি[...] যাকে মনের এক নিভৃত নেপ[...] সংগোপনে সঞ্চিত করে রেখেছিল[...]

কে দেখার জন্যে মনের মধ্যে একটা দু'দম আকাঙ্ক্ষা ছটফট করে উঠত, তাকে দেখার লালসা এমন উহ্য হয়ে গেল কী করে। সেই-যে এসেছিল ডুরে শাড়ি প'রে, সেই-যে এসে বসেছিল চেয়ারের হাতলের সঙ্গে নিজেকে লেপ্টে নিয়ে, তারপর আর তো আসেনি। তারপর দেখিনি তো তাকে একদিনও। আজ হিসেব করে আমাকে বের করতে হল এই তত্ত্বটা। এর মধ্যে মেনকা দেবীকে আর একবার দেখব বলে কোনো ইচ্ছে যেন বোধ করিনি আমি।

ইচ্ছে-বোধ না করলে কী হবে। একদিন এসে হাজির হলেন মেনকা দেবী হঠাৎ।

রাস্তার দরজা ছিল খোলা। ছুটির দিন। ঘরে বসে খবরের কাগজ পড়ছি। পায়ের শব্দ শুনে চোখ তুলে তাকাতেই দেখলাম এক আশ্চর্য মূর্তি। চিনতে পারতাম কি না জানিনে, তার আগেই সরাসরি ঘরে ঢুকে হাতজোড় ক'রে নমস্কার করে বললেন, এই যে। নমস্কার। আছেন কেমন?

থতমত খেয়ে কথা জড়িয়ে গেল আমার। হাতের কাগজ ফেলে উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, আপনি? মনে আছে আমাদের কথা?

দু পাশে দুই বিনুনি ঝোলানো, চোখে কালো কাঁচের চশমা, দু হাত ভর্তি প্ল্যাস্টিকের কালো সরু সরু চুড়ি,—আমার সম্মুখে সপ্রতিভ ভঙ্গিতে দাঁড়াল হালদার-বাড়ির পুরস্ত্রী। সবিস্ময়ে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলাম ওই দিকে। প্রতিনমস্কার করতে গিয়ে আমার হাত-দুটো কেঁপে গেল।

বললাম, বসুন।

—না। বসব না আর। কাজ আছে মেলা। আজ আবার এক জলসায় যেতে হবে বাঁশবেড়ে। হেনাদি নেই?

আজ আর কোনো লজ্জাও নেই, সংকোচও নেই। আমাদের মত সাধারণ ঘরের দীনতা লুকিয়ে রাখার জন্যে আর নেই কোনো ব্যস্ততা। প্রাসাদোপম সেই বৃহৎ অট্টালিকার মণিমুক্তাবিভূষিতা অন্তঃপুরিকার কাছে দীনতার লজ্জা ছিল একদিন, সে-লজ্জা দূর হয়ে গেছে একেবারে। বললাম, চলুন, ভিতরে চলুন।

খাড় কাচবার জন্যে তৈরি হচ্ছিল হেনা, ময়লা জামা-কাপড় সিদ্ধ হচ্ছিল আখায়। পাথার বাঁট দিয়ে ফুটন্ত সাবান-সোডার জলের মধ্যে জামা-কাপড় উল্টিয়ে দিচ্ছিল, পরনে তার ময়লা-পেড়ে একটা জীর্ণ শাড়ি।

রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে বললাম, এই দেখ, কে এসেছে।

হেনা চমকে উঠল, বিরক্ত চোখে একবার আমার দিকে চেয়ে নিজের পরনের কাপড়ের দিকে চাইল, তারপর বলল, ওঃ, আপনি? আসুন। চলুন, ঘরে চলুন।

বিব্রত হয়ে উঠল হেনা। নির্লিপ্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি।

কিন্তু ঘরে যাবার সময় নেই মেনকা হালদারের। অনেক কাজ তার। একটা ইস্কুল খোলা হচ্ছে। মস্ত একটা বাড়ি জোগাড় হয়েছে গোলপার্কের গায়ে।

—আপনাদের সাহায্য চাই কিন্তু।

হাঁটুর উপরের ছেঁড়াটা কোঁচা দিয়ে আড়াল করে খুব দরাজ মেজাজে বললাম, কি সাহায্য করতে পারি বলুন।

মেনকা হালদার বললেন, আপনার মেয়েদের দিতে হবে আমার ইস্কুলে।

হেনা এক ঝলক আমার দিকে চাইল। আমি হেনার চাউনির মানে বুঝতে পারলাম না, বললাম, নিশ্চয়। আপনি ইস্কুল খুলছেন, দেব বৈ কি।

—মনে থাকে যেন। তা ছাড়া আরো কিছু মেয়ে জোগাড়ও করে দিতে হবে কিন্তু।

হেসে হেনার দিকে দেখিয়ে বললাম, ওটা মেয়েদের ডিপার্টমেণ্ট। ও'কে বলুন।

মেনকা গায়ে ঝাঁকি দিয়ে হেসে উঠলেন, বললেন, আশ্চর্য। পুরুষ-মানুষেরা আজকাল বড় অকেজো হয়ে পড়েছে, তাই না হেনাদি? আমার ওনারও ঠিক এই রকমের কথা—সব আমার উপর ঠেলে দেন।

আর দাঁড়ালেন না মেনকা দেবী।
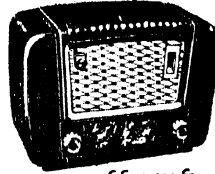
অনেক কাজ তাঁর। বাঁশবেড়েয় যাওয়া আছে, ইস্কুলের জন্যে একজন নামজাদা সেক্রেটারি জোগাড় করা আছে,—

কথা বলতে বলতেই চলে গেলেন তিনি। আমার চোখে তাঁর শরীরের স্বর্ণচ্ছটা ছড়িয়ে দিয়ে নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেলেন ওই বনহরিণী।

সেই ফিগার, সেই রং, আর সেই চোখ—যা দেখে একদিন অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম আমি, আজ এই ছুটির দিনের স্পষ্ট আলোয় ওঁর সর্বাঙ্গে খুঁজে বেড়ালাম সেই স্বপ্ন। খুঁজে পেলাম না। কালো কাঁচের আড়ালে চলে গেছে সেই চোখ, গাঢ় পাউডারের নেপথ্যে সেই রং। আর ফিগার? অনেক স্থূল হয়ে গেছেন মেনকা হালদার।

মন বিষণ্ণ হয়ে উঠল। খবরের কাগজ খুলে বসলাম।

হেনা ভীষণ চটেছে বুঝতে পারছি। রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকেছে, মেনকা চলে যাবার পর কোনো কথাই বলল না আমাকে।

আমি উঠে ভিতরের ঘেরা বারান্দায় পায়চারি করতে করতে রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়ালাম।

হাতপাখা উল্টো করে ধরে, বাঁহাত কোমরের উপর রেখে উপুড় হয়ে দাঁড়িয়ে, সোডাসাবানের হাঁড়ির ভিতরটা খোঁচাচ্ছে হেনা। সেখান থেকেই ঘাড় বেঁকিয়ে আমার দিকে চেয়ে বলল, হুলুস্থুল কাণ্ড। কি, মেয়েদের বুঝি দিচ্ছ ওই ইস্কুলে? কক্খনো না। আমি বেঁচে থাকতে না।

মেঘনাদের কথাটা নকল করে বললাম, এর মধ্যে গান কিন্তু শিখেছে ফাস্ ক্লাস।

এই কথা নিয়ে এর আগে আমাদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে, তাই কথাটা শুনেই সোজা হয়ে দাঁড়াল হেনা, বলল, রসিকতা এখন রাখ। কোন্ আক্কেলে হুড়মুড় করে নিয়ে এলে বল তো। কী হালে আমি আছি দেখছ না?

বললাম, বয়ে গেছে। এটা অন্তঃপুর। এতে মান যাবে না।

আমার কথা হেনা বুঝল কি না জানিনে। সে চলে গেল নিজের কাজে। আমি এসে বসলাম খবরের কাগজ নিয়ে।

এত অল্প সময়ের মধ্যে এমন উন্নতি, সত্যিই, আশ্চর্যের কথাই। শুধু গানে নয়, চাল-চলনে আচারে-আচরণে বসনে-ভূষণে অবিশ্বাস্য উন্নতি হয়েছে মেনকা-দেবীর। এতদিন যে ছিল বন্দিনী, মুক্ত হয়েই সে নিজেকে নতুন ভাবে গ'ড়ে তুলল এত শিগগির?

হেনা বলল, উন্নতি না ছাই। এটা অধঃপতন। বারান্দা থেকে উঠোনে পড়ে গেলে হাত-পা ভাঙতে পারে, প্রাণ যায় না। কিন্তু বেশি উঁচু থেকে, তেতলা-চারতলা থেকে নীচে পড়লে আর রক্ষে নেই, ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। প্রাণ মান কিছুই থাকে না। এত বড় বংশের বৌ—

নরহরি খুব ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে। বোঝা যাচ্ছে, ইস্কুল গড়ে তুলবার জন্যে তারাও লেগেছে উঠে-পড়ে।

তিন-চার দিন বাদে পুনরায় মেনকা-দেবী এলেন। এত সপ্রতিভ, এমন অকপট, আর এমন সরল, বললেন, আপনার বন্ধু তো সেদিন আমার উপর খাপ্পা।

—কবে?

—এই-যে সেদিন। বাঁশবেড়ে গিয়ে-ছিলাম। ফিরতে দেরি হয়ে গিয়েছিল। রাত প্রায় আড়াইটে হয়েছিল।

বললাম, তা জলসায় তো ওরকম হবেই।

মেনকা বললেন, তবেই দেখুন। আপনি বুঝলেন। কিন্তু উনি বড় অবুঝ। রেগে খাপ্পা। পীরগাছার কুমারবাহাদুরের নাম শুনেছেন নিশ্চয়? খুব গুণী লোক। আমার ইস্কুলের প্রেসিডেন্ট। ওই রাত্তির, কী ক'রে ফিরি? তিনিও গিয়েছিলেন জলসায়। তাঁর গাড়িতে ক'রে পৌঁছে দিলেন তাই রক্ষে। কিন্তু আপনার বন্ধুর মেজাজ যদি দেখতেন।

বললাম, মেঘনাদটা একটু ছেলে-মানুষ।

আমার কথা শুনে খুশী হলেন মেনকা দেবী। তাঁর গানের জীবন ও তাঁর ইস্কুলের ভবিষ্যৎ নিয়ে কিছুক্ষণ গল্পগুজব ক'রে চলে গেলেন তিনি।

এর পরে আর আসেননি মেনকা-দেবী। উত্তরোত্তর তাঁর নাম বাড়ছে, যশ বাড়ছে—এটা লক্ষ্য করে চলেছি। আমার বন্ধুপত্নী একজন কৃতি শিল্পী হয়ে উঠছেন, এটা আমার আনন্দেরই কথা।

মেনকাদেবী আসেন না বটে, কিন্তু মেঘনাদ মাঝে মাঝে আসে। কী-যে বলতে চায় সে, কিছুই বুঝতে পারিনে তার কথায়।

জিজ্ঞাসা করলাম, শরীর অসুখ নাকি রে। এমন শুকিয়ে উঠছিস কেন?

মেঘনাদ বললে, ওটা তোর চোখের দোষ। শরীর ঠিক আছে।

বললাম, বৌয়ের খবর কি?

বলল, কী জানি। বাড়িতেই-বা থাকে কতটুকু, দেখাই-বা হয় কতটুকু।

হেসে উঠলাম, বললাম, সে কি রে। আমি তো দেখি প্রায়ই। দেখি, কখনো পায়ে হেঁটে চলেছেন, কখনো রিক্শায়।

মেঘনাদ বলল, থামলে কেন? বল, কখনো মোটরে, কখনো উড়োজাহাজে।

ওর তামাশায় হেসে উঠলাম আমি। কিন্তু মেঘনাদ গম্ভীর হয়ে গেল।

কোনো কথা না বলে উঠে চলে গেল সে। আমি কিছু বুঝতে পারলাম না, একটু অবাকই হলাম।

এর পর অনেক দিন কেটে গেছে। ওদের খোঁজ-খবর আর পাইনি। খুব আনন্দেই ওদের দিন কাটছে ব'লে মাঝে-মাঝে হেনার সঙ্গে আলোচনা করেছি।

কাল আবার এসেছিল মেঘনাদ, মুখ শুকিয়ে গেছে, চুল রুক্ষ। স্থির হয়ে সে বসল, ধীরে ধীরে বলল, তুই নাকি লিখিস-টিকিস। আমার জীবনের কথা তোকে বলব। এই নিয়ে দ্যাখ্-না একটা উপন্যাস হয় কি না।

* পলিকার্প কুশ্ ও তাঁর আবিষ্কার *
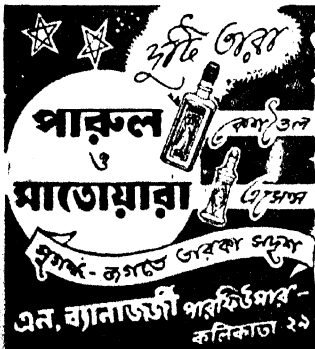
বিজ্ঞান ভিক্ষু

(১)

এ বৎসর পদার্থ-বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কারের অংশীদার দুইজন; কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর পলিকার্প কুশ্ আর কালিফোর্নিয়ার স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর উইলিস ই ল্যাম্ব। কলম্বিয়া থেকে স্ট্যানফোর্ড—মার্কিন যুক্তরাজ্যের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত, অতলান্তিকের এক কূল থেকে প্রশান্ত মহাসাগরের আর এক কূলে। কিন্তু বিজ্ঞান-রাজ্যে এই দুই কূলের ব্যবধান সামান্য, গবেষণার পথে এই দুই বিশ্ববিদ্যালয় শুধু সহযাত্রী নয়, আজ শ্রেষ্ঠ সম্মানের সহভোগীও বটে। আর এই গৌরব যাঁরা অর্জন করিলেন সেই অধ্যাপক কুশ্ ও ল্যাম্বও তেমনি বিজ্ঞান ক্ষেত্রে পরস্পরের নিকট-প্রতিবেশী, দুই-জনেই পরমাণুবিদ্, আরও সঠিকভাবে দুইজনেই নিউক্লিয়াস্-বিজ্ঞানী।

বোমার দৌলতে আণবিক বা পারমাণবিক কথা দুইটি যেমন চালু হইয়া গিয়াছে, নিউক্লিয়াস্ কথাটি তেমন নয়; যদিও ঠিকভাবে বলিতে গেলে আণবিকও নয়, পারমাণবিকও নয়, হিরোশিমার বোমা নিউক্লিয়াসিক। কারণ প্রলয়ের আগুন যে বীজের মধ্যে লুকান আছে, সে পরমাণুরও গভীরে—এই নিউক্লিয়স্ বা কেন্দ্রকের মধ্যে। যেমন স্থূল পদার্থ বিশ্লেষণ করিয়া মেলে উপাদান, আবার উপাদানকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ক্ষুদ্রত্বের অতল খাদে অবতরণ করিয়া আমরা পৌঁছাই অণুতে, তারও পরে পর-

ডক্টর পলিকার্প কুশ্

ডক্টর উইলিস ই ল্যাম্ব

মাণ্বতে, তেমনি আরও গভীরে, পরমাণ্ব থেকেও পরমাণীয়ান্, সূক্ষ্ম থেকেও সূক্ষ্মতর আমাদের এই পরমাণ্ব-কেন্দ্রক। আমের যেমন আঁটি, পরমাণ্বর তেমনি কেন্দ্রক, অবশ্য পরমাণ্বকে যদি একটা বড় ফজলীর সঙ্গে তুলনা করা যায়, তবে তার আঁটিটি হওয়া চাই একটি সরিষার চেয়েও অনেক ছোট। কারণ কেন্দ্রকের ব্যাস গোটা পরমাণ্বর ব্যাসের প্রায় এক লক্ষ ভাগের এক ভাগ। কিন্তু আমাদের এই উপমার বিড়ম্বনা এই যে, সরিষার চেয়ে ছোট আঁটিওয়ালা আম পাইলে খ্বই খ্শী হওয়ার কথা, কিন্তু উপমা রাখিতে গেলে শাঁস রাখা যায় না; কারণ পরমাণ্বর কেন্দ্রকের বাহিরে সবটাই বলিতে গেলে একদম ফাঁকা। স্বতরাং গজভুক্ত কপিত্থের মত সব শাঁস একদম নিষ্কাশন করিয়া সেই ফাঁপা খোলের মধ্যে কেন্দ্রকের চারিদিকে কতকগ্বলি ক্ষ্বদ্রাতিক্ষ্বদ্র বিদ্যুৎকণিকা বসান দরকার —যারা কেবলই লাটিমের মত নিজের মের্বদণ্ডের উপরও পাক দেয়, যাকে বলা হয় স্ব-ঘূর্ণন (ইনট্রিন্সিভ স্পিন বা আহ্নিক গতি) আবার আপন আপন কক্ষপথে কেন্দ্রকের চারিদিকে ঘ্বরিতে থাকে, যাকে বলা হয় কক্ষ-পরিক্রমণ (অরবিটাল রোটেশন)। এই সব বিদ্যুৎ-কণার নাম ইলেকট্রন। যে চলবিদ্যুৎ আমাদের আলো জ্বালায়, পাখা ঘোরায়, তাহা এই ইলেকট্রনকণার স্রোত। পাম্পের সাহায্যে যেমন পাইপের মধ্যে জলের স্রোত পাঠান হয়, তেমনি ডাইনামোও একটি পাম্পবিশেষ, তামার তারের মধ্য দিয়া এই ইলেকট্রন-স্রোত প্রবাহিত করাই তার কাজ।

এই ইলেকট্রনের বিদ্যুৎ ও কেন্দ্রকের বিদ্যুৎ বিপরীতধর্মী ও পরিমাণে সমান বলিয়া সাধারণভাবে সমস্ত পরমাণ্ব বিদ্যুৎ-নিরপেক্ষ। এইর্প বিদ্যুৎ-নিরপেক্ষ দ্বই বা ততোধিক পরমাণ্ব মিলিয়া এক-একটি অণ্ব, আর অগণিত অণ্ব মিলিয়া দৃশ্যমান পদার্থ।

পরমাণ্ব মাত্রেই মৌলিক অর্থাৎ কুলীন অর্থাৎ তাদের জাত আছে, কিন্তু অণ্ব বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই পাঁচমেশালী। অবশ্য একই জাতের পরমাণ্ব মিলিয়া যে অণ্ব তাকে বলা যায় মৌলিক অণ্ব। যেমন সিসিয়ম্ একটি মৌলিক ধাতু, ইহার অণ্বতে দ্বইটি সিসিয়ম্ পরমাণ্ব পরস্পর একটা নিবিড় আকর্ষণে আলিঙ্গনবন্ধ হইয়া আছে। আলিঙ্গন-বন্ধ বলার চেয়ে পায়রা-দম্পতির মত একে অন্যের পিছনে একটা চক্রাকার পথে কেবলই ঘ্বরপাক খাইতেছে বলাই ভাল। পায়রা-দম্পতির প্রণয়-গভীরতা মাপিবার কোনও যন্ত্র নাই। কিন্তু সিসিয়ম্ পরমাণ্ব দ্বইটি যে বন্ধনে আবদ্ধ সেই অণ্ব-বন্ধনের পরিমাণ সঠিক নির্ধারণ করা সম্ভব। আশ্চর্য মনে হইলেও সত্য, আর যিনি এই অণ্ব-বন্ধনের পরিমাণ মাপিয়া দিয়াছিলেন তিনিই আজকের জগদ্বিখ্যাত অধ্যাপক ডক্টর পলিকার্প কুশ্।

শ্বধ্ব অণ্ব-বন্ধন নির্ণয় নয়, সিসিয়মের বর্ণালী বিশ্লেষণ করিয়া ন্বতন আলো-রেখার সন্ধান তাঁর প্রথম গবেষণা—আর ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে বিজ্ঞান পত্রিকায় প্রকাশিত সেই নিয়া তাঁর প্রথম গবেষণা-নিবন্ধ। নিবন্ধ না বলিয়া লিপিকা বলাই ভাল। কত সন্তর্পণে লেখা গ্বটি দ্বই তথ্যের নিবেদন, সিসিয়মের বর্ণালীতে অজানা আলো-রেখার অস্তিত্বের সংবাদ!

আমরা জানি সূর্যের আলো ত্রিশিরা কাঁচের ভিতর দিয়া পাঠাইলে পর্দার উপর সাত রঙের আলোর সারি পাওয়া যায়, তাকেই বলে বর্ণালী। বৃষ্টির পর বাতাসে ভাসমান জলকণায় বিশ্লিষ্ট হইয়া সূর্যের আলো আকাশে যে বর্ণালী সৃষ্টি করে আমরা তাকে বলি রামধন্ব। আবার পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, কোনও পদার্থ গরম করিতে থাকিলে শেষে উজ্জ্বল হইয়া যে আলো দেয়, বিশ্লেষক-যন্ত্রে সেই আলোরও বর্ণালী পাওয়া যায়। তবে সেই বর্ণালীতে রামধন্বর রঙের বাহারের বদলে সারি সারি অতি সর্ব আলোর রেখা পাওয়া যায়। ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের বর্ণালীর আলোরেখাগ্বলি ভিন্ন, স্বতরাং বর্ণালীও স্বতন্ত্র। আরও আশ্চর্য এই, ধমক খাইলে ইস্কুলের ছোট ছেলেরা যেমন যার যার জায়গায় গিয়া বসে, তেমনি বর্ণালী-যন্ত্রের মধ্যস্থ ত্রিশিরা কাঁচের (বা স্ফটিকের) কাছে কানমলা খাইয়া এই নানা রঙের আলোরেখাগ্বলি স্থিত ক্যামেরার পর্দায় ঠিক নিজ জাগয়ায় গিয়া বসে। ইহার [illegible] ব্যত্যয় হয় না। পরমাণ্বকে উ[illegible] করিয়া এই যে বর্ণালী ইহাকে রেখা-বর্ণালী (অ্যাটমিক স্পেকট্রাম) আবার অণ্বকে পরমাণ্বতে বিশ্লিষ্ট করিয়া উত্তেজিত আণবিক অবস্থায় বর্ণালী পাওয়া যায় তার আলো[illegible] গ্বলি স্থ্বল এবং তাকে বলে [illegible] বর্ণালী (ব্যান্ড স্পেকট্রাম) [illegible] কোনও বর্ণালীর ছবির বৈশিষ্ট্য দেখি[illegible] কোন্ পরমাণ্বর বা অণ্বর বর্ণালী [illegible] চেনা যায়। এই অণ্ব-বর্ণালী নিয়ে[illegible] নিয়াই অধ্যাপক কুশের প্রথম গবেষ[illegible] এবং সেই থেকেই সিসিয়ম্, রুবিডি[illegible] প্রভৃতি অণ্বর ঘরের খবর আজ আম[illegible] জানি।

কিন্তু আমরা অনেকেই জানি [illegible] যে, ঐ খবরটুকু সংগ্রহ করার জ[illegible] আজকের নোবেল-বিজয়ী কুশ্ [illegible] বৎসর আগে ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে গবেষণা কর্মী মিঃ পলিকার্প কুশ্রূপে গবেষণা[illegible] গারের নির্জনে ধৈর্য আর অধ্যবসায়ে[illegible] পরীক্ষা দিতেছিলেন। কুশ্ [illegible] গবেষণাকর্মী, কাজ করেন ইলিনয়েস বিশ্ববিদ্যালয়ে, অধ্যাপক এফ্ ডব্ল[illegible] ল্বমিসের তিনি ছাত্র। অধ্যাপক ল্বমিস তখন আণবিক গবেষণা নিয়া ব্যস্ত[illegible] তাঁর অধীনে আরও ছাত্র আছেন, কুশ তাঁদেরই একজন, প্রথম গবেষণায় হাতে খড়ি। কিন্তু তর্ণ বট যেমন আপ[illegible] সহজাত শক্তিতে তার কৈশোরের আরণ্য[illegible] সঙ্গীদের ছাড়াইয়া উঠে, তেমনি নবী[illegible] গবেষকও আপন বৈশিষ্ট্যে সকলে[illegible] দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন পদার্থ থেকে পদার্থান্তরে তাঁর সন্ধানী শক্তি নিয়ো[illegible] করিয়া অণ্ব-বন্ধনের পরিমাণ নির্ধারি[illegible] করিয়া, অণ্ব-বর্ণালী (ব্যান্ড স্পেকট্রাম) বিশ্লেষণ করিয়া গবেষণা-নিব[illegible] প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এই সম[illegible] অধ্যাপক ল্বমিস্ বর্ণালীর উপর চুম্বক শক্তির প্রতিক্রিয়া (ম্যাগনেটিক রোটেশন স্পেকট্রাম) অন্বসন্ধানের জন্য যে য[illegible] খাড়া করিয়াছিলেন তাহাতে শ[illegible] লোহিতাতীত (ইনফ্রা-রেড) ও দৃশ্য রশ্মি পর্যবেক্ষণ করা চলিত। পলিকা[illegible]

রেখ-বর্ণালী (অ্যাটমিক্‌ স্পেকট্রাম)
(ক) পারদ জ্বালাইয়া যে আলো পাওয়া যায়, তার বর্ণালীর ছবি
(খ) হিলিয়াম গ্যাস থেকে অনুরূপ বর্ণালীর ছবি
দ্রষ্টব্যঃ দুইটি বর্ণালীর আলোকরেখার সারি স্বাতন্ত্র

...ন্ত্রের উন্নতি সাধন করিয়া অণু-বর্ণালীর অতি-বেগুনী অঞ্চল পরীক্ষারও ব্যবস্থা করিলেন। এইরূপে ইলিনয়েস্ বিশ্ববিদ্যালয়ে কিঞ্চিদধিক তিন বৎসর কাটিয়া গেল।

বিজ্ঞানীদের আসরে তখন তিনি আর অর্বাচীন নন। যদিও "গুণীগণ গণনারম্ভে সসম্ভ্রম কটিনী" লাভ অর্থাৎ সসম্মান উল্লেখ তখনও তাঁর ভাগ্যে সম্ভব হয় নাই। কারণ যে কাজ তিনি করিয়াছিলেন সে পথে তিনি ত' পাইয়োনিয়র ছিলেন না। বর্ণালী বিশ্লেষণ দ্বারা নূতন তথ্য উদ্ঘাটন করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তিনি তখনও নূতনপন্থী। এ যেন কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের পর সেই নূতন মহাদেশের নানা অজানা অঞ্চল জরিপ-এতে অধ্যবসায় আছে, পরিশ্রম আছে, কিন্তু তবু আবিষ্কারের চাঞ্চল্য নাই। এখানে বলা ভাল যে, ডাঃ পলিকার্প কুশ্ বরাবরই তথ্যবিজ্ঞানী, নূতন তথ্য উদ্ঘাটনই তাঁর সাধনা, সেই তথ্যের ভিত্তি অনুধাবন তাঁর কাজ নয়। কারণ তিনি তত্ত্ব-বিজ্ঞানী নহেন। প্রকৃতির রাজ্যে নূতনের সন্ধানই তাঁর লক্ষ্য, দুর্ধর্ষ নাবিকের মত নূতন দ্বীপ, অজানা দেশ, তার অমূল্য পণ্য সংগ্রহ করাই তাঁর ব্রত।

সেই ব্রত উদ্‌যাপনের প্রথম অধ্যায় শেষ করিয়া তিনি ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি ইলিনয়েস্ থেকে বিদায় নিলেন, যোগ দিলেন মিনেসোটা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে। জীবনের উন্নতির পথে এখানে তাঁর প্রথম পদক্ষেপ। সেখানকার গবেষণাগারে তিনি আর ছাত্র নন, বরং সহযোগীদের নিয়া তিনি নূতন উদ্যমে কাজ শুরু করিলেন। মিনেসোটা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে তিনি বেশী দিন থাকেন নাই। এখানে তাঁর পুরাতন কাজেরই পুনরনুবৃত্ত, অবশ্য পদ্ধতি ছিল নূতন। সেলেনিন্ আর এথিলিনের ইলেকট্রন-বন্ধন নির্ণয় চেষ্টায় তিনি অন্য ধরনের পরীক্ষা শুরু করেন। শক্তিশালী ইলেক্‌-ট্রনিকদের স্রোতকে বুলেটের মত ... অণুপুঞ্জকে নিক্ষেপ করিয়া, এই সব অণুকে আংশিকভাবে আঘাত করিয়া তাহাতে ইলেকট্রন বিচ্ছিন্ন (আয়োনাইজড্) অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি কিঞ্চিদধিক এক বৎসরকাল মিনেসোটায় ছিলেন। তারপর যোগ দেন কলাম্বিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়ে।

(২)

যে কথা বলিতেছিলাম, প্রথম অণু, তারপর পরমাণু, তার পরে কেন্দ্রক; যেন অতলস্পর্শী রহস্যের খনিতে অব-তরণের পর পর তিনটি ধাপ। ডক্টর কুশ্‌ও সেই ধাপে ধাপে অগ্রসর হইয়া গভীর থেকে গভীরতর রহস্য উদ্ঘাটনে নিবিষ্ট হইলেন। প্রথমে ইলিনয়েস্ গবেষণাগারে ছিলেন মৌলিক অণু গবেষণায় লিপ্ত, তারপর মিনেসোটার বিশ্লিষ্ট যৌগিক অণু ছিল তাঁর পর্য-বেক্ষণের বিষয়, তারপর থেকে অদ্যাবধি তিনি পরমাণু আর কেন্দ্রকের তথ্য উদ্ঘাটনে ব্যাপৃত। তিনি এই গবেষণা-গারে যোগ দেওয়ার কিছুকাল পরেই ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে তথ্য-বিজ্ঞানের চাঞ্চল্য-কর আবিষ্কার। অবশ্য এই আবিষ্কারের কৃতিত্ব তাঁর একার নয়, আরও তিন জন সহযোগী ছিলেন। প্রথম বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক রাবি, তারপর জ্যাকোরিয়া, মিলম্যান, তারপর কুশের নাম। তাঁরা আবিষ্কার করিলেন কেন্দ্রকের চুম্বক-শক্তির পরিমাপের একটি নিখুঁত যান্ত্রিক পদ্ধতি, যাকে বলা যায় "চুম্বক প্রভাবিত আণবিক স্রোতের অতি-সাড়া (রিজোনেন্স) পদ্ধতি বা ইংরেজীতে মলিকুলার বিম ম্যাগনেটিক রিজোনেন্স মেথড। কেন্দ্রকের এই চুম্বকশক্তি বলিতে আমরা কি বুঝি?

চুম্বক আমরা সকলেই দেখিয়াছি, প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থেও অয়স্কান্ত মণির উল্লেখ আছে (অয়স্=লৌহ, কান্ত= স্বামী)। মাকড়সা যেমন তার চার পাশে জাল পাতিয়া শিকারের জন্য বসিয়া থাকে, তেমনি চুম্বকও তার দশ দিকে একটা আকর্ষণের জাল পাতিয়া আছে। যখনই নাগালের মধ্যে কোন লৌহ বা নিকেল ঢুকিয়া পড়ে তখনই জাল গুটাইয়া (Contraction of Faraday tubes) চুম্বক তাকে টানিতে থাকে। এই আকর্ষণের জালকে বলা হয় চুম্বক-ক্ষেত্র (ম্যাগনেটিক ফীল্ড)। আবার চুম্বক শুধু আকর্ষণ করে ইহাই সাধারণ ধারণা, কিন্তু আসলে চুম্বক বিকর্ষণও করে।

অণু-বর্ণালী (ব্যাণ্ড স্পেকট্রাম্) কার্বন অণু উত্তেজিত করিয়া যে বর্ণালী পাওয়া যায়, **রেখ-বর্ণালীর** সঙ্গে পার্থক্য দ্রষ্টব্য

দুইটি চুম্বকের সমধর্মী দুই প্রান্ত পরস্পরকে ঠেলিয়াও দেয়।

এদিকে আম্পিয়র আবিষ্কার করিলেন যে, যদি চলবিদ্যুৎবাহী একটি তারের আংটির নিকট কোন লোহখণ্ড বা অপর একটি চুম্বক আনা যায়, তবে সে ক্ষেত্রেও আকর্ষণ (বা বিকর্ষণ) অনুভূত হয়। সুতরাং চলবিদ্যুতের চারিদিকেও চুম্বকক্ষেত্র আছে। আগেই বলিয়াছি পরমাণুর ভিতরে ইলেকট্রন স্থির নয়, তার দুই রকম গতি আছে, প্রথমত কক্ষ-পরিক্রমণ আর দ্বিতীয় তার লাটিমের মত স্ব-ঘূর্ণন। সুতরাং ইলেকট্রনের এই দুই গতির সঙ্গেও দুইটি চুম্বকক্ষেত্র জড়িত থাকা উচিত।

যে বর্ণালীর কথা আগেই বলিয়াছি তার আলোরেখা পরীক্ষা করিয়া বিজ্ঞানীরা দেখাইয়াছেন যে, একই ইলেকট্রনের এই দুইটি বিভিন্ন চুম্বকক্ষেত্র পরস্পরের উপর যে আকর্ষণ-বিকর্ষণ করে তার ফলে প্রাথমিক বর্ণালীর এক-একটি আলোরেখা বিশ্লিষ্ট হইয়া সূক্ষ্ম রেখা-সমষ্টিতে পরিণত হয়, এই রেখা-সমষ্টিকে বলে সূক্ষ্ম-বর্ণালী (ফাইন স্ট্রাকচার)।

কিন্তু কিছুদিন পরেই আর একটা সমস্যা দেখা দিল। উন্নততর বর্ণালী-যন্ত্র দিয়া দেখা গেল যে, উল্লিখিত সূক্ষ্ম-বর্ণালীর যে সব ক্ষীণ আলোরেখাকে পূর্বে একক ভাবা গিয়াছিল, আসলে তারা একক নয়, তাদের প্রায় প্রত্যেকে আবার এক ঝাঁক ক্ষীণতর আলোরেখার সমষ্টি, অর্থাৎ এই সব সূক্ষ্ম আলোরেখা নিজেরা আবার এক-একটি স্বতন্ত্র অতি-সূক্ষ্ম-বর্ণালী (হাইপার-ফাইন স্ট্রাকচার)। এই অতি-সূক্ষ্ম-বর্ণালীর ক্ষীণ আলোরেখায় অবস্থান তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ইত্যাদি বুঝিতে গিয়া বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক পাউলি সর্বপ্রথম প্রস্তাব করেন যে, বিদ্যুৎধর্মী পরমাণু-কেন্দ্রকটিও একটি চুম্বক। যেহেতু চলবিদ্যুতের সঙ্গেই চুম্বকত্ব থাকিতে পারে অতএব কেন্দ্রক স্থির নহে, ইলেকট্রনের মত তারও স্ব-ঘূর্ণন আছে! অর্থাৎ কেন্দ্রকটিও যেন নিজের পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের উপর ভর দিয়া ভঙ্গিভরে দাঁড়াইয়া বস্তুত একটু হেলিয়া বন্ বন্ করিয়া নিজের উপর পাক দিতেছে। বিচিত্র বটে! অতএব এক পরমাণুর মধ্যেই যদি দুইটি চুম্বক থাকে, একটি ইলেকট্রন আর অপরটি এই কেন্দ্রক, তবে এই দুইটি চুম্বকও পরস্পরকে আকর্ষণ বিকর্ষণ করিবে ইহাই ত' স্বাভাবিক এবং পাউলি দেখাইলেন যে, বস্তুতই ইহারই ফলে অতি-সূক্ষ্ম-বর্ণালীর সৃষ্টি।

কিন্তু এই অতি-সূক্ষ্ম-বর্ণালী বিশ্লেষণ থেকে কেন্দ্রকের যদিও স্ব-ঘূর্ণন মাপা যায়, কিন্তু তার চুম্বকশক্তি মাপা দুরূহ এবং গৌণও বটে। যদি কোনও মুখ্য উপায়ে স্বতন্ত্রভাবে কেন্দ্রকের এই চুম্বকশক্তি মাপা যাইত? 'অহো তবে ত' কেন্দ্রকেরও রহস্যময় অন্তঃপুরে প্রবেশের পথ আমাদের কাছে খুলিয়া যাইত! বিজ্ঞানীরা চঞ্চল হইয়া উঠেন, তারপর চমকিয়া উঠেন সেই চেষ্টার সাফল্যে, এই চুম্বকশক্তি মাপিবার একটি চাঞ্চল্যকর পদ্ধতি আবিষ্কারের ঘোষণায়। এইখানেই অধ্যাপক কুশ্ প্রভৃতির আবিষ্কারের সার্থকতা এবং তাঁহাদের আবিষ্কৃত এই আণবিক অতি-সাড়া পদ্ধতি শুধু যে নূতন তাই নয়, এত নিখুঁত যে ভাবিলে অবাক হইতে হয়। স্বয়ংসিদ্ধের মত এই যান্ত্রিক পদ্ধতির ফলাফল সন্দেহাতীতভাবে চুম্বকশক্তির এক-এককের সহস্রাধিক ভাগের এক সূক্ষ্ম ভাগ পর্যন্ত মাপিয়া দিতে সমর্থ।

অবশ্য আগেই বলিয়াছি অধ্যাপক পলিকার্প কুশ্ এই গৌরবের নিঃসঙ্গ অধিকারী নহেন। এই যুগান্তকারী আবিষ্কারের সঙ্গে তাঁর নাম জড়িত আছে একজন সহযোগীর মত। বস্তুত এই সহযোগিতার নীতি ডক্টর কুশের চরিত্রের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য বলা চলে। যতদূর আমরা জানি, আজ পর্যন্ত তিনি ছাপ্পান্নটি গবেষণামূলক নিবন্ধ রচনা করিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্য এই, তার মধ্যে মাত্র ছয়টি প্রবন্ধ একক নিজ নামে প্রকাশিত, বাকী সমস্তই সহযোগীদের সঙ্গে সমবেতভাবে প্রচারিত। গুরুর সঙ্গে, ছাত্রের সঙ্গে, বন্ধুর সঙ্গে, সহ-অধ্যাপকের সঙ্গে সমান সহযোগিতা। প্রায়শ সকলের পশ্চাতে নি[...] লিখিয়া দিয়া আবার নি[...] গিয়াছেন পরবর্তী অনুসন্ধা[...] তাই আজ তিনি নোবে[...] হইয়াও তাঁর ব্যক্তিগত জীব[...] লোকলোচনের অন্তরালে। ত[...] টুকু সংগ্রহ করিয়াছি সে[...] জীবনের সংবাদ। এ যেন ক[...] "সবার পিছনে, সবার আড়া[...] কেবলই ঢাকিয়া" রাখার চেষ্টা[...]

যে আণবিক অতি-সাড়া[...] জন্য তিনি আজ বিখ্যাত, তা[...] কিছু জটিল। মোটামুটি ব্যা[...] প্রথমত যে উপাদানের কেন্দ্র[...] শক্তি পরিমাপ করিতে হই[...] উত্তাপ দিয়া বাষ্পীভূত করা[...] পর এই বাষ্পীয় অণুর স্রো[...] থেকে গ্রাহক-যন্ত্রের (ডিটেক্ট[...] একটা সরল পথে দ্রুতগতি চা[...] হয়। এই চলার পথে[...] প্রথমত একটি বিপুলশক্তিস[...] দ্বারা প্রভাবিত হয়। এই[...] চুম্বক ক্ষেত্রের শক্তি এত[...] ইলেকট্রন ও কেন্দ্রকের মধ্যে[...] বন্ধনের কথা আগে বলি[...] বন্ধন বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। এই চুম্বক-বন্ধন-বিচ্ছিন্ন (ele[...] স্বাধীন অণুস্রোতকে দ্বিতী[...] একটি চুম্বক দিয়া গ্রাহকয[...] (focus) করার ব্যবস্থা আছে। যন্ত্রে এই অবস্থায় ধৃত আণবি[...] পরিমাণ থাকে সবচেয়ে বেশ[...] অবস্থায় ঐ দুই চুম্বক ক্ষে[...] একটি তারের আংটি ঝুলাইয়া[...] প্রত্যাবর্তনশীল চলবিদ্যুৎ (অল[...] কারেন্ট) অতিদ্রুত চালনা[...] প্রত্যাবর্তনশীল চলবিদ্যুৎ[...] কেবলই দিক বদল করে বা[...] সঙ্গে জড়িত যে চুম্বকক্ষেত্র[...] কেবলই দিক পরিবর্তন করে[...] মূলত এই তৃতীয় চুম্বক ক্ষেত্র[...] পড়ে প্রথম চুম্বক ক্ষেত্রের সঙ্গে[...] ভাবে। দেখা গেছে, এই অবস্থায়[...] গুলি প্রথম চুম্বক ক্ষেত্রকে[...] করিয়া তার চারিদিকে মের[...] একটু হেলাইয়া ঘুরাইতে থাকে, সঞ্চালনকে বলে লারমর্[...]

...ীয় চুম্বক ক্ষেত্রের দিক পরি-...হার বা ফ্রিকোয়েন্সি (অর্থাৎ ...যতবার দিক পরিবর্তন করে ...খ্যা) কেন্দ্রকের শির-সঞ্চালনের ...or precession) হারের কাছা-...হয় তখন উহাদের মধ্যে একটা সাড়া পড়িয়া যায় এবং অণু-বিভক্ত হইয়া গ্রাহকযন্ত্রের দিকে ...য়া ভিন্ন পথে পরিচালিত হয়। ...ং গ্রাহকযন্ত্রে প্রাপ্ত অণুর পরিমাণ পাইতে থাকে। যখন উক্ত দুইটি প্রায় সমান হয় সেই অবস্থাকে বলে সাড়া বা রিজোনেন্স। আর সেই ...ায় গ্রাহকযন্ত্রে প্রাপ্ত অণুর ...াণ ন্যূনতম। এই অবস্থায় ...ছলেই কার্যসিদ্ধি। তখন চল-...তের প্রত্যাবর্তনবেগ, কেন্দ্রকের ... ও চুম্বকশক্তি, আর প্রথমোক্ত ...-ক্ষেত্রের মান মিলাইয়া একটা ...সূত্র প্রমাণ হয়। অর্থাৎ তখন এই ...করণটি খাটে ঃ—

$$\text{...লবিদ্যুৎ প্রত্যাবর্তনের হার} = \frac{\text{কেন্দ্রক-চুম্বকশক্তি} \times \text{প্রথম চুম্বক-ক্ষেত্রের শক্তি}}{\text{কেন্দ্রকের ঘূর্ণন} \times \text{প্ল্যাঙ্কের স্থিরাঙ্ক}}$$

...সূত্রে এক কেন্দ্রকের চুম্বকশক্তি ছাড়া ... সমস্ত রাশি জানা কিংবা উক্ত ...ক্ষায় মাপিয়া ঠিক করা যায়, অতএব ...দ্রকের চুম্বকশক্তির মান অনায়াসে ...র্ণয়।

... এই আবিষ্কারের দুই বৎসরের মধ্যে ...থিয়ম, ক্লোরিন, নাইট্রোজেন, সোডিয়ম, ...াশিয়ম, সিসিয়ম, বেরিলিয়ম ইত্যাদি ... অণু ও পরমাণু নিয়া অধ্যাপক ... তাঁর গবেষণা চালাইলেন এবং ...নি ও তাঁর সহযোগীরা বহু নিবন্ধ ...াশ করিলেন। শুধু তাই নয়, আরও ...না শ্রেণীর পরীক্ষা চলিল। অতি-...ক্ষ্ম বর্ণালী বিশ্লেষণ, বিজ্ঞানী ...ম্যান আবিষ্কৃত বর্ণালীর উপর ...বকের প্রতিক্রিয়া নিয়া পরীক্ষা, ...দ্রকের কোয়াড্রুপল, অক্টুপল চুম্বক-...ক্তি নির্ণয় ইত্যাদি।

...ন্তু এই নিবিষ্ট গবেষণার ...ায় হইয়া দাঁড়াইল বিশ্বব্যাপী ...যুদ্ধ। ১৯৪১ সাল থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত সর্বগ্রাসী যুদ্ধের দাবী মিটাইতে মারণাস্ত্রের সন্ধানে অধিকাংশ বিজ্ঞানীর স্বনির্বাচিত গবেষণার পথ ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। এই কয় বৎসর যেন বৈজ্ঞানিকদের অজ্ঞাতবাসের কাল। ডাঃ কুশ্‌ও সেই অজ্ঞাতবাস থেকে রেহাই পান নাই। মহা আশংকার মৌন মন্ত্র-জপ চলিতে লাগিল। উত্তরের শীতল বাতাসে বিরল-পত্র তরুর মত সমস্ত বিজ্ঞান পত্রিকা ক্ষীণ হইয়া চলিল। যে অরণ্য একদা বহুজনের যত্নে ফলসম্ভারে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতেছিল, তাহাই পরিত্যক্ত কাননের মত শোভাহীন হইয়া উঠিল।

মহাযুদ্ধের সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে আবার নূতন উদ্যমে গঠনের উদ্যোগ চলিতে লাগিল। অধ্যাপক কুশ্‌ ও তাঁর সহযোগীরাও সযত্নে ও বহু অধ্যবসায়ে যে সব দুর্লভ তরুরাজিকে বর্ধিত করিয়া তুলিয়াছিলেন আবার নূতন করিয়া তার তলে বারি সিঞ্চন চলিল, আবার সেগুলি নূতন ফলভারে পূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল। পত্র-পত্রান্তরাল থেকে নূতন গবেষণার ফল সযত্নে সংগৃহীত হইতে লাগিল।

এইখানে আর দুই-একটি কথা না বলিয়া শেষ করিতে পারি না। অধ্যাপক কুশ্‌ যে কেন্দ্রকের চুম্বকশক্তি সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিলেন তার রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য, কেন্দ্রকের অন্তস্থ কণিকাসমূহের (প্রোটন্‌ নিউট্রন) বিশেষ অবস্থান ও ঘূর্ণনের রহস্য জানিবার জন্য সর্বত্র তত্ত্ববিজ্ঞানীদের মধ্যে দারুণ উদ্দীপনা দেখা দিয়াছে এবং এই বিশ্ব ঐকতানে ভারতবর্ষও দুই একটি তার বাঁধিয়া দেওয়ার জন্য সচেষ্ট। যেমন বিদেশে তেমনি এখানেও এই কেন্দ্রকের চুম্বকধর্ম সম্বন্ধে তাত্ত্বিক গবেষণা আজ চলিতেছে। আর সেই প্রচেষ্টায় অধ্যাপক কুশের প্রদত্ত এই নূতন তথ্যসম্ভার শুধু যে অপরিহার্য তাই নয়, আজও অবিসংবাদী।

বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষ হইতে বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনার একটি প্রতিযোগিতা আহ্বান করা হইয়াছে। বিজ্ঞানের নিম্নলিখিত শাখা দুইটির অন্তর্গত যে কোন বিষয়বস্তু অবলম্বন করিয়া সহজে সরল ভাষায় জনপ্রিয় প্রবন্ধ পাঠাইতে হইবে—(ক) জড়বিজ্ঞান—পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, ধাতুবিজ্ঞান, ইত্যাদি। (খ) জীববিজ্ঞান—উদ্ভিদ বিজ্ঞান, প্রাণী বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান, শারীরবৃত্ত ইত্যাদি বিষয় দুইটির প্রত্যেকটির জন্য উৎকৃষ্ট প্রথম তিনটি প্রবন্ধের রচয়িতাদের প্রত্যেককে ৫০্ পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে। মোট পুরস্কারের সংখ্যা ছয়টি। ইহা ছাড়া উপযুক্ত বিবেচিত হইলে আরও কয়েকটি পুরস্কার দেওয়া যাইতে পারে।

প্রবন্ধ কালি দিয়া কাগজের এক পিঠে পরিষ্কার হস্তাক্ষরে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। প্রতিটি প্রবন্ধের আয়তন ফুলস্ক্যাপ (১৩"×৮") ৮ পৃষ্ঠার অধিক বা ৬ পৃষ্ঠার কম না হওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রবন্ধের উপর লেখকের কোন নাম ঠিকানা থাকিবে না—তাহা পৃথক কাগজে লিখিয়া সংলগ্ন করিয়া দিতে হইবে।

সকল প্রবন্ধ আগামী ৩১শে জানুয়ারী '৫৬ তারিখের মধ্যে পরিষদ কার্যালয়ে কর্ম-সচিব, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, ৯৩, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৯, এই ঠিকানায় প্রেরিতব্য।

দামের তুলনায় অনেক বেশী শক্তি পাবেন!

ব্যবহার করুন

আপনার এঞ্জিনের শক্তি ক'মে যাওয়ার অন্ততঃ পাঁচটি বড় বড় কারণ এঞ্জিনীয়াররা দেখাতে পারেন।' কাজেই, পেট্রলে একটিমাত্র অ্যাডিটিভ থাকলে সেই পাঁচ-পাঁচটি গলদ দূর হওয়া যে সম্ভব নয়, একথা ব'লে বোঝাবার দরকার করে না।

আজ থেকেই দ্বিবিধ-শক্তিসম্পন্ন মবিলগ্যাস নিন—একমাত্র এই পেট্রলেই মবিল পাওয়ার কম্পাউণ্ড মেশানো আছে—অনেকগুলি অ্যাডিটিভের এরকম শক্তিশালী সংমিশ্রণ আজ পর্যন্ত কোনো পেট্রলে মেশানো হয়নি।

যে কোন মেকারের এঞ্জিন হোক্ না কেন, দ্বিবিধ-শক্তিসম্পন্ন মবিলগ্যাস ব্যবহারে যত রকম গোলমাল সারে, অন্য কোন পেট্রলে তা হয় না। মবিলগ্যাস আপনার এঞ্জিনের শক্তি বাড়িয়ে দেবে। পেট্রল নিতে হলেই মবিলগ্যাস নিন, কারণ মবিলগ্যাস দামের তুলনায় অনেক বেশী কাজ দেয়।

স্ট্যাণ্ডার্ড-ভ্যাকুয়াম অয়েল কোম্পানী (কোম্পানীর সদস্যদের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ)

V 1041 (Rev)

চক্রদত্ত

যন্ত্রের যুগে মানুষ সবকিছুই যন্ত্রের সাহায্যে করতে চায়। এমন কি, গণিত-বিজ্ঞানেও এখন যথেষ্ট পরিমাণে যন্ত্রের সাহায্য নেওয়া হচ্ছে। যেমন বড় বড় অংক—যোগ, বিয়োগ ইত্যাদি এক মুহূর্তের মধ্যে যন্ত্র করে দিচ্ছে। ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট সম্প্রতি ২৫ লক্ষ টাকা দিয়ে সোভিয়েট রাশিয়া থেকে এইরকম একটি যন্ত্র ক্রয় করেছেন। এই যন্ত্রটিকে 'ইলেক্‌ট্রোনিক ব্রেন' বলা হয়। এই যন্ত্রটি বিরাট বিরাট হিসাব নির্ভুলভাবে খুব অল্প সময়ের মধ্যে করে ফেলতে পারবে। খুব কম করেও আধ ডজন নাম-করা অংকশাস্ত্র-বিদ্‌ যে সব অংক এবং হিসাব করতে অনেক সময় নেবেন, সেই কাজ এই 'ইলেক্‌ট্রোনিক ব্রেন' অল্প সময়ের মধ্যেই করে দিতে পারবে। এইরূপ বৃহৎ ইলেক্‌ট্রিক চালিত যন্ত্র সম্ভবত এশিয়ায় এই প্রথম। ইনস্টিটিউট এটি কলিকাতায় স্থাপিত করবেন বলে ঠিক করেছেন। যন্ত্রটি অবশ্য এখনো এসে পৌঁছয়নি।

*

জনৈক বিচারক রায় দেবার সময় বলেছেন যে, আজকাল কলকাতা শহরে যানবাহনের জন্য রাস্তায় চলাফেরা করা বিষধর সর্পসংকুল অরণ্যে চলাফেরা করার চেয়ে বিপজ্জনক। বাস্তবিক কল্‌কাতার রাস্তাঘাটে বের হয়ে গাড়ি, মোটর 'চাপা পড়াটা' অঘটন নয়, না 'চাপা পড়ে' ঘরে ফিরে আসাটাই যেন অঘটন বলে মনে হয়। অবশ্য বিজ্ঞান যে রকম এগিয়ে চলেছে তা'তে বোধ হয় এই দুঃখ কষ্ট আর বেশীদিন ভোগ করতে হবে না। কারণ ভবিষ্যতে সব মোটর গাড়ি-গুলো আর চলার পথে ভিড় না করে মাঝে মাঝে আকাশ পথে উড়ে যাবে। বৈজ্ঞানিকরা আশা করছেন যে, পাতলা দু' চাকার এক ধরনের মোটর গাড়ি তৈরি সম্ভব হবে যেটা প্রয়োজন হলে রাস্তা থেকে সোজা শূন্যে উঠে চলতে আরম্ভ করবে। অবশ্য এই মোটরগুলো 'এ্যাটম-ইলেক্‌ট্রিক্যাল' শক্তির সাহায্যে চলবে। তাছাড়া, এই গাড়িতে 'র‍্যাডার ব্রেক'-এর বন্দোবস্ত থাকবে যার ফলে প্রয়োজন হলে শূন্যে গাড়ি হঠাৎ থামিয়ে দেওয়া যাবে। তাছাড়া, এই গাড়িতে এমন বন্দোবস্তও থাকবে যে, গাড়ি হঠাৎ চলতে চলতে বিকল হয়ে গেলে পড়ে গিয়ে কোন দুর্ঘটনা ঘটাবে না। বৈজ্ঞানিকরা এই ধরনের গাড়ির নাম 'এয়ারমোবাইল' দেবার কথাও ভাবছেন। এয়ারমোবাইল রাস্তায় চলতে চলতে যদি দেখে যে, রাস্তায় যানবাহনের খুব ভিড় লেগে রয়েছে তাহ'লে শূন্যে উঠে গিয়ে চলতে আরম্ভ করবে—শুধু তাই না, কোন কারণে রাস্তায় যদি লাল আলোর সংকেত দেওয়া থাকে তাহ'লে এয়ার-মোবাইল আর না থেমে শূন্য দিয়ে উড়ে গিয়ে আলোর সংকেত এড়িয়ে চলে যেতে পারবে।
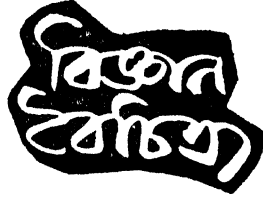
*

রোদ আর বৃষ্টি থেকে মাথা বাঁচাতে গেলে আমাদের ছাতার সাহায্য নিতে হয়। অবশ্য টুপি কিছুটা রোদ আটকাতে পারে, কিন্তু বৃষ্টির সময় খুব কাজে লাগে না। কিন্তু ছাতা আমরা অনেকেই ব্যবহার করতে চাই না, কারণ ছাতা মাথায় ধরে রাখা বিরক্তিকর। এই অসুবিধা একজন শৌখীন ভদ্রলোক কিছু পরিমাণে দূর করতে পেরেছেন। তিনি হাল্কা ধরনের একটা ছোট মাপের ছাতা তাঁর মাথার টুপির ওপরে সহজে আটকাবার ব্যবস্থা করে নিয়েছেন। আর প্রয়োজন না থাকলে সেটা খুলে ভাঁজ করে পকেটে রেখে দেওয়া যায়।

টুপির ওপর ছাতা আটকান আছে

*

'এইচ' বোমা, অর্থাৎ 'হাইড্রোজেন বম্ব' তার পাশেই 'এইচ টু ও' বোমা। প্রথমটি হচ্ছে মারাত্মক বোমা, ছোট একটা বোমা গোটা শহর সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিতে পারবে। আর দ্বিতীয় বোমাটি নেহাৎ নিরীহ 'জল বোমা'। ক্যানেডার ফরেস্ট ডিপার্টমেণ্ট দাবানল নেভাবার জন্য এক নতুন ধরনের 'এইচ টু ও বম্ব' বা জল বোমা তৈরি করেছেন। এই বোমা কাগজ, রবার ল্যাটেক্স এবং জল দিয়ে তৈরি। কোন বনে আগুন লাগলে সেখানকার কর্তৃপক্ষ এতদিন উড়োজাহাজের সাহায্যে কোথায় আগুন লেগেছে সেটা শুধু খুঁজে বার করতো। তারপর দমকল এসে সেখানকার আগুন নেভাবার ব্যবস্থা করত। কিন্তু এখন উড়োজাহাজ খবর পাওয়ার সংগে সংগে সেই আগুনের ওপর জল বোমা ফেলার বন্দোবস্ত করে। উড়োজাহাজ চালক তার উড়োজাহাজ কাছে পিঠে কোন হ্রদ অথবা নদীতে নামিয়ে জল বোমার খালি খোল-গুলি জলে ভরে নেয়। এক একটা বোমাতে প্রায় ৩১ গ্যালন করে জল ধরে। তারপর সেই বোমাগুলি এক একটা করে আগুনের ওপর প্রায় ২০০ ফিট ওপর থেকে ফেলতে থাকে। অবশ্য এতে আগুন সম্পূর্ণভাবে নেবে না বটে, তবে আগুনের তেজ কমে যাওয়াতে মাটির ওপরকার দমকলগুলো সহজেই আগুন আয়ত্তে আনতে পারে।

ধীরাজ ভট্টাচার্য

॥ সতেরো ॥

সন্দেহ সংশয় ভয়, অন্যদিকে আশা আকাঙ্ক্ষা কৌতূহল। এই সব-ক'টি অনুভূতি যখন একসঙ্গে জোট বেঁধে মনটাকে তোলপাড় করে ফেলে, তখন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায়, যুক্তিহীন বেপরোয়া যৌবনের অদম্য কৌতূহলই অন্য সবাইকে দাবিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়। আমারও ঠিক তাই হল। আগের দিন রাত্রে সম্ভব অসম্ভব অনেক রকম যুক্তি-তর্ক দিয়েও মনকে বোঝাতে পারলাম না যে, গোপার সঙ্গে দেখা না করাটাই হবে আমার পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ। শেষ পর্যন্ত বেপরোয়া হয়ে ভাবলাম, দেখাই যাক না কি বলতে চায় গোপা। আমার দিক থেকে এমন কোনও অপরাধ করিনি, যার জন্যে কাপুরুষের মত লুকিয়ে থাকতে হবে।

ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধে যখন পৌঁছলাম, তখন ছ'টা বেজে গেছে। শীতের সন্ধ্যা। মনে হল বেশ খানিকটা রাত হয়েছে। চারদিকে আলোর মালায় ঘেরা অগণিত স্বাস্থ্যান্বেষী স্ত্রী-পুরুষ ও শিশুর কলকণ্ঠমুখর প্রস্তরসৌধ যেন কিছুক্ষণের জন্য সজীব হয়ে উঠেছে। উত্তর দিকের ফুটপাথের গা ঘেঁষে দাঁড় করান গাড়িগুলোর নম্বর-প্লেটের উপর চোখ বোলাতে বোলাতে পূব থেকে পশ্চিম দিকে ধীরে ধীরে এগুতে লাগলাম। বেশ কিছু দূর এগিয়েও গোপাদের গাড়ির নম্বর দেখতে পেলাম না। ভাবলাম, তবে কি সমস্ত ব্যাপারটাই ভুয়ো ধাপ্পাবাজী? আমাকে বোকা বানিয়ে নিছক খানিকটা কৌতুক করাই এর মুখ্য উদ্দেশ্য? কিন্তু এ ব্যাপার নিয়ে আমার সঙ্গে এভাবের কৌতুক করতে পারে এমন কোন লোককে আমার স্মরণগণ্ডির মধ্যে অনেক চেষ্টা করেও খুঁজে পেলাম না। আবার এগুতে লাগলাম। ফুটপাথ প্রায় শেষ হয়ে এল, হঠাৎ দেখি দশ-বারো হাত দূরে অপেক্ষাকৃত একটু নির্জন ও অন্ধকার জায়গায় বিরাট কালো দৈত্যের মত দাঁড়িয়ে আছে একখানা গাড়ি, পিছনের টকটকে রেড লাইটের ঠিক নিচেই রক্তের অক্ষরে লেখা রয়েছে গোপার দেওয়া নম্বর—৫৬৭৮০। বুকের স্পন্দন বেড়ে গেল। ভাবলাম, চলেই যাই। এ সাক্ষাতের পরিণাম কোনও দিক দিয়েই যে শুভ হবে না তা জেনেও কেন—

লোভী যৌবন গর্জন করে উঠল—কাপুরুষ! জীবনটাকে পরিপূর্ণভাবে ভোগ করার বাসনা আছে, সাহস নেই। এ-রকম ভীরু মন নিয়ে আর কোনও দিন বাইরে বেরিও না। ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে বসে থেকো!

যা হবার হবে। এক পা দু'পা করে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালাম গাড়িটার পাশে। গাড়ির ভিতরটা অন্ধকার। আবছা আলোয় মনে হল একটি মহিলা বসে আছেন। কি করব না করব ভাবছি, এমন সময় ড্রাইভারের সিট থেকে নেমে এল পুরু খাকি প্যাণ্ট ও গলাবন্ধ কোট পরা ড্রাইভার। বুকের ডান পাশের হিজিবিজি মনোগ্রাম দেখে অনুমানে বুঝলাম, রায় বাহাদুরের নাম। ড্রাইভার দরজা খুলে পাশে দাঁড়াল, বুঝলাম গাড়িতে উঠতে বলছে। দুরু দুরু বক্ষে উঠে বসলাম। ড্রাইভার দরজা বন্ধ করে নিজের সিটে আদেশের অপেক্ষায় বসল। আমার সিটের অন্য ধার থেকে বেশ গুরুগম্ভীর গলায় আদেশ হল—'চালাও।'

একটু সোজা গিয়ে ডান দিকে মোড় নিয়ে গাড়ি মন্থরগমনে চললো রেড রোড ধরে। কিছু দূর গিয়ে একটি শাখাবহুল গাছের তলায় আসতেই আবার শুনলাম—'থামাও।'

গাড়ি থেমে গেল। আদেশ হল—'রঘুনন্দন, কাছাকাছি থেকো। ডাকলেই যেন পাই।'

মাথার গোল টুপিটায় ডান হাত ছুঁইয়ে রঘুনন্দন অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এমনিতেই রেড রোড জনবিরল। কচিৎ কখনো দু'একখানা গাড়ি আসে যায়। রাস্তা নিঝুম, গাড়ির ভিতরটাও তাই। রুক্ষ গম্ভীর কণ্ঠ নিস্তব্ধতা ভেঙে চুরমার করে দিলে—'বুঝতে পেরেছ বোধ হয় আমি গোপা নই, গোপার মা?'

অনুমানে আগেই বুঝতে পেরে ছিলাম। চুপ করেই রইলাম।

—'চিঠিটা অবিশ্যি লিখেছিল গোপাই, আসবার কথাও ছিল তার কিন্তু ধম্মের কল বাতাসে নড়ে, তা হরিমতি ব্যাপারটা আগেই আমার কাছে ফাঁস করে দিয়েছে।'

একটু চুপ করে আবার প্রশ্ন—

—'তুমি আজকাল খিদিরপুর যা না কেন?'

—'এমনি, সময় পাইনে বলে।'

—'সময় পাও না, না মারের ভয়ে

—'মারের ভয়ে?'

'হ্যাঁ। এবার খিদিরপুর গেলে হাত-পা আস্ত নিয়ে ফিরে আস পারবে না।'

অবাক হয়ে তাকালাম। অন্ধকা গোপার মায়ের মুখ স্পষ্ট দেখতে পে না, শুধু ক্রুদ্ধ চোখের মত নথের হ

দ্বটো রাস্তার অস্পষ্ট আলোতেও জ্বল জ্বল করে জ্বলতে লাগল।

শান্ত কণ্ঠে বললাম—'কি উদ্দেশ্যে এত বড় ছলনার আশ্রয় নিয়ে আজ আপনি আমার সংগে দেখা করতে এসেছেন জানি না, জানবার কৌতূহলও নেই। শ্বধ্ব আমাকে মার-ধোর করলেই যদি আপনার আক্রোশ খানিকটা নিবৃত্ত হয়, তাহলে ড্রাইভার রঘ্বনন্দনকে ডাকুন। আমাকে মেরে রাস্তায় ফেলে দিয়ে যাক। বাধা দেবো না আর দিয়েও কোনও লাভ হবে না।'

চুপ করে রইলেন গোপার মা। চলমান একটা গাড়ির হেড-লাইট ভিতরের অন্ধকার কয়েক সেকেন্ডের জন্য ঘ্বচিয়ে দিল। গোপার মাকে দেখলাম। প্রকান্ড গোল ম্বখ। মিশমিশে না হলেও বেশ কালো রঙ। নাকে প্রকান্ড গোল নথ, তাতে নানা রঙের দামী পাথর বসানো। বেশ রাশভারি চেহারা, দেখলে ভয় হয়।

গোপার মা-ই শ্বর্ব করলেন—'মাকাল ফলের মত কটা রং আর একরাশ বিশ্রী বাবরি চুল নিয়ে যদি মনে করে থাক মেয়েরা তোমায় দেখলেই পাগল হয়ে যাবে, তাহলে মস্ত ভুল করেছ।'

জবাব দেবার প্রশ্ন নয়। চুপ করেই রইলাম।

গোপার মা বলে চললেন—'পই পই করে কত্তাকে বলেছিলাম মেয়ে ছেলেকে অত লেখাপড়া শিখিও না, ভাল ঘর দেখে একটা নৈকশ্য কুলিনের ছেলের সংগে মেয়েটার বিয়ে দিয়ে দাও। শ্বনলেন না আমার কথা। এখন হাড়ে হাড়ে ব্বঝ্বন।

কথাগ্বলো বলেই বোধ হয় ব্বঝতে পারলেন যে, এই সব পারিবারিক আলোচনা একজন বাইরের লোকের সামনে না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তখনই কথার মোড় ঘ্বরিয়ে দিলেন।

—'রিনির বাবা তোমার আপন কাকা?'

—'না, বাবার মামাতো ভাই।'

—'হ্বঁ, তাই বল।'

কিছ্বক্ষণ চুপচাপ। এবার যেন [illegible] মনেই বলতে শ্বর্ব করলেন [illegible] মা।

—'[illegible] এক ফোঁটা মেয়ে দেখতে, কিন্তু এদিকে বিষ-প্বঁট্বলি, ঐ তো যত নষ্টের ম্বল।'

এই সব অসংলগ্ন বিক্ষিপ্ত কথাগ্বলোর শেষ পরিণতি কোথায় জানবার জন্য একট্ব অসহিষ্ণ্ব হয়েই বললাম—'কি জন্যে আমাকে ডেকেছেন দয়া করে বলবেন কি?'

গর্জন করে উঠলেন গোপার মা,—'নিশ্চয় বলব, নইলে কি তোমার সংগে হাওয়া খেতে ঘর-সংসার ফেলে লজ্জা-সরম ছেড়ে এতদ্বর ছ্বটে এসেছি? গোপাকে বিয়ে করার আশা তুমি ছেড়ে দাও, অন্তত আমি বেঁচে থাকতে তা হতে দোব না।'

বললাম—'দিলাম।'

এত সহজ ও স্পষ্ট উত্তর আশা করেন নি গোপার মা। একট্ব অবাক হয়ে তখ্বনি আবার জ্বলে উঠলেন—'তোমার কথায় বিশ্বাস কি? যারা বায়োস্কোপ করে বেড়ায়, তাদের কথার দাম আছে নাকি?' এর আগে ক'খানা চিঠি দিয়েছে গোপা?'

—'একখানাও না।'

—'কি জন্যে তাহলে চিঠি লিখে এখানে দেখা করতে চেয়েছিল সে!'

—'জানি না।'

—'জানো—বলবে না। আর একটা কথা। দ্বপ্বরবেলা নিরিবিলি থাকায় বাড়িতে গিয়ে আমার মেয়ের সংগে দেখা করার চেষ্টা আর কোনও দিন কোরো না। তোমার কাকা সব কথা শ্বনে ভীষণ রেগে গেছেন আর সেই ক্ষ্বদে মেয়েটাকে আচ্ছা করে পিটিয়ে ঘরে বন্ধ করে রেখেছেন। দ্বদিন খাওয়া বন্ধ।'

অন্ধকারে শিউরে উঠলাম। রিনি, আমার পার্ল হোয়াইট। কাকা এত বড় অমান্বষ যে, ঐ ফ্বলের মত নিষ্পাপ মেয়েটাকে——। চোখে জল এসে গেল। কিন্তু করবার কিছ্ব নেই, শ্বধ্ব নিজের মনে গ্বমরে মরা ছাড়া।

অনুমানে আমার অবস্থা কল্পনা করেই যেন খুশী হয়ে গোপার মা বললেন—'চমৎকার মানুষ তোমার কাকা। তিনি তো স্পষ্টই বললেন, ওদের সঙ্গে সম্পর্ক আছে, এটা স্বীকার করতেও লজ্জা হয়। তোমার বাবাই বা কি রকম—'

বাধা দিয়ে বললাম—'আমার বাবাকে এর মধ্যে টানবেন না, আপনার অনুযোগ আমার বিরুদ্ধে। আমায় যা খুশী বলুন।'

অন্ধকারেও বেশ বুঝতে পারলাম আমার দিকে চেয়ে আছেন গোপার মা। এতক্ষণ বাদে বাইরে চাইলাম। এরই মধ্যে ঘন কুয়াশার আস্তরণ নেমে এসেছে গড়ের মাঠে। চারপাশের আলোগুলো কেমন নিস্তেজ, মিটমিট করছে জোনাকির মত। কিছুদূরে ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধ অস্পষ্ট স্বপ্নপুরীর মত দেখাচ্ছে। ঘড়ি না দেখেও বুঝলাম, রাত বেশ হয়েছে। সহজ-ভাবেই বললাম,—'আপনার কথা আশা করি শেষ হয়েছে। এবার আমি যাচ্ছি রাত হয়ে যাচ্ছে।'

গাড়ির ভিতরকার হ্যান্ডেলটা ঘুরিয়ে দোর খুলতে যাব, এমন সময় এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল। হঠাৎ এগিয়ে এসে আমার হাত দুটো ধরে কান্নায় ভেঙে পড়লেন গোপার মা—'অনেক কটু অপ্রিয় কথা বলেছি তোমায় বাবা, তুমি আমার ছেলের মত। কিছু মনে কোরো না, গোপা আমাদের একমাত্র মেয়ে। আমাদের মান-সম্ভ্রম সাধআহ্লাদ সবই নির্ভর করছে ওর উপর। তুমিই বলতো বাবা, আজ যদি তোমার সঙ্গে ওর বিয়ে দিতে হয়, তাহলে সমাজে, আত্মীয়স্বজনদের কাছে, আমাদের অবস্থা কি দাঁড়াবে?'

এতক্ষণ শুধু দাম্ভিকা রায় বাহাদুর গৃহিণীর কথাই শুনছিলাম, এবার কথা কইলেন গোপার মা। অভিভূত হয়ে গেলাম।

গোপার মা বললেন—'বাপের অসম্ভব আদুরে ও অভিমানী মেয়ে গোপা। আমার শুধু ভয় হয় কখন কি করে বসে। গরীব হলেও আপত্তি হোত না শুধু যদি তুমি বায়োস্কোপ না করতে আর আমাদের পাল্টা ঘর হতে।'

চুপ করে রইলাম। আঁচলে চোখের জল মুছে গোপার মা বললেন—'কখনও কোনও পরপুরুষের সামনে বার হইনি বা কথা কইনি। আজ শুধু মেয়েটার ভবিষ্যৎ ভেবে দিগ্বিদিগ জ্ঞান হারিয়ে তোমার কাছে ছুটে এসেছি। একটা কথা আমাকে দিয়ে যাও বাবা।'

বললাম—'কি!'

'গোপার জীবন থেকে তুমি সরে দাঁড়াবে।'

একবার ভাবলাম বলি—সিনেমার লোকের কথার দাম কি! কিন্তু আর আঘাত দিতে প্রবৃত্তি হল না।

বললাম—'আমার দিক থেকে আমি রাখব আপনার কথা, কেননা ভেবে দেখেছি কোনও দিক দিয়েই এ মিলন শুভ হতে পারে না। না আমার দিক থেকে না গোপার। কিন্তু আপনার মেয়ে যদি না শোনে আপনাদের কথা।'

মিনিটখানেক উদ্দেশ্যহীনভাবে বাইরে চেয়ে কি যেন ভাবলেন গোপার মা তারপর বললেন—'সে ভার আমাদের। তার জন্যে যদি—যাক্ অনেক রাত্রি হয়ে গেল বাবা, চল, তোমায় নামিয়ে দিয়ে যাই। কোথায় থাক তুমি?'

—'ভবানীপুরে, হরিশ পার্কের কাছে নামিয়ে দিলেই হবে।'

গোপার মা ডাকলেন—'রঘুনন্দন!'

হঠাৎ আলাদিনের দৈত্যের মত অন্ধকার কুয়াশার আবরণ ভেদ করে সামনে এসে দাঁড়াল বিরাটকায় রঘুনন্দন।

—'চল, বাবুকে নামাতে হবে হরিশ পার্কের কাছে।'

'মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা' কথাটাই শোনা ছিল, ওর সত্যিকার অর্থটা জানা ছিল না। আজ সেটা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করলাম। হিসাবের খাতায় জমার ঘরে শূন্য আগেই দিয়ে রেখে-ছিলাম। তারই পাশে গোপার মা আরও কয়েকটি শূন্য যোগ করে দিলেন। একটা কথা কিন্তু কিছুতেই ভুলতে পারছিলাম না, আমাকে উপলক্ষ্য করেই দুটো মেয়ের জীবনে নেমে এল দুর্যোগের ঘনঘটা। অথচ আমার কিছুই করবার নেই, শুধু নিরপেক্ষ দর্শকের আসনে বসে বিয়োগান্ত দৃশ্যগুলোতে হা-হুতাশ করা ছাড়া!

পথ অল্প। নিঃশব্দে বসে আছি দুটি প্রাণী, একই চিন্তা নিয়ে। হরিশ পার্কের মাঝামাঝি আসতেই গাড়ি থামিয়ে দরজা খুলে নেমে পড়লাম। হঠাৎ সাময়িক খেয়ালে একটা কান্ড করে বসলাম। গাড়ির মধ্যে ঝুঁকে পড়ে গোপার মাকে প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিলাম। তারপর তাড়াতাড়ি সশব্দে দরজাটা বন্ধ করে পশ্চিমদিকের ফুটপাথ মুখো হন হন করে চলতে শুরু করলাম। পিছন ফিরে না চেয়েও বেশ স্পষ্ট অনুভব করলাম—রঘুনন্দনকে গাড়ি চালাবার হুকুম দিতে ভুলে গিয়ে আমার গমনপথের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছেন গোপার মা। (ক্রমশ)

৭

পথে নেমে এসে মণিময় বড় লজ্জা বোধ করল। নির্মলার পরিহাসের জবাবে অত কথা বলা ঠিক হয়নি। এত অল্পেই ধরা দেওয়া উচিত হয়নি তার। মণিময় সাধারণত চাপা স্বভাবের মানুষ। বেশি কথা বলা তার অভ্যাস নয়। নিজের জীবনের কথা তো নয়ই। কিন্তু হঠাৎ মাঝে মাঝে ব্যতিক্রম ঘটে। যে গুরুভার পাথরে পূর্ব স্মৃতিকে চেপে রেখেছে মণিময়, তা যেন আপনা থেকেই সরে যায়। কোন একজনের কাছে সব কথা খুলে বলতে ইচ্ছা করে; কিন্তু মণিময় মনের এই ইচ্ছাকে সহজে আমল দেয় না। তবু কোন এক অসতর্ক মুহূর্তে সেই নিষিদ্ধ [illegible] জানলাটি খুলে যেতে চাইলেও মণিময় তা তাড়াতাড়ি বন্ধ করে।

খানিকটা পথ হেঁটে আসবার পর [illegible] হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, 'করুণাদির [illegible] বুঝি আপনার আগে থেকেই আলাপ [illegible]?'

মণিময় একটু অনিচ্ছার সঙ্গে বলল, [illegible] অল্প স্বল্প। তাকে তুমি দিদি বল [illegible]'

[illegible] বলল, 'সম্পর্ক ধরে বললে [illegible] বলাই উচিত। আমি অবশ্য কিছুই [illegible]। [illegible]দের যা আলাপ। একদিন [illegible] দেখেছি। তাও ভিড়ের মধ্যে। [illegible] কতদিনের জানা শোনা?'

[illegible] একটু খনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করল

মণিময় প্রসঙ্গটা থামিয়ে দিয়ে বলল, 'সে কথা পরে একদিন বলব। কিন্তু তুমি যদি অত আস্তে হাঁট বাস কিছুতেই ধরতে পারবে না মালা।'

মালা বুঝল মণিময় আর বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করতে চায় না। মণিমামার ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে কৌতূহল প্রকাশ ক'রে বরং একটু লজ্জিত হ'ল মালা। আর কোন কথা না বলে নিঃশব্দে হাঁটতে লাগল। খানিক বাদে মণিময় বলল, 'ও সব নিয়ে জল্পনা-কল্পনার তোমার কোন দরকার নেই মালা। রাঙাদির সঙ্গে আমি একটু ঠাট্টা করছিলাম।'

ব্যাপারটার সবখানিই যে ঠাট্টা নয় তা মালার বুঝতে বাকি নেই। কিন্তু এ নিয়ে আর কোন প্রতিবাদ করল না। মণিমামার প্রকৃতি মালা জানে। তিনি যখন একবার কথাটা চেপে গেছেন কারো সাধ্য নেই তাঁর মুখ থেকে এ প্রসঙ্গে ফের কোন কথা বার করে।

মালা বলল, 'আপনি তো আমার স্বভাব জানেন। কারো কোন বিষয় নিয়ে জল্পনা-কল্পনা আমি করিনে, করার সময়ই বা কই।'

আর একটু জোর পায়ে হাঁটতে গিয়ে মালার ডান পাটা হঠাৎ ছোট একটা গর্তের মধ্যে পড়ে গেল। দিন দুই আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে। তার জল কাদা এখনো ভালো ক'রে শুকায়নি। এক পাটি জুতো ভিজে গেল। খানিকটা কাদা ছিটকে গিয়ে লাগল শাড়িতে। মণিময় টর্চটা ঘুরিয়ে ধরল। বাঁ হাতে ধরে ফেলল, মালাকে। তারপর একটু হেসে বলল, 'আমার ওপর রাগ করে নিজের পাটা ভেঙে ফেললে নাকি মালা? খুব লাগল, না?'

শেষ কথাটায় স্নেহ আর সহানুভূতি প্রকাশ পেল মণিময়ের।

মালা বলল, 'না লাগেনি।'

মণিময় বলল, 'না লাগলেও নিশ্চয়ই জুতো আর শাড়িটা গেছে। চল বাড়ি গিয়ে বদলে আসবে।'

মালা আপত্তি ক'রে বলল, 'না না তেমন ভেজেনি। আমি বেশ যেতে পারব। হাসপাতালে গিয়ে সব ধুয়ে নিলেই হবে।'

মণিময় বলল, 'আচ্ছা, তোমার যাতে সুবিধে হয় তাই করবে।' তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, 'এবার এই রাস্তাটায় হাত না দিলে আর চলবে না।'

মালা একটু বিস্মিত হ'য়ে বলল, 'রাস্তায় হাত দেবেন মানে?'

মণিময় একটু হেসে বলল, 'পায়ের

রাস্তা তো হাত দিয়েই গড়তে হয় মালা। সব সময় কি পায়ের ওপর নির্ভর করলে চলে?' পথে হাঁটতে হাঁটতে আমি নিজেও অনেকদিন হোঁচট খেয়েছি। খানা খন্দে পড়েছি কয়েকবার। যারা রোজ চলে তাদের অসুবিধে তো অনেক বেশি। তবু কেউ টুঁ শব্দ করে না।'

মালা বলল, 'হোঁচট খেতে খেতে তাদের অভ্যাস হয়ে গেছে মণিমামা।'

মণিময় বলল, 'অভ্যাসটা সদভ্যাস নয়।'

মালা একটু হাসল, 'আপনি সৎই বলুন আর অসৎই বলুন তাদের কিছু এসে যায় না। যারা হোঁচট খেতে ভালোবাসে তারা হোঁচট খাবেই।'

মণিময় বলল, 'হোঁচট খেতে কেউ ভালোবাসে না। ওটা তোমার রাগের কথা। আমার তো মনে হয় দু' একজন গরজ ক'রে হাত লাগালে তার পিছনে পিছনে আরো দশজন ছুটে আসবে।'

মালা বলল, 'হাত লাগিয়ে দেখুন আসে কি না। আমি তো তেমন কোন আশার লক্ষণ দেখিনে।'

মণিময় লক্ষ্য করেছে মালার কথায় এ ধরনের কিছু না কিছু নৈরাশ্য প্রায় সব সময় ফুটে বেরোয়। এত নিরাশা হতাশ ওর বয়সের পক্ষে মোটেই উপযোগী নয়। কিন্তু যে অবস্থার ভিতর দিয়ে ও বড় হয়ে উঠছে, যে প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে ওর প্রতিদিনের সংগ্রাম চলছে তাতে সর্বদা ও আনন্দে আহ্লাদে উৎফুল্ল হয়ে থাকবে এমন আশা করাটাও ভুল। মালাকে দেখলে মনে হয় ওর আসল বয়সের চেয়ে মনের বয়স অনেক বেশি। নানা সাংসারিক অভিজ্ঞতায় ওর প্রবীণতা অনেক বেড়েছে। তাকে ঠিক অকাল পক্কতা বলা যায় না। মণিময়ের মনে হয় এই প্রবীণতার জন্যেই ওর সান্নিধ্য তার কাছে সহনীয় হয়ে উঠেছে। যেমন সমবয়সীর সঙ্গে করা যায় তেমনি অনেক কথা ওর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে পারছে মণিময়। [illegible] একটি অল্পবয়সী মেয়ের বাচালতা [illegible] যে [illegible] করতে পারত [illegible] মেয়ের [illegible] [illegible]।

[illegible]

রাস্তায় এসে পড়ল। এ রাস্তার মোড়ে আলো আছে। লোকজন আছে। দোকান পাটগুলি এখনো খোলা। শুক্লা লন্ড্রী আর কাত্যায়নী ভান্ডারের ঝাঁপ বন্ধ হয়নি। মিষ্টির দোকানের মালিক খদ্দেরের কাছ থেকে পয়সা গুণে নিচ্ছে।

বড় তেঁতুল গাছটার তলায় কলকাতা-গামী বাস দাঁড়িয়ে আছে। কন্ডাকটার থেকে থেকে মুখ বাড়িয়ে ডাকছে 'দমদম, বেলগাছিয়া শ্যামবাজার।'

মালা বলল, 'যাক ভাগ্য ভালো। বাসটা পাওয়া গেছে। আপনি অনেকদূর কষ্ট ক'রে এলেন।'

মণিময় একটু হাসল, 'ভদ্রতা করা হচ্ছে বুঝি?'

মালা একবার কোন জবাব না দিয়ে মৃদু হাসল। তারপর বাসের ভিতরে গিয়ে বসল। জানলা দিয়ে চোখে পড়ল, মণিময় তখনও দাঁড়িয়ে আছে। মালা মুখ বাড়িয়ে বলল, 'আমি কাল ফিরে না আসা পর্যন্ত যেন চলে যাবেন না মণিমামা।'

মণিময় কোন জবাব না দিয়ে স্মিত-মুখে দাঁড়িয়ে রইল। বাসে বেশি যাত্রী ওঠেনি। প্রায় খালি বাসই বলা যায়। কথায় কথায় বেশ একটু দেরি হয়ে গেছে মালার। অন্তত আধ ঘণ্টা লেট হ'তে হবে। স্টাফ নার্সের বকুনি খাওয়া আছে ভাগ্যে। অপেক্ষাকৃত এই জনবিরল পথে, রাত্রের এই যাত্রাটা মন্দ লাগে না মালার। প্রথম প্রথম গা একটু ছমছম করত। কীর্তিপুর থেকে মেয়েছেলে বড় একটা কেউ ওঠে না। সব পুরুষ। গোড়ার দিকে কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করত মালা। মনে হ'ত সবাই যেন চক্ষুময় হয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে। কিন্তু আস্তে আস্তে অভ্যাস হয়ে গেছে। এখন আর সেই ভয়ও নেই অস্বস্তিও নেই। রাস্তার দু'দিকের [illegible] স্তব্ধ গাছপালাগুলির দিকে তাকিয়ে সেই গা ছমছমানি দূর হয়েছে। আজকাল বরং বেশ একটু মজাই লাগে মালার। [illegible] গাড়িতে না উঠলে [illegible] জীবনকে যেন [illegible] পাওয়া যায় না। [illegible] মালার মনে হয় এই [illegible] [illegible] যে [illegible] চলে, যার

পথেরও শেষ নেই, গতিরও শেষ নেই তেমন কোন গাড়িতে যদি মালাকে কেউ তুলে দেয় তার কেমন লাগে? ভাবতেই মালা যেন শিউরে উঠলো। ওরে বাবা। না তেমন অফুরন্ত পথ সে চায় না। পথ এসে ঘরের কাছে থামে বলেই তো পথের এত আদর। শুধু যদি পথে পথে বেড়ায় মালা তাহলে তো বাবা মা ভাই বোন কাউকেই পাবে না। ভাইবোনেরা ভারি ভালোবাসে মালাকে। যীশু প্রায়ই বলে 'দিদি, আমাকেও নিয়ে যেয়ো তোমাদের হাসপাতালে।' রীণা বলে, 'দিদির কি মজা। রোজ গাড়িতে করে বেড়াতে যায়।' ওরা খুব ভালোবাসে তাকে। ওদের জন্যেই যে এত কষ্ট করে মালা তা ওরা খুব বোঝে।

বাসটা কীর্তিপুর কলোনীর কাছে এসে থামল। কোন যাত্রী না ওঠায় প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ছেড়ে দিল। সেই মুহূর্তে পিছন থেকে একজনের গলা শোনা গেল 'বাঁধকে বাঁধকে। এই কন্ডাকটার বাঁধকে।'

কন্ডাকটার বাস থামিয়ে বলল, 'আইয়ে জলদি আইয়ে।'

সঙ্গে সঙ্গে প্রায় হুড়মুড় ক'রে একজন যাত্রী উঠে পড়ল। সে যেন চলন্ত বাসে উঠছে এমনই তার ভাব। হাতে খয়েরি রঙের ঢাকনিতে ঢাকা একটি সেতার। টাল সামলাতে না পেরে পা ফসকে সে প্রায় মালার গায়ের ওপর পড়ে যাচ্ছিল, মাথার ওপরকার রডটা তাড়াতাড়ি ধরে ফেলল। মালার পাশের বেঞ্চ থেকে একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক ধমকে উঠলেন 'কি মশাই, দেখে শুনে উঠতে পারেন না? মেয়েছেলের গায়ের ওপর পড়বেন নাকি? নেশাটেশা করে এসেছেন বুঝি?'

কমলাক্ষ সহযাত্রীর দিকে একবার চোখ তুলে তাকাল। কিন্তু মুখ ফিরিয়ে এনে মালার দিকে চেয়ে বলল, 'সরি, মাপ করবেন।'

মালা তাকে লজ্জার হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে একটু সরে পাশের জায়গাটি দেখিয়ে দিয়ে বলল, 'বসুন।'

কমলাক্ষ তখনো বিস্মিত হয়ে চেয়ে আছে দেখে মালা মৃদু হেসে বলল 'চিনতে পারছেন না? সেদিন আ[illegible] নিমন্ত্রণ খেয়ে এলাম।'

কমলাক্ষ এতক্ষণে চিনতে পেরে বলল, 'ও।' তারপর একটু ইতস্তত ক'রে পাশে বসে পড়ল।

যে ভদ্রলোক ধমক দিয়েছিলেন তিনি অস্ফুটস্বরে কি যেন বিড়বিড় ক'রে উঠলেন ঠিক বোঝা গেল না।

একটু বাদে সংকোচ কাটিয়ে কমলাক্ষ বলল, 'আপনাকে এ সময় এই বাসে দেখব আশা করিনি।'

মালা স্মিতমুখে চুপ করে রইল।

কমলাক্ষ বলল, 'যদি কিছু মনে না করেন তো জিজ্ঞেস করি কোথায় যাচ্ছেন?'

মালা বলল, 'মনে করবার কি আছে? ডিউটিতে।'

কমলাক্ষ বলল, 'ডিউটি সে আবার কি?'

মালা বলল, 'আপনি বোধ হয় জিজ্ঞেস করতে চান সে আবার কোথায়? আমি হাসপাতালে কাজ করি আপনি কি শোনেননি? আপনাদের বাড়ির আর সবাই তো জানেন।'

কমলাক্ষ বলল, 'কই আমি তো শুনিনি। শুনেছি কি না ঠিক খেয়াল নেই।'

মালা বলল, 'বোধ হয় শেষ কথাটাই সত্যি। আপনারা আর্টিস্ট মানুষ, খেয়াল একটু কম।'

কমলাক্ষ বলল, 'না না ঠিক তা নয়। কিন্তু আপনি হাসপাতালে কাজ করেন শুনে ভারি অদ্ভুত লাগছে।'

মালা একটু বিস্মিত হয়ে বলল, 'কেন, অদ্ভুত লাগবার কি আছে?'

কমলাক্ষ বলল, 'না না, এমনিই বলছিলাম। কিছু মনে করবে না।'

মালা বলল, 'এর মধ্যে মনে করবার কি আছে?' আপনি বোধ হয় কোন জলসায় টলসায় যাচ্ছেন?'

কমলাক্ষ একটু হাসল, 'হাতের সেতার দেখে বলছেন তো। না কোন জলসায় নয়। কাল সকালে রেডিওতে আমার প্রোগ্রাম আছে। অত ভোরে বাসটাস না পাই তাই আজই এগিয়ে থাকি। বেলগাছিয়া আমার বাড়ি আছে। সেখানেই থাকব রাত্রে।'

মালা বলল, 'রেডিওতে আপনি বুঝি প্রায়ই বাজান?'

কমলাক্ষ স্মিতমুখে বলল, 'প্রায়ই না, মাঝে মাঝে প্রোগ্রাম পাই। আপনি কি এসব ভালোবাসেন?'

মালা বলল, 'কি সব?'

কমলাক্ষ বলল, 'মানে এই গান বাজনা।'

মালা মৃদু হেসে বলল, 'গান বাজনা কে না ভালোবাসে। শুনতে খুবই ভালোবাসি।'

কমলাক্ষ বলল, 'শুধু শুনতে? কেন নিজে চর্চাটর্চা করলেই পারেন।'

মালা বলল, 'সবাই কি সব কাজ পারে?'

কমলাক্ষ এবার একটু লজ্জিত বোধ করল। সত্যি ও কথা জিজ্ঞাসা করা তার উচিত হয়নি। সবাই সব জিনিস পারে না তা ঠিক। অনেকের ভিতরেই এ সব জিনিসের অভাব থাকে। আবার অনেকের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সাধ্যে কুলায় না। মালার কেন হচ্ছে না একবার জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হল কমলাক্ষের। কিন্তু কি ভেবে থেমে গেল। নিতান্ত বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে ছাড়া সে বেশি কথা বলে না। কিন্তু এই অল্প পরিচিত মেয়েটির কাছে সে এরই মধ্যে অনেক কথা বলে ফেলেছে। নিজের আচরণে সে নিজেই এতক্ষণে লজ্জা বোধ করল। না জানি মালা তার সম্বন্ধে কি ভাবছে।

কিন্তু এ নিয়ে বেশিক্ষণ ভাবতে হল না কমলাক্ষকে। মালা নিজে থেকেই ফের কথা শুরু করল, 'আপনাদের বাড়ির সব কেমন আছেন?'

কমলাক্ষ ফিরে তাকাল, 'ভালোই।'

মালা বলল, 'কাকাবাবু একদিন আসতে চেয়েছিলেন কই এলেন না তো।'

কমলাক্ষ বলল, 'সময় পেয়ে ওঠেন না। এতদূর থেকে কলেজে যাতায়াত করতে খুব অসুবিধে হয়! সময় তো কম লাগে না।'

মালা বলল, 'তা অবশ্য ঠিক। বেশ সময় লেগে যায়। কিন্তু ও'রা তো আসতে পারেন কাকীমা, করুণা—'

দিদি বলতে গিয়ে মালা তাড়াতাড়ি শুধরে নিয়ে বলল, 'করুণা পিসীমা এনাক্ষী।'

কমলাক্ষ কৈফিয়তের ভঙ্গিতে বলল, 'প্রত্যেকেই তো যাবেন যাবেন করেন। আচ্ছা, আমি ও'দের বলব।'

মালার একবার ইচ্ছা হ'ল মণিময়ের সঙ্গে কমলাক্ষদের পরিচয় আছে কি না সে কথা একবার জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু পাছে কোন অপ্রীতিকর প্রসঙ্গ উঠে পড়ে সেই আশঙ্কায় কথাটা চেপে গেল।

বেলগাছিয়ার মোড়ে এসে কমলাক্ষ উঠে দাঁড়াল। বলল, 'আমাকে এবার নামতে হবে। সময়টা বেশ কাটল।'

মালা মৃদু হেসে চোখ নামিয়ে নিল। কথাটা তো তারও।

কমলাক্ষ নেমে গেল। পরের স্টপটায় মালাকেও নামতে হল। সামনেই হাসপাতাল। আজকাল ওয়ার্ডে ডিউটি পড়েছে মালার। হল ঘরে ঢুকতেই স্টাফ নার্স 'রমা নন্দী ভ্রূ কুঁচকে কৈফিয়ৎ তলব ক'রে বসলেন, 'এত দেরি হল যে মালা?'

বেঁটে কালো মোটা সোটা চেহারা। বয়স চল্লিশ পার হয়েছে। মেজাজটা একটু খিটখিটে। কাজকর্ম ভালোই বোঝেন। মনে মায়া মমতাও আছে। কিন্তু ভাষা বড় রুক্ষ।

মালা যোগ্য কৈফিয়ৎ খুঁজে না পেয়ে বলল, 'দেরি হয়ে গেল রমাদি।'

শুধু এই স্বীকৃতিতে রমা নন্দী খুশি হলেন না। ধমক দিয়ে বললেন, 'আরে দেরি যে হয়ে গেল তা তো দেখতেই পাচ্ছি। কেন দেরি হল সেই কথাই জিজ্ঞেস করছি তোমাকে। এত করে বলি অত দূর থেকে আসা পোষাবে না। তোমার যদি বা পোষায় হাসপাতালের পোষাবে না। এখানে হস্টেল টস্টেল আছে তাতে থাক, তা নয়। আসবে সেই ধেড়ধেড়ে গোবিন্দপুর থেকে আর রোজ লেট হবে।'

রোজ অবশ্য লেট হয় না মালা। কদাচিৎ দু' একদিন দেরি হয় তার, কিন্তু এই মুহূর্তে প্রতিবাদ করে লাভ নেই। তাতে রমাদি আরও চটে যাবেন। মালা ওর স্বভাব জানে। আর হস্টেলে থাকার কথা তিনি বললেন। হস্টেলে থাকতে গেলে যা মাইনে পায় তার প্রায় সবটাই এখানে তাকে রেখে যেতে হবে সে কথাও রমাদি না জানেন তা নয়। সে কথাও ও'কে মনে করিয়ে দেবে। একটি পয়সাও কি হিসাবের বাইরে ব্যয় করবার জো আছে মালার। তাতেও তো মাসের পনের দিন যেতে না যেতে টানাটানি শুরু হয়ে যায়। নিজেদের সংসারের এত খুঁটিনাটি ব্যাপার মালা কাউকে বলে না। অনর্থক অনুকম্পা কুড়িয়ে লাভ কি। নিজের দুঃখ নিজে বহন করাই ভালো। নিঃশব্দে মালা চার্জ বুঝে নিতে লাগল।

রমা নন্দী আড় চোখে তার দিকে একটুকাল তাকিয়ে তাকিয়ে কি দেখলেন। তারপর এগিয়ে এসে পিঠে হাত রেখে বললেন, 'ঈস, একটা কথা বলেছি কি মেয়ের চোখ অমনি ভার। চোখ ছলছল করছে।'

মালা এবার মুখ ফেরাল, 'ও কথা বলবেন না রমাদি। আমার চোখ অত অল্পে ছলছল করে না।'

রমা নন্দী বললেন, 'থাক আর বাহাদুরী দেখাতে হবে না। তোমরা কত যে শক্ত মেয়ে আমার খুব জানা আছে। এই বয়সে দিব্যি ঘর গেরস্থালী করবে বিয়ে থা হবে, মান অভিমানের পালা চলবে স্বামীর সঙ্গে। তা তো নয় এসেছ এব রাজ্যের রোগী ঘাটতে। এসেছ যখ যাও ওই একুশ নম্বর বেডের কাছে। একট তত্ত্বতালাস কর।'

অকসিজেন দেওয়া হচ্ছে একুশ নম্ বেডের পেশেণ্টকে।

মালা সেদিকে একবার তাকিয়ে স্টা নার্সকে জিজ্ঞাসা করল, 'অপারেশন হ গেছে বুঝি?'

রমা নন্দী বললেন, 'হ্যাঁ, ওভারি বাদ দিতে হয়েছে। টেম্পারেচার রাইজ করছে। বেশ ভোগাবে মনে হচ্ছে। থার্মোমিটারটা আবার দাও তো।'

স্টাফ নার্সের নির্দেশে মালা নম্বর বেডের দিকে এগিয়ে গেল।

হল ভরা সারি সারি বেড। ভাগই ভরতি। একবার ঘুরে এসে মাঝখানে টেবিলটার কাছে দু' একটি পেশেণ্টের চীৎকার আসছে। প্রথম প্রথম এতে বিচলিত বোধ করত মালা। হয়ে পড়ত। আজকাল রমাদি বলেন, শুধু হাত হৃদয়কেও যন্ত্রের মত করে নিতে নইলে নিয়মমত কাজ করা যায় না।

ঢং করে একটা বাজল দেয়াল ঘড়ির নিচে রেডিওর পেশেণ্টদের জন্যে রেডিওর ব্যবস্থা ঘরে। মালার হঠাৎ মনে পড়ল কথা। কাল সকালে তার প্রোগ্রাম

সারারাত জাগবার পর হাসপাতালে বসেই শুনতে পারে কিন্তু শুনতেই যে হবে তার আছে। নিজের আগ্রহের ওপর ঔদাসীন্যের আবরণ টানল।

ঝাঁসীর রানী ০ মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য

॥ ১৬ ॥
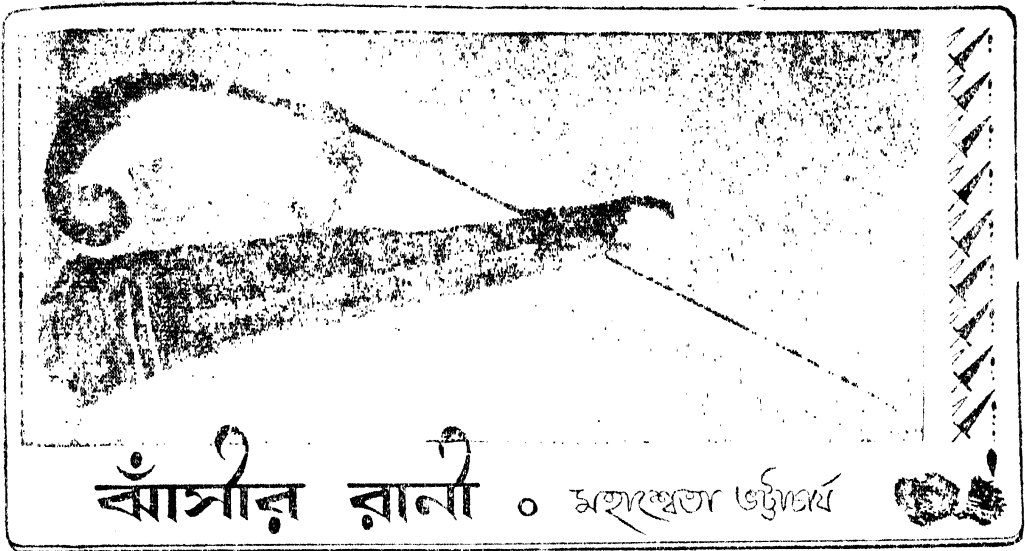
ঝাঁসীর শাসনভার হাতে নিয়েই রানী নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করলেন। একটি টাঁকশাল বসালেন, কেল্লা এবং শহরের গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলিকে মেরামত করে অভেদ্য করলেন। প্রাসাদ প্রাঙ্গণ থেকে খুঁড়ে তিনখানি কামান বের করলেন, উপরন্তু নতুন কামান ঢালাই করলেন। একটি নতুন ফৌজও গড়লেন।

কৃষকদের খাজনা মকুব করে তাদের প্রীতি অর্জন করলেন। উপরন্তু সরকারী টাকা দিয়ে শস্য খরিদ করে গোলাজাত করলেন। ঝাঁসী রাজের প্রাক্তন ৩,২৪০ জন বরখাস্ত সৈন্যকে ডেকে পাঠালেন। তা ছাড়াও তাঁর ফৌজী দলে যোগ দিল আফগান, পাঠান এবং মকরানী মুসলমানরা; বুন্দেলা, ঠাকুর প্রভৃতি রাজপুতরা এবং কাচ্ছি, কোরি, তেলি ও কৃষক সম্প্রদায়ের মানুষ।

অভিজাত রাজপরিবারের বধূ লক্ষ্মীবাঈ, শুধু নিজের আত্মীয় পরিজন বা উচ্চবর্ণের মহারাষ্ট্রীয়দের যদি উচ্চপদ দিতেন, তাতে আনুগত্য পেতেন একটি মুষ্টিমেয় সংখ্যার মানুষের। ঝাঁসীকে রক্ষা করতে হলে প্রত্যেকটি মানুষের [illegible] চেতনা থাকা প্রয়োজন। তাই তিনি ধর্ম, জাতি নির্বিশেষে সাধারণ মানুষকে ডেকে বিভিন্ন দায়িত্ব দিলেন। তাঁর প্রধান গোলন্দাজ ছিলেন গোলাম ঘোস খাঁ, সহকারী ছিলেন খুদাবকস্। খুদাদাদ্, মির্জা সায়েদ, এই সব যোদ্ধাদের নামও পাওয়া যায়।

তা ছাড়াও তিনি মেয়েদের জাতিধর্ম-নির্বিশেষে আহ্বান করে একটি নারী-বাহিনী গঠন করেন। প্রাসাদ কাননে তিনি নিজে নিয়মিত সেই মেয়েদের নিয়ে মালখাম্বা, নারিকেলে সাদা দাগ দিয়ে পিস্তল, তরোয়াল চালনা, অশ্বারোহণ ইত্যাদি অভ্যাস করতেন। মেয়েদের গোলন্দাজদের সহায়তা করতে এবং পুরুষদের সমান লড়াই করতে শেখানো হয়েছিল। ইতিহাসের উত্তর অধ্যায়ে শুধু ভারতবর্ষেই নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মেয়েরা দায়িত্ব গ্রহণ করে পুরুষদের সঙ্গে সমানে যুদ্ধ করেছেন। শতবর্ষ পূর্বে ভারতবর্ষে আমাদের দেশীয় এক রমণী, সেই গৌরবের সূচনা করেছিলেন জেনে আমরা ন্যায়ত গর্ব অনুভব করতে পারি। রানী এবং তাঁর নারীবাহিনী বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। কতখানি বলিষ্ঠ ছিল রানীর সংগ্রামী চেতনা, তাতেই অনুমেয়।

আমাদের দেশে যদিও মেয়েদের বীরত্বের দৃষ্টান্ত সেই দিনের আগেও বারবার মিলেছে, তবু তাঁদের চেয়েও রানীর ভূমিকা অনেক সম্পূর্ণ এবং সার্থক।

সেই প্রবল স্বধর্মানুগত্যের দিনে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে রানীর পতাকার তলায় যোগ দিল। উৎসাহ এবং উদ্দীপনা সঞ্চারিত হ'ল প্রত্যেকটি

হ্দেরে। ঘরে ঘরে তৈরী হ'ল সৈনিক। রানী সেই জন্যই সার্থক নেতা। সার্থক নেতৃত্ব শুধু নিজেকেই বড় করে তোলে না, সঙ্গে সঙ্গে আরো হাজারটা প্রাণকে উদ্বুদ্ধ করে গড়ে তোলে হাজারটা যোদ্ধা। রানী সেই পরীক্ষায় সফল হয়েছিলেন, তাই তাঁর নেতৃত্ব হয়েছিল সার্থক।

নীল চন্দেরীর পাঠান পোশাকে সারেংগী ঘোড়ীর পিঠে ব'সে তিনি নগরের পথে পথে ঘুরে সৈন্যদের সঙ্গে নিজে কাজ করতেন, নির্দেশ দিতেন, তারা জেনেছিল রানী তাদের মতোই শ্রম করেন। তিনি সিপাহীদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করতেন? সেই কথা আজও কখনো সন্ধ্যার সেইসব অঞ্চলে বৃদ্ধ কিষাণের মুখে গান হয়ে বাতাসে ভেসে যায়—

"যিন্‌নে—
সিপাই "লোগো"কো মালাই খিলায়ে
আপনে খায়ে গুড়ধানী—
অমর রহে ঝাঁসি কী রাণী॥"

রানী সিপাহীদের মালাই খাইয়েছেন এবং নিজে খেয়েছেন গুড় ও খই। নিঃসন্দেহে সেই মানুষ তাদের মনে একান্ত প্রিয়।

সেটা ১৮৫৭'র গোড়ার দিক। ঝাঁসীর অরক্ষিত অবস্থার সুযোগ নিয়ে শত্রু তৎপর হয়ে উঠল ঘরে বাইরে। গঙ্গাধরের জ্ঞাতি ভ্রাতুষ্পুত্র সদাশিব-নারায়ণ পারোলা থেকে এসে কাড়রার দুর্গ অধিকার করলেন। সেখানকার তহসিলদারকে তাড়িয়ে ১৬ই জুন ১৮৫৭-তে নিজের রাজ্যাভিষেক করলেন। নিজের নামে জাগীরনামা লিখিয়ে ঝাঁসীর তহসিলগুলিতে পাঠালেন। রাজাপুর-দিহালার তহসিলদার গোলাম হোসেনকে লিখলেন—

"আমি তোমার চাকরি বহাল রাখলাম। আমাকে উপযুক্ত নজরানা পাঠাবে।

আষাঢ় বৈদ্যাষ্টমী সংখ্যা ১৯১৪"।

দুইদিন বাদে লিখলেন—

"তোমাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত করেছি। তোমার চাকরি গেল।"

রানী এই নতুন রাজাটিকে বন্দী করবার জন্য এক হাজার সৈন্য পাঠালেন। গোয়ালিয়ারের অন্তর্গত নারোয়ারে পালালেন সদাশিব রাও। সেখান থেকে তাঁকে বন্দী করে এনে ঝাঁসীর দুর্গে রাখা হ'ল। রানী তাঁর কোন অসম্মান করেননি। কারাগারে তাঁকে নিয়মিত দুধ-ঘি এবং মিষ্টান্ন পাঠান হ'ত। ১৮৫৮ সালে ঝাঁসীদুর্গ অধিকার করবার পর ইংরেজরা বন্দী সদাশিবকে দেখে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন।

"Surprised to find an extremely healthy prisoner."

সদাশিবরাওকে ইংরাজ-বিচারে আঠারো বছরের জন্য আন্দামানে পাঠান হয়। বারো বছর বাদেই মেয়াদ উত্তীর্ণ না হতেই মুক্তি দেওয়া হয় তাঁকে। একজন হিতৈষী আত্মীয়ের সাহায্যে তাঁর বিবাহ হয়। এই সদাশিবরাও নেবালকরের বংশধররা আজও বিদ্যমান।

সদাশিবরাওকে বন্দী করবার পর রানীকে পুনর্বার বিপদের সম্মুখীন হ'তে হ'ল। ঝাঁসী যে রাজপুতরাজ্য অরছা ও দতিয়ার মাঝখানে তা পূর্বেই বলা হয়েছে। অরছা ও দতিয়া এই সময় পুনঃ পুনঃ আক্রমণে ঝাঁসীকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলল।

ঝাঁসীর সঙ্গে অরছার বিরোধের ইতিহাস দুইশো বছরের পুরোন। অরছার রাণী লড়ৈ দুলৈ'য়া নানা কারণে ঝাঁসীর প্রতি বিদ্বেষ পরায়ণ ছিলেন।

রানী লড়ৈয়ার আদেশে তাঁর দেওয়ান নথে খাঁ বিশ হাজার সৈন্য এবং উপযুক্ত পরিমাণ সামরিক সরঞ্জাম, হাতী, কামান ইত্যাদি নিয়ে ঝাঁসীর বিভিন্ন অংশ জয় করতে করতে চললেন। স্থানীয় কবির রাসোতে সেই যুদ্ধযাত্রার বর্ণনা মেলে—

সংবত দশনও সৈকরা উপর চৌদহ সাল
তাসময় অংগ্রেজ কোঁ, আপুস ময়' দহ্‌চাল॥
ফিরি' কিরটৌ ছাউনী ভরৌ গদর অসরার
যে পায়ে অংগ্রেজ জহ', তে তাঁ ভায়েমার॥
ছলবল সোঁ' ঝাঁসী লই', গংগাধর কিনার।
তাকৌ অব আগে কহত, ভাঁলী ভাঁত ব্যেজার
শহর উড়ছে (অরছা) কী হাতী, কহি
লড়ই রাণী সিরকার
নথে খাঁ মুখ্‌তিয়ার সোঁ, বাড় কহী নিরধার॥"

রানী নথে খাঁর আক্রমণের কথা মেজর আরস্কাইনকে জানালেন। সাহায্য চেয়ে পাঠালেন। আরস্কাইন লিখলেন—

"রানী নামেমাত্র ঝাঁসীর শাসক সমস্ত জেলাতে চলেছে ব্যাপক অরাজকতা। টেহ্‌রী-অরছার রানীর সেনাপতি এবং দতিয়ার রাজা দুই দিক থেকে ঝাঁসী আক্রমণ করবার ফলে বিপন্ন রানী সাহায্য চেয়ে পাঠিয়েছেন।"

২-১০-১৮৫৭

এই রকম চিঠি আরস্কাইন ১১ই অক্টোবর এবং ১৬ই ও ২১শে নভেম্বরে লেখেন। জুন, ১৮৫৭ থেকে মার্চ ১৮৫৮ অবধি দশ মাস ধরে অরছা ও দতিয়ার আক্রমণ ঠেকাতে হয়েছিল রানীকে। আরস্কাইন তাঁর ঊর্ধ্বতন অফিসারকে কাছে বিবৃতি পেশ করে রানীর চিঠি প্রাপ্তি স্বীকার করেছেন। কিন্তু রানীকে তিনি কোনো কথা জানাননি।

১৮৫৭'র গোড়ার দিকের স্থিতির সম্পর্কে সামান্য বলা প্রয়োজন। যে রানী লক্ষ্মীবাঈ ১৮৫৮ সালে বীরত্বের সঙ্গে হিউরোজের বিরুদ্ধে লড়ে ইংরেজকে প্রতিরোধ করেন এবং ব্রিটিশ বিরোধী যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দেন সেই রানীকেই আমরা দেখি ১৮৫৭ সালের গোড়ার দিকে ইংরেজ অফিসার আরস্কাইনের সঙ্গে পত্র ব্যবহার করতে। তাঁর মোট আচরণের অর্থ মরাঠী জীবনকার এমনভাবে করেছেন যাতে মনে হয়, রানী ইংরেজের স্বপক্ষে ছিলেন শুধু ইংরেজ তাঁর আনুগত্য প্রত্যাখ্যান করার ফলেই তিনি যুদ্ধে অবতীর্ণ হন।

প্রকৃতপক্ষে, ১৮৫৭'র গোড়ার দিকে বিদ্রোহ সীমাবদ্ধ ছিল উত্তর ভারতে। তখন ঝাঁসী মধ্যভারতে। আশেপাশে তো কোথাও বিদ্রোহের নাম গন্ধ নেই। রাজপুতরাজ্য তার আশেপাশে। সে রাজ্যগুলি একান্ত ব্রিটিশানুগত এবং ঝাঁসীর বিপক্ষে। মারাঠী রাজন্যদের মধ্যেও প্রবল পরাক্রান্ত গোয়ালিয়র ইন্দোর সবই ব্রিটিশের মিত্র। ভূপালের বেগমের ইংরেজানুগত্য প্রসিদ্ধ। ব্রিটিশ বিরোধী বিক্ষোভ ব্যাপক সংগ্রামের রূপ নেবে কিনা, তা তখনও বোঝা যায়নি। সেই অবস্থায় ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে তাঁর ও ঝাঁসীনগরের অবস্থা হ'ত শোচনীয়। ঝাঁসীতে ইংরেজ নরনারীর হত্যার দায়ও তাঁরই হ'ত।

সমস্ত বুঝেই তিনি আরস্কাইনকে ...লিখেছিলেন। ভেবেছিলেন এই সব ...ণ্ড খণ্ড বিদ্রোহ যদি থেমে যায়, ...লে তাঁর ভূমিকা সহজেই বুঝতে ...বে ইংরেজ এবং দামোদরের ...উত্তরাধিকারও স্বীকার করবে।

এদিকে আরস্কাইন রানীকে রাজ্য-শাসনের অধিকার দেবার পরেই জানলেন, ...নিং রানীকে জুন মাসের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে সম্পূর্ণ অপরাধী মনে করেন। ...নে আরস্কাইন দুই মুখো নীতি অবলম্বন করলেন। অরছার রানীকে তিনি পরোক্ষে জানান ঝাঁসীর রানী ব্রিটিশের শত্রু এবং ইংরেজদের হত্যার জন্য দায়ী। কাজেই অরছা যদি ঝাঁসী আক্রমণ করে, তাহলে বন্ধুর কাজই করবে।

আরস্কাইনের এই গোপন ভূমিকাটুকুর জন্যই অরছার ফৌজ ব্রিটিশ পতাকা হাতে 'আমি ইংরেজের বন্ধু' এই কথা বলতে বলতে ঝাঁসী আক্রমণ করে এবং আরস্কাইন প্রকাশ্যে ঝাঁসীর রানীকে রাজ্য শাসনের অধিকার দিয়ে গোপনে লেখেন,

"অরছার রানী ব্রিটিশের মিত্র এবং ঝাঁসীর রানী ব্রিটিশের শত্রু। অরছা রাজ্যের ঝাঁসী আক্রমণ একটি ন্যায়সঙ্গত কাজ হয়েছে।'

সুখের বিষয়, এই দুই মুখো নীতি রানী বুঝেছিলেন এবং অতি শীঘ্রই সমগ্র উত্তর ও মধ্য ভারতের বিক্ষুব্ধ জনসের পটভূমিকায় তিনি খোলাখুলি-ভাবে কূটনীতি পরিহার করে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

ইতিমধ্যে বেত্রবতী নদীর বালুকাময় তীরে তাঁবু ফেলে নথে খাঁ চিঠি লিখে জানালেন—

"ঝাঁসীর রানীকে আমি একটি মাসোহারা দেব। ঝাঁসী নগরী ও কেল্লা রানী ছেড়ে দিন।'

রানী সাভিমানে জানালেন—

"বড়ো অভিমানকারী ফৌজ
কি তিয়ারী হ্যায়।
চড়ে খাট লৈহোঁ ম্যয় কিল্লা
পুরা খাই হোঁ—
জগৎ মানে জো মারাঠা
কি নারী হ্যায়॥'

খোলা দরবার বসালেন রানী। নীল-... ...আচকান ... নীল

চিপা পায়জামা, মাথায় মুরেঠা, কণ্ঠে মুক্তার কণ্ঠি, হাতে রত্নখচিত তরোয়াল নিয়ে তিনি গদিতে বসলেন দামোদরকে কোলে নিয়ে। গঙ্গাধর রাওয়ের কাছে অরছার যেসব পওয়ার রাজপুত সর্দারেরা আনুগত্য নিয়ে এসেছিলেন, তাঁদের জানালেন—অরছার বিরুদ্ধে তাঁদের লড়তে বলেন না রানী। ইচ্ছা থাকলে তাঁরা স্বচ্ছন্দে অরছার পক্ষে ফিরে যেতে পারেন।

জবাহির সিং পটুবালে পওয়ার, দিলীপ সিং, রঘুনাথ সিং কুঁয়ার প্রভৃতি রাজপুত সর্দারেরা জানালেন—

'জো নিমক খায়ো ঝাঁসীরাজকো
তো মান লীয় বাইকী রাজ—
অব কৈসে ছোড়ী নিমক কী বাড়—
ঔর মান ভরি লাজ?"

অতএব রাজপুত সর্দারদের আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি নিয়ে রানী যুদ্ধের প্রস্তুতি করলেন।

অনন্ত চতুর্দশীর দিন কেল্লার দক্ষিণ দিকে, যেখানে বর্তমানে কেল্লার প্রবেশপথ, সেই দিকে সদলবলে এলেন নথে খাঁ। স্থূলকায়, ভোজনপটু এবং অহংকারী নথে খাঁর ধারণা ছিল, ঝাঁসী নগরী অধিকার করার পক্ষে সামান্য হুমকিই যথেষ্ট।

কামানের আওতার মধ্যে তাঁরা এসে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কামানের গোলা এসে পড়তে লাগল। দুই দিন ভয়াবহ যুদ্ধ হল। অরছা গেটের অবস্থা শোচনীয় জেনে রানী স্বয়ং সেখানে গেলেন। সোনার মোহর, পায়ের রুপোর কড়া ইত্যাদি দিয়ে সিপাহীদের উৎসাহ দিলেন। গোলাম ঘৌস খাঁ হাতী দিয়ে কড়কবিজলী কামান এনে গোলা ছুঁড়লেন।

'ঈতৈ ঘোস খাঁ নে কমানী চলাই।
কড়ংকে কড়ক গাজ ঘন তৈ' সবাই।"

রানী সিপাহীদের বললেন—
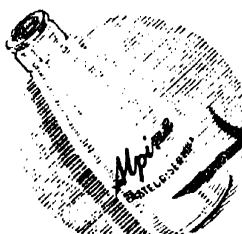
"বাই নে বিন্‌তি কিয়া সুনো সিপাই বাত।
অবকে কঠিন লড়াই, লাজ তিহারে হাত॥
লাজ তিহারে হাত, কৌন শঙ্কা না মানো।
যাঁ তক জীবত রহু তাঁ তক তব গুণ মানো॥
কহে সুকবি সিচার লৌণকে লেও ভাঁজাই।
রাঁড়ন রোটি দেউঁ, সনদ করকে মায় বাই।"

"আজ যদি আমার লজ্জা রাখো, তবে আমি সনদ করছি,·যুদ্ধে হত সৈনাদের বিধবাদের রুটির দায়িত্ব আমার।"

গোলাম ঘোসকে তিনি নিজের পায়ের কড়া এবং স্বর্ণালঙ্কার দিয়ে উৎসাহিত করলেন। যুদ্ধের ফলে বিপর্যস্ত নথে খাঁ কুড়িটি হাতী, কামান অস্ত্রশস্ত্র, তাঁবু সব ফেলে রেখে পালালেন।

কর্নেল শ্লীম্যানের সঙ্গে ঠগী দমনে কৃতিত্ব দেখিয়ে ভিক্টোরিয়ার সার্টিফিকেট পেয়েছিলেন রঘুনাথ সিং জাজেরবালে। ঝাঁসীর উপকণ্ঠে সৈনা নিয়ে উপস্থিত থেকে পলায়নপর নথে খাঁকে আক্রমণ করে পর্যুদস্ত করলেন বৃদ্ধ রঘুনাথ।

রানীর সহকারীদের সম্পর্কে ভূপৎ কবি বলেছেন—

"গুলাম ঘোস কা শোর বঢ়ায়ে
খুদাবক্স্ জওয়ান—
বড়ী হিম্মতে ন্যাব (যুদ্ধ) চঢ়ায়ো
নবীন রঘু দিবান॥
দেশ মুখ কা যুক্তি অপার
জবাহর থে বড়া সার
ইতৌ মণ্ডলীসে মরাঠাকে নার (নারী)
ফেরঙ্গ হটায়ে অধার॥"

রানীর বিমাতা চিমাবাঈয়ের মতে, নথে খাঁর পরাজয়ের পর অরছার রানী ও ঝাঁসীর রানীর মধ্যে সাময়িক সন্ধি স্থাপনা হয়েছিল। তাঁরা দুজনে—"ঝা সহোদর বহিনী প্রমাণে মিলাল্যা।" কিন্তু মার্চ ১৮৫৮ অবধি অরছার ফৌজ ঝাঁসীতে উৎপাত করেছিল।

নথে খাঁর যুদ্ধের সময়ে রানী যুদ্ধ-কালীন হাসপাতাল চালু করেছিলেন। আহত সৈন্যদের মলমপট্টি, ওষুধ, সবাই ভারতীয় আয়ুর্বেদীয় মতে হত। বিচক্ষণ হাকিম ছিল। রানী নিজে ঘুরে ঘুরে আহত সৈনাদের দেখতেন। তাদের গায়ে হাত দিয়ে, কপালে হাত দিয়ে দেখতেন। এই হাসপাতাল তখন থেকেই চালু ছিল।

নথে খাঁ ঝাঁসী আক্রমণ করেন নবেম্বর মাসে। ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই রানী তাঁর হৃত এলাকাগুলি পুনরুদ্ধার করেন।

নথে খাঁকে পরাভূত করবার পর রানীর নিজের সামরিক শক্তির সম্বন্ধে সঠিক ধারণা হল এবং সেই সময় থেকেই তিনি শুধু ঝাঁসী নয়, চন্দেরী, বাণপুর, ললিতপুর প্রভৃতি স্থানের বিভিন্ন সর্দার-দের সঙ্গে যোগ স্থাপনা করলেন। বাণ-পুরের রাজা ঠাকুর মর্দান সিং, কলিকারের জাহ্‌গিরিদার চৌবে, এঁরা এই সময় থেকেই *রানীর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনা করে সৈনাদল গড়তে শুরু করেন। ঝাঁসীর* ক্রিমিন্যাল কোর্টের সিরস্তাদার গোপাল-রাও ইংরেজী জানত বলে রানী তাঁকে *রেখেছিলেন ইংরেজী পড়া ও বলার সুবিধের জন্য। এই গোপালরাও যে ইংরেজ গোয়েন্দা, তা তিনি জানতেন না।* গোপালরাও আরস্কাইনকে নিয়মিত খবরাখবর দিতে লাগলেন।

নথে খাঁর সঙ্গে যুদ্ধের আগেই তিনি ইংরেজদের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে নিজের নির্দোষিতা প্রমাণ করে একখানি চিঠি লেখেন স্যার রবার্ট হ্যামিলটনকে। কিন্তু তার বহু আগেই ক্যানিং তাঁর সম্বন্ধে অন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন।

সমগ্র উত্তর ও মধ্য ভারতের অবস্থা ইংরেজদের অবস্থা, এইগুলি দেখে রানী বুঝলেন সময় সামান্য, যুদ্ধের সময়ে তিনি রণোন্মাদনার স্বাদ পেয়েছেন, সাধারণ মানুষের আনুগত্য এবং উৎসাহের প্রতিশ্রুতি পেয়েছেন, অপর পক্ষে ইংরেজ তরফ থেকে পেয়েছেন নিষ্ক্রিয় উপেক্ষা। সমস্ত পরিস্থিতি তাঁকেও একটি চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাল। খোলাখুলিভাবে ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রামের আহ্বান জানালেন তিনি বুন্দেলখণ্ডের সর্বত্র। সমগ্র ব্রিটিশ ভারতের এক-শতাংশ পরিবারের ক্ষুদ্র নগরী ঝাঁসী থেকে সেই আহ্বান এখানে সেখানে ছড়িয়ে পড়ল। বাষট্টি মাইল তফাতের গোয়ালিয়ারে গোয়ালিয়ার কনটিনজেন্টে খবর যেতে লাগল। গুপ্তচরের মুখে মুখে খবর ফিরতে লাগল। মুখোমুখি ব্রিটিশের সঙ্গে যুদ্ধে নামবার উৎসাহ রানী সর্বত্র সঞ্চার করতে লাগলেন। নিজেকে তিনি ঘোষণা করলেন নাবালক দামো রাওয়ের অভিভাবক বলে। ঘোষণা করে ঝাঁসী স্বাধীন রাজ্য। নিজের নামে ... চালু করলেন। কেল্লায় উড়িয়ে দি... তাঁর নিজস্ব পতাকা।

মারাঠাদের পতাকা নৈরাকান্তী ... ছিল গৈরিক—জরি পতাকা ... রানীর মনের কোথাও গৈরিক ছিন্ন ... ইংরেজের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তিনি ... বাইশবছরের জীবন পণ করেছেন ... থেকে তাঁদের মধ্যে এক ভাষা সেই ... হবে, সে ভাষা *তরোয়ালের সা... তরোয়ালের মোকাবিলা।* একটি জমি দাঁড়াবেন তাঁরা, সে জমি সংগ্রামের ... ভাবের লেনদেন হবে, সে ভাব শত্রু ... *শত্রুর মনোভাব। একদা ... নরনারীকে নিজের জীবন ... সাহায্য করেছিলেন তিনি। তার ...* সমগ্র ঝাঁসী রাজ্যের তিন লক্ষাধিক *বাসিন্দার বিরুদ্ধে মৃত্যু পরোয়ানা ...* হয়ে গেছে ফোর্ট উইলিয়ামে। ঝাঁসী নগরীর যাট হাজার বাসিন্দার ওপর ঝুলছে ফাঁসির দড়ির ছায়া। এই ... অবস্থার সামনে দাঁড়িয়ে রানী তাঁর ... সন্ধান করে দেখলেন তন্ন তন্ন ... কোথাও পেলেন না বৈরাগ্য। তাই তিনি লাল পতাকা উড়িয়ে দিলেন কেল্লার দক্ষিণ বুরুজে।

১৮৫৭ সালের আকাশের রং লাল। সমগ্র মধ্য ভারত তখন ধূমায়িত। মালোয়া, ইন্দোর, গোয়ালিয়ার, বান্দা, গড়াকোটা, বাণপুর, চিরখারী, চন্দেরী, শা-গড়, রামগড়, সর্বত্র প্রবল ব্রিটিশ-বিরোধী অভ্যুত্থানের ফলে টলে গেছে ব্রিটিশের মুঠো। গোয়ালিয়ারের সিন্ধিয়া, ইন্দোরের হোলকার, নেপালের রাণা, আর বরোদার গাইকোয়াড়ের আনুগত্যও বাঁচাতে পারেনি ব্রিটিশকে। দমিয়ে দিতে পারেনি জনসাধারণের বিক্ষোভ। লক্ষ লক্ষ ভারতীয় মানুষের মনকে মূর্ত করে সেই লাল পতাকা উড়তে লাগল ১৮৫৭ সালের আকাশে অসীম গর্বভরে।

১৮৫৮ সালের ৫ই এপ্রিল, হিউরোজের ব্যক্তিগত উপস্থিতিতে ছিঁড়ে টেনে ফেলে না দেওয়া পর্যন্ত সেখানে ছিল সে পতাকা।

(ক্রমশ

ট্রামে-বাসে

মার্শাল বুলগানিন ও মঃ ক্রুশ্চেভের ভারত আগমন প্রসঙ্গে বিশুখুড়ো মন্তব্য করিলেন—"আমরা সম্মানিত অতিথিদের সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করছি। আমাদের কান পর্যন্ত

রাশ্যার ক্ষীণকণ্ঠ যতটুকু পৌঁছয়, তাতে মনে হয় তাঁরা বুঝি—পার্বতীসুত লম্বোদর বলছেন, কিন্তু রাশ্যার ভারতীয় version-এর লাউড্-স্পীকারে শুনি—পাক দিয়ে সুতো লম্বা করা। কোন্ কথাটা সত্যি, তা এবারে জেনে নেবার সৌভাগ্য হবে।"

* * *

মার্শাল বুলগানিন এই ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়াছেন যে, তাঁহাকে এবং তাঁহার দলের লোকদের সঙ্গে যেন সাধারণ নাগরিকের মত ব্যবহার করা হয়। —"আমরা সবিনয়ে নিবেদন করব, অন্তত কলকাতায় যেন তিনি সাধারণ নাগরিকের অধিকার দাবী না করেন। টালিগঞ্জ থেকে টালা পর্যন্ত শুধু একদিন মাত্র ট্রামে-বাসে যাতায়াত করলেই বুঝতে পারবেন আমাদের কথার অর্থ"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

আচার্য ভাবে নাকি বলিয়াছেন যে, সীমার বাদবিসম্বাদ তিনি এক নিমেষে by toss of coin মীমাংসা করে দিতে পারেন। খুড়ো বলিলেন—"কিন্তু ব্যাপারটা অত সোজা নয়, কাজে হাত দিতে গিয়ে আচার্যজী দেখবেন কেউ কেউ বলছেন—হেড আই উইন, টেইল ইউ লুজ্"!!

* * *

কলিকাতা স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইন্সিট-টিউটের ব্যবহারের জন্য রাশ্যা হইতে পঁচিশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি "ইলেকট্রোনিক ব্রেন" যন্ত্র ক্রয় করা হইবে। —"বিনিপয়সার ব্রেন্ সংগ্রহের জন্যে ফড়েরা নাকি বহুদিন আগে থেকেই চেষ্টা করছে"—বলিলেন বিশুখুড়ো।

* * *

বিদেশ হইতে অনেক সুন্দরী তরুণীরা নাকি পশ্চিম পাকিস্তানে ভিড় করিয়াছেন—সন্দেহ করা
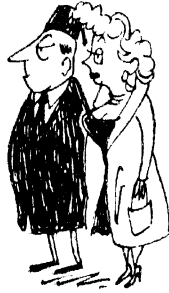
হইতেছে, তাঁরা বিদেশীদের কানাকানি বিভাগের কর্মী। শ্যামলাল বলিল—"মন্দ কি, নাকের বদলে নরুন তো মিলবে!"

* * *

শোনপুরের বিখ্যাত মেলায় এবার নাকি হাতী-দৌড়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আমাদের জনৈক ঘোড়দৌড় রসিক যাত্রী বলিলেন—"সেই ভালো, মারি তো হাতী! কিন্তু হ্যাণ্ডিক্যাপ বেরিয়েছে কি?"

* * *

জনৈক জাপানী নাবিককে সম্প্রতি ফিলিপাইনে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। নাবিকটির ধারণা প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধ এখনো শেষ হয় নাই। বিগত যুদ্ধে সে মারা গিয়াছে মনে করিয়া তার বাবা-মা একটি সমাধিস্তম্ভ স্থাপন

করিয়াছেন। নাবিক নাকি তার নিজের সমাধিস্তম্ভ পরিদর্শনে যাইবে। —"এই রকম সৌভাগ্য সবার হয় না, যদিও অনেকেই নিজের কবর নিজেই খুঁড়েন"—মন্তব্য করে শ্যামলাল।

* * *

আচার্য কৃপালনী সম্প্রতি বলিয়াছেন যে, তিনি বিহারের পাড়াগাঁয়ের লোকদের জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—রাজেন্দ্রপ্রসাদ এবং নেহরু কে এবং তাঁরা কী কাজ করেন; কিন্তু কেহই এই প্রশ্নের জবাব দিতে পারে নাই। আচার্য বলিলেন যে, ইহার অর্থ যে, কংগ্রেস সরকারের গাঁয়ের সঙ্গে যোগাযোগ নাই। খুড়ো বলিলেন—"খুবই পরিতাপের কথা, কিন্তু ভীষ্ম-দ্রোণ-কর্ণের যেখানে এই অবস্থা, সেখানে শল্যের কথা ভেবে খুব উৎসাহবোধ করছিনে!!"

জীবনী

Dr. B. C. Roy—কে পি টমাস প্রণীত। শ্রীঅতুল্য ঘোষ, প্রেসিডেন্ট, পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস কমিটি কর্তৃক ৫৯।বি চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-২০ হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১০, টাকা।

'কর্মের ফলের দিকে লক্ষ্য রাখিও না, কর্ম না করার জন্য যেন তোমার প্রবৃত্তি না হয়'—গীতার এই যে আদর্শ, ইহা যাঁহাদের জীবনকে মহিমান্বিত করিয়া তুলিয়াছে, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় তাঁহাদের অন্যতম। বিচিত্র তাঁহার কর্মময় জীবন, অসামান্য তাঁহার ব্যক্তিত্ব। সুবিখ্যাত সাংবাদিক মিঃ কে পি টমাস, এদেশের চিন্তাশীল সমাজের সর্বজনপ্রিয় 'থোমা', পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর বিরাট এই ব্যক্তিত্বের মূলে তাঁহার অনন্যসাধারণ চরিত্র-শক্তির স্বরূপ আলোচ্য জীবনীতে পরিস্ফুট করিয়া গীতোক্ত সেই আদর্শ আমাদের দৃষ্টিতে উন্মুক্ত করিয়াছেন। ডাঃ রায়ের সহিত যাঁহারা ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত নহেন, তাঁহারা অনেকে এ লেখায় অভিনবত্ব উপলব্ধি করিবেন। চিকিৎসক, ভাইস-চ্যান্সেলার, মেয়র, শাসক ডাঃ রায়ের প্রতিভা যেদিকে সম্প্রসারিত হইয়াছে, সেই দিকেই তিনি সাফল্যের সর্বোচ্চশীর্ষে অধিরূঢ় হইয়াছেন। লিখিবার মতই তাঁহার জীবন। অবস্থার কোন প্রতিবন্ধকতাই তাঁহার অগ্রগতিকে প্রতিরুদ্ধ করিতে পারে নাই। মানুষের জীবনের এই দ্বন্দ্বসংঘাত তাহার শক্তির বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে। প্রতিকূল অবস্থাকে অতিক্রম করিয়া তাঁহার প্রতিষ্ঠার সূত্রটি জানিবার জন্য সাধারণের কৌতূহলকে উদ্দীপিত হয়। আলোচ্য জীবনীতে এমন উপাদান অনেকই আছে। দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া ভারতে এবং ইংলণ্ডে ডাঃ রায়কে চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে হইয়াছে। তাঁহার জীবনের সেই কাহিনী উপন্যাসের মতই বিস্ময়কর। চরিত্র-শক্তির সুপ্রতিষ্ঠ এমন মহিমা ডাঃ রায়ের ব্যক্তিত্বকে আগাগোড়া উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে।

ডাঃ রায় কর্মিপুরুষ। কর্মই তাঁহার আনন্দ। কর্মসাধনার অনপেক্ষ এই আনন্দের মধ্যেই তাঁহার সমগ্র শক্তির উৎস নিহিত রহিয়াছে। বৃহত্তর সহিত কর্মের সম্বন্ধ-সূত্রে মনের মূলে একটি ছন্দ জাগে। এই ছন্দই প্রতিকূল অবস্থাকে অতিক্রম করিবার উপযোগী দুর্দমনীয় গতিবেগ মনে প্রাণে সঞ্চার করে এবং সেই ভাবে সর্বাবস্থার মধ্যে স্বাচ্ছন্দ্য দেয়। স্বলক্ষ্যে মনের এক বৃত্তি এবং নিয়তস্থিতির সামর্থ্যপ্রদ এই ছন্দটিকে আচার্য শঙ্কর শম নামে অভিহিত করিয়াছেন। ফলতঃ শম কর্মত্যাগ নহে, সিদ্ধি এবং অসিদ্ধিতে সমানভাবে কর্ম করিবার সামর্থ্য, বড় কথায় ইহাকেই বলা যায় যোগ।

শম শান্তির আস্পদ। ডাঃ রায়ের জীবনাদর্শের মূলে রাগমার্গের প্রচণ্ড আগ্নেয় উদ্দীপ্তি, উদ্বেগ, মনের বিভিন্ন বৃত্তির সংঘাত-সমুত্থ আবর্ত এবং আলোড়নাংশের অপেক্ষা এই শান্ত রসেরই সমধিক পরিচয় পাওয়া যায়। উদ্দাম আবেগ এখানে সংযত এবং সমাহিত। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, যতীন্দ্রমোহন, শরৎচন্দ্র, সুভাষচন্দ্র, এমনকি পণ্ডিত জওহরলালের জীবন-দর্শনের সহিত তাঁহার জীবনের এক্ষেত্রে এই একটি সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। গ্রন্থকার ত্রিবাঙ্কুরবাসী। তিনি সংবাদপত্রসেবিরূপে দীর্ঘদিন বাঙলাদেশে আছেন। তিনি বাঙালীর নিজের

লোক হইয়া গিয়াছেন। বাঙলার পঞ্চপ্রধান বা বিগ্ ফাইভের প্রত্যেকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইবার সুযোগ তাঁহার ঘটিয়াছে। সুতরাং এই রাজ্যের রাজনৈতিক জীবনের গতি-প্রকৃতির সঙ্গে তাঁহার পরিচয় যথেষ্টই আছে, কিন্তু এই ক্ষেত্রে রাজনীতির পাকের মধ্যে তিনি জড়িত হইতে চাহেন নাই। এজন্য এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন চরিত্রের বিস্তৃত আলোচনা তিনি এড়াইয়া গিয়াছেন। তিনি সোজাসুজি ডাঃ রায়ের কর্মসাধনা এবং তাঁহার চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করাইয়া দিয়াছেন। আলোচ্য জীবনীতে মানুষ হিসাবে ডাঃ রায় যে কত বড়, আমাদের পক্ষে এই সত্য উপলব্ধি করা এজন্য সহজ হইয়াছে।

বস্তুতঃ বিধানচন্দ্র রাজনৈতিক নহেন। কর্মের প্রেরণাই তাঁহার জীবনের রাজনৈতিক দিকটাকে প্রেরণা দিয়াছে। ফলতঃ এই প্রেরণা পরোক্ষ, অন্য কথায় ইহা অনেকটা আরোপিত, তাঁহার স্বভাবগত বস্তু নয়। [illegible] সম্বন্ধে কর্মের সহজাত ছন্দ বা স্বধর্ম কংগ্রেসের এই বন্ধনকেও সঙ্গে [illegible] জড়িত করিয়াছে। কিন্তু তিনি কোন অবস্থাতেই স্বধর্ম হইতে বিচ্যুত হন নাই; প্রকৃতপক্ষে হইতে পারেন নাই, বরং এই কথাই বলা চলে। ডাঃ রায়ের চরিত্রগত শম গুণ [illegible] তাঁহার অন্তরে নৈতিক বুদ্ধিকে [illegible] রাখিয়াছে। রাজনীতিকসুলভ লোক-[illegible] সাময়িক আবর্তে তাঁহার চিত্ত [illegible] হয় নাই। পক্ষান্তরে মনের [illegible] স্থায়ী ভিত্তি হইতেই কর্মের বল [illegible] হইয়া থাকে, [illegible] অন্যথায় কর্মকে খোঁটা এলাইয়া পড়িতে হয় এবং জীবনে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ করা তাহার পক্ষে সম্ভব হয় না।

[illegible] দার্শনিক পরিভাষায় এই আদর্শ [illegible]। বিধানচন্দ্রের চরিত্রে এই বিচিত্র [illegible] ও [illegible] আমরা প্রতি ক্ষেত্রে [illegible] কৃষ্ণদাস গোস্বামী বলিয়াছেন, প্রতিষ্ঠার স্বভাব এই জগতে বিদিত, যে না চায় তার হয় বিধাতৃ প্রদত্ত। ডাঃ রায়ের জীবনে আমরা এই মহাজন বাণীর যাথার্থ্য মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিতে পারি। আশ্চর্য এই যে, প্রতিষ্ঠা তিনি কোনদিনই চাহেন নাই, অথচ প্রতিষ্ঠাই তাঁহার পিছু ছুটিয়াছে। কংগ্রেসের নেতৃত্ব হইতে বাঙলার মুখ্য-মন্ত্রিত্বেও ডাঃ রায়ের জীবনে এই সত্যই [illegible] হইয়া উঠিয়াছে। মান, যশ, প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে অনপেক্ষভাবে কর্মসাধনার ভিতরে এই যে আনন্দ, এই যে অনাসক্তি—সাক্ষাৎ-সম্পর্কে ভজন, সাধন, উপাসনা প্রভৃতি আনুষ্ঠানিক আস্তিকতা ইহাতে অভিব্যক্ত হোক না হোক, আধ্যাত্মিকতাই ইহার স্বরূপ। ডাঃ রায়ের জীবন-দর্শনের এই স্বরূপগত আধ্যাত্মিকতাই তাঁহাকে গান্ধীজীর একান্ত অনুরক্ত করিয়া তোলে। সেই অনুরক্তির রীতি তাঁহার মনের অবচেতন স্তর হইতেই হয়ত পরিস্ফুর্ত হইয়া তাঁহাকে প্রভাবিত করিয়াছে। তিনি গান্ধীজীর প্রদর্শিত অহিংস নীতির মধ্যেই জীবনের সঙ্গতি উপলব্ধি করিয়াছেন। ডাঃ রায়ের মতে, সর্বপ্রকার দ্বন্দ্ব ও বিরোধকে উপশমিত করিয়া আত্মভাবকে প্রতিষ্ঠা করার মধ্যেই জীবনের শাশ্বত সত্র নিহিত রহিয়াছে এবং সেই পথেই মিলে অমৃত। সেই সূত্রেই মানুষের সঙ্গে ঈশ্বরের যোগ। গান্ধীজীর জীবনাদর্শের এই আধ্যাত্মিক সত্যের উদ্দীপনা ডাঃ রায় আবার প্রকৃতপক্ষে তাঁহার পরম সাধক পিতৃদেব এবং তপঃপরায়ণা পুণ্যশীলা জননীর নিকট হইতে লাভ করিয়াছেন। ডাঃ রায়ের জীবনের অন্তর্নিহিত শক্তি, সেবাধর্মে তাঁহার প্রেরণা, ইহার গোড়া রহিয়াছে সেই-

খানে। এই হিসাবে তিনি সত্যই উত্তরাধিকার সূত্রে দুর্লভ সম্পদের অধিকারী।

গ্রন্থকার বলিয়াছেন, তিনি ডাঃ রায়ের বিস্তৃত জীবনী লিখেন নাই; তিনি শুধু তেমন জীবনী লিখিবার পথ প্রস্তুত করিয়াছেন। ডাঃ রায়ের মত বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষের বৈচিত্র্যময় জীবনের পূর্ণ পরিচয় সমধিক পরিব্যাপ্তি এবং বিস্তৃতির অপেক্ষা করে, ইহা ঠিক; কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থে সেজন্য অপূর্ণতা উপলব্ধি হয় না। প্রকৃত গ্রন্থকারের লিপিকৌশলে ডাঃ রায়ের শ্রেষ্ঠ পরিচয়ই আমরা পাই। এই জীবনী আলোচনা করিলে আমাদের মনে এই সত্য সুদৃঢ় হইয়া উঠে যে, সাধনায় ঐকান্তিকতা থাকিলে সিদ্ধিতে সমারূঢ় হওয়া সকল মানুষের পক্ষেই সম্ভব। মানুষ অবস্থার দাস নয়। আত্মবীর্যে অবস্থার উপরে সে উঠিতে পারে। মানুষের এই পরম মাহাত্ম্যে এমন জীবনী সমাজকে উদ্দীপিত করিবে। বস্তুতঃ আত্ম-প্রত্যয়বোধই ব্যক্তি এবং জাতির উন্নতির মূলে কাজ করে। এই বোধটি সমাজ-জীবনে বলিষ্ঠ করিয়া তুলিবার প্রয়োজন সকলেই উপলব্ধি করিবেন। শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকার দেশের সেই জরুরী প্রয়োজনটি সাধন করিয়াছেন। আমরা এজন্য তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতেছি।

৩৭৫।৫৫

প্রাপ্তি স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থ আসিয়াছে।

বাঙলার তীর্থ—ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য।

তপস্যা—শ্রীমঞ্জুল সেন।

নূতন সূর্যোদয়—শ্রীদীপিকা মৈত্র।

গায়ত্রী ও গীতামন্ত্র—ভাই হরিতোষ।

গোপীর মন—শ্রীমতী রাইহানা তায়েবজী। অনুবাদক—শ্রীনীরদবরণ গোস্বামী।

অম্ল-মধুর—নারায়ণ চৌধুরী।

বিষকন্যা—আশরাফ সিদ্দিকী।

মহাকাশের ঠিকানা—অমল দাশগুপ্ত।

পূর্বাভাষ—ইভান তুর্গেনিভ; অনুবাদক—রাম বসু।

শিল্পী—তারাপদ রাহা।

বিমান-বোটে বোম্বেটে—দীনেন্দ্রকুমার রায়।

পদ্মদীঘির বেদিনী—অমরেন্দ্র ঘোষ।

শিশু শিক্ষার গোড়ার কথা—শ্রীউৎপল হোম রায়।

মৃত্যুত্তীর্ণ—বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

The Cardinal Doctrines of Hinduism—Srimat Puragra Parampanthi.

Pictures from St. Francis—T. L. Vaswani.

Radio Sangeet Sammelan 10-15 November, 1955—Published by the Publications Divisions, Ministry of Information and Broadcasting Govt. of India.

সুযোগের অপচয়

…পা বইয়ের গল্প হলেই প্রায় …ত্রে দেখা যায় ছবিতে লেখকের নামটাই … ব্যবহার করা হয়েছে, তার মূলে …র বেশীরভাগই কিছু নেই। অনেক …ত্রে আবার লেখকের দেওয়া গল্পের …ম পর্যন্তও বদলে নেওয়া হয়। রূপ-…র্তির তোলা "দুজনায়" ছবিখানি …জ বসুর উপন্যাস "এক বিহঙ্গী"র …র্তিত নাম। অবশ্য গল্পটা ছবিতে …ক অমনধরো বদল করা হয়নি, …ন্যাসের অনেকটাই আছে, ভাবে ঘটনায় … চরিত্রে সব দিক থেকেই। তবে …ন্যাস থেকে ছবির জন্য উপাদান …র্বাচনটা যথাযথ হয়নি। এ উপন্যাস … ছবি তুলে নতুন একটা কিছু করা …শা যেতো না, সে প্রেরণা দেবার মতো … নেই এতে, তবে যা ছিল তা …হারে অনভাবে বিবেচনা খাটালে …লে … মতো রসালো … ছবি একখানি বেশ তৈরী করা …তো! এই একটা সুযোগ পরিচালক … যে নষ্ট করে ফেলেছেন। তাছাড়া, …ও যদি হতো যে, মূল গল্পের …ইনতা ঢাকা দিয়ে পরিচালক তাঁর …জস্ব চিন্তাশক্তির প্রয়োগে এমন …টা কিছু সৃষ্টি করতে সক্ষম …ছেন, যা মূল কাহিনীর সঙ্গে যথেষ্ট …ল নিয়েও একটি বেশ নয়নমন ভরানো ছবি হয়ে উঠতে পেরেছে, …লে উপন্যাসের পাঠক হিসেবে …যোগ থাকলেও ছবির দর্শক হিসেবে …ক্ষণ পুষিয়ে যেতে পারতো। কিন্তু …হয়নি। এখানে দেখা যাচ্ছে উপন্যাসে …ছিল, দুর্বল পরিচালক তা ঠিক মতো …ালো করে তুলতে বা বেছে বাদ দিয়ে …ত পারেননি, কিন্তু উপন্যাসে গুণের …ছিল, ছবিতে তার অনেকই পরিহার …গিয়েছেন।

* * *

নামটাতেই তো গোলমাল! "এক …গী"র যা কাহিনী, তাতে ও-নামটা …সঙ্গে মানিয়ে যায়, কিন্তু ছবির নাম … রাখা হলো "দুজনায়", অথচ …কে ঠিক সেইমতো সাজিয়ে নেওয়া … না। চিত্রনাট্য একটি বিহঙ্গীরই

—শৌভিক—

কাহিনী নিয়ে "দুজনায়" নামের সার্থকতা দাঁড় করাতে হয় টেনেবুনে, জোর করে—গল্প একজনকেই নিয়ে। মা-মরা বড়লোকের মেয়ে, কলেজে পড়ে, সাধারণো নাচ-গান-থিয়েটার করে, আড্ডা দিয়ে রাত করে বাড়ি ফেরে, সাধারণত ফোন করে যাদের শহুরে শিল্পী মেয়ে বলে অভিহিত করা হয়, সেই গোত্রের মেয়ে অনিতা। ওকে ধরেই ছবির আরম্ভ। মোটর চালিয়ে চলেছে কলকাতার রাস্তা ধরে, রাস্তার আলো দেখে বোঝা যায় যে, সময়টা সন্ধ্যার পর। অনিতা চলেছে তো চলেছেই; এসপ্লানেড, চৌরঙ্গী ও ময়দানের রাস্তা ধরে ধরে চলার যেন শেষ হতে চায় না। অবশেষে গাড়ি এসে থামলো এক বাড়িতে। অনিতা বাড়িতে প্রবেশ করতেই সামনে দেখলে এক অতি গোবেচারা গেঁয়ো চেহারার লোক; পরনে প্রকাণ্ড সাবেক … যেন গলাবন্ধ কোট, বুট-জুতো, টেরি না কেটে সোজা চুল আঁচড়ানো হলেই গাঁয়ের লোক বোঝা

শীঘ্রই ভারতের সর্বত্র মুক্তিলাভ করছে—লক্ষ্য রাখুন

[...]। এই ব্যক্তিই নায়ক মিহির। [উপ]ন্যাসে এমন অসংগত পরিকল্পনা নেই, [...] করে এর পরেই যখন জানতে [পারা] গেল যে, মিহির বি-এস্‌সি পাশ, [যদি]ও গ্রামে বাস হলেও কোন না কোন [...] কলেজে তাকে চারটি বছর [...]ই হয়েছে। তার অমন একটা [পো]শাক অসংগত অবশ্যই। আরও একটা [...] দিক আছে। ঐরকম চাষাড়ে পোশাক সত্ত্বেও যেই দেখা গেল যে, [নায়]কের চরিত্রে রয়েছেন বসন্ত চৌধুরী, [...] যিনি নায়কের চরিত্রেই অবতরণ [করে]ন, সঙ্গে সঙ্গেই ধরা পড়ে গেল যে, [ই]নিই নায়ক এবং সবিতা চট্টোপাধ্যায় [অভি]নীত অনিতা চরিত্রই নায়িকা। গল্প [...] না হতেই নায়ক-নায়িকা নির্দিষ্ট [হয়ে] যাওয়ার ফলে গল্পের রস জমবার [সম্ভাবনা] সেই যায় ফিকে হয়ে, ফলে দর্শকের [...] চরিত্র দুটি সম্পর্কে পরে আর [...] সময়েই ঘনীভূত হতে পারলো না। [এ]রপর শুধু বাকি রইলো ওরা দুজনে [...] বাধা টপকে শেষে মিলিত হয়, [তা]ই দেখবার আগ্রহটুকু।

* * *

অনিতা যে মিহিরের সঙ্গে দেখা [হবা]র অল্প পরই তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে [প]ড়ছে, তা বুঝতে বাকি রইলো না, যখন মিহিরকে প্রথমে বেয়ারার চাকরির জন্য উমেদার মনে করে শেষে পরীক্ষা করতে গিয়ে মিহির গ্র্যাজুয়েট শুনে অনিতাকে ঢোক গিলতে হলো। এরপর এদের সম্পর্ক কি দাঁড়াবে, অর্থাৎ সরল গবেট চেহারার আবরণে মহাগুণীর সন্ধান পেলে নায়িকারা তাকেই পাবার জন্যে যে কেমন আকুল হয়ে ওঠে, সে কাহিনী বহু আগে থেকেই বহুজনের বহু রচনায় ও ছবিতে দেখাই আছে। কিন্তু দেখে আকৃষ্ট হওয়া মাত্রই যদি দুজনের মিল হয়ে যায়, তাহলে গল্প ওইখানেই ফুরিয়ে যায়। কাজেই ওদের পরম মিলনক্ষণটি এনে দিতে আরো খোরাপথ ধরতেই হয়; মিলন যাতে সুলভ না হয়, তার জন্য মাঝে নানারকমের প্রতিবন্ধক, বিচ্ছেদ ও সমস্যার সৃষ্টি করতে হয়। এই হলো ছকে বাঁধা গল্পের ধারা। এখানেও তা-ই ঘটেছে।

* * *

মিহির গ্র্যাজুয়েট এবং অংকে দুরন্ত জানতে পেরে অনিতা তাকে অংক শেখাবার জন্য শিক্ষক নিযুক্ত করে নিলো। বলা বাহুল্য, অনিতার আসল উদ্দেশ্য যে, মিহিরকে কাছে পাওয়া তা প্রকাশ পেতে দেরী হলো না, অংক শেখাটা বাহানা মাত্র। মিহিরের এ বাড়িতে আসার একটা সূত্র আছে। অনিতার বাবা হিমাংশু আইনজীবী। একবার জঙ্গীপাড়ায় এক মামলার তদারকে গিয়ে অসুখে পড়েন এবং সে সময়ে মিহির তার শুশ্রূষা করায় তিনি কৃতজ্ঞতাস্বরূপ মিহিরকে চাকরি দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসেন। সেই সূত্রেই মিহিরের আসা। হিমাংশুর ভুলো মন স্বভাবের মধ্যে একটা অমনস্তাত্ত্বিক অসঙ্গতি পাওয়া যায়। ভুলোমন মানুষকে দেখা যায় সংসারের কাজকর্ম, কথাবার্তা সম্পর্কে একেবারে উদাসীন, কিন্তু যার যা পেশা তার মধ্যেই মগ্ন হয়ে থাকে। আইনজীবী আইনের বা নিজের হাতের কোন মামলার মধ্যে ডুবে থাকে এবং তার কথাবার্তার মধ্যে তারই জের চলতে থাকে। হিমাংশু কিন্তু তা নয়, ওকে যেরকম ভুলোমন দেখানো হয়েছে তাতে অমন লোকের পক্ষে আইনের ব্যবসা করাই চলে না। উপন্যাসে অবশ্য

প্রগতির পরিচয়—স্ট্যানভ্যাক কুইজ-৩
দেশের সর্বসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্যেই ভারতের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, একথা আপনি জানেন। কিন্তু প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এ পর্যন্ত দেশের কতখানি উন্নতি হয়েছে তার খবর রাখেন কি? নীচের প্রশ্ন ও উত্তরগুলোর সঙ্গে আপনার ধারণা পরখ করে দেখুন!
১ বড় বড় সেতু তৈরী হওয়ায় যোগাযোগ ও পরিবহন অনেক সহজ হয়েছে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে ১৯৫৫ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত নির্মিত সেতুর সংখ্যা ছিল:
ক) ৬ খ) ২৫ গ) ১২
২ শুধু বৃহৎ পরিকল্পনামূলক কাজই নয়, নানা রকম শিল্প-দ্রব্যও তৈরী হচ্ছে। ১৯৫৪-৫৫ সালে ভারতে
সেলাই কল
তৈরী হয়েছে:
ক) ৮০,৭৭৬
খ) ৮২,৩৯১
গ) ৩৬,২২৫
৩ তুলা
ভারতবর্ষের একটি অতি-প্রয়োজনীয় কৃষিজাত পণ্য। ১৯৫১-৫৫ সালের মধ্যে তুলার
বার্ষিক উৎপাদন
বেড়েছে:
ক) ২,১৯,000,000 পা:
খ) ৫,২0,000,000 পা:
গ) ১৭,000,000 পা:
৪ বিরাট বিরাট কৃষি-পরিকল্পনার জন্যে ভারতে সারের প্রয়োজন খুব বেশী। ১৯৫৪-৫৫ সালে ভারতে অ্যামোনিয়াম সালফেট তৈরী হয়েছে:
ক) ১,১৫,000 টন
খ) ১৭,000 টন
গ) ৩,৬৫,000 টন
ভারতের
এই তথ্য পরিবেশন করতে পেরে আজ গর্বিত—তা ছাড়া আমাদের পেট্রলজাত দ্রব্য উৎপাদন, পরিশোধন ও পরিবেশনের ত্রিবিধ কর্মধারা দেশের এই অগ্রগতির সহায় বলে স্ট্যাণ্ডার্ড-ভ্যাকুয়াম আজ গৌরবান্বিত।
উত্তর
১ ২৫টি বিরাটকায় সেতুর নির্মাণকার্য সমাপ্ত হয়েছে—আরো অনেক সেতু এখন নির্মীয়মাণ!
২ ৮০,৭৭৬টি। ভারতে তৈরী সেলাই কল বাইরেও রপ্তানি হচ্ছে। ফলে, দুর্লভ বিদেশী মুদ্রা হাতে আসছে!
৩ ৫,২0,000,000 পাউণ্ড। মূল পরিকল্পনার লক্ষ্য ছাড়িয়ে প্রত্যেক ভারতবাসীর জন্যে ১.২/৫ পা: অতিরিক্ত তুলা উৎপন্ন হয়েছে।
৪ ৩,৬৫,000 টন। পরিকল্পনার প্রথম বছরের তুলনায় ১৯৫৪/৫৫ সালে অ্যামোনিয়াম সালফেট-এর উৎপাদন প্রায় চারগুণ বেশী!
নয়াদিল্লীতে ইণ্ডিয়ান ইণ্ডাস্ট্রীজ ফেয়ার দেখুন, ২৯-এ অক্টোবর থেকে ১৫ই ডিসেম্বর
V 2431

পারলে এ গল্প যে ঐখানেই শেষ হয়ে যায়! কাজেই তাকে অনুপস্থিত রাখতে হয়েছে। বিয়ের কনে হয়ে এসেই অনিতা দারুণ দুর্ভোগের মধ্যে পড়লো। মিহিরের বাড়িতে একপাল হ্যাংলা ছেলেমেয়ে আর বিষদশনা একদল মেয়ের শ্লেষ একদিনেই অতিষ্ঠ করে তুললে। গ্রামের মুখরা আত্মীয়া মেয়ে কজনে অনিতাকে শহুরে নাচনেওয়ালী যথেচ্ছ চালচলনের মেয়ে বলে শ্লেষ বর্ষণ করতে লাগলো। গ্রামের

মেয়েরা অবশ্য অনিতার আসল পরিচয় জানতেই পেরেছিল। ওদিকে অতিষ্ঠ হয়ে এবং আর একদিক থেকে বাবার অসুস্থতার কথা শুনে অনিতা ফুলশয্যার পরদিনই একা চাকরের সঙ্গে বাবার কাছে চলে এলো। ওর এইভাবে চলে আসাটাও অতীব কষ্ট কল্পনা, এখানেও গল্পকে জবরদস্তী জট পাকানো।

* * *

তারপর অনিতা ও মিহিরের আর দেখা সাক্ষাৎ নেই। স্বামীকে ছেড়ে থাকা যে কি দুর্বিসহ ব্যাপার সে বিষয়ে অনিতাকে অবহিত করার জন্য সী এলো। শেষে একদিন মিহিরকেই আস হলো অনিতার ক্লাবে তার সঙ্গে দে করার জন্য। মিহিরের মা আসছে বৃন্দাবন থেকে এবং মাত্র একবেলার জন্য পুত্রের সংসারে কাটিয়ে যাবেন। ছেলের বিয়ে পর্যন্ত দেখে যেতে পারে না তার কাছে দীর্ঘদিন পর আসছেন একবেলার জন্য! আরো বেশী সম তাকে রাখলে কি অসুবিধে হতে উপন্যাসে অবশ্য শেষটা অন্যরকম সেটার মধ্যে যুক্তি ছিল। বৃন্দাবন থাক মিহিরের মা পুত্রবধূর নামে কুৎসা রটা উড়ো চিঠি পেতেন, তিনি তা বিশ্ব করেননি। তার ধারণা তার ছেলে আনন্দভরা সংসার পেতে সুখে ঘরক করছে। তার সেই ধারণা যাতে টুটে যায় এই জন্যেই মিহির চায় অন্তত একবেলার জন্যও অনিতা যেন গ্রামে সংসার পেতে সুখে ঘরকন্নার অ করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় কাহিনীর শুধু এই অংশটি 'অ নামে মনোজ বসু একটি স্বতন্ত্র গল্পাক ছাপিয়েছিলেন। তখন মিহিরের ম ওপর অনিতা সম্মতি না জানালেও মিহির মাকে নিয়ে গ্রামে পৌঁছতে দে অনিতা আগেই এসে ঘরকন্না সা বসে আছে। মিহিরের মা ওদের বিচ্ছেদের সংবাদ জানতে পারলেন সেটা যাতে জানতে না পারেন সেইজ মিহিরের যে বাড়িতে অনিতা কনে প্রথম গিয়েছিল সেই বাড়ি, আর বাড়িতে ওদের সঙ্গে মা দেখা এলেন, এই বাড়ি দুটি পৃথক গ্রামে দেখানো হয়েছে। বড়ো কৃত্রিম
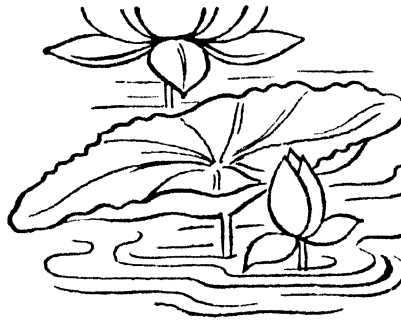
মধু বসু পরিচালিত নিলি দেবীর কাহিনী অবলম্বনে গৃহীত "শুভ-লগ্ন"র নায়িকা নবাগতা শুক্লা সেন

সাজানো গল্প; অত্যন্ত কষ্টকল্পিত। এ বিষয়ে মূল উপন্যাসের প্রভাব ছবিতে ঠিকমতোই প্রতিফলিত হয়েছে। মার সামনে অনিতা একেবারে অন্য মানুষ। এমন কি গোবর জল দিয়ে ঘর নিকিয়ে পর্যন্ত মিহিরকে সে অবাক করে দিলে। একবেলাতেই সেবাযত্ন করে অনিতা শাশুড়ীর মন সম্পূর্ণ জয় করে নিলে। যাবার আগে মা অনিতার হাতে ও-বংশের বালাজোড়া পরিয়ে দিয়ে গেলেন। তিনি চলে যাবার পর এবার এলো অনিতার চলে যাবার পালা। মিহির ওর চলে যাওয়া ব্যাপারে কেমন যেন নির্বিকার। শেষে অনিতাই অবশ্য ভেঙে পড়লো মিহিরের বুকে।

• • •

শহরের মেয়ে নাচগান করে কলেজে পড়ে, স্বাধীনভাবে চলাফেরা করে, আড্ডা দিয়ে রাত করে বাড়ি ফেরে বলেই তারা সংসারধর্মের বাইরের জীব, বা নারীর সহজ সরল জীবনধর্ম থেকে তারা
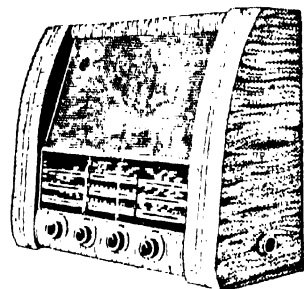
রিচিত্রয়, সেটা যে সীতা নয় তারই দৃষ্টান্তরূপেই অনিতা চরিত্রটির পরিকল্পনা। ছবিতে তা ফুটেছে কিন্তু অত্যন্ত কৃত্রিম ও অস্বাভাবিক পরিবেশের মধ্যে দিয়ে। আগেই দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে কিভাবে জোর করে গল্পকে জট পাকিয়ে তোলা হয়েছে। বেশ চমক ধরাবার মতো কোন ঘটনা নেই, গল্পের বাঁধুনিও তেমন নয়। শেষের দিকে গল্প যেপ্রকার ঘটনা নিয়ে সাজানো তার অনেকাংশই অবান্তর। তবু ছবিখানি শেষপর্যন্ত দেখার জন্য যে বসে থাকা যায় তার দরুণ কয়েকজন অভিনয় শিল্পীরই দায়ী। এদের মধ্যে একটু বেশী ঢিলে ঢালা চরিত্র হয়ে পড়লেও অনিতার ভূমিকায় নীলিমা চট্টোপাধ্যায়কে ভালো লাগলো। একটা অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্য আছে ওর অভিনয়ে, এর গড়বড়ি যা ঘটেছে তা থাকতে দেওয়ার দোষ পরিচালকের। বসন্ত চৌধুরী প্রথম আবির্ভাবে এতো গরীব গোবেচারার চেহারায় মিহিরকে হাজির করে দেন যে, পরে স্বাভাবিক শিক্ষিত ও ভব্যপরিচ্ছদ যুবকরূপে ওকে দেখে হঠাৎ খটকা লাগা অস্বাভাবিক নয়; পরিবর্তনটা এমনিই দৃষ্টিতে পড়ে খোঁচা হয়ে। এ ভাবটা দৃষ্টি থেকে সরিয়ে ফেললে শেষের দিকে ওর অভিনয়ে একটা আন্তরিকতার রেশ উপলব্ধি করা যায়। অলকের চরিত্রে [illegible] একেবারেই বেমানান। স্কুলের ছাত্রের অতিশয়তাই প্রকট হয়েছে ওর অভিনয়ে। ওটা ওর প্রকৃতির ভূমিকাই নয়। ভোলানাথ হিমাংশুর চরিত্রে পাহাড়ী সান্যালের অভিনয় ভালো লাগলেও চরিত্রটির প্রকৃতির মধ্যে গুরুচণ্ডালি দোষ এসে পড়েছে। আগে কিছুই মনে থাকতো না, মহা হাসিখুশী আত্মনিমগ্ন ব্যক্তি। মিহিরকে নিমন্ত্রণ করে তাকে খেতে না দিয়েই চলে যেতে বলে বসেন তিনি। অথচ অনিতার বিয়ের পর এমন স্বাভাবিক মানুষের গাম্ভীর্য তার মধ্যে দেখা গেল যে মনে হয় আগের অংশে তিনি ভুলো সেজে থাকার ভান করছিলেন যেন। আর ভালো লাগার মতো অভিনয় দেখিয়েছেন শান্ত মেয়ে সীতার ভূমিকায় অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়। অল্প কথা, শান্ত সলজ্জ ভাবটি তিনি সুন্দর ফুটিয়েছেন। তবে অলকের প্রণয় নিবেদনকালে অনিতার কাছে ধরা পড়ে ছাদে গিয়ে ওর গান চরিত্রটির মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করে দিয়েছে; ওখানটা বম্বের অনুসৃতি হয়ে পড়েছে। তবে এ দোষটা পরিচালকের। মলিনা দেবী মিহিরের মার চরিত্রে স্নেহশীলা উদারচিত্ত মার চরিত্রই ফুটিয়েছেন। কমিক পরিবেশন করেছেন মিহিরের আশ্রয়দাতা আত্মীয়ের চরিত্রে তুলসী চক্রবর্তী, যে কয়েকটি দৃশ্যে সামান্যক্ষণের জন্যও তিনি আছেন সে সময়ে আর কাউকে তিনি পাত্তা পেতে দেননি। পরিচালক নির্মল দে মিহিরের মেসের এক সহবাসীর চরিত্রে ভানু বন্দোপাধ্যায়ের স্থান নিতে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু এতোই কি সহজ! অভিনয়ে আর আছেন বেচু সিংহ, নৃপতি, সুপ্রভা মুখোপাধ্যায়, তারা ভাদুড়ী, প্রমীলা ত্রিবেদী, আরতী দাস, কমলা অধিকারী প্রভৃতি।

রিহার্সালের স্থানটা ক্যাবারে বলে ভ্রম হয়। দৃষ্টিকটু এবং শ্রুতিকটুও হয়েছে পরিবেশের সঙ্গে কাজের ঝাঁঝ মিশিয়ে দেওয়ার জন্য। বস্তুত এ ছবির সংগীত পরিচালকই কিছুদিন আগে '[illegible]'র সংগীত পরিচালনা করেছিলেন মনে করতেও কষ্ট হয়, তার আগের অতুল কীর্তির কথা বাদই দেওয়া গেল। সংগীতের দিক ছবির দুর্বলতা বাড়িয়েছে। আলোকচিত্রগ্রহণে দেওজী ভাইয়ের কাজ ভালো। তবে কলকাতার রাস্তা দেখাতে কেবলই রাতের বেলা একটা একঘেয়েমী এনে দেয়। জে ডি ইরানীর শব্দগ্রহণ কাজও পরিচ্ছন্ন। কয়েকস্থানে কোঁচকানো সেট, ঝকঝকে করে সাজানো অনিতার ঘরে ময়লা একটা আর্শি, সোনারপুরে মিহিরের বাড়িতে অনিতা প্রথম যাবার সময়ে চালাটি সেট বলে খটখটে দেখানো প্রভৃতি ত্রুটি সত্যেন রায়চৌধুরীর মতো শিল্পনির্দেশকের কাছে আশা করা যায় না। তা নইলে কাজ তাঁর ভালো।

* * *

কলেজের ছেলেমেয়েদের নাটক

একলব্য

নিউজিল্যাণ্ড এখন ভারতের ক্রিকেট অতিথি এবং ক্রিকেট মাঠে নিউজিল্যাণ্ড ও ভারতের এই প্রথম প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এর আগে ক্রিকেট মাঠে নিউজিল্যাণ্ডের সঙ্গে ভারতীয় দলের সাক্ষাৎ না হলেও ভারতের হকিকে প্রথম আতিথ্য জানিয়েছিল নিউজিল্যাণ্ড। বিশ্বের অন্য কোন দেশ আমন্ত্রণ জানাবার আগে ১৯২৬ সালে ভারতের এক ফৌজী হকি দলকে নিউজিল্যাণ্ড বিদেশ সফর করার জন্য প্রথম আমন্ত্রণ জানায়। এই ঐতিহাসিক সফরের অভাবনীয় সাফল্যের ফলে ভারত আমস্টার্ডাম অলিম্পিকে জাতীয় দল পাঠাবার অনুপ্রেরণা পায়; আর নিউজিল্যাণ্ড

কেভ
(অধিনায়ক)

রিড
(সহ অধিনায়ক)

[illegible] দ্বিতীয় [illegible] হল [illegible] ক্রিকেটের অভিজ্ঞতা। সুতরাং নিউজিল্যাণ্ডের কাছে আমাদের [illegible] শিখবার কিছু আছে বই কি?

নিউজিল্যাণ্ড বৃটিশ কমনওয়েলথভুক্ত ছোট্ট দেশ। ইংরেজ যেখানে তাদের পতাকা উড়িয়েছে, সেখানেই পুঁতেছে তাদের ক্রিকেট স্টাম্প। ফলে অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ও ভারতের মত নিউজিল্যাণ্ডও ক্রিকেট খেলা শিখতে পেরেছে। নিউজিল্যাণ্ড দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের আবহাওয়া, প্রাকৃতিক অবস্থা এবং পরিবেশ ইংলণ্ডের লোকের কাছে এতই ঘরোয়া বলে মনে হয় যে, প্রত্যেক ইংলণ্ডবাসী মনে করেন—ইংলণ্ডের বাইরে পৃথিবীতে আর একটি ইংলণ্ড আছে, সেটি হচ্ছে নিউজিল্যাণ্ড।

১৯৩০ সালের আগে নিউজিল্যাণ্ড ইংলণ্ডের সঙ্গে টেস্ট ক্রিকেট প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করলেও নিউজিল্যাণ্ড ক্রিকেটের বিবরণ থেকে পাওয়া যায় ১৮৭৭ সাল থেকে ১৯১৪ সালের মধ্যে ১৫বার অস্ট্রেলিয়ান টীম এবং ৭বার ইংলণ্ড টীম নিউজিল্যাণ্ড সফর করে এসেছে। নিউজিল্যাণ্ডে ক্রিকেট খেলার প্রচলন হয়েছে অবশ্য আরও আগে। ১৮৩৫ সাল থেকে এরা খেলা আরম্ভ করে এবং ১৮৪১ সাল থেকে সংবাদপত্রে ক্রিকেট খেলার বিবরণ প্রকাশ হতে থাকে। ১৮৬০ সাল থেকে আন্তঃপ্রাদেশিক খেলার প্রবর্তন হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে মাকলারেন, [illegible], মেরিস, ভিভিয়ান, এলেন প্রভৃতি খ্যাতনামা খেলোয়াড়দের নেতৃত্বে বিভিন্ন ইংলিশ টীম নিউজিল্যাণ্ড সফর করেছে। মহাযুদ্ধের পর [illegible] ব্রাউনের নেতৃত্বে অস্ট্রেলিয়া দল এবং [illegible] অধিনায়কত্বে এম সি সি দল [illegible] সফর করে। [illegible] অস্ট্রেলিয়া সফর শেষে নিউজিল্যাণ্ডে [illegible] এম সি সি দলের [illegible]। [illegible] হাটনের এম সি সি দল নিউজিল্যাণ্ড সফর করেছে। অপরদিকে নিউজিল্যাণ্ড দলও ইংলণ্ডে দুইবার [illegible] দক্ষিণ আফ্রিকা ঘুরে এসেছে। কিন্তু এত অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে নিউজিল্যাণ্ডের অবদান [illegible]। ব্যক্তিগতভাবে অনেক খেলোয়াড় আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছেন, কিন্তু দলগত কৃতিত্ব বেশী নেই। আমাদের ভারতেরই মত, বহুদিন থেকে ভারত ক্রিকেট খেলছে। কিন্তু বৈদেশিক সফরে দলগত সাফল্য উল্লেখ করার মত নয়। ক্যান্টারবেরী, অকল্যাণ্ড, ওটাগো, সেন্ট্রাল ডিস্ট্রিক্ট, সাউথল্যাণ্ড প্রভৃতি নিউজিল্যাণ্ডের নামকরা ক্রিকেট দল। প্লাঙ্কেট শীল্ডের খেলাই এখানকার ক্রিকেটের আকর্ষণীয় খেলা। ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে খেলা আরম্ভ হয়ে মার্চ মাসের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে এই খেলা শেষ হয়ে যায়। অবশ্য সপ্তাহ শেষে প্রীতি ক্রিকেট খেলার রেওয়াজ চলে বহুদিন ধরে।

সাটক্লিফ হেজ

নিউজিল্যাণ্ড দল পাকিস্থানে মোটেই ভাল খেলতে পারেনি। পাকিস্থানে মাত্র একটি খেলায় তারা বিজয়ী হয়েছে। দুটি টেস্টসহ তিনটি খেলায় স্বীকার করেছে পরাজয় আর অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে দুটি খেলা। ভারতে এসেও নিউজিল্যাণ্ডকে প্রথম খেলায় পশ্চিম অঞ্চল দলের কাছে ৬ উইকেটে হার স্বীকার করতে হয়েছে। হায়দরাবাদে ভারতের সঙ্গে তাদের প্রথম টেস্ট খেলা শেষ না হতেই এই বিবরণ লেখা হল। নীচে নিউজিল্যাণ্ড দলের খেলোয়াড়দের সংক্ষিপ্ত জীবন পরিচয় দেওয়া হচ্ছে।

হেনরী বি কেভ—অধিনায়ক—হেনরী কেভ নিউজিল্যাণ্ডের সেণ্ট্রাল ডিস্ট্রিক্ট দলের

পুর লেগার্ট

অধিনায়ক। এবার সর্বপ্রথম নিউজিল্যাণ্ড দলের অধিনায়কত্ব করবার সম্মান পেয়েছেন। 'সিম বোলার' হিসাবেই কেভের সুনাম, কিন্তু ব্যাটিংয়েও তিনি কম পারদর্শী নন। ১৯৪৯ সালের ইংলণ্ড সফরে সর্বপ্রথম নিউজিল্যাণ্ডের জাতীয় দলে মনোনীত হন তবে ইংলণ্ডে কেভ আশানুরূপ সাফল্য অর্জন করতে পারেন নি। তবু বোলার হিসাবে তিনি নিউজিল্যাণ্ড দলের পক্ষে অপরিহার্য ছিলেন। গত তিন বছর কেভ খুবই ভাল খেলছেন। ১৯৫৩-৫৪ সালে কেভের অধিনায়কত্বে সেণ্ট্রাল ডিস্ট্রিক্ট ক্লাব নিউজিল্যাণ্ড ক্রিকেটের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার প্লাঙ্কেট শীল্ড লাভ করেছে। ১৯৫২-৫৩ সালে প্লাঙ্কেট শীল্ডের খেলায় লেগার্টের সহযোগিতায় কেভ নবম উইকেটের এক নতুন রেকর্ড করেন। নবম উইকেটের ২৩৯ রানের মধ্যে এঁর রান ছিল ১১৮। একজন উঁচু দরের স্পোর্টসম্যান হিসাবে নিউজিল্যাণ্ডে কেভের খ্যাতি। বয়স ৩৩ বছর।

জন রিড—সহ অধিনায়ক—সহকারী অধিনায়ক জন রিড নিউজিল্যাণ্ড দলের নামকরা চৌকস খেলোয়াড়। ব্যাটিং এবং বোলিংয়ে এঁর প্রায় সমদক্ষতা, আবার নিউজিল্যাণ্ডের শ্রেষ্ঠ ফিল্ডসম্যান হিসাবেও

রিডের খ্যাতি সর্বজনবিদিত। ১৯৪৭—৪৮ সালে রিড সর্বপ্রথম প্রতিনিধিমূলক ক্রিকেটে অংশ গ্রহণের সুযোগ পান। পরের বছর নিউজিল্যান্ড দলের সঙ্গে রিড ইংলন্ড সফর করেন। ব্যাটসম্যান এবং অতিরিক্ত উইকেট হিসাবে তার নির্বাচন অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল। ঐ সফরে তিনি অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়ে ১[illegible]০০ রান সংগ্রহ করেছিলেন এবং তার গড় রানের হিসাব ছিল ৪১। ইংলন্ডের বিরুদ্ধে তিনটি টেস্ট খেলাতেই অংশ গ্রহণ করে রিড ১৭৩ রাণ সংগ্রহ করেছিলেন। ১৯৫৩—৫৪ সালে নিউজিল্যান্ডের দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে তিনি সমস্ত খেলায় অংশ গ্রহণ না করেও ১০০০ রান ও ৫০ উইকেট দখল করেন। বিশেষ উল্লেখযোগ্য রিডের আগে দক্ষিণ আফ্রিকায় বিদেশের আর কোন খেলোয়াড় ঐ কৃতিত্ব অর্জন করতে পারেন নি।

গায় অ্যালাবাস্টার
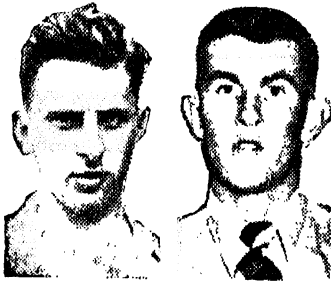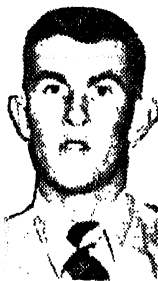
এ্যাটাকিং ব্যাটসম্যান এবং মিডিয়াম-ফাস্ট বোলার রিডের বর্তমান বয়স ২৭ বছর। মেরে খেলতে অভ্যস্থ বলে রিডের পক্ষে সেঞ্চুরী লাভ করা কষ্টকর হয়ে পড়ে, কিন্তু তিনি বহুক্ষেত্রে বিপদের সময় অনমনীয় দৃঢ়তা দেখিয়ে নিজ দলকে রক্ষা করেছেন এবং অনেক খেলায় জয়লাভের প্রধান স্তম্ভ হিসাবে সুনাম অর্জন করেছেন। ইনি নিউজিল্যান্ডের ওয়েলিংটন দলের খেলোয়াড়।

বার্ট সাটক্লিফ—বিশ্বের অন্যতম সুনিপুণ খেলোয়াড় বার্ট সাটক্লিফের জনপ্রিয়তা এত বেশী যে, ইনি—নিউজিল্যান্ডের ব্রাডম্যান নামে পরিচিত। সত্যই সাটক্লিফ বিশ্বের সেরা খেলোয়াড়দের অন্যতম এবং এর ব্যাটিংয়ের মনোরম ভঙ্গি দর্শক চক্ষুর আনন্দদায়ক। 'বিশ্ব একাদশ' নামে একটি দল গঠন করলে যে সব খেলোয়াড় দলে স্থান পেতে পারেন তার গবেষণা করে অতীত দিনে ধুরন্ধর খেলোয়াড় এবং ক্রিকেট-পন্ডিত জে এইচ কিংগলটন সম্প্রতি যে দল গঠন করেছিলেন বার্ট সাটক্লিফকে সেই দলে ওপেনিং ব্যাটসম্যান হিসাবে স্থান দেওয়া হয়েছে। সুতরাং তিনি যে বিশ্বের ধুরন্ধর খেলোয়াড়দের অন্যতম এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

ম্যাকময়ের ম্যাকমোহন

কিন্তু সাটক্লিফের প্রতিভা পদ্ধতির দিকে বলেই মনে হয়। পাকিস্থানে তিনি ভাল খেলতে পারেন নি। ভারতেও এখনও তার হাত খোলেনি।

১৯৪৬—৪৭ সালে হ্যামন্ডের এম সি সি দলের বিরুদ্ধে সাটক্লিফ দুই ইনিংসে সেঞ্চুরী করে প্রথম খ্যাতি অর্জন করেন। তারপর সাটক্লিফ নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট বহু নতুন রেকর্ডের সৃষ্টি করেছেন। প্লাঙ্কেট শীল্ডের খেলায় অকল্যান্ড দলের বিরুদ্ধে তার ব্যক্তিগত ৩৫৫ এবং ক্যান্টারবারীর বিরুদ্ধে তার ৩৮৫ রাণ বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য। প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলায় তিনি এ পর্যন্ত ১০ হাজারেরও বেশী রাণ সংগ্রহ করেছেন; টেস্ট খেলাতেও তিনি বহু সেঞ্চুরীর অধিকারী। সাটক্লিফের উইকেট কিপিংয়েও সুনাম আছে। ন্যাটা স্পিন বোলারও বটে, ফিল্ডিংও ভাল করেন। ওটাগো দলের খেলোয়াড়। বয়স ৩১ বছর।

ট্রেভর ম্যাকমোহন—নিউজিল্যান্ড দলের উইকেট কিপার ম্যাকমোহন অন্যান্য খেলোয়াড়ের মত বেশী প্রথম শ্রেণীর খেলায় অংশ গ্রহণের সুযোগ পাননি। ম্যাক মুনে নিউজিল্যান্ড দলের নিয়মিত উইকেট কিপার ছিলেন। ফলে যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও ম্যাকমোহন নিউজিল্যান্ড দলে নির্বাচিত হননি। কিন্তু গতবার উইকেট কিপিংয়ের সুযোগ পেয়ে ম্যাকমোহন নিজ প্রতিভার পরিচয় দেন এবং ইংলন্ডের

হারফোর্ড ম্যাগ্রেগর

গডফ্রে ইভান্সের মতই এখন নিউজিল্যান্ডে ম্যাকমোহনের সুনাম। এইবারই [illegible] সাগরপার সফরের সুযোগ পেয়েছেন। [illegible] তারিখ ১৯২৯ সালের ৮ই অক্টোবর।

এম বি পুর—এম বি পুরের [illegible] নিউজিল্যান্ডের ক্রিকেট মহল বেশ [illegible] আশ্চর্য হয়ে গেছেন। কারণ পুরের [illegible] কোন রেকর্ড নেই যার ফলে তিনি [illegible] হতে পারেন। তবে নির্বাচক সমিতি [illegible] করেন পুর ভারত সফরে ভালই [illegible] পুরের ব্যাট চালনার ভঙ্গি সত্যই [illegible] কিন্তু মোটেই নির্ভরযোগ্য নয়। উইকেটে কিছুক্ষণ টিকে থাকতে পারলে অবশ্য [illegible] খেলেন—দর্শকরাও খেলা দেখে আনন্দ [illegible] পুর ক্যান্টারবারীর খেলোয়াড়। বয়স [illegible] বছর।

এরিক পেট্রি—এরিক পেট্রি নিউজিল্যান্ড দলের দ্বিতীয় উইকেট কিপার [illegible]
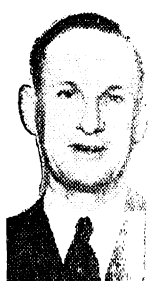
ম্যাকাগবন কুপার

উইকেট কিপার হিসাবেই তিনি শুধু [illegible] হননি। ব্যাটিংয়েও তার চমৎকার [illegible] নির্ভরযোগ্যভাবে ব্যাট চালনা করেন। [illegible] ২৮ বছর। ওয়াই কাটো ক্লাবের সভ্য।

এলেক্স ম্যাকময়ের—এলেক্স [illegible] ওটাগো ক্লাবের খেলোয়াড়। নিউজিল্যান্ড [illegible] মধ্যে ইনি বয়োজ্যেষ্ঠ। মারমুখী ব্যাটসম্যান হিসাবে ম্যাকময়েরের সুনাম আছে। [illegible] করেন ভাল। ইনি লেগ স্পিনার। বয়স [illegible] বছর।

জে গর্ডন লেগার্ট—জে [illegible] লেগার্ট ক্যান্টারবারীর খেলোয়াড়। [illegible] নিউজিল্যান্ড দলের ওপেনিং [illegible] ম্যান। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে [illegible] জিল্যান্ড দলের ইনি পরম নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যান। গতবার দক্ষিণ আফ্রিকায় [illegible] পর নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার [illegible] তিনি মাত্র ৬টি ইনিংসে ৪০০ রাণ [illegible] করেন। প্রধানত লেগার্টের কৃতিত্বপূর্ণ ব্যাটিং নৈপুণ্যে নিউজিল্যান্ড দল শক্তিশালী দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া দলকে পরাজিত [illegible] সমর্থ হয়। এই খেলায় তিনি ১৫০ মিনিটে ১২১ রাণ সংগ্রহ করে[illegible]

ব্যাটসম্যান হিসাবে যে কোন দলের পক্ষে ... অপরিহার্য বিবেচিত হলেও ফিল্ডম্যান হিসাবে অস্ট্রেলিয়ার আয়রন মঙ্গারের মত ... সুনাম আছে। লেগাটের পেশা শিক্ষকতা।

এন্টনী ম্যাকগিবন — নিউজিল্যাণ্ডের সমস্ত খেলোয়াড়ের মধ্য থেকে ম্যাকগিবনকে খুঁজে বের করতে কষ্ট হয় না। এঁর দেহের দৈর্ঘ্য প্রায় সাড়ে ছয় ফুট, সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। ফাস্ট বোলার এবং মারমুখী ব্যাটসম্যান হিসাবে ম্যাকগিবনের খ্যাতি। কিন্তু ফাস্ট বোলার হলেও তাঁর বেশীর ভাগ বলই হয় বিপথগামী। বর্তমানে তিনি বলের গতিবেগ একটু মন্থর করেছেন, ফলে বল আর তেমন বিপথগামী হয় না। দক্ষিণ আফ্রিকার পাঁচটি টেস্টে ম্যাকগিবন ২২টি উইকেট লাভ করেছিলেন এবং তাঁর প্রতি উইকেট রানের হিসাব ছিল ২০.৬। ইংলণ্ড সফরে ৬৩টি উইকেট পেয়ে ম্যাকগিবন নিউজিল্যাণ্ডের বোলারদের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করেন। বয়স ৩১ বছর।

জন হেজ—ফাস্ট বোলার জন হেজ নিউজিল্যাণ্ড দলের আক্রমণের প্রধান স্তম্ভ। ১৯৪৯ সালে ইংলণ্ড সফরে তিনি নিউজিল্যাণ্ড দলের পক্ষে প্রথম নির্বাচিত হন; কিন্তু মাংসপেশীতে টান ধরায় ইংলণ্ডে হেজ তেমন বেশী ম্যাচ খেলতে পারেন নি। ভিজিটিং ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের বিরুদ্ধে টেস্ট খেলায় হেজ বোলিংয়ে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন। ৩ উইকেটে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল ১৮৬ রান সংগ্রহ করবার পর জন হেজ মাত্র ১৪ রানের মধ্যে তিনজন কৃতী ব্যাটসম্যান ওয়ালকট, ওরেল এবং গোমেজের উইকেট দখল করেন। এর পর হেজের সুনাম আরও ছড়িয়ে পড়ে এবং তিনি নিউজিল্যাণ্ড দলের পক্ষে অপরিহার্য বিবেচিত হন। হেজ ক্যাণ্টারবারীর খেলোয়াড়। জন্ম তারিখ ১৯২৭ সালের ১১ই জানুয়ারী।

পার্ক হ্যারিস—পার্ক হ্যারিস এই বছর সর্বপ্রথম নিউজিল্যাণ্ড দলের পক্ষে বিদেশ সফরের সুযোগ পেয়েছেন। ব্যাটিংয়ে এঁর হাত মন্দ নয় এবং সময় সময় বোলারদের কোনরকম সমীহ না করে বেপরোয়াভাবে ব্যাট চালিয়ে থাকেন। ইনি সেণ্ট্রাল ডিস্ট্রিক্টের খেলোয়াড়। বয়স ২৮ বছর।

জন গায়—জন গায় ভারত সফরকারী নিউজিল্যাণ্ড দলের বয়োকনিষ্ঠ খেলোয়াড়, এর বয়স মাত্র একুশ বছর। কিন্তু এর মধ্যেই গায় নিজ দেশে ক্রিকেট খেলায় যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন এবং এর নির্বাচনে ক্রিকেট মহলও হয়েছেন সন্তুষ্ট। বেশ নির্ভরযোগ্যভাবে ব্যাট করেন, কিন্তু ব্যাটিংয়ের চেয়েও এর ফিল্ডিংয়ে সুনাম বেশী। গায় সেণ্ট্রাল ডিস্ট্রিক্টের খেলোয়াড়।

জন অ্যালাবাস্টার—অ্যালাবাস্টার নিউজিল্যাণ্ড দলের লেগব্রেক ও গুগলী বোলার। এ পর্যন্ত প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলায় অংশ গ্রহণের তেমন সুযোগ পাননি। নিউজিল্যাণ্ডের ক্রিকেট কর্তৃপক্ষ মনে করেন ১৯৫৮ সালের ইংলণ্ড সফরে অ্যালাবাস্টার যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করতে পারবেন। ভারত সফর থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের চেষ্টা করছেন। সাউথল্যাণ্ডের খেলোয়াড়। বয়স তেইশ।
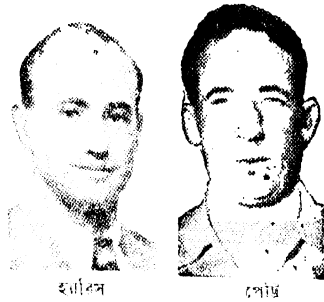
হ্যারিস পোর্

নোয়েল ম্যাগ্রেগর—নোয়েল ম্যাগ্রেগরের ব্যাটিং করবার ভঙ্গি সত্যই মনোরম। হাতে মারও আছে ভাল। একমাত্র খেলোয়াড় যিনি পাকিস্থানের বিরুদ্ধে টেস্ট খেলায় সেঞ্চুরী করেছেন। লাহোরে দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় ইনি ১১১ রান করেন। ১৭ বছর বয়স থেকে নিউজিল্যাণ্ডের প্লাঙ্কেট শীল্ডে খেলছেন। এখন বয়স ২৪ বছর। ইনি ওটাগোর খেলোয়াড়।

নোয়েল হারফোর্ড—রাইট হ্যাণ্ড ব্যাটসম্যান এবং মিডিয়াম ফাস্ট পেস বোলার হিসাবে হারফোর্ডের সুনাম। নিউজিল্যাণ্ডের প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে ইনি নবাগত। বয়স ২৩ বছর। পাকিস্থানের বিরুদ্ধে লাহোর টেস্টে মাত্র ৭ রানের জন্য সেঞ্চুরী করতে পারেননি।

ডবলিউ এইচ কুপার—কুপার ম্যানেজার হিসাবে নিউজিল্যাণ্ড দলের সঙ্গে এসেছেন।
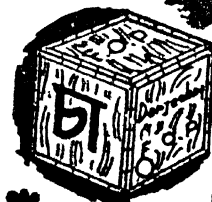
দেশী সংবাদ

১৪ই নভেম্বর—অদ্য সমগ্র ভারতে প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরুর শুভ ৬৬তম জন্মদিনটি বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে শিশু দিবসরূপে উদ্‌যাপিত হয়। নয়াদিল্লীতে অদ্যকার সমস্ত অনুষ্ঠানের মধ্যে ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে শিশুদের বিরাট সমাবেশ সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য।

১৫ই নভেম্বর—রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ আজ পণ্ডিচেরীতে বলেন, কেবলমাত্র ধৈর্যের সাহায্যেই আমরা দেশের এই অংশ লাভ করিয়াছি এবং এখনও ক্ষমতা হস্তান্তরের যে আনুষ্ঠানিক পর্ব বাকী আছে, তাহাও অনুরূপভাবে সমাধা হইবে।

জনৈক তস্কর ২৪৫০০ টাকা সহ একটি ট্রেনে করিয়া পলায়ন করিবার সময় দশ হাজার টাকা উৎকোচ দানের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া শিয়ালদহ গভর্ণমেণ্ট রেলওয়ে পুলিসের হাবিলদার শ্রীমন্মথনাথ সমাজদার উক্ত তস্করকে হাতেনাতে গ্রেপ্তার করে। এই মামলার বিচারকারী অতিরিক্ত প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট শ্রী বি সি ঘোষ তাঁহার রায়ে উক্ত হাবিলদারের সততার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

১৬ই নভেম্বর—ভারত সরকার নিখুঁত ইস্পাত ও "ত্রুটিযুক্ত আস্ত ইস্পাত" সংগ্রহ ও বিক্রয় সম্পর্কে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন করিয়া দুইটি বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়াছেন। ১৫ই নভেম্বর হইতে এই আদেশ বলবৎ হইয়াছে।

নয়াদিল্লীর সংবাদে প্রকাশ, প্রতিরক্ষা নিরাপত্তা বাহিনীর মন্ত্রণালয়ের ডিরেক্টর কর্ণেল এম এস ধীলন এবং তাঁহার পত্নী গত সোমবার রামপুরে এক অজ্ঞাত আততায়ীর গুলীতে নিহত হইয়াছেন।

১৭ই নভেম্বর—আজ প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহরু ভাকরা নাঙ্গাল সেচ পরিকল্পনার অন্তর্গত ভাকরা বাঁধের ভিত্তিতে প্রথম এক বালতি কংক্রীট স্থাপন করিয়া উহার নির্মাণ কার্যের উদ্বোধন করেন। এই বাঁধটি পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে উঁচু হইবে এবং আগামী সাড়ে তিন বৎসরের মধ্যে ৬৪ কোটি টাকা ব্যয়ে উহার নির্মাণকার্য শেষ হইবে।

পর্তুগীজ গোয়ার আঞ্চলিক সামরিক ট্রাইবুনাল ভারতের বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দলের নেতা ও ভারতীয় সংসদের সদস্য শ্রীত্রিদিব চৌধুরীকে দশ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার সীমানা পুনর্বিন্যাস সম্পর্কে আলোচনার জন্য উক্ত তিনটি রাজ্যের প্রতিনিধিবৃন্দ আজ নয়াদিল্লীতে কংগ্রেসের উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কমিটির সহিত এক বৈঠকে মিলিত হন।

ভারতে বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম উৎপাদনের উদ্দেশ্যে কারখানা স্থাপনের জন্য আজ নয়াদিল্লীতে ভারত সরকার ও বৃটেনের এসোসিয়েটেড ইলেকট্রিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেডের মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে।

১৮ই নভেম্বর—সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী মঃ বুলগানিন ও কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রথম সেক্রেটারী মঃ খ্রুশ্চেভ আজ বেলা ২-৩১ মিনিটের সময় দিল্লীতে পৌঁছেন। পালাম বিমান ঘাঁটিতে ইঁহাদিগকে অভূতপূর্ব বিরাট সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। ভারতের রাজধানীতে এত বড় সমারোহ আর কখনও হইয়াছে কিনা সন্দেহ।

১৯শে নভেম্বর—সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী মঃ বুলগানিন আজ নয়াদিল্লীতে রামলীলা ময়দানে সম্বর্ধনার উত্তরে বলেন যে, প্রকৃত সাম্য ও পারস্পরিক কল্যাণের ভিত্তিতে সোভিয়েট ইউনিয়ন ও ভারতের মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও বাণিজ্যিক উন্নয়নের জন্য সর্বপ্রকার প্রয়োজনীয় পরিবেশের সৃষ্টি হইয়াছে।

মঃ বুলগানিন ও মঃ খ্রুশ্চেভ আজ রাজঘাটে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর সমাধিতে মাল্য অর্পণ করেন।

পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের সুপারিশের প্রতিবাদে আগামী ৪ঠা ডিসেম্বর সারা পশ্চিমবঙ্গ প্রতিবাদ দিবসরূপে পালনের আহ্বান জানাইয়া পশ্চিমবঙ্গ ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠন কমিটির উদ্যোগে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় প্রস্তাব গৃহীত হয়।

২০শে নভেম্বর—আজ রাষ্ট্রপতি ভবনের মোগল উদ্যানে রাষ্ট্রপতি ডাঃ [illegible] সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী মঃ [illegible] মঃ খ্রুশ্চেভের সম্মানার্থে এক [illegible] আয়োজন করেন।

মঃ বুলগানিন ও মঃ [illegible] ইতিহাস প্রসিদ্ধ তাজমহল এবং আগ্রা [illegible] পরিদর্শন করেন।

আজ বোম্বাইয়ে এক বিরাট [illegible] বক্তৃতা দিবার সময় বোম্বাইয়ের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই মাথায় ইষ্টকের আঘাতে আহত হন।

বিদেশী সংবাদ

১৪ই নভেম্বর—আর্জেণ্টিনার [illegible] বাহিনীর চীফ অব ষ্টাফ জেনারেল [illegible] গত রাত্রিতে নূতন অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট রূপে [illegible] শপথ গ্রহণ করেন।

১৬ই নভেম্বর—জেনেভায় বৃহৎ চতুঃশক্তি পররাষ্ট্র মন্ত্রিসম্মেলন শেষ হইয়াছে। তাঁহারা আজ চূড়ান্ত ইস্তাহারে ঘোষণা করেন [illegible] তাঁহারা আলোচনার ফল নিজ নিজ [illegible] প্রধানকে জানাইবেন এবং ভবিষ্যতে পররাষ্ট্র মন্ত্রিগণের মধ্যে আলোচনার পদ্ধতি [illegible] কূটনৈতিক প্রতিনিধিগণের মারফৎ স্থির করিবার সুপারিশ করিয়াছেন।

মরক্কোর সুলতান সিদি মহম্মদ [illegible] ইউসুফ দুই বৎসর নির্বাসিত জীবন [illegible] করিয়া আজ বিজয়ীর ন্যায় স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

১৭ই নভেম্বর—পূর্ববঙ্গ সরকার [illegible] চাউল [illegible] ব্যবস্থা স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। ঢাকা শহরে নারায়ণগঞ্জে [illegible] চাউল বিক্রয়ের নিমিত্ত ১৫০টি সরকারী দোকানে এক লক্ষ ৩০ হাজার লোকের [illegible] ২৬ হাজার রেশন কার্ড বিলি করা হইয়াছে। আজ পুলিস ঢাকায় চাউল ও লবণ [illegible] করা এবং ঐ সকল দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির অভিযোগে ২৪ জনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

ভারত যাত্রার প্রাক্কালে সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী মঃ বুলগানিন ও মঃ খ্রুশ্চেভ [illegible] মস্কোতে অনুষ্ঠিত ভারতের হস্তশিল্প [illegible] দ্রব্য প্রদর্শনীটি পরিদর্শন করেন।

১৯শে নভেম্বর—ওয়াশিংটনের সংবাদে প্রকাশ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্যবাহিনীর ইঞ্জিনীয়াররা আজ ঘোষণা করেন যে, পা[illegible]স্থানের সশস্ত্র বাহিনীগুলি যাহাতে আমে[illegible] কর্তৃক প্রেরিত আধুনিক সাজসরঞ্জাম ব্যবহার করিতে পারে সেজন্য তাঁহারা শী[illegible] নির্মাণকার্য আরম্ভ করিবেন। এই সম্পর্কে প্রাথমিক উদ্যোগ আয়োজনের জন্য ব্রিগেডিয়ার জেনারেল বি বি টালি আগা[illegible] বৃহস্পতিবার করাচী পৌঁছিবেন।

প্রতি সংখ্যা—৵০ আনা, বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০,

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা, লিমিটেড, ৬ ও ৮, সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১৩

শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস লিমিটেড হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদক শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন

সহকারী সম্পাদক শ্রীসাগরময় ঘোষ

আত্মদাতা স্বদেশ প্রেমিকের সম্মান

মণিপুরের রাজধানী ইম্ফলের অদূরবর্তী ভারত ব্রহ্ম সীমান্তের ময়রাং গ্রামে আজাদ-হিন্দ বাহিনীর আত্মদাতা স্বদেশপ্রেমিক সেনাদলের স্মৃতি স্তম্ভ প্রতিষ্ঠার আয়োজন আরম্ভ হইয়াছে। সম্প্রতি কংগ্রেস-সভাপতি শ্রীযুক্ত ধেবর এই স্মৃতিস্তম্ভের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। এই স্থানের পার্বত্যশ্রেণী আজাদ হিন্দ সেনাদলের বীর যোদ্ধাদের শোণিতে সিক্ত হয়। আত্মদাতা এই বীরগণের অস্থিতে সমাকীর্ণ এই পবিত্রভূমি ভারতবাসীমাত্রের শ্রদ্ধিত দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কংগ্রেস সভাপতির উপস্থিতিতে ভারতের স্বাধীনতার জন্য নেতাজী সুভাষচন্দ্রের অনুগামীদের বীরত্বের স্মৃতি সকলের মনে নূতনভাবে উজ্জীবিত হয়। আজাদ-হিন্দ সেনাদলের আত্মদাতা বীরদের স্তূপীকৃত অস্থিরাশি দেশপ্রেমের অগ্নিময় স্পর্শ স্মৃতিপ্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানে যোগদানকারী নরনারীদের অন্তরকে উদ্দীপ্ত করিয়া তোলে। এগার বৎসর পূর্বে ব্রহ্ম ভারত সীমান্তের এই স্থানে আজাদ হিন্দ দলের সেনাদের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সংঘর্ষ ঘটে। আত্মদাতা স্বদেশ প্রেমিকদের অনেকের অস্থি এই সুদীর্ঘকালে মাটিতে মিশিয়া গিয়াছে; কিন্তু তাঁহাদের আত্মদানের ভিতর দিয়া ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে যে শক্তি উজ্জীবিত হইয়াছে তাহা ধ্বংস হইবার নয়। প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাই বিদেশীর প্রভুত্বকে এদেশ হইতে উৎখাত করিয়াছে। আজাদ হিন্দ সেনাদল এইভাবে পরাজয়ের ভিতর দিয়া তাঁহাদের আত্মদানের অপরিম্লান মহিমায় ভারতের রাষ্ট্রীয় মুক্তির সাধনাকে জয়যুক্ত করিয়াছে। বৃটিশ শক্তির ভারত ত্যাগের মূলে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সেনাদলের আত্মদানের এই প্রভাবের গুরুত্ব তৎকালীন রাজনৈতিক পরিবেশের মধ্যে যদি আমরা সম্যক্ ভাবে উপলব্ধি করিতে না পারি তবে ঐতিহাসিক সত্য এবং মানব-প্রকৃতি এই দুইকে অস্বীকার করা হইবে। প্রকৃত প্রস্তাবে স্বাধীন ভারত আজাদ হিন্দ দলের আত্মদাতা সন্তানদের স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করিয়া সত্যকেই মর্যাদা দিয়াছে। কংগ্রেস-সভাপতি এই অনুষ্ঠানে স্বয়ং যোগ দিয়া রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে মূলীভূত মানব-মুক্তির মহান্ আদর্শকেই গৌরব-যুক্ত করিয়াছেন। দেশের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে যাঁহারা জীবন দান করিয়াছেন তাঁহারা মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইয়া মহীয়ান্ হইয়াছেন। তাঁহাদের, মহৎ জাতির মনুষ্যত্বকে জাগ্রত করিয়াছে। ভারতের ইতিহাসে তাঁহাদের আত্মদানের মহিমা উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে।

রাজ্য পুনর্গঠনের নীতি ও পরিণতি

চক্রবর্তী রাজাগোপালআচারী রাজ্য পুনর্গঠনের পরিকল্পনা ১৫ বৎসরের জন্য স্থগিত রাখিবার প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন। পক্ষান্তরে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের অন্যতম সদস্য সর্দার পানিক্করের মতে রাজ্য পুনর্গঠনের সিদ্ধান্ত অবিলম্বে কার্যে পরিণত করাই উচিত। সর্দারজী ভাষাগত ভিত্তিতে রাজ্য পুনর্গঠনের প্রয়োজনের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া বলিয়াছেন যে, এই পরিকল্পনা নূতন কিছু নহে। মহাত্মা গান্ধীর পরিচালনাধীনে কংগ্রেস ইতঃপূর্বেই এই আদর্শ স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। সর্দার পানিক্করের যুক্তির সারবত্তা আমরাও স্বীকার করি। প্রকৃতপক্ষে ভাষাগত ভিত্তিতে রাজ্য পুনর্গঠনের নীতি কার্যে পরিণত করিতে গেলে ভারতের অখণ্ড রাষ্ট্রীয়তার আদর্শ ক্ষুণ্ণ হইবে, আমরা এমন যুক্তি স্বীকার করিয়া লইতে প্রস্তুত নহি। পক্ষান্তরে আমাদের মতে ভাষাগত ভিত্তিতে রাজ্যসমূহ পুনর্গঠিত হইলে ভারতের রাষ্ট্রীয় চেতনা সমধিক সংহত হইয়া উঠিবে আমাদের ইহাই বিশ্বাস। ভাষা জাতির সংহতির পক্ষে প্রধান ভিত্তি স্বরূপে কাজ করে। ভাষার ভিত্তিতে ভারতের বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলি সংহত হইয়া উঠিলে, সংহত স্বার্থের সেই চেতনা অখণ্ড ভারতের একাত্মতাকে সুদৃঢ় হইবার পক্ষে সহায়তাই করিবে। ফলতঃ জনচেতনার উপর যেখানে রাষ্ট্রীয়তার প্রতিষ্ঠা নির্ভর করে, সেখানে ভাষার এই ভিত্তির শক্তিকে অস্বীকার করিলে জনসংযোগের সূত্র হইতে বিচ্ছিন্ন রাষ্ট্রসাধনা স্বভাবতই দুর্বল হইয়া পড়ে। প্রকৃতপক্ষে রাজ্য পুনর্গঠনের পরিকল্পনা ভ্রান্তির ফলে কমিশনের কাজে নূতন কোন সমস্যার সৃষ্টি হয় নাই। কমিশনের কতকগুলি সিদ্ধান্ত সমীচীন না হওয়াতেই কতক-

গুলি সমস্যা সৃষ্টির কারণ ঘটিয়াছে। ভাষাগত ভিত্তিতে রাজ্যসমূহের পুনর্গঠন সীমানা নির্ধারণে এবং সেই সঙ্গে সমগ্র ভারতের বৃহত্তর স্বার্থের আদর্শটি সেই সিদ্ধান্তের ভিতর দিয়া পরিস্ফুট করাই এক্ষেত্রে প্রয়োজন ছিল। দুঃখের বিষয় এই যে, কমিশন এই দিকে দৃষ্টি রাখিয়া তাঁহাদের সিদ্ধান্তে বলিষ্ঠতার পরিচয় দিতে পারেন নাই। পশ্চিমবঙ্গের দাবীর প্রশ্নটি আমরা এই ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিতে পারি। প্রকৃতপক্ষে পশ্চিমবঙ্গের দাবীর স্বীকৃতির পথে ভাষার ভিত্তিতে রাষ্ট্রের পুনর্গঠন বা সীমানা নির্ধারণ এবং সেই সঙ্গে ভারতের স্বার্থের সমীকরণ একসঙ্গে সম্পন্ন করিয়া রাজ্য পুনর্গঠন নীতির মৌলিক আদর্শকে জাতির দৃষ্টিতে উজ্জ্বল করিয়া তোলা সম্ভব হইত। এই দিক হইতে পশ্চিমবঙ্গের দাবীর সমীচীনতা যেমন রহিয়াছে, সেইরূপ সেই দাবী রক্ষিত হইবার পক্ষে জটিলতাও এমন কিছু নাই। কিন্তু কমিশন এই ক্ষেত্রে ভাষাগত ভিত্তিতে রাজ্য সংগঠনের যুক্তি অবলম্বনে যেমন সংকুচিত হইয়াছেন, সেইরূপ পশ্চিমবঙ্গের দাবীর যৌক্তিকতা অস্বীকার করিয়া তাঁহারা ভারতের বৃহত্তর স্বার্থ সম্বন্ধে বিচারপরায়ণতা প্রদর্শনে পরাঙ্মুখ হইয়াছেন। বলা বাহুল্য পশ্চিমবঙ্গের দাবীর যৌক্তিকতা সম্বন্ধে নূতন করিয়া বলিবার কিছুই নাই। ভারতের রাষ্ট্র-সাধনার ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষা স্বভাবতই সেই দাবীর যৌক্তিকতা সুচিন্তিত করিয়া তুলিয়াছে; এবং ভারত বিভাগের পরবর্তী পরিস্থিতি ভারতের বৃহত্তর স্বার্থের দিক হইতে সেই দাবী সংরক্ষণের সঙ্গতিকে একান্তভাবে অনিবার্য করিয়া তুলিয়াছে। বস্তুতঃ রাজ্য সংগঠনে এবং সীমানা পুনঃ নির্ধারণের প্রশ্নটি অন্য রাজ্যের পক্ষে বিলম্বিত করা সম্ভব হইলেও পশ্চিমবঙ্গের দাবী সংরক্ষণে বিলম্ব করিবার অবসর নাই; কারণ তাহাতে ভারতের বৃহত্তর স্বার্থই বিপন্ন হইবে। আমরা আশা করি, সংকীর্ণ প্রাদেশিকতার প্রতি গুরুত্ব না দিয়া পশ্চিমবঙ্গের দাবী সম্বন্ধে নিরপেক্ষভাবে এখনও সুবিচার করা হইবে।

শাসক ও জনসাধারণ

ভারতের প্রধানমন্ত্রী শাসন বিভাগের কর্মচারীদের আমলাতন্ত্রসুলভ সাবেকী মনোভাব এবং কাজের ধারার প্রতিবাদ করিয়াছেন। তাঁহার মুখে এইরূপ মন্তব্য পূর্বেও বহুবার অভিব্যক্ত হইয়াছে। পণ্ডিতজী সত্যই বলিয়াছেন, বিদেশী প্রভুত্ববাদের উত্তরাধিকারসূত্রেই এই ভাবটি সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু ভারতের আধুনিক রাষ্ট্রতন্ত্রের কাঠামোর সঙ্গে কর্তৃত্বের এই মনোভাবটি খাপ খায় না। প্রকৃতপক্ষে এই মনোভাবের যদি পরিবর্তন সাধিত না হয়, তাহা হইলে দেশে সংগঠনমূলক যে সব পরিকল্পনা লইয়া কাজ আরম্ভ করা হইয়াছে, সেগুলি সার্থকতা সাধনের পথে প্রবল অন্তরায় দেখা দিবে। ভারত সরকারের দৃষ্টি এই বিষয়ের গুরুত্বের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে দেখিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। রাজ্য সভায় একটি প্রশ্নের উত্তরে প্রকাশ পাইয়াছে যে, ইণ্ডিয়ান এডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসে যাঁহারা নিযুক্ত হইবেন, সমাজ-বিজ্ঞান ও সমাজ-সেবা এই দুইটি বিষয় তাঁহাদের শিক্ষণীয় বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হইবে। ইহার ফলে জনসাধারণের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসিবার প্রয়োজনীয়তা শাসকগণ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবেন আমরা ইহাই আশা করি। প্রকৃত প্রস্তাবে শুধু কতকগুলি পুঁথি কেতাবগত বিদ্যার সাহায্যে জনসেবার প্রবৃত্তি অন্তরে লাভ করা যায় না। প্রত্যুত, সমগ্রভাবে রাষ্ট্র-তান্ত্রিক, বিশেষভাবে অর্থনৈতিক প্রতিবেশ তদুপযোগী হওয়া প্রয়োজন। প্রকৃত প্রস্তাবে জনসাধারণের এবং সরকারী কর্মচারীদের জীবিকার মানের ভিতর যে বৈষম্য রহিয়াছে, সেই বৈষম্য শাসকদের মধ্যে প্রভুত্বের ভাবটি জাগাইয়া তোলে। সুতরাং জনসাধারণের জীবনের অর্থনৈতিক মান যতদিন উন্নীত না হইবে ততদিন জনসাধারণের সহিত শাসকদের ঘনিষ্ঠতা-বোধকে নীতি হিসাবে গুরুত্ব দিলেও বাস্তব জীবনে তাহা কতটা সার্থকতা লাভ করিবে, এ সম্বন্ধে সন্দেহের কারণ রহিয়াছে। ফলতঃ শাসকদের মধ্যে নীতিগতভাবে উদারতার মনোভাবটি জনসাধারণের জীবনে অনুগ্রহের আকারে দেখা দেয়, তবে আমাদের মতে তাহা মনস্তাত্ত্বিক দিক হইতে জনসাধারণের পক্ষে নিগ্রহেরই নামান্তর হইবে।

ভারতে রাজা ইবন সউদ

সৌদী আরবের নৃপতি ইবন সউদ কিছুদিনের জন্য ভারতে আগমন করিয়াছেন। ভারতের সহিত আরবের দীর্ঘকালের সাংস্কৃতিক সম্পর্ক বিদ্যমান রহিয়াছে। অতীতে আরব হইতে ভারতে বহু পর্যটক আগমন করিয়াছেন। অতীতের ইতিহাসে ভারত এবং আরবের মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্কও ঘনিষ্ঠতর ছিল। আরবের ভিতর দিয়া ভারতের সাংস্কৃতিক প্রভাব অর্থনৈতিক আদান প্রদানের সেই সূত্রে ইউরোপে সম্প্রসারিত হইয়াছিল ইতিহাসে এরূপ প্রমাণও বিরল নহে। এদেশের ভাষা এবং সাহিত্যের সমৃদ্ধি সাধনে আরবী ভাষার অবদানও সামান্য নহে। উত্তর ভারতে এই প্রভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। নব ভারতের প্রবর্তক রাজা রামমোহন আরবী ভাষায় একখানি পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই পত্রিকা ভারতের বাহিরে আরবী ভাষা-ভাষী দেশসমূহের জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ সমাদর লাভ করে। রাজা রামমোহনের প্রগতিশীল বৈদান্তিক চিন্তার ধারা উক্ত পত্রিকাখানি মধ্য প্রাচীর চিন্তাজগতে সম্প্রসারিত করে। পরবর্তীকালে অধ্যাত্ম সাধনা এবং দার্শনিকতার পথে ভারতের সহিত আরবের সম্পর্কের এই নৈকট্য বৈদেশিক পরাধীনতার প্রভাবে অনেকটা প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। স্বাধীনতা লাভের পর এই সম্পর্ক পুনরায় নিবিড় হইয়া উঠিবার পথ উন্মুক্ত হইয়াছে। সৌদী আরবের নৃপতির ভারত পরিদর্শন হেতু আগমনে ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রের দেশ ভারতের সঙ্গে আরবের সাংস্কৃতিক পূর্ব সৌহার্দ্য বর্তমানে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠিবে, এই সম্ভাবনায় বিশেষ উৎসাহিত হইয়া আমরা আরবের নৃপতিকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

বৈদেশিকী

একই সময়ে সোভিয়েট নেতা মিঃ বুলগানিন ও মিঃ খ্রুশ্চেভ, সৌদী আরবের রাজা সৌদ এবং নেপালাধীশ মহেন্দ্র ভারতে সফর করছেন। অতিথি সংকারের বিশেষত রাজদরবারী অতিথি-সংকারের ভাষা বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক সত্যের শাসন মেনে চলে না, হয়ত চলতে পারেই না। তাকে ইতিহাসের উপর রং চড়াতে হয়। অনেক সময়ে সে রংএর লেপ এতো বেশি পুরু করে দেয়া হয় যে, বলতে ইচ্ছা করে ইতিহাসে "যা ছিলো কালো ধলো" সব "তোমার (রাজনীতির) রংএ রংএ রাঙা হোল"। তার উপর যদি এক সঙ্গে তিন তিনটে ঐতিহাসিক দোলখেলা চলে তবে তার ঠেলা অতি-বিশ্বাসী মনের পক্ষেও সামলানো মুশকিল! এতো গেলো বুদ্ধির সমস্যা। ভাবের দিক দিয়ে আরো মুশকিল।

'প্রোটোকল' যাই বলুক না কেন, সোভিয়েট রাশিয়া, সৌদী আরব ও নেপালের প্রতিনিধিদের সম্বন্ধে কী এদেশের গভর্নমেণ্টের কী জনসাধারণের ঔৎসুক্য এবং আগ্রহ একরকম নয় এবং হতেও পারে না। সুতরাং এঁদের সম্বর্ধনার বহরও একরকম হতে পারে না। এক ক্ষেত্রে ষোড়শোপচারে পূজা, অন্য ক্ষেত্রে যাকে বলে 'নমো নমো করে সারা'—এরকম হবেই। যদি এঁরা তিন দল একসঙ্গে না আসতেন তবে এই পার্থক্য এতো বেশি চোখে লাগত না। সৌদী আরব বা নেপাল কখনই আশা করতে পারে না যে, তাদের রাজা বিদেশে গেলে সেখানে তেমন আলোড়ন বা আতিথ্যের সমারোহ হবে যেমন হবে সোভিয়েট রাশিয়ার মতো মহাপ্রতাপশালী রাষ্ট্রের প্রধান নেতারা গেলে। সৌদী আরবের রাজা যদি কিছুদিন পূর্বে বা পরে ভারতে আসতেন তবে ভারতে মিঃ বুলগানিন ও মঃ খ্রুশ্চেভের সম্বর্ধনার বহরের সঙ্গে নিজের অভিজ্ঞতার তুলনা

করে তাঁর বা তাঁর স্বদেশবাসীদের ঈর্ষা বা দুঃখবোধ হোত না। কিন্তু সোভিয়েট নেতাদের সফরের সময়ে ভারতে এসে আরব নৃপতি ও নেপালের রাজা যে অবস্থায় পড়েছেন সেটা কিঞ্চিৎ করুণার উদ্রেক না করে পারে না।

অথচ এটা আশা করা যেতে পারে না যে, সোভিয়েট প্রতিনিধিদের নিয়ে গভর্নমেণ্ট এবং জনসাধারণ যে-রকম নাচানাচি করবেন সৌদী আরব বা নেপালের রাজাকে নিয়ে সেরকম করবেন। এসব ব্যাপারে উচিত হচ্ছে যেখানে রাজকীয় বহরে অতিথিসৎকার করতে হবে সেখানে একই সময়ে একাধিক অতিথিকে নিমন্ত্রণ না করা। তবে আজকাল যে "রেটে" কর্তাদের মধ্যে আতিথ্য বিনিময়ের রেওয়াজ চলতি হয়েছে তাতে "ওয়ান্ অ্যাট্ এ টাইমের" নিয়ম রক্ষা করাও কঠিন।

আর একটা কথা বে-আদবি হলেও —এই প্রসঙ্গে বলা দরকার। বিদেশী অতিথির সৎকার করতে গিয়ে অত্যধিক ভাবালুতা প্রকাশ বাঞ্ছনীয় নয়। অসংযত গদগদ ভাব জাতির মর্যাদা বৃদ্ধি করে না, এমন কি তার দ্বারা অতিথির সত্যকার শ্রদ্ধাও অর্জন করা যায় না। অনেক ক্ষেত্রে সেটা অগভীরতার পরিচয় মাত্র হয়। একটা সেণ্টিমেণ্টাল শ্লোগান তারস্বরে চিৎকার করলেই কিছু মস্ত একটা লাভ হয় না। আজ মিঃ বুলগানিন ও মিঃ খ্রুশ্চেভ ভারতে এসেছেন, আমরা "হিন্দী-রুশি ভাই ভাই" বলে চেঁচাচ্ছি। এই ধ্বনি সত্য হোক্ এবং কেবল রাশিয়ান নয়, জগতের সমস্ত দেশের লোকের সঙ্গেই ভারতবাসীর ভ্রাতৃভাব জাগ্রত ও প্রতিষ্ঠিত হোক্—এটা অবশ্য কাম্য। কিন্তু আমরা যখন এই শ্লোগান চিৎকার করি তখন কি আমরা নিজেদের দিকে একবার তাকাই? যাদের আজ "বাঙ্গালী-বিহারী ভাই ভাই" বা "বাঙ্গালী-আসামী ভাই ভাই" বা "মারাঠী-গুজরাতী ভাই ভাই" বা "তামিল-তেলেগু ভাই ভাই" বলতে বাধছে, একই ভারতের মধ্যে প্রদেশের সীমানা নিয়ে যারা মাথা-ফাটাফাটি করছে তারাই আবার "হিন্দী-রুশি ভাই ভাই" বলে গদ্‌গদভাব দেখাচ্ছে! মিঃ বুলগানিন ও মিঃ খ্রুশ্চেভ কি জানেন না বোম্বাইতে সেদিন অতগুলো লোকের প্রাণ কেন গেল?

আমরা "হিন্দু-মুসলমান ভাই ভাই" বলে কি চেঁচাই নি? তা সত্ত্বেও দেশ বিভক্ত হয়েছে। যদি বলি যে, দোষ আমার নয়, ভাইয়ের, তবে স্বীকার করতে হবে যে, বিপথগামী ভাইকে সহ্য করার মতো সপ্রেম বীর্য আমার ছিল না অথবা তাকে শাসন করার মতো সাহস আমার ছিল না, যা থাকলে দেশকে এক রাখার জন্য আমি তার সঙ্গে লড়াই করে যেতে পশ্চাৎপদ হতাম না। ভাবালুতার সবচেয়ে আশ্চর্যকর প্রকাশ হয়েছিল ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট, যেদিন রাত্রে দ্বিধাবিভক্ত ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-লাভের আনন্দে আমরা কলকাতায় "হিন্দী-পাকিস্তানী ভাই ভাই" বলে অনেক আনন্দাশ্রু বিসর্জন করেছিলাম যার স্মৃতিকে ভারত-পাকিস্থান সম্বন্ধের পরবর্তী বিবর্তন নিদারুণ বিদ্রূপের দ্বারা লাঞ্ছিত করেছে। "ভাই ভাই" শ্লোগান চিৎকার করা সহজ কিন্তু তার দায়িত্ব বহন করার দৃঢ়তা যাদের অর্জিত হয়নি তাদের পক্ষে ঐ বুলি আওড়ানোতে কেবল ভাবশক্তির অপচয় হয় মাত্র।

* * *

সোভিয়েট নেতারা ভারতবর্ষে তাঁদের বক্তৃতায় পশ্চিমা শক্তিদের নিন্দা করেছেন, আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক আদবের দিক থেকে এ নজিরটা ভালো হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে আমরা গত সপ্তাহে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলাম। ইতিমধ্যে মিঃ বুলগানিন ও মিঃ খ্রুশ্চেভ পশ্চিমা শক্তিদের আরো অনেক বেশি কঠোর সমালোচনা করেছেন। অবশ্য যদি এটা রেওয়াজ হয়ে যায় যে, যে-কোনো দেশের রাজপুরুষেরা অন্য যে-কোনো দেশে অতিথি হয়ে খোলাখুলি তাঁদের মতামত ব্যক্ত করতে পারবেন এবং যে-কোনো গভর্নমেণ্টের সমালোচনা করতে পারবেন তবে ভালোই হয়। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় সে সম্ভাবনা দেখি না। সেজন্যই যে-সব দেশ নিজেদের কোনো দলভুক্ত বলে মনে করে না তারা তাদের অতিথিদের কাছ থেকে অন্য দেশ সম্বন্ধে প্রকাশ্য উক্তিতে কিছুটা বাক্-সংযম আশা করে।

রুশ নেতাদের এখানকার বক্তৃতায় ইংরেজরা অত্যন্ত চটেছে। এমন কি কোনো কোনো বিলাতী সংবাদপত্র এরূপ মন্তব্য পর্যন্ত করেছে যে, আগামী বৎসরে মিঃ বুলগানিনের বৃটেন-ভ্রমণের যে নিমন্ত্রণ আছে, যে-নিমন্ত্রণ তিনি গ্রহণ করেছেন—সেটা বাতিল করে দেওয়া হোক্। এটা অত্যন্ত অসঙ্গত কথা বলে মনে হয়। মিঃ বুলগানিন বৃটিশ নীতির সমালোচনা করেছেন বলে তাঁকে বৃটেনে ডাকায় দোষ কী? তিনি বৃটেনে গিয়েও যদি বৃটিশ নীতির সমালোচনা করেন তাতেই বা কী ভয়? সেখানে তাঁর কথার জবাব দেবার সুযোগ বৃটিশ গভর্নমেণ্টের থাকবে। অস্বস্তির কারণ ঘটে যদি এক দেশের প্রধান সরকারী নেতারা কোনো নিরপেক্ষ দেশে অতিথি হয়ে সেখানে প্রকাশ্যে তাঁদের বিরুদ্ধপক্ষের নিন্দা করেন। এখানে মুশকিল নিন্দাকারী বা নিন্দিতের নয়, মুশকিল হয় নিরপেক্ষ গৃহস্বামীর। ভারতে সংঘটিত কোনো কিছুর দরুন ইঙ্গ-রুশ সম্বন্ধ যদি তিক্ততর হয় তবে আমাদের প্রধানমন্ত্রীই বোধ হয় সবচেয়ে দুঃখিত হবেন। ২৯।১১।

প্রেমেন্দ্র মিত্র

দাও না দোকান। দোষ কি তাতে! ,
মনোহারী দোকান।
সাজাও পুতুল, কাঁচের চুড়ি, জরির ফিতে,
রং-বেরং-এর ছবি।
হাতা খুন্তি হাঁড়ি কড়াই, তাই বা কেন নয়!
সুলভ সওদা স্বল্প সাধের।
একটু চটক, একটু পালিশ,
প্রাণের পণ্য একটু রঙীন করে
দোকানদারী বুলি দুটো দিও না হয় জুড়ে'
ঝিরিঝিরি জীবন যদি তাতে-ই ঝলোমলো।

বেচাকেনা ইমানদারী, দেওয়া নেওয়ার চলা,
এইত সব-ই, পেশা নেশা, এইত পরম!
দেওয়া খুশির, খাঁটি, কোথাও নেইক ফাঁকি;
নেওয়ার বেলা উচিত দাম-ই চেয়ো,
হিসেব তুলো পাকা খাতায়,
জমাখরচ, আর যা পেলে ফাউ,
চোখের চুড়ির সমান ঝিলিক
লাজুক বৌ-এর মুখে,
খোকনমণির চোখ-জ্বলজ্বল পুতুল-পাওয়া সুখ,
গিন্নিবান্নি, ভারিক্কি চাল, সাবধানী সখ—আহা!
হৃদয় ছিঁড়ে প্রাণের সলতে ওরাই পাকায় আর
বুকের আড়াল আগলে ফেরে আশার প্রদীপ
ঝড়-বাদলে—
দরদস্তুর, নাড়াচাড়া, যাওয়ার ভীড়েও থমকে থেমে
একটু দেখার গরজ,
ভালোমন্দ দুটো কথা, জলে ছায়া-র চলতি
চেনাশোনা।

মেলার ধারেই থাক্‌'তে সই।
খাল পেরিয়ে মাঠ পেরিয়ে
পাঁচটা গাঁয়ের মানুষ আসবে যাবে,
উড়বে ধুলো, থামবে না গোল সকাল সন্ধ্যে দুপুর
কত না মুখ কত না পা পেরিয়ে যাবে চলে,
এলোমেলো খেই-না পাওয়া কত কথার ঢেউ,
ছুঁয়ে যাবে, রেখে যাবে হয়ত কি গুণগুণ,
বন্ধ ঝাঁপের রাত প্রহরে শুনবে যা ফের
দোকান-দোসর অশথ-কাঁপা হাওয়ায়।

টঙের ঘরে একা একা
শুধু নিজের নাইকুণ্ডুল খুঁজে,
হয়ত আখের পাকা হোতো। করবে কখন,
মেলার বেসাত মজায় যদি!
বসেই থাকো কিম্বা চলো, বেচো কিম্বা কেনো,
প্রাণের মেলায় তুমিও পাঁওদল,
ভালোবাসায় ভীড়ের মানুষ,
তোমার আখের চলার পায়ে-ই মাটি।
লাভ লোকসান খতিয়ে তবু, দেখো যদি
হিসেবে গরমিল,
জমার চেয়ে খরচ বেশী ফাজিল,
যত গুমোট মেঘ সরানো
হৃদয় জুড়ে রোদ ছড়ানো
সেইত তোমার অগাধ অপার নীল।

পত্রাবলী

[কনিষ্ঠ জামাতা নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত।
নগেন্দ্রনাথের কন্যা শ্রীমতী নন্দিতা কৃপালনীর সৌজন্যে
প্রাপ্ত। বিশ্বভারতীর অনুমতিক্রমে মুদ্রিত]

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

নগেন, অনবরত ঘুরে বেড়াচ্চি। বোধ হচ্চে আগামী শীতের শেষ পর্যন্ত এই লেকচারের ঘূর্ণি চল্‌বে। তারপরে যদি যুদ্ধ থামে তাহ'লে য়ুরোপে যেতে হবে। কেননা আমার যা বলবার কথা আছে তা য়ুরোপকে বলব বলেই লিখেছিলুম এবং য়ুরোপ তা শুন্‌বেই। কিন্তু আজ পর্যন্ত যুদ্ধ থামবার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্চে না—হয়ত বা এই শীত পেরিয়ে আস্‌চে শীত পর্যন্ত চল্‌বে কিছুই বলা যায় না। তা যদি হয় তাহলে আবার চীন-জাপানের রাস্তা দিয়ে ভারতবর্ষে ফিরতে হবে। এখানকার হাওয়া আমার শান্তির পক্ষে প্রতিকূল অথচ এখানেই আমার কাজ পড়েচে এই বিষম দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে গেছি।

সুরুলের বাড়ির কথা কাল রথীকে টেলিগ্রাফ করে দিয়েচি। বিধাতা তোমার জীবনের ক্ষেত্র ঐখানেই নির্দিষ্ট করবেন বলে বারম্বার ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তোমাকে ঐখানেই টেনে আন্‌চেন। অন্যত্র তুমি যে নিরাশ হয়েচ সে তোমার পক্ষে ভালই হয়েচে। সত্যের প্রবেশ-দ্বার সঙ্কীর্ণ—মাথা হেঁট করে তার দর-বারে ঢুক্‌তে হয়—বারবার মাথা ঠুকে ঠুকে তবেই সে কথা আমরা বুঝতে পারি এবং নম্র হয়ে সত্যকে গ্রহণ করতে শিখি। যতক্ষণ আত্মা-ভিমান থাকে ততক্ষণই আমাদের আত্মোৎসর্গের পূজার ফুলে কাঁটা থেকে যায়। এ কথা তুমি মনে নিশ্চয় জেনো শান্তিনিকেতনের কাজেই তোমাকে সম্পূর্ণ আত্মদান করতে হবে নইলে কখনই সুরুলে তোমার অধিকার জন্মাবে না। শান্তিনিকেতনকে সমস্ত জীবন দিয়ে এবং তার কাছে তোমার সমস্ত মান অভিমান বিসর্জন দিয়ে তাকে তোমার গ্রহণ করতেই হবে এই জন্যেই আজ তুমি সুরুলে প্রবেশ করচ। যতদিন সম্পূর্ণ প্রস্তুত হওনি, যতদিন মনের মধ্যে তোমার বিক্ষেপ ছিল ততদিন বারবার তুমি বাইরে ঘুরে ঘুরে আঘাত পেয়েছ। আজ তুমি কেবল মাত্র আমার কাছ থেকে নয় শান্তিনিকেতনের কাছ থেকেই সুরুলের বাড়ি প্রসাদরূপে গ্রহণ করচ এই কথা মনে রেখো। তোমার জীবনের লক্ষ্য কেবলমাত্র তোমার নিজের অভিমুখী হবে না বিধাতা তোমাকে এই বর দিচ্চেন, তোমার জীবন দিয়ে তাঁর শিশুদের তুমি সেবা করবে, তাদের সত্যের পথে চালনা করবার উপলক্ষ্যে নিজেকে সেইপথে চালনা করবে তোমার জীবনের এই ব্রত তাঁর হাত থেকে গ্রহণ করে তুমি ধন্য হও।

ইতি ৬ই কার্তিক ১৩২৩

একান্ত শুভানুধ্যায়ী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

তোমার বই ছাপাতে যদি বেশি টাকা লাগে তাহলে লোকসান হবে। রামানন্দবাবু[১] বল্‌ছিলেন, ব্লক তৈরির খরচ বাদে ১৪।১৫০

১ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

সাধারণ ছবি হাজার ছাপাতে তাঁর ৬৫০ টাকা লেগেচে। তাহলে তোমার বই ছাপতে সবসুদ্ধ যে কত লাগ্‌বে তা বুঝতে পারচিনে। একটু হিসাব করে চল্‌তে হবে। কেননা সম্প্রতি বিদ্যালয়ের ছাপাখানা প্রভৃতি নানা কাজে কেবলি টাকা ঢাল্‌তে হচ্চে—৬।৭ শো টাকা যদি আটকে থাকে তাহলে খুবই অসুবিধা ঘটতে পারে।

রামমোহন রায়ের উপর তুমি যেটা লিখেচ সেটা "পূজার ছুটি"তে[২] চলবে না। কেননা ওর মধ্যে যে আলোচনা আছে সে সাধারণ পাঠকের পক্ষে রুচিকর হবে না। এ বইয়ে এমন কোনো প্রসংগই থাকা উচিত না যা কোনো সম্প্রদায়ের পক্ষে অপ্রিয় হবে। এতে বেশ আমোদ এবং সহজ শিক্ষার মত উপকরণ থাকা চাই।

তোমার সব লেখাগুলি একবার দেখে শুনে বাছাই না করলে বোধহয় ভাল হবে না। ভাষা এবং বানানের প্রতিও দৃষ্টি রাখা খুব দরকার হবে। কোন্‌ ছাপাখানার সঙ্গে বন্দোবস্ত করচ?

আমার হোমিয়োপ্যাথি বইগুলো আমার ঘরে কোথাও আছে। সেগুলো সংগে করে এনো।

ইতি ২১শে আষাঢ় ১৩২৫
শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

সমস্ত সকাল আমি ক্লাস নিই, তারপরে খাওয়ার পরেই Matric class-এর তর্জমার ক্লাসে অনেকক্ষণ কাটে। তারপরে সন্ধ্যার আগে পর্যন্ত lesson তৈরি করতে হয়। কোনো রকম লেখা আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। একদিনও আমার সময় নেই—মনও অন্যদিকে দেওয়া আমার পক্ষে শক্ত। তাই পার্বনীতে কোনো মজার কিম্বা গম্ভীর রকমেরও লেখা দেওয়া আমার অসাধ্য।

আমার লেখার আশা এখন দীর্ঘকালের জন্যে ছেড়ে দিতে পারো। "সমবায়" লেখাটি[৩] যখন দৈনিক মাসিকে তুলে দিয়েচে তখন ওটা আর পার্বণীতে মানাবে না।

বিদ্যালয়ে নূতন প্রাণ সঞ্চার করতে হচ্চে—রথী যোগ দেওয়াতে আমার অনেক সংকল্প কার্যে পরিণত হতে পারচে—অর্থব্যয় আমার সামর্থ্যকে ঢের বেশি ছাড়িয়ে যাচ্চে কিন্তু এই তো আমার পূজার অর্ঘ্য অতএব এখন আমার আর কিছুতে শক্তি সম্বল বা চিত্তকে বিক্ষেপ করার সুযোগ নেই—হুকুম নেই। সময় যখন এসেচে তখন সাধ্যকে সংকুচিত করতে পারব না।

ইতি ১২ই ভাদ্র ১৩২৫
শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

তোমার "পার্বণী" পড়িয়া বিশেষ আনন্দ পাইয়াছি। ইহা ছেলে বুড়ো সকলেরই ভাল লাগিবে। তোমার পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে। দেশের প্রায় সমস্ত বিখ্যাত লেখকদের ঝুলি হইতে বাংলা দেশের ছেলেদের জন্য এই যে পার্বণী আদায় করিয়াছ ইহা একদিকে যত বড়ই দুঃসাধ্য কাজ অন্যদিকে তত বড়ই পুণ্যকর্ম। বস্তুত আমি ইহার বৈচিত্র্য, সৌষ্ঠব ও সরসতা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি—অথচ ইহার মধ্যে পাঠকদের জানিবার, ভাবিবার, বুঝিবার কথাও অনেক আছে। তোমার এই সংগ্রহটি কেবলমাত্র ছুটির সময় পড়িয়া তাহার পরে পাতা ছিঁড়িয়া, ছবি কাটিয়া, কালী ও ধুলার ছাপ মারিয়া জঞ্জালের সামিল করিবার সামগ্রী নহে—ইহা আমাদের শিশু-সাহিত্যের ভাণ্ডারে নিত্যপ্রয়োজনের জন্যই রাখা হইবে। প্রথম খণ্ড পার্বণীতে যে আদর্শে ডালি সাজাইয়াছ বৎসরে বৎসরে তাহা রক্ষা করিতে পারিলে মা ষষ্ঠী ও মা সরস্বতী উভয়েরই তুমি প্রসাদ লাভ করিবে।

আজকাল কাগজ প্রভৃতির দুর্মূল্যতার দিনে কেমন করিয়া যে দেড় টাকা দামে তুমি এই বই বাহির করিলে বুঝিতে পারিলাম না, বোধকরি

২ সম্ভবত 'পার্বণী'র পূর্ব প্রস্তাবিত নাম
৩ ১৩২৫ শ্রাবণ সংখ্যা ভাণ্ডার পত্রে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের "সমবায়" প্রবন্ধ

সংগ্রহ করিবার উৎসাহে লাভলোকসান খতাইয়া দেখিবার সময় পাও নাই।[১]

ইতি ৯ই আশ্বিন ১৩২৫
শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

কোনো নেটিভ স্টেট্‌সে কাজ করা শ্রেয় মনে করিনে। সে সকল জায়গায় দিনরাত ঈর্ষা ও ষড়যন্ত্র চলবেই। তার থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে চলা কঠিন। তুমি শিক্ষা বিভাগেই কাজ কর এই ইচ্ছা এণ্ড্রুজকে জানিয়েছিলাম। ন্যাশনাল য়ুনিভার্সিটিতে যদি তোমার কাজের ক্ষেত্র পাও তাহলে সেইটেই সব চেয়ে ভাল হয়। ওখানে তোমার শক্তির যথার্থ পরীক্ষা হতে পারবে, উপর থেকে কোনো বাধা পাবে না। আমি নিজে যেতে পারলে হয়ত সুবিধা হত কিন্তু আত্মীয়দের জন্য প্রার্থনা করা কোনোমতেই আমার মুখ দিয়ে বেরয় না। যতটুকু করেচি তাতে কেবল গ্লানিই রয়ে গেছে কোনো ফল পাইনি। বাঙগালোর মাদুরা প্রভৃতি জায়গা থেকে নিমন্ত্রণ পেয়েছি, যদি কখনো যেতে পারি তাহলে দৈবাৎ কোনো একটা সুযোগ ঘট্‌তেও পারে। কিন্তু এ পর্যন্ত কখনো সুযোগ আমি ঘটাতে পারিনি তাই এ সম্বন্ধে আমার মনে কানো আশা নেই এবং অপর্যাপ্ত সঙ্কোচ আছে। এণ্ড্রুজকে বলে দিয়েচি, সে যথাসাধ্য চেষ্টা করবে তাতে সন্দেহমাত্র নেই।

আমাদের বিদ্যালয়ের নানারকম নূতনের প্রবর্তন ও পুরাতনের সংস্করণের ব্যাপার নিয়ে ব্যস্ত আছি। ঘরবাড়িও অনেক বাড়াতে হচ্চে। যুদ্ধের উৎপাতে জিনিসপত্র কিছুই পাওয়া যাচ্চে না—এখন শান্তি হয়েচে কিন্তু রেলপথে মাল আনানো আগেকার চেয়ে অনেক বেশি কঠিন হয়েচে। সেইজন্য সকল কাজেই পদে পদে বাধা পাচ্চি। সুরুলের বাগান থেকে দুটো অর্জুন গাছ কাট্‌তে হল নইলে মিস্ত্রি মজুর বসিয়ে রেখে প্রতিদিন লোকসান দিতে হচ্চিল।

নীতু বেশ সুস্থ সবল না হলে মীরার কাছ থেকে এনো না, তাহলে মীরা বড় বেশি উদ্বিগ্ন হবে।

ইতি ২৫শে অগ্রহায়ণ ১৩২৫
শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

তোমাদের এই সঙ্কটের দিনে আমার মন তোমার জন্য অত্যন্ত বেদনা বোধ করচে। আজ তোমার চিত্তে ঈশ্বর বল সঞ্চার করুন এই আমি একান্ত মনে কামনা করি। যে পরীক্ষায় তিনি তোমাকে ফেলেছেন তার থেকে উত্তীর্ণ হয়ে তুমি নূতন জীবন লাভ কর এবং নূতন শক্তিতে সংসারের কল্যাণে আপনাকে নিযুক্ত করবার তেজ ও উৎসাহ প্রাপ্ত হও। অন্ধকার ঘনীভূত—ঈশ্বরের প্রসাদ একে ভেদ করে দিক্। আলো আসুক, আলো আসুক,—সমস্ত অবসাদ এবং অন্ধতা সম্পূর্ণ কেটে যাক্—আমাদের মধ্যে ঈশ্বরের প্রকাশ দিনে দিনে পূর্ণ হোক্—যিনি রুদ্র তাঁর দক্ষিণ মুখ সমস্ত সুখে দুঃখে আমাদের রক্ষা করুক।

একান্ত শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১ চিঠিখানি পূর্বে ১৩২৭ সংখ্যা পার্বণীতে প্রকাশিত

অনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায়

বর্তমান সভ্য জগতে মুদ্রণ শিল্প একটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য বিষয় হয়ে উঠেছে। পৃথিবীর সব দেশেই মুদ্রণের বিভিন্ন ধরনের বৈশিষ্ট্য রয়েছে। য়ুরোপ ও আমেরিকার মতো দেশে সাংবাদিকতা, প্রচারকার্য, পুস্তক প্রকাশন প্রভৃতি খুবই উন্নত স্তরের; ঐ সব দেশে উন্নত ধরনের মুদ্রণের জন্য নানাবিধ যন্ত্রপাতি উদ্ভাবিত হয়েছে। ভারতবর্ষেও মুদ্রণ শিল্পের মান বর্তমান সময়ে বহু গুণে উন্নত ধরনের হয়ে উঠেছে। কলিকাতা ও বোম্বাই-এর মতো মহানগরীতে মুদ্রণ পারিপাট্যের এত সব বৈচিত্র্য এখন দেখা যাচ্ছে যা শিল্পোৎকর্ষ ও সুষ্ঠুতার দিক থেকে য়ুরোপ ও আমেরিকার মতো দেশের উচ্চাঙ্গ মুদ্রণ শিল্পের সঙ্গে তুলনীয়। এখন ভারতে যে ধরনের মুদ্রণ হয়ে থাকে, কুড়ি-পঁচিশ বছর আগে কখনো এ রকম হতো না। এক কথায় বলা যায় মুদ্রণ শিল্প ও পুস্তক প্রকাশনার মান এখন বহু গুণে উন্নীত হয়েছে। বর্তমান সময়ে অনেক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, শিল্প প্রতিষ্ঠান ও বাণিজ্যিক গোষ্ঠী তাদের প্রচারকার্যের জন্য চিত্রিত পুস্তিকা, মনোরম রঙে সযত্নে মুদ্রিত নানা রকমের ফোল্ডার, ব্রসিউর ও লিফলেট প্রভৃতি প্রস্তুত করে থাকেন। এই ধরনের মুদ্রণ কার্যে প্রচুর অর্থ ব্যয় হয় আর সেই সঙ্গে প্রচারের ক্ষেত্রে সার্থকতা অর্জনের জন্য অত্যন্ত যত্ন সহকারে মুদ্রণ যন্ত্র মারফৎ কাজ হয়ে থাকে। প্রচারকার্যে এবং প্রকাশনের ব্যাপারে মুদ্রণ শিল্পের আশ্চর্য রকমের উৎকর্ষতা যদিও যুদ্ধোত্তর কালের আমদানী,—তবু বলা যায়, এই ধরনের কাজে উৎকর্ষ লাভ করার ক্ষেত্রে এখনকার কালে এই ক্ষেত্রে বহু অভিজ্ঞ ও সুদক্ষ ব্যক্তির মনোযোগ বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছে।

আমাদের দেশের মুদ্রণ শিল্পের দ্রুত উন্নতির ফলে বহু দিক থেকে আমরা উৎকর্ষতা ও দক্ষতা অর্জন করেছি। এই বছর ভারত সরকারের প্রচার ও তথ্য দপ্তর থেকে মুদ্রণ শিল্পের উৎকর্ষতার জন্য এবং চিত্রিত মুদ্রণের অভিনব ধরনের সুষ্ঠুতার জন্য কতকগুলো পুরস্কার

মুদ্রণশিল্প প্রদর্শনীতে ডাঃ রাধাকৃষ্ণন

দেওয়া হয়েছে। মুদ্রণ কার্যে পরিপাটি সুষ্ঠুতা এবং চিত্রকর্মে শিল্পীদের আশ্চর্য নৈপুণ্য, সেই সঙ্গে প্রকাশকদের অভিনব ধরনের রুচি জ্ঞান প্রভৃতির দিকে লক্ষ্য রেখে ভারত সরকার একটি উল্লেখযোগ্য প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেন। এই প্রতিযোগিতায় ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের সকল ধরনের প্রকাশক ও মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানগুলোর নিকট তাদের কাজের বিভিন্ন ধরনের নমুনা চেয়ে সরকার থেকে যোগাযোগ করা হয়। এই প্রতিযোগিতার জন্য নয়াদিল্লীর ঈস্টার্ন কোর্টস্থ সেন্টেনারী হলে একটি সুবিপুল প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। এই ধরনের প্রচেষ্টা ভারত সরকারের এই প্রথম। এই প্রদর্শনীটি ৮ই থেকে ১৫ই নভেম্বর পর্যন্ত খোলা ছিল। ১৪ই নভেম্বর রাত সাড়ে সাতটায় ভারতের প্রধান মন্ত্রী এই প্রদর্শনী পরিদর্শন করেন এবং তিনিও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানগুলোর কৃতিত্বপূর্ণ কাজের প্রশংসা করেন। এই প্রদর্শনীতে যে সব মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান ও প্রকাশনা ভবন তাদের বিবিধ উল্লেখযোগ্য কাজের নমুনা পাঠান, তাদের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর জন্য উল্লেখযোগ্য রকমের পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়ঃ—

(১) ছোটদের পাঠোপযোগী করে প্রকাশিত সবচেয়ে সেরা বই।

(২) বহুবিধ চিত্র সমন্বিত সেরা বই।

(৩) ভিতরে চিত্রিত নয় এমন ধরনের বই।

(৪) ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত সবচেয়ে সেরা বই।

(৫) ভারতবর্ষের হাতে তৈরি কা[illegible] প্রস্তুত সবচেয়ে সেরা বই।

এ ছাড়া যে সব কাজের মধ্যে মু[illegible] উৎকর্ষ এবং মুদ্রণ শিল্পের উন্নত ধ[illegible] রুচিবোধের পরিচয় নিহিত রয়েছে [illegible] রকম কতকগুলো কাজের জন্যও পু[illegible] দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। সেই ধ[illegible] কাজের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়[illegible] উল্লেখযোগ্যঃ—

(১) প্রচার বিষয়ক ফোল্‌ডার
- (ক) লেটার প্রেস
- (খ) অফ্‌সেট

(২) প্রচার বিষয়ক পোস্টার
- (ক) লেটার প্রেস
- (খ) অফ্‌সেট

(৩) এক রঙা অথবা বহু রঙে [illegible] ক্যালেণ্ডার।

(৪) বহু কার্যকরী বিষয়ের জন্য অথবা উপহার দেবার জন্য ডায়েরী।

(৫) ম্যাগাজিন, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্র এবং পত্রিকা।

(৬) ইংরেজী এবং ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত দৈনিক সংবাদপত্র।

(৭) 'কাস্ট্' করার কাজে উপযোগী সবচেয়ে সেরা ধরনের দেবনাগরী অক্ষরের হরফ।

এই রকম বিভিন্ন শাখা ও উপশাখা অনুযায়ী যে সব চিত্রশিল্পী, মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান, প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান এবং বিজ্ঞাপন এজেন্সীগুলো কাজের উৎকর্ষতার জন্য প্রতিযোগিতায় প্রথম বা দ্বিতীয় পুরস্কার লাভ করেছেন এবং (প্রথম বা দ্বিতীয় স্তরের পুরস্কার ছাড়াও) যাঁরা ভারত সরকার থেকে সার্টিফিকেট অব মেরিট লাভ করেছেন, তাঁদের একটি সামগ্রিক পরিচিতি নিম্নে দেওয়া হল:—

এই বিচিত্র ধরনের প্রতিযোগিতামূলক প্রদর্শনীটি ভারত সরকারের মিনিস্ট্রি অব ইনফরমেশন অ্যান্ড ব্রডকাস্টিং-এর অন্তর্ভুক্ত ডাইরেক্টরেট অব এ্যাডভার-টাইজিং অ্যান্ড ভিস্যুয়েল পাবলিসিটি দপ্তরের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়েছে। শীঘ্রই এই প্রদর্শনীটি কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ ভারতের এই কয়টি প্রধান মহানগরীতে ক্রমান্বয়ে প্রদর্শিত হবে।

শ্রেণী	পুরস্কার	প্রকাশক চিত্রকার	মুদ্রক	যেই বিষয়ের জন্য পুরস্কার দেওয়া হয়েছে
১। দশ বছরের নিম্ন বয়স্ক শিশুদের জন্য বই।	প্রথম	শ্রীসমর দে	শ্রী সরস্বতী প্রেস লিঃ, কলিকাতা	চড়ার ছবি (বাঙলা)
	প্রথম	সি এইচ জি ময়ে হাউস	দ্বিতীয় পুরস্কার পেয়েছেন রাজকমল পাবলিকেশন (মুদ্রক ও প্রকাশক)	'দাদে লাগ্রে কি কহানী' (হিন্দী)
	সার্টিফিকেট অব মেরিট	পূর্ণ চক্রবর্তী	শ্রী সরস্বতী প্রেস লিঃ, কলিকাতা	ছবিতে রামায়ণ (বাঙলা)
২। দশ বছরের উর্ধ্বে যাদের বয়স সেই সব ছোটদের জন্য বই।	প্রথম	সত্যজিৎ রায় এবং সুকুমার রায়	শ্রী সরস্বতী প্রেস লিঃ,	খাই খাই (বাঙলা)
	দ্বিতীয়	সূর্য রায়	শ্রী সরস্বতী প্রেস লিঃ,	৩ টির দিনে মেঘের গল্প (বাঙলা)
	সার্টিফিকেট অব মেরিট	পশ্চিম বাঙলার শিক্ষা বিভাগ	গভর্নমেণ্ট প্রেস, কলিকাতা	চিত্রে ভারতের ইতিহাস) (বাঙলা)
৩। চিত্রিত পুস্তক	প্রথম	পপুলার বুক ডিপো, বোম্বাই	কর্ণাটক প্রিন্টিং প্রেস, বোম্বাই	এ জার্নি থ্রু টয়ল্যান্ড (ইংরেজী)
	দ্বিতীয়	শ্রী আচারেকর	কমার্সিয়াল প্রিন্টিং প্রেস, বোম্বাই	স্যাট পেপার এন্ড ফ্লাইং গন্ধর্বস (ইংরেজী)
	সার্টিফিকেট অব মেরিট	থিওসোফিকেল পাবলিসিং হাউস, মাদ্রাজ।	থিওসোফিকেল পাবলিসিং হাউস, মাদ্রাজ	কিংডম অব দি গডস্ (ইংরেজী)
৪। শিল্প সম্পর্কীয় বই	প্রথম	ললিতকলা একাডেমী দিল্লী	ভিকিল এন্ড সন্স, বোম্বাই	মোগল মিনিয়েচার (ইংরেজী)
	সার্টিফিকেট অব মেরিট	পাবলিকেশনস্ ডিভিসন	টাইমস্ অব ইণ্ডিয়া প্রেস, বোম্বাই	'কাংড়া ভ্যালী পেণ্টিংস'
৫। পুস্তক প্রকাশনা (ইংরাজী)	প্রথম	রিজার্ভ ব্যাংক অব ইণ্ডিয়া	টাইমস্ অব ইণ্ডিয়া প্রেস, বোম্বাই	ব্যাংকিং এন্ড মনেটারী ষ্ট্যাটিস্টিক্স অব ইণ্ডিয়া
	প্রথম	শ্রী আর. এস. ধর্মকুমার সিংজী, ভাবনগর	টাইমস্ অব ইণ্ডিয়া, বোম্বাই	বার্ডস অব সৌরাষ্ট্র
	সার্টিফিকেট অব মেরিট	শ্রী কে. ডি. চ্যাটার্জি এম. ডি., কলিকাতা	শ্রী সরস্বতী প্রেস লিঃ, কলিকাতা	'হিউম্যান পারাসাইটিক ডীজীজ'
২। পুস্তক প্রকাশনা (ভারতীয় ভাষায়)	প্রথম	সিগনেট প্রেস, কলিকাতা	শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস, কলিকাতা	'অনন্যা'
	দ্বিতীয়	বিশ্বভারতী পাবলিকেশনস ডিপার্টমেণ্ট	নাভানা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস, কলিকাতা	'গল্প স্বল্প'
	সার্টিফিকেট অব মেরিট	ব্যাঙ্গালোর প্রেস, ব্যাঙ্গালোর	ব্যাঙ্গালোর প্রেস, ব্যাঙ্গালোর	'যশোদা'

শ্রেণী	পুরস্কার	প্রকাশক চিত্রকার	মুদ্রক	যেই বিষয়ের জন্য পুরস্কার দেওয়া হয়েছে
৬। হাতে তৈরী কাগজে মুদ্রিত পুস্তক	সার্টিফিকেট অব মেরিট	সিগনেট প্রেস, কলিকাতা	শ্রী সরস্বতী প্রেস লিঃ, কলিকাতা	'ভারত সন্ধানে নে[illegible]
	ঐ	অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটি প্রেস, বোম্বাই	টাইমস্ অব ইণ্ডিয়া, বোম্বাই	'আওয়ার ইণ্ডি[illegible]
	ঐ		ইণ্ডিয়া প্রেস, এলাহাবাদ	'ঋতু সংহার'
৭। (১) দৈনিক পত্রিকা (ইংরেজী)	প্রথম	স্টেটস্‌ম্যান		
ভারতীয় ভাষায় মুদ্রিত	প্রথম	নবভারত টাইমস্ (হিন্দী)		
	সার্টিফিকেট অব মেরিট	প্রজাবাণী (কানাড়া)		
	ঐ	আনন্দবাজার পত্রিকা (বাঙলা)		
৮। শিল্প সম্পর্কীয় ম্যাগাজিন	প্রথম	মার্গ, বোম্বাই	কমার্সিয়াল প্রিণ্টিং প্রেস, বোম্বাই	
	সার্টিফিকেট অব মেরিট	রূপলেখা, অল ইণ্ডিয়া ফাইন আর্ট এণ্ড ক্র্যাফ্‌টস সোসাইটী	ক্যাক্সটন প্রেস, দিল্লী	
	ঐ	শংকর্স্ য়্যানুয়েল শ্রী শংকর	ন্যাশনাল প্রিণ্টিং ওয়ার্কস, দিল্লী	
৯। হাউস জার্ণালস্	প্রথম	বার্মা শেল	টাইমস্ অব ইণ্ডিয়া,	বার্মাশেল নিউজ
	সার্টিফিকেট অব মেরিট	ডানলপ, ডি জে কিমার এণ্ড কোং	গসেন এণ্ড কোং	ডানলপ গেজেট
	ঐ	আই সি আই, ডি জে কিমার এণ্ড কোং	গসেন এণ্ড কোং	আই সি আই [illegible]
১০। পিরিওডিকেলস্	দ্বিতীয়	সেণ্ট্রাল সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার বোর্ড	ন্যাশনাল প্রিণ্টিং ওয়ার্কস, দিল্লী	'সমাজ কল্যাণ'
	সার্টিফিকেট অব মেরিট	কির্লোসকর ব্রাদার্স লিঃ, কির্লোসকর ওয়াদি	কির্লোস্কর প্রেস, কির্লোস্কর ওয়াদি	'কির্লোস্কর'
	ঐ	দিল্লী প্রিণ্টিং এণ্ড পাবলিসিং কোং লিঃ, দিল্লী	দিল্লী প্রিণ্টিং এণ্ড পাবলিসিং কোং লিঃ, দিল্লী	'ক্যারাভেন'
১১। পোষ্টারস্	প্রথম	এয়ার ইণ্ডিয়া ইণ্টারন্যাশনাল, বোম্বাই।	বোম্বাই ফাইন আর্ট এণ্ড প্রিণ্টিং ওয়ার্কস, বোম্বাই	'ইণ্ডিয়া'
	প্রথম	ডাইরেক্টর অব এ্যাড্‌ভারটাইজিং এ্যাণ্ড ভিসুয়েল পাবলিসিটি মিনিষ্ট্রি অব ইনফরমেশন এ্যাণ্ড ব্রডকাষ্টিং	সরস্বতী প্রেস লিঃ, কলিকাতা	'তাজমহল'
	দ্বিতীয়	জে, ওয়াল্‌টার টমসন কোং (ঈ) লিঃ, বোম্বাই	ক্লারিজেস, বোম্বাই	(মোবিল গ্যাস ডাবল পাওয়ার)
	দ্বিতীয়	এসোসিয়েটেড সিমেণ্ট কোম্পানীজ, বোম্বাই	ঐ	(এ সি সি সিমেণ্ট)
	সার্টিফিকেট অব মেরিট	বার্মাশেল	টাইমস্ অব ইণ্ডিয়া, বোম্বাই	(শেললুব্রিকেশন)
১২। ফোল্ডারস্ অব্‌সেট	প্রথম	ডাইরেক্টর অব এ্যাডভারটাইজিং এণ্ড ভিসুয়েল পাবলিসিটি, মিনিষ্ট্রি অব ইনফরমেশন এণ্ড ব্রডকাষ্টিং	ঈগল লিথোগ্রাফিং কোং, কলিকাতা	'হিমালয়ান হলিডে'

শ্রেণী	পুরস্কার	প্রকাশক চিত্রকার	মুদ্রক	যেই বিষয়ের জন্য পুরস্কার দেওয়া হয়েছে
	দ্বিতীয়	জে, ওয়াল্টার টমসন কোং (ঈ) লিঃ, বোম্বাই		মোবিল ওয়েল
	সার্টিফিকেট অব মেরিট	ডাইরেক্টর অব এ্যাডভার-টাইজিং এন্ড ভিস্যুয়েল পাবলিসিটি, মিনিষ্ট্রি অব ইনফরমেশন এন্ড ব্রডকাস্টিং	ঈগল লিথোগ্রাফিং কোং, কলিকাতা	'আগ্রা'
লেটার প্রেস	প্রথম		টাইমস্ অব ইণ্ডিয়া, বোম্বাই	'আহমেদাবাদ'
	দ্বিতীয়	অল ইণ্ডিয়া হ্যাণ্ডি-ক্রাফ্টস্ বোর্ড	ক্যাক্স্টন প্রেস, দিল্লী	'ফুলকারী'
	সার্টিফিকেট অব মেরিট		গসেন এন্ড কোং, কলিকাতা	সল্‌ভা
ক্যালেন্ডারস্ অফ্‌সেট	প্রথম	এয়ার ইণ্ডিয়া ইণ্টার ন্যাশনাল, বোম্বাই	ঈগল লিথোগ্রাফিং কোং, কলিকাতা	
	দ্বিতীয়	ভোল্টাস, বোম্বাই	ক্যারিমেস প্রিণ্টিং হাউস, বোম্বাই	
লেটার প্রেস	প্রথম	শার্লিক এন্ড কোং লিঃ	টাইমস্ অব ইণ্ডিয়া	
	দ্বিতীয়	জার্ডিন মেনকাইস এন্ড কোং, আলফা এ্যাডভার-টাইজিং কোং	কলিকাতা	
	সার্টিফিকেট অব মেরিট	জে ওয়াল্টার টমসন কোং (ঈ) লিঃ, বোম্বাই	সরস্বতী প্রেস লিঃ, কলিকাতা	ইম্পিরিয়াল টোব্যাকো কোং ক্যালেন্ডার
	ঐ	ক্যালিকো মিলস্, আহমেদাবাদ		ক্লথ ক্যালেন্ডার
	ঐ	ফিলিপস্	গসেন এন্ড কোং, কলিকাতা	ফিলিপস্ ক্যালেন্ডার
১৪। ডায়েরী	প্রথম	নিউ ইণ্ডিয়া য়্যাস্যুরেন্স কোং লিঃ, বোম্বাই	ভকিল এন্ড সান্স, বোম্বাই	'নিউ ইণ্ডিয়া ডায়েরী'
	সার্টিফিকেট অব মেরিট	ডাইরেক্টর অব এ্যাডভার-টাইজিং এন্ড পাবলিসিটি মিনিষ্ট্রি অব ইনফরমেশন এন্ড ব্রডকাস্টিং	গ্লাসগো প্রিণ্টিং ওয়ার্কস, কলিকাতা	ট্যুরিষ্ট ডায়েরী, ১৯৫৫
১৫। দেবনাগরী টাইপ ফেসেস্	প্রথম	গুজরাটী টাইপ ফাউণ্ড্রী		
	দ্বিতীয়	শ্রী টাইপ ফাউণ্ড্রী, কলিকাতা		
১৬। পাবলিসিটি বুকলেট্স্	সার্টিফিকেট অব মেরিট	১) এসোসিয়েটেড সিমেণ্ট কোং, বোম্বাই ২) বার্মাশেল, বোম্বাই ৩) বোম্বাই গভর্নমেণ্ট কটেজ এন্ড স্মল স্কেল ইনডাস্ট্রিজ ৪) গ্লাসগো ল্যাবোরো-টরিজ বোম্বাই		
১৭। লেবেল	সার্টিফিকেট অব মেরিট	কার্ণোডায়া লিথো প্রেস, ওল্ড ভিক্টোরিয়া মিল, বোম্বাই		

* জগদীশ চন্দ্র বসু প্রসঙ্গ *

জন্ম ৩০ নভেম্বর ১৮৫৮ ॥ মৃত্যু ২৩ নভেম্বর ১৯৩৭

রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশচন্দ্র

রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশচন্দ্র কর্তৃক পরস্পরকে লিখিত পত্রাবলী প্রবাসী পত্রে যাঁরা পাঠ করেছেন তাঁরাই জানেন, গত শতাব্দীর শেষভাগে এই দুই মনীষীর মধ্যে যে সৌহৃদ্যবন্ধন স্থাপিত হয় তা সুচিরস্থায়ী হয়ে দীর্ঘকাল পরস্পরকে জীবনব্রতোদযাপনের সহায় হয়েছিল। "আমার জীবনে প্রথম বন্ধুত্ব জগদীশের সঙ্গে। আমার চিরাভ্যস্ত কোণ থেকে তিনি আমাকে টেনে বের করেছিলেন যেমন করে শরতের শিশিরস্নিগ্ধ সূর্যোদয়ের মহিমা চিরদিন আমাকে শোবার ঘর থেকে ছুটিয়ে বাইরে এনেছে। তাঁর মধ্যে সহজেই একটি ঐশ্বর্য দেখেছিলাম। অধিকাংশ মানুষের যতটুকু গোচর তার বেশি আর ব্যঞ্জনা নেই, অর্থাৎ মাটির প্রদীপ দেখা যায়, আলো দেখা যায় না। আমার বন্ধুর মধ্যে আলো দেখেছিলাম। আমি গর্ব করি এই যে, প্রমাণের পূর্বেই আমার অনুমান সত্য হয়েছিল।"

"তিনিও তখন চূড়ার উপর ওঠেননি। পূর্ব উদয়াচলের ছায়ার দিকটা থেকেই ঢালু চড়াই পথে যাত্রা করে চলেছেন, কীর্তিসূর্য আপন সহস্র কিরণ দিয়ে তাঁর সফলতাকে দীপ্যমান করে তোলে নি। তখনো অনেক বাধা, অনেক সংশয়।..."১

জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞানসাধনার সূচনা-পর্বে তাঁর সাংসারিক মানসিক বাধা-মোচনের কর্তব্যপালনে রবীন্দ্রনাথের হৃদয় কি গভীরভাবে আন্দোলিত হয়েছিল ইতিপূর্বে একটি প্রবন্ধে২ তার কথঞ্চিৎ

জগদীশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ

পরিচয় দেওয়া হয়েছে। জগদীশচন্দ্রও তার প্রতিদান করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা, নির্ভর ও প্রীতির দ্বারা। ১৩০৬ সালে কোনো মাসিক পত্রে একটি গল্পে রবীন্দ্রনাথের চরিত্রকে লাঘব করবার চেষ্টা হয়েছিল; জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে সেই প্রসঙ্গে লিখছেন—

..."আপনি অনেক উচ্চে আছেন; এসব কর্দম আপনাকে স্পর্শ করিবে না।

"আমি সম্পূর্ণ বুঝিতে পারি, যাঁহারা কার্যে ব্রতী তাঁহারা অনেকের ভালবাসা দ্বারা উন্নীত না হইলে কার্য সমাধা করিতে পারেন না। ঈশ্বরানুগ্রহে আপনার ভক্তের অভাব নাই। যদি কেহ আপনার কবিতা হইতে বঞ্চিত হন, তাঁহাদিগকে করুণার পাত্র মনে করি। আর যাঁহারা আপনার লেখা হইতে জীবন নবীন ও পূর্ণতর করিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদের আশীর্বাদ কি আপনার নিকট পৌঁছে না? আমি ত কখন কখন আপনার ব্যক্তিত্ব পর্যন্ত ভুলিয়া যাই।" ২১ জুন ১৮৯৯।

রবীন্দ্রনাথের অবিরত উৎসাহ ও বাণীতে জগদীশচন্দ্রের মনে দেশজননীর আশীর্বাণী প্রতিধ্বনিত হত।

"তোমাদের পশ্চাতে আমি এক দীন চীরবসনপরিহিতা মূর্তি সর্বদা দেখিতে পাই।"

"তোমার স্বরে আমি ক্ষীণ মাতৃস্বর শুনিতে পাই—সেই মাতৃদেবী ব্যতীত আমার আর কি উপাস্য আছে?...তোমাদের স্নেহে আমার অবসন্নতা চলিয়া যায়। তোমরা আমার উৎসাহে উৎসাহিত। তোমাদের বলে আমি বলীয়ান। তোমাদের আশাতে আমি আশান্বিত। আমি আর নিজের সুখদুঃখের কথা ভাবি না; কি করিতে হইবে বলিও। তোমরা যে আমাকে ঘিরিয়া আছ, আমি যে একাকী নই, তাহা এখন বুঝিতে পারিয়াছি।

"আর একটা কাজ তোমাকে করিতে হইবে। তুমি যদি আমাকে তোমার হৃদয়ে স্থান দিয়া থাক, তাহা হইলে তুমি আমার সুখে সুখী, আমার কষ্টে দুঃখী।...আমার কি শ্রেয়ঃ তুমিই তাহা আমার হইয়া স্থির করিও। তুমি আমার সমস্ত বিষয় জানিয়া যাহা ভাল স্থির করিও।" লণ্ডন ৬ জুলাই ১৯০১।

এই সময়েই জগদীশচন্দ্র পাশ্চাত্য দেশে রবীন্দ্রনাথের রচনা প্রচারে উদযোগী হয়েছিলেন, যদিও এ চেষ্টা তখন সার্থক হয়নি।—রবীন্দ্রনাথকে জগদীশচন্দ্র লিখছেন—

"তুমি পল্লীগ্রামে লুক্কায়িত থাকিবে আমি তাহা হইতে দিব না। তুমি তোমার কবিতাগুলি কেন এরূপ ভাষায় লিখ যাহাতে অন্য কোন ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব? কিন্তু তোমার গল্পগুলি আমি এদেশে প্রকাশ করিব। লোকে তাহা কতক কতক বুঝিতে পারিবে। আর তুমি দেখিও, তুমি সার্বভৌমিক।" লণ্ডন ২ নভেম্বর ১৯০০।

---

১ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "পত্র-পরিচয়", জগদীশচন্দ্রের পত্রাবলী, প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩

২ "চিত্রা" রায়, রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশচন্দ্র", শারদীয়া দেশ পত্রিকা, ১৩৫৯

এই পত্রের শেষেই লিখছেন—

"তোমার নূতন লেখা অনেকদিন যাবৎ পাঠাও নাই, পাঠাইও। আমি মনে করি, তোমার কবিতা চিরকালের জন্য। তোমার লেখা আমাকে যেরূপ জ্বলন্ত করে, সেরূপ যেন অসংখ্য লোককে করিতে পারে।"

পরবর্তী চিঠিতেও এই গল্প অনুবাদের পরিকল্পনা—

"তোমার পুস্তকের জন্য আমি অনেক মতলব করিয়াছি। তোমাকে যশোমণ্ডিত দেখিতে চাই। তুমি পল্লীগ্রামে আর থাকিতে পারিবে না। তোমার লেখা তরজমা করিয়া এদেশীয় বন্ধুদিগকে শুনাইয়া থাকি, তাঁহারা অশ্রু সম্বরণ করিতে পারে না। তবে কি করিয়া publish করিতে হইবে, এখনও জানি না।......অনেক Castles in the air প্রস্তুত করিতেছি।

"এবার যদি তোমার নাম প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি তাহা হইলেই যথেষ্ট মনে করিব। ৬টি গল্প বাহির করিতে চাই।"
২৩ নভেম্বর ১৯০০

অপর পত্রে—

"তোমার গল্পের পুস্তক ২য় খণ্ড কবে পাইব? প্রথম খণ্ড হইতে ৩টি গল্প তরজমা হইয়াছে। ভাষার সৌন্দর্য ইংরাজীতে রক্ষা করা অসম্ভব। কি করিব বল? তবে গল্পের সৌন্দর্য আছে। এখন নরওয়ে সুইডেন ইটালী দেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প এদেশে আগ্রহের সহিত পঠিত হয়, সে-সবের সঙ্গে তুলনার জন্য তোমার গল্প বাহির করিতে চাই। এদেশে এমন লোক আজকাল অধিকমাত্রায় হইয়াছে, যাহাদের কিপলিংই গুরু, সুতরাং popular হইবে কিনা জানি না। তবে তিন শ্রেণীর বন্ধুগণের মত জোগাইতেছি:—

প্রথম। এক সম্ভ্রান্ত আমেরিকান মহিলা—সাহিত্যে বিশেষ অনুরাগ আছে। "ছুটি" শুনিয়া কাঁদিয়া আকুল।

দ্বিতীয়। Typical John Bull। "ছুটী" শুনিয়া বলিলেন যে, local colour ত কিছু দেখিলাম না—ফটিক যে আমাদের দেশী ছেলে, এরূপ দু-একজনকে

আমি জানি—true to life তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, ভারতবর্ষীয় ছেলেদের স্বভাব অন্যরূপ।

তৃতীয় আমার এই বন্ধুটির সম্বন্ধে দেখা হইলে বলিব: ইঁহার জীবন অতি আশ্চর্য। ইনি একজন বিশেষ সম্ভ্রান্ত-বংশীয় ইয়োরোপীয় বহু ভাষার পণ্ডিত। He has not seen such fine touch in any European literature.

লণ্ডন, ১৬ জানুয়ারি ১৯০১

"কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ"

অনেকেই জানেন, রবীন্দ্রনাথের কোনো কোনো ছোটগল্প, জমিদারিতত্ত্বাবধানরত রবীন্দ্রনাথের অতিথিরূপে নৌকাবাসকালে জগদীশচন্দ্রের নির্বন্ধাতিশয়ে, তাঁর অবসর

বিনোদনের জন্য রচিত।৩ জগদীশচন্দ্রের প্রথম দিক্‌কার চিঠিগুলিতে দেখা যায়, জগদীশচন্দ্র অবিরতই নূতন গল্প কবিতার জন্য রবীন্দ্রনাথকে তাগিদ দিচ্ছেন, রবীন্দ্রনাথও তাঁর কাছে নূতন রচনা পাঠাচ্ছেন। এইরকম একখানি চিঠিতে (দার্জিলিঙ, ২০এ মে, ১৮৯৯) জগদীশচন্দ্র লিখছেন—

"...আপনি যদি আসিতে পারিতেন তবে ভাল হইত। কয়দিনের জন্য আসিতে পারেন কি? তদভাবে আপনার গ্রন্থাবলী পড়িতেছিলাম। আপনার পৌরাণিক কবিতাগুলি সর্বাংশে সুন্দর হইয়াছে। এগুলি কবে সম্পূর্ণ করিবেন? এখন ভারতীর বোঝা গিয়েছে। মহাভারত হইতে আরও অনেকগুলি লিখিবেন।

"একবার কর্ণ সম্বন্ধে লিখিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। ভীষ্মের দেব-চরিত্রে আমরা অভিভূত হই, কিন্তু কর্ণের দোষগুণমিশ্রিত অপরিপূর্ণ জীবনের সহিত আমাদের অনেকটা সহানুভূতি হয়। ঘটনাচক্রে যাঁহার জীবন পূর্ণ হইতে পারে নাই, যাহার জীবনে ক্ষুদ্রতা ও মহৎভাবের সংগ্রাম সর্বদা প্রজ্জ্বলিত ছিল, যে এক এক সময়ে মানুষ হইয়াও দেবতা হইতে পারিত এবং যাহার পরাজয় জয় অপেক্ষাও মহত্তর, তাহার দিকে মন সহজেই আকৃষ্ট হয়।..."

চিঠির শেষ ছত্রটি পড়লে "কর্ণ-কুন্তী সংবাদে" কর্ণের শেষ উক্তি অনেকের মনে পড়বে—

"যে পক্ষের পরাজয়
সে পক্ষ ত্যজিতে মোরে কোরো না আহ্বান।
জয়ী হোক, রাজা হোক পাণ্ডব সন্তান—
আমি রব নিষ্ফলের, হতাশের দলে।
শুধু এই আশীর্বাদ দিয়ে যাও মোরে
জয়লোভে যশোলোভে রাজ্যলোভে, অয়ি,
বীরের সদ্‌গতি হতে ভ্রষ্ট নাহি হই।"

এই কবিতার রচনাকাল ১৫ ফাল্গুন ১৩০৬। ২৬ ফেব্রুয়ারী ১৯০০।

এই প্রসঙ্গে সাহিত্য রচনা ব্যাপারে 'ফরমাস' প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উক্তি স্মরণযোগ্য।

"ফরমাস ব্যাপারটা মোটর গাড়ির স্টার্টার-এর মতো। চালনাটা শুরু করে দেয় কিন্তু তারপরে মোটরটা চলে আপন মোটরিক প্রকৃতির তাপে। প্রথম ধাক্কাটা একেবারেই ভুলে যায়।...ফরমাসের ধাক্কা নিঃসন্দেহেই সম্পূর্ণ ভুলেছে—কল্পনার আন্তরিক তাড়িৎশক্তি আপন চিরন্তনী প্রেরণায় তাদের চালিয়ে নিয়ে গেছে। প্রথম হাতল ঘোরানো হতেও পারে বাইরের থেকে, কিন্তু সচলতা শুরু হবামাত্রই লেখবার আনন্দ সারথি হয়ে বসে।"

কর্ণ-চরিত্র ও জগদীশচন্দ্র

কর্ণ-চরিত্র জগদীশচন্দ্রকে বাল্যাবধি কিভাবে উদ্‌বুদ্ধ করেছে তার বিবরণ এই প্রসঙ্গে অনেকের পক্ষে চিত্তাকর্ষক হতে পারে মনে করে তাও সংকলন করে দেওয়া গেল।

'বাল্যকালে এবং পরবর্তী জীবনে কোন্ কোন্ বই তাঁদের মনে ছাপ রাখিয়া গিয়াছে' বঙ্গশ্রী-সম্পাদক কর্তৃক সে-সম্বন্ধে জানাতে অনুরুদ্ধ হয়ে জগদীশচন্দ্র লিখেছিলেন—

"বাল্যকালে মহাভারত পাঠ করিয়াই জীবনের আদর্শ উপলব্ধি করিয়াছিলাম। যে রীতিনীতি মহাভারতে প্রচারিত হইয়াছিল সেই নীতি যেন বর্তমান-কালেও জীবন্তভাবে প্রচারিত হয়। তদনুসারে যদি কেহ কোন বৃহৎকার্যে জীবন উৎসর্গ করিতে উন্মুখ হন, তিনি যেন ফলাফল-নিরপেক্ষ হইতে পারেন। তাহা হইলে বিশ্বাসনয়নে কোনদিন দেখিতে পাইবেন যে, বারবার পরাজিত হইয়া যে পরাঙ্মুখ হয় নাই, সেই এক-দিন বিজয়ী হইবে।"৪ ৭-৯-৩৩

মহাভারতে কর্ণ-চরিত্রই যে জগদীশ-চন্দ্রের মনকে সর্বাপেক্ষা উদ্বেলিত করেছিল সে কথা তাঁর জীবনীকারের বিশেষভাবেই লিখেছেন।৫

বশীশ্বর সেন ১৯১৬ ফেব্রুয়ারি সংখ্যা মডার্ন রিভিউ পত্রে "Round the World with my Master" প্রবন্ধে Influence in Early Life প্রসঙ্গে লিখেছেন—

"Through the vernacular literature he had early access to the great epics, Ramayana and Mahabharata, and the hero he worshipped was not the one who had achieved great success, but Karna, the Disowned, who, in the last encounter which was to determine for him victory or defeat, life or death, rejected the divine weapon that would have decided the day in his favour. For he would use no strength that was not his own nor would he follow any path that was not straight. This must be the law for all who are Disinterested, to win by strength and righteousness that which has been forfeited by decrees of fate."

অধ্যাপক প্যাট্রিক গেডিস তাঁর **The life and work of Sir Jagadish C. Bose** গ্রন্থে (১৯২০) Childhood and Early Education অধ্যায়ে জগদীশ-চন্দ্রের জীবনে মহাভারতের বিভিন্ন চরিত্রের প্রভাবের কথা উল্লেখ করে লিখেছেন—

Above all, and most characteristically, it was Karna who became the boy's hero; and this from ... years old onwards, up to the formative years of puberty indeed so deeply that it might still ... put on his garden-stage to-day and the part vividly played ...

---

৩ রবীন্দ্রনাথের কোনো কোনো ছোট গল্প জগদীশচন্দ্রের মনকে কিরূপ গভীরভাবে আন্দোলিত করেছিল, তাঁর চিঠিপত্রে সে কথা উল্লিখিত আছে।—"তোমার 'জয়পরাজয়' গল্পটি আমাকে কিরূপ আবিষ্ট করিয়াছে, বলিতে পারি না। রয়্যাল ইনষ্টিট্যুসনের বক্তৃতার দিন যেন তাহারই অভিনয় হইতেছিল। যদি ভক্তের পূজা ভারতী গ্রহণ করিয়া থাকেন, তবে জয়পরাজয় আমার নিকট একই।"......লণ্ডন, ৩০ অগষ্ট, ১৯০১।

বসু-বিজ্ঞান-মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে নিবেদন, এইভাবে আবিষ্ট হয়েই পরিসমাপ্তিতে জগদীশচন্দ্র লিখছেন—"যখন প্রদীপ্ত জীবন নিবেদন করিয়াও তাহার সাধনার সমাপ্তি হইবে না, যখন পরাজিত ও মুমূর্ষু হইয়া সে মৃত্যুর অপেক্ষা করিবে, তখনই আরাধ্যা দেবী তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইবেন। এইরূপ পরাজয়ের মধ্য দিয়াই সে তাহার পুরস্কার লাভ করিবে।"—নবেম্বর, ১৯১৭

৪ বঙ্গশ্রী, আশ্বিন ১৩৪০

৫ 'মহাভারত তাঁহার সর্বাপেক্ষা প্রিয় গ্রন্থ এবং মহাভারতের কর্ণচরিত্র তাঁহার আদর্শ।'—"আচার্য জগদীশ-চন্দ্র", শ্রীসজনীকান্ত দাস; বঙ্গশ্রী, পৌষ ১৩৪০

him, despite grey hairs and [illegible]ale! Indeed it should be so:

অতঃপর লেখক কর্ণ-প্রসঙ্গে জগদীশ-চন্দ্রের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন: for hear him talk:

"Karna! Karna! the greatest of all the heroes! Eldest of the Pandavas, he should have been the king but he was more—the son of a great god. Floated away by his mother, he was found and brought up by the wife of a charioteer, who trained him to be the great warrior he was. From his low caste came rejections, came every disadvantage; but he always played and fought fair!

So his life, though a series of disappointments and defeats to the very end—his slaying by Arjuna—appealed to me as a boy as the greatest of triumphs. I still think of the tournament where Arjuna had been victor, and then of Karna coming as a stranger to challenge him. Questioned of name and birth, he replies, "I am my own ancestor! You do not ask the mighty Ganges from which of its many springs it comes; its own flow justifies itself, so shall my deeds me!" Then later, when before the great battle his mother reveals to him the secret of his birth, and tells him that if he will refrain from this contest with her sons—whom he now for the first time knows to be his younger brothers—she will answer for it that he shall be their chief and reign as emperor; he says: "No! Those who brought me up are my true mother and father, poor though they be; and it is Duryodhana, King of the Kauravas, who has been my chief through life. I cannot change sides now. But this I promise you; on your other sons, my brothers, I will not lay a hand, save only on Arjuna; but him I must fight to the end!" And then their battle! At Arjuna he aims his arrow, and would have slain him; but a defending god shakes the earth under his feet as he lets the arrow fly, and so it misses his enemy by a hair-breadth. Now the arrow was magical, though Karna knew it not; so it flew back into his hand and spoke to him: "I was made to kill Arjuna; with my winged sharpness and your aim we are invincible; aim me once more." But Karna threw it away saying, I will have no advantage; I fight but in my own strength!"

And so he took again another arrow. But this time the unfriendly god suddenly opened an earth-crack which swallowed Karna's chariot-wheel; he leapt down to lift it out, and as he stooped Arjuna cut him down with his great sword; and so he fell, still defiant of his fate!"

জীবনের সাধনা ও জয়-পরাজয়ের কথা আলোচনা করতে গিয়ে জগদীশচন্দ্র তাঁর পিতার কথা বার বার স্মরণ করেছেন—

"যে পরীক্ষার কথা বলিব তাহা শেষ করিতে দুইটি জীবন লাগিয়াছে।....... পরীক্ষার আরম্ভ পিতৃদেব স্বর্গীয় ভগবানচন্দ্র বসুকে লইয়া। তাঁহারই নিকট আমার শিক্ষা ও দীক্ষা।.....দেশহিতকর নানা কার্যে তিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। শিক্ষা, শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে তিনি তাঁহার সকল চেষ্টা ও সর্বস্ব নিয়োজিত করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল। সুখ-সম্পদের কোমলশয্যা হইতে তাঁহাকে দারিদ্র্যের লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল। সকলেই বলিত, তিনি তাঁহার জীবন ব্যর্থ করিয়াছেন। এই ঘটনা হইতে সফলতা কত ক্ষুদ্র এবং কোন কোন বিফলতা কত বৃহৎ, তাহা শিখিতে পারিয়াছিলাম। পরীক্ষার প্রথম অধ্যায় এই সময় লিখিত হইয়াছিল।"

অন্যত্র—

"যদিই বা পরাজিত হইলে, যদিই বা তোমার চেষ্টা বিফল হইল, তাহা হইলেই বা কি? তবে এক বিফল জীবনের কথা শোন। যাঁহার কথা বলিতেছি তিনি অতদিন পূর্বেও দিব্যচক্ষে দেখিয়াছিলেন যে, শিল্প, বাণিজ্য এবং কৃষি উদ্ধার না করিলে দেশের আর কোন উপায় নাই। যাঁহারা প্রথম পথপ্রদর্শক হন তাঁদের যে গতি হয়, তাঁহার তাহাই হইয়াছিল।... জীবনের শেষভাগে দেখিতে পাইলেন যে,

তাঁহার সমস্ত জীবনের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। ব্যর্থ? হয়ত একথা তাঁহার নিজ জীবনে প্রযোজ্য হইতে পারে; কিন্তু সেই ব্যর্থতার ফলে বহু জীবন সফল হইয়াছে। ...তাঁহার জীবন দেখিয়া শিখিয়াছিলাম যে, সার্থকতাই ক্ষুদ্র এবং বিফলতাই বৃহৎ। এইরূপে যখন ফল ও নিষ্ফলতার মধ্যে প্রভেদ ভুলিতে শিখিলাম, তখন হইতেই আমার প্রকৃত শিক্ষা আরম্ভ হইল। যদি আমার জীবনে কোন সফলতা হইয়া থাকে তবে তাহা নিষ্ফলতার স্থির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।"

পিতৃচরিত্রের মধ্যে তরুণ বয়সে জগদীশচন্দ্র কর্ণ চরিত্রেরই ছায়া প্রতিবিম্বিত দেখেছিলেন—

'This too was the hero I loved to identify with my own father—always in struggle for the uplift of the people, yet with so little success, such frequent failures, that to most he seemed a failure. All this too gave me a lower and lower idea of all ordinary worldly success—how small its so-called victories are!—and with this a higher and higher idea of conflict and defeat; and of the true success born of defeat.'

জয়পরাজয়ে এই উপেক্ষাকেই জগদী- চন্দ্র ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ আদর্শরূপে অং- স্বীকার করেছিলেন—

'In such ways I have come [illegible] feel one with the highest spirit [illegible] my race; with every fibre thr[illegible] ing with the emotion of the p[illegible] That is its noblest teaching [illegible] the only real and spiritual a[illegible] vantage and victory is to [illegible] fair, never to take crooked w[illegible] but keep to the straight pa[illegible] whatever be in the way!'

শ্রীপুলিনবিহারী সেন কর্তৃক সংকলিত

রত্নাকর

সংগীতশাস্ত্রে ৬৪ প্রকার ললিতকলার উল্লেখ আছে। কিন্তু কোন ললিতকলাই সংগীতকলার তুল্য ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় না। অর্থাৎ অন্য কোন কলাকেই সংগীতের ন্যায় সর্বজনীনভাবে অভ্যাস করা হয় না। কোন ললিতকলারই গঠন কৌশল এত জটিল, এত সূক্ষ্ম, এত পরিশ্রমসিদ্ধ নয়; কোন কলাই এত আবেগময়, এত ভাবোদ্দীপক, এত উত্তেজনাপূর্ণ, এত মর্মস্পর্শী নয়। অথচ, আশ্চর্য এই যে কোন কলারই বোধগম্যতা এত দুঃসাধ্যও নয়। সাধারণ শ্রোতা সংগীত শোনেন, সংগীতের দ্বারা অভিভূত হন, কিন্তু কেন অভিভূত হন, এ তাঁরা সঠিক বুঝতে পারেন না। মনের মধ্যে এক অভূতপূর্ব উচ্ছ্বাসের লীলা মেলে যায়, সমস্ত দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে, সমস্ত মন এক অপর জগতের অলৌকিক আনন্দ উপভোগ করে, অথচ কেন যে এই উন্মাদনার সৃষ্টি হয়, বোঝা যায় না। কারণ, সংগীতের রচনা-কৌশলের ভিতর কি তথ্য, কি নীতি নিহিত থাকে, এ সংবাদ সাধারণ শ্রোতার নিকট অজ্ঞাত। কেবল সাধারণ শ্রোতার কথা তুললে ভুল হবে, অনেক সময় শিক্ষাপ্রাপ্ত সংগীতকারও ঠিক উপলব্ধি করতে পারেন না, যে সংগীতকলার ভিতর রুচি বা সৌন্দর্য-বিজ্ঞানের নীতিগুলি কি পরিমাণে এ বিষয়ে সাহায্য করে। সংগীতে অনুরাগী ব্যক্তির স্বতঃই কতকগুলি প্রশ্ন এ সম্পর্কে মনের কোণে উদিত হয়। "সংগীত" অর্থে আমরা সাধারণত কি বুঝি? সংগীতের নির্মাণকৌশলের মধ্য দিয়ে যিনি সে সংগীত রচনা করেছেন এবং যিনি টীকাকাররূপে সে সংগীতে ব্যাখ্যা করে লোকসমক্ষে পেশ করেন, তাঁরা আমাদের কি বলতে চা'ন? শ্রোতার নিকট সংগীত কিভাবে আত্মপ্রকাশ করে? কোন্ এক বিশেষ সংগীত অপর এক অপেক্ষা বেশী চিত্তাকর্ষক ও জনপ্রিয় হয়? ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কিছু প্রশ্নই মনের কোণে উঁকি মারে।

সাঙ্গীতিক নীতিবিজ্ঞান, যেটি সম[illegible] নীতিবিজ্ঞানশাস্ত্রের সামান্য একটি [illegible] মাত্র, সেটির সম্বন্ধে এমনও [illegible] বাদানুবাদ, অনেক তর্কজালের সৃষ্টি [illegible] তবে সুখের বিষয় এই যে, গত [illegible] শতাব্দীর নানাপ্রকার তর্কবিতর্কমূ[illegible] আলোচনার পর, সাঙ্গীতিক রুচি [illegible] নীতিবিজ্ঞানকে দার্শনিক তথ্যের অন্[illegible] করে অনেকটা নিশ্চয় করে [illegible] হয়েছে যে এ সম্পর্কে যথোচিত গ[illegible] ও অনুসন্ধান করার প্রয়োজন [illegible] পূর্বে, দার্শনিকেরা অন্যান্য চারুশিল্প[illegible] যেমন কাব্যকলা বা চিত্রকলা বা স্থপ[illegible] বিদ্যা প্রভৃতি—সংগীতকলার সহিত [illegible] পর্যায়ে ফেলবার চেষ্টা করতেন, [illegible] তাঁরা ভাবতেন যে, এ সকল কলা[illegible] ব্যবহারিক জীবনের সহিত অঙ্গাঙ্গী[illegible] জড়িত। এই ধারণার ফলে তাঁদের [illegible] স্বতঃই প্রলুব্ধ হোত এ প্রসঙ্গে ক[illegible] গুলি মূলনীতিকে সূত্রাকারে গ[illegible] করতে, সেগুলি বিশেষভাবে কাব্যকলা [illegible] গঠনমূলক শিল্প (অর্থাৎ স্থপতি[illegible] মৃৎশিল্প, ছাঁচশিল্প প্রভৃতি প্লা[illegible] আর্ট) সম্বন্ধে প্রযোজ্য। ইদানীং [illegible] এই অসম্ভব চিন্তাধারার কিছুটা প[illegible] বর্তমান হয়েছে এবং তারা ভাবতে শিখে[illegible] যে সকল শ্রেণীর চারুশিল্পকে [illegible] প্রকার নীতির খড়্গের দ্বারা বলিদান [illegible] চলতে পারে না। কোন কোন দার্শনিক[illegible] আবার বিপরীত মত পোষণ করে [illegible] কাল বলতে শোনা যাচ্ছে যে, যদি [illegible] নীতিই বাঁধতে হয়, তো সেগুলি[illegible] সংগীতকলার আদর্শেই যেন বাঁধা [illegible]

অন্য কোন কলাই সংগীতকলার ন্যায় এত আত্মনির্ভর, এত আত্মকেন্দ্রিক নয়। তাঁরা বলেন যে, কাব্যকলা তো কতকগুলি শব্দের সমষ্টি, যে সকল শব্দ পরিষ্কার-রূপে কোন অর্থ, কোন ভাবনা প্রকাশ করে; স্থপতিশিল্পের বনিয়াদ ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা সাধনের জন্য; ভাস্করবিদ্যা স্বাভাবিক মূর্তির বা দৃশ্যের প্রতিরূপ প্রদর্শন করে; চিত্রকলাও, কতকটা ভাস্কর-শিল্পের ন্যায়, নানারূপে স্বভাবকে চিত্রিত করে; কিন্তু সংগীতকলার এরূপ কোন রূপ নেই। সংগীতকলা কোন কিছুরই প্রতিচ্ছায়া নয়, বা কোন বাস্তব বস্তু বা বিষয়ের প্রতিনিধিত্বও করে না। সংগীত-কলার রূপ আছে কিন্তু দেহ নেই, যেন অশরীরী আত্মা মানসিক এক সুগভীর অথচ আনন্দরসে উদ্বেলিত অনুভূতির ভিতর দিয়ে প্রকট হচ্ছে। সংগীতকলার সহিত অন্য কোন কলারই তুলনা চলে না।

আজকালকার আর্ট অবশ্য, তা সে কি কাব্যকলা, কি চিত্রকলা, কি স্থাপত্যবিদ্যা, ঠিক প্রকৃতির অনুকরণের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। তা না হোক, তবুও বলতে বাধা নেই যে সংগীতকলার তত্ত্ব অন্যান্য কলার তত্ত্বকে কতকটা প্রভাবান্বিত করেছে, যদিও আমরা এখনও পর্যন্ত সংগীতকলার প্রকৃতির নিজস্ব কি যে বৈশিষ্ট্য, এ বিষয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারিনি। সংগীতকলার দার্শনিক তত্ত্ব নিরূপণ করতে গিয়ে, আমরা কেবল আমাদের ভারতীয় সংগীতকেই আমাদের আদর্শ ধরে নিয়েছি এবং আমাদের সংগীতের পৃথক সত্ত্বাকে অনুভব করতে শিখেছি। গোঁড়ামির বশে আমাদের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে, কেবল আমাদের সংগীতকলাই বিশ্ববরেণ্য, আমাদের সংগীতকলাই সত্যকার আর্টের নিদর্শন, অভিব্যক্তি; কেবল আমাদের সংগীতকলা দ্বারাই ব্রহ্মকে উপলব্ধি হয়, অতএব সে তুলনায় পৃথিবীর অন্যান্য সংগীতকলাই তুচ্ছ, নগণ্য, আমাদের অনুশীলনের অযোগ্য। কিন্তু আমাদের জীবনেই আমরা দেখছি যে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সংগীত পরস্পরের ক্রমশই নিকটবর্তী হচ্ছে, পূর্বেকার সে ভেদাভেদ ক্রমশই অন্তর্হিত হয়ে যাচ্ছে, ভাবের আদানপ্রদানের ফলে আমাদের মনের সে বিজাতীয় বিদ্বেষ দূর হয়ে আমরা ক্রমশই পাশ্চাত্ত্য ও অন্যান্য সংগীতকলাকে তাদের যথাযোগ্য আসনে বসিয়ে তাদের যথোপযুক্ত সম্মান দিতে আরম্ভ করেছি। আমরা হৃদয়ঙ্গম করতে শিখেছি যে ঈশ্বরোপলব্ধি করার জন্য যেমন যত মত তত পথ আছে, তেমন সংগীতকলার অনুশীলন ও উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন পন্থা খোলা পড়ে আছে। কেননা, আমরা যদি বৈজ্ঞানিক উপায়ে এর বিশ্লেষণ করি, তবে দেখি যে সংগীত-কলার দার্শনিক তত্ত্ব নির্ধারণ করতে হলে সাঙ্গীতিক ধ্বনির কিরূপে সৃষ্টি ও বিকাশ হয়, এ সম্বন্ধে জেনে রাখার দরকার, অর্থাৎ আমাদের শ্রুতিবিজ্ঞান বা এ্যাকুস্টিকস্ (acoustics) এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের প্রয়োজন। কিন্তু শ্রুতি-বিজ্ঞান পদার্থবিদ্যার অন্তর্গত, অতএব পদার্থবিদ্যা সম্বন্ধেও কিছু জ্ঞান অর্জন করতে হবে আমাদের। আবার, শ্রবণেন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়ে যখন আমাদের ধ্বনি শ্রবণ হয়, তখন এ বিষয়ে যথা-রীতি জানতে হলে, আমাদের কিছু এ্যানাটমি ও ফিজিওলজিও (anatomy and physiology) পড়া দরকার। পুনশ্চ, সংগীত আমাদের মনের মধ্যে যে অনু-ভূতির সৃষ্টি করে, সেটুকু বুঝতে হলে চাই আমাদের মানসিক মনস্তত্ত্ববিদ্যা কিছু জানা। এমনই ভাবেই আমরা সংগীতকলার বিশ্লেষণ করি নানাভাবে কিন্তু সাহিত্য সৃষ্টি যেমন ব্যাকরণকারের সূত্রের উপর নির্ভর না করে স্বাধীনভাবেই নিজের রাস্তা ঠিক করে নেয়, সংগীত-কলাও তেমন বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে না। তবুও সাহিত্য সৃষ্টির পরে যেমন ব্যাকরণ সৃষ্টি হয়, তেমন সংগীতকলার সৃষ্টির পর তার বাঁধা-ধরা কতকগুলি নিয়মকানুন তৈরী হয় এবং সেই প্রণালীবদ্ধ নিয়মানুসারীই আর্টের রূপ পরিগ্রহ হয়।

রোমান্টিক অপেরার একজন অগ্রগামী স্রষ্টা Mehul তাঁর অপেরা ARIODANT (আরিওদা) বিখ্যাত সংগীতাচার্য Cherubini (কেরুবিনি)র নামে উৎসর্গ করে এ সম্পর্কে যে উক্তিটুকু করেছেন, সেটি পাঠক-পাঠিকার গোচরার্থে নিম্নে উদ্ধৃত করলুমঃ—

"সকল প্রকার কারুকলার মধ্যে সংগীতকলারই সর্বাপেক্ষা বেশী ব্যাপক-ভাবে অনুশীলন হয়, সংগীতকলারই সর্বাপেক্ষা বেশি ব্যাপক অনুশীলন হয়। সংগীতকলারই সমস্ত বিশ্বে বেশী আদর, অথচ কি কারণে এই ললিতকলার এমন অলৌকিক নাটকীয় প্রভাব, এ বিষয়ে খুব কম লোকই খবর রাখেন। সংগীত সম্বন্ধে আলোচনা অনেকে করেন বটে, কিন্তু কেবল মুষ্টিমেয় দুচারজনই এর যথার্থ কারণ অনুসন্ধান করার শক্তি রাখেন। একদল যেমন এর প্রশংসায় পঞ্চমুখ, অন্যদল তেমন একে এর প্রাপ্যটুকুও দিতে নারাজ। যাঁরা এই কলাকে ভালবাসেন, তাঁরা যদি এর প্রেমিক না হয়ে শুধু বন্ধুই হতেন, তাঁরা যদি এর বিচারের পূর্বে এই বিদ্যাটিকে গভীর-ভাবে চর্চা করতেন, তাহলে এঁরা সকলে আমাদের মতেরই পৃষ্ঠপোষকতা করতেন, বিভিন্ন মত পোষণ করে আপসে দলাদলি করতেন না। কিন্তু অহংকার বশতঃই হোক আর আলস্য বশতঃই হোক, মানুষের প্রবৃত্তি শিক্ষালাভের পরিবর্তে বিবাদ বিসংবাদেরই অনুকূলে।" (মূল ফরাসী হতে লেখকের অনুবাদ)

চক্রদত্ত

মিঃ হার্ডি এবারকার কাঞ্চনজঙ্ঘা অভিযানের একজন সদস্য। তিনি এই অভিযান থেকে ফিরে এসে এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, এভারেস্টের পেছন দিকে তিব্বত পর্যন্ত প্রায় শত শত পর্বতশৃঙ্গ ছড়িয়ে আছে। এই সমস্ত চূড়া এখন পর্যন্ত আমাদের কাছে অজানা রয়েছে এবং তিনি আশা করেন যে অদূর ভবিষ্যতে এই সমস্ত স্থানে অভিযান করবার চেষ্টা হবে। তিনি নিজে প্রায় ১৯ এবং ২০ হাজার ফুট উচ্চে একটি নতুন গিরিবর্ত্ম আবিষ্কার করেছেন। এটির তিনি নাম দিয়েছেন 'ইস্ওয়া লা'। মিঃ হার্ডি বলেন যে, তিনি এই ইস্ওয়া লা গিরিবর্ত্ম পার হয়ে অপর পারে গিয়ে অনেক নতুন নতুন শৃঙ্গ দেখতে পান—এর মধ্যে অনেকগুলি ২৪,০০০ ফুটের চেয়েও বেশী উঁচু। উড়োজাহাজ থেকে এগুলো লক্ষ করার পর ভাবা হয়েছিল যে, এই শৃঙ্গগুলিতে কোন দিনই অভিযান চালান সম্ভব হবে না—কারণ এতে যাওয়ার মত কোন পথই নেই। কিন্তু বর্তমানে নতুন গিরিবর্ত্ম আবিষ্কার হবার পর আর অভিযান চালাবার বোধ হয় কোন অসুবিধাই হবে না। তিনি এই সঙ্গে হিমালয়ের নদী 'ইনখুর' উৎসের সন্ধানও খুঁজে বার করতে পেরেছেন। তার মতে এই নদীটি "লোহটসে হিমবাহ' থেকে আরম্ভ হয়েছে—এটি প্রায় ১৯ হাজার ফুট উঁচুতে। অবশ্য ১৯৫৪ সালে নিউজিল্যান্ডের অভিযাত্রীরা ইস্ওয়া লা গিরিবর্ত্মটি দেখেছিলেন, কিন্তু তাঁরা এর মধ্যে ঢুকতে পারেননি অথবা এটি পার হয়ে অপর পারেও যেতে পারেননি।

*

সাধারণ রাস্তাঘাট তৈরি করতে খুব বেশী খরচ অবশ্য পড়ে না—তবে পৃথিবীতে এমন অনেক রাস্তা আছে যা প্রায় সোনা দিয়ে মুড়ে তৈরি করার মত খরচ পড়েছে। ভেনিজুলাতে সম্প্রতি এই রকম একটা রাস্তা তৈরি করা হয়েছে। এর খরচের হিসাব করে দেখা গেছে যে এই রাস্তাটা তৈরি করতে ৬,০০০,০০০ ডলার মাইল পিছু খরচ হয়েছে। যদিও সমস্ত রাস্তাটা মাত্র ১০ মাইল লম্বা। রাস্তাটি ভেনিজুলার একটি বন্দর থেকে পাহাড়ের ওপর অবস্থিত একটি বিখ্যাত বিমানবন্দরের সঙ্গে যোগ করেছে। অবশ্য এর আগে এই দুটি স্থানের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবার জন্য একটি রাস্তা ছিল সেটা প্রায় ৪২ মাইল লম্বা এবং পাহাড়ের অনেক উঁচু নিচু চড়াই উৎরাই পার হয়ে ঘুরে ঘুরে গিয়েছিল। প্রায় ছ বছরের চেষ্টায় এই নতুন রাস্তাটি তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। এর জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে পাহাড় কেটে চেঁচে নিয়ে তবে রাস্তাটি তৈরি করা হয়েছে। এতে প্রায় ২০০০ লোক ২০০টি 'বুলডজার', 'ট্রাকস্' 'ট্রাক্টার' ইত্যাদির দরকার হয়েছিল। আগে এই রাস্তা দিয়ে এক শহর থেকে আর এক শহরে যেতে প্রায় ১ ঘণ্টা সময় লাগত—আর এখন সেখানে প্রায় ১৫ থেকে ২০ মিনিটে যাওয়া যাচ্ছে! রাস্তা যাতে সোজা এবং খুব বেশী চড়াই উৎরাই না হয় তার জন্য এই ১০ মাইল রাস্তায় দুটি টানেল, প্রায় ১ মাইল করে লম্বা, বড় বড় তিনটে ব্রিজ এবং মাত্র ৩৬টি বাঁক করা হয়েছে।
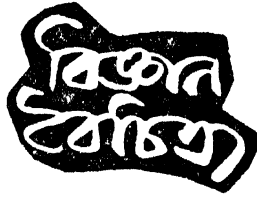
*

ভোর বেলায় ঘুম থেকে উঠে যদি আমরা দেখি যে সকালের কাগজে ১১ দিন আগেকার একটা তারিখ বসান আছে—তাহলে আমরা কোনক্রমেই সেটা বিশ্বাস করব না। কিন্তু এরকম একটা ঘটনা ২০০ বছর আগে, ১৭৫২ সালে ইংলণ্ডে ঘটেছিল। ব্রিটেনের সব লোকেরা ২রা সেপ্টেম্বর ১৭৫২ সালে রাত্রে ঘুমবার পর পরদিন ঘুম ভাঙার সঙ্গে দেখল যে সেটা ৩রা সেপ্টেম্বর নয়, সেটা ১৪ই সেপ্টেম্বর। এই ১১ দিনের জুলিয়াস সিজার একটা পঞ্জিকা করেন, যেটার নাম জুলিয়ান পঞ্জিক[illegible] কিন্তু এই পঞ্জিকা ঠিক না থাকা[illegible] অনেক গোলমাল দেখা দিল। তখন [illegible] গ্রেগরী একটা পঞ্জিকা ইয়োরোপে[illegible] সমূহের জন্য তৈরী করেন—এর 'গ্রেগরিয়ান ক্যালেণ্ডার'। কিন্তু ই[illegible] এই পঞ্জিকা গ্রহণ করল [illegible] ফলে বহু গোলযোগ দেখা [illegible] বিশেষত ব্যবসাবাণিজ্যের ক্ষেত্রে—[illegible] যখন ইংলণ্ডের ১লা জানুয়ারী [illegible] ইয়োরোপের অন্য দেশগুলির [illegible] বছর চলছে। এই সব অসুবিধা [illegible] করবার জন্য ১৭৫২ সালে ই[illegible] গ্রেগরিয়ান পঞ্জিকা গ্রহণ করতে [illegible] হোল। অবশ্য এতে প্রথম দিকে ই[illegible] লোকেরাও খুব ক্ষেপে উঠেছিল—[illegible] অনেকের অনেক রকম ক্ষতি [illegible] করতে হয়েছিল। যেমন অনেকের [illegible] কমে গেল, অনেকের জন্ম তারিখের [illegible] হদিস রইল না, অনেকের সুদ এবং [illegible] দেনের কারবারে অনেক লোকসান [illegible] কিন্তু শেষকালে গোলমাল মিটে [illegible] এবং ১১ দিন হারিয়ে ইংলণ্ড [illegible] পঞ্জিকা মেনে নিল।

*

টেলিফোন ব্যবহার করতে গেলে [illegible] ইলেকট্রিক দরকার আর না হয় সাধা[illegible] ব্যাটারীর দরকার হবে। কিন্তু [illegible] টেলিফোন কোম্পানী সূর্যের তাপ [illegible] শক্তি সংগ্রহ করে টেলিফোন চাল[illegible] ব্যবস্থা করেছেন। তাঁরা একটা সিলি[illegible] চাকতি এলুমিনিয়ামের ফ্রেমে ল[illegible] সূর্য থেকে শক্তি সংগ্রহ করে ব্যা[illegible] জাত করেছেন। রাত্রিবেলা এবং [illegible] দিনে সঞ্চিত ব্যাটারী থেকে টেলি[illegible] চলবে—আর সাধারণ অবস্থায় সূ[illegible] আলোর তাপ সোজাসুজি টেলিফো[illegible] চলতে সাহায্য করবে। বেল কোম্প[illegible] আশা করছেন যে, এই সূর্য-তাপ [illegible] চালিত টেলিফোন গ্রামের খুব উপ[illegible] করবে।

॥ ২ ॥

এক রাত্রির সঙ্গীত বৈঠকের কথা মনে পড়ে; সর্বপ্রথম বৈঠক আর সর্বপ্রথম অভিজ্ঞতা। আগ্রাওয়ালী মালকা, গহর, চুলবুল্লেওয়ালী মালকা এবং জংগী, বশীর ও মৌজুদ্দীন সকলে উপস্থিত। ন্যাটা আব্দুল, আর মাথায় টিকধরা আব্দুল, দুজন তবলাবিশারদ উপস্থিত। খলিফা বদল খাঁ সাহেব, দুলীচাঁদজী আর শ্যামলালজী এবং আর আর বৈঠকধারীরা জমে বসেছেন, কারণ আজ ভাইয়াসাহেবের মাইফেল অর্থাৎ ভাইয়াসাহেব হারমোনিয়ম হাতে নেবেন। হারমোনিয়ম আর বাঁয়া-তবলার ছড়াছড়ি, কারণ শ্যামলালজীর দরুণ দুটি ত আছেই, তার ওপর জংগী আর বশীরের হাতের বাজনাও এসেছে। গান হবে না? নিশ্চয়ই হবে শ্যামলালজী বললেন; গহরা-মালকারা আর মৌজুদ্দীন থাকতে যদি গান না হয়, তবে গান আর কবে হবে!

ভাইয়াসাহেব নিজেই শ্যামলালজীর হারমোনিয়ম একটি টেনে নিলেন। এমন সময় একজন পরিষ্কার চেহারার মুসলমান ভদ্রলোক এসে উপস্থিত; ভাইয়া সাহেবকে আদাব জানাতে জানাতে। তিনি অন্য অনেকেরই পরিচিত; আমরা কিন্তু প্রথম দেখলাম। ভাইয়া সাহেব স্বয়ং খাতির করলেন তাঁকে। বললেন, "আইয়ে জনাব মির্জাসাহেব, আব্ ইস্ বাজু তসরিফ্ রাখিয়ে"। শ্যামলালজীকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম, ইনি মেটেবুরুজের নবাব বংশের সন্তান; সম্ভ্রান্ত, সঙ্গীতরসিক লোক আর খুব বড় আর্টিস্ট, হারমোনিয়মের। ইনিও ভাইয়া সাহেবের শিষ্য।

ভাইয়াসাহেবের অনুরোধে ইনি বসতে না বসতেই শ্যামলালজীর অন্য হারমোনিয়মটি টেনে নিলেন। ভাইয়া সাহেবের ইশারায় যখন জংগী আর বশীরও তাঁদের হারমোনিয়ম বাগিয়ে ধরলেন তখন বুঝলাম আজ হারমোনিয়মেরই মাইফেল; নবী বলল, আজ মাথায় ওপর চুনবালি খসে না পড়লে বাঁচি!

বেচারা হারমোনিয়ম! এরা তখনই কিছু নবীর কথার জবাব দেয়নি। এরা কথা বলতে পারে না; কিন্তু ওস্তাদের হাতে পড়লে সুরের মধ্যে দিয়ে কথার নিবেদন করত। আমার স্মরণে এদের নিবেদনটা বলি, কারণ এদেরও দাবী আছে। শ্যামলালজীর হারমোনিয়ম-যমক বলছে—আমাদের প্রত্যেকের বনাই খরচ সাড়ে সাতশ করে টাকা। আপনারা একটু মন দিয়ে শুনুন, বাঁশীর আওয়াজ শুনবেন, কখনও বা সারেঙ্গী আর ফ্লুটের একাকার ধ্বনিও শুনবেন; রাগ শুনবেন, গানও শুনবেন। কিন্তু কে বাজাবে! নেহাইৎ শৌখীন সুরবিলাসী লোক ছাড়া আমাদের দেহ যেন আর কেউ স্পর্শ না করে, এই আমাদের প্রার্থনা। ভাইয়াজী, বাবুজী, বশীর সোহন প্রভৃতি গুণীদের হাতে আমাদের ছেড়-ছাড় শোনার পর আপনার কানে সেতারের আওয়াজ মনে হবে যেন টিনের কেটলির ওপর চড়্‌বড়ি বাজছে। আর পৃথক্ করে সারেঙ্গী শুনলে মনে হবে শাঁখচুন্নির অনুনয়-বিনয়। অনধিকারী সমালোচকেরা যখন গুণীদের প্রতিভা ভুলে গিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে একতরফা ডিগ্রী দেয়, তখন আমরা বলি—

অরাঁধুনির হাতে পড়ে রুইমাছ কাঁদে!
না জানি রাঁধুনি আমায় কেমন করে রাঁধে!

হারমোনিয়ম যমকের নিবেদন আমার প্রাণে লেগেছে। এদের কথা সত্য। তবে নবীর কথা, অর্থাৎ বালিখসার আতঙ্কটাও খুব মিথ্যে নয়। কিন্তু বাজনায় কিনা গানে। 'অধিকন্তু' আমি বলি, ভাল সুরেলা যন্ত্রের কান্নাও শুনেছি। সেতার বেহালা সরোদ সারেঙ্গী এমন কি বীণ্ সুরশৃংগারের সুরেলা কিন্তু মর্মান্তিক আর্তনাদও শুনেছি। কান্না অর্থাৎ অত্যাচার উৎপীড়নের দরুণ কান্না শুনে কার না দুঃখ হয়। হারমোনিয়ম বেচারী একাই এ দুঃখের দুঃখী নয়।

দুঃখের কথা থাক্। ভাইয়া সাহেব মনে হ'ল অনুরোধের সুরেই আগ্রাওয়ালী মালকাকে বললেন, "চুন্ গয়ি জিয়া বিচ প্যারি ছব তিহারী" গানটি গাইতে। গুরুর গুরু অনুরোধ করছেন, মালকা বিস্ময়ে আনন্দে সম্মত হ'লেন। আমরা ভাবলাম মৌজুদ্দিন গহরও ত' রয়েছেন; খাস করে মালকাজানকেই বা তিনি ঐ

পদটি গাইতে বললেন কেন। স্কেল চেঞ্জ হারমোনিয়মে সতক্ষণ চাবি সরিয়ে নড়িয়ে সুর ঠিক করা হচ্ছে আর তবলা ঠোকা হচ্ছে, ততক্ষণ আমরা তম্নলালজীকে প্রশ্ন করলাম। তম্নলালজীর কথাটা মোটের ওপর এই যে—সকলেই ভাল গায় সুরে গায় সেটা এমন কিছু সূক্ষ্ম সমঝদারির নয়, আশ্চর্য ব্যাপারও নয়। আর ঐ গানটি সকলেরই রপ্ত আছে কারণ, গান রচনা করেছিলেন পাটনার হায়দরবাইজী আর ইনি ছিলেন ভাইয়া সাহেবের গুরুবহিন; ঠুমরী গানে অবশ্য। কিন্তু সকলেই সব গানের অরমাঁ অর্থাৎ মর্মের আকাঙ্ক্ষা ভাল ফুটিয়ে তুলতে পারে না। সকলের গানের মেজাজ একরকমের নয়। এই গানটি ধীরা নায়িকার অরমাঁ দিয়ে গড়া। একমাত্র আগ্রাওয়ালীর মেজাজই এর যোগ্য। অন্যদের মেজাজে এমন কিছু কড়াপন (তীক্ষ্ণতা) বা প্রগল্‌ভতা আছে যেটা 'ধীরা'র মেজাজসহি নয়। অন্যেরা এই গান গাইলে তাদের অজানতেই তাদের মেজাজটা বার হয়ে পড়ে, গানের মেজাজটা চাপা পড়ে যায়। গান গাওয়া আর গানের ছক্ উগলে দেওয়া এক কথা নয়; রাগ জাহির করা ত' বিলকুল অন্য কথা। গান ওঠে কলিজা থেকে; ছক্ ওঠে মাথা থেকে জাহির হয় কণ্ঠে। গানের পক্ষে অর্থাৎ সাচ্চা গানের পক্ষে কলিজাটাই হ'ল আসল যন্ত্র। বাকি সব ত' কসরত, আর নকলনবিশি। খাস্ করে ঠুমরী গানের সম্বন্ধে একথা বুঝতে পারবেন, ক্রমশ।

এই গানটি নিয়ে কথা অনেকদূর গড়িয়েছিল। পরেই হবে।

গহর-মালকাদের সঙ্গে ভাইয়া সাহেবের সম্বন্ধ ছিল,—রসিক কল্পতরু ঠাকুরদাদা আর প্যারী নাতনিদের সম্বন্ধ। কণ্ঠের কোন সুর, কথার কোন ছন্দ দিয়ে অনুরোধ করলে বিনয় হার মেনে যায়, হৃদয়ের কপাট খুলে যায়, এ সকল রহস্য ভাইয়া সাহেব ভাল করেই জানতেন। অবশ্য তম্নলালজী, হাকিমজী আর বলদেওদাসজীও এ বিদ্যাটা আয়ত্ত করেছিলেন এবং যোগে যাগে প্রয়োগও করতেন। ফলে,—যাঁরা কখনও সারেঙ্গী বা ভাল হারমোনিয়ম-তবলার সঙ্গত্ ছাড়া গানই করতেন না, সেই গহর-মালকারা বৈঠকে বিনা সঙ্গতে হাসি-মুখেই গান করতেন, দেখেছি। কিন্তু শ্যামলালজী বদল খাঁ সাহেব এসব কৌশল জানতেন না।

দেখলাম ভাইয়া সাহেব মালকার সঙ্গে মৃদুস্বরে কথা বলছেন আর মালকার মুখে চোখে কখনও বা কৌতুক, কখনও বা স্মিত হাসির ঈষৎ রক্তিম চঞ্চলতা ফুটে উঠছে। ভাইয়া সাহেব কি বললেন আর মালকা কি শুনলেন, কি বুঝলেন, তা আমরা জানব কি করে! আমরা প্রতীক্ষা করে আছি মালকা কখন আরম্ভ করবেন, ভাইয়া সাহেব কিরকমই বা সঙ্গত্ করবেন। সত্তরের ওপর বয়স তখন ভাইয়া সাহেবের, শীত ও বসন্তের মধ্যে আশ্চর্য খেলা হবে বুঝি।

মালকা গান আরম্ভ করলেন। তবলায় সঙ্গত্ করলেন ন্যাটা আবদুল, প্রসিদ্ধ সঙ্গতি তখনকার। ভাইয়া সাহেব, মির্জা সাহেব, বশীর আর জঙ্গী হারমোনিয়মে খুব মোলায়েম করে সুর ছাড়তে আরম্ভ করলেন।

গানের আরম্ভই ছিল মুদারার পঞ্চম স্বরে, আর সেইখানেই হ'ল সম্। গান বয়ে চলল তিলককামোদের নক্‌শায় অপূর্ব একটি ভাঁজে যা আজকাল আর শুনতে পাওয়া যায় না। পদের সুর নেমে আসতে আসতে মাঝপথে একবার খাদের পঞ্চমে এসে মৃদু দীর্ঘনিঃশ্বাসের মতো একটা বিরতি ফুটে ওঠে মালকার কণ্ঠে, 'প্যারে' শব্দকে কেন্দ্র করে'। অপূর্ব! পঞ্চম ত' উল্লাসের স্বর, সেই পঞ্চম দিয়েও হৃদয়ের আক্ষেপকে ব্যক্ত করা যায়! তাহ'লে সকলই সম্ভব! খাদের পঞ্চম আর 'প্যারে' বলে সম্বোধন শব্দ, এদের মিলিয়ে মিশিয়ে সুরের কারুকার্য করে আক্ষেপের কতরকম নূতন ভাব দেখান যায় বিচিত্র প্রভাব সৃষ্টি করা যায়—মালকা নিশ্চয়ই জানতেন, কারণ ঘুরে ফিরে ঐ সকরুণ ভাবজাল রচনা করতে থাকেন, একের পরে এক। আমি স্তব্ধ হয়ে শুনছি।

ভাইয়া সাহেব, মির্জাসাহেব, বশীর, জঙ্গী সকলেই অতি মৃদু সুর দিয়ে মালকাকে অনুসরণই করছেন মাত্র; নূতন পথ কেটে কেউই ঝাঁপিয়ে পড়েন না। মালকাকে অতিক্রম করে সাহসই করেন না বোধ হয়। মাঝে মাঝে তারিফ করে উঠছে। ভাইয়া সাহেবেরাও তারিফ করে যাকে বলে খাস্ জায়গায়। হারমোনিয়মের সুরের মধ্যে সাহেবের সুরের বিশেষত্বও পাই। ভরে গানই শুনেছি; আর মালকা নেমে এলেই উৎকর্ণ হচ্ছি।

বিচিত্র রকমের মীড়ের কৌশল মালকা বোল বিস্তার করে প্রতিবারেই নূতন, অথচ—সুরের রয়েছে সেই খাদের পঞ্চমে, আর সুরের চটুলতা দেখা দেয় না পর্যন্ত। গানটি চমৎকার জমে

সহসা কানে এল যেন সুরের চারটি স্ফুলিঙ্গ ছিট্‌কে পড়েছে। খেলা একেবারে; খাদের কড়ি মধ্যম কোমল নিখাদের অপূর্ব সঙ্গত্ হারী লীলা! মালকা গানে হয়েছেন। দেখি ইন্দ্রজাল রচনা মির্জাসাহেব। অন্যেরা একেবারে যেন। সুরের ভঙ্গিমার মধ্যে এই আবেগ চঞ্চলতা এসে দেখা দিল, মালকা যে বিরহকরুণ ভাবের জাল করে এগিয়ে আসছিলেন মুদারা রেখভ পর্যন্ত সেই জাল ছিঁড়ে মির্জাসাহেবের বাঁ হাতের সুরের মধু জমে আছে। অনুভব করলাম। ভাইয়া সাহেব তারিফ না করে' পারলেন না।

গানটি ফিরে গেল মালকার তিনি একটু উত্তেজিত হয়েছেন বুঝতে পারল। হয়ত' মির্জাসাহেবের সুরভঙ্গিমার ইঙ্গিত গ্রহণ করলেন অথবা পদের মধ্যেই যে রয়েছে দীর্ঘ নয়নমণির ছটার কথা, ভাব আর যাই হ'ক,—পরিবর্তন একটা যেন পড়ছে। বশীর ও জঙ্গীর হাত গেল; তান আর মুরকীর চমৎকারি উছলে উঠতে থাকে তাঁদের বাজনা কিছুক্ষণের জন্য গানটা চলে মালকার কণ্ঠ থেকে বশীর ও জঙ্গীর হাতে। মালকা যেন এ'দের শুনবেন এরকম ভাব করলেন। ভাইয়া সাহেবের বাঁ হাতের আঙ্গুল এইমাত্র; কিন্তু সেটা চিত্রের পটভূমি

...সামান্য নির্বিশেষ তুলির পোঁচ ...র মতো ফিকে, হাল্কা।

জঙ্গী-বশীরের সুরের খেলার পরেই গানটা চলে গেল মালকার মুখে। মালকা সুস্থির হয়ে গানের মেজাজটি ধরে নিলে, বোল চলে মীড়ের আর মোচনের ...র মুখে। আক্ষেপের ভাবটা আমরা নূতন মূর্তিতে আবিষ্কার করছি, আস্বাদও করছি চোখ বুঁজে।

সহসা মালকার বোল রচনা স্তব্ধ হয়ে যায়; মির্জাসাহেব, জঙ্গী-বশীর যেন নিষ্কর্মা হয়ে থাকেন। কানে এল সুরে একটি সূক্ষ্ম আর্তনাদ। কিন্তু সে কি হারমোনিয়ামের সুর? তুলো দিয়ে যদি ফুল তৈয়ারী করা যায় আর হারমোনিয়মের চাবিগুলি সেই ফুল দিয়ে স্পর্শমাত্র করে সুরে গতায়াত করা যায়—ভাইয়া সাহেবের আঙ্গুলে সেই কুসুমকোমল স্পর্শ আর সঞ্চারের কলা-কৌশল দেখলাম। কিন্তু কলা-কৌশলের বোধটাও চলে গেল আমার মন থেকে।

তিনি মালকার বোলের অভিসন্ধি ধরে নিয়েছেন। কোনও কিছু তান চমৎকারী না করে, মাত্র সুত্ আর মীড়ের উলট্-পালট্ এলায়িত ভঙ্গি রচনা করতে করতে পূর্বরাগ আর বিরহের ভাবচিত্রগুলি এমনভাবে ফুটিয়ে তুলতে লাগলেন, যার অনুরূপ আমি জীবনে আর কখনো ত' শুনিনি। মীর্জাসাহেব-বশীরের কথা ভুলে গিয়েছি। অভিভূত হয়ে গিয়েছি করুণ ভাবের চরম নিদারুণ আকুল অভিব্যক্তি অনুভব করতে করতে। নায়িকা কি বেদনায় লুটিয়ে পড়েছেন! হাঁ, তাই। আমাদের মনই লুটিয়ে পড়ছে।

যখন তিনি গানের মুখে ফিরে এলেন আর বোলের পর্যায় শেষ করলেন, তখন আমার মনে মাত্র একটি ছবির রেশ থেকে গেল; অবর্ণনীয়। আবার গান আরম্ভ হয়েছে, বশীরদের বাজনাও চলছে কিন্তু আমার মন থেকে ভাইয়া সাহেবের আঁকা সেই ছবিটি মিলিয়ে যেতে চায় না। আমি অভিভূত অন্য-মনস্ক হয়ে পড়েছি। সহসা মনে পড়ে গেল এক ছত্র—

বসুধালিঙ্গধূসরস্তনী
বিললাপ বিকীর্ণমূর্ধজা!!

এই তো! এই ত' মালকার বোলের অভিসন্ধি! এই তো ভাইয়া সাহেবের ফুটিয়ে তোলা ছবি! এই ভাবগুলিই ত' আমার অন্তরের মধ্যে ঘনীভূত মাধুর্যের রূপে তোলপাড় করে। এই মধুর রূপ-গুলি আস্বাদ করতে করতে আনমনা হয়ে পড়েছি।

কিন্তু আপন মনের মাধুরীতেও যে স্থির থাকতে পারলাম না। কানে এসে পড়ে হারমোনিয়মের তানের উদ্দাম তরঙ্গ। মির্জাসাহেব, বশীর বা জঙ্গী কার হাত দিয়ে কখন এরা উছলে উঠে ভ্রূক্ষেপ করিনি; মনে ভাল লাগেনি! এরা আমার মনের ছবি ভেঙ্গে চুরে নূতন ছবি গড়ে দিতে চায়। আমি অসহায় শ্রোতামাত্র।

চরমে উঠেছে এই নূতন উত্তেজনা যখন দেখলাম যন্ত্রের মতো মালকা একই কলি বার বার গেয়ে চলেছেন, আর নাটা আব্দুল তবলাবায়াতে "ধাঁতিনাড়া - তাঁতিধাড়া" বোলগুলি তুলে লয়ের তুলো-ধোনা করছেন। মালকাও গান ছেড়ে দিলেন। তখন বশীর জঙ্গী আর আব্দুল তিনজন মিলে তুবড়ীবাজীর কোঠায় নিয়ে গেলেন সুর ও ছন্দকে। মির্জাসাহেব চুপ করে বসে; নেহাইত্ ভাল মানুষটি যেন। কিন্তু ভাইয়া সাহেব একেবারে নিষ্কম্প প্রদীপের মতো স্থির।

জঙ্গী বশীরের হাতে সুরের চার্খ-চৌদুন তানের কারিগরী আর চাতুর্য মেনে নিতেই হল। গানের বোল ত' জমে আর ভেঙ্গে পাথরের টুকরা হয়ে গিয়েছে। গানটা হয়েছে যেন পাথর-বিছানো রাস্তা। আব্দুলের হাতের বোল যেন টাট্টু ঘোড়ার মতো ছুটে চলেছে সেই পাথরের ওপর দিয়ে; ছোট ছোট আচমকা মুখড়াগুলি আগুনের ফুলকির মতো ঠিকরে ওঠে আর মিলিয়ে যায়। পাশেই ওস্তাদজী বসে; চোখ বুজে নেই মুখে। ভাবলাম, লোকটি দার্শনিক প্রকৃতির; পরিপূর্ণ উল্লাস

অনুভব করেও গম্ভীর মুখ করে আছেন। কিছু জিজ্ঞাসা করব ভেবেছিলাম, কিন্তু করা হ'ল না।

জঙ্গী-বশীর সুরের খেলা শেষ করে এসেছেন, আব্দুল একটি লম্বা তেহাইয়ের বোল জাল ফেলার মত ফেলে সুন্দর করে গুটিয়ে নিয়ে সমে এসে দাঁড়িয়েছেন কি অশনিনিনাদের মতো সুরের গর্জন শুনলাম! ভাইয়া সাহেব একটি তান তুললেন, হারমোনিয়মের 'বেলোতে' কঠিন চাপ দিয়ে! মাইকেল-ভর লোক চমকে উঠেছে। রাগ ত' তিলককামোদই আছে। কিন্তু তানটি যত বা অভিনব, ততো বা উদ্‌ভ্রান্ত, সৃষ্টিছাড়া রকমের ত্বরিত চমৎকার! ঢিমা তেতালায় সঙ্গত্ চলছিল। তানটি দেখা দিল গুচ্ছে গুচ্ছে ভাগ করা, দু' আওর্দ লম্বা; প্রতিটি সুরের গুচ্ছ সৌন্দর্যের মুক্তাবলী যেন। চৌদুনি তানের এত তেজ, এত শোভা আর ত' অনুভব করিনি কখনও! আগে যে আঙ্গুল কুসুমকোমল স্পর্শে সুরের মায়া রচনা করছিল, সেই আঙ্গুলেই রয়েছে এত উদ্দীপনা আর সবলতা! জঙ্গী-বশীরের কারিগরী আর সাফাইয়ত্ কোথায় ভেসে গেল, কি ডুবেই গেল! আব্দুল খুব সাবধান হয়ে, চম্‌কে গিয়ে মাত্র ঠেকার বোল ছাড়তে থাকে, টিক্ টিক্ করে।

এরকম তানের পর আর কিছু হ'তে পারে কিনা সন্দেহ। তবে গাইয়ে বাজিয়েরা স্বভাবেই নাছোড়বান্দা। আর বৈঠকও ঘরোয়া, শিষ্যশাবকেরাই মিলে এক জোট হয়ে আনন্দ করছে। সুতরাং গান বাজনা আরও চল্‌ত। বিশেষ এই যে—মূল গাইয়ে মালকার মুখে অন্তরা তখনও বাকী আছে, বোল-বিস্তারও বাকী আছে, চরম বা আখেরী তান ত' ভবিতব্যই হয়ে রয়েছে।

কিন্তু সমস্ত আগের মাটি হ'ল—জঙ্গীর মুখের একটি কথায়। জঙ্গী ছিলেন ভাইয়া সাহেবেরই শিষ্য; খুব প্রিয় শিষ্য, শ্যামলালজীর পরেই। অত্যন্ত আবেগভরে জঙ্গী বলে' উঠল—"হায় ওস্তাদ! হায় হায়! সারে দিল কো খসোট্ লেকর আপনে তান তোড়ি! হায় হায়!"—অর্থাৎ আমাদের হৃদয়ের সমস্ত প্রত্যাশা মুচড়ে ছিড়ে নিয়ে আপনি তানটি জাহির করলেন। জঙ্গীর কথাটি আজ আওড়াতে গিয়ে সন্দেহ হ'তে পারে, জঙ্গী বোধ হয় সেদিন কবিত্ব করে ফেলেছিল। কিন্তু তা নয়। স্মৃতির অতলে ঐ কথাটি উজ্জ্বল, নিষ্ঠুর সত্যরূপেই জমে আছে।

কথা ত' মাত্র এই! কিন্তু কিসের থেকে কি হয়ে গেল। জঙ্গীর কথা শুনেই ভাইয়া সাহেব গম্ভীর হয়ে গেলেন। কী যে ভাবান্তর হ'ল বুঝলাম না। মুহূর্তের মধ্যেই অত্যন্ত চটে গিয়ে আর বিরক্ত হয়ে হারমোনিয়মটা সামনে থেকে ঠেলে ফেলে দিলেন। হারমোনিয়মের নীচে চারটে ছোট ছোট চাকা ছিল, তাই রক্ষা। তারপর আরম্ভ হ'ল জঙ্গীর ওপর কটূক্তি; বড়ো বড়ো আর বিচিত্ররকমের হিন্দুস্থানী লব্‌জ দিয়ে। মোদ্দা কথাটা সংক্ষেপে আর মোলায়েম করে দাঁড়ায় যথা—"জঙ্গী একটা আস্ত গাধা আর বেহুদা আর বেতমিজ্। তিনি ত' এ ধরনের পছাঁওবাজী তান-তরকীব কতদিন থেকে বাত্‌লে আসছেন! আর মাত্র আজ এই মুহূর্তে জঙ্গীর কলেজায় টান আর মোচড় লাগল! এরকম তান ত' ... চামচ-ঢালা মতো করে তানের ... দিয়েছেন। পয়লা নম্বরের ... জঙ্গীটা! এতদিনের তালিম ... সোহবৎ-সঙ্গত্ ত' তাহ'লে ... গিয়েছে! নাঃ! কুল্ মেজাজটা ... বরবাদ্ করে দিল জঙ্গী! থাক্ ... এখানে আর গান বাজনা করব ... সকালে কোন্ সে মন্‌হুস্‌টাকে ... ছিলাম, শ্যামলাল, বলতে পারো?" ... শ্যামলালজী আর দুলীচাঁদজীর ... তাকিয়ে রায় দিলেন, চলো ভাই ... গাড়ি আনাও, দুলীচাঁদের বৈঠকে ... গপ্-সপ্ করা যাক্। আজকের মতো ...

ব্যাপার দেখে শুনে বৈঠকের লোকেরা নির্বাক হয়ে গিয়েছে। ননী আর আমি ত' হতভম্ব। ননীকে ফিস্ ফিস্ করে বললাম—ভাই শেষমেশ আমরা দু'জনে মন্‌হুস্ হয়ে গেলাম নাকি! ননী কিন্তু সাহস করে বলল—হতেই পারে ... আজ সকালে আমরা ত' ভাইয়া সাহেবের সামনে আসিনি। অপরার ফলটা ফলা চাই; দিন-রাত্রি পেরিয়ে ... হবে না। ইত্যাদি।

আবার ভাইয়া সাহেবের কথা কানে গেল; দেখি সুরটা খুব মোলায়েম। বদল খাঁ সাহেবকে ভাইয়া সাহেব খলিফা বদল খাঁ সাহেব বলে সম্বোধন করে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করছেন, আসরটি সমূলে দুলীচাঁদের বাড়িতে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ায় বদল খাঁ সাহেব রাজী আছেন কি?

ভাইয়া সাহেব পশ্চিমা রাজবংশের ঔরসজাত সন্তান; যেমন গুণী, তেমনি ধনী, দানশীল, প্রতিষ্ঠাবান পুরুষ। তিনি অনুমতি চাইছেন বদল খাঁ সাহেবের মুখে! বদল খাঁ সাহেবেরই জয় দিতে হয়, তাহ'লে! বদল খাঁ সাহেব ভাইয়া সাহেব থেকেও বার কি তের বৎসরের বড়। গণপতরাও সাহেব কি মাত্র বয়সের সম্মান করলেন?

আমাদের পিছন দিকে দেয়াল ঘেঁষে লাঠি পাশে নিয়ে বসে বদল খাঁ সাহেব। সকলের নজর তাঁর দিকে চলে গেল। আমরাও ঘুরে বসলাম। শোনা যাক খাঁ সাহেব কি বলেন।
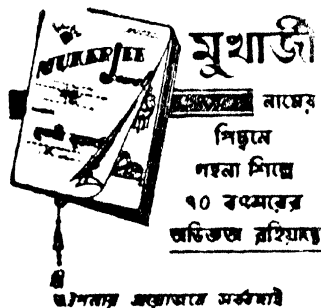
(ক্রমশঃ)

লাফা-যাত্রা

মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়

॥ ৫ ॥

রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে আছি। গাড়ি এদিকে বিরল। দু'এক খানা যা গেল তা হয় যাত্রীতে ভর্তি, আর নয় হাত দেখালেও থামলো না। হঠাৎ দেখি একটা কাঠ বোঝাই লরি আসছে। [illegible] পিঠে আমাদের দুজনকে রাস্তার ধারে উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে লরির গতি কমে এল। আমরাও সুযোগ বুঝে হাত তুললুম। লরিটা থামতে দেখি তাতে অমায়িক দুটি ছেলে, একজন তার মধ্যে লরি-চালক। কিন্তু তাদের পাশে বসে আর একজন ও কে? ও মা, এ যে দেখি আমাদের যুথ হস্টেলের সেই ডেনিশ কবি!

আমরা লরির পিছনে কাঠের বোঝার ওপর উঠতে উঠতে কবিকে বল্লুম—কোথায়, কতদূরে যাওয়া হচ্ছে?

—কোথায় আবার? গ্রানা দ্বীপে, আপনারা যেখানে যাচ্ছেন।

—বাঃ, তা জানলে তো একসঙ্গেই বেরতে পারতুম। আমাদের আগে বল্লেন না কেন?

—শুনুন তবে বলি। কাল শুনলুম আপনারা লাফা-যাত্রা করে গ্রানা যাবেন স্থির করেছেন। মনে করলুম আপনারা নতুন যাত্রী, নবীন উৎসাহ, তড়বড় করে চলবেন। হয়তো ভোর না হতেই রওনা দেবেন। আমি কুঁড়ে মানুষ আপনাদের সঙ্গে পেরে উঠবো কেন?—তাই কিছু বলিনি।

আমরা বল্লুম—আপনি বুঝি কুঁড়ে মানুষ? কুঁড়ে হলে কি আর বাড়ি ঘর ছেড়ে বেরতেন দুনিয়া দেখতে?

কবি বল্লেন—লাফা-যাত্রার আসল রসটাই তাহলে দেখছি আপনারা ধরতে পারেন নি। যারা তাড়ঘাড় এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যেতে চায়, লাফা-যাত্রা তাদের জন্যে নয়। কুঁড়ে লোক, যার কোনো সময়ের দাম নেই তারাই এর রস পুরোপুরি উপভোগ করতে পারে। আমি যথার্থ ঐ দলে।

আমরা বল্লুম এইবারে একটু বোধগম্য হচ্ছে।

—আজকের লাফা-যাত্রাটাই দেখুন না। আপনারা আমার কত আগে বেরিয়েছেন। যে গাড়ি আগে পেয়েছেন তাতেই তাড়াতাড়ি উঠে পড়েছেন। অথচ দেখুন এগিয়ে গিয়ে আপনাদের কিছুই লাভ হয়নি। লাফা-যাত্রার সূত্র অনুসারে যে পিছিয়ে থাকে তারই লাভ বেশী। কারণ গাড়িগুলো তো সামনের দিক থেকে আসে না; আসে পিছন থেকে। পিছনের লোকই সেইজন্যে সুযোগ পায় সব চেয়ে বেশী। এই দেখুন না, আজ তিনখানা গাড়ি থামিয়ে তাদের ছেড়ে দিয়ে এই চতুর্থ গাড়িটাকে পছন্দ করেছি। যখন শুনলুম এইটে সোজা গ্রানায় যাচ্ছে তখন এটাতেই চেপে বসলুম আপনাদের হারিয়ে দিতে। আমার কিছু বেগ পেতে হল না।

আমরা বল্লুম লাফা-যাত্রার সূত্রটা এতক্ষণে আমাদের মাথায় ঢুকলো।

আমাদের লরি গ্রানায় এসে পৌঁছল। ছোট্ট একখানি গ্রাম, ছবির মতো সুন্দর ঝকঝকে। ঘন সারিবদ্ধ গাছের ছায়ায় ঢাকা একখানি রাস্তার ধারে আমাদের নামিয়ে দিয়ে লরিটা চলে গেল। ছায়া-সমাচ্ছন্ন এই রাস্তাটা ঢালু হয়ে নেমে নেমে জলের ধার পর্যন্ত গিয়েছে। খোলা লরিতে ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুরে শরীর মাথা যেমন গরম হয়ে গিয়েছিল, গ্রানার এই সুশ্যামল বীথিতে নেমেই মন প্রাণ দেহ শীতল হয়ে গেল। হ্রদের ধারে পৌঁছেই একটা নৌকো পেয়ে গেলুম এবং ওপারে ভিসিংস্ দ্বীপে পৌঁছতে মাত্র কয়েক মিনিট লাগল।

সকলেরই খিদে পেয়ে গিয়েছিল। সকলেই প্রায় একসঙ্গে প্রস্তাব করলুম—প্রথমে খাওয়া, তারপর অন্য কাজ। ঘাসে ঢাকা দ্বীপের এক অংশ বেছে নিয়ে আমরা তিন জনে বসে পড়লুম
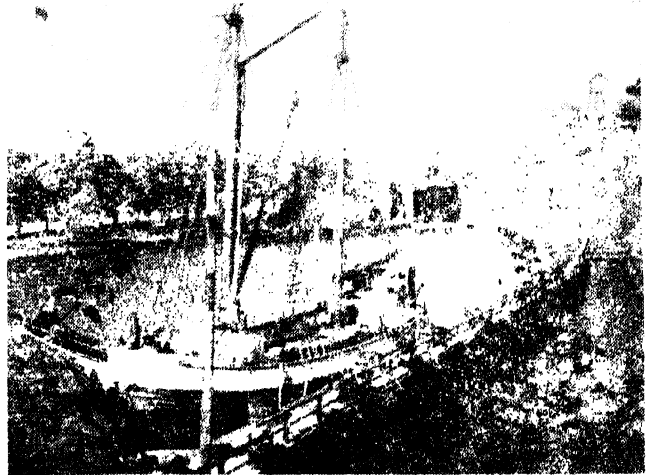
গ্যোটা খাল

এবং যে যার পিঠঝুলি খুল্লুম স্যাণ্ডুইচ বার করবার জন্যে। মিরেক আর আমি পিঠঝুলি থেকে আজ সকালের প্রাতর্ভোজনের উথলে পড়া ভোজ্যাংশ প্রচুর বার করলুম, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় কবির পিঠঝুলি থেকে কয়েক টুকরো কাগজ ছাড়া আর কিছুই বেরোল না। তিনি সেই কাগজগুলি বেশ পরিপাটি করে ঘাসের উপর বিছিয়ে আমাদের স্যাণ্ডুইচের জন্যে বসে রইলেন; বল্লেন আপনারা যা তাড়াতাড়ি করে দ্বীপে চলে এলেন, গ্রামে গিয়ে একটু রুটি মাখন কিনব তারও সময় পেলুম না।

অগত্যা আমাদের স্যাণ্ডুইচের পাহাড় তিন ভাগে ভাগ হল এবং সেই পর্বত শেষ হতে খুব বেশী সময় লাগল না। দ্বীপে আমরা খানিকটা বেড়ালুম। পুরাকালের দ্বীপাধিকারীর প্রাসাদ দেখলুম। তারপর সে দিনের অভিযান শেষ করে ফিরতি পথে চল্লুম বাড়িমুখো।

গ্রানা গ্রামের মোটর-গামী পথে দাঁড়িয়ে আমাদের ঠিক হল, তিন জন একসঙ্গে যাওয়া চলবে না। তাতে হয়তো অনেক গাড়িই থামবে না। কাজেই আমি আর মিরেক একত্র এবং কবি একলা, এইভাবে যাওয়া যাক।

কবি বল্লেন—আপনারা তাহলে এগিয়ে যান। আমি না হয় পরেই যাচ্ছি।

মিরেক বল্লে আরে তা কি হয়? আপনি হলেন মাননীয় অতিথি, আপনি এগোলেন তবে না আমরা আপনার পিছু পিছু যেতে পারব?

কবি বল্লেন বটে? আমার কাছে বিদ্যে শিখে এখন আমারই উপর ফলানো হচ্ছে? কিন্তু য়োনশোপিংএর পথে প্রথম যে গাড়িটা আসবে সেটার মাত্র একটা সীট খালি থাকবে। কাজেই আপনাদের না নিয়ে সেটা আমাকেই নিয়ে যাবে দেখবেন।

এই ভবিষ্যৎ বাণী করে কবি এগোলেন। আমরা দুজনে দাঁড়িয়ে রইলমু। রাস্তার উপর স্যাণ্ডেল ঘষতে ঘষতে আমাদের কবি চোখের আড়ালে অদৃশ্য হয়েছেন এমন সময় টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি পড়তে হল। হ্রদের দিক থেকে মেঘ অলক্ষ্যে উঠছিল, সূর্যকে আড়াল করে পিঠঝুলি খুলে বর্ষাতি উদ্যোগ করছি, এমন সময় গাড়ি আসছে। গাড়িটাকে একজন ভদ্রলোক আর মহিলা বসে। গাড়ির পিছনটা খালি। করে জানলুম তাঁরা এই গ্রানা প্রান্তে একটি হোটেল পর্যন্ত ততক্ষণে বেশ বড় বড় ফোঁটায় এসে গেছে। আমি বল্লুম—মিরেক, যতটুকু যাওয়া যায়, নইলে ভিজতে হবে।

কিন্তু মিরেক পিছিয়ে এল। না, এ গাড়ি নিলে আমরা ঠকে বেশী দূর তো যাওয়া যাবে না, ছাড়িয়ে কিছুটা যাবো মাত্র। কবিরই সুবিধে হবে। পিছন একখানা দূরগামী গাড়ি আগেই ধরবে; ধরে হয়তো এক য়োনশোপিং! এই বলে অনেক জানিয়ে গাড়িটাকে সে ছেড়ে আমরা তখন একটা বাড়ির আলসের গিয়ে বর্ষাতি বার করে পরলুম।

অনেকক্ষণ পরে আর একটা এল। আমরা হাত দেখাবার গাড়িটা থামল। অতি অমায়িক ভদ্রলোক। বর্ষাতি পরা দেখেই চিনেছিলেন। বল্লেন, শোপিংএর ঠিক আগের গ্রাম তিনি যাচ্ছেন, তাতে যদি আমাদের সুবিধে হয়।

আমরা বল্লুম—নিশ্চয় হবে। থেকে তো সামান্য দূরে। তা ছাড়া রয়েছে। বলে, আমরা গাড়িতে বসলুম। গাড়ি চলতেই মিরেক আর রাস্তার দিকে লক্ষ্য রাখলুম, কোথাও দেখা যায় কি না। কিন্তু তার টিকিটি দেখতে পেলুম না। আশ্চর্য, লোকটা গেল কোথায়? একটিই তো রাস্তা—অন্ততঃ পাঁচ মাইলের মধ্যে কোনো তে-মাথা অন্য দিক থেকে আগত কোনো গাড়ি

তে পারে। এইটুকু সময়ের মধ্যে টা পথ তার পক্ষে হাঁটাও সম্ভব । তবে লোকটা কি উবে গেল?

মিরেক বল্লে—নিশ্চয় বৃষ্টি দেখে বরে বাড়িতে গিয়ে ঢুকে জমিয়ে আছে। হয়তো সেখানে এখন সোফায় বসে চা-কেক খাচ্ছে।

আমায়িক ভদ্রলোক আমাদের নিয়ে যখন তাঁর গ্রামের কাছে পেঁছিলেন তখন বৃষ্টি কমে গেছে। কিন্তু সম্পূর্ণ থামেনি। তিনি বল্লেন—চলুন আপনাদের স্টোনশোপিং পর্যন্ত পেঁছেই দিয়ে আসি। আমারও তাহলে ডাকঘরটা ঘুরে আসা হয়। দেখব চিঠি পিঠি এসেছে কি না। এই বলে আমাদের যুথ হস্টেলের মোড়ে নামিয়ে দিয়ে চলে গেলেন।

যুথ হস্টেলে পেঁছে দেখি, অনেক আগেই কবি এসে গেছেন। কি ব্যাপার, জিজ্ঞেস করতে তিনি বল্লেন—বৃষ্টি দেখে তিনি এক পেট্রোল স্টেশানে গিয়ে উঠেছিলেন। সেখানে পেট্রোলওয়ালা তার কাচের ঘরে বসে চা খাচ্ছিল। তার সঙ্গে বসে চা-কেক খেতে খেতে আর গল্প করতে করতে হঠাৎ একটা গাড়ি তেল নিতে এল। স্টোনশোপিং থেকেই এল গাড়িটা, সেইদিকেই ফিরে যাবে। কাজেই কবির মিলে গেল সুযোগ।

এইভাবে তিনি বাড়ি ফিরেছেন।

সেদিন রাত্রে খাবার টেবিলে মিরেক আর আমি পরামর্শ করতে বসলুম স্টকহলমে পেঁছে সেখান থেকে কি উপায়ে নরওয়ে যাওয়া যায়। লাফা-যাত্রার আমোদটা দুজনকেই আমাদের পেয়ে বসেছিল। এই একদিনের লাফা-যাত্রায় কতরকম মজার লোকের সঙ্গেই না পরিচয় হল। ট্রেনের কামরায় বসে বা দূরগামী বাস্-এর সীটে বসে কি আর এমন বিচিত্র অভিজ্ঞতা হবে? এক জায়গায় বসে বসে শুধু পা টন্ টন্ করবে, চোখ টন্ টন্ করবে! সুতরাং ঠিক হল 'জয় বিশ্বনাথ' বলে বেরিয়ে পড়ব স্টকহল্ম থেকে রাস্তার উপর। তারপর আমাদের হাত উঠবে আর নামবে। দেখি কতদিনে কতগুলো গাড়ি থামিয়ে নরওয়েতে পেঁছতে পারি।

এইভাবে মনস্থির করে নিয়ে পরের দিন ভ্যাটার্ন হ্রদের উপকূলে গিয়ে স্টীমারে উঠলুম। এস্পেরাণ্টো বুড়ো আমাদের বিদায় জানাতে ঘাটে এসেছিলেন। স্টীমার ছাড়বার ঠিক আগে তাঁর ব্যাগ থেকে বার করে দুটি উপহার আমাদের হাতে গুঁজে দিলেন—একটি মানিব্যাগ আর একটি টুপি। অদ্ভুত এই উপহার দুটি গ্রহণ করে আমরা হাত নেড়ে প্রচুর ধন্যবাদ জানালুম। স্টীমার ছেড়ে দিল। তখন উপহার দুটিকে আমরা ভাল করে লক্ষ্য করলুম। দেখলুম, দুটিই বহুদিনের পুরোনো ব্যবহার করা জিনিস।

আমি মিরেককে বল্লুম—মিরেক, এই বুড়োকে আজ অবধি আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারলুম না।

মিরেক বল্লে—আমিও না। চল জাহাজের পিছনে যাতে বিশেষ কারো চোখে না পড়ে, এই স্মৃতিচিহ্ন দুটিকে ভ্যাটার্ন-এর, জলেই বিসর্জন দেওয়া যাক।

স্টোনশোপিং ছাড়িয়ে চল্লো আমাদের স্টীমার ভ্যাটার্ন হ্রদের কূলে কূলে। চারিদিকের স্থির নীল জল, ঢেউ নেই, হাওয়া নেই। রোদের আলোয় জল, জলের ধারে মাটি, মাটির উপর ঘাস, সব কিছু যেন হাসছে। দক্ষিণ দিকে যে উপকূল দেখা যায়, তাই হচ্ছে লেগারলফ্ বর্ণিত স্মোল্যাণ্ডের সুজলা সুফলা অংশ। ডান

উঁচু এবং তারপর ক্রমাগত নীচের দিকে নেমে গিয়ে শেষে বলটিক সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে এই খাল। জলপৃষ্ঠের এই উচ্চতা আর নিম্নতা লাভ করবার উপায় হচ্ছে এই 'লক্'গুলি। সারা খালে প্রায় সত্তরটা লক্ আছে তার বেশীর ভাগই খালের পশ্চিমাংশে। লক্-এর দু'পাশে দুটি ফটক। ফটক যখন বন্ধ থাকে তখন ফটকের মধ্যেকার জল বাইরের জলের চেয়ে হয় উঁচু নয় নীচু। ফটক খুলে দিলেই ভিতরের জল আর বাইরের জলের উচ্চতা এক হয়ে যাবে। জলের এই সহজ স্বাভাবিক গুণকে কাজে লাগিয়ে মানুষ লম্বা লম্বা অসমতল খালের মধ্যে দিয়ে স্টীমার নৌকো চলাচল করায়।

আমাদের স্টীমার যেই 'লক্'-এর ফটকের গা ঘেঁষে দাঁড়ালো অমনি সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পিছনে একটা ফটক বন্ধ করে দেওয়া হল। পিছনের ফটক ভাল করে বন্ধ করতেই আমাদের সামনে যে ফটক যার কাছে গিয়ে আমরা দাঁড়িয়েছিলুম সেটা আস্তে আস্তে খুলে গেল। এর সামনে ছিল উঁচু জল—সেই জল এসে মিশল আমাদের জলে। আমাদের জল ক্রমে ক্রমে হতে লাগল উঁচু। পিছনে ফটক পড়ে গেছে—সে জলের আর ফিরিয়ে যাবার উপায় নেই। কয়েক মিনিটের মধ্যে আমাদের স্টীমার বেশ কয়েক ফিট উঁচুতে উঠে পড়ল। পিছনে দেখলুম পড়ে রয়েছে গোটা খালের নিম্ন জলাংশ। এইভাবে একটার পর একটা লক্ পার হয়ে আমরা এগিয়ে যেতে লাগলুম।

বিকেলের আলো সোনালী হয়ে মাঠ ঘাট উপবন, গ্রামের বাড়ির দেয়ালগুলি, গাছের চূড়োগুলি সব সোনার পাতে মুড়ে দেয়। তারপর এক সময় দেখি সূর্য নেই কিন্তু আকাশে প্রচুর আলো রয়েছে। এদেশের এই মজার সন্ধ্যা। গ্রীষ্মের দিনে সন্ধ্যার আলো রয়ে রয়ে আকাশের গায়ে লেগে থাকে। সব সময় মনে হয়, এইবার অন্ধকার নামবে কিন্তু অন্ধকার নামতে চায় না। সন্ধ্যার খাওয়া দাওয়া সব হয়ে যায়, খোলা ডেকে সন্ধ্যার আলোতে গান বাজনা চলতে থাকে। অনেকে তাদের রং-বাহার গ্রাম্য পোশাক বার করে চাষীদের নাচ নেচে নেচে সবাইকে দেখাতে থাকে। মন হাল্কা হয়ে ওঠে। ছুটির সুর এসে লাগে সকলের প্রাণে। যাত্রীতে যাত্রীতে চেনা পরিচয় ঘনিষ্ঠতা বেড়ে ওঠে। তারপর কখন একসময়ে অন্ধকার নেমে আসে খালের উপর। স্টীমারের সামনের সার্চ লাইটটা জ্বলে উঠতে সকলের নজর সেই দিকে যায়। ডেকের আলোগুলো বন্ধ করে তখন সকলে চেয়ে একবার স্টীমারের বাইরের জগতে নজর দেয়। সেখানে দেখা যায় অন্ধকারের লেপ মুড়ি দিয়ে সারি সারি গ্রাম ঘুমিয়ে পড়েছে। দু'একটি রাত জাগা প্রাণী যারা বাইরে ছিল তারাও মোটরে করে গ্রামের রাস্তা দিয়ে বাড়ি ফেরায় ব্যস্ত। স্টীমারের যাত্রীদের এতক্ষণে ঘুমের কথা মনে পড়ে। মনে পড়তেই সঙ্গে সঙ্গে আড্ডা ভেঙে যায়। সকলে সকলের কাছ থেকে রাত্রের মতো বিদায় নিতে শুরু করে। ডেক খালি হয়ে আসে।

হঠাৎ মনে পড়ে যায়, তাই তো, হিলারিকে এই গোটা খাল থেকে একখানা চিঠি দেবার কথা ছিল। তাড়াতাড়ি একখানা গোটা খালের ছবি দেওয়া পোস্ট কার্ড কিনে হিলারিকে চিঠি লিখতে বসে গেলুম। চিঠিটা শেষ করে মিরেক আর আমি যখন ঘুমতে যাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছি, ঠিক তখনই জাহাজের কাপ্তেন এসে আমাদের পাশে বসলেন। যে রকম ভাবে বসলেন, মনে হল ভাল করে ভাব না জমিয়ে উঠবেন না। প্রথমেই বল্লেন—কেমন লাগছে আপনাদের এই খাল?

—অপূর্ব।

—বলুন আপনাদের কি খেতে দেব? মদ খাবেন?

—মদ আমরা খাই না। বরং কমলালেবুর রস আনতে বলুন।

কাপ্তেন তখন প্রকান্ড এক জগ ঠান্ডা কমলালেবুর সরবৎ আর চকচকে তিনখানা গ্লাস আনিয়ে বসলেন আমাদের সঙ্গে। ডেকের আলো নিভিয়ে দেওয়া হল। আলো নেভাতেই আমরা টের পেলুম আকাশে ফুটফুটে জ্যোৎস্না। কখন যে চাঁদ উঠে এমন মায়াজাল বুনে গেছে কেউই আমরা জানতে পারিনি।

জ্যোৎস্না ভরা আকাশের দিকে মুখ তুলে কাপ্তেন বল্লেন—গোটা খাল কে বানিয়েছে জানেন?

আমরা দুজনেই বল্লুম—জানি না তো!

কাপ্তেন তেমনি হেসে ভাবে বল্লেন—শুনতে পাই গোটা খাল বানিয়েছে সুইডেনের সুদক্ষ ইঞ্জিনিয়ার টমাস টেলফোর্ড। মেপে জুপে, এটা গড়ে, ওটা ভেঙে, এটা জুড়ে, ওটা খুলে বাইশ বছর লেগেছিল এই খাল সম্পূর্ণ করতে। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না।

আমরা ভারি অবাক হয়ে বল্লুম—সে কি?

কাপ্তেন বল্লেন ছেলেবেলায় আমরা আমাদের ঠাকুর্দার কাছ থেকে গোটা খাল সৃষ্টির যে অপূর্ব গল্প শুনেছি তা যেমনি চমকপ্রদ তেমনি মনোরঞ্জক। আমি ঠাকুর্দার গল্পটাই বিশ্বাস করি। ইঞ্জিনীয়ার টেলফোর্ড-এর গল্প আমার মনে হয় ভুয়ো।

আমরা বলে উঠলুম—কি রকম, শুনি শুনি।

কাপ্তেন বল্লেন—আপনারা বিশ্বাস হয়তো না-ও করতে পারেন। কিন্তু ছেলেবেলায় আমার তিন দাদা আর দুই বোন আমরা সকলেই বিশ্বাস করতুম; আমি নিজে এখনও করি এই খাল সৃষ্টি করেছেন 'হিসিংগেন'-এর রাজপুত্র।

আমরা বল্লুম—বলুন না গল্পখানা শুনি।

কাপ্তেন তখন কমলালেবুর রসে আর একবার আমাদের গ্লাস ভরে দিলেন। গল্প শুরু হল।

(ক্রমশ)

ডাক্তারের ডায়েরী

—ডাঃ আনন্দকিশোর মুন্সী

॥ ১৪ ॥

ডাক্তারী পাশ করে বছর দুই কলকাতায় প্র্যাকটিস জমাবার চেষ্টা করে ঘরের পয়সা বেশ কিছুটা নষ্ট করে আমার এক সহপাঠী বাইরে একটা ফ্যাক্টরীর ডাক্তার হয়ে একদিন কলকাতা ছেড়ে চলে গেল। যাবার আগে ওর এক বন্ধুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলে গেল, অসুখবিসুখ হলে যেন আমি একটু দেখি।

ছেলেটি আমাদেরই সমবয়েসী। কিন্তু চেহারা দেখে অনেক ছোট মনে হল। রোগা পাতলা ছিপছিপে লম্বা চেহারা। দাড়ি-গোঁফ কামানো। মাথায় লম্বা লম্বা চুল। চোখে পুরু কাঁচের চশমা।

কী কাজ করেন জিজ্ঞাসা করায় একটু হেসে বেশ খানিকটা দম্ভভরে মাথা নেড়ে পুলিন বলল—আমি নিজে কিছু করি না। স্ত্রী রোজগার করে, ঘরে বসে তাই খাই।

শুনে তাজ্জব বনে গেলাম। আবার এক বেকার রুগী ঘাড়ে এল ভেবে মনটা দমে গেল। তবু বিনয়ের হাসিটি মুখে ফুটিয়ে কোনও রকমে বললাম—আপনি দেখছি ভাগ্যবান পুরুষ। তা আসবেন যখন দরকার। যতটুকু সাধ্য নিশ্চয় করব।

পুলিন বিদায় হলে বন্ধুকে বললাম কলকাতা ছেড়ে চলে যাবার আগে বিনে পয়সার একটি রুগী ঘাড়ে চাপিয়ে যাওয়াটা কি বন্ধুর কাজ হল?

বন্ধু হেসে বলল—আরে, না, না। একেবারে বিনে-পয়সার রুগী এরা নয়। কিছু কিছু দেবে। যা যখন পারে। পুলিনটা চিরদিনই ঐ রকম ঠোঁটকাটা। ঐ মুখের জনাই ভাল কাজ ও বেশীদিন রাখতে পারে না।

সেই থেকে পুলিনের সঙ্গে আমার পরিচয় হল। ক্রমে বুঝলাম ছেলেটা সত্যি একেবারে বেকার নয়। সিভিল সার্ভিস এবং আরও অনেক প্রতিযোগিতা-মূলক পরীক্ষা দিয়ে চাকরি না পেয়ে ভীষণ ক্ষেপে আছে। লেখাপড়ায় বরাবর ভাল ছিল, তাই ছোটখাট কাজে মন বসে না। সামান্য কারণে বসের সঙ্গে খটাখটি লেগে যায়। কাজ ছাড়তে হয়। উপস্থিত গোটা দুই ভাল টিউশানি আছে। স্ত্রীও একটা স্কুলের হেড-মিসট্রেস। ছেলেপিলে নেই। দুজনের বেশ চলে যায়।

তখন সবে যুদ্ধ বেধেছে। এবার যে জার্মানিই জিতবে আর ইংরেজ হারবে, তাতে আমাদের মনে কোন সন্দেহ নেই। দশদিনের মধ্যেই পোল্যান্ড খতম হয়ে গেল। আর ফাঁকতালে রুশ সৈন্য বিনাযুদ্ধে পোল্যান্ডে ঢুকে অর্ধেক দেশ দখল করে গ্যাঁট হয়ে বসে গেল। দেখে আমরা দুপক্ষকেই খুব বাহবা দিলাম। ভাবলাম বেশ হয়েছে। রুশ-জার্মান প্যাঁচে পড়ে ইংরেজের এবার [illegible] নেই।

সেই সময় শীতের [illegible] একদিন খট্ খট্ শব্দ শুনে [illegible] মনে হল কে যেন দরজায় [illegible] তাড়াতাড়ি উঠে আলো [illegible] গায় দিয়ে হাঁক দিলাম—কে?

দরজার কড়ানাড়া বন্ধ [illegible] কণ্ঠে কে যেন বলল—[illegible] আছেন?

দরজা খুলে দেখি পুলিন।

বিস্মিত হয়ে বললাম—[illegible] কি ব্যাপার?

পুলিন মুখ কাঁচুমাচু করে [illegible] এক্ষুনি একবার আসতে হবে [illegible] শীগ্‌গির চলুন।

জিজ্ঞাসা করলাম—কি হয়েছে?

পুলিন যেন একটু [illegible] বলল—কি হয়েছে বুঝলে আর [illegible] কাছে ছুটে আসব কেন? আমি [illegible] ডাক্তার? ট্যাক্সী নিয়ে এসেছি, [illegible] দেখে বলুন কি হয়েছে।

কথা শুনে মেজাজ খারাপ [illegible] গেল। বিরক্ত হয়ে বললাম—[illegible] দেখব?

পুলিন বোধ হয় বুঝল। [illegible] দেখুন ভারি ঘাবড়ে গেছি, তাই [illegible] কথাই বলা হয় নি। বিরজা [illegible] যেন করছে। বোধ হয় অজ্ঞান [illegible] গেছে। দাঁতে দাঁত লেগে [illegible] একা ফেলে ট্যাক্সী নিয়ে আপনার [illegible] ছুটে এসেছি। চলুন শীগ্‌গির।

বললাম—তা যাচ্ছি। কিন্তু [illegible] রাত্রে আপনার নিজের ঘুমই বা [illegible] কি করে? আর গিন্নী ঘুমুচ্ছেন [illegible] অজ্ঞান হয়ে গেছেন, তাই-বা বুঝলেন [illegible] করে?

পুলিন বলল—রাত ৯টার [illegible] সিনেমায় গিয়েছিলাম। ফিরে [illegible] খেয়েদেয়ে শুতে শুতে বারোটা [illegible] গেল। রাত্রে একখানা বই নি[illegible] শুলে আমার আবার ঘুম আসে [illegible] কিন্তু বিরজা বলল ওর ঘুম [illegible] আলো নিভিয়ে দিতে। দেই, [illegible] করে একটু দেরি হয়ে গেল। [illegible] গোঁ গোঁ শব্দ শুনে ফিরে তাকিয়ে [illegible]

বিরজা দু'হাত পেটে ঠেসে দাঁত দিয়ে দাঁত কামড়ে শব্দ করছে। জিজ্ঞাসা করলাম কি হয়েছে? একবার কোনও-রকমে বলল—কিছু না। তার পর থেকেই ঠিক এমন করে যেন তাকিয়ে রইল। ভয়ানক ভয় পেয়ে গেলাম। ডাকলেও সাড়া দেয় না। পেটে হাত দিলেও উঃ আঃ কিছুই করে না। তাই ভয় হল বুঝি অজ্ঞান হয়ে গেছে।

জিজ্ঞাসা করলাম—ওঁর কি ফিটের ব্যামো আছে নাকি?

পুলিন বলল—আগে তো কখনও দেখিনি। আজই দেখছি কি রকম যেন করছে। একবার শুধু বলেছে ডান-দিকের পেটে খুব ব্যথা। এ্যাপেণ্ডি-সাইটিস নয় ত?

বললাম—চলুন দেখে আসি।

তাড়াতাড়ি পোশাক প'রে ব্যাগ নিয়ে তৈরী হয়ে পুলিনের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। কাছেই বাড়ি। মিনিট পনেরোর মধ্যেই পৌঁছে গেলাম।

গিয়ে দেখি শোবার ঘরে লেপ গায়ে দিয়ে বিরজা শুয়ে আছে। মাঝবয়েসী ঝিটি মাথার কাছে বসে চুলে হাত বুলোচ্ছে। এই দারুণ শীতে হাতপাখা দিয়ে মাথায় বাতাস করছে।

আমরা ঢুকতেই ঝিটি উঠে দাঁড়াল। বিরজা চোখের পাতা খুলল না। খাটের পাশে চেয়ারে বসে নাড়ী দেখলাম বেশ স্বাভাবিক। হাত- ঠাণ্ডা নয়। চোখের পাতা টেনে দেখতেই বিরজা চোখ মেলে তাকাল।

জিজ্ঞাসা করলাম—কোন কষ্ট হচ্ছে?

কিছুক্ষণ আমার চোখে চোখ রেখে স্থির হয়ে তাকিয়ে বিরজা বলল—পেটে খুব ব্যথা।

পেটে হাত দিতেই বিরজা উঃ করে চেঁচিয়ে উঠল। যেখানেই হাত দিই, বলে ভীষণ ব্যথা। ভাল করে আস্তে আস্তে সমস্ত পেটটা টিপে দেখে মনে হল, সে রকম ব্যথা কোথাও কিছু নেই। আসলে রোগটা মনের।

পুলিন ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করল—এ্যাপেণ্ডিসাইটিস নয় ত?

গম্ভীর মুখে মাথা নেড়ে বললাম—না। সেরকম কঠিন কোন অসুখ তো মনে হচ্ছে না।

পুলিন বলল—তাহলে হজমের গোলমাল থেকেই হয়েছে। কি বলেন?

ব্যাগ থেকে একটা বড়ি বার করে বললাম—তা হতে পারে। এই বড়িটা খাইয়ে দিন, এক্ষুনি ব্যথা কমে যাবে। তারপর কাল সকালে দেখা যাবে।

পুলিন তক্ষুনি বড়িটা খাইয়ে দিল। আমিও উঠলাম।

দেখে পুলিন বলল—আর একটু দেখে যান।

অনেক ভরসা দিয়ে বললাম—ব্যথা এমনিতেই অনেক কমে গেছে। অষুধে আরও কমে যাবে, ঘুম হবে। আর দেখবার দরকার নেই।

তবু পুলিন ছাড়ল না। একটু বসুন, একটু বসুন বলে আরও কিছুক্ষণ আটকে রাখল।

শীতের রাতে ঘুম থেকে উঠে এই রকম নিউরটিক রুগীর কাছে বিনা প্রয়োজনে বসে থাকতে কার ভাল লাগে বলুন তো?

কিন্তু পুলিন কিছুতেই ছাড়বে না। অগত্যা বিরজার কাছে গিয়ে বসলাম। নাড়ী দেখে বললাম—এই ত দেখছি ব্যথা বেশ কমে গেছে। নাড়ীর গতি স্বাভাবিক হয়েছে। এইবার আলো নিভিয়ে দিয়ে একটু ঘুমুবার চেষ্টা করুন।

বিরজা আমার হাত চেপে ধরে বলল—রাত্রে আবার বাড়বে না তো?

বললাম—এই অষুধের কাজ ছ'ঘণ্টা পর্যন্ত থাকবে। কাজেই রাতে আর কিছু হবে না। এখন আর কথা বলবেন না। আলো নিভিয়ে দিক। নইলে হয়ত মাথা ধরবে। অষুধের কাজ ভাল হবে না।

কাল নিশ্চয় একবার আসবেন বলে বিরজা আমার হাত ছেড়ে দিল।

ভেবেছিলাম, পরদিন ভোর না হতেই পুলিন এসে দরজা ধাক্কাবে, কিন্তু বেলা ন'টা বেজে গেল পুলিনের দেখা নেই।

বুঝলাম বিরজা নিশ্চয় ভাল আছে। তবু বেরুবার মুখে ওদের বাড়িই আগে গেলাম। দেখলাম স্নান-খাওয়া সেরে পোশাক পরে বিরজা স্কুলে যাবার জন্য প্রস্তুত। আমাকে দেখেই সলজ্জ হেসে বলল—আসুন।

পুলিন মুখ গোমড়া করে খবরের কাগজ নিয়ে বসেছিল।

আমি ঢুকতেই বলল—এই দেখুন কত করে বারণ করলাম স্কুলে যেতে। কিন্তু একটা দিনও রেস্ট নেবে না। এই নিয়েই সকাল থেকে কথা কাটাকাটি তাই আর আপনার কাছে যাওয়া হল না।

বিরজা একটু হেসে বলল—অসুখ

...নিয়ে দেখুন। বড় ডাক্তার কাউকে দেখান, তিনিও দেখবেন এই কথাই বলবে।

চিন্তিত মলিন মুখে পুলিন উঠে গেল। মুখ দেখে মনে হল ওর বুঝি সর্বনাশ হয়েছে। হয় চাকরি গেছে, নয় সর্বস্ব চুরি হয়েছে।

এরপর অনেকদিন ওরা কেউ আর এল না।

তখন জার্মানির জয় জয়কার। পোল্যাণ্ড গেছে। ফ্রান্সও খতম হয়েছে। ইতালী জার্মান-জাপান মিলে অক্ষশক্তি তৈরী হয়েছে। কলকাতায় ব্ল্যাক-আউট শুরু হয়েছে।

একদিন সন্ধ্যের সময় পুলিন আবার এল কোট-প্যাণ্ট পরা। ছোট করে চুল ছাঁটা।

বললাম—কি খবর?

হেসে পুলিন বলল—নতুন চাকরি। তাই একটু ব্যস্ত ছিলাম। অনেকদিন এদিকে আসা হয় নি।

শুনলাম গভর্নমেণ্টের পাবলিসিটি ডিপার্টমেণ্টে ভাল একটা কাজ পেয়েছে। খুব খুশী হলাম।

বললাম—বাড়ির খবর কি?

পুলিন বলল—সেইজন্যই তো এলাম। চলুন একবার।

জিজ্ঞাসা করলাম—কি হল?

পুলিন বলল—যা চেয়েছিলেন, তাই হয়েছে। তখন বলেছিলেন বাচ্চা না হলে শরীর খারাপ হবে। এখন দেখছি হবার সম্ভাবনা থেকেই শরীর খারাপ হয়েছে। আজ মাসখানেক থেকে কিছুই খায় না। পুষ্টিকর কিছুই পেটে থাকে না। আজে-বাজে ছাইভস্ম কিসব সারাদিন খায়। এবার দেখছি আমিই পাগল হয়ে যাব।

বললাম—এতে আর ভয় পাবার কি আছে প্রথম প্রথম অনেকেরই এরকম হয়। চলুন দেখে আসি।

গিয়ে দেখি বিরজা বিছানায় শুয়ে কি একটা বই পড়ছে। আমাদের দেখে তাড়াতাড়ি বইটা বালিশের নীচে লুকিয়ে উঠে বসে সলজ্জ হাসি হেসে বলল—আসুন।

দেখলাম, চেহারা বিশেষ খারাপ কিছু হয় নি। মুখখানা একটু যেন শুকনো। চোখ দুটি খুশীতে বেশ উজ্জ্বল।

জিজ্ঞাসা করলাম—কষ্ট কিছু নেই তো?

মৃদু হেসে বিরজা বলল—না। এতদিন কিছু খেতে পারতাম না। এখন তো সব খাচ্ছি।

পরীক্ষা করে একটা ভিটামিন আর আয়রন-টনিক লিখে দিলাম। বললাম—এইবার শরীর ক্রমশ ভাল হবে। একটু কিছু খারাপ মনে হলেই খবর দেবেন।

সেই থেকে প্রায়ই ওদের বাড়ি যেতে হ'ত। সময় হবার মাসখানেক আগে একদিন আমাদের হাসপাতালে দেখিয়ে নিয়ে এলাম। তারপর আর একদিন হাসপাতালে ভর্তি করে দিলাম। বাচ্চা হতে কোন গোলমাল হল না। দিন সাতেক হাসপাতালে থেকে একটি ছেলে নিয়ে বিরজা একদিন বাড়ি ফিরে এল।

তখন প্রায়ই পুলিন আসত। আমাকেও ওদের বাড়ি যেতে হ'ত। আজ ছেলের পেট খারাপ, কাল জ্বর।

এমনি করে মাস ছয়েক কেটে গেল। আমি তখন এ আর পি'র ডাক্তার। জাপানী বোমার ভয়ে লোকে শহর ছেড়ে পালাচ্ছে।

একদিন পুলিন আমার পোস্টে এসে বলল—আপনি কী মন্ত্র যে বিরজার কানে দিয়ে এসেছেন, জন্ম-নিরোধের কোন ব্যবস্থা আর নেওয়া যাবে না।

বললাম প্রয়োজনই বা কিসের? দুজনেই তো এখন চাকরি করছেন।

পুলিন বলল—তাই বলে ছ'মাসের মধ্যেই আবার সন্তান সম্ভাবনা হবে? এতে বিরজার শরীর টিঁকবে?

বললাম—যত্ন নিলে কেন টিঁকবে না? এটা তো অস্বাভাবিক কিছু নয়।

পুলিন বলল—কি জানি। এত ঘন ঘন ছেলেপিলে হওয়া আমার ভাল লাগে না। তা ছাড়া ওর শরীর টিঁকলেও আমার টিঁকবে না। এত ঝামেলা আমি সইতে পারব না। জন্ম-নিরোধের ব্যবস্থা যখন নেওয়া যাচ্ছে না, তখন এইবার বাচ্চা হলে ওর একটা অপারেশন করিয়ে দিন।

শৌখিন সমাজে মেয়েদের এই অপারেশন তখন সবে শুরু হয়েছে। এখনকার মত হাসপাতালে এত বেশী টিউব লাইগেশন তখনও রেওয়াজ হয় নি। যাদের পয়সা আছে, তারাই শুধু নার্সিং-হোমে থেকে এই লাইগেশন করাতে পারত।

বললাম—বিরজা এতে রাজী হবে কি?

হেসে পুলিন বলল—ওই তো আপনার কাছে আমায় পাঠালে।

বললাম মেয়েদের বেলায় অজ্ঞান করে পেট কেটে জরায়ুর দুপাশের টিউব

বার করে কেটে বেঁধে দেওয়া হয়। ১০।১৫ দিন বিছানায় শুয়ে থাকতে হয়।

পুলিন বলল—তা বিরজা জানে। ওর এক বন্ধুর নাকি হয়েছে।

বললাম—তার চেয়ে আপনি নিজেই কেন ভ্যাসেকটমি করিয়ে নেন না? অজ্ঞানও করতে হবে না। শুয়েও থাকতে হবে না।

পুলিন জিজ্ঞাসা করল—ওটা কি অপারেশন?

বললাম—ইনজেকসন্ দিয়ে অসাড় করে কুঁচকির দুপাশ কেটে যে টিউব দিয়ে বীজ যায়, সে দুটি কেটে বেঁধে দিলেই হ'ল। কোন ঝামেলা নেই। ছোট্ট অপারেশন।

পুলিন বলল—কিন্তু তাতে কোন অসুবিধে হয় না?

বললাম—না। যৌবন ফিরে আসে। ক্ষরণও ঠিকই হয়। শুধু সন্তান হয় না।

পুলিন বলল—বেশ তাই করে দিন তাহলে। কত খরচ হবে?

বললাম—আপনি মন ঠিক করুন। ওসব হবে পরে।

পুলিন বলল—মন আমার ঠিক আছে। আপনি খবর নিন।

বললাম—বেশ কাল আসবেন। সব বলে দেব।

সেই যে পুলিন গেল, আর এল না। দেখতে দেখতে যুদ্ধের মোড় ঘুরে গেল। রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে নেবে জার্মানী হাবুডুবু খেতে লাগল। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ জনযুদ্ধে পরিণত হল।

আবার একদিন পুলিন এল। বলল—বিরজার হাসপাতালে যাবার সময় হয়েছে। একবার দেখে একটু ব্যবস্থা করে দিন।

জিজ্ঞাসা করলাম—আপনার সেই অপারেশনের কি হল?

পুলিনের মুখ যেন একটু লাল হ'ল। বলল—আমি তো রাজীই ছিলাম, কিন্তু বিরজা কিছুতেই রাজী হল না। বলল, এইবার বাচ্চা হলে ও নিজেই লাইগেশন করিয়ে নেবে।

বললাম—কিন্তু এ অপারেশন তো হাসপাতালে হবে না। মাত্র দুটি বাচ্চা, কোন সার্জন হাসপাতালে এসব করবে না।

তাহলে নার্সিং হোমে ব্যবস্থা করুন। খরচ যাই হোক সন্তান মানুষ করবার চেয়ে তো আর বেশী হবে না?

ওর কথায় সার্জনদের সঙ্গে পরামর্শ করে একবারে ঠকেছি। এবার তাই চট্ করে আর রাজী হলাম না।

বললাম—বিরজাকে একদিন নিয়ে আসুন। অপারেশনের সুবিধে অসুবিধে সব উনি শুনুন। তারপর নার্সিং হোমের ব্যবস্থা করা যাবে।

পুলিন বলল—তাহলে আজই চলুন। এই শরীরে ওর এখানে আসা কি ঠিক হবে?

বললাম—বেশ তাহলে কাল আসবেন। কাল গিয়ে কথা বলে আসব।

পরদিন পুলিন এসে ওদের বাসায় নিয়ে গেল। বিরজাও দেখলাম এই অপারেশনে খুব রাজী। বলল—দুটির বেশী সন্তানের আমার দরকার নেই। আপনি সব ঠিক করুন।

স্ত্রী-রোগ বিশেষজ্ঞ একজন সার্জনকে দেখিয়ে নার্সিং হোমে সব ব্যবস্থা করে দিলাম। ঠিক হল যেদিন বাচ্চা হবে তার পরদিন লাইগেশন হবে।

একদিন সময় মত বিরজা নার্সিং হোমে গেল। সেদিনই রাত্রে ওর আর একটি ছেলে হল।

পরদিন বেলা ১২টায় অপারেশন। বিরজাকে রেডী করা হয়েছে। ঘণ্টা-খানেকের মধ্যেই সার্জন এসে পড়বেন। এট্রোপিন ইনজেক্শন দেওয়া হল। দেখলাম বিরজার মুখখানা যেন ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

জিজ্ঞাসা করলাম—কি হ'ল?

বিরজা আমার হাত শক্ত করে ধরে রইল। দেখলাম হাত বরফের মত ঠাণ্ডা। বুঝলাম ভয় পেয়েছে।

ভরসা দিয়ে বললাম—অপারেশ আগে সকলেরই ভয় হয়। কিন্তু ভয় কিচ্ছু নেই। কিচ্ছু টের পাবেন

বিরজার চোখ দুটি ছল ছল উঠল। আমার হাত আরও শক্ত করে বলল—অপারেশনের ভয় আমার

গলার স্বর শুনে চমকে উঠলা বললাম—তা হবে?

বিরজা পাশের বেবী-খাটে ছেলের দিকে তাকিয়ে বলল—এটা না হয়ে যদি মেয়ে হত!

এইবারে বুঝলাম। বললাম—ত কি হয়েছে? অপারেশন তাহলে থাক।

দেখলাম বিরজার মুখের সেই পা ভাব কেটে গেল। চোখে মুখে হা আভা খেলে গেল।

বলল—কিন্তু ওঁকে কি বলব?

বললাম—সেজন্য ভাববেন না। বলে, কাল যে পরিমাণ রক্ত ক্ষয় হয়ে তাতে এ অপারেশন এখন আর চলবে না। আপনি শুধু বলবেন ডাক্তার অপারেশন করল না তা আপ জানেন না।

বিরজা খুশীতে উচ্ছ্বসিত হ আমার হাতটা একটু ঝাঁকিয়ে ছে দিল।

নার্সকে ডেকে বললাম—অপারেশ হবে না। রুগীকে খেতে দিন।

নার্স অবাক হয়ে গেল। বল—সে কি? কেন?

কাছে গিয়ে ফিস্ ফিস্ ক বললাম—গোলমাল আছে।

সার্জনকে টেলিফোন করে বারণ ক নীচে নেমে দেখি পুলিন বসে আছে

উদ্বিগ্ন মুখে জিজ্ঞাসা করল—কখন হবে?

মুখ খুব গম্ভীর করে বললাম—কাল ভীষণ হেমারেজ হয়েছে। এ অবস্থায় অপারেশন চলবে না।

পুলিনের মুখ শুকিয়ে গে বলল—তাহলে?

বললাম—আবার একটি হে তখন হবে। না হয় আপনি নিজে এবার করিয়ে নিন না?

পুলিন ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

ঝাঁসীর রাণী ০ মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য
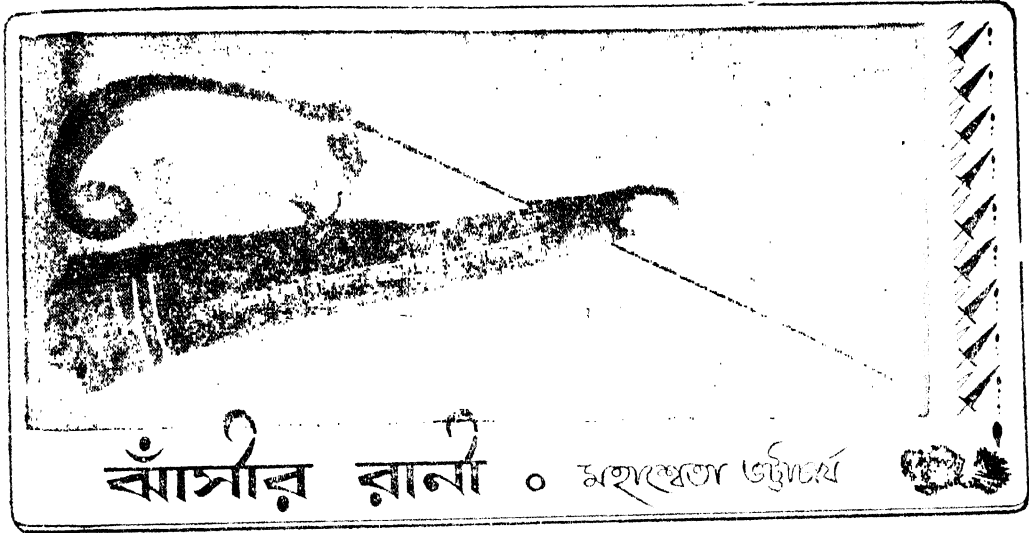
॥ ১৭ ॥

রাণীর রাজত্বকালে তাঁর চরিত্রের সম্যক পরিচয় পাওয়া গেল। ইংরাজের গুপ্তচর গোপালরাও শিরস্তাদারের বিবৃতিতে ঝাঁসীর তৎকালীন অবস্থা বেশ বোঝা যায়।

২৫।১১।১৮৫৭ সালের চিঠিতে মেজর আরস্কাইন লিখছেন,

"গোপালরাও শিরস্তাদারের খবরে জানা গেল, ঝাঁসীর রাণী বাণপুরের রাজার সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছেন। শহরের সর্বত্র ব্রিটিশবিরোধী ভাব সুস্পষ্ট। রাণী সর্বত্র নিজে ঘুরে বেড়াচ্ছেন এবং সকলকে উত্তেজিত করছেন। ভাব দেখে মনে হয়, ঝাঁসীতে যেন ব্রিটিশ শাসন ছিলই না।"

রাণীর সুশাসন সম্পর্কে অনেক কথা শোনা যায়। তাঁর শাসনব্যবস্থা, ঝাঁসী নগরী এবং নিকটস্থ অঞ্চলগুলিতে প্রধানত সীমাবদ্ধ থাকত।

রাণী প্রত্যহ অত্যন্ত ভোরে উঠতেন। রাজা গঙ্গাধর রাওয়ের জীবদ্দশায় তাঁর শরীর-চর্চা ইত্যাদি করবার বিশেষ সুবিধা ছিল না। এখন তিনি শরীর-চর্চা করতেন। মালখাম্বা, মুগুর আদি অভ্যাস করতেন। ঘোড়া চড়বার সময়ে ঘোড়াকে সম্পূর্ণ গণ্ডি বেষ্টন করে অশ্বমণ্ডলী অভ্যাস করতেন।

শরীর চর্চার পর তিনি শরীর মালিশ করাতেন, চুলে সুগন্ধি তেল দিতেন, তারপর সুবাসিত জলে স্নান করতেন। ঝাঁসীর সিরাজু পরিবার আতর বিখ্যাত গন্ধদ্রব্যের কারিগর সিরাজুদ্দের জ্ঞাতি ছিলেন। তাঁদের তৈরী আতর ও সুগন্ধি বিখ্যাত ছিল। রাণীর স্নানেতে তাঁর ব্যবহৃত সুগন্ধি জল সংগ্রহ করতেন রাজপরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিবারের মেয়েরা।

বিধবা বলে তিনি নিত্য কেশসিক্ত করে স্নান করতেন এবং দাসীরা হাতে ছোট ছোট চুল্লী নিয়ে তাঁর চুল শুকিয়ে দিত। কেশ-প্রসাধন করে শুদ্ধবস্ত্র 'ঘোরড়া' পরে তিনি তুলসীমঞ্চে জল-সিঞ্চন করে স্বজাতীয় প্রথানুযায়ী স্বামীর দেহান্তেও চুল কেটে ফেলেননি বলে প্রায়শ্চিত্ত পূজা করতেন। এই সময় ভজনকার ও গীতিকার তাঁকে গান শোনাত।

১৮৬৫ সালে মোরোপন্ত তাম্বের একটি পুত্রসন্তান হয়। রাণী এই বৈমাত্রেয় ভাইটিকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। শিশু চিন্তামণিকে প্রায়ই তিনি কাছে এনে রাখতেন। তাঁর জন্য দুধ-ধাই রেখেছিলেন, দেখাশোনার জন্য দাসী রেখেছিলেন।

প্রাতঃ-পূজোর পর রাণী পুরাণ পাঠ করতেন। দামোদরও এসে মা'র কাছে এই সময় বসতেন।

পুরাণ পাঠের পর তাঁর সঙ্গে বিভিন্ন সর্দারেরা দেখা করতে আসতেন।

আহার বিষয়ে তিনি অত্যন্ত অনাড়ম্বর রুচিসম্পন্না ছিলেন। তাঁর বিমাতা বলেছেন, মকাই এবং ভুট্টার সময়ে ভুট্টা খেয়েই তাঁর অনেকদিন কেটে যেত।

আহারের পর তিনি সামান্য বিশ্রাম করতেন।

বেলা তিনটের সময়ে তিনি দরবারে যেতেন। তখন তিনি কোনদিন পরতেন পাঠানী পোশাক। চন্দেরী শাড়ী আজও মধ্যভারতে বিখ্যাত। চন্দেরী তৈরি হ'ত চন্দেরী, গোয়ালিয়র ও ইন্দোরে। কাশী ও বাঙলার বেনারসী, পট্টবস্ত্র এবং রেশম অপেক্ষাকৃত অপরিচিত ছিল মধ্যভারতে। চন্দেরী ছিল মধ্যভারতের সম্ভ্রান্ত রমণীদের প্রিয় বস্ত্র। রাণী কখনো সাদা রেশমের শালওয়ারের উপর নীল চন্দেরীর আঙ্গরাখা পরতেন। মাথায়

কখনো মুরেঠা, কখনো শিরমৌল্ বাঁধতেন। স্বামীর মৃত্যুর পর নথ, কানে বুগড়ী বা ঝুলোনদা, গলায় কণ্ঠচাপ্ত পরতেন না। হাতে এক গাছা হীরের বালা, হীরের আংটি এবং একটি মুক্তার কণ্ঠী ছিল তাঁর একমাত্র ভূষণ। কখনো শাদা চন্দেরী শাড়ী পরতেন স্বদেশীয় ভঙ্গীতে।

দরবারের দরবারীরা একজনও অনুপস্থিত থাকলে তাঁর নজরে পড়তো। স্মৃতিশক্তি ছিল তাঁর ভীষণ। প্রত্যেক দরবারীর নামধাম জানতেন তিনি। দরবারের কাজকর্ম সবই তাঁর নিজস্ব তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হ'ত। কাগজপত্র তাঁকে শুনিয়ে নিতে হ'ত এবং প্রয়োজন হলে তাঁর নির্দেশে লেখা হ'ত হুকুমনামা। রাণী লক্ষ্মীবাঈয়ের মণ্ডলীর মধ্যে লছমনরাও বান্দে, রামচন্দ্ররাও দেশমুখ, নানা ভোপটকার, লালাভাও বক্সী, জবাহির সিং, রঘুনাথ সিং, জমা খাঁ, দুলহাজু এঁদের নাম উল্লেখযোগ্য। মারোপোন্ত তাম্বে সর্বদাই মেয়ের শুভ-কল্যাণের জন্য তৎপর থাকতেন। রাণীর বিমাতা চিমাবাঈ ছিলেন তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু। মেয়েদের মধ্যে কালী, মান্দার, গঙ্গুবাঈ, হীরাকোরিণ, ঝলকারী, বেশিনী, মোতি এবং শালিনীর নাম উল্লেখযোগ্য।

ঝাঁসীর কুলস্বামিনী মহালক্ষ্মী মন্দিরের প্রতি রাণীর শ্রদ্ধা-ভক্তি ছিল। প্রতি শুক্রবারে উপবাস করে সন্ধ্যায় তিনি বালক দামোদরকে সঙ্গে নিয়ে একা যেতেন মন্দিরে। কখনো তাঁর সুবিখ্যাত সুবর্ণমেণা বা পালকি চড়ে বেরোতেন। সেদিন 'চৌঘড়া' বা সানাই বাজত লছমী দরোজার পাশে। রাণীর সুন্দরী সহচারিণীরা সেই পাল্কি বইতেন। রাজকোষ থেকে তাঁদের দেওয়া হোত জরির চেলি ও শাড়ী, পায়ের নাগরা। রূপোর চামর দোলাত সহচারিণীরা, পেছনে ২০০ আফগান পদাতিক ও ১০০ জন অশ্বারোহী, সামনে বাজনদারদের দল চলত।

ঝাঁসীর বিখ্যাত গ্রন্থাগারটিকেও তিনি সমধিক উন্নত করেছিলেন। মূল্যবান সাচ্চা সোনার তার ... বাঁধিয়েছিলেন বইগুলি। ... গীতার অন্তত কুড়িটি সংস্করণ ... একটি ছিল তাঁর ব্যক্তিগত ... কলাকার, শিল্পী, গায়ক ... শাস্ত্রীরা তাঁর কাছে সাহায্য ... ঝাঁসীতে বহু মারাঠী ব্রাহ্মণ ... স্থায়ী বাস ছিল। সেই সময় ... এসেছিলেন বিষ্ণুভট্ট গোড়সে ... সোইকর। তাঁর ব্যক্তিগত ... তিনি লিপিবদ্ধ করে গেছেন। ... বইখানি থেকে ঝাঁসীর অনেক ... জানা যায়।

ঝাঁসীতে মেয়েদের অবাধ স্বাধীনতা এবং স্বচ্ছন্দ বিহার দেখে তিনি চমৎকৃত হয়েছিলেন। ঝাঁসীতে মেয়েরা ... রাস্তা দিয়ে চলতেন, ঘোড়া চড়তেন ... হরিদ্রা-কুঙ্কুম জাতীয় উৎসবে ... ধুমধাম করে আনন্দ করতেন।

পারোলাতে সেনালকর ... পুরোহিত ঢেকরেরা ঝাঁসীতে ... ছিলেন। সুবিখ্যাত ধনী ... পরিবারের মহিলারা যে রকম ... অলংকারাদি পরতেন, তাই দেখে ... চমৎকৃত হতেন।

লালুভাও ঢেকরে একদা রাণীর কাছে একটি দরিদ্র ব্রাহ্মণকে ... আসেন। ব্রাহ্মণ জানালেন, ... দেশস্থ শ্রেণীর মারাঠী ব্রাহ্মণ। ... পত্নীর বিয়োগান্তে, বিবাহেচ্ছায় ... একটি দ্বাদশবর্ষীয়া কন্যার ... কাছে প্রস্তাব করেন। পিতা ... টাকা চেয়েছেন। ব্রাহ্মণ ... বললেন—

"তে মী' গরীবানে' কোঠুন আণ..."

রাণী তাঁকে পাঁচশো টাকা দিয়ে ... করলেন। কৌতুক-হাস্যে বললেন ... "লগ্ন স্থির হলে আমাকে ... পত্রিকা পাঠাতে ভুলবেন না।"

ডিসেম্বর মাসে তীব্র শীত ... রাণী যখন মন্দির থেকে ফিরছেন, ... ঘিরে ধরল দরিদ্র কিষাণ ও ভিখারী ... রাণী খলিফাদের ডেকে এক ... তুলোর কোট, টুপি ও মেরজাই ... দিলেন। সেই শীতবস্ত্র ও ... বিতরণ করলেন শহরে।

রাণীর অশ্ব-পরীক্ষা সম্পর্কে বিবিধ কাহিনী প্রচলিত। তখন অশ্বারোহণ ঘরে ঘরে চলত। বিশেষ পারদর্শী না হলে কারো খ্যাতি ছড়াত না অশ্বারোহণ বিষয়ে। উত্তর হিন্দুস্থানে তিনজন অশ্বারোহীর নাম ছিল প্রসিদ্ধ। নানা-ধুন্দু পন্থ, বাবাসাহেব আপ্তে গোয়ালিয়রকর এবং ঝাঁসীর রাণী।

একদা এক ইংরাজের সঙ্গে বাজি রেখেছিলেন বাবাসাহেব আপ্তে। ইংরাজ বাবাসাহেবকে বললেন—শুনেছি, আপনি একশোটি ঘোড়ার কৌশল জানেন। শুনবেন, আমি জানি একশো একটি।

বাবাসাহেব সবিনয়ে জানালেন, পরীক্ষা হয়ে যাক। একটি মস্ত কুয়োর মুখে কাঠের বরগা ফেলা হ'ল। সে কুয়োর মধ্যে কোন কারণে পড়ে গেলে উদ্ধার অসম্ভব। সাহেব সেই কুয়ো পার হবেন ঘোড়ায় চড়ে। তিনি যখন মাঝপথে, তখন বাবাসাহেব অন্যদিক থেকে ঘোড়ায় চড়ে উঠে এসে মাঝপথে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বললেন—"একটি মাত্র কৌশল দেখান আপনি যে, ঘোড়াকে নিরাপদে পেরিয়ে নিয়ে যান।" সাহেব পরাজয় স্বীকার করলেন। এগিয়ে যাওয়া চলবে না, পিছু হটা অসম্ভব; পড়ে গেলেই মৃত্যু। বাবাসাহেব তখন তাঁর অশ্বকে নির্দেশ দিলেন, অশ্ব পিছনের পায়ে উঠে ঘুরে গেল এবং পেরিয়ে চলে গেল। সাহেব নিরাপদ মাটিতে এসে বাবাসাহেবকে ভূয়সী প্রশংসা করলেন।

রাণীর সম্বন্ধেও এমনি সব গল্প আছে। একদা তাঁর কাছে সবচেয়ে বড় অশ্ববিক্রেতা মিঞা ইরাণী দুটি ঘোড়া নিয়ে এল। একটি নয়নমনোহর। বলল—দাম ঠিক করে দিন। রাণী বললেন—সুন্দর ঘোড়াটির দাম পঞ্চাশ টাকা, অন্যটি হাজার। বললেন—সুন্দর ঘোড়াটির ফুসফুস ফুটো। ও বাঁচবে না বেশীদিন, কিন্তু অন্য ঘোড়াটি অনেক দিন। রাণীর কথা মেনে নিল অশ্ব-বিক্রেতা। রাণী দুটি ঘোড়াই কেনেন। প্রথম ঘোড়াটিকে খাইয়ে-দাইয়ে তাজা করে রাখেন এবং অপর ঘোড়াটি তিনি বড় আদর করে রাখেন। এই ঘোড়ার নাম ছিল রাজরত্ন।

অন্য সময়ে তাঁর কাছে একটি অতি সুলক্ষণা, বলিষ্ঠ, তেজী ঘোড়ী নিয়ে এসে অশ্ববিক্রেতা জানান—এই ঘোড়ী পিঠে সওয়ার রাখে না—তার বদনাম হয়ে গেছে, বেচা চলছে না। রাণী চড়ে দেখলেন ঘোড়ীটি। পিঠ থেকে না নেমেই বললেন—আমি এই ঘোড়ী কিনব।

কিনবার পর বললেন—ঘোড়ীর পেটের ডানদিকে একটি বেদনা আছে, চড়তে গেলেই সেখানে ব্যথা লাগে ও ঘোড়ী ছট্‌ফটিয়ে ওঠে। অশ্ববিক্রেতা বিশ্বাস করল না। রাণী অশ্ব-চিকিৎসক এনে অস্ত্রোপচার করালেন। একটি পেরেক বেরোল পাঁজর থেকে। এই ঘোড়ী উত্তরকালে তাঁর একান্ত প্রিয় সারেংগী ঘোড়ী নামে খ্যাত হয়েছিল।

একদা গোয়ালিয়রের বিখ্যাত নাট্যাধিকারী সদোবা তার ভ্রাম্যমান দল নিয়ে ঝাঁসীতে এল। তার দলে ছিল পঞ্চাশজন নট, গায়ক ও বাদক। রাণী নিত্য তাদের সিধা পাঠালেন ও শহরে সে নিত্য নাটক করতে লাগল।

একদিন আয়োজন হ'ল প্রাসাদে। অন্তঃপুরের মেয়েরা দেখবেন। নাটক হবে হরিশচন্দ্র। নাটকের শেষ দৃশ্যে হরিশ্চন্দ্র শ্মশানে মৃৎকলস ভাঙবেন, এই দৃশ্যের অভিনয় করতে সদোবাকে নিষেধ করলেন প্রৌঢ়ারা। মহারাষ্ট্রীয়রা মৃতদেহকে মৃৎকলসে তপ্ত জলে স্নান করিয়ে সেই কলস শ্মশানে ভাঙেন। ঘরে সেই দৃশ্য অভিনয় করাতে প্রাচীনাদের সংস্কার ছিল। সদোবা কাতরভাবে রাণীকে জানাল, এমন করলে তার নাটকের রস ক্ষুণ্ণ হবে। রাণী অনুমতি দিলেন। সদোবা সেই মৃৎ-কলস ভাঙবার সঙ্গে সঙ্গে প্রৌঢ়ারা বললেন—অপশকুন আছে। অর্থাৎ অমঙ্গল ঘটল। সদোবা অপ্রস্তুত হ'ল। রাণী করুণাপরবশ হয়ে সদোবাকে পুরস্কৃত করলেন এবং মহিলাদের বললেন—"সামান্য নাটক অভিনয়ের সঙ্গে অমঙ্গল ঘটবার কোন যোগ নেই। আপনারা মিথ্যা ভয় পাচ্ছেন।"

অন্তঃপুরিকারা কিন্তু সেকথা ভুললেন না। এই ঘটনার বিশ-ত্রিশ বছর বাদেও রাণীর কথা যদি উঠত, তখন গলা নামিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বৃদ্ধারা বলতেন—"বাইসাহেব তো কারো কথা মানতেন না। সেদিন যদি সেই নাটক করে অমঙ্গল না ডাকতেন বাইসাহেব, তাহলে ঝাঁসীর রাজপরিবার এমন করে অভিশপ্ত হয়ে যেত না।"

তাঁদের ধারণা ভুল। দৈব রাণীর প্রতিকূলে ছিল না। তাঁর বিরুদ্ধে সমরায়োজনে তৎপর হয়ে উঠেছিলেন ব্রিটিশ সরকার। ক্যানিংয়ের জরুরী পরোয়ানা পৌঁছেছিল সাত সাগরের পারে। আধখানা পৃথিবী পাড়ি দিয়ে একখানি জাহাজ সেপ্টেম্বর মাসেই পৌঁছেছিল বোম্বাইয়ের ডকে। সেই জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখছিলেন এক প্রবীণ সৈনিক। মালোয়া এবং মধ্যভারতকে ইংরেজের হাতে ফিরে দেবার জন্য এসেছেন তিনি। নাম তাঁর হিউরোজ। (ক্রমশ)

ঘটনাটি আমার কাছে যতটা রহস্যজনক মনে হয়েছিল, সোনালির কাছে ততটা নয়। আগাথা ক্রিস্টির পোকা সোনালি, ও তাই হার্কুল পায়রোটের মতো সহজ বিশ্লেষণ করে বললে, ডাক্তার আসলে মেয়েটাকে খুন করেছে।

খুন? আমি রীতিমতো অবাক।

হ্যাঁগো। সোনালি গোয়েন্দার ভাষায় বললে, মোটিভটা তো পরিষ্কার। সম্পত্তি, টাকাপয়সা।' লোকটাকে প্রথম দেখেই আমার কেমন সন্দেহ হয়েছিল।

সোনালির বুদ্ধি নিশ্চিন্ত সমাধান খুঁজে পেলেও আমি অমন সহজে মেনে নিতে পারছিলাম না। ডাক্তার মিত্র খুন করেছেন? ...সম্পত্তির জন্য?...

হাওয়া বদলাতে খাণ্ডালা এসেছি। এক মাস হয়ে গেল। আমি আর সোনালি দুটি প্রাণী। এমন নির্জন পাহাড়ী জায়গায় সময় কাটানোও এক দুশ্চিন্তা। সোনালির কি? বাক্স ভর্তি আগাথা ক্রিস্টি, কার্টার ডিকসন, এলেরী কুইন আর রেক্স স্টাউট। খুনখারাবী মেয়েদেরও যে এত ভালো লাগে সোনালিকে বিয়ে করবার আগে জানতাম না। সোনালি তো খুনীর পেছনে ঘুরে ঘুরে সময় কাটাচ্ছে, কিন্তু আমি করি কি? কিন্তু ভাগ্য ভালো আমার। পরদিন বিকেলেই পাশের বাড়ির প্রতিবেশীর সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। ভদ্রলোক বাঙালী। ডাক্তার পীযূষ মিত্র। খাণ্ডালাতে আছেন পনেরো বছর। বেশ ডাকসাইটে ডাক্তার। ব্যাচেলর। মাঝে মাঝে ওঁর টেবিলে চা খেতে শুরু করলাম। আমার টেবিলেও ডেকে আনি কোনদিন। সোনালি লুচি করে দেয়, চপ কাটলেটও করে। সাতসতেরো আ[...] করি। কাশ্মীর, জওহরলাল, রবীন্দ্র[...] ক্যানসার, আবহাওয়া।

কিন্তু হঠাৎ ছন্দপতন ঘটল। [...] অনুপস্থিত। প্রথমে ভাবলাম [...] তারপর দেখলাম শাড়ি। সোনা[...] সাহিত্যরুচিতে পুরুষ হলেও কৌতূ[...] অকৃত্রিম নারী। ডাক্তার মিত্রের বা[...] শাড়ি এল কি করে?

খাওয়ার টেবিলে ফিস ফিস [...] জানালো সোনালি,—আজ দেখেছি[...]

দেখেছো?

—হ্যাঁ, বললে বিশ্বাস করবে[...] আরতি রায়।

আরতি—?

তোমাদের 'ফিল্মস্টার গো, যার [...] ভেবে তোমাদের রাতে ঘুম হত না, [...] আরতি রায়।

ডাঃ মিত্রের সঙ্গে ওর কি সম্পর্ক থাকতে পারে। তুমি কি দেখতে কি দেখেছো। আত্মীয়াটাত্মীয়া হবেন।

আত্মীয়া বুঝি? তুমি কি করে জানলে? দরদী এসেছেন আমার।—বলে ডাল দিতে গিয়ে টেবিলে ডাল ফেলে সোনালি, হুঁ, আত্মীয়া, পরমাত্মীয়া! গজগজ করে ও।—এ'সব পরমহংসদের আমার চেনা আছে, বুঝেছ।

সত্যিই আরতি রায়।

সেদিন বিকেলেই সোনালি ডেকে আমায় দেখালো। ডাঃ মিত্রের বেডরুমের জানালা দিয়ে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। খুব দুর্বল লাগছিল, কিন্তু আরতি যে সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না।

ডাঃ মিত্রের চরিত্র সম্পর্কে এবার আমিও সন্দেহাক্রান্ত হলাম।

সত্যিই তো, ব্যাচেলর মানুষ, তার ঘরে আরতি কেন। যে আরতির গাদা গাদা স্ক্যাণ্ডাল শুনে আমাদের কান ঝালাপালা, সে মেয়ের সঙ্গে পীযূষবাবুর যোগাযোগটা আমাদের কাছে বিশেষ রুচিকর লাগল না। এরকম লোকের সঙ্গে আলাপ হওয়াটাই উচিত হয়নি, সোনালির এই সিদ্ধান্ত আমার কাছে যুক্তিসংগতই মনে হল।

দিন কাটতে লাগল। সোনালির রহস্য-উপন্যাসে তেমন মন নেই আজকাল, বিকেলে চায়ের টেবিলে ও পাশের বাড়ির খবর দিতে থাকল। মুখরোচক খবরগুলো ছাড়া বিকেলের চা-ই বিস্বাদ লাগত আমার। পরচর্চা এমন উপাদেয় আগে ভালো করে জানতামই না!

কিন্তু হঠাৎ অনেকদিন বাদে ডাক্তার সে হাজির হলেন। বিকেল বেলা। ডাক্তার আমাদের মুখচোখের অসৌজন্য উপেক্ষা করে বললেন, মিসেস গাঙ্গুলী, আপনি আমাকে একটা জিনিস দিতে পারেন?

সোনালি তেতো গলা একটু ভিজিয়ে বললে, কি জিনিস?

একটু সিঁদুর।

—সিঁদুর?

হ্যাঁ বড্ড দরকার। দিতে পারেন। হ্যাঁ, আমি বিয়ে করছি।

বিয়ে? —সোনালি বিষম খেল। আমি খুব চমকেছি সন্দেহ নেই কিন্তু নিজেকে সংযত করলাম। ব্যস্ত হয়ে বললাম,—সিঁদুরটা দিয়ে দাও সোনালি। সোনালি প্রায় ছুটে গিয়েই নিয়ে এল। কৌটোটা হাতে পেয়ে ডাক্তার আর দেরি করলে না, ধন্যবাদ জানিয়ে চলে গেল।

আমরা দুজন মুখ চাওয়াচাওয়ি করি।

এর তিনদিন বাদে মাঝরাত্তিরে মারা গেল আরতি। মাঝরাত্তিরে শোরগোল শুনে জেগে খবর পেলাম আমরা। সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন অসম্ভব ঠেকল। কিন্তু ভোরসকালেই দেখলাম। অজস্র ফুলে সাজানো আরতির মৃতদেহ।

কলকাতা থেকে হঠাৎ আরতি রায়ের আগমন, ডাঃ মিত্রের সিঁদুরকৌটো চেয়ে নিয়ে বিবাহ আর তারপর আচমকা মাঝ-রাত্রিতে মৃত্যু সবটা মিলিয়ে কেমন গা ছমছম রহস্যের গন্ধ।

কিন্তু সোনালির সিদ্ধান্ত সম্পর্কে ওর অটুট বিশ্বাস। খুন। আরতি রায়ের সম্পত্তির জন্যই ডাঃ মিত্রের বিবাহ ও হত্যা।

এমন রোমহর্ষক ঘটনা আমি মেনে নিতে না পারলেও একটু যেন ভয় ভয় একটা 'হয়তো' লুকিয়ে ছিল মনের ভেতর। ডাঃ মিত্রকে আর আমি কতটুকুই বা জানি। হয়তো, হয়তো সোনালি যা বলছে, নাঃ, কিছু ঠিক করতে পারছিলাম না। যাকগে, তার চেয়ে নিজের শরীরের ভাবনাই ভাবি।

কোথাকার কে ডাক্তার মিত্র, কোথাকার কে আরতি রায় তাদের সম্পর্কে আমার এতটা উদ্বিগ্ন না হলেও চলবে। মনে মনে এমন একটা সিদ্ধান্ত করে নিজেকে অনেকটা হাল্কা মনে হল। ভুলেই হয়তো যেতাম, কিন্তু......

. .

সিদিন বিকেলে টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছিল। রোদ্দুরের শুভদৃষ্টি ছিল সেই সঙ্গে অম্লান। সেই শেয়ালের বিয়ে বিকেলে, রেশমী সুতোর মতো বৃষ্টির ধারায় স্নিগ্ধ পাহাড়গুলোর দিকে তাকিয়ে বারান্দায় বসেছিলাম। আত্মমগ্ন সোনালি ব্যস্ত ছিল বেণীবন্ধনে। সোনালির দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছিল ও সত্যিই সুন্দরী। অজস্র চুলের মাঝে ওর মুখ, যার ওপর ভেজা রোদ্দুর কমলা রঙের একটা আভায় ওকে গোধূলি-মদির বাসরবধূর মতো লাবণ্যময়ী করেছে, সে মুখ থেকে চোখ ফেরাতে পারছিলাম না। এ এক নতুন আবিষ্কার। আস্তে আস্তে ডাকলাম,—সোনালি।

উঁ। চোখ তুলল ও।

শোন।

কি?

কাছে এসো।

কেন?

এসো না।

চুল বেঁধে নি দাঁড়াও।

না। শোন তুমি।

সোনালি উঠল। কাছে এসে ব...
—কি বলো?

দু'হাতে ওর কোমর জড়িয়ে কাছে টেনে নিলাম আমি।

আরে আরে কি হচ্ছে, ছাড়ো ছা... বলছি।

না।

এই অসভ্য, ছাড়ো। দেখো, কে ... আসছে গেট দিয়ে, ছাড়ো শীগ্‌গির।

ছেড়ে দিলাম। সত্যি গেট খু... এগিয়ে আসছে একজন। এগিয়ে আসা... ডাক্তার মিত্র। মুহূর্তে আমার মুখ কা... হয়ে গেল, সোনালির মুখ আরো। সি... দিয়ে উঠে আসতেই কাষ্ঠহাসি হে... সোনালি এড়িয়ে-যাওয়া গোছের এক... নমস্কার করলে। তারপরই আমার দি... তাকিয়ে বললে,—মাথা ধরেছে বলছ... বসে আছো কেন। বিছানায় গিয়ে একটু রিলাক্স করো না।

ডাক্তার মিত্র বোকা নন। ম... ম্লান হেসে বললেন,—মিছেমিছি ব্যস্ত হবেন না আপনারা, আমি বসতে আসিনি। মিসেস গাঙ্গুলী, আপনার সিঁদুরের কৌটোটা ফেরত দিতে এসেছি। পকেট থেকে কৌটোটা বার করলেন ডাক্তার।

না না, ব্যস্ত,—বলে সোনালি আরো বিব্রত বোধ করল নিজেকে, তারপর হাত বাড়িয়ে দিল কৌটোটার জন্য।

কার দোষ জানি না, হাত ফসকে কৌটোটা মাটিতে পড়ে গেল আর সমস্ত সিঁদুর ছড়িয়ে পড়ল বারান্দায়। সোনালি আর ডাক্তার দুজনই বোকার মতো তাকিয়ে রইল সেদিকে। তারপর চোখ যখন তুলল তখন সেই কমলা রোদের ভেজা আলোয় স্পষ্ট দেখলাম দু'ফোঁটা জল। ডাক্তার মিত্রের চোখে চকচক করছে দু'টি অশ্রু বিন্দু। সোনালিও দেখল। এইবার আমি কথা বললাম,—ডাক্তারবাবু, বসুন। হাত ধরে সামনের বেতের চেয়ারে বসিয়ে

লাম আমি। দু'হাতে মুখ ঢেকে ধপ করে বসে পড়ল ডাক্তার। সোনালি কিছু বলতে যাচ্ছিল, আমি ঠোঁটে আঙুল রেখে তাকে মানা করলাম। নিঃশব্দ কয়েকটা মুহূর্ত। শুধু ঝিরি ঝিরি বৃষ্টির নুপুর।

—আমার জীবনে সিঁদুর কোনদিন আসরে ভাবতেও পারিনি আমি। এলেও তা এমনি সামান্য চারটে দিনের জন্যে তাও কি জানতাম।—দীর্ঘশ্বাস ফেলে মুখ তুলে তাকালো ডাক্তার।—এক গ্লাস জল দেবেন মিসেস গাঙ্গুলী।

সোনালি উঠল, কুজো থেকে জল গড়িয়ে এনে দিল। এক নিঃশ্বাসে গ্লাস খালি করে দিয়ে বললেন ডাক্তার, আমার পাগলামীকে ক্ষমা করবেন আপনারা। সদুরটা নষ্ট হওয়ায় আমি লজ্জিত। আমি চলি।

এবার সোনালিই বাধা দিলে।—না না, আপনি বসুন। না জেনে রূঢ় ব্যবহার আমরাই করেছি। এমনি ভাবে চলে গেলে আমরা সত্যি বড় কষ্ট পাব ডাক্তারবাবু। আপনি বসুন।

বেশ খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ ডাক্তার বলে উঠলেন, আচ্ছা মৃন্ময়বাবু, আপনি তো লেখক মানুষ, বলতে পারেন, আসলে ভালোবাসাটা বড়, না ভালোবাসার দম্ভটা?

আচমকা প্রশ্নটা, বলা বাহুল্য আমার বোধগম্য হয় না। ডাক্তার তাই হাসলেন, হেঁয়ালী লাগছে, না? বেশ সবটাই বলি। এই বলার পেছনে সস্তা একটা অহমিকা হয়তো নজরে পড়বে আমার, ওটা যদি একটি উচ্চস্বর মনে হয়, মাপ করবেন। সেধে যাদের গান শুনতে হয় তাদের চেয়ে সেধে যারা গান শোনায় তারা ছোট দরের শিল্পী সন্দেহ নেই। তবু শ্রোতারা তাদের ক্ষমা করে। কারণ তাদের সুরে বারোয়ারী ব্যাপ্তি নেই ঠিকই, কিন্তু স্বরে আত্মতুষ্ট ব্যক্তি স্পষ্টগোচর। এই ছোট ছোট সন্তুষ্টিকে হাততালি দিতে মানা নেই। চুপ করলেন ডাক্তার। বাইরে তখন রোদ সরে এসেছে, বৃষ্টির রঙটাও তাই নিষ্প্রভ হয়ে আসছে। সেদিকে তাকিয়ে বলতে শুরু করলেন ডাক্তার। আরতির সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ স্টুডিওতে। আমার তখন মেডিক্যালে ফাইনাল ইয়ার। রঞ্জন চৌধুরীকে চেনেন নিশ্চয়ই, রঞ্জনদা আমার দাদার বন্ধু ছিলেন। দাদার বন্ধু বলে দাদার মতোই শ্রদ্ধা করতাম, কথা বিশেষ বলতাম না, কালেভদ্রে হয়তো এক-আধটু সামান্য বলেছি। রঞ্জনদা তখনই নামকরা পরিচালক, একটা ছবি করে বেশ নাম করেছেন। ক্রিকেট খেলে বাড়ি ফিরছি একদিন, দেখলাম, ড্রইংরুমে দাদা আর রঞ্জনদা গল্প করছেন। আমাকে দেখেই রঞ্জনদা বললেন ওহে পীযূষ, শোন তো এদিকে।

কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম।

—একটু উপকার করতে পারো ভায়া? আমার নতুন ছবিটায় হাসপাতাল হচ্ছে পটভূমি। ডাক্তার নার্সের গল্প। আমার তো ওসব বিদ্যে একেবারেই নেই। কয়েকটা সেটে তুমি যদি এডভাইজার হয়ে থাকো বড় উপকার হয়।

আমি জবাব দেবার আগেই দাদা বললেন,—তা ওকে অনুরোধ করবার কি হয়েছে রঞ্জন, ও যাবে। যখন দরকার হয় খবর পাঠিয়ে নিয়ে যেও।

আমি, বলা বাহুল্য, মাথা নাড়লাম।

রঞ্জনদা হেসে বললেন, পীযূষ ডাক্তারী পড়ছে বলে আমার এমন উপকারে লাগবে কে জানত। তা পীযূষ এ কাজে যে তোমার বিরক্তি লাগবে না তা বলতে পারি। ছাত্রীটি কে হবে তোমার জানো? আরতি রায়। কি, পছন্দ তো?

আমি বোকার মতো একটু হেসে চলে এলাম।

খাওয়ার টেবিলে আমাকে একা পেয়ে বৌদি খুব ঠাট্টা করলেন। খবরটা নিশ্চয়ই রঞ্জনদা দিয়েছেন বৌদিকে।

—তারপর ঠাকুরপো, আরতি রায়কে ডাক্তারী শেখাতে গিয়ে নিজেই আবার ওর পেশেণ্ট হয়ে যেও না যেন।

কি যে বলো বৌদি,—লাজুক গলায় বললাম। তখন কি ছাই পীযূষ মিত্র বুঝতে পেরেছিল সত্যি আরতির কাছে পেশেণ্ট হয়ে যাবে ও!

রাত্তিরে শুয়ে শুয়ে ভেবেছি না জানি আরতি রায় কেমন মেয়ে। রূপ তো ওর জানতাম, সে রূপে যে কি সাংঘাতিক চুম্বক লুকোন তা সে রাতে ভেবে আন্দাজ করতে পারিনি।

সেটে গিয়ে দেখলাম আরতি রায়কে। মাপ করবেন মিসেস গাঙ্গুলী, তার সেই অপূর্ব স্বাস্থ্যে তখন ভলকানো। খুব নার্ভাস হয়ে গেলাম। আমাকে দেখে মৃদু হাসলে আরতি,—রঞ্জনবাবু, এই সেই মেডিক্যাল স্টুডেণ্টটি, যে সব দেখাবে-টেখাবে?

রঞ্জনদা বললে, হ্যাঁ।

আরতি ব্লাউজের বোতামটা আঁচল দিয়ে আলতো একটু ঢেকে বললে, একেবারে বাচ্চা তো।

শুনে কান পর্যন্ত অপমানে লাল হয়ে গেল আমার। আরতি রায় এমনি একটি স্বাস্থ্যবান সুপুরুষ, (তখন লোকে সত্যি সুপুরুষই বলতো আমাকে) যুবককে একেবারে নস্যাৎ করে দিল বাচ্চা বলে! গা জ্বলে উঠল আমার। কাঁচা বয়েসের রাগে বলে উঠলাম, রঞ্জনদা আপনি একাজের জন্য বেশ বড় দেখে এডভাইজার জোগাড় করুন, আমি চললাম।

আরে আরে আরতি চেয়ার ছেড়ে উঠে হাত চেপে ধরলেন আমার—বাচ্চা বলেছি বলে বাচ্চার মতো চট'তে আছে বুঝি? বসুন, বাচ্চা ছেলেই তো আমার পছন্দ। রাগ করবেন না। বসুন।

দু'চোখ তুলে তাকালাম ওর চোখের দিকে। সমস্ত অভিমান মুছে গেল আমার। জানিনা সেদিন ওর চোখে কি ছিল। আজো ভেবে কূল পাই না আমি কি দেখেছিলাম সেদিন ওর চোখ দুটোয়। বিদ্যুৎই ছিল বোধ হয়, যা ভালো করে দেখতে পাইনি, যখন পেলাম তখন বজ্রকে এড়ানো সম্ভব ছিল না।

কাজ চলতে লাগল। রোজ কাজ শেষ হয়ে গেলে মন খারাপ লাগত আমার, একটি মিষ্টি দিন তো ফুরিয়ে গেল! দিনের পর দিন ওর আকর্ষণ দুর্বার হয়ে উঠল আমার কাছে। একটা সেট শেষ হলে অধৈর্য অপেক্ষায় থাকতাম পরের সেটের জন্য। এমনি একমাস পরে একটা সেট লাগাতে আমি ন'টায় গিয়ে হাজির হলাম। এত তাড়াতাড়ি আসায় নিজই লজ্জিত বোধ করেছিলাম। তারপর শুটিং শুরু হবার সময় হঠাৎ খবর এলো। খবর এলো আরতি রায়ের শরীর খারাপ আসতে পারবেন না। হঠাৎ আমার কি হল। চুপি চুপি প্রোডাকসন ম্যানেজারের কাছ থেকে ও'র ঠিকানাটা নিয়ে সোজা হাজির হলাম বাড়িতে। পার্ক স্ট্রীটের সে মস্তো ফ্ল্যাটের প্রশস্ত সুসজ্জিত ড্রইংরুমে বসে নিজেকে বড্ড নার্ভাস মনে হল। একবার ইচ্ছে হল পালিয়ে যাই। কিন্তু তার আগেই বেয়ারা এসে বললে, আপনাকে মেমসাব ভেতরে ডাকছেন।

ঢিপ ঢিপ বুকে ঢুকলাম বেডরুমে। মস্তো বড় পালঙ্কে মাথা এলিয়ে শুয়ে আছেন আরতি রায়। চুল উস্কুখুস্কু, সারা শরীরে আলস্য। অপরূপ দেহটির ওপর বস্ত্রের আবরণ শালীনতার বিজ্ঞান মানে নি। মাথাটা আমার ঝিমঝিম করতে লাগল।

তুমি হঠাৎ আমার বাড়িতে?—(কাজের চতুর্থ দিনে আরতি আমারই অনুরোধে 'তুমি'র মাধুর্যে নেমে এসেছিল।)

মানে স্টুডিওতে শুনলাম আপনার জ্বর তাই দেখতে এলাম।

তাই বুঝি?—হাসল আরতি,—কিন্তু চোখমুখ দেখে তো মনে হচ্ছে তোমারই।

আমি প্যাণ্টের পকেটে হাত ঢু... ঘামতে লাগলাম। একটু সরে ... আরতি বললে,—বোস।

ভয় ভয় গলায় বললাম, বিছানা...

হ্যাঁ অমন ভয় পাচ্ছো কেন, বসতে বলেছি, শুতে তো বলিনি।

সারা শরীর হিম আমার। বসতে ... বললাম, কাল রাত্তিরে বুঝি জ্বর এসেছে...

জ্বর? জ্বর কোথায়? কাল ঐ ... সেনের পাল্লায় পড়ে বেশী হুইস্কী ... ফেলেছি তাই সকাল থেকে এই ... ওভার, মাথা তুলতে পারছি না।

আপনি, আপনি মদ খেয়েছেন?

কেন। জানতে না আমি মদ খাই...

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ ... বসলাম। আপনি আর মদ খাবেন ... আরতি দেবী।

কি? কি বললে—বিস্ময়ে চো... গোল গোল করে আমার দিকে তাকালে ও,—পীযূষ, আমি মদ খাই বলে তোমা... এত কষ্ট হচ্ছে কেন বলতো? ... পড়ে গেছ বুঝি?

কিছু বললাম না। চোখ যখন তুল... দু' চোখে তখন দু' ফোটা অবাধ্য ... শোয়ার, ভঙ্গী থেকে উঠে বসল আরতি... দু' হাতে মুখটা ঘুরিয়ে ধরে বললে,—ছিঃ, কাঁদছ কেন? বোকা ছেলে।

আর পারলাম না। দু' হাতে বুকে টেনে নিলাম ওকে। বাধা দিল না আরতি। শুধু কানের কাছে মুখ এনে আবেগভরা গলায় বললে,—বোকা ছেলে।

—আমি তোমাকে মদ খেতে দেবো না। কিছুতেই না।—কান্নায় বুজে আসে আমার গলা। চুলে হাত বুলোতে বুলোতে বললে আরতি,—মদ না খেলে কি তোমার এমন ভালবাসা দেখতে পেতাম ... চোখ মোছ, বাচ্চা ছেলের মতো কাঁদছ কেন। কাঁদে না, ছিঃ—আঁচল দিয়ে চোখ মোছাল আরতি। তারপর চোখে চোখ রেখে হাসল। সে চোখেরও মানে কি, তখন বুঝতে পারিনি। বুঝতে পারিনি সে চোখের আরেক নাম বুঝি ভস্মলোচন।

তারপর......

ঝড়। ঝড় বৈকি। আমার জীবনে সব মিথ্যে তখন। ...

ডিপ্লোমাটা জুটে গিয়েছিল আগেই নইলে সেটাও পেতাম না কোনদিন। সারা শহরময় কুৎসা কিন্তু আমি বেপরোয়া। উপহারে উপহারে সঞ্চিত অর্থ ঢেলে দিতে শুরু করলাম আরতির পায়ে। দাদা, যে আমাকে বাবার মতো স্নেহ করতেন, তাঁর সঙ্গে, মাতৃতুল্য বৌদির সঙ্গে ঝগড়া করে সম্পত্তি আলাদা করে নিলাম। সে সম্পত্তিও লিখে দিলাম আরতির নামে। সে কি উন্মত্ত দিন গেছে। শুধু জীবনকে ভোগ করে গেছি। পেছন ফিরে তাকাইনি, হিসেব করে দেখিনি, কি পেলাম আর কি পাইনি।

তারপর? খুব সাধারণ। ঝড় একসময় থামল। আমি তখন আরতির সেবায় নিজেকে নিঃস্ব করে ফেলেছি। তেমনি একদিনে আরতি দিল্লী গেল কি সব চারিটির কাজে। ফিরে এল সঙ্গে ছোট্ট কোন এক স্টেটের ছোকরা প্রিন্সকে নিয়ে। ফোন করেছিলাম দেখা করব বলে. জানালাম সন্ধ্যায় ও বাড়িতে থাকবে। সন্ধ্যা থেকে বসে বসে পুরোরাত জাগলাম, আরতি বাড়ি ফেরেনি। সকাল বেলায় হঠাৎ খবর পেলাম প্রিন্সটাকে নিয়ে ও গ্র্যাণ্ডে থাকছে এখন। সমস্ত ক্রোধ এক লহমায় হিংস্র হয়ে উঠল। পাগলের মতো জুটে গেলাম গ্র্যাণ্ডে। দরজা নক করে ঘরে ঢুকেই গলা টিপে ধরলাম ওর! শোরগোল পড়ে গেল হোটেলময়। প্রিন্সপুঙ্গব পুলিসও ডাকল।

চেঁচিয়ে বললাম,—তুমি এমন নীচ, নেমকহারাম—

বেড়ালের মতো শয়তানী হাসি হাসল আরতি, তারপর নিজের গলায় হাত বুলোতে বুলোতে বলল,—ইন্সপেক্টর, ওকে অ্যারেস্ট করুন। ও ঘরে ঢুকে আমাকে খুন করবার চেষ্টা করে। তারপর অস্ফুটকণ্ঠে বলল, বোকা ছেলে। ভালবাসতে এসেছিল ত্রিশ হাজারের এক সম্পত্তি হাতে নিয়ে ফুঃ।

টাকা? টাকার জন্যে তুমি,—হাত-কড়ার মধ্যে আমার হাত দুটো শক্ত হয়ে ওঠে।

না। টাকার জন্যই নয়। নতুন বাচ্চা ছেলেদের সঙ্গে প্রেম প্রেম খেলতে বেশ লাগে আমার। বেশ লাগে ওদের বোকামী চাখতে। কিন্তু একবার সে বোকামী ভেঙ্গে গেলে তাতে আর স্বাদ পাইনে। এবার পীযুষ সত্যি তুমি তেতো হয়ে উঠেছিলে। গুড় বাই।—বলে প্রিন্সের বগলে হাত ঢুকিয়ে বেরিয়ে গেল আরতি আমার চোখের ওপর দিয়ে। এতদিনের সমস্ত সম্পর্ক আরতি এক মুহূর্তে এমনভাবে উড়িয়ে দিতে পারবে কল্পনাও করতে পারিনি।

পাগলের মতো ঘুরলাম অনেকদিন, তারপর ঠিক করলাম প্রতিশোধ নিতে হবে। নির্মম প্রতিশোধ। খুন করব? না, খুন নয়। একদিন সোজা গিয়ে বললাম, তোমাকে ভালোবেসে নয়, টাকার অংকে পেতে হলে কত চাও তুমি বলো?

ব্যবসার অংক জানতে চাও?

হ্যাঁ।

পঞ্চাশ হাজার। এক মাসের জন্য। পারবে দিতে?

যেদিন পারব সেদিনই আসব।

সেদিন ফিরিয়ে দিতে পারবে না।

না। বিশ্বাস না হয় লিখে দিচ্ছি, দেবো?

দরকার নেই। তখন অস্বীকার করলে শাস্তি আমি নিজের হাতেই দেবো।

পঞ্চাশ হাজারের প্রতিজ্ঞা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। যেদিন পুরো টাকাটা হবে সেদিন নতুন একজন মানুষ হয়ে আসব ওর কাছে। আর নিষ্ঠুর নির্যাতনে ওকে নির্মম শাস্তি দেবো।

তারপর ঘুরতে ঘুরতে খাণ্ডালা। পাগলের মতো টাকা জমাতে লাগলাম।
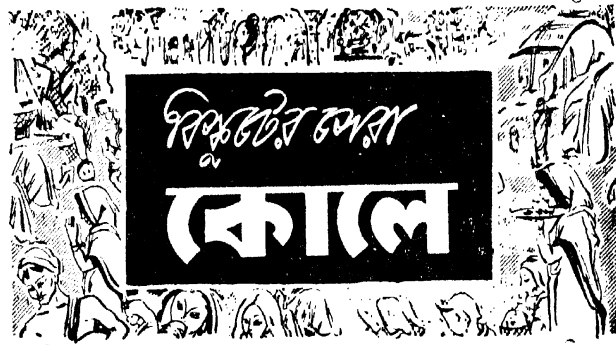
পঞ্চাশ হাজার আমাকে জমাতেই হবে। এর জন্যে কিছু বাজে কাজ করতেও লাগলাম। পয়সা চাই, প্রতিশোধ আমায় যে নিতেই হবে।

তারপরই অঘটন ঘটল। অঘটন কি? কে জানে। বোম্বে থেকে একজন আর্টিস্ট, যার অনেক চিকিৎসা আমি করেছি. একদিন গাড়ি করে নিয়ে এল এক অসুস্থ রোগিণীকে। তাকে ভালো করে দিতে হবে, দুরারোগ্য রোগ তার।

দেখলাম রোগিণী। আশ্চর্য ঘটনাচক্র। যা ভেবেছেন, আরতি রায়। হাসি পেল আমার। উচ্চস্বরে হেসে উঠতে চাইলাম। এ সেই আরতি রায় বিশ্বাস করা শক্ত। কার ওপর আর প্রতিশোধ নেবো আমি! কুৎসিত জীবনই এর ওপর প্রতিশোধ নিয়েছে আজ। অতীতই প্রতিশোধ নিয়েছে, প্রতিশোধ নিয়েছে প্রকৃতি। আরতির সিফিলিস হয়েছে।

তারপর আপনারা জানেন। ওকে ঘরে তুলে নিলাম। আরতি কিছু বললে না, শুধু অজস্র কান্নায় গলতে লাগল। আজ ও কপর্দকহীনা। সমস্ত ঐশ্বর্য লুপ্ত, রূপ গেছে, বয়েসও জেঁকে বসেছে, আর মৃত্যু এখন শিয়রে। ছেঁড়া জুতোর মতো ওকে ছুঁড়ে ফেলেছে তারাই যারা একদিন মৌমাছির মতো ওকে ঘিরে রেখেছিল। বড্ড করুণ হল।

বললাম, আরতি, এতদিনে পঞ্চাশ হাজার টাকা পুরো করেছি আমি। তোমার পুরোন সেই চুক্তি যদি তুমি রাখতে রাজি থাকো এখনো, তবে আমিও রাজী। বলো।

আরতি কিছু বলল না, শুধু পা জড়িয়ে ধরল আমার। হাসি পাচ্ছিল, প্রতিশোধ নেবো কার ওপর? কাকে আমি নিষ্ঠুর নির্যাতনে দগ্ধ করব এখন? এতদিনের যে কঠিন ব্রত ছিল, সে ব্রতের সমাপ্তি হবে কিসে? প্রকৃতির কি অমোঘ বিধান!

জল টলটল চোখে আরতি বললে,--মরবার আগে তোমার কাছে মরতে পারছি এ পুণ্যেই হয়তো স্বর্গে যেতে পারব আমি।

জানি মিথ্যে, তবু আশ্বাস দিলাম। তুমি বাঁচবে আরতি। আমি ডাক্তার, আমিই তোমাকে বাঁচাবো।

না।—আরতি বললে,—সারা জীবনে যা করেছি তার জন্যে আমার কোন দুঃখ নেই পীযূষ। জীবনকে আমি বাহান্নটা তাসের মতো ছিটিয়ে প্রায় সবগুলো তাসই উলটিয়ে দেখে নিয়েছি তার জোর কতটুকু। এভাবেই বা কজন জীবনকে দেখে! শুধু দুঃখ এই. সব চেয়ে বড় তাসটাই বুঝি উলটাতে পারিনি।

—তার মানে, কি বলতে চাও তুমি

—সিঁদুর আর ঘোমটার জীবনটা জানা হয়নি আমার। জানা হয়নি নতুন নামের. নতুন জন্মের জীবন। সেটাই বাকী রয়ে গেল।

তাই মিসেস গাঙ্গুলী সেদিনে আপনার কাছ থেকে সিঁদুরের কৌটো নিয়ে গিয়েছিলাম. শহর থেকে রেজিস্ট্রার ডেকে বিয়ে করেছিলাম আমরা। হয়তো এটাই আমার প্রতিশোধ!

সেই অপূর্ব সন্ধ্যায় একটা করুণ সত্য জানালো আরতি। ও বলল,—মনে হচ্ছে তোমাকে আমি সত্যিই ভালোবেসেছিলাম, অথচ ভালোবাসতে আমি চাইনি। তাই জীবনের অজস্র ভোগের মধ্যে খুঁজেছি, কিন্তু সত্যি করে [illegible] আনন্দ আমি পাইনি। যত বেশ[illegible] লোভে গা ডুবিয়েছি তত বেশী বেদনায় জ্বলেছি আমি। ঐশ্বর্য বাড়ল ততই নিঃস্ব হয়ে যেতে লাগ[illegible] তখন সেই প্রাচুর্যের ক্লান্তিতে [illegible] মধ্যে একটা অস্ফুট বেদনা কাঁদত মাঝে মাঝে। তখন বুঝিনি, এখন ব[illegible] সে বেদনা আর কিছু নয়, সে তুমি [illegible]

আয়নায় ওর সিঁদুর টিপ [illegible] মুখের দিকে তাকিয়ে নিজেই [illegible] মতো বলল আরতি,—আজ [illegible] পেলাম পীযূষ। আজ আমি [illegible] আমি মরে গেলে ভুলে যেও [illegible] রায়কে, ভুলে যেও তার অতীত। [illegible] আজকের এই অপূর্ব সন্ধ্যাটি [illegible] যে সন্ধ্যায় আরতি রায় [illegible] পেয়েছে, খুঁজে পেয়েছে সিঁদুরের [illegible] পদবীর স্বীকৃতিতে। যে সন্ধ্যায় [illegible] রায় পীযূষ মিত্রের স্ত্রী, একটি [illegible] মেয়ে, একজন সাধারণ বৌ।

মরবার দিনও ওর মুখে হাসি [illegible] ছিল। মরবার আগে দুষ্টুমি করে [illegible] ছিল,—ওগো শুনছ. একটু সিঁদুর [illegible] দাও কপালে। দিয়েছিলাম। [illegible] মতো।

চুপ করলেন মিঃ মিত্র। [illegible] পাহাড়ের বুকে হামাগুড়ি দিয়ে [illegible] নামছিল তখন। বৃষ্টির নূপুর [illegible] অজস্র কান্নায় দ্রুততর হয়ে উঠল। [illegible] ঝম ঝম আওয়াজ হচ্ছিল বাংলোর [illegible]

হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন ডাঃ মিত্র. [illegible] পর আমরা কিছু বলবার আগে [illegible] মাথায় করেই সিঁড়ি দিয়ে নেমে [illegible] গেলেন। তাঁর আবছায়া মূর্তি ধীরে ধীরে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

অনেকক্ষণ বাদে সোনালি [illegible] বললে। বললে, গায়ে ছাট আসছে. [illegible] ভেতরে যাই।

ঘরে এসে ঢুকলাম আমরা। [illegible] অন্ধকার বারান্দায় পড়ে রইল [illegible] চেয়ার, আর, আর মেঝেতে এক [illegible] সিঁদুর। যেন তিনটি নির্বাক [illegible] একটি বাঙময় বেদনা মুখ থুবড়ে [illegible] আছে।

ধীরাজ ভট্টাচার্য

॥ আঠারো ॥

৯৩০ সাল, ২৪শে ডিসেম্বর। আমার জীবনের খরচের খাতায় আর সব কিছু মুছে নিঃশেষ হয়ে গেলেও ধ্রুবতারার মত অম্লান হয়ে চিরদিন জেগে থাকবে ঐ একটি দিন। একটু আগে থেকেই শুরু করি। ডিসেম্বর মাসের প্রথমেই 'নৌকাডুবি'র শুটিং আরম্ভ হল। সবাক নয় নির্বাক। মাস খানেক আগে থেকেই হ্যারিসন রোডে পার্শী অ্যালফ্রেড থিয়েটারে (বর্তমান 'দীপক সিনেমা') পুরোদমে রিহার্সাল শুরু হয়ে গিয়েছিল। রমেশ—আমি, হেমনলিনী—শান্তি গুপ্তা, কমলা—সুনীলা দেবী (গত যুগের বিখ্যাত অভিনেত্রী শ্রীমতী দেববালার ছোট বোন), অক্ষয়—নরেশদা, অন্নদাবাবু—কুমার কনক-নারায়ণ, যোগেশ—গিরিজা গাঙ্গুলী, ডাঃ নলিনাক্ষ—মিঃ রাজহংস প্রভৃতি। সবাক 'নৌকাডুবি'র জন্য আমরা তখন রীতিমত প্রস্তুত—হঠাৎ শুনলাম সবাক হবে না। প্রধান কারণ হল, বিশ্বভারতী ফিল্ম রাইটের জন্যে প্রচুর টাকা চাইছেন, দ্বিতীয় কারণ তখনও কি কারণে জানি না টকি মেশিন এসে পৌঁছোয়নি। জাহাঙ্গীর সাহেব রেগেমেগে নরেশদাকে বললেন—'কুছ পরোয়া নেহি—নির্বাকই তোল।' বলা বাহুল্য অনেক আগে থেকেই ম্যাডানের নির্বাক চিত্রস্বত্ব কেনা ছিল।

বড়ুয়া সাহেব তখন তাঁর নিজস্ব বড়ুয়া স্টুডিওতে নির্বাক 'অপরাধী' ছবি তুলছেন। তিনিই প্রথমে ইলেকট্রিক লাইটে ঘরের মধ্যে ছবি তোলা পরীক্ষা-মূলকভাবে শুরু করেন এই ছবিতে, ফলও খুব খারাপ হয়নি। আমরা কিন্তু যে-তিমিরে সেই-তিমিরেই। বাইরে সিন খাটিয়ে আয়না ও রিফ্লেকটার দিয়ে ক্যামেরাম্যান যতীন দাস নৌকাডুবি তুলতে আরম্ভ করে দিল। যদিও সবাক ছবির জন্য একটি ফ্লোর প্রস্তুত ছিল এবং ইলেকট্রিক লাইটও এসে গিয়েছিল। কিন্তু বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবার লোক তখনও আমেরিকা থেকে না আসায় সেদিকে মাথা ঘামানো দরকার বোধ করল না কেউ।

নভেম্বরের গোড়া থেকেই নৌকাডুবির রিহার্সাল শুরু হয়। জাহাঙ্গীর সাহেবের কথা মত ঐ মাস থেকেই বাড়তি কুড়ি টাকা মাইনের খাতায় জমা হয়ে গেল। স্কুলে হেড মাস্টার মশায়কে সব বললাম। ত্রিশ টাকায় একজন টেম্পরারি মাস্টার নীচু ক্লাসে পড়াবার জন্য ঠিক হয়ে গেল। সবই একরকম ঠিক হল, হল না শুধু বাবার ভেঙেপড়া শরীরটা। দিন দিন খারাপের দিকেই যেতে লাগল। ডাক্তার নগেন দাস একদিন আমায় আড়ালে ডেকে স্পষ্টই বলে দিলেন—'তোমার যদি ইচ্ছা হয় অন্য ডাক্তার দেখাতে পার, আমার তো ভাল মনে হচ্ছে না। গত বাইশ দিন জ্বর একেবারে রেমিশান হয় না তার উপর বুকের সর্দিটাও রয়েছে।'

দিশেহারা হয়ে গেলাম। তখন ডাঃ পি সান্না হোমিওপ্যাথিকে সবে নাম করতে শুরু করেছেন। তাঁর শরণাপন্ন হলাম। অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করে তিনি বললেন—'একটু দেরি হয়ে গেছে। দেখি, কতদূর কি করতে পারি।'

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা চলতে লাগল। সারাদিন শুটিং করে এসে সন্ধ্যা থেকে বাবার কাছে বসি। কোনও কোনও দিন সারারাত কেটে যেত। সংসারের যাবতীয় কাজ তার উপর রাত জাগা একা মা পেরে উঠতেন না। বাবা আপত্তি করতেন, আমরা শুনতাম না। ইতিমধ্যে আমার ছোট বোনকে অনেক কষ্টে বাবার অসুখের অজুহাতে নিয়ে আসা হয়েছিল। শ্বশুর বাড়িতে স্বামী ও শাশুড়ীর অমানুষিক নির্যাতনে বেচারী মরতে বসেছিল। ঐ একটি মাত্র বোন; আমাদের অবস্থার অতিরিক্ত খরচ করে বাবা বিয়ে দিয়েছিলেন বছর চারেক আগে। সেই থেকে আর পাঠায়নি, অজুহাত বিয়ের সময় গলার হারের তিন ভরি সোনা কম হয়েছিল। বছর দুয়েকের একটি ও ছমাসের একটি মেয়ে নিয়ে সেদিন এক বস্ত্রে প্রথম বাবার সামনে এসে দাঁড়াল বোনটা, বাবা কেঁদে ফেলেছিলেন। বাবার চোখে জল বোধহয় এই প্রথম দেখলাম। দু-তিন দিন বাদে একদিন রাত্রে আমার বোনের রক্তহীন শীর্ণ হাত-খানি আমার হাতের উপর রেখে বাবা বললেন, 'আজ থেকে একে তোমার আর একটি ছোট ভাই বলে মনে করবে, তোমার যদি একমুঠো জোটে এরও জুটবে। শত দুঃখ কষ্টের মধ্যেও একে কোনও দিন শ্বশুরবাড়ি পাঠাবে না, কথা দাও।' দিয়ে-ছিলাম আর কথা অক্ষরে অক্ষরে পালনও করেছিলাম। অবশেষে একটু একটু করে ঘনিয়ে এল সেই সর্বনেশে দিন, ২৪শে ডিসেম্বর। সকাল থেকে বেশ ভালই ছিলেন বাবা, জ্বর ও কাশিটা বাড়ল বিকেল থেকে। সারাদিন বাড়ির বার হলাম না, সন্ধ্যারপর মা কাঁদছেন দেখে বাবা হেসে বললেন, 'ছিঃ লীলা (আমার মায়ের নাম লীলাবতী) তুমি কাঁদছো? কত বড় গুরুভার আমার ধীউবাবার ঘাড়ে চাপিয়ে যাচ্ছি দেখতে পাচ্ছ না? কোথায় ওকে উৎসাহ দেবে তা না তুমি নিজেই স্বার্থ-পরের মত কেঁদে ভাসাচ্ছ?'

পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলাম, বললাম,

আমাকে থিয়েটারে ঢোকবার অনুমতি দিয়ে যান বাবা, নরেশদা বলেছেন আপাতত প'চাত্তর টাকা মাইনে ও'রা দেবেন, নইলে এত বড় সংসার, মাত্র আমার মাইনে আশি টাকায় কি করে চালাব আমি।'

ক্ষণকাল চোখ বুজে থেকে অনুমতি দিলেন বাবা।

আজ কথা কইবার নেশায় পেয়ে বসেছে বাবাকে। ছেলেবেলায় কি রকম দুষ্টু ছিলেন, অবাধ্য হয়ে আর দুষ্টুমি করে কত দুঃখ দিয়েছেন ঠাকুর্দাকে তা গড়গড় করে বলে যেতে লাগলেন। বেশি কথা বলা ডাক্তারের নিষেধ ছিল। আমি ও মা অনেক করে বললাম অত কথা না কইতে কিন্তু আজ বাবা যেন মরিয়া। প্লাবনের নদী, বাঁধন দিয়ে আটকে রাখা অসম্ভব। বললেন,—'ধীউবাবা, আমি ছেলে বয়েস থেকে মা হারা তাই সংসার আমাকে বাঁধতে পারেনি। কিন্তু তোমার আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধন তার উপর রেখে গেলাম তোমার মাকে।'

অনেকগুলো কথা বলে হাঁপাতে লাগলেন বাবা। মা বুকে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। একটু সুস্থ হয়ে আবার শুরু করলেন বাবা, 'আমি জানি, মাকে দুঃখ কষ্ট কোনও দিনই তুমি দেবে না। তবুও বলে যাই—সংসারে প্রত্যক্ষ দেবতা মা বাবাকে দুঃখ কষ্ট দিয়ে যারা কল্পিত পাথরের মূর্তির সামনে মাথা খুঁড়ে মরে, পুণ্য তাদের কোনও দিনই হয় না শুধু মাথা ব্যথাই সার হয়।'

বুকের ঘড়ঘড়ানিটা যেন বেড়েছে। কথা বলতে কষ্ট হচ্ছিল বাবার। মাকে ইশারা করে একটু বেদানার রস দিতে বললাম। খেয়ে একটু সুস্থ হলেন যেন। পায়ের কাছে বসেছিলাম, ইশারা করে কাছে আসতে বললেন। বুকের কাছে ঝু'কে বললাম—'আমায় কিছু বলবেন বাবা?'

উত্তর না দিয়ে হাতখানি বুকের উপর চেপে ধরে চোখ বুজে রইলেন বাবা। তারপর আস্তে আস্তে বললেন,—'বাপের কর্তব্য কিছুই করে যেতে পারলাম না। তোমাদের জন্য রেখে গেলাম শুধু একরাশ দেনা, আর—।'

গলা ধরে গেল বাবার। এক ফোঁটা জলও গড়িয়ে পড়ল বালিশের উপর।

বললাম—'ওসব চিন্তা করে আপনি মন খারাপ করবেন না বাবা। আপনি যাচ্ছেন আশীর্বাদ, খুব কম ছেলের মা যা রেখে যেতে পারেন। টাকা বিষয় সম্পত্তি চিরস্থায়ী নয়। প্রচুর রেখে গেলেও বুদ্ধির দোষে ... তা অদৃশ্য হয়ে যায়। আপনি আমায় আশীর্বাদ করে যান ... অশান্তি অভাব আমাকে কোনও বিচলিত করতে না পারে।'

স্পষ্ট মনে আছে। একটা ... হাসি ফুটে উঠেছিল বাবার ... খানায়। রাত তখন এগারটা ... বাবা বললেন—'যাও, একটু ... আজ ক'দিন ধরে দিনে রাতে ... বিশ্রাম পাওনি।' মাও বললেন ... বসে আছি তুমি যাও একটু ... নাওগে।'

উপরে বাবার ঘরের পাশেই ... চওড়া ঘেরা বারান্দা, সেখানেই ... তক্তপোশের উপর একটা মাদুর ... নিয়ে র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে ... ঘুমিয়ে পড়লাম।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে ধড়মড় করে ... পড়লাম। ঘরে ঢুকে দেখি মা ... ছোট ভাইটা সব একসঙ্গে বুকফাটা ... শুরু করে দিয়েছে বাবাকে ... চিৎ হয়ে শুয়ে হাত দুটো জপের ... বুকের উপরে রেখে শান্ত সৌম্য ... খানাতে পরিপূর্ণ তৃপ্তির হাসি ... চিরনিদ্রায় ঘুমিয়ে পড়েছেন বাবা।

পাখিরা ঘুম ভেঙে বিচিত্র ... স্বাগত জানাচ্ছে নবারুণের ... পুবের আকাশ কুয়াশার আবরণ ... সবে একটুখানি আলোর আভায় ... বাবার মুখে শুনেছিলাম এই ... ব্রাহ্মমুহূর্ত বলে—ভাগ্যবান না ... শুভ মুহূর্তে জন্ম মৃত্যু হয় না।

ছোট ভাই রাজকুমার ... বাড়িতে পুরুষ বলতে আর দ্বিতীয় ... নেই। বাবার অসুখের বাড়াবাড়ি ... তিন চার দিন আগে মামাকে খবর ... দেশ থেকে আনিয়েছিলাম। দেখলাম ... মাঝখানে বসে হাঁটুর উপর মুখ ... তিনিও কাঁদতে শুরু করে দিয়েছেন ... বাবার বিছানার পাশে রাখা কাঠের ... চৌকো বাক্স ছিল—ওতেই টাকা ...

দরকারী কাগজপত্তর সব থাকতো। খুলে দেখি নগদ ও খুচরো মিলিয়ে টাকা আড়াই এর বেশি বাক্স নেই। মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। এদিয়ে বাবার শেষ কাজ দূরে থাক কাঠের খরচই কুলোবে না। চিন্তার সময় নেই—ছোটভাইকে বাবার দেহ ছুঁয়ে বসিয়ে দিয়ে নীচে এসে দরজা খুলে বেরিয়ে পড়লাম।

পূর্ণ থিয়েটারের দক্ষিণের গা ঘেঁষে একটি চায়ের দোকান, নাম 'বেঙ্গল রেস্টুরেণ্ট'। দোকানের মালিক সুধীর তালুকদার আমার সহপাঠী। সেইখানে গিয়ে দাঁড়ালাম। সুধীর তখন সবে দোকান খুলে ধূপ ধুনো গঙ্গাজল দিয়ে দেওয়ালে র‍্যাকে বসান গণেশের মূর্তিকে প্রণাম করছে। মুখ তুলতেই চোখাচোখি। কোনও কথা না বলে আমার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বললে—কত?

এখানে একটু বলে রাখি, সুধীর আমার অসুখের বাড়াবাড়ির কথা জানতো। আমিও একটু আভাষ দিয়ে রেখেছিলাম যদি হঠাৎ দরকার হয় কিছু টাকা প্রস্তুত রাখতে। বললাম—'গোটা কুড়ি এখন দে, পরে দরকার হলে বলব।'

দ্বিরুক্তি না করে ক্যাশবাক্সটি খুলে দুখানা দশ টাকার নোট বার করে আমার হাতে দিল সুধীর। সটান বাড়ি এসে মামার হাতে টাকাটা দিয়ে বললাম—'কাচা ও থান কাপড়চোপড় যা দরকার কিনে আনুন। আমি সৎকারের লোক ডাকতে যাচ্ছি।'

বাবার রোগজর্জর অস্থিসার দেহটিকে কেওড়াতলা শ্মশানঘাটে ভস্মীভূত করে যখন বাড়ি ফিরলাম তখন বেলা দুটো বাজে।

ঘরের মেজেতে একখানা কম্বল বিছিয়ে শুয়ে আর একখানা মুড়ি দিয়ে একটু বিশ্রম নিতে যাব নীচে থেকে পিওন হাঁকলে—'রেজেস্ট্রী চিঠি বাবু!' বাবার নামে চিঠি, আসছে খুলনা লোন অফিস থেকে। যথারীতি সই করে চিঠি নিয়ে পড়ে দেখি—গত কয়েক বছর ধরে বাবা কিছু কিছু ধার নিয়েছেন লোন অফিস থেকে, মাঝে মাঝে সুদের টাকা পাঠিয়েছেন—ওরাও চুপ করে আছে। গত তিন বছরের মধ্যে সুদ কিছুই দেওয়া হয়নি। ওদের সুদই পাওনা হয়েছে প্রায় পাঁচ শ' টাকা। চিঠি প্রাপ্তির পর থেকে সাত দিনের মধ্যে সমস্ত সুদ পরিশোধ করে না দিলে ওরা আইনের সাহায্যে দেশের সমস্ত সম্পত্তি নিলামে বিক্রি করে তা থেকে প্রাপ্য টাকা নিয়ে নেবে। ছোট বোনের বিয়ের সময় একটা মোটা টাকা ধার করতে হয়েছিল তাছাড়া মাঝে মাঝে টিউশনি না থাকলে সংসার খরচের জন্য কিছু কিছু ধার করতেন জানতাম। কিন্তু এ যে একেবারে শিয়রে সংক্রান্তি! আমাকে দাঁড়িপাল্লায় ওজন করে সের দরে বিক্রি করলেও কেউ পাঁচ শ' টাকা দেবে না। কি করি? অনেক ভেবেও কোনও কুলকিনারা পেলাম না।

রাত্রে ঘুম হল না। সারারাত বাবাকে উদ্দেশ করে বললাম এত শিগগির আমাকে এরকম কঠিন পরীক্ষায় ফেললেন বাবা!

সকালে একটু বেলায় নরেশদার ডাকাডাকিতে ঘুম ভাঙলো। বাবার মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে এসেছেন। থিয়েটারের অনুমতি পেয়েছি শুনে খুশী হলেন, বললেন, 'সামনের জানুয়ারী থেকেই তোমাকে 'দীপালি' নাট্য মঞ্চে ভর্তি করে নেব।'
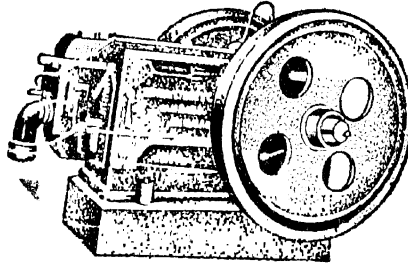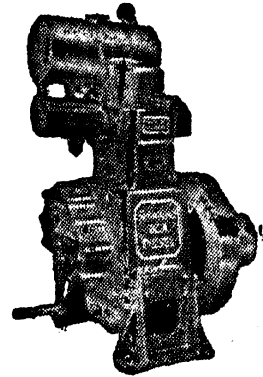
মুখ ধুতে ধুতে তো এক বালতি জল ফুরিয়ে ফেললে। আর এক বালতি জল দিয়ে আসব নাকি মণিময়?'

মণিময় মুখ ফিরিয়ে হেসে বলল, 'না আমার আর দরকার হবে না। আপনার দু নম্বর বালতি নীলকান্তদার জন্যে রিজার্ভ রাখুন।'

বারান্দায় লম্বালম্বিভাবে দড়ি টানানো, তাতে লালগামছা ঝুলছে। গামছা-খানা নিয়ে মুখ মুছতে মুছতে মণিময় বলল, 'কই দিন চা।'

বিশু যীশু আর রীণাকে প্রাতরাশ হিসাবে বাটিতে করে মুড়ি বাতাসা সাজিয়ে দিয়েছেন নির্মলা। মণিময় সেই সারিতে বসে বলল, 'এ যে দেখছি শিব-হীন যজ্ঞ। কর্তা কই।'

নির্মলা বললেন, 'তিনি কি তোমার আমার মত ভিড়ের মানুষ যে এখানে আসবেন? তাঁর চা আর খাবার আলাদা ক'রে পাঠিয়ে দিয়েছি।'

মণিময় হেসে বলল, 'তাই নাকি? দাঁড়ান নীলকান্তদাকে আমি এবার দশ-জনের ভিড়ে টেনে নামিয়ে তবে ছাড়ব।'

নির্মলা বলল, ঈশ অতই ক্ষমতা? তোমার হুকুমে বরং পুবের সূর্য পশ্চিম থেকে উঠবে; কিন্তু ওঁকে ঘরের বাইরে কিছুতেই নিতে পারবে না।'

মণিময় চটুল স্বরে বলল, 'আচ্ছা রাখুন বাজি। যদি ওঁকে বদলাতে পারি কি দেবেন বলুন।'

নির্মলা হেসে বললেন, 'কি আর দেব? ওঁকেই নিয়ে যেয়ো। তোমার দেশের কাজে টাজে যদি লাগাতে পার মন্দ কি।'

মণিময় চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বলল, 'বাপরে। এ যে একেবারে সর্বস্ব-দান। দিতে পারবেন প্রাণ ধরিয়ে?'

নির্মলার মুখে কিসের একটা ছায়া পড়ল। মৃদুস্বরে বললেন, 'অমন সর্বস্ব অনেকবার গেছে মণিময়। এখন আর কিছুতেই কিছু ভয় নেই।'

ছেলে মেয়েরা রয়েছে। বিশু সব কথাই আজকাল কিছু কিছু বুঝতে পারে। তাই তাড়াতাড়ি কথার মোড় ঘুরিয়ে দিলেন নির্মলা, 'কই মালা তো এখনো এল না।'

বিশু বলল, 'নাইট ডিউটি থাকলে দিদি এত সকাল সকাল ফেরে নাকি মা, যে এখনই আসবে? অন্য সিফটের লোকজন এলে চার্জ বুঝিয়ে দিয়ে তবে তো রওনা হবে। তার ফিরতে ফিরতে সেই ন'টা।'

মণিময় হেসে বলল, 'বিশু আপনার চেয়ে অনেক বেশি খোঁজ খবর রাখে দেখেছেন?'

তার মনে পড়ল মালা বলে গেছে সে এসে পৌঁছাবার আগে যেন মণিময় চলে না যায়। আজ রবিবার। অফিসের তাড়া নেই। কিন্তু নারকেলডাঙায় নিমন্ত্রণ আছে বন্ধু প্রভাত দত্তের বাসায়। তাঁর ছেলের আজ অন্নপ্রাশন। মণিময়দেরই দলের কর্মী প্রভাতদা। একই সঙ্গে জেল খেটেছেন। তারপর পঞ্চাশ বছর বয়স পার হয়ে এসে বনে না গিয়ে কর্পোরেশন স্কুলের এক বিধবা মিস্ট্রেসকে বিয়ে করেছেন। সেই বিয়ের ছেলে। সবাই ধরে পড়েছে জাঁকজমক ক'রে অন্নপ্রাশন করতে হবে। পুরোন বন্ধুদের সঙ্গে সেও নিমন্ত্রিত হয়েছে। গেলে অনেকেরই সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হবে। কিন্তু কীর্তিপুর থেকে যে আজ সহজে বেরোতে পারবে এমন ভরসা কম। মালার অনুরোধের জন্যে নয়। এখানকারই কাজের জন্যে। রবীন্দ্র জয়ন্তী উৎসব এগিয়ে আসছে। তাই নিয়ে গুটি তিনেক দল হয়েছে। এক একটি কলোনী আলাদা আলাদা ভাবে জয়ন্তী কমিটি গঠন করেছে। কমিটি ছোট হলেও প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারীরা কেউ ছোট নয়। মণিময় কাল কয়েকটি ছেলেকে ডেকে বলেছিল, 'তোমরা যদি একসঙ্গে কাজ কর, সবগুলি দল মিলে একজায়গায় ফাংশনের ব্যবস্থা কর আমি কলকাতা থেকে নামকরা একজন সাহিত্যিক এনে দেব। সভাপতি কি প্রধান অতিথি যা খুশি তোমরা তাঁকে করে নিতে পারবে।'

প্রস্তাবটা অনেকের কাছেই লোভনীয় মনে হয়েছে। তারাও মিলে মিশে কাজ করতে চায়। দায়িত্ব আর ব্যয় অনেকের মধ্যে ভাগ করে দিলে তাতে উৎসবের আড়ম্বর আয়োজনটা বাড়ে অথচ মাথা-পিছু চাঁদাটা কম পড়ে। কিন্তু কোন কলোনীর দল আগে এগিয়ে আসবে, কে প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারীর পদ নিঃস্বার্থভাবে আর একজনকে উৎসর্গ করবে সে মীমাংসা কাল হয়নি। কেউ কেউ বলেছে এর আগে সব কটি কলোনীর ছেলেরা মিলে যাতে সর্বজনীন সরস্বতী পুজোর ব্যবস্থা করা যায় তার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু ফল হয়নি। দুটোর জায়গায় তিনটে দ[illegible] গিয়েছিল। এবার রবীন্দ্র জয়ন্তীর [illegible] যে তার ব্যতিক্রম হবে এমন আশা [illegible] যায় না। কিন্তু কলেজের দুটি [illegible] ছেলে নিশীথ, সুনীল আর [illegible] মণিময়ের সঙ্গ ছাড়েনি। তারা ব[illegible] বলেছে, 'আপনি যদি চেষ্টা করেন [illegible] ব্যাপারটা হয়ে যায়। একটা ব্যবস্থা ন[illegible] দিয়ে আপনি এখান থেকে [illegible] পারবেন না।'

মণিময় হেসে বলেছে, [illegible] ভার তো আমার ওপর নয় [illegible] নিজেদের ওপর। আমি বাইরের [illegible] আর তোমরা এখানকার স্থায়ী [illegible] এখানকার লোকজনকে তোমরা [illegible] আমি তেমন ক'রে চিনতে পারি [illegible] তবে তোমরা যদি কিছু করতে চাও [illegible] তোমাদের সঙ্গে থাকব।'

এই প্রতিশ্রুতি পেয়ে ওরা সবাই [illegible] হয়ে উঠেছে। নিশীথ বলেছে, [illegible] নয়, আপনি আমাদের আগে আগে [illegible] আপনি যা বলবেন তাই করব আমরা।'

মণিময়ের মনে পড়ল এই [illegible] আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি ওই বয়সে [illegible] নিজের দলপতিকে দিয়েছে। [illegible] আন্তরিকতাকে সন্দেহ করবার [illegible] কারণই নেই। ভাষার মধ্যে যদি [illegible] অতিশয়োক্তি থাকে তাকে উপহাস [illegible] উচিত হবে না মণিময়ের। ঘৃণা [illegible] মত শ্রদ্ধা ভক্তিও মানুষের স্বাভাবিক বৃত্তি। বিশেষ করে অল্পবয়সী ছেলেমে[illegible] দের। ওদের হৃদয় এখনো নরম। যেমন [illegible] ভালোবাসতে চায়, তেমনি চায় শ্রদ্ধা [illegible] ভক্তি দিয়ে কাছাকাছি একজনকে [illegible] তুলতে। যার কথা মত ওরা কাজ [illegible] যাকে ওরা অনুসরণ করবে। কিন্তু [illegible] কি ওদের সেই আশা পূরণ [illegible] পারবে? বহু নৈরাশ্য আর ব্যর্থতা[illegible] কিছুমাত্র উদ্যম উৎসাহ কি আর [illegible] অবশিষ্ট আছে? বয়স বাড়বার সঙ্গে [illegible] খাটবার শক্তি কমে আসছে। জীবনের [illegible] দিনগুলি জীবিকার জন্যে অফিসের [illegible] আর আনন্দের জন্যে পড়াশুনো [illegible] কাটিয়ে দেবে ভেবেছিল মণিময়, [illegible] আবার জড়িয়ে পড়তে যাচ্ছে কেন। [illegible] নাম কি সহস্র বন্ধন? এতে কি [illegible] মুক্তির স্বাদ মিলবে?

চা খাওয়ার পাট চুকতে না চুকতেই নিশীথরা এসে পড়ল। 'মণিময়দা আছেন?' অল্পদিনের মধ্যেই মণিময়ের বাবু ঘুচিয়ে তাকে ওরা দাদা ডাকতে আরম্ভ করেছে। আঠেরো থকে কুড়ির মধ্যে ওদের বয়েস। সময়মত বিয়ে করলে মণিময়ের ছেলের বয়সই ওদের মত হ'ত। কিন্তু দাদা ডাকে কোন বাধা দেয় না মণিময়। ওরা যা ডেকে খুশি হয় ডাকুক না।

নিশীথদের সাড়া পেয়ে মণিময় উঠে দাঁড়াল।

নির্মলা বললেন, 'যাও, তোমার চেলা চামুণ্ডারা এসে পড়েছে। ছেলেপুলে নিয়ে এবার হৈ চৈ করতে পারো।'

মণিময় হেসে বলল, 'আইবুড়ো থাকার এই সুবিধে। কোনদিন বুড়ো হ'তে হয় না।'

একটু বাদেই নিশীথরা উঠানে এসে দাঁড়াল। আরো গুটি কয়েক ছেলে জুটিয়ে ওরা দলে ভারি হয়ে এসেছে।

সুনীল বলল, 'চলুন মণিময়দা।'

মণিময় বলল, 'চল। কোথায় যেতে হবে শুনি।'

শীতাংশু বলল, 'কাল যে বললাম আপনাকে। বীরনগর কলোনীতে। জিতেনবাবু—জিতেন বিশ্বাস সেখানকার প্রেসিডেণ্ট। ওখানে তাঁর মত না নিয়ে কিছু করবার জো নেই। ওখানে সবাই তাঁর কথা মেনে চলে।'

নিশীথ বলল, 'তা চললই বা। তিনি সেখানকার প্রেসিডেণ্ট আছেন বেশ তো। তাই বলে আমাদের মণিময়দার মর্যাদা কি কারো চেয়ে কম নাকি? উনি কেন যাবেন? বরং তাঁকেই বুঝিয়ে শুনিয়ে আমরা এখানে নিয়ে আসি।'

মণিময় বাধা দিয়ে বলল, 'না নিশীথ, সে কি কথা। আমিই যাব তাঁর কাছে। এখানে মানমর্যাদার কোন প্রশ্নই ওঠে না। কার্যোদ্ধার করাটাই আসল কথা।'

নীলকান্তের ঘরের সমুখ দিয়েই পথ। যেতে যেতে মণিময় একটু উঁকি দিয়ে দেখল। নীলকান্ত পুরোন ডায়েরি আর চিঠিপত্রের স্তূপ খুলে বসেছেন। মণিময় তাঁর সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে সেখানে একটু দাঁড়াল। জিজ্ঞাসা করল, 'কি করছেন?'

নীলকান্ত তাড়াতাড়ি চিঠিগুলিকে আড়াল করে বললেন, 'কিছু না।'

মণিময় বলল, 'হাতে যদি কোন কাজ না থাকে তাহলে চলুন না আমাদের সঙ্গে। ঘুরে আসবেন একটু।'

নীলকান্ত মৃদু হাসলেন, 'ঘোরাটা কি সকর্মক ক্রিয়া? কে যায় মান ঘুরতে?'

মণিময় বলল, 'এই তো কাছেই। বীরনগর কলোনীতে।'

'কেন?' নীলকান্ত ফের জিজ্ঞাসা করলেন।

মণিময় বলল, 'রবীন্দ্র জয়ন্তীর ব্যাপার নিয়ে কলোনীর ছেলেদের মধ্যে গোলমাল বেধেছে জানেন বোধ হয়। চলুন না, মিটমাট করে দেওয়া যায় কি না চেষ্টা করে দেখি।'

নীলকান্ত একটু হাসলেন, 'বিরোধ ঘটাবার কাজও তোমার বিরোধ মেটাবার ভারও তোমার। ও কাজ তো আমার না মণিময়। আর রবীন্দ্র জয়ন্তী পালন করবার কথা বলছ? সে উৎসবেরও আমার নিজের ধরন আছে। তার সঙ্গে তোমাদের মিল হবে না।'

মণিময় বলল, 'নাই বা হল। তবু আপনার ধরনটা কি শুনি।'

নীলকান্ত বললেন, 'পঁচিশে বৈশাখে আমি রবীন্দ্রনাথ থেকে ফিরে ফিরে আমার প্রিয় কবিতাগুলি পড়ব। তার চেয়ে বড় উৎসবে আমার কোন দরকার নেই।'

মণিময় বলল, 'আচ্ছা, এর জবাব আপনাকে পরে এসে দেব।'

ছেলেদের নিয়ে মণিময় পথে নেমে পড়ল। খানিকটা এগোবার পর নিশীথ বলল, 'মণিময়দা, আপনাকে একটা কথা বলব, রাগ করবেন না তো?'

মণিময় হেসে বলল, 'রাগের কথা হলে অবশ্যই রাগ করব। কিন্তু সেই ভয়ে তুমি যদি কথাটা না তোল তাহলে আমার রাগ বেশি ছাড়া কম হবে না।'

নিশীথ বলল, 'তাহলে কথাটা বলেই ফেলি। নীলকান্তবাবুকে এ সব কাজে আর ডাকবেন না মণিময়দা। আমরা অনেক ডাকাডাকি করে দেখেছি। উনি আসেন না, মেশেন না কারো সঙ্গে। বোধ হয় মেশবার যোগ্য মনে করেন না আমাদের। শুধু আমরা কেন কলোনীর ছেলেবুড়ো কারো সঙ্গে ওঁর কোন আলাপ নেই। উনি কারো বাড়িতে যান না, কাউকে বাড়িতে ডাকেনও না। শামুকের মত নিজের খোলসটির মধ্যে দিনি গুটিয়ে রয়েছেন। এমন অসামাজিক মানুষ আমরা আর দুটি দেখিনি।'

সুনীল আরো কড়া কথা বলল, 'যেমন অসামাজিক, তেমনি দাম্ভিক।'

মণিময় সস্নেহে সুনীলের পিঠে হাত রেখে বলল, 'অত রাগ কোরো না সুনীল, অত রাগ ভালো নয়। সবাইর কি সব ক্ষমতা থাকে? নীলকান্তবাবুও সামাজিক হ'তে পারেন না, বলেই সামাজিক হতে চান না। সেই অক্ষমতাকে তোমরা অহঙ্কার বলে ভুল কর, দম্ভ বলে ভুল কর।'

শীতাংশু বিজ্ঞানের ছাত্র। ফোর্থ ইয়ারে পড়ে। বয়সে তার সঙ্গীদের চেয়ে বড়। সে ফের তর্ক তুলল, 'মাফ করবেন মণিময়দা। মানুষের সব অক্ষমতা কিন্তু ক্ষমারযোগ্য নয়। আর ক্ষমা করলে তা কোন দিন কমে না, বরং বেড়েই যায়।'

মণিময় বলল, 'তা ঠিক। কিন্তু ক্ষমতা যাচাই করবার উপায়ও একরকম নয়। তাছাড়া ওটা সব বয়সে যে সমান থাকে সেকথাও বলা চলে না। আর সামাজিকতার কথা বলছ তারও রকমভেদ আছে। সব সামাজিকতা সরাসরি চোখের সামনে দেখা যায় না। তুমি আমি যে অর্থে সামাজিক কি সমাজকর্মী, একজন লেখক, দার্শনিক কি বৈজ্ঞানিক সেভাবে সামাজিক না হতেও পারেন।'

শীতাংশুরা আর কোন তর্ক করল না। মনে মনে ভাবল বন্ধু বলে, আত্মীয় বলে নীলকান্তবাবু সম্বন্ধে হয়ত মণিময়ের কিছু দুর্বলতা আছে। এনিয়ে বেশি আলোচনা না করাই ভালো।

নিশীথ বলল, 'যাক গে। ও'র কথা বাদ দিন মণিময়দা।'

মণিময় হেসে বলল, 'আমরা কারো কথাই বাদ দেব না নিশীথ। আমরা সবাইকে সঙ্গে নিয়ে চলব।'

একটু বাদেই পথের সেই গর্তটার দিকে চোখ পড়ল মণিময়ের। কাল এই গর্তে পা পড়ায় মালা হোঁচট খেয়েছিল। রাত্রে চলবার সময় মণিময় নিজেও বহুদিন অসুবিধা বোধ করেছে। হঠাৎ পথের মাঝখানে সে দাঁড়িয়ে পড়ল।

শীতাংশু পিছন ফিরে বিস্মিত হয়ে বলল, 'ওকি মণিময়দা থেমে পড়লেন যে, আর কয়েক পা এগুলেই বীরনগর কলোনী। আমরা প্রায়ই এসে পড়েছি। আপনাকে কষ্ট ক'রে আর একটু হাঁটতে হবে।'

মণিময় বলল, 'একটু কেন, অনেকখানিই হাঁটতে রাজী আছি। কিন্তু তার আগে তোমাদের একটা কথা, বলে নিই।'

শীতাংশু বলল, 'বলুন।'

মণিময় বলল, 'তোমরা এখানে কালীপুজো, সরস্বতীপুজো, রবীন্দ্রপুজো —অনেক পুজোই করছ কিন্তু এই রাস্তাটার দিকে একবার তাকাচ্ছ না কেন।'

শীতাংশু একটু অবাক হ'ল। হঠাৎ এমন উল্টো সুর গাইতে শুরু করলেন কেন মণিময়দা। একি নীলকান্তবাবুকে নিন্দা করবার জের? আগে জানলে কে তাঁর কথা তুলে মণিময়দাকে চটাতে যেত?

শীতাংশু একটু লজ্জিত হয়ে বলল, 'সত্যি রাস্তাটা আমাদের খুবই খারাপ। খানা গর্তে ভরতি। এই বৈশাখ জ্যৈষ্ঠে তো তবু কোনরকমে চলা যায়। আসুক আষাঢ় মাস তখন দেখবেন জল বৃষ্টিতে এ পথের কি হাল হয়। কাদা আর শুকোতে চায় না।'

সুনীল বলল, 'সত্যি, বর্ষার দিনেই সব চেয়ে কষ্ট বেশি। [illegible] কিছু থাকে না।'

মণিময় বলল, 'কষ্টটা [illegible] বোঝ হাত লাগাও না কেন।'

শীতাংশু বলল, [illegible] কি করব। একি কয়েকখানা [illegible] একবার আমরা ছেলেরা [illegible] এই নেতাজী নগরের সমুখ দিয়ে মাটি ফেলেছিলাম। কিন্তু [illegible] ধুয়ে গেছে।'

সুনীল বলল, [illegible] দিয়ো না শীতাংশুদা। এই [illegible] দিয়ে কি কম গাড়ি [illegible] করে? ইট সুরকির [illegible] লোহা-লক্কড়ের লরী [illegible] দিয়ে। অত লরীর ভার [illegible] রাস্তা সইতে পারবে [illegible]

মণিময় বলল, [illegible] গুলি?'

সুনীল আঙুল [illegible] 'কোথায় আবার। ওই কী[illegible] ছিল কীর্তিপুর এখন [illegible] রাখা হয়েছে কীর্তিনগর [illegible] জবরদখল কলোনীগুলির [illegible] যায় সেই জন্যেই এই চেষ্টা। [illegible] নতুন পাকা বাড়ি উঠছে। [illegible] একজন প্রফেসর এসে বাড়ি [illegible]

শীতাংশু বলল, 'হাঁ হাঁ, [illegible] কলেজেই তো পড়ান তিনি। [illegible] প্রফেসর। এ বি এস। [illegible] অমিয়ভূষণ সেনগুপ্ত।'

নেতাজীনগর বীরনগর থেকে [illegible] মাইলখানেক দূরে বড় পাকা সড়ক [illegible] হয়ে গাছপালার আড়ালে কী[illegible] খানিকটা চোখে পড়ল মণিময়ের। [illegible]

...রে নাকি মা, ...
...জন্য সিফটের লোকজন যায় ...

...সে নগরের একটি নাগরিকার নাম ...মত ঝলকে উঠল মনে। করুণা। ...একা ওখানেই থাকে।

মুহূর্তের জন্যে বোধ হয় অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল মণিময়। শীতাংশুর ডাকে ...তাকাল, 'চলুন মণিময় দা, আমরা এসে পড়েছি। এই তো বীরনগর। ...জিতেনদা—জিতেন বিশ্বাস মশাই ...বেন।'
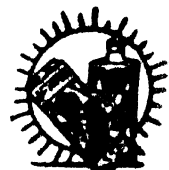
ডান দিকে বীরনগর কলোনী। পাছে ...কেউ ভুলে যায়, কি কারো চোখে না পড়ে তাই পাশাপাশি দুটো নারকেল গাছের সঙ্গে একখানি টিনের সাইনবোর্ডে কলোনীর নামটি বড় বড় অক্ষরে লিখে রাখা হয়েছে। সেই গাছের পাশ দিয়ে শীতাংশুদের পিছনে পিছনে কলোনীর মধ্যে ঢুকল মণিময়। প্রেসিডেন্টের বাড়ি ঠিক রাস্তার পাশে নয়, আর একটু ভিতরের দিকে গিয়ে। কলোনীর মধ্যে নারকেল তেঁতুল আর আমগাছের অভাব নেই। উপনগর তো নয় উপবন। আগে তাই-ই ছিল। জমিদারদের ফলের বাগান আর বাগানবাড়ি। সেই সব পোড়ো বাগান এরা জোর করে দখল ক'রে বাড়ি তুলেছে। পথের দু ধারে সারি সারি ছোট ছোট ঘর। কাঁচা মাটির ভিত, কাঁচা বাঁশের খুঁটি আর বেড়া। চালে হয় টালি না হয় করোগেটেড টিন। কিছু কিছু ছনের ঘরও আছে। খাটো ধুতিপরা খালি গায়ে কয়েকজন অধিবাসীকে চোখে পড়ল। জন দুই অল্পবয়সী বউ মাথায় আঁচল টেনে পথ থেকে সরে গেল। কিন্তু বেড়ার আড়ালে গিয়ে খানিকটা ঘোমটা ফের তুলে ফেলে মণিময়ের দিকে তাকিয়ে রইল। দীর্ঘকায় সুদর্শন এই পুরুষটি যে কলোনীর মানুষ নয় তা বুঝতে তাদের বাকি রইল না।

একটি উঠানে তুলসীমঞ্চ চোখে পড়ল। দারুণ গ্রীষ্মে চারা গাছটি শুকিয়ে গেছে। কিন্তু তাই বলে তাকে বাঁচাবার চেষ্টার ত্রুটি নেই গৃহস্থের। গাছের দুপাশে কাঠি পুঁতে ছোট একটি ঘট ফুটো করে বেঁধে দেওয়া হয়েছে। সেই ফুটোর মুখে ন্যাকড়ার কুচি। তুলসীতলায় জল পড়ছে চুঁইয়ে চুঁইয়ে। দেখবার জন্যে একটুকাল থেমে থেমে দাঁড়াল মণিময়। মনে হ'ল যেন পূর্ববঙ্গের আস্ত একখানি গ্রামকে মাথায় করে এনে কেউ এই কলোনীর মধ্যে বসিয়ে দিয়েছে। না ঠিক আস্ত গ্রাম বলা যায় না। গ্রামের সেই সমৃদ্ধি নেই, সুখস্বাচ্ছন্দ্য শান্তি নেই। কলোনীগুলিকে ঠিক গ্রাম বলা যায় না। গ্রামের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ভগ্নাংশ। এখানকার মানুষেরাও বুঝি তাই। মানুষের অণুপরমাণু। গ্রাম নয়, উপগ্রাম। কিন্তু কোন একটি কলোনীর নামই গ্রামের সঙ্গে যুক্ত নয়। সব নগর। মহানগরের অধিবাসী না হ'লে কি হবে, ছোট একটু শহরের সুখ সুবিধাটুকু পর্যন্ত না থাকলে কি হবে, এরা কেউ আর নিজেদের গ্রামবাসী বলতে রাজী নয়, সবাই নাগরিক। কলোনীগুলিকে এরা নগরের নামে ডাকবে, নিজেদের বাসভূমিকে এরা নগরের ধাঁচে গড়বে এই এদের স্বপ্ন এই এদের প্রত্যাশা। যে গ্রাম এরা ছেড়ে এসেছে সেই গ্রামে আর ফিরে যাবে না। ঠিক অবিকল সেই গ্রাম আর তারা গড়ে তুলবে না।

আর একটু এগিয়ে যেতেই প্রেসিডেন্ট জিতেন বিশ্বাসের বাড়িটি চোখে পড়ল। অবশ্য শীতাংশুই চিনিয়ে দিল মণিময়কে। বলল, 'ওই যে উঠানের ওপর তিনটি নারকেল গাছ দেখছেন ওই বাড়ি। আমরা সংক্ষেপে বলি তিনারকেলের বাড়ি। তিন-নারকেল আর এক তেঁতুল। ঘরের পিছনে কত বড় একটি ঝাঁপটানো তেঁতুল গাছ দেখেছেন? কেউ কেউ বলেছিল গাছটা কেটে ফেলুন। অতবড় গাছ। বাড়ি অন্ধকার ক'রে রেখেছে। কিন্তু জিতেনদা কিছুতেই কাটতে চাইলেন না। গাছের ওপর ও'র ভারি মায়া।'

কথা শেষ করে শীতাংশু হাঁক দিল, 'জিতেনদা আছেন নাকি? ও জিতেনদা। আপনার সঙ্গে মণিময়বাবু দেখা করতে এসেছেন।'

সাড়া পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে একটি লোক বেরিয়ে এল। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। রোগা ছিপছিপে চেহারা। গায়ের রঙ বেশ ফর্সা। মাথায় একটু টাকের আভাস। গাটা খোলাই ছিল। অপরিচিত লোককে সামনে দেখে কোঁচার খুঁট খুলে গায়ে একটু জড়িয়ে নিল জিতেন। তারপর স্মিতমুখে হাতজোড় ক'রে বলল, 'নমস্কার। আসুন ভিতরে আসুন।'

প্রেসিডেন্ট কথার সঙ্গে একটি জাঁদরেল কালো মোটাসোটা মানুষের মূর্তি কল্পনায় এসেছিল মণিময়ের। তার পরিবর্তে প্রায় সমবয়সী এবং সুদর্শন আকৃতির এই মানুষটিকে দেখে মণিময়ের মন বেশ খুশী হয়ে উঠল। তার সাদরসম্ভাষণে স্মিত মুখে সাড়া দিয়ে বলল, 'চলুন।'

(ক্রমশ)

আলোচনা

'স্বামী ব্রহ্মানন্দের পারিবারিক জীবন'

গত ১৩ই আশ্বিন তারিখের 'দেশ' পত্রিকায় "স্বামীজীর মহাপ্রয়াণের পর" শীর্ষক সুলিখিত প্রবন্ধে স্বামী ব্রহ্মানন্দের পারিবারিক জীবনের অধুনা অপ্রকাশিত অনেক কথা আলোচিত হইয়াছে। তাঁহার জীবনের কয়েকটি ঘটনা নানা পুস্তকে আছে, তাহার সহিত প্রবন্ধের কোন কোন স্থলে পার্থক্যও দেখা যায়। তাঁহার পুত্র সত্যানন্দের জন্ম তারিখ এই প্রবন্ধে বা অন্য কোন পুস্তকে পাওয়া যায় না। প্রকৃত তথ্য নির্ধারণের জন্য নিম্নে কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করিলাম। যদি এই সম্বন্ধে কেহ কিছু অবগত থাকেন তিনি তাহা জানাইলে প্রকৃত তথ্য নির্ধারণের সাহায্য হইবে।

১। সত্যানন্দের জন্ম

(ক) 'শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত' পুস্তকে দেখা যায় যে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ৬ই এপ্রিল তারিখে শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন—"রাখাল বাড়ীতে আছে। একটি ছেলে বুঝি তার হবে শুনলাম।"

(খ) 'ভক্ত মনোমোহন' পুস্তকে দেখা যায় যে, ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ২৩শে অক্টোবর তারিখে মনোমোহনবাবু পত্র লিখিয়াছিলেন—"বিসা (বিশ্বেশ্বরী, রাখাল মহারাজের পত্নী) ও তার ছেলে ভাল আছে।"

(গ) আলোচ্য প্রবন্ধে দেখা যায় যে, শ্রীশ্রীঠাকুর শ্যামপুকুরের বাড়ীতে আসিবার অল্প দিন পরে রবিবারে সত্যের অন্নপ্রাশন হইয়াছিল, সেদিন খুব গরম ছিল এবং তাহার নাম (রাশি নাম) রাখা হইয়াছিল সত্যচরণ। রাখাল মহারাজ ছেলের অন্নপ্রাশনের জন্য সকলকে খাওয়াইয়াছিলেন।

(ক) ও (খ) হইতে সত্যানন্দের জন্ম তারিখ ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ৬ই এপ্রিল হইতে ২৩শে অক্টোবরের মধ্যে পড়ে। ১২৯২ সালের (১৮৮৫ খৃঃ) আশ্বিন মাসের মাঝামাঝি হইতে অগ্রহায়ণ মাসের শেষ পর্যন্ত ঠাকুর শ্যামপুকুরের বাড়ীতে ছিলেন। আশ্বিন মাসে ও কার্তিক মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত গরম থাকে। ১২৯২ সালে ১০ই আশ্বিন হইতে ২৩শে কার্তিকের মধ্যে কেবলমাত্র ২৬শে আশ্বিন (১১ই অক্টোবর ১৮৮৫ খৃঃ) এবং ৩রা কার্তিক (১৮ই অক্টোবর ১৮৮৫ খৃঃ) এই দুইটি রবিবারে অন্নপ্রাশনের দিন ছিল। এই দুই দিনের কোন একটি দিনে অবশ্যই অন্নপ্রাশন হইয়াছিল। নাম রাখা হইয়াছিল সত্যচরণ নামের আদি অক্ষর কুম্ভ রাশিতে জন্ম বুঝায়। ছয় মাসে অন্নপ্রাশন এবং জন্মরাশি কুম্ভ হইতে সত্যানন্দের জন্ম তারিখ ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ৮ই, ৯ই কিম্বা ১০ই মে (১২৯২ সালের ২৬শে, ২৭শে, কিম্বা ২৮শে বৈশাখ) শুক্রবার, শনিবার কিম্বা রবিবার পাওয়া যায়। তাঁহার জন্মবার যদি কেহ বলিতে পারেন তাহা হইলে জন্ম-তারিখটি নির্ণয় করা যাইতে পারে।

২। বিবাহের সময় বিশ্বেশ্বরীর বয়স

উক্ত প্রবন্ধে লিখিত আছে "দশম বর্ষীয়া বিশ্বেশ্বরীর সঙ্গে রাখালের বিবাহ হইয়াছিল।" শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতে দেখা যায় ১৮৮৪ খৃঃ ২০শে জুন তারিখে রাখাল মহারাজের সম্বন্ধে ঠাকুর বলিতেছেন—"× × ওর পরিবার এখানে এসেছিল। ১৪ বৎসর বয়স। × × ×" শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা গ্রন্থ ঠাকুরের কথাই সমর্থন করিতেছে। এই গ্রন্থ মতে ১৮৮১ সালের মধ্যভাগে রাখাল মহারাজের বিবাহ হইয়াছিল এবং তখন বিশ্বেশ্বরী "বয়স প্রায় একাদশ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে।" তাহা হইলে বিবাহের সময় বিশ্বেশ্বরীর বয়স দশ বৎসর ছিল বলিয়া মনে হয় না।

৩। বিশ্বেশ্বরীর দেহত্যাগের সময় সম্বন্ধে নিম্নলিখিত উপাদান পাওয়া যায়—

(ক) 'ভক্ত মনোমোহন' পুস্তকে দেখা যায়—"ঠাকুরের দেহাবসানের (আগষ্ট ১৮৮৬ খৃঃ) পর বিশ্বেশ্বরী সহসা মৃত্যুকে বরণ করিয়াছিলেন।" কত পরে তাহা লেখা নাই।

(খ) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতের দ্বিতীয় ভাগের পরিশিষ্টে ১৮৮৭ খৃঃ ৮ই মে তারিখে লিখিত আছে—"রাখাল সন্তান পরিবার ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন।"

(গ) উক্ত প্রবন্ধে লিখিত আছে—"তিন বৎসরের শিশুকে অনাথ করিয়া সে (বিশ্বেশ্বরী) জীবনের দুঃখ জ্বালার হাত এড়াইয়া চলিয়া গেল।"

(ঘ) উক্ত প্রবন্ধে অন্যত্র লিখিত হইয়াছে—"রাখালের একবার বৃন্দাবনে থাকিবার সময় × × × সে (বিশ্বেশ্বরী) আত্ম-হত্যা করিয়া দেহত্যাগ করে।"

(খ) অনুসারে ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের মে মাসে বিশ্বেশ্বরী জীবিত ছিলেন। শিশু সত্যানন্দের জন্ম ১৮৮৫ সালে, সুতরাং (গ) অনুসারে তাহার তিন বৎসর বয়সে অর্থাৎ ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে বিশ্বেশ্বরী দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। রাখাল মহারাজ বৃন্দাবনে প্রথম গিয়াছিলেন ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে, তখন শিশু জন্মগ্রহণ করে নাই। শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা গ্রন্থের ১১৬—১১৭ পৃষ্ঠায় দেখা যায় যে, ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি দ্বিতীয়বার বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন। সুতরাং [illegible] অনুসারে বিশ্বেশ্বরী ১৮৯০ [illegible] অর্থাৎ শিশুর ৫ বৎসর [illegible] করিয়াছিলেন। উক্ত প্রবন্ধে (গ) [illegible] অনুসারে বিশ্বেশ্বরীর দেহত্যাগের [illegible] বিভিন্ন সময় পাওয়া যাইতেছে, ইহার কোনটি ঠিক?

৪। রাখাল মহারাজ ও সত্যানন্দ [illegible]

উক্ত প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে [illegible] স্বামিজী ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিবার [illegible] স্বামী ব্রহ্মানন্দ তাঁহার [illegible] করিতে অগ্রণী হইয়াছিলেন এবং [illegible] তাঁহার মাতৃহীন ছেলেটির [illegible] পাইয়াছিলেন। × × ছেলে [illegible] স্নেহ পাওয়া দূরে থাকুক [illegible] চোখেও দেখে নাই।"

স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৭ [illegible] ১৫ই জানুয়ারী আমেরিকা হইতে [illegible] শহরে প্রত্যাগমন করেন [illegible] ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে [illegible] মৃত্যু তারিখ ১৮৯৬ [illegible] এপ্রিল। এই দুইটি তারিখের [illegible] মাস। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দত্ত [illegible] "লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ" [illegible] পাঠ করিয়া মনে হয় না যে [illegible] দশ মাস পরে পুত্র বিয়োগ সংবাদ [illegible] ছিলেন। উক্ত পুস্তকের ১৪ এবং [illegible] কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"একদিন (১৮৯৬ খৃঃ মে [illegible] মাসে) বেলা ১১ বা ১২টার সময় [illegible] (লণ্ডনে) মিস্ মুলারের বাড়ীর [illegible] বৈঠকখানা ঘরটিতে আসিয়া একখানি [illegible] বসিলেন। ডাক পিয়ন কতকগুলি [illegible] দিয়া গিয়াছিল, সারদানন্দ স্বামী [illegible] চিঠি স্বামিজীকে পড়িয়া শুনাইতে [illegible] কলিকাতার একখানি চিঠিতে [illegible] স্থানে লেখা ছিল 'রাখাল মহারাজের [illegible] সত্যের মৃত্যু হইয়াছে। ইহাতে [illegible] মহারাজ বড় ব্যথিত ও বিমর্ষ [illegible] পড়িয়াছেন।' এই খবরটি শুনিয়া [illegible] দুঃখিত হইলেন। স্বামিজী বলিতে [illegible] 'রাখালের মত এত উচ্চ অবস্থার [illegible] পুত্রশোকে বিহ্বল হয়। পুত্রশোক কি [illegible] জিনিস! মানুষ জগতের সব সহ্য [illegible] পারে কিন্তু পুত্রশোক সহ্য করতে [illegible] এত বেশী অধীর হয়ে পড়ে। [illegible] রাখালের ছেলেটি মারা গেল—ছেলেটি [illegible] থাকলে তাকে গিয়ে মঠে নিয়ে [illegible] ছেলেটাকে তৈরী করে নিতুম। [illegible] ব্যামো হয়েছিল?' বর্তমান লেখক (শ্রী[illegible] নাথ দত্ত) বলিলেন, 'ছেলেদের [illegible] খেলতে খেলতে সে পড়ে যায়। তাই [illegible] বুকে একটা গোঁজা লেগে পাঁজরা ফ[illegible] সেই থেকে তার হৃৎপিন্ড রোগ হয় [illegible] সময় বুক ধড়ফড় করতো। শ্রী[illegible]

মুখোপাধ্যায়।

মনে এলো

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

পরের, কিংবা আরো দু একদিন পরের ঘটনা আরো বিস্ময়কর।

স্যানিটোরিয়মে আরেকজন ভদ্রলোক ছিলেন, শ্রীভূদেব রায়। তিনি আমার ডাক্তার (নরনাথ মুখোপাধ্যায়) বন্ধু। বোধহয় সেইবার প্রথম দার্জিলিঙে এলেন। আমি এর পূর্বে আরো দু একবার এসেছিলাম। সে যাই হোক, অবজার্ভেটরির পাহাড়ে ভূদেববাবুকে বরফ-ঢাকা চূড়ো-গুলো দেখাচ্ছিলাম। 'কাঞ্চনজঙ্ঘা এইটে, আমার আঙুল যেখানে সেইটে।' ভূদেব-বাবু ঠিক ধরতে পারছিলেন না। এমন সময় পিছন থেকে গম্ভীর কণ্ঠে কে বলে উঠলেন, 'না, ওটা নয়—আমার ফিংগার ফলো করুন।'

দেখি, ব্রজেনবাবু। আমি বললাম, 'এই ত' সার্ভে অফিসের তৈরী ম্যাপটা রয়েছে, ওই দেখলেই ত'...'

'না হে না, ওটা ঠিক নয়।'

'স্যার, সার্ভে অফিস অতটা ভুল করবে!'

'ওটা ভুল নয়, এর‍্যর।'

'কোথায়?'

'আমার প্রথম অবজেক্শ্যান ফাইল-লজিক্যাল...'

'সে কি! মাপা-জোপার সঙ্গে ফাইল-লজির সম্বন্ধ কোথায়?'

'আছে, হে, আছে। ঐ জঙ্ঘা কথাটি ধর। কথাটি সংস্কৃত, জন্ ধাতু থেকে এসেছে। অর্থাৎ ভারতীয়, অর্থাৎ অ্যাঙ্গল্ অব অবজরভেশ্যান হচ্ছে ইন্ডিয়ান, নয় কি?'

'নিশ্চয়ই...'

'তার ওপর কাঞ্চন...'

'হ্যাঁ, স্যার—যাকে পরমহংসদেব বলতেন কামিনীকাঞ্চন। কিন্তু কাঞ্চনের জঙ্ঘাটা কি রকম? ওটা কি ইনভারশান, স্যার?'

'ওটা ট্রিগোনোমেট্রিকাল।'

তারপর রিফ্র্যাক্শান, ডিফ্র্যাক্শ্যান, রেফারিকাক্শান এর অতি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করলেন। মোদ্দা কথা এই: 'মাপ-জোপ করতে হবে অন্তত পনের বিশ হাজার ফুট থেকে, ভিন্ন ভিন্ন জায়গা থেকে এবং বেশি দূরে-দূরেও নয়। সবচেয়ে বড় কথা, নেপাল-তিব্বতের দিক থেকে। সার্ভে অফিস তা করেনি। তারপর দেখতে হবে নেপাল-তিব্বতের লোকরা কোন শিখরটাকে

কি বলে। এইটেই হল এ্যানথ্রপোলজিকাল রিসার্চের পদ্ধতি। ওদের ভাষা এবং ওদের অর্থ—এই ধর...

ধরবার সুযোগ হোলো না, বৃষ্টি এলো। দার্জিলিঙের বিদ্যুৎ-চমকান আমার মোটেই পছন্দ হোতো না—আর ঐ রকম কড় কড় ঘড় ঘড়, একেবারে যাচ্ছে-তাই! যাই হোক্, রাত্রে খাবার পর ভূদেববাবু গা ঢাকা দিলেন। আমিও দরজা বন্ধ করে রিহার্সাল দিতে লাগলাম। ব্রজেনবাবু ততদিনে নিজের ঘরে চলে গেছেন। বোধ হয়, তিন চার দিন তাঁর সঙ্গে আর দেখা হয়নি।

হঠাৎ একদিন বেলা এগারটার সময় আমার ডাক পড়ল। টেবিলের ওপর স্তূপীকৃত পুঁথি। 'এই দ্যাখ...' কি আর দেখব!

ব্যাপারটা এই: ব্রজেনবাবু রায় বাহাদুর শরৎ দাসের বাড়ি গিয়ে কাঞ্চন-জঙ্ঘা প্রভৃতি শিখরের তিব্বতী নাম খুঁজেছেন এবং পাছে আমার সন্দেহ দূর না হয় ভেবে প্রমাণ সংগ্রহ করে এনেছেন! এ যুগে এ মানুষ হয়? এমন জ্ঞান-স্পৃহা, জ্ঞানের এমন বিশালতা, একটি বিদ্যার সঙ্গে অন্য বিদ্যার যোগ সম্বন্ধে এমন সচেতনতা, আর এমন বিনয় ও শিশু-সুলভ সরলতা বর্তমান পণ্ডিতদের মধ্যে আছে কি?

তাঁরা বলেন, বিদ্যা বাড়ছে এমন দ্রুতভাবে যে তার সঙ্গে তাল রেখে চলাই দুষ্কর। নিশ্চয়ই। কিন্তু কথাটা হচ্ছে, জড়ো করা নয় যোগসাধন। সেজন্য যোগ-সূত্রের সন্ধান হওয়া চাই মুখ্য উদ্দেশ্য। যোগসূত্রের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমরা নির্বিকার। তার কারণ সামাজিক, বিদ্যার বৃদ্ধি নয়। য়ুরোপের নব যুগে ফিউডাল সমাজ নিশ্চয়ই ভাঙছিল। কিন্তু তখনও খৃষ্টানী ভূয়োদর্শনের কাঠামো বজায় ছিল। (শেক্স্পীয়রের নাট্যালোচনায় টিলিয়ার্ড সাহেব বিশদভাবেই দেখিয়েছেন)। কেবল তাই নয়, সেই সঙ্গে নতুন বৈশ্য সমাজ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। (মার্টিন তাঁর 'সোশ্যোলজি অব্ রিলেশান্স' বইখানিতে তার একটি যথার্থ

...হজম করে শান্ত হওয়া—এইটাই ...রতীয় সংস্কৃতির বিশেষত্ব শুনেছি। ...যদি নাও হয়, তবু ডিগ্‌নিটি, পয়েজ-...মত্তা নিশ্চয়ই আছে। (এটা আমি ...চীন আজকালকার রুশ সাহিত্যে ও ...কলায়। আধুনিক চীনে সাহিত্যেও ...সঙ্কট হয়েছে।) যামিনীদার বাড়িতে ...নিন আমেরিকান যে দুইই আসে ছবি ...দেখতে, সেটা পলিটিক্যাল ব্যাপার নয়, ...কৌতূহলের ব্যাপার।

এই পয়েজ, এই ডিগ্‌নিটি, এই ...স্থিরতা—কিন্তু স্থিতিস্থাপকতা নয়। ...অশোক ঠিকই ধরেছে যে যামিনীদার ছবিতে একটা ডাইন্যামিক পয়েণ্ট আছে। (...বড় আর্টিস্টেরই সব ভালো ছবিতেই ...তা থাকতে বাধ্য।) কিন্তু তাই বললেই ...বলা হবে না। সেই চালিকা বিন্দু থেকে কিভাবে গতির প্রসার হচ্ছে? এইটাই প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা, প্রসারে ভার-সাম্যের ব্যাঘাত ঘটেছে কি না। তৃতীয় কথা, নতুন ভারসাম্য (ডাইন্যামিক ইকুইলিব্রিয়ম) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কি না। আমার বিশ্বাস, যামিনীদা প্রধানত সরল রেখার ব্যবহারে নতুন ভারসাম্য প্রস্তুত করে এসেছেন এত দিন। (যামিনীদার ছবিতে পুরুষের ও এখনও স্ত্রীলোকের শিরদাঁড়া খাড়া সোজা ...ধ শক্ত ও লম্বা, চোখ পটল-চেরা অর্থাৎ সরল রেখা।) বাঁকা রেখা যখন ব্যবহার করেন, তখন সেটা যেন সম্পূর্ণ হতে চায়—এটাও সরলতার লক্ষণ। মিশরী ধরনের ছবির আঙ্গিকের তাই অর্থ। যামিনীদার ছবিতে শান্তি আছে। শান্তি-রসপ্রধান কিংবা শান্তিরসাত্মক বললে অন্য রসের অভাব মনে ওঠে। পশ্চিমী দৃষ্টি-ভঙ্গীতে 'পয়েজ' 'ডিগ্‌নিটি' মানুষিক নয়, মনুষ্যোচিত—আধুনিক মানুষের আকাঙ্ক্ষিত শান্তি, শাম্ভীর্য।

১১।৯।৫৫

আজ সন্ধ্যায় ডাঃ নুরুল হাসান তার প্রথম উদ্বোধনী ভাষণ পড়লে। নুরুল হাসান ইতিহাসের ভালো স্কলার। অল্প বয়সে প্রোফেসর হয়েছে এবং হবার যোগ্য। বিষয় হল ভারত ইতিহাসের মধ্য যুগের ঐতিহাসিক সমস্যা। ইতিহাস-দর্শন সম্বন্ধে আধ ঘণ্টা বিচারের পর কুড়ি মিনিট কাল বিশেষ সমস্যার আলোচনা হলে। শেষাংশটুকু আরো বিশদ হলে ভালো হোতো। বিকেলে ইশায়া বার্লিন-এর 'হিস্টরিকাল ইনেভিটেবিলিটি' পড়েছিলাম। বক্তৃতার পর ব্লখ-এর 'হিস্টো-রিয়ান'স ক্রাফ্‌ট'-এর দুটি অধ্যায় আবার পড়লাম। নুরুল হাসান ও বার্লিন অক্স-ফোর্ডে, আর ব্লখ প্যারিস। ব্লখ আমার প্রিয় ইতিহাস-লেখক। অল্প বয়সে মারা গেলেন, জার্মনরা গুলী করে মারলে। প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, জার্মন বিরোধী দলের গুপ্ত নেতা। বইখানি অসম্পূর্ণ কিন্তু হীরের টুকরো। ইতিহাসের কার্য-কারণ সম্বন্ধে একটা সম্পূর্ণ বই লিখতে চেয়েছিলেন, তা ঘটে ওঠেনি। একটি ছোট্ট অধ্যায়ে সামান্য ইঙ্গিত আছে।

নুরুল 'হিস্টরিকাল কজেশান' নিয়ে কোনো মন্তব্য করলেন না। শক্ত হোতো অবশ্য, কিন্তু আমি চেয়েছিলাম। বার্লিন সাহেবেরও বয়স কম। অক্সফোর্ডে তার বক্তৃতায় ভিড় হয় রীতিমত। অনেকেই বললেন, সব চেয়ে ব্রিলিয়েণ্ট 'ডন'। বেশি কথা বলেন, একই কথা ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে,

বারবার। কিন্তু মন আছে। ব্যক্তির দায়িত্ব সম্বন্ধে তাঁর ঝোঁকটি সত্যই মূল্যবান। তাঁর 'এম্পিরিসিজ্‌ম'টাও সুস্থ। কিন্তু মার্কসিস্টরা যখন 'মেকিং হিস্ট্রি' বলেন, তখন কি অনিবার্য নিয়ন্ত্রণ স্বীকার করেন? 'ভ্যলগার মার্কসিস্ট'দের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু এই প্রকারের 'আণ্ট স্যালি' খাড়া করা সততার পরিচয় নয়। অবশ্য এই চলছে পণ্ডিত মহলে।

আমাদের সময় একটি ছাত্র এম এ পরীক্ষার দর্শনের খাতায় লিখেছিল,—হেগেল সেজ্‌, "......"। পরীক্ষক ছিলেন ডাঃ হীরালাল হালদার। একে হেগেল বিশেষজ্ঞ, তার ওপর ব্রাহ্ম। ছাত্রের উদ্ধৃতিটা লাইব্রেরিতে খুঁজে পেলেন না। খাতা ফেরৎ দেবার সময় হোলো। পরীক্ষার ফল বেরুতে দেরী হচ্ছে, আশুবাবু খাপ্পা। হালদার মশায় সময় চাইলেন। তিনি বিলেতে চিঠি লিখেছেন উদ্ধৃতির জন্য। বলা বাহুল্য, খবর আসেনি এবং ছাত্রটি ঐ পেপারে ফেল্‌ হোলো।

অবশ্য গোড়ার দিকে মার্ক্‌স ও এঙ্গেল্‌স এক প্রকার ডিটারমিনিজ্‌ম প্রচার করেছিলেন নিশ্চয়। তাঁদের চলতি মতবাদের বিপক্ষতা করতে হয়েছিল। কিন্তু পরে, বহুবার তার ব্যত্যয়ও দেখিয়েছেন। প্রথম উক্তির ভার নামানো শক্ত। ম্যাক্‌স-মুলের এরিয়ান রেস প্রথমে লিখে পরে প্রত্যাহার করেন, তখন আর কে শোনে! গান্ধীজীর হিন্দ স্বরাজে পশ্চিমী যান্ত্রিক সভ্যতার বিপক্ষে অনেক কটু কথা লেখেন। পরে মত অনেকটা বদলালেন, তবু গান্ধী মানে মাত্র চরখা! রবীন্দ্রনাথের মেসেজ অব দী ফরেস্ট, আর্টিস্ট একাকী ('আমার ধর্ম'), কিন্তু কোনোটাই তাঁর সম্পূর্ণ বক্তব্য নয়।

ব্যাপারটা বোধ হয় এইঃ মহাপুরুষেরা জনমতের বিপক্ষে নিজেদের মত খাড়া করবার জন্য একটু উগ্রভাবেই বলে থাকেন। নচেৎ লোকে গ্রহণ করবে কেন? আত্মসমর্থনও ত' চাই! বার্লিন সাহেবের ' ব্যাপার অন্য। তাঁর নিজের মত কি বোঝা গেল না। তাঁর বুদ্ধির প্রাখর্যের বলে তিনি নিজে যে একজন বিশেষ মন-সম্পন্ন ব্যক্তি তারই প্রমাণ হোলো। এর পিছনে একটা অধ্যাপকসুলভ দম্ভ রয়েছে। পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্নতা ও নিজেদের ছোট গণ্ডীর মধ্যে তীক্ষ্ণ প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য ঐ ধরণের ব্রিলিয়েন্স-এর প্রয়োজন ঘটে। বিশেষত অক্সফোর্ড-কেম্ব্রিজে। সে যাই হোক্‌, এম্পিরিসিজ্‌ম দর্শন নয়—দৃষ্টিভঙ্গী। বহু দৃষ্টিকোণের বহু ভঙ্গী। ইতিহাসের দর্শন সম্ভব কি না, তা নিয়ে বহু তর্ক আছে ও আরো চালানো যায়। র‍্যাঙ্কে ও ফিশার বলেছেন, ইতিহাসের ফিলজফি নেই, হওয়া সম্ভব নয়। আমার ক্ষুদ্র মতে—আছে ও সম্ভব। তবে ফিলজফির অর্থ ভূয়োদর্শন ও ইতিহাসের অর্থ মানব-সভ্যতার গতিবিধির চেয়ে অধিক হলেই মুস্কিল। আমার দলেও বড় বড় লোক আছেন। ভারতবর্ষের ইতিহাস (সভ্যতা অর্থে)—দর্শন সম্বন্ধে একটা বই ও গোটা কয়েক বক্তৃতা দিই ও প্রবন্ধ লিখি, ইংরেজীতে ও বাঙলাতে। শেষে ছেড়ে দিতে বাধ্য হলাম। সেগুলো নতুন করে সাজাতে হবে......

* * *

কেন এমন হয়? কেন শক্ত জিনিস ধরতে চাই, কেনই বা ছেড়ে দিই? এক উত্তর—দম্ভ। খানিকটা সত্য, পুরোপুরি নয়। বাকিটা শিক্ষা। প্রথমে পারিবারিক শিক্ষা। সারাদিন মোকদ্দমা চালিয়ে সন্ধ্যায় ক্লান্ত হয়ে স্প্রিং-এর খাটে শুয়ে বাবা আমাকে বললেন, মেকলের ইংলণ্ডের ইতিহাস পড়ে শোনাও। মর্লের লেখা গ্ল্যাডস্টোনের জীবনীও মধ্যে মধ্যে পড়তে হোতো। তখন বয়স বোধ হয় দশ এগার। তিনি ব্যাখ্যা করতেন মিডলোথিয়ান ক্যাম্পেন-এর, ডিস্‌রেলির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণগুলি, সেই সঙ্গে ইংরেজী পার্লামেণ্ট আর কন্‌স্টিটিউশ্যন। মায়, ইংরেজী শব্দের উচ্চারণও শুধরে দিতেন।

তারপর স্কুলে ঈশান ঘোষের ইতিহাস আর নারাণবাবুর সাহিত্য পড়ানো; কলেজে ফাদার পাওয়ার, আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর, জানকীনাথ, ক্ষেত্রমোহন, বিপিন গুপ্ত, ললিত বন্দ্যোপাধ্যায়, তার সঙ্গে সতীশ চট্টোপাধ্যায়ের অঙ্ক আর কৈলাস পণ্ডিত মশাই-এর সংস্কৃত পড়ানো, অঘোর চট্টোপাধ্যায়ের কেমিস্ট্রি; বিশ্ববিদ্যালয়ে স্টিফেন সাহেব, মনোমোহন ঘোষের ইংরেজী বক্তৃতা শোনা, তার [illegible] ব্রজেন শীল, বিজয় মজুমদার, [illegible] মজুমদার, বিপিন সেন, অজয় [illegible] রায়; সেই সঙ্গে প্রমথ চৌধুরী, রবী[illegible] নাথ, প্যাট্রিক গেডিস এবং [illegible] জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্র; [illegible] অবনবাবু, গগনবাবু, [illegible] গাঙ্গুলী, কুমারস্বামী, রাধিকা [illegible] কেরামৎ খাঁ, বিশ্বনাথ রাও, [illegible] আরো কত! আমার মনে হ[illegible] ক্ষুদ্রে সন্তুষ্ট হতে বারণ [illegible] জানকীবাবু ওয়ার্ডসওয়ার্থ পড়া[illegible] প্লেটো-উপনিষদের ব্যাখ্যা [illegible] করলেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে [illegible] অর্থনীতির আলোচনাও করেছি [illegible] চৌধুরীর কাছে জানবার [illegible] সম্পর্ক সম্বন্ধে অনেক কথাই [illegible] এমন কপাল যে আমার অন্তরঙ্গ [illegible] ঐ প্রকৃতির। বুদ্ধিবিদ্যার [illegible] আমার শিক্ষা। দুরাশা পোষণ করেছি [illegible] হইনি, সেজন্য খেটেওছি। এটা [illegible] একদিক। অন্যদিকে শেষরক্ষা [illegible] পারিনি। খানিকটা স্বাস্থ্য, খানিকটা অধৈর্য, খানিকটা পেশা অর্থাৎ অর্থনীতি ও সমাজ তত্ত্বের অধ্যাপনা। আজকাল[illegible] অর্থনীতি এতটা জটিল হয়ে উঠেছে [illegible] তার মূল কথাগুলি ধরবার চেষ্টা [illegible] হয়। যতই ইকনমিক্‌স পড়ছি, ততই [illegible] হচ্ছে ও ততই মূর্খ হয়ে যাচ্ছি [illegible] হচ্ছে। এখন এমন অবস্থা যে-ধারে [illegible] ফেরাই, সে-ধারেই না-জানার পাহাড়! অথচ ছাত্রদের সব সময় সব কথা [illegible] যায় না!

তা' হলে, দাঁড়াল কি? কি [illegible] দাঁড়াবে? উইলিয়ম জেম্‌স ক্লাসে [illegible] পর ঘণ্টা নিজের মনে যা আসত তাই [illegible] যেতেন। একদিন ছাত্ররা জিজ্ঞাসা করলে: 'What then, Sir, is your conclusion?'

জেমস উত্তর দিলেন,—

'Conclusion? Is the universe concluded that I should come to a conclusion?'

জীবনের অন্তে সিদ্ধান্ত। ই[illegible] ধস্তাধস্তি, রগড়া-রগড়ি। খেটে যাও [illegible] ঘণ্টায় ষাট মিনিট বেগে মৃত্যুর [illegible] অগ্রসর হও। ব্যস্‌! ফাদার পাওয়ার বলতেন, Who cares!

কলিকাতা

১ নম্বর চৌরঙ্গী টেরাস-এ কিছুদিন আগে শিল্পী শ্রীশৈলেন মিত্রের চিত্র প্রদর্শনী হয়ে গেছে। এটি শিল্পীর চতুর্থ একক প্রদর্শনী।

স্কেচ

ছোট বড় মিশিয়ে শিল্পী সবসুদ্ধ ৩৫টি ছবি পেশ করেছেন। রকমারী কম্পোজিশনে, রকমারী আঙ্গিকে, রকমারী বিষয়বস্তু নিয়ে এবং রকমারী মাধ্যমে ছবিগুলি অঙ্কিত। এর মধ্যে খুব দুর্বল ছবি একটিও চোখে না পড়লেও আমার ব্যক্তিগত মতে তাঁর ল্যান্ডস্কেপগুলিই সব থেকে রসোত্তীর্ণ হয়েছে। হুবহু প্রকৃতিকে তিনি ক্যানভাস-এ ধরে রাখার চেষ্টা করেন নি। সামনে প্রকৃতিকে রেখে খুশি মত রূপ দিয়েছেন। কেউ যদি প্রশ্ন করেন এমনটি না হয়ে অমনটি হল কেন সে কথার অবশ্য জবাব দিতে পারব না। এঁর ছন্দোময় তুলির টানটোনে ভিনসেণ্ট ভ্যান গগের কিছুটা প্রভাব লক্ষ্য করা যায় বটে কিন্তু একটি ইংরাজী দৈনিকে যে লেখা হয়েছে—কয়েকজন প্রখ্যাত সমসাময়িক ভারতীয় শিল্পীর ছাপ এগুলি বহন করছে, কৈ তেমন কিছু তো চোখে পড়ল না। পত্রিকাটি আরও বলেছেন—র ছবির অংকনপদ্ধতি এবং স্টাইল নাকি একই রকম,—এ উক্তিরও সমর্থন করা গেল না। 'কম্পোজিশন ২' ছবির পাশে 'টেম্পল ওয়ে' ছবিখানি রাখলে যে কোনও দর্শক পার্থক্য বুঝতে পারবেন। যাই হোক, একের সঙ্গে অন্যের সব সময় মতের মিল হয় না সুতরাং এ প্রসঙ্গ এইখানেই স্থগিত রাখা শ্রেয়।

ল্যান্ডস্কেপগুলি ছাড়া 'কক্ ফাইট', 'থ্রী ফিগার্স', 'থ্রী ইন এ রুম', 'ভিলেজ মার্কেট', 'সিমেট্রী অ্যাট নাইট', 'কম্পোজিশন ১', 'টেম্পল ওয়ে' প্রভৃতি ছবিও যথেষ্ট দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ছবিগুলি মাঝে মাঝে অ্যাবস্ট্র্যাক্ট মাঝে মাঝে
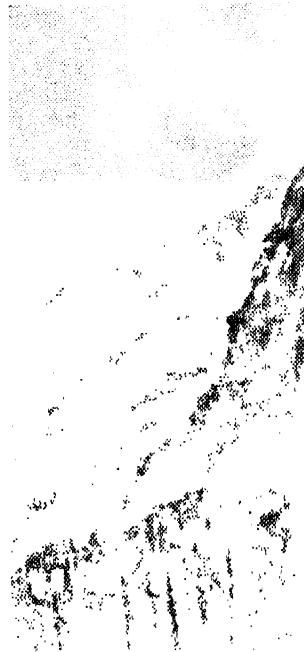
শৈলশিখরে

সুররিয়্যালিস্ট। অবশ্য সম্পূর্ণ অ্যাবস্ট্র্যাক্ট বলা চলে না কারণ সব ছবিগুলির মধ্যেই বাস্তব জগতের কিছু না কিছু আভাস পাওয়া যায়। পশ্চিমের আঁচ কিছুটা এসে পড়লেও শিল্পী যথেষ্ট স্বকীয়তার পরিচয় দিয়েছেন। সব চেয়ে বড় কথা এঁর একনিষ্ঠতা। প্রত্যেক ছবির কম্পোজিশন-এর পিছনে যথেষ্ট চিন্তা আছে এবং প্রত্যেকটিই মৌলিক। কিছু ছবির মধ্যে জাপানী প্রভাবও লক্ষ্য করলাম।

পরিশেষে এই তরুণ শিল্পীকে তাঁর পরিপূর্ণ শিল্পকর্মের জন্য অভিনন্দন

তাপস

১

জগতের ইতিহাসে আজকের মত সঙ্কটময় মুহূর্ত আর কখনও আসেনি একথা অবিসংবাদিত; কিন্তু আজকের মত মহৎ সমৃদ্ধিময় সম্ভাবনাও আর কি কোনোদিন দেখা দিয়েছিল? তাই শঙ্কার কথা, সংশয়ের কথা কিছুই আমি বলব না,—আমি দেব আলোকের আশ্বাস। আজ নিঃসংশয়ে জানি, এত যুগের পুঞ্জীভূত অন্ধকারের সকল বাধা অতিক্রান্ত হওয়া যায় এক মুহূর্তে। এই ভরসা কৃষ্ণমূর্তির কাছ থেকে।

২

কৃষ্ণমূর্তির পরিচয় বাংলাদেশ খুব অল্পই জানে; যতটুকুও বা জানে, সে-টুকুও নানা রহস্য-কুয়াসায় আবৃত। ১৯০৩ সনে দৈবক্রমে যখন থিয়োসফিক্যাল সোসাইটিতে তাঁকে নিয়ে আসে, তখন তাঁর বয়স আট বৎসর। সকল মহাপুরুষের জীবনেতিহাসে দেখি, শৈশবেই তাঁদের ভবিষ্য-জীবনের আভাস বিদ্যুৎ-ঝলকে দেখা দেয়। কৃষ্ণমূর্তির জীবনেও তাই—ঐ বয়সেই তাঁর অসামান্যতার পরিচয় পেয়ে যাঁরা তাঁর মধ্যে মহান ব্যক্তিত্বের সম্ভাবনা দেখতে পান, মনস্বিনী ডাঃ অ্যানি বেসাণ্ট তাঁদের অন্যতমা। ডাঃ বেসাণ্ট মাতার স্নেহে অতি যত্নে তাঁকে পালন করেন, যাতে তাঁর অন্তর্নিহিত শক্তি বিকশিত হবার পথে বাধা না পায়। ১৯১০ সনে সকলকে অভাবিত বিস্ময়ে আপ্লুত করে কিশোর কৃষ্ণমূর্তি রচনা করলেন অতুলনীয় পুস্তিকা At the feet of the master যার মধ্যে শিশুর ভাষায় নিখুঁতভাবে রয়েছে মানুষের চরিত্র গঠনের, ভগবানলাভের সকল ইঙ্গিত। তারপর থেকে সোসাইটি তাঁকে ঘিরে সংগঠিত করলেন পৃথিবীর নানা জায়গায় নানা প্রতিষ্ঠান—সহস্র সহস্র মুমুক্ষু ও জগৎ-হিতকামী এই প্রতিষ্ঠানের সভ্য হয়ে প্রতীক্ষা করতে লাগলেন কৃষ্ণমূর্তির পূর্ণ পরিণতির। শতদল-কমল একদিন প্রস্ফুটিত হল পূর্ণ মহিমায়; কিন্তু সেদিন অপেক্ষমান সকলকে নিরাশ করে সমস্ত প্রতিষ্ঠান একদিনে ভেঙে দিয়ে থিয়োসফিক্যাল সোসাইটি থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে পথে বেরিয়ে এলেন তিনি। পূর্ণ সত্যকে তিনি লাভ করেছেন, তাকে কোনো সঙ্ঘের কারাগারে সীমিত করা অসম্ভব; সত্য জীবন্ত, মানুষের অন্তরে সত্য বিকশিত হয় ফুলের মত; সত্যের ছাঁচ দেওয়া যায় না।

আলোড়ন হল বিপুল, এত অদ্ভুত দুর্যোগের মধ্যে হয়তো আর কোনো মহাপুরুষকে পড়তে হয়নি। কিন্তু সত্যের মূর্তি নির্ভীক অটল, বাধা পেলে তার মহিমা হয়তো আরো অনুপমভাবে বিচ্ছুরিত হয়ে পড়ে। সেদিন আশ্চর্য লাগে ডাঃ বেসাণ্টকে; এতটুকু বাধা তিনি দিলেন না, ঠিক বুঝলেন,—'তুমি যা করবে তাই ঠিক হবে। ঐ সব প্রতিষ্ঠান সংগঠনের সূত্রপাতের কাল হতেই সবাইকে তিনি বলতেন, ভগবানের কাজ তোমার আমার পরিকল্পনার অনুসারে হবে না, যে-কোনো অবস্থার জন্যে নিজেদের আমরা যেন প্রস্তুত করে রাখি।'
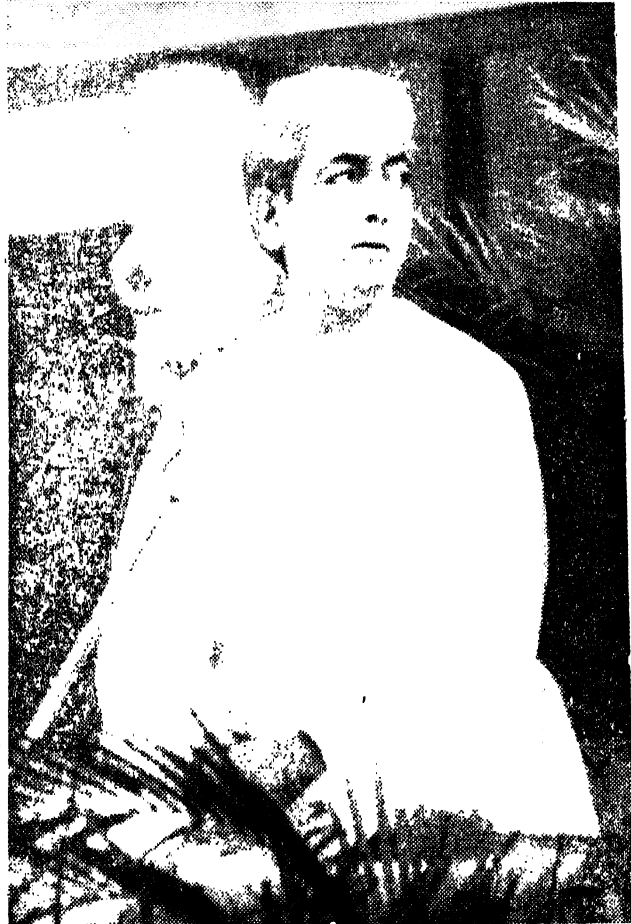
৩

সে হল ১৯২৯ সনের কথা, তার পরে বাইশ বৎসর অতিক্রান্ত হয়েছে। তারপর থেকে এই নিঃসঙ্গ গম্ভীর আনন্দময় পুরুষ নিঃশঙ্ক পদক্ষেপে অবিশ্রান্ত ঘুরেছেন—ইয়োরোপ হতে আমেরিকা, আমেরিকা হতে ভারত, ভারত হতে অস্ট্রেলিয়া—শুনিয়েছেন অপরাজিত তাঁর বাণী, যে বাণীর মধ্যে নিহিত আছে ব্যক্তি হতে জগৎ পর্যন্ত সকল সমস্যার শিবময় সমাধান। আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ, ভক্তের জন্যে, গোষ্ঠীর জন্যে এতটুকুও অপেক্ষা নাই; 'I have a song in my heart, so I sing'। নিঃসন্দেহে জানেন, সত্য উচ্চারিত হলে অব্যর্থ তার শক্তি—সত্যের বীজ রয়ে যাচ্ছেই সারা জগতে ব্যাপ্ত সহস্র সহস্র তাঁর বন্ধুদের চিত্তে। সেই বন্ধুরা অন্তরে অন্তরে জানেন, আর ভয় নেই; জগৎ 'জটিল-গহন-পথসংকট-সংশয়-উদ্‌ভ্রান্ত' হলেও তার সুমঙ্গল মহা-প্রভাত আসন্ন—এতদিনে ফিরে পাওয়া গেছে তার যুগান্তরের হারিয়ে-যাওয়া বাঁশি।

তবু বাঁশির সুর চিরনূতন। শুধু অপরূপের চিরন্তন অনির্বচনীয়তায় নয়। জীবনের প্রবাহ অবিরাম, আজকের জগৎ অতীতের জগৎ নয়। বিশ্বমানব প্রতিদিন এগিয়ে চলেছে,—তার বর্তমানের বিপুল-বিত্ত, অতুলন মানস-সম্পদ্, তেমনি বর্তমানের ব্যাপক সহস্রমুখী সমস্যা অতীতে কোনোদিনই ছিল না। অতীতের মত মন্ত্রে বর্তমানের ব্যূহ ভেদ করা যায় না।

৪

কী সেই সত্য? যার মধ্যে ব্যক্তি-পরিবার বর্ণ অর্থ সমাজ গোষ্ঠী জাতি ধর্ম রাষ্ট্র সকল সমস্যার চাবি আছে? যা সূর্যের আলোর মত সবাকার জন্যে, যা অধিকারীভেদকে গণনা করে না, যা বিদ্যা-বুদ্ধি-প্রকৃতি প্রভৃতির সকল স্তরগত বিভাগকে মুহূর্তে বিলুপ্ত করে দিতে পারে? কৃষ্ণমূর্তিকে দেখবার পর থেকে বারে বারে রবীন্দ্রনাথকে মনে পড়েঃ যে-আলোর মধ্যে সকল প্রশ্নের উত্তর নেই, যা কেবল বিশেষের জন্যে, সে-আলো আলোই নয়। কিন্তু সত্যের সহস্র রশ্মি—তার ইঙ্গিত হয়তো দেওয়া যায়, তার ব্যাখ্যা হয় না; তার ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন, কেননা সত্যের ব্যঞ্জনা মানুষের হৃদয়ে। আমি শুধু একটু আভাস দেবার চেষ্টা করব।

আমরা যেমন, জগৎ তেমনি। আমরা দুটি মানুষ মিলতে পারি না, তাই জগতে যুদ্ধ ঘটে। অন্ন-বস্ত্র-গৃহের শারীরিক প্রয়োজন স্বাভাবিক, কিন্তু সেই প্রয়োজনকে সাইকলজিক্যাল করে তুলে আমরা পরস্পরের সঙ্গে কাড়াকাড়ি রেষারেষি করছি; অথচ ভবিষ্য-নিরাপত্তার উদগ্র উৎকট এই আকাঙ্ক্ষাই টেনে আনছে বর্তমানের যত আপদ এবং একই কারণে ভবিষ্যৎও যেমন অনিশ্চিত তেমনই থেকে যাচ্ছে। চামড়ার ভিতরে দেহে-মনে সকল মানুষই আমরা এক ধরনের; বিশেষ পারি-পার্শ্বিক বাইরে আমাদের অল্পবিস্তর বিভিন্ন রূপ দেয়, কিন্তু ভিতরে ভিতরে এত এক আমরা। আমাদের সকল ভালবাসা ভয় দিয়ে ঈর্ষা দিয়ে অধিকারবোধ দিয়ে দেনা-পাওনার বৃত্তি দিয়ে পঙ্কিল; আমাদের প্রত্যেকের মাঝে আছে লোভ ভয় দ্বেষ স্বার্থবুদ্ধি শতলক্ষ কামনা; প্রত্যেকের বুদ্ধি কুসংস্কার, আইডিয়া, নানা মতামত বিশ্বাস দিয়ে আচ্ছন্ন। তবু বলছি, আমি ব্রাহ্মণ তুমি ক্ষত্রিয়, আমি বাঙালী তুমি জার্মান, আমি অভিজাত তুমি মধ্যবিত্ত এবং আরো কত কী। সত্যের আবির্ভাব কখনও জাতি-দেশ-কালের অপেক্ষা রাখেনি, বাধিত না হলে সে তার কল্যাণ-ময় সমগ্র রূপ মানবের অন্তরে প্রকাশিত করেছে; সেই সত্যকে খণ্ড খণ্ড করে হিন্দু বৌদ্ধ মুসলমান ক্রিশ্চান নাম দিয়ে আমরা কী নিদারুণ বিরোধের সৃষ্টি করেছি। তারপরে আছে আজকের দিনের নানা পলিটিক্যাল ধর্ম। অতীতের মানুষ তাদের আনন্দ-বেদনাকে আশা-আকাঙ্ক্ষাকে উপলব্ধি-কল্পনাকে আকার দিয়ে গেছে ভাষায় চিত্রে মূর্তিতে স্থাপত্যে গীতি-উৎসবে; নানা দেশে তার নানা রূপ—তারাও মানুষের মতামতের বৈষম্যের কারণ। শিক্ষায়তনগুলিও প্রকৃত শিক্ষা আমাদের দেয় না, তারা পর্যন্ত বিভেদ বজায় রাখবার জন্যেই নিয়োজিত। বিদ্বেষ দিয়ে কুসংস্কার দিয়ে, নানা ইডিয়লজি, নানা সম্প্রদায় স্থাপন করে আর্থিক সামাজিক ও জাতিগত কৃত্রিম সীমারেখা টেনে এক অখণ্ড বিশ্বমানবকে ছিন্ন করে পৃথিবীকে আমরাই এই [illegible] রূপ দিয়েছি। সেই কথা [illegible] উপলব্ধি করে যদি আমরা নিজেদের [illegible] দায়িত্ব গ্রহণ করি, নিজেকে [illegible] রূপান্তরিত করি, তবেই জগতের [illegible] অভ্যুদয়' সম্ভবপর।

মানি, বুদ্ধিতে প্রকৃতিতে নানা [illegible] দিয়ে অসমান হয়েই মানুষ জন্মগ্রহণ [illegible] কিন্তু মানুষের সম্ভাবনাও যে [illegible] একই জীবনে। তার ইচ্ছামতে [illegible] প্রাণীর মত উদ্ভিদের মত [illegible] নিয়ন্ত্রিত থাকা তার [illegible] ক্ষুদ্র কুঠুরিকে ক্ষুদ্র [illegible] মাত্র তার বিস্তার ঘটে [illegible] ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে আমরণ [illegible] মানবতার ধর্ম? মানুষের [illegible] সমাধান প্রেমে। প্রেম মানুষের [illegible] স্বাভাবিক প্রবৃত্তিও, কিন্তু [illegible] মনকে জুড়ে আছে [illegible] স্ফূর্তির পথ আজ অবরুদ্ধ।

পরিবারে সমাজে [illegible] আমরা দেখতে পাচ্ছি, [illegible] ভাঙন ধরেছে। [illegible] বুদ্ধির অভাব কোনোদিনই [illegible] 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী'[illegible] এক ইডিয়লজি আসছে ভাঙন [illegible] মতে ঠেকিয়ে রাখতে। তবু [illegible] একথা সুস্পষ্ট। কেননা সকলেই [illegible] ভাসা রিফর্ম-এর চেষ্টা করছেন [illegible] থেকে গড়বার কথা কেউ [illegible] না। পরিবার সমাজ জাতি [illegible] ভিত হল ব্যক্তি, সমাজ প্রভৃতি [illegible] সকল প্রতিষ্ঠান ব্যক্তিরই [illegible] ব্যক্তি জীবন্ত, সে দিনে-দিনে [illegible] নূতন; সমাজ রাষ্ট্র প্রভৃতিকে [illegible] তাল রেখে চলতে হয়। কিন্তু [illegible] শতাব্দী ধরেই প্রতিষ্ঠানগুলির [illegible] সচল মানুষকে নিয়ন্ত্রিত [illegible] চেষ্টা করছে। তাই যুগে যুগে [illegible] মানুষ পরিবার সমাজ বর্ণ জাতি [illegible] দায়ের গোড়ায় ভাঙন ধরিয়ে [illegible] কেটে বেরিয়ে এসেছে; সমাজ [illegible] তাকে পূজা করেছে কিংবা [illegible] শৃঙ্খলিত,—কিন্তু কখনও তার [illegible] পরিত্রাণ পায়নি। এই ব্যক্তি-সমস্যা [illegible] হয়ে জগৎ-সমস্যায় হাত দিলে [illegible] যতই থাকুক এবং সংগঠন শক্তি [illegible]

রোক বারে বারেই ব্যর্থ হতে হবে—এত শতাব্দী ধরে যা হয়ে আসছে। সকল প্রশ্নের নিঃশেষ উত্তর আছে ব্যক্তির রূপান্তরণে,—অন্ধকার হতে বিদ্বেষ হতে কামনা হতে শঙ্কা হতে আলোকে প্রেমে করুণায় অমৃতত্বে তার উত্তরণে।

আমি জানি এখনই প্রশ্ন উঠবে, একটি একটি করে মানুষ জাগবে, এমনি করে শান্তিময় পুণ্য পৃথিবী সৃষ্টি করতে যে যুগ কেটে যাবে! তার প্রথম উত্তর, পাঁচ হাজার বছর ধরে আমরা যুদ্ধ করে আসছি, না হয় আরো কিছুকাল গেলই; পন্থাকে শুদ্ধ রেখে চলি যদি, লক্ষ্যে একদিন পৌঁছতে পারবই—কোনো কারণেই অশুদ্ধ পন্থা গ্রহণ করে জগতকে আরো কলঙ্কময় করব না। দ্বিতীয়ত দীর্ঘ সময় কেনই বা লাগবে? একজন মুক্ত পূর্ণ মানবের সাধ্যের কি কোনো সীমা আছে? জগতের এক এক সংকটে দিশারী হয়েছেন একা কৃষ্ণ, একা বুদ্ধ, একা ক্রাইস্ট। মানুষের অন্তরের অন্তরে যে আছে, সে সৌন্দর্যের পূজারী; সৌন্দর্যকে কোথাও দেখলে একমুহূর্তে সে রূপান্তরিত হয়ে যায়;—সেখানে কালের অপেক্ষা নেই।

ক্রাইস্টের জীবন নিয়ে রচিত ক্ষুদ্র একটি আখ্যায়িকা মনে পড়ে। তাঁর তখন বারো বছর বয়স, একদিন কর্মান্তে পিতা জোসেফের সঙ্গে বাড়ি ফিরছেন। রাজপথ দিয়ে প্রহরীরা ধরে নিয়ে যাচ্ছে নিরপরাধ এক যুবককে; জোসেফ তাদের থামিয়ে জিজ্ঞাসা করছেন যুবকের অপরাধ কী। জনতা জড়ো হল তাঁদের চারদিকে, কেউ লক্ষ্য করল না যীশু কোথায়। সহসা সকলে সভয়ে চমকে উঠে দেখল যীশু কোথা থেকে একপাত্র জল সংগ্রহ করে এনেছেন, উৎপীড়নে অনভ্যস্ত শ্রান্ত কয়েদী সাগ্রহে সেই জল পান করছে। প্রহরীরা একবার ভাবল বাধা দেবে, পেরে উঠল না। সেই মুহূর্তে সমস্ত জনতার চিত্তে যে মহাকরুণার জন্ম হল, তা কি আর কোনো মন্ত্রে কোনো অনুশাসনে জাগা সম্ভবপর? আমার সমস্ত আশা মানুষের ঐ অন্তরকে, সত্য-শিব-সুন্দরের রূপে যার প্রকৃত প্রেম; শুধু হয়তো সেই খবর আজও তার জানা নেই,—জানা নেই তার পথ কোন দিক্ দিয়ে।

৫

যে-কোনো সমস্যা উঠলে তৎক্ষণাৎ তার শ্রেষ্ঠ উত্তর আবিষ্কার করায় বুদ্ধির চরম সার্থকতা। তা সম্ভব হয়, যদি আমরা আমাদের সমস্ত স্মৃতি, জন্মগত সকল সংস্কার ও অর্জিত সমস্ত মতামতের আবরণ হতে নিজেকে বিযুক্ত করে অখণ্ড মন দিয়ে সোজাসুজি সমস্যার দিকে তাকিয়ে দেখতে পারি। চরম বিপদে বা প্রেমের অনন্দঘন মুহূর্তে আমরা জীবনে দু একবার হয়তো এই স্বচ্ছদৃষ্টি লাভও করি। কিন্তু অধিকাংশ সময়েই জ্ঞানত কি অজ্ঞানে আমাদের মন অতীতের পর্বত-প্রমাণ বোঝা বয়ে বয়ে তার চাপে পঙ্গু হয়ে রয়েছে; এবং আমরা জানিই না যে এই বোঝা বওয়া একেবারেই নিরর্থক। বরং আমাদের ধারণা এবং বর্তমান শিক্ষা-পদ্ধতিও এই কথাই বলে,—যে যত বেশী বিদ্বান ও স্মৃতিমান, সে-ই তত জ্ঞানী, জীবনযাত্রায় সে-ই তত নিরাপদ। তাই নানারকম রেডী-মেড্ জ্ঞান দিয়ে অনবরত আমাদের স্মৃতিকে ভারাক্রান্ত করা হচ্ছে। চিন্তা করতে আমরা ভুলে যাচ্ছি, অপরের চিন্তার পুনরাবৃত্তি করে করে মন বড় অকেজো হয়ে পড়ছে। বাস্তবিকপক্ষে, জ্ঞানার্জনের প্রকৃত রীতি কী? জ্ঞান-লাভের উৎসস্বরূপ প্রতি ঘটনার থাকে ভাব আর দেহ, অর্থ আর রূপ। সেই ভাবটুকু ঠিকমত গ্রহণ করতে পারলে তদনুসারে সত্তার রূপান্তর ঘটে, বাকি সমস্ত গন্ধমাদন খসে পড়ে যায়—আবার নূতন ঘটনাকে গ্রহণ করবার জন্যে মন খালি হয়ে থাকে। কোনো চিত্র দেখতে হলে গান শুনতে হলে তার আগে আমরা নিজেদেরকে অতীত মতামতে যতটা সুসজ্জিত করতে পারি, ততটা নিরাপদ মনে করি। তার ফলে সুনিপুণভাবে চিত্রকে গীতকে বিশ্লেষণ করে তাকে বিশেষ কোঠায় ফেলি, তুলনা করি, বিচার করি, নামকরণ করি, কিন্তু কী যে তার প্রাণের কথা তা শুনতে পাই না; এবং বুঝতেও পারি না যে প্রকৃতপক্ষে বঞ্চিত হলাম। তা পর, অন্ন-বস্ত্র-গৃহসমস্যা না মিটলে মানুষের এগিয়ে চলা অসম্ভব এবং বর্তমান যুগের বৈজ্ঞানিকেরা বারে বারে বলছেন ধরিত্রী রিক্ত নয়, সকল মানুষের অন্ন-বস্ত্র-গৃহের স্বচ্ছন্দ সংস্থান এখনই হতে পারে, যদি সারাপৃথিবীর জনকতক মানুষ একযোগে মিলতে পারে। এইখানে গিরি-সংকট সৃষ্টি করেছে যত পলিটিক্যাল ধর্ম। মানুষ খেতে-পরতে না পায় না পেল, আমার 'ইজম্' ছাড়তে পারি না। এই নিয়ে সমস্ত দেশ রক্ত-তিলক পরেছে, কিন্তু অন্ন-বস্ত্র-গৃহের মূল সমস্যা—যার জন্যে সকল 'ইজম্'এর সৃষ্টি—যেখানে ছিল সেইখানেই থেকে যাচ্ছে, আজ কয়েক হাজার বছর ধরে।

জীবন স্রোতস্বতী, স্বচ্ছন্দে প্রবাহিত হওয়া তার ধর্ম। প্রতিদিনের বোঝা প্রতি-দিন ফেলে দিয়ে দিয়ে তার পথ-চলা—প্রতিমুহূর্তের মরণের ভিতর দিয়ে পথ। প্রতি প্রভাতে নূতন হয়ে যে জাগতে পারে, জীবনের রহস্য সে-ই জেনেছে; সে-ই জানে, এই মরণের মাঝেই নিহিত আছে অমৃতত্বের পথ।

৬

মানুষের এই রূপান্তরণের পথ কী? কৃষ্ণমূর্তি বলেন, জীবনের, ধর্মের মন্ত্র

একটিই মাত্র—অতন্দ্রচেতনা, প্রতিমুহূর্তের জাগৃতি। আত্মজ্ঞানে পথের শুরু। "To go for one must begin near, begin now." এই মুহূর্ত হতে জাগ্রত হও, জাগ্রত হয়ে লক্ষ্য কর তোমার প্রতি কাজ, প্রতি বাক্য, প্রতিটি চিন্তা। আহারে-বিহারে, ধ্যানকালে, বন্ধুসঙ্গমে, মানে-অপমানে, বিপদে-সম্পদে নিজের পরিচয় নাও; দেখ চাকরের সঙ্গে কীভাবে কথা বলছ, উপর আলার সঙ্গেই বা কীভাবে। দেখ সকল ভূমিতে সকল অবস্থায় তোমার ভিতর-বাহির একসুরে বাঁধা আছে কি না। নিজের মধ্যে পরিহার্য বলে যদি কিছু পাও, নম্রচিত্তে তাকে স্বীকার করে নাও, তাহলে একমুহূর্তে তা হতে পরিত্রাণ পাবে। ক্ষুদ্র-বৃহৎ বলে ভাগ কোরো না—সজীব সংবেদনশীল চিত্তে তুচ্ছ অপরাধও বজ্রাঘাত হয়েই বাজে। ক্ষুদ্র একটি লোভ হতে সম্পূর্ণ মুক্ত হও যদি, সমস্ত লোভ হতেই মুক্ত হলে।

অলস ইতস্তত ভ্রাম্যমান স্বপ্ন-বিলাসী মন অমনি বলে ওঠে, এ যে ভারি দুরূহ পথ। কৃষ্ণমূর্তি বলবেন—দুরূহ হয়ও যদি, এভারেস্টকে কখনও নীচে নামিয়ে এনো না, জীবন-পণ করে সেখানে আরোহণ করতে হয়। সত্যকে খাটো করে করেই তো পৃথিবী এত কুৎসিত হয়েছে। আর, সত্যিই কি এ-পথ কঠিন? সকল সাধনার লক্ষ্য হল আত্মশুদ্ধি; প্রত্যেকের কাছে সবচেয়ে অন্তরঙ্গ সে নিজে, আত্মপরিচয়ের পথ দিয়ে সেই আত্মশুদ্ধি কি সবচেয়ে নিকট সাধনা নয়? প্রতি মুহূর্তে জাগ্রত থাকা অনভ্যস্ত চিত্তের পক্ষে প্রথমে হয়তো কিছু কঠিন, কিন্তু মানুষ নিজেকে চিনলে তবেই তো জগতকে চিনতে পারবে? এই সাধনায় অধিকারী-ভেদের প্রশ্নও ওঠে না—তীব্র উন্মুখীনতা যার আছে, সে যে সহস্র সোপান অতিক্রম করবে এক মুহূর্তে।

৭

জপ, ধ্যান, পূজা প্রভৃতি এতকাল ধরে মানুষ করে আসছে কৃষ্ণমূর্তি কেন তার বিরুদ্ধে কথা বলেন, এই প্রশ্ন তাঁর সামনে হাজারবার উঠেছে। বলেন, প্রথমত অস্বাভাবিক পথ, গুরুর 'পরে বিশ্বাস করে পথ চলতে হয়, অন্ধকারে চলা। তুচ্ছ বিষয়েও অন্যের 'পরে নির্ভর করতে আমরা সহজে পারি না, আর এ যে সমস্ত সত্তাকে নিয়ে! কাল-সাপেক্ষ, প্রত্যেক গুরুই বলে দেন, ক্রমে ক্রমে হবে। আত্মশুদ্ধি কি ক্রমে ক্রমে হয়? লোভ ক্রমে ক্রমে বাড়তে পারে, কিন্তু লোভ হতে মুক্তি পাওয়া কি ক্রমের ব্যাপার? যে মুহূর্তে চিনলাম লোভ কী, মুক্তি সেই মুহূর্তেই। তারপর ভক্তি, ভালবাসা এ কি ক্রমে ক্রমে হয়? তাছাড়া, কালাতীত যিনি, তিনি কি ক্রমে ক্রমে আবির্ভূত হন?

দ্বিতীয়ত, আমি আমার ভিতরের কুশ্রীতা বুঝতে পেরে একটি আদর্শ গ্রহণ করি, আমার বিকল্প হিসাবে। সেই আদর্শের ধ্যান করি, এদিকে আমার ভিতরকার সকল কুশ্রীতা যেমন তেমনি থেকে যায়,—হয়তো অবদমিত থাকে, হয়তো ঢাকা থাকে। বার্ধক্যে কি দুর্বল মুহূর্তে ঠিক তারা আত্মপ্রকাশ করে। সেই মলিন চিত্তে যিনি নির্মল, যিনি পবিত্রস্বরূপ, তাঁর আবির্ভাব সম্ভব কি?

তৃতীয়ত, একটি বিশেষ মূর্তিতে বা ভাবে আমি রূপান্তরিত হতে চাই, কিন্তু মানুষের যে আছে সব-কিছু হবার বৃহৎ সম্ভাবনা। সেই সম্ভাবনাকে কেন সংকুচিত করব?

চতুর্থত, ভগবান অনির্বচনীয়, অজানা অচিন্ত্য, প্রতি মুহূর্তে নূতন; চিন্তা দিয়ে তাঁকে পাওয়া যায় না, আমাদের জানা পথে তিনি আসেন না। জপ-ধ্যানাদি সম্পূর্ণভাবেই মনেরই তো কাজ; এইসব পথে দর্শন-উপলব্ধি এক ধরনের হয়ও, কিন্তু তা মনোজাত; সে সত্য নয়।

৮

তবে সত্য কী?

তিনি বলেন, সত্য প্রতিভাসিত হন চিন্তাশূন্য শান্ত চিত্তে। তুমি বসে ধ্যান করতে বসেছ, মনে বারে বারে উঠছে বন্ধুর সঙ্গে কাল সকালে কী কথা হয়েছিল। আমি বলি তোমার ধ্যান মিথ্যা। তার চেয়ে তোমার মনে যে চিন্তা উঠছে, তাকেই তার শেষ পর্যন্ত অনুসরণ কর না কেন? তার মধ্যে নিশ্চয়ই এমন কিছু আছে, যা তুমি পুরোপুরি গ্রহণ কর নি, তাই সে ফিরে ফিরে আসছে। তার সব কথাটা শুনে নাও, তাহলেই সে আর কখনও ফিরবে না। এমনি করে মন যখন চিন্তাশূন্য হয়,—জোর করে চিন্তার অকালমৃত্যু ঘটিয়ে নয়—তখন সেই শান্তচিত্তে সত্য প্রতিফলিত হন। সে উপলব্ধি অনির্বচনীয়, অপরিমেয়।

পূর্ণ সত্যের অননুকরণীয় এই উপলব্ধি হলে তারপরে তার কাজ যদি বিরোধ বা সমস্যা ঘটিয়ে তোলে না। তখন সে ফুলের মত অনায়াসে জগতে সৌরভ বিকীর্ণ করে—জগতে একটি আনন্দলোকের সৃষ্টি করে, মুক্তির একটি কেন্দ্র হয়। এইরকম মানুষের অস্তিত্বেই বিধৃত রয়েছে জগতের শান্তি সৌষম্যের উপায়।

৯

পূর্ণ সত্যের সামান্যতম অধিকারও পরম লাভ। একদিন তাঁকে প্রশ্ন করেছিলাম, সম্পূর্ণ রূপান্তরণের আগে কাজ করতে যাওয়া কি অসঙ্গত নয়? বললেন, অপেক্ষা কেন করবে? তোমার মাঝে যেদিন যতটুকুই আলো আসবে সেদিন থেকেই তার প্রকাশ। ধরো, জাতীয়তাবোধ হতে তুমি সম্পূর্ণ মুক্ত হয়েছ; জাতীয়তাবোধ আছে যার, তাকে কি বলবে না যে, তা সকল দিক দিয়ে ক্ষতিকর? যদি জেনে থাকো অর্গ্যানাইজড কিলিং চরম নৃশংসতা, তোমাকে বাধ্য করলেও তুমি কি আর কোন লোভে কি কোন ভয়ে যুদ্ধে যোগ দিতে পারো?

১০
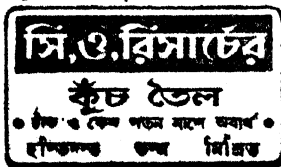
ঐ মানুষ ঘুমে-জাগরণে দিনরাত্রির সকল অবস্থায় সত্যের সঙ্গে একেবারে এক হয়ে রয়েছেন। তাঁর বাক্য বা দৃষ্টি বা কোন ব্যবহারে স্খলন হওয়া অসম্ভব— যে তাঁর সত্যকেই পূর্ণ মহিমায় প্রকাশ করে। তাঁর কাছে মাস্ নেই, ... অত্যধিক ভিড় না হলে প্রত্যেক ...র মুখের দিকে চেয়ে দেখবেন। ... তুচ্ছ প্রশ্ন হোক্, মনোযোগ দিয়ে ...ন, তার উত্তর দেবেন। জীবন ...র্কে যে কোন প্রশ্নই হোক্, তাকে ... করলেন—জীবনের কোন ভূমিই ... সত্যের পথিকের কাছে পরিত্যজ্য ... গৃহাভ্যন্তরে বা সভামণ্ডপে তাঁর ... বিভিন্ন রূপ নেয় না—তাঁর ... বা দূরে কেউ নয়। কারো তিনি ... নন, নগণ্য হোক্ কি অসাধারণ ..., সকলেই অনুভব করে তিনি বন্ধু, ... সাথী। শক্তির শ্রেষ্ঠ পরিচয় ... সংবরণে; বৃকমূর্তি কোনদিন ...ও তাঁর ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ করে ...কে চমক লাগান না। সহজ, সরল ... বলবার ভঙ্গী, নিরহঙ্কার সপ্রেম ...। শুধু যে জানে সে জানে ঐ ...ই মধ্যে আছে সব। প্রেম তাঁর ... স্বাভাবিক বিচ্ছুরণ, যে কেউ তাঁর ... যায়, তাঁর 'পরে প্রেম উছলে ওঠে— ... কি প্রকৃতিও সেই প্রেমে বঞ্চিত ...। মানুষ বিস্মিত হয়ে মুগ্ধ হয়ে ... বারে জিজ্ঞাসা করে, কে আপনি? ... বিনয়ে উত্তর দেবেন, আমি কে সেই ... অতি তুচ্ছ, প্রশ্নেরও বিষয় নয়; ... আমার কথা সত্য কি না, মানুষের ... তাতে পরিপূর্ণভাবে মেটে কি না। ... লেবেল লাগিয়ে আমাকে ফলো ... চেয়ো না; আমাকে ঘিরে মন্দির ... আমার কাজ ব্যর্থ করো না, মন্দির আমি বারে বারে ভেঙে দেব। ... সত্যের পূর্ণ জাগ্রত জ্যোতিকে ...লঙ্কিত রাখো।

জানি, আলোকের আবির্ভাবেরই মাঝে ... আলোকের জয়বার্তা—কথা দিয়ে ... প্রকাশের দুঃসাধ্য চেষ্টা করি নি; ...র লক্ষ্য শুধু খবর দিয়ে যাওয়া, ...দের কারণে।

সোনার মেয়ে

সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়

ধূসর স্মৃতি আকাশে আঁকা কতোনা জলছবি!
অলস ক্ষণে মন-মুকুরে স্বপ্ন হয়ে ভাসে—
অনেক মুখ, অনেক চোখ এগিয়ে কাছে আসে;
একটু পরে ছায়ার মতো মিলিয়ে যায় সবই।

কেবল দুটি চোখের তারা আমার দিকে চেয়ে
পলক-হারা তাকিয়ে থাকে,—কয় না কোনো কথা;
তবুও কতো অর্থ-ভরা তার সে নীরবতা!
আমারো মন চমকে ওঠে মনের সাড়া পেয়ে।

হৃদয় বলে, সোনার মেয়ে, তোমায় আমি চিনি,
হারিয়ে-যাওয়া কোন সে দিনে মধুর খেলা-ছলে
গেঁথে কথার মুক্তোমালা পরিয়ে দিলে গলে—
যাইনি ভুলে তোমার প্রেমে আমি যে কতো ঋণী।

আজকে তুমি যদিও নেই আমার কাছে কাছে
তোমার সব মনের কথা কবিতা হয়ে আছে।

অনবকাশ

গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়

শান্ত দিবসের মুখ কতো দিন দেখিনি যে আমি!
সকালের সোনারোদ শিশিরের ঠোঁটে; দুপুরের
উজ্জ্বল আকাশে রাঙা চিল, গাছে কাক, পুকুরের
ছায়া-ঢাকা ভাঙা ঘাট! কাক-চোখ জলে গিয়ে নামি,

ইচ্ছে করে। সাধ হয়, ম্লান-রোদ মাঠের [illegible]
সবুজ ঘাসের পরে খালি পায়ে হাঁটি, [illegible]
গান গাই, চেয়ে থাকি; কবিতা আওড়াই সুর [illegible]
শুয়ে পড়ে তারা দেখি রাত্রির আকাশের [illegible]

মায়াবী ইচ্ছার ফুল মনে ঝরে, মোছে রঙ [illegible],
ভোরের হাঁসের মতো দীঘিতে না, কাজে ছুটে [illegible]
মুহূর্ত বিশ্রাম নেই; মুখ থুবড়িয়ে থাকি। [illegible]
নিঃসঙ্গ মনের বৃত্ত—নিশুতি রাত্রিকে সাথী [illegible]

কখনো কাজের স্তূপে কার মুখখানি মনে পড়ে।
মুহূর্তের দিবাস্বপ্ন—স্নায়ুকে বিভ্রান্ত করে কাড়ে।

কালগ্রাসে

সৌমিত্রশংকর দাশগুপ্ত

সময়ের আছি নদী
ইতিহাস-ভোলা বিস্মৃতির
অনিঃশেষ ধারা।
জন্ম—মৃত্যু হারা।
প্রাণ—লীলা—প্রয়াণের
ত্রিধারায়—
উদ্বেল অধীর।
সুখে—দুখে নিরুত্তাপ
সময় নদীর—
বিচিত্র এ রূপ!
আমাদের হাসি-খেলা, ভালবাসা,
হৃদয়ের যত তাপ-জ্বালা—
নিয়েছে জঠরে।
মিলনের সাগর-সংগম
তবু তার চির-অগোচরে!

লেখাগুলো যেন সাময়িক মূল্যের ঊর্ধ্বে বিশেষ কিছু মর্যাদা পাচ্ছে না। বুদ্ধদেব বসু, অজিত দত্ত, সৈয়দ মুজতবা আলী প্রমুখ জনকয়েক প্রখ্যাত লেখকের ব্যক্তিগত প্রবন্ধ সংগ্রহ কয়েকটি প্রকাশিত হয়েছে বটে, কিন্তু সমাদরের তুলনায় তার সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য। বিভিন্ন বিক্ষিপ্ত পত্র-পত্রিকায় বহু ভালো রচনা প্রকাশিত হয়ে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, আকর্ষণ থাকা সত্ত্বেও বহুজনদৃষ্টির আগোচরে তা হয়তো নষ্ট হয়ে গেল। এ-সব দিক থেকে বিচার করলে সাগরময় ঘোষকে অভিনন্দন না জানিয়ে উপায় নেই। তিনি যে কেবল ভালো লেখা আর আনন্দ পাওয়ার উৎসাহে এ সঙ্কলন-কার্যে হাত দিয়েছেন, তাতেই তাঁর সাহসের পরিচয় পাওয়া গেল। কিন্তু এ তো সঙ্কলন মাত্রই নয়, এ-যে ইতিহাসও। সাহিত্যের যে একটা বিশেষ ধারা প্রথমাবধি বয়ে চলেছে, অথচ যে কোনো কারণেই হোক পাঠকসমাজ যার প্রতি সমান দৃষ্টি দেয়নি, "রম্যরচনার" সাহিত্যের সেই ধারাটিরই ইতিহাসবাহী। সুতরাং বাঙালী পাঠক মাত্রের কাছেই এই সঙ্কলনই-গ্রন্থটি প্রচুর সমাদর পাবে, এ কথা বললে কিছু অন্যায় বলা হবে না।

গ্রন্থশেষে লেখক-পরিচিতি যোজনা করে সম্পাদক পাঠকমহলের কৃতজ্ঞতাভাজন হলেন। বাংলাদেশের লেখকদের সম্বন্ধে অন্তত একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় জেনে রাখা সকলের উচিত। সে-উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে এ-পরিচ্ছেদটি যথেষ্ট সাহায্য করবে। ৯২৩।৫৫

অনিল চক্রবর্তী

ছোট গল্প

নাটক নয় নভেল নয়—বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়। নব ভারত পাবলিশার্স, ১৫৩।১, রাধাবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা—১। আড়াই টাকা।

অতি সাধারণ বাস্তব ব্যাপারের খুঁটিনাটি থেকে কৌতুকরস ফুটিয়ে তোলার কৃতিত্ব দেখিয়ে গল্পকারদের মধ্যে শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় অনেকদিন হলো প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন। বারোটি গল্প আছে এই বইখানিতে। ইস্কুলের কয়েকটি বাঙালী ছেলে তাদের সহপাঠী বীপনদেও প্রসাদের নেতৃত্বে এক বিয়ে-বাড়িতে কীর্তন গাইতে গেল; দেশভেদে রুচিভেদ,—বিয়ের আসরে কীর্তনের রেওয়াজ বাংলাদেশে না থাক, অন্যত্র চালু থাকতে পারে। কিন্তু কৌতুকের খোরাক শুধু রুচিভেদের প্রসঙ্গেই আবদ্ধ রাখেননি বিভূতিভূষণ। ছেলেদের পুরো অভিযানটিই নানারকম আশাভঙ্গে এবং বিপত্তিতে ভরে উঠেছে। 'সদানন্দের চিত্তশুদ্ধি'তে ভোজন-রসিক সদানন্দকে উপবাসের ব্যবস্থা দেবার ফলে গুরুঠাকুরের দণ্ডভোগের গল্প ফুটেছে। সদানন্দকে দীক্ষা দেবার আগেই প্রাণভয়ে গুরুঠাকুর গ্রাম ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছেন। আয়োজনের রকমফের আছে বটে, কিন্তু মোটামুটি সব গল্পেরই প্রকৃতি একরকম। পরিস্থিতি সৃষ্টির দিকে তাঁর বিশেষ ঝোঁক আছে। প্রয়াসের আতিশয্য ঘটেছে অনেক জায়গায়। লেখার ভাষাগত সাবলীলতার জন্য অবাধে পড়া সম্ভব হলেও গল্পগুলি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কেমন যেন জোর করে হাসাবার চেষ্টা বলে মনে হয়। সমালোচনার নিরপেক্ষ নীতিতে শ্রদ্ধা রেখে একথা অপ্রিয় হলেও অস্বীকার করবার জো নেই। ছাপা-বাঁধাই ইত্যাদি মনোরম।

২৯২।৫৫

আমার বন্ধু—বুদ্ধদেব বসু। জিজ্ঞাসা, ১৩৩এ, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলিকাতা। দুই টাকা।

গীতিকবিতার বিষয়ের মতো একটিমাত্র কথা বা সুর থেকে মসৃণভাবে বড়ো আয়তনের গল্প লিখে ফেলতে পারেন বুদ্ধদেব বসু। 'আমার বন্ধু' হলো ব্যর্থমনোরথ এক সাহিত্যযশপ্রার্থীর ব্যর্থতার ইতিহাস। সাহিত্যস্রষ্টার পূর্ণ যশ এবং কৃতিত্বলাভ সাহিত্যের সব সাধকের অদৃষ্টে থাকে না। ভবভূতি এমনি একজন সাহিত্যিক। সারা জীবনের বিফলতা সত্ত্বেও তাঁর আগ্রহে ভাঁটা ধরেনি। জগতে তাঁর একমাত্র প্রিয় বন্ধু ছিলেন এই 'আত্মজীবনী'র কথক রামতনু মজুমদার। রামতনু নিজে সাহিত্যযশস্বী। ভবভূতির আন্তরিক সাধনার সমবেদনাশীল পর্যালোচক রামতনু শেষ পৃষ্ঠায় বলেছেন, 'ভাবতে ভালো লাগে, ভবভূতি (যক্ষ্মায় ভবভূতির মৃত্যু ঘটেছে) তার ক্ষতিপূরণ পেয়েছে, অতীন্দ্রিয় কোনো সার্থকতা, পৃথিবী-অতীত কোনো পূর্ণতা—অন্য কোনো জীবনে।'

১৯৩৩-এ 'আমার বন্ধু' প্রথম ছাপা হয়। বর্তমান সংস্করণ তারই পরিবর্ধিত রূপ। উপন্যাসের বিস্তার, জটিলতা ইত্যাদি লক্ষণ নেই এ-গল্পে। যশস্বী লেখকের প্রথম দিকের ভাবালুতাময় একটি বড়ো গল্প হিসেবে বইখানি সমাদরণীয়। ছাপা ব[illegible] ত্রুটিহীন। ২৯৯

চার দৃশ্য—বুদ্ধদেব বসু। জিজ্ঞা[illegible] ১৩৩এ, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলিকা[illegible] ২৯। আড়াই টাকা।

'মা, বোন, ভাই', 'দুই মা', 'ভবিষ্য[illegible] বাক্স' এবং 'চার দৃশ্য'—সবসমেত [illegible] চারটি গল্পের প্রত্যেকটিতেই দেখা [illegible] প্রতিষ্ঠিত লেখকের গতানুগতিক নৈপু[illegible] যতদিন বাপ বেঁচেছিলেন, ততদিন অ[illegible] অনটনের দুঃখ বুঝতে দেননি ছেলেমেয়ে[illegible] তাঁর মৃত্যুর পরে বড় ছেলে বারীন অ[illegible] স্নেহ-মমতার তাগিদে নিজের লেখা[illegible] ছাড়তে বাধ্য হলো। তার যে বোনটির [illegible] খুবই ভালোবাসতো, সেই অরুন্ধতীর কলে[illegible] পড়া এবং তৎপরে তার বিয়ের খরচ জো[illegible] বারীনকে সর্বস্বান্ত হতে হলো। তবু তো[illegible] কাছে, মায়ের কাছে তার লাঞ্ছনার অন্ত [illegible] প্রথম গল্পের এই হলো বিষয়বস্তু। [illegible] অবশ্য মানবপ্রকৃতি যে কতভাবে, [illegible] অসম্ভব আচরণের মধ্য দিয়ে অভিব্য[illegible] তার সীমা নির্ধারণ করা দুঃসাধ্য, তবু [illegible] উপন্যাসের লেখককে যে সতর্কতার [illegible] মেনে চলতে হয়, এই গল্পটিতে মা[illegible] চরিত্র রূপায়ণে সে রকম পুরোপুরি [illegible] হয়নি। 'দুই মা' গল্প মাইমাদের [illegible] মলিনাও একই কারণে অবিশ্বাস্য চ[illegible] দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছেন। 'ভবিষ্যতের বাক্স' [illegible] এ-ধরনের অন্যান্য বহু গল্প মতো [illegible] স্বাভাবিক। বিশিষ্টকরের [illegible] থেকে স্বচ্ছলাবস্থায় এগিয়ে যাবার গল্পটি[illegible] মধ্যে লেখকের প্রকাশগত বাহাদুরি[illegible] অনুকূল পাঠক তারিফ করবেন বলে [illegible] হয়। শেষ গল্প 'চার দৃশ্য' একজন বিখ্য[illegible] ডাক্তারের পুত্রশোকের মনোবিক্রিয়া[illegible] ভূমিকা হিসেবে মেনে নিয়ে তাঁর এক রা[illegible] দাক্ষিণ্যের নাটকীয় পরিস্থিতি বর্ণ[illegible] উদ্যোগী এবং অনিবার্য অতিনাটকীয়[illegible] সত্ত্বেও এ-বইয়ের অন্যান্য গল্পের ম[illegible] এ গল্পটিও প্রধানত সমাজ-কল্যাণে[illegible] অভিমুখী।

ছাপা, বাঁধাই, প্রচ্ছদ প্রশংসনীয়।

৩০০।[illegible]

জীবনী

স্বামী সারদানন্দের জীবনী—ব্রহ্মচা[illegible] অক্ষয়চৈতন্য প্রণীত। গ্রন্থকার কর্তৃক ২[illegible] শ্যামচরণ দে স্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। মূ[illegible] ৪৲ টাকা।

শ্রীরামকৃষ্ণ-সাহিত্যে ব্রহ্মচারী অক্ষ[illegible] চৈতন্যের অবদান বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছে[illegible] তাঁহার লিখিত 'শ্রীসারদা দেবী' এবং 'বাঙলা[illegible] দুই ঠাকুর' সর্বজনপ্রিয় গ্রন্থ এবং বাঙলা[illegible] সুধিসমাজে সর্বত্র সমাদৃত। ব্রহ্মচারী অক্ষ[illegible]

...চৈতন্যের লেখার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, ভাবকে তিনি সংযত এবং সুমধুর ভাষা রূপ দিতে জানেন। অযথা উচ্ছ্বাস তাঁহার লেখায় মনকে উদ্‌ভ্রান্ত করে না, পরন্তু একটি উদারবীর্য সাক্ষাৎ-সম্পর্কে অন্তরকে স্পর্শ করে। স্বামী সারদানন্দের জীবনীতে তাঁহার সেই কৃতিত্ব সর্বতোভাবে পরিস্ফুট হয়েছে। স্বামীজীর সম্বন্ধে ইতঃপূর্বে কয়েকখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থকারের লিখিত 'শ্রীশ্রীসারদানন্দ প্রসঙ্গ' এবং স্বামী সারদানন্দের পত্রমালার কথা এই সম্পর্কে উল্লেখ করা যাইতে পারে। আলোচ্য গ্রন্থখানি একটু স্বতন্ত্র ধরনের। শরৎ মহারাজের জীবন কর্মময়। রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদকরূপে এবং আর্ত, পীড়িত নরনারীর সেবাকার্যে এই মহাপুরুষের জীবনের বিরাটত্ব এবং বিশালত্বের সম্বন্ধে আমাদের কিঞ্চিৎ পরিচয় পাই। আলোচ্য গ্রন্থখানিতে লেখক স্বামীজীর এই কর্মসাধনার মূলে যে শক্তি অন্তরালে উৎসরূপে কাজ করিয়াছে, সে শক্তিটি তাঁহার স্বরূপ লক্ষণের ধারা [illegible] নিমিত্ত আমাদের অনুধ্যানে [illegible] চেষ্টা করিয়াছেন। শরৎ মহারাজের সাধনজীবন এবং সেই জীবনের অন্তরালে আচার্য ভাবটি তিনি উন্মুক্ত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। ঠাকুরের সঙ্গে স্বামীজীর প্রথম সাক্ষাৎ হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার শ্রীচরণপ্রান্তে থাকিয়া শিক্ষা ও সাধনা, পর্যটন ও তপস্যা, সমুদ্রপারে তাঁহার প্রচারকার্য, ভারতে সংগঠন-কার্য; তৎপরে শ্রীশ্রীমায়ের সেবায় আত্ম-নিবেদন, মিশন পরিচালনা প্রসঙ্গত সব আলোচনাই গ্রন্থখানিতে রহিয়াছে; বৈশিষ্ট্য এই যে, সর্বত্রই সুস্পষ্টরূপে আত্মসমাহিত সাধকভাবটি আলোচনাংশকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিত এবং দীপ্ত দিয়াছে। স্বামীজীর আত্মভাবটির এই সংস্পর্শে আমাদের চিত্তবৃত্তি প্রসাদরসে প্রাচুর্য উপলব্ধি করে। যাঁহারা মহামানব, তাঁহাদের জীবনী রচনায় সার্থকতা এইখানে। ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্যের অবদান এইদিক সার্থকতা লাভ করিয়াছে। স্বামী সারদানন্দের সাধক-জীবনের স্বরূপ এমনভাবে পরিস্ফুট করিয়া তিনি সমাজ-জীবনে উদার চেতনার সঞ্চার করিয়াছেন। পরিশিষ্টাংশে গুরু-শিষ্য সংবাদ স্বরূপে স্বামীজীর মধুর উপদেশ সংগ্রহ গ্রন্থখানির বিশেষ সমৃদ্ধি সাধন করিয়াছে। এমন মহৎ জীবনের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়। ছাপা, বাঁধাই, কাগজ সবই সুন্দর। কয়েকখানি মূল্যবান ফটোচিত্রে গ্রন্থখানি সুশোভিত। ২৮৮।৫৫

শহীদ অনন্ত হরি—শিবরাম গুপ্ত প্রণীত। হোমশিখা প্রকাশনী বিভাগ। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর রোড, কৃষ্ণনগর। মূল্য ।০ আনা।

অনন্তহরি মিত্র বাংলার আত্মদাতা বীর [illegible]কদের অন্যতম। অনন্তহরি গোয়েন্দা-বিভাগের ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেন্ট ভূপেন চট্টোপাধ্যায়কে কারাগারের মধ্যে হত্যা করিবার অভিযোগে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। পুস্তকখানি বাঙলার বীর সন্তান শহীদ অনন্তহরির জীবনী নহে। জীবনী রচনা লেখকের উদ্দেশ্য বলিয়াও মনে হয় না। কারণ অনন্তহরির জীবনীর বিস্তৃত উপকরণ সংগ্রহ করা লেখকের পক্ষে সম্ভব না হইলেও দক্ষিণেশ্বরের মামলা, জেলে অনন্তহরি এবং সহকর্মিগণের তৎপরতা, আলীপুর ট্রাইবুনালে অনন্তহরি প্রমোদ চৌধুরী বীরেন বন্দ্যোপাধ্যায় ইঁহাদের বিচার এবং প্রাণদণ্ডাদেশ এ সব ঘটনার সম্বন্ধে অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া লেখকের পক্ষে দুঃসাধ্য ছিল না। প্রকৃতপক্ষে পুস্তকখানিতে অনন্তহরির স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করাই লেখকের উদ্দেশ্য। পড়িলে বইখানি অসম্পূর্ণ বলিয়া সহজে মনে আক্ষেপ জাগে; কিন্তু বিস্তৃত জীবনী জানিবার জন্য আগ্রহ উদ্দীপিত হয়।

ভ্রমণ কাহিনী

চীন দেখে এলাম : প্রথম পর্ব : ৪র্থ সংস্করণ—মনোজ বসু; বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলিকাতা—১২। দাম—তিন টাকা।

মনোজবাবুর চীন ভ্রমণ অতি মনোজ্ঞ কাহিনী। সরকারী ডেলিগেশনের সদস্যরূপে গেলে চোখমুখের যে ভাব, মনোজবাবুর লেখায় সে ভাবের লেশ মাত্র নেই। অতি পুরাতন প্রতিবেশী চীনকে তিনি যেভাবে দেখেছেন ও বুঝেছেন, তার মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত বিস্ময় ও সরল আনন্দটাই মূর্ত হয়ে উঠেছে। চীনের নব জাগরণ তার আকাশে বাতাসে, লোকের মুখে চোখে ও কর্মশক্তির অদম্য প্রেরণায় এমন পরিস্ফুট যে মনোজবাবু অনেকটা অভিভূত। এবং অভিভূত হবারই কথা। কারণ নূতন চীন যেভাবে তার ভূমি ও সমাজ আর সেই সঙ্গে রাষ্ট্রকে নূতন পরিবেশে ও ব্যবস্থায় রূপায়িত করেছে, নানা আর্থিক সংকট ও হানাদার সাম্রাজ্যবাদের প্রাণান্ত বিপদ কাটিয়ে প্রতিকূল অবস্থাকে জয় করে শান্তিবাদের ভিত্তিতে সংগঠিত হয়েছে এবং পৃথিবীকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে, তাতে বিস্মিত না হয়ে উপায় নেই। মনোজবাবু সেই আন্তরিক আনন্দ ও বিস্ময় কথকতার ভঙ্গীতে পাঠক-সমাজে পরিবেশন করেছেন। গল্প বলার ধরনে একটা বৈঠকী অন্তরঙ্গতা এসেছে, যেখানে লেখক পাঠকের মুখোমুখী হয়ে বসেছেন। মনোজবাবুর লিপিকুশলতা সুবিদিত। তাই পড়তে পড়তে এক এক সময়ে মনে হয়, শব্দযোজনায় ও বাক্যগঠনে তিনি মজলিশী ঢং আমদানী না করে যদি স্বভাবসিদ্ধ প্রকাশভঙ্গীকে অবলম্বন করতেন, তাহলে বোধ হয় আরও ভাল হ'ত। যে আওয়াজ তাঁর মনে আসে, তাকেই হুবহু প্রতিধ্বনি তুলতে গেলে কেমন যেন কানে লাগে, চপলতার আভাস এসে যায়।

অনুবাদ সাহিত্য

শেষ সীমান্ত—হাওয়ার্ড ফাস্ট, অনুবাদক—অনন্ত সান্যাল; ন্যাশনাল বুক এজেন্সী লিঃ, কলিকাতা-১২। তিন টাকা চার আনা।

আমেরিকার শ্রী হাওয়ার্ড ফাস্ট স্বাধীনতা-বোধের উদ্বোধনময়, উদ্দীপনাময় কাহিনী লিখে হাওয়ার্ড ফাস্ট প্রভূত খ্যাতিলাভ করেছেন। প্রায় পঁচাত্তর বছর আগে আমেরিকার [illegible] 'ইণ্ডিয়ান' এলাকা ওক্লাহোমা থেকে এই আদিম অধিবাসীদের ছোট একটি দল 'চুক্তি' [illegible] অভিমুখে

তাদের স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পথে যে সংঘর্ষ ও দুঃসাহসের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিল,—সেই স্বাধীনতাস্পৃহার বীরত্বকাহিনীই হলো 'শেষ সীমান্তের' আখ্যানবস্তু। বর্তমান বঙ্গানুবাদের জন্য লেখক এবং প্রকাশক উভয়েই কৃতজ্ঞতা দাবী করতে পারেন। সে দাবী অন্যায় নয়। কিন্তু অনুবাদ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা দরকার। "এমন কি ওয়েজেলসের শ্লথস্নায়ু পর্যন্ত আক্রান্ত হয়ে পড়ল।" [পৃঃ ২০০]; "অন্যদের পায়ে মেকোসিনগুলো পুরনো চামড়ার কয়েকটি ফালিমাত্র" [পৃঃ ১৭২];—এই রকম দু'একটি-মাত্র জায়গায় অতি সামান্য একটু হোঁচট খেতে হলেও শ্রীযুক্ত সান্যালের এই অনুবাদ সত্যিই প্রশংসার জিনিস। রোমাঞ্চকর নৃশংসতার ছবি, দুর্ধর্ষ অভিযানের দৃশ্য, প্রকৃতির নিরিবিলি সৌন্দর্য ইত্যাদি যাবতীয় ব্যাপার মসৃণভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। বইখানি যে অন্য কোনো ভাষা থেকে অনুবাদ করা হয়েছে, সে কথা পাঠকের মনেই থাকে না। মামুলি অনুবাদের দৃষ্টান্ত নয়,—'শেষ সীমান্ত' ছাপা, বাঁধাই, প্রচ্ছদে যেমন, অনুবাদের দক্ষতাতেও তেমনি অকুণ্ঠভাবে প্রশংসনীয়। ২৩৩।৫৫

এ ক্রিসমাস ক্যারোল—চার্লস ডিকেন্স; অনুবাদক : শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক : শৈলশ্রী; ১।১।১এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য—১৲।

চার্লস ডিকেন্সের উপন্যাসগুলি প্রধানত উপদেশাত্মক ও শিক্ষামূলক। আলোচ্য গ্রন্থটিও তার ব্যতিক্রম নয়। এ বইটিতে দেখান হইয়াছে কি করিয়া একটি অতি কৃপণ, অসামাজিক, সহানুভূতিহীন ও রুচীহীন বৃদ্ধের মনের বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন হইল। এই পরিবর্তন সাধনের জন্য অনুভূতিহীন বৃদ্ধের সম্মুখে হাজির করা হইয়াছে তাহার অতীত জীবনের স্মৃতি আর ভবিষ্যতের অবশ্যম্ভাবী শোচনীয় পরিণাম। এই দুই জীবন্ত চিত্র পুস্তকের কৃপন স্ক্রুজকে জীবনের সহজ সত্য পথকে গ্রহণ করিতে বাধ্য করিয়াছে। লেখকের বর্ণনা হৃদয়গ্রাহী, সেই বর্ণনাকে সুন্দরভাবে অনুবাদ করিয়া অনুবাদক কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। বইটি পড়িয়া ছোটরা আনন্দলাভ করিবে। ৫২০।৫৫

ম্যাকবেথ—শ্রীপ্রফুল্লরতন গঙ্গোপাধ্যায়। প্রকাশক : শ্রীশিশিরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়; ৬।২বি, মদন মিত্র লেন, কলিকাতা—৬। মূল্য—১৲।

'ম্যাকবেথ' অমর লেখক সেক্সপীয়রের একটি অনন্যসাধারণ বিয়োগান্ত নাটক। ইতিপূর্বে এই বিশ্ব-বিশ্রুত নাটকটি বাঙলা ভাষায় অনূদিত হয়েছে। প্রফুল্লবাবু কিন্তু নাটকটি বাঙলা ভাষায় রূপান্তরিত করার চেষ্টা করেন নি, তিনি ম্যাকবেথ নাটকের কাহিনী গল্পে বলেছেন। লেখকের গল্প বলার ভঙ্গী সুন্দর, ভাষাও হৃদয়গ্রাহী। বইটি পড়িয়া সকলেই আনন্দ পাইবে। ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর।

উপন্যাস

বাগ্‌দত্তা—অনুরূপা দেবী; গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩-১-১, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। পাঁচ টাকা।

'মন্ত্রশক্তি', 'পোষ্যপুত্র' প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থের লেখিকা শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবীর 'বাগ্‌দত্তা' উপন্যাসের এই চতুর্থ সংস্করণটি ছাপা-বাঁধাই এবং প্রচ্ছদসজ্জায় মনোরম হয়েছে। পুরোনো আমলের বাঙালী যৌথ পরিবারের প্রীতি, মমতা, কর্তব্যের বন্ধন,—বংশজ ও কুলীনের বিবাহসমস্যা ইত্যাদি প্রসঙ্গ বর্ণনায় অনুরূপা দেবীর কৃতিত্বের পরিচয় সর্বজনবিদিত। একালের দৃষ্টিতে সেকালের উপন্যাসের রীতি, ভঙ্গি, পাত্রপাত্রী-সমাবেশ এবং পুরোনো মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়। পর্যায়ক্রমে বাটটি অধ্যায়ের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের ব্যক্তি ও সমাজজীবনের যে কাহিনীটি 'বাগ্‌দত্তায়' রূপায়িত হয়েছে, তাতে উপন্যাসের বিস্তার এবং গভীরতা—গল্পের টান এবং চরিত্রের আদর্শ বা স্বাতন্ত্র্য, কিছুই বিশেষ ক্ষুন্ন হয়নি। ৩১১।৫৫

স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১৷৷৹ টাকা।

বাঙলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে গ্রন্থ সুপরিচিত। কিন্তু তাঁহার রচিত ক গ্রন্থের প্রকাশ এই প্রথম। পুস্তকখানি ৫০টির অধিক কবিতা সংকলিত হইয় এগুলিতে তাজাপ্রাণের স্পর্শ পাওয়া এবং রচয়িতার কবি-প্রকৃতির পরিচিতি মি ৩২২

যখন মন্ত্রণা—রাম বসু : হিন্দু প্রিণ্টার্স : ৫২বি, রাজা দীনেন্দ্র স কলিকাতা-৯। দেড় টাকা।

একটি স্পষ্ট জোরাল বক্তব্য কবিতাগু একধরনের ঋজুতা এনেছে, কিন্তু প্রসাদ সর্বত্র রক্ষিত হয়নি। এই কারণেই অ আবেগপ্রধান কবিতাও নিতান্ত বাকসর্বস্ব মনে হবে। 'উৎসর্গ', 'সে', 'চন্দ্রহার' প্র কবিতায় ব্যতিক্রম স্পষ্ট। আবেগ এ মাত্রাসংহত আঙ্গিকে সুষমব্যক্ত। ধ্বনিব শব্দচয়নে কবির নৈপুণ্য প্রায় সর্বত্রই লক্ষণ —১৩৭।

বিশ্বশান্তি ও গান্ধীবাদ

The World Peace—শ্রীক্ষিত চন্দ্র চক্রবর্তী প্রণীত। এম সি সরকার সন্স লিমিটেড, ১৪নং বঙ্কিম চ্যাট স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১৲ টাকা।

গ্রন্থকার সুপ্রীম কোর্টের এডভো বাঙলার রাজনীতিক ক্ষেত্রে প্রবীণ কং কর্মী হিসাবে তাঁহার খ্যাতি আছে। কলিক হাইকোর্টে আইন ব্যবসা বর্জন করিয়া সবরমতী আশ্রমে গিয়া গান্ধীজীর অনু অনুগত স্বরূপে কর্মজীবন যাপন করে গান্ধীজীর অহিংস নীতি এবং তা জীবনাদর্শের অনুসরণের দ্বারাই বর্ত জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পা আলোচ্য পুস্তকখানিতে ঐতিহাসিক সন্নিবেশের দ্বারা তিনি ইহাই প্রতি করিয়াছেন। তাঁহার মতে অহিংস নী অবলম্বনের দ্বারা বিশ্বে শান্তি প্রতি মহান্ ব্রতে ভারতকেই অগ্রণী হইতে হই গ্রন্থকার অহিংসনিষ্ঠ ডিক্টেটারের পরিচাল দেশের সর্বত্র অহিংসার আদর্শ প্রবর্ত পক্ষপাতী। তাঁহার মতে পাশ্চাত্যের ভে বিলাসমূলক সভ্যতা অহিংসার আদর্শে বিরোধী; সুতরাং তাহা পরিবর্তন করি সেবানিষ্ঠ সরল জীবনপদ্ধতি অবলম্বন ক কর্তব্য এবং সেইপথেই ভারতের উন্নতি সম্ভ হইতে পারে। ১৮৩।৫

কিশোর সাহিত্য

রং বাহার—শ্রীকার্তিকচন্দ্র দাশগু প্রকাশক : শ্রীসুরেশচন্দ্র ধর; ৯৩।৩। বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা-৯। মূল্য—

'রং বাহার' ছোটদের জন্য লিখিত এক সংকলন পুস্তক। ইহাতে সর্বশুদ্ধ স্থান পাইয়াছে—ইহার মধ্যে ৪টি

...র তিনটি কবিতা। ছোটদের উপযোগী ...প কবিতা রনায় কার্তিকবাবু সিদ্ধহস্ত। ...লোচ্য সংকলনের প্রতিটি লেখায় তাঁর সেই ...নপুণ্যতার ছাপ পরিস্ফুট। শিশুরা বইটি ...ড়িয়া আনন্দ পাইবে। গল্প ও কবিতার সঙ্গে ...হু রেখাচিত্র সংযোজিত হওয়ায় বইটি ...রও আকর্ষণীয় হইয়াছে। বইয়ের ছাপা, ...ধাই ও প্রচ্ছদপট প্রশংসনীয়। ৩৬৬।৫৫

ছোটদের সমাজবাদ—বিশ্বনাথ রায় : ...রিবেশক—বিদ্যার্থী প্রকাশ ভবন : ১, রাজা ...রদাস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। এক টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থে লেখক সমাজবাদের মত ...কটি জটিল বিষয়কে ছোটদের উপযোগী ...রে স্বল্পপরিসরে আলোচনায় ব্রতী হয়েছেন। ...চেষ্টা দুরূহ সন্দেহ নেই। তবে লেখক ...চেষ্টার ত্রুটি করেন নি। সমাজবাদ সম্বন্ধে ...কটা মোটামুটি ধারণা এ বই পড়লে ছেলেদের ...নে জন্মাবে। তবে সেই সঙ্গে লেখকের ...য়েকটি বিতর্কমূলক ঐতিহাসিক ঘটনার ...নজস্ব ভাষ্য নিতান্তই বিভ্রান্তিকর এবং সেই ...রণে ইত্যাকার গ্রন্থে সর্বথা পরিত্যাজ্য।
—১৩৪।৫৫

সাত সমুদ্দুর—**ইন্দিরা দেবী সম্পাদিত।** ...রলোক প্রকাশনী, ৪৩, চিত্তরঞ্জন ...ভিনিউ। মূল্য আড়াই টাকা।

ছোটদের জন্য প্রতি বছরই একাধিক ...র্ষিকীর আয়োজন করা হয়। 'সাত ...মুদ্দুর' ঐ রকম একটি বার্ষিক সংখ্যা। গত ...ছরের তুলনায় এ বছরের সংখ্যাটি আরও ...নোরম লাগিল। মোট প'য়তাল্লিশটি রচনা-...ভারের পক্ষে মূল্য বেশি নয়। তবে চিত্র-...জ্জা সুবিধার হয় নাই, মুদ্রণে ত্রুটি দেখা ...য়। পড়িবার জিনিসের মধ্যে এরূপ ...াতার ফাঁকে ফাঁকে বৃহৎ বিজ্ঞাপন ...স্বাস্থ্যকর। ধীরেন্দ্রলাল ধরের 'বড় ...শা ছোট গনশা', অলক চক্রবর্তীর 'ছোটরা ...তেই হয়', রণজিত মুখোপাধ্যায়ের 'চু ...-এর বউ', প্রভাতকিরণ বসুর 'গুরুর ...', অমল চক্রবর্তীর 'এক মিনিটের গল্প', ...পূর্ণা গোস্বামীর 'ফ্যাংসান' ও খগেন্দ্রনাথ ...র ... প্রভৃতি গল্প, স্বপন ... 'উড়ন তুবড়ী' এবং কালিদাস ... শতদল গোস্বামী ও ... কবিতা বেশ উপভোগ্য ... দৃঢ়তা ও কঠিন জিদ ... 'পণরক্ষা' রচনাটি
(৫০৪।৫৫)

...—শ্রীমনোরঞ্জন জানা ... জানা কর্তৃক ৬, সাউথ ...২৯ হইতে প্রকাশিত।

...তী, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এবং দেবেন্দ্রনাথ এই তিনজন কবির অবদান সম্বন্ধে পুস্তকখানিতে আলোচনা করা হইয়াছে। গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখিয়াছেন, বিশিষ্ট কয়েকজন বাঙালী কবির কেবলমাত্র কাব্য আশ্রয় করিয়া জাতির প্রায় এক শত বৎসরের অধ্যাত্ম-সংগ্রামের যে স্বরূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে, এই আলোচনায় তাহাই মুখ্য স্থান অধিকার করিয়াছে। আলোচনা সুচিন্তিত এবং সারগর্ভ। সাহিত্য-রসামোদী মাত্রেই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আনন্দ পাইবেন। ৪০৯।৫৫

ঊনিশ শতকের চারজন

ঊনবিংশ শতাব্দীর পথিক—ডাঃ অরবিন্দ পোদ্দার। ইণ্ডিয়ানা লিমিটেড, ২।১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। তিন টাকা।

রামমোহন, বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র এবং বিবেকানন্দ—ঊনিশের শতকের এই চারজন মহাপুরুষের ভাবজীবন ও কর্মজীবনের দিকে দৃষ্টি রেখে বাঙালীর তৎকালীন জাতীয় অভ্যুত্থানের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে এই বইখানিতে। ডাঃ পোদ্দারের 'বঙ্কিম-মানস'-এর সঙ্গে এই আলোচনা সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্ক নয়। তাঁর অধ্যবসায় প্রশংসনীয় এবং মতামতও ইতিহাস-নিরপেক্ষ নয়। "আধুনিক ভারতের সাংস্কৃতিক বিকাশের ক্ষেত্রে, ইতিহাসের অচেতন হাতিয়াররূপে অন্তর-প্রেরণা যুগিয়েছে ইংরেজ। সেদিন, ভারতবর্ষ হারিয়েছিল নিজেকে; কিন্তু আরেক অর্থে পেয়েছিল বিশ্বজগৎ।" 'বিশ্বজগৎ-প্রাপ্তি'র এই পথ দেখা হয়েছে রাষ্ট্র-সমাজ-অর্থনীতির আলোতে। ফলে, বিবেকানন্দের বিষয়ে ডাঃ পোদ্দার বলেছেন, "বিবেকানন্দ যে আন্দোলনের সূত্রপাত করলেন, তা ভারতের ব্যবহারিক রাষ্ট্রিক জীবনধারার মূল প্রবাহের বাইরে।" বলা বাহুল্য, এ মন্তব্য বিতর্ক-সাপেক্ষ তো বটেই, এমন কি তর্কের পরেও এ মত অগ্রাহ্য মনে করা নির্বুদ্ধিতা নয়। বিশ্লেষণ এবং সিদ্ধান্তে ফাঁক দেখা যায় মাঝে-মাঝে। সহিষ্ণু পাঠক এ-বই পড়ে বাংলাদেশের ঊনিশের শতকের আধ্যাত্মিকতার কথা ভাববার প্রেরণা পাবেন। বইখানির ভাষা বড়োই বাধাপ্রদ। ছাপা-বাঁধাই সুরম্য।
৩০৪।৫৫

ধর্মগ্রন্থ

ECHOES—Sri Sri Nripendra Nath. —শ্রীচন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ কর্তৃক ১২।১, কালীদাস পতিতুণ্ডী লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য ২৷৷০ আনা।

সাধক শ্রীশ্রীনৃপেন্দ্রনাথের উপদেশসমূহের সংগ্রহ স্বরূপে পুস্তকখানি লিখিত হইয়াছে। অধ্যাত্ম রাজ্যের গূঢ় রহস্যরাজী প্রত্যক্ষানুভূতির আলোকে উপদেশসমূহে উজ্জ্বল। শ্রীশ্রীনৃপেন্দ্রনাথ সহজ, সরল এবং স্বাভাবিক পথে সংঘকে উপলব্ধি করিবার পথ দেখাইয়াছেন। তাঁহার নির্দেশে সন্দেহ বা দ্বিধার অবকাশ নাই। সর্ববিধ সংকীর্ণতার সংস্কার মুক্ত সার্বভৌম উদার মানব-ধর্মের বিকাশোপযোগী সত্যদ্রষ্টা সাধকের এই অমূল্য উপদেশরাজীর বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।
১১০।৫৫

প্রাপ্তি স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থ আসিয়াছে।

সাত নরীর হার—আবুজাফর ওবায়দুল্লাহ
অমৃত-বাণী—শ্রীশ্রীনৃপেন্দ্র নাথ
স্বীকারে শান্তি—শ্রীচুণীলাল বসু
রেখা ও লেখা—প্রদীপ চক্রবর্তী
শুভরাত্রি—শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
ছোটদের কেদারনাথ ও বদরিকানাথ—জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

একলব্য

মার্শাল বুলগানিন ও মঃ ক্রুশ্চেভের ঐতিহাসিক শুভাগমনের একদিন আগে রাশিয়ার লোকোমোটিভ ফুটবল দলের কলকাতায় আগমন স্মরণীয় ঘটনা হলেও খেলা ও রাজনীতির এই অতিথিদের আগমনের মধ্যে কোন যোগাযোগ ছিল না। ফুটবল দলটি এসেছে আই এফ এর আমন্ত্রণে আই এফ এর হীরক জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে দুটি প্রদর্শনী ফুটবল খেলায় অংশ গ্রহণের জন্য। এরা দূরপ্রাচ্য সফর করছিল। ভারতীয় ফুটবল দলের রাশিয়া সফর কালে এদের কলকাতায় আসার ব্যবস্থা পাকাপাকি ঠিক হয়। কিন্তু মার্শাল বুলগানিন ও মঃ ক্রুশ্চেভের ভারত তথা কলকাতা আগমন রাজনৈতিক এবং ঐতিহাসিক ঘটনা। তবে উদ্দেশ্য কতকটা এক নৌকি! ভাবের আদান প্রদান এবং পারস্পরিক সহযোগিতা যেমন রাজনৈতিক সফরের প্রধান লক্ষ্য, তেমন প্রীতির সম্পর্ক এবং সৌভ্রাত্রের বন্ধন দৃঢ় করাই আন্তর্জাতিক খেলাধুলার চরম সার্থকতা। দুইয়ের ক্ষেত্রেই বলা যেতে পারে 'মিত্রতা-কী-যাত্রা'। বলা বাহুল্য, ভারত ও রাশিয়ার জনগণের মধ্যে আজ অন্তরের যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, দুই দেশের মধ্যে প্রীতির যে নিদর্শন দেখা যাচ্ছে, খেলার মাঠে এর প্রথম বীজ উপ্ত না হলেও রাশিয়ান ফুটবল দলের ভারত সফর এবং রাশিয়ায় ভারতের পাল্টা ফুটবল সফর দুই দেশের সখ্যসূত্রের গ্রন্থি দৃঢ় করবার ক্ষেত্রে যে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। যাই হোক সোভিয়েট রাশিয়ার দুই মহানেতা মার্শাল বুলগানিন এবং মঃ ক্রুশ্চেভের অগ্রদূত হিসাবেই লোকো-মোটিভ দলকে সম্বর্ধনা জানানো হয় এবং উৎসবমুখর বিমান বন্দরে খেলোয়াড়রা ভারতীয় ভাবধারায় সম্বর্ধনা লাভের নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। বিমান থে… অবতরণ করবার সঙ্গে সঙ্গেই কলকা… ডেপুটি মেয়র ডাঃ অমরনাথ মুখো… কলকাতার অধিবাসীদের পক্ষ থেকে … নিখিল ভারত ফুটবল ফেডারেশনের সভাপ… শ্রীপঙ্কজ গুপ্ত ফুটবল সংস্থার পক্ষ … খেলোয়াড়দের সম্বর্ধনা জানান। এদি… বিমানঘাটির বিশ্রাম কক্ষে শুচিশুভ্র প… বেশের মধ্যে একদল কুমারী বালিকা ফু… অতিথিদের সম্বর্ধনা জানাবার জন্য … আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। বালিকা… প্রত্যেকের পরিধানে ছিল শুভ্র বস্ত্র … হাতে ছিল পুষ্প স্তবক। কারো হাতে ম… শাঁখ, কারো হাতে প্রজ্জ্বলিত … কারো হাতে আবার চন্দনাধার শোভা পাচ্ছি… সোভিয়েট দেশের ফুটবল অতিথিরা বি… কক্ষে প্রবেশ করবার সঙ্গে সঙ্গে মেয়ে… হুলুধ্বনি এবং মঙ্গল শাঁখের আওয়া… বিমানঘাটির আকাশ বাতাস মুখরিত … ওঠে। এক শুচিময় এবং ভাবগম্ভীর পা… বেশের মধ্যে ডেপুটি মেয়র ডাঃ মুখো… খেলোয়াড়দের মাল্যভূষিত করেন, কুমা… বালিকারা তাদের ললাটে চন্দন তিলক পরি…

সোভিয়েট রাশিয়ার লোকোমোটিভ ফুটবল দল। সম্বর্ধনার পর দমদম বিমান ঘাটিতে এই ছবি তোলা হয়।

লোকোমোটিভ দলের খেলোয়াড়দের সম্বর্ধনার জন্য কুমারী মেয়েরা ফুলের তোড়া হাতে দাঁড়িয়ে আছেন

পুষ্পস্তবক উপহার দেন। এই অভিনব সম্বর্ধনায় খেলোয়াড়রা হয়ে পড়েন অভিভূত। লোকোমোটিভ দলের খেলোয়াড়দের এই সম্বর্ধনা জানানোর পিছনে অবশ্য একটু ইতিহাসও আছে। ভারতের খেলোয়াড়রা সোভিয়েট দেশের জনগণের কাছ থেকে বিপুল সম্বর্ধনা লাভ করে এসেছেন, এভাবে তাদের একটি দলকে সম্বর্ধনা জানানো সেই ঋণ পরিশোধেরই আংশিক প্রচেষ্টা। গত জানুয়ারী মাসে রাশিয়ার যে দলটি ভারত সফর করে গেছে, তাদের শক্তির সঙ্গে লোকোমোটিভ দলের শক্তির তুলনা হয় না সত্য, কিন্তু এই লোকোমোটিভ টীমই রাশিয়ায় ভারতের জাতীয় দলকে ৩—০ গোলে হারিয়ে দিয়েছিল; সুতরাং এদের খেলায় আমরা নৈপুণ্যের আভাষ পাবো বলে আশা করতে পারি।

* * *

দুই দিন অমীমাংসিত থাকবার পর তৃতীয় দিনের ফাইন্যাল খেলায় মাদ্রাজ রেজিমেণ্টাল সেণ্টার ৩—২ গোলে আই এ এফ অর্থাৎ ভারতীয় বিমান বাহিনীর ফুটবল দলকে হারিয়ে দিয়ে ডুরাণ্ড কাপ লাভ করেছে। প্রথম দুই দিনের খেলায় কোন গোল হয়নি। তৃতীয় দিন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে চারটি গোল হলেও খেলাটি আবার অমীমাংসিত থাকবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। কারণ দুই দলই দুটি করে গোল করে, কিন্তু অতিরিক্ত সময়ের খেলায় আর একটি গোল লাভ করায় মাদ্রাজ দল লাভ করে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফুটবল প্রতিযোগিতার বিজয়ীর সম্মান। মাদ্রাজ রেজিমেণ্টাল সেণ্টার ইতিপূর্বে ডুরাণ্ড কাপের খেলায় অংশ গ্রহণ করেনি। প্রথমবার অংশ গ্রহণ করেই তাদের এই বিজয় সাফল্য সত্যই কৃতিত্বপূর্ণ। কারণ ভারতের তিন প্রধান ফুটবল প্রতিযোগিতা- আই এফ এ শীল্ড এবং রোভার্স ও ডুরাণ্ড কাপে ভারতীয় দলের সাফল্যের হিসাবের মধ্যে ডুরাণ্ডে ভারতীয় দলের সাফল্য সবচেয়ে কম। এর আগে মাত্র চারটি দলের পক্ষে ডুরাণ্ড কাপ লাভ করা সম্ভব হয়েছে; মাদ্রাজ রেজিমেণ্টাল সেণ্টার ভারতের পঞ্চম দল হিসাবে লাভ করেছে ডুরাণ্ড কাপ।

ভারতের খেলাধুলার সমস্ত বিভাগে সামরিক বিভাগের খেলোয়াড়রা ধীরে ধীরে প্রাধান্য বিস্তার করছেন, রেজিমেণ্টাল সেণ্টার দলের ডুরাণ্ড কাপ লাভ থেকে এই কথাই প্রমাণ হয়। এবার ডুরাণ্ড ফাইন্যালের প্রতিদ্বন্দ্বী দুইটি দলই ছিল সামরিক। দিল্লী ক্লথ মিল ফুটবল প্রতিযোগিতার বিজয়ী আই এ এফ দল ডুরাণ্ড লাভ করতে না পারলেও ক্রীড়ানৈপুণ্যে দর্শকদের প্রশংসা অর্জন করেছে। ভলিবল, বাস্কেটবল, সাঁতার, হকি প্রভৃতি খেলাধুলায় সামরিক খেলোয়াড়দের কৃতিত্বের কথা সর্বজনবিদিত। এ্যাথলেটিক স্পোর্টসে তো কথাই নেই। এ্যাথলেটিক স্পোর্টসে তাদের একচেটে প্রাধান্য। ক্রিকেটেও তারা কম কৃতিত্ব দেখাচ্ছেন না, এখন ফুটবলেও তাদের মধ্যে যথেষ্ট উন্নতি দেখা যাচ্ছে। এর থেকে আর একটি কথা প্রমাণ হয়, স্বাস্থ্যই সম্পদ, সুস্বাস্থ্যই খেলাধুলায় উন্নতি লাভের প্রধান সোপান।

• • •

ডুরাণ্ড কাপ ভারতের সর্বপ্রাচীন ফুটবল প্রতিযোগিতা। ১৮৮৮ সালে ভারত সরকারের বৈদেশিক সেক্রেটারী মার্টিমার

ভারতের সর্বপ্রাচীন ফুটবল প্রতিযোগিতার বিজয়ীর পুরস্কার ডুরান্ড কাপ

ডুরান্ডের নামে এই প্রতিযোগিতার সৃষ্টি। হেনরী মর্টিমারই সামরিক বিভাগে ফুটবল প্রতিযোগিতা প্রচলনের জন্য ডুরান্ড কাপ দান করেছিলেন। হেনরী ডুরান্ড পরে স্যার খেতাব লাভ করেন। উপর্যুপরি তিন বছরের বিজয়ী চিরতরে ডুরান্ড কাপটি লাভ করবে, প্রতিযোগিতার প্রথমদিকে এই নিয়ম থাকায় হাইল্যান্ড লাইট ইনফ্যান্ট্রি দল ১৮৯৫ সালে চিরতরে ডুরান্ড কাপটি লাভ করে। স্যার হেনরী ডুরান্ড বিজয়ীর পুরস্কারের জন্য আর একটি কাপ দান করেন। ১৮৯৯ সালে আবার অনুরূপ ঘটনা ঘটে। এবার পর পর তিনবার বিজয়ী হয়ে চিরদিনের মত কাপটি লাভ করে ব্ল্যাক ওয়াচ। স্যার হেনরী মুক্ত হস্তে আবার এগিয়ে আসেন এবং দান করেন তৃতীয় ডুরান্ড কাপ। সঙ্গে সঙ্গে নিয়ম হয় পর পর তিন বছরের বিজয়ীকে আর ডুরান্ড কাপ দেওয়া হবে না। তার বদলে তাদের দেওয়া হবে একটি ছোট কাপ। তবে ফাইন্যালের বিজয়ী প্রতিবারই এক বছরের জন্য ডুরান্ড দখলে রাখতে পারবে। প্রথমদিকে ডুরান্ড কাপের খেলা হত সিমলায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সিমলার শৈলাবাস থেকে ডুরান্ড দিল্লীর রাজধানীতে নেমে এসেছে। যাই হক ১৯৩৪ সালে ভারত সরকারের কর্মিবৃন্দ এবং সিমলার ফুটবলপ্রিয় দর্শক-সমাজের দানে 'সিমলা ট্রফি' নামে এক সুদৃশ্য ট্রফি সৃষ্টি করা হয়। সিমলা ট্রফি ডুরান্ডের আকর্ষণ আরো বাড়িয়ে তোলে। যে দল উপর্যুপরি তিন বছর ডুরান্ড বিজয়ী হবে, তারা চিরতরে সিমলা ট্রফি লাভ করবে বলে আইন করা হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ডামাডোলের মধ্যে ১৯৪১ সাল থেকে ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত ডুরান্ডের খেলা স্থগিত থাকবার পর ১৯৫০ সাল থেকে যখন দিল্লীর সামরিক কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে আবার ডুরান্ডের খেলা আরম্ভ হয়, তখন রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ হন ডুরান্ডের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। রাষ্ট্রপতি প্রদত্ত 'রাষ্ট্রপতি কাপ' এখন ডুরান্ডের অন্যতম আকর্ষণ। ভারতের জাতীয় সরকারের প্রতীক অশোক স্তম্ভের উপর নির্মিত এই কাপটির সারা অঙ্গে রয়েছে শিল্প নৈপুণ্যের নিখুঁত ছাপ। ডুরান্ড বিজয়ীর এটি অন্যতম পুরস্কার। কাপটি ফিরিয়ে দিতে হয় না। ১৯৫২ সালে 'রবার্ট হজ চ্যালেঞ্জ কাপ' নামে আরও একটি কাপ ডুরান্ডের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। রবার্ট ই হজ তাঁর লোকান্তরিত পিতা রবার্ট হজের নামে কাপটি দান করেছেন। সেমি ফাইন্যালের পরাজিত দুইটি দলের মধ্যে যে বিশেষ খেলার ব্যবস্থা আছে, তারই বিজয়ী দল লাভ করে 'রবার্ট হজ' কাপ।

ডুরান্ড বিজয়ীর অন্যতম পুরস্কার 'সিমলা ট্রফি'

ডুরান্ড বিজয়ীর বিশেষ পুরস্কার 'রাষ্ট্রপতি কাপ'

প্রথমদিকে ডুরান্ড ছিল নিরঙ্কুশ সামরিক ফুটবল প্রতিযোগিতা। ডুরান্ড ইতিহাসে ১৯২৪ সাল দুটি কারণে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই বছরের ৮ই জুন ভারতীয় ফুটবলের হিতৈষী স্যার হেনরী ডুরান্ড ইংলণ্ডে দেহত্যাগ করেন। আর এই বছরই সর্বপ্রথম বে-সামরিক ফুটবল দলকে ডুরান্ডে খেলবার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। অবশ্য ডুরান্ডে ভারতীয় দলগুলির যোগদানের পথ উন্মুক্ত হলেও ১৯৪০ সালের আগে কোন ভারতীয় দলের পক্ষেই ডুরান্ড লাভ করা সম্ভব হয়নি। ১৯৪০ সালে দুর্ধর্ষ মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব ফাইন্যালের ওয়েলচ রেজিমেণ্টকে পরাজিত করলে ডুরান্ড কাপ সর্বপ্রথম কালা আদমীদের দখলে আসে। যুদ্ধের ডামাডোলের মধ্যে জাতিচ্যুত ডুরান্ড কাপ ৯ বছরের জন্য মুখ লুকিয়ে না থাকলে আরও ভারতীয় দলের পক্ষে হয়তো ডুরান্ড কাপ লাভ করা সহজ হত। যাই হোক দিল্লীতে খেলা আরম্ভের পর থেকে হায়দরাবাদ পুলিশ দুইবার, ইস্টবেঙ্গল ক্লাব দুইবার আর মোহনবাগান ক্লাব একবার ডুরান্ড লাভ করেছে। বৃটিশ যুগের সামরিক ফুটবলের বহু স্মৃতি বিজড়িত ডুরান্ড কাপে ভারতের একটি সামরিক দলের সাফল্য এই সর্বপ্রথম।

* * *

ভারতে এসে নিউজিল্যান্ড দলকে প্রথম খেলায় পশ্চিম অঞ্চল দলের কাছে ১ উইকেটে হার স্বীকার করতে হলেও

ভারতের সঙ্গে প্রথম টেস্ট খেলা অমীমাংসিত-ভাবে শেষ করে নিউজিল্যান্ড দল কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে। পরের খেলাটিতে তারা হারিয়েছে দক্ষিণ অঞ্চল দলকে এক ইনিংস ও ৩ রানে। সুতরাং নিউজিল্যান্ড দলের খেলায় যে উন্নতি দেখা যাচ্ছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সবচেয়ে বড় কথা, তাদের দুই জন কীর্তিমান খেলোয়াড়—বার্ট সাটক্লিফ ও রিড, যাদের খেলা দেখার আকর্ষণ সবচেয়ে বেশী, তারা দুইজনই নিজেদের মনোবল এবং হাতের নিপুণতা ফিরে পেয়েছেন। ফলে নিউজিল্যান্ডের পরের খেলাগুলি সম্পর্কেও দর্শকদের মধ্যে কিছুটা আগ্রহের সঞ্চার হয়েছে।

বেশ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেই নিউ-জিল্যান্ডকে দ্বিতীয় টেস্টে ভারতের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়। দুই মল্লবীরের কঠিন সংগ্রামে ভূতলশায়ী মল্লবীর যেমন অনমনীয় দৃঢ়তার সঙ্গে আত্মরক্ষা এবং পরাজয়ের হাত থেকে অব্যাহতি পাবার চেষ্টা করেন, নিউজিল্যান্ডকেও তেমন হায়দরাবাদের ফতে ময়দানে প্রথম টেস্ট খেলায় বেশ অসুবিধার মধ্যে পড়ে পরাজয়ের হাত থেকে অব্যাহতি পেতে হয়েছে। একটা বড় রানের বিরুদ্ধে খেলতে হলে যতটুকু মনোবল, যতটুকু দৃঢ়তা এবং যতখানি সহিষ্ণুতার প্রয়োজন, তার কোনই অভাব দেখা যায়নি নিউজিল্যান্ডের খেলায়। সত্য বটে, খেলার 'পিচ' নিউজিল্যান্ড দলের এই আত্মরক্ষা-মূলক ব্যাটিংয়ের পক্ষে পরম সহায়ক হয় এবং ভারতের বোলাররাও আশানুরূপ সাফল্য অর্জন করতে পারেননি, তবুও প্রথম টেস্ট অমীমাংসিতভাবে শেষ করার মূলে নিউজিল্যান্ডের কৃতিত্ব অস্বীকার করা যায় না। পাঁচ দিনব্যাপী টেস্ট খেলার প্রথম দুই দিনে ভারত ৪ উইকেটে ৪৯৮ রান তুলে ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করলে নিউ-জিল্যান্ড দল এক সমস্যাসংকুল অবস্থার মধ্যে উপনীত হয়। জয়লাভের আশা তো তারা ছেড়েই দেয়, কিভাবে পরাজয়ের হাত থেকে অব্যাহতি পাবে, এই সমস্যাই বড় হয়ে দেখা দেয় নিউজিল্যান্ড অধিনায়কের সম্মুখে।

কৃপাল সিং মঞ্জরেকার

নিউজিল্যান্ড ও ভারতের প্রথম টেস্ট খেলায় ডাবল সেঞ্চুরী ও ভারতের টেস্ট ক্রিকেটে নতুন রেকর্ডের অধিকারী পলি উমরিগর

সুতরাং মন্থর ক্রিকেটে সময় অতিবাহিত করবার নীতি গ্রহণ করে তারা ব্যাট চালনা করতে থাকে এবং প্রথম ইনিংসের খেলায় পুরো দুইদিন সময় অতিবাহিত করে লাভ করে ৩২৬ রান। অবশ্য 'ফলো-অনের' হাত থেকে অব্যাহতি না পাবার ফলে তৃতীয় দিনও তাদের ব্যাটিং আরম্ভ করতে হয়। কিন্তু প্রশংসনীয়ভাবে এবং রীতিমত দৃঢ়তার সঙ্গে খেলেই তারা প্রথম টেস্টে পরাজয়ের হাত থেকে অব্যাহতি পায়।

হায়দরাবাদের ফতে ময়দানে নিউজিল্যান্ড ও ভারতের প্রথম টেস্ট খেলায় ভারতের ৪ উইকেটে ৪৯৮ রান, ভারতের কীর্তিমান খেলোয়াড় পলি উমরিগরের ডাবল সেঞ্চুরী লাভ এবং তৃতীয় উইকেটে মঞ্জরেকার ও উমরিগরের একত্রে ২৩৮ রান করার কৃতিত্ব—তিনটি ঘটনাই ভারতের টেস্ট ইতিহাসের নতুন রেকর্ড। এর আগে কোন টেস্ট খেলায় ভারত এত বেশী রান সংগ্রহ করতে পারেনি। ১৯৫১ সালে ইংলন্ডের বিরুদ্ধে ৯ উইকেটে ৪৮৫ রান লাভই ছিল ভারতের টেস্ট খেলার সবচেয়ে বেশী রান। উমরিগর ছাড়া এর আগে ভারতের কোন খেলোয়াড়ও টেস্টে ডাবল সেঞ্চুরী করতে পারেননি, কোন উইকেটেও ২৩৮ রান যোগ হয়নি। অবশ্য ১৯৫৩ সালে জামাইকাতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে পি রায় ও মঞ্জরেকার দ্বিতীয় উইকেটে ২৩৭ রান করেছিলেন। উমরিগরের ডাবল সেঞ্চুরীর আগে টেস্ট খেলায় সবচেয়ে বেশী রান করার অধিকারী ছিলেন বিনু মানকড়। ১৯৫২ সালে লর্ডস মাঠে ইংলন্ডের বিরুদ্ধে তিনি ১৮৪ রান করেন।

টেস্ট খেলার এই তিনটি নতুন ঘটনা ছাড়া প্রথম সুযোগে তরুণ খেলোয়াড় কৃপাল সিংয়ের টেস্ট সেঞ্চুরী লাভ উল্লেখ করবার মত বিষয়। ভারতের খুব বেশী খেলোয়াড়ের পক্ষে প্রথম সুযোগে টেস্ট সেঞ্চুরী লাভ করা সম্ভব হয়নি। এর আগে অমর এবং অদ্বিতীয় রনজি, তার যোগ্য ভ্রাতুষ্পুত্র দলিপ সিংজী, পাতৌদির নবাব, লালা অমরনাথ এবং দীপক সোধন—এই পাঁচজন খেলোয়াড় টেস্ট খেলার প্রথম সুযোগে শত রান লাভ করেছেন। এখানে বলা যেতে পারে, বিশ্বখ্যাত রনজি, দলিপ আর পাতৌদি ভারতেরই খেলোয়াড়, কিন্তু প্রথম সুযোগে টেস্ট সেঞ্চুরী করেছেন ইংলন্ডের পক্ষে—এরা ভারতীয় ক্রিকেটের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক—ভারতীয় ক্রিকেটের গৌরব।

প্রথম টেস্টে নিউজিল্যান্ডের পক্ষে যারা সেঞ্চুরী করেছেন, তাঁরা হচ্ছেন দলের সর্ব-কনিষ্ঠ খেলোয়াড় জন গায় এবং দলের সর্ব-শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় বার্ট সাটক্লিফ। দুইজনেরই ব্যাট করবার সুন্দর ভঙ্গি দর্শকদের আনন্দ দান করে। নীচে প্রথম টেস্ট খেলার সংক্ষিপ্ত ফলাফল দেওয়া হলঃ—

প্রথম টেস্ট

ভারত—প্রথম ইনিংস (৪ উইঃ ডিক্লেয়ার্ড) ৪৯৮ রান (পলি উমরিগর ২২৩, ভি এল মঞ্জরেকার ১১৮, কৃপাল সিং নট আউট ১০০; হেজ ৯১ রানে ৩ উইকেট)।

নিউজিল্যান্ড—প্রথম ইনিংস ৩২৬ রান (জে গায় ১০২, এস ম্যাকগিবন ৫৯, জন রিড ৫৪; এস গুপ্তে ১২৮ রানে ৭ উইঃ)।

নিউজিল্যান্ড—দ্বিতীয় ইনিংস (২ উইঃ) ২১২ (বার্ট সাটক্লিফ নট আউট ১৩৭, জন রিড নট আউট ৪৫)।

(খেলা অমীমাংসিত)
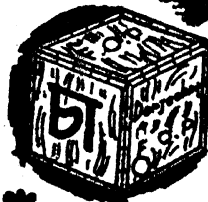
দেশী সংবাদ

২১শে নবেম্বর—আজ বোম্বাইয়ে বিক্ষুব্ধ জনতা ও পুলিসের মধ্যে কয়েকবার সংঘর্ষের ফলে ১২জন নিহত ও ২৬৬জন আহত হয়। পৃথক বোম্বাই শহর রাজ্য গঠনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপনের জন্য বামপন্থিগণ এক দিনের জন্য যে ধর্মঘট আহ্বান করে, তাহা কার্যে পরিণত করিতে গেলে এই সংঘর্ষ বাধে।

সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী মঃ বুলগানিন আজ নয়াদিল্লীতে সংসদের উভয় পরিষদের সদস্যগণের এক সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বিশ্বের শান্তির জন্য ভারত-সোভিয়েট মৈত্রীর প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করেন। তিনি বলেন, অর্থনীতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র ছাড়াও বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী ব্যাপারে গবেষণার ক্ষেত্রে ভারত-সোভিয়েট সহযোগিতার ক্ষেত্র আরও সম্প্রসারণের যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। আমরা আমাদের অর্থনীতিক ও বৈজ্ঞানিক ব্যাপারে আমাদের অভিজ্ঞতা আপনাদের জানাইতে প্রস্তুত আছি।

২২শে নবেম্বর—সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী মঃ বুলগানিন ও মঃ খ্রুস্চেভ আজ ভাকরা বাঁধ নির্মাণ পরিকল্পনার কার্য পরিদর্শন করিয়া বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করেন। মঃ বুলগানিন ভাকরা-নাঙ্গাল পরিকল্পনাকে 'অপূর্ব' বলিয়া বর্ণনা করেন।

আজ কলিকাতায় ভাষা কমিশনের সম্মুখে সাক্ষ্য দিতে গিয়া পশ্চিমবঙ্গের দুইটি বিশিষ্ট সংস্থার পক্ষ হইতে এই অভিমত প্রকাশ করা হয় যে, সংবিধানে প্রস্তাবিত পথে ইংরাজীর সহিত আমাদের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করা অথবা একটি মাত্র আঞ্চলিক ভাষাকে জাতীয় ভাষার মর্যাদা দেওয়া সমীচীন হইবে না। তাঁহারা উত্তর ভারতের একটি ভাষা, দক্ষিণ ভারতের একটি ভাষা এবং ইংরাজী ভাষাকে জাতীয় ভাষার মর্যাদা দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন।

২৩শে নবেম্বর—বোম্বাই নগরী আজ সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী মঃ বুলগানিন ও মঃ খ্রুস্চেভকে বিপুলে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে। সেখানে এক লক্ষ লোকের এক জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে মঃ বুলগানিন বলেন, আজ বিশ্বের সম্মুখে দুইটি মাত্র পথ খোলা রহিয়াছে, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান অথবা ধ্বংস।

রেওয়ায় বিন্ধ্য প্রদেশ বিধানসভায় রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের রিপোর্ট সম্পর্কে আলোচনা কালে এক হাঙ্গামা দেখা দেয়। তথায় প্রায় একশত লোক বিধানসভা কক্ষে প্রবেশ করিয়া অর্থমন্ত্রীকে প্রহার করে এবং কক্ষের মধ্যে ইটপাটকেল ও জুতা নিক্ষেপ করে।

২৪শে নবেম্বর—সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী

মঃ বুলগানিন আজ বোম্বাইয়ে সম্বর্ধনাসভায় বলেন যে, মানবজাতির মুক্তিদাতা হিসাবে লেনিন এবং মহাত্মা গান্ধী একই শ্রেণীভুক্ত। ভারতের অধিবাসীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, এই মহান দেশে মহাত্মা গান্ধীর প্রধান শিষ্য শ্রীজওহরলাল নেহরুকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে পাইয়া আপনারা ভাগ্যবান।

রুশ নেতৃদ্বয়ের কলিকাতা আগমন উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৩০শে নবেম্বর সারা পশ্চিমবঙ্গে ছুটির দিন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

২৫শে নবেম্বর—কংগ্রেস সভাপতি শ্রী ইউ এন ঢেবর আজ ইম্ফল হইতে ৩০ মাইল দূরে মাইরঙ্গ নামক স্থানে আজাদ হিন্দ ফৌজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। ভারতের মুক্তির জন্য ১৯৪৪ সালে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ বাহিনীর যে সকল অজ্ঞাত সৈন্য এখানে সংগ্রাম করিয়া জীবন দিয়াছে, তাহাদের বীরত্বপূর্ণ কার্যের সম্মানার্থ এই ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়।

আজ লোকসভায় এক প্রশ্নের উত্তরে কৃষিমন্ত্রী ডাঃ পাঞ্জাবরাও দেশমুখ জানান যে, বর্তমান বৎসরে বন্যার ফলে আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, উত্তরপ্রদেশ, দিল্লী, পাঞ্জাব, পেপসু ও অন্ধ্রে প্রায় ৬৫ কোটি টাকা মূল্যের শস্যের ক্ষতি হইয়াছে।

২৬শে নবেম্বর—মঃ খ্রুস্চেভ আজ ব্যাঙ্গালোরে ঘোষণা করেন যে, সোভিয়েট ইউনিয়ন প্রচণ্ড শক্তিসম্পন্ন একটি আণবিক অস্ত্রের বিস্ফোরণ ঘটাইয়াছে। তিনি বলেন, যাহারা নূতন যুদ্ধ আরম্ভ করিতে চাহে, তাহাদের উপর প্রভাব বিস্তার করার উদ্দেশ্যেই সোভিয়েটের তূণীরে ঐ অস্ত্র রাখা হইয়াছে।

কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী শ্রী ডি পি কারমারকার আজ নয়াদিল্লীতে আমদানী উপদেষ্টা পরিষদের তৃতীয় বৈঠকে বক্তৃতাকালে বলেন যে, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কালের মধ্যে যন্ত্রপাতি, কলকারখানা এবং লৌহ ও ইস্পাত আমদানীর জন্য প্রায় দেড় হাজার কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা প্রয়োজন হইবে।

অদ্য শ্রীচক্রবর্তী রাজগোপালাচারী দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে ভাষণ দেন। তিনি বলেন, এক দেশের দ্বারা অপর দেশের শাসন যে অসম্ভব, তাহা গান্ধী এবং ভারত প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং অস্ত্রসজ্জার ভয়ে বিরাট অস্ত্রসজ্জার ব্যবস্থা করা সম্পদের অপচয় ছাড়া আর কিছুই নহে।

২৭শে নবেম্বর—সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী মঃ বুলগানিন আজ কোয়েম্বাটুরে জনসভায় বলেন, ভারত ও রাশিয়া এই দুই সুমহান দেশের মধ্যে বন্ধুত্বের প্রগাঢ় বন্ধন প্রতিষ্ঠার ফলে সমগ্র বিশ্বে শান্তিরক্ষার মহান উদ্দেশ্য সাধিত হইবে।

সৌদী আরবের রাজা ইবন সৌদ আজ বিমানযোগে দিল্লীর পালাম বিমান বন্দরে পৌঁছিলে ২১ বার তোপধ্বনি করিয়া তাঁহাকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। তিনি ১৭ দিন ভারত পরিদর্শন করিবেন।

বিদেশী সংবাদ

২১শে নবেম্বর—ঢাকা শহরের ও পার্শ্ববর্তী নারায়ণগঞ্জের কোন কোন অঞ্চলে কনস্টেবলগণ আজ কাজে যোগ না দেওয়ার পূর্ব পাকিস্থান রাইফেল বাহিনীর কয়েকটি দল পুলিশের কার্য গ্রহণ করে।

২২শে নবেম্বর—আজ কাসাব্লাঙ্কার কারাগার অভিমুখে অগ্রসর এক ক্ষুব্ধ জনতার উপর পুলিশ গুলী চালাইলে কতিপয় মরক্কোবাসী নিহত হয়। সিদি মহম্মদ বেন ইউসুফের সিংহাসনে পুনরায় আসীন হওয়ার পর গত রাত্রি হইতে সমগ্র মরক্কোতে নূতন করিয়া অরাজকতা আরম্ভ হইয়াছে।

২৩শে নবেম্বর—আণবিক শক্তি কমিশন আজ সংবাদ দেন যে, সোভিয়েট ইউনিয়ন তাহাদের বৃহত্তম আণবিক বিস্ফোরণ ঘটাইয়াছে।

২৫শে নবেম্বর—ঢাকার সংবাদে প্রকাশ, গত পাঁচ দিন যাবৎ কিছু সংখ্যক পুলিস কর্তব্যে হাজিরা দিতে অসম্মত হওয়ায় তৎসম্পর্কে এপর্যন্ত পূর্ববঙ্গ আইনসভার কতিপয় সদস্যসহ ৮২ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

২৬শে নবেম্বর—পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রী চৌধুরী মহম্মদ আলি আজ করাচীতে সর্বদলীয় কাশ্মীর সম্মেলনের উদ্বোধন প্রসঙ্গে এই সতর্ক বাণী উচ্চারণ করেন যে, কাশ্মীরে অচলাবস্থার দরুণ পাকিস্থানীদের মনে হতাশা ও তিক্ততা বৃদ্ধি পাইতেছে এবং উহার দরুণ শেষ পর্যন্ত তাহারা যাহাতে বেপরোয়া ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য না হয়, তজ্জন্য পূর্বেই বিষয়টির মীমাংসা একান্ত প্রয়োজন।

২৭শে নবেম্বর—পাকিস্থানের গভর্নর জেনারেল মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা আজ পাক-আফগানিস্থান বিরোধ মীমাংসার জন্য একটি গোলটেবিল বৈঠকের প্রস্তাব করেন।

প্রতি সংখ্যা—৴৹ আনা, বার্ষিক—২৲, ষাণ্মাসিক—১০,
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা, লিমিটেড, ৬ ও ৮, সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১৩
শ্রীপ্রাণপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস লিমিটেড হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত
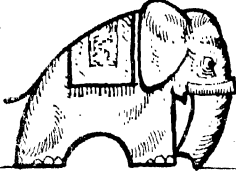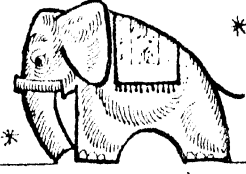
দেশ
২৩ বর্ষ ॥ ৬ সংখ্যা ॥ ৷৵০
শনিবার, ২৪শে অগ্রহায়ণ, ১৩৬২
DESH : 6 Annas
SATURDAY, 10th DEC., 1955.

সম্পাদক—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন
সহকারী সম্পাদক শ্রীসাগরময় ঘোষ

রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ

গত ১৮ই অগ্রহায়ণ রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ ৭২ বৎসর বয়সে পদার্পণ করিয়াছেন। আমরা এই উপলক্ষে তাঁহাকে আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা এবং অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি। মহাত্মা গান্ধীর নিষ্ঠাবান অনুগামিস্বরূপে রাজেন্দ্র প্রসাদ দেশ ও দশের কল্যাণ সাধনে তাঁহার জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। পদ, মান এবং প্রতিষ্ঠার ঊর্ধ্বে তাঁহার জীবন জাতির সেবায় মহনীয় আদর্শে উজ্জ্বল। ভারতের রাষ্ট্রপতির পদে অধিষ্ঠিত হইবার পরও রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ দেশের সর্বজনের একান্ত আপনারই রহিয়া গিয়াছেন। সকলের প্রতি শ্রদ্ধা এবং বিনয়ের তিনি বিগ্রহ-স্বরূপ। এদেশের নিতান্ত যে দীন-দরিদ্র ভারতের রাষ্ট্রপতি তাহার পক্ষেও আপন জন। চরিত্র-মাধুর্যে এমন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন আদর্শনিষ্ঠ উদার হৃদয় পুরুষকে রাষ্ট্রপতি পাইয়া আমরা নিজদিগকে সৌভাগ্যবান মনে করি। ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ সুদীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া দেশ ও দশের কল্যাণ সাধন করিতে থাকুন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

প্রীতির শক্তি ও রীতি

সোভিয়েট নেতৃবৃন্দের কলিকাতা শহরে অভ্যর্থনা আধুনিক জগতে ঐতিহ্য সৃষ্টি করিয়াছে। শহরের ময়দানে তাঁহাদের অভিনন্দনের জন্য ৩০ লক্ষ নরনারীর এমন বিরাট এবং বিশাল সমাবেশ ইতঃপূর্বে দেখা যায় নাই। মানবমুক্তির জন্য সোভিয়েট রাষ্ট্রের আদর্শ এবং সাধনা এক্ষেত্রে অনেকখানি কাজ করিয়াছে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। 'রাষ্ট্রীয় মুক্তির আদর্শে সমগ্র ভারতের মধ্যে বাংলার অবদান সর্বাপেক্ষা অধিক'—কলিকাতার ময়দানে জনসমাবেশে সোভিয়েট-নেতা মঃ ক্রুশ্চেভের এই উক্তিতে বাংলার অন্তর-ধর্মই অভিব্যক্ত হইয়াছে। বস্তুত রাজা রামমোহন হইতে আরম্ভ করিয়া বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বাংলার সংস্কৃতিতে যে উদার প্রাণশক্তি জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছেন, পশ্চিমবঙ্গে সোভিয়েট-নেতৃবৃন্দের অভ্যর্থনায় বিশ্ব-জগৎ তাহার উদ্বেল-লীলারই পরিচয় পাইয়াছে। সাম্রাজ্যস্বার্থ এবং জাতি-বৈষম্যগত প্রভুত্বের অচলায়তনের ঘাটি যাঁহারা অন্তরে অন্তরে আগুলাইয়া রাখিতে চাহেন, তাঁহাদের অন্তরে সোভিয়েট-নেতাদের এমন অভ্যর্থনা শঙ্কার সৃষ্টি করিবে, ইহা স্বাভাবিক। কানাডার পররাষ্ট্রসচিব মিঃ লিস্টার পিয়ার্সন এই অভ্যর্থনা প্রসঙ্গ অবতারণা করিয়া সম্প্রতি নিউইয়র্কে এই কথা বলিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন যে, সোভিয়েট ইউনিয়ন একটা ইস্পাতের কল দিয়া ভারতে যে আন্দাজ বাহবা পাইতেছে, তদপেক্ষা চার-পাঁচগুণ অধিক অর্থ সাহায্য করিয়াও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভাগ্যে তাহা জুটিতেছে না। মিঃ পিয়ার্সন এক্ষেত্রে অর্থের ওজনে মানুষের প্রীতি বিচার করিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু মানুষের অন্তরের প্রবৃত্তি অর্থের মাপ-কাঠির হিসাবে চলে না। প্রকৃতপক্ষে কোনরূপে আর্থিক সাহায্য না করিয়াও এক জাতির সহিত অপর জাতির প্রীতির সম্বন্ধ নিবিড় হইতে পারে। পরস্পরকে কে কতখানি আপনার করিয়া দেখিতে পারে, এই বিচারই এক্ষেত্রে বড় হইয়া দাঁড়ায়। সোভিয়েট-নেতারা ভারতে আসিয়া এদেশের অধিবাসীদিগকে যত-খানি আপন করিয়া লইয়াছেন, আমেরিকা কিংবা আমেরিকার গোষ্ঠী-স্বার্থবাদী দেশের পক্ষে তাহা সম্ভব হয় নাই। পাশ্চাত্ত্য শক্তির বিভিন্ন মুখপাত্রগণ ঔপনিবেশিক প্রভুত্ববাদের বিরুদ্ধে মুখের ভাষায় প্রতিবাদ করিলেও কাজের বেলায় তাঁহারা মানব-মুক্তির বিরোধী সেই প্রভুত্ববাদকেই সমর্থন করিয়া থাকেন। গোয়ার ব্যাপারে এই পরিচয় আমাদের দৃষ্টিতে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

অন্তঃপ্রকৃতির প্রতিফলন

সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী মঃ বুলগানিন ভারত পরিদর্শনকালে গোয়ায় পর্তুগীজ প্রভুত্বের বিরুদ্ধে যে-সব কথা বলেন, মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব মিঃ জন ফস্টার ডালেস এবং পর্তুগীজ পররাষ্ট্র সচিব সেনর পলো কুনহা একটি যুক্ত বিবৃতি জারী করিয়া তাহার প্রতিবাদ

করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে সোভিয়েট নেতাদের এইরূপ উক্তি শান্তির সহায়ক নহে এবং এই ধরনের উক্তির দ্বারা প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে বিদ্বেষের ভাব উস্কাইয়া তোলা হইতেছে। গোয়ার সম্বন্ধে পর্তুগীজদের মনোভাব আমাদের অবিদিত নহে, সুতরাং মঃ বুলগানিন এবং মঃ ক্রুশ্চেভের ঔপনিবেশবাদের বিরোধী মন্তব্যে যে পররাষ্ট্র সচিবের মাথার টনক নড়িবে, ইহা আশ্চর্যের বিষয় কিছুই নয়, কিন্তু মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব মিঃ ডালেস খোলাখুলিভাবে তাঁহার সুরে সুর মিলাইয়া যেভাবে ঔপনিবেশিকবাদের সমর্থনে নীতিকথা আওড়াইয়া আগাইয়া আসিয়াছেন, তাহা আমাদিগকে বিশেষ-ভাবে চিন্তিত করিয়া তুলিয়াছে। মিঃ ডালেস তাঁহার এতৎসম্পর্কিত উক্তির সত্যতা সুনিশ্চিত বলিয়া পরে যে উক্তি করিয়াছেন, তাহা রাষ্ট্রনীতি ক্ষেত্রে চূড়ান্ত নির্লজ্জতার এবং হীনতার পরি-চায়ক। গোয়ার কথাটা স্পষ্ট করিয়া দিয়া তিনি এক্ষেত্রে ভারতকেই হুমকি দেখাইয়াছেন। কিন্তু ভারত তাঁহাদের হুমকিতে ডরায় না, ইহা তাঁহারা জানিয়া রাখুন। প্রকৃতপক্ষে ঔপ-নিবেশিকবাদের বিরুদ্ধতা করিয়া সোভিয়েট-নেতৃগণ প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যের মধ্যে বিদ্বেষের ভাব প্ররোচিত করিতে-ছেন, তাঁহারা জাতিতে জাতিতে বিভেদ সৃষ্টি করিতেছেন—এই সমস্তই ছেঁদো কথা। সোজা ভাষায় ইহা রাজনীতিক ধাপ্পাবাজী ছাড়া আর কিছুই নয়। ফলত যে সব শ্বেতাঙ্গ জাতি শ্বেতবর্ণের দেমাকে গায়ের জোরে একটা জাতিকে পরাধীন রাখিয়াছে এবং সেই জাতিকে অসভ্য মনে করিয়া ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করিতেছে, তাহারাই প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যের মধ্যে বিদ্বেষবুদ্ধিকে জাগাইয়া তুলিতেছে এবং জাতিতে জাতিতে বিভেদের যতরকম অনর্থ সৃষ্টি করিয়া জগতের শান্তিকে মানবতা-বিরোধী পশুবলে উদ্দীপ্ত করিতেছে। আমরা এই কথাটা বলিব যে, মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব পর্তুগীজদের প্রভুত্ববাদের সমর্থনে তাহাদের সঙ্গে যোগ দিয়া যে বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন তাহা প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে যে বিভেদের সৃষ্টি করিয়াছে এবং বিদ্বেষবুদ্ধি জাগাইয়া তুলিয়াছে, সোভিয়েট-নেতৃবৃন্দের প্রতি দেশে ঘুরিয়া পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য চালাইলেও ততটা ভেদ-বিদ্বেষ সৃষ্টি হইত না।

পূর্ববঙ্গে বাংলা ভাষার সাধনা

গত ২রা ডিসেম্বর পূর্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মিঃ আবুহোসেন সরকার বাঙ্গালী একাডেমী বা বঙ্গভাষা পরি-ষদের উদ্বোধন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়াছেন। বিভিন্ন ভাষার দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক এবং সাহিত্য সম্পর্কিত পুস্তকসমূহের অনুবাদ করা এবং সেগুলি প্রকাশ করা এই পরিষদের অন্যতম উদ্দেশ্যস্বরূপে নিরূপিত হইয়াছে। পূর্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বলিয়া-ছেন যে, পূর্ববঙ্গের ৪॥ কোটি অধিবাসী বর্তমানে বাংলা ভাষাকে পাকিস্থানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা স্বরূপে মর্যাদা দানে সংকল্পবদ্ধ হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে পূর্ববঙ্গে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দানের আন্দোলনে গত ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে যে সব ছাত্র জীবন দান করেন, তাঁহাদের কথা উত্থাপন করিয়া তিনি বলেন, ইঁহারা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করিয়া জাতির গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। তাঁহাদের আত্ম-দানের ফলে বাংলা ভাষার মর্যাদা দানের দাবী সুদৃঢ় হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর এই উক্তি আমরা সর্বতোভাবে সমর্থন করি। প্রকৃতপক্ষে ভাষাকে ঐক্যের ভিত্তিস্বরূপে গ্রহণ করিয়াই রাষ্ট্রীয় চেতনা সংহত হইয়া উঠে। দুঃখের বিষয় এই যে, ধর্মগত সাম্প্রদায়িকতা পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার মূলে থাকার জন্য রাষ্ট্র-হিসাবে পাকিস্থানের বিশ্বজগতে মর্যাদা লাভের পক্ষে প্রধান অন্তরায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। বাংলা ভাষার প্রতি মর্যাদাকে ভিত্তি করিয়া পূর্ববঙ্গ রাষ্ট্রীয়তাবোধের এই অন্তরায় অপসারণ করিয়া পাকিস্থানের অভ্যুন্নতির পথ প্রশস্ত করিতে পারে এবং সেই পথে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিরও নিরসন ঘটা সম্ভব। কারণ বাংলা ভাষার সমৃদ্ধি মূলে হিন্দু, মুসলমান সকলের সংস্কৃতি কাজ করিয়াছে। ফলত ভাষার সমৃদ্ধি এ সাহিত্যের সাধনার পথে সাম্প্রদায়িক বা সংকীর্ণতার কোন স্থান নাই।

সোভিয়েট নেতৃবৃন্দের কাশ্মীর পরিদর্শ

ব্রহ্ম পরিভ্রমণের পর ভার প্রত্যাবর্তন করিয়া সোভিয়েট নেতৃবৃন্দে কাশ্মীর দর্শন ব্যবস্থা জাতির সর্ব সাধারণের মনে বিশেষ ঔৎসুক্য সঞ্চা করিয়াছে। গোয়ার সম্বন্ধে সোভিয়ে নেতৃবৃন্দের মনোভাব সোভিয়ে কমিউনিস্ট দলের প্রধান সম্পাদক ম ক্রুশ্চেভের মুখে স্পষ্ট ভাষাতেই অভিব্য হইয়াছে। কাশ্মীর পরিদর্শনের সিদ্ধান্তে কাশ্মীর সম্পর্কেও তাঁহার মনোভাবে পরিচয় পাওয়া গেল। বলা বাহুল্য কাশ্মীর রাজ্যের ভারতভুক্তি সম্বন্ধে তাঁহাদের মনে যদি কোনরূপ সন্দেহের কারণ থাকিত তবে তাঁহারা এই ব্যবস্থায় আগ্রহ প্রদর্শন করিতেন না। প্রকৃতপক্ষে সোভিয়েট-নেতৃগণ এই সত্য সম্যক্‌ভাবেই উপলব্ধি করিয়াছেন যে, কাশ্মীরের জন-সাধারণ ভারতেরই অন্তর্ভুক্ত হইবা পক্ষপাতী এবং এই কাশ্মীরের জন-মতানুমোদিত এই সিদ্ধান্তকে একান্ত ন্যায্য বলিয়াই বুঝিয়াছেন। প্রত্যু কাশ্মীরের ভারতের অন্তর্ভুক্তির যাহা বিরুদ্ধতা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে সোভিয়েট নেতৃগণ তাহাদের স্বার্থ-প্রভাবিত নীতির গূঢ় গতিটি ধরিয়া ফেলিয়াছেন এবং ন্যায়ের দিক হইতে তাহার প্রতিবাদ করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছেন। উপজাতীয়দে দ্বারা আক্রান্ত কাশ্মীরের অতী অভিজ্ঞতা এবং তৎপরবর্তীকালের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট শক্তিগোষ্ঠীর কূটনৈতিক খেলা তাঁহাদের অন্তরে মানুষের অধিকার এবং জনগণের রাষ্ট্রনীতিক পথে আত্মাভিব্যক্তির পথ উন্মুক্ত করিবার পক্ষে অনু-প্রাণিত করিয়াছে। মানুষের অধিকার সমর্থনে তাঁহাদের এই বলিষ্ঠ মনোভাব ভারতের সঙ্গে তাঁহাদের প্রীতি বন্ধনকে সমধিক বলিষ্ঠ করিয়া তুলিবে সন্দেহ নাই।

গত সপ্তাহে ওয়াশিংটনে মার্কিন ও র্তুগালের পররাষ্ট্র সচিবদের মধ্যে না বিষয়ের আলোচনার পরে যে যুক্ত-বৃতি প্রকাশিত হয়েছে, তার একাংশে শিয়ায় ভ্রমণরত সোভিয়েট নেতাদের িসমূহের সমালোচনা করা হয়। মিঃ ালেস ও ডাঃ কুনহা তাঁদের বিবৃতিতে ই মত প্রকাশ করেছেন যে, পশ্চিমা শক্তি-দের সম্বন্ধে এবং সুদূর প্রাচ্যে "পর্তুগীজ দেশ"গুলি সম্পর্কে সোভিয়েট নেতারা -সব দোষারোপপূর্ণ উক্তি করেছেন, সেগুলি বিশ্ব-শান্তির সহায়ক নয়, সেগুলি প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে বিদ্বেষ সৃষ্টির প্ররোচক। "পর্তুগীজ প্রদেশ"গুলি লতে পর্তুগালের গোয়া প্রভৃতি ভারতস্থ পনিবেশগুলিও বুঝায়, এই ধারণার পর একটা আলোড়ন উপস্থিত হয়েছে; রণ বিবৃতির ধরন থেকে মনে হয় যে, ঃ ডালেস গোয়াতে পর্তুগীজ অধিকারের য্যতা স্বীকার করছেন। এ পর্যন্ত মেরিকা (বা বৃটেন) গোয়ার ব্যাপারে রপেক্ষের ভূমিকায় অভিনয় করছিল। ন মার্কিন গভর্নমেণ্ট পর্তুগীজ গভর্ন-ণ্টের পক্ষে প্রকাশ্যভাবে সমর্থন নালেন—বিবৃতির দ্বারা এই ধারণার ষ্টি হওয়ায় ভারতীয় সরকারী মহলে ক্ষোভ ও উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে। গত ধবার পার্লামেণ্টে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহরু লেস-কুনহা বিবৃতির উল্লেখ করে বলেন এটা একটা অত্যন্ত গুরুতর ব্যাপার এর ফল সুদূরপ্রসারী হতে পারে। তিতে কী বলা হয়েছে, সেটা তরভাবে জেনে নিয়ে ভারত সরকার বিষয়ে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন বেন। এ সম্পর্কে ভারতস্থ মার্কিন তের এবং ভারতীয় পররাষ্ট্র দপ্তরের চারীদের মধ্যে একাধিকবার দেখা-ৎ হয়েছে।

সংবাদপত্রে ডালেস-কুনহা বিবৃতির ে প্রকাশিত হয়েছে সেটা যে নির্ভুল ভারত সরকারকে মার্কিন রাজদূত নিশ্চয়ই জানিয়ে দিয়েছেন। ইতিমধ্যে একটি সাংবাদিক বৈঠকে মিঃ ডালেস সাংবাদিকদের সঙ্গে প্রশ্নোত্তরে বিবৃতিটির ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন, সোভিয়েট নেতাদের উক্তিতে গোয়ার ব্যাপারে বিদ্বেষ সৃষ্টির চেষ্টা হচ্ছে, যার ফলে বলপ্রয়োগের সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে, যুক্ত-বিবৃতির উদ্দেশ্য বিশেষ করে সোভিয়েট নেতাদের এই চেষ্টার নিন্দা করা। মিঃ ডালেস বলেন, পর্তুগালের কনস্টিটিউশন অনুসারে গোয়া পর্তুগালের একটি "প্রদেশ" সন্দেহ নেই, ৪০০ বছর ধরে গোয়া পর্তুগালের একটি "প্রদেশ" বলেই খ্যাত, একথা সকলেই জানে। গোয়ার ব্যাপারে ন্যায়-অন্যায়ের দিক থেকে কোন পক্ষের দাবী ঠিক সে বিষয়ে আমেরিকা পূর্বেও যেমন এখনও তেমনি কোন "পজিশন" নিচ্ছে না, আমেরিকা চাচ্ছে এ প্রশ্নটি যেন শান্তিপূর্ণ উপায়ে মীমাংসিত হয়, এ ব্যাপারে যেন বল-প্রয়োগের চেষ্টা না হয়। NATO-র উল্লেখ হওয়াতে মিঃ ডালেস স্পষ্ট করে বলেন যে, গোয়া NATO-র এলাকার বাইরে।

গোয়া সম্পর্কে মার্কিন সরকারের

মনোভাব পূর্বেও যেমন ছিল, এখনও তেমনি আছে—এটা যদি ধরেও নেয়া যায়, তাহলেও ডালেস-কুনহা বিবৃতি ও মিঃ ডালেসের ব্যাখ্যা থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, মার্কিন সরকারের সেই মনোভাব পর্তুগালের নীতির পরিপূর্ণ সহায়ক হয়েছে এবং হচ্ছে। একদিকে ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্নে মার্কিন সরকার নিজেকে নিরপেক্ষ বলে জাহির করছেন এবং সেই সঙ্গে বলছেন যে, সমস্যাটির সমাধানে যেন বলপ্রয়োগের চেষ্টা না হয়। অন্যদিকে পর্তুগাল আগাগোড়াই বলে আসছে যে, সে কিছুতেই বিনাযুদ্ধে গোয়ার পর্তুগীজ অধিকার ত্যাগ করে আসবে না। এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, পর্তুগীজ গভর্নমেণ্ট শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমস্যা সমাধানের পথে গোয়া ছেড়ে যেতে রাজী নয় এবং ভারত গভর্নমেণ্ট বলপ্রয়োগের দ্বারা গোয়ার উদ্ধার করতে গেলেও আপত্তি হবে। ফলে গোয়ার সমস্যা যেখানে আছে সেখানেই থাকবে। গোয়ার সমস্যা মীমাংসিত হোক, এটা যদি সত্যই মার্কিন গভর্নমেণ্টের অভিপ্রেত হোত, তাহলে মার্কিন গভর্নমেণ্টের পক্ষে ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্নে নিরপেক্ষ থাকা সম্ভব হতো না। ভারত সরকার শান্তিপূর্ণ উপায়ে মীমাংসাই চান, বলপ্রয়োগ করতে চান না—এটা সর্বজনবিদিত। কিন্তু গোয়া থেকে পর্তুগীজ কর্তৃত্ব অপসারণের ভিত্তিতে ভিন্ন গোয়া সমস্যার মীমাংসা অসম্ভব—এ দাবী ভারত গভর্নমেণ্ট করতে পারেন না। এ অবস্থায় যাঁরা শান্তিপূর্ণ উপায়ে মীমাংসার সমর্থক বলে নিজেদের জাহির করেন, তাঁদের ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্নে নিরপেক্ষ থাকার ভান কপটতামূলক বলে মনে করা ছাড়া উপায় নেই।

যাঁরা শান্তিপূর্ণ উপায়ে মীমাংসার পক্ষপাতী এবং বলপ্রয়োগের বিরোধী, তাঁদের অন্তত স্পষ্ট করে বলতে হবে তাঁরা কোন্ পক্ষের দাবী সঙ্গত বলে মনে করেন। পর্তুগীজ গভর্নমেণ্টের বর্তমান নীতি অসঙ্গত একথা যাঁরা স্পষ্ট করে বলতে রাজী নন, তাঁদের প্রভাব শান্তিপূর্ণ উপায়ে মীমাংসার প্রতিকূল। কারণ পর্তুগীজ সরকারের উপর যথেষ্ট পরিমাণে আন্তর্জাতিক চাপ না পড়লে তাঁরা শান্তিপূর্ণ উপায়ে মীমাংসার পথে আসবেন না, এ সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই। ভারত সরকারের গোয়া সম্পর্কিত নীতি গত ছ' বছরে নানারকম আবর্তের মধ্য দিয়ে এসেছে, অনেক রকম অসঙ্গতি তাতে দেখা গেছে, তার বিস্তৃত আলোচনা এখানে অনাবশ্যক। কিন্তু এ সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই যে, শান্তিপূর্ণ উপায়ের উপরেই ভারত সরকার আগাগোড়া জোর দিয়ে এসেছেন এবং তাঁদের নীতির মূল সূত্র ছিল এবং রয়েছে এই যে, ভারতীয় দাবীর পক্ষে আন্তর্জাতিক জনমতের প্রভাব ক্রমশ বিস্তৃত হয়ে পর্তুগীজ গভর্নমেণ্টকে মীমাংসার পথে আনতে বাধ্য করবে। এখন দেখা যাচ্ছে, এই নীতি কিছুমাত্র সফলতার দিকে অগ্রসর হতে পারেনি।

প্রকৃতপক্ষে বর্তমানে দুই ব্লকের মধ্যে বিভক্ত পৃথিবীতে এই সফলতা লাভ একরূপে অসম্ভব। কারণ আজকাল যে-কোনো গভর্নমেণ্ট সে যত অন্যায়ই করুক না কেন, কোনো এক দলে যোগ দিলেই সে সেই দলপতিদের কাছ থেকে প্রশ্রয় পায়। সুতরাং কেবলমাত্র নৈতিক আন্তর্জাতিক চাপের দ্বারা কোনো অন্যায়ের প্রতিকার সম্ভব হয় না। বিরুদ্ধ দলের প্রতিবাদে অন্যায়কারী স্বীয় দলের কর্তাদের কাছ থেকে আরো লাই পায়, কারণ বৃহৎ শক্তিরা নিজেদের দলীয় স্বার্থের কথাই চিন্তা করে। যেখানে বৃহৎ শক্তিদের দলীয় স্বার্থ বিপন্ন হয়, কেবল সেখানেই দলের ভিতরের কারো উপর চাপ দেওয়ার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

সোভিয়েট গভর্নমেণ্ট গোয়া সম্পর্কে ভারতের দাবীর প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন। এ সমর্থনের জন্য ভারতের নিকট তাঁরা ধন্যবাদার্হ। কিন্তু ভারত সরকারের গোয়া-নীতির যে মূল সূত্র উপরে উল্লিখিত হয়েছে, তা কেবলমাত্র সোভিয়েট সমর্থনের দ্বারা পুষ্ট বা দৃঢ়তর হবে না, ভারতের বর্তমান গোয়া-নীতির [illegible] সম্ভব হতে পারে যদি ইঙ্গ-মার্কিন কর্তারা পর্তুগীজ গভর্নমেণ্টের উপর [illegible] দেন। এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, সো[illegible] সমর্থন প্রকাশের ফলে আমেরিকার থেকে পর্তুগীজ গভর্নমেণ্ট যেন [illegible] আশ্বাস পেয়েছেন। এতে এটা যেন না ভাবেন যে, সোভিয়েট-সমর্থনের [illegible]শ্রুতি লাভটা ভারতের পক্ষে [illegible] হয়েছে। শুধু এটা মনে রাখা দরকার এই প্রতিশ্রুতি থেকে ভারত সরকার বর্তমান নীতি লাভবান হবে না, [illegible] পেতে হলে নীতির পরিবর্তন আবশ্[illegible]

আসল কথা হচ্ছে, ভারত সরকার বর্তমান নীতি যে কিছুমাত্র কার্যক[illegible] হচ্ছে না, সেইটাই প্রমাণিত হচ্ছে। [illegible] ধরনের আন্তর্জাতিক চাপ [illegible] আশায় ভারত সরকার রয়েছেন, বর্তমান নীতির দ্বারা বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে পয়দা করা সম্[illegible] নয়। ফল লাভ করতে হলে নীতি বদলা[illegible] হবে। শান্তিপূর্ণ উপায়ে পর্তুগীজ গভর্নমেণ্ট মীমাংসা করতে অর্থাৎ গোয়া[illegible] পর্তুগীজ শাসনের অবসানের [illegible] করতে রাজী না হলে ভারত সরকার [illegible] প্রয়োগ করতে বাধ্য হবেন, একথা [illegible] করে জানিয়ে দিলেই পরিস্থিতি [illegible] যাবে। ভারত-পর্তুগীজ সামরিক সংঘর্ষ[illegible] সম্ভাবনার উল্লেখ (বিশেষত সোভিয়েট সমর্থনের প্রতিশ্রুতির পরিপ্রেক্ষিতে) ইঙ্গ-মার্কিন ব্লককে মুহূর্তের মধ্যে সজাগ করে তুলবে, ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্নে নিরপেক্ষ থাকার ভান দূর হয়ে যাবে এবং ভারত সরকারের বহুপ্রত্যাশিত আন্তর্জাতিক চাপ পর্তুগালের উপর [illegible] এসে পড়বে। তাতে অবশ্য পণ্ডিত[illegible] একটু নাম খারাপ হবে, মিঃ ডালেস বলবেন তিনি এবং ডাঃ কুনহা [illegible] বলেছিলেন যে, সোভিয়েট নেতাদের [illegible] গুলিতে বলপ্রয়োগের উস্কানি [illegible] যাকে বলে নাইণ্টিনাইন পার্সেণ্ট [illegible] হচ্ছে—গোয়ার সমস্যা মেটার পথে [illegible] এবং যুদ্ধ হবে না। কিন্তু ভারত সরকার কি এই পথ নেবেন? বিশেষ [illegible] হয় না। ৭।১২।৫৫

পত্রাবলী

[কনিষ্ঠ জামাতা নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত। নগেন্দ্রনাথের কন্যা শ্রীমতী নন্দিতা কৃপালনীর সৌজন্যে প্রাপ্ত। বিশ্বভারতীর অনুমতিক্রমে মুদ্রিত]

ওঁ

কল্যাণীয়েষু,

পশ্চিমের সহরে বক্তৃতা পাঠের জন্য বের হয়েছিলুম। কিন্তু কাশীতে গিয়ে বক্তৃতা করার পরে পুনশ্চ অসুস্থ হয়ে ফিরে এসেছি। ডাক্তার বলেন এখন আমাকে অন্তত ১৫ দিন বিছানায় শুয়ে কাটাতে হবে—কারণ, ইনফ্লুয়েঞ্জার জের আমার শরীর থেকে যায়নি বলে হৃদ্‌যন্ত্র দুর্বল হয়ে পড়েচে।

তোমাদের দুঃখ আমার হৃদয়ে খুব গভীর করে আঘাত করেচে। অথচ তোমাদের কোনো সাহায্য করতে পারি এমন শক্তি আমার নেই। সংসারের দিকে আমার ব্যর্থতা বোধ করি আমার বিধাতারই অভিপ্রেত। আমার শক্তি যা কিছু আছে সমস্তই বড় কাজের ভিতর দিয়ে তাঁর কাছে দিতে হবে।

তোমাদেরও আমি সেই কথাই বলি—সংসারে থেকে যে বেদনা পাও সংসারে তার সান্ত্বনা নেই। নিজের অন্তরে নিজের জীবনের সার্থকতা সন্ধান কর—পরিপূর্ণভাবে ভূমার কাছে আত্মোৎসর্গের দ্বারাই মানুষ সমস্ত ক্ষতি ও আঘাত থেকে রক্ষা পায়—যতই নিজের অহং এর দিকে তাকাবে ততই ক্ষুদ্র হয়ে যাবে—তার ছোট বন্ধন থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে সমস্ত ক্ষতি ও অপমানের ঊর্দ্ধে নিজের গৌরবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত কর। আমরা নিজে সত্য হতে পারি এই আমাদের পরম অধিকার অন্যকে জোর করে সত্য করতে পারিনে—আমাদের পরস্পরের জীবন পথ দৈবাৎ একটা জায়গায় মেশে, কিন্তু তারপরে কোথায় ছাড়িয়ে যায় তা ঈশ্বরই জানেন, তাঁর হাতেই সে পথের ভার। থিয়োসফিক্যাল সোসাইটিকে দিয়ে আমার সেই শিক্ষাসম্বন্ধীয় প্রবন্ধ ছাপাতে আপত্তি দেখিনে—সে লেখাটা ক্রমেই বড় হয়ে উঠ্‌চে। বিদ্যালয়ের জন্য ৭ হাজার টাকার দরকার হয়েচে, এইটে কোনো মতে তুলতে পারলে এই বছরটা কাটে।

ইতি

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

তুমি কোনো চিন্তা কোরো না। এখানে অনিয়ম ঘট্‌তে পারবে না। দুতিন দিনের মধ্যেই বোলপুরে চলে যাব।

তুমি অনন্যমনে নিজের কাজের দিকে লক্ষ্য কর। যে বিষয়টি অবলম্বন করেচ সেইটিকেই পূর্ণভাবে পরিণত করে তোল। ব্যক্তিগত জীবনের সুখ দুঃখ নিয়ে জীবনের বড় উদ্দেশ্যকে অকৃতার্থ কোরো না। সম্ভবত মৈসুরেই তোমার কার্যক্ষেত্র মিলবে—কিন্তু কার্য্যের দায়িত্ব যথার্থভাবে গ্রহণ করতে হবে। যদি তুমি নিজের শক্তিতে যথার্থ প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পার তাহলে সেই গৌরবে তোমার সমস্ত গ্লানি কেটে যাবে।

আমরা নিজে যে সমস্ত বীজ বপন করি তার ফল ভোগ করবার সময় বিনম্র চিত্তে যেন তার দুঃখ বহন করতে পারি—অশান্ত হয়ে বা রাগ করে কোনো কল্যাণ হয় না—তপস্যা দ্বারা [illegible]

করে তবেই কর্ম্মের ভোগ এড়াতে পারি। সেই তপস্যায় তোমার মন সম্পূর্ণ নিরত হোক্ তোমার হয়ে এই আমি প্রার্থনা করি।

ইতি
শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

এইমাত্র তোমার টেলিগ্রাম পেলুম। তুমি দুটো লেখা পাঠাতে বলেছ, বোধ হয় সেই শিক্ষা-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ[১] ছাড়া the message of the forest-টাও চাও। Macmillan-এর সঙ্গে আমার agreement আছে আমার সমস্ত English publication-এর first refusal ওরাই পাবে। Education প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমি ওদের agent-দের বলে-কয়ে রাজি করিয়েচি। কিন্তু অন্যটা ওরা ছাড়বে না, তার কারণ ওটা বিশেষভাবে ভারতবর্ষের পাঠক-দের জন্যে নয়। আমি থিয়োসফিক্যাল সোসাইটির শিক্ষার উদ্যোগে যুক্ত আছি ওদের আমি চান্সেলার —সেইজন্যে শিক্ষার প্রবন্ধটা ওরা ছাপলে দেখ্‌তে ভাল হয়। বাঙ্গালোর থেকে ঐ প্রবন্ধ ছাপ্‌বে বলে ওরা চেয়ে পাঠিয়েচে—আমি বল্‌লে সম্ভবত ওরা কপিরাইট কিনে নিতেও পারে—কিন্তু আমি তাদের লিখে দিয়েচি থিয়োসফিক্যাল সোসাইটির সঙ্গে আমার কথা চল্‌চে, সেটা শেষ না হলে আমি এ লেখা সম্বন্ধে ওদের কাছে কোনো প্রস্তাব তুলতে পারি নে। Adyar যদি রাজী না হয়, তাহলে হয় বাঙ্গালোর, নয় ম্যাকমিলানের সঙ্গে কথা ঠিক করে ফেলব। শিক্ষা প্রবন্ধটা পরিমাণে পূর্ব্বের চেয়ে অনেক বড় হয়েচে—এখন এর আয়তন বেশ একটু বড়।

এখানে এখন বেশ ঠাণ্ডা চল্‌চে। খোকার শরীর ভালই আছে—লিভারের অসুখ সেরেচে। যে রকম অত্যন্ত রোগা হয়ে এসেছিল এখন সে রকম নেই। আমি ডাক্তারের উপদেশ মত যতক্ষণ পারি চুপচাপ করে শুয়ে পড়ে থাকি। নিয়মিত কাজ-কর্ম্ম করবার শক্তি এখনও হয়নি। কৃষি সম্বন্ধে তোমার লেখার কাজ চল্‌চে ত?

ইতি ৯ বৈশাখ ১৩২৬
শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

বিদ্যালয়ের আর্থিক অবস্থা ও অন্যান্য ব্যাপার সম্বন্ধে যে মুদ্রিত বিবরণী চেয়েচ সে সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা করা যাবে। জানি না আমার মধ্যে কি একটা ত্রুটি আছে যে জন্য আমার দেশের লোককে আমি আমার কাজে আহ্বান করে সাড়া পাইনে। আসল কথা, দল বাঁধতে গেলে খাঁটি সোনায় বিস্তর মিথ্যার খাদ মিশাতে হয়—অনেক ভড়ং এবং লোকের মন জোগাবার জন্যে অনেক অত্যুক্তি দরকার হয়ে পড়ে, তাতে কর্ম্মসাধনার বিশুদ্ধতা এবং তার স্বাধীনতা নষ্ট হয়। এই জন্যেই বিধাতা আমাকে এতকাল কোণে ঠেলে লোক-সহায়তার প্রলোভন থেকে রক্ষা করে নিঃসঙ্গভাবে কাজ করিয়েছেন। সেই একলা সাধনার দিন যদি উত্তীর্ণ হয়ে থাকে তাহলেই বাইরের লোকে সাড়া দেবে—নইলে আমি ইচ্ছা করচি বলেই যে সাড়া পাব তা হবে না।

ওখানকার ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে এই খবরটি জানিয়ে দিতে পার যে, ছুটির পর অর্থাৎ আষাঢ়ের মাঝামাঝি থেকে এখানে বৌদ্ধদর্শন শেখাবার জন্য আমাদের মহাস্থবির ক্লাস খুলবেন। যাঁদের সংস্কৃত ভাষায় প্রবেশাধিকার আছে তাঁরা এখানে যদি শিক্ষা করতে চান তাহলে আমাদের শাস্ত্রী মশায়ের কাছে পালি ও মহাস্থবিরের কাছে বৌদ্ধ-শাস্ত্র খুব ভাল করে শিখতে পারবেন। শাস্ত্রী মশায়[১] সংস্কৃত শিক্ষারও ভার গ্রহণ করবেন। এণ্ড্রুজ ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য শেখাবার ভার নেবেন। নন্দলাল ও সুরেন[২] চিত্রকলা শেখাবেন। আর যদি কেউ বাংলাভাষা ও সাহিত্য শিখ্‌তে চান তারও উপায় হবে। সমস্ত ব্যয়ের জন্যে বোর্ডিং

১ "The Centre of Indian Culture" প্রবন্ধ, পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত

১ পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী
২ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কর

টাকা লাগ্‌বে। ইংরেজি ও সংস্কৃতে যাঁদের উপযুক্ত পরিমাণে শিক্ষা আছে তাঁদেরই সাহায্য করা হবে। অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রমাণে শিক্ষা দেওয়া হবে। নন্দলালের কাছে মদনাপল্লি থেকে একজন ছাত্র আসবার কথা হয়েচে।

যথার্থ তপস্যার ভাবে কর্ম্মসাধনার আহ্বান তুমি পেয়েছ—সকল মন ও শক্তি দিয়ে এই সাধনায় তুমি সিদ্ধিলাভ কর এই আমার কামনা। দুঃখের তেজ নিজেকে দগ্ধ করবার জন্যে নয়, সেই তেজে প্রদীপ্ত হয়ে তুমি নিজের যথার্থ স্বরূপকে আবিষ্কার করবে।

ইতি ১৪ বৈশাখ ১৩২৬
শুভানুধ্যায়ী শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

শরীর অসুস্থ বলে কোনো কাজ করতে উৎসাহ হয় না। তাই এতদিন সেই Education lecture-টা ফেলে রেখেছিলুম। তোমার টেলিগ্রাম পেয়ে আজ তার পরিবর্দ্ধনের পালা শেষ করেচি। জিনিষটা typed কাগজের ৩৫ পাত আন্দাজ হবে। কাল কলকাতায় type করতে পাঠাব। তারপরে তোমাকে যথাসময়ে পাঠিয়ে দেব। যাঁরা এটা ছাপ্‌তে চান তাঁদের বোলো এটা ঠিক ব্যবসার ভাবে তাঁরা যেন না নেন—শান্তিনিকেতনের সাহায্যের জন্যেই তাঁরা টাকা দিচ্চেন এই কথা আমরা ধরে নেব।

খোকা নন্দিতার শরীর বেশ ভালই আছে—অল্পকালের মধ্যে এ রকম সুস্থ এবং প্রফুল্ল ওরা বোধ [হয়] ছিল না। এখানকার খোলা মাঠে খোলা হাওয়ায় ওদের খুবই উপকার হয়েচে। তোমার জন্যে আমার মন বড় উদ্বিগ্ন আছে। আমার এই একমাত্র কামনা যে, তুমি সমস্ত অবস্থা বিপর্যয়ের উপরে উঠে আত্মগৌরব লাভ করবে।

ইতি ২৪ বৈশাখ ১৩২৬
শুভানুধ্যায়ী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

বিদ্যালয় খুলেচে কাজ আরম্ভ হয়েচে—দুই একটা ক্লাস নেবার চেষ্টা করে দেখচি। কিন্তু বোধ হয় পেরে উঠ্‌বে না—আমার শরীর তেমন ভাল ঠেকচে না, অল্পেই ক্লান্ত হয়ে পড়ি। তুমি আমাকে পার্ব্বণীর জন্যে লেখা দিতে বলেচ—আপনিই যদি কলমের মুখে লেখা এসে পড়ে দেব জোর করে ভেবে আজকাল লেখা আমার পক্ষে শক্ত হয়েচে। কিছুই যে লিখিনে তা নয় কিন্তু সে সব লেখা আপনি এসে পড়ে, তাতেই একটু রস পাই বলে সেগুলো ছেড়ে আর কিছুতে মন যায় না। আমার বেশি লেখার দিন ত নেই কাজেই নানা লেখায় সময় দেওয়া যায় না। তবু হয় ত একটা কিছু এসে পড়তে পারে। সুকুমারকে পাঠিয়ে দেব।

তোমার বন্দুক নিয়ে মুস্কিল হয়েচে। পাসের সময় lapse করাতে ওটা রাখা বিপদজনক হয়ে উঠেচে। বন্দুকটা আমাদেরি অথচ ওটার কথা তুল্‌তে গেলেই পুলিসে কেবল সে দাবী করে বাজেয়াপ্ত করবে তা নয় দণ্ড দেবে। শীঘ্র original পাস সমেত ওটা আমাকে বা রথীকে দান করচ বলে লিখে দাও। তারপরে ম্যাজিস্ট্রেটকে বলে কয়ে একটা গতি করতে চেষ্টা করব। নইলে এর পরে তোমাকে মুস্কিলে পড়তে হবে।

বোলপুরে এসে ছেলেরা সকলেই ভাল আছে। খোকা মাঝে কলকাতায় জ্বরে পড়েছিল। ওর সেই আগেকার ধাক্কা এখনো শরীর সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠ্‌তে পারেনি। কিন্তু এখানে ও খুব ভাল আছে—অনেকটা শুধরেচে।

মৈসোরে তোমার কাজ পাওয়ার সংবাদের অপেক্ষা করচি।

ইতি ১৪ই আষাঢ় ১৩২৬
শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মনে এলো

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

২৩।৯।৫৫

হেরাক্লিটাস পড়া গেল। গ্রিফিথ সাহেব হেরাক্লিটাস আর লাওৎসের মধ্যে মিল খুঁজে পেয়েছেন। অর্থাৎ তাঁর ধারণা যে, দুজনেই বছর পাঁচশ' পরে জন্মালে নিশ্চয়ই খৃষ্টান হতেন। বিদ্যের পেছনে খৃষ্টানী গোঁড়ামি লুকিয়ে রয়েছে। শ্রীঅরবিন্দের ব্যাখ্যার মধ্যেও উপনিষদ আছে, তবে তিলমাত্র গোঁড়ামি নেই। গিলবার্ট মারে'র গ্রীক ধর্মের বর্ণনা সুখপাঠ্য। Zeller-এর বড় বইটা এখানে নেই, ছোটটাতেই কাজ চালাতে হোলো। বার্নেটও নাকি নেই। এথেনিয়ন স্বর্ণ যুগের কিছু আগে পর্যন্তও চিন্তাশীল ব্যক্তিরা ভাবছিলেন, দেশ উচ্ছন্ন গেল, লোকে সত্যসন্ধানে বিমুখ হয়ে পড়েছে, জনসাধারণের অরাজকতা এসেছে ইত্যাদি। এইরকম বিপর্যয়ের সন্ধিক্ষণেই কি মানুষের মাথা খোলে? দরায়ুস হেরাক্লিটাসকে পারস্য দেশে আসতে নিমন্ত্রণ করেন। চিঠিতে আছে, 'গ্রীস দেশে গুণের কদর নেই। আপনি চলে আসুন, এখানে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ও প্রকৃত সমাদর পাবেন।'

হেরাক্লিটাস যান নি। ভদ্রলোককে কন্‌স্টিটিউশনের খসড়া করতে অনুরোধ জানান হয়। দেখা গেল, আর্টেমিসের মন্দিরের প্রাঙ্গণে ছেলেদের সঙ্গে তিনি গুলি খেলছেন। 'আপনি এখানে?' উত্তরে তিনি বললেন, 'আরে মশাই, ছেলেমানুষি যদি করতেই হয়, তবে ছেলেমানুষদের সঙ্গে করাই ভালো।' জ্ঞানী লোক ছিলেন, প্রোসেস্‌-এ বিশ্বাস করতেন। সক্রেটিস্ পর্যন্ত তাঁর বক্তব্য ঠিক ধরতে পারেননি। তবে তাঁর অগ্নি-দর্শনের মধ্যে এক মহান্ অনুভূতি রয়েছে। পারমেনাইডিস ও হেরাক্লিটাসের বিবাদ এখনও ফুরোয়নি। প্রাক্‌সক্রেটিস দর্শন ও ধর্ম ভারতবাসীর মনোগ্রাহী।

এতদিন বেশ ছিল। সর্বনাশ করলেন ঐ অ্যারিস্টটল, ফিলজফির প্রথম প্রোফেসর! শাদা-কালোর মধ্যে 'কোল্ড ওঅর'-এর জনক ঐ অ্যারিস্টটল। 'Either-Or' পৃথিবীকে ক্ষেপিয়ে তুলেছে। ক্রাবিন্‌স্কির মতে আজ-কালকার উন্মত্ততার হেতু ঐ অ্যারিস্টটলের সিলজিস্‌ম। রাসেল বলছেন, বিজ্ঞান দর্শন প্রভৃতিতে যা কিছু অগ্রসৃতি হয়েছে, তা' অ্যারিস্টটলের শিষ্যবৃন্দের আপত্তি অগ্রাহ্য করেই। হেরাক্লিটাসের যুক্তিপদ্ধতি ডায়েলেকটিক, আমাদেরও আসীৎ-অনাসীৎ একত্রে। 'ক কখনও একত্রে ক ও ক নয় হতে পারে না' যদি সত্য হত, তবে প্রেম বস্তুটা জগৎ থেকে উবে যেত। শ্রীঅরবিন্দ প্রত্যেক জিনিসই অন্য স্তর থেকে দেখতেন। প্রকৃত সমদর্শী হতে গেলে উপরে উঠতে হয়, ডায়েলেকটিকেরও।

২৪।৯।৫৫

পুরাতন গেজেটিয়ার নতুন করে লেখার প্রয়াস চলছে। এখানকার কলেক্‌টর জনকয়েককে ডেকেছিলেন। শহরের মাতব্বরদের মধ্যে বহু ছাত্রের সঙ্গে দেখা হোলো। সকলেই খুশী। খুশী ত' হলেন, কিন্তু ঘাড়ে কাজ চাপল। সরকার এক পয়সা খরচ করবেন না। অথচ সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ভৌগোলিক আরো কত কী-র পরি-বর্তনের ইতিহাস চান। থুতুতে ছাতু ভেজে না। আদমশুমারির কাজে এটা জুড়ে দিলে হোতো। এইখানে [illegible] জিতেছে। মৌর্য যুগে আদমশুমারি বাৎসরিক ব্যাপার ছিল। তার ওপর সরকার আলিগড়ের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসও চান। কেঁচো খুঁড়তে সাপ না বেরিয়ে পড়ে। সরকারী ইতিহাসের আমি বিপক্ষে। তবে প্রধানমন্ত্রী ডাঃ সম্পূর্ণানন্দ সত্যকারের শিক্ষিত ও পণ্ডিত ব্যক্তি। তিনি সত্য কথা বলেন ও সহ্য করেন। দেখি কতদূর এগোয়! এ সম্বন্ধে আমার অন্য ধারণা। জন-গণের ইতিহাস এখানে কে লিখবে! মালমশলা জোগাড় করতেই বছর কয়েক লাগবে। তার ওপর পরিবর্তন। প্রায় দুঃসাধ্য, যদি না একটা বড় টীম এই কাজে লেগে থাকে। ক্রোচে-র মতে ইতিহাস স্বাধীনতার ইতিহাস। বড় হেগেল-বাদী। আমার মনে হয়, ইতিহাস স্বাধীনতা ও নিয়তির দ্বন্দ্বের ইতিহাস।

* * *

ইতিহাস বিজ্ঞান-সম্মত অনেকটা, বাকীটা কবিতা। অর্থাৎ কবিতা হিসেবেও দেখা যায় এবং কবিতা যতদূরে বোঝা যায়, ততদূরে ইতিহাসও বোঝা যায়। পশ্চিমী সভ্যতার ইতিহাসের মূল সূত্র হয়তো অ্যারিস্টটলের 'পোয়েটিক্স'-এর মধ্যে আছে। অন্তত স্পেংগলার, টয়েনবীর রচনা পড়লে তাই মনে হওয়া স্বাভাবিক। আর পি ব্ল্যাকমার লিখছেন,

"....We have Aristotie frankly at work in Toynbee's version of his Poetics....For Toynbee constantly sees the action in his history in the terms of Aristotelian poetics—especially in hamartia or the tragic faut by which we explain and even excuse but cannot justify human action, in anagnorisis or the blinding recognition by which we see the motives of our own actions and natures, and in peripeteia or the reversal of role where we find both our motives and our fates were far deeper in ourselves and outside ourselves than we had known; and the passage of history in each of the countries named above as seen through these terms comes alive as praxis or action."

পরে আরো অনেক কথা লিখেছেন ব্ল্যাকমার......

আমার মনে হচ্ছেঃ (১) এই ধরনের মন্তব্য পশ্চিমী সভ্যতার এক ধরনের ঐতিহাসিকের প্রাথমিক মনোভাব সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। টয়েনবী, স্পেংগলার, হেগেল, এমন কি মার্ক্স—যিনি গ্রীক ট্র্যাজেডির অত্যন্ত ভক্ত ছিলেন—এঁদের মধ্যে হ্যামার্শিয়া, আনাগনরিসিস্, পেরিপেশিয়ার আমেজ নিশ্চয় আছে। কিন্তু আমাদের ইতিহাসের ঐতিহাসিকদের মধ্যে? অবশ্য ঐ ধরনের ভারতীয় ঐতিহাসিক নেই। কেবল তাই নয়, কর্তারা বলেন, আমাদের ইতিহাসই নেই। স যাই হোক, আমাদের ইতিহাসের ট্র্যাজিক ফল্ট কি? জাতিভেদ, মুসলমান রাজত্ব, অন্তর্বিবাদ, দার্শনিকতা? সংস্কৃত কাব্যবিচার অনুযায়ী শান্ত রসই আমাদের সভ্যতার মূল রস নয় কি? বহুর মধ্যে একের সন্ধান? আমাদের কাব্যবিচারে ট্র্যাজেডিই নেই, কারণ ইতিহাসের দুর্ঘটনাকে ঐ ধরনের ট্র্যাজেডি হিসাবে বোধ হয় কখনও ধরিনি।

৫।১০।৫৫

লক্ষ্ণৌ-এ বেশ কাটান গেল, এক হিসেবে। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে সাক্ষাৎ, আলাপ-আপ্যায়ন। আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে কিন্তু নতুন চিন্তার খোঁজ পেলাম না। চিন্তা করবে কখন? প্রাণ রাখতেই প্রাণান্ত! এমন সর্বব্যাপী ব্যর্থতা আমার কল্পনাতীত। আমার চোদ্দ পুরুষের ভাগ্যি যে, ঠিক অবসর নেবার মুখে মুখে আলিগড়ের নিমন্ত্রণ পেলাম। আর এক বছর থাকলে সন্ন্যাসরোগে মারা যেতাম। এলাহাবাদের ছাত্রদের প্রতি সহানুভূতি জানাতে লক্ষ্ণৌ-এর ছাত্ররা টোকেন স্ট্রাইক করলে শুনলাম। কোনো গোলমাল হয়নি। এ-সব আমার অপছন্দ। তবু লক্ষ্ণৌ-এর ভদ্রতার তুলনা হয় না।

রাত্রে একটি মিরাসী ঘরের মেয়ের

গান শোনা গেল। মেয়েটির বাবা বল্লেন, মিরাসী ওস্তাদ আর কেউ নেই। বেশী কিছু জানে না, কিন্তু অপূর্ব কণ্ঠ। যেমন জোরদার, তেমনি দরদী। পুরনো বাড়ির পুরনো বৈঠক। যেন বেচারীকে কখনও মাইকের সামনে গাইতে না হয়।

ছাত্র-ছাত্রীর স্নেহ অধ্যাপকদের শ্রেষ্ঠ, *বোধ হয়, একমাত্র সম্পদ। যে-সব ছাত্রকে রিসার্চে লাগিয়ে এসেছিলাম তাদের উৎসাহ কমেছে সন্দেহ হল।*

ডাক্তার দেখালাম। সকলেই বল্লে, চুপচাপ শুয়ে থাকতে। চা-কফি-সিগারেট খেতে বারণ করলে না। লক্ষ্ণৌ-এর ডাক্তার ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোনো শহরের ডাক্তার কি অত বুঝদার, অত ভদ্র হয়। মস্কোর ডাক্তাররা সব বন্ধ করে দিয়েছিল। কেবল তাই নয়, গাইডদের পর্যন্ত হুকুম হয়েছিল দেখতে যেন সিগারেট-চা না খাই। ঐ এক জায়গায় হাড়ে-হাড়ে বুঝেছিলাম রেজি-মেণ্টেশনের অর্থ। শেষকালে আধ ঘণ্টা অন্তর স্নানের ঘরে যাওয়া। বলে কিনা ভড্‌কা সিগারেটের চেয়ে কম ক্ষতিকর! বলে কিনা সিগারেট খেলে ক্যান্সার হবে! আমি সিগারেট খেয়ে ক্যান্সারই করি আর যাই করি, সেটা আমার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, আমার হিউম্যান ডিগনিটি, আমার কন্‌জিউমারস্‌ সভারেন্‌টি! ওপ্রকার চিকিৎসা ভারতবর্ষে চলবে না। ভারতবর্ষে চলে ত' লক্ষ্ণৌ-এ কখনও চলবে না। এমন স্বাধীন শহর হয় না! হজরতগঞ্জের রাস্তার ওপর দল বেঁধে দাঁড়িয়ে গল্প করব, মোটর চাপা দিক্‌ দেখি! লক্ষ্ণৌ শহরে মোটর চাপা দেখিনি বত্রিশ বৎসরে। সকলে চাপা পড়ে মরতে তৈরী, অথচ কেউ মরছে না, আঁচড় পড়ছে না! গাড়ি থামিয়ে নেমে অনুরোধ করুন, 'একটু মেহেরবাণী করে যদি......', অমনি মাপ চেয়ে ইঞ্চিখানেক সরে দাঁড়াব। এই যে মৃত্যু ও জীবনের সঙ্গে মধুর বোঝাপড়া, এই ত' স্বাধীনতা, এই ত' বিশুদ্ধ ডিমক্রাসি, এই ত' ভদ্রতা!

* * *

রাত্রে আলি আকবরের স্বরোদ শুনলাম। রেডিওর লঙ রেকর্ড। এ-পন্থাটা ভালো। আমাদের সঙ্গীত পনের মিনিটের আগে তাতে না। আলাপেই পনের কুড়ি মিনিট অন্ততপক্ষে। তারপর আস্থায়ী আরো পনের। তবে আধ ঘণ্টার পর যেন একঘেঁয়ে হয়ে যায়। বয়সের দোষ কি আর কিছু? যুবা বয়সে এম্‌দাদ খাঁর পুরিয়া আড়াই ঘণ্টা ধরে শুনি। তখন ক্লান্ত হইনি। তাঁর *পুত্র এনায়েৎ খাঁ, পৌত্র বিলায়েৎ সেতার অনেকক্ষণ ধরে শুনেছি।* এ... দাদের 'ঘরানা' আমার জীবদ্দশায় ... হোলো। এই ঘরের সৃষ্টিশক্তি প্র... তেমনি আলাউদ্দিন, আবদুল করিম খ... ঘরের। এক এক সময় মনে হয়, আ... আকবর, রবিশঙ্কর একটু বে... পরীক্ষাশীল। অর্থাৎ সব মিশ্রণ আমা... ঠিক কানে বসে না। নিশ্চয়ই আমা... কানের দোষ। পরীক্ষা চলুক, প... কানে বসবে, রূপ স্বকীয় হবে। গো... কয়েক হবে, গোটা কয়েক হবে না, তা... কি আসে যায়! 'মেনি আর কল্‌ড, ফি... আর চোজ্‌ন'। ছাত্রদের বেলাও ... প্রাকৃতিক নির্বাচন আর সামাজি... নির্বাচন দুটো এক না হলেও পদ্ধতি... মিল আছে তাদের মধ্যে। পার্থক্য বুদ্ধি... প্রয়োগে। অবশ্য বুদ্ধিরও পরী... আছে। সেটা চলছে। সাঙ্গীতিক বু... আর লেখাপড়ার বুদ্ধি এক নয়। ... সাধারণ বৈদগ্ধ্যের একটা মূল্য আ... মনে হয়। তার ফলে পরীক্ষার প্র... জাগ্রত থাকে এবং পরীক্ষার রীতি-নী... বোঝা যায়। তার ওপর দখল আ... ভুল ভ্রান্তি কম হয়।

আমার মনে হয়, মুঘল চিত্র আ... খেয়ালের ধর্ম অনেকখানি এক। রা... পুত্র চিত্র, মাড়োয়ারী লোকসঙ্গীত ... চারণ-বর্ণিত ইতিহাস; অষ্টাপদী, কী... পট আর বিষ্ণুপুরের স্থাপত্য-ভাস্কর্য —প্রতি তিনটির মধ্যে যেন একই ... রয়েছে। সেই সূত্র ধরতে পারলে ন... সৃষ্টির রীতি-নীতিও বোঝা যায় ম... হচ্ছে। রাইক্‌স-মিউজিয়মের সপ্তদশ শতাব্দীর ছবির সঙ্গে খালের ধারে বণিক-দের অফিস-বাড়ি, গুদোম, বসতবাড়ির মিল ঘনিষ্ঠ। অবশ্য তিনের কোনোটি বেশি ফোটে। একজন বিদেশী অধ্যাপক আমাকে এই প্রশ্নটি করেছিলেন, "কে... কোনো দেশে কোনো একটি যুগে একটি বিশেষ কোনো আর্ট অন্য আর্টের চেয়ে বেশি ফোটে?" ব্যাপারটা ঘটে দেখেছি কিন্তু তার সামাজিক ব্যাখ্যা জানি না... ভেবে কূল কিনারা পেলাম না। সামাজিক ব্যাখ্যা অচল না কি? অর্থনৈতিক ব্যাখ্যাও মাথায় এলো না। সপ্তদশ শতাব্দীর ডাচ্‌ আর্টের বেলায় সমাজ-

...তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা কিন্তু সবচেয়ে সোজা। একটা দার্শনিক আবহাওয়া? যুগাত্মা? অনেক জার্মান পণ্ডিত তাই বলতেন। একটা ব্যাখ্যায় সবটা বোঝা যায় না। কিছু দৈবের খেলা আছে। প্রতিভাকেও বাদ দেওয়া যায় না। তবে আমি জোর দিতে রাজি আছি ছকের ওপর, একটা প্যাটার্ন, নক্সা, একটা নেট-ওয়ার্কের ওপর।

অগাস্ট লুক্‌স্‌-এর 'ইকনমিকস অব্‌ লোকেশান' পড়তে আরম্ভ করেছি। ওখানেও সেই সিস্‌টেম অব নেটওয়ার্ক্‌স্‌-এর আলোচনার পর কতকগুলি নূতন ফ্যাক্টর-এর বিচার। ফিরোজাবাদে কেন অত চুড়ি তৈরী হয়? কাঁচা মালের কোনো সুবিধে নেই, রেলওয়ের ভাড়ার সুবিধেও নেই, অথচ ভারতবর্ষের মেয়েরা যত চুড়ি পরে, তার শতকরা আশী ভাগ ফিরোজাবাদের। অর্থাৎ একবার শুরু হলে এবং অন্যান্য সুবিধে থাকলে উৎপাদন চলতে থাকে, তারপর বাড়ে। তবু নক্সাটাকে কারণ বলতে মন চায় না। অবশ্য কারণ মানে আদিম কারণ নয়। তবু যেন মন আদিম কারণই খোঁজে। মধ্যযুগীয় মনোভাব বটে, তবু ফাল্‌ড-থিওরিতে যেন মন ভরে না। কারণ আর উপকরণ, এই দুটোর মধ্যে একটাকে ছাড়তে হয়। ওটা সপ্তদশ শতকের ডাচেদের ফীল্‌ড অব্‌ বিহেভিয়র, আর গতি ফীল্‌ড অব্‌ ইকোয়েশান্‌স্‌ না হয় বুঝলাম। তবু কেন এটা, অন্যটা নয়?

লুস্‌ক্‌ পড়ছি। দেশের প্ল্যান-ফ্রেম ত' তৈরী হোলো এবং পার্স্‌পেক্‌টিভ প্ল্যানিং-এর জন্য তোড়জোড় হচ্ছে। অত্যন্ত সুখের কথা। নতুন প্রদেশ কি হবে এখনও জানা যায় নি, তবে রীজ্যানাল প্ল্যানিং আর ব্যালেন্স না সম্ভব হলে কিছুই হোলো না। সোভিয়েট রাশিয়ায় প্ল্যান তৈরী হবার পর রীজ্যানাল ব্যালেন্স-এ পরিণত করা হয়। একে ব্রেক-ডাউন বলে। অতএব এখান থেকে লোকেশান-স্টাডি আরম্ভ হোক। প্ল্যানিং কমিশনের কাজে এখনও নতুন ভূগোলের জ্ঞান প্রবেশ করেনি। অর্থনীতিবিদ্‌রা কতদূর পারবেন বুঝতে পারছি না।

গ্রোথ-মডেল নিয়ে সেমিনারে ঘণ্টা দুই আলোচনা হোলো। আবার কাল হবে। হ্যারড-ডোমার-সিংগার প্রভৃতির প্রবন্ধ পড়া ছিল। আলোচনা ত' হোলো। কিন্তু কীন্‌স্‌-এর ব্যবহৃত 'ব্ল্যাক ম্যাজিক' কথাটি কেবলই মনে পড়ছিল। স্ট্যাটিক আর ডাইন্যামিক—কথা দুটিরই বা অর্থ কি? অণু ও তরঙ্গ পৃথক্‌ স্তর যেমন, এও কি তাই? অন্য উন্নত বিজ্ঞান থেকে প্রত্যয় ধার করার বিপদ আছে। ফোর্স, রেসিস্টান্স কিংবা ফ্রিকশ্যন, ইকুইলিব্রিয়ম, প্রোসেস্‌ প্রভৃতি অংক কিংবা ভূতবিদ্যার প্রত্যয়গুলি কি অর্থনীতির বেলায় খাটে? আমরাও ঐ শব্দগুলির ব্যবহার করছি, কিন্তু এক অর্থে? মনে হয় না। এফ্‌ এইচ নাইট

তাঁর 'এথিক্‌স্‌ অব্‌ কম্পিটিশ্যন' বইয়ের স্ট্যাটিক্‌স্‌ এবং ডাইনামিক্‌স্‌ নামক অধ্যায়ে লিখছেনঃ

"Our general conclusion must be that in the field of economic progress the notion of tendency toward equilibrium is definitely inapplicable to particular elements of growth and with reference to progress as a military process or system of interconnected changes is of such limited and partial application as to be misleading rather than useful. This view is emphasized by reference to the phenomena covred by the loose term 'institution'."

এইসব ঘটনার ইতিহাস আছে। যে কাল-বৃত্ত ইতিহাসের বিষয়, সেখানে প্রাইস্‌-ইকুইলিব্রিয়ম প্রভৃতি প্রত্যয় অপ্রযোজ্য। তিনি তাই বলেন যে, ইতিহাসের মূলে পরিবর্তনগুলির আলোচনায় শক্তি, প্রতিরোধ এবং গতি প্রভৃতি নির্দিষ্ট শব্দগুলি এবং গতানুগতিক যান্ত্রিক তুলনার ব্যবহার সম্পূর্ণ বর্জন করে খুব সম্ভবত আমাদের আরো এগিয়ে যেতে হবে। নাইট সাহেবের মাথা ঠাণ্ডা, আমি তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি। কিন্তু প্রবন্ধটি বেরিয়েছিল বইয়ের আকারে ১৯৩৫ সালে। তারপর অর্থনীতিবিদ্‌রা বুঝেছেন যে, মেক্যানিক্যাল অ্যানালজিকে কিছু অদল-বদল করতে হবে। তাই 'গ্রোথ' শব্দটির প্রয়োগ। নৃতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্ববিদ্‌রা 'চেঞ্জ' কথাটি ব্যবহার করছেন। অর্থনীতিবিদ্‌ এখনও ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট, ইকনমিক হিস্ট্রি কথাগুলি ছাড়তে পারেন নি। সব বিশ্ববিদ্যালয়েই এখনও ঐ চলছে। 'গ্রোথ'-ব্যাপারে দিক্‌নির্ণয় নেই। দিক্‌, ডিরেক্‌শ্যন, কেবল অ্যাংগ্‌ল বিট্যুইন চেঞ্জেস। কিন্তু ডেভেলপমেণ্ট-এর নিশ্চয়ই একটা দিক্‌ আছে। 'প্রোগ্রেস্‌' কথাটি ত' ছেড়েই গেছে। তেমনি ইকুইলিব্রিয়ম হোলো প্রোসেস্‌—তার বিলম্বিত লয় হোলো গিভ্‌ন কন্‌ডিশ্যন, যার মধ্যে একটা, কি তারো বেশি প্রোসেস্‌ দ্রুত লয়ে চলছে একটা চলন্ত সাম্যের দিকে। তা ত' বুঝলাম (অর্থাৎ কিছুই বুঝলাম না), কিন্তু আমাদের প্রয়োজন? চেঞ্জ, গ্রোথ, ডেভেলপমে[nt] প্রোগ্রেস—কোন্‌টার দিকে বেশি [জোর] দিলে ছাত্ররা ভবিষ্যৎ ভারতের স্রষ্টা হ[বে]।

আমার মনে হয়, ডেভেলপমেণ্ট-দিক্‌টাই জোর দেওয়া ভালো। ত[ার] অঙ্গ হবে চেঞ্জ গ্রোথ ইত্যাদি। পা[ঠ্য] তালিকা সব বদলে দিয়েছি ঐ কথা মনে রেখে। ম্যাক্রো-ইকনমিক্‌স্‌ প্রধান হোক। এক ধারে মার্জিনাল কস্‌ট্‌ নিয়ে অধ্যাপকরা ব্যস্ত অ[ন্য] ওধারে সরকার মহোদয় গড়পড়তা খর[চ] অনুসারে সংসার চালাচ্ছেন। এইস[ব] নানা কারণে গ্রোথ-মডেল তৈরী করা যে একরকমের খেলা মনে হয়। বেশ মজা লাগে, কিন্তু ঐ মজাই! এল্‌কেমি যেমন পরে কেমিস্ট্রি হয়েছিল, তেমনি হয়তো মডেল-নির্মাণ থেকে কোনো না কোনো দিন ইমারৎ তৈরী হবে। এই আশা-বিলাসকেই আদর্শবাদ নাম দেওয়া হয়। আমরা সত্যই বোকা বনতে সদাই রাজী।

৯

সারি সারি তিনটি নারকেল গাছের পিছনে টালির ঘর। তার সামনে ঢাকা বারান্দা। দুপাশে দুখানি তক্তপোশ পাতা। একটিতে মাদুর আছে, আর একটিতে নেই। এই বারান্দায় একই সঙ্গে সমিতির অফিস আর বৈঠকখানার কাজ চলে। পূর্বদিকের তক্তপোশে আরো কয়েকটি ছেলে একটু উত্তেজিতভাবে কিসব আলোচনা করছিল, মণিময়ের লকে দেখে তারা চুপ করল, সরেও বসল খানিকটা।

জিতেন পশ্চিমদিকের তক্তপোশখানায় মণিময়কে বসবার অনুরোধ করে বলল, 'কি ব্যাপার বলুন তো। আপনি কাল নেতাজী নগরে এসেছেন আমি খবর পেয়েছি; কিন্তু শরীরটা তেমন ভালো না থাকায় গিয়ে দেখা করতে পারিনি।'

শীতাংশু বলল, 'কাল বুঝি আপনার আবার হাঁপানীর টান উঠেছিল জিতেনদা?'

সকলের সামনে বিশেষ করে অল্প-পরিচিত মণিময়ের কাছে শীতাংশু তার রোগের কথাটা উল্লেখ করায় জিতেন খুব খুশী হল না। রোগটা যেন তার গৌরব আর অপযশের ব্যাপার। প্রকাশ্যে প্রকাশ করবার মত বিষয় নয়। জিতেন প্রতিবাদের সুরে বলল, 'না না, ও সব কিছু না। হাঁপানীর দোষ আমার আজকাল আর নেই। তবে নিয়ম-টনিয়ম হলে শরীরটা একটু খারাপ হয়। যাকগে, কি ব্যাপার বলুন।'

ভূমিকা বাড়াবার ইচ্ছা মণিময়েরও নেই। তার এখনো আশা প্রভাতদার ছেলের অন্নপ্রাশনের নিমন্ত্রণ রাখতে যাবে। না গেলে তিনিও ক্ষুণ্ণ হবেন, মণিময়ও পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে।

মণিময় বলল, 'ব্যাপারটা এই ছেলেদেরই। পাড়ায় পাড়ায় এক একটি করে রবীন্দ্র জয়ন্তীর সব আয়োজন হচ্ছে। আমি তা শুনে বললাম, তোমরা এক সঙ্গে মিলেমিশে যদি কর, জিনিসটা ভালো হবে।'

জিতেন বলল, 'সে তো সত্যি কথা। এতে কার কি আপত্তি থাকতে পারে।'

পূর্বদিকের তক্তপোশে যে কয়েকটি ছেলে বসেছিল, তাদের ভিতর থেকে একজন বলে উঠল, 'আমাদের আপত্তি আছে জিতেনদা। এর আগেও একবার নেতাজীনগরের সঙ্গে আমরা মিশতে গিয়েছিলাম। খুব শিক্ষা হয়ে গেছে আমাদের।'

বছর পনের ষোল হবে ছেলেটির বয়স। গোঁফের রেখা দেখা দিয়েছে। কালো রোগাটে চেহারা। তার কথার ভঙ্গি দেখে মণিময় কৌতুক বোধ করল। মৃদু হেসে বলল, 'কি শিক্ষা হয়েছে ভাই?'

ছেলেটি মণিময়ের কথার কোন জবাব না দিয়ে চুপ করে রইল। বেশ বোঝা গেল, মণিময়ের এই হস্তক্ষেপ সে পছন্দ করে নি। তাছাড়া মণিময় যে তাকে পরিহাস করছে, সেকথাও তার বুঝতে বাকি নেই।

জিতেন ছেলেটির দিকে চেয়ে বলল, 'ভন্টু, এ কি! ফার্স্ট ক্লাসে পড়ছ, সাধারণ একটা ভদ্রতা-জ্ঞান নেই তোমার? ওঁর কথার জবাব দাও।'

ভন্টু মণিময়ের দিকে চেয়ে বলল,

কি আর জবাব দেব। ওই নিশীথদা, শীতাংশুদাকে জিজ্ঞাসা করুন। তারাই সব বলুক। খাতার পাতা থাকলে মিথ্যে কথা নিশ্চয়ই বলবে না আপনার কাছে।'

জিতেন তাকে আর একবার শিষ্টাচারের কথা স্মরণ করিয়ে দিল, 'ছিঃ ভণ্টু, ওইভাবে কি ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলে?'

শীতাংশু একটু হেসে বলল, '[illegible] ভণ্টুর বোন মিণ্টুর একটি গান গাওয়ার কথা ছিল, আর ওর ভাই রণ্টু 'বীরপুরুষ' কবিতাটি আবৃত্তি করবে ঠিক ছিল। কিন্তু প্রোগ্রাম লেংদি হয়ে যাওয়ায় সভাপতি আপত্তি করতে লাগলেন। তাই প্রায় আধাআধি আইটেম বাদ দিতে হল। সেইজন্যেই ভণ্টুর রাগ আমাদের ওপর।'

ভণ্টু প্রতিবাদ করে উঠল, 'হুঃ, সেইজন্যেই রাগ! কই, সভাপতি আপত্তি করলেন বলে আপনাদের লম্বা লম্বা প্রবন্ধ পাঠ, আপনাদের ভাইবোনদের গান আর আবৃত্তি তো বাদ পড়ল না। বাদ গেল কেবল মিণ্টুর গান।' বল্‌ বলতে ভণ্টু মণিময়ের দিকে [illegible] তাকাল, 'জানেন, আমার ভাই বোন [illegible] আবৃত্তি করবে বলে আমি নিজে [illegible] করলাম না। নইলে আমারও তো [illegible] তৈরী ছিল 'নিঝ'রের স্বপ্নভঙ্গ' [illegible] 'এবার ফিরাও মোরে'। কিন্তু ভাবলা[ম] আমি তো স্কুলেই চান্স পাই। কলো[নীর] ফাংশনে রণ্টু মিণ্টুই করুক। কত ক[ষ্ট] করে ওদের শেখালাম। মিণ্টুটা টাই[ফয়েড] ফয়েড থেকে উঠেছে। চুল উঠে য[াওয়ায়] মা মাথা ন্যাড়া করে দিয়েছে। তবু [ও] গাওয়ার খুব ইচ্ছে। কেবলই বলে, দা[দা] আমি যদি ভালো করে গাইতে পা[রি] তবু কি ন্যাড়া মাথা দেখে লোকে [ঠাট্টা] করবে?'

জিতেন বাধা দিয়ে বলল, 'যাক যাক ওসব যেতে দাও। গত বছরের ব্যাপার তো হয়েই গেছে। গতস্য শোচনা নাস্তি।'

কিন্তু মণিময় সহানুভূতি মেশানো সুরে বলল, 'না না, তুমি বল ভণ্টু, শুনি ব্যাপারটা। তারপর?'

ভণ্টু বলতে লাগল, 'আমি তাকে বললাম, লোকে তো তোর মাথা দেখতে যাবে না, গান শুনতেই যাবে। তুই ভালো করে তোর গানটা তৈরী কর। চমৎকার হবে। ছ' সপ্তাহ ধরে রিহার্সাল দিল মেয়েটা। ওই কীর্তিনগর কলোনীর একটি বউয়ের কাছে গিয়ে কত কষ্ট করে হাতে পায়ে ধরে গানটা তুলেছিল। তার কত আশা, কত সাধ। মার সেদিন জ্বর। মাথার যন্ত্রণায় উঠতে পারে না বিছানা থেকে। তবু নিজের হাতে ওকে শাড়ি পরিয়ে সাজিয়ে গুজিয়ে দিল। মিণ্টু আর রণ্টু গিয়ে বসে রইল প্যাণ্ডেলের পিছনে। এই বুঝি ডাক আসে, এই বুঝি মাইকে ওদের নাম এনাউন্স করা হয়। কিন্তু ওদের নাম কিছুতেই আর ডাকা হল না।'

মণিময় বলল, 'সত্যি, ব্যাপারটা ভারি দুঃখেরই হয়েছে।'

ভণ্টু বলল, 'সেই থেকে আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, ওসব সর্বজনীন টর্ব- জনীনের মধ্যে আর যাব না। এ বছর আমরা বীরনগর কলোনীতে আলাদা করে রবীন্দ্রজয়ন্তী করব। বাইরে থেকে কাউকে না আনতে পারি আমাদের

জিতেনদাই সভাপতি হবেন। কোন নাম-করা আর্টিস্টেরও ধার ধারব না। কিন্তু আমাদের কলোনীতে গান গাইতে জানা যত অল্পবয়সী মেয়ে আছে তাদের প্রত্যেকের মুখে একটি ক'রে গান আর যত ছেলে আছে তাদের প্রত্যেককে এক-এক করে আবৃত্তি আমরা দেবই। সন্ধ্যা থেকে আরম্ভ ক'রে শেষরাত অবধি আমরা ফাংশন চালাব। কোন্ সভাপতি এসে বাধা দেয় দেখব আমরা।'

মণিময় তক্তপোশ থেকে উঠে এসে ভণ্টুর পিঠে হাত রেখে বলল, 'নিশ্চয়ই' এইতো চাই, এইতো চাই ভণ্টু। তোমার মত কয়েকজন ছেলে যদি জোটে, এখানে সব হবে।'

ভণ্টু ঘাড় ফিরিয়ে ভ্রু কুঁচকে বলল, 'আপনি ঠাট্টা করছেন?'

মণিময় বলল, 'না ভণ্টু, ঠাট্টা করছিনে, আমি তোমার প্রশংসাই করছি। এই ধরনের রোখ না থাকলে কোন কাজ করা যায় না।'

শীতাংশুদের দল মণিময়ের কাণ্ড দেখে একটু বিস্মিত হ'ল। ভণ্টুকে অবশ্য দলে তারা টানতে চায়, কিন্তু তাই বলে অত বেশি আস্কারা দেওয়া কি উচিত?

জিতেন মণিময়ের দিকে চেয়ে বলল, দেখুন, এইসব নিয়েই গোলমাল বাধে। সবাই চান্স পেতে চায়, সবাই এক্‌জি-কিউটিবের ভিতরে আসতে চায়, প্রেসিডেণ্ট সেক্রেটারীর পদের দিকে অনেকেরই লোভ। আমি শেষে ভেবেছি, কি দরকার এই নিয়ে বাদ-বিসংবাদ করে, তার চেয়ে আলাদা আলাদা ফাংশন ক'রে ওরা যদি খুশী হয় হোক, তাছাড়া এসব ছেলেছোকরাদের ব্যাপার নিয়ে আমাদের অত মাথা ঘামাতে যাওয়ার কি দরকার।'

মণিময় মাথা নেড়ে বলল, 'আপনার কথা আমি মানতে পারলাম না জিতেন-বাবু। আমরা যদি মাথা না ঘামাই ওরা মাথা ফাটাফাটি করবে। তাছাড়া, ঝগড়া ঝাটি হবে সেই ভয়ে ওদের আমরা আলাদা করে দিতে পারিনে। তাহলে যে এক একজন মানুষকে নিয়ে এক একটি দল গড়তে হয়।'

জিতেন বলল, 'তা ঠিক। আমাদের কলোনীর ইউনিটি নষ্ট হোক আমিও চাইনে। ছেলেদের ঝগড়া তো শুধু ছেলেদের মধ্যেই থাকে না, বাপ খুড়োদের মধ্যে চলে যায়। ওদের এক জোট করতে পারলে আমাদেরই লাভ।'

মণিময় বলল, 'তাহলে আসুন, একবার চেষ্টা করা যাক।'

আস্তে আস্তে আলাপ জমে উঠল, আলোচনা চলতে লাগল। এক ফাঁকে জিতেনের আট ন' বছরের একটি মেয়ে চায়ের কাপ আর দুটি মুড়ির মোয়া নিয়ে এল ছোট একখানি রেকাবিতে করে।

মণিময় আপত্তি ক'রে বলল, 'এসব কি বলুন তো।'

জিতেন হেসে বলল, 'যা দেখছেন তাই। এক কাপ চা আর দুটি মোয়া। তার চেয়ে এক বিন্দুও বেশি কিছু নয়।'

একটি মোয়া জিতেনের মেয়েটিকে জোর করে গছিয়ে দিল মণিময়। বলল, 'তুমি না খেলে আমি কিছুতেই খাব না।'

স্থির হ'ল, বীরনগর, নেতাজীনগর আর বাপুজীনগর—এই তিনটি কলোনীর বাসিন্দারা মিলে এক সঙ্গে রবীন্দ্রজয়ন্তী উৎসব করবে এবার। কমিটিতে তিনটি কলোনীর লোকই থাকবে। তিনটি কলোনীর যোগ্য ছেলেমেয়েরাই গান আর আবৃত্তির প্রোগ্রাম পাবে। যদি সম্ভব হয় একটি নাটকের অভিনয়ও করানো হবে ছেলেমেয়েদের দিয়ে। দুজন নাম-করা সাহিত্যিককে কলকাতা থেকে নিয়ে আসবে মণিময়। একজন সভাপতি আর একজন প্রধান অতিথি। রবীন্দ্র-সঙ্গীত গেয়ে যারা নাম করেছেন শহরে তাঁদেরও দু' একজনকে আনবার চেষ্টা করবে। তবে অনুষ্ঠানটা পঁচিশে বৈশাখ না ক'রে সপ্তাহখানেক পিছিয়ে দিলে ভালো হয়। না হ'লে খ্যাতিমান সাহিত্যিকদের হয়তো কাউকে পাওয়া যাবে না। তাঁরা কলকাতার এবং অন্যান্য জায়গার বড় বড় অনুষ্ঠানগুলিতে নিশ্চয়ই এতদিনে কথা দিয়ে বসে আছেন।

অনুষ্ঠানের তারিখ পিছিয়ে দেওয়ার প্রস্তাবে কয়েকটি ছেলে নিরুৎসাহ হয়ে পড়ল। কিন্তু শীতাংশুরা বলল, 'কয়েকদিন দেরি ক'রে করলে যদি ফাংশনটা ভালো হয়, তাতে ক্ষতি কি। আমাদেরও তো তৈরী হ'তে সময় লাগবে। এখন পর্যন্ত একটি পয়সা চাঁদা আদায় হয়নি।'

আপাতত একটি অস্থায়ী কমিটি গঠন করা হ'ল। প্রেসিডেণ্ট জিতেন আর সেক্রেটারী মণিময়। সে প্রথমে আপত্তি ক'রে বলল, 'আমি তো বাইরের লোক, তোমরা নিজেরা কেউ এ ভার নাও।'

শীতাংশু বলল, 'আপনাকে এখন আর আমরা বাইরের লোক বলে ভাবিনে। আপনি আমাদের ভিতরের মানুষ। এড়াতে চাইলেও আপনাকে আমরা কিছুতেই ছেড়ে দেব না।'

মণিময় হাল ছেড়ে দিয়ে বলল, 'বেশ আমার নামটা যদি রাখতেই চাও রাখো, কাজ কিন্তু তোমাদেরই করতে হবে।'

সুনীল বলল, 'আচ্ছা, সে দেখা যাবে।'

কমিটির সদস্য তালিকায় ভণ্টুর নামটাও রাখল মণিময়।

ভণ্টু লজ্জিত হয়ে বলল, 'না না, আমাকে কেন ধরছেন, আমাকে বাদ দিন, আমি এমনিই সব কাজকর্ম করব।'

মণিময় হেসে বলল, 'আমরা তো কাজের লোকদের নামের লিস্টই করছি। অকেজো মানুষকে তো ডাকছিনে। তোমাকে থাকতেই হবে ভণ্টু। তুমি না থাকলে আমিও থাকব না।'

মেম্বারদের মধ্যে অল্পবয়সী ছেলে-দের সংখ্যাই বেশি। ভণ্টুর বয়স তাদের মধ্যে সবচেয়ে কম। জিতেন বিশ্বাস মণিময়ের কাণ্ড দেখে মনে মনে ভাবল, বয়স বাড়লেও অনেকে প্রবীণ হয় না। বয়স্কদের সঙ্গে মিশে সুবিধা পায় না। ছেলেছোকরাদের নিয়ে সময় কাটাতেই ভালবাসে বেশি। মণিময়ও নিশ্চয়ই সেই দলের। যতক্ষণ ক্ষতির আশঙ্কা না থাকে, এ ধরনের বুড়ো শিশু ভোলা-নাথকে প্রশ্রয় দিয়ে বিনা খরচে মজা পাওয়া যায়।

মণিময় হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, 'একটা কথা। আপনারা এই কীর্তিনগর কলোনীর লোকদের ডাকছেন না কেন। তাহ'লে তো দলটা আরো ভারি হয়।'

জিতেন হাতজোড় ক'রে বলল, 'মাফ করবেন, ওইটে হবে না মশাই, ওইটে পারব না। ওইসব হাই ব্রাউ উঁচকপালে লোকদের গিয়ে সাধাসাধি করতে পারব না। তাতে জয়ন্তী হয় হবে, না হয় না হবে।'

শীতাংশুও সায় দিয়ে বলল, 'ওদের সঙ্গে আমাদের মিশ খায় না মণিময়দা। আমরা অনেক এগোবার চেষ্টা ক'রে দেখেছি, ও'রা মিশতে চান না, ও'রা পিছিয়ে যান।'

মণিময় হেসে বলল, 'ব্যাপার কি। মাত্র একটি রাস্তার এপার-ওপার। কিন্তু তোমাদের কথাবার্তা শুনে মনে হয় কীর্তিনগরের সঙ্গে তোমাদের যেন সাত সমুদ্দুরের ব্যবধান।'

জিতেন বিশ্বাস বলল, 'তার চে বেশি।'

তারপর আস্তে আস্তে সবাই ব্যবধানের কারণটা ধরনটা বলতে লাগল

কীর্তিনগর কলোনী জবরদ কলোনী নয়। ওখানকার বাসিন্দ কাঠা প্রতি পাঁচ সাত শ' টাকা দিয়ে জ কিনে পাকা বাড়ি তুলেছে। ওখা সবাই মোটামুটি অবস্থাপন্ন, সচ্ছ শিক্ষিত। বীরনগর, নেতাজীনগর লোকদের মত দরিদ্র আর হাড়হাভ নয়। এই বৈষম্যের কথাটা কীর্তিনগর লোকেরা সব সময় মনে রাখে। ওদে কলোনীর চারদিকে উঁচু পাকা দেয়াল গেটের কাছে জমিদারের বন্দুকধার দারোয়ান। প্রভাকর দত্তগুপ্ত যদি ঠিক জমিদার নয়, তবুও সাধারণ লোকে তাঁকে জমিদার বলেই জানে, জমিদার বলেই ডাকে। কিন্তু জিতেন আর শীতাংশুরা জানে তাঁর যথার্থ স্বরূপ। প্রভাকর দত্তগুপ্ত কীর্তিনগর কো-অপারেটিভের চেয়ারম্যান। দত্তগুপ্ত এণ্ড সন্স নামে একটি ফার্ম আছে পোলক স্ট্রীটে। ইঞ্জিনীয়ার আর কন্ট্রাক্টর। ফার্মের অস্তিত্ব আগে অবশ্য কেউ জানত না। জেনেছে এই কীর্তি-নগর কলোনী হওয়ার পর। দূরবুদ্ধি ছিল প্রভাকরবাবুর একথা স্বীকার করতেই হবে। পার্টিশন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় বিঘা চল্লিশেক পোড়ো জলা জমি তিনি প্রায় জলের দরে কিনে নিয়েছিলেন। অবশ্য একা কেনেননি, আরো দু' তিনজন বন্ধু ছিলেন সঙ্গে শেষ পর্যন্ত তাঁদের শেয়ার প্রভাকর কিনে রেখেছেন। বন্ধুরা ভেবেছে পুরোন বন্ধুর সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ, মামলা মোকদ্দমা করার চেয়ে আগে ভাগে সরে পড়াই ভালো। প্রভাকর জলের দরে জমি কিনে সোনার দরে বিক্রি করেছেন। প্রতি বিঘায় হাজার দশেক টাকা লাভ করেছেন অন্ততঃ। বিঘা হিসাবে বিক্রি করেননি, কাঠা হিসাবে বেচেছেন। শুধু জমি বিক্রি করেই যে লাভ করেছেন তাই নয়, বেশির ভাগ বাসিন্দার বাড়িও তাঁরই তুলে দেওয়া। ইঁট কাঠ সুরকি লোহা লক্কড় প্রত্যেকটি জিনিসে লাভ করেছেন প্রভাকর। কলোনীর মধ্যে নিজে বিঘা
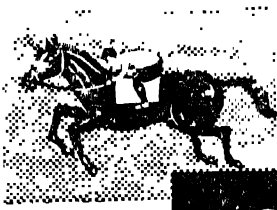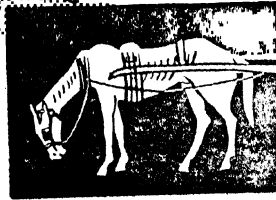
প্রচুর জমি নিয়ে বাড়ি করেছেন। বড় দোতলা বাড়ি উঠেছে তাঁর। কলকাতায়ও জায়গা কিনেছেন। সেখানে বাড়ি তৈরী হচ্ছে। বড় ছেলে মৃগাঙ্ককে বিলাত ঘুরিয়ে এনেছেন। সে এখন নিজেদের ফার্মই দেখাশোনা করে। গাড়ি আছে নিজেদের। বাপ ছেলে একই সংগে তাতে বেরোন। এই উদ্বাস্তু কলোনীগুলির ওপরও প্রভাকরবাবুর লোভ আছে। দু' একটা কলোনী যদি কিনে নিতে পারেন তাঁর সুবিধে হয়। এই নিয়ে জমিদারদের সংগে মাঝে মাঝে তাঁর আলাপ-আলোচনা চলে। মামলা মোকদ্দমাও চলছে প্রত্যেকটি কলোনীর বাসিন্দাদের নামে। অনধিকার প্রবেশের মামলা। কিন্তু না জমিদার, না পুঁজি-দার কেউ এই কলোনীগুলির ওপর তাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি।

এইসব কারণে জবরদখলকারী উদ্বাস্তুদের সংগে প্রভাকরবাবুর ঠিক প্রীতির সম্পর্ক নেই। আর কীর্তি-নগর কলোনীর যাঁরা অভিজাত বাসিন্দা তাঁরা যদিও প্রভাকরবাবুর ওপর অপ্রসন্ন, তবু কলোনীর লোকজনদের সংগে আত্মীয়তা করতে উৎসুক নন। শিক্ষায় দীক্ষায় আর্থিক অবস্থায় তাঁরা অনেক কুলীন। তাঁরা জবরদখল কলোনীর বাসিন্দাদের সংসর্গ সভয়ে এড়িয়ে চলেন। কারণ তাঁদের ছেলেমেয়েরা এদের ছেলে-মেয়েদের সংগে মিশলে উপকৃত হবে না, বরং অপকারের আশংকা আছে। কলোনীতে যারা থাকে তারা সবাই সাধু নয়, তা বলাই বাহুল্য। নানারকম ফিকির ফন্দি করে অনেককেই অন্ন জোটাতে হয়। সিঁদেল চোর না থাকলেও পকেটমার যে শতকরা দু' একটি নেই তা বলা যায় না। কিন্তু কীর্তিনগরের ধারণা, এদের মধ্যে শুধু পকেটকাটা নয়, গলাকাটার দলও কম নেই। আলাপ পরিচয় করতে গেলে এরা হয় ধার চাইবে, না হয় চাকরি চাইবে কিংবা অন্য কোন সুবিধা সুযোগের জন্যে ঘোরাফেরা শুরু করবে। তাই এই ধড়িবাজ কোম্পানীর সঙ্গে যত কম মাড়ানো যায় ততই ভাল। যারা জোর করে পরের জমি দখল ক'রে বাস করতে পারে, তারা না পারে কি।

কীর্তিনগরের এই মনোবৃত্তির কথা

জানতে পেরে বীরনগর, নেতাজীনগর এবং আশেপাশের আরো অনেক উদ্বাস্তু নগরের লোকজন এইসব বড়লোকদের কাছে ঘেঁষে না। ব্যক্তিগত জন্ম মৃত্যু বিয়ে অন্নপ্রাশনে কি সর্বজনীন উৎসব অনুষ্ঠানে ডাকতে যায় না। তবে কি কীর্তিনগরে ভালো লোক, হৃদয়বান্ লোক কেউ নেই? আছে বই কি। তবে কি তাঁদের কারো সঙ্গেই উদ্বাস্তু কলোনীর কোন কোন লোকের ব্যক্তিগত আলাপ পরিচয় হৃদ্যতার সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি? উঠেছে বইকি। তেমন দু' চারটি পরিবার কীর্তিনগরেও আছে। যেমন অধ্যাপক অমিয়ভূষণ। তিনি নতুন এসেছেন কীর্তিনগরে। কিন্তু অনেক পুরোন বাসিন্দার চেয়ে উদ্বাস্তু কলোনীর লোকেরা তাঁকে বেশি চেনে। বাসে যেতে যেতে তিনি সহযাত্রীদের সঙ্গে নিজে থেকেই যেচে আলাপ করেন। তাদের সুখ দুঃখ সুবিধা অসুবিধার কথা জিজ্ঞাসা করেন। সবটাই যে 'বড়লোকী' কৌতূহল তা বলা যায় না। কারণ তাঁর কথাবার্তায় হৃদয়ের উত্তাপ অনুভব করা যায়। উদ্বাস্তু কলোনীতে তাঁদের কলেজের দু' তিনটি ছাত্রও আছে। শীতাংশু দত্তও ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসে ইংরেজী পড়েছে ও'র কাছে। বি এস সি'তে ইংরেজী আর পড়তে হয় না। কিন্তু তাই বলে এই দু' বছরে অমিয়ভূষণ শীতাংশুকে ভুলে যাননি। নামটা মনে না আনতে পারলেও মুখ ঠিক মনে রেখেছেন এবং চা খাওয়ার জন্যে একদিন নিমন্ত্রণও করেছেন বাড়িতে। শীতাংশু গিয়েছিল সেখানে। অমিয়বাবুর ছেলেমেয়েরা অবশ্য তেমন সামাজিক নয়। তবে ছেলে খুব ভালো সেতারী। নিজের গান বাজনা নিয়েই আছে। মেয়েও উচ্চ শিক্ষিতা। তাছাড়া, চমৎকার রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে পারে। শীতাংশু ভেবেছে তাদের জয়ন্তী উৎসবে তার এই অধ্যাপক পরিবারটিকে নিমন্ত্রণ করবে। তাঁদের শুধু যে দর্শক হিসাবে আসতে বলবে তাই নয়, শিল্পী হিসাবেই আমন্ত্রণ জানাবে। কমলাক্ষবাবু বাজাবেন, এনাক্ষী দেবী গাইবেন। অমিয়বাবু অধ্যাপক মানুষ। অনুরোধ করলে অবশ্যই বক্তৃতা করবেন। তাছাড়া, আরো একজন বিদুষী মহিলা আছেন ওবাড়িতে। না, অমিয়বাবুর স্ত্রী নন তিনি, বোন। শ্যামবাজার স্কুলে টিচারি করেন। তাঁর সঙ্গেও শীতাংশুর আলাপ হয়েছে। চমৎকার মহিলা। সত্যিই ভদ্র। তাঁকে শীতাংশু অনুরোধ করবে রবীন্দ্রনাথের গল্প উপন্যাসের নারীচরিত্র সম্বন্ধে কিছু বলতে। যদি মুখে বলতে অসুবিধা হয়, তিনি না হয় লিখেই আনবেন। এম এ পাশ যখন করেছেন, নিশ্চয়ই ছোটখাট রকমের প্রবন্ধ লেখা তাঁর অভ্যাস আছে।

শীতাংশু তার কথার শেষে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, 'অমিয়বাবু যদি সপরিবারে আমাদের ফাংশনে সত্যিই যোগ দেন তাহলে বাইরের আর কাউকে না পেলেও আমাদের চলবে মণিময়দা।'

এতটা উচ্ছ্বাস ভালো লাগল না জিতেন বিশ্বাসের। সে একটু ঠোঁট বাঁকিয়ে বলল, 'কিন্তু তুমি ভুলে যাচ্ছ শীতাংশু, অমিয়বাবুরাই এখানে বাইরের লোক। আমরাই বা অত সাধাসাধি, অনু... আমন্ত্রণ নিমন্ত্রণ করতে যাব কেন তাঁদের? দু'দিন বাদে ওই কীর্তিনগরের লোকেরাই বলবে, আমরা গেলাম তবে তোমাদের ফাংশন হ'ল। খরচ করব আমরা, খেটে মরবে আমাদের এইসব কলোনীর ছেলেরা, অথচ নাম কিনবেন, হাততালি পাবেন তোমাদের ওই অমিয়বাবুর দল। কলকাতা থেকে যদি ভালো আর্টিস্ট না আনতে পার, নাই বা পারলে, তবু ওই কীর্তিনগরে গিয়ে কাজ নেই। ভণ্টু যা বলেছে তাই হবে। এখানকার ছেলেমেয়েরাই সন্ধ্যা থেকে সারারাত গান আবৃত্তি বক্তৃতা চালাবে। কিন্তু ধর্না করবার জন্যে আমরা কিছুতেই কীর্তিনগরে যাব না।'

শীতাংশু বলল, 'তাতে দোষ কি জিতেনদা? আর্টের কি জাত আছে? আর্টিস্টের কি জাত আছে?'

জিতেন বলল, 'ওসব বড় বড় বুলি রাখ। জাত আর্টিস্টদের কথা জানিনে, কিন্তু ক্ষুদে আর্টিস্টদের জাতের গুমোর তো সবচেয়ে বেশি। আমার কথা হচ্ছে এই, কীর্তিনগরের মানুষ আমাদের সঙ্গে যখন কোন সামাজিক সম্বন্ধ রাখতে চায় না, তখন আমরাই বা আগ বাড়িয়ে তাদের ডাকতে যাব কেন? এতকাল যদি ওদের ছাড়া আমাদের চলতে পেরে থাকে, এবারকার রবীন্দ্রজয়ন্তীতেও চলবে। অমিয়বাবু তোমার প্রফেসর। বেশ তাঁর সঙ্গে তুমি নিজে গিয়ে দেখা সাক্ষাৎ কর, নিজের বাড়িতে ডেকে এনে চা খাওয়াও ভালো কথা। কিন্তু সামাজিক নিমন্ত্রণ তাঁকে আমরা করতে পারিনে। তাহলে কীর্তিনগরের যে সব পরিবারের সঙ্গে আমার জানাশোনা আছে, কি এই সুনীলের জানাশোনা আছে তাদেরও তো বলতে হয়।'

শীতাংশু রাগ ক'রে বলল, 'বেশ তো বলুন না। বাধা দিচ্ছে কে?'

জিতেন জেদের সঙ্গে বলল, '... বাধা না দিলেও আমরা তা বলব না।'

শীতাংশু উদ্ধতভাবে বলল, 'বেশ, তাহলে আমি আর নেই এ সবের মধ্যে।'

এই ব্যাপার নিয়ে আবার ছড়াছড়ি দলাদলি হয়ে যায় আর কি। মণিময় ফের মীমাংসার জন্যে এগিয়ে এল। সে হেসে বলল, 'আচ্ছা, অমিয়বাবুদের সম্বন্ধে আমরা পরে বিবেচনা করব। এখনও তো তার যথেষ্ট সময় আছে। তাছাড়া, বললেও যে অমিয়বাবুরা আসবেন আমার তো মনে হয় না। কাদের নিমন্ত্রণ করব না করব, সে সব পরে ভাবব আমরা। তার আগে আমাদের বহু কাজ করবার আছে। চাঁদা তোলা, প্যাণ্ডেলের জন্যে জায়গা ঠিক করা—বহু কাজ রয়েছে।'

জিতেন হাত জোড় ক'রে বলল, 'আজ থাক মণিময়বাবু, ওসব আলোচনার জন্যে আমরা ফের আর একদিন বসব। আজ বড়ই বেলা হয়ে গেছে। আমাকে আবার খেয়ে দেয়ে বেরোতে হবে।'

এতক্ষণে মণিময়ের খেয়াল হ'ল তাঁকেও নিমন্ত্রণ রাখতে যেতে হবে। সে সময়ও পার হয়ে গেছে প্রায়। কিন্তু ওঠবার আগে মণিময় তাড়াতাড়ি বলল, 'আর একটা কথা। আর এক মিনিট জিতেনবাবু।'

জিতেন বলল, 'বলুন।'

মণিময় বলল, 'আসতে আসতে কথাটা আমি এই শীতাংশু আর সুনীলদেরও বলেছিলাম। আপনাদের এই রাস্তাটার কথা।'

জিতেন বলল, 'তাই কি।'

এতগুলি কলোনীর সর্বসাধারণের ব্যবহারের পথটির অব্যবহার্যতা সম্বন্ধে মণিময় ফের ছোটখাট একটি বক্তৃতা দিল। পদে পদে হোঁচট খেতে হয়, খানায় গর্তে পড়তে হয়, বর্ষাকালে কাদাজল ভাঙতে ভাঙতে পা পচে যাওয়ার জো হয়। সবাই ভুক্তভোগী সবাই অনুভব করে, কিন্তু কেউ এই রাস্তাটির সংস্কারের দিকে কণামাত্র দৃষ্টি দেয় না একথা বলে মণিময় কলোনীবাসীদের বিরুদ্ধে একটু অনুযোগ করল। সেই সঙ্গে জিতেনকে প্রশংসা করতে হবে একথাও ভুলে গেল না। মণিময় অবশেষে বলল, 'আপনারা এ অঞ্চলের নেতৃস্থানীয়, আপনারা যদি এসব কাজে এগিয়ে না আসেন কে এগোবে?'

জিতেন বলল, 'এগিয়ে কি করব বলুন? এ কি দু' চারজনের কাজ? কি দু' চার টাকার কাজ? তাছাড়া, আমাদের তো মশাই পথের ওপরেই বাস। পথের কথা আলাদা ক'রে ভাবব কি, সবই আমাদের পথ। জবরদখল কলোনী গভর্নমেণ্ট স্বীকার করে নেবে কিনা, নিলেও কবে নেবে তার কিছু ঠিক নেই। এই অস্থায়ী অবস্থার মধ্যে নিজেদের ঘরদোরই মনের মতো ক'রে বাঁধেনি আর পথ বাঁধবে?'

মণিময় বলল, 'কিন্তু ঘর যেমন দরকারী, পথটাও তো তেমনি দরকারী। ঘরে আর কতক্ষণ থাকতে পারেন বলুন। এই পথ দিয়েই তো বেরোতে হয়, ফিরতে হয়। মেয়েছেলে নিয়ে ওই রাস্তা দিয়েই চলাফেরা করেন।'

জিতেন বলল, 'ও রাস্তায় মেয়েদের অবশ্য বেশি বেরোবার দরকার হয় না। তবে হ্যাঁ, কোন কোন বাড়ির মেয়ে চলাচল করে বটে।'

মালার কথাটা মনে পড়ে গেল জিতেনের। হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল মুখ। মালা ওই পথ দিয়ে যাতায়াত করে বটে। তার সকাল নেই, দুপুর নেই, সন্ধ্যা নেই, রাত দুপুর নেই। সে হয় বেরোয়, না হয় ঢোকে। জিতেন খোঁজ নিয়ে দেখেছে মেয়েটি হাসপাতালে নার্সের কাজ করে, একথা মিথ্যা নয়। কিন্তু তারপর আর কি করে না করে ভগবান জানেন। তার চলাফেরা অনেকের চোখেই আপত্তিকর লেগেছে, রহস্যময় মনে হয়েছে। জিতেনের কাছেও। সিফ্‌ট ডিউটি থাকলে চাকরির সময় ঠিক থাকে না, সে কথা ঠিক। কিন্তু তাই বলে কি অন্ধকার রাত্রে একজন সঙ্গী নিয়ে হাসি গল্প করতে করতে যেতে হবে? মণিময়ের সঙ্গে মালার একটু বেশিরকম গা-ঘেঁষাঘেঁষিটা অনেকেরই চোখে লেগেছে। কিছু কিছু কথা জিতেনের যে কানে আসেনি তাও নয়। অবশ্য ওদের সম্পর্ক নাকি মামা ভাগ্নীর। আপন নয়, পাতানো সম্পর্ক। স্থান-কাল বিশেষে আপনের মধ্যেও কিছু বাঁধে না, আর তো পাতানো। পাতানো সম্পর্ক আড়ালে আড়ালে নতুন ক'রে পাতিয়ে নিতে দেরি লাগে না। দেখতে তো আর কম দেখেনি জিতেন বিশ্বাস। তবে কেউ কেউ আবার অন্য কথাও বলে। মালা নয়, মালার মার সঙ্গেই নাকি মণিময়ের বেশি দহরম মহরম। হাসি ঠাট্টা খুব চলে। যারা ওদের পড়শী তারাই খবর দিয়েছে জিতেনকে। অসম্ভব কিছু নয়। মা মেয়ে দুজনের সঙ্গেই একই রকমের সম্পর্ক বজায় রেখে চলতে পারে এমন চতুর-চূড়ামণিও কিছু কিছু আছে দুনিয়ায়। কিন্তু নেতাজীনগরের কমিটি রয়েছে কি? তার প্রেসিডেণ্ট সেক্রেটারী কি চোখ বুজে আছে? বুজে থাকাটা

বিচিত্র নয়। কারণ চালুনি হয়ে সুচের ছিদ্র খুঁজতে যাওয়ার আশংকা আছে। এসব ব্যাপারে কতটা কি আছে বলা যায় না, তবে টাকা পয়সা সম্বন্ধে নেতাজী-নগরের কমিটির বেশ দুর্বলতা আছে তা জিতেন জানে। বখরা নিয়ে নিজেদের মধ্যেই নাকি মাঝে মাঝে ঝগড়া লেগে যায়। কিন্তু ওরা যদি কোন স্টেপ না নেয়, বাধ্য হয়ে বীরনগরকেই এগিয়ে যেতে হবে। এসব দৃষ্টান্ত তো ভালো নয়। পর্দার আড়ালে অবশ্য অনেক ব্যাপারই ঘটে। কিন্তু মালা মণিময়েরা যে পর্দার বাইরে এসেই সব ঘটাচ্ছে। চোখের পর্দা আর রাখতে দিচ্ছে না। নেতাজীনগরের একটি ঘরের ওপর অতিরিক্ত মাত্রায় আকর্ষণ আছে বলেই কি মণিময় অত পথ পথ করছে? ওই পথটা মালাদের বাড়ির সমুখ দিয়ে গেছে বলে. মালাকে এই পথে রাত দুপুরে অন্ধকারে সঙ্গী নিয়ে চলাফেরা করতে হয় বলেই কি মণিময় তাকে সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে রাখতে চায়?

মণিময় জিতেনকে নীরব আর অন্য-মনস্ক দেখে বলল, 'আপনি কি ভাবছেন জিতেনবাবু? কোন কোন বাড়ি কেন, আমি তো দেখছি সব বাড়ির মেয়েদের ওইটাই বেরোবার রাস্তা। সব বাড়ির মেয়েদের বেরোতে হয় না একথা ঠিক। কিন্তু সব বাড়ির কচি কচি ছেলে-মেয়েরা তো ওই রাস্তা দিয়েই স্কুলে যায়, বাজারে যায়। বিপদ আপদ হ'তে বেশি সময় লাগে না।'

জিতেন বলল, 'সে কথা ঠিক মণি-ময়বাবু। বিপদ আপদ সম্বন্ধে আমাদের সবাইরই সাবধান হওয়া উচিত।'

মণিময় বলল, 'তাহলে আসুন কিছু একটা করা যাক।'

জিতেন বলল, 'কি করতে চান বলুন?'

মণিময় বলল, 'প্রথমে আসুন একটা কমিটির মত করি।'

জিতেন হেসে বলল, 'বেশ বেশ। কি নাম দেবেন বলুন তো? রয়াল রোড কমিটি?'

মণিময় বলল, 'ধরুন তাই না হয় নাম দেওয়া গেল। এ কমিটিরও আপনিই প্রেসিডেণ্ট থাকবেন।'

জিতেন ফের হাত জোড় করল, 'মাফ করবেন। এই কলোনী কমিটির প্রেসিডেণ্ট আছি তাতেই রক্ষা নেই। আর ঝামেলা বাড়াতে চাইনে। সংসার আছে, চাকরি বাকরি আছে। কলকাতার একটা প্রেসের দেখাশোনা করি। নামেই ম্যানেজার। জুতো সেলাই থেকে চণ্ডী পাঠ সবই দেখতে হয়। আপনাদের তো ঝক্কি ঝামেলা কম। আপনারা করুন।'

মণিময় বলল, 'বেশ, আপনি প্রেসিডেণ্ট না থাকতে চান কমিটির মধ্যে মেম্বার হিসাবে আসুন, তাতেও সবাই উৎসাহ পাবে।'

জিতেন বলল, 'এখন থাক। আমার সময় বড় কম।'

মণিময় এবার গম্ভীর মুখে উঠে পড়ল। জিতেনের কাছে বিদায় নিয়ে বলল, 'আচ্ছা, নমস্কার।'

বীরনগর কলোনী ছাড়িয়ে তারা আবার পথে নামল। সংকীর্ণ, অসমান, খানাখন্দ ভরা সেই পথ। উত্তরে-দক্ষিণে দুদিকেই যেতে যেতে ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে অদৃশ্য হয়েছে।

শীতাংশু বলল, 'পথের কথাটা ও'র কাছে পাড়াই আপনার উচিত হয়নি। আচ্ছা, জিতেন বিশ্বাসই তো কলোনী-গুলির একমাত্র হর্তাকর্তা নয়। ও'কে বাদ দিয়েও আমরা চলতে পারব। রবীন্দ্র-জয়ন্তীর বাপারটা মিটে যাক। তারপর রোড কমিটির কথা আমরা আর একদিন ভেবে দেখব।'

'আবার আর একদিন কেন শীতাংশুদা। আজই তো ভেবে দেখা যায়। আসুন মণিময়দা, এই রাস্তায় দাঁড়িয়েই রোড কমিটি আজ আমরা ফর্ম করে ফেলি।'

সবাই অবাক হয়ে পিছন ফিরে তাকাল। দেখল ভণ্টু। বীরনগরের প্রতিনিধি হিসাবে একমাত্র সেই তাদের এতদূর অবধি এগিয়ে দিতে এসেছে।

এই শ্যামবর্ণ কিশোরবয়সী ছেলেটির দিকে তাকিয়ে মণিময় ফের খুব খুশী হয়ে উঠল। তাকে কাছে ডেকে হাত রাখল তার কাঁধে। হেসে বলল, 'ঠিক বলেছ ভণ্টু। রোড কমিটি রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফর্ম করাই ভালো। আর কেউ না আসুক, আমরা পাঁচজন তো আছি। তুমি, আমি, শীতাংশু, সুনীল আর নিশীথ। এ কমিটির নাম দেওয়া যাক কীর্তিপুর রোড কমিটি। প্রথম সদস্য তুমি। তোমার ভালো নামটা যেন কি?'

পকেট থেকে ফাউণ্টেন পেনটা তুলে নিয়ে, এক টুকরো কাগজ হাতের তেলোয় রেখে সত্যিই মণিময় ছেলেদের নামগুলি লিখতে শুরু করল।

ভণ্টু লজ্জিত হয়ে বলল, 'আমাকে কেন ধরছেন? আমাকে বাদ দিন মণিময়দা! আমি কি আর কমিটিতে থাকবার যোগ্য?'

মণিময় বলল, 'নিশ্চয়ই যোগ্য। বল তোমার ভালো নামটা।'

ভণ্টু কুণ্ঠিত হয়ে বলল, 'আমার ভালো নামটা আরো খারাপ মণিময়দা—ভজহরি। লিখতে হয়তো ভণ্টু বন্দ্যো-পাধ্যায় বলেই লিখুন। আমি ওই লিখি।'

নামগুলি লেখা শেষ করে মণিময় ছেলেদের কাছ থেকে বিদায় নিল। মালাদের বাড়িতেই ফিরে যেতে হল। ব্যাগটা সেখানে ফেলে এসেছে। শীতাংশুরা তাকে খানিকদূর এগিয়ে দিয়ে যে যার বাড়ির দিকে চলল। যেতে যেতে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করল, 'মণিময়দা শুধু যে কাজের মানুষ তাই না, রসিকতাও কম জানেন না। দেখলে তো ভণ্টু আর রোড কমিটি নিয়ে কেমন তামাসাটা করলেন।'

বাকিটা পথ একা একা এগোতে লাগল মণিময়। মাথার ওপর বৈশাখের কড়া রোদ। রোড কমিটি আর জয়ন্তী কমিটির কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ রবীন্দ্রনাথের একটি লাইনের কথা মণিময়ের মনে পড়ল। ধারে-কাছে কেউ নেই। পংক্তি ক'টি এবার তাই সশব্দে আবৃত্তি করতে করতে চলল মণিময়—

"হে ভবেশ, হে শঙ্কর
সবারে দিয়েছ ঘর
আমারে দিয়েছ শুধু পথ।"

(ক্রমশ)

॥ ৩ ॥

ব **দল খাঁ** সাহেবের কথা শুনলেই মনে হ'ত ঝাঁকে ঝাঁকে ছর্‌রার গুলি বার হয়ে আসছে; অনভ্যস্ত শ্রোতার পক্ষে অর্থগ্রহ দুঃসাধ্য। একটু চাপা গলায় আর নীচু মুখে খাঁ সাহেব বললেন, ভাইয়াজীর মেজাজ ত' তাঁর জানাই আছে। মেজাজ ভাঙ্গলে যোড়া দেওয়া যায় না। এখানে বসে থেকে লাভ নেই। ...ঠজীর বাড়িতে যিনি যাবেন তিনি ...দুন। ভালই হবে, জায়গা বদল হবে, চাই কি নূতন করে মেজাজ বনে' যেতেও পারে। আমি ত' তৈয়ার, ভাইয়াজী!

বলেই খাঁ সাহেব তাঁর লাঠিটি উঠিয়ে নিয়ে উঁচু করলেন। তিরাশি বৎসর বয়সের এই শীতাবধূতকে আমার স্মরণের প্রণতি জানাই।

একে ভাইয়া সাহেবের মর্জি, তার ওপর খলিফা বদল খাঁ সাহেবের সম্মতি। আর কি রক্ষা আছে! এঁদের ওপরও তুরুপ ঝাড়লেন দুলীচাঁদজী, বললেন, সকলেই চলুন অনুগ্রহ করে। শাক্‌ পুরি আর শোয়ার বন্দোবস্তও ওখানে হবে, কিছুমাত্র তকল্‌লুফ করবেন না। জী হাঁ।

তার পরেই ট্যাক্‌সি ডাকার পালা, না হয় ট্রেন ধরে দমদমা যাওয়ার হল্লা আর দল তৈরী। লোক জড়ো করো, গয়ার যাই এই ভাব।

এই ফাঁকে আমি ভিতরবাড়িতে শ্যামলালজীকে ধরলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, কাল সকালে আসব কি? তিনি বললেন, "আলবৎ আসবে। তবে আজ তোমাদের নিয়ে যেতে চাইনে এই হুল্লোড়ের মধ্যে।" ননী যতই সাহস দিক, মন্‌হুস্‌ হওয়ার ভয়টা আমার মন থেকে যায়নি। বাবুজীর কথায় আশ্বস্ত হলাম অনেকখানি।

বৈঠকখানায় ফিরে এসে তন্নুলালজীর পাশে বসলাম। দমদমযাত্রীদের ভীড় কেটে যাক, পরে বাড়ি যাব এই হ'ল আমাদের ইচ্ছা।

ননী খপ্‌ করে ভাইয়া সাহেবের প্রসঙ্গ তুলে তন্নুলালজীকে বল্‌ল—আপনাদের ভাইয়া সাহেব যাই হ'ন, তিনি বড্‌ড বদ্‌মেজাজি লোক। আর, বেচারা জঙ্গীকে এত লোকের সামনে গালাগালি ক'রে অসম্মান কেন করলেন বুঝলাম না। রাজা-উজিরী মেজাজ্‌ রাজসভায় চলতে পারে; কিন্তু গানের বৈঠকে ওরকম মেজাজ্‌ বরদাস্ত করাও ত' দায়!

তন্নুলালজী ননীর কথা শুনে মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাসছিলেন। ননীর কথা শেষ হ'লে আমার দিকে চেয়ে বললেন—ভাইয়া সাহেবের মেজাজের কথা ছাড়ুন। গান কেমন শুনলেন তাই বলুন।

আমরা দু'জন প্রায় এক সঙ্গেই বলে উঠি, গানটা পুরোপুরি হ'লই বা কোথায়! গানটা ত' নষ্টই হয়ে গেল!

তৎক্ষণাৎ তন্নুলালজী জিজ্ঞাসা করলেন—ঠিক কথা। কিন্তু কে নষ্ট করলেন তাও ত' বলুন। আগ্রাওয়ালী নিজে, না ভাইয়া সাহেব, না মির্জাসাহেব, না কি জঙ্গী-বশীর আর আব্‌বুল?

ননী আর আমি ঘাবড়ে গেলাম। আমাদের দু'জনকেই স্বীকার করতে হ'ল, গানটা যতক্ষণ মালকার হেফাজতে ছিল, আর মির্জাসাহেবের আঙ্গুলে চলে যাচ্ছিল ততক্ষণ ত' নষ্ট হয়নি। আর ভাইয়া সাহেব!—অদ্‌ভুত তাঁর আঙ্গুলের খেলা; তিনি ত' মালকার গানের সাহায্যই করলেন প্রথমবার। তবে শেষের সেই তানটি ত' একটা তলোয়ার খেলা। সেও ত' অতুলনীয়। তবে কি, বশীর-জঙ্গীরাই গানটাকে নষ্ট করল!

তন্নুলালজী বললেন—হাঁ, বশীর-জঙ্গী আর আব্‌বুল এই তিনজন মিলে গানটাকে জবাই করল। বুঝে দেখুন! গানের ভাব আর মেজাজটাকে তারাই ত' উপড়ে ফেলল,—তানবাজি ক'রে আঙ্গুলের চুলকানি মিটাতে গিয়ে। চরম করল আব্‌বুলের ঐ "ধাতিনাড়া"র বাতিক। ও বাজায় ভাল, কিন্তু ভূত ঘাড়ে চাপলে ওর কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। শুধু ওকে দোষ দিয়েই বা কি হবে! গাইয়েরা নিজেদের গান নিজেরাই জবাই করে অনর্থক তানবাজি ক'রে! যাক্‌ গে। এখন ভাইয়া সাহেবের মেজাজের রহস্যটা কিছু বুঝলেন কি?"

ননী আর আমি চুপ করে থাকি। তন্নুলালজী তখন বললেন—ভাইয়া সাহেব বিলক্ষণ বুঝতে পারছিলেন, এরা তিনজন গানের মেজাজের খাতির রাখছে না। তিনি নিজে বাজিয়ে তাদের হুশ্‌ ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলেন। তাতেও এদের হুশ্‌ ফিরল না। মাইফেলের মধ্যে যদি কেউ দুঃখ পেয়ে থাকে ত' ভাইয়া সাহেবই পেয়েছেন, তিনিই ত' গানটি নিমন্ত্রণ করে নিয়ে এলেন সভার মধ্যে, আর তাকে আসন দিলেন মালকার কণ্ঠে। সেই গানের বেখাতির হ'ল দেখে যদি ভাইয়া সাহেবের মেজাজ্‌ বিগড়ে গিয়ে থাকে, সেটা কি খুব অন্যায়! বশীর-জঙ্গীরা কশাইয়ের মতো করে গানটাকে টুকরা করে ফেলল, আপনাদের যদি অনুভব থাকে ত' বুঝেছেন। ভাইয়া সাহেব দেখলেন, গানটা ত' মরেই গিয়েছে, তখন এই বশীর-জঙ্গীদের অহঙ্কার আর তেজটাও নষ্ট করতে হয়। তিনি মারলেন তলবারের চোট। বস্‌! ঐ এক চোটেই কশাইগুলো ঘায়েল। আপনারা জানেন না, ওস্তাদের হাতে তলবারের প্যাঁচ হাজারো রকমের আছে। মাত্র একটি ত'

শুনলেন আজ। আর গালাগালির কথা! —তিনি নিজেরই বাড়ি বসে আছেন আর ছেলেকে ধমক্ দিচ্ছেন, মনে করতে হবে। কেউ কখনো দেখেনি শোনেনি যে, বাইরের কোনও মাইফেলে ওস্তাদ্ মেজাজ্ ফলিয়ে অভদ্রতা করেছেন। সেরকমের ধাত্ই নয় ওঁর।

ননী আর আমি ঘরে ফিরে যাওয়ার পথে জল্পনা করছিলাম, গানের অমন সুন্দর একখানি নৌকা ঘাটে ভিড়তে না ভিড়তেই, সেই মজলিশী ঘাটই ভেঙে গেল আজ! বাড়ি ফিরছি মাত্র গানের একটা রেশ্ নিয়ে, আর তানতলবারের একটা শেষ চোট নিয়ে। ননী ছিল লাভ-লোকসানের হিসাবে ওস্তাদ। বলল, ভাইয়া সাহেবের এই মেজাজ্-দারিতে কার লাভ হ'ল বল দেখি? আমাকে নিরুত্তর দেখে ননীই বলল—বুঝলে না ভাই! লাভ হ'ল বদল খাঁ সাহেবের। ভাইয়া সাহেবের মুখে সম্মান পেলেন, আবার, ট্রেনের খরচা দিয়ে দমদমায় ফিরে যেতেন, সে ক'টা পয়সাও ট্যাঁকে জমল। খাশা তোয়াজ করে দুলীচাঁদের মোটরে ফিরে গেলেন!

হিসাবের ঐতিহাসিক সূত্রটা খুব মজবুত। খলিফা বদল খাঁ সাহেব কিছুদিন থেকে, অর্থাৎ তখনকার হিসাবে প্রায় ত্রিশ বৎসরের অবিচ্ছিন্ন সূত্রে দুলীচাঁদজীর আশ্রয়ে আছেন; দুলী-চাঁদজীর দ্বিতীয়া পত্নী শ্রীমতী তারা-বাইকে (ইনি সম্ভ্রান্ত গোয়ানিজ বংশের কন্যা, বাইজী নহেন) খেয়াল-ঠুমরি শিক্ষা দিয়ে আসছেন। শ্যামলালজীই আগ্রা থেকে বদল খাঁ সাহেবকে ধরে নিয়ে এসে দুলীচাঁদজীর জিম্মায় ছেড়ে দেন। কিন্তু এ বিষয়ে মূল উদ্যোক্তা বা উপদেষ্টা ছিলেন গণপত্রাও ভাইয়াসাহেব। যাই হ'ক, বদল খাঁকে আমি যখন প্রথম দেখলাম শ্যামলালজীর বৈঠকে, তখন এঁর জীবনের লাটাই বিরাশী বৎসরের সুতো ছেড়ে চলেছে; ঘুড়িখানিও সুন্দর উড়ছে। প্রায় সারাদিন ইনি দমদমায় থাকেন। বৈকালে কলিকাতায় চলে আসেন, সন্ধ্যার সময়ে শ্যামলালজীর বৈঠকে এসে অন্তত ঘণ্টা দুই বসেন। রাত্রিতে দমদমায় ফিরে যান। এই নিত্য গতায়াতের মধ্যে কোনও দিন একটা অঘটন দুর্ঘটনা হয় নি; আশ্চর্য! সুরের

ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়—আরোহী অবরোহীর সপাট, বাদী আর সংবাদিদের মোকাম আর সংগত বিষয়ে বদল খাঁ সাহেবের জীবন-রাগ সম্পূর্ণ, নিখুঁৎ একটা অভিব্যক্তি!

পরদিন সকালে ননী আর আমি বৈঠকে চলেছি, একটু দেরী করে। ভাইয়াসাহেবের নজরে মনহুস বনে যাওয়ার ভয়টা তখনও মন থেকে বিলুপ্ত হয় নি। ভাবছিলাম, ভাইয়াসাহেব কি কাল রাতে শ্যামলালজীর বাড়িতে ফিরেছেন? ভাবছিলাম, সেই "চুব গয়ি" গানটির ভাঁজের কথা। শেষে বার বার সেই মেঘের গর্জনের মতো তানটির কথাই মনে পড়তে থাকে; আজব তান বটে! এমন সময়ে ননী যেন আমার মনের কথা জানতে পেরে বলল—"ও রকম তান আর হয় না ভাই, হবেও না কারুর হাতে।" আমি চুপ করে থাকি। মনটা চলে যায় মির্জাসাহেব, বশীর, জঙ্গীর কলাকৌশলের দিকে। এঁরা কি গানের খাতিরে তান পাল্টা করেন, না কি তান-পালটার খাতিরে গান বাজান। তন্নু-লালজীর কথা আমার মনে সন্দেহ জাগিয়ে দিয়েছে। আচ্ছা, এমনও ত হতে পারে এরা রাগের মোহেই তান পাল্টা করেন, গান বা পদকে বিসর্জন দিয়ে। গানের পদ কি তুচ্ছ জিনিস? তা নয়। তবে মাটির ওপরে চলা-ফেরার কাজে পদই হ'ল সম্পদ, ভরসা; গানের পদের খাতিরেও সে রকম বোধ হয়।

বৈঠকে হাজির হয়েই দেখি ঘরটা ফাঁকা। তবে বশীর বসে আছেন সামনে হারমোনিয়ম নিয়ে। আমরা পা টিপে টিপে ঘরে ঢুকেছি, তিনি বুঝতে পারেন নি। সামনে রাস্তার দিকে খোলা দরজার মধ্যে দিয়ে তাঁর অন্যমনস্ক চাহনি চলে গিয়েছে দূরে। মনে করলাম, এবার তিনি ছেলেকে সংগে করে নিয়ে আসেন নি। ছেলের কথাই ভাবছেন হয়ত।

পূর্ব থেকেই বশীর আর আমার মধ্যে একটা প্রীতির বন্ধন হয়ে গিয়েছে। তাঁর ছেলেটির প্রসংগে আগে একবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম—খাঁ সাহেব, ছেলেকে বাজনা শেখাচ্ছেন ত? বশীর অত্যন্ত করুণো মুখ করে জবাব দিয়েছিলেন—"পেশাদারী গান-বাজনায় নফ্‌রৎ। নাকে খত্‌ দিয়েছি। পরের মুখের দিকে তাকিয়ে আর পেটে হাত বুলিয়ে কি গান-বাজনার দিল্‌ ভরে! ছেলেকে এ কাজে লাগাবো না, লেখাপড়া শেখাচ্ছি মাস্টার রেখে।" বশীর তখন ইন্দোরের রাজ-সভার মাইনে-করা শিল্পী, মাসে দেড়শো টাকা নগদ ঘরে আসে। তাঁর মুখে এমন কথা, মনে এমন দুঃখ! বশীর বলে-ছিলেন—"দেখিয়ে পাঁচুবাবু! বাবুজী, মৌজুদ্দীন, ভাইয়াসাহেব, এঁরা কত আনন্দে আছেন। কারও পরোয়া করেন না, রুপেয়া-পয়সা কাপড়া-লত্তার জন্য গান-বাজনা করতে হয় না এঁদের।" খুব সত্য কথা।

বশীরের পাশে গিয়ে বসলাম আমরা সেলাম জানিয়ে। বাবুজী ভিতর বাড়িতে। বশীরকে জিজ্ঞাসা করলাম, তাজা খবর কি তাই বলুন। বশীর বললেন—ওস্তাদ (অর্থাৎ গণপত্‌ রাও ভাইয়াসাহেব) এখন শেঠজীর ফুল-ওয়াড়িতেই তশরিফ্‌ রাখলেন, যতদিন তাঁর মর্জি আর শেঠজী আর তারা-বাইএর নসিব্‌। তবে মৌজুদ্দিন কাল রাত্রেতেই চলে এসেছে কলকত্তায়।" বশীরের কথা শুনে আমরা পাশের ঘরের দিকে তাকাই। বশীর বললেন—এখানে নয়, অন্য জায়গায় আছে সে। ভাইয়া-সাহেবের ভয়ে সে দমদমায় থাকতে চাইল না, নইলে আমার ত' কোনও অসুবিধা নেই" বলে একখিলি পান মুখে চেপে বশীর এদিক-ওদিক চেয়ে সিগারেট বার করলেন। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম—এ আবার কেমন কথা! মৌজুদ্দীনের মনে ভয়!"

সিগারেটটি ধরিয়ে একটি টান ছেড়ে বশীর বলেন—মৌজুদ্দীন ত' ওস্তাদকে বাঘের মত ভয় করে। তার ধারণা ওস্তাদ যদি শুনতে পান মৌজুদ্দীন একই বাড়িতে থেকে নেশা করেছে ত' তিনি চাবুক মেরে মৌজুদ্দীনকে সায়েস্তা করবেন। তা যাক, আবার বাবুজীর এখানে এসেও ত' মৌজুদ্দীনের সুবিধা নেই। এত সব অসুবিধা শেষ করে

দিলেন স্বয়ং জদ্দন্ বাইসাহেবা। ইনি বাবুজীকে বললেন—রাতে মৌজুদ্দীনের খাওয়ার অসুবিধা হবে, দিনের বেলা উনি আপনার বাড়িতে মৌজ করুন, কিন্তু রাতের খাওয়া-শোয়ার ভার আমাকে দেন অনুগ্রহ করে। বাবুজী বুঝেসুঝে অনুমতি দিলেন। তবে বললেন,—আমাকেও (বশীরকেও) মৌজুদ্দীনের সঙ্গে থাকতে হবে, পাহারা দেওয়ার জন্য; অন্তত যে কয়দিন ওস্তাদ আছেন এখানে। বাবুজীর হুকুম ত' অমান্য করা যায় না"—বলে বশীর খুব লম্বা একটা টান দিলেন সিগারেটে। আমরা বললাম—ঠিক কথা খাঁ সাহেব! বশীর খুব মিহি-গলায় আখেরী মন্তব্য করলেন—গত রাত্রিতে শেঠজী-বাড়ির মাইফেল ভাঙলেই জদ্দন্ খুব খাতির করে' মৌজুদ্দীনকে আর আমাকে তাঁর বাসায় নিয়ে গেলেন, সেখানে মৌজুদ্দীনের গানও হ'ল। জদ্দন খুব খাতিরদারী করেছেন, বড়ই অতিথিবৎসলা তিনি।

ননী সহজ চটকদার ভঙ্গীতে বলল—বেশক্ খাঁ সাহেব। মগর, আমি ভাবছি আপনাকে পাহারা দেওয়ার লোকের দরকার হ'লে আমরা দু'জন তৈয়ার আছি। জরুরত্ বুঝলেই জানাবেন। তার জন্য আর কি!" বলেই নিজের ডান হাতের বাইসেপস্‌টা শক্ত করে খাঁ সাহেবের হাত টেনে লাগিয়ে বুঝিয়ে দিল আমরাও শক্ত মজবুত লোক, বাবুজীর শিষ্য ত বটেই—একরত্তির মতো চোখ টিপল ননী।

ননীর কথা শুনে বশীর খাঁ সাহেবের কী হাসি! হাসতে হাসতে বিষম লাগার উপক্রম। সিগারেটটা ছিটকে পড়ে জাজিমের ওপর।

এমন সময়ে বাবুজী ঘরে ঢুকলেন কি একটা খুঁজতে। ব্যাপার দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি হলো আবার!" বশীর সিগারেটটা খপ্ করে তুলে নিলেন, উঠে দাঁড়িয়ে বাবুজীকে কুর্ণিশ করেন আর সংক্ষেপে পাহারাদারের ওপর পাহারাদারীর প্রসঙ্গ পেশ করে বললেন—বাবুজী! আপ্ ঔর ইয়ে দো শাগুর্দ আপ্‌কে সলামত্ রহে, জিন্দগীভর।" বাবুজী সমঝদার লোক। হাসতে হাসতে বললেন—বড়ি হুঁশিয়ারিসে বাত্ কর না ইন্ দোনো ডাকটর বাবুসে। সমঝে?" বশীর বসতে বসতে বললেন, "জী হাঁ! জরুর।"

বশীর খাঁ সাহেব লোকটি ছিলেন
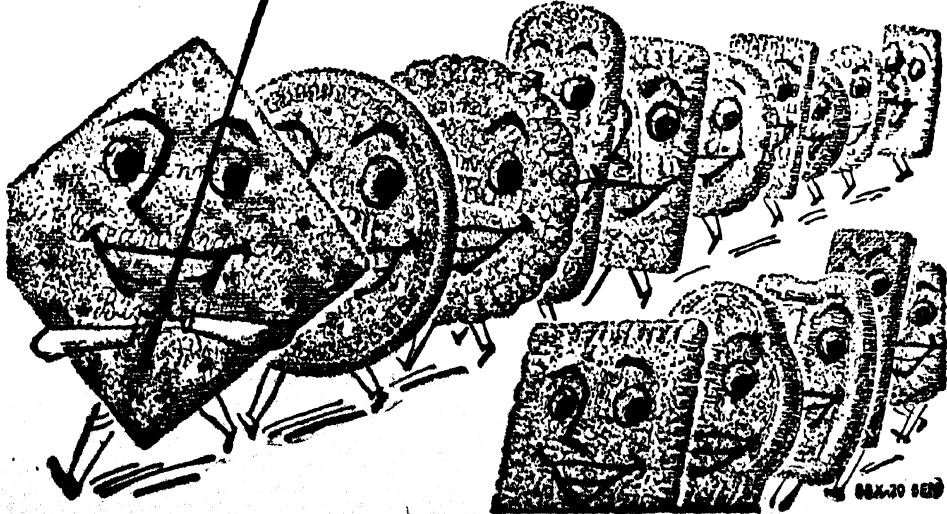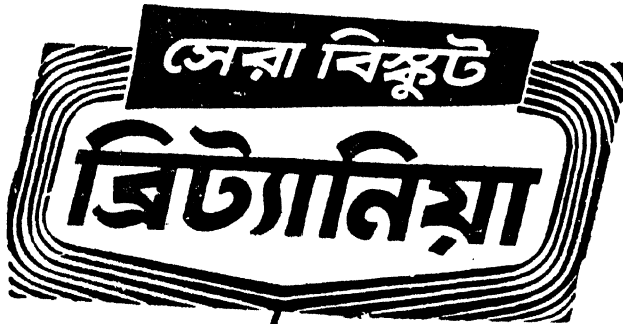
স্প ছাঁদের; মিতব্যয়ী, সরল-হৃদয়! ই জন্যই প্রাণ খুলে হাসতে পেরে-লেন।

বাবুজী ভিতরে চলে গেলেন। দিকে আমরা আরও কত কি জিজ্ঞাসা র, কিন্তু হারমোনিয়মের বেলো টেনে ই বশীর একটা লম্বা পাল্লার সাপাট ন মারলেন চৌদুনি লয়ে, দরবারী ড়ির সুরে। লম্বা ত লম্বা! মোনিয়মের এ মুড়ো থেকে ও মুড়ো ন্ত। বীণ, সেতার, সুরশৃংগারে এ ম ব্যাপার সম্ভবই নয়! সুরের রাজ্যে । অকস্মাৎ অরুণোদয় হ'ল, বুল-লদের মুখ ফুটে গেল, অসংখ্য ফুল উ গেল এক সঙ্গে। বশীরের ঙুলের টিপ্ আর সাফাইয়ত্ মনে । প্রশংসা না করে পারি নি।

দু'এক সেকেণ্ডের জন্য থেমে রম্ভ হ'ল কসরতী বাজনা অর্থাৎ টনা মিনিট চার-পাঁচের জন্য দরবারীর গুলি তালিমী নক্শা অনুযায়ী ট-পালট খেতে খেতে চলে যায় অতি-ার শেষ সীমায়, আবার ফিরে আসে মন্দ্র স্থানে। রাগদেবতার প্রতি ত জ্ঞাপন হ'ল, সুরের এই আরতি ; ন্যাস মন্ত্র পড়ে পুজো আরম্ভ র মতো শব্দের ছক্-কাটার ব্যাপার। র সুন্দর ফ্রেমের শোভার মতো লি আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে।

বশীর থামলেন, যেন বিশেষ কিছুই নি। তিনি সিগারেট মুখে করলেন । ননী জিজ্ঞাসা করল—শেঠজীর ক অতগুলি গুণী গিয়ে জমল। কি করল, কীই বা হ'ল বলুন খাঁ ব।

বশীর বললেন—কলকাতা থেকে গহর সুগ্গনের (বাইজী) সারেংগীয়া নকে (অর্থাৎ ইমদাদ্ খাঁ আর ব খাঁকে) নিয়ে এল আব্দুল, সেই । এলেন জদ্দন বাইজী। দস্তুরমতো ফল বসল, কিন্তু দাদ্রার মাইফেল। (হারমোনিয়ম) নিলেন ওস্তাদ আর ঙ্গী আর মির্জাসাহেব। গহরই রংগ । "চিন্হত নাহি তোহে" গানটি । লেকিন্ ওস্তাদ যা করলেন, ওপর আর কেউ কিছু করতে নি। জদ্দনও গহরের সংগে গান করেছিলেন, দোচাব তানও জমিয়েছিলেন।

এর পরেই ওস্তাদ আগ্রাওয়ালীকে দিয়ে শুরু করলেন—"কহু সৌতনকে সংগ বিরমায়ে অজ হু ন আয়ে রে।" আরে পাঁচুবাবু! মালকা কী রংগই জমালেন। হায় হায়! সেই যে বোলটা, "মন কি বিথা ময় কাসো কহু, জিয়রা মসোস্ রহু" (মনের ব্যথা অন্যের কাছে প্রকাশ করে কী-ই বা হবে, তাইতে ইচ্ছা করছে মনটা ছিঁড়ে উপড়ে ফেলি।) বস্, এইটে নিয়ে কী সে সুরের লচাও। উত্‌রা নিখাদ্ এমন করে করালাও করলেন তিনি, মনে হ'ল যেন ঐ সুরটাই চলতে থাকুক, অন্য সুর হবে আর একদিন! আমাদের চোখে জল এসে গেল। বাবুজী ত বাজা ছেড়ে দিয়ে বার বার চোখ মুছতে থাকেন। শাবাস আগ্রাওয়ালী!"

বশীরের কথা শুনে ননী দুঃখ করে বলে—"বাবুজী যদি আমাদের ইশারা করেও জানিয়ে দিতেন ত' আমরাও যেতাম।" আমি ননীকে বাবুজীর কথা বলতে তখন ননী বলল—যাক্, যা হওয়ার হয়েই গিয়েছে। তবে পরে মালকার সংগে বোঝাপড়া হবে; ঐ নিখাদ নিয়ে। পাঁচুভাই মনে করিয়ে দিও ত আমায়।" আমি ভাবছিলাম,—বশীরের প্রাণটা ত' যন্ত্রসার প্রাণ নয়! বশীর ত' গানেও মজে, ভাবেও বিহ্বল হয় তাহলে!

একথা সেকথায় জিজ্ঞাসা করলাম,—মৌজুদ্দীন এখনও এলেন না? বশীর বললেন—অনেক রাত্রিতে বিছানা নিয়েছে, আর সকাল হলেই ত' আমার মতো বিছানা ছেড়ে উঠে বসার অভ্যাস নেই তার; কারুর নোকর ত নয় সে! এসে পড়বে এখনই হয়ত। ডাক্তারবাবু কাল রাতে মৌজুদ্দীনের হালত্ দেখলে অবাক হয়ে যেতেন।। মালকার বোলের চোটে মৌজুদ্দীনের চোখে জল আসে। আর চোখ রগড়ায়, আর সুর্মাটা বে-রাস্তায় এসে চোখ-মুখ কাল করে দেয়। বারে বারে বাইরে চলে যায়, আর ফিরে এসে জায়গা বদল করে বসে। আমরা বুঝলাম তার দিল্ ফুলে উঠছে গাইবার জন্য, কিন্তু ওস্তাদ ইশারা না করলে তার সাধ্য কি সুর জাহির করে। যাই হ'ক, পরের মুখে, জেনানার মুখে গান শুনে তার চোখে জল আসতে আর ত' দেখিনি কখনও।"

বশীরের বাঁ হাতের আংগুল যেন আপনা থেকেই চলে গেল হারমোনিয়মে পর্দার ওপরে। আমরা চুপ একেবারে। বশীরের চোখে ধ্যানের ভাব। লক্ষণটা ভালই বলতে হবে।

আমাদের লক্ষ্য ক'রে "জেরা খ্যাল কিজিয়ে" বলেই বশীর খাঁ মুদারার মাঝামাঝি একটা পর্দা থেকে আচমকা সুরের কাকলী তুললেন; ঠিক যেন ডালে বসে কতকগুলি পাখি সুরে ডাক ছাড়ল, আর তেমনিই অপ্রত্যাশিতভাবে থেমে গেল, মাত্র এক সেকেণ্ডের জন্য। নিমেষের পরেই, খাঁ সাহেবের আংগুল সেই আস্তানা ছেড়ে দিয়ে বিদ্যুৎগতিতে চলে গেল চার-পাঁচটা পর্দা এগিয়ে আর সেখানে যেতে না যেতেই বার হয়ে এল

অন্য একদল চিড়িয়ার আওয়াজ! যেন পাল্টা জবাব, বিচিত্র, মনোরম। আর হিসাব থাকে না। দু' দলের কলরব, আর আক্রোশধ্বনি, আর ঝুটোপুটি; কিছুক্ষণের জন্য। কানে শুনতে শুনতেই চোখে দেখার এমন পরিষ্কার অনুভব আর কখনও হয়েছে হয়ত; কিন্তু বিহঙ্গ-কাকলীর প্রতিযোগিতা শুনেছি ও দেখেছি বলে ত' মনে হয় না।

সহসা একটি সোজা সরল চৌদুনি তানের মধ্যে বিলীন হয়ে গেল সেই ইন্দ্রজাল কলরব। আমি আর আমাতে নেই! ইচ্ছা করল বশীর খাঁকে জড়িয়ে ধরি আর বলি ঐ ব্যাপারটা আর একটি বার ক'রে দেখিয়ে দিতে। কাজের গতিকে জড়িয়ে ধরিনি, লজ্জা করেছিল। তবুও তাঁর হাঁটুতে হাত দিয়ে কাকুতি-মিনতির সুরে বললাম—দোহাই খাঁ সাহেব! বিলকুল ঐ তানটি আর একবার করুন। দোহাই আপনার।

বশীর সতেজ চাহনি দিয়ে আমার চোখের দিকে চেয়ে থাকেন। তাঁর চোখে কি ছিল জানিনে, কিন্তু গর্ব বা অহংকারের লেশ-মাত্র অনুভব করিনি। বললেন, "আচ্ছি বাত! ফির লিজিয়ে, শুনিয়ে" ব'লেই সুরের সেই অপূর্ব কাকলী আর ঝুটোপুটি আগা গোড়া অবিকল ছেড়ে দিলেন আমাদের কানে। এতই সহজে নির্ভাবনায় যে, পরে মনে হয়েছে,—কড়ি-খেলোয়াড় যেন কড়ির মুঠো বেঁধে নিয়েই চড়-বড় করে দান ফেলে দিল, আর প্রত্যেক দানই জিতের দান!

সুর ত' একরকমের হাওয়া! কিন্তু নাকে যায় না এটা। দরবারি টৌড়ির এমন হাওয়া সম্ভব! কানে গিয়ে বুক ভরিয়ে দেয়, মন ভরিয়ে দেয় আকুল আবেগ আর উত্তেজনায়!

আর কিছু বলিনি আমরা। কিন্তু বশীর বললেন—"ফির ভি শুনিয়ে ইস্‌কো" আর সঙ্গে সঙ্গে বৈঠক ভরে ওঠে সেই সুর, সেই খেলা, সেই আনন্দের কোলাহলে। বার বার তিনবার হ'ল। ননী আর আমি স্তব্ধ হয়ে বসে আছি। আনন্দে চোখে জল আসে।

চমক ভেঙ্গে গেল। বশীর আমার পিঠে হাত বুলিয়ে দিলেন, আমাদের চোখের দিকে তাকালেন ভাল করে'। সেই স্নেহস্পর্শ আর প্রীতিভরা চাহনি স্মৃতির অতলে জমে আছে, এখনও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

বশীরের কথা কানে গেল। বললেন—আপনারা আমার ছোট ভাইয়ের মতো। আমি যখন মালকার সেই বোল বনানর কথা বলছিলাম, আর আমাদের চোখে জল ভরে যাওয়ার কথা বললাম, তখন আপনাদের মুখ দেখে বুঝলাম, আপনারা বাতে'-বাত্ (গল্পকথা) মনে করলেন। আমি আপনাদের দোষ ধরিনি। কিন্তু মনে করলাম আপনাদের চোখে আজ কিছু জল আনিয়ে ছাড়ব। নয়তো ওস্তাদ্ আর বাবুজীকে আমি এত সেবা করলাম সে-সব বৃথাই হয়েছে। এখন বুকে হাত দিয়ে বলুন ত' চো এক বিন্দু জল এসেছে কিনা। খাঁ সুর দিয়েই চোখে জল বার করা যা ত' সুর আর বোলের তাসিরের ক কী আর বলব!"

ননী খপ্ করে বশীরের বাঁ হাতখা ধরে আঙ্গুলগুলি একে একে পরী করতে থাকে। পরীক্ষার শেষে বলল—সুরের তাসির নয়, খাঁ সাহেব! সুর বাজার মধ্যে বন্ধ হয়ে রয়েছে। তাসি আপনার আঙ্গুলের, আর আমাদে প্রতি আপনার যে মহব্বত্—সে আপনার কলেজার। এতেও যদি চো জল না আসে ত' আমাদের চোখ চোখ নয়।

বশীর খাঁ তখুনি দু' হাত দি ননীকে আদাব করেন, আর বার বা তিনবার নাক আর কানের ডগা ছুঁ ওস্তাদ্দের স্মরণ করেন।

জিজ্ঞাসা করলাম—খাঁ সাহেব, এ ত' দেখছি লা-জবাব এক তালিম তান! কোথায় পেলেন? বাবুজী কাছে? কবে পেলেন? ইত্যাদি।

আমার কথার জবাবে বশীর খাঁ এ তানের প্রসঙ্গে একটা কাহিনী ব গেলেন; আমার দৃষ্টিতে এটা সে তানের ইতিহাস। বাদশাহ অওরঙ্গজে ১৭০৭ সালে মারা গিয়ে ঐতিহাসি বক্তা বা ব্যাখ্যাতাদের কতোখানি উপকা করে গিয়েছেন বা এখনও করছে জানিনে। কিন্তু এই আখ্যায়িকা আমা মহোপকার সাধন করে। আমার গুরু দেবেরও গুরুদেব গণপতরাও ভাই সাহেবের পুণ্য স্মরণে আমাকে ধন্য ক এই গল্পটি। তা ছাড়া, এর ঐতিহাসি অন্য উপকার আর কিছু আছে ব বোধ হয় না। প্রধানভাবে বশীর জবান্ অবলম্বন করে গল্পটি স্ম করি।
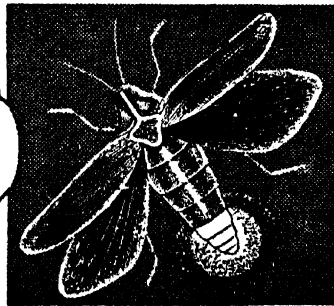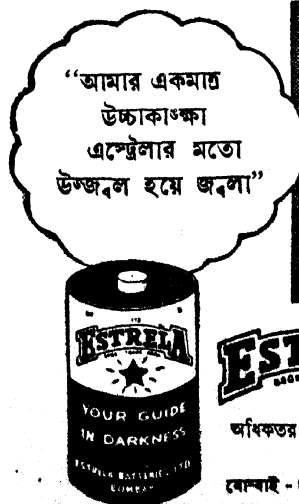
(ক্রমশ

ল্যাক্সা-যাত্রা

মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়

॥ ৬ ॥

কাপ্তেন বল্লেন—আমাদের দেশ হলো 'মোটালা' গ্রামেরই ঠিক পাশে। আমাদের গ্রামের উপর দিয়ে গ্যোটা খাল বয়ে গেছে। ঠাকুর্দা ছেলেবেলা থেকে ঐ গ্রামে মানুষ, কাজেই গ্যোটা খালের সত্য ইতিহাস তিনি যদি না জানেন তো আর কে জানবে? ঠাকুর্দা বলতেন, হিসিঙ্গেন' দ্বীপে বহুকাল আগে এক াজপুত্র থাকতেন। হিসিঙ্গেন কোথায় ানেন তো? ভেনার হ্রদ থেকে গ্যোটা দী বেরিয়ে এসে যেখানে সমুদ্রে মশেছে সেখানে নদীর দুই বাহুর াঝখানে পড়ে একটি ত্রিকোণাকার ভূখণ্ড কটি ব-দ্বীপের সৃষ্টি করেছে। ম্যাপ ল্লেই দেখতে পাবেন, এই হচ্ছে িসিঙ্গেন। এই হিসিঙ্গেন ব-দ্বীপের ূব কোণে হচ্ছে এখনকার গ্যোটেবুর্গ দর। তখনকার দিনে গ্যোটেবুর্গ ল কি না, অথবা তার কি নাম ছিল না নেই। কিন্তু হিসিঙ্গেন দ্বীপ ছিল খনকার দিনে অতি উর্বর দ্বীপ। খানকার মাটিতে সোনা ফলত। সিঙ্গেন দ্বীপে যা গম হত, যা ফসল ত, যা ফল হত, যা তরকারি হত, যা ধ হত, যা মাখন হত, যা পনির হত, ডিম হত, হিসিঙ্গেন দ্বীপের জেলেরা মাছ ধরত, তা হিসিঙ্গেনের মতো খানা দ্বীপের লোক খেয়ে শেষ করতে ত না। কাজেই হিসিঙ্গেন-রাজ এই বাড়তি ফসল বাড়তি খাদ্যদ্রব্য দ্বীপের রে বিক্রী করতেন আর তার বদলে তেন দেশের লোকের জন্যে ভাল কাপড় চোপড়, জুতো, গৃহস্থালীর নস, আর নানারকম দ্রব্য, যা সঙ্গেন দ্বীপে হয় না। সে রাজ্যে ন্দা অভাব ছিল না, প্রজারা সুখে ন্দে থাকত।

হিসিঙ্গেন রাজপুত্রের ছিল সমুদ্রে ঘুরে বেড়াবার শখ। তিনি ছিলেন যেমন সুন্দর সুপুরুষ, তেমনি ছিলেন শক্তিমান। আর নৌচালনায় ছিলেন তিনি দক্ষ। তখনকার দিনে সুইডেনের পশ্চিম উপকুলের রাজাদের রাজপুত্রদের সকলকেই নৌচালনা ভাল করে শিখতে হত। কারণ প্রথমত সমুদ্রের দিক থেকে প্রায়ই দেশ আক্রান্ত হত; দেশরক্ষা করতে গেলে জলযুদ্ধ ভাল করে জানা চাই। আর দ্বিতীয়ত তখনকার রাজবংশ বিয়ে করতেন এমন কন্যাকে যার দেশ সাগরকূলে। সমুদ্রের উপরে এমনই তাদের টান ছিল যে, সাগরকূলের কন্যা না হলে তাঁদের বিয়েই হত না। আর বিয়ে করে কন্যাকে ঘরে আনতেন তাঁরা নিজেদের নৌকোয় করে। সাজানো নৌকো নিজে চালিয়ে—এই ছিল রীতি।

হিসিঙ্গেন রাজপুত্র একবার সমুদ্রে গিয়েছিলেন বেড়াতে তাঁর নিজের নৌকোয়। সঙ্গে ছিল কয়েকজন অনুচর। হঠাৎ উত্তর দিক থেকে উঠল এক ঝড়। নৌকো ছুটল ঝড়ের মুখে তীরের বেগে। কূলে কোথায় পড়ে রইল তার ঠিক রইল না। দিকভ্রম হয়ে গেল। তিন দিন তিন রাত এমনি সমুদ্রের কোলে ভেসে ভেসে তারপর যখন ঝড় থামল, তখন রাজপুত্র আর অনুচরেরা দেখতে পেলেন আকাশের পথে ঝাঁকের পর ঝাঁক পাখী উড়ে চলেছে। এই পাখীর ঝাঁক নিশ্চয় ডাঙার দিকে যাচ্ছে, এই ভেবে সেই পাখী-ওড়া পথ লক্ষ্য করে তাঁরা নৌকো বাইতে লাগলেন। সারাদিন নৌকো বেয়ে তাঁরা শেষে কূল পেলেন এবং যেখানে এসে পৌঁছলেন তার নাম হচ্ছে 'মেম্'। এ হচ্ছে সুইডেনের পূর্ব উপকূলে বল্টিক সমুদ্রের উপর। বল্টিকের জল এখানে 'ফিয়োর্ড'-এর আকার নিয়ে জমির মধ্যে প্রায় কুড়ি কিলোমিটার ঢুকে গিয়েছে। ফিয়োর্ড-এর শান্ত স্থির জলের উপর শান্ত স্থির এই গ্রাম 'মেম্' যেন চুপটি করে বসে ফিয়োর্ড-এর জলে নিজের মুখচ্ছবি দেখছে। রাজপুত্র তাঁর অনুচর নিয়ে এই গ্রামে এসে উঠলেন।

গ্রামের লোকেরা, যখন শুনলো হিসিঙ্গেন দ্বীপের রাজপুত্র এসেছেন, তারা খাতির করে নিয়ে গেল তাঁকে গ্রামের জমিদারের বাড়ি। জমিদারবাড়িতে রাজপুত্র পরম সমাদরে রইলেন। রাজপুত্রের নৌকোয় ঝড়ের ফলে যে ভাঙচোর হয়েছিল তা গ্রামে সারানো হতে থাকলো।

এই জমিদারের এক পরমা সুন্দরী মেয়ে ছিল। রাজপুত্র তাকে দেখে মুগ্ধ হলেন। রাজপুত্র জমিদারকে জানালেন
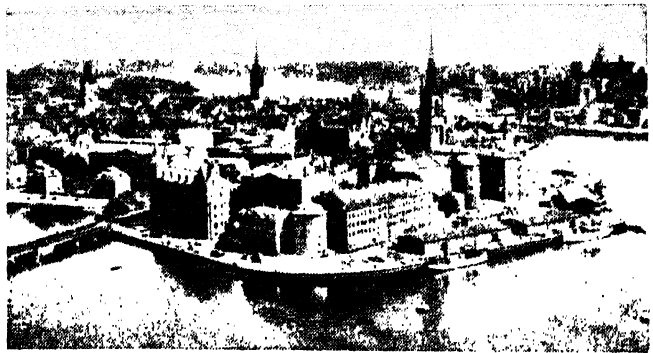
স্টকহলম

তিনি তাঁর কন্যাকে বিয়ে করে নিয়ে যেতে চান। জমিদার তো খুশীই হলেন। এমন জামাই তিনি পাবেন কোথায়? বিয়ে হয়ে গেল ধুমধাম করে। ইতিমধ্যে রাজপুত্রের নৌকো সারানো হয়ে গেল। রাজপুত্র হুকুম দিলেন রেশমী কাপড় আর জরি দিয়ে নৌকো ভাল করে সাজাতে—তিনি বৌ নিয়ে নৌকো বেয়ে দেশে ফিরবেন। নৌকো সাজল, অনুচরেরাও সাজল। গ্রামের লোকেরা নৌকোয় ফুল ভরে দিল। তারপর গ্রাম শুদ্ধ সবাই এসে জমিদারকন্যাকে রাজপুত্রের নৌকোয় তুলে দিলে। জমিদার জমিদারনী আর গ্রামের সকলে চোখের জল মুছে তীরে দাঁড়িয়ে রইল—রাজপুত্র তাঁর বধুকে নিয়ে জলের পথে পাড়ি দিলেন। রাজপুত্র নিজে ধরে বসলেন হাল—যেমন হিসিঙ্গেন দেশের রীতি।

ফিয়োর্ড-এর শান্ত জল ছেড়ে নৌকো যখন খোলা সমুদ্রে গিয়ে পড়ল তখন আকাশ অন্ধকার করে এলো ঝড়। বড় বড় ঢেউ আর নৌকোর দুলুনি দেখে জমিদারের মেয়ে ভয়ে কান্না করলেন। রাজপুত্র যত তাকে যত বলেন এই ঢেউ দেখে ভয় চেয়ে কত বড় বড় ঝড়ের মধ্যে আমাদের নৌকো বেয়ে নিয়ে জমিদারকন্যা কিন্তু কিছুতেই না। পাটাতনের উপর বসে তিনি ঝরে কাঁদেন আর বলেন তাঁর দেশে ফিরিয়ে দিয়ে আসতে। শেষে আর থাকতে পারলেন না, বল্লেন, ফেরাও নৌকো মেম্-এর

রেশমী কাপড়, জরী আর সাজানো নৌকোকে ফিরতে শুদ্ধ লোক অবাক হয়ে ঘাটে এলো। তারপর যখন সকলে কারণ শুনলে তারা জমিদারের বড় ছেলে যে সমুদ্রে গিয়েছিলেন।

সে যাই হোক, জমিদারকন্যা এসে আর নড়তে চাইলেন না। বল্লেন—স্থলপথে ঘোড়ায় চতুর্দোলায় চেপে হিসিঙ্গেন কিন্তু রাজপুত্র রাজি হলেন না। বল্লেন, তাঁদের বংশের কোনো রাজপুত্র ঘোড়ায় করে তাঁরা সকলেই রাজবধূ এনেছেন করে নিজের হাতে হাল ধরে। রাজপুত্রের নৌকো ঘাটে বাঁধা রাজপুত্র ঘোড়ায় করে স্থলপথে ফিরে গেলেন। বলে গেলেন, কন্যার যদি কোনোদিন জলপথে দেশে আসবার সাধ জাগে তবেই আসবেন বধূকে নিতে।

দেশে ফিরে এসে রাজপুত্রের এক নতুন মতলব খেলে গেল। করে তিনি যে পথ দিয়ে সে পথে তিনি দেখেছিলেন একটা একটা হ্রদ প্রায় সারা রাস্তা জুড়ে রয়েছে। সুইডেন দেশে যে থাকতে পারে তা তিনি জানতেন এই হ্রদগুলিকে যদি খাল কেটে মতো জুড়ে দেওয়া যায়, হিসিঙ্গেন থেকে মেম্ পর্যন্ত একটা জলপথ সৃষ্টি করা যায়। মতলব মাথায় আসতেই রাজপুত্র লাগলেন। খাল কাটা শুরু হয়ে

বসন্তকালের আরম্ভে

ঘোড়ায় করে দেশে ফিরে এসেছিলেন। পরের বছর যখন পাহাড়ের বরফ গলতে আরম্ভ করেছে, নেড়া গাছের ডাল পাতার কুঁড়িতে ভরে আসছে আর মাঠের কোণে কোণে ফুটতে আরম্ভ করেছে বসন্তের প্রথম ফুল 'স্নো ড্রপ' ঠিক তখনই রাজপুত্র খাল কাটা শেষ করে মেম্‌এ এসে পৌঁছলেন।

এবারে আর নৌকো করে শ্বশুরবাড়ি যেতে জমিদার-কন্যার কোনো বাধা রইল না। ঘাটে বাঁধা রাজপুত্রের নৌকো আবার নতুন-সাজে সাজল। সারা গ্রাম পতাকা দিয়ে সাজানো হল। জমিদার মস্ত ভোজ দিলেন। মনে হল যেন রাজপুত্র আর জমিদার-কন্যার আর একবার নতুন করে বিয়ে হচ্ছে। তারপর জমিদার-কন্যা রাজবধূর সাজে রাজপুত্রের হাত ধরে হাসিমুখে নৌকোয় গিয়ে উঠলেন। রাজপুত্র নিজের কাটা খালের মধ্য দিয়ে নৌকো চালিয়ে বৌ নিয়ে দেশে ফিরলেন। রাজবংশের পুরোনো রীতি বজায় রইল; নতুন বৌ-এরও মনে কোনো কষ্ট রইল না।

এই হচ্ছে গোয়াটা খালের ইতিহাস। ...টেবুর্গ থেকে গোয়াটা খালের পথে ...হলম হচ্ছে তিনশো ষাট মাইল। ...তু হ্রদ নদী বাদ দিলে এই পথে ...ষের কাটা খাল হচ্ছে মাত্র পঞ্চাশ ...ল। এই পঞ্চাশ মাইল খাল কাটতে ...হিসিংগেনের রাজপুত্রের একবছর ...গ থাকে, সেইটাই বেশী বিশ্বাস্য, না ...ফোর্ডের মতো ইঞ্জিনীয়ারের লেগে- ...বাইশ বছর সেটাই বিশ্বাসের ...যুক্ত?

আমরা একবাক্যে স্বীকার করলুম ...সিংগেনের রাজপুত্রই এ খাল ...ছেন, এর আর কোনো ভুল নেই।

কাপ্তেন বল্লেন—দেখুন একবার ...স্না রাতের দিকে তাকিয়ে। দেখুন ...র খালের জলের ছবি। চুপটি করে ...ন একবার স্টীমারের জল কেটে ...র ঝর্‌ ঝর্‌ শব্দ। চোখ বুজে ... এইখান দিয়ে রাজপুত্র তার ... নিয়ে ঠিক এমনি এক রাতে তাঁর ... নৌকোয় করে ফিরছেন। কতদিন ...কাজের শেষে এই স্টীমারে বসে চোখের সামনে হিসিংগেন রাজপুত্র

সিগটুনার কাছে হ্রদ

আর তাঁর বধূর ভেসে যাওয়ার ছবি দেখেছি। খালের যে জায়গাটা সুন্দর লেগেছে, ভেবেছি হয়তো রাজপুত্র এইখানে নৌকো ভিড়িয়ে রাজবধূর হাত ধরে জমিতে গিয়ে নেমেছেন। এমনি জ্যোৎস্না রাতে খালের ধারে উঁচু জমিটার পাশে গাছের শিকড়ের উপর পাশাপাশি বসেছেন। এই ধারা কত কি ছবি দেখেছি!

আমি কাপ্তেনের হাত চেপে বল্লুম—দোহাই কাপ্তেন! একটি অনুরোধ। আজকের এই জ্যোৎস্না রাতে এই উপবনের ধারে একবার থামান আপনার স্টীমারটা কয়েক মিনিটের জন্যে! চট করে নেমে একবার দেখে আসি চারিদিকের শোভা!

কাপ্তেন—হাঃ হাঃ করে হেসে উঠে বল্লেন—আপনাদেরও দেখছি আমার মতো ভাবালুতায় পেয়ে বসেছে। উঁহুঃ, ওটি হবার যো নেই। আমি তো আর হিসিংগেনের রাজপুত্র নই। আমি হচ্ছি এই জাহাজের কাপ্তেন। আমার হাত-পা বাঁধা। কাজের বাঁধনে নিয়মের বাঁধনে আমার চলতে হয়। শুধু যখন ছুটি পাই, তখনই হচ্ছে আমার কল্পনার মেঘে চড়ে উধাও হবার সময়। আপনাদের অনেক সময় নষ্ট করলুম। রাত হয়েছে, আপনারাও নিশ্চয় ক্লান্তি বোধ করছেন।

এই বলে কাপ্তেন উঠে দাঁড়ালেন। আমরা বল্লুম—সময় নষ্ট আবার কি? এই পরিবেশের মধ্যে এমন চমৎকার গল্প—এতে কি আর সময়ের কথা কারো মনে থাকে? অনেক ধন্যবাদ কাপ্তেন অনেক ধন্যবাদ!

কাপ্তেন বিদায় নিলেন। মিরেক বল্লে—জাহাজের কাপ্তেন এরকম কাব্যিক হতে পারে, গোয়াটা খালে না এলে এ আমার ধারণাই হত না।

মধ্যরাত অনেকক্ষণ পেরিয়ে গেছে। জাহাজের অন্যান্য যাত্রী ততক্ষণে সব ঘুমে অচেতন। আমরাও তাই আর দেরি না করে বিদায় বাচনের পর যে যার বিছানায় গা এলিয়ে দিলুম।

ভোরবেলা যখন ঘুম ভাঙল তখন মেম্‌ ছাড়িয়ে আমাদের স্টীমার ফিয়োর্ড-এর মধ্যে দিয়ে বল্টিক সাগর অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছে। আকাশে পাৎলা মেঘ, জলের রং ঘোলাটে। সমুদ্রে এসে পড়তেই দেখলুম সে এক অদ্ভুত দেশ। সমুদ্রের জলে কে যেন মুঠো মুঠো নুড়ি ছড়িয়ে দিয়েছে।

এক একটি নুড়ি হচ্ছে এক একটি দ্বীপ। কত যে অসংখ্য দ্বীপ আমাদের সামনে পিছনে ডাইনে বাঁয়ে তার ইয়ত্তা নেই। তাদের মধ্যে দিয়ে এঁকে বেঁকে রাস্তা করে নিয়ে আমাদের স্টীমার এগোতে লাগল। গাছের সবুজ ঘেরাটোপে ঢাকা দু' চারটে বড় বড় দ্বীপ চোখে পড়ে, কিন্তু বেশীর ভাগ দ্বীপই ছোট—তাতে আছে শুধু পাথর আর পাথরের ফাঁকে ফাঁকে সামুদ্রিক উদ্ভিদ। ছোট গোলাকৃতি দ্বীপগুলি এত সুন্দর যে মনে হয় একখানি ছোট্ট ঘর বেঁধে থাকবার উপযুক্ত জায়গা এর থেকে আর ভালো কিছুই হতে পারে না। দ্বীপগুলি যেই কাছে আসে অমনি উঁকি মেরে দেখি সেই নিরালা ঘরখানি কোথায়? কিন্তু কোনো দ্বীপেই মানুষের বাঁধা কোনো ঘর চোখে পড়ে না। কোনো দ্বীপেই কোনো বসতি নেই। শুধু সমুদ্রের নোনা জল সেই নির্জন দ্বীপের গায়ে আছড়ে পড়ছে।

মেঘলা আকাশের নীচে ফেনিল সমুদ্রের কিনারায় এই দৃশ্য দেখতে দেখতে আমরা ক্রমে স্টকহলমে এসে পেঁছিলুম। সুইডেনের রাজধানী স্টকহলম। এখানে দু' একদিন কাটিয়ে আমাদের যাত্রা শুরু হবে নরওয়ের রাজধানী অস্‌লোর দিকে। আমরা গিয়ে উঠলুম স্টকহলমের বিরাট য়ুথ হস্টেলে। সেখানে পাঁচ ছ'শো চরণিকের জায়গা। খুব কম জায়গাই খালি পড়ে আছে। এখানে এলে মনে হয় যেন সমস্ত সুইডেনই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে বাহিরটাকে দেখবার জন্যে। চারিদিকে খালি পিঠঝুলি আর পিঠঝুলি। খাটের উপর, বারান্দার কোলে, খাবার টেবিলে, চেয়ারে, চরণিকের পিঠে কেবল ঐ একটি জিনিস চোখে পড়ে—পিঠঝুলি। ঘর-ছাড়ারা সব কিছু ফেলে দিয়ে বেরিয়ে এসেছে—বিছানা চাদর, লেপ, কম্বল, ইস্ত্রি করা কাপড়, নেকটাই, পালিশ করা জুতো, পেয়ালা, পিরিচ, কাঁটা চামচ, হাঁড়িকুঁড়ি ডেকচি, ঘরের কোণের যত কিছু আরাম, যতকিছু সুবিধা বরবাদ করে সঙ্গে নিয়েছে পথের সাথী জীবনের সম্বল ঐ এক পিঠঝুলি। যতগুলি যাত্রী ততগুলি পিঠঝুলি।

স্টকহলমে আমরা মোটামুটি দুটি জিনিস দেখলুম। প্রথম হচ্ছে শহরের মাঝখানে চৌরাস্তার মোড়ে একটি টুপির দোকান। খুব দামী দামী শৌখিন টুপি এখানে পাওয়া যায়—শহরের বড়লোকের গিন্নীরা এখানে টুপি কিনতে আসেন। কিন্ত এ দোকানের বিশ্বজোড়া খ্যাতি ভাল টুপির জন্যে নয়। বিখ্যাত ছায়াচিত্র তারকা গ্রেটা গার্বো ছায়াচিত্রে নামবার আগে টুপি বিক্রী করতেন এই দোকানে—এই কারণে এই দোকানের এত নাম। দলে দলে বিদেশী—যারাই স্টকহলম দেখতে আসে তারাই এই দোকান দেখতে আসে। আমরাও গেলুম। তবে সারি সারি নানা আকৃতির টুপির বদলে গ্রেটা গার্বোকে দেখতে পেলেই আমরা খুশী হতুম।

স্টকহলম-এর দ্বিতীয় দৃশ্য হচ্ছে স্কান্‌সেন। লণ্ডনের ছাত্র ক্লাবের আমার একটি সুইডিশ বন্ধু তখন স্টকহলম্‌-এ ছিল। তাকে খুঁজে বার করলুম।

কাইজা হঠাৎ আমাদের দেখে কি যে করবে ভেবে পেলেনা। খুব রাগ করল যখন শুনলে যে আর মাত্র একদিন আমরা স্টকহলম্‌-এ থাকব। কাইজা বল্লে—এক-দিনে কখনও স্টকহলম্‌ দেখা যায়? কি তোমাদের দেখাবো, কোন দিক থেকে আরম্ভ করব কিছুই যে ভেবে পাচ্ছিনা।

আমরা কাইজাকে আশ্বস্ত করবার জন্যে বল্লুম—আমরা ইতিমধ্যেই গ্রেটা গার্বোর টুপির দোকান দেখে নিয়েছি, কাজেই আর একটা কিছু দেখবার মতো দেখতে পেলেই আমরা খুশী হই।

কাইজা একটু ভেবে বল্লে—ঠিক হয়েছে। চলো তবে সকলে মিলে 'স্কানসেন্'।

—সেটা আবার কি?

—চলো গেলেই দেখতে পাবে, বুঝিয়ে বলতে হবে না।

'স্কানসেন'কে বলা যেতে পারে স্টক-হলম্‌-এর প্রমোদ উদ্যান। কিন্তু প্রমোদ উদ্যান শুনলে যে ছবি মনে আসে এটা তা নয়। এটা বড়লোকের প্রমোদ-কা[illegible] নয়—এর অধিকার জনসাধারণের। এ[illegible] সেই কারণে এখানে আমোদের সঙ্গে প্র[illegible] শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। রাজধানী[illegible] উপকণ্ঠে একটা গোটা দ্বীপের উপর [illegible] স্কানসেন্ পার্ক। পার্কের বিভিন্ন অং[illegible] এক এক রকমের ব্যাপার। ছোটদের খে[illegible] জায়গা, ছোটদের রঙ্গমঞ্চ, ছোট[illegible] বায়োস্কোপ এবং চিড়িয়াখানা [illegible] অংশে। বড়দের হালকা গান বা[illegible] ওস্তাদি গান বাজনা, লোক সংগীত, লো[illegible] নৃত্য আরেক অংশে। মিউজিয়াম, র[illegible] মঞ্চ, নানা রকম ক্রীড়াভূমি আরেক অং[illegible] মিউজিয়াম-ভূমিতে বিশেষ দ্রষ্টব্য [illegible] ঐতিহাসিক যুগ থেকে সুইডেনে [illegible] রকম গোলাবাড়ি ছিল তারই একটা সং[illegible] ছোট ছোট পুতুল খেলার বাড়ি নয়; [illegible] গোটা বাড়িগুলোকে বয়ে এনে স্কানসে[illegible] এর মিউজিয়ামে বসিয়ে দিয়েছে। এইর[illegible] সংগ্রহ পৃথিবীর আর কোথাও আছে [illegible] আমার জানা নেই। এমনি আরো ক[illegible] আছে। আর সব জায়গায় আছে স[illegible] সুন্দর কফিখানা, মিল্ক-বার' [illegible] রেস্তরাঁ। স্কানসেনের উপভোগ্য যা [illegible] উপভোগ করে সেখানকার কফিখানার [illegible] রেস্তরাঁর অত্যাৎকৃষ্ট খাদ্য খেয়ে [illegible] কাইজাকে প্রাণের সঙ্গে ধন্যবাদ জা[illegible] আমরা স্টকহলম্‌-এর পালা শেষ কর[illegible]

ধীরাজ ভট্টাচার্য

॥ উনিশ ॥

অদম্য কৌতুহল বাড়ি আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে রাজি হল না। কান থেকে বেরিয়ে অপেক্ষাকৃত একটা র্জন স্থানে দাঁড়িয়ে খামটা ছিঁড়ে লাম। ভিতরে রয়েছে পাঁচখানা কড়ে নতুন একশ' টাকার নোট। সারা হর উপর দিয়ে একটা অজানা শিহরণ গেল। তখনি আবার অন্য একটা তায় ভয়ে কাঠ হয়ে গেলাম। এই টা যতদিন না শোধ হয় ততদিন যদি নে বন্ধ হয়ে যায়? তাহলে? তেও সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল। একটু স্তত করে আবার পার্টিশনের পাশে দাঁড়ালাম। ভেতরে নরেশদা হবের সঙ্গে হেসে কি একটা আলোকরছেন। যা থাকে কপালে, সাহসে করে ঢুকে পড়লাম ভেতরে। হবের কাছে গিয়ে এক নিশ্বাসে বলে াম,—'স্যর, মাসে মাসে কিছু কিছু এই টাকাটা কাটলে আমার সুবিধা নইলে এক সঙ্গে কেটে নিলে—'

আর বলতে পারলাম না, চীৎকার উঠলেন রুস্তমজী—'তোমাকে আমি কক্ষণ আগে বাড়ি যেতে বলেছি। ও এখানে কি করছ?'

উত্তরে কিছু বলতে গেলাম। ধমক সাহেব বললেন—'কোনও কথা চাইনে। গেট আউট।'

নরেশদাও ইশারা করে বাইরে যেতে বললেন। রীতিমত আশাহত হয়ে বাইরে বেরিয়ে এসে সামনে ফুটপাথের উপর দাঁড়িয়ে রইলাম। আধ ঘণ্টা বাদে নরেশদা বেরিয়ে এলেন। আমায় দেখে হেসে বললেন—'বাড়ি যাওনি এখনও?'

বললাম—'সাহেব হঠাৎ অত রেগে গেলেন কেন নরেশদা?'

—'নাঃ, তোমায় বুদ্ধিটা ভগবান একটু কমই দিয়েছেন দেখতে পাচ্ছি। সাহেবও সেই কথা বললেন।'

নিজের মনকে প্রশ্ন করলাম—দ্বিতীয়বার সাহেবের সঙ্গে দেখা না করে সটান বাড়ি চলে এলেই বুদ্ধিমানের কাজ হত কি?'

নরেশদা বললেন—'তোমার কথাই আলোচনা হচ্ছিল সাহেবের সঙ্গে। দুর্গাদাস ঝগড়া করে চলে যাওয়ার পর সাহেব বেশ একটু দমে গেছেন। আমায় বলছিলেন—দেখ না মিটার, ছেলেটাকে যদি মানুষ করতে পার, চেহারায় দুর্গার সঙ্গে খানিকটা সাদৃশ্য আছে, তবে দুষ্টু বুদ্ধিতে দুর্গার ধারে কাছে ঘেঁষতে পারবে না। আরও অনেক কথা হল। এখন মাস দুই আমার নৌকাডুবি বন্ধ।

বিস্মিত হয়ে বললাম—'কেন নরেশদা?'

—'সত্যিই তোমার মগজে বুদ্ধির একান্ত অভাব।'

চুপ করে আছি দেখে নরেশদাই বললেন—'বুদ্ধির ঢেঁকি, আর কয়েকদিন বাদেই তোমার বাবার শ্রাদ্ধে মাথা মুড়িয়ে ফেলবে। তারপর ঐ টাক মাথা নিয়ে 'রমেশে'র পার্ট করবে কি করে? কাজেই আবার যতদিন না মাথায় চুল গজায় ততদিন অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় কি!'

মনে মনে সত্যিই লজ্জা পেলাম।

নরেশদা বললেন—'সেই কথাই আলোচনা করতে সাহেবের কাছে এসেছিলাম। আমার ভয় ছিল, হয়তো বলবে—অন্য লোককে রমেশের পার্ট দিয়ে শুটিং চালিয়ে যাও। কিন্তু সাহেব

নিজে থেকেই বললেন,—তোমার হিরো খানিক আগে এসেছিল, ওর বিপদের কথা সব শুনেছি, মাস দুই শুটিং বন্ধ রাখ, আর ওকে বলে দিও মাসের তিন তারিখে শুধু মাইনে নিতে আফিসে আসতে।'

দ্বিধাভরে বললাম,—'কিন্তু এই পাঁচশ' টাকার কি ব্যবস্থা হবে?'

একটু হেসে নরেশদা বললেন,—'এরকম গোপন দান রুস্তমজীর অনেক আছে। এ নিয়ে হৈ চৈ করলে সাহেব ভীষণ চটে যান। তাই তো টাকার কথা বলতেই সাহেব চটে উঠলেন। নিশ্চিন্ত মনে বাড়ি চলে যাও। ও টাকা কোনও দিনই তোমার মাইনে থেকে কাটা হবে না।'

জাহাঙ্গীর সাহেবের বেয়ারা এসে বললে—'সাহেব সেলাম দিয়েছেন।' তাড়াতাড়ি সিঁড়ি বেয়ে উপরে চলে গেলেন নরেশদা।

ফুটপাথ থেকে দু তিন পা পূর্বদি এগিয়ে গেলেই মদের দোকানের সাম পড়া যায়। উত্তর থেকে দক্ষিণ-মু প্রকাণ্ড লম্বা ঘর। শেষ প্রান্তে কাঁচে পার্টিশন। ওখান থেকে পরিষ্কার দে না গেলেও আবছা দেখা যায়, কালো পা কোট ও টুপি মাথায় রুস্তমজীকে একদৃষ্টে চেয়ে মনে মনে ভাবলাম- এ যুগে এরকম মনিবও আছে?

বোধ হয় বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়ি ছিলাম, দেখলাম চেনা অচেনা অনেকে বেশ একটু অবাক হয়ে চাইতে চাই যাচ্ছেন।

আমাদের পাড়ার একটি ভদ্রলোক মুখের চেনা-পরিচয়, বিশেষ আলা ছিল না। তিনি যেতে যেতে থমকে আমার কাছে দাঁড়িয়ে পড়লেন। মিনি খানেক নীরবে একবার আমার দিকে একবার দোকানের প্রবেশপথের দু কাঁচের শো-কেসে রাখা রং বেরঙে বিলাতী মদের বোতলগুলোর দিকে চে বেশ একটু শ্লেষের সঙ্গে বললেন,- 'এখনও অশৌচ কাটেনি, এর মধ্যে কথামালার শৃগালের মত দ্রাক্ষাফলে দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে আছ, উ উত্তরের অপেক্ষা করলেন না ভদ্রলো হন হন করে এগিয়ে বোধ হয় এই মুখ রোচক খবরটা পাড়ার চেনা-অচে সবাইকে পরিবেশন করবার জন্যই চলে গেলেন।

রুস্তমজীর কথাই সারা মনটাকে আচ্ছন্ন করেছিল, চেষ্টা করেও অন্য কিছু ভাবতে পারছিলাম না। ধর্মতলায় এ কালীঘাটের ট্রামে উঠে বসলাম। গড়ে মাঠের পাশ দিয়ে হু হু করে ছু চলেছে ট্রাম, মনটাও সঙ্গে সঙ্গে ছুটেছে বাড়ির দিকে।

খুলনা লোন কোম্পানীর সম সুদের টাকা শোধ করে এক বছরের ম নিশ্চিন্ত হয়ে কলকাতায় ফিরে এলাম পাঁচশ' টাকার সবটা লাগেনি, পঁচিশ টি টাকা বাঁচল। সেই টাকায় আর 'দীপা নাট্য সঙ্ঘে' ভর্তি হয়ে এক মাসের অগ্রি অ্যাড্‌ভান্স পঁচাত্তর টাকা নিয়ে যথাসম বাবার পারলৌকিক কাজ শেষ করলাম এ ক'দিন কিছু ভাববার সময় পর্যন্ত

ইনি। এইবার একটু নিশ্চিন্ত হয়ে দিক বেশ করে ভেবে একটা ব্যবস্থা তে হবে। দুপুর বেলায় উপরের র শুয়ে এইসব চিন্তা করছি, ছোট ই এসে বললে—বাড়িওলা লালবিহারী- নিচের ঘরে বসে আছেন। এদিকটা ন্দম ভেবে দেখিনি। মাথায় নতুন র আকাশ ভেঙে পড়ল।

বাড়িওয়ালা লালবিহারী মুখোপাধ্যায় কাতার কাছে বৈদ্যবাটীতে বাস তেন। বয়স ষাটের কাছাকাছি। ফুট লম্বা জোয়ান চেহারা, মুখে অল্প ড় ও গোঁফ। সদালাপী নিষ্ঠাবান্ মণ। রিটায়ার্ড গভর্নমেণ্ট অফিসার, নশন নিয়ে বাড়িতেই বসে থাকেন। ত মাসের নির্দিষ্ট দশ তারিখে সকালে মাদের বাড়িতে এসে দুপুরে খেয়ে- য় বাড়িভাড়া নিয়ে বিকেলে বৈদ্যবাটী রে যেতেন। বাবা ওঁকে যথেষ্ট ভক্তি ধা করতেন এবং দাদা বলে ডাকতেন। ই সুবাদে আমরা সবাই জ্যেঠামশাই ল ডাকতাম। বাবার অসুখের তিন । মাস কি আরও বেশি দিন থেকে ন আসেন না।

তাড়াতাড়ি উঠে নীচে নেমে গিয়ে াম করে পাশে বসলাম। মামুলী ল প্রশ্নাদির পর একটু ইতস্তত করে াটা উনিই পাড়লেন।—'বাবা ধীরাজ! ামার এই দুঃসময়ে কথাটা তুলতেও জা হচ্ছে আমার। কিন্তু বাবা নতো, বাড়িতে এক গাদা পোষ্য। বল মাত্র পেনশনের ক'টি টাকা আর বাড়িভাড়া পঁয়তাল্লিশ টাকা। তাও জ এগার মাস পাইনি।'

বাড়িভাড়ার ব্যাপারে কোনওদিন মাথা াইনি আর বাবাও সে সম্বন্ধে নওদিন কিছু বলেন নি আমাকে। ন্তু এগার মাস বাড়িভাড়া দেওয়া হয়নি কল্পনাতীত। কি উত্তর দেব, মুখ করে বসে রইলাম।

জ্যেঠামশাই বললেন—'জানি বাবা, তোমার পক্ষে এক মাসের ভাড়া ওয়াও অসম্ভব। আর সে জন্যও আমি সিনি। তুমি যদি কিছু মনে না —'

কথাটা শেষ করলেন না জ্যেঠামশাই, একটা সংকোচ এসে বাধা দিল। বললাম,—'আপনি বলুন জ্যেঠামশাই, আমি জানি, আপনি যা বলবেন আমার ভালর জন্যই বলবেন।'

জ্যেঠামশাই বললেন,—'বাড়িভাড়া তোমার সুবিধামত যখন পার কিছু কিছু করে দিও, কিন্তু বর্তমান অবস্থায় মাসে পঁয়তাল্লিশ টাকা বাড়িভাড়া দেওয়া তোমার পক্ষে সম্ভব কি? সেইজন্যে আমি বলছিলাম, তুমি যদি অল্প ভাড়ার একটা বাড়ি দেখে উঠে যেতে তাহলে আমাদের দুপক্ষেরই সুবিধে হত।'

খুব যুক্তিপূর্ণ কথা। এদিক দিয়ে একেবারে ভেবে দেখিনি। বললাম,— 'তাই হবে জ্যেঠামশাই, এ মাসের শেষ দিকে আমি বাড়ি ছেড়ে দেব, বাকি ভাড়া আমি প্রতি মাসে কিছু কিছু করে দেব।'

ঐ পাড়াতেই, বলরাম বোসের ঘাটের কাছেই দুখানা টিনের ঘর পাওয়া গেল। মাটির দেওয়াল, মেঝে ও রক সিমেণ্ট করা, সামনে ছোট্ট এক ফালি উঠোন, পাশে দিকে একটা এঁদো পুকুর। বড় রাস্তা বলরাম বোসের ঘাট রোড থেকে একটা সরু গলি বেয়ে খানিকটা এসে বাড়িটা। রান্নাঘর নেই, দাওয়ার এক পাশ ঘিরে রান্না করতে হবে। কোনও দিক দিয়েই পছন্দ হবার কথা নয়, শুধু ভাড়াটা ছাড়া। এগার টাকা ভাড়া। 'দীপালি নাট্য সঙ্ঘ' আর আমার ধারাতে মাইনেতে এর চেয়ে ভাল বাড়ি নিতে পারতাম, কিন্তু মা বললেন—'না। কম ভাড়ার বাড়ি নিয়ে আগে তোমার জ্যেঠা- মশায়ের বাকি পড়া ভাড়া শোধ কর।' তাই করলাম।

আর সি এ মেশিন, সঙ্গে তিনজন বিশেষজ্ঞ অবশেষে সত্যিই এসে পড়ল। স্টুডিওতে বেশ একটু সাড়া পড়ে গেল। শুটিং সব বন্ধ। মাসের তেসরা তারিখে শুধু খাতায় সই করে মাইনে নিতে হেড আফিসে যাই। বলা বাহুল্য, মাইনে থেকে রুস্তমজী সাহেবের দেওয়া টাকার এক পয়সাও কাটেনি। কাজকর্ম নেই, সময় আর কাটতে চায় না। ছোট একটা ছিপ যোগাড় করে দুপুর বেলা এঁদো পুকুরের পাড়ে বসে পুঁটি মাছ ধরে সময় কাটিয়ে দিই।

দু' তিন দিন পরের কথা। সেদিনও যথানিয়মে পুঁটি মাছের বংশক্ষয়ে মনো- নিবেশ করে ছোট্ট ফাৎনাটার দিকে চেয়ে বসে আছি, বাইরে রাস্তা থেকে মনে হল, কে যেন আমার নাম ধরে ডাকাডাকি করছে। নেহাৎ অনিচ্ছায় উঠে অন্ধকার গলিপথ পেরিয়ে বলরাম বোসের ঘাট রোডে পড়েই দেখি, আশেপাশের বাড়ি- গুলোর জানালা দরজায় বেশ লোক জড় হয়েছে। রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে মুখুজ্যে খালি বলে চলেছে,—'বলতে পারেন এখানে কোন্ বাড়িতে ধীরাজ উঠে এসেছে? আগের বাড়িতে যারা এসেছে তারা বললে ঘাটের কাছাকাছি বস্তিতে উঠে গেছে।'

হঠাৎ আমায় দেখতে পেয়ে কাছে এসে বললে—'এই যে নদের চাঁদ। এরকম আত্মগোপন করে থাকার হেতু?'

হেসে বললাম—'অবস্থার ফেরে পাণ্ডবদেরও আত্মগোপনের প্রয়োজন হয়েছিল, আমি তো কোন ছার।'

—'থাক, আর কবিত্ব করে কাজ নেই। এখন ভেতরে চল দেখি, কথা আছে।' বলে একরকম আমাকে ঠেলে নিয়ে যায় আর কি। মহা লজ্জায় পড়লাম। মাত্র দু'খানি পায়রার খোপের মত ঘর, জিনিসপত্তরই সব ধরে না, সেখানে নিয়ে বসাব কোথায়!

আমায় ইতস্তত করতে দেখে মুখুজ্জে বললে 'ব্যাপার কি, বাড়ি নিয়ে যেতে আপত্তি আছে নাকি?'

বললাম—'না না তা নয়, মানে সবে এসেছি। জিনিসপত্তর চারদিকে ছড়ানো —তার মধ্যে—'

'বুঝেছি।' বলে চারদিকের কৌতূহলী লোকগুলোর দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললে মুখার্জি,—'যাই বল ভাই—তোমার পাড়াটি কিন্তু মোটেই সুবিধের নয়। তোমার আগের বাড়িতে যাঁরা এসেছেন—তাঁরা তো ঠিকানা বললেনই না—অধিকন্তু ঠাট্টা করে বললেন—'বস্তি-টস্তির ভেতর খুঁজে দেখুন, পেয়ে যাবেন।' গলাটা একটু নীচু করে চোখ ইশারায় আশেপাশের লোকগুলোকে দেখিয়ে বললেন—'এ'দের জিজ্ঞাসা করলাম, শুধু মুচকি হেসে বলে দিলেন—ডাকাডাকি করুন—পাওনাদার না হন তো বেরিয়ে আসবে।' হোতো আমার পাড়া—।'

কথাটা চাপা দেবার জন্যে বললাম—'এসো এক কাজ করা যাক। সামনেই বলরাম বোসের ঘাট। দুপুর বেলা, এখন লোকজন কেউ নেই। চল না ঐখানে বসেই কথাবার্তা বলি।'

খুব খুশী হল না মুখুজ্জে। দুজনে গিয়ে ঘাটের ডান দিকের উঁচু সিমেন্টের চাতালটার উপর বসলাম। একটু চুপ করে থেকে বললাম—'মুখুজ্জে, প্রকাণ্ড বটগাছের আড়ালে বসে এতদিন বাইরের ঝড় ঝাপটার অস্তিত্ব পর্যন্ত জানতে পারিনি। দুনিয়াটাকে ভাবতাম রঙিন স্বপ্নে ভরা। সেই দুনিয়ার ছায়াছবির নায়ক হবার স্বপ্ন দেখতাম ছেলেবেলা থেকে। ঝড়ে পড়ে গেছে বটগাছ, সঙ্গে সঙ্গে চোখ থেকে খসে পড়ল রঙিন স্বপ্নের ঠুলি।

কি একটা বলতে যাচ্ছিল মুখুজ্জে। বাধা দিয়ে বললাম—'কথাগুলো শেষ করতে দাও আমাকে। আমার বাবা টাকা কড়ি কিছুই রেখে যাননি, রেখে গেছেন এক রাশ দেনা। সে দেনা শোধ করতে হলে বস্তিতে বাস করা ছাড়া আমার অন্য রাস্তা খোলা নেই।' কথা শেষ করে ভাঁটায় চড়াপড়া মরা গঙ্গার দিকে চেয়ে রইলাম। বেশ বুঝতে পারলাম, মুখুজ্জে একটু লজ্জায় পড়ে গেছে। অপ্রীতিকর প্রসঙ্গটা চাপা দেওয়ার জন্য একটু পরে আমিই বললাম,—'তারপর? কি কথা বলবে বলছিলে?'

যেন বেঁচে গেল মুখুজ্জে, বললে,—'এক্‌সেলেণ্ট্‌!' চমৎকার পার্ট হয়েছে তোমার 'কালপরিণয়ে'। এডিটিং শেষ করে কাল রাত্রের শো-এর পর এলফিনস্টোন পিকচার প্যালেসে দেখা হল ছবিটা। রুস্তমজী, বজ্‌জরজী, জাহাঙ্গীরজী, নরেশদা, গাঙ্গুলীমশাই সবাই দেখেছেন, সবাই একবাক্যে তোমার সুখ্যাতি করলেন। সামনের শনিবারে 'ক্রাউনে' রিলিজ, যেও কিন্তু।'

হেসে বললাম,—'এই টাক মাথা নিয়ে?'

—'তাতে কি হল, একটা খদ্দরের গান্ধী ক্যাপ পরে যেও। এবার আসল কথাটা শোন।'

পকেট থেকে কাঁচি সিগারেটের প্যাকেট বার করে একটা আমায় দিয়ে নিজে ধরালো একটা। আসল কথাটা শোনবার জন্যে মুখুজ্জের দিকে চেয়ে চুপ করে সিগারেট খেতে লাগলাম।

নিঃশব্দে সিগারেটে কয়েকটা সুখটান দিয়ে মুখুজ্জে বললে—'শোন, কাল একবার স্টুডিওয় যেও। বিশেষ দরকার।'

বেশ একটু অবাক হয়ে বললাম,—'ব্যাপার কি মুখুজ্জে?'

—'ব্যাপার গুরুতর! কাল সব বড় বড় আর্টিস্টদের ডাকা হয়েছে স্টুডিওতে।'

আবার বললাম,—'ব্যাপার কি মুখুজ্জে?'

বেশ একটু মুরুব্বিয়ানা চালে মুখুজ্জে বললে,—'ভয়েস টেস্ট।'

—'ভয়েস টেস্ট! তার মানে?'

—'মানে টকিতে কার গলা কি রকম আসে দেখে নেওয়া হবে। মাইক্রোফোনের কাছে চালাকি চলবে না। যাদের গলা ভাল রেকর্ড করবে না তারা খতম।'

ভয় পেয়ে গেলাম। বললাম,—কালকে কার কার গলার টেস্ট নেওয়া হবে?

গড় গড় করে বলে গেল মুখুজ্জে—'অহীন্দ্রবাবু, দুর্গাদাস, কৃষ্ণচন্দ্র দে, নরেশদা, তুমি, নির্মল লাহিড়ী, হাঁদুবাবু, কার্তিকবাবু, জয়নারায়ণ মুখুজ্জে আরও অনেক অভিনেতার। মেয়েদের মধ্যে তোমাদের নৌকাডুবির ব্যাচের শান্তি গুপ্তা, সুনীলা, তাছাড়া ললিতা দেবী পেসেন্স কুপার আর তার তিন বোন সীতা দেবী, ইন্দিরা দেবী, আরও এক গাদা অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়ে।

অবাক হয়ে বললাম—'অ্যাংলো মেয়েগুলো কেন মুখুজ্জে? ওরাও কি বাংলা ছবিতে—'

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে মুখুজ্জে বললে—'হিন্দি হিন্দি! বাংলা হিন্দি দুটো ভাষাতে ছবি হবে। ফিরিঙ্গিপাড়ায় গিয়ে দেখো ইংরাজী কিচির মিচির নেই মুন্সী রেখে সবাই উর্দু পড়তে শুরু করেছে—আলেফ্‌ বে পে তে—।'

(ক্রমশ)

* ভারতীয় শিল্প প্রদর্শনী *

পূর্ণিমা সরকার

মেলা" কথাটির আর এক অর্থ "বহু" তাই বোধ হয় মেলার মধ্যে সব জিনিসের বাহুল্য এবং প্রাচুর্য। 'মেলা' কথাটির উৎপত্তি কোথা থেকে, তা আমরা জানি না, তবুও সাধারণভাবে দেখতে পাই যে, এক একটি মেলায় মেলা জিনিস মেলে ধরা হয়। এখনকার দিনে প্রদর্শনী বা এক্সিবিশন কথার প্রচলনই বেশী। এসব অবশ্য নবযুগের কথা—মেলা আদি যুগ থেকেই চলে আসছে। শুধু ভারতে নয়, জগতের নানা দেশে যুগ যুগ ধরে যে মেলার প্রচলন আছে, সেকথা আমরা ইতিহাস পুরাণের পাতায় দেখতে পাই। ভারতের শোণপুরের মেলা, ভরতপুরের মেলা, প্রয়াগের মেলা সর্বজনবিদিত।

মধ্যযুগে যে সব মেলার উদ্ভব হয়, সেগুলির উদ্দেশ্য ছিল প্রচার এবং প্রসার। এছাড়া বহুলভাবে কেনা বেচা করাও উদ্দেশ্য ছিল। এক একটি মেলায় দেশবিদেশের ব্যবসায়ীরা এসে জড়ো হয়ে কেনা বেচা করতো। মধ্যযুগ থেকেই মানুষ মেলার উপকারিতা সম্বন্ধে সচেতন হয়। এই কারণে কোনও কোনও মেলা সাম্বৎসরিকভাবে চলতে থাকে। এমন কি কয়েকটি মেলা বৎসরে দু তিন বার করে বসে। ভালো করে নজির খুঁজে দেখলে দেখা যাবে যে, ১৫০০ শতাব্দী থেকে এই রকম মেলার প্রচলন হয়েছে। ভারতের নানা স্থানে বৎসরে বেশ কয়েকবার করে মেলা বসে। নগর-শহর ছাড়াও গ্রামে গ্রামেও অনেক মেলা বেশ খ্যাতি লাভ করে। এই সমস্ত মেলার সবগুলিই আজকের দিনের মেলার মত বিরাট আকারের না হলেও নিতান্ত তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের নয়। এইসব ছোটখাট মেলাগুলিই আনন্দের উৎসস্বরূপ। পাল-পার্বণে এই রকম মেলা বসে আর এই মেলায় আনন্দের হাট বসে যায়। দিন গুণে গুণে যখন মেলার দিনটি এসে হাজির হয়, তখন লোকের আনন্দ আর ধরে না। সেজেগুজে মেলায় যাওয়া এক পরম আনন্দের ব্যাপার, তার উপর মেলা থেকে কিছু না কিছু জিনিস কিনে আনাও বিশেষ লোভনীয় ব্যাপার। ছোট ছোট মেলায় হয়তো দেশ বিদেশ থেকে জিনিস আমদানী করা হয় না, কিন্তু স্থানীয় লোকেদের শিল্পদ্রব্য এবং আশেপাশের আরও পাঁচখানা গ্রামের শিল্পদ্রব্য সংগ্রহ করে মেলার দোকানগুলি ক্রেতার দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য এবং সেদৃষ্টিকে লুব্ধ করে তোলার জন্য বিশেষ নিপুণতার সঙ্গেই সাজিয়ে রাখা হয়।
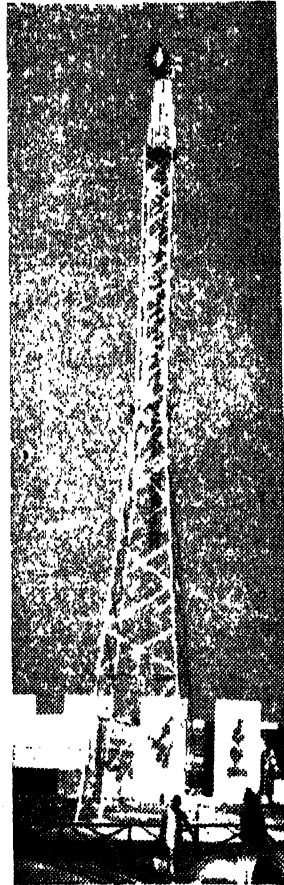
মেলায় সুউচ্চ স্তম্ভ

আজকের দিনের দিল্লীর 'ভারতীয় শিল্প প্রদর্শনী'র তুলনায় ঐসব ছোট ছোট মেলা সমুদ্রের কাছে গোষ্পদের মতই মনে হয়। দিল্লীর ইণ্ডিয়ান ইণ্ডাস্ট্রীজ ফেয়ারের আড়ম্বর আমাদের চমক লাগায়। তবুও মনে হয়, শৈশবে মেলায় গিয়ে তেলেভাজা আর পাঁপড় ভাজা খেয়ে একটি রঙিন খেলনা কী বাঁশি হাতে নাগরদোলায় চড়ে যে আনন্দ পেয়েছি, আজ সেই নিছক আনন্দলাভের মর্মটি হারিয়ে গেছে। এখন সব কিছুই আমরা সমালোচকের দৃষ্টি দিয়ে দেখতে শিখেছি। তাই দিল্লীর মেলায় আমাদের চমক লাগলেও চোখ ধাঁধিয়ে যায় না।

এই মেলা একদিনে ঘুরে দেখে শেষ করা যায় না এবং ভালো করে খুঁটিনাটি দেখতে গেলে কতদিনে দেখা শেষ হবে, তাও বলা যায় না। তবে মেলার মধ্যে সব কিছুরই আমদানী আর সব মানুষকে সব কিছু আকৃষ্ট করে না। ব্যক্তিবিশেষে দৃষ্টিভঙ্গির তারতম্য ঘটে।

এই মেলাতে ভারতের বাইরের ২১টি দেশ যোগদান করেছে। শুধু যোগদান করা নয়, কয়েকটি দেশ তাদের উন্নতির মূল সূত্রগুলি এবং তাদের বৈশিষ্ট্যগুলি বিশেষভাবে প্রদর্শন করেছে। বিদেশ ছাড়া স্বদেশের সরকারী ও বেসরকারী বহু প্রতিষ্ঠানের আন্তরিক সহযোগিতা লক্ষ্য করা যায়।

দিল্লীর এক প্রান্তে মথুরা রোডের ৭৩ একর পরিমাণ জায়গা জুড়ে বিরাট মেলার ব্যবস্থা। 'ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ান চেম্বারস অব কমার্স অ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রীজ পাঁচ কোটি টাকা ব্যয়ে এই বিপুল আয়োজন করেছেন। ভারতের কেন্দ্রীয়
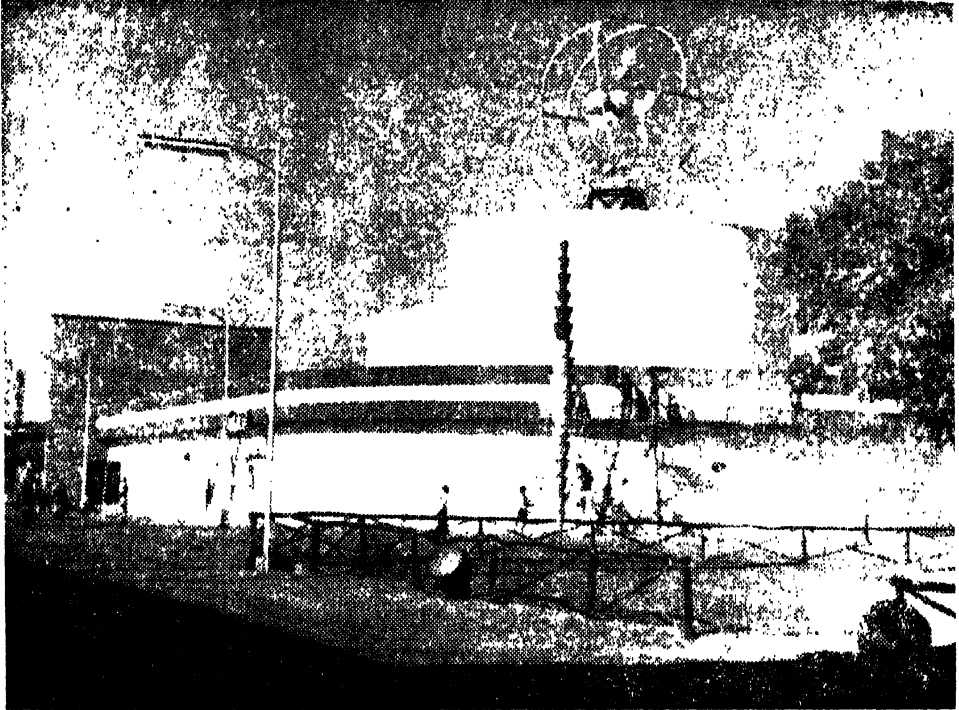
ইউ এস এ প্যাভিলিয়নের একাংশ

সরকার কোনরকম আর্থিক সাহায্য না করলেও জমিটির বন্দোবস্ত করে এবং এই বিরাট জমি মেলার উপযোগী করে পরিষ্কার করে বিশেষ সাহায্য করেছেন।

প্রতি বৎসরের এপ্রিল মাসে মিলানে বিশ্বব্যাপী যে বিরাট মেলা হয়, সেটি পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম মেলা বলেই পরিচিত। এই মেলা ১০০ একর ভূমির উপর বসে আর এতে ৪৪টি দেশ যোগদান করে। এই তুলনায় ভারতবর্ষের এই মেলা নিতান্ত ছোট নয়। এইটিই বোধ হয় এশিয়ার মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় মেলা।

বিরাট মেলার বিপুল আয়োজন—মেলায় ঢুকেই প্রথম চোখে পড়ে নানা রঙের আলোর সমারেশ আর একটি সুবৃহৎ জলের ফোয়ারা। হাসিখুশি আর আনন্দের উৎস, এই মেলার সমস্ত সুরটি যেন এই ফোয়ারায় মূর্ত হয়ে উঠেছে। এর পরই রীতিমত ধাঁধা লাগে। কোন পথ ধরে এগিয়ে গেলে কোন কোন প্যাভেলিয়নে গিয়ে পড়বো, তার কোনই হদিস পাই না। আগেই বলেছি, এক দিনে সবকিছু দেখা সম্ভব নয়, অথচ ভালোগুলি আগে দেখার আকাঙ্ক্ষা আছে; কিন্তু তার ঠিকানা কোথায় পাব?

ফোয়ারার বাঁ-হাতি রাস্তা ধরে এগিয়ে যাই, কিন্তু বেশীক্ষণ এগোনো যায় না; পথে যে প্যাভেলিয়নটি বেশী করে দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তার মধ্যেই ঢুকে পড়ি।

'শিল্পের আজব দেশ' ইউ এস এর প্যাভেলিয়নটিই সর্বপ্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। ১,০০০০০ বর্গ ফিট অর্থাৎ আড়াই একর জমি নিয়ে মস্ত প্যাভেলিয়ন ইস্পাত আর রী-এনফোর্সড কনক্রীট দিয়ে গড়া। ভেতরে ৩০টি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের নানা রকম জিনিসপত্র সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা হয়েছে। এখানে যন্ত্রপাতির প্রাধান্যই বেশী দেখা গেল। অ্যাটমিক ও ইলেকট্রনিক সংক্রান্ত যেসব নতুন নতুন আবিষ্কার ওদেশ করেছে সেইগুলি আজ চাক্ষুষ দেখার সুযোগ পাওয়া গেল। খুব সহজ উপায়ে শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের জন্য অ্যাটমের উপকারিতা এখানে বোঝান হয়েছে। এলুমিনিয়মের তৈরি ৪০০ রকম জিনিস দেখা গেল। সবচেয়ে বড় কথা এখানে খুব সস্তার তাঁত ও সেলাই বোনার কল দেখা গেল। হাল ফ্যাশানের রান্নাঘর 'অটোমেটিক ভোটিং মেসিন', সেলাই-বোনার কল, ইলেকট্রিক ট্রেনের নমুনা, জাহাজ, হেলিকপটার ইত্যাদি জিনিসের মধ্যে বিশেষ নতুনত্বের আভাস পাওয়া যায়। একটি জিনিসকে ঘিরে বহু দর্শকের ভীড় জমেছে। জিনিসটি আর কিছুই নয়—একটি সূক্ষ্মতম কাঁচের গামলা। এই পাতলা কাঁচের পাত্রটি সম্পূর্ণভাবে হাতের তৈরি। এর নাম

দেওয়া হয়েছে 'স্টিউবেনবোল'। শোনা যাচ্ছে মেলা ভেঙ্গে গেলে ইউ এস এর গবর্নমেণ্ট ভারত গবর্নমেণ্টকে বন্ধুত্বের নিদর্শনস্বরূপ এইটি উপহার দিয়ে যাবেন।

সোভিয়েট প্যাভেলিয়নের বিরাট তোরণটিও বেশ আকৃষ্ট করে। ভেতরে ঢুকেই প্রথমে চোখে পড়ে লেনিনের মস্ত বড় প্রতিমূর্তিটি। মূর্তিটি ছোট ছোট কাঠের টুকরো দিয়ে তৈরী করা হয়েছে। সমগ্র প্যাভেলিয়নটি পাঁচটি বড় বড় হলে ভাগ করা হয়েছে। প্রধান হলটিতে শ্রীনেহরুর রাশিয়া ভ্রমণের দুখানি প্রকান্ড ছবি টাঙ্গান আছে। এই প্যাভেলিয়নের বাইরের চেহারার মত ভেতরের আড়ম্বরেও বিশেষ বাহুল্য দেখা যায়। সমস্ত রিপাবলিকগুলির সংস্কৃতি ও আর্থিক উন্নতির ছবি, ফটো-গ্রাফ ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। একটি হলে ঐ দেশের নানারকম যন্ত্রপাতি, ব্লাস্ট ফার্নেস, হাইড্রোইলেকট্রিক স্টেশন, থার্মাল স্টেশন, ইলেকট্রিক রেলপথ, মোটর গাড়ির কারখানা ইত্যাদির প্রতিকৃতি করে রাখা হয়েছে। আর একটি হলকে সম্পূর্ণভাবে অস্ত্রোপচারের যন্ত্রপাতি, টেলিভিসন সেট, অনেক রকম বাজনা; ঐ দেশীয় হাতের তৈরি সূক্ষ্ম শিল্প নানান ভাষার নিজেদের দেশের ও অন্যান্য দেশের বইএর অনুবাদ প্রভৃতি রাখা হয়েছে। আর একটি হলে কৃষিজাত বহু শস্যাদি ও টিনে ভরা খাদ্যদ্রব্যও লোককে দেখাবার মত করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। সাধারণ নিয়মানুসারে এগুলি বোতলে ভরে না রেখে প্লাস্টিকের তৈরি গাছের পাতার আকারের এক রকম আধারের মধ্যে জিনিসগুলি ভরে বিশেষ একটি রুচি-সম্মতভাবে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। এদের দেশের রেশমী, পশমী ও লিনেন বস্ত্র ইত্যাদি সহ জল-কাঁচের এবং পোর্সিলিনের তৈজসপত্র ইত্যাদি রীতিমত মনোমুগ্ধকর। বিশেষত জল-কাঁচের পাত্রগুলি ডায়মণ্ড কাটা বলে চতুর্দিক ঘিরে আলোর লহরী তুলে বেশী করে দর্শকদের মন হরণ করছে। ভারী যন্ত্র-পাতিগুলি হলের বাইরে রাখা হয়েছে।
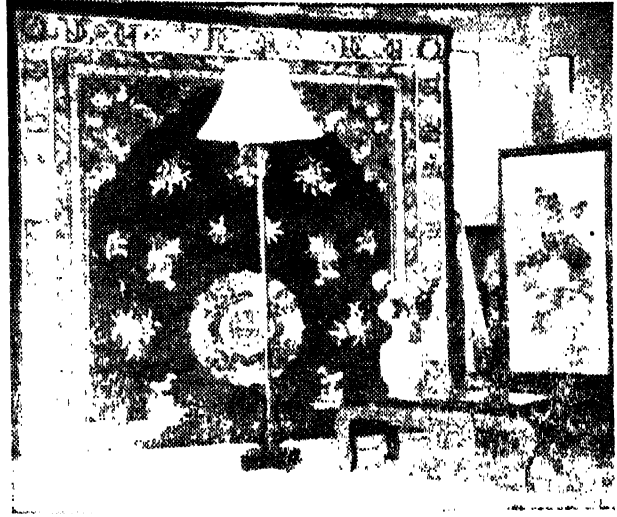
চীনা কার্পেট ও কাঠের কাজের নমুনা
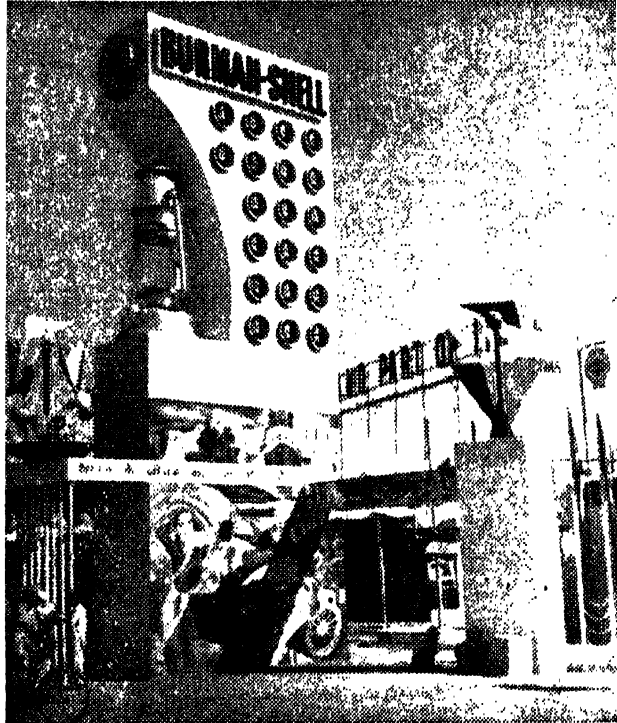
বার্মা-শেল কোম্পানীর প্যাভেলিয়ন
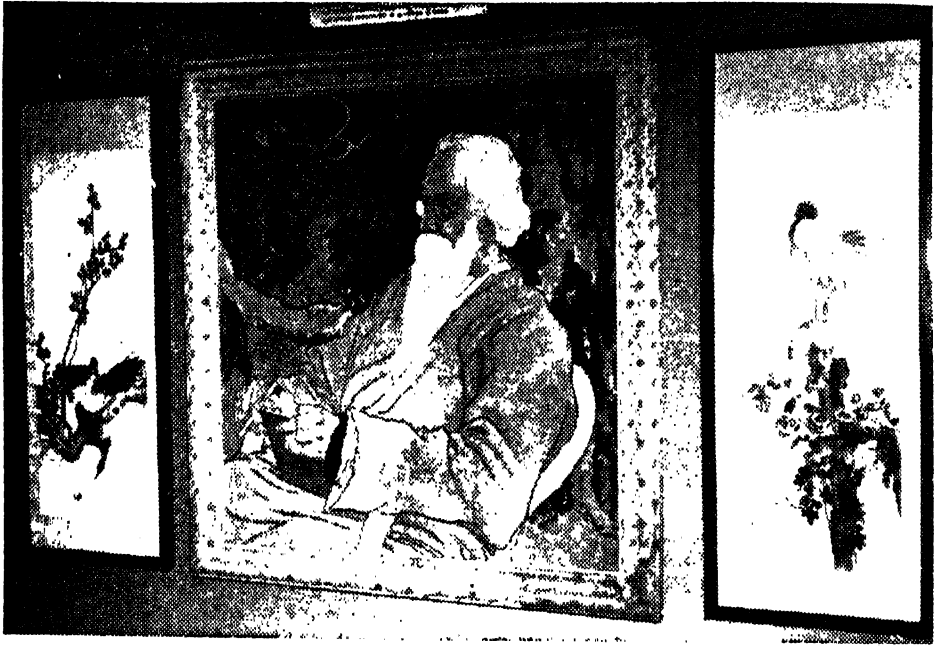
চীনা সূচিশিল্পে রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি

এর মধ্যে কয়লা ও তেলের খনিতে ব্যবহারযোগ্য যন্ত্রপাতি, পাথরা কাটা যন্ত্রই বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

নানা রঙের চিত্রিত বিচিত্রিত প্যাভেলিয়নটি দেখে চৈনিক প্যাভেলিয়ান বলে চিনে নিতে কষ্ট হয় না। সোভিয়েট প্যাভেলিয়নের মত গাম্ভীর্যপূর্ণ চেহারা না হলেও চাকচিক্য ও আড়ম্বরের দিক থেকে এই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্যাভেলিয়নটিকে প্রথম শ্রেণীভুক্ত করা যায়। সোভিয়েট প্যাভেলিয়নের চেয়ে প্রায় দেড় গুণ বেশী জায়গা জুড়েছে চীনা প্যাভেলিয়ন। ৫৮ হাজার বর্গফিটেরও বেশী স্থান দখল করে দাঁড়িয়ে আছে চীনা প্যাভেলিয়নটি। সাধারণ প্যাভেলিয়নের মত এর আকারটি ঠিক সাময়িক বন্দোবস্ত মনে হয় না। এর সামনে দাঁড়িয়ে বেশ একটু স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। মনে হলো যেন চীনা রাজ প্রাসাদেই ঢুকছি, অভিবাদনের ঢংটা যেন জেনে নেওয়া দরকার। বাস্তবিকই সবগুলির মধ্যে এই প্যাভেলিয়নটিকে বেশী মনোরম বলে মনে হয়। শুধু বাইরেই যে এই বর্ণবৈচিত্র্য, তা নয়। ভিতরেও আলো আর রং-এর ছড়াছড়ি। এই চোখ ঝলসানি আলো আর রঙের রাজ্য থেকে চোখ মুছে ভাল করে তাকালেই কিন্তু প্রথমেই মাও-সে-তুং-এর বিরাট প্রতিমূর্তি থেকে চোখ ফেরান শক্ত হয়ে ওঠে। মাও-সে-তুং ভারতের প্রথম স্বাধীনতা দিবসে যে বাণী পাঠিয়েছিলেন, সেগুলি হিন্দী, চীনা ও ইংরেজী ভাষায় প্রতিমূর্তির পিছনের পর্দায় লেখা আছে। এখানে নেহরুজীর চীন ভ্রমণ ও দিল্লীতে চৌ-এন-লাই-এর সম্বর্ধনায় কয়েকখানি ছবিও চোখে পড়ে। প্রধান হলের দু পাশে দুটি বড় বড় হলে এরা এদের দেশের যাবতীয় শিল্প সম্পদের নমুনা সাজিয়ে রেখেছেন। বাঁদিকের হলে বেশীর ভাগ বড় বড় যন্ত্রপাতি আছে। ভারী লেদ যন্ত্র, ড্রিলিং মেশিন, ক্রেন, এয়ার কম্প্রেসর, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, খনিজ সংক্রান্ত নানাবিধ যন্ত্র প্রভৃতি এঘরে দেখতে পাওয়া যাবে। পাশের ঘরটি সমগ্র চীনের মূর্ত প্রতীক বলেই মনে হয়। এই ঘরখানি ভালো করে পর্যবেক্ষণ করলেই এদের সমাজ চিত্র, এদের সংস্কৃতি, শিল্প নৈপুণ্য, শিক্ষা-দীক্ষা, বাণিজ্যের প্রসার সমস্তই দৃষ্টি-গোচর হয়। চীনে মাটির বাসন ও খেলনাপত্র আমাদের বহু পরিচিত, তবুও এতগুলি শৌখিন জিনিসের একত্র সমাবেশ সহজে চোখে পড়ে নাই। বিশেষ করে এইসব চীনে মাটির জিনিসপত্রের মধ্যে কয়েকটি জিনিস চোখে লাগল। হাতীর দাঁত এবং কাঠের উপর খোদাই সূক্ষ্ম কাজগুলি অপূর্ব শিল্প-চাতুর্যের পরিচয় দেয়। সূক্ষ্ম সূচি শিল্পগুলি শিল্পীর হাতের নৈপুণ্যে খুব কাছ থেকেও তুলি দিয়ে আঁকা বলে মনে হয়। ঘরের মাঝখানে স্তরে স্তরে সুসজ্জিত তাজা ফলগুলির দিকে এগিয়ে গিয়ে রীতিমত বিস্ময় লাগে। এগুলোর কাছে লেখা আছে 'মোমের তৈরি।' এদের প্যাভেলিয়নেই শুধু

এদের সংস্কৃতির পরিচায়ক নানান রকম বাদ্যযন্ত্রের সমাবেশ দেখলাম। এদের শিল্প সম্পদের মত কৃষি সম্পদও কিছু কম নয়।

ইউনাইটেড কিংডমের প্যাভেলিয়নটি উপরিউক্ত প্যাভেলিয়ন কয়টির তুলনায় বড়ই ক্ষুদ্র মনে হয়। মাত্র ২০ হাজার বর্গফিট জায়গায় সমস্ত চত্বরটি হয়েছে। ভিতরে বিভিন্ন বৃটিশ ফার্মের নানা রকম জিনিসপত্র দিয়ে ভাগ ভাগ করে সাজান হয়েছে। এদের দোকান সাজানর সুচারু পদ্ধতি বিশেষ শিক্ষণীয়। কোন জিনিসটি কেমনভাবে রাখলে দর্শকের চিত্তাকর্ষক করা যায়, সেই সূক্ষ্ম কলা এদের সম্পূর্ণ আয়ত্বাধীন। তাদের দেশের শিল্পজাত যে সমস্ত জিনিস পরে ভবিষ্যতে ভারতে আমদানী করা হবে, সেগুলি আজ দর্শকের চোখে তুলে ধরার কলা কৌশল এই বণিক শ্রেণীর বিশেষভাবেই জানা আছে। এদের প্যাভেলিয়নের এই বৈশিষ্ট্যটুকুই বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

৫৮ হাজার বর্গফিটের চেয়েও

অস্ট্রিয়ান প্যাভেলিয়নের প্রবেশপথ
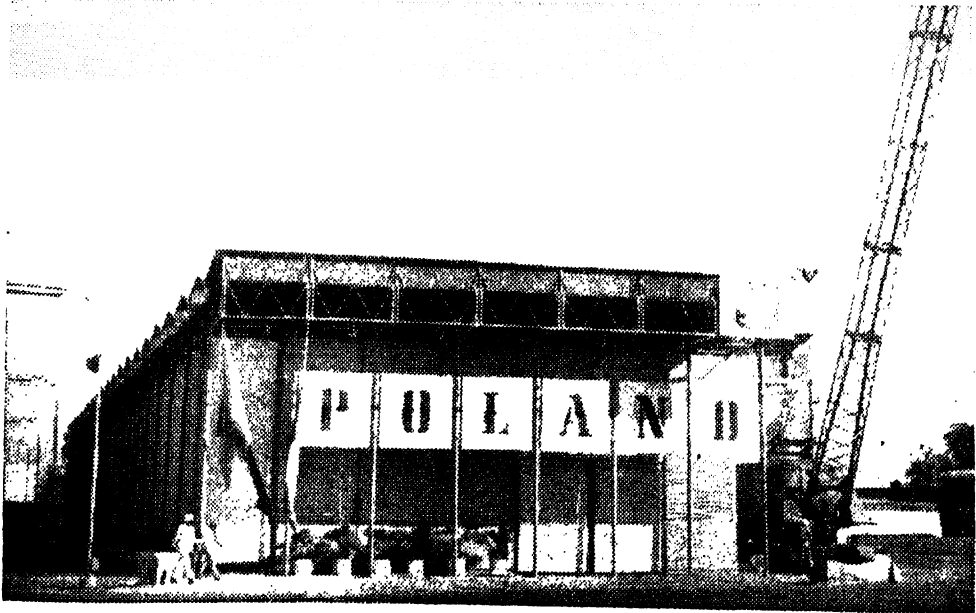
পোলিশ প্যাভিলিয়ন
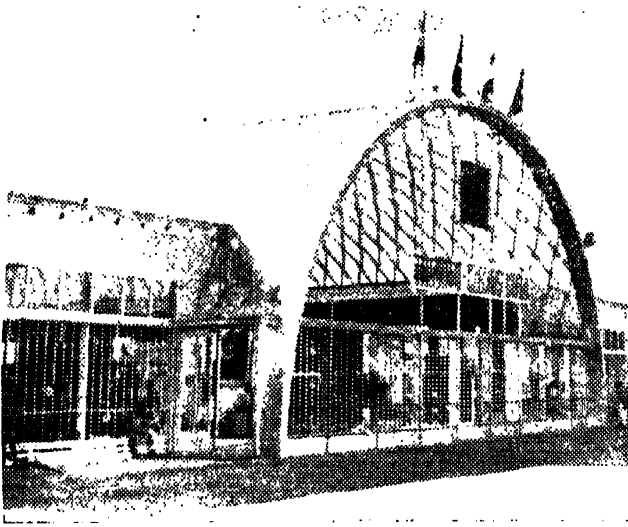
চেক প্যাভেলিয়নের প্রবেশ-তোরণ

বেশী জায়গা জুড়ে পশ্চিম জার্মানীর প্যাভেলিয়ন। এর মধ্যে একটিমাত্র বড় ঘর আর কয়েকটি ছোট ছোট ঘরে ভাগ করা আছে। এরাও ইউনাইটেড কিংডমের মত ভারতের বাজারে তাদের দেশজাত কোন জিনিসের বেশী চাহিদা হতে পারে সেদিকটি লক্ষ্য রেখেই দোকান সাজিয়েছেন। প্লাস্টিকের ছোট জিনিস থেকে আরম্ভ করে সুবিখ্যাত 'মার্সি-ডীস বেন'মোটরগাড়িও প্রদর্শনীর মধ্যে রাখতে ভোলেনান। এদের দোকানগুলির বৈশিষ্ট্য হিসাবে লক্ষ্য করা যায় যে, বিগত মহাযুদ্ধের আগে ওদের দেশের যে জিনিসগুলি ভারতে আমদানী করা হতো, সেগুলির সংগে সংগে বর্তমানে যেসব জিনিস আমদানী করা হয়, সেগুলিও ভালো করে দেখিয়েছে এখানে পশ্চিম জার্মানীর প্রায় ১০০ প্রতিষ্ঠানের এমন কি 'সী মেন্স', ক্রু ড্যামেগ' প্রভৃতি বড় বড় কোম্পানী জিনিসও আনা হয়েছে।

এই সংগে পূর্ব জার্মানী জার্মান ডেমোক্র্যাটিক রিপাব্লিকের প্যাভেলিয়নের কথাই মনে হয়। বড় বড় যন্ত্রপাতি থেকে আরম্ভ করে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর যন্ত্রপাতি এখানে প্রদর্শিত হয়েছে। এদের এখানে একটি বিশিষ্ট জিনিস দেখা গেল 'কাঁচের মানুষ'। এটি কিন্তু কাঁচ দিয়ে তৈরি নয়, কাঁচের মত মসৃণ ও স্বচ্ছ একটি পদার্থ দিয়ে তৈরি। এই পদার্থটির নাম শেল্লোন। এই কাঁচের মানুষটির বিশেষত্ব এই যে, একটি মনুষ্য দেহের যাবতীয় যন্ত্রপাতি এবং তাদের কার্যকলাপ এই স্বচ্ছ কাঁচের মানুষের মধ্যে দেখান হয়েছে। এমন কি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরা উপশিরা এবং নার্ভগুলি ও তাদের কার্যকলাপও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। এদের প্যাভেলিয়নের আরও একটি আকর্ষণীয় বস্তু — প্ল্যানেটোরিয়ম। প্ল্যানেটোরিয়মের মধ্যে দিয়ে সারা বৎসরের গ্রহগণের গতিবিধি ও তাদের আকৃতি দেখা যায়। এই দুটি জিনিসই তারা প্রদর্শনীর শেষে ভারত সরকারকে বন্ধুত্বের নিদর্শনস্বরূপ উপহার দিয়ে যাবেন।

পোল্যাণ্ডের প্যাভেলিয়নটিও বেশ সুসজ্জিত মনে হলো। নানা রকম জিনিসপত্র এখানে রাখা হয়েছে। গত মহাযুদ্ধের আগে এদের দেশে যেসব বাণিজ্যিক সম্পদ উৎপন্ন হতো, এখন তার চেয়ে অনেক বেশী উৎপন্ন হয়।

হাঙ্গেরিয়ান প্যাভেলিয়নে বড় বড় যন্ত্রাদি ছাড়া আধুনিক ঘর সংসারের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রাদির প্রাচুর্য দেখা যায়। তাছাড়া ঐ দেশীয় সুতী ও রেয়নের কাপড়, পোর্সিলিনের জিনিস, ওষুধপত্র, মদ ইত্যাদি অনেক কিছুই আছে। এদের এখানে এলুমিনিয়ামের তৈরি 'ইয়াট' একটি দেখার মত জিনিস।

যুগোস্লাভিয়ার প্যাভেলিয়নে যন্ত্রপাতি ও বৈদ্যুতিক জিনিসপত্র ছাড়া এদের তৈরি একরকম তামার পাত ও নানা রকম পাইপ, ডাক্তারী ও অস্ত্রোপ-

মধ্যপ্রদেশ কুটির-শিল্প স্টলের দুর্গের অনুকরণে নির্মিত তোরণদ্বার
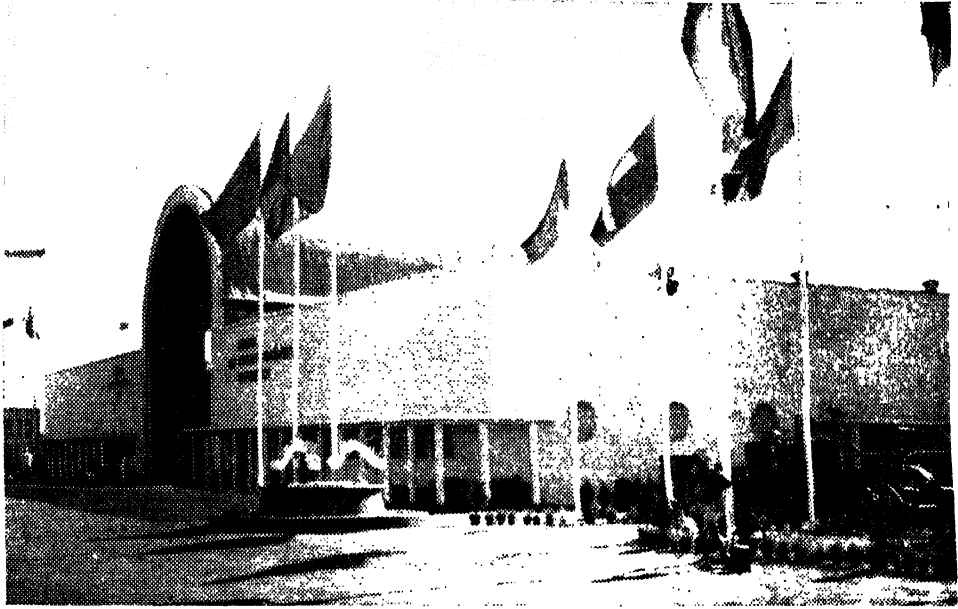
ইউ এস এস আর-এর প্যাভিলিয়নের দৃশ্য

চারের যন্ত্রপাতি এবং এক্সরে যন্ত্র উল্লেখযোগ্য। এদের সমগ্র প্যাভেলিয়নটি কোনও রকম জোড়বিহীন চাদর ও পাইপ দিয়ে তৈরি করা হয়েছে।

অস্ট্রিয়ান প্যাভেলিয়নে ইস্পাতের তৈরি পুল ও বিভিন্ন ধরনের ডিজেল ইঞ্জিন অন্যান্য যন্ত্রপাতির মধ্যে দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

নেদারল্যান্ডের চত্বরে তাদের নানা-বিধ যন্ত্রপাতির মধ্যে তাদের রেলপথের সিগন্যালের যন্ত্র থেকে আরম্ভ করে পেট্রলের হাত পাম্পও দেখিয়েছেন। ছোট ছোট জিনিসের মধ্যে অপটিক্যাল যন্ত্রপাতি, ক্যামেরা ও প্রোজেক্টরের প্রাধান্য দেখা যায়।

ইরাণের প্যাভেলিয়নটি ছোট হলেও এর দুপাশে খেজুর গাছের মত দুটি থাম দিয়ে বাইরের চেহারাটা বেশ আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। ভেতরে ঢুকেও বিশেষ নিরাশ হতে হয় না। রুক্ষ মরুভূমির দেশে বেশ সজীবতার লক্ষণ দেখা যায়। এখানে খেজুর ও খেজুর গাছের থেকে তৈরি জিনিসপত্র বেশী চোখে পড়ে। এছাড়া ইরাণের সুন্দর সুন্দর নক্সার কার্পেট নজর এড়ায় না।

জাপানের প্যাভেলিয়নটি বড়ই ম্রিয়মাণ। জনসাধারণের চোখ বাঁচিয়ে একটি কোণায় মাত্র ২০০ বর্গফুট জমির এই ছোট্ট স্টলটি বড়ই দীনহীন মনে হয়। মাত্র কয়েকটি যন্ত্রপাতির ছবি দেওয়ালে টাঙান আছে। জাপানী শিল্পের খ্যাতি চিরদিনই শুনে আসছি, কাজেই এদের এখানে অনেক কিছুই দেখার আশা ছিল, কিন্তু রীতিমত নিরাশ হতে হয়।

মেলার উদ্বোধনের দু একদিন পরেই রুমানিয়ান চত্বরটি পুড়ে যায়। শোনা যাচ্ছে যে, এটি খুবই সুন্দর করে সাজান হয়েছিল। অবশ্য এই ক্ষতির জন্য তারা একটুও হতাশ না হয়ে আবার একটি নতুন প্যাভেলিয়ন খুব শীঘ্রই তৈরি করে তুলছেন। এখনও তাদের ১৪০ ফিট উ'চু মাটির থেকে তেল তোলার টাওয়াটি ঘিরে বহু দর্শকের ভীড় জমছে। কেমন করে মাটির মধ্যে গর্ত খুঁড়ে তেল তুলতে হয়, সেইটাই এখানে দেখানো হয়।

চেকোস্লাভোকিয়ান প্যাভেলিয়নটিতে বেশ একটু স্থাপত্য বিদ্যার নৈপুণ্যে দেখা যায়। এ'রা প্লাস্টিকের তৈরি অর্ধ গম্বুজাকৃতির ভল্টের মত প্যাভে-লিয়নটিকে বিশেষ দর্শনীয় করে তুলেছেন। এদের প্যাভেলিয়নে ভারী যন্ত্রপাতি ছাড়া সূক্ষ্ম কাঁচের জিনিসও প্রচুর রেখেছেন।

আমাদের প্রতিবেশী পাকিস্থান গবর্নমেণ্টের প্যাভেলিয়নটিও বেশ মনোরম। হাতীর দাঁতের রুপার শঙ্খের সূক্ষ্ম জিনিসপত্র এখানের বৈশিষ্ট্য।

ফিলিপস কোম্পানীর চত্বরে দর্শকের ভীড়ের একটু বাড়াবাড়ি দেখা যায়। এদের টেলিভিসন যন্ত্রটিই চুম্বকস্বরূপ। টেলিভিসন যন্ত্র অবশ্য সোভিয়েট রাশিয়া ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের প্যাভিলিয়নেও আছে। এদের টেলিভিশনে শুধু চত্বরের মধ্যের কোনও কিছুর প্রতিফলন দেখা যায়, কিন্তু ফিলিপস-এর টেলিভিসন যন্ত্রটির একটু বিশেষত্ব

আছে। এরা দিল্লীর মধ্যে নানা স্থানে ঐ যন্ত্র স্থাপন করে প্রদর্শনীর মধ্যে সমস্ত কিছু প্রতিফলিত করে দেখাচ্ছেন।

ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সরকারী ও বেসরকারী বহু প্রতিষ্ঠান যোগদান করেছেন। কেন্দ্রীয় সরকার ৬০ হাজার বর্গফিট জায়গায় একটি প্যাভেলিয়ন তৈরি করে এদের প্রতি-ষ্ঠানের নানা রকম পরিকল্পনা, তার ফলাফল, প্রচেষ্টা পদ্ধতি প্রভৃতি মডেল, ম্যাপ ও ফটোগ্রাফের সাহায্যে সর্বসাধারণকে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। এর মধ্যে ভাখরা ও হীরাকুদ বাঁধ দেশের কত উপকারে লাগবে, সেগুলি খুব বড় বড় দুটি মডেলের সাহায্যে দেখিয়েছেন। সিন্দরী ফার্টি-লাইজার ফ্যাক্টরী, চিত্তরঞ্জন লোকো-মোটিভ ওয়ার্কস, হিন্দুস্থান সিপ ইয়ার্ডের নতুন রকম ডিসেল ইঞ্জিন চালিত চার ফুট লম্বা 'জল বিহার'-এর যথাযথ মডেল এখানে দেখানো হয়েছে। মিনিস্ট্রী অব ইনফরমেশন ও ব্রডকাস্টিং বিভাগের তরফ থেকে একটি স্টলে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ভারত কতখানি অগ্রসর হয়েছে, তাও দেখান হয়েছে। মিনিস্ট্রি অব ট্রান্সপোর্ট বড় বড় রাজপথ, বন্দর, লাইট হাউস ইত্যাদি কতখানি উন্নতি সাধিত হয়েছে দেখিয়েছেন। এখানে বড় বড় যন্ত্রপাতি দোকানপসারের চাপে কুটীরশিল্পে

(অন্য)ও বেশী চোখে পড়ে। একটি কোণায় নানারকম কুটীরশিল্প ও গ্রামের শিল্পদ্রব্য সংগ্রহ করে ৭৫টি দোকানসহ 'স্মল স্কেল ইণ্ডিয়ান ম্যানুফ্যাকচারার্স' নাম দিয়ে কুটীরশিল্পের প্রদর্শনী হয়েছে। এখানে কোনও জিনিসেরই অভাব দেখা যায় না। অতি নগণ্য তুচ্ছ পদার্থ থেকে খ্যাতিসম্পন্ন বহু জিনিস এখানে দেখা যায়।

'অল ইণ্ডিয়া হ্যাণ্ডলুম বোর্ড' থেকে যে প্যাভেলিয়নটি হয়েছে, সেখানে তাঁতশিল্পের বহুবিধ জিনিস সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা আছে।

এছাড়া 'কয়ার ইণ্ডাস্ট্রীর' নারকেল ছোবড়ার অতি মনোরম পদার্থের প্রদর্শনী সত্যই দর্শনযোগ্য। 'মধ্যভারত ষ্টেট ইণ্ডাস্ট্রী' তাদের চত্বরটি একটি মধ্যযুগীয় দুর্গের আকৃতিবিশিষ্ট করে গড়েছেন। ভেতরে ঐ প্রদেশের কুটীরশিল্পের বহু জিনিস রেখেছেন।

বেসরকারী বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে 'ইম্পিরিয়াল টোব্যাকো কোম্পানী', বার্মা শেল কোম্পানী', 'টাটা কোম্পানী', 'অতুল প্রডাক্টস', জে কে অর্গানাইজেশন', 'সুরজমল নগরমল', 'হিন্দুস্থান মোটর কোম্পানী', 'ডানলপ কোম্পানী', 'প্রিমিয়ার অটোমোবাইল কোম্পানী' প্রভৃতির প্যাভেলিয়নগুলি বেশ দৃষ্টি আকর্ষণকারী।

প্রদর্শনীর মধ্যে প্রমোদ উদ্যানের কথাও উল্লেখ করতে হয়।

প্রদর্শনীর মধ্যের জল বিহারের জন্য কৃত্রিম হ্রদটি বহু দর্শককে আকর্ষণ করে।

ইরানের প্যাভিলিয়ন

সমগ্র প্রদর্শনীর জাঁকজমক আমাদের খুব বেশী অভিভূত করলেও কতকগুলি বিশেষ অসুবিধা আমাদের ভোগ করতে হয়েছে। প্রথমেই বলেছি এত বড় প্রদর্শনী কয়েক ঘণ্টায় দেখে শেষ করা যায় না এবং বেশ একটু নিয়মানুবর্তিতার সঙ্গে একধার থেকে দেখে যেতে পারলেই সুবিধা হয়; না হলে ঘুরে ফিরে একই জায়গায় বারে বারে এসে পড়ার সম্ভাবনা আছে। এজন্য স্থানে স্থানে ভালোমত একটি ম্যাপের সাহায্যে আলোর সংকেতসহ পথ নির্দেশের ব্যবস্থা থাকলে দর্শকদের খুবই সুবিধা হতো। মেলার মধ্যে আরও বেশী পথের সাহায্যে প্যাভেলিয়ন ও স্টলগুলির সঙ্গে যোগাযোগের বন্দোবস্ত থাকলেই ভালো হতো। অন্যান্য আড়ম্বরের তুলনায় আলোর ঔজ্জ্বল্য কিছু কম বলেই মনে হয়। আলোর প্রাচুর্য থাকলে রাস্তাঘাটগুলিতে চলাচলের অসুবিধা ঘটে না। শহরের এক প্রান্তে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হলেও দর্শক হিসাবে শহরের লোকদের আনাগোনাই আশা করা যায়। যথেষ্ট যানবাহনের অভাবে জনসাধারণকে বড়ই অসুবিধা ভোগ করতে হয়। বিশেষত কোথা থেকে কীভাবে যানবাহন পাওয়া যেতো তার নির্দেশ দেওয়ার জন্য কোনও রকম সুষ্ঠু বন্দোবস্ত দেখি না। শহরের রাস্তা ছেড়ে মথুরা রোডের পথে কোনও রকম আলোর ব্যবস্থা না থাকায় এবং রাস্তাটিও যথেষ্ট চওড়া না হওয়ায় যানবাহন ও মানুষের চলাফেরায় খুবই অসুবিধা হয়। প্রদর্শনী দেখে যে প্রসন্ন মনটি নিয়ে ঘরে ফেরা উচিত ছিল, এইসব অব্যবস্থা, বিশেষ করে যানবাহনের অসুবিধার জন্য তা আর হয় না। রীতিমত বিরক্তি নিয়েই ঘরে ফিরতে হয়। রেলওয়ে এক্সিবিশন এবং এইরকম অন্যান্য অনেক প্রদর্শনী এখানেই হয়েছে এবং দর্শকদের একই অসুবিধা ভোগ করতে হয়েছে। এবিষয়ে কর্তৃপক্ষরা কেন যে এত উদাসীন তা জানি না।
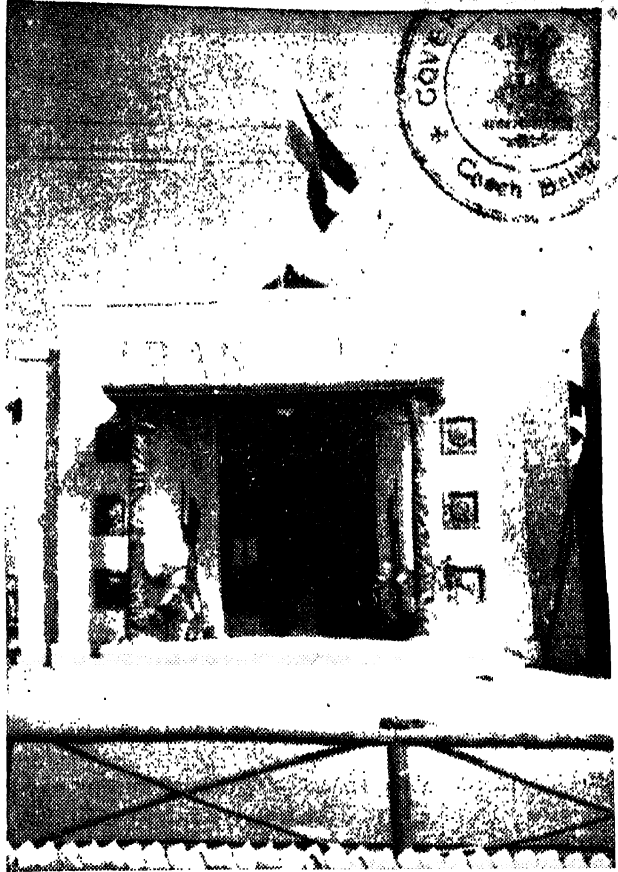
হুঁ' ইনছ ?

কি কইবার লাইগছ ?

ক্যাম্‌পো ত না কি কয় তুইলা দিব।

অন্ধকারে বসে বসে ওরা বলাবলি করছে। আরো ক'জন এসে যোগ দেয় ওদের কথায়। বুড়োটা হাউ মাউ করে কে'দে উঠল। কান্না শুনে ক্যাম্প থেকে আরো ক'জন ছুটে এল। এল মেয়েমরদ। কাচ্চাবাচ্চাগুলোও এসে পাশে দাঁড়াল।

এ ওর মুখের পানে অন্ধকারে পরস্পর চাওয়া-চাওয়ি করল। সবাই যেন থ' মেরে গেছে একেবারে। শুধু একটা বোবা দৃষ্টি বুলিয়ে নিল এ ওর মুখের ওপর। মনের ব্যথা বুঝতে কারো কোনো অসুবিধা হল না।

কেউ কেউ যেন অন্ধকারে একটু নড়ে চড়ে উঠল। কপালে হাত দিয়ে বসে পড়ল।

উপায় ?

উপায় তো কারো জানা নেই। গেল বছর বানের জলে ভেসে বেরিয়েছে মানুষগুলো। ধাক্কা না সামলাতেই এবারও ঘরদোর ছেড়ে ওরা ভিড় জমিয়েছে আশ্রয় শিবিরে।

কেউ বুনেছিল ধান। কেউ বুনেছিল পাট। কেমন লকলকিয়ে উঠেছিল সবুজ চারাগাছগুলো। লকলকিয়ে উঠেছিল ওদের গেল বছরের ভেঙ্গেপড়া মনটাও। কর্জ'টা এবার শোধ দেবে ফসল ঘরে উঠলে। হালের গোরু জোড়া বদলাবে। আরেকটা দুধলো গাই। সব আশা ওদের ভেস্তে গেল। উপরি-উপরি দুটো বছর ফসল তুলতে পারছে না ঘরে। গেল বছর পচে গিয়ে বাদ বাকি যা পেয়েছিল ঝেড়ে-ঝুড়ে তাও নিয়ে গেছে জমির মালিক। এবার তো জমির মালিককেও বুঝ দেয়া যাবে না কিছুতেই। সারাটা বছর তাহলে খাবে কি।

বুড়োথুড়ো যা হোক হালের গোরু ছিল। কিছু গেছে গলা ফুলে, কিছু গেছে বানের জলে। সে আশাতেও ছাই।

তবে উপায় ?

ওরা ঠিক করল, কয়ে বলে আরো ক'টা দিন কাটানো যায় কিনা দেখা যাক।

দেখা গেল। সকালবেলায় ক'টা লোক এসে বলে গেল, আজকে বেলা বারোটার আগে ক্যাম্প খালি করে দিতে হবে। শুনে নতুন করে আবার সবাই কে'দে উঠল হাউ মাউ করে। বুড়ো এসে ওদের পা জড়িয়ে কান্না জুড়ে দিল। বলল, আমাগোরে বাইর কইরা দিয়েন সায়েব বাবা। এতডা মানুষ খামু কি

খাবে কি ?

সে কথা ওরা কি জানে।

বাপের বয়েসী বুড়ো, মন ভিজে গেল তবু একজনের। বলল, কে ভাত খাবে।

ভাত ?

বুড়োটা কান্না জুড়ে দিল আবার মানুষগুলো চলে গেল ওদের কাজে।

বেলা বারোটায় ক্যাম্প খালি করে দিতে হবে। লাইন ধরে ক্যাম্প থেকে মানুষগুলো বেরিয়ে পড়ল রাস্তায় কারো ছেলে কোলে। কারো মাথায় পুঁটুলি। মনে হচ্ছে যেন দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে ওরা।

কান্না ছেড়ে বুড়োটা এতোক্ষণ কুঁকড়ে মুকড়ে শুয়ে ছিল ক্যাম্পের কোণায়। পায়ে ধরল মানুষগুলোর। কেউ কিছু বলল না তো তবু। বেরিয়ে যেতে হবে বারোটায়। বুড়ো বেরিয়ে

পড়েলশ সবার শেষে। যাবে কোথায়। অতোদূরে গিয়ে ফিরে এল আবার। কিছু ফেলে যাচ্ছে নাকি!

ভুতি গেল কোথায়, ভুতি?

ক্যাম্পে গিয়ে দেখল বুড়ো ভুতি আছে নাকি।

নেই! ভুতিকে তালাস করতে এসে পেয়ে গেল তার ভাঙ্গা দোতারাটা।

তবে ভুতি গেল কোথায়! কোথায় গেল ভুতি?

ভুতি কই গেলি গা। বুড়ো ডাক দেয়।

কোনো সাড়া নেই। বুড়োকে ফেলেই চলে গেল তবে ভুতি! বুড়ো ভাবছে। যাবে কোথায় অমন বয়স্কা মেয়েটা। কপালে হাত দিয়ে বসে পড়ল বুড়ো। ভুতি তার বড়োছেলের বড়ো মেয়ে! বড়োছেলে মারা গেল গত বছর বানের শেষে টাইফয়েডে মাথা পাগল হয়ে। বড়োছেলের বউটা মারা গেছল তার আগের বছর। ভুতির বিয়ে হয়েছিল। মাসদুয়েক হ'ল বেইমানটা ভুতিকে ফেলে রেখে পালিয়েছে। বলেছে আর নেবে না ভুতিকে।

ভুতির আর কেউ নেই। বুড়োরও আর কেউ নেই এই ভুতি ছাড়া। বুড়ো ভাবলে, সে মরলে ভুতিই হবে তার বাড়ির কোণের ভিটিটুকুর একমাত্র মালিক।

এ জায়গায় সে জায়গায় খোঁজ করল সে ভুতির। যাকে পেল তাকেই জিগ্‌গেস করল উদ্‌ভ্রান্তের মত, ভুতি গ্যাছে এহান দিয়া?

কেউ বা একটু হাসল বুড়োর কথা শুনে। বলল, কে জানে তোমার কেথাকার ভুতির খবর। কেউ বা সাড়াই দিল না বুড়োর কথায়। ভেবেছে, লোকটা পাগল।

সত্যিই মানুষটা পাগলই হয়ে গেল যেন। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল। সূর্য ডোবে ডোবে। তবু সে ক্যাম্পের কাছে-কিনারে ঘুরে ঘুরে বেড়াল। যদি এসে যায় ভুতি।

কিন্তু ভুতি এল না। সন্ধ্যের আবছা অন্ধকার নেমে এল শহরের বুকে। ভুতি এল না তবু।

বুড়ো যাবে কোথায় অমন অন্ধকারে। বুড়ো ভাবলে, দেখা যাক কয়ে বলে রাতটা যদি ক্যাম্পোয় কাটানো যায়। অন্ধকার ঠেলে ঠেলে, ভাঙ্গাচোরা রাস্তাটা হাতড়ে হাতড়ে বুড়ো গিয়ে দাঁড়াল ক্যাম্পের দরজার বাইরে। কারা যেন কথা বলছে ক্যাম্পের ভেতর। খিল এ'টে দিয়েছে। ভেতর থেকে মনে হল যেন বাইরে কেউ উসখুস করছে! দরজাটা খুলতেই বুড়ো থতমত খেয়ে গেল। ঘোলাটে চোখ দুটো তুলে ধরে বলল, এইডা না ক্যাম্পো?

ক্যাম্পো? সাড়া দিল ভেতর থেকে।

হ ক্যাম্পো, এইডা না?

ক্যাম্পো ত তোমার বেলা বারোটায় তুলে দিয়েছে। অন্য মানুষ এসে গেছে এখন।

অন্ধকার ঠেলে ঠেলে, ভাঙ্গাচোরা রাস্তাটা হাতড়ে হাতড়ে চলে আসে বুড়ো।

তারপর।

খালি খালি বুকটা চেপে ধরে বুড়ো কোথায় চলে গেছে তা কেউ জানে না।

এককালে সবই ছিল বুড়োর। বলতে গেলে, সেই গোলাভরা ধান। গোয়াল-ভরা গোরু। দু দুটো দুধেলো গাই। সবই ছিল একদিন। ছিল ঘর ভরে উছলে পড়া হাসিখুশি।

নিজের জমি ছিল এক বিঘে। আরো দু বিঘে চষতো পরের। কিছুটায় লাগাত পাট, কিছুটায় লাগাত আখ আর বাকি সবটায় বুনত ধান। দু ছেলেই বড় হয়েছিল। বাপছেলেয় কাজ করত দিনরাত। বুড়োর মতে, কাজ না করে শুয়ে থাকাটা ছিল লক্ষ্মীছাড়া কাণ্ড। কাজ করে করে মরে যেতেও রাজি ছিল বুড়ো। কাজ না করে লক্ষ্মীকে তাড়িয়ে দাও ঘর থেকে, বুড়ো তা কিছুতেই সহ্য করতে পারত না। দু ছেলেই বড় হয়েছিল। দু ছেলেরই বিয়ে দিয়ে দিল সে। ওমনি হাসি-হাসি খুশি-খুশি দিন চলছিল বুড়োর। এরি মধ্যে হঠাৎ এক অশুভ ডাক পড়ল দেশে।

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ জাপানীদের আক্রমণে জব্দ হয়ে এসে হাজির হল দেশে। লোক চাই। দেশেও সেবার
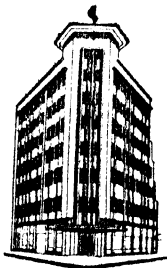
শ্খা হল। বৃষ্টির অভাবে সোনাফলা মাঠটা ফেটে চৌচির, আর ধানের চারা-গাছগ্লো রোদে পুড়ে পুড়ে লাল হয়ে গেল। ফসল তুলতে পারল না কেউ ঘরে। তারপর দালালরা তো আছেই। ঝোপ বুঝে ওরা কোপ মারল। গ্রামে গ্রামে, গঞ্জে গঞ্জে ঢোল পেটাল। পথে-ঘাটে, হাটে-বাজারে বিজ্ঞাপন ছড়িয়ে দিল। লোভ দেখাল, ভুরি ভুরি চকচকে টাকার। দেশে তখন আকাল। জিনিস-পত্তরের দাম বেড়ে যাচ্ছে লাফে লা ছ'পসা-দ্য়ানা সেরের চালের দাম গেল এক টাকা। তেল-ডাল, কা চোপড় তো মিললই না। গোলক ধ পড়ে গেল নিরীহ মানুষগু একদিকে জাপানী বোমার আত অপরদিকে টাকা। টাকা হলে বাঁচবে তবু। মা-বোনদের মান-ই বাঁচানো যাবে। না খেয়ে মরবে না।

দলে দলে গিয়ে নাম লেখাতে করল। টিপসই দিয়ে এল গাঁয়ের মান গঞ্জের মানুষ।

বুড়োও সেবার ফসল তুলতে পা না ঘরে। দুটো ছেলে একদিন থেকে এসে বলল, তবে আমিও যাই নাম লেহাইয়া দিই না কি কও?

বুড়ো তেড়ে এল, বলল, কইছ লাইগছস কি হারামজাদা শুয়ো বাচ্চা। যুদ্ধে যাইবার শখ কান দুটো ছেলে চুপ করে গেল তখনো বীজ ধান ক'টি হাতে ছিল।

ক'দিন যেতে শেষ হয়ে গেল বী ধানও। তারপর হালের বলদ জোড় দুধলো গাই দুটি।

ছোট ছেলে না কয়ে গঞ্জে গি একদিন নাম লিখিয়ে এল। বাড়ি এ বলল বাপকে। বুড়ো কপালে হা রাখল। ভাবল। বলল, কি খামু আ হেইডা না অইলে।

দরদর করে দু চোখ বেয়ে জল নেমে এল বুড়োর। ছোট ছেলে চলে গেল যুদ্ধে নাম লিখিয়ে।

বুড়োর সেই চোখের জল আর ফুরলো না। পথে ঘাটে যাকে পায় জিগ্যেস করে, যুদ্ধের কথা। গঞ্জে গেলে জিগ্গেস করে যুদ্ধের কথা। জাপানী আক্রমণ তখনো অব্যাহত। দাউ দাউ করে ওঠে বুড়োর বুকটা।

ক'মাস কেটে গেল। সোনার সংসারটা বুড়োর পুড়ে ছারখার হয়ে গেল। দেনায় ডুবে গেল। দেনা শোধ করতে গিয়ে জমি বিক্রি করে দিল অর্ধেকটা।

জিনিসপত্তরের দাম আরো বেড়ে গেল। আধপেটা খেয়ে, না খেয়ে চালাল কতদিন। খোরাকি চালাতে গিয়ে বাকি জমিটুকুনও বন্ধক দিয়ে এল একদিন

গাঁয়ের মোড়লের কাছে। টাকা যা নিল, লিখিয়ে দিয়ে এল তার তিন গুণ। নইলে যে টাকা ধার দিতে চায় না কেউ। কথা ছিল শোধ দেবে বোশেখ মাসে। ছোট ছেলে যুদ্ধে গেছে টাকার জন্যে। এখন ফাল্গুন মাস। চত্তির গেলে বোশেখ মাস। বোশেখ মাসে ছোটো ছেলে টাকা পাঠাবে। জমিটা তখন ফিরিয়ে নেবে। আবার লাঙল করতে হবে। এক জোড়া বলদ। দুটো দুধলো গাই। আবার সেই হাসি খুশি।

ফাল্গুন গেল। চত্তির গেল। এল বোশেখ। ছেলে টাকা পাঠাল। ডাক-পিয়ন একদিন খবর দিয়ে গেল ডাকঘর থেকে গিয়ে টাকা নিয়ে আসতে। বুড়ো একটু হাসল। এইতো লক্ষ্মী ঘরমুখো হয়ে গেল আবার। জমিটা এবার ফিরিয়ে নিতে হবে। আবার লাঙল বলদ। দুটো দুধলো গাই।

হঠাৎ কি যেন ভাবল বুড়ো। ছুটে গেল ডাকপিয়নের পিছু পিছু। পথ আগলে দাঁড়ায় ডাকপিয়নের। বলল, ছোটছেইলাডা আমার এখন কোন্ মুল্লুকে যুদ্ধ কইরবার লাইগছে এট্যু কইবার পারেন পিয়ন বাবা?

পিয়ন প্রিয়নাথ চুপ মেরে গেল বুড়োর কথায়।

এট্যু কইবার পারেন পিয়ন বাবা? ঘোলাটে চোখে আবার সপ্রশ্ন দৃষ্টি মেলে ধরল বুড়ো।

পিয়ন প্রিয়নাথ কি জানে কোথায় যুদ্ধ করছে বুড়োর ছোটছেলে। অথচ একটা উত্তর তো দেয়া চাই তাড়াতাড়ি। বলল, চীন মুল্লুকে।

চীন মুল্লুক! বুড়ো হাঁ করে তাকিয়ে থাকে।

বলল, কখন আইবো, কইছে আপনাগো দিয়া?

তা কি করে বলবো, যুদ্ধ শেষ হলে আসবে। বেকায়দায় পড়ে গেল পিয়ন প্রিয়নাথ।

শেষ অইবার লাইগ্‌ছে যুদ্ধ। বুড়ো জানতে চাইল।

তা কে জানে কখন শেষ হবে যুদ্ধ।

বলেই পিয়ন প্রিয়নাথ এগিয়ে চলল গাঁয়ের পথ বেয়ে বেয়ে। বুড়ো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল পিয়ন প্রিয়নাথ কোন্ দিকে গেল। হাঁটতে হাঁটতে মেঠো পথ ধরল পিয়ন। তারপর সড়ক বেয়ে বেয়ে ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল দূরে।

বুড়ো বাড়ির পথ ধরল। এসে ঘরের দাওয়ায় বসে বসে কি যেন ভাবল খুব করে।

পরদিন ভোর ভোরেই গঞ্জের পথে পা বাড়াল। হাঁটতে হাঁটতে পা ধরে গেল তার। বোশেখের খররোদে টস্‌টস্ করে ঘাম বেয়ে বেয়ে পড়ল চিবুক থেকে। মাথার ওপর সূর্য। প্রচণ্ড উত্তাপে মাথাটা যেন ফেটে যাচ্ছিল। কিছুদূরে গিয়ে বটের ছায়ায় বসে একটু জিরোল।

ডাকঘরে গিয়ে পৌঁছতে বেলা প্রায় বারোটা বেজে গেল। পিয়ন প্রিয়নাথকে দেখতেই বুড়ো ডাকঘরের জানালা দিয়ে ঘোলাটে চোখ দুটো মেলে ধরল। হাত দিয়ে আসতে ইশারা করল। পিয়ন প্রিয়নাথও এতোক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছিল বুড়োর জন্যে। টাকা বিলি হলে যে যা পারে সাধ্যিমত সম্মান করে যায় গাঁয়ের মানুষগুলো। যুদ্ধের বাজার। নইলে কিছুতেই ঠেকা দেয়া যায় না যুদ্ধের বাজারে। এ দক্ষিণা গ্রহণে তাই কোনো কুণ্ঠা নেই। প্রত্যুত্তরে কৃতজ্ঞতা জানাতেও ভুল করে না কখনো প্রিয়নাথ।

সরকারী কাজ। সব সময়ই ভয় হয় টাকা বিলি করতে। মানুষ হল সে মাত্তর বিশ টাকার। যুদ্ধের বাজারে নাড়াচাড়া করে কিন্তু দেদার। আর একটু ইদিক-সেদিক হয়ে গেলে তো সোজা শ্রিঘর। কালকেও সে নাম জিগ্‌গেস করেছিল। তাই আজকে নামটা আবার জিগ্‌গেস করল।

বুড়ো নাম বলল।

মিলিয়ে দেখল প্রিয়নাথ। ঠিক আছে।

গাঁয়ের নাম?

চাঁপা। বুড়ো বলল।

মিলিয়ে দেখল প্রিয়নাথ। ঠিক আছে।

সই করতে জানেন?

আমরারে কি আর লেহাপড়াডাও হিখাইছে! কেমন করে যেন বুড়ো একটু হাসল।

তবে হাতের টিপসই দিন ওখানটায়।

আঙুলে কালি মেখে নিয়ে টিপসই দিল বুড়ো।

আরেকটা দিন এখানটায়। জায়গা নির্দেশ করে এবার কালি মাখিয়ে দিল পিয়ন প্রিয়নাথ।

আরেকটা টিপসই দিয়ে বুড়ো যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। বেজায় লজ্জা পেল মনে মনে। বুড়ো হয়ে গেল, একটা সই করতে পর্যন্ত শিখল না আজো।

টাকা গুনে হাতে নিল বুড়ো। কি যেন ভাবল দু' মিনিট। তারপর আস্তে দুটো টাকা গুঁজে দিল পিয়ন প্রিয়নাথের হাতের মুঠোয়। হাসি ফুটে উঠল প্রিয়নাথের মুখে। বলল, আবার যদি টাকা আসবে, অতো পথ হেঁটে আপনাকে আর আসতে হবে না। আমি গিয়েই দিয়ে আসবো।

ক্যান, আপনে লেহাপড়া জানা মানুষ। কষ্ট কইরবার যাইবেন ক্যান? আমিই আহুম। ছোট ছেইলাডা ট্যাহা পাডাইব। জমিডা নেওন লাইগবো এই মাসে। ফিরাইয়া দিবার চাইব না ট্যাহা না দিবার গ্যালে।

শেষের কথা ক'টি বুঝল না প্রিয়নাথ। দুপুরের রোদ মাথায় করে বাড়ি ফিরল বুড়ো।

এরপর প্রিয়নাথ আর আসেনি। আসবার প্রয়োজন হয়নি কখনো। বুড়ো অনেকবার অনেক পথ হেঁটে গঞ্জে গিয়ে খোঁজ নিয়ে এসেছে। টাকা আসেনি। কোনো চিঠিপত্তরও না। দেশে কিন্তু ভীষণ আকাল। যুদ্ধের বাজার। টাকা দু'শো। কোনখান দিয়ে এল আর কোনখান দিয়ে গেল বুড়ো তা টের পেল না।

বোশেখ গেল। জষ্টি গেল। ছোট ছেলেটার কোনো খবর নেই। জমির আশাও শেষ। মোড়ল ধান তুলেছে ঘরে। বুড়োর চোখে জল।

বড় ছেলেটাও একদিন গঞ্জ থেকে সে বলল, তবে আমিও যাইয়া নাম লেখাইয়া দিই গা, কি কও?

বুড়ো তেড়ে এল, হারামজাদা, দূর হইয়া যা তবে আমার সামনে থিকা। দূর অইয়া যা তোরা আমার সামনে থিকা।

বড় ছেলে গিয়ে লাঙল ধরল অন্য জনের। মাস মাইনে যা পায় তা দিয়ে খেয়ে না খেয়ে চলল কোনমতে কিছুদিন। ছোট ছেলের বউ চলে গেল বাপের বাড়ি। আর এল না।

যুদ্ধ থামল। বাংলার ঘরে ঘরে যে দাউ দাউ আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে গেল তা কিন্তু থামল না আর। গাঁয়ের কেউ কেউ ফিরে এল। বুড়োর ছোট ছেলের খবর কেউ দিতে পারল না। বুড়ো কাঁদল না। মানুষ দেখলে যেন কেমন করে চেয়ে থাকে পলকহীন ঘোলাটে চোখ দুটো দিয়ে। ভালোয় মন্দয় কিছুরই আর ধার ধারে না সে। একমাত্র রোজগেরে এখন বড় ছেলে। মাস মাইনে যা পায় তা এনে খাওয়ায় ঘরশুদ্ধ মানুষগুলোকে।

একটা পুরনো বাতিক ছিল বুড়োর। সব হারিয়ে আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠল ওটা। ঘরের কোণ থেকে একদিন টেনে নিল সে ভাঙ্গা দোতারাটা। কে জানতে কখন একটা তার ছিঁড়ে গেছে। আরেকটা ঠিক আছে এখনো। হাতের আঙ্গুল বসিয়ে টেনে দেখল তারটা। টং করে করে আওয়াজ উঠল একটা নতুন সুরের সৃষ্টি করে। টেনেটুনে জোড়া দিল কোনোমতে ভাঙ্গা তারটাও। আঙ্গুল বসিয়ে টেনে দেখল। টং করে আওয়াজ উঠল। কান পেতে শুনল বুড়ো। আগেরটার সেই সুরের আবেদন নেই ছেঁড়া তারটায়। টেনেটুনে আবার দেখল। টং করে আওয়াজ উঠল আবার। অনেকটা ঠিক হয়ে গেল যেন এবার।

সব হারিয়েও এবার যেন কিছু পেল বুড়ো। গেঁয়ো পথে পথে ঘুরে বেড়াতে শুরু করল সে ভাঙ্গা দোতারাটা নিয়ে। গান গেয়ে গেয়ে বেড়াল এখানে সেখানে। কেউ শুনল। কেউ শুনল না।

দুটো বছর এইভাবে কাটল।

একদিন বড় ছেলে কাজ ছেড়ে দিয়ে এসে বলল পরের কাম আর ভালো লাগতাছে না। ব্যাপার কইরা খামু।

আমিও হেইডি কইবার লাইগছিলাম। বুড়ো বলল।

ঘরের কোণে রেখে দিল বুড়ো দোতারাটা। নগদ কিছু গুনে দিল বড় ছেলের হাতে। বড় ছেলে গাঁয়ে ঘুরে ঘুরে হাঁস মুরগী চালান দিতে শুরু করল শহরে।

কেটে গেল অনেক বছর। এরি মধ্যে একদিন মরে গেল বড় ছেলের বউ।

চলল এক বছর। পরের বছর শুরু হ'ল আবার এক সৃষ্টিছাড়া কাণ্ড। বানের জলে ভাসিয়ে নিয়ে গেল সব। গোরু-মোষ, হাঁস মুরগী। ঘরের ভেতর বুক সমান পানি। যে যেদিকে পারল ভয়ে পালাল। বানের শেষে একমাত্র রোজগেরে ছেলেটাও মরে সব শেষ হয়ে গেল। সব হারিয়ে রয়ে গেল শুধু বুড়ো। আর বড় ছেলের বড় মেয়ে এই ভুতি।

ভুতির মন কেমন কেমন করে।

এই অন্ধকার কানা গলিটায় কিছুতেই ভাল লাগে না ভুতির।

শহরের বুকে আবছা অন্ধকার নেমে আসতেই কত রাজ্যের কত মানুষ এসে ভিড় করে। তাড়ি খেয়ে ঢলে ঢলে পড়ে। আবোল-তাবোল বকাবকি করে। কাছে এসে ফুসুর ফাসুর করে, গায়ে হাত রেখে, চোখে চোখ রেখে নানা কথা কয়। ভয়ে চুপসে যায় ভুতি ওদের কাণ্ড দেখে।

সোন্দরমাসী বলে, ভয় কিলা তোর, অমোন সমত্ত ছুঁড়ী!

ভুতি বলে, ঘিন করে মোর।

ঘিন করে! সোন্দরমাসী মুখ নাড়া দেয়।

ভুতি চুপ করে যায়। মনে মনে ভাবে। সোন্দরমাসীও তাহলে আর দেখতে পারে না। মনে পড়ে ভুতির, প্রথম যেদিন ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে আর আর মানুষগুলোর সাথে ঘোমটা টেনে লাইন ধরে এসে এই খারাপ গলিটার ভেতর পা দিয়েছিল, সোন্দরমাসী এসে বুকে জড়িয়ে ধরেছিল। আদর সোহাগের অন্ত ছিল না। ভুতিরও ভার ভালো লেগেছিল এই সোন্দরমাসীকে। বুকের

ভেতর মুখটা টেনে নিয়ে জিগ্‌গেস করেছিল, নাম কিলো তোর রূপসী?

ভুতি। জবাব দিয়েছিল ও।

ভুতি! অবাক হয়ে গিয়েছিল সোন্দরমাসী, অমন যার রূপ কে দিল তোকে এমন বেরসিক নামটা?

বুড়ো ডাক পাইর্‌ত ভুতি কইয়া। আর হগলে জরি কইয়া।

জরি?

হ। ঘাড় নেড়েছিল ভুতি।

ওসব নাম চলে না এখানে। রূপ না থাকলেও নামের বাহার থাকা চাই। বুক ঠেলে কান্না আসতে চাইলেও হি হি করে অথবা মুখ টিপে হলেও অন্তত একটু হাসা চাই। নইলে বাবুরা কাছে ঘেঁষে না। তাই এখানে আসলেই সোন্দরমাসী নাম বদলিয়ে দেয় সবাইর। যার নাম কালি, হয়ে যাবে রুবি। যার নাম ছালি হয়ে যাবে ডালি। ভুতির তো রূপের অভাব নেই। বয়েসও বড়জোর উনিশ কি কুড়ি। দেখতে লাগে যেন একটা ভরা-কলসী। ভুতির চিবুকে একটা টিপ দিয়ে সোন্দরমাসী সেদি বলেছিল, আজ থেকে তোর নাম রে দিলাম রূপসী।

ভুতি কিছুই বলেনি। লজ্জায় মু নিচু করে গেল।

ভুতি ভেবেছিল, ওর প্রতি সোন্দর মাসীর ওটা একটা আলাদা টান। কদি যেতেই টের পেয়ে গেল ভুতি। আসলে সোন্দরমাসীর কাছে সবাই সমান রাতপিছু সবাইর কাছ থেকেই নিজে মাশুল, ঘর ভাড়া সব কেটেকুটে রাখে বিনিময়ে সে কিছুই করে না তা নয় নতুন যারা আসে, তাদের দরদ দেয়, চলন বলন শেখায়।

একদিন ভুতি বলল, আজ শরীলডা ভালা যাইবার চায়নি মাসী। দুইডা আনা কম লেও।

মাসী বলল, আমারো খেতে হয়। আমি চলি কি করে? হয় না তা।

সে থেকেই ভুতি টের পেয়ে গেছে এই সোন্দরমাসীটাও কোন জাতের মানুষ। তাই বলে সোন্দরমাসীর সাথে আর আর বেহায়াদের মত ঝগড়া আর বচসা করে পাড়া মাথায় করে না ভুতি।

দিন যায়। ভুতিরও আস্তে আস্তে সয়ে যাচ্ছে সব কিছু। হঠাৎ একদিন বিকেলবেলায় মাথা ধরল ভুতির। টন টন করে উঠল মাথাটা। যেন ছিঁড়ে পড়বে। অন্ধকার নেমে এসেছে গলির ভেতর। দরোজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ল ভুতি। খারাপ মানুষগুলো এসে ভিড় জমিয়ে তুলল গলির ভেতর। ভুতি দরজা খুলল না।

সোন্দরমাসী এসে দরোজা ধাক্কা দিয়ে বলল, কইলো রূপসী, সবাই যে এসে ফিরে যায়; মরে গেলি নাকি তুই!

শরীলডা ভালা যাইবার চায় না গো মাসী।

কই, দরজাটা খোল দেখি। সোন্দর-মাসী বসে।

ভুতি উঠে এসে দরজা খুলে দিল। বলল, মাথাডা ছিড়্যা পইরবার লাইগছে মাসী। বমি বমি কইরবার লাইগছে সক্যাল থিকা।
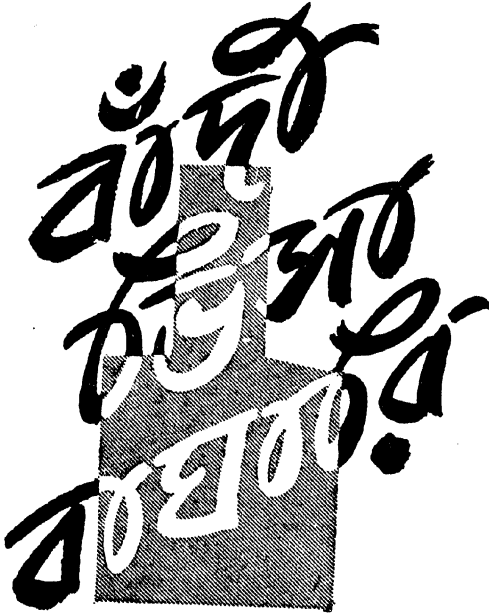
সোন্দরমাসী অবাক হয় শোনে। বলে, দাঁড়া দেখি।

ভূতি উঠে দাঁড়াল। পা থেকে মাথা পর্যন্ত তন্ন তন্ন করে দেখল সোন্দর মাসী, বলল, কোথা থেকে নিয়ে এলি। এখেনে এলি তো এই সেদিনটায়।

ভূতি মুখ নিচু করে চুপ হয়ে বসে রইল।

চুপ করে রইলি যে হতভাগী!

কি কমু? ভূতি বলে।

এখন তো পেটের ভেতর বড় সড় হয়েছে। বলবি কি আর!

সোন্দরমাসী আবার বলে, নিয়ে এলি কোথা থেকে?

ফুঁপিয়ে উঠে সোন্দর মাসীর পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ল ভূতি। কিছু বলতে পারল না।

মাসী বলে, কেঁদে কি হবে আর।

ফুঁপিয়ে ওঠা কান্নার বেগ কমলে ফিস্‌ফিসিয়ে ভূতি বলে, বেইমানডা এই মুখ দিয়া চইলা গ্যাছে। সোয়ামী কিনা!

অবাক হল মাসী। বলল, বিয়ে হয়েছিল তোর?

হ। ভূতি জবাব দেয়।

সোন্দরমাসী কি ভাবছিল। বলল, আমি তো ভেবেছিলাম কোনো খারাপ মানুষের।

ভূতি সোন্দরমাসীর পা ধরে বলে, তোমার পায়ে ধইরা কই মাসী, আমারে পার কইরা দ্যাও।

গাঁয়ের নাম মনে পড়ে তোর? মাসী আচমকা জিগ্‌গেস করে।

পড়ে। চাঁপা। ভয়ে ভয়ে বলে ভূতি।

বাড়িতে কে আছে তোর?

ক্যান, বুড়াডা!

তবে এখেনে এলি কেন?

পথ ভুইলা উয়ারগো লগে।

তাহ'লে যাবি কিসে?

খেয়া নৌকায়। ভূতি বলে। ভোর-বেলায় কদমতলি থেকে নৌকো ছাড়ে চাঁপার দিকে।

সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে মাসী এসে জাগায় ভূতিকে।

ভূতি উঠে এসে বলল, চলো।

মাসী বলল, চল্।

টাকা আছে তোর কাছে? হাঁটতে হাঁটতে জিগ্‌গেস করল মাসী।

আছে একটা।

নৌকোয় নিব কত?

কইবার পারি না।

মাসী চটে উঠে বলে, অ নেকি আমার! ধর, এইটে রেখে দে কাপড়ের খুঁটে।

মাসীর মুখের দিকে চেয়ে রইল ভূতি। কথা বলতে পারছিল না। অন্ধকার নোংরা গলির সেই মাসী আর এই-মাসী কি এক নাকি! অনেকটা পর বলল, ক্যান মাসী, তোমারও তো চলন লাইগবো।

লাইগব মাসী যেন ভেঙচি কেটে ওঠে। মরদ, বলি যাবি কেমন করে ছুঁড়ি!

ভূতি চুপ করে যায়।

বিদেয় বেলায় নৌকোয় চেপে ভূতি মাসীর দিকে চেয়ে চেয়ে বলল, যাইবার লাইছি মাসী।

মাসী চলে এল কথার জবাব না দিয়ে।

তখনো দুপুর হয়নি। চাঁপায় এসে পৌঁছল ভূতি। সাপের মত একেবেঁকে গেছে গাঁয়ের পথ। গেঁয়ো পথ বেয়ে বেয়ে ভূতি গিয়ে বাড়িতে পা দিল। সাপ দেখলে মানুষ যেমন ভয়ে আঁতকে ওঠে, বাড়ির মেয়েমরদ সবাই ভূতিকে দেখেও তেমন করে আঁতকে উঠল। তবু কি এক কৌতূহলে যেন মেয়েছেলেরা সবাই এসে ভূতিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রইল। ভূতি মুখ নিচু করে মাটির পানে চেয়ে আছে।

কে যেন বলে উঠল, বুড়াডা গ্যাছে কই?

ভিটির পানে মাথা তুলে ভূতি জিগ্‌গেস করল, ক্যান সে আসেনি?

সবাই বলল, হেইডা আমরা কইবার পারুম কোনহান থিকা।

হাত-পাগুলো পেটের ভেতর ঢুকে পড়ল ভূতির। নেই তাহ'লে আর ওর! ভিটির পানে মুখ তুলে চেয়ে দেখল ভূতি, বানের জলে ধুয়ে ধসে যে মাটি-টুকু এখনো রয়েছে কচি কচি আগাছায় ভরে গেছে ওখানটায়।

বাড়ির সবাই তন্ন তন্ন করে দেখল ভূতিকে। কিছু বলল না ও। মুখ নিচু করে রইল শুধু। ওদের দৃষ্টি যেন তীর হয়ে ওর পেটে গিয়ে বিঁধছে।

লেদির মা এসে দেখে বলল, ওমা, এই পাপ লইয়া আইলি কোনহান থিকা।

ভূতি কথা বলল না।

কে যেন বলল, যেহান থিকা তুই এই পাপ আইনবার গেছলি সেইহানে চইলা যা তুই ভূতি। নইলে সামনের বছরডাও ডুইবা মইরবার লাইগবো আমাগো।

মাটির সাথে মিশে গেল যেন ভূতি ওদের কথায়। সন্ধ্যে নাগাত বসেছিল ও মুখ নিচু করে। রাতের বেলায় কোথায় চলে গেছে তা কেউ দেখেনি।

প্রগতির পরিচয়—স্ট্যানভ্যাক কুইজ-৪
দেশের সর্বসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্যেই ভারতের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, একথা আপনি জানেন। কিন্তু প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এ-পর্যন্ত দেশের **কতখানি** উন্নতি হয়েছে তার খবর রাখেন কি?
নীচের প্রশ্ন ও উত্তরগুলোর সঙ্গে আপনার ধারণা পরখ করে দেখুন।
১ বেশী করে খাদ্যশস্য উৎপাদন করা পরিকল্পনার একটি প্রধান অঙ্গ। ১৯৫৫ সালের মার্চ মাসের মধ্যে ভারতে খাদ্যশস্যের বার্ষিক উৎপাদন বেড়েছে :
ক) ১,৫৫,৬০,০০০ টন
খ) ১,১৫,৯০,০০০ টন
গ) ২৮,০০,০০০ টন
২ পশম শিল্পের উৎপাদন বাড়ানোও পরিকল্পনার অন্যতম লক্ষ্য। ফলে ১৯৫৪/৫৫ সালে পশমজাত দ্রব্য তৈরী হয়েছে মোট :
ক) ৯৩,৫০,০০০ পা:
খ) ২,০৮,৭৫,০০০ পা:
গ) ৩২,০০,০০০ পা:
৩ পুস্তক পাঠ ও প্যাকেটে জিনিস কেনা বেড়ে যাওয়ায় কাগজ ও পিস্ বোর্ডের চাহিদা বেড়ে গেছে। ১৯৫৪/৫৫ সালে কাগজ ও বোর্ড তৈরী হয়েছে :
ক) ১,৯১,২০০ টন
খ) ১,৬৯,০০০ টন
গ) ৮২,০৩৫ টন
৪ পরিকল্পনার নানা কাজে ও ক্রমোন্নতিশীল শিল্পক্ষেত্রে সিমেন্টের প্রয়োজন খুব বেশী বলে ভারতে সিমেন্টের চাহিদা বেড়ে চলেছে। ১৯৫৪/৫৫ সালে সিমেন্টের উৎপাদন বেড়েছে :
ক) ২,৮৫,০০০ টন
খ) ৫,৭৫,০০০ টন
গ) ১৭,২৫,০০০ টন
পারিবেশন করতে পেরে আজ গর্বিত—তা ছাড়া আমাদের পেট্রলজাত দ্রব্য **উৎপাদন, পরিশোধন ও পরিবেশনের** বিবিধ কর্মধারা দেশের এই অগ্রগতির সহায় বলে স্ট্যাণ্ডার্ড-ভ্যাকুয়াম আজ গৌরবান্বিত।
উত্তর
১ ১,১৫,৯০,০০০ টন—পরিকল্পনার চরম লক্ষ্য থেকে অনেক বেশী। এতে বিদেশী মুদ্রা খাতে ১৩০ কোটি টাকার ওপর ব্যয় বন্ধ হয়েছে।
২ ২,০৮,৭৫,০০০ পা:—প্রায় ৩০ লক্ষ পাউণ্ড পশমী জিনিস বেশী তৈরী হওয়ায় গরম পোশাকের সুরাহা হয়েছে।
৩ ১,৬৯,০০০ টন—লেখা, ছাপা, মোড়া ও কার্ডবোর্ড বাক্স তৈরীর উপযুক্ত কাগজ তৈরী হয়েছে।
৪ বছরে ১৭,২৫,০০০ টন বেশী সিমেন্ট তৈরী হওয়ায় বাঁধ, কারখানা, বাসগৃহ, স্কুল ও হাসপাতাল তৈরীর বিশেষ সুবিধা হয়েছে।
নয়াদিল্লীতে ইণ্ডিয়ান ইণ্ডাস্ট্রীজ ফেয়ার দেখুন, ২৯-এ অক্টোবর থেকে ১৫ই ডিসেম্বর
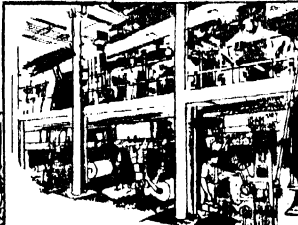
ঝাঁসীর রাণী

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য

॥ ১৮ ॥

হিউরোজের নেতৃত্বে মালোয়া এবং মধ্যভারত অভিযান ১৮৫৭ সালের পঞ্চম এবং শেষ অধ্যায়।

ঝাঁসীতে সিপাহীদের সশস্ত্র বিদ্রোহের পরে, প্রথমে বুন্দেলখণ্ড এবং সাগর ও নর্মদা ডিভিশনের অন্তর্গত সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল বিদ্রোহ। এই ব্যাপক ব্রিটিশ বিরোধী অভ্যুত্থান ঝাঁসীতে কেন্দ্রীভূত হয় এবং রাণীর নেতৃত্বে এই খণ্ড খণ্ড বিদ্রোহগুলি একযোগে পরিণত হয় যুদ্ধে।

সেই সময় বহু হিন্দু এবং মুসলমান বীর যোদ্ধা যোগ দিয়েছিলেন যুদ্ধে। তাঁদের নাম ইতিহাসে নেই। স্থানীয় মানুষের রচনায়, পুঁথিতে, বিবরণীতে তাঁদের ইতিহাস মেলে। বাণপুরের রাজা ঠাকুর মর্দন সিংহ, জুলাই ১৮৫৭তে সাগরের অন্তর্গত খুরই কেল্লা অধিকার করেন। সরকারী তহশীলদার আহম্মদ বক্স, আফগানী সৈন্যদের নিয়ে বাণপুরের রাজার সাথে যোগ দেন। খুরই-তে ভারতীয়দের একটি ঘাঁটি স্থাপিত হল। তারপরে ঠাকুর মর্দন সিংহ ললিতপুর (লালথাপুর), বালাবেহাত, চন্দেরী সর্বত্র গিয়ে বিক্ষুব্ধ জনসাধারণকে উৎসাহিত করেন যুদ্ধপ্রস্তুতিতে—সর্বত্র প্রবল প্রতিরোধের প্রস্তুতি চলে। শাহ্‌গড়ের রাজা বখ্‌তব্‌ আলি বাণপুরের রাজার সহায়তা করেন। ভূপালের নবাববংশীয় মহম্মদ ফাজিল খাঁ, সংক্ষেপে আমাপানি নবাব নামে খ্যাত ছিলেন। রাথ্‌গড়ে ছিল তাঁর ঘাঁটি। তাঁর আত্মীয়া ভূপালের বেগমের বিরুদ্ধে গিয়ে তিনি রাথগড়ে একটি যুদ্ধের ঘাঁটি গড়ে তোলেন। সাগরস্থিত 42nd B. N. I'র শেখ রমজান শাহ্‌গড়ের রাজা বখ্‌তব আলির সঙ্গে যোগ দেন।

শেখ রমজানের কিছু বাঘী সিপাহী (বাঘী বিদ্রোহী) দামোহ্‌ পৌঁছল। ক্রমে শাহগড়, রাথগড়, দামোহ্‌, সাগর, খুরই সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল যুদ্ধের প্রস্তুতি। হিন্দোরিয়ার তালুকদার কিশোরসিংহ তাঁর চাষীদের নিয়ে যোগ দিলেন। এইভাবে ঝাঁসীর দক্ষিণে সর্বত্র ব্রিটিশবিরোধী ঘাঁটি গড়ে ওঠে। এই প্রসঙ্গে গোণ্ড্‌ রাজ্যের রাজা শঙ্কর শাহ্‌এর করুণ এবং হৃদয়বিদারী ইতিহাস স্মরণীয়।

একদা গোণ্ড রাজ্য বিখ্যাত ছিল গোণ্ডোয়ানা নামে। চন্দেল্ল কুলকন্যা, গোণ্ড রাজের বধূ রাণী দুর্গাবতীর নাম আজও সেই সব অঞ্চলে গানে গানে বেঁচে আছে। তাঁর বংশধর হৃদয়শাহ্‌র বিবাহ হয়েছিল বঘেলা রাজবংশে। শাসকের বিরুদ্ধে শাসিতের অভ্যুত্থানের মার্জনা নেই ইতিহাসে। অলিখিত আইন সেইসব বিদ্রোহী মানুষকে, সরিয়ে দিয়েছে চিরদিনের মতো। শুধুমাত্র সেই অপরাধে সেইসব রাজ্য চিরদিন অনুন্নত থেকে গেছে, লুপ্ত হয়ে গেছে কখনো বা। রাণাপ্রতাপের অপরাধে চিতোর ধীরে ধীরে ধ্বংস হয়ে গেছে, দুর্গাবতীর পরে গোণ্ডোয়ানার নাম হয়ে গেছে ক্রমশ বিলুপ্ত। বুন্দেলখণ্ডে মরাঠা অধিকার স্থাপিত হবার পর গোণ্ডের শেষ স্বাধীন রাজা সুমেরশাহ্‌ ১৮০৪ খৃীঃ অব্দে মারা গেলেন। তাঁর পুত্র শঙ্করশাহ্‌ রাজ্য, অধিকার, সম্পত্তি ও বৃত্তি বঞ্চিত হয়ে নির্বাসিত হলেন জব্বলপুর থেকে চার মাইল দূরে অবস্থিত একটি গ্রামে। সেইখানে যখন তাঁর মাটির ঘরের সংলগ্ন বাগানে গোরা পল্টনের ঘোড়া এসে গাছ নষ্ট করে যেত, কখনো তাঁকে বিদ্রূপ করে সেলাম জানাত রাজা বলে, তখন হৃতবল, নির্বাসিত বৃদ্ধ শঙ্করশাহের হয়ে প্রতিবাদ করতেন যুবক পুত্র রঘুনাথ।

লেফটেনাণ্ট ক্লার্ক (Lt. Clarke) ১৮৫৭ সালের প্রথমেই একদিন কুড়িজন সশস্ত্র সৈন্য নিয়ে ঘেরাও করলেন শঙ্কর-

শাহের মাটির বাড়ী। শঙ্কর শাহ্ ও রঘুনাথ শাহকে বন্দী করলেন। [illegible] নারী ও বালকবালিকাকে গরুর গাড়ী করে নিয়ে এলেন জব্বলপুরে। শঙ্কর শাহের বাড়ীতে একখানি চণ্ডীস্তোত্র পাওয়া গেছে। "হে শত্রুসংহারিকা, সর্বদা শক্তি মাতা চণ্ডী, প্রসন্ন হও ভক্তের প্রতি, নিধন করো শত্রুকে—" এই স্তোত্রের ছত্রে ছত্রে নাকি শঙ্কর শাহের ইংরাজ নিধনের "[illegible] অভিসন্ধি" ধরা পড়েছে। তাই বিচার হবে জব্বলপুরে। পথ দিয়ে হাত বাঁধা অবস্থায় টাট্টুর পিঠে যাচ্ছেন শঙ্কর শাহ এবং গরুর গাড়ী চড়ে বৃদ্ধা স্ত্রী, পুত্রবধূ, কন্যা, নাতিনাত্নী সেই করুণ দৃশ্য দেখে বিলাপ করতে করতে চলেছেন। এই উপসংহার রাণী দুর্গাবতীর উপাখ্যানের সঙ্গে থাকা উচিত। রাণী দুর্গাবতীর বীরত্বের গাথা আমরা বইয়ে বইয়ে পড়ি, কিন্তু সেই বীর রমণীর যুদ্ধের কথাতেই তাঁর কাহিনীর সমাপ্তি ঘটেনি। ইতিহাসের চক্র আবর্তিত হয়ে পূর্ণচ্ছেদ টানতে ১৮৫৭ সাল এসে গিয়েছিল।

ক্লার্ক ঠিক করলেন, একটি ভয়াবহ মৃত্যুদণ্ড দিয়ে ভারতীয়দের মন থেকে বিদ্রোহের বীজ বিলুপ্ত করবেন। শঙ্কর শাহ এবং রঘুনাথ শাহকে উড়িয়ে দেবেন কামানের মুখে—

"This type of execution is always feared by natives, since the body is left at the mercy of vultures and jackals, and no funeral rite can lessen the pain or ease the path for the soul departing for heaven." Charle Ball— Vol. I).

রাজা শঙ্কর শাহের বয়স তখন সাতষট্টি। শ্বেতকেশ ও শ্মশ্রু শোভিত এই বৃদ্ধের হত্যা দেখবার জন্য বলপূর্বক তাঁর সমস্ত পরিবারকে আনা হ'ল। দৃঢ়-পদক্ষেপে রাজা শঙ্কর শাহ কামানের সামনে দাঁড়ালেন। অবিচলিত, ঘৃণাপূর্ণ কঠোর কণ্ঠে বললেন—"এক বুড্ঢাকে জান খতম করনেসে আগ্‌কো রাখ্ বন্ধ নেহি সাকোগে। ম্যায় মৌত্‌সে [illegible] হোঙ্গে নেহি। ঔর লাখ্ আদমী ইস্‌কে জান্‌কা বদলা লেগা। তব্ তুম্ লোগোঁকো কৌন্ কামান বচায় গা "

পিতা ও পুত্রকে কামানের সামনে

পিছমোড়া করে বেঁধে ক্লার্ক রঘুনাথ শাহের পাঁচ বছরের ছেলে, আট বছরের মেয়ে এবং মৃত জ্যেষ্ঠভ্রাতার ছেলে, পনেরো বছর বয়সের কিশোর বালককে জোর করে দেখতে বাধ্য করলেন। কামানের গর্জনে গোলার আঘাতে ছিন্ন-ভিন্ন রক্তাক্ত হয়ে উড়ে গেল দুটি মানুষ—

"Instantaneously the torn and shattered remains of two human beings were strewn in a shower of blood, over the residency compound. Of these, the kites and vultures had a share; but such parts as could be collected were given to the Ranee, terrible memories of what had once been a husband and a son."

তার পরে আসছে হিউরোজের আগমনের গৌরচন্দ্রিকা। ১৩ই আগস্ট ১৮৫৭ সালে বিলেত থেকে কমাণ্ডার-ইন-চীফ কোলিন ক্যাম্পবেল এসে পৌঁছলেন। সতেরোই আগস্ট গ্রহণ করলেন তাঁর দায়িত্ব। ক্যানিংয়ের সঙ্গে যুক্ত পরামর্শ করে বিভিন্ন বাহিনী গঠনের পরিকল্পনা করা হল। তখনকার ভারতের অবস্থা কি?

সমস্ত অযোধ্যা বিদ্রোহী। রোহিলখণ্ড, দোয়াব ও মধ্য ভারতে ব্রিটিশ শাসন ভূমিসাৎ। দিল্লীর একটি বিশাল সামরিক গুদাম বা ম্যাগাজিন ভারতীয়দের অধিকারে। ফতেগড়ে কামান তৈরী করবার কারখানা সিপাহীরা ভেঙে দিয়েছে। পাঞ্জাবের সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ। লক্ষ্ণৌ, আগ্রা বেহাত। বিদ্রোহের প্রতিটি ঘাঁটিতে সামরিক গুদামগুলি সিপাহীদের হাতে। বেঙ্গল আর্মির এক লক্ষ সিপাহী, অযোধ্যা এবং উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের (ঝাঁসী তারই অন্তর্গত) প্রত্যেকটি অধিবাসী বিভিন্ন নেতৃত্বের অধীনে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করেছে। রাস্তা, নদীপথ সমস্ত ভারতীয়দের হাতে। মধ্য ভারতের অবস্থা সবচেয়ে শোচনীয়। ঝাঁসীর রাণীর সঙ্গে তাঁতিয়া টোপী যে কোন সময়ে যোগ দিলে, একটি বিশাল সমরানল জ্বলে যাবে, বুন্দেলখণ্ডের অবস্থা এমনিতেই ধূমায়িত। সঙ্গে সঙ্গে যদি পাহাড়-অরণ্য সমাকুল দুর্গম মহারাষ্ট্র যোগ দেয়—(কেননা রাণী এবং তাঁতিয়া মহারাষ্ট্রীয়), তাহলে কি হবে তা ভাবতেও

ক্যানিংয়ের বুক কেঁপে যায়। ইংল্যান্ড তাঁকে ক্ষমা করবে না। ঝাঁসী এবং আশপাশে ঘাঁটিগুলিকে পুনরায়ত্ত করবার জন্য ক্যানিং ও ক্যাম্পবেল একটি তিন মুখো অভিযানের পরিকল্পনা করলেন। এই অভিযানের পক্ষে সেদিন ক্যানিং ও ক্যাম্পবেল বাংলা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ, তিন প্রেসিডেন্সীর সমস্ত সামরিক কর্মচারীদেরও পর্যাপ্ত মনে করেননি, বিলেত থেকে এবং অন্যান্য ব্রিটিশ উপনিবেশ থেকে জরুরী তলব পাঠিয়ে অফিসার ও ফৌজ আনা হয়েছিল।

Bombay Column-এর সঙ্গে রাজপুতানা ফিল্ড্ ফোর্স, সাগর এবং নর্মদা ফিল্ড্ ফোর্স নিয়ে সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়া ফিল্ড্ ফোর্স গঠিত হ'ল। এর প্রধান ঘাঁটি হল মৌ। প্রথমে জেনারেল জন জ্যাকবকে এই নতুন বাহিনীর ভার দেবার কথা ছিল। পরে হিওরোজকে দেওয়া হয়।

১৮৫৭ সালের আগে হিওরোজের সামরিক জীবনের সাঁইত্রিশ বছর কেটে গেছে। আয়ারল্যাণ্ড, সিরিয়া, ক্রিমিয়া এবং সিবাস্তোপোলের অভিজ্ঞ সৈনিক তিনি। উচ্চতম সামরিক সম্মান পেয়েছেন তিনি।

C. I. F. Forceকে তিনি দুটি ব্রিগেডে ভাগ করলেন। Brigadier Stuart নিলেন প্রথম ব্রিগেডের ভার। তিনি রইলেন মৌ-এ।

Brigadier Steuart নিলেন দ্বিতীয় ব্রিগেডের ভার। তিনি রইলেন সিহোরীতে।

পরিকল্পনা হ'ল প্রথম ব্রিগেড বম্বে-গোয়ালিয়ার গ্র্যাণ্ড ট্রাংক রোডের সমান্তরাল পথে দেওয়াস, সারনপুর, বিজোরা, নিপালপুরী, বরসাদ, রাঘগড়, গুণা সাদোরা, চন্দেরী, তালবেহুত, হয়ে ঝাঁসীর সামনে দ্বিতীয় ব্রিগেডের সঙ্গে মিলিত হয়ে ঝাঁসী আক্রমণ করবে। ১০ই জানুয়ারী ১৮৫৮তে প্রথম ব্রিগেড মৌ ছেড়ে রওনা হয়ে গেল।

১৫ই জানুয়ারী দ্বিতীয় ব্রিগেড নিয়ে হিউরোজ চললেন। পথে ইংরাজ মিত্র ভূপালের বেগমের আতিথ্য গ্রহণ করে তাঁকে ধন্য করে হিউরোজ চললেন

রায়গড়, বারোদিয়া, চান্দেরাপুর, গড়াকোটা, সেরাই, মারাওরা, প্রত্যেকটি জায়গায় ঠাকুর মদন সিংহ প্রমুখ নেতাদের কাছ থেকে অতি সুপারিকল্পিত প্রতিরোধ পেলেন হিওরোজ। ঝাঁসীর তখনকার অবস্থা গুপ্তচর গোপালরাও শিরস্তাদার, আরস্কাইনকে লিখে জানালেন—

"সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খবর হল নানা সাহেবের পক্ষের একজন উকীল ঝাঁসীতে আছেন। বাণপুরের রাজা এবং নানাসাহেব, ঝাঁসীকেই তাঁদের শেষ আশ্রয়স্থল বলে জানেন। বাণপুরের তিন হাজার ফৌজ ও দুটি কামান ঝাঁসীতে। ব্রিটিশ সেনাদের অগ্রগতির খবর রাণী রাখছেন। কানপুরে ইংরেজ জিতেছে একথা যে বলছে, তাকেই রাণী শাস্তি দিচ্ছেন। ঝাঁসীতে দিবারাত্রি যুদ্ধের প্রস্তুতি চলেছে। মেয়ে পুরুষ সকলেই তৎপর।"

২৭শে ফেব্রুয়ারী ঝাঁসীর পথে চললেন হিউরোজ। ঝাঁসীর সম্বন্ধে তিনি কি বলেছেন?

"তেজ অংরেজকো—অংরেজ রাজনে হাঁসী
মাহ বল বিক্রম কী—লেও ঝটপট ঝাঁসী॥
ঝাঁসী গলেমেঁ ফাঁসী দেও,
অরছা গলমেঁ হার
যবতক রাণী কিল্লা ন ছোড়ী
তব তক ন পাও ও ধার॥"
কহত ভুপৎলাল যবতক বুন্দেলা
শূর রহে জীউ
তবতক অংরেজ ক্যায়সে লেবত
ঝাঁসী ম্যঁয় দেখ্‌লেউ॥
ঝাঁসীমে যবতক বাই রহে
ঔর কিল্লা রহে জীউ
তবতক অংরেজ ক্যায়সে লেবত
ঝাঁসী হামে দেখ লেও॥"

ইতিমধ্যে ঝাঁসির রাণী সমস্ত বুন্দেলখণ্ডে ছড়িয়েছেন তাঁর গুপ্তচর বাহিনী। বাণপুরের রাজা, ঝাঁসীর পথের তিনটি গিরিবর্ত্ম, নারুজ, ধামোনী ও মাদিলপুরে রক্ষা করতে গিয়ে পরাজিত হয়েছেন। খবরাখবর আসছে আগুনের সংকেতে। পাহাড়ে পাহাড়ে কৃষক চাষী, ইংরাজের আসবার আভাস পেলেই আগুন জ্বালিয়ে দিচ্ছে ডালপালায়। সেই আগুন দেখে আগুন জ্বালাচ্ছে অপেক্ষমান অন্য ঘাঁটির মানুষেরা। নৈশ প্রকৃতির বুকে আগুনের সংকেত জ্বলছে দেখে সতর্ক হয়ে যাচ্ছে ঝাঁসীর কেল্লার ফৌজ।

ঝাঁসীতে প্রথমে রাণীর হিতৈষী মন্ত্রিমণ্ডলী, যুদ্ধ না করে সন্ধির প্রস্তাব করেছিলেন। রাণী অভিমানে জবাব দিয়েছেন "মরণা রুচে বীরালা

না রুচে ক্ষণমাত্র অপযশে মরণে॥

সংকটের দিনে রাণী নির্ভয়ে হাত বাড়ালেন জনসাধারণের দিকে। বুন্দেলা, ঠাকুর, কাছি, কোরী, কুর্মী, তেলি, আফগান, পাঠান, জাতিধর্মবর্ণনির্বিশেষে মানুষ এল তাঁর ফৌজে। মেয়েরা এল এগিয়ে।

রাণী বিশ্বাস করে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করলেন। সংগ্রামী চেতনায় উদ্দীপ্ত হয়ে এগিয়ে এল সেই সব মানুষ। তরুণী, সুন্দরী, মনোহারিণী রাণী নির্ভয়ে অশ্বারোহে একলা ঘুরে ঘুরে তাঁর ফৌজ তৈরী করতে লাগলেন। এক সঙ্গে সাড়া দিল বাট হাজার মানুষ। কতখানি সফল হয়েছিলেন তিনি সে সম্বন্ধে Malleson বলেছেন—

It was sure that the Rani had infused some of her lofty spirit into the compatriots. Women and children were seen assisting in the repair of the havoc made in the defences by the fire of the besiegers, and in carrying food and water to the soldiers on duty. It seemed a contest between the two races.

Keye & Malleson যুক্তভাবে বলেছেন সেই কথা। Innes বলেছেন। এক কথায় বলা চলে, রাণীর নেতৃত্বে ঝাঁসীতে যুদ্ধটি সত্যিই স্বাধীনতা সমরের রূপ পরিগ্রহ করল।

২১শে মার্চ ১৮৫৮ তারিখে হিওরোজ সকাল সাতটায় রাণীর সামনে পৌঁছলেন।

নাতি উচ্চ পাহাড়ের ওপর ভয়ংকর নিষেধের মতো ঝাঁসীর কালো কেল্লা। তার দক্ষিণ বুরুজ থেকে রাণীর লাল নিশান প্রভাতের বাতাসে উড়তে লাগল।

"One of these towers had been raised by the rebels. From it floated the red standard of the Rani." (Forrest—Vol. III).

"খাইনে ভেজো অংরেজকো বাত।
মর্দান হো তো লেও কটোয়ার হাঁথ॥
কটোয়ার হাঁথ লেও নাব চড়াও।
নাব চড়াও কী মোরছা বড়াও॥
মোরছা বড়াও জী তেলংগা লের।
মৈঁ তো বাঘিন হো সমঝায়ো ফেরা॥"

ক্রমশ

কলিকাতা

অ্যাকাডেমী অব ফাইন আর্টস-এর পরিচালনায় কলকাতায় সম্প্রতি রুশ এবং ভারতীয় পুতুল শিল্পের একটি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে।

রুশ পুতুলগুলির মধ্যে জর্জিয়া, এস্তোনিয়া, মস্কো, মঙ্গোলিয়া, আর্কটিক নর্থ প্রভৃতি সোভিয়েট সোসিয়ালিস্ট রিপাবলিক প্রদেশগুলির শিশুদের, মাঝে মাঝে বড়দেরও মূর্তি সাজানো হয়েছিল। রূপশিল্পের সব নিয়ম, যেমন রূপভেদ, প্রমাণ ভাব, লাবণ্য, সাদৃশ্য, অ্যানাটমি প্রভৃতি খুব কড়াভাবে মেনে চলার ফলে এগুলি নিভুল পুতুল বটে, কিন্তু ভারতীয় পুতুলের রস ও সৌন্দর্য তুলনায় অনেক উপরে। বিভিন্ন দেশের শিল্প বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হতে পারে, কিন্তু সেই বহুধা বিভক্ত শিল্প রসের দিক দিয়ে এক বলে প্রমাণিত হয়েছে রসিকদের কাছে, সেখানে ভারতীয় কি অভারতীয়, প্রাচ্য কি পাশ্চাত্ত্য এমনভাবে দেখার প্রয়োজন হয়নি। এ যুক্তিটি এখানে উল্লেখ করার উদ্দেশ্য পাঠক যেন মনে না করেন যে আমি কেবলমাত্র ভারতীয় শিল্পেরই অনুরাগী, সেই কারণে রুশ পুতুলগুলির তারিফ করতে পারছি না। ওদেশের শিল্পীরা, লক্ষ্য করলাম, সব চেয়ে জোর দেন পোশাক পরিচ্ছদ পরানোর ব্যাপারে এবং প্রধানত পোশাক ভেদেই ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের অধিবাসী বা বিভিন্ন পেশার মানুষ বোঝানো হয়। কেবল মঙ্গোলিয়ার শিশু মূর্তিগুলি একটু অন্য রকম লাগলো। ছেলে ভুলানো পুতুল হিসাবে অবশ্য রুশ পুতুলগুলি বেশ আকর্ষণীয় এবং এটাও সত্যি যে শিশুর মনের মতন পুতুল গড়া খুব একটা সহজ কাজ নয়। ভারতীয় বিভাগে রাখা হয়েছিল, মালাবার, গুজরাট, উড়িষ্যা, বাঙলা প্রভৃতি যে সব প্রদেশ লোকশিল্পে খুব সমৃদ্ধ কেবল সেই সব প্রদেশেরই নিদর্শন। এগুলি এত সুন্দর তার কারণ, লোকশিল্পীরা নিজের প্রবৃত্তি এবং রস-বুদ্ধির দ্বারা প্রণোদিত হয়ে স্বাধীনভাবে শিল্প রচনা করে থাকেন। লেখাপড়া শিখে পাশ্চাত্ত্য শিল্প শাস্ত্র পড়ে এখনও এঁদের সহজ বুদ্ধি এবং কারিগরী হারিয়ে ফেলেননি। বলিষ্ঠ রঙে, বলিষ্ঠ তুলির টানে এবং ফর্ম-এ আদি কালের কাজের লক্ষণ দেখা যায়। এই ছোট্ট প্রবন্ধে সব কিছু বিশ্লেষণ করে আলোচনা করতে পারলাম না। নিদর্শনগুলির মধ্যে গুজরাটের গুড়িয়া, উড়িষ্যার টেরাকোটা এবং মালাবারের কথাকলি নৃত্যের পুতুল অন্য সব পুতুলের তুলনায় বেশী আকর্ষণী বলে মনে হয়েছে আমার কাছে।

যাই হোক, এই আয়োজনের জন্য কর্তৃপক্ষ জনসাধারণের কাছ থেকে অবশ্যই ধন্যবাদ দাবী করতে পারেন।

* * *

গত সপ্তাহে আরেকটি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। এটি শিল্পী পূর্ণ চক্রবর্তীর প্রথম একক প্রদর্শনী। পূর্ণবাবু বাঙলা দেশে পুস্তক-চিত্রকার হিসাবেই পরিচিত। 'ওমর খৈয়াম', 'মেঘদূত' 'হংসদূত', 'ছোটদের রামায়ণ' প্রভৃতি গ্রন্থে এঁর ছবি দেখেছি। পৌরাণিক ছবি আঁকায় এঁর সুনাম খুব। এক সময় বহু রাজা মহারাজারা এঁর পৌরাণিক ছবির খরিদ্দার ছিলেন। ১৯২১ সালে পূর্ণবাবু গভর্নমেণ্ট স্কুল অব আর্ট-এ যোগ দেন এবং ছাত্রাবস্থাতেই নানা প্রদর্শনীতে ছবি পেশ করে বহু পুরস্কার পান। আর্ট স্কুলের তখনকার অধ্যক্ষ পার্সি ব্রাউন এঁর খুব প্রশংসা করতেন।

তৈল চিত্র, জল রঙ চিত্র, টেম্পারা চিত্র এ সব মিলিয়ে ৮০টি ছবি পেশ করা হয়েছিল। এর মধ্যে জল রঙ ছবির সংখ্যাই ছিল সবচেয়ে বেশী। আমার মনে হয় এ প্রদর্শনীটি আরও বছর বিশেক আগে হলে পূর্ণবাবু প্রশংসা পেতেন। এখনকার কলারসিকদের মনহারী রস এঁর ছবিতে নেই। তবুও 'গাংটক', 'দি ব্রুক', 'এ শাল ফরেস্ট', 'কার্শিয়াং', 'দি ব্রোকেন মস্ক' প্রভৃতি কয়েকখানা ল্যান্ডস্কেপ মোটামুটি চোখে সুন্দর ঠেকে। অন্যান্য ছবি মারাত্মক রকম পুস্তক-চিত্রন ঘেঁষা। ফাইন আর্ট হিসাবে এগুলিকে মর্যাদা দেওয়া চলে না। এগুলিতে ছবি আঁকার সব নিয়মই মেনে

চুনারের গ্রাম—পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বিভাগে রক্ষিত একটি প্রাচীর-চিত্রের নমুনা

চলা হয়েছে বটে, কিন্তু শিল্প কর্মীর দেখা এবং শিল্প রসিক ভাবুকের দেখা এ দুই দেখার ফলে যে পরিপূর্ণতা পায় শিল্পরচনা সে পরিপূর্ণতা এগুলিতে নেই। —চিত্রগ্রীব

ভারতীয় শিল্পমেলায় প্রাচীর চিত্র ও ভাস্কর্যের নিদর্শন

যে কোনও প্রচেষ্টাকে সর্বাঙ্গসুন্দর করিয়া তুলিতে হইলে চারুকলা ও ভাস্কর্যের কতখানি প্রয়োজন ভারতীয় শিল্পমেলায় পদার্পণ করিলেই তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। বস্তুতপক্ষে এই মেলাতে প্রাচীরচিত্র ও ভাস্কর্যের বিভিন্ন নিদর্শন দেখিবার সুযোগ দিয়া কর্তৃপক্ষ সত্যই সুরুচির পরিচয় দিয়াছেন। কয়েকজন উদীয়মান শিল্পী ও ভাস্করকে লক্ষ লক্ষ দর্শকের সম্মুখে তাঁহাদের কলানৈপুণ্য দেখাইবার সুযোগ দিয়া একদিকে যেমন কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন, অন্যদিকে সেইরূপে এই দেশের রস ও রুচিবোধের পরিচয় দিবার জন্য তাঁহারা সমগ্র দেশবাসিগণের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

প্রাচীরচিত্র অঙ্কিত করিবার জন্য কর্তৃপক্ষগণ স্থানীয় কয়েকজন পরিচিত শিল্পী নিযুক্ত করেন—ঠিক শিল্পী বলিলে হয়ত ঠিক হইবে না, কারণ তাঁহারা স্থানীয় কয়েকটি কলা সমিতির হস্তেই এই ভার দেন এবং এই সমিতিগুলি যোগ্য ও পরিচিত শিল্পীদের দ্বারা প্রাচীরচিত্র অঙ্কন করাইয়া দেন। দেশের দৈনন্দিন ও সামাজিক জীবনের বিভিন্ন অধ্যায় অবলম্বন করিয়া এই প্রাচীরচিত্রগুলি অঙ্কিত হইয়াছে। প্রায় প্রত্যেকটি প্রাচীরচিত্রই দুই বা ততোধিক

'দি অ্যাটম' (প্লাস্টার)
—চিন্তামণি কর

শিল্পী মিলিয়া অঙ্কন করিয়াছেন, সুতরাং প্রত্যেক রচনাভঙ্গীতেই নূতনত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, প্রত্যেক প্রাচীরচিত্রেই অঙ্কনরত শিল্পীদের পরিকল্পনা, বর্ণনাকৌশল ও অঙ্কনপ্রণালী পৃথকভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে অথচ সামগ্রিকভাবে দেখিলে প্রত্যেকটির মধ্যেই একটি বিশিষ্ট আবেদন আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। প্রাচীরচিত্রগুলির প্রধান বিশেষত্ব এই যে, ইহাদের মধ্যে বিভিন্ন শিল্পী আপন আপন রচনা-পদ্ধতি বজায় রাখিয়াও সম্মবদ্ধভাবে নানা রীতির অপূর্ব সংমিশ্রণ করিয়াছেন। বিশেষ করিয়া পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বিভাগে ও প্রধান তোরণে রক্ষিত চিত্রগুলির মধ্যে নিখিল ভারত শিল্প ও চারুকলা সমিতির শিল্পী-সভ্যবৃন্দ অতিশয় মুনশীয়ানার পরিচয় দিয়াছেন। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্য দিয়া মাত্র কয়েক বৎসরের ভিতর সমগ্র দেশ কৃষি, শিল্প-বাণিজ্য, জলসেচন ও পথ-ঘাট বিভাগে যে কিরূপ দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে শিল্পিগণ অতি সহজ ও সরল চিত্রাবলীর মধ্য দিয়া প্রাঞ্জলভাবে তাহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বিশেষ করিয়া দৃঢ়রেখামূলক রচনা, বর্ণনির্বাচন ও সমাবেশের জন্য এই প্রাচীরচিত্রগুলি সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দেশের বৃহৎ ও কুটির শিল্প,

তোরণদ্বারের পার্শ্বে রক্ষিত আর একটি প্রাচীর-চিত্র

বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও এই জাতীয় বিষয়গুলি রূপকের মধ্য দিয়া তোরণদ্বারে রক্ষিত প্রাচীরচিত্রগুলির মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। বাস্তবিকপক্ষে এই চিত্রগুলি যে কেবলমাত্র শিল্পমেলার শোভাবর্ধন করিয়াছে তাহা নহে, উপরন্তু এগুলি দেখিয়া সকলেই দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির বিষয়ে সম্যক জ্ঞানলাভ করিবেন। শুধু তাহাই নহে, প্রাচীরচিত্র বিভাগে এই দেশের চিত্রকলা যে কতদূর অগ্রসর হইয়াছে দেশবাসিগণ তাহারও প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভ করিবেন। অন্যান্য প্রাচীরচিত্রের মধ্যে নিখিল ভারত হস্ত শিল্প বিভাগের কয়েকটি চিত্র চোখে পড়ে। রেখাব্যঞ্জক হইলেও এইগুলির সরলতা ও বলিষ্ঠতা উল্লেখযোগ্য।

কয়েকটি ভাস্কর্যের নিদর্শন যথাযথভাবে রাখিতে পারিলে উন্মুক্ত মেলাক্ষেত্রের সৌন্দর্য যে কতটা বাড়িয়া যায় তাহা যিনি এখানে পদার্পণ করিয়াছেন তিনিই বুঝিতে পারিবেন।

প্রত্যেক ভাস্করই আপন আপন কল্পনা ও চিন্তাধারা অনুযায়ী মূর্তি রচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে চিন্তামণি কর, ধনরাজ ভগত, কে এস কুলকার্নি ও শ্রীমতী উষা হুজার নাম উল্লেখযোগ্য।

চিন্তামণি করের নূতন করিয়া পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। এই শিল্পী-ভাস্কর বিলাতেই স্বাধীনভাবে নিজের স্টুডিয়োতে কাজ করিয়া থাকেন। রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের এক সুদীর্ঘ প্রতিমূর্তি তৈয়ারী কালে মাত্র কয়েক মাস পূর্বেও তিনি দিল্লীতে অবস্থান করিতেছিলেন। অধুনা নির্মাণরত স্থানীয় কোনও বিরাট সৌধের উপর রিলিফ কার্য করিবার জন্য কমিশন লইয়া তিনি আগামী জানুয়ারী মাসে পুনরায় ভারতে আসিবেন। পেলবতা ও সজীবতা তাঁহার রচনার প্রধান আকর্ষণ। সুতরাং বিরাট মেলাক্ষেত্রের একটি বিশিষ্ট স্থানে রক্ষিত "দি অ্যাটম" সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বর্তমান জগতে অ্যাটমের অপরিসীম শক্তির বিষয়ে সকলেই সবিশেষ সচেতন। এই অ্যাটম শক্তি যদি সমগ্র জগতের মানবকল্যাণে নিয়োজিত হয় তাহা হইলে এই পৃথিবীই নন্দনকাননে পরিণত হইতে পারে। শান্তির প্রত্যক্ষ প্রতিমূর্তি হিসাবে এক নিষ্পাপ শক্তিস্বরূপিনী বালিকা যেন মূর্তিমতী কল্যাণের মতো অ্যাটম শক্তির মধ্যে সমগ্র পৃথিবীকে অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। ধনরাজ ভগত পরিচিত ভাস্কর। গঠনপারিপাট্যে সম্পূর্ণ পাশ্চাত্ত্য প্রভাব থাকিলেও "কর্মী"খানিও সহজে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। চিন্তামণি করের ন্যায় সমাপ্তি-কুশলতা না থাকিলেও ভগতের ভাস্কর্যের মধ্যে প্রকাশভঙ্গিমার পরিচয় পাওয়া যায়। সেইজন্য তোরণদ্বারে রক্ষিত এই মূর্তিখানি মেলার সৌন্দর্য এক হিসাবে কিছু বৃদ্ধি করিয়াছে। উষা হুজার "শক্তি ও শিল্প" কল্পনার দিক হইতে মৌলিকতা দাবী করিলেও ভাস্কর্য নিদর্শন হিসাবে উচ্চাঙ্গের বলিয়া বোধ হয় না। কারণ শক্তি ও শিল্পের রূপক অভিব্যক্তি প্রকাশ করিতে গিয়া তিনি শিল্পের প্রতীক পুরুষ মূর্তি গঠন করিতে আদৌ শারীরিক সমতা ও সজীবতা রক্ষা করিতে পারেন নাই।

প্রদর্শনীর বিভিন্ন স্টলেও নানা ভাস্কর্য ও রিলিফ কার্যের নমুনা দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে জে কে ইণ্ডাস্ট্রীজ ও ন্যাশনাল কার্বন স্টলের প্রবেশ পথের নিদর্শনগুলি চোখে পড়ে। ভাস্কর্য নমুনার মধ্যে শঙ্খ চৌধুরীর রচনা উল্লেখযোগ্য।

পরিশেষে দুইটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। যে কোনো মেলা বা প্রদর্শনী বলিলেই আমরা সাধারণত বুঝি আমোদ-প্রমোদের নূতন ব্যবস্থা এবং বিচিত্র ও বর্ণবহুল আলোকমালার সমারোহ। সুতরাং ভবিষ্যতে যাঁহারাই ব্যাপকভাবে কোনও প্রদর্শনী বা মেলার আয়োজন করিবেন তাঁহাদের নিকট অনুরোধ তাঁহারা যেন ভারতীয় শিল্পমেলার কর্তৃপক্ষের ন্যায় দেশের শিল্প ও ভাস্কর্য বিষয়ে সচেতন হইয়া দেশের শিল্পবোধ জাগাইয়া তোলেন। আর একটি কথা। বহির্গমনের পথের পার্শ্বে প্রাচীরচিত্র প্যানেলটি কর্তৃপক্ষ ঐ স্থানে না রাখিলেই ভাল করিতেন। কারণ এইটি অধিকাংশ দর্শকেরই নজরে পড়ে না। যতবার গিয়াছি বা বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি ততবারই লক্ষ্য করিয়াছি দর্শকসাধারণের অধিকাংশই ইহার দিকে ফিরিয়াও চাহেন না।

চিত্তপ্রিয়

বিদেশ হইতে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি সম্প্রতি ভারতে আগমন করিয়াছেন এবং করিতেছেন। তাঁহাদের সকলের মুখেই শুনিতেছি যে ভারতের সঙ্গে তাঁহাদের নিজ নিজ দেশের সাংস্কৃতিক এবং অন্যান্য যোগ বহু দিনের।—"শুধু মাঝখানে বিয়োগ করতে গিয়েই ফলে গোল হয়েছে"—মন্তব্য করিলেন বিশু খুড়ো।

* * *

মার্শাল বুলগানিন ও ক্রুশ্চেভকে সম্বর্ধনা শোভাযাত্রা হইতে সরাইয়া পুলিশ ভ্যানে করিয়া রাজভবনে পৌঁছাইয়া দিতে হইয়াছে। শ্যামলাল বলিল—"মঃ ক্রুশ্চেভ তাঁর এক সাম্প্রতিক ভাষণে আমেরিকাকে সবার সঙ্গে বন্ধুত্বের প্রতিযোগিতা করতে আহ্বান করেছেন। বোধ হয় সেই কথা মনে করেই কলকাতা সম্বর্ধনা প্রতিযোগিতায় সবার ওপর টেক্কা মেরে গেল" !!

* * *

মঃ ক্রুশ্চেভ তাঁর অন্য এক ভাষণে বলিয়াছেন যে, মহিষ ঘাস খায় এবং বাঘে খায় মাংস। কেহই কোন সময়ে

মহিষকে মাংস খাওয়াতে পারে না এবং পারে না বাঘকে ঘাস খাওয়াতে। আমাদের জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"ঠেলায় পড়লে বাঘেও নাকি ধান খায়; অবশ্য একথা শুনেছি, কিন্তু চোখে দেখিনি। তবে কোন কোন সিংহকে ঘাস খেতে নিজের চোখেই দেখেছি"।

* * *

মার্শাল বুলগানিন বলিয়াছেন যে হিন্দ-রুশি ভাই ভাই। বুঝিবার অসুবিধা যাহাতে না হয় তার জন্য পরে বলিয়াছেন-হিন্দ-রুশি সহোদর।

"হিন্দুস্থানে থেকেও যাঁরা অনেক হিন্দুস্থানীকে গিন্নির সহোদর ছাড়া ভাবেননি বা ডাকেন নি তাঁরা বড়ই বিপদে পড়ে গেছেন, কী বলে এখন ডাকবেন তা ভেবেই পাচ্ছেন না"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

রাশিয়ার সম্মানিত অতিথি ইন-কিলাবকে জিন্দাবাদ না জানাইয়া শুধু শুধু বলিতেছেন, বন্ধুত্ব জিন্দাবাদ। "আজকেরা নতুন বুলি শুনে তোতা ঘাড় কাৎ ক'রে ভাবছে—তাইতো" !!

* * *

ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য রাশিয়া হইতে মান্দ্রাজ চিড়িয়াখানায় কতকগুলি জন্তু-জানোয়ার উপহার দেওয়া হইয়াছে। —"অন্য কোন উপহার পেলেই ভালো হতো, জন্তু-জানোয়ারের দিক থেকে ভারত মোটেই ঘাটতি অঞ্চল নয়"—বলিলেন জনৈক সহযাত্রী।

* * *

সৌদি আরবের রাজাকে দিল্লী পৌরপ্রতিষ্ঠান হইতে একটি হাতীর দাঁতের দাবার ছক উপহার দেওয়া হইয়াছে। বিশু খুড়ো বলিলেন—"প্রকাশ থাকে যে নূতন দাবা খেলায় গজ-ঘোড়া-মন্ত্রীর স্থান নেই, মাৎ করতে চাই শুধু বোড়ের চাল"!

* * *

সৌদি আরবের রাজা মন্তব্য করিয়াছেন যে, যে দেশে ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ ও শ্রীনেহরুর মত চিন্তানায়ক রহিয়াছেন, সেই দেশের অধিবাসীরা ভাগ্যবান। —"কোন কোন দেশের চিন্তানায়করা অবশ্য তোবা তোবা না করলেও মুখ ফুটে তোফা তোফা বলতে পারছেন না"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

একটি সংবাদ—শিরোনামা—Power from earth in Newzealand. আমাদের জনৈক ক্রিকেট ক্রীড়া রসিক সহযাত্রী বলিলেন—"দেখা যাক টার্ফে খেলে নিউজিল্যান্ড কতটা কী করেন, পাকিস্তানের ম্যাটিং-এ তো দেখলাম একেবারে ন্যাজে গোবরে" !!

* * *

গুরু নানকজীর জন্মদিন উৎসবের এক ভাষণ প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত জহরলাল বলিয়াছেন—দিন আসিতেছে, যখন দেশের সবাই হইবে রাজা। খুড়ো বলিলেন—"সবই হবে, কান্ড শুধু দেখে যাবে না"।

ঝান্সীর রানী

মহাশয়,—

"দেশ" পত্রিকার ২৫শে কার্তিকের সংখ্যায় আলোচনা-বিভাগে (পৃঃ ১৫৬) শ্রীঅরুণকুমার চক্রবর্তী মহাশয় যুক্তিসংগত-ভাবে দেখাইয়াছেন যে, যে উমেশচন্দ্র ব্যানার্জিকে বিলাতে যাবার খরচ বাবদ ঝান্সীর রানীর তরফ হইতে ৬০০০০, টাকা দেওয়া হয় তিনি কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা উমেশচন্দ্র ব্যানার্জি নন।

এখন আলোচনা হইতে পারে যে, এই উমেশচন্দ্র ব্যানার্জি কে?

Presidency College Register (compiled and edited by Surendra Chandra Majumdar & Gokul Nath Dhar. Published by Government of Bengal. Education Department, 1927).

নামক পুস্তকে হিন্দু কলেজের ছাত্রদের একটি তালিকা আছে। ইহা পড়িলে বুঝিতে পারা যায় যে, হিন্দু কলেজের কয়েকজন ছাত্র সিপাহী বিদ্রোহে যোগদান করিয়াছিলেন। পিয়ারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় নামক একজন হিন্দু কলেজের ছাত্র সিপাহী বিদ্রোহে ইংরেজের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন (প্রেসিডেন্সী কলেজ রেজিস্টার, পৃঃ ৪৪৮)।

আলোচনা

এই খবরটি আমি একটি প্রামাণিক প্রবন্ধে পড়িয়াছিলাম। আর একজন ছাত্র, বেণীমাধব মুখোপাধ্যায় সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইংরাজদের সাহায্য করিয়াছিলেন (Ibid, p. 465. Entered Hindu College about 1826. Rendered Hindu College about 1826. Rendered valuable service to Government during the Sepoy Mutiny. Zemindar and Merchant)

ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, হিন্দু কলেজের কতিপয় ছাত্র সিপাহী বিদ্রোহে যোগদান করিয়াছিলেন।

এই পুস্তকে একজন উমেশচন্দ্র ব্যানার্জির উল্লেখ আছে। তাঁহার সম্বন্ধে লিখিত আছে Banerji, Umesh Chandra. Junior Free Scholarship, 1851. (Ibid. 449) ইহার বেশী আর কিছু লেখা নাই। তবে এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ হিন্দু কলেজের অনেক ছাত্রের জীবনী অসম্পূর্ণভাবে লিপিবদ্ধ আছে। এই সম্বন্ধে গ্রন্থকারদ্বয় লিখিয়াছেন,

"For obvious reasons this list could not be made exhaustive. Further information regarding senior and Junior Scholars of the Hindu College will be thankfully received." (Ibid. p. 447)

ইনি উকীল ছিলেন কিনা তাহা সঠিক বলা যায় না, তবে তাঁহার সমসাময়িক কয়েকজন ছাত্র উকীল বা এটর্নী হইয়াছিলেন যথা অতুলচন্দ্র মল্লিক (Ibid, p. 461), কাশীনাথ মল্লিক, সি-আই-ই (Ibid, p. 463), মুরলীধর সেন (Ibid, p. 469) সুতরাং এই রকম হইতে পারে যে এই উমেশচন্দ্র ব্যানার্জি উকীল ছিলেন। যেহেতু তিনি ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে হিন্দু কলেজের জুনিয়র ফ্রি স্কলার ছিলেন, সেহেতু তিনি যে ঝান্সীর রানীর সমসাময়িক ছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। এখন তিনি ব্যবহারজীবী ছিলেন কিনা এবং ঝান্সীর রানীকে সাহায্য করিয়াছিলেন কিনা সে বিষয়ে অনুসন্ধান করা প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করি। ইতি—শ্রীচারুচন্দ্র দাশগুপ্ত, এম-এ, পি-আর-এস, পি-এইচ-ডি, সংস্কৃত কলেজ, কলিকাতা—১২।

বাংলার নাট্যসাহিত্য

বাঙলা নাটকের ইতিহাস—অজিতকুমার ঘোষ, জেনারেল প্রিণ্টার্স এ্যাণ্ড পাবলিশার্স লিঃ, ১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা। (দ্বিতীয় সংস্করণ) দশ টাকা।

১৯৪৬-এ অধ্যাপক অজিতকুমার ঘোষের 'বাংলা নাটকের ইতিহাস' প্রথম প্রকাশিত হয়। ন' বছর পরে সে বইয়ের পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপা হলো। বাংলায় যথার্থ নাট্যসাহিত্য বিশেষ সমৃদ্ধ না হলেও নাটক-নাটিকার চর্চা কিছু কম হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠ্য তালিকায় দু'একখানি নাট্যগ্রন্থ প্রতি বছরই জায়গা পায়। বাংলা রঙ্গমঞ্চের জনপ্রিয়তা ব্যাপক না হলেও নিতান্ত তুচ্ছ নয়। গিরিশচন্দ্র ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, অমৃতলাল বসু, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ,—অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগে শচীন সেনগুপ্ত, মহেন্দ্র গুপ্ত, মন্মথ রায় প্রভৃতি নাট্যকার এ-পথের অক্লান্ত কর্মী। রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্রও নাট্যানুশীলন সম্পূর্ণ পরিহার করেননি। প্রমথনাথ বিশী, বনফুল, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধায়ক ভট্টাচার্য প্রভৃতি নবীন-প্রবীণ আরো অনেক নাট্যকারের নাম সুপরিচিত। এ অবস্থায় বাংলা নাট্যসাহিত্য

সম্বন্ধে আলোচনার প্রয়োজনীয়তা, এমন কি একাধিক বৃহৎ গ্রন্থেরও অবকাশ স্বীকার্য। অধ্যাপক অজিতকুমার ঘোষের বইখানির এই পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণে বিভিন্ন নাট্যকার, নাট্যগ্রন্থ, অভিনয় প্রসঙ্গ ইত্যাদি তথ্য ও তত্ত্বের আলোচনা দেখে অনুরাগী পাঠক সমাজ উপকৃত হবেন। মধুসূদনের আগের পর্ব থেকে শুরু করে দীনবন্ধু ও সমসাময়িক অন্যান্য নাট্যকারের কথা আলোচনা করে পরবর্তিকালে বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্তর পেরিয়ে তিনি বলেছেন, ভাবী কালের অনাগত সমাজ "অসংশয়ে স্বীকার করবে, রবীন্দ্রনাথ বাংলার শুধু শ্রেষ্ঠ কবি নহেন, তিনি শ্রেষ্ঠ নাট্যকারও বটে।" এই ধরনের মন্তব্য উপযুক্ত বিশেষজ্ঞদের দ্বারা সমর্থিত হওয়া উচিত। অজিতকুমার প্রায় সাড়ে তিনশো পৃষ্ঠার এই একখানি বইয়ের মধ্যে সংস্কৃত নাটক থেকে শুরু করে অয়স্কান্ত বক্সী, দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেকের কথা বলবার চেষ্টা করেছেন বলেই বইটির কোথাও বা অনুচিত ত্বরা, কোথাও বা হ্রাসের বাক্‌স্বল্পতা ঘটেছে। 'সংস্কৃত নাটকের ইতিহাস, এই নামের বেঢপ হরফের শিরোনামের নীচে) একটি প্রসঙ্গ শেষ হয়েছে মাত্র দু' পৃষ্ঠায়। বাংলা নাটকের বিবর্তনে সংস্কৃত নাট্যরীতির প্রভাব পুরোপুরি অগ্রাহ্য করা উচিত কি অনুচিত, সে কথা আলোচকের ব্যক্তিগত বিদ্যাবুদ্ধি-বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে, কিন্তু প্রসঙ্গটি আর একটু বিস্তারিতভাবে আলোচিত হওয়া দরকার। বাংলা নাটকে গর্ভ-গর্ভাঙ্কের ভেদ, স্বগতোক্তির ব্যবহার, গানের বৈচিত্র্য ইত্যাদি প্রসঙ্গ ছাত্রদের পরীক্ষার প্রশ্নে বার বার দেখা দেয়। এগুলি এড়িয়ে যাওয়া ঠিক নয়। বইয়ের শেষ অধ্যায়ে 'বাংলা নাট্য-সমালোচনার আদর্শ' শিরোনামে এ সম্পর্কে যে কৈফিয়ৎ দেবার চেষ্টা আছে, সে কৈফিয়ৎ বিবেচকের পক্ষে অগ্রাহ্য। আর মাত্রাজ্ঞানের যে অভাব বইটির নানা দিকে পরিদৃশ্যমান, সে অভাব উৎকট হয়ে উঠেছে অধ্যাপকের উদ্ধৃতি প্রীতিতে। প্রমথনাথ বিশী সম্পর্কে তাঁর আলোচনা বড়োই অল্প; পরশুরামের ক'খানি বইয়ের নাট্যরূপের কথা তিনি উল্লেখও করেননি· রবীন্দ্রনাথ মৈত্র ('রবীন্দ্রমোহন' ভুল; পৃ: ৩১৯) নিঃসন্দেহে অনাদৃত। তা'ছাড়া ছাপার ভুল বড়ো বেশি দেখা গেল।

এ সব সত্ত্বেও বইখানি লেখকের শ্রম ও সদুদ্দেশ্যের পরিচায়ক। ৩১৫।৫৫

কবিতা

কৃষ্ণচূড়া—মণীন্দ্র রায়। দীপঙ্কর প্রকাশনী, ১১ ঘোষাল স্ট্রীট, কলকাতা ১৯। দেড় টাকা।

শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র রায় কৃতী কবি। জনপ্রিয় কি না জানিনে, তবে রসিকজনের প্রিয়। বাংলা কাব্য-সাহিত্যে তিনি একটি স্থায়ী আসন করে নিয়েছেন। তাঁর ভাষা সুন্দর, ভঙ্গী পারিপাটি। কবিতার আঙ্গিক নিয়ে নিত্য নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় তাঁর উৎসাহ প্রায় অন্তহীন। সেই উৎসাহ তাঁর কবি-চিত্তের সজীবতার পরিচয় বহন করছে। "কৃষ্ণচূড়া" তাঁর নবতম কাব্যগ্রন্থ।

কবি হিসেবে তিনি জনপ্রিয় কি না, সে-বিষয়ে আমাদের অজ্ঞতার কথা ইতিপূর্বেই ব্যক্ত করেছি। তবে এ-কথা ঠিক যে, শুধু রসিকজনকে তৃপ্তি দিয়ে তিনি তুষ্ট নন। আসলে আপন কবি-মানসের সঙ্গে জন-মানসের সংযোগ সাধনেই তাঁর আগ্রহ। "কৃষ্ণচূড়া"র একাধিক কবিতা পড়ে এই কথাই আমাদের মনে হয়েছে। সাধারণ মানুষের মনটিকেও তিনি বুঝতে চান, তাদের আনন্দ-বেদনার কথাই তিনি লিখতে চান। অথচ প্রকাশ-ভঙ্গীর অতিমাত্রিক সরলীকরণে তাঁর আস্থা নেই। ফলে, ব্যাপারটা মোটামুটি এই দাঁড়িয়েছে যে, তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তু যদিও প্রাকৃত, তাঁর কাব্যকলার মার্জিত নাগরিকতায় মুগ্ধ হওয়া একমাত্র শিক্ষিত তীক্ষ্ণবুদ্ধি পাঠকের পক্ষেই সম্ভব। অর্থাৎ শুধু তাঁদেরই পক্ষে, নাগরিক কাব্যকলার কিঞ্চিৎ পাঠ যাঁরা পূর্বাহ্নেই নিয়েছেন।

"কৃষ্ণচূড়া"র বহু কবিতাই ভাল। এবং এমন কবিতাও বেশ কয়েকটি আছে, শুধুই 'ভাল' বললে যাদের প্রতি সুবিচার করা হয় না। দৃষ্টান্ত হিসেবে "চিঠি" কবিতাটির এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। পূর্ববঙ্গের জনৈকা উদ্বাস্তু বৃদ্ধার মর্মবেদনা এখানে এতই সুন্দর ও সংশয়াতীতভাবে ব্যক্ত হয়েছে—এবং ব্যক্ত হয়েছে সেই বৃদ্ধারই জবানিতে—যে, কবিতাটি পড়বার বহুক্ষণ পরেও পাঠকের চিত্তে সেই বেদনার রেশ বাজতে থাকে। এ-রকম সর্বাঙ্গসুন্দর কবিতা—যার আবেদন শুধুই মস্তিষ্কের কাছে নয়, হৃদয়ের কাছেও—ইদানীং খুব বেশী লেখা হয়েছে বলে আমাদের মনে হয় না। এবং এ-রকম কবিতা এ-বইয়ে আরও কয়েকটি আছে।

মণীন্দ্র রায়ের ছন্দের হাত অত্যন্তই কুশলী। তবু, বলতে বাধা নেই, ছন্দ নিয়ে এমন কিছু পরীক্ষা এ-বইয়ে তিনি করেছেন, যা হয়তো না করলেই ভাল ছিল। বিশেষ করে সেই সব পরীক্ষা, দেখানিয়ানার ভাবটা যার মধ্যে অত্যন্তই প্রবল। তাঁর মনে রাখা দরকার, সঙ্গত যদি সঙ্গীতকে ছাপিয়ে যায়, সেটা সুখের কথা হয় না।

"কৃষ্ণচূড়া"র মুদ্রণ ও অঙ্গসজ্জা পরিপাটি। প্রচ্ছদ-চিত্রটি অসাধারণ সুন্দর হয়েছে। ৪০০।৫৫

ছোটগল্প

আলেয়া—নিরুপমা দেবী, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ, ৯৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা—৭। দুই টাকা।

'আলেয়া', 'অপমান না অভিমান' ও 'প্রত্যাখ্যান', এই তিনটি গল্পের মধ্যেই লেখিকার বিশিষ্ট রীতির ছাপ আছে। দেওঘরের বিরলবসতি কোনো এক অঞ্চলে

অনেকদিন আগেকার কোনো এক সন্ধ্যায় একটি খোশগল্পের আড্ডায় বসে যে গল্পে রস পাওয়া যেত, আজ পরিবর্তিত জীবন ভূমিকায় সে গল্পের দাম আছে কি নেই,—থাকলেও তার আবেদন কতোটুকু, এ সব প্রসঙ্গ এই বইখানির পাঠকের কাছে আজ পুরোপুরি অবান্তর নয়। কারণ নিরুপমা দেবীর খ্যাতি ছিল এক সময়ে। বাংলা গল্প-উপন্যাসের সেই অদূর অতীত পর্ব এখন ইতিহাসের সামগ্রী। সাহিত্যের ইতিহাসের প্রতি শ্রদ্ধাশীল পাঠকের কাছে 'আলেয়া'র সমাদর হবে।

বইখানির তিনটি গল্পই আমাদের গল্প চর্চার উদ্‌যাপিত অধ্যায়ের স্মারক। ছাপা, বাঁধাই, প্রচ্ছদ নিখুঁৎ। ৩২৪।৫৫

জেগে আছি ঃ আলাউদ্দিন আল আজাদ। ওয়েসী বুক সেণ্টার, ঢাকা। দাম তিন টাকা।

তরুণ লেখকের প্রথম গল্পগ্রন্থ। প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হবার পরে চারটে নতুন গল্প সংযোজিত হয়ে নতুন সংস্করণ। একটি সভ্যতা, কয়লা কুড়ানো দল, সৃষ্টি, কয়েকটি কমলালেবু, রাঙ্গলা, মহামুহূর্ত, হাত ছাড়া, ছুরি, শিকড়, একটি কথার জন্ম ঃ এই দশটি গল্প এই সংস্করণে সংকলিত হয়েছে।

পূর্ব পাকিস্থানে সাম্প্রতিককালে কয়েকজন শক্তিশালী কথাশিল্পীর আবির্ভাব ঘটেছে, লেখক তাঁদের মধ্যে নিঃসন্দেহে অন্যতম। দৃঢ় ঋজু একটা দৃষ্টিভঙ্গী তাঁর, প্রকাশভঙ্গীও বলিষ্ঠ। যে জীবনবোধ মানুষকে খণ্ডিত করে দেখে, লেখক তার ঊর্ধ্বে উঠতে পেরেছেন। মানুষের অন্তরঙ্গ পরিচয় আছে তাঁর লেখায়, অভিজ্ঞতার সমৃদ্ধিও আছে তাঁর। তাঁর সাহিত্যকর্মের জনপ্রিয়তা তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের মধ্যেই প্রকাশিত।

১১৯।৫৫

অনুবাদ সাহিত্য

প্রত্যাবর্তন—আপটন সিনক্লেয়ার। অনুবাদক—বিনোদবিহারী চক্রবর্তী, প্রাচী প্রকাশন, ১২, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা তিন টাকা।

আপটন সিনক্লেয়ারের Lany Bud Flies Again (The Return of Lany Bud)-এর কাহিনী হলো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী কতকগুলি আন্তর্জাতিক ঘটনার সঙ্গে জড়িত। প্রসঙ্গতঃ য়ুরোপের নানা দেশে এবং মার্কিন মুলুকে পরিভ্রমণের কথা আছে। বর্তমান বঙ্গানুবাদে মূলের প্রথম অংশ মাত্র ছাপা হয়েছে। দীর্ঘ কাহিনী,—অসংখ্য ঘটনা,—বিচিত্র রাজনীতিচিন্তা—'প্রত্যাবর্তনে' এই সব উপাদানের যতো ভার পড়েছে, ততো রস নেই। অনুবাদের আড়ষ্ট ভাব হয়তো অনিবার্য। বইয়ের এক জায়গা থেকে একটু নমুনা তুলে দিলেই এই সুদৃশ্য বইখানির ভেতরের প্রকৃতি কতকটা বোঝা যাবে:—"তুমি নিশ্চয় জেনে রাখ...কাল যদি আমেরিকানরা ইউরোপ থেকে চলে যায় তাহলে সপ্তাহ শেষ হবার আগেই 'লাল'-রা হাত বাড়িয়ে আসবে।" গল্প আছে, ঘটনা আছে, নানান মানুষ আছে, কিন্তু সকলের মধ্যে প্রধান হয়ে আছে দুর্নীর প্রচারের পণ!

৩১৯।৫৫

প্রাপ্তি স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থ আসিয়াছে।

টাকা কড়ির কথা—নরেন্দ্রনাথ রায়।

শিশু মন—রমেশ দাস।

উর্বীদেবী—সমীর ঘোষ।

ঊষালগ্ন—ধীরেন্দ্রনাথ মিত্র।

জনসভার সাহিত্য—বিনয় ঘোষ।

মলাটের রঙ—নরেন্দ্রনাথ মিত্র।

মাতৃমঙ্গল—আবুল হাসানাৎ।

জন্ম-নিয়ন্ত্রণ—আবুল হাসানাৎ।

যে দীপ দিল না আলো—শ্রীমতী মিনতি নাথ।

উত্তরা পথে—শ্রীপ্রভাতচন্দ্র দোবে।

—শৌভিক—

একটি মেশিনে তৈরী গল্প

গল্প মেসিনেও তৈরী হয় এবং সে গল্পে হাসি, কান্না, আমোদ, উত্তেজনা, রোমাঞ্চ, রোমান্স আদি ভাবাবেগও মনে খেলে যায়। অর্থাৎ খেলিয়ে দেওয়া যায় ঠিক ছক ধরে ধরে ছাঁদে মেপে মেপে। যুক্তি ও সঙ্গতির বালাই রাখলে কিন্তু চলবে না। অবশ্য এ গল্প পড়ার নয়, পর্দায় দেখবার ও শোনবার। দৃষ্টান্ত হিসেবে মেশিনে তৈরি একটি গল্পের বিবরণ এখানে দেওয়া হল :

গল্পের উদ্বোধনে পাটনা হাইকোর্টের বারান্দা। দু'জন যুবক উকিল দূরে থেকে এগিয়ে ক্যামেরার সামনে এসে মুখ খুললে। একজন অপর জনকে শংকর বলে সম্বোধন করে খুনের মামলায় জয়ী হয়ে আসামীকে নিরপরাধ সাব্যস্ত করার কৃতিত্বের জন্য অভিনন্দন জানালে। ক্যামেরার সামনে এসে না দাঁড়ানো পর্যন্ত কথাটি সে বন্ধ করে রেখেছিল। শংকর এর পর বাড়িতে। তার প্রৌঢ়া মা শিক্ষকতা করে ফিরলেন। শংকর তাঁকে বিজয়বার্তা শোনালে। মা আনন্দিত হয়ে বললেন শংকর যেন ওকালতীই করে যায় এবং নিরপরাধদের হয়ে লড়াই করে তাদের মুক্ত করে দেয়। কথাবার্তায় জানা গেল একটি মেয়ের সঙ্গে শংকরের বিবাহ প্রায় ঠিক। একে দিয়েই শংকরের মায়ের অভিলাষের বিপক্ষ সৃষ্টি করে নাটক পাকানো হলো। পরে অবশ্য এ মেয়েটির কোন অস্তিত্ব রইলো না। মেয়েটি শংকরকে জানালে যে, তার বাবা শংকরকে একটা ভালো চাকরি করে দেবেন; শংকর যেন ওকালতীর অনিশ্চিত আয়ের ভরসা ছেড়ে চাকরি গ্রহণ করে। শংকর ফিরে এসে মায়ের কাছে সে কথা নিবেদন করতে মা বারো বছর আগেকার কাহিনী শংকরকে শোনালেন। যা থেকে জানা গেল শংকরের নাম শংকর চৌধুরী নয়, শংকর চ্যাটার্জি। তার বাবার নাম প্রশান্ত চ্যাটার্জি। বারো বছর আগে এক বীমা কোম্পানীর ইন্সপেক্টার হিসেবে কৃষ্ণনগরে গিয়ে হেমাঙ্গিনী নামক এক নারীকে হত্যার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। কয়েদ হয়ে যাবার পর জেল থেকে লেখা প্রশান্তর একখানি চিঠি মারফৎ শংকরের মা প্রথম খবরটি জানতে পারলেন। কৃষ্ণনগরে মামলা হচ্ছে, কাগজে কাগজে হৈ-চৈ, প্রাচীন যুগেও নয়, মাত্র ১৯৪২ সালের কথা অথচ শংকররা কলকাতায় থেকেও ওর মা ঘটনাটা শোনেননি। অতীব বিস্ময়কর ব্যাপার, আর শংকরের মা অশিক্ষিতাও ছিলেন না। তবু মেশিনের ছকে এইভাবে গল্প চালাই করে নেওয়া হয়েছে যাতে বারো বছর পর প্রশান্তর ঐ প্রথম ও শেষ চিঠি পুত্র শংকরের মনকে আবেগে অশান্ত করে তুলতে পারে। তাই চিঠিতে যা লেখা আছে মা শংকরের কাছে তা বিবৃত করে

দিলেও চিঠিখানি আবার শঙ্করের হাতে দেওয়া হলো চেঁচিয়ে পড়তে পড়তে তার মনে যে ভাবান্তর খেলে যাচ্ছে তা দেখিয়ে দেবার জন্য। নয়তো চিঠি পড়ে সময় নষ্ট ও ছবির দৈর্ঘ্যই বাড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। আরও দেখা যায়, শঙ্কর ওকালতী করছে বছর-খানেক, ওকে দেখেও পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়সের বলে মনে হয়। অর্থাৎ ওর বাবা জেলে যাবার সময় ওর বয়েস তের-চোদ্দর কোঠায়, হয়তো উপনয়নও সম্পন্ন হয়েছে। বাবার জেলে যাওয়ার ঘটনা ওর কাছে গোপন করা যদিওবা সম্ভব, কিন্তু ওর মা চ্যাটার্জি পদবী তুলে দিয়ে চৌধুরী পদবী চালু করে দিলেন অতো অবোধ ছেলেমানুষ তের-চোদ্দ বছর বয়সে কেউ থাকে নাকি? কিন্তু মেসিন কোন যুক্তির ধার ধারে না, অমনিভাবেই হয়ে যায়। যেমন, শঙ্করের বাবার বিচারের সময় পাবলিক প্রসিকিউটর বললেন, এ রকম আসামীর ফাঁসি হওয়া উচিত নয়, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হওয়া উচিত। এই কথাকে জজ ও জুরীরা তথাস্তু বলে সে সময় মেনে না নিলে এ গল্পই তো ফাঁদা যেতো না। সুতরাং মেশিন যা দিয়েছে তার ওপর আর কথা চলে না।

* * *

মার কাছ থেকে সব জেনে শঙ্কর হাতে এক সুটকেস নিয়ে পাটনা থেকে হাজির হলো কলকাতার প্রেসিডেন্সী জেলে। পুলিস ইনস্পেক্টার ওকে জানালে যে, প্রশান্ত চ্যাটার্জিকে ঠাণ্ডি গারদে রাখা হয়েছে, তার সঙ্গে দেখা হবে না, আর বারো বছর পর হঠাৎ একজন দেখা করতে এসে নিজেকে কয়েদীর ছেলে বলে পরিচয় দিচ্ছে সেটাও সে সন্দেহ করে। শঙ্কর এবারে এলো কৃষ্ণনগরে। (ক্যামেরার দিকে দৃষ্টি ভিড় করে দাঁড়ানো জনতা কি পরিহার করা যেতো না!) স্টেশন থেকে বেরিয়ে দূরে একটা সাইকেল-রিক্সাকে শঙ্কর হাঁক দিতেই পাশ থেকে এক তরুণীও তাকেই হাঁক দিয়ে ডাকলে। বলা বাহুল্য, এই হলো নায়িকা শ্বেতা। ছকে বাঁধা নায়ক-নায়িকার প্রথম সাক্ষাৎ। দর্শক আমোদ পেলে। তারপর যেমন
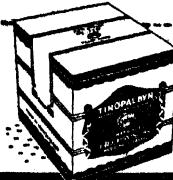
হয়—এ" ওকে গাড়ি ছেড়ে দিতে চাওয়া এবং শেষে দুজনেই ভাগাভাগি করে গাড়িতে চড়া। ঋতাই কথা বলে চলে, আলাপ করে, নাম বিনিময় করে এবং শেষে নামবার সময় রেজকি না থাকার ফিকিরে পুরো ভাড়া দিয়েই বাড়ির সামনে নেমে যায়। ঋতার দুই বান্ধবী বারান্দা থেকে ঋতাকে শঙ্করের সঙ্গে দেখে হেসে লুটোপুটি; কেন কে জানে! তবে দর্শক আমোদ পেলে।

* * *

শঙ্কর এসে উঠলো ঋতারই নির্দেশিত এক হোটেলে। সেখান থেকে গেলো শিল্পালয় নামক এক বিপনীতে। বাইরের নাম-প্লেটে সহদেব দত্ত ও বীণা রায় লেখা; এদেরই খোঁজ নিতে এসেছে সে। কিন্তু ভিতরে ঢুকে শঙ্করের প্রশ্নে এক ব্যক্তি যখন জানালে যে, সহদেব দত্ত বলে কেউ নেই তখন শঙ্কর বাইরে নেম-প্লেট দেখে এসেও দ্বিধা না করে সেই ব্যক্তির কথা মেনে নিয়ে চলে গেল। হাতে এক কপি সাপ্তাহিক কৃষ্ণনগর সমাচার পড়তে শঙ্কর জানতে পারলে যে, কাগজখানিতে মামলার বিবরণ প্রকাশিত হয়। সমাচার দপ্তরে এসে শঙ্কর বারো বছর আগেকার কপির খোঁজ করলে। ম্যানেজার স্মৃতি-ধর; প্রশান্ত চ্যাটার্জির মামলার কথা তুলতেই গড়গড় করে সব দিন তারিখ বলে দিলে। পাঁচ টাকা দাখিল করে শঙ্কর সেই পুরনো কপি নিয়ে বসলো। দেখা হলো ঋতার সঙ্গে, ওখানে পার্ট-টাইম কাজ করে সে। গল্প সাজাতে শঙ্করের সঙ্গে ঋতার এইভাবে দেখা করিয়ে দেওয়া দরকার যে অজুহাতেই হোক। ঋতা শঙ্করের জন্য চা আনতে গেল। শঙ্কর তার বাবার সেই মামলা পাতার পর পাতা উল্টে হেডিং দেখে ডায়রীতে নোট করে যাচ্ছে। এক একটা হেডিং দেখে শঙ্করের এক এক ভাবান্তর। হেডিংই যথেষ্ট, পূর্ণবিবরণ পড়ছে দেখাতে গেলে অনেক সময় যাবে। শেষে [illegible] হেডিং দেখে শঙ্কর আবেগে [illegible] পড়ে সেখান থেকে দৌড়ে বেরিয়ে [illegible]। তাতে খুনের উদ্দেশ্য বলে লেখা [illegible] যে হেমাঙ্গিনী চার মাস অন্তঃসত্ত্বা [illegible] সেই ফ্যাসাদ থেকে বাঁচবার জনাই [illegible] তাকে খুন করেছে। শঙ্কর চলে যাবার পর এ গল্পের ধারা অনুসারেই ঋতা চা নিয়ে হাজির হলো এবং শঙ্করের ফেলে যাওয়া ডায়রীটি হস্তগত করে শঙ্করের সব কথা জেনে নিলে। এরকম না করলে ঋতাকে শঙ্করের সব কথা জানানো বুঝি যায় না। তাছাড়া ঋতা যে শঙ্করের সব কথা জেনেছে এটা শঙ্কর জানতে পারলে তবেই না অনুরাগের মাত্রা বাড়িয়ে দেওয়া যায়!

* * *

মামলার বিবরণ পড়ে শঙ্কর যে কটি নাম পেয়েছিল তাদের সঙ্গে সে দেখা করতে আরম্ভ করলে। প্রথমে গেল তারাপদ সরকার নামে এক ব্যক্তির কাছে। যে বাড়ির দোতলায় খুন হয়, সেই বাড়িরই একতলায় সে থাকে। সাক্ষ্য দেবার সময় সে জানায় যে খুনের দিনে সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে যে ব্যক্তিকে সে পালাতে দেখেছে সে ব্যক্তিকে দেখতে প্রশান্তর মতো নয়। তার চোখ খারাপ এই কথা বলে তারাপদর সাক্ষ্য বাতিল করে দেওয়া হয়। তারাপদ এখন প্রায় বছর সত্তরের বৃদ্ধ। শঙ্করের কাছে খুনের দিনের বিবরণ বলার সময় ফ্লাশ-ব্যাকে বারো বছর আগেকার দৃশ্য সামনে এনে দেওয়া হলো। তাতে দেখা গেল তারাপদ বছর ত্রিশেকের যুবক। মাত্র বারো বছরে অতো বুড়ো কি করে হতে পারে সে হিসেব মেসিনের খোপে গ্রাহ্য হয় না। তারাপদর কাছ থেকে শঙ্কর বের হলো সুশীল রায় নামক সেই সময়কার এক দারোগার খোঁজে। তারাপদর বাড়ি থেকে বের হবার সময় গেটে

দেখা হলো বীণা রায়ের সঙ্গে, ঐ বাড়ীর অর্ধেক মালিকিন এবং শঙ্কর যেদিন শিল্পালয়ে যায় সেদিন বেরিয়ে আসার সময় বীণার সঙ্গে ধাক্কা লাগে। বীণার কেমন ঢলে পড়া ভাব। শঙ্করকে সে শিল্পালয়ে আসার আমন্ত্রণ জানালে। দারোগা সুশীল রায়ের খোঁজ করতে করতে শঙ্কর বিখ্যাত ময়রা নিবারণ কুড়ীর দোকানে এলো। নিবারণ কুড়ী শঙ্করকে পরদিন আসতে বললে। সেই দোকানেরই সামনের বাড়িতে থাকে ঋতা। শঙ্করকে দেখে ও সামনে এসে দাঁড়ালো এবং শঙ্করের ডায়রী ফেরত দিয়ে তাকে বন্ধু ও সমব্যথী বলে গ্রহণ করতে বললে। শঙ্কর ঋতাকে নিবারণের কাছে আসার উদ্দেশ্য জানালে। ঋতা স্মরণাপন্ন হলো সমাচারের সেই স্মৃতি-ধর ম্যানেজারের। তার কাছ থেকে সুশীল রায়ের পাত্তা বের করে নিতে মোটেই অসুবিধে হলো না। পরদিন শঙ্কর নিবারণ কুড়ীর কাছ থেকে ব্যর্থ হয়ে দোকানের বাইরে পা দিতেই ঋতার সঙ্গে দেখা। শঙ্করের অতো উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা সুশীল রায়ের পাত্তা যোগাড় করার জন্যে, কিন্তু অমন শুভানুধ্যায়ী বান্ধবী তারো সরাসরি খবরটা না দিয়ে রঙ্গ পরিহাসের সঙ্গে, খানিকটা মন দেয়ানেয়ার ভাব ফুটিয়ে ওপরে ডেকে নিয়ে গিয়ে জলখাবার খাইয়ে তারপর খবরটা দিলে। এ না করলে গল্পতে রোমান্সটাকে বাগিয়ে আনার উপায় নেই, হোক না কেন অসঙ্গত আচরণ!

*　　*　　*

সুশীল রায় ট্রেন থেকে পড়ে গিয়ে আহত অবস্থায় হাসপাতালে শয্যাশায়ী। শঙ্কর তার সঙ্গে দেখা করলে। সুশীল রায় পুরনো দিনের ঘটনা বিবৃত করতে এলো ফ্ল্যাশ-ব্যাকে ঘটনাবলীর দৃশ্য। ফ্ল্যাশব্যাকের নিয়মে যে ব্যক্তিকে ধরে পুরনো ঘটনার অবতারণা করা হয় তারই সাক্ষাতে যা ঘটেছে সেই সব ঘটনাবলীই দেখিয়ে দেওয়া। এখানে সে নিয়ম খাটানো হয়নি। সুশীল রায়ের অলক্ষ্যে যা ঘটেছে তাও দেখনো হয়েছে। অবশ্য তাতে ঘটনাটা পুরোপুরি জানতে পারা গেল। খুনের খবর পেতেই থানার দারোগা সুশীল রায়কে পাঠায় তদন্তের জন্য। সুশীল ঘটনাস্থলে একটি এস এইচ নামাঙ্কিত সিগারেট কেস ও একখানি চিঠি পায়। চিঠিতে খুনের একটা ইঙ্গিত ধরা পড়ে। হেমাঙ্গিনী সহদেব দত্তর ভগিনী বলে পরিচিতা। তার কজন পুরুষ বন্ধু ছিল। সহদেব তার নামে পঞ্চাশ হাজার টাকার এক বীমা করাতে চায়। মহিলা এতো টাকার বীমা করছে, এই বিষয়ে তদন্তের জন্য প্রশান্ত কৃষ্ণনগরে আসে। সহদেব তার সঙ্গে হেমাঙ্গিনীর আলাপ করিয়ে দেয়। মামলায় সাক্ষ্যদানকালে সহদেব জানায় যে, ঘটনার দিন প্রশান্ত তাকে বলে যে, সে নবদ্বীপে গিয়েছে এই কথা যেন প্রচার করে দেওয়া হয়। আসলে প্রশান্ত নবদ্বীপ যায়নি। এক কম্পাউন্ডার সাক্ষ্য দিয়ে বলে যে, খুন করে পালাতে যে ব্যক্তিকে সে দেখেছে, সে প্রশান্ত। বীণা রায় জানায় সেও প্রশান্তকে পালাতে দেখেছে। মাঝে দেখা গেল সহদেব কম্পাউন্ডার ও বীণাকে মিথ্যা সাক্ষ্য দেবার জন্য ঘুষের লোভ দেখাচ্ছে। প্রশান্তকে ধরে আনা হয় রেঙ্গুনগামী জাহাজ থেকে। কৃষ্ণনগর থেকে রেঙ্গুন যেতে কলকাতা পড়লেও প্রশান্ত স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে দেখা না করেই চলে যাচ্ছেন কেন? তার ব্যাগ থেকে একখানা ক্ষুর বের করে পাবলিক প্রসিকিউটর সুরেন দাস প্রমাণ করিয়ে দেন, সেই ক্ষুর দিয়েই হেমাঙ্গিনীর গলা কাটা হয়েছে। সব একতরফা সাক্ষী। আশ্চর্য কাণ্ড হচ্ছে যে, প্রশান্ত নিজের পক্ষে কোন উকিল রাখলে না। কারণ তা দেখাতে গেলেই ভেস্তে যায়। সে উকীল নিশ্চয়ই ঘটনাস্থলে প্রাপ্ত সিগারেট-কেস ও চিঠি নিয়ে টানাটানি করবেই। এই দুটিই প্রশান্তর নির্দোষিতা প্রমাণের অস্ত্র। আদালতে তা দাখিল হলে গল্প থাকে না। কিন্তু এ দুটি সরিয়ে রাখাতে বোঝা গেল, কৃষ্ণনগরের পুলিসও নিশ্চয়ই ষড়যন্ত্রে জড়িত ছিল। অথচ ওদিকটা স্রেফ চেপে দেওয়া হয়েছে। পাবলিক প্রসিকিউটারের কথা-মতোই প্রশান্তর সাজা হয়ে গেল। প্রশান্ত আইন-আদালত, ধর্ম-ভগবান সব মিথ্যে বলে চীৎকার করতে করতে কয়েদখানায় গেল। ফ্ল্যাস ব্যাক শেষ হলো। সুশীল রায় অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে প্রশান্তর চীৎকারের প্রতিধ্বনি তুলে ভীষণ চীৎকার করতে লাগলো। ঘর ভর্তি রুগী, একটু তফাতে এক ডাক্তার ও নার্সকেও দেখা গেল, কিন্তু অতো চীৎকারেও সকলেই নির্বিকার। ঐ রকম নির্বিকারত্ব না রাখলে 'এফেক্ট' থাকে না বোধ হয়। মেসিনের কি আর বোধশক্তি থাকে!

*　　*　　*

বীণা রায়ের আমন্ত্রণে শঙ্কর শিল্পালয়এ যায়। সহদেব দত্তই ঐ দোকানের বাকি অংশীদার। ... থেকে বীণার সঙ্গে শঙ্কর ... শুনলে। বীণা তো প্রশান্তর ... ঢলেই আছে; শঙ্করকে সে ... সন্ধ্যায় আসার নিমন্ত্রণ জানালে। শঙ্কর চলে যেতে সন্দিগ্ধ সহদেব তার ... নিতে হোটেলে এলো। হোটেলের ম্যানেজারের কাছে শঙ্কর সম্পর্কে ... নেবার সময় শঙ্করের নামে একখানা চিঠি সহদেবের হাতে ম্যানেজার ... দিলে। সহদেব মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস-চেয়ারম্যান বলেই বোধ ... সেই জোরেই চিঠিটা ছিঁড়ে পড়লে ... তা থেকে জানতে পারলে শঙ্কর প্রশান্তর পুত্র এবং সেই খুনের মামলা সম্পর্কে ... কৃষ্ণনগরে এসেছে। এভাবে না ... সহদেবের কাছে শঙ্করের পরিচয় ... কিভাবে দেওয়া যায়—সে তো ... কথা, যা মেসিনে থাকবার কথা নয়। শঙ্কর বীণার সঙ্গে দেখা করতে ... পর সহদেব বাইরে থেকে দরজা ... দিলে। বীণা শঙ্করকে পাশের ... দিয়ে বেরিয়ে যাবার রাস্তায় ... এলো। বীণা শঙ্করের আসল পরিচয় জানে না, সহদেব যে শঙ্করকে চিনেছে সেকথা শঙ্কর জানে না, তবুও লুকোবার

দরকার হলো। কারণ সহদেব বীণার কাছে এসেই শঙ্করকে উপলক্ষ্য করে চীৎকার করে যে কথা শোনালে, তা আড়াল থেকে না শুনতে পেলে শঙ্কর জানতে পারতো না সহদেবই খুনের সঙ্গে জড়িত। শঙ্কর চলে যেতে গিয়ে একটা জিনিস পড়ে আওয়াজ হতেই সহদেব বেরিয়ে এসে চোর চোর বলে তাড়া করতে শঙ্কর পালালো। দারোগা সুশীল রায়ের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ায় এবারে কিন্তু নার্স শঙ্করকে একরকম তাড়িয়েই দিলে, রোগীকে উত্তেজিত হতে দেখে। আসবার আগে শঙ্করের হাতে সুশীল রায় মামলা ব্যাপারে সে যা কিছু সাব্যস্ত করেছিল, তার নথিপত্র দিয়ে দিলে। সুশীল রায় জানালে শঙ্কর যেন সেই সিগারেটকেসের মালিক ও চিঠিখানির লেখকের সন্ধান করে। আরো জানায় যে, চিঠিখানি লেখা বাঁ-হাতে এবং লেখক হয়তো সব কাজই বাঁ-হাতে করে। আরও জানিয়ে দিলে, শঙ্কর যেন হেমাঙ্গিনীর পূর্ব পরিচয় জোগাড় করে। মাঝে নদীর ধারে সন্ধ্যায় শঙ্কর ও ঋতার মিলন এবং পাকাপাকিভাবে প্রেম-নিবেদন ইত্যাদি বিষয়ে বক্তৃতাদি আছে।

* * *

সহদেব শঙ্করের পিছনে লাগলো। রাস্তায় এক ব্যক্তি এসে শঙ্করকে গলা চড়িয়ে থানায় যাবার জন্যে বললে। শঙ্কর সুড় সুড় করে থানায় হাজির হলো। থানার অফিসার শঙ্করকে অবিলম্বে কৃষ্ণনগর ত্যাগ করে যেতে বললে। শঙ্কর কথাটি না বলে তাই মেনে নিয়ে বেরিয়ে এলো। শঙ্কর উকীল অথচ পুলিসের এই আচরণে কি করতে হয়, তাও সে জানে না এবং অফিসারের মৌখিক কথায় শহর ত্যাগের হুকুম যে খাটে না, সে জ্ঞানটুকুও তার নেই। অবশ্য জ্ঞানটা থাকলেই বিপদ ঘটতো, সেক্ষেত্রে গল্পকে পেঁচিয়ে তোলা মুশকিল হতো। কাজেই শঙ্করকে দিয়ে তা মানিয়ে নেওয়ানোই দরকার. শঙ্কর হোটেলে আসতেই ম্যানেজার জানালে, তাকে হোটেল ত্যাগ করতে হবে। এক কথায় শঙ্কর তাও মেনে নিলে। চলে আসার সময় ম্যানেজার চল্লিশ টাকা বাকির দায়ে শঙ্করের সুটকেস আটক করলে। শঙ্কর বিদেশে একটা অমন মামলা তদারকে এলো শূন্য হাতে, তাও অসঙ্গত বললে চলবে না। কারণ এখানে দেখানো দরকার শঙ্করের জন্য ঋতার আকুলতা। হোটেল থেকে বিতাড়িত হয়ে শঙ্কর যাকে পরম বন্ধু, সমব্যথী ও হিতকারী বলে গ্রহণ করেছে, বলা বাহুল্য, সেই ঋতার কাছে গেল না। পথে পথে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। ওর দুরবস্থায় অনুকম্পার 'এফেক্ট' সৃষ্টির জন্য বৃষ্টিতে গাছের গুঁড়ির পাশে জড়োসড়ো হয়ে ওকে পড়ে থাকতে দেখানো হয়েছে। শঙ্কর আবিষ্কার করেছে যে, হেমাঙ্গিনীকে খুন করেছে দুজন; একজন সামনের দিক দিয়ে পালায় এবং আর একজন পিছনের রাস্তা দিয়ে। ঘুরতে ঘুরতে একদিন সে সেই বাড়ির পিছনের দরজা দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করতেই ওপরের ঘর থেকে ভেসে আসা কথা ওর কানে এলো। বেশ চেঁচিয়ে কথা না হলে একতলা পর্যন্ত পৌঁছয় না। সেই খুন ব্যাপার নিয়েই দুই ব্যক্তির চেঁচিয়ে কথাবার্তা। অদ্ভুত সঙ্গতি! সেখান থেকে বেরিয়ে রাস্তায় পড়তেই পুলিসে করলে তাড়া। শঙ্কর দৌড়ে পালাতে লাগলো। পুলিসও হুইসিল বাজিয়ে সোরগোল তুলে তাড়া করে চললো। রাস্তার দোকানী, পথিক এরা সব কিন্তু নির্বিকার, একটু ঘাড় ফিরে কেউ চায়ও না ঐ হুটোপুটির দিকে। শঙ্কর পালাতে সক্ষম হলো। পথে পথে স্টেশন প্ল্যাটফর্মে শঙ্কর দিন কাটায়। সহদেব ওর পিছনে লেগেছে এবং পুলিসও ওকে শহর ছাড়তে হুকুম দিয়েছে, কিন্তু শঙ্কর দিব্যি পথে পথে সর্বসমক্ষেই ঘুরে বেড়াতে লাগলো। এ গোঁজামিল কাটাবার উপায় নেই এই গল্প বানাতে।

ঋতা হোটেলে শঙ্করের খোঁজ নিতে এসে ম্যানেজারের কাছে ওর চলে যাওয়ার কথা শুনলে। বাকি টাকা দিয়ে দিতেই ম্যানেজারও অজ্ঞাত-পরিচয় তরুণীর হাতে আর একজনের সুটকেস তুলে দিতে এতটুকুও দ্বিধা করলে না। এটাও মেনে নিতে হবে, নয়তো পরে শঙ্করের সঙ্গে দেখা হতে প্রথমদিন গাড়িভাড়ার আট আনা আর সুটকেস ছাড়ানোর চল্লিশ টাকা জুটে সাড়ে চল্লিশ টাকা দেনার কথা তুলে মজা করা যায় না। শঙ্করের জন্য ঋতার আকুল হয়ে পথ চাওয়া, সুতরাং পথ চাওয়ার গান। ঋতা জানলার ধারে বর্ষণমুখর সন্ধ্যায় গাইলে—"জানি না ফুরাবে কবে এই পথ চাওয়া।" বর্ষা রাখতে হলো 'মুড' আনতে। রাস্তায় ঋতার সন্ধানী দৃষ্টি ঘুরতে ঘুরতে বলা বাহুল্য, ঠিক শঙ্করের মতো পোশাক-পরা একজনকে ভুল করে ডাকার ব্যাপার একটা হলো। যাই হোক, ঋতা শঙ্করকে খুঁজে পেলে। ওকে বাড়িতে এনে সামনে বসিয়ে খেতে দিলে। এইভাবে খাওয়ানো একটা চিরাচরিত ব্যাপার এবং খেতে বসে মায়ের স্নেহের প্রসাদ তুলে মাতৃভক্তিতে গদগদ হয়ে ওঠাটাও। খাওয়ার পর শঙ্করকে নিজের বিছানায় শুইয়ে দিলে। তারপর চাঁদের সামনে গিয়ে ঋতা গান ধরলে— "এই চাঁদের তিথিরে বরণ করি।" ঋতার সঙ্গে দুই বান্ধবীও থাকতো, বলা বাহুল্য, অমন একটা প্রেমময় মধুরাতি বানাবার সুবিধে করে রাখতে ওদের উবিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ঋতার সঙ্গে নতুন উদ্দীপনায় শঙ্কর তদারকে নামলো। ঋতা উদ্বাস্তু প্রতিষ্ঠানের কর্মী পরিচয়ে চালাকি করে সহদেব, পাবলিক প্রসিকিউটর এবং পুলিস-কর্তার হাতের লেখা সংগ্রহ করলে। শঙ্কর ঠিক করলে মামলা নিয়ে সে জনমত সৃষ্টি করবে। এই ভেবে আদালত প্রাঙ্গণে সে এক সভা করে বক্তৃতা দিতে লাগলো। পুলিস এসে বেআইনী জনতার সৃষ্টির জন্যে গ্রেপ্তার করে তাকে গারদে পুরে দিলে। আদালতে হাজির করতেই প্রসাদ রায় নামক এক ব্যক্তি নিজেকে উকীল এবং ভারতী কাগজের সম্পাদক বলে জানিয়ে শঙ্করের হয়ে জামীন দাঁড়াতেই শঙ্কর খালাস পেয়ে গেল। অবশ্য শঙ্কর যে উকীল, সে তো অনেক আগেই উহ্য করে দেওয়া হয়েছে ঘটনা পাকাবার সুবিধের জন্য। বাড়িতে ফিরেই শঙ্কর পড়লো দারুণ অসুখে। এটা দেখানো দরকার হলো, কারণ তা না হলে বোধ

হয় ঋতা যে শঙ্করের জীবন সম্পূর্ণ ভরে রয়েছে, তা দেখানোর ফাঁক থেকে যায়, যদি না ঋতাকে একবার শঙ্করের শুশ্রূষাকারিণীরূপেও দেখানো হয়। সব মাপা ব্যাপার। কোন কিছু বাদটি থাকতে দেওয়া হবে না।) ইতিমধ্যে সম্পাদক প্রসাদ রায় তার কাগজে লিখে প্রশান্ত চ্যাটার্জীর মামলা নিয়ে একটা আন্দোলন তুলে গভর্নমেণ্টকে বাধ্য করলে এক ট্রাইবুনাল গঠন করে মামলার পুনর্বিচার করতে। মামলায় আসামী-পক্ষের উকীল দাঁড়ালো শঙ্কর নিজে। প্রশান্ত চ্যাটার্জীকে বুদ্ধ পাগল অবস্থায় কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হলো। পাবলিক প্রসিকিউটর সুরেন দাস জানালেন, মামলায় নতুন করে তার কিছু বলবার নেই। শঙ্কর তারপর আরম্ভ করলে সাক্ষীদের জেরা। হেমাঙ্গিনীর দেহের ময়না তদন্তকারী ডাক্তার তার সাক্ষ্যে জানালে যে, খুব ধারালো ডাক্তারী ছুরি দিয়ে হেমাঙ্গিনীর গলা কাটা হয়েছে বাঁ-হাতের সাহায্যে এবং সার্জারীতে নিপুণ সে হাত। সহদেব দত্তকে জেরা করতে ফাঁস হলো যে, প্রশান্ত প্রথম যেদিন কৃষ্ণনগরে তার সঙ্গে দেখা করে, সেটা বিশে এপ্রিল তারিখ; খুন হয় দশই জুন, অর্থাৎ প্রশান্ত ও হেমাঙ্গিনীর পরিচয় একান্ন দিন অথচ মৃতা হেমাঙ্গিনী খুনের সময় ছিল চার মাস অন্তঃসত্ত্বা। সুতরাং প্রশান্ত হেমাঙ্গিনীর ঐ অবস্থার জন্য দায়ী নয়, অর্থাৎ কুৎসা ও দুর্নাম থেকে বাঁচবার জন্য প্রশান্ত হত্যা করেনি। (কিন্তু কি এমন ইন্সপেকসন যে, প্রশান্তকে একান্নদিন কৃষ্ণনগরে থাকতে হলো।) আরও জেরাতে প্রকাশ পেলো যে, সহদেব খুনের দিন সকালে প্রশান্ত তাকে মিথ্যে করে নবদ্বীপ যাওয়া রটিয়ে দিতে বলেছিল বলে যে সাক্ষ্য দিয়েছিল, তা সত্য নয়, কারণ শঙ্কর নবদ্বীপ থানার ডায়েরী থেকে প্রমাণ করালে যে সহদেব সেদিন মারপিটের অভিযোগে গারদে ছিল। সুতরাং প্রশান্তকে সে মিথ্যে করে খুনের সঙ্গে জড়িয়ে দিয়েছে। বীণা তার সাক্ষ্যে জানালে যে, খুন করে প্রশান্ত পালিয়ে যাবার সময় রাস্তার গ্যাসের আলোতে স্পষ্ট সে প্রশান্তর মুখ দেখেছে। শঙ্কর প্রমাণ দিলে যে, সেদিন ছিল শুক্লা দশমী; রাত আটটার আগে গ্যাস জ্বলেনি, কাজেই বীণা স্পষ্টভাবে মুখ দেখেনি। বীণার মিথ্যে সাক্ষ্য ধরা পড়লো। ক্যাম্পবেল হাসপাতালের হেডক্লার্ক সাক্ষ্য দিয়ে বললে যে, বহু বছর আগে হেমাঙ্গিনী তাদের হাসপাতালের নার্স ছিল। একটি ছাত্রের সঙ্গে প্রণয়ঘটিত ব্যাপারে লিপ্ত হওয়ায় তাকে এবং সেই ছাত্রটিকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। হেমাঙ্গিনী কৃষ্ণনগরে চলে যায়। আর ছাত্রটি আইন পাস করে ওকালতিতে ভর্তি হয়। সার্জারীতে সেই ছাত্রটি সুদক্ষ ছিল এবং ছাত্রটি ছিল ন্যাটা। এর পর শঙ্কর সেই চিঠির লেখকের সন্ধান দিলে। উদ্বাস্তু প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি সেজে ঋতা যে হাতের লেখা সহদেব, পাবলিক প্রসিকিউটর সুরেন দাস প্রভৃতির কাছ থেকে সংগ্রহ করেছিল, তার একটির সঙ্গে খুনের জায়গায় পাওয়া চিঠির হাতের লেখার মিল পাওয়া গেল। চিঠি দুখানিরই লেখক পাবলিক প্রসিকিউটর সুরেন দাসের এবং প্রাপ্ত সিগারেট-কেসটিও তারই নামাঙ্কিত। সুরেন দাসই কুৎসা থেকে বাঁচবার জন্য হেমাঙ্গিনীকে খুন করেছে প্রমাণ হয়ে গেল। প্রশান্ত সসম্মানে ছাড়া পেল। কিন্তু তখন সে উন্মাদ। নিজের স্ত্রী-পুত্রকে চিনতে পারে না। ঋতা এগিয়ে গিয়ে তার কানে বাস্তুহারার দুঃখ ঢেলে দিতেই মন্ত্রবৎ প্রশান্ত জ্ঞান ফিরে পেলে। অলমতি বিস্তারেণ—

* * *

এই হলো এম পি প্রডাকসন্সের মেসিনে তৈরী অগ্রদূত পরিচালিত "সবার উপরে" (ঋতার চরিত্রাভিনেত্রী সুচিত্রা সেনের উচ্চারণে "সবাড় উপড়ে"; র'-টা ওর আসে না, আমরা নিড়পড়াধ!) রেললাইনের বাঁধা রাস্তা ধরে তর তর করে গল্প গড়িয়ে গিয়েছে, যুক্তিসংগতির জন্যে কোথাও দাঁড়ায়নি। চলতে চলতে দুঃখ, প্রেম, রহস্য, রঙ্গ, উত্তেজনা, কৌতূহল প্রভৃতি ভাব ঠিক মেপে মেপে পরিবেশন করে যাওয়া হয়েছে। তার ওপর চাপানো হয়েছে ঝুড়ি ঝুড়ি বুকনি। একটা কথাও সোজা সরাসরি বলা নেই। এ এক কথক ঠাকুর কাহিনী ও সংলাপ রচয়িতা নিতাই ভট্টাচার্য। দার্শনিক গুরুমশাই বললেও হয়। প্রেম, মানবতা, মাতৃস্নেহ, আইনের অবিচার, জনমতের প্রভাব, সংবাদপত্রের কর্তব্য ইত্যাদি কোন বিষয়েই বক্তৃতা ফাঁদতে বাদ নেই। খালি উপদেশ, গড়গড় করে বকবক করে। কথার জন্যেই ছবির বিরক্তিকর দৈর্ঘ্য ষোল হাজার ফিটাধিক। একটা উৎকট যান্ত্রিক কৃত্রিমতা লেপে রয়েছে সারা অঙ্গে, এমন কি সকলের অভিনয়েও। সব জিনিসটাই অত্যন্ত চড়া মাত্রায় তোলা। গল্প সাজানো আমেরিকান ক্রাইম-ড্রামার ধাঁচে, তবে তার সঙ্গে রোমান্সকেও প্রধান করে রাখা হয়েছে। কি যে সার্থকতা এ গল্পের, বোঝা যায় না। চমৎকার হয়েছে শুধু শেষে ট্রাইবুনালে বিচারের দৃশ্যটি। দৃশ্যটি নাটকীয়ভাবে পরিবেশনে সকলেরই বেশ নৈপুণ্য প্রকাশ পেয়েছে। সাক্ষীদের জেরা করে মিথ্যে প্রতিপন্ন করে শেষে সুরেন দাসকে কথায় কথায় হেনস্তা করে দোষী প্রমাণিত করিয়ে দেওয়ায় শঙ্করের চালচলন কথায় দর্শক বেশ আমোদ উপভোগ করে। ছবির চরিত্রাভিনয়ে আছেন—উত্তমকুমার, ছবি বিশ্বাস, নীতিশ মুখোপাধ্যায়, কমল মিত্র, পাহাড়ী সান্যাল, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, তুলসী চক্রবর্তী, সুচিত্রা সেন, শোভা সেন, জয়শ্রী সেন, তপতী ঘোষ প্রভৃতি। সংগঠনে আছেন আলোকচিত্র গ্রহণে বিভূতি লাহা ও বিজয় ঘোষ, শব্দগ্রহণে যতীন দত্ত, সুরযোজনায় রবীন চট্টোপাধ্যায়, শিল্পনির্দেশে সত্যেন রায়চৌধুরী ও সম্পাদনায় সন্তোষ গাঙ্গুলী।

সঙ্গীতানুষ্ঠান

দক্ষিণ কলিকাতা তরুণ সমিতির উদ্যোগে আগামী রবিবার, ১২ই ডিসেম্বর ইন্দিরাতে একটি সঙ্গীতানুষ্ঠান হবে। অংশ গ্রহণ করবেন—ওস্তাদ আলি আকবর খান, ওস্তাদ নিসার হোসেন খান, ওস্তাদ বিলায়েৎ খান, প্রঃ আল্লারাখা, জনাব ইমরৎ খান। বিচার বিভাগীয় মন্ত্রী শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করবেন।

একলব্য

একদিকে সাঁতার, আর একদিকে ফুটবল একদিকে আমেরিকা অন্যদিকে সোভিয়েট রাশিয়া। খেলাধুলার উৎসাহী দর্শকেরা কোনটি রেখে কোনটি দেখে? সাঁতার না ফুটবল? একই দিনে এবং প্রায় একই সময়ে আজাদ হিন্দ বাগের পুকুরে আমেরিকান টীমের সঙ্গে বাঙলার সাঁতার প্রতিযোগিতা আর ক্যালকাটা মাঠে সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে আই এ এফ-এর ফুটবল খেলা। অবশ্য রাশিয়ার এটি জাতীয় ফুটবল দল ছিল না—সোভিয়েট দেশের একটি ক্লাব মাত্র। সাঁতারু টীমকেও আমেরিকার প্রতিনিধিমূলক টীম বলা যায় না। তবুও বাঙলার শক্তির তুলনায় বলবিক্রম ও কৌশল চাতুর্যে একটিকে জলের কুমীর আর একটিকে জঙ্গলের বাঘ বলে অভিহিত করা যায়; বলা বাহুল্য জলে-স্থলে কুমীর-বাঘ দুইয়ের হাতেই মার খেতে হয়েছে বাঙলাকে। রাশিয়ার ফুটবল টীম ৫—০ গোলে শোচনীয়ভাবে মোহনবাগান ক্লাবকে হারাবার পর ২—০ গোলে হারিয়েছে আই এফ এ-কে। আর একমাত্র 'ব্রেস্ট স্ট্রোক' ছাড়া আমেরিকার সাঁতারুরা সব বিষয়েই বাঙলার সাঁতারুদের করেছে পরাজিত।

সাঁতার এবং ফুটবল—দুটিই ছিল এখানকার আন্তর্জাতিক ক্রীড়ানুষ্ঠান। এই দুই অনুষ্ঠানের স্মৃতি মন থেকে মুছে যেতে না যেতেই আরম্ভ হয়েছে আর এক আন্তর্জাতিক খেলা-ধুলার টেবিল টেনিস। ইডেন উদ্যানের ইনডোর স্টেডিয়ামে হাঙ্গেরী, সিঙ্গাপুর ও ভারতের এই খেলুড়েদের টেবিল টেনিসের আকর্ষণও কম নয়। সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব ভারত চ্যাম্পিয়ন-শিপেরও খেলা চলছে। সাঁতার, ফুটবল এবং টেবিল টেনিস—জল স্থল ও বদ্ধঘরের তিন ধরনের তিনটি খেলা। সব খেলা ক্রীড়ামোদী সব দর্শকের পক্ষে দেখা সম্ভব নয়, সব খেলায় সবার স্পৃহাও নেই। তবুও কলকাতায় আন্তর্জাতিক খেলাধুলার যেমন ঘন ঘন আসর বসছে তাতে সব কিছু দেখবার জন্যই মনটা উসখুস করে বৈকি? এরপর আবার কলকাতায় প্রায় একই সঙ্গে আরম্ভ হচ্ছে এশিয়ার টেনিস খেলা আর ভারত—নিউজিল্যাণ্ড টেস্ট ক্রিকেট খেলা। উডবার্ন পার্ক এবং ইডেন উদ্যানে তার তোড়জোড়ও আরম্ভ হয়েছে। এশিয়ান লন টেনিসে আমন্ত্রিত সাগরপারের এবং দেশ বিদেশের রথীন্দর টেনিস খেলোয়াড়দের সমাগমে উডবার্ন পার্ক ক্ষুদে 'উইম্বলডনের' মর্যাদা পাবে, আর ভারত ও নিউজিল্যাণ্ডের ব্যাট বলের লড়াইয়ে ইডেন উদ্যান হয়ে উঠবে সরগরম। এই দুই ক্রীড়ানুষ্ঠানের জন্যও ক্রীড়ামোদীরা সাগ্রহে অপেক্ষা করছে। পোশাক পরিচ্ছদের নতুন অর্ডার এবং পুরনো শাড়ি স্যুটেরও পরিচর্যা চলছে। কারণ টেনিস আর ক্রিকেট অভিজাত সম্প্রদায়ের খেলা। অনেকের কাছে এ খেলা দেখার আনন্দের চেয়ে এ খেলা দেখতে যাবার আনন্দ বেশী, এর মধ্যে সামাজিক আভিজাত্যের প্রশ্ন নিহিত।

* * *

সোভিয়েট রাশিয়ার যে ফুটবল টীমটি মোহনবাগান ও আই এফ এ কে সহজেই হারিয়ে গেল এদের নাম—মস্কো লোকোমোটিভ ফুটবলের নিপুণ শিল্পী—বিশ্বের ফুটবল লীগে এরা পঞ্চম স্থানের অধিকারী। সুতরাং রাশিয়ার জাতীয় দলের শক্তির সঙ্গে এদের তুলনা হয় না! কুশলী খেলোয়াড়ের সংখ্যাও কম। গত বছরের রাশিয়ান ফুটবল দলটি তার্তুশিন, ইলিন, সালীনিকফ, সাইমোনিয়ান নাশাশকিন, নেত্তো প্রভৃতি যে সব কুশলী ও সুনিপুণ খেলোয়াড়ে সমৃদ্ধ ছিল, মস্কো লোকোমোটিভ দলে তেমন খ্যাতিমান খেলোয়াড়ের সন্ধান পাওয়া যায়নি। আগের দলের যাদের নাম করা হল এরা প্রায় সবাই ফুটবলের রূপদক্ষ শিল্পী—বিশ্বের ফুটবল ক্রীড়াক্ষেত্রে সুপরিচিত। হ্যাঁ তবে লোকোমোটিভ দলের দুই একজনের ক্রীড়াধারায়ও উন্নত ফুটবল নৈপুণ্যের ছাপ পাওয়া গেছে বৈকি! এদের মধ্যে প্রথমেই সেণ্টার ফরোয়ার্ড বুবুকিনের নাম করতে হয়। প্রথম দিন মোহনবাগানের বিরুদ্ধে পাঁচটি গোলের মধ্যে বুবুকিন একাই পর পর প্রথম চারটি গোল করে 'হ্যাট্রিক' করবার কৃতিত্ব অর্জন করেন; কিন্তু গোল বা 'হ্যাট্রিক' করাতেই বুবুকিনের নৈপুণ্য আমাদের চোখে পড়েনি। বল পায়ে রাখায় তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য, বল দেওয়া নেওয়ায় চমৎকার কৌশল, চলমান বলের সঙ্গে এগিয়ে যাবার অনবদ্য ভঙ্গি, সব কিছুই ফুটবল শিল্পীর পরিচায়ক। সত্যই বুবুকিন একজন উঁচু দরের ফুটবল খেলোয়াড়। বুবুকিন ছাড়া দলের অধিনায়ক রঘোভও নিপুণ খেলোয়াড়। পায়ে চোট থাকায় প্রথম দিনের খেলায় তিনি অংশ গ্রহণ করতে পারেন নি। দ্বিতীয় দিন চোটলাগা পা নিয়ে যেটুকু খেলেছেন তা থেকেই তার নৈপুণ্য ফুটে উঠেছে। তরোশিলভ এবং কোভালেভও মন্দ খেলেননি। তবে, ব্যক্তিগত ক্রীড়ানৈপুণ্য দেখানো রুশ ফুটবলের বিশেষত্ব নয়। ফুটবল যে একজনের খেলা নয়, এগারো জনের খেলা একথা মনে রেখেই এরা ফুটবল খেলে। সুতরাং ব্যক্তিগত নৈপুণ্য বেশী দেখানোর অবকাশ কোথায়? সুইডেনের হেলসিংবর্গ ক্লাব, গোটেবর্গ ক্লাব, অস্ট্রিয়ার লিনজ ক্লাব, জার্মানীর অফেনব্যাক কিকার্স প্রভৃতি ইউরোপ অঞ্চলের যেসব টীম এর আগে কলকাতায় খেলে গেছে মস্কো লোকোমোটিভ দলের খেলার ধারার সঙ্গে তাদের খেলার ধারার বিশেষ পার্থক্য নেই। এরাও তিন ব্যাক প্রথায় খেলতে অভ্যস্থ। আক্রমণ ধারার
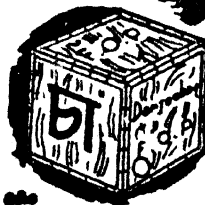
সংগে পরস্পর স্থান পরিবর্তনের পদ্ধতি, দৈহিক পটুতা, পায়ের ক্ষিপ্রতা সবই এদের প্রশংসার দাবী রাখে, তবে গোলে শট করবার ক্ষমতা ক্রীড়াধারার সংগে সংগতিপূর্ণ নয়। শুটিং দুর্বলতা এদের খেলার প্রধান ত্রুটি।

মোহনবাগান এবং আই এফ এ এদের কাছে পরাজিত হলেও দৃঢ়তার সংগে খেলেছে একথা স্বীকার করতেই হবে। শ্রম কাতরতাই ছিল কলকাতার লীগ চ্যাম্পিয়ন ও বোম্বাইয়ের রৌভার্স বিজয়ী মোহনবাগানের শোচনীয় পরাজয়ের প্রধান কারণ। ২৫ মিনিট করে ৫০ মিনিট যারা খেলতে অভ্যস্থ ৩৫ মিনিট করে ৭০ মিনিট খেলালে তাদের যে অবস্থা হয় মোহনবাগান এবং আই এফ এ দলের খেলোয়াড়দেরও হয়েছিল সেই অবস্থা। শেষ দিকে মোটেই দম ছিল না, ফলে সবারই চোখে মুখে ফুটে ওঠে শ্রম কাতরতার স্পষ্ট ছাপ। কিন্তু আন্তর্জাতিক ফুটবলের সংগে তাল রেখে চলতে হলে আমাদের খেলার সময় বাড়াতে হবে—হতে হবে শ্রমশীল, এমনভাবে স্বাস্থ্য গড়ে তুলতে হবে, এমনভাবে অনুশীলন করতে হবে যাতে ৯০ মিনিট খেলতে আমরা পরিশ্রান্ত হয়ে না পড়ি। কারণ আন্তর্জাতিক ফুটবলের স্থায়িত্বকাল ৯০ মিনিট। গ্রীষ্ম প্রধান দেশে আমরা ৭০ মিনিট খেলতে সমর্থ হলে শীত প্রধান দেশে ৯০ মিনিট খেলতে আমাদের কোন কষ্ট হবে না বলেই মনে হয়। নিখিল ভারত ফুটবল ফেডারেশনের এবিষয়ে উদ্যোগী হয়ে খেলার সময় বাড়ানো উচিত। তারা কি এবিষয়ে উদ্যোগী হবেন? পায়ে বুটের বেড়ি পরিয়ে খালি পায়ে খেলার বৈশিষ্ট্যকে জলাঞ্জলি দিতে যারা একটুও দ্বিধা বোধ করেননি, সময় বাড়ানোর ব্যাপারে তাদের এ দ্বিধা কেন?

* * *

পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান আন্তর্জাতিক খেলাধুলার অন্যতম উদ্দেশ্য। কিন্তু অপরের ভাষা জানা না থাকলে ভাব বিনিময়ে যে সমস্যা দেখা দেয় ভারত ও সোভিয়েট রাশিয়ার খেলোয়াড়দের মধ্যে ভাব বিনিময়ের ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে সেই সমস্যা। ইস্টবেংগল ক্লাবের রাশিয়া সফর থেকে এই পর্যন্ত ভারত ও রাশিয়ান খেলোয়াড়দের মধ্যে অনেকগুলি ফুটবল খেলা হয়ে গেল; কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই দুই দেশের খেলোয়াড়রা কি প্রাণ খুলে মিশতে পেরেছে। সাংবাদিকদেরও এই অবস্থা, তারাও রাশিয়ান খেলোয়াড়দের সংগে প্রাণখুলে আলাপ জমাতে পারেনি ভাষার অজ্ঞতায়। সম্প্রতি দুই একজন ক্রীড়া-সাংবাদিক বিশ্ব যুব উৎসব উপলক্ষে পোল্যান্ড রাশিয়া প্রভৃতি ঘুরে এসেছেন এবং সে দেশ থেকে শিখেও এসেছেন দু'একটি কথা। কিন্তু 'দোবরে উতরো' (গুড মর্নিং), 'স্পেসিবা' (থ্যাংক ইউ) বা 'দশভিদানিয়া' (গুড নাইট) পর্যন্ত। তার বেশী নয়। এদের কাছ থেকে এক আধটি কথা ধার করে আমরাও রাশিয়ান খেলোয়াড়দের অভিবাদন এবং প্রত্যাভিবাদন জানিয়েছি। আগে ধারনা ছিল একটু ইংরেজী জানা থাকলে পৃথিবীর অনেকের সংগেই ভাবের আদান প্রদান হতে পারে; কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে আমাদের ধারনা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। ইংরেজী ভাষার তোয়াক্কা রাখে না এমন দেশের প্রতিপত্তি বিশ্বে কম নয়।

* * *

উত্তর কলকাতা কংগ্রেস কমিটি এবং আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে মস্কো লোকোমোটিভ দলের সম্বর্ধনার আয়োজন হয়েছিল। এইসব সম্বর্ধনা সভায় রাশিয়ান টীমের দলপতি মিঃ জর্গোশাইয়ের বক্তৃতাকালে দো-ভাষীর কাজ করেছেন শ্রীনিশিথেশ ব্যানার্জী ও শ্রীহীরেন সান্যাল। এরা দুজন কলকাতা হাইকোর্টের দো-ভাষী। হাতে কাছে এ'দের পাওয়া না গেলে রাশিয়ান দল পতির বক্তৃতার মর্ম বুঝতে একটু অসুবিধা হত বৈকি! যাই হোক এদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আই এফ এর কর্মকর্তা, খেলোয়াড় ও রেফারীদের পুরস্কার দানের সময় রাশিয়ান দলপতি দুইজন দো-ভাষীকেও দুটি ঝর্ণা কলম উপহার দিয়ে গেছেন। পুরস্কার দানে কথায় আর একটি কথা মনে পড়ে গেল। গ্রে ইস্টার্ন হোটেলে আই এফ এ প্রদত্ত নৈ ভোজের পর রাশিয়ান দলপতি পুরস্কার প্রদানের জন্য খেলোয়াড়দের আহ্বান করে তখন কোন খেলোয়াড়কেই খুঁজে পাওয়া যা না। আই এফ এর সম্পাদকরূপী সারথি শ্রী এম দত্ত রায় শ্রীকৃষ্ণের মত এগিয়ে আসেন- 'কর্মফল আমাকেই প্রদান কর'। ভারোপা মোহনবাগান ও আই এফ এ খেলোয়াড়দের পুরস্কার তাঁর হাতেই সমর্পণ করেন। প জানা যায় কোন খেলোয়াড়কেই নিমন্ত্রণ কর হয় নাই। রাশিয়ান খেলোয়াড়দের সম্বর্ধনা জন্য আয়োজিত নৈশ ভোজ সভায় উপস্থি থাকবার জন্য আই এফ এর সদস্যবৃন্দ, তাদে সাঙ্গপাঙ্গ, কয়েকজন চিত্রাভিনেতা, খেল রেফারী, লাইন্সম্যান কেউই নিমন্ত্রিতে তালিকা থেকে বাদ যাননি। কয়েকজন অ সাংবাদিকও নিমন্ত্রণ পেয়েছিলেন; কি খেলোয়াড়? একজনও নয়। এ যেন 'য বিয়ে তার দেখতে মানা' গোছের ভাব। যাদে শ্রমে আই এফ এ-র এই জমিদারি তাদের প্র এই ঔদাসীন্য কেন?

* * *

আমেরিকান সাঁতারুদের কলকাতায় দিন অবস্থানের মধ্যে প্রদর্শনী সং তাঁরা বাঙ্গলার সংগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা কর মাত্র একদিন। বাকী দু'দিন ক্লাবের সাঁতারের কৌশল এবং ওয়াই এম এ হলে সাঁতারের ছায়াচিত্র দেখিয়ে গে ছায়াচিত্র এবং সাঁতারের নানা রকমের পদ্ধতি দেখে বাঙ্গলার সাঁতারুরা আমেরি সাঁতারুদের কাছ থেকে শিক্ষামূলক কি গ্রহণ করেছে সন্দেহ নেই। কিন্তু আমেরি সাঁতারুদের যে ছলাকলা দেখবার আগ সবচেয়ে বেশী ছিল, তা হচ্ছে স্কি ব্রাউনিংয়ের ডাইভিং। স্কিপ ব্রাউ অলিম্পিকের স্প্রিং-বোর্ড ডাইভিং চ্যাম্পি ১৯৫২ সালের হেলসিঙ্কি অলিম্পিকে তি এই খেতাব লাভ করেছেন। সুতরাং স্প্রি বোর্ডের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ডাইভারের থেকে ডাইভিংয়ের নয়নাভিরাম দৃশ্য দে যাবে তাতে সন্দেহ কি? সত্যিই আজাদ হি বাগে ডাইভিংয়ের সুচারু ভঙ্গি দেখিয়ে তি দর্শকচিত্ত জয় করে গেছেন। শূন্যে দেহটি ঘুরপাক খাইয়ে কখনো সোজাভাবে কখনো উল্টোভাবে জলের উপর পড়ে যাবার মধ্যে যে কত নৈপুণ্য দেখানো য স্কিপ ব্রাউনিংয়ের ডাইভিং না দেখলে

কঠিন। একটি মানুষে অন্য ...কে নিয়ে জলের ছিটে উপরে না, জলে কোন তোলপাড়ও নেই; ...বর্শাফলকের মত মানুষটি জলের ...তলিয়ে যাচ্ছে, আবার ভেসে উঠছে। ...পড়বার সময়ই বা দেহের কি মনোরম ... কতখানি নৈপুণ্য থাকলে এবং কত ... ফলে দেহের ভারসাম্য বজায় রেখে ...লে ডাইভ খাওয়া সম্ভব, তা অনুমান ...রে কষ্টসাধ্য নয়। জলের উপর ৯০ ... পড়লে জল ছিটকে উপরে ... কিন্তু শূন্যে কয়েকটি সামার-... দেহের ভারসাম্য বজায় রেখে ৯০ ...জলে পড়া কি সহজ কথা? ... বাগে ন্যাশনাল সুইমিং এসো-...নবনির্মিত কংক্রিট ডাইভিং বোর্ড ... উন্নত নৈপুণ্য দেখানর সহায়ক ... সন্দেহ নেই। বোর্ডটি তৈরী করবার ...স্প্রিং-বোর্ডে 'ফালক্রাম' (Fulcrum) ...যোজিত করা হয়। 'ফালক্রামের' সাহায্যে ডাইভার তাঁর দেহের ভারসাম্য বজায় রাখবার ... নিজের ইচ্ছেমত স্প্রিং সরিয়ে বোর্ডটিকে ...পন করতে পারেন। এখানে বলা যেতে ...রে, ভারতের অন্য কোন ডাইভিং বোর্ডে ...লক্রামের' এমন ব্যবস্থা নেই।

ডাইভিংএ আমেরিকান ডাইভারদের শ্রেষ্ঠত্ব অনস্বীকার্য। গত দুইবারের অলিম্পিক ফিক্সড বোর্ড ডাইভিং চ্যাম্পিয়ন স্যামী লী-ও আমেরিকার অধিবাসী। অবশ্য লী-র আদি বাস ছিল কোরিয়ায়, এখন তিনি আমেরিকাতেই স্থায়ীভাবে বাস করছেন এবং সেখানকার নাগরিকত্বও লাভ করেছেন। গত বছর স্যামী লী ভারত সফর করে গেছেন, কিন্তু বিজ্ঞানসম্মত সুইমিং পুলের অভাবে কলকাতায় ডাইভিংয়ের কলাকৌশল দেখাতে পারেন নি। বিশ্ববিখ্যাত ডাইভার ডেস্ জার্ডিন তাঁর ভাবী পত্নী মিস ম্যারিয়ম হপকিনসকে সঙ্গে করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে কলকাতা সফর করে গেছেন। পরে এঁরা পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। আমেরিকান দম্পতির সেই ডাইভিংয়ের কলাকৌশল এখনো অনেকের স্মৃতিপটে অম্লান আছে। স্কিপ ব্রাউনিংয়ের ডাইভিংয়ের নয়নাভিরাম দৃশ্যও অনেক দিন দর্শকমনে জাগরূক থাকবে।

ব্রাউনিং ছাড়া আমেরিকার সাঁতারু দলে কয়েকজন এমন সাঁতারু ছিলেন, যাঁরা তাঁদের দেশের একাধিক রেকর্ডের অধিকারী। ব্রেস্ট স্ট্রোকে এঁদের মধ্যে কেউ ভাল সাঁতারু ...লেন না, ফলে ব্রেস্ট স্ট্রোকে কমল সাহার পক্ষে জয়লাভ সহজ হয়েছে। কিন্তু অন্য সব বিষয়েই আমেরিকান সাঁতারুরা অনবদ্য ...গীতে সাঁতার কেটে বাঙলার সাঁতারুদের ...রেছেন পরাজিত। তাঁদের দুরত্ব অতিক্রমের ...র ভারতের রেকর্ড নিরূপিত সময়ের চেয়ে ...ক উন্নত ছিল।

হায়দরাবাদের ফতে ময়দানে ভারত ও নিউজিল্যান্ডের প্রথম টেস্ট খেলা অমীমাংসিত-ভাবে শেষ হবার পর বোম্বাইয়ের দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় ভারত এক ইনিংস ও ২৭ রানে নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে দিয়েছে। প্রথম টেস্টে অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও নিউ-জিল্যান্ড দলের খেলায় যে দৃঢ়তার পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল, দ্বিতীয় টেস্টে তাদের খেলায় সে দৃঢ়তা প্রকাশ পায়নি। প্রথম টেস্টের মত এ টেস্টেও ভারত টসে জয়লাভ করে প্রথম ব্যাটিং করবার সুযোগ পায় এবং ৮ উইকেটে ৪২১ রান করে ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। এই রানের বিরুদ্ধে নিউ-জিল্যান্ডের ব্যাটিংয়ের সূচনা অবশ্য ভালই হয় এবং ৫টি উইকেট হারিয়ে তৃতীয় দিনের শেষে তারা সংগ্রহ করে ২০৮ রান। চতুর্থ দিনের খেলায় নিউজিল্যান্ডের ব্যাটিংয়ে শোচনীয় বিপর্যয় দেখা দেয়। বাকী পাঁচটি উইকেটে তারা ৫০ রানের বেশী সংগ্রহ করতে পারে না। ফলে ফলো অন করে দ্বিতীয় ইনিংসে তাদের ব্যাটিং আরম্ভ করতে হয় এবং দিনের শেষে ৭টি উইকেট হারিয়ে ৯৯ রান তোলে। পঞ্চম দিন খেলা আরম্ভের পর মাত্র ৫৫ মিনিটের মধ্যে বাকী তিনটি উইকেট পড়ে যায়। ভারত এক ইনিংস ও ২৭ রানে জয়লাভ করে। তৃতীয় দিন থেকে খেলার 'পিচ' স্পিন বোলারদের সহায়ক হওয়ায় ভারতের জয়লাভ যেমন সহজ হয়েছে তেমন নিউজিল্যান্ডের পরাজয়ও হয়েছে ত্বরান্বিত।

দ্বিতীয় টেস্টে ভারতের অভিজ্ঞ খেলোয়াড় ভিনু মানকড়ের ২২৩ রান লাভ বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। পলি উমরিগড় আগের টেস্টে ঠিক ২২৩ রান করেই ভারতের টেস্ট ক্রিকেটে নতুন ইতিহাসের সৃষ্টি করেছিলেন, মানকড় হয়তো আবার নতুন রেকর্ড করতে পারতেন, কিন্তু একটু চঞ্চলতার ফলে তিনি উমরিগরের চেয়ে একটিও বেশী রান করতে পারেন নি। নিউ-জিল্যান্ডের ব্যাটসম্যানদের মধ্যে দলের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় বার্ট সাটক্লিফ ছাড়া আর কেউই ব্যাট ধরে বেশিক্ষণ টিকতে পারেন নি। সাটক্লিফ প্রথম ইনিংসে ৭৩ আর দ্বিতীয় ইনিংসে ৩৭ রান করে প্রশংসা অর্জন করেন। ফলাফল :—

দ্বিতীয় টেস্ট

ভারত—প্রথম ইনিংস (৮ উইঃ ডিঃ) ৪২১ (ভি মানকড় ২২৩, কৃপাল সিং ৬৩, ফাদকার নট আউট ৩৭; কেভ ৭৭ রানে ৩ উইঃ, পুর ৪৯ রানে ২ উইঃ, ম্যাকগিবন ৫৬ রানে ২ উইঃ)

নিউজিল্যান্ড—প্রথম ইনিংস ২৫৮ (বার্ট সাটক্লিফ ৭৩, জন রিড ৩৯, এ ম্যাকগিবন ৪৬; এস গুপ্তে ৮৩ রানে ৩ উইঃ, ফাদকার ৫৩ রানে ২ উইঃ, রামচাঁদ ৪৮ রানে ২ উইঃ)

নিউজিল্যান্ড—দ্বিতীয় ইনিংস ১৩৬ (বার্ট সাটক্লিফ ৩৭; এস. গুপ্তে ৪৫ রানে ৫ উইঃ, মানকড় ৫৭ রানে ৩ উইকেট)

(ভারত এক ইনিংস ও ২৭ রানে বিজয়ী)

দেশী সংবাদ

২৮শে নবেম্বর—সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী মঃ বুলগানিন আজ মাদ্রাজে এক সম্বর্ধনা সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, ভারতে পর্তুগীজ এলাকার অস্তিত্ব বহাল রাখার কোন যৌক্তিকতা নাই। তিনি আরও বলেন যে, গোয়ার মুক্তি সংগ্রামে রাশিয়া সকল সময়েই ভারতের পাশে থাকিবে।

দিল্লীর নাগরিকগণ আজ লালকেল্লার দেওয়ান-ই-খাসে সৌদী আরবের রাজাকে নাগরিক সম্বর্ধনা জানায়। প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু অনুষ্ঠানের তাৎপর্য বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে জানান যে, এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া আরব ও ভারতের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের এক গৌরবময় অধ্যায়ের সূচনা হইল।

রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের সুপারিশ সম্পর্কে রাজ্য সরকারসমূহের অভিমত জ্ঞাপনের সময়ের মেয়াদ নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে আইনমন্ত্রী শ্রী সি সি বিশ্বাস অদ্য লোকসভায় একটি বিল উত্থাপন করেন।

অর্থমন্ত্রী শ্রীচিন্তামন দেশমুখ আজ লোকসভায় জানান যে, শ্রীরামকৃষ্ণ ডালমিয়া স্বেচ্ছায় ভারত ইনসিওরেন্স কোম্পানীর এক কোটি ৮০ লক্ষ টাকা প্রত্যর্পণের যে প্রস্তাব করিয়াছেন, সরকার তাহা মানিয়া লইয়াছেন।

২৯শে নবেম্বর—সোভিয়েট রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী মঃ বুলগানিন এবং সুপ্রীম সোভিয়েট সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য মঃ খ্রুশ্চেভ আজ কলিকাতায় আগমন করিলে পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসিগণের পক্ষ হইতে মহানগরীর জনগণ তাঁহাদিগকে অভূতপূর্ব স্বাগত সম্ভাষণ জ্ঞাপন করেন।

ভারত হইতে তীর্থযাত্রী দলসমূহ পূর্বে অনুমতি গ্রহণ না করিয়া বৎসরের সকল সময়েই পশ্চিম পাকিস্থানস্থিত শিখ তীর্থ নানকানাসাহেবে অবাধে যাইতে পারিবে। আজ ভারতস্থিত পাকিস্থান হাই কমিশনার মিঃ গজনফর আলী খাঁ কর্তৃক পাকিস্থান সরকারের এই সিদ্ধান্ত ঘোষিত হইয়াছে।

নয়াদিল্লীতে প্রাপ্ত এক খবরে প্রকাশ, পশ্চিম পাকিস্থানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশস্থ খণ্ড জাতীয় এলাকার চমনে পাখতুনদের ব্যাপকভাবে গ্রেপ্তার করা হইতেছে। গত মাসে চমনবাজার ও রাস্তায় পাক বিরোধী বিক্ষোভ প্রদর্শন সম্পর্কে ২১ জন পাখতুনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী বক্সী গোলাম মহম্মদ এক জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে ঘোষণা করেন যে, করাচীর সর্বদল সম্মেলন কাশ্মীরবাসীদের ভারতে অবস্থানের দৃঢ় সঙ্কল্পের পরিবর্তন ঘটাইতে পারিবে না। কাশ্মীরের ভারতে যোগদানের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত ও অপরিবর্তনীয়।

মধ্যপ্রদেশের অর্থমন্ত্রী শ্রীব্রিজলাল বিয়ানির রাজ্য বিধানসভায় নির্বাচন বাতিল বলিয়া আজ নির্বাচন ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক ঘোষিত হইয়াছে।

৩০শে নবেম্বর—আজ কলিকাতা ময়দানে অগণিত নরনারী সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী মঃ বুলগানিন ও মঃ খ্রুশ্চেভকে বিপুল সম্বর্ধনা জানায়। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু এই সম্বর্ধনা সভায় ঘোষণা করেন যে, সোভিয়েট নেতৃদ্বয়কে সম্বর্ধনা করিবার জন্য এইখানে যে বিরাট জনতার সমাবেশ হইয়াছে, সেরূপ সমাবেশ তিনি ভারতের কোথায়ও এমন কি পৃথিবীর অন্য কোথায়ও দেখেন নাই।
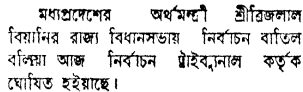
আজ রাজ্যসভায় তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে হিন্দু উত্তরাধিকার বিলটি গৃহীত হয়। এই বিলে মৃতের সম্পত্তিতে পুত্র ও কন্যার সমান অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে।

১লা ডিসেম্বর—কেন্দ্রীয় শিক্ষাদপ্তর কর্তৃক রাজ্য সরকারসমূহের নিকট প্রেরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, রাজনৈতিক দলসমূহ কর্তৃক নির্বাচনের প্রচারকার্যে অল্প বয়স্ক ছাত্রদিগকে নিয়োগ জাতীয় স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর এবং তাহা পরিহার করা উচিত।

আজ সকালে রেঙ্গুন যাত্রার প্রাক্কালে সোভিয়েট নেতৃদ্বয় মঃ বুলগানিন ও মঃ খ্রুশ্চেভকে দমদম বিমানঘাটিতে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।

আজ লোকসভায় প্রশ্নোত্তরকালে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু জানান যে, পর্তুগীজ সরকার কর্তৃক ২৬ জন ভারতীয় সত্যাগ্রহী দণ্ডিত হইয়াছেন এবং পাঁচজনকে গোয়া, দিউ ও দমনে আটক রাখা হইয়াছে।

নেপালের মহারাজা মহেন্দ্র এবং তাঁহার পত্নী আজ কলিকাতায় পৌঁছিলে সম্বর্ধিত হন।

২রা ডিসেম্বর—প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু কংগ্রেসী সংসদ সদস্যদের নিকট প্রেরিত এক পত্রে বলিয়াছেন, সংবিধান সংশোধন বিল সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরণের প্রস্তাবে সরকারের পরাজয় ঘটায় একটি অদ্ভুত পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, আমরা ইহা অতিক্রম করিতে না পারিলে ভবিষ্যৎ কার্যসূচী বিপর্যস্ত হইবে।

আজ নয়াদিল্লীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির রাজ্য পুনর্গঠন সম্পর্কিত উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন সাব কমিটির ৪৫ [illegible] অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে [illegible] এবং মহারাষ্ট্র সমস্যা সম্পর্কে [illegible] হয়। প্রকাশ, সাব কমিটি একটি [illegible] গ্রহণ করিয়া ভূপালকে প্রস্তাবিত রাজ্যের রাজধানী করার অনুকূলে [illegible] প্রকাশ করিয়াছেন।

৩রা ডিসেম্বর—আজ লোকসভা[illegible] ত্তরের সময় প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু জ[illegible] নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর মৃত্যু [illegible] তদন্ত করার জন্য ভারত সরকার [illegible] সদস্য লইয়া গঠিত একটি [illegible] দলকে প্রেরণের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

৪ঠা ডিসেম্বর—আজ কলিকাতা জাতীয় সমরশিক্ষার্থী বাহিনীর আ[illegible] কুচকাওয়াজের সময় এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। প্রকাশ যে, একখানি [illegible] নানারূপ কসরৎ দেখাইবার সময় [illegible] ভূপতিত হইয়া জ্বলিয়া উঠে এবং উ[illegible] জন আরোহী শ্রীশান্তনুকুমার বসু [illegible] শ্রীমহাবীরপ্রসাদ ঐ প্রজ্বলিত বিমানে[illegible] দগ্ধ হইয়া মারা যান।

বিদেশী সংবাদ

২৮শে নবেম্বর—করাচীতে সর্ব[illegible] কাশ্মীর সম্মেলনের অধিবেশন আজ [illegible] হইয়াছে। উহাতে এক দীর্ঘ প্রস্তাব [illegible] করিয়া আট বৎসরের পুরাতন কা[illegible] বিরোধের মীমাংসায় বিলম্ব করার [illegible] ভারতের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয় [illegible] এই সম্পর্কে নিরাপত্তা পরিষদের 'দ[illegible] নীতির সমালোচনা করা হয়।

৩০শে নবেম্বর—বৃহৎ চতুঃশক্তি [illegible] কম্যুনিস্ট চীনের সশস্ত্র বাহিনীসম[illegible] আয়তন হ্রাস করার উদ্দেশ্যে আজ রাষ্ট্রপু[illegible] রাজনৈতিক কমিশনের বৈঠকে একটি প্রার্থ[illegible] নিরস্ত্রীকরণ চুক্তি সম্পাদনের প্রস্[illegible] করা হইয়াছে।

১লা ডিসেম্বর—অদ্য রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধা[illegible] পরিষদের রাজনৈতিক কমিটিতে ভারতের [illegible] হইতে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া স[illegible] প্রকার আণবিক অস্ত্রের পরীক্ষাকার্য স্থগি[illegible] রাখার জন্য আবেদন জানান হয়।

৮ই জানুয়ারীর মধ্যে ফ্রান্সে সাধার[illegible] নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রশ্নে ফ্রান্সের ফো[illegible] মন্ত্রিসভার ৫ জন রেডিক্যাল দলভুক্ত সদ[illegible] অদ্য পদত্যাগ করিয়াছেন।

৩রা ডিসেম্বর—মার্কিন রাষ্ট্রমন্ত্রী [illegible] জন ফস্টার ডালেস এবং পর্তুগালের পররাষ্ট্র মন্ত্রী ডাঃ পাওলো কুনহা আজ এক যৌ[illegible] ইস্তাহারে বলেন, ভারত-রহ্ম সফরকালে সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী মঃ বুলগানিন এবং মঃ খ্রুশ্চেভের সাম্প্রতিক মন্তব্যে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে ঘৃণা ও বিদ্বেষ বৃদ্ধির চেষ্টা করা হইয়াছে।

প্রতি সংখ্যা—[illegible] আনা, [illegible]—২০, বাণ্মাসিক—১০,
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা [illegible], ৬ ও ৮, সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১৩
[illegible] কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, [illegible] প্রেস লিমিটেড হইতে [illegible]